চিত্র-সূচি

পৌষ—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

মাঘ—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

ফাল্গুন—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

চৈত্র—১৩৩৩

বহুবর্ণ চিত্র

বৈশাখ—১৩৩৪

বহুবর্ণ চিত্র

জ্যৈষ্ঠ—১৩৩৪

বহুবর্ণ চিত্র

আরতি

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]　　[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

পৌষ, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

অনেক দিন হইতে অনেক প্রবন্ধে খাঁটি বেদ হইতে এত মন্ত্র উদ্ধার করিয়া আপনাদের শুনাইয়া রাখিয়াছি যে, আজ যদি তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রের দিকে একটু পক্ষপাত দেখাই, তাহা হইলে, ভরসা করি, আপনারা আমায় অবৈদিক স্থির করিয়া ফেলিবেন না। আপনারা অবশ্য ষট্‌চক্রভেদের কথা শুনিয়াছেন। ছয়টা চক্রের প্রথম ও প্রধান চক্র মূলাধার। এক একটা চক্র এক একটা শক্তিকেন্দ্র (centre of force), ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। একটা এটমই যখন শক্তির ভাণ্ডার (a magazine of relatively equilibrated energy) বলিয়া সাব্যস্ত হইল, তখন একটা নার্ভ-সেণ্টার (চক্র যদি নার্ভ-সেণ্টারই হয়) যে শক্তি-ভাণ্ডার হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? চক্রগুলি, বিশেষতঃ মূলাধার (মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে যাহার স্থান) মহাশক্তির ভাণ্ডার বলিয়া তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র বর্ণনা করেন। সাধারণ ভাবে, বিজ্ঞানের এ কথায় সম্মতি আছে। রেডিয়াম, অথবা অন্য যে-কোন পদার্থের একটা অণুই মহাশক্তির ভাণ্ডার। তবে বিজ্ঞান এখনও মূলাধার প্রভৃতির বিশেষ দাবী বিচার করিয়া দেখেন নাই; ঠিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও এ সম্বন্ধে বড় একটা চলে নাই। কুণ্ডলিনী যোগ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনা বন্ধুবর স্যার জন উডরফ সাহেবের সঙ্গে আমি পূর্ব্বে করিয়াছিলাম, এবং এ সম্বন্ধে আমার ধারণাটিকে তিনি তাঁহার "শক্তি ও শাক্ত" নামক গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে এবং "Serpent power" নামক গ্রন্থের সুদীর্ঘ ভূমিকার উপসংহারে বিস্তারিত ভাবেই বিবৃত করিয়াছেন। এখানে সে আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব না। আপাততঃ, আমাদের প্রশ্ন এই:—মূলাধার যদি শরীরেরই স্নায়ুকেন্দ্র-বিশেষ হয়, তবে তাহাকে মহাশক্তির ভাণ্ডার ভাবিতে বিজ্ঞানের কিছুমাত্র আপত্তি নাই। রেডিয়াম প্রভৃতি আবিষ্কারের পূর্ব্বে কথাটা শুনিলে অনেকে হাসিত, কিন্তু

এখন হাসিলে আনাড়ী সাব্যস্ত হইতে হইবে। কিন্তু এই মহাশক্তির ভাণ্ডারের চাবি খুলিব কি উপায়ে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিকেরা এটমের ভাণ্ডারের ঘটাটা ফাঁক দিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু ভাণ্ডার খুলিবার চাবিকাটি এখন পর্য্যন্ত তাঁদের হাতে আসে নাই। স্যার ওলিভার লজ্ বলিলেন—জোনাকি না কি এ কৌশল একটু আধটু জানে। কিন্তু যোগীরা সত্য সত্যই কি ভাণ্ডার খুলিবার ও লুটিবার একটা ফন্দি বাহির করিয়া গিয়াছেন? যদি তাহাই হয়, তবে মানবের অভিনব সাধনাকে আবার যোগীদের উপদেশ শুনিতেই হইবে; কেন না, মানুষও এখন সূক্ষ্মের মধ্যে বিপুল শক্তির ঠিকানা পাইয়া তাহাকে আয়ত্ত করার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে। এই ব্যাকুলতার সুরে পশ্চিমদেশের বর্ত্তমান ঋষিগণের চিন্তা যে ভরা! "এত শক্তি ঐটুকুখানি পদার্থের মধ্যে! কেমন করিয়া উহাকে বশে আনিব; শক্তি আহরণের জন্য বাহিরে ছুটাছুটি করিয়া প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হইয়াছে; তিল তিল করিয়া আর কত শিশির কুড়াইয়া মরিব? কাগজের উপর এই ধূলোর মধ্যেই শক্তির সাগর বাঁধা রহিয়াছে; কে আমায় সে বাঁধন খুলিয়া দিবে?"—ইহাই হইল পশ্চিমদেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের চিন্তার ধুয়া। তন্ত্র ও যোগ বলিতেছেন—"মাভৈঃ—আশ্বস্ত হও; আমি উপায় বলিয়া দিতেছি, যে উপায়ে নিজের দেহের একটা কেন্দ্র হইতে এতখানি শক্তি তুমি লুটিয়া লইতে পারিবে যে, অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টসিদ্ধি, অর্জ্জুনের কাছে উর্ব্বশীর মত, অভিসারিকা হইয়া আসিয়া তোমায় সাধিয়া যাইবে। তোমার ইচ্ছা হয় তুমি তাদের বরণ করিয়া লইও; না লইলেও, কাহারও শাপে নপুংসক হইয়া অজ্ঞাতবাস করিতে তোমায় হইবে না।"

তবেই, এটমিক্ এনার্জিকে বশে আনিবার কৌশল যোগীদের কাছ হইতে শিখিতে পারিব মনে হইতেছে। বিজ্ঞানাগারে সে কৌশল এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই—বিজ্ঞানাগারের যে সমস্ত মামুলি উপায় (ordinary chemical and physical means) ছিল, তারা একরূপ এ আসরে হারি মানিয়া গিয়াছে। সিদ্ধাশ্রম দাবী করিতেছেন—এর উপায় আমি পাইয়াছি। শিবসংহিতা, ষট্চক্রনিরূপণ প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থে দেখিতে পাই যে, চক্রগুলি ঠিক স্থূল জিনিস নহে; সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বলিয়াই এগুলি কথিত হইয়াছে। এগুলিকে ঠিক্ নার্ভ-সেণ্টারস্ বা গ্যাংলিয়া ভাবিলে বোধ হয় ঠিক হইবে না। প্রসিদ্ধ দয়ানন্দ সরস্বতী না কি শবব্যবচ্ছেদ করিয়া, চক্রসমূহের কোনই ঠিকানা না পাইয়া, ও-সবে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রেডিয়ামের তেজোবিকীরণ ত চোখে দেখি না, অনেক যন্ত্রেও (যথা Spectroscope) ধরা পড়ে না; তাই বলিয়া জিনিসটাকে গাঁজাখুরি বলিব কি? আচ্ছা, ধরুন, চক্রগুলি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্তু। অবশ্য খুব ছোট জিনিসকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন বড় (magnify) করিয়া দেখার ব্যবস্থা আছে, তেমনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চক্র প্রভৃতিকেও চিন্তার সময় বড় করিয়া ভাবিবার ব্যবস্থা আছে। এক একটা চক্রের মধ্যে ভাবিতে হইবে কত কাণ্ডকারখানা! এখন, এই সূক্ষ্ম চক্রগুলি এটম, ইলেক্‌ট্রণের মত সূক্ষ্ম কি না, তার আলোচনায় লাভ নাই। প্রসঙ্গক্রমে, এটম ও চক্র বা system এ কথাটা আপনারা স্মরণ রাখিবেন। এই চক্রগুলির মধ্যে প্রচুর শক্তি গুপ্ত রহিয়াছে। সিদ্ধাশ্রম বলিতেছেন—আমি উপায় বলিয়া দিতেছি, যে উপায়ে এই শক্তিকে তুমি কাজে লাগাইতে পারিবে। সে উপায় কুম্ভক, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি। বিজ্ঞানাগার এ উপায় এখনও জানে না; কাজেই সে এটমিক্ এনার্জিকে যে কি উপায়ে ব্যবহারে আনিবে, তার হদিশ পাইতেছে না। আকাশে উড়িবার ইচ্ছা? এটমিক্ এনার্জির দ্বারা এ কাজটা হাঁসিল করিতে পারিলে বেশই হইত; কিন্তু কি করিব, সে এনার্জি আমার অস্পৃশ্যা, অভোগ্যা—যদিচ এখন আর অদৃশ্যা নহেন। কাজেই পেট্রল পোড়াইয়া এরোপ্লেন চালাইতে হইতেছে। তাহাতে হাঙ্গামা ও বিপদ ঢের। কিন্তু করিব কি? সিদ্ধাশ্রম বলেন—মূলাধার চক্রে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে প্রাণায়াম ও ধ্যান দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তোল, এরোপ্লেন লাগিবে না, আপনি দেহ আকাশে উঠিয়া যাইবে। শিবসংহিতা বলিতেছেন—

"যঃ করোতি সদাধ্যানং মূলাধারে বিচক্ষণঃ।
তস্য স্যাদ্দার্দ্দুরী সিদ্ধি ভূমিত্যাগঃ ক্রমেণ বৈ।"

মূলাধার-চক্রে সংযম করিলে দার্দ্দুরী গতি এবং ক্রমশঃ ভূমিত্যাগ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এক প্রবন্ধে প্রাণায়ামের বিস্তৃত আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছিলাম, ভূমিত্যাগ করিয়া শূন্যে উঠিতে গেলে পৃথিবীর আকর্ষণের বিরুদ্ধে কি ভাবে আমাদের চেষ্টা-চরিত্র করিতে হয়।

পৃথিবীর টানের বিপরীত দিকে তার চাইতে বলবত্তর টান যে হওয়া দরকার, তাহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন এই—সে বলবত্তর টান জন্মান যায় কি উপায়ে? মন্ত্রের দ্বারা, কুম্ভক দ্বারা অথবা অন্য কোনও উপযুক্ত উপায়ে, মূলাধার-চক্রের আণবিক শক্তি (atomic energy) আয়ত্তাধীন করিয়া, খুব সম্ভবতঃ আমরা এই বিভূতি লাভ করিতে পারি। বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি বানাইয়া, পেট্রল পোড়াইয়া যে সিদ্ধি কষ্টে-সৃষ্টে লাভ করিতেছে, যোগী মূলাধারচক্রের শক্তিব্যূহকে নিজের প্রয়োজনানুরূপ নিয়োগে সেই সিদ্ধিলাভ করেন,—ইহাই হইল সিদ্ধাশ্রমের দাবী। এ দাবী অগ্রাহ্য করার পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, স্বয়ংই হউক আর অপরের দ্বারাই হউক। আসল কথা এই যে, এই বিশ পঁচিশ বছর হইতে বিজ্ঞান যে আণবিক শক্তিরাশিকে কাজে লাগাইবার জন্য উতলা হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু কোনই কূল-কিনারা করিতে পারিতেছেন না, সিদ্ধাশ্রম, অন্ততঃ একটা ব্যাপারে, সেই শক্তিকে ব্যবহারে আনার উপায় দেখাইয়া দিতে পারেন বলিতেছেন। মূল-চক্রে যে শক্তিরাশি রহিয়াছে, তাহাকে কুণ্ডলিনীশক্তি বলা হইতেছে কেন—এ বিচার খুব প্রয়োজনীয় হইলেও, এখানে আমরা করিব না। আমার বোধ হয়, অণুর ভিতরকার শক্তির যে নক্সা, তাহা সম্ভবতঃ কুণ্ডলাকৃতি। জে, জে, টম্‌সন, রাদারফোর্ড, নিকল্‌সন, র‍্যাম্‌জে প্রভৃতি অণুর অন্দরমহলের একটা নক্সা আঁকিয়া ফেলার জন্য অনেক দিন হইতেই ব্যস্ত আছেন। শেষ পর্য্যন্ত নক্সাখানি যে কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা এখনও বলা শক্ত; তবে অণুর ভিতরে শক্তির বিন্যাস মোটের উপর কুণ্ডলাকৃতি (rotatory), ইহা বোধ হয় কতকটা নিঃসংশয়েই বলা যাইতে পারে। টম্‌সন সাহেবের মতে একটা "Uniform sphere of positive electrification" এর মধ্যে দানা দানা নেগেটিভ চার্জগুলা নানা ভাবে নানা সংখ্যায় পাক খাইতেছে। নিকল্‌সন সাহেবের মতে পজিটিভ চার্জটাও অবিভক্ত (continuous) অবস্থায় নাই—সেটাও টুক্‌রা-টুক্‌রা ভাবে অণুর মধ্যে রহিয়াছে। এ মতেও কিন্তু পাক। কাজেই সকল মতের মিল দেখিতেছি একটা কথায়—শক্তির পাক বা আবর্ত্ত। এই পাক খাওয়া শক্তি কুণ্ডলিনী শক্তি।

বৈজ্ঞানিকেরা এ নক্সা আঁকিতে গিয়া কতকটা পরীক্ষার সুযোগও পাইয়াছেন, কিন্তু বেশীর ভাগ আন্দাজ ও গণা-গাঁথার উপরই তাঁদের নির্ভর। কিন্তু সিদ্ধাশ্রম বলেন—যোগী ধ্যানে সাক্ষাৎ দেখিতেই পান, কি ভাবে শিববিন্দুর চারি ধারে শক্তিবিন্দু পাক খাইতেছে। আইন-ষ্টাইন প্রভৃতির মত দেশ ও কালকে এক করিয়া দেখিলে, ঐ পাক-খাওয়া বিন্দু একটা স্থির বক্র রেখাতে (fixed curve) পরিণত হয়। এই যে স্থির রেখা তাহাই তন্ত্রের "সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা, প্রসুপ্তভুজগাকারা" কুণ্ডলিনী শক্তি। এ কথাটা বোঝা একটু শক্ত। পূর্ব্বে এক দিন এই শক্তিবিন্দুর প্রসঙ্গ পাড়িয়া আপনাদের অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি করিয়া দিয়াছিলাম। আজ আবার দেশ ও কালের মিলানোর ব্যাখ্যা যুড়িয়া দিলে আপনারা হয়ত এই মুহূর্ত্তেই আমার সম্বন্ধে 'হরতাল' করিয়া বসিবেন। যাহা হউক, আণবিক শক্তিকে, শক্তির সূক্ষ্ম অব্যক্ত ভাবটিকে, ব্যবহারে আনিবার একটা উপায় সিদ্ধাশ্রম উদ্‌ভাবন করিয়া দিলেন—এইটাই খুব প্রয়োজনীয় কথা, এবং ইহার দিকেই বিজ্ঞানের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়া দরকার। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মানবাত্মা একটা সমস্যাপূর্ণ সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, যেখানে পুরানো লইয়া আর নিশ্চিন্ত ভাবে পড়িয়া থাকা চলিতেছে না, অথচ নূতনের দিকে সাহস করিয়া এগিয়ে পড়ার সুব্যবস্থিত পথও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। রেডিয়াম প্রভৃতি অবতীর্ণ হইয়া আমাদের লক্ষ্যকে একরূপ স্থির করিয়া দিয়াছে—সে লক্ষ্য আণবিক শক্তি-ভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব। কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিব কোন্ পথে? প্রাচীন বিদ্যা বলিতেছেন—সে পথ যোগ; সে পথের পাত্তা বিজ্ঞানাগারে এতদিন মিলে নাই; সিদ্ধাশ্রমে মিলিবে। কথাটা পরখ করিয়া দেখা দরকার।

বাস্তবিক আমার মনে হয়, বিজ্ঞানের কার্য্যপ্রণালীর মোড় ফিরিয়া যাইবার শুভ মুহূর্ত্ত উপনীত হইয়াছে। সেই বেকন প্রভৃতির পর হইতে বিজ্ঞানের দৃষ্টি, আস্থা ও মমতা ছিল বাহিরের উপর। কয়লা পোড়াইতে হইবে, তবে এঞ্জিন চলিবে, ট্রাম চলিবে; তেল পোড়াইতে হইবে, তবে মোটর চলিবে, এরোপ্লেন উড়িবে—এই ধারণা বিজ্ঞানে বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছিল। এটম, মলিকিউলগুলা যেন বিলিয়ার্ড বল—বাহির হইতে টক্কর খাইয়া তাহারা চলা

ফেরা করে—তাদের আবার অন্দরমহল, সেখানে আবার মহাশক্তির ভাণ্ডার! আগের বৈজ্ঞানিকেরা আণবিক শক্তি প্রভৃতির কথা মুখেও আনিতেন না। কিন্তু রেডিয়াম প্রভৃতি আসরে নামার পর হইতে বিজ্ঞানের দৃষ্টি বোধ হয় আবার ঘরের দিকে, অন্দরের দিকে ফিরিতে সুরু করিয়াছে। এখন বিজ্ঞান ভাবিতেছেন—"তাই ত, যেটাকে নিতান্ত ছোট বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছি, তাহার ভিতরে এত শক্তি মজুত রহিয়াছে যে, তাহাকে বশে আনিতে পারিলে, আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর হইতে পারি। বাহিরে ছুটাছুটি করার প্রয়োজন কি? কয়লা, পেট্রল পোড়াইয়া আনন্দময়ের এমন সোণার সৃষ্টিটাকে শ্মশানবৎ বিকৃত কুৎসিত করিয়া তোলার দরকার কি? যে-কোন একটা এটম লইয়া বসিয়া গেলেই ত হয়। বাহিরের এটমেই বা কাজ কি? আমার দেহেরই কোনও সূক্ষ্ম কেন্দ্রের সাধনা করিলেই ত হয়! সেখানে এত শক্তি আছে এবং সেখান হইতে এত শক্তি বাহির করিয়া লইব যে, আমার কাছে কোন সিদ্ধিই দুর্লভ রহিবে না। অথচ ঘরে বসিয়াই এ সাধনা—এ শক্তির উদ্বোধন। ভাল, সাধন ত করিব, কিন্তু উপায় বাত্লাইবে কে? চপ্ কাট্‌লেট ডেভিল্ না খাইয়া, স্যাণ্ডোর ব্যায়াম না করিয়াও, দেহে অমানুষিক শক্তি জাগাইয়া তোলা বিচিত্র নয়; কেন না, দেখিতেছি, দেহের একটা রেণুতেই প্রায় ব্রহ্মাণ্ডটা চালাইবার উপযুক্ত শক্তি মজুদ রহিয়াছে; কিন্তু কোথায় গুরু! আমায় দেখাইয়া দাও আমার চলিবার পথ, আমায় শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত কর, যাহার প্রসাদে আমি সিদ্ধি, এবং সিদ্ধির চাইতেও বড়, শান্তি লাভ করিতে পারি।" বিজ্ঞানের মর্ম্মস্থানে এই চিন্তা ও প্রার্থনা জাগিয়াছে। এইবার শ্রীগুরুর আসন টলিবে কি?

যে উপায়-বিশেষের দ্বারা শক্তির ভাণ্ডারকে নিজের প্রয়োজন সাধনে লাগাইতে পারা যায়, তাহার পারিভাষিক নাম যোগশাস্ত্রে 'সংযম'। পাতঞ্জল-দর্শনের সমস্ত বিভূতি-পাদটা পড়িয়া দেখুন, এই সংযম বা মানসিক অভিনিবেশের প্রয়োগ বাহিরের জিনিসে তেমন একটা নাই; নিজের ভিতরেই এই সংযম প্রয়োগ করিয়া নানা রকমের সিদ্ধি বা বিভূতি আমরা পাইতে পারি। ধরুন, ভূত জয়। রেডিও-একটিভিটির আলোচনা-প্রসঙ্গে আমরা বলিয়াছি যে, সকল ভূতের অণুগুলার মধ্যেই নিত্য ভাঙ্গন-গড়ন চলিতেছে। ইহাই ভূত-পদার্থসমূহের বিবর্ত্তন—Evolution of matter। একটা ভূত ধীরে ধীরে বিবর্ত্তিত হইয়া অপর একটা কিছু হইতেছে; সেটা আবার হয় ত অন্য কিছু হইয়া দাঁড়াইবে। রেডিয়াম অন্য কিছু হইতে জন্মিয়াছে; আবার তাহা হইতে অন্য কিছু জন্মিতেছে। বস্তুতঃ ভূতগুলির জাতি-সম্পর্কের আভাস আমরা স্পষ্ট ভাবেই পাইতেছি। Strutt সাহেব দেখাইয়াছিলেন যে, যে-কোন জড় দ্রব্যে অন্য সমস্ত জড় দ্রব্যের ধর্ম্ম একটু-আধটু বিদ্যমান আছে; একেবারে একচেটিয়া কোনও জড়-ধর্ম্ম নাই। তার পূর্ব্বে মেণ্ডিলিফ প্রভৃতি দেখাইয়াছিলেন যে—গানে যেমন সুরের সপ্তক বা গ্রাম আছে, সেইরূপ কেমিকাল এলিমেণ্টগুলির ধর্ম্মাবলীর গ্রাম আছে। এক গ্রামের elementsএ যে সকল ধর্ম্ম দেখিলাম, পরের গ্রামের elementsএ সেই সকল ধর্ম্মের পুনরাবৃত্তি দেখিব। কাজেই অনেকদিন হইতেই মনে প্রশ্ন উঠিতেছিল—সকল element মূলতঃ কি এক নয়? একটা ভূত অন্য ভূতে বিবর্ত্তিত হইতে পারে না কি? এ প্রশ্নের "হাঁ" জবাব দিতেছিলেন অনেকেই; কেহ কেহ বা মূল বস্তুটির নামকরণ করিয়াছিলেন 'প্রোটাইল'। কিন্তু রেডিও-এক্‌টিভ্ ব্যাপার ধরা পড়িয়া এ অনুমানটিকে প্রায় প্রমাণিত সত্যই করিয়া দিয়াছে। হিকেল প্রভৃতি জীব-জন্তুদের যেমন বংশাবলী তৈয়ার করিতেছিলেন, তেমনি রাদারফোর্ড প্রভৃতি শনৈঃ শনৈঃ জড়পদার্থগুলার বংশাবলী (Genealogical tree রচিয়া ফেলিতেছেন। অতএব সকল ভূতের এক মূল ভূত, এবং ভূতগুলার রক্তের সম্পর্ক, একটার অন্যটায় পরিণতি—এখন আর অবিশ্বাস্য কথা নয়। তবে আগের মতন এখানেও মুস্কিল এই যে—এই ভূতগুলার বিবর্ত্তন আমরা ইচ্ছাধীন করিতে পারিতেছি না। প্রকৃতি নিঃশব্দে এই ভাঙ্গাগড়া, বিবর্ত্তন করিয়া যাইতেছেন; আমরা তাহা দেখিতেছি; কিন্তু ধূলাকে সোণা করিব, পাথুরে কয়লাকে খাঁটি হীরা বানাইয়া দিব (এ ক্ষেত্রে পদার্থান্তর নহে, allotropic modification) এমন পরশ-পাথর আমরা আজিও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কাজেই বিজ্ঞানাগারে, 'ভূত জয়' এই সিদ্ধিটার কথা শুনিয়া কেহ আর না হাসিলেও, এ সিদ্ধি লাভের উপায় কেহ এখনও দেখাইয়া দিতে পারিতেছেন না। এ সমস্যায়, আমাদের আবার সিদ্ধাশ্রমের অভিমুখেই

যাত্রা করিতে হইবে। পাতঞ্জল-দর্শনের ৩ পাদের ৪৪ সূত্রের মর্ম্ম এই যে, 'সংযম' দ্বারা ভূতের পাঁচটি অবস্থা জয় করিতে পারিলেই ভূত জয় হইয়া গেল। অর্থাৎ ভূতের স্থূল, সূক্ষ্ম প্রভৃতি পাঁচটি অবস্থার 'সংযম' করিতে হইবে, তাহা হইলেই—ব্যাস ভাষ্যের ভাষায়—'তত্র পঞ্চভূত স্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াৎ বৎসানুসারিণ্য ইব গাবো অস্য সঙ্কল্প বিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি।" বাছুরের পিছন পিছন যেমন গরু ধায়, তেমনি যোগীর সঙ্কল্পানুসারেই নিখিল ভূত-প্রকৃতি বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যোগী যেমনটা সঙ্কল্প করিবেন, তেমনটা ভূতই হইবে। তিনি সঙ্কল্প দ্বারা মাটিকে সত্যসত্যই সোণা করিয়া দিতে পারিবেন। ইহার ভিতরকার রহস্য বারান্তরে আরও পরিষ্কার করিয়া আলোচনা করিব, আজিকার মত কথাটা এই—বিজ্ঞান এই বিশ পঁচিশ বছর ভূত জয়ের একটা ফন্দি খুঁজিতেছেন; চোখের সামনে, একটা জিনিস বদ্‌লাইয়া আর একটা (chemically different) জিনিস হইল, দেখিতেছেন। তাঁর সাধ হইয়াছে—এই নিত্য সংহার ও সৃষ্টির ভার তিনি কতকটা নিজ হাতে লইবেন। বিজ্ঞানাগারে তাঁর পুঁজি এক রকম ফুরাইয়াছে; এইবার সিদ্ধাশ্রমের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তাঁর গতি আছে কি?

১০।১।৩ ঋক্ অগ্নিকে বিষ্ণু ও বিদ্বান্ বলিয়াছেন। বিষ্ণু মানে সর্ব্বব্যাপী। এই সর্ব্বব্যাপী অগ্নিকে চিনিতে গিয়া আমরা অণুর অন্দরমহল পর্য্যন্ত ঢুকিয়া পড়িয়াছিলুম। আমরা দেখিলাম, শুধু স্থূল জিনিসগুলা নয়, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম জিনিসগুলার মধ্যেও অগ্নিকাণ্ড চলিতেছে, যাহার ফলে পদার্থসমূহের নিয়ত সংহার ও নিয়ত সৃষ্টি হইতেছে। রেডিও-একটিভিটি লইয়া এই কথাটা বুঝিবার সুবিধা আমাদের প্রচুর হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা মস্ত কথা আমরা কতকটা বুঝিলাম—ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট শক্তি খেলা করিতেছে; এবং নব্যবিজ্ঞানের অতর্কিত কোনও উপায়ে সে শক্তিকে ব্যবহারে লাগাইতে পারিলে, মানুষ অসাধ্য-সাধন করিতে পারিবে—হয় ত ঈশ্বরত্বই লাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে নব বিজ্ঞানের সমক্ষে যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনাদিগকে শুনাইয়াছি; এবং সেই সমস্যার পূরণের জন্য, বিজ্ঞানকে যে কি ভাবে নিজের চিরপরিচিত পরীক্ষাগার ছাড়িয়া সিদ্ধাশ্রমের দিকে তীর্থযাত্রা করিতে হইবে, তাহাও আপনাদের শুনাইতে বাকি রাখি নাই। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানকে এখন যোগের সংযমে গিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে হইবে। নইলে, নব বিজ্ঞানের "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থা ঘুচিবে না, তাহার দৃষ্টির সামনে অভীষ্ট তীর্থযাত্রার পথ ঠিক সরল ও সুস্থির ভাবে প্রসারিত হইবে না। এই ভাবে নব বিজ্ঞানকে শিষ্যত্বে বরণ করিতে না পারিলে, প্রাচীন বেদ-বিদ্যারও যেন সার্থকতা নাই; মনের মত শিষ্য পাইলে, তবে না গুরু তাহার মধ্যে নিজেকে আবার যাচাই ও পরখ করিয়া লইবেন।

আজিকার উপসংহারে এই কথা—বেদ, অগ্নিকে নানা যায়গায় স্থূল রূপে দেখিলেও, তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিষ্ণুই ভাবিয়া গিয়াছেন। রেডিও-একটিভিটি পর্য্যন্ত অগ্নির দৌড় আছে কি না, এ সংস্কার মনে তুলিবেন না। ঋষিরা অগ্নিকে কিছুতেই ধরিয়া বাঁধিয়া রাখেন নাই। ১০।৩।৬ ঋক্ বলিতেছেন—"অগ্নির স্বভাব অগ্রসর হওয়া এবং সর্ব্বদিকে বিস্তারিত হওয়া। এ লক্ষণ শুধু স্থূল অগ্নি(fire)রই এমন নহে। ১০।৫।৭ ঋক্ বলেন— "অগ্নি সৎ এবং অসৎ দুই-ই; তিনি পরম ধামে আছেন, তিনি আকাশের উপরে সূর্য্য-রূপে জন্মিয়াছেন। অগ্নিই আমাদের অগ্রে জন্মিয়াছেন, তিনি যজ্ঞের পূর্ব্ববর্ত্তীকালে অবস্থিত ছিলেন। তিনি বৃষও বটেন, গাভীও বটেন; অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই তাঁর রূপ।" এ অগ্নিকে গণ্ডীতে বাঁধিয়া রাখা যায় কি? ১০।৫৬।১ ঋক্ বলেন —"তোমার তিন অংশ; স্থূল অগ্নি তোমার এক অংশ, বায়ু তোমার এক অংশ, আর জ্যোতির্ম্ময় আত্মা তোমার তৃতীয় অংশ। এই তিন অংশ দ্বারা তুমি (অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য) প্রবেশ কর।" সর্ব্বভূতে নিগূঢ় অগ্নির এ আবার কি কীর্ত্তন! ১০।৮৮।১৮ ঋক্ বলেন—"হে পিতৃগণ! তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, অগ্নি কয় জন, সূর্য্য কয় জন, উষা কয় জন, জলই বা কয় জন?" এ প্রশ্নের ভঙ্গীতেই বুঝিতেছি না কি যে, অগ্নিকে কোনও এক বিশিষ্ট রূপ দিয়া ধরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ঋষিরা করিতে রাজি ছিলেন না? তাই বলিতে সাহস হয়, অণুর ভিতরেও যে বিপ্লব ও তেজোবিকীরণ চলিতেছে বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি, সেটা সত্য-সত্যই অগ্নিকাণ্ড।

খোকার টাটি

"এ সংসার খোকার টাটি !"—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতায় কলেজ-ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন-রোডের মোড়ে খবরের-কাগজ-ফেরিওয়ালারা ফুটপাথের উপর উবু হয়ে বসে' প্রেস থেকে সদ্য আনা খোলা ছড়ানো কাগজের তা ভাঁজতে ভাঁজতে বিকট কণ্ঠে চেঁচাচ্ছিলো—আই-এ পাশের খবর বেরোয়্‌লো বাবু, আই-এ পাশের খবর বেরোয়্‌লো……

তাদের চারিদিক থেকে ঘিরে উৎসুক উৎকণ্ঠিত ছাত্রবৃন্দ ভিড় করে' ঠেলাঠেলি কর্‌ছিলো এবং ঝুঁকে পড়ে' একখানা কাগজ অপর সকলের পূর্ব্বে হস্তগত কর্‌বার চেষ্টা করছিলো। কাগজওয়ালা একখানা কাগজ তুলে একজন ক্রেতাকে দেবার চেষ্টা কর্‌ছে, আর তার হাত থেকে ছোঁ মেরে আর-একজন সেখানা নিয়ে নিচ্ছে। সুতরাং ঠেলাঠেলির অন্ত নেই—যে লোক কাগজ পেয়েছে সে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছে, আর যে তখনো কাগজ পায় নি সে ভিড় ঠেলে ব্যূহের ভিতরে ঢোক্‌বার জন্যে চেষ্টা কর্‌ছে,—ফলে বাইরে বেরোনো ও ভিতরে ঢোকা দুই-ই সহজে হচ্ছে না।

দুটি ছেলে একখানা খবরের কাগজ কিনে নিয়ে কোনো-মতে ব্যূহ ভেদ করে' বাইরে বেরিয়ে এলো, কিন্তু কাগজ-খানাকে তারা অখণ্ড বার করে' আন্‌তে পার্‌লে না; কাগজের একটা কোণ অপর একজনের আগ্রহান্বিত মুঠার মধ্যেই রয়ে গেলো। তারা বাইরে বেরিয়েই সেই কোণছেঁড়া কাগজখানা দুজনে দুদিকে ধরে' মেলে ফেল্‌লে, এবং চল্‌তে চল্‌তেই ভাগ্যবান্‌দের নামের ভিড়ের মধ্যে নিজেদের নাম তল্লাস কর্‌বার জন্য উৎসুক নেত্রের ব্যাকুল দৃষ্টি নামিয়ে নিবিষ্ট হয়ে গেলো।

একটি ছেলে ভিড়ের বাইরে এক পাশে দাঁড়িয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে কাগজ-ক্রেতাদের দিকে তাকিয়ে ছিলো; সে এবার পরীক্ষা দিয়েছে, নিজের ভাগ্যফল জান্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে আছে, কিন্তু তার এমন সঙ্গতি নেই যে চার পয়সা খরচ করে' একখানা কাগজ কেনে। সে কোনো কাগজ-ক্রেতা ছাত্রের অনুগ্রহ লাভের আশায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা কর্‌ছিলো। সে ঐ ছেলেদুটিকে তার পাশ দিয়ে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে কাগজ দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেতে দেখে কাতর বিনতির স্বরে বল্‌লে—মশায়, দয়া করে' একটু দেখুন না থাকোহরি জানার নামটা……

ছেলে দুটি কাগজ থেকে মুখ তুলে থাকোহরির মুখের দিকে তাকালে; তার পর কাগজখানা মুড়্‌তে মুড়্‌তে একজন বল্‌লে—মাপ কর্‌বেন, এখন আমাদের নাম খোঁজ্‌বার সময় নেই।

তারা দুই বন্ধুই পাশ করেছে; সাফল্যের আনন্দ তাদের

মুখে চোখে ঝলমল কর্‌ছিলো, তাদের বাড়ীতে আর বন্ধুমহলে খবর দেবার জন্ত ত্বরাও ছিলো। তারা থাকোহরির ম্লান ও ব্যাকুল মুখের দিকে লক্ষ্য না করে' হাসিমুখে গল্প কর্‌তে কর্‌তে চলে' গেলো।

তখন থাকোহরি আবার উৎসুক আকুল দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে লাগলো, আর কোন্ কাগজ-ক্রেতার অনুগ্রহ সে প্রার্থনা কর্‌বে।

থাকোহরির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো একজন লোক; থাকোহরির ব্যগ্র ব্যাকুলতা দেখে তার মনোযোগ থাকোহরির দিকে আকৃষ্ট হলো; সে দেখ্‌লে থাকোহরির পরিচ্ছদ পুরানো ও মলিন, তার মুখ গৌরবর্ণ ও সুশ্রী হলেও সেখানে দারিদ্র্যের কুণ্ঠা ও অপরাধী ভাব মুদ্রিত হয়ে আছে, তার চোখ দুটি টানা ও উজ্জল হলেও শঙ্কা-চকিত। সেই লোকটি থাকোহরিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি কি এবার এগ্‌জামিন দিয়েছিলে?

থাকোহরি তার ব্যস্ত কুণ্ঠিত দৃষ্টি সেই প্রশ্নকারীর মুখের দিকে ফিরিয়ে বল্‌লে—আজ্ঞে।

সেই লোকটি তখন থাকোহরিকে বল্‌লে—আচ্ছা দাঁড়াও, আমি কাগজ কিন্‌ছি, তুমি দেখো......

থাকোহরির মুখ কৃতজ্ঞতার আনন্দে উজ্জল হয়ে উঠ্‌লো।

সেই লোকটি একখানা কাগজ কিনে নিজে না দেখেই থাকোহরির হাতে দিলে।

থাকোহরি আবেগ-কম্পিত হাতে কাগজের পাট খুলে নিবিষ্ট একাগ্রতায় নিজের নাম খুঁজ্‌তে প্রবৃত্ত হলো। থাকোহরির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রথম বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এবং ক্রমে দ্বিতীয় বিভাগ থেকে তৃতীয় বিভাগে নেমে গেলো; যতোই তার দৃষ্টি নেমে চ'লেছিলো ততোই তার চাহনি হতাশ হয়ে উঠ্‌ছিলো; তৃতীয় বিভাগে চোখ বুলাতে বুলাতে তার চোখ সজল হয়ে উঠ্‌লো—কোথাও তার নাম তার দৃষ্টিতে ঠেক্‌লো না। সে তার অশ্রুতে-ঝাপ্‌সা চোখকে পুরা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লে না, আবার একবার প্রত্যেক বিভাগে নিজের নামের সন্ধান কর্‌লে। তার পর সে কাগজখানি সযত্নে ভাজ করে' তার-প্রতি-অনুকম্পা-পরায়ণ লোকটির হাতে যখন ফিরিয়ে দিলে তখন তার দুই গালের উপর দিয়ে ব্যর্থতার বেদনা গলে' গড়িয়ে পড়্‌ছে।

কাগজ-দাতা লোকটি থাকোহরির বিগলিত অশ্রুধারা দেখে ব্যথিত হয়ে বল্‌লে—তোমার নাম দেখ্‌তে পেলে না? তোমার নাম কি বলো তো, আমি একবার খুঁজে দেখি......

থাকোহরি ক্ষীণ আশার প্রলোভনে উচ্ছ্বসিত কান্না দমন করে' বল্‌লে—আমার নাম থাকোহরি জানা।

সেই লোকটি কাগজের আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে যখন থাকোহরির দিকে চোখ তুলে তাকালে তখন তারও চোখে জল ছলছল কর্‌ছে। সে বল্‌লে—এই কাগজে হয় তো ছাপার ভুল হয়ে থাক্‌তে পারে; দাঁড়াও, আমি অন্য কাগজ কিনে দেখ্‌ছি......

থাকোহরির মন আশার ক্ষীণ আভাসে আবার উৎসুক হয়ে উঠ্‌লো।

সেই লোকটি অন্য একখানা খবরের কাগজ কিনে খুঁজে দেখ্‌লে, তাতেও থাকোহরির নাম নেই। সে ব্যথিত দৃষ্টি তুলে থাকোহরির মুখের দিকে তাকালে।

একজন অচেনা লোকের সহানুভূতি দেখে থাকোহরি আর আপনাকে সম্বরণ করে' রাখ্‌তে পার্‌লে না, সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো—আমার মা পরের বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করে' আমাকে পড়াচ্ছিলেন; আমি মাকে কেমন করে' মুখ দেখাবো?......

এই কথা শুনে ও থাকোহরির কান্না দেখে সেই অপরিচিত লোকটিরও চোখের ছলছল জল উছ্‌লে গড়িয়ে পড়্‌লো, তার মনে হলো—এই ছেলেটির নাম যখন থাকোহরি, তখন নিশ্চয়ই এর মা অনেক ছেলে হারিয়ে হরিকে মিনতি করে' এই একটি ছেলেকে নিজের বারংবার শূন্য কোলে থাকিয়েছে; সেই মরুঞ্চে পোয়াতি যমের উচ্ছিষ্ট এই ছেলেটিকে মানুষ করে' তুলে সুখী দেখ্‌বার জন্যে কঠোর তপস্যা কর্‌ছেন; মায়ের প্রতি ছেলেরও শ্রদ্ধা ও মমতার পরিচয় তার একটি কথা থেকে যা পাওয়া গেলো, তাতে মনে হয় ছেলেটিও লেখাপড়ায় অবহেলা করে নি, পাস কর্‌বার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। চেষ্টার নিষ্ফলতা যে আরো কষ্টকর! এই কথা ভেবে নিয়ে সেই লোকটি থাকোহরিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বল্‌লে—চেষ্টায় নিষ্ফল হলেই কি অমন হতাশ হতে আছে? আবার চেষ্টা করো, আস্‌ছে বছর পাস হয়ে যাবে।

থাকোহরি চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে হতাশা-শিথিল স্বরে বল্‌লে

—আমার আর পড়া হবে না; কোথাও যা হোক কিছু কাজ করে' উপার্জন করতে হবে; মাকে আর দাসীর কাজ করতে দিতে আমি পারবো না।

থাকোহরি এই কথা কয়টি এমন করুণ স্বরে বললে যে তার সহানুভূতিতে সেই অচেনা লোকটিও ঘন ঘন চোখ মুছতে লাগলো।

রাস্তার মাঝে এই রকম কান্নাকাটি দেখে ওদের দুজনকে ঘিরে কলকাতার হুজুগ-প্রিয় বহু লোক জমা হয়ে গিয়েছিলো। সেই জনতার ভিতর থেকে একজন লোক থাকোহরির দুঃখে ব্যথিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে—ছেলেটি আপনার কে হয় মশায়?

সেই লোকটি সজল চোখের দৃষ্টি প্রশ্নকারীর দিকে ফিরিয়ে বললে—দুজনেই মানুষ, এই হিসেবে ভাই হয় বলতে পারেন; নইলে ও জাতে জানা, আর আমি মুখুজ্জে,......

আবার একজন প্রশ্ন করলে—অনেক দিনের আলাপ-পরিচয় আছে বুঝি?

উত্তর হলো—না, এই মাত্র হলো......

আবার প্রশ্ন হলো—তবে যে আপনি কাঁদছেন?

মুখুজ্জে লোকটি বিরক্ত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বললে—কাঁদবো না? মানুষ হয়ে মানুষের দুঃখে কাঁদবো না?—তবে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেনো?

প্রশ্নকারীরা পরাস্ত হয়ে নিরস্ত হলো। সমস্ত জনতা মুখুজ্জের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাতে লাগলো, চারিদিকে সকলে জনান্তিকে তার মহাপ্রাণতার প্রশংসা করতে লাগলো।

এই-সব দেখে শুনে মুখুজ্জে একটু অপ্রস্তুত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থানোদ্যত হয়ে দেখলে যে থাকোহরি সেখানে নেই। তখন সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস চেপে জনতার ব্যূহ ভেদ করে' বাইরে বেরিয়ে পড়লো।

একজন ভদ্রলোক ঘরের গাড়ীতে যেতে যেতে গাড়ী থামিয়ে কাগজ কিনছিলেন। তিনি গাড়ীতে বসে থেকেই থাকোহরি ও মুখুজ্জের কথাবার্ত্তা সব শুনছিলেন। মুখুজ্জে ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেই ভদ্রলোক গাড়ী থেকে নেমে এলেন এবং মুখুজ্জের সামনে দাঁড়িয়ে নত হয়ে নমস্কার করে' জিজ্ঞাসা করলেন—মুখুজ্জে মশায়ের নামটি কি জানতে পারি?

মুখুজ্জে বিরক্ত ভাবে একবার মাত্র প্রশ্নকারীর মুখের দিকে দেখে পাশ কাটিয়ে চলে' যেতে যেতে বললে—নাম জেনে আর কী হবে?......আমার নাম শ্রীরামযাদু মুখোপাধ্যায়......

সেই ভদ্রলোক বিনীত স্বরে বললেন—আমি মশায়কে বলতে তো পারি নে, তবে মুখুজ্জে মশায় যদি দয়া করে' এক দিন আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেন তো কৃতার্থ হই......

রামযাদু কার বাড়ীতে কোথায় কেনো যেতে হবে, না জেনেই বিরক্ত স্বরে বললে—আচ্ছা, সে একদিন দেখা যাবে......

সেই ভদ্রলোক বললেন—আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস, ৩৩ নম্বর হলধর বিশ্বাসের ষ্ট্রীটে......

রামযাদু এইটুকু শুনেই মুখ ফিরিয়ে পরাণ-বাবুর দিকে চেয়ে অগ্রাহ্যের ভাবে বললে—আচ্ছা, তা যাবো একদিন......

পরাণ-বাবুর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপান্ন হবে; তিনি খুব মোটা, আর খুব কালো; তাঁর মাথাটা হাতীর মাথার মতন, চুল ব্রহ্মতালুর উপর পাতলা হয়ে গেছে ও সেখানে টাকের আসর পাতা হচ্ছে; কিন্তু তাঁর গোঁপ প্রকাণ্ড, মুখবিবরের উপর ঝাঁপের মতন ঝুলে পড়েছে, কুলোর মতন কান-দুটোও চুলে আচ্ছন্ন; তাঁর দাড়ি কামানো। এই কদর্য্য চেহারার লোকটির বাড়ীতে পায়ের ধুলা দিবার কিছুমাত্র আগ্রহ অনুভব না করে রামযাদু পাশ কাটিয়ে দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

* * * *

পরাণ-বাবু বাড়ীতে ফিরে গিয়ে পত্নীকে উদ্দেশ করে' গম্ভীর স্বরে ডাকলেন—কোথায় গো?

পাশের ঘর থেকে তেমনি মোটা গলায় জবাব এলো——এই যে, কেনো?

এই কথা সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সেই ঘর থেকে ভোমরার মত মিশ কালো বছর ছয়েকের একটি মেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এলো এবং ছুটে পরাণ-বাবুর কাছে এসে তাঁর হাটুর কাছটা দুই হাতে জড়িয়ে ধরে' আনন্দিত স্বরে ডাকলে—বাবা!

পরাণ-বাবু বাৎসল্য-সুখের হাসিতে মুখ ভরে' তুলে মেয়ের উঁচু দিকে চাইতে গিয়ে পিছন দিকে হেলে পড়া

হাসিমুখখানির দিকে নত দৃষ্টিতে চেয়ে কণ্ঠস্বরে আদর ঢেলে বল্‌লেন—কেনো মা!

পরাণ-বাবুর এই মেয়েটির নাম কৃষ্ণকলি। ঐ নামের কালো ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য অনুভব করে' পরাণ-বাবু মেয়ের নাম রেখেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের নাম ডাকার সময় ঠাকুর-দেবতার নামটা উচ্চারণ করবার লোভটাও তাঁর মনে একটু ছিলো। কৃষ্ণকলির গায়ের রংটি বেশ কালো, চেহারাতেও শ্রী-ছাঁদের নিতান্তই অভাব—ঠোঁট দুটো পুরু উল্টানো, নাকটা নেই বল্‌লেই হয়, কপালটা ঢিপি-পানা, কান দুটো কুলোর মতন,—এক কথায় সে অতিশয় কুৎসিত। অনেক সন্তানের জনক-জননীর এক মাত্র অবশিষ্ট কোলের ধন এই মেয়ে কালো কুৎসিত হলেও বাপমায়ের বড়ো আদরের,—তাই তাঁরা কালো কুৎসিত মেয়েরও ফুলের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখে নাম রেখেছেন কৃষ্ণকলি। এই কৃষ্ণকলি নাম অতি আদরে সঙ্কুচিত হয়ে কখনো হয় কেষ্টো, আর কখনো হয় কলি।

পরাণ-বাবু কৃষ্ণকলিকে কোলে তুলে নিয়ে যে-ঘর থেকে পত্নীর সাড়া এসেছিলো সেই ঘরে ঢুকলেন। সেখানে তাঁর স্ত্রী ফল ছাড়িয়ে স্বামীর বৈকালী জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। পরাণ-বাবুর পত্নীর নাম মাতঙ্গিনী। তাঁর বিপুলায়তন কৃষ্ণবর্ণ কুৎসিত দেহ তাঁর নাম সার্থক করে' তুলেছে!—তিনি যেনো তাঁর কন্যা কৃষ্ণকলিরই শতগুণ পরিবর্দ্ধিত রাজসংস্করণ! তিনি যেমন মোটা তেমনি লম্বা—একেবারে যাকে বলে দশাসই! চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বহরের কাপড়ে তাঁর পায়ের গোছ ঢাকে না; দশহাতি কাপড় তাঁর বিপুল দেহের পরিধি বেষ্টন করে' আসতেই ফুরিয়ে যায়, মাথায় ঘোমটা দিতে কুলায় এমন একটু আঁচল অবশিষ্ট থাকে না। স্বামীকে ঘরে আসতে দেখে তিনি কাপড়ের আঁচলটা টানাটানি করে' মাথায় তোলবার বৃথা চেষ্টা বার কতক করলেন,—অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে হেসে বল্‌লেন—এমন অসময়ে বাড়ীর ভেতর যে?

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—অপ্রস্তুত রূপসীর অসম্বৃত রূপ অতর্কিতে দেখে নিতে এলাম!—

ইয়ম্ অধিক-মনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী,
কিম্ ইব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্!

মাতঙ্গিনী স্বামীর রসিকতায় সুখী ও লজ্জিত হয়ে হেসে বল্‌লেন—রূপসী তন্বীই বটে! দশ হাত কাপড়ের বেড়ে কুলোচ্ছে না, হাঁপিয়েই সারা হচ্ছি! তোমার বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ করতে হবে না। বাইরে যাও তুমি। এখনো কি পঙ্গপাল এসে জোটে নি?

পরাণ-বাবু হাসি-মুখে অথচ ক্ষুণ্ণ স্বরে বল্‌লেন—এ রকম কথা তোমার বলা উচিত নয় গিন্নি। আমাদের সুযোগ হয়েছে তাই কতকগুলো টাকা হাতে এসে পড়েছে, আর দশজনের সে সুযোগ হয়নি তাই তারা আমার কাছে আসে। টাকার মূল্য হয় খরচেই তো? নইলে পুঁজি করে' রেখে দিলে টাকাও যা ঢেলাও তাই—দুইয়েরই দাম সমান।

মাতঙ্গিনী প্রকাণ্ড নথ নেড়ে বল্‌লেন—তা তো বেশ বুঝলাম। কিন্তু তা বলে' তো আমরা হরিশ্চন্দ্র রাজার মতন সর্ব্বস্ব দান করে' আমাদের কলিকে পথে বসাতে পারবো না।

কৃষ্ণকলি বলে' উঠলো—ফুটপাতের উপর বসলে গাড়ী-চাপা পড়বার ভয় নেই মা।

পরাণ-বাবু হাসিমুখে কন্যার মুখচুম্বন করে' পত্নীকে বল্‌লেন—কলির জন্যে ভেবো না গিন্নি। কলির জন্যে দেশ-জোড়া যে আশীর্ব্বাদ ভগবানের ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে তাতেই আমার কলির সকল অভাব মোচন হবে—সে ব্যাঙ্ক কখনও ফেল হয় না।

মাতঙ্গিনী মনে খুশী হয়েও মুখে বিরক্তি দেখিয়ে বল্‌লেন, —শুধু ভুয়ো আশীর্ব্বাদ কুড়িয়ে ধুয়ে খেলে তো পেট ভরবে না! কলিকালে আশীর্ব্বাদ আবার ফলে না কি? তা হলে অমন হাতী হাতী ছেলেগুলো মরতো না।

পরাণ-বাবুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে' উঠলো; তিনি স্নিগ্ধস্বরে বল্‌লেন—ভগবান্ দুঃখ দেন পরের দুঃখ অনুভব করতে শেখবার জন্যে। ভগবানের সেই শিক্ষা কি তুমি ব্যর্থ করবে মনকে সকলের দিক থেকে বিমুখ করে রেখে? শুধু কি আমার নিজেরটুকু নিয়েই জগৎ, গিন্নি? প্রসন্ন মনে দিয়ে চলো যতদূর দিতে পারো; তা হলে পেতেও আর কিছু বাকী থাকবে না।

মাতঙ্গিনী অন্তরে স্বামীর মহত্ত্ব অনুভব করতেন; কিন্তু পাছে দানের নেশাতে স্বামী সব খুইয়ে ফতুর হয়ে' পড়েন এই আশঙ্কায় তিনি মাঝে মাঝে স্বামীর দানের ঝোঁকটাকে একটু পিছনে টেনে' রেখে তাঁকে সচেতন ও সাবধান করতে চেষ্টা করতেন। মাতঙ্গিনী স্বামীর কথায় খুশী হয়ে হেসে

বল্‌লেন—আচ্ছা গো কথার ভট্‌চার্জ্জি, আচ্ছা! একা রামে রক্ষে নেই আবার সুগ্রীব দোসর হলেই তো হয়েছে! তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমিও দিতে থাক্‌লেই তো চিত্তির! আমি কৃপণ মানুষ, আমার হাত দিয়ে জল গলে না, টাকা কড়ি তো অনেক স্থূল জিনিস!

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—তুমি যে কেমন কৃপণ তা আমার জান্‌তে বাকী নেই গো বাকী নেই। বৈজা নাপ্তের বৌ, জগা ছুঁতোরের ছেলে, মধু হাল্‌দারের নাত্‌নী……

নিজের গোপন দানের পাত্রদের নামের ফর্দ্দ শুনে' লজ্জিত মুখে হেসে' মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—আচ্ছা গো আচ্ছা, তোমার অতো পরচচ্চায় মন কেনো বলো তো? কে কোথায় কি কচ্ছে আড়ি পেতে লুকিয়ে লুকিয়ে সব খবর নেওয়া হয়!

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—পরচচ্চা তোমার কাছেই শিক্ষে—তুমি তো আমাকে ছেড়ে কথা কওনা!

মাতঙ্গিনী নথ দুলিয়ে বল্‌লেন—তুমি কি আমার পর?

পরাণ-বাবু হেসে' বল্‌লেন—আর তুমি কি আমার পর?

মাতঙ্গিনী কথা কইতে কইতেই জলখাবারের জো শেষ করে' ফেলেছিলেন; তিনি একখানা আসন পেতে' তার সামনে জল-খাবারের রেকাবি রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লেন—বেশ গো বেশ, এখন জল খাও তো, মুখ একটু বন্ধ থাকুক। এখনি আবার কে এসে পড়্‌বে; খাওয়া হবে না, নিজের খাবারটি তার মুখের কাছে ধরে' দেবে!

পরাণ-বাবু একটু কাচুমাচু ভাবে বল্‌লেন—দেখো গিন্নি, আবশ্যকের অতিরিক্ত গিলে গিলে ফল হচ্ছে তো এই প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে সদাই অসাব্যস্ত থেকে হাঁপিয়ে মরা! খিদে কাকে বলে তা তো একদিনের তরেও জান্‌তে পার্‌লাম না। তার চেয়ে খিদের অন্ন যারা পায় না, তাদের খেতে দেওয়ায় কি বেশী সুখ নয়?

মাতঙ্গিনী হেসে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—বাইরে কেউ এসেছে বুঝি?

পরাণ-বাবু কুণ্ঠিত-স্বরে বল্‌লেন—হ্যাঁ। একটি ছেলেকে তার মা পরের বাড়ীতে রাঁধুনীর কাজ করে' পড়াতো; সে এণ্ট্রান্সে ফেল্ করেছে বলে' রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদ্‌ছিলো…

মাতঙ্গিনী মুখ ঘুরিয়ে নথ নেড়ে বল্‌লেন—আর তুমি তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছো! নিজে হতেই বাড়ীতে এসে যা জোটে তারই ঠেলা সাম্‌লানো দায়, তার উপর আবার পথ কুড়োতে আরম্ভ কর্‌লেই তো চিত্তির!

পরাণ-বাবু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লেন—না, না, তা কেনো? কলির জন্যে তো একজন মাষ্টার রাখ্‌তে হবেই; ছেলেটি দেখ্‌তে শুন্‌তে বেশ ভালো তাই নিয়ে এসেছি—বাড়ীতে থাক্‌বে আর……

মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হয়ে' বলে' উঠ্‌লেন—না না, ওসব উপদ্রব বাড়ীতে ঢুকিও না। নিজেদেরই দেখ্‌বার শোন্‌বার লোক নেই, তার উপর আবার পরের ছেলের ঝক্কি কে সাম্‌লাবে?

পরাণ-বাবু স্ত্রীর স্বভাব জান্‌তেন—স্বামীর কথায় আপত্তি করে শেষে তা আপনা হতেই পালন করা ছিলো তাঁর রীতি। তাই পরাণ-বাবু হেসে' বল্‌লেন—আচ্ছা আচ্ছা, তোমার যখন মত নেই তখন তাকে গোটাকতক পয়সা দিয়ে বিদায় করে' দিই গে, দোকান থেকে কিছু কিনে খাবে—কচি ছেলে, খিদের দুঃখে একেবারে মুষ্‌ড়ে পড়েছে।

মাতঙ্গিনীর মন অম্‌নি স্নেহার্দ্র হয়ে উঠ্‌লো; তিনি বলে উঠ্‌লেন—আহা! কতো বড়ো ছেলেটি? তাকে বাড়ীর ভিতরেই ডেকে' আনাও না, আমি একবার দেখি।

স্ত্রীর কোমলহৃদয়ের আর একটি পরিচয় পেয়ে পরাণ-বাবু সুখী হ'য়ে বল্‌লেন—আচ্ছা, তুমি আনা দুচ্চার পয়সা বা'র করো, আমি তাকে ডেকে আন্‌ছি।

পরাণ-বাবু কৃষ্ণকলিকে কোলে ক'রেই বাহির হয়ে' গেলেন। মাতঙ্গিনী ক্ষুধিত অতিথির জন্য পয়সা বা'র না করে' খাবারের ঠাঁই কর্‌তে লাগ্‌লেন।

পরাণ-বাবুর আহ্বানে থাকোহরি পরাণ-বাবুর পিছনে পিছনে বাহির-বাড়ীর ও ভিতর-বাড়ীর মাঝখানে একটা দালানে এসে' দেখ্‌লে একটা পুরু গালিচার আসনের সাম্‌নে এক রেকাবি জলখাবার ও সর্‌পোশ-ঢাকা এক গেলাস জল রয়েছে; তারই সাম্‌নে নর্দ্দমার কাছে একঘটী জল আর একখানা ধোয়া তোয়ালে রয়েছে, আর তার কাছে একজন চাকর দাঁড়িয়ে আছে। পরাণ-বাবু অতিথি-সৎকারের এই আয়োজন দেখে' খুশী হয়ে' থেমে' ঘুরে' দাঁড়িয়ে থাকোহরিকে বল্‌লেন—বসো বাবা, একটু জল খাও।

থাকোহরির বিলক্ষণ ক্ষুধা পেয়েছিলো ব'লেও বটে

এবং অপরিচিত স্থানে গুরুর আপত্তির কোনো কথা বল্‌তে লজ্জা অনুভব ক'রেও বটে সে কোনো কথা না বলে' কুণ্ঠিত ভাবে এই রাজভোগ খেতে বস্‌লো।

তার সাম্‌নে পরাণ-বাবু মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে তার হাত ধরে' দাঁড়িয়ে আছেন; মাতঙ্গিনী কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দারিদ্র্যমূর্ত্তি বালকটির প্রতি করুণায় কাতর হয়ে তার খাওয়া দেখ্‌ছেন; এমন সময় একজন চাকর এসে পরাণবাবুকে বল্‌লে বাইরে একজন বাবু এসেছেন।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কোন্ বাবু?

চাকর বল্‌লে—এ বাবু নতুন—খুব রোগা ফর্সা মতন...

এই শুনেই পরাণ-বাবু বলে' উঠ্‌লেন—ও! রামযাদু-বাবু এসেছেন। তাঁকে আমি আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দিতে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। পরের দুঃখে যাঁর চোখের জল পড়ে, তিনি মহাপুরুষ!

থাকোহরি এতক্ষণ মাথা হেঁট করে' খাবার খাচ্ছিলো; পরাণ-বাবুর কথা শুনে' সে মুখ তুলে' পরাণ-বাবুর দিকে চাইতেই পরাণ-বাবু তাকে বল্‌লেন—সেই যে-বাবুটি কাগজ কিনে তোমায় দেখ্‌তে দিয়েছিলেন......

থাকোহরির মন সেই অচেনা দরদীর নাম শুনেই কৃতজ্ঞতায় ভরে' উঠ্‌লো, তার চোখ ছলছল আর মুখ জলজ্বল কর্‌তে লাগ্‌লো।

থাকহরির মুখের ভাব দেখে খুশী হয়ে' পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তুমি বসে' বসে' খাও, তাড়াতাড়ি কিংবা লজ্জা করোনা, আমি রামযাদু-বাবুর সঙ্গে আলাপ করিগে।... ওগো, তুমি বেরিয়ে এসোনা, একরত্তি ছেলেমানুষকে দেখে আবার লজ্জা!

স্বামীর ডাকে লজ্জিত হাসিমুখে মাতঙ্গিনী কপাটের আড়াল থেকে একটু একটু করে' সরে' এসে থাকোহরির পিছনে দাঁড়ালেন। পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তুমি থাকোহরিকে খাওয়াও, আমি বাইরে রামযাদু-বাবুর কাছে যাই।

মাতঙ্গিনী চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ করে' জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তাঁর জলখাবার বাইরে পাঠাবো কি?

পরাণ-বাবু বাইরে যেতে যেতে বল্‌লেন—তিনি ব্রাহ্মণ। আমার বাড়ীতে খাবেন বুঝ্‌লে বলে' পাঠাবো।

কৃষ্ণকলি বাবার হাত ছেড়ে দিয়ে এসে মার হাত ধরে' কৌতুহলভরা দৃষ্টিতে থাকোহরির খাওয়া দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

থাকোহরি অপরিচিত লোকের বাড়ীতে প্রথম দিন এসেই খেতে লজ্জা বোধ কর্‌ছিলো; তাতে আবার এখন অন্তঃপুরের সীমানায় বসে' একজন স্ত্রীলোকের সাম্‌নে তাঁরই তদারকে খেতে তার অত্যন্ত লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌লো।

সে আড়ষ্ট হয়ে' অল্প খেয়েই পরাণ-বাবুর যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাত গুটিয়ে বস্‌লো।

তা দেখে' মাতঙ্গিনী থাকোহরির সাম্‌নে একটু এগিয়ে এসে বল্‌লেন—এখুনি হাত গুটুলে তো চল্‌বে না, বাবা—বেশী তো কিছু দিইনি—ও-সব তোমায় খেতে হবে......

থাকোহরি অপ্রতিভ মুখ না তুলে' এবং কিছু না ব'লেই আবার খেতে প্রবৃত্ত হলো। বাইরের অনুরোধের চেয়ে তার আভ্যন্তরিক অনুরোধ তখনও প্রবল ছিলো। সে পাত্রের সমস্ত খাদ্য নিঃশেষ করে' হাত গুটিয়ে বস্‌লো।

তখন মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—উঠে হাত ধোও বাবা। ও ভুখন, বাবুর হাতে জল দে।

দালানের একপাশে যেখানে ভুখন কাঁধে ধোয়া নূতন তোয়ালে আর হাতে জলের ঘটী নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর্‌ছিলো, থাকহরি সেখানে গিয়ে কুণ্ঠিত হয়ে' বল্‌লে—ঘটীটা আমায় দাও, আমিই জল নিচ্ছি......

থাকোহরির কথা শুনেই মাতঙ্গিনী ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠ্‌লেন—না, না, ও ঘটী তুমি ছুঁয়ো না, তোমার ছোঁয়া জল আবার কোথায় পড়্‌বে টড়্‌বে আর আমরা মাড়াবো...

থাকোহরি মনে কর্‌লে সে ছোটো জাত বলে' মাতঙ্গিনী তাকে ঘটী ছুঁতে নিষেধ কর্‌ছেন। থাকোহরি সঙ্কুচিত হয়ে অপ্রতিভ মুখে চাকরের দিকে হাত বাড়িয়ে নত হলো; চাকরের হাতের ঘটী থেকে ঢালা জলে হাত মুখ ধুয়ে সে ফিরে দাঁড়িয়ে নিজের কোঁচার কাপড়ে হাত মুখ মুছ্‌তে লাগ্‌লো; চাকর তোয়ালে এগিয়ে দিলে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে বল্‌লে—থাক্......

মাতঙ্গিনী তখন কন্যার হাতে পানের ডিবে দিয়ে বল্‌লেন—কলি, যাও, তোমার মাষ্টার মশায়কে পান দাওগে।

থাকোহরি লজ্জিত মৃদুস্বরে বল্‌লে—আমি পান খাইনে।

মাতঙ্গিনী তাড়াতাড়ি ঘরে যেতে যেতে বল্‌লেন—তবে দাঁড়াও বাবু, মস্‌লা এনে দিচ্ছি।

মাতঙ্গিনী চলে' গেলে কৃষ্ণকলি আশ্রয়হীনা ক্ষুদ্র লতার

মতন অপরিচিতের সামনে দাঁড়িয়ে কৌতুক ও কৌতূহলের সঙ্গে তাকে দেখছিলো, এবং মার কাছে পালাবে কি মার আগমনের অপেক্ষায় দাঁড়াবে এই দ্বিধা মীমাংসা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলো। তার মতিস্থির হবার আগেই থাকোহরি হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে টপ্ করে' কৃষ্ণকলিকে কোলে তুলে নিলে এবং তার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে' জিজ্ঞাসা করলে—তোমার নাম কি খুকুমণি?

কৃষ্ণকলি থাকোহরির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লজ্জার সঙ্কোচে মুখ ফিরিয়ে তার কোল থেকে নেমে পড়্‌বার জন্য ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌লো, কিন্তু থাকোহরির বাহুবেষ্টন থেকে নিজেকে কিছুতেই মুক্ত কর্‌তে পার্‌তে পার্‌ছিলো না।

মাতঙ্গিনী একটা ডিবের খোলে করে' মসলা নিয়ে ঘরের দরজার কাছে এসেই মেয়েকে থাকোহরির কোলে দেখে আতঙ্কিত হয়ে' বলে' উঠ্‌লেন—ও কি সর্ব্বনাশ কর্‌ছো বাবা! ওর পা যে তোমার গায়ে ঠেক্‌ছে—শিগ্‌গির নাবিয়ে দাও ওকে, শিগ্‌গির নাবিয়ে দাও। এতে আমাদের অপরাধ হবে যে, পাপ হবে যে!

কৃষ্ণকলি থাকোহরির কোল থেকে নাম্‌বার জন্য চেষ্টা কর্‌ছিলই, তার উপর মাতঙ্গিনীর হঠাৎ ব্যস্ততায় অপ্রস্তুত হয়ে থাকোহরি কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে।

মাতঙ্গিনী অমনি মেয়েকে বল্‌লেন—মাষ্টার মশায়কে পেন্নাম করো কেষ্টো—মাষ্টার মশাই বামুন, তাঁর গায়ে পা ঠেকেছে……

কৃষ্ণকলি সার্কাসের সায়েস্তা জানোয়ারের মতন ব্রাহ্মণ শব্দের সঙ্কেতেই থাকোহরির সাম্‌নে গড় হয়ে প্রণাম কর্‌তে যাচ্ছিলো, থাকোহরি খপ করে' তাকে ধরে' আবার কোলে তুলে নিয়ে লজ্জিত মুখে মাতঙ্গিনীকে বললে—আমরা বামুন নই মা, আমরা জাতে মাহিষ্য।

মাতঙ্গিনী আশ্চর্য্য হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—বামুন নও! কৈবর্ত্ত? তবে যে কত্তা বলছিলেন তোমার মা কাদের বাড়ী রাঁধুনীর কাজ করেন।

থাকোহরি অপ্রস্তুত কুণ্ঠিতভাবে বললে—দাসীর কাজের চেয়ে রাঁধুনীর কাজে একটু সম্মান খাতির বেশী পাওয়া যায় আর মাইনেও বেশী মেলে, তাই মা রাঁধুনীর কাজ করেন।

মাতঙ্গিনী শিউরে উঠে মুখ একেবারে অন্ধকার করে' বলে' উঠ্‌লেন—সর্ব্বনাশ! সে কি গো! লোকের জাত মারা! সে যে বিষম পাপ!

থাকোহরি অপ্রতিভভাবে বল্‌লে—মা ব্রাহ্মবাড়ী রাঁধেন। ব্রাহ্মরা তো জাত মানে না।

থাকোহরির এ উত্তরে মাতঙ্গিনী কিছুমাত্র আশ্বস্ত না হয়ে' বল্‌লেন—বেম্ম‌জ্ঞানী, তারা তো খিষ্টান। ওমা, খিষ্টানের বাড়ী রান্না খাওয়া! তা হলে তোমাদেরও জাত নেই—তোমরাও খিষ্টান নাকি?

থাকোহরি অত্যন্ত অপ্রস্তুতভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে না। সেখানে হাঁড়ি হেঁসেল আর কেউ ছোঁয় না, আমরা সেখানে স্বপাক খাই।……

মাতঙ্গিনী এই কথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লেন—তা হোক্ বাছা। কিন্তু খিষ্টানের বাড়ী তো। সেখানে তোমরা আর থেকো না। তোমরা যখন আমাদের স্বজাত, তোমরা আমাদের বাড়ীতে এসেই থাকো। এখানে কলিরও কেউ খেল্‌বার সঙ্গী নেই, আমিও একলাটি আর পেরে উঠিনে। অপরাধের ভয়ে বামুন তো রাখতে পারিনে; আমাদেরই স্বজাতের একটি মেয়ে ছিলো এতোদিন, ঘর সংসার দেখ্‌তো শুন্‌তো; তার মেয়ে-জামাই-এর অবস্থা হচ্ছে বলে' সে চ'লে গেছে। এখন তোমার মা এলে আমিও একজন কথা কইবার লোক পেয়ে বাঁচি।

থাকোহরি এই অপরিচিত দম্পতির মহৎ উদার সদয় হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার মাতঙ্গিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ তাঁর পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে।

থাকোহরি প্রণাম করে' উঠে দাঁড়াতেই মাতঙ্গিনী বল্‌লেন—তা হলে এই ঠিক হলো তো বাবা? মাকে নিয়ে এসে এই বাড়ীতেই থাকবে তো?

পিছন থেকে পরাণ-বাবু তাঁর প্রাণখোলা সাদা সরল হাসি হেসে বলে' উঠ্‌লেন—আমাকেও তুমি জিতে গেলে গিন্নি! আমি কেবল থাকোহরিকেই নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তুমি থাকোহরির মা-ঠাকরুণকেও নিমন্ত্রণ করলে। আমরা যখন স্বজাত, পরিচয় হলে একটা সম্পর্কও বেরিয়ে যেতে পারে চাই কি। আত্মীয়ের সঙ্গে থাকৃতে আর বাধা কি? কি বলো বাবা?

থাকোহরি মুখে কিছু বল্‌তে না পেরে পরাণ বাবুকেও প্রণাম করে' পূর্ণ প্রাণের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তবে তোমার মাকে নিয়ে আজই এসো, কেমন?

থাকোহরি বিনীত মৃদুস্বরে বল্‌লে—মা যাঁদের বাড়ী কাজ করেন, তাঁরা একজন লোক না পাওয়া পর্য্যন্ত চ'লে আসা কি ঠিক হবে?

পরাণ-বাবু খুশী হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—ঠিক বাবা ঠিক! তবে যতো শিগ্‌গির পারো—এসো।

থাকোহরি নতমুখে বল্‌লে—আচ্ছা।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—রামযাদু-বাবুর মতন কোরো না যেনো। আস্‌বো বলে' আর দেখা নেই। তিনিই দয়া করে' পায়ের ধূলো দিতে এসেছেন মনে করে' তাড়াতাড়ি বাইরে গেলাম; গিয়ে দেখি সে রামযাদু-বাবু নয়, সে বামাচরণ। রামযাদু-বাবু অতি চমৎকার মহাশয় লোক—নয়?

থাকোহরি মৃদুস্বরে বল্‌লে—আজ্ঞে।

পরাণ-বাবু বলে' উঠ্‌লেন—একটা বড়ো ভুল হয়ে গেছে হে—তাঁর ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি। তিনি দয়া করে' নিজে না এলে অমন মহৎ লোকের দর্শন আর পাওয়া যাবে না। তোমার ঠিকানাটা বলো তো—

তুমি আপনি না এলে আমি যেনো ধরে' আন্‌তে পারি।

থাকোহরি কৃতজ্ঞ আনন্দে লজ্জিত স্মিতমুখে বল্‌লে—আমরা থাকি ৬৭।১।১এ অচিন্ত্য দত্তর গলিতে নীলাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তারের বাড়ী।

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—অতো কথা বুড়োমানুষের মনে থাক্‌বে না—বাইরে চলো একটু লিখে দেবে।

থাকোহরি পরাণ-বাবুর পিছনে পিছনে বাহির বাড়ীতে চলে' গেলো।

থাকোহরি চলে' যেতেই কৃষ্ণকলি মার মুখের দিকে মুখ তুলে বলে' উঠ্‌লো—ও কে মা? ও বেশ ভালো—না? কেমন ফস্‌সা শাদা! কেমন কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল মা! দাঁতগুলো চক্‌চক্ করছে—পান খায় না কি না! খুব ভালো—না মা?

মাতঙ্গিনী হেসে ঘাড় কাত করে' মেয়ের কথায় সায় দিলেন।

কৃষ্ণকলি আবার বল্‌তে লাগ্‌লো—কিন্তু ও অতো রোগা কেনো মা?

মাতঙ্গিনী ব্যথিত হয়ে করুণার্দ্র স্বরে বলে' উঠ্‌লেন—আহা গরিব, ভালো করে' খেতে পার্‌তে পায় না……

কৃষ্ণকলি বলে' উঠ্‌লো—তুমি তো ওকে খেতে দিলে মা, কৈ মোটা তো হলো না?

মাতঙ্গিনী হেসে বল্‌লেন—একদিন খেলেই কি মোটা হয় রে পাগ্‌লী? রোজ রোজ খুব পেট ভরে' খেলে তবে মোটা হয়।

কৃষ্ণকলি বল্‌লে—ও তো এখানে এসে থাক্‌বে, ওকে রোজ রোজ খেতে তো দেবে, তা হলেই ও তোমার মতন আর বাবার মতন মোটা হয়ে যাবে?

মাতঙ্গিনী হেসে বল্‌লেন—হাঁ।

কৃষ্ণকলি গাল ফুলিয়ে বলে' উঠ্‌লো—না মা, অতো মোটা বুঝি ভালো? মোটা হলে আবার কালো কিষ্টিও হয়ে যাবে তো? ওকে তা হলে বেশী বেশী খেতে দিয়ো না মা।

মাতঙ্গিনী হেসে উঠে বল্‌লেন—আচ্ছা রে আচ্ছা, ওকে তোর মনের মতন করেই গড়ে' তুল্‌বো।

এই কথা বল্‌তেই মাতঙ্গিনীর মনে থাকোহরিকে ঘর-জামাই কর্‌বার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটা বিদ্যুৎ-চমকের মতন উঁকি মেরে চলে' গেলো।　　(ক্রমশঃ)

তক্ষশিলা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি-এ

স্তূপ, বিহার ও মন্দির

তক্ষশিলার নগরত্রয়ের বিবরণ প্রদত্ত হইল। একণে আমরা অন্যান্য সৌধসমূহের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। এতদুদ্দেশ্যে আমরা সর্ব্বপ্রথম পূর্ব্বোক্ত হথিয়াল পাহাড়ের দক্ষিণদিকস্থিত তক্ষশিলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌধ ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ হইতে আরম্ভ করিব, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ উত্তর, এবং তৎপরে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইব।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ বা চির টোপ

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের অগ্রভাগ পূর্ব্ববর্ত্তী খননকারিগণ "চিরিয়া" অর্থাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল; এই অর্থে ইহার স্থানীয় নাম "চিরটোপ।" স্তূপকে এখানকার লোকে টোপ কহে। হথিয়ালের দক্ষিণ দিকে, তম্রানালার পারে একটি সমুচ্চ ভূমির উপর ধ্বংস-প্রাপ্ত এই বিশাল স্তূপটি দণ্ডায়মান। ইহার চতুর্দ্দিকে আরও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ, উপাসনা-কক্ষ (chapels), সঙ্ঘারাম বা বিহার প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মূল স্তূপ

মূল স্তূপটি গোলাকৃতি; ইহার পাদনিম্নে চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া একটি সুমুচ্চ 'মেধী' বা রোয়াক (terrace); —রোয়াকে উঠিবার জন্য চারিদিকে চারি প্রস্থ সোপান। স্তূপের অভ্যন্তর ভাগ অসমান পাথরে নির্ম্মিত, এবং কেন্দ্র হইতে প্রসারিত ৩৪ ফিট পুরু ১৬টি দেওয়াল দ্বারা দৃঢ়ীকৃত। এই দেওয়ালগুলি ভিত্তি-মূল হইতে গাঁথিয়া উঠান হয় নাই, স্তূপের নিম্নগাত্রস্থ বেষ্টনীর (berm) উপর হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কুষান-যুগে স্তূপটির পুনর্নির্ম্মাণ কালে এই দেওয়ালগুলি গঠিত হয়। ইহার গাত্রভাগ বৃহদাকার চুণাপাথর ও কঙ্কুরে মণ্ডিত। কঙ্কুরের উপর বিবিধ কারুকার্য্য ও স্তম্ভসমূহ ক্ষোদিত; আর সমগ্র অংশ চুণ ও রংয়ে আবৃত ছিল। স্তূপের গাত্রোপরিস্থ আলঙ্কারিক ক্ষোদিত কার্য্য পূর্ব্ব পার্শ্বে সর্ব্বাপেক্ষা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহার ভাস্কর্য্য-বিন্যাসের (mouldings) পরিষ্কটতা, এবং কুলুঙ্গীগুলির গঠন-ভঙ্গিমা। কুলুঙ্গীগুলি দুই ধরণের,—প্রথম ত্রিপত্রাকৃতি খিলান (trefoil arches) বিশিষ্ট, দ্বিতীয় ক্ষুদ্র দ্বার (portals) বেষ্টিত; ইহাদের মধ্যে একটি করিয়া করিন্থীয় গাত্রস্তম্ভ। এই স্তূপটি সিথীয়-পার্থিয়দের রাজত্বকালে নির্ম্মিত, এবং কুষান যুগে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তৎপর খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর সমসময়ে ইহার অংশবিশেষ পুনঃ সংস্কৃত হয়। রোয়াকের উপরিভাগের কারুকার্য্য এই পরবর্ত্তী যুগের।

প্রদক্ষিণ পথ

রোয়াকের নীচে, স্তূপের পাদদেশের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া একটি উন্মুক্ত পথ। রোয়াক ("মেধী") এবং এই পথ, উভয়ই প্রাচীনকালে প্রদক্ষিণ-পথ রূপে ব্যবহৃত হইত। স্তূপটিকে সর্ব্বদাই দক্ষিণে রাখিয়া বৌদ্ধ ভক্তগণ ইহার চারিদিক পরিক্রম করিতেন,—ইহাই বৌদ্ধগণের রীতি।

প্রদক্ষিণ-পথের তলদেশ অর্থাৎ মেঝে প্রথমে চুণ এবং বালি মিশাইয়া প্রস্তুত করা হয়। ইহার অংশবিশেষ বিভিন্ন আকারের শঙ্খের বলয় দ্বারা অদ্ভুত ধরণে ভূষিত ছিল। ইহার উপর প্রায় তিন ইঞ্চি পুরু পুরাতন ভগ্নাবশেষ জমিয়া যায়। তাহার উপর আবার দ্বিতীয় একটি চুণের মেঝে তৈরী করা হয়। এই মেঝের ঠিক উপরিস্থ স্তর-মধ্যে অনেকগুলি কাঁচের টালি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, সম্ভবতঃ সমগ্র প্রদক্ষিণ-পথটিই এক কালে এই টালি দ্বারা মণ্ডিত ছিল। স্তূপের পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী সিঁড়ির ঠিক বাম দিকে একটি স্তম্ভের নিম্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই স্তম্ভের শীর্ষভাগ প্রসিদ্ধ অশোক-স্তম্ভসমূহের অনুকরণে সিংহ-মূর্ত্তি-শোভিত ছিল।

প্রদক্ষিণ-পথে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি

প্রদক্ষিণ-পথ-মধ্যে যে সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে গান্ধার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন,—অভয় মুদ্রায় ছত্রতলে দণ্ডায়মান, সপার্ষদ বোধি সত্বের (শাক্যমুনি ?) মূর্ত্তি ক্ষোদিত একখানি শিলাফলক, এবং কতকগুলি মুদ্রা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুদ্রাগুলি সংখ্যায় ৩৫৫। এগুলি প্রধানতঃ ২য় এজেস, "সোটের মেগস", হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের; কতকগুলি ইন্দো-সাসানায় অথবা কুষান-সাসানীয় ধরণের।

ক্ষুদ্র উপাসনা-কক্ষ মণ্ডলী।

মূল স্তূপের সোপান চতুষ্টয়ের বিপরীত দিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বার, এবং স্তূপের চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া পূর্ব্বোক্ত ছোট স্তূপগুলির মাঝে মাঝে কতকগুলি ক্ষুদ্র উপাসনা-কক্ষ (chapels)। প্রধান স্তূপের দিকে সম্মুখ করিয়া বৌদ্ধ প্রতিমা সমূহ স্থাপনোদ্দেশ্যে এই কক্ষগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এতন্মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন কক্ষগুলি খৃঃ ১ম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে প্রস্তুত। এ গুলির গাঁথনি তৎকালে প্রবর্ত্তিত ঈষৎ সমান ও আকারযুক্ত ছোট পাথরের (small diaper masonry)। খৃঃ ১ম শতাব্দীর শেষ দিক হইতে এই গাঁথনির মধ্যে ছোট পাথরের পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত বড় পাথর ব্যবহৃত হইতে থাকে। এই ধরণের গাঁথনি large diaper masonry) দ্বারা উপাসনা-কক্ষগুলির সংস্কার করা হয়। তার পর কালক্রমে এই সৌধগুলি ধ্বংস-মুখে পতিত হইবার পর সেই সব ধ্বংসের উপর আবার অর্দ্ধ-চৌকস ধরণের (semi-ashler style) গাঁথনি দ্বারা কতকগুলি উপাসনা-কক্ষ নির্ম্মিত হয়। এইরূপে আমরা শিরকাপের ন্যায় এখানেও মূল স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়োল্লিখিত
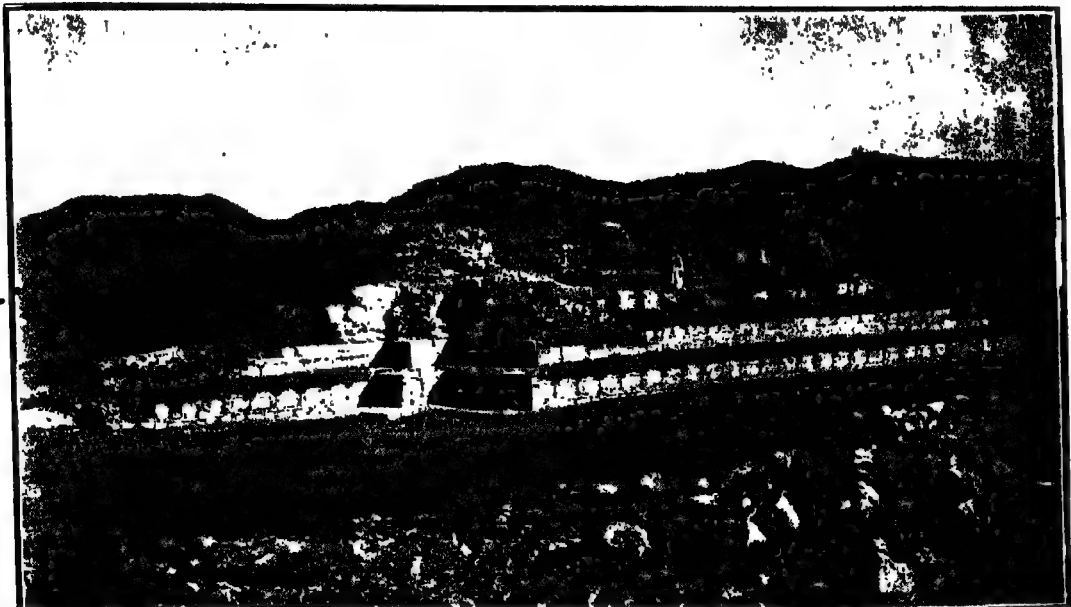
"কুণাল স্তূপ"—সাধারণ দৃশ্য

মূল স্তূপের চতুর্দ্দিকবর্ত্তী ক্ষুদ্র স্তূপমণ্ডলী

বলা বাহুল্য এই বৃহৎ স্তূপটিই সর্ব্ব প্রথম এই ভূখণ্ডের উপর নির্ম্মিত হয়। তার পর কালক্রমে এই কেন্দ্রীয় সৌধের চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপ রচিত হয়। এইরূপ দশ এগারটি স্তূপ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্র স্তূপগুলি প্রথমে গোলাকার ছিল; পরবর্ত্তী কালে ইহাদের কতকগুলির আয়তন সম-চতুষ্কোণ বেদীযোগে বর্দ্ধিত করা হয়। কতকগুলি স্তূপের মধ্যে, বেদীর ৫।৬ ফিট নিম্নে প্রোথিত অস্থি-ভস্ম পাওয়া গিয়াছে।

চারি প্রকার স্বতন্ত্র ধরণের গাঁথনির সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মূল ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে আরও বহুসংখ্যক স্তূপ ও উপাসনা-কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল ধ্বংসাবশিষ্ট সৌধের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা পাঠকগণের নিকট নিতান্ত একঘেয়ে বোধ হইবে বিবেচনায় তাহা হইতে বিরত হইলাম; কেবল কৌতূহলোদ্দীপক কতিপয় বিষয়ের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

দণ্ডায়মান ভক্তমণ্ডলী সমভিব্যাহারে সারি সারি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তিগুলি বালি চূণের (stucco) নির্ম্মিত। ভক্তদের পোষাক ঠিক ইন্দো-সিথীয় ধরণের। মূর্ত্তিগুলির পরস্পরের মধ্যে একটি করিয়া করিন্থীয় গাত্র-স্তম্ভ। দ্বিতীয় বন্ধনীর কারুকার্য্য মধ্যে সারি সারি হস্তী,—প্রত্যেক হস্তীর পর এক জোড়া করিয়া "ভারবাহী" মনুষ্যমূর্ত্তি (atlantes) স্থাপিত।

'খ' এবং 'গ' চিহ্নিত উপাসনা-কক্ষদ্বয়।

এখান হইতে আমরা দক্ষিণে ও বামে আরও বহু-

জণ্ডিয়াল—মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য
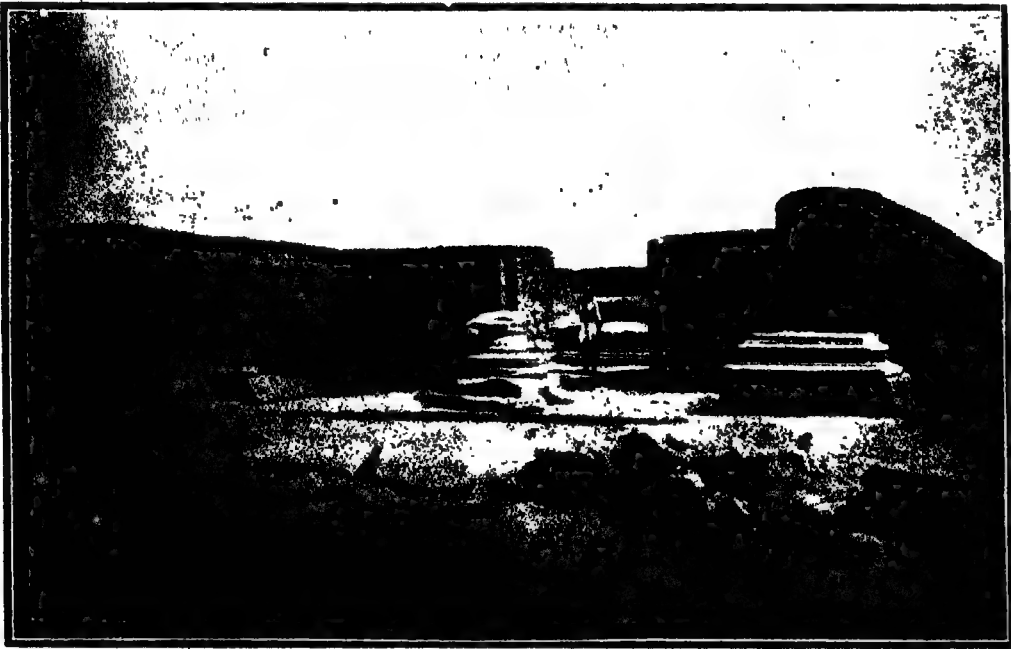
'ক' চিহ্নিত স্তূপ।

প্রদক্ষিণ-পথের দক্ষিণ দ্বার দিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক মূল স্তূপটি পরিক্রম করিয়া পুনঃ উক্ত দ্বার দিয়াই বাহির হইলে অনতি দূরে একটি বৃহদায়তন স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয় (ক)। এই স্তূপটি প্রায় ৩২ ফিট লম্বা একটি সমচতুষ্কোণ বেদীর উপর অবস্থিত। বেদীর চারি পার্শ্বে তিনটি করিয়া বন্ধনী (tiers)। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে এই বেদীর উপর যথারীতি একটি বৃত্তাকার জয়ঢাক এবং ছত্র-শোভিত একটি 'অন্ড' বা গম্বুজ ছিল। বেদীর উত্তর পার্শ্বের সর্ব্বনিম্ন বন্ধনীর মধ্যে,—উভয় পার্শ্বে

সংখ্যক ধ্বংসাবলীর মধ্য দিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া দুইটি বৃহৎ উপাসনা-কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলাম। এতদুভয়ের মধ্যে কয়েকটি বুদ্ধ প্রতিমার ধ্বংসাবশেষ বিরাজিত। তন্মধ্যে প্রধান মূর্ত্তি কয়েকটি বিরাট দেহ-বিশিষ্ট ছিল। গ' চিহ্নিত কক্ষের মধ্যস্থ মূর্ত্তিটির কেবল মাত্র পদদ্বয় এবং পোষাকের নিম্নভাগ অবশিষ্ট আছে। গোড়ালি হইতে অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ইহার পায়ের দৈর্ঘ্য ৫ ফিট ৩ ইঞ্চি। ইহাতে মনে হয়,—মূর্ত্তিটি প্রায় ৩৫ ফিট লম্বা, এবং কাজে কাজেই—কক্ষটি অন্যূন ৪০ ফিট উচ্চ ছিল। এই সব মূর্ত্তির

অভ্যন্তর ভাগ (core) কঙ্কুর পাথরে অথবা কর্দ্দমে, অথবা মিশ্রিত কর্দ্দম-প্রস্তরে নির্ম্মিত। উপরে শুধু চুণের আস্তর দিয়া তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। কয়েকটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তির পদের ভাস্কর্য্য কৌশল অত্যন্ত চমৎকার। ভগ্নাবশেষের মধ্যে কতকগুলি মস্তক এবং হস্ত পাওয়া গিয়াছে।

সঙ্ঘারাম

উপরিউক্ত কক্ষদ্বয়ের কিছু উত্তরে অনেকগুলি উঁচু মোটা দেওয়াল ও প্রকোষ্ঠ বাহির হইয়াছে। সম্ভবতঃ
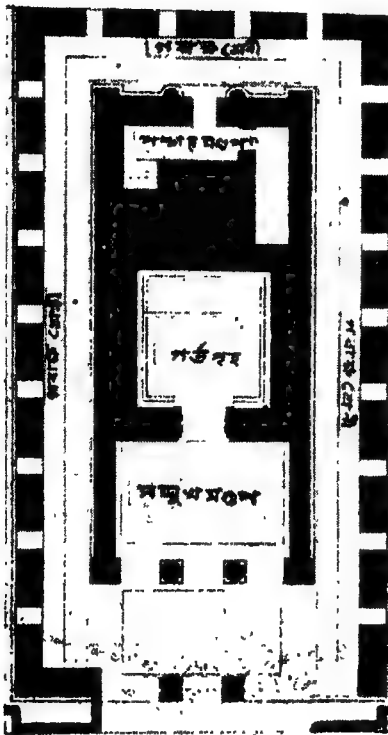
জণ্ডিয়াল—মন্দিরের নক্সা

এই অংশে বৌদ্ধ শ্রমণগণের বাসস্থান—সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল। এই স্থানের অতি সামান্য অংশ খনিত হইয়াছে।

'ঘ' এবং 'ঙ' চিহ্নিত সৌধদ্বয়

এখান হইতে আমরা কিয়দ্দূর প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ডাহিনে কতকগুলি স্তূপের পাশ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পাশাপাশি একটি স্তূপ ও একটি উপাসনা-কক্ষের (ঘ এবং ঙ) নিকটে উপস্থিত হইলাম। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথে উক্ত স্তূপের গাত্রে পাশাপাশি দুইটি বিরাট বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যান-মুদ্রায় উপবিষ্ট। উভয়ের হস্তদ্বয় ক্রোড়ে স্থাপিত। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইহাদের মস্তক দুইটি পাওয়া যায় নাই।

চৌবাচ্চা

ইহার কিছু পশ্চিমে একটি চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চার উত্তর এবং পূর্ব্ব দিকে ছোট ছোট চারিটি স্তূপ। কুষানগণের সময় নির্ণয় সম্পর্কে এই চৌবাচ্চা এবং স্তূপগুলির একটা বিশেষ মূল্য আছে। চৌবাচ্চাটি বিবিধ প্রকার অসমান পাথরের গাঁথনিতে প্রস্তুত। উপরে চুণের আস্তর। উত্তর দিকে তল পর্য্যন্ত প্রসারিত এক-প্রস্থ সিঁড়ি। প্রথম বিবেচ্য এই, উত্তর দিকস্থ 'চ' এবং 'ছ' চিহ্নিত স্তূপদ্বয়ের ভিত্তি সিঁড়ির উত্তর প্রান্তের উপর পর্যন্ত বিস্তৃত। কাজেই এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, উক্ত স্তূপদ্বয়ের নির্ম্মাণের পূর্ব্বেই চৌবাচ্চাটি অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু চৌবাচ্চাটি খৃঃ ১ম শতাব্দীর সিথীয়-পার্থিয় যুগের পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল না। কাজেই উক্ত স্তূপদ্বয়ের গঠন-কাল কিছুতেই ২য় শতাব্দীর পূর্ব্বে যাইতে পারে না। এখন দেখিতে হইবে, এই স্তূপগুলি কোন্ বংশীয় নৃপতিদের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। 'ছ' চিহ্নিত স্তূপের মধ্যে একটি ভাণ্ডের ভিতর কিছু ভস্ম এবং মহারাজ কণিষ্কের তিনটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। চৌবাচ্চার পূর্ব্বদিকে উক্ত স্তূপের সমসাময়িক 'জ' চিহ্নিত স্তূপটির মধ্যেও হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের দশটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতএব প্রমাণিত হইল, এই স্তূপগুলি কুষান যুগের। সুতরাং তক্ষশিলায় প্রাপ্ত বহুবিধ প্রমাণের ন্যায় বর্ত্তমান আবিষ্কারও প্রমাণ করিতেছে যে, কুষানগণের অভ্যুদয় পার্থিয়দের পরে হইয়াছিল, পূর্ব্বে হয় নাই।

'ঝ' চিহ্নিত সৌধ

উক্ত চৌবাচ্চার কিছু উত্তরে একটি চতুষ্কোণ দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত (ঝ)। সম্ভবতঃ এই সৌধটি নির্ব্বাণোন্মুখ বুদ্ধের একটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সৌধটির তিন ধরণের গাঁথনি দেখিয়া মনে হয়, ইহা তিনটি বিভিন্ন যুগে গঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্রীক রাজা জোইলাসের ২৮টি নিরস রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

'১৩৬ সালের' রৌপ্য-লিপি

ইহার কিছু দক্ষিণে এক স্থানে একসঙ্গে অনেকগুলি উপাসনা-কক্ষের শ্রেণী। এতন্মধ্যে 'ঞ' চিহ্নিত কক্ষটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়; কারণ, এই গৃহমধ্যে ভারতবর্ষের অন্যতম সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক একটী প্রাচীন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জিনিসটি রৌপ্যপাতের উপর খরোষ্ঠী অক্ষরে উৎকীর্ণ একখানি লিপি। একটি পাথরের পাত্রের মধ্যে একটি রূপার ভাণ্ড ছিল; এই ভাণ্ডের ভিতর উক্ত লিপিখানি এবং একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণ-কৌটা ও তন্মধ্যে কয়েক টুকরা অস্থি পাওয়া গিয়াছে। লিপিখানির তারিখ "১৩৬ সাল" (অনুমান ৭৮ খৃঃ) বলিয়া উক্ত হইয়াছে। লিপি পাঠে জানা গিয়াছে, অস্থিগুলি স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেবের।

'ঠ' চিহ্নিত উপাসনা-কক্ষ

উক্ত উপাসনা-কক্ষের কিছু দক্ষিণে, প্রধান স্তূপের নিকট 'ট' চিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র স্তূপ অবস্থিত। এই স্তূপটি ভিন্ন ভিন্ন যুগে সংস্কৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই বর্দ্ধিত অংশের (ঠ) উপর গান্ধার শিল্পাদর্শে ক্ষোদিত মূর্ত্তিগুলি বিশেষ ভাবে দর্শনযোগ্য। এতন্মধ্যে একটিতে—গৌতম বজ্রপাণি সমভিব্যাহারে কপিলাবস্তু হইতে প্রস্থান করিতেছেন—এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। দ্বিতীয় একটিতে কণ্ঠকনামা ঘোটক স্বীয় প্রভুর নিকট হইতে বিদায় লইতেছে; ঘোটকটী গৌতমের পদচুম্বন করিবার জন্য জানু পাতিয়াছে, আর এক পার্শ্বে ছন্দক ও অন্য একটি মূর্ত্তি, এবং অপর পার্শ্বে বজ্রপাণি তাকাইয়া আছে।

'ড' চিহ্নিত উপাসনা-কক্ষ

ইহার ঠিক দক্ষিণে দ্বি-প্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট একটি উপাসনা-গৃহের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই গৃহের চতুর্দ্দিকে গান্ধার ভাস্কর্য্যের নিদর্শন—বহুবিধ প্রস্তর-ক্ষোদিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তদৃষ্টে মনে হয়, মূল সৌধটি এই মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা পরিশোভিত ছিল। কাজেই এগুলি যে উক্ত গৃহের সমসাময়িক, এবং সুতরাং কুষান যুগের, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই স্থানে প্রাপ্ত একটি পাথরের প্রদীপ গাত্রে খরোষ্ঠী অক্ষরে "তক্ষশিলার অগ্র ধর্ম্মরাজিকা স্তূপ"—এই কথা কয়েকটি উৎকীর্ণ আছে।

চৈত্য মন্দির

উক্ত সৌধের কিছু পশ্চিমে পূর্ব্ব-অধ্যায়োল্লিখিত দ্বিতীয় চৈত্য মন্দিরটির (Apsidal Temple) ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। মন্দিরটির পরিকল্পনা অতি চমৎকার। প্রাচীন কালে ভক্তগণ অর্চ্চনা করিবার জন্য এই মন্দিরে একত্র আগমন করিতেন। সৌধটি কুষান যুগে নির্ম্মিত হয়। ইহার পশ্চাদ্বর্ত্তী মণ্ডলের (apse) অভ্যন্তরভাগ শিরকাপের চৈত্য মন্দিরের মণ্ডলের ন্যায় বৃত্তাকার নহে, অষ্টকোণিক (octagonal) মণ্ডলের মধ্যে কঙ্কর পাথর নির্ম্মিত একটী অষ্টকোণ-বিশিষ্ট স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সম্মুখবর্ত্তী মণ্ডপটী (nave) একটী সাধারণ প্রবেশ পথ তুল্য; প্রস্থে মণ্ডলের একটী বাহুর সমান, এবং উভয় পার্শ্বে খুব পুরু দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত।

'ঢ' চিহ্নিত কক্ষ

উক্ত মন্দিরের কিছু দূরে, 'ঢ' চিহ্নিত কক্ষটির তলদেশ বা মেঝে উজ্জ্বল নীল বর্ণ কাঁচের টালি দ্বারা মণ্ডিত ছিল। এই টালিগুলি বিশেষভাবে দর্শনযোগ্য।

মূল স্তূপের পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষসমূহে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি

মূল স্তূপের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী উপরিউক্ত স্তূপ এবং উপাসনা-কক্ষসমূহ হইতে যে সমস্ত প্রাচীন দ্রব্য সামগ্রী আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :—

চূণ-বালি ও পোড়া-মাটী-নির্ম্মিত মস্তক; চিত্র-ক্ষোদিত শিলা-ফলক; মাটীর শিলমোহর; পাথর, সোনা এবং রূপার ভস্মাধার; কুষান-যুগের শেষভাগের ৫টি স্বর্ণমুদ্রা; সাসানীয় বংশের রাজা ২য় সাপুরের (খৃঃ ৩০৯—৩৭৯) ১৫।১৬টি তাম্রমুদ্রা; কয়েকটি সোনার অলঙ্কার ও মালা; ভগ্ন শঙ্খ-বলয়; মাটীর হাঁড়ি বাসন, লোহার অস্ত্রশস্ত্র, ইত্যাদি ইত্যাদি।

ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের বর্ণনা শেষ হইল। এখন আমরা এখান হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত "কুণাল স্তূপে" গমন করিব। "কুণাল স্তূপে" যাইবার দুইটি রাস্তা আছে,—একটি সরকারী সড়ক, অপরটি এই ভূখণ্ডের উত্তর দিকস্থ হথিয়াল পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটি সঙ্কীর্ণ বন্ধুর পথ। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত

দীর্ঘতর,—প্রায় ৩ মাইল লম্বা; সুতরাং দর্শকগণের পক্ষে দ্বিতীয়টিই সুবিধাজনক।

'কুণাল স্তূপ' সম্বন্ধে কিম্বদন্তী

ঠিক যেখানে আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিত শিরকাপ নগরের সমতল অংশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে যাইয়া শেষ হইয়াছে, সেইখানে নগর-প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী হথিয়ালের উত্তর দিককার শেষ পাহাড়টির উপর এই স্তূপটি অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন্-সঙ তক্ষশিলা নগরে আগমন করেন, তখন তিনি অন্যান্য সৌধের মধ্যে এই স্তূপটিও পরিদর্শন করেন। প্রবাদ এই, সম্রাট অশোক তদীয় পুত্র কুণালের চক্ষু-উৎপাটন-স্থানে স্মারকচিহ্ন স্বরূপ এই স্তূপটি নির্ম্মাণ করেন। হিউ-এন্-সঙ তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে এই কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়া কুণালের দুরদৃষ্টের কথা বিবৃত করিয়াছেন। বিমাতা তিষ্য-রক্ষিতার প্ররোচনায় কুণাল অশোক কর্ত্তৃক রাজপ্রতিনিধি রূপে তক্ষশিলায় প্রেরিত হন। তৎপর তিষ্যরক্ষিতা অশোকের নাম দিয়া একখানা আদেশ-পত্র লিখেন, এবং সম্রাটের ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁহার দন্তের ছাপ দ্বারা উক্ত আদেশ পত্র শিলমোহর করিয়া দেন। পত্রে কুণালের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ, এবং তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করিয়া দিবার আদেশ লিখিত ছিল। প্রথমতঃ মন্ত্রিগণ উক্ত আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হন; কিন্তু রাজকুমার স্বয়ং তাঁহার পিতার আজ্ঞা পালনের জন্য জিদ করিতে থাকেন। আদেশ পালিত হইবার পর তিনি তদীয় পত্নীসহ দিশাহারা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পথ জিজ্ঞাসা করিয়া করিয়া অবশেষে তাঁহার পিতার সুদূরস্থিত রাজধানীতে উপস্থিত হন। তাঁহার পিতা তাঁহার কণ্ঠস্বর এবং বাঁশীর ধ্বনি শুনিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারেন। অতঃপর নিষ্ঠুর এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণা মহিষীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তখন যুবরাজ বুদ্ধগয়ায় গমনপূর্ব্বক ঘোষ নামক জনৈক বৌদ্ধ অর্হতের সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান। হিউ-এন্-সঙ লিখিয়াছেন; বহু অন্ধ ব্যক্তি এই স্তূপের নিকট আগমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিত। এবং অনেকেই পুনঃ দৃষ্টি-লাভ করিয়া প্রার্থনানুযায়ী ফল পাইত।
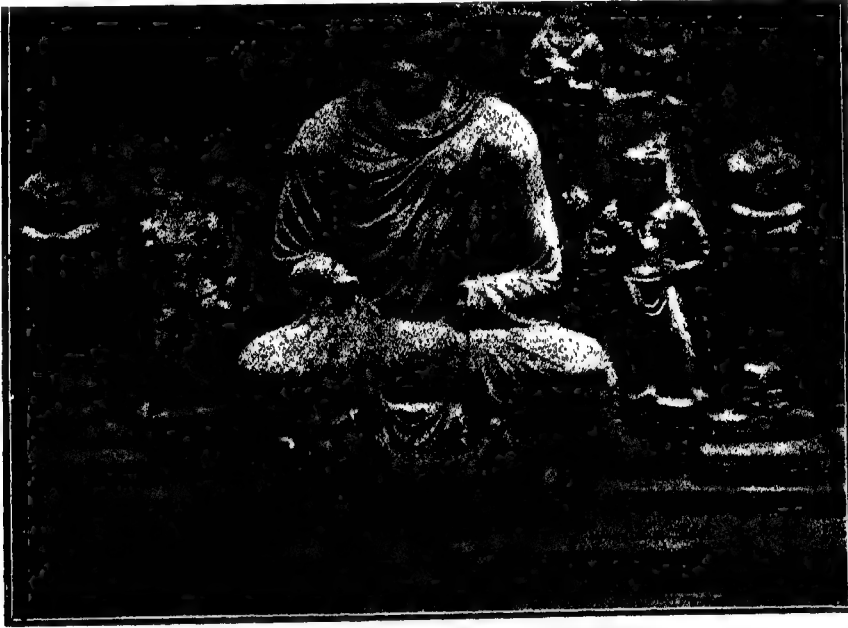
মোহ্রামোরাদু—স্তূপগাত্রস্থ মূর্ত্তিশ্রেণী

Sir John Marshall উপরিউক্ত কিম্বদন্তীতে আস্থা স্থাপন করেন নাই। তিনি ইহাকে সাধারণ উপকথারূপে গ্রহণ পূর্ব্বক কথিত স্তূপটির নির্ম্মাণ-কাল খৃঃ ৩য় অথবা ৪র্থ শতাব্দীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্তূপের বর্ণনা

একটি সুউচ্চ চতুষ্কোণ বেদীর উপর স্তূপটি অবস্থিত। বেদীটি দৈর্ঘ্যে উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিদধিক ১০৫ ফিট্, এবং প্রস্থে পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৬৪ ফিট। উত্তর দিক হইতে এক-প্রস্থ সিঁড়ি প্রসারিত। বেদীটি তিনটি স্তর বা 'বেদী'তে (terrace) বিভক্ত। সর্ব্ব নিম্ন স্তরটি সারি সারি খর্ব্বাকৃতি করিন্থীয় গাত্র স্তম্ভে (pilasters) পরিবেষ্টিত। স্তম্ভগুলির নীচে, স্তূপবেদীর পাদদেশে "গোলা এবং খাঁজ" ("Torus and Scotia") ধরণযুক্ত বিশদ ভাস্কর্য্য-বিন্যাস

(mouldings)। স্তম্ভের শীর্ষোপরি এক কালে দণ্ডাকৃতি কর্ণিশ (dentil cornice) এবং 'উষ্ণীষ' সমূহ (copings) যুক্ত ছিল। শীর্ষভাগ (capital) এবং কর্ণিশের মধ্যে হিন্দু ধরণের খাতযুক্ত অবলম্বনীসমূহ (brackets of the "notched" variety) স্থাপিত। মধ্যবর্ত্তী স্তরটি সাদাসিধা; কেবল উপরে চূণ-বালির একটি 'আস্তর। সর্ব্বোপরিস্থ স্তরটি নিম্নতম স্তরের ন্যায়ই কারুকার্য্য-খচিত ছিল; তবে দ্বিতীয় অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ অধিক উচ্চ ছিল। স্তূপটির উপরাংশের মধ্যে কেবলমাত্র ইহার অভ্যন্তর ভাগের সামান্য অংশ বর্ত্তমান আছে। উক্ত অংশস্থিত কারুকার্য্যের বহু মধ্যে বা নিম্নে ভস্ম-প্রকোষ্ঠের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

অন্তর্বর্ত্তী ক্ষুদ্র স্তূপ।

এই স্তূপের অভ্যন্তরে, ইহার উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার গঠন-রীতি দৃষ্টে অনুমান হয়, স্তূপটি খৃঃ ১ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সে সময় ইহার পার্শ্ববর্ত্তী পূর্ব্বদিকস্থ নগর-প্রাচীরটি অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান ছিল। স্তূপটি প্রায় ১০ ফিট উচ্চ, এবং অসমান চূণাপাথরে গঠিত; তলদেশে একটি সম-চতুষ্কোণ বেদী। উপরিভাগ যথারীতি
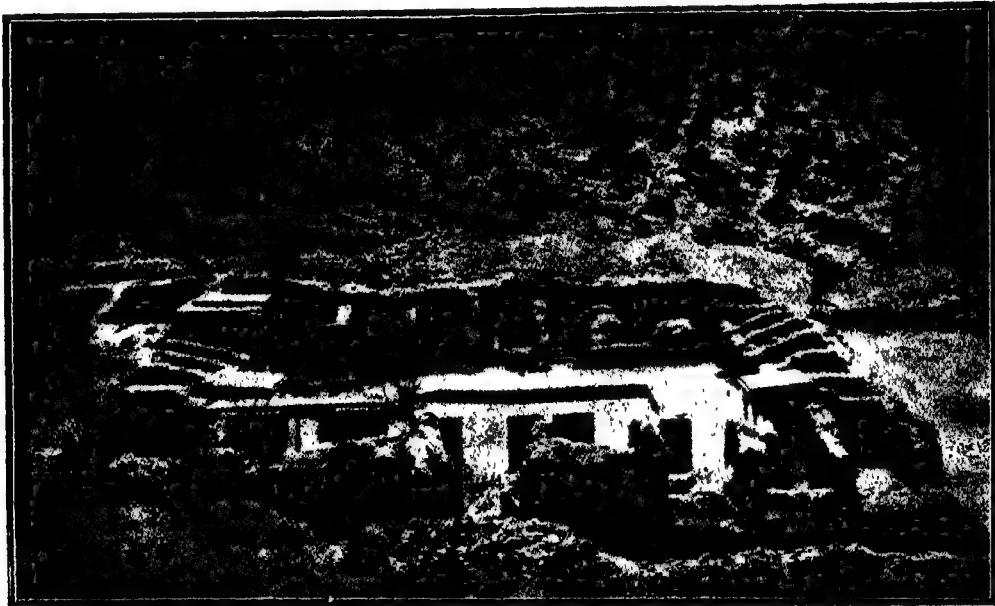
মোহ্‌রামোরাদু—বিহারের সাধারণ দৃশ্য

ভগ্নাংশ বেদীর চতুর্দ্দিকে পাওয়া গিয়াছে। সেগুলির ধরণ দৃষ্টে Sir John Marshall সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উপরিস্থ বৃত্তাকার জয়ঢাকটি স্তূপের আয়তনের অনুপাতে অত্যধিক উচ্চ, এবং পর পর ৬।৭টি বন্ধনীতে (tiers) বিভক্ত ছিল। বন্ধনীগুলি অনেকটা নিম্নের স্তবকগুলির ন্যায় সারি সারি গাত্রস্তম্ভ এবং দণ্ডাকৃতি কর্ণিশে সুশোভিত ছিল; আর জয়ঢাকের উপর যথারীতি একাধিক ছত্রযুক্ত একটি 'অণ্ড' (dome) স্থাপিত ছিল। এই যুগের অন্যান্য স্তূপের ন্যায় এখানেও ভস্ম-প্রকোষ্ঠটি নিঃসন্দেহ স্তূপটির শীর্ষদেশের সন্নিকটে স্থাপিত ছিল। কেন না, সৌধের ভিটির জয়ঢাক এবং 'অণ্ড' শোভিত। কেবল শীর্ষস্থ ছত্রটি বিদ্যমান নাই। স্তূপটির অসমান গাত্রভাগ পূর্ব্বে চূণ দ্বারা আস্তৃত করতঃ তদুপরি কারুকার্য্যসমূহ ক্ষোদিত করা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সমস্ত আস্তর পড়িয়া গিয়াছে।

সঙ্ঘারাম

"কুণাল স্তূপে"র ঠিক পশ্চিম দিকে, কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমিতে অর্দ্ধ-চৌকস বৃহৎ পাথরে সুগঠিত একটি সুপ্রশস্ত বিহার বা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। সঙ্ঘারামটি উক্ত স্তূপেরই সমসাময়িক। ইহার প্রাচীরগুলি স্থানে স্থানে ১৩।১৪ ফিট উচ্চ; অভ্যন্তরে দুইটি চৌক (court),—তন্মধ্যে বৃহৎটি

উত্তর দিকে, আর ক্ষুদ্রটি দক্ষিণ দিকে, অবস্থিত। সঙ্ঘারামের পূর্ব্বদিকস্থ বহিঃপ্রাচীরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৯৫ ফিট, আর তন্মধ্যস্থ বৃহত্তর চৌকটি প্রস্থে প্রায় ১৫৫ ফিট। এই চৌকটি যথারীতি চতুঃশালা আদর্শে পরিকল্পিত, অর্থাৎ মধ্যস্থলে উন্মুক্ত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ, তাহার চতুর্দ্দিকে সমুচ্চ বারান্দা, বারান্দার চারি পার্শ্বে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে সাধারণ খিলানবিশিষ্ট বহু কুলুঙ্গী (niches)। কুলুঙ্গীগুলির ভিতর দীপাধার প্রভৃতি রক্ষিত হইত।

জণ্ডিয়াল

"কুণাল স্তূপ" হইতে অবতরণপূর্ব্বক শিরকাপ নগরের রাজপথ ধরিয়া উভয় পার্শ্বে অগণিত ধ্বংস-সমাধি অতিক্রম করিয়া আমরা নগরের উত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত জণ্ডিয়ালের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মিউজিয়ম হইতে এই স্থানের দূরত্ব সরকারী রাস্তায় প্রায় ১৷৷০ মাইল।

মন্দির

অতি চমৎকার উন্মুক্ত স্থানে একটি ২৫।২৬ ফিট উচ্চ কৃত্রিম মাটীর ঢিবির উপর, শিরকাপের দিকে সম্মুখ করিয়া, এই মন্দিরটি দণ্ডায়মান। উত্তর-দক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ ফিট। এই ধরণের আর দ্বিতীয় একটি মন্দির এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কুত্রাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহার পরিকল্পনার সহিত গ্রীসের প্রাচীন মন্দির সমূহের আশ্চর্য্যরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তবে আলোচ্য মন্দিরটি, গ্রীক-আদর্শসুলভ স্তম্ভ শ্রেণীর (peristyle of columns) পরিবর্ত্তে, ঘন ঘন বৃহৎ গবাক্ষযুক্ত একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এই গবাক্ষসমূহের মধ্য দিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রচুর আলোক প্রবেশ করিত। দক্ষিণ দিকস্থ প্রবেশ কক্ষের সম্মুখে দুইটি, এবং ইহাদের সোজাসুজি পশ্চাৎভাগে, উভয় পার্শ্বস্থিত চতুষ্কোণ স্তম্ভদ্বয়ের (pilasters) মধ্যে আর দুইটি গ্রীক ধরণের স্তম্ভ (Ionic columns) দণ্ডায়মান ছিল। স্তম্ভসমূহের উপরে মাথাল বা আলম্বন (architrave) স্থাপিত ছিল। প্রবেশ-কক্ষের পর মন্দিরের সম্মুখ মণ্ডপ (pronaos), তাহা পিছনে গর্ভগৃহ (naos or sanctum)। উভয়ের মধ্যে একটি প্রশস্ত দ্বার-পথ। সর্ব্ব শেষে, পশ্চাদ্মণ্ডপ (opisthedomos)। পশ্চাদ্ মণ্ডপ এবং গর্ভগৃহের মধ্যবর্ত্তী স্থান পাথরে বাঁধানো। ইহার ভিত্তি মন্দিরের তলদেশ হইতে প্রায় ২০।২১ ফিট নীচে পর্য্যন্ত প্রসারিত। ভিত্তির এতাদৃশ গভীরতা দৃষ্টে Sir John Marshall সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উক্ত বাঁধানো স্থানের উপর একটি সুউচ্চ গুরুভার গম্বুজ (tower) স্থাপিত ছিল। মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী মণ্ডপ মধ্যস্থ সোপানাবলী সাহায্যে এই গম্বুজের উপরে আরোহণ করা হইত। এখনও উক্ত সোপানের দুইটি শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। সম্ভবতঃ আরও অন্ততঃ তিনটি শ্রেণী ছিল। অনুমান, গম্বুজটি প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ ছিল।

মন্দিরটি প্রধানতঃ চুণা পাথর এবং অংশতঃ কঙ্কর পাথরে নির্ম্মিত। গাত্রভাগ পূর্ব্বে চূণ-বালিতে আবৃত ছিল; ইহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্ভগুলি বৃহদায়তন বেলে পাথরে নির্ম্মিত। এই শ্রেণীর পাথর এখানে পাওয়া যায় না, স্থানান্তর হইতে তাহা আনয়ন করা হইয়াছিল। স্তম্ভসমূহের পাদদেশ (base), কাণ্ড (Shaft) এবং শীর্ষভাগ (capital) পৃথক পৃথক প্রস্তর-খণ্ডে গঠিত। খণ্ডগুলি চতুষ্কোণ লৌহ-কীলক দ্বারা পরস্পর সংবদ্ধ ছিল। স্তম্ভগুলির পাদদেশস্থ "গোলা এবং খাত" (Torus and scotia) ধরণের ভাস্কর্য্য বিশেষ সুক্ষ্মভাবে সম্পন্ন নহে; তবে- "পত্র ও অস্ত্র" ("leaf and dart") এবং "কাটিম ও মালা" ("reel and bead") ধরণযুক্ত এবং শঙ্খের ন্যায় কুণ্ডলী (volute) বিশিষ্ট শীর্ষভাগ বড়ই চমৎকার।

মন্দিরের মূল অংশের অন্তর্গত মাথাল বা আলম্বন, ফ্রিজ (frieze) এবং কর্ণিশ কাঠের ছিল, এবং এ সমুদায়ই, উপরিউক্ত গোলাকার স্তম্ভ, চতুষ্কোণ-গাত্রস্তম্ভ, এবং প্রাচীরের পাদদেশস্থ ভাস্কর্য্য বিন্যাসের ন্যায় গ্রীক ধরণে রচিত ছিল। ছাদও কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ছিল। মন্দিরের মেঝেতে বহু কাঠের কড়ি, লম্বা লম্বা লোহার পেরেক, দরজার কব্জা এবং চুণ-বালি মিশ্রিত কর্দ্দমের একটি পুরু স্তর পাওয়া গিয়াছে। এই সব দৃষ্টে অনুমিত হয়, মধ্যবর্ত্তী গম্বুজ ব্যতিরেকে মন্দিরের ছাদটি অধিকাংশ প্রাচ্য সৌধের ছাদের ন্যায় সমতল এবং কর্দ্দমাবৃত ছিল।

এই বিশিষ্ট ধরণের মন্দিরটি কোন্ ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল;— এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। ইহার ভগ্নাবশেষের মধ্যে কোন

বৌদ্ধ মূর্ত্তি অথবা অন্যবিধ বৌদ্ধ নিদর্শন কিছুই পাওয়া যায় নাই। তৎপরে, ইহার অদ্ভুত পরিকল্পনার সহিত কোন বৌদ্ধ সৌধের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। এই সব দৃষ্টে মনে হয়, ইহা কখনই বৌদ্ধ মন্দির নহে। এবম্প্রকার কারণে ইহাকে হিন্দু অথবা জৈন ধর্ম্মান্তর্গত বলিয়াও নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। পক্ষান্তরে মন্দিরের মধ্যস্থিত ও গর্ভগৃহের ঠিক পশ্চাদ্বর্ত্তী সুউচ্চ গম্বুজটি বিশেষ অর্থ-জ্ঞাপক। (Sir John Marshall এর মতে এই গম্বুজটি পিরামিডের ন্যায় ক্রম-সূক্ষ্মাগ্র বিশিষ্ট মেসোপটেমিয়ার একটি "জিকুরৎ" বিশেষ ছিল। ইহাতে আরোহণ করিবার প্রণালীও তদ্রূপ ছিল। এই সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া তিনি এই মন্দিরটিকে জোরোস্ত্রিয় (পারসীক) ধর্ম্মান্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মন্দিরটি অগ্নিদেবতার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। তিনি বলিয়াছেন, উক্ত গম্বুজের শীর্ষ ভাগে দাঁড়াইয়া বিশ্বাসী ভক্তগণ সূর্য্য, চন্দ্র এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর স্তুতিবাদ করিয়া প্রার্থনা করিতেন। এই সমস্ত হইতে তাঁহাদের চিন্তারাশি ক্রমে প্রকৃতির স্রষ্টার দিকে ধাবিত হইত। গর্ভগৃহের মধ্যে পবিত্র অগ্নি-বেদী এবং তৎপার্শ্বে মঞ্চ স্থাপিত ছিল; মঞ্চ হইতে পুরোহিতগণ অগ্নিদেবকে আহুতি প্রদান করিতেন।

মাহামোরাদুর বিহার—প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরস্থ স্তূপ

এসিরীয়ার "জিকুরতে"র সঙ্গে পারসীকগণ সমধিক পরিচিত ছিল। কাজেই ইহা খুবই সম্ভব যে, তাহারা তাহাদের অগ্নি-মন্দির নির্ম্মাণে উক্ত "জিকুরতে"র পরিকল্পনা গ্রহণ করিত। পরন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষ স্মরণযোগ্য। গঠনরীতি দৃষ্টে মনে হয়, এই মন্দিরটি খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে সিথীয়-পার্থিয় যুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সময়ে তক্ষশিলায় নিশ্চয়ই জোরোস্ত্রিয় ধর্ম্মের বিশেষ প্রভাব ছিল।

সম্ভবতঃ এইটিই এপলোনিয়াসের জীবনী-লেখক ফিলোষ্ট্রেটাস বর্ণিত মন্দির। এপলোনিয়াস এবং তাঁহার সঙ্গী ডেমিস রাজার নিকট হইতে নগর-প্রবেশের অনুমতির জন্য এই মন্দিরে অপেক্ষা করিয়াছিলেন। অন্যান্য বর্ণনার পর ফিলোষ্ট্রেটাস লিখিয়াছেন, এই মন্দিরের প্রত্যেক দেওয়াল-গাত্রে সংবদ্ধ পিত্তল ফলকের উপর পুরু এবং আলেকজণ্ডারের কার্য্যাবলী অঙ্কিত ছিল। বলা বাহুল্য, এই সময় তক্ষশিলা নগরী মন্দিরের দক্ষিণ দিকবর্ত্তী শিরকাপ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সুতরাং এই সৌধটিই যে ফিলোষ্টেটাস-কথিত মন্দির তাহা তল্লিখিত "প্রাচীরের সম্মুখে"—এই অবস্থান-নির্দ্দেশেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে।

এই মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে কতকগুলি স্তূপ ও বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত; কিন্তু সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। কাজেই আমরা তদ্বর্ণনায় বিরত হইলাম।

এখান হইতে আমরা সরকারী রাস্তা ধরিয়া বামে শিরসুখ নগরের ধ্বংসাবলী এবং দক্ষিণে বহু সংখ্যক স্তূপ ও বিহারের ভগ্নাবশেষ রাখিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকস্থ হথিয়াল পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী মোহামোরাদুর স্তূপে গমন করিলাম।

মোর্হামোরাদু

অবস্থান ও প্রাকৃতিক দৃশ্য

এই স্তূপের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে যে দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা অতীব মনোরম। বামে নাতিউচ্চ পাহাড়ের উপরিস্থ ক্ষুদ্র মোর্হামোরাদু পল্লী, দক্ষিণে কৃষকদের ক্ষেত্র রাজি, আর সম্মুখে সোনাথা এবং বন্য জলপাইতরু-মণ্ডিত সুউচ্চ শ্যামল শৈলাবলী,—বড়ই চমৎকার শোভা—দেখিলে প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকে উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। পাদনিম্নে একটি ক্ষুদ্র অধিত্যকা। তন্মধ্যে এই বিশাল স্তূপটি অবস্থিত। সম্মুখস্থ পাহাড়ের বন্ধুর পাদদেশের উপর দিয়া একবার এই অধিত্যকায় প্রবেশ করিলে মনে হয়, বহির্জ্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এক জনমানবহীন প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সংসারের কলকোলাহল এখানে আসিয়া থামিয়া গিয়াছে। বাহিরের ঈর্ষা-দ্বেষ-কলহের পূতি-গন্ধময় দূষিত বায়ু অবিরত এই পাহাড়-প্রাচীরে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এই স্থানে সর্ব্বক্ষণ এক সুমহান পবিত্র গম্ভীর ভাব বিরাজ করিতেছে। ধন্য বৌদ্ধ শ্রমণগণ! ধন্য তাঁহাদের স্থান-নির্ব্বাচনা শক্তি! আর আজ এই বিংশ শতাব্দীতে, এই উন্নত সুসভ্য যুগে কোলাহল-মুখরিত জন-বহুল নগরের আবেষ্টনীর মধ্যে শত শত তথাকথিত মঠ বা মন্দির দেখিলে বড়লোকের সুরম্য বৈঠকখানা বা প্রাসাদ-ভবন বলিয়া ভ্রম হয়!

মূল স্তূপ

উপরিউক্ত অধিত্যকার মধ্যে একটি দীর্ঘায়তন সমুচ্চ ভূমির উপর পাশাপাশি এই স্তূপটি ও এতৎসংলগ্ন বিহার বা সঙ্ঘারাম অবস্থিত। স্তূপটি পশ্চিম দিকে; সঙ্ঘারামটি পূর্ব্ব দিকে। স্তূপটি সম্ভবতঃ খৃঃ ২য় শতাব্দীর শেষ অথবা ৩য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুষান যুগে নির্ম্মিত হয়। ধর্ম্মরাজিকা স্তূপের ন্যায় এই স্তূপেরও অগ্রভাগ পূর্ব্বকালে ধনলোভীরা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলে। স্তূপের গাত্র-ভাগ নানারূপ বৌদ্ধ মূর্ত্তিতে শোভিত। মূর্ত্তিগুলি চূণ-বালিতে (Stucco) নির্ম্মিত। দেখিয়া মনে হয়, জয়ঢাকের শীর্ষ পর্য্যন্ত সৌধটির সমগ্র গাত্রভাগই এইরূপ মূর্ত্তিসমূহে মণ্ডিত ছিল। এখনও গাত্রস্তম্ভগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপবিষ্ট এবং দণ্ডায়মান বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। স্তম্ভগুলির উপরেও স্তরে স্তরে বুদ্ধমূর্ত্তি সজ্জিত। জয়ঢাকের উপরেও ঐরূপ ছোট ছোট মূর্ত্তি স্থাপিত। স্তূপের পূর্ব্ব দিক হইতে প্রসারিত সোপানাবলীর উভয় পার্শ্বেও ঐরূপ সারি সারি মূর্ত্তি ছিল। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয় বিষয়,—ইহাদের জীবন্ত এবং সচল ভাব। এই জীবন্ত এবং সচল ভাব বুদ্ধের পার্শ্ববর্ত্তী কোন কোন বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তিতে বিশেষ পরিস্ফুট। বুদ্ধের পশ্চাদ্ভাগে উভয় দিকে বিরাজিত মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া মনে হয়, ইহারা ঠিক যেন মেঘের মধ্য হইতে বাহির হইতেছে। কোথাও কোথাও রংয়ের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—মূর্ত্তিগুলির অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং কাপড়ের ভাঁজের ভঙ্গী। ইহাতে শিল্পীর সূক্ষ্ম কলা-নৈপুণ্য এবং নির্ভুল পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

স্তূপের বেদীর চারিদিকে অনেকগুলি ভগ্ন মুণ্ড পাওয়া গিয়াছে। স্তূপের সিঁড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে ইহার সমসাময়িক এই ধরণেরই আর একটি ক্ষুদ্র স্তূপ অবস্থিত।

সঙ্ঘারাম

এতৎসংলগ্ন বিহারটি স্তূপের ন্যায়ই চমৎকার। ইহার মধ্যস্থলে যথারীতি একটি অনাবৃত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ অবস্থিত। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথে উঠিবার জন্য দুই-প্রস্থ চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির উপরে অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বার-মণ্ডপ। দ্বারমণ্ডপের পশ্চিম দেওয়ালে একটি খিলানযুক্ত কুলুঙ্গী। কুলুঙ্গীর মধ্যে চমৎকার একপ্রস্থ মূর্ত্তি স্থাপিত,—কেন্দ্রস্থলে বুদ্ধ, তাঁহার প্রত্যেক পার্শ্বে চারিজন করিয়া উপাসক। দ্বার-মণ্ডপ অতিক্রম করিলেই সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ। ইহার চতুর্দ্দিকে ২৭টি প্রকোষ্ঠ (cells) সজ্জিত। প্রাঙ্গণের মধ্য ভাগ প্রায় দুই ফিট পরিমাণ নীচু। এই নীচু অংশের উপর চারি পাশ হইতেই সিঁড়ি প্রসারিত। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে একটি সম-চতুষ্কোণ মঞ্চ অবস্থিত। ইহার উপর এককালে একটি কোঠা দণ্ডায়মান ছিল। খুব সম্ভব এটি স্নানাগার রূপে ব্যবহৃত হইত। নীচু অংশের চতুর্দ্দিকস্থ সমুচ্চ রোয়াকের উপর ৫ ফিট অন্তর অন্তর কতকগুলি প্রস্তর-খণ্ড প্রোথিত দেখা যায়। এগুলির উপর উপরিউক্ত প্রকোষ্ঠ-নিচয়ের সম্মুখবর্ত্তী সুপ্রশস্ত বারান্দার থাম্বাসমূহ দণ্ডায়মান ছিল। প্রকোষ্ঠগুলি দ্বিতল বিশিষ্ট ছিল। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগের প্রাচীরে স্তর-চিহ্ন (ledge) এবং সারি সারি

ছিদ্র দৃষ্টে বুঝা যায়, নিম্নতল প্রায় ১২ ফিট পরিমাণ উচ্চ ছিল। দক্ষিণ দিকের একটি প্রকোষ্ঠের মধ্যে সিঁড়ির দুইটি শ্রেণী দেখা যায়। এই সিঁড়ি সাহায্যে উপর তলে আরোহণ করা হইত। নিম্নতলের আলোক-পথ বা জানালাগুলি ভূমি হইতে প্রায় ৮ ফিট উচ্চে স্থাপিত। জানালাগুলি শীর্ষ-দিকে কিঞ্চিৎ চাপা, এবং বহির্মুখে কথঞ্চিৎ বক্র। কোন কোন প্রকোষ্ঠ গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলুঙ্গী দেখা যায়।

বলা বাহুল্য, এই প্রকোষ্ঠগুলিতে বৌদ্ধ শ্রমণগণ বাস করিতেন। প্রকোষ্ঠগুলির অভ্যন্তর ভাগ চূণ বালির আস্তরে মণ্ডিত ছিল; কিন্তু কোন কারুকার্য্যে ভূষিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। বারান্দার প্রাচীরগুলি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, এবং ইহার ছাদের কাঠের সাজ নানারূপ অলঙ্কার কার্য্যে ক্ষোদিত এবং চিত্রিত বা গিল্টী করা ছিল। আর প্রকোষ্ঠগুলির সম্মুখে, স্তম্ভপদের (pedestal) উপর বিশাল-দেহ বুদ্ধমূর্ত্তি সকল স্থাপিত করিয়া, অথবা প্রাচীর-গাত্রস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুলুঙ্গীর মধ্যে পবিত্র মূর্ত্তি-শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রাঙ্গণটির অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করা হইয়াছিল। প্রথমোক্ত মূর্ত্তিনিচয়ের মধ্যে অঙ্গনের চতুর্দ্দিকে ৭টির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি খৃঃ ৪র্থ অথবা ৫ম শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিহারের বাম দিকে এক প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ কুলুঙ্গীর ভিতর অতি সুরক্ষিত অবস্থায় এক-প্রস্থ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেন্দ্রস্থলে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধদেব, তাঁহার দক্ষিণে ও বামে কতিপয় পার্শ্বচর।

এতদপেক্ষা মূল্যবান একটি জিনিস, অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ একটি স্তূপ—বিহারের বাম দিকেই আর একটি প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্তূপটি ১২ ফিট উচ্চ এবং গোলাকার। ইহার বেদীটি পাঁচটি বন্ধনীতে (tiers) বিভক্ত। সর্ব্ব নিম্ন বন্ধনীতে পর্য্যায়ক্রমে হস্তী এবং মনুষ্য-মূর্ত্তি (Atlantes), আর উপরিস্থ বন্ধনী-গুলিতে পর পর কুলুঙ্গী মধ্যে উপবিষ্ট বুদ্ধ এবং চতুষ্কোণ স্তম্ভসমূহ স্থাপিত। স্তূপের উপরিস্থ ভাস্কর্য্য বিন্যাস এবং অন্যান্য কারুকার্য্য চূণ-বালি দ্বারা সম্পাদিত। এককালে এ সমস্তই লাল, নীল এবং হলুদে বর্ণে চিত্রিত ছিল। স্তূপের 'অণ্ডো'পরিস্থ 'হর্ম্মিকার' (pedestal of the shaft of the Umbrella) উপর একটি লৌহ-নির্ম্মিত 'যষ্টি'র মধ্যে সাতটি ছত্র গ্রথিত। ছত্রটি স্তূপের পার্শ্বে পড়িয়া ছিল। ছত্রগুলির কিনারা ছিদ্র-সমন্বিত; ছিদ্রের মধ্যে পতাকা অথবা মালা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। এ পর্য্যন্ত উত্তর-ভারতে এই ধরণের যে সমস্ত স্তূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে এই স্তূপটিই সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ। সুতরাং পুরাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার একটি বিশিষ্ট মূল্য আছে।

পূর্ব্ববর্ণিত সন্ন্যাসীদের আবাস-স্থান—প্রকোষ্ঠ চৌক এবং স্নানকক্ষ (জন্তাগার) ব্যতিরেকে মধ্যযুগের একটি বৌদ্ধ বিহারের প্রধান অংশনিচয় ছিল—একটি সভাগৃহ (উপস্থানশালা), একটি আহার-গৃহ (উপাহারশালা), একটি রন্ধন-গৃহ (অগ্নিশালা), একটি ভাণ্ডার-গৃহ (কোষ্ঠক) এবং একটি শৌচাগার (বর্চ্চ কুটি)। আমাদের বর্ণনীয় বিহারে উপরিউক্ত গৃহগুলি প্রকোষ্ঠ চৌকের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। তন্মধ্যে উত্তর সীমানার সমচতুষ্কোণ এবং সুপ্রশস্ত কক্ষটিই সভাগৃহ। এই গৃহের ছাদ এককালে চারিটি স্তম্ভের উপর ছিল। সভাগৃহের পরবর্ত্তী কোঠাটিই সম্ভবতঃ রন্ধনশালা ছিল। ইহার সহিত ভাণ্ডার-গৃহটি সংলগ্ন ছিল। দক্ষিণ প্রান্তের কোঠা দুইটি সম্ভবতঃ প্রথমতঃ আহার-গৃহ এবং কর্ম্মকর্ত্তার গৃহরূপে ব্যবহৃত হইত। পরবর্ত্তী-কালে শেষোক্ত গৃহটির মেঝে ভাগ ৮ ফিট পরিমাণ উঁচু করিয়া তন্মধ্যে একটি জলাধার নির্ম্মাণ করতঃ ইহাকে স্নানাগারে পরিণত করা হয়। এই পরিবর্ত্তনের পর আহার-গৃহটি সম্ভবতঃ সভাগৃহের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

সঙ্ঘারামের প্রাচীরগুলির গঠন-প্রণালী এবং অন্যান্য প্রমাণ দৃষ্টে Sir John Marshall ইহার নির্ম্মাণকাল খৃঃ ২য় শতাব্দীর শেষভাগে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে পরবর্ত্তী অর্দ্ধচৌকসের ধরণের গাঁথনি যোগে এই বিহারের পরিবর্দ্ধন এবং সংস্কার করা হয়। বিহারের মেঝের উপর কুষান রাজা হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে প্রায় অক্ষত অবস্থায় বোধিসত্ত্ব গৌতমের (?) একটি চমৎকার গান্ধার মূর্ত্তি, বুদ্ধের কতকগুলি পোড়ামাটীর মূর্ত্তি, এবং "হরিশ্চন্দ্র" নামাঙ্কিত গুপ্তযুগের একটি মোটা পাথরের শিলমোহর পাওয়া গিয়াছে।

এখান হইতে আমরা ইহার এক মাইল উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী জৌলিয়াঁর স্তূপাবলীতে গমন করিব। মোহ্রামোরাদু হইতে এই স্থানে যাইবার দুইটি রাস্তা আছে,—একটি সরকারী সড়ক, অপরটি পাহাড় মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ। দ্বিতীয় পথটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পদীর্ঘ, এবং ইহার মধ্য দিয়া পদব্রজে গমন দর্শকের পক্ষে বেশ সুখকর।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৪

সেদিন প্রভাত হইতে কিরণের মনের উৎকণ্ঠা ও অশান্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। আজ লীলা অরুণের কাছে গোপন রহস্য প্রকাশ করিতে আসিবে। আজ কিরণের ভাগ্য-পরীক্ষার দিন। আজ সে কিছুতে বাড়ীতে থাকিতে পারিল না। চা খাওয়া সাঙ্গ হইতে না হইতেই ব্যগ্র অশান্ত চিত্তে সে বাহির হইয়া পড়িল। এখনি হয় ত লীলা আসিয়া পড়িবে! লীলাকে অরুণের সঙ্গে একত্র দেখা তাহার পক্ষে অসহ্য! একান্ত অসহ্য ব্যাপার!

বাহিরে আসিয়া সে তাহার নিজের কোন কাজে মনোযোগ দিতে পারিল না। ফল যাহা হইবে তাহা ত জানা কথা—সে কথা মনে পড়িলে সে পাগল হইয়া উঠে। একটা নির্জ্জন বাগানের মধ্যে আসিয়া সে দুই হস্তে মাথা টিপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল।

মানুষ ঘোর নিরাশার ভিতরও আশার ক্ষীণ রেখাটুকু প্রাণ ধরিয়া ছাড়িতে পারে না। থাকিয়া থাকিয়া কিরণের মনেও একটা অনিশ্চিত আশার আলো জাগিয়া উঠিতেছিল—যদি সব শুনিয়া অরুণ শেষ পর্য্যন্ত লীলাকে তাহার সর্ত্ত হইতে মুক্তি দেয়! কিরণ নিজের অনুকূল যুক্তি দ্বারা মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিল যে, অরুণের পক্ষে ইহাই সম্ভব ও উচিত। সে যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে ছাড়িয়া তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কাহাকেও সে কেমন করিয়া বিবাহ করিবে? এই যে সে লীলাকে ভালবাসে, সে কি কোন বিশেষ অবস্থা-চক্রে পড়িয়া লীলার পরিবর্ত্তে অন্য কোন মেয়েকে বিবাহ করিতে পারে? অন্য মেয়ের সঙ্গে আলাপ হইতে পারে, বন্ধুত্ব হইতে পারে; কিন্তু বিবাহ! সে ত সম্পূর্ণ অসম্ভব!

লীলার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসার পর তাহার সহিত প্রথম পরিচয়ের সময় হইতে সব কথা একে একে কিরণের মনে পড়িতেছিল। সে দিনের কি নিশ্চিন্ত আনন্দময় জীবন! তখন লীলা একেবারে সম্পূর্ণ তাহারই আয়ত্তের মধ্যে ছিল। সে তখন সহজেই তাহাকে নিজের করিয়া লইতে পারিত। লীলা বা তাহার পিতা মাতা—কাহারও তাহাতে কিছু আপত্তি থাকিত না। তাহা না করিয়া সে কেবল ছেলেমানুষি করিয়া খেলায় ও আমোদে মাতিয়া কাটাইয়া দিল। মানুষের জীবনে সুযোগ দৈবাৎ আসে। সে সময় তাহাকে লইতে না পারিলে যাবজ্জীবন মনস্তাপে কাটাইতে হইবেই ত!

কিরণ নিজের নিশ্চেষ্টতা ও মূঢ়তার কথা ভাবিয়া নিজের উপর অত্যন্ত রাগিয়া উঠিল। ধরিতে গেলে সেই ত একরূপ তাহার লীলাকে অরুণের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এখন আর সে জন্য অনুতাপ করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইয়া লাভ কি?

মাথার উপর রৌদ্র ক্রমশঃ প্রখর হইতে হইতে যখন বেলা প্রায় বারোটা বাজিয়া গেল, তখন আর বসিয়া থাকা অসম্ভব দেখিয়া কিরণ শ্রান্ত অবসন্ন শরীরটা কোন মতে টানিয়া টানিয়া শুষ্ক মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

বাহিরের ঘরে অরুণ প্রসন্ন মুখে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া ছিল। তাহার পায়ের শব্দ শুনিয়াই সে ডাকিতে লাগিল—কিরণ! এসো, এ ঘরে! আগে এসো। তোমায় বলবার অনেক কথা আছে। আমি কতক্ষণ থেকে তোমার জন্য যে বসে রয়েছি! আজ তুমি বড় দেরি করেছ কিন্তু!

কিরণ ঘরে আসিয়া অরুণের পাশে একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। অরুণের হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া তাহার ব্যাপার বুঝিতে বেশি বিলম্ব হইল না।

অরুণ বলিতে লাগিল, কিরণ! আজ আমাদের দুজনের সব বিষয় ঠিক হয়ে গেছে ভাই। লীলা আজ এসেছিল। সে আমায় আজ সব কথাই বলে গেছে—যদিও আমি আন্দাজে অনেক দিন আগে থেকেই সব জানতুম,—

কিরণ শুষ্কভাবে বলিল—জানতে? কি করে জানলে?

অরুণ হাসিয়া বলিল—জানতুম বৈ কি! তোমাদের বর্ণনা আর কথা শুনেই ধরে ফেলেছিলুম। তুমিও ত সব জানতে ভাই। সব জেনে শুনেও তুমি ত এত দিন আমায় কোন কথাই বল নি। যা হোক, সে জন্য আমি তোমায় কিছু বলতে চাই না। লীলার অনুরোধ—সে যে কি জিনিস, তা আমার বুঝতে বাকি আছে? আজই সে বাড়ী গিয়ে মিঃ রায় ও মিসেস রায়কে এ কথা জানাবে বলে গেছে। তার পরে আমাদের বিবাহের আর বেশি বিলম্ব হবে না।

কিরণ নিস্পন্দ দেহে চৌকির উপর হেলিয়া পড়িল। অরুণের কথার উত্তর দিবার বা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করিবার মত তাহার দেহে আর শক্তি ছিল না। যে শাণিত অসি এত দিন তাহার উপরে উদ্যত থাকিয়া কোন্ সময়ে তাহার মাথায় পড়িবে বলিয়া তাহার আশঙ্কা ও উদ্বেগের সীমা ছিল না, আজ তাহা নিজ রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজ হইতে আর তাহাকে অশান্তি ও উৎকণ্ঠার দহনে উৎপীড়িত হইতে হইবে না! অনিশ্চিত এত দিনে সুনিশ্চিত হইয়া গেল! আজ তাহার সব শেষ! আশা, আনন্দ, সুখ তাহার জীবন হইতে চির-বিদায় লইল! তবে আর কেন তাহাকে লইয়া টানাটানি?

অরুণ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য না করিয়াই নিজের আনন্দে নিজে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিল—যে রকম দেখছি, তাতে মনে হয়, আমাদের বিয়ে হতে হতে গরম পড়ে আসবে! আমি তাই ভাবছি, বিয়ের পর এখান থেকে লীলাকে নিয়ে নাইনিতাল কি মুসুরি পাহাড়ে চলে যাব। গরমটা সেখানেই কাটিয়ে তার পর দেশে ফেরা যাবে। এর মধ্যে তোমাকে অনেকগুলো কাজ করতে হবে ভাই! আমি ত এ পর্য্যন্ত লীলাকে কিছু দিই নি। বিয়ের সময় ওঁরা যা দেবেন, সে তো আছেই। আমার দিক থেকে তুমি সেদিন তোমার মনের মত করে তাকে সাজিয়ে দিও। তোমার রুচি আছে। তুমি তাকে অনেক দিন থেকে দেখছো। তুমি তাই বেশ ভাল করেই বুঝবে, কোন্ কোন্ কাপড়ে, কি কি গহনায় তাকে ভাল মানাবে। আমার ত চোখ নেই যে আমি সে সব বুঝতে পারবো? আর আমার তুমি ছাড়া আছেই বা কে, যাকে এ সব কথা বলতে যাব। তাই তোমাকেই বলছি কিরণ, টাকার দিকে চেও না, শুধু সেদিন আমার লীলাকে আমার হয়ে তুমি মনের মতন করে সাজিয়ে দিও ভাই!

বলিতে বলিতে অরুণের গলার স্বর ভারি হইয়া আসিল, সে কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিল—বাস্তবিক কিরণ! এটা বড় আশ্চর্য্য বলে মনে হয়, যে, মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার যেন শেষ নেই! এই আমার দেখ—যে দুর্দ্দশা আমার হয়েছিল, তাতে আমারও এবারকার মত সবই শেষ হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু পেয়ে আবার আমি মন স্থির করে দাঁড়াতে পারলুম, তাও যে পাব, এমন কোন আশা ছিল না। তবু দেখ, আজ আমি কোন মতে মন স্থির করতে পারছি না। খালি আমার মনে আক্ষেপ আসছে, যদি একবার এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেতুম! আমার লীলার প্রিয় সুন্দর মুখখানি আমি জীবনে কখনো দেখতে পাব না। একবার সে দিন এক মুহূর্ত্তের জন্য দেখে নিয়ে আবার যদি আমার দৃষ্টি লোপ পেয়ে যেত, সত্য বলছি—আমি কোন দিন তার জন্য দুঃখ করতাম না।

তাহার পর সে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিল, যাক্ গে, যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে আর কি হবে! তবু আজ এই মনে করে আমার প্রাণে শান্তি আছে যে, আমার প্রচুর টাকা আছে। যাকে আমি ভালবেসেছি, যে নিজে আমায় ভালবেসে, আমার জন্য জীবনব্যাপী এত বড় ত্যাগ স্বীকার করে, আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে আমি যেমন ইচ্ছা হবে, তেমনি করে সাধ মিটিয়ে সাজাতে পারব, সুখে রাখতে পারবো,—টাকার জন্য কোন দিন মনের ক্ষোভ মনে মেরে চলতে হবে না। টাকা আছে বলে এত সুখ কখনো পাই নি, আমার সেই ঐশ্বর্য্যের যে এক দিন এমন সদ্ব্যবহার করবার দিন আসবে, তাও কোন দিন আশা করি নি। কিন্তু কিরণ! তুমি কোন কথা বল্লে না যে!

এতক্ষণ পরে অরুণের চৈতন্য হইল, যে, কিরণ এ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলে নাই। সে তখন অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, কিরণ! আজ তোমার কি হলো? আমার এত বড় আনন্দ ও সৌভাগ্যের খবরে তুমি আমায় অভিনন্দন করলে না, কোন আনন্দ প্রকাশ করলে না—এটা যে আমার বড়ই বেসুরো লাগছে। তুমি ছাড়া আমার প্রকৃত আত্মীয় বা বন্ধু কেউই নেই ত। আমি যে সর্ব্ব প্রথম অভিনন্দন

তোমার কাছ থেকেই পাব, আশা করেছিলুম—আজ তুমি এমন চুপচাপ করে আছ কেন ভাই?

সে চৌকি হইতে হেলিয়া পড়িয়া কিরণের হাত ধরিতে গিয়া হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে হাত তুষার-শীতল, অবশ, নিস্পন্দ—যেন তাহাতে জীবনের কোন স্পন্দন নাই।

তখন সহসা বিদ্যুচ্চমকের মত একটা অস্পষ্ট সংশয়ের রেখা অরুণের মনে উদয় হইয়া তাহাকেও একেবারে স্পন্দনহীন করিয়া দিল। কত দিন—কতবার কিরণের ব্যবহারে, কিরণের কথায় তাহার সন্দেহ হইয়াছে—যে কিরণ হয় ত লীলাকে ভালবাসে; কিন্তু সে কখনো মন হইতে সে কথা বিশ্বাস করিত না, এবং এ বিষয় লইয়া চিন্তা করিবার মত তাহার সময় বা অবসরও ছিল না। সে তখন নিজের ভাবনা, নিজের আনন্দেই বিভোর।

আজ তাহার মনে হইল, তাহার শত অনুরোধ ও আগ্রহ সত্ত্বেও কোন দিন কিরণ তাহার ও লীলার সঙ্গে একত্র আলাপে যোগ দেয় নাই। লীলার আসিবার উপক্রমেই সে ভূত-তাড়িতের মত বাড়ী হইতে ছুটিয়া পলাইত। লীলা চলিয়া যাইবার পর বহুক্ষণ অতীত হইয়া না গেলে সে বাড়ী ফিরিত না। সে নিজে কোন দিন ইচ্ছাক্রমে লীলার নাম মুখে আনিত না। কিন্তু অরুণের বারবার জিজ্ঞাসার দরুণ যদি কখনো সে লীলার প্রসঙ্গ তুলিত, তবে সেদিন আর সে কথা কিছুতে থামিতে চাহিত না। লীলার কথা বলিতে বলিতে সে যেন আনন্দে আবেগে আত্মহারা হইয়া পড়িত, তাহার সে কথা শেষ হইত না। অরুণ সত্যই অন্ধ,—সে কোন দিন এ সব কথা বুঝিল না।

এই অপ্রীতিকর বিসদৃশ ঘটনার মধ্যে পড়িয়া অরুণের সমস্ত হাসি খুসী শুকাইয়া গেল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া শেষে ডাকিল—কিরণ!

অরুণের সেই বেদনাপ্লুত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে কিরণের শরীরে যেন সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। সে চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল—কি অরুণ? কি বেলছো ভাই?

কিরণ! আমি সবই বুঝেছি! আমার আরো আগে বোঝা উচিত ছিল, আমি নিতান্ত মূর্খ—তাই—কিন্তু কিরণ! আমি ত অনেক দেরিতে এসেছিলুম ভাই! তুমি অনেক আগে থেকে তাকে ত জানতে,—কেন তাকে নিজের করে নাও নি এত দিন? তা হলে আজকার এ কাণ্ডটি ঘটতো না ত!

এতক্ষণ যে রুদ্ধ বেদনা বিরাট পাষাণভারের মত কিরণের হৃদয়ে চাপিয়া থাকিয়া তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া মারিতেছিল, অরুণের কোমল সহানুভূতিপূর্ণ কথায় তাহা গলিয়া অশ্রুরূপে কিরণের নয়ন ভিজাইয়া দিল।

সে রুমালে চোখ মুছিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া সহজ সুরে বলিতে গেল, তার জন্য আর বৃথা ভেবে কি হবে অরুণ? আমি ঈসপের গল্পের খরগোসের মত দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি, এখন জেগে উঠে অনুতাপ করে আর কি হবে? তোমরা দুজনে দুজনকে ভালবেসে সুখী হও, তোমাদের জীবন পরস্পরের প্রেমে আনন্দে পূর্ণ হয়ে ধন্য হয়ে উঠুক,—আমি তোমাদের উভয়ের বন্ধু, তাই দেখে সুখী হই,—এখন এই আমার আন্তরিক কামনা।

অরুণ বলিল, আমি কিন্তু এতে শান্তি পাচ্ছি না ভাই! তোমার এ অভিনন্দন আমি কি মূল্যে কিনেছি—তা ত আমি নিজে জানি! আমি বড় হতভাগা। আমি যেখানে যাব, দুঃখ বেদনা যেন আমার সঙ্গের সাথী হয়ে, আমার সংস্রবে যারা থাকে তাদের শুদ্ধ পুড়িয়ে মারবে। আমার প্রতি তোমার এত দিনের এত যত্ন, ভালবাসা, আদরের কি চমৎকার প্রতিদানটাই তুমি আমার কাছ থেকে ফিরিয়ে পেলে! এ কি হলো কিরণ! আমি এ কি করলুম?

কিরণ অরুণের ভাবপ্রবণ প্রকৃতি ভালরূপেই বুঝিত। সে নিজের দুঃখ ভুলিয়া তখন তাহাকে শান্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

অরুণের পিঠ চাপড়াইয়া সে হাসিয়া বলিল, এ কি পাগলামো সুরু হল, বল ত? একবার মাথায় একটা কিছু ঢুকলেই হলো—আর রক্ষে নেই। তার পর সেই নিয়ে হা-হুতাশ চললো কিছু দিন! আর আমার জন্য এত ভাবনাই বা কিসের? প্রথম আঘাতটা লাগলেই দু দণ্ডের জন্য মন মুষড়ে যায়। সেটা কি কখন বরাবর কারু মনে থাকে, না কেউ মনে রাখতে পারে? এই আজ আমায় একটু দমে যেতে দেখে তোমরা এত ভাবছো,—হয় ত দুমাস পরেই দেখবে, একটি বিবাহ করে এনে দিব্যি ঘরকন্না জুড়ে দিয়েছি।

অরুণ বলিল, তা যদি হতো, তা হলে আর এত ভাববার কিছু থাকতো না। তুমি সেই ধরণেরই মানুষ কি না? আমি যেন আর তোমায় চিনি না, তাই ও-কথা বিশ্বাস কোরবো।

কিরণ বলিল, আচ্ছা, তুমি ত আমায় বেশ ভাল করেই চেন,—বল দেখি, আমার মধ্যে ও-সব প্রকৃতি তুমি কবে লক্ষ্য করেছো? আমি চিরদিন কাজের মানুষ—কাজ-কর্ম্ম করি, খাই দাই, আমোদ করে বেড়াই—এই পর্য্যন্ত। মরীচিকার পিছনে হা-হুতাশ করে ছুটে বেড়ান আমার ধাতে নেই। বুঝতেই ত পারছো—সেদিকে বেশি আগ্রহ থাকলে, এতদিন আমার বিয়ে কোন্ কালে হয়ে যেত। তুমি এ কথা নিয়ে মিছে মন খারাপ করো না। বেলা হয়ে গেছে অনেক। আমি স্নান-আহারের পালাটা আগে সেরে আসি,—তার পর বসে তোমার বিবাহের বিষয় পরামর্শ করা যাবে।

লীলা সেদিন বাড়ী ফিরিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের পর মিসেস রায়ের ঘরে গিয়া দেখিল, তিনি বিছানায় শুইয়া আছেন, বীণা নিকটে বসিয়া একখানা উপন্যাস পড়িয়া তাঁহাকে শোনাইতেছে।

লীলা কোন ভূমিকা না করিয়া সহজ ভাবে বলিল, মা! আমি তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি। আমি অরুণকে বিবাহ করতে চাই, আজ তাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত কথা দিয়ে এলুম।

বীণা কথাটা শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লীলার মুখের দিকে চাহিল, কোন কথা বলিল না।

মিসেস রায় প্রথমে কিছুক্ষণ হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন—যেন কথাটা তিনি কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। তাহার পর বলিলেন, অসুখ থেকে উঠে মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? কি বোলছো, আবার বল ত?

লীলা আবার বলিল, আমি অরুণকে বিবাহ করতে চাই, আজ সকালে তাকে এ বিষয় কথা দিয়ে এসেছি।

মিসেস রায় অবাক হইয়া বলিলেন—কে অরুণ? অরুণ ঘোষাল? তার সঙ্গে তোমার দেখা হলো কোথায়? আর কোথাও কিছু নেই, আমরা কোন কথা জানলুম না, শুনলুম না, তুমি একেবারে কথা দিয়ে এলে কি রকম?

লীলা বলিল, তাঁর সম্বন্ধে নতুন করে জানবার তোমাদের আর কি আছে? তার সব বিষয়ই ত তোমরা বেশ ভাল করেই জান। তার সঙ্গে এ রকম সম্বন্ধ হওয়ার বিষয়েও তোমাদের কোন আপত্তি ছিল না। যা নিয়ে তোমরা গোল করছিলে, আমার তাতে কোন অমত নেই। আমি ত তখনি তোমাদের বলেছিলুম, তার অন্ধত্ব আমার মতে বিবাহ-ভঙ্গের কারণ হতে পারে না।

মিসেস রায় অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন, ও-সব কথা এখন যেতে দাও। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর আগে চাই। সে এখন আছেই বা কোথা, আর তোমার সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠতা কবে থেকে আর কি করেই বা হলো?

লীলা এবার একটু বিব্রতভাবে বলিল, সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ীতে আছে, তোমরা সকলেই ত সে কথা জান! আমি সকালে বেড়াতে যাবার সময় মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতুম।

বীণা লীলার এ দুঃসাহসের কথা শুনিয়া লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। কিরণের বাড়ী? যেখানে একটা মেয়ের সংস্রব নেই, সেইখানে শুধু অরুণ আর কিরণের কাছে লীলা যাওয়া-আসা করিত? ছি! ছি! কি লজ্জা ও ঘৃণার কথা!

মিসেস রায় প্রথমটা বিস্ময় ও ক্রোধে রুদ্ধবাক্ হইয়া রক্তিম নয়নে লীলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। এ মেয়েটা বলে কি? তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার নিজ কন্যার দ্বারা এসব কি লজ্জা ও কলঙ্কের কাজ হইতে আরম্ভ হইল? এ কথা যদি প্রকাশ হয়, তিনি সমাজে মুখ দেখাইবেন কিরূপে?

প্রথম উত্তেজনার দুই এক মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেলে তিনি সবেগে বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, তুমি আজ এ সব কি যে বোলছো, আমি ত কিছু বুঝে উঠতে পারছি না! তুমি—তুমি একা বসন্তপুরে কিরণের বাড়ী অরুণের সঙ্গে দেখা করতে যেতে? এ যে কি করে সম্ভব হতে পারে, তা ত আমার মাথায় আসছে না!

লীলা বলিল—অসম্ভবই বা কেন হবে—তা-ও তো আমি কিছু বুঝি না! তোমরা দুজনে কথাটা শুনে পর্য্যন্ত এমন ভাব দেখাচ্ছ—যেন কি একটা কিম্ভূত-কিমাকার কাণ্ড ঘটেছে। তোমাদের ভাব-গতিক দেখলে সহজ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায়!

মিসেস রায় সরোষে বলিলেন—আবার এর উপর তর্ক করতে লজ্জা হচ্ছে না? অবাধ্য নির্লজ্জ মেয়ে! সমাজে আমার মাথাটা ডুবিয়ে দিলে একবারে! কিরণের বাড়া! যেখানে কেবল কতকগুলো পুরুষ মানুষের জটলা—একটা আড্ডাখানা বললেই হয়, সেখানে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে গিয়ে দাঁড়াতে পারে কখনো? নিজের মান-সম্ভ্রম বলেও কি একটা জ্ঞান-চৈতন্য নেই? তাই দিন কতক ধরেই দেখছি, যেখানেই যাই, মনে হয় মেয়েরা কি একটা কথা নিয়ে কেবলি কাণাকাণি, হাসাহাসি করছে—আমায় দেখলেই সব অমনি চোখে চোখে ইসারা করে চুপচাপ! আমি বলি, কি-না-কি! আমি ত জানিনি যে আমারই গুণের মেয়ে কীর্ত্তির ধ্বজা ওড়াচ্ছেন! কি ঘেন্নার কথা! ছি! ছি! ছি! মনে হলে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া মিসেস রায় হাঁপাইয়া পড়িলেন। বিষম ক্রোধ ও লজ্জায় তাঁহার মূর্চ্ছা আসিবার উপক্রম হইতেই তিনি তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর হইতে স্মেলিংসল্টের শিশিটা লইয়া সজোরে তাহার ঘ্রাণ লইলেন! তাহার পরে রুমালে ঘর্ম্মাক্ত ললাট ও মুখ মুছিয়া একটু প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বীণা একখানা পাখা লইয়া মাকে বাতাস করিতে লাগিল।

লীলা বিষম বিরক্তি ও রাগে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে ফুলিতেছিল। মিসেস রায় ক্ষণকাল পরে তাহার দিকে চাহিয়া আবার আরম্ভ করিলেন—এই যে বাড়ীতে আরো একটা মেয়ে রয়েছে—কই, কখনো তার জন্য আমাকে কোন দিন একটা কথা শুনতে হয়েছে? সমাজেও আরো পাঁচটা মেয়ে আছে, কিন্তু এ রকম বেয়াড়া ধিঙ্গা মেয়ে আমি কখনো দেখি নি! মিসেস দত্ত এখন কলকাতায় আছেন, তাই আমি এতদিন তোমার এ সব কীর্ত্তির কথা জানতে পারি নি। তিনি পাঁচ যায়গায় যান, সব খবরই তাই আগে তাঁর কাণে আসে। এখন এই যে কথাটা সমস্ত সহরময় লোকের মুখে মুখে রটনা হতে লাগলো, কার মুখে হাত চাপা দেওয়া যাবে, তাই শুনি? আমি বহুকাল থেকেই জানি, যে, এই মেয়ের জন্যই আমার কোন দিন ঘরছাড়া হতে হবে। অবশেষে ঘটলোও তাই! বীণা! তোমার বাপকে ডেকে আন, তাঁকে সব কথা বলি আগে। এর কিছু বিহিত করেন তো করুন, না হলে আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব! তাঁর আদরের মেয়েকে নিয়ে তিনি থাকুন! আমার নিজের বাড়ীতে আমার একটা কথা চলে না—আমি যেন বাড়ীর ঝিয়েদের সামিল। বাইরের লোকে ত তা বুঝবে না—তাদের কাছে এ সব কাণ্ডের যত কিছু লজ্জা অপমান সব আমাকেই পোহাতে হয়।

বীণাকে আর মিঃ রায়কে ডাকিতে হইল না। মিসেস রায়ের উচ্চ স্বর ও গোলমাল শুনিয়া তিনি নিজেই ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইলেন। মিসেস রায়ের সম্মুখ লীলাকে ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার বেশি বিলম্ব হইল না। তিনি বলিলেন, এত গোলমাল কিসের? লালু মা, আজ আবার কিছু করেছ না কি?

তাঁহাকে হাসিমুখে কথা বলিতে শুনিয়া অনলে যেন ঘৃতাহুতি পড়িল। মিসেস রায় বলিলেন, তোমার লালু-মাকে নিয়ে তুমি থাক, আমার মেয়ে নিয়ে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি! আমাদের মত মন্দ লোকের এখানে ত স্থান নেই! উনি এলেন তামাসা করতে—এত বেয়াদবি আমি সহ্য করতে পারবো না! এতে সব মেয়ে আস্কারা পাবে না?

মিসেস রায় উঠিবার উপক্রম করিতেই মিঃ রায় বলিলেন, আরে যাও কোথায়? কি হয়েছে তাই শুনি না আগে?

মিসেস রায় বলিলেন—শুনবে আর কি? তোমার শিষ্ট শান্ত মেয়ে অরুণ ঘোষালকে বিয়ে করবেন, কথা দিয়ে এসেছেন! আমরা আর কে—আমাদের তাই এত দিন কোন কথা বলা দরকার মনে করেন নি। সে বসন্তপুরে কিরণের বাড়ী থাকে। সেইখানে রোজ ঘোড়া ছুটিয়ে উনি তার সঙ্গে আড্ডা দিতে যেতেন। তোমার চোখে ত কিছুতেই দোষ নেই! তবে সমাজের লোকেরা অত উদার আর সিভিলাইজ্ড্ নয় তো! কাজেই কথাটা নিয়ে বেশ চর্চ্চা আরম্ভ হয়েছে—আরো হবে। কার মুখ বন্ধ করবে তুমি? জজের মেয়ে বলে কেউ কি ছেড়ে কথা কইবে?

মিঃ রায় এ কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত নেত্রে লীলার মুখের দিকে চাহিলেন—এ আবার কি কথা! তাঁহার মনে বিশ্বাস ছিল—তাঁহার আদরের লিলির হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা একমাত্র কিরণকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ কথা কি সত্য লিলি?—মিঃ রায় অতিশয় গম্ভীর মুখে লীলার প্রতি দৃষ্টি ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

লীলা শুধু বলিল—মা সত্য কথাই বলেছেন।

বেশ! তবে তুমি আমার সঙ্গে লাইব্রেরী ঘরে চলে এসো—সেইখানে সব কথা হবে!

দুইজনে লাইব্রেরীতে আসিয়া বসিলে, মিঃ রায় কক্ষ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—এইবার গোড়া থেকে সব কথা আমায় গুছিয়ে বল তো? আমি যে কিছু বুঝতে পাচ্ছি না!

লীলা এতক্ষণে একটু শান্ত হইয়া তাঁহাকে একে একে সব কথা বলিয়া চলিল। যখন সে অরুণের ভুল সংশোধন না করিয়া নিজেকে বীণা বলিয়া চালাইবার কথা বলিল, মিঃ রায় তখন সেইখানে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—এইখানে তুমি বিষম ভুল করেছ লিলি! এ কাজ কিছুতে তোমার উপযুক্ত হয় নি! যাক—তার'পর?

লীলা আবার বলিতে আরম্ভ করিল। সব বলা শেষ হইলে মিঃ রায় বলিলেন—যাক্ সব ভালো যার শেষ ভালো। তার সম্বন্ধে কোন দিন তোমার ক্লান্তি বা অবসাদ আসবে না—এটার বিষয় তুমি স্থির নিশ্চয় তো?

লীলা বলিল, আমি ত বলেছি—সে অসহায় অন্ধ বলেই আমি তাকে ছাড়া অসম্ভব বলে মনে করি! সে জন্ম কিছু আটকাবে না।

মিঃ রায় বলিলেন, বেশ, তা হলে আমাদেরো এতে আপত্তি করবার কিছু নেই। তোমার মাকে আমি বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবো। তবে তুমি আর সেখানে এ-ভাবে যাওয়া আসা কোরো না। সমাজে একটা কুৎসার অবসর দেওয়া আর মার মনে বৃথা কষ্ট দেওয়া কি ভালো? এ গুলো তোমার এখন বুঝে চলা উচিত।

লীলা বলিল, বাবা! তুমি জান না, আমার সেখানে যেতে দু' এক দিন দেরী হলে সে কি ব্যাকুল হয়ে ওঠে! তাই—

মিঃ রায় বাধা দিয়া বলিলেন, কিছু ভেবো না, আমি সব ব্যবস্থা করবো। সেই দিনই সন্ধ্যায় মিঃ রায় বসন্তপুরে গিয়া অরুণকে পরম সমাদরে নিজের গৃহে আনিয়া রাখিলেন। তাহার পর হইতে কিরণকে পাটনা সহরে আর কেহ দেখিতে পাইল না।

(ক্রমশঃ)

অতৃপ্ত কামনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

(১)

এ স্বর্ণনিঝরপাতে হৈমন্তী সন্ধ্যায়,
স্তব্ধ নীলাকাশে ঐ রঞ্জিত ছায়ায়,
খণ্ড মেঘ সনে এ কি তব লুকোচুরি
ব্রীড়ারক্ত হোলিখেলা! অলোক-বাঁশরী
কম্প্র মূর্চ্ছনায় কারে দেয় হাতছানি!
কোন্ দয়িতার পানে চাহিয়া না জানি
সতৃষ্ণ আরক্ত-ওষ্ঠ ঐ মেঘমালা!
কার চুম্বনের আশে একান্ত নিরালা
নিকুঞ্জে প্রতীক্ষামগ্ন গোলাপ-কলিকা?
কোন্ প্রিয়তম-স্পর্শে হরিত লতিকা
[illegible] শিহরে? কার আবাহন তরে

স্তবক-বিনম্র প্রসূন আবেশ ভরে
অর্দ্ধ নিমীলিত দলগুলি রহে মেলি
এ প্রদোষ-ম্লানিমায়? কার সনে খেলি
ভ্রমর মধুপ মকরন্দ করি পান
নীরব-গুঞ্জন বসে ও বকুলে? প্রাণ
তন্দ্রাশ্রুত যেন কোন অমূর্ত্ত সঙ্গীত
শীকরপরাগগন্ধে বৈরাগী—ঝঙ্কৃত
পীযূষ ঝরার রূপালি উচ্ছলনাদে
উদ্‌ভ্রান্ত আপনাহারা; চিত্ত পূর্ণসাধে
উৎকর্ণ শিহতে কোন অস্ফুট বৈভবে
বর্ণে, গন্ধে, রূপে ঝিল্লী বিহঙ্গের স্তবে।

(২)

চিত্র, রেখা, গতিবেগে এ কি ইন্দ্রজালে
রচ তুমি যাদুকরি! নীল অন্তরালে
রেখেছ লুকায়ে কোন্ মায়াদণ্ড দেবি!
যাহার ইঙ্গিতে বিশ্বসৌন্দর্য্য নিষেবি'
ও রাঙাচরণে লুট' নিত্য নেয় রূপ
নব নব ছন্দে অহরহ! অপরূপ
সৃষ্টিখেলা হে প্রকৃতি বর্ণগরিমায়
খেল তুমি! চিরদিন যে তব খেলায়
দ্যুতির স্ফুলিঙ্গ নব নব পড়ে ঝরি'
তব প্রতি আবর্ত্তনে! ও দেহবল্লরী
হ'তে প্রতি হেলনেতে প্রতি ভঙ্গিমায়
কি সুষমা পড়ে ফাটি উষায় সন্ধ্যায়
ক্ষণে ক্ষণে নব রূপে! কি বর্ণ উৎসব
চিরপুরাতন—চিরনূতন! নীরব
অশান্ত এ প্রাণ মম গূঢ় সঙ্গোপনে
চাহে—এ অঞ্জলি ভরি' বিস্মিত প্রেক্ষণে
ও অমৃত-ইন্দ্রজাল করিবারে পান
আকণ্ঠ; পিয়াসী মোর বঞ্চিত পরাণ
অতিথি হইতে তব নীল নিমন্ত্রণে
যেথা এ পার্থিব কোলাহল নাহি স্বনে;
যেথা ক্ষুদ্র কাড়াকাড়ি, নিনাদ মুখর
অভিযোগ-অনুযোগ-ঈর্ষা-দ্বেষ-স্বর
নাহি পশে; যেথা শুধু অম্বরের স্থির
আস্তরণ-বেলাতটে সুধাবারিধির
ললিত লহরী গেয়ে যায় কল্লোলিয়া;
যেথা উপলব্ধি সর্ব্ব তৃষ্ণারে ব্যাপিয়া
উদাত্ত ডমরু তার নির্ঘোষি' অধীর
হৃদয়ে নিথর করে; যেথায় নিবিড়
বিরাজে পূর্ণতানন্দে আপন মুক্তির
অরূপ রূপের ধ্যানে; যেথায় সমীর
চির-মলয়াভিরাম; যেথায় চঞ্চল
সমাহিতে নিবেদিয়া আপন উচ্ছল
গতির স্বতোবিরোধ বিরাজে গম্ভীর
প্রশান্তে বরিয়া; যেথা উদ্বেল, বধির
ব্যস্ততা প্রতিষ্ঠামাঝে আপনা বিলায়ে
বিলসে সে জ্যোতিঘন আশ্রয়ের ছায়ে
শান্ত চিরদিন।

(৩)

মোর পরাণ অবোধ
সংস্কারের শত লক্ষ বাধা প্রতিরোধ-
বাঁধেতে ব্যথিয়া শির—অন্বেষু, ব্যাকুল
আশ্রয় লভিতে চায় কোনও সুবিপুল
লীলোচ্ছল বেলা'পরে অথবা গহনে;—
যেথা নাহি মবতের কণ্টক-চারণে
পদে পদে ক্ষতভয়, যেথা নাহি সীমা
শুধু কান্ত কান্তারের মুক্ত মধুরিমা
স্বাগত সম্ভাষে পান্থে; উচ্ছ্বসিত ধারা
হৃদয়ের প্রতিহত হ'য়ে পথহারা
যেথা নাহি হয়; যেথা জলধি-স্তনিত
তারালোক রচে গীতি মুগ্ধ অতন্দ্রিত
সমুদাত্ত সাঙ্গহীন রেশে চিরদিন
প্রকাশে-আপনহারা—স্বতঃ অন্তর্লীন
মন্দ্র অন্তর্গূঢ় স্বরে; যেথায় যৌবনে
হারাই-হারাই-ত্রাস সতত জীবনে
ক্লপণ না করে; বক্তদোল পিছে জরা
নাহি অনুসরে; বিন্দুসম জ্যোতি ত্বরা
বিবর্ণ না হয় যেথা তমিস্র-আঁধার-
ব্যাদিত-ব্যাদান-গ্রাসে, স্নেহের যেথায়
শুভ্র নির্মলিন জ্যোতি অতৃপ্তি ছায়ায়
ক্ষণে ক্ষণে নহে রাহুগ্রস্ত; ভালবাসা
যেথা দীপ্ত আপন গৌরবে; প্রেম-আশা
দাবীর অঙ্কুশমুক্ত—ঝরিয়া আপন
স্নিগ্ধ ধারাসার—যেথা বড়; নিষ্পেষণ
প্রেমাস্পদে শৃঙ্খলে বাঁধিতে যেথা হেয়;
হিংসার কামনা যেথা নিত্য অবজ্ঞেয়;—
কাম্য এ জীবনে—শুধু উৎসারিত দান
আপনা বিলানো; প্রভুত্বের অধিষ্ঠান
প্রেম-সিংহাসনে যেথা অসম্ভব; ভয়
মিলন শিয়রে যেথা নাহি ভয় রয়,

সদা বির্ভীষিকা সম ; যেথা অবসাদ
উৎকণ্ঠিত হারাবার নাহি সাধে বাদ
প্রাপ্তি-সার্থকতা সনে ; পরাভব-ভয়
যেথা দুষ্ট কীট সম না জড়ায়ে রয়
প্রতি জয়মাল্যে গুপ্ত ; শুধু মুক্ত প্রাণ
উড়ে চ'লে যায় গেয়ে পূর্ণতার গান
দিগন্ত বিতত লীলাক্ষেত্র মাঝে তার
মুক্তির আনন্দে, পাখা মেলিয়া তাহার
উপেক্ষি' বস্তুর ভার ;—যে মাধ্যাকর্ষণ
মুমুক্ষুরে ধরাপানে টানি অনুক্ষণ
সাধে শক্তি-অপচয় বিজয়-গৌরবে
সদাই করিতে খর্ব্ব জড় পরাভবে।

(৪)

জীবনদেবতা ! মোরে সত্য কহ, স্বপ্নঘোরে
রচি আমি কিগো শুধু মায়া মরীচিকা ?
এ রঙীন কল্পনার ইঙ্গিত—আলেয়া ? তার
মোহজাল—আকাশকুসুম, কুহেলিকা ?
স্বপ্নছন্দে যাহা নিতি রচি,—সে বেসুরো গীতি ?
বিশ্রব্ধ নির্ভর—আশাহতেরই প্রলাপ ?
সত্য—শুধু অগৌরব, ধূলিজালে পরাভব
তৃষা কামনার ? প্রেম-উৎস অভিশাপ ?
দৈবস্বের পরাজয়, পীযূষের অপচয়,
গড়া ধূলিসাৎ, আঁখিলোর-অপমান,
এই কি বাস্তব ? আর এ কৃষ্ণ যবনিকার
নেপথ্যে নাহি কি কোনও শ্রেষ্ঠতর গান ?
যাহা কিছু উপহসি' সোনালি বিশ্বাস, খসি'
চাহে দলিতে মরতে স্বর্গ-বিরচন,—
যাহা কিছু অনুদার, বদ্ধ, জড়, বস্তুসার,
সেই শুধু সত্য—আর সকলই স্বপন ?

(৫)

'নহে নহে কভু নহে,'— জীবনবিধাতা কহে,
'ও নীল অবগুণ্ঠন-অন্তরালে রাজে
'উদ্ভাসিত সমুজ্জ্বল জ্যোতির্লোক অচঞ্চল
'যেথায় সুন্দর নিত্য নবতন সাজে
'হ'য় প্রতিভাত নিতি যেই অপার্থিব গীতি
পৃথ্বীতে শরীরী হয় ছন্দে নব নব,
'তাই মুরলী বাঁশিতে মূর্ত্ত নিতি কলগীত এ ;
'রূপে, রসে, গন্ধে, রূপ-অতীত বৈভব
'ফাটিয়া পড়িতে চায় ; তাই শিল্পী ব্যগ্র ধায়
'রেখায় বন্দিতে সেই অরূপ আভাষ
'তাই গুণী ওঠে গেয়ে যে 'চ্ছসিত কণ্ঠ ছেয়ে
'সেই পলাতক জ্যোতি হয় পরকাশ ;
'তাই নদী সিন্ধুপানে অকূল মিলন টানে
'ছোটে রণি' তুলি' প্রাণে বিবাগী নূপুর,
'তাই পাখী নীলাকাশে ভাসায় লীলাবিলাসে
'টানে এ মাটির কান্না,—উদাসি মধুর
'তাহার উধাও গানে ; তাই বাণী কলতানে
'আভাষে মরতে সেই মূর্চ্ছনা মেখলা
অপূর্ব্ব পুরার, যার সমাপ্তিহীন আসার
'করে ত্রিদিবেও ধ্বনিসম্পাতে উতলা ;
'মুকুতাসম্ভার খচি' ছন্দে বর্ণে স্বপ্ন রচি'
'উদ্ভাসে চিত্তেরে কবি সেই জ্যোতিরেশে ;—
মর্ত্তে নর স্বর্গ গড়ে সে আদর্শে ওঠে, পড়ে,
'তবু খোঁজে মুক্তি বন্ধনের ছদ্মবেশে।'

(৬)

নেপথ্যে বুঝি নীলিমা ! নীলবিতানে মহিমা
আবরি বাজাও তবে অচিনের বাঁশি ?
অসীম-পরশ দিয়া বর্ণচ্ছটা তানে হিয়া
প্লাবি' নিতি কর তারে বৈরাগী উদাসী ?
সীমায় অসীম রেশ আসন পাতি নীলেশ।
অনন্তে ব্যাপিয়া বুঝি বিরাটের গানই
বাজায়ে মোদের এ কাণে তব সুদূরের [illegible]
ভূলোকে ধ্বনিয়া তোলো দ্যুলোকের বাণী ?
সুন্দর ! বুঝেছি মায়া নহে কল্পলোকচ্ছায়া !
পূত মাহেন্দ্র লগনে যে আলো উদ্ভাসি'
ওঠে হেথা—রূপকার রূপদানেতে তাহার
মর্ত্ত্য মানবেরে করে অমর্ত্ত্য-বিলাসী।
স্বপ্নে, প্রেমে, সুষমাতে ধরা দেয় এ ধরাতে
আলোকপুরীর সেই প্রাণারাম হাস,
হিল্লোলিত জ্যোতি যার বাস্তবের হাহাকার
ভেদিয়া প্রভায় করে অমা-তমোনাশ।
নহে এ কবিকল্পনা বর্ণসার আলিম্পনা
স্বপ্ন কল্পনার বাণী নহে মরীচিকা
রূপে যে সুধা না ক্ষরে মানব অরূপ-বরে
সৃজি' তারে কল্পরাজ্যে পরে জয়টীকা।

সাকী

শিল্পী—মহম্মদ আবদার রহমান চঘ্‌তাই   [Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

আজমীর ও পুষ্কর

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

দিল্লী হইতে রাত্রি আটটার সময় ট্রেণে উঠিলাম, পরদিন সকালে আজমীর পৌছিব। ফাল্গুন মাস হইলেও সেদিন বড় দুর্য্যোগ ছিল। রাইসিনা হইতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লী রেল ষ্টেসনে কি করিয়া পৌছিব, তাহাই চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে ট্রেণে উঠিবার সময় বেশী বৃষ্টি হয় নাই। ট্রেণে উঠিবার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। গাড়ীর ছাদ ফুটা ছিল—গাড়ীর মধ্যেও একটু একটু বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। গাড়ীতে আর কেহ ছিল না। যেদিকে

মেও কলেজ, আজমীর

বৃষ্টি পড়ে না, সেই দিকে বিছানা সরাইয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম। শেষরাত্রে জয়পুর ষ্টেশনে ঘুম ভাঙ্গিল। গাড়ীর ধারে পাণ্ডা আসিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, এখানে নামিয়া গোবিন্দজী দর্শন করিয়া যাইবেন। জয়পুর অতি সুন্দর নগর, একজন বাঙ্গালী এই নগরের নক্‌সা করিয়াছিলেন। এখানে ভাল ভাল মন্দির আছে। এজন্য জয়পুর দেখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু একটি ছেলের শরীর অসুস্থ ছিল; এজন্য এবার জয়পুর দেখা হইল না। ফুলওয়ারা জংশনে অনেকক্ষণ গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। এখান হইতে একটী শাখা রেল শম্ভর হ্রদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। শম্ভর হ্রদ লবণের জন্য বিখ্যাত। এখান হইতে প্রভূত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ ভারতের সকল স্থানে চালান দেওয়া হয়। গাড়ী যখন কিষণগড় ষ্টেসনে পৌছিল, তখন বেশ সকাল হইয়াছে। গাড়ীতে বসিয়া সহরের সুগঠিত সাদা বাড়ীগুলি দেখিতে পাইতেছিলাম। নগরের বাহিরে ছোট ছোট পাহাড়ের ধারে কয়েকটি বাঙ্গলো বাড়া দেখিলাম। আমরা রাজপুতানার মধ্য দিয়া যাইতেছিলাম। দুই পাশে অনুর্বর প্রান্তর ছোট ছোট গাছ বা গুল্মে আবৃত। প্রান্তরের মধ্যে কখনও কখনও হরিণের দল দেখা যাইতেছিল। মাঝে মাঝে পাহাড়, পাহাড়ের উপর গাছপালা প্রায় নাই। এই সকল পাহাড় আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। বেলা প্রায় আটটার সময় আমরা আজমীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। আজমীর প্রায় চারিধারে পাহাড় দিয়া ঘেরা। পাহাড়ের অন্তরাল দিয়া ট্রেণ চলিল। প্রভাতের আলোকে বহু সুগঠিত গৃহপূর্ণ নগরটি অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। নগরের পাশেই পাহাড়ের উপর দুর্গ দেখা যাইতেছিল। অবশেষে ট্রেণ ষ্টেসনে

আসিয়া দাঁড়াইল। ষ্টেসনটি বেশ বড়। ষ্টেসনে কয়েকটি মারাঠী ভদ্রলোক ও মহিলা দেখিলাম। আজমীর হইতে আমেদাবাদ হইয়া বোম্বাই পর্য্যন্ত রেল লাইন গিয়াছে। "বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া" রেলের কয়েকটী বড় আফিস এখানে আছে। এজন্য এখানে নানা দেশের লোক বাস করে।

আজমীরে আমরা King Edward Memorial Hallএ বাসা লইয়াছিলাম। এখানে ঘর ভাড়া পাওয়া যায়। রান্নার বন্দোবস্ত নিজেদের করিয়া লইতে হয়। বাড়ীটি ষ্টেসনের নিকটেই। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য রাজপুতানার রাজন্যবৃন্দ এবং সাধারণ অধিবাসিগণ চাঁদা তুলিয়া এই গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। গৃহটি দ্বিতল। পাশেই অনেকখানি খোলা জমি ও বাগান আছে। বারাণ্ডাগুলি বেশ চৌড়া। অসুবিধার মধ্যে ঘরগুলি বড় ছোট এবং ভয়ানক ছারপোকার উপদ্রব।

আজমীরে প্রধান দেখিবার জিনিস—আড়াই-দিন-কা-ঝোম্প্রা। নগরের এক প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে এই গৃহটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গৃহটি উচ্চ ভূমির উপর নির্ম্মিত। প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের দ্বারা এই উচ্চ ভূমি সুরক্ষিত; এই প্রাচীরের গায়ে কয়েকটি স্তম্ভ আছে। স্তম্ভের মধ্যে মধ্যে সুন্দর কারুকার্য্য। ভূষণ সমলঙ্কৃত রমণীর সুললিত বাহুর ন্যায় স্তম্ভগুলি অতিশয় সুদৃশ্য। অনেকগুলি প্রশস্ত সোপান আরোহণ করিয়া আমরা এই উচ্চ প্রাঙ্গণে আরোহণ করিলাম। প্রাঙ্গণটি চারিদিকে উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা। এক প্রান্তে একটি গৃহ। গৃহটির চারিদিক খোলা। সারি সারি থামের উপর ছাদটি অবস্থিত। ইহা হিন্দুরাজাদের নির্ম্মিত। ইহার গায়ে পাথরের বড় খিলানযুক্ত কয়েকটি ফটক নির্ম্মিত হইয়াছে। এই খিলানগুলি মুসলমানরা নির্ম্মাণ করিয়া গৃহটিকে একটি মসজিদে পরিণত করিয়াছিল। আড়াই-দিন-কা-ঝোম্প্রা এই নাম মুসলমানদের সময়ে ইহাকে দেওয়া হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, আড়াই দিনে মুসলমানদের আমলের খিলানগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, মোল্লারা এখানে আসিয়া আড়াই দিন ধরিয়া সভা করিতেন বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। এই গৃহটি বিদ্যালয়ের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহের স্তম্ভগুলির উপর অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য বিদ্যমান আছে। উপরের দিকে চাহিলে ছাদেও খুব সুন্দর কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই গৃহ সম্বন্ধে General Cunningham বলেন,

আজমীর নগর (রেল ষ্টেসন হইতে)

"There is no building in India which either for historical interest or archaeological importance is more worthy of preservation. * * For gorgeous prodigality of ornament, beautiful richness of tracery, delicate sharpness of finish, laborious accuracy of workmanship, endless variety of detail, all of which are due to the Hindu

masons, this building may justly vie with the noblest buildings which the world has ever produced. Dr Fuhrer বলেন, "The whole of the exterior is covered with a net-work so finely and delicately wrought that it can only be compared to fine lace."

এখানে ঐতিহাসিকের পক্ষে সাতিশয় মূল্যবান শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, ১১৫৩ খৃঃ অব্দে চৌহান বংশীয় রাজা বিশালদেব বিগ্রহরাজ এই গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে ছয়টি দেবনাগরী-

মহাফিলখানা বা সঙ্গীত-ভবন (দরগা খাজা সাহেবের অভ্যন্তরে)

অক্ষর-সমাচ্ছাদিত শিলাখণ্ড পাওয়া গিয়াছিল। সেগুলি আজমীরের যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এগুলির অক্ষর দেখিয়া জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এগুলি লেখা হইয়াছিল। দুইটী প্রস্তরখণ্ডে কবি সোমদেব বিরচিত 'ললিত বিগ্রহরাজ' নাটকের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। নাটকের আখ্যানভাগ এইরূপ—রাজা বিগ্রহরাজ ইন্দ্রপুরের রাজা বসন্তপালের কন্যা দেশলাদেবীর সহিত প্রেমে পড়িয়াছেন। দেশলাদেবীও স্বপ্নে বিগ্রহরাজকে দেখিয়া তাঁহাকে ভালবাসিয়াছেন এবং রাজার মনোভাব জানিতে শশিপ্রভাকে পাঠাইয়াছেন। রাজা কল্যাণবতীর হাতে দেশলাদেবীকে প্রেমপত্র পাঠাইলেন, তাহাতে লিখিলেন যে তুরস্কদের সহিত যুদ্ধের অভিযানের সময় তিনি দেশলাদেবীর সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইবেন।

তুরস্করা রাজার শিবিরে চর পাঠায়। রাজাও তুরস্কদের শিবিরে চর পাঠান। রাজা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতেছেন। তুরস্কদূত রাজ শিবিরে উপস্থিত হইয়াছে।

নাটকের অবশিষ্ট অংশ পাওয়া যায় নাই। Indian Antiquary, Volume XX, ২০১ পৃষ্ঠাতে Dr. Keilhorn এই নাটকটি ছাপাইয়াছিলেন। তিনি অনুমান করেন যে, এ ক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় যুদ্ধ হয় নাই এবং রাজা প্রণয়পাত্রীর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দিল্লীতে শিবালিক স্তম্ভের শিলালিপিতে লেখা আছে যে, বিশালদেব বিগ্রহরাজ বার বার মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

৩য় ও ৪র্থ প্রস্তরখণ্ডে বিগ্রহরাজ বিরচিত হরকেলি নাটকের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। ৫ম খণ্ডে একটি কবিতার কিয়দংশ আছে। ৬ষ্ঠ খণ্ডের কয়েকটি ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে লেখা আছে যে, রাজা অজয়দেব আজমীর নগর নির্মাণ করেন। তিনি অবন্তীর নিকট

মালবরাজ নরবর্ম্মাকে পরাস্ত করেন এবং পুত্রের উপর রাজ্যভার দিয়া স্বয়ং বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া পুষ্করের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ঝোঁপড়ার নিকট মৃত্তিকা খনন করিলে আরও অনেক শিলালিপি পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা যায়।

আজমীরের আর একটী বিখ্যাত স্থান—দরগা খাজা সাহেব। ভারতবর্ষে মুসলমানদের ইহা অন্যতম সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান। এখানে খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তির সমাধি আছে। ইনি ১১৪৩ খৃঃ অব্দে আফগানিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমুদায় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্র-দিগকে বিতরণ করিয়া ফকির হন। মক্কা মদিনা বাগদাদ প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ইনি অবশেষে শাহাবুদ্দিন ঘোরির সৈন্যের সহিত ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমে আজমীরে বাস স্থাপন করেন। ৯৭ বৎসর বয়ঃক্রমে ইনি মারা যান। মৃত্যুর সাত বৎসর পূর্ব্বে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। অধিকাংশ সময় উপাসনা এবং ধ্যানে কাটাইতেন। আহার অতি সামান্য ছিল। ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতেন। চিতোর অধিকার করিয়া আকবর পদব্রজে আগ্রা হইতে এখানে আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে দরগা খুব বিখ্যাত হয়। আকবর, শাজাহান, হায়দ্রাবাদের নিজাম প্রভৃতি লোকেরা বিভিন্ন সময়ে দরগায় সুদৃশ্য গৃহ, দ্বার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একটী প্রকাণ্ড দ্বার দিয়া এখানে প্রবেশ করিতে হয়। ভিতরে কিছু দূর গিয়া শাজাহান যে ফটক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহার নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। ইহাকে নক্করখানা বলে; কারণ দ্বারের উপর দুইটি প্রকাণ্ড ঢাক আছে। কেহ কেহ বলেন, এই ঢাকগুলি আকবর চিতোর হইতে আনিয়াছিলেন। ইহার পর দক্ষিণে আকবরি মসজিদ। বুলান্দ দরওয়াজা নামক আর একটি অতিশয় উচ্চ দ্বার অতিক্রম করিয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণ দেখা যায়। এখানে দুইটি প্রকাণ্ড তামার হাঁড়ি আছে, একটীতে ৭০ মণ আর একটিতে ২৮ মণ চাউল রন্ধন হয়। বৎসরে একবার করিয়া এখানে পোলাও রান্না হয়। তাহার পর সর্ব্বসাধারণে কাড়াকাড়ি করিয়া ইহা ভোজন করে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমে নিজাম নির্ম্মিত মহাফিল-খানা বা সঙ্গীতালয় আছে। খাজা সাহেবের সমাধি-ভবন শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত। শাজাহান ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার ভিতরে হিন্দু ও মুসলমানদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়; খৃষ্টানরা প্রবেশ করিতে পারে না। বেগমী দালান দিয়া সমাধি-ভবনে প্রবেশ করিতে হয়। এই দালান শাজাহানের কন্যা জাহানারা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সমাধি-ভবনের অভ্যন্তর বিবিধ বর্ণের প্রস্তর দ্বারা সমলঙ্কৃত। সমাধির উপর সোনার কাজ করা কাপড় দিয়া ঢাকা। চারিদিকে রূপার রেলিং। নিকটে আরও একটা সমাধি

জৈন মন্দির, আজমীর

আছে। তন্মধ্যে খাজা সাহেবের দুই স্ত্রী, এক কন্যা এবং শাজাহানের কন্যা চিমনি বেগমের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সমাধি-ভবন এবং পাহাড়ের মধ্যে একটী গভীর জলাশয় আছে। সমাধি-ভবনের পশ্চিমে শাজাহান নির্মিত শ্বেত মর্মরের জামা মসজিদ। ইহাই এখানকার সর্ব শ্রেষ্ঠ গৃহ। আজমীরে একটী প্রবাদ আছে যে, দরগা সাহেবের প্রাঙ্গণের নীচে একটী শিবালয় আছে, এবং খাজা সাহেবের আদেশ মত দরগার মুসলমান পরিচারকগণ নিয়মিত ভাবে শিবালয়ে পূজা দিয়া থাকেন।

আজমীর নগরের মধ্যে বাজারের পার্শ্বেই আকবরের দৌলৎখানা বা Magazine। ইহার মধ্যস্থলে প্রাসাদ, চারিদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া সারি সারি ঘর। চারি কোণে চারিটি বৃহৎ গম্বুজযুক্ত ঘর, পশ্চিমে প্রকাণ্ড দরজা। সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য আকবরকে প্রায় আজমীরে আসিতে হইত। এখানে তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ছিল না বলিয়া তিনি ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার পশ্চিমের দরজার সম্মুখে খানিকটা খোলা জায়গা আছে। এখানে হাতীদের যুদ্ধ এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হইত। বাদশা এবং বেগমেরা উপরের জানালা হইতে তাহা দেখিতেন। মধ্যের প্রাসাদ এক্ষণে রাজপুতানা যাদুঘর (Museum) রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা দেখিলে একটী নূতন বাড়ী বলিয়া ভ্রম হয়। ইহার মধ্যে একটি বড় হল, চারি কোণে চারিটি কক্ষ এবং দুইটি সিঁড়ি আছে। বারাণ্ডায় বড় বড় স্তম্ভ আছে। প্রাঙ্গণের চারি পাশে যে সকল ঘর আছে তাহার ছাদে উঠিবার সিঁড়ি আছে। প্রকাণ্ড দ্বারপথের উপরে যে ঘর আছে, এখানে Sir Thomas Roe প্রথমে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করেন বলিয়া ইহা বিখ্যাত। Sir Thomas Roe সেই সাক্ষাতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। নূরজাহান এবং অপর এক বেগম দেওয়ালের অন্তরাল দিয়া এই অদ্ভুত বিদেশী ব্যক্তিকে দেখিতেছিলেন, Sir Thomas Roe তাঁহাদের বহু রত্নালঙ্কার-শোভিত রূপরাশি দেখিতে পাইয়াছিলেন। মারাঠারাও কিছুকাল আজমীর অধিকার করিয়াছিল। সে সময় তাহারা নিকটবর্ত্তী আনা সাগরের তীরে শাজাহান নির্মিত একটি সাদা পাথরের বারদরি * উঠাইয়া আনিয়া এখানে ছাদের উপর স্থাপন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ জীর মন্দিরে পরিণত করিয়াছিল। যাদুঘরে অনেক হিন্দু ও জৈন দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। একটি বাঙ্গালী কর্মচারী বিশেষ যত্ন সহকারে কোন্‌টি কাহার মূর্ত্তি, কোন্‌টির বিশেষত্ব কি, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন।

জামা মসজিদ, দরগা খাজা সাহেব

আজমীরে জৈনদের একটি সুন্দর আধুনিক মন্দির আছে। ইহা লাল পাথরে নির্মিত বলিয়া Red Temple নামে পরিচিত। শেঠ মূলচাঁদ সোনি নামক আজমীরের একজন ধনী ব্যক্তি ইহা নির্মাণ করিয়া দেন। জৈন ধর্মের প্রধান ঘটনাগুলির প্রতিমূর্ত্তি ইহার মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির চারি দিক কাচ দিয়া ঘেরা। দর্শকগণ চারিদিকে ঘুরিয়া ইহা দেখেন। জৈনদের প্রথম অবতার আদিনাথ

* 'বারদরি' একটি ছোট গৃহ।

বা ঋষভদেব অযোধ্যার রাজা নাভী এবং রাণী মেরুদেবীর পুত্র। তাঁহার জন্ম হইবার পর ইন্দ্র তাঁহাকে সুমেরু পর্বতে লইয়া গিয়া ক্ষীর সমুদ্রের জলে স্নান করাইয়া আবার যথা-স্থানে রাখিয়া যান। আদিনাথ অল্প দিন রাজত্ব করিয়া প্রয়াগে অক্ষয় বটের নীচে বসিয়া ধ্যান করেন। এখানে এক সহস্র বৎসর ধ্যান করিয়া তিনি কৈবল্য-জ্ঞান লাভ করেন। এই সকল ঘটনার প্রতিমূর্ত্তি মন্দির মধ্যে রক্ষিত আছে। পর্বত, সমুদ্র, নদ, নদী, সাগর, বৃক্ষ প্রভৃতির বিবিধ বর্ণের সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। দেবগণ আকাশে বিবিধ বাহন বা বিমানে চড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেছেন, তাহাও বেশ সুন্দর দেখায়। সিঁড়ি দিয়া দোতালা এবং তেতালাতে উঠিয়া গৃহের চারিদিকে ঘুরিয়া এই সকল মূর্ত্তি দেখিতে হয়।

আজমীরের নিকটবর্ত্তী আনা সাগর হ্রদ দেখিতে অতি রমণীয়। ১১৫০ খৃঃ অব্দে অর্ণ রাজা বা আনাজি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুইটি পাহাড়ের মধ্যে একটি বৃহৎ বাঁধ দিয়া ইহা নির্মিত হইয়াছিল। ইহা যখন জলপূর্ণ থাকে, তখন তাহার চারিদিকের পরিধি ৮ মাইল। ইহার চারিদিকে পাহাড়—তন্মধ্যে পশ্চাতের নাগপাহাড় সর্ব্বোচ্চ। Dr. Fuhrer বলেন, "It is perhaps the greatest of the various natural beauties that contribute to make Ajmere one of the most remarkable of the old native cities of India." আনাজি যে বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ১,১০২ ফিট দীর্ঘ। ইহা পাথরে বাঁধান, এবং খুব উচ্চ। জাহাঙ্গীর ইহার তীরে উদ্যান এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শাজাহান বাঁধের উপরিভাগ মর্ম্মর পাথর দিয়া বাঁধাইয়া দেন এবং তাহার উপরে পাঁচটি অতিশয় মনোহর মর্ম্মর নির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ বা "বারদরি" নির্ম্মাণ করেন।

আড়াই-দিন কা-ঝোম্প্রা (ভিতরের দৃশ্য)

আনাসাগরের দৃশ্য অতি মনোরম। দূরে আকাশের গায়ে সারি সারি পাহাড়। নীচে হ্রদের বিশাল নীল জল। হ্রদের চারিদিকে গৃহ, উদ্যান, ঘাট। বিবিধ জলচর পক্ষী হ্রদের জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালায় আন্দোলিত হইতেছে। স্নিগ্ধ সমীরণ হ্রদের

জলে তরঙ্গ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং শরীর স্পর্শ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া দিতেছে।

আজমীরের প্রাচীন দুর্গের নাম তারাগড় বা গড় বিটালি। নগরের ধারেই উচ্চ পাহাড়ের উপর ইহা নির্ম্মিত। পাহাড়ের শিখরদেশ ২৯০০ ফিট উচ্চ। আজমীর নগর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০০০ ফিট উচ্চ। অতএব নগর হইতে প্রায় ৯০০ ফিট উঠিলে পাহাড়ের উপর আরোহণ করা যায়। পাহাড়টি খুব খাড়া। এজন্য এই দুর্গটিকে Gibraltarএর দুর্গের সহিত তুলনা করা হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দার প্রারম্ভে অজয়দেব ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই দুর্গ অধিকারের জন্য অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহা অনেকবার অবরুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্গমধ্যে দুই একটি জলাশয়ের চিহ্ন দেখা যায়। ১২০০ লোক ইহাতে বাস করিতে পারিত। কিছুদিন ইহা যুরোপীয় সৈন্যদের স্বাস্থ্যনিবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহা পরিত্যক্ত স্থান মাত্র। ইহার মধ্যে দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। আজমীরের প্রথম রাজা আজ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। ইনি শেষ বয়সে সন্ন্যাসী হন।

দুর্গের পশ্চিমে কিছুদূর নামিলে চশমা নামে একটি উপত্যকা পাওয়া যায়। এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া জাহাঙ্গীর একটী প্রাসাদ ও উদ্যান নির্ম্মাণ এবং কয়েকটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন। এইখানে ঔরঙ্গজেব ও দারা শিকোর যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধে হারিয়া দারাশিকোর সম্রাট হইবার আশা চিরতরে নির্ম্মূল হয়।

রাজা অজয়পাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আজমীর নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অজয়পাল বৃদ্ধবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া তারাগড়ের পশ্চাতে একটী উপত্যকায় বাস করিতেন। অজয়পালের পৌত্র গোবিন্দরাজ মুসলমানদের সৈন্য পরাস্ত করিয়া সুলতান বেগ বরিসকে বন্দী করিয়াছিলেন। এই বংশে বাক্‌পৎরাজ, সিংহরাজ, বিগ্রহরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন। ১০২৪ খৃঃ অব্দে সুলতান মামুদ গজনি আজমীর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি যুদ্ধে আহত হইয়া অনহলওয়ারা চলিয়া যান। অজয়দেব একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার পুত্র আনাজি আনাসাগর হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিশালদেব বিগ্রহরাজ হিমালয় পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের প্রথম চৌহান সম্রাট হইয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত এবং কবি ছিলেন। তাঁহার পৌত্র বিখ্যাত পৃথ্বীরাজ। রাজপুতগণ পৃথ্বীরাজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজপুতবীর বলিয়া মনে করেন। তিনি মোটে ১৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল কীর্ত্তি রাজপুত কবিদের গীতের অতিশয় প্রিয় বিষয়। পৃথ্বীরাজ গুর্জর জয় করিয়াছিলেন এবং মহোবার রাজাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, এই উপলক্ষে মহোবার বিখ্যাত সেনাপতি আলা এবং উদিল অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পৃথ্বী

বুলান দরজা (দরগা খাজা সাহেব)

রাজের হস্তে নিহত হন। কনোজের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা পৃথ্বীরাজের বীরত্বের কাহিনী শুনিয়া স্বয়ম্বর সভায় পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় মাল্যদান করেন। এই সময় পৃথ্বীরাজ বহু বিখ্যাত রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া সংযুক্তাকে নিজ রাজধানী লইয়া যান। পৃথ্বীরাজ তাঁহার মাতামহের নিকট হইতে দিল্লীর সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া রাজধানী আজমীর হইতে দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া যান। শাহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরির সহিত প্রথম যুদ্ধে, শাহাবুদ্দিন হারিয়া পৃথ্বীরাজের নিকট বন্দী হন। উদার-হৃদয় পৃথ্বীরাজ শাহাবুদ্দিনকে ছাড়িয়া দেন। ইহার পর শাহাবুদ্দিন পুনরায় দিল্লী আক্রমণ করেন, এবং ছলনা কৌশলে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া পৃথ্বীরাজকে বন্দী করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—যে পৃথ্বীরাজ পূর্ব্বে তাঁহাকে বন্দী করিয়া ছাড়িয়া

সমাধি ভবন, দরগা খাজা সাহেব

দিয়াছিলেন, শাহাবুদ্দিন সেই পৃথ্বীরাজকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। এই দিন হইতে ভারতে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয়। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা হরিরাজ মুসলমানদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু হারিয়া যান। এই সময় হইতে আজমীরের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়।

আজমীর হইতে পুষ্কর মোটে সাত মাইল পথ। ঘোড়ার গাড়ী করিয়া আমরা আজমীর হইতে পুষ্কর রওনা হইলাম। সহরের পাশেই একটি ছোট পাহাড় পার হইলাম। তাহার পর পথটি বেশ সুন্দর। দুই পাশে যবের ক্ষেত, মধ্য দিয়া পথ, পথের দুইধারে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষ। উত্তরে আনাসাগরের বিশাল জলরাশি সূর্য্যালোকে ঝলমল করিতেছিল। তাহার তীরে বাটী, উদ্যান, ঘাট প্রভৃতি শোভা পাইতেছিল। চারিদিকে আকাশের গায়ে পাহাড়। কিছুদূর গিয়া আমরা আর একটি পাহাড় পার হইলাম। ইহার নাম নাগ পাহাড়। তাহার পর বনভূমির মধ্য দিয়া কিছুদূর গিয়া অদূরে সাবিত্রী পাহাড় এবং পাহাড়ের উপর মন্দির দেখিতে পাইলাম। একটু পরে আমরা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। দুই পাশে দোকান, মন্দির, বাড়ী; মধ্য দিয়া পথ। আমাদের পাণ্ডা লছমীনারায়ণ রামনারায়ণ আমাদিগকে একটী ধর্ম্মশালায় লইয়া চলিল। এই ধর্ম্মশালাটি একটী সিন্ধুদেশীয় রমণী তাঁহার স্বর্গীয় স্বামীর স্মৃতিরক্ষার জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা এখানে সিন্ধী ধর্ম্মশালা নামে পরিচিত।

পুষ্করের প্রধান স্থান এখানকার হ্রদ। হ্রদটি খুব বড়; কতকটা বৃত্তাকার। হ্রদের চারিদিকে বহুসংখ্যক ঘাট আছে। তন্মধ্যে বরাহ-ঘাট, গো-ঘাট এবং ব্রহ্মঘাট প্রধান। জয়পুর, যোধপুর, কোটা, ভরতপুর, কিষণগড় প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও এখানে ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঘাটগুলি জয়পুর-ঘাট, যোধপুর-ঘাট প্রভৃতি নামে পরিচিত। ঘাটের ধারে ধারে অসংখ্য মন্দির। হ্রদের মধ্যস্থলে একটী ছোট ঘর, তাহার পাশে অনেক কুমীরকে বিশ্রাম করিতে দেখা যায়। হ্রদের জলেও কুমীর ভাসিয়া বেড়াইতেছে দেখা যায়। এজন্য পুষ্করে খুব সতর্ক হইয়া স্নান করিতে হয়। তবে কুমীরে যাত্রীর অনিষ্ট করিয়াছে, ইহা শোনা যায় নাই। হ্রদে অনেক মাছ আছে। বলা বাহুল্য, এখানে কেহ মাছ

ধরিতে পারে না। হ্রদের চারিপাশে তীর্থের সীমানার মধ্যে কোন প্রাণিবধ হইতে পারে না, এইরূপ নিয়ম আছে। ঘাটের ধারে দাঁড়াইয়া খৈ, ছোলা প্রভৃতি জলে ছুঁড়িয়া দিলে বহুসংখ্যক মাছ আসিয়া খাইয়া যায়। এখানে অনেক ময়ূরও আছে। তাহারা যাত্রীদের কাছে আসিয়া খাবার লইয়া যায়। হরিদ্বার এবং মথুরাতে যেরূপ গঙ্গা ও যমুনার আরতি হয়, পুষ্করে সেইরূপ পুষ্করের আরতি হয়। সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ঘাটের উপর আরতি হয়।

ব্রহ্মা। ব্রহ্মার চারি মাথায় চারিটি মুকুট। উপরে চূড়া, রূপার উপর সোণালি রং করা। ব্রহ্মার বাম পাশে শ্বেত পাথরের ক্ষুদ্রকায় গায়ত্রীর মূর্ত্তি। সম্মুখে দুইটি করিয়া চারিটি মূর্ত্তি। ইঁহারা সাবিত্রীর পুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমার। প্রাঙ্গণের এক পাশে অপর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে পঞ্চমুখ মহাদেবের মূর্ত্তি, গৌরীশঙ্করের মূর্ত্তি, বীণা হস্তে নারদের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি শ্বেত-মর্ম্মর-নির্ম্মিত। মন্দিরে গেরুয়া-পরা অনেক সন্ন্যাসী দেখিলাম। শুনিলাম, ইঁহারা শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়। কয়েকটি সন্ন্যাসিনীও দেখিলাম।
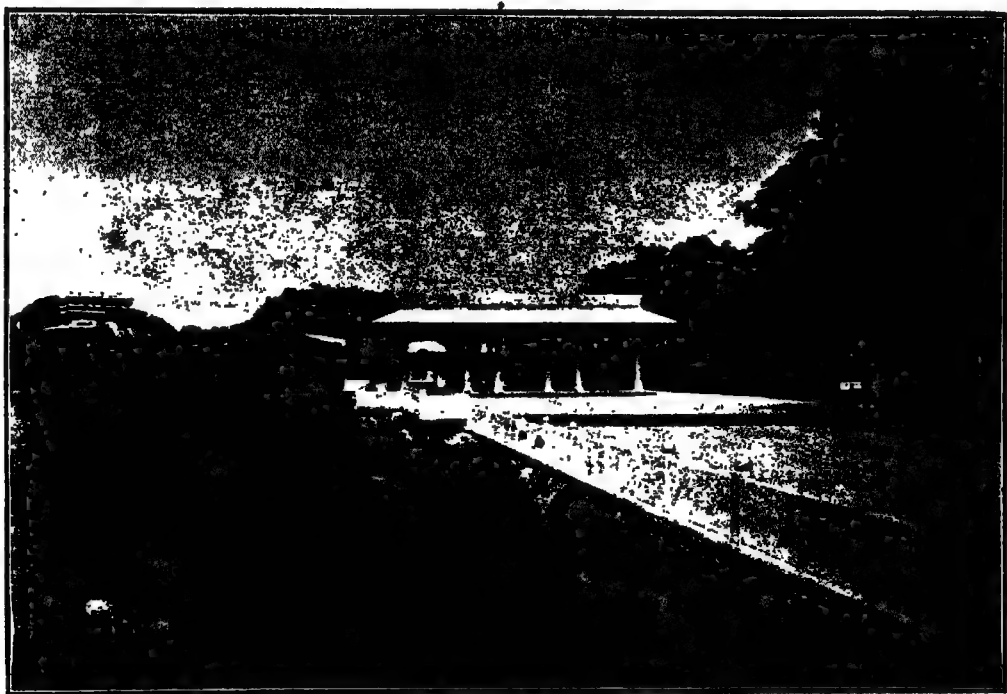
আনাসাগর এবং একটি 'বারদরি'

পুষ্করের প্রধান মন্দিরের নাম ব্রহ্মার মন্দির। ভারতের নানা স্থানে বিষ্ণু ও মহাদেবের অসংখ্য মন্দির আছে; কিন্তু ব্রহ্মার মন্দির না কি আর কোথাও নাই। মন্দিরটি পুষ্করের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। বিস্তৃত সোপান-শ্রেণী দিয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে উঠিতে হয়। মন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণটি পাথর দিয়া বাঁধান। প্রাঙ্গণ-মধ্যে হস্তীর উপর উপবিষ্ট ইন্দ্র ও কুবেরের মূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্য দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ। মূল মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির। নাটমন্দিরের মধ্যে চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদ চিত্রিত। মূল মন্দিরের প্রধান মূর্ত্তি চতুর্মুখ

বাঙ্গালী যাত্রীর, বিশেষতঃ মেয়েদের কাছে পুষ্করের প্রধান আদর এখানকার সাবিত্রীর মন্দিরের জন্য। বাঙ্গালী মেয়েদের বিশ্বাস—সাবিত্রীর কপালে সিন্দুর দিলে সাত জন্ম বিধবা হয় না। এখানকার সাবিত্রী কিন্তু সত্যবানের স্ত্রী নহেন; ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠা পত্নী। সাবিত্রীর মন্দিরটি একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। যাত্রীদের জন্য ডুলি পাওয়া যায়। নগর হইতে প্রায় মাইলখানেক বালুকাময় পথ দিয়া পাহাড়ের নিকট পৌছান যায়। পাহাড়ে উঠিবার সিঁড়ি আছে। পাহাড়টি খাড়া। পাহাড়ের উপর কয়েকটি

পত্রবিরল গাছ আছে। পাহাড়ের উপর হইতে পুষ্করের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখায়। পাহাড়ের নীচেই প্রায় গোলাকার পুষ্কর হ্রদ। হ্রদের চারিদিকে ঘরবাড়ী, মন্দির, গাছপালা। পুষ্করের অপর পার্শ্বে পাহাড়ের উপর পাপমোচিনীর মন্দির। চারিদিকে প্রস্তরময় বৃক্ষহীন পাহাড়। কোথাও এক একটী স্বতন্ত্র পাহাড়, কোথাও বা পাহাড়ের শ্রেণী। এই সকল পাহাড় আরাবল্লী গিরিশ্রেণীর অন্তর্গত। দূরে পাহাড়ের কোলে লুনি নদীর ক্ষীণ প্রবাহ রজতধারার ন্যায় দেখা যাইতেছে। এই নদী রাজপুতানার বিশাল মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া কচ্ছোপসাগরে (Runn of Cutch.) সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে কোথাও ছোট ছোট শস্যক্ষেত্র; তাহার চারিদিকে গাছপালা এবং দুই চারিখানি সাদা বাড়ী। সাবিত্রী পাহাড়ের শীর্ষদেশ অপ্রশস্ত। এইখানে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। মন্দিরের চারিদিকে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া দেওয়াল। আমরা একটা বড় দরজা দিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রাঙ্গণে একটী ছোট গৃহে শচী দেবীর মূর্ত্তি এবং অন্য কয়েকটি মূর্ত্তি দেখিলাম। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সাবিত্রী দেবীর মন্দির। সাবিত্রী দেবীর মূর্ত্তিটি শ্বেত-মর্ম্মর-গঠিত। গায়ে লাল রঙের রেশমী ওড়না, পরিধানে

আঢ়াই-দিন-কা ঝোম্প্রা (বাহির হইতে)

আজমীর, সাধারণ দৃশ্য

হরিদ্বর্ণের রেশমী ঘাগরা। বহুবিধ সুবর্ণের অলঙ্কার গায়ে শোভা পাইতেছে। মায়ের প্রসন্ন মুখশ্রী দেখিয়া অত্যন্ত তৃপ্তি হইল। মায়ের বামপার্শ্বে শ্বেত-মর্মর-গঠিত বিচিত্র বসন পরিহিত ব্রহ্মা-কন্যা সরস্বতী দেবীর মূর্ত্তি। ।৵৹ ভেট দিলে যাত্রীরা নিজ হাতে মায়ের কপালে সিন্দুর দিতে পায়, এবং মায়ের হাতে লোহা ঠেকাইয়া দেয়। মায়ের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, হাতগুলি বস্ত্রাবৃত। মায়ের পূজা করিয়া, মন্দিরের চারিদিক পরিক্রম করিয়া আমরা পর্বত অবরোহণ করিয়া বাসায় ফিরিলাম।

প্রবাদ এই যে, স্বর্গে বসিয়া ব্রহ্মা ভাবিতেছিলেন, পৃথিবীর উপর কোথায় তিনি যজ্ঞ করিবেন। এমন সময় তাঁহার হাত হইতে একটি পদ্ম (পুষ্কর) পৃথিবীতে পড়িয়া গেল। যেখানে পদ্ম পড়িল, সেইখানে তিনি যজ্ঞ করিবেন স্থির করিলেন। তিনি পত্নী সাবিত্রীদেবীকে এবং অন্যান্য দেবদেবীকে ডাকিতে পাঠাইলেন। দেবতারা আসিলেন। কিন্তু শচী প্রভৃতি দেবীদের "সাজ করিতে বেলা ফুরাইল।" সাবিত্রীদেবী স্বয়ং প্রস্তুত হইয়াছিলেন; কিন্তু অন্য দেবীদের ফেলিয়া একা যাইতে চাহিলেন না। এদিকে শুভক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া যায়। অগত্যা গায়ত্রীদেবীকে পত্নীরূপে লইয়া ব্রহ্মা যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। সাবিত্রী দেবী আসিয়া খুব রাগ করিলেন, শাপ দিলেন,—পুষ্কর ভিন্ন আর কোথাও ব্রহ্মার মূর্ত্তি পূজা হইবে না, এই বলিয়া পাহাড়ে উঠিয়া বসিয়া রহিলেন।

গো-ঘাট, পুষ্কর

পুষ্করে আরও অনেক মন্দির আছে। তাহাদের মধ্যে বরাহজির মন্দির, বদ্রিনাথের মন্দির, অটমটেশ্বর মহাদেবের মন্দির, রঙ্গজি ও বেঙ্কটেশের মন্দির প্রসিদ্ধ। অনেক স্থলেই প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে নূতন মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ব্রহ্মার বর্ত্তমান মন্দির ১৮০৯ খৃঃ অব্দে সিন্ধিয়ার মন্ত্রী গোকুলচাঁদ পরেখ নির্মাণ করিয়াছিলেন। বরাহজির প্রাচীন মন্দির আজমীরের রাজা অর্ণরাজ (যিনি আনাসাগর খনন করিয়াছিলেন) ১১২৩ খৃঃ অব্দে নির্মাণ করিয়াছিলেন। মেওয়ারের রাণা প্রতাপসিংহের ভ্রাতা সগর-সিংহ ইহার পুনঃসংস্কার করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিলেন, জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ পুনরায় নির্মাণ করিয়াছিলেন। গৌঘাটের নিকট কেশো রায়ের একটি বড় মন্দির ছিল, আওরঙ্গজেব উহা ভাঙ্গিয়া সেখানে মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। অটমটেশ্বর মহাদেবের প্রাচীন মন্দিরটি মাটির নীচে। তাহার উপরিভাগে আজমীরের মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্তা গুমনজিবাও আধুনিক মন্দিরটি নির্মাণ করিয়াছেন। বেঙ্কটেশের মন্দির বৃন্দাবনের শেঠজির মন্দিরের ন্যায় দাক্ষিণাত্য-প্রথায় নির্মিত হইয়াছে। উভয় স্থলেই অর্থশালী শিষ্য দক্ষিণদেশীয় নিজ নিজ গুরুর আদেশে মন্দিরগুলি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

পুষ্কর অতি প্রাচীন স্থান। সত্যযুগ হইতে ইহা তীর্থ রূপে খ্যাত আছে। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার উল্লেখ

আছে। পদ্মপুরাণে পুষ্কর-মাহাত্ম্যের কথা বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে। সেখানে পুষ্করকে "সমস্ত তীর্থানামাদ্যং" অর্থাৎ সকল তীর্থের আদি বলা হইয়াছে। পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, এখানে অসংখ্য তীর্থ এবং মুনি ও রাজর্ষির আশ্রম আছে। তন্মধ্যে পঞ্চস্রোতা সরস্বতী, যজ্ঞপর্বত, নাগতীর্থ, চক্রতীর্থ, জমদগ্নির কুণ্ড, গয়াকূপ, কপিলা পুষ্করিণী, সুপ্রভাকূপ, রূপতীর্থ, রুদ্রকুণ্ড, অগস্ত্যাশ্রম, মৃকণ্ডমুনির তীর্থ, পুলস্ত্যতীর্থ, বিষ্ণুপদ, দধীচির আশ্রম, পাপনাশন তীর্থ, মংকণের আশ্রম, মার্কণ্ডেয়ের আশ্রম, প্রেততীর্থ, সপ্তর্ষির আশ্রম, দশাশ্বমেধ তীর্থ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। নাগপর্বতের ক্রোড়ে ঝরণার

রাজপথ, আজমীর

ধারে সাধারণতঃ এই আশ্রমগুলি অবস্থিত। সেখানকার দৃশ্য অতি রমণীয়। কত ঋষি ও মুনি এই পুণ্য ভূমিতে তপস্যা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাই পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

পুষ্করে দুর্লভং স্নানং পুষ্করে দুর্লভং তপঃ।
পুষ্করে দুর্লভং দানং পুষ্করে দুর্লভা স্থিতিঃ॥

পুষ্করের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করিয়া পুরাণকার বলিয়াছেন,—

অন্যস্থানে কৃতং পাপং তীর্থস্থানে প্রণশ্যতি।
তীর্থস্থানে কৃতং পাপং বজ্রলেপো ভবিষ্যতি॥

অন্যস্থানে যে পাপ করা যায়, তীর্থস্থানে তাহা বিনষ্ট হয়। কিন্তু তীর্থস্থানে যে পাপ করা যায়, তাহা হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।

কামুকাঃ ঘাতুকাঃ নিত্যং পরবঞ্চন তৎপরাঃ।
নহি তে শুদ্ধিমায়ান্তি কোটিতীর্থৈরপি ধ্রুবম্॥

যাহারা কামুক, হত্যাকারী এবং পরকে বঞ্চনা করে, তাহারা কোটি তীর্থ করিলেও শুদ্ধ হয় না।

পুষ্করে আমরা চারি পাঁচ দিন ছিলাম। প্রভাতে ব্রহ্মাজির মন্দির হইতে নহবতের সঙ্গীত শোনা যাইত। অপরাহ্ণে ঘাটের ধারে গিয়া বসিতাম। সূর্য্যের কিরণ মৃদু হইয়া আসিত, স্নিগ্ধ পবন হ্রদের জলে ক্ষুদ্র বীচিমালা সৃজন করিয়া প্রবাহিত হইত, ছেলেদের হাত হইতে খাদ্যলাভের আশায় ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ঘাটের নিকট আসিত, ময়ূর-ময়ূরী ঘাটের সোপানের উপর ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিত, অদূরের ঘাট আরতির আলোকমালায় সাজিয়া উঠিত, হ্রদের জলে সে আলোক প্রতিফলিত হইত, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনিতে নৈশ বায়ু পরিপূর্ণ হইত। অনেকক্ষণ পরে আমরা বাসায় ফিরিতাম।

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৬)

সত্যর দিকে যে জিতেন্দ্রনাথের একেবারেই দৃষ্টি ছিল না—এমন কথা বলিতে পারি না। সত্য প্রায়ই নিতান্ত অনাহূতের মতই দাদার বাড়ীতে গিয়া পড়িত, এবং সে বাড়ীর আদর বা অনাদর কিছুই গায়ে মাখিত না।

এই পরিবারের মধ্যে বীথি সত্যকে যথার্থই ভালবাসিত, ভক্তি করিত। সে বরাবর দিদিমা ও দাদামহাশয়ের নিকটে ছিল। মাঝে মাঝে দুই এক দিন বাধ্য হইয়াই পিতামাতার কাছে আসিয়া তাহাকে থাকিতে হইত। সে যখন অতি শিশু, তখন পিতা-মাতার নিকট তাহাকে রাখিয়া মায়া ইয়োরোপ গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া বীথিকে আর পান নাই।

মেয়েটী ছিল পাতলা ছিপ্‌ছিপে গোছের ; কিন্তু তাহারই মধ্যে তাহার সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল, মুখখানি অনিন্দ্য ছিল। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই তাহার ছিল না, অন্তরের সৌন্দর্য্য তাহাকে আরও রমণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সরলমনা দিদিমার শিক্ষা-গুণে তাহার মনটী বড় সরল ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। জলে ধোয়া যূঁই ফুলটীর মতই তাহার অন্তরখানা নির্ম্মল ও পবিত্র, যেন দেবতার পায়ে উৎসর্গ করিয়া দিবার মত। সংসারের ময়লা তাহার শুভ্র মনটীকে স্পর্শ করিয়া আজও ছোপ ধরাইতে পারে নাই।

তাহার ছোট বোন গীতি ও অন্য ভাই-বোনগুলি পিতা-মাতার কাছে অন্য বাড়ীতে বাস করিত। তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা মায়ের পছন্দ অনুসারে সম্পূর্ণ বিদেশী ধাঁজেরই ছিল। প্রাচীন দাদামহাশয় ও দিদিমার শিক্ষানুযায়ী কেহই চলে নাই। বীথির প্রাথমিক শিক্ষা দিদিমার কাছে লাভ হওয়ায়, সে প্রাচীন সমাজকে একেবারে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই,—নূতন ও পুরাতন এই দুইটীর মাঝখানে সে রহিয়া গিয়াছিল।

সত্য এই পরিবারের মধ্যে বীথিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসিত, তাহার শিক্ষা-গুণে। বয়সে অনেক বড় হইয়াও সে বীথিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিত। যে নারীর নিকট হইতে বীথি শিক্ষালাভ করিয়াছিল, সেই নারীর নিকট হইতে মায়াও শিক্ষা পাইয়াছিলেন। তথাপি কেমন করিয়া যে তিনি এমন ভাবে বদলাইয়া গেলেন, সত্য অবাক হইয়া তাহাই ভাবিত।

এক বীথির মধ্যেই সে যথার্থ নারীত্বের বিকাশ দেখিয়াছিল। সে শিক্ষিতা ; কিন্তু সে শিক্ষা তাহাকে মায়ের মত উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিতে পারে নাই, বরং আরও সংযত করিয়াছিল। সে মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে,—নূতন ও পুরাতনের মিলনের সেতুরূপে সে মা ও দিদিমার মাঝখানে রহিয়াছে।

মনটা তাহার বড় কোমল। কাহারও দুঃখের কাহিনী শুনিলে তাহার হৃদয় গলিয়া যাইত, সে কাঁদিয়া ভাসাইত। তাহার এরূপ মনের ভাব দেখিয়া মা বড় দুঃখিতা হইয়াছিলেন,—তাঁহার মেয়ের মন এত কোমল হইল কিরূপে? এত সঙ্কোচ কেন তাহার, এত লজ্জাই বা কেন? তাঁহার অপর কন্যা গীতি ঠিক তাঁহার আদর্শানুসারেই গঠিত হইয়া উঠিতেছিল। আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য উভয় ভগিনীর মধ্যে থাকিলেও প্রকৃতিগত সৌসাদৃশ্য একটুও ছিল না।

বড় আদরিণী একমাত্র মেয়েকে স্বেচ্ছাচারিণী বিলাসিনী হইয়া উঠিতে দেখিয়া মা সরলার মনে ক্ষোভের শেষ ছিল না। যত দোষ তিনি সবই স্বামীর ঘাড়ে চাপাইতেন। স্বামী নীরবে স্ত্রীর কথা সহিয়া যাইতেন, উত্তর দিবার মত কথা তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না।

পিত্রালয়ের সহিত বীথির বড় বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে মাঝে মাঝে সেখানে মায়ের আগ্রহে যাইতে হইত। এবার সে অনেক দিন যায় নাই ; সেই জন্য সত্যর বিলাত যাইবার কথাও সে জানিতে পারে নাই। সেদিন সে স্কুলের

ছুটীর পর বাড়ীর গাড়ীতে ফিরিতেছিল,—পথে অকস্মাৎ সত্যর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে ডাকিল—"কাকা!"

তাহার আদেশে গাড়ী থামিল। সত্য হাসি মুখে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি মা, বাড়ী যাচ্ছো বুঝি? ভাল আছ তো?"

"এস কাকা, গাড়ীতে উঠে এস, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

হাত বাড়াইয়া সে সত্যর হাতখানা চাপিয়া ধরিল। সত্য আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না। অগত্যা তাহাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। বীথির আদেশে কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বীথি অভিমানপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "এবার অনেক দিন আমার সঙ্গে মোটে দেখা কর নি কাকা। আমায় তুমি আর একটুও ভালবাস না, তা তোমার ব্যবহারেই বুঝতে পারছি।"

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, "নানা ধান্দায় ঘুরছি মা। দেশে এক মাস কেটে গেল। তার পর এখানে এসে নানা কাজে মোটে ছুটি পাচ্ছি নে।"

বীথি ওষ্ঠ স্ফীত করিয়া বলিল, "তোমার কিন্তু এ সব কথার মধ্যে অধিকাংশই মিথ্যে কাকা। আশ্চর্য্যের কথা যে, মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলতেও তুমি একটু ভয় পাও না। এই তো বেশ বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ, এখান হতে এইটুকু মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটে যেতে তোমার কতখানি সময় মাটি হয় তাই জিজ্ঞাসা করি? বেশী দূরের পথ হলেও না হয় একটা ওজর করতে পারতে,—বুঝতে পারতুম, সত্যিই তোমার সময় নষ্ট হবে। দেশের খবর আমার একটাও পেতে নেই—না কাকা? আমি তো তাঁদের কেউই নই; কাজেই তাঁদের কথা আমায় শুনাবে কেন? তোমারই তাঁরা আপনার লোক, বাপ বোন, স্ত্রী,—আমার আর কে, আমি তো তাঁদের পর।"

সত্য অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, "সত্যি মা, আমার মোটেই মনে থাকে না যে, তাঁদের খবর নিতে এই কলকাতায় আর কেউ আছে। দাদা একটীবার জিজ্ঞাসাও করেন না—বাবা কেমন আছেন, অভাগিনী বোনটা কেমন আছে। আমি যেচে কথা যখন তুলি, তখন বাধ্য হয়েই কথাটা শোনেন। বুঝতে পারি—সে কেবল শুনেই যান, সে কথাগুলো তাঁর মনে এতটুকু দাগ দিতে সমর্থ হয় না। এক জন পর যেমন কারও কথা শুনে যায়, দাদা তার চেয়ে বেশী কিছু ঔৎসুক্যের সঙ্গে বাবার কথা শুনেন না। তুমি যে মা আমাদের সেই দেশের কথা ভাব,—যাদের কখনও দেখনি তাদের কথা মনে কর, তা আমি কোন দিনই ধারণা করতে পারি নি মা। এর জন্যে আমায় মিথ্যে দোষ দিয়ো না।"

বীথি ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিল, "না কাকা, সত্যি এ জন্যে তোমায় দোষ দিতে পারি নে। তোমার মুখে ঠাকুরদা, পিসীমা আর কাকিমার কথা শুনে আমি মনের মধ্যে বেশ একটা ছবি এঁকে নিয়েছি। সেকালের সেই সব ঋষিদের শান্ত ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তির কথা মনে করতে গেলে, তোমার মুখে শোনা ঠাকুরদার সেই মূর্ত্তিখানাই আমার মনে ভেসে ওঠে, আর আমার মনখানা আনন্দে পূর্ণ হয়ে যায়। সেকালের আশ্রমবাসিনী ঋষিকন্যাদের কথা মনে করতে করতে—বইতে তাঁদের ছবি দেখতে দেখতে—আমার মনে জেগে ওঠে আমার কাকিমা আর পিসীমার পবিত্র মূর্ত্তি,—তেমনি শান্ত, তেমনি সহিষ্ণু। তুমি জানো না কাকা, তাঁদের না দেখলেও, তোমার মুখে শুধু তাঁদের কথা শুনে আমি তাঁদের কত ভালবাসি, কত ভক্তি করি।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলিল, "এ কথাও সত্যি যে বাবা বড় নিষ্ঠুরের মতই ব্যবহার করেছেন,—আপনার বাপ, ভাই, বোন সকলকে ত্যাগ করেছেন। সত্যি এটা অন্যায় হয়নি কি কাকা?"

কাকা বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "সেটা তুমিই মনে ভেবে দেখ মা।"

বীথি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "কেন, তুমি এই সত্যি কথাটা বলতে পারছ না? আমার বাপের নিন্দে আমার সামনে করবে, তাই তুমি ভয় পাচ্ছো,—কিন্তু কাকা, তিনি তো শুধু আমারই বাপ নন, তোমারও তো দাদা, তোমার সহোদর ভাই। সত্যি কথা সব সময়ে বলতে পারা যায়। আমার বাপ ভাই যদি দোষ করে, আমি তা চেপে রাখতে মিথ্যা ব্যবহার করব কেন? সকলের সামনেই সত্যি কথা বলতে পারো—এতে লুকোচুরি করবার কোন কারণ নেই। আমি লুকোচুরি মোটেই পছন্দ করিনে কাকা। যার যা দোষ, তা মুখের সামনেই বলে

দেই,—তা সে রাগই করুক আর যাই করুক। লোকের দোষ সামনাসামনি ধরিয়ে দিলে সে সামান্য একটু দুঃখ পেতে পারে। সেই দুঃখটাই তাকে সংজ্ঞান দিতে পারে, তা তো জানো।"

সত্য হাসিল। স্নেহপূর্ণ নেত্রে বীথির পানে তাকাইয়া বলিল, "কিন্তু আর একটা দিক দেখ মা,—সত্য কথা বলে লোকের অপ্রিয়ই হতে হয়।"

বীথি বলিল, "তাই বলে তুমি সত্যকে গোপন করে রাখবে,—মিথ্যেকে মিথ্যে জেনেও তাকে ওপরে আসন দেবে? বাঃ, বেশ লোক তো তুমি কাকা! তাহলে তুমি তো সবই করতে পারো।"

সত্য এই তেজস্বিনী ভ্রাতুষ্পুত্রীর কাছে পরাজিত হইয়া নীরব হইল। বীথিও খানিকক্ষণ কথা কহিল না, অন্যমনস্ক ভাবে সে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। যখন সে চোখ ফিরাইল, সত্য তখন বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। বীথি তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বড় কোমল সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার কথা শুনে রাগ করলে কাকা?"

সত্য চমকাইয়া তাহার পানে তাকাইল,—"রাগ করব কেন মা, কি রাগের কারণ হয়েছে?"

বীথি সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "তোমাকে আমি বড্ড কড়া কথা বলেছি, তুমি রাগ করেছ।"

সত্য হাসিমুখে বলিল, "তুমি তো ভাল কথাই বলেছ মা,—এর মধ্যে শক্ত কথা আমি তো একটাও পেলুম না। তুমি যা বলেছ এ সব সত্য। তারই জন্যে আমি রাগ না করে যথার্থই ভারি খুসি হয়েছি।"

"খুসি হয়েছ তো, বাঁচলুম। আমি ভাবছিলুম, তুমি বুঝি রাগ করলে।" হাসিতে বীথির মুখখানা ভরিয়া উঠিল। "এই যে বাড়ী, গাড়ী থেমেছে, নামো কাকা।"

সত্য আগে নামিয়া তাহার হাত ধরিয়া নামাইতে নামাইতে বলিল, "আমি কিন্তু এখনি যাব বীথি।"

"আচ্ছা, যেয়ো এখন কাকা, আমার সঙ্গে খাবার খেয়ে তবে আজ তোমায় যেতে হবে। এই বিকেল বেলাটায় তোমায় যে কিছু না খাইয়ে বিদায় দেব, তা তুমি মনেও করো না। তুমি তো এ বাড়ীতে কক্ষনো এসো না,—আজ যখন তোমায় আনতে পেরেছি, তখন মনে ভেব না যে অমনি তোমায় ছেড়ে দেব।"

শক্ত করিয়া সত্যর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সে অগ্রসর হইল।

দাদামহাশয় সুবিনয় বাবু তখন বৈঠকখানায় বসিয়া দরকারী কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। দৌহিত্রীর অস্থির পদশব্দে মুখ তুলিলেন। বীথির হাতে সত্যকে বন্দী অবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত সুরে বলিলেন, "এ কি, তুমি কে?"

সত্য উত্তর দিবার আগেই বীথি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "কাকা কিছুতেই আসতে চাচ্ছিল না দাদামশাই, আমি জোর করে ধরে নিয়ে এসেছি। এস না কাকা, আবার দাঁড়ালে কেন?"

কাগজের উপর আবার দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া সুবিনয়বাবু বলিলেন, "ওর সঙ্গে এখন যাও সত্য। যাওয়ার সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো। পাগল যখন ধরেছে তখন কিছুতেই ছাড়চে না।"

কুণ্ঠিত সত্য বলিতে যাইতেছিল, "তা এইখানেই বসি না কেন বীথি, আবার ভেতরে গিয়ে—"

বীথি হাসি চাপিয়া গম্ভীর সুরে বলিল, "তোমার এতটুকু ভয় নেই কাকা, বাড়ী মধ্যে এক দিদিমা ছাড়া আর কেউ নেই। দিদিমা তো তোমার মায়ের মত, ওঁকে লজ্জা করলে চলবে কি করে?"

লজ্জিত সত্য মাথা নত করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বীথি তাহাকে নিজের ঘরে বসাইয়া স্কুলের কাপড় ছাড়িতে ও দিদিমাকে খবর দিতে চলিয়া গেল। খানিক পরে একখানি চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি ও সাদাসিধা সেমিজ গায়ে দিয়া সে আসিয়া দেখা দিল।

সত্য তাহার অপূর্ব্ব সাজের দিকে তাকাইয়া একটু হাসিয়া বলিল, "এই বেশেই তোমায় বড় সুন্দর দেখাচ্ছে মা, ঠিক তুমি এইবার আমার মায়ের সাজে সেজেছ। এতক্ষণ জুতো মোজা পরে নূতন ফ্যাসানের পোষাকে যথার্থই তোমায় ভাল দেখাচ্ছিল না।"

বীথি তাহার পার্শ্বের চেয়ারখানায় বসিয়া পড়িল, বলিল, "যথার্থ কাকা, যাদের যা তাই মানায়। বাঙ্গালীর ঘরের বউ মেয়েকে লালপেড়ে শাড়ি, লাল শাঁখা আর লাল সিঁদুরে সাজতে দেখলে কেমন আনন্দ হয়,—মনে হয়, এ আমাদেরই

দেশের খাঁটি জিনিস,—বিদেশের নাম গন্ধও এতে নেই। আমি আমাদের প্রাচীন আদর্শটা বড় ভালবাসি কাকা। ওই জন্তেই আমার মা-বাপের সঙ্গে মোটেই মিল হয় না। সেদিন একটা ব্যাপার হয়ে গেছে,—তুমি নিশ্চয়ই তার কিছুই জানো না। আমি দিদিমার সঙ্গে ও-বাড়ীতে গিয়েছিলুম। এর আগে যতদিন গেছি—বেশ বিবি সেজে যেতুম। সেদিন এই পাশের বাড়ীর একটী বউকে দেখে কি খেয়াল হল যে, আমি ওর মত সেজে বেড়াতে যাব। দিদিমা কত বারণ করলেন, না শুনে, এই কাপড়খানা পরে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, আলতা পরে ওবাড়ী গেলুম। বাবা আমায় দেখে একটুমাত্র হেসে চলে গেলেন। আর মা দুই হাতে মুখ চেপে ধরলেন। তার পর সে কি ঝগড়া দিদিমার সঙ্গে। বললেন, দিদিমাই না কি আমায় খারাপ করে দিলেন। দিদিমা শেষে কেঁদে ফেলে আমায় বললেন—তুই আর আমার জ্বালাস নে বীথি। ওরা মনে ভাবছে, আমি তোকে কুশিক্ষা দিচ্ছি, তোকে দিয়ে যা না করাবার তাই করাচ্ছি। আমার কথা শোন ভাই, ওসব খুলে ধুয়ে ফেলে তুই যার মেয়ে তার কাছে যা, আমার কাছে আর থাকিস নে। আমার সেদিন খুব রাগ হয়ে গেল। দিদিমার হাত ধরে সেই যে বার হয়ে এসেছি, আর এই কয়মাস যাই নি। এই বিজয়া দশমী গেল, কত বাড়ীতে কত লোককে প্রণাম করে এলুম, ও-বাড়ীতে তবু আমি যাই নি।"

সে বুকফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাসটা দমন করিবার জন্ত চেষ্টা করিলেও, তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বেদনাভরা নিঃশ্বাসটা বাহির হইয়া গেল—"কিন্তু মাও তো আমায় ডাকেন নি কাকা। বাবা আসবেন বলেছিলেন, তিনিও আসেন নি।"

তাহার কণ্ঠস্বর ক্রমেই করুণ হইতে করুণতর হইয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ যেন চেতনা পাইয়া জোর করিয়া বেদনাকে ঠেলিয়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, "তা, না ডাকলেই বা, তাতেই না কি কাকা? যাদের মা বাপ নেই—তারা কি বেঁচে থাকে না? পাশের বাড়ীর একটী মেয়ে—এতটুকু কাকা, বড় জোর তার বয়েস দশ এগার বছর হবে মাত্র,—সে না কি খুব ছোটবেলা হতে মা-বাপ হারিয়ে পরের কাছে রয়েছে। দাদা মশাই আর দিদিমা এঁরা আমায় যতটা ভালবাসেন, তার এতটুকু যদি মা-বাবা আমায় ভালবাসতেন—"

চাপা ব্যথা নিবিড়ভাবেই তাহার কণ্ঠে জাগিয়া উঠিল, বীথি নীরব হইয়া গেল।

"বীথি!—"

চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া বীথি দেখিল দিদিমা সরলা। শান্ত স্নিগ্ধ সেই মাতৃমূর্ত্তিটীর পানে তাকাইয়া সত্যর দুটি চক্ষু জুড়াইয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া নত হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল।

সরলার বিষাদভরা মুখে একটু শান্ত হাসির রেখা জাগিয়া উঠিল, ছেলেটী তাঁহার অপরিচিত নয়,—কন্তার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে করিতে সত্যকে সেখানে তিনি কতদিন দেখিয়াছেন।

"বিজয়ার প্রণাম মা,—"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার মাথায় স্নেহভরা হাতখানি রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া সরলা বলিলেন, "সুখী হও বাবা, আশীর্ব্বাদ করছি—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।"

চকিতে তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দুইটী হঠাৎ জলে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মনে পড়িয়া গেল, বিজয়ার এই আশীর্ব্বাদ লইতে আজ এখনও তাঁহার কন্তা পর্য্যন্ত আসে নাই,—ছেলে মেয়ে জামাই—কেহই এদিক মাড়ায় নাই।

বীথির মুখের উপর অশ্রুসিক্ত দুটি চোখের দৃষ্টি ফেলিয়া আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বীথি, তুই কাপড় জামা ছেড়েই গল্প করতে বসে গেছিস। এখনও কিছু খাস নি, সত্যকেও কিছু খেতে দিস নি। যা দিদিমণি, তোর আর তোর কাকার খাবার নিয়ে আসতে বলে দে রমাকে।"

বীথি উঠিয়া গেল।

সত্য কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না; কারণ, সরলার সহিত এ পর্য্যন্ত তাহার বড় বেশী কথাবার্ত্তা চলে নাই। তাহার সঙ্কুচিত ভাব দেখিয়া সরলা একটু হাসিয়া বলিলেন, "এত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন বাবা? আমি তোমার মা, মায়ের কাছে সন্তানের লজ্জা করবার কারণ কিছুই থাকতে পারে না। মায়ার বিয়ে দিয়ে তোমার দাদাকে একটী ছেলের মতই কোলে পেয়েছিলুম, কিন্তু—"

তাঁহার কণ্ঠ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিল। মনের আর্দ্রতা

তখনই জোর করিয়া দূর করিয়া ফেলিয়া তিনি বলিলেন, "যাক গিয়ে সে সব অতীতের কথা,—ও-সব আমি আর ভাবতে চাই নে। তবুও কেমন মনে জেগে ওঠে। কাল রাত্রে শুনতে পেলুম, তুমি না কি বিলেত যেতে ইচ্ছুক। শুনছি, তোমার দাদা না কি তোমার যাওয়ার আয়োজন করছেন। তোমরা একে যা বলতে চাও বল, আমি একে কুমতি বই আর কিছুই বলতে পারি নে। কেন বাবা, দেশের ছেলে দেশে থেকে কি জ্ঞানোপার্জ্জন করা যায় না? বিলেতে গিয়ে যে বেশী কিছু শিখে আসতে পারা যায়, তা আমার মনে হয় না। তবে হ্যাঁ, একটা জিনিস শেখা যায়,—সেটা বিলাতী সভ্যতা,—যেমন সভ্যতার স্বাদ আমরা প্রতিনিয়ত পাচ্ছি। লোকে দেখছে, শুনছে, ঠকছে, তবুও কেন যে তা পেতে চায়, তা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝতে পারি নে।"

এই সময়ে দুই হাতে দুইখানি খাবার-পূর্ণ ডিস লইয়া বীথি ফিরিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটী বিধবা কিশোরী চায়ের পাত্র কাপ প্রভৃতি লইয়া আসিল। টেবলে খাবারের ডিস দুখানা রাখিয়া বীথি বলিল, "নাও কাকা, খাও।"

সত্য বলিল, "তুমি খাও মা, আমি অনেক বেলায় আজ এক বন্ধুর বাড়ী খেয়েছি, ক্ষিদে হয় নি।"

"ও কথা বললে চলছে না কাকা, কুটুম্বিতার ধার আমি ধারি নে। ওরকম তুমি ও-বাড়ীতে কোরো। আমায় যখন মা বলেছ, তখন আমার কাছে ও রকম কথা তোমার খাটবে না। যদি জাত যাওয়ার ভয় কর—তাই আগেই বলে রাখছি—দিদিমা খাঁটি বামনি, আর আমিও—"

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসি দেখিয়া সত্যও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তুমিও বামনি, না বীথি?"

বীথি জোর করিয়া তাহার হাতখানা খাবারের উপর দিয়া বলিল, "হ্যাঁ; বীথি বলে ডেকো না; মা বোলো বলে দিচ্ছি। ছেলে হয়ে মায়ের নাম ধরে ডাকবে—এটা যেন বড় বিশ্রী শোনায়। নাও, খাও বলছি, না হলে জোর করে খাইয়ে দেবার অধিকার আমার আছে। তুমি ভারি অবাধ্য ছেলে। ও রকম অবাধ্যতা যদি কর, তা হলে আমি কক্ষনো তোমার মা হব না বলে দিচ্ছি।"

সত্য আহার করিতে করিতে বলিল, "তবে বাধ্য হয়ে আমায় খেতেই হ'ল মা! কেন না, তুমি আমার মা না হলে কিছুতেই চলবে না যে। আমায় খেতে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না মা, তোমাকেও বসতে হবে যে।"

বীথি তাহার পার্শ্বে বসিয়া গেল।

বিধবা তরুণীটি মুখের উপর অল্প অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া ধীর হস্তে কাপে চা ঢালিয়া দিতেছিল। সত্য তাহার পানে তাকাইয়া সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটি কে মা?"

একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরলা বলিলেন, "এটি আমার এক আত্মীয়ের মেয়ে। ছোট বেলায় বিধবা,—মা মরণের সময় আমার হাতে একে দিয়ে গেছে, সেই পর্য্যন্ত আমার কাছেই আছে।"

সামান্য অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া মেয়েটার মলিন মুখখানা দেখা যাইতেছিল। ব্যথিত ভাবে সত্য বলিল, "ভবিষ্যতে এর ভার সবই আপনাকে বইতে হবে?"

সরলা আবার একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, বলিলেন, "আর কে নেবে,—অভাগিনীর এ পৃথিবীতে আর যে কেউই নেই।"

বীথির চেয়েও মেয়েটী বয়সে ছোট,—বছর চৌদ্দ পনের তাহার বয়স হইবে। হিন্দুর গৃহের বিধবা যে কি, তাহা সত্য জানিত। তাই এই অল্পবয়স্কা বিধবাটীকে দেখিয়া সত্য হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছিল। সে নিজে এমনই অল্পবয়স্কা বিধবাদের বিবাহের পক্ষপাতী ছিল। তর্ক করিবার প্রবৃত্তিটা তাই এই সময়ে তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সরলার নিষ্ঠাপূর্ণ উজ্জ্বল মুখখানার পানে চাহিয়া সে সম্বন্ধে একটা কথাও সে মুখে আনিতে পারিল না।

বীথি জিজ্ঞাসা করিল, "কাল দাদামশাই বলছিলেন, তুমি না কি বিলাতে যাবে কাকা?"

সত্য মাথা চুলকাইয়া বলিল, "এখনও ঠিক হয় নি। তবে দাদার আর তোমার মার একান্ত ঝোঁক,—আর তাঁরা যাওয়ার যোগাড়ও করে দিচ্ছেন—"

বীথি শুধু গম্ভীরভাবে বলিল,—"হুঁ—"

তাহার অন্ধকার-পূর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া সত্য কথাটা আর শেষ করিতে পারিল না। চায়ের কাপটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া দিয়া সে অন্য দিকে চাহিল।

শান্তকণ্ঠে বীথি জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাচ্ছ?"

সত্য ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "যদি যাওয়া হয়—"

একটু রুক্ষভাবেই বীথি বলিল, "আবার 'যদি' কি? বল যে যাওয়া ঠিকই হয়েছে—এখন গেলেই হয়।"

সত্য একটু হাসিবার চেষ্টা করিল। হাসি ফুটিল না, সে চেষ্টার ফলে শুধু তাহার মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল।

বীথি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "ঠাকুরদার, কাকিমার মত নিয়েছ?"

সত্য শুধু মাথা নাড়িল।

বীথি বলিল, "শুনেছি, বাবা যখন বিলেত গিয়েছিলেন, ঠাকুরদাকে কিছু জানান নি। তুমিও তেমনি করে পালিয়ে যাবে তা বুঝতে পেরেছি। ছিঃ, এ রকম করে লুকিয়ে চলে যেতে তোমাদের এতটুকু লজ্জা হয় না কাকা? আগেই বলেছি—লুকিয়ে কিছু বলা বা করাকে আমি বড় ঘৃণা করি। লুকান কিছু আমি আদবে সইতে পারি নে।"

তাহার কথার সুরে ঘৃণা উচ্ছ্বসিয়া পড়িতেছিল। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল,—সরলা বাধা দিলেন, ডাকিলেন, "বীথি—"

বীথি এবার মুখ ফিরাইয়া লইল,—আর সে কথা তুলিল না।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বীথির দাসী আসিয়া লাইট জ্বালাইয়া দিয়া গেল। সত্য তখন উঠিয়া পড়িল।

বীথি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির পর্য্যন্ত আসিল। সত্যর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কাকা, একটা কথা বলি, বিলাতে যাবে—তার আগে ঠাকুরদাকে জানিয়ে যেয়ো। তুমি যে লুকিয়ে চলে যাবে, সে খবরটা যখন তাঁর কাণে পৌছাবে—একবার মনে করো, কি রকম ব্যথা তিনি তখন পাবেন। এক আঘাতে তাঁর বুক শূন্য হয়ে রয়েছে। তার ওপরে এই আঘাতটা তিনি আর সইতে পারবেন না। বাপের প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য মনে রেখো কাকা। মনে করো না—তুমি বড় হয়েছ বলে তাঁর ওপর তোমার কোনও কর্ত্তব্য নেই। বড় দুঃখের কথা কাকা—তোমার মুখে তাঁর কথা শুনে—এই আঘাতে তিনি কেমন হয়ে যাবেন সেটা আমি অনুভব করতে পারছি। আর তুমি তাঁর সন্তান হয়ে,—দিনরাত তাঁকে দেখে শুনেও সে ধারণা করতে পারছ না। তোমার পায়ে পড়ছি কাকা, যাবে যেয়ো বিলেতে,—তোমার মনের উচ্চ আশার মূলে আমি কুঠারাঘাত করতে চাই নে,—শুধু ঠাকুরদার অনুমতি নিয়ো।'

সে বড় অনুনয়ের কণ্ঠস্বর। সত্য আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তাই হবে মা, আমি বাবাকে বলব।"

বীথি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিল।

৭

প্রাতঃস্নানান্তে উপেন্দ্রনাথ পূজার গৃহে প্রবেশ করিতেন। সেই গৃহেই তাঁহার দু'তিন ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। এ সময়টায় কেহ তাঁহাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইত না।

গৃহদেবতা দামোদর। কে জানে কত পুরুষ হইতে এই দেবতা এ সংসারে স্থাপিত হইয়াছেন। বরাবর দামোদরের পূজা এই পরিবারে ভক্তিভরে একান্ত নিষ্ঠার সহিত চলিয়া আসিতেছে,—কোন দিন সামান্য একটু পূজার ত্রুটী হয় নাই।

কাল রাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া পর্য্যন্ত উপেন্দ্রনাথের মনটা বড় খারাপ হইয়া গিয়াছে। আজ পূজার আসনে বসিয়া সেই স্বপ্নটার কথাই মনে পড়িয়া গেল। উপেন্দ্রনাথ বিভোর প্রাণে বসিয়াই রহিলেন,—হাতের ফুল বিল্বপত্র হাতেই থাকিয়া গেল।

স্বপ্ন যে বাস্তবেরই পূর্ব্বাভাস মাত্র, তাঁহার মনে এই সংস্কারটাই জাগিয়া উঠিয়াছিল। সুস্বপ্ন দেখিলে তাহা কদাচিৎ ফলে; কিন্তু কুস্বপ্ন দেখিলে তাহা যে অচিরেই ফলিয়া যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি জোর করিয়া মনকে বুঝাইতে চাহিতেছিলেন, স্বপ্ন কিছুই নয়। দিনে যে কথাটা ভাবা যায়, স্বপ্ন-স্বরূপে সেই চিন্তাটাই সত্য হইয়া দেখা দেয়। তাঁহার মনের মধ্যে দিনরাত সত্যর কথাই জাগিতেছে। সত্যর জন্য—মুখে প্রকাশ না করিতে পারিলেও—মনে তিনি এতটুকু শান্তি পাইতেন না। একটী ছেলে পাশ্চাত্য মোহে অন্ধ হইয়া যেমন করিয়া সকল মায়া কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে, আর পিছনে ফিরিয়া চায় নাই, এও পাছে তেমনি করিয়া চলিয়া যায়, এই চিন্তাটা অদৃশ্য ভাবে সর্ব্বদাই তাঁহার মনের মধ্যে জাগরিত থাকিত। বিশ্বাস তিনি হারাইয়াছিলেন; তাই জোর করিয়া বিশ্বাস আনিতে চাহিলেও বিশ্বাস আসিত না।

কিছুদিন হইতে সত্যর চালচলনের মধ্যে তিনি একটা "নূতন কিছু" গোছের ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহা তিনি পূর্ব্বে কখনও দেখিতে পান নাই। তাঁহার মনে হইতেছিল, সত্যও দিন দিন দূরে সরিয়া যাইতেছে,—তাহাকে আর বেশী দিন ধরিয়া রাখা যাইবে না।

একজামিন শেষ হইয়া গিয়াছে। সত্যকে বাড়ী আসিবার জন্ম তিনি পত্র দিয়াছেন। আর এখন কলিকাতায় থাকিবার প্রয়োজন কি? পরীক্ষার ফল বাহির হইতে এখনও অনেক দেরী আছে,—তাহার প্রত্যাশায় কলিকাতায় থাকিয়া কি হইবে?

"জ্যেঠা মশাই—"

বাহির হইতে কে ডাকিল। শব্দটা কাণে আসিবামাত্র আত্মভোলা অন্তমনস্ক উপেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি সংযত হইয়া বসিলেন,—না, এ কেবল মিথ্যা ভাবনা করা হইতেছে। হাতে ফুল অথচ তাহা দেবতার পায়ে পড়িল না! আপনার চিন্তাতেই তিনি উন্মত্ত, দেবতার যে পূজা হইল না।

"জ্যেঠা মশাই বাড়ী আছেন?"

ভবানী রান্নাঘরে মসলা বাটিতেছিল,—শিল ও নোড়ার অবিরত ঘটাং ঘটাং শব্দে বাহিরের কোন কথা তাহার কাণে আসিতেছিল না। দেবী ঘাট হইতে ফিরিয়া কলসী নামাইতে নামাইতে বলিল, "বাইরে বাবাকে কে ডাকছে ঠাকুরঝি, শুনে এসো না। বলে দাও, বাবা এখন পূজো করতে বসেছেন, বিকেলের দিকে এলে দেখা হবে এখন।"

ভবানী বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ডাকুক গিয়ে—যেতে দাও না বউ। ডেকে ডেকে সাড়া না পেয়ে আপনিই চলে যাবে এখন। এই মস্লা পিষতে পিষতে আমি পঞ্চাশবার আর উঠতে পারি নে।"

দেবী বলিল, "বোধ হচ্ছে যেন প্রকাশ ঠাকুরপো এসেছেন। দেখ না, কলকাতার খবর নিয়ে এসেছেন বোধ হয়। অনেক দিন ধরে তো খবরই পাওয়া যায় না,—বাবা এদিকে ভেবে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছেন।"

ভারি ব্যগ্রতার সুর এ। বাবাই যে ভাবিয়া যাইতেছেন, আর সে কিছুই ভাবে না—এই কথাটা মনে করিতে ভবানীর মুখে হাসি আসিল। সে ভাব প্রকাশ না করিয়া সে উঠিল —"আমি এসে বাকি মসলাটা পিষছি বউ, এর মধ্যে তুমি যেন পিষে ফেলো না। তোমার তো সে গুণটুকু বিলক্ষণ আছে। এসে করব ভেবে কোন কাজ যদি ফেলে রেখে যাওয়ার যো থাকে,—অমনি সেটাতে হাত দিয়ে শেষ না করলে তোমার চলবে না। ভারি একরোখা মেয়ে বাপু তুমি—"

বকিতে বকিতে সে বাহির হইল। প্রাঙ্গণের রুদ্ধ দরজার দিকে যাইতে যাইতে বলিল, "কে গো,—এই সকাল বেলা গাঁ মাথায় করে তুলছো চেঁচিয়ে? বাবা পুজো করতে বসেছেন, সেটা একটু হিসেব করে সকাল বেলায় আসতে হয়।"

বলিতে বলিতে দরজা খুলিয়াই সম্মুখে প্রকাশকে দেখিয়া থমকিয়া গেল,—'ও—তুমি প্রকাশ-দা? বউ তা হলে ঠিক কথাই বলেছে। আমিই একেবারে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিচ্ছি যে, দাদা এল না তুমি আসবে কি করে? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বাড়ীর মধ্যে এসো।"

প্রকাশ নড়িল না, বলিল, "জ্যেঠামশাই পুজো করতে বসেছেন, তবে এখন যাই; বিকেলে আসব এখন।"

ভবানী বলিল, "বাঃ, বাবা পুজো করতে বসেছেন বলে তোমার আর ভেতরেও আসতে নেই? বাবার সঙ্গেই তোমার সম্পর্ক, আমাদের সঙ্গে কিছু সম্পর্ক নেই তবে?"

গম্ভীর-প্রকৃতি প্রকাশ হাসিল। বলিল, "তোদের সঙ্গে কি সম্পর্ক ভবানী, তোরা হচ্ছিস সব মেয়েমানুষ—"

ভবানী রাগ করিয়া বলিল, "তা ঠিক, মেয়েমানুষ আমরা —তাই কারও সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। মেয়েমানুষকে কোন কথা বলতে পারো না, মেয়েমানুষকে কিছুর মধ্যে জড়াতে চাও না; কেন না, তোমরা পুরুষ, তোমাদের পদমর্য্যাদা বেশী। ছোটবেলা হতে দেখে আসছি তোমাদের, আমরা তোমাদের কাছে—কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরালেই পাজি—হই। চিরটাকাল দাদার কাছে যেমন আবদার করেছি, তোমার কাছেও তেমনি করেছি। আজ কয় বছর কলকাতায় থেকে একেবারে ভারী হয়ে পড়েছো, —মেয়েরা বড় হেয়, আর তোমরা বড় উঁচু—এ জ্ঞানটা খুব বেশী করেই জন্মেছে।"

ভবানীর কথাগুলা বেশ ঝাঁঝালো গোছের ছিল। প্রকাশ বাধা দিয়া বলিল, "থাম রে বাপু, আর লেকচার দিস নে। কলেজে লেকচার শুনে শুনে কাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে তোরাও যদি লম্বা লেকচার দিস, তা হলে যাই কোথায় বল দেখি।"

ভবানী মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল, "একটু শুনতে হয় প্রকাশ-দা,—মেয়েদের একেবারে হেয় বলে ভাবলে চলে না,—তাদেরও সব কাজের অংশ দিতে হয়। যাই হোক, আসবে—না ওখান হতেই ফিরবে?"

প্রকাশ বলিল, "সত্যর খবর শুনতে চাস তো? তা এখান হতেই শুনে নে না কেন? বাড়ীর মধ্যে গিয়ে গোলমাল করব,—জ্যেঠা মশাইয়ের পূজো করা হবে না।"

ভবানী বলিল, "চীৎকার করে না বললে বুঝি বলা যায় না? দাদার খবর আমি একা শুনলেই কি চলবে প্রকাশ-দা, আর কারুর বুঝি দাদার খবর শুনতে নেই?"

প্রকাশ ভিতরে প্রবেশ করিল। ভবানী বারাণ্ডায় একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিল। তাহার উপর বসিয়া প্রকাশ রান্নাঘরের দিকে আড়চোখে তাকাইয়া দুষ্টামীর হাসি হাসিয়া বলিল, "কই,—আর কে সত্যর খবর নিতে চায়? সে বাইরে আসুক, নইলে বলব কি করে?"

দেবী রান্নাঘরে রাগে ফুলিতেছিল। ভবানীর যেন এতটুকু জ্ঞান নাই। তাহার কথা শুনিয়া প্রকাশ হয় তো—হয় তো কেন, নিশ্চয়ই—মনে করিয়াছে, দেবীই সত্যর সংবাদ লইতে চায়। ভবানীর এ রকম কথা বলা বড় অন্যায়; কেন না, সত্যই দেবী স্বামীর সংবাদ লইবার জন্য বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য প্রকাশ করে নাই।

ভবানী আবার একটু হাসিল। এ হাসিটা যে দেবীকে উদ্দেশ করিয়াই, তাহা দেবী রান্নাঘরের বেড়ার ছিদ্র দিয়া দেখিয়া আরও জ্বলিয়া গেল।

মুখখানা নিতান্ত ভালমানুষের মত করিয়া ভবানী বলিল, "বউ ওখান হতেই শুনতে পাবে এখন প্রকাশ-দা। সামনে আসার হ'লে সামনে আসত। যাক, দাদা ভাল আছে তো প্রকাশ-দা?"

প্রকাশ একটু কাসিয়া উত্তর দিল, "হ্যাঁ, বেশ আছে।"

ভবানী বলিল, "হ্যাঁ, বেশ ভাল আছে বই কি। তুমিও সেই মেসেই থাকো, না প্রকাশ-দা? সেখানকার যা সব খাওয়া দাওয়া,—মাগো, দাদার মুখে শুনে ভাবি—কি করে তোমরা সে সব খাও? কলকাতা হতে যখন বাড়ী এস, তখন যা চেহারা করে আনো, তা তো সামনে দেখতে পাচ্ছি। এখানে থাকলে—বলতে নেই—তবু তোমাদের চেহারা ফেরে। হাজার হোক—বাড়ীর খাওয়া তো বটে।"

প্রকাশ নিজের দেহের পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "নাঃ, তোরা যা বলিস, বিবেচনা করে দেখে আমরা ততদূর মন্দ বলতে পারিনে। চেহারা খারাপ কেমন করে—কোন চোখে দেখলি বল দেখি?"

ভবানী বলিল, "এই চোখ দিয়ে সোজা তাকিয়ে দেখছি—আবার কি করে, কেমন ক'রে দেখব? এই তো এবার যখন কলকাতায় গেলে, তখন কেমন চেহারা ছিল, তা তখনও আয়না দিয়ে দেখেছ, এখনও একবার ফিরে আসার চেহারাখানা আয়না দিয়ে দেখে তবে কথা বল। দুটি চোখ বসে গেছে, চোখের নীচে কালি, মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে,—যেন কত রোগ ভোগ করে উঠে এসেছ—"

বাধা দিয়া হাসিয়া প্রকাশ বলিল, "সেটা খাওয়ার কষ্ট নয় রে, খাওয়ার অভাবে নয়। আগে তোরা মূল কারণটা ধরতে পারিস নে,—ফস করে আর একটা কারণ ধরে, সেইটেই আঁকড়ে পড়িস—এই তো তোদের মেয়ে জাতের প্রধান দোষ। ভাবছিস, খাওয়ার কষ্টে এরকম হয়েছে,—তা নয় রে, এর মূল হচ্ছে একজামিনের তাড়া। যত ছেলে স্কুল কলেজে পড়ে তাদের এই একই অবস্থা হয়েছে তা জানিস? দুই মাস আগে তাদের চেহারা দেখিস, আর পরীক্ষার পর তাদের চেহারা দেখিস;—দেখতে পাবি, অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে। তোরা তো জানিস নে,—আমরা এই একজামিনরূপ সাগর পার হওয়ার সময় দেহের দিকে তাকাই নে, কি খাচ্ছি তার মোটে ঠিকই থাকে না। একটা গল্প জানিস ভবানী?—একটী ছেলে একজামিনের কথা ভাবতে ভাবতে একটা ব্যাং খেয়ে ফেলেছিল, এমনই আত্মভোলা চিন্তা এ। তোরা থাকিস ঘরের মধ্যে, লেখাপড়া কি তাই জানিস নে—জানবি কি—একজামিন দেওয়া কাকে বলে। আমাদের কত রাত বিনিদ্র চোখের ওপর দিয়ে চলে যায়। পাছে সময় ফাকি দিয়ে চলে যায়, একজামিনের পড়া না হয়, এই ভয়ে আমরা চোখের দুটি পাতা এক করিনে। চেহারায় যদি কিছু পরিবর্ত্তন দেখে থাকিস, তবে সে এই একজামিনের দোষে।—খাওয়ার দোষ আনুষঙ্গিক কারণ মাত্র, প্রধান নয়। যাই হোক, এবারে এক রকম করে সাঁতার তো দিয়ে এসেছি। ফল যা হবে সে পরের কথা। এখন দিন কতক মা বোনের কাছে থেকে দিব্যি করে পেট ভরে খেয়ে আর সারাদিন

রাত ঘুমিয়ে—যা হারিয়েছি তার ডবল আদায় করতে হবে।"

তাহার কথা শুনিয়া ভবানী হাসিতেছিল, বলিল, "তুমি তো এলে প্রকাশ-দা, দাদা কবে আসছে ?"

প্রকাশ হঠাৎ যেন থতমত খাইয়া বলিল,—"কে, সত্য ? সে তোদের পত্র দেয় নি ?"

ভবানী বলিল, "সেই অনেক দিনের কথা—একবার একখানা পত্র লিখেছিলেন—তাঁর মোটে সময় নেই; একজামিন আসছে, ভারি ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন। সেই পত্রখানা পাওয়ার পরে আর পত্র পাওয়া যায় নি। এই তো একজামিন হয়ে গেছে, তুমি এসেছ ; কিন্তু দাদা তো এল না। বোধ হয় আজকালই আসবে, না প্রকাশ-দা ?"

প্রকাশ মাথাটা একটু কাত করিয়া বলিল, "বোধ হয়।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া ভবানী বলিল, "বাঃ! বোধ হয় কি ? এক মেসে থাক, অথচ বলছ বোধ হয় ; কেন, দাদা তোমায় কিছু বলে নি ?"

প্রকাশ বলিল, "অন্যায় বলি নি ভবানী, তোমার দাদা এখন তো মেসে থাকে না।"

বিবর্ণ হইয়া গিয়া ভবানী বলিল, "তবে কোথায় থাকে ?"

প্রকাশ উত্তর দিল, "তোমার বড়দার বাড়ীতে।"

"বড়দার বাড়ীতে!—" ভবানী স্তব্ধ হইয়া গেল। পিতা খৃষ্টান বলিয়া যে দাদার নামও মুখে আনেন না—সেই দাদার বাড়ীতে গিয়া সত্য রহিয়াছে, সেখানে সে খায়, ইহাও কি সম্ভব ? এত সহজে—এমন করিয়া সে পিতার সান্নিধ্য ত্যাগ করিতে পারিবে কি, সকল সম্পর্ক তুলিয়া দিতে পারিবে ?

তখনি ব্যাকুলকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "বাবাকে এ কথা বলবে প্রকাশ-দা ?"

নিজেদের কথা দূরে গেল, পিতার জন্যই স্নেহশীলা কন্যার যত ভাবনা। তাঁহাকে সে সকল আঘাত হইতে রক্ষা করিতে চায়, তাঁহাকে অক্ষত রাখিতে চায়। এ সংবাদ তাঁহার স্নেহশীল বক্ষে যে কি আঘাত দিবে, তাহা ভবানী জানিত। তাই সে বড় উৎকণ্ঠিতা হইয়া পড়িল।

প্রকাশ বিমর্ষমুখে বলিল, "জানাতেই তো এসেছি ভবানী।"

"না,—তোমায় পায়ে পড়ি প্রকাশ-দা, এ কথা তুমি বাবাকে শুনিয়ো না। তা হলে বাবা একেবারে পাগল হয়ে যাবেন,—জীবনে আর কখনও দাদার মুখ দেখবেন না,—ধর্ম্মচ্যুত বলে তার হাতের জলও নেবেন না। বাবা ভারি গোঁড়া। ধর্ম্মের দিক হতে এতটুকু লোকসান তিনি দেখতে পারবেন না। তোমার আজই দাদাকে চুপি চুপি একখানা পত্র দিতে হবে,—যাতে বেশী গোলমাল না হতে হতে দাদা এসে পড়েন তাই লিখে দাও। দাদা এলে আমি দাদার পায়ে ধরে বলব, যেন আর তিনি বড়দার বাড়ী না যান। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে, আর যেন কিছু না করেন। আমি সেখানকার ঠিকানা জানি নে প্রকাশ-দা। তোমায় একখানা পত্র লিখে দিতেই হবে ; বল, দেবে ?"

তাহার কথার মধ্যে যে ব্যগ্রভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহা প্রকাশের হৃদয় স্পর্শ করিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি আজই পত্র লিখব। কিন্তু সে আর আসবে না ভবানী।"

"আসবে না ?—কেন ?" ভবানী যেন আকাশ হইতে পড়িল ; অবাক হইয়া প্রকাশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

প্রকাশ মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "তাকে তোমার বড়দা বিলাতে পাঠাচ্ছেন,—তার যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেছে।"

ভবানীর মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে দেয়ালে ঠেস দিয়া বদ্ধদৃষ্টিতে কোন্ দিকে চাহিয়া রহিল।

বড়দা বিলাতে গিয়া, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া, পিতাকে একেবারেই পর করিয়া দিয়াছেন। সন্তান জীবিত থাকিতেও পিতার মুখে এতকালের মধ্যে কেহ তাঁহার নাম উচ্চারিত হইতে দেখে নাই,—সন্তানের পক্ষে ইহাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ তো বাধা দিয়াছিলই ; তাহার উপর পুত্র নিজেই মাঝখানে একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর গঠন করিয়া লইয়াছিলেন। ধর্ম্মান্তরের প্রাচীর কোনমতে পার হইতে পারিলেও, এই শিক্ষিতের আত্মাভিমানরূপ প্রাচীর ভেদ করিবার সামর্থ্য পিতা উপেন্দ্রনাথের নাই, কখনও হইবে না। তিনি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও যদি একবার "বাবা" বলিয়া ডাকিয়া কাছে আসিতেন, পিতার পা দুখানি জড়াইয়া ধরিতেন, পিতা কিছুতেই আপনার ধর্ম্মগত সংস্কারকে জাগাইয়া রাখিতে সমর্থ হইতেন না ; কারণ, তাঁহার সন্তানেরা যে মাতৃহীন।

ধর্ম্ম, নিষ্ঠা, জ্ঞান—সকলের উপরে অটুট আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে পিতামাতার সন্তান-বাৎসল্য। তিনি মুখে না বলুন, অন্তরেও কি আশা রাখেন নাই—সে আসিবে, তাহার কৃত কর্ম্মের জন্য ক্ষমা চাহিবে? নিশ্চয়ই এতটুকু আশা তাঁহার অন্তরের এক কোণে পড়িয়া ছিল। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তিনি চমকাইয়া পথের পানে চাহিতেন। কিন্তু গর্ব্বোদ্ধত জিতেন্দ্রনাথ বিলাত হইতে পূর্ণভাবে সাহেব সাজিয়া আসিয়া নিজেকে অতি উচ্চ বলিয়াই ধারণা করিয়াছিলেন; এবং এই অশিক্ষিত শ্রেণীর ভট্টাচার্য্য লোকটাকে পাছে পিতৃসম্মান দান করিলে শিক্ষিত সমাজ হাসে, তাই বহু দূরে সরিয়া গিয়াছিলেন।

বড়দা নিজে তো একেবারেই চলিয়া গিয়াছেন, ছোট ভাইকেও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখাইয়া প্রলোভিত করিয়া পিতার স্নেহময় কক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইলেন। হায় রে অদৃষ্ট,—হতভাগ্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখন কি লইয়া বাঁচিবেন? তাঁহার যে বয়স তাহাতে সার বস্তু বিসর্জ্জন দিয়া স্মৃতি লইয়া দিন কাটানো অসম্ভব। ভবানী এখন কোন্ আশার আলো তাঁহার সম্মুখে ধরিবে,—জগৎ যে তাঁহার সম্মুখে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে!

"প্রকাশ-দা—"

ডাকিতে গিয়া তাহার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া বন্ধ হইয়া গেল। চোখের জল উপচাইয়া পড়িয়া গেল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "বাবাকে এ কথা বলো না প্রকাশ-দা। দাদা আজ আসবেন, কাল আসবেন,—বাবা এই আশায় আছেন, আমিও সেই আশা দিচ্ছি। তোমায় যখন জিজ্ঞাসা করবেন, তুমিও এই কথা বলো। বড়দা যে বাবার একদিককার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়েছেন, তাই বিশ্বাস করতে তাঁর মন আর সরে না। তুমি বলো না প্রকাশ-দা—তাঁর আর একদিককার পাঁজর ভেঙ্গে দিয়ে, তাঁর অবিশ্বাসকে জমাট করে তুলতে ছোড়দাও বিলেতে চলে যাচ্ছে,—ফিরবে যখন তখন আর এদিকে চাইবে না। দাদা কবে যাবে তা কি শুনেছ প্রকাশ-দা?"

প্রকাশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আজকালই সে যাচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। তাকে বোঝাবার চেষ্টা অনেক করেছিলুম ভবানী, আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে। সে স্পষ্টই আমায় বললে—"বাপের জন্যে অনেক স্বার্থত্যাগ করেছি। যাকে বিয়ে করতুম তাকে না বরণ করে বাবার আদেশে এক গ্রাম্য বালিকাকে বিয়ে করেছি। নিজের জীবনে এতটুকু সফলতা কখনও লাভ করতে পারি নি। এবার এ সুযোগ আর হারাতে বোলো না।"

ভবানীর আয়ত চোখ দুটি মুহূর্ত্তের তরে ধ্বক ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "তা বটে প্রকাশ-দা, সে কথা যথার্থ বটে। আমি বলছি—দাদাকে তোমরা 'শিক্ষিত' বলতে চাও, আমি তাকে মূর্খ বলি। হাঁা, দাদা একেবারে মূর্খ। প্রকৃত শিক্ষা দাদার কিছুই হয় নি। যা শিক্ষা করেছে, সে পুঁথিগত শিক্ষা তাকে উন্নত করতে পারে নি, আরও অবনত করেছে। মনে করো না নামের আগে পেছনে কতকগুলো অক্ষর গড়ে দিলেই সে জ্ঞানী হয়ে যায়। যার মনে সহজজাত জ্ঞানটুকু নেই, কিছুই তাকে জ্ঞানী করতে পারে না। দেবীকে বিয়ে করে দাদা বড় অনুতপ্ত হয়েছেন; তাই কথাটা মুখ ফুটে বেরিয়ে পড়েছে। এখনও তিনি বুঝতে পারেন নি, কি রত্ন লাভ করেছেন। বলতে পারিনে, কখনও বুঝতে পারবেন কি না। এমন স্ত্রী মিলতে পারে আমাদেরই ঘরে। যাদের মনে সহজ জ্ঞানজাত পাতিব্রত্য সঞ্চিত রয়েছে, যাদের সামনে এদেশের সতী সাবিত্রী সীতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পড়ে রয়েছে, অন্য রুচি এসে তাদের অন্তরকে বিকৃত করে তুলতে পারে নি। এ দেশের সতীধর্ম্মে দীক্ষিতা হয়ে তারা স্বামীর জন্যে সবই করতে পারে। সেইজন্যেই দেবী সে দিন স্বামীর পড়ার খরচ দিতে,—হাতে দুটি শাঁখা মাত্র রেখে সব গয়না হাসিমুখে স্বামীর হাতে তুলে দিয়েছে। বলতে পারিনে প্রকাশ-দা, পাশ্চাত্যে কয়টি মেয়ে এ-রকম ভাবে স্বামীকে দেবতা বলে ভাবতে পারে, স্বামীর জন্য নিজের সুখ দুঃখ বিসর্জ্জন দিতে পারে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষালাভ করে আমাদের দেশের যে মেয়েরা শিক্ষিতা নামে পরিচিতা হয়েছে, তাদের মধ্যে কতটা এমন নির্ভীক দৃঢ়তা আছে, তাও আমার অজ্ঞাত। আর আমার সঙ্গে যদি ছোড়দার একবার দেখা হতো, আমি মনের সাধ মিটিয়ে একবার কথা বলে নিতুম।"

প্রকাশ বিষাদের হাসি হাসিয়া বলিল, "বললেও কোন ফল পেতে না ভবানী, সে এখন কারও কথা কাণে নেবে না। তার মনের উচ্চ আশা—সে নিজে শিক্ষিত হয়ে ফিরবে, তার স্ত্রীকে বউদির মত শিক্ষিতা করে নেবে—"

বাধা দিয়া ভবানী বলিল, "দেশে থাকলে তা হতো না প্রকাশ-দা? বাবা আর কতকাল বাঁচবেন? যে রকম বাবার চেহারা হয়েছে—বড় জোর যদি পাঁচটা বছরও বাঁচেন, সে আমাদেরই কপাল। বাবা মরে গেলে তার পর যা খুসি তাই করতেন, কেউ তো তাঁকে বাধা দিতে থাকত না। বাবার মার কারও অন্তরে তাতে আঘাত বাজত না। বাবার শেষ জীবনটা এমনি অশান্তিতেই ভরে উঠল, স্বার্থান্ধ ছোড়দা পর্য্যন্ত নিজের দিকটা দেখলেন—তাঁর দিকটা দেখলেন না? পাঁচ বছর যেখানে বাঁচতেন, সেখানে আয়ু কমিয়ে পাঁচ দিন করে দিয়ে গেল—এই ছেলের কাজ?"

উদ্বেলিত অশ্রু তাহার কণ্ঠকে চাপিয়া ধরিল।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কোন মতে নিজেকে সামলাইয়া বিকৃত কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি এখন যাও প্রকাশ-দা, বাবা এক্ষনি পুজো সেরে বেরুবেন। মনের যে রকম অবস্থা, তাতে তুমি কখনই এখন কথাটা লুকিয়ে রাখতে পারবে না, প্রকাশ করে বলবে। বিকেলে এসো, বলো দাদা পশ্চিমে গেছে, শিগগিরই ফিরবে।"

প্রকাশ উঠিল।

ফিরিয়া আসিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভবানী দেখিল, দেবী আড়ষ্টভাবে বসিয়া আছে।

"সব শুনলে বউ?"

চমকাইয়া উঠিয়াই দেবী হাসিল। সে হাসি বড় মলিন। অন্তরের গোপন বেদনাই যেন হাসিরূপে ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "শুনেছি। চুপ কর, বাবার পুজো হয়ে গেছে, আর ও সব কথা তুলো না।"

উভয়ে নীরবে নিজের নিজের কাজে প্রবৃত্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সৌরজগৎ-রহস্য

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু এম-এসসি

সৌরজগতের কথা বল্‌বার আগে এই জগতের আদি ও কেন্দ্র-স্বরূপ সূর্য্যকে বিশেষভাবে জানা আবশ্যক। সবিতাই হল আদি-দেবতা। আদিম মানব এই সবিতৃদেবকেই প্রথম পূজার অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেছিল। সাবিত্রী মন্ত্রে আছে—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ওঁ ॥

তেজের আধার হ'ল সবিতা—তাঁর অস্তিত্বেই আমাদের মেধা ও বুদ্ধি। আমাদের দেশে অধুনা সূর্য্যের উপাসক কতগুলি ও তাঁদের প্রধানতঃ কোথায়-কোথায় বাস, সব আমার জানা না থাকলেও, সৌরধর্ম্মী যে হিন্দুদের একটা কুক্ষিগত সম্প্রদায় তার কোন বলিষ্ঠ প্রমাণ না দেখালেও চলে। এখনও হিন্দুদের মধ্যে নৈষ্টিক অনেক লোককে স্নানের অব্যবহিত পরে নবগ্রহের স্তব আবৃত্তি করতে শুনেছি; এবং সর্ব্বাগ্রে এই কথাগুলি উচ্চারণ ক'রে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রতে দেখেছি—

(ওঁ) জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

সূর্য্যের উপাসক যে শুধু ভারতেই ছিল, এ কথা আমি বলি না। কারণ, মিশরে, গ্রীসে এই সৌরপূজার প্রচলন ছিল; এমন কি, প্রাচীন ব্যাবিলন-বাসীরাও সূর্য্যকে দেবতাস্বরূপ পূজা ক'র্‌তেন। এখন এই পূজা কর্‌বার অর্থ আর কিছু থাক্ বা না থাক্—আমরা প্রকৃতির রাজ্যে কোন বিরাট শক্তির আধারকেই দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করি। এই প্রসঙ্গে ইন্দ্র ও পবনকে যতটা কাল্পনিক দেবতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছি, চাক্ষুষ অগ্নি-সূর্য্যকে সে রকম কাল্পনিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায় না। এই অগ্নি-সূর্য্যের প্রত্যেককে যদি আমরা ব্যষ্টিভাবে চিন্তা করি ত তেজের (fire) কণার সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই দেখি না। এই তেজই আবার বাস্তব জগতের একটা মূল উপাদান।

ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ তান্মাত্রিক সৃষ্টি হ'য়েছে এইরূপ কতকগুলি মূল পদার্থকে লইয়াই। এখন সৌরজগতের বিকাশ বুঝ্‌তে হলে সৌর-জগতের আদি-বীজ ঠিক সূর্য্যকে ধ'র্‌লে যদিচ অসঙ্গত হবে না, তত্রাচ

এটা খুবই স্তায্য ব'লে গণ্য হবে, যদি জগৎপ্রপঞ্চের মূল উপাদানগুলাকে অঙ্গাঙ্গীভাবে নাড়াচাড়া করা যায়। মোটামুটি সৌরজগতের কথা বুঝতে গেলে সূর্য্য জিনিসটা কি সেটার বিশ্লেষণ ক'রে ফেলা উচিত। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বুঝতে হ'লে, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তারে কি-কি আদি-বীজ কি-কি নিয়মে গঠন-কার্য্যের সহায়তা ক'রেছিল, তার একটা সম্পূর্ণ Synthesis অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে। যেটা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় চির-ঈপ্সিত সামগ্রী, সেটার বিচার ও নিষ্পত্তি সময়ের অনন্ত পরিধির কাছে ছেড়ে দিয়ে, যেটা সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সেইটে নিয়ে যুক্তি করাই শ্রেয়ঃ। তাই সূর্য্যকে লইয়া সৌর বিজ্ঞানবিদ্-মণ্ডলী (astro-physicists) যে-ভাবে গবেষণা ক'র্‌ছেন, তাতে ওই জাগতিক অভিব্যক্তির synthesis আপনা হ'তেই গড়ে উঠবে, এরূপ আশা করা যায়।

সাধারণতঃ সূর্য্যকে আমরা ব'লে থাকি—জগচ্চক্ষু। যাঁর আলোক-জ্যোতিতে আমরা জ্যোতিষ্মান্; যাঁর জীবনের সঙ্গে আমাদের জীবন, পশুপক্ষী বৃক্ষগুল্মলতা উদ্ভিজ্জের জীবন—আপামর পার্থিব বস্তুর জীবন জড়িত র'য়েছে; যাঁর অস্তিত্ব আমাদের জীবনের পক্ষে কল্যাণপ্রদ,—রোগশোকক্ষয়-বিনাশক (১); যাঁর দীপ্তিতে মানব-প্রতিভার উন্মেষ ও যাঁর এক মুহূর্ত্ত অনুপস্থিতি আমাদের সত্যো মৃত্যুর কারণ, স্থাবর-জঙ্গমের বিনাশ,—সেরূপ জড়পিণ্ডকে—আমাদের plebians বলুন আর যাই বলুন—আমরা আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী দেবতা বলেই পূজা করি।

অসীম ব্যোমে ভ্রাম্যমান্ জ্যোতিষ্কের কথা অল্প-বিস্তর সকলেই শুনেছেন। এই অনন্ত ব্যোমে অগণিত জ্যোতিষ্ক আছে, এ কথা তিনিই স্বীকার ক'র্‌বেন, যিনি অন্ধকারময় নিশীথে অসীম গগনকুট্টিমে প্রদীপ্ত তারকারাজির ঝক্‌মকানি লক্ষ্য ক'রেছেন। অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে কত কোটী কোটী নক্ষত্র সন্তরণ ক'র্‌ছে তার ইয়ত্তা হয় না। কিন্তু প্রতীচির মহাপণ্ডিত আইনষ্টাইন্ যে-দিন মত প্রচার ক'রলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডের ব্যাপ্তি সীমাহীন হ'লেও জ্যোতিষ্কের সংখ্যা অপ্রমেয় নয়; এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সমষ্টি এক-কোটী-কোটী-কোটীর উর্দ্ধে নয়, তখন প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিদ্বৎসমাজে কথাটা একটা রহস্যোদ্ভেদের মতই হ'য়ে গেল।......

যে সব স্থিরকক্ষ জ্যোতিষ্ককে আমরা সোজা কথায় (অবৈজ্ঞানিকের কথায়) ব'লে থাকি 'তারা' বা 'নক্ষত্র', তাদের মধ্যে সূর্য্যটাও হল একটা নক্ষত্র। প্রভেদ এইটুকু যে, পৃথিবী ও চন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট বলিয়া ইহাকে এইরূপ একটা মহাদ্যুতিসম্পন্ন অগ্নিপিণ্ডের মত প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্র মাত্রেই সূর্য্যের ন্যায় বা তদপেক্ষা বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র অগ্নিপিণ্ড। অন্যান্য জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্য্যের সহিত সর্ব্বাপেক্ষা নৈকট্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ইহা অস্থিরকক্ষ বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি প্রভৃতি গ্রহোপগ্রহকে স্বীয় আকর্ষণে আবদ্ধ রাখিয়া, তাপ ও আলোক বিতরণ-পূর্ব্বক তন্নিবাসী জীবসমূহের নানা উপায়ে জীবন-রক্ষা ক'রে থাকে। ইহার শাসনে সমস্ত গ্রহোপগ্রহ নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহাদের গতির কোনও অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না, সকলেই আপনাপন বৃত্তাভাসকক্ষে কোন অপূর্ব্ব অপরিজ্ঞাত বিধিনিচয়ের দ্বারা সুসংবদ্ধ হ'য়ে অবিরাম পরিক্রমণ ক'র্‌ছে,—কোন সংঘর্ষ নাই, সংঘাত নাই। কি বিচিত্র প্রকৃতির নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ এই জ্যোতিষ্ক-সম্প্রদায়!

পৃথিবী হ'তে সূর্য্যের বিপুল দূরত্বের দোহাই দিয়ে আমরা ব'লে থাকি, সূর্য্যের আয়তন একখানা বৃহৎ থালার ন্যায়। কিন্তু এই অস্পষ্ট ইঙ্গিতে প্রকৃত সূর্য্যের দূরত্ব নির্ণয় করার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। সূর্য্যের দূরত্বের জ্ঞান না জন্মিলে সূর্য্যের প্রকৃত আয়তন, mass (জড়ত্ব) অথবা সূর্য্যসম্পর্কীয় নানা উপলভ্য বিষয়ে (phenomena) জ্ঞান জন্মাতে পারে না।

আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১,৮৬,৩৩০ মাইল যখন জানা গেল, তখন জ্যোতির্বিদ ব্রাড্‌লে ইং ১৭২৫ অব্দে আলোকের মার্গচ্যুতি সম্বন্ধীয় (aberration) আবিষ্কার ক'র্‌লেন, আর গণিতবিদ্ পণ্ডিত গণিতের পদ্ধতি অবলম্বনে সূর্য্যের দূরত্বের পরিমাণ কষিয়া বাহির করিলেন,—কিঞ্চিদধিক দ্বিনবতি কোটি মাইল। তৎপরে জ্যোতির্বিজ্ঞানে parallax নামক একটি নব্য বিষয়ের যখন আবিষ্ক্রিয়া হল, তখন এই দূরত্বটির যাথার্থ্য প্রতিপাদন কর্‌বার একটা অভিনব উপাদান সংগৃহীত হ'য়েছিল।

কামানের গোলা সেকেণ্ডে আড়াই হাজার ফিটের বেশী বেগে যেতে পারে না। পৃথিবী আপন কক্ষে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে যে গতিতে প্রদক্ষিণ ক'র্‌ছে, সেটা ওই গোলার বেগাপেক্ষা গড়ে চল্লিশগুণ বেশী। যদি পূর্ব্বোক্ত গতিতে একটা গোলা অবিশ্রান্ত ভাবে সূর্য্যের দিকে প্রধাবিত হয়, তবে সূর্য্যলোকে পঁহুছিতে তার ছয় বৎসরের অধিক কাল লাগ্‌বে। কিম্বা কোন বাষ্পীয় শকট যদি ঘণ্টায় ষাট্ মাইল বেগে অবিরাম গতিতে ও সমভাবে ১৭৫ বৎসর কাল সূর্য্যাভিমুখে যাত্রা করে, তবেই গন্তব্য স্থানে পঁহুছিতে সমর্থ হইবে। অথবা দ্বি-চক্রযানে আরোহণ করিয়া কেহ যদি প্রতিদিন ১০০ মাইল ভ্রমণ করিতে সমর্থ হন তবে ওই গতিতে গেলে ২৫৫০ বৎসর অতীত হবার পূর্ব্বে তিনি সূর্য্যলোকে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। সূর্য্য হ'তে পৃথিবীতে আলোক আস্‌তে লাগে মোটে আট মিনিট; কিন্তু পৃথিবীর নেদিষ্ঠ নক্ষত্র আল্‌ফা-একুইলি হ'তে পৃথিবীতে আলোক আস্‌তে লাগে সার্দ্ধ-চার বৎসর। এমন দূরবর্ত্তী ভাস্বর নক্ষত্র আছে, যেখান হ'তে পৃথিবীতে আলোক পঁহুছিতে হাজারের উর্দ্ধ বৎসর লাগ্‌তে পারে।

সূর্য্যের আয়তন সম্বন্ধে একটা কথা প্রয়োজনীয় মনে হয়। অনুমান করুন, সূর্য্যের অবয়ব হ'তে সব 'মাল-মসলা' বাহির করে ফেলা হ'য়েছে,—যথা, একটা ফাঁপা গোলকের প্রতিকৃতি স্বরূপ। যদি পৃথিবীকে সেই ফাঁপা গোলকের কেন্দ্রে রাখা হয়, তবে সূর্য্যের উপরিভাগটা কেন্দ্র হ'তে ৭,৩৩,০০০ মাইল দূরে থাকবে, এবং পৃথিবীবেষ্টনকারী চন্দ্র সেই ফাঁপা গোলকটার অভ্যন্তরেই থেকে যাবে,—প্রায় কেন্দ্র হ'তে সৌরগোলকের

(১) রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ডে অগস্ত্য উক্ত স্তোত্রে আছে,—

সর্ব্বমঙ্গল মাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং

চিন্তাশোক প্রশমনমায়ুর্ব্বর্দ্ধনমুত্তমম্।

উপরিভাগের অর্দ্ধপথে ঘূর্ণ্যমান থাকবে।......কি বিশাল জড়পিণ্ড এই সৌরজগতের-তার কেন্দ্রটি! আর ইহার গুরুত্বও বড় কম নয়, পৃথিবীর চেয়ে তিন লক্ষ তেত্রিশ হাজার গুণ ভারী।

পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ-বলে প্রত্যেক জড় বস্তুকে তাহার কেন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ করে, এ কথা দর্শন-প্রণেতা আর্য্য ঋষিরাও বলে গেছেন। কিন্তু Newton যখন এই মাধ্যাকর্ষণের নিখিলব্যাপকতা নির্দেশ করলেন ও এ সম্বন্ধে গতি-বিজ্ঞানের একটা বিধি আবিষ্কার ক'রে ফেললেন, তখন জ্যোতিষশাস্ত্রের একটা নূতন রকম প্রসব-বেদনা অনুভূত হল, ব্রহ্মাণ্ড-তত্ত্বের একটা নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেল। আমরা জানলাম, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রচণ্ড বলে টানিয়া আছে, নচেৎ এই বেগবতী পৃথিবী সূর্য্যের কবল হ'তে কোন্ কালে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে অনন্তের নিরুদ্দিষ্ট পথে ছুটে চ'লে যেত সন্দেহ নাই। এবং সূর্য্যের বিহনে পৃথিবীতে প্রজার সৃষ্টিও অসম্ভব হত। এ কথাও খুব জোরের সহিত বলা যায় না; কেন না অনন্ত আকাশ-পথে ঘুরিতে ঘুরিতে হয় ত কোন ভাস্কর সদৃশ প্রতাপশালী নক্ষত্রের কবলিত হ'ত!...ধরিত্রীর প্রতি সূর্য্যের যে বিষম টান আছে, তার পরিমাণ ব'লছি। একটা ইস্পাতের লাঠি যাহার ব্যাস ৩০০০ মাইলের কিছু অধিক হবে, সেই লাঠিটা ভাঙ্গতে কতগুণ 'রামমূর্ত্তি'র বল লাগ্‌বে, সেটা যদি অনুমান করতে পেরে থাকেন, তবেই বুঝবেন—অনন্ত শূন্যমার্গে বিচরণশীল এই দুইটী জড়-পিণ্ডের মধ্যে কি এমন অদৃশ্য অলঙ্ঘ্য নিয়ম সংস্থাপিত আছে, যাহার দরুণ এই নিদারুণ আকর্ষণ ধরণীকে আপনার যদৃচ্ছাবৃত্তি হ'তে বিরত রেখেছে, সংযম এনে দিয়েছে! যদিও আমরা সূর্য্যলোকে গমন ক'রতে সমর্থ হব না এবং সে দুঃসাহসিক চেষ্টা ক'রলে গ্রীসদেশীয় প্রাচীনযুগের আইকারাশ ছোক্‌রার দশা প্রাপ্ত হব, তবু আমরা ত বিজ্ঞানের সাহায্যে ক্রমেই জানতে পাচ্ছি সূর্য্যের মূল উপাদান কি কি?...একটা একমণ ৩৫ সের ওজনের মানুষ সূর্য্যমণ্ডলে গেলে তার ওজন দুই টনের উপর হ'য়ে যায়। কিন্তু সেখানে উত্তাপ সহ্য ক'রে তিষ্টিবার সাধ্য মানবের নাই; এবং পৃথিবীর ঘনত্বের চতুর্থাংশ ঘনত্ব সূর্য্যের সব জায়গায় আছে কি না সন্দেহ। বর্ণচ্ছদবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, উদজান ব্যতীত বিভিন্ন ধাতুও বাষ্পাকারে সূর্য্যে বর্ত্তমান আছে, যেমন লৌহ, কালশিয়ম, সজ্জি, তাম্র, ইত্যাদি। সূর্য্যে বাষ্পাকার অবস্থায় ভিন্ন শক্ত বা তরল অবস্থায় কোন বস্তুর থাকা সম্ভব নয়। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ (temperature)। সেণ্টিগ্রেড তাপমান-যন্ত্রের মাত্র ১০০ ডিগ্রিতে জল ফুটিয়া বাষ্পাকারে পরিণত হয়। আর সেই যন্ত্রের ১৫হাজার ডিগ্রি উত্তাপে বাষ্পে পরিণত হ'তে কোন জিনিসের বাকী থাকে কি?

সূর্য্যে যে কতকগুলা কাল দাগ আছে, তাদের সৌর-কলঙ্ক—এই অভিধা দেওয়া যেতে পারে। এই সৌর-কলঙ্কগুলাকে সূর্য্য-পৃষ্ঠের উপর দিয়া পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতে লক্ষ্য করা গিয়াছে। তাহাতে অনেকেই বলেন যে, সূর্য্যের আবর্ত্তন আছে। মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবীর ঘুরিবার কাল আমাদের ঘড়িতে যেমন চব্বিশ ঘণ্টা, সেইরূপ সূর্য্যের এই আবর্ত্তনকাল (Synodic period) আমাদের কাছে মনে হবে মাত্র সওয়া সাতা'শ দিন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঘূর্ণনটা প্রায় সাড়ে পঁচিশ দিনেই (sidereal period) হ'য়ে থাকে। পৃথিবীর মেরুদণ্ডটা ধ্রুবনক্ষত্রের দিকে মুখ ক'রে আছে; কিন্তু সূর্য্যের মেরুদণ্ডটা এমন একটা দিক নির্দ্দেশ ক'রছে, যেটা ধ্রুবনক্ষত্র ও আল্‌ফা-লিরা ব'লে উত্তরনক্ষত্র-মণ্ডলীর যে একটা নক্ষত্র আছে, এই দুইটি নক্ষত্রের মাঝখান বরাবর।

আমরা নগ্ন চক্ষে যে সমুজ্জ্বল শুভ্র আলোকময় গোলাকৃতি সূর্য্যটি প্রত্যক্ষ করি, সেটা সূর্য্যমণ্ডলের অংশমাত্র। সূর্য্যের অবয়বটি ইহাপেক্ষা অনেক বৃহৎ। সমগ্র সূর্য্যের এই দর্শন-গ্রাহ্য স্থানটিকে বলে দৃশ্যমণ্ডল (photosphere)। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে—যদি যন্ত্রটির শক্তি ক্ষীণ হয়—কখনও কখনও কোন বিশেষ অনুকূল অবস্থায় এই দৃশ্য-মণ্ডলটিকে দেখা গিয়াছে যে, এই অংশটি সর্ব্বথা সমভাবে আলোকিত নয়,—খুব আব্‌ড়োখাব্‌ড়ো ব্লটিং কাগজের ন্যায় শবল; এবং দৃশ্যমণ্ডলটির কেন্দ্রভাগ অপেক্ষা সীমান্তবর্ত্তী স্থানগুলা নিষ্প্রভ। এটা ফটো দেখে বেশ বোঝা যায়। পক্ষান্তরে যদি বেশী শক্তিশালী দূরবীক্ষণ ব্যবহৃত হয়, তবে কাল পৃষ্ঠভাগের (back ground) উপর পারিপার্শ্বিকভাবে বিস্তৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোজ্জ্বল পিণ্ড সমস্ত সৌর-রেকাবখানিকে ভরিয়া দিয়াছে, এরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। হার্শেল তাদের নামকরণ ক'রেছিলেন nodules ব'লে। জ্যোতিষী-কবি ল্যাংলে তার উপমা দিয়াছেন যেমন (২)—

ধূসর বসন মাঝে
তুষার কণিকা সাজে।

সৌর-কলঙ্কগুলার আশে-পাশে সময়-সময় উজ্জ্বল ডোরাকাটা দাগ দেখা যায়। সেগুলাকে বলে ফ্যাকুল (Faculae); দৃশ্যমণ্ডলের প্রান্তদেশে এগুলা প্রায়ই নয়নগোচর হয়।

দৃশ্যমণ্ডলের অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, যেমন পার্থিব বায়ুমণ্ডলে বাষ্প জমাট বাঁধিয়া মেঘের সঞ্চার হয়, সেইরূপ দৃশ্যমণ্ডলটি আর কিছুই নয়—একখানা শুভ্র মেঘ অপেক্ষাকৃত অল্পোজ্জ্বল বায়ুমণ্ডলে ভাসমান র'য়েছে। ভেল্‌শবাখ্ বারনারে (Welsbach Burner) যে গ্যাসশিখা আছে, তার প্রান্তভাগে যে উজ্জ্বল আচ্ছাদন দেখা যায়, সেটা ঔজ্জ্বল্যে যেরূপ এই গ্যাসশিখাকে অতিক্রম ক'রে গেছে, সেই দৃশ্যমণ্ডলরূপী মেঘপ্রচ্ছদ, যে গ্যাসময় বায়ুমণ্ডলে সে প্রবমান রয়েছে, তদপেক্ষা ঔজ্জ্বল্যে খুবই বেশী, এবং ওই মেঘখানার যে উপাদান সমুদায় আছে, তাদের তাপবিকিরণ শক্তি উপর্যুক্ত বায়ুমণ্ডলের গ্যাসসমষ্টির চেয়ে অনেক বেশী।

দৃশ্যমণ্ডলের বহির্দ্দেশে আর একটা স্তর আছে—যাকে অদৃশ্যমণ্ডল (chromosphere) বলব। কেন না, এই মণ্ডলটি সাধারণতঃ নগ্ন-চক্ষে দেখা যায় না। যখন সূর্য্যগ্রহণ হয়, তখন দৃশ্যমণ্ডলটি অন্ধকারাবৃত হয়,

---

(২) "Like snowflakes on gray cloth."—Langley.

সেই সময় spectro heliograph যন্ত্রযোগে অদৃশ্যমণ্ডলের আলোকচিত্র লওয়া হয়। সেই আলোকচিত্রে অদৃশ্যমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত বায়ুমণ্ডলের অবস্থা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত হ'তে পারে, যখন শ্বেতবর্ণ দৃশ্যমণ্ডল অন্ধকারে ঢাকা পড়ে, তখন অদৃশ্যমণ্ডলের ফটো কিরূপে অঙ্কিত হবে? এ প্রশ্নের জবাব শক্ত নয়। যেমন সূর্য্যের প্রখর তেজে আমরা দিবাভাগে অন্যান্য ক্ষীণালোক জ্যোতিষ্ক দেখিতে পাই না, সেইরূপ দৃশ্যমণ্ডলের প্রখর তেজে অদৃশ্যমণ্ডল ম্লান হয়ে থাকে। কেবল সৌর-গ্রহণের সময় দৃশ্যমণ্ডল অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায়, অদৃশ্যমণ্ডলের ক্ষীণালোক চক্ষে ফুটিয়া উঠে, এবং Spectroheliograph দ্বারা ফটো গৃহীত হয়।

অদৃশ্যমণ্ডলের অধোদেশের বায়ুমণ্ডল অন্যান্য স্থানাপেক্ষা খুব গাঢ় এবং উত্তপ্ত। অদৃশ্যমণ্ডলের বর্ণ রক্তাম্বুজ সদৃশ; ইহার কারণ আর কিছুই নয়, অদৃশ্যমণ্ডলটি প্রধানতঃ জলজান বাষ্পে পরিপূর্ণ; অর্থাৎ ইহার মূল উপাদানটি তাহাই। বর্ণচ্ছদবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা বস্তুর মূল উপাদান কি কি তাহা জানিতে পারা যায়—বর্ণচ্ছদের রেখাগুলির (Spectral lines) বৈশিষ্ট্যই বস্তুর স্বরূপ সূচিত ক'রে দেয়। অদৃশ্যমণ্ডলে কি কি মৌলিক পদার্থ বর্ত্তমান আছে, তাহা নির্ণীত হ'য়েছে ওই স্পেক্‌ট্রোস্‌কোপ্‌ অঙ্কিত-রেখাগুলির সমাবেশ দেখিয়া। অদৃশ্যমণ্ডলে প্রধানতঃ জলজান, হিলিয়ম-গ্যাস ও কাল্‌শিয়মের বাষ্প আছে।

অগ্নি যখন খাণ্ডববন দগ্ধ ক'রেছিল, তখন তার লেলিহান জিহ্বা আকাশপটে একটা রক্তিম তরঙ্গের লীলাবৈচিত্র্য অঙ্কিত ক'রেছিল। সেইরূপ যখন সবিতৃদেব রাহুগ্রস্ত হন, তাঁর অদৃশ্যমণ্ডল অবয়বটি কতকটা সেইপ্রকারই উদ্দাম পাবকশিখা দ্বারা রঞ্জিত পরিদৃশ্যমান হয়। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণকালে চন্দ্র যখন সূর্য্যালোকের গতিরোধ করে দৃশ্যমণ্ডল একেবারে অন্ধকারাবৃত হয়, পূর্ব্বেই বলেছি, তখন অদৃশ্যমণ্ডলটিই দেখা যায়। আমাদের চক্ষে আপাত প্রতীয়মান হয় যেন চন্দ্রেরই উপরিভাগে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় চাক্‌চিক্যময় লোহিত দ্রব্য চুণীর মত দপ্‌ দপ্‌ ক'রছে। দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায়, কতকগুলা ভাস্বর মেঘ, বিভিন্ন আকৃতির। এইগুলাকে সৌর-স্ফীতি (Solar prominences) এই আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে।

অদৃশ্যমণ্ডলে কোনরূপ দহনকার্য্য চলিতেছে, এভ্রান্তি স্বাভাবিক বটে; বস্তুতঃ তা নয়। সূর্য্যে যদিচ দাহ্য উদজান গ্যাস বর্ত্তমান আছে, তথাপি ইহার অপর কোন গ্যাস বা বাষ্পের সহিত রাসায়নিক সংযোগ অসম্ভব। কথাটার কিছু বিস্তার আবশ্যক। অদৃশ্যমণ্ডলের উত্তাপ এত বেশী যে, কোন যৌগিক পদার্থ (compound)—যাহা দুই বা ততোধিক মূল পদার্থের সমবায়ে গঠিত হ'য়েছে—ওইরূপ যৌগিক অবস্থায় থাকতে পারে না, বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যায়। একে বলে তাপজনিত বিশ্লেষণ বা temperature dissociation। এমন কি, মূল পদার্থের অণুগুলি পর্য্যন্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া তাহার পরমাণুগুলি ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে। আপনারা জানেন যে, অণুগুলি কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। আবার পরমাণুর সূক্ষ্ম পরিণাম আছে, এবং তাহা একটি জড়বীজ (nucleus) ও কতকগুলি ইলেক্‌ট্রনের সমষ্টি। অদৃশ্যমণ্ডলের তাপ সর্ব্বত্র সমান নয়। দৃশ্যমণ্ডলের তাপ আরও বেশী, এত বেশী যে কোন বস্তু পরমাণু অবস্থায় থাকতে পারে না—তাপজনিত বিশ্লেষণ হওয়ায় কতকগুলা ইলেকট্রন প্রত্যেক পরমাণু হইতে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় ও পরমাণুর অবশিষ্টাংশ পড়িয়া থাকে। ইহাকেই বলে পরমাণুর ionized বা বিশ্লিষ্টাবস্থা। এই ইলেকট্রন্‌ অর্থাৎ ঋণতাড়িতময় রেণুগুলি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করায় সূর্য্যমণ্ডল বিজলীর একটা প্রকট লীলাক্ষেত্ররূপে পরিণত হ'য়েছে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের একটা অধ্যায়ে তাড়িত ও চৌম্বকধর্ম্মের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন মাখামাখি সম্বন্ধ চিরদিনের জন্য বিধিবদ্ধ হ'য়েছে। বিষয়টি এই, যখন তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হয়, তখন সে তাহার চতুষ্পার্শ্বে একটা চৌম্বক-ক্ষেত্র উৎপাদন করে। উদাহরণ স্থলে বক্তব্য, বীক্ষণাগারে যে তাড়িতচুম্বক (electromagnet) আছে, তদ্দারা ইহার যাথার্থ্য সুচারুরূপে উপলব্ধি করা যেতে পারে। সূর্য্যালোকের স্থানে স্থানে তাড়িতের তথা ইলেক্‌ট্রনের প্রবাহ আছে বলিয়াই, একটা বিশাল চৌম্বক-ক্ষেত্রের সৃষ্টি হ'য়েছে। বর্ণচ্ছদবীক্ষণযন্ত্রে কোন বাষ্পের বর্ণচ্ছত্ররেখা পর্য্যবেক্ষণ করবার পর যদি সেই বাষ্পাধারের আবেষ্টনরূপে কোন তাড়িতচুম্বক রাখা হয়, দেখা যাইবে বর্ণচ্ছত্রের রেখাগুলি বিযুক্ত হইয়া প্রতি রেখার আশে-পাশে আরও দুই-তিনটি নব্য রেখার উদ্গম হ'য়েছে। ইহার কারণ এই যে, বাষ্পের পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ ইলেক্‌ট্রনগুলির পরিস্পন্দন ওই বর্ণচ্ছত্রে প্রতিফলিত হ'চ্ছিল, চৌম্বকক্ষেত্রের সংস্পর্শে উক্ত পরিস্পন্দন উদ্দীপিত হ'য়ে ভিন্ন প্রকৃতি-সম্পন্ন হ'য়েছে—যা'কে আলোকবিজ্ঞানে বলে ধ্রুবতাপত্তি (polarization)—এবং তজ্জন্য বর্ণচ্ছত্র রেখাগুলি সংশ্লিষ্ট হ'য়েছে। ইহাকে আলোক-বিজ্ঞানে Zeeman effect ব'লে ঘোষণা করা হ'য়েছে; কেন না, এই ফলাফলের আবিষ্কর্ত্তা জিমান্‌। সূর্য্যমণ্ডলে যে চৌম্বকক্ষেত্র আছে বলে অনুমিত হ'য়েছিল, তার সাব্যস্ত হ'য়েছে ওই জিমান্‌ ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া।

পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণ কালে তামসী দৃশ্যমণ্ডলের বহিঃসীমান্তে অদৃশ্য মণ্ডলের গাত্রে একটা প্রভা-বেষ্টন দেখতে পাওয়া যায়। তার রঙটি মুক্তাধবল ও ভারি মনোহর। রক্তজবা সৌরস্ফীতি সমুদায় শুভ্র সৌর পরিবেশের আস্তরণে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে কি চমৎকার নয়নরঞ্জন করে। সৌরবিজ্ঞানে এই প্রভা-বেষ্টনের নাম দেওয়া হ'য়েছে 'করোণা'। করোণার ফটো লওয়া একটা ক্ষিপ্র হস্তের পরীক্ষা; কেন না, প্রভা-বেষ্টনটি দুই তিন মিনিট কালের বেশী স্থায়ী হয় না। সেই সময়ের মধ্যে ফটো তুলতে হবে। কেবল দক্ষ আর্টিষ্টই তাহাতে কৃতকার্য্য হয়।

অনেকে মনে ক'রে থাকেন, করোণা একটা শুধু আলোকের লীলাখেলা—optical phenomenon—যেমন মরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকা। প্রকৃত তা নয়, এটা সূর্য্যেরই সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে। বায়ুমণ্ডল যেমন পৃথিবীর একটা সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে, একটা যেমন constant quantity,—করোণা সূর্য্যের ঠিক সেরূপ সাঙ্গোপাঙ্গের মধ্যে নয়। পৃথিবীতে যেমন উদীচ্যালোকের দীপ্ত পতাকা কি ধূমকেতুর জ্বলন্ত পুচ্ছ কদাচিৎ চোখে পড়ে, সেইরূপ করোণাকেও যখন তখন দেখা যায় না। প্রতীচিন

কোন কোন অধ্যাপক এই করোণার বিকাশকে এক্স-রের ক্রিয়া ব'লে থাকেন। সৌরপরিবেশেও উদজান, হিলিয়ম ও কালশিয়ম আছে।... গত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সুমাত্রা হ'তে যে পূর্ণসূর্য্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল, লিক্ (Lick) মানমন্দিরের পর্য্যবেক্ষক-সম্প্রদায় সেই সময় করোণার আলোকচিত্র ল'য়েছিলেন। করোণার উপাদান গ্যাস ও বাষ্প ত বটেই; অধিকন্তু সেখানে ধুলিরাশির একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছে—এ মীমাংসা হ'য়ে গেছে। কেন না তদ্ভিন্ন পরাবর্ত্তিত আলোকের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা সুকর হয় না।

এখন সূর্য্যের আলোক ও তাপ সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলব। এক মিটার দূরবর্ত্তী আলোকবর্ত্তিকা একটা শুভ্র পরদাকে যে পরিমাণে আলোকিত ক'র্বে, সূর্য্য যখন আকাশমার্গে ঠিক মস্তকের উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সেই শুভ্র পরদাকে তাহার পঁয়ষট্টি সহস্র গুণ আলোকিত ক'র্বে। কিন্তু সূর্য্যকে যদি উক্ত বাতিটির ন্যায় এক মিটার দূরে রাখা যায়, তাহা হইলে পরদাটিতে যে আলোক পড়্বে, তার পরিমাণ ওই পঁয়ষট্টি হাজারের দশ-কোটি কোটি গুণেরও অধিক। সোজা কথায় ব'ল্তে হ'লে বাতির আলোকের চেয়ে এমন একটি সংখ্যাগুণ বেশী যেটা অঙ্কে লিখ্লে হয়,—১৫৭৫×১০২৪, অর্থাৎ একহাজার পাঁচশত পঁচাত্তরের পৃষ্ঠে চব্বিশটা শূন্য। চন্দ্র হ'তে যে আলোক আমরা পাই, তার ছয়-লক্ষ গুণ আলোক আমরা সূর্য্য হ'তে পাই। আর সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল লুব্ধক নক্ষত্র (Sirius) যে আলোক প্রদান করে, তার সাতশত কোটিগুণ আলোক সূর্য্য প্রদান করে।...

সূর্য্যের তাপ আমরা কতটা পেয়ে থাকি, তার একটা সংক্ষিপ্ত উদাহরণ বলি। মনে করুন, পৃথিবী-পৃষ্ঠে একশত চব্বিশ ফিট পুরু একটা বরফের চাপড়া বসান গেল। সূর্য্য পৃথিবীকে বৎসরে যে তাপ প্রদান করে, তাহা উপর্য্যুক্ত বরফের স্তূপটিকে গলিয়ে দিতে পারে।... সূর্য্য অনন্ত ব্যোমে যে তাপবিকীরণ করে, পৃথিবী তার সামান্য অংশ পায় মাত্র। পৃথিবীর এক বর্গমিটার জমি যে মাত্রা তাপ পায়, সূর্য্যমণ্ডলের এক বর্গমিটার জমি সেই মাত্রার ছয়চল্লিশ হাজার গুণ তাপ অনন্ত আকাশে ছড়িয়ে দেয়।...

কোন জলন্ত বস্তুর গাত্র হ'তে যে পরিমাণ তাপ নিঃসৃত হবে, এক কথায় রেডিয়েশন হবে, সেটা সেই বস্তুর টেম্পারেচারের উপর নির্ভর করে। এই দু'য়ের ভিতর কি সম্বন্ধ, ষ্টিফেন সাহেব তার একটা অতি সুন্দর নিয়ম আবিষ্কার ক'রেছিলেন। জার্ম্মান পণ্ডিত বল্জ্‌মান ও সেটা অন্য দিক দিয়ে সমর্থন করেন। যাহা হউক, গণনায় স্থিরীকৃত হ'য়েছে যে, সূর্য্যের টেম্পারেচার গড়ে সেন্টিগ্রেড তাপপরিমাণযন্ত্রের সাতহাজার ডিগ্রি।...

এখন জিজ্ঞাস্য হ'চ্ছে, সূর্য্য হ'তে কি আবহমান কাল ধ'রে সমভাবেই এই অনন্ত ব্যোমে তাপ নিঃসরণ হ'তে থাকবে?...কর্ম্মকারের নেহাইয়ে কোন গনগনে ধাতু রাখ্লে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঠাণ্ডা হ'য়ে যায় যদি না নূতন ক'রে তাপ যোগান যায়। যদি ধরি সূর্য্য একটা জলন্ত পিণ্ড, তাহা হইলে যত দিন সূর্য্যের উৎপত্তি হ'য়েছে, সেই দিন নাগাদ আজ পর্য্যন্ত সূর্য্য বরফের মত শীতল হোক বা না হোক্, অনেকটা শীতল হ'য়ে যেত, সন্দেহ নেই;—আলোক বা তাপ দিবার সেরূপ ক্ষমতা থাকৃত না, যেরূপ ক্ষমতা আজ পর্য্যন্ত সে বজায় রেখে এসেছে। তবে তাপ কে জোগায়?...সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান যোগান, না যোগালে সৃষ্টি রক্ষা হবে কোথেকে? সত্যি কথা। বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী এই 'যোগান'র মধ্যে একটা সত্য নিরূপণ না ক'রে বিরত হ'তে চান না। এই প্রশ্নের উত্তর পরে বল্‌ছি।

সূর্য্যের তেজঃশক্তি বজায় থাকে কি প্রকারে?—এই নিগূঢ় সমস্যাটার একটা মীমাংসা হ'য়ে গেছল, যখন হেলমৎ হোল্জ ১৮৫৩ অব্দে গতি-বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে একটা ব্যাখ্যা উপস্থাপিত ক'রেছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি দু'চারটে অনুমানের সহায়তা গ্রহণ ক'রেছিলেন সত্য,—তন্মধ্যে প্রধান কথা নীহারিকাবাদ।...সূর্য্যকে এখন যেরূপ দেখা যায়, সৃষ্টির প্রাক্কালে সেটা আরও বৃহদায়তন ছিল। সূর্য্যটা ছিল একটা প্রকাণ্ড মূল নীহারিকা (primordal nebula), যাহার আয়তন এরূপ বিপুল যে, সেই প্রায় গোলাকার নীহারিকারূপী বস্তুটির ব্যাসার্দ্ধ সৌরজগতের সীমান্তবর্ত্তী নেপচুন গ্রহটির কক্ষ পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল; অর্থাৎ ইহার ব্যাস আধুনিক ব্যাসের চেয়ে প্রায় ষাট গুণ বড় ছিল। তার পর ব্যাসটি ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে আস্ছে। সৌরনীহারিকা ধীরে ধীরে ঘূর্ণায়মানা ছিল। সেই হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে নীহারিকাবয়ব হ'তে সময় সময় জড়পিণ্ড বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গ্রহোপগ্রহাদির সৃষ্টি ক'রেছে।

গতিবিজ্ঞানে ব্যক্ত শক্তি ও অব্যক্ত শক্তি নামে দুইটা কথা পাওয়া যায়। কোন গমনশীল বস্তু এই দুই শক্তিরই আধার। কখনও ব্যক্ত শক্তি অব্যক্ত শক্তি অপেক্ষা বর্দ্ধিত হয়, কখনও বা হ্রাস হয়; কিন্তু এই দুই শক্তির মাত্রা একত্রে একটি ধ্রুব সংখ্যা—এ সমষ্টির অপচয় হয় না। এ গেল মোটামুটি কথা। সূক্ষ্মকথা এ বিষয়ে বিস্তর আছে। সে সমস্তই উচ্চ-গণিত-সাপেক্ষ এবং আমাদের উপস্থিত সন্দর্ভে তার বিস্তার অপ্রাসঙ্গিক বোধে সে-সবের অবতারণা কর্‌লাম না।...যখন নীহারিকাটি বৃহদায়তন ছিল, তখন অব্যক্ত শক্তি বেশী ছিল; নীহারিকাটি যতই ক্ষুদ্রত্ব লাভ করিতে লাগিল, অব্যক্ত শক্তিও ততই কমিতে লাগিল। যে পরিমাণ অব্যক্ত শক্তির হ্রাস হইতে লাগিল, সেই আপাত-প্রণষ্ট অব্যক্ত শক্তি অন্য শক্তি রূপে রূপান্তরিত হইল; অর্থাৎ ব্যক্ত শক্তির রূপ পরিগ্রহ করিল। এই ব্যক্ত শক্তির আধিক্যে তাপ-শক্তির উন্মেষ। ব্যক্ত শক্তি ও তাপশক্তির এই যে যোগসূত্র, সেটা তাপ-বিজ্ঞানের একটা মূল তথ্য রূপেই পরিগণিত হ'য়েছে।...জগতে শক্তির (energy) ধ্বংস নাই। এই শক্তিকেই সাংখ্যে রজঃ বলিয়াছে, যাহা হ'তে তন্মাত্রার উদ্ভব।

সূর্য্য যে পরিমাণ তাপ বিকীরণ করে, সেই পরিমাণ অথবা তদপেক্ষা অধিক তাপশক্তি সঞ্চয় করে ক্রমশঃ ক্ষীণায়তন লাভ করিয়া। হেলমৎ-হোলজ গণনা দ্বারা স্থির ক'রেছেন, যে, সূর্য্যের ব্যাস যদি বৎসরে দুইশত ফিট করিয়া কমিতে থাকে, তবে তাপবিকীরণ জন্য যে তাপ নষ্ট হয় তার পূরণ হবে। অতএব সূর্য্যদেবের ক্ষয়রোগ হ'য়েছে এটি চিকিৎসক হেলমৎ হোল্জ ধরে ফেলেছিলেন। হেমলৎ হোলজের

এই diagnosis যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তবে ত সুদূর ভবিষ্যতে সূর্য্যের অস্তিত্বই পাওয়া যাবে না। আর সে কয় দিনেরই বা কথা,—মোটে আড়াই কোটি বৎসর বই ত ত নয়।......কিন্তু এ থিওরিটাও সকলে অনুমোদন করেন না। সে যাই হ'ক, আমাদের ত বিশ্বাস, ব্রহ্মার শত বৎসর পরমায়ু নিঃশেষ হ'লেই প্রলয় হবে ও নূতন সৃষ্টি হ'য়ে নূতন জগৎ হবে। তবে ব্রহ্মার একশত বৎসর হল আমাদের প্রায় পনর হাজার কোটি বৎসর। তা হ'লে সূর্য্যের মেয়াদ আরও অনেক দিন আছে।......

আরও একটা বিশেষ কথা। 'রেডিও অ্যাক্টিভিটি' ব'লে একটা কি বেরিয়েছে; অর্থাৎ যার বাংলা তর্জমা করিলাম 'রেডিয়ম শক্তি', কেন না, রেডিয়মের পরিভাষা অদ্যাপি বাংলা ভাষায় চক্ষে পড়ে নাই।... রেডিয়ম শক্তির তাৎপর্য্য এই যে, জড়জগতে যে বিরানব্বইটা ভূতের (elements) সন্ধান পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে যেগুলা খুব ভারী ভারী—তাহা হ'তে অহরহঃ অন্যান্য ভূতের সৃষ্টি হ'চ্ছে। দিন নেই, রাত নেই, তাদের স্বতঃই বিশ্লেষণ চ'লেছে। সেটাকে বন্ধ ক'রতে পারে এমন কোন উপায় কৌশলী মানব আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবন ক'রতে সমর্থ হয় নি। আমরা 'ক্ষিত্যপ্‌ তেজোমরুদ্ব্যোমঃ' এই পঞ্চভূতের কথাই অবগত ছিলাম। এখন দেখি, তার স্থলে দ্বিনবতি সংখ্যক ভূত!—আবার রেডিয়ম শক্তির উদ্দীপনায় কত নব্য ভূতের উদয় হবে কে জানে!... ইউরেনিয়ম, অ্যাক্টিনিয়ম, থোরিয়ম প্রভৃতি ধাতুর পরমাণু হ'তে স্বতঃই কতকগুলা জড় রেণু নির্গত হ'চ্ছে। তাদের নাম দেওয়া হ'য়েছে আল্‌ফা রেণু, বীটা-রেণু, ইত্যাদি। এগুলি আবার বিজলীর আধার। যখন পূর্ব্বোক্ত রেণুগুলা বেরিয়ে যায়, তখন এত বেশী তাপের উদ্রেক হয় যে, তার পরিমাণ নির্ণয় ক'রতে গেলে গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'তে হয়।...সূর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে এই রেডিয়ম শক্তির আত্মবিকাশ অনাদি কাল হ'তে চ'লেছে। এজন্য এই মনে হয়, অধ্যাপক হেলমৎ হোলজ নির্ণীত ক্ষয়রোগ সেরে যেতে পারে এই রেডিয়ম শক্তির ক্রিয়ায়—যে অটো-ভ্যাক্সিনের ফল ফলছে। ইহা একটা আধুনিক পরিকল্পনা এবং বিজ্ঞানানুগও বটে।

এইবার সৌরকলঙ্কের কাহিনী কিছু বিবৃত ক'রতে বাসনা হয়েছে। এ সম্বন্ধে দু' চারটে কথা প্রসঙ্গক্রমে পূর্ব্বেই ব'লেছি। দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গিয়াছে যে, সৌরকলঙ্কে দুইটি বিভাগ আছে। যেমন কেন্দ্রভাগ; ইহা খুবই অন্ধকার। ইহাকে বলে প্রচ্ছায়া। দ্বিতীয়তঃ,—প্রান্তভাগ; এখানে আলোক-আঁধার মেশামিশি ক'রে আছে। ইহাকে বলে উপচ্ছায়া। দৃশ্যমণ্ডল যে সমুদায় স্থানে সৌরকলঙ্ক আছে, তাদের টেম্পারেচার খুবই অল্প। কলঙ্কগুলা বিভিন্ন আকৃতির। যেগুলা বৃহৎ, তাদের ব্যাস দৃশ্যমণ্ডলের ব্যাসের প্রায় বিশ ভাগের এক ভাগ, অথবা আমাদের পৃথিবীর ব্যাসের পাঁচ গুণ। সৌরকলঙ্কগুলা সূর্য্য-পৃষ্ঠে স্থির হ'য়ে আছে এ কথা বলা যায় না; কেন না উহাদেরও সূর্য্য-পৃষ্ঠের উপর দিয়া একটা নিজস্ব গতি আছে, ইহা প্রমাণিত হ'য়েছে।

সৌরকলঙ্কের একটা আবর্ত্তনকাল আছে। এগার বৎসর অন্তর চাকের বেশ দেখা যায়। কালচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সৌরকলঙ্কগুলা পুঞ্জীভূত হ'য়ে পৃথিবীমুখী হ'য়ে দাঁড়ায়, তখন পৃথিবীতে কয়েকটা অনিবার্য্য দুর্দ্দৈব ঘটে। মানুষের পক্ষে সেরূপ বিপদ কাটান দায় হয়ে উঠে। উদিচ্যালোকের সূত্রপাত হয়, যদ্দ্বারা পৃথিবীর চৌম্বক-ধর্ম্মের বিকৃতি ঘটে। অথবা চৌম্বক ঝঞ্ঝা, ভীষণ বাতাবর্ত্ত, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন বা গুমোট, মড়ক ইত্যাদি বহুবিধ দুর্ঘটনার উৎপাত হয়।

মানুষের মনোধর্ম্মের ব্যাঘাত কিছু কিছু যে ঘটাতে পারে, তাও আশ্চর্য্য নয়। এই কথাটা আমার মনে হ'য়েছিল প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে। তখন এ-সম্বন্ধে সংবাদপত্রে জানিয়েছিলাম—গত য়ুরোপব্যাপী মহাসমরটা কি একটা দুর্ঘটনা নয়? এবং সৌর-কলঙ্কের প্রভাব তখন কি পরিমাণে হ'য়েছিল যাতে imperialismএর তাড়নায় পৃথিবী-পৃষ্ঠে Chauvinistic spirit জেগে উঠে রক্তস্রোতের বন্যা এনে দিলে?... বিলাতে যে Monthly Notices of the Royal Astronomical Society নামক পত্রিকা আছে, তাতে এমন কতকগুলা data আমি পেয়েছিলাম যে, সেরূপ কোন একটা সিদ্ধান্ত করা আমার পক্ষে অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছিল। মৎলিখিত দু'-চারটে কথা উদ্ধৃত ক'রলাম।(৩)

সে সিদ্ধান্তটা আমার বৃথাই হউক আর যাই হউক, এটা কিন্তু অবিচল সত্য কথা যে, সূর্য্যই আমাদের শাসনে রেখেছে। এই গ্রহোপগ্রহ

* ......I have studiously omitted to mention the influence of sunspots activity on the recent cataclysm swept over the world' past our vision; as a matter of fact, this I have been inspired to glibly philosophise, "*en passant*, from statistical data. A recent issue of the Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (Vol. Lxxx, 3, 1923) makes it somewhat transparent that my conclusion is irresistible, I am tempted to quote the following portion (table) from page 205:—

Year	1913	1914	1915	1916	1917	1918	1919	1920	1921
Mean Daily Spot Disc-area	0·04	0·82	4·51	4·52	12.10.	7·90	3.40	4.00	3·14

It is clear that the tide of war rose to the maximum in 1917 in synchronism with the maximum spot-activity. Then there is an abrupt fall (c. f. League of Nations, Treaty of Versailles) then peaceful days of 1920-21, then who knows since I have no reeent data accruing at my command, the figure might be a little higher up as spectacular of the present tension the shining armour of imperialism, menacing some anomaly, if not acute disaster.

It goes without saying inasmuch as the year 1921 discloses the lowest spot activity of post-war period, it was an interval of normal state of things, I mean, partial *rapprochement*, if not full in the political sense.

—*A. B. Patrika*,

সংবলিত সৌরজগৎ-যন্ত্রটার প্রধান স্প্রিং হল সূর্য্য,—সমগ্র জীবের সৃষ্টিকর্ত্তা সূর্য্য, জীবের রক্ষাকর্ত্তা সূর্য্য এবং বিনাশকর্ত্তাও সূর্য্য। হে সূর্য্যদেব! তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর; যেহেতু সত্ত্বরজঃ-তম এই তিন সত্তার আধার তুমি!

ত্রৈগুণ্যঞ্চ মহাশূরং ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরম্
মহাপাপহরং দেবং তং সূর্য্যং প্রণমাম্যহম্। ওঁ।

বিবাহ ও সমাজ-প্রসঙ্গ

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণী-এট-ল

"ভারতবর্ষের" ১৩৩২ সালের মাঘ মাসের সংখ্যায় "বিবাহ ও সমাজ-প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, প্রকৃতি সৃষ্টি রক্ষা করিবার নিমিত্ত সমস্ত জীবের ভিতর ক্ষুধা ও কামকে প্রায় দুর্দ্দমনীয় করিয়াছেন। আরও দেখাইয়াছি যে, দীর্ঘকাল অসহায় শিশুদিগের প্রতিপালনের সুবিধার নিমিত্ত স্থায়ীভাবে বিবাহ আবশ্যক; এবং শিশুদিগের প্রতিপালনের ভার পিতাদিগকে লওয়াইতে হইলে, মাতাদিগের সতীত্ব আবশ্যক; এবং তাহার অভাব যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণে শিশুদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দশা বাড়িতেই হইবে। আরও দেখাইয়াছি যে, অপত্য-প্রতিপালন হইতেই পরার্থপর সমস্ত সদ্‌গুণেরই সাধারণতঃ ও সহজভাবে উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এই পরার্থপর গুণগুলি যেমন নিজের সুখ ও শান্তিদায়ী, তেমনই, বা তাহার অধিক পরিমাণে, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, এবং সকল ধর্ম্মশাস্ত্রমতে আমাদের পরকালের সম্বল। প্রকৃতির নিয়মে আমরা ক্ষুধা নিবৃত্তির নিমিত্ত যেরূপ লালায়িত, ভালবাসা পাইবার ও ভালবাসিবার নিমিত্ত প্রায় ততটাই লালায়িত। এই জন্ত নির্জ্জন কারাবাস সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শাস্তি। আমরা পরস্পর সমবেদনা, সহানুভূতি, ভালবাসা, সাহায্যের নিমিত্ত কত লালায়িত। আমরা সকলেই সমাজে তাহা কতক পরিমাণে পাই বলিয়াই সহজে তাহার মূল্য বুঝিতে পারি না। সুস্থ সময়ে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কতটা প্রয়োজনীয়, আমরা তাহাদের উপর কতটা নির্ভর করি,—অসুস্থ না হইলে যেমন তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না,—এই পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা, সাহায্যের উপর আমরা কতটা নির্ভরশীল, তাহার অভাব না হইলে তাহাও হৃদয়ঙ্গম হয় না। রবিন্‌সন্ ক্রুসোর ন্যায় জনমানবহীন দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইলে তবে তাহা পূর্ণ ভাবে বুঝা যায়। বিদেশে প্রবাসকালে স্বদেশীয়ের মুখ দেখিলে যে আনন্দ হয়, তাহার কারণ, তৎকালে আমাদের হৃদয় সমবেদনার অভাবে শুষ্ক থাকে। সেই জন্ত সহানুভূতিসম্পন্ন স্বদেশবাসীকে দেখিয়া সহানুভূতি পাইবার প্রচ্ছন্ন আশায় উৎফুল্ল হই। সুখের সামগ্রী একা উপভোগে তত সুখ হয় না। দুঃখের সময়ে অন্তের সহানুভূতিতে তাহার লাঘব হয়। এই জন্ত আহার যেমন মুখ্য প্রয়োজন, কাম চরিতার্থ করিবার সুবিধা (পরের অনিষ্ট না করিয়া) পাওয়া, ভালবাসিতে পাওয়া ও ভালবাসা পাওয়া তেমনই মুখ্য প্রয়োজন,—অন্ত সকল অভাবই গৌণ অভাব। মুখ্য অভাব পূরণ করিতে না পারিলে, প্রকৃতির তাড়নায় জীবন দুর্ব্বিবহ হয়। গৌণ অভাব পূরণ তত প্রকৃতিগত নয়। আমরা নিজেরা অভ্যাস বশে গৌণ অভাবগুলিকে কতক পরিমাণে মুখ্য অভাবের ন্যায় বিবেচনা করি। এইরূপ করা আর না করা অনেকটাই আমাদের ইচ্ছাধীন, অভ্যাসাধীন। গৌণ অভাব পূরণার্থ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সহিত মুখ্য অভাব পূরণার্থ প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিনিময় করা চলে না। দুর্ভিক্ষের সময়ে হীরা-জহরতের মূল্য নাই। গৌণ অভাব সত্ত্বেও মানুষ মনের সুখে থাকিতে পারে। অনেক অসভ্য মানব-সমাজের আনন্দময়ত্ব অনেক ধনবানের কাছেও লোভনীয়। কিন্তু মুখ্য অভাব সত্ত্বে প্রায় কোন লোকই সুখে থাকিতে পারে না। এই জন্ত অনেক গৌণ অভাব-পূরণ-সমর্থ ক্রোড়পতিকেও আত্মহত্যা করিতে দেখা যায়। কিন্তু যে খাইতে পায় ও ভালবাসা পায় ও ভালবাসে, তাহাকে কখনও আত্মহত্যা করিতে দেখা যায় না। কেবল যাহাকে সে ভালবাসে তাহাকে সুখী করিতে না পারার জন্ত কখন কখন আত্মহত্যা করিতে দেখা যায়। সেও ভালবাসার অতৃপ্তিহেতু। সুতরাং সাধারণ লোকসমূহের এই দুই বা তিনটি মুখ্য অভাব যাহাতে পূরণ হইতে পারে, সমাজের তাহা করা একান্ত বিধেয়। সকল সভ্যসমাজের কর্তৃপক্ষ, সকলে যাহাতে খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য—এ কথা এখন সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এক সময়ে সমাজের এই প্রধান কর্ত্তব্য স্বীকৃত হইত। কি উপায়ে এই কর্ত্তব্য পালিত হইত তাহা প্রবন্ধান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। আমাদের দেশে যাহাতে সাধারণ লোকসমূহ পরের অনিষ্ট না করিয়া কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারে এবং ভালবাসা পায় ও ভালবাসিতে পারে, তাহারও উপায় করা হইয়াছিল। প্রকৃতির নিয়মে দুর্দ্দমনীয় কাম-প্রবৃত্তির তাড়নায় অধিকাংশ স্ত্রী-পুরুষই পরস্পর সঙ্গত হইবেই। এবং তাহার ফলে অনেক স্থলেই সন্তানোৎপাদন হইবেই। এবং অবিবাহিত অবস্থায় সন্তানোৎপাদন হইলে ওই সকল সন্তান অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের পিতাদের যত্ন, সাহায্য ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইবেই; এবং তাহাতে ওই সকল সন্তান ও তাহাদের মাতাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষদিগের একত্র বহুকাল অসহায় সন্তান পালনের ফলে যে প্রকৃত ভালবাসার ও পরার্থপর গুণ সকলের উদ্ভব ও বিকাশ হয়, যে আমিত্বের প্রসার হয় (পূর্ব্ব প্রবন্ধ দেখুন), তাহা অন্তরূপে সচরাচর সম্ভব হয় না জানিয়াই আমাদের দেশে চিরকালই প্রায় সকল সুস্থ যুবাই বিবাহ করিতে বাধ্য ছিল। এখন পাশ্চাত্য আদর্শে ও পাশ্চাত্য অর্থতত্ত্ববিৎদিগের মতে—যাবৎ নিজে স্ত্রী ও পুত্র-কন্তাদের সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে না পারে, তাবৎ বিবাহ করা উচিত নয়—এই মত আমাদের দেশে চলন হইতেছে, এবং সমাজ-সংস্কারকেরা এই মতেরই প্রবর্ত্তন করিতেছেন; এবং যুবক সম্প্রদায়ও সম্যক্ উপার্জ্জনক্ষম হইবার পূর্ব্বে বিবাহ করিতেছেন না। এই মতবাদটি প্রথম দৃষ্টিতে বেশ ভাল বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ইহা সাধারণতঃ প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদের সমাজের তাহাতে

কিরূপ মঙ্গল, কিরূপ উন্নতি হইবার সম্ভাবনা, এবং তাহাতে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই বা কিরূপে সাধিত হইবে, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। কি সামাজিক নিয়ম, কি রাজনৈতিক নিয়ম—জনসাধারণের পক্ষে তাহা উপকারী কি না তাহা দেখিতে হইবে। কতক লোকের তাহাতে সুবিধা হইলেও, বেশী লোকের তাহাতে যদি অসুবিধা হয়, তাহা হইলে তাহার সমর্থন করা যায় না। চুরির কোন শাস্তি না থাকিলে চোরেদের পক্ষে মঙ্গল হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সমাজের পক্ষে তাহা মঙ্গলকর নয়। সুতরাং আমাদের সামাজিক গঠন ও নিয়মাবলি উক্ত মতবাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে আমাদের জনসাধারণের কিরূপ মঙ্গল বা উন্নতির আশা করা যায়, এবং বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই বা কিরূপে সাধিত হয়, তাহা দেখা আবশ্যক। ইহার বিচার করিতে হইলে প্রথমেই বুঝা আবশ্যক—স্ত্রী-পুত্রদের সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা কাহাকে বলে। কত টাকা মাসিক আয় হইলে বিবাহ করা যাইতে পারে? এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত হইবেই। ইহার মাপকাটি কোথায়? আমাদের বিলাত-ফেরৎ ধনীরা হয় তো পুত্র-কন্যাদের Oxford ও Newnham Collegeএ পড়াইবার, motor রাখিবার, এবং গরমের সময়ে শীতপ্রধান দেশে বাস করাইবার ক্ষমতা না থাকিলে বোধ হয় স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সম্যক প্রতিপালন করা হইল না, বলিবেন। সেইরূপ একটা নিয়ম করা যাইতে পারে না। এই নিয়মটা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, সেই দেশের সাধারণ লোকদের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া, তাহা হইতে বেশী উচ্চ কোন মাপ কাটি ধার্য্য করিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের নীচ শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিবাহকালে কন্যাদের বা তাহাদের আত্মীয়দের পণ দেওয়ার প্রথা আছে। তাহার ফল যে অতি বিষময় হইতেছে, আমরা চক্ষের সম্মুখে তাহা দেখিতেছি। সেই পণ জোগাড় করিতে পুরুষদের ৩৫।৪০।৫০ বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। অল্প-বয়স্কা বিধবা রাখিয়া, অল্প অপত্য রাখিয়া তাহারা মরিয়া যায়। এই সকল বিধবার অনেকেই ভ্রষ্টা হইয়া যায়—মুসলমান হইয়া যায়। সেই সকল জাতিরাই ক্ষিপ্র গতিতে ধ্বংসমুখে চলিতেছে—আমরা দেখিতেছি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণ লোকদিগের আর্থিক অবস্থার অতিরিক্ত কোন অবস্থা হওয়া চাই, তবে বিবাহ করিতে পাইবে—এরূপ নিয়ম করিলে, তাহার ফল ভাল হওয়া দূরে থাকুক—অত্যন্ত মন্দই হয়,—সেই জাতিই ধ্বংসমুখে চলিয়া যায়। আমাদের দেশের জনসাধারণের কিরূপ অবস্থা, তাহা একবার পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। Sir William Digby এবং দাদাভাই নাওরোজি পূর্ব্বে ভারতবর্ষের লোকদের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ১৯ টাকা স্থির করিয়াছিলেন। Sir William Hunter সাহেব গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে দেখান ২৫ টাকা। Lord Curzon সাহেব দেখাইলেন ২৯ টাকা। আজকাল অনেকে বলিতেছেন ৪৯ টাকা। যাহা হউক, এই আয় বৃদ্ধি হইতে লোকদের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, Lord Curzon সাহেবের আমল হইতে এখন দ্রব্যের মূল্য অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, এই গড়পড়তা আয় অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর লোকদের আয় অনেক কম; কারণ, ধনকুবেরদের ও মধ্যবিত্ত লোকদের আয় এই গড়পড়তা আয়ের ভিতর ধরা হইয়াছে; সুতরাং সাধারণ লোকদের বাৎসরিক আয় বোধ হয় এখনও ৩০ টাকার ঊর্দ্ধে হইবে না। এ স্থলে স্ত্রী-পুত্রদের সম্যক প্রতিপালনের কথা তোলা বাতুলতা মাত্র। সম্যক প্রতিপালনের মাত্রা যতই কমাইয়া ধরুন, নিম্নশ্রেণীর লোকদের কেহই বিবাহ করিতে পায় না; সুতরাং তাহারা শীঘ্রই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের প্রার্থিত উন্নতি এত দ্রুতবেগে হইবে যে, শীঘ্রই তাহারা স্বর্গে উপনীত হইয়া পড়িবে, মর্ত্ত্যে তাহাদের কোন চিহ্ন থাকিবে কি না সন্দেহ।

আবার যদি, এই নিয়ম কেবল মধ্যবিত্ত বা উচ্চ শ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রযোজ্য—এই কথা আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা বলিতে চান, তাহা হইলে তাহাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহাও একবার দেখা চাই। ১৯২৩—২৪ সালের ইন্‌কাম্ টেক্সের বাৎসরিক বিবরণ হইতে পাওয়া যায় যে, সমস্ত বাঙ্গালা দেশে ৫৩৫৪৯ জন ইন্‌কাম্ টেক্স দিয়াছে; অর্থাৎ তাহাদের বাৎসরিক আয় ২০০০ টাকা বা তাহার ঊর্দ্ধ। ইহার মধ্যে ৩৩৫৭৯ জন কলিকাতা হইতে এই টেক্স দেয়। সুতরাং কলিকাতা ছাড়া বক্রী সমস্ত বাঙ্গালা দেশে ২০০০০ লোক ইনকাম টেক্স দেয়। কলিকাতার ৩৩৫৪৯ জনের মধ্যে ৫৭০৬ জন বাঙ্গালার বাহিরে থাকে; তাহাদের কর্ম্মস্থানের বড় আপিস কলিকাতায় বলিয়া তাহাদিগকে কলিকাতার ভিতর ধরা হইয়াছে। তা ছাড়া ২১৬৫টি যৌথ কারবার। সুতরাং এই ৫৭৩৬ ও ২১৬৫ বাদ দিলে কলিকাতার ভিতর রহিল ২৫৫৮১ জন। ইহার ভিতর ইংরাজ আছেন, মারওয়াড়ী আছেন, ইহুদী আছেন, ভাটিয়া আছেন, তাহাদের জন্য যদি ১০০০০ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে পাওয়া যায় যে আমাদের বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের ভিতর ১৫০০০ কি ১৬০০০ লোকও ইনকাম্ টেক্স দেয় না। আবার যদি মনে রাখি যে, যাহারা এই ইনকাম্ টেক্স দিতেছে, তাহাদের অনেকেই জীবনের শেষভাগে ইনকাম্ টেক্স দিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়াছে, তখন ৪০ বৎসর বয়স হওয়ার পূর্ব্বে যাহারা এই টেক্স দেয়, কলিকাতায় তাহাদের সংখ্যা যদি ৭০০০, বা ৮০০০ ধরা যায়, তাহা হইলে বোধ হয় কম ধরা হইবে না। কলিকাতা ছাড়া বক্রী বাঙ্গালা দেশেও সেইরূপ ৮০০০ কিম্বা ৯০০০ হইতে পারে। বক্রী বাঙ্গালা দেশেও সাহেব, মাড়ওয়াড়ি প্রভৃতি অন্য জাতিরা আছে, (এবং বুড়ারাও আছে)। তাহা হইলে দেখা গেল, সমস্ত বাঙ্গালা দেশে, যাহার লোক সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার কোটি, তাহাদের মধ্যে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের ১৫০০০ বা ১৬০০০ লোকও ইনকাম্ টেক্স দেয় না। চাষের জমির আয় ইনকাম্ টেক্সে ধরা হয় না এবং অনেক লোক ইনকাম্ টেক্স ফাঁকি দেয়। যদি তাহাদের সংখ্যা লাখ কি দুই লাখ কিম্বা চারি লাখও ধরিয়া লওয়া হয়, এবং ১৬০ টাকা মাসিক আয় হইলে বিবাহ করা যাইতে পারে এরূপ নিয়ম করা যায়, তাহা হইলে ৪০ বৎসরের পূর্ব্বে মাত্র শতকরা দুইজন পুরুষ বিবাহিত হইতে পারে। ইংলণ্ডেও এখন লোকে বাৎসরিক ২০০০ টাকা আয়েতে ইনকাম্ টেক্স দিতে বাধ্য। সেখানে প্রায় ৪৭০০০০০ লোক ইনকাম্ টেক্স দেয়। সেখানে প্রায় অর্দ্ধেক

যুবতী স্ত্রীলোক বিবাহিত হইতে পায় না। সুতরাং আমাদের এই গরীব দেশে এইরূপ অর্থনৈতিক সমাজ-সংস্কারকদিগের মত প্রবর্ত্তিত হইলে, আমাদের দেশে কয়জন বিবাহিত হইতে পারিবে, তাহা তাঁহারা যদি একটু স্থির চিত্তে ভাবেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিবেন, তাহাতে আমাদের কোন-রূপ উন্নতির আশা নাই। আমরা ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যেই এই মত-মদিরোন্মত্ত অবস্থায় ধ্বংস-মুখে নীত হইব——সেটা যদি প্রার্থিত উন্নতি মনে করেন, তবে আলাহিদা কথা। ফ্রান্স দেশে এই মতবাদের প্রাবল্যে তাহাদের লোক-সংখ্যা-বৃদ্ধি অনেক কাল পূর্ব্বেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা পর-রাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিজেদের কিরূপে রক্ষা করিবেন এই ভয়ে সর্ব্বদা ভীত ছিলেন। এখন তাঁহারা লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির আশায় বহু-অপত্যের মাতাদের পেন্সান দেন,—বিবাহিত লোকদিগকে অনেক টেক্স হইতে রেহাই দেন। বিলাতেও আজকাল এই মতবাদের প্রাবল্যে মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর তুলনায় অনেক কম বৃদ্ধি হইতেছে। তাহাতেই তাঁহারা সমাজের ভবিষ্যতের নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন। আমরা পরাধীন জাতি—আমরা টিঁকিয়া আছি কেবল সংখ্যা-বাহুল্যের জোরে। মুসলমানদের সংখ্যা আমাদের অপেক্ষা অধিক হারে বৃদ্ধি হইতেছে,—তাহা দেখিয়া অনেকেই অতিশয় চিন্তিত হইতেছেন; কিন্তু এই মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইলে আমরা যে শীঘ্রই সমূলে অদৃশ্য হইব, তাহা তাঁহারা কেন দেখিতেছেন না, তাহা বুঝিতে পারি না।

এখনকার বাৎসরিক রিপোর্টে কোন্ জাতির ভিতর কত লোক ইনকাম্ টেক্স দেয়, তাহা প্রকাশ পায় না। ১৯১১ সালের আদম্ সুমারির রিপোর্টে এইরূপ তালিকা আছে। তখন সালিয়ানা ৫০০ টাকার উর্দ্ধ আয় হইলে ইনকাম্ টেক্স দিতে হইত। বাঙ্গালায় যে সকল জাতি আছে, তাহাদের সংখ্যা তখন কত ছিল এবং তাহাদের ভিতর কতজন ইনকাম্ টেক্স দিত, তাহার একটি তালিকা নিম্নে দিলাম। তাহা হইতে দেখিবেন, আমাদের দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকদেরও আয় কত কম।

	মোট সংখ্যা	ইনকাম্ টেক্স দাতাদিগের সংখ্যা
ব্রাহ্মণ	১২৫৩৮৩৮	২৮৫৩
কায়স্থ	১১১৩৬৮৪	৩০৪১
বৈদ্য	৮৮৭৯৬	৪৮০
তিলি ও তেলি	৪১৯১২২	১৫৭৩
গন্ধবণিক	১১৯৪৫৫	৩৭৭
সুবর্ণবণিক	১০৯৪২৯	৩৮৮
সদ্গোপ	৫৫০০১৭	৫০৩
সাহা	৩৩৪৯২৭	২৭৭৪
তাঁতী ও তন্তু	৩২২৯৮৩	৩৮৬
কৈবর্ত্ত	২৪৮৭৩৯০	৬৪২
মুসলমান		২৭৬২
সেখ		৬৬৬

এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে, ১১ লাখ কায়স্থের ভিতর ৩০০১ লোকের মাসিক আয় ৪২ টাকা ছিল। যে সকল কায়স্থ এই টেক্স ফাঁকি দিয়াছিল, ও যাহাদের চাষের জমীর আয় ছিল, তাহাদের সংখ্যা আর বিশ কি পঁচিশ হাজার ধরিলেও ৪২ টাকার উর্দ্ধ আয়ওয়ালা লোকের সংখ্যা ৩৮০০০ বই হয় না। ইহার ভিতর ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক লোকই বেশী আছে। অর্থাৎ গড়পড়তা ধরিলে ১৪০০০ লোক। যত লোক আছে, সাধারণতঃ বিলাতী পণ্ডিতরা বলেন, তাহার ভিতর ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের লোক তাহার অর্দ্ধেক।

১১ লাখ কায়স্থের ভিতর মোটামুটি অর্দ্ধেক পুরুষ ধরিয়া লইলে, সমস্ত পুরুষের সংখ্যা হয় সাড়ে পাঁচ লাখ। তাহার ভিতর ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক লোক ১৭৫০০০। ১৫ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক লোক যদি ৫০০০০ ধরা যায়, তাহা হইলে পাওয়া যায় ২২৫০০০ পুরুষ ২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্ক। ৪২ টাকা মাসিক আয়ে যদি বিবাহ করিবার হুকুম পাওয়া যায়, তাহা হইলেও ২০ নাগাৎ ৪০ বৎসর বয়স্ক লোকদের ভিতর ১৪০০০ অর্থাৎ শতকরা ৬জন লোক বিবাহ করিবার অনুমতি পায়। বাকী সকলেই অবিবাহিত থাকিয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের ভিতর আরও অল্প সংখ্যক যুবা বিবাহ করিবার অনুমতি পাইত। বৈদ্য তিলি ও সাহাদের কিছু ভিতর বেশী। সুতরাং লোক-সংখ্যা যে অতি দ্রুত হারে কমিয়া যাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তাহা হইলে শীঘ্রই আমাদের অস্তিত্বের লোপ হইবে। বক্রী যুবা পুরুষেরা, যাহাদের সংখ্যা ৯০এর অধিক, তাহারা যে প্রকৃতির তাড়না এড়াইয়া যাইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করা যায় না। কোন দেশে কোন কালেই কেহ এরূপ করিতে পারে নাই। সুতরাং তাহারা হয় অন্য স্ত্রীগামী হইবে, না হয় তাহারা অবৈধ উপায়ে প্রকৃতির তাড়না এড়াইতে চেষ্টা করিবে। পুরুষদের বিষয়ে যাহা বলা হইতেছে, স্ত্রীলোকদিগের বিষয়েও যে তাহাই প্রযোজ্য, তাহা মনে রাখিতে হইবে। অবৈধ উপায় অবলম্বনে যে অনেক উৎকট ব্যাধি হয়—সকল চিকিৎসকেরই এই মত। পুরুষদের শুক্রতারল্য, স্বপ্নদোষ—স্ত্রীলোকদিগের রজঃ সংক্রান্ত নানাবিধ পীড়া হয়। এই সকল পীড়ার আনুষঙ্গিক অন্য অনেকগুলি পীড়া আসে—অজীর্ণ, নানারূপ শিরঃ-পীড়া—মস্তিষ্কের অবসাদ বা দৌর্ব্বল্য, স্মরণশক্তির হ্রাস এবং অন্য নানারূপ ব্যাধি—তাহাতে প্রায় আজীবন ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইতে হয়। আমাদের দেশে এই ব্যাধি কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা এই সকল রোগের ঔষধের বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি হইতে প্রমাণ হইতেছে। Dr. Brodie Birmingham Science Congressএ বলিয়াছেন যে, বেশ্যাগমন আর অবৈধ উপায়ে কাম চরিতার্থ করার ফল প্রায় সমান। এইরূপ ভগ্ন-স্বাস্থ্য লোকেরা পরে বিবাহিত হইলে তাহাদের বিকৃত শারীরিক ও মানসিক অবস্থা তাহাদের বিবাহিত জীবনের সকল সুখের ও শান্তির অন্তরায় হয়। তাহাদের পুত্র-কন্যারাও অনেক সময় স্বাস্থ্যহীন হয় এবং তাহাও তাহাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হয়। অনেকেই অন্য স্ত্রীগমন

করে। বিখ্যাত ফরাসী উপন্যাস-প্রণেতা Guy De Maupasant, যাঁহার লিখিত পুস্তক সকল দশ বিশ লক্ষ করিয়া বিক্রয় হয়, তিনি তাঁহার Son নামক ছোট গল্পে দুই সহৃদয় গণ্যমান্য পণ্ডিত বন্ধুর—একজন Senator (পার্লামেন্টের সদস্য), আর একজন Member of the French Academy (ফরাসী বিশেষ পণ্ডিত-সভার সদস্য)—এক জায়গায় পরস্পর কথাবার্ত্তার অবতারণা করিয়াছেন। একজন অপরকে বলিতেছেন—দেখ, আমরা প্রত্যেকেই ১৮ হইতে ৪০ বৎসরের ভিতর দুই কি তিন শত স্ত্রীলোকের সহিত উপগত হইয়াছি। কে বলিতে পারে যে তাহাদের ভিতর আমরা এক বা ততোধিক হতভাগ্য পুত্র কন্যাদের জন্ম দিই নাই, এবং তাহারা যে চৌর্য্য বা ডাকাতি করিতেছে না এবং আমাদেরই খুন জখম করিয়া আমাদের সর্ব্বস্বাপহরণ করিবার নিমিত্ত পথের ধারে লুকায়িত নাই, তাহাই বা কে বলিতে পারে? এবং আমাদের ঔরসজাত কন্যারা যে বেশ্যাবৃত্তি বা দাসীবৃত্তি করিতেছে না, (এবং আমাদেরই প্রলোভিত করিতেছে না) তাহাই বা কে বলিতে পারে? সুতরাং আমরা যে যথেচ্ছাবিহারী জন্তুদের অপেক্ষা সন্তানদের প্রতি অধিক কর্ত্তব্যপরায়ণ তাহাও বলা যায় না। Guy De Maupasantএর পাশ্চাত্য সমাজে প্রভূত অন্তর্দৃষ্টি আছে বলিয়াই তাঁহার লিখিত পুস্তকের এত কাটতি। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই ওইরূপ বহু স্ত্রীগমনই করেন; এবং আমাদের দেশেও পাশ্চাত্যের অনুকরণে বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে ওইরূপই হইবে। কোন শিক্ষার দ্বারা এই কাম-প্রকৃতি কোথাও বিশেষরূপে নিরোধ করিতে পারা যায় নাই; এবং সমাজের অধিকাংশ লোকই যদি বিবাহ না করে, তবে তাহারা বহু-স্ত্রী-গমন ও বহু-পুরুষ-গমন করিতে একরূপ বাধ্য হয়। এইরূপ স্ত্রীগমন তিন রূপে হইতে পারে—বেশ্যাগমন, কুমারী-গমন ও পরস্ত্রী-গমন (বিধবা-গমন তাহার অন্তর্গত)। প্রথম দুই ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যদি অপত্যোৎপাদন হয়—অনেক হইবেই—তবে সেই অপত্যেরা অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের পিতার যত্ন, ভালবাসা ও সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে; এবং তাহাদের মাতাদের একা তাহাদের প্রতিপালনের দুর্ব্বিষহ ভার বহন করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের স্থলে স্থলে এই জারজ সন্তানের সংখ্যা বিবাহিতদের সন্তানের সংখ্যার অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। (যথা Gratz ও Munich সহরে—Vide Westermarck's Evolution of Marriage, P. 67.)। ইহা হইতে দেখা যায় যে, যিনি নিজে তাঁহার স্ত্রীর সাহায্যে পুত্র-কন্যাদের সম্যক প্রতিপালন করিতে পারিবেন না বলিয়া বিবাহ করিলেন না, সেই কর্ত্তব্যজ্ঞান-পীড়িত বীরপুরুষ তাঁহার ঔরসজাত অপত্যদের ভার একা একটি স্ত্রীলোকের ঘাড়ে চালাইতে কুণ্ঠিত হইলেন না; এবং সেই মাতারা কি উপায়ে তাহাদের একা প্রতিপালন করিবে তাহার বিষয় চিন্তা করিবার কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না। এবং তাঁহারই ঔরসজাত পুত্র-কন্যারা জারজ সন্তানদিগের অপমান, দুঃখ, দৈন্য ও কষ্ট আজীবন বহন করিবে—হয় তো তাহারা অনেক স্থলেই বাধ্য হইয়া চৌর্য্য, ভিক্ষা বা বেশ্যাবৃত্তি করিবে, তাহাও দেখিবার আবশ্যকতা বিবেচনা করিলেন না। ধন্য তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান! ধন্য তাঁহাদের স্ত্রীজাতির সহিত সহানুভূতি!! ধন্য বিলাতি সভ্যতা!!! ইঁহারাই আবার আমাদিগকে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচারশীল বলেন—স্ত্রীদের আমরা দাসীবৃত্তি করাই, বলেন। মুসলমানরা অনেকগুলি বিবাহ করে। সে তো বিবাহ—যাহা ইঁহারা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি ঘোর অত্যাচারের নিদর্শন বলেন। তাহা এইরূপ যথেচ্ছা স্ত্রীগমন অপেক্ষা অনেকগুণে ভাল। তাহারা তাহাদের অপত্যদের ভার এই সকল বীর-পুরুষদিগের মত্তন স্ত্রীলোকদিগের উপর অসঙ্কুচিত চিত্তে চালায় না; তাহারা নিজে সে ভার বহন করে। তাঁহারা এই যে বহু স্ত্রীলোকের সহিত উপগত হয়েন—তাহার ভিতর কতকগুলি কুমারী, কতকগুলি বিবাহিতা স্ত্রী থাকে। তাহার স্বল্পাংশ কুমারী হইলেও, তাহাদের সহিত তাঁহারা কত প্রেমাভিনয় করিয়াছেন; তাহাদের হৃদয়ে কত আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর কত হতাশায় তাহাদের হৃদয় চূর্ণ করিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন—তাহা কে বলিতে পারে? তাহার ভিতর কতগুলি যে অবশেষে বেশ্যাবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, তাহারই বা সংখ্যা কে করে? কতগুলিকে যে পাগলা গারদে আশ্রয় লইতে হয়, তাহারই বা কে খোঁজ করে? আমাদের দেশের তুলনায় বিলাতে পাগলের সংখ্যা ১৫ গুণ বেশী (vide Census Report, Vol. I, P. 346)। প্রেমাভিনয়ের পর প্রত্যাখ্যান তাহার ভিতর কতগুলির জন্য দায়ী, তাহা কে বলিতে পারে? কত স্ত্রী পুরুষ এইরূপ প্রেমে প্রতারণায় জীবনের ব্যর্থতা বোধে মাতাল হইয়া যায়, আত্মহত্যা করে, তাহাই বা কে দেখে? কত স্বামী-স্ত্রীকে পৃথক করা হয় এবং তাহাদের সন্তানদের পিতা বা মাতাদের যত্ন সাহায্য ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করা হয় তাহাই বা কে দেখে? অনেকে বলিবেন যে, এই সকল স্ত্রীলোক স্বইচ্ছায় তাঁহাদের সহিত উপগত হইয়াছে,—ইহাতে তাঁহাদের দোষ কি? ইহাদের ভিতর অনেকেই যে পেটের দায়ে এরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হয়, তাহা মনে রাখিতে হইবে; অনেকের সহিত প্রেমাভিনয় করা হইয়াছে, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। অনেক সময়ে তাহাদের বুদ্ধিহীনতা, অপরিণামদর্শিতা, সাময়িক মানসিক দৌর্ব্বল্য দেখিয়া, সেই সময়ে নিজেদের কার্য্য সিদ্ধি করিয়া লওয়া হয়, তাহাও মনে রাখিতে হইবে। যদি ইহাতে কোন দোষ না থাকে, তাহা হইলে মাতাল কাপ্তেন বাবুদের কাছে কম টাকা দিয়া বেশী টাকা লওয়ারও কোন দোষ নাই—তাহারাও সেই সময়ে স্ব-ইচ্ছায় এইরূপ ধার লয়। এইরূপে দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় কাটাইয়া যদি তাহাদের আর্থিক উন্নতি হয়—বেশীর ভাগ স্থলেই হয় না—তাহা হইলে সেই উন্নতিটা যে এই সকল স্ত্রীলোকদিগের ও তাহাদের ঔরসজাত সন্তানদের আজীবন দুর্ব্বিষহ কষ্টের বিনিময়ে, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ইঁহারাই আবার অর্থবান হইয়া, পদস্থ হইয়া সমাজে মাননীয় হন। ইঁহাদের জীবন-চরিত লেখা হয়। ইঁহাদেরই জীবনাদর্শ আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা আমাদের অনুকরণ করিবার উপদেশ দিতেছেন।

আরও দেখা যায়, বেশ্যা-গমনের ফলে দেশে যৌন-রোগ সকলের (venereal diseases) বিশেষ বৃদ্ধি হয়। Rev. Usher তাঁহার

নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা —বিদ্যাপতি

শিল্পী—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার [Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

Neo Malthusianism গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে শতকরা ৬০ হইতে ৭৫ জন এই রোগের বিষময় ফল—যাহা পুরুষ-পরম্পরাগত তাহা—ভোগ করিতেছেন। সকল ডাক্তারই স্বীকার করেন যে, অধিকাংশ ভীষণ রোগ—যথা মহাব্যাধি, কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, পিনাস, অন্ধতা নানারূপ ক্লেশদায়ক চক্ষুপীড়া, বধিরতা, উন্মত্ততা, গর্ভপাত, মৃতবৎসাত্ব, অনেক রকম ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ ও প্লীহার ব্যারামগুলি মূলে এই যকৃত বা পৈতৃক যৌন রোগ। Dr. Dechalet বলেন, গরমীর ব্যারামের অপেক্ষা ভীষণ রোগ আর নাই। এই রোগ ভয়ানক ভাবে বাড়িয়াছে ও বাড়িতেছে। বিবাহ যত কমে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি তত বাড়ে; যৌন ব্যাধিও তত বাড়ে; জারজ সন্তানের সংখ্যাও তত বাড়ে (Westermarck's Evolution of Marriage)। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এই যৌন ব্যাধি যাহাতে হইতে না পায়, যাহাতে এইরূপ ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা ভালরূপে চিকিৎসিত হইতে পারে, তাহার নিমিত্ত অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও ক্রোড় ক্রোড় টাকা অকাতরে ব্যয় হইতেছে। এই ব্যাধির চিকিৎসা বহুব্যয়সাপেক্ষ ও বহুকালসাপেক্ষ। বহুকাল-ব্যাপী ও বহুব্যয়সাপেক্ষ চিকিৎসা করাইলে তাহার বিষময় ফল অনেকাংশে লাঘব হইতে পারে; কিন্তু সমূলে নির্ম্মূল হয় না। জারজ সন্তানদের জন্য অনেক Foundling হাসপাতালে আছে, Maternity Homes আছে। তাহাতেও জারজ সন্তানদের মৃত্যু-সংখ্যা অন্য সন্তানদের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। আমাদের দেশে এইরূপ কয়টা হাসপাতাল আছে? আমাদের এই গরীব দেশে সেইরূপ চিকিৎসা করাইবার টাকাই বা কোথা হইতে আসিবে? এত টাকা খরচ করিয়া যখন পাশ্চাত্য দেশসমূহ বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তখন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কি সর্ব্বনাশ হইবে—সকলের কিরূপ স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে, কিরূপ শিশু-মৃত্যু বাড়িবে, স্ত্রীলোকদিগের জীবন কিরূপ দুর্ব্বিষহ হইবে, তাহা একবার পাঠকবর্গকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি ও সমাজ-সংস্কারকদিগকে তাহার উপায় বলিয়া দিতে অনুরোধ করি। বড়মানুষেরা অনেক বখামি, অনেক মাতলামি, অনেক অন্যায় কার্য্য করিয়াও সমাজে গণ্য-মান্য হইয়া চলিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু গরীবেরা সেরূপ করিলে একেবারে জাহান্নমে যায়। গরীবরা যদি মনে করে, ওইরূপ করাটাই বড়লোকদিগের উন্নতির মূল, তাহা হইলে তাহারা যেরূপ ভুল করে, আমরা প্রভূত ধনশালী প্রভূত বীর্য্যবান পাশ্চাত্যের অনুকরণ করিলে সেইরূপ ভুল করা হয় না কি? যদি আশু কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় এরূপ উপায় নির্দ্ধারণ করিতে না পারা যায়, সে সামর্থ্য যদি না থাকে, তবে আমাদের প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে বলাটা কি হঠকারিতা বা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় হয় না? পৈতৃক ভিটাটায় হয় তো অনেক অসুবিধা হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা সহজসাধ্য। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কিরূপ বাটী নির্ম্মাণ করিতে হইবে, তাহার একটা নক্সা করা আবশ্যক। তাহাতে কিরূপ সুবিধা হইবে, তাহার ঘরগুলিতে আলো ও হাওয়া খাইবে কি না, তাহাও দেখিতে হয়। সেরূপ বাটী নির্ম্মাণ করিবার উপযুক্ত অর্থ-সামর্থ্য, মাল-মসলা আছে কি না, তাহাও দেখিতে হয়। এ যে না আছে চিত্র, না আছে অর্থ-সামর্থ্য, অথচ ভাঙ্গিবার হুকুম! যে সকল দেশে সম্যক উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়—এই মত প্রবর্ত্তিত সেই সকল দেশে বহু লোকই বহুকাল অবিবাহিত থাকে—অনেকে একেবারেই বিবাহ করিতে পায় না—অনেকে বিবাহ করিবার আবশ্যকতাই বিবেচনা করে না। আমাদের এই গরীব দেশে উহাদের অপেক্ষা শতকরা অনেক বেশী লোকের বিবাহ হইবে না। সুতরাং বহু স্ত্রীলোকই বহুকাল পর্য্যন্ত—অনেকে আজীবনই—অবিবাহিত থাকিয়া যাইবে। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিলে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ-প্রথার প্রচলন হওয়া অনিবার্য্য। যদি তাহা হয়, তাহাদের মনোমত স্বামী ও স্ত্রী পাইবার নিমিত্ত স্ত্রী-পুরুষদের মেলামেশা করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের পিতা বা অন্য অভিভাবকদিগকে, যাহাতে তাহাদের কন্যারা সুবিধা মত বা মনোমত স্থানে বিবাহিত হইতে পারে তন্নিমিত্ত, কন্যাদিগকে নানা স্থানে যেখানে অনেক লোক সমাগম হয় সেখানে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম সাজ-সজ্জা করাইয়া লইয়া যাইতে হইবে। যাহাদিগকে পছন্দসই মনে হয় তাহাদিগকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে; তাহাদের সহিত মেশামিশি করিবার সুবিধা করিয়া দিতে হইবে। কুমারীদিগকে সাজ-সজ্জা করাইয়া এইরূপ দেখা শুনা মেশামিশি করান বহুব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অনেকেই তাহা পারিয়া উঠিবে না। অধিক দিন এরূপ করিতে হইলে পিতা মাতারা বিরক্ত হইয়া উঠিবে। সুতরাং বহু স্ত্রীলোকই উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইবে। আমাদের এই গরীব দেশে প্রায় সকল স্ত্রীলোকই অর্থোপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইবে। অনেকের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে তাহাদের পিতা মাতা মরিয়া যাইবে। তাহারা মরিয়া গেলে অন্য আত্মীয়দের কাছে কন্যারা বেশী কিছু সাহায্য পাইবে না। বিশেষতঃ তখন তাহাদের ভ্রাতারা অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহিত হইবে। সেখানেও তাহারা আশ্রয় পাইতে পারিবে না—যৌথ-পরিবার-প্রথা সমূলে নষ্ট হইবে। এইরূপ আশ্রয়-হীন অবস্থায় তাহাদের কি দুর্দ্দশা হইবে, একবার ভাবিয়া দেখুন। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের উপার্জ্জন করিবার কি কি পথ উন্মুক্ত আছে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। পরিচারিকা, পাচিকা, সেবিকা (nurse), ধাত্রী, মেয়ে ডাক্তার, শিক্ষয়িত্রী, হোটেল-কর্ত্রী, সামান্য কেরাণীগিরি (যদি জোটে), দুই দশ রকমের সামান্য গৃহ-শিল্প, কলের কাজ, ঝাড়ুনী, পানওয়ালী, ফলওয়ালী, অত্যন্ত ছোট দোকানদারী। আমাদের দেশের ফিরিঙ্গি স্ত্রীলোকদিগের দশা দেখুন। তাহারা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের তুলনায় সংখ্যায় নগণ্য। তাহাদিগকে সাহেবরা অনেকে অনুগ্রহ ও সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করেন। তাহা সত্ত্বেও তাহাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, ভাবিয়া দেখুন। আমাদের দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক যদি কর্ম্ম করিয়া খাইতে বাধ্য হয়, তবে এই কর্ম্ম জোটানটাই কত দুঃসাধ্য হইবে, তাহাও ভাবিয়া দেখুন। এখনই স্ত্রী-লোকদিগের কর্ম্ম জোটাটার মূল্য অনেক স্থলে চরিত্রহীনতা। সে একটা

সত্যটাও মনে রাখিতে হইবে। আশ্রয়হীন, অভিভাবকহীন যুবতী স্ত্রীলোকদিগের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ায় কত বিপদ, তাহা পাচিকা পরিচারিকাদিগের অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে বুঝা যায়। ইহার উপর তাহারা নিজেরাই পুরুষদের সহিত মেলামেশা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিবে। আমাদের দেশের বিধবা কর্ম্মীদের মতন তাহাদের ওরূপ মেলামেশায় কোন দোষ আছে বলিয়া গণ্য হইবে না। সুতরাং প্রকৃতির তাড়না, প্রলোভন, ভাল বেশ-ভূষা পাইবার নিমিত্ত টাকার অভাবে ইহাদিগের ভিতর অনেকের চরিত্র-দোষ জন্মিবে – অনেকেই বাধ্য হইয়া প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি করিবে তাহাও সহজে অনুমেয়। পাশ্চাত্য দেশে অনেককেই এরূপ করিতে হইতেছে। Gohre নামক একজন ধর্ম্মযাজক জার্ম্মানীর শ্রমিকদিগের ভিতর বহুকাল বাস করিয়া তাহাদের জীবন বিশেষভাবে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, Chimnitz সহরে কোন ১৭ বৎসরের অধিক বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষকে তিনি চরিত্রবান দেখেন নাই। (Rev. Usher's Neo-Malthusianism P. 84). Tolstoy সাহেবও বলেন ১০০০০এর ভিতর একটি লোককেও চরিত্রবান দেখা যায় না। সব দেশেই কলকারখানার শ্রমিকদিগের—কি স্ত্রী, কি পুরুষ—ভয়ানক চরিত্রদোষ হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং আমাদের এই গরীব দেশে যৌবনে অবিবাহিত থাকিলে পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা আরও অধিক চরিত্রদোষ হইবারই সম্ভাবনা—কম হইবার কোন কারণই দেখা যায় না। সুতরাং এখানেও পুরুষরা অনেক কুমারী-গমন করিবে এবং তাহার ফলে অনেক জারজ সন্তান জন্মিবে; এবং তাহাদের ভারও কুমারীদের ঘাড়ে পড়িবে। তাহাতে তাহাদের এবং এই সকল জারজ সন্তানদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। বেশ্যাগামী পুরুষ-সহবাসে তাহাদের ও তাহাদের অপত্যদের যৌন রোগের প্রকোপে ভুগিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগকে আমাদের দেশে স্বামী-পুত্রদের জন্য রাঁধিতে, বাসন মাজিতে, জল তুলিতে ও অন্যান্য অনেক রকম গৃহকর্ম্ম করিতে হয় বলিয়া অনেকের চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসিয়া যায় দেখিতে পাই। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, এই সকলই তাহাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম-বিভাগ এবং স্ত্রীলোক মাত্রেই মাতৃজাতীয়া। পরের সুবিধার জন্য, বিশেষতঃ যাহাদের তাঁহারা ভালবাসেন তাহাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করাটাই তাঁহাদের সহজ প্রকৃতিগত—তাহাই মাতৃত্বের অঙ্গ। ভালবাসার রীতিই এই যে, যাহাদের ভালবাসা যায়, তাহাদের সেবা করিবার প্রবৃত্তি আপনা হইতেই আসে। তাহাদের জন্য কষ্ট স্বীকার করাতেই একটা তৃপ্তিবোধ, একটা গভীর শান্তি আছে, যাহাতে এইরূপ কষ্ট করাটাই সুখের হয়। এই জন্য অনেক দাসদাসী, পাচিকা থাকা সত্ত্বেও অনেক বড়মানুষদের স্ত্রীরা নিজের হাতে রাঁধিয়া স্বামী-পুত্রদিগকে খাওয়ান। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের উন্নতিকল্পে আমাদের সমাজ-সংস্কারকেরা যে উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে অর্থের নিমিত্ত পরের দাসীবৃত্তি করিতে হইবে। একে তো অর্থের নিমিত্ত কর্ম্ম করা স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃতিগত নয়। উপরন্তু বাধ্য হইয়া অনেককে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইবে—জারজ সন্তানদের ভার একা বহন করিতে হইবে। স্ত্রীলোকদিগের সহিত সহানুভূতিশীল যুবক-সম্প্রদায় একবার ভাবিয়া দেখুন যে, তাঁহারা যে সম্যক উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না, তাহার ফল কি হইবে। তাঁহাদের ভগিনীদের ও কন্যাদের অনেককেই হয় তো এই অবশ্যম্ভাবী দাসীবৃত্তি বা বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইবে—ইহাতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন কি?

এখনই ইহার ফলে বর-পণপ্রথা ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছে। যুবকরা কতক পরিমাণে উপার্জ্জনক্ষম হইতে ২৭।২৮।৩০ বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। সুতরাং যদি পুত্রকন্যাদের সংখ্যা মোটামুটি সমান ধরা যায় (যদিও এখন বৈদ্যদের ছাড়া অন্য সকল জাতিতেই পুরুষের সংখ্যা কিছু বেশী), তাহা হইলে পুত্ররা ২৭ বৎসর অবিবাহিত থাকিলে, অনেক ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা কন্যাও অবিবাহিতা থাকিবে। ১৪, ১৫ বৎসর বয়স্কা হইতে ২৭ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কা কন্যাদের সংখ্যা একত্রে সমষ্টি করিলে, তাহাদের সংখ্যা বিবাহপ্রার্থী পুত্রদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেক গুণ বেশী হইবেই। ইহাদের সকলের ভিতর প্রকৃতির নিয়মে কামের স্ফুরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পাছে তাহাদের পদস্খলন হয় (কিছু কিছু হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সব দেশেই অবিবাহিত যুবকদেরই মত অবিবাহিত যুবতীদেরও কতক অংশে চরিত্রদোষ হয়—তাহা যেন মনে থাকে), এই ভয় সকল মাতা পিতাদেরই আছে। হইলে, ওই কন্যাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না, এ কথা সকলেই জানে। এই ভয়ে সকল মাতা পিতারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও তাহাদের বিবাহ দিবার নিমিত্ত উৎগ্রীব থাকেন। এ দিকে পাত্রের সংখ্যা পাত্রীর সংখ্যার অনেকগুণ কম হওয়ায়, সকলেই পাত্র বা তাহার অভিভাবকদিগকে টাকার লোভ দেখান। এখানে Law of supply and demandএর কার্য্য চলিতেছে। ১৮৭৫—৭৭ সাল হইতে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্যদের ভিতর যখন হইতে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া উচিত নয় এই মত প্রবর্ত্তিত হইল, তখন হইতেই বর-পণপ্রথা আরম্ভ হইল। ক্রমে যত এই মত প্রচলিত হইতেছে, ততই এই পণপ্রথা ভীষণ হইতেছে। আবার পণপ্রথা ভীষণ হইয়াছে বলিয়াই যুবকরা আরও বিবাহ করিতে চাহিতেছেন না—বিবাহটাই ভয়াবহ হইয়া দাঁড়াইতেছে। উপার্জ্জনক্ষম লোকেরা যৌথ-পরিবার হইতে পৃথক হইয়া পড়িতেছেন—সাধারণ লোকের অবস্থা হৃদয়বিদারক ভীষণ ভাব ধারণ করিতেছে। অর্থাভাবে একরূপ অনাহারে জীবন যাপন করিতে হইতেছে। যক্ষ্মাকাস রোগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইতেছে। পণপ্রথা নিবারণের জন্য সকল প্রকার চেষ্টা বৃথা হইতে বাধ্য। কারণ ইহা Law of supply and demandএর অনিবার্য্য ফল। উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিও বলিয়া, তাহার পর পণ লইও না বলায়, গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার মতন সে পরামর্শ নিষ্ফল হইতে বাধ্য।

যদি এই সর্ব্বনাশকারী পণপ্রথা উঠাইতে চাও, তাহা হইলে তাহার আগে এই সর্ব্বনাশকারী মতটাও বর্জ্জন কর—পণপ্রথা আপনা হইতেই কমিয়া যাইবে।

পুরুষদেরও এই মতে চলিলে যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহাও মনে

হয় না। অনেক লোককে অবস্থাহীনতা হেতু অবিবাহিত থাকিতে দেখিলাম। অনেকে অল্প বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হওয়াতে আর দারপরিগ্রহ করিলেন না দেখিলাম। কাহারও তজ্জন্য অর্থের বিশেষ স্বচ্ছলতা হইতে দেখিলাম না। যাহাতে কোন ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপিত হয়, তাহা করিতে দেখিলাম না। যাহাতে দেশের আর্থিক উন্নতি হয়, এমন কোন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া কাহাকেও সাফল্য লাভ করিতে দেখিলাম না। (স্যার প্রফুল্ল রায় ছাড়া—তাঁহার মতন মনীষী অতি অল্পই হয়) বেশীর ভাগ লোককেই অল্পবিস্তর দিন পরে পরস্ত্রী-রতই দেখিলাম—তাহাদের উদ্যমহীনতা, অস্থিরচিত্ততা, অপরিণামদর্শিতা, কর্ত্তব্য-শিথিলতা চতুর্দ্দিকেই নয়নগোচর হয়; এবং সবশেষে সর্ব্বস্বান্ত, বহু ব্যাধিগ্রস্ত, ও বৃদ্ধ বয়সে তাহাদের কষ্টের একশেষ হয়, ইহাই তো দেখা যায়। আমাদের দেশে এইরূপই হইবার কথা। আমাদের দেশের জল-হাওয়ার গুণে আমরা স্বভাবতঃ শারীরিক কর্ম্মপরায়ণ নই। অথচ এইরূপ কর্ম্মপরায়ণতাই অনেকটা আর্থিক উন্নতির মূল। সেইজন্য আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব মোচন হইলেই আমরা অবকাশ খুঁজিয়া লই। আমাদের ভিতর একপ্রকার ভাবুকতা আছে, সেই ভাবুকতা স্থির-লক্ষ্য নয় বলিয়া কার্য্যকরী হয় না। কিন্তু তাহার নিমিত্ত সহজে বুঝিতে পারি যে প্রচুর অর্থস্বচ্ছলতা বা বিলাসিতা কখন মানুষকে সুখী করিতে পারে না। সেই জন্য যখন অর্থস্বচ্ছলতা চলিয়া যায়, তখন হৃদয়ে একটা অতৃপ্তি আসে, যেটা মূলতঃ ভালবাসার অভাব-বোধ। তখন কিছুই ভাল লাগে না। একটা হঠকারিতা, যথেচ্ছাচারিতা আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহা সহজে আমাদিগকে বিপথে লইয়া গিয়া আমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধিত করে। খালি জাহাজ যেমন সামান্য তরঙ্গে বা বায়ুর আঘাতে বিপর্য্যস্ত হয়, আমাদের ঘাড়ে স্ত্রীপুত্রদের ভার না থাকিলে আমরা তেমনই সহজে বিধ্বস্ত হই। তাহাদের প্রতি ভালবাসাই আমাদিগকে স্থিরলক্ষ্য ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করে; নচেৎ আমরা উদ্‌ভ্রান্ত হই। এই কারণে আমরা বেশী বয়সে বিবাহ করিলে আমাদের আর্থিক উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩

সন্ধ্যার পর এক-পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আকাশ এখনো মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। অন্য দিন অপেক্ষা শীঘ্রই কাছারির কাজ শেষ করিয়া জগদীশ বাবু আহারাদির পর শয়ন-ঘরে তাকিয়া হেলান দিয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে তামাক টানিতেছিলেন; আর মনে মনে কাশী যাওয়ার খরচপত্রাদির হিসাব, কল্যাণীকে তাহার মাতুলালয়ে রাখিয়া আসিবার বন্দোবস্ত, প্রভৃতি নানা বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন; আর মাঝে মাঝে আফিংয়ের নেশায় এক একবার ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। কল্যাণী ধীরে ধীরে আসিয়া রৌপ্য-নির্ম্মিত পানের কৌটাটী জগদীশবাবুর সম্মুখে রাখিতেই, জগদীশবাবু তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "ওঃ, আজ যে দেখছি, ওর নাম কি, বড় সকাল সকালেই...তাহলে মনটা খুসী আছে—কেমন কি না?"

কল্যাণী হাসিয়া কহিল, "কিসে বুঝলে?"

জগদীশবাবু কৌটা হইতে একটা ছোট পানের খিলি মুখে ফেলিয়া গালের একপাশে রাখিয়া কহিলেন, "এ আর এমন শক্তটা কি বোঝা? আজ দেখছি চুল বাঁধা হয়েছে, টিপ পরেছ...বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে ত মুখখানা!"

কল্যাণী তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টানিয়া হাসিয়া বলিল, "শুনলাম কাশী যাওয়া হচ্ছে না কি?"

"হ্যাঁ, কাদী ধরেছে, মামীও অনেক দিন থেকেই বলছেন,—ঘুরে আসা যাক্ একবার। তুমিও কিছু দিন তোমার মামার বাড়ী থেকে এসগে। অনেক দিন থেকেই 'যাই যাই' করছিলে, তোমার মামাও এসে সেবার ফিরে গেছেন... যাও, দেখে শুনে এস একবার।" কল্যাণী জগদীশবাবুর পাশের দিকটায় একটু সরিয়া আসিয়া, বিছানার চাদরের একটা কোণ নাড়াচাড়া করিতে করিতে নত মুখে কহিল, "আমি যাব না।"

বিস্মিত কণ্ঠে জগদীশবাবু কহিলেন, "বল কি—যাবে না?"

"না।"

"তা কি করে হয়? এখানে একা একা—আমি থাকছি না…কেন, আমি যখন বলছি, বেশ ত ঘুরেই এস না দিন কতকের জন্য।…বিশেষ এখানে যখন তোমার শরীর দিনকার দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"…

"তোমায় বলিছি আমি?"

"না বল্লেও আমার চোখ ত আছে?"

"হ্যাঁ—তাই বুঝি অনন্ত জোড়া হাতে ওঠে না, আর চুড়িগুলো মাংস কেটে বস্‌ছিল,—ভারি ত দেখেছেন!"

"ও-সব ত তুমি ইচ্ছে করেই খুলে রেখেছিলে নতুন বৌ ..আজই দেখছি।"

"তাই ত! উনি ত সবই জানেন! মেয়ে মানুষে আবার সাধ করে কেউ গহনা খোলে কি না!"

"না হয় মানলাম তাই। কিন্তু তোমার মন ত ভাল থাকছে না। যেন কত দুঃখু-কষ্টে তোমার মন ভরে উঠেছে,—এ তো তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়! এ কথা অস্বীকার করলে চলবে না…"

কল্যাণী একবার জগদীশবাবুর দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল, "ইঃ, গণৎকার ঠাকুর এসেছেন, সবই উনি বোঝেন যেন,…ওঁর কাণে কাণে সব বলেছে…"

"না বল্লেও তা একটু বুঝি বৈ কি নতুন বৌ,…আর না বুঝলেই বা চল্‌বে কেন? এই এত বড় জমিদারীর সব লোকগুলোই কি তাদের মনের কথা মুখ ফুটে সব সময়ে খুলে বলে আমায়? ..তা বলে না। হাবে-ভাবে, চাল-চলনে অনেকের মনের কথাই আমাকে বুঝে নিয়ে সেই ভাবে চলতে হয় বৈ কি!"

কল্যাণী গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমি ত আর তোমার জমিদারীর লোক নই…যাক্ গে, আমি যাব না সেখানে"—

"তবে কি এখানে থাকতে চাও?"

"না।"

জগদীশবাবু হাতের নলটা বিছানায় ফেলিয়া একটু বিরক্ত ভাবে কহিলেন "কি মুস্কিল! এও না, সেও না… কি বল্‌তে চাও তাও ত ছাই খুলে বলছ না! ঐ ত তোমার দোষ!"

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিল—"কেন, এইমাত্র তুমি যে বড় বলছিলে মনের কথা বুঝতে পার?" বলিয়া কল্যাণী জগদীশবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘরের উজ্জ্বল আলোক তখন কল্যাণীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। তার বড় বড় কাল চোখ দুটির সকৌতুক দৃষ্টি, হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি, যৌবনশ্রীতে পূর্ণ দেহ-ভঙ্গিমা, বহিঃপ্রকৃতির মেঘ-বিদ্যুতের খেলার মতই জগদীশ-বাবুর অন্ধকার হৃদয়খানি মুহূর্ত্তের জন্যে নাচাইয়া তুলিল। স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া জগদীশ-বাবু কহিলেন, "কি বলছ তা'হলে—সত্যিই যাবে না?"

"না—আমিও কাশী যাব।"

"কাশী যাবে? কেন?"

"ঠাকুরঝি বলছিলেন, এবার কাল আছে,—আমি সেখানে গুরুদেবের কাছে মন্ত্র নেব।"

"মন্ত্র নেবে…সে কি!…হঠাৎ মাথায় এ ঝোঁক চাপল যে?"

কল্যাণীর মুখের হাসি চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হইল। সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। জগদীশবাবু নলটা মুখে তুলিয়া অন্য দিকে চাহিয়া কয়েক টান দিবার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া পুনরায় কহিলেন, "সত্যি বলছ নতুন বৌ…মন্ত্র নেবে তুমি?"

কল্যাণী গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল—"হ্যাঁ, নেব।"

"তাই নাও—সে মন্দ নয়। কথাটা আমিও অনেকবার ভেবেছি; কিন্তু তোমায় বল্‌ব বল্‌ব করেও বলতে পারি নি,—হয়ত তুমি আবার অন্য কিছু মনে করে বস্‌বে!"

কল্যাণী নতমুখে বলিল, "এতে মনে করবারই বা কি আছে—আর বলতেই বা কি বাধা ছিল!"

জগদীশ বাবু তাকিয়াটা পিঠের দিকে আরও একটু সরাইয়া আনিয়া কহিলেন, "তা একটু ছিল বৈ কি নতুন বৌ, —সব জিনিসেরই ত একটা সময় আছে। যে অবস্থায়, আর যে বয়সে স্ত্রীলোক ধর্ম্মকর্ম্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে, অর্থাৎ এই জপ, তপ, পূজা ইত্যাদি নিয়ে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো একটু শান্তিতে কাটাতে চায়, ইহকালের সব আশা, আকাঙ্ক্ষা, সুখ দূরে ঠেলে পরকালের দিকে নিজেকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়, সে বয়স তোমার আসে নি। যদি মনে করে থাক যে এ-সব তুমি না করলে আমি অসুখী হব, বা কিছু মনে করব, বাস্তবিক তা নয়। আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছে বলেই যে জোর করে তোমার মনটাকে বুড়ো করে তুলতে হবে, তা নয়। তবে যদি এটা ভাল

বলে বুঝে থাক, আর মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পার, তা'হলে মন্ত্র নাও, খুবই সুখের কথা। যদি ধর্ম্ম কর্ম্মের দিকে মন দিয়ে একটু শান্তি পাও, সে ভাল কথা। এমন ভাবে মনমরা হয়ে থাকার চাইতে একটা কিছু নিয়ে থাকাটাই আমার ভাল বলে মনে হয়।"

কল্যাণী প্রত্যুত্তরে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পারিল না। জগদীশ বাবুর কথাগুলির মধ্যে যে সত্যের কঠোর শ্লেষ তাহার অন্তরকে পীড়ন করিতেছিল, সেই বেদনার একটা চাপ যেন গলা পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিল। কল্যাণীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া জগদীশ বাবু পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "দেখ নতুন বৌ, অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম যে, কথাটা তোমায় বলি, কিন্তু এত দিন তা হয়ে ওঠে নি। আজ যখন কথাটা উঠেছে, তখন বলি শোন।"

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল—"না থাক, আর শুনতে চাই না। একটা সামান্য বিষয় নিয়ে এত কথা হবে জানলে, কখনই আমি বলতাম না। বেশ, তোমার যখন এতই অনিচ্ছা, তখন নাই বা নিলাম মন্ত্র!...আমার ত জোর নেই কিছু!"

জগদীশ বাবু হাসিয়া কহিলেন, "আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা বাদ দিলেও, এইখানটাতেই তুমি মস্ত বড় একটা ভুল করে বসে আছ। জোর তোমার ষোল আনাই আছে নতুন বৌ, কেবল তুমি সেটাকে খাটাতে চাইছ না, এই যা কথা!"

ঈষৎ মাথা দোলাইয়া কল্যাণী বলিল, "তা ত দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে।"

......"আহা-হা—ভুল বুঝো না নতুন বৌ, কথাটা বেশ করে তলিয়ে বুঝে দেখ। মন্ত্র নেওয়া সম্বন্ধে আমি তোমায় কিছু বলিনি,...আমি যা বলছি, সে হচ্ছে তার গোড়ার কথা, বুঝলে কি না!"

"কি জানি—তোমার ওসব গোড়া আগা মাথা মুণ্ডু কিছু বুঝি না আমি।"—বলিয়া কল্যাণী জগদীশ বাবুর পায়ের কাছটাতে উঠিয়া বসিল।

"ওখানে কেন নতুন বৌ, এইদিকটাতেই সরে বস না;—সত্যিই ত আর আমায় ছুঁলে তোমার জাত যাবে না।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অভিমান-ভরা সুরে কল্যাণী কহিল—"অমন করলে কিন্তু আমি"......

"আচ্ছা, আচ্ছা, ঐখানেই ব'স।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম, কথাটা আর কিছুই না,—কথাটা হচ্ছে, এই তোমার মনের দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি নিয়ে। এটা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি এখন, যে এ-সবের কারণ আর কিছুই নয়, কেবল এই কি বলে, তোমার আর আমার ভিতরকার বয়েসের তফাৎটা—এইটেই হয়েছে যত গরমিলের গোড়া। নইলে আমার সংসারে ভগবানের ইচ্ছায় অভাব অনাটন ত কিছু নেই, যার জন্যে তোমার একটুও কষ্ট হতে পারে।"

এত বড় সত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া তর্ক করিবার সাহস ও ক্ষমতা কল্যাণীর ছিল না। তাহার বুকের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। কল্যাণী বুঝিল, স্বামী তাহার হৃদয়ের কোন্ গভীর বেদনাতুর স্থলের দিকে ক্রমে ক্রমে আগাইয়া যাইতেছেন। কল্যাণী তাহার আঁচলের প্রান্তভাগ আঙ্গুলে জড়াইতে জড়াইতে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তোমায় বলতে গিয়েছি—নয়?...নিজের মনগড়া যা তা একটা ভেবে নিলেই ত আর হ'ল না।"

"যা তা বলে উড়িয়ে দেবার মত কথা হলে আমি তা তুলতাম না নতুন বৌ। তোমায় বলতে বাধা কি, আমি ম'লে মল্লেনপুরের মুখুজ্যে-বংশে বাতি দেবার আর কেউ থাকবে না। শুধু এই কথাটা ভেবেই এ বয়সেও আমায় আবার বিবাহ করতে হয়েছে।—হয় ত ভগবানের সে ইচ্ছা নয়,—কিন্তু আজ যদি একটী ছেলে থাকত তোমার নতুন বৌ, তা হলে বোধ হয় এ সংসার অথবা আমি তোমার কাছে এতখানি বিরক্তির বিষয় হয়ে উঠতাম না। থাক্—সে কথা তুলে আর কিছু লাভ নেই। কিন্তু তোমায় যখন বিবাহ করেছি, তখন এটা দেখা আমার অবশ্যই দরকার যে, তুমি যাতে শান্তিতে থাকতে পার, সে যেদিক দিয়েই হোক্।...কাশী গিয়ে মন্ত্র নিতে চাও,—বেশ, চল—আমার কোন আপত্তি নেই তাতে—"

"আচ্ছা, আমি একটা কথা বলব,—রাখবে?"

"তোমার কোন্ কথাটা আমি না রাখি বল ত?"

কল্যাণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা কহিল না। জগদীশ বাবু আগ্রহভরে কহিলেন, "চুপ করে রইলে কেন নতুন বৌ? বল কি বলছিলে"—

সহসা কল্যাণী মাথা ঝাঁকাইয়া কহিল, "না, থাক্‌গে...কিছু না..."

"কিছু না কেন...যা বলতে চাইছিলে

"বলছিলাম—তাহলে বরং দিনকতকের জন্তে এর মধ্যে খড়দা থেকে ঘুরে আসিগে—কেমন ?"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জগদীশ বাবু বলিলেন "ভাল কথা।"

"দিন দুই থাকব মাত্র,—আচ্ছা, তুমিও চল না…মা কত করে বলে পাঠালেন—মামাও কত অনুরোধ করে গেছেন—চল না"…

…"আর আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন ? তুমিই এসগে না ঘুরে…না, কি বলছ ?…আমার যাওয়া—সে এক হাঙ্গামা বই ত নয়…কি দরকার মিছিমিছি…কি বল ?" কল্যাণীকে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া জগদীশ বাবু হাতের নলটা একটু নাড়াচাড়া করিতে করিতে একটু সরিয়া আসিয়া কল্যাণীর পিঠে হাত দিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া কহিলেন, "তাতে তুমি সুখী হবে নতুন বৌ ?"

কল্যাণীর সমস্ত দেহের উপর দিয়া বিদ্যুৎগতিতে একটা চঞ্চল শিহরণ খেলিয়া গেল। তার ওষ্ঠ দুখানি ঈষৎ কম্পিত হইল মাত্র। কি কথা যেন জিহ্বাগ্রে আসিয়া বাধিয়া গেল। জগদীশবাবু আরও খানিকটা সরিয়া আসিয়া কহিলেন, "কি বলছ…তা'হলে কি যেতেই হবে না কি আমাকে"—

কল্যাণী নতমুখে কহিল, "সে তোমার ইচ্ছে—আমরা গরীব—আমাদের বাড়াতে তোমার মত লোকের যাওয়াটা অবিভি" কল্যাণীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

জগদীশ বাবু ব্যস্তভাবে কহিলেন, "আহা হা—রাগ কর কেন, আমি তার জন্তে বলি নি। কথায় কথায় যে চটে ওঠ, ঐ তো তোমার…ওর নাম কি—কেমন দোষ যেন ! কথাটা হচ্ছে, বয়স যাই হোক্ না কেন, দেখতেও লোকগুলো আমায় বুড়োর মতনই দেখে, কেউ আবার ঠাট্টা মস্করা করে কিছু বলবে-টলবে শেষটায় !…জানই ত এ অঞ্চলের মধ্যে আমাদের নাম-ডাকটাই সব চেয়ে বড়…এই সব সাত পাঁচ ভেবে বলছিলাম"—

কল্যাণী অন্ত দিকে চাহিয়া কহিল,"থাক্—নাই বা গেলে তা'হলে !" জগদীশবাবু কল্যাণীর চিবুক ধরিয়া করুণ স্বরে কহিলেন "বলি রাগ করলে ? আঁ্যা—"

"না…ওঃ—খুব ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে ত ?"

"তা' হচ্ছে…আচ্ছা, একটা কথা আমায় সত্যি করে বল্‌বে আজ ?"

"কি ?"

"সত্যি বলবে ত ?"

"কি মুস্কিল। কথাটাই শুনলাম না, আগে থাকতেই"—

"কথাটা অন্ত কিছু নয়…তবে কি বলে…আচ্ছা, তুমি আমাকে ভক্তি কর নতুন বৌ ?"

"ওঃ—খুব কথা বল্লেন ত ! মেয়ে মানুষ আবার স্বামীকে ভক্তি না করে কবে ? তা ত জানি না।…কেন—এ কথা জিজ্ঞেস করছ যে ? আমি কি কোন দিন তোমায়—"

"এই নাও,…নাঃ, এখনো তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষটাই আছ দেখছি। আমি কি জানি না বা বুঝি না নতুন বৌ, যে, তোমার শ্রদ্ধার, যত্নের কোন ত্রুটী নেই"—

"তবে যে বলছ ?"

"না, না, বলছিলাম কি, এই ভক্তি শ্রদ্ধা যত্নগুলো ছাড়া আর কি অন্ত কিছু তোমার কাছে আমার পাবার নেই নতুন বৌ ?"

সহসা একটা বিদ্যুৎ-চমকের রক্তিম ঝলক জানালার ছিদ্র-পথ ভেদ করিয়া চঞ্চল ক্রীড়ায় মুহূর্তের জন্ত ঘরের ভিতরটা আলো করিয়া দিল। কল্যাণী একবার চক্ষের পলকে মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল, জগদীশবাবু স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আছেন। সেই দৃষ্টির ভিতর দিয়া যেন কল্যাণীর মনের গোপন কোণে লুকান যত কিছু ছিল সকলই দেখিয়া লইতেছেন। সে দৃষ্টির অন্তরালেও আগুনের খেলা আরম্ভ হইয়াছে !

বহিঃপ্রকৃতির মতই কল্যাণীর অন্তরের মধ্যে সহসা আর্জ ঝড় উঠিল। সে ভয়-কাতর অবনত দৃষ্টিতে রুদ্ধ কণ্ঠে কি একটা কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কড় কড় শব্দে আকাশে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল। কল্যাণী তাহার উভয় হাতে কাণ চাপিয়া কহিল, "আমি শুই,—আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।"—বাহিরে মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে।— উন্মত্ত ভৈরব গর্জ্জনে প্রমত্ত ঝড় রুদ্ধ বাতায়নের ফাঁক দিয়া শোঁ শোঁ শব্দে ঘরের ভিতর আসিয়া দীপ শিখা নিবাইয়া দিল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত ও মুহুর্মুহু মেঘ-গর্জ্জনের শব্দে যখন কিছুই শোনা যায় না, জগদীশবাবু কল্যাণীর কাণের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন, "ঘুমুলে না কি ?"

কল্যাণী প্রাণপণ শক্তিতে তাহার দ্রুত-কম্পিত বক্ষের সঘন নিঃশ্বাস রোধ করিয়া অস্ফুট বিকৃত কণ্ঠে কহিল, "না।"

(ক্রমশঃ)

পশু-প্রশস্তি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ

নমামি তোমারে মায়ের বাহন
নমামি সিংহ সিংহী,
বট ত বৃটিশরাজের প্রতীক
না হও নন্দী ভৃঙ্গী।
কখনো দয়াল কভু ভাস্বরক
হতে পার তুমি যখন যা সখ,
চেনে ক্রীতদাস এণ্ড্রোকিলিস্
তুমি পশুরাজ ধিঙ্গি।

হে বৃক ব্যাঘ্র হে ভীম ভয়াল
সুন্দরবন-চন্দ্র।
কিবা উজ্জ্বল চক্ষু-যুগল
গুরু গর্জ্জন মন্দ্র।
যেমন হিংস্র তেমনি পেটুক
'ফেউ' সনে তব দ্বন্দ্ব মিটুক
'যোগে' তব ঘরে বসতি লভুক
মিটে যাক সব ধন্দ।

তবু ভল্লুক মধুর পিয়াসী
কপিত্থ-ফল-ভক্ত,
তুমি 'সসেমিরে' নিশ্বাসে শোষ
জীবের বুকের রক্ত।
নাকে দড়ি দিয়ে হায়রে নাচায়
পশুশালে রাখে ভরিয়া খাঁচায়
'খোয়াব' দেখহে সেথা শুয়ে শুয়ে
কোথায় 'রুষের' তক্ত।

তুমি গণ্ডার হাতে মর তার
ভাণ্ডার যার ভোগ্য,
কঠিন চর্ম্ম ফোটে না ক শূল
তুমি দৈত্যের যোগ্য।
'কালির পাকে'র হাতে দাও ঢাল,
কত লোকে তুমি কর হে নাকাল,
কোনো দেবতার নহ যে বাহন
হবে না কি তব মোক্ষ!

তুমি হে শৃগাল পরম চতুর
প্রবীণ 'পঞ্চতন্ত্রে'
দীক্ষিত তুমি অম্ল ভক্ষ্য
ধনুর্গুণের মন্ত্রে।
টক্ আঙুরের ধার না ক ধার
বোকা ছাগলের সঙ্গে বিহার
সব জ্ঞান তব নিমেষে ফুরায়
শিয়ালমারার যন্ত্রে।

তুমি কুক্কুর বুলডগ আর
ব্লাড হাউণ্ডের গোষ্ঠী,
কভু বেঁড়ে কভু লাঙ্গুল সনাথ
যাচিছ অন্ন-মুষ্টি।
কভু দীনবেশে চরণে লুটাও,
কখনো কুটিল দন্ত ফুটাও,
বিশ্বাসী প্রভুভক্ত তুমি হে
অল্পেতে তব তুষ্টি।

তুমি হনুমান রামের মিত্র
আমের আবিষ্কর্ত্তা,
মর্ত্তমানের পরম মানদ
পেঁপে ও পিয়ারা-হর্ত্তা।
শুনিয়াছ তুমি রামায়ণ-গান
কবিতায় আর কি দিব হে মান
সব তরু মোর হক ফলবান—
পড়ুক তোমার পড়তা।

কত নাম লব মানবে পশুতে
বেশী ভেদাভেদ নাই ত;
একই জগৎপিতার পুত্র
সে হিসাবে ভাই ভাই ত।
কেহ লভিয়াছে দেবের চরণ,
কেহ লভিয়াছে দেবের শরণ;
আমার দুইএর কিছুই মেলেনি
ভাবিতেছি বসে তাই ত।

প্রার্থী

কথা, সুর ও স্বরলিপি.........শ্রীদিলীপকুমার রায়।

বাহার খাম্বাজ......একতালা

প্রভু ঝরুক্ এ তৃষিত চিতে তব গীত নির্ঝরের ধারাসারই;
যেন জীবনে তোমার এ আলো সম্ভারে নিয়ত বরিতে পারি।

শারদ আকাশে তারামালা সম
শুভ্র যে গীতিজ্যোতি নিরুপম
দীন কণ্ঠে কি শোভে সে পরম
গৌরব জয়হারই!

যেন না গণি স্বপনে যা গড়ি জীবনে স্রষ্টা আমি তাহারই—
শুধু জীবনে তোমার এ আলো সম্ভারে যেন গো বরিতে পারি।
মোর রিক্ত চিত্ত উছসি নিত্য ঢেলেছ পীযূষ-ধারা
আমি রচেছি যা কিছু কৃপা তব পিছু বহেছে প্রেরণা তারা;

যত্নের তব অযোগ্য আধারে
চাওয়ার-অতীত অমৃত অপার এ
ঢালিয়া অঝোরে ক'রেছ আমারে
ধন্য দানে তোমারই!

যেন ভুলি না এ কথা পেয়েছি যত তা নহে গো নহে আমারই—
মোর কণ্ঠে যে গান ফুটেছে,—সে দান লভেছি তরে সবারই!

০ ১ + ৩

II সা মা | { মা মা মা | মা মা মা | মা পা ধা | মজ্ঞা মজ্ঞা জ্ঞমা |
প্র ভু ম ক্ল ক্লএ তৃ বি ত চি ত্তে ত ব - গীত

মা ণা ধণা | পধা না র্সা | নর্সর্রা র্সর্রা ণধা | নর্সা নর্সা (নর্সা) | } II
নি ঝ রে র ধা রা সা রই - - - -

র্সর্সা | না সা র্রা | র্সা ণর্সণ ণা পা | মা পণা পমা | জ্ঞমা মা মা |
যেন জী ব নে তো মা র এ আ লো সম - ভা রে

সা রা মজ্ঞা | পমা পা পা | জ্ঞমজ্ঞা রসা রা | সা II II
নি য় ত ব রি তে পা - - রি

মা মা মা | ণা ধণা পধা | না র্সা র্রজ্ঞর্রা | র্সনা র্সা র্সর্সা |
শা র দ আ কা শে তা রা মা লা - সম
ব রে র ত ব অ যো - গ্য আ - ধারে

না র্সা র্রা | জ্ঞা র্রা র্সা | না র্সা র্রা | র্সধা র্সণ ণধা |
শু - ভ্র যে গী তি জ্যো তি নি রু - পম
চাওয়া র অ তী ত অ মৃ ত অ - পারএ

র্সা র্রা র্সর্রা | র্মজ্ঞা র্রা র্সা | মজ্ঞা মজ্ঞা রা | সরা সা সা |
দী ন ক - ণ্ঠে কি শো ভে সে প র ম
চা লি য়া অ ঝো রে ক' রে ছ আ মা রে

সা মা মা | মা ণা ধা | মজ্ঞা মজ্ঞা মা | মা -া
গৌ - র ব জ য় হা - - রই -
ধ - ন্য দা নে তো মা - - রই -

মজ্ঞা | মা ণা ধা | না র্সা সণ | না র্সা পা | না র্সা র্সা |
যেন না গ ণি স্ব প নে যা গ ড়ি জী ব নে
যেন ভু লি না এ ক থা পে য়ে ছি য ত তা

র্সা র্গা র্গর্মা | র্রা র্রা র্রর্সা | নর্সা নর্সর্রর্সা নর্সা | ণধা ণপা
প্র - ষ্টা আ মি তা হা - - রই -
ন হে গো ন হে আ মা - - রই -

পা পা | ধা ণা র্সা | র্রা র্সা র্সপা | পা ধা ণা | র্সা ণা ধা |
শু ধু জী ব নে তো মার এ আ লো স ম্ ভা রে
মো র ক - ণ্ঠে যে গা ন ফু টে ছে সে দা ন

মা মা পধণর্সা | ণধপা মা পা | জ্ঞমজ্ঞা রসা রা | সা II II
যে ন গো ব রি তে পা - - রি
ল ভে ছি ত রে স বা - - রই

{ সা | ণা -া পা | ধা -া পমা | গা মা পা | মপমা জ্ঞরা সা |
মোর রি - ক্ত চি - ত্ত উ চ্ছ সি নি - ত্য

সা রা মজ্ঞা | রা সা রা | ধ্ ণ্া সরা মজ্ঞা | রসা -া
ঢে লে ছ পী যূ ষ ধা - - রা

স সা | সরমা মা মা | জ্ঞমপা পা পা | মধা ধা ধণা | পধর্সা ণা ধা |
অ মি র চে ছি যা কি ছু স্ব পা ত ব পি ছু

পমগা মা পা | মজ্ঞরা জ্ঞা মা | জ্ঞমজ্ঞা রসা রা | সা -া }
ব হে ছে প্রে র ণা ভা - - রা -

সালঙ্কার কঙ্কাল

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

এককড়ি-বাবুর বাড়ীখানা কুড়ি বৎসর তালা বন্ধ হয়ে পড়ে' ছিলো। আজ এতোকাল পরে সেই বন্ধ বাড়ীর তালা খুলে গৃহপ্রবেশ কর্‌লেন লোকেন্দ্র-বাবু আর তাঁর পত্নী যশোদা। ঠিক কুড়ি বৎসর আগে এক দিন যুবক লোকেন্দ্র বরবেশে এসে এই বাড়ীতে প্রবেশ করেছিলেন এককড়ি-বাবুর কন্যা অতুলনাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য; কিন্তু সে বিবাহ দৈব-দুর্বিপাকে ঘটে' ওঠে নি; আজ কুড়ি বৎসর পরে প্রৌঢ় লোকেন্দ্র সেই বাড়ীতে এসে প্রবেশ কর্‌লেন পত্নীকে সঙ্গে করে' কিন্তু তাঁর এই পত্নী যশোদা এককড়ি-বাবুর কেউ না। যে রাত্রে লোকেন্দ্র অতুলনাকে বিবাহ কর্‌তে এসে অতুলনাকে না পেয়ে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যান, সেই রাত্রেই এককড়ি-বাবুও বাড়ীতে তালা বন্ধ করে' সপরিবারে দেশ ছেড়ে একেবারে লাহোরে পলায়ন করেন। বিবাহ কর্‌তে এসে বিবাহ কর্‌তে না পাওয়াতে লোকেন্দ্র যেমন লজ্জিত হয়ে এককড়ি-বাবুর বাড়ী থেকে ফিরে গিয়েছিলেন, কন্যার বিবাহ দিতে না পেরে এককড়ি-বাবুও ততোধিক লজ্জিত হয়ে রাতারাতি বাড়ীঘর জিনিসপত্তর ফেলে সুদূর বিদেশে পলায়ন করেছিলেন। এতোকাল পরে এককড়ি-বাবু দেশের বাড়ী মায় জিনিসপত্র জলের দরে বেচে দিয়েছেন; লোকেন্দ্র হ'লে-হ'তে-পার্‌তো শ্বশুর বাড়ী কিনে পত্নীকে সঙ্গে করে' দেখ্‌তে এসেছেন কোথায় কি মেরামত করাতে হবে আর কবে নাগাদ তাঁরা সপরিবারে এসে গৃহপ্রবেশ করতে পার্‌বেন। এই বাড়ী তিনি এতো সস্তায় পেয়েছেন যে বাড়ী কেন্‌বার আগে তিনি বাড়ীর অবস্থা কেমন আছে তা দেখ্‌বারও দর্‌কার মনে করেন নি।

বাড়ীতে প্রবেশ করে'ই উঠানে যেতে যেতে তাঁরা দেখ্‌লেন দেউড়ির গলির মেঝেতে পুরু হয়ে ধুলো জমেছে, কিন্তু ধুলোর ফাঁকে ফাঁকে আলপনার ম্লান রেখা উঁকি মার্‌ছে; দেউড়ির গলির মুখে আলপনা-চিত্রিত দুটি মাটির মঙ্গল-ঘট বসানো হয়েছিলো, তার একটি এখনো বসে' আছে, একটির তলার বিঁড়ে পচে যাওয়াতে কাত হয়ে পড়ে' গেছে, ঘরের গায়ের আলপনা-চিত্র ধূসর হ'য়ে উঠেছে। উঠানে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিলো; দীর্ঘ কুড়ি বৎসরের রৌদ্র বৃষ্টি খেয়ে খেয়ে পাট্‌নাই খেরো কাপড়ের সামিয়ানা একেবারে গলে' ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেছে, কেবল দেয়ালের ধারে ধারে কয়েক জায়গায় লাল খেরো ধূসর বর্ণ পতাকার আকারে ঝল্‌ঝল্‌ কর্‌ছে। বাড়ীর ভিতরে গিয়ে লোকেন্দ্র ও যশোদা দেখ্‌লেন—উঠানে ছাদ্‌না-তলার চিহ্ন এখনো বোঝা যায়; আল্‌পনা-দেওয়া কাঁঠাল-কাঠের বড়ো পাঁড়িখানা কালো হয়ে উঠেছে, তার পিঠ তেবড়ে উঠেছে, খানিকটা কাঠ ফেটে চটে' খসে' পড়ে' যে কোথায় গেছে তার সন্ধানই নেই, হয়তো বা উড়ে' গেছে, নয়তো বা ঐখানে গুঁড়ো হয়ে ধূলা হয়ে গেছে; চারটে মাটির তালের পায়া করে' চারটে কলা-গাছ পোঁতা হয়েছিলো, সেই মাটির তাল চারটে গলে' সেইখানে ছড়িয়ে জমে' আছে, তার উপরে আগাছা জন্মেছে, আর কলার গাছের আঁশ-গুলো ধূলোর মধ্যে লুটিয়ে আছে। ঘরের মধ্যে গিয়ে গিয়ে তাঁরা দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—রান্নাঘরের উনানে বড়ো বড়ো কড়া, পিতলের হাঁড়ি বসানো আছে, কড়ার মধ্যে ঝাঁঝ্‌রা ছাঁকনা ও হাঁড়ির ভিতরে হাতা ডুবানো আছে, যেনো রান্না হতে হতে রাঁধুনি সব ফেলে রেখে চলে' গেছে; উনানের মধ্যে ও আখার মুখের কাছে রাশীকৃত ছাই আর পোড়া কাঠের জীর্ণ টুক্‌রো পড়ে' আছে, উনুন জ্বলে' জ্বলে' আপনি নিবে গিয়ে যেমন ছিলো তেমনি আছে; শিলের উপর নোড়া পাতাই আছে, বাটনা বাট্‌তে বাট্‌তে কাজ স্থগিত হয়ে গেছে; কাঠের বারকোষ ও পিতলের বড়ো বড়ো পরাতের উপর মাখা ময়দার তাল' ও লেচি পড়ে' আছে, কিন্তু ধূলোয় ঝুলে সেগুলির রং কাদার ডেলার মতন হয়ে গেছে, কতক কতক গুঁড়িয়ে গেছে; বড়ো বড়ো ঝোড়া

বাঁধন ছেড়ে ছড়িয়ে পড়েছে, বোধ হয় তাতে তরকারী কোটা ছিলো; তাঁরা দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন—এককড়ি-বাবুর ঘরের সমস্ত সাজ সরঞ্জাম পড়ে' আছে; বিছানা পাতাই আছে, তার উপর পুরু হয়ে ধুলো জমেছে, উপরে মশারি থাকাতে বিছানার উপর তত্তো বেশী ধুলো জম্‌তে পায় নি, দেয়ালের গায়ের ছবিগুলোর কোনোটা কোণাচ হয়ে বেঁকে গেছে, কোনোটার দড়ি ছিঁড়ে গিয়েও হুকে লেগে থেকে তখনো দুল্‌ছে, কোনোটা বা ছিঁড়ে আছড়ে পড়ে' গেছে, মেঝেময় ভাঙা কুচো কাঁচ ছড়িয়ে আছে; ঘরের দেয়াল-গোড়ায় তোরঙ্গ দেরাজ আল্‌মারী ধূলায় ধূসর জীর্ণ দেহে এখনো বর্ত্তমান; কাঠের আল্‌নায় কাপড় জামা জুতো ছাতা লাঠি ছিঁড়েখুঁড়ে তেব্‌ড়ে বেঁকে এখনো বিরাজ কর্‌ছে। এক জায়গায় কতকগুলো মাটির গেলাস খুরি স্তূপাকার করা রয়েছে, এক বোঝা কুশাসনের গুঁড়ো কাঠি ছড়িয়ে আছে, আর বড়ো বড়ো হাঁড়া শূন্য মুখ ধ্যাদান করে' বিস্ময়ে অবাক্‌ লোকের চোখের মতন ফ্যালফ্যাল করে' আকাশ পানে তাকিয়ে পড়ে আছে; তাতে বোধ হয় জল ধরা ছিলো, এখন সব জল শুকিয়ে গেছে, তার ভিতরে মাকড়সা জাল বুনেছে। এক ঘরের তালা খুলে ভিতরে যেতেই তাঁরা দেখ্‌লেন—সেখানে কন্যা-সম্প্রদানের আয়োজন সজ্জিত আছে, আল্‌পনা-দেওয়া দুখানি পীঁড়ি পাশাপাশি এখনো পাতা আছে; তার সাম্‌নে কন্যাছত্র আল্‌পনার ফুলের হৃদয়কোষের উপর তামার ঘটটী এখনো বসানো আছে, যদিও তার অন্তরের মঙ্গলবারি শুকিয়ে উবে গেছে ও মুখের আম্রপল্লব শুকিয়ে গুঁড়িয়ে গেছে; একদিকে বরশয্যা, তৈজস দানসামগ্রী, রূপার বাসন, একটা বাইসাইকেল, একটা সোনার হাতঘড়ী ও হাতঘড়ীর বাক্‌সের ডালার উপরে একটা আংটি, কোঁচানো গরদের জোড়, কার্পেট, আসন, চেয়ার টেবিল আল্‌মারী দেরাজ, পাম্প্‌-শু চটি-খড়ম, লণ্ঠন শামাদান বৈঠকী আলো বিবিধ বরাভরণ সজ্জিত আছে, কেবল জিনিসগুলি ধূলিধূসর বিবর্ণ বিকৃত জীর্ণ হয়ে গেছে। একটা ঘরে বোধ হয় বাসরের বিছানা পাতা হয়েছিলো—মেঝের উপর বিছানা পাতা, বিছানার উপর পাতা হয়েছিলো সাটিনের চাদর আর সাটিনের বালিশ, কিন্তু সে সাটিনের যে কী রং ছিলো তা এখন চেন্‌বার জো নেই—বোধ হয় লাল রঙেরই ছিলো। বিবাহের সব আয়োজনই প্রস্তুত ছিলো তবু অভাবিতের বিড়ম্বনায় বিবাহ হতে পায় নি, লোকেন্দ্রকে লজ্জিত কুণ্ঠিত হয়ে ফিরে যে'তে হয়েছিলো।

লোকেন্দ্র ও যশোদা বেড়িয়ে বেড়িয়ে সব দেখ্‌ছিলেন আর তাঁদের মনে হচ্ছিলো এ যেনো উপকথার রাক্ষস-হানা পোড়ো বাড়ী, ভোগের সব আয়োজন সম্পূর্ণ আছে; নেই কেবল উপভোগ কর্‌বার মানুষ, একজন যে মানুষ আছে সেও রূপার কাঠি ছুঁইয়ে ঘুমপাড়ানো রাজকন্যা। লোকেন্দ্র-বাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাব্‌লেন—কিন্তু সেই ঘুমন্ত রাজ-কন্যারই এখানে অভাব! কোথায় গেলো সেই অতুলনা!

লোকেন্দ্র-বাবুর মনের উপর দিয়ে অতীতের স্মৃতি ব'য়ে চলেছিলো চলচ্চিত্রের মতন।

লোকেন্দ্র এককড়ি-বাবুর বন্ধুপুত্র। সেইজন্য উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিলো, ঘন ঘন উভয়ে উভয়ের বাড়ীতে গতায়াত কর্‌তেন। সেই সূত্রে উভয় পরিবারের কর্ত্তা-গিন্নিরা স্থির করেন যে লোকেন্দ্রের সঙ্গে অতুলনার বিবাহ হবে। এই প্রস্তাব লোকেন্দ্র ও অতুলনাও শুনেছিলো এবং এতে উভয়ের প্রীতি আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠেছিলো।

লোকেন্দ্র বি-এ পাশ কর্‌লে বিবাহ হবে ঠিক হলো। কিন্তু বি-এ পড়্‌বার সময় কলেজের ছাত্ররা এক গোঁয়ার ইংরেজ অধ্যাপকের দুর্ব্যবহারে উত্তেজিত হয়ে তাকে প্রহার করে। সেই অপরাধে লোকেন্দ্র কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়। দেশে লেখাপড়ার কোনো আশা নেই দেখে সে আমেরিকায় চলে' গেলো। আমেরিকায় ছ বৎসর থেকে সে যখন ডাক্তার হয়ে দেশে ফিরে এলো, তখন আর বিবাহের কোনো প্রতিবন্ধক রইলো না; বিবাহের দিন স্থির হয়ে গেলো—ভাদ্র আশ্বিন কার্ত্তিক তিন মাসে বিবাহের দিন নেই, অগ্রহায়ণ মাস পড়্‌তেই বিবাহ হবে। লোকেন্দ্র ও অতুলনা আনন্দিত অন্তরে দিন গুণ্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু কার্ত্তিক মাসের মাঝামাঝি একদিন অতি প্রত্যূষে পুলিশের লোক লোকেন্দ্রের বাড়ী ঘেরাও করে' তাকে গেরেপ্তার কর্‌লে এবং সে আমেরিকায় গিয়ে 'গদর' বা বিদ্রোহীদের দলে ছিলো এই সন্দেহে তাকে অন্তরীণে অন্তর্ধান করে' ফেল্‌লে।

লোকেন্দ্রের পিতা ও এককড়ি-বাবু লোকেন্দ্রকে

নির্দোষ প্রমাণ করে' উদ্ধার কর্‌বার অনেক চেষ্টা কর্‌লেন; কিন্তু কিছুতেই তাকে মুক্ত কর্‌তে পার্‌লেন না।

তখন এককড়ি-বাবু হতাশ হয়ে অতুলনার অন্যত্র বিবাহের সম্বন্ধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু অতুলনা বিনম্র নম্র ভাবে পিতাকে জানালে যে সে লোকেন্দ্রকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে না; লোকেন্দ্র যবে মুক্তি পাবেন তবেই বিবাহ হবে; অপেক্ষা কর্‌তে কর্‌তে সে বৃদ্ধা হয়ে গেলেও সেই বৃদ্ধবয়সেই তাদের বিবাহ হবে; লোকেন্দ্রের জন্ম সে আমরণ অপেক্ষা কর্‌বে; যদি চিরকুমারী থেকে মরে'ও যেতে হয় তবু সে লোকেন্দ্রের বাগ্‌দত্তা বধূ হয়েই মর্‌বে।

অতুলনার দৃঢ় অনিচ্ছা দেখে এককড়ি-বাবু অন্য স্থানে কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করার চেষ্টা থেকে নিরত হলেন; এবং লোকেন্দ্রের অবিচারে অবরুদ্ধ অবস্থার অবসান প্রতীক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

অকস্মাৎ একদিন প্রভাতে লোকেন্দ্র মুক্তি পেয়ে বাড়ী ফিরে এলো। বাড়ীতে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করে'ই লোকেন্দ্র এলো এককড়ি-বাবুর বাড়ীতে। লোকেন্দ্র অকস্মাৎ উপস্থিত হয়ে এককড়ি-বাবুর সাম্‌নে প্রণাম কর্‌তেই এককড়ি-বাবু বিস্মিত ও পুলকিত হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—কে? লোকেন্দ্র? কখন ছাড়া পেলে?

লোকেন্দ্রের মুখ থেকে প্রশ্নের উত্তর শোন্‌বার অপেক্ষা না করে'ই এককড়ি-বাবু চীৎকার করে' ডাক্‌তে লাগ্‌লেন—ওগো শুনছো? এইদিকে এসো……লোকেন্দ্র এসেছেন……ও অতুলনা,……দেখ্‌বে এসো…লোকেন্দ্র এসেছেন…

এককড়ি-বাবুর আনন্দাতিশয্য দেখে লোকেন্দ্রও হর্ষোৎফুল্ল হয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌তে লাগ্‌লো।

এককড়ি-বাবুর স্ত্রী স্রস্ত বস্ত্র অঙ্গে বিন্যস্ত কর্‌তে কর্‌তে ছুটে এসে লোকেন্দ্রকে দেখেই বল্‌লেন—বাবা লোকেন, এসেছো। কেমন ছিলে বাবা? কোথায় ছিলে? কবে ছাড়া পেলে? বড্ড রোগা হয়ে গেছো……

সকলেরই মুখে প্রথম প্রশ্ন—লোকেন্দ্র, তুমি? তুমি এসেছো?" কেউ যেনো নিজেদের দৃষ্টিকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিলেন না যে বাস্তবিকই লোকেন্দ্র এসে উপস্থিত হয়েছে, অভাবিত ব্যাপার সম্ভব হয়েছে, অপ্রত্যাশিত ঘটনা বাস্তবিক ঘটেছে। এতোদিন যার কোনো খবরই জান্‌তে পারা যায় নি, যার সংবাদ জান্‌বার জন্ম মন নিয়ত উৎসুক হয়ে ছিলো, তাকে সাম্‌নে দেখেই মনের মধ্যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ভিড় করে' জেগে উঠ্‌ছে, কেউ একটা প্রশ্নেরও উত্তর শোন্‌বার জন্ম অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌ছিলেন না, মনের সঞ্চিত কৌতূহল প্রশ্নমালায় প্রকাশ করে' তাঁরা মনটাকে হাল্কা কর্‌তে পার্‌লে যেনো বাঁচেন।

লোকেন্দ্র অতুলনার মাতাকে প্রণাম কর্‌বার জন্ম যখন স্মিতমুখে ভূমিতে মস্তক নত কর্‌লে তখন এককড়ি-বাবু পত্নীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—অতুলনা কই? তাকে শিগ্‌গির ডাকো……

অতুলনার মা আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বল্‌লেন—অতুলনা তোমার ডাক শুনেই ছুটে গিয়ে পূজোর ঘরে ঢুকেছে……

এককড়ি-বাবু গাঢ় গম্ভীর স্বরে বল্‌লেন—বাবা লোকেন্দ্র, তুমি অতুলনার সঙ্গে দেখা করোগে……

লোকেন্দ্র এককড়ি-বাবুর অনুরোধে ও আপনার অন্তরের আগ্রহে লজ্জিত স্মিতমুখে অতুলনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চল্‌লো।

লোকেন্দ্র এককড়ি-বাবুর পূজার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে—অতুলনা গলবস্ত্র হয়ে হাত জোড় করে' দুইপা পিছন দিকে মুড়ে মাটিতে বসে' আছে, আর তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুজলধারা গড়িয়ে পড়্‌ছে; লোকেন্দ্র আরো দেখ্‌লে—যদিও অতুলনার চোখে জল তবু তার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, তার অন্তরের আনন্দাতিশয্য ও কৃতজ্ঞতা যেনো বিগলিত হয়ে পরমেশ্বরের পূজায় নিবেদিত হচ্ছে। লোকেন্দ্রের দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ থাকার দুঃখ অতুলনার চোখের জলে শ্লাঘ্য ও বরেণ্য বলে' মনে হতে লাগ্‌লো। লোকেন্দ্র যখন হর্ষগদ্গদ স্বরে ডাক্‌লে—অতুলনা! তখন অতুলনা অশ্রুসিক্ত নীরব দৃষ্টি ফিরিয়ে যে মধুর ভঙ্গীতে লোকেন্দ্রের দিকে তাকিয়েছিলো, তা লোকেন্দ্রের স্মৃতিতে আজও মুদ্রিত হয়ে আছে। অতুলনার সেই সুখদুঃখমিশ্রিত দৃষ্টি বাস্তবিকই অতুলনা অনির্ব্বচনীয়। তার পর যখন অতুলনা কথা বল্‌তে পেরেছিলো, তখন যে সে কতো কি বলেছিলো তা এখন আর মনে নেই, সুমিষ্ট সঙ্গীতের মতন সেই প্রণয়প্রলাপ লোকেন্দ্রের সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুভূতিকে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছিলো,

এখন কথা-ভোলা গানের সুরের রেশটুকুর মতন অতুলনার কথায় আনন্দটুকু শুধু মনে আছে।

লোকেন্দ্র যখন অতুলনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাড়ীতে যাবার কথা মনে কর্‌তে পার্‌লে তখন এককড়ি-বাবু তাকে বল্‌লেন—বিয়েতে বারম্বার বাধা পড়ে' যাচ্ছে; এবার আর বিলম্ব করা নয়। এর পরে প্রথম শুভদিনেই তোমাদের দুই হাত এক করে' দিয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হতে চাই।

লোকেন্দ্র সুখলজ্জিত মুখ নত করে' নম্র স্বরে বল্‌লে—তাতে বাবার অমত হবে না।

অর্থাৎ এককড়ি-বাবুর প্রস্তাবে লোকেন্দ্রের সম্পূর্ণ সম্মতি আছে এ কথা সে পিতার বেনামীতে জানিয়ে দিয়ে গেলো।

তার পর প্রথা-সঙ্গত ভাবে বৈবাহিক শুভানুষ্ঠান পালিত হতে লাগ্‌লো—পাত্র-পাত্রীকে আশীর্ব্বাদ করা হলো; গায়ে হলুদ দেওয়া হয়ে গেলো; তার পর চটপট বিবাহের দিনও এসে উপস্থিত হলো—রাত্রি দশটার পর শুভলগ্ন।

রাত্রি নটার সময় আলো জ্বালিয়ে বাজ্‌না বাজিয়ে পুষ্প-পত্রভূষিত চতুর্দ্দোলায় চড়ে' বর এসে উপস্থিত হলো। বিলম্বিত বিবাহ অবশেষে হতে চলেছে বলে' সমারোহ উৎসবের আয়োজনে বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষ কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।

শুভলগ্ন উপস্থিত। কিন্তু ক'নেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অতুলনা বাড়ীর কোথাও নেই।

উদ্বিগ্ন শুষ্ক মুখে এককড়ি-বাবু এসে লোকেন্দ্র ও তার পিতাকে একান্তে ডেকে চুপিচুপি এই খবর দিলেন। সকলে তো অবাক্‌!—যেনো বজ্রাহত। কোথায় গেলো অতুলনা? কোথায় সে যেতেই বা পারে?

এককড়ি-বাবু বল্‌লেন—অতুলনা তার স্কুলের সমপাঠিনী বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছিলো; তাদের কাছে শুন্‌লাম, তারা সন্ধ্যাবেলা অতুলনাকে নিয়ে লুকাচুরি খেল্‌ছিলো; অনেকক্ষণ খেলার পর অতুলনা একবার চোর হয়; পরে সে তার এক সখীকে ছুঁয়ে চোর করে' দেয়; তখন সেই মেয়েটি অতুলনাকে বলে—"রোস্‌ না, আমাকে যেমন ছুঁয়ে দিলি, আমি এবার সবাইকে ছেড়ে তোকেই ছোঁবো দেখিস।" এই কথা শুনে অতুলনা হেসে বল্‌লে—"আচ্ছা দেখা যাবে। এবার আমি এমন জায়গায় লুকাবো যে সাত দিন সাত রাত্রি খুঁজ্‌লেও আমাকে বার কর্‌তে পার্‌বে না।" এর পর অতুলনা একাকিনী কোথায় গিয়ে যে লুকিয়েছে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা বাড়ীসুদ্ধ লোক প্রত্যেক ঘর গলি ঘুঁজি খাটের তলা আল্‌মারীর পাশ দেরাজের ফাঁক বাথ-রুম তন্ন তন্ন করে' খুঁজেছি—এক জায়গা শতেক বার দেখেছি, কোথাও তার অস্তিত্বের চিহ্ন মাত্র নেই।

এককড়ি-বাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে' পড়্‌লেন। লোকেন্দ্রের পিতা স্তম্ভিত হয়ে অনেক ক্ষণ থেকে অবশেষে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌লেন—ভগবানের ইচ্ছা নয় যে এই বিবাহ হয়; তাই বারম্বার ব্যাঘাত ঘট্‌ছে। আমরা তাঁর আদেশের ইঙ্গিত অমান্য কর্‌তে চেষ্টা করেছি, তাই তোমার এই দুশ্চিন্তা ও মনস্তাপ আর আমাদেরও এই লজ্জা আর অপমান পেতে হলো। বিবাহ না দিয়ে বর ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এই লজ্জায় লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হবে। বরযাত্রীদেরই বা আমি কী বল্‌বো?

এককড়ি-বাবু নিজে শোকাচ্ছন্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাক্‌লেও বন্ধুর কথা শুনে ব্যথিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—বরযাত্রীদের জান্‌তে দিয়ে কাজ নেই যে মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; আহার্য্য প্রস্তুত আছে, তাঁদের এখনি আমি খেতে বসিয়ে দিচ্ছি। আর অতুলনার অনেকগুলি সখী নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে; কারো কারো অভিভাবকও এসেছেন; তাঁদের বলে' কয়ে' একজনকে কন্যাসম্প্রদান কর্‌তে সম্মত করানো যেতে পারে......

লোকেন্দ্র প্রতিবাদ করে' বল্‌লে—না, আমি যে মেয়ের কোনো পরিচয়ই পাই নি, তাকে আমি বিয়ে কর্‌তে পার্‌বো না। হঠাৎ অতুলনা অসুস্থ হয়ে পড়েছে এই কথা রটিয়ে আমরা ফিরে যাই...

লোকেন্দ্রের পিতা ও এককড়ি-বাবু অগত্যা লোকেন্দ্রের প্রস্তাবেই সম্মত হতে বাধ্য হ'লেন। কিন্তু সত্য ব্যাপার গোপন রাখা গেলো না; লোকের মুখে মুখে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা খবরও রটে' গেলো যে একটা হিন্দুস্থানী ছোক্‌রা চাকর আর অতুলনার মাতার গহনার বাক্‌সটাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

অতি সহজেই সকলে এই তিনটির তিরোধান এক সূত্রে গ্রথিত করে' ফেল্লে। এবং চাকরের সঙ্গে কুলত্যাগিনী কন্যার পিতার গৃহে কোনো ভদ্রলোক আহার করতে সম্মত হলো না; কোনো ভদ্রলোক স্ত্রী-কন্যা নিয়ে এই কলঙ্কিত বাড়ীতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করতে আর চাইলো না। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই বহুজনসমাকুল গৃহ পরিত্যক্ত বিজন হয়ে গেলো; বর লোকেন্দ্রও ব্যথিত লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি পলায়ন করলে।

অতুলনার তিরোধান যখন অনির্দ্দেশ্য রহস্য থেকে কুৎসিত আকার ধারণ করে' বীভৎস হয়ে উঠ্লো, তখন অতুলনার আচরণ সম্বন্ধেও লোকেন্দ্রের মনে নানাবিধ সন্দেহ উঁকি মারতে লাগলো; লোকেন্দ্র অন্তরীণ থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এলে অতুলনা যে পূজার ঘরে গিয়ে কেঁদেছিলো সে কি তবে দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতার আনন্দে নয়, তার গুপ্ত প্রণয়ের অন্তরায় রূপে লোকেন্দ্র ফিরে এসেছে বলে' দুঃখে অভিভূত হয়ে দেবতার কাছে অশ্রুসিক্ত নালিশ! লোকেন্দ্র যাকে ভালো বেসেছিলো, যে অতুলনা এককড়ি-বাবুর মতন ভদ্রলোকের শিক্ষাপ্রাপ্তা ভব্যা কন্যা, তার একজন ছোটোলোক ভৃত্যের সঙ্গে গৃহত্যাগের কুপ্রবৃত্তি লোকেন্দ্রকে অত্যন্ত পীড়া দিয়েছিলো; নিজের প্রণয়ের অপমানে তার কষ্ট, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও পিতৃবন্ধু এককড়ি-বাবুর অপমান ও মনঃক্লেশে তার কষ্ট, শিক্ষিতা মহিলার মতিভ্রংশের জন্য তার কষ্ট।

এককড়ি-বাবুর অবস্থা আরো শোচনীয়, আরো ভয়ানক! বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রতিবেশী-পরিচিত সকলের দ্বারা পরিত্যক্ত ও পরিবর্জ্জিত হয়ে লজ্জায় মনস্তাপে তাঁর জীবন দুর্বহ মনে হতে লাগলো। কন্যার বিবাহ-উৎসবের সমারোহ, বিবাহ-ভোজের আয়োজন, বাসর-ঘরের ফুলশয্যা যেনো চারিদিক থেকে তাঁকে বিদ্রূপ-কটাক্ষ করতে লাগলো। তিনি সমস্ত জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিলো তেমনি ফেলে রেখে স্ত্রীপুত্রকন্যাদের সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঘরে ও বাড়ীর সদর দরজায় তালা লাগিয়ে সেই রাত্রেই লাহোর পলায়ন করলেন।

কয়েক দিন পরে এককড়ি-বাবুর পলাতক চাকরটা ক্যাশ্‌বাক্‌স সমেত বালিয়া জেলায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। পুলিশ খোঁজ নিয়ে নিয়ে সেই চাকরটাকে লাহোরে এককড়ি-বাবুর কাছে নিয়ে যায়। এককড়ি-বাবু চোর চাকরকে দেখে ও পুলিশের অভিযোগ শুনে অন্তরের দারুণ ক্রোধ ও ক্ষোভ গোপন করে' রেখে যথাসাধ্য গম্ভীর স্বরে বল্লেন—ও বাক্‌স আমি ওকে দিয়েছি।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করলে—বাক্‌সর মধ্যে টাকা আর গহনা……

চক্ষুশূল লোকটাকে চটপট চক্ষুর অন্তরালে সরিয়ে ফেল্‌বার জন্য এককড়ি-বাবু তাড়াতাড়ি বল্লেন—ও সমস্তই আমি ওকে বক্‌শিশ দিয়েছি।

চোর চাকর ক্লিষ্ট শুষ্ক মুখে পূর্ব্ব প্রভুর তিরস্কার ও অভিযোগ শোন্‌বার আশা করছিলো, প্রভুর অভিযোগের সাক্ষ্যে তার জেল্ অনিবার্য্য মনে করে' অন্তরে অন্তরে কম্পিত হচ্ছিলো; কিন্তু প্রভুর মুখে অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনে সে স্তম্ভিত হয়ে গেলো, পরক্ষণেই বিস্ময়ে তার চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো এবং তৎপরক্ষণেই তার চক্ষু দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং তৎপরক্ষণে কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে প্রভুর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌লো।

এককড়ি-বাবু তার অশুচি স্পর্শ থেকে নিজের পা সরিয়ে নিয়ে ধীর শান্ত স্বরে বল্লেন—তুমি শিগ্‌গির আমার চোখের সাম্‌নে থেকে চলে' যাও……

চাকর বল্লে—আমার কসুর মাফ করুন; আপনি আমার বাপ; বাক্‌সটা আপনি ফিরিয়ে নিন—আমি ও থেকে কেবল এক কুড়ি সাত রূপেয়া খরচ করে' ফেলেছি…

এককড়ি-বাবু সেখান থেকে চলে' যেতে যেতে বল্লেন—ও বাক্‌স আর বাক্‌সের জিনিস্ সব আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি, তুমি নিয়ে চলে' যাও……

এককড়ি-বাবুর একবার ইচ্ছা হলো যে তিনি ওকে জিজ্ঞাসা করেন অতুলনা কোথায় কেমন আছে; কিন্তু তিনি মুখ ফুটে সে কথা প্রকাশ করতে পারলেন না। অতুলনা যদি এখনো ঐ লোকটার বাড়ীতেই থেকে থাকে তা হলে ওদের তো কিছু অর্থের আবশ্যক আছেই, এই মনে করে'ই এককড়ি-বাবু ভৃত্যকে অলঙ্কার ও অর্থপূর্ণ বাক্‌সটা অক্লেশে দান করে' দিলেন।

তারপর অতুলনার আর-কোনো সংবাদ পাওয়া যায় নি।

লোকেন্দ্র যতোক্ষণ পূর্ব্ব কথা পর্য্যালোচনা করছিলেন ততোক্ষণ লোকেন্দ্রের স্ত্রী কৌতূহলী হয়ে ঘরে ঘরে সমস্ত জিনিস পর্য্যবেক্ষণ করে' বেড়াচ্ছিলেন। এককড়ি-বাবু

যেনো অতুলনার স্মৃতিজড়িত এই বাড়ীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন কর্‌বার জন্যই এই বাড়ী থেকে কোনো জিনিসই নিয়ে যেতে চান নি, বাড়ীর সমস্ত জিনিস সুদ্ধই বাড়ীটা লোকেন্দ্রকে বিক্রয় করে' দিয়েছেন; এবং বাড়ী বিক্রয় স্থির হয়ে যাওয়ার পরেই বাড়ীর সদর দরজার চাবির সঙ্গে সঙ্গে আরো এক হাজা চাবি পাঠিয়ে দিয়েছেন যেগুলো দিয়ে বাড়ীতে পরিত্যক্ত বাক্স সিন্দুক প্রভৃতি খোলা যেতে পারবে। লোকেন্দ্রের স্ত্রী যশোদা সেই সব চাবি বেছে বেছে অথবা নিজের আঁচলের চাবির গোছা থেকে চাবি বেছে বেছে এক-একটা বাক্স খোল্‌বার চেষ্টা করছেন; বাক্স খুলে গেলে ব্যথিত বিস্ময়ের সহিত বাক্সের ভিতরের জিনিসগুলি দেখছেন। কতো কাপড়-চোপড়, বাসন-কোশন, কতো গৃহস্থালির টুকিটাকি বাক্সে বাক্সে সঞ্চিত হয়ে আছে!

লোকেন্দ্র ও যশোদা এ-ঘর ও-ঘর দেখ্‌তে দেখ্‌তে একটা পাশের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন। সে ঘরটা বোধ হয় ভাঁড়ার-ঘর ছিলো—এক পাশে একটা জীর্ণ ভগ্ন তক্তপোষ আছে, তার তিনটে পায়া ভেঙে গেছে আর তার পাটাতনের কাঠামোটা মাটির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, মাঝে মাঝে তক্তা পচে' খসে' যাওয়াতে সেখানা একটা অতিকায় জন্তুর জীর্ণ পঞ্জরের মতন দেখাচ্ছে; এই তক্তপোষের উপরে চারিদিকে বোধ হয় ভাণ্ডারের দ্রব্যসম্ভার সাজানো ছিলো, তক্তপোষ ভগ্নপদ হয়ে পড়ে' যাওয়াতে তার পৃষ্ঠে সজ্জিত হাঁড়ি কলসী কাঁচের শিশি বোতল টিনের কৌটা প্রভৃতি মাটিতে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। আর সেই ঘরের এক পাশে আছে একটা প্রকাণ্ড বেলে পাথরের সিন্দুক। সেই অসাধারণ সামগ্রীটি দেখে কৌতূহলী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে যশোদা লোকেন্দ্রের মনোযোগ আকর্ষণ কর্‌বার জন্য বলে' উঠ্‌লেন—দেখো দেখো! কতো বড়ো একটা পাথরের সিন্দুক!

লোকেন্দ্র সেই দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন—কাকাবাবুর বাবা চুণারে পাথরের কার্‌বার কর্‌তেন; তিনি বোধ হয় এই সিন্দুকটি ফর্‌মাস দিয়ে তৈরি করে' আনিয়েছিলেন……

যশোদা কৌতূহলী হয়ে ঐ সিন্দুকের মধ্যে কি আছে দেখ্‌বার জন্য ক্ষিপ্রপদে তার কাছে সরে' গেলেন। যশোদা দেখ্‌লেন সিন্দুকটায় তালাচাবি কিছু নেই; তালা লাগাবার জন্য সিন্দুকের সাম্‌নের দিকে ডালার গায়ে দু-পাশে দুটো ও মাঝখানে একটা পিতলের বড়ো বড়ো আল্‌তারাফ লাগানো আছে এবং সিন্দুকের খোলের দেয়ালের গায়ে তিনটা বড়ো বড়ো পিতলের আংটা হুক বসানো আছে; তিনটা আল্‌তারাফের মধ্যে পাশের একটা আল্‌তারাফ সিন্দুকের ডালার গায়ে উল্টে লেগে আছে, অপর পাশের আল্‌তারাফটা নীচের হুকের উপর ঝুঁকে পড়েছে, কিন্তু হুকের মূল পর্য্যন্ত বসে' যায় নি, আর মাঝের আল্‌তারাফটা হুকের গায়ে একেবারে গেঁথে বসে' গেছে। সিন্দুকটা দেখেই মনে হয় হয়তো বিবাহবাড়ীর কর্ম্মের উপলক্ষে বাসন-কোশন বাহির কর্‌বার জন্য এই সিন্দুক খোলা হয়েছিলো, কিন্তু আর বন্ধ করা হয় নি, কেবল ভারী পাথরের ডালা নামিয়ে দেওয়াতে আল্‌তারাফ দুটো আপনি নীচে ঝুলে পড়েছিলো, মাঝের আল্‌তারাফটা বারম্বার খোলা-লাগানোর ফলে তার ছিদ্র বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তাই সেটা হুকের গায়ে চেপে বসে' গেছে, কিন্তু পাশের আল্‌তারাফের একটার কব্জা তো ঘোরেই নি, অপরটা নেমে পড়েছে বটে কিন্তু তার ছিদ্র হুকের আকারের সঙ্গে টায়-টায় মাপের বলে' সেটা আর আপনি চেপে বসে' যায় নি, যে এই সিন্দুক খুলে বন্ধ করেছিলো সেও চেপে লাগিয়ে দেয় নি।

যশোদা সিন্দুকের মধ্যে কি আছে দেখ্‌বার জন্য আল্‌তারাফ খুলে আল্‌তারাফ চেপে ধরে' ডালা তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু ভারী ডালা উঠ্‌লো না; তখন দু-হাতে দুটো আল্‌তারাফ চেপে ধরে' উপরে টান্‌তে লাগ্‌লেন; ভারী পাথরের ডালা একটু উঠ্‌লো; সিন্দুকের ডালা একটু ফাঁক হতেই সিন্দুকের ভিতর থেকে কেমন একটা পচা ভেপ্‌সা গন্ধ ভক্ করে' বেরিয়ে এলো। যশোদা তাড়াতাড়ি ডালা নামিয়ে দিয়ে নাকে কাপড় দিয়ে বল্‌লেন—ওমা! সিন্দুকটার ভিতরে কী বিট্‌কেল গন্ধ! ইঁদুর-মিহুর পচে' আছে না কি?

লোকেন্দ্র বল্‌লেন—কুড়ি বচ্ছর বন্ধ পড়ে' আছে, আর্শোলার নাদি-টাদি পচেছে……

যশোদা নাকে কাপড় জড়াতে জড়াতে বল্‌লেন—ধরো তো ডালাটা, খুলে ফেলি……তুমি নাকে রুমাল বাঁধো……

যশোদা আর লোকেন্দ্র ধরাধরি করে' পাথরের সিন্দুকের

ভারী ডালা খুলে ফেল্‌লেন। ভিতর থেকে খুব খানিকটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এলো। তাঁরা সবিস্ময়ে বিস্ফারিত-নেত্রে দেখ্‌লেন সিন্দুকের মধ্যে শুয়ে আছে একটি নরকঙ্কাল!

বিস্ময়ের উপর বিস্ময় সেই নরকঙ্কালটির সর্বাঙ্গ মণিখচিত স্বর্ণালঙ্কার!

সেই কঙ্কালটিকে দেখেই লোকেন্দ্র উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—এই তো অতুলনা!

ডাক্তার লোকেন্দ্র নরকঙ্কালটি দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লেন সেটি রমণীর কঙ্কাল এবং কঙ্কালের গায়ের অলঙ্কার দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লেন সে অতুলনা!

কঙ্কালের হাতের মণিবন্ধে জড়োয়া বালা চুড়ি, বাহুতে তাবিজ, গলায় হার, পায়ে পাঁয়জের জলজল কর্‌ছে, এবং বাঁ হাতের অনামিকা অঙ্গুলিতে একটি অঙ্গুরী অঙ্গুলির দুই গ্রন্থির মাঝখানের পর্বে তখনো সংলগ্ন হয়ে আছে স্খলিত হয়ে পড়ে' যায় নি। ঐ আংটিটি লোকেন্দ্র হ্যামিলটনের বাড়ীতে ফরমাস দিয়ে গড়িয়ে এনে আশীর্ব্বাদের দিন অতুলনার আঙুলে নিজের হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন; আংটিটি খিলানো, খিলের কব্জায় দুটি হাত দুদিক্‌ থেকে ছাড়ানো লাগানো যায়, লাগিয়ে দিলে দুটি হাত সংযুক্ত হয়ে পরস্পরের পাণিগ্রহণ করে; দুটি হাতের একটি হাত পুরুষের, সেই হাতের মণিবন্ধে শার্ট ও কোটের হাতার আভাস খোদিত আছে, অপর হাতখানি রমণীর, তার মণিবন্ধে আছে অলঙ্কারের আভাস; দুটি হাত যে-খিলের কব্জায় আট্‌কানো আছে তার সঙ্গে একটি সম্পূর্ণ গোলাকার স্বর্ণবেষ্টনীর মাঝখানে একটি হৃদয়াকৃতি সংলগ্ন আছে, সেই হৃদয়ের উপর মীনার কাজ করে' ও মণি বসিয়ে লোকেন্দ্র ও অতুলনার নামের আদ্যক্ষর জড়াজড়ি করে' লেখা আছে। লোকেন্দ্র কঙ্কালের হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে আংটিটি দেখে প্রফুল্ল মুখে বল্‌লে—এই অতুলনা! এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। সে লুকোচুরি খেল্‌তে গিয়ে এই সিন্দুকের মধ্যে লুকিয়েছিলো, তার পর সিন্দুকের ডালা হয় আপনি পড়ে' গিয়েছিলো বা সে নিজেই ঢাকা দিয়েছিলো, কিন্তু পরে আর ভারী ডালা তুল্‌তে পারে নি, আল্‌তারাফও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো; এই সিন্দুকে বন্দিনী হয়ে ভয়ে সে হয়তো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলো, অথবা ভিতর থেকে সে চীৎকার করেছে কিন্তু পুরু পাথর ভেদ করে' সেই শব্দ কারো শ্রুতিগোচর হয় নি। বাড়ীর সকলে সকল স্থানে অন্বেষণ করেছে, কিন্তু এই সিন্দুকে অতুলনার লুকানোর সম্ভাবনা কারো মনেও উদয় না হওয়াতে এই আসল জায়গাটাই খোঁজা হয় নি। আমরা অজ্ঞানতার বশে অতুলনার চরিত্র সম্বন্ধে কতো কু ধারণা করে' অবিচার করেছি! এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরে অতুলনার অঙ্গের মেদ মাংস ত্বক্‌ সব গলে' গেছে, কেবল কঙ্কালখানি তার সাধ্বীত্বের সাক্ষী হয়ে আজও বিরাজ কর্‌ছে!

যশোদা বিস্ময়ে ভয়ে অবাক্‌ হয়ে গিয়েছিলো; সে একটি কথাও বল্‌তে পার্‌লে না।

লোকেন্দ্র বল্‌লে—চলো, এখন বাড়ী বন্ধ করে' চলে' যাই····· পথে কাকা-বাবুকে একটা টেলিগ্রাম করে' দিয়ে যাবো, তিনি এই সংবাদ পেলে সুখী হবেন।

এককড়ি-বাবু লোকেন্দ্রের জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে স্খলিত বচনে স্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন—ওগো ওগো শুনে যাও······পরম সু-খবর এসেছে······ লোকেন্দ্র অতুলনার কঙ্কাল আমাদের বাড়ীতেই পেয়েছেন··· ···সে সেই পাথরের সিন্দুকে লুকিয়ে ছিলো······আমরা তো কল্পনাও করি নি যে সে সেখানে লুকাতে পারে, তাই ঐ জায়গাটাই খোঁজা হয় নি! তাই তো বলি অতুলনার মতন মেয়ের কি অমন কুপ্রবৃত্তি হতে পারে? আঃ! এতো দিনে বাঁচ্‌লাম!······

কোনো পিতা-মাতা সন্তানের মৃত্যুসংবাদ শুনে কখনো এতো আনন্দিত হন নি। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে একটি অনুশোচনা বিদ্ধ হয়ে রইলো—আহা! তখন যদি ঐ সিন্দুকটি খুলে দেখতাম! বৃদ্ধ দম্পতির আনন্দোজ্জ্বল মুখের উপর দিয়ে শোকাশ্রু গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো।

লোকেন্দ্র অতুলনার সালঙ্কার কঙ্কালটিকে নিজের বস্‌বার ঘরে সেই পাথরের সিন্দুকে করে'ই সযত্নে রেখে দিলেন।

এতে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন যশোদা! তাঁর মনে হিংসা ও ভয় মিশে রইলো; তিনি সেই সিন্দুকটা দেখ্‌লেই তাঁর গা ছম্‌ছম্‌ করে, মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে!

লোকেন্দ্র স্ত্রীর বিরাগ বুঝ্‌তে পেরেও অতুলনার সালঙ্কার কঙ্কালটিকে কাছ-ছাড়া কর্‌তে পার্‌লেন না। কুড়ি বৎসর পরে অতুলনার সঙ্গে তাঁর অভাবনীয় মিলন ঘটেছে!

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বার্ণাড্ শ'

গত ১১ই নভেম্বর বিশ্ব-বিশ্রুত আইরীশ মনীষী শ্রীযুক্ত জর্জ্জ বার্ণাড শ' তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার জন্য ১৯২৫ সালের "নোবেল পুরস্কার" পেয়েছেন। "নোবেল পুরস্কার" যে এবার জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম সাহিত্যিক পেয়েছেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। ইংরেজ হয়ত শ্রীযুক্ত 'টমাস হার্ডির' জন্য আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে; কারণ বার্ণ ড্ শ' ইংলণ্ড-প্রবাসী আইরীশম্যান হলেও ইংরেজ বার্ণাড্ শ'কে তত ভালবাসে না, যত ভালবাসে সে তার টমাস হার্ডিকে। 'টমাস হার্ডি' আজ এই "নোবেল পুরস্কার" পেলে ইংরেজ যতটা খুশী হ'তে পারতো, বার্ণাড্ শ'র এই সম্মানে সে ততটা সুখী হবে না; কারণ এটাকে সে কিছুতেই তার জাতীয় সম্মান ও গৌরব বলে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে না। 'টমাস হার্ডি' ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক। তাঁর পরিচয় আমরা বারান্তরে দেবো। 'নোবেল পুরস্কার' হয় ত তিনিও পাবার আশা ক'রতেও পারেন; কিন্তু বার্ণাড্ শ' যে তাঁর চেয়ে কোনও অংশেই অযোগ্য ন'ন, এ কথা মানতেই হবে। বহু দিন পূর্ব্বেই বার্ণাড শ'র এই সম্মান প্রাপ্য হয়েছিল। ইংরেজ বার্ণাড্ শ'কে দেখতে পারে না,—সে তিনি শুধু আইরীশম্যান ব'লে নয়, তিনি প্রচণ্ড শক্তিশালী লেখক। তিনি শুধু নির্ভীক ন'ন, তিনি দুঃসাহসিক! তিনি ইংরেজের সম্বন্ধে অনেক অপ্রিয় রূঢ় সত্য কথা জোর গলায় জগতের লোককে শুনিয়েছেন। তাই ইংরেজ বার্ণাড্ শ'র প্রতি প্রসন্ন নয়। যাক্ সে কথা, আমরা আজ ভারতবর্ষের পাঠকপাঠিকাদের কাছে এই আইরীশ মনীষীর উগ্র প্রতিভার একটু পরিচয় দিতে এসেছি মাত্র। সেইটুকুই দিয়ে যাই।

১৮৫৬ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের ডাবলীন্ শহরে এক সম্রান্ত বংশে বার্ণাড্ শ' জন্মেছিলেন। তাঁর পিতা একজন প্রধান শেরীফ্ ছিলেন। কিন্তু ১৮৭৬ সালে কোনও রাজনৈতিক কারণে তাঁর পরিবারবর্গ লণ্ডনে এসে বসবাস করতে বাধ্য হ'ন। বার্ণাড্ শ' সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত লণ্ডনেই বাস করছেন। লণ্ডনে আসবার সময় তাঁর বয়স একুশ বৎসর পূর্ণ হয় নি।

একজন ইংরেজ সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এক যায়গায় বলেছেন—"লোকে যে তাঁকে এ যুগের একজন বহু-প্রতিভান্বিত ব্যক্তি বলে, সে কথা ঠিক;—নাটকের ক্ষেত্রে ত' তাঁর তুলনাই হয় না; তাছাড়া আরও দু' তিনটি বিষয়ে তিনি যে বিশেষজ্ঞ শিল্পী, তাতে আর কোনও ভুল নেই; কিন্তু, শত্রু বৃদ্ধি করবারও এমন নিরুপদ্রব উপায় তাঁর মতো আর কারুরই জানা নেই! * * * সেই অপ্রাপ্ত-বয়স্ক আইরীশ বালক বার্ণাড্ শ' লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলেন যেন একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে যে, এক দিন তিনি আমাদের এতকালের জানা সমস্ত সংস্কার, সমস্ত বিশ্বাসের ভিত্তিকে সবলে নাড়া দিয়ে—উল্টে-পাল্টে তাকে সন্দেহ ও শঙ্কাজনক করে তুলবেনই! * * * তিনি আমাদের ভিতরে থেকেও যেন বাইরে দাঁড়িয়েই আমাদের ভিতরটাকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখছেন! তাঁর এই দর্শকের দৃষ্টির সম্মুখে পাছে আমাদের অভ্যন্তরটা কখন বে-আবরু হ'য়ে পড়ে—এই দুশ্চিন্তায় শ' আমাদের সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত ক'রে তুলেছেন। এই জন্যই তাঁর প্রতি আমরা বিরক্ত!"—কথাটা খুব ঠিক।

বার্ণাড্ শ' চিরদিন নিরামিষাশী থেকে, জীবনে কখন সুরা স্পর্শ না ক'রে ও ধূমপান না ক'রে ইংরেজ জনসাধারণের আরও অপ্রিয় হয়ে পড়েছেন। কারণ, এ ক'টাই ঠিক তাদের জীবনযাত্রার প্রয়োজনের বিপরীত! এর উপর আবার ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়েও তিনি একজন 'ফেবীয়ান্' ও সোশ্যালিষ্ট! এই আইরীশ যুবক বার্ণাড্ শ'র সমাজ-বিদ্রোহ-মূলক বক্তৃতা ও রচনাবলীর কোনও খোঁজই ইংরেজ

রাখতো না; কিন্তু পরে যেদিন ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে বার্ণাড্ শ'র নাটক অভিনয় হতে সুরু হ'ল—যখন তারা গিয়ে দেখলে যে, এ নাট্যকার তাদের বহু প্রাচীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে কেবলই তামাসা ক'রছে—তাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও কলকারখানার প্রতি দোষারোপ করছে,—বিদ্রূপ ক'রছে—তারা এতদিন যেগুলোকে তাদের জাতের গুণ ও বিশেষত্ব বলে সগর্ব্বে প্রচার ক'রে এসেছে—সেইগুলোকেই সে তার অদ্ভুত বিচার-শক্তির অব্যর্থ প্রভাবে যখন বিষম দোষ ও অন্যায় ব'লেই সপ্রমাণ ক'রে দিচ্ছে—তখন অধিকাংশ ইংরেজ উত্যক্ত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে বর্ব্বরের মতো প্রশ্ন করতে সুরু করেছিল—"কে এ হতভাগা লোকটা?"

ক্রমে তারা জানতে পারলে যে এই লোকটাই সেই 'Cashel Byron's Profession' নামে নূতন ধরণের একখানি চমৎকার সুন্দর উপন্যাস লিখেছে। "দি ষ্টার" নামক পত্রিকায় সুর-শিল্পের যে অপূর্ব্ব সমালোচনা প্রকাশ হ'য়েছিল তার লেখক Corno di Bassetto' এই বার্ণাড্ শ'রই ছদ্মনাম। বার্ণাড্ শ'র জননী একজন সুকণ্ঠ গায়িকা ছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যার একজন নিপুণা শিক্ষয়িত্রী বলেও তাঁর সুযশ ছিল। বার্ণাড্ শ' তাঁর প্রবন্ধে সঙ্গীত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে নিখুঁত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে পাঠকদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন, সে তাঁর মায়ের কাছ থেকেই শেখা। সেই প্রবন্ধে তিনি সেই সময়ের সব ক'জন জনপ্রিয় গায়িকা সঙ্গীতাভিনেত্রী ও রচয়িতাদের প্রবলভাবে আক্রমণ করেছিলেন। সেই অজানা অচেনা লেখকের লেখনীর এমনিই মুন্সিয়ানা ছিল যে, সেদিন সেই নির্দ্দয় কঠোর অজ্ঞাত সমালোচকের লেখার প্রত্যেক বর্ণটাই সত্য বলে সকলের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'য়েছিল। সকলের মনে হয়েছিল—এই প্রবন্ধকারের মতটাই ঠিক; আর তাদের নিজেদের ধারণা ভুল।
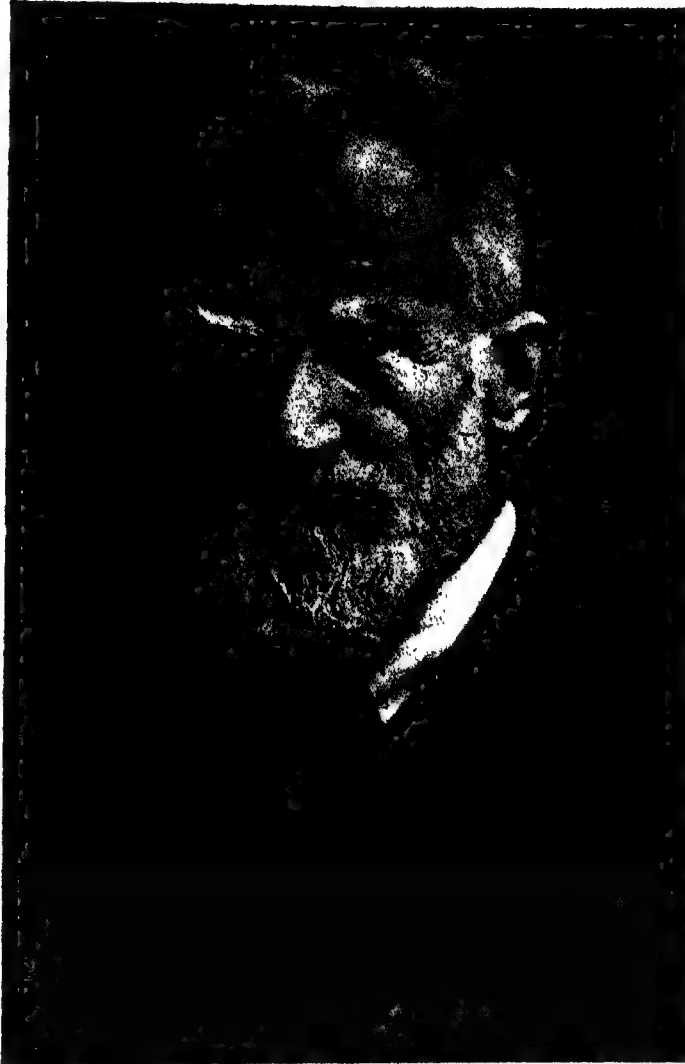
তারপরই জানা গেল যে, "The Pall Mall Gazette" 'The World' 'The Saturday Review' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতে 'Art Music and Drama' সম্বন্ধে যে সব চিন্তাশীল ও গভীর গবেষণা-পূর্ণ ও নানা নূতন তথ্য-সম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশ হ'তো, সেগুলি এই ব্যক্তিটিরই লেখা।

বার্ণাড্ শ'

ক্রমে এই সব প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রকাশ হওয়া বন্ধ হ'য়ে এসেছিল বটে, কিন্তু বার্ণাড্ শ'র বিখ্যাত সব নাটক

একখানির পর আর একখানি যেন একেবারে নিয়মিত ভাবে দ্রুত-আসতে সুরু করলে! Widowers' Houses নাটকখানি প্রকাশ হ'তে না হ'তেই এল তাঁর বিশ্ববিখ্যাত নাটক 'Mrs. Warren's Profession'। কিন্তু এই শেষোক্ত নাটকখানি এতকাল কোনও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হ'তে পারে নি; কারণ গভর্মেণ্ট পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে এত দিন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করা হয়েছিল। ১৯২৬ সালের আগে 'সেন্সার' (Censor) এ নাটকখানিকে কিছুতেই পাশ করে নি। আমেরিকা সর্ব্বপ্রথম এই নাটকখানি অভিনয় করতে সাহসী হয়। ১৮৯৪ সালে তার Arms and the Man' নাটকখানির অভিনয় হয়েছিল। এই সময়ই তিনি 'Candida' নামে তাঁর আর একখানি বিখ্যাত নাটক রচনা করেন; কিন্তু প্রায় ন' বৎসর পরে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

পরে তাঁর 'You Never can Tell' 'The Devil's Disciple' 'Caesar & Cleopatra' 'Captain Brass-bound's Conversion' 'John Bulls' other Island' 'Major Barbara' প্রভৃতি নাটকগুলি একে একে দেখা দিলে।

'Man and Superman' নাটকখানি প্রকাশ হবার পর থেকে যখন সমস্ত পৃথিবীর লোক বার্ণ ড্ শ'র বই নিয়ে আলোচনা সুরু করে দিলে, তখন তাঁর নিজের দেশের লোকেরা কিন্তু এক রকম স্থির করেই ফেলেছিল যে, বার্ণাড্ শ' যাই লিখুক না কেন, ও ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়! শ'র রচনা সব জ্ঞান-গম্ভীর স্থির-মস্তিষ্কের চিন্তা-প্রসূত বলে গ্রহণ করবার প্রয়োজন নেই! অবশ্য বার্ণাড্ শ' তাদের যত কিছু কটু জিনিস পেয়েছেন, লিখেছেন বটে, কিন্তু সে বোধ হয় তামাসা করেই!—একটু মজা দেখবার জন্যই তিনি আমাদের এই চিমটি কাটছেন!— মনে মনে তিনি মুখ টিপে হাসছেন নিশ্চয়।—এই ছিল তখনকার জন সাধারণের মনোভাব!

১৯০৯ সালে তাঁর 'The Showing up of Blanco Posnet' শীর্ষক নাটকখানি প্রকাশিত হয়েছিল; এবং এর দু'বৎসর পরে তাঁর আর একখানি প্রসিদ্ধ নাটক 'Fanny's First Play' প্রথম অভিনীত হয়। এই শেষোক্ত নাটকখানিতে তিনি নাট্য-সমালোচকদের রচনার ব্যঙ্গ অনুকৃতি (Parody) ক'রে তাদের অতি কঠোর বিদ্রূপ ক'রেছেন। তার পরই তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেছল—'Androcles and the Lion'। এই নাটকে তিনি অনেককেই চমৎকার বোকা বানিয়েছেন! এর পরই ১৯১৪ সালের বাসন্তী রাত্রে তাঁর নূতন নাটক Pygmalion মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। তখনকার সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা সার বীরভম্‌ট্রী ও সর্ব্বপ্রধানা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্যাট্রিক্ ক্যাম্পবেল তাঁর এই নাটকে অভিনয় ক'রেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ য়ুরোপে যুদ্ধ বেধে যাওয়াতে তখন কিছুদিনের জন্য সমস্ত থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেছল। কাজে কাজেই আমরাও তাঁর কাছ থেকে এ সময় আর নূতন কিছু নাটক পাই নি।

১৮৯৮ সালে Constable Co. তাঁর নাটকগুলি সব একত্র মুদ্রিত ক'রে প্রকাশ করাতে, দূরদেশের পাঠকদের পক্ষে শ'র রচনাবলির পূর্ণ আস্বাদ গ্রহণ করা সহজসাধ্য হয়েছিল। Plays Pleasant and Unpleasant বার্ণাড্ শ'র প্রতিভার প্রসাদ নিয়ে বিশ্বের রসিক জনের দ্বারে দ্বারে আজও অমৃত-ভোগ বিতরণ ক'রে ফিরছে!

১৯২৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে কোর্ট থিয়েটারে অভিনীত হ'য়েছিল তাঁর Back to Methuselah—এখানি শ'র এক বিরাট রচনা! এ বইখানিকে 'পঞ্চনাট্যচক্র' বা 'Meta-biological pentateuch' বলা যেতে পারে। এই নাটকখানিতে নাট্যকারের লিখিত একটি ভূমিকাই আছে প্রায় ১০০ পৃঃ। বার্ণাড্ শ'র প্রত্যেক নাটকের বিশেষত্বই হচ্ছে তাঁর এই বিস্তৃত বিশদ ভূমিকা! নাটকখানি পড়বার আগে তার ভূমিকাটি ভাল করে পড়'লে নাটকীয় ব্যাপার সংশ্লিষ্ট ইতিহাস—বিজ্ঞান—প্রত্নতত্ত্ব—মনস্তত্ত্ব—সমাজতত্ত্ব—রাজ-নীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ে অনেক নূতন নূতন জ্ঞানলাভ করা যায়।

বার্ণাড্ শ'র রচনাভঙ্গী অতি সুন্দর। কেবলমাত্র ভাষার দিক দিয়েই নয়—তাঁর ভূমিকার প্রত্যেক পাতাটির ছত্রে ছত্রে হাস্যরস ঝল্‌মল্ করে! সে রস একেবারে টাট্‌কা—নূতন— নির্ম্মল— ঝরঝরে— সরস—ঝাঁঝালো—চিন্তাভারে ঘন—কল্পনা-মাধুর্য্যে ভরপুর—বার্ণাড্ শ'র বিচিত্র বৈশিষ্ট্য ও অসীম প্রতিভার পূর্ণ পরিচায়ক!

১৯২৪ সালেই মার্চ্চ মাসে 'নিউ থিয়েটারে' তাঁর আর একখানি নূতন নাটক 'Saint Joan' অভিনীত হয়!

'জোয়ান অফ্ আর্কের' জীবনী অবলম্বনে রচিত এই মহানাটকখানি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে'ছিল। 'Back to Methuselah' এবং এই 'Saint Joan' নাটক দু'খানিই সম্ভবতঃ বার্ণাড্ শ'কে জগতের সাহিত্য-ক্ষেত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের আকাঙ্ক্ষিত সম্মান এনে দিয়েছে।

'Saint Joan' নাটকের ভূমিকায় বার্ণাড্ শ' এক স্থানে বলে নিয়েছেন যে, তাঁর প্রতিভা এখন অস্তগমনোন্মুখ, তাঁর রচনা-শক্তি ক্ষীণ হ'য়ে আস্‌ছে,—কল্পনার জ্যোতিও নিষ্প্রভ হ'য়ে পড়্‌ছে—কিন্তু তাঁর এই শেষ দুই রচনা প'ড়লে এ-সবের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না! বরং আশা হয় যে, তিনি আরও কিছুকাল বেঁচে থেকে আরও খানকতক এই রকম জগৎকে ভাবিয়ে তোলবার মতো বই লিখে রেখে যেতে পারবেন বোধ হয়।

নোবেল পুরস্কারের গুণ-মর্য্যাদা প্রায় লক্ষ টাকা (৬,৫০০৲ পাউণ্ড)! এ পর্য্যন্ত জগতের যত বড় বড় সাহিত্যিক এই সম্মান পেয়েছেন, তাঁরা কেউই, পুরস্কারের টাকাটা প্রত্যাখ্যান করবার মতো সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও, তা গ্রহণ কর'তে অসম্মত হ'ননি। কিন্তু বার্ণাড্ শ' একটি নূতন প্রস্তাবের সঙ্গে এই পুরস্কারের টাকাটা প্রত্যাখ্যান ক'রে কেবলমাত্র সুইডীশ এ্যাকাডেমীর নোবেল পুরস্কার কমিটিকে নয়,—বিশ্ব-জগৎকেও বিস্মিত ও চমৎকৃত করে দিয়েছেন। এ কাজ তাঁরই মতো বরেণ্য প্রতিভার যোগ্য!—এ সম্বন্ধে তিনি তাঁদের যে পত্র লিখেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, তিনি এই সম্মানের জন্য কমিটিকে তাঁর আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছেন; কিন্তু তাঁর বই'য়ের পাঠকেরা ও দর্শকেরা তাঁর প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থই তাঁকে দেয়; এবং তাঁর খ্যাতিও তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে যতখানি কল্যাণকর তার চেয়েও অনেক বেশী হ'য়ে পড়েছে। সুতরাং তাঁর কাছে এই টাকাটা আজ যেন—যে সাঁতার কেটে সাগর পার হ'য়ে নিরাপদে তীরে এসে পৌঁছেচে তাকে 'মগ্ন-ত্রাণ' (Life Belt) দিয়ে সাহায্য করার মতোই বোধ হ'চ্ছে। * * *

তিনি আরও বলেছেন যে—সুইডেন তাদের প্রস্তুত কাগজ কেনবার জন্য ইংরেজকে অনুরোধ করে বটে, কিন্তু সে সবই সাদা কাগজ—তাতে কালির আঁচড়টি পর্য্যন্ত থাকে না; আর তার সেই কাগজ ব্যবহার হয় কেবল অষ্ট্রেলীয়ায় উৎপন্ন আপেল মুড়ে প্যাক করে পাঠাবার জন্য!—অথচ সুইডেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মূল্যবান রপ্তানী যে তার সাহিত্য—সে সম্বন্ধে ইংরেজ-ব্যাপারীরা একেবারে শোচনীয় রকম অনভিজ্ঞ!

তাই বার্ণাড্ শ' প্রস্তাব করেছেন যে, তিনি এই সম্মান গ্রহণ ক'রলেন বটে, কিন্তু টাকাটা নেবেন না। সেই টাকায় একটা 'ফণ্ড' বা অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হোক্; এবং সেই ভাণ্ডারের বার্ষিক আয়—ইংলণ্ড ও সুইডেন পরস্পর পরস্পরের শিল্প ও সাহিত্য যাতে ভাল করে অনুশীলন করে, সেইরূপ কার্য্যে উৎসাহ দেবার জন্য ব্যয় করা হোক,—বিশেষ করে সুইডেনের অমূল্য গ্রন্থরাজির অনুবাদ প্রকাশে বিনিয়োগ করা হোক্!

কিন্তু কমিটি বার্ণাড্ শ'র এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই; কারণ, তাঁরা বলেছেন, পুরস্কারের টাকাটা না নেওয়া মানেই 'নোবেল পুরস্কার' প্রত্যাখ্যান করা! কমিটির একজন সভ্য স্পষ্টই বলেছেন যে, পুরস্কারের টাকাটা বার্ণাড্ শ' আমাদের যেরূপ ভাবে ব্যবহার করতে বলছেন, আমরা তা পারি না; কারণ, আমাদের সেরূপ করবার অধিকার নেই। তিনি যদি টাকা নিতে অসম্মত হ'ন, তাহ'লে অগত্যা আমাদের ১৯২৫ সালের নোবেল পুরস্কার কাউকে দেওয়া হ'ল না বলেই জমা ক'রে রাখতে হবে!—অগত্যা বার্ণাড্ শ' উপস্থিত এই গুণ-মর্য্যাদার দাক্ষিণ্য গ্রহণ করেছেন। শীঘ্রই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য-মতো টাকাটা একটা বিশিষ্ট ভাণ্ডারের জন্য দানপত্র ক'রে দেবেন।

আগামী বারে আমরা বার্ণাড্ শ'র দু'একখানি নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা ক'র্‌বো।

পথিক

কুমারী অনিমা দাসগুপ্তা

সকালে ব্রেকফাষ্টের টেবিলে বেয়ারা একটা ট্রে-বোঝাই চিঠিপত্র দিয়ে গেল। তার মাঝে একখানা খামের উপর লাল পেন্‌সিল দিয়ে মোটা মোটা করে লেখা—urgent। কাজেই সেখানাই আগে খুলে ফেল্‌লাম। চিঠি-খানা পড়ে আমার ব্রেকফাষ্টের নেশা এবং অন্যান্য চিঠিগুলি পড়বার ইচ্ছা মুহূর্ত্তেই নিবে গেল।

মোম্বাসা থেকে জেনারেল ম্যানেজার লিখ্‌ছেন—"আঠারোই তারিখে সস্ত্রীক ডক্টর বোস্ কারখানা ভিজিট করতে যাচ্ছেন—তাঁদের সযত্নে সব দেখাবে। তাঁদের কোন বিষয়ে কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখ্‌বে। আর তাঁরা তোমার স্বদেশবাসী বলে, কোম্পানীর পক্ষ থেকে তাঁদের আতিথ্যের এবং অভ্যর্থনার ভার তোমার উপর দেওয়া গেল। আশা করি, তুমি তোমার স্বদেশবাসীর উপযুক্ত অভ্যর্থনা ক'রবে।"

কি সর্ব্বনাশ! আজই যে আঠারোই—তাড়াতাড়ি কোন গতিকে চা, ডিম, টোষ্টগুলা গলাধঃকরণ ক'রে বেয়ারাকে ডেকে আমার ড্রয়িংরুমটা আর ভিজিটারদের বাংলোটা ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে রাখ্‌তে বলে দিলাম।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম, আটটা বেজে কয়েক মিনিট হয়েছে। মোম্বাসা থেকে মেইল্ ট্রেণ এখানে এগারোটায় পৌছবে। আর, এই তিন ঘণ্টার ভেতর কারখানা, লেবরেটারী, বাংলো সব কি করে আমি ঠিক করে নিই? ম্যানেজার সাহেব কি হঠাৎ আমাদের এই কালা আদমীদের সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন মনে করলেন না কি? এক দিন আগেও খবর দিতে পারলেন না? সন্দেহ ভাঙ্গবার জন্য আর একবার চিঠিখানা পড়লাম। না, ভুল হয় নি—এই ত স্পষ্ট লেখা—"আঠারোই তারিখে সস্ত্রীক ডক্টর বোস্ কারখানা ভিজিট করতে যাচ্ছেন—"। চিঠির তারিখ ও মোম্বাসার ডাকঘরের শিল দেখলাম ১৫ই তারিখের—তবে ত এ চিঠি কাল—সতেরই তারিখে পাওয়ার কথা! হঠাৎ মনে হল, পথে লাইন ভেঙ্গে যাওয়ায় কালকের মেইল ট্রেণ আজ ভোরে এখানে পৌছেছে—আর তাই আমার চিঠি পেতে এক দিন দেরী হয়ে গিয়েছে! একেই বলে দৈব বিড়ম্বনা!

যথাসম্ভব ঘর-দোর সাজিয়ে, নিজে সেজেগুজে, এগারোটা বাজতে কয়েক মিনিট থাকতেই বেয়ারা চাপরাশীদের নিয়ে ষ্টেসনে গিয়ে হাজির হলুম।

কিছুক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মে পায়চারী করতেই ট্রেণ এল। ফার্ষ্ট ক্লাশ কম্পার্টমেন্ট থেকে বসু-দম্পতী নাম্‌লেন। তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রতে আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাছে গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমার মুখ দিয়ে একটা কথাও বেরুল না—শুধু অবাক হয়ে মিসেস্ বোসের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তিনিও যেন আমায় দেখে প্রথমে কেমন বিহ্বল হয়ে গেলেন। তার পর নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বললেন,—আপনি!

এতক্ষণে যেন আমার বাক্‌শক্তি ফিরে এল, বললাম—হাঁ, কোম্পানীর পক্ষ থেকে আমি আপনাদের রিসিভ কর্ত্তে এসেছি।

ডক্টর বসু এতক্ষণ অবাক হয়ে আমাদের কথা শুন্‌ছিলেন, আর দুজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। এখন যেন ব্যাপারটা খানিক বুঝতে পেরে বললেন,—এ কি, আপনারা পরস্পর পরিচিত?

খানিকটা কৈফিয়তের সুরে মিসেস বললেন,—হাঁ, তুমি যখন বিলেতে, তখন এঁর সঙ্গে আলাপ হয়—ইনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তার পর হঠাৎ এক দিন কাউকে কিছু না বলে ইনি যে ডুব মারলেন, তার পর আর দেখা নেই। হেসে ডক্টর বসু বললেন,—Thank God, তোমার ভাগ্য ভাল নীলি, এই দূর দেশে ভগবান্ একজন বন্ধু জুটিয়ে দিলেন।

আমি বল্‌তে গেলাম,—এখানে আপনাদের অতিথিরূপে পাওয়া আমার অতি বড় সৌভাগ্যের কথা—

বাধা দিয়ে মিসেস বসু বললেন—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার সৌভাগ্য, আপনি ধন্য হবেন—সব মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এগুলো বাড়ী গিয়ে বল্‌বেন—এখন চলুন তো আপনার বাংলোয়।

খানিকটা অপ্রস্তুত হয়েই বেয়ারাকে লাগেজগুলো বুঝে আস্তে বলে বসু-দম্পতীকে নিয়ে ষ্টেসনের বাইরে মোটরের দিকে চল্লাম।

এই সেই নীলিমা—যাকে পথে পেয়েছিলাম, আবার যাকে হারিয়ে বিশ্বের পথেই বেরিয়ে পড়েছিলাম! কিন্তু হায়, জগৎটা কি এতই সীমাবদ্ধ যে, এর কোন প্রান্তে গিয়েও একটী পরিচিত চক্ষুর আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখা যায় না! অন্ধকার রুদ্ধ ঘরের মতই কি চল্‌তে চল্‌তে এক প্রান্তে গিয়ে, গতি প্রতিহত হয়ে, মানুষ ঘুরে ঘুরে এক যায়গায়ই ফিরে আসে? নইলে যাকে দূরে রাখ্‌ব বলে দেশ ছেড়ে বেরুলাম, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, 'যাক্, তার সঙ্গে আর দেখা হবে না'—তার সঙ্গেই দেখা হ'ল ছ'হাজার মাইল দূরে আফ্রিকার বনে-ঘেরা এই ক্ষুদ্র গাঁয়ে!

কলকাতায় তখন মেসে থেকে বি-এসসি পড়তাম! কলেজের পড়া আর ল্যাবরেটারীর প্র্যাক্‌টীক্যাল শেষ করে যেটুকু সময় পেতাম, তা আমার ঘরের সাম্‌নে ছোট বারান্দাটীতে বসেই কাটিয়ে দিতাম! তখনই নীলিমাকে প্রথম দেখি। মেসের পাশের ছোট বাড়ীটা বহু দিন ভাড়াটের অভাবে তালাবন্ধ পড়ে ছিল। তার পর হঠাৎ এক দিন কোথা থেকে এক বুড়ো বাপ আর তাঁর তরুণী মেয়ে এসে সেখানে তাদের ছোট সংসারটী পাত্‌ল। দূরে থেকে এদের বিষয়ে এইটুকু মাত্র জান্তে পেলাম যে, রোজ দশটায় খাওয়া দাওয়া করে মেয়েটী এক বোঝা বই নিয়ে বাপের সঙ্গে বেরিয়ে যায়; আবার পাঁচটার সময় বাপের সঙ্গে বাড়ী ফেরে। এ ছাড়া তাদের বিষয়ে তখন আর কিছু জান্তে পারি নি—বোধ হয় জান্‌বার মত কিছু ছিলও না।

প্র্যাক্‌টীক্যাল ক্লাশ না থাকায় সেদিন একটু আগে ছুটী পেয়েছিলাম। মেসে ফিরছি, দেখি, ঠিক আমাদের গলির মোড়ে একটা চোর ধরা পড়েছে—বেজায় ভীড়। উপস্থিত সবাই বেচারার প্রতি একটা কিছু দণ্ডের ব্যবস্থা করছে। হঠাৎ এক দিকে দৃষ্টি পড়ায় দেখলাম, পাশের বাড়ীর সেই মেয়েটী নিতান্ত অসহায় ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভীড়ে পথ বন্ধ—যেতে পারছে না—তাকে দেখেও কেউ পথ ছেড়ে দিচ্ছে না। মেয়েটীর এই বিব্রত বিপন্ন ভাব দেখে, আমি কাছে এগিয়ে নমস্কার করে বললাম,—দেখুন, আপনি আমায় চেনেন না বটে, কিন্তু আমি আপনাদের প্রতিবেশী—যদি আমার দ্বারা আপনার কোন উপকার হয়—মেয়েটী একবার আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে কি ভাব্‌তে লাগ্‌লো। তার এই ইতস্ততঃ ভাব দেখে আমি আবার বললাম,—আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারেন,—আমি আপনাদের পাশের বাড়ীতেই থাকি। মেয়েটী এবার চোখ তুলে বলল,—দেখুন, এই ভীড় ঠেলে আমি যেতে পারছি না—আপনি যদি দয়া করে বাড়ী পৌঁছে দেন। আমি বললুম,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—চলুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি—কিন্তু তার আগে আমার একটা আরজি রাখ্‌তে হবে—ঐ মস্ত বইয়ের বোঝাটা আমায় দিতে হবে—নৈলে বড় বিশ্রী দেখ্‌তে হয়!

একটু করুণ হাসি হেসে মেয়েটী তার বইগুলি আমায় দিলে—সে হাসিটুকু যেন বল্‌তে চাইল—রোজই ত এই বই আমি নিজে বয়ে থাকি—এ আর বোঝা কি?

ভীড় পেরিয়ে কিছু দূর গেলে আমি বললাম,—মাফ্ কর্‌বেন, আপনি কি রোজই একা কলেজে যান্?

মেয়েটী যেন এ প্রশ্নে একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। তার পর বলল,—না, বাবা আমায় কলেজে পৌঁছে দিয়ে অফিসে যান্; আবার ফেরবার সময়ে সঙ্গে করে আনেন। কিন্তু আজ ক'দিন তাঁর জ্বর—এই যে আমাদের বাড়ী এসে পড়েছি—ব'লে সে তাদের বাড়ীর দরজার সাম্‌নে থেমে দাঁড়াল। বইগুলি তার হাতে দিয়ে নমস্কার করে বিদায় নিচ্ছি, এমন সময় যেন এতক্ষণের সব দ্বিধা, ইতস্ততঃ ভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল,—বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবেন না?

বললাম—এখন আমায় মাফ্ করুন, অন্য সময় তাঁর সঙ্গে দেখা কোরব।

—কোরবেন কিন্তু—নইলে আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে আমায় বেজায় বকুনি খেতে হবে।

—হ্যাঁ কোরব, বলে একটা নমস্কার করে চলে এলাম।

সেদিন সন্ধ্যা বেলায় নীলিমাদের বাড়ী গেলাম। নীলিমার বাবা আনন্দ বাবুর সঙ্গে অনেক কথা হ'ল। কথায় কথায় বললেন,—ঐ আমার একমাত্র অবলম্বন বাবা! ওর এক বছর বয়সের সময় ও ছাড়া আর সবাই আমায় ছেড়ে যায়। তখন থেকে শুধু ওর মুখ চেয়েই এই আঠার বছর কোন গতিকে কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ওকে আমি যেমনটি চাই তেমনটী করে ত রাখতে পারিনে। দেখ বাবা, ওর পড়বার যেমন ঝোঁক, তেমনি ঘরের সব কাজ করে সময়ও নিতান্তই কম পায়। তাও আবার আমার অসুখ বিসুখ হ'লেও ওর কলেজ বন্ধ! আজ জেদ করে একা কলেজে গিয়েছিল; কিন্তু যে রকম ব্যাপার ঘটল, তাতে তুমি না থাকলে কতক্ষণে যে বাড়ী আসত বা কি ঘটত বলা যায় না। তার পর তাঁর সাংসারিক নানা কথা বললেন। যা সামান্য মাইনে পান্ তা থেকে ভবিষ্যতে মেয়ের জন্য যে কিছু রেখে যেতে পারবেন এমন ভরসা নাই। মেয়েকে এক উচ্চ শিক্ষা ছাড়া আর বিশেষ কিছু তিনি দিয়ে যেতে পারবেন বলে মনে হয় না—ইত্যাদি।

চা খেতে খেতে আমি আনন্দ বাবুকে বললাম,—আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনি যতদিন না সেরে ওঠেন সে কয়দিন না হয় আমিই ওঁকে কলেজে পৌঁছে দেব। আমারও কলেজ ত ঐ দিকেই—

বাধা দিয়ে আনন্দ বাবু বললেন,—না, না, বাবা, সে যে তোমার উপর বড় অন্যায় করা হবে।

আমি বললাম,—না, না, আপনি তা ভাবলে আমি বিশেষ দুঃখিত হব। আমি যদি আপনাদের এতটুকু কাজে লাগতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে কোরবো।

দুই একবার আপত্তি করে শেষে আনন্দ বাবু রাজী হলেন। আনন্দ বাবুকে আরও এক সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। এই কয়েকদিন আমিই নীলিমাকে কলেজে পৌঁছে দিতুম, আবার চারটের পরে তাকে বাড়ীতে নিয়ে আসতুম। তার পরেও সময় অসময়ে ওবাড়ীতে আমার ডাক পড়ত,—মাঝে মাঝে খাবার নিমন্ত্রণও হ'ত।

সেদিন কি জন্য কলেজ বন্ধ ছিল। আনন্দ বাবু আমাকে নীলিমার সঙ্গে দুপুরটা কাটাতে বলে অফিসে গেলেন।

দুপুর বেলা আনন্দ বাবুর বাড়ী গিয়ে দেখলাম, পড়বার ঘরে চেয়ারের পিঠে চুল এলিয়ে দিয়ে দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে নীলিমা কি পড়ছে। চেয়ারের পাশে মাটীতে তার শাড়ীর আঁচল লোটাচ্ছে। তার খোলা চুলের গন্ধে ঘর ভরপুর! সে গন্ধ যেন আমার মনটাকেও মাতাল ক'রে তুলছিল।

আমি এসেছি সে তা টের পায় নি—পিছনে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ নয়নে তার সেই তন্ময় মূর্ত্তি দেখছিলাম। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ডাকলুম,—নীলা—

চম্‌কে উঠে আমায় দেখে তাড়াতাড়ি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে সে বলল,—এ কি, আপনি কতক্ষণ এসেচেন?

বললুম,—এই এখুনি আসচি।

একটা চেয়ার সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নীলিমা বলল,—দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন না। তার পর আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু ব্যস্ত ভাবে বলল—আপনার শরীর আজ ভাল নেই না কি? চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে বললাম, না নীলিমা, আমার শরীর বেশ ভালোই আছে। আজ তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে—মন দিয়ে শুনো। কারণ, তার ওপরেই আমার জীবনের সুখ শান্তি, আশা ভরসা সব নির্ভর করছে—বলতে বলতে তার একখানা হাত দুহাতে চেপে ধরে বললাম,—যেদিন তোমায় দেখেছি, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার আগে, সেদিন থেকে তোমায় আমি চাইছি—প্রাণ দিয়ে বুক দিয়ে বল নীলা, তুমি আমার হবে, আমার এ চাওয়া সফল করবে? বল, বল, চুপ করে রইলে যে—বল, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি!

হাত ছাড়াবার কোন চেষ্টা না করে সে কাঁপা গলায় বলল, কিন্তু সে যে হবার নয় অমিয় বাবু, আমি বাগ্‌দত্তা—

তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললাম,—বাগ্‌দত্তা! তুমি বাগ্‌দত্তা নীলিমা! কার কাছে, কে সে সৌভাগ্যবান্?

নীলিমা বলল,—হ্যাঁ, সেটা জান্তে চাইবার অধিকার আপনার আছে। তিনি বাবার বন্ধুপুত্র, জার্ম্মাণীতে সায়ান্স পড়তে গিয়েছেন।

হায় রে আমার দুরাশা! কোথায় জার্ম্মাণীতে শিক্ষা-

প্রাপ্ত ধনী বন্ধুপুত্র আর কোথায় আমি মধ্যবিত্ত ঘরের বি-এস্ সি-পড়া ছেলে!

জিজ্ঞাসা করলাম—সেই জন্যেই বুঝি তোমায় বাবা তোমায় এত পড়াচ্ছেন?

দ্বিধা ভরে নীলিমা বলল,—না—ঠিক সে জন্যেও নয়—তবে সেও একটা কারণ বটে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম,—আমায় মাফ কোরো নীলিমা, না জেনে তোমায় বিরক্ত করেছি। সে কোন কথা না বলে একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগ্ল। তাকে নীরব দেখে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়্লাম।

সেই সময় শুন্লাম, এক কোম্পানী থেকে আফ্রিকায় অফিসার নিচ্ছে। ভাবলাম এই সুযোগ, দেশ থেকে পালাবার এই একমাত্র উপায়। তার পর এক মাসের ভেতরেই কাজ ঠিক করে ভারতের কাছে চির-বিদায় নিয়ে বোম্বে থেকে জাহাজে উঠ্লাম।

* * * *

দিন দশেক অংস্থানের পর ডাক্তার বোস আমাকে খুব উচ্চ সার্টিফিকেট দিয়ে এবং আমার বেতন বৃদ্ধির জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের কাছে এক অনুরোধ-পত্র দিয়ে সস্ত্রীক বিদায় নিলেন।

আমি সেই-দিনই ম্যানেজার সাহেবকে পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দিয়ে য়ুরোপগামী জাহাজে আমার বার্থ রিজার্ভ করে তার কবে দিলাম।

বিশ্বের অন্তঃহীন পথের পথিক আমি—এই ত আমার চলা আবার সুরু হ'ল। কোথায় এ চলা শেষ হবে—কে জানে?

রাশিয়া

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(১)

রাশিয়া ইয়োরোপের অধিকাংশ এবং এসিয়ারও অংশ লইয়া গঠিত। রাশিয়াকেই একটি মহাদেশ বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হয় না। সেই জন্য রাশিয়ার লোকদের চরিত্রেও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এই উভয় দেশের লোকদের চরিত্রের অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। রাশিয়া ইয়োরোপের পূর্ব্ব প্রান্তে এবং এশিয়ার উত্তরে অবস্থিত। রাশিয়ার এসিয়াস্থিত অংশের নাম সাইবেরিয়া। খৃঃ ১৩ শতাব্দীতে মোঙ্গল এবং চীনারা রাশিয়াদেশ প্রায় ছাইয়া ফেলে। অনেকে কিছু কাল পরে রাশিয়া ত্যাগ করে; কিন্তু অনেকেই এই দেশে পাকাপাকি রকমে বসবাস করিতে আরম্ভ করে। রাশিয়ার লোকদের চরিত্রে ইহারা এসিয়ার প্রভাব অনেক পরিমাণে আনে। রাশিয়ার অনেক অংশে এখনও খাঁটি মোঙ্গল বা টার্টার জাতীয় লোকের বাস আছে। ইহারা বিবাহাদির সূত্রে রাশিয়ার আদিম লোকদের সহিত মিশিয়া যায় নাই। রাশিয়ার দক্ষিণ অংশে স্লাভ জাতির বাস। ইহারা শ্বেতাঙ্গ জাতিদের এক শ্রেণী। কিন্তু খৃঃ ৯৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত ইহাদের অসভ্য বলিয়াই গণ্য করা হইত। ৯৮৮ খৃঃ অব্দে ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর সামান্য পরিমাণে খৃষ্টীয় সভ্যতার অধিকারী হইল। ইহাদের হয় ত ইয়োরোপের অন্যান্য জাতিদের মতই সভ্য হইয়া উচিত; কিন্তু এসিয়ার নানা অসভ্য জাতির আক্রমণ ইহাদিগকে তাহাতে প্রভূত পরিমাণে বাধা দিয়াছে। রাশিয়াতে যদি এই সমস্ত আক্রমণকারীরা বাধা না পাইত, তাহা হইলে ইয়োরোপের অন্যান্য অংশের লোকদের সভ্যতার গতি কি হইত, তাহা বলা যায়

না। তবে ইহা বলা যায় যে, রাশিয়া নিজে সভ্যতা লাভ না করিলেও, সভ্যতার আক্রমণকারীদের বাধা দিয়া ইয়োরোপের অন্যান্য অংশের লোকদের নিরুপদ্রবে সভ্যতা লাভে ... করিয়াছিল। এই উপকারের জন্য রাশিয়ার প্রতি ইয়োরোপের অন্যান্য অংশের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

রাশিয়ার মধ্য এবং দক্ষিণ অং... বিশেষ করিয়া স্লাভ রাশিয়ানদের বাস। ইহাদিগকে "The Little Russian" বলা হয়। যাহারা "The Great Russian" বলিয়া পরিচিত, তাহারা স্লাভ এবং ফিন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হইয়াছে। টার্টারদের প্রভাবও ইহাদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে। খৃষ্টীয় ১৩ শতাব্দীর মোজল আক্রমণের পর এই "Great Russian"রাই শক্তিশালী হইয়া পড়িল। কিভ্ (Kiev) নামক স্থান হইতে ইহারা মস্কাও সহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করে। 'পিটার দি গ্রেট' এই মস্কাও সহর হইতে, পিটার্সবার্গ সহর নির্ম্মাণ করিয়া, সেইখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। গত মহাযুদ্ধের পর পিটার্সবার্গের নাম হইয়াছে পেট্রোগ্রাড্। সোভিয়েট রাশিয়ার রাজকার্য্য এই স্থান হইতেই পরিচালিত হয়।

রাশিয়ার শিক্ষা-বঞ্চিত সাধারণ লোক

পিটার দি গ্রেট রাশিয়ার রাজা হইবার পূর্ব্বে রাজনৈতিক জগতে রাশিয়ার কোন স্থান ছিল না। রাজা পিটার রাশিয়াকে তাহার বিষম রাজনৈতিক দুরবস্থা হইতে উত্তোলন করেন। কেবল রাজনৈতিক নহে, রাজা পিটার বহু প্রকার হীন অবস্থা হইতে রাশিয়াকে উদ্ধার করেন। এইজন্য তাঁহাকে ... সমস্ত জীবন ধরিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে ...। পিটার দি গ্রেট অবশ্য সকল রকমে রাশিয়ার ... ভালই যে করিয়াছিলেন, তাহা নয়,—কয়েকটি ... বিষয়ে তাহার অত্যন্ত অনিষ্টও করিয়াছিলেন ...।

তাঁহার মত ছিল যে, রাজ...ই দেশের সকল প্রকার শক্তির উৎস বা মূল ... থাকিবেন। তাঁহার বিনা অনুমতিতে বা তাঁহাকে ... বাদ দিয়া কোন কার্য্য চলিতে পারে না ...। রাজ-কর্ম্মচারীর সংখ্যা তিনি অসম্ভব ... রকম বর্দ্ধিত করেন। সকল রকম রাজকর্ম্মচা...কে তাহার পদানুযায়ী বিশেষ কোনো উর্দ্দী পরিধা...ন করিতে হইত। রাজার সহিত দেখা করিতে ...ইলে রাজ-মন্ত্রীদেরও বিশেষ উর্দ্দী পরিধান ... করিয়া রাজ-সকাশে হাজির হইতে হইত। এম...ন কি, বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেদের উর্দ্দী প...রিয়া অনেক সময় বিদ্যালাভ করিবার জন্য বিদ্যাল...য় হাজির হইতে হইত। পিটার রাজ্যমধ্যে ১৪ শ্রেণীর ওমরাহ্ সৃষ্টি করেন। বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উন্নতি লাভ করিতে পারা যাইত। রাজকর্ম্মচারীদেরও শ্রেণী ভাগ করা হয়। নিম্ন শ্রেণীর কোন রাজকর্ম্মচারী কোন এক উচ্চ

শ্রেণীতে উঠিবার জন্য অনেক সময় প্রাণপণ করিয়া রাজকর্ম্ম সম্পাদন করিত। রাজাকে কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে উন্নতি লাভ সহজসাধ্য হইত।

উচ্চ শ্রেণীর ওমরাহ বা রাজকর্ম্মচারীরা সাধারণের নিকট হইতে অত্যন্ত সম্মান লাভ করিত—কিন্তু এই সম্মানের সহিত ক্ষমতার কোন যোগ ছিল না। ওমরাহদের বিশেষ

মস্কাওয়ের বাজার (বর্ষায় জলে প্লাবিত)

কারুকার্য্য-খচিত একটা বিরাট কামান

রেড স্কোয়ারে বেসিল গির্জ্জা

মস্কাওয়ের গির্জ্জা
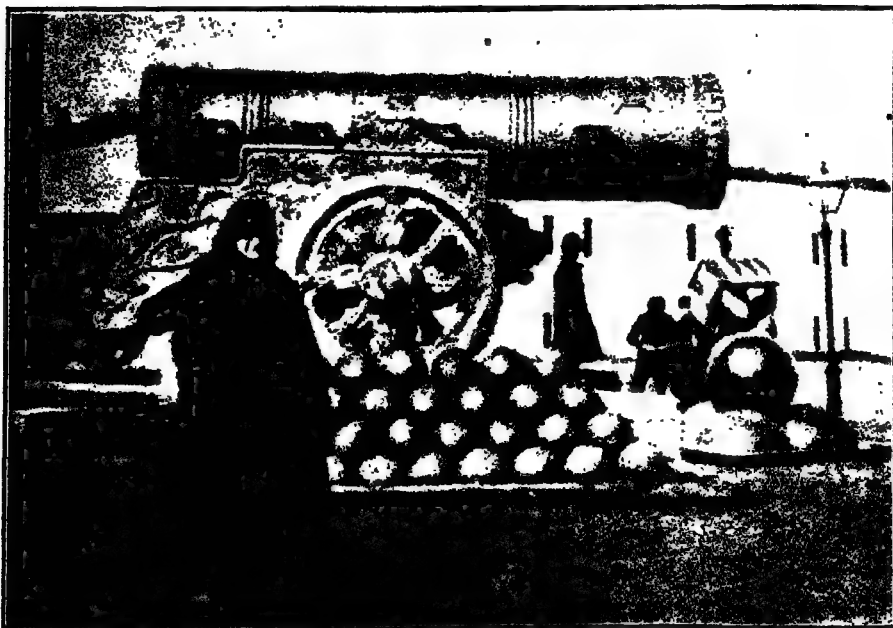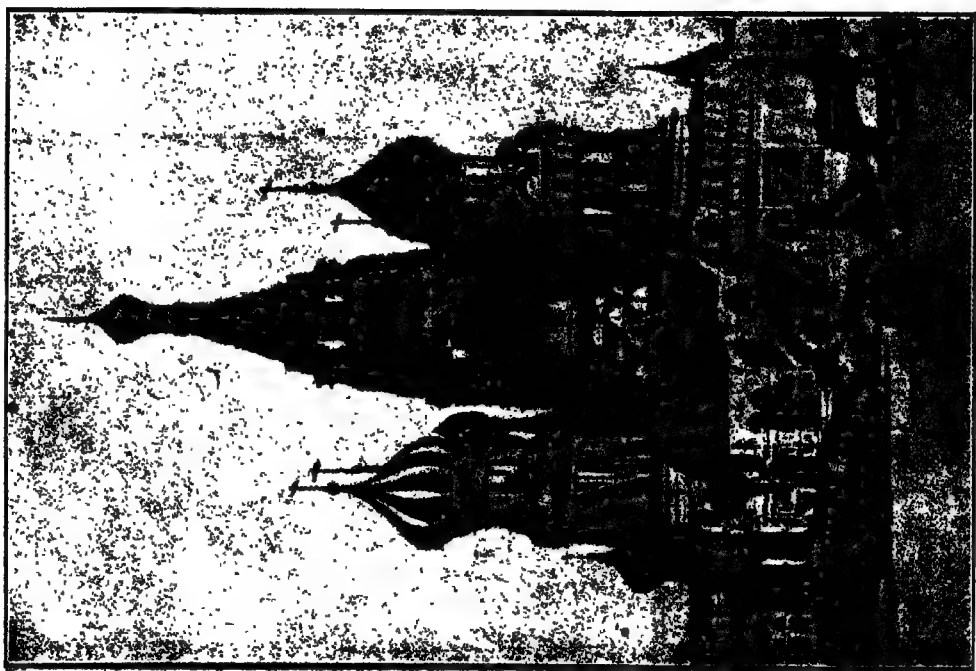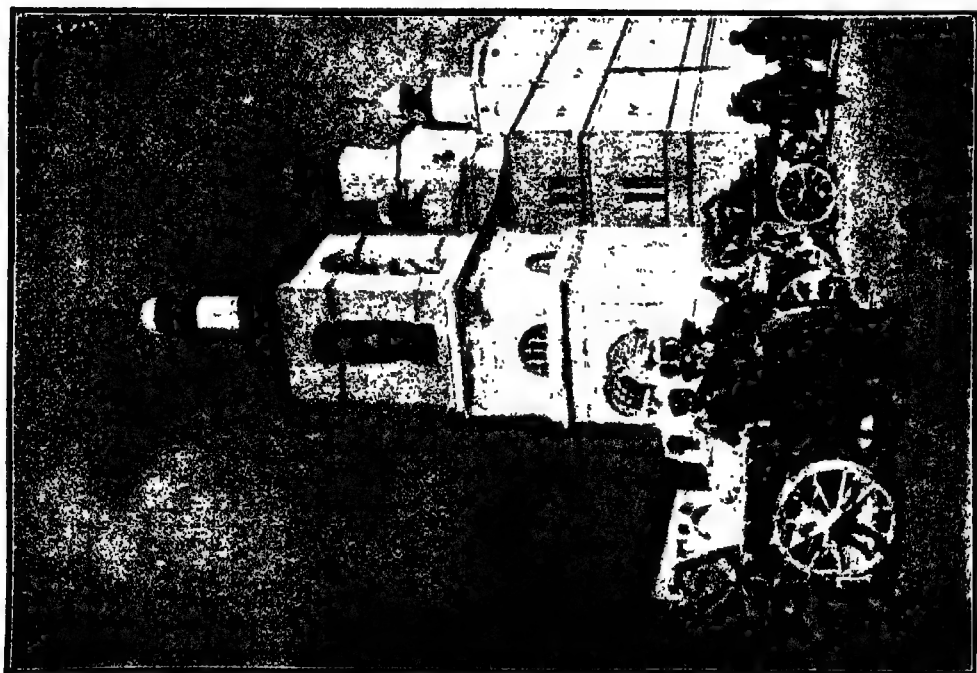
কোন ক্ষমতা ছিল না। তাহারা ছিল রাজার হুকুমের চাকর। রাজ-আজ্ঞা পালনের যোগ্যতা এবং তৎপরতার উপরেই পদগৌরব মূলতঃ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

শেকভের গল্পে এই সময়কার রাশিয়ান চরিত্র সম্বন্ধে অনেক হাস্যকর বিষয় জানিতে পারা যায়। সাধারণ লোকে এবং নিম্নপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা ওমরাহ বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্ম-

সন্ন্যাসীদের মঠ
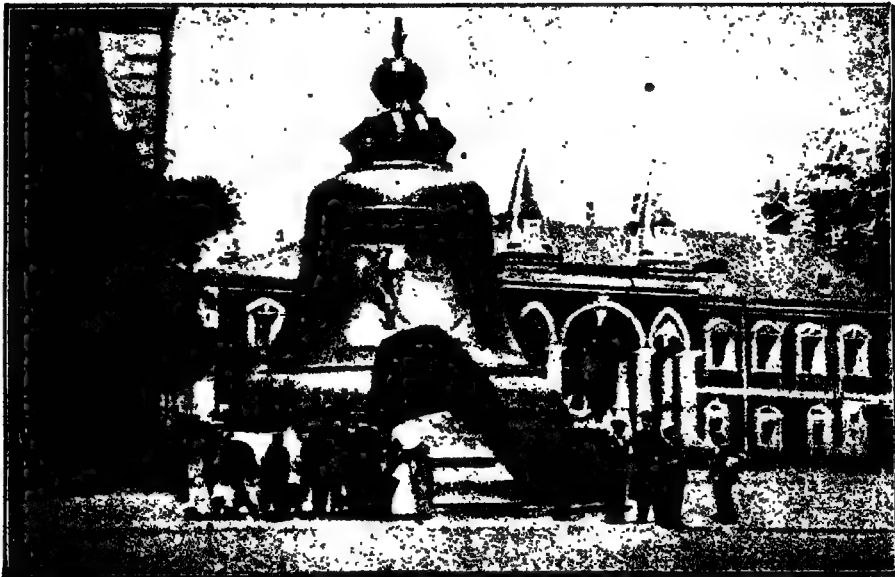
পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম ঘণ্টা

চারীদের অত্যন্ত সম্মান এবং ভয় করিত। একটি গল্পে আছে:—একজন কেরাণী থিয়েটার দেখিতে গিয়া হঠাৎ নায়কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। ড্রপ্-সিন যতবার পড়িল, সে প্রত্যেকবার সেনানায়কের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

লুরিয়ানস্কি স্কোয়ার—মস্কাও

মস্কাওয়ের রাজপথ

তাহার সামনে উপবিষ্ট একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়কের সামনে হাঁচিয়া ফেলে। হাঁচিয়া ফেলিয়াই কেরাণী সেনা- থিয়েটার ভাঙ্গিলে পর সে আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। পরদিন সকাল, বিকাল, সন্ধ্যায়, সেনানায়কের বাড়ী গিয়া

সে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আসিল। পরদিন, তাহার পরদিন ক্রমান্বয়ে এই প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপার চলিল। করিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়া জাহান্নমে চলিয়া গেল। গল্পটি কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে লেখা কি না বলিতে পারি না।

মৃত সৈনিকের সমাধি-যাত্রা

অবশেষে দিন দশ পরে সেনানায়ক ক্রুদ্ধ হইয়া সেই হাঁচিবার অপরাধে বিষম অপরাধী কেরাণীকে বলিল যে, "তুমি জাহান্নমে যাও।" এই কথা শুনিয়াই কেরাণী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন যাহাই হউক, এই গল্প হইতে সেই সময়ের রাশিয়ানদের চরিত্রের একটা দিকের খানিক আন্দাজ পাওয়া যায়।

'জার'দের রাজত্বকালে রাশিয়ার গরীব লোকেরা

বরফ-বিক্রেতা ও বরফের গাড়ী

রাজ-কর্ম্মমাত্রকেই অতিশয় সম্মান দেখাইত। এই অতি-সম্মানের জন্ম ভয় হইতে। রাজকর্ম্মচারীরা প্রায় সকলেই অত্যন্ত অত্যাচারী এবং ঘুষখোর ছিল। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন নালিশ চলিত না; কারণ, নালিশ করিবে কাহার কাছে? সকল রাজকর্ম্মচারাই প্রায় সমান ছিল। সেইজন্য সাধারণ এবং গরীব লোকরা মুখ বন্ধ করিয়া সকল অত্যাচার

মস্‌কাও নগরের চৌরাস্তা

জেরুসালেমের গির্জ্জার অনুকরণে নির্ম্মিত মসকাওয়ের একটি গির্জ্জা

সহ্য করিত। তাহারা মনে করিত, তাহাদের অদৃষ্টে ইহা লেখা আছে, অতএব ইহা খণ্ডন করিবার শক্তি পৃথিবীর

রাশিয়ান জমিদারের তিন ঘোড়ার গাড়ী

কোন লোকের নাই। অতএব যাহা অখণ্ডনীয়, তাহা খণ্ডন করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কি লাভ?

রাশিয়ার সাধারণ লোকদের ভিতর এখনও এই মনোভাবের যথেষ্ট প্রাবল্য দেখা যায়। তাহাদের কোন উচ্চাশা থাকিলে তাহা পূর্ণ না হইলে তাহাদের কোন দুঃখ হয় না—কারণ "Si on n'a pas ce que l'on aime, il

চালুনী-বিক্রেতা

faut aimer ce que l'on a" (অর্থাৎ যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা যদি না পাই তাহা হইলে যাহা পাইয়াছি তাহাই চাহিয়াছিলাম মনে করিয়া লওয়াই ভাল।) ইহা যথার্থ কথা। ইহাতে মানুষের মনে অসন্তোষ-বিষ জন্মিতে পারে না। দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্য মানুষ সমান ভাবে গ্রহণ করিবে—রাশিয়ান মনোভাবের ইহা একটি বিশেষ দিক্। টাকা যদি থাকে এবং তাহা খরচ করিয়া যদি আনন্দলাভ করিবার আশা থাকে—তবে তাহা সব খরচ করিয়া দিতে কাহারো আপত্তি নাই। আবার অন্য দিকে—যদি টাকা না থাকে, তবে টাকা রোজগার করিবার জন্য বেশী চেষ্টাও বই ভাল হইবে না। মানুষের মনের খেয়ালের গতিরোধ করিলে মানুষের আত্মার অগ্রগতিও থামিয়া যায়—ইহারা ইহাই মনে করে।

অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত রাশিয়ান নানা প্রকার কুসংস্কারে অত্যন্ত আস্থাবান। বর্ত্তমান সময়ে রাশিয়া বল্‌সেভিক্‌দের নায়কতায় শিক্ষাবিষয়ে উন্নতিলাভ করিতেছে। জারের আমলে রাশিয়ার জনগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের কোন প্রকার চেষ্টা ছিল না বলিলেই হয়। শিক্ষা আভিজাত্য সম্প্রদায়ের এক রকম একচেটিয়া ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সরকারী বিদ্যালয়ে নিখরচায় শিক্ষালাভ বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। ইহাতে অদূর-ভবিষ্যতে রাশিয়ার সর্ব্ববিষয়ক উন্নতি যে বিশেষ দ্রুতগতিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পাড়াগেঁয়ে হাট

রাশিয়ান উপন্যাস পড়িয়া অনেকের ধারণা হয় যে,রাশিয়ান জাতিটাই অত্যন্ত নিরানন্দ। এই ধারণা ভুল। রাশিয়ানরা যে কোন রকমের আনন্দ অত্যন্ত ভালবাসে। স্ফূর্ত্তি করিতে পাইলে তাহারা আর অন্য কিছু চায় না। অবশ্য প্রায় সকল সময়েই তাহাদের আনন্দ পূর্ণ

বড় একটা কেহ করিতে চায় না। কোন রকমে দিন চলিয়া গেলেই হইল। ইহাতে কুঁড়ে হইয়া বসিয়া থাকিতে কোন আপত্তি নাই। দিনের পর দিন যে লোক চুপচাপ খাটিয়া যায়, এমন লোককে ইহারা খুব প্রশংসার চক্ষে দেখে বলিয়া মনে হয় না। বরং এই প্রকার লোকের প্রতি ইহাদের একটা ঘৃণামিশ্রিত দয়ার ভাব বর্ত্তমান থাকে। রাশিয়ানদের চরিত্রের ইহাও একটা অদ্ভুত দিক। ইহারা মনের খেয়াল মত কাজ করিয়া যাইতে ভালবাসে; এবং তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই খেয়ালের গতি রোধ করিলে মন্দ

করিবার জন্য নানা রকম নেশার দরকার হয়। যাহারা অবস্থাপন্ন, তাহারা দামী মদ্য পান করিয়া আনন্দলাভ করে। যাহারা গরীব, তাহারা "ভোড্‌কা" নামক মদ পান করে। "ভোড্‌কা"কে আমাদের দেশের পচাই বা ধেনো মদ বলাও চলে। গরীব লোকেরা ইহা তাহাদের ঘরে প্রস্তুত করিয়া লয়।

পেট ভরিয়া পান-ভোজন করিয়া জিপ্‌সিদের গান শুনিতে রাশিয়ানরা অনেকেই খুব ভালবাসে। জিপসিরা আমাদের দেশের বেদেদের জাত-ভাই। জগতে কোথাও

তাহাদের স্থির বাসস্থান নাই। সকল দেশেই তাহারা স্বাধীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহারা কখনও দলছাড়া হইয়া বেড়ায় না। এই জিপ্‌সিদের গান-বাজনা রাশিয়ানদের ইহার খানিক সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়। গানের সুর খুব চমৎকার নয়; কিন্তু এই গানের মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে, যাহা শ্রোতার মনকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দেয়।

যে কেন ভাল লাগে তাহা বলা শক্ত। এই গান অত্যন্ত একঘেয়ে—বিরক্তিকরও বলা যায়।

গায়কের দল গোল হইয়া বসে। মাঝখানে একজন একটা তানপুরা গোছের যন্ত্র লইয়া বসে। এই বাদ্যকর সঙ্গীত পরিচালনা করে। গানের এক একটি পদ একজন লোক একবার করিয়া একলা গায়—তার পর সকলে মিলিয়া তাহা

জারের আমলের রাশিয়ান সৈনিক

শুষ্কফল-বিক্রেতা

গান করে। এইভাবে গান ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে থাকে। আমাদের দেশের কীর্ত্তন গানের সঙ্গে

এই গানের যেন একটা নেশা আছে। খানিকক্ষণ গান শুনিলে গান যেন সমস্ত মনকে পাইয়া বসে। রাশিয়ান্ মনকে এই জিপ্‌সি গান অত্যন্ত আকৃষ্ট করে। সেইজন্য রাশিয়ান্‌রা এই গান শুনিবার জন্য খুব বেশী পরিমাণ অর্থব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তবে গরীব শ্রেণীর লোকেরা এই জিপ্‌সি গান শুনিবার সৌভাগ্য বড় একটা পায় না। তাহারা "ভোড্‌কা" পান করিয়া নিজেরাই মনের আনন্দে গান করে। বিবাহাদি ব্যাপারে প্রচুর পরিমাণে ভোড্‌কা পান করা হয়। অন্যান্য পর্ব্বাদিতেও, বিশেষ করিয়া 'ইষ্টার' পর্ব্ব উপলক্ষে, গ্রামে গ্রামে ভোড্‌কার বন্যা বহিয়া যায় বলিয়া মনে হয়। স্ত্রী পুরুষ সকলেই এক সঙ্গে বসিয়া ভোড্‌কা পান করে।

ইহাদের মদ্যপানের পরিমাণ দেখিলে মনে হয় যেন জগৎ-সংসারে ইহা ছাড়া তাহাদের আর কিছু কাম্য নাই। ১৯১৪ অব্দ পর্য্যন্ত "ভড্‌কা" পান অত্যন্ত ভয়ানক ভাবে চলে। রাস্তায় ঘাটে মাতাল গড়াগড়ি যাইতেছে—এ দৃশ্য যেন গাড়ী ঘোড়া দেখার মত লোকের চোখে এবং মনে সহিয়া গিয়াছিল। গত শতাব্দীর শেষ দিকে কাউণ্ট উইট্ (Count Witte) নামক একজন উচ্চপদস্থ রাজস্ব-কর্ম্মচারী "ভোড্‌কা" চুয়ান

এবং বিক্রয় সরকারের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার মতে ভোড্‌কা খাওয়া খারাপ হইলেও, দেশের সকল লোকেই যখন উহা খায়, তখন ঐ ভোড্‌কা বিক্রয় করিয়া রাজসরকার যদি দুপয়সা উপার্জ্জন করে, তবে তাহাতে দোষের কিছু নাই। ইহার ফলে এই হইল যে, ভোড্‌কা সরকার বাহাদুরের একচেটিয়া হইবার পর রাজকর্ম্মচারীরা ভোড্‌কা বিক্রয় বাড়াইবার নানা প্রকার ফন্দী বাহির করিতে লাগিল। কারণ মদ যত বেশী বিক্রয় হইবে—রাজার ঘরে পয়সাও সেই পরিমাণে বেশী আসিবে। রাজকর্ম্মচারীরা এই প্রকারে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিবার আশায় প্রজাদের সর্ব্বনাশ করিতে লাগিল। ভোড্‌কার দোকান হুহু করিয়া বাড়িতে লাগিল। ভোড্‌কা বিক্রয়ের রাজস্ব ৫০,০০০০০০ রুবল হইতে ১০০,০০০০০০ রুবলে দাঁড়াইল। ভোড্‌কা-স্রোতে দেশ একেবারে ডুবিয়া যাইবার মত হইল।

১৯১৪ খৃঃঅব্দে একজন মন্ত্রী জারকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, ভোড্‌কা দেশের কি ভয়ানক ক্ষতি করিতেছে। জার সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া ভোড্‌কার বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ করিয়া দিলেন। মহাযুদ্ধের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভোড্‌কা বা অন্য প্রকার মদ বিক্রয় একেবারে আইন করিয়া বন্ধ হইল। ইহা যে কেবল প্রজার মঙ্গল চাহিয়া করা হয়, তাহা নয়। মাতাল সৈন্য লইয়া শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা চলে না—এক রকম দায়ে পড়িয়াই ইহা করিতে হয়। ১৯০৪ খৃঃঅব্দে জেনারেল কুরোপাটকিন সৈন্যবিভাগে মদ্যপান বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে তিনি সফলকাম হন নাই। এই সময় রাশিয়ান পল্টন সকল সময় মদে চুর হইয়া থাকিত। রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের হাতে রাশিয়ার যে কি ভীষণ দুরবস্থা হয়, তাহা অনেকেই জানেন। রাশিয়ানরা কিছু কম মদ্যপান করিলে রাশিয়ান্ সৈন্যদিগকে জাপানী পল্টন অত সহজে হটাইতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। মদ বিক্রয় বন্ধ হইবার পর হইতেই রাশিয়ার লোকদের মধ্যে নানা দিকে উন্নতি দেখা যাইতে লাগিল। অনেকে টাকা জমাইতেছে, চাষবাসের অবস্থা ভাল হইতেছে। লোকের পোষাক পরিচ্ছদ খাওয়া দাওয়া ইত্যাদিও ভোড্‌কা-যুগ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে ভাল হইতেছে।

রাশিয়ানদের ধর্ম্মপ্রাণতা—ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট চিত্রদর্শনে প্রণাম

রাশিয়ার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, মানুষকে অমানুষ করিবার মত যাহা কিছু উপকরণ আছে—সেই সমস্ত অকল্যাণের ঝড় রাশিয়ার লোকদের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। এত বাধা, এত অকল্যাণ ইত্যাদির মধ্য দিয়া আসিয়া আজিও যে রাশিয়ানরা মানুষের মত আছে, একেবারে পশু হইয়া যায় নাই, ইহা এক পরম আশ্চর্য্য

ব্যাপার। বর্ত্তমান বা বিগত অবস্থা দেখিয়া রাশিয়ানদের বিচার করা ভুল। তাহাদের মনের গতি কি, তাহারা কোন্ মার্গে উঠিতে চায়, ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রাশিয়ানদের বিচার করা কর্ত্তব্য। কখন কি অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে, তাই দেখিয়া একটা জাতির বিচার চলে না। জাতির আদর্শ দেখিয়া একটা সমগ্র জাতির যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায়। সমগ্র রাশিয়ান জাতির মধ্যে কয়েকটি গুণের অতি প্রাবল্য দেখা যায়। তাহারা ধর্ম্মভীরু, সৎ, সরল, ভাল মানুষ। ইয়োরোপের অন্যান্য অনেক জাতিসুলভ ধূর্ত্ততা রাশিয়ানদের মধ্যে নাই।

তিব্বত-পর্য্যটকের ডায়েরী

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় বি-এ, বি-টি

[চট্টলের অস্তমিত ভাস্কর রায় বাহাদুর ৺শরচ্চন্দ্র দাস C. I. E. মহোদয় দার্জ্জিলিঙস্থিত ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে, ১৮৭৯-১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিপদ-সঙ্কুল দুর্গম গিরিপথে কয়েকবার তিব্বত পরিভ্রমণ করিয়া অধিবাসীবর্গের রীতি-নীতি ও বহু তথ্যপূর্ণ ভ্রমণ বিবরণ ইংরাজীতে প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহারই কয়েকটা নিবন্ধ সংগ্রহ করিয়া তদীয় ইংরেজী 'তিব্বত ভ্রমণ' প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশকের অনুমতি গ্রহণে তদবলম্বনে আমি "তিব্বত পর্য্যটকের ডায়েরী" পাঠকগণকে উপহার দিতে ব্রতী হইলাম।—লেখক।]

নবেম্বর ৭, ১৮৮১।

রাত্রিকালে দার্জ্জিলিঙ্ পরিত্যাগ করিলাম। তখন আকাশের গায়ে কৃষ্ণ মেঘ দেখা দিয়া বৃষ্টির পূর্ব্ব-লক্ষণ সূচনা করিতেছিল; কিন্তু চন্দ্রমার উজ্জ্বল কিরণে তখনও ধরিত্রী প্লাবিত হইতেছিল। নেপালের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত শৈলশৃঙ্গে আমরা পুনঃ পুনঃ ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। তথায় তুষারপাত হইতেছে বলিয়া আমাদের মনে ভীতির সঞ্চার হইয়া উঠিতেছিল। দার্জ্জিলিঙ্গের আবাস পরিত্যাগ করিলে তুষার-সমাধির আশঙ্কায় কখন কখন আমার মন বিচলিত হইয়া উঠিত। আবার পরক্ষণেই প্রাকৃতিক বাধা-বিঘ্নের সহিত সংগ্রামে বিজয় লাভাশায় হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। এ-যাত্রা দীর্ঘকালের জন্য জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলাম। পুনরায় যে কোন দিন সেই রম্য নিকেতন দর্শন করিতে পাইব, এই আশা আমার মনে বড় স্থান পাইত না।

আমি নিঃশব্দে অশ্বারোহণে পথ চলিতে লাগিলাম। দার্জ্জিলিঙ্গামী দুইজন ভুটিয়া ব্যতীত আমরা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হই নাই। এজন্য বড়ই স্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। অধিক লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ইহারা হয় ত কোনরূপ অনর্থ ঘটাইয়া বসিত। তাকুবীর নামক স্থানে শ্রমজীবীদিগের সরল মধুর সঙ্গীত, বংশীর সুরলহরী ও ঢাকের বাদ্য নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের শ্রবণ-বিবরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রুতিসুখ উৎপাদন করিতে লাগিল। নদীতীরে পৌছিবামাত্র লামা উজিয়েন জীয়েস্তোর (Ugyen gyasto) (১) সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমার নদীপারের বন্দোবস্ত করিবার জন্যই তথায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। স্রোতস্বিনীর তৎকালে প্রশান্ত মূর্ত্তি। নদীর উপর ২।৩টী বাঁশ ফেলিয়া তাহার উপর দিয়া অতি কষ্টে নদীটি পার হইলাম। তার পর একজন সুচতুর ভুটিয়া সহচরের সহায়তায় সঙ্কীর্ণ পিচ্ছিল গিরিপথ অতিক্রম করিতে করিতে রাত্রি দেড় ঘটিকার সময় গোক নামক স্থানে পৌছিলাম। স্থানটী এক সময়ে খুব বিখ্যাতই ছিল, কিন্তু সে সময়ে একেবারে জনমানবশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এক দিন যে-স্থলে দ্বাদশটী বিপণি ও কতিপয় বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন সেখানে একটী গোশালা মাত্র অবস্থিত। তন্মধ্যে একজন নেপালী বিকট নাসিকা-রব করিতে করিতে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। এ স্থান হইতেই পশ্চিম অঞ্চলের শস্য

(১) ইনি ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের তিব্বতীয় ভাষায় শিক্ষক ছিলেন।

ব্যবসায়ীরা ভারতীয় শস্য ও এলাচির বীজ প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিয়া দার্জ্জিলিঙ্ বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে।

গোশালা-সংলগ্ন দীর্ঘ তৃণরাশির উপর কম্বল পাতিয়া আমি কিছুক্ষণ বিশ্রামের প্রয়াস পাইলাম। নিতান্ত অসমতল স্থানেই শয্যা স্থাপন করিয়াছিলাম। এদিকে কত কীট পতঙ্গ আসিয়া আস্তে আস্তে আমার দেহে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। আবার পাতলা কম্বলের ভিতর দিয়া নিম্নস্থ কাঁটাগাছগুলি শরীরে বিদ্ধ হইতে লাগিল। তদুপরি এক পসলা বৃষ্টি আসিয়া আমাদিগকে একেবারে ভিজাইয়া দিয়া গেল। এতগুলি অন্তরায়ের মধ্যে নিদ্রা যাওয়ার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম। রাত্রি চারিটার সময়ই আবার পর্য্যটনে বাহির হইয়া পড়িলাম। আমাদের রাস্তাটীর পরিসর একফুটও হইবে কি না সন্দেহ। তাহাও আবার লম্বা লম্বা ঘাস ও আগাছায় পরিপূর্ণ। আমি লণ্ঠনের আলো জ্বালাইয়া ভৃত্য ফুরচুঙের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে আমার বোঝাটী লইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল। বোঝার উপর আমার বন্দুকটী সংবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। রাস্তায় কতবার আমার পদস্খলন ঘটিয়াছিল, তাহার অন্ত নেই। এই ভাবে পথ চলিতে চলিতে, আমরা যখন রুম্মাম উপত্যকায় উপনীত হইলাম, তখন পূর্ব্ব-গগন তরুণ তপনের হৈমচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল।

নবেম্বর ৯—

রুম্মাম সুবৃহৎ রঞ্জিৎ নদীর একটী উপনদী। ইহা সিঙ্‌লি শৈলমালা হইতে উদ্ভূত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে স্বাধীন সিকিম ও ব্রিটিশ রাজ্যের সীমা বিভাগ করিয়া দিতেছে। রুম্মামের দক্ষিণস্থ সমস্ত রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের অধীন। তখনও নদীতে প্রবল প্রবাহ বর্ত্তমান ছিল। নদীর উপর একটি বংশ-সেতু নদীমধ্যস্থ সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের উপর সংস্থাপিত। দুই দিকের পাহাড়ই ইহার অবলম্বন। লেপ্‌চা ও লিম্বু জাতি এই নদীর খাত হইতে শীতকালে ক্ষুদ্র-বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া দার্জ্জিলিঙ্ বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করে। এ স্থানে প্রচুর শালবৃক্ষ বিদ্যমান। ক্রমনিম্ন পর্ব্বত-গাত্রে কত এলাচি ও কার্পাস বৃক্ষ আমাদের নয়নগোচর হইল। সবগুলিই তখন ফল-সংগ্রহের উপযোগী হইয়া রহিয়াছিল। বৃহৎ বৃহৎ শস্যক্ষেত্রের মধ্যস্থিত এক একটী বংশ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে বংশ-সংঘর্ষণে মর্কট ও ভল্লুক তাড়াইবার জন্য প্রহরিগণ অবস্থান করিতেছিল। এই উপত্যকায় এক প্রকার বৃহদাকার বানরের বাস। ইহারা কৃষক, সঙ্গিহীনা মহিলা ও পথিকদিগের ভীতি উৎপাদন করিয়া থাকে। একপ্রকার ক্ষুদ্রকায় বানর আমাদেরও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। এই অত্যাচারী বানরগণের বধসাধনোদ্দেশ্যে লেপ্‌চারা এক-প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষমূল ভাত বা তরিতরকারীর সহিত মিশ্রিত করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখে।

আমরা রুম্মামের সেতুটির নিকটবর্ত্তী হইলে জন কুড়ি লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ইহারা আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে নাই। স্বল্পকাল বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাতরাশ শেষ করিয়া লইলাম। তৎপরে দেশীয় পোষাক পরিত্যাগ করিয়া তিব্বতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম। এখন আমরা গিরিপথে ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিলাম। মিটোগাঙ্ গমনের রাস্তা আমাদের দক্ষিণে পড়িয়া রহিল। এ স্থান অনেক মৃগ ও বন্য ছাগের বাসভূমি। গ্রামবাসীরা দরিদ্র,—ইহারা এত শিকার করিবে কিসে! তাহাদের নিকট সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী ক্ষুদ্র বন্দুক (Match-lock) আছে কি না সন্দেহ। এখানে অনেক নেপালী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। আমি এ স্থানে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও ছত্রী দেখিতে পাইলাম। সাধারণতঃ দুগ্ধ ও মাখন বিক্রয় করিয়াই ইঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। পর্ব্বত-গাত্রে নির্ম্মিত মৃত্তিকা-বেদীর উপর কত শস্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। এখানে বলদ দ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভুটিয়াগণ চাষের জন্য এরূপ মৃত্তিকা-বেদীও নির্ম্মাণ করে না, লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণও করে না। ইহারা তাহাদের চির-ব্যবহৃত কোদালি ও ওক-বৃক্ষ নির্ম্মিত তীক্ষ্ণ দণ্ড দ্বারাই চাষাবাদ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রাচীন প্রথা অবলম্বনে অতি সামান্য শস্য লাভই ইহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। লিম্বুজাতি ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর একই জমি চাষ করিয়া পুনরায় তিন বৎসরের জন্য তাহা ফেলিয়া রাখে; এই অবসরে ক্ষেত্রে আগাছা জন্মিলে, সেগুলি দগ্ধ করিয়া ক্ষেত্র পুনরায় চাষোপযোগী করিয়া লয়।

কয়েকটী সরলোন্নত শৈল অতিক্রম করিয়া অবশেষে আমরা এক পর্ব্বতশৃঙ্গে আরূঢ় হইলাম। নিকটস্থ প্রস্তর-স্তূপ এ স্থানটীকে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। এ স্থানে

দেবোদ্দেশ্যে ভুটিয়া প্রভৃতি জাতি পূজা অর্পণ করিয়া থাকে। এখান হইতে ধর্ম্মদায়েন উপত্যকা ও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের মনোরম দৃশ্য আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। উপত্যকায় উপরিস্থিত আবাস-গৃহগুলি এক একটী বিচিত্র বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। এ স্থানটীকে পাহাড়িয়াগণ 'মণিদারা' এবং ভুটিয়ারা চুটেনগঙ বলিয়া থাকে। উভয়ের অর্থ—পবিত্র স্তূপ-শৈল। এখানে আমরা অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়া লিম্বুদিগের নিকট হইতে দুই বোতল দেশীয় সুরা ও কিছু শাক-সব্জী ক্রয় করিয়া লইলাম।

লিম্বুদের আবাস-গৃহের পার্শ্বস্থিত একটী সোজা রাস্তা ধরিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। ইহাদের বাড়ীর সম্মুখভাগে ভেড়ার খোঁয়াড়, শূকর বাঁধিবার স্থান, এবং চতুর্দ্দিকে কয়েকটী ছাগল গরু দেখিতে পাইলাম। লিম্বুদের বাড়ীতে যে মোরগ দেখিতে পাইলাম, ভুটিয়াদিগের পালিত মোরগ অপেক্ষা এগুলি আকারে ক্ষুদ্রতর। পথ চলিতে চলিতে আমি ভুটিয়াদের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলাম। সামান্য সামান্য কাজেই ইহারা ঢাক বাজাইয়া থাকে,—ইহা তাহাদের একটী বিশেষত্ব। ধনী হউক নির্ধন হউক প্রত্যেকের বাড়ীতে তিন চারিটী ঢাক থাকা চাই। স্বগ্রাম পরিত্যাগ কালে অথবা গ্রামে প্রত্যাগমন সময়ে ইহারা ঢাক বাজাইয়া থাকে। কাহারও বহির্গমন কালে তৎপুত্র-কন্যা ও পত্নী তাহার সম্মানার্থ এরূপ বাদ্য করিয়া থাকে। আবার গৃহস্বামী স্বয়ং গৃহত্যাগের প্রাক্কালে তদ্রূপ বাদ্যধ্বনি করে।

পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া আমরা অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ দেশে পৌঁছিলাম। এ স্থানের শাক-সব্জী ও উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্যই সমৃদ্ধির প্রমাণ। কোথাও নিবিড় বেতস-বন, কোথাও বৃহৎ বৃহৎ ফলের বাগান বিদ্যমান। স্থানটী যে ঈষৎ উষ্ণ, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইল।

নবেম্বর ১০—

সেদিন আমাদের যাত্রাকালে আকাশ মেঘাবৃত ও দিঙ্মণ্ডল কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন ছিল। নদীতটস্থিত সুউচ্চ দেবদারু ও বৃহদাকার ফার্ণ বৃক্ষ শ্রেণীর ভিতর দিয়া আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। নদীর সমগ্র তীরভূমিই বৃক্ষকুঞ্জে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। আবার পর্ব্বত-শীর্ষ হইতে কত জলপ্রপাত সবেগে প্রবাহিত হইয়া বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্যে প্রতিহত হইতেছিল।

হি-পর্ব্বতের গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে এক ঘণ্টাকাল পাহাড় ভাঙ্গিয়া—'ঋষি চুর্টেন'এ উপনীত হইলাম। এখান হইতে হি-গিরিবর্ত্ম আরম্ভ হইয়াছে। এ স্থান হইতে পশ্চিম সিকিম ও দার্জ্জিলিঙের মনোরম দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া লইলাম। চতুর্দ্দিকের নিবিড় বনে বন্য শূকর-যূথ সানন্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, দেখিতে পাইলাম। আর সমস্ত বনটী যেন ওক-বীজ-ভোজী বানরের শব্দে মুখরিত।

সন্ধ্যা প্রায় ছয় ঘটিকার সময় আমরা এক শৈল-শৃঙ্গে উপস্থিত হইলাম। স্থানটী সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৬০০০ ফিট উচ্চ। অতঃপর আমরা কয়েকটী ক্ষুদ্র সরিৎ পার হইলাম। এগুলি ঋষি নদীর বক্ষে গিয়া আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছে। অতঃপর কয়েকটী গোশালার ধারে পৌঁছিয়া আমি একটু বিশ্রামের প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু বিশ্রাম ভাগ্যে ঘটিল কৈ! বৃহৎ বৃহৎ জলৌকা দ্রুতগতিতে অথচ যেন সমবেগে আমার দিকে ধাবিত হইল। হুকার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, এগুলি মানুষের মোজা-জামা ভেদ করিয়া মনুষ্য-দেহ হইতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া থাকে।

সন্ধ্যা চারি ঘটিকার সময় শৈল-শিখর হইতে আমরা অবতরণ করিতে আরম্ভ করিলাম। এস্থানে একটী প্রস্তর-স্তূপ অবস্থিত। তৎসংলগ্ন থর্ব্বাকার বংশ-বনে ছিন্ন রক্তবস্ত্র দোদুল্যমান দেখিলাম। ফুংচুঙ শৈল-দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে দেব, আমায় শতায়ুঃ কর, আমায় শতায়ুঃ কর।" এ স্থানে আমরা জঙ্গলের একটী পরিষ্কৃত অংশে দীর্ঘায়তন ওকবৃক্ষ-মূলে রাত্রি যাপন করিলাম। ইহার কয়েক মাইল নিম্নেই 'লিঙচাম' গ্রাম অবস্থিত। এখানে প্রচুর বিচুটিবৃক্ষ জন্মিয়াছিল।

নবেম্বর ১১—

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। একদিকে বৃষ্টি বর্ষিত হইতেছে, অপর দিকে সূর্য্য কিরণজাল বিস্তার করিতেছে। ভুটিয়াদের ভাষায় এরূপ আবহাওয়ার নামই "পুষ্প-বৃষ্টি"। হি-গ্রামের পার্শ্ব দিয়া আমাদের পথ। গ্রামে ভুটিয়া, লেপচা ও লিম্বুর বসতি। লিম্বুগণ অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। মহিষ

চালিত হল দ্বারা ইহারা ক্ষেত্র-কর্ষণ করে এবং জলসিক্ত উন্নত ভূমিতে ধান্য বপন করে।

কালাই (বা কালাইত) নদীর কয়েক শত গজ উপরে একটী এলাচি-ক্ষেত্র আমাদের দৃষ্টি-গোচর হইল। কালাই নদী শীত-ঋতুতেও ভীষণ খরস্রোতা। ইহা সিঙ্লি গিরি-বর্ত্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত কুটিল গতিতে প্রবাহিত হইয়া তাসিভিঙ্ শৈলের পাদদেশে সুবৃহৎ রঙ্গিৎ নদীতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে। নদীর উভয় কূলে বহুদুর পর্য্যন্ত গ্রাম অবস্থিত। পাহাড়ের উপরিস্থিত গ্রামগুলি শৈলমালার দুইটী পক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

কালাই নদীর দুই দিকের ঢালু তীরে সু-উচ্চ বৃক্ষশ্রেণী বর্ত্তমান। নদী বক্ষ হইতে নিবিড় স্থানটী আপাত-দৃষ্টিতে অগম্য বলিয়া মনে হয়। নদীর উপর দুইটী বৃহৎ স্থূল বংশের সেতু প্রতিষ্ঠিত আছে। স্রোতস্বিনীর মধ্যস্থিত প্রস্তরখণ্ড এবং দুই পার্শ্বের দুটী প্রস্তরফলক সেতুটীর অবলম্বন। মৎস্য ধরিবার জাল রাখিবার জন্য নদীর অগভীর অংশে বহু দণ্ড প্রোথিত আছে। এ স্থানের সলিল-প্রবাহে প্রচুর সুস্বাদু মৎস্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিম্বু বস্তীর পার্শ্বে 'নাডাগসিগ' নামক এক প্রকার বিষাক্ত বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। নদীর বদ্ধ সলিলে মৎস্যাদি উপস্থিত হইলে, নদীতে এই বৃক্ষের পত্র নিক্ষেপ করিয়া ইহাদের শরীরে বিষ ক্রিয়া উৎপাদন পূর্ব্বক সহজেই এগুলি ধৃত করা হয়।

লিম্বুদিগের মধ্যে পঞ্চ শ্রেণীর পুরোহিত রহিয়াছেন। তাঁহারা ঐহিক ও পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদি সম্পাদন করিয়া থাকেন। ফেডাংবা, বিজুয়া, দামি, বৈডাং এবং শ্রীজঙ্গা নামে ইঁহারা পরিচিত। ফেডাংবাগণ ধর্ম্মক্রিয়া সম্পাদনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। ইঁহারা ভাগ্য গণনা করিয়া ভবিষ্যৎ-বাণীও বলিয়া থাকেন। বিজুয়াগণ ঐন্দ্রজালিক পূজা (Shamanic) সম্পাদনে শিক্ষালাভ করিয়া থাকেন। উদ্দাম নৃত্যই ইহার প্রধান অঙ্গ। তৃতীয় শ্রেণীর পুরোহিতগণ শুধু যাদুবিদ্যায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া থাকেন। লোকের মুখ দিয়া তাহাদের শরীরাশ্রিত ভূত প্রেতকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া ইঁহাদের একটী কার্য্য।

বৈডাংগণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী। বৈডাং শব্দ সংস্কৃত বৈদ্য শব্দ হইতে উদ্ভূত। শ্রীজঙ্গ সম্প্রদায়ই পঞ্চবিধ পুরোহিতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহারা ধর্ম্ম-গ্রন্থাদির ব্যাখ্যা, ধর্ম্মাচার ও অনুষ্ঠানাদির বিবরণ পাঠ করিয়া লোকজনকে শুনাইয়া থাকেন। আমি যাঁহার নিকট হইতে এই তথ্য অবগত হই, ইনি শ্রীজঙ্গ সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, অপরাপর চতুর্ব্বিধ পুরোহিতের গুণাবলীও তন্মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। তজ্জন্যই লিম্বুদের নিকট ইঁহার অশেষ সম্মান প্রতিপত্তি। তাঁহাকে সকলেই স্বর্গীয় গুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিত।

কালাই নদীর তীর পরিত্যাগ করিয়া আমরা শৈল-পথে উর্দ্ধদিকে উঠিতে লাগিলাম। লম্বা লম্বা ঘাসের ক্ষেত ও নিবিড় নলবনের ভিতর দিয়া আমাদের পথ। এ স্থানে অসংখ্য বন্য বরাহ ও সজারুর বাস। সজারু কলাই ও মূলা ক্ষেতে দৌরাত্ম্য করে, বিশেষতঃ এ স্থানের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য শালগম একেবারে নির্ম্মূল করিয়া ফেলে।

কালাই উপত্যকা হইতে প্রায় ৩০০০ ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া আমরা কালাই ও রতঙ্ নদীর উভয় তীরস্থ উচ্চ সমতল শৈলমালার উপরিস্থিত দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহের মোহন দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া লইলাম। আমাদের দক্ষিণদিকে লিঙ্চাম গ্রাম। তাহাতে কতিপয় কমলালেবুর বাগান ও সংখ্যাতীত মারোয়া ক্ষেত্র অবস্থিত। আমরা একটি লিম্বুর বাসস্থানের নিকট দাঁড়াইলাম। কুলিরা, পাহাড়ের ফাটালে উৎপন্ন বন্য পেঁয়াজ আহরণ করিয়া লইল। তদ্দ্বারা ইহারা ব্যঞ্জনাদি রসনারোচক করিয়া থাকে। এই পেঁয়াজ সাধারণ রসুনের ন্যায় আঘ্রাণবিশিষ্ট হইলেও তন্মধ্যে রসুনের অর্দ্ধেক তীব্রতাও বর্ত্তমান নাই। মাংসের সহিত ব্যবহারে উহা অপূর্ব্ব আস্বাদ জন্মাইয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাসির'ও সৃষ্টি করিয়া তোলে।

মানব-বিজ্ঞান

(Anthropology)

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় বি-এ

মানব-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা ইতিহাস আছে। ইহা কি, কোথা থেকে এল, কি ছিল এবং কি করেই বা বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে, সেই জ্ঞানের কথাই আমি বলছি।

ঐ যে রাস্তার ধারে ক্ষুদ্র প্রস্তরের টুকরাটি পড়ে রয়েছে, বৈজ্ঞানিক কঠোর অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়ের ফলে উহার ভিতর থেকে যে ইতিহাস বা তথ্য বের করে ফেলবে, তা অনেক উপন্যাস ও গল্পের চেয়ে অধিক আনন্দদায়ক। যদি তাহাই হয়, যদি মৃত মূক প্রস্তর-খণ্ডের ইতিহাস আমরা বুদ্ধিবলে জেনে নিতে পারি, তবে জীবিত প্রাণীর ইতিহাস যে আরও সুন্দর ভাবে জানতে পারবো, এবং তাহা যে আরও আনন্দদায়ক হবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রাণি-জগতে মানবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব। এই মানুষেরও একটা বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আছে। মানব-মণ্ডলীর একটা গোটা ইতিহাস বুঝিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। এখন দেখা যাক্, কি করে আমরা এ বিষয়ে অগ্রসর হতে পারি। বৈজ্ঞানিক প্রণালী ছাড়া এলোমেলো ভাবে যদিও অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়, তথাপি জ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌছিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভিন্ন গত্যন্তর নাই; কেন না তদভাবে পর্য্যবেক্ষণ বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। বিজ্ঞানের যুক্তি, তর্ক, পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাপকাটী নিয়ে প্রত্যেক তথ্যে অগ্রসর হওয়াই প্রকৃষ্ট উপায়; এবং তদ্দ্বারাই আমরা মানব-বিজ্ঞান বুঝে নিতে চাই। বিজ্ঞানের কাজ সত্যানুসরণ ও সত্যের আবিষ্কার করা। আমরা সত্যানুসন্ধিৎসু; তাই আজ বিজ্ঞানের সাহায্য লইব।

যে বিজ্ঞানের সাহায্যে নৃতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহার নাম Anthropology বা নৃবিজ্ঞান বা মানব-বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান মানবের গোটা ইতিহাস জানবে। মানব-বিজ্ঞান শুধু আজিকার মানবের ইতিহাস নয়, পরন্তু ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করে সেই আদিম যুগ হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমান

কালের সকল মানবের ইতিহাস জানতে চেষ্টা করবে। ইহা সমস্ত কালের—অতীত ও বর্ত্তমান, পৃথিবীর সমস্ত অংশের সভ্য ও অসভ্য মানবের কথা জানবে। শুধু তাহাই নয়। ইহা মানবের দেহ ও মনের সকল তথ্য জানতে চেষ্টা করবে। দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে; আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে দেহ ও মনের বিস্তর সম্বন্ধ রয়েছে; মানব-বিজ্ঞান এই বিষয়গুলাকে বাদ দিতে পারবে না। এক কথায় বলতে গেলে, এই বলা যায় যে, ইহা সমগ্র মানব-সমাজের সর্ব্বপ্রকার ইতিহাস জানতে চেষ্টা করবে।

এখন দেখা যাক্ এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? উল্লিখিত বিষয়গুলার দিকে নজর রেখে, মানবের উদ্ভবের সেই শুভ মুহূর্ত্ত হতে আজ পর্য্যন্ত এর দৈহিক ও মানসিক যাহা যাহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়েছে, সেগুলার ধারাবাহিক একটা নক্সা তৈয়ার করে, বিজ্ঞানের বিশেষ জ্ঞানকে থিওরির (Theory) গণ্ডীতে আবদ্ধ না রেখে, সর্ব্বসাধারণোপযোগী ব্যাপক কার্য্যকরী জ্ঞানে উন্নীত করণান্তর জগতের কল্যাণ সাধন করাই মানব-বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। যে ক্রমবিকাশের স্রোতে মানব ভেসে চলেছে তার একটা ধারা জানবার উপায় বাহির করাই মানব-বিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মানব-বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানানুসন্ধান, সত্যের জন্যই সত্যানুসন্ধান। ব্যবহারিক জগতে এই বিজ্ঞান কোন কাজে লাগ্‌বে কি না, সে বিষয়ে মানব-বিজ্ঞানবিদের কোন লক্ষ্য নাই। আমরা সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়েছি—সত্যের অনুসন্ধানই আমাদের কাজ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি এই বিজ্ঞান ব্যবহারিক জগতে কোন কাজে আসবে না? তা নয়। মানব-বিজ্ঞানবিদ যে তথ্য আবিষ্কার করবে, সেই সত্য অন্যান্য বিজ্ঞানের মতই ব্যবহারিক কার্য্যে প্রয়োগ করা যাবে; এবং এই বিজ্ঞানের সত্যসমূহ প্রয়োগের ফলে মানবের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে। মানব-বিজ্ঞানের কাজ যখন মানব নিয়ে, তখন মানব সংক্রান্ত সকল বিষয়ের সহিত ইহার কিছু না কিছু সম্বন্ধ রয়েছে। যাঁহারা মানব নিয়ে কাজ করবেন, তাঁহাদের এই বিজ্ঞানের তথ্যগুলা জানা নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ যাঁহারা সমাজনীতি, রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি আলোচনা করবেন, তাঁহাদের মানব-বিজ্ঞানের সাহায্য লওয়া একান্ত দরকার। এই বিজ্ঞানের সাহায্য না লইলে, তাঁহাদের প্রতি পদবিক্ষেপে ভুলের সম্ভাবনাই অধিক হবে; এবং তা হলে তাঁহাদের কাজ সাফল্য-মণ্ডিত না হয়ে ধুলায় ধূসরিত হবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ কিন্তু হৃদয়বান ও সহানুভূতি-সম্পন্ন কোন লোক বিকারগ্রস্ত রোগীর দুঃখে দুঃখিত হয়ে তার খেয়াল মত কুপথ্য দিলে, অজ্ঞাতসারে রোগীর অপকার করাই হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসক কিন্তু রোগ নির্ণয়ান্তর, রোগীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর দৃকপাত না করে, উপযুক্ত চিকিৎসা দ্বারা রোগীর অশেষ মঙ্গলের কারণ হন। মানব-বিজ্ঞানাভিজ্ঞ ব্যক্তিও ঠিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় সমাজের উপকারের কারণ হয়ে থাকেন। পরন্তু ধার্ম্মিক হৃদয়বান ব্যক্তি যদিও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী, তথাপি অভিজ্ঞতার অভাবে সমাজের মঙ্গল সাধন করতে যেয়ে অনেক সময় অমঙ্গল করে বসেন। অতএব যাঁহারা সমাজের দুঃখে দুঃখিত হয়ে সমাজের মঙ্গল করতে যাবেন, যাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য রাজনীতির চর্চ্চা করবেন বা যাঁহারা মানবকে পাপ কার্য্যে লিপ্ত দেখে দুঃখিত হয়ে ধর্ম্মের প্রচারে বহির্গত হবেন, তাঁদের মনে রাখতে হবে যে, শুধু হৃদয় থাকলেই হবে না, তার সঙ্গে থাকা চাই প্রকৃত রোগ বা কারণ নির্ণয় করবার জ্ঞান, যার অভাবে অনেক সময় মঙ্গল করতে যেয়ে অমঙ্গল করে বসবেন।

আমাদের সমাজে ধর্ম্মের নামে বহু কুসংস্কার বর্ত্তমান থেকে আমাদের উন্নতির পথে অবিরত বাধা প্রদান করছে। এই কুসংস্কার আমাদের আত্মাকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করে স্বাধীনতা হরণ করে ফেলেছে। যদি আত্মার স্বাধীনতাই মানবজীবনের লক্ষ্য হয়, তবে এই সকল বন্ধন যত কমে ততই মঙ্গল। মানব-বিজ্ঞান এই বন্ধন খুলে ফেলতে অনেক সাহায্য করবে।

মানব-বিজ্ঞানের আলোচনা করলে কি উপকার হতে পারে, তাহা সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বলা যায় যে, ইহাতে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র বর্দ্ধিত হয়, কুসংস্কার দূর হয়, মানবের সকল অনুষ্ঠানগুলা সুসম্পন্ন করা যায়, নভেল নাটক পড়ায় আনন্দ পাওয়া যায়, মানবের প্রতি

মানবের প্রীতি বর্দ্ধিত হয় এবং ভগবানের উপর বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

মানব-বিজ্ঞান অল্পদিনের বস্তু। যদিও ইহা এখনও মাতৃগর্ভে অবস্থিত বললেই চলে, কিন্তু ইহার প্রসারতা দিন দিন বর্দ্ধিত হচ্ছে। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এর চর্চ্চা দ্রুতগতিতে বর্দ্ধিত হয়ে যাচ্ছে এবং ইহার জন্য তাহারা অকাতরে অর্থ ব্যয় করছে। তাহারা বুঝেছে যে, ইহার চর্চ্চা মানবের একান্ত আবশ্যক। শাসন বিভাগে ইহার উপকারিতা দর্শনে ভারতবর্ষে অনেক ইংরেজ সিভিলিয়ান ইহার বিষয়ে অনেক চর্চ্চা করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে শুধু বাঙ্গালা দেশে স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্টে সম্প্রতি এই বিজ্ঞান পড়াবার জন্য বি.এস্‌সি, এম-এ, এম-এসসি ক্লাস খোলা হয়েছে। আজকাল লোকের দৃষ্টি এই দিকে একটু আকৃষ্ট হয়েছে। সম্প্রতি I. C. S. পরীক্ষায় এই বিষয়টী পাঠ্যতালিকাভুক্ত হয়েছে। এই পরীক্ষার সুবিধার জন্য সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় ও অন্যান্য প্রদেশের কলেজ সমূহে ইহার ক্লাস খোলা হবে। ভারতবর্ষ মানব-বিজ্ঞান চর্চ্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখানে ইহার আলোচনা যত হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল।

মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

যে ক্রমবিকাশের ধারা জানবার জন্য আমরা অগ্রসর হয়েছি, তাহা জানতে পারা সহজ নয়; কারণ, মানব-জীবন জটিলতায় পূর্ণ। সেই জন্য তাহার সম্বন্ধে জানতে হলে তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি আমাদের প্রথমে জানতে হবে। অতএব মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বিশাল ও বিস্তৃত। মানবের দেহ মন সম্বন্ধে যত বিষয় এবং মানবের চিন্তা ও কর্ম্ম-প্রসূত যত বিষয় আছে, তাহা সকলই এই বিজ্ঞানের গণ্ডীর ভিতর এসে পড়ে; কিন্তু এলোমেলো ভাবে সকল বিষয় জানতে গেলে আমাদের কোন সুবিধা হবে না। আমাদের শৃঙ্খলার সহিত অগ্রসর হতে হবে। মানব-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি কি, তাহার একটা মোটামুটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। প্রাক্ ইতিহাস—(ক) শিল্পতত্ত্ব (technology)
(Pre-history) (খ) চিত্রকলা (Art)

২। ভূতত্ত্ব— (ক) ভূ-বৃত্তান্ত (Geology)
(খ) ভূগোলবিদ্যা (Geography)

৩। প্রাণিতত্ত্ব—(ক) প্রাণিতত্ত্ব—(Zoology)
(খ) প্রাচীন জীবজন্তু বিষয়ক বিজ্ঞান—(Palaeontology)
(গ) দেহতত্ত্ব—(Anatomy)
(ঘ) মনস্তত্ত্ব—(Psychology)

৪। জাতিতত্ত্ব- (ক) সমগ্র মানবজাতি সমূহের বিবরণ—(Ethnography)
(খ) মানবজাতির মূল বিভাগ ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ক বিজ্ঞান—(Ethnology)

৫। সমাজতত্ত্ব—(ক) সর্ব্বপ্রকার সমাজের বিবরণ।
(খ) সামাজিক সম্বন্ধ—
(গ) সমাজের আইনকানুন, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ইত্যাদি—

৬। ধর্ম্মতত্ত্ব—(ক) সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মের বিবরণ।
(খ) ব্রত, পূজা, উপাসনা ইত্যাদি,—
(গ) ব্রতকথা, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, গল্প ইত্যাদি।

৭। ভাষাতত্ত্ব—প্রধান প্রধান ভাষা সমূহ এবং তাহাদের সম্বন্ধ।

৮। আত্মতত্ত্ব—আধ্যাত্মিক জ্ঞান, দর্শন, যোগ, সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) মানসিক চর্চ্চা (Psychic culture) ইত্যাদি।

উপরিউক্ত বিষয়গুলা যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, তথাপি, এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটির সহিত প্রত্যেকটির সম্বন্ধ রয়েছে। কেবল সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেকটি বিষয় পৃথক ভাবে আলোচনা করেছি।

প্রথমতঃ আমাদের জানতে হবে মানবের কখন জন্ম হয়েছে। ইতিহাসে তাহার কোন কথা লেখা নাই। ইতিহাস বড় জোর ১০।১৫ হাজার বৎসর অতীতের কথা বলতে পারে। কিন্তু তাহারও পূর্ব্বে যে মানব ছিল, তাহার সব কথা আমরা জানব কি করে? আমরা ঐ প্রাক্ ইতিহাস জানতে পারি তৎকালীন মানবের নির্ম্মিত দ্রব্য-

সামগ্রী ও চিত্রকলা দ্বারা। আর জানতে পারি তৎকালীন মানবের কঙ্কাল দ্বারা; এবং মানবের বয়স নির্ণয় করতে পারি মাটির স্তর দেখে। সেই জন্যই আমাদের প্রাক্-ইতিহাস, ভূতত্ত্ব ও প্রাণিতত্ত্ব জানতে হবে। একখানা অস্থি, প্রস্তর বা একটা চিত্র দেখে কি করে প্রাক্-ইতিহাস জানতে পারবো, তাহা পরে বর্ণিত হবে।

তার পর আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর সকল জাতির কথা। শুধু বর্ত্তমানের নয়, অতীতেরও সমগ্র জাতির কথা জানবো। প্রত্যেক জাতির দৈহিক গড়নে একটা বিশেষত্ব আছে; সেই দৈহিক গড়নের বিশেষত্ব বুঝতে হলে আমাদিগকে প্রাণিতত্ত্ব, প্রাচীন জীব-বস্তুতত্ত্ব, ও দেহতত্ত্ব জানতে হবে; এবং মেপে-জুকে কি করে এক জাতি হতে অন্য জাতিকে চিনতে পারা যায়, তাহাই শিখতে হবে। মস্তকের খুলি, গায়ের রং, চুল, দৈহিক গড়ন ইত্যাদির ভিতর অনেক বিশেষত্ব লুকান রয়েছে।

মানবের জন্মস্থান কোথায় এবং এক জাতির সহিত অন্য জাতির কি সম্বন্ধ, তাহা আমাদের জানতে হবে। আজ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত অংশেই মানব দেখতে পাই। মানব কি চিরকাল সেই সেই স্থান হতে বর্দ্ধিত হয়ে বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে, অথবা এক স্থান হতে জন্মগ্রহণ করে পরে বংশবৃদ্ধির দরুণ ও অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে? আমরা দেখতে পাই যে, ধরাপৃষ্ঠ অনবরত পরিবর্ত্তিত হতেছে—আজ যে স্থানে সাগর, পূর্ব্বে সেই স্থানে হয় ত দেশ ছিল; এবং আজ যেখানে স্থল, সেই স্থানে হয় ত সাগর ছিল! আমাদের বাঙ্গালা দেশ বহু পূর্ব্বে সাগর-গর্ভে ছিল। এবং আমরা বাঙ্গালী চিরদিন এই স্থানে ছিলাম না, অন্য কোথাও হতে এসেছি। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের ফলে মানব এক স্থান হতে অন্য স্থানে যেতে বাধ্য হয়। আমরা যদি এই প্রাকৃতিক কারণগুলি জানতে পারি, তবে মানবের গতিবিধি জানবার অনেকটা সুবিধা হয়; এবং তাহা লক্ষ্য করে আমরা জানতে পারবো মানব প্রথম কোন্ স্থান হতে জন্মগ্রহণ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই সব জানতে হলে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞান আহরণ করতে হবে—অতীত ও বর্ত্তমানের প্রধান প্রধান সহর—দেশের জলবায়ু—নদনদী—সাগর ও স্থলের অবস্থান—জীবজন্তু ও উদ্ভিদ—খাদ্য, পোষাক, বাসস্থান, মানবের পেশা—কাজ করবার যন্ত্রাদি—যাতায়াতের সুবিধা অসুবিধা—কোন্ জাতি কর্ত্তৃক কোন্ জাতি পরাভূত—ব্যবসা বাণিজ্য—আচার ব্যবহার—রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান আমাদের থাকা চাই।

বিভিন্ন দেশের ভাষার আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, অনেক পুরাতন শব্দ আছে যাহা প্রায় অনেক দেশের ভাষার মধ্যে দেখা যায়। কোন কোন শব্দ হয় ত অনেকগুলি ভাষার মধ্যে দেখতে পাই; আবার কোন কোন গুলি দেখতে পাই কম সংখ্যক ভাষার মধ্যে। যদি এক জাতি এক স্থান হতে জন্ম নিয়ে পরে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, তবে ছড়িয়ে পড়বার পূর্ব্বে যে যে শব্দ তাহারা ব্যবহার করত, তাহা পরবর্ত্তী বিভিন্ন ভাষার মধ্যে দেখতে পাওয়া সম্ভব। এবং ছড়িয়ে পড়বার পরে যে সকল শব্দ প্রত্যেকটা শাখার মধ্যে উদ্ভব হয়েছে, তাহা এই সকল শাখার মধ্যে দেখতে না পাওয়াই সম্ভব। এক ভাষা হতে শব্দ ধার করে নিলে শুধু অন্য ভাষায় সেই শব্দ পাওয়া সম্ভব। ভাষার আলোচনা করে আমরা অনেকটা অনুমান করতে পারি যে, কোন্ জাতির সহিত কোন্ জাতির সম্বন্ধ রহিয়াছে।

তাহার পর আমাদের সমস্ত রকম সমাজের সংবাদ নিতে হবে; এবং তাহাদিগকে বিশ্লেষণ করে তাহার ভিতর ঐক্য-সূত্র বের করতে হবে। কেন মানব সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করে? কেমনে পারিবারিক জীবন গঠিত হয়ে উঠে, কেমনে সমাজ গড়ে উঠে এবং কেমনে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়? বিবাহ, আইন-কানুন, আচার ব্যবহারে কিরূপে উৎপত্তি হয়েছে? সামাজিক সম্বন্ধ কি করে গড়ে উঠে? এই সব বিষয় আমাদের জানতে হবে।

সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মের বিবরণ, ব্রত, পূজা, পৌরাণিক আখ্যায়িকা, গল্প ইত্যাদি জেনে, আমরা জানতে চেষ্টা করব কি করে ধর্ম্মের উৎপত্তি হল এবং মানবের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ কি?

সর্ব্বশেষে আমরা জানতে চেষ্টা করব আত্মা কি? নিজেকে জানা মানব-বিজ্ঞানের শেষ কথা।

চণ্ডীদাস

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

(নান্নুর ও ছাতনা)

"নান্নুরের মাঠে পাতের কুটীর
নিরজন স্থান অতি।
বাসুলী আদেশে চণ্ডীদাস নিতি
ভজন করয়ে তথি" ॥

ইহা চণ্ডীদাসের লেখা কি না জানি না, তবে চণ্ডীদাসের পদাবলীতেই পাওয়া গিয়াছে। অনেকে বলেন—

"নান্নুরের মাঠে হাটের নিকটে
বাসুলী বৈসয়ে যথা।
বাসুলী আদেশে চণ্ডীদাস নিতি
ভজন করয়ে তথা" ॥

ইহাও না কি পদাবলীতেই লেখা আছে। শেষোক্ত পদে বোধ হয় দেবতা বাসুলী ও ডাকিনী বাসুলী দুই জনেরই কথা আছে। বাসুলী মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের নিকটে পূর্ব্বে গ্রাম ছিল না, গ্রামের বাহিরে ঐ যায়গায় হাট বসিত। এখনো সেখানে হাটতলায় শিবের ভাঙ্গা মন্দির পড়িয়া আছে।

নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডের লোক, এবং তিনি মহাপ্রভুর সমসাময়িক। ১২৬৮ সালের আগে নান্নুরের মত শ্রীখণ্ড, কান্দরা প্রভৃতি ও বীরভূমের এলাকায় ছিল, পরে বর্দ্ধমানের সামিল হইয়াছে। শ্রীখণ্ডকে নান্নুরের প্রতিবেশী বলা যাইতে পারে, কারণ উভয়ের দূরত্ব বেশী নহে। সরকার ঠাকুর মহাশয় চণ্ডীদাস-বন্দনায় নান্নুরের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব চারশো বৎসর আগে নান্নুরের খবর পাওয়া যাইতেছে।

"জয় জয় চণ্ডীদাস দয়াময় মণ্ডিত সকল গুণে।
অনুপম যা'ক যশ রসায়ন গাওত জগত জনে ॥
নান্নুর গ্রামেতে নিশা সময়েতে বাসুলী প্রসন্ন হইয়া।
রাই-কানু দুঁহু নওল চরিত কহয়ে নিকটে গিয়া ॥
* * * *
* * * *
ধুবনী মহিমা সীমা জানাইল ধন্ত সে বাশুলী দেবী।
নরহরি কহে পাইল দুলহ প্রেম চণ্ডীদাস কবি" ॥

এই পদ নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের রচিত। কবি রায়শেখর এবং তরুণীরমণ প্রায় মহাপ্রভুর সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন। কাটোয়ার যদুনাথের লেখা "সংগ্রহ তোষণী" নামে একখানা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। "চণ্ডীদাস—(সহজিয়া)" প্রবন্ধে এই পুঁথি ও যদুনাথের পরিচয় দিয়াছি। যদুনাথ খেতুরীর মহোৎসবের সময় (১৫০৪ শকাব্দায়) বর্ত্তমান ছিলেন; তিনি 'সংগ্রহ তোষণীতে' রায়শেখর ও তরুণীরমণের নাম করিয়াছেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, বইখানি খেতুরীর মহোৎসবের পরের লেখা, তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হয়, রায়শেখর ও তরুণীরমণ প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ পরের পুঁথিতে নাম উল্লেখের মত নাম-যশ তখন তাঁহাদের হইয়াছে। এই রায়শেখর ও তরুণীরমণের রচিত চণ্ডীদাস-বন্দনা পাওয়া গিয়াছে। দুইটী পদই এখানে তুলিয়া দিলাম—

(১)

"নান্নুর সরসিজ দ্বিজকুলইন্দু।
পীরিতি রসাল গীত মাধবী বন্ধু ॥
রামীনী সঙ্গিনী প্রেমরসভোর।
অনুখণ সঁওরণ যুগল কিশোর ॥
যা'ক অমিয় গীত গম্ভীরা মাহ।
রায় স্বরূপ সঙ্গে রস নিরবাহ ॥
রাতি দিবস শ্রুতি ভক্ত করু পান।
কলিযুগ পাবন প্রেম নিধান ॥
চণ্ডীদাস পদ পল্লব আশ ॥
রায়শেখর তছু দাস অনুদাস ॥

(২)

"সহজ পীরিতি জানিবে কে।
বাসুলী যাহারে জানাঞেছে ॥
রজনী সাজনী নান্নুরে গিয়া।
করে করে বাঁধি রামীরে দিয়া ॥
সহজ ভজন কথাটা কহে।
যজন যাজন যেমতি হয়ে ॥
তিনের সহিত তিনের মিলা।
তিনকে লইয়া তিনের খেলা ॥
তিন যে ডুবিল দুয়ের মাঝ।
দুয়েতে মাতিল কহিতে লাজ ॥
রসের সাগরে উঠিল ঢেউ।
তরুণীরমণে দেখেবা কেউ ॥"

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় একখানি পুরানো পুঁথি আছে। তাহার পত্রাঙ্ক বোধ হয় তিরিশের বেশী হইবে না, এবং তার বয়স মাত্র এক শত বৎসরের কাছাকাছি। সহজ উপাসনার নানাবিধ তত্ত্ব লইয়া পুঁথিখানি রচিত, কিন্তু প্রসঙ্গত ইহাতে তরুণীরমণের ভণিতাযুক্ত কয়েকটী কবিতা আছে। এই জন্য পুঁথিশালায় কর্ত্তৃপক্ষ পুঁথিখানি ভালরূপে চামড়ায় বাঁধাই দেওয়াইয়া অতি যত্নে রাখিয়াছেন। রায়বাহাদুর ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এবং পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পুঁথিখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া কয়েকটী প্রয়োজনীয় অংশ লাল পেন্সিলের দাগে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অনুমতি অনুসারে পুঁথির একাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই অনুমতি দানের জন্য তাঁহারা আমার ধন্যবাদভাজন।

পুঁথির কবিতাংশের বিষয়—তরুণীরমণ বলিতেছেন যে চণ্ডীদাস নকুলকে এই ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন—

"শুন শুন রসিক ভকত বন্ধু জন।
চণ্ডীদাস নকুলে দিলেন প্রেমাঞ্জন" ॥

কিরূপে ইহা ঘটিয়াছিল, পুঁথিতে প্রসঙ্গত তাহারও উল্লেখ আছে।

"রামী রজকিনী সঙ্গে চণ্ডীদাস প্রীত।
নকুলে বুঝাইল রাজা বুঝাইতে হিত ॥
রাজা কহে বাণীতুল্য বিদ্বান চণ্ডীদাস।
সর্ব্বদেশে পূজনীয় নাহি তার হ্রাস।
আমার পণ্ডিত তিঁহো বিদ্যাশিরোমণি।
সকল করিল নাশ রামী রজকিনী ॥

* * * *

রহিত হইয়া আছে দ্বিজ চণ্ডীদাস।
নকুলে ডাকিয়া রাজা করয়ে সম্ভাষ ॥
সভামধ্যে রাজা কহে শুনহে নকুল।
চণ্ডীদাস বিনে আমি হয়েছি আকুল ॥
রহিত করিনু তারে ধুবনী ছাড়িতে।
তবু না ছাড়িল চণ্ডীদাস কোন মতে ॥
উদ্ধার করিব তারে পতিত হইতে।
যাওহে নকুল চণ্ডীদাসের সাক্ষাতে ॥
ব্রাহ্মণ মণ্ডলী করিব অনুমতি লইয়া।
চলিল নকুল মনে হরষ হইয়া ॥

* * * *

"নান্নড়" গ্রামেতে বাসুলীর ঈশান কোণেতে।
চণ্ডীদাসের বাসঘর আছয়ে সেথাতে ॥
রামী রজকিনীর ঘর সেখান হইতে।
দক্ষিণেতে এক পোয়া নিকট সাক্ষাতে ॥"

পুঁথির বানান আমি বজায় রাখি নাই, কেবল "নান্নড়" কথাটী অবিকল রাখিয়াছি। ইহা নান্নুর নামের লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়। কিম্বা লিপিকরের স্থানীয় উচ্চারণই, হয় তো ঐরূপ ছিল। নকলের পর নকলে ইহার অল্প পরিবর্ত্তনও কিছু হইয়া থাকিবে। কিন্তু পুঁথিখানিকে অবিশ্বাস করিবার কোনো হেতু নাই; কারণ, ইহাতে সহজ সাধনের অনেক গোপনীয় তত্ত্ব আছে; এবং শেষের দিকের ছন্দ ও ভাষায় তরুণীরমণের হাতের পরিচয় সুস্পষ্ট। শেষ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের কি হইল, পুঁথিতে তাহার কোনো উল্লেখ নাই। আছে—রাজার কথা শুনিয়া নকুল চণ্ডীদাসের কাছে গিয়া সব কথা বলিলেন। চণ্ডীদাস উত্তর দিলেন আমি দেহ, সে প্রাণ, সে আমার সর্ব্বস্ব। আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না। তবে তুমি রামীর নিকট যাও। সে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব। নকুল রামীর নিকট গেলেন। গিয়া দেখেন, চণ্ডীদাস তৎপূর্ব্ব

হইয়াছেন। রামী সমস্ত শুনিয়া নকুলকে অর্দ্ধরাত্রে একা আসিয়া দেখা করিতে বলিল। নকুল সে কথা রাজাকে জানাইয়া অর্দ্ধরাত্রে চণ্ডীদাস ও রামীর নিকটে গেলেন। তাঁহারা নকুলকে সহজ ভজনের সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব উপদেশ করিলেন।" তরুণীরমণ বলিতেছেন—

"চণ্ডীদাস নকুলকে যাহা শ্লোকে শিক্ষা দিলা।
আপনা বুঝিতে কিছু প্রচার করিলা" ॥

তরুণীরমণ একটা নূতন কথা বলিয়াছেন,—নান্নুরের নিকটেই কোথাও এক রাজা ছিলেন, যিনি চণ্ডীদাসের পঞ্চগ্রামী, বা সপ্তগ্রামী, নবগ্রামী সমাজের সীমানায় অবস্থিতি করিতেন। চণ্ডীদাস তাঁহার সভাপণ্ডিত বা সভাকবি ছিলেন এবং রাজা ধোপানী সঙ্গ ছাড়াইতে চণ্ডীদাসকে "রহিত" করিয়াছিলেন। অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী করার কথায় সন্দেহ হয়—রাজা চণ্ডীদাসের স্বজাতি ছিলেন না। "প্রবাসী"র অগ্রহায়ণের "নান্নুর" প্রবন্ধে আমরা কীর্ণাহারের কিঙ্কিন রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছি। কীর্ণাহার গ্রাম নান্নুরের মাত্র দুই মাইল উত্তরে। হইতে পারে—তরুণীরমণ এই রাজারই উল্লেখ করিয়াছেন। পরে কিলগির খাঁ কিঙ্কিনকে মারিয়া কীর্ণাহার দখল করেন এবং শেষে বেগমের ব্যাপারে চণ্ডীদাসকেও হত্যা করেন।

ভক্তিরত্নাকরের নরহরি চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চণ্ডীদাস ও তারার নাম উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর লিখিত চণ্ডীদাস-বন্দনায় আছে—

"মরি মরি কি রীতি পীরিতি রস শশধর
তারা সহ কো করু ওর।
বিরচয়ে ললিত গীত শুনইতে ইহ
অখিল ভুবন নরনারী বিভোর ॥"

বীরভূমের নান্নুর পল্লী অনেক দিন হইতে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রবাদ লইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রায় চারি শত বৎসরের খবর আমরা দিলাম। নান্নুর যে আরো পুরাতন, সে প্রমাণ আমরা পূর্ব্বোক্ত নান্নুর প্রবন্ধে দিয়াছি। বাঙ্গালায় আজ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় নান্নুরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই।

বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামে চণ্ডীদাসের অবস্থিতি সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবাদ আছে। এমন কি চণ্ডীদাসের ভাই দেবীদাসের বংশধরেরাও না কি আজিও সেখানে বর্ত্তমান আছেন। ছাতনার প্রধান দাবী বাসুলী দেবী। তন্ত্রোক্ত ধ্যানের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি না কি আসল বাসুলীরূপে পরিচিতা হইয়াছেন। কিন্তু বাসুলী যখন বৌদ্ধ দেবতা, ধর্ম্মঠাকুরের আবরণ দেবতা, আবার হিঁদুর ঘরে তিনিই মঙ্গলচণ্ডী, তখন বাঙ্গালার প্রাচীন যে কোনো বৌদ্ধ বা হিন্দু-প্রধান পল্লীতে তিনি থাকিতে পারেন। নান্নুরের মন্দির ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে বাসুলীর অস্তিত্বও লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু গ্রামদেবতার পূজা তো আর বন্ধ থাকে না। তাই রাজভয় তথা মুসলমানের অত্যাচার-ভয় কাটিয়া গেলে মন্দিরের ভিটা হইতে যে কোনো একটা মূর্ত্তি পাইয়া তাহাকেই বাসুলীরূপে খাড়া করা হইয়াছিল। পূজক নিজের বিদ্যাবুদ্ধি মত মূর্ত্তির একটা ধ্যান তৈরী করিয়া লইয়াছেন। অনুষ্টুপ-ছন্দে শ্লোক রচনা সেকালে একটা বেশী কথা ছিল না, একালেও নহে। সুতরাং ঐ অসংস্কৃত ধ্যানই সপ্রমাণ করিতেছে যে, বাসুলী নান্নুরের গ্রামদেবতা ছিলেন, এবং তাঁহারই স্মৃতি বর্ত্তমান মূর্ত্তিতে আরোপিত রহিয়াছে। গ্রামের লোক মূর্ত্তি পাইয়া আর পণ্ডিত না ডাকিয়া নিজেদের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল।

নান্নুরের সঙ্গে ছাতনার প্রবাদের একটা গুরুতর পার্থক্য আছে। সে প্রবাদ চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধীয়। নান্নুরে চণ্ডীদাসের তিরোভাবের যে প্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরানো হাতের লেখা পুঁথিতে তাহার সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। গত ১৩২৬ সালের ২য় সংখ্যক পরিষৎ পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম-এ, সি-আই-ই মহোদয় "চণ্ডীদাস" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য দিয়াছিলেন—পুঁথিখানি দুশো আড়াইশো বৎসরের পুরানো। কবিতাগুলির মর্ম্ম—

"চণ্ডীদাস রামীকে লইয়া কোনো রাজবাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। রাজার রাণী গান শুনিয়া মুগ্ধা হইয়া চণ্ডীদাসকে কামনা করেন এবং সাহস-পূর্ব্বক রাজাকে সে কথা বলেন। রাজা রাগিয়া চণ্ডীদাসকে বধের আদেশ দেন। একটা হাতীর উপরে চণ্ডীদাসকে কাছি দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া হাতীকে জোরে চালাইবার আদেশ দেওয়া হয়। ইহাতেই চণ্ডীদাসের প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই রাণীর মৃত্যু হয় এবং রামী রাণীর পায়ের উপর পড়িয়া কাঁদিতে থাকে।"

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কবিতায় বেগমের উক্তি, চণ্ডীদাসের উক্তি এবং রামীর উক্তিমূলক কথা আছে। বেগম—

"পার্চ্ছায় বেগম" ও 'রাণী' বিশেষণে, এবং রাজা—গৌড়েশ্বর, মহীপতি, নৃপচূড়ামণি প্রভৃতি আখ্যায় বিশেষিত হইয়াছেন। "রাজাহে যবন জাতি" বলিয়াও উল্লেখ আছে। গৌরবে গৌড়েশ্বর নাম সেকালের কবিতায় যত্র-তত্র পাওয়া যায়। অতি ছোট জমিদারও প্রতিপালিতের নিকট গৌড়েশ্বর অভিধান পাইয়াছেন। অনেকের আবার এক গৌড়েশ্বরে তৃপ্তি হয় নাই,—তাঁহারা পঞ্চ-গৌড়েশ্বর নাম দিয়া কবিত্ব করিয়াছেন। সুতরাং কীর্ণাহারের কিলগির খাঁও ঐ নাম পাইতে পারেন,—দুসমনকে কে না ডরায়! কিম্বা কবিতাগুলি তিন শত বৎসরের পরের লেখা, কি লিখিতে কি লিখিয়াছে। অথবা কিলগির গৌড়েশ্বরের দরবারে নালিশ করিয়া চণ্ডীদাস-বধের অনুমতি আনাইয়াছিলেন। প্রবাদ সে কথা ভুলে নাই। হয় তো কিলগিরের বদলে গৌড়েশ্বরের নামটাই প্রবাদে জড়াইয়া গিয়াছিল। পরবর্ত্তী কবি সেই কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। বেগম ও রাণী একজনই হইতে পারেন। কারণ সেকালে অনেক সৈনিক বা ধর্ম্মপ্রচারক মুসলমান এদেশে আসিয়া ছলে বলে জমিদার হইয়া বসিবার পর বিবাহ করিত। টাকার জোরে বড় স্বজাতি-ঘরে বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল, তথাপি অনেকে জোর পূর্ব্বক হিন্দু নারীকে মুসলমান বানাইয়া বিবাহ করিত। নানা কারণে অনেকে ইচ্ছা করিয়াও জাতি দিত। কিলগিরের এইরূপ বেগম বা রাণী থাকা বিচিত্র নহে। হয় তো সে কোনো সহজিয়ার মেয়েও হইতে পারে। মোটের উপর চণ্ডীদাসের অপমৃত্যু বিষয়ক যে প্রবাদ নান্নুরে প্রচলিত আছে, প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে দেশের লোক সে প্রবাদ জানিত। ইহা এ কালের রচা কথা নহে। নান্নুর কীর্ণাহারের ধ্বংস-স্তূপ কেহ হালে তৈরী করে নাই।

যেমন লোকে গৌরব করিয়া বলে "বাঁকুড়ার গান্ধী" "বীরভূমের রামপ্রসাদ" "অভিনব জয়দেব" "দ্বিতীয় ভারতচন্দ্র" ইত্যাদি, তেমনি "চণ্ডীদাস" উপাধি চালানো অসম্ভব নহে। বাসুলী বা মঙ্গলচণ্ডীর সেবকও যে-কেহ চণ্ডীদাস হইতে পারেন। দেশে এমন চণ্ডীদাস যে ছিলেন না বা হইতে পারেন না, এ কথা তো জোর করিয়া বলা যায় না। ছাতনায় হয় তো এমনই কোনো চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন। কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা চণ্ডীদাস যে নান্নুরের অধিবাসী, সে বিষয়ে সংশয় করিবার কোনো হেতু নাই। বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন সম্পাদনকালে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বিশেষ অনুধাবনের পর নান্নুরকেই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বাঁকুড়া জেলার লোক, বহুবার ছাতনায় গিয়াছেন, প্রবাদ শুনিয়াছেন, ইঁট দেখিয়াছেন, অনেক পুরানো পুঁথি ঘাঁটিয়াছেন,—সুতরাং তাঁহার কথা উড়াইয়া দিবার মত নহে।

আপাততঃ প্রায় তিনজন চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। পণ্ডিতেরা একজন 'আদি' চণ্ডীদাস উপস্থিত করিতে চাহেন। "আদি চণ্ডীদাস চারি সে বুঝান", "আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়" এইরূপ লেখা দেখিয়া তাঁহারা আদি চণ্ডীদাসের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে "প্রথম চণ্ডীদাস বুঝাইয়া দেন" বা "প্রথম চণ্ডীদাস বিধেয় কয়" এই রকম মানে না করিয়া "চণ্ডীদাসই প্রথম বুঝাইয়াছেন" বা "চণ্ডীদাসই প্রথম বিধেয় কহিয়াছে" এই মানেও তো করা যাইতে পারে। সুতরাং ঐ দুইটা ছত্রের উপর নির্ভর করিয়া আদি চণ্ডীদাসের স্থাপনা চলে কি না—পণ্ডিতগণকে দ্বিতীয়বার বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এই তথাকথিত আদি চণ্ডীদাসকে বাদ দিলে ছাতনার চণ্ডীদাস, (?) নান্নুরের প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস এবং একজন "দীন চণ্ডীদাস" পাওয়া যাইতেছে। পদকল্পতরুতে "দীন হীন" ভণিতা-যুক্ত যে পদ আছে, তাহা এই দীন-চণ্ডীদাসের। সহজ ভজনের পদ, রাগাত্মিকা পদ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা, রাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, চৌত্রিশা পদ বা চিত্রপদাবলী এবং আরো কয়েকটী (কীর্ত্তনের) পদ ইহার রচিত। "শ্রীনির্ব্বাস" নামে ইহাঁর একখানি সহজ সাধনের পুঁথিও আছে। ইনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য, নরোত্তম শাখা গণনায় ইহাঁর নাম পাওয়া যায়,—

"জয় চণ্ডীদাস যে পণ্ডিত সর্ব্বগুণে।
পাষণ্ডী খণ্ডনে দুঃখ দয়া অতি দীনে॥"

ইহাঁর রচিত নরোত্তম-বন্দনা পাওয়া গিয়াছে—

"জয় নরোত্তম গুণধাম।
দীন দয়াময় অধম দুর্গত পতিতে করুণাবান॥
সখা রামচন্দ্র সনে আলাপন নিশিদিশি রসভোর।
যো হেনু পাতকী তারণ করণ গুণে ভুবন উজোর॥

শকুনি

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

নব তাল মান কীর্ত্তন সৃজন প্রচারণ ক্ষিতি মাঝ।
অতুল ঐশ্বর্য্য লোষ্ট্রের সমান ত্যজনে না সহে বেয়াজ ॥
নরোত্তমরে বাপরে ডাকে স্নাসিমণি পুন প্রভু আবির্ভাব।
দীন চণ্ডীদাস কহ কতদিনে পদযুগ হবে লাভ।"

কেহ কেহ বলেন 'বড়ু' ও 'দ্বিজ' চণ্ডীদাস দুইজন পৃথক ব্যক্তি; আমি তাহা মনে করি না। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে 'বড়ু' 'দ্বিজ', এবং কেবল 'চণ্ডীদাস' অর্থাৎ যাহার সঙ্গে বড়ুও নাই, দ্বিজও নাই, এই তিন রকম ভণিতার এমন কতকগুলি পদ আছে যেগুলি একসুরে বাঁধা; ভাবে ভাষায় ঝঙ্কারে গাম্ভীর্য্যে এতটুকু পৃথক নহে। দ্বিজও বাসুলী আদেশেই বলিতেছেন, এমন পদের অভাব নাই; তা ছাড়া বড়ু ও দ্বিজ তো প্রায়ই একার্থবাচক। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে নাই, কীর্ত্তনীয়াগণ ঘসিয়া মাজিয়া দেন নাই, কোনো 'জয়গোপালের' হাতে শুদ্ধ হয় নাই, ইদানীং এমন অনেক পদও পাইয়াছি, যাহা কেবল চণ্ডীদাস বা দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত, অথচ বড়ু ভণিতাযুক্ত পদের সঙ্গে মিলে। বস্তুতঃ যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক,—নান্নুরের চণ্ডীদাসই যে পদাবলীর রচয়িতা, তাঁহারই অমিয়-মধুর পদাবলীই যে মহাপ্রভুর আস্বাদন-গৌরবে ধন্য হইয়াছিল, তাঁহারই পদাবলী যে পরবর্ত্তী সংগ্রহ-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, এ বিষয়ে সংশয় করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। যিনি আপত্তি করিবেন—এ বিষয়ের প্রমাণের ভার তাঁহাকেই লইতে হইবে। কতকগুলি বাজে তর্ক না তুলিয়া যুক্তিযুক্ত কথায় কেহ আলোচনায় অগ্রসর হইলে, আমরা সসম্ভ্রমে তাঁহার কথার উত্তর দিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত রহিলাম। আমার সংগৃহীত কাগজপত্রও যে কেহ ইচ্ছা করিলেই যখন খুসী পরীক্ষা করিতে পারেন।

চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নাই—এ কথা বহুবার বলিয়াছি, আজও বলিতেছি। কেবল যে ভণিতা দেখিয়াই রচয়িতা ঠিক্ করা যায় না, ইতিপূর্ব্বে এই 'ভারতবর্ষে'ই চণ্ডীদাসের দুইটী পদ তুলিয়া তাহার উদাহরণ দিয়াছিলাম, আজ আর একটী দিলাম। পূর্ব্বোক্ত পদ দুইটী যে চণ্ডীদাসের হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ—নীলরতন বাবুর সংগ্রহের (৪) ও (১২) সংখ্যক পদ তুলিয়া দেখাইয়াছিলাম। (৪) সংখ্যক পদের—

"অঙ্গের বসন ঘুচায়ে কখন সঘনে ঝাঁপয়ে তাই।"
"হাসির চাহনি দেখালে কামিনী পরাণ হারায়্যু ভাই ॥"

এবং (১২) সংখ্যার পদের—

"ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে সঘনে দেখায় পাশ।
উচ কুচযুগ বসন ঘুচায়ে মুচকী মুচকী হাস ॥"

এ চিত্র যে চণ্ডীদাসের রাধিকার নয়, এবং পদ দুইটী জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে, তখন এ কথাও বলিয়াছিলাম। এখন আজিকার কথা বলি। নীলরতন বাবুর সংগ্রহের ২৭৯ ও ২৮০ পদ দুইটী পড়িয়া দেখুন—

"এমন বঁধুরে মোর যেজন ভাঙ্গাবে।
অবলা রাধার বধ তাহারে লাগিবে ॥" (২৭৯)
"সে হেন বঁধুরে মোর যেজন ভাঙ্গায়।
হাম নারা অবলার বধ লাগে তায় ॥" (২৮০)

চণ্ডীদাসের যে রাধা এমন কথা বলিতে পারেন,—

"বিধির বিধানে হাম আনল ভেজাই।
যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই ॥
গুরু দুরুজন যত বঁধুরে দ্বেষ করে।
সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে ॥
আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়।
কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায় ॥
আমার বঁধুকে যে করিতে চাহে পর।
দিবস দুপুরে যেন পুড়ে তার ঘর ॥
এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে।
কেনা বঁধুকে দেখে বুকু ফেটে মরে ॥
বাসুলী আদেশে বড়ু চণ্ডীদাস ভণে।
তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥"

এই সব গালাগালি কি সেই রাধিকার উক্তি বলিয়া মনে হয়? আমরা রুচিবাদী নহি, সংস্কারক নহি। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য যে, চণ্ডীদাসের রসের একটা ধারাবাহিকতা আছে; তাঁর আঁকা ছবির আগাগোড়া একটা সঙ্গতি-সামঞ্জস্য আছে। সে সব না পাওয়া গেলেই তিনি বড়ুই হৌন, আর দ্বিজই হৌন—চণ্ডীদাস বলিয়া তাঁহাকে মানিয়া লইয়া আমরা অপরাধী হইব না। প্রগল্‌ভা নায়িকার চিত্র চণ্ডীদাসের নহে, যিনি ধীরভাবে তাঁহার আক্ষেপানুরাগের পদগুলি পড়িয়াছেন, তিনিই এ কথা মানিয়া

লইবেন। আক্ষেপানুরাগে অভ্যস্ত হইলে, মজিলে—চণ্ডীদাসকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। উপরের পদটী নীলরতন বাবুর বইয়ে দ্বিজ ভণিতায় আছে, প্রাচীন সংগ্রহে আমরা বড়ু ভণিতায় পাইয়াছি। এমন গোলমাল ঢের আছে।

রাধা মোহন ঠাকুর বা আর কেহ যে চণ্ডীদাসের কোনো কোনো পদের "পদপূরণ" করিয়া দেন নাই, এমন কথা আমরা বলি না। কারো কারো ভাল পদ যে লিপিকর প্রমাদে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া যায় নাই, তাই বা কি করিয়া বলিব? তা বলিয়া চণ্ডীদাসের কোনো পদই যে অবিকল পাওয়া যাইতেছে না, আস্ত কিছুই নাই, সব তাতেই ভেল ঢুকিয়াছে—এ কথা বলিবার পাগ্লামীও আমাদের নাই। পণ্ডিতে বলিলেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না এই জন্য, যে, তার প্রমাণাভাব। নীলরতন বাবুর সংগ্রহে অতি পুরানো অনেক পদ আছে, বহু পুরানো পুঁথিতে আমরা সে পদ দেখিয়াছি। চণ্ডীদাসের দেয়াশিনী মিলন প্রভৃতির ইঙ্গিত শ্রীজীব গোস্বামীর গোপাল-চম্পূতে পাওয়া যাইতেছে। অনুসন্ধান করিলে এইরূপ আরো অনেক সূত্র আবিষ্কৃত হইতে পারে। আমরা পদাবলী-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণকে এই সব বিষয় আলোচনার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

হস্তহীন চিত্রশিল্পী—

একজন স্ত্রীলোকের দুইটি হাতই কনুইএর উপর পর্য্যন্ত কাটিয়া যায়। এই স্ত্রীলোকটি দাঁতে তুলি ধরিয়া

হস্তহীন চিত্রশিল্পী

চমৎকার ছবি আঁকিবার অভ্যাস করিয়াছে। এমন কতকগুলি ছবি সে আঁকিয়াছে—যাহা চিত্রবিদ্ ব্যক্তিরা মূল্যবান্ বলিয়াছেন। চিত্রে দেখুন—হস্তহীনা কেমন করিয়া দাঁতে তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিতেছে।

অভিনব সর্প—

দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে নিউ ইয়র্ক সহরের এক জন্তু-শালায় নানা প্রকার সর্পের আমদানী হইয়াছে। ইহার

রকমারী সর্প

মধ্যে নানা প্রকার অত্যন্ত বিষাক্ত সাপ আছে ;—এবং দেখিতে ভয়ানক অথচ গোবেচারী সাপও আছে। ছবিতে দেখুন—একজন একটি গোলাকার বস্তু হাতে করিয়া বসিয়া আছেন। ইহা একটি সাপ। এই সাপকে ছুঁইবা-মাত্র ইহা কেয়ুইএর মত তাল পাকাইয়া যায়। ইহারা ভয় পাইয়াই এই প্রকার করিয়া থাকে। ইহারা খুব নিরীহ প্রকৃতির।

গ্যাস পিস্তল—

আমেরিকার যে সকল লোক ব্যাঙ্কের টাকা পয়সা বহন করিবার কাজ করে, তাহারা পথে-ঘাটে সব সময় সঙ্গে একটি করিয়া গ্যাস পিস্তল রাখে। রাস্তায় কাহারো দ্বারা আক্রান্ত হইলে সে এই কাঁদন-গ্যাস-ভরা পিস্তল ছুড়িয়া আক্রমণকারীকে অভিভূত করিয়া ফেলে। গ্যাস আততায়ীর চোখে মুখে নাকে প্রবেশ করিবামাত্র সে ভয়ানক কাঁদিতে আরম্ভ করে—তখন তাহার কাঁদা ছাড়া আর কিছু করিবার উপায় থাকে না। এই সময় পুলিশ তাহাকে অতি সহজেই ধরিতে পারে।

আত্মরক্ষার্থ গ্যাস ব্যবহার

বালক শিকারী—

আরনেষ্ট কিং নামক একটী বালক তাহার পিতা-মাতার সঙ্গে আফ্রিকার জঙ্গলে শিকার করিতে যায়। বয়স ১০ বৎসর হইলেও এই বালক পাকা শিকারী এবং অসম সাহসী। সে একটি অতি প্রকাণ্ড গণ্ডার কর্তৃক আক্রান্ত হয়—কিন্তু তাহার বন্দুকের গুলিতে গণ্ডার মরিয়া যায়। ছবিতে দেখুন—বালকটি গণ্ডারের পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ক্রীড়াতে নারী—

কিছুকাল হইতে নারীরা পুরুষদের সকল রকম খেলাতেই সমান ভাবে যোগদান করিতেছেন। টেনিস খেলাতে

বালক শিকারী।—পার্শ্বের গণ্ডারটি তাহারই গুলিতে নিহত

ত নারীরা বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেছেনই—বর্ত্তমান সময়ে এমন সকল খেলাতে নারীরা নামিয়াছেন, যাহাতে শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী পরিমাণে দরকার হয়। অনেকের মনেই এখন এই প্রশ্ন জাগিতেছে যে, পুরুষদের সকল প্রকার খেলাই নারীদের খেলা উচিত কি না; এবং খেলিলে তাহার ফল নারীদের দেহ মনের পক্ষে ভাল কি না। নারী অপেক্ষা পুরুষ যে বেশী বলশালী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও দেখা যায় যে, নারীদের শারীরিক কষ্ট-সহিষ্ণুতা পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশী। হঠাৎ খুব জোর দিয়া কোন কাজ পুরুষ যত সহজে পারে, নারী তত সহজে পারে না।

ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় নারী—উচ্চ লম্ফ প্রদান

অনেক পুরুষের পক্ষে খেলা একটা নেশার মত—অনেকের পক্ষে ইহাই পেশা (আমাদের দেশে এ কথা অবশ্য খাটে না)। নারীরাও যদি পুরুষদের মত খেলা জিনিষটাকে তাহাদের অন্যান্য কর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর দরকারী বলিয়া গ্রহণ করে—তাহাতে ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে বলা শক্ত। তবে কতক বিষয়ে যে নারী তাহার নারীত্ব হারাইবে তাহা ঠিক।

নারীর বেড়া উল্লঙ্ঘন

পুরুষদের অপেক্ষা নারীদের খেলিবার, দৌড়িবার, সাঁতার কাটিবার ধরণ ঢের ভাল—এই কথা সাধারণ ভাবে বলা যায়। যে সকল নারী ভাল খেলিতে বা দৌড়িতে পারে না, তাহাদের দৌড়িবার ধরণ (Style) চমৎকার। বিশেষ করিয়া লম্বা-লাফ এবং হার্ডল দৌড়ে নারীদের ষ্টাইল বেশ ভাল দেখা যায়। নারীদের

দৌড়ের বেগ পুরুষ অপেক্ষা কম। তবে বেশী দূর দৌড়ের বেলা তাহারা চেষ্টা করিলে হয় ত ভাল ফল পাইতে পারে।

সন্তরণকারিণী

সাঁতারে নারীরা বোধ হয় পুরুষ অপেক্ষা ভাল। দূর সাঁতার বিষয়ে এই কথা বিশেষ করিয়া বলা যায়। সাঁতারে আজকাল নারারা প্রায় ক্ষেত্রেই ভাল ফল দেখাইতেছে। সাঁতারের দুইটি বিভাগে (১) ডুব সাঁতারে এবং (২) ডুবিয়া থাকাতে পুরুষ নারীকে পরাজিত করিতে পারে নাই।

যে সকল খেলাতে বেশী ক্ষণ ধরিয়া ধৈর্য্যের প্রয়োজন, সেই সব খেলাতে নারীরা পুরুষ অপেক্ষা অধিক পারগ।

রেলবিহীন রেলগাড়ী—

ছবিতে একটি ইঞ্জিন এবং একটি গাড়ী দেখন। গাড়ী আগে আছে। এই ইঞ্জিন এবং গাড়ীগুলির বিশেষত্ব—ইহার চাকাতে রবার টায়ার আছে, এবং ইহার চলিবার জন্য রেল লাইনের দরকার না। ভাল রাস্তা হইলেই হয়। জগতে রেলপথ হীন রেলগাড়ী এই প্রথম। ইহার পূর্ব্বে সকল রেলগাড়ী রেল লাইনের উপর চলিয়াছে। এই গাড়ীব নাম অবশ্য রেলগাড়ী হওয়া উচিত নয়। এই গাড়ী খানি নিউইয়র্ক হইতে লস অ্যাঞ্জলস্ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল।

আমেরিকার প্রথম ইঞ্জিন—

১০০ বছর পূর্ব্বে আমেরিকার ওয়াশিংটন সহরে এ ইঞ্জিনখানি প্রথম চলে। এই ইঞ্জিনখানি এখনও বে
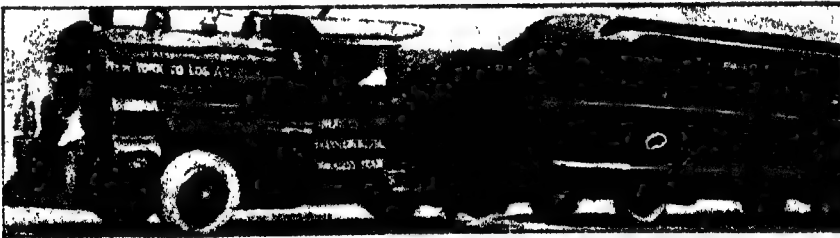
বিনা রেলে রেলগাড়ী

পোক্ত আছে। বাষ্পের সাহায্যে এখনও এই ইঞ্জিন বেশ চলিতে পারে।
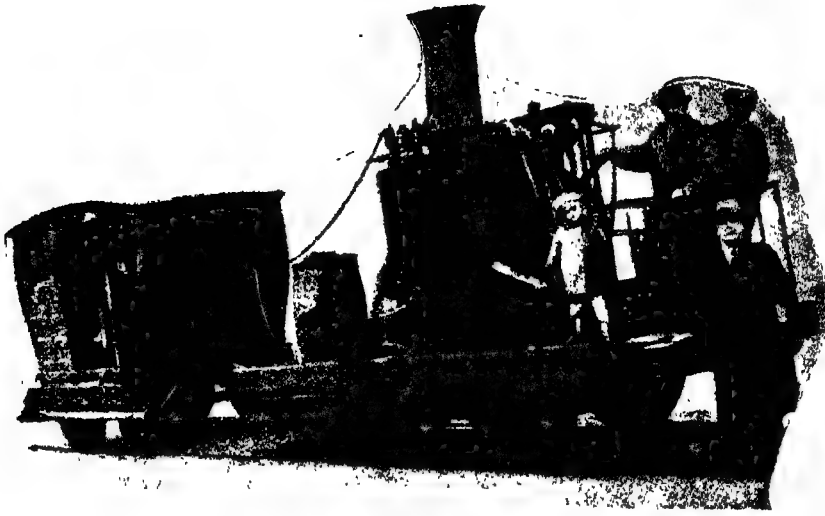
আমেরিকার প্রথম এঞ্জিন (এখনও চলিতে সমর্থ)

অভিনব এরোপ্লেন—

গত বৎসর এক প্রকার নতুন এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনও এই এরোপ্লেনের বিশেষ ব্যবহার আরম্ভ হয় নাই। এরোপ্লেনটি যখন আকাশে উড়ে, তখন ইহা দেখিতে ঠিক অন্য যে-কোন এরোপ্লেনের মতই; কিন্তু ইহা যখন জলে নামে, তখন ইহা একটি পাল-তোলা নৌকাতে পরিণত হয়। দুইটি পাল গুটান থাকে,—জলে নামিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মাস্তুলের সাহায্যে খাটাইয়া দেওয়া হয়। দরকার মত হাওয়া থাকিলে পালের
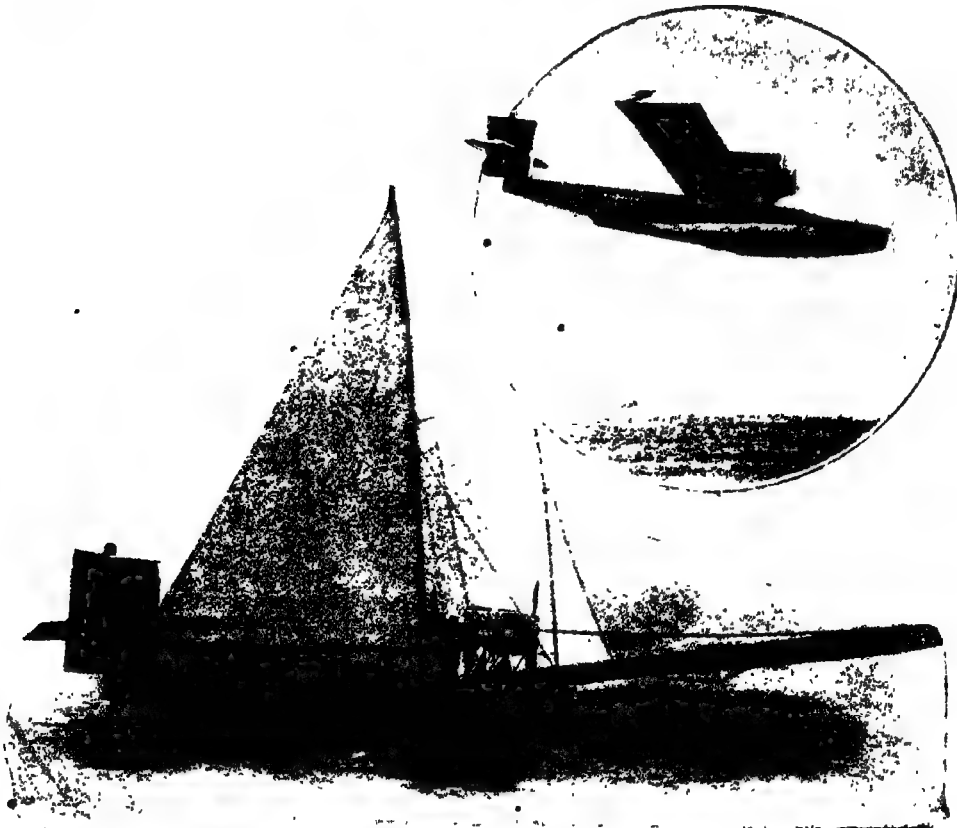
উভচর যান। (আকাশে বিমান; সমুদ্রে নৌকা)

সাহায্যেই এই উভচর যান স্রোত কাটিয়া যায় এবং দরকার মত ইঞ্জিন চালাইয়াও এই এরোপ্লেনটিকে জলের উপর চালাইয়া লওয়া যায়। সমুদ্রের উপর দিয়া আকাশে চলিবার সময় পেট্রোল কম পড়িলে অথবা হঠাৎ ইঞ্জিন খারাপ হইয়া গেলে—ইহাকে জলের উপর নামাইয়া নৌকার মত ব্যবহার করা যায়। এই রকমের এরোপ্লেনের নাম Rohrbach plane। ইহা ডুরেলুমিনের তৈরী। ডুরেলুমিন যেমনি শক্ত তেমনি হাল্‌কা। ইহার আর একটি গুণ এই যে ইহা আগুনে পোড়ে না।

এরোপ্লেন-বম্ব্‌—

এরোপ্লেনে করিয়া কি ভয়ানক ভারী এবং প্রকাণ্ড বোমা শত্রুপক্ষের উপর ফেলা হয়, তাহার ধারণা হয় ত অনেকের নাই। ছবিতে দেখুন, একটি ছোটখাট এরোপ্লেন-বম্বের পাশে একজন লম্বা লোক দাঁড়াইয়া আছে। ইহা হইতেই বোমার আকার বুঝা যাইবে। বোমাটি ১৪ ফিট লম্বা এবং প্রায় ৫৪ মণ ভারী।

এরোপ্লেন-ধরা জাল—

টাকিও টাকাসি নামক একজন জাপানী আবিষ্কারক শত্রুপক্ষের এরোপ্লেন ধরিবার জন্য এক প্রকার অতি অদ্ভুত জাল আবিষ্কার করিয়াছেন। জালের চারিকোণে চারটি প্যারাসুট বাঁধা থাকে। জালের এক প্রান্ত অন্য প্রান্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ভারী। রকেটের ভিতর ভরিয়া এই জাল আকাশের দিকে ছুঁড়িয়া দেওয়া হয়। রকেট ফাটিয়া গেলে পর জালও রকেট হইতে বাহির হইয়া

বিমান-বোমা। (এই প্রকাণ্ড বোমা বিমান হইতে নীচে ফেলিয়া দিলে গ্রামকে গ্রাম উজাড়)।
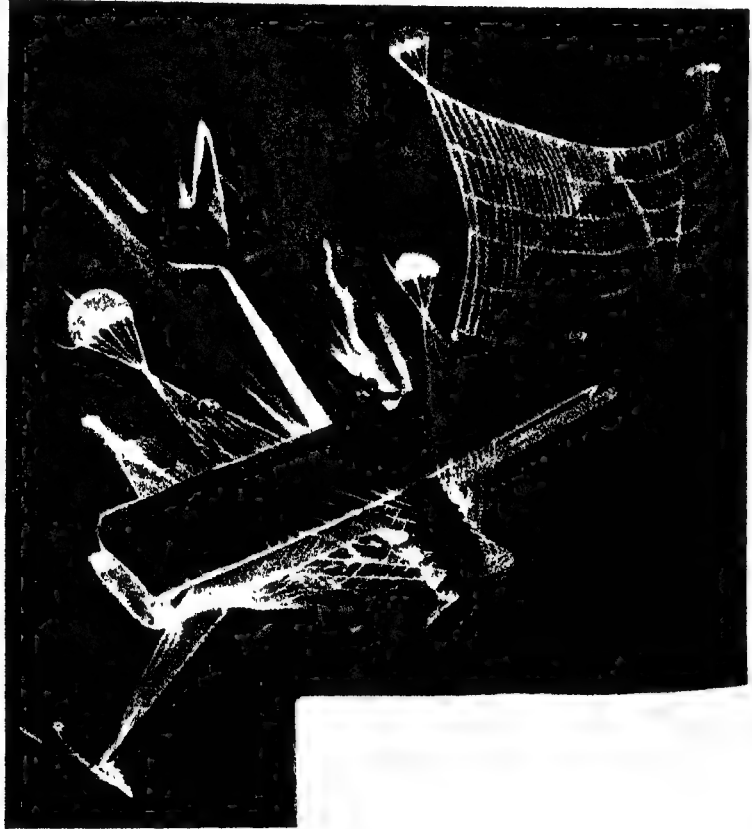
বিমান-ধরা জাল ("আকাশ ঘিরে জাল ফেলে তারা (বিমান) ধরাই ব্যবসা!")

পড়ে এবং প্যারাসুটের সাহায্যে আকাশে ঝুলিতে থাকে। রাত্রিকালেই ইহা আকাশে ছোঁড়া প্রশস্ত। শত্রুপক্ষের এরোপ্লেনের প্রপেলার জালে জড়াইয়া যায়—এবং প্রপেলার বন্ধ হইবামাত্র এরোপ্লেন হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়ে। ছবি দেখিলে এই ভীষণ জালের সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ডানপিটের খেলা—

১২৫ ফিট উচ্চ একটি মইএর উপরে চড়িয়া পরিধেয় বস্ত্রাদি গ্যাসোলিনে ভিজাইয়া তাহার পর তাহাতে আগুন ধরাইয়া নীচের পুকুরে লাফ দেওয়া যাহার তাহার কাজ নয়—ইহাতে কিছু সাহসের দরকার। উইলসন নামক একজন অসমসাহসী ডানপিটে লোক এই কাজটি করিয়া থাকে। হাজার হাজার লোক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া তাহার এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া থাকে।

আর একজন লোককে দেখুন—ইনি ৩০০ ফিট উচ্চ একটি ফ্ল্যাগপোলের (পতাকা-খুঁটি) ডগায় চড়িয়া এক হাতে পোলের ডগা ধরিয়া আর এক হাতে একটি ছাতা লইয়া ভার-সমতার নানা প্রকার খেলা দেখাইতেছেন। এই ব্যক্তির নাম কার্ল এ্যান্টনি—ইনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফর্ণিয়া ষ্টেটের লোক।
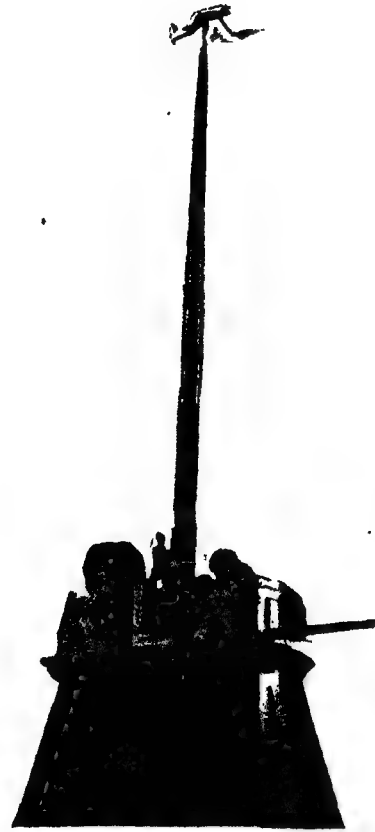
ডানপিটে উইলসন

ভার-সমতার খেলা

আর একজন মোটর সাইকেলওয়ালার কাণ্ড দেখুন। মোটর সাইকেল তীরবেগে ছুটিয়াছে। সেই অবস্থায় এলবার্ট

মিল্‌নায় সাইকেলের ওপর ময়ূর হইয়া চলিয়াছেন। হ্যাণ্ডেল যদি সামান্ত একটু এদিক ওদিক হইয়া যায়—তাহা হইলে ইঁহার বাঁচিবার কোনো আশাই নাই।

খোঁড়া কুকুরের চিকিৎসা—
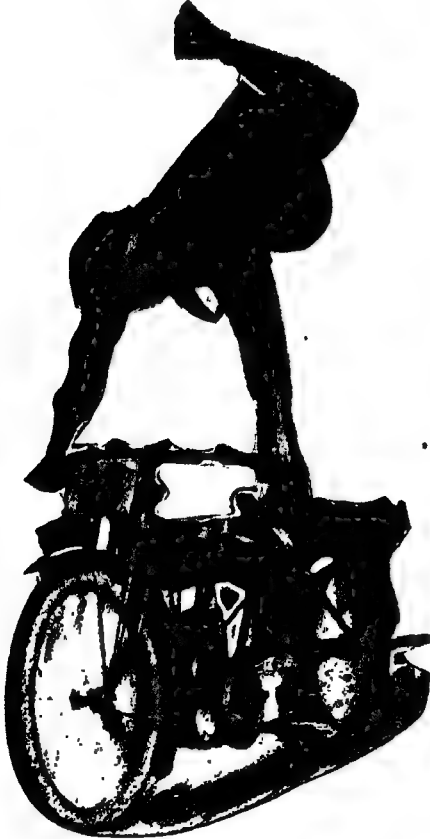
মোটরকারের চাকার তলায় পড়িয়া একটি কুকুরের পিছনের পা দুইটি ভাঙ্গিয়া যায়। চিকিৎসক অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন তাহার পা ভাল করিতে পারিলেন না, তখন কুকুরটিকে মারিয়া ফেলিবার কথা হইল। কিন্তু অন্য একজন পশু-চিকিৎসক এই কুকুরটির জন্ত একটি অভিনব গাড়ী তৈয়ার করিয়া দেন (ছবি দেখুন)।

মোটর সাইকেলের উপর ডিগবাজী

খোঁড়া কুকুরের ঘোড়ার দর (গাড়ীর সাহায্যে চলাফেরা)

গাড়ীর চারটি পায়াতে চারিটি ছোট চাকা লাগান আছে। গাড়ীটি দেখিতে একটি ফ্রেমের মত। সামনের পায়ের সাহায্যে কুকুরটি ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। এই প্রকারে কুকুরটির পিছনের পায়ের অবস্থা ক্রমে ভাল হইতেছে।

গুবরে পোকার ছবি—

ছবিতে দেখুন—একটা ভয়ানক-দর্শন জন্তু ক্ষুদ্রতর কোনো একটি জন্তুকে খাইবার জন্য ধরিয়াছে। ভক্ষক জন্তুটি একটি গুবরে পোকা—একটি মাছিকে খাইতেছে। বায়স্কোপের পর্দাতে ছোট ছোট পোকা মাকড় কি ভয়ানক দেখিতে হয়, ইহা তাহার একটি নমুনা মাত্র।

গুবরে পোকার মক্ষিকা ভক্ষণ

নিরঞ্জন

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

(গাথা)

সাত বছরের শিশু সুকুমার
শুয়ে আছে ; হোলো এগারো মাস,
জানে না কিছুই, তিলে তিলে তার
যক্ষ্মা করিছে জীবন গ্রাস।

বিষে পরিপূর ব্যাধির নাগিনী
খেয়েছে সবারে, মা শুধু আছে
নয়নের জলে চির-অভাগিনী
হৃদি-দুলালের আরোগ যাচে।

কহে যোড় করে "নিয়ো না দেবতা
কোমল মুকুল ছিঁড়িয়া মোর।
সব গেছে, ভালো জানো তো সে কথা,
বাকী ঐ-টুকু প্রেমের ডোর।"

করি কাজ মাতা পরিচারিকার
আনে মাসে মোটে তেরটি টাকা,
(অসহায় শিশু একা ঘরে তার)
তাও অভাগীর হোলো না রাখা।

কে তারে যোগাবে পথ্য, ঔষুধ ;
কে আসে ভিষক্ অর্থ বিনা ?
গৃহে আর নাই এক কণা ক্ষুদ
প্রতিবাসীদের তারে যে ঘৃণা।

শুধু আঁখিজল সম্বল করি'
যায় না ফেরানো স্বাস্থ্য কারো ;
নিয়তির ক্রূর কশাঘাত স্মরি'
মরমের ব্যথা বাড়ে যে আরো।

* * *

আরো তিন মাস কাটিল এমন ;
এলো আশ্বিনে মায়ের পূজা,
কহে কাঙালিনী "হৃদয়ের ধন
বাঁচে যেন মোর মা দশ'ভুজা ;

"জননীর ব্যথা জগতজননী
তুই ছাড়া কেবা বুঝিবে আর ?
বরাভয়করা বিঘ্ন-হরণী
ঘুচা শিব'জায়া অশিব'ভার।"

আর্ত্তের সেই কাতর রোদন
বুঝি মহামায়া শুনিল স্নেহে ;
বাঁশীতে যেমনি বাজিল বোধন
বল পেল' শিশু রুগ্ন দেহে।

গেল ছাড়ি জ্বর, ষষ্ঠীর দিনে
উজ্জ্বল হোলো আননখানি,
বলে "মাগো, মোরে দিবি তো গো কিনে
বিজয়াতে রাঙা কাপড় আনি ?"

* * *

সেদিন বিজয়া ; ধনীর প্রাসাদে
প্রতিমা দেখাতে মা তারে নিয়ে
বাহিরিল পথে, ঝরিল অবাধে
আনন্দে জল দু'চোখ্ দিয়ে।

এক ক্রোশ পথ গেছে দোঁহে হাঁটি
প্রণাম করিতে দেবীর পায়ে,
মায়ে সুতে আজি নোয়াবে মাথাটি
হেরিয়া হরষে বিশ্বমায়ে।

সফল সাধন—সন্তানে চুমি
শোয়াইয়া ধীরে জননী কহে,
"বুকের মাণিক যাদুমণি তুমি
তোর মুখ চে'য়ে সবি যে সহে।"

* * *

নিশীথ রাত্রি, ত্রস্ত চমকে
ব্যাধি-তাপে শিশু ভুতলে লুটে
মুখ দিয়া তার দমকে দমকে
গাঢ় শোণিতের উৎস ছুটে।

"কি হোলো, কি হোলো" চীৎকারে মাতা
বক্ষে কুমারে জড়ায়ে ধ'রে—
স্তব্ধ সকলি, দেছে তারে ধাতা
নর'-নিয়তির অতীত ক'রে।

পরাজিতা

শ্রীযুগলকিশোর সরকার, বি-এ

(এক)

প্রিয়নাথ ছোকরাটি ছিল খুব সাদাসিদে; সাত পাঁচ কাহাকে বলে সে বুঝিত না। দুই বেলা মেডিক্যাল কলেজে হাজিরা দেওয়া, ফুটবল খেলা, আর সন্ধ্যার পর বাড়ীতে আসিয়া দিদির উপর শিশুর মত নানা রকম উপদ্রব করা ছাড়া অন্য কোন রকমের কাজ তাহার ছিল না। তবে এই কাজ কয়টি সে খুব ভাল করিয়াই বুঝিত। প্রিয়নাথ এগজামিন দিলে ক্লাসের অন্য ছেলেদের প্রথম স্থান অধিকার করিবার আশা মোটেই থাকিত না। আর 'ম্যাচ' খেলায় প্রিয়নাথ 'ফরওয়ার্ড' থাকিলে, অন্য দলের 'গোলকিপারের' মাথা 'গোল' খাইবার ভয়ে খেলিবার আরম্ভেই গোলমাল হইয়া যাইত।

প্রিয়নাথ শৈশবেই মাতৃহীন। কাজেই দিদি তরলা দেবী প্রিয়নাথকে মাতার স্নেহে দেখিতেন, তার শত আব্দার অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করিতেন। প্রিয়নাথের পিতা মথুরবাবু ছিলেন 'ব্রেকৃজ' কোম্পানির হেডক্লার্ক। পুত্র প্রিয়নাথকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবার পর বৎসরেই তিনি পরপারের যাত্রী হইলেন। প্রিয়নাথের স্কন্ধে দিয়া গেলেন কেবল একখানি ছোট দোতালা বাড়ী, 'প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের' কয়েক হাজার টাকা, আর ঐ বিধবা দিদিটিকে।

সংসারে অন্য পাঁচজনের যাহা হয় প্রিয়নাথেরও তাহাই হইল। প্রথম শোকাবেগ কিছু প্রশমিত হইলে প্রিয়নাথ দেখিল 'প্রভিডেণ্ট ফণ্ডে' মাত্র চার হাজার টাকা আছে। পড়িবে কি পড়া ছাড়িয়া দিয়া চাকুরীর চেষ্টা দেখিবে, এ বিষয়ে দিদির সহিত সে যুক্তি করিল। তরলা দেবী তাহার পড়া ছাড়িবার প্রস্তাবে মোটেই মত দিলেন না। প্রিয়নাথকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'আমাদের সংসারে খরচ কি? খেতে পরতে মাত্র আমরা দুটী প্রাণী। আমি রান্নাবাড়া করব, অন্য সব কাজও ক'রব। কেবল একটা ঝি রাখব, সে বাজার-টাজার ক'রে দেবে। বাড়ী ভাড়া ত আর আমাদের লাগচে না, কেবল তোমার কলেজের মাইনে মাসে বারটি টাকা। কাজেই আমাদের খাওয়া পরা, তোমার পড়ার খরচ—সব ঐ চার হাজার টাকাতেই আসচে পাঁচ বছর কেটে যাবে। তার পর তুমি পাশ হ'লে আর আমাদের ভাবনা কি?'

প্রিয়নাথ ভারি সাদাসিদে; কাজেই সে ভাবিল, 'বাঃ, এই ত ঠিক্; তবে আর আমাদের ভাবনাটা কি? নাই বা বড়লোক হ'লুম। বড়লোক না হওয়াটা ত' একটা দোষ বা পাপ নয়' ইত্যাদি ইত্যাদি।

(দুই)

দেখিতে দেখিতে চার বৎসর অতীত হইয়াছে। প্রিয়নাথের ক্ষুদ্র সংসারে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পত্নী সুরূপা ঘর করিতে আসিয়াছে। ব্যায়ামে আসক্তিবশতঃ প্রিয়নাথকে এক দিকে যেমন অধিক বলশালী মনে হয়, অন্য দিকে আবার বেশী চিন্তাশীল মনে হয়। মুখটী তেমন আর মুখর সদা-হাস্যময় নাই। এখন আর সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়াই সে ফুটবল্ খেলার গল্প জুড়িয়া দেয় না। কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সে বাড়ী ঢুকিয়াই দিদিকে বলিত, সে কিরূপে সেদিন একজন গোরা খেলোয়াড়ের ঘাড়ে পড়িয়াছিল। তাহার নিকট বল লইতে আসিয়া অন্য দলের 'হাফব্যাক' কিরূপে চীৎপাত হইয়া সটান পড়িয়াছিল, কে হাত ভাঙ্গিয়া আবার তাহাদেরই কলেজে চিকিৎসার জন্য আসিয়াছিল, এবং সে নিজে তাহার চিকিৎসা করিয়াছিল, ইত্যাদি সকল কথা না বলিয়া প্রিয়নাথ জল গ্রহণ করিত না। তরলা দেবী বাধা দিয়া কেবলই বলিতেন,—'একটু জল খা প্রিয়, তবে তোর কথা শুনব; মুখে যে ফেনাবেটে গেল।' কে তখন কথা শুনিবে; খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রিয়নাথ তখন নিজের জয়ঘোষণায় ব্যস্ত থাকিত।

কিন্তু মনের সে নবীনতা, সে সরলতা, সে হাল্‌কাভাব হঠাৎ যেন শুষ্ক, প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। দেখিলেই অস্বাভাবিক গম্ভীর বোধ হইত। কলেজ হইতে আসিয়া সন্ধ্যার সময় চুপিচুপি বাড়ী ঢুকিত; কোন দিন একটু জল খাইত, কোন দিন বা 'ক্ষিদে নাই'—বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইত। আবার কখন কখন জল খাইয়া সমস্ত রাত্রির জন্ত 'নাইট ডিউটিতে' চলিয়া যাইত। তরলা দেবী প্রিয়নাথের এই অস্বাভাবিক ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন! প্রিয়নাথকে জিজ্ঞাসা করিলে 'কই কিছু না', 'এমনি' ছাড়া অন্য কোন উত্তর পাইতেন না। কিন্তু প্রিয়নাথের মনের ভিতর যে একটা বিপ্লবের সূচনা হইয়াছে, এবং এই অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য যে তাহারই বহির্বিকাশ, তরলা দেবী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

(তিন)

বধূ সুরূপাকে বাহ্যতঃ দেখিলে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি নৈপুণ্যের তারিফ্ না করিয়া থাকিতে পারা যাইত না। অবশ্য সুরূপার চোখ দুটী 'পটল চেরা', নাকটী 'টিকল', চুলগুলি 'ভ্রমরকৃষ্ণ' বা 'আগুল্‌ফলম্বিত' ছিল কি না, ঠিক বলিতে পারা যাইত না। সে মুক্ত, উদার, অনবদ্য সৌন্দর্য্য উপমায় শৃঙ্খলিত করা যায় না। তবে দেখিলেই মনে হয়, তাহা যেন একটা একটানা লীলায়িত লাবণ্য, এক ঝলক শরতের জ্যোৎস্না। কিন্তু ভিতরটি ছিল একেবারে অগ্নিময়। সুরূপা দাম্ভিক, অহংকারী ও ঐশ্বর্য্যমত্তা। সুরূপার পিতা 'রিটায়ার্ড' ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। সুরূপা নিজে অনিন্দ্যসুন্দরী ও আধুনিক প্রণালীতে শিক্ষিতা; কাজেই ত্র্যহস্পর্শ। সবার উপর সুরূপা একেবারে বর্ত্তমান যুগের মেয়ে। যে যুগে স্বামীতে 'দেবত্ব' আরোপিত হইত, সুরূপা মোটেই সেই মধ্য যুগের আওতায় শিক্ষিতা হয় নাই। যে যুগে স্বামীতে ঠিক সাধারণ 'মানবত্ব' আরোপিত হয়, স্বামী যে যুগে সঙ্গী, সহচর বা বন্ধু শ্রেণীর—সুরূপা সেই যুগের। কাজেই বধূ সুরূপা ঘর করিতে আসিলে যে সরল, শিশুস্বভাব প্রগল্‌ভ প্রিয়নাথ হঠাৎ চিন্তাশীল ও গম্ভীর হইয়া পড়িবে, তাহা আর বিচিত্র কি? স্বামীর ঘর সুরূপার মোটেই মনোমত হয় নাই। বাগানের ভিতর পিতার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার সহিত তুলনায় সিমলার ছোট গলির ভিতর প্রিয়নাথের জীর্ণ দোতালা বাড়ীটি তাহার চক্ষে আস্তাবলের মত বোধ হইত। পিতার গৃহে 'কৌচ', 'কুশন চেয়ার', 'থ্রোন্ চেয়ার' প্রভৃতি কত মূল্যবান গৃহসজ্জা; আর প্রিয়নাথের দরিদ্র গৃহে মাত্র দু-একটা ভাঙা চেয়ার টেবিল, একখানা খাট। সুরূপার ক্ষোভের সীমা ছিল না। স্বামীর ঘরকে নিজের ঘর মনে করিবার মত মনের প্রশস্তি সুরূপার ছিল না। ক্রমশঃ সে স্বামীর ঘরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। প্রিয়নাথ প্রথম দিনের কথাবার্ত্তার ভাবভঙ্গীতেই সুরূপার অন্তঃকরণ বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। সবার চেয়ে আপনজন দিদিকেও সে এ বিষয়ে কিছু বলে নাই। রুদ্ধ বেদনা বুকের ভিতর জমাট করিয়া রাখিয়া নিজেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল মাত্র।

(চার)

সমস্ত শীতের রাত্রি 'নাইট ডিউটিতে' জাগিয়া বেলা প্রায় আটটার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া প্রিয়নাথ নিজের ঘরে গিয়া ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। পত্নী সুরূপা তখন একটা 'ভারতবর্ষে'র পাতা উল্‌টাইতেছিল। প্রিয়নাথ যে ঘরে প্রবেশ করিল, ইহা যেন সুরূপা দেখিয়াও দেখিল না। ক্লান্ত প্রিয়নাথ অগত্যা পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, 'সুরু, এক কাপ চা খাওয়াতে পার?'

রাগতভাবে সুরূপা উত্তর করিল, 'বেশ তোমার কাজ কিন্তু! এই মাত্র আমার চা খাওয়া শেষ হ'ল আর তুমি এলে। একটু আগে এলে ত আর দুবার ক'রে ঐ এক কাজ আমায় ক'রতে হ'ত না! বরাত ক'রতে ত খুব বাহাদুর—কিন্তু এ দিকে একটা চাকরও নাই। সব কাজই আমায় ক'রতে হবে।' বিস্মিত প্রিয়নাথ কহিল, 'আচ্ছা থাক্, তোমার কষ্ট হবে। কাল সমস্ত রাতটা জেগেচি, তাই তোমাকে ক'রতে ব'ললুম। না হ'লে—'বাধা দিয়া সুরূপা কহিল, 'না হ'লে কাকে হুকুম করতে শুনি?'

'হুকুম আর কাকে করব সুরু; হয় নিজে ষ্টোভ্ জেলে জল গরম ক'রতুম, না হ'লে দিদিকে ব'লতুম।'

'আচ্ছা, তুমি কি আগেও নিজে চা তৈরি করে খেতে?'

'তা না করলে চল্‌ত কেমন করে? চাকর বাকর ত আগেও ছিল না আজও নাই।'

'আচ্ছা, একটা রাখ নাই কেন? রাখলেই ত পার।'

শিক্ষিতা যোড়শ বর্ষীয়া সুরূপা এই 'কেন'র অর্থ কি

তাহা জানিত। জিজ্ঞাসা করিল কেবল উত্তরটুকু নূতন করিয়া উপভোগ করিবার জন্য। রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তির পর এত বড় খোঁচা খাইয়া প্রিয়নাথ নিরুত্তর রহিল। বেদনাতুর ভগ্নহৃদয়ে ভাঙ্গা টেবিলের উপর দুই হাতে মাথা চাপিয়া চেয়ারে পূর্ব্ববৎ বসিয়া রহিল মাত্র। প্রিয়নাথকে নিরুত্তর দেখিয়া কি জানি কি মনে করিয়া সুরূপা মিনিট দশেক পরে এক কাপ চা আনিয়া তাহার আনত মুখের দিকে আগাইয়া দিল। কিন্তু প্রিয়নাথের হৃদয় তখন ভরপুর; চা খাইবার মত সামর্থ্য তাহার ছিল না। ধপ্‌ধপে সাদা পেয়ালায় সোণালি রংএর চা-টা তাহার নিকট একটা রঙ্গিন পরিহাসের মত প্রতিভাত হইল। কেবল কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রুকণা চায়ের পেয়ালার উপর পড়িয়া চায়ের সহিত মিশিয়া গেল।

(পাঁচ)

সাহেবী ভাবাপন্ন বড় লোকের গৃহে অতিমাত্রায় আদরে আব্দারে প্রতিপালিতা হইলে যা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে, সুরূপারও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। যে সব অপরিতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা তাহার মগ্ন-চৈতন্যের ভিতর প্রসুপ্ত অবস্থায় দেদীপ্যমান ছিল—যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব রুদ্ধ উদ্বেল প্রবৃত্তিনিচয়ের বিকাশও হইয়াছিল। বিলাসোপকরণের প্রাচুর্য্যে সেই সব প্রবৃত্তিনিচয় পরিতৃপ্ত হওয়ায় সাম্যভাবে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু প্রিয়নাথের গৃহে সুরূপার অধিকাংশ বাসনাই পরিতৃপ্তি লাভের সুযোগ না পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। ছেলেবেলা হইতে সাধারণ হিন্দুগৃহের নিয়ম সংযমের শত বাঁধনের মধ্যে পালিতা হইলে এবং অনুরূপ শিক্ষাদীক্ষা পাইলে হয় ত বা সুরূপা প্রিয়নাথের ভগ্ন গৃহেই নন্দনের আস্বাদ পাইত। আর প্রিয়নাথের ছিল না কি? অটুট স্বাস্থ্য, সরল স্বভাব, প্রভূত বিদ্যানুরাগ—সবই প্রিয়নাথের ছিল। কিন্তু এ সবের মধ্যে সুরূপার কাম্য জিনিস ছিল কমই। তাই তাহার গর্ব্বিত, উচ্ছৃঙ্খল মন দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে স্বামীর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। স্বামী যে স্ত্রীলোকের আরাধ্য দেবতা—তা তিনি ধনীই হউন আর দরিদ্রই হউন—এই সহজ সত্য কথাটি সুরূপার মনে ভুলক্রমেও স্থান পায় নাই। তাই আজ গত দিনের রাত্রি জাগরণের পর বেলা তিনটার সময় প্রিয়নাথ গাত্রোত্থান করিবামাত্র সুরূপা কহিল,—'দেখ, আজ বিনয়দার চিঠি পেলুম। লিখেছে—বৌদিকে নিয়ে 'সি-বাথ' ক'রতে পুরী যাবে। আমায় যেতে লিখেছে।'

নিদ্রাভঙ্গের পরই 'সি-বাথের' অছিলায় তাহার অদৃষ্টে আবার নূতন করিয়া কি অপমান সঞ্চিত আছে, হঠাৎ ঠিক করিতে না পারিয়া, প্রিয়নাথ শূন্য দৃষ্টিতে সুরূপার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, উত্তর যোগাইয়া উঠিল না। অসন্তোষের স্বরে সুরূপা পুনরায় কহিল, 'কি—উত্তর দিলে না যে?'

এবার উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'কি বলব বল।'

'বাঃ, কি বলব বল—এতক্ষণ পরে বুঝি এই উত্তর খুঁজে পেলে? বিনয়দা 'সি-বাথে' যাচ্চে। বিনয়দা নিজে আমাকে নিতে আসতে পারবে না। অমরদা পরশু আমায় নিতে আসবে। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। এই ত' কথা! তা আর বলবে কি?' অমরদার শুভাগমন করিবার এবং সুরূপার বিনয়দার সহিত সি-বাথে যাইবার যে সব ঠিক হইয়া গিয়াছে, প্রিয়নাথ তাহার কিছুই জানিত না। অনুচ্চ-স্বরে প্রিয়নাথ কহিল 'পরশু থেকে আমার 'ফাইনেল এগ্‌জামিন' আরম্ভ হবে—আর তুমি চলে যাবে?' ঝঙ্কার দিয়া সুরূপা কহিল 'এগ্‌জামিন হবে ত 'সি-বাথে'র সঙ্গে কি?'

'কিছু না; তবে এত গরমে পুরী যাবে—তাই বলচি।'

'বেশ কথা কিন্তু; এত গরমে এই অন্ধকূপের মত ঘরে থাকা চলে; আর পুরীতে সমুদ্রের ধারে দোতালা ফাঁকা বাড়ীতে থাকা চ'লতে পারে না? তুমি না ডাক্তারী পড়?'

'আচ্ছা তাই যেও'—বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রিয়নাথ বাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া গেল। সে বেশী কিছু বলিতে পারিল না। তাহার ডাক্তারী বিদ্যার উপরও সুরূপা যথেষ্ট সন্দিহান—এই পরম সত্যে তাহার হৃদয় তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

* * * * * *

(ছয়)

অনেক দিনের পর প্রিয়নাথকে পূর্ব্বের মত হাসিমুখে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া তরলাদেবী আনন্দিত হইয়া সমীপবর্ত্তী হইলেন। যে প্রগল্ভ শিশুস্বভাব এতদিন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল, আজ যেন তাহা প্রিয়নাথের চোখে মুখে ফুটিয়া

উঠিয়াছিল। তরলাদেবী জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই প্রিয়নাথ দুষ্টামীর সুরে কহিল, 'একটা সু-খবর দিলে কি দেবে বল ত'?' আনন্দিত হইয়া তরলাদেবী কহিলেন, 'কি রে, পাশ হ'য়েছিস্ না কি?' 'হ্যাঁ, একেবারে ফার্ষ্ট, সোনার মেডেল পেয়ে।' তরলাদেবী প্রিয়নাথের মস্তক চুম্বন করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দুই চারি ফোঁটা তপ্ত অশ্রুজল প্রিয়নাথের হাতের উপর পড়িয়া গেল। তরলাদেবীর হাত ধরিয়া একটু ঝাঁকানি দিয়া বালকের মত আব্দারের সুরে প্রিয়নাথ কহিল, 'যাও—সব তাতেই তুমি বড় কাঁদ,—তাই ত কিছু ব'লতে চাই না।'

'আমি কাঁদচি প্রিয়,—আজ আমাদের এই সুখের দিনে মা বাবা কোথায়। তোমাকে একবছরের রেখে মা আমার চ'লে গেছেন। সেই অবধি আমি তোমাকে বুকে করে—' আবার অবাধ অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িল, তরলাদেবী কথা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'আবার কাঁদে, তবে আমি চল্লুম।' 'না ভাই, লক্ষীটি আমার, আমি আর কাঁদব না' বলিয়া তরলা-দেবী অঞ্চলাগ্রে অশ্রু মুছিলেন। আনন্দিত হইয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'জান, আরও কত খবর আছে। 'ব্রেক্-জ' কোম্পানীর বড় সাহেব আজ পাঁচ বছর বিলেতে ছিল। বিলেতে 'ব্রেক্-জ' কোম্পানীর যে 'ফারম্' আছে, তার কাজ তিনি এত দিন দেখা শুনো ক'রছিলেন। তাঁর ছোট ভাই এখানকার বড় সাহেব হ'য়েছিলেন। তিনি সম্প্রতি এখানে ফিরে এসেছেন। বাবা তাঁকে ঐ কোম্পানীরই একটা 'শেয়ার' বিক্রি করে টাকা তাঁর কাছে মজুত রেখেছিলেন। তুমিও জান বোধ হয় বাবার একটা 'শেয়ার' ছিল। বাবা যে মারা গেছেন—বিলেতে থাক্‌তে থাক্‌তে তিনি তা জানতে পারেন নাই। এসে শুনেছেন, বাবা মারা গেছেন। তদন্ত ক'রে, আমি তাঁর ছেলে জানতে পেরে, টাকা নিতে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।'

বাষ্পাকুল কণ্ঠে তরলাদেবী কহিলেন, 'ভগবানকেই তায় লাগে প্রিয়! আমি ভেবে সারা হ'চ্ছিলুম—ডাক্তারিতে বসবার সময় কোথায় তুমি টাকাকড়ি পাবে। টাকা যা মজুত ছিল, তা ত' প্রায় সব ফুরিয়ে এসেছে। আমি ঠিক করেছিলুম—আমার গয়নাগুলা সব বিক্রি ক'রে তোমাকে টাকা দোব।'

'কিন্তু কালই যে আমাকে পুরী যেতে হ'চ্চে।' পুরীর কথায় তরলাদেবীর বধূ সুরূপাকে মনে পড়িল। বিমর্ষভাবে কহিলেন, 'প্রিয়, বউ কি তোকে চিঠি দেয় না রে? সে কি এখন পুরীতে?' বর্ত্তমানে বধূ সুরূপার কথা প্রিয়নাথের মনে ছিল না। অকস্মাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ায়, যেন একটা পুরাতন বিষাক্ত ক্ষতে নূতন করিয়া অস্ত্রোপচার হইল। কহিল 'বউ ত আমাকে চিঠি-পত্র দেয় না দিদি। সে ত আজ চার মাস পূর্ব্বে সে তার মামাত দাদা বিনয়বাবুর সঙ্গে পুরীতে সমুদ্র-স্নানে গিয়েছিল। এখনও কি আর সেখানে বসে থাকবে। আর থাকলেই বা কি? তাঁরা কোথা থাকেন আমি তা জানি না। জানলেও সেখানে যাবার আমার মোটেই প্রবৃত্তি থাক্‌ত না। আমি দরিদ্র, তার চোখে হেয়, অবজ্ঞেয়। পুরুষ মানুষ দিদি, তাই সব নিজের ভেতরেই রেখেছি। যদি জানতে—থাক্।'

তরলাদেবী একটা চাপা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। প্রিয়-নাথ পুনরায় কহিল, 'আমি ত ব'লেছিলুম দিদি, বড়লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতে করে কাজ নাই। তুমি ত শুন্‌লে না।'

'সবই ভবিতব্য প্রিয়; না হ'লে তোমার খেলা দেখে যোগেনবাবুর অত ভাল লাগবে কেন? আর তিনি বিনা নিমন্ত্রণে বাড়ীতে এসে আমাকে শুদ্ধ অত অনুরোধ ক'রবেন কেন? যেন আমি যোগেনবাবুর মেয়ে—এমনি স্নেহে তিনি কথাবার্ত্তা বলেছিলেন। মনে ক'রেছিলুম, অমন দেবোপম লোকের মেয়ে নিশ্চয় ভালই হবে। কিন্তু আমাদের বরাতের দোষে সব উল্‌টো হ'য়ে গেল। যোগেনবাবুর দোষ কি?'

'বল কি দিদি? কই, এই চার মাসের মধ্যে একটা চিঠিও ত' তিনি দিতে পারতেন।'

'হয় ত মনে ক'রেছেন, তাঁর মেয়ে তোমাকে নিয়মমত চিঠি পত্র দেয়; তাই হয় ত তিনি আর নিজে লেখেন নাই। বুড়ো হ'য়েছেন—হয় ত সব সময় খেয়ালই থাকে না।'

প্রিয়নাথকে বিমর্ষ ও নিরুত্তর দেখিয়া তরলাদেবী এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, 'কিন্তু এ বছর ছেলেদের পাণ্ডা সেজে তোমাকে আমি পুরীতে যাত্রীদের চিকিৎসা ক'রতে যেতে দোব না।' প্রিয়নাথ উত্তর করিল, 'তা কি হয় দিদি? সাহেব ভাববে প্রিয়নাথের মনের বল কমে

গেছে। জগতের অনেকে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও, সাহেব যে বড় সম্মানের চোখে দেখেন দিদি? তাঁর কাছে আমি কোন রকম দুর্ব্বলতা দেখাতে পারব না। তা ছাড়া, কত বিপন্ন যাত্রী আমাদের যত্নে গত দুবছর প্রাণ পেয়েছে, তা যদি জানতে দিদি, তা হ'লে বারণ ক'রতে না।'

'তা বটে! তবে তুমি ঐ সব রোগীদের নিয়ে দিনরাত নাড়াচাড়া ক'রবে, আর আমি কেমন ক'রে ঘরে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকব' বল ত'।'

'বাঃ! তবে তুমি ডাক্তারী প'ড়তে অত জেদ করেছিলে কেন? ডাক্তার হ'লেই ত ঐ-সব ক'রতে হবে। তোমার আর ঘরে থাকবার ভাবনাটা কি? ঝি রাতে তোমার কাছে শোবে। আর বিশ্বনাথ দুবেলা তোমার খবর নিয়ে যাবে, কেমন?'

বিশ্বনাথ প্রিয়নাথের সতীর্থ ও বন্ধু শচীনাথের ছোট ভাই; প্রিয়নাথদের বাড়ীর নিকটে থাকিত। অতঃপর তরলাদেবী আর কিছু বলিলেন না। প্রিয়নাথের পুরী যাওয়াই ঠিক হইল।

(সাত)

ডাক্তার প্রিয়নাথের নেতৃত্বে মেডিক্যাল কলেজের যে পনের জন 'সিনিয়ার ষ্টুডেণ্ট' স্বেচ্ছাসেবক হইয়া ৺পুরীধামে আসিয়াছিল, তাহারা যোগ্যতার সহিত স্ব-স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল। বামনদেবকে রথে দেখিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না—এই আশায় সহস্র সহস্র নরনারী ৺পুরীধামে আসিয়াছিল। দারুণ গ্রীষ্মে এই বিরাট জনতায় বিসূচিকা অন্যান্য বৎসরের মত তাহার ভৈরবী মূর্ত্তি লইয়া হাজির হইতে ভুল করে নাই। প্রিয়নাথের অক্লান্ত পরিশ্রমে শত শত বিপন্ন যাত্রী রোগমুক্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। যাত্রীর ভিড় আর নাই, প্রিয়নাথের কাজও শেষ হইয়াছে। তাই অনেক দিনের ক্লান্তির পর প্রিয়নাথ সতীর্থ শচীনাথকে লইয়া সন্ধ্যায় সমুদ্রতীরে পায়চারি করিতেছিল। এমন সময় একটী ভদ্রবেশী, প্রিয়দর্শন যুবাপুরুষ নিকটবর্ত্তী হইয়া তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, 'মশাই না ক'লকাতা থেকে যাত্রীদের চিকিৎসা ক'রতে এসেছেন?'

একটু বিস্মিত হইয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'আজ্ঞে হাঁ! তা আপনি আমায় চিনলেন কেমন ক'রে?'

'আপনাকে আমি গত ১৪।১৫ দিন বিপন্ন যাত্রীদের খোঁজ নিতে দেখেছি।'

'তা আমার সঙ্গে আপনার প্রয়োজন?'

'আমার এক ভগ্নীর বেলা ন'টা থেকে কলেরা হ'য়েছে। যে ডাক্তার দেখছিলেন তিনি কিছু ক'রতে পারলেন না। বোধ হয় 'টাইপ' খুব খারাপ। এখন জ্ঞানহীন অবস্থায়। আমি অন্য ডাক্তার ডাকবার জন্যে বেরিয়েছি—আর এই রাস্তায় আপনার দেখা পেলুম। একবার দয়া করে আপনাকে যেতে হবে; ঐ আমার বাড়ী'—বলিয়া একটী হ'লদে রংএর দোতালা বাড়ী অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। স্বেচ্ছাসেবকের দল সমুদ্রতীরের একটী বাড়ীতে আড্ডা করিয়াছিল। সেখান হইতে তাড়াতাড়ি ঔষধপত্র লইয়া প্রিয়নাথ ও শচীনাথ শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে হাজির হইল। রোগিনীকে দেখিয়াই প্রিয়নাথের শরীরে একটা প্রবল উষ্ণ রক্তস্রোত বহিয়া গেল। একটা বিরাট অন্ধকার চক্ষের সামনে ঘনাইয়া আসিল। এ যে তাহার পত্নী সুরূপা! প্রিয়নাথ প্রথমে বড় বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু উত্তেজনায় চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটিলে প্রাণহানি হইবে নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়া অতি কষ্টে উত্তেজনা দমন করিয়া সে চিকিৎসা সুরু করিয়া দিল। বলা বাহুল্য, ঐ ভদ্রবেশী যুবকটি সুরূপার 'বিনয়দা'। প্রিয়নাথ কোনরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিল না। চার পাঁচঘণ্টা অবিরাম চিকিৎসার পর সুরূপার জ্ঞানসঞ্চার হইল। এমন কঠিন ব্যাধিরামে এত দিনের পর অকস্মাৎ প্রিয়নাথকে দেখিলে উত্তেজনায় সুরূপার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা; এজন্য প্রিয়নাথ উপরের বারাণ্ডায় বসিয়া ছিল। তাহার আদেশমত শচীনাথ ঔষধাদি বদলাইতেছিল। নীলাম্বুরাশি অশ্রান্ত গর্জ্জনে বেলাভূমির উপর আছড়াইয়া আবার ফিরিয়া যাইতেছিল। প্রিয়নাথ বারাণ্ডায় বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে সেই অপার জলরাশির দিকে উদাস নেত্রে চাহিয়া ছিল। তাহার বুকের উপর কাণ পাতিয়া দেখিলেও বোধ হয় একটা বিরাট ব্যর্থতার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত।

ক্রমশঃ সুরূপা আপনাকে সুস্থ বোধ করিতে লাগিল। রাত্রি ১২টার সময় কথাবার্ত্তা কহিল। তৎপরে ঘণ্টা চারেক নিদ্রালস ভাবে থাকিয়া প্রভাতের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ জ্ঞানসঞ্চার

হইল। পূর্ব্বাকাশ রক্তিম হইতে আরম্ভ করিতেই যথাবিধি ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রিয়নাথ গৃহস্বামী বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিদায় লইতে গেল। বিনয়বাবু ইংরাজী আদব-কায়দা অনুযায়ী 'থ্যাঙ্কস্' দিয়া একখানি এক শত টাকার নোট প্রিয়নাথের হাতের দিকে আগাইয়া দিল। হাত সরাইয়া লইয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'মাপ ক'রবেন, বিনয়বাবু; আপনি ভুলে গেছেন—আমরা স্বেচ্ছাসেবক। উপার্জ্জনের জন্যে আমি আর আমার সহযাত্রীগণ ৺পুরীধামে আসি নাই। থাক্—যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাদের আবার খবর দেবেন। তবে সম্ভবতঃ আর প্রয়োজন হবে না।' বলিয়া বিনয়বাবুকে আর কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া প্রিয়নাথ বাহির হইয়া গেল। বিনয়বাবু একটু বিস্মিত হইল।

(আট)

অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটী যোগেনবাবু জীবনের অপরাহ্ণে বিহারের একটী সহরে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন। চা পানান্তে 'ইংলিশম্যান' খানি খুলিবামাত্র প্রথম 'কলমে' বড় বড় হরফে দেখিলেন, 'The Efforts of the Medical College Volunteers—A Success.' 'এডিটর' মেডিক্যাল কলেজের স্বেচ্ছাসেবকদের কার্য্যাবলীর শতমুখে প্রশংসা করিয়া কাপ্তেন প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাহার নীচেই দেখিলেন 'Personal Tribute' বলিয়া শচীনাথ মিত্র বলিয়া একজন, প্রিয়নাথের বিদ্যাবত্তা, আত্মত্যাগ ও কর্ত্তব্যানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, শেষে তাহার অদ্ভুত মানসিক শক্তির জন্য ধন্যবাদ দিয়াছেন। এমন কি, পুরী ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কিরূপে কাপ্তেন প্রিয়নাথ তাঁহার নিজের স্ত্রীর কলেরার চিকিৎসা করিতে গিয়াও এতটুকু বিচলিত হন নাই, এবং কিরূপে আত্মগোপন করিয়া চিকিৎসা সম্পাদন করিয়া রোগিনীকে মৃত্যুপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহাও লিখিয়াছেন।

যোগেনবাবু একটু গম্ভীর হইয়া মেয়ে সুরূপাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 'সি-বাথে'র জন্য পুরীতে চারি মাস বাস করার তিনি অনুমোদন করেন নাই। বাড়ী ফিরিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সম্বন্ধিপুত্র. বিনয়কে ও সুরূপাকে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে নাই। যৌবনের প্রাক্কালে যোগেনবাবু পুরাদস্তুর বিলাতী আচার-ব্যবহার ও আদব-কায়দার পক্ষপাতী ছিলেন। সেই আদর্শ অনুযায়ী মেয়ে সুরূপাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবনের অপরাহ্ণে বিলাতী সভ্যতার রঙ্গিন আবরণ যোগেন বাবুর চক্ষু হইতে খসিয়া গিয়াছিল। সুরূপার ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যের জন্য তিনি বর্ত্তমানে আপনাকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া আন্তরিক কষ্ট পাইতেন।

সুরূপা তখনও শয্যাত্যাগ করে নাই। এত দিন অবিশ্রান্ত আমোদ-প্রমোদে গা ঢালিয়া দেওয়ার পর অবসাদের জন্যই হউক, বা কঠিন পীড়ার পর দুর্ব্বলতার জন্যই হউক, সুরূপাকে বড় মলিন ও উন্মনা দেখাইতেছিল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই সুরূপার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল; তবুও বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া সে কত কি ভাবিতেছিল। যে ডাক্তার পুরীতে সুরূপার চিকিৎসা করিয়াছিল, সুরূপা তাহাকে দেখে নাই। তবে শুনিয়াছিল, একটী স্বেচ্ছাসেবক নবীন ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিয়াছিল। কি জানি কেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটী নবীন ডাক্তারের ছবি সুরূপার মানসনেত্রে প্রতিভাত হইল। তিন চার মাস পূর্ব্বের অস্পষ্ট স্মৃতির রুদ্ধ দ্বারে কে যেন হঠাৎ আঘাত করিল। সুরূপার মনে পড়িল, যেদিন সে কলিকাতা ত্যাগ করে, সেদিন প্রিয়নাথের পরীক্ষা প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। বেলা দশটার সময় সুরূপার কলিকাতা ছাড়িবার ট্রেণ; কিন্তু প্রিয়নাথের পরীক্ষা বেলা নয়টার সময় আরম্ভ হইবে বলিয়া, প্রিয়নাথই সুরূপা ও সুরূপার অমরদার নিকট বিদায় লইয়াছিল। বিদায়ের সময়ের সেই ছল-ছল' চোখ দুটী সুরূপার মনে পড়িল। তাহার ও তাহার অমরদার দিকে চাহিয়া কেবল 'সুরু, তোমরা তবে দশটার গাড়ীতেই যেও, গাড়ী ব'লে রেখেছি; আমার ন'টাতে 'এগজামিন' আরম্ভ হবে আমি তবে চ'ল্লুম' বলিয়া ত্রস্তপদে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। সেই ব্যথামণ্ডিত মুখখানি সুরূপা আজ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। প্রিয়নাথের সেই শিশুসুলভ সরলতা, সেই অনাবিল ভালবাসার প্রতিদানে সে কি দিয়াছে—সুরূপা আজ তাহাই ভাবিতেছিল। প্রিয়নাথের বেদনাতুর হৃদয়কে সে কেবল বারে বারে আঘাত করিয়াছে মাত্র। আজ যেন তাহার সন্দেহ হইতেছিল—তাহার শিক্ষা, তাহার সৌন্দর্য্য, তাহার আভিজাত্য তাহাকে জয়মাল্য

দিয়াছে কি না। আজ যেন তাহার মনে হইতেছিল তাহার এই পরিপূর্ণতার মধ্যে কোথায় একটা মস্ত-বড় ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। কোন্ অদৃশ্য 'মন্ত্রশক্তি'র প্রভাব আজ তাহার সমস্ত চৈতন্যটাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ পিতার নিকট হইতে ডাক আসাতে, তাড়াতাড়ি উঠিয়া মুখে-চোখে একটু জল দিয়া সে পিতার গৃহে প্রবেশ করিল। যোগেনবাবু কন্যার বিমর্ষ মুখখানির দিকে একবার চাহিয়া তাহাকে পাশের চেয়ারে বসিতে বলিলেন; এবং 'ইংলিশম্যান'-খানা তাহার হাতে দিয়া বড় বড় হরফে লেখার যায়গাটা অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। পড়িতে পড়িতে সুরূপার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল; যোগেনবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সুরূপা চিরদিন ভোগেই সেবা করিয়া আসিয়াছে। একজন তাহার বাঞ্ছিতের জন্য নিজের জীবনকে হেলায় বিপন্ন করিয়া, অভিমানে আত্মগোপন করিয়া, কোন পুরস্কার, কোন আদরের অপেক্ষা না করিয়া যে চলিয়া যাইতে পারে, প্রিয়নাথের ব্যবহারে তাহা সুরূপা বেশ দেখিতে পাইল। পিতার নিকট আসিবার পূর্ব্ব হইতেই কি এক অদৃষ্ট মহাশক্তি তাহার মনটাকে কেবল প্রিয়নাথের দিকে টানিতেছিল। তাহার উপর খবরের কাগজের ঐ বড় বড় হরফের কাল লেখা কয়টার উপর প্রিয়নাথের নিষ্কাম, অনাবিল প্রেম যেন নিকষে সোণার আঁচড়ের মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। অশ্রুময়ী সুরূপার হৃদয় তখন ভরপূর; কথা কহিবার সামর্থ্য তাহার ছিল না। যোগেন বাবু সস্নেহে কন্যার পিঠে হাত দিয়া কহিলেন,—'এখন বুঝতে পেয়েছ ত মা—গলদ কোন্‌খানে? প্রিয়নাথের এই আত্মত্যাগ, এই আত্মগোপন তোমার পরাজয়ই ঘোষণা ক'রছে।' বাষ্পাকুল-কণ্ঠে সুরূপা কহিল, 'হাঁ বাবা, আমি তাঁকে—' সুরূপার গলা ভারী হইয়া উঠিল, সে কথা শেষ করিতে পারিল না। চেয়ারটা আর একটু সুরূপার দিকে আগাইয়া দিয়া সুরূপার মাথায় হাত দিয়া যোগেনবাবু কহিলেন, 'পাগলা মেয়ে, সব তাতেই বাড়াবাড়ি। যখন আর একটু বড় হবে মা, তখন বুঝতে পারবে—এ অনুতাপেরও প্রয়োজন আছে। মঙ্গলময়ের রাজ্যে কোন কিছু অর্থহীন নাই, অবিচার নাই। যে উঁচু আসন প্রিয়নাথকে তোমার আপনা আপনি দেওয়া উচিত ছিল, তুমি তা দাও নাই। তাই আজ প্রিয়নাথ জোর ক'রে তোমার কাছ থেকে তা আদায় ক'রছে—তার ত্যাগের ভেতর দিয়ে। এটা যে তার ন্যায্য অধিকার; এতে বাধা দিলে পরাজয় যে শেষে তোমার হবেই মা। তুমি না 'সত্যেন্দ্র দত্তর' একটা কবিতা আমাকে প'ড়ে শোনাচ্ছিলে; তাতে না লেখা ছিল 'হক্‌দাবী যার বুক তাজা তার।' পাগলা মেয়ে এত পড়াশুনো কর, তবু সোজা জিনিসে এত ভুল কেন কর মা?' ব্যথিতা সুরূপা উত্তর কহিল, 'এখন কি ক'রব বাবা, আমি যে ভেবে কিছু ঠিক ক'রতে পারছি না?' শান্তকণ্ঠে যোগেন বাবু উত্তর করিলেন, 'কেন, তার জন্যে বেশী ভাববার ত দরকার দেখছি না! তোমাকে বরাবর প্রিয়নাথের কাছে যেতে হবে, আর কি? সুনীলের কলেজও ত পরশু খুলচে, সে তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে। প্রথমে গিয়ে তোমার জ্যেঠামহাশয়ের বাসায় উঠবে, তার পরে সুনীল তোমাকে প্রিয়র বাড়ীতে রেখে আসবে।'

সুনীল যোগেনবাবুর একমাত্র পুত্র; কলিকাতায় এম-এ পড়ে। সুরূপা কহিল, 'আমি যে তাঁর বিনা অনুমতিতে কলকতা ছেড়ে এসেছি। আমি গেলে তিনি কি আর তাঁর ঘরে আমাকে—' মুখের অসমাপ্ত কথা টানিয়া লইয়া যোগেনবাবু কহিলেন "যায়গা দেবেন না—এই ত বলতে চাও মা? পাগল আর কি, এখনও তুমি প্রিয়কে ঠিক চিনতে পার নাই সুরু। সে তোমাকে বরণ ক'রে নেবার জন্যে চিরদিন প্রস্তুত ছিল; আর আমি জোর ক'রে ব'লতে পারি, তার ঘরে তোমার ন্যায্য আসন আজও তেমনি ভাবে পাতা আছে। তোমার কোন ভয় নাই মা; শুধু নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চেও। তুমি যে অনুতপ্ত হ'য়েছ, তা সে তোমাকে দেখলেই বুঝতে পারবে। একবার তোমার এই বুড়ো ছেলের কথা শুনেই দেখ না। হাঁ, তুমি এখন এস'। বেলা হ'য়েছে, স্নান ক'রে খাওয়া দাওয়া ক'রে, কলকাতা যাবার বন্দোবস্ত করগে।' অশ্রুময়ী সুরূপা নীরবে বাহির হইয়া গেল।

(নয়)

'ব্রেক্-জ' কোম্পানীর বড় সাহেবের নিকট 'শেয়ার' বিক্রয়ের গচ্ছিত টাকা আদায় করিয়া লইয়া প্রিয়নাথ বিডন স্কোয়ারে, একটা বড় দোতালা বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করিতেছিল। 'ডিস্‌পেনস্যারীর' জন্য আবশ্যক টেবিল, আলমারি ইত্যাদি কিনিতে গত ২।৩

দিন সে বড় ব্যস্ত ছিল। আজও বেলা নয়টার সময় আহারাদির পর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়া সন্ধ্যার সময় সে বাড়ী ফিরিল। চা পানান্তে উপরে নিজের বসিবার ঘরে ঢুকিয়া টেবিলের উপর একখানা খামের চিঠি দেখিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। চিঠিতে এইরূপ লেখা ছিল;—

ভবানীপুর, কলিকাতা

মঙ্গলবার।

শ্রীচরণকমলেষু,—

দয়িত আমার! প্রাণদাতা! আমাকে ক্ষমা ক'রো, আমার শত অপরাধ ক্ষমা ক'রো। তোমার মত দেবোপম লোকের স্ত্রীপদবাচ্য হ'য়ে তোমার ঘর ক'রব এত উচ্চাশা আমি ক'রতে পারি না। যদি তোমার সামান্য দাসীর মত চরণ সেবার অধিকার পাই, তো আমি নিজেকে ধন্য মনে ক'রব। আমি তোমার দুটী পায়ে ধরে ক্ষমা চাইচি; এবারের মত আমায় ক্ষমা ক'রো। তোমার উপর স্ত্রীর মত ব্যবহার আমি কখনও করি নাই। দেবতা আমার, এতদিন ক্ষমা ক'রে এসেছ', এবার কি দাসীকে ক্ষমা ক'রবে না?

আমি আজ তিন দিন দাদার সঙ্গে ভবানীপুরে এসেছি। পরশু দাদা সঙ্গে ক'রে আমাকে তোমার বাড়ী নিয়ে গেছলেন। কিন্তু হতভাগিনীর অদৃষ্ট দোষে তোমার দোয়ারে চাবি বন্ধ ছিল। দেবতা আমার! যদি দণ্ড দিতে ইচ্ছে কর, দিও, তোমার সুরূপা মাথা পেতে নিতে প্রস্তুত আছে। তবে তোমার কাছে রেখে, তোমার চরণসেবার অধিকারিণী ক'রে তার পর যা শাস্তি দিতে চাও দিও। তুমি আমার জন্মজন্মান্তরের,—তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। আমার ইমান, আমার ইজ্জৎ সব তুমি;— আমার শিক্ষায় বাজ পড়ুক, এই সহজ সত্যি কথাগুলো আমার পোড়া চোখে পড়ে নাই।

আজ দাদা সকালে তোমার নূতন বাড়ীর খোঁজ পেয়েছেন; তুমি বাড়ীতে ছিলে না, তাই দেখা হয় নাই। সন্ধ্যের পর আমি তোমার কাছে যাব। স্ত্রী ব'লে স্থান যদি না দিতে পার, তবে সুরূপাকে তোমার সামান্য দাসীর স্থান দিয়েও তোমার বাড়ীতে জায়গা দিও। তা যদি না দিতে পার তবে পুরীতে কেন সুরূপাকে মৃত্যুপথ থেকে ফিরিয়ে এনেছিলে? দেবতা আমার—এ প্রাণ ত' তোমার; তোমার চরণে ডালি দোব, তোমার যা ইচ্ছে হয় ক'রো। শুধু এইটুকু তোমাকে জানাতে চাই, তোমার সুরূপার ভুল ভেঙ্গে গেছে, পরশমণির সহবাসে লোহা সোণা হ'য়ে গেছে। আমি আবার তোমার দুটী পায়ে ধ'রে বলি—আমায় ক্ষমা ক'রো। ইতি শ্রীচরণাকাঙ্ক্ষিণী

সুরূপা

চিঠিটা খামের ভিতর রাখিয়া প্রিয়নাথ দিদি তরলা-দেবীকে সুরূপার আসিবার সংবাদ দিতে যাইবে মনে করিতেছে, এমন সময় দোয়ার খোলার শব্দে পিছু দিকে চাহিয়া দেখিল, স্বয়ং তরলাদেবী সুরূপার হাত ধরিয়া তাহারই কক্ষে প্রবেশ করিতেছেন। প্রিয়নাথকে কোন কিছু বলিবার সুযোগ না দিয়াই তরলাদেবী কহিলেন,—'ওরে প্রিয়, আমাদের ঘরের লক্ষ্মী নিজেই আমাদের ঘরে ফিরে এসেছে। দেখিস্, তুই আর কিছু মনে রাখিস্ না, বউকে কোন কথা বলিস্ না। ছেলেমানুষ তাই ভুল ক'রেছে। এর পরে সব সেরে যাবে। এখন সব ভুলে গিয়ে লক্ষ্মীকে ঘরে তুলে নে। আমি খাবার করতে নীচে চল্লুম।'

তরলাদেবী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। প্রণাম করিয়া নতমুখে সুরূপা প্রিয়নাথের কাছে দাঁড়াইল। স্নেহভরে সুরূপার হাতটী ধরিয়া প্রিয়নাথ কহিল, 'সুরু, তোমাকে এত মলিন দেখাচ্চে কেন?'

সুরূপা নীরব,—তাহার অশ্রুভরা চোখদুটী প্রিয়নাথের কথার জবাব দিল।

মধ্যপ্রদেশের খনিজ সম্পদ

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম্-এ

(১)

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে, এই লেখার মধ্যে গবেষণা নাই। অল্প দিন হইল তাতা কোম্পানীর ভূতাত্ত্বিক মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বলরাম সেন এম্-এসসি মহাশয়ের সহিত, কর্ম্মোপলক্ষে মধ্যপ্রদেশে যাইতে হইয়াছিল। তথায় খনিজ সম্পদের নানাবিধ নিদর্শন দেখিতে পাই। দেখিয়া কৌতূহলী হই এবং মধ্যপ্রদেশের যাবতীয় খনিজ পদার্থের বিবরণ সংগ্রহে আগ্রহান্বিত হই। বর্ত্তমান প্রবন্ধ উক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত-সার।

আজকালকার এই যুগে যদি অর্থবান ও উদ্যোগী বাঙ্গালীদের দৃষ্টি, বাংলার বাহিরে, এই খনিজ সম্পদের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতির ও দেশের কল্যাণ হয়। (সাধারণ বাঙ্গালী পাঠককে, মধ্য প্রদেশের খনিজ সম্পদ বিষয়ে, কৌতূহলী করিবার উদ্দেশ্যেই এই সংকলন প্রকাশিত হইল। যাঁহারা এই সম্পদ আহরণ করিবার ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা যেন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করেন।)

মধ্যপ্রদেশে, দরকারী ও মূল্যবান খনিজ পদার্থের
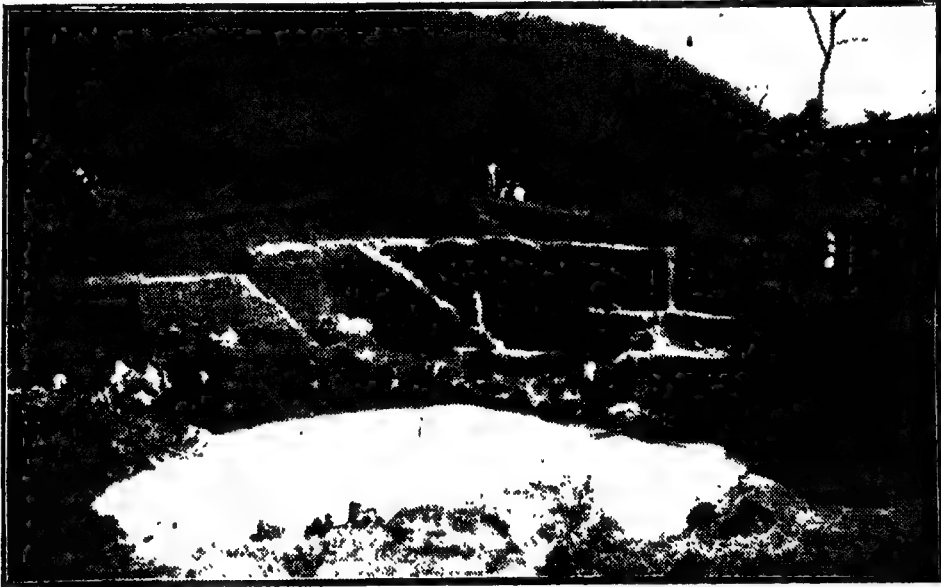
রমরমার অন্তর্গত ম্যাঙ্গানিজ খনি। (ফটো- বি সেন)

বাংলাদেশ খনিবহুল নহে। পশ্চিম বঙ্গের কয়লা বাদ দিলে সম্পদ হিসাবে, বাংলায় অন্য কোনো খনিজ পদার্থের নাম মনে হয় না। অনেক বাঙ্গালী কয়লার খনিতে কাজ করিয়া লাভবান হইয়াছেন। কয়লার কারবারেও অনেক বাঙ্গালী কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিশেষ করিয়া, বাঙ্গালী ভূতত্ত্ববিৎ ও খনিবিৎ পণ্ডিতের সংখ্যা কম নহে। সংখ্যা খুব বেশী। কিন্তু তাহার সবগুলিরই যে বর্ত্তমানে উদ্ধার হইতেছে তাহা নহে। মধ্যপ্রদেশে এমন অনেক খনিজ পদার্থ আছে, যাহাদের উদ্ধারে খুব বেশী মূলধনের আবশ্যক নাই। এই সব পদার্থের উত্তোলন-কার্য্যে ও ব্যবসায়ে অনেক মার্‌ওয়াড়ী, গুজরাতি, মারাঠি, ভাটিয়া পার্শি ও ইংরাজ নিযুক্ত আছেন। দু-একজন ছাড়া, খনির

অধিকারী, উত্তোলনকারী, ঠিকাদার বা ব্যাপারী হিসাবে বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যায় না। বেকার শিক্ষিত বাঙ্গালী, দেশে চাকুরীর বৃথা উমেদারী না করিয়া, দেশ ছাড়িয়া মধ্য প্রদেশে যাত্রা করিলে, অন্ততঃ নিজেদের অন্ন-সংস্থান করিতে পারিবেন, দেখিয়া শুনিয়া আমার এই ধারণা হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, উদ্যোগী, কষ্টসহিষ্ণু, অধ্যবসায়ী, বাঙ্গালী যুবকের সংখ্যা বিরল নহে। মধ্য প্রদেশে তাঁহারা একবার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া আসুন না? 'রাতারাতি বড়লোক' হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা লইয়া যাত্রা না করিলে, তাঁহাদের যাত্রা নিশ্চয়ই সফল হইবে।

ভূতাত্ত্বিকেরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত খনিজ পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহাদের তালিকা, নিম্নে তাঁহাদের ভাষায় দেওয়া গেল।

(১) Alluvium—Brick-clays, Kankar, salt, gold। ইহাদের মধ্যে লবণ ও স্বর্ণ ছাড়া, বাকী দুইটি পদার্থকে ব্যবসায়ে লাগান যাইবার মত অবস্থায় পাওয়া যায়।

(২) Lateritic Formations :

(ক) Laterite—Bauxite, building stone, pyrolusite, iron ore, ochre, diamonds.

এলুমিনিয়মের মূলধাতু bauxite, আর ইমারতে লাগাইবার পাথর ও খনিজ লৌহ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

(খ) Lateritoid—খনিজ লৌহ ম্যাঙ্গানিজ ধাতু, ochre। বর্ত্তমানে মধ্য প্রদেশের খনিজ পদার্থের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ খুব বেশী পরিমাণে উত্তোলিত হইতেছে; এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহার ব্যবসায় খুব লাভজনক হইয়া উঠিয়াছে।

(৩) Deccan Trap :—Building Stone, (basalt), agate, carnelian, jasper, opal, rock-crystal, Soda (trona), mineral waters, Iceland spar :

ইহাদের মধ্যে ইমারতের প্রস্তর ও সোডা প্রস্তর মূল্যবান।

(৪) Infra Trappean—Lime stone, manganese ore.

(৫) Gondwana :

Upper—Pottery clay ; fireclay, coal, jasper, pebbles.

Lower—Coal, fireclay, sandstone, pottery clay, iron ore, manganese ore.

ম্যাঙ্গানিজ ট্রলি বোঝাই হইতেছে। (ফটো—বি সেন)

ইহাদের মধ্যে pottery clay, coal, fireclay ও sand stone মূল্যবান।

(৬) Vindhyan—

Upper—Sandstone, limestone, lithographic stone, manganese ore, lead ore.

Lower—Limestone, fuller's earth, shale, sandstone, diamond.

ইহাদের মধ্যে Sandstone, Limestone, fuller's earth ও shale প্রধান।

fluorspar, barytes, wolfram। ঐ ছাড়া, ores of copper, lead, silver, gold.

এ শ্রেণীর কোনোটিই এমন অবস্থায় পাওয়া যায় না, যাহাতে তাহাদের উদ্ধার লাভজনক হয়।

(১০) Granite—Building Stone.

(১১) Gneiss—ঐ

(১২) Dharwarian—(ইহার মধ্যে বিন্নিঘাট ও সোনাখান ধাতব গর্ভও অন্তর্গত) ! Manganese ore, iron one, limestone, dolomite, marble, ochre,

ছোট রেলে বোঝাই

ম্যাঙ্গানিজ বালাঘাট হইতে গড়িয়া যাইতেছে। (ফটো—বি সেন)

(৭) Bijawar—Limestone, sandstone, jasper. iron ore, lead ore, Silver.

এই শ্রেণীর অন্তর্গত কোনো পদার্থই ব্যবসায়ে লাগাইবার মত অবস্থায় পাওয়া যায় না।

(৮) Cuddapah—Limestone, lithograpic stone, lead ore, sandstone :

ইহার মধ্যে Limestoneই প্রধান।

(৯) Pregmatites and mineral Veins Cutting archaeans : Mica, quartz, rose quartz,

Steatite, asbestos, jasper, garnet, opal, Spinal : মোটামুটি বলিতে গেলে, এলুমিনিয়মের মৃৎধাতু bauxite, কয়লা, খনিজ লৌহ, চূণা পাথর ও ম্যাঙ্গানিজ মধ্য প্রদেশের খনিজ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

১৯১৪ সাল হইতে ১৯১৮ পর্যান্ত মধ্য প্রদেশে যে সমস্ত মূল্যবান খনিজ পদার্থ উত্তোলিত হইয়াছে, তাহাদের তালিকা ও পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল; ১৯০৯ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত ৫ সালের গড়পড়তা হিসাবও তুলনার জন্য দেওয়া হইল।

Minerals.	Average			Tons.		
	1909-1913	1914	1915	1916	1917	1918.
Asbestos	3 (1910)	—	—	—	7	13
Bauxite.	449	514	876	750	1, 363	1, 192.
Clay	17, 382	33, 7738	33, 359	—	—	2, 918
Coal	227, 960	244, 745	253, 118	287, 832	371, 498	481, 470
Corundrum	—	—	—	—	—	80
Fuller's earth	100	109	139	179	334	218
Iron ore	2, 612	18, 402	4, 747	4, 464	3, 169	6, 097
Laterite	—	—	16, 445	—	—	—
Limestone and Kanker	79, 816	148, 471	63, 079	45, 555	80, 444	134, 794
Manganese ore	488, 485	564, 890	394, 215	558, 828	577, 841	438, 628
Ochre	258	108	12	8	900	16
Steatite	476	502	329	8921	2, 422	3, 473
Wolfram	1.3 (total)	—	—	1. 3	—	—
Lead ore	—	3	7	7	—	—

এই তালিকা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্যবসায়ীদের ঝোঁক বেশী পড়িয়াছে, ম্যাঙ্গানিজ, কয়লা ও চুণা পাথরের উপর। এই সমস্ত পদার্থের চাহিদা, ভারতে ও ভারতের বাহিরে, দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের উত্তোলন-কার্য্যেও খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না। ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনকারীদের মধ্যে, বড় বড় কোম্পানী ত আছেই, তদ্ব্যতীত, বহুসংখ্যক লোক অল্প মূলধন লইয়াই, এই পদার্থের উদ্ধারে ব্যাপৃত আছে। বাঙ্গালী দুই এক জন যাঁহারা আছেন, তাঁদের দৃষ্টি, আমার মনে হয়, উদ্ধারের দিকে কম—খনিজ স্বত্ব খরিদ-বিক্রয় দিকে বেশী। বাঙ্গালার ভাগ্যদোষে ইহাতে লোকসান বই লাভ হয় না।

খনিজ এলুমিনিয়ম

সরকারী ভূতাত্ত্বিকেরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিতে পান যে, ভারতের অধিকাংশ lateritic স্তর এলুমিনিয়মে পূর্ণ। আর এই এলুমিনিয়ম পদার্থ bauxiteএর অনুরূপ। Bauxite হইতেই এলুমিনিয়ম সাধারণতঃ নিষ্কাসিত হয়। ১৯০৩ সাল হইতে, ভূতত্ত্ববিভাগের কর্ম্মচারীরা ইহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগৃহীত নমুনা ভূতত্ত্ববিভাগের রসায়নাগারে, এবং Imperial Instituteএ বিশ্লেষণ করা হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, ভারতীয় bauxite ইংলণ্ড, আয়ার্লণ্ড, ফ্রান্স, ও আমেরিকা হইতে যে bauxiteএর আমদানী হয়, তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে।

ভারতে এ-যাবৎ আবিষ্কৃত bauxite স্তরের মধ্যে, মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বালাঘাট জেলার বাইহির নামক উচ্চ ভূমিতে, জব্বলপুর জেলার কাটনির নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাপ্ত bauxiteই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সারগুজা, যশপুর রাজ্যে আর মণ্ডলা ও সেওনি জেলায় প্রাপ্ত bauxiteও বিশেষ মূল্যবান।

আজ পর্য্যন্ত বালাঘাট ও জব্বলপুরের bauxiteএর উপরেই সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ঐ ঐ স্থানে প্রাপ্ত bauxiteএর রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার মধ্যে শতকরা ৫১.৬২ হইতে ৫৮.৮০ অংশ এলুমিনিয়ম অক্সাইড (Al_2O_3) আছে।——পোড়াইবার পর এলুমিনিয়ম অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ৭১ হইতে ৮০

হয়। ইহা হইতে ভূতাত্ত্বিকেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, বালাঘাট ও জব্বলপুরের bauxite খুব উচ্চ শ্রেণীর। তাঁহারা মনে করেন যে, এই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। সেই জন্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া, এই ধাতুকে, ব্যবসায়ে লাগাইবার উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা হইতেছে। সরকারী ভূতত্ত্ববিৎদের মতে—ভারতীয় bauxiteএর ব্যবসায় তিন রকমে লাভজনক হইতে পারে।

(১) খনি হইতে উদ্ধৃত কাঁচামাল রপ্তানি করিয়া অথবা ইহা পোড়াইয়া রপ্তানি করিয়া (calcination)।

(২) ক্ষার পদার্থ সংযোগে, এলুমিনা বা এলুমিনিয়ম অক্সাইড্ উদ্ধার করিয়া ইয়োরোপ ও আমেরিকার এলুমিনিয়ম কারখানায় প্রেরণ করিয়া।

(৩) ভারতেই এলুমিনিয়ম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিয়া।

প্রথমোক্ত উপায় ত্যক্ত হইয়াছে। কারণ বিদেশী বন্দরে কাঁচা মালের দর নাই। তৃতীয়টি সহজসাধ্য নহে। কারখানা স্থাপনের জন্ত বিপুল মূলধনের প্রয়োজন। তা ছাড়া বড় কারখানা স্থাপনের পূর্ব্বে, ভারতীয় আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, এলুমিনিয়ম নিষ্কাসনের সাফল্য সম্বন্ধে আরও বেশী অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন হইবে। এইরূপ অনুসন্ধান ও পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল অনিশ্চিত। সুতরাং সাধারণ অর্থশালী লোক, এই কার্য্যে অর্থব্যয় করিতে অনিচ্ছুক হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় উপায়টিই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ। ইহাতে লোকসানের সম্ভাবনা অল্প। খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজন নাই। প্রাথমিক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা সরকারী ভূতাত্ত্বিকেরা করিয়াছেন। অনুসন্ধানের ফলও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতীয় bauxiteকে এলুমিনা (Aluminium oxide) তে পরিণত করিবার প্রক্রিয়া খুব বেশী জটিল নহে। এ বিষয়ে অর্থবান ও উদ্যোগী ভারতবাসীদের দৃষ্টি বেশী পরিমাণে আকৃষ্ট হওয়া দরকার।

চমুয়া পাথরের ভাটা। (ফটো—বি সেন)

যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিলাতে manufactured aluminaর দাম টনকরা ৮০৲ টাকা হইতে ১১০৲ টাকা ছিল। এখন আরও বেশী হইয়াছে।

তা ছাড়া কাহাকেও একেবারে নূতন করিয়া এই ব্যবসায় আরম্ভ করিতে হইবে না। গত কুড়ি বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে অনেকেই bauxite উদ্ধার করিবার ইজারা প্রভৃতি লইয়া অল্পবিস্তর কার্য্য করিয়াছেন। ১৮৮৩ সালে, জব্বলপুর জেলার কাটনির নিকটবর্ত্তী টিকারীতে ম্যালেট্ সাহেব সর্ব্বপ্রথমে aluminious lateriteএর সন্ধান পান। সরকারী অনুসন্ধানের বিবরণ Records of the Geologi-

cal Survey of Indiaর নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলিতে পাওয়া যায় :—

ভলুম নং ২৫—পৃষ্ঠা ২৯
ভলুম নং ৩৬—পৃষ্ঠা ২২০
ভলুম নং ৪৬—পৃষ্ঠা ১১৩

এই বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর, ১৯০৫ সালের প্রথমে জব্বলপুরের শ্রীযুক্ত পি, সি, দত্ত মহাশয়, এই অঞ্চলের অনুসন্ধানের পাট্টা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। তৎপরে তিনি Bombay Mining ও Prospecting Syndicate নামক কোম্পানী গঠন করিয়া রীতিমত সন্ধানের অনুমতি লয়েন। এই কোম্পানীর উদ্দেশ্য নানাবিধ ছিল; যথা, hydrated alumina, alumina, alum, aluminium প্রস্তুতকরণ, সিমেণ্ট ও চুণ প্রস্তুতকরণ, পটারি ও fire brick প্রস্তুতকরণ। Bauxite উত্তোলনের পাট্টা যে অঞ্চলে তাঁহারা লইয়াছিলেন, তথায় এই সমস্ত পদার্থের প্রাচুর্য্য তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বোম্বাইএর Messrs. C. Macdonald & Co. এই কোম্পানীর Managing Agents ছিলেন।

১৯১২ সালের আগষ্ট মাসে Katni Cement and Industrial Company Ltd—উক্ত কোম্পানীর স্বত্ব সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। Bauxite সম্পত্তিও ইহার অন্তর্গত। তাঁহারা Cement ও চুণের ব্যবসায় করিতেছেন। এলুমিনিয়ম সম্বন্ধে কি করিতেছেন তাহা জানিতে পারি নাই।

তাতারাও এদিকে নামিয়াছিলেন। Tata Electro Chemicals Ltd—নামক একটি কোম্পানীও গঠিত হইয়াছিল। অল্পদিন হইল এই কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে।

জব্বলপুরে ও কাটনিতে bauxite হইতে এলুমিনিয়ম নিষ্কাসনের উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান এখনও চলিতেছে। উদ্যোগের অভাব হয় নাই। সাফল্য আসিবেই।

রম্‌রমা ম্যাঙ্গনিজ মাইনের মাদ্রাজী ম্যানেজারের বাঙ্গলা। (ফটো—বি সেন)

মধ্যপ্রদেশের কয়লা

মধ্যপ্রদেশে বর্ত্তমানে তিরিশটি কয়লার খনি আছে। এই প্রদেশে কয়লার পরিমাণ বিপুল। এই বিপুলতা সত্বেও খনির সংখ্যা কম হইবার দুইটি কারণ অনুমিত হয়। প্রথম কারণ এই যে, এ-যাবৎ আবিষ্কৃত কয়লা নিম্নশ্রেণীর,—ভূতাত্বিকদের শ্রেণী বিভাগ অনুসারে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে পড়ে; এবং অধিকাংশ তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, যাতায়াত ও মাল চলাচলের পথ দুর্গম ও বিরল। প্রথমোক্ত কারণে নর্ম্মদা উপত্যকার লামেটা ঘাট প্রভৃতি স্থানের কয়লা

মাত্র স্থানীয় ব্যবহারের জন্ত উত্তোলিত হয়। দ্বিতীয় কারণে কোরীয়া রাজ্যের কুরাশিয়া অঞ্চলের কয়লা প্রথম শ্রেণীর হইলেও উত্তোলিত হয় নাই। কয়লার পরিমাণ স্থানে স্থানে খুব অধিক। নিম্নলিখিত তালিকা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। আনুমানিক নির্দ্ধারণে, ওয়ারধা উপত্যকায় ২৫,২৫০ লক্ষ টন কয়লা আছে। তাহার মধ্যে ১৭,১১০ লক্ষ টন পাওয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে আবার ১৫,০০০ লক্ষ টন Wan (ওয়ান) নামক স্থানে অবস্থিত।

১। নরসিংহপুর জিলার মোহাপানি নামক স্থানে ৮০ লক্ষ টন।

২। কুরাশিয়া—তিন হইতে ৫ কোটী টন।

৩। ওয়ারোরা—দেড় কোটী টন।

৪। ঘুঘস—সাড়ে চার কোটী টন।

ম্যাঙ্গানিজের সন্ধানে শ্রীযুক্ত বলরাম সেন—(জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন) (ফটো—বি সেন)

৫। বল্লারপুর—সাড়ে তিন কোটী টন।

৬। উম্রন পাপুর—পাঁচ কোটী টন।

৭। উম্রন—একশত পঞ্চাশ কোটী টন।

৮। জুনারা ও টিপেলী—সাড়ে সাত কোটী টন।

বিহার ও উড়িষ্যার কয়লার সঙ্গে তুলনায়, মধ্যপ্রদেশের কয়লা নিকৃষ্ট।

ওয়ারোরা খনি, ৫৩ বৎসর ধরিয়া মধ্য-প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া ১৯০৬ সালে বন্ধ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট তৎপরে বল্লারপুর কোলিয়ারিতে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯১৩ সালে, বল্লারপুর বেসরকারী কোম্পানীকে দেওয়া হয়।

নর্ম্মদা আইরণ কোল কোম্পানী, ১৮৬২ সালে মোহপানি কয়লার খনিতে কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৯০৪ সালে এই কোলিয়ারি Great Indian Peninsular Railway কোম্পানীকে বিক্রয়
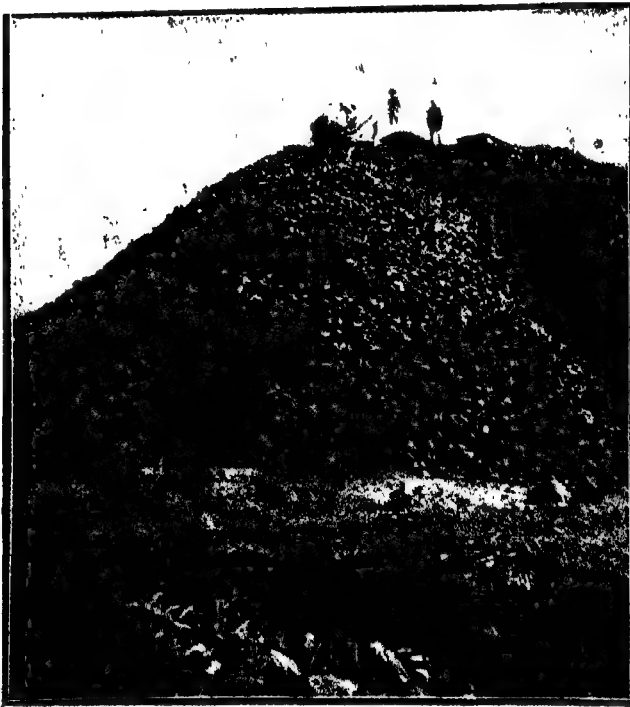
উচ্চ গিরিচূড়ায় ম্যাঙ্গানিজ। (ফটো—বি সেন)

করা হয়। তাঁহারা এই খনি পরিচালন করিতেছেন। পেঞ্চ (Pench) উপত্যকার কয়লা খনিগুলি এখন B. N. R. ও G. I. P. উভয় Ry দ্বারা সংযুক্ত। মধ্যপ্রদেশের কয়লা বেশীর ভাগ এই অঞ্চল হইতেই উত্তোলিত হয়। কোরীয়া রাজ্যের কুরাশিয়ার কয়লার জন্ত শীঘ্রই B. N. R. কাটনি বিলাসপুর লাইন হইতে একটি শাখা লাইন নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাতা কোম্পানী এই অঞ্চলের খনিজ স্বত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন এবং কতক অংশ G. I. P.কে উত্তোলন করিবার ভার দিতেছেন।

বালাঘাট জিলার রম্‌রমা ম্যাঙ্গানিজ খনি। (ফটো—শ্রীযুক্ত বলরাম সেন)

রেললাইন বিস্তার, এবং চলাচলের রাস্তা সুগম হইলে পর, মূল্যে ও পরিমাণে, মধ্যপ্রদেশের কয়লার ব্যবসায় প্রভূত লাভবান হইবে, আশা করা যায়। মাত্র গবর্ণমেণ্টের উপর এই কার্য্যের ভার ন্যস্ত থাকায়, এ অঞ্চলের কয়লার সুদিন আসিতে বিলম্ব হইতেছে।

২

যে খনিজ পদার্থের জন্ত মধ্যপ্রদেশ বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছে, তাহা ম্যাঙ্গানিজ। পৃথিবীতে, একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে, এই ধাতু উত্তোলিত হয়। ভারতের মধ্যে, মধ্যপ্রদেশে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ধরিতে গেলে, উত্তোলিত ধাতুর পরিমাণ হিসাবে এবং উহার মূল্য হিসাবে, মধ্য প্রদেশকেই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ম্যাঙ্গানিজ সম্বন্ধে মধ্যপ্রদেশের এই প্রতিষ্ঠা, মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও ছিল না। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের, মধ্যপ্রদেশে, এই ধাতুর অবস্থিতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর জানা ছিল মাত্র। কেহ কেহ নির্ণয় করেন, যে, ১৮২৯ খৃঃ অব্দে মধ্যপ্রদেশে ম্যাঙ্গানিজ খনি প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার ৭০ বৎসর পরে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম, অনুসন্ধানের পাট্টা (prospecting license) গৃহীত হয়। নাগপুর জিলায় সর্ব্বপ্রথম সন্ধানের কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে, সর্ব্বপ্রথম নাগপুর হইতে খনিজ ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে, বালাঘাট জিলায়, ১৯০৩ অব্দে ভাণ্ডারায়, ১৯০৬ অব্দে ছিন্দ্‌ওয়ারায় ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলনের কার্য্য আরম্ভ হয়। আজ পর্য্যন্ত, মধ্যপ্রদেশে, এই চারি জিলা হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খনিজ ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইতেছে। উত্তোলিত খনিজ ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ ১৯০১ খৃঃ অব্দে ৪৮,২৫৭ টন ছিল, ১৯০৬ অব্দে ৩৫১,৮৮০ এবং ১৯০৯ অব্দে ৫৬৫,০১৭ টন হইয়াছিল। তৎপরে বৎসরে গড়পড়তা ৫ লক্ষ টন করিয়া ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইতেছে।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৬৪৯,৩০৭ টন হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ভারতে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজ খুব অল্প পরিমাণই ভারতে ব্যবহৃত হয়। জেমসেদপুরে টাটার কারখানায় ও কুলটির কারখানায়, যৎসামান্য ধাতব ম্যাঙ্গানিজ ফেরো ম্যাঙ্গানিজএ পরিণত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বেশীর ভাগ ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানি হয়।

ম্যাঙ্গানিজের মূল্য বৃদ্ধি, ও উত্তোলন ও রপ্তানির বৃদ্ধি অনুসারে, রপ্তানির মূল্যও অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে, মধ্য প্রদেশে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের মোট মূল্য প্রায় সাড়ে চল্লিশ লক্ষ টাকা ছিল। ১৯১৭ সালে ইহার মোট মূল্য দেড় কোটিরও অধিক ছিল। বর্ত্তমানেও বৎসরে পাওয়া যায় না। *ভারতে প্রাপ্ত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ অধিক হইলেও ইহা নিশ্চিত, যে, ভারতে ম্যাঙ্গানিজের* ভাণ্ডার অফুরন্ত নহে। যে সময়ে, আমাদের দেশে, ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার-সম্বলিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতিলাভ করিবে, সে সময়ে হয় ত, আমাদিগকে সোণার দামে, সুদূর ব্রেজিল হইতে অথবা, দক্ষিণ রুশ হইতে ম্যাঙ্গানিজ আমদানী করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলন ও রপ্তানির ব্যাপারে যে লাভ হইতেছে, তাহার কতক সরকারের তহবিলে যাইতেছে, কতক বিদেশী বণিকের ঘরে যাইতেছে। কতক অংশ অবশ্য আমাদের হাতে আসিতেছে। সেই জন্য আমার মনে হয়, যে, যতদিন, 'রাষ্ট্রীয়' বিষয়ে,

লেখকের খনি-গহ্বরে যাত্রা। (ফটো—বি সেন)

প্রায় দুই কোটী টাকা মূল্যের ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানি হইতেছে।

অবশ্য ইহা হইতে মনে করা যায় না যে, ভারতের পক্ষে, এই ধাতব পদার্থের রপ্তানি লাভজনক ব্যবসায়, বা ইহাতে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতেছে। অর্থশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে, এরূপ ধাতুর রপ্তানি, অন্তিমে, দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে না। এরূপ মনে করিবার প্রধান কারণ এই যে, বর্ত্তমান জগতে যে যে ব্যবসায় ও শিল্পে, ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বহুল প্রচার ভারতে হয় নাই। কতকগুলি ব্যবসায়ে ও শিল্পে, ম্যাঙ্গানিজ অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য পদার্থ। পৃথিবীর সকল দেশে ম্যাঙ্গানিজ আমাদের নিজস্ব কিঞ্চিৎ ক্ষমতা না পাওয়া যায়, ততদিন, এমন কোনো ধাতু আমাদের উত্তোলন করা উচিত নয়, যাহা আমরা ব্যবহারে আনিতে পারি না, যাহা আমাদিগকে বিদেশে পাঠাইতে হয়। আরও ব্যাপার এই যে, ভারতের অন্যান্য কাঁচা মালের মত, ম্যাঙ্গানিজও, কাঁচা অবস্থায় রপ্তানি হইয়া, ভিন্ন আকারে দেশদেশান্তরে, বহুগুণ মূল্যে রপ্তানি হয়। আমাদের দেশেও, কিছু কিছু যে না আসে তা নয়।

ম্যাঙ্গানিজের কারবারে ছোট-বড় অনেক ব্যবসায়ী লিপ্ত আছেন। বাংলাদেশে যেমন, এক কালে, রাতারাতি বড় লোক হইবার আশায়, কয়লার পিছনে, রাণীগঞ্জ ও

ঝড়িয়ার দিকে, বহু যোগ্য ও অযোগ্য লোক ধাওয়া করিতেন, মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজও সেইরূপ, ধনী, নির্ধন, দেশী, বিদেশী বহু লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে। সকলেরই ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছেন কি না জানি না; তবে অনেকেই যে এই ব্যবসায়ে লক্ষপতি, বহুলক্ষপতি হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ নাগপুর, বালাঘাট, ছিন্দ্‌ওয়ারা, ভাণ্ডারায় পাওয়া যায়।

ম্যাঙ্গানিজ কি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, এইবার সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

খনিজ ম্যাঙ্গানিজে নিম্নলিখিত পদার্থ পাওয়া যায়—

১। ম্যাঙ্গানিজ মূল ধাতু

শিল্প ও ব্যবসায়ে, নানা প্রকারে ও আকারে খনিজ ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ ম্যাঙ্গানিজ মিশ্র ধাতু প্রস্তুত করণে। ইহার কয়েকটি প্রকার আছে—

(১) ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ, মিশ্র ধাতু।

(২) ম্যাঙ্গানিজ ও লৌহ ও সিলিকন মিশ্রধাতু।

যথা—ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ, স্পাইগেল আইসেন, সিলিকো-স্পাইগেল। এই সমস্ত মিশ্র ধাতু, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। এই মিশ্র ধাতুর ব্যবহারে ভাটায় (furnaceএ) লোহা ও ইস্পাত 'ধরিয়া' যায় না (prevent over oxidation), নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ

ম্যাঙ্গানিজ বাজো ডাক বাঙ্গালা
(ইহার ১০০ ফিটের মধ্যে চতুর্দ্দিকেই ম্যাঙ্গানিজ)

২। লৌহ

৩। সিলিকা বা বালুকা

৪। ফস্‌ফরস বা অঙ্গারজান

৫। জল বা বাষ্প।

ম্যাঙ্গানিজ, লৌহ, সিলিকা ও ফস্‌ফরসের তারতম্য অনুসারে, ধাতব ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহারিক মূল্য নির্দ্ধারিত হয়।

অঙ্গার (carbon) ও ম্যাঙ্গানিজ মূলধাতু, তৈয়ারী ইস্পাতে যুক্ত থাকে, গন্ধক ও ফস্‌ফরস বিদূরিত হয়, তৈয়ারী লোহা ও ইস্পাতকে ইচ্ছামত ধাতবগুণসম্পন্ন করে, এবং লৌহ ও ইস্পাতের মলকে সহজদ্রবণীয় অবস্থায় রাখে।

সম্ভবতঃ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, ইস্পাত প্রস্তুত করণে বিসিমার (Besemmer) প্রণালীর উদ্ভব হয়। বিসিমার

প্রণালী দ্বারা ইস্পাত তৈয়ারী করিবার সময় হইতে, উপরি লিখিত মিশ্র-ম্যাঙ্গানিজ ধাতুর প্রয়োগ অতিশয় বাড়িয়া যায়। এই প্রণালীতে, ম্যাঙ্গানিজ-মিশ্র ধাতু অপরিহার্য্য। বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীতে যে পরিমাণ খনিজ ম্যাঙ্গানিজ বা ম্যাঙ্গানিজযুক্ত খনিজ লৌহ উত্তোলিত হয়, তাহার শতকরা ৯০ ভাগ, এই মিশ্র ধাতু প্রস্তুতকরণে ব্যয়িত হয়।

ম্যাঙ্গানিজ কেন্দ্র বালাঘাটে তাতা কোম্পানীর বাঙ্গলা (ফটো—বি সেন)

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ

দ্বিতীয়তঃ—এক রকমের ইস্পাতে (যাহাকে Manganese Steel বা Hadfield Steel বলে) শতকরা ১১ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ এবং এক হইতে দেড় ভাগ কার্ব্বন বা অঙ্গার থাকে। ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত বলিয়া এই ইস্পাত অতিশয় দৃঢ় ও কঠিন হয়। রেলের পয়েণ্ট, ক্রসিং প্রভৃতি এই ইস্পাতে নির্ম্মিত হয়। তাহা ব্যতীত পাথর ভাঙ্গিবার ও কাটিবার যন্ত্রপাতি, সমুদ্র ও নদীগর্ভ খনন করিবার খনিত্র, বাস্‌তি প্রভৃতি, ও ধনরত্নাদি রাখিবার জন্য সিন্দুক আদি, ম্যাঙ্গানিজযুক্ত ইস্পাতে তৈয়ারী হয়।

লৌহ ও বালুকা ব্যতীত অন্যান্য ধাতুর সহিত ম্যাঙ্গানিজ মিশ্রিত করিয়া যে মিশ্র ধাতু তৈয়ারী হয়, তাহাও বহুবিধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ম্যাঙ্গানিজযুক্ত ব্রঞ্জ ও পিতলে, তাম্র, ম্যাঙ্গানিজ, জিঙ্ক ও টিন থাকে। তামা, ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও জিঙ্কের (zinc) মিশ্রণে যে মিশ্রধাতু হয়, তাহাকে বাজারে ম্যাঙ্গানিজ জার্ম্মাণ-সিল্‌ভার বলে। জাহাজের নানা অংশে, ম্যাঙ্গানিজ ব্রঞ্জ ব্যবহৃত হয়। কামানের ফ্রেম, মাউনটিং প্রভৃতিতে ব্রঞ্জ ম্যাঙ্গানিজ লাগে। ইহা ছাড়া, বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি বাড়াইবার যন্ত্রপাতিতে, তামা, নিকেল ও ম্যাঙ্গানিজযুক্ত মিশ্রধাতু ব্যবহৃত হয়।

নানাবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাঙ্গানিজের রাসায়নিক মিশ্রণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আগামী বারে করা যাইবে।

কোষ্ঠী গণনা

শ্রীসুখেন্দুবিকাশ দাস বি-এ

(১)

"ও কি, এর মধ্যে জলের গ্লাসে হাত দিচ্ছ যে? খাওয়া যে কিছু হল না" বলিয়া বর্ষিয়সী গৃহিণী সরলা দেবী হাতের পাখাটা থামাইয়া আহারে উপবিষ্ট স্বামীর মুখের প্রতি তাকাইলেন।

প্রিয়নাথবাবু বলিলেন "আমার কম খাওয়া হ'ল কি না তাও তুমি ব'লে দেবে?"

"তুমি গুণে একটা কম ভাত খেলেও যে আমি বলে দিতে পারি, তা' তুমি—"

প্রিয়নাথবাবু কাঁচা পাকা গোঁফের পাশে একটু হাসিয়া বলিলেন, "তা' জানি, জানি। তবে তোমার মুখ হ'তে ওই কথাটা শুনতে বেশ ভাল লাগে কি না তাই!" 'থাও' বলিয়া সরলাদেবী একটু হাসিলেন। পরে বলিলেন, "কি ঠিক্ করলে? কবে বেরুচ্ছ? এবারে যাওয়া চাই-ই। কলেজ বন্ধ হ'চ্ছে ক'বে?"

"কলেজ বন্ধ হ'চ্ছে পরশু। আমাদের অন্ত কয়েকটি প্রফেসার এবার ওয়ালটেয়ার যাবার ঠিক্ করেছেন।"

"তাঁরা যেদিকেই যান্, তোমার সে সঙ্গে যাওয়া হ'বে না। আমাকে নিয়ে পুরী যাওয়া চাই-ই।"

"আমার বোধ হয়, কোন দিকেই যাওয়া হ'বে না।—দেখ, এ বন্ধটা থাক্। পরের বন্ধে যে দিকে বল্‌বে সেই দিকেই বেরিয়ে পড়ব, একটি কথাও বল্‌ব না।"

"কেন, এবারটায় থাক্‌বে কেন? দেখ, পুরী যাবার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। কাছাকাছি ভুবনেশ্বর, উদয়গিরি, খণ্ডগিরি, আরও সব অনেক তীর্থস্থান আছে। আমার অনেক দিনের সাধ। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথ একবার—"

"এরই মধ্যে কি, গিন্নি, তোমার তীর্থ করবার বয়স হ'ল?"

"হোক্ না হোক্ পুরী যেতেই হ'বে।"

"আচ্ছা দেখি" বলিয়া চিন্তিত মুখে প্রিয়নাথবাবু আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন।

(২)

"এই বন্ধের ভিতর সৌরীনবাবুর বিয়ের নিমন্ত্রণটা পাওয়া যাবে বোধ হয়?"

সৌরীন রমেশের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "কি ক'রে বলি বলুন?"

কোন কলেজের মেসের একটা কক্ষে কতকগুলি ছাত্রের মধ্যে এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

রমেশ বলিল, "কেন, আপনার বিয়ের কথাবার্ত্তা পাকা হ'য়ে গেছে শুনলাম।"

সৌরীন বলিল, "আমার বাবার ও সেই মেয়ের বাপের মধ্যে টাকার কথাবার্ত্তা ঠিক্ হ'য়ে গেছে বটে। কিন্তু টাকার চুক্তি হয়ে গেলেই যে আমাকে গিয়ে—"

"সৌরীন!"

দুইজনেই দ্বারের দিকে ফিরিয়া দেখিল, প্রিয়নাথ বাবু দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

প্রিয়নাথ বাবু বলিলেন, "আমার সঙ্গে আয়।"

প্রিয়নাথবাবু সম্পর্কে সৌরীনের ঠাকুর্দ্দা হইতেন। রাস্তায় নামিয়া তিনি সৌরীনকে বলিলেন, "একটা ভারী মুস্কিলে পড়েছি, নাতি সাহেব!"

"কি ঠাকুর্দ্দা?"

"তোর ঠাকুরমার পুরী যাবার অত্যন্ত ইচ্ছা, অথচ নানা কারণে যাওয়া হ'তে পারে না। ব্যবসাটায় অনেক টাকা লাগিয়েছি—হাতে টাকা নাই;—ব্যবসাটাও বন্ধের মধ্যে একবার ভাল ক'রে চা'লাবার চেষ্টা করতে হ'বে।"

"তাই কেন বুঝিয়ে বলুন না?"

"বল্‌লেও শুনবে না।"

প্রিয়নাথ বাবুর বাড়ীতে পৌছিতেই সৌরীন সোজা

রান্নাঘরে সরলাদেবীর নিকট উপস্থিত হইল। সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিয়ের ত' সব ঠিক্ শুনলাম। গণনায় মিলে গেছে, আর কারও অমত নাই বোধ হয়।"

"কুষ্ঠী, গণনা ও-সব আমি বিশ্বাস করি না।"

"তোরা সব আজকালকার কলেজের পড়ুয়া, বিশ্বাস করবি কেন? এই যে আমার পিস্তুতো বোনের বিয়েতে ভট্‌চায কুষ্ঠী দেখে বলে দিলেন 'এক বছরের মধ্যে বিধবা হ'বার যোগ আছে'; পিশেমশায় অবিশ্বাস ক'রে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ঠিক এক বছরের মধ্যে বিধবা হ'ল।"

"অমন একটা দুটো হঠাৎ 'কাক তালীয়ব' মত মিলে যায়। তার পর, পুরী যাবার ঠিক্ করছ বুঝি? নাই বা গেলে এ বছরটায়?"

"তোকে ওকালতী করতে পাঠিয়েছেন বুঝি? ওসব এবারে শুন্‌ছি না। অনেক বছর ধরে 'যাচ্ছি' 'যাব' ক'রে কাটিয়ে দিচ্ছেন।"

সৌরীন তাহার ঠাকুরমার দৃঢ়তা দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

সরলা বলিলেন, "মেসে যে কি খাওয়া হয়, তা জানি। মাঝে মাঝে আসিস্ না কেন? এক্ষুনি পালাস্ নি, খেয়ে তবে যাবি।"

তার পর সৌরীন খাইতে খাইতে সরলাদেবীর পুরী যাওয়াতে কি প্রকারে বাধা দেওয়া যায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময় তাহার মুখখানা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইলে সৌরীন প্রিয়নাথবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ছোটবেলায় কিছু 'ফাঁড়া' গেছে?"

"হাঁ—কেন?"

"কি, কি, বলুন দেখি?"

"একবার ছোটবেলায় নদীতে ডুবে গেছ্‌লাম, আর একবার ছাতের আলসের ইট ছেড়ে পড়ে গেছ্‌লাম।—হঠাৎ ও-সব কথা জিজ্ঞাসা করছিস্ কেন?"

"পরে বলিব" বলিয়া সৌরীন সরলাদেবীর নিকট আসিয়া বলিল, "এখন তবে চল্লাম। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি ত খুব কুষ্ঠীতে বিশ্বাস কর। আমাদের মেসের পাশে একজন খুব বড় জ্যোতিষী এসেছে, তাকে দিয়ে একবার ঠাকুরদাদার কুষ্ঠীটা দেখাও না কেন? ঠাকুর্দা ব্যবসাটার জন্ত খুব ভাব্‌ছেন। ভট্‌চায যদি বলেন যে শীঘ্র ধনযোগ আছে, তাহ'লে বুঝতে হ'বে যে ব্যবসাটা নিশ্চয় খুব ভাল ক'রে চল্‌বে।"

"খুব ভাল জ্যোতিষী?"

"হাঁ—খুব বড়।"

"তাহ'লে কাল তাঁকে নিয়ে আসিস্।"

"আচ্ছা" বলিয়া সৌরীন বাহির হইয়া গেল।

(৩)

পরদিন বৈকালে সৌরীন প্রিয়নাথবাবুর ঘরের ভিতর আসিয়া ডাকিল, "ঠাকুরমা কোথায়? ভট্টাচায মশা'য় এসেছেন।" সরলা স্বামীর কোষ্ঠী লইয়া আসিয়া সৌরীনকে দিলেন। সৌরীন বলিল, "তাঁকে বাইরের ঘরে বসিয়েছি। তুমি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনবে এস—কি বলেন।"

সৌরীন বাহিরের বসিবার ঘরে গিয়া ভটচাযকে কোষ্ঠী দিয়া বলিল, "এই কোষ্ঠী দেখ্‌বার জন্ত আপনাকে ডাকা হয়েছে।" সরলা দ্বারের আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

জ্যোতিষী মহাশয় কোষ্ঠী সম্মুখে মেলিয়া, কাগজ পেন্সিল লইয়া খুব গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "গোড়া হ'তেই ভাল ক'রে দেখি।"

সৌরীন বলিল, "তাই দেখুন।"

জ্যোতিষী কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "বৃহস্পতি গ্রহ—দ্বাদশীর সপিণ্ডকরণ—হুঁ, আচ্ছা বাবাজী, বাবুর কুড়ি বছর বয়সে নদীর জলে কোন 'ফাঁড়া' গেছে?"

সৌরীন দ্বারের নিকট গিয়া সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যোতিষী মশা'য় বল্‌ছেন ঠাকুরদার কুড়ি বছর বয়সে নদীতে জলে ডুবে কোন ফাঁড়া গেছে?"

সরলা বলিলেন, "হাঁ—আমার শাশুড়ীর কাছে শুনেছি, উনি ঐ বয়সে একবার গঙ্গায় ডুবে যান্, অনেক কষ্টে বাঁচেন।" সৌরীন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "বাঃ, ঠিক্ ব'লে দিলেন,—খুব বড় জ্যোতিষী বটেন।"

ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া সরলা বলিলেন, "আশ্চর্য্য! ঠিক্ বয়স পর্য্যন্ত মিলে গেল!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "দেখ্‌ছি, টাকা কিছু জমাতেও পারেন নি। তবে এই এক বছরের ভিতর ধনযোগ আছে। আচ্ছা, এই এক বছরের ভিতর কোন উচ্চ স্থান হ'তে পতনে প্রাণহানির ফাঁড়া গেছে?"

সরলা শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ রে সৌরীন, এটাও ত' ঠিক্ বলেছেন! গত বছর দেশের বাড়ীতে ছাতের উপর কার্ণিস ছেড়ে গিয়ে একবার এম্‌নি বিপদ হয়েছিল।"

সৌরীন বলিল, "আশ্চর্য্য!"

সরলা বলিলেন, "বাস্তবিক!"

জ্যোতিষী বলিলেন, "দেখুন, উপস্থিত সব গ্রহই শুভ। পুত্র-কন্তার পক্ষেও মঙ্গল। ধনযোগও শীঘ্র মধ্যে আছে। কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি—" জ্যোতিষী হঠাৎ স্তব্ধ হইলেন।

সৌরীন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি দেখ্‌ছেন?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "বাবুর খুব শীঘ্র মধ্যে তীর্থযোগ রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে—তাই ত!"

অতি কাতরভাবে সরলা সৌরীনকে বলিলেন, "ওরে, জিজ্ঞাসা কর্ না—কি?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "তীর্থস্থানং গমনঞ্চ রাহুশনি উভেরপি—অর্থাৎ এখনও বাবুর তিন মাস সময় খুবই খারাপ। রাহু-শনি দুইই রয়েছে। কোন তীর্থস্থানে এই তিন মাসের মধ্যে খুব বড় দুর্ঘটনা ঘট্‌তে পারে। তিন মাস পার হ'য়ে গেলে, তার পর খুব ভাল সময় পড়বে।"

সৌরীন বলিল, "তা হ'লে কি হ'বে?"

জ্যোতিষী বলিলেন, "ভয় এমন বিশেষ কিছু নাই। তবে যোগটা যখন তীর্থস্থানে রয়েছে, আমি বলি, বাবু যেন এই তিন মাস কোথাও বিদেশে না যান্।"

সৌরীন বলিল, "তা না হয় কোথাও যাবেন না।"

কাতরভাবে সরলা বলিলেন, "আমি এই তিন মাস কোথাও বেরুতে দিব না। আর কোনও ভয় নাই ত'?"

"না।" জ্যোতিষী দুইটি টাকা লইয়া বিদায় হইলেন।

সরলা বলিলেন, "ভাগ্যে ত' ও'কে ডাকা হয়েছিল! এ ভগবানের রক্ষা করা! আমরা ত' পরশু পুরী যাব ঠিক্ করেছিলাম।"

সৌরীন বলিল, "মনে একটা আশঙ্কা নিয়ে কোথাও না যেয়োনই উচিত। কিন্তু গণনা ক'রে সব ঠিক্ বলে দিয়ে গেলেন!"

সরলা বলিলেন, "বাস্তবিক্—খুব বড় জ্যোতিষী বটেন। ফাঁড়া দুটো ঠিক্ মিলে গেল!"

প্রিয়নাথবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। "কি রে সৌরীন, আমরা ত' পরশু পুরী যাচ্ছি। তোর ঠাকুরমা কিছুতেই ছাড়বে না। চ'ল্ আমাদের সঙ্গে দিনকতক বেড়িয়ে আস্‌বি।"

সরলা বলিলেন, "না, এ বন্ধে গিয়ে কাজ নাই।"

প্রিয়নাথবাবু বলিলেন, "জানিস্ সৌরীন, ওটা হ'ল রাগের কথা। আমি প্রথমে যেতে বারণ করেছিলাম কি না!"

সরলা—না, গো, না—রাগের কথা নয়। এবারে যেয়ে কাজ নাই।

প্রিয়নাথ—তুমি রাতদিন মুখ ভার ক'রে থাক্‌বে, সে আমি দেখ্‌তে পারব না। আমি সব ঠিক্ করে ফেলেছি।

সরলা—আমি বল্‌ছি, কিছুতেই যাব না।

প্রিয়নাথ—দেখ ঠিক্ বল্‌ছ? আমার কোন দোষ নাই।

সরলা—হাঁ গো হাঁ। সরলাদেবী রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়নাথবাবু সৌরীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ক'রে মত হ'ল রে?"

সৌরীন সব খুলিয়া বলিল।

প্রিয়নাথ—কাজটা ভাল হয় নাই।

সৌরীন—এক দিন সব খুলিয়া বলিলেই হইবে।

(৪)

দুই মাস পরের কথা।

সৌরীন প্রিয়নাথবাবুর ঘরে আসিয়া ডাকিল, "ঠাকুরমা কোথায় গো?"

উপর হইতে সরলা বলিলেন, "আয়, উপরে আয়। কাল কলেজ খুলেছে, নয়? কবে এ'লি?"

সৌরীন উপরে উঠিয়া গিয়া বলিল, "কাল।"

সরলা—"বন্ধে কোথাও বেড়াতে গেছ'লি?"

সৌরীন—"না, তোমাদের পুরী যাওয়া হ'লে, সঙ্গে যেতাম্।" সৌরীন হাসিয়া ফেলিল।

সরলা—"হাস্‌ছিস্ যে?"

সৌরীন সমস্ত খুলিয়া বলিল যে, সে লোকটা জ্যোতিষী নয়, পুরী যাওয়ায় বাধা দিবার জন্য তাহাকে ঐরূপ ভাবে শিখাইয়া আনিয়াছিল।

সরলা—তা হ'লে ওঁর পূর্ব্বের 'ফাঁড়ার' কথা জান্‌ল কি ক'রে?

সৌরীন—আমি ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা ক'রে, সেই লোকটাকে বলেছিলাম।

প্রিয়নাথবাবু ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সরলা—ওঃ, ভারী। আর আমি যদি কখনও কোথায় যেতে চাই! অমন মিথ্যা কথা ব'লে ঠকাবার কি দরকার ছিল?

প্রিয়নাথবাবু—আমার মৃত্যু কাঁড়া আছে শুনলে কি কর তাই দেখ্‌বার জন্ম। এ'তে ভিতরের ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায় কি না।

সরলা—দেখ্‌, সৌরীন, কথাগুলো একবার শোন। আজ চল্লিশ বছর বিয়ে হ'য়েছে। সাত-আটটা ছেলের মা হ'লাম। বুড়িয়ে চুল পাক্‌তে চল্‌ল—এই বুড়ো বয়সে উনি আমার ভালবাসা যাচাই করতে এসেছেন।

প্রিয়নাথ—আহা, তা' নয়, তা' নয়! চুল পাকার সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসাটা কেমন পেকেছে, তাই দেখ্‌তে।

সরলা—ভালবাসা বুঝি আবার কখন পাকে? দেখ্‌, সৌরীন, দিন যাবার সঙ্গে সব জিনিসই পাকে। কাঁচা হ'তে পাকা হয়, গোড়া আলগা হয়, তার পর একদিন ঝ'রে যায়। ভালবাসা কিন্তু দিন যাবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা হ'তে আরও কাঁচা হয়; গোড়া আলগা হয় না, বাঁধন আরও শক্ত হয়। (প্রিয়নাথবাবুর মস্তিষ্কের টাকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) তোর ঠাকুরদাদার মাথায় পাকা চুলই বল্‌, কিম্বা দাঁতই বল্‌, গাছের পাতা, ফুল, ফল যা'ই বল্‌, বাইরের জগতের জিনিসের সঙ্গে বুকের ভিতরের ভালবাসা জিনিসটা একবারে ভিন্ন। বুঝ্‌লি? আচ্ছা নাত বৌ হো'ক, তার পর সে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু খুলে বল্‌লেই ত' হোত—এই এই কারণে যাওয়া চল্‌বে না; এমন দুষ্টামি করবার কি দরকার ছিল? বল্‌—আর কারও সঙ্গে এমন দুষ্টামি করবি না?"

সৌরীন—না।

সরলা—আচ্ছা, এখন খাবি আয়।

পরের বন্ধে সরলাদেবী স্বামী ও নাতিটির সঙ্গে বহু স্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন।

সাগর-সৈকতে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আবার এসেছি ফিরে' হে সিন্ধু, তোমার তীরে;
ল'বে না কি সাদরে আমার?
সেই উর্ম্মি-বীচি-মালা খুলে' দেয় ছন্দ-ডালা
উগারিয়া তরঙ্গ-ধারায়।
সেই সিন্ধু-বারিরাশি কত না আনন্দে আসি'
পরাণের পরতে পরতে,
হৃদয়ের নির্ঝরিণী দেয় খুলে মায়াবিনী
সমুদ্রের বালুকা-সৈকতে।
পৌর্ণমাসী রজনীতে টল' মল' বারিধিতে,
অগণিত হিমাংশুপ্রভায়—
ফেনীল-সুনীল বারি কত রঙ্গে সারি সারি
করে খেলা বিচিত্র-লীলায়।

কোন্ স্বপ্ন-লোক হ'তে আসে গো কল্লোল-স্রোতে
মধুমাখা কা'র গুঞ্জরণ?
সুরের লহরী কা'র ভেসে আসে অনিবার;
করে কাণে অমৃত-বর্ষণ।
ক'রো না বিফল তা'রে, যতবার হেরিবারে
এসেছে সে এই বেলা-ভূমে;
মধুর অঙ্গের ভঙ্গী দেখে' চ'লে গেছে সঙ্গী
ও' শীতল পদতল চুমে'।
আজ তারে দিও ঠাঁই, আর তো সে যা'বে নাই,
চিরতরে রহিবে হেথায়;
সুধামাখা তব গীতি শুনিবে গো নিতি-নিতি
ধূসর-উষর-বালুকায়।

দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর আহার

ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এস

(১)

"দুগ্ধ"-পোষ্য শিশুর আহার দুধ—এ সম্বন্ধে আবার বলিবার কি আছে? এই কথাটা স্বতঃই মনে উঠে। বলিবার অনেক কিছু আছে বলিয়াই এমন উদ্ভট রকমের নাম দিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি।

একটা স্থূল নিয়ম আছে যে, মাতৃ-স্বাস্থ্য যদি ভাল থাকে, তবে যত দিন শিশুর দাঁত না উঠে (এবং তাহার ২।৪ মাস পর পর্য্যন্তও) মাতৃস্তন্য ছাড়া দুনিয়ার অপর কোনও জিনিস শিশুকে খাইতে দিতে নাই। প্রসবের ৬।৭ মাস পর হইতে মাতৃস্তন্য "নিরেশ" হইয়া পড়ে—সে দুধে শিশুর তেমন উপকার হয় না—বরং সে দুধ পান করিয়া শিশুর রক্তাল্পতা (এনিমিয়া) ঘটে। স্তনদুগ্ধ ত্যাগ হইবার পরে, এ দেশে গো-দুগ্ধই শিশুর দ্বিতীয় প্রধান খাদ্য। যেমন "ঝিকে মারিয়া বধূকে শিখানর" কথা এ দেশে প্রচলিত আছে, সেই রকম গো-সেবার কথার ভিতর দিয়া, বধূ-সেবার কথাটা বলিতে চাই—বঙ্গ-জননীরা আমার "বধূ-সেবা" কথাটা বলায় রুষ্ট হইবেন না। এ দেশে "গো-সেবা" প্রচলিত আছে, "জামাতা-অর্চ্চন" (জামাই-ষষ্ঠী) হয়, কি জন্যই বা "বধূ-সেবা" প্রচলিত হইবে না? আজ যিনি বধূ, কাল তিনি সংসারের কর্ত্রী; আজ যিনি বধূ, কাল তিনি সন্তানের জননী, বংশধরের মাতা, ধাত্রী ও শিক্ষয়িত্রী - সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের বিধাতৃ। এই জন্যই সংসারের সমাজের ও দেশের কল্যাণ চিন্তা করিয়া বধূসেবার কথাটা পরে বলিতেছি।

(২) একবার গো-সেবার কথাটা প্রথমে বলিব। বর্ত্তমান কালে, গো-সেবা জিনিসটা উঠিয়া গিয়াছে। তাহার কারণ দুইটি—প্রথমতঃ, আমরা "বাবু" (অর্থাৎ নিরর্থক অভিমানী) হইয়া পড়িয়াছি; এবং দ্বিতীয়তঃ, আমরা স্ব-ধর্ম্ম হারাইয়াছি। অথচ, বর্ত্তমান কালে আমরা দুধ পান করিবার জন্য যত বেশী ব্যগ্র হইয়াছি, পূর্ব্বে ততটা ব্যগ্র ছিলাম না। এখন পান করিবার দুধ চাই, চায়ের দুধ চাই, সন্দেশ মণ্ডা নিত্য খাওয়া চাই, কথায় কথায় লুচি খাওয়া চাই; আজ কাল দুধ ও দুধের ঘি যত চাই, পূর্ব্বে আমরা তত চাহিতাম না। অথচ, আজকাল এ দেশে গাভীর যত দুর্দ্দশা, গোখাদক জাতিদের দেশে গাভীকে তাহার এক-সহস্রাংশ দুর্দ্দশাও ভোগ করিতে হয় না! পরন্তু গো-খাদক জাতিরা গাভীর যত সেবা করে,

হিন্দুত্বাভিমানী বাঙ্গালী তাহার কল্পনাও করিতে পারে না।

যে ব্যক্তি গো-দুগ্ধ পান করিতে চাহেন, তাঁহার পক্ষে এই এই গুলি অবশ্য কর্ত্তব্য :—

(১) গোরুর ভাল "জাতি" দেখিয়া গরু ক্রয় করা চাই। ভাওয়ালপুর (নাগরা) মুলতান প্রভৃতি স্থানের গরুরা খুব বেশী দুধ দেয়। এমন জাতীয় গরু কেনাই উচিত।

(২) গোরুর ভাল বৎসতরী উৎপাদন করাইবার জন্য উৎকৃষ্ট "ষণ্ডের" প্রয়োজন। এ দেশে, বিনামূল্যে উৎকৃষ্ট ষণ্ডের অভাব দূরীকরণার্থ, বৃষোৎসর্গ-শ্রাদ্ধে উৎসর্গীকৃত বৃষকে গ্রামে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে দিবার প্রথা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে, মিউনিসিপ্যালিটির কর্ত্তৃপক্ষ, সেই ষণ্ডগুলিকে ময়লার গাড়ী টানাইবার কার্য্যে লাগাইয়া, হিন্দুসমাজের বুকে পদাঘাত করিতেছেন এবং দেশের অসীম অকল্যাণ করিতেছেন। দেশবাসী নীরব!

(৩) "গোচারণের ভূমি" যথেষ্ট থাকা চাই। যে গাভী যথেষ্ট জীবন্ত তৃণ ভক্ষণ করে, তাহার দুগ্ধ বেশী হয়, এবং সেই দুগ্ধ পানে শারীরিক পোষণ সমধিক হইয়া থাকে;— কারণ, জীবন্ত তৃণভোজী গাভীদিগের দুগ্ধে ভাইটামীন পদার্থ প্রচুর পরিমাণে থাকে। গোয়ালে-আবদ্ধ, বিচালী-ভোজী গাভীর দুগ্ধে ভাইটামীন কমই থাকে। কাজেই গোচারণ ভূমি রক্ষা করা সমস্ত জাতির কল্যাণ-সাধক।

(৪) মানুষ যেমন রাত-দিন গৃহে আবদ্ধ থাকিলে কখনো সুস্থ থাকিতে পারে না; গরুর পক্ষেও সেই নিয়ম খাটে। গরুকে শুধু রৌদ্রে বাঁধিয়া রাখিলে হইবে না, তাহাকে কতক সময় দৌড়াদৌড়ি করিতে দিতেও হইবে।

(৫) আমাদিগের যেমন গা-হাত-পা টিপাইলে, অথবা অপর ব্যায়াম দ্বারা অঙ্গ-চালনা করিলে, শরীর সুস্থ থাকে, গোরুরও সেই রকম "ডলাই-মলাই" রীতিমত করান চাই। ইহার অভাবে গোরুর স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এ কথা স্মরণযোগ্য।

(৬) আমাদিগেরও যেমন স্নান প্রয়োজনীয়, গোরুরও তাই। আমাদিগের দেহকে যেমন পরিষ্কার রাখিতে হয় এবং পরিষ্কার স্থানে বাস করিতে হয়, গোরুর পক্ষেও সেই নিয়ম।

(৭) গোরুর খাদ্য সম্বন্ধেও গৃহস্থকে অবহিত হইতে হইবে। কি খাইলে গোরুর স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কি খাইলে দুধ বেশী ও ভাল হয়, সদা সর্ব্বদাই সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহস্থকে চলিতে হয়।

খুব স্থূল ভাবে যে কয়েকটী কথা গোসেবা সম্পর্কে বলিলাম, সে কয়েকটী কথা হইতেই বেশ বুঝা যায় যে, গোরুর স্বাস্থ্য, গোরুর খাদ্য ও তাহার বাসস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে "নিত্য অবহিত" না হইলে, সে গোরুর দুধ পান করা বিড়ম্বনা। গোরুর রীতিমত সেবা করিলে, গোরু স্বাস্থ্যবতী থাকে; এবং স্বাস্থ্যবতী গাভীর দুগ্ধই পানের উপযুক্ত। কিন্তু, হায়! আজ বাঙ্গালাদেশে স্বাস্থ্যবতী গাভী কোথায়? আজ মৃতকল্প ও রোগগ্রস্ত গোরুর দুধ তাহার বৎসতরীকে না দিয়া আমরা তস্করের ন্যায় উপভোগ করিতেছি—আজ তাই দেশ-জোড়া অস্বাস্থ্য, ক্ষয় রোগের বৃদ্ধি, অল্পায়ুতা।

(৩) যা'ক—সে অন্য কথা। এখন আমাদিগের বধূমাতাদিগের কথা পাড়ি। বধূ মাতারা স্বয়ং কয়েদীরও অবস্থা হইতে কষ্টকর অবস্থায় কোন কোন সংসারে থাকেন—কাজেই বধূমাতাদিগের প্রতি এ কথাগুলি প্রয়োগ না করিয়া, তাঁহাদিগের শ্বশ্রূঠাকুরাণীগণকে করজোড়ে এই কথাগুলি শুনাইতে চাহি। তাঁহারা আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন। এ স্থলে, বর্ত্তমান কালে দুই রকমের শ্বশ্রূঠাকুরাণী দেখা যায় বলিয়া, তাঁহাদিগকে পৃথকভাবে একটি গোড়ার কথা শুনাইব। "সেকেলে ধরণের" যাঁহারা গৃহিণী আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে কথা কওয়াই বিড়ম্বনা; তাঁহারা আপনাদিগকে এত বেশী সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিমান রাখেন যে, তাঁহারা হয় ত আমার কথা একেলে বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিবেন। দিন,—তাহাতে আমার দুঃখ কিছুই নাই; কিন্তু সমস্ত জাতির কল্যাণ কামনা করিয়া যে কথাগুলি বলিতেছি, সে কথার মূল্য কিছু আছে কি না, তাহারই বিচার করুন, লেখকের ব্যক্তিত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর গৃহিণীরা "হাল ফ্যাসানের"। তাঁহারা না অতীতে শ্রদ্ধা রাখেন, না বর্ত্তমানের সংবাদ রাখেন। জাতীয় কল্যাণার্থ দয়া করিয়া তাঁহারাও অবহিত হউন, এই আমার প্রার্থনা। এইবারে বধূমাতাদিগের কথা। প্রথম কথা—পুত্র-কন্যার বিবাহের কথা। গোজাতির উন্নতির কথা উল্লেখ করিবার

সময়ে, ভাল "জাতের" গোরু ও উৎকৃষ্ট বৃষের কথা বলিয়াছি—স্মরণ করুন। যত দিন আমরা রূপের জৌলুষ ও পয়সার কথাতেই উঠিব বসিব, তত দিন আমাদের ভাল হইবে না। রূপের আমি নিন্দক নহি—কিন্তু গঠনের ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবের আমি অধিকতর পক্ষপাতী। ঘোর কলিতে অর্থই ইষ্ট, অর্থই স্বয়ং ভগবান—সে অর্থকে আমি, এমন কি, মৌখিক ঘৃণাও করিতেছি না;—কিন্তু জাতির কল্যাণকে তাহার চেয়ে বড় জিনিস মনে করি। যেখানে রূপ, গঠন, অর্থ—এরূপ ত্র্যহস্পর্শ ঘটে, সেখানে তাহা হউক—কিন্তু ভাবী বংশধরের কল্যাণার্থ সদ্বংশজাত, অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্ন ও স্বাস্থ্যবান পুত্র-কন্যা দেখিয়াই বিবাহ দেওয়া উচিত। সেরূপ না করায় ফলে আজ স্বল্পায়ুতা, চিররোগ, ও দারিদ্র্য ঘরে ঘরে!!!

দ্বিতীয়তঃ, আমি পুত্র-কন্যাদিগের আহারের দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। "ভাল খাওয়া" বলিলে কেবল দুধ-ঘিকেই লক্ষ্য করা হয় না; যে খাবার খাইতে তৃপ্তিকর ও কাযে পুষ্টিকর, সেই খাবারকেই ভাল খাবার বলি। যাঁহাদের সংসারের যেমন অবস্থা, তাঁহারা তদুপযোগী ব্যবস্থা করিবেন—এ সম্বন্ধে কোনও "নিরিখ" বাঁধিয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। এই জন্য, খুব সাধারণ ভাবে খাদ্য সম্পর্কিত কথাগুলি বলিয়া যাইব। আমি ছেলেদিগের ও মেয়েদিগের কথা স্বতন্ত্রভাবে বলিব না—বরং মেয়েদিগের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখিয়া কথাগুলি বলিব; কারণ সকল সংসারেই দেখিতে পাই যে, ছেলেরা ভাল খাবারগুলি পায়—কুলাইলে তবে মেয়েদের মধ্যে অবশিষ্টাংশ বণ্টন করা হয়। তাহা ছাড়া, ছেলেরা বাটীর বাহিরে নানারূপ ভোজ্য সংগ্রহ করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করে; কিন্তু যে বধূমাতাদিগকে সন্তান পালন করিতে হয়, তাঁহাদের আহারের ব্যবস্থা কিরূপ? প্রথমতঃ, সংসারের কোনও পুষ্টিকর খাবার তাঁহারা পাইবেন না, কেন না "মেয়েদের ভাল খাইতে নাই।" দ্বিতীয়তঃ, পুরুষদিগের পাতের এঁটো তাঁহাদিগকে খাইতে হয়—নতুবা সেগুলি ফেলিয়া দিতে হয়; এবং তৃতীয়তঃ, পুরুষদিগের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই কোন রকমে বধূদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যিনি ভাবী বংশধরদের জননী, যাঁহার স্বাস্থ্যের উপরে সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে—এই কি তাঁহাদিগের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার? যাহা হউক, সে বিষয়ে বেশী বকিয়া লাভ নাই—কারণ, মানুষ সহজে তাহাদের মধ্যে নিত্য প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না—বিশেষ করিয়া "পাকা" গৃহিণীরা ত চাহিবেনই না।

হিন্দুর ঘরে যত রকমের খাবার আছে, তাহার মধ্যে দুধ যুবতী মাতা বা ভাবী মাতার পক্ষে অমৃততুল্য। রীতিমত দুবেলা একটু খাঁটি দুধ পাইলে শরীর যেমন ভাল থাকে, অপর কোনও খাদ্যে তত ভাল থাকে না। এ জন্য, স্তনদাত্রী জননীকে, যত দিন তাঁহার শিশু-সন্তানকে স্তন দিতে হয়, অন্ততঃ তত দিনও নিয়মিত ভাবে দুধ পান করিতে দিতে হয়। স্বচ্ছল সংসারে, দুবেলা অন্ততঃ এক সের দুধ পান করান উচিত। দুধ পান করাইলে যে শুধু মাতৃস্তন্য বৃদ্ধি পায়, তাহা নহে; দুগ্ধ পানের ফলে, মাতৃদেহের বল, স্বাস্থ্য ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়—এক কথায় মায়ের দেহের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়।

যেখানে ঘি খাইতে দিবার অবস্থা, সেস্থলে একটু ঘৃত ভোজন করানও যুক্তিসঙ্গত। কাঁচা ঘি পাতে খাইলে সহ্য হয় ত তাহাই খাওয়ান উচিত—নতুবা লুচি হালুয়া প্রভৃতির আকারেও কিছু কিছু ঘৃত নিত্য ভোজন করা ভাল। কারণ, "এক বলক খাঁটি দুধের" পরই, দেহের উন্নতি সাধনে ঘিয়েরই স্থান।

নিত্য কোনও-না-কোন একটা সময়ের ফলও খাওয়ান দরকার। ফল যে কেবল মুখ-রোচক তাহা নহে; ফল খাইলে রক্ত পরিষ্কার থাকে। টাট্‌কা ফলের রসে এমন কতকগুলি পদার্থ থাকে (ভাইটামীন), যাহার জন্য দেহের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। দুধে, ঘৃতে, ফলে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামীন থাকায় দেহের পুষ্টিকরণে ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণে ঐ খাদ্যগুলি অমূল্য।

পুরুষেরা মাংস খান, ডিম খান, অনেক স্থলে স্ত্রীলোকেরা তাহা খান না। যেমন অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া, পুরুষদিগের জন্য মাংস ডিম ক্রীত হয়, সপ্তাহে অন্ততঃ একটা দিনও বধূদিগের জন্য সেইরূপ দুপয়সার বেশী মাছ কেনা হয় না। অথচ প্রত্যেক গৃহিণীই জানেন যে, মাছ, মাংস ও ডিম পরম পুষ্টিকর খাদ্য। সামর্থ্যে কুলাইলে, সপ্তাহে এক দিন খিচুড়ি, ঘিভাত, হালুয়া বা পাঁচ রকমের মাছের তরকারী করা ভাল।

আমাদের ভাতের "ফেন" ফেলিয়া দেওয়া হয়; আলুর "খোসা" ফেলিয়া দেওয়া হয়; "ডাল" খাওয়া এক রকম নাই

বলিলেই হয়। পুরুষেরা হতশ্রদ্ধা করিয়া ডাল খান, স্ত্রীলোকদিগের আহারের সময়ে হয় ত ডালে কুলায় না। "শাক" ভোজন এক রকম উঠিয়াই গিয়াছে। বাজার হইতে আনিতে পারিলে তবে "বড়ি" খাওয়া সম্ভবপর হয়। এ সকলগুলিই পুষ্টিকর অথচ স্বল্প মূল্যের; কিন্তু আমরা এ সকল বিষয়ে আদৌ অবহিত নহি।

আজকাল পয়সা খরচ করিয়া বাজারের বাসী ও ভেজাল-বহুল "খাবার" খাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কোনও কোনও দোকানের সন্দেশ ব্যতীত দোকানের কোনও খাবার কাহারো স্পর্শ করা উচিত নয়। দোকানের ক্ষীরের খাবার (খাঁজা, বরফি, কালাকন্দ ইত্যাদি) ও রাবড়ী অনেক স্থলে ভীষণ উদরাময় সৃষ্টি করিয়াছে, দেখিয়াছি। এজন্য, দোকানের রাবড়ী ও ক্ষীরের খাবার বিষবৎ ত্যাজ্য। "গরম-গরম," "টাটকা ভাজা," "এখনি-কার তৈয়ারী" এই অজুহাতে এবং রসনার তৃপ্তির লোভে অনেকেই দোকানের খাবার খাইতে চাহেন। "গরম" বা "টাটকা ভাজা" হইলেও সে খাদ্যের ভেজাল ও অপ-কৃষ্টতা দূর হয় না, এ সামান্য সত্যটা তাঁহারা ভুলিয়া যান কেন?

"ফল" মহার্ঘ্য বটে—কিন্তু বোধ হয় সে কারণে নয়—শুধু অভ্যাসের অভাবে—অনেকেই ফল খাওয়াটা প্রয়োজনায় মনে করেন না। সময়ের ফল কোষ্ঠ শুদ্ধ রাখে, রক্ত পরিষ্কার করে, যকৃতের পক্ষে উপকারী। পিত্তনাশ করিয়া, ফল আহারে রুচি আনে। তদ্ব্যতীত, ফলে প্রচুর ভাইটামীন থাকায়, দৈহিক পুষ্টির পক্ষে ফল পরম সহায়ক। আম, কাঁটাল, বেদানা, আঙ্গুর, ডাবের শাঁস, খেজুর, কিসমিস, মনক্কা, পেস্তা-বাদাম, চিনাবাদাম, ইক্ষু, প্রভৃতি পরম পোষক। জামরুল, গোলাপজাম, কমলা-লেবু, বাতাবি লেবু, পাতিলেবু, কাগজী লেবুর রসে পোষক গুণ না থাকিলেও উহারা রক্ত পরিষ্কারক। শসা, ফুটি, তরমুজ শুক্রপাক। আনারস, পেঁপে, জাম হজমী। শাঁকআলু, কেশুর, পানিফল পোষক। এক কথায় সময়ের ফল কেবল যে খাওয়া ভাল তাহা নহে—খাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

অল্প কথায়,—কি খাওয়া উচিত, কি খাওয়া অনুচিত,—তাহারই ক্ষুদ্র তালিকা দিলাম। প্রবন্ধান্তরে, বহুবার, এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি বলিয়া, এখানে আর তাহাদের পুনরুক্তি করিলাম না। আমার এই অনুরোধ যে, যেমন গাভীর বা অপর গৃহপালিত জীব-জন্তুর "সেবা" করা হয়, সেই ভাবে প্রত্যেক শ্বশ্রূঠাকুরাণীরই কর্ত্তব্য, "বধূ সেবা" করা। বধূমাতারা পরের মেয়ে; তাঁহারা সর্ব্বদাই লজ্জায় ও ভয়ে ভীতা—ত্রস্তা। তাঁহারা নিজহস্তে কোনও জিনিস তুলিয়া খাইবেন না, বা মুখ ফুটিয়া চাহিয়াও লইবেন না। এমন অবস্থায়, তাঁহাদিগের স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীকেই বধূ মাতার খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে আত্মভোলা হইয়া, তাঁহারই শ্বশ্রূকুলের বংশবৃদ্ধিকারিণী বধূমাতাকে রীতিমত যত্ন ও "সেবা" করিতে হইবে। পুরাকালের কথা ও আচার ভুলিতে হইবে; দেশকাল পাত্র বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। কালই প্রবল, কালই সবল, এই মহাবাক্যটিকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, আমি বধূমাতাদিগের পরিশ্রম ও বায়ু সেবনের কথা বলিতে চাই। পল্লীগ্রামে মুক্ত হাওয়া ও অগাধ রৌদ্র ত আছেই। সেখানে বধূরা স্বচ্ছন্দে পাড়ায় পাড়ায় বা ঘাটে যাতায়াত করিবার সুযোগও পান; কাযেই, তাঁহা-দিগের শত কর্ম্মের মধ্যেও, হাওয়া-খাইবার ফাঁক থাকে। কিন্তু সহরের বধূরা, বায়ু ও রৌদ্রহীন একতলায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৮ ঘণ্টা কাটাইতে বাধ্য হন; সেখানে যেমন স্যাঁতসেতে তেমনি ধোঁয়া ও জলখরচের বাহুল্য। এ রকম স্থানে থাকিলে শরীর ভাঙিবেই ভাঙিবে। এই জন্যই, সহরের বধূরা "কুড়ি বছরেই বুড়ি," এবং এই জন্যই, তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, স্তনে বেশী দিন দুগ্ধ থাকে না, ক্ষয়কাস রোগ এত প্রবল। তাঁহারা সংসারের বিনা-বেতনের দাসী। কিন্তু বেতনভোগিনী দাসীর ফোঁস্ করিবার এক্তিয়ার থাকিলেও, বধূমাতাদিগকে নীরবে গুরু ভার বহন করিতে হইবে। দাসী পাড়ার বাটীর বাহিরে যাইতে পায়, উপদ্রুত হইলে দাসী ঝঙ্কার করিয়া উঠে,—ইচ্ছামত কাযে অবহেলা করিবারও তাহার স্বাধীনতা আছে; কিন্তু কচি মেয়ে বধূমাতাকে নীরবে সত্যসত্যই প্রাণপাত করিয়া, দিনের পর দিন, খাটিয়া যাইতে হইবে,—তাহার আরামও নাই, বিরামও নাই।

শ্রদ্ধেয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীগণ! আপনারা একবার আমার

কথাগুলি একত্র করিয়া গুছাইয়া লইয়া ভাবুন দেখি —ভবিষ্যৎ বংশের আপনারা কি সর্ব্বনাশই না করিতেছেন। দেখুন—

(১) আপনারা স্বাস্থ্য ও অঙ্গসৌষ্ঠবসম্পন্না মেয়েকে বধূরূপে নির্ব্বাচন করেন না—আপনারা ইহুদীর রং ও মেয়ের বাপের ইহুদীর মত অর্থ দেখিয়া বধূ নির্ব্বাচন করেন।

(২) আপনারা তাহার খাদ্যাখাদ্যের বিচার না করিয়া, সেকেলে ধরণের যা-তা—গৃহস্থের যেমন জোটে—ছেলেদের পাতকুড়ান অথবা তাহাদের খাওয়াইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই খাওয়াইয়া বধূদিগকে লালনপালন করেন।

(৩) যথেষ্ট পরিমাণে রৌদ্র ও বাতাস না লাগিলে গাছ ফলদে হয় ও তাহার বাড়তি কমিয়া যায়; গরুর স্বাস্থ্যহানি ঘটে—কিন্তু বধূমাতারা "মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু-বিশিষ্টা পরের মেয়ে কি না, তাই তাঁহাদিগের কিছুই হইবার কথা নয়!

এমন বধূদের গর্ভে সন্তান হইলে তাহারা রুগ্ন হয়, অল্পায়ু হয়। এবং সেই বধূর গর্ভজাত প্রত্যেক সন্তান পালন করিতে যাইয়া, রাশি রাশি বৈদ্যের কড়ি যোগাইতে হয়। বৈদ্যকে কড়ি দিয়াও নিষ্কৃতি নাই—অনেক স্থলে গৃহস্থ ধনে ও প্রাণে মারা যায়, নিত্যই উৎকণ্ঠায় দিনপাত করে—এবং সেরূপ সন্তান বড় হইয়া ইংরাজের দপ্তরে কেরাণীগিরি করা ছাড়া, দুনিয়ার অপর কোনও কাযের উপযোগী হয় না। অথচ, যদি গোড়া হইতে বধূসেবায় সামান্য মাত্র ব্যয় করিয়া, বধূদিগের স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে মন দেওয়া যায়, তবে স্বাস্থ্যবান সন্তান জন্মে—এবং সে সন্তান সংসারের পক্ষে আনন্দ-দায়ক হয়!

(৪) আজ তাই দুগ্ধপোষ্য শিশুর আহার বর্ণনা করিতে যাইয়া, প্রথমে গাভী, ও পরে বধূ-মাতার, আহার ও স্বাস্থ্যের কথা বলিলাম, কেন না, জননীর ও গাভীর স্বাস্থ্যের উপরে দুগ্ধপোষ্য শিশুর স্বাস্থ্য নির্ভর করিতেছে! যে গাভী ভাল জাতের, যে গাভী রীতিমত সেবা, ভাল খাদ্য, রৌদ্র ও বাতাস পায়—সে গাভীর দুগ্ধ পান করিলে, মানুষ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়; আর ফুকাদেওয়া ও গোয়ালে-বাঁধা গরুর দুধ পান করিয়া, আজ বাঙ্গালী জাতি "ক্ষয়কাসের" জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতেছে। যে মাতা সদ্বংশজাতা ও স্বাস্থ্যসম্পন্না, যাঁহার আহারের দিকে তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীরা একান্ত অবহিত, যে মাতারা শারীরিক পরিশ্রমে নমিতা ও ভগ্নস্বাস্থ্য নহেন, যাঁহারা রীতিমত রৌদ্রবাতাস সেবন করিতে পান, তাঁহাদের সন্তানেরা স্বাস্থ্য লইয়া জন্মে ও দীর্ঘায়ু হয়! আজ এই হতভাগ্য দেশে, গোজাতিরও যত বা দুর্গতি, বধূমাতাদেরও ততোঽধিক দুর্গতি। তাই আজ আমাদের সন্তান জন্মিলেই ডাক্তার ডাকিতে হয়, প্রসবের পরে সূতিকা ও ক্ষয়কাস ব্যারাম ধরে, স্তনে দুধ থাকে না, বধূমাতাদিগের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। এবং সেই কারণেই, এ দেশে ছেলে জন্মিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ডিস্পেন্সারি বসাইতে হয়, ডাক্তারের ডাক বসাইতে হয়, এবং বার্লি মেলিন্স ফুড প্রভৃতির ছড়াছড়ি করিতে হয়। ইহাই হইতেছে গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা। আমরা যদি বালিকা কাল হইতে মেয়েদিগকে যথেষ্ট "সেবা" করি, তবে ব্যয়ও তেমন হয় না, অথচ এ জাতিটা বাঁচিয়া যায়! দুগ্ধপোষ্য শিশুর কল্যাণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম গোমাতা ও বধূমাতার সেবা করা কর্ত্তব্য! বাঙ্গালী জাতি, যদি নিজ বংশধরের উন্নতি কামনা কর, তবে মনে প্রাণে গো-সেবা ও বধূ সেবায় তৎপর হও!

দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর প্রথম ও প্রধান আহার্য্য হওয়া উচিত, তাহার মাতৃস্তন্য। যত দিন দাঁত না উঠে (এবং বড় জোর শিশুর এক বৎসর বয়স পর্য্যন্ত), তাহাকে মাতৃস্তন্যই প্রচুর পরিমাণে দিতে হয়। মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলেই এইরূপ করা চলে। কিন্তু মাতার স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে, অথবা, যদি তাঁহার স্তন্য কমিয়া আসে, সে স্থলে জোর করিয়া মাতৃস্তন্য বাড়াইবার চেষ্টা করা অন্যায়; কেন না ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপরে বেশী দুধ জোগাইতে গেলে, শিশুর মাতার স্বাস্থ্য আরো খারাপ হইবার আশঙ্কা। মাতাকে রীতিমত একসের খাঁটি গো-দুধ ও যথেষ্ট পরিমাণে সাগু খাওয়াইয়া যদি তাঁহার স্তন্য দুগ্ধ বাড়ে, তবে তাহার চেষ্টা করার দোষ নাই। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের উপরে রোগা শরীরে ঐরূপ করিলে মাতৃস্বাস্থ্যহানি ও সৎসঙ্গে শিশুরও স্বাস্থ্যহানি অবশ্যম্ভাবী! "ল্যাকটাগল" নামক তুলার বীজ-

চূর্ণ হইতে প্রস্তুত একটা ঔষধ খাওয়াইলেও মাতৃস্তন্য বৃদ্ধি পায়; মাতার স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে, উহা ব্যবহার করার বাধা নাই—মাতৃ-স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইলে, উহার আদৌ প্রয়োগ করিতে নাই!

মাতৃ স্তন্য যথেষ্ট না থাকিলে, গো-দুগ্ধই শিশুর পক্ষে উৎকৃষ্ট খাদ্য। কিন্তু এদেশে গরুকে এমন নোংরা করিয়া রাখা হয় যে, গো-দুগ্ধকে যথেষ্ট না ফুটাইয়া পান করিতে দিতে সাহস হয় না। এবং গো-দুগ্ধকে যত বেশী ফুটান যায়, ততই উহার "ভাইটামীন" নামক শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী পদার্থটির অভাব ঘটে। শিশুর পক্ষে গো-দুগ্ধের দোষ এই যে, দুধ দেখিতে জলের মত তরল পদার্থ হইলেও, পেটে যাইয়াই বড় বড় ছানার দলা হইয়া দাঁড়ায়! কচি ছেলেকে কেহ বড় বড় ছানার টুকরা খাইতে দিতে চায় না—কিন্তু গো-দুধ খাইতে দেওয়াও যা', আর ডেলা-ডেলা ছানা খাইতে দেওয়াও তা'। এইজন্য গোরুর দুধের সঙ্গে বার্লি, সাগু, এরোরুট, শঠির বা পানিফলের পালো, মেলিন্সফুড প্রভৃতি মিশাইয়া দিলে—অভাবে মিছরি বা চিনি মিশাইলেও—পেটের মধ্যে যাইয়া বড় বড় ডেলা ডেলা ছানা বাঁধিতে পারে না—ঢের ছোট ছোট ছানার কুচিতে পরিণত হয়। মাতৃস্তন্য পেটে যাইলে, অতীব সূক্ষ্ম ছানার কুচি হয়; গো-দুগ্ধ বার্লি সহ পান করিলে, মাতৃস্তন্য জাত সূক্ষ্ম ছানার কুচির মত না হইলেও, বেশ ছোট ছোট ছানার কুচি হয়; এবং ছোট কুচি হইলেই, শিশুরা গোদুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে। এই জন্য শিশু যদি মাতৃস্তন্য না পায়, তবে প্রথম ২।৩ মাস বার্লির সঙ্গে গো-দুধ মিশাইয়া দিতে হয়। শিশুর বয়স যত কম হইবে, ততই বার্লির ভাগ প্রথম প্রথম বেশী দিতে হয়; পরে, শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্য দেখিয়া, বার্লির ভাগ ক্রমশঃ কমান যাইতে পারে। শঠি ও এরোরুট খাইলে পেট আঁটে; সাগু, পানিফলের পালো ও মেলিন্সফুড খাইলে, কোষ্ঠ সাফ থাকে। সবচেয়ে বার্লিই আমি পছন্দ করি। রবিন্সনের "পেটেন্ট" গুঁড়া বার্লিই প্রশস্ত।

শিশুকে দুধ পান করাইবার নিয়ম আছে। স্তন্য দিতে হইলে, একবার দক্ষিণ স্তন, ফিরে বারে বাম স্তন—এই রকম করিয়া দিতে হয়। শিশুর কত বয়সে, কতবার করিয়া, ও কতটা করিয়া, দুধ দিতে হয়, তাহা কোষ্টকাকারে নিম্নে লিখিয়া দিলাম—

	কত ঘণ্টা অন্তর খাইবে	কতটা পরিমাণ দুধ-বার্লি সারা দিনে-রাতে খাইবে
জন্ম দিবসে ...	৬	
২য় দিবসে	৪	
প্রথম মাসে	২৷৷০	১০—১৫ আউন্স
দ্বিতীয় "	২৷৷০	২০—২৪ "
তৃতীয় "	২৷৷০	২৪—৩০ "
চতুর্থ "	৩	৩০—৩৪ "
পঞ্চম "	৩	৩৪—৩৬ "
ষষ্ঠ "	৩	৩৬—৪০ "
সপ্তম " ...	৩	৪০ "

এক আউন্স = অর্দ্ধ ছটাক।

প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা ও ভোর ৩,৪ টায় শিশুকে খাওয়াইবে। রাত্রি ১১ হইতে ভোর ৩।৪ টা পর্য্যন্ত কোনও মতে খাওয়ান অভ্যাস করিতে নাই।

চারটি সাধারণ (কিন্তু বড় দরকারী) কথা বলিয়া দিই:—(১) রীতিমত ঘড়ি ধরিয়া খাওয়ানই উচিত; সেরূপ না খাওয়াইয়া—নিজের সুবিধামত, অথবা যখন মনে পড়িয়া গেল তখন, অথবা শিশু কাঁদিলেই—কদাচ খাওয়াইবে না। এরূপ করিলে, শিশু ভোগে, তাহার "লিভার" (যকৃত বৃদ্ধি) হয়, কোষ্ঠবদ্ধ অথবা পেটের অসুখ হয়। (২) যখন খাওয়াইবে, তখন পেট ভরিয়া মাই বা গাই দুধ দিবে—কখনো মাঝে মাঝে "গলা ভিজানর" জন্যও এক ফোঁটা মাই দুধ দিবে না। রাত্রে মাই মুখে করিয়া শিশুকে ঘুমাইতে দিবে না; ঘুমন্ত অবস্থায়, অনবরত চুষিয়া, শিশু অতিমাত্রায় দুধ পান করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়ে। (৩) শিশু কাঁদিলেই মাই দেওয়া ভুল; হয় ত অতিমাত্রায় মাই দুধই খাইয়া, পেট কামড়াইতেছে বলিয়া, শিশু কাঁদে; তাহার উপরে, মাই দেওয়া অত্যন্ত ভুল। (৪) মাই বা গাই দুধ অসহ্য হইলে, শিশু যখন-তখন কাঁদে, ঘুমাইয়া "দেয়ালা" করে, এবং তাহার মলে টক গন্ধ হয়, ছানা-বাটার মত সাদা সাদা কুচি মলে দৃষ্ট হয়, মলের সঙ্গে প্রচুর জল ও আম বাহির

হয়, পেটে হাওয়া হয়। এমন হইলেই অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা-কাল সকল প্রকারের দুধ বন্ধ রাখিতে হয়। (৫) একালের অনেক ছোকরা ডাক্তার "সাগু বার্লি শিশুর পেটে হজম হয় না" এমন কথা বলেন। সে কথা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। এদেশে ছেলেদের পেটে উক্ত খাবার যথেষ্টই সহ্য হয়।

এইবার শিশু-খাদ্য সম্বন্ধে আরো দুই একটি অবশ্য-প্রয়োজনীয় কথা বলিব। (১) মাটাতোলা দুধ শিশুর কোনও উপকারে আসে না। কলিকাতার অধিকাংশ গয়লার দুধই মাটা তোলা। এইজন্য কলিকাতার শিশু-দিগের বাড়বাড়ন্ত নাই, তাহারা রোগা ও রুগ্ন। বিলাতী "গাঢ় দুধ" (কন্‌ডেন্‌স্‌ট্‌ মিল্ক) যে শুধু মাটাহীন তাহা নহে—তাহাতে অতিমাত্রায় চিনি মিশান থাকায়, সে দুধ অপকারী। (২) যতগুলি বিলাতী "ফুড" আছে—সব-গুলিই শিশুর পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য। নিতান্ত বাধ্য না হইলে, উহা খাওয়াইলে শিশুর স্বাস্থ্যের হানি ঘটে।

প্রত্যেক শিশুকে রীতিমত নিয়ম করিয়া রৌদ্র সেবন করান চাই। যে ছেলে রৌদ্র না পায়, তাহার হাড় কাঁচা থাকে (রিকেট্‌স্‌ ব্যারাম)। তদ্ব্যতীত প্রত্যেক শিশুকে প্রত্যহ, নিয়ম করিয়া, কোন-ও-না-কোন টাট্‌কা ফলের রস খাওয়ান উচিত। লেবুর রস, আমের রস, কমলালেবুর রস প্রভৃতি দেওয়া চাই-ই চাই। রীতিমত রৌদ্র সেবন ও টাট্‌কা ফলের রস না পাইলে, শিশুর স্বাস্থ্যের হানি হয়। এ গুলিকে, বিশেষ করিয়া টাট্‌কা সময়ের ফলের রসকে—শিশুর অবশ্য প্রাপ্য খাদ্য মধ্যে গণনা করা উচিত। যে ছেলেরা রীতিমত রৌদ্র পায়, নিত্য টাট্‌কা ফলের রস ও মাতৃস্তন্য পায়, তাহাদের স্বাস্থ্য, অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি ও পুষ্টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে হইয়া থাকে।

জন্মাবধি ২।১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, প্রত্যেক শিশুকেই, রীতিমত, তৈল মাখাইয়া রৌদ্রে শায়িত রাখার প্রথা, এ দেশে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত আছে। তাহার ফলে, এ দেশে "রিকেট্‌স্‌" ব্যারাম হইত না। বর্ত্তমান কালে, শিক্ষিত ও ধনীদিগের ঘরে, সাসি-খড়খড়ির বিশেষ করিয়া ফ্যাসান হইয়াছে; সাসি-খড়খড়ি কোনও প্রকারে মন্দ বা নিন্দনীয় জিনিস নহে; কিন্তু, পাছে রৌদ্র লাগিয়া, ছেলে কালো হইয়া যায়, পাছে রৌদ্র খাইয়া ছেলের অসুখ করে, এই অমূলক ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, শিক্ষিত পরিবারে ও ধনীদিগের বাড়ীতে, শিশুরা না রৌদ্র পায়, না তাহাদিগকে তৈল মাখান হয়,—উপরন্তু, অমূলক ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে সার্সি বন্ধ থাকায়, তাহারা বিশুদ্ধ বায়ু হইতেও বঞ্চিত হয়। তাই আজ মধ্যবিত্ত ও ধনীদের সংসারে যে পরিমাণে রিকেট্‌স্‌ দেখা যায়, গরীবদের ঘরে তেমনটি দেখা যায় না। ইংরাজী শিক্ষার ইহা একটি কুফল, সন্দেহ নাই।

কচি ছেলেকে টাট্‌কা ফলের রস খাওয়ানর ওকালতি শুনিয়া, অনেক গৃহিণী হয় ত ঝঙ্কার করিয়া উঠিবেন—"আমরা কত ফল খাইয়াছি এবং আমার এতগুলো ছেলে পুলে মানুষ হইল, তাহারাই বা কত ফল খাইয়াছে? ওসব ডাক্তারদের বাড়াবাড়ি!" এই কথার উত্তরে আমি বলিব যে, গৃহিণীরা, সেকাল যে কি ছিল তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। সেকালে, গগনস্পর্শী বাড়ী ছিল না, এবং সে বাড়ীর একতলা পাতকূয়ার মত স্যাঁতস্যেঁতে আলোবাতাসহীন ছিল না। সেকালে, যাহার ঘরে ১০।২০ টা স্বাস্থ্যবতী গাভী থাকিত না, সে হিন্দু নামের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আর এখন টাকায় ২॥০ সের মাটাতোলা দুধ। সে কালে, লোকে টাট্‌কা শাকসব্জী ও টাট্‌কা মাছ খাইত; একালে, বাসি ও ভেজাল ছাড়া কথা নাই। সেকালে পাড়ায় পাড়ায় বেড়ান ছিল, জামা জোড়ার বালাই ছিল না;—একালে, মেয়েরা গাঁটছড়া বাঁধিয়া শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করে, আর একেবারে নীমতলায় বাহির হয়—সাধ আহ্লাদ, বেড়ান-চেড়ান তাহারা করিতে পায় না! সেকালে, ভাল বংশের ভাল মেয়ে আনা হইত; একালে, ডানাকাটা পরী ও কুবেরের কন্যা ভিন্ন অপর মেয়েদের আশা কম। কাযেই, এই সব গলদ মেরামত করিবার জন্য, একটু টাট্‌কা ফলের রসমাত্র যে দরকার হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

তাই আজ বারম্বার বলি,—ঘুরিয়া-ফিরিয়া বলি, হে বাঙ্গালি, যদি তোমার ভাবী বংশধরের কল্যাণ কামনা কর, তবে—

> গো-সেবায় মন দাও,
> বধূ-সেবায় অবহিত হও,
> শিশুর কল্যাণ কিসে হয় তাহা জানিয়া লও।

শোক-সংবাদ

৺রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর

রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর, এম-আর-এ-এস্ (ইংলণ্ড্)। গত ৫ই অগ্রহায়ণ রাত্রে তাঁহার ভবানীপুরস্থ আবাসে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। ঢাকা বিক্রমপুরের অতি সম্ভ্রান্ত বৈদ্য বংশে

৺রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর

ইঁহার জন্ম হয়। ঢাকা কলেজ ও শিবপুর কৃষি কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৪ সালে ওভার্‌শিয়ার্ রূপে ইনি বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগে প্রবেশ করেন, কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায় বলে ক্রমে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে ১৯১৭ সালে পশ্চিম সার্কেলের ডেপুটী ডাইরেক্টার্ অফ্ এগ্রিকাল্‌চারের পদে উন্নীত হন। তাঁহার উদ্যম ও কর্ম্মকুশলতার পুরস্কার স্বরূপ ১৯২০ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। সামান্য পদ হইতে সর্ব্বোচ্চ পদে উন্নীত হইলেও সে পদের অভিমান তাঁহার একেবারেই ছিল না। যে কেহ রায় বাহাদুরের সহিত পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণ এবং সরল অমায়িকতা গুণে মুগ্ধ হইতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৪৮ বৎসর হইয়াছিল। ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় আত্মার সদ্গতি বিধান করুন। আমরা শোক-সন্তপ্ত পরিবারের শোকে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত

আমরা শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কয়েক দিন হইল পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মজিলপুরের অধিবাসী ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই হারাণচন্দ্র সাহিত্য-সেবায় আত্ম নিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি 'কর্ণধার' প্রবর্ত্তন করেন। সেই কাগজ উঠিয়া গেলে তিনি 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে প্রবিষ্ট হন। সেই সময় বঙ্গবাসীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের উপদেশে তিনি ল্যাম্বের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় সেক্সপীয়রের নাটকগুলির গল্পাংশ প্রকাশিত করেন। সে সময়ে এই পুস্তকের যথেষ্ট সুখ্যাতি হয় এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দান করেন। জীবনের শেষ ভাগে হারাণচন্দ্র বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বগ্রামে বাস করিতে থাকেন। তিনি বিনয়ী ও নির্ব্বিরোধ ছিলেন। কিছুদিন সামান্য রোগ ভোগের পর হঠাৎ হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর হইয়াছিল। আমরা হারাণচন্দ্রের শোক-সন্তপ্ত পুত্র কন্যাগণের গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

৺শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গের প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক ও মানচিত্র-প্রণেতা শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় F. R. G. S., (Lond.) F. R. S. A. (Lond.) গত ১৭ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার সকাল ১০টা ২০ মিনিটের সময় তাঁহার মধুপুরস্থ ভবনে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তিনি পুরাতন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তদানীন্তন অধ্যাপকবৃন্দ তাঁহাকে "বিদ্যা-বাচস্পতি" উপাধিতে ভূষিত করেন। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া তিনি মিথিলায় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মিথিলা হইতে প্রত্যাগমন করার পর তৎকালীন বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব তাঁহাকে আসামের ইনস্পেক্টরের পদ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু তাঁহার পিতৃদেবের অনিচ্ছা থাকায় তিনি ঐ পদ গ্রহণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। তৎপরে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর ও ইনস্পেক্টর মহোদয়দিগের অনুরোধে তিনি বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের ভূগোল লিখিতে বাধ্য হয়েন। ঐ সময়ে প্রাথমিক ও মধ্যবাংলা স্কুল ও পাঠশাল সমূহে বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের ভূগোল পুস্তকের বড়ই অভাব ছিল। সুতরাং তিনি "ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ" নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ পুস্তকই বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের স্কুল ও পাঠশালাসমূহের পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। তখন শিক্ষক-মণ্ডলী ভারতবর্ষের ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া তাঁহার "ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণে"র সবিশেষ সমাদর করেন। এই সময়ে বঙ্গভাষায় মানচিত্র ও এট্‌লাস (atlas) প্রস্তুত করিবার জন্য শিক্ষক-মণ্ডলী ও গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহাকে ঐকান্তিক অনুরোধ করেন। বঙ্গভাষায় মানচিত্র ও এট্‌লাস প্রস্তুত হইলে, বিহার ও উড়িষ্যার শিক্ষক-মণ্ডলী হিন্দী ও উড়িয়া ভাষায় মানচিত্র ও এট্‌লাস প্রস্তুত করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি উঁহাদেরও অভাব দূর করেন। ক্রমে তিনি ইংরাজি, উর্দ্দু ও অন্যান্য ভাষায় মানচিত্র, এট্‌লাস ও গ্লোব প্রস্তুত করেন। সুদূর মহীশূর গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে কানেড়ি ভাষায় মানচিত্র প্রস্তুত করিয়া তিনি তথাকার ছাত্রদিগেরও শিক্ষার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। তিনি আজীবন ছাত্রগণের ভূগোল শিক্ষার সুবিধার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় সহচর ও সোমপ্রকাশ নামে দুইখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচলিত ছিল। তিনি এই সহচর পত্রিকার বহুদিন সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি সৎ-সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার প্রণীত "রামের রাজ্যাভিষেক" ইহার দৃষ্টান্ত। তিনি হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮৬ বৎসর হইয়াছিল।
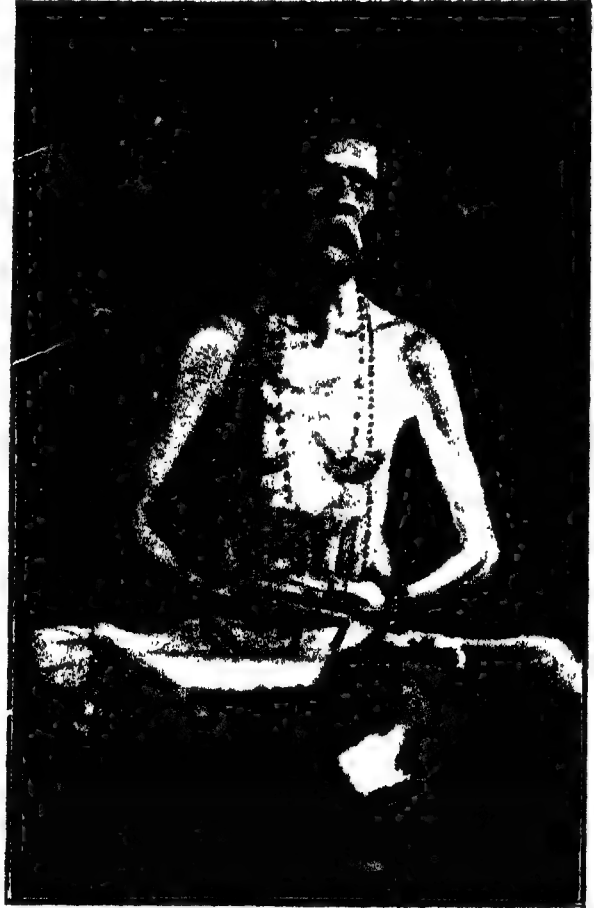
৺শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায়

সাইকেলে বাঙ্গালীর পৃথিবী-ভ্রমণ

চারিজন বাঙ্গালী যুবক বিগত ১২ই ডিসেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ-কালে কলিকাতা টাউন-হল হইতে সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁহাদের বিদায়সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। যুবক চতুষ্টয়ের নাম—শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র ঘোষ। ইঁহাদের ভ্রমণ-প্রোগ্রামের আভাস দিতেছি। কলিকাতা হইতে দিল্লী হইয়া করাচি; করাচি হইতে ষ্টীমারে বাস্‌রা; সেখান হইতে পুনরায় সাইকেলে বাগদাদ, মোসল, এঙ্গোরা হইয়া কনষ্টানটিনোপল; তাহার পর সোফিয়া, বেল্‌গ্রেড, ভিয়ানা, আমষ্টারডাম হইয়া কোপেনহেগেন; তাহার পর ষ্টকহলম (ষ্টীমারে); তৎপর ক্রিষ্টিয়ানা হইয়া বারজেন; তাহার পর ষ্টীমারে ডোভার পার হইয়া লণ্ডন, ডবলিন; পুনরায় ক্যালে পার হইয়া ব্রুসেল্‌স, পারি, জেনেভা, লোরেন্স, রোম, ভেনিস হইয়া আলেকজান্দ্রিয়া; সেখান হইতে ষ্টীমারে কেপ্‌টাউন, নাইলভ্যালি, টাঙ্গানিয়েকা, ট্রান্সভাল, ইউগণ্ডা, অরেঞ্জ-ফ্রি-ষ্টেট হইয়া ষ্টীমারে বুনাস্ এরিস, তাহার পর ষ্টীমারে নিউ-ইয়র্ক, পরে সান্‌ফ্রান্‌সিস্কো, ইয়াকোহামা, কোবে, পিকিন, হংকং, ব্রিস্‌বেন, এডিলেড, মেলবোরণ, কলম্বো; সেখান হইতে মাদ্রাজ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন। যেখানে যেখানে সমুদ্র-পথ সেখানেই সাইকেলের বিশ্রাম। আমরা সাহসী যুবক চতুষ্টয়ের যাত্রার সাফল্য কামনা করি। তাঁহারা নিরাপদে সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করুন।

সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণকারী বাঙ্গালী চতুষ্টয়

বিমল অশোক আনন্দ মণীন্দ্র

সাময়িকী

এ মাসের 'ভারতবর্ষে'র নিচোলে যে মনীষীর প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, এ-কালের অনেকে হয় ত তাঁহার পরিচয় জানেন না; কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যের এক যুগে এই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাব-শতক' সাহিত্য-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বৈদ্য-বসতি-প্রধান সেনহাটী গ্রামে ১২৪৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্য হইতে ইঁহার হৃদয়ে কবিত্বের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় মজুমদার মহাশয়ের বিশেষ অধিকার ছিল। ইনি জীবনের অধিকাংশ সময় যশোহর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে অতিবাহিত করেন; এই কার্য্য হইতেই তিনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। স্কুলের পণ্ডিতি করিয়া যাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে, তিনি যে দরিদ্র ছিলেন, এ কথা না বলিলেও চলে; কিন্তু এ দারিদ্র্য তাঁহার কবি-জীবনকে এক দিনের জন্যও স্পর্শ করিতে পারে নাই। আমরা শুনিয়াছি, একবার সরকার হইতে তাঁহার বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব হয়। এই কথা অবগত হইয়া মজুমদার মহাশয় বলেন যে, তিনি যে বেতন পাইতেছেন তাহাতেই ত তাঁহার চলিয়া যাইতেছে; তিনি অধিক বেতন চান না; বরঞ্চ সেই টাকা তাঁহার নিম্নপদস্থ পণ্ডিত মহাশয়কে দিলে তাঁহার অসচ্ছলতা দূর হইবে। এমন নির্লোভ ব্যক্তি অতি কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার 'সদ্ভাব-শতক' তাঁহার নাম বাঙ্গলা-সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিয়াছে। ইনি মধ্যে কিছুদিন ঢাকাপ্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও বৈভাবিকীর সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। গুপ্ত কবির সংবাদ-প্রভাকরে মজুমদার মহাশয়ের অনেক লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি নিজ জন্মভূমিতেই অবশিষ্ট জীবনকাল অতিবাহিত করিয়া ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ তারিখে পরলোক-গমন করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। আমরা 'সদ্ভাব-শতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম।

বাঙ্গলা দেশের ভোট-রঙ্গ শেষ হইয়া গিয়াছে; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের কতক হইয়া গিয়াছে, কতক হইতেছে; অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ভোট-পর্ব্ব শেষ হইবে। কিন্তু, এখানেই যবনিকা পতন হইবে না; আর একটা বড় অঙ্কের অভিনয় এখনও বাকী আছে। সেটী মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ-পর্ব্ব। এইটী হইয়া গেলেই তিন বৎসরের জন্য অভিনয় বন্ধ থাকিবে। তাহার পর যা করেন রয়েল কমিসন। এই দশ বৎসরের হিসাব-নিকাশ করিয়া বিলাতের কর্ত্তারা যদি বুঝিতে পারেন যে ভারতবর্ষের লোক স্বায়ত্ত-শাসনের যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, সাবালক হইয়াছে, তাহা হইলে হয় ত শাসন-সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ অধিকার এ-দেশবাসীর অদৃষ্টে লাভ হইতে পারে। আর যদি রয়েল কমিসন সিদ্ধান্ত করেন যে, এ দেশের লোক এখনও নাবালক, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিবেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। তিন বৎসর পরে কি হইবে, না হইবে, স্বরাজ-রথ কতদূর অগ্রসর হইবে, সে কথা লইয়া এখন বাদ-বিতণ্ডা করিয়া কোন লাভই নাই; এখন এ বৎসর যে ভোট-যুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার ফলাফল একটু বিচার করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

অন্য প্রদেশের কথা এখন ধামা-চাপা থাকুক, বাঙ্গালা দেশের হিসাবটাই এখন দেখা যাউক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে একশত চল্লিশ জন। এই একশত চল্লিশ জনের হিসাব এই—সরকারী ও বে-সরকারী (মনোনীত) ২৬ জন, ইউরোপীয় (নির্ব্বাচিত) ৫ জন, দেশীয় বণিকমণ্ডলী (নির্ব্বাচিত) ৪ জন, হিন্দু (নির্ব্বাচিত) ৪৬ জন, মুসলমান (নির্ব্বাচিত) ৩৯ জন। এখন, এই বৎসরের ভোটের ফল কি হইল, দেখা যাউক। সদস্যগণের মধ্যে মনোনীত ছাব্বিশ জন, ইউরোপীয় ষোল জন ও এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দুইজন—এই চুয়াল্লিশ জন ব্যতীত অবশিষ্ট ৯৬ জনের শ্রেণী-বিভাগ দল হিসাবে এইরূপ করা যায়—

স্বরাজী হিন্দু	৪০
স্বরাজী মুসলমান	২
রেস্‌পন্সিভ্‌ ও ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট	১৭
বেঙ্গল মুস্‌লেম দল	১৮
ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট মুস্‌লেম দল	৯
কোন দলের নহে এমন মুসলমান	১০
মোট	৯৬

এইবার একটু গড়া-পেটা (Permutation and Combination) করিয়া দেখা যাক্ না। প্রথম মুসলমান সদস্যদিগের লইয়াই অঙ্কপাত করা যাউক। এটা কিন্তু মন্ত্রীত্ব-রক্ষণের বোঝাপড়ার হিসাব। মনোনীত, ইউরোপীয়ান এবং য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যাঁরা আছেন, তাঁরা চুয়াল্লিশ জন যে মন্ত্রীত্ব-রক্ষণের পক্ষপাতী, এ কথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর উপরে যে তালিকা দেওয়া হইল, তাহাতে 'বেঙ্গল মুস্‌লেম দল' বলিয়া যাঁহাদের অভিহিত করা হইয়াছে, তাঁহারা সার আব্‌দর রহিমের দল, সুতরাং তাঁহারা মন্ত্রীত্ব গঠনের পক্ষপাতী। এখন উপরিউক্ত দুই দলের যদি মিলন হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সংখ্যা হয় বাষট্টি। এই বাষট্টি জনে ত সংখ্যাধিক্য হয় না—অন্ততঃ ৭১ জন চাই। শ্রীযুক্ত সার আব্‌দর রহিম যদি আর নয়টী মূর্ত্তি স্বদলে আনিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি মন্ত্রীদল রক্ষা করিতে পারেন। কিন্তু, এই নয়জনের আগমন-সম্ভাবনা কোথা হইতে আছে? স্বাধীন মুসলেম দলেরা নয়জন আছেন; কিন্তু, তাঁহারা ত এতদিন বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সার আব্‌দার রহিমের দলের সঙ্গে মিশিবেন না, তাঁহারা স্বাধীনভাবে কাজ করিবেন, কোন ব্যক্তি-বিশেষের আজ্ঞাবাহী হইবেন না। এখন যদি তাঁহারা সে কথা মান্য না করিয়া রহিমী দলে যোগ দেন, তাহা হইলে সার রহিমের জয় হইবে এবং তিনি মন্ত্রীদল রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু, ঐ নয়জনের কেহই যদি না আসেন, বা দুই একজন আসেন তাহা হইলে কি উপায় হইবে? কোন দলের নয়, এমন মুসলমান সদস্য দশজন আছেন। তাঁরা যদি রহিমী দলে যোগ দেন, তাহা হইলেও রহিমী রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর একদল আছেন, রেস্‌পন্‌সিভ ও ইনডিপেনডেণ্ট দল। এঁদের মধ্যে মন্ত্রীত্ব-প্রয়াসী সদস্য আছেন; তাঁহারা সংখ্যায় কয়জন, তাহা এখন কেমন করিয়া বলিব;—সে যে আঁধারের খেলা! যে রকম দেখা যাইতেছে, তাহাতে সার আবদার রহিম কোন প্রকারে নয়টী মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে পারিলেই মন্ত্রী। তিন-তিনটী দলে যথাক্রমে ১৭, ৯, ১০ মোট ৩৬ জনের মধ্য হইতে চতুর্থাংশ অর্থাৎ নয়জনও কি সার আব্‌দর নিজের পক্ষে অর্থাৎ মন্ত্রীত্বের পক্ষে লইতে পারিবেন না? আমরা ভবিষ্যদ্‌বক্তা নহি; তাহা হইলেও হিসাবের কড়ি যাহা দেখিতেছি, তাহার গড়া-পেটা করিয়া রহিমি রাজ্যের সম্ভাবনাই বেশী দেখিতেছি। এদিকেকিন্তু শুনিতেছি, বেগতিক দেখিয়া সার আব্‌দার রহিম হাল ছাড়িয়া দিবেন বলিতেছেন। তবে কি চুয়াল্লিশেও গোল আছে?

আর একটা দলের হিসাবও করা যাক্ না। এটা কোন দলের নহে, এমন মুসলমান দল। এ দলে কয়েকজন মাতব্বর ও দমে-ভারি সদস্য আছেন। তাঁরা যদি রহিমী দলের সঙ্গে না মিলিয়া সুধু রেস্‌পন্‌সিভ ও ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট দলকে হস্তগত করিতে পারেন, তাহা হইলে সরকারী ৪৪+নিজেরা ১০+রেস্‌পন্‌সিভ ১৭=৭১, ঠিক একাত্তর জন হয়। তাহা হইলে তাঁহারাও বাজী জিতিতে পারেন। এখানে একটা বড় রকম 'কিন্তু' আছে। রেস্‌পন্‌সিভ দলের মধ্যেও যে মত-ভেদ আছে।

এইবার স্বরাজীদিগের কথা ভাবিয়া দেখা যাউক। তাঁরা বাধা দিবার দল, দোয়ারকি ধ্বংস করিবার দল। তাঁহারা মন্ত্রীত্বের সমর্থন করিবেন না। কিন্তু, ধ্বংস করিতে পারিবেন কি? তাঁহারা সংখ্যায় ৪২ জন। তাঁরা এই বিরোধী দলে আরও ২৯ জন কোথায় পাইবেন? তাঁহাদের দলে দুইজন মাত্র মুসলমান আছেন। রহিমী দল তাঁদের সঙ্গে কিছুতেই যোগ দিয়া নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করিবেন না, তাঁহাদের সে অভিপ্রায়ই নাই। স্বাধীন মুসলমান দলের দুই চারিজন হয় ত স্বরাজীদের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারেন; কোন দলের নহেন, এমন দুই চারি জন হয় ত মন্ত্রীত্বের বিরোধী হইতে পারেন। কিন্তু, দুই চার জনের ত কর্ম্ম নহে—উনত্রিশ জন চাই। তবেই দেখা গেল বাধা দিয়া মন্ত্রীত্ব লোপ করিতে হইলে স্বরাজীদিগকে

অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিতে হইবে; কিন্তু, সে চেষ্টার ফল ত আমরা অঙ্কপাত করিয়া পাইলাম না। অতএব—

"হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।"

হৈমবতীর প্রশ্নের উত্তরে পশুপতি কি বলেন, তাহা জানিবার জন্ত আমরা উৎসুক রহিলাম।

প্রতি বৎসর ৩০শে নবেম্বর তারিখে ভারত-প্রবাসী স্কচগণ একটা ভোজের আয়োজন করিয়া থাকেন। এই ভোজের নাম সেণ্ট এনড্রুজ ডিনার। সেণ্ট এনড্রুজ স্কটল্যাণ্ডবাসীদিগের গৃহ-দেবতা। এই দেবতার স্মৃতি-পূজা উপলক্ষে উদর-পূজার বিপুল আয়োজন করা হয়। কলিকাতায় এই উপলক্ষে যে ভোজ হয়, তাহাতে এখানকার স্কচেরা সকলেই থাকেন, তা ছাড়া ইংলণ্ডেরও বাছা-বাছা ভদ্র লোকের নিমন্ত্রণ হয়, দুই চারিজন এদেশীয় ভাগ্যবান ব্যক্তিও নিমন্ত্রণ পান। এ ভোজে যদি পান-ভোজনই হয়, তাহা হইলে কোন কথাই থাকে না; কিন্তু এই ভোজের একটা বিশেষত্ব আছে; ভোজের শেষে ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের জন্ত সুধু পানীয়ই প্রচুর বলিয়া মনে না হওয়ায় অনর্গল বাক্যবর্ষণ করিয়া ভোজনকারিগণ উদরের ভার লাঘব করিয়া থাকেন। সে বক্তৃতাও যিনি-তিনি করেন না, বাঙ্গালা দেশের সরকারী সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তিই প্রধান বক্তার আসন গ্রহণ করেন, অর্থাৎ লাট সাহেব বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহারই নিম্নস্থ কেহ বক্তৃতা করেন এবং সে বক্তৃতা সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক নহে—খাঁটী রাজনীতিক। প্রায় প্রতি বৎসরই বাঙ্গালার লাট সাহেব এই ভোজের সময় কলিকাতায় উপস্থিত থাকেন; সুতরাং এ বক্তৃতা তাঁহাকেই করিতে হয়। এবার আমাদের লাট লিটন মহোদয় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার কয়েকটী কথা আমরা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। অন্যান্য বৎসরে যে বক্তৃতা হইয়াছে, তাহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করি নাই। কিন্তু, লর্ড লিটন আর কয়েক মাস পরেই দেশে চলিয়া যাইবেন; সুতরাং বিগত পাঁচ বৎসরের যে হিসাব তিনি দিয়াছেন, তাহার প্রধান কথাগুলির সার মর্ম্ম সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত বলিয়াই আমরা এই বক্তৃতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিলাম।

বক্তৃতার সুচনায় শ্রীযুক্ত লর্ড লিটন জানাইয়াছেন—"৫ বৎসরের সমালোচনা করিতে গেলে আমি কার্য্যভার গ্রহণ করিবার সময় কি কি আশা অন্তরে লইয়া আসিয়াছিলাম এবং সে সব আশা কতটা সফল হইয়াছে, অথবা সে সম্বন্ধে কতটা নৈরাশ্য আসিয়াছে, তাহা স্মৃতিপথে উদিত হয়। ব্যক্তিগতভাবে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গেলে অভিযোগ করিবার আমার কিছুই নাই, কৃতজ্ঞ হইবারই অনেক বিষয় আছে। ভারতে আসিয়া আমি অনেক সুখ লাভ করিয়াছি। এখানে আমি অনেককে বন্ধুস্বরূপে লাভ করিয়াছিলাম। সর্ব্বত্র আমি যে সদয় ব্যবহার লাভ করিয়াছি, তাহার স্মৃতি অন্তরে লইয়া আমি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। কিন্তু আমি যে রাজনীতিক আশা লইয়া এদেশে আসিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন যখন আমার মনে উদয় হয়, তখন আমাকে স্বীকার করিতেই হয় যে, অধিকাংশক্ষেত্রেই ঐ সম্বন্ধে আমি নিরাশ হইয়াছি।"

তৎপরে মণ্ট-ফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন-সংস্কার আইন পাশ হইবার অব্যবহিত কাল পরেই আমি ইণ্ডিয়া আফিসে গমন করি। যাঁহারা ঐ বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে অবস্থান করিবার সময় আমি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল এবং আশাই বা কি ছিল, তাহা অবগত হইয়াছিলাম। পার্লামেণ্টে এই আইনের খসড়া উপস্থিত করা হইলে উহার বিরোধী দল এই যুক্তি লইয়া উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন যে, ঐ ব্যবস্থাটি কালোচিত হয় নাই; ইহাতে ভারতের অধিবাসীদের হাতে অনেক বেশী দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; তাহারা এই সব দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত যোগ্যতা লাভ করে নাই। আমি পার্লামেণ্টে ইহাদের বিরুদ্ধতা করিয়া এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করিয়াছিলাম। দায়িত্ব গ্রহণ করিতে অথবা দায়িত্ব প্রদান করিতে আমি কোন দিনই ভীত হই নাই। এখানে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার ঐ বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও টলে নাই। বর্ত্তমান শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে অভিযোগ করিবার আমার যদি কিছু থাকে, তবে তাহা ইহাই যে, অনেক বিষয়েই ইহাতে দায়িত্ব হব ভাগাভাগি

অথবা সঙ্কুচিত করা হইয়াছে। তারপর আমি ভারতে আগমন করি। ভারতে আসিবার আমার একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যে ব্যবস্থা এখন অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহার সঙ্গতি প্রদর্শনই ছিল ঐ উদ্দেশ্য। সেই এক উদ্দেশ্য লইয়াই আমি আসিয়াছিলাম। একটি আশা লইয়া আমি আসিয়াছিলাম, আমার আশা ছিল, ভারতের জাতীয়তার পক্ষ যাঁহারা সমর্থন করিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাসই জয়যুক্ত হইয়াছে এবং যাঁহারা উহার বিরোধী তাঁহাদের ভীতি যে অমূলক ইহার সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেশে ফিরিতে পারিব। আমি আশা করিয়াছিলাম, আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি দেখাইতে পারিব যে, ব্রিটিশ স্বার্থ এবং ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা পরস্পর-বিরোধী নহে এবং নব-প্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কার পার্লামেণ্টের অভীষ্ট পথে ভারতকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানেরই যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিবে। কিন্তু আমাকে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বিগত ৫ বৎসরে বাঙ্গালায় যে সব ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহাতে নূতন শাসন-তন্ত্রের বন্ধুদের জোর বাড়ে নাই; বিরোধী পক্ষেরই জোর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে।"

তাঁহার পর লর্ড বাহাদুর বলিয়াছেন—"এই ৫ বৎসরে অনেক বিষয়ে সাফল্য লাভ করিতে চেষ্টা হইয়াছে এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈফল্য লাভ হইয়াছে। কেহ কেহ শাসন-সংস্কার সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন। আবার কেহ কেহ প্রথমতঃ এই শাসন-সংস্কারকে নিষ্ক্রিয় অসহযোগের দ্বারা এবং পরে প্রত্যক্ষভাবে বাধাদানপূর্ব্বক ধ্বংস করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহারাও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছেন। কারণ এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, বাঙ্গালার দ্বৈতশাসন যদি স্থগিত হইয়া থাকে, ইহার বিরোধীদের কার্য্যের জন্ম হয় নাই; ইহার যাঁহারা সমর্থক, তাঁহাদের জন্যই হইয়াছে। কারণ এই প্রদেশে বিরোধী পক্ষ কখনই সংখ্যাধিক্য লাভ করেন নাই। আবার কেহ কেহ বলপ্রয়োগ এবং ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা তাঁহাদের মত চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; তাঁহাদের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। অবশেষে দুইটি প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমান শান্তি রক্ষা করিতে এবং সাম্প্রদায়িকতার উপর জাতীয়তার প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু গত ৬ মাসে তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়াছেন।"

উপসংহারে লর্ড লিটন বলিয়াছেন—

"বিদায় গ্রহণের প্রাক্কালে কাহারও উপর দোষারোপ করিবার ইচ্ছা আমার নাই। ব্যর্থতা যদি আসিয়া থাকে, সেজন্য নিজের যতটুকু দায়িত্ব, আমি তাহা পূর্ণ ভাবেই স্বীকার করিয়া লইতেছি। এই সময়টা একেবারেই বৃথা গিয়াছে, এ কথাও আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি; কারণ শিক্ষা সফলতার দিক হইতেও যেমন লাভ হয়, বিফলতার ভিতর দিয়াও তেমনই লাভ হইয়া থাকে। কোন জাতি বা ব্যক্তি সাফল্যের দ্বারা যেমন শিক্ষা লাভ করে, ব্যর্থতা বা ভুল-ভ্রান্তির ভিতরেও সেইরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সব ভুল-ভ্রান্তি যে এক পক্ষেরই হইয়াছে, এমন কথা আমি বলি না; পার্লামেণ্টও ভুল করিতে পারেন,—অবশ্য উদ্দেশ্যে নয়; কিন্তু নীতিতে ভুল তাঁহাদেরও হইতে পারে। এ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য রয়াল কমিসন যখন বসিবে, এতৎ সংশ্লিষ্ট সকলের কার্য্যের সেদিন সমালোচনা হইবে। ভারতের সম্বন্ধে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমার মনে হয়, এ পর্য্যন্ত যে সব বিফলতা আসিয়াছে, উভয় পক্ষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের অভাবই তাহার কারণ। ইংরেজের মতলবের উপর ভারতবাসীদের আস্থা খুবই কম। আবার বৃটিশ জনসাধারণেরও ভারতবাসীদের বন্ধুতার উপর খুবই কম বিশ্বাস। ভারতবাসীদের দাবী গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থের বিরোধী নহে, ইহা প্রতিপন্ন না করা পর্য্যন্ত ব্রিটিশ জনমতের কাছে তাহা কিছুতেই গ্রাহ্য হয় না; সেইরূপ ভারতের প্রতি সহানুভূতির যত কথাই ব্রিটিশেরা বলুন, এদেশের যাঁহারা ইংরেজকে তাঁহাদের শত্রুস্বরূপ মনে করেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই উহাকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখেন। উভয় দেশের লোকের পক্ষেই যাহা সন্তোষজনক এই সমস্যার সমাধান করাই উভয় দেশের রাজনীতিক নেতাদের কর্ত্তব্য। এই সবে মাত্র ভারতে সাধারণ-নির্ব্বাচন শেষ হইল। নূতন আইনসভাগুলি অবিলম্বে তাহাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবেন। যে দশ বৎসর অবসানে শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে তদন্ত-কমিসন নিযুক্ত হইবার কথা আছে, তাহার

শেষভাগ উঁহাদেরই হাতে থাকিবে। সুতরাং অবিশ্বাসের স্থলে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করিবার সময় এখনও আছে। আমার কার্য্যকালের যে কয়েক মাস অবশিষ্ট আছে, আমি যথাশক্তি সেই ভাব প্রতিষ্ঠার জন্যই চেষ্টা করিতেই ব্যগ্র আছি।

প্রায় পাঁচ বৎসর হইল, কাশীবাসিনী তিনটী বঙ্গ মহিলা অতিকষ্টে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া কাশী আয়ুর্ব্বেদ সম্মিলনীর সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী উপাধি লাভ করিয়া নারীজাতির মধ্যে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার প্রচারকল্পে কাশীতে জগদম্বা আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যালয় স্থাপনা করেন। এখানে চারি বৎসর আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী উপাধি দেওয়া হয়। গত দুই বৎসরের মধ্যে তিনটী ছাত্রী সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখানে কেবল স্ত্রীলোকদিগকেই লওয়া হইয়া থাকে। বিনা-ব্যয়ে বোর্ডিংয়ে ছাত্রীদের থাকিবার স্থান দেওয়া হয়। শিক্ষার জন্য বেতন লাগে না। ইহা ছাড়া অসমর্থা ছাত্রীদিগকে ৫৲ পাঁচ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দেওয়া হয়। এখানে বঙ্গালা অথবা হিন্দি ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়। দাতব্য চিকিৎসা বিভাগে হাতে-কলমে চিকিৎসা শিখাইবার সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। প্রবেশেচ্ছু ছাত্রীগণ শ্রীমতী প্রেমলাবালা আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রী প্রধান শিক্ষয়িত্রী, জগদম্বা আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয়, দুর্গাকুণ্ড রোড কাশী, এই ঠিকানায় অনুসন্ধান করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

বিলাতের সাম্রাজ্য-পরিষদে (Imperial Conference) বৃটীশ সাম্রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রতিনিধিরা সমবেত হইয়া ভবিষ্যতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সে পরিষদে ভারতের স্থান কোথায়, তাহা বুঝিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় না; কারণ অন্যান্য দেশ হইতে প্রধান মন্ত্রীরা এই পরিষদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর এদেশ হইতে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা মন্ত্রী বা রাজ-প্রতিনিধি নহেন, ভারত সরকারের মনোনীত ব্যক্তিগণ। সেই সাম্রাজ্য-বৈঠকে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছিল, সে কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার ও আয়রলণ্ডের ফ্রি-ষ্টেটের প্রতিনিধিদিগের চেষ্টায়। তাঁহাদেরই চেষ্টায় একটী কমিটি গঠিত হইয়াছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, উপনিবেশ-সমূহ বৃটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকায় যে তাঁহাদের অধীনতা সূচিত হয় না, উপনিবেশসমূহকে তাহা বুঝাইবার জন্যই বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইংরাজের মনে ভয় ছিল, যদি উপনিবেশসমূহের মনে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, তাহারা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় ইংরাজের অধীনে, তবে তাহারা আর সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিতে চাহিবে না। তাহারা যদি সম্বন্ধ লোপ করে, তাহা হইলে বৃটীশ সাম্রাজ্যের অবস্থা যে বড়ই ক্ষীণ হইবে, তাহাই বুঝিতে পারিয়া এই ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন। এ অধিবেশনে সে ভয় মিটিয়া গিয়াছে—বৃটীশ সাম্রাজ্যের নাম পূর্ব্ববৎ গৌরবোজ্জ্বলই থাকিবে। রিপোর্টে ভারতবর্ষের উল্লেখমাত্র নাই। কেন নাই, তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে, সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ভারত সরকার আইনে নির্ণীত হইয়াছে; অর্থাৎ ভারতবর্ষ যে বিজিত দেশ, সেই জন্য তাহার অধীনতা তাহার সম্বন্ধে সাম্রাজ্য বৈঠকের নির্দ্ধারণ প্রয়োগের অন্তরায়। বহুত আচ্ছা!

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর প্রণীত সচিত্র-ভ্রমণ-কাহিনী "দক্ষিণাপথ" মূল্য—২৷৹

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "মনের পরশ" মূল্য—৩৲

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত সচিত্র গল্প পুস্তক "বিলাসিনী" মূল্য—১৷৹

শ্রীপ্রমথ লাহা প্রণীত "পরিহাস" (কবিতা) মূল্য—৸৹

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "আলোর কমল" মূল্য—১৸৹

শ্রীবিলাসচন্দ্র রায় দেবশর্ম্মা প্রণীত "শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা ও পদ্যানুবাদ" মূল্য—৷৵৹ ও "বঙ্গীয় গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসন বিষয়ক আইন" মূল্য—১৲

শ্রীবীরেশ্বর দত্ত প্রকাশিত "সত্য-প্রতিষ্ঠা" মূল্য—৷৹

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "জটিল তপস্বী" মূল্য—১৷৹

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

রাজগৃহের পথে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ
মহাশয়ের অনুগ্রহে

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

মাঘ, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

ধর্ম্মের জয়

অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এস্‌সি

কোনও কোনও অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে,—লোকের যে একটা বিশ্বাস আছে এবং অনেক শাস্ত্রেও যে কথাটা লেখাও আছে—যে ধর্ম্মের (morality) জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয় হইবেই হইবে—সে কথাটা বিচারসহ নয়। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই, ধার্ম্মিক ব্যক্তি পরাজিত হইল এবং অধার্ম্মিক ব্যক্তি জয়ী হইল। যে প্রাকৃতিক নিয়মে (laws of nature) মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাহা ধর্ম্মানুগতও নয়, অধর্ম্মানুগতও নয়; তাহা ধর্ম্মাধর্ম্মসম্পর্কবর্জ্জিত (non-moral) (১)। তাঁহারা প্রসঙ্গক্রমে মহাভারতের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, যে মহাভারতে—"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" এই কথাটি প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া লোকের বিশ্বাস, সেই মহাভারত পড়িয়াই আমরা দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মের জয় হয় নাই। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদিগের পক্ষে সে জয় এরূপ সুখশূন্য হইয়াছিল যে, তাহাকে পরাজয় বলিলেও চলে।

এই কথাটা পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কথা—বিশেষতঃ হিন্দুশাস্ত্রের। মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, ও শুক্রনীতিসার প্রভৃতি অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি কামশাস্ত্র (Æsthetical literature) এবং বেদ, দর্শন, তন্ত্র, নারদভক্তিসূত্র প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র এবং ইতিহাস ও পুরাণাদি শাস্ত্র—যাহাদিগকে হিন্দুবিশ্বকোষ নামে অভিহিত করা যায়—সমুদায় শাস্ত্রেই এই কথাটা পাওয়া যায় যে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

এই দুইটী মতের মধ্যে কোন্‌টী ঠিক, তাহা নির্ণয়

(১) এ কথাটি বৈজ্ঞানিক হাক্‌স্‌লীও বলিয়াছেন।

করিবার জন্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আমার ধর্ম্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, এই তর্কের সময় উল্লিখিত পণ্ডিতদিগের মতই অজ্ঞেয়বাদী থাকিব। কেন না, আজকাল শিক্ষিতগণের মধ্যে অজ্ঞেয়বাদীর সংখ্যা কম নয় এবং তাঁহাদিগের সহিতই আমার তর্ক। যাঁহারা ঈশ্বর বা পুনর্জন্ম মানেন, তাঁহাদিগের সহিত তর্কের কোনও প্রয়োজন নাই। কেন না, তাঁহারা নিজের নিজের বিশ্বাসের জন্য আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে চলেন—কাহারও তর্কের ধার ধারেন না। আর একটী কথা,—এ প্রবন্ধে আমি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধেই কথা বলিব; যেহেতু অন্যান্য ধর্ম্মের কথা আমি ভাল জানি না, এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, কয়েক হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র বর্ত্তমান কালে বুঝিতে পারা অতি দুরূহ। (২)

ধর্ম্ম কি?

প্রথমেই দেখিতে হইবে, ধর্ম্ম শব্দটী আমাদের শাস্ত্রে কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রমতে যে কর্ম্ম বা আচার দ্বারা নিজের ও সমাজের উভয়েরই কল্যাণ হয় তাহাই ধর্ম্ম। (৩) অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'duty' বা কর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম কি কি, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ ভূয়োদর্শন ও তৎকালে জ্ঞাত বিজ্ঞানের (Science) সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখি—তাহাতে শুধু ethics (নীতি-বিজ্ঞান) নয়, অধিকন্তু science of education (শিক্ষা-বিজ্ঞান), eugenics (বংশোৎকর্ষ-বিজ্ঞান), hygiene (স্বাস্থ্যবিজ্ঞান), economics (অর্থবিজ্ঞান), politics (রাজনীতি) ও law (আইন) প্রভৃতিও রহিয়াছে। পাঠক এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাইবেন ভূদেববাবুর প্রবন্ধসমূহে, বঙ্কিমবাবুর ধর্ম্মতত্ত্বে, অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সনাতনীতে, চন্দ্রনাথবাবুর প্রবন্ধে, রাজনারায়ণবাবুর সেকাল ও একালে, বৈজ্ঞানিক পি, এন্, বসুর পুস্তকে ও বর্ত্তমান লেখকের অন্যান্য প্রবন্ধে। এই সকল হইতে আমার মনে হয়—আমাদের ধর্ম্ম প্রধানতঃ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাজেই ধর্ম্মের জয় মানে বিজ্ঞানের জয় বা জ্ঞানের (knowledgeএর) জয়। অবশ্য সর্ব্বত্রই যে জ্ঞানের জয় হয়, তাহা বলা যায় না; তবে অধিকাংশ স্থলে যে হয় তাহা নিঃসন্দেহ। এইজন্য হিন্দু অর্থশাস্ত্রে ও কামশাস্ত্রে লিখিত আছে—ধর্ম্ম হইতে অর্থ (wealth) লাভ হয় এবং অর্থ হইতে কাম (sensual and æsthetical pleasures) লাভ হয়। (৪)

এখন অনেকে ধর্ম্ম কথাটীর অনুবাদ করেন Religion শব্দটীর দ্বারা; কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্মমতে hygiene, politics প্রভৃতি বিজ্ঞানগুলিকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই। কাজেই—একজন খৃষ্টানের পক্ষে স্বাস্থ্যবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া অসুস্থ হওয়া সম্ভব এবং তাহা দেখিয়া অজ্ঞেয়বাদী বলিবেন—"দেখ, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তি রোগে কষ্ট পাচ্ছে।" কিন্তু একজন ধার্ম্মিক হিন্দু সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইবেন—কেন না তাঁহার ধর্ম্মের মূলে স্বাস্থ্যবিধি আছে।

কেহ কেহ ধর্ম্ম অর্থে ethics বুঝেন। Religionগুলি বাদ দিলেও অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক নিজ নিজ মতানুসারে ethics ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে অনেক মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। সে সকল মতবাদের অধিকাংশেরই মধ্যে hygiene, eugenics আদি স্থান পায় নাই। কাজেই—

(২) দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন—বেদসংহিতার অর্থ নানা পণ্ডিতে নানা রূপ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল ব্যাখ্যার মধ্যে যেখানি প্রাচীনতম সায়ন ভাষ্য, সেখানিও বেদ রচিত হইবার অন্ততঃ দুই হাজার আড়াই হাজার বছর পরে লিখিত।

(৩) আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান দ্বিজঃ।
মনু, ১ম অধ্যায়।

আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারো হন্ত্যলক্ষণম্। মনু, ৪র্থ অধ্যায়।
যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সো-সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।
বৈশেষিক দর্শন, ১ম অধ্যায়।

(৪) তস্মাৎ স্বধর্ম্মং ভূতানাং রাজা ন ব্যভিচারয়েৎ।
সংদধানো হি প্রেত্য চে নন্দতি।
(কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র)

ধর্ম্মার্থাবিরোধেন কামং সেবেত। (ঐ)
শতায়ুর্বৈ পুরুষো বিভজ্য কালমন্যোন্যানুবদ্ধং
পরস্পরস্যানুপঘাতকং ত্রিবর্গং সেবেত। (কামসূত্র)
(কামাঃ ফলভূতাশ্চ ধর্ম্মার্থয়োঃ। (ঐ)

তাঁহাদের মতে যিনি moral, তিনিও অসুস্থ হইতে পারেন, বা তাঁহার অযোগ্য সন্তান জন্মিতে পারে। কাজেই, ধর্ম্মের জয় হইল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—হিন্দুর ধর্ম্ম Scienceএর উপর প্রতিষ্ঠিত। এখন scienceএর একটী লক্ষণ—ইহা যুক্তি-সম্মত। যত বড় লোকই হউন না কেন, তাঁহার কথা তত দিনই স্বীকার্য্য, যত দিন তাহা প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। মনুসংহিতায় লেখা আছে—"ধর্ম্মতত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বিবিধ বেদমূলক শাস্ত্র এই প্রমাণত্রয় বিলক্ষণরূপে অবগত হইবেন। বেদ ও ধর্ম্মশাস্ত্রমতে যে ব্যক্তি বেদের অবিরোধী তর্ক দ্বারা বিচার করে সেই—ধর্ম্মবেত্তা, অন্যে নহে। * * * * যে ধর্ম্মের কথা লেখা হইল না, সে-বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, শিষ্ট ব্রাহ্মণেরা যাহাকে ধর্ম্ম বলিবেন, তাহা নিঃসন্দিগ্ধ ধর্ম্ম জানিবেন।"

মনুসংহিতার আর এক স্থলে ধর্ম্মের চারিটী লক্ষণ দেওয়া হইয়াছে; যথা, বেদ, স্মৃতি, সদাচার (ভাল লোকে যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন) ও নিজের আত্মার প্রিয় বা প্রীতি (অর্থাৎ conscience)। এখন জগতের অনেক নীতিতত্বজ্ঞ পণ্ডিতের মতে শাস্ত্র বা আপ্তবাক্যই ধর্ম্ম-নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। আবার অন্যান্য নীতিতত্বজ্ঞের মতে বিবেকই (conscience) ধর্ম্ম-নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। আবার কাহারও মতে 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'; অর্থাৎ মহাপুরুষগণের দৃষ্টান্ত দেখিয়াই কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকল মহাপুরুষ এক পথে যান নাই। তাঁহাদের সকলেরই মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে বটে, যেমন ঐকান্তিকতা (sincerity); কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে অমিলও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—যীশু ও মহম্মদের জীবন তুলনা করিয়া দেখুন। মনু কিন্তু এই সকল পরস্পর-বিরোধী মতগুলির সুন্দর সামঞ্জস্য (compromise) বিধান করিয়া গিয়াছেন। শাস্ত্র, সদাচার ও বিবেক সকলেরই সাহায্য লইয়া ধর্ম্ম মীমাংসা করিতে হইবে।

হিন্দুধর্ম্ম যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তনশীল, সে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিবে না, যদি তিনি মনুসংহিতা ও রঘুনন্দনের স্মৃতি এই দুইখানি বই মিলাইয়া পড়েন। কেবল দুই একটা কথার উল্লেখ করিব। এক সময়ে আর্য্যগণ গোমাংস ভক্ষণ করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান কালে হিন্দুধর্ম্মের নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে (এমন কি বৌদ্ধ, জৈন, শিখ পর্য্যন্ত) যদি কোনও একটী বিষয়ে মিল থাকে ত তাহা এই গোহত্যায় আপত্তি। যে জাতিভেদ এক্ষণে বংশগত, এক সময়ে তাহা গুণ ও কর্ম্মের উপর নির্ভর করিত—ইহার প্রমাণ নানা শাস্ত্রে পাওয়া যায়।

আজকালকার দিনে অনেকে যজ্ঞ বলিতে—স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুসংস্কারপূর্ণ কতকগুলা অনুষ্ঠান বুঝেন। এবং তপস্যা বলিতে—অমানুষিক শক্তিলাভের জন্য নিজের শরীরকে ক্লেশ দেওয়া বুঝেন। কিন্তু মনুসংহিতা ও ভগবদ্‌গীতা পড়িলে এই দুইটী শব্দ অতি উচ্চ অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। ত্যাগের ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই যজ্ঞ বলা হইয়াছে (যজ্ঞের ইংরাজী—অনুবাদ sacrifice অর্থাৎ ত্যাগ)। মনুর পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও গীতার দ্রব্য যজ্ঞ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ—শ্রীধর), তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়-জ্ঞানযজ্ঞ (বেদের অধ্যয়ন ও তাহার অর্থজ্ঞানরূপযজ্ঞ—শ্রীধর) প্রভৃতি হইতে যজ্ঞ সম্বন্ধে আমাদের খুব ভাল ধারণাই হয়। তেমনি তপস্যার অর্থ দেখি—ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য ও প্রিয় ও শ্রোতার হিতকর বাক্য বলা, বেদপাঠ, মনের প্রসাদ (বা প্রসন্নতা) ভাবসংশুদ্ধি (ব্যবহারে কপটতা না থাকা) ইত্যাদি (গীতা, ১৭শ অধ্যায়); এবং মনুতে দেখি—'যে সর্ব্বোত্তম ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য তপস্যার আচরণ করিবেন, তিনি সর্ব্বদা সম্যক্‌রূপে জানিবার জন্য বেদের আবৃত্তি করিবেন; যেহেতু, ইহলোকে ব্রাহ্মণাদির বেদ অভ্যাসই পরম তপস্যা বলিয়া মুনিগণ কহিয়াছেন (মনু, ২য় অধ্যায়)।

এই সম্পর্কে কেহ হয় ত বলিবেন—ব্রাহ্মণ ও মীমাংসা প্রভৃতি শাস্ত্রে এমন সব যজ্ঞের প্রক্রিয়া আছে, যাহা আমাদিগের নিকট অর্থহীন বলিয়া মনে হয়; এবং পুরাণ ও ইতিহাসে এমন তপস্যার বর্ণনা আছে, যাহা আজকালকার দিনে কুসংস্কার বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার উত্তরে আমি বলি—"শাস্ত্রের সকল অংশ হয় ত আমরা বুঝি না, এবং যাহা বুঝি না বা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে যাহাকে খারাপ বলিয়া বুঝি, সে সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া, যে অংশগুলি ভাল বলিয়া বুঝিতে পারি, আপাততঃ সেই অংশগুলিই

আলোচনা করি, ও সাধারণ লোকের উপকারার্থ প্রচার করি। সাধারণ লোকের মনে শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে; এবং সেই শ্রদ্ধার জন্যই তাহারা নৈতিক ভাবে (morally) জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। যদি শাস্ত্রনিন্দা শ্রবণে তাহাদিগের মনে শাস্ত্রবিশ্বাস দূর হয়, তাহা হইলে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। (৫)

আর একটা কথা—আমাদের শাস্ত্রসকলের মধ্যে কতকগুলিকে বিশেষভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাধারণের মধ্যে সেগুলি স্মৃতি নামে পরিচিত। যথা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রণীত সংহিতাগুলি। (৬) ইহাদের মধ্যে মনুসংহিতাই প্রাচীনতম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। এইজন্য প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম কিরূপ ছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাদিগকে প্রধানতঃ এই মনুসংহিতার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধেও তাহাই করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে বলিতে চাই যে, মনুসংহিতা যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তেমনি সাধারণ লোকের পক্ষে ভগবদ্গীতা মোক্ষশাস্ত্র সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। সেই জন্যই দেখিতে পাই—বর্ত্তমান যুগে যে সকল ইংরাজী-শিক্ষিত হিন্দু তাঁহাদের সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রধানতঃ এই দুইটী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভূদেববাবু মনুসংহিতার প্রতি এবং বঙ্কিমবাবু গীতার প্রতিই বেশী মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন।

হিন্দুধর্ম্মের আর একটী লক্ষণ—ইহা অধিকারী-ভেদ মানে—অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মের ব্যবস্থা—যথা, পণ্ডিতের ধর্ম্ম, যোদ্ধার ধর্ম্ম, বণিকের ধর্ম্ম ও চাকরের ধর্ম্ম; এবং ছাত্রের ধর্ম্ম, গৃহস্থের ধর্ম্ম, সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম ইত্যাদি। বাস্তবিক হিন্দুধর্ম্মকে একটী ধর্ম্ম না বলিয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমষ্টি বা সমন্বয় বলিলেই ভাল হয়। এই জন্য হিন্দুধর্ম্ম খুব practical অর্থাৎ সংসারের পক্ষে উপযোগী। এবং ইহাতে নিজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। নানারূপ ধর্ম্মের মধ্যে এই যে একটা সামঞ্জস্য (compromise) আমরা হিন্দু ধর্ম্মে দেখিতে পাই, এরূপ আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলিতে চাই। দার্শনিক নিট্‌শে খৃষ্টীয় নীতিতত্বের নিন্দা করিয়া নিজে একটা নীতিতত্ব প্রচার করিয়াছেন; এবং সেই সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধার সহিত মনুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি মনুর মত সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অধিকারী-ভেদ বুঝিতে পারিলে, খৃষ্টীয় নীতিতত্ব এবং নিট্‌শের নীতিতত্ব উভয়েরই সামঞ্জস্য হইয়া যায়। বাস্তবিক বলিতে কি, আমরা আজকাল Spiritualism বা আত্মবাদের সঙ্গে Materialism বা প্রকৃতিবাদের, Socialism বা সমাজবাদের সঙ্গে Eugenics বা বংশোৎকর্ষ-বিজ্ঞানের এবং এক Religion বা ধর্ম্মমতের সঙ্গে অন্য Religion বা ধর্ম্মমতের যে সমস্ত বিরোধ দেখিতে পাই, অধিকারী-ভেদ মানিলে সে সমস্ত বিরোধের অবসান হইয়া যায়।

এই অধিকারী-ভেদ মানার জন্য হিন্দুধর্ম্মে আর একটা গুণের আবির্ভাব হইয়াছে—যথা, পরধর্ম্মবিদ্বেষের অভাব (toleration)। হিন্দু মানেন যে, নানা দেশে ও নানা জাতির মধ্যে ধর্ম্ম নানা আকারে মূর্ত্তিমান হইয়াছে (৭) এবং দেশ কাল ও পাত্রের ভেদ থাকায় সেই সমুদায় ধর্ম্মই তত্তৎদেশের ও জাতির পক্ষে উপযোগী;—হঠাৎ একটা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া তার যায়গায় আর একটা ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিমানের লক্ষণ নয়। এই জন্য হিন্দু অন্য ধর্ম্মের লোককে নিজের ধর্ম্মে আনিবার জন্য ব্যস্ত নন। তাহা বলিয়া, হিন্দু যে ধর্ম্মপ্রচার করেন না তাহা নয়; কথকতা, কীর্ত্তন, যাত্রা প্রভৃতির সাহায্যে হিন্দুধর্ম্মের সারসত্যগুলি সাধারণের বোধগম্য ভাবে প্রচার করা হয়।

---

(৫) ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গীনাম্
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্।
(গীতা, ৩য় অধ্যায়)

(৬) এগুলি আবার ধর্ম্মসূত্র নামক প্রাচীনতর ধর্ম্মশাস্ত্রের পরবর্ত্তী সংস্করণ মাত্র। ধর্ম্মসূত্রগুলি বেদের অঙ্গ বা বেদাঙ্গ নামে অভিহিত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে ইহাদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতাব্দী।

(৭) মনু ভিন্ন ভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ধর্ম্ম, বংশপরম্পরাগত কুলধর্ম্ম ও যে সকল লোক বেদ মানে না তাহাদেরও ধর্ম্ম এই শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়াছেন (মনু, ১।১১৮)।

কিন্তু অন্য ধর্ম্মের নিন্দা করা হয় না। এবং তাহার ফলে যদি কোনও ব্যক্তি বা জাতি হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে চায়, তাহাকে গ্রহণ করা হয়। ইতিহাস পড়িলে জানা যায়, প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অনেক ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেকলের শক, হুন হইতে আরম্ভ করিয়া একালের ডোম, বাউরী, আহম পর্য্যন্ত হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

ইহা ছাড়া, যাঁহারা বেদ মানেন না, হিন্দু তাঁহাদিগের প্রতিও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বুদ্ধপন্থী, জৈনপন্থী, জরথুষ্ট্রাপন্থী, মুসাপন্থী, মহম্মদপন্থী, খৃষ্টপন্থী জনগণের সহিত সন্ধি ও সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া বেদপন্থাগণ বরাবরই অপর ধর্ম্মাবলম্বীগণের সহিত ভাগে ভারতবর্ষের সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয় যে, কোনও কালে ভারতবর্ষে ধর্ম্মের জন্য বিবাদ বিসম্বাদ হয় নাই।—আমি বলিতে চাই এই যে, অন্যান্য দেশের ইতিহাস পড়িলে যেমন দেখা যায়, ধর্ম্মবিবাদের জন্য কিরূপ নররক্তের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, ভারতবর্ষে তেমন কিছুই হয় নাই।

যাহা হউক, ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, বৌদ্ধশাস্ত্র, বাইবেল, ও কোরাণেও পরধর্ম্মদ্বেষের বিরুদ্ধে লেখা আছে।

জন্মান্তরবাদ

স্পেন্সার তাঁহার 'Ethics'এ hygiene প্রভৃতি বিজ্ঞানকে স্থান দিয়াছেন; সুতরাং সেটা অনেকটা ব্যাপক হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার Ethics হইতেও ধর্ম্মের জয় সব সময় প্রমাণিত হয় না। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্তরবাদের কথা বিবেচনা করেন নাই। এই জন্মান্তরবাদটা যে ভাবে ধর্ম্মসমূহে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সে ভাবে অজ্ঞেয়বাদীরা মানিবেন না।—কিন্তু এটাকে যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে সেটা স্বীকার করিতে তাঁহাদিগের আপত্তি হইবে না। একজনের পিতার ও মাতার জীবন, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ ও মাতামহীর জীবন, প্রপিতামহ, প্রপিতামহী ইত্যাদির জীবন প্রভৃতিকে তাহার পূর্ব্বজন্ম বলা যাইতে পারে; এবং তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র প্রভৃতির জীবনকে তাহার পরজন্ম বলা যাইতে পারে। (৮) এবং তাহা যদি হয়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে, পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য ও পাপের ফল ইহজন্মে ভোগ করিতে হয়; এবং ইহজন্মকৃত পাপপুণ্যের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে হইবে। যদি দেখি, পিতামাতার দোষে সন্তান বিকলাঙ্গ হইয়া জন্মিল, তাহা হইলে বলিব, পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল সে ভোগ করিতেছে; এবং ইহজন্মে অধর্ম্ম করিয়াও যদি কেহ শাস্তি না পায়, তাহা হইলে তাহার সন্তানগণ তার শাস্তি ভোগ করিবে—অর্থাৎ পরজন্মে সে কর্ম্মফল ভোগ করিবে। দেখা যায়, কেহ কেহ অধর্ম্ম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিল; এবং পরে বিলাসী হইয়া রোগাক্রান্ত হইল; এবং তাহার ফলে হয় নিঃসন্তান হইল, নয় রুগ্ন সন্তানের জনক হইল—অর্থাৎ পরজন্মে সে স্বকৃত পাপের ফল পাইল। (৯)

(৮) হিন্দুশাস্ত্রেও আছে—"আত্মৈব জায়তে পুত্রঃ।"

ইহার সহিত জন্মান্তরবাদের আর একটা অর্থ যোগ করিতে হইবে। একজন যে কর্ম্ম করে, তাহার মৃত্যুর পরে তাহার সেই কর্ম্মের স্মৃতি থাকে—যাহাকে লোকে যশ বা অপযশ বলে। শঙ্কর ও চৈতন্য নিঃসন্তান অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগের যশে আজও জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। যদি কেহ একটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা বা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, ত, তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখে। এই যশ ও কীর্ত্তিকেও পুনর্জন্ম বা বর্ত্তমান জীবনের অংশ (continuation) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। (১০) জন্মান্তরবাদের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অজ্ঞেয়বাদীর গ্রহণের জন্য করা গেল।

একটা অনুসন্ধানের বিষয়

এই সম্পর্কে আর একটা কথা অত্যন্ত সংকোচের সহিত তুলিতে চাই। আসুন—আমরা সকলে যে যার নিজের জীবন-কাহিনী পর্য্যালোচনা করি, এবং দেখি, তাহা দ্বারা ধর্ম্মের জয় কথাটা প্রতিপন্ন হয় কি না। অপরের জীবন-

(৯) মানবজীবনের উপর বংশানুক্রমের প্রভাব যে কত অধিক, তাহা জানিবার জন্য প্রবন্ধলেখকের বংশোৎকর্ষ-বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(১০) একটা প্রচলিত কথা আছে, পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যং লক্ষণম্—অর্থাৎ একজনের পুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার কিরূপ পুত্র হইয়াছে অথবা তাহার যশ কিরূপ অথবা তিনি পুষ্করিণী আদি কোনও কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন কি না তাহা বিচার করিলে। আমি এই কথাটিকেই পরজন্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি। আর একটা প্রচলিত শ্লোক আছে—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

কাহিনী পড়িয়া বা শুনিয়া বিশেষ লাভ নাই; কেন না সমুদায় সত্য ঘটনা জানিবার উপায় নাই। (১১) পিতা ভ্রাতা সন্তান প্রভৃতি নিকট আত্মীয়ের জীবনের বার আনা ভাগ জানিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাদের মনের পাপ ত জানা যায় না। (১২) নিজের জীবনের বোধ হয় পনের আনা ভাগ জানা যায়, তবু এক আনা বাকি থাকে—সেটা মনের subconscious part। যাহা হউক, আমরা যদি নিজের জীবনের এই পনের আনা ভাগ পরীক্ষা করিয়া দেখি; তাহা হইলে কি সত্য-নির্ণয়ের একটা উপায় হইবে না? একজন দুজন নয়, অনেকের জীবন আলোচনার ফল সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশ্য কাহাকেও তাঁহার জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিতে বলা হইবে না; কেবল তাঁহাদিগের বিবেচনায়, তাঁহাদিগের নিজ নিজ জীবনে এই কথাটী সত্য অথবা মিথ্যা বলিয়া মনে হইয়াছে—কেবলমাত্র সেইটী তাঁহারা একটী অনুসন্ধান-সমিতিকে জানাইবেন। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গেলে একটা ভুল এই হইবে যে, যিনি নিজ জীবন আলোচনা করিবেন, তাঁহার বিবেচনা-শক্তির দোষ থাকিতে পারে—তাঁহার মনে হয় ত আগে হইতে একটা সংস্কার থাকিতে পারে যে, ধর্ম্মের জয় হয়েই থাকে, বা ধর্ম্মের জয় হয়ই না। কিন্তু এরূপ অনুসন্ধানে সেরূপ ভুলের আশঙ্কা (Subjective bias) সর্ব্বদাই আছে ধরিয়া লইয়াই কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। এই মনে করুন, একটা সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে যে, অন্যায় করিয়া কাহারও মনে কষ্ট দিলে নিজেকে কষ্ট পাইতে হয়—ঋষির শাপ ও কাহারও মনস্তাপ উভয়কেই ভয় করিয়া চলিবে। এ কথাটার কোনও প্রমাণ কেহ নিজ জীবনে পাইয়াছেন কি না? অর্থাৎ আমি বলিতেছি, বিজ্ঞান দ্বারা যাহার অর্থ নির্ণয় হয় না এমন সব ব্যাপার, ঘটে কি না? মনে করুন, আপনি কোনও অন্যায় কাজ করিয়া একজনের মনস্তাপের কারণ হইলেন; এবং কিছুকাল পরে অন্য এক উপায়ে আপনিও মনস্তাপ পাইলেন;—সাধারণ দৃষ্টিতে এই দুইটী মনস্তাপের মধ্যে কোনও কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নাই—কিন্তু আপনার মনে হইল, ঠিক যেন আপনি আপনার দুষ্কর্ম্মের ফল পাইলেন। এরূপ ঘটনা কত জনের জীবনে ঘটিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিলে (অবশ্য ঘটনাগুলির বিবরণ না দিলেও চলিতে পারে,—যদিও নাম-ধামাদি গোপন করিয়া ঘটনাগুলির স্থূল বিবরণ দিতে পারিলে খুব ভাল হয়) এ বিষয়ে একটা আবশ্যক সত্য-নির্ণয়ের সুবিধা হয়। এই স্থলে আমি বলিতে চাই—আমার জীবনে এইরূপ ঘটনা দুই তিন বার ঘটিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

মোক্ষ

এইবার আর একটি বিষয়ের আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব। পৃথিবীর প্রায় সমুদায় ধর্ম্মশাস্ত্রই বলে—ধর্ম্মের প্রধান ফল কোনও প্রকারের মোক্ষ। এই মোক্ষের অর্থ কোনও ধর্ম্মমতে প্রকৃতি হইতে আত্মার মুক্তি, কোনও ধর্ম্মমতে নির্ব্বাণ, কোনও ধর্ম্মমতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি, কোনও ধর্ম্ম-মতে ঈশ্বরের সামীপ্য, কোনও ধর্ম্মমতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ইত্যাদি। প্রায় সকল ধর্ম্মই বলে—এই মোক্ষের অবস্থায় সকল দুঃখ নিবৃত্ত হয় এবং একপ্রকার অনির্ব্বচনীয়, অনন্ত পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই মোক্ষ কিরূপ জিনিস, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অতীত—তর্কের দ্বারা ইহার স্বরূপ নির্ণয় হয় না। যাঁহারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল ইহাকে জানেন—সাধারণ লোকের উচিত তাঁহাদিগের নিকট হইতে মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় জানিয়া লওয়া। বহু সাধনার পর তবে মোক্ষ পাওয়া যায়। (১৩)

(১১) Bernard Shaw said "When you read a biography, remember that the truth is never fit for publication."

একজন লোক নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার আত্মজীবনী লিখিতে বলেন। তাহাতে গিরিশবাবু উত্তর দেন—"যখন বেদব্যাসের মত সত্যবাদী হবার সাহস হবে তখন আত্মজীবনী লিখ্‌ব।" বেদব্যাস মহাভারতে নিজের জননীর কলঙ্ক পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।"

(১২) কথায় বলে—মনের অগোচর পাপ নাই, মায়ের অগোচর বাপ নাই।

(১৩) নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
(কঠোপনিষৎ)

তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রহ্মসূত্র)

ওঁ বাদো নাবলম্ব্যঃ (নারদের ভক্তিসূত্র)

অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্‌ং, মূকাস্বাদনবৎ (ঐ)।

অনেক বিখ্যাত পাশ্চাত্য দার্শনিকও কোনও না কোনও প্রকারে উপরিউক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। (Cf. Kant, James, Bergson, Eucken etc.)

এখন একজন অজ্ঞেয়বাদী মোক্ষকে কিরূপে বুঝিতে পারিবেন? তিনি নিজে মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য মুক্ত পুরুষের উপদেশমত বহুকাল সাধনা করিতে সম্মত হইবেন না—কেন না, তাঁহার মতে উহা বহুমূল্য সময়ের অপব্যবহার মাত্র। কাজেই সমস্যা বড় কঠিন। তবে অজ্ঞেয়বাদী মোক্ষের প্রকৃতি সম্বন্ধে কি রকম একটা আন্দাজ করিতে পারেন তাহা দেখা যাক—যদিও এ আন্দাজের মূল্য কতটুকু তাহা বলিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদীর অভিধানে আত্মার অর্থ consciousness বা অহংজ্ঞান, ব্রহ্মের অর্থ mystery of the world বা জগৎ-রহস্য, ঈশ্বরের অর্থ একজন অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন কাল্পনিক পুরুষ বা নারী। একজন যদি নিজের মনকে নিজের সুখদুঃখজনক বিষয় সকল হইতে ফিরাইয়া আনিয়া জগতের রহস্য ধ্যানে (contemplation) নিযুক্ত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার একরূপ মানসিক সুখের (intellectual pleasure) সম্ভোগ হইবে—ইহাই হইল জ্ঞানীর মোক্ষ। (১৪) কিম্বা যদি একজন নিজের সমুদায় ভালবাসা একজন কাল্পনিক প্রিয় ব্যক্তির প্রতি অর্পণ করে, তাহা হইলেও তাহার একরূপ ভাবপ্রধান সুখের (emotional pleasure) আস্বাদন হইবে—ইহাই হইল ভক্তের মোক্ষ। এই মোক্ষজনিত সুখের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা একজনের সাংসারিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না—কেন না, এটা কেবল নিজের মনের উপর নির্ভর করে। এবং পার্থিব ভালবাসায় যে সকল কণ্টক আছে, যেমন প্রেমাস্পদ হয়ত দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িল বা মরিয়া গেল,—এই ঐশ্বরিক ভালবাসায় তেমন কোনও কণ্টক নাই।

এখন দেখা যায়, অধিকাংশ লোকই কিছুকাল জাগতিক সুখদুঃখ ভোগের পর ইহাদিগের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। কেন না, পার্থিব সুখমাত্রেই দুঃখের সঙ্গে জড়ান। তখন তিনি ইহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কোনও দুঃখ-সম্পর্কশূন্য সুখের জন্য লালায়িত হন। শাস্ত্রে এরূপ অবস্থার লোককে বলে মুমুক্ষু। (১৫) মুমুক্ষুর জন্যই মোক্ষের ব্যবস্থা—যদি কেহ পার্থিব সুখেই সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তিনি মোক্ষের অধিকারী নহেন। অধার্ম্মিক ব্যক্তিও ইহার অধিকারী নহে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হয়। (১৬) শাস্ত্রের এই কথাটা অজ্ঞেয়বাদীও বুঝিতে পারিবেন। কেন না, যদি কাহারও মনে একটা খট্‌কা থাকে যে, আমি পাপ করিয়াছি বা করিতেছি, তাহা হইলে মোক্ষ যে প্রকৃতির মানসিক সুখ তাহা সে ভোগ করিতে পারিবে না। আর সাংসারিক বিষয়ে বীতরাগ না হইলে মোক্ষের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ জন্মিবার ত কথা নয়।

আবার হিন্দুশাস্ত্র বলেন, কখনও কখনও মোক্ষ হয় ত এক জন্মের ধর্ম্মাচরণে লব্ধ নাও হইতে পারে, কিন্তু কয়েক জন্মের ধর্ম্মাচরণে তবে প্রাপ্তব্য হইতে পারে। অজ্ঞেয়বাদীর ভাষায় বলা যায়, কখনও কখনও একজন আংশিকভাবে ধর্ম্মাচরণ করিয়া মারা যান; কিন্তু তাঁহার সন্তান পিতার

---

(১৪) Bernard Shaw প্রণীত 'Man and Superman' নামক নাটকে এক স্থানে contemplationকেই স্বর্গের তুল্য বলা হইয়াছে।

(১৫) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় জগতের যাহা কিছু প্রার্থনীয় বস্তু—বিদ্যা, ধন, সৎপুত্র, যশ সকলই পাইয়াছেন। ক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি শান্তি পাইয়াছেন কি না, তখন তিনি বলেন শান্তি পান নাই এবং শান্তিলাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। (মনোরমার জীবনচিত্র, ২য় ভাগ।)

(১৬) অধিকারী তু বিধিবদধীত বেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততোঽধিগতাখিল বেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিল কল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা। (বেদান্তসার)

ওঁ ভবতু নিশ্চয় দার্ঢ্যাদূর্দ্ধং শাস্ত্ররক্ষণম্ (নারদ ভক্তিসূত্র)

তপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ। (যোগদর্শন)

কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানান্নহি মোক্ষোঽভিজায়তে।

কিন্তু তাভ্যাং ভবেন্মোক্ষঃ সাধনন্তূভয়ং বিদুঃ॥

(যোগবাশিষ্ঠ, ১ অঃ)

স্বধর্ম্মং প্রতিপশ্যন ন ধর্ম্মং হাতুমর্হসি (ঐ, ৯ম অঃ)

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ (ঈশ উপনিষৎ)

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়ানাঞ্চ সংযমঃ।

অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥ (মনুসংহিতা, ১২ অঃ)

অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েত্তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।

যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

(ভাগবত, ৩স্কন্ধ, ২৯ অঃ)

পরবর্ত্তীকালে শঙ্কর-রামানুজ-চৈতন্যাদি জ্ঞানযোগী অথবা ভক্তি-যোগী সন্ন্যাসীগণও সাধারণ লোকের জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মেরই বিধান দিয়া গিয়াছেন (Vide Farquhar's 'An Outline of the Religious Literature of India.")

গুণের ও স্মৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া পরিপূর্ণভাবে ধর্ম্মাচরণ করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন।

মহাভারত

এইবার পাণ্ডবগণের জীবন আলোচনা করিয়া দেখা যাক। তাঁহারা নিজ জীবনেই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—মানব-জীবনের এই চারিটী প্রার্থনীয় বস্তুই লাভ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের বংশীয় রাজগণ বহুকাল ধরিয়া সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের যশের কাহিনী কত হাজার বছর ধরিয়া জগতে প্রচারিত রহিয়াছে। নিজ জীবনে তাঁহারা দুঃখের অপেক্ষা সুখই অধিক পরিমাণে ভোগ করিয়াছিলেন—কেন না, তাঁহারা যত কাল রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় বনবাস ও কুরুক্ষেত্রের বছরগুলি অতি অল্প কালই বলিতে হইবে। আর বনবাসের কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ-জনিত সুখও পাইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে স্বজনের মৃত্যুজনিত দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধজয়ী বীরের সমরোল্লাস মিশ্রিত ছিল। এমন কি, অভিমন্যুর মৃত্যুতেও অর্জ্জুনকে এই সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছিল যে, এরূপ গৌরবময় মৃত্যু যোদ্ধা-মাত্রেরই আকাঙ্ক্ষণীয়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ও পরে কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে যে মোক্ষশাস্ত্রের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহাদিগের এই যুদ্ধজনিত বিষাদ দূর হইয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহারা অশ্বমেধাদি উৎসবে মন দিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কেবল আঠার দিন মাত্র হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পর পাণ্ডবগণ ছত্রিশবৎসর ধরিয়া সাম্রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের তুলনায় দুর্য্যোধনের জীবন কিরূপ দুঃখময়! বেচারী ত চিরটা কাল পাণ্ডবদের হিংসায় জ্বলিয়া মরিল। আর তাঁহার জীবনের শেষ অংশটা কি ভয়ানক কষ্টকর। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অভিমানী রাজা দুর্য্যোধন যখন পাণ্ডবের জয়ের কথা ভাবিতেছিলেন, তখন যে তাঁহার কিরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত। ইহার পরও কি বলিতে হইবে, মহাভারতে ধর্ম্মের জয় প্রদর্শিত হয় নাই? (১৭)

তেমনই বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁহার একটী প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, রাম ও সীতা তাঁহাদিগের জীবনে দুঃখ অপেক্ষা অনেক অধিক সুখই ভোগ করিয়াছিলেন।

উপসংহার

এই দীর্ঘ প্রবন্ধে নানা কথার অবতারণা করা হইয়াছে। পাঠকের বুঝিবার সুবিধা হইবে বলিয়া নিম্নে প্রবন্ধের সারমর্ম্ম দেওয়া গেল।

১। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, যে কর্ম্ম বা আচার দ্বারা নিজেরা ও সমাজের উভয়েরই কল্যাণ হয় তাহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেইজন্য ইহা যুক্তি-সম্মত ও পরিবর্ত্তনশীল এবং ইহাতে অধিকারী-ভেদ মানা হয় ও পরধর্ম্মে বিদ্বেষ দেখান হয় না। কাজেই ধর্ম্মের জয় মানে বিজ্ঞানের জয়; এবং অজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের জয়ের সম্ভাবনা অনেক বেশি। তাই, ধর্ম্ম হইতে অর্থ লাভ হয় এবং অর্থ হইতে কাম লাভ হয়।

২। অজ্ঞেয়বাদীর নিকট একজনের পরজন্মের অর্থ হইবে—(১) একজনের বংশধরগণের জীবন এবং (২) তাহার স্মৃতি বা যশ। এখন, ধর্ম্মের জয় অনেক স্থলে ইহজন্মে দেখা যায়, অনেক স্থলে পরজন্মে দেখা যায়। আবার অনেক স্থলে ইহজন্ম ও পরজন্ম উভয়ত্রই দেখা যায়। একজনের ইহজন্ম ও পরজন্ম কোথাওই ধর্ম্মের জয় হইল না, এমন দেখা যায় না।

৩। অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও মনে কষ্ট দিলে নিজে কষ্ট পাইতে হয়—এই যে একটী সাধারণ বিশ্বাস আছে, ইহার মূলে কতটা সত্য আছে তাহার অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

৪। ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফল মোক্ষ। এই মোক্ষলাভ দ্বারাই ধর্ম্মের জয় সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হয়।

---

(১৭) এই সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, খুব ধার্ম্মিক মানুষও দুই এক সময় ঘটনাচক্রে পড়িয়া পাপকার্য্য করিয়া ফেলে এবং তাহার শাস্তিও ভোগ করেন। পাণ্ডবগণও, হয় ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কখন কখন অধর্ম্মজনক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান কথা হইতেছে এই যে, মোটের উপর পাণ্ডবগণ ধার্ম্মিক ও কৌরবগণ অধার্ম্মিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মূল মহাভারতে পাণ্ডবগণের দ্বারা কোনও অধর্ম্ম যুদ্ধের কথা ছিল না। বলা বাহুল্য, সকল পণ্ডিত বঙ্কিমচন্দ্রের মত গ্রহণ করিবেন এরূপ আশা করা যায় না এবং সেইজন্য বর্ত্তমান তর্কে আমিও সে মতের সাহায্য লই নাই।

৫। মহাভারতে ও রামায়ণে ধর্ম্মের জয়ই প্রদর্শিত হইয়াছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, উপরিলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, একজন অজ্ঞেয়বাদীকেও মানিয়া লইতে হইবে যে ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী; এবং যদি মানবজীবনকে একটী বৃক্ষরূপে কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ধর্ম্ম (অর্থাৎ কর্ত্তব্য কর্ম্ম) সেই বৃক্ষের মূল, কাণ্ড ও শাখা,—কেন না ধর্ম্মের দ্বারাই মানব-জীবন ধৃত অর্থাৎ রক্ষিত হয়; অর্থ তাহার পত্র—কেন না ধনৈশ্বর্য্যই জীবনকে সৌষ্ঠবসম্পন্ন করে এবং এই পত্রসমূহ যে ছায়ার সৃষ্টি করে তাহার তলায় অনেক দুঃস্থ প্রাণী দারিদ্র্য-রূপ আতপ হইতে আশ্রয়লাভ করে; কাম তাহার পুষ্প—যেহেতু পুষ্প যেমন বৃক্ষকে সৌন্দর্য্য দান করে, সেইরূপ কলাবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা জীবন আনন্দপূর্ণ হয়; এবং মোক্ষ তাহার ফল—অর্থাৎ যেমন সুমধুর ফলই বৃক্ষের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপভোগ্য বস্তু, তেমনই মোক্ষ বা সকল দুঃখের নিবৃত্তি ও অপূর্ব্ব সুখের আস্বাদই মানব-জীবনের সর্ব্বপ্রধান উপভোগ্য বস্তু।

অজয়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

১

গঙ্গা আমার পূজ্যতমা সরিৎরূপা দেবী,
মৃত্তিকাতে অমৃত তাঁর, পুণ্য সলিল সেবি!
স্তোত্র তাঁহার গাইতে আমার কুলায় না ক ভাষা,
ধন্যা হরি-পাদোদ্ভবা, অন্তিমেরি আশা!
তিনি গীতা গায়ত্রী মোর, আরাধনার ধন,
সাত পুরুষের স্বর্গ আমার, নিতান্ত আপন।
কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি?
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

২

যমুনা নাম করতে আমার শিউরে উঠে গা;
নামে আনে বৃন্দাবনের পরাগ বহিয়া।
আরাধ্যেরি আরাধ্য মোর, প্রাণের আমার প্রাণ
তরঙ্গিত বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের গান।
আমার শ্যামের বংশী-ধ্বনি, গোরার আঁখিজল
স্বপ্নে আমার কর্ণে পশে মধুর কলকল।
কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি?
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৩

সরযূ যে আমার গোটা তরল রামায়ণ!
ব্রহ্মা না হ'ক বাল্মীকিরি কমণ্ডলুর ধন।
সীতারামের 'গাহন-পূত, অপার্থিব নীর
নামেতে হয় পুণ্য দেহ, ধুলায় লোটে শির।
ত্রেতার স্মৃতি জেতার স্মৃতি ত্রাতার স্মৃতি সে
বুকের মাঝে যপ করি পাই শক্তি নিমেষে।
কিন্তু মায়ার কীট যে আমি বলতে পারি কি?
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৪

বিশ্বপ্রেমিক নই ক আমি শক্তি নাহি হবার
দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা মাগি সবার।
ক্ষুদ্র আমি বিরাটকে তাই ক্ষুদ্র ছবি করি
আরাধনার বুকের মাঝে নিত্য রাখি ধরি।
ক্রুদ্ধ কেহ হবেন না ক ক্ষম্য অভাজন—
ক্ষুদ্র গ্রামের চৌসীমানায় রুদ্ধ তাহার মন।
অভয় মাগি, মনের কথা বলতে পারি কি?
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

৫

অজয় আমার ভাঙবে গৃহ হয় ত দু'দিন বই—
তবু তাহার প্রীতির বাঁধন টুট্‌তে পারি কই।
সে ত কেবল নদ নহে ক, নয় ক শুধু জল,
সে যে তরল 'গীত-গোবিন্দ' 'চৈতন্য-মঙ্গল'।
সে যে আমার চণ্ডী দেবীর চরণ-অমৃত,
বন কে করে শ্যামল, এবং মনকে সমৃদ্ধ।
দুঃখ এবং দৈন্য মাঝে বলতে পারি কি?
উজানি আর অজয় আমার প্রাণের সামগ্রী।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৪

পূজা আসিয়াছে। প্রবাসী বাঙ্গালী বৎসরান্তে প্রিয়জন-দর্শনাকাঙ্ক্ষায় স্বদেশে ফিরিতেছে—কত আনন্দ উৎসাহ বুকে লইয়া। কয়লা-খাদের আর আর বাবুরাও যে যার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, কেবল যায় নাই ধীরু। তাহার প্রাণটা কাঁদিয়া কাতর হইল সেই আবাল্যের সুখ-স্মৃতি-ঘেরা গ্রামখানির কোলে ফিরিয়া যাইতে,—এক দিন যে স্থান সে দারুণ অভিমানে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। এক দিন যাহার মমতা তার এই খামখেয়ালী জীবনের ধারায় ছিন্ন হইয়াছিল, আজ আবার সেই চিরপুরাতনের মাঝে নূতন আনন্দ নূতন দুঃখ লইয়া তাহার প্রাণ চাহিতেছে ফিরিয়া যাইতে। হায়, জন্মভূমির আকর্ষণ মানুষকে এমনি করিয়াই তাহার কাছে টানে। কিন্তু না…সেখানে আর কার কাছে যাইবে? সে পিসীমা নাই, কল্যাণীও দূরে। ধীরুর প্রাণ দুঃখে ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, গত বৎসর বিজয়ার দিন প্রথমেই সে কল্যাণীদের বাড়ী গিয়াছিল, এবং দিগম্বরী ঠাকুরাণীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও কল্যাণীর প্রণাম গ্রহণ করিয়াছিল। সেই কল্যাণীর হাসিভরা মুখখানি, আশীর্ব্বাদ লওয়ার নীরব প্রার্থনা…আরও কত কি! ধীরু হঠাৎ ঘরের ভিতর আসিয়া ট্রাঙ্কটা তক্তাপোসের নীচে হইতে টানিয়া বাহির করিল এবং তাহা গুছাইতে বসিয়া গেল।

রাধি এতক্ষণ কবাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া ছিল,—হঠাৎ ধীরুকে ট্রাঙ্ক গোছাইতে দেখিয়া ধীরে ধীরে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। ধীরু একবার রাধির দিকে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনরায় আপন মনে কাপড় জামা বাহির করিতে লাগিল।

তাহার ট্রাঙ্কের মধ্যে জিনিসগুলি নিতান্তই এলোমেলো, অবস্থবিস্তম্ভ দেখিয়া রাধি মৃদু কণ্ঠে কহিল, "সর, আমি গুছিয়ে দিচ্ছি, এ সব বেটাছেলের কাজ নয়।"

ধীরু কোন জবাব দিল না।

"সর, আমি গুছিয়ে দিই…!"

ধীরু গম্ভীর ভাবে বলিল "না"—

কি একটা কঠিন কথা রাধির মুখে আসিয়া বাধিয়া গেল। রাধি নিজেকে সংযত করিল। তাহার জীবনে এ জিনিসটা সম্পূর্ণ নূতন। সে নিজেও ভারী আশ্চর্য্য হইল। তাহার এ কি পরিবর্ত্তন! যে দুর্জ্জয় অহঙ্কার অভিমানের স্তূপের উপর সে বসিয়া ছিল, তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল? সে কণ্ঠে মিনতি ভরিয়া কহিল…"দিই না—এতে কিছু দোষ হবে না। পরশু চলে যাচ্ছি, হয় ত

তোমার সঙ্গে আর জীবনেও দেখা হবে না। যাবার সময় আর আমার সঙ্গে ঝগড়া নাই বা রাখলে।"

ধীরু উঠিয়া দাঁড়াইলে, রাধি তাহার ট্রাঙ্কের সামনে বসিয়া জামা কাপড় পরিপাটি রূপে সাজাইতে লাগিল। ধীরু বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া পায়চারী করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে রাধি কহিল, "তোমার জর্দ্দার কৌটোটা আমার কাছে ছিল, এই বাক্সয় রেখে দিচ্ছি!"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, "ও আর ফিরিয়ে দিতে হবে না, ওটা তোমায় আমি দিয়েছি।"

রাধি রুক্ষ কণ্ঠে কহিল, "না—তোমার তাচ্ছিল্যের দান হাসি-মুখে নেবার মতন দৈন্য আমার আসে নি।"

ধীরু মুখ তুলিয়া রাধির দিকে চাহিল। রাধি কহিল "ভারী আশ্চর্য্য হচ্ছ—না? ভাবছ—যে জিনিসটাকে এক দিন সাগ্রহে তুলে নিয়েছিলুম, সেইটাকেই আবার এমন অবহেলায় ফেলে দিচ্ছি! হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবার কথা বটে! কিন্তু সংসারে এমন অনেক ঘটনাই ঘটে, যা প্রথমে আশ্চর্য্য বলে মনে হয়—কিন্তু দুদিন গেলে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, অত্যন্ত পুরাতন। তা দেখে অবাক হবার কিছুই নেই।"

ধীরু গম্ভীর ভাবে কহিল…"হতে পারে, হয় ত এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই—এই যে রুক্ষ ব্যবহার—এটাও—"

রাধি বাধা দিয়া কহিল, "হ্যাঁ, এই রুক্ষ ব্যবহার যে করে, সেটা তার নজরে খারাপ ঠেকে না বলেই সে করতে পারে। সে যদি ভাবতে পারত এতে কারুর প্রাণে আঘাত লাগে, তাহলে হয় ত সে পারত না,—তুমিও পারতে না, আমিও না।"

ধীরু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল…"কিন্তু এই ব্যবহারের রুক্ষতা ও কোমলতা তার কারণের ওপর নির্ভর করে না কি?"

"নিশ্চয়! কিন্তু এই কারণটা তোমার দিক থেকে দেখে বিচার করেছ, কিন্তু এর যে আরও একটা দিক আছে, যা তুমি দেখ নি, ভাবতে পার না, জান না।"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল, "যেটা আমার ভাবনার বাইরে, তা ভাববার দরকার নেই।"

রাধি রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "তোমার দরকার না থাকতে পারে; কিন্তু তাই বলে কিসের জোরে তুমি একজনের মাথায় মেয়েমানুষের সব চেয়ে বড় অপরাধের বোঝা চাপিয়ে দেবে? তুমি ঘৃণা করতে পার, আমার সঙ্গে কথা না কইতে পার,—সে হচ্ছে তোমার নিজের মনের পরিচয়। আমি শুধু বলতে চাই, যে, যা ভেবেছ তা নয়!"

ধীরু অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "হতে পারে!"

"তবু আমার কথা সত্য বলে মেনে নেবে না? এমনি সংকীর্ণ মন তোমার? অবাধে আমার মাথায় এত বড় সর্ব্বনাশের বোঝা চাপিয়ে দেবে? বেশ—তাই দাও। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখো,—সমুদ্র-তরঙ্গের তীরে আছড়ে পড়া স্বভাব হলেও, সেটা তার সার্থকতা নয়; আর তীরের বাধাদানের ক্ষমতা মোটেই নেই! সমুদ্র যে উন্মত্তবেগে সমস্ত ভাসিয়ে নিয়ে যায় নি এটা তার অনুগ্রহ!" রাধি বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ধীরু ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘণ্টা দুই পরে দুইটা কুলীর মাথায় ট্রাঙ্ক ও বিছানা চাপাইয়া ধীরু ষ্টেসনের দিকে রওনা হইল। খানিকটা পথ সে যখন আসিয়াছে, পশ্চাতে পাঁড়ে বামুন ছুটিয়া আসিতেছিল। সে দাঁড়াইল। "কি রে?"

পাঁড়ে ঠাকুর একটা ফরসা নেকড়ায় বাঁধা ছোট একটা পুঁটলী দিয়া কহিল "খাবার আছে, দিদিমণি ভেজলে!"

ধীরু চাহিয়া দেখিল—অদূরে জানালার কাছে রাধি দাঁড়াইয়া আছে। ধীরু মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। রাধি তখনও জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধীরু যখন মাঠ পার হইয়া একেবারে দৃষ্টি-পথের বাহির হইয়া গেল, রাধি আঁচলে চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল।

১৫

একখানা এক্কা আসিয়া পরদিন সকালে যখন সোনার-পুর মহল্লায় ২৪নং বাড়ীখানার দরজায় দাঁড়াইল, নারাণী কৌতূহল বশতঃ জানালা খুলিয়া দেখিতেই, ধীরু জিজ্ঞাসা করিল "এইটে কি যদুবাবুর বাড়ী?" নারাণী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল। তার পর ছুটিয়া গিয়া যদুবাবুকে কহিল, "কে যেন আমাদের বাড়ী এসেছেন—দেখগে!"

ধীরু গাড়ী-ভাড়া চুকাইয়া দিয়া বাক্স বিছানা রোয়াকে রাখিতেই যদুবাবু আসিয়া বিস্মিত ভাবে কহিলেন, "আপনি কোত্থেকে আসছেন? মশায়কে চিনতে পারছি না ত?"

ধীরু হাসিয়া কহিল, "আপনারই নাম কি যদুবাবু?"

"হ্যাঁ—"

"আমি কলিয়ারী থেকে আসছি—আমার নাম ধীরেন।"

"ও, ধীরেন?...এস...এস...নারাণী তোর পিসীকে গিয়ে বল্—ধীরু এসেছে।"

ইতিমধ্যে ধীরু তাহার ট্রাঙ্ক ও বিছানা ঘরের এক পাশে রাখিয়া দিয়া যদুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা ভাল আছেন?"

"—হ্যাঁ—না—তা এস ভেতরে—সব বলছি" যদুবাবু বাড়ীর ভিতর আসিয়া কহিলেন, "দিদির বড় অসুখ...তা তুমি এসেছ, ভালই হয়েছে, নইলে হয় ত আমায় তোমাকে টেলিগ্রাম করতে হত।"

ব্যস্ততা সহকারে ধীরু কহিল, "কোথায় তিনি? কি অসুখ?"

"ওই ঘরে আছেন। কাল সমস্ত রাত জ্বরের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে এই সকাল বেলায় একটু চোখের পাতা বুজেছেন! নারাণী, ধীরুকে দিদির কাছে নিয়ে যাও মা!"

নারাণীর পশ্চাতে ধীরু ঘরের ভিতর যাইয়া দেখিল, একটা অর্দ্ধমলিন বিছানায় দয়াদেবী শুইয়া আছেন। পাণ্ডুর বর্ণ মুখখানির উপর সমস্ত রাত্রিব্যাপী যাতনার কালিমা-চিহ্ন তখনও রহিয়াছে। শীর্ণ বাহু-যুগল বক্ষের উপর স্থাপিত। অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষের কোণে তখনও অশ্রুর ধারা শুকাইয়া যায় নাই। ধীরু স্থির করুণ নেত্রে কিছুক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া ডাকিল "পিসী, পিসী!"

দয়াদেবী একবার চক্ষু মেলিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিলেন। তার পর উভয় হস্তে চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া কিছুক্ষণ ধীরুর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন—"ধীরু, কখন এলি?"

"...এই আসছি! থাক্—থাক্, তোমার এখন উঠে কাজ নাই।" বলিয়া ধীরু দয়াদেবীর কাছে বসিয়া তাঁহার মাথায় কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দয়াদেবী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "এখন বেশ ভাল আছি...আমায় একটু তুলে বসিয়ে দে ত নারাণী!" নারাণী ধীরে ধীরে দয়াদেবীকে উঠাইয়া বসাইল। দয়াদেবী পিঠে বালিশ দিয়া বসিলেন। ধীরু তাঁহার কাছে সরিয়া বসিতেই, দয়াদেবী ধীরুর মাথার উপর কম্পিত হাতখানা রাখিয়া কহিলেন, "আজ ক'দিন ধরে একটু অসুখ করেছে। তা তুই যে হঠাৎ চলে এলি? লিখেছিলি—বড় কাজের ভীড়—আসতে পারবি নি?"

"ভারী মন কেমন করতে লাগল পিসী! কত দিন তোমায় দেখি নি কি না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া দয়াদেবী তাঁহার কম্পিত হাতখানা ধীরুর মাথায় গায়ে বুলাইয়া কহিলেন, "তোর এ কি চেহারা হয়েছে রে? রোগা হয়ে গেছিস; তেমন সোণার মত রং নেই, মুখে কে যেন কালী মেড়ে দিয়েছে—"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "যে রোদ সে দেশে—থাক্, তোমার এমনধারা অসুখ—তা আমায় একবার খবর দাও নি? যদি—".

এমন সময় যদুবাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আমিও সে কথা কতবার বলেছি দিদিকে। তা দিদি বলেন, সে বিদেশে কাজকর্ম্ম করে—এখন দুপয়সা রোজগার করছে,—দরকার কি তাকে মিছিমিছি ব্যস্ত করবার! কি বলব বল?"

"আর এখানে যদি এমনি ভাবে মরে যেতে—তাহলে!"

"এমন কপাল কি করেছি বাবা, যে, বিশ্বনাথ চরণে স্থান দেবেন! দাদা গেল,—তোর মা পুণ্যিবাণী চলে গেল'। আমি যে কত পাপই করেছিলুম, তাই আজও—" দয়াদেবী তাঁহার চক্ষু মুছিয়া পুনরায় কহিলেন, "ধীরু এসেছে দাদা...বাজারটা একটু..."

"হ্যাঁ, যাচ্ছি,—বাবাজীর কি চা খাওয়া অভ্যেস আছে না কি?"

বাধা দিয়া ধীরু কহিল, "থাক্—থাক্...আর সে সব হাঙ্গামায় কাজ নাই।"

নারাণী যদুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল "উনুনে জল বসানো আছে—"

"তাহলে ধীরুকে একটু চা করে দে,—সারারাত জেগে গাড়ীতে এসেছে,—আজকাল আবার যাত্রীর যা ভীড়...বড্ড কষ্ট হয়েছিল বোধ হয় গাড়ীতে? সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে একটু বিশ্রাম কর বাবাজী!"

ধীরু সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিল "কে দেখছে পিসীকে?"

"রমানাথ কবিরাজ, এখানকার একজন নামজাদা বদ্যি

…বেশ হাতযশ তার—আর চিকিৎসাও ভাল করে! কিন্তু হলে হবে কি…দিদি কি আর ওষুধ খান ?"

দয়াদেবী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "হ্যাঁ, মরতে এসে আবার ওষুধ খেয়ে বাঁচতে হবে ? বাবা বিশ্বনাথ এখন যদি টানেন তাহলে যে মরে বাঁচি বাবা !"

"শুনলে ত! দিদি ওই এক কথা ধরে বসে আছেন! কবিরাজ আসে যার এই পর্য্যন্ত…আরে ওষুধ না খেলে কি কখনও রোগ সারে? না মরব বল্লেই মরা যায়? যাক্ তুমি এসেছ বাপু, ভালই হয়েছে—এইবার দেখে শুনে যা হয়—"

দয়াদেবী বাধা দিয়া কহিলেন "সে পরের কথা পরে হবে…এখন তুমি বাজারে যাও…দে ত মা নারাণী, বাক্স থেকে একটা টাকা বার করে দাদাকে। একটু দেখে শুনে যা হয় এনো !"

"থাক্, আমিই দিচ্ছি…" বলিয়া ধীরু তাহার পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া একখানা দশটাকার নোট যদুবাবুর হাতে দিয়া কহিল "এইটে আপনার কাছে রেখে দিন, যা দরকার হয় এ থেকেই আনবেন !"

নারাণী দয়াদেবীর দিকে চাহিয়া কহিল "কেন, বাবার কাছে ত তোমার সেদিনের ৮৹ আনা পয়সা রয়েছে… তাই দিয়েই ত বাজার হবে'খন…আবার এখন টাকা দেওয়া কেন ?"

যদুবাবু হাসিয়া কহিলেন "কবেকার রে বেটী ?"

"বাঃ গো, পরশুদিনের আগের দিন সন্ধ্যে বেলায় গয়লা এলে তোমায় যে একটা টাকা বার করে দিলুম ·· হ্যাঁ—সে কথা বুঝি আর আমার মনে নাই ?" বলিয়া নারাণী তাহার হাসি মুখখানি ঈষৎ নত করিল।

যদুবাবু একটু অপ্রস্তুত ভাবে হাসিয়া কহিলেন "তাই ত রে বেটী, সে কথা ত আমার মনেই ছিল না একেবারে, ব্যাটা ফিরতি পয়সা দেয় নি। খুব মনে করিয়ে দিয়েছিস, আজ নিতে হবে চেয়ে !"

ধীরু হাসিয়া কহিল "থাক্‌গে, ওটাও আপনার কাছে রেখে দিন…কখন কি দরকার হবে।"

দয়াদেবী কহিলেন "অমনি গয়লাকে বলে যেও—একসের করে দুধ বেশী দিতে—যে কদিন ধীরু থাকে।"

"আচ্ছা" বলিয়া যদুবাবু সেখান হইতে চলিয়া গেলে, দয়াদেবী কহিলেন "ধীরু, এই নারাণী,—এর কথাই তোকে লিখেছিলুম। আহা, ওর যা সেবা-যত্ন তা আর কি বলব বাবা! আপনার পেটের মেয়েও বুঝি এতখানি করে না। বাছার গুণে এখানে আমার কোন কষ্ট নেই। মুখে মায়ের কথাটি নেই,—সমানে রাতদিন আমার সেবা করছে, আর সমস্ত সংসারের কাজ গুছিয়ে তুলছে। এমন কাজের মেয়ে আর দুটি দেখি নি! ওর ঋণ আমি শুধতে পারব না ধীরু… তুই শুধিস।"

ধীরু তাহার আন্তরিক কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে নারাণীর মুখের দিকে চাহিতেই নারাণী চক্ষু নত করিল,—লজ্জায় তাহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল।

দয়াদেবী ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। দেহের দুর্ব্বলতার সঙ্গে মানসিক উত্তেজনা বশতঃ তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নারাণী আর সেখানে অপেক্ষা না করিয়া বাহিরে আসিল! ধীরু দয়াদেবীর মাথায় আস্তে আস্তে বাতাস করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে দয়াদেবী কহিলেন, "থাক্—আর বাতাস করবার দরকার হবে না… তুই জামা কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধো…সকাল সকাল বাড়ীতেই নেয়ে ফেল্…সারারাত জেগে এসেছিস! যা ওঠ,, আর দেরী করিস নি।"

ধীরু তাহার পকেট হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া দয়াদেবীর হাতে দিয়া কহিল "এটা তোমার কাছেই রেখে দাও…আর এই রুমালে বাঁধা খুচরো টাকা পয়সা আছে, যা দরকার হবে খরচ করো। তোমার টাকা আর খরচ করতে হবে না।" দয়াদেবীর ম্লান মুখে হাসির দীপ্তি বিদ্যুতের মতই মুহূর্ত্তে ফুটিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া গেল। চক্ষের কোণ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। দয়াদেবী চক্ষু মুছিয়া কহিলেন "সঙ্গে বিছানা-পত্তর কিছু এনেছিস ?"

"ওহো—ঠিক" বলিয়া ধীরু বাহিরে যাইতেই দেখিল, নারাণী তাহার মুখ-চোখ লাল করিয়া ধীরুর ষ্টীল ট্রাঙ্কটা লইয়া আসিতেছে।

ধীরু লজ্জিত ভাবে কহিল, "থাক্ থাক্ খুকী,—তুমি পারবে না—আমিই নিয়ে আসছি।" নারাণী তাহার আরক্তিম মুখখানি তুলিয়া একবার ধীরুর দিকে চাহিল মাত্র। ঈষৎ-স্ফুরিতাধর সলজ্জ হাসি-মুখের উপর একটা

দৃঢ়তাব্যঞ্জক ভাব ফুটিয়া উঠিল। সে তাহার দৃষ্টির দ্বারা বুঝাইয়া দিল—না, সে পারিবে।

ধীরু যখন তার বিছানার গাঁটরী লইয়া আসিল, নারাণী তখন ষ্টীল ট্রাঙ্কটা দয়াদেবীর ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিয়া তাঁহার নিকট দাঁড়াইয়া ছিল। ধীরু আসিতেই সে কহিল "মুখ ধোবার জল, দাঁতন বারান্দায় আছে। আমি চা নিয়ে আসছি।" বলিয়া নারাণী চলিয়া গেল।

ধীরু তাহার জামা জুতা খুলিয়া, কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "বেশ মেয়েটি পিসী!"

দয়াদেবী কহিলেন "খাসা মেয়ে রে! এসেছিস ত… দেখতেই পাবি স্বচক্ষে—পিসীর কথা সত্যি না মিথ্যে!"

হাত মুখ ধুইয়া চা পানান্তে ধীরু পিসীর কাছে বসিয়া কর্ম্মস্থলের কথাবার্ত্তা, দীনুবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর সদ্ব্যবহার, টাকা পয়সা কি কত উপার্জ্জন করিল ইত্যাদি সমস্ত কথা একে একে বলিতে লাগিল। ধীরুর ছন্নছাড়া জীবনের এই আমূল পরিবর্ত্তন দেখিয়া এবং অর্থোপার্জ্জনের কথা শুনিয়া দয়াদেবী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন "এইবার বাবা বিয়ে করে সংসারী হও। আর ত তোর কোন ভাবনা নেই, ভাইদের মুখ চেয়েও থাকতে হবে না। 'সাগর-দীঘির' উপর আমার যে সাড়ে তিন বিঘে জমী আছে, সেইখানে তুই তোর মনের মত ঘরবাড়ী করে নে!… ওদের সঙ্গে না পোষায় ওদের বাড়ী নাই বা থাকলি!"

ধীরু সে কথার কোন জবাব না দিয়া কহিল "দাদারা তোমার কোন খবর নেয় পিসী?"

দয়াদেবী চক্ষু বুজিয়া কহিলেন "আগে আগে রাজু চিঠি লিখত, আর টাকাও পাঠাত! কিন্তু আজ ক'মাস থেকে তারও আর চিঠিপত্তর পাই না! তা না লিখুক, ছেলেমেয়ে নিয়ে সে যেখানে থাকে ভাল থাক্, বিশ্বেশ্বরের কাছে আমার এই প্রার্থনা!"

"আমার কাছে কেউ লেখে না পিসী!"

"না লিখুক গে, তুই মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করে টাকা পয়সা উপার্জ্জন করে—দশের একজন হ'; দেখবি তখন—সকলে তোর খবর নেবে। এই হচ্ছে দুনিয়ার গতিক বাবা!"

কোন্ ফাঁকে ধীরুর মন ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই আবাল্যের স্মৃতিভরা গ্রামখানির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে,—সেই পথ-ঘাট, বন-বাগান, দীঘি-পুষ্করিণী, শস্য-শ্যামল মাঠ, ধূধূ প্রান্তর…দূরে কুল-কুল বাহিনী-প্রবাহমালা জাহ্নবী! অতীতের পৃষ্ঠাগুলি ঝড়ের বেগে তাহার চক্ষের উপর দিয়া ওলট-পালট খাইয়া উড়িয়া গেল! ধীরু দেখিল, কখন যেন সে কল্যাণীদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!

"হ্যাঁ রে, নবনে কি বেঁচে আছে জানিস্?"

ধীরু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া চোখ মুছিয়া কহিল "কি বলছ পিসী?"

"বলছিলাম নব্‌নের কথা! সে কি বেঁচে আছে জানিস?"

"না।"

"বিদ্যেবাগীশ খুড়ো?"

"বলতে পারি না।"

"তাহলে গাঁয়ের তুই কোন খবর জানিস না বল্?"

ধীরু অন্যমনস্কভাবে কহিল "না—জানি না।"

ধীরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "হ্যাঁ, ভাল কথা, জান পিসী—আসবার দিন কতক আগে মাধব-খুড়ার চিঠি পেয়েছিলাম!"

দয়াদেবী আগ্রহভরে কহিলেন "মাধব? বাঁড়ুয্যে-পাড়ার মাধব? হ্যাঁ, মাধব কি লিখেছে?"

"লিখেছেন দাদার ছেলে 'বলুর' অন্নপ্রাশন, খুব ঘটা করে হচ্ছে!"

"মাধব লিখেছে?"

"হ্যাঁ।"

দয়াদেবী কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, "বেশ সুখের কথা! আমি যে বাবা মায়া কাটিয়ে আসতে পেরেছি, এই আমার ভাগ্যি! হ্যাঁ রে, 'কলির' কথা মাধব কিছু লিখেছে? আহা—অমন মেয়ের অদৃষ্টে—" দয়াদেবী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। কাল-বৈশাখীর মত একটা ঝড়ের ঝাপটা ধীরুর বুকের উপর দিয়া বহিয়া গেল। ধীরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল "না!"

নারাণী একটা ছোট পাথরের বাটিতে তেল আনিয়া কহিল "স্নানের জল কি গরম করতে হবে পিসী?"

"না—আমি ঠাণ্ডা জলেই নাইব'খন"—বলিয়া ধীরু তাহার ষ্টীল ট্রাঙ্কটা খুলিয়া গামছা কাপড় ও একজোড়া থান

বাহির করিয়া কহিল "পিসী, এই থান-জোড়া এনেছি, তুমি পরো। এই রইল।"

দয়াদেবী একটু হাসিয়া কহিলেন "আমার ত কাপড় আছে বাবা, আবার এখন আনবার দরকার কি ছিল? এই ত ও-মাসে তুই কাপড় কেনবার টাকা পাঠিয়েছিস? নারাণী, কাপড় জোড়া তুলে রাখ ত মা।"

"রাখব'খন" বলিয়া নারাণী কাপড়-জোড়া দয়াদেবার বাক্সের উপর রাখিয়া কহিল "আর দেরী না করে স্নানটা করে নিলেই ত হয়।"

ইতিমধ্যে যদুবাবু বাজার হাতে আসিয়া বলিলেন "নারাণী…অ নারাণী!"

"যাই…এত দেরী হল যে তোমার ফিরতে?"

"আর মা—বাজারের যা অবস্থা হয়ে উঠলো দিন দিন! এর পর আর কিছু কিনে খাওয়া দায় হয়ে উঠবে।" বলিয়া যদুবাবু নারাণীর হাতে মাছের থলেটা দিয়া কলতলা হইতে হাত পা ধুইয়া বারান্দায় আলু, বেগুন প্রভৃতি তরকারী নামাইয়া রাখিলেন।

ধীরু মাথায় তেল মাখিতে মাখিতে বাহিরে আসিয়া কহিল "এ যে মেলাই জিনিস এনেছেন দেখছি।…বাঃ, বেগুনগুলো ত চমৎকার! আমাদের দেশে কিন্তু এমন-ধারা বেগুন ফলে না। কত করে দর?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মাথা দোলাইয়া যদুবাবু কহিলেন "আর বল কেন, ছ আনা সের!"

"বলেন কি—এত সস্তা?"

আশ্চর্য্যভাবে যদুবাবু কহিলেন "সস্তা? বল কি হে? এই বেগুন আগে ছ পয়সা তিন পয়সা সের ছিল। আর এই ট্যাঁড়োস গুলো মিলত আধ পয়সায়! আজকাল নানান দিককার বাবু-ভায়ারা এসেই না কাশীর এ হালটা করলে! সে যাক্ গে, তোমার এখনও নাওয়া হয় নি?"

"এই যাচ্ছি" বলিয়া ধীরু উঠানে নামিতেই, যদুবাবু কহিলেন, "এখন আবার গঙ্গায় যাবে না কি? এই রোদের মধ্যে—"

"না—বাড়ীতেই নেয়ে ফেলব!"

"তাই-কর! নারাণী, ধীরুকে জলটল এনে দে মা!"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "জল আর এনে দিতে হবে না… চৌবাচ্ছায় ত জল আছে, আমি নেয়ে নিচ্ছি।"

"আচ্ছা! তবে আমার এক-কলকে তামাক সেজে দে ত নারাণী!" বলিয়া যদুবাবু তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন।

ধীরু একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া কলতলায় স্নান করিতে যাইলে, নারাণী ধীরুর কাপড়খানা কোঁচাইয়া বারান্দায় এক কোণে একখানা জল-চৌকির উপর রাখিয়া তরকারী গুলি আঁচলে তুলিয়া রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

আহারান্তে ধীরু পিসীর কাছে যাইতেই দয়াদেবী কহিলেন "সারারাত জেগে এসেছিস, একটু গড়িয়ে নে, পাশের ঘরে নারাণী তোর বিছানা পেতে দিয়েছে।"

"তা ত হল, কিন্তু তুমি যে এখনও জলটুকুও মুখে করলে না পিসী; কিছু খাও।"

দয়াদেবী জিব কাটিয়া কহিলেন, "আজ যে একাদশী বাবা! বিশ্বেশ্বরের চন্নামেত্ত একটু মুখে ফেলে দেব'খন! তাঁর রাজ্যে ত উপোসী থাকতে নেই কি না—তাই!"

ধীরু আর কোন কথা না বলিয়া পাশের ঘরে যাইয়া দেখিল, একখানি ছোট খাটের উপর তাহার বিছানা পাতা আছে, এবং পাশেই একখানি ছোট রেকাবীর উপর কতকগুলি সাজা পান রহিয়াছে এবং তাহার কাছেই একখানা ছোট খাতা! কৌতুহলবশতঃ খাতাখানি খুলিয়া ধীরু দেখিল, সেখানি হিসাবের খাতা! সে যে দয়াদেবীকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাইয়াছে, তাহারই জমা-খরচ ইহাতে অতি সুন্দর এবং স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। ধীরুর মুখে একটা হাসির ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল! কিন্তু একটা দুঃখও তাহার হৃদয়কে অধিকার করিল! হায়, পিসীর নিজস্ব কত টাকা সে শুধু খেয়ালের বশে নষ্ট করিয়াছে, তাহার কোনই হিসাব নাই, আর আজ তাহার প্রেরিত সামান্য টাকার কড়াক্রান্তি হিসাবটি পর্য্যন্ত পিসী রাখিয়াছেন, কারণ ইহা ধীরুর টাকা! আজ অর্থের মূল্য ধীরু বুঝিয়াছিল, তাই দয়াদেবীর অতলস্পর্শ স্নেহের গভীরতা অর্থের মাপ-কাটিতে নির্ণয় করিতে যাইয়া সে তাহার অতল তলে ডুবিয়া গেল! ভক্তি-আপ্লুত হৃদয়ে ধীরু ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িল! খাতাখানা তাহার বুকের উপর পড়িয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

তক্ষশিলা

শ্রীনরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত বি-এ

জৌলিয়াঁ

একটি ৩০০ ফিট উচ্চ ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর এই বৌদ্ধ ধ্বংসনিচয় অবস্থিত। ইহার উত্তর দিক উন্মুক্ত, অপর তিন দিক পাহাড়ে পরিবেষ্টিত। প্রথমোক্ত পাহাড়ের উত্তর গাত্রবাহী পথটি ধরিয়া উপরে আরোহণ পূর্ব্বক একবার উত্তর দিকে নেত্রপাত করিলে উপত্যকার যে দৃশ্য চোখে পড়ে, তাহাতে প্রাণ-মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। দূরে বিশাল-দেহ গর্ব্বোন্নত-শির সর্ভ-পাহাড়। তন্নিম্নে পাদ-প্রবাহিনী হারো নদীর অমল ধবল প্রশস্ত বক্ষ। চারিদিকে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর। তদুপরি মাঝে মাঝে কলাই এবং সোনাখা বৃক্ষের সুবিন্যস্ত বীথিকা আর ঊর্দ্ধে অনন্ত, স্বচ্ছ, নীল নভোমণ্ডল,—দেখিলে চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এ হেন মহামহিমময় দৃশ্য, শান্তিময় নির্জ্জনতা, স্নিগ্ধ ও নির্ম্মল বায়ু, এবং সর্ব্বোপরি গম্ভীর পবিত্র ভাব-সমন্বিত শৈল-শীর্ষে বাস—বৌদ্ধ সঙ্ঘের শ্রমণগণের পক্ষে বাস্তবিকই গভীর আকর্ষণের বিষয় ছিল।

উপরিউক্ত সৌধগুলি খৃঃ ৩য় শতাব্দীর প্রথম ভাগে কুষান যুগে নির্ম্মিত, এবং ইহার প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে তক্ষশিলা নগরী শিরসুখ নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। সৌধগুলি মোটামুটি দুই অংশে বিভক্ত। এক অংশে, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে একটি মধ্যমায়তন বিহার বা সঙ্ঘারাম, অপর অংশে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে দুইটি স্তূপের চৌক। এতন্মধ্যে উত্তরের চৌকটি কিঞ্চিৎ নিম্নতর ভূমিতে, আর দক্ষিণের চৌকটি কিঞ্চিৎ উচ্চতর ভূমিতে অবস্থিত। এইস্থানে প্রবেশ করিবার তৎকালে তিনটি পথ ছিল। একটি নিম্নতর চৌকের উত্তর-পশ্চিম কোণের নিকট, দ্বিতীয়টি উচ্চতর চৌকের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, এবং তৃতীয়টি সঙ্ঘারামের পূর্ব্ব দিকে।

আমরা প্রথমোক্ত পথ দিয়া প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ-বেষ্টিত একটি বৃহৎ উন্মুক্ত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, এইটিই পূর্ব্বোক্ত নিম্ন চৌক। প্রাঙ্গণের পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠসমূহে বিবিধ বিগ্রহ-প্রতিমা স্থাপিত ছিল। ইহার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ৫টি মধ্যমায়তন স্তূপ অবস্থিত। সমস্ত স্তূপেরই জরঢাক এবং 'অণ্ড' ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। তবে ইহাদের সমচতুষ্কোণ বেদীগুলি এখনও বন্ধনী-মধ্যস্থ নানাবিধ ক্ষোদিত মূর্ত্তিতে পরিশোভিত আছে। তন্মধ্যে কুলুঙ্গীর ভিতর রক্ষিত সপার্ষদ বুদ্ধ অথবা বোধিসত্ত্ব প্রতিমাসমূহ, এবং বিবিধ অঙ্গ-ভঙ্গীতে বিন্যস্ত সারি সারি হস্তী, সিংহ অথবা মনুষ্য-মূর্ত্তিগুলি বিশেষভাবে দর্শনযোগ্য। 'ক' চিহ্নিত স্তূপের উপর কয়েকটি খরোষ্ঠী লিপি উৎকীর্ণ আছে। লেখগুলিতে প্রতিমাসমূহের উপাধি এবং তাহাদের দাতৃগণের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। খৃঃ ৪র্থ অথবা ৫ম শতাব্দীতে যখন মূল স্তূপটি সংস্কৃত এবং পুনরলঙ্কৃত হয়, তখন এই প্রাঙ্গণোপরিস্থ যাবতীয় সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

উচ্চতর চৌকের মধ্যস্থলে মূল স্তূপটি দণ্ডায়মান। বলা বাহুল্য, ইহারও শীর্ষভাগ ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই স্তূপটি সর্ব্ব প্রথম কুষান আমলে নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর দিক হইতে এক প্রশস্ত সোপান প্রসারিত। এই সোপানের কিঞ্চিৎ বামে একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তির নাভিতে একটি গোল ছিদ্র, এবং পাদপিঠে একখানি খরোষ্ঠী লিপি। লিপিতে উৎকীর্ণ আছে,—ইহা বুধমিত্র নামক জনৈক ব্যক্তি,—"যিনি ধর্ম্মে আনন্দলাভ করিতেন",—তাঁহার দান।

মূল স্তূপের চতুর্দ্দিকে সুচারু কারুকার্য্য-ভূষিত আরও ২১টি নাতিবৃহৎ স্তূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত। ইহাদের বহির্দ্দেশে সারি সারি অনেকগুলি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ অবস্থিত। উক্ত স্তূপ শ্রেণীর মধ্যে দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী 'ধ' চিহ্নিত স্তূপের বেদীর পূর্ব্ব পার্শ্বোপরিস্থ ধ্যান মুদ্রায় উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিটি অতি চমৎকার। মুখের ভাবটি দেখিলে বাস্তবিকই

হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়। মূর্ত্তিটি বেশ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এই স্তূপ মধ্যে প্রাপ্ত ভস্মপ্রকোষ্ঠটি অত্যন্ত লম্বা এবং সঙ্কীর্ণ ছিল। ইহার ভিতর একটি আশ্চর্য্য ধরণের ক্ষুদ্রাকৃতি স্তূপ পাওয়া গিয়াছে।

উপরি উক্ত 'খ' চিহ্নিত স্তূপটির পশ্চাদ্দিকে, প্রধান স্তূপের দক্ষিণ গাত্রের উপর কয়েকটি বিশালকায় বুদ্ধ-প্রতিমা অবস্থিত। এই প্রতিমাগুলি অনুমান খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছিল। প্রধান স্তূপের পশ্চিম দিগ্বর্ত্তী 'গ' চিহ্নিত স্তূপটির উপরেও কয়েকটি খরোষ্ঠী লিপি উৎকীর্ণ আছে।

জৌলিয়াঁ—স্তূপ সমূহের সাধারণ দৃশ্য

এখন আমরা স্তূপের চৌক হইতে ঈশান পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী সঙ্ঘারামে প্রবেশ করিব। প্রবেশ-পথের ঠিক বাহিরে বাম দিকে একটি ক্ষুদ্র উপাসনা-কক্ষের মধ্যে চুণ-বালিতে নির্ম্মিত অত্যুৎকৃষ্ট একপ্রস্থ মূর্ত্তি বিরাজিত। তন্মধ্যে কেন্দ্র স্থলে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট বুদ্ধ, তাঁহার দক্ষিণে ও বামে একজন করিয়া দণ্ডায়মান বুদ্ধ, এবং পশ্চাতে দুইজন সেবক। সেবকের মধ্যে একজনের হস্তে চামর (চৌরী), অপর জনের হস্তে বজ্র ('বজ্রপাণি')। ইহার কিছু বামে দ্বিতীয় একপ্রস্থ মূর্ত্তি। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তথাপি তন্মধ্যে একজন সেবকের হস্তধৃত ফুল এবং ফলের সাজিটি দেখিলে বাস্তবিক ফুল এবং ফল বলিয়া ভ্রম হয়; আর দ্বিতীয় জনের পরিচ্ছদটিও বিশেষ দর্শনযোগ্য।

জৌলিয়াঁ—স্তূপ ও বিহারের নক্সা
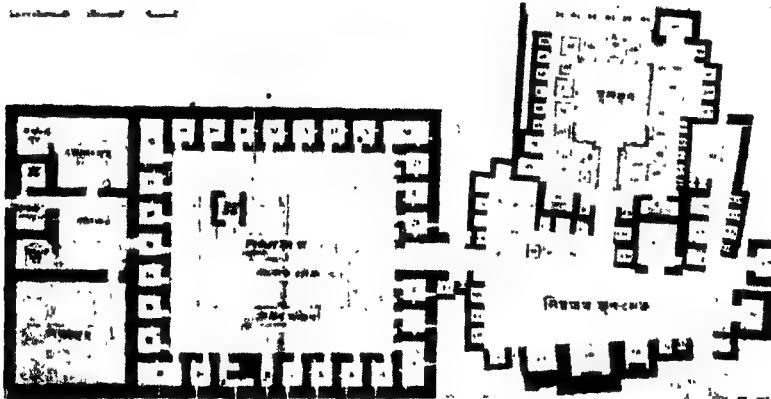
মোহেঁজোদারোর ন্যায় জৌলিয়াঁর বিহারেও মধ্যভাগে উন্মুক্ত চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ; প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে দ্বিতল প্রকোষ্ঠসমূহ, এবং মধ্যস্থলে সমচতুষ্কোণ নিম্নভূমি। নিম্নভূমির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে স্নানাগার। তৎপর মোহেঁজোদারোর ন্যায় এখানেও প্রকোষ্ঠ চৌকের পূর্ব্ব দিকে সভাগৃহ, রন্ধনশালা, ভোজন গৃহ, ভাণ্ডার-গৃহ প্রভৃতি। প্রকোষ্ঠসমূহের সম্মুখে সেইরূপ মূর্ত্তি নিকেতন (alcoves), অভ্যন্তরে সেইরূপ কুলুঙ্গী ও জানালা, এবং উপর তলে

উঠিবার নিমিত্ত উত্তর দিকে সেইরূপ একপ্রস্থ সিঁড়ি। মোটের উপর এই বিহারদ্বয় একই আদর্শে পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই কর্দ্দমে নির্ম্মিত; উপরিভাগ একটি মসৃণ লেপন (slip), শাদা চূণের পোচ, রং এবং সোণালী বর্ণে সম্পাদিত। এই মূর্ত্তিগুলি গান্ধার শিল্পের নিদর্শন। সুতরাং ইহাদের একটা বিশিষ্ট মূল্য আছে। আমরা ইহার একপ্রস্থ মূর্ত্তির বর্ণনা প্রদান করিতেছি—

জৌলিয়াঁ—স্তূপ-গাত্রস্থ বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি

মধ্যস্থলে অভয় মুদ্রায় দণ্ডায়মান বুদ্ধ; তাঁহার দক্ষিণে ও বামে আর দ্বাদশটি অন্যবিধ মূর্ত্তি ছিল, কিন্তু ইহাদের কতিপয় বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশিষ্টের মধ্যে বুদ্ধের দক্ষিণ দিকস্থ মধ্যমাকৃতি পুরুষ মূর্ত্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক। ইহার দেহে আজানুলম্বিত চাপকান (tunic), পরিধানে বোতামযুক্ত পাজামা, কোমরে সুঅলঙ্কৃত কোমরবন্ধ এবং মস্তকে টুপি। এই অদ্ভুত ধরণের পোষাক এবং শ্মশ্রুযুক্ত মস্তক দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায়, মূর্ত্তিটি কোন বিদেশীর। বুদ্ধ এবং এই মূর্ত্তির মাঝখানে লম্বা পোষাকে এবং বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত আর একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। বুদ্ধের বাম দিকে "সঙ্ঘাটী"-পরিহিত একটি সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান। অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি অতিশয় জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।

খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে এই সঙ্ঘারামটি অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্য উপরিউক্ত কর্দ্দম-নির্ম্মিত মূর্ত্তিসমূহ, এবং কাঠের সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সমস্তই পুড়িয়া যায়। এতন্মধ্যে গুপ্তযুগের ব্রাহ্মী অক্ষরে "শ্রীকুলেশ্বর দাসে"— এই শব্দদ্বয় ক্ষোদিত একটি লাল পাথরের শিলমোহর, এবং উক্ত অক্ষরেই লিখিত ভূর্জ্জ (birch)-বল্কলের একখানি পাণ্ডুলিপি দগ্ধাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই বিহার মধ্যে দুই শতের অধিক মুদ্রা—অধিকাংশ কুষান-সাসানীয় ধরণের (৪র্থ অথবা ৫ম শতাব্দী),—বহু সংখ্যক লোহার পেরেক, কব্জা, অস্ত্রশস্ত্র, তামার অলঙ্কার, পোড়া মাটীর জিনিষ, বহুবিধ মৃন্ময় পাত্র, কতিপয় বৃহৎ পাথরের জালক, যাঁতা, শিল-পাটা, ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে।

বাদলপুর

জৌলিয়াঁর প্রায় ১॥ মাইল উত্তরে বাদলপুর নামক স্থানে আর একটি বিশালকায় স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। গঠনে এবং পরিকল্পনায় এই স্তূপটি আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত "কুণাল স্তূপের" ন্যায় ছিল। ধনান্বেষীদের হস্তে ইহার প্রভূত বিনাশ সাধিত হইয়াছে। তথাপি এখনও যে সামান্য অংশ অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, এককালে এই স্তূপটি তক্ষশিলার অন্যতম অত্যুৎকৃষ্ট সৌধ ছিল। ইহার বিপুলায়তন বেদীটি লম্বায় ৮২ ফিটেরও অধিক, এবং উচ্চতায় প্রায় ২০ ফিট। স্তূপের উত্তর এবং দক্ষিণ পার্শ্বে দুই সারি কোঠা; কোঠাগুলির সম্মুখে নাতি-পরিসর বারান্দা। এই সমস্ত কক্ষে বৌদ্ধ প্রতিমাসমূহ স্থাপিত ছিল। স্তূপের প্রায় ৭০ গজ পূর্ব্বে একটি সুপ্রশস্ত সঙ্ঘারামের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত।

ধ্বংসাবলীর মধ্যে যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই কুষান রাজা কনিষ্ক, হুবিষ্ক এবং বাসুদেবের। এই সব হইতে এবং গাঁথনির ধরণ দৃষ্টে অনুমান হয়, সম্ভবতঃ খৃঃ ৩য় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এই সৌধগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

লালচক

বাদলপুরের প্রায় ১॥ মাইল পশ্চিমে, এবং পূর্ব্বোক্ত শিরসুখ নগরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে লালচক নামক স্থানে আর কয়েকটি বৌদ্ধ স্তূপ, দেবালয় এবং বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই সৌধগুলি সম্ভবতঃ খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর সমসময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সৌধাবলীর উত্তরাংশে একটি চমৎকার সঙ্ঘারাম বা বিহার অবস্থিত। ইহার সম্মুখ ভাগে একটি অনাবৃত অঙ্গন। অঙ্গনের পরে চারিটি আবাস-কক্ষ, এবং পশ্চিম দিকে একটি ক্ষুদ্র কোঠা,—সম্ভবতঃ ভাণ্ডার গৃহ। দক্ষিণ দিকে প্রবেশ-পথ। প্রবেশ-পথে উঠিবার জন্য একপ্রস্থ পাথরের সিঁড়ি। উপরতলে আরোহণ করিবার নিমিত্ত প্রাঙ্গণের পশ্চিম প্রান্ত হইতে আর একপ্রস্থ পাথরের সিঁড়ি ছিল। বর্ত্তমানে ইহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপরতলের প্রাচীরগুলি অবশ্য প্রস্তর-গঠিত ছিল; কিন্তু ভগ্নাবশেষের মধ্যে প্রাপ্ত বহুপরিমাণ ভস্ম, পোড়া মাটী লোহার পেরেক ইত্যাদি দৃষ্টে মনে হয়, গৃহের সাজ-সরঞ্জাম, উপরতলের মেঝে এবং কর্দ্দমাবৃত ছাদ নিশ্চয়ই কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। ভগ্নাবশেষের মধ্যে শ্বেত হূনগণের ৪টি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মনে হয়, খৃঃ ৬ষ্ঠ অথবা ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বেই এই সঙ্ঘারামটি দগ্ধীভূত এবং লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। বাস্তবিক ইহা খুবই সম্ভব যে, সঙ্ঘারামটি অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল অবিকৃত অবস্থায় ছিল না।

এই স্থানে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যাদির মধ্যে অলঙ্কারখচিত একটি ত্রিশূল, কতকগুলি তাম্র-নির্ম্মিত ফুল, একটি ব্রোঞ্জের অঙ্গুরীয়, লোহার কুঠার ও তীরের ফলক, এবং বিবিধ জাতীয় মূল্যবান পাথর, স্ফটিক, স্বর্ণ, মুক্তা এবং শঙ্খের মালা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত সঙ্ঘারামের সন্নিকটে দুইটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এতদুভয়ের মধ্যে যে সমস্ত প্রাচীন দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ১৪০টি মুদ্রা এবং ৩০টি সোনা, মরকত ও শঙ্খের মালা প্রধান।

জৌলিয়াঁ—কক্ষমধ্যস্থ বুদ্ধ মূর্ত্তি

ভল্লর টোপ

তক্ষশিলা-উপত্যকার উত্তর সীমাবর্ত্তী বিশালদেহ সর্ড পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে এক অতি প্রকাণ্ড স্থানে আর একটি সুবৃহৎ স্তূপ দণ্ডায়মান। এই স্তূপটির স্থানীয় নাম "ভল্লর টোপ"; তদনুসারে ঐ স্থানটিরও নাম "ভল্লর টোপ"।

মিউজিয়ম হইতে এই স্থানের দূরত্ব ৪॥ মাইল। সমগ্র উপত্যকা হইতেই এই সুউচ্চ স্তূপটি পরিদৃশ্যমান। স্তূপের পশ্চিম দিক ঘেঁসিয়া হেভেলিয়াঁ রেলওয়ে লাইন চলিয়া গিয়াছে।

খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন্-সঙ তক্ষশিলায় আগমন করেন, তখন তিনি এই স্তূপটিও পরিদর্শন করেন। তিনি তদীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছেন, ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহার পূর্ব্ব এক জন্মে এই স্থানে নিজ মস্তক অপরকে কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ অশোক তাহারই স্মারক-চিহ্ন স্বরূপ উক্ত স্থানে এই স্তূপটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বোধিসত্ত্বের উক্ত জন্মে নাম ছিল চন্দ্রপ্রভ, আর তক্ষশিলার নাম ছিল ভদ্রশিলা। চন্দ্রপ্রভ ভদ্রশিলায় রাজত্ব করিতেন।

জৌলিয়াঁ—কুলুঙ্গী মধ্যস্থ "ম্লেচ্ছ"-মূর্ত্তি

বলা বাহুল্য, Sir John Marshall এই কিম্বদন্তীতে বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যদি অশোক বাস্তবিকই কোন কালে এখানে কোন সৌধ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্ন নাই। এমন হইতে পারে যে, এখন যেখানে ভল্লর স্তূপটি দণ্ডায়মান সেইখানে এককালে চন্দ্রপ্রভ নামক কোন বীরের স্তূপ ছিল ;—তাঁহার ধর্ম্মমত পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান স্তূপটি খৃঃ ৩য় অথবা ৪র্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয় নাই।

উপত্যকার বিপরীত দিগ্বর্ত্তী আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত "কুণাল স্তূপের" ন্যায় এই স্তূপটিও একটি দীর্ঘায়তন সমুচ্চ বেদার উপর দণ্ডায়মান। ইহাতে আরোহণ করিবার জন্য পূর্ব্ব দিকে একপ্রস্থ সুপরিসর সিঁড়ি; উপরিভাগে যথারীতি একটি জয়ঢাক এবং 'অণ্ড' বা গম্বুজ, এবং তদুপরি এক বা ততোধিক ছত্র ছিল। সমগ্র সৌধটির ব্যাসের অনুপাতে জয়ঢাকটি অত্যধিক উঁচু; ইহা ৬।৭টি বন্ধনীতে বিভক্ত ছিল। বন্ধনীগুলি নিম্ন হইতে উপর দিকে ক্রমশঃ ক্ষুদ্রাকার, এবং সারি সারি খর্ব্বাবয়ব করিন্থীয় গাত্রস্তম্ভ, ফ্রিজ এবং দন্তাকৃতি কর্নিশে শোভিত ছিল। স্তূপটীর উত্তরার্দ্ধ সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। এই পার্শ্বস্থ অস্থি-প্রকোষ্ঠটি এখন পরিষ্কার দেখা যায়। প্রকোষ্ঠটি জয়ঢাকের শীর্ষের নিকটে স্থাপিত ছিল। স্তূপের প্রাঙ্গণ-মধ্যে বহু সংখ্যক মূর্ত্তি-কক্ষ এবং অন্যান্য সৌধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পূর্ব্ব দিকে মোটা দেওয়াল বিশিষ্ট একটি সুপ্রশস্ত সঙ্ঘারাম অবস্থিত। হিউ-এন্-সঙ বলেন, এই সঙ্ঘারামের মধ্যে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কুমারলব্ধ তদীয় গ্রন্থানিচয় প্রণয়ন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সময়ের অনতিকাল-পূর্ব্বে স্তূপ-প্রাঙ্গণে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্তা জনৈকা স্ত্রীলোক স্তূপের নিকট পূজা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়া দেখিতে পায়, সমস্ত প্রাঙ্গণটি খড় এবং ময়লায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। তখন সে ইহা পরিষ্কার করিয়া সৌধটির চতুর্দ্দিকে ফুল ছড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে সে কুষ্ঠ

হইতে মুক্ত হইয়া তাহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পাইল।

আমরা তক্ষশিলার প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বর্ণনা শেষ করিলাম। এতদ্ব্যতীত এই উপত্যকার উপর সমতলক্ষেত্রে অথবা পাহাড় শ্রেণীর মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আরও অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিরাজিত আছে। ইহার মধ্যে কতক কতক খনিত হইয়াছে, আর অনেকগুলি এখনও ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। সেগুলি কোন দিন লোকচক্ষুর গোচরে আসিবে কি না সন্দেহ। স্থানীয় গ্রামবাসীরা আবহমান কাল হইতে অসংখ্য প্রাচীনমুদ্রা ("সীতারামী") এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া আসিতেছে। এখনও হল চালনাকালে সময় সময় তামা অথবা রূপার পয়সা বাহির হইয়া পড়ে। রাওলপিণ্ডির চতুর মুদ্রা-ব্যবসায়িগণ এই সব নিরক্ষর সরল কৃষকদিগকে ঠকাইয়া অতি স্বল্পমূল্যে উক্ত মুদ্রাসমূহ ক্রয় করিয়া অন্যত্র সুবিধাজনক স্থানে বহুমূল্যে বিক্রয় করে। ইহারা পুরুষানুক্রমে এই ব্যবসা করিয়া আসিতেছে। এই ভাবে অতীতে যে কত অসংখ্য মূল্যবান মুদ্রা শত শত লোকের হাত ঘুরিয়া অবশেষে সুদূর বিদেশে যাইয়া পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সৌভাগ্যক্রমে বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ এখানে ভারতীয় প্রত্ন-বিজ্ঞান বিভাগের আস্তানা হওয়াতে এই পথ কতকটা রুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখন আর সময় নাই,—মূল্যবান মুদ্রা প্রায় সমস্তই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। (ক্রমশঃ)

ভল্লর স্তূপের সাধারণ দৃশ্য

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

মিঃ চ্যাটার্জ্জি যখন প্রস্তাব করিলেন তাঁদের একমাত্র কন্যা ইলার সহিত তিনি সত্যর বিবাহ দিয়া তাহার বিলাতের ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে চান, তখন জিতেন্দ্রনাথের দৃষ্টি বেশ ভাল করিয়াই ভাইটীর উপর পড়িল এবং তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তিনি যথার্থই মনে মনে খুসি হইয়া উঠিলেন।

উদারহৃদয়া মায়াও ইহাতে অমত করেন নাই। তাঁহার মনটা নেহাৎ মন্দ ছিল না। তিনি উচ্চাভিলাষিণী ছিলেন; তাই সকলেরই উন্নতির বাসনা করিতেন। শ্বশুরকে তিনি ঘৃণা করিতেন; কিন্তু যদি সম্ভবপর হইত, শ্বশুরকে শিক্ষিত করিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা পাইতেন না। যখনই তিনি মোটা উপবীতধারী মাথায় দীর্ঘ শিখা, মোটা থাদি পরিহিত শ্বশুরের কথা মনে করিতেন, তখনই ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিতেন। এ যাবৎ তিনি শ্বশুরালয়ের কথা কাহাকেও বলেন নাই,—সে বিষয় উত্থাপনে তিনি একেবারেই নির্ব্বাক ছিলেন। সত্যকে দেবর নামে এখন পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে; কেন না, সে প্রশংসার সহিত এম-এ পাস করিয়াছে, এবং গণ্য মান্য ধনী মিঃ চ্যাটার্জ্জি নিজে তাহার সহিত সুন্দরী কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখন সত্য তাঁহাদের কাছে বিশেষ আদরের পাত্র, গৌরবের স্থল।

বিলাতে যাইবার প্রবল ঝোঁকে পড়িয়া পতিগতপ্রাণা পত্নীর কথা সত্য ভুলিয়া গিয়াছিল। গৃহের কথা, বৃদ্ধ পিতা, অভাগিনী ভগিনীর কথা সে মনে স্থান দেয় নাই। উৎসাহ দিয়া হৃদয়টাকে সে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। এখন গৃহের কথা ভাবিতে গেলে আর সে অদম্য উৎসাহ থাকিবে না ভাবিয়া, সে পুরাতনকে বিদায় দিয়া নূতন লইয়া পড়িয়াছিল। কোন মতে এই বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে জাহাজে উঠিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যায়। তাহার ভয় হইতেছিল—এই নূতনের মধ্যে পাছে পুরাতনের ছোঁয়াচ লাগিয়া নূতনকে বিবর্ণ করিয়া ফেলে।

সত্যর বিলাত যাত্রা করিবার নির্দ্দিষ্ট দিনের আগে মায়া বাড়ীতে একটী আনন্দোৎসবের প্রস্তাবনা করিলেন। মায়া ব্যয়কুণ্ঠা হইলেও এদিকে তাঁহার দৃষ্টি প্রখর ছিল; এবং এইরূপ আনন্দ-মিলনে যে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারা যায় তাহা জানিতেন।

মায়ার পিত্রালয়েও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। সরলা আসেন নাই, মাতার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে বীথি আসিল।

তাহার সেই অনাড়ম্বর সাদাসিদা বেশভূষার পানে তাকাইয়া মায়া ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "দিন দিন তুমি যে কি অভিনব এক রুচির পক্ষপাতিনী হচ্ছো বীথি, তা আমি বুঝতে পারছি নে। এতটুকু মেয়ে, তুমি, সাজ পোষাক করে এসেছ বুড়োদের মত, দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমার সঙ্গে এসো, আমি ভাল করে সাজিয়ে তবে তোমায় ওদিকে যেতে দেব। এ রকম জঙ্গলী ভূতের মত গেলে ওঁরা সব হাসবেন, ঠাট্টা করবেন—সে আমি সইতে পারব না।"

বীথি একটু হাসিয়া বলিল, "কেন মা, এ তো বেশ দেখাচ্ছে। দিদিমা এবার এই কাপড় আর ব্লাউসটা পছন্দ করে কিনেছেন। আজ নিজের হাতে তিনি আমায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, খুব ভাল মানিয়েছে।

মুখখানা অতিরিক্ত রকম বিকৃত করিয়া ফেলিয়া মায়া বলিলেন, "হ্যাঁ, মানিয়েছে বই কি? মা দিন দিন চোখের জ্যোতি হারাচ্ছেন, তার সঙ্গে মনের জোরও হারাচ্ছেন,—পছন্দ অপছন্দের ধারও আর ধারেন না।"

বীথি শান্ত সুরে বলিল, "এই কাপড়ই থাক মা, আমারও এ বেশ লাগছে। বেশী আড়ম্বর করে চলতে গেলে

আমার বড় লজ্জা করে। মনে হয়, সকলে বিশেষ করে যেন আমাকেই চেয়ে দেখছে। এ বেশ সাদাসিদে মা, কেউ লক্ষ্যও করবে না যে আমি আছি।"

মায়া মেয়ের প্রকৃতি জানিতেন, সে যাহা একবার ধরে তাহা আর ছাড়িতে চায় না। তিনি ভারি চটিয়া গিয়া বলিলেন, "মার কাছে থেকে তোমার যে তেমন শিক্ষালাভ হচ্ছে না তা আমি বরাবরই জানি। তবে এতদূর যে হয়েছে, তা জানতুম না বীথি। তোমায় আমি আর ওখানে রাখব না, নিজের কাছে এনে রেখে তোমায় সকলের সঙ্গে মিশবার শিক্ষা আমাকেই দিতে হবে,—মার কাজ এ নয়।"

বীথি জানিত, মায়ের সে ক্ষমতা আছে। নিমেষে তাহার ফুল্ল মুখখানা মলিন হইয়া গেল, সে মায়ের পানে তাকাইয়া রহিল। মা রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, তাহার পানে আর ফিরিয়া চাহিলেন না।

সত্য তখন তাহার ভাবী বধূ সুন্দরী ইলাকে লইয়া মহাব্যস্ত। উভয়ের মধ্যে তখন সাহিত্যের আলোচনা চলিতেছিল। বীথি মাঝখানে আসিয়া পড়িল।

সত্য ভারি সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল; কারণ, এই ছোট মেয়েটীকে সে যেমন ভালবাসিত, তেমনি শ্রদ্ধা করিত। ভয়টা অবশ্য আজ ছাড়া আর কোন দিন হয় নাই। বীথি তাহার সঙ্কুচিত ভাব লক্ষ্য করিয়াও করিল না, বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ দরকারী কথা আছে কাকা,—একটীবার শুনতে হবে।"

ইলার পানে তাকাইয়া হাসিমুখে বলিল, "একটু মাপ কোরো ভাই ইলাদি, আমি পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ঘুরে আসছি।"

সত্যর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সে একটা নির্জ্জন ছোট কুঠরীতে লইয়া গেল।

বিস্মিত সত্য বলিল, "কি এমন কথা বীথি, যার জন্যে এমন একটা নির্জ্জন স্থান দরকার—যেখান হতে আমাদের কথা আর কারও কাণে গিয়ে পৌছাবে না?"

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বীথি বলিল, "সে রকম কোন কথা নেই কি কাকা, যা অপরকে শুনতে দেওয়া—আমার না হোক, তোমার অভিপ্রেত নয়? মনে করে দেখ দেখি—এমন কোনও কথা নেই কি, যা আমি আর আমার মা বাপ ছাড়া আর কেউই জানে না?"

সত্যর মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হইয়া গেল। কম্পিত হাতে একখানা চেয়ার ধরিয়া তাহাতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আছে মা, আমি—"

সে কথাটা শেষ না করিয়া ভাবিতে লাগিল। তাহার চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার উপর অবিচল দৃষ্টি ন্যস্ত রাখিয়া বীথি শক্ত সুরে বলিল, "আমি আগেও বলেছি কাকা, এখনও বলছি—এ কি তোমার উচিত কাজ হচ্ছে? যাদের অশিক্ষিত মূর্খ বলে ঘৃণা কর, এমন করে কপটতার মুখোশ তারা পরতে পারে না; কারণ, তারা শিক্ষা পায় নি বলেই ছলনা প্রতারণা শেখে নি। তোমরা শিক্ষিত, তোমরা জ্ঞানী, তাই তোমাদের আসল মুখ কেউই দেখতে পায় না। যে যেমন তার কাছে তেমনি করে নিজেদের ফুটিয়ে তোলো। না কাকা, এমন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার চেয়ে তুমি যদি নিরক্ষর হয়ে সমাজের এককোণে পড়ে থাকতে সে ও যে ভাল ছিল।"

"বীথি—"

ব্যাকুলভাবে সত্য বীথির হাত দুখানা চাপিয়া ধরিল।

বীথি হাত টানিয়া লইল। সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, তোমার এ কাজে আমি তোমায় এতটুকু প্রশংসা করতে পারব না, তোমায় ক্ষমার চোখে দেখতে পারব না, তোমায় জ্ঞানপাপী বলে ঘৃণা করব। এ সমাজে সকলেই জানে তোমার বিয়ে হয় নি। অসঙ্কোচে আমার মা বাপ এই মিথ্যে কথাটা প্রচার করতে পারেন,—কিন্তু তুমি কি করে করলে কাকা? কেউ জানে না—দেশে তোমার কেউ আছে কি না। আমার মা বাপ এ সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন; তাই তাঁদের কথা লোকে সহজেই বিশ্বাস করে যাচ্ছে। তুমি কি করে সহজেই জানালে কাকা—তোমার কেউ নেই? সতী সাধ্বী পতিব্রতা স্ত্রী থাকতেও কেমন করে বললে তোমার বিয়ে হয় নি? ছিঃ! তুমিও যে এমন ভাবে প্রতারণা করতে জানো, তা আমি কখনই জানতুম না কাকা। জানলে তোমার সঙ্গে কথাই বলতেম না। কাকিমা যে নিজের গায়ের গহনা দিয়ে তোমার পড়ার খরচ চালিয়েছেন, সে কথাটা তোমার একটী বারের জন্যেও মনে পড়ল না? এমনই অকৃতজ্ঞ বটে তোমরা,—উপকারীর উপকার তোমরা বড় সহজে ভুলে যাও। মনে কর দেখি, তোমার ঘরের

দৈন্ত অবস্থা, শ্মশানযাত্রী বাপ, স্বামী-ত্যক্তা ভগিনী আর দুর্ভাগিনী তোমার স্ত্রী—"

ব্যগ্রকণ্ঠে সত্য বলিয়া উঠিল, "চুপ কর মা, চুপ কর—সে সব কথা আর তুলো না। যা হয়ে গেছে তার আর সংশোধনের পথ নেই। প্রকাণ্ড একটা জুয়াচুরীর জাল পেতে ফেলেছি, এতে শুধু আমারই মুখ একেবারে কালি-মাখা হবে না, তোমার বাপ মা—এমন কি তোমরাও আর সমাজে মুখ দেখাতে পারবে না। লোকে স্পষ্ট মুখের সামনেই জুয়াচোর বলে ঘৃণা করে চলে যাবে। এখন তোমায় মিনতি করছি বীথি, তোমার হাত ধরে বলছি মা, মায়ের মত কাজ কর, সে সব কথা প্রকাশ কোর না, তা হলে বাধ্য হয়ে আমার আত্মহত্যা করতে হবে।"

বীথি আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, বলব না কাকা। তোমরা সব জেনে, সব বুঝে যখন ব্যাপারটাকে এমন করে তুলেছ, তখন আমার কোন কথা বলবার আর দরকার নেই। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করতে পার। আমায় একজন বলতে বলেছেন, তাই আমি আজ এই প্রীতি-উৎসবটা উপলক্ষ করে বলতে এসেছি।"

সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "কে বলতে বলেছেন ?"

বীথি উত্তর দিল, "ঠাকুর-দা।"

"কে, বাবা—?"

সত্য হাঁপাইয়া উঠিয়া বীথির পানে চাহিল।

বীথি শান্তভাবে বলিল, "হ্যাঁ, তিনিই।"

রুদ্ধকণ্ঠে সত্য বলিল, "তিনি এসেছেন ? আমার জন্যে—কলকাতায়—"

অধীরভাবে সে দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিল।

বীথি বলিল, "হ্যাঁ, তিনি এসেছেন, কিন্তু আমাদের কাছে নয়, আমি এখনও তাঁকে দেখতে পাই নি। তিনি প্রকাশ বাবুর কাছে এসেছেন, সেইখানেই আছেন। প্রকাশ বাবু আজ সকালে আমার কাছে এসে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে গেছেন। তাই তাঁর আদেশ পালন করতে এসেছি। নইলে এমন ভোগ-বিলাসের স্রোতে গা ভাসাতে আমি আসতুম না।"

তাহার কথাগুলা শেষের দিকটায় তীব্র হইয়াই বাজিয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সত্য সেদিকে মনোযোগ দেয় নাই। সে মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল,—পিতার শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিখানি তখন তাহার মনে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই কুটীরখানির কথাও মনে হইল। সে করিতেছে কি ? উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইয়া এই স্রোতের মুখে ক্ষুদ্র তৃণের মত সে ভাসিয়া চলিতেছে কোথায় ? ঐ স্রোতের মুখে বাধা দিয়া কূলে উঠিবার শক্তি তো তাহার ছিল, তবে সে ভাসিয়া চলিতেছে কেন ? তাহার আপনার যাহারা তাহাদের পিছনে ফেলিয়া আসিয়া সে এখন বরণ করিয়া লইতে যাইতেছে কাহাদের ? তাহার দাদার মত সেও নৃশংস হইবে, পিতাকে এমন আঘাত দিবে ?

আর সে—তাহার দেবী—

মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল তাহার সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানি—সেই সরলতাময় কথা, সরলতাময় ব্যবহার।

অভাগা—অভাগা—সত্যই কি সে বড় অভাগা ?

সেই দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে মন আবার সবল হইয়া উঠিতে চাহিল,—ধীরে ধীরে মনে জাগিয়া উঠিল ভবিষ্যতের ছবি। সে বড়লোক হইয়াছে, স্ত্রীকে নিজের আদর্শানুযায়ী গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, চিরদুঃখী পিতাকে সুখী করিতে সমর্থ হইয়াছে, পিতার মলিন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। চির-দুঃখিনী ভগিনী ভাইয়ের ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে স্ফীতা। না, সে তো তাহার দাদার মত হৃদয় পায় নাই,—সে পিতাকে, স্ত্রীকে ভগিনীকে সুখী করিবে, তাঁহাদের মুখে সুখের হাসি ফুটাইয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিবে।

সত্য ধীরে ধীরে মুখ তুলিল,—দেখিল, বীথি তখনও তাহার মুখ পানে তাকাইয়া আছে। সত্য জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা আমায় কিছু বলতে ব'লেছেন বীথি ?"

বীথি বলিল, "হ্যাঁ বলেছেন। বলেছেন, তাঁর সম্বন্ধে তোমায় এতটুকু ভাবতে হবে না, কিন্তু তোমার স্ত্রীর উপায় তিনি কি করবেন ? তাঁর জীবন কাল ফুরিয়ে এসেছে, তোমার স্ত্রীর এখনও সারাজীবন বাকি, তার কি হবে সেই কথাটা তিনি জানতে চান। এই প্রশ্নের উত্তর আজই তাঁকে দিয়ে আসতে হবে। তুমি কি উত্তর দেবে দাও।"

সত্য চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বীথি অনুনয়ের স্বরে বলিল, "তুমি একবার চল না বাসায়—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আবার ফিরে এসো,—চল না, কাকা, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি "

সত্য একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল, "না বীথি, আমি যাব না, আর এ মুখ বাবাকে দেখাব না।"

উত্তেজিত হইয়া বীথি বলিল, "যাবে না কাকা, বাপের প্রতি সন্তানের,—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য নেই?"

সত্য রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না বীথি, নেই। উচ্চ মোহে অন্ধ হয়ে সর্ব্বস্বই বিসর্জ্জন দিয়েছি,—আমার বলতে আর কেউ রইল না। বুঝতে পারছি; কিন্তু আর ফেরার পথ নেই,—সব পথ নিজের হাতে বন্ধ করে দিয়েছি। আমি যদি ফিরতে পারতুম, তা হলে বাবার কাছে যেতে পারতুম, আবার তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম। কিন্তু আমি তো ফিরতে পারব না বীথি, তবে আমি কি করে তাঁর সামনে যাব? না, আমি যাব না। আমার যা হয় হোক, আমি ফিরব না, আমি এগিয়েই চলব। মা কল্যাণী, তুমি যে আমার কল্যাণের জন্য এতটা করছ, এর প্রতিদানে আমি যে কি দিতে পারব, তা ভেবে পাচ্ছি নে।"

বীথির হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া সত্য ছলছল নেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। হতভাগ্য কাকার মনের ব্যথা বীথি বুঝিতে পারিতেছিল,—ব্যথিত ভাবে সে শুধু চাহিয়া রহিল।

একটুখানি পরে ব্যথিত সুরে বলিল, "তবে আর কি বলব কাকা, বলবার মত আর কিছুই নেই। আমি এইবার পেছন দরজা দিয়ে বাড়ী চলে যাব, তুমি আমার শোফারকে গাড়ীখানা পেছন দরজায় আনবার আদেশ দাও গিয়ে। আমি এখানে আনন্দে যোগ দিতে আসি নি, এ রকম অসার আনন্দ আমি অন্তর দিয়ে ঘৃণা করি, তা তুমি জানো। আমার যাওয়া এখন কেউ জানতে পারবে না, সবাই আনন্দে মত্ত হয়ে আছে। একটা কথার উত্তর দিয়ে যাও,—কাকিমার কি হবে?—আমি সে কথার কি উত্তর দেব? তুমি তো ইলাদিকে বিয়ে করছ। তার পর কয় বছরের জন্যে বিলেত চলে যাবে। ফিরে এসে ত সে বিয়ের কথা আর প্রকাশ করতে পারবে না,—সে কথা যেমন গোপন আছে তেমনি গোপনেই থাকবে। তাঁর আজীবন কি করে কাটবে, কি হবে—"

সত্য ব্যাকুলভাবে বীথির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, "সে ব্যবস্থা তুমিই করবে মা।"

"আমি করব কাকা,—আমি—?"

সত্য বলিল, "হ্যাঁ মা, তুমিই করবে। কল্যাণী মা আমার—আমায় এ লজ্জা হতে মুক্ত করতে একমাত্র আজ তুমি। তুমিই সব দিক দেখবে মা, তোমার হাতে আমি সব ভার দিচ্ছি। আমার আশা ছেড়ে দাও, মনে কর—তোমার কাকা নেই, তোমার কাকার শেষ কথা তুমি রাখছ। সে এই দুনিয়ায় বড় একা, বড় অভাগার সে নিজের দ্বারা যতদূর প্রতারিত হয়েছে, তা মনে করে তাকে এতটুকু দয়া করো।"

ধীরে ধীরে বীথির হাত দুখানা ছাড়িয়া দিয়া সত্য বাহির হইয়া গেল।

খানিক পরে দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, পিছনের দরজায় মোটর আসিয়াছে।

কাহারও সহিত দেখা না করিয়া ও কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বীথি পিছনের দরজা দিয়া মোটরে গিয়া উঠিল। সে যে কার্য্যভার বহন করিয়া আসিয়াছিল, তাহা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

৯

ভবানী নিজেই যে কথা প্রকাশ করিতে প্রকাশকে নিষেধ করিয়াছিল, সেই কথা নিজেই পিতাকে এক দিন বলিয়া ফেলিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সে এ কথাটা গোপনে রাখিতে পারিল না। এখনও সত্য বিলাতে যায় নাই; পিতাকে এখনও যদি তাহার সামনে পাঠাইতে পারা যায়, হয় তো সে ফিরিতে পারে. পিতাকে দেখিয়া তাহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে, কারণ জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সে পিতাকেই ভালবাসে।

সংবাদটা পাইবামাত্র উপেন্দ্রনাথ পাগলের মত হইয়া গেলেন; তখনই প্রকাশের সহিত তিনি কলিকাতায় রওনা হইলেন। সেদিন প্রকাশকে সঙ্গে লইয়া তিনি কেবল মাত্র সত্যকে ফিরাইবার জন্যই ধর্ম্মত্যাগী জ্যেষ্ঠপুত্রের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু দ্বারবান এই দরিদ্র বৃদ্ধকে তাড়াইয়া দিল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি প্রকাশের সহিত ফিরিলেন। প্রকাশ বলিল, "আপনার কথা বীথিকে জানালে সে একটা কোন উপায় করতে পারত জ্যেঠামশাই।"

উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন "বীথি কে?"

তাঁহার মাথার গোলমাল দেখিয়া প্রকাশ ব্যথা পাইল, বলিল, "বীথি আপনার পৌত্রী, জিতেন্দ্রবাবুর মেয়ে।"

ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সে দরকার নেই প্রকাশ, আমি আমার ছেলেকে কাছে ফিরে পাওয়ার জন্তে কারও সাহায্য চাই নে।"

প্রকাশ বলিল, "আপনি বীথিকে যেমন ভাবছেন জ্যেঠামশাই, সে বাস্তবিক তেমন নয়। বীথি তার দাদা-মশাইয়ের কাছে থাকে, এঁদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আপনি বীথিকে চেনেন নি জ্যেঠামশাই, একবার তাকে দেখলে আপনি আর কখনও ভুলতে পারবেন না। ভারি সরল মন তার। ঠিক জলে ধোওয়া যুঁই ফুলটীর মতই সে নির্ম্মল, দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র। আপনি বলুন বা নাই বলুন, আমি বীথিকে এ খবর দিতে চললুম, তাকে দিয়েই আমি সত্যর খবর আনাব।"

বীথিকে প্রকাশই খবর দিয়াছিল—তাহার ঠাকুরদা আসিয়াছেন, তিনি সত্যকে ফিরাইয়া লইতে চান। বীথিকে এই উপকারটী করিতেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

বীথি বলিয়া গিয়াছিল, বৈকালে সে সত্যর খবর প্রকাশকে দিবে; প্রকাশ সেই কথা অনুসারে বৈকাল হইতেই বীথির সহিত দেখা করিতে আসিল।

বীথি ভাবিতেছিল এ সংবাদটা সে কেমন করিয়া প্রকাশকে দিবে; সে চুপ করিয়া খোলা ছাদের ধারে রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আরক্তিম পশ্চিমাকাশের পানে তাকাইয়া কেবল সেই ভাবনাই করিতেছিল—সত্য যে এক ঘণ্টার জন্তও আসিল না এই নিদারুণ কথাটা সে বলিবে কি করিয়া?

দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—"কাল সকালে যে বাবুটি দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি আবার এসেছেন।"

বীথি নামিয়া আসিল। সুবিনয় বাবু তখন বাড়ী ছিলেন না, প্রকাশ একা বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল।

বীথি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল, বিষণ্ণমুখে বলিল, "এই যে আপনি এসেছেন কাকা, আমি আপনার আদেশ পালন করতে কাল রাত্রে কাকার কাছে গিয়েছিলুম।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রকাশ বলিল, "কি হলো, সত্য কি বললে?"

বীথি একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "তিনি আসবেন না।"

প্রকাশ বলিল, "কি রকম?"

বীথি একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তিনি বললেন —আমার আশা ছেড়ে দাও, আমি মনুষ্যত্ব হারিয়েছি।"

প্রকাশ শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "তার বুড়ো বাপের কথা বলেছিলে?"

বীথি বলিল, "বলেছিলুম?"

প্রকাশ বলিল, "তার স্ত্রীর কথা—"

বীথি বলিল, "কাকিমার ভার আমার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।"

প্রকাশ বিস্মিতকণ্ঠে বলিল, "তোমার ওপরে—?"

বীথি বলিল, "হ্যাঁ, আমার ওপরে।"

প্রকাশ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "পাগলের পাগলামী। তার নিজের রোখটাই বজায় রইল, উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্রোতে তার বুড়ো বাপ, স্ত্রী, বোন সব ভেসে গেল।"

বীথি বলিল, "কাল কাকার বিয়ে হবে কাকা।"

প্রকাশ অসম্ভব রকম চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল,—"আবার বিয়ে? তার স্ত্রী আছে জেনে শুনেও—"

বীথি ধীরকণ্ঠে বলিল, "কেউ তা জানে না কাকা। আমার বাপ মা চারদিক দেখে শুনে তবে কাজে হাত দিয়েছেন। এতে কাকারই শুধু দোষ দেখেন না, আমার বাবাই এতে সম্পূর্ণ দোষী। কাকার হৃদয়ে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ রোপণ করেছেন তিনিই; সেই বীজে জলসিঞ্চন করে বৃক্ষে পরিণত করেছেনও তিনি। কাকা সত্যিই বড় হতভাগা, আমি কাকার বুকের ব্যথা বুঝেছি। কাকা এমন জায়গায় আছেন, যেখান হতে উদ্ধার পেতে হলে আত্মহত্যা করা ছাড়া আর উপায় নেই। ভদ্র-সন্তান মরবে তবু আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে পারে না। এখন তাঁর বিয়ের ঠিক হয়েছে, জাহাজের টিকিট নেওয়া হয়েছে; যে যেখানে আছে সবাই জানে এই মাসের শেষ তারিখে তিনি বিলাত যাত্রা করবেন। এখন যদি প্রকাশ হয় তিনি বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী এখনও বর্ত্তমান, তা হলে সেটা কি রকম হবে বিবেচনা করে দেখুন। লোকের কাছে তিনি আর মুখ দেখাতে পারবেন কি?"

প্রকাশ একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "তুমি শুধু তোমার

কাকার দিকটাই দেখছো বীথি। তোমার ঠাকুরদার কথা আমি ধরছি নে, বুড়ো মানুষ,—ছেলের এ অবহেলা, এ আঘাত তিনি সইতে পারবেন না; বেশ বুঝতে পারছি তিনি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। কিন্তু তার সেই দুর্ভাগিনী স্ত্রী,—তুমি তার ভার নিলেও—তার জীবনটা কি রকম ব্যর্থ করে দেওয়া হল, সেটা একবার ভেবে দেখেছ কি?"

তেমনি শান্তকণ্ঠে বীথি বলিল, "ভেবে দেখেছি কাকা। কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী কি স্বামীকে সকল রকম অপমান হতে বাঁচাবার জন্যে এই ত্যাগটা স্বীকার করতে পারবেন না? আমার মনে হচ্ছে, সব কথা শুনলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, এই ত্যাগটুকু মেনে নেবেন। অবশ্য চিরকালের জন্যে আমি বলছি নে, কাকা বিলেত হতে ফিরে এলে আমিই একটা গোল করে দেব। এর ফলে তিনি আবার তাঁর স্থান প্রাপ্ত হবেন। ইলাদি' সে রকম স্বার্থপর মেয়ে নয়। তার মন বড় উদার। শিক্ষা তার মনকে সঙ্কুচিত করে নি। সব কথা যখন সে শুনবে—জেনো, নিশ্চয়ই সে ক্ষমা করবে,—অর্দ্ধেক যায়গা সে ছেড়ে দেবে। আপনি এই কথাটা তাঁকে বুঝিয়ে বলতে পারবেন না কাকা?"

প্রকাশ বলিল, "কেমন করে বলব মা, আমি তাঁর সঙ্গে কোন দিনই কথা বলি নি। আজ এই নিদারুণ কথাটা যে আমাকেই বলতে হবে, তা আমি পারব না বীথি। সত্য তোমার ওপরে ভার দিয়েছে,—তোমার কর্ত্তব্য তুমি যে রকমেই পার পালন কোরো,—আমায় রেহাই দাও।"

বীথি একটু ভাবিয়া বলিল, "বেশ কাকা, আমিই কাকিমাকে সব কথা পত্রে লিখে জানাব। ঠাকুরদা এখন দু'দিন এখানে থাকবেন কি কাকা?"

প্রকাশ মলিন হাসিয়া বলিল, "আর কিসের জন্য থাকবেন মা? যে জন্যে এসেছিলেন তার কিছুই হ'ল না, সম্ভব আজ রাত্রেই তিনি চলে যাবেন।"

বীথি ব্যস্তভাবে বলিল, "আজ রাত্রেই যাবেন? আমাদের বাড়ীতে একবার আসবেন না?"

প্রকাশ শুধু মাথা নাড়িল।

ব্যথিত কণ্ঠে বীথি বলিল, "বুঝেছি, একা বাবার জন্যে আমরা সকলেই তাঁর কাছে অপরাধী হয়েছি। সেই জন্যে তিনি আমাদের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে চান না। কাকা, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব, আমায় নিয়ে যাবেন কি?"

প্রকাশ বিস্মিত হইয়া বীথির পানে তাকাইল,—"কোথায়?"

"আমি একবার ঠাকুরদাকে দেখব। কখনও তাঁকে দেখি নি; পরের মুখে তাঁর যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তাতে আমার অন্তর তৃপ্ত হয় নি, জানার ইচ্ছা আরও বেড়ে উঠেছে। তাই আমি তাঁকে দেখতে চাই। এখানে—আমার দরজায় এসে তিনি ফিরে যাবেন, দেখার প্রবল বাসনা থাকতেও আমি তাঁকে দেখতে পাব না, তাও কি হয় কাকা? চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাব, আমার গাড়ী আনতে বলে দেই।"

সে ঘণ্টা বাজাইতেই ভৃত্য আসিয়া দাঁড়াইল। বীথি তাহাকে গাড়ীর কথা বলিয়া দিল।

প্রকাশকে একটু বসিতে বলিয়া সে দিদিমার অনুমতি লইবার জন্য বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

সে ঠাকুরদার সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেছে শুনিয়া সরলা খুব খুসি হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "পারিস তো বুড়োকে একেবারে টেনে নিয়ে আসিস্ বীথি। বলিস,—এ হিন্দু বামনের বাড়ী, আমি নিজে তাঁকে রেঁধে খাওয়াব।"

বীথি হাসিয়া বলিল, "তুমি বামন দিদিমা, আমি কি?"

স্নেহমাখা হাতখানা তাহার মাথার উপর রাখিয়া সরলা বলিলেন, "তা হলে তুইও বামনবীথি।"

ঠাকুরদাকে আনিবার চেষ্টা করিবে বলিয়া বীথি ফিরিল। প্রকাশকে সঙ্গে লইয়া মোটরে উঠিয়া পড়িল। মেসের এক কোণে একটা ছোট স্যাঁৎসেঁতে অন্ধকার-প্রায় ঘরে মলিন ভাবে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তাহারি নিকটে একটা মাদুরে বসিয়া উপেন্দ্রনাথ তামাক টানিতেছিলেন। দোটানার মাঝখানে পড়িয়া মনটা ভারি খারাপ ছিল। ললাটে চিন্তার রেখা কয়টা স্পষ্টভাবে জাগিয়াছিল।

বীথি পিছনে ছিল, সে বারাণ্ডায় দাঁড়াইল,—প্রকাশ একেবারে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

ব্যগ্র ভাবে মুখ হইতে হুঁকা সরাইয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন "এই যে প্রকাশ, আমি এতক্ষণ ধ'রে তোমার কথাই ভাবছিলুম।—তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমায়—রাত্রে যে ট্রেণখানা গোপালপুর গিয়ে পৌঁছায়, সেইখানা

ধরিয়ে দিতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আর দেরি করলে চলবে না।"

মলিন দীপালোক দরজার উপর দণ্ডায়মানা কৃশা সুন্দরীর উপর গিয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ তরুণীর উপর দৃষ্টি পড়িতেই বৃদ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

প্রকাশ দেয়ালের আলোটা ক্ষিপ্রহস্তে জ্বালিয়া দিতেই উজ্জ্বল আলো চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। বীথি ধীরপদে অগ্রসর হইয়া আসিয়া ঠাকুরদার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া,—তিনি সরিয়া যাইবার আগেই তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। বৃদ্ধের বিস্ময়ভরা মুখখানার পানে চাহিয়া প্রকাশ বলিল,—"এই বীথি, আপনার পৌত্রী।"

"আমার পৌত্রী, আমার পৌত্রী—অ্যাঁ, প্রকাশ—"

আত্মহারা বৃদ্ধ হাঁ করিয়া বীথির অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন।

বীথি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ দাদু, আমি আপনারই পৌত্রী বীথি।"

উপেন্দ্রনাথ মুগ্ধ বিস্ময়ভরা দৃষ্টি একবার তাহার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুলাইয়া লইলেন। কই, যেমন শুনিয়াছিলেন এ তো তেমন নয়। শিক্ষিতা মেয়ে বলিতে দেশের লোকে চমকাইয়া উঠে, কারণ শিক্ষিতা মেয়ে বলিতে সেই রূপ রমণীই বুঝাইয়া থাকে যাহারা ফ্যাসান-দুরস্ত, খালি পা করিলে সর্দ্দি ধরে, নোংরামো সহ্য করিতে পারে না; তাই অশিক্ষিতের সহিত কথা কহিতে ঘৃণা বোধ করে। কই, বীথির পায়ে জুতা নাই, পরণে গাউন নাই, মাথায় টুপি নাই, হাতে ষ্টিক নাই। তাঁহার ঘরের মেয়ের যেমন সাদাসিদা সাজ তিনি দেখিয়া আসিতেছেন, যে সাজ দেখিতে তাঁহার চক্ষু অভ্যস্ত, তিনি সেই সাজই বীথির গায়ে দেখিতে পাইলেন।

"ও আলোতে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনে প্রকাশ, কাছে—আমার চোখের সামনে আলো না ধরলে কিছু দেখতে পাইনে যে। আলোটা সামনে ধর, আমি একটু ভাল করে দেখে নেই।"

প্রকাশ একটু হাসিয়া একটা বাতি ধরাইয়া সম্মুখে রাখিল। বীথি এবার হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "ও রকম করে কি দেখছেন ঠাকুরদা?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দেখছি দিদি, তুমি তাদের না আমার।"

চাপা সুরে বীথি বলিল, "আমি কারও নই ঠাকুরদা, আমি আমার নিজের। স্বেচ্ছায় আপনার হাতে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে আনন্দপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করব বলেই ছুটে এসেছি। তাদের হলে আমার তো এমন ঔৎসুক্য জেগে উঠত না ঠাকুরদা। বাবার সকল অপরাধের বোঝা আমাদেরও যেন বইতে না হয়, আমি এইটুকুই আপনার কাছে প্রার্থনা করতে এসেছি ঠাকুরদা। মনে করুন, আমি আপনার নাতনি, আপনি আমার ঠাকুরদা। আমায় স্নেহের চোখে দেখুন, আপনার ক্ষমাপূর্ণ ভালবাসা আমায় উপভোগ করতে দিন।"

তাহার কণ্ঠে বেদনা বাজিয়া উঠিতেছিল।

এমন পৌত্রী তাঁহার,—তিনি তাহারই ঠাকুরদা। হায় রে, এ রত্ন এত দিন কোথায় ছিল? অন্ধকার শূন্য গৃহ হাহাকার করিতেছে,—সেখানে বাজিয়া উঠে শুধু রোদনের সুর। সে গৃহ যে হাসিতে ভরিয়া উঠার কথা,—জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল থাকিবার কথা। এ যে তাঁহার পৌত্রী, জোরের জিনিস,—বড় আদরে বুকের মধ্যে টানিয়া লইবার ধন, অবহেলা বা ঘৃণা করিয়া দূরে রাখিবার জিনিস এ তো নয়।

উপেন্দ্রনাথের দুইটী চোখের উগ্র দৃষ্টি কোমলতায় ভরিয়া গেল, চোখের কোণে অনেকখানি জল আসিয়া দাঁড়াইল; রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তাই দেখছি দিদি, তুমি আমারই বটে, ওদের নও। তোমায় তোমার দিদিমা যে নিজের বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে আছেন, নিজের শিক্ষা দিয়ে তোমার অন্তর ভরে দিচ্ছেন, তোমায় ওদের স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে ছেড়ে দেন নি—এতে যে আমি কতদূর কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে, তা বলতে পারি নে। আজ এই মুহূর্ত্তে আমি যে তৃপ্তিটুকু পথচলার মাঝে কুড়িয়ে পেলুম, এমন তৃপ্তি জীবনে কখনও লাভ করি নি। আজ মনে হচ্ছে, আমার মনের ফাঁকগুলি সব ভরে উঠেছে, আমার মনে কোনও ব্যথা নেই। আমার গভীর দুঃখে সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমি সব হারিয়ে আজ তোমায় পেলুম,—এ আনন্দ রাখার মত যায়গা আমার নেই। বড় সাধে বড় আশায় ঘর সাজিয়েছিলুম দিদি। তখন ভুলেও ভাবি নি—এক নিমেষে একটা বাতাসের ধাক্কায় এ ঘর ভেঙ্গে পড়বে। নদীর যে ধারটা ক্রমাগত ধাক্কায়

ভেঙেই পড়ছে, তবু সেই ধারটা দুই হাতে আঁকড়ে ধরে ছিলুম। এখন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছি—বাতাস এল—ঘর আমার ভেঙ্গে পড়েছে, নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছি, ঢেউয়ের তালে পায়ের তলা হতে মাটী খসেই পড়ছে। দিদিমনি, সব যাচ্ছে, আমায় আছড়ে ওপরে তুলে দিয়ে যাচ্ছে, আমায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। এই যাওয়ার মাঝে একটুখানি তবু পেয়েছি, সে বড় শান্তি। আশীর্ব্বাদ করছি সুখিনী হও। তোমার এই বুড়ো ঠাকুরদার আশীর্ব্বাদ তোমার পথের সকল বাধা সরিয়ে দিয়ে সে পথ সরল সুগম করে তুলুক।"

গভীর ভাবের আবেশে তিনি নীরব হইয়া গেলেন। প্রকাশ এই সময়ে আস্তে আস্তে বলিল, "সত্য এল না জ্যেঠামশাই।"

উপেন্দ্রনাথ উদাসসুরে বলিলেন, "দরকার নেই প্রকাশ, আর তার আমায় দরকার নেই। আমার বেদনা অনন্ত, সে কেন বেদনার অংশ নিতে আসবে? এত দিন পথ চেনে নি, তাই আমার কাছে থাকতে হয়েছে তাকে, আমার বেদনার অংশ নিতে হয়েছে। এখন পথ পেয়েছে, সুখের সন্ধানে সে চলেছে,—চলে যাক। আমি কি কিছুই বুঝি নি বাবা, সব বুঝেছি। প্রথম যখন ভবানীর মুখে এ কথা শুনলুম, মনে হল আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, আমি মূর্চ্ছিতের মত মাটিতে লুটিয়ে পড়লুম। সে কতক্ষণ—আমি হো হো করে হেসে উঠলুম—কারণ সেই মুহূর্ত্তে আমার অন্তরে সত্য জ্ঞান জেগে উঠল। সে আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে। সে জানালে—এ জগতে কে কার? আমি নিজেই তো আমার নই, নিজেকেই নিজে যখন বিশ্বাস করতে পারি নে, তখন আর বিশ্বাস করব কাকে? মনে হল—

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।

নিজের মনকে নিজে প্রবোধ দিতে পারলুম, পাগলী মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিতে পারলুম না। বউমার মলিন মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠল,—আমি আর থাকতে পারলুম না, মনে হল—যদি ফিরাতে পারি। আমার জন্যে নয়—দুর্ভাগিনী বউমার জন্যে আমি ছুটে এসেছিলুম। খুব সমাদর লাভ করেছি প্রকাশ, সকালেই আমি সকল আশা ছেড়ে দিয়েছি। তুমি আমার না জানিয়ে আবার তাকে ফিরাতে গিয়াছিলে, ছিঃ, কাজটা তোমার উচিত হয় নি। বাপের মাথা ছেলের কাছে একেবারে নত হয়ে পড়ল,—আমার সম্মান কতটা নষ্ট হয়ে গেল, তা এখনও বুঝতে পারছ না।"

প্রকাশ অবনতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল,—বীথির বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। হায় রে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সত্য কি মানুষ! এমন বাপের বুকে সে ব্যথা দিল?

"ঠাকুর দা—"

উপেন্দ্রনাথ নিজের ব্যথায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিলেন; আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কেন দিদি?"

বীথি ঠাকুরদার শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া অনুনয়ের সুরে বলিল, "আমাদের বাড়ী কি একবার যাবেন না ঠাকুরদা? দিদিমা আপনাকে একটীবার নিয়ে যাওয়ার জন্যে আমাকে অনেক করে বলে দিয়েছেন।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তোমার দিদিমাকে বলো দিদি, তাঁর অনুরোধ আমি রাখতে পারলুম না; এ জন্যে যেন তিনি আমায় ক্ষমা করেন। তাঁর দয়ার কথা আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর দয়াতেই আজ আমি তোমার দেখা পেয়েছি। এই পাওয়ার স্মৃতি আমার মনে আমরণ কাল জেগে থাকবে। যারা আমার ঘরে ছিল তারা বাইরে গেল, কোথায় ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু তুমি দিদি বাইরে থেকে আপনাকে গুটিয়ে এনে আমার বুকের মধ্যে নিজেকে বন্দিনী করলে। দিদি, তোমার দিদিমাকে বলো, বাড়ীতে অল্পবয়স্কা দুটি মেয়ে রেখে এসেছি, তাদের দেখতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমি মরে গেলে তাদের অদৃষ্টে যা ঘটবার তাই ঘটবে, যতক্ষণ বেঁচে আছি তাদের জন্যে আমায় ভূতের বেগার খাটতেই হবে। তাদের রেখে কোথাও গিয়ে একটা দিন থাকবার যো আমার নেই। আঃ, জীবনের এই শেষকালটায় এই জোয়াল ঘাড়ে—"

তাঁহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

বীথি তাহার মুখের উপর দুটি চোখের কাতর দৃষ্টি মেলিয়া রাখিল। সে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

প্রকাশ বলিল, "আজই যান যদি—তবে এখনই রওনা হওয়া দরকার।"

সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সময় হয়েছে? তবে দিদি—"

"কেন দাদা?"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমায় যে এখনই যেতে হবে! তোমায় পেয়েও তো বেশীক্ষণ রাখতে পারলুম না, বড় শীগগিরই ছেড়ে দিতে হলো। আর যে তোমায় আমায় দেখা হবে সে আশা নেই, হতভাগা ঠাকুরদার কথা মনে করো।"

বীথি বলিল, "আপনি আর আসবেন না?"

হাসিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর না দিদি,—আর আসব না। যে কাজের জন্যে আসা তা মিটে গেছে।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বীথি উঠিয়া দাঁড়াইল,—"হেঁটেই ষ্টেসনে যাবেন ঠাকুরদা?"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তা বই কি দিদি? আমরা এত বুড়ো হলেও বেশ হাঁটতে পারি। এটা ছোটবেলা হতে অভ্যাসের ফল কি না। হাঁটতে আমার ভাল লাগে, গাড়ীর মধ্যে যেন হাঁপিয়ে উঠতে হয়।"

বিদায় লইয়া বীথি বাহির হইল।

প্রকাশের পানে চাহিয়া বিষাদপূর্ণ কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "যাওয়ার বেলায় আমায় এ মায়ার পুতুল কোথা হতে এনে দিলে প্রকাশ? যারা আছে তাদের জন্যেই এখন আমি পাগল, একে আবার আনলে কেন? আমার মনে আবার একটা বেদনার ছাপ দিতে, নতুন একটা দুঃখপূর্ণ সুখের আস্বাদ দিতে কেন একে আনলে প্রকাশ? আমার মনে এই কথাটাই জাগছে—এমন নাতনী থাকতে আমি আজ তার স্নেহ হতে বঞ্চিত। আমার মত সুখের সংসার তো কারও নেই প্রকাশ, আমার দুই ছেলে, দুই পুত্রবধূ, আমার নাতি নাতিনী—সব আছে—তবু আজ আমার কেউ নেই, সব থাকতে আমি সর্ব্বস্বহারা। এই গভীর অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক বিজলী প্রকাশ করে এ অন্ধকারের গাঢ়ত্ব বেশী করে তুলতে একে কেন আমার কাছে আনলে প্রকাশ?"

তাঁহার কোটর-প্রবিষ্ট চোখ দিয়া দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

উৎকল-অভিযান ও খুর্দ্দা-বিদ্রোহ

শ্রীহরিচরণ বসু

(২)

খুর্দ্দা-বিদ্রোহ

উড়িষ্যা প্রদেশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাজ্য আছে। তন্মধ্যে আয়তনে ও প্রাধান্যে খুর্দ্দা রাজ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। খুর্দ্দা হইতে পুরী পর্য্যন্ত ভূভাগ ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ কতকগুলি জমিদারী লইয়া এই হিন্দু-রাজ্য গঠিত হইয়াছে। মুসলমানগণ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হইলেও খুর্দ্দার হিন্দু-রাজত্বের লোপ হয় নাই। এই খুর্দ্দার রাজগণ প্রবল প্রতাপান্বিত গজপতি-বংশের বংশধর বলিয়া লোকে ইহাদিগকে অত্যন্ত ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে। এই গজপতি-বংশ উড়িষ্যার সকল রাজাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ইঁহারা বংশানুক্রমে পুরীর ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির সম্মার্জ্জন ও তাহার অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন। এই হেতু ইঁহাদের মর্য্যাদাও অনেক অধিক। পুরীর বর্ত্তমান রাজা,—পুরীর জগন্নাথ দেব অপেক্ষা যাঁহার অধিক সম্মান, যাঁহাকে উড়িয়াবাসীগণ "চলন্তি বিষ্ণু" বলিয়া জ্ঞান করে,—তিনি সেই খুর্দ্দা রাজ্যের বংশধর।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ১৫৭৪ খৃঃ অঃ মোগলগণ পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া উড়িষ্যার রাজা হইলে, মোগল সম্রাট আকবর এই উড়িষ্যা প্রদেশ বন্দোবস্ত জন্য তাঁহার সেনাপতি রাজা জয়সিংহ ও রাজা টোডর মল্লকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন। তাঁহারা ১৫৮০ খৃঃ অঃ এখানে আসিয়া উড়িষ্যার বন্দোবস্ত করেন। সেই সময় তাঁহারা উড়িষ্যার রাজ্যচ্যুত হিন্দু রাজ-পরিবারের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাদের সম্মান ও মর্য্যাদানুযায়ী জীবন-যাপনের ব্যবস্থা করা ধর্ম্মসঙ্গত ও ন্যায়ানুমোদিত মনে করেন। তখন তাঁহারা পরাজিত ও নিহত রাজা মুকুন্দ দেবের পুত্র রামচন্দ্র

দেবকে আনয়ন করিয়া খুর্দ্দা মহল ও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত লিম্বি, রহং, সেরাই ও চৌবিশ কুড—এই চারি পরগণার জমিদারী প্রদান করেন; এবং তাঁহাকে উড়িষ্যার মহারাজ ও খুর্দ্দার জমিদার বলিয়া অভিহিত করেন। (১)

খুর্দ্দার রাজগণ নির্ব্বিবাদে মোগল-বাদশাহ-প্রদত্ত এই জমিদারী ১৭৬১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। এই সময় বীরসিংহ দেব খুর্দ্দার রাজা ছিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অঃ মারহাট্টাগণ উড়িষ্যা প্রদেশ অধিকার করেন, এবং ১৭৬১ খৃঃ অঃ মারহাট্টা সুবেদার শিউভট সাণ্ডিয়া উক্ত চারি পরগণা খুর্দ্দা তালুক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন; কিন্তু খুর্দ্দা তালুক ১৮০৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজার অধিকারে থাকে। (২)

বীরসিংহ দেবের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র দ্বিতীয় দিব্যসিংহ দেব খুর্দ্দার রাজা হন। ১৭৯৮ খৃঃ অঃ দিব্যসিংহ দেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় মুকুন্দ দেব উড়িষ্যার ও খুর্দ্দার রাজা হন। ইঁহারই রাজত্বকালে অর্থাৎ ১৮০৩ খৃঃ অঃ ইংরাজ-রাজ উড়িষ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময় মুকুন্দ দেব মনে করিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-রাজ তাঁহার প্রতি ন্যায়-বিচার করিয়া উপরিউক্ত চারি পরগণা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই আশায় আশান্বিত হইয়া, তিনি, সেনাপতি হারকোর্ট সাহেব কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং উক্ত চারি পরগণা পুনঃ-প্রাপ্তির প্রস্তাব করেন। কিন্তু কমিশনরগণ রাজার এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা বলেন যে, ইংরাজ-রাজ মারহাট্টাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়া উৎকল প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা মারহাট্টাদের ছিল, ইংরাজদেরও তাহাই থাকিবে, ইহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে কমিশনরগণ প্রস্তুত নহেন। কমিশনরদের এই উক্তি রাজার প্রীতিকর না হইলেও তিনি প্রকাশ্যে উহাতে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু অন্তরে ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন; এবং কি উপায়ে ইহার প্রতিশোধ লইবেন তাহার সুযোগ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন তিনি দেখিলেন যে, যুদ্ধার্থ আগত সমস্ত ইংরাজ সৈন্য মান্দ্রাজে পুনঃ প্রেরিত হইয়াছে, তখন তিনি প্রকাশ্যে ইংরাজদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৮০৪ খৃঃ অঃ জুলাই মাসে রাজা একজন গোমস্তাকে মোগলবন্দীর অন্তর্গত বাটগ্রামের রাজস্ব আদায় জন্য প্রেরণ করিলেন। এই গ্রাম রাজার অধিকারভুক্ত নহে জানিয়া গ্রামবাসীগণ উক্ত গোমস্তাকে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। কমিশনরগণও রাজার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ আর না হয়, তজ্জন্য সতর্ক করিয়া রাজাকে এক পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু রাজা ইহা গ্রাহ্য না করিয়া পুনরায় অক্টোবর মাসে একদল পাইক বরকন্দাজকে পিপ্‌লীতে প্রেরণ করেন। ইহারা পিপ্‌লী ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল লুণ্ঠন ও গবাদি পশু সকল ধৃত করিয়া লইয়া যায়। এই সংবাদ অবগত হইয়া কটক হইতে একদল সৈন্য খুর্দ্দায় প্রেরিত হয়। এই সৈনিক দল পিপ্‌লী হইতে রাজার পাইকদিগকে দূরীভূত করিয়া দিলে, তাহারা খুর্দ্দার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই দুর্গ খুর্দ্দা উপত্যকার পূর্ব্বাংশে পাহাড়ের তলদেশে অবস্থিত। এই দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে। ইংরাজ-সৈন্য আসিয়া এই দুর্গ অবরোধ করে, এবং তিন সপ্তাহ পরে তাহা অধিকার করিয়া লয়। রাজা কয়েকজন অনুচর সহ পলায়ন করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে আত্ম-সমর্পণ করিলে, তাঁহাকে ১৮০৪ খৃঃ অঃ ৪ নবেম্বর কটক দুর্গে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, এবং তাঁহার দুর্গ ভগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া মেজর ফ্লেচরকে খুর্দ্দা প্রদেশ বন্দোবস্ত জন্য প্রেরণ করা হয়। অল্প দিন পরে রাজাকেও মুক্তি প্রদান করা হয়।

মারহাট্টাদের রাজত্বকালে উড়িষ্যার রাজগণ সামান্য মাত্র রাজস্ব প্রদান করিয়া আপন আপন দেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। উড়িষ্যার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, খুর্দ্দার রাজা কেবল মাত্র পনর হাজার টাকা রাজস্ব প্রদান করিতেন। (৩) ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই রাজস্ব এক লক্ষ টাকা ধার্য্য করেন, এবং পরবর্ত্তী বন্দোবস্তে উহা বৃদ্ধি করিয়া ১,৩৮,০০০৲ টাকা ধার্য্য হয়। (৪) রাজা উহা প্রদান করিতে অসম্মত হন। পরিশেষে রাজা ৩০,০০০৲ টাকা

(১) Vide Toynbee's Account of Orissa.

(২) Toynbee's Account of Orissa.

(৩) Toynbee's Account of Orissa.

(৪) Toynbee's Account of Orissa.

দিতে সম্মত হইলেও, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উহা গ্রহণ না করিয়া, তাঁহাদিগের বংশানুগত কৌলিক কার্য্য জগন্নাথ দেবের মন্দির সম্মার্জ্জন ও মন্দিরের তত্ত্বাবধান জন্য পুরীতে বাস করিবার অনুমতি দিয়া তথায় তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন; এবং তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য খুর্দ্দা ষ্টেট হইতে মাসিক ২৫০০৲ বৃত্তি নির্দ্ধারিত হয়।

খুর্দ্দায় রাজস্ব আদায় জন্য ইংরাজ অফিসারগণ যেরূপ উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাতে দেশ নিঃস্ব এবং বহু প্রজা সর্ব্বস্বান্ত ও আপন আপন পৈতৃক বাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। ইহার ফলে দেশময় অশান্তি ও বিদ্বেষ-চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল এবং ক্রমে বিদ্রোহ-বহ্নিও প্রধূমিত হইয়া উঠিল। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, উড়িষ্যা অধিকার করিয়া গবর্ণমেণ্ট অনেক বাঙ্গালী আম্‌লা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের অত্যাচার এবং প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক উড়িয়াদের জমিদারী খরিদ ও লুণ্ঠনই খুর্দ্দা বিদ্রোহের প্রধান কারণ। ফল কথা—এই সময় কটকে বাঙ্গালীদের প্রাধান্য থাকায়, এবং তাহারা নীলামে উড়িয়াদের জমিদারী সমস্ত খরিদ করায়, উড়িষ্যাবাসীদের অত্যন্ত হিংসা হয়, ইহা সত্য। কিন্তু সেই হেতু বাঙ্গালী-প্রাধান্য বা তাহাদের দ্বারা জমিদারী খরিদ যে বিদ্রোহের কারণ, ইহা কখনই বলা যায় না।

খুর্দ্দায় এক শ্রেণীর লোক ছিল, এবং এখনও অনেক আছে, ইহারা "পাইক" নামে খ্যাত। লাঠি, তরবারি, তীর-ধনুক ও বর্শা লইয়া যুদ্ধে ইহারা সিদ্ধহস্ত। দুর্গম পার্ব্বতীয় প্রদেশে ইহারা অজেয়। ইহারা রাজার নিকট হইতে বিনা করে জমি প্রাপ্ত হইত, এবং তাহাই নিজ হস্তে চাষ আবাদ করিয়া পরিবারের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিত। এই সমস্ত জমিকে চাক্‌রান জমি বলিত। ইহারা রাজার নিকট হইতে কোন বেতন পাইত না; কিন্তু আবশ্যক হইলে যুদ্ধ করিতে বাধ্য থাকিত। এই সমস্ত পাইকের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ ছিল। ফ্লেচর সাহেব বন্দোবস্তের সময় এই সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইলেন। তখন আর ইহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় রহিল না। সুতরাং ইহারা ইংরাজ অফিসারদের এই অত্যাচার জন্য বিদ্রোহী হইয়া উঠিল এবং একজন উপযুক্ত দলপতির অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এই সময়ে জগদ্বন্ধু নামক একজন প্রবল প্রতাপশালী লোকের অভ্যুদয় হয়। ইহার সম্পূর্ণ নাম—জগদ্বন্ধু বিদ্যাধর মহাপাত্র ভবন বীর রায়। ইনি বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ছিলেন ও ইঁহার দেহের গঠন অতি সুন্দর ছিল। (৫) ইনি খুর্দ্দা রাজের সেনাপতি ও বক্‌সী (Paymaster) ছিলেন। এই কার্য্য ইঁহাদের বংশগত ছিল। বেতন ও জায়গীর ব্যতীত কেল্লা-রোরং নামক বৃহৎ জমিদারী তাঁহারা বংশ-পরম্পরায় ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। যখন ইংরাজগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন, তখন এই জমিদারী জগদ্বন্ধুর দখলে ছিল। সেনাপতি হারকোর্ট যুদ্ধ জয় করিয়া কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, জগদ্বন্ধু তাঁহার শরণাপন্ন হন, এবং এক বৎসরের জন্য কেল্লারোরং বন্দোবস্ত করিয়া লন। ইহার পরে তিন বৎসরের জন্য পুনরায় উহা জগদ্বন্ধুর সহিত বন্দোবস্ত হয়। এই সময় কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কালেক্টরের দেওয়ান ছিলেন। ইনিই সাধারণের নিকট লালাবাবু নামে পরিচিত। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ ১৮০৫ খৃঃ অঃ পদত্যাগ করিয়া কটকেই বাস করিতেছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা গৌরহরি সিংহ গবর্ণমেণ্টের খাস মহলের তহশীলদার ছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মারহাট্টা সুবেদার খুর্দ্দা হইতে ৪টী পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ দখলে রাখিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই চারিটী পরগণা কোন অর্থশালী লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছুক হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ উহার মধ্য হইতে তিনটী পরগণা নিজ নামে বন্দোবস্ত করিয়া লন; এবং চতুর্থ রোহং পরগণা লক্ষ্মণ নারায়ণের বেনামীতে বন্দোবস্ত হয়। (৬)

এই রোহং পরগণার সংলগ্ন কেল্লা রোরং অবস্থিত। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের পরামর্শ মত জগদ্বন্ধু কেল্লা রোরংএর রাজস্ব তহশীলদার গৌরহরি সিংহকে দিতেন। গৌরহরি উহা "রোহং পরগণা ওগয়রহ" বলিয়া কালেক্টরীতে দাখিল করিতে লাগিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে এক সনের রাজস্ব বাকী রাখায় রোহং পরগণা নীলাম হয়, এবং কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ উহা খরিদ করিয়া লন। ওগয়রহ লেখা থাকা হেতু কেল্লা রোরংও ঐ সঙ্গে নীলাম হইয়া

(৫) এরূপ প্রবাদ যে, খুর্দ্দার এক প্রাচীন মন্দিরে একখানি প্রস্তর ছিল। উহা ১০ ফিট দীর্ঘ ৫ ফিট প্রস্থ এবং ২।০ ফিট পুরু। জগদ্বন্ধু এই প্রস্তরখানি অনায়াসে উত্তোলন করিতে পারিতেন।

(৬) Toynbee's Account of Orissa.

যায়। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের লোক উহা দখল করিতে আসিলে, জগবন্ধু দখল না দিয়া নীলাম রদের জন্ত কমিশনর সাহেবের নিকট আপীল করেন। তদন্তে যদিও উহা প্রবঞ্চনা-মূলে বিক্রীত বলিয়া প্রমাণ হইল, তথাপি গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দখল না দিয়া দেওয়ানী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আদেশ দিলেন। অর্থাভাবে, এবং আদালতে অর্থশালী প্রবল জমিদারের বিপক্ষে তাঁহার স্তায় ক্ষুদ্র প্রজার মোকদ্দমা করা ব্যর্থ-প্রয়াস মনে করিয়া জগবন্ধু উহাতে সম্মত হন নাই। এই ঘটনায় জগবন্ধু কপর্দ্দকশূন্ত হইয়া পড়েন। কয়েক বৎসর চেষ্টা করিয়াও যখন সম্পত্তি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন অনন্তোপায় হইয়া জগবন্ধু অন্ত পথ অবলম্বন করিলেন। ইহাই খুর্দ্দা বিদ্রোহের প্রধান কারণ ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন। (৭)

অতঃপর জগবন্ধু প্রকাশ্তে বিদ্রোহী হইয়া ১৮১৭ খৃঃ অঃ মার্চ্চ মাসে গুমসর হইতে ৪০০ জন অস্ত্রধারী খোন্দ-দিগকে লইয়া খুর্দ্দায় প্রবেশ করেন এবং পুলীশ কর্ম্মচারী-দিগকে আক্রমণ করিয়া দূরীভূত করিয়া দেন এবং কালেক্টর সাহেবের আফিস লুণ্ঠন করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান করেন। ইহার পরে জগবন্ধু অনুচরগণসহ বানপুরে গমন করিয়া শতাধিক লোক হত্যা করেন; এবং প্রায় ১৫০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়া লন। এথান হইতে চিল্কা হ্রদে উপস্থিত হইয়া Salt Superintendent অর্থাৎ নিমকীর দেওয়ান ব্লেচর সাহেবকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহার বজরা লুট করিয়া লন। সাহেব পলাইয়া আত্ম-রক্ষা করেন। জগবন্ধুর খুর্দ্দা আগমন এবং তৎসঙ্গে বানপুর লুণ্ঠন দর্শন করিয়া সমস্ত খুর্দ্দা প্রদেশে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। দলে দলে খুর্দ্দার অসন্তুষ্ট পাইকগণ ও গৃহচ্যুত প্রজাবর্গ আসিয়া জগবন্ধুর দলভুক্ত হইতে আরম্ভ করিল। অচিরে ৪০০০ লোক তাঁহার দলপূর্ণ করিল। এই সকল লোক তরবারি, বর্শা, তীর-ধনুক এবং কেহ কেহ বন্দুক লইয়া জগবন্ধুর সাহায্য জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। খুর্দ্দায় যে সমস্ত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। বিদ্রোহীগণ সমস্ত গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া উহা ভস্মসাৎ করিয়া দেয়; এবং ধনাগারে যে সমস্ত অর্থ ছিল তাহা লুণ্ঠন করিয়া লয়। তৎপরে একদল বিদ্রোহী লিম্বি অভিমুখে গমন করিয়া তত্রস্থ কর্ম্মচারী চরণপুট নায়ককে হত্যা করে।

কটকে এই বিদ্রোহের সংবাদ পৌঁছিবামাত্র এক দল সিপাহী সৈন্ত লইয়া Lieut. Priveaux খুর্দ্দা অভিমুখে এবং অন্ত আর এক দল সৈন্ত লইয়া Lieut. Faris লিম্বা রক্ষার্থ পিপ্‌লী গমন করেন। ১লা এপ্রেল ম্যাজিষ্ট্রেট Impey সাহেব Lieut Travis ও ৬০ জন সিপাই লইয়া খুর্দ্দা গমন করেন। ২রা তারিখে তাহারা গাঙ্গপাড়া উপস্থিত হইলে এক দল বিদ্রোহী সৈন্ত তাহাদের গতিরোধ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কটকে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

Lieut. Priveaux যখন সৈন্তসহ খুর্দ্দা অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তখন তিনি সংবাদ পান যে, বিদ্রোহীগণ পঙ্কগড়ের রাণী মুক্তকেশী দেবীর গৃহ লুণ্ঠন ও তাঁহার দেওয়ানকে ধৃত করিয়া ৫০০০ লোক সহ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইতেছে। এই সময়ে তিনি আরও জানিতে পারেন, Cap. Wallington কতক সৈন্ত লইয়া পুরীর দিকে অগ্রসর হইয়াছেন এবং Lieut. Faris তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্ত আদিষ্ট হইয়াছেন। এই আদেশ পাইয়া Faris ৫০ জন অনুচর সহ গাঙ্গপাড়ার নিকটবর্ত্তী গ্রামে আহার্য্য সংগ্রহ জন্ত গমন করেন। কিন্তু জগবন্ধুর লোক উহা অবগত হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিয়া দূরীভূত করিয়া দেয়। এই খণ্ডযুদ্ধে Faris ও তাঁহার অধীনস্থ একজন দেশীয় সুবাদার হত হইলে, অবশিষ্ট লোক পলায়ন করিয়া Priveauxএর দলে মিলিত হয়। অবশেষে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সমস্ত আসবাব-পত্র বিদ্রোহীদের হস্তে প্রদান করিয়া পিপ্‌লী হইয়া উহারা কটকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দ্বিতীয়বার উহাদিগকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে, জগবন্ধুর লোক এবারেও উহাদিগকে পরাভূত করিয়া দেয়।

দুই দুইবার এইরূপ জয়লাভ করিয়া জগবন্ধুর অত্যন্ত সাহস বাড়িয়া যায়। তখন তিনি বহুসংখ্যক বিদ্রোহী সৈন্ত সঙ্গে লইয়া ১২ এপ্রেল লোকনাথ ঘাট দিয়া পুরী প্রবেশ করেন এবং উহা অধিকার করিয়া লন। এই স্থান রক্ষার জন্ত কেবল

(৭) Toynbee's Orissa.

মাত্র ৮০ জন সিপাই ছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা ৪ সহস্র। জগবন্ধুর লোক সহর লুণ্ঠন করিয়া দুর্গ গৃহ প্রভৃতি সমস্ত স্থানে অগ্নি প্রদান করে, এবং কালেক্টর সাহেবের গৃহ ও ধনাগার রক্ষার জন্য যে সমস্ত সিপাই তথায় ছিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করে; কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রতিগমন করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর সিপাইগণ তথায় ধন রক্ষা নিরাপদ নহে জানিয়া সমস্ত টাকা লইয়া কটকে গমন করে।

এই ঘটনায় সমস্ত পুরী প্রদেশেও বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যে সমস্ত প্রাচীন অধিবাসী তাহাদের পৈতৃক অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, তাহারাও সকলে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিল। পুরীর এই বিদ্রোহ অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। বিদ্রোহীদের ইচ্ছা ছিল যে, তাহারা তাহাদিগের রাজাকে দলপতি করিয়া ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করে; কিন্তু রাজা এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। ১৩ই এপ্রেল বিদ্রোহীগণ পুনরায় পুরীতে প্রবেশ করিলে, ইংরাজ অফিসরগণ পুরী পরিত্যাগ করিয়া কটকে গমন করেন।

Lieut. Lefevre ৯ই এপ্রেল কটক ত্যাগ করিয়া নিরাপদে খুর্দ্দা উপস্থিত হন এবং ১৬ই তারিখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদের অধিকৃত দুইখানি গ্রাম—বাজপুর ও কদলীবাড়ী, দগ্ধ করিয়া সন্ধ্যার সময় টপংএ উপস্থিত হন। ১৭ই তারিখে তিনি কানীশে পৌঁছিয়া মুর্না নদী পার হইয়া নওগ্রামে শিবির স্থাপন করেন। পরদিন তিনি দোবান্দা গ্রামে উপস্থিত হইয়া ১০০০ বিদ্রোহীর সম্মুখীন হন। ইহারা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। Lefevre পরে পুরী অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং ১৮ই এপ্রেল বৈকালে তথায় উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, Willingdon এবং সমস্ত ইংরাজ অফিসর পুরী হইতে বিতাড়িত এবং তাহাদের বাসগৃহগুলি ভস্মসাৎ হইয়াছে। তিনি দেখিতে পান যে, খুর্দ্দা রাজ ১৬ খানি পাল্কী সহ পলায়ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখনই তিনি তাঁহাকে ধৃত করিলেন। এই সমস্ত কারণে তিনি বানপুরে জগবন্ধুর অনুসরণ বা কানীসে তাঁহার প্রধান সর্দ্দার কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যাধরকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইতে পারেন নাই। ইহার পরেই তিনি রাজাকে ধৃত করিয়া কটকে পাঠাইবার জন্য গবর্ণর জেনারেলের আদেশ প্রাপ্ত হন। Lefevre রাজাকে লইয়া কটক যাত্রা করেন। পথিমধ্যে পিপ্‌লীতে রাজাকে ইংরাজ হস্ত হইতে মুক্ত করিবার জন্য ২০০০ বিদ্রোহী ঐ স্থানে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। Cap. Armstrong আসিয়া তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। ১১ই মে রাজা কটকে পৌঁছিলেই তাঁহাকে দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এইখানে ১৮১৭ খৃঃ অঃ ৩০ নবেম্বর তাঁহার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র হরিকৃষ্ণ দেব রাজা হন। ইঁহার বয়স তখন ১৩ বৎসর।

খুর্দ্দা বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব অঞ্চলের পাইকগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাহারা অসুরেশ্বর, তিরণ, হরিহরপুর ও গোপ থানা পোড়াইয়া দিল। এরূপ অনুমান হয় যে, কুজং এবং কর্ণিকার রাজা গোপনে ইহাদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ১৮১৭ খৃঃ অঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর কটক হইতে Cap. Kenneth, এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে Lieut. Forrester Wood এবং Erskine বিদ্রোহীদের দমন জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৪ই তারিখ Kenneth নৌগড়ে উপস্থিত হন, কিন্তু বিদ্রোহীগণ তাহার পূর্ব্বেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া কুজং চলিয়া গিয়াছিল। তিনি ঐ স্থানে ৩টী হস্তী, কয়েকটী কামান এবং কতকগুলি অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯শে তারিখে Kenneth ২০০০ বিদ্রোহীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ২টী হস্তী ও ৩টী অশ্ব ধৃত করেন। ২রা অক্টোবর কুজংএ রাজা আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহাকে ও তাঁহার দুইজন সর্দ্দার নারায়ণ পরম গুরু ও বামদেব পটযশীকে ধৃত করিয়া কটকে আনা হয়। বিচারে রাজার ১ বৎসর ও অপর ২ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হয়। অক্টোবরের শেষে কুজংএ বৃটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়।

১৮১৭ খৃঃ অঃ জুন মাসে গোপে প্রথম বিদ্রোহ হয়। পাইকগণ কর্ণিকার সর্দ্দারের অধীনে থানা আক্রমণ করে এবং পুলীশ কর্ম্মচারীদিগকে দূরীভূত করিয়া দেয়। Cap. Faithful ৮০ জন লোকসহ গোপে উপস্থিত হন; কিন্তু বিদ্রোহীদিগকে দেখিতে পান নাই।

পুরী ইংরাজগণ কর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইলেও, খুর্দ্দা বিদ্রোহীদের অধিকারেই থাকে। মে মাসে প্রায় ২ হাজার সৈন্য পিপ্‌লী ও উহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল আক্রমণ করে। Lt. Travis দক্ষিণ খুর্দ্দায় এবং Lt. Bell উত্তর খুর্দ্দায় আসিয়া উহাদিগকে দূরীভূত করিয়া দেন। এই সময় লুম্বি, কুজং এবং খুর্দ্দার বিদ্রোহ শান্তি জন্য General

Gabriel Martindale প্রেরিত হন। তিনি বিদ্রোহ দমন করিয়া বৎসরের শেষভাগে দেশে শান্তি সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগবন্ধু এবং অপর কয়েকজন বিদ্রোহী-দলপতি পলায়ন করিয়া মহানদীর তীরস্থ অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে বাস করিতেছিল। কিন্তু Lt. Travis ও Bellএর সৈন্য কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ইহারা যোনপুরে গমন করে। এইখানে গুমসরের খোন্দ অধিবাসীগণ সাদরে ইহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিল।

ইংরাজরাজ ১৮১৯ খৃঃ অঃ ঘোষণ পত্র দ্বারা সকলকে অভয় প্রদান করিলে, বিদ্রোহীগণ প্রত্যাগমন করিয়া আপন আপন দেশে বাস করিতে আরম্ভ করিল। ১৮২৬ খৃঃ অঃ জগবন্ধু আত্মসমর্পণ করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পেন্‌সন দিয়া কটকে বাস করিবার অনুমতি দেন। এইরূপে সমস্ত প্রদেশের বিদ্রোহ নির্ব্বাপিত হইয়া দেশে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। এক্ষণে এই বিদ্রোহের জন্য কে দায়ী, তাহা সুধী পাঠকবর্গই বিবেচনা করিবেন।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৩

প্রাতে চা পানান্তে ভবিষ্যতের মন্ত্রে মন দিলাম। সন্ধান করিয়া গণেন বাবুর আশ্রয়দাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। লোকটিকে ষণ্ডা বলা যায়, গুণ্ডা বলা যায়,—পাণ্ডা সে নয়,—পাণ্ডাদের পরিজন। তাহাদের দালালী করে, নিজের বাড়ীতে যাত্রীও তোলে। তাহাকে ভাল কথায় বুঝাইয়া দশ টাকা দিয়া শিল-আংটিটি আদায় করিলাম এবং জয়হরির জন্য একখানা দিশি কালাপেড়ে ধুতি লইয়া ফিরিলাম। গণেন বাবু'কেও দেখিয়া আসিলাম।

চা পানের সময় হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া জয়হরির হাতে দিয়া বলি—"তোমার কাছে রাখ—আবশ্যক-মত খরচ কোরো। দরকারের সময় আমার দেখা না পেলে অসুবিধায় পড়তে হবে না।"

সে সবিস্ময়ে আমার মুখে চাহিয়া বলে—"আপনার দেখা পাব না কেন? আপনি কি একা বেরুবেন নাকি? তবে আর আমি এলুম কেন। না না, সে হবে না—আপনি টাকা রাখুন—দরকার হলে আমি চেয়ে নেব।" পরে কাতর ভাবে বলিল—"একটি অসহায় ভদ্রলোকের বিদেশে এই সঙ্কট অবস্থা—তাই। এই ত এ-ঘর ও-ঘর বই ত নয়।" আপনাকে ছেড়ে আমি নিজেই কি নিশ্চিন্ত থাকি।"

কি পাগল! সে আমার ভাবনা ভাবিতেছে! আমি তার কাজটা অনুমোদন করিতেছি কি না, এমন সন্দেহ থাকিতে পারে—তাই তাহাকে উৎসাহ দিয়া ও পথ্যাদি সম্বন্ধে সাবধান করিয়া বিদায় দিলাম। টাকা কয়টি নিকটে রাখিতে বলিলাম। আর কোন কাজে লাগুক বা না লাগুক এখন তাহার নিজের আহার সম্বন্ধে সময়ের স্থিরতা থাকিবে না—অথচ সে ক্ষুধা সহ্য করিতে পারে না,—সুবিধা মত কিছু খাইয়া লইতে পারিবে। পাঁচ সাত দিন পূর্ব্বের কথা—বৈকালে একা বাহির হইয়াছিল। বেগুনী ফুলুরি ভাজিতেছে দেখিয়া খাইবার ইচ্ছা হয়। পকেটে পয়সা ছিল না—আটখানা পোষ্ট-কার্ড ছিল, সব গুলি দিয়া ছ আনার বেগুনী খাইয়া আসিয়া বলে "বড় বড় লোক আমাদের কথা কিছুই বোঝে না, কেবল নিজেদের কথাই কয়। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে তার ঠিক নেই। সরকার কত বুঝে পোষ্ট-কার্ডের দাম ছপয়সা করে দিয়েছেন,—সময়ে অসময়ে গরীব দুঃখীর কাজে লাগবে বলে। ওকি শুধু চিঠি লেখবার জন্যে!—তা কেউ তলিয়ে বুঝবে না। পয়সা ছিল না—আটখানা সামনে ধরতেই গরম গরম বেগুনী এসে গেল—ব্যাটা কথাটি কইলে না। কে খায় মুশাই। বাবুরা এই

সব সুবিধেগুলি নষ্ট করতেই আছেন। যাঁদের রাজ্যি তাঁরা বোঝে না—ওঁরা বোঝেন! আরো দুঃকু-কষ্ট বাড়ুক, দেখবেন একখানা পোষ্ট কার্ডে এক আনার বেগুনী মিলবে। লোকের দুঃকু বোঝা চাই মশাই,—সবচেয়ে বড় কায সেইটেই।"

শুনিয়া আমি ত' নির্ব্বাক। সেইদিন হইতেই তাহার পকেটের খোঁজ আমাকে রাখিতে হয়।

* * * *

আজ মাতুল বাড়ী রওয়ানা হইলেন। জয়হরি নিজের কথা রক্ষা করিয়াছে—তাঁহার বিছানা বাসন ট্রাঙক্ নিজে বহিয়া আনিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়াছে। আমিও ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলাম। বিদায়টা সত্যই বেদনার আদান-প্রদানে সমাধা হইল। জয়হরি তাঁহাদের সঙ্গে জসিডি পর্য্যন্ত যাইতে পারিল না বলিয়া যেন অপরাধীর মত হইয়া পড়িল। নীরবেই বাসায় ফিরিলাম। জয়হরি বিমর্ষ মুখেই ধর্ম্মশালায় ঢুকিল। আজ দুই দিন তাহার আহার নিদ্রার কোন আগ্রহই দেখি না। সেজন্য বাড়ীর মেয়েদেব দুর্ভাবনার অন্ত নাই। কর্ত্তা অরুচির অষুধ—নেবুর আচার, লাইম জুষ, আলু বখরা, খোবানীর মোরব্বা প্রভৃতি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মায়েদের বিশ্বাস—নজর লাগিয়াছে। কর্ত্তা জলপড়াও জানেন—তাহার ব্যবস্থাও হইতেছে।

৫৪

দিন দিন চিন্তা বাড়িয়াই চলিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেওঘরের হিমশীতল উজ্জল প্রভাতগুলি ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিত, সর্ব্বাঙ্গে শক্তি-সঞ্চার করিত, হিমস্নাত ঝক্‌ঝকে পাতাগুলি ঝির্‌ঝিরে প্রভাতী বাতাসে এস এস বলিয়া ডাকিয়া লইত,—পথে বাহির হইয়া বাঁচিতাম। স্ফূর্তিই গতি যোগাইত।

আর আজ মুড়ি দিয়া শুঁড়ি মারিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া, বেকার বোকার মত বসিয়া আছি! সিগারেটের রেট্ বাড়িয়াই বসিয়াছে, ঠোঁট দুখানি সিগারেট-ধরা সাঁড়াশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—রংটিও পাইয়াছে লোহারই। বসিয়া বসিয়া পাছু হটিয়া গিয়া শুইতে পারিলেই বোধ হয় আরাম পাই।

জয়হরি আবার কবে কি আবিষ্কার করিয়া আনিবে;—কর্ত্তার বাধাসৃষ্টির নিপুণতার অন্ত নাই;—গণেন বাবুর রোগ-মুক্তি ও শারীরিক শক্তি-সঞ্চয়—সময়-সাপেক্ষ,—প্রভৃতি চিন্তা মাথার মধ্যে যাঁতা ঘুরাইতেছিল। সর্ব্বোপরি অতিথিভাবে এরূপ গাঢ় স্থিতিটাও ভদ্রনীতিবিরুদ্ধ। এই সপ্ততাল ভেদ করিয়া বাহির হইবার কোন ভব্য উপায়ও মাথায় আসিতেছিল না।

ভাবিতে ভাবিতে শেষ পুরাণে আসিয়া পৌছিলাম। যাত্রাটা অগস্ত্য-যাত্রার যোগে বা দুর্য্যোগে করা হয় নাই ত! অগস্ত্য সেই যে কাশী ছাড়িয়া বিন্ধ্যাচলকে বাঙালী বানাইয়া চলিয়া গেলেন,—কই আর পালটাইতে পারিলেন কি? আমিও তো কাশী ছাড়িয়া যাত্রা করিয়াছি। তবে—কাহাকেও কিছু বানাই নাই, বানাইতেছি নিজেকেই,—নিজের মেরুদণ্ডই মচ্‌কাইতেছি। দেখিতেছি—বুদ্ধিমানের সমাজের চেয়ে পাগলা-গারদ মন্দ যায়গা নয়,—যদি মার থোর না থাকে! মাতুল ছিল—বেশ ছিলাম।

চিন্তার জন্য টিকিট্ কিনিতে হয় না, তারা বেশ অবাধে মাথাটাকে পাইয়া বসিয়াছে—নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিতেছে!

* * * *

অমর আসিয়া উপস্থিত—একদম ঘরের মধ্যে। আমি অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, সে ধূল পায়েই রুষ্ট কণ্ঠে আরম্ভ করিল—"দেখ দেখি বেইয়ের বেইমানিটে—সে সরে পড়েছে! আমি কিনা তার ভালর তরে সস্ত্রীক এলুম,—বেয়ান একলাটি থাকেন—এঁকে পেলে, তিনি রাঁধলেন বাড়লেন ইনি কুটনো কুটে দিলেন; বিকেলে তিনি বাটনাটা বেটে ফেললেন,—লুচি ভাজ্‌লেন, ইনি চুল বেঁধে দিলেন, দুটো গল্প করলেন,—এই রকমে দুজনে ভাগাভাগি করে খাটলে চট্ কাজও হয়ে যেত, দুটিতে বেড়াবার ফুরসৎও পেতেন,—কতটা আনন্দে থাকতে পারতেন! কলিকাল বটে! এখন আমার কি আতন্তর বল দেখি! চালটি পর্য্যন্ত—"

বলিলাম "তাইত অমর, এই খরচ করে আসা—"

"তুমি তাই ঠাউরেছ বুঝি, রেলে পয়সা দেব সে বান্দা আমি নই। কুম্ভমেলা গেল—টিকিট্ বাবুদের অনেকেই বাড়ী কেঁদেছেন। লোহার কড়িগুলো সস্তায় সাতাশের জায়গায় সাঁইত্রিশে ঝাড়ছি—সবাই খুসি। পাশের ভাবনা

কি? হাতে আল্‌গো কিছু এলে—ছোটো নজর চলে যায়,—কেউ টেনে চলে না। হরিরামের পাশে সস্ত্রীক চারিধাম সেরে বসে আছি,—তীর্থ আর বাকী রাখিনি ভায়া। যাক্—ছট্টু সর্দ্দার বেটার জানলায় গরাদে চাই,—ভগবানই জুটিয়ে দেন—সেই বেটার পাশেই চলে এলুম। চক্ষুলজ্জায় সস্তায় দিতেই হ'ল। কেবল তেরটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজলুম! পাশের ভাবনা! সে যেন হ'ল, কিন্তু বেই বেটা ভারী কস্‌কালো। আচ্ছা—"

ওই "আচ্ছাটার" মধ্যে এমন একটা নির্ম্মম সুর বেজে উঠল যে তার ভেতর রেহাইএর এতটুকু রাস্তা নেই।

বলিলাম, "তাঁর দোষ নেই অমর—তাঁর না গেলে নয়—আপিসে কি একটা ভুল করে এসেছেন—যদি সামলাবার উপায় করতে পারেন—তাই। কাচ্চাবাচ্চাওলা কেরাণী, বড় চঞ্চল হয়েই গেছেন। তাঁর যাবার ইচ্ছা ছিল না।"

"ও সব চাল আমি খুব বুঝি হে খুব বুঝি। কাণই গেছে, চোক্ দুটো তো যায় নি, অনেক দেখলুম—"

ভাবিলাম—অমরকে বুঝাবার চেষ্টা করা কেবল বৃথা নয়,—নিজের গলাটাকেও মিথ্যা পীড়িত করা,—চীৎকার করিয়া ফল নাই। সম কথায় বলিলাম "তা তিনি গেলেনই বা—তোমার ভাবনাটা কি। হাতের কাছেই সব,—বাড়ীও এখন বহুত্ খালি।"

অমর আমার মুখের উপর স্থির নেত্রে চাহিয়া বলিল "ওই বুদ্ধিতেই ত কলাপোড়া খেয়েছ,—তবে আছ বেশ,—কোনও বখেড়া নেই। আরে—রাবড়ী নয় রসগোল্লা নয়—সেরেফ হাওয়া খাবার জন্য বিদেশে পয়সা খরচ করে থাকবার ছেলে আমি নই। সে ব্যবস্থা বাগিয়ে ফেলেছি। বাবার পিসীর এক জামাই উইলিয়ামস্ টাউনে থাকেন—মুন্সেফ্ ছিলেন, দিব্যি বাড়ী করেছেন। দিন কতক আগে বাজারে আলাপ হওয়ায় সম্পর্ক বেরিয়ে পড়ল। তিনিও বুঝলেন লাখের উপর উঠেছি,—ব্যস্। ওইটিই মানুষের মৃত্যুবাণ—ওইতেই মেরে রেখেছি। লক্ষীমন্তের ঝক্কি পোয়াতে সবাই লালায়িত—সেটা বোঝ ত'! আমার সিকি পয়সা কেউ পাক্ বা না পাক্—পাবে আবার কি!—আমাকে পাওয়াটাই যে তার অতিবড় ভাগ্য—তার দাম নেই কি! কথাটা বুঝলেনা।"

"না—একটু খুলে বল ভাই।"

"আঃ তোমার ত চোক্ কাণ দুই-ই রয়েছে,—এই সোজাকথাটা বুঝলেনা,—সে কি হে! কি করে যে এই লম্বা পাড়ি মেরে চলেছ—ভেবে পাইনা। বেশ আছ কিন্তু। আরে—কোন্ বড় লোক কাকে ক'টাকা দেয়,—তাদের দিতে হয়না—দিতে হয়না,—দিতে হলে বড় লোক হয়ে তাদের লাভ? তাদের সঙ্গ পাওয়াটায়, তাদের কাজকর্ম্মে সাহায্য করতে পাওয়াটায় একটা গৌরব-বোধ নেই কি? সেইটাই তাদের প্রাপ্য। তারও ত' একটা মূল্য আছে। নেই কি? যাক্—' মুন্সেফ্ তাঁদের best room (বাবু ঘর) আমাদের ছেড়ে দেছেন, গুরুর আদরে আহার—যায় মেওয়া। আবার লোহার কড়ি-বরগা নেবেন—বাড়ী বাড়াচ্ছেন। যখন বার টাকা মাইনের চাক্‌রী করতুম, বার দোর ঘুরেও একটা পয়সা ধার পেতুমনা, এখন সব সেধে গচ্ছিত রেখে যায়—তাও তের হাজারের উপর উঠেছে। আমি আর ক'দিন—ছেলেগুলো মানুষ হয় ত—"

তাড়াতাড়ি বলিলাম "অমর আর কেন ভাই, এখন ওসব চিন্তা একদম্ ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আরাম কর, ভগবানের নাম কর, সাধুসন্তের জীবন-চরিত পড়—"

সে বাধা দিয়া বলিল, "তুমি যেমন পাগল,—সব করে দেখা হয়েছে বন্ধু,—পয়সা ছাড়া কিছুতে সুখ নেই। জান ত "বোধোদয়" আমার ফাইন্যাল্ final (মৌরস্ত)—চতুর্ব্বেদের বাবাখানা বিদ্যেসাগরের এই বইখানি,—তিনিই লোহার খবরটা দেন,—তারপর আর বই ছুঁইনি। তবে বাকী কিছু রাখিনি, ধর্ম্মচর্চ্চারও চূড়োন্ত করে ফেলেছি;—পাঞ্জাবী গুরু—ঝাড়া সাতফিট্ তিন ঞ্চ'। আসন করে একটু চোখ্ বুজে বসলেই সুষুম্না থেকে আধ্যাত্মিক আওয়াজ পাই—বৌবাজারের পুরোনো লোহালক্কড় মাটির দরে এনে গুদোম ঠেশে ফ্যাল্,—সোনা ফলবে। যুদ্ধের সময় ফলে গেলও তাই। লোহাই আমার তুলসীদাসের দোহা, লোহার রস যে স্বর্ণাসব সেটা তোমরা বুঝবে না। এ কেমিস্ট্রীর মিস্ট্রী—রস-রহস্য, ইউরোপই বুঝেছে।"

ধর্ম্মের কাহিনী আমারও রুচি-বিরুদ্ধ। "সারমন্" (বিজ্ঞ-বুলি) কার মনই বা শুনতে চায়। তবে "nothing like leather"—পাঁচ কাহনটা থামাইবার জন্য বলিলাম, "মাতুল থাকলে ত মুন্সেফবাবুর এই সব আদর আপ্যায়ন কি

আত্মীয়তার স্বাদই পেতে না,—এতটা সুবিধা আর আরাম থেকে বঞ্চিত হতে,—কতবড় লোকসানটা হ'ত। মাতুল গিয়ে ত ভালই হয়েছে ভাই!"

"তা বটে,—তবে তার ব্যাভারটা দেখলে ত! আমি কোথায় তার আরো দু'মাসের ছুটীর কথা পেড়ে এলুম—একখানা দরখাস্ত পাঠালেই মঞ্জুর হ'ত,—সব বেটাই খাতির করে ত। আর বেইমান কিনা সরে পড়ল! উনি আঁব দুধটা ভালবাসেন তাই সঙ্গে নিয়েলুম, আর আমাকে কি রকম খেলো করলে বল দিকিন। ওখানে ছেলের বে দিয়ে বাক্‌মারী করেছি—জলের দামে ছেড়ে দিতে হয়েছে। দম্ দিলে—ওদের আপীসের অর্ডারগুলো আর যায় কোথা! বড় ঠকিয়েছে। ও ছেলেটা বেকায়দা গেছে হে—কোনও কাজ দিলে না। ব্রাহ্মণীর দশ দশ মাস কেবল কষ্ট ভোগ ছিল,—যাক্—"

একটু অন্যমনস্ক থেকে বললে "তুমি ত কাগজ-টাগজ পড়,—লড়াইয়ের সাড়া শব্দ পাচ্ছ কি ?"

বলিলাম, জগতের civilisationটা (মুখোসটা) যে রকম চার পায়ে চলেছে তাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে অল্পে তুষ্ট থাকাটাই অসভ্যতার লক্ষণ। কাজেই কারুর সঙ্গেই কারুর সত্যের সদ্ভাব থাকবার কথা নয় অমর; মৌখিক্ মলম্ মাখানো আর মানুষমারার উপায় বাড়ানোই চলেছে। এতটা ব্যয় আর বড় বড়দের মাথা ঘামানো কি মিথ্যা হবে!"

"তাই বলো ভাই, আর একটা যেন দেখে যেতে পারি। আচ্ছা—হ্যাঁ, তোমার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, একটুকরো কাগজ আর পেন্সিলটে দাও তো।"

কাগজ লইয়া দ্বিখণ্ড করিয়া প্রত্যেকখানিতে কি লিখিল। খণ্ড দুইখানি সমান ভাবে মুড়িয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল। ভূমে পাড়বার পর আমাকে বলিল, "মা কালীকে স্মরণ করে ওর একখানা তুলে আমার হাতে দাও।"

মা কালীকে এই ফ্যাসাদের মধ্যে না টানিয়া একটি মোড়ক তুলিয়া অমরকে দিলাম।

খুলিয়াই—'ব্যস, মার দিয়া' বলিয়া লাফাইয়া উঠিল। "এই দেখ না লড়াই লাগবেই লাগবে। তবে সাত বছরের মধ্যে। তা "মধ্যে" মানে এক বছরেও লাগতে পারে—তিন মাসও তর্ সইতে না পারে। . তোমার হাতে তোলা—মিথ্যা হবে না, সে বিশ্বাস আমার আছে। কিছু করলে না এই যা দুঃখু—কিন্তু আছ ভাল! আমার ঠিকুজি খোদ্ শিবু আচার্য্যির তৈরী, এখনো সতের বছর ত বাঁচবই। কুছ্ পরোয়া নেই—সাত বছর সাত বছরই সই; তবে "মধ্যে" যখন রয়েছে—সাত মাস হ'তে কতক্ষণ,—অতদিন কখনই নেবে না; অ্যাঁ—কি বলো,—মা সবই পারেন। ওই সঙ্গে কাণ ছুটোর ওপরেও কৃপা কোরো মা।"

"বড় মন-মরা হয়ে পড়েছিলুম, ভারী উপকার করলে ভায়া। আচ্ছা—এখন "প্যালেসে" (রাজবাড়ী) চললুম। ওদের আবার ঘণ্টা ধরে খাওয়া,—চাকরী করে মরেছে কিনা।"

আমি সহিষ্ণু শ্রোতা হইলেও সর্ব্বক্ষণ বিষয়ের কথা বড়ই বদ্‌হজম্। তথাপি আবশ্যক বোধে একটা কথা না বলিয়া বিদায় দিতে পারিলাম না।

বলিলাম, "শুনে থাকবে এখানে মাঝে মাঝে চোরের উপদ্রব আছে;—daring ডাকাতির কথাও কাণে আসে। তারা নবাগতদের খবর রাখে—বিশেষ কেউ সস্ত্রীক এলে। তুমি সস্ত্রীক এসেছ। খোলা যায়গায় আছ, খুবই ভাল। এখানে অনেকেই সুবিধা পেয়ে দৌড়বার যায়গা দখল করে আছেন। ডেকে কেউ কারুর সাড়া পান না। হাওয়াটা ভাল খেলে বটে, কিন্তু চোর ডাকাতের ধাওয়াটাও সেই দিকেই বেশী। একটু সাবধান থেক' ভাই।"

অমর আমার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিল "আমার চেয়ে যারা হুঁসিয়ার তারা কেউ বাইরে নেই—সব জেলে। অভ্যাস-বিরুদ্ধ হলেও কি জানি কেন' তোমাকে কোনো কথা গোপন করি না। তোমাকে বলি—সম্ভ্রম বজায় রাখতে স্ত্রীকে এক-গা গয়না পরিয়ে আনতে হয়েছে বটে। কেউ আসেন—সব খুলে দিতে বলব'। তাতে তের টাকা দশ আনার বেশী যাবে না। খাঁটি কেমিকেল হে—খাঁটি কেমিকেল। আচ্ছা এখন চল্‌লুম,—বেই বেটা কিন্তু—"

আর শুনিতে পাইলাম না।

৫৫

দেখিতে দেখিতে আরও দশ বার দিন কাটিল। ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করিয়াছি। ওই সঙ্গে ঘৃণা লজ্জা ভয়ও ফিকে মারিয়া আসিতেছে। সপ্রতিভ ভাবেই খাই শুই বেড়াই আর সিগারেট টানি বেশ আছি বলাই ভাল।

আমার এই উদাসীন ভাবটা বোধ করি জয়হরির লক্ষ্য এড়ায় নি। সে মধ্যে মধ্যে কাছে আসিয়া বড় কিন্তুর মত বসে, আর বলে,—"বড় দেরী হয়ে গেল, আপনার কষ্ট হচ্ছে, সেবা যত্ন হচ্ছে না, কি করি,—গণেনদা এই সেরে উঠলেন বলে।" তার পরেই মাথা চুলকোয়।

বলি—"তাড়াতাড়ি নেই, তিনি ভাল করে সেরে উঠুন না।"

তখন সে প্রফুল্ল মুখে—"আমি জানি আপনি—" ইত্যাদি বলিতে বলিতে ধর্ম্মশালায় চলিয়া যায়।

মনে মনে ভাবি—'তুমি ছাই জান', আমার বয়স পাও আগে—তখন জানবে—আমারো একদিন যৌবন এসেছিল, তখন বাড়ীর কথা ভাবতেন বাপ-খুড়ো, আমি ভাবতাম পরের কথা—দেশের কথা। সে কি আমি ভাবতুম—যে ভাবতো সে ঐ যৌবন, যে চিরকাল এই জগৎটাকে পুরানো হতে দেয়নি—এত মধুর এত সুন্দর করে রেখেছে। সেই ত জগতের প্রাণ,—তাই না ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্ন দিতে ছোটে, কেউ ডুবছে দেখে হাত বাড়িয়ে দেয়, আশ্রয়হীনের জন্যে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করে, অসহায় রোগীকে খুঁজে সেবা করে প্রাণ বাঁচাতে প্রাণ দেয়। বার্দ্ধক্য শরীর নিয়ে আর "নিজের" নিয়ে ব্যস্ত, তার বাইরে তার দৃষ্টি অতি ক্ষীণ। নিজের ষোল আনা সেরে ফাউ দেবার কিছু আর থাকে না,—শুভঙ্করও রাখেন নি। বাতিক বৃদ্ধিটা বয়সের রোগ,—বাড়ে আর থাকে কেবল সেইটেই,—তাতে বকায় বেশী। সেটা সারা জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা—যা একপা এগুতে দেয়না, বলে কেবল পেছু হটতে;—বোধ হয় সেটা বাৎসল্যের মমতা আর মোহ। যাক্—এবার পুন্নামক নরকের অখণ্ড অধিকার পাওয়ায় আমার ও বালাইটা কিছু কম বটে। আবার বলে কিনা—"আমার সেবা যত্ন হচ্ছেনা।" সেইটাই যেন আমার চাঞ্চল্যের কারণ। বাড়ী গেলেই যেন সবাই মিলে আমার ডলাই মলাই সুরু করে দেবে,—এমন তেল মাখাবে যমে ধরলে যেন পিছ্‌লে পড়ি; পাকা চুল তুলে বসন্তরায় বানিয়ে দেবে! কি পাগল! দেখছি আমার কাছে তার কুণ্ঠা সঙ্কোচ দেখা দিচ্ছে. নিজেকে সে অপরাধী ভাবছে।

আজও তার ডাক্তারবাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ। তবে এ-বাটীর রান্নাঘরে ঢুকিয়া মেয়েদের কাছে হাত পাতিয়া কিছু খাইয়া যাওয়া তার চাই,—সেটা সে ভোলে নাই। সহজে এমন আপনার হইতে ও আপনার করিয়া লইতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ফিরিলে, আজ তাহাকে বুঝাইয়া নিঃসঙ্কোচ করিয়া দিতে পারিলে আমি স্বস্তি পাই।

বাতিকটা বাধা পাইল; কর্ত্তা আজ বাড়ীর ভিতর হইতে অসময়ে আসিয়া পড়িলেন—"কই ঘুমুন্ নি তো?"

বলিলাম, "দিনে বড় একটা ঘুমুইনা, একটু গড়িয়ে নিই বটে। বই কি খবরের কাগজ পেলে তাই নিয়েই থাকি।"

"ও বদ অভ্যাসটা থেকে মা সরস্বতী কৃপা করে রেহাই দেছেন,—যথা লাভ। তবে বাঙ্গলা হরপ্‌গুলো ভুলে না যাই তাই পাঁজী একখানা থাকে, মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনগুলো দেখি—তারা ইণ্টারেষ্টিং—মজাদার, কিন্তু ঝঞ্ঝাটও বড়—বাক্সের মধ্যে বন্ধ রাখতে হয় ছেলেমেয়েদের হাতে না পড়ে।"

বলিলাম—"আপনিও ত শোন্‌নি দেখছি।"

"আমি? হুঁঃ—পেন্সেন্ নিচ্ছি যে! সেদিন দেখি নতুন কামিজগুলো নাতনীদের সেমিজ হবার জন্যে গলা দিচ্ছে; হাত দুটো নিয়ে দুমেয়ের কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে—যেন মেডিকেল কলেজের মড়া পেয়েছে। ধাম্‌সী আর খাবড়ীর জাঙ্গিয়া বনবে। গিন্নি বল্লেন—ওসবে তোমার আর দরকারই বা কি,—বাজার করা তো গামছা হলেই হয়। যাক্—সে অনেক কথা। হাঁ, দিনে ঘুমুবার কথা বলছিলেন না। দেখছেন না—তোফা মানস সরোবরে রয়েছি। রাজহংসীদের কলরবেই কাহিল। চোখ বুঝতে ভয় হয়। ক্ষুদেগুলোর কোন্‌টা কখন এসে চোখ্ খুবলে নেবে।—"

"তবে আহারের পরে চার পাঁচ ঘণ্টা করেন কি?"

"করেন কি? করেন কর্ম্মভোগ। গ্রহ কি সূত্র ধরে কখন যে দেহে প্রবেশ করে তা ঠিক নেই। কৈশোরে শিল্পের দিকে বেশ একটু ঝোঁক ছিল। বেগুনী রংএর রেশম এনে ছুঁচ দিয়ে চাদরে পাড় তুলে ব্যাভার করতুম,—দেখে বাহবা পড়ে গেল। মামা জ্যোতিষীর বাড়ী ছুট্‌লেন, পণ্ডিত বলে দিলেন—"কাশ্মীরের বিখ্যাত শাল-শিল্পী কুদরৎ-খাঁ এসে জন্মেছে, কালে এ জামিয়ার বানাবে।" মামা প্রতিভার আদর জানতেন, আমাকে চট্ স্কুল ছাড়িয়ে দিলেন। এখন তাঁরই অনুগ্রহে আর আশীর্ব্বাদে নিদ্রা ত্যাগ করে জামিয়ার বানাচ্ছি। কাটতিও তেমনি।"

আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে শুনছিলুম আর ভাবছিলুম "জগতে এসে দিনগুলো বৃথাই কাটিয়েছি। দেখছি সকলেই কিছু না কিছু জানেন। অমর ঠিকই বলে— বাজে কাজে আর বাজে কথায় বেলাটা শেষ করেছি।"

বলিলাম "বিজ্ঞাপন নেই কিছু নেই—নেবার লোক পান কোথায়?"

"নেবার লোক? সে অভাব নেই। বচরে তিন চারটি বাঁধা খদ্দের আসছেই—প্রত্যেকের অন্ততঃ এক ডজন করে চাই। পারলে তিন ডজন করে দিন না— অধিকন্ত ন দোষায়। কেউ চাইনা বলবেনা। অতো পেরে উঠিনা, সেজন্যে সৎপরামর্শ সামলাতে রাতের ঘুমও যায় যায় হয়েছে।"

বলিলাম—"না মশায়, ছুঁচের সূক্ষ্ম কাজ—এ বয়সে রাত্রে আর করবেননা। পয়সা আছে বটে—"

তিনি বাধা দিয়া বলিলেন "পয়সা!" বলিলাম— "না হয় টাকাই হ'ল"

তিনি কোন কথা না কয়ে চট্ বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। তখনই একটা গাঁটরী এসে পড়ল। বললেন "খুলে দেখুন না।"

খুলতেই কতকগুলো ছোট বড় প্রমাণ "কাঁথা" বেরিয়ে পড়ল।

"নির্ভয়ে নেড়ে চেড়ে দেখুন,—ওতে এখনও আমার কৃতকর্ম্মের পুরস্কার স্পর্শ করে নি;—প্রকৃতির প্রতিশোধ আরম্ভ হতে দেরী আছে।"

দেখিয়া শুনিয়া আমি ত স্তম্ভিত।

"চুপ করে রইলেন যে।"

"না ভাবছি—আমাদের শুভানুধ্যায়ী শাস্ত্রকারেরা অনেক ভুগেই বলে গেছেন—বাঁচতে চাও ত পঞ্চাশ পেরুলেই বনে যাও।"

"বন আপনি কাকে বলেন? বাঘ ভালুক থাকলেই ত সেই হ'ল আসল্ বন। তার সঙ্গে গেঁটে বছরের চিতে, নেকড়ে যার বাছা বিচ্চু আর কি চান? অভাব অনুভব করছেন না কি?"

সহসা মাতুলকে মনে পড়ল। ভাবলুম অন্ততঃ মাতুলের অভাবটা আজ ঘুচল'। কেহই কম নন। আত্মা যে এক আর অবিনাশী সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ রইল না। এখন থামাই কি করে। বলিলাম—"গৃহস্থালীর ছুঁচের কাজটা সকল দেশে মেয়েরাই—"

তিনি বলে উঠ্‌লেন, "অবল মশাই—অবল। আহারান্তে অমনিতেই তাঁর বুকে ছুঁচ ফুটতে থাকে—তার ওপর আবার হাতে ছুঁচ। বলেন কি! কাশীর গার্গি-ভৈরবী দিদি বড় স্নেহ করেন—ওস্তাদও তেমনি,—তাঁর ব্যবস্থাতেই বেঁচে আছেন। সিদ্ধা কিনা,—সেটা দেখলেই বোঝা যায়। চূড়া বাঁধা চুলে, সোনার তারে গাঁথা স্ফটিকের মালা জড়ানো,— হাতে জার্ম্মাণ-সিল্‌ভারের হাই-পালিশ্‌ ত্রিশূল, দেহ যেন চন্দনের ক্ষেত—গন্ধ ভুরভুর করছে। তাঁর টোটকাই চলছে,—আহারান্তে তিন ঘণ্টা গড়ানো—না হয় চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্যে তিন ঘণ্টা তাস খেলা। এই সব কঠযোগে যদি না হটে,—পাক্কা তিন পো মালাই। শেষেরটিই দেখছি ব্রহ্মাস্ত্র,—যেন আগুনে জল ঢালা—পড়েছে কি সব বালাই সাফ। সেইটেই চলছে।—

"হাঁ—"গৃহস্থালী" বলছিলেন না,—সেটি আপনার ভুল। গৃহস্থালী নয়—এটি আমার নিজের গড়া গোলেবকাউলি। বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি আর কি!"

আমিও সেই কথাই ভাবিতেছিলাম—শেষটা কি Penguine Islandএ উঠে পড়েছি! ইনিই কি মহাত্মা St. Meal! ভাবিতেছিলাম আর কাঁথাগুলি পাট করিতে-ছিলাম। তাড়াতাড়ি পুঁটলি বাঁধিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। পাছে অভদ্রতা হয় তাই বলিলাম "করেছেন কিন্তু সুন্দর— কলাবিদ্যা একেই বলে।"

"হাঁ—আসল চাটিম। কুদরৎ খাঁ যে!" বলিয়া, হাসিমুখে গাঁটরী লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভাবিলাম রেহাই।

* * * *

কি বিপদ,—পুনঃপ্রবেশ! এসেই—"হাঁ, যে কথা বলতে এসেছিলুম;—বাবার মন্দির থেকে ফিরছি, সাড়ে দশটা হবে, রোদে বধে ফেলছে, দেখি আপনার বন্ধু অমরবাবু সেই প্রচণ্ড রোদে লোহালক্কড়ের দোকানে ছুটোছুটি করচেন। বললুম,—"এতো বেলায় এই রোদে করছেন কি? অসুখ খুঁজছেন বুঝি। বিশেষ দরকার নাকি! ছাতাটা ফেললেন কোথায়?"

তিনি হেসে বললেন—"যাতে দু'পয়সা আসে—তাই

মন্দির দুয়ারে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী]

দরকারী! এই দেখুননা, ঘণ্টা দেড়েক ঘোরাঘুরি বকাবকি করে, মাসিক দেড়শো টাকায় আট্‌কে বেঁধে ফেলি! ভাববেন না, আমরা রোদে জলেই মানুষ,—ছাতা নেবার বদ অভ্যেস নেই। বাজে জিনিসে হাত জোড়া করা কেনো,—আপনি যদি একটা লাউ কি কুমড়ো শাক দেন—তখন হাতটা পাবো কোথায়। আর অসুখ বলছেন? অ-রোজগারের চেয়ে অসুখ আছে নাকি!" এই বলেই হি হি করে হেসে "ক্যা ভেইয়া" বলে একটা লোহার দোকানে ঢুকে পড়লেন।

"বাঃ, পয়সার প্রেম—এঁকে যৌবনের বল্ যুগিয়ে জোয়ান করে রেখেছে! আর আমি বেটা "চিন্তামণি" হয়ে রইলুম।"

"সে আবার কি? আপনি তো ভগবতী বাবু!"

"ভগবতী তো বটেই, ওটা ছেলেদের কাছে প্রমোসন্ পাওয়া খেতাব।"

"বুঝলুম না।"

"খুব সোজা হলেও—ঠ্যাকে একটু কঠিন বটে। গরুটো সাতমাস গাবিন,—কোন্ ফাঁকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, সন্ধ্যা হয়,—ফেরেনা। চঞ্চল হতে হ'ল। হলে আর হবে কি—বাতে কাত্ করে রেখেছে! যা হোক্—শুভক্ষণে কি কুক্ষণে কড়াইসুঁটির কচুরি হতে দেরী হওয়ায়, বাবাজীরে তখনো বাড়ী ছিলেন,—অর্থাৎ আটকে গিয়েছিলেন। বললেন—"ভাবছেন কেনো—আমরা দেখছি!—"

"শুনে কতটা শান্তি আর সাহস পেলুম সেটা বুঝতেই পারছেন। ভগবানের কাছে তাদের কুশল আর দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করলুম,—বাতের বেদনা ভুলে গেলুম,—আনন্দাশ্রু বেরিয়ে এলো। পুত্রহীনদের জন্যে পরম আপশোস্ অনুভব করতে লাগলুম,—তারা কী দুর্ভাগা! মা ষষ্ঠী পুত্র যেন, সবাইকে দেন।—হেঁকে বললুম—"তা হ'লে দেরী করিসনে বাবা,—কালা গাই, সন্ধ্যা হয়ে গেলে দেখতে পাওয়া শক্ত হবে। হিন্দু'র দেশ, কোন্ ভক্ত বেড়ো মেরে খোঁড়া গাইটে সাবাড় করে দেবে, বেরিয়ে পড়ো বাছুরো।" "কালা গরু" কিনা, কি মিষ্টি দুধই দেয় মশাই।

ব্রাহ্মণী আড়ানা-বাহারে বলে উঠলেন—"বাছাদের কি খেতেও দেবেনা,—এখনো পাঁচখানাও পেটে পড়েনি। তোমার তাড়ায় বসেনি পর্য্যন্ত, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মুখে দিচ্ছে।"—

"অর্থাৎ—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, কেশ আর কচুরি—দুয়ের সেবাই চলছে। যাক্—চুল ফিরিয়ে পাঞ্জাবী পরে, পমস্ মেরে—গরুখোঁজা বেশ সেরে, চট্ বিশ মিনিটের মধ্যেই তারা বেরিয়ে পড়লো।—

"বৈদ্যের বাতের তেলের বিদ্‌কুটে গন্ধ সারা দিন আদ-মারা করবার পর সহসা সুমধুর সৌরভে ঘরটা মালঞ্চ মেরে যাওয়ায় নিঃশ্বেস টেনে—আঃ কি আরামই পেলুম! বাবাজীরে বোধ হয় রুমাল টেনে মুখ মুছতে মুছতে গেল। ব্রাহ্মণীকে ডেকে বললুম— "কচুরিগুলো সবই ফেলে গেলো নাকি,—আহা রেখে দাও, এসে খাবে অখন। আমাকেও একখানা দাও তো দেখি—কেমন বানালে।"

বললেন—"গোণা গুণতি করেছিলুম, তার আবার ফেলে যাবে কি,—সোমোত্তো ছেলে!" ইত্যাদি বহুৎ। "যাক্—যখন ফেলেনি, বোধ হয় ভালই হয়ে থাকবে।"

বললেন—"মন্দ হলে ওরা মুখে করতো কিনা!"

বললুম—"রাম কহো—ওরা সে ছেলেই নয়!" পুনগর্ব্বে বাতের বেদনা আবার ভুলে গেলুম। "সোমোত্তো" কথাটা বারোয়-পড়া অনূঢ়া কন্যার বেলাই শুভানুধ্যায়িনীরা শোনান, পাঁড় ছেলেদের কড়াইসুঁটির কচুরি খাবার ক্ষেত্রেও যে তার সুপ্রয়োগ আছে, সেটা আজ শিখলুম;—বেঁচে থাকায় অলাভ নেই! যাক্, চিন্তায় চুর হয়ে কেবল কালা-গরুই ভাবছি,—সাতটা বাজলো,—আটটায় ঘা দিলে,—এই আসে! গরু এলনা,—নটার আওয়াজ এলো। কাণ ছুটো রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালো। সে কী প্রতীক্ষা!"

"তদুপরি ব্রাহ্মণী এসে তর্জ্জন সহ বললেন,—ছেলেগুলো ঘুরে ঘুরে গেলো,—এখন তারা ফিরলে যে বাঁচি। কেবল গরু, গরু, গরু,—আর ছেলেরা হ'ল ওঁর গরুর চেয়ে কম্।"

বললুম—"কি বলচো গো! এমন কথা আমি ভুলেও যে কখনো ভাবিনা! আর যা বলো—বলো, এত বড় মিথ্যে অপবাদটা আমাকে দিওনা গিন্নি।

"একখানা মোটর এসে দরজায় থামলো। এত রাত্রে আবার কে? বোধ করি রহিম মিঞা বিজয়ার নমস্কার করতে এসেছে,—মোটরে আর কে আসবে? সে আমাদের সইস্ ছিলো, এখন তার সময় খুব ভালো,—দু'বছর থেকে আসছে। শুধু হাতেও আসে না।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়ে,—ধামা, চেঙারি—লুকিয়ে

রাখতে ব্রাহ্মণী দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছেলের প্রবেশ,—"ট্যাক্সী ভাড়াটা চট্ করে দিন—পাঁচ টাকা দশ আনা! বেটাকে ছ'টাকা দেবে না আরো কিছু, আমরা যেন' মিটার বুঝি না—এমনি মুক্ষু ঠাউরেছে! শীগ্‌গির দিন, ছোটলোক বেটাকে বিদেয় করি। যা ঘুরিয়েছি এক ফুট্ পথ ছুট্ যায়নি, বেটা ফাঁকি দেবে আমাদের! দিন আর দেরী করবেননা,—বজ্জাৎ বেটা লাভের ছ'গণ্ডা টেনে নেবে আবার"।

"ভাঙানো ছিলনা,—ছ'টাকাই হাতে দিতে হল। বললুম—"শ্যামলীকে পেলি কোথায়?"

"বলছি" বলে দ্রুত বেরিয়ে গেল। যাক্—গাবিন গরুটা যে পাওয়া গেছে সেইটাই পরম শান্তি,—বাড়্তি লাভ "পাইভারের" পরিমল; বাপ্—অকৃত্রিম মহামাস তেলটা ক্ষাণিকক্ষণ মগজ্ মথন করবেনা।—

"পাশের ঘর থেকে মাতা পুত্রের বাৎসল্য-বিপুল কথোপকথন কর্ণকুহর জুড়িয়ে দিতে লাগলো। মনটা ভালো থাকলে সবই মধুর লাগে কিনা। সংসারের সুখই এই। সবই ভাগ্যসাপেক্ষ। দেখুননা—এরা আদিতে আমার কেউ ছিল না, মধ্যে কোথা থেকে উড়ে এসে এই মধুচক্র রচনা করেছে! আর—

"গুণ গুণ রবে * * * কেমন সুখেতে সব মধু পান করে"! আবার (ঈশ্বর না করুন) অন্তেও কেউ থাকবে-না,—অবশ্য, আমার প্রাণান্তের পর। একেই বলে ভগবৎ-লীলার শিলাবৃষ্টি,—আদিতে জল. অন্তে জল, মধ্যে—মাথা সামলাও! যাক্—

"শ্রবণে পশিল—বাবাকে চট্ নিশ্চিন্ত করবার জন্যে বাবাজীরা মোটর নিয়ে গরু খুঁজতে রওনা হল। যেখানে যেখানে খোঁজা দরকার,—হোটেল, বায়স্কোপ, কিন্নরী সেরে, ইডেন্ গুয়ে হায়রাণ হয়ে ফিরেছেন। বুঝেছেন—অত বড় গড়ের মাঠে যে গরু মেলেনা—সে গরুই নয়! জনৈক গন্ধ-বণিক বন্ধু বলে দিয়েছেন—মহামাস তেলের গন্ধেই গরু পালিয়েছে,—তোমরাও সাবধান। বাবার দোষেই তো এমনটি হ'ল! সে আর আসছেনা। যাক্, না এলেই ভালো। দিন্ একটাকার দুধ কিনলেই ঢের হবে,—সোজা কথা তো বাবা বুঝবেননা। গরু গরু একটা বাই,—গরুর যেন অভাব! ইত্যাদি—

"বামাস্বর বেরুলো—"আগে তো এমন ছিলেননা, কাছারী যাওয়া বন্ধ করেই বুদ্ধি শুদ্ধি বিগড়ে গেছে। এক হাবাতে বাত্ জুটিয়ে দিনরাত পড়ে আছেন, বেরুতে বললেই বেদনা বাড়ে। দুধ কেনবার কথা পাড়লেই বলে' বসে আছেন—"টাকা আসবে কোথা থেকে"!—

"বাবাজীবনরা বলে উঠলেন—"ও ভেবনা মা—"যে খায় চিনি—তাকে যোগান্ চিন্তামণি"!—

"শুনলেন,—গরু গেলো, গরু খোঁজার মোটর ভাড়া গেলো, উপরন্তু—সাত-সেলামী! শেষ "চিন্তামণি" বানিয়ে রেখেছে। যা চাই—যোগাতে হবে,—নান্য পন্থা, বেঁচে থাকতে—অন্নদায়! কি বলেন?"

আর দাঁড়ালেননা। যাবার সময় যে হাসিটে মুখে করে নিয়ে গেলেন, সেটা আমাকে বেদনাই দিলে। (ক্রমশঃ)

"কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ—"

শ্রীরাধারাণী দত্ত

বন্ধ-দুয়ারে রন্ধ্র নাহি যে গন্ধ আমার কাঁদে,
সন্দ' জাগিছে অন্ধ কি আমি ? অন্ধকারে'র ফাঁদে !
ওমা তরু তুই বল্ মোরে আজ,
জীবনে কি মোর নেই কিছু কাজ ?
কেন রেখেছিস্ আঁধারের মাঝ—?
নাহি কি মমতা তোর,—
দলে'র কঠিন বাঁধন কেন গো
অঙ্গ বেড়িয়া মোর ?

রুদ্ধ-কারায় বদ্ধ রহিয়া তবুও বক্ষে কেন
অনাগত কোন্ অতিথি'র আসা—আশা-ভাষা লেখে যেন !
কার মিলনের অজানানন্দে
অন্তর মোর ভরেছে গন্ধে,
বিচিত্রতর ব্যাকুল-ছন্দে
কিঞ্জল্কে'রা জাগে,
অধীর-চিত্ত কার দরশন-
পরশন-মধু মাগে !

প্রাচীরে'র আড়ে রহিয়াও তবু কত কী যে শুনি মাগো,
কে যেন ডাকিছে ঘন-অনুরাগে—"সখি জাগো, সখি জাগো",
গুঞ্জন তুলি মধুময়-সুরে,
কা'রা যেন মোর চারিপাশে ঘুরে,
বিপুল-পুলকে বুক ওঠে পুরে—
—খুলে দে' মা বন্ধন !
আমার না-দেখা-বন্ধুরে দিব
বুকের গন্ধ-ধন !

মৃদুল-উষ্ণ চুম্বনে কা'র কঠিন অঙ্গ মোর
শিথিল হইয়া পড়িছে আপনি,—কেটে যায় ঘুম-ঘোর !
—প্রভাতে'র আলো ?…শুনিয়াছি নাম,
রূপ নাকি তার নয়নাভিরাম !…
স্ফুটন-মন্ত্র কাণে অবিরাম
ঢালে বলো কোন্ বঁধু ?
কার অনুরাগে শিহরণ জাগে,
বুকে জমে' ওঠে মধু !

দখিণা-বাতাস ? তারই ছোঁওয়া একী ? মাগো মোরে ধর্ ধর্,
চিনি আমি তার চরণের ধ্বনি,—অই শোন্ মর্ম্মর !
তার আগমনে কিশলয় মোর,
বিকাশ-স্বপনে হয় যে বিভোর,
পরশন তা'র প্রাণ-মন-চোর,
—উতলা তাহার বাঁশী,
ঘরছাড়া-করা—মায়াসুরে ভরা
গৃহ-বন্ধন-নাশী !

সারা তনু মোর এলায়ে পড়িছে ! বিপুল-পুলক লাগে !
গোপন-বর্ণ গাঢ় হ'য়ে ওঠে সুনিবিড়-প্রেমরাগে !
পুষ্প-স্তাবক ভ্রমরের গান,
না ফুটিতে মোর মোহিয়াছে প্রাণ,
—বিকাশ-প্রার্থী অতিথি'র মান
কি দিয়ে রাখিব বল্,
একটু গন্ধ মধু ও বর্ণ
দীন-হীন সম্বল !

কাহারে দিব মা সৌরভ-ভার ? কা'রে দিব মধুটুক্ ?
কা'রে অর্পিব বর্ণ-বিভব ? পরিমল-ভরা বুক ?
না দেখেও যা'রা মোরে চিনিয়াছে
বিকাশে'র আগে মধু কিনিয়াছে
অবরুদ্ধার প্রাণ জিনিয়াছে
—সে বন্ধু দল এলে,
স্বাগত-আদরে বরিতে পাব কি
মর্ম্মের কোষ মেলে ?

চিনিতে তাদের পারিব তো আমি ? তাই তুই মোরে বল্ ?
তা'রা না আসিতে ফুরায় না যেন সৌরভ-পরিমল !
মোর পানে আঁখি মেলি অনিমিখ
তাকাবে যখন,—চিনিব' তো ঠিক ?
গন্ধে তখন ভরে যেন দিক্—
বুক না এমন কাঁপে,
পাপ্ড়ী আমার কুঞ্চিত হ'য়ে
সরমে না মুখ ঝাঁপে !

চিত্রকর

ডাঃ শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

গ্রাম হইতে দূরে, মাঠের মাঝখানে ছোট একখানা ঘর, চারিদিক তার দৈন্যের ছায়ায় অন্ধকার। তার মাঝে তার চক্ষে ফুটিয়া উঠিত—কোন্ এক অজানা স্বর্গের অসীম শোভা, অশেষ সম্পদ!

সে পটের সামনে তুলি লইয়া বিভোর হইয়া ছবি আঁকিত—সেই রূপের, যা তার চ'খের উপর বিজলীর মত খেলিয়া যাইত; রঙের আখরে ধরিয়া রাখিতে চাহিত—সেই সুষমা, যা কেবলি তার চোখের সামনে রঙিন আলোর ছায়াবাজীর মত খেলিয়া বেড়াইত।

সে ছবি আঁকিত। অনেকক্ষণ পরে সে উঠিয়া তফাৎ হইতে দেখিত সে ছবি। চাহিয়া চাহিয়া তার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিত—কাঁদিয়া সে বলিত, এ তো সে নয়, সে নয়! যে আলোর মেলা তার চোখের মাঝে দিন রাত লুকোচুরী খেলিয়া বেড়াইতেছে এ তো সে নয়, সে নয়।

পটের পর পট আঁকে সে—ক্ষণেক চাহিয়া মুগ্ধ হয়—মরি কি রূপ! আবার সে চাহিয়া দেখে—তুচ্ছ এ রূপ, এ তো সে নয়, সে নয়!

রাশি রাশি পট সে আঁকিল। তার কুটীরের সঙ্কীর্ণ আয়তন ভরিয়া গেল সে ছবিতে, কিন্তু তার মন ভরিল না। অনাদৃত অবজ্ঞাত শত শত ছবি ভূমে লুটাইয়া তার অসার্থকতার বোঝা বাড়াইল।

অভাব তার দুয়ারে নিত্য অতিথি,—মিটিবার নয় যে ক্ষুধা, সে তাহার দেহ দিন দিন শীর্ণ করিয়া তুলিল। কিন্তু সে কথা সে এক দিনের তরে ভাবে না—সে সুধু ছবি আঁকে।

* * * *

এক বুড়ী তার দেখা-শোনা করে। লোকে জানে সে ঝি, কিন্তু সে কোন দিনই মাইনা পায়ও না—চায়ও না। সে সুধু আসে আর কাজকর্ম্ম করে, চিত্রকরকে খাওয়ায় দাওয়ায় আর মাঝে মাঝে তাকে তার কাজ হইতে টানিয়া উঠায়।

এমনি বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। চিত্রকর সুধু পাগলের মত ছবির পর ছবি আঁকিয়া চলিল—তার আশ মিটে না—যত রূপ তার চোখের উপর দিনরাত খেলিয়া যায়, তা সে পটের উপর আঁকিয়া তুলিতে পারে না!

* * *

বুড়ীর একটি মেয়ে ছিল। যখন চিত্রকর তাকে প্রথম দেখিয়াছিল, তখন তার বয়স ছিল বার বছর। তার পর হইতে সে তাকে দেখিয়াই চলিয়াছে—ঠিক যেন সে সেই ছোট মেয়েটিই আছে। সে তার মার সঙ্গে আসে যায়। শিল্পীর একাগ্র সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করিবার জন্য আহার নিদ্রা ঝি প্রভৃতি যে অজস্র উপাদান জগতে আছে, মেয়েটি চিত্রকরের কাছে সুধু তারই মাঝে একটি—আর কিছুই নয়।

সহসা এক দিন অলকার চেহারা ফিরিয়া গেল। চিত্রকর তার দীর্ঘ সমাধি হইতে হঠাৎ যে দিন জাগিয়া উঠিল, তখন অলকার যৌবন কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে, রূপ তার শরীরকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। তার পটের উপর বাঁধা দৃষ্টি ফিরাইয়া একবার চিত্রকর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল—সে চমকাইয়া উঠিল—দেখিল, তার মানস-প্রতিমা মূর্ত্তিমতী হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। অলকা তখন পেয়ারা গাছের একটা ডাল নুয়াইয়া পেয়ারা পাড়িতেছিল!

চিত্রকর উঠিয়া দাঁড়াইল। তার সমুখ হইতে ছবি-আঁকা পটখানি দূরে ফেলিয়া দিল। আর একটা পট লইয়া তার উপর তুলি চালাইয়া তাড়াতাড়ি সে অলকার মূর্ত্তিখানা রঙে আঁকিয়া তুলিতে চেষ্টা করিল।

অলকা তাকে দেখিয়া লজ্জায় লাল হইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। মুগ্ধ চিত্রকর আর একখানা পট টানিয়া লইল। এও যে একখানা তুলিয়া লইবার মত ছবি!

তার পর সে বুড়োকে বলিল সে অলকার ছবি তুলিবে—অলকা যেন রোজ তার ঘরে আসে। অলকার মা বলিল, "ছি! সোমত্ত মেয়ে—ও এলে যে ওর বিয়ে হ'বে না।"

একটা বিদ্যুতের রেখা চিত্রকরের অন্তর যেন বিদীর্ণ করিয়া গেল। অলকার বিবাহ হইবে—সে তার চক্ষের আড়ালে যাইবে! সে হইতে পারে না!

সে চট্ করিয়া বলিয়া বসিল, "আমি ওকে বিয়ে ক'রবো।"

বিবাহ হইয়া গেল।

* * * *

অলকার ছবিতে ঘর ভরিয়া গেল, অলকার ছবি তার অন্তর ভরিয়া রহিল, মুগ্ধ চিত্রকর দিন রাত সেই ছবিতে মশগুল হইয়া কাটাইল।

তার পর আসিল এক শিশু, দুটি শিশু, তিনটি শিশু। তাদের ছবি বাড়িয়া চলিল, অলকার মাতৃমূর্ত্তি পটে পটে হাসিয়া উঠিল।

অনেক দিন এমনি কাটিল।

তার পর এক দিন ছবি আঁকিতে আঁকিতে চিত্রকর জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সে আঁকিতেছিল "শারদলক্ষ্মী"। তার সামনে বসিয়াছিল শারদলক্ষ্মী বেশে অলকা। তার অপরূপ রূপরাশির উপর একটা অতি সূক্ষ্ম স্বচ্ছ শুভ্র বস্ত্র বই আর কোনও আবরণই ছিল না। মাথায় তার এলায়িত চিক্কণ কেশরাশির ভিতর গোঁজা ছিল একটী কাশের গুচ্ছ; তার বুকের কাছে সে চাপিয়া ধরিয়া ছিল একটি হংস। চিত্রকর তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া তার পটের উপর তুলির লেখা চালাইতেছিল, আর এক একবার চাহিতেছিল অলকার উচ্ছ্বসিত রূপরাশির দিকে।

একবার শুধু সে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। স্বচ্ছ নীল উজ্জ্বল আকাশের বুকে শরতের শিশু রবি রাঙা রূপ লইয়া হাসিতেছিল, সবুজ রঙের ধানের ক্ষেতের মাঝে মাঝে থোপা থোপা কাশের ঝোপ, আর নীল আকাশের বুকে থোপা থোপা সাদা মেঘের স্তূপ সেই হাসির সুরে নাচতেছিল। কাচের মত বিলের জলে সবটা আকাশ ও সবগুলি গাছের ছায়া জল জল করিতেছিল। সমস্ত দেশ যেন একটা কচি রূপে টলমল করিতেছে।

চিত্রকর ভুলিয়া গেল তার ছবি, ভুলিয়া গেল তার সামনে বসা রূপসী—সে মুগ্ধ নয়নে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল—উঠিয়া গিয়া জানালা ধরিয়া চাহিয়া রহিল।

অনেক দিনের হারান স্বপন তার চোখের উপর নাচিয়া উঠিল। যে রূপের আলো তার চোখে এত দিন মলিন হইয়া গিয়াছিল—কে যেন তার ধূলার আবরণ মুছিয়া ফেলিল। আঁধার ঘরে যেন হঠাৎ বিজলী বাতি জলিয়া উঠিয়া তার কোণায় কোণায় রূপের সব লুকান ভাণ্ডার নিমেষে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। চিত্রকর চাহিয়া রহিল। দূর আকাশে সাদা হাঁসের মালা সাদা মেঘের স্তরে স্তরে তুষারের সেতু বাঁধিতে ও ভাঙ্গিতে লাগিল—শারদলক্ষ্মীর নীল কণ্ঠে গজমোতির চঞ্চল মালার মত।

চোখের সামনে তার ভাসিয়া উঠিল অপরূপ রূপসজ্জার শারদলক্ষ্মীর! তার চারি পাশে ছুটিয়া ফিরিতেছে শত স্বর্গ-শিশুর বিমল হাস্য—টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া সে হাসি ছড়াইয়া পড়িয়াছে আকাশের মেঘে আর কাশের বনে। এলায়িত নীল বেণী তার তরঙ্গিত তরল কৌস্তুভের মত আকাশের নীল অঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তার পূত শুভ্র কান্তির কণামাত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে কুমুদপল্লবে—গণ্ডের আভায় তার রঙিন হইয়াছে সরোবরে থরে থরে কমলের দল! কি রূপ সে! কি মাধুরী তার!

আবেশ-বিহ্বল হইয়া সে টানিয়া লইল একখানা পট, তুলিয়া লইল তার তুলি। স্বপ্নের ঘোরে সে অশেষ স্নেহের সহিত বুলাইয়া চলিল তার তুলি সেই শুভ্র পটের উপর!

অলকা হাসিয়া বলিল, "আমার ছবি হ'য়ে গেল? এখন আমার ছুটি?"

চট্ করিয়া স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চিত্রকর চাহিয়া দেখিল তার সম্মুখে বসিয়া আছে সুধু এক লজ্জাহীনা নারী—কদর্য্য তার বেশ ভূষা, দৈন্যে ভরা তার অরূপ! চাহিয়া দেখিল তার ছবির দিকে—কতকগুলি রঙের বিশ্রী পোঁচড়! ভ্রূকুটি করিয়া সে সেদিকে চাহিল—অলকা ভয়ে চুপ করিয়া রহিল।

চিত্রকর মুখ ফিরাইয়া চাহিল বাহিরে—চক্ষু বুজিয়া ধ্যান করিতে লাগিল তার স্বপ্নের 'শারদলক্ষ্মী!—সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—অন্তর্ধান করিয়াছে সে লক্ষ্মী! পাগলের মত চিত্রকর তার স্মৃতির অন্ধকার গহ্বরে হাতড়াইয়া সেই রূপের বিস্রস্ত কণাগুলি আকুল হইয়া কুড়াইতে

লাগিল, তুলির লেখার কণা কণা তার ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে সে তার ছবির দিকে পরীক্ষকের দৃষ্টি দিয়া চাহিল। উন্মত্তের মত ঘাড় নাড়িয়া সে বলিল, 'এ তো সে নয়! সে নয়!"

ছুঁড়ে ফেলিয়া দিল সে পট।

তার পর সে তার চিত্রশালার চারিদিকে চাহিল। অলকা তখনও তেমনি বসিয়া ছিল!—বিরক্ত হইয়া চিত্রকর বলিল, "যাও, দূর হও তুমি।"

চক্ষু মুছিতে মুছিতে অলকা তার নগ্ন দেহ আবৃত করিয়া চলিয়া গেল।

সামনে যে ছবিখানি ছিল সেখানির দিকে চিত্রকর চাহিয়া দেখিল—অলকার যত ছবি তুলিয়াছিল, একে একে সব দেখিল—সব টানিয়া ছিঁড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। শিশুদের সব ছবি চুরমার করিয়া ফেলিয়া দিল। একে একে ঘরের ভিতর হইতে সবগুলি ছবি ফেলিয়া দিয়া সে বসিয়া তার চুল ছিঁড়িতে লাগিল—বলিল, "পারলাম না, পেলাম না তোমায়! সুধু চোখের উপর মায়ার খেলা খেলে পালালে কে তুমি গো?"

বাহিরে জানালার নীচে যেখানে ছবির স্তূপ পড়িয়া ছিল, অলকা নিঃশব্দে সেখানে গিয়া সেগুলি সংগ্রহ করিতেছিল। চিত্রকর ছুটিয়া বাহিরে গেল—অলকার হাত হইতে পটগুলি কাড়িয়া লইয়া সে স্তূপের ভিতর আগুন লাগাইয়া দিল।

দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল। স্তব্ধ দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে আগুন তার ঘরে লাগিল—অলকা চীৎকার করিয়া ঘরে ঢুকিল তার শিশুদের রক্ষা করিতে। দূর গ্রাম হইতে লোক ছুটিয়া আসিল। তারা কিছুই করিতে পারিল না—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল—অলকা তিনটি সন্তান বুকে করিয়া সে আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। চিত্রকরের সর্ব্বস্ব পুড়িয়া গেল।

সে সুধু মাথায় করাঘাত করিয়া বলিল, "পেলাম না, পেলাম না!"

সকলে বুঝিল বেচারা স্ত্রী ও সন্তানের শোকে পাগল হইয়া গিয়াছে।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—বিশ্বমানবের
সৌন্দর্য্যের শেষবাণী সৌরজগতের!
স্রষ্টার চরম সৃষ্টি অপূর্ব্ব সুন্দর
অপূর্ব্ব বিরাট সঙ্গী—গৌরী মহেশ্বর!
কল্পনার শেষ কথা—বিস্ময় বারতা
সারা বিশ্বভুবনের। শ্রেষ্ঠ সার্থকতা।
সে দৃশ্যের দ্রষ্টা আর কি করিবে ভয়
রুদ্রের মৃত্যুরে আজি; লভিয়া বিজয়
মানবেরই দৃষ্টি দিয়া সে যে দেখিয়াছে
শিবের সুন্দর মূর্ত্তি ভীষণের কাছে।
তাই আজি মনে হয়, ত্রিকালজ্ঞ যাঁরা
মুনিঋষি তপোবনে, কি হেতু তাঁহারা
তোমাতে করেন বাস—ওগো হিমাচল
স্বর্গের সোপান তুমি প্রমূর্ত্ত মঙ্গল।

সিঞ্চলের সূর্য্যোদয়—সৌন্দর্য্যের শেষ
যেথায় ধরণী করে নয়ন উন্মেষ
ধরণী মায়ের পানে, প্রথম পুলকে
ছাড়িয়া সূতিকাগৃহ, লজ্জারাঙা চোখে!
অসংখ্য সন্তানে আজি ভরা তার কোল
খসিয়া পড়িছে ধীরে বক্ষের নিচোল
কুয়াশার স্বপ্নসম; লঘুমেঘ বাস
বাঞ্ছিতের করস্পর্শে অনিবদ্ধ পাশ!
ভোলেনা সন্তানে তবু, সবাকার লাগি'
স্বামীর সদয় দৃষ্টি লইতেছে মাগি'।
পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়—কিবা তার ভয়
মা জননী অন্নপূর্ণা, অব্যয় অক্ষয়
নিয়ত ভাণ্ডার যার—কিবা দুঃখ তার
হে শিব সুন্দর মূর্ত্তি লহ নমস্কার।

এক দৌড়ে পূজার ছুটি

শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার

গত বৎসর বিন্ধ্যাচল হইতে ফিরিবার পর হইতে এই সমস্যাটা আমার মনে জাগিয়াছিল যে-এমন একটা স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্যান্বেষী বাঙ্গালী ভিড় না করিয়া, এখানে-ওখানে ঠাসাঠাসি করিয়া বেড়াইতেছে কেন? ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশ ভ্রমণের সৌভাগ্য ও সুবিধা লাভ করায় যে কয়েকটি স্বাস্থ্যকর স্থানের সন্ধান আমি পাইয়াছি, বিন্ধ্যাচল তন্মধ্যে একটি। জলের রাসায়নিক ভাগ-বাঁটোয়ারার খবর আমি দিতে পারিব না; হাওয়ার অক্সিজেন বা ওজোন বেশী, তার খবরও আমার জানা নাই; আমি বলিতে পারি এমন সুমিষ্ট জল বেশী জায়গায় পাই নাই। মধুপুরের মধু মাতিয়া, গাঁজিয়া গুড় হইয়া গিয়াছে; শিমুলতলার অবস্থা শিমুল-ফুলেরই মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বৈদ্যনাথ-ধামেও বিনা বৈদ্যে আর উপকার পাওয়া যাইতেছে না; জসিদির জয়পতাকা আর উড়ে না;—তবুও যে স্বাস্থ্যকামী বাঙালী ভদ্রব্যক্তিগণ ঐ সকল স্থানেই গুঁতাগুঁতি করিতেছেন, তাহার কারণ কি এই নয় যে, চেষ্টা করিয়া, সুড়ুক সন্ধান লইয়া কোন কাজ করিতেই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা ও উৎসাহের অভাব ঘটিয়াছে? অথচ সারা ভারতের মধ্যে স্বাস্থ্য-সম্পদে আজ বাঙালীর চেয়ে দরিদ্র কে? দুই চারিটা ব্যতিক্রম হয় ত আছে; কিন্তু অধিকাংশ বাঙালীর অবস্থা "পদ্মপাঠের" সেই "কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ!" আর্থিক দারিদ্র্যের সঙ্গে দৈহিক দারিদ্র্য বাঙালীকে বেড়িয়া ধরিয়াছে; মারিতে বসিয়াছে। তাই যাঁহাদের সামান্য সম্বলও আছে, তাঁহারাই কাজ-কর্মের মধ্য হইতে একটু অবসর পাইলেই অমনি তল্পীতল্পা বাঁধিয়া, গৃহিণীর হাত ধরিয়া, ছেলেমেয়ে-রেজিমেণ্টের কোমরে বগলোস আঁটিয়া, হিঁচড়াইতে-হিঁচড়াইতে এখানে-না-হয় ওখানে গিয়া হাজির হন। অন্য অনেক জাতি আছে, ছুটী পাইলে যাহারা দেশ-বিদেশে দৃশ্য দেখিতে চলিয়া যায়; কিন্তু নিছক Sight-seeing বাঙালী-পরিবার শতকরা একটি মিলে কি-না সন্দেহ। অধিকাংশ স্থলেই শুনি, "বাড়ীর মধ্যের" শরীরটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই দেখি একবার যদি—ইত্যাদি। বাস্তবিক বাঙালী মধ্যবিত্ত গৃহস্থের "বাড়ীর মধ্যেই" যত উৎপাত। ডাক্তার মুখো হইতে সুরু করিয়া বহু মানব-হিতকামী ব্যক্তি ইহার কারণ নির্ণয় করিতে ও লোক-সমাজে তাহা প্রচার করিতে ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু আমাদের কানের তুলা ও পিঠের কুলা কোনটাই কম মজবুত নয়—সুতরাং ফল যে কি হইতেছে তা বলা শক্ত নয়। আজ এই বাঙলা-দেশের মধ্যবিত্ত ঘরের কতগুলি বাড়ার মধ্যে প্রতি বৎসর যে ঘর শূন্য করিতেছেন, তাহার মোটামুটি হিসাব দেখিলে মানুষমাত্রেই শিহরিয়া উঠিবে। অবশ্য ইহার দ্বারা কন্যাদায় প্রোব্লেমের কতকটা প্রতিকার হইতেছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু আমি জানি অধিকাংশ ঘর ছন্নছাড়া, শান্তিহারা হইয়া পৃথিবীর শান্তি হরণ করিতেছে। অনেক চিন্তার পর আমাদের ভাই-দাদারা স্থির করিয়াছেন যে, বৎসরান্তে সকলকে এক-আধবার হাওয়া খাওয়াইয়া আনিবেন। ব্যবস্থা মন্দের ভাল। ইহার জন্য কিছু ঋণ হয়, অনেকে তাহাতেও স্বীকার। ভাল হাওয়া এখন ঘৃতের চেয়েও মূল্যবান। সুতরাং ঋণ করিয়া ঘি খাওয়ার ব্যবস্থা যখন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে, তখন ভাল হাওয়া খাইতে নিশ্চয়ই নিষেধ নাই। বিশেষতঃ ভাল ঘি বলিতে যাহা বুঝায় তাহা যখন একেবারেই দুষ্প্রাপ্য; ঘিয়ের কড়ি গণিয়া হলাণ্ডের শব্জী-পদার্থ (Vegetable ghee) ভক্ষণ করা আর মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ করিয়া বাপ-পিতামহের শ্রাদ্ধ সারা একই কথা। তাই ছুটি-ছাটার সময়ে বাঙলা খালি করিয়া বাঙালী বিদেশের পানে ছুটিয়া যায়। বিদেশে সহরের কড়া পর্দা নাই;—বাঙালীর মেয়ে দিনকতকও ঘোমটাটাকে খাটো

করিয়া আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন। বাঙালীর মেয়ের মনের জোরটা কিছু বেশী,—নতুবা তাঁহাদের সেই মাংসহীন, জ্যোতিঃহীন, স্বাস্থ্যহীন, জার্ণশীর্ণ দেহগুলাকে টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছেন কি করিয়া? আমার ধারণা, মনের জোরটুকু স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিদায় গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের দাঁড়াইবার শক্তিটুকুও থাকে না।

এ-বছর বিদেশ-যাত্রার ধুমটা কিছু বেশী হইয়াছিল। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতায় কৃতান্ত এ বৎসর নূতন এক মূর্ত্তিতে দেখা দেন। সহরসুদ্ধ লোক সসম্ভ্রমে তাঁহার নামকরণ করে, বেরি-বেরি। কলিকাতা কর্পোরেসনের মতে স্যাঁতানে গুদামের চাল খাইয়াই রোগের উৎপত্তি হইতেছে;—সঙ্গে সঙ্গেই ময়দা, গম, আটার বাজারে আগুন ধরিয়া গেল; লোকে অন্ন এক-রকম ত্যাগই করিল; কিন্তু বুক ধড়াস্ ধড়াস্ কমিল না, সারা সহরে পালাই-পালাই রব উঠিল। রেল কোম্পানীও গুদাম সাবাড়ের বিজ্ঞাপন দিলেন, এক ভাড়ায় যাতায়াত হইবে। এ সুযোগ ত্যাগ করা সমীচীন নহে বিধায় বাঙালী যে-যেখানে পারিলেন—ছুট্ দিলেন। সস্তায় কিস্তি পাইলে ফরেক্কাবাদ যাত্রা করা উচিত, ইহাই বিধি।

২

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ"—শাস্ত্র-অনুশাসন আমি মানি। তার উপর আমার "বাড়ীর মধ্যে"টিরও বার মাসে তের পার্ব্বণ, দোল-দুর্গোৎসব, গুড্‌ফ্রাইডে, মহরম লাগিয়াই আছে। পূজার সংখ্যা "কাগজ" বাহির করিয়া দিয়া, পূজার ছুটি পাইবামাত্র বিন্ধ্যাচলের কয়েকখানি টিকিট সংগ্রহ করিয়া ফেলিলাম ও স্যানিটোরিয়ামে সংবাদ দিলাম। বলা বাহুল্য, তাঁহারা খুসী হইলেন এবং ফেরত ডাকেই জানাইলেন যে, আমাদের জন্য একটি পরিবার-মহল (family quarters) রক্ষিত হইয়াছে। এখানে বলিয়া রাখা দরকার মনে করিতেছি যে, মিষ্ট জল ও বিশুদ্ধ বায়ুর লোভে বাঙালীকুল আকুল হইয়া যদি বিন্ধ্যাচলরূপ পুষ্পবীথিকার উদ্দেশে সগুজন ধাবমান হন্, তবে তাঁহাদিগকে বিলক্ষণ মনস্তাপ পাইতে হইবে। থাকিবার মত বাড়ীর এখানে বিশেষ অসদ্ভাব—নাই বলিলেই ঠিক হয়। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড—তথা গবর্ণমেণ্টের একটি ডাক-বাঙলা আছে; তাহা প্রায়ই খালি পাওয়া যায় না। যদি পাওয়া যায়, এমন বেপোট্ জায়গায় সেটি অবস্থিত যে, সেখানে থাকা আর বহরমপুরে রাজ-অতিথি হইয়া থাকা প্রায় সমান। দুই চার ঘর বাঙালী এখানে বসবাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহার-কাহারও দুই-একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ী আছে বটে; কিন্তু তদ্দৃষ্টে বহু বাঙালীর নাসিকাই স্বস্থান পরিত্যাগ করতঃ শূন্যমার্গে উত্থিত হইবে। তবে রাহী-যাত্রী তীর্থভ্রমণকারী-কারিণীদের জন্য স্থান আছে,—ধর্ম্মশালা আছে, পাণ্ডাদের গৃহ আছে। দুই তিন দিন সেখানে 'বেশ' থাকা যায়;—ঠাকুর দেখা, পূজা দেওয়া চলে; কিন্তু স্বাস্থ্যের সম্পর্ক সেথায় নাই। দুইতিন বৎসর পূর্ব্বে এই স্যানিটোরিয়ামটি খুলিয়াছে বটে, আজও তাহার শৈশবাবস্থা ঘুচে নাই। ষাট-সত্তর জন লোক আসিলেই, তাঁহারা কলিকাতার থিয়েটারের অনুকরণে "হাউস্ ফুল্" টাঙ্গাইয়া দেন—এ বছর দিয়াছিলেন। চলে কেমন? যাদু ঘোষের রথ যেমন চলে, তেমন। তা চলুক এবং যত দোষ থাকুক, ষাট সত্তরজন স্বাস্থ্যকামী বাঙালীও যে একটু আশ্রয় প্রাপ্ত হ'ন—ইহারই জন্য প্রতিষ্ঠাতারা ধন্যবাদার্হ।

এতদঞ্চলে পাণ্ডারা ধনবল, জনবল, দেহ-বল আজও একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘোর কলি, এই ম্যালেরিয়া, ডিসপেপাসিয়া, এই ১৪৪ ধারা, এই অর্ডিন্যান্স, সিকিউরিটি এ্যাক্টের আমলেও তাহাদের দীর্ঘ, দৃঢ়, ঋজু পেশীবহুল দেহ, ছয় হস্ত পরিমিত বংশদণ্ড ও দাঁড়াপা দেখিলে কোন বাঙালীই সহজে বিশ্বাস করিতে চাহিবে না যে, মাত্র ৪৬২ মাইল দূরেই এই দৃশ্য দেখিতেছে। এই ধন-জন-শক্তিসম্পন্ন পাণ্ডাদের কাছে বাঙালী লোভনীয় শিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। তাহারা আসুক, তাহাদের বাড়ীতে থাকুক, পূজা দিউক, সুফল লউক, ইহাতে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ এবং সহানুভূতি আছে, কথ্য এবং অকথ্য বহুবিধ উপায়ে অর্থাগমের সম্ভাবনা সমধিক; কিন্তু বাঙালী আসিয়া এখানে বাড়ী করিয়া তাহাই ভাড়া দিয়া তাহাদের 'খাস্তা' ভাঙাইয়া লইবে, ইহা সহ্য করিবার মত বুদ্ধি ও স্থৈর্য্য শ্রীশ্রীদেবী বিন্ধ্যেশ্বরী তাহাদিগকে দেন নাই। শুনিয়াছি এমন সুন্দর স্থানে বাঙালী যে বাড়ী করিতে পারে নাই বা এখনও পারে না, তাহার মূল কারণও ঐ স্থানে নিহিত। স্যানিটোরিয়ামটাও

যে এতদিনে হামাগুড়ি ছাড়িতে পারিল না, তাহার মূলেও বিন্ধ্য-জননীর সেবায়েতগণের সাধু সদিচ্ছাই বিদ্যমান। তবু যে সেটি টিকিয়া আছে এবং দণ্ড-দাঁড়াশার দায় এড়াইয়া বাঙালী তথায় সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে ও অক্ষত অঙ্গে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছে, তাহার কারণটি আমি যতদূর জানিয়াছি—বলিতেছি।

বিন্ধ্যাচল স্বাস্থ্য-নিবাসটির প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী। তিনি বা তাঁহারা ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসরকাল মীর্জাপুরে বসবাস করিতেছেন। মীর্জাপুর, বেনারস,—যুক্তপ্রদেশের প্রায় সর্বত্র ইনি ডংগার বাবু বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বাপ-মায়ের দেওয়া একটা কিছু নাম অবশ্যই ছিল, হয়ত বা এখনও আছে; কিন্তু এ অঞ্চলের এক প্রাণীও তাহার খবর জানে না। তাহারা জানে ডংগার বাবু। চিঠি লেখে, তার ভেজে, শমন পাঠায়, সনদ দেয়—ডংগার বাবু। আসলে লোকটি ডাক্তার। "ডাক্তার বাবু" কোন্ ভোজপুরী ভাষাবিদের কল্যাণে কিরূপে ডংগার বাবুতে পরিণত হইলেন তাহা বহুভাষাবিৎ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার নূতন গ্রন্থ Origin and Development of Bengali Language হাতড়াইয়া বাহির করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দিয়াছেন। বঙ্গের বাহিরে বাঙালী যে কয়েকজন বিদ্যাবলে, বুদ্ধিবলে অথবা ছলে-বলে-কৌশলে প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তালিকায় এই ডংগার বাবুটি উঠিয়াছেন কি-না আমি জানি না; তবে না উঠিলে সে তালিকা যে অসম্পূর্ণ রহিয়া গেছে—তাহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। এই ডংগার বাবুকে বাঙালী মাত্রেই রিক্তহস্তে রোগী দেখিতে আহ্বান দিতে পারেন, গতবারই ইহা আমি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। শুধু তাই নয়—আপদে-বিপদে বিদেশে বাঙালীর এত বড় একটা ভরসা, বড় সামান্য নয়।

পঞ্জাব মেলে সে-দিন কি বাঙালীর ভিড়! চেনা-শুনা লোকই বা কত! উকীল-সাহিত্যিক কেশব-দাদা আসল মায় সুদ দিল্লী চলিয়াছেন; সরকার-দলও দিল্লী-যাত্রী, কত নাম আর করিব! সাহেব-সুবার ভিড় বড় ছিল না, বোধ হয় কালা-আদমীর সংখ্যাধিক্য দেখিয়া পূর্বাহ্নেই তাঁহারা সতর্ক হইয়াছিলেন। আমাদের এক ইওরোপীয় বান্ধবী ঐ গাড়াতেই সিমলা যাইতেছিলেন, বোধ হয় বর্ণ ততটা শ্বেত ছিল না বলিয়াই তিনি ধর্মঘট করেন নাই। আমরা তাঁহাকে সকালে আমাদের গাড়ীতে আসিয়া ভীম-নাগ সহযোগে চা-পানের নিমন্ত্রণ দিয়া শুইয়া পড়িলাম। তিনি অবশ্য
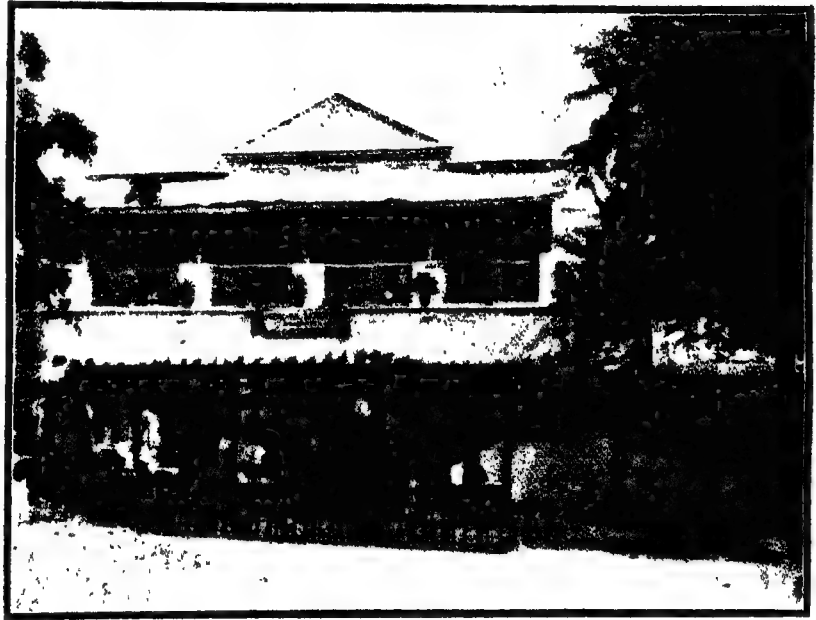
স্যানিটোরিয়াম—(স্বাস্থ্য-নিবাস)

নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিয়া বর্ণ-মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব মেল মীর্জাপুরে থামিতেই সপুত্র ডংগার বাবু আমাদের পার্টিকে 'অভিনন্দন দিয়া' নামাইয়া লইলেন। বাহিরে তাঁহারই 'মক্কেল' রামেশ্বর দাসের সুদৃশ্য ল্যাণ্ডো দাঁড়াইয়া ছিল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বিন্ধ্যাচল স্বাস্থ্য-নিবাসের দ্বারদেশে অবতরণ করা গেল। এ সময়ে ভিড় এতই জমাট বাঁধিয়াছিল যে নবাগত দেখিলেই বোর্ডারেরা বিরক্ত অথবা শঙ্কিত হইয়া পড়িতেন; সব চেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ হইতেন, স্থানীয় বাসিন্দারা। মাছের সের তিন আনা হইতে সাত আনায় উঠিয়াছে; জিগাপী চৌদ্দ আনায়—তা'ও দুষ্প্রাপ্য;

প্যাড়ার পরিচয় আর কারে নহে—নামে মাত্র; অপিচ মূল্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত। সুতরাং তাঁহারা যে জননী বিন্ধ্যবাসিনীর কাছে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া বর প্রার্থনা করিবেন না ইহা সুনিশ্চিত। দুই একা মোট-মাটরা ও ল্যাণ্ডো-ভরা মনুষ্য যে তাঁহাদের প্রীতি-সিন্ধুতে বান ডাকায় নাই বরং নাসাকুঞ্চনেই সাহায্য করিয়াছিল, মনে মনে উপলব্ধি করিয়া, একটু হাসিয়া আমাদের নির্দিষ্ট আবাসে উঠিয়া গেলাম; এই ফ্যামিলি কোয়াটারগুলি স্যানিটোরিয়ামের মূল গৃহেরই অংশ বিশেষ, স্নানকক্ষ, পাকশালা প্রভৃতির পৃথক ব্যবস্থা আছে—ইচ্ছা করিলে অন্য সকলের সহিত সম্পর্ক রহিত করিয়াও থাকা যায়।

প্রবাসী বাঙ্গালী

৩

প্রথমেই আলাপ হইল, ভবেশবাবুর সহিত। কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক, পণ্ডিত এবং প্রবীণ। সরপুরিয়ার দেশের লোক, রসেজরা রসবড়ার মত। চেহারাটীতে রসের বড়ই অভাব। প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর তাঁহার অগণিত ছাত্রবৃন্দ অধ্যাপক মহাশয়টির রূপ-রস (বাহিক) সকলই শোষণ করিয়া লইয়াছে, ভিতরের রসটা অপরিমিত ওজনেই আছে। প্রভাতে প্রত্যহ পাহাড়ে পাহাড়ে ন্যূনাধিক আট দশ মাইল, অপরাহ্নেও তাই ভ্রমণ করেন ও যাবতীয় কূপ এবং কুণ্ডের জল পরীক্ষা করিয়া বেড়ান। কলেজে ছাত্র পরীক্ষা, এখানে তদ্‌অভাব, সুতরাং জল পরীক্ষা চলিতেছে। অর্থাৎ কাজে ফাঁকী নাই। কিছুদিন কালীকুণ্ডার জল 'সর্ব্বজ্বর-গজব্যাঘ্র' হইয়াছিল, তৎপর আবিষ্কৃত হয়, সীতাকুণ্ড। কয়েক দিন পরে তাহারও বরাত পুড়ে ও ভৈরবকুণ্ডে ভরাভর হইয়াছে আমি দেখিয়া আসিয়াছি। জলের বলেই বহুকাল-আশ্রিত ডিস্‌পেপ্‌সিয়াটিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়াছেন—তাহারই আনন্দে মশগুল। উক্ত ব্যাধিটি বড়লোকের,—আহা, তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদেরই থাক্‌!—কিন্তু এই democracy অথবা গণতন্ত্রের আমলে আমাদের মত গরীব সাহিত্যিকদের প্রতি নেকনজরে চাহিতেও দ্বিধা করিতেছে না, আমিও উপর্য্যুপরি কয়েক মাস ডিস্‌পেপ্‌সিয়া-শুরু দিয়া অস্থিচর্ম্মসার হইয়া পড়িয়াছিলাম, কাজেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বাগাইয়া ধরিয়া ভবেশবাবুর সঙ্গ গ্রহণ করিলাম। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে অভাগার অদৃষ্টে সৌভাগ্য টিঁকিল না, একদিনেই সাধু-সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইল; আট-দশ মাইল একাদিক্রমে হাঁটা—

উঃ! খাস্ ক্যালকেসিয়ান বাবু আমরা, আমাদের ধাতে সহিবে কেন? শুধু আমি নহি, পরে শুনিয়াছি, অনেকেই 'অধ্যাপক মহাশয় শ্রীচরণেষু'—দণ্ডবৎ হইয়া, পৈতৃক-প্রাণ পিঞ্জর ছাড়া হইবার পূর্বেই সরিয়াছেন। হাঁ, অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায় কাশীতে কাহার নিকট আমি সপরিবারে বিন্ধ্যাচলে আছি শুনিয়া আসিয়া যখন আমার কাছে দৈনন্দিন ভ্রমণেতিহাস জানিতে চাহিলেন, তৎক্ষণাৎ ভবেশবাবুকে ডাকিয়া, তাঁহার সঙ্গে ভিড়াইয়া দিলাম। এক লাঙ্গলে (?) দুই অধ্যাপককে জুড়িয়া দিয়া দেখিয়াছিলাম, বেড়ে মিল হইয়াছে। সুনীতিবাবু ভারতের এবং ভারতের বাহিরেরও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট হইতে যে পরিমাণ সনদ আদায় করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মহা-ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইবার কথা। কলিকাতাতেই বাস—ভগবান রক্ষা করিয়াছেন, চমৎকার স্বাস্থ্য—কোন বালাই নাই। শুধু স্বাস্থ্য চমৎকার নয়—লোকটিও চমৎকার।

ঢেঁকী শুনিয়াছি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু সুনীতিবাবুকে সত্য সত্যই এখানে আসিয়াও ধান ভানিতে দেখিলাম। পাহাড়ে জঙ্গলে বনে বাদাড়ে ঘুরিয়া মূর্ত্তি, লিপি খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। ভবেশবাবু খুঁজিতেছেন, জল; আর ইনি প্রস্তর—অভাবে তাম্র-শাসন;—কেমন, যোগ্যে যোগ্যে মিল হয় নাই কি? শেষটা কিন্তু সুনীতি দুর্নীতি হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদা পাহাড় হইতে কাহাকেও কিছু না বলিয়া—পাহাড়কেও না—বহু কালের পুরাতন একটি শিব-শির অপহরণ করিয়া বসিলেন। চোরের মন আর কা'কে বলে? বিন্ধ্যর উপরে কোথায় পুঁই আদাড়ে মূর্ত্তিটি পড়িয়া ছিল, দেখিবামাত্র সুনীতি স্বীয় নামের সম্মানও রাখিতে পারিলেন না। ঘরে ফিরিয়া মূর্ত্তিটি আমাকে চুপে চুপে দেখাইলেন; তাহার বয়স, জাতি, জ্ঞাত-গোত্র সম্বন্ধেও বহু পরিচয় প্রদান করিলেন; আমার প্রখর স্মরণশক্তি তাহা তখনই বিস্মৃত হইয়াছে। তবে আশা আছে, কোনদিন কোন যাদুঘরে সেই শিব-মূর্ত্তিটি শোভা পাইতেছে দেখিতে পাইব এবং তাহার সকল পরিচয়ও পাওয়া যাইবে—সংগ্রহের ইতিহাসটি ছাড়া। সে ইতিহাস প্রকাশ হইলে, নীতিধ্বজদের সে মূর্ত্তি দর্শনে দশাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে। একে মূর্ত্তি, তায় চোরাই!

বিন্ধ্যাচলে এক সাক্ষাৎ নীতিরত্নাকরের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ করিয়াছিলাম। সেদিন একাকী সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছি, গৃহিণী ও পুত্রগণ শ্রীমান সতুভায়ার সঙ্গে নৌকা-ভ্রমণে গিয়াছেন; ধীরে ধীরে পাহাড়ের উপরকার সুন্দর রাস্তাটি ধরিয়া অষ্টভুজা-মন্দিরোত্থিত রক্তপতাকা লক্ষ্য করিয়া চলিতেছি; এক সৌখীন বাঙালী দম্পতীর সহিত সাক্ষাৎ। ভদ্রলোকটির চেহারা বেশ আঁট-সাঁট, গুম্ফভাঁটা

বধূ জলে চলে লইয়ে গাগরী

গোছের কিন্তু মহিলাটির—না থাক্, কাজ নাই বর্ণনায়। পরস্ত্রীর রূপ-বর্ণনা না কি করিতে নাই। করিতে থাকিলে, কি ভাবে নাসিকাটি চশমা সমেত সামনের দিকে সাত ইঞ্চি অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে; চোখের—থাক্! পরে পরিচয় পাইয়াছি, মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্-এ ডিগ্রী অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন।

ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন—"সামনে দিয়ে নামবার পথ আছে কি ?" ভাল মানুষটির মতই কহিলাম, আছে বৈ কি, সুন্দর পথ। অষ্টভুজার মন্দিরের সিঁড়ির মত সিঁড়ি বিন্ধ্যপর্বতে আর নাই।

ভদ্রলোকটি দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

প্রশ্ন। কি মন্দির বল্লেন ?

উত্তর। অষ্টভুজা দেবীর মন্দির।

প্রশ্ন। পাহাড়েও ?—বলিয়াই ভদ্রলোক স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন—চল।

হরি! হরি। বলিয়াছি দৃষ্টিতত্ত্বে আমার ব্যুৎপত্তি নাই, ভুল হইলেও হইতে পারে—যেন মনে হইল, মহিলাটি এই অকারণ সমারোহ সমর্থন করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু ভদ্রলোকটি কাঁচপোকা হইয়া স্ত্রীটিকে তেলাপোকার মত হিঁচড়াইয়া লইয়া ছুটিতেছেন। ছেলেবেলায় টিফিনের পয়সা বাঁচাইয়া গুরুদাস বাবুর দোকান হইতে একখানি বহি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম—"দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।" বাঙ্গালাভাষায় এমন মধুর, এমন সরস, দেশবিদেশের তথ্য-পূর্ণ জ্ঞানভাণ্ড'র আর নাই। তাহাতে একটা গল্প আছে,
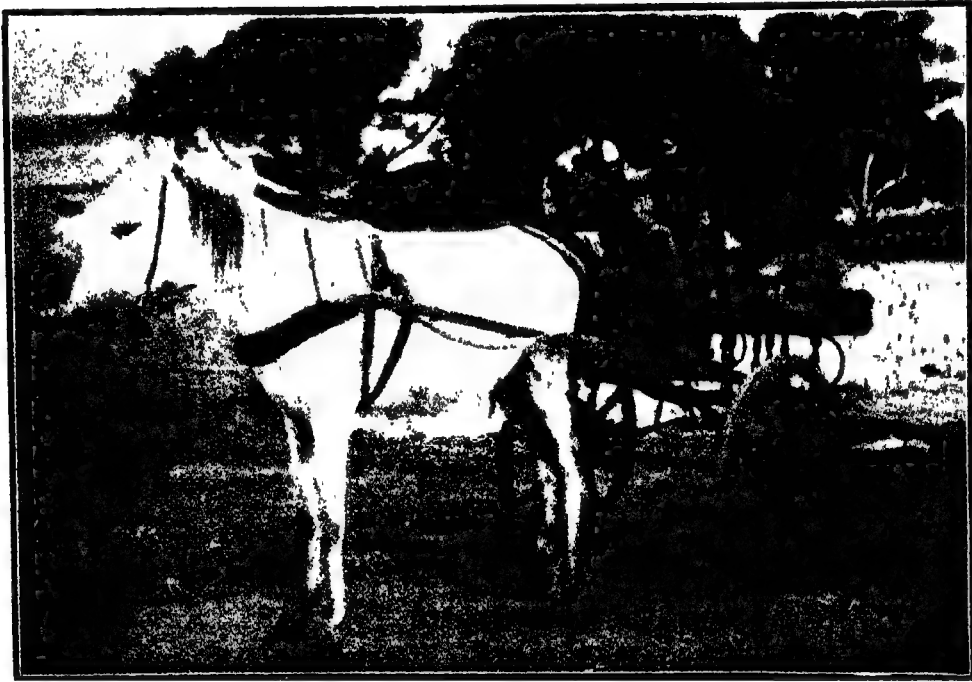
কলির পুষ্পরথ

আমি দৃষ্টিতত্ত্ব-বিশারদ নহি; তথাপি মনে হইল, সেই আলোকপ্রাপ্তা কৃশাঙ্গী মেয়েটির চোখে অনিচ্ছার ছায়াই যেন দেখিয়াছিলাম;—কিন্তু বাঙালী স্ত্রী—এম্‌-এ পাশই করুন আর যাই করুন, স্বামীর অবাধ্য হইতে জানেন না—ফিরিলেন।

অধিকার অনধিকারের তর্ক ভুলিয়া গিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম—ফিরলেন যে!

ভদ্রলোক শুষ্কমুখে, ততোধিক শুষ্ককণ্ঠে শুষ্ক ও শুভ্রদন্ত বিকাশ করিয়া কহিলেন—এপথে ঠাকুর আছে জানলে আমরা এদিকে আসতাম না।

মনে পড়িয়া গেল—কোথায় যেন দুর্গা পূজা হইতেছে। যে বাড়ীতে পূজা হইতেছে, তাহার সামনের রাস্তা দিয়া একটু দূর গেলে ব্রাহ্ম-মন্দিরে পৌছান যায়। উপাসনার সময় আগত, রাস্তায় এই মূর্ত্তি-বিঘ্ন! কয়েকজন নৈরেকার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া, হাতড়াইয়া পূজা-বাড়ীর সান্নিধ্যটুকু অতিক্রম করিতেছেন—এই সময়ে মর্ত্ত্য-পর্য্যটক দেবগণ তথায় উপস্থিত। তাঁহারা লোকগুলার মুখে চোখে কাপড় বাঁধার কারণটি জানিয়া, হাসিয়া বাঁচেন না। ভক্তগণ, ইহাঁদিগকে রাস্তাটুকু পার করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। শনিপুত্র উপশনি বড় রসিক লোক, practical jokes (জ্যান্ত

রসিকতা ?) একটু বেশী পছন্দ করিতেন। "এই দিই—" বলিয়া বাছাদের হাত ধরিয়া এমন এক জায়গায় আনিয়া ছাড়িয়া দিয়া, অগ্রসর হইতে বলিলেন যে, একটি পা বাড়াইতেই তাঁহারা সধবার একাদশীর নিমচাঁদের দশা প্রাপ্ত হইলেন —অর্থাৎ সশরীরে শ্রীশ্রীথানায় পড়িলেন। আজ বিন্ধ্যপর্বতে শ্রীমান উপশনি উপস্থিত হইলে আমাদের ঐ ভ্রাতা ভগিনীর অদৃষ্টে কি ঘটিত, বলিতে পারি না, মর্ত্ত্যলোকের বেচারী আমি, আমার ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি খোরাক জুটিয়া গেল ভাবিয়া খুশী হইয়া আমার গন্তব্য পথে চলিয়া গেলাম।

বড় পাওয়া যায় না, আমরা এবার সেই কথাই বলিব। এ-সকল স্থানে কত রকমারি চরিত্র দেখিতে ও অধ্যয়ন করিতে পারা যায়, তাহার সংখ্যা হয় না। আমরা ত সকল কর্ম ফেলিয়া স্যানিটেরিয়ামের 'কমন-রুম' কিম্বা বারান্দায় একখানা আরাম-কেদারা ফেলিয়া, পড়িয়া পড়িয়া তাহাই লক্ষ্য করিতাম। আমার পাঠক পাঠিকাগণকে কয়েকটি চরিত্র কথা উপহার দিলাম।

মোহিনী বাঙ্গালা দেশের আদি ও অকৃত্রিম ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি। সর্বাঙ্গ পাংশু; চক্ষু হরিদ্রাভ; হাত-পাগুলি সুল

আরোহিণীগণ

৪

"—পঞ্চবটী বনে মোরা
ছিনু সুখে—"

বেশী হাঁটি আর নাই হাঁটি, কুয়া-কুণ্ড চাখিয়া বেড়াই আর নাই বেড়াই—আমরা বেশ ছিলাম, ইহা বলিতেই হইবে। বাঙালীর জীবনে এই "বেশ থাকার" তুল্য দুষ্প্রাপ্য বস্তু আর কি আছে ?

হোটেল, স্যানিটোরিয়াম প্রভৃতি স্থানে বাস করার অসুবিধার সঙ্গে একটা বিশেষ সুবিধা আছে, যাহা অন্যত্র

স্থূল করিতেছে; কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ, চিঁ চিঁ করিতেছে। চোঁয়া ঢেকুর উঠে, অম্বল হয়। সে সদা সর্বদা, লোক পাইলেই ম্যালেরিয়ার আসামী বিন্ধ্যাচলে উপকার পায় কি-না তাহাই যাচাই করিয়া লইতে ব্যস্ত। শ্রীমান নদীয়া Ruralএর আমদানী। সর্বদাই শঙ্কা—'ঐ গো ডিডি চললে!" "ঐ মাথাটা কেমন করিল।" "ঐ বুঝি চোঁয়া ঢেকুর উঠিয়া পড়িল।" ঐ ঐ ইত্যাদি। অতএব অনাহার!

যাঁহারা দুই দশদিনের ছুটী কাটাইতে ও তৎসঙ্গে স্বাস্থ্যান্বেষণ করিতে আসেন, তাঁহাদের জীবন-যাপন-ধারা

অনুরূপ। তাঁহারা হাঁটিতেছেন, ভীষণ; খাইতেছেন, ভীষণতর; আর ভিজি ভরাইতেছেন, ভয়ানকতম। স্যানিটোরিয়ামের সর্ববিধ খাদ্য ত আছেই, তা ছাড়া সারা সহর ঘুরিয়া স্থাবর জঙ্গম কিছুই বাদ দিতেছেন না। গতি ডাকগাড়ীর অনুরূপ; কিন্তু আচার ব্যবহার গুডস্ ট্রেণের মত—ঝড়তি-পড়তি নাই, মাল পাইলেই হইল। ইহার ফলে এক ভদ্রলোক কি কাণ্ডটি ঘটাইয়া বসিয়াছিলেন, ভাবিতেও হৃৎকম্প হয়। ভদ্রলোক যুবক, কলেজে পড়েন, অসুস্থ আত্মীয়কে escort করিয়া, পৌছাইয়া দিতে আসিয়া-ভারবহনে অস্বীকার করিল অথবা তথায় হিন্দু-মুসলমান বিরোধ বাধিল, ঠিক বলিতে পারিনা, হঠাৎ রাত্রি ৩—৪টায় স্যানিটোরিয়ামের ম্যানেজার মিষ্টার ঘোষ শঙ্কাকুল চিত্তে সংবাদ দিলেন—* * * এসিয়াটিক কলেরার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ডাক্তারখানায় লোক ছুটিল—Doctor Quick.

অবস্থা উত্তরোত্তর মন্দের দিকেই ছুটিতেছিল। বিন্ধ্যবাসিনীর দয়ায় এবং প্রবাসী বাঙালীদের মিলিত শুভেচ্ছার জোরেই ভদ্রলোকটি বিকালের দিকে কতকটা যেন হাঁফ ছাড়িতে দিলেন।

কূয়া-সেচ

ছিলেন, পরমায়ু মাত্র চারদিন। চারদিনেই শরীরটা সারাইয়া লইতে হইবে সঙ্কল্প;—স্যানিটোরিয়ামের সমস্ত আহার্য্য ত খাইতেছেনই; তার উপর নিত্য খানিকটা (চামচ মাপিবার ইচ্ছা বা সময়াভাব) Keplers malt of Cod Liver Oil ও সের দেড়েক খাঁটি দুধ ("কলিকাতার জলমিশ্রিত খাঁটী" নয়) যুগপৎ একই সময়ে পরিপাক-যন্ত্রাভ্যন্তরে ডেসপ্যাচ করিয়াছেন। পূর্ব হইতে তথায় সঞ্চিত ছিল, গুটি চারেক ছোট ডিম্ব, আধসেরটাক মাংস, খান চৌদ্দ রুটী ও আধসের মালাই অথবা রাবড়ী—মাত্র চারদিনের আয়ু কি-না। পাক-যন্ত্র

যাঁহারা দেশভ্রমণে বা তীর্থ-ভ্রমণের জন্য আসেন, উপদ্রব তাঁহাদেরই অল্প। তাঁহারা আসিয়াই সন্ধান লয়েন, কি পাওয়া যায়? বিন্ধ্যাচলের ৫ সেরা মূলা ও ৬ সেরা বেগুন হইতে মীর্জাপুরের পাঁপর, কার্পেট, আসন খরিদ করিয়া পোঁটলাপুঁটলী বহিয়া সরিয়া পড়েন। যাত্রী-সংখ্যার অনুপাতে স্থানটিকে ছোট-কালীঘাট বা পকেট কাশী বলা যাইতে পারে। এমন ট্রেণ নাই, যাহা হইতে বিন্ধ্যাচলের যাত্রী অন্ততঃ পঞ্চাশজন না নামে। এমন দেশের লোক নাই, অবশ্য হিন্দু—যাহা সর্ব্বদাই এখানে

দুষ্ট না হয়। পাণ্ডারা কিছু জবরদস্ত, ফাঁকী দিবার চেষ্টা করিলে গ্রাম-চিমটিটা-আনটা দিতে ত্রুটী করে না। তবে বাঙালীর সে সৌভাগ্য কচিৎ ঘটে।

যাঁহারা আসেন স্বাস্থ্যান্বেষণে, হাঙ্গামা তাঁহাদের লইয়াই। তাঁহারা তাঁহাদের আধখানি মন ঘরে—ঐ সেই বাড়ীর মধ্যের আঁচলের ভিতরে রাখিয়া আসেন; সিকি রাখেন ডাকঘরের পানে; আর বাকী সিকির কতক থাকে স্বকীয় পকেটে, বক্রী কতকাংশ আর পরহস্ত-গত করেন না, সেটুকু নিজের কাছেই রাখেন এবং তাহারই জোরে খাইয়া, খেলাইয়া বেড়ান। অধিকাংশের এই দশা। আর তার একমাত্র কারণ আমরা বাঙালী। কথাতেই আছে—গোয়াল-মুখো গরু আর ঘরমুখো বাঙালী।

এক "দাদামহাশয়" আসিলেন, উকীল; বেড়ে লোক। সদানন্দ পুরুষ, সদাই হাসিমুখ। শরীর চিরদিন ভাল ছিল, সম্প্রতি কৃতী কনিষ্ঠ সহোদরটির মৃত্যু-আঘাতে শরীরটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; একটা রোগও নাকি (?) আশ্রয় করিয়াছে। (রোগটা প্রকাশ করিতে দাদামহাশয়ের নিষেধ আছে)। বয়স পঞ্চাশোর্দ্ধ হইলেও, বঙ্গমনের কোন সম্ভাবনা নাই—প্রায় প্রত্যহ ৭৪৷৷০ টাকা ও "মালিক ভিন্ন কেহ খুলিবে না, মা-কালীর দিব্য" দেওয়া চিঠি আসে। নেশাভাঙ্গ নাই, অনিন্দ্য চরিত্র, লেখাপড়াও বেশ, পসারও খুব—অর্থাৎ এককথায় "আদর্শ গৃহী"। ভোর না হইতে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া একটি এলুমিনমের দশ-সেরা ঘড়া হাতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাবতীয় কূপ-কুণ্ড দেখিবেন, জল punch করিয়া টানিয়া লইবেন। বোধ হয় কোন নাছোড়-বান্দা উপরওয়ালার (?) কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলেন যে কার্পেট আনিবেন। কয়েকদিন ধরিয়া কার্পেট পরীক্ষা ও দরদাম যাচাই চলিল; তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া একদা সন্ধ্যায় স্বয়ং কার্পেট খরিদ মানসে একা নামক মর্ত্ত্যের পুষ্পকরথে আরোহণ করিয়া মীর্জাপুরে রওনা হইলেন। কার্পেট আসিল কিন্তু রিটার্ণ টিকিটের অর্দ্ধাংশ যে কোথায় গেল, তাহার আর তল্লাস পাওয়া গেল না। আমাদের দিদিমা বোধ হয় সূর্য্যমুখীর চেয়েও কড়া হাকিম, "ঝড় উঠিলে নৌকা লাগাইও"র চেয়েও বেশী কড়া হুকুম দিয়া দিয়াছিলেন যে "যাহা যাহা হইবে, সমস্তই আমাকে লিখিবে"—হঠাৎ one fine morning দেখা গেল, ৭৪৷৷০এর আগমন, দাদামহাশয়ের মুখ শুষ্ক হওন ও তল্পীতাল্পা বন্ধন এবং ২৪ ঘণ্টার পূর্ব্বেই ফিরিয়া যাওন।

গৃহস্থ-পরিবার

বিন্ধ্যাচলের লাঠী

চিঠিতে কি লেখা ছিল দেখি নাই, তবে অনুমান হয় যে, যে লোক অক্লেশে টিকিট হারাইয়া ফেলিতে পারে, তাহার নিজেরই হারাইয়া যাইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা বুঝিয়া দিদিমা বাহিরে বিদেশে থাকিবার অনুমতি প্রত্যাহার

উপজীবিকা ছাগল

করিয়া লইয়াছেন এবং ইম্পারিয়েল গবর্ণমেণ্টের আদেশ (Vide বিষবৃক্ষ) অবহেলা করিবার ক্ষমতা চাকুরে দাদা মহাশয়ের নাই। থাকিবার কথা ছিল, অনেক দিন। কিন্তু বাড়ীর মধ্যে যিনি আধখানা-মনের স্বত্বাধিকারিণী, তাঁহার ইচ্ছা অন্যরূপ; সিকি মন যাহা ডাকঘরে নিবদ্ধ ছিল, তাহা পত্র বহিয়া আনিল, অর্থাৎ অগ্নিতে ইন্ধন দান করিল; বাকী সিকি যাহা ছিল পকেটে, তাহা বায়ু সঞ্চালিত করিল। সুতরাং শরীর সারা হইল না—চলিয়া যাইতে হইল। ক'দিনের দেখা-শুনা, ক'দিনের বা পরিচয় কিন্তু দাদামহাশয় বিদায় লইতেই অবস্থাটা হইল

"নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।"

এক নব্য উকীল—বোধ হয় কিছু আছে, স্বকৃত অবশ্যই নয়—বাপ-পিতামহের; তিনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট, তাঁহার aristocracy না নষ্ট হয়। একদিন "প্রবাসী-বাঙালী"দের ফোটো উঠিবে, ভদ্রলোকটি শাল-দোশালা ত ছার, এসেন্স, পোমেড মাখিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই। সে ছবিখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, নতুবা আমাদের পাঠক "উকীল কি চিজ্ রে"—দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারিতেন। তাঁহার চাকর-বাকর কিরূপ থালা-বাটীতে ভাত খায়; তাঁহার সহিস কিসের গেলাসে জল পান করে; ঘোড়া কি-ধাতু নির্ম্মিত দানা চিবায় এ সকল জিহ্বাগ্রে হরিনামশতকম্! নাসিকা ত ললাট স্পর্শ করিয়াই আছে। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন এ অভ্যাস যাঁহাদের নাই, বাড়ীর বাহির হওয়া তাঁহাদের পক্ষে "বিড়ম্বনা কেবল"। এই সঙ্গে আর একটি নব্য উকীল ছিলেন, 'বাঙ্গাল্ বটেন', কিন্তু বেশ লোক। ওমর খায়েমের নীতি, Eat, drink, Be merry—খাও, দাও, স্ফূর্ত্তি করো—পালন করিয়াই চলেন। দোষের মধ্যে চোখ দুইটা অস্বাভাবিক-রকমের বড়, চেঁচাইয়া চাহিলে ছেলেপিলের বাবারাও ভয় পাইতে পারে।

এ জগৎ যে চিড়িয়াখানা—তাহাতে সন্দেহ কি! দুইটা মানুষ দুই-রকমের জীব। কেহ দিনরাত নাড়ী
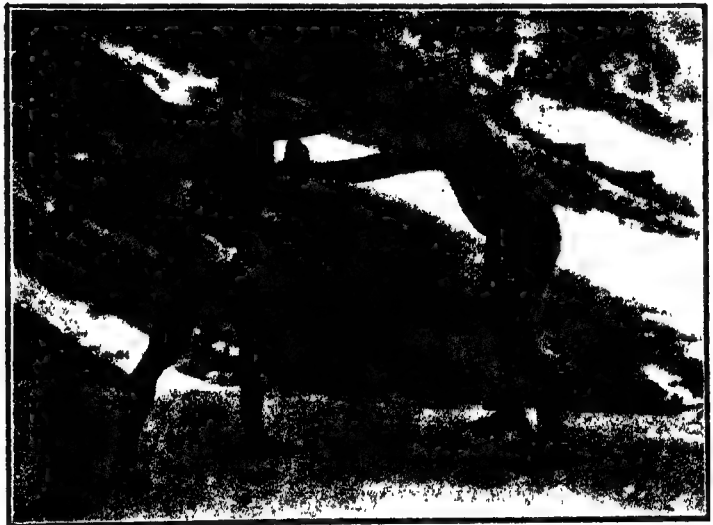
পাণ্ডা

টিপিতেছেন, শরীরটা ভাল থাকিবে না ভাবিতেছেন; কেহ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পিওন মানত করিতেছেন; কেহ অহোরাত্র উদরনামক ঢক্কা নিনাদ করিতেছেন—কেহবা সমস্ত 'ডোণ্ট্-কেয়ার' করিয়া নিত্য গঙ্গাস্নান, দেবী-দর্শন, পর্বত ভ্রমণ করিয়া, হাসিয়া 'রসিয়া' বেড়াইতেছেন। কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার ও মিসেস্ ক্ষেত্রমোহন সেন দুই চারিদিনের জন্ম গিয়াছিলেন, দুই চারিদিনেই দেখাশুনা, কেনাকাটা সব শেষ করিবার উদ্দেশ্যে এভাবে হাঁটা আরম্ভ করিয়া দিলেন যে অনেকে তাঁহাদেরই দেখিয়া ধন্ম হইতে আসিত। আবার আমাদের মত হাড়-কুঁড়েরও অভাব ছিল না। আমার বিশ্বাস, এত রকম-বেরকমের দর্শনীয় বস্তু না থাকিলে বিন্ধ্যাচলের মত না-সহর না-পাড়াগাঁয়ে বেশী দিন কেহ থাকিতে পারিত না। আমি ত—নয়ই।

আমাদের দিনগুলা কবির কথায় নদীর স্রোতের মত সুখেদুঃখে বেশ কাটিতেছিল। সুখে এই জন্ম যে, খুব হজম হয়, এই খাই—এই নাই; ভাবনা-চিন্তা নাই, কম্পোজিটার কাপির জন্ম তাড়া দেয় না, পাওনাদার টাকার হুড়ো দেয় না, সভা-সমিতিতে যোগ দিবার জন্ম কেহ জিদ ধরে না—সুখে নয় ত কি! আর দুঃখে বলিয়াছি—অনেক দুঃখে। আমার মেজ ছেলে, তার নাম সুধা। ছেলেটা যেমন সুশ্রী, তেমনই দুর্বল। একদিন একতলা-নীচু এক খাদে পড়িয়া, মাথা ফাটাইয়া এক কাণ্ড করিল। ঠিক তার দুইদিন পরে মস্ত এক বোলতার চাকে বাঁশীর খোঁচা দিল ও শতাধিক বোলতা-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অজ্ঞান-অচৈতন্ম অবস্থায় গোটা দিনটা পড়িয়া রহিল। জ্বরটা ছাড়িয়াছে মাত্র, সিঁড়ি হইতে নীচের পাথরের রোয়াকে এমন এক লাফ দিল যে ঠোঁট কাটিয়া, চিবুক ছিঁড়িয়া বাছা আমার আবার শয্যা লইলেন। সকলে বলিল—বাহবা বাহবা বেশ! এ ছেলে উদ্ধার করিবে দেশ! কিন্তু আমার ভয় হয় বাছা দেশ উদ্ধার করিবার আগে অপঘাতে নিজেই না উদ্ধার হইয়া যায়। ডংগার বাবু চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, তাহার কল্যাণ-কামনায় পাঁচ দিন চণ্ডীপাঠও করাইলাম। পাঠকটি পাইয়াছিলাম ভাল, নির্লোভ, শুদ্ধাচারী, কান্তিমান। মনে হইল আপৎকাল কাটিয়া গিয়াছে। গৃহিণী বিন্ধ্য-বাসিনার ভোগারতির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিলেন।

অকস্মাৎ একদিন সামাল্ সামাল্ রব উঠিল। আহারাদির পর—দিবা নিদ্রা নয়—বিশ্রাম করিতেছি, নীচে হৈ চৈ শুনিয়া কাণ খাড়া করিলাম। একসঙ্গে অনেকগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শুনা গেল। কেহ বলিতেছে সাহাব লোকের বিস্তারা লে যাও। কেহ হাঁকিতেছে, গোসল বাণাও।—সমারোহ যাহাকে বলে। এইবার খোদ ম্যানেজারের গলা শুনা গেল, তিনি প্রশ্ন করিতেছেন—খাবার দিতে বলি?

ডংগার বাবু

মেম-সাহেবের গলায় কে উত্তর দিল thanks very much!

শুইয়াছিলাম, উঠিয়া বসিলাম। এই 'পাণ্ডব বর্জ্জিত' বিন্ধ্যাচলের স্বাস্থ্য-নিবাসে মেম সাহেব! বাহারে সৌভাগ্য। এতদিন বিকট বদনগুলা দেখিয়া চক্ষের যেন থাইসিস্ হইয়া গিয়াছিল—চাহিতে আর চায় না! আহা, আজ সকালে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম গো! নব-বসন্তে ফুল-ভারানত ব্রততীর মত আমার সেই ক্লান্ত নয়নদ্বয়ে কি

শোভাই না উদ্ভাসিত হইবে! সত্য কথা বলিতে কি, মন আমার মেঘোদয়ে ময়ূরের মত নাচে রে! পুলকাতিশয্যে ঘরে বসিয়া থাকিতে পারা গেল না—ছুটিয়া নীচে নামিয়া পড়িলাম। আসিয়া যাহা দেখিলাম, হরি হরি! যাঁহাদের জন্ত এত হৈ হৈ রৈ রৈ,—তাঁহারা শ্বেত মেম্ ত নহেনই, শাড়ীপরা কালা মেম্‌ও ন'হেন, তৎপরিবর্ত্তে, ওহো মানুষের সাজ-পোষাকে ছুইখানি ধনু! টঙ্কার দিলেই হয়।

তাঁহাদের একজন মেম-লাঞ্ছিতকণ্ঠে বলিতেছেন, তাঁহারা শিকার করিতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছেন। অনেক গায়ক-

মীর্জাপুরের "টালা"

গায়িকা, শুনিয়াছি, কোকিল ভজিত করিয়া ভক্ষণ করেন ও কোকিলকণ্ঠ অথবা কণ্ঠি খেতাব প্রাপ্ত হ'ন। আমাদের এই ধনুক—সাহেবটি কি তবে মেম্ পুড়াইয়া খাইয়া মেম-কণ্ঠ হইয়াছেন? হায় হায় বিশ্রামটাই মাটী হইল গা!

আমাদের বুড়া শ্রীশ বাবুটি সকলের সঙ্গেই আলাপ জমাইয়া ফেলিতে অদ্বিতীয়। তিনি সাহেব-লোকের সঙ্গে জমাইয়া ফেলিয়াছেন। সাহেব-লোক ইংরেজীতে যাহা কহিতেছেন, তাহার ভাবার্থ এই দাঁড়ায় যে তাঁহারা আর কিছুই করিবেন না, কেবল শিকার, শিকার, শিকার! নাও ঠেলা! লোকে বিন্ধ্যাচলে তীর্থধর্ম করিতে আসিত; স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিতেও আজকাল দুই দশজন আসিতেছে, এই সাহেব দু'টি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বর্জন করিয়া Via Black Sea, কিষ্কিন্ধ্যা রেলওয়ে দিয়া আসিলেন কি-না বিন্ধ্যাচলে শিকার খেলিতে! মন রে, প্রেমানন্দে তুমি একবার হরি হরি বল।

বাঙ্গালী পিতামাতার সন্তান আর নিতান্ত অকৃতজ্ঞও নহেন, বাঙলা কথাবার্ত্তাগুলা বুঝিতে চেষ্টা করেন দেখিলাম, কিন্তু বাঙলা বলেন না! বোধহয় বাঙ্গালাভাষা শিকারীর ভাষা নয় বলিয়াই ওটা ভুলিয়া গিয়াছেন। খাঁকি হাপ-প্যাণ্ট, খাঁকি সার্ট, খাঁকি টুপি—হাতে বন্দুক, আর মুখে বাঙলা-বুলি, কেমন কেমন দেখায় যেন! মুর্গী রান্না—গঙ্গাজলে যেমন!

নাটকে যেমন ঘাত-প্রতিঘাত থাকে, সংসারে যেমন সুখ-দুঃখ থাকে, আকাশে যেমন আলো আঁধার থাকে, বিন্ধ্যাচল স্বাস্থ্য নিবাসেও ঘাত-প্রতিঘাতের বৈচিত্র্য ছিল। পাছে সাহেব দেখিয়া, সাহেবী ভাষা শুনিয়া, আমাদের চক্ষু ঝলসিয়া যায়, দিন দুই না কাটিতেই কবিরাজ শিরোমণি

শ্যামাদাসের শুভাগমন। পায়ে তালতলার চটি, অঙ্গে শুদ্ধ খদ্দর, মস্তকে দীর্ঘ শিখা। দুইবেলা দেবীদর্শন, গঙ্গাস্নান, পূজা-অর্চ্চনা—আদর্শ হিন্দু, আদর্শ বাঙ্গালী। লুপ্তপ্রায় বিজ্ঞানের দীপ-শিখাটি সযত্নে, সগৌরবে ধরিয়া আছেন আজ বাঙ্গালা দেশে একমাত্র শ্যামাদাসই!

৫

বিন্ধ্যাচল হইতে বার, মীর্জাপুর হইতে সাত মাইল দূরে বীরপুরা রোডের শেষ প্রান্তে পর্বতোপরি একটি সুদৃশ্য জলপ্রপাত আছে। ইংরেজীতে তাহা 'টাণ্ডা ফলস্' ও দেশী ভাষায় 'টাঁড়েকা দড়ী' নামে খ্যাত। টাণ্ডা ইতিপূর্বে আমার একবার দেখা থাকিলেও আর একবার দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। 'বাড়ীর মধ্যে'দেরও দেখাইতে হইবে ত? ডংগার বাবু দুইখানি মোটরের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, ভাড়া ২৮৲। আমরা ও অধ্যাপক ভবেশবাবু সপরিবারে টাঁড়ে দেখিতে বাহির হইয়া পড়িলাম। মীর্জাপুর হইতে টাঁড়ে মোটরে ভাড়া লাগে দশ টাকা; একায় তিন টাকার মধ্যে যাতায়াত হয়। কিন্তু একা-রথে বাঙালীর মেয়েদের লইয়া যাওয়া কতখানি নিরাপদ তাহা নিরূপণের ভার আমার পাঠিকাদের উপর অর্পণ করিলাম। একা চড়া শুধু বিহারেই বেঘোরে নয়, সর্বত্রই তাই। একবার ঐ স্বর্গীয় রথ ভাঙ্গিয়া অর্দ্ধপঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়ায়, ইদানীং আমার একা-ফোবিয়া হইয়া গিয়াছিল। যতক্ষণ একায় থাকিতাম, আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতার তিন কোটীকে যে কাছ-ছাড়া করিতাম না ইহা তাঁহারা অন্তর্যামী—জানেনই।

বাঁধা ঘাট—মীর্জাপুর

আমাদের জন্য দুইখানি মোটর আসিয়াছিল, একখানি ফোর্ড, অন্যখানি সেভরলে। ফোর্ডখানির মধ্যে ইঞ্জিন নামক বস্তুটি না থাকিলে সেখানি গো-যান কি অশ্বযান কিম্বা অন্য কোন যান, তাহা নির্ণয় করাও দুরূহ ছিল, সেভরলে কতক মতক নূতন, তুলনায় ত বটেই। কিন্তু ধরাইতে পারিলে কাঠের বিড়ালও যেমন ইঁদুর ধরে, হাজার খানেক ফুট খাড়া পাহাড়ে উঠিবার সময় সেই হুমায়ুন-বাদশার আমলের ফোর্ডই নিরুপদ্রবে উপরে উঠিয়া গেল। সেভরলে উঠিল বটে, অনেক কষ্টে, অনেক বেগ দিয়া। পাহাড়ের উপর দিয়া মিনিট দশেক ছুটিবার পর টাণ্ডার সাদা ডাক-বাঙালা-খানি দেখা গেল।

টাণ্ডার চতুষ্পার্শে প্রকৃতি রাণীর সবুজ-রঙের শাড়িখানি আকাশের কোলে ঠেকিয়া নীল পাড় উপহার পাইয়াছে; মাঝখানে সাদা বাঙলো আর বারিধারাগুলি যেন সবুজ জমির উপর সাদা জরির গুল-বসানো, ঢেউ খেলানো শিল্প কাজ। টাণ্ডার বাঙলোর সামনে দিয়া, আশ-পাশ দিয়া, নীচে দিয়া অজস্রধারে অবিশ্রান্ত ঝঙ্কারে টাণ্ডার জলধারা ঝরিয়া পড়িয়া,

ক্লক-টাউয়ার

নদী হইয়া বাহিয়া চলিয়াছে।—কোথায় কে জানে। দৃশ্য গম্ভীর, শান্ত, উদাত্ত! মনোহর। বাঙলোয় বসিলে উঠিতে ইচ্ছা হয় না। মহিলারা বারান্দায় বসিয়া সে দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলেন; আমরা এদিকে-ওদিকে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। শ্রীমান 'কানাই বলাই দু'টি ভাই' ছোট-বড় মিলাইয়া গুটি সাত আট এ্যাসিষ্ট্যান্ট লইয়া খুব সোরগোল, হাঁকডাক করিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া বিপুল উৎসাহে চা প্রস্তুত করিতে বসিল। স্যানিটোরিয়ামের ম্যানেজার বাবু আমাদের সঙ্গে যথা এবং সর্ব্বস্ব সবই দিয়াছিলেন, চাবি কাঠিটি ছাড়া। অর্থাৎ চা-চিনি-দুধ, কাপ্-প্লেসার-চামচ-ছাঁকনি, সন্দেশ, গেলাস, ষ্টোভ, ঘটি—দেন নাই কেবল স্পিরিট। কানাই শুক্না পাতা জ্বালিয়া বার্ণার (burner) গরম করিয়া ষ্টোভ জ্বালিয়া ফেলিল ও আধঘণ্টার মধ্যে সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক চা পান করাইয়া দিল। চা-পান শেষ করিয়া আমরা রিজারভয়ার দেখিতে গেলাম। এই রিজারভয়ারটিকে মীর্জ্জাপুরের "টাপা" বলা যাইতে পারে। পাঠক ইহার প্রতি-চিত্র হইতে ইহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এটি দৈর্ঘ্যে ন্যূনাধিক ১মাইল; প্রস্থে অর্দ্ধ মাইল হওয়াই সম্ভব। নীলাম্বুরাশি ধীরে ধীরে নীল আকাশের সীমারেখায় লীন হইয়াছে। তখন দিনকর পশ্চিম গগনে আরোহণ করিয়াছেন, আকাশ লোহিত বরণে রাঙাইয়া গিয়াছে; তাহারই একটা স্বর্ণাভা জলের উপর, স্তম্ভ দুইটির উপর পড়িয়া 'চিক্ মিক্' খেলা করিতেছে।

যদি কোন সৌন্দর্য্য-পিয়াসী পরিবার জ্যোৎস্নাহসিত নিশীথে টাণ্ডার তীরে বাঙলোখানিতে একটি রাত্রিও বাস করিয়া আসিতে পারেন, আমার বিশ্বাস তাঁহারা একটা 'দ্রবীভূত তাজের' শোভাই সন্দর্শন করিবেন। তবে তাঁহাদিগের প্রতি আমার একটি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ আছে। আমাদের মত ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার হইয়া তাঁহারা যেন না যান। টাণ্ডা যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইলেও পার্ব্বত্যজাতিদের সে খ্যাতি আদৌ নাই। সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র থাকিলে কোন ভয় নাই; বরং প্রচুর আনন্দের উপাদান টাণ্ডার তীরে ছড়ান আছে।

রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নাময়ী. ফিরিবার তাড়াও আমাদের ছিল না; আর মোটর ড্রাইভারও কলিকাতার ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ান নয়, যতক্ষণ ইচ্ছা থাকা যাইতে পারিত,

তবে সঙ্গে অনেকগুলি—আমাদের শুধু নয়, অধ্যাপক ভবেশ বাবুরও—কাচ্চা বাচ্চা, টাঙ্গাকে গুড বাই করিতে হইল। ফোর্ড এবারও কৃতিত্ব দেখাইয়া আগে নামিয়া গেল। সেভরলে এবারও অনিচ্ছায় নামিল। এ যেন দুষ্ট ছেলে—মারধোর না করিলে পড়িতে চায় না।

বীরপুরা—জব্বলপুর পথটি বেশ—তাহার পরই ধূলা ধূঁয়ার রাজ্য। কলিকাতা সহরে ধূলার হোলিখেলা দেখিয়া যাঁহারা কর্পোরেসনের সৎনাম না করিয়া বারি গণ্ডুষ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা বর্ত্তমান ভারতের রাজধানী দিল্লীর অবস্থা দেখিলে কি যে করিবেন তাহা ত আমি ভাবিয়াই পাই না। ধূলা হিসাবে—বাঙলা সোনার বাঙলা।

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরের বহির্দৃশ্য

মীর্জাপুরে দর্শন যোগ্য কয়েকটি জিনিষ আছে। যথা—পাকা ঘাট, ক্লক টাউয়ার, ও পুরাতন স্থাপত্যের ও শিল্পের বহু নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান।

তিন গরুর গাড়ী

মীর্জাপুর ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যে একটি অতি সুন্দর সুদৃশ্য নয়নমনোরঞ্জন সেতু আছে—তাহারই উপর দিয়া বড় রাস্তাটি চলিয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর উপর এই সেতুটি নির্ম্মিত হইয়াছে; এমন সুন্দর সেতু সচরাচর চক্ষে পড়ে না। ইহার নাম ওজলা ব্রীজ। পশ্চিমগামী যাত্রীরা মীর্জাপুর ষ্টেশন ছাড়িয়া যদি গাড়ীর দক্ষিণদিকের জানালা অধিকার করিয়া বসেন, তবে ওজলা-ব্রীজটি দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বগামী অর্থাৎ ডাউন ট্রেণের যাত্রীরা গাড়ীর বাঁ দিকে দৃষ্টি রাখিলে ওজলার সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখিয়া খুসী হইতে পারিবেন। সেতুটি সরকার বা সরকারী ডিষ্ট্রিক্ট অথবা লোক্যাল বোর্ডের তৈয়ার নয়। এক হিন্দু জুয়াড়ী সেতুটী করাইয়া দিয়াছিল। কথিত আছে, সারা ভারতবর্ষে তুলার খেলা নামক জুয়া যখন খুব জোর চলিয়াছিল, এক ব্যক্তি তখন কিঞ্চিৎ অসদুপায়ে বহু অর্থ প্রাপ্ত হয়। তাহার বন্ধু বান্ধব বলে, একে জুয়া, তায় অসদুপায়—অন্ততঃ কিছু টাকা সদ্ব্যয় করা কর্ত্তব্য; পাপের খণ্ডন হইলেও হইতে পারে। তখনকার লোক এখনকার চেয়ে

পাপকে একটু বেশী ভয় করিত। জুয়াড়ী দান ধ্যান সদাব্রত, মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওজলা নদীর উপর এই নয়নানন্দকর সেতুটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেয়। ওজলা-ব্রিজের ঠিক পার্শ্বে ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান রেলের ব্রিজ—ওজলার পার্শ্বে, পর্ব্বতপার্শ্বে উইঢিবিবৎ প্রতীত হয়। ওজলার দুই প্রান্তে দুইটি করিয়া চারটি স্তম্ভ আছে, প্রায়ই ভোরে বাহির হইয়া তাহারই একটায় উঠিয়া আমরা অরুণোদয় দেখিতাম। বাম দিকে স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথী প্রবাহিতা,—মা'র বুক হইতে তরুণ রবি ফুটিয়া উঠিতেছেন, দৃশ্য-সৌন্দর্য্য কেবল অনুমেয়। ওজলা পুলের উপরে স্তম্ভ, নীচে সুড়ঙ্গ। ভারতচন্দ্র এ-দেশের কবি হইলে আমরা আর একখানি খাটি বাঙালা কাব্য উপহার পাইয়া ধন্য হইতাম।

জীর্ণ শীর্ণ, যেন দুর্ভিক্ষ ফেরত। কিন্তু নারী অধিক ক্ষেত্রেই শক্তিসম্পন্না, সৌন্দর্য্যময়ী; লাবণ্যবতী। যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্না, তেমনই কর্ম্মিষ্ঠা। ছোট ছোট মেয়েগুলা পর্য্যন্ত এত পরিশ্রম করে যে দেখিলেও বিশ্বাস করা শক্ত হইয়া পড়ে। এক একটা মেয়ে বড় বড় দুই তিনটা গাগরী ভরিয়া এক ক্রোশের মাথা হইতে জল বহিয়া আনে যখন, তখন বাঙালীর চক্ষু স্থির না হইয়া যায় না। স্রষ্টা অনেকখানি সাহায্য করিয়াছেন, জলহাওয়ার সহায়তাও আছে স্বীকার করি, কিন্তু যৌবন স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হয় কেমন করিয়া, তাহা ইহারা জানে। ইহাদের অন্তঃপুরে নাটক-নভেল, সীবন-যন্ত্র প্রবেশ করে নাই, (করিলেও বাঙালী লেখকদিগের বিশেষ সুবিধা হইত না) তাই অম্ল, অজীর্ণও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। ইহাদের দেহগুলা যে বয়সে বুড়া হয়, বাঙ্গালীর মেয়ে সে"বয়সে" via পরলোক গোটা দুই জন্মেরই মুখ দেখিয়া ফেলে। পর্দার বাড়াবাড়ি নাই, উপরন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা একটু বেশী মাত্রায় আছে। তাহার দোষ এবং গুণ—দুই-ই আছে।

সস্তার চালানী (Cheap Transport)

এখানে জুয়ার চলনটা খুবই বেশী। মার্বেল খেলা, তিতিরের লড়াই হইতে সুরু করিয়া অনেক বড় বড় জুয়া চলে দেখিয়াছি। পুলিস প্রাইভেট জুয়ার উপর যেমন একটা রীতি-রক্ষা গোছের নজর রাখে, এখানেও তাহা রাখে তবে সর্বত্রই যেমন 'পারিয়া উঠে না', এখানে তাহাই।

বিবাহটা অধিকাংশই অসম। বর বড় না ক'নে বড় প্রশ্নের উত্তরে ক'নে বড়ই—অবধারিত শুনিতে পাওয়া যায়। বড় তা'ও আবার কম বড় নয়, অনেক ক্ষেত্রে দশ-পনেরো বছরের বড় ক'নেও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বিবাহ-ছাড়াও সমাজ-অনুমোদিত ঘর-সংসার খুবই চোখে পড়ে। এরূপ অবস্থায় মোড়লদের দুই একটা ভোজ দিতে হয়।

কৃষ্ণ-লীলার দেশ বলিয়াই হউক (মথুরা-বৃন্দাবন কাছেই) আর যে কারণেই হউক, মামী-ভাগ্নের সম্বন্ধটা

৬

বিন্ধ্যাচলে একটি জিনিস যাহা আমার চোখে সর্বদাই পড়িত, তাহা এই :—এখানকার পুরুষ মাত্রেই কি অসামান্য অলস, অকর্মণ্য আর নারী কি কর্মপরায়ণা! পুরুষ দিনরাত বসিয়া ঝিমাইতেছে, তামাক খাইতেছে—তামাকের ছোট-বড় ভেদ বড় নাই—ঘুড়ী উড়াইতেছে, মার্বেল খেলিতেছে, আর নারী! হেন কর্ম নাই, যাহা করিতেছে না। বাজারে পণ্য লইয়া যাইতেছে, মোট বহিতেছে, ক্ষেত্রে কাজ করিতেছে, সন্তান পালন, স্বামীপোষণ, গবাদিপশু চারণ এ সকল ত আছেই। পাণ্ডা ও গুণ্ডা শ্রেণীর পুরুষ ছাড়া অধিকাংশ পুরুষ আমাদের দেশের মত ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট,

এখানে লক্ষ্য করিবার মত। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে মামীদের লাঞ্ছনা (?) দেখিলে আমাদের কষ্ট হয়; কিন্তু শ্রীমতীর-অনুগৃহীতা মাতুলানীকুলকে সর্বদাই হাসিমুখে সেগুলি হজম করিতে দেখিতাম! শুধু হজম বলিলে হয়ত ঠিক বলা হইবে না, কেন না হজম ত অনেক জিনিসই হয়—বিশেষ অগ্নির তেজ থাকিলে কিন্তু সুস্বাদ ও সুপাচ্য দ্রব্য হজম যেমন সানন্দে সম্পন্ন হয়, এই রসিকতাগুলিও তেমনই deliciously তৃপ্তিসহ পরিপাক হইত। শুনিলাম, ফাগুয়ায় মামীদের অবস্থা দাঁড়ায়—'প্রাণ আর বাঁচে কেমনে?'

ভাষা, ভোজপুরী। কানু ছাড়া গীত নাই, যদি থাকে তাহা তাহারই উত্তর প্রত্যুত্তর। সুর মিষ্ট।

মীর্জাপুর বিন্ধ্যাচল অঞ্চলে লাঠির যেমন চলন এমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। লাঠি বলিলে আপনারা হয়ত তাহার আকৃতির কতকটা অনুমান করিতে পারিবেন না, তাই স্পষ্ট করিয়া বলা দরকার মনে করিতেছি যে এক-একটি লাঠি ত নয়—বাঙালী ভীমের গদা। একদিন একটা সাধারণ লাঠি এক হাতে করিয়া তুলিবার প্রতিযোগিতা হইয়াছিল। একমাত্র অধ্যাপক সুনীতিকুমার ছাড়া তত্রত্য বাঙ্গালী বোর্ডার সকলেই নাকের জলে চোখের জলে ভাসিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন। সুনীতিবাবুর স্রষ্টা তাঁহাকে অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য আর তাঁহার সরস্বতী তাঁহাকে অখণ্ড পাণ্ডিত্য দিয়াছেন, যে সমাবেশ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে একরূপ দুষ্প্রাপ্য। আর একজন প্রতিযোগিতায় পাশ হইয়াছিলেন—তিনি কঁবরেজ বাবু। তিনি কিন্তু সেখানকারই লোক, ভালরুটীর চেহারা! অথচ এখানকার ছেলেবুড়া সকলকার হাতেই এক-একটা লাঠি অথবা যম-দণ্ড থাকে। বাঙালীর জামা জুতা, ইহাদের লাঠি! বিলাসের উপকরণও, ঐ লাঠি। দিনে দুইবার তেলে-জলে স্নান করান, নিশীথে শিশির শয়ান—তাহাদের ছেলেপুলেরাও এত আদর যত্ন পায় না—আমার বিশ্বাস ইহাদের কৌলীন্য পরিচয় ঐ লাঠিতেই পাওয়া যায়। A gentleman without a Motor-car যেমন Gentleman নয়, এখানকার আভিজাত্য রাখিতে হইলে তেমনই লাঠির সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে হয়। এই সুস্নেহ লাঠিগুলির উপরে যখন আবার টাজি বসে তখন সোনায় সোহাগা পড়ে। আমি—প্রয়োজন হইলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া শপথ করিয়া বলিতে পারি যে বাঙালী সে সুদৃশ্য অস্ত্র দেখিলে শত হস্তেন বাজীনা হইবেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যে সদাশয় তাহা এখানে আসিবার পূর্বে আমি বিশ্বাস করিতাম না। বাঙলাদেশে অর্থাৎ কি-না

দাঁড়াসা (দণ্ড + অসি = দাঁণ্ডাসা ?)

আমাদের দেশে মলক্কা-কেন্‌টারই জন্ত যা লাইসেন্স দরকার হয় না, তার উপরে উঠিলেই arms act ; আর এখানে? থাক্ এ সম্বন্ধে বেশী কথা না বলাই ভাল। জানি কি কেঁচো খুঁড়িতে খুঁড়িতে অন্য কিছু বাহির হইয়া পড়িলেও পারে। তবে মাঝে মাঝে ১৪০ ধারার সন্দর্শন এখানেও পাওয়া যায়। রাম-লীলা, ভরত-মেলা, হনুমান-মেলার দিনে ঢোল-সহরতে প্রচার করা হইত—কেহ লাঠি লইয়া পথে বাহির হইতে পারিবে না। দেখিতে পাইলে…ইত্যাদি। এ আদেশ রাস্তার ধারের Commit no nuisance এর মতই সম্মানিত হইত দেখিতাম।

কাছে না পাওয়া যায়, হেন কার্য্য খুব কমই আছে। আমাদের দেশে রৌপ্যমুদ্রার নীচে সবই যেমন খোলামকুচি, এখানে কিন্তু আদৌ তা নয়, একটি "ডবলের"ও যথেষ্ট দাম আছে। পয়সাকে ইহারা ডবল বলে। গরু দুধ কম দেয়; ছাগল দেখিতেই মস্ত, নির্য্যাস নামে মাত্র। আর দিবেই বা কোথা হইতে? খাইবে কি? ঘাস কোথায়? ও সকল জন্তুর 'দুধ যে মাথে।'

যাহার কোন জীবিকা নাই, সে এখানে ছাগল পোষে। ছাগলের ব্যবসাটা মন্দ চলে না। বিন্ধ্যেশ্বরী দেবী নিরামিষাশী ন'ন, নিত্য শত শত ছাগ তাঁহার পাষাণ-দৃষ্টির

টাঁড়েকা দড়ী

বাঙালী এখানে আসিয়াই একগাছি করিয়া লাঠি কিনিয়া বসে। এ একটা সংক্রামক ব্যাধির মত। তবে দেশোয়ালী লাঠি কিনে না, "বাঙালী-লাঠি"ই ক্রয় করে। এই বাঙালী লাঠিগুলি যষ্টিরই নামান্তর ও রূপান্তর।

দেশটা গরীবের দেশ—পাণ্ডারা ছাড়া সকলেরই অন্ন-ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ অবস্থা। ভগবান বিরূপ—উপায়ও নাই। ক্ষেত্রে কোন শস্যই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে না; যাহা জন্মে তাহা দ্বারা কোন গৃহস্থেরই সংসার দুই এক মাসের বেশী চলিতে পারে না। পয়সার বিনিময়ে এখানকার লোকের

সম্মুখে ছাগজন্ম হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে; খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে মা খুব লিবারেল, গৃহস্থের মেয়ের মত, যা পা'ন্—ভ্রূণ হইতে প্রাচীন (ছাগ) কিছুতেই অরুচি অথবা আপত্তি নাই। চোখ ফুটিয়াছে কি-না, মা চোখ মেলিয়া তা'ও দেখেন না। আমাদের দেশের সঙ্গে ব্যবস্থার পার্থক্য অনেক। আমাদের দেশে উৎসৃষ্ট ছাগ এক আঘাতেই দ্বিখণ্ডিত হয়, এখানে সে বালাই নাই, কাটা লইয়া কথা, তা কে-জানে এক; আর কে-জানে এগার। পীঠস্থানে নাকি দোষ নাই, শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। 'হবেও বা!'

এখানকার আহীরিণী বা গোয়ালিনীরা দর্শনীয় দ্রব্যের সামিল। প্রত্যূষে তাহারা যখন দলে দলে গুঁট্যা-বোঝাই বাজরা মাথায় রাজমার্গ আলো করিয়া চলে, তখন প্রথম-দৃষ্টিতে বুঝা কাহারও সাধ্য নহে যে সেই স্তূপীকৃত "শুষ্কীকৃত" জমাট গব্য-রসের নিয়ে তরল পদার্থও আছে বা থাকিতে পারে। আমাদের পরিচিত এক পরিবার প্রথম দিনটা সারা দিন আসার আশায় বসিয়া থাকিয়াও দুগ্ধ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের বাড়ীতে আবার ছেলেবুড়া সব চা-খোর। চা-অভাবে গৃহে কি ব্যাপার চলে। একটি সামনে, দুইটি যথাস্থানে বাঁধা হয়। পাথর বোঝাই করিয়া আনাই এখানকার গরুর গাড়ীর একমাত্র কাজ। অন্যান্য কাজ—যা কিছু, তা কতক মানুষ গাড়ীতে—দুইটা বলদের স্থানে দুইটা মানুষ, জীব দুই-শ্রেণীর বটে, আসলে কিন্তু একই রকম—কতক ঘোড়া বা গাধার পৃষ্ঠে ও বাকী সর্বাপেক্ষা সস্তা বাহন 'উষ্ট্রের' পিঠে বাহিত হয়। উটটা এদেশে খুবই বেশী; গাছের ডাল পালা খাইয়াই তাহারা বাঁচে, আহা বেচারিটা! শিঙটি পর্য্যন্ত নাই, টাট ছুড়িতেও পারে না।

ট্যাঙ্কের অপর প্রান্ত

সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা পাঠক-পাঠিকাগণকে অনুধানে অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি। তাঁহারা অবশেষে আমাদের শরণ লইয়া বলিলেন যে এ দেশের গরু কি কেবল গুঁট্যাই উৎপন্ন করে; আর কিছু না? ব্যাপার শুনিয়া আমরা তাঁহাদের নর-নারী সকলকে চা খাওয়াইয়া দিলাম ও পরদিন ঐ গুঁট্যা পর্বত ভেদ করিতে পরামর্শ দিলাম। তাঁহারা স্বীকার করিয়াছিলেন, দুইচারিটা খুনোখুনির দায় হইতে আমরা তাঁহাদের রক্ষা করিয়াছি।

এখানে তিন-গরুতে, কখনও কখনও 'চৌ-গরুর' গাড়ীও

একটা জিনিষের ছবি আমি কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারি নাই, জিনিসটা এদেশের লাঙ্গল। লাঙ্গল, সঙ্গে মই ও তৎসঙ্গে বীজ বপনের চোঙা। একসঙ্গে চষা, মাটী ভাঙ্গা, বীজ ছড়ান হয়। জিনিসটা দেখিতে অনেকটা তৈলের ফাণেলের মত—লম্বা, জমি স্পর্শ করিয়া থাকে। লাঙ্গল অবশ্য পুরুষেই ধরিয়া থাকে, স্ত্রী সহকারিণী হইয়া পার্শ্বে থাকিয়া ফাণেলে বীজ ঢালিয়া দিয়া যায় এবং অলস পুরুষ যখন শ্রান্তিবশতঃ (?) বিমায়—তখন তাহাকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করে। এদেশের নারী-চরিত্রের ইহা এক বৈশিষ্ট্য।

মেয়েরা রঙীন কাপড়টাই বেশী পরে—পছন্দ করে। যাহার চার কাল গিয়াছে অর্থাৎ কোন কালই বাকী নাই, সাদা কাপড় তাহারও মনোরঞ্জন করিতে পারে না। বাঙালীর বৌ, একছেলের মা—তা সে যত অল্প বয়সেই হোক—হইলেই পাছা-পাড়টিও পরিত্যাগ করেন, রঙীন কাপড়ের ত কথাই নাই; ইহারা ঠিক বিপরীত। কাপড়ের রঙও ছাড়ে না, পায়ের "পায়েরও" ফেলে না। আমার মনে হয়, ইহার মধ্যে বেশ একটু psychology মনস্তত্ত্বের ব্যাপার আছে। সাদা কাপড়ের সঙ্গে জরা-মরণের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইহারা তাহাদের আমলে আনিতেই চায় না। বরং যাবৎ জীবেৎ নীতি পালন করিয়া আমরণ রঙীন থাকিলে ভাল থাকে। কাপড় পরার ধরণটিও বেশ, সামনের দিকে কোঁচাও আছে, মাথার উপরে অাঁচলও আছে, একটু টানিয়া দিলে অবগুণ্ঠনের কাজও করিতে পারে। অবশ্য সে কাজ ইহাদের কচিৎ করিতে হয়। আগে একেবারেই ছিল না,—আজকাল দুই একটি বাড়ীতে ঘোমটা সূচিত হইতেছে লক্ষ্য করিলাম। আদর্শটা কেন যে স্পৃহনীয় ও গ্রহণীয় হইল, তাহা অবশ্য আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে বাঙালী যেমন ইওরোপীয়ানদের অনুকরণ করিয়া কৃতার্থ হয়, অ-বাঙালীরাও দেখি বাঙালীর অনুকরণ করিয়া চতুষ্পদ হইবার চেষ্টা করে। কলিকাতা সহরে দেখি, মাড়োয়ারী, ভাটিয়া, বেহারী, হিন্দুস্থানী (খোট্টা) সকলেই বাঙালীর অনুকরণ করে। এবং আমরা যেমন সাহেবদের খারাপটাই নকল করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করি, ইহারাও বাঙালীর সেই দিকটাতেই ঝুঁকিয়া পড়ে। বাঙ্গালীর আদর্শে বিলাস-স্রোতে অবগাহন করে, সদ্ব্যয়ের চেয়ে অসদ্ব্যয়ই—অনেকে বেশী করে।

এখানে পুরুষ, মাত্রেই 'ভাইয়া'—দেশী পরদেশী ভেদ তাহাতে নাই। ধনী-দরিদ্রে, হিন্দু-মুসলমানেও 'ভাইয়া'। আর অধিক বয়স্কা রমণী মাত্রেই ভৌ-জী অর্থাৎ বৌ-দি। পুরুষ যে পরিমাণে পরুষ, কঠোর, রুক্ষ, উগ্র; রমণী ততোঽধিক মাত্রায় কোমলা, মধুরা, হাস্যাধরা। রণ-ক্ষেত্রে অবশ্য অন্যরূপ। সেখানে এক-একজনে নেপোলিয়ান বোনাপার্টির নাকটা কানটা কাটিয়া আনিবার শক্তিও ধরে।

বাঙালীর মেয়ের সঙ্গে পার্থক্য এইখানেই এবং সে পার্থক্য প্রায় আকাশ-পাতালের মতই অসম। বঙ্গনারী শুধুই কোমলা, মধুরা, হাস্যাধরা—ইহাদের প্রকৃতিতে দুই-ই আছে। উজ্জলে মধুরে, কোমলে কঠোরে—চমৎকার। স্বেচ্ছায় যদি elope হয়—সে কথা স্বতন্ত্র; দুর্বৃত্ত এ দেশের নারীকে বলপূর্বক হরণ বা ধর্ষণ করিতে পারে না; করিয়াছে বলিয়াও শুনি নাই। আমাদের বঙ্গবাসিনীরা যদি নাকুর বদলে নরুণের আদর্শে ঘোমটাটি দিয়া শক্তি-মন্ত্রটা লইয়া আসিতে পারেন, সংসারের উন্নতি হয়; সমাজ সুসংস্কৃত হয়; দেশের ও জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়।

৭

বিন্ধ্যাচলে বিন্ধ্য-বাসিনী দেবীই প্রধানা। কথিত আছে এইরূপ যে, পুরাকালে দেবী বিন্ধ্য পর্বতেই ছিলেন। কোন শক্তিমান বিধর্মী নরপতি (অনেকে নবরঙ্গদেব অর্থাৎ ঔরঙ্গজেবকে সন্দেহ করে) পর্বতগাত্র হইতে দেবীকে অপহরণ করিয়া নৌকাযোগে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে-ছিলেন। পথে নৌকা বাণচাল হইয়া যায়, দেবী গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিতা হন্। পরে পুনরুদ্ধার করিয়া গঙ্গাতটে মন্দির নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। যাহারা সন্দেহ করে যে শ্রীমান ঔরঙ্গজেব এ-পথে আসিয়া ঐ কর্মটি করিয়াছিলেন, তাহাদের অনুমান যে অমূলক অথবা ভিত্তিহীন এমন কথা সাহস করিয়া বলা শক্ত। এখানে আশে-পাশে ভগ্ন দেবদেবী-মূর্তি এত বেশী দৃষ্ট হয় যে, তাহা হইতে হিন্দু-বিদ্বেষী শ্রীমান অথবা তাঁহারই মত কোন ধী-মানের আগমন-সম্ভাবনা কল্পনা করিয়া লইতে কষ্ট হয় না। আরও এক কথা; শ্রীমান ঔরঙ্গজেব বারাণসীতে গিয়াছিলেন, ইহা তো অস্বীকার করা যায় না; অথচ এত কাছে বিন্ধ্যাচল, তৎপ্রতি এতখানি ঔদাসীন্য, ইহা মনে করিলে তাঁহার উপর কতকটা অবিচার করা হয় না কি?

বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরটি সহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং অধিকাংশ দেব-দেবীর মন্দিরের মতই স্থানটি খুব "ঘিঞ্জি"—স্বল্প-পরিসর। মন্দিরের দ্বার অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অতিমাত্র তাবাবিষ্টের মত ঢুকিতে গেলে আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা আছে। মন্দিরের পাণ্ডারা যাত্রীর উপর উৎপাত ত করেই; আর এক অভিনব ফন্দী-ফিকির খাটাইয়া রোজগারের চেষ্টা করে। মন্দিরে লইয়া গিয়া—ক'টি

মেয়ে, বাবু কি কম্‌মো করেন—ইত্যাকার প্রশ্ন করিতে সুরু করে। করিতে করিতে যখন থামে, তখন যাত্রী বুঝিতে পারেন যে দেবীকে কাপড় দিবার, নথ দিবার প্রতিশ্রুতিও করিয়া ফেলা হইয়াছে এবং দেবীর মন্দিরের উপরে দাঁড়াইয়াই কথাগুলা বলা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইহার প্রতিকার—একমাত্র, নীরবতা।

দ্বিতীয় মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, সেখানে দেবী অষ্টভূজা বিরাজিতা। মন্দিরটি পাহাড়ের গুহায় খোদিত—সামনের দিকেই দ্বার-জানালা যা-কিছু, অপর তিনটা দিকই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। অষ্টভূজা-মন্দিরের পাদদেশে ভৈরব-কুণ্ড—এই কুণ্ডের জলে অধিকমাত্রায় Calcium থাকায় হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে ইহা বিশেষ উপকারী শুনিলাম। এক যক্ষ্মা-রোগ-গ্রস্ত রোগী এই জল পান করিয়া প্রায় সারিয়া উঠিয়াছিলেন তা'ও শুনা গেল। কুণ্ডটি খুবই ছোট; দৈর্ঘ্যে প্রস্থে তিন হাত হয় কি না হয়। গভীরতা আধ হাতেরও কম, কিন্তু সদাই সুনির্ম্মল জল টলমল করিতেছে।

নীচে, আর একটু দূরে সীতাকুণ্ড। ডিস্‌পেপ্‌টিকদের নিকট ইহার বড় আদর। অষ্টভূজার মন্দিরে পাণ্ডার অত্যাচার বিশেষ নাই, তবে প্রার্থীর সংখ্যা কিছু বেশী। প্রধানতঃ প্রার্থিনীদের হাত এড়াইয়া আসা দুষ্কর। বিলাতী দোকানে Shop girlsরা যেমন দৃষ্টি দালালিতেই অদরকারেও দ্রব্যাদি কিনাইয়া ছাড়ে, এখানেও তেমনই সুদর্শনা ভিখারিণীর দল ব্যাগ খালি করাইয়া ছাড়িবেই।

অপর মন্দির কালী-খোপ্। ইহারই নীচে কালীকূয়া নামে বিখ্যাত কূয়াটি অবস্থিত। এ কূয়ার জল খুব সুস্বাদু ও হজমী। রিউম্যাটিক ও ডায়েবেটিক রোগীদের পক্ষে অমৃততুল্য।

অমরাবতী রোডের উপর স্যানিটেরিয়াম হইতে ঠিক এক মাইল দূরে একটি কূয়া আছে, তাহার নাম নাঙ্গা বাবার কূয়া। বোধ হয় কোন কালে ইহার পার্শ্বে বসিয়া কোন বস্ত্রত্যাগী সাধক সাধনা করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই ঐ নামের উৎপত্তি। এই কূয়াটির জলের মত সুমিষ্ট, সুস্বাদু ও উপকারী শীতল জল আমি কোথাও পাই নাই। বৈদ্যনাথবাবু এই জল বিতরণ করিয়া স্যানিটেরিয়ামে দাতা-কর্ণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ক্ষুধাবৃদ্ধির সহায়ক এমন জল বিন্ধ্যাচলেও অল্প আছে। স্যানিটেরিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষ কোন 'বিখ্যাত' কূপ বা কুণ্ডের জল বোর্ডারদের দেন না। দেন না, বোধ করি দেউলিয়া হইবার আশঙ্কায়। পশ্চিম দেশ, সকল জল ও হাওয়াই ভাল, অমনই ক্ষুধা বৃদ্ধি পায়, তার উপর এই সব নামজাদা কূপ জলের সহায়তা পাইলে বোর্ডাররা কি আর তাঁহাদের ইঁট পাথরগুলাই রাখিয়া আসিবেন?

ভ্রমণের পক্ষে পর্বতের উপর যে রাস্তাটি আছে সে'টি ও এই অমরাবতী রোড—দুইটিই প্রশস্ত। অমরাবতী রোড যেখানে পাহাড়ের কোলে শেষ হইয়াছে সেখানটাকে 'রাজ-বাড়ী' বলে। আমরা রবার-টায়ার এক্কা পাইলে প্রায় অপরাহ্নে রাজ-বাড়ী বেড়াইতে যাইতাম। একস্থানে মাঠের মাঝখানে একটা ভাঙ্গা পাথরের প্রকাণ্ড স্তম্ভ পড়িয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার অঙ্গে যে শিল্পকার্য্য আজও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান, তাহা দেখিয়া অনুমান করিতে পারা যায় যে এখানে কোন কালে কোন রাজ-রাজড়ার একখানি প্রাসাদ ছিল; কাল-সাগরে তাহা লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

আমি উপরে কয়েকটি প্রসিদ্ধ মন্দিরের কথা বলিয়াছি; এ ছাড়া কত ছোট বড় মন্দির ও ঠাকুর দেবতা আছে ও আছেন যে তাহা গণিয়া শেষ করিতে হইলে খোদ শুভঙ্করকে তলব দিতে হয়। এদেশে হনুমানজী—থুড়ি মহাবীরজীর প্রভাব কিছু বেশী; তাঁহার মন্দিরের সংখ্যা অগণিত। সম্প্রতি নড়াইল রাজ-বংশের কোন পুণ্যকামিনী রমণী একটি কালী-মন্দিরও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

আমার ধারণা ছিল, আমার গৃহিণীটির তীর্থ করিবার বয়স এখনও হয় নাই; বিন্ধ্যাচলে যে-সব দেব-দেবী আছেন তাঁহাদের দেখিয়া ও সাধ্যমত পূজার্চনা করিয়াই তিনি বিরত থাকিবেন; আমিও অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্যের দায় হইতে অব্যাহতি পাইব। বরাবর আমি একলাই দেশ ভ্রমণ করি। "স্বামীর পুণ্যে স্ত্রীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।" কবি রবীন্দ্রনাথের "পুরাতন ভৃত্য" হইতে উক্ত ছত্রটি শুনাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিয়া আসায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম।

জীবনে বোধ হয় এই দ্বিতীয়বার আমাকে জোড়ে পুণ্য করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। আমাদের মত দীন দরিদ্র সাহিত্য-সেবীর সহ-ধর্ম্মিণীর পক্ষে কোন অধিব্যাধি থাকার কথা নহে; ছিল-ও না, তাই মরি-বাঁচি করিয়া এমন এক

জায়গায় লইয়া গিয়া বোঝা নামাইয়াছিলাম যে, ইচ্ছা করিলেও ব্যয় বর্দ্ধিত হইবার উপকরণ নাই ; কিন্তু সেই যে ইংরেজীতে একটা কথা আছে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানেই উপায়—এটা শীঘ্রই হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে হইয়াছিল। কতকগুলা অর্থ-ব্যয় অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও, কোন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আমাকে তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করিতে হয়।

গৃহিণী বলিলেন—কাল কাশীতে বিজয়া দশমী দেখব। ভিড়, ঝামেলী, কাচ্চা-বাচ্চা ঠাণ্ডা, হিম—যত রকমের লোকে প্রতিমা দর্শন করিতেছে, পূজা দিতেছে, অঞ্জলি দিয়া ধন্য হইতেছে, আর অভাগা আমি, কোথায় পড়িয়া আছি! ভাগ্য যেবার প্রসন্ন হয়, সেবার মরুভূমিতেও সলিল-সম্ভার দেখা যায়—যেখানে বাঙালীর দুর্গা পূজা হইবার কথা নয়—সেখানেও পূজা দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মীরাট, সাঁওতাল পরগণার নাম করিতে পারি। কাশীর এত কাছে এই মীর্জাপুর বিন্ধ্যাচল, অথচ একখানি পূজাও নাই। অর্থবান লোকেরও ত অসদ্ভাব নাই, তবু যে কেন
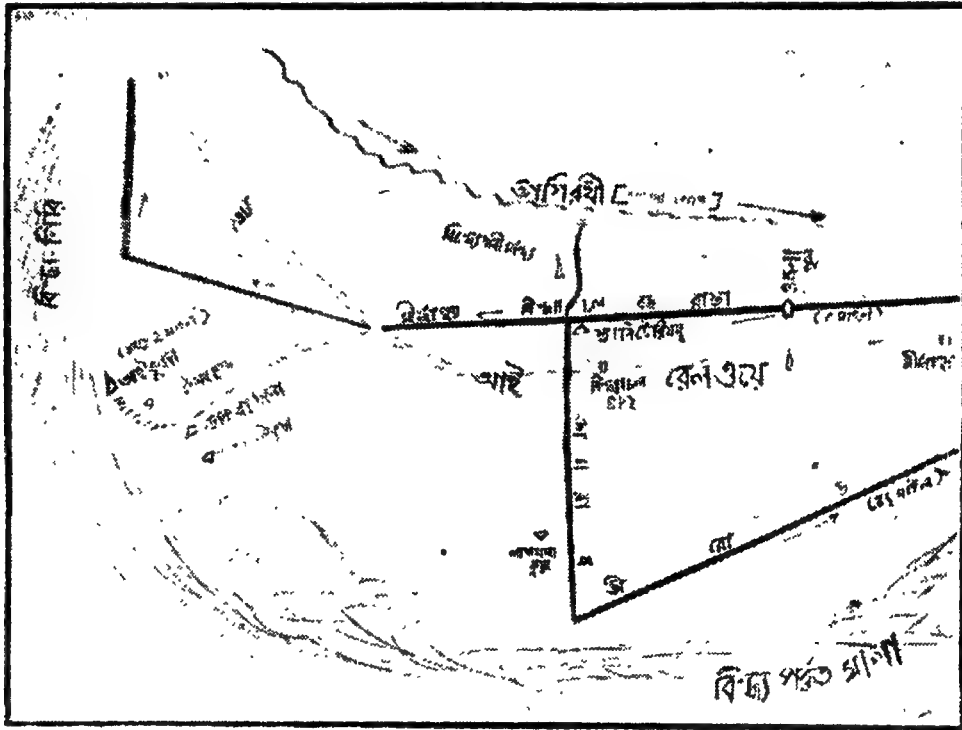
মানচিত্র

যত বিঘ্ন উপস্থাপিত করা যাইতে পারে, করিলাম কিন্তু অধমের কাহিনী তিনি শুনিবেন কেন ?

বলিলেন—বচ্ছরকার দিন, মা'র মুখ দেখব না ?

এ দুঃখ যে আমারও ছিল না, তা নয়। তবে আমি কতকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি। প্রতি বৎসরই এ সময়ে আমি বাঙলার বাহিরে থাকি ; কোনবার ভাগ্যবশে জগজ্জননীর দর্শন পাই, কোনবার ঘটে না। কিন্তু বাঙলীর ছেলে, যেখানেই যাই-না কেন, পূজার তিনদিন অহোরাত্র মনে জাগে, বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে কি আনন্দের উৎসব চলিয়াছে ; দালান আলো করিয়া মা বিরাজ করিতেছেন। মা'র বোধন-বাদ্য বাজে না, তাহা আমি ভাবিয়া পাই নাই। মীর্জাপুরের Towering personality ডংগার বাবু আমাদের কথাগুলি ভাবিয়া দেখিতে পারেন।

সেদিন যে নবমী এবং কালই যে মা বাঙলা অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইবেন তাহা আমার মনে ছিল না, সারা দিন হেঁসেলে ব্যস্ত থাকিলেও (মাঝে মাঝে স্বহস্তে নানাবিধ খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া স্যানিটেরিয়ামের বোর্ডারদের খাওয়াইবার সখ্ তাঁহার হইত ; সেদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা চপ্-প্রস্তুত করিয়াছেন) গৃহিণী তাহা ভুলেন নাই ; বলিলেন—যাইতেই হইবে।

খরচের ভয়ই যে একমাত্র ভয় ঠিক তাহা নহে। আমরা একটু স্থবির প্রকৃতির লোক; অর্থাৎ বসিতে পাইলে শুইয়া পড়ি, উঠিতে বড় চাই না। দৌড় ঝাঁপ, গাড়ী ঘোড়া সত্যই অপ্রীতিকর। এ সকল বাধা তুচ্ছ না হইলেও সংস্কারের আকর্ষণ বড় কম ছিল না। যদি বা মনে মনে মা'র মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া চুপ-চাপ থাকিয়া যাইতেও পারিতাম; কিন্তু বাঙালীর মেয়ে—যাহাদের জন্ম আজও বাঙালা দেশটা পুরাপুরি ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইতে পায় নাই; আমাদের তীর্থ-ধর্ম, সংসার-কর্ম যাঁহারা বজায় রাখিয়াছেন—তাঁহাদেরই একজনকে জগজ্জননী-দর্শন সুখে বঞ্চিত করিতে প্রাণে আঘাত অনুভব করিতে লাগিলাম।

বলিলাম—তথাস্তু।

শ্রীমান সতুকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। এবং কোন্ পথে কি-ভাবে আরামে যাওয়া যাইতে পারে—তাহারই পরামর্শ করিতে বসিলাম। মোটরের ব্যবস্থা করিলে একদিনে যাতায়াত সম্ভব; পরে ইহা প্রত্যক্ষও করিয়াছি। আমাদের গাণ্ডীব (শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায়—Translation খ্যাত বেণীমাধবের পুত্র) একদিন কাশী হইতে দল বল লইয়া মোটরে আসিলেন, ঘণ্টা কতক থাকিয়া আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তবে মীর্জাপুরে তেমন ভাল মোটর পাওয়া যায় না শুনিলাম। নৌকাযোগে যাওয়া যায় শুনিয়া আমার উত্তম বৃদ্ধি পাইল, এতক্ষণ শুইয়া শুইয়া কথা কহিতেছিলাম, উঠিয়া বসিলাম। "সেই ভাল"—বলিয়া তখনই নৌকা পাওয়া যায় কি-না, একটানা স্রোতে কতক্ষণ লাগিতে পারে, ভাড়া কত লাগিবে—সকল বিষয়ে পরামর্শ করিতে নীচে নামিয়া গেলাম। গৃহিণীকে অভয় দিলাম—যাইবই; তা' সে জল-স্থল বা শূন্য-পথে হৌক। সেইদিন বিকালে এক-খানা এরোপ্লেন উড়িতে দেখা গিয়াছিল।

আমার তিন বীর-পুত্র বারাণসীতে বন্দুক পাওয়া যাইবে মাতার নিকট এই শুভসংবাদ অবগত হইয়া পরস্পরের মস্তককে চাঁদমারীর চিবি কল্পনা করিয়া আহার-নিদ্রা ত্যাগ করণান্তর বীরত্ব অভ্যাস করিতে সুরু করিয়া দিল।

অলক্ষণা

শ্রীনির্ম্মল দেব

আমার যৌবন-তপস্যার সিদ্ধি সেদিন,—আমার বিয়ে! কত দীপালোক,—কত সুন্দরীর কলকণ্ঠ,—কত রক্ত-অধরের হাসির দেওয়ালী! তখন স্ত্রী-আচার হ'চ্ছিল,—চাঁপা-রঙের গরদ প'রে, টোপর-মাথায় বরণ-পিঁড়ির ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলুম—নিশ্চল-নিষ্কম্প হ'য়ে। সাতটী তরুণী—যেন সাতখানি শুকতারা—আমায় ঘিরে প্রদক্ষিণ ক'রছিল,—হাতে তা'দের মিলন-দেবতার বিচিত্র-সম্ভার! কেমন যেন একটা বিহ্বল আবেশে আমার চেতনা এলিয়ে প'ড়ছিল, আমার মন যেন চুপি-চুপি ব'লছিল—"নারি! চির-কল্যাণময়ী নারি! সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাত থেকে যুগ-যুগান্ত ধ'রে এমনি ক'রে পুরুষকে ঘিরে অবিশ্রান্ত তোমরা চ'লেছ—হাতে তোমাদের পথ-দেখানো প্রদীপ-শিখা, চক্ষে তোমাদের দুঃখ-ভোলানো হাসি, বক্ষে তোমাদের প্রেম-ঝীমানো বরণ-ডালা!"

অকস্মাৎ সেই উৎসব-প্রাঙ্গণে একটা রুক্ষ-কর্কশ কণ্ঠ বেজে উঠলো—"হ্যাঁরে মায়া, কী বেয়াক্কেলে মেয়ে তুই বল্ ত! এই শুভকর্ম্মে তুই অলক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছিস্! যা' হতচ্ছাড়ী, ওপরে যা'!"

সেই নারী-জনতার ভিতর থেকে কে-একজন প্রৌঢ়া দরদী স্বরে ব'ললেন—"আহা থাক্, থাক্! ছেলেমানুষ, ওর কি সে জ্ঞান আছে! খুণুতে ওতে একটা প্রাণ, খুণুর বিয়েতে কি ও না এসে থাক্তে পারে! এতে অকল্যাণ হবে না!"

আবার সেই কণ্ঠ সাড়া দিলে—"তোমরাও কি আক্কেলের মাথা খেলে গা! শুভকর্ম্মে ওই পোড়াকপালী এসে দাঁড়াবে! তোমরা কি নতুন শাস্তর লিখতে চাও!......মুখপুড়ী, কাণের মাথা খেয়েছিস্, শুনতে পাচ্ছিস্ না কি ব'লছি!"

ব্যাপারটা কি—কিছুই বুঝতে পারলুম না, কেবল দেখলুম

একটি নিরাভরণা কিশোরী—চতুর্দ্দশ বসন্তের অর্দ্ধ-বিকশিত শতদল—ম্লানমুখে সে উৎসব-সভা ত্যাগ ক'রে চ'লে গেল! —কে জানে তা'র দীর্ণ অন্তরের অতল তল থেকে কিসের তরঙ্গ পূর্ণিমার সাগরের মতন ফুলে-ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌লো!

* * * * *

বাসর-ঘরে এসে ব'সলুম—শত অপরিচিতার অকুণ্ঠিত প্রীতির যমুনা-তীরে! কত হাসি, কত রঙ্গ, কত কৌতুক বিজয়ী বীরের শিরে পুর-নারীর লাজ-বৃষ্টির মতন আমার ওপর ঝ'রে প'ড়তে লাগ্‌লো। কিন্তু কেন জানি না, আমার মনে হ'তে লাগলো যেন এ হাসি, এ আনন্দ, এ আলো—এ সবই যেন একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার লীলা। সুন্দর দেহের মধ্যে প্রাণহীন কঙ্কালের মতন, দীপ্ত যৌবনের পিছনে অসহায় জরার মতন, প্রভাতের রাঙা আলোর পারে সন্ধ্যার কালো ছায়ার মতন আজকের এই উৎসবের আড়ালে যেন কোথায় একটা নিবিড় মৌন হাহাকার লুকিয়ে আছে!

আমার এ উদাস স্বপ্নাবেশকে একটা নিদারুণ নাড়া দিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দার আবার সেই কর্কশ কণ্ঠের সাড়া এলো—"মায়া, তবু দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিস্! কী বেহায়া মেয়ে রে তুই! তোকে উঠ্‌তে-ব'স্‌তে কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছি, বার-বার ব'লছি অন্ততঃ আজকের মতন ঝুণুর ত্রি-সীমানা মাড়াস্ নি, তবু পোড়ারমুখী তুই ন'ড়বি না! রাক্ষুসী, সব খেয়েছিস্, তা'তেও তোর ক্ষিধে মেটে নি। .....কী, তবু দাঁড়িয়ে রইলি! দাঁড়া যাচ্ছি!......"

একটা রূঢ় আঘাতের আওয়াজ এলো!

আমার বুকের ভেতরটা একটা বিস্মিত আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌লো!—ওই আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ, ওঁরই মেয়েকে আজ আমার জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী ক'রে ডেকে নিলুম। এর প্রাণটাও যদি ওম্‌নি কঠিন পাষাণ হয়! দৃষ্টি আমার আপনি ফিরে গেল আমার পাশের মূর্ত্তির পানে। চেয়ে দেখলুম—লাল চেলীর ছায়া-তলে একখানি শান্ত ম্লান ব্যথাহত মুখ!—ওই নির্ম্মম আঘাত যেন এরই বুকে এসে লেগেছে, আর কাউকে লাগে নি! বাইরে অন্ধকার আকাশের সুদূর প্রান্তে একখানা বড় তারা জ্বল্‌জ্বল্ ক'রছিল, সে যেন হাত তুলে আমায় ব'ললে—ভয় নেই, ওরে ভয় নেই! এ যে তোর যৌবন-প্রভাতের শুভ্র কমল—ফুটেছে পাঁকের ওপর!

কত রাত হ'য়েছিল জানি না। চোখে ঘুম আসেনি, কিন্তু একটা শ্রান্ত অবসাদে শরীরটা নুয়ে প'ড়ছিলো,—একটা বালিশের ওপর ভর দিয়ে আমি একটু এলিয়ে প'ড়লুম। আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ ঘরে ঢুকে বিরক্ত-স্বরে মেয়েদের ব'ললেন—"কতক্ষণ বাপু তোরা জামাইকে এম্‌নি ক'রে জ্বালাতন ক'রবি,—বেচারী যে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো, যা' এইবার সব যে-যা'র শুয়ে প'ড়গে যা'! ও-বেচারী একটু ঘুমোক্।...যা' না, কথা কি কাণে যাচ্ছে না!"

দিনান্তের ব্যথিত আলোর মতন তরুণীর দল ক্ষুব্ধ-চিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—ঘরখানাকে যেন অন্ধকারে ভ'রে দিয়ে! সকলের শেষে দরজাটাকে টেনে বন্ধ ক'রে দিয়ে আমার দরদী শাশুড়ী-ঠাকরুণ চ'লে গেলেন।

* * * * *

রুদ্ধ-দুয়ার ঘরের মধ্যে শুধু আমরা দু'জনে—দু'টি প্রয়াগ-সঙ্গমের তীর্থযাত্রী! কত—কত ব্যাকুল মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে কেটে গেল লজ্জা-সঙ্কোচের দোলায় দুলে! তা'রপর আমি আকম্পিত-কণ্ঠে ডাক্‌লুম—"ঝুণু।"

সে কিছু ব'ললে না, শুধু একটা সলজ্জ হাসির হাল্‌কা বাতাস তা'র আরক্ত মুখের ওপর ব'য়ে গেল, একটা নিমেষ আমার উৎসুক মুখের পানে চকিত দৃষ্টি মেলে সে কুণ্ঠিত চোখ-দুটি নত ক'রলে।

আমি তৃষিত হাত বাড়িয়ে তা'র হাতখানি ধ'রে, তা'কে বুকের ওপর টেনে এনে, তা'র রক্তাভ গালের ওপর আমার অধীর অধর ছুঁইয়ে দিলুম। সে লজ্জায় ম'রে গিয়ে আমার উদ্বেলিত বুকের কোণে রাঙা মুখখানা লুকিয়ে চুপ ক'রে প'ড়ে রইলো।

আরও—আরও কত মুহূর্ত্ত কেটে গেলো এম্‌নি নিঃশব্দে। আমি আবার ডাকলুম—"ঝুণু।"

ভোরের ঘুম ভাঙানো পাখীর ডাকের সুরে সে সাড়া দিলে—"কি?"

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"মায়া কে?"

কোথায় গেল তা'র দুর্জ্জয় লজ্জার বাঁধ! মায়ার কথা জিজ্ঞাসা ক'রতেই সে নিঃসঙ্কোচে উঠে ব'সে আমার মুখের দিকে চেয়ে কতদিনের পরিচিতের মতন ব'ললে—"মায়া

আমার খুড়তুতো বোন। বেচারী জন্ম-অভাগিনী, কবে যে ওর মা-বাবাকে হারিয়েছে, সে ও জানে না। তা'র পর বারো বছর বয়সে ওর তেজ্‌বরে বিয়ে হয়; ওর স্বামীর অনেক বয়েস হ'য়েছিলো, বিয়ের পর ছ'মাস যেতে-না-যেতেই তিনি হাঁপানিতে মারা যান। মা ওকে একেবারেই দেখতে পারেন না। ও ব'লেছিলো—আমার বিয়ের দিন ও আমায় সাজিয়ে দেবে। ওর বড্ড সাধ ছিল এই বাসর-ঘরে এসে ও ব'সবে, কিন্তু মা ওকে কিছুতেই এদিকে আসতে দিচ্ছেন না! বেচারী আজ সারাদিন ধ'রে মুখ শুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে!"

ক্ষণেক থেমে ব্যথা-ভরা-কণ্ঠে ঝুণু জিজ্ঞাসা ক'রলে—"আচ্ছা, সত্যিই কি শুভ কাজে বিধবা থাক্‌লে অকল্যাণ হয়?"

আমি একটা ভারী নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললুম—"তা'ই যদি হয়, তা'-হ'লে গৃহীর সংসারে সন্ন্যাসীর সমাদর কেন হয় ঝুণু?"

ঝুণু কোনো উত্তর দিলে না, কোথায় কোন্ অন্তর-লোকে তা'র লক্ষ্যহীন নয়নের ক্ষুব্ধ ম্লান দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে সে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।

আমি ব'ললুম—"যাও ঝুণু, মায়াকে ডেকে নিয়ে এসো, —বিধবার আশীর্ব্বাদে সধবার সিঁদুর উজ্জ্বল হো'ক!"

ঝুণু গলায় আঁচল দিয়ে আমায় ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে আমার পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে হাসি-মুখে উঠে গেল।

খানিক পরে ম্লান-মুখে ফিরে এসে ব'ললে—"এত ক'রে ডাক্‌লুম, সে এলো না। ওপরে তেতলার ঘরে জানলার ধারে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!"

আমি ব'ললুম—"চলো ঝুণু, আমরাই তা'র কাছে যাই!"

* * * * *

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ঝুণুর সঙ্গে তেতালার ছাদের কোণে একটা নিরিবিলি ঘরের দুয়ারে এসে দাঁড়ালুম। অন্ধকার ঘর,—মানুষের কোনো সাড়া-শব্দ পেলুম না।

ঝুণুকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম—"কই, মায়া কোথায়?"

ঝুণু ব'ললে—"ওই যে, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে!"

অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই দেখতে পেলুম না। কেবল মনে হ'লো যেন খোলা জান্‌লার গরাদের গালটি রেখে একটি শ্বেত-বসনা বালিকা বাইরের স্তূপীকৃত আঁধারের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে মর্ম্মর-মূর্ত্তির মতন নিস্পন্দ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি ডাকলুম—"মায়া!"

কোনো সাড়া এলো না!—কেবল শুন্‌তে পেলুম একটা ক্ষীণ চাপা-কান্নার সুর—স্তব্ধ-গভীর নিশীথে সুদূর আর্ত্তনাদের মতন!

* * * * *

তীরে

আচার্য্য শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

জীবন-নদীর তীরে—
কেগো এসে বাঁধ্‌লে বাসা সারা ডাঙ্গা ঘিরে'?
মিথ্যাবাদী তুমি;
বেচি নাই ত তোমার কাছে আমার বাসের ভূমি।

ভেঙ্গে নিয়ে চালা,
ভাল যদি চা'স্‌রে তবে প্রাণ নিয়ে তুই পালা।

উল্টে নিয়ে মানে,
ব'ল্‌ছ কি না প্রাণটা নিয়েই ছুটবে আকাশ পানে?
ক'র্‌ব আমি লড়াই,
সইব না এ বে-আইনি, পরের উপর চড়াই।
সন্ধি কিসের ডাকাত?
ডরি না তোর পাথর-ভাঙ্গা হুড়ুম্ গুড়ুম্ ঠকাৎ।
যুদ্ধ বীরে বীরে।
কে জয়ী, কে পরাজিত জীবন-নদীর তীরে?

বিবিধ-প্রসঙ্গ

সাঁওতালি ভাষায় সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত এম-এ

ঠিক্ কোন সময়ে সাঁওতালেরা ভারতে এসেছিল তা জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, তারা হিমালয় থেকে এসেছিল, আর বাঙ্গলা বিহার ওড়িশায় এসে বাস করেছিল। কেউ বলেন তারা সাগর পার থেকে এসেছিল। আবার কেউ বলেন সাঁওতালেরা ভারতেরই আদিম বাসিন্দা। এটা নিশ্চিত যে তারা এই ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী হতে বসবাস করছে। অনুমান যে আর্য্যগণের ভারত অধিকার কর্ব্বার পূর্ব্ব হতেই তারা ভারতে ছিল।

বিহারের ছোটনাগপুর বিভাগে, সাঁওতাল পরগণায়, ওড়িশায় বালেশ্বর জিলায় আর ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে, প্রাচীন বঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জিলায়, উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জিলায় সাঁওতালদের সংখ্যাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত কিম্বদন্তী ও তাহাদের সম্বন্ধে প্রকাশিত পুস্তকাদি হ'তে বুঝতে পারা যায় যে, মেদিনীপুর জিলার উত্তর পশ্চিম অংশে, সাঁওতালদের আদি বাসস্থান, অন্ততঃ আদি ও দীর্ঘকালস্থায়ী উপনিবেশ ছিল। মেদিনীপুর জিলার এই অংশ, ইংরাজ অধিকারের প্রথমে 'জঙ্গল-মহাল' নামে স্বতন্ত্র জিলারূপে শাসিত হত। জঙ্গল-মহালকে বিচ্ছিন্ন করে, কতক অংশ মানভূমে, কতক বীরভূমে, কতক বাঁকুড়ায় আর বেশীর ভাগ মেদিনীপুর জিলার সঙ্গে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ খৃঃ অব্দের মধ্যে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে মনে ক'রতাম যে সাঁওতালি বুঝি বা খাঁটী বা অবিমিশ্র ভাষা। এ রকম মনে করা ভুল। কোনো জীবন্ত ভাষার পক্ষে স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকা অসম্ভব। বিবিধ সভ্য ও বর্ব্বরজাতির সহিত সংঘর্ষে ও সাহচর্য্যে সাঁওতালদের জাতীয় প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে, তাহাতে ভাষায় পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন অবশ্যম্ভাবী। আদিম ও বর্ব্বর সাঁওতাল এখনও ওড়িশার পার্ব্বত্য প্রদেশে বর্ত্তমান। এখনও তারা কাপড় পরে না, বল্কলেই লজ্জা নিবারণ করে। সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুরে, সাধারণ হিন্দুচাষী ও গৃহস্থের তুল্য সাঁওতাল চাষী ও গৃহস্থের অভাব নাই। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ডেপুটি, কেরাণী, স্কুল মাষ্টার সাঁওতাল, সাঁওতাল পরগণা ও হাজারিবাগ জিলায় বিরল নহে। সুতরাং সাঁওতালদের মধ্যে প্রচলিত ভাষারও তারতম্য দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে।

রেল, কারখানা, মিশন, আইন আদালত, দোকান, মহাজন, এ সবের আমলে আসে নাই এমন জাতি বা সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায় না। সুতরাং অনেক ইংরাজী, বাংলা, হিন্দীশব্দ তাদের ভাষায় জোর করে ঢুকেছে। তাদের বেছে বার করা কঠিন নয়। তাদের ভাষাও এখন আর-সমস্ত জীবন্ত ভাষার মত মিশ্রভাষা। আমার অনুমান হয়, 'আদি ও অকৃত্রিম' সাঁওতালি ভাষা এখন লুপ্তপ্রায়।

আদিতে আর্য্যের সহিত সংঘর্ষের ফলে অনেক সংস্কৃত শব্দ সাঁওতালেরা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তীর ধনুকের এমনি অপ্রচলন আজকালকার যুগে, যে, আমরা মনে করি যে, ওটা বুঝি বন্য ও পার্ব্বত্য জাতিদের নিজস্ব অস্ত্র। ভাষা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে ঐ অস্ত্রও ধার করা। তীর-ধনুকের সাঁওতালি প্রতিশব্দ নাই। 'তীর'কে বলে 'শর', আর ধনুককে বলে 'জ্যা'; একেবারে খাঁটী সংস্কৃত। অপর প্রতিশব্দ হচ্ছে 'কাঁড়,' কার্ম্মকেরই অপভ্রংশ; আর ধনুক হল 'বাঁশ'; 'বংশ' আর খুঁজতে হয় না। আশ্চর্য্য মনে হতে পারে, কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রচলিত সাঁওতালি ভাষায়, সংস্কৃত শব্দই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী,—সংস্কৃত বা সংস্কৃতমূলক। পূর্ব্বেই বলেছি যে অনেক বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া শব্দ সাঁওতালি ভাষায় সম্পদবৃদ্ধি করেছে।

প্রদেশভেদে একই শব্দের রূপান্তর দেখা যায়। বীরভূমের সাঁওতাল রাস্তাকে বলে 'কুলহি'। কুলি বাংলা শব্দ। মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর থানায় আর বালেশ্বর জিলায় সাঁওতালেরা, পথকে বলে 'দাণ্ড'। আপনারা পুরী শ্রীক্ষেত্রের 'বড়দাণ্ড' শুনিয়াছেন।

সাঁওতালকে তাহার জাতি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'সাঁতাল', ওড়িশায় বলে 'সাঁতাড়', বীরভূমে বলে 'মাঝা'। নিজেদের মধ্যে বলে 'হড়'। 'হড়' বা 'হর' খাটী কোলারীয় শব্দ। সাঁওতাল ও কোলেরা নিজেদের বলে 'বীরহর'। 'বীর' মানে জঙ্গল, যার থেকে, কেউ কেউ বলেন, 'বীরভূমির' নাম হয়েছে; আর 'হর' হ'ল মানুষ। 'বীরহর' মানে 'জঙ্গলের মানুষ' আমরা যেমন সাধারণ কথায় বলি 'জঙ্‌লি'।

স্ত্রীলোক বলতে কিন্তু 'কুঁরি', বাঙ্গলা ও সংস্কৃত 'কুমারী'রই সাঁওতালি রূপ। বিবাহিতা স্ত্রীকে বলে 'মাইজু' বা 'ঐরা'। 'মাইজু', হিন্দী 'মাই', 'মাইজীর' রূপান্তর। 'ঐরা' কি 'উহারা'র সংক্ষিপ্ত সংস্করণ? ভাবিবার বিষয়, কারণ সাঁওতাল বা কোল নিজের স্ত্রীর নাম লয় না।

ছেলেপিলাকে বলে 'গিদিরা' বা 'হপন'। গিদিরা কি 'ক্ষুদ্র' হইতে আসিয়াছে? কিন্তু পুত্র সন্তানকে বলে 'কোরা গিদিরা', 'কোরা' নিশ্চয়ই

'কুমারের' রূপান্তর। কন্যাকে সেইরূপ বলে 'কুড়ি গিদিয়া'। 'হপন' কেবল শাবক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, ভালুক ছানা, 'বনাহপন'।

সাঁওতালেরা বাসঘরকে বলে 'বাসা'। গ্রামের নামের অন্তে সেইজন্য 'বাসা' প্রায়ই পাওয়া যায়। আমাদের নিকটেই ভালু 'বাসা' আপনারা জানেন। 'চাঁইবাসা'তে ঐ 'বাসা'। রাখাল বা গোপালককে সাঁওতালেরা বলে 'গুপী'। হলচালনকারীকে বলে 'চাসা'। এর থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে আদিম অবস্থায়, এরা হলচালনা করত না, ঘর বেঁধে থাকত না, গোপালন করত না।

দেবদেবীর নাম বেশী নাই। দেবতা, ঠিক ঠিক বলতে গেলে অপদেবতা, মহাশয়দের সাধারণ নাম 'বোঙ্গা'। খুব বড় দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বরকে বুঝাইতে বলে 'সিং বোঙ্গা'। 'সিং' সিংহ থেকে। সিংহ বনের প্রবল প্রতাপশালী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। হিন্দুর নিকট ধার করা 'চণ্ডী' দেবতাকেও 'চণ্ডীবোঙ্গা' হতে হয়েছে।

সাঁওতালেরা বোধ হয়, সৃষ্টির আদি থেকেই নৃত্যগীত ও বিলাসপ্রিয় ও সৌন্দর্য্যের উপাসক। সেই জন্যই বোধ হয়, চন্দ্র তাদের প্রিয়। চন্দ্র ও সূর্য্যের নাম করণের সময়, আগে চন্দ্র হ'লেন 'চাঁদো'; সূর্য্য উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর, সুতরাং তিনি হলেন 'সিং চাঁদো'। মাসও 'চাঁদ' এক মাস. দু মাস হলো, 'মিত চাঁদ' 'বারেয়া চাঁদ'। 'আগুন'কে বলে 'সেঙ্গেল্'—অগ্নির ধ্বনি আছে। বাসগৃহকে বলে 'ওরা'—গৃহের ধ্বনি বর্ত্তমান।

গৃহপালিত জীব জন্তুর মধ্যে তাহাদের প্রধান হচ্ছে মুর্গী,—বলে 'সিম্'। অনেক সাঁওতাল বলে 'কুকড়া' কুক্কুটের—হিন্দী সংস্করণ। আর সব প্রায়ই ধার করা, যেমন—

গাভী—গাই। গাধা—গাধা। উট—উঁট

পাখি—'চেড়ে'—হিন্দি উর্দ্দুর চিঁড়িয়ার সংক্ষিপ্ত রূপ।

ষণ্ড—'আণ্ডিয়া'—এঁড়ে হইতে মনে হয়।

কুকুর—সেতা

ছাগল—মেরোম—ধ্বনিবাচক শব্দ। ম্যাড়া পাঁঠা বাংলার চলিত আছে।

'হরিণ' কিন্তু 'জেল'—সিংএর নামে জন্তুর নাম।

অশ্ব—সাদম—আর্ব্বি থেকে কোন কালের ধার করা জানা যায় না।

সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে সংস্কৃত শব্দের চিহ্ন এখন ধরা কঠিন। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে সাঁওতালেরা আর্য্যগণের নিকট গণনা শিক্ষা করেন। এক হইতে দশ পর্য্যন্ত সংখ্যায়, বাঙ্গলা বা সংস্কৃতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় না। অন্য কোনো ভাষার প্রতিধ্বনি আছে কি না, অভিজ্ঞেরা বলতে পারেন।

এক—মি
দুই—বারেয়া
তিন - পে-আ
চার—পোণে-আ
পাঁচ—মোরে
ছয়—তুরুই
সাত—এ-আ-এ
আট—ই-রা-ল
নয়—আ-রে
দশ—গেল্

তবে বিশ বা কুড়িকে বলে 'ইসি'। 'ইসি', বিশ বা বিংশ থেকে এসেছে বলা যায়। আবার কুড়ির ঊর্দ্ধ সংখ্যা বাচক শব্দগুলি সংস্কৃতের অনুরূপ প্রণালীতে গঠিত। যেমন চল্লিশ 'বার ইসি', কিন্তু পঞ্চাশ হ'ল 'বার ইসি গেল' অর্থাৎ দুকুড়ি দশ। তেমনি এক শত, 'মোরে ইসি' অর্থাৎ পাঁচ কুড়ি। সাধারণ সাঁওতালেরা কুড়ির বেশী গুণিতে পারে না। অপেক্ষাকৃত সভ্য সাঁওতালেরা একশকে প্রদেশভেদে বলে 'শয়, শত, বা শ'—ওড়িয়া, হিন্দী ও বাংলার চলিত রূপ।

তারপর সর্ব্বনাম দেখা যাক। 'আমি', সাঁওতালি 'ইঞ্‌এ'—অহংএর স্পষ্ট ধ্বনি আছে। 'আমরা'—'আবে' বা 'আবাবে'—'আবাব্' পরিচয় দিচ্ছে। 'তোর' বা 'তোমার' বলিতে, 'তস্' ত্বংএর মূল। তোমাদের বলিতে 'তাবেন' সং তাভ্যাংএর ধ্বনি আনে অর্থ না আসুক। 'আপনি' বলিতে 'আপে' তে ভবান বা আপনির চিহ্ন বর্ত্তমান। আপনার বলিতে 'তাপে' তে 'তব' রহিয়াছে, খুঁজিতে হয় না। 'তিনি' বলিতে 'হনি'—উনিরই প্রকার ভেদ। তাহার বলিতে 'তায়্' এতে তাহার বা তস্য গন্ধ আছে।

দেহ ও অঙ্গবাচক শব্দে 'পা' অর্থে দেহের নিম্ন। কোমরকে 'কটা', জঙ্ঘাকে 'জাঙ্গা' বলে। মূল সহজেই ধরা দেয়। নাসিকাই মুখমণ্ডলের প্রধান শ্রী ও অবয়ব। সেই জন্য 'নাক' বলিতে তারা 'মু' বলে। মুখগহ্বরকে বলে 'মোকা'; মুখ ধরা পড়ে। দাঁতকে বলে—'ডাটা'—দন্তের ধ্বনি আছে। কেশকে বলে 'উপ্'। 'জিহ্'কে বলে 'আলা'—তালুর অপভ্রংশ বলে বোধ হয়। পেটের মধ্যে নাভিই লক্ষ্য; পেটকে তাই সাঁওতালেরা বলে 'লাই'।

ধাতুর মধ্যে লৌহ, হল 'মেড়ে'—মূল ধরতে পারিনি। সোনা হ'ল 'সামানম্' স্বর্ণের অপভ্রংশ। রৌপ্য হ'ল 'রূপা'—বাংলা শব্দ। আর কোনো ধাতু তারা জানত না।

সম্বন্ধবাচক শব্দে আগাগোড়া সংস্কৃত বা বাংলা শব্দের আকৃতি বর্ত্তমান—যেমন :—

বাঙ্গলা	সাঁওতালি
বাবা	বাবা বা আপু
মা	মায়ো, এঙ্গা
ভাই	দাদা বা ভাইয়া
দিদি	দাই

নীচে কতকগুলি শব্দের তালিকা দেওয়া গেল এগুলিতে বাংলা ও সংস্কৃতের যেরূপ প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়, উচ্চারণ করিলেই তা বুঝতে পারা যাবে।

সাঁওতালি	বাঙ্গলা	সংস্কৃত ধাতু বা শব্দ
সেন	যাওয়া	আস ধাতু
হিজু	এখানে এস	আগচ্ছ বা ইহা গচ্ছ
জম্‌	খাওয়া	ভুজ ধাতু
ডাল	প্রহার করা	দণ্ডধাতু
দুরুপ্‌	বসা	উপ-বিশ ধাতু
তিঙ্গু	দাঁড়ান	দণ্ড ধাতু
গুজু	মৃত্যু হওয়া	গতায়ু বা গত
এম্‌	দেওয়া	দা—মি
চেতন	উঁচু	উচ্চতম
থেঁরে	নিকটে	স্থা ধাতু,
ওকোএ	কে ও	কঃ অয়ং
চেৎ কো	কি ?	কিম্‌ ? চিৎ ?
চাহ্‌, চেদা	কেন	চিৎ কং ?
আদো, আর	এবং, আর	এবং
মেনখান	কিন্তু	কিন্তু
ইদু	যদি	যদি
হঁ, হো	হাঁ	
আড বাং	না	মা
এহে ওহো	আহা !	
উগুন	উঁচু	উচ্চ
ক্রিং	কেনা	ক্রী ধাতু।

আরও উদ্ধার করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতে আরও আলোচনা করা যাবে। তবে একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মধ্যে যাঁরা সংস্কৃত ও প্রাদেশিকে ভাষায় অনভিজ্ঞ—প্রধানতঃ তাঁরাই সাঁওতালি ভাষার অভিধান সঙ্কলন করেছেন। ইংরাজী হরফে তা ছাপা হয়েছে। বাংলা সরল সাঁওতালি শিক্ষা যা দেখা যায় তার মূলও ইংরেজী। সাঁওতালি ভাষার কোন অক্ষর নাই। মিশনারীগণ সাঁওতালি একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ভাষা মনে করে, সাঁওতালি শব্দের রূপ এমন পরিবর্ত্তন করেছেন যে তা দেখলেই নূতন শিক্ষার্থী ভীত হবেন। আমাদের মধ্যে যাঁরা, সংস্কৃত ও প্রাদেশিক ভাষায় অভিজ্ঞ, সাঁওতালি ও অন্যান্য কোলারিয় ভাষার আলোচনা করলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাবেন। *

* জেমসেদপুর সাহিত্য সভার সাধারণ অধিবেশনে পঠিত।

বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের প্রভাব

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার এম-এ

এক দিন এক শেঠজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বাবুজি বাঙ্গলা দেশে মাড়োয়াড়ীদের আসার ইতিহাস জানেন?" তাঁহার বলা ইতিহাসটী একটু নূতন রকমের। তিনি বলিলেন,—এক দিন তাঁহার দেশ হইতে লোটা-কম্বল লইয়া একজন তীর্থ করিতে কালীঘাটে আসেন। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহরে তৃষ্ণায় কাতর হইয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে জল পান করিতে যাইয়া তিনি ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে চাকর ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন, গৃহস্থ নিদ্রিত। আরও ২।১ বাড়ী ঘুরিয়াও দেখিতে পাইলেন, পরিবারস্থ সকলেই নিদ্রিত। কেবল ২।১টী দাস দাসী ও বালক বালিকা জাগিয়া আছে। তীর্থ দর্শনের পুণ্যস্বরূপ মাড়োয়াড়ী বণিকের মনে হইল, ভগবান তাঁহাকে পিপাসার দ্বারা সুযোগ জোগাইয়া দিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে দেশে চিঠি লিখিলেন—"বন্ধুবান্ধবকে বলিও, আমি এক অদ্ভুত দেশে আসিয়াছি। এ দেশে সবাই দিবসে নিদ্রা যায় ও বোধ হয় রাত্রি জাগিয়া কাটায়। কাজেই, সহজে ধনবান হইতে হইলে, এ দেশের মত সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।" এই পত্র পাইয়া দলে দলে সেই দেশ হইতে তাঁহারা আগমন করিলেন; এবং কিছুদিনের মধ্যেই ধনী হইয়া পড়িলেন। শেঠজীর গল্প শুনিয়া মাড়োয়ারী বণিকের—মধ্যাহ্ন-বিশ্রামকে নিদ্রা মনে করা একটা চূড়ান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার প্রমাণ স্বরূপ মনে করিয়া বেশ একটু আনন্দ লাভ করিতেছি; কিন্তু পরক্ষণেই এই গল্পের সত্যটা অনুভব করিয়া লজ্জিত না হইয়া পারিলাম না।

আমরা আজকাল কথায় কথায় উপদেশ দিয়া থাকি—"চাকুরি চাকুরি করিয়া ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়াই ত আমাদের বাঙ্গালী জাতি ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। ব্যবসা কর—দেখিবে "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী"। আর ব্যবসার কথা উঠিতেই—মূলধন চাই। মূলধন না হইলে ব্যবসা করা যায় কিরূপে? সুতরাং মূলধনের জন্য ডেপুটী, মুন্সেফ, অন্ততঃ ষ্টেসন মাষ্টার আত্মীয় স্বজনকে পত্র লিখা, কিংবা handbill ছাপাইয়া ২।১টী Charles Dygambar অথবা সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড্ দাঁড় করান ছাড়া আর কি উপায় থাকিতে পারে? তার পর কিছু না হইলেই বলা যাইবে—আরে ভাই, আগে চাই মূলধন। ধনই মূল। তাহা না হইলে হইবে কেন? আমাদের দেশে মূলধনই নাই—ব্যবসা হইবে কোথা হইতে? এ দেশের ঐ ত অভাব।

কিন্তু এই মূলধনও যে টাকা ছাড়া তৈয়ারী হইতে পারে, সে দিকে আমাদের লক্ষ্য খুব কম। টাকা না হইলেও, যদি লক্ষ টাকার মাল পাওয়া যায়, কিংবা একখানি কাগজের পৃষ্ঠে স্বাক্ষরের বলেই ক্রয়-বিক্রয় চলিতে পারে, তাহা হইলে এই রৌপ্যের টাকা কিংবা কাগজের নোটের প্রয়োজন কি আছে, তাহা আমরা ভাবিতে যাই না। আর ঐ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীর সহিযুক্ত নোট কাগজখানির মূল্য ই বা কোথ

হইতে আসে, তাহার বিচারও আমরা কমই করিয়া থাকি। এই কথার উপর ক্রয়-বিক্রয়, কিংবা মাত্র স্বাক্ষরের উপর লক্ষ টাকার কারবার—ইহার পশ্চাতে যে শক্তিটুকু থাকে, বাস্তবিক পক্ষে তাহাই ব্যবসায়ীর মূলধন। ইহার প্রসারণ ও সঙ্কোচনের উপরই ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে। ইংরাজীতে ইহাকেই বলে Credit। ইহা মাত্র রৌপ্য-নির্মিত টাকা ও সোণার মোহরের উপর নির্ভর করে না। ইহার অস্তিত্বের উপরই বরং টাকা, মোহর, নোট নির্ভর করে।

ইংরাজীতে ব্যাঙ্কগুলিকে "manufactory of credit and a machine of exchange" বলা হইয়াছে। ব্যাঙ্কেই credit তৈয়ারী ও আদান প্রদান হইয়া থাকে। আর এই creditএর উপরই যখন সমস্ত নির্ভর করিতেছে, তখন Bank না হইলে কোনও দেশের কিংবা জাতির উন্নতি হইতে পারে না। আমরা এই ব্যবসা ক্ষেত্রে কতদূর উন্নত, আমাদের দেশে দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের অভাবই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। বাঙ্গালীর দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত "বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক" প্রায় ২০ বৎসরে পড়িয়াছে। কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অক্লান্ত পরিচর্য্যা সত্ত্বেও দেশজাত ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আজও তাহা পশ্চিমপ্রদেশীয় অনুষ্ঠান-গুলির সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে নাই।

যাহাদের টাকা নাই—টাকা খাটাইবার জন্ম মাথা-ব্যথাও তাহাদের নাই; কিন্তু দেশে অনেক লোক আছে, যাহারা তাহাদের টাকা লইয়া কি যে করিবে, তাহাই ঠিক করিতে পারে না। অনেকেই জানেন—অনেক ধনী ব্যক্তির ২।১ জন করিয়া অর্থবিৎ কর্ম্মচারী থাকে। তাহাদের কাজ—কেমন করিয়া ধনী ব্যক্তির উদ্বৃত্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। সুপ্রসিদ্ধ দ্বারভাঙ্গার মহারাজার এই প্রকার ২।১ জন উচ্চ-বেতন-ভোগী কর্ম্মচারী আছেন। এই এক শ্রেণীর লোক—যাঁহাদের টাকা এত বেশী যে, তাঁহারা ঠিক করিতে পারেন না—কি প্রকারে ঐ টাকার সু-নিয়োগ হয়। আবার আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের টাকা খুব কম, এবং এই স্বল্পতা বশতঃ তাঁহাদের বিপদ-আপদের জন্ম কিছু কিছু সঞ্চয় করা আবশ্যক। এই শ্রেণীর লোকের পরিচয় বাঙ্গালা দেশে দিবার কোন প্রয়োজন নাই; কিন্তু এই শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তিগণের সঞ্চয়ের সমষ্টি বড় কম নয়। এই দুই শ্রেণী ছাড়া আরও এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কোনও-না-কোনও প্রকার অক্ষমতা হেতু, তাহাদের অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে অসমর্থ। নাবালক, স্ত্রীলোক, ডাক্তার, উকীল এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্ম্মচারিগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীর লোকের পরিচয়ও বাঙ্গলা দেশে দিবার প্রয়োজন হয় না।

একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—এই তিন শ্রেণীর লোকের উদ্বৃত্ত টাকা যদি একত্র করা যায়, তাহা হইলে সে কত হইতে পারে। এই টাকার উপযুক্ত ব্যবহার দ্বারা দেশের শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ে কত উন্নতি হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই সমস্ত টাকা একত্রীকরণ ও দেশের লাভজনক কাজে নিয়োগ করা ব্যাঙ্কের কাজ। ভারতবর্ষে ব্যাঙ্কের সংখ্যা লোক-সংখ্যার অনুপাতে খুবই কম। আমেরিকার ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৮০০০, ইংলণ্ডে ৯৩০০, জাপানে ৫৮০০, আর আমাদের ভারতবর্ষে মাত্র ৩৭০। প্রতি দশ লক্ষ ব্যক্তির জন্ম গড়ে আমেরিকায় ২৪০টী, ইংলণ্ডে ২১৭টী, জাপানে ১০টী আর আমাদের ভারতবর্ষে মাত্র ১টী ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু এই ৩৭০টী ব্যাঙ্কেও প্রায় ২০০ কোটী টাকা জমা আছে। উপযুক্তভাবে চালিত হইলে এই ২০০ কোটী টাকার ব্যবহার দ্বারা দেশের ব্যবসা প্রভৃতির কত না উন্নতি সাধিত হইতে পারে!

ভারতবর্ষে Bankএর সংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতিকল্পে গবর্ণমেণ্ট শীঘ্রই একটী কমিটী নিযুক্ত করিবেন। বর্ত্তমান দেশীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ২।১টীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

ভারতবর্ষীয় ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে Imperial Bank of India সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ১৯২১ সালে Bank of Bengal, Bank of Bombay ও Bank of Madras তিনটী ব্যাঙ্ক একত্র সংযুক্ত হইয়া Imperial Bank নাম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা সরকার বাহাদুরের খাজাঞ্চি; ও কাজেকাজেই সরকারী টাকা আপনার প্রয়োজন মত ব্যবহার করিয়া থাকে। এই ব্যাঙ্কের ১৬০টী শাখা আছে; কিন্তু বাহুবল ও অর্থবল বেশী হইলেও, ইহার অধিকাংশ উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ইংরেজ; সুতরাং দেশীয় ব্যবসার উন্নতিকল্পে সাহায্য ইহা হইতে আশানুরূপ পাওয়া যায় না। সরকারী সংস্রব থাকাতে ইহা সরকারী আদব-কায়দার অনেকটা প্রশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। Sir R. N. Mukherje, রাজা শ্রীযুত হৃষীকেশ লাহা, স্যর দিনসা ওয়াচা প্রভৃতি কয়েকজন দেশীয় লোক Board of Governorsএর মেম্বর আছেন; তবে অধিকাংশই সরকারী কর্ম্মচারী কিংবা সরকার দ্বারা মনোনীত। এই ব্যাঙ্কে আমানতী টাকার পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটী।

ইহার পরই সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীদের দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ 'সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্' (Central Bank of India Ltd.)। ১৯১১ সালে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া প্রাতঃস্মরণীয় স্যর ফিরোজশাহ মেটার নেতৃত্বে ও সোরাবজী পোচখানাওয়ালার যত্নে এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। ১৯২৩ সালে Tata Industrial Bank ইহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষব্যাপী ইহার ২১টী শাখা আছে। ইহার বর্ত্তমান মূলধন ১৬৮০০০০০ টাকা। রিজার্ভ ১ কোটী ও আজকাল ইহার ডিপোজিট প্রায় ১৮ কোটি টাকা। স্থিতির মধ্যে গবর্ণমেণ্টের কাগজে ও নগদ টাকার প্রায় ১২ কোটি আছে। এই অনুষ্ঠানের বিশেষত্ব এই যে, এত বড় একটী বিরাট কারবার কেবল মাত্র ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। ব্যাঙ্কের ১০০০ জন কর্ম্মচারী সকলেই দেশীয়—পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, মহারাষ্ট্রীয়, বাঙ্গালী, পারসিক, ভাটিয়া ও হিন্দুস্থানী সমস্ত জাতীয় লোকই আছে। বর্ত্তমান ডিরেক্টারগণের সভাপতি প্রসিদ্ধ সর ফিরোজ শেটনা। ইহার প্রাণ-স্বরূপ সোরাবজী পোচখানাওয়ালার জীবনের ইতিহাস অতি আশ্চর্য্য।

তিনি সামান্য কেরাণীরূপে ২০৲ টাকা মাহিয়ানায় চাকুরী আরম্ভ করেন। পরে কালক্রমে Bank of India'র অপেক্ষাকৃত বেশী বেতনে কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন। একবার একটী officeএর কর্ম্মখালি হইলে তিনি উহার প্রার্থী হন; কিন্তু কেবল মাত্র ইয়োরোপীয়গণই ঐ পদের উপযুক্ত বিবেচিত হওয়াতে তিনি উহা পাইলেন না। ঐ অপবাদে মর্ম্মাহত হইয়া তিনি স্যর ফিরোজশাহার সাহায্যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত করেন। এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ভারতবর্ষে গৌরবময় মহানুষ্ঠান ও ভারতবাসীর অক্ষমতা সম্বন্ধে মিথ্যা অপবাদের প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

তার পর Bank of India। ১৯০৬ খৃষ্টঃ অঃ বোম্বাই নগরে ইহা স্থাপিত হয়। ইহার বর্ত্তমান ডিরেক্টরগণের সভাপতি Sir Sasoon David। ইহার ২টী শাখা আছে—কলিকাতা ও আমেদাবাদ। ইহার মূলধন ১ কোটী টাকা। রিজার্ভ ৭৮ লক্ষ ও ডিপোজিট ১০ কোটী। এই ব্যাঙ্ক অন্যান্য কাজের সহিত Executor ও Trusteeর কাজ করিয়া থাকে। উইল করিয়া Bankএ কোন কাজ করিবার জন্য ভারার্পণ করা হইলে, এই ব্যাঙ্ক একটী নির্দ্দিষ্ট হারে কমিশন লইয়া উইলের সর্ত্ত অনুযায়ী উইলকারীর সম্পত্তির বিলি-বন্দোবস্ত করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অন্য কোনও Bank এরূপ করে না। এই ব্যাঙ্কটীর অধিকাংশ উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ইয়োরোপীয়।

১৯০৭ সালের মার্চ্চ মাসে মান্দ্রাজে একটী ব্যাঙ্কের স্থাপনা হয়—তাহার নাম India Bank Ld. সুপ্রসিদ্ধ Gillandersদের কারবার ফেল হওয়ার পর কৃষ্ণস্বামী আয়ার দেওয়ান বাহাদুর আদিনারায়ণ আয়ার ও রামস্বামী চেটিয়ারের চেষ্টায় ১২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক খোলা হয়। ইহার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিত্তাসাগর পাণ্ডে। পাণ্ডে মহাশয় একজন অক্লান্তকর্ম্মা দেশসেবক। মান্দ্রাজে সমুদ্রতীরে এই ব্যাঙ্কের প্রধান আফিস। এই বাড়ীটি ব্যাঙ্কের নিজস্ব। আজকাল এই ব্যাঙ্কের ডিপোজিট ১ কোটি; ইহাও সম্পূর্ণভাবে দেশীয় লোক দ্বারা পরিচালিত।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক ১৮৬৫ সালে স্থাপিত। ইহার শাখার সংখ্যা ৩৫ ও বর্ত্তমান ডিপোজিট প্রায় ৭ কোটি টাকা। ইহার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী প্রায়ই ইংরেজ; তবে কয়েকজন দেশীয় ব্যক্তিও আছেন। কয়েক বৎসর হইল ইংলণ্ডের P. and O. Banking Corporationএর সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া ইহার কিছু ভাবান্তর ঘটিয়াছে। ইহার মূলধন ৩৫৷৹ লক্ষ; রিজার্ভও ৪৫৷৹ লক্ষ।

উপরিউক্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে বাঙ্গালীর নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু আর একটী পুরাতন নামজাদা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতৃগণের নামধাম অনুসন্ধান করিতে করিতে একজন বাঙ্গালীর নাম দেখিয়া স্বভাবতঃ আনন্দলাভ করিলাম। এই ব্যাঙ্কের নাম পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। এই ব্যাঙ্কটী ১৮৯৫ খৃঃ লাহোরে শ্রীযুক্ত হরকিষণ লাল, সরদার দয়াল সিংহ, বকসী জয়সিরাম ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন রায়ের প্রযত্নে স্থাপিত হয়। ইহার বর্ত্তমান শাখাগুলির সংখ্যা ৪৪ ও ডিপোজিট ৭॥ কোটী টাকা। এই ব্যাঙ্কেও সেণ্ট্রাল ও ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ন্যায় সমস্ত কর্ম্মচারী ভারতবাসী। তবে প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে একজন বাঙ্গালী থাকিলেও, আজকাল উচ্চপদে কোন বাঙ্গালী আছেন কি না সন্দেহ।

এই সমস্ত ব্যাঙ্ক ছাড়া আরও কয়েকটী দেশীয় ব্যাঙ্ক আছে; কিন্তু সকলেরই মূলধন ১০ লক্ষের কম ও ডিপোজিটও পূর্ব্বোক্ত ব্যাঙ্কগুলির অনুরূপ নহে। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে National, Mercantile, Chartered, Hongkong Shanghai, Lloyds, P. and O. International, Eastern ও Yokohama Specie ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাতে দেশীয় ব্যক্তিগণের কেরাণী কিংবা খাজাঞ্চির অপেক্ষা উচ্চপদ নাই। একটী ব্যাঙ্কে আবার এমন নিয়ম আছে যে, কোনও ইয়োরোপীয় কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর না থাকিলে কোন রসিদ কিংবা পত্র গ্রাহ্য করা হইবে না।

বাহাই ধর্ম্ম

আবুল ফজল

বাহাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কিছু লিখিত হয় নাই—কিছু হইয়া থাকিলেও তাহা এতই সামান্য যে তাহা হইতে কোন বাঙ্গালীর পক্ষে পৃথিবীর এই নূতনতম ধর্ম্মটী সম্বন্ধে একটী মোটামুটী ধারণা করাও অসম্ভব। ধর্ম্মমতের সূতিকাগার (১) প্রাচ্যের বুকে এই নব ধর্ম্মের জন্ম হইলেও পাশ্চাত্য দেশেই এর বেশী আলোচনা হইয়াছে, এবং পাশ্চাত্য দেশবাসীই এসিয়ার এই ধর্ম্মশিশুটীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে আমরা প্রাচী এবং প্রতীচির মনোবৃত্তির একটা পরিচয় পাই। প্রতীচি পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর জ্ঞান-ভাণ্ডার লুণ্ঠনেও চিরতৎপর। তার চিরচেতন সজাগ আত্মা—পৃথিবীর কোন্ ক্ষুদ্র কোণে কোন্ ক্ষুদ্র ঘটনাটীর অভিনয় হইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিতেও চির-উন্মুখ; এবং তাহার রসধারা নিজের সাহিত্যে প্রবাহিত করিয়া নিজের জাতীয় জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে চির-উৎসাহশীল। আর প্রাচী এখনও জ্ঞান-সমুদ্রের বেলাভূমিতে;—মাথা ঘরিয়ায় কি অপূর্ব্ব অশ্রুত তরঙ্গ-ভঙ্গের সৃষ্টি হইতেছে, সে খবর তাহার কাণে আসিয়া পঁহুছে না। Plato বলিয়াছেন "Man differs from animals in aiming at some goal. মানুষের জীবনের এক বিরাট লক্ষ্য আছে। মানব-জীবন সাগরের বুদ্‌বুদ নয়; অথচ আমাদের কমলাকান্তের বর্ণিত গাছের ফলও নয় যে, শুধু পাকিয়া ঝরিয়া পড়িয়াই তার সমাপ্তি। শুধু খাইয়া, পরিয়া, নিদ্রা যাইয়া আর সন্তান উৎপাদন করিয়াই জীবন কাটানো যদি মানব-জীবনের পরিণতি হইত, তাহা

১। The world's creeds were born in Asia.

F.— H. Strine

হইলে মানুষের জীবনে আর অন্যান্য প্রাণীদের জীবনে কোন পার্থক্য থাকিত না। অনন্ত কাল হইতে মানব-জীবন এক মহা লক্ষ্যের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। সৃষ্টির আদি হইতে যুগের পর যুগ ধরিয়া মানুষের জ্ঞানের অভিযান চলিয়াছে—আরও অনন্ত কাল পর্য্যন্ত চলিবে।

পৃথিবীর অতি শৈশবকাল হইতে মানব-জাতির ইতিহাসে একটী জিনিস অপরিবর্ত্তিত ভাবে দেখা যায়। সেইটী এই—মানুষ সকল অবস্থায়, তার সমস্ত সুখ-দুঃখের মধ্যে একটী অদৃশ্য শক্তিকে মানিয়া চলিয়াছে। সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনায়ও সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ এখনও নির্ণীত হয় নাই। তথাপি সেই শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে মানুষের বাধে নাই। কোন ধর্ম্ম মানে না—পৃথিবীতে এমন মানুষের অভাব নাই; কিন্তু এই অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে না, এমন মানুষ আছে কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। একজন ইয়োরোপীয় লেখক লিখিয়াছেন:—"A man may have no religion, but he always has a god." (২) এই অদৃশ্য শক্তিকে যুগে যুগে মানুষ দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছে; এবং বিভিন্ন রকমে এই অদৃশ্য শক্তির পায়ে মাথা নত করিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্ম কি? এই অদৃশ্য শক্তির পায়ে মাথা নত করাই কি আবহমান কাল হইতে পৃথিবীর প্রচলিত ধর্ম্ম নয়?

"Belief in the existence of supernatural power, and a sense of dependence thereon." এই ত মানুষের আসল ধর্ম্ম। শুধু শিক্ষিত লোকেরা এই অদৃশ্য শক্তির কাছে মাথা নত করে নাই—অশিক্ষিত পাহাড়ী যাহাদিগকে সভ্য ভাষায় বর্ব্বরও বলা হয়—এই অদৃশ্য শক্তিকে মানিয়া চলিয়াছে। আগেই বলিয়াছি, স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে এই অদৃশ্য শক্তির পরিকল্পনায়ও বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। শিক্ষিত লোকেরা যেখানে এক নিরাকার ভগবানের পরিকল্পনা করিয়াছেন, সেখানে অশিক্ষিত লোকেরা হয় ত কোন শক্তিধর পশু বা কোন প্রাচীন বৃক্ষ বিশেষের মধ্যে এই অদৃশ্য শক্তির কল্পনা করিয়া তাহাকে পূজা-নিবেদন করিয়া আসিয়াছে। এই যে অনন্ত সুষমার আধার সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী প্রকৃতি—ইহাকে ছাড়াইয়া তাহাদের চিন্তা হয় ত আর ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই। এর মধ্যে তাহারা সেই রহস্যময় অদৃশ্য শক্তির বিচিত্র লীলা খেলা দেখিয়াছে। তাই সে এই প্রকৃতির পূজা করিয়াই নিজের চিত্তক্ষুধা মিটাইতেছে। উপাসনা মানুষের প্রাণের আহার। উপাসনা ছাড়া মানুষ বাঁচিতে পারে না—মানুষের আত্মা তৃপ্ত হইতে পারে না,—সে যে প্রকারের উপাসনাই হউক। যাহাদের চিন্তা আরও কিছু ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে—তাহারা নিজেদের কল্পনানুযায়ী সেই অদৃশ্য শক্তির একটী মূর্ত্তি গড়িয়া তাহারি পায়ে মস্তক নত করিয়া আসিয়াছে। আর কেহ বা কোন বাহ্যিক মূর্ত্তি না গড়িয়া সেই কাল্পনিক অদৃশ্য শক্তির উদ্দেশে নিবেদন করিয়া আসিয়াছে। প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছানুরূপ ভগবানের কল্পনা করেন। Every one makes his God after his own image. প্রাচীন জগতের কোন পয়গম্বর বা সাধু শ্রেণীর লোক মেষ চরাইতে চরাইতে বলিয়াছিলেন, 'যদি ভগবানের একটী মেষ থাকিত, আমি তাহা চরাইতাম'। কি সুন্দর, সহজ, সরল ভক্তি!

সৃষ্টির আদি হইতে যুগে যুগে মানুষ সেই অদৃশ্য শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতে এবং তাহার মনস্তুষ্টির বিচিত্র বিধি-বিধান নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। তাই এত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সৃষ্টি। তাই প্রাচীন কালের Animism হইতে আরম্ভ করিয়া Totemism Polytheism, Dualism, Pantheism, Aerthetism, Agnosticism, Parasitism, Mysticism ইত্যাদি হইতে আজিকার Bahaism পর্য্যন্ত এত ismএর সৃষ্টি। এই যে অনন্ত কাল হইতে সুদূর অনন্ত কাল পর্য্যন্ত মানুষের জ্ঞানের অভিযান চলিয়াছে—সাধনার জয়-যাত্রা সুরু হইয়াছে, তার পশ্চাতে কি কোন আদর্শ, কোন বৃহৎ লক্ষ্য নাই?—মানুষ চায় পৃথিবী আরও উন্নত হউক, মানব জাতি আরও সুখী হউক—কোন্দল-কলহের পরিবর্ত্তে মানুষ মানুষের ভাই হউক। বিশ্ব রহস্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিয়া মানুষ এই বিরাট তথ্যের সমাধান করিতে চায়। কিন্তু এই প্রবীণ পৃথিবীর এত ism প্রসবের পরেও আমাদিগকে Mrs. Stannardএর মত জিজ্ঞাসা করিতে হয় 'Has humanity advanced?' মানুষ কি সুখী হইয়াছে? মানবজীবন কি আশানুরূপ উন্নত হইয়াছে? মানুষ কি মানুষের ভাই হইতে পারিয়াছে? এখনও ত কোন কোন মানুষের জীবন দেখিলে তাহাকে পশু হইতে শ্রেষ্ঠ ভাবিতে সঙ্কোচ হয়!

"Man is not man because he has a body: he is man in that he possesses a soul. Its perishable clothing assimilates him to the animals: the soul distinguishes him from them." (৩)

বাহাইরা বলিতেছেন মানবাত্মার উন্নতি হয় নাই, মানুষে মানুষে মিলন হয় নাই; মানব-জাতির কল্যাণ হয় নাই। জাতিতে জাতিতে কোন্দল, ধর্ম্মে ধর্ম্মে হানাহানি, দেশে দেশে রেষারেষি, মানুষে মানুষে মারামারি—এই ত পৃথিবীর নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাই মানব-জাতির কল্যাণের জন্য আরও উন্নত ধরণের উদার ব্যাপক ধর্ম্ম মত সৃষ্টির কি দরকার হয় নাই? 'প্রত্যেক মানুষ ভাই ভাই' এই বিশ্ব-মানবতা প্রচারে কি সময় আসে নাই? পৃথিবীর এই ঘোর রেষারেষির সময়ে এই নব বাণী প্রচারের দরকার হইয়া পড়িয়াছিল, the time was ripe for a more effectual reformation and again light shone from the East.' (৪) তাই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে পারস্যের শীরাজ নগরে এই নব বাণী প্রচারের অগ্রদূত বাব বা বাহাই-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মির্জ্জা আলী মোহাম্মদের আবির্ভাব হয়। এই নব ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত আভাষ প্রদানই এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

(২) F. H. Strine.

(৩) Address by Abdul Baha in Paris, November 1911.

(৪) F. H. Strine.

এই নব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক সৈয়দ মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে শীরাজনগরের কোন দরিদ্র মুদীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, হজরত মোহাম্মদের মত ইনিও বাল্যকালে কোন বিদ্যাশিক্ষা পান নাই। তাই বাবিরা মুসলমানদিগকে বলিয়া থাকে—কোরাণ যদি হজরত মোহাম্মদের পয়গম্বরীর অন্যতম নিদর্শন হইয়া থাকে, তবে মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ লিখিত 'বয়ান' কেন তাঁহার পয়গম্বরীর নিদর্শন হইবে না? অথচ কোরাণের ভাষা হজরত মোহাম্মদের মাতৃভাষা; আর 'বয়ানের' ভাষা আরবী, যাহা মির্জ্জা আলী মোহাম্মদের মাতৃভাষা ত নহেই, বরং সেই ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগও তিনি কখনো পান নাই। ১৯ বৎসর বয়সে এই বালক বাব নাম ধারণ করিয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন বাব আরবী শব্দ—তাহার অর্থ দরওয়াজা। দরওয়াজা অর্থে তিনি এই মনে করিয়াছিলেন যে, তাহার মধ্য দিয়া মানুষ দ্বাদশ ইমাম বা ইমাম মেহদীর শিক্ষা পাইবেন। এইটি জানা কথা যে, পারস্যের মুসলমানেরা শিয়া মতাবলম্বী। এই শিয়া মতবাদের প্রভাবের উপরই 'বাব' ধর্ম্মের ভিত্তি। কাজেই বাব ধর্ম্মের গোড়ার কথা জানিতে হইলে, শিয়াদের মতামত সম্বন্ধে কিছু জানা দরকার। শিয়াদের মতে হজরত মোহাম্মদ তাঁহার মৃত্যুর সময় তদীয় জামাতা হজরত আলীকে খলিফা পদে মনোনীত করিয়া যান। (৫) অন্যায় পক্ষপাতের ফলে হজরত আবুবকর, ওমর, ওসমান ক্রমান্বয়ে খলিফা-পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। হজরত ওস্‌মানের মৃত্যুর পর যদিও হজরত আলী খলিফা-পদে বৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হন। এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে তৎপুত্র ইমাম হাসন হোসেনও অতি নির্দ্দয়রূপে নিহত হন। কারবালার মরুপ্রান্তরে কনিষ্ঠ ইমাম হোসেনের অপূর্ব্ব আত্মদান হইতে শিয়াদের, তথা সমগ্র মোসলেম-জগতের, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শোকোৎসব মহরমের সৃষ্টি। ইমাম হোসেনের বংশধর আরও নয়জন ইমাম ক্রমান্বয়ে জন্মিয়া, আব্বাসীয় খলিফাগণের দ্বারা নিহত হইয়াছেন বলিয়া শিয়াদের ধারণা। শিয়া মতবাদ পারস্যে অধিকতর জনপ্রিয় হইবার আরও একটী বিশেষ কারণ আছে। পারস্যবাসীদের বিশ্বাস 'আদেসিয়া' সমরে পারস্যের 'সাসানীয়' বংশের শেষ সম্রাট তৃতীয় ইজদজোরদের কন্যা বন্দি হইয়া আরবে প্রেরিত হয় এবং তৎসঙ্গে ইমাম হোসেনের বিবাহ হয়;—এই সমস্ত ইমামেরা এই কন্যারই বংশধর। ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ এবং পারস্যের রাজ-পরিবারের বংশধর বলিয়াই হয় ত ইমামেরা পারস্যে এত জনপ্রিয়। তাই শিয়াদের মত "Whosoever dies without recognizing the Imam of his time, dies the death of a pagan." সুন্নীদের মত, কেয়ামতের পূর্ব্বে ইমাম মেহদী আবির্ভূত হইয়া আবার ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিয়াদের মতে ইমাম হাসন হোসেনের বংশের দ্বাদশ ইমাম মেহদী। তিনি ৯৪০ খৃষ্টাব্দে লোকচক্ষু হইতে গা ঢাকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি আজিও বাঁচিয়া আছেন, এবং এক দিন আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন। তাই শিয়াগণ আজিও তাঁহার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া থাকে, আজ্জু-লাল্লাহু ফরজুহু (খোদা শীঘ্রই তাঁহার আবির্ভাব করুন)। শিয়াদের মতে ইমাম মেহদীর নিরুদ্দেশের পর ৬৯ বৎসর যাবৎ চারিজন মধ্যস্থ ব্যক্তির মধ্য দিয়া তিনি তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা শিয়াদের কাছে পাঠাইতেন। এই চারিজন প্রত্যেকেই "বাব" নামে পরিচিত ছিলেন। বাবিদের মতে মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ অন্যতম বাব ইমাম মেহদীর শিক্ষা প্রচারের জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এই বাবি-মতের মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে আমাদিগকে আরও একটু পিছাইয়া যাইতে হয়। ইঃতপূর্ব্বে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শেখ আহামদ আল্‌আহ্‌সায়ী (১৭৩৩—১৮২৬) নামক এক ব্যক্তি শেখ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। ইহাদেরও মত ছিল ইমাম মেহ্‌দী এবং তাঁর অনুসরণকারিগণের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের জন্য একজন মধ্যস্থ ছিল, যাহাকে তাহারা বাবের পরিবর্ত্তে "শিয়াইকামেল" (পূর্ণ শিয়া) বলিত। সেখ আহামদের মৃত্যুর পর সৈয়দ কাজেম নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। অমাদের মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ ও বাবি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেত্রী পারস্যের খ্যাতনামা মহিলা জাবি কুররতোল আইন্ (চক্ষুর শীতলতা) প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাবি নেতারা এই শেখ সম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। সৈয়দ যাজেমের মৃত্যুর পর উনবিংশবর্ষীয় নবীন যুবক মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ 'বাব' নাম ধারণ করিয়া ২৩ মে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সেই সম্প্রদায়ের নেতা হইয়া বসেন। কিন্তু সমস্ত শেখেরা তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু বলিয়া মানিয়া লয় নাই। যাহারা মানিয়া লয় নাই তাহারা শেখ নামে আজিও পারস্যে টিকিয়া আছে। আর যাহারা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল, তাহারা ভবিষ্যতে বাবি নামেই পরিচিত হইয়াছে। বাবিরা পৃথিবীর সমস্ত পয়গম্বর বা অবতারে বিশ্বাস করে; কিন্তু মুসলমানদের মত হজরত মোহাম্মদেই পয়গম্বরী খতম্ এই কথা বিশ্বাস করে না। তাহাদের মতে চিরকাল ধরিয়া যুগে যুগে পৃথিবীকে কল্যাণের বাণী শুনাইবার জন্য নব নব পয়গম্বর বা অবতারের সৃষ্টি হইবে। মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ এই যুগের একজন অবতার। পৃথিবীর সব ধর্ম্মকেই গোড়াতে অন্যান্য মতাবলম্বীগণের হাতে অত্যাচার উৎপীড়ন ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। এই নব ধর্ম্মের ইতিহাসও তাহা হইতে মুক্ত নহে—পারস্যের ওলামা সম্প্রদায় ও তাঁদের প্ররোচনায় পারস্য সরকারের আদেশে শত শত বাবিকে শৃগাল কুকুরের মত প্রকাশ্য রাজপথে বড়ই নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করা হইয়াছে। মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ অর্থাৎ 'বাব' তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম বৎসর মক্কা পরিদর্শনে গিয়াছিলেন। তথা হইতে ফিরিবার সময় 'বুশয়র' নগরের লোকেরা তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া নব উদ্যমে তিনি ধর্ম্মপ্রচারে লাগিয়া পড়েন এবং শীরাজনগরে পঁহুছিয়া ঘোষণা করেন—হজরত মোহাম্মদের 'মিশন্' শেষ হইয়াছে এবং তিনি নব মত সৃষ্টির জন্যে প্রেরিত হইয়াছেন। ইহাতে শীরাজবাসীরা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তঁহার গৃহ আক্রমণ

(৫) এই সমস্ত তারিখ লইয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিকের মধ্যে মতানৈক্য আছে। আমি প্রচলিত মতই গ্রহণ করিয়াছি।

করিয়া অতি নির্দ্দয় প্রহারের পরে তাঁহাকে বন্দী করে। ১৮৪৫ এর সেপ্টেম্বর হইতে ১৮৪৬ এর মার্চ্চ পর্য্যন্ত তিনি শীরাজনগরে বন্দী ছিলেন। তথা হইতে কোন প্রকারে পলাইয়া ইস্পাহানে যান। সেখানে আবার ধৃত হইয়া মাকুতে (Maku) প্রেরিত হন। তথা হইতে আবার চিহরিক্ (Chihrik) নগরে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হয়। অত্যাচার উৎপীড়ন যতই বাড়িতে লাগিল, তাহাতে সুবিধা এই হইল যে, ধীরে ধীরে বাবিমত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ইহা পারস্য সরকারের সহ্য হইল না। তাই এই নব ধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটনের জন্য, তাহার প্রবর্ত্তক মির্জ্জা আলী মোহাম্মদকে তাহারা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ্য রাজপথে গুলি করিয়া হত্যা করিল। কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইল না। বাবের মৃত্যুর সময় তিনি মির্জ্জা এহিয়া নামক একটী উনবিংশবর্ষীয় যুবককে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়া যান। এই যুবক পরে 'সুবেহ্-এজেল্' নামে পরিচিত হন। তিনি বালক বলিয়া তাঁর পরিবর্ত্তে তাঁর বৈমাত্রেয় বড় ভাই মির্জ্জা হোসেন আলী—যিনি পরে বাহাউল্লাহ নামে পরিচিত হন—সমস্ত সম্প্রদায়কে পরিচালন করিতেন। ১৮৫২ খৃঃ কয়েকজন বাবি পারস্যের তদানীন্তন সম্রাট নাসিরউদ্দীন শাহকে (৬) হত্যা করিবার চেষ্টা করে। এই হইতে বাবিদের উপর অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়িয়া যায়। এই সময় মহিলা বাবি 'কুররতোল আইন' সহ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাবিদিগকে হত্যা করা হয়। পারস্যের প্রত্যেক সম্প্রদায় এই হত্যা-যজ্ঞে যোগ দিয়াছিল। এই সময় কোন প্রকারে সুবেহ্ এজেল ও বাহাউল্লাহ বাগদাদে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ১৮৫৩ হইতে ১৮৬৪ খৃঃ পর্য্যন্ত বাগদাদ বাবি সম্প্রদায়ের কেন্দ্রভূমি ছিল। এখানে ১৮৬৪ খৃঃ সুবেহ্ এজেল এবং বাহাউল্লার মধ্যে মতবিরোধ জাগিয়া উঠে। 'বাব' অর্থাৎ মির্জ্জা আলী মোহাম্মদ শেষ বয়সে ঘোষণা করিয়াছিলেন—তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহা হইতেও শ্রেষ্ঠ এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, যাঁহার অগ্রদূত মাত্র তিনি। এখন মির্জ্জা হোসেন আলী অর্থাৎ বাহাউল্লাহ 'বাব' কথিত সেই মহাপুরুষ বলিয়া দাবী করিয়া বসিলেন। আগেই বলা হইয়াছে—সুবেহ্ এজেলের অল্পবয়স্কতার জন্য বাহাউল্লাহ সমস্ত সম্প্রদায়ের পরিচালনা করিতেন। কাজেই সমস্ত সম্প্রদায় তাঁহারই প্রভাবাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং তাঁহার এই নূতন দাবীকেও অধিকাংশ শির মাথা পাতিয়া লইল। সুবেহ্ এজেলের নেতৃত্বে যাহারা টিকিয়া রহিল, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য ছিল। এই দুই দলের মত-বিরোধ ক্রমে বিবাদে পরিণত হয়। তখনও বাগদাদ তুরস্কের অধীন ছিল। Mandatoryর নামে এই নাবালক দেশটীর উপর মুরুব্বিয়ানা করিবার খেয়াল তখনও ফরাসী কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। তুরস্ক গভর্ণমেণ্ট একই সম্প্রদায়ের এই বিবদমান শাখা দুইটীকে বাগদাদ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। প্রথমে ইহারা তুরস্কের রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপলে নীত হয়। পরে সেখান হইতে তাহাদিগকে আড্রিয়ানোপলে নির্ব্বাসিত করা হয়। এখানেই বাহাউল্লাহ সুবেহ্ এজেলের সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া ১৮৬৬ খৃঃ নিজেকে বাব-কথিত অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। এখন হইতে উভয় মতাবলম্বীদের মধ্যে বিবাদ ঘোরতর হইয়া উঠে। ইহাতে তুরস্ক সরকার বিরক্ত হইয়া এজেলীদিগকে সাইপ্রাসে এবং বাহাইদিগকে সিরিয়ার একা (Acre) নগরীতে নির্ব্বাসিত করেন। বলা বাহুল্য, সুবেহ্ এজেলের অনুসরণকারীগণকে আজলী এবং বাহাউল্লার অনুসরণকারীগণকে বাহাই বলা হয়। আজলীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল, এমন কি তাদের সংখ্যা ৩০এর অধিক ছিল না। কিন্তু বাহাইদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং দেখিতে দেখিতে একা নগরী এখন বাহাই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত বাবি সম্প্রদায় এই হইতে বাহাই নামে অভিহিত হইতে লাগিল। আজলীদিগকে no changers বলিলে ঠিক বলা হয়। ইহারা বাব-প্রচারিত রীতি নীতির বাহিরে পা দিতে অনিচ্ছুক আর বাহাইরা ছিল পরিবর্ত্তনপন্থী। বাহাউল্লাহ বাব-প্রচারিত মতামতের উপর নিজের সাধনালব্ধ অনেক স্বাধীন চিন্তা যোজনা করিয়া বাহাই ধর্ম্মকে আরও উদার ও ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছেন।

বাবি এবং পারস্যের সরকারের মধ্যে যখন ঘোর কোন্দল চলিতেছিল—অসংখ্য বাবির রক্তদানেও যখন পারস্য সরকারের জিঘাংসা-বৃত্তি চরিতার্থ হইল না, তখন বাহাউল্লাহ নিজের শিষ্যদের মধ্যে অহিংসা মন্ত্র প্রচার করেন। তিনি বলিলেন 'সত্য এবং ধর্ম্ম প্রচারের জন্যে মারামারি করা, কিছুতেই উচিত নয়—বিশ্বাসীদের আত্মদানের উপর সত্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়িবে। অন্যের রক্তপাতের পরিবর্ত্তে নিজের রক্ত দানই শ্রেয়। এই হইতে বাহাইরা আর সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাধা দেয় নাই; বরং দলে দলে অম্লান বদনে ধর্ম্মের জন্য আত্মদান করিয়াছে। এই নির্ব্বিকার নিঃস্বার্থ আত্মদান বাহাই ধর্ম্মের প্রতি মানুষকে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইসলামের শৈশব জীবন যেমন তাহার অনুরক্ত ভক্তগণের নিঃস্বার্থ আত্মদানের ঔজ্জ্বল্যে উজ্জল ও মহিমান হইয়া রহিয়াছে—এই নব ধর্ম্মের শৈশব জীবনও সেই একই অনুভূতির গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া আছে। ইহারা অসহিষ্ণু অত্যাচারীর হাতে অম্লান বদনে নিজের শেষ রক্তবিন্দুটী পর্য্যন্ত দান করিয়াছে; তথাপি নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করে নাই। ইহারা নিজের ধর্ম্মগুরুকে এত বেশী ভক্তি করিত যে, তাঁহার জন্য যে কোন মুহূর্ত্তে, এমন কি অতি অবিবেচনার সহিতও প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকিত। যখন আজলীদিগকে সাইপ্রাসে এবং বাহাইদিগকে একাতে নির্ব্বাসিত করা হয়, তখন তুরস্ক সরকার একজন বাহাইকে আজলীদের সঙ্গে তাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণের জন্য সাইপ্রাসে যাইতে বলেন। ইহাতে সে নিজের ধর্ম্মগুরুর সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় নিজের গলায় ছুরি বসাইয়া দিয়া এই আদেশের প্রতিবাদ করে; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই আদেশ প্রত্যাহৃত হয় নাই ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষতস্থানে

(৬) ১৮৯৬ খৃঃ ১লা মে মির্জ্জা মহম্মদ রেজা নামক এক ব্যক্তি ইঁহাকে হত্যা করেন। Persian Revolution by E. G. B.

ঔষধ প্রয়োগ বা ব্যাণ্ডেজ করিতে দেয় নাই। একবার এক বৃদ্ধ শেখ অনেকগুলি চিঠি সহ সরকারের হস্তে বন্দী হন। চিঠিগুলি বিভিন্ন বাহাই কর্তৃক তাঁদের নেতার উদ্দেশে লেখা। চিঠিগুলি ধরা পড়িলে লেখকগণের নাম ও ঠিকানা সরকার জানিতে পারিয়া শাস্তি দিতে পারে এই আশঙ্কায়—এবং চিঠিগুলিকে অন্য কোন প্রকারে ধ্বংস করিতে না পারিয়া—বৃদ্ধ শেখ সাহেব এক একটা করিয়া চিঠিগুলি গিলিয়া ফেলেন। কাগজ চিবাইবার যাদের অভ্যাস আছে তারা জানে ইহা মুখরোচক কিছুতেই হয় নাই। চিঠির সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। তদুপরি এক-খানি চিঠি না কি খুব প্রকাণ্ড ছিল—যাহা গিলিতে ভদ্রলোককে বেজায় বেগ পাইতে হইয়াছিল। সে যাই হউক, বহু কষ্টের পর নিজের পৈতৃক জীবনকে বিপন্ন করিয়া তিনি সব চিঠিগুলি গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন।

বাহাউল্লাহ বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ব ঘোষণা করেন মানুষ মানুষের ভাই ইহাই তাঁহার মত। ধর্ম্ম এবং দেশের গণ্ডীকে ডিঙ্গাইয়া মানুষ এক হউক ইহাই তাঁহার মিশন। তিনি লিখিয়াছেন :—

"Ye are all leaves of the same tree, and drops of one ocean. We desire only the good of the world and the happiness of the nations, that they may become one in faith and all men may live together as brothers; that the bonds of affections and unity between the sons of men may be strengthened; that diversities of religions may cease, and difference of race be annulled; mankind becoming one kindred and one family. Let not a man glory in that he loves his country, let him rather take pride in this—that he loves his kind."

বাহাউল্লাহ তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণের জন্যে তদানীন্তন বিভিন্ন রাজন্য-বর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। পারস্যের নাসিরউদ্দীন শাহ, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, রুশিয়ার জার, ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়ন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি এবং ইটালীর পোপকে এক এক স্বতন্ত্র পত্র লিখিয়া তাঁহার মিশন গ্রহণের জন্যে আহ্বান করিয়া পাঠান। পারস্য সম্রাট নাসিরউদ্দীন শার কাছে যে দূত এই পত্র বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহার দুঃসাহসের জন্য সম্রাটের আদেশে তাহাকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃঃ পর্য্যন্ত বাহ ইদের উপর পারস্য সরকারের অত্যাচারের মাত্রা অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু তথাপি বাহাইরা নিজেদের মত প্রচারে নিরস্ত হয় নাই। বরং তাহারা এই সময় হইতে আরও নব উদ্যমে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করিয়া ইয়োরোপ আমেরিকায় তাহাদের ধর্ম্ম মত প্রচারের চেষ্টা করে। এবং ইহাতে তাহারা আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যও হইয়াছে। একজন ইংরেজ লেখক লিখিয়াছেন "Persia, Syria and Egypt are full of the leaven of Bahaism, from every European countries engineers and proselytes are flocking to its standard. The United States of America is a specially fayourable culture-ground for the beneficient microbe of brotherhood." আমেরিকায় এই নব ধর্ম্ম খুব দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে—অল্প দিনের মধ্যেই কয়েক সহস্র আমেরিকান এই নব ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। চিকাগো সহরের নিকটেই ইহাদের এক বৃহৎ ভজনালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। বাহাইরা প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং উৎসাহী। তাই অল্প দিনের মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজেদের একটা সাহিত্যও গড়িয়া তুলিয়াছে। এমন কি আমেরিকার দীক্ষিত বাহাইরাও নিজেদের একটা আলাদা সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দের ১৬ই মে বাহাউল্লার মৃত্যু হয়। তৎপুত্র আব্বাস একেন্দী—যিনি আবদুলবাহা নামে পরিচিত—তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। বাহাউল্লার মিশন প্রচারের জন্যে আবদুল বাহা ১৯১১ খৃঃ একবার ইউরোপে গিয়াছিলেন—এবং প্যারিসের এক সাধারণ সভায় তিনি ইয়োরোপকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন—"Let us serve the cause of human unity treating all men as brothers and equals." ইহাই বাহাই ধর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এখন ইহাদের কয়েকটা মতামত ও আচার-পদ্ধতির উল্লেখ করিয়া আপনা-দিগকে এই ধৈর্য্যের পরীক্ষা হইতে রেহাই দিব।

বিশ্বমানবের একতা ও মিলন বাহাউল্লার মিশনের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। এ মিলন যাহাতে সম্ভব হয় সেজন্য তিনি সমস্ত পৃথিবীর জন্য এক সাধারণ ভাষা সৃষ্টির উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর শান্তির জন্য রাজশক্তি-গুলিকে নিরস্ত্রীকরণ (disarmament) আবশ্যক এমন কি, কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষেও যুদ্ধের সময় ছাড়া অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। বিভিন্ন শক্তি সমূহের বিবাদ মীমাংসার জন্য শক্তিসমূহের প্রতিনিধি লইয়া এক সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। "বাব" ভগবানে পঁহুছিবারই দ্বার (দরওয়াজা)। একজন বাবের প্রচারিত শিক্ষা দীক্ষা যুগের অনুপযোগী হইলে অন্য একজন বাব নূতন মিশন লইয়া আবির্ভূত হন। কোন শিশুকে তার অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ, হয় ত এই শিশুতেই ভবিষ্যতের বাব লুপ্ত আছে—কে বলিতে পারে এই শিশুই ভবিষ্যতের 'বাব' নহে! পৌরোহিত্য ইহাদের সমাজে নাই—বৈরাগ্য, সন্ন্যাস, ভিক্ষাবৃত্তি এই সমস্তকে কঠোর ভাবে বর্জ্জন করা হইয়াছে। কর্ম্মকে উপাসনা মনে করিতে হইবে—সকলকেই কোন না কোন ব্যবসা করিতে হইবে। এই রকমে পৃথিবীতে বেকার-সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। বালক-বালিকাকে সমানভাবে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া ধর্ম্মের মত মনে করিতে হইবে। যাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততি নাই—তারা অন্য কারও একটা ছেলের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করিবে। প্রত্যেকে নিজের আয়ের কতকাংশ দান করিবে। সেই দানভাণ্ডার হইতে নির্ব্বাচিত বোর্ড কর্তৃক বিধবা, অসমর্থ, রোগী ও এতিমদের শিক্ষাদীক্ষা ও লালন পালনের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইবে। নারী-পুরুষের অধিকার সমান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে; এবং নারীকে স্বাধীনতা দিতে হইবে। বিবাহ একবারেই সীমাবদ্ধ রাখিতে

অগ্নির বরপ্রার্থনা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী]

[Bharatvarsha Halftone & Printing Works.
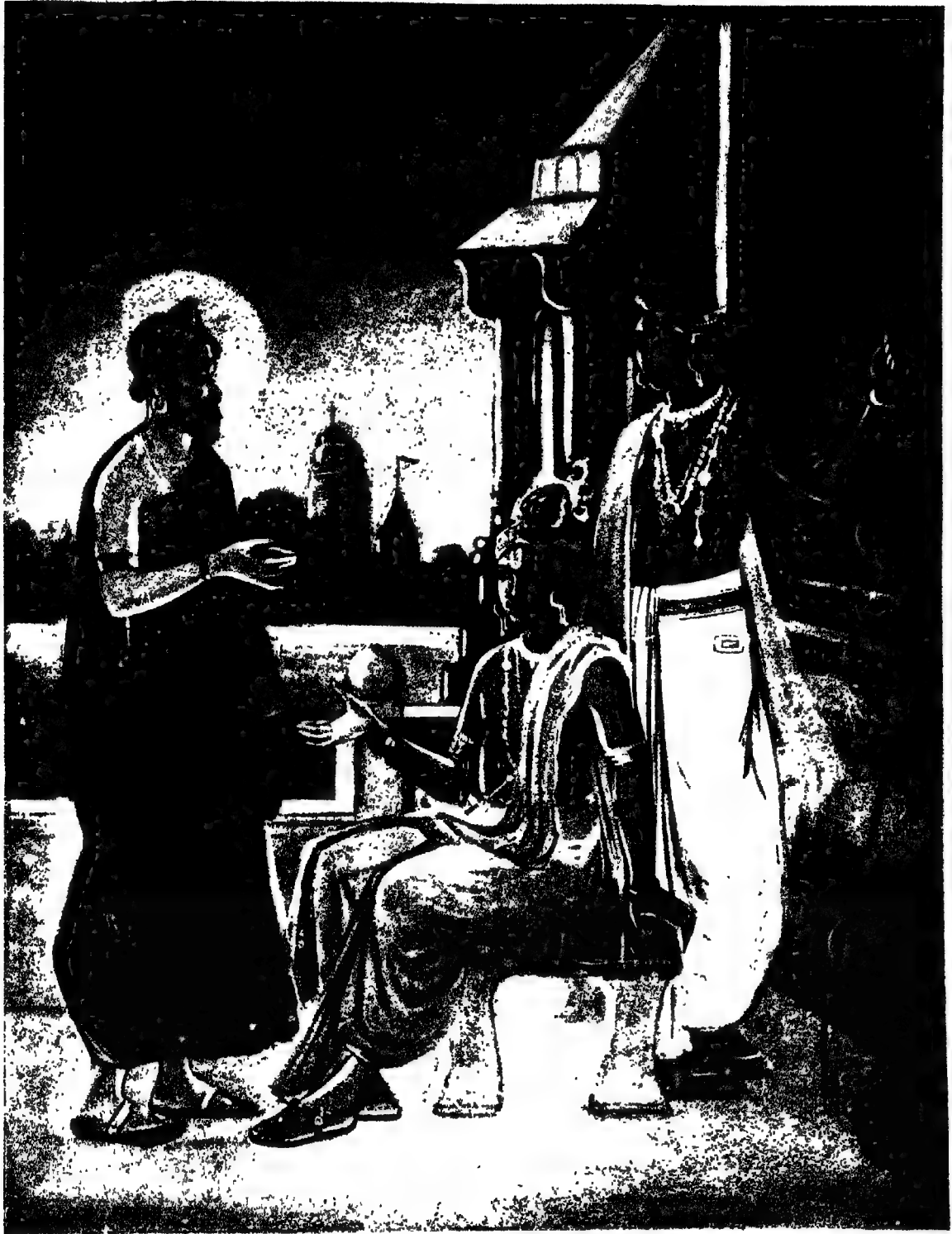
হইবে। মাদক, পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা, নেশাভাও ইত্যাদি একেবারেই নিষিদ্ধ। কাহাকেও জোর করিয়া ধর্ম্মে দীক্ষিত করা বা কাহাকেও ভিন্ন ধর্ম্মমতের জন্তে শাস্তি দেওয়া নিষিদ্ধ।

ইহাদের কাছে ১৯ সংখ্যাটা খুবই পবিত্র। কারণ, শিয়াদের মতে হজরত আলী না কি বলিয়াছেন সমস্ত কোরাণের সারাংশ সুরে ফাতেহাতেই (১) নিবদ্ধ এবং সুরে ফাতেহার তথা সমস্ত কোরাণের সারাংশ এক বিশ্‌মিল্লাতেই সংবদ্ধ। এই "বিশ্‌মিল্লাহি রহমানির রহিম"এ ১৯ অক্ষর আছে। তিনি না কি আরও বলিয়াছেন, সমস্ত বিশ্‌মিল্লার সারাংশ বিশ্‌মিল্লার 'বে' অক্ষরের নক্‌তাতেই নিবদ্ধ। কাজেই তাহাদের মতে এই নক্‌তাতেই সমস্ত কোরাণের সারাংশ বিহিত আছে। তাই বাবি বা বাহাইরা তাদের ধর্ম্মগুরুকে নক্‌তা বা pointও বলিয়া থাকে। আবার এই নক্‌তার সঙ্গেও ইহারা ১৯এর একটা সংযোগ করিয়াছে। 'বে'তে এই নক্‌তা মাত্র একটি। একের আরবী "ওয়াহেদ্‌"। আরবীতে বর্ণাক্ষরের সংখ্যা নির্ণয়ের একটা হিসাব আছে; তাহাকে আবজাদী হিসাব বলে। অনেকেই দেখিয়াছেন, মুসলমানেরা চিঠির উপর (৭৮৬) লিখিয়া থাকে। ইহা সমস্ত বিশ্‌মিল্লার অক্ষরগুলির সংখ্যা। এই আবজাদী হিসাবে "ওয়াহেদের" সংখ্যাও হয় ১৯ (যেমন ওয়া—৬; আলেপ—১; হে—৮; দাল—৪; মোট ১৯)। তাই ১৯ ইহাদের কাছে খুবই পবিত্র। ১৯ দিনে ইহাদের মাস হয় এবং ১৯ মাসে ইহাদের বৎসর। ইহারা রোজাও রাখে ১৯টা। ইহারা নমাজ পড়ে দিনে তিন (বার) সকালে, সন্ধ্যায় ও দুপুরে—প্রত্যেক ওক্তে তিন রকাৎ মাত্র। ইহারা মক্কার দিকেই মুখ করিয়া নমাজ পড়ে অর্থাৎ মক্কাই ইহাদের কোব্‌লা। প্রবাসে শুধু একবার 'সুবাহনল্লাহ' বলিলেই সারে। ইহাদের এক জানাজার নমাজ (অর্থাৎ সমাধির সময়ের নমাজ) ছাড়া আর সব নমাজ জমাতের পরিবর্ত্তে একলা পড়াই নিয়ম। নমাজ জমাতে না পড়িলেও মসজিদ নির্ম্মাণের হুকুম আছে।

ইহাদের পুরুষেরা সালাম করে "আল্লাহো আকবর" (আল্লাই সর্ব্বপ্রধান) বলিয়া; আর উত্তর দেয়, আল্লাহো আজম (আল্লাই সর্ব্বশক্তিমান)। মেয়েরা সালাম করিবার সময় আল্লাহো আজমল্‌ (আল্লাহ সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর) বলে, আর উত্তর দেয় আল্লা সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল।

বাহাইদের মতে অন্তের জন্ত খোদার কাছে ক্ষমা চাওয়া নিষেধ। অপরাধী যে সে নিজেই অনুতপ্ত হইয়া খোদার কাছে ক্ষমা চাহিবে। চুরি করিলে প্রথম দুই একবার জেলে দেওয়া হইবে; তার পরও যদি চুরি করে তবে তার কপালে এমনভাবে দাগ কাটিয়া দিতে হইবে, যাতে সে যেখানে যায়, সেখানে লোকে তাকে চোর বলিয়া চিনিতে পারে। মাথার চুল একেবারে মুড়াইয়া ফেলা নিষেধ; তবে বগলের নীচেও যাতে না যায়। তবে সুখের বিষয় দাড়ী মুড়ান নিষেধ নহে। সাহিত্য সমাজের সভ্যদের ভয় পাইবার কারণ নাই—গান বাজনা করারও অনুমতি আছে। অপ্রচলিত অর্থাৎ dead language পড়া নিষেধ এবং প্রত্যেক বই ২০২ বৎসর পরে এক একবার নূতন করিয়া লেখা উচিত। কোন বাবি বা বাহাইর সংসর্গে আসিবার সুযোগ আমাদের ঘটে নাই—কারণ বাংলা দেশে কোন বাহাই আছে কি না আমরা জানি না। যাঁহারা বাহাইদের সঙ্গে মিলিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা তাহাদিগকে খুব উদার, কুসংস্কারবর্জ্জিত ভদ্র বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। একজন আরমেনিয়ান লিখিয়াছেন—"I like the Babis because of their freedom from prejudice, and openhandedness; they will give you anything you ask them for without expecting it back, though on the other hand they will ask you for anything they want and not return it unless you demand it. তাদের এই স্বভাবের জন্ত কেহ কেহ তাহাদিগকে communist বলিয়াও ধারণা করিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা communist নয়। প্রাচ্য বিত্তায় সুপণ্ডিত, Literary History of Persia, Persian Revolution প্রভৃতি গ্রন্থের খ্যাতনামা লেখক মনীষি E. G. Brown লিখিয়াছেন—"I have found the Babis as a general rule men of learning, reasonable and human." মানবজাতির চিন্তা-ধারার এই নব প্রসূনটী জগতের কতখানি কল্যাণ করিবে, তাহার হিসাব-নিকাশ করিবার সময় এখনও আসে নাই; কারণ, মাত্র ৭০।৮০ বৎসর একটী বিশ্বধর্ম্মের জীবনে কিছুই নয়। তবে এই কথা সত্য যে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক এই নব ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারিবে না।

(১) কোরাণের মুখবন্ধ।

* ঢাকা মুসলমান সাহিত্য সমাজে পঠিত।

স্বয়ম্বরা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

অল্প ভাড়ায় মনের মতো একখানি ছোট বাড়ী খুঁজে পেয়ে সুরেশ যেদিন রাতারাতি যতীনদের পাশের একতলা বাড়ীখানি দখল করলে, যতীনের স্ত্রী অনুরূপা সেইদিনই রাত্রে তাদের খিড়্‌কী দিয়ে এসে সুরেশের স্ত্রী কমলার সঙ্গে আলাপ ক'রে গেল। অনেক রাত পর্য্যন্ত থেকে তার সঙ্গে সঙ্গে তাদের এই নূতন ঘর-দোর-গুলো খানিকটা গুছিয়ে দিয়ে গেল।

যাবার সময় বলে গেল "আজ আর এতরাত্রে কাঠকুটো জ্বেলে রাঁধাবাড়ার হাঙ্গামা কোর না বোন্, এই তো তিনটি প্রাণী খেতে?—আমি এখনি বাড়ী থেকে তোমার মেয়ের জন্যে দুধ-মিষ্টি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আধঘণ্টার মধ্যেই আমার ঠাকুর তোমাদের কর্ত্তা গিন্নীর খাবার দিয়ে যাবে। একেবারে কাল সকালে উঠে নোতুন উনুনে আগুন দিও, সারারাত হাওয়া পেলে কাঁচা উনুনটা অনেকখানি টেনে যাবে, ভাতের হাঁড়ি বসাবার সময় বুঝ্‌তে পারবে কেমন উনুন এই 'অনুপ' বামনী তোমায় গড়ে দিয়ে গেছে!"

সেইদিন রাত্রে সুরেশ খেতে বসে কমলার কাছে পাশের বাড়ীর বউটির গুণপনার যে খ্যাতি শুনলে এবং তার রূপের যে বর্ণনা পেলে, তাতে সে মনে মনে তার ধনী প্রতিবেশী যতীনবাবুর সৌভাগ্যের ঈর্ষা না ক'রে থাকতে পারলে না।

* * * *

সাতদিন যেতে না যেতেই সমবয়সী যতীনের সঙ্গে সুরেশের এমন একটা হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব স্থাপিত হলো,—এমন একটা ঘনিষ্ঠতা তাদের মধ্যে জমে উঠ্‌ল—যেন তারা দুটিতে আজন্মের পরিচিত! সুরেশ কেবল দুপুর বেলা অফিসটুকু যাওয়া ছাড়া সকালে, বিকালে, রাত্রে ও ছুটীর দিনটা সমস্তই যতীনের বৈঠকখানায় কাটিয়ে দিতে লাগল! ওদিকে—কর্ত্তাটি অফিসে গেলে—মেয়েটিকে ইস্কুলে পাঠিয়ে, হেঁসেলের পাট চুকিয়ে, কমলার যদি পাশের বাড়ীতে যেতে একদিন দুপুরে একটু দেরী হ'তো, অমনি 'অনুপ' আসতো নিজে তার কাছে ছুটে!

একমাসের মধ্যেই এই দুই পরিবারের ভিতর থেকে পর্দ্দার আড়ালটুকুও সরে গেল। সুরেশ এসে সরাসর একেবারে বাড়ীর ভিতরে গিয়ে ডাক দিতে সুরু ক'রলে—"বৌদি, চা দাও!"

যতীন যেদিন অনুরূপার সঙ্গে সুরেশের পরিচয় করিয়ে দিলে, তার পরদিনই কমলাকেও জোর কোরে সুরেশ যতীনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে, অতিকষ্টে তার লজ্জা ভেঙেছে। কমলাকে যতীন নাম ধরেই ডাকে; কারণ, কমলা তার স্বামীর ডাকেরই প্রতিধ্বনি করে তাকে' যতীনদা' বলেই ডাকতে সুরু করেছিল।

যতীনের সন্তানাদি ছিল না, সুরেশের মেয়ে সাত বছরের 'পাপড়ী' এই ক'দিনের ভিতরই তার 'জ্যাঠাবুর' একান্ত আদরিণী হ'য়ে উঠ্‌লো। সে এক দিন ভাঙ্গা শ্লেট হাতে ক'রে আর ছেঁড়া জুতো পায়ে দিয়ে ইস্কুলের গাড়ীতে উঠ্‌ছিল দেখে সেইদিনই বিকেলে যতীন 'পাপড়ীকে' নিজের মোটরে ক'রে নিয়ে গিয়ে তার স্কুল যাবার আলাদা 'স্যুট্' করিয়ে এনে দিয়েছে।

সুরেশ সেদিন আফিস থেকে এসে যখন এ খবর শুনলে, সে ভয়ানক চটে যতীনকে গিয়ে বললে "না যতীনদা, এ কিছুতেই হবে না! আমি গরীব মানুষ, আমার মেয়ে ভাই গরীবের মতোই থাকবে। তাকে কেন তুমি অত দামী সব 'স্যুট-ফ্রুট' কিনে এনে দিয়েছো?"

যতীন স্নিগ্ধ হেসে বললে "ওঃ! অপমান বোধ হ'য়েছে বুঝি? তা সেগুলো ফিরিয়ে এনে দিয়ে আমাকে না হয় উল্টে অপমান ক'রে যাও! আমি তো জানিনি যে তুমি মুখে আমাকে 'দাদা' বলো বটে, কিন্তু মনে আমি তোমার দাদা নই; নইলে আমার ভাইঝীকে ইস্কুলে পাঠাবার আমি যোগ্য ব্যবস্থা করিছি দেখে, ছোটভাই এমন রুখে আমাকে মারতে আসতো না!"

সুরেশ লজ্জায় একেবারে লাল হ'য়ে উঠল! নিতান্ত অপ্রতিভ হয়ে বার-বার ক্ষমা চেয়ে ব'ললে "আমার বড্ড অন্যায় হ'য়েছে যতীনদা; তোমাকে যে দেবার অধিকার দিয়েছি এ কথা আমি ভুলেই গেছলুম! 'পাপড়ী' তোমাদেরও মেয়ে বটে!"

* * * *

সুরেশ একদিন অফিস থেকে এসে দেখে কমলা ব'সে আপনার মনে একখানি এস্রাজ কাঁধে ফেলে বাজাচ্ছে! কমলা একটা গোখরো সাপ নিয়ে খেলা করছে দেখলেও সুরেশ ততটা আশ্চর্য্য হত না যতটা আশ্চর্য্য হ'লো সে কমলার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পেয়ে। খানিকক্ষণ অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে সে শুনলে—কমলা বেশ সুরে ল'য়ে তালে বাজিয়ে চলেছে!

সুরেশ নিজে একজন বেশ সঙ্গীতজ্ঞ হ'লেও তার স্ত্রী যে এ বিষয়ে কতটা অনভিজ্ঞ এ কথা তার অবিদিত ছিল না। তাই সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কমলার মুখের দিকে চেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে' যখন জানতে পারলে যে কমলার 'অনুপ্‌দি' তাকে এই বিদ্যা শিখিয়েছে—তখন সে আরও আশ্চর্য্য হয়ে গেল। সুরেশ শুনলে যে কমলার অনুপ্‌দি শুধু যে সবরকম তারের যন্ত্র বাজাতে জানেন তাই নয়, অতি চমৎকার গান গাইতেও পারেন। সুরেশ কিন্তু কথাটা বিশ্বাসই করতে পারলে না, বললে "না, এ হ'তেই পারে না, এতদিন এখানে এসেছি, কই এক দিনও তো তাঁকে গাইতে বা বাজাতে শুনিনি!"

কমলা ব'ললে "এ পাড়ার লোকেরা ভদ্রলোকের বাড়ীর মেয়ে-ছেলেদের গান বাজনা করাটা মোটেই পছন্দ করেন না বলেই তিনি ও-পাট তুলে দিয়েছেন। সেদিন কথায় কথায় আমার কাছে যখন শুনলেন যে তুমি এসব ভারি ভালবাস, অথচ আমি পোড়ারমুখী এ বিদ্যের 'ব'ও জানিনে, তখন তিনি আমাকে রোজ দুপুরে পাড়ার সব বাবুরা অফিস আদালতে চলে গেলে এস্রাজ বাজানোটা আস্তে আস্তে একটু করে শেখাতে আরম্ভ করেছেন'। এ যন্ত্রটা তিনিই আমাকে উপহার দিয়েছেন!"

* * * *

সেইদিনই সুরেশ যতীনের বাড়ীর ভিতর ঢুকে মহা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিলে—"বৌদি, তোমাকে এস্রাজ বাজিয়ে গান গেয়ে শোনাতেই হবে! তুমি কেন এতদিন আমাকে বলোনি যে তোমার পেটে এ বিদ্যে পোরা আছে?"

অনুরূপা কিছুতেই তাঁর এই সঙ্গীতানুরাগী দেবরটিকে শান্ত করতে না পেরে শেষে উদ্ধারের জন্য স্বামীর শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু যতীন বললে "সুরেশ যে আনন্দটুকু আজ তোমার কাছ থেকে ভিক্ষা চাইছে, বহুকাল আমিও যে তা থেকে বঞ্চিত রয়েছি অনুপ? সুরেশের চেয়ে আমার লোভও ত বড় কম নয়। পাড়ার লোকের দোহাই দিয়ে এবার সারা বর্ষাটা ত' আমাকে ফাঁকি দিয়েছো, আশ্বিনও প্রায় যায় যায়। শরৎকেও কি ব্যর্থ হয়ে যেতে হবে'? না কখনই তা হবে না, গাও অনুপ, তোমার সেই শরতের সুন্দর গানখানি—সেই—

"ওগো শেফালী বনের
মনের কামনা!
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে—"সেইটে!"

অগত্যা অনুরূপার আর আপত্তি করা চল্‌লো না। এস্রাজখানি বার করে এনে ছড়ীর টানে টানে গাইতে সুরু করে দিলে—

"আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি
তৃণ উঠুক্ শিহরি শিহরি,
নাম' তাল-পল্লব বিজনে
নাম' জলে ছায়া ছবি সৃজনে!
এস সৌরভ ভরি আঁচলে
আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে
মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থাম না!"

অনুপের অনুপম কণ্ঠের সুরলহরীতে মুগ্ধ হ'য়ে সঙ্গীতজ্ঞ সুরেশ আর চুপ করে বসে থাক্‌তে পারলে না। সুরে সুর মিলিয়ে সেও তার কিন্নর কণ্ঠে গাইতে লাগল—

"ওগো সোনার স্বপন সাধের সাধনা!
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে
জ্বালি জোনাকী প্রদীপ মালিকা
ভরি নিশীথ তিমির থালিকা
প্রাতে কুসুমেরি সাজি সাজায়ে
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে
কত করেছে তোমার স্তুতি আরাধনা!"

সুরেশের যোগদানে উৎসাহিত হ'য়ে অনুরূপা এবার পরিপূর্ণ কণ্ঠে গাইতে লাগল:—

"আহা শ্বেত চন্দন তিলকে,
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে,
আহা, তোমারে বরিল কে আজি

তার দুঃখ শয়ন ভেয়াজি—
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা !"

গাইতে গাইতে অনুরূপার চ'খের সহাস্য দৃষ্টিটুকু যতীনের প্রীতিপ্রফুল্ল মুখের উপর খেলে বেড়াতে লাগল !

এই ঘটনার পর থেকে যতীনের বৈঠকখানায় বসে সুরেশের কেবল সাহিত্য-চর্চা, কাব্য-আলোচনা, দেশের কথা,—সমাজের কথা,—স্বাধীনতার কথা এবং ভারতবর্ষের তথা বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষণাই নয়,—দস্তুর-মতো সঙ্গীতালাপও সুরু হ'য়ে গেল !

কারণ, সুরেশের অভিযোগের উত্তরে অনুরূপাও তাকে শুনিয়ে দিয়েছিল "কই, তুমিও তো এতদিন এ বিদ্যে জানতে বলে ধরা দাওনি ঠাকুরপো ! ভাগ্যিস কমলা সেদিন আমাকে ব'ললে, তাই ত' টের পেলুম !"

* * * *

দেখতে দেখতে পুজো এসে পড়ল'। সেবার আশ্বিনের শেষেই মহাপূজা। পাড়ায় পাড়ায় বোধনের বাজনা বেজে উঠল। পূজা উপলক্ষে কমলা ও তার কন্যাকে অনুরূপা বহুমূল্য এক-একখানি শাড়ী উপহার দিয়েছে। যতীনও সুরেশকে কাপড় চাদর পাঠিয়েছে। 'পাপড়ীকে' একগাছি সোনার হার গড়িয়ে দিয়েছে।

সুরেশ তখন যতীনকে ও অনুরূপাকে এসে বললে "এ গরাব ভাইটি ত' কেবলই তোমাদের কাছে নিয়েই আসছে, এবার তার কাছে থেকে তোমাদের কিছু নিতে হবে। পুজোয় কী পেলে তুমি খুসী হও বলো বউদি !"

অনুরূপা ব'ললে—"আমি এই ক'দিন থেকেই তোমার কাছে একটা জিনিস চাইবো, ভাবছি—তা রোজই ভুলে যাই। আমায় তুমি রবিবাবুর গানের স্বরলিপি এক সেট্ এনে দিও তো ঠাকুরপো ! আমার একখানিও নেই।"

যতীন ব'ললে—"সত্যি কথা ব'লতে কি ভাই, তোমার ওই মীনের কাজ করা রূপোর 'সিগারেট-কেস্‌টার' উপর আমার ভারি লোভ হ'য়েছে ! আমায় যদি ঠিক ওই রকম একটি এনে দিতে পারো তো দিও,—নইলে তোমারটাই কোন্‌দিন চুরি যাবে বলে রাখলুম !"

সুরেশ সেইদিনই অফিস থেকে আসবার সময় যতীন ও অনুরূপার ঈপ্সিত সামগ্রী এনে হাজির ক'রে দিয়ে যেন অনেকখানি তৃপ্তি বোধ ক'রলে।

এতদিন পাড়ায় কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার সুযোগ সুরেশের ঘোটেই হয়নি। সেইদিন সকালে পাড়ার দু'একজন তার বাড়ীতে এসে তার সঙ্গে আলাপ করে গেছে এবং মহাপূজা উপলক্ষে তিন দিন তাদের বাড়ীতে গিয়ে প্রতিমাদর্শন ও প্রসাদ পাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে-গেছে ! সন্ধ্যের পর পাড়ার আরও দু'ঘর থেকে কর্ত্তারা এসে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেল।

এই প্রথম পাড়ার লোকেদের সঙ্গে সুরেশের আলাপ-পরিচয় হ'লো। তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে দু'বেলাই সুরেশ একটা জিনিস লক্ষ্য করলে যে তারা সকলেই প্রায় তাকে একই প্রশ্ন করে গেল—'পাশের বাড়ীর যতীনবাবুটির সঙ্গে তার এত ঘনিষ্ঠতা হ'ল কেমন করে ? যতীনবাবুর কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে সে কিছু জানে কি না ?' সুরেশ তাঁদের এরূপ প্রশ্ন করবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা সকলেই বলে গেছেন—"একদিন আসবেন দয়া করে, গরীবদের বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন,—সব কথা আপনাকে জানাবো,—আজকে এখানে বসে' নয়।—সে সব বড় অপ্রিয় আলোচনা,—বড় নোংরা কথা।"

* * * *

পরের দিন যাঁরা যাঁরা কাল সুরেশের বাড়ী এসেছিলেন সুরেশ তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়ী প্রত্যভিবাদন দিতে গিয়ে তাদের কাছে যতীন ও অনুরূপা সম্বন্ধে যা যা শুনে এল, তাতে কোনও ভদ্রলোকই আর তাদের সঙ্গে সংস্রব রাখতে পারে না।

সুরেশ আষাঢ়ের মেঘের মতো মুখখানা কালো ক'রে অনেক বেলায় বাড়ী ফিরল'।

কমলা জিজ্ঞাসা করলে "হ্যাগা, আজ বুঝি তোমাদের আপিসের ছুটী ? এতো বেলা হয়ে গেল এখনও নাওয়া-খাওয়ার তাড়া নেই ! কাল রাত্রে একটু যদি আমাকে ব'লতে তা হ'লে আর আমি ভাত চড়াবার জন্যে এত তাড়াতাড়ি করে মরতুম না। অনুপদি' বলেছিলেন—ভোরের বেলা উঠে পুজোর এই ক'দিন আমরা হেঁটে গঙ্গাস্নান করতে যাবো, সঙ্গে ওঁদের গাড়ী থাকবে, নেয়ে উঠে ফেরবার সময় গাড়ীতে বাড়ী ফিরবো। কিন্তু আমি এ স্নানের হাঙ্গামের মধ্যে গেলুম না—পাছে ঠিক টাইমে তোমায় আপিসের ভাত না দিয়ে উঠতে পারি এই ভয়ে।

তা' অনুপদি' আমার জন্যে গাড়ী নিয়ে বেলাতেই নাইতে যাবার ব্যবস্থা ক'রেছেন!"

সুরেশ গম্ভীরভাবে বললে,—"আজ থেকে আর তুমি পাশের বাড়ীতে ঢকো না কমলা! ওঁরা এলে আস্‌তে বারণ ক'রে দিও। 'পাপড়ী'কেও আর ওখানে যেতে দিও না!"

কমলা আশ্চর্য্য হয়ে সুরেশের মুখের দিকে চাইতেই চমকে উঠলো! তার হাত থেকে সুরেশের স্নানার্থ গামা, সাবানের কেস্‌, তেলের শিশি তোয়ালে—সব মেঝের উপর ছিট্‌কে প'ড়ে গেল!

সুরেশ ব'ললে "আমি অফিসে চ'ললুম, বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে—স্নান করবার আর সময় নেই—খেতে'ও কিছু ইচ্ছে নেই। কিন্তু খবরদার আর ও-বাড়ীতে যেও না। ওদের সঙ্গে সমস্ত সংস্রব আজ থেকে উঠে গেল! কেন, কী বৃত্তান্ত—সব অফিস থেকে এসে ব'লবো, এখন আর সময় নেই—" বলতে বলতে সুরেশ বেরিয়ে চলে গেল!

*　　*　　*　　*

দুপুরে কমলা এল না দেখে অনুরূপা তার ঝী ক্ষীরোদাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল কমলাকে ডেকে আনবার জন্যে। ক্ষীরোদা এসে বললে "ও বাড়ীর দিদিমণির শরীরটা ভাল নেই। শুয়ে আছেন। রাত্রে আসবেন বলেছেন! আপনাকে আর কষ্ট ক'রে যেতে মানা ক'রে দিলেন। বললেন—'ক্ষীরো! বড় ঘুম এসেছে রে, দিদিকে ছুটে আস্‌তে বারণ করিস্‌। একটু ঘুম দিয়ে যদি শরীরটা বেশ সুস্থ হয়—আর বেলা থাকে ত' আমি তোদের বাড়ী যাবো, রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর নিশ্চয় হাজির হবো, বলিস্‌—আজ সাড়ে নটায় বায়োস্কোপ দেখতে যাবো—যেন বাবুকে গাড়ীর কথা বলে রাখেন।'"

অনুরূপা তখন মেঝের সতরঞ্চের উপর পাড়া এস্রাজ-খানাকে আবার ঘেরাটোপের মধ্যে পুরে দেয়ালের গায়ে টাঙিয়ে রেখে, শেল্‌ফের ভিতর থেকে রবীন্দ্রনাথের "বলাকা"খানাকে টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লো।

যতীন আজ সকাল-সকাল তার ব্যবসা-স্থল থেকে ফিরে এসে দেখলে অনুপ তখনও ঘুমুচ্ছে। ডেকে তুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তোমার ছাত্রীটি অনুপস্থিত দেখছি যে! কমলার কি গানবাজনা শেখবার সখ মিটে গেল?"

অনুপ তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললে—"ওমা, তাইত', এত বেলা পড়ে গেছে তবু ক্ষিরী আমাকে তুলে দেয়নি! যাই, তোমার জলটলখাবার গুলো গুছিয়ে এনে দিই গে। কমলার শরীরটা ভাল নয়, সে তাই আসতে পারেনি আজ, বাড়ীতে প'ড়ে ঘুম দিচ্ছে! আজ গুরু-শিষ্যা দুজনেরই দেখছি দিবা-নিদ্রাযোগ ছিল!" বলে মধুর হাস্য করে অনুরূপা স্বামীর জলযোগের আয়োজন করতে চলে গেল।

যতীন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বিছানায় ব'সে "বলাকা"খানা নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা কবিতায় চোখ পড়তে তার প্রাণটা কেমন উতলা হ'য়ে উঠল'! সে বার বার করে পড়লে—

"তোমার কাছে আরাম চেয়ে
　　পেলুম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
　　পরাও রণ-সজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব
আঘাত খেয়ে অচল রব
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
　　বাজবে জয় ডঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধ'রে
　　তোমার জয় শঙ্খ!"

অনুরূপা যতীনের জন্য ফলের ডিশ ও মিষ্টির রেকাবিখানি হাতে ক'রে ঘরে ঢুকতেই, যতীন বললে "অনুপ, এবার পুজোয় চলো আমরা অনেক দূরে কোথাও কোনও অজানা দেশে বেড়িয়ে আসি গে দিনকতক,—কেমন?"

"বেশ ত' চল না, আমি তো বেড়াতে পেলে আর কিছু চাই নি। কিন্তু তোমারই ত মুস্কিল, যে ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁদে বসেছো, নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াবার কি জো' আছে? পিছনে পিছনে দু'শো টেলিগ্রাম আর সাতশ' চিঠি আসবে ত?"

"নাঃ, এবারে আর কিছু গণ্ডগোল হবে না। এবার মনে ক'রছি সুরেশ ভায়াকে 'পার্টনার' করে নিয়ে ওর ওপরেই ব্যবসা আর বাড়ী-ঘর-দোর দেখবার ভার দিয়ে তোমাতে আমাতে স'রে পড়বো!"

"তা' এ প্রস্তাবটা তোমার বেশ লাগছে বটে, কিন্তু একটা কথা তুমি বোধ হয় ভেবে দেখ নি কিছু! যে জন্যে আজ তোমার সমস্ত বন্ধু ও আত্মীয় আমাদের বর্জ্জন করছে—সুরেশ যেদিন সে কথা শুনবে, সে কি তোমার পাশে থাকবে ?"

যতীন হেসে ব'ললে "আজ সেই কথাটাই সুরেশ এলে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে নেবো স্থির করিছি! আমাদের ইতিহাস আজ তাকে আগাগোড়া সব খুলে ব'লবো। তুমি বেলাবেলি কাজ-কর্ম্ম সেরে নিয়ে আজ বাইরে এসো। তোমাকেও উপস্থিত থাকতে হবে!"

অনুরূপা রাজি হ'য়ে তার সম্মতি জানালে।

* * * *

সেদিন সুরেশ অফিস থেকে এসে মুখ হাত ধুয়ে জলটল খেয়ে ঘরের মেঝের একখানা মাদুর বিছিয়ে একটা তাকিয়া নিয়ে—হারিকেন লণ্ঠনটার প'লতের চাবি ঘুরিয়ে আলোটা একটু জোর ক'রে দিয়ে পূজার সংখ্যা মাসিক পত্র একখানা টেনে নিয়ে পড়তে সুরু করলে দেখে কমলা হেসে বললে "এই যে—নিজেও দেখছি নিষেধ পালন করছো! আমি মনে করেছিলেম শাস্তিটা বুঝি শুধু একা আমারই হ'চ্ছে হয় ত' আমারই নিজের কোনও অজ্ঞাত অপরাধের জন্য, কিন্তু মহাশয়ও যখন পাশের বাড়ীতে একবার না গেলে ভাত হজম হবে না জেনেও না গিয়ে থাকবারই চেষ্টা করছেন, তাতে মনে হ'চ্ছে অপরাধটা পাশের বাড়ীরই—আমাদের নয়!"

সুরেশ মাসিকপত্রখানা মুড়ে রেখে বললে "হ্যাঁ—ভাল কথা; শোনো, এইখানে একটু বোসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে, ও বাড়ীতে যাওনি ত আজ ?" কমলা মাদুরের একধারে বসে' তেমনিই সহাস্য মুখে সুরেশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলে—"তোমার কি মনে হয় ?"

"নিশ্চয় যাওনি। কিন্তু, উনি ডাকতে আসেন নি ?"

—"তাঁকে আসতে মানা করে দিয়েছিলেম।"

সুরেশ উৎসাহিত হ'য়ে উঠে কমলার দুটি হাত নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে ব'ললে "বেশ করেছো! বেশ করেছো! আর নয়,—যা হবার হ'য়ে গেছে!—হ্যাঁ—পাপ্‌ড়ী কোথায় ?"

ওদিককার কোণের ঘরটায় বসে প'ড়ছে। তার (জ্যাঠাবাবু) মাষ্টার বাহাল করবার পর থেকে তার কি আর সন্ধ্যের পর ফুরসুৎ আছে! মেয়ের তোমার এত পড়ার চাড় যে, সংসারের আমার কড়ার কুটোটা পর্য্যন্ত নাড়ে না। আগে কত কাজ ক'রতো।"

"ইস্কুল থেকে এসে ও-বাড়ী যায়নি ত ?"

"কি করে যাবে ? কর্ত্তার ইচ্ছেয় তো কর্ম্ম! আমি যেতে দিইনি।"

"যাবার জন্য খুব ছটফট্ করেছিল ?"

"ওঃ—তা আর করেনি ? সে ইস্কুলের গাড়ী থেকে নেমে জুতো জামা খুলতে স্বর সয় না! তোমার নাম করে বললুম যে 'উনি তোমাকে আজ 'জ্যাঠাবু'র কাছে যেতে বারণ করেছেন। তাঁর শরীরটা আজ ভাল নেই, তুমি তাঁকে বিরক্ত করতে যেও না। উনি অফিস থেকে এলে আমরা সবাই একসঙ্গে তোমার 'জ্যাঠাবু'কে দেখতে যাবো।' বোকা মেয়ে তাই বিশ্বাস করেছে। কিন্তু, সে যাই হোক, এখন ব্যাপারটি কি আমায় খুলে বলো তো ?"

সুরেশ চুপি চুপি প্রায় কমলার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললে "তোমার অনুপ্‌দি' যতীনের স্ত্রী নয়!"

কমলা কথাটা শুনে শিউরে উঠ্‌ল! কিন্তু পরক্ষণেই তার সেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললে "এ তত্ত্বটা তুমি আবিষ্কার করলে কোত্থেকে ? 'অনুপ্‌দি' যতীনদা'র স্ত্রী নয় ত' কি গুরুমশাই ?"

সুরেশ গম্ভীরভাবে বললে—"হাসি নয় কমল, পাড়াশুদ্ধ লোক আমাকে এ কথা বলেছে।" তারপর পাশের বাড়ী ওই সুখী ও শ্রেষ্ঠ দম্পতির বিরুদ্ধে সুরেশ পাড়ায় লোকে কাছে যা কিছু দুর্নাম শুনেছিল, কমলাকে সব জানালে।

কমলা বিশ্বাস করলে না। ঘাড় নেড়ে বললে "উঁহু! ও সব মিছে কথা! এ পাড়ার লোকগুলো ভারি দুষ্ট দেখছি। তুমি আর ওদের সঙ্গে মিশো না!"

সুরেশ হেসে বললে "আর দু'চার দিন ও-বাড়ীতে যাতায়াত করতে দেখলে, এ পাড়ার লোকেরা নিজেরাই যতীনের মতো আমাকেও একঘরে করে রাখবে!"

"রাখুকগে, বড় বয়ে' গেল! বিপদের সময় যাদের টিকি দেখতে পাওয়া যায় না, দুটো টাকা ধার চাইলে যাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় না, কোনও কিছু উপকার করে না যারা ভুলেও এক দিন—সে রকম প্রতিবেশী থাকলেই

বা কি—না থাকলেই বা কি? পূজোর সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কেবল চা'লকলার গোঁসাই?"—

*　　*　　*　　*

—"কে র্যা সে—কমল? দে না বঁটি দিয়ে তার নাকটা কেটে—" বলতে বলতে অনুরূপা ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো, পিছু পিছু যতীনও এসে হাজির! চোখের সামনে ভূত দেখতে পেলে লোকে যেমন ভয়ে শিউরে উঠে বিবর্ণ হ'য়ে যায়—সুরেশও আজ তার এই বন্ধু ও বান্ধবীর শুভ পদার্পণে তেমনিই শঙ্কিত ও পরিপাণ্ডুর হয়ে উঠল!

পাপ্‌ড়ী ইস্কুল থেকে এসে 'জ্যাঠাবু'র কাছে এলো না দেখে যতীন তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, কমলা সে লোককে বলে দিয়েছিল—'তাকে একটা পশমের আসন বুনতে শেখাচ্ছি, একটু পরে পাঠিয়ে দেবো!"

তারপর সুরেশও যখন অফিস থেকে এসে প্রতিদিনকার মতো "বৌদি, চা দাও" বলে এসে হাজির হ'ল না, তখন যতীন ও অনুরূপা দু'জনেই একটু শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ল! অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তারা সুরেশের আগমনের প্রতীক্ষায় থেকে হতাশ হ'য়ে—শেষে দু'জনেই একবার পাশের বাড়ীতে তাদের খবর নিতে যাওয়া উচিত স্থির করে—একসঙ্গেই চলে এসেছে!

সুরেশ কি করবে কিছু স্থির করতে না পেরে শুয়েই রইল। কমলা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে' তাদের খুব সমাদরে অভ্যর্থনা করলে। ঘরের মেঝেয় আর একখানি মাদুর পেতে দিয়ে বললে "বসো ভাই অনুপদি'! তুমি ত আমাদের ঘরের লোক, তোমাকে আর কী খাতির করবো? তবে যতীনদা'র পায়ের ধুলো একটু কালে-ভদ্রে পাওয়া যায় বটে! আজ কি ভাগ্যি! কার মুখ দেখে উঠেছিলেম কে জানে—তাই এই গরীবদের কুটীরে যতীনদা'র পদার্পণ—"

বাধা দিয়ে যতীন বললে "কমলা, তুমি যদি ওই রকম দুষ্টুমী আরম্ভ করো তাহ'লে কিন্তু আমাকে পালাতে হবে!" তারপর সুরেশকে ডেকে বললে "কি হে সুরেশ—ব্যাপার কি তোমার? অসুখ বিসুখ বাধিয়ে বসেছো না কি? তোমার বৌদি ত' আজ সেই নতুন দার্জ্জিলিঙ্‌ চা কত কায়দা ক'রে তৈরি ক'রে নিয়ে তোমার জন্ত সন্ধ্যে থেকে বসে ছিলেন। তা তোমায় অদৃষ্টে নেই ভায়া, কি করবে বলো! আজ চা'টা তোমার বৌদি এত ভাল রেঁধেছিলেন যে তোমার দেরী দেখে তোমার 'কাপ'টারও লোভ আমি শ্যামলাতে পারলুম না! হ্যাঁ, কী হয়েছে তোমার বল তো?"

সুরেশ এইবার উঠে বসল বটে, কিন্তু কিছু বলতে পারলে না! কমলা এই সময় ব্যাপারটা তার পক্ষে খুব সহজ ক'রে দিলে। সে বললে "কী আবার হবে? আমি ত দেখছি—এক মাথাখারাপ হওয়া ছাড়া ওঁর আর কিছু হয়নি! কে কোথাকার পাড়ার গোটাকতক হতভাগা বুড়ো কী যে বিষমন্ত্র ওঁর কাণে দিয়েছে—উনি একেবারে মূর্চ্ছা গেছেন! বলেন 'তোমাদের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখা হবেনা!'"

অনুরূপার প্রফুল্ল কমলের মতো সহাস্য মুখখানি সহসা যেন কুজ্ঝটিকার মতো ম্লান হ'য়ে গেল! যতীনের গাম্ভীর্য্য যেন আরও একটু অস্বাভাবিক গুরু হয়ে উঠ্‌ল!

ঠিক এমনি সময় পাপ্‌ড়ী তার পড়া শেষ করে, তার চিকণের কাজ-করা সাদা ফ্রকটা দুলিয়ে যেন শরতের লঘু শুভ্র মেঘখণ্ডের মতো সেই ঘরে ভেসে এলো!

"—এই যে জ্যেঠাবু, এসেছো? 'সুন্দর মা'ও এসেছো? বাঃ বেশ হ'য়েছে, ভারি মজা হয়েছে!—আমাকে আজ মা তোমাদের বাড়ী যেতে দেয়নি, বাবা মারবে বলেছে! ওদের বল না—আমাকে তোমাদের বাড়ী যেন যেতে দেয়! আমি তো রোজ যাই—আজ কেন মা'তে আর বাবাতে মিলে আমাকে বারণ করেছে?"

যতীন তাকে বুকের উপর টেনে নিয়ে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল!

*　　*　　*

"এই বাড়ীতেই তিনি থাকতেন?"—সুরেশ চমকে উঠ্‌ল! যতীন বললে "হ্যাঁ সুরেশ—এই বাড়ীতেই উপেনবাবু থাকতেন। দুর্দ্দান্ত মাতাল ব্যাভিচারি লম্পট বলে পাড়ার সকলেই তাঁকে জানতো, তাই সবাই তাঁকে ঘৃণা করতো। কিন্তু আমি কোনও দিন তাঁকে অখাতির ক'রতে পারিনি, কারণ—তিনি ছিলেন আমার পিতৃবন্ধু! টাকা-কড়ির দরকার হলে হামেশা তিনি আমারই কাছে ছুটে আসতেন,—কোনও বিষয়ে পরামর্শের দরকার হ'লেও তিনি আমারই কাছে এসে যুক্তি নিতেন। কিন্তু যেদিন্‌ শুনলেম যে তিনি গোপনে আবার তৃতীয়বার বিবাহ করবার জন্য—'ষাট' উত্তীর্ণ হয়েও—নির্ল্লজ্জের মতো মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন,—আমি সেদিন আর চুপ ক'রে থাকতে পরলুম না,—তাঁকে ডেকে

পাঠিয়ে বললুম—'না উপেনবাবু, এ কাজ আর আপনি করতে পাবেন না।' তিনি বললেন 'এখন ত' আর উপায় নেই যতু! আগে বললেও বা না হয় বন্ধ করে দিতে পারতুম—এখন যে আশীর্ব্বাদ হ'য়ে গেছে! গায়ে হলুদ আর বিবাহের দিনও ধার্য্য হ'য়েছে'—"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর কেঁপে উঠ্‌ল। বেশ রুক্ষ ভাবেই বললুম "এখন আর বন্ধ হয় না বুঝি?—তবে কি আপনি তাদের বলেছেন যে আপনার প্রথমা স্ত্রী অন্তঃসত্বা অবস্থায় মাতাল স্বামীর শ্রীচরণ-প্রহারে অপঘাত-মৃত্যুকে অসময়ে বরণ করে নিতে বাধ্য হয়েছিল?—বলেছেন কি তাদের—যে আপনার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী আপনার অমানুষিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ হ'য়ে তার জীবনের উষারম্ভেই উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছে?—"

উপেনবাবু তখন বেশ প্রমত্ত অবস্থাতেই ছিলেন। আমার রাগ দেখে ও রুক্ষ কথা শুনে তিনি যেন একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে পড়লেন,—ঘাড় হেঁট করে টলতে টলতে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিনি যখন উঠান পার হয়ে প্রায় সদরের কাছে গিয়ে পড়েছেন—আমি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললুম—"আবার একটি নিরপরাধিনী মেয়েকে এনে অকারণে মারবেন না উপেনবাবু, আপনি এ বিবাহের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন!"

উপেনবাবু তাঁর আরক্ত শিব-নেত্র আমার দিকে সবিস্ময়ে ফিরিয়ে, অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন—'তা কি হয় যতীন, তুমি একবারও এখনও বিয়ে করোনি,—তাই আমায় এমন অন্যায় অনুরোধ ক'রতে তোমার একটুও বাধছে না। আচ্ছা, তোমার এতখানি বয়স হয়েছে, এতগুলো পাশ দিয়েছো, একজাহাজ লেখাপড়া শিখেছো ব'ললেই হয়—আর এটা শেখোনি যে, যে বাঘটা একবার মানুষের রক্তের আস্বাদ পেয়েছে, সে আর মানুষ খাওয়া ছাড়তে পারে না?...তুমি হয় ত ব'লবে যে, সেজন্য এই বয়সে একটা বিয়ের ভণ্ডামী না ক'রে আর পাঁচজনে যা করে, আপনিও কেন সেইরকম একটা কিছু ব্যবস্থা করুন না।...হ্যাঁ—সে একটা সৎ পরামর্শ বটে,—আর আমিও এই পাকাচুলে টোপর পরে' বিয়ের বরের সঙ্‌ সেজে রঙ্‌-তামাসা করতে নিশ্চয়ই যেতুম না—যদি আমার ঘরে উপযুক্ত ছেলে-বউ বা নাতি-নাত্নী থাক্‌তো। কিন্তু আমার ঘর যে একেবারে খালি বাবাজী! তাছাড়া বেলা দশটার মধ্যে রান্না-বান্না সেরে কে আমাকে অফিসের ভাত দেবে বলো? বাসন-পত্রগুলোই বা মাজে কে—ঘর-দোরগুলোই বা ধোয়া-মোছা করে কে? বিছানা-মাদুরই বা পাতে কে, সন্ধ্যেয় আলো দেবে কে, দরকার হলে তামাক সেজে দেবে কে, রোগে পড়লে সেবা শুশ্রূষা করবে কে?—অর্থাৎ কি জানো? —বিয়ে ত' ক'রলে না কখনও—তা' বুঝবে কি?—বিয়ে করা মানে কেবল একটি 'রাঙাবউ' নিয়ে আসা নয়—একটি মিনি-মাইনের রাঁধুনী—চাকরাণী—শুশ্রূষাকারিণী—সোহাগিনী—combined!—এ বাবা, সেই শালগ্রাম শিলার সামনে উবু হ'য়ে বসে' মন্ত্র আউড়ে, মালা বদল না করলে,—পাবার জো নেই! কাজে কাজেই আমাকে বাধ্য হয়ে এই বার-বার তিনবার তাই করতেই যেতে হ'চ্ছে!"

বলেই উপেনবাবু চলে যাচ্ছিলেন—আমি তাঁর হাতটা আবার চেপে ধরে বললুম—"দেখুন, বিয়ের নামে এতবড় ফাঁকি আর কোনও দেশেই নেই। শালগ্রামের চেয়েও বড় শিলা ছুঁয়ে এবং সারারাত মন্ত্র পড়ে বিবাহ করলেও দুটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও প্রেমের সম্পর্কশূন্য মানুষের এই লোক-দেখানো সামাজিক নিয়মাধীন বিবাহকে আমি কিছুতেই ধর্ম্ম-বিবাহ বলে মানতে পারিনে! বরং আমি বিশ্বাস করি যে, মন্ত্র বাদ দিয়েও এবং শিলা-বিগ্রহের অবর্ত্তমানেও দু'টি মানুষের যেখানে প্রেমের দেউলে পরস্পরের সঙ্গে হৃদয়-বিনিময় হয়, সেখানে বাইরের মাল্য-বিনিময় ব্যাপারটা না ঘটলেও, তাদেরই মধ্যে যথার্থ সত্য-বিবাহ হয়। আপনি যে সেবা-যত্নটুকু পাবার প্রয়াসী, তা যদি প্রেমের ভিতর দিয়ে অনুপ্রাণিত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত না হয়—সে যদি শুধু ভরণ-পোষণেরই প্রতিদান স্বরূপ ও শাসন-উৎপীড়নের আশঙ্কাতেই কেবল পাওয়া যায়—তা'হলে সে সেবায় সন্তুষ্ট হতে পারা যায় কি?—সে যত্নে ত' তৃপ্তি লাভ হয় না—তার কোনও মূল্য নেই!"

এইখানে হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে সুরেশ বলে উঠ্‌ল—"ঠিকই ত। নিশ্চয়। তুমি ত দেখছি ঠিক আমারই মনের কথা টেনে বলেছিলে যতীনদা'! আমিও ঠিক ওই কথা বলি। আমাদের অভিভাবকেরা আমাদের নিয়ে যেন 'পুতুলের' বিয়ে দিয়ে তাঁদের সংসার-খেলার সখ মেটান্‌!"

পাশ থেকে ফোঁস্ ক'রে উঠে, কমলা সুরেশের দিকে তার ডাগর চোখ ছুটি মেলে ধরে ব'ললে "বটে—বটে? তা'হলে আমাদের বিবাহটা একেবারে অসিদ্ধ—কেমন? আমি যা করি তা কেবল ভরণ-পোষণের বিনিময়েই—না? আমাদের কেবল মালা-বদলই হয়েছে, কিন্তু মনের মিল হয়নি ত?"—

অনুরূপা কমলার মুখে হাতচাপা দিয়ে বললে, "আমরা আজ বক্তা নই, আমরা আজ শ্রোতা বোন্। তুমি ভাগ্যবতী —তোমার জীবনের জুয়াখেলার রাত্রে দেবতুল্য স্বামী পেয়েছিলে—ভালবেসে ও ভালবাসা পেয়ে সার্থক হয়েছো কিন্তু সকলের ভাগ্য ত আর তোমার মতো সুপ্রসন্ন হয় না!"

"ঠিক বলেছো বৌদি, কমলাকে পেয়ে যে আমি সুখী হ'তে পেরেছি'—এটা আমার পূর্ব্বজন্মের অনেক সুকৃতির ফলে এবং কতকটা অবশ্য কমলার নিজগুণেও বটে!" বলে কমলার দিকে ফিরে সুরেশ মুখ টিপে হাসতে লাগ্‌ল'।

যতীন বললে "আচ্ছা, ও চিরন্তন দাম্পত্য-কলহটা উপস্থিত স্থগিত রেখে আমার বক্তব্যটা আগে শুনে নাও, —রাত বাড়ছে! 'পাপ্‌ড়ী' আমার এই মাদুরের উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে দেখ্‌ছি। একে বিছানায় তুলে শুইয়ে দাও তো অনুপ্।"

* * * *

"হ্যাঁ, তারপর উপেন বাবু ত কোনও কথাই শুনলে না ভাই,—কবে যে একদিন চুপি চুপি বিয়ে করে এসেছিল কিছুই টের পাইনি। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে উপেনবাবুর বাড়ী থেকে নারী-কণ্ঠের কাতর চীৎকার শুনতে পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল! আমি তাড়াতাড়ি উঠে বিছানার চাদরখানাই গায়ে জড়িয়ে একেবারে উপেন বাবুর বাড়াতে গিয়ে হাজির! এই ঘরেই—ঠিক অমনি জায়গাতেই এক খানা সাবেক ধরণের খাট পাতা ছিল। ঘরে ঢুকে দেখি—সেই খাটের এক পাশের একটি দণ্ড আঁকড়ে ধরে অসুর-ভয়-বিহ্বলা দেববালার মতো একটি বছর সতেরো আঠারোর অনুপমা সুন্দরী তরুণী দাঁড়িয়ে ঝড়ের ফুলের মতো থর্-থর্ করে কাঁপ্‌ছে ও কাতর স্বরে কাঁদছে! আর সুরাপানোন্মত্ত উপেন বাবু তার রাশিকৃত ভোমরার মতো কালো চুলের গোছা মুঠোর মধ্যে টেনে ধরে তাকে জড়িত 'জিহ্বায়' বিকৃতকণ্ঠে অশ্রাব্য, অকথ্য, গালাগালি দিচ্ছে ও মাঝে-মাঝে টলিত চরণে পদাঘাত ক'রছে! চকিতের মধ্যে ঘরের আশপাশে চেয়ে দেখলুম—এক কোণে একটা হ্যারিকেন আলো জ্বলছে, ঘরের মেঝেয় খাবারের থালা ঢাকা-খোলা প'ড়ে; খাবার কতকটা ইতস্ততঃ ছড়ানো,—জলের গেলাসটাও একটু দূরে যেন ছিট্‌কে গিয়ে পড়েছে, এমনি ভাবে উল্টে রয়েছে। নিমেষের মধ্যে আমি বুঝতে পারলুম যে একটু আগে এই ঘরে দুরন্ত মাতালের কী দৌরাত্ম্যই না হ'য়ে গেছে! বজ্রনির্ঘোষে চীৎকার করে উঠলুম—'শীগ্‌গীর ওঁকে ছেড়ে দিয়ে এদিকে সরে আসুন উপেনবাবু'।"

আমার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠে, উপেনবাবু তৎক্ষণাৎ নারী-নির্য্যাতন পরিত্যাগ করে' কতকটা যেন সংযত হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। উপেন বাবুর আক্রমণ থেকে মুক্তি পাবামাত্র সেই তরুণী ব্যাধ-বাণ-ভয়-ভীতা হরিণীর মতো ছুটে এসে আমার শরণাপন্ন হ'লো। অতি করুণ নেত্রে আমার মুখের পানে চেয়ে কাতর কণ্ঠে বললে— "আমাকে রক্ষা করুন! আমাকে আপনি বাঁচান! আমি আর একদণ্ডও এখানে থাকবো না! আমাকে আমার মামার বাড়ীতে নিয়ে চলুন—আপনার দু'টি পায়ে পড়ি!" বলতে বলতে সেই তরুণী রূপসী ভূমিষ্ঠ হ'য়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলেন।

সযত্নে সসম্ভ্রমে তাকে পায়ের কাছ থেকে হাত ধ'রে তুললুম, নির্ব্বাক বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকালের জন্য যেন নিজের অস্তিত্ব ভুলে গেলুম! সে কি বিশ্ব-বিজয়িনী রূপ! আমার চোখে মুখে সেদিন সেই মুহূর্ত্তে যে আনন্দ ও কৌতূহল দীপ্ত হয়ে উঠেছিল,—নারীর অন্তর্দৃষ্টিতে তা' হয়ত' ধরা পড়ে গেছল! প্রথম রমণী-স্পর্শে কম্পিত দেহ—আমার শিথিল মুষ্টি থেকে কোমল-কোরকের মতো তার সুকোমল হাত দু'খানি টেনে নিয়ে সে নতশিরে আবার অনুরোধ ক'রলে "আমায় নিয়ে চলুন!"

আমি এবার লজ্জিত হ'য়ে তাড়াতাড়ি বলে ফেললুম— "হ্যাঁ, চলুন,—আপনার মামার বাড়ী কোথা?"

"শ্যামবাজারে—নিকাশী পাড়ায়—"

"বেশ, তাঁর নাম-ঠিকানা দিন—আমি এখনি পত্র লিখে তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি,—আপনাকে এই রাত্রেই তিনি এসে যেন নিয়ে যান।"

সহসা তরুণীর মুখখানি গম্ভীর হ'য়ে গেল। সে যেন এবার বুঝতে পারলে—আমাকে এতক্ষণ সে কি অসম্ভব অনুরোধই করছিল! বললে—"তিনখানা চিঠি আমি তাঁকে লিখেছি—কিন্তু তবু তিনি আসেন নি,—জবাবও দেন নি কিছু,—সুতরাং আমাকেই কোনও রকমে সেখানে গিয়ে হাজির হ'তে হবে!"

"কেন, তিনি আসবেন না কেন? আপনার এখানে কষ্ট হচ্ছে শুনলে তিনি নিশ্চয়ই আসবেন।"

"অতটা স্নেহের পাত্রী যে আমি তাঁদের নই, এ কথাটা স্বীকার ক'রতে লজ্জা হলেও, এ অতি সত্য কথা। আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, আমি তাঁদের গলগ্রহই হয়ে ছিলেম—নইলে, বিন্দুমাত্র স্নেহ থাকলে, কখনই তাঁরা আমাকে এমন এক অমানুষের হাতে বিলিয়ে দিতেন না!" ব'লে তরুণী তার চম্পকাঙ্গুলী নির্দ্দেশে উপেনবাবুকে দেখিয়ে দিলে।

আমি চেয়ে দেখে চমকে উঠলুম!—উপেন বাবু তখন খাটের তলায় বে-এক্তার অবস্থায় পড়ে নাক ডাকাচ্ছেন। তাঁর মুখ দিয়ে লাল গড়াচ্ছে! ঘৃণায় আমার সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো!

মেয়েটি ব'লতে লাগল—"কিন্তু, তবু, স্নেহের একান্ত অভাব সেখানে জেনেও, আমায় আজ সেইখানেই ফিরে যেতে হবে!" বলে সে এবার অসহায়ের মতো আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলে। আমাকে দেখে তার দৃষ্টিতে যেন একটা পরিচয়ের আভাস ফুটে উঠল! অনেকক্ষণ তার সে চোখ দু'টিতে আর পল্লব পড়ল না,—সেই সুযোগে আমিও দেখ্‌ছিলেম—কি সুন্দর তার সেই ডাগর দু'টি চোখ! কী সে চোখের ভাষা!—তাই পড়বার জন্যে আমি বোধ হয় নিজের অজ্ঞাতসারে সেই মুখের দিকে একটু অতিরিক্ত ঝুঁকে প'ড়েছিলুম—হঠাৎ তার সেই কাজলের মতো কালো দু'টি আঁখি-তারার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে দেখতে পেয়ে চমকে উঠলুম! মুখটি নীচু করে—লক্ষ্মীর আল্‌পনার মতো তার পা দু'খানির দিকে চেয়ে ব'ললুম—"তা দেখুন, আমার মনে হয়—যেখানে স্নেহের একান্তই অভাব, সেখানে ফিরে যাওয়া একেবারেই অনুচিত।"

মেয়েটিও এবার মুখ নীচু করলে; বললে "সে কথা মানি; কিন্তু এ নরক-কুণ্ডতে যে আর আমি তিষ্ঠতে পারছি নে! মামার বাড়ী আমার পক্ষে মরুভূমি হলেও সেটা এর চেয়েও ভয়ানক নয়। অনাদরে আমি আশৈশব অভ্যস্ত বটে, কিন্তু এ অত্যাচার আমার অসহ্য!"

সেই মেয়েটির কথা বলবার ধরণ আমাকে যেন একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে দিচ্ছিল! বললুম—"দেখুন, এ স্থান যে আপনার পক্ষে স্বর্গ নয়, সেটা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু, তবু—বিবাহের বলে এখানে আপনার একটা নিজস্ব অধিকার আইনতঃ স্থাপিত হয়েছে; সুতরাং, এটাকে নরক বলে মনে হ'লেও, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকার চেয়ে বরং দুর্ভাগ্যলব্ধ এই নরকের শাসনভার গ্রহণ করাটাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নয়?"

"বুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে কি সবই মেপে করা যেতে পারে মনে করেন? জীবনে বুদ্ধিকে এড়িয়েও মানুষের অনেক কাজ করতে হয়,—বুদ্ধিমানেরা যার নাম রেখেছেন 'আহাম্মুকী' বা 'বোকামী'! কিন্তু সে কথা যাক্—আপনি কে বলুন ত? এই বুড়ো মাতালটির সঙ্গে বেশ পরিচয় আছে বলে মনে হ'লো যেন!"

"হ্যাঁ তা আছে, কিন্তু তার কারণ এ নয়, যে, আমিও একজন মাতাল! তার কারণ হচ্ছে—আপনাদের বাড়ীর গায়েই আমাদের বাড়ী। আমরা পরস্পরের নিকটতম প্রতিবাসী!"

মেয়েটি একটি কথাও কইলে না। মাথা নত করে অনেকক্ষণ কি ভাবতে লাগল। আমিও চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম; শুধু মেঝের উপর নিদ্রিত মাতালের শুরু নিশ্বাস-ধ্বনি ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল।

হঠাৎ মুখ তুলে মেয়েটি বললে "দেখুন, আমি আপনাকে বন্ধু-ভাবে বিশ্বাস করে কতকগুলো কথা বলতে চাই। আমার বড় বিপদে সাহায্য করবার জন্য ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন, আমি এ সুযোগ হয় ত' আর পাবো না। আপনাকে বলি শুনুন,—এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই যে, আমি এই দুর্দ্দান্ত মাতাল বর্ব্বর বৃদ্ধ পশুকে মনে প্রাণে কিছুতেই স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারছিনি! আজ এই তিন মাস ধরে নিজের সঙ্গে কত যুদ্ধ করিছি। হিন্দুনারীদের সতীত্বের আদর্শ-কাহিনী সব স্মরণ করে আমি এই অমানুষকেই আত্মসমর্পণ করবো বলে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছিলুম! কিন্তু, কিছুতেই তো তা পারলুম না। দেহ মন দুই-ই আমার বিপক্ষে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠলো! ওর স্পর্শ

আমাকে পীড়া দেয়! ওর আদর আমাকে আঘাত করে! তাই সর্ব্বরকমে আজও স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করতে আমি পারিনি। যথাসাধ্য সাংসারিক গৃহকর্ম্ম করে যাচ্ছি বটে, কিন্তু কেবলমাত্র তাতেই এ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হ'তে পারছেনা, ক্রমে এ অধীর হ'য়ে উঠে এখন আমাকে নির্য্যাতন করতে সুরু করেছে! সুতরাং আপনার কথামতো এই দুর্ভাগ্যলব্ধ নরকই আমার জন্মান্তরের দুষ্কৃতির ফল ব'লে মেনে নিয়ে চলাও যে আমার পক্ষে কতখানি দুষ্কর, তা' বোধ হয় বুঝতে পারছেন? আমি এখন কি করবো—আমাকে সৎপরামর্শ দিন!"

আমি বললুম "এরূপ প্রশ্নের সহসা কোনও উত্তর দেওয়া কঠিন। আমি একটু ভেবে দেখবার সময় চাই।"

মেয়েটি আবার প্রশ্ন করলে "আচ্ছা, যাকে আমি স্বামী বলে মনে-প্রাণে বরণ করে নিতে পারিনি—এবং কখনও হয় ত'পারবো বলে যেটা কিছুতে কল্পনা পর্য্যন্ত করতে পারছিনি, তার সঙ্গে একটা বিবাহ ব্যাপারের অভিনয়মাত্র হয়েছে বলেই কি আজীবন আমাকে তার কাছে ক্রীতদাসীর মতো থেকে নিগৃহীত হ'তে হবে?"

আমি বললুম "হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ সেই রকমই উপদেশ দেন কিন্তু!"

অধীর হ'য়ে মেয়েটি বলে উঠল "আমি সে শাস্ত্র ও সে সমাজকে অস্বীকার করতে চাই! আমি হৃদয়ের ধর্ম্ম ছাড়া অন্য ধর্ম্ম মানবোনা! আমি বিবেকের শাস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও শাস্ত্র-উপদেশও গ্রাহ্য করবো না!"

সেই তেজস্বিনী তরুণীর এই স্বাধীনচেতার স্থায় নির্ভীক উত্তর ও দৃঢ়সঙ্কল্প শুনে আমি আনন্দে বিস্ময়ে পুলকিত হ'য়ে বলে ফেললুম—"আপনার এই অনন্যসাধারণ হৃদয়ের বল যদি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে—তাহ'লে জগতের কোনও অমানুষই কখনও আপনার লেশমাত্র অমর্য্যাদা করতে পারবে না।"

মেয়েটি এ কথায় কোনও জবাব দিলে না। অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করলে—

"আপনার স্ত্রী এখানে আছেন?"

"কেন? তার সঙ্গে কি আপনার পরিচয় আছে?"

"না, ভাবছি যে কাল দুপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি এই সব বিষয়ে আলাপ ক'রে আসবো। আপনি ঠিক আমাদের—এই বাঙালী হিঁদুর মেয়েদের—অসহায় অবস্থা অনুভব করতে পারবেন না। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে—যে স্ত্রী তার বিবাহিত স্বামীকে ভালবাসা দূরে থাক্, সহ্য করতে পর্য্যন্ত পারছে না—সে স্বামার উচিত নয় কি—তেমন স্ত্রীকে লোকতঃ ধর্ম্মতঃ বিবাহ-বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া?"

"দু'হাজার বছর আগে এ দেশে সে ব্যবস্থা ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও তার বিধান দেখতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আজ সে বিধি অচল! এখন স্বামী স্ত্রী উভয়েরই সমান অবস্থা!—যে স্বামী তার স্ত্রীকে ভালবাসতে পারে না, সে স্বামীর কি করা উচিত বলুন ত!"

"দেখুন, স্বামীর দল সৌভাগ্যক্রমে পুরুষ জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে জীবনের এ সব জটিলতা নিয়ে তা'দের বিশেষ কোনও বন্ধনের মধ্যে আটকে পড়ে থাকতে হয় না। স্ত্রীকে মনে ধরেনি বলে তাকে নিয়ে স্বামী ঘর করছে না—এ রকম অনেক শুনিছি। আপনারা তো শুধু আমাদের স্বামী নন, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী, সুতরাং যা ইচ্ছে তাই ক'রতে পারেন এবং করেন-ও!"

"হাঁ—সে কথা ঠিক বটে, কিন্তু আপনার হঠাৎ এরকম সন্দেহ হবার কারণ কি যে আমার স্ত্রী আমাকে ভালবাসেন না?" বলে আমি তাঁর দিকে চেয়ে একটু হাসলুম। তিনি যেন একটু অপ্রতিভ হ'য়ে ব'ললেন "না—না, আপনার সম্বন্ধে আমি কেন তা মনে করতে যাবো? আমি আমার নিজের কথাই বলছিলুম। আপনার ভাগ্যবতী স্ত্রী নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবেসে সুখী হ'তে পেরেছেন।"

আমি কৌতূহলী হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলুম "আপনার এরকমই বা ধারণা হবার কারণ কি—জানতে পারি?"

মেয়েটি জেরায় পড়ে বলে ফেললে "বাঃ! আপনি এমন উদার—এমন মহৎ—এমন সুন্দর—" বলতে বলতে হঠাৎ তার দৃষ্টি আমার চোখের উপর পড়তেই কি জানি কেন সে আর কিছু বলতে পারলে না! তার সুন্দর মুখখানি লজ্জায় যেন শরতের প্রভাতের মতো রাঙা হ'য়ে উঠল! সে মাথাটি নত ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ তোমাদের কাছে এ কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই, যে, সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত অন্তর

এই মেয়েটির প্রতি একটা গভীর অনুরাগে ভরে উঠেছিল, এবং হয় ত আমার চোখের দৃষ্টিতে সে অনুরাগ খানিকটা প্রকাশ হয়ে পড়েছিল, যা দেখে—মেয়েটিও সরমে রাঙা হ'য়ে উঠেছিল। আমি সহাস্য প্রফুল্ল মুখে বললুম—"আপনি হয় ত' শুনে আশ্চর্য্য হবেন যে, আমি এখনও অবিবাহিত! তবে আপনি যদি কাল অনুগ্রহ করে আমাদের বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেন, তাহ'লে আমার মা জননী যে আপনাকে একটুও অনাদর ক'রবেন না—এটা ঠিক!"

এবার মেয়েটির চোখে মুখে একটা কৌতূহল ফুটে উঠ্‌তে দেখা গেল! সে জানতে চাইলে—আমি এখনও বিবাহ করিনি কেন? আমি বললুম—"আজ থাক্‌, আর একদিন সেকথা বলবো।"

নারীর কৌতূহল কি না!—সে আবার প্রশ্ন করলে—

"আপনার মা ঠাকরুণ এজন্য আপনাকে পীড়াপীড়ি করেন না?"

"সে বিষয়ে সন্তানের প্রতি মায়ের কর্ত্তব্যের এক দিনও অবহেলা হ'তে দেখিনি। প্রতিদিন খেতে বসলেই মা আমার নব-নব ভাবী-বধূর সন্ধান দিতে বসেন।"

"তার কোনটিকেই বুঝি আপনার মনে ধরে না?"

"দেখুন, আমার মনে-মনে পত্নীর একটা আদর্শ আছে। আমি শুধু একটি সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করে এনে কেবলমাত্র তাকে আমার শয্যাসঙ্গিনী করে রাখতে চাইনি। তাকে আমার জীবনেরও সঙ্গিনী ক'রে নিতে চাই। নইলে, আমার বিশ্বাস—দাম্পত্য জীবনের আনন্দ অপূর্ণ থেকে যায়। সেই জন্যে আমি মনে করি—শিক্ষিত যুবকদের স্ত্রী বিদুষী না হোন্ অন্ততঃ শিক্ষিতা হওয়া দরকার! আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ক'য়ে মনে হচ্ছে—আপনি একজন বেশ চিন্তাশীলা শিক্ষিতা মহিলা! অমন কংস-মাতুলের অধীনে থেকে এত অল্প বয়সে শিক্ষার এতখানি উৎকর্ষ লাভের সুযোগ পেলেন কেমন করে জান্‌তে পারি কি?"

"কই আর শিক্ষার কিছু অবসর পেলুম বলুন। যে ক'দিন বাবা বেঁচে ছিলেন,সেই ক'দিনই ইস্কুলের মুখ দেখতে পেয়েছিলুম। তারপর এই তিন চার বছর মামার বাড়ীতে এসে আমার ইস্কুলের পাঠ চুকে গেছে, মামার বাড়ীতে লুকিয়ে চুরিয়ে যতটা পারতুম পড়াশুনো করতুম। বাবা আমার যেমন গান-বাজনা ভালবাসতেন—মামা ঠিক্ তেমনিই তার বিরোধী! মামার বাড়ীতে এসে ঢুকতে না ঢুকতেই আমার এস্রাজ আর হারমোনিয়মটা মামা কেড়ে নিয়ে বেচে দিয়েছেন।"

"বাঃ—আপনি গানবাজনাও জানেন বুঝি? আমি নিজে ওটা এত পছন্দ করি!"

"তাই না কি? তাহ'লে আপনি নিশ্চয় আপনার স্ত্রীর গানবাজনায় আপত্তি না ক'রে তাকে সে বিষয়ে উৎসাহই দেবেন—কি বলুন?"

"আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি আর বিবাহই করবো না স্থির করিছি। আদর্শ অনুযায়ী মনের মতো পত্নী পাওয়া হিন্দুঘরের ছেলেদের পক্ষে একান্ত দুর্লভ!"

"আর মনের মতো আদর্শ পতি পাওয়া বুঝি হিন্দু ঘরের মেয়েদের পক্ষে বেশ সুলভ? দেখুন—আপনাদের এই স্বার্থপরতার জন্য আপনাদের উপর আমার ভয়ানক রাগ হয়। আপনারা যখন ভাবেন তখন কেবল নিজেদের কথাই ভাবেন, আমাদের কথা আপনাদের কিছুই মনে থাকে না।"

"খুব থাকে,—কেমন করে স্ত্রীলোকদের শাসন করবো,—কি ভাবে তাদের শাস্তি দেবো—কিসে তাদের একেবারে নিজস্ব সম্পত্তি করে রাখতে পারবো—এ সব আমরা গোড়া থেকেই ভেবে রেখেছি!"—বলে আমি খুব খানিকটা হেসে উঠলুম। মেয়েটিও হেসে ফেললে! কোজাগরী পূর্ণিমার মতো কী সুন্দর সে হাসি! আমি গম্ভীর হ'য়ে বললুম "দেখুন, আপনারা নিজেরা যতদিন না নিজেদের জন্য ভাবতে শিখবেন, ততদিন মুক্তির দিকে এক পাও অগ্রসর হ'তে পারবেন না!"

"সে কথা মানি, কিন্তু পাছে আমরা ভাবতে শিখি বলেই ত' আপনারা আমাদের মূর্খ করে রেখেছেন! পাছে আমরা কোনও দিন এগিয়ে যাই বলেই ত' চিরকাল বন্দিনীর মতো লক্ষ্মণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছেন!"

আমি হাত জোড় ক'রে বললুম "আমাকে মাফ্ করুন। আমি সমস্ত অপরাধ মাথা পেতে নিচ্ছি। আজ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে আমি যে দুর্লভ সম্পদ ও অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করলুম, এর মধুর স্মৃতিকে নরনারীর চিরন্তন দ্বন্দ্বের ঝটিকা তুলে আমি কিছুতেই একটা অপ্রীতির মধ্যে শেষ হ'তে দেব না।"

মেয়েটি লজ্জানত মুখে বললে "সে আনন্দ ও সম্পদ কেবল আপনারই একার লাভ হয়েছে মনে করলে একটু ভুল করবেন। তা ছাড়া, এ কথাও আজ আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি, যে, আজ আপনার সঙ্গে দেখা না হ'লে হয় ত এ বাড়ী ছেড়ে যাবার জন্য আমি সাংঘাতিক একটা কিছু ক'রে বসতুম!"

ঢং ঢং করে দেওয়ালের গায়ের বড় ঘড়ীতে রাত্রি তিনটে বেজে গেল।

আমরা দু'জনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলুম। দু'জনেরই দৃষ্টি এক-সঙ্গে গিয়ে পড়ল, প্রথমটা ঘড়ীর কাঁটার উপর; তার পর সেই ঘরের মেঝের উপর নেশায় ও নিদ্রায় অচেতন মাতাল উপেন্দ্রের উপর। মেয়েটি মুখখানি ঘৃণায় সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন একটা তৃপ্তির দৃষ্টি বিকীর্ণ করে স্মিত অধরপ্রান্তে বললে—

"তাইত' আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে দেখছি রাত্রি ভোর হ'য়ে গেল! আপনাকে অনেকক্ষণ আট্‌কে রেখেছি—ঘুমের ব্যাঘাত হ'ল ক'ত! তা—কি করবো বলুন, অপরাধ নেবেন না, এরকম দুর্দান্ত প্রতিবেশী থাকলে পাশের বাড়ীর লোকেদের সুস্থ হ'য়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানো সব দিন ঘটে ওঠে না!"

এবার মেয়েটির চোখ দুটি পর্য্যন্ত হেসে উঠল!

আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে অপরাধীর মতো বললুম,—"আমাকে মাফ্ করবেন! এত রাত পর্য্যন্ত আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, কিছু টের পাই নি—কত কষ্ট হ'ল আপনার! আমি চল্লুম, আপনি ভয় পাবেন না—কাল থেকে আপনার এই নরক-যন্ত্রণা যাতে বন্ধ হয় আমি প্রাণপণে সে চেষ্টা ক'রবো—"

বলতে বলতে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলুম; আসতে আসতে দালান থেকে শুনতে পেলুম মেয়েটি বলছে—"কষ্ট বরং আমিই দিলুম আপনাকে অনেক—কিন্তু সে যে কী অবস্থায় পড়ে' সেইটুকু বিবেচনা ক'রে আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর'বেন!"

* * *

যতীন এইখানে থেমে যেতেই সুরেশ আগ্রহে বলে উঠল "তার পর? তার পর?—এ যে ক্রমেই চিত্তাকর্ষক হ'য়ে উঠ্‌ছে! মেয়েটির বিদুষীর মতো কথাবার্ত্তা শুনে, তার গান বাজনা ও লেখাপড়া জানার পরিচয় পেয়ে—আমার মত বিবাহিত লোকেরই তাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে!"—এইখানে কমলা ব'লে উঠ্‌ল "শুন্‌ছো তো অনুপদি'!—আমার ওপর ওঁর ভালবাসার টান কতটা বুঝ্‌ছ' তো?" সুরেশ এ কথায় মোটেই কাণ না দিয়ে যতীনকে বললে—"তুমি যতীনদা' অবিবাহিত অবস্থায় নিশ্চয়ই তাকে ভালবেসে ফেলেছিলে—না?"

যতীন হাসতে হাসতে বললে, "তা হয় ত' সেই প্রথম সাক্ষাতেই আমি তাকে আমার অজ্ঞাতসারে অনেকখানিই ভালবেসে ফেলেছিলুম!"

এইবার অনুরূপা বললে—"ওই শোনো কমল, সব শেয়ালেরই এক ডাক ভাই! পুরুষ মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক!"

যতীন এ কথায় উত্তর না দিয়ে হেসে বললে—"নইলে—তার পরে যে ঘটনা ঘটেছিল তা কখনই ঘটতো না! সেই কথাই বোল্‌বো এইবার—শোনো—

"তার পর প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। একদিন আমাদের ঐ দক্ষিণের বারান্দায় ইজি চেয়ারখানায় বসে রবীন্দ্রনাথের নূতন একটি কবিতা পড়'তে পড়'তে আমি তখন তন্ময় হ'য়ে গেছি—

"যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমার দিনগুলি!"

হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে এস্রাজের সুমধুর ঝঙ্কার এসে আমার প্রাণের সমস্ত তারগুলোতে একটা সুরের মূর্চ্ছনা তুলে দিলে! আমি আগ্রহে উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম। ধীরে ধীরে এস্রাজের পর্দ্দায় পর্দ্দায় সুর মিলিয়ে একটি কোকিল কণ্ঠের সুস্বর-লহরী সঙ্গীতের বিচিত্র তানে আমার কাণে ভেসে আসতে লাগল—

"রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হ'ল সেই মোহানার ধারে!"

ঘুরে-ফিরে অনেকবার বেজে-বেজে গানের সঙ্গে সঙ্গে এস্রাজও থেমে গেল। আমি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার আমার হাতের কবিতাটিতে মনঃসংযোগ করবার চেষ্টা করলুম। তখন দিবালোকের দীপ নিবিয়ে দিয়ে সন্ধ্যার আঁধার আঁচল পৃথিবীর বুকের উপর লুটিয়ে পড়ছিল। তারই নীল শাড়ীর সোণালী ফুলের মতো দু'একটা তারা আকাশের গায়ে ঝিকমিক্ করছিল বটে, কিন্তু সে আলোয় বইয়ের লেখা আর স্পষ্ট পড়া যাচ্ছিল না। তবু আমি পড়বার

চেষ্টা করছিলুম। এমন সময় যেন সন্ধ্যার ধ্যান ভঙ্গ করে, আমার চিত্তকে সচকিত করে, এস্রাজের সুরের সঙ্গে আবার সেই সুধাকণ্ঠ ধ্বনিত হ'য়ে উঠল।—কাণ পেতে শুনতে লাগলুম—

"ভোরের বেলা কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেছে ভেসে।
"মনে হল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হ'ল সকল দেহ
পূর্ণ হল গানে গানে,
হৃদয় যেন শিশির নত
ফুটল পূজার ফুলের মত
জীবন-নদী কূল ছাপিয়ে
ছাড়িয়ে গেল অসীম দেশে।"

এস্রাজের সুর আর সঙ্গীতের ধ্বনি এবার যে কখন থেমে গেছল' আমি কিছুই টের পাইনি। আমার তখন মনে হচ্ছিল 'আকাশ যেন কইছে কথা কানে কানে……সকল দেহ পূর্ণ হল' গানে গানে!' মনে হচ্ছিল যেন 'আমার জীবন নদী কূল হারিয়ে অসীম দেশে ছড়িয়ে পড়ছে!'…… হঠাৎ উপেনবাবুর কণ্ঠস্বরে আমার চমক্ ভাঙল। চেয়ে দেখি বারান্দার বিজলী-বাতিটা জেলে দিয়ে উপেনবাবু আমার ইজি চেয়ারের হাতলের উপর হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে আমার দিকে চেয়ে বলছে—

"এ কি, সন্ধ্যের ঝোঁকে চোখ বুজিয়ে বারান্দায় বসেই বেশ একঘুম দিয়ে নিলে যে দেখছি! অবেলায় ঘুমোনো বড় খারাপ, উঠে পড়ো বাবাজী!"

আমি বললুম "ঘুমাবো কেন? আপনার স্ত্রীর গান শুনছিলেম এখানে বসে। কী চমৎকার গান করেন উনি! এমন মিষ্টি গলা আমি আর কখন শুনিনি, আর এস্রাজেও এমন সুন্দর হাত আমি আর কারুর দেখিনি!"

"তা তো মনে হবেই! ও তোমাদের বয়সের ধর্ম্ম! ও বয়সে মেয়েছেলেদের সবই ভাল লাগে।" বলে উপেনবাবু খুব খানিকটা অসভ্যর মতো হেসে উঠলেন। আমি গম্ভীর হয়ে বল্লুম "তা নয় উপেনবাবু, আপনার স্ত্রী সত্যই একজন গানের গুণী ও সুরের সিদ্ধাঙ্গনা। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি তা জানেন না!"

"তুমিই ত বাবাজী ছুঁড়িটের মাথা খেয়ে দিয়েছো! সেই যে এক এস্রাজ কিনে দিয়ে এসেছিলে কোন্ মান্ধাতার আমলে, সেটাকে ত ও আর কাছ-ছাড়া করে না দেখতে পাই! যখনই সময় পায় সেটাকে বুকের উপর টেনে তুলে নিয়ে বাজায়! আবার মধ্যে মধ্যে গানও করে! একেবারে বাঈজীর বেহদ্দ হ'য়ে উঠেছে বাবাজী! বুঝলে! গেছলুম একদিন তেড়ে—তোমার বারণ না মেনে—ওটাকে কেড়ে নিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলতে;—তা ছুঁড়ী বল্লে কি জানো— 'বিষ খেয়ে মরবে!' আর ভয় দেখালে যে পুলিশে চিঠি লিখে দিয়ে যাবে যে আমিই তাকে বিষ খাইয়ে মেরেছি! দেখো দেখি বাবা কী শয়তানী বুদ্ধি মেয়েমানুষের! একেবারে ফাঁসি-কাঠে তুলে দেবার মৎলব! সেই থেকে আর ভয়ে ওকে কিছু বলতে পারিনি! লেখাপড়া-জানা মেয়ে—কি জানি যদি কিছু করেই বসে! আজকালকার মেয়েগুলোকে একটু বিশ্বাস নেই, এরা সব কর'তে পারে!"

"আপনি বুঝি গান-বাজনা লেখা-পড়া—এসব একেবারেই পছন্দ করেন না?"

"এই দেখ ত' বাবাজী তোমার অন্যায় কথা! আমি গান-বাজনা পছন্দ করবো না কেন, তা বলে কি ঘরের বউকে খেমটাউলী করে তুলতে হবে? তাহ'লে বাইরের বাঈজীতে আর ঘরের স্ত্রীতে তফাৎ রইল কি? আর, তুমি যাই বলো বাবাজী, ও মেয়েছেলের গুষ্ঠী বেশী লেখাপড়া শিখলেই একেবারে মাষ্টার মশাই হ'য়ে ওঠে। সে আর ঘরের লক্ষ্মীটি থাকে না!"

উপেনবাবুর যুক্তি শুনে আমি না হেসে থাকতে পারলুম না। তিনি বললেন—"না বাবাজী, এ হেসে উড়িয়ে দিলে চলবে না! আমি এসব মোটেই পছন্দ করিনি, তাই তোমার কাছে এলুম, তোমাকে এটা বন্ধ করে দিতে হবে!"

আমি আরও হেসে উঠে বললুম "সে কি ব'লছেন উপেন বাবু, আমি বন্ধ করবার কে? আমার কী অধিকার আছে? আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে উনি আপনারই স্ত্রী—আমার কেউ নন!"

"তা ব'ল্লে কি হয়! ও যে আমাকে গ্রাহ্যই করে না। তোমার কথা কিন্তু ও বেদবাক্যের মতো শোনে!"

"তাই না কি?"

"তবে আর ব'লছি কি? কথায় কথায় আমাকে চোখ রাঙিয়ে বলে 'খবরদার, গায়ে হাত দিও না,—কেবল 'অমুক' বাবুর অনুরোধেই আমি তোমার বাড়াতে থাকতে সম্মত হয়েছি। নইলে অনেক দিন আগেই এখান থেকে চলে যেতুম!'—ভাল বিপদে পড়িছি বাবা এই তেজপক্ষের স্ত্রী নিয়ে! আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না, আমার ত্রিসীমানায় ঘেঁসে না, কেবল কলের মতো দুটি বেলা সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে। ঠিক টাইম মত সব পাচ্ছি। ঘরদোরগুলোও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখেছে, আর রাঁধেও ভাল! কিন্তু ওই একটা ভারি দোষ—বড় একগুঁয়ে! তোমাকে যে ও কী সুচক্ষে দেখেছে কে জানে? আর তুমিও তো বাবাজী ওর প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠো! তাই বোধ হয় তোমার মা ঠাকরুণ সেদিন ওর কাছে বলেছেন যে 'তোমার মতো একটি মেয়েকে আমার যতীনের জন্যে খুঁজে এনে দিতে বোলোতো মা, উপেনকে! তোমার মত একটি বউ আনতে পারলে আমার বিবাগী ছেলেকে নিশ্চয় সংসারী করতে পারবো!' কথাটা আমারও কেমন প্রাণে লাগ্‌ল বাবাজী, মনে হ'লো বটে, দুচারবার যে—এই মাষ্টারনী মেয়েটাকে আমি বিয়ে না করে যদি তুমি বিয়ে করতে তাহ'লে তোমরা দু'জনেই সুখী হ'তে পারতে! আর আমার এ হয়েছে যেন সাপে ছুঁচো গেলা! নেশা কেটে গেলেই বুঝতে পারি, আমি ও মেয়েটার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলেরও যোগ্য নই! যে ঠিক্ ওর যোগ্য তাকে কিন্তু ও চিনে নিয়েছে! ভারি intelligent মেয়ে বুঝ্‌লে—" বলে উপেনবাবু আবার সেই অসভ্য হাসি হেসে উঠলেন।

বাধা দিয়ে আমি বললুম "থামুন উপেনবাবু, আজ দেখছি সন্ধ্যে থেকেই মাতলামী সুরু কর'লেন!"

উপেনবাবু চোখ দুটো কপালে তুলে বললে "বল কি বাবাজী! মাসের এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হাতে কি এখন আর একটি আধলাও আছে? কাল কি বাজার হবে তারই সংস্থান নেই! মদ খাবো কোথা থেকে? আমি এসেছিলুম, তোমার কাছে গোটাকুড়ি টাকা ধার করতে। এই ক'টা দিন চালিয়ে দাও বাবাজী; মাসকাবারে মাইনে পেলেই দিয়ে যাবো। আর একটা মাস সবুর করো না, তোমার জন্যেও আমি ঠিক অমনি একটি মেয়ে যেখান থেকে পাই খুঁজে এনে হাজির করে দিচ্ছি—তোমার মা ঠাকরুণের অনুরোধ আমাকে রাখতেই হবে।"

আমি বিরক্ত হ'য়ে বললুম "আমার মা ঠাক্‌রুণের এখনও ভীমরতি হয়নি যে আপনাকে আমার জন্য ঘটকালী করতে অনুরোধ করবেন। এসব কার কাছে শুনলেন?"

"আরে! আমি কি মিছে কথা বলছি? আমার স্ত্রীর কাছে তোমার মা ঠাকরুণ নিজে বলেছেন। সেই ত সেদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে যে, "হিন্দুর মেয়ের মরণ ভিন্ন আর জীবনের ভুল শোধরাবার উপায় নেই, তাই তোমার মতো এক অমানুষেরও অন্ন গ্রহণ করতে হ'চ্ছে আমাকে! এর চেয়ে যদি ও বাড়ীর মায়ের দাসী হয়েও তাঁর চরণ-সেবার অধিকার পেতুম—জীবন আমার ধন্য হ'তো!"

আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠ্‌ল! তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ড্রয়ারের ভিতর থেকে দু'খানা দশ টাকার নোট বার করে এনে উপেনবাবুর হাতে দিয়ে বললুম—

"এই নিয়ে যান, মদ খেয়ে যেন এ টাকাটা ওড়াবেন না। যদি শুনি যে এই ক'দিনের ভিতর আপনি মাতলামী করেছেন—তা'হলে আর কখন একটি পয়সাও আপনাকে সাহায্য করবো না, তাছাড়া আপনার সমস্ত হ্যাণ্ডনোট আদালতে দাখিল করে আপনার নামে নালিশ রুজু করে দেবো। এ টাকাতে মাস-কাবার না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল সংসার-খরচ চালাবেন—বুঝেছেন!"

"আরে বাবাজী!—সে কথা আর অত চোখ রাঙিয়ে কড়া ক'রে ব'লতে হবে না। মদ কি আর আমার খাবার জো আছে? কাল ব্যামোয় ধরেছে যে! ডাক্তার সেদিন ব'ললে—এবার মদ খেলেই হঠাৎ একদিন মারা পড়তে পারি!"

কথাটা শুনে আমি চম্‌কে উঠলুম! উপেন বাবুর দু'টি হাত ধরে ব্যাকুল হ'য়ে বললুম "দোহাই আপনার উপেন বাবু! আর কখন ও-জিনিস ছোঁবেন না, খুব সাবধান! নেশার জন্য যেন আত্মহত্যা করবেন না!"

"আরে পাগল হ'লে তুমি! সে কি আর আমি বুঝিনি? —এতখানি বয়স হ'ল আমার! তোমরা পাঁচজন হিতৈষী যখন নিষেধ করছো, তখন কি আর আমি সে কাজ করতে

পারি? বিশেষ তোমার পরামর্শ না শুনে হাল্‌ফিল এই বিয়েটা ক'রে কী ভুলই না করিছি! এসব মেয়ে কি আর আমাদের ঘরের যোগ্য? ও তোমাদের ঘরেই মানায়—" বলতে বলতে—"আজ তবে আসি বাবা, কাজ আছে একটু" এই বলে উপেনবাবু চলে গেলেন। আমি আবার বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বারান্দাব ইজি চেয়ারখানায় এসে লম্বা হ'য়ে পড়লুম।

উনি উপেনবাবুর স্ত্রী না হ'য়ে যদি আমার স্ত্রী হ'তেন তাহ'লে আমি যে এ জীবনে নিঃসন্দেহ সুখী হ'তে পারতুম এ পাপ চিন্তা—এ আকাশ-কুসুমের ব্যর্থতার ক্ষোভ যে আমার মনের মধ্যে এর আগে বহুবার উঁকি মারে নি, এমন কথা আমি বলতে পারিনি,—কিন্তু উপেন বাবুর নিজের মুখে আজ তাঁর স্ত্রীর স্বীকারোক্তি শুনে আমি যেন আনন্দে উন্মাদ হ'য়ে উঠছিলুম। কিন্তু আমার সমস্ত আনন্দ-উন্মাদনাকে অকস্মাৎ বেদনার অন্ধকার দিয়ে গ্রাস করে ফেললে—সমুখের নিশ্চিত নিষ্ফলতার নিবিড় নৈরাশ্য!

হায়, যার কথায়, কণ্ঠস্বরে, হাসিতে, চাহনীতে, প্রতি গতি-ভঙ্গীতে অন্তরে যেন আনন্দের উৎস উৎসারিত হয়ে যায়; যাকে দেখলে চিত্ত পুলকে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে; যার ঈষৎ স্পর্শে দেহমন এক অভিনব ভাবের হিল্লোলে বিহ্বল হয়ে পড়ে; যার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় আপন অন্তরের চিন্তাধারার এমন একটা ঐক্য অনুভব করি; যার নিয়ত সঙ্গ ও সাহচর্য্যে একান্ত অভিলাষী অন্তর আমার চিরদিন বুভুক্ষুর মতো অপেক্ষা করে আছে;—আমার কিশোর প্রাতের যে রঙীন ছবি—যৌবন-নিশার যে নবীন স্বপন—আজ সে আমার কল্পনার তমসা-তীর ছেড়ে আমার চোখের সামনেই একেবারে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে;—কিন্তু, অদৃষ্টের কি পরিহাসে তার ওপর আমার কোনও দাবী নেই—আমার কোনও অধিকার নেই··· ভাবতে ভাবতে সজল চোখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম কিছু মনে নেই!

* * * *

সেই রা'ত্রেই উপেন বাবু আবার মদ খেয়েছিলেন।

তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে অতি কষ্টে যমের মুখ থেকে সাত দিন পরে বাড়ীতে টেনে নিয়ে এলুম বটে, কিন্তু 'লিভার' ও 'হার্টের' অবস্থা এত খারাপ যে, ডাক্তারেরা সকলেই পরামর্শ দিলেন যে, ওঁকে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য অবিলম্বে নিয়ে যাওয়া দরকার।

মাকে বলে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে আমি উপেন বাবুকে নিয়ে 'চেঞ্জে' চলে এলুম; ইচ্ছে ছিল একজন নার্স রাখিয়ে তাঁর সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাবো, কিন্তু, উপেন বাবুর তৃতীয় পক্ষের পত্নী বললেন যে, সেটা তাঁরই কর্ত্তব্য, সুতরাং তিনিও জেদ্ করে সঙ্গে এলেন। আমি এতে অবশ্য মনে মনে খুসীই হলুম। আমার মনের গোপন কোণে এই বাসনাই যেন লুকিয়ে ছিল!

পশ্চিমে এসেও উপেন বাবুর হৃত-স্বাস্থ্যের বিশেষ কোনও উন্নতি দেখা গেল না, বরং ক্রমেই যেন অবস্থা আরও খারাপ হ'য়ে আসতে লাগল। আমি শুধু দিনের বেলাটাই তাঁকে দেখাশুনো করতুম, কারণ রাত্রি জাগরণের পালাটা তাঁর স্ত্রীই জোর ক'রে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিলেন। আমি অনেক আপত্তি করেছিলুম, বলেছিলুম—আপনাকে আমাদের জন্য রান্না-বান্না করতে হ'চ্ছে, রোগীর পথ্য তৈরী প্রভৃতি দিনের বেলার অনেক কাজই আপনার রয়েছে, তার ওপর রাত্রি জাগরণে আপনার কষ্ট হবে।"

তিনি বললেন "আমার কষ্ট লাঘব করাই যদি আপনার আন্তরিক ও অকপট ইচ্ছা হয়, তাহ'লে জানবেন—আমাদের দুর্দ্দিনের বন্ধু নিদ্রাহীন থাকলে আমি সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাবো।"

এই ভাবেই মাসখানেক চলবার পর আমি বেশ বুঝতে পারলুম যে—আর আমার এখানে থাকা—আমার বা সস্ত্রীক উপেনবাবুর—কারুর পক্ষেই নিরাপদ নয়। এই যে তরুণী তার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও অসামান্য গুণ নিয়ে প্রতিদিন আমাকে আমার অজ্ঞাতসারে তার দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে—আমার সমস্ত সংযমের বাঁধ কে জানে সে কবে অকস্মাৎ চূর্ণ ক'রে দিয়ে বন্যার প্লাবনের মতো আমার মনুষ্যত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে?

সেইদিনই টেলিগ্রাম করে আমি একজন সরকার ও দারবানকে কলিকাতা থেকে আসতে লিখে, উপেনবাবুকে গিয়ে বললুম "দেখুন—একটু বিশেষ কাজে—" উপেনবাবু আমাকে বাধা দিয়ে ব'ললেন—"দেখ বাবাজী, একটা কথা বলি শোনো—এ পাষণ্ডকে বাঁচাবার এত চেষ্টা তুমি কেন করছো বল' তো?—বৃথা তোমার এ পরিশ্রম ও অর্থব্যয়!

আমি বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে!—যে সতীর সিঁথার সিঁদুর উজ্জ্বল রাখবার জন্য তোমার এই প্রাণান্ত চেষ্টা—যতীন, তুমি জানোনা বোধ হয়, সে আমাকে অনেকদিন আগেই স্পষ্ট মুখের উপর বলে দিয়েছে—যে—'আমার অন্তরাত্মা তোমাকে স্বামী বলে গ্রহণ ক'রতে পারলে না—আমাকে মার্জ্জনা কোরো!' আজ আমিও তার কাছে মাপ চেয়ে নেবো। তার জীবনটাকে ত' এক রকম আমিই নষ্ট করে দিলুম—কি বলো? আমি চোখ বুজ্‌লে ও দাঁড়াবে কোথায়? হাঁা, তোমার মা চেয়েছিলেন অমনি একটি মেয়ে,—বটে বটে, আমি তাঁর কাছে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেম এনে দেবো বলে, কিন্তু আর ত' সময় হবে না! ওকেই আমি দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। তোমার মা ঠাক্‌রুণকে আমার নাম করে নিয়ে গিয়ে দিও!"

"আঃ, কি বলছেন সব! চুপ করুন। ভয় কি? এই-রকম বাঁধাধরা নিয়মে দিনকতক থাকলেই সেরে উঠবেন—" এই সময় এক বাটী গরম বার্লী হাতে করে উপেনবাবুর স্ত্রী ঘরের মধ্যে এ.লন। বললেন "এ কি! বৃষ্টির ছাটে যে রোগীর বিছানা ভিজে যাচ্ছে? আপনি ত খুব তত্ত্বাবধান করছেন দেখছি!"—

আমি দেখলুম সত্যই মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে—আর তার ছাট্ লক্ষ কণায় চূর্ণ হয়ে ঘরের মধ্যে এসে উপেনবাবুর বিছানা সিক্ত করছে! আশ্চর্য্য! কখন যে বৃষ্টি নেমেছে কিছু টের পাইনি। অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি উঠে জানালাটা বন্ধ ক'রতে যাচ্ছিলেম, উপেনবাবু বললেন—"থাক্ থাক্ যতীন, বন্ধ কোরোনা, আমার এই বৃষ্টির ছাটটা বড় ভাল লাগছে! প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে!" স্ত্রীর দিকে চেয়ে ব'ললেন "ও কি এনেছ' তুমি—বার্লী বুঝি?—কি হবে?—দরকার নেই ত' আমার! আজ ক্ষিধে তেষ্টা যেন লোপ পেয়েছে!"

স্ত্রী বার্লীর বাটী হাতে নিয়ে তবু দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখে, উপেনবাবু বললেন—"বাটীটা তুমি ও-ঘরে ঢাকা দিয়ে নামিয়ে রেখে এসো,—তোমার সঙ্গে আমার আজ বিশেষ দরকারি কথা আছে,—তোমার প্রতি আমি যে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করি'ছি—আমি তার জন্তে আজ ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই!"—

উপেনবাবুর স্ত্রী বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইলেন,—সে দৃষ্টির সম্মুখে আমার চোখ নত হ'য়ে পড়লো।—তিনি বার্লীর বাটীটা ওদিকের ঘরে রেখে আসতে চ'ললেন দেখে,—আমি সেই সুযোগে তাড়াতাড়ি উপেনবাবুকে বলে নিলুম "দেখুন, একটু বিশেষ কাজে আমি আজই কলকাতা চলে যাচ্ছি!"—সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ বাইরে একটা ঝন্‌ঝন—ঝনাৎ—শব্দ ও সেই সঙ্গে-সঙ্গে গুরুভার কোনও কিছু একটা পতনেরও আওয়াজ পাওয়া গেল! সেই শব্দে রুগ্ন উপেনবাবু এবং আমি, দু'জনেই চম্‌কে উঠলুম! ব্যাপার কি জানবার জন্য আমি দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি—বার্লির বাটী-শুদ্ধ উপেনবাবুর স্ত্রী দালানে আছাড় খেয়ে পড়েছেন! মনে করলুম ছুটে গিয়ে তখনি ধরে তুলি তাঁকে—কিন্তু এমন একটা লজ্জা এসে উঁকি মারলে যে, সাহস হ'ল না!

তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম "তাই ত'! এ কি? পা' পিছ্‌লে প'ড়ে গেলেন বুঝি? বৃষ্টিতে দালানটায় বড় পিছল হয়েছে দেখছি! লাগেনি ত'?"

কাতরভাবে হাত দুটো আমার দিকে তুলে দিয়ে তিনি বললেন—"বেটক্করে কোমরটায় বড্ড লেগেছে! আমাকে ধ'রে একটু তুলে দিন, আমি ও-ঘরটায় চলে যাই।"

সযত্নে তাঁকে হাত ধরে তুলে আমার কাঁধের উপর তাঁর শরীরের সমস্ত ভর দিতে বলে তাঁকে সাবধানে ধ'রে দালানের ও-দিকের ঘরটাতে নিয়ে যাচ্ছিলুম—কিন্তু কি জানি কেন—সেই শিরীষকুসুমসদৃশ লঘু, সেই মৃদুতাপ তপ্ত, যৌবন-তরল, কোমল অঙ্গ স্পর্শে আমার দেহের শিরায় শিরায় যেন সহসা অগ্নিময় প্রচণ্ড বিদ্যুৎ শিখার তাণ্ডব নৃত্য সুরু হ'য়ে গেল! আমার শরীরের প্রতি রক্তবিন্দুর মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন একটা অননুভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার নেশা উদ্দাম হ'য়ে উঠলো! পলকের মধ্যে আমি তাঁকে অসহায় শিশুর মতো আমার দুই বাহুর মধ্যে আঁকড়ে ধরে চক্ষের নিমেষে বক্ষের উপর তুলে নিয়ে তাঁর পদ্মের মতো সুন্দর মুখখানিকে অজস্র চুম্বনে রাঙা করে দিলুম!—কিন্তু ঠিক তার পরমুহূর্ত্তেই হঠাৎ একটা অসহ্য লজ্জায় শিউরে উঠে তাঁকে গৃহতলে নামিয়ে দিয়ে চোরের মতো ছুটে একেবারে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেলুম!

* * * *

সত্যই উপেনবাবুর দিন ফুরিয়ে এসেছিল।

আমার টেলিগ্রাম পেয়ে কলিকাতা থেকে দ্বারবান ও সরকার যেদিন এসে পৌছল, সেই দিনই রাত্রে উপেনবাবু চিরদিনের জন্ম বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

উপেনবাবুর স্ত্রী যথাবিধি তাঁর সৎকার ক'রে আমারই সরকার ও দ্বারবানকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের কলিকাতার বাড়ীতে ফিরে এলেন।

আমি কিন্তু তখনও বাড়ীতে ফিরিনি। সেদিনের সেই দুষ্কৃতির লজ্জায় আত্মগ্লানিতে মর্ম্মাহত হ'য়ে আমি সেই রাত্রেই সেখান থেকে পালিয়ে বরাবর আমাদের মৌরলা গাঁয়ের কাছারী-বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলুম।

উপেনবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত বিবরণ শুনে মা আমার জন্ম বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। চারিদিকে আমার অনুসন্ধান সুরু হ'তেই মৌরলা গাঁয়ের নায়েবের কাছ থেকে তিনি আমার সংবাদ পেলেন এবং আমাকে বাড়ী ফিরে আসবার জন্য অনুরোধ ক'রে পত্র দিলেন। তাঁরই পত্রে আমি প্রথম উপেনবাবুব দেহান্তরের সংবাদ ও তাঁর স্ত্রীর কলিকাতায় ফিরে যাবার কথা শুনলুম।

আমি সে পত্রের উত্তরে মাকে জানালুম যে আমার মনের অবস্থা এখন অত্যন্ত খারাপ। আমি এখন কিছুদিন বাড়ীতে ফিরতে পারবো না।

তারপর আরও কিছুদিন কেটে গেল। বাড়ী ফেরবার জন্ম মায়ের কাছ থেকে আবার তাগিদের উপর তাগিদ আসতে লাগল! শেষকালে বাধ্য হ'য়ে আমি একদিন মাকে স্পষ্টই লিখে দিলুম "মা, তুমি না হয় এখানে চলে এসো। আমি আর ও-বাড়ীতে ফিরতে পারবো না।"

* * * *

সেই চিঠি যাবার দিন দুই পরেই একদিন আমি মৌরলার কাছারী-বাড়াতে আমার শোবার ঘরে ব'সে একখানা ইংরাজি বই পড়ছি "The Woman Thou Gavest Me" এমন সময় নায়েব এসে আমাকে নমস্কার করে বললে "কলকাতা থেকে হুজুরের কোনও আত্মীয়া মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর'তে এসেছেন!"

আমি বই পড়তে পড়তে অভ্যাস বশতঃ অন্যমনস্ক হ'য়ে বললুম "পাঠিয়ে দিন।"

নায়েব মহাশয় কখন চলে গেছেন জানিনি; হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠে প্রশ্ন শুনলুম—

"সত্যিই কি আর বাড়ী ফিরবেন না স্থির করেছেন?"

সেই কণ্ঠস্বর শুনে সচকিতে চেয়ে দেখলুম—আমার সামনেই উপেনবাবুর স্ত্রী দাঁড়িয়ে!

বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে ভাবতে লাগলুম—এ স্বপ্ন না সত্য? এ কি আমারই প্রতিদিনের উষ্ণ মস্তিষ্কের দুশ্চিন্তার ফল?

"আচ্ছা, কেন আপনি আর ও-বাড়ীতে ফিরতে পারবেন না বলে মাকে চিঠি লিখেছেন—জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

উপেনবাবুর স্ত্রীর এই প্রশ্নে আমি একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়ে ব্যাপারটা কতক যেন বুঝতে পারলুম। বুঝতে পারলুম—মা আমাকে গৃহে নিয়ে যাবার জন্ম এঁকেই প্রতিনিধি ক'রে পাঠিয়েছেন।

উপেনবাবুর স্ত্রী আবার ব'ললেন "আপনার মায়ের আদেশে আপনাকে বাড়ী ফেরাবার জন্মই আমি এখানে আসবার স্পর্দ্ধা করিছি।"—তারপর ছলছল চোখে মিনতি-পূর্ণ কণ্ঠে বললেন "আপনি ফিরে চলুন। আর তাঁর কাছে আমার লজ্জা ও অপরাধ বাড়াবেন না!"

আমি আর চুপ ক'রে থাকতে পারলুম না; চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্তের মতো সলজ্জ হ'য়ে বললুম—"আপনার কাছে আমি যে অন্যায় করেছি এবং আপনার স্বর্গগত স্বামীর নিকট আমি যে বিশ্বাসঘাতকতা করিছি, জানি আমার সে অপরাধ অমার্জ্জনীয়। সে গুরুপাপ আমার ক্ষমা চাইবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। তাই, আপনাকে এ দুষ্কৃতের সামনে যাতে আর কখন আসতে না হয়, সেই জন্ম আমি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দূরে আত্মগোপন ক'রেই থাকবো মনস্থ করিছি। আমার অপরাধের আমি শাস্তি নিতে চাই!"

উপেনবাবুর স্ত্রীর মুখে ঝরা-শেফালীর মতো একটু ম্লান হাসি ফুটে উঠলো! করুণ-নেত্রে আমার দিকে চেয়ে বললেন "সেটা শাস্তি হবে বটে; কিন্তু সে শাস্তি যে সকলের চেয়ে বেশী দগ্ধ করবে কাকে সেটা জানতে পারলে আপনি কি আর ও-শাস্তি গ্রহণ করতে পারবেন?…কিন্তু সে কথার আগে আমি জানতে পারলে খুসী হতুম যে আপনার 'অপরাধ'টা কি?"

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে তার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন স্বপ্নাবিষ্টের মতো আপন মনেই বললুম "তবে,—তবে কি তুমি আমার অপরাধ নাওনি!"

গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে আমার পায়ের ধূলো তার সীমন্তে তুলে নিয়ে সে নতজানু হয়েই বললে—"দেবতার চরণে নিবেদিত যে পুষ্পাঞ্জলি, দেবতা যদি স্বয়ং তা' গ্রহণ করে থাকেন, সেটা কি তবে তাঁর অপরাধ হয় স্বামী?"

"স্বামী! স্বামী!" দুই বাহু প্রসারিত করে আমি তাকে আমার আনন্দ-স্পন্দিত বুকের উপর তুলে নিলুম।

ফিরে এসে মার হাতে তাকে যখন স'পে দিলুম, মা আপন অঞ্চলে তার অশ্রু-সজল চোখ দু'টি মুছিয়ে দিয়ে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে ঘরে তুলে নিলেন!

হাসিমুখে এবার অনুরূপার দিকে চেয়ে যতীন বললে—"মা আজ স্বর্গে চলে গেছেন বটে, কিন্তু আমার অনুপ সেই থেকে আমারই গৃহলক্ষ্মীর স্বরূপ ঘর আলো করে আছে সুরেশ!"

সুরেশ বালকের মতোই আনন্দে লাফিয়ে উঠে তার বৌদির পায়ের উপর ঢিপ্ ঢিপ্ ক'রে দুটো তিনটে প্রণাম দিয়ে বলে উঠ্‌ল—"তোমাকে অসতী ব'লে আর যারা 'এক-ঘরে' করে রাখ্‌তে চায় রাখুক বৌদি,—সুরেশ তাদের দলে নয়।"

* * * *

সাধুর বিচার

রায় শ্রীরমণীমোহন ঘোষ বাহাদুর বি-এল্

"আমি এ গ্রামের রাজা—সমাজের পতি,
কে না জানে মোরে?
এই পথে যায় মোরে না করি প্রণাম!
ধরে' আন্ ওরে!
শিবুরে আনিয়া ভৃত্য কহে—"এই হাড়ি
বলা'য়ের চেলা
না মানে কাহারে—বর্ণগুরু ব্রাহ্মণেরে
করে অবহেলা।"
কহে জমিদার—"বটে! এত স্পর্দ্ধা তোর
ওরে বেটা পাজি;
আমারে করিস্ তুচ্ছ! শিক্ষা সমুচিত
দিব তোরে আজি।"

শিবু কহে "যে মস্তক লুটেছে গুরুর
চরণ-ধূলায়
ছুইবেনা সেই শির—বাঁচি যতদিন—
অন্য কারু পায়।"
প্রভুর ইঙ্গিত মাত্র যত অনুচর
নির্দ্দয় প্রহারে
অর্দ্ধমৃত করি' তারে ফেলে দিল দূরে
পথের কিনারে।
ক্ষণপরে সংজ্ঞা লভি' বহু ক্লেশে শিবু
চলি ধীরে ধীরে

হল উপনীত—যেথা গুরু বলরাম
ভৈরবের তীরে।
কহিল কাতরে কাঁদি লুটিয়া চরণে
"চাহি প্রতিকার,
প্রবল দুর্ব্বল প্রতি কেন করে প্রভু
হেন অত্যাচার?
দোষ গুণ জান তুমি—জানি আমি, দেব!
তোমার শকতি
বিচার করিয়া কর দুষ্টের দমন,
চরণে মিনতি।"
কহিলেন বলরাম—"কেন মনে দ্বেষ
ক্ষোভ অকারণ।

মানুষ কি পারে কভু করিতে মানুষে
নিগ্রহ এমন?
তোমারে যে দিল ক্লেশ, নহে সে মানুষ,
দণ্ড দিব কারে?
দেখিতেছি চেয়ে আমি—হিংস্র ব্যাঘ্র সে যে
মনুষ্য-আকারে।"
এত বলি' দিলা তার সর্ব্বাঙ্গে বুলায়ে
স্নেহ-হস্তখানি,
দূরে গেল যত ব্যথা—ঘুচিল শিবুর,
অন্তরের গ্লানি।
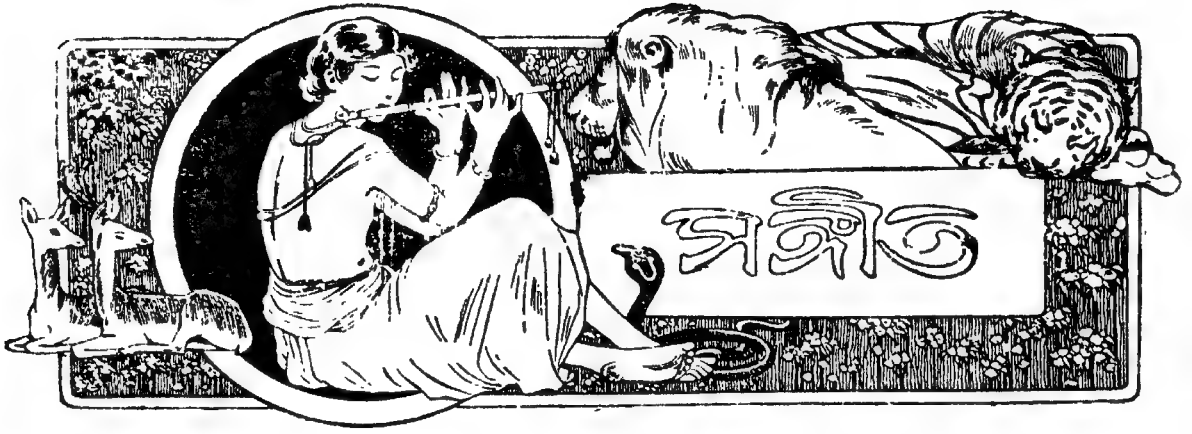
কীর্ত্তন…একতালা

সাথী

কথা ও স্বর…শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন　　　　স্বরলিপি…শ্রীদিলীপকুমার রায়

(ওগো) সাথী মম সাথী, (আমি) সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ তিলক মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল　　যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে।
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে　　যায় ফুলহাতে প্রেমের দেউলে
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে।
যে পথে পাখীরা যায় গো কুলায়　　যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে।

গা মা | II মা পা পা | -া মা ধা | পা-া মপা | ধগা মগা মা |
ও গো　সা - থা　- ম ম　সা - থী　- - -

পা না না | ধনা ধা পক্ষা | পা ধা পধা | নসা ধনা -া | II
সে ই প　থে যা ব　সা - থে　- - -

পা ধা ধর্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা নর্সর্রা র্সর্রর্সনা |
যে প থে　আ সি বে　ত রু ণ　প্র ভা ত
যে প থে　ম ল য়　আ নে সৌ　- র ভ
যে প থে　ব ন্ ধু　ব ন্ ধু　র দে শে
সে প থে　মো দে র　হ বে অ　ভি সা র

```
না র্সা না | ধা পা ধপক্ষা | পা ধা পধনর্সা | ধনা না র্সা | ধা না না |
অ রু ণ  তি ল ক  মা - থে  - আ মি  সে ই প
শি শি র  সি - ক্ত  প্রা - তে  - - -  - - -
চ লে ব  ন্ ধু র  সা - থে  - - -  - - -
শে - ষ  তি মি র  রা - তে  - - -  - - -

ধনা ধা পক্ষা | পা ধা পধনর্সা | ধনা ধা পমা | II II
থে যা ব  সা - থে  - ও গো
- - -  - - -  - - -
- - -  - - -  - - -
- - -  - - -  - - -

মা পা পা | পক্ষা ধা পা | মা পা ধা | পা মগা মা |
যে প থে  কা ন নে  আ সে ফু  ল দ ল
যে প থে  পা খী রা  যা য় গো  কু লা য়

                                        [-া]
দা দা দা | দা দা ণদপা | পা পদণা দণা | দা পা দপম
যে প থে  ক ম লে  প শে প  রি ম ল
যে প থে  ত প ন  যা য় স  ন্ ধ্যা য়
যা য় ফু  ল হা তে  প্রে মে র  দে উ কে

সা সা রা | রা রা গা | মা পা ধা | পা পা মগমা
যে প থে  ব ধূ রা  য মু না  র কূ লে
```

পুরাতনী

শ্রীহরিহর শেঠ

৫

ভারতে ইংরাজ ও ইংরাজি সম্পর্কে প্রথম

ভারতে সর্ব্বপ্রথম যে ইংরাজ আগমন করেন তাঁহার নাম টমাস্ ষ্টিফেন্স্ (Thomas Stephens)। ইনি ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে আগমন করেন। ইহার পূর্ব্বে স্যার হিউ উইলোবি (Sir Hugh Willoughby) ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। (১)

* * * * *

প্রথম যে ইংরাজ মহিলা ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন,

(১) Historians History of the World, Vol. XXII.

তিনি টমাস্ পাওয়েলের (Thomas Powell) পত্নী মিসেস্ পাওয়েল্। মিঃ পাওয়েল্ ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূত ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে সিন্ধু প্রদেশে আসিয়া তিনি অল্প দিন বাস করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার একটি সন্তান হয়। এইটিই প্রথম ইংরাজ সন্তান, যিনি ভারতে জন্মগ্রহণ করেন।

মিসেস্ পাওয়েলের আগমনের পাঁচ বৎসর পরে মিসেস্ হড্‌শন্ (Mrs. Hudson) ও মিসেস্ ষ্টীল্ (Mrs. Steele) এদেশে আসেন। (২)

* * * * *

ব্যবসায়ের জন্ত যে ব্যক্তি প্রথম বিলাত হইতে এ দেশে আসেন, তাঁহার নাম ফিচ্ (Fitch)। তিনি ও আর তিন জন ইংরেজ বাগদাদ্ ও এপলো হইয়া ১৫৮৩ অব্দে ভারতে আসিয়া পৌছান। (৩)

* * * * *

ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের মূল কারণ—বিলাতে মরিচের দর চড়িয়া যাওয়া। উহা ৩ শিলিং হইতে ৬ শিলিং ৮ পেন্স বৃদ্ধি হওয়ায় ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে এক সভা হয়। এই সভাতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠনের প্রথম কথা হয়। তথাকার ব্যবসায়ীরা প্রথম ৩০১৩৩ পাউণ্ড চাঁদা তুলিয়া বিলাতের তদানীন্তন রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে প্রথম ১৫ বৎসরের জন্ত ভারতে ব্যবসায়ের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহাই ইংরাজদের ভারত-বিজয়ের সূত্রপাত। দেড়শত বৎসর কাল তাঁহারা কেবলমাত্র ব্যবসায় কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, তৎপরে কুঠী-রক্ষা ব্যপদেশে অস্ত্রধারণ করিয়া প্রায় পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইংরাজরা হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং পেশোয়ার হইতে শ্যাম পর্য্যন্ত সুবিশাল ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম অংশী ছিল ১২৫ জন এবং মূলধন ৯০০০০ পাউণ্ড। ১৬১২ সালে উহা ৪০০০০০ পাউণ্ডে পরিণত হয়। (৪)

* * *

প্রথম যে দুই জন ইংরাজ কুঠীয়াল বাঙ্গলায় আসেন, তাঁহারা ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় উপস্থিত হন। (৫)

* * * * *

ইংরাজরা প্রথমে বাঙ্গলার মধ্যে বালেশ্বরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রথমে তথায় 'ফ্যালকন্' নামক যে জাহাজ আসে, তাহাতে ৪০০০০ পাউণ্ডেরও অধিক মাল ছিল। (৬)

* * * * *

সর্ব্বপ্রথম বিলাতি মাল এ দেশে যাহা আসে, তাহা প্রধানতঃ লৌহ, টিন, বস্ত্র, কাচ, অস্ত্র-শস্ত্র ও পারদ ইত্যাদি। উহা ১৬০১ খৃষ্টাব্দের ২রা মে কাপ্তেন ল্যাঙ্কাষ্টারের (Captain Lancaster) অধিনায়কত্বে পাঁচখানি জাহাজ পূর্ণ হইয়া আসে। উহার মোট মূল্য ৬৮০০০ মুদ্রা। (৭)

* * * * *

প্রথমে দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, লবণ, চাউল, তৈল, সুতা, গাছ, চুণ, তামাক, জ্বালানি কাষ্ঠ, মাদুর, বাঁশ, পাণ, ইক্ষু, বস্ত্র, প্রভৃতি ও জুতাওয়ালা, মৎস্য-ব্যবসায়ী ও তাঁতিদের উপর ডিউটী ছিল।

শুল্কের হার ছিল বস্ত্রের শতকরা দুই টাকা; দাসদাসী প্রতি ৪।০; প্রত্যেক পাট্টায় ৪।০; বন্ধকি কাজে শতকরা ৫৲ টাকা; বিবাহে ৩৲ টাকা সিক্কা, নূতন ক্ষুদ্র পোত প্রতি ৫০৲ বা ১০০৲। (৮)

* * * *

ইংরাজরা কেবলমাত্র ব্যবসায় ভিন্ন আবশ্যক মত এ দেশীয়দের সহিত যুদ্ধ ও সন্ধি প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন প্রথম দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব কালে ১৬৩১ খৃষ্টাব্দের ৩রা এপ্রেল। (৯)

* * * *

কলিকাতায় জব্ চার্নক প্রথম বৃটিশ পতাকা উড্ডীন

(২) Times of India Annual, 1924.

(৩) The History of India, Vol. I.—Marshman.

(৪) The History of India, Vol. I.—Marshman ও Historians History of the World, Vol. XXII.

(৫) The History of India, Vol. I. Marshman ও Historians History of the World, Vol. XXII.

(৬) The Early History and Growth of Calcutta.

(৭) The History of India, Vol- I.—Marshman.

(৮) The Early History and Growth of Calcutta.

(৯) The History of India, Vol. I.—Marshman.

করেন ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট। ১৭৫২ সালে কলিকাতার যে ক্ষেত্র-পরিমাণ পাওয়া যায় তাহা এইরূপ,—ডিহি কলিকাতা ১৭০৪ বিঘা ৩ কাঠা, সুতানুটী ১৮৬১ বিঘা ৫৷০ কাঠা, এবং গোবিন্দপুর ১০৪৬ বিঘা ১৩৷৷০ কাঠা। বর্ত্তমান হাটখোলার ঘাটকে সুতানুটীর ঘাট বলিত। (১০)

ভারতের সহিত ইংলণ্ডের স্বাধীন ব্যবসায় প্রচলিত হইবার প্রথম নোটীশ প্রচারিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর। (১১)

* * * *

ইংরাজদের এদেশে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া প্রথম আইন-সঙ্গত হয় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে। তৎপূর্ব্বে উহা নিষিদ্ধ ছিল। (১২)

* * * *

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি নগর বলিয়া প্রথম ঘোষিত হয় ইংরাজি ১৭০৭ সালে। (১৩)

* * * *

প্রথম ইংরাজি সংবাদপত্র এ দেশে প্রকাশিত হয় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে। উহা বেঙ্গল গেজেট। হিকির গেজেট (Hickey's Gazette) এবং ইণ্ডিয়া গেজেটও ঐ বৎসর প্রকাশিত হয়। কলিকাতা গেজেট ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতে প্রথম প্রকাশিত ছাপা সংবাদপত্র এইগুলিই। (১৪) Good Old Days of Honourable John Company গ্রন্থে ইণ্ডিয়া গেজেটকেই সর্ব্বপ্রথম সংবাদ-পত্র বলিয়াছে। ইহাতে লিখিত হইয়াছে—উহা ১৭৭৪ সালে প্রকাশিত হয়।

* * * *

ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরাজি উচ্চ বিদ্যালয় ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে খোলা হয়। (১৫) ফ্রি স্কুল ও মাদ্রাসা উহার পূর্ব্ববর্ত্তী। মিঃ ডানকানের চেষ্টায় ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য বেনারসে একটি কলেজ স্থাপিত হয়। (১৬)

* * * *

সাহেবরা এদেশে জমি মোকরর করিবার প্রথম অনুমতি প্রাপ্ত হয় লর্ড্ উইলিয়ম্ বেণ্টিকের সময়। (১৭)

* * * *

ইংরাজদের দ্বারা বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম ছেলেদের জন্য যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম Bellamy's Charity School। উহা ১৭৩১ সালে S. P. C. Kর উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা দাতব্য বিদ্যালয়। (১৮)

* * * *

কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় উহা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে। মিসেস হেজেস (Mrs. Hedges) উহার প্রতিষ্ঠাত্রী। এই বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা এবং নৃত্য-কলাও শিক্ষা দেওয়া হইত। ক্যাপ্টেন উইলিয়ম্সন (Captain Williamson) প্রণীত East India Vade Macum গ্রন্থে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মিসেস্ হজেস্ (Mrs. Hodges) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম নারী-শিক্ষালয়ের কথা জানা যায়। মনে হয়, হেজেস্ ও হজেস একই নাম, সময় সম্বন্ধে কাহারও ভুল আছে। কেরি সাহেবের গ্রন্থে মিসেস্ পিটের (Mrs. Pitts) বিদ্যালয়ই প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। (১৯)

* * * *

বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রথম যে পুস্তকাগার ইয়োরোপীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ১৭০০ খৃষ্টাব্দে।

সার্কুলেটিং লাইব্রেরি ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে। উহা S. P. C. Kর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। (২০)

* * * *

(১০) The Early History and Growth of Calcutta.
(১১) The History of India, Vol. II,—Marshman.
(১২) Rural Life in Bengal.
(১৩) Carey's Good Old Days.
(১৪) Echoes from Old Calcutta.
(১৫) The Early History and Growth of Calcutta.
(১৬) Carey's Good Old Days.
(১৭) The History of India, Vol. III.—Marshman.
(১৮) Promotion of Learning in India by European Settlers.
(১৯) Promotion of Learning in India by European Settlers.
(২০) Promotion of Learning n India by European Settler

বৃটিশ ভারতে মাদ্রাজ সহরে ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। তথা হইতে ১৭১৪ সালে তামিল ভাষায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। হুগলীতে উইল্কিন্স্ সাহেবের দ্বারা ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাই প্রথম বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই ছাপাখানায় মুদ্রিত হাল্হেড্ সাহেবের ব্যাকরণই প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা বই। উহা মিঃ এণ্ডুরু নামক পুস্তক-বিক্রেতার দ্বারা প্রকাশিত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়া গেজেট প্রকাশ সম্বন্ধে যে উল্লেখ পাওয়া যায়, উহা সত্য হইলে হুগলীর ছাপাখানার পূর্ব্বেও এ প্রদেশে অন্য ছাপাখানা ছিল বলিয়া বুঝা যায়।

মাদ্রাজের ছাপাখানার অনেক পূর্ব্বে ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টুগীজ মিশনারি দ্বারা এ দেশে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তথা হইতে পর বৎসর প্রথম গ্রন্থ মুদ্রিত হয় Catachisms de Doctrina of St. Francis Xavier। অন্য মতে Doctrina Christina of Giavanni Gonsalvez নামক পুস্তকই ভারতে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। (২১)

* * * *

বসন্তের জন্য ইংরাজি টিকা ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আরম্ভ হয়। (২৭)

* * * * *

এ দেশে প্রথম মুদ্রিত সংস্কৃত পুস্তক কালিদাসের "ঋতু-সংহার"। উহা ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার তৎকালীন মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল দশ সিক্কা টাকা।

সংস্কৃত গ্রন্থের প্রথম ইংরাজি তর্জ্জমা হয় মেঘদূত। উহা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তখন মূল্য ছিল ১৬ সিক্কা টাকা। (২৮)

* * * * *

খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রথম বাঙ্গলা পুস্তক "মেথু লিখিত সুসমাচার" শ্রীরামপুরের কেরি (Rev. William Carey) সাহেব দ্বারা ১৮০১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উহার প্রথম পৃষ্ঠা ছাপা হয় ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ।

প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গলা গদ্য গ্রন্থ রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী। উহাও মিঃ কেরির দ্বারা এই সময় প্রকাশিত হয়। (২৯)

* * * * *

প্রথম চিনির কল স্থাপিত হয় ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। উহা সাজাহানপুরে কার কোম্পানীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলায় খেজুরে গুড় হইতে এবং সিলোনে নারিকেল হইতে দেশীয় প্রথায় চিনি হইত।

সামুদ্রিক লবণ প্রথম ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতাতে উন্নত প্রণালীতে সাহেবদের দ্বারা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়। তৎপূর্ব্বে দেশীয় প্রণালীতেই প্রস্তুত হইত। এ দেশের জন-সাধারণের লবণ প্রস্তুত আইন অনুসারে নিষিদ্ধ হয় ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন। তখন ঘোষণার দ্বারা জ্ঞাপন করা হয়—১১৯৬ সালের আষাঢ় মাসের পর হইতে যে ব্যক্তি নিজ হিসাবে লবণ প্রস্তুত করিবে, সপারিষদ গভর্ণর জেনারেল তাহার প্রতি যে দণ্ড দেওয়া ঠিক মনে করিবেন, সেই দণ্ডে তাহাকে দণ্ডনীয় করা হইবে। যে বৎসর এই আইন হয়, সেই বৎসর আয় ধরা হইয়াছিল ৭০ লক্ষ টাকা, কিন্তু বিলাতি লবণের মোট আয় হইয়াছিল ২০০০০০ পাউণ্ড। (৩০) এ দেশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্বেত লবণ প্রস্তুত হইত কটকে।

* * * * *

খরিদ সূত্রে ইংরাজদের প্রথম জমি লাভ হয় ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। আরঙ্গজেবের পুত্র আজিম ওসানের নিকট হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সুতাহুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ১৬০০০৲ টাকা মূল্যে খরিদ করেন। খাজনা স্থির হয় ১১৯৫ সিক্কা টাকা। তখন উক্ত স্থানের মোট

(২১) The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. I. ও Promotion of Learning in India by European Settlers.

(২৭) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৮) The Good Old Days of Honourable John Company.

(২৯) The Good Old Days of Honourable John Company.

(৩০) Selections fram Calcutta Gazette of the years 1789 to 1797. ও The Good Old Days of Honourable John Company.

পরিমাণ ছিল লম্বায় প্রায় ৩ মাইল এবং চওড়ায় ১ মাইল। ইংরাজরা ব্যবসায় সংক্রান্ত বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত হয় ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে এবং সেই সময়ই তাহারা ৩৭।৩৮ খানি গ্রাম খরিদের অনুমতি পায়। ১৭০০ সালে কলিকাতায় মোট ১২০০ ইংরাজ ছিল। (৩১)

* * * * *

ইংরাজ কোম্পানীর নিকট প্রথম যে ব্যক্তি দোভাষীর কাজ করেন, তিনি ছিলেন একজন ধোপা। তাঁহার নাম রতন সরকার। বসাক ও শেঠেরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী, তাঁহারা কাপড়ের কাজ করিতেন এবং বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, কোম্পানীর লোক তাঁহাদের কাছে একজন দোভাষী চাওয়ায় তাহার কথা বুঝিতে ভুল করিয়া তাঁহারা এক ধোপাকে পাঠাইয়া দেন। (৩)

* * * * *

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায় কলিকাতায় প্রায়ই লটারি দ্বারা টাকা তুলিয়া সাধারণের হিতার্থ অনেক কাজ করা হইত। এক্সচেঞ্জ বাটী, টাউনহল্ প্রভৃতি এই উপায়ে প্রস্তুত হয়। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম লটারি খেলা আরম্ভ হয়। উহাতে অনেক টাকার টিকিট বিক্রী হইয়াছিল। (৩৩)

* * * * *

এদেশে সর্ব্ব প্রথম ইংরাজি হোটেল উইলশন্ সাহেবের দ্বারা কলতায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতার প্রথম হোটেল স্পেনসেস্ ও আকল্যাণ্ড্ সাহেবের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা সম্ভবতঃ ১৮১০এর পরে। (৩৪)

* * * * *

কলিকাতার প্রথম ঘোড়দৌড় খেলা বেঙ্গল জকি ক্লাবের দ্বারা ১৮০৮ সালে আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান রেস্‌কোর্স্ ১৮১৯এ প্রস্তুত হয়। (৩৫)

* * * * *

সোডা ওয়াটার প্রথম ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রচলিত হয়। তখন উহা বিলাত হইতে আমদানী হইত। দর ১৪৲ হিসাবে ডজন বিক্রীত হইত এবং বোতলের জন্য ২৲ টাকা দোকানদারের নিকট জমা রাখিতে হইত। তখনকার দিনের সুপ্রসিদ্ধ টালক্ কোম্পানী উহা আমদানী করিয়া যে বিজ্ঞাপন দেন, তাহাতে লেখা ছিল, উহা উৎকৃষ্ট পানীয় ও হজমের মহৌষধি। উহাতে আরও লেখা ছিল, বোতল কাত করিয়া না রাখিলে কয়েক দিনের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। (৩৬)

* * * *

সাপ্তগাছ ও পাথুরে কয়লা ইং ১৭৮৯ সালে একজন কোম্পানীর কর্ম্মচারীর দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত হয়। কয়লা তৎপূর্ব্বে জ্বালানি রূপে ব্যবহৃত হইত না, উহা হইতে আলকাতরার মত একপ্রকার তৈলাক্ত পদার্থ নিষ্কাশন করিয়া ঔষধরূপে ব্যবহার করা হইত। (৩৭)

খাদ হইতে কয়লা উত্তোলনের জন্য ছোটনাগপুরের কলেক্টর মিঃ হিট্‌লে (Mr. Heatley) প্রথম আবেদন করেন; এবং তিনি কিছু কয়লা উত্তোলন করেন। চল্লিশ বৎসর পরে মিঃ জোন্স্ (Mr. Rupart Jones) পুনরায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। পরে মেসার্স্ এলেকজেণ্ডার কোম্পানী এই কাজ গ্রহণ করিয়া তাহার স্বত্বাধিকারী হন। ১৮৩৫ সালে এই কোম্পানী দেউলিয়া হন। বাঙ্গালীর মধ্যে পরম উৎসাহশীল দ্বারকানাথ ঠাকুর রাণীগঞ্জের খাদ খরিদ করিয়া একটি কোম্পানী গঠন করিয়া কাজ চালান। আট বৎসর পরে এই কোম্পানী অন্যের সহিত মিলিত হইয়া বেঙ্গল কোল কোম্পানীর সহিত এক হইয়া যায়। (৩৮)

* * * *

বরাকরের লোহার কারখানাই এ দেশে প্রথম। উহা গবর্ণমেণ্টের দ্বারা পরিচালিত হইত। (৩৯)

* * * *

---

(৩১) History of British India—Macfarlane ও The Early History and Growth of Calcutta.

(৩২) Carey's Good Old Days.

(৩৩) The Good Old Days of Honourable John Company.

(৩৪) The Hand Book of India ও The Good Old Days of Honourable John Company.

(৩৫) The Hand Book of India.

(৩৬) The Good Old Days of Honourable John Company.

(৩৭) Selections from Calcutta Gazettes of the years 1789 to 1797.

(৩৮) Rambles in India.

(৩৯) Rambles in India.

ইংরাজদের প্রথম টাঁকশাল মুরশিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ হ্যামিল্টন্ নামক একজন সার্জ্জন ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে এই অনুমতি প্রাপ্ত হন। তখন সপ্তাহে ৩ দিন মুদ্রা প্রস্তুত হইত। (৪০)

* * * *

আসামের চা গাছ প্রথম ইং ১৮২৫ সালে মিঃ ব্রূসের (Mr. Bruce) দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। (৪১)

* * * *

বাঙ্গলা নাম সহ প্রথম মানচিত্র দেশীয় ভাষায় বিলাতের প্রসিদ্ধ শিল্পী মিঃ ম্যাকের দ্বারা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রকাশিত হয়। (৪২)

* * * *

পাবলিক্ ইনষ্ট্রাক্‌শন্ কমিটি প্রথম স্থাপিত হয় ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে। (৪৩)

* * * *

রালে (Sir Walter Raleigh) ভারজিনীয়া হইতে সভ্য জগতে তামাকু আনয়ন করেন। স্যার টমাস্ রো উহা প্রথম ভারতে আনয়ন করেন এবং বাদশাহ জাহাঁগীরকে উহা উপহার দেন। বাদশাহ ঔৎসুক্য নিবারণের জন্ম উহার স্বাদ গ্রহণ করিয়া এতই পীড়িত হইয়া পড়েন যে, দরবার হইতে উহার চির-নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করেন। কিছু দিন পরে পুনরায় তিনি তাঁহার চিকিৎসকের দ্বারা উহার পরীক্ষা করান। এই চিকিৎসকেরাই হুঁকার আবিষ্কার করেন। বিলাতের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চিকিৎসক মেকেঞ্জি (Sir Morell Mackenzie) প্রথম "Mackengie Cartridges" নামে ব্লটিং কাগজের দুই ইঞ্চ লম্বা চুরুটের নল নির্ম্মাণ করেন। (৪৪)

(৪০) The History of India and of the British Empire in the East, Vol. I. by E. H. Nolan Ph. D., LL D.

(৪১) Carey's Good Old Days.

(৪২) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II.

(৪৩) Life and Times of Carey, Marshman and Ward, Vol. II.

(৪৪) The Calcutta Review, 1915.
ইয়োরোপে তামাকুর প্রথম আনয়ন সম্পর্কে থেনেট্ (Andre Thenet). ড্রেক্ ও ফার্ণেণ্ডিস্ (Fransis Fernandes) এর নামও শুনা যায়।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৫

গভীর রজনীর অন্ধকারের মধ্যে নির্ম্মলা তাহার ঘরের জানালায় বসিয়া দূর আমবাগানের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। চারিদিকের ঘন অন্ধকার যেন পুঞ্জীভূত হইয়া আমবাগানের উপর জমাট বাঁধিয়া বাসা করিয়াছে। মাঝে-মাঝে সেই ঘোর আঁধারের মাথায় শত শত জোনাকির আলো ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছিল। আকাশে সেদিন চাঁদ ছিল না। কেবল গোটা কয়েক তারা বহুদূর হইতে ঘুমন্ত স্তিমিত চোখে এই রহস্যময়ী ধরণীর দিকে রহস্যভরা দৃষ্টিতে তাকাইয়া ছিল।

নির্ম্মলার চোখে সেদিন কিছুতেই ঘুম আসিতেছিল না। বহুক্ষণ ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া অবশেষে সে বিরক্ত হইয়া জানালায় আসিয়া বসিল। ক্লান্তি ও অবসাদে তাহার শরীর মন যেন দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

অসিতের সেদিন অভুক্ত অবসন্ন অবস্থায়, তাহার পিতার নাম শুনিবামাত্র, সেইভাবে তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সে নিস্পন্দ জড়প্রায় হইয়া কাটাইল। তাহার বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি, বিচার করিবার ক্ষমতা সমস্তই যেন মূর্চ্ছিত, স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কিছুদিন সে কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে বা মনে করিতে পারিত না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে নিরুত্তরে কেবল তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। মিঃ ঘোষ নিজের ভাবনায় ও পিসীমা সংসারের ভারে ব্যস্ত থাকায়, তাহার এ ভাবান্তর আর কেহ বিশেষ বুঝিতে পারিল না।

অতর্কিত বিষম আঘাতে তাহার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী এইভাবে কিছুদিন অবসাদগ্রস্ত ও মূর্চ্ছিত থাকিবার পর, আবার ধীরে ধীরে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি ফিরিয়া আসিতে লাগিল। যেদিন নির্ম্মলা সেদিনকার সমস্ত ঘটনা স্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে পারিল, সেদিন তাহার মনে হইল, সংসার তাহার পক্ষে সবই শূন্য। এখানে সে আর কাহারও নয়, তাহারও কেহ কোথাও নাই। তাহার চারিদিকের সমস্ত বন্ধন যেন এক নিমেষে সর্ব্বদিক হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান তাহার পক্ষে মৃত, ভবিষ্যৎ অন্ধকার মরুময়, আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্তই লুপ্ত। কেন যে সে এই অসীম শূন্যতার মাঝে তাহার ব্যর্থ জীবনভার টানিয়া টানিয়া বেড়াইতেছে, তাহা সে নিজেই কিছু বুঝিতে পারিল না।

অসিতের কথা মনে পড়িলে নির্ম্মলা তীব্র বেদনায় আকুল হইয়া বুকফাটা কান্না কাঁদিল! এবার সে বেশ বুঝিয়াছে, যে-কোন কারণেই হোক, অসিতের সঙ্গে তাহার পিতার মর্ম্মান্তিক শত্রুতা আছে। অসিত এই কারণেই তাহাদের বাড়ী কোন দিন আসে নাই, ভবিষ্যতেও কোন দিন আসিবে না। তাহার নিজের অজ্ঞাতে দৈবাৎ সেদিন আসিয়া পড়িয়াছিল, পরিচয় পাইবামাত্র ঘৃণায় তাহাদের সঙ্গ ও আতিথ্য পরিহার করিয়া সেই মুহূর্ত্তে চলিয়া গিয়াছে। এ পর্য্যন্ত নির্ম্মলা বেশ বুঝিতে পারে। কিন্তু অসিত না খাইয়া চলিয়া গিয়াছে, এই একটা সামান্য ঘটনায় তাহার জীবন কেন যে এমন মরুময় হইয়া উঠিল, এই কথাটা এখনো সে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারে না। যদি তাহার অনুমান সত্য হয়, যদি সত্যই অসিতের সঙ্গে তাহার পিতার কোনও শত্রুতা থাকে, তাহা হইলে অসিত কখনো তাহাদের সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না, এটা স্থির নিশ্চয়। কিন্তু নাই বা সে এখানে আসিল? নাই বা তাহার সহিত কোন সংস্রব থাকিল—তাহাতে এমনই বা কি যায় আসে? সে কে তাহাদের? একবার দৈবচক্রে দুই ঘণ্টার জন্য তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল—এইমাত্র তাহার সঙ্গে তাহাদের পরিচয়। এই পরিচয়ে নির্ম্মলার জীবনে সে এতখানি স্থান করিয়া লইল কিরূপে? সে যাক্ বা থাক্—নির্ম্মলার তাহার জন্য এত ভাবিবার কি আছে?

নির্ম্মলা অসিতের চিন্তা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য এইসব কথা ভাবিয়া দেখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু সে ভুলিতে চাহিলেও তাহার অন্তর এসব যুক্তির দোহাই মানিতে চাহিত না। অসিতের সঙ্গে আর কোন দিন দেখা হইবে না, এই কথাটা মনে পড়িলেই তাহার বুকের ভিতর হইতে একটা নীরব হাহাকার ঠেলিয়া উঠিয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। তাহার নয়নের মুক্ত অশ্রু আর বাধা মানিত না,—মনে হইত, তাহার ইহ-জীবনের যাহা কিছু একমাত্র কাম্য ও প্রিয়তম বস্তু, তাহা হইতে কে যেন তাহাকে একবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে! যাহা সে হারাইল, কোন দিন আর তাহা সে ফিরিয়া পাইবে না!

মাঝে মাঝে অসিতের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনা সে উলটিয়া পালটিয়া মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিত। সে স্থির বুঝিয়াছিল,—অসিত বা মিঃ ঘোষ কেহই পরস্পরের কাছে পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিলেন না। তাঁহারা ত উভয়েই বেশ প্রফুল্লভাবে প্রথমে আলাপ করিয়াছিলেন। সে যখন শেষে গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে, তখনো মিঃ ঘোষ হাসিয়া হাসিয়া নিজের নাম ও পরিচয় দিয়া অসিতকে তাহাদের বাড়ী আসিতে অনুরোধ করিতেছেন, তাহাও সে শুনিয়াছে। তাহার পর সে একটু অন্যমনস্ক হইয়া অন্য দিকে চাহিয়া ছিল,—পরের কথা আর কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু বার বার একই বিষয় মন দিয়া ভাবিতে ভাবিতে সে এটা বেশ বুঝিয়াছিল যে, সেখান হইতে ফিরিয়াই মিঃ ঘোষের ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। তাহার পর হইতে আর তিনি কখনো তাহাদের নাম করেন নাই। নির্ম্মলা দুই একবার সে চেষ্টা করিলে, তিনি তাহাকে থামাইয়া দিয়াছেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার ক্রমশঃ সদা-সশঙ্কিত ভাব,—সর্ব্বক্ষণ নিজের ঘরে একলা থাকা—ঘুমের ঘোরে ভয় পাওয়া,—রাত্রে উঠিয়া নিজের অজ্ঞাতে বিচরণ,—এই সব রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। সে বুঝিয়াছিল, নিশ্চয়ই তাহার পিতার দ্বারা

অসিতের কোন বিষম অনিষ্ট ঘটিয়াছে। তিনি সেদিন আত্মপরিচয় দিবার পরই তাঁহারা দুইজনে পরস্পরকে চিনিয়াছিলেন। তবে দুই একটা কথা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিত না। মিঃ ঘোষ তাঁহার রাত্রির স্বগত উক্তির মধ্যে প্রায়ই রামগোবিন্দের নাম করিতেন। এ রামগোবিন্দ কে? নির্ম্মলা মনে মনে এসব বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক বিষয় মিলাইতে পারিত,—আবার অনেক কথা তাহার কাছে অস্পষ্ট রহস্যের মত ছায়াচ্ছন্ন বলিয়া মনে হইত।

এক এক সময় তাহার মনে হইত, যে তাহার পিতার জীবনের এমন মর্ম্মান্তিক শত্রু, যাহার জন্য তাহার বৃদ্ধ পিতা সর্ব্বদা আতঙ্কে উদ্বেগে মনের সমস্ত সুখশান্তি হারাইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় দিন কাটাইতেছেন, সে কোন্ লজ্জায় অহরহ তাঁহাদের সেই প্রবল শত্রুর ধ্যান করিয়া কাটাইতেছে? মিঃ ঘোষের তন্দ্রাচ্ছন্ন পাংশুবর্ণ মৃতবৎ মুখ মনে পড়িয়া লজ্জায় ধিক্কারে তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিতে চাহিত। সে তখন প্রাণপণে অসিতকে ভুলিবার, অসিতের প্রতি বিরুদ্ধভাব আনিবার জন্য নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া আপনাকে শ্রান্ত ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিত। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! সে কাহার জন্য কাঁদিবে? কাহার কথা ভাবিবে? উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত দুইজনের জন্যই যে তাহার হৃদয় বেদনায় দুঃখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে! কাহাকে রাখিয়া সে কাহার কথা মনে করিবে? নির্ম্মলা কোন দিকে কোন উপায় দেখিল না। দিনের পর দিন এই অনিশ্চিত অবস্থায় ও নিজের ভাবনায় তাহার জীবনে একটা উদাস ভাব আসিয়া তাহাকে একবারে মুহ্যমান করিয়া দিয়াছিল। সংসারের কোন চিন্তা, কোন বিষয় আর তাহার চিত্তে সুখ দুঃখের কোন তরঙ্গ তুলিতে পারিত না। তাহার উদাস দৃষ্টির সম্মুখে বাড়ীতে সকলের চলা-ফেরা, কাজকর্ম্ম, হাসিগল্প—সবই যেন ছায়াবাজির পুতুলের নৃত্যের ন্যায় মনে হইত। একদল আসিতেছে, অপর দল ফিরিয়া যাইতেছে—লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিত,—পিসীমার সঙ্গে মিশির ঠাকুরের রান্না লইয়া গণ্ডগোল আগের মতই এক একদিন তুমুল কাণ্ডে পরিণত হইত। পিসীমার অপার ভাবাজ্ঞানের ক্ষমতায় বিহারী বাজারের হিসাব বা অন্য কোন কাযের ফরমাসে, আগের মতই মধ্যে মধ্যে এক একটা অঘটন ঘটাইয়া তাহার মেড়ুয়াবাদীত্ব সকলের চোখের সামনে প্রমাণ করিয়া তুলিত। কিন্তু এসব বিষয় আর কোন দিন তাহার অন্তরে সামান্য কৌতুক-স্পৃহাও জাগাইয়া তুলিতে পারিত না।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে একা বসিয়া বসিয়া নির্ম্মলা অসিতের কথাই নিজের মনে মনে ভাবিতেছিল। সে যে আর কোন দিনই তাহাদের দিকে আসিবে না, তাহাদের কোন সংস্রবে থাকিবে না,—তাহার সে দিনের ব্যবহারের পর নির্ম্মলা তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াছিল। কিন্তু তবু মানুষ প্রাণ থাকিতে একেবারে আশা ছাড়িতে পারে না। নির্ম্মলার অন্তরের কোন নিভৃততম প্রদেশের এক কোণে একটি অতি ক্ষীণ আশার রেখাও মাঝে মাঝে ফুটিয়া ওঠে—হয় তো আবার সে এক দিন আসিতেও পারে! কেন সে আসিবে—কাহার জন্যই বা আসিবে—সে সব সে কিছুই ভাবে না—জানেও না। তবু কেমন করিয়া তাহার যেন মনে বিশ্বাস হয়, না আসিয়া সে থাকিতে পারিবে না। আর সমস্ত চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র অসিতের চিন্তাই দিন দিন তাহার একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। অসিত তাহাকে কি ভাবে দেখে, নির্ম্মলা মাঝে মাঝে তাহাই ভাবিয়া দেখিত। প্রথমে সে তাহাকে সম্ভ্রান্ত ভদ্র-মহিলা হিসাবেই দেখিয়াছিল, ও সেইরূপ ভদ্র ব্যবহারও করিয়াছিল। সে যে কত যত্নে কত সন্তর্পণে তাহার আহত রক্তাক্ত হাতখানির সেবা করিয়াছিল, তাহার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট কাতর মুখের দিকে সে কি কোমল সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আজো তাহা নির্ম্মলার চিত্তে উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহার হাতের উপর অসিতের সেই মৃদু কোমল স্পর্শের কথা মনে পড়িলে আজো নির্ম্মলার স্পন্দহীন অসাড় চিত্ত চঞ্চল করিয়া একটা সুখের পুলকের শিহরণ তড়িত-রেখার মত বহিয়া যায়। কিন্তু তাহার পর? যখন হইতে সে তাহাকে তাহার পরম বৈরীর কন্যা বলিয়া জানিয়াছে, তখন হইতে নির্ম্মলার প্রতি তাহার ব্যবহারও বদলাইয়া গেল। সে তাহার হস্তের সেবা স্পর্শ না করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে! তাহার কাতর অনুরোধ গ্রাহ্য না করিয়া অবহেলায় তাহাদের গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এখন হয় তো নিশ্চয়ই সে নির্ম্মলাকে মনে মনে ঘৃণা করে!

এ চিন্তায় নির্ম্মলার অন্তরে দারুণ আঘাত লাগিল। এ কয়েক মাস অনন্তচিত্ত হইয়া নিশিদিন যাহার চিন্তা তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে, প্রতিদানে তাহার ঘৃণা মাত্র সার করিয়া তাহাকে এ দুর্ব্বহ জীবন-ভার বহিতে হইবে! তাহার ভাগ্যে এমন অঘটন কাহার দোষে ঘটিল? এ চিন্তায় তাহার উভয় নয়ন বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। এই সংসারে তাহার মত কত মেয়ে—যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত আরামে ঘর করিতেছে। তাহাদের জীবনে কোথাও কোন বাধা নাই—কোন বিপত্তি তাহাদের জীবন অশান্ত করিয়া তোলে নাই। আর তাহার বেলা সবই বিপরীত! এই যে তাহার এতদিনকার সরল স্বচ্ছন্দ জীবনে এমন জটিলতা আসিয়া জড়াইয়াছে, এর পরিণাম কোথায় কি ভাবে দাঁড়াইবে, কে জানে?

মাথার উপর দিয়া কি একটা অজ্ঞাত পাখী ঝটফট করিতে করিতে উড়িয়া গেল! নির্ম্মলা সেই শব্দে চকিত হইয়া চোখ মুছিতেই, সহসা একটা কথা মনে পড়ায়, সে তাহার পূর্ব্বের চিন্তা ভুলিয়া গেল!

বিহারীর সঙ্গে অতিথি সৎকারের জন্য যখন সে, অতিথি কে তাহা না জানিয়াই ঘরে ঢুকিয়াছিল, তখন তাহাকে অতর্কিত ভাবে সেখানে দেখিয়া অসিতের মুখে যে হর্ষ ও বিস্ময়ের রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, নির্ম্মলা তখন তাহাই ভাবিতে লাগিল। যে সত্যই যাহাকে ঘৃণা করে, সে কি কখনো তাহাকে দেখিয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারে? আর কেনই বা সে তাহাকে ঘৃণা করিবে? সে তো বেশ ভালোই জানে—নির্ম্মলা কোনও দোষে দোষী নয়? এ চিন্তায় সে মনে কথঞ্চিৎ শান্তি পাইয়া নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছিল।

সেই সময় বারাণ্ডার ধারে খট্ করিয়া একটা শব্দ হইল। নির্ম্মল চাহিয়া দেখিল—মিঃ ঘোষ বিজ বিজ করিয়া বকিতে বকিতে তাঁহার ঘর হইতে তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন! হাতে এক তাড়া কাগজ! নির্ম্মলা নিজের চিন্তা ভুলিয়া অতি সন্তর্পণে তাঁহার নিকট উঠিয়া গেল।

৩৬

অরুণ মিঃ রায়ের গৃহে অতিথিরূপে আসিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ও সুখী হইল। আর তাহাকে লীলার নিকট হইতে বহু দূরে থাকিয়া কেবল তাহার আশাপথ চাহিয়া দিন কাটাইতে হইবে না। এখন সে সর্ব্বক্ষণই প্রায় লীলাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাইত। মিঃ রায় সত্যই তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মিসেস রায় ও বীণা তাহার প্রতি নিজেদের ব্যবহার স্মরণ করিয়া একটু কুণ্ঠিত হইলেও, তাহার মধুর প্রকৃতির গুণে তাঁহারা আর তাহাকে দূরে রাখিতে পারেন নাই। মিঃ রায়ের অনেক চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ মিসেস রায় লীলার প্রতি বিরাগ ভুলিয়া তাহার বিবাহে সম্মতি দিয়াছিলেন। সমাজে সকলের নিকটই প্রচার হইয়া গেল—লেফটেনেণ্ট ঘোষালের সঙ্গে মিঃ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে।

লীলা সমস্ত দিন তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজগুলির মধ্যেও অরুণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। সন্ধ্যায় কোন কোন দিন তাহার মা ও বীণার সঙ্গে ক্লাবে আসিত, কিম্বা অরুণের নিকট থাকিয়া তাহার লেখার সাহায্য করিত। মনের অবস্থা ভাল থাকায় অরুণের পুস্তক দ্রুত পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই তাহার শরীর ও মনে এত উন্নতি হইল, যে, সে অনেক সময় তাহার দৃষ্টিশক্তি পর্য্যন্ত ফিরিয়া পাইবার আশা করিত। তাহার সুন্দর কান্ত রূপের ছটা, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের দীপ্তি যেন দিন দিন ফাটিয়া পড়িতেছিল। লীলা তাহার এ পরিবর্ত্তনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেও মনে তাহার কোন শান্তি ছিল না। সমস্ত দিন সে সকলের সঙ্গে, নানা কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়া, তাহার অন্তরের জ্বালা ভুলিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু যখন দিন শেষে সব কর্ম্মের অবসান হইয়া যাইত, যখন রজনীর নীরব অন্ধকারে বাড়ীতে সকলেই যে যাহার ঘরে গভীর সুপ্তির মধ্যে অচেতন হইয়া পড়িত, তখন নিজের ঘরে একা বসিয়া লীলার নয়নের অশ্রু আর বাধা মানিত না।

গভীর মনস্তাপে ও অভিমানে যে মর্ম্মাহত হৃদয়ে দেশ ত্যাগ করিয়া এই বিপুলা ধরিত্রীর কোন্ নিভৃত কোণে নিজেকে লুকাইয়া রাখিল, আর কি কোনও দিন সে লীলার কাছে ফিরিয়া আসিবে? লীলার সমস্ত হৃদয়-মন যে তাহারই জন্য আকুল আগ্রহে সর্ব্বক্ষণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে! কিরণের সেই প্রশান্ত দৃষ্টি—যে দৃষ্টি লীলার দৃষ্টির সহিত মিলিত হইলেই তাহাকে বুঝাইয়া দিত, 'আমি তোমারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি'—সেই নীরব দৃষ্টির মর্ম্ম

রহিয়া রহিয়া লীলার অন্তরে স্বচ্ছ প্রতিকৃতির মত ফুটিয়া উঠিত। তাহার এক এক দিনের এক একটি কথা—'আমার বলবার কিছু নেই লীলা! শুধু আমি যে জীবনে মরণে তোমারই, সেই কথা তোমায় জানিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম, তোমায় পাই না পাই, আমি তোমারই'—উল্টিয়া পাল্টিয়া লীলার মনে সেই সব কথাই শত শত বার নানারূপে উদিত হইয়া তাহাকে আকুল করিয়া তুলিত। হায়! এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় সে এ কি করিয়া বসিল? তাহার প্রিয়তমকে সে নিজের বুদ্ধির দোষে এমন বেদনা ও দুঃখ দিয়া কোন অকূলে বিসর্জ্জন দিল? কিরণের স্মৃতি যে তাহার অন্তর বাহিরে সমস্তই জুড়িয়া রহিয়াছে, আজ সে কেমন করিয়া কোন্ প্রাণে সেই স্মৃতির মূল উৎপাটন করিয়া তাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করিবে?

কুমার গুণেন্দ্রভূষণ সেদিনের পর হইতে আর মিঃ রায়ের গৃহে বা ক্লাবে কোথাও আসেন নাই। বীণাও তাহার পর হইতে অধিকাংশ সময় বাড়ীতে নিজের ঘরের মধ্যেই কাটাইত। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে সে লীলার সঙ্গে কথা বলিত না। অপরাহ্নে মায়ের সঙ্গে একবার ক্লাবে আসিত, তাও অত্যন্ত গম্ভীর ও নির্লিপ্ত ভাবে! লীলা তবু কিছুদিন তাহার প্রতি প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছিল, যাহাতে সে কুমারের সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিতে বা সাক্ষাৎ করিতে না পারে। ক্রমশঃ তাহারও বিশ্বাস হইল,—বিপদ কাটিয়া গিয়াছে।

এক সপ্তাহের পর এক দিন সন্ধ্যার সময় ক্লাবে মিসেস রায় লীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। বীণা কোন্ দিকে গেল দেখতে পাচ্ছি না, তাকে ডেকে নিয়ে এসো।

কথাটা শুনিয়াই লীলার মনে সন্দেহ হইল, এই তো সে খানিক আগে বীণাকে হলের মধ্যে দেখিয়া গিয়াছে,—ইহার মধ্যে সে আবার কোন্খানে গেল?

সে মাকে কিছু না বলিয়া সমস্ত ঘরগুলি, বারাণ্ডার প্রত্যেক কোণ সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আসিল, কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল—সকলেই তখন প্রায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ কোথাও নাই। কেবল দুই একটি বয়স্থা মহিলার সঙ্গে তাহার মা হলে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। হঠাৎ তাহার মনে হইল, বীণা বাগানের দিকে যায় নাই তো? তখনি সে বাগানের দিকে ছুটিল। প্রকাণ্ড বাগানের সকল দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। একজন খানসামা তাহাকে ওরূপ ভাবে ঘুরিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সে বীণার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল।

খানসামা বলিল, তিনি তো বাগানের দিকে আসেন নি,—সন্ধ্যার আগে তাঁকে একবার ছাতের উপর দেখেছিলুম।

লীলা তখন কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত-চিত্তে ছাতের উপর উঠিল। প্রকাণ্ড ছাত—এক দিক হইতে অন্য দিকে সন্ধ্যার অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। লীলা কিছুক্ষণ ব্যর্থমনোরথ হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে দেখিল, ছাতের শেষের দিকে এক কোণে কাহারা যেন বসিয়া আছে।

সে তখনি সেই দিক লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া যাইতেই দেখিল—হাঁ! তাহার অনুমান সত্যই বটে! একখানা বেঞ্চের উপর কুমার গুণেন্দ্রভূষণ বসিয়া—তাঁহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বীণা কাঁদিতেছিল!

ভাঙ্গা ভাঙ্গা চাঁদের আলো তাহাদের মুখে আসিয়া পড়িয়াছে! লীলার ছায়া পড়িতেই তাহারা উভয়ে চমকিত ভাবে মুখ ফিরাইল! লীলাকে দেখিয়াই দুইজনে অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল!

এই দৃশ্য দেখিয়া লীলা রাগে জ্ঞান হারাইল! কি ঘৃণা! কি লজ্জা! তাহার আপনার সহোদরা ভগিনী—তাহার এই কাজ! কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলিতে পারিল না,—কেবল রক্তিম নেত্রে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল!

লীলার সম্মুখে ওরূপ অবস্থায় পড়িয়া বীণা ভয়ে শুকাইয়া গিয়াছিল! তাহার সমস্ত শরীর ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

কোন ছাত্র গুরুতর দোষ করিয়া স্কুলমাষ্টারের নিকট ধরা পড়িয়া গেলে তাহার যেমন ভাব দাঁড়ায়, কুমারের প্রায় তদ্রূপ ভাব! অত্যন্ত বিব্রত ও অপ্রস্তুত হইয়া সে বুকে দুই হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে লীলা নিজেকে কতকটা সংযত করিয়া বীণাকে বলিল—তুমি নীচে যাও, মা তোমার জন্য অপেক্ষা

করছেন! আমি এই লোকটার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে একটু পরে যাচ্ছি!

বীণা অত্যন্ত ভয় পাইয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, আমি মার কাছে এখনি যাচ্ছি, কিন্তু দিদি! সত্য বলছি, ওঁর কোন দোষ নেই এতে! ওঁকে তুমি কিছু বোল না— আমিই একটা কথা বলবার জন্ম ওঁকে আজ ডেকে এনেছিলুম!

লীলা সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিল—বলছি না তোমায় এখনি নীচে চলে যেতে! তোমার কাণ্ড দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি! আবার ওকালতি করতে লজ্জা হচ্ছে না? যাও—নীচে নেমে যাও! এক মুহূর্ত্ত দেরী নয়—এখনি!

লীলার চোখে আগুন জ্বলিতেছিল! বীণা আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া সজল করুণ দৃষ্টিতে একবার উভয়ের দিকে চাহিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল!

সে চলিয়া যাইবার পর লীলা কুমারের সম্মুখে সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জ্বলন্ত দৃষ্টি কুমারের মুখে স্থির রাখিয়া অত্যন্ত উদ্ধত স্বরে বলিল, বীণার সঙ্গে এমন নির্জ্জনে দেখা করবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? সেদিন বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও আপনি কোন্ সাহসে আমার কথা অমান্য কর্লেন?

কুমার একবার লীলার মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার শঙ্কাপূর্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল! অত্যন্ত নম্রস্বরে বলিল, এজন্ম আমায় দোষী করবেন না মিস রায়! আপনার ভগ্নীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যই এর জন্ম দায়ী—আমিও ত সেদিন আপনাকে বলেছিলুম, এত সহজে আমি বীণার আশা ছাড়তে পারবো না—

অভদ্র বেয়াদব! ভদ্রভাবে কথা বলবার সহবৎ পর্য্যন্ত যার নেই, তার আশা আর স্পর্দ্ধা একেবারে অমার্জ্জনীয়! এ সব লোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করা আমারই অন্যায় হয়েছে! যাক্—আমি যে কথা দিয়েছিলুম, আজকার ব্যবহারের পর আর সে কথামত চলবার প্রয়োজনীয়তা থাকলো না! তোমার মত কুকুরকে সায়েস্তা করতে যে রকম ব্যবহার করা উচিত, এবার সেই রকম ব্যবহারই করা যাবে!

লীলা নামিয়া আসিবার জন্ম মুখ ফিরাইতেই কুমার বলিল—কিন্তু এটা বড় অন্যায় হচ্ছে আপনার! যদিও আপনার মত সুন্দরীর গালাগালি শোনা আমার সৌভাগ্যের বিষয় বলেই আমার মনে হয়, তবু কথাটা যে আপনার ক্রমশই অত্যন্ত রূঢ় হয়ে উঠছে, সে কথা বাধ্য হয়ে বলতে হলো! আমার এতে দোষটা কি?

লীলার মূর্ত্তি ক্রোধে ও উত্তেজনায় ক্রমশঃ ভীষণ হইয়া উঠিতেছিল। সে একবার অগ্নিময় দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল। যদি সেখানে তখন হাতের কাছে কোন কিছু থাকিত, তাহা হইলে সে তখনি কুমারকে মারিয়া বসিত!

কিছু দেখিতে না পাইয়া সে বলিল,—শুধু কথায় তোমার আর কি হবে? কি বোলবো—আজ আমার হাতে কিছু নেই। চাবুকটা হাতে থাকলে, দোষটা যে কি, ভাল করে একবার বুঝিয়ে দিতুম!

কুমার কিছুক্ষণ প্রশংসমান দৃষ্টিতে লীলার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, বাঃ! এ যে একেবারে আগুনে ভরা! সত্য বলছি মিস রায়! আমি আপনার একজন কত বড় মুগ্ধ ভক্ত, আপনি সেটা বোঝেন না! আমার তাতে এত দুঃখ হয়!

লীলা আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ী নামিতে লাগিল। তাহার দেরি দেখিয়া মিসেস রায় হয় ত ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন!

কুমার সঙ্গে সঙ্গে নামিতে নামিতে বলিতে লাগিল— অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? একটু আস্তে আস্তে নামুন না! আমি কি এতই অভদ্র যে আমার পাশে একটু দাঁড়ালেও আপনার ক্ষতি হবে? কেনই যে আমার উপর আপনার এত বিরাগ, তা' তো কিছু বুঝি না! লীলা তাহার কথায় দৃকপাত না করিয়া নামিতেছিল। যখন তাহারা সিঁড়ির সর্ব্বশেষ চাতালে আসিল, তখন কুমার বলিল— মিস রায়! একটু দাঁড়ান্! অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আমি সত্যই বলছি—আমার আপনাকে কিছু বলবার আছে!

লীলা বলিল—আমি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা শুনতে চাই না, বলবারও আমার আর কিছু নেই! এবার যা কিছু করণীয় আছে—তারই ব্যবস্থা করা যাবে!

কুমার বলিল—আমি আবার বলছি—এক মুহূর্ত্ত স্থির

হয়ে আমার কথা শুনুন। আপনি হয় ত কাল সকলের সমক্ষে আমার যত কিছু কলঙ্কের কথা প্রকাশ করে দিতে পারেন, মিঃ রায় হয় ত আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু তাতে আপনার ভগ্নীর সুনাম বজায় থাকবে কি? আমি অবশ্য তখন মূক হয়ে থাকবো না—এটা নিশ্চয়—বিশেষ আজকার ঘটনার পর! আপনি নিজেই দেখেছেন, সে আমার সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে! তা ছাড়া—আমি সব সময় আট-ঘাট বেঁধে কাজ করি—এটা আমার স্বভাব। আজ যখন বীণাকে নিয়ে ছাতে আসি, তখন দুজন খানসামাকে ডেকে লেমনেড ও বরফ খেয়েছি। তারা এই নির্জ্জন ছাতে আমাদের দুজনকে খাইয়ে গেছে—বক্‌সীসও পেয়েছে প্রচুর! দরকার হলে তারা এ কথা সকলের কাছেই বলতে পারবে! এখন ভেবে দেখুন—আমার সঙ্গে ঝগড়াটাই বজায় রাখবেন, না—কোন সর্ত্তে একটা রফা কর্ব্বেন? লীলা কথাটা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। দাঁতে দাঁত ঘষিয়া নিষ্ফল আক্রোশে অস্ফুটস্বরে বলিল, কাপুরুষ শয়তান! তাহার পর সেইখানে দাঁড়াইয়া কি করা উচিত—ভাবিতে লাগিল।

লীলাকে তদবস্থ দেখিয়া কুমার বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিল, এই যে! এতক্ষণে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হয়েছে দেখছি! আমার বক্তব্যটা এই বেলা বলে নি তা হলে! দেখুন—আপনি চেষ্টা করলে আমায় প্রকাশ্যে তাড়াতে পারেন, তা আমি স্বীকার করছি; কিন্তু তার শেষ ফল ভাল হবে না। যতক্ষণ আমি জানবো যে বীণার আমার প্রতি অনুরাগ সমভাবে অব্যাহত রয়েছে, ততক্ষণ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আমায় কোনরূপেই তফাৎ করতে পারবেন না। তার উপর আমার প্রভাব যে কতদূর, তা আপনি জানেন না,—আমি তাকে যেদিকে ফেরাবো, সে ঠিক সেইদিকে ফিরবে। তবে সে যদি নিজের মুখে আমায় বলে, যে, আর আমার প্রতি তার সে ভাব নেই, কিম্বা যদি স্বইচ্ছায় পত্র লিখে আমায় জানায়, যে, আমাকে আর সে চায় না,—তা হলে আর কখনো আমি তার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখব না। সে যেখানে থাকবে, আমি তার ত্রিসীমার মধ্যে পদার্পণ করবো না। কেবল এই একটিমাত্র সর্ত্তে আমি তার উপর সমস্ত অধিকার ছেড়ে দিতে রাজি আছি। আর আমি—পথের কুকুর, কাপুরুষ, ইতর—যাই হই, কথার ঠিক যে রাখি, আপনি সেটা বিশ্বাস করতে ও তার পরীক্ষা গ্রহণ করে দেখতে পারেন! কথা শেষ করিয়া কুমার অত্যন্ত বিনম্রভাবে লীলাকে নমস্কার করিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

সে রাত্রে বাড়ী আসিয়া—বীণা যে কি ভয়ানক দুষ্ট ও ধূর্ত্ত লোকের কবলে নিজেকে এমন অসহায়ভাবে সমর্পণ করিয়াছে,—লীলা তাহাই ভাবিতে লাগিল। কুমার যাহা বলিয়াছে, তাহার পক্ষে তাহা করা অসম্ভব নয়—দুর্ব্বলপ্রকৃতি বীণার উপর তাহার শক্তি যে অজেয়, তাহাও এখন লীলা বুঝিয়াছে। বীণাকে দিয়া এখন পত্র লেখান ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

কিন্তু এ ব্যাপারটি বিশেষ সহজসাধ্য হয় নাই। বীণা এ সর্ত্তে কিছুতেই সম্মত হইতে চায় না। সে কেবল বলিতে লাগিল, আমি তাঁকে সব কথা বলেছি, তিনিও সব অন্যায় স্বীকার করেছেন—তিনি সে মেয়েটির সম্বন্ধে খুব ভাল ব্যবস্থা করে দেবেন—আর আমার জন্য এবার তিনি নিজের স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করবেন। যদি এখন আমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়, তা হলে আর কখনো তিনি ভাল পথে ফিরতে পারবেন না। তাই আমি এ রকম চিঠি কখনো লিখতে পারবো না। লিলি! তুমিও কথাটা ভেবে দেখ—একটা দোষ হয়েছে বলেই কি একেবারে এত কঠোর হওয়া উচিত? তার চেয়ে তাঁকে কিছুদিন সময় দেওয়া যাক্। দেখ—তিনি তাঁর কথা রাখতে পারেন কি না। যদি না হয়—তখন এ রকম চিঠি লেখা যাবে।

লীলা কিন্তু তাহার সমস্ত যুক্তি, মিনতি, অশ্রু—সব উপেক্ষা করিয়া অনেক শাসন ও ভয় প্রদর্শনের পর নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার মনের মত পত্র লিখাইয়া লইল, ও তখনি নিজে গিয়া সেই পত্র পোষ্ট করিয়া আসিল।

এ সব শেষ হইলে তাহার মনে হইল, বিপদ হয় তো কাটিয়া গেল, কিন্তু তবু তাহার মন স্থির হইল না—কারণ বীণার উপর তাহার কোন আস্থা ছিল না। সে তাহার প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখিয়া চলিত।

এইরূপে লীলা যখন বীণার জন্য বিশেষ চিন্তিতভাবে

দিন কাটাইতেছিল, তখন একদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর অরুণ একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনায় একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল!

সে সেদিন চোখ খুলিয়া শূন্যতার পরিবর্ত্তে তাহার চিরপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখিয়া অবাক্! তাহার ক্ষীণ দৃষ্টির সম্মুখে দেওয়ালের ছবিগুলি ঝুলিতেছে!

অরুণের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল! সে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিতেছে না তো? সে উভয় হস্তে চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে আবার চাহিল—ওই যে সত্যই দেওয়ালে ছবি! এ কি আশ্চর্য্য কাণ্ড!

বিষম উত্তেজনায় অরুণ অধীর হইয়া উঠিল! এ কি সত্য যে সে আবার দেখিতে পাইতেছে? আরও নিঃসন্দেহ হইবার জন্য সে তাহার হাত চোখের গোড়ায় ধরিল! ঐ তো! হাতের পাঁচটা আঙুল স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

অর্দ্ধ সন্দেহ ও অর্দ্ধ বিশ্বাসে সে ঘরের চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া প্রত্যেক জিনিসটির সহিত পরিচিত হইতে লাগিল। ঐ ত চেয়ার, তার পাশে আলনায় কাপড় সাজান রহিয়াছে—পালঙ্কের উপর শুভ্র শয্যা—সেখানে এখনো সে শুইয়া আছে! ঐ ড্রেসিং টেবিলযুক্ত বৃহৎ আয়না—টেবিলের উপব সাজ-সজ্জার উপকরণ সজ্জিত—সবই ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে!

বিষম আনন্দে ও বিস্ময়ে সে খড়খড়ির পাখীগুলি পর্য্যন্ত গণিতে আরম্ভ করিল! তাহার সে সময়কার হর্ষ ও আহ্লাদ বর্ণনাতীত।

অরুণ ভক্তি-নত হৃদয়ে ভগবানের উদ্দেশে বারবার প্রণাম করিল! হে ভগবান্, তুমিই ধন্য! যেমন অতর্কিতে আমার দৃষ্টি হরণ করিয়াছিলে, আবার তেমনি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরাইয়া দিলে!

অত্যন্ত উত্তেজনায় তাহার মাথার শিরা দপ্ দপ্ করিতেছিল! তবু সে বার বার তাহার নবলব্ধ দৃষ্টি ঘরের চারিদিকে ফিরাইয়া পরীক্ষা করিতেছিল।

আজ সে কোন চাকরকে তাহার পোষাক পরিবার সময় সাহায্য করিতে ডাকিল না। নিজেই উঠিয়া পোষাক পরিল। যতক্ষণ লীলা না জানে, ততক্ষণ আর কাহাকেও এ কথা জানাইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

তাহার কালো চশমা চোখে দিয়া সে নিজেই বাগানে বেড়াইতে লাগিল। এতদিন সে যে সব দৃশ্য কল্পনায় দেখিত, আজ সে সবই পরিষ্কার! তাহার চশমার ভিতর হইতে সে মাঠের সমস্ত দৃশ্যই দেখিতেছিল!

মাঠের ধারে সেই সব শ্রেণীবদ্ধ ফুলের গাছ, লম্বা বড় বড় গাছের ঘন-সন্নিবিষ্ট পত্রশ্রেণী—গোলাপ গাছের সারে বড় বড় সুন্দর গোলাপ ফুটিয়া স্বর্গীয় সুষমায় বাগান আলো করিয়া আছে। এই সেই চাঁপাগাছতলার বেদী—লীলা ও বাড়ীর সকলে ক্লাবে গেলে, এই বেদীতে সে বৈকালে আসিয়া বসে!

বেড়ার ওধারে টেনিস কোর্ট দেখা যাইতেছে—যেখানে সে বহু—বহু দিন আগে সর্ব্বদা খেলিতে আসিত। যদিও গণনায় বেশি দিন নয়—তবু যেন মনে হয়, কত দিন কাটিয়া গিয়াছে!

অরুণ মনের আনন্দে একটা সিগারেট জ্বালাইয়া ধূমপান করিতে লাগিল। আজ আর তাহাকে যষ্টির সাহায্যে পথ চিনিতে হইবে না; কখন তাহার পথে কি বাধা আসিয়া পড়িবে, সেই আশঙ্কায় সশঙ্কিত থাকিতে হইবে না! আজ মুক্তির এ কি বিপুল আনন্দ!

দূরে একজন মালী গোলাপ গাছের মাটি কাটিতেছিল। সে অরুণকে এত ভোরে বাগানে একা ঘুরিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল! মিঃ রায়ের আরদালি তাহার পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে অন্ধ জানিয়া সেলাম না করিয়াই প্রতি দিনের মত চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অরুণ উঠিয়া লীলার ঘরের দিকে চলিল! লীলা টেবিলের উপর ফুল সাজাইতেছিল,—অরুণ চশমা খুলিয়া তাহাকে ডাকিল—লীলা!

লীলা তাহাকে প্রতি দিনের মত অন্ধ জানিয়া মুখ না তুলিয়াই সাদরে বসিতে বলিল—বেশ ত! আজ যে খুব ভোরেই উঠেছ দেখছি! রোজ এমনি সকাল করে উঠলেই ত ভাল হয়!

বীণার স্মৃতি অরুণের চিত্তে জাগিয়া উঠিল! সেই পুতুলের মত সুন্দর ভাবশূন্য মুখের পরিবর্ত্তে এ কি অপূর্ব্ব প্রাণবন্ত বুদ্ধি ও প্রতিভায় উজ্জ্বল সুশ্রী মুখ! অরুণ লীলার সুগঠিত সরল একহারা আকৃতির দিকে চাহিল। তাহার তরুণ মুখে হাস্যোজ্জ্বল প্রফুল্ল দীপ্তিময় চক্ষু দুটির দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল! হয় ত অনিন্দ্যসুন্দর না হইতে পারে,

কিন্তু ভালবাসিবার উপযুক্ত! আর অরুণের নিজের কাছে পৃথিবীতে একমাত্র কাম্য বস্তু!

অরুণের চিত্ত দুর্নিবার আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেছিল! লীলা—সংসারে রূপে গুণে এমন দুর্ল্লভ রত্ন—সে একমাত্র তাহারই! অরুণ ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার ডাকিল—লীলা!

লীলা এবার হাসিয়া মুখ তুলিল—কেন অরুণ?

অরুণের দিকে চাহিতে লীলা অবাক্ হইয়া গেল! অরুণের চোখে মুখে এ কি দুরন্ত আনন্দের উচ্ছ্বাস! সে আজ না হাতড়াইয়া সোজা লীলার কাছে গেল, তাহার হাত হইতে ফুলগুলি লইয়া হাতখানি নিজের গলায় জড়াইয়া ধরিল! আর কিছু বলিবার প্রয়োজনও ছিল না!

তাহার পরিষ্কার চক্ষুর দিকে চাহিয়া লীলা সবই বুঝিল! আজ এ কি বিভিন্ন মুখ সে দেখিতেছে! এ মুখ যে প্রাণে পূর্ণ, দৃষ্টিতে ভরা! যে চোখ এত দিন লক্ষ্যশূন্য হইয়া বিষাদদৃশ্যে ভরা ছিল, আজ সেই চোখ ভাবে ও ভাষায় পূর্ণ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে!

তুমি তবে দেখতে পেয়েছ অরুণ? শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়াই লীলা অপ্রত্যাশিত আনন্দে ও সুখে কাঁদিয়া ফেলিল!

অরুণ তাহার মাথায় ধীরে হাত বুলাইতেছিল! সে বলিল—আজকার দিনে কাঁদো কেন লীলা? আজ যে আমাদের শুভদৃষ্টি!

অরুণের আরোগ্য-সংবাদ বাড়ীতে প্রচারিত হইয়া পড়িতেই চারিদিকে একটা আনন্দ-কোলাহল পড়িয়া গেল! লীলার আনন্দে সবাই আনন্দিত!

মিঃ রায় কথাটা শুনিয়াই চায়ের টেবিল হইতে উঠিয়া আসিয়া অরুণকে গভীর স্নেহে বক্ষের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার অন্তরের বিপুল আনন্দ, সেই নীরব আলিঙ্গনের মধ্য হইতে প্রকাশ পাইতেছিল।

মিসেস রায় আসিয়া ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ মুগ্ধ নয়নে অরুণের দৃষ্টির জ্যোতিতে উদ্ভাসিত সুন্দর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার প্রতি তাঁহার নিজের ব্যবহার মনে হইয়া লজ্জা ও অনুতাপে তাঁহার হৃদয় মথিত হইতেছিল। অরুণ যখন তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তখন সেই বহুদিন পূর্ব্বের অরুণকে ঠিক আগের মত ভাবে ফিরিয়া পাইয়া তাঁহার চিত্তে সুখের ও তৃপ্তির আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইয়া গেল।

বাড়ীর চাকরেরা সকলে আসিয়া সহর্ষে তাহাকে অভিনন্দন করিল! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ্ হইল বীণার! এক সময় যাহাকে ভালবাসিয়া সে তাহার সহিত বিবাহের অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছিল, আজ এত কাণ্ডের পর আবার তাহার কাছে কিরূপে সহজ ভাবে গিয়া দাঁড়াইবে, এই সঙ্কোচ ও লজ্জা তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

অরুণ তাহার কুণ্ঠা বুঝিতে পারিয়া নিজেই তাহার কাছে গিয়া অত্যন্ত সহজ ভাবে আলাপ করিয়া তাহার প্রথম সঙ্কোচ কাটাইয়া দিল।

অপরাহ্নে সে লীলার সঙ্গে ক্লাবে গেল। সেখানে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের আনন্দ ও অভিনন্দন তাহার সে দিনটাকে স্মরণীয় করিয়া তুলিল।

পরদিন অরুণ তাহার নবলব্ধ চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মত জানিতে কলিকাতায় চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

রাশিয়া

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

রাশিয়ানদের মন স্বভাবতই কোমল। কোন লোক যদি কোন পাপকার্য্য করে, তবে আমরা তাহাকে যতখানি মন্দ লোক বলিয়া মনে করি—রাশিয়ানরাও হয় ত তাহাই করে; কিন্তু তাহাদের মনে পাপী বা অপরাধীর প্রতি ঘৃণার ভাব আমাদের অপেক্ষা অনেক কম। তাহারা তাহাদের অত্যন্ত ক্ষমার চোখে দেখিয়া থাকে। পাপীর প্রতি ঘৃণা তাহাদের নাই, আছে করুণার ভাব।

যাঁহারা রাশিয়ানদের সঙ্গে মেলা-মেশা করিয়াছেন এবং রাশিয়ান চরিত্র বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন যে রাশিয়ান ঔপন্যাসিকদের লেখার মধ্যে যে সকল চরিত্র পাওয়া যায়, তাহা নিছক বা খাঁটি নয়, তাহাতে বহু পরিমাণে কল্পনার মিশাল আছে। বিখ্যাত রাশিয়ান ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভ্ বেশীর ভাগ সময়েই ফ্রান্সে বাস করিতেন, এবং তাঁহার অনেক লেখা ফ্রান্সে বসিয়াই হইয়াছিল। সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে, দূর হইতে রাশিয়ান চরিত্র ঠিকভাবে লেখা সম্ভব নহে। ইহা অবশ্য সকল ক্ষেত্রে জোর করিয়া বলা চলে না। টলষ্টয় সম্বন্ধেও অনেকে বলেন যে, তিনি রাশিয়ান অভিজাত-বংশের লোক—তাঁহার লেখার মধ্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহা রাশিয়ান জনগণের ভাব নয়, তাহা অভিজাত-বংশের। রাশিয়ান দরিদ্রদের অন্তরের কথা, তাহাদের চিন্তার ধারা, তাহাদের নানা প্রকার সুখ-দুঃখের কথা বাহির হইতে বুঝা সম্ভব নহে।

রাশিয়ার সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী

রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত রাশিয়ান জনগণ এবং ধনী ও জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরের

বা বাহিরের কোনো বিশেষ যোগ ছিল না। যে যোগ ছিল, তাহা প্রভু এবং ভৃত্য অথবা পীড়ক এবং উৎপীড়িতের সম্বন্ধ। কোনো রকম প্রীতির সম্বন্ধ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। বড়লোকদের মধ্যেই শিক্ষার সামান্ত প্রচলন ছিল।

রাশিয়ান পাদ্রীদের ধর্ম্মানুষ্ঠান

পেট্রোগ্রাডের অন্যতম প্রধান রাজপথ নেভস্কি প্রস্পেক্ট (এই রাস্তায় অনেক যুদ্ধ হইয়া রাস্তাটি বহুবার রক্তের নদীতে পরিণত হইয়াছিল)

গরীবদের মধ্যে কোনো প্রকার শিক্ষারই চলন ছিল না। বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেশের সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বিনাব্যয়ে শিক্ষার প্রচলন হইয়াছে। এখন শিক্ষা লাভ করা সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিশেষের

নিরাভরণা রাশিয়ান সুন্দরী

বিশেষ অধিকার নয়—সকলেরই ইহাতে সমান অধিকার। বাল-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এমন কি, অনেক ক্ষেত্রে সরকার হইতে ছাত্রদের জন্ত আহার এবং বাসস্থানের পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে এমন অনেক সহর ছিল, যেখানে লেখা-পড়া-জানা লোক একটিও থাকিত না; এমন কি ধর্ম্ম-যাজকও সম্পূর্ণ নিরক্ষর। লোকে তাঁহাকে ভয় করিত এবং অনেকে হয় ত সামান্ত শ্রদ্ধাও করিত; কিন্তু এই শ্রদ্ধা বা ভয় ধর্ম্মযাজকের বিদ্যা বা জ্ঞানের জন্ত নয়, ইহা তাহার যাদুকরা শক্তির জন্ত। সাধারণ লোকে বিশ্বাস

সুন্দরী প্রকৃতির রাজ্যে রাশিয়ান সুন্দরী

করিত যে, ধর্ম্মযাজক মন্ত্র-শক্তিতে নানা প্রকার অসাধ্য-সাধন করিতে পারেন। গৃহস্থের মঙ্গলসাধন করাও তাঁহার মন্ত্র-শক্তিতে হইতে পারিত। ভূত-প্রেত ইত্যাদিও না কি মন্ত্রবলের বশ থাকিত। রাশিয়ার প্রান্তস্থিত অনেক গ্রামের অবস্থা এখনও এই প্রকার আছে।
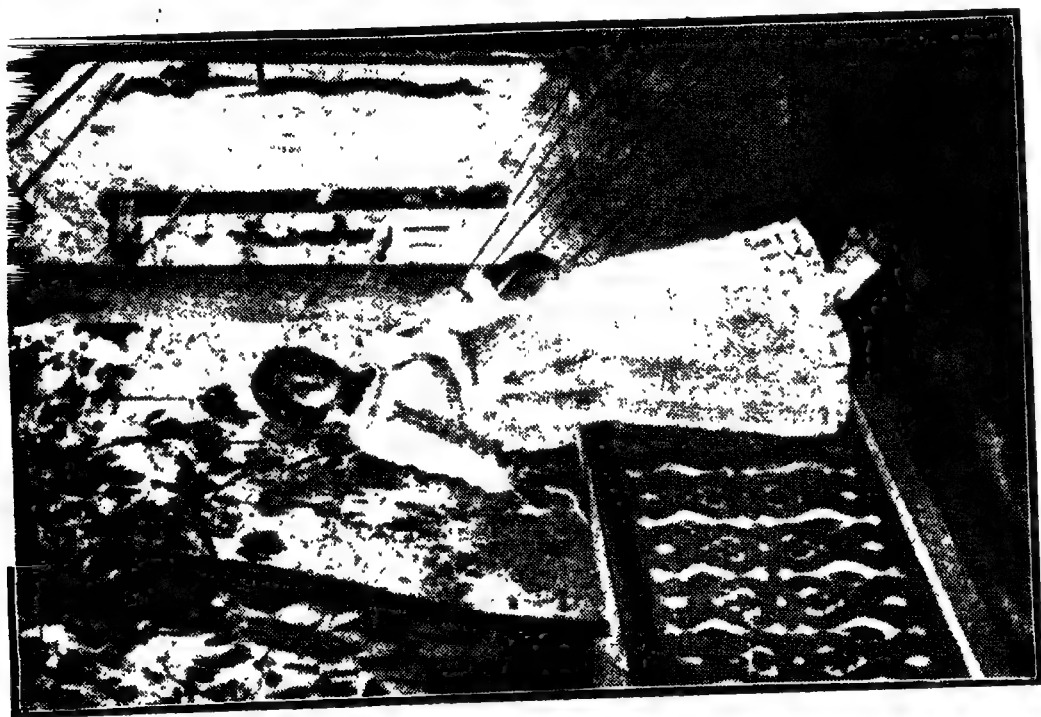
রাশিয়ার বালখিল্য সেনাদল (জার্ম্মাণীর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য রাশিয়ানরা বালকদের ধরিয়া তাহাদের হাতে রাইফেল দিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়াছিল)

রাশিয়ান তরুণী কলাশিল্পী

রাশিয়ান চাষাভুষোরা বিশ্বাস করে যে, সকল মঙ্গল-কার্য্যেই "চার্চ্চ" অর্থাৎ গীর্জ্জার আশীর্ব্বাদ আবশ্যক। এই আশীর্ব্বাদ না লইয়া কোনো কাজ করিলে তাহার ফল শেষ পর্য্যন্ত ভাল হয় না। গৃহ-প্রবেশ, নতুন দোকান খোলা, বিদেশ-যাত্রা, বিবাহ, নামকরণ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি বহু কাজে ধর্ম্মযাজকের আশীর্ব্বাদ এখনও অনেক স্থানের লোকেরা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে। ধর্ম্ম-যাজককে বাদ দিয়া তাহাদের চলে না। এই কারণে ধর্ম্ম-যাজক বা পাদ্রীর ক্ষমতা সমাজের উপর বিশেষভাবেই আছে। কার্য্য-সুচনা করিবার সময় কেবল একবার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেই ব্যাপার ঐখানেই শেষ হইয়া যায় না। প্রত্যেক বছর ঐ দিন হইতে ধর্ম্ম-যাজককে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া পুনরায় আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে হয়। রাশিয়ার ধর্ম্ম-যাজকদের প্রভাব কতকটা আমাদের দেশের গ্রাম্য এবং অশিক্ষিত পূজারী এবং পুরোহিতদের সমতুল্য। আমাদের দেশের পূজারী এবং পুরোহিতদের মধ্যেও যেমন পণ্ডিত এবং জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন, রাশিয়াতেও ঠিক তাই; তবে তাঁহাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। পূজা অর্চ্চনা ইত্যাদি কার্য্য করিয়া দিবার জন্য ধর্ম্মযাজককে দক্ষিণা দান করিতে হয়।

রাশিয়ান রমণীগণের তীর্থযাত্রা

বরফ আহরণ (এই লোকগুলি খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষার জন্য জমিয়া-যাওয়া নেভা নদী হইতে বরফের চাঁই কাটিয়া পেট্রোগ্রাডে লইয়া যাইতেছে)

অর্থের পরিমাণ পুরোহিত নিজে যাহা বলিবে, তাহাই দিতে হয়। কারণ, পুরোহিত সন্তুষ্ট না হইলে তাহার পূজাও আশানুরূপ সুফলপ্রদ হইবে না। রাশিয়ার গ্রাম্য লোকদের পূজারী পাদরীদের সম্বন্ধে একটি বড় অদ্ভুত ধারণা আছে। পাদরী যখন পূজার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, কেবল সেই সময়টুকুর জন্যই সে যাদুকরের শক্তি পায়,—তাহার মন্ত্রে শক্তি আসে। অন্য সময় সাধারণ লোকের সহিত তাহার কোনো প্রভেদ নাই।

রাশিয়াতে উৎসবাদি অত্যন্ত জাঁক-জমকের সঙ্গে করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক উৎসবেই সঙ্গীতের স্থান প্রথম। রাশিয়ান গানের মধ্যে একটা উন্মাদনী শক্তি আছে। গীর্জ্জায় যখন গান হয়, তখন অত্যন্ত লঘুচিত্ত ব্যক্তির মনও ভগবৎ-প্রেমে সেই সময়কার মত আপ্লুত হয়। ক্রীষ্টমাস, ইষ্টার ইত্যাদি উৎসব রাশিয়াতেও প্রথম স্থান

পায়। রাশিয়ানরা নামত খ্রীষ্টিয়ান হইলেও, ইহাদের মধ্যে পৌত্তলিকতার ভাব অনেক কাল যাবৎ কিছুমাত্র

গ্রাম্য পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ বিতরণ

কমে নাই। যিশুর ছবি পূজা করা ত অনেক স্থানেই হইয়া থাকে। খ্রীষ্টয়ান সাধুরাও অনেকের কাছে পূজা পাইতেন। বর্ত্তমান সোভিয়েট রাশিয়াতে পৌত্তলিকতা অনেক পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে।

রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লবের পূর্ব্বে ধর্ম্মযাজকদের নৈতিক অধঃপতন অতিমাত্র রকম হইয়াছিল। এমন কোন পাপ্‌কার্য্য ছিল না, যাহা ধর্ম্মযাজকরা করিত না বা করিতে পারিত না। ধর্ম্মকেও তাহারা অর্থের বিনিময়ে জারের পদতলে অঞ্জলি দিল। সাধারণ লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, ধর্ম্মের নিষেধ তাহারা ভঙ্গ করিলে পাপ হয়, কিন্তু রাজার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতে পারেন। তিনি ধর্ম্মেরও রাজা—অতএব ধর্ম্মই তাঁহার বিধান মানিয়া চলিবে, তিনি ধর্ম্মের বিধান মানিতে বাধ্য নন। এখন এই ধারণার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে হাজার রকমের অনাচার অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু রাজার কাণে কিছু তুলিতে মন্ত্রিগণও সাহস করিত না। রাজার কাণে এই সকল উঠিলে হয় ত সেই সময় ইহার কিছু প্রতিকার হইতে পারিত।

জারের সামনে মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া সকল লোকই অত্যন্ত সভয়ে এবং ভীত চিত্তে দাঁড়াইয়া থাকিত। রাজাকে বলা হইত—"ভগবানে অভিষিক্ত"। পৃথিবীর কোনো লোক তাঁহার কোনো কার্য্যের সমালোচনা করিতে বা তাহাতে বাধা দান করিতে পারে না। রাজা সর্ব্বশক্তিমান্,—ভগবান রাজার শরীরে বাস করেন। শিক্ষিত লোকেরাও যে সকলে রাজাকে এই ভাবে দেখিত, তাহা নহে। তবে বেশীর ভাগ লোকে রাজাকে যে ভাবে দেখে, তাহারাও সেইরূপ ভাব দেখাইত যে তাহারাও রাজাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মনে করে।

রাজসভা একটি ষড়যন্ত্র এবং ব্যক্তিগত রেষারেষির স্থান ছিল। যাহাদের উপর রাজ্য শাসন করিবার ভার, তাহারা রাজ্যের কোন খবর রাখিত না; কেবল নিজের স্বার্থের উন্নতির চেষ্টায় থাকিত। রাজ্যের চারিদিকে অসন্তোষ

গ্রীক মতের রাশিয়ান পাদ্রী

এবং অন্নকষ্ট বিরাজমান থাকিত। প্রজারা চুপ চাপ; কিন্তু তাহাদের মনে দারুণ অশান্তির আগুন জ্বলিত। রাজকর্ম্মচারীরা এই সকল ব্যাপারের খবর রাখিয়াও তাহার কোনো প্রতিকার করে নাই। জারের কাছেও যদি তাহারা প্রজাদের এই অবস্থার এবং রাজ্যের সাধারণ অবস্থার কথা জানাইত, তাহা হইলে বোধ হয় রাশিয়ার রাষ্ট্র-বিপ্লব এমন আচম্‌কা আসিয়া পড়িত না। রাশিয়ার রাজশক্তির পতনে, রাজার অপেক্ষা রাজকর্ম্মচারীদের অপরাধ অধিক ছিল।

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাশিয়ার সাধারণ লোকদের বিশ্বাস ছিল যে, জার নিজে সমস্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। রাজ্য পরিচালনা যে কি ব্যাপার, এবং তাহার জন্য কত রকমের কলকব্জার যে দরকার হয়, সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকদের কোনো প্রকার ধারণা ছিল না। শিক্ষিত ব্যক্তিরা সমস্ত খবরই রাখিত। তাহারা রাজশক্তির অত্যাচার প্রকাশ্যে মুখ বুজিয়া গ্রহণ করিত; কিন্তু গোপনে নানা ভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। প্রকাশ্যে কিছু বলিবার বা করিবার কাহারো সাহসে কুলাইত না। প্রকাশ্যে রাজার বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ করা বা কিছু করা মানে বরফাবৃত সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসন-দণ্ড লাভ করা। নির্ব্বাসন-দণ্ডের আজ্ঞা

নাছোড়বান্দা রাশিয়ান ভিখারী (কিছু আদায় না করিয়া ছাড়িবার পাত্র নয়!)

রাশিয়ান চাবিওয়ালা। ইহারা আমাদের দেশের চাবি-ওয়ালাদেরই মতন একরাশ চাবি বাজাইয়া ফেরী করিয়া ভাঙা তালা ও কল মেরামত এবং হারান চাবি তৈয়ার করিয়া বেড়ায়)

এমন হঠাৎ দেওয়া হইত যে, দণ্ডিত ব্যক্তি তাহার জন্য কোনো প্রকার আয়োজন করিবার সময় প্রায় ক্ষেত্রেই পাইত না। সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনে যাওয়া এবং পরিচিত জগৎ হইতে চিরবিদায় লওয়া একই কথা। যাহারা যাইত, তাহাদের শতকরা ৯৯ জন সেই দেশেই থাকিয়া যাইত। অনেকে নতুন ঘর-সংসার পাতিয়া বসিত। রাজনৈতিক অপরাধে যাহারা নির্ব্বাসন-দণ্ড লাভ করিত, তাহারা আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ-কষ্ট পাইত না। সাইবেরিয়ার কোনো সহরে পৌঁছিয়া তাহারা পুলিশকে তাহাদের পৌঁছান সংবাদ দিয়াই খালাস। তার পর তাহারা স্বাধীন ভাবে থাকিতে পাইত। খাস রাশিয়া অপেক্ষা এইখানে তাহারা কার্য্য করিবার এবং মনোভাব খোলাখুলি বলিবার বেশী সুবিধা পাইত। এইখানে তাহারা সহজেই নিজেদের খরচ রোজগার করিয়া লইতে পারিত।

সাইবেরিয়ার সহিত অনেক বিষয়ে ক্যানাডার তুলনা করা যাইতে পারে। সাইবেরিয়ায় খনির সংখ্যা নাই। সেই সমস্ত খনিতে কত রকমের জিনিস যে পাওয়া যায়, তার

রাশিয়ান শ্রমজীবিনা

সংখ্যা নাই। চাষবাস করিবার মত জমিও সাইবেরিয়াতে সহস্র সহস্র বিঘা পড়িয়া আছে। জারের আমলে সাইবেরিয়াকে নির্ব্বাসিতদের আড্ডা করা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগান হয় নাই। বর্ত্তমানে সোভিয়েট সরকার সাইবেরিয়াতে খনিজ পদার্থ উত্তোলন, চাষবাস ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য্যে হাত লাগাইয়াছে। ভরসা আছে যে, কিছু কাল পরে এক সাইবেরিয়া হইতে সমগ্র ইয়োরোপের খাদ্য যোগান যাইতে পারিবে।

রাজনৈতিক অপরাধীদের সাইবেরিয়াতে কিছু সুবিধা থাকিলেও, অন্যান্য অপরাধীদের কোনো প্রকার সুখ এই দেশে ছিল না। সাইবেরিয়াতে গ্রীষ্মকাল মাত্র কয়েক সপ্তাহ—এই সময় শীতের আধিক্য সামান্য পরিমাণে কমে। শীতকালে সমস্ত পথঘাট বরফে ঢাকা থাকে। কয়েদীদের খালি পায়ে এবং সামান্য বস্ত্র পরিয়া এই সমস্ত পথ অতিক্রম করিতে হইত। পথের যে কি কষ্ট, তাহার বর্ণনা করা যায় না। পথেই অনেক কয়েদী প্রাণত্যাগ করিত। পথ অতিক্রম করিয়া যাহারা গন্তব্য স্থলে পৌছিত, তাহারাও প্রায় আধমরা অবস্থায় পৌছিত। কয়েদীদের উপর অত্যাচারও হইত অমানুষিক রকমের। কথায় কথায় চামড়ার চাবুক মারিয়া কয়েদীদের পিঠের চামড়া তুলিয়া দেওয়া হইত। সাইবেরিয়ায় যে সকল জেলখানা ছিল, তাহার একমাত্র কর্ত্তা ছিল জেলার। তাহার কথার উপর কথা বলিবার দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না। কয়েদীরা জেলারকে যেমন ভয় করিত, যমকেও তেমন ভয় করিত কি না সন্দেহ। অত্যাচার করিত জারের কর্ম্মচারীরা। জার তাহার কোন খবর রাখিতেন না, তাঁহাকে কোনো খবর দেওয়াও হইত না। কিন্তু সাধারণ লোকে মনে করিত—এই সমস্ত অত্যাচার বুঝি জারের আজ্ঞামতই হইতেছে। সেইজন্য রাষ্ট্র-বিপ্লব যখন দেশের উপর বন্যার মত আসিয়া পড়িল, তখন সাধারণ লোকেরা জারকে সপরিবারে হত্যা করিয়া তাহাদের বহু শত বর্ষের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইল। রাজকর্ম্মচারীরা, যাহারা সাধারণ লোকদের দলে যোগদান করিল, তাহারা বাঁচিয়া গেল,—বাকি নিহত হইল। অথচ রাজকর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করিলে বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত।

রাশিয়ানরা ভাল বক্তার পাল্লায় পড়িলে বক্তার

দূর-তীর্থযাত্রী

মতানুসারে সকল কাজই করিতে পারে। তিনজন ভাল বক্তা যদি পর পর বক্তৃতা দেন, তবে শেষের জন যাহ

বলিবেন, রাশিয়ান শ্রোতার দল তাহাতেই সায় দিবে। নিজেরা ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবার বিশেষ অভ্যাস তাহাদের নাই।

প্রতিজ্ঞা করিতে রাশিয়ানরা পিছপাও হয় না। যে-কোন কাজ করিবার প্রতিজ্ঞা তাহারা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়াই করিবে। প্রতিজ্ঞা করিবার সময় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে বলিয়াই করিবে। ঠকাইবার মতলব লইয়া তাহারা কোনো প্রতিজ্ঞা করিবে না—কিন্তু কোনো কারণে প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইলে, তাহারা বিন্দুমাত্র লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করিবে না। এই কথা অবশ্য সাধারণ ভাবে বলা হইতেছে। শিক্ষার প্রসার হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল চরিত্রদোষ নিশ্চয় দূর হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়েও এই মানসিক দুর্ব্বলতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ে অল্পবিস্তর আছে।

রাশিয়ান জুরিদের সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। বিচারে প্রমাণ হইল যে একজন লোক আর এক-জন লোকের ঘরে আগুন লাগাইয়া দ্যায়। কিন্তু জুরিরা মত দিবার সময় লোকটিকে নির্দ্দোষ বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। তাহার কারণ দেখান হইল যে—আগুন দেওয়ার শাস্তি দু' বছর জেল হইলে, তাহারা দোষীকে দোষী বলিত। কিন্তু যেহেতু আগুন দেওয়ার শাস্তি অত্যন্ত বেশী, ৫ বৎসর জেল; সেইজন্য তাহারা দোষীকে দোষী জানিয়াও নির্দ্দোষ বলিতে বাধ্য হইল। তাহা ছাড়া বিচারের দিনটি খুব পরিষ্কার এবং ভাল ছিল, এবং এমন চমৎকার দিনে কাহাকেও শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে না বলিয়াও দোষীকে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস করিয়া দেওয়া হইল।

অনেকের মতে পাপীর শাস্তি মানুষের দিবার অধিকার নাই, ভগবানই যাহার যা দণ্ড তাহা ঠিক দিবেন। এই বিশ্বাসে অনেক সময় বিচারক এবং জুরি এক মত হইয়া অনেক দোষীকে খালাস করিয়া দ্যায়। আবার এমনও দেখা যায় যে, সামান্য অপরাধে কাহারো বা ভীষণ দণ্ড লাভ হইল।

বরফাস্তীর্ণ পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা

জারের রাজত্ব কালে খুনীর দণ্ড হইত বারো বৎসর নির্ব্বাসন-দণ্ড। কিন্তু জেলখানায় ষড়যন্ত্র করা, জেল হইতে পলায়ন, পাহারাওলাকে মারপিট ইত্যাদি অপরাধে প্রাণদণ্ড

হইত। চুরী, জুয়াচুরীর বিশেষ দণ্ড সকল সময় ঠিক মত হইত না। অনেক সময় জুয়াচুরীকে চালাকী এবং বাহাদুরীর কাজ বলিয়া গণ্য করা হইত। তবে পুলিশ আদালতের বিচার অনেক ক্ষেত্রে ভাল হইত। এইখানে ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে দুই পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে রায় দিতেন। পুলিশ আদালতে উকিলদের স্থান ছিল। বাদী এবং ফরিয়াদী নিজমুখে আপনাপন বক্তব্য বলিত। ম্যাজিষ্ট্রেট নিজেই তাহাদের জেরা করিতেন। লোকে এই সকল নিরপেক্ষ বিচারকের উপর যথেষ্ট আস্থা রাখিত। সামান্য সামান্য মোকদ্দমার বিচার করিয়া পুলিশ আদালতের বিচারকেরা কালে বড় বড় জজ হইত।

রাশিয়ান চাষারা এমনি খুব সরল এবং সোজা বুদ্ধির লোক হইলেও, কতক বিষয়ে তাহাদের প্রচুর চতুরতা দেখা যায়। তাহারা একা কোন কাজ করিতে চাহে না। সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে তাহারা ভালবাসে; এবং ইহাতে কাজও তাহারা ভাল করিয়া করিতে পারে। বহুকাল পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে স্বায়ত্ত শাসন ছিল। গ্রামের লোকেরা পঞ্চায়েত করিয়া গ্রামের শাসনাদি সকল কার্য্য করিত। বর্ত্তমান সময়েও আবার সেই পূর্ব্ব প্রথা ফিরিয়া আসিতেছে। প্রতি গ্রামে একজন করিয়া মেয়র বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য একটি কমিটি বা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা থাকে। মেয়র এই সভার সাহায্যে গ্রামের সকল প্রকার শাসন কার্য্য চালান।

রাশিয়ানরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একজনের চালনায় কাজ করিতে চায়। এমন কি, যদি তিন জন লোক কোন কাজে নিযুক্ত হয়, তবে তাহারা তাহাদের মধ্যে একজনকে তাহাদের নেতা নির্ব্বাচন করিয়া, তাহার কথামত কাজ করে। ইহাতে কাজের এই সুবিধা হয় যে, কার্য্য সম্বন্ধে ভাবনা চিন্তা একজন করে, বাকী দুই জন তাহার কথামত কাজ করিয়া যায়। তাহাদের ভাবনা চিন্তার জন্য সময় নষ্ট করিতে হয় না, বা মতদ্বৈধ ঘটিয়া কার্য্যহানি হয় না। রেলের কাজে যাহারা নিযুক্ত তাহাদের বিশেষ সঙ্ঘ আছে। মিস্ত্রিদের সঙ্ঘ আছে। কুলীদেরও সঙ্ঘ আছে। এই প্রকারে দেখা যায়—বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত লোকদের নিজেদের একটি করিয়া সঙ্ঘ আছে। সঙ্ঘের একজন কর্ত্তা থাকে এবং তাহার সাহায্যের জন্য একটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাও থাকে। বেতনাদি লইয়া গোলমাল হইলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা মধ্যস্থ হইয়া অনেক সময় গোল মিটাইয়া দ্যায়। রাশিয়ার এই "আর্টেল" অর্থাৎ কর্ম্মীসঙ্ঘ রাশিয়ার বিশেষ নিজস্ব জিনিস। "ট্রেড্ ইউনিয়ন" ইত্যাদির জন্মও বোধ হয় ইহা হইতেই হয়।

সঙ্ঘ হইতে অনেক সময় অনেক কাজের ঠিকা লওয়া হয়। কাজ শেষ করিয়া যাহা আয় হয়, তাহা সঙ্ঘের সভ্যদের ভিতর বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। রাশিয়ার সমস্ত সঙ্ঘের সভ্য সংখ্যা বর্ত্তমানে দুই কোটীরও বেশী হইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

বয়াটে ছেলে

শ্রীকঙ্কাবতী সাহু বি-এ

সে ছিল পাড়ার মধ্যে বয়াটে ছেলে। বাপ-মার প্রদত্ত নামটা চাপা দিয়ে, পাড়ার মাতব্বরের দল যে কবে কোন্ ফাঁকে এবং কেন যে তার কপালে এই "ট্রেড্ মার্কটী" দাগিয়া দিয়াছিলেন সে তাহা জানে না—এবং জানিবার প্রয়াস সে কোন দিনও করে নাই। সে অবাধে পাড়ার বিজ্ঞ লোকদের বিস্ময়-দৃষ্টির মাঝখান দিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে চলিয়া যাইত। ফলে দাঁড়াইল এই যে, পাড়ার কোন ছেলে তাহার সঙ্গে মিশিল না, সকলের বাড়ী যাওয়া-আসা তাহার বন্ধ হইল—তাহাদের মা বেটা দুজনকে একধারে সরাইয়া রাখিয়া পাড়ার লোকজন কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু এ নিশ্চিন্ততার মাঝে পরিপূর্ণ সুখ হইল না, কারণ পল্লীগ্রামের মতন ত আর

এখানে ধোপা, নাপিত, ডাক্তার বন্ধ হয় না। সুতরাং মুরুব্বিরা গোঁফে চাড়া দিয়া সেই নির্য্যাতন দেখিতে না পাইয়া মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। আবার সেই বয়াটে ছেলেটা যখন সিল্কের পাঞ্জাবীর হাতা উঠাইয়া, সোনার ঘড়ি বাঁধা কব্জিখানা বাহির করিয়া বুক ফুলাইয়া চলিত, তখন তাঁহাদের মুখের চেহারা এমন অস্বাভাবিক রকমের পাংশুবর্ণ ধারণ করিত, যাহার কারণ অতি বড় মনস্তত্ত্ববিদ্‌ও বলিতে পারেন না।

তার নাম ভুলো। চেহারাটা দেখিতে আঠার কি আটাশ, অনুমান করা শক্ত। যে বাড়ীটায় সে থাকে, সে বাড়ীটা তার নিজের। বাড়ীর মধ্যে বুড়ো মা আর একটী বুড়ী ঝি— এই নিয়েই তার সংসার। মা সরস্বতার সঙ্গে কবে যে তার নন্‌-কো-অপারেশন হয়েছিল—কেউ জানে না। বাঁধা টাইমে, নাকে-মুখে গুঁজে, সকলের মত বেলা ন'টায় ছুটাছুটী করতেও কেহ তাকে দেখে নি। কাজেই কাজকর্ম্ম সে কিছুই করে না। অথচ কেমন করে ধার দেনা না করে এই কলকাতা সহরে ভাল খেয়ে-পরে ঘুমিয়ে সেজে-গুজে পরম নিশ্চিন্তে সে সিগারেট ফুঁকিয়া বেড়ায়—এইটাই সকলের বিস্ময়ের বিষয়। লোকে বলে বুড়ীর হাতে টাকা আছে। কেউ প্রতিবাদ করে বলে, "না হে, জান না— ও-ছোঁড়া লুকিয়ে কোকেনের ব্যবসা করে।" কিন্তু কেহই কোনরকম স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারে না।

সেদিন কালীপূজা। পাড়ার শেষে যেখানে বস্তিটায় কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষের বাস, তারই পোড়ো জমিটার উপর প্যাল টাঙ্গানো হয়েছে,—চারিধার পাতা দিয়া সাজানো,—মাঝখানে একখানা ছেঁড়া সতরঞ্চি পাতা। সেখানে 'বারোয়ারা'র কালীপূজা। ঢাক ঢোলের শব্দে সারা পল্লী মুখরিত। "বারোয়ারী" বলিতে তারা নিজেরাই সব···পাড়ার ভদ্রলোকদের এর মধ্যে কোন সংস্রব নাই,— এক পয়সা চাঁদাও কেহ দেন নাই। কেবল ভুলো মোটা চাঁদা দিয়ে তাদের এই উৎসবে যোগ দিয়েছে; আর সে-ই না কি দলের পাণ্ডা। সারারাত ধরিয়া পূজা হইল। শ তিনেক কাঙ্গালী পেট ভরে খেয়ে দুহাত তুলে ভুলোকে আশীর্ব্বাদ করে চলে গেল। ভুলো রাত তিনটার সময় বাড়ী এসে কড়া নাড়তেই, তাদের বুড়ো ঝি এসে দরজা খুলে দিলে। সেই সময় পাশের বাড়ী থেকে কে অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠলো, "ছোঁড়াটা একেবারে বয়ে গেল।" ভুলো হেসে বাড়ীর ভেতর প্রবেশ করলে!

২

সেই পাড়ায় এক বুড়ী গয়লানি ছিল—মঙ্গলা মাসী। হঠাৎ কলেরা হয়ে বুড়ী সেদিন সকালে মারা যায়। বুড়ীর আর কেউ নেই,—দশ বছরের নাতি কেবলা কাঁদতে কাঁদতে ভুলোর কাছে এসে বল্লে, "দাদাবাবু, দিদিমা কি রকম করছে, তুমি একবার এস না।"

"বুড়ীর কি হল?"

"কি জানি? সকালে ঘুম ভাঙ্গতে দেখি, ঘরময় বমি করেছে, কথা বলতে পারছে না। তোমাকে আমায় ডাকতে বল্লে, তাই ত মুই ছুটে এনু।"

"চল্ দেখি।" ভুলো যখন বুড়ী মঙ্গলার কাছে এল, তখন বুড়ীর আসন্ন অবস্থা! জড়িতকণ্ঠে মঙ্গলা বল্লে, "দাদাবাবু, গতিটা করিয়ে দিও। চল্লুম। ছোঁড়াটাকে জামাইটার কাছে ন-গাঁয়ে পাঠিয়ে দিও। পায়ের ধূলো একটু দাও।" ভুলো বস্তি থেকে জন তিনেক লোক সঙ্গে ফিরে এল। সকলেই কাজে চলে গেছে। যারা ২।১ জন আছে, তারাও কলেরার নামে অসুখের ভান করে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। ভুলো ছেলেটাকে মার কাছে রেখে তাদের সঙ্গে বুড়ী মঙ্গলার মৃতদেহ নিয়ে যখন পাড়ার মধ্যে দিয়ে "হরিবোল" দিয়ে নিয়ে গেল, তখন মুরুব্বীরা বলে উঠলেন "একেবারে গোল্লায় গেল!···বামুনের ছেলে হয়ে কি না ওই মাগীকে কাঁধে করে নিয়ে গেল,—ম্লেচ্ছ বেটাকে পাড়া-ছাড়া কর।"

* * * *

পরদিন ভুলোর মাও মঙ্গলার অনুসরণ করলে। পাড়ার মুরুব্বীরা মাথা নেড়ে বল্লেন "দেখলে ত—ধর্ম্ম আছেন কি না! ছোঁড়াটা বড় বাড়িয়েছিল। বাছাধনের এবার মাতৃদায়— দেখি, আমাদের দরজায় মাথা নোয়াতে হয় কি না।" এত দুঃখেও ভুলো হাসিল। তার যৌবনের গরম রক্ত লাফিয়ে উঠে এই সব নাচ নিষ্ঠুর লোকগুলোকে শিক্ষা দিতে চাইতেই, মার মৃত্যু-বিবর্ণীকৃত মুখখানার দিকে চেয়ে সে নিজেকে সামলে নিলে। তার থিয়েটার ক্লাবের ছেলেদের নিয়ে সে মাতৃ-সৎকার করে ফিরে এল। বুড়ো ঝি পাঁকাটি জ্বালিয়া

দেয়, ভুলো মালসা পোড়াইয়া হবিষ্যান্ন রাঁধে। কোন দিন বলে "আজ থাক্ ঝি-মা, ক্ষিধে নেই।" বুড়ো ঝি তাহার ভাবান্তর দেখে চোখের জলে ভাসে। যে খোকা সমস্ত দিন হেসে খেলে বেড়াত, সে আজকাল গালে হাত দিয়ে দিন-রাত ভাবে! কেন এত ভাবে? খোকনের ত টাকা আছে!

শ্রাদ্ধ মিটে গেল। খুব সমারোহের সঙ্গেই হল—কিন্তু পাড়ার লোক কেউ গেল না। সেই সময় উত্তরবঙ্গে জল-প্লাবনের জন্য সর্ব্বত্র চাঁদা আদায়ের ধূম পড়িয়াছিল। চারিদিকে ছেলেরা হারমনিয়ম বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে ছোট বড় একসঙ্গে মিশে পাড়া কাঁপিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ায়। এমন কি যে বারাঙ্গনাগণ সর্ব্বদা বিলাস-তরঙ্গে ভাসে, তাহারা পর্য্যন্ত দেশের এই দুঃসময়ে নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। ভুলোর প্রাণে একটা সাড়া পড়ল। সত্যই ত,—এত দিন সে বৃথাই দিন কাটাইয়াছে। আজ তাহার কেহ নাই—সংসারের একমাত্র বাঁধনটুকু ছিঁড়িয়াছে। এই ঘরবাড়ী, অর্থ, ঐশ্বর্য্য,—ইহার সার্থকতা কোথায়? তাহার নিজের প্রয়োজনে এরা কোন দিন লাগবে না। বাঁধন-হারা প্রাণটা স্রোতের মুখে তরণীর মতন কোন্ এক অজানা পথে কিসের টানে ভাসিয়া চলিল,—পর দিন আর কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না।

* * * * *

ভুলোর বাড়ীর জিনিসপত্র গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে যখন চলে গেল, পাড়ার লোক বিস্মিত হল। ক্রমে সকলেই শুনলে—বাড়ীটা সে বেচে গেছে। পাড়ার মাতব্বরের দলের একজন তার সঙ্গীদের কাছে বল্লে—"দেখলে হে, বলেছিলুম না মদে-মেয়েমানুষে ছোঁড়াটা সর্ব্বস্বান্ত হবে! কিন্তু ওর আক্কেল দেখ,—সেই বাড়ীখানা আধা-কড়িতে বেচলে, তবু—আমি পাড়ার লোক, দূর সম্পর্কে মামা হই,—আমার কাছে বেচলে না। উচ্ছন্ন যাবে, বয়াটে কোথাকার।"

"সে না Flood reliefএ গেছে?"

লোকটা হাসবার ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত করে বল্লে, "ওটা আমিই রটিয়েছি,—আসলে তা নয়। হাজার হক সম্পর্কে ভাগনে ত বটে। কলঙ্কটা ত ঢাকতে হবে, না হলে সে একটা বয়াটে ছেলে।"

অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্য *

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম

বাংলা সাপ্তাহিকে, মাসিকে, বার্ষিকে আজকাল ছোটবড় গল্প, উপন্যাস সস্তা হইয়া ছড়াছড়ি যাইতেছে। সম্পাদকদের প্রশ্ন করিলে, প্রবীণ যাঁহারা তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন,—"কি করবো বল, গল্প না হ'লে কাগজ তো আর চলে না!" নবীন যাঁহারা, এবং নিজেদের যাঁহারা তরুণ বলিয়া কাগজে-পত্রে বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকেন, তাঁহারা একটু উষ্ণ হইয়া বলেন,—"কেন, গল্প-সাহিত্য কি আমাদের সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ নয়? গল্পের ভিতরই কি মানব-জীবনের বিচিত্র ধারা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না? গোর্কি, শেকভ, শরৎচন্দ্র কি—" হঠাৎ মনে পড়িয়া যায় লেখক যশ-প্রার্থী আমি, নবীন সম্পাদককে চটাইয়া ভাল করি নাই; সুতরাং মধ্যপথেই তাঁহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া বলিতে হয়,—"হাঁ, তোমার কথাই ঠিক, আমারই বুঝিতে ভুল হইয়াছিল।"

ট্রামে চলিতে চলিতে দেখি—আঠারো কি বিশ বৎসরের দুই যুবক অতি উৎসাহে তর্কে মাতিয়াছে। মনের মধ্যে আপনি কৌতূহল জাগে, কান পাতিয়া শুনি,—ট্রামের ঘর্ঘর ও রাস্তার বিচিত্র কোলাহলকে ছাপাইয়া উঠিয়া, মাঝে মাঝে ক্নুট হামসুন্, জোহান্ বোয়ার, ম্যাক্সিম গোর্কির নাম উচ্চারিত হইতেছে। বিস্মিত পুলকে ভাবি—এই বয়সে তো আমরা থ্যাকারে, ডিকেন্স্, জর্জ্জ ইলিয়টের যুগও পার হই নাই! ইহারা সমস্ত অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া

* শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে দিল্লী নগরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত।

বর্ত্তমানের সঙ্গে সমান-তালে পা ফেলিয়া চলিয়াছে,—আধুনিক য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিরাজ্যের মধ্যে স্বেচ্ছাবিহার করিতেছে। আবার নবীন সম্পাদকের কথা মনে পড়ে—বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হৃদয়ে আশা জাগে। কিন্তু যত দিন যায়, মাসিক, সাপ্তাহিকের গল্প ও উপন্যাস গুলি যতই মন দিয়া পড়ি, তাহার মর্ম্মকথার মধ্যে ভাল করিয়া ঢুকিতে চেষ্টা করি, মন ততই নৈরাশ্যে ভরিয়া উঠে,—বাংলা কথা-সাহিত্যের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে তখন আর খুব বেশী উজ্জ্বল বলিয়া মনে করিতে পারি না। যে কয়টি মাসিক ও সাপ্তাহিক আজকাল হাতে হাতে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহার একটি নয়, দু'টি নয়, গল্পের পর গল্প পড়িয়া যাই,—মন বিরূপ হইয়া উঠে, তিক্ততায় চিত্ত বিকৃত হয়। এ কি কৃত্রিম ভাব-বিলাস, প্রেমের অসহনীয় ন্যাকামি, ভাষা ও ভাবের বিকৃত অসংযম, বাস্তবতার নামে কলাকৌশলশূন্য অভিনয়, আন্তরিকতাবিহীন অনুভূতির মায়া-কান্না বাংলা কথা-সাহিত্যকে পাইয়া বসিল! ইহাই কি বাংলার নবযুগের সাহিত্য? ইহারই মধ্যে কি আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিচিত্র সমস্যা ও নিগূঢ় রসরহস্য রূপায়িত ও প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতেছে? তরুণ তরুণীর অসীম প্রেম-তৃষ্ণা, দেশের লক্ষ লক্ষ দুঃখীজনের করুণ জীবন যাপন, সমাজ ও রাষ্ট্রে আমাদের শত-সহস্র অধীনতার নিগড় সমস্তই তো কথা সাহিত্যের অমূল্য ও অপূর্ব্ব উপাদান; কিন্তু যে কল্পনা (imagination) ও সহানুভূতি-দৃষ্টি (sympathetic vision) থাকলে, মনের যে প্রসার থাকলে, এই উপাদানকে সাহিত্যের সামগ্রী করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহা কোথায়? কথায় কথা গাঁথিয়া, কান্নার মালা দুলাইয়া, নাকি-সুরে বাঁশী ধরিলে তাহাতে ছিঁচকাঁদুনে আদুরে ছেলের আব্দার প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু প্রেমের নীরব-গোপন গুঞ্জনের যে মৃদু-মাধুর্য্য, তাহা কি এই ন্যাকামি এবং কাঁদুনে ভাষা-বিলাসের বস্তু? প্রেমের রহস্য কত বিচিত্র, হৃদয়ের গোপন-পথে তাহার যাওয়া-আসা; হৃদয় দিয়া তাহাকে জানিতে ও বুঝিতে হয়; কিন্তু সে জন্য যে শুদ্ধ-সবল চিত্তের প্রয়োজন, যে শিক্ষা ও সাধনার আবশ্যক, তাহা কোথায়? যে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক প্রেম-বিলাস বাংলার অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহার চাপে নূতন সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ফলে ছোটবড় যত গল্প সব এমন একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে যে, একটি একটি করিয়া প্রত্যেকটি গল্প তলাইয়া পড়িবার কোন প্রয়োজন হয় না, গ্রীক-পুরাণের "Procrustian Bed"এর মতন সব গল্পগুলিকেই এক মাপ কাঠিতে ফেলিয়া পরিমাপ করা চলে। খুব কম গল্পই মনের মধ্যে এমন ছাপ রাখিয়া যায় যে, ছ'মাস পরে তাহার 'প্লট' চেষ্টা করিয়াও স্মরণে আনা যাইতে পারে! মাঝে মাঝে দু'একটি এমন গল্প চোখে পড়ে, যাহার মধ্যে হয় তো লেখকের ভাষার 'কেরামতি' কিংবা প্লটের নূতনত্ব কতকটা আবিষ্কার করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাতে কথা-সাহিত্যের যে আর্ট তাহাকে ধরাও যায় না; শক্তি ও সংযম, কল্পনা ও সত্য-অনুভূতির অভাবে তাহাও অপাঠ্য হইয়া উঠে। মানবচিত্ত ও চরিত্রের যে অভিজ্ঞতা থাকিলে, কল্পনার যে প্রসার, অনুভূতির যে গভীরতা থাকিলে, আমাদের বাঙালী-জীবনের প্রতি দিনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও সাহিত্যের সত্যবস্তু হইয়া উঠে, সুদূর আফগানিস্থানের "কাবুলীওয়ালা"ও নিতান্ত আপনার জন হইয়া দেখা দেয়,—সেই অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও অনুভূতির কোন পরিচয় নবীন লেখকদের একটি গল্পেও বুঝি ধরা-ছোঁয়া যায় না। আধুনিক বাংলা গল্পের নায়ক যে হইবে,"অচঞ্চল অগ্নিশিখার" মত হইবে তাহার "দেহযষ্টি," "আর্টিষ্টের মতন" হইবে তাহার "লতানো আঙুল," সময়ে অসময়ে ঘরে বাহিরে প্রেমে পড়িতে পারাই হইবে তাহার একমাত্র যোগ্যতা; আর নায়িকার হইবে "বাঁশীর মত নাক, লাল টুকটুকে গাল, পাতলা ঠোঁট, কোমর ছোঁয়া কোকিল-কালো চুল," পরনে তাহার থাকিবে "হেলিয়োট্রোপ্ রংয়ের সাড়ী," "ফিকে নীল রংয়ের ব্লাউস," আর বাজিবে তাহার "চুড়ির রিনিঝিনি" ও "পিয়ানোর টুংটাং!" নিছক কাব্যবিলাসপূর্ণ শুধু কথায় গাঁথা কতকগুলি কাহিনী এবং রসরহস্যবিহীন কতকগুলি সত্যঘটনার বিবরণই যেন অতি-আধুনিক বাংলা গল্প-সাহিত্যের প্রধান উপাদান। এই সব গল্পের প্রত্যেকটি নায়ক, প্রত্যেকটি নায়িকা যেন একই ছাঁচে ঢালা; তাহারা সকলেই একই ভাবে চলে, বলে ও অশ্রুজলে গলে, শুধু নামগুলি তফাৎ বলিয়াই কোনোরকমে তাহাদের পরিচয় লাভ সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, চিত্তের দুর্ব্বলতা ও ভাবের অসংযম তো প্রত্যেকটি লেখকের মধ্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং এই সংক্রমণ, যাঁহারা খবর রাখেন তাঁহারা

জানেন, ক্রমশঃ বাংলার তথাকথিত "তরুণ" দলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ফলে যে বাঙালী শৈশবে লিভারে, যৌবনে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ও বার্দ্ধক্যে ডায়াবেটিজে ভুগিয়া ভুগিয়া মরিত, সেই বাংলার আধুনিক তরুণ দলের "দোদুল দে" ও "শিহরণ সেন" "ব্যথা-ব্যথা" বলিয়া হা-হুতাশে দেহমনের ক্ষুধাকে ক্ষয়রোগে দাঁড় করাইতেছে; অথবা বিষৌষধ পান করিয়া অজানা প্রিয়ার উদ্দেশে আত্মাহুতি দিতেছে! ফল হইয়াছে এই যে, ব্যর্থপ্রেমের ব্যর্থতর কাহিনী সমস্ত কথা-সাহিত্যকে জঞ্জালে ভরিয়া তুলিয়াছে; আর যাঁহারা এই সকল কাহিনীর স্রষ্টা, তাঁহারা মনে ভাবিতেছেন 'ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিতেছি'! কিন্তু কি হাস্যকর ভাবেই না এই সৃষ্টির প্রয়াস সর্ব্বত্র ব্যর্থ হইতেছে! ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিয়া মানুষের মনে দুঃখের অনুভূতি জাগাইতে বড় নৈপুণ্যের, বড় শিল্পকৌশলের দরকার। প্রেম ব্যর্থ হইলেই কিম্বা বিচ্ছেদের বেদনায় নায়ক-নায়িকার চোখে অশ্রুর বন্যা বহিয়া গেলেই ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয় না; ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করিতে হইলে দেশ কাল ও পাত্রের একটা ওজন ও সুসঙ্গতি রক্ষার দরকার। সর্ব্বোপরি পাঠকের মনের প্রত্যেকটি গোপন কোণের সহিত লেখকের মনের সংযোগ না থাকিলে, কি ভাবে কথাটি বলিলে, কি ভাবে ঘটনার সমাবেশ করিলে পাঠকের হৃদয়তন্ত্রী বাজিবে, সে সম্বন্ধে সূক্ষ্ম ও সম্যক জ্ঞান না থাকিলে, খুব ওস্তাদ শিল্পীর হাতেও 'ট্র্যাজেডি' জমিতে পারে না। আর এ কথা আমাদের কথা-সাহিত্যের লেখকদিগকে কে বলিয়া দিবে যে, দুঃখের মধ্যেও সংযম চাই, গাম্ভীর্য্য চাই; ব্যথা যেখানে গভীর হয়, যত করুণ হয়, এবং তাহাতে যতটা শান্তশ্রী ফুটিয়া উঠে, বিষাদের সত্য প্রতিমূর্ত্তি, আর্টের সৌন্দর্য্য সেইখানেই তত আত্মপ্রকাশ করে, ব্যথার পূজা সেইখানেই সার্থক হয়।

প্রেম সাহিত্যের সত্য ও সনাতন বস্তু। এই প্রেমকে কেন্দ্র করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় সাহিত্য রসে ও সৌন্দর্য্যে স্নাত ও অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই প্রেম যদি আজ বাংলার নব-কথা-সাহিত্যের মূলে রস যোগায়, তবে তাহাতে দুঃখ করিবার কিছু নাই; বরং তাহার শক্তিমান বিকাশে উৎফুল্ল হইবারই যথেষ্ট কারণ আছে। সেই প্রেম যদি তরুণ চিত্তকে দোলাইয়া, নাচাইয়া সাহিত্যে সৌন্দর্য্য ও অভিজ্ঞতার রসে ও রহস্যে প্রতিবিম্বিত হয়, তবে তো সেই প্রেম, সম্মানে ও মর্য্যাদায় অভিষিক্ত হইয়া, তারুণ্যকে জয়যুক্ত করে। কিন্তু বাংলার নব-কথা-সাহিত্যে তাহার পরিচয় কোথায়? নর-নারীর প্রেমের একটা রক্তমাংসের দিক আছে এ কথা জানি, এবং সে দিকটা যে অবহেলার জিনিষ নয় সে কথাও মানি। কিন্তু যে প্রেম-কাহিনীর মধ্যে ঐ রক্তমাংসের সম্বন্ধের কথাই একান্ত হইয়া দেখা দেয়, হৃদয়াবেগের সূক্ষ্ম অনুভূতি ভাব ও ভাষার বিলাসে আত্ম-হত্যা করে, সাহিত্য-রচনা সেখানে আর্টের রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত। যাহা স্থূল, যাহা অসুন্দর, যাহা লোভে ও মোহে অশুচি, জীবনে তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আর্টে তাহা সত্য কিছুতেই হইতে পারে না; কারণ আর্ট শুধু জীবনে নিবদ্ধ হইয়া নাই, আর্টের রাজ্য বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে জীবনকে অতিক্রম করিয়া। মানুষের জীবন যাহাকে ধরিতে পারে না, ছুঁইতে পারে না, রক্তমাংসের সমস্ত আকুতি দিয়া যাহার পাদসামায়ও পৌঁছিতে পারে না, আর্টিষ্টের চিত্ত কল্পনা দিয়া, অনুভূতি দিয়া সেই সুদূরের রাজ্যেই বিহার করে; এবং শুধু বিহার করে না, তাহারই মধ্যে আপন সৃষ্টির সার্থকতাও খুঁজিয়া পায়। সেই সার্থকতার রাজ্যের সন্ধান, সেই কল্পলোকের অনুভূতির রসাস্বাদনের আভাস যে লেখক তাঁহার প্রেম-কাহিনীর মধ্যে দিতে পারেন, তাঁহাকেই বলিব প্রকৃত আর্টিষ্ট। প্রেমের গল্প যদি শুধু আমাদের চারিপাশের নর-নারীর প্রেমকাহিনার প্রতিবিম্ব হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাহিনী মাত্র বলিতে পারি, কিন্তু সাহিত্য বলিতে পারি না, আর্ট বলিতে পারি না। অথচ আজিকার দিনের বাংলা কথা-সাহিত্যে হইয়াছে তাহাই। প্রেমের গল্পমাত্রই হইয়াছে একশ্রেণীর তরুণ-তরুণীর প্রেম-বিলাসের অথবা অতৃপ্ত দৈহিক বুভুক্ষার প্রতিবিম্বমাত্র; তাহার মধ্যে না আছে কোন কল্পনা, না আছে কোন সত্যানুভূতি, না আছে সুস্থ ও শক্তিমান প্রকাশ। প্রেম কি শুধু মানুষকে বিলাসের বধ্যভূমিতে ডাকিয়া আনিয়া লালসার যূপকাষ্ঠে তাহাকে বলি দিবার জন্যই আধুনিক বাংলার কথা-সাহিত্যের সিংহাসনে আসিয়া আসন লইয়াছে? একেই তো দুর্ব্বল, শক্তিহীন বাংলা,—তাহাকে আরো দুর্ব্বল, আরো শক্তিহীন করিয়া তুলিবার জন্যই কি বাংলার 'তরুণ' লেখকেরা জয়যাত্রায় বাহির হইয়াছেন? শুনি—তাঁহারা জীবনকে

ভোরের বাঁশী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

ভালবাসেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধকে "সবার উপরে সত্য" বলিয়া জানেন; কিন্তু সব ভালবাসা, সব জানা যে ব্যর্থ হইয়া যায়, অপমানে ক্ষুব্ধ হয়—যদি প্রেম সেই সম্বন্ধকে স্বাস্থ্যবান করিয়া না তোলে, চিত্তকে সঞ্জীবিত ও সুস্থ না করে। গল্প লিখিতে বসিয়া লেখক নীতিশতক আওড়াইবেন, আর্টিষ্ট শুকদেব গোস্বামীর আসন লইবেন, এমন কথা আমি বলিতেছি না; সাহিত্যের দিক হইতে, আর্টের দিক হইতেই বলিতেছি—অস্বাস্থ্য বা দুর্ব্বলতা কখনও প্রেমের উপাদান হইতে পারে না; সর্ব্বোপরি কখনও শিল্পে বা সাহিত্যে স্থান লাভ করিতে পারে না! প্রেম ব্যর্থ হইলে তরুণ চিত্তকে ব্যথায় পীড়িত করে, এ কথা সত্য; সে ব্যথার উপরে সহজে জয়ী হওয়া যায় না, সে কথাও সত্য; কিন্তু এই সুদুঃসহ ব্যথা যদি দেহমনকে অসুস্থ করিয়া তুলে, বিষবাষ্পে সমস্ত অন্তরকে ভরিয়া দেয়, এবং চিত্তের শুচিতা ও সংযমকে ভ্রষ্ট করে, তবে সে প্রেমের মর্য্যাদা রহিল কোথায়? আর নীতির কথাই যদি বলি, তাহাতেই বা ভয় পাইবার কি আছে? মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যেখানে যত নিবিড়, যত জটিল, যত বেদনাপরিপ্লুত, সেইখানে তো কোন না কোন নীতি নিহিত থাকিবেই! কবি যিনি, লেখক যিনি, শিল্পী যিনি, তিনি সে সম্বন্ধকে সমস্ত জটিলতা ও মলিনতা হইতে মুক্তি দিয়া তাহাকে মঙ্গলে ও সুন্দরে জয়যুক্ত করিবেন। শুধু সৌন্দর্য্য-সম্ভোগ বা প্রেম-বিলাসের মধ্যেই তরুণ-চিত্ত যদি ডুবিয়া মজিয়া থাকে, তবে প্রেম তাহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাইবে কেমন করিয়া? প্রেম যদি তপস্যার অনলে পুড়িয়া শুদ্ধ সংযত না হয়, তবে যে বরাবর তাহাকে দুষ্মন্তের রাজসভা হইতে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে। সতেরো-বৎসর বয়সেই যে অজাতশ্মশ্রু তরুণের—"একটুখানি শাড়ীর আঁচল দেখ্‌লেই বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠে, একটু চুড়ির রিনিঝিনি শোন্‌বার জন্যে মনটা তৃষিত হ'য়ে থাকে, এবং কাঁচাবয়সের মেয়ে দেখ্‌লেই ছুটে গিয়ে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে আস্‌তে ইচ্ছে হয়," তাহার দেহমনের স্বাস্থ্য যে অটুট আছে, এ কথা কি করিয়া বলিব? সতেরো বৎসরের ছেলে যেখানে পনেরো বৎসরের মেয়ের বয়সকে লোভনীয় বলিয়া কামনা করিতেছে, সেখানে প্রেমের বিকার হয় নাই এ কথা কে স্বীকার করিবে? অথচ এই বিকৃত, বিষদুষ্ট, অস্বাস্থ্যকর প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই তো অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইতেছে! যে তারুণ্য ভর্ৎসিত হইলে এখনও শৈশবের মাতৃদুগ্ধ উদ্গারণ করে, সে তারুণ্যের উপর এই বিকৃত প্রেমের প্রভাব কি করিয়া বিস্তৃত হইল, তাহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। এক একবার মনে হয়, অভিভাবকের শাসন-কশার অভাবে বাংলার এই অকালপক্ক তারুণ্য কি বল্গাবিহীন তুরঙ্গের মত পথ হারাইয়া পিচ্ছিল পঙ্কে পদস্খলিত হইয়া মরিবে? এই দুর্ব্বল, অস্বাভাবিক ও বিকৃত মনস্তত্ত্বের নিদান আবিষ্কার করিতে সমর্থ বোধ হয় একমাত্র ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু।

নারী-রূপের একটা মোহ আছে সত্য, কিন্তু তাহা কি সর্ব্বদাই লালসায় পঙ্কিল? তাহা কি কখনো সৌন্দর্য্যে স্নিগ্ধ নয়? ভদ্রসমাজে অবাধগতি মাসিকের পাতা খুলিয়া যখন পড়ি,—"উত্তেজনার ফলে সে একটু একটু কাঁপ্‌ছিল, ওর বুক তীব্র নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দুল্‌ছিল—এক একবার ফুলে' ফুলে' উঠে' ব্লাউসের নির্দ্দিষ্ট বন্ধনের সীমা প্রায় অতিক্রম ক'রে যাচ্ছিল—মনে হচ্ছিল পাত্র বেয়ে সুরা উছলে পড়তে চাচ্ছে",—তখন কি মনে হয় না যে প্রেমের শান্তশ্রী, স্নিগ্ধ অনুভূতি কর্দ্দমের পঙ্কিলতার মধ্যে বিসর্জ্জিত হইয়া, চিত্তের সমস্ত শুচিতা ও সংযম অন্তর্হিত হইয়া, শুধু দৈহিক ভোগের তৃষ্ণা ও রক্তমাংসের বুভুক্ষাই একান্ত হইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া মরিতেছে; এবং তাহারই মধ্যে আত্ম-পরিতৃপ্তি কল্পনা ও কামনা করিতেছে? নর-নারীর যে সহজ, স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেম, তাহার মধ্যে জীবনের যে গভীরতর অর্থ, ব্যাপকতর সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিবার প্রয়াস—যে প্রয়াস ও যাহার সার্থকতা সত্য সাহিত্যের অভিব্যক্তি—তাহা তো কাহারও রচনার মধ্যে দেখিতে পাইতেছি না। প্রকৃতির নির্দ্দেশ যাহা তাহা তো মানুষ পালন করিবেই,—সম্ভোগের তৃষ্ণা, দেহের ক্ষুধা সে তো মিটাইবেই; কিন্তু ঐখানেই তাহার শেষ নয়, শেষ হইতে পারে না; শুধু ঐ কথা লইয়াই যিনি সাহিত্যে আসর জমাইতে বসেন, তিনি শুধু জঞ্জালকে বাড়াইয়া তোলেন, আর্টের ত্রিসীমানায় তাঁহার স্থান নাই। এই তৃষ্ণা, এই বুভুক্ষাকে অতিক্রম করিয়া, প্রকৃতির নির্দ্দেশের উপর জয়ী হইয়া, মানুষের চিত্ত সর্ব্বদাই অজানা অপূর্ব্ব মহীয়ান্ মানবত্বের দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে। এই

দরশন-পরশন জগতের বাহিরে, সেই অজানার উদ্দেশে যাত্রার যে ইঙ্গিত ও আভাস তাহাই যেখানে প্রতিদিনকার জীবনযাত্রার, আচার-ব্যবহারের, চলাফেরার, কথাবার্ত্তার মধ্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সেইখানেই বুঝি আর্ট ও সাহিত্য আপন সত্যকার সত্ত্বা খুঁজিয়া পাইয়াছে। "মানুষের মানে চাই" বুঝিলাম; বুঝিলাম মানুষকে তাহার সমস্ত বিশ্লেষণ করিয়া তন্ন তন্ন করিয়া জানিতে হইবে; কিন্তু মানুষ শুধু প্রকৃতির নির্দ্দেশকেই মানিয়া চলিবে, তাহার উপর জয়ী হইবে না, শুধু রক্তমাংসের ক্ষুধাকেই পরিতৃপ্ত করিবে, তাহাকে অতিক্রম করিবে না, সৌন্দর্য্য সম্ভোগেই মজিয়া থাকিবে, সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবে না, ইহাই কি হইল "মানুষের মানে"? সমস্ত দুঃখ-বেদনা, সমস্ত ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সমস্ত পাপ-পঙ্কিলতার মধ্যে থাকিয়াও মানুষ যে আপনার চেতনাকে কল্যাণতর, উন্নততর আদর্শে জাগরিত রাখে, তাহার কি কোন অর্থ নাই, কোন মূল্য নাই?

তর্ক উঠিবে—"আমরা কথা-সাহিত্যে বাস্তবতার সৃষ্টি করিতেছি—এবং তাই বলিয়াই নর-নারীর প্রেমের এই নিতান্ত স্থূল দিকটাই আমাদের চোখে পড়িয়াছে।" শুনিয়াই বুঝিতে পারি, বাংলা সাহিত্যে য়ুরোপীয় Realism ও realistic interpretation of life-এর ধুয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। "হে কল্পনে, রঙ্গময়ী, আর ভুলায়ো না সমীরে সমীরে, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়"—ভাল কথা। কিন্তু এই বাস্তবতা বলিতে "তরুণ" সাহিত্যিকেরা কি বুঝিয়াছেন? বাস্তবতা বলিতে কি তাঁহারা বুঝিয়াছেন, আমাদের দৃষ্টির কিংবা অনুভূতির গোচরে যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহারই হুবহু নিখুঁত চিত্রাঙ্কন? এবং তাহাই কি হইবে আর্ট? আমরা দশজনে প্রতি দিন ঘরে-বাহিরে যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহার সঠিক বিবরণই যদি সাহিত্য হইত, তবে তো আমাদের প্রায় সকলেরই সাহিত্যিক বলিয়া মান্য না হউক অন্ততঃ গণ্য হইবার পক্ষে কোন বাধাই থাকিত না! কিন্তু সুখের বিষয় সাহিত্যে যাহাকে বাস্তবতা (Realism) বলা হয়, তাহার অর্থ ইহা নয়। বাস্তব-সাহিত্য বলিব তাহাকেই, যাহা আমাদের জীবনের পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের, প্রতি দিনের ঘটনার ছায়াচিত্রকে প্রতিবিম্বিত মাত্র করে না; সেই ঘটনার অন্তরালে, সেই ছায়া-চিত্রের পশ্চাতে মানব-জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র ইতিহাসের মর্ম্মকথা, বিপুল সমস্যার অভিব্যক্তি,—ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাহার যোগসূত্রের সন্ধান,—এ সমস্তকে কল্পনা, সত্য-অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে। য়ুরোপীয় বাস্তব-সাহিত্যের যাঁহারা প্রধান পুরোহিত, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই মানব-জীবনের বা সমাজের একটা বিশিষ্ট সমস্যা ও তাহার সমাধানকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টাতেই তাঁহাদের চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও অনুভূতিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। বাংলার কথা-সাহিত্যে যে বাস্তবতার ধুয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে এই প্রয়াস কোথায়? আমরা বাস্তবতা বলিতে বুঝিয়াছি, মানুষের আপাত-বুদ্ধি ও দৃষ্টিকে যাহা অভিভূত করে, চিত্তকে সহজে নাড়া দেয়, তাহার স্থূল ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ বা বড়জোর একটা সমস্যার ইঙ্গিত!

তবে বাস্তব-সাহিত্যের ভিত্তি কি? মানুষের ব্যক্তি, ধর্ম্ম, সমাজ বা রাষ্ট্রজীবনে যখন কোন একটা বিশেষ সমস্যা একান্ত হইয়া দেখা দেয়, তখন সেই সমস্যাকেই কেন্দ্র করিয়া কোন বিশেষ যুগের একটা বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠে। এ কথা বোধ হয় বলা চলে যে, উনবিংশশতাব্দীর শেষার্দ্ধে সমগ্র পাশ্চাত্য জগৎ যে সমুদায় কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহাকেই অবলম্বন করিয়া য়ুরোপের বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। এই দিক দিয়া হয় তো য়ুরোপীয় সাহিত্যের সহিত বাংলার নব-"রিয়ালিষ্টিক্" সাহিত্যের কতকটা মিল আছে; কারণ, নানা দিক দিয়াই বাঙালী জীবনে এবং সমাজে কতকগুলি সমস্যা আজকাল বেশ জটিল হইয়া দেখা দিয়াছে; এবং তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া যদি আমাদের এই বাস্তব-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়া থাকে, তবে তাহা সময়োপযোগীই হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু এই সমস্যাগুলি লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা দরকার, তাহার বিস্তার ও গভীরতা কতখানি, তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, ইঙ্গিতে ও আভাসে কতটুকু ব্যক্ত হইতেছে; জানা প্রয়োজন—তাহার প্রচ্ছন্ন ইতিহাসের নিগূঢ় মর্ম্ম-কথার ভাব ও ভাষা। "রিয়ালিষ্টিক্" সাহিত্য সৃষ্টি করা ছেলেখেলা নয়; তাহার মধ্যে একটা বিপুল দায়িত্ব লেখকের আছে। তাহা ছাড়া, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ-শক্তি, সুদুর্লভ অভিজ্ঞতা, মনের উদার প্রসার, এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টি না থাকিলে বাস্তব-সাহিত্য সৃষ্টি করা

সম্ভব নয়। কিন্তু নবীন লেখকদের কয়জন এই শক্তি লইয়া এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন? সেই শিক্ষা ও সাধনা তাঁহারা কোথায় অর্জ্জন করিয়াছেন? আমাদের এই নব কথা-সাহিত্যের "রিয়ালিজম্" আমরা য়ুরোপ হইতে আমদানী করিয়াছি,—সেখানকার সাহিত্য হইতে এই পরগাছাটি রস ও জীবনীশক্তি আহরণ করিতেছে। তাহার শক্তি তাই ক্ষীণ, তাহার গতি তাই আড়ষ্ট, এবং অসুস্থতায় তাই তাহার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত। সুদুঃসহ সাধনায়, দুঃখের নিদারুণ দহনে য়ুরোপের শিল্পীরা যে বাস্তবতার অন্তরে প্রবেশ লাভ করিলেন, আমরা তাহাকে লাভ করিতে চাহিলাম শুধু তাঁহাদের অনুকরণ করিয়া, শুধু পরের মুখে ঝাল খাইয়া। ফল যাহা হইয়াছে, তাহাতে আর কিছু হইলেও, বাংলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি হয় নাই।

বাস্তবতার এই ঢেউ আমাদের সমাজ-জীবনের কয়েকটি সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া অতি-আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আসিয়া প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আমাদের সমাজ-জীবনের যে অংশ একই সঙ্গে করুণ ও কদর্য্য, অত্যাচারে পিষ্ট ও জর্জ্জরিত, দেহ ও মনের অস্বাস্থ্যে মৃতপ্রায়, তাহা যদি আজ বাংলার তরুণ লেখকদের চিত্তে সমবেদনা ও সহানুভূতির সুর জাগাইয়া থাকে, তাঁহারা যদি আমাদের দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলিকে বিচিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা নিশ্চয়ই ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু এই সব সমস্যাকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে চেষ্টা যদিও বা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ করিয়াছেন, হৃদয় দিয়া, অনুভূতি দিয়া এই সমস্যাকে নিজেদের অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করিবার চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে কেহই করেন নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তাহার ফলে এক ধরণের বাস্তব গল্প শুধু বাহিরের জিনিষ—কুলী ধাওড়া, কামিনদের বস্তী, ছেঁড়া চট্, দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা, পঙ্কিল পথ, অস্বাস্থ্য, কলহ—লইয়াই আরম্ভ ও শেষ হইল! ইহাদের অন্তরালে মানব-মনের ও প্রাণের যে শাশ্বতলীলা সকল দৈন্য ও কুশ্রীতার উপরে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহার কোন সন্ধানই দিতে পারিল না,—তাহাদের মধ্যে দু' একটি ছাড়া কোনটিতেই অন্তর্দৃষ্টির আভাস পাইলাম না। এ কথা সত্য নয় যে, এই সমুদায় গল্পে চিত্রিত নর-নারীদের জীবনের পরিচয় জানিতে হইলে, ইহাদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইলে, ইহাদের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া ইহাদেরই মধ্যে জীবনযাপনের একান্ত প্রয়োজন, যদিও বর্ত্তমান কালে এ শ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টির যিনি অগ্রদূত, সেই মনীষি গোর্কি শ্রমজীবীদের মধ্যে, কয়লার খাদে, জঘন্য বস্তীতে জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছিলেন। এই দুঃখের দহনে যে নিদারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়, সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাহার মূল্য নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু শুধু এই অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নহে,—যদি তাহার সঙ্গে সমস্ত সমস্যাটিকে অন্তরের মধ্যে বুদ্ধি দিয়া, হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিবার ও যথোচিত ভাবে ও ভাষায় তাহাকে প্রকাশ করিবার শক্তি না থাকে। এ কথা ভুলিলে কোন মতেই চলিবে না যে, কেবলমাত্র বস্তুর অভিজ্ঞতাই আর্টের মর্য্যাদা পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার পল্লীজীবনের সুখদুঃখের অংশীদার হইয়া সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সঞ্চয় করেন নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার গল্পে যে ভাবে তাহাকে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবতার অভাব আছে এমন অভিযোগ এক বস্তুতন্ত্রবাদী ছাড়া আর কেহ করিতে সাহস পাইয়াছেন কি? কোনো নির্জ্জন পল্লী-প্রান্তের পোষ্টাফিসের পোষ্টমাষ্টারী রবীন্দ্রনাথ যে কখনো করেন নাই এ কথা হলফ্ করিয়াই বলিতে পারি; কিন্তু যে "পোষ্টমাষ্টার" এবং তাহার পার্শ্বচারিণী রতন তাঁহার হাতেই রূপায়িত হইয়া উঠিল, বাংলা সাহিত্যে, কোন দেশের কোন সাহিত্যে তাহার জুড়ি মিলিবে কি? সেই জন্যই বলিতেছি, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই বাস্তব-সাহিত্যের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু নয়; অধিক প্রয়োজনীয় হইতেছে—পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি।

কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া এখন দেখা যাক্—আমাদের এই "রিয়ালিষ্টিক্" সাহিত্যের বাস্তবভিত্তি কতটুকু? শুধুই কি য়ুরোপীয় বাস্তব-সাহিত্যের অনুকরণ করিয়া আমরা আমাদের কথা-সাহিত্যে নানা কাল্পনিক সমস্যার সৃষ্টি করিতেছি, না আমাদের সমাজ-জীবনে যে সমুদায় সমস্যা সত্যই জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে? আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে পশ্চিমের অর্থনৈতিক ও শ্রমজীবি-সমস্যার একটা বাহিরের মিল হয় তো আবিষ্কার

করা যাইতে পারে, কিন্তু য়ুরোপে যে ভাবে এই সমস্যা দেখা দিয়াছে, এবং ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যকে স্তরে স্তরে রূপান্তরিত করিয়াছে, বাংলা-দেশে সে সমস্যাগুলির প্রায় কোনটিরই কোনো বাস্তবভিত্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। সমস্যার মূল কারণ হয় তো দুই দেশেই এক, কিন্তু য়ুরোপে তাহা যে ভাবে ও যে ধারায় প্রকাশ পাইয়াছে, আমাদের দেশে তাহা পায় নাই; অথচ য়ুরোপের ধারাই আমাদের দেশের ধারা ভাবিয়া আমরা সাহিত্যে তাহাকে রূপায়িত করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইতেছি!

কথাটা একটু খুলিয়া বলিলেই বুঝা যাইবে; এবং তাহার সঙ্গে বাস্তব-সাহিত্যের আর একটা যে দিক আমাদের অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যে অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, নর-নারীর সেই যৌনসম্বন্ধের কথাও আসিয়া পড়িবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক য়ুরোপে Industrialism-এর যুগ। এই Industrialism-এর পশ্চাতে সেখানে নানা বিচিত্র সমস্যার সূত্রপাত ও সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমাধান-চেষ্টা দেখা দেয়। সাহিত্যের মধ্যেও সে চেষ্টা বাদ যায় নাই। Industrialism-এর বৃদ্ধির ফলে সমাজে যে ধনী ও নির্ধনের ভেদ-বৈষম্য উগ্র হইয়া উঠিল, সমাজ-অঙ্গে অভাবে ক্লিষ্ট, দুঃখে ভারাক্রান্ত, অত্যাচারে জর্জ্জরিত, ইন্দ্রিয়বিকারে কলুষিত যে এক নূতন স্তরের সৃষ্টি হইল, সেই স্তরের নর-নারীর জীবনের মধ্যে সমস্ত অন্তর দিয়া প্রবেশ করিয়া, সাহিত্যে সেই জীবনকে বেদনায় ও বিদ্রোহে চিত্রিত করিলেন এক দল শক্তিমান লেখক। এই দলের অগ্রণীগণই ফ্রান্সে ও রাশিয়ায় "রিয়ালিষ্টিক" সাহিত্যের রচয়িতা। Industrialism-এর ব্যাপক বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে আরো নূতন নূতন সমস্যা আসিয়া জুটিল। Economic independence of women হইল তাহার প্রধান একটি। জীবিকা-সংগ্রহের ক্ষেত্রে নারী যখন স্ব-তন্ত্র ও স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ হইল, গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম আর তখন সে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবার প্রয়োজন বোধ করিল না। কিন্তু প্রকৃতির নির্দ্দেশ যেখানে অবিচল, সেই রক্তমাংসের তাড়নায় তাহাকে পুরুষের দুয়ারে অতিথি হইতেই হইল, আর সে ক্ষুধা মিটাইতে গিয়া সৃষ্টি হইল সমাজনিন্দিত যৌন-সম্বন্ধ। পরে সেই যৌন-সম্বন্ধই একটা স্বতন্ত্র সমস্যায় দাঁড়াইল। এই সমস্যা অত্যুগ্র হইয়া দেখা দিয়াছে গত মহাযুদ্ধের পর—যখন সমগ্র য়ুরোপে পুরুষের সংখ্যা ভয়াবহরূপে কমিয়া গিয়া উদ্বৃত্ত স্ত্রীলোকের বা Surplus women-এর সংখ্যাই অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এই কারণেই বর্ত্তমান য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের বাস্তবতা নারীর স্বাতন্ত্র্য ও নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধকে এতখানি আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু য়ুরোপের এই সমুদায় সমস্যার অভিব্যক্তির সঙ্গে আমাদের দেশের সমস্যার মিল কোথায়? আমাদের দেশে নর-নারীর মধ্যে এই অসামাজিক যৌনসম্বন্ধ কখনই এত উগ্র হইয়া দেখা দেয় নাই; আর Economic independence of women বলিয়া কোন কথাই তো আমাদের সমাজ-জীবনে এখনও সৃষ্টি হয় নাই। আমাদের দেশে Industrial problem ক্রমে সুকঠিন হইয়া দেখা দিতেছে সত্য, এবং হয় তো ক্রমে পশ্চিমের উদ্দাম সমাজ-জীবন আমাদের ভিতরও আসিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারে; কিন্তু সাহিত্যিক যিনি, আর্টিষ্ট যিনি, তিনি যদি শুধু নূতনত্বের মোহে মুগ্ধ হইয়া তাহারই অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলেন, তাহা হইলে সুস্থ ও সত্য সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইতে পারে না। আর পশ্চিমের বাস্তব-সাহিত্যে যৌন-সম্বন্ধের যে রূপচিত্রণ অতি ঔৎসুক্যে আমাদের কথা-সাহিত্যে আমরা অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহা কি শুধু আমরা সৃষ্টির আনন্দেই করিতেছি? তাহার অন্তরালে কি ইন্দ্রিয়-লালসার একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন হইয়া নাই এবং তাহার কলুষ কি আমাদের সাহিত্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িতেছে না? তাহা যদি না হইবে তবে হঠাৎ 'রজনী' যখন তখন 'উতলা' হইয়া উঠিবে কেন, অথবা দেহের জন্ম দেহ এমন করিয়া আকুল হইয়া ছুটিবে কেন? কথা উঠিতে পারে —"এ তো আমরা মনগড়া কাল্পনিক কথা লিখিতেছি না, জীবনে যাহা নিত্য ঘটে, নিত্য ঘটিতেছে, তাহারই সত্যরূপ আমরা 'সাহস করিয়া' পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে ধরিয়া দিতেছি,—নীতি-দুর্নীতির কোন কথাই তো ইহার মধ্যে আসিতে পারে না।"

শুধু নীতি-দুর্নীতির কথা আমিও তুলিতেছি না। আমি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরী করি বটে ও সহরের স্বাস্থ্য-বিবরণ আমার জানা প্রয়োজন; কিন্তু তাহা হইলেও

আমি সাহিত্যের "স্যানিটারী ইনস্পেক্টার" নই ; সে কাজের জন্ম প্রচুর অবসরপ্রাপ্ত রাজভৃত্য রহিয়াছেন ; আমি শুধু আর্ট ও সাহিত্যের দিক হইতেই কথাটা বলিতেছি। এমন এক সময় ছিল যখন Art for Art's sake কথাটা ছিল একদল সাহিত্যিকের ধুয়া ; এখন যেন হইয়াছে Sex for Sex's sake ; কিন্তু Art for Art's sake যেমন আর্টের চরম উদ্দেশ্য হইতে পারে না, তেমনি শুধু যৌনসম্বন্ধের গল্প বা উপন্যাস কখনও সাহিত্যের সত্যবস্তু বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে বাংলা দেশে রাজদ্বারে দণ্ডিত "বিবাহবিজ্ঞান" ও "স্ত্রীর পত্র" ও পশ্চিমের রাশি রাশি Pornography-র কেতাবও অতি সহজেই সাহিত্য-পদবীতে উন্নীত হইত। সুখের বিষয় তাহা হয় নাই।

নর-নারীর সমাজ-স্বীকৃত যৌনসম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-নিন্দিত যৌনসম্বন্ধও অতীতকালে ছিল, বর্ত্তমানে আছে ও ভবিষ্যতে থাকিবে ; এবং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে তাহাকে লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসও হইয়াছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ পথে যিনি চলেন তিনি ক্ষুরধার দুর্গম পথের পথিক, প্রতি পদে তাঁহাকে সাবধান হইয়া চলিতে হয় ; এক চুল এ-দিক ও-দিক হইলেই তিনি সাহিত্য-স্রষ্টার আসন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়েন। এ পথে যাঁহার লেখনী শঙ্কালেশহীন হইয়া ছুটিয়া চলে, তিনি যে "দুঃসাহসিক" তাহা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিব ; কিন্তু তিনি লালসা বা ইন্দ্রিয়-বিকারের ছবি আঁকিতেছেন বলিয়াই যে আর্টের পূজারী বা সাহিত্যের স্রষ্টা, তাহা বলিব কি করিয়া ? এই যৌনসম্বন্ধীয় বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গে আইনে দণ্ডনীয় কতকগুলি সমাজ-সংস্থান-বিরোধী ব্যাপারও আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের অতি রুচিকর উপাদান-বস্তু হইয়া উঠিয়াছে ! ইহারও উদ্ভব আমাদের দেশে প্রথম হয় নাই। ডষ্টয়ভেস্কি-প্রমুখ কয়েকটি শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় ঔপন্যাসিক Criminology-কে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদের বাস্তব কথা-সাহিত্যের কতকটা জুড়িয়া তাহারই এক ব্যর্থ ও অসংযত অভিব্যক্তি দেখা যাইতেছে। ডষ্টয়ভেস্কির "Crime and Punishment" রাশিয়ার সমাজের এক অংশের একটি পরম শক্তিমান চিত্র ; কিন্তু এই সুবৃহৎ উপন্যাসটির কোথাও মানব-চিত্তের মাংসলোলুপতার কিম্বা পাপ-পঙ্কিল লালসার মনস্তত্ত্ব একান্ত হইয়া পাঠকের মনকে মোহগ্রস্ত করিয়া দেয় না। বরং সমাজ-জীবনের এই সুকঠিন সমস্যা সমবেদনা ও সহানুভূতিতে রূপায়িত এবং বুদ্ধি ও বিবেচনায় বিশ্লেষিত হইয়া চিত্তকে ভাবে ও ভাবনায় অভিভূত করিয়া দেয়। সেইখানেই বলিতে পারি আর্ট তাহার সার্থকতা লাভ করিল। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে-" কেও একদিক হইতে যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধীয় উপন্যাসের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। মানব-দেহের রক্তমাংসের যে কামনা, সন্দীপের মধ্যে তো তাহাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে ; এবং সেই কামনার ইন্ধনে পতঙ্গের মত আত্মাহুতি দিবার জন্ম সন্দীপের বারম্বার আহ্বান তো বিমলাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে ; কিন্তু সন্দীপের এই অসংযত লালসার উগ্র বহ্নিশিখা কোথাও পাঠকের চক্ষুকে পীড়িত করে নাই ; কেন না, সর্ব্বত্র একটি পবিত্র সংযমের ঘৃতদীপশিখা সমস্ত লালসা-কামনার উপর অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ আলোক-সম্পাত করিয়াছে। সে আলোক সন্দীপের উদ্দাম লালসা ছাপাইয়া নিখিলেশের শান্ত-শুভ্র চরিত্রের উপর পড়িয়া পাঠক পাঠিকার চিত্ত পবিত্রতায় অভিষিক্ত করিয়া দেয়। সাধারণ লেখকের কাছে অবশ্য এই আদর্শের পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না ; কিন্তু যাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিব সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাঁহাকেই বাস্তব-সাহিত্যের উপযুক্ত লেখক বলিয়া অভিনন্দিত করিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যে তেমন একটি লেখকও আজ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইতেছি না। বাংলাদেশের লেখকেরা ভাবিতেছেন, আমাদের সমাজ-জীবনের আনাচে কানাচে যে পাপ ও অন্যায় নিত্য অভিনীত হইতেছে, তাহাকেই হুবহু চিত্রিত ও প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলেই বুঝি বাস্তব-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। সেই জন্যই আর্টের মর্য্যাদা-রক্ষা অপেক্ষা পাঠকের কাছে বিবৃত ঘটনাকে রসালো করিয়া তুলিবার চেষ্টাই প্রবল হইয়া দেখা দিয়াছে—লালসার ফেনিলোচ্ছ্বসিত উদ্দাম বিলাসশালায় নারীমাংস-লোলুপদের আমন্ত্রণের ইঙ্গিতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে এবং অতৃপ্ত ইন্দ্রিয়-বুভুক্ষার বিস্তৃত বিবরণে নব-কামায়ণ বিরচিত হইতেছে। আমাদের লেখকদিগকে এ কথা কে বুঝাইবে যে, ইহাই যদি সাহিত্যের রাজসভায় স্থান পাইতে পারে, তাহা হইলে খবরের কাগজে পুলিস-কোর্টের, নারী-হরণের এবং

বিবাহ-বিচ্ছেদের যে বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই আসনের দাবী করিতে পারিবে না কেন? তাহাতে রোমান্সের অভাব নাই—প্রেম আছে, ঈর্ষা আছে, যৌন-মিলনের বৈচিত্র্য আছে, এমন কি রক্তারক্তি, খুনাখুনী পর্য্যন্ত আছে—এবং তাহাকে ঘোরালো ও রসালো করিয়া তুলিবার জন্ম "News of the World"এর মত বিলাতী সাপ্তাহিকের চেষ্টারও অবধি নাই;—সে চেষ্টা এতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে যে, পাশ্চাত্যদেশে আইন করিয়া বিবাহ-বিচ্ছেদের এইরূপ বিবরণ প্রকাশ নিষেধ করিয়া দিবার জন্ম আন্দোলন সুরু হইয়াছে।—কিন্তু যত রসালোই হউক আর যত রোমান্সই তাহাতে থাক্, সাহিত্যে তাহার স্থান কোথায়?

বলিয়াছি, এবং সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, আমাদের বাংলা নব-কথাসাহিত্য য়ুরোপের আধুনিক কথা-সাহিত্যের প্রভাব ও অনুকরণে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতেছে। বিদেশের মানুষকে ছাড়িয়া স্বদেশের কুকুরকে মাথায় করিব—এমন উৎকট জাতীয়তা-বোধ আমার নাই; কিন্তু ঘরের শুভ্র স্নিগ্ধ মাটির প্রদীপখানি নিভাইয়া বিদেশের যে অত্যুজ্জ্বল আলো, সহজেই যাহা চক্ষুকে ঝল্‌সাইয়া দেয় এবং স্বাস্থ্যকে পীড়িত করে, তাহাকে ঘরে আনিয়া জ্বালাইবার পূর্ব্বে একবার কি বিচার করিয়া দেখিব না,—কি ঘরে আনিতেছি, কেন আনিতেছি? কিন্তু আমরা তাহা করি নাই, করিবার প্রয়োজনও অনুভব করি নাই। আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহার আপাত-মোহন রূপে, আমরা মুগ্ধ হইয়াছি তাহার নোবেল-প্রাইজের হীরকোজ্জ্বল তক্‌মার সৌন্দর্য্যচ্ছটায়। সুইডেন হইতে রাজটীকা ললাটে পরিয়া যাহা বাহির হইল তাহাই হইল আমাদের কাছে "বিশ্ব-সাহিত্য"! কথা উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথও তো আজ সুইডেনের দৌলতেই জগৎ-সাহিত্যের দরবারে আসন পাইয়াছেন; কিন্তু এ কথা মূঢ়দের কে বুঝাইবে যে, নোবেল-প্রাইজ পাইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্মানিত হন নাই, রবীন্দ্রনাথে অর্পিত হইয়া নোবেল-প্রাইজই সম্মানিত হইয়াছে; সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার সমকক্ষতা করিতে পারে, নোবেল-প্রাইজের সুদীর্ঘ তালিকাটিতে এমন একটি নামও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নোবেল-প্রাইজ শুধু রবীন্দ্রনাথকে বিদেশের সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করিয়াছে মাত্র।

তরুণ-দলের কাগজপত্রে "বিশ্ব-সাহিত্য" কথাটা আজকাল খুব বেশী দেখা যায়, তাঁহাদের মুখে কথাটা শোনাও যায় খুব। কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য জিনিষটা কি? তাঁহারা "Continental Literature"-এর অর্থ করিয়াছেন "বিশ্ব সাহিত্য" (Continent=বিশ্ব; Literature=সাহিত্য)। কিন্তু এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান, য়ুরোপীয় সাহিত্য বলিয়াই তাহা বিশ্ব-সাহিত্যের আসন পাইতে পারে না, এমন কি নোবেল-প্রাইজের তক্‌মা পাইলেও নয়। যে সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে একটা ভাববিপুলতা নাই, রসে ও সৌন্দর্য্যে, প্রেরণায় ও অনুভূতিতে যাহা সর্ব্বদেশের, সর্ব্বকালের, সর্ব্বমানবের চিন্তা ও রসের উৎস স্থানটিকে আঘাত করে না, তাহা "Continental Literature" হইতে পারে, কিন্তু বিশ্ব-সাহিত্য তাহা কিছুতেই নয়। য়ুরোপের আধুনিক কথা-সাহিত্য যদি আমাদের কথা-সাহিত্যিকদের উপর তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তবে তাহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহা-কিছু Continental Literature তাহাই যদি তাঁহাদের মোহগ্রস্ত করিয়া থাকে, তবে ভয় পাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমি সাহিত্যে স্বাদেশিকতার ওকালতী করিতেছি না; যে সাহিত্য জীবন্ত সে তাহার উপকরণ চারিদিক হইতে আহরণ করে, বিদেশী সাহিত্যের সকল রকম বৈচিত্র্যের সহিত সে সহজ সম্বন্ধ স্থাপন করে এবং সকল দেশের সাহিত্যের সঙ্গমতীর্থে স্নান করিয়া সে তাহার পুণ্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে; কোনপ্রকার সংকীর্ণ স্বদেশাভিমানের স্থান সেখানে নাই।

অতি-আধুনিক "Continental Literature"-এর মোহ আমাদের এই বাংলা কথা-সাহিত্যিকদের কি ভাবে দুর্ব্বল করিতেছে তাহা একটু বলা দরকার। কয়েকদিন আগে কোন সাহিত্য-রসিক বন্ধুর বাড়ীতে এক 'তরুণ' বন্ধুর সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা। আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ হইতেছিল। কথায় কথায় আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি ভিক্টর হুগোর 'Toilers of the Sea' পড়িয়াছ?" বন্ধু একটু উষ্ণ হইয়া উত্তর করিলেন, "ভিক্টর হুগোর যুগ এখনও আছে না কি?—এখন Continental Literature-এর যুগ; মেটারলিঙ্ক, রলাঁ, আনাতোল ফ্রান্স, ব্লাস্কো ইবানেজ, জাসিন্তে বেনাভেন্তো, হামসুন, বোয়ার, গর্কি, শেকভ্—ইঁহারাই এ যুগের লেখক,

তাঁহাদেরই আমরা পাঠক।" শুনিয়া বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই—কেন না ইতিপূর্ব্বেই আমার জানিবার অবসর ঘটিয়াছিল যে, "তরুণ" দলের অনেকেরই কাছে উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যিকেরা নিতান্তই "সেকেলে" হইয়া পড়িয়াছেন এবং "Continental Literature" 'ফিরিঙ্গি' আওড়ানো এমন একটা 'ফ্যাসান' হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যাহার সে-রাজ্যের অলি-গলিতে ও আঁস্তাকুড়ে গতিবিধি নাই—তারুণ্যের মধ্যে তাহার অবাধ অধিকার নিষিদ্ধ। কিন্তু আজ পর্য্যন্তও আমি ভাবিয়া পাইলাম না, য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের Classics-এর সহিত যাহার পরিচয় নাই—আধুনিক "Continental Literature"এর সহিত তাহার পরিচয় এত সহজে কি করিয়া এত নিবিড় হইতে পাবে; মূল হইতে যাহা বিচ্ছিন্ন, শিকড় যাহার উৎপাটিত, সে বৃক্ষের শাখায় শাখায় ঘুরিয়া কতটুকু রসের আস্বাদন পাওয়া যাইতে পারে! য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের রস ও সৌন্দর্য্যের ঐতিহাসিক ধারাটিকে সমস্ত ভাববোধ দ্বারা যে অনুসরণ করিল না, তাহার আধুনিকতম বিকাশ তাহার কাছে কি করিয়া সহজবোধ্য হইয়া উঠিল? থ্যাকারে, ডিকেন্স্ যে পড়িল না, সে মেরেডিথ্ ও হার্ডিকে বুঝিবে কি করিয়া? শেরিডানকে যে অনুসরণ করে নাই, বার্ণার্ড শ, অস্কার ওয়াইল্ড এর সূক্ষ্ম হাস্যরস, তীব্র শ্লেষকে সে উপভোগ করিবে কি করিয়া? টুর্গেনিভ, টলষ্টয়কে যে জানে না, শেকভ, গর্কি তাহার নিকট সহজ হইবে কেন? ব্যালজাক্, ভিক্টর হুগোর সহিত যাহার পরিচয় নাই, আনাতোল ফ্রান্স বা রম্যাঁ রলাঁর সহিত তাহার সৌহার্দ্দ্যের সম্ভাবনা কোথায়? য়ুরোপের Classical কথা-সাহিত্য হইল তাহার আধুনিক কথাসাহিত্যের পটভূমি বা background; এই পটভূমির (background-এর) সহিত পরিচিত হইতে না পারিলে আধুনিক কথা-সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায় না; অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যোগ ও বৈষম্যের ধারাটিকে না বুঝিলে বর্ত্তমানকে স্বীয় স্বরূপে জানিতে পারা অসম্ভব। য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের ইতিহাস যুগে যুগে স্তরে স্তরে যে সঙ্গতি ও পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান না থাকিলে, তাহার রস ও সৌন্দর্য্যের ধারার ও সমস্তার অভিব্যক্তির ঐতিহাসিক বোধ না থাকিলে কিছুতেই তুলনায় আধুনিক সাহিত্যের সম্যক্ মূল্য নিরূপণ করা চলে না। সেই জন্যই আধুনিক য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্য পড়িতে গিয়া বাংলার তরুণেরা মুড়ি-মিছ্রীর একদর বাঁধিয়া দিল, বাংলার তারুণ্যের সমস্ত শক্তি দরাজ হস্তে অপব্যয় হইয়া গেল—ঘরের কথা-সাহিত্য সমৃদ্ধ তো হইলই না, বরং তাহা অজীর্ণতার উদ্গারে ভরিয়া উঠিল। য়ুরোপের কথা-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য যদি বুঝিতে জানিতেও পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের নব-কথা-সাহিত্যে যে অভাব ও দুর্ব্বলতা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, হয় তো তাহা করিতে হইত না। নবতম য়ুরোপীয় সাহিত্যের যত রকমের বাহ্য রূপ—একটি একটি করিয়া প্রায় সব কয়টিই আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে আমরা আমদানী করিয়াছি। কিন্তু সে রূপের পশ্চাতে অরূপের যে আভাস রহিয়াছে, তাহার পরিচয় পাইলাম না, তাহার প্রাণের সন্ধান পাইলাম না বলিয়া আমাদের সৃষ্টি ব্যর্থ হইল।

বাংলাদেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের আবহাওয়া কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির পক্ষে খুব অনুকূল নহে। পশ্চিম হইতে অনুকূল বাতাস আসিয়া যদি তাহার পালে হাওয়া লাগাইয়া দিকে দিকে তাহার যাত্রা সুরু করিয়া দিত, তাহা হইলে বাংলার নব কথা-সাহিত্য হয় তো একদিন জগতের সাহিত্য-সঙ্গমতীর্থে আসিয়া তরী ভিড়াইতে পারিত। কিন্তু "Continental" কথা-সাহিত্যের মোহে আবিষ্ট হইয়া সে পথ বুঝি বা অবরুদ্ধ হইয়া গেল; এবং শুধু এক প্রকার সৌখীন প্রেমের গল্প, নগ্ন যৌনলীলার গল্প, অথবা কল-কারখানার কুলীমজুরের জীবনের বাহিরের দিক্‌টার গল্পই আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের সমস্তটুকু জুড়িয়া রহিল। দুঃখ এই যে, যে পথিক সুদীর্ঘ পথের যাত্রী, দৃষ্টির যাহার শেষ নাই, সীমা নাই, সে পথিক কলিকাতার কোন বিশিষ্ট সহরতলীর আশে-পাশেই ঘুরিয়া মরিল, না হয় বড়জোর একটু শিলং, দার্জ্জিলিং অথবা রাঁচী, হাজারীবাগে ঘুরিয়া আসিল। যাহাদের জ্ঞানের পরিধি সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গনে আবেষ্টন করিতে চায়, তাহাদের প্রতিদিনের জীবন ড্রয়িং-রুমের চায়ের পেয়ালার উপরই নিঃশেষিত হইয়া গেল, অথবা নারী-জীবনের নিগূঢ় রহস্য মেয়ে-ইস্কুলের সু-উচ্চ প্রাচীর-সীমার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া রহিল! এই বৈচিত্র্য-হীনতাই বাংলা কথা-সাহিত্যের সৃষ্টি ও সমৃদ্ধির পথে

সর্ব্বাপেক্ষা সুকঠিন বাধা। এ জন্ম অনেকাংশে দায়ী অবশ্য আমাদের বাঙালী-জীবন। নানা কারণে বাংলা দেশের সমাজ-জীবন অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কর্ম্মক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ, মানুষের বিচিত্র শক্তি তাহার মধ্যে অবাধ লীলার অবসর পায় না এবং তাহার হৃদয় যে দিনে দিনে আপনাকে নব নব রূপে সৃষ্টি করিতে চায়, সেই সৃষ্টিপথে বাধা পাইয়া পাইয়া ভাব ও কল্পনা পঙ্গু এবং বুদ্ধিবৃত্তি চিন্তাবিমুখ হইয়া পড়ে। য়ুরোপের সাহিত্য যে বিচিত্র রসে ভরপুর তাহার কারণই হইতেছে তাহাদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন; স্বাধীন তাহাদের চিত্ত, জীবন তাহাদের নানাদিকে স্ফূর্ত্ত। তাহারা আমাদের মত মরিয়া বাঁচিয়া নাই, তাহাদের জীবনে adventure আছে, romance আছে; এ সব আমাদের কিছুই নাই। আমাদের দেশের তরুণ যাঁহারা, তাঁহারা জীবনে রোমান্সকে কখনো ভাল করিয়া চেনেন নাই, কাজেই সুস্থ সত্য প্রেমের গল্পও বাংলার নব কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতে পারিল না। সেই জন্যই মনে হয়, বাঙালী-জীবন যতদিন না পৃথিবীর বিস্তীর্ণ উদার লীলাভূমিতে দিকে দিকে আপনার বিচিত্র শক্তিকে আনন্দে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছে, বাংলার সমাজ যতদিন না কৃত্রিমতা ও মিথ্যার বন্ধন হইতে মুক্তি পাইতেছে, তত দিন বাংলা কথা-সাহিত্যের নবজীবন লাভ বুঝি আর হইবে না! এই নৈরাশ্যের কথাকে মন স্থান দিতে চায় না; কিন্তু সে বুঝিতেছে এ কথা সত্য, ইহাকে এড়াইবার উপায় নাই।

নৈরাশ্য আছে জানি, কিন্তু নৈরাশ্যের কথা আজ নাই বলিলাম। আজ না হয় পশ্চিম-সমুদ্রের উদ্গীর্ণ ফেণরাশিকে "প্রাণরসের ফোয়ারা" বলিয়া আমরা আনন্দে অভিনন্দিত করিতেছি; কিন্তু এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যেদিন সত্যই চারিদিক হইতে স্বচ্ছ, অনাবিল জলস্রোত আসিয়া আমাদের আবদ্ধ পঙ্কিল অতি-আধুনিক কথা-সাহিত্যধারার খাতে নূতন ধারা বহাইয়া তাহাকে রসে অভিষিক্ত, সৌন্দর্য্যে রূপায়িত ও শক্তিতে সঞ্জীবিত করিবে। আমাদের বর্ত্তমান "তরুণ" সাহিত্যিকেরা নন্—ভবিষ্যতে তারুণ্যের জয়টীকা পরিয়া যাঁহারা আসিতেছেন, যাঁহারা শুদ্ধ শুচি, সংযমে শক্তিমান, যাঁহারা আজিকার মাসিকপত্রিকার সহজ সম্মানে লুব্ধ হইবেন না, যাঁহাদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে শুধু রক্তমাংসের তাড়নাই প্রকাশ পাইবে না, শুধু য়ুরোপীয় সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণ দেখা যাইবে না, যাঁহারা মানুষের জীবনকে আর্টের পূজা-বেদীতে নৈবেদ্যরূপে উৎসর্গ করিবেন—আমরা তাঁহাদের আগমন-আশায় অপেক্ষা করিতেছি, বাংলা কথা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ তাঁহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছে। আজ তাঁহাদের আমরা পূর্ব্বাহ্নেই অভিনন্দিত করি; তাঁহারা আসিয়া বাংলা কথা-সাহিত্যকে ক্লেদ-পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করুন, তাঁহাদের স্পর্শে সমস্ত প্রগল্‌ভ কল্লোল নীরব হউক, ঝরণার পঙ্কিল আবর্ত্তন স্তব্ধ হউক, কালি-কলমের কলঙ্ককালিমা শুভ্র শুচিতায় স্নিগ্ধ হউক,—সেই শুভদিনকে লক্ষ্য করিয়া যাত্রা সুরু হউক, বাংলা-সাহিত্যের যিনি দেবতা, যিনি কর্ণধার, তাঁহার বন্দনা-গানে গগন-পবন মুখরিতহইয়া উঠুক—

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্।"

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বার্ণাড্ শ'র রচনার পরিচয়

"মেথুশেলায় প্রত্যাবর্ত্তন" (Back to Methuselah) এবং সেণ্ট জোয়ান্ (Saint Joan) নাটক দুখানিতে অধ্যাত্ম দর্শন ও মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের জটিলতা নিয়ে বার্ণাড্ শ' বিশদ ও সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। এই উভয় গ্রন্থেও তিনি তাঁর অন্যান্য নাটকের ন্যায় যে শত-পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় বোঝাবার চেষ্টা করেছেন সে তাঁর অসাধারণ মনীষারই পরিচায়ক! নাটকের এই সুবৃহৎ অবতরণিকায় তিনি নাটকীয় বস্তুর দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও কলানুগত নানাদিকের

অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্ক বিচার ও বিশ্লেষণের দ্বারা গভীর ভাবে অনুশীলন করেছেন। যে বাইবেলোক্ত পঞ্চতন্ত্রের জীব বিবর্ত্তন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে তিনি 'মেথুশেলায় প্রত্যাবর্ত্তন' শীর্ষক 'পঞ্চনাট্য চক্র' রচনা করেছিলেন ১৯২৪ সালের ১৮ই থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারী, এই পাঁচ দিন ধরে—কোর্ট-থিয়েটারে তার অভিনয় হয়েছিল। 'বার্ণাড্ শ'র ভক্তরা দল বেঁধে কোর্ট-থিয়েটারে ভিড় ক'রে এসে পরের পর পাঁচ দিন ধরে এই 'পঞ্চনাট্যচক্রর' সম্পূর্ণ অভিনয় দেখেছিল।

'মেথুশেলায় প্রত্যাবর্ত্তন' নাটক সে সময় নাট্য ও সাহিত্য জগতে বেশ একটা আন্দোলনের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল! এই নাটকের প্রথম চক্রে নাট্যকার আমাদের একেবারে নন্দনবনে (The Garden of Eden) নিয়ে যান। এর এই আদি খণ্ডের প্রথম ভাগে এ্যাডাম, ইভ ও নাগরূপী শয়তান ছাড়া আর কোনও চরিত্র নেই! ব্যাপারটা এই ভাবে সুরু হয়েছে—

ইভ। কিন্তু তোমাকে কথা ব'ল্‌তে শেখালে কে?

নাগ। তুমি আর এ্যাডাম! আমি ঘাসের ভিতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে লুকিয়ে এসে তোমাদের কথা শুনিছি। মাঠে যতরকম জীব আছে, আমি তাদের সকলের চেয়ে ওস্তাদ। আমি অনেক বিষয় জানি, আমি খুব বুদ্ধিমান। আমিই ত তোমাদের সব প্রথম 'মৃত্যুর' খবর শোনালুম—মরণ—মরণ,—তোমরা যা জান্‌তে না—মরো না।

(একটু আগেই একটি চঞ্চল সুন্দর হরিণ-শিশুকে উচ্চস্থান হ'তে প'ড়ে ঘাড় ভেঙে মরে যেতে দেখে ইভ বড় কাতর হ'য়ে প'ড়েছিল। এ্যাডাম, সেই হরিণ-ছানাটিকেই কবর দিতে নিয়ে গেছে!)

ইভ। (শিউরে উঠে) কেন তুমি আমাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ? আমি তোমার ঐ বিচিত্র সুন্দর ফণা দেখে সে কথা ভুলে গেছলুম! আমাকে দুঃখের কথা মনে করিয়ে দেওয়া তোমার উচিত নয়।

নাগ। মৃত্যু দুঃখের বস্তু নয় যদি তুমি তাকে জয় করতে শেখো!

ইভ। কেমন করে আমি তাকে জয় ক'রবো?

নাগ। আর একটা জিনিসের সাহায্যে!—'জন্ম' দিয়ে!

ইভ। 'জন্ম' কি?

নাগ। এই নাগ অমর। নাগ কখন মরে না। এক দিন তুমি হয় ত দেখবে, আমি আমার এই সুন্দর খোলস থেকে বেরিয়ে আসছি—নব নাগরূপে নবীনতর ও সুন্দরতর হ'য়ে আর একটি নূতন আধারে।—সেই তো 'জন্ম'।

এমনি করে' আরও কত কথাই নাগ ইভকে শোনাতে লাগল। তাকে সে বুঝিয়ে দিলে যে, 'এ্যাডাম আর তুমি অমর নও। তোমাদেরও এক দিন মরতে হবে। তবে তোমাদের মধ্য থেকেই আরও নূতন নূতন এ্যাডাম ও ইভেরা উৎপন্ন হবে'!

এ্যাডাম ফিরে আসতে ইভ তাকে এই নূতন বার্ত্তা শোনালে। এ্যাডাম কিন্তু বিশ্বাস করলে না!—তখন নাগই স্বয়ং এ্যাডামকে এ বিষয়ে তর্ক করে' বোঝাতে লাগল!

ইভ। আমি আরও কত এ্যাডাম আরও কত ইভ তৈরি করবো জানো?—

এ্যাডাম। খবরদার ওরকম গল্প কোর না—আমি তোমায় এই বলে রাখলুম! ও হ'তেই পারে না।

নাগ। আমার মনে আছে—তুমি এক সময় এমন কিছু ছিলে, যা হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল—তবুও তো তুমি হ'য়েছো!

এ্যাডাম। (বিস্ময়ে) হ্যাঁ, ঠিক! নিশ্চয় তা হ'তে পারে।

নাগ। আমি ইভকে সেই 'গুপ্তকথা' বলবো। সে আবার তোমাকে সেটা শোনাবে।

এ্যাডাম। গুপ্তকথা!—(কথাটা শুনে চমকে উঠে চট করে নাগের দিকে ফিরতে গিয়ে একটা কিছু তীক্ষ্ণ জিনিসের উপর পা পড়তেই এ্যাডাম চীৎকার করে উঠল) উঃ!

ইভ—কী হয়েছে গা?

এ্যাডাম—(পায়ে হাত বুলুতে বুলুতে) একটা কাঁটা-নটে। পাশেই একটা শেয়ালকাঁটা, আবার চোরকাঁটাও রয়েছে। আমি এ বাগানখানি চিরকালের জন্য আমাদের পক্ষে সুখকর করে রাখবার ইচ্ছায় এই সব কাঁটা-গাছ উপ্‌ড়োতে উপড়োতে হায়রাণ হয়ে গেছি!

নাগ—তুমি কেন কষ্টভোগ ক'রে ম'রছ? নূতন এ্যাডাম যারা আসবে, তারা নিজেদের জন্যে জায়গা পরিষ্কার করে নেবে।

ইভ—(এ্যাডামকে) না—না, তুমি ও ভয়ঙ্কর কাঁটাবন খানিকটা সাফ্ ক'রে রাখো ; নইলে আমাদেরই গায়ে আঁচড় লাগবে, পায়ে বিঁধবে !

এ্যাডাম—হ্যাঁ—হ্যাঁ, নিশ্চয় ! খানিকটা সাফ্ করতেই হবে। 'কাল'ই কতকটা আমি পরিষ্কার করে ফেলবো !

(নাগ হেসে উঠ্‌লো)

কী সুন্দর মজার শব্দ করলে তুমি ! আমার ভারি ভাল লাগে !

ইভ—আমার ভাল লাগে না !

(নাগ হেসে উঠ্‌লো)

—আঃ তুমি আবার ওরকম শব্দ ক'রছ কেন ?

নাগ—এ্যাডাম একটা নূতন জিনিস আবিষ্কার করেছে ! সে 'কাল'টাকে সন্ধান করে বার করেছে ! এখন থেকে তোমরা রোজই একটা না একটা কিছু নতুন জিনিস আবিষ্কার করবেই,—কেন না তোমাদের মাথার উপর থেকে অমরত্বের গুরুভার আমি সরিয়ে দিয়েছি কি না ?

ইভ—অমরত্ব ?—সে আবার কি জিনিস ?

নাগ—ওটা আমি চিরকাল বেঁচে থাকার আর একটা নূতন নাম রেখিছি 'অমরত্ব !'

ইভ—শোনো এ্যাডাম, নাগ কেমন আমাদের অস্তিত্বেরও একটা নূতন নাম করেছে—বেঁচে থাকা !

এ্যাডাম—আমাকে—'কাল কাজ করার' একটা ভাল কথা কিছু তৈরি করে দাও না !

নাগ—দীর্ঘসূত্রতা !

ইভ—বাঃ ! কী মিষ্টি কথা ! আমার যদি নাগের মতো রসনা হতো !—আমার বড় ইচ্ছা করে নাগের মতো কথা বলতে।

নাগ—তাও হতে পারে হয় ত ! সকলই সম্ভব !

এ থেকে নাট্যকারের অনেক কিছু বক্তব্যই আমরা বুঝতে পারি। আদি খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে একেবারে কয়েক শতাব্দী পরের দৃশ্য। মেশোপোটামীয়ার মরু মধ্যের এক স্নিগ্ধ শ্যামল ভূখণ্ডে এ্যাডাম মাটি খুঁড়ে চাষের কাজ ক'রছে। ইভ একটি গাছের তলায় ছায়ায় বসে সুতো কাটছে ! এই দৃশ্যে নাট্যকার এ্যাডাম ও ইভের পুত্র 'কেইন'কে উপস্থিত করেছেন। কেইন পিতা মাতার তেমন প্রিয় নয় ; কারণ, সম্প্রতি সে 'আবেল্'কে হত্যা করেছে ; তার উপর সে বড় গর্ব্বিত ! সে পৃথিবীর প্রথম মানুষের প্রথম পুত্র, এই শুধু তার গর্ব্ব নয়—সে এই বিশ্বের প্রথম হত্যাকারী বলেও আস্ফালন করতো ! বুড়ো বাপ কেবল জমী চাষ করে খায় ব'লে, কেইন বাপকে খাতির করতো না ; কারণ, সে নিজে ছিল গোঙার ! দুঃসাহসিকের কাজ করতেই সে ভালবাসতো !

এ দৃশ্যে তাই আমরা পিতা-পুত্রের বাদ-বিসম্বাদ, কলহ, এমন কি, হাতাহাতি হবার উপক্রম পর্য্যন্তও দেখি—এখানে স্বামী-স্ত্রীতেও বাক্‌বিতণ্ডা আছে, নাগের মতো নারীরও রসনায় বিষ দেখানো হয়েছে। কেইন পিতামাতাকে ত্যাগ ক'রে চলে যাবার পর তখন এ্যাডাম ও ইভের মধ্যে আবার একটা সন্ধি ও শান্তি স্থাপিত হয়। এ্যাডাম আবার কোদাল পাড়ে, ইভ আবার সুতো কাটে ; কিন্তু সেই একঘেয়ে কাজ আর তাদের ভাল লাগছিল না, তাই ইভ এক দিন বিরক্ত হ'য়ে এ্যাডামকে ডেকে বললে—

ইভ—তুমি যদি এতবড় একটা আহাম্মুক না হ'তে, তুমি, আমাদের দু'জনের বেঁচে থাকবার জন্যে এই মাটী কাটা আর সুতো বোনা ছাড়া অন্য কিছু ভাল কাজ যোগাড় করতে পারতে।

এ্যাডাম—বকিস্ নি ; কাজ করে যা,—যা ব'লছি শোন্ —নইলে পেটে অন্ন জুটবে না !

ইভ—মানুষের কেবল অন্ন চিন্তাটাই সবচেয়ে প্রধান নয় ! অন্ন ছাড়া অন্য কিছুও আছে যা মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সে যে কি, আমরা এখনও তার কিছু সন্ধান পাইনি ! তবে এক দিন পাবো নিশ্চয়ই ! তখন আমরা সেই নিয়েই কেবল বেঁচে থাকবো। তাহ'লে আর চাষ করতেও হবে না, লড়াই করতেও হবে না—মানুষ মারতেও হবে না !

এইখানে প্রথম খণ্ডের যবনিকা। দ্বিতীয় খণ্ডে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত বারনাবাস ভায়াদের সুসমাচার ! (The Gospel of the Brothers Barnabas.) এ অংশটি একটি চমৎকার হাস্যোজ্জ্বল 'ক'মেডি' ! এর মধ্যে বর্ত্তমান যুগের রাজনৈতিক গন্ধ সুস্পষ্ট বিদ্যমান। দুটি চরিত্র এর মধ্যে প্রধান—'জয়েস্ বার্জ' (Joyce Burge) আর হেনরী হপ্‌কীন্স্ লাবীন্ (Henry Hopkins Lubin)। বিলাতের উদারপন্থী দলের দু'জন বিখ্যাত নেতার সঙ্গে এদের সাদৃশ্য বেশ বুঝতে পারা যায়।

বারনাবাস ভায়ারা এ যুগের শিক্ষিত সুসভ্য চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রতিনিধি স্বরূপ! কনরাদ (Conrad) জারো ফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবতত্ত্বের অধ্যাপক; আর ফ্রাঙ্কলীন (Franklyn) সঙ্গতিপন্ন বেকার লোক। এক সময়ে তিনি ধর্ম্মপ্রচারক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,—উপস্থিত বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। কনরাদ ও ফ্রাঙ্কলীন্ বারনাবাস্ অনেক বিচার-বিতর্ক করে স্থির করেছেন যে, মানুষের জীবনের মেয়াদ এত অল্প যে, জীবনটাকে সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। তাঁরা দু'জনেই তাই একমত হয়ে ঠিক করেছেন যে, জীবনের মেয়াদটা অন্ততঃ পক্ষে আরও তিনশ' বছর বাড়িয়ে নেওয়া দরকার। এইটেই হ'চ্ছে বারনাবাস্ ভায়াদের 'সুসমাচার' (Gospel)।

এই খণ্ডে আরও কয়েকটী উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে। তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন পাদ্রী শ্রীযুক্ত হাস্লাম (Mr. Haslam)। ইনি তরুণ যুবা—একেবারে একালের পাদ্রীদের মতোই সৎ ও আনন্দময়! ইনি সারাজীবন পাদ্রীগিরি করার একেবারেই পক্ষপাতী ন'ন। কাজে কাজেই এঁর কাছে বারনাবাস্ ভায়াদের সেই তিনশ বছর পরমায়ু বৃদ্ধির প্রস্তাবটা মোটেই লোভনীয় নয়! বারনাবাস্ ভায়াদের একটি ভাইঝী আছে সাইন্থীয়া (Cynthia)। মেয়েটিকে তার খুড়োরা 'স্যাভী' বলে ডাকতেন। ডাঃ কনরাদ বলতেন যে 'স্যাভী'টা হচ্ছে স্যাভেজেরই (Savage) অপভ্রংশ। মেয়েটি বেশ সাদাসিধে সরল,—কথাবার্ত্তা কিন্তু একটু অসভ্য রকমের। পাদ্রী হাস্লামের সঙ্গে তার প্রায়ই তর্ক বাধতো। খুড়োরা তার ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের দোষ ধরতেন, কিন্তু হাস্লাম সাইন্থীয়ার কোনও দোষ লক্ষ্য করতেন না। তার পর এতে একজন পরিচারিকা আছে। সে কাজে ইস্তফা দিয়ে এক নোটিস জারি করে যে, তার যখন এই একটি মাত্র জীবন, তখন তাকে বিবাহ করে সংসারী হ'তে হবে। সে বিবাহ করতে চায় একটি গ্রাম্য কাঠুরেকে, যার চোখ দুটি বেশ কবির মতো, কিন্তু গোঁফজোড়াটি বেশ বীরের মতো! এই পরিচারিকার চরিত্রটি শেষ বরাবর এমন বদলে যায় যে, এ ভূমিকাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বারনাবাস ভায়ারা যেদিন দেশের সেই দুই রাষ্ট্রনেতা বার্জ্জ আর লাবীন্‌কে তাদের 'সুসমাচার' শোনালে, তাদের সেই মেথুশেলায় প্রত্যাবর্ত্তনের প্রস্তাব তাঁরা অনেক তর্ক বিতর্কের পর সমর্থন করলেন; কিন্তু গোল বাধ্‌ল ঐ তিনশ' বছর বেঁচে থাকা নিয়ে! বিশেষ তাঁরা যখন শুনলেন যে ঐ তিনশ বছর বাঁচাটা কোন রাষ্ট্রনেতাদেরই একচেটে থাকবে না, জনসাধারণে ও তিনশ' বছর বাঁচবে! তখন তাঁরা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়লেন! বারনাবাস ভায়ারা শেষ যখন বললেন যে তাঁরা ঠিক জানেন না যে মানুষের এ অবস্থা কবে হবে,—তবে হবেই যে তাতে আর কোনও ভুল নেই—তখন রাষ্ট্রনেতারা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—

লাবীন—আচ্ছা, তোমরা 'তিনশ' বছর হিসেব করে একটা নির্দ্দিষ্ট সময় নিরূপণ করে বসে আছো কেন?

ফ্রাঙ্কলীন—কারণ, আমাদের একটা নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করে দিতেই হবে যে। ওর চেয়ে কম হলে চলবে না, এবং ওর চেয়ে বেশী বলতেও এখন সাহস হয় না!

লাবীন—ওঃ! ভারি! আমি তো তিন হাজার বছর বলতেও প্রস্তুত, এমন কি তিন লক্ষ বলতেও আপত্তি নেই।

কনরাদ—হ্যাঁ, কারণ তোমার কথা যে এক দিন রাখতেই হবে এ ভাবনা তোমার নেই!

ফ্রাঙ্কলীন—(বিনীতভাবে) তা ছাড়া, বোধ হয় ভবিষ্যতের চিন্তা আপনাকে কোনও দিনই তেমন কাতর ক'রে তুলতে পারে না!

বার্জ্জ—(জোর করে) শ্রীযুক্ত হেনরী হপকিন্স্ লাবীনের কাছে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই।

লাবীন—ভবিষ্যৎ বলতে তোমরা যদি সত্যযুগ বা রামরাজ্যের স্বপ্ন মনে করো—যেটাকে তোমরা একগোছা গাজরের মতো দেখিয়ে এই ব্রিটীশ গাধাগুলোকে 'পোলিং-বুথে' টেনে নিয়ে যাও তোমাদের পক্ষে 'ভোট' দেবার জন্যে,—তাহলে আমি স্বীকার করছি যে, আমার কাছে ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই!

তার পরের দৃশ্য হচ্ছে যেন ২১৭০ খৃঃঅব্দে বারনাবাস ভায়াদের বাসনা পূর্ণ হয়েছে। এই আড়াইশ' বৎসরের মধ্যে ইংলণ্ডের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সেখানে আর এখন রাজা নেই। গণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট! তাঁর নাম বার্জ্জ-লাবীন্—মোটা শোটা আধা-বয়সী লোক, দেখতে সুপুরুষ। বেশ জমকালো দামী পোষাক পরা। তাঁর চেহারায় জয়েস্ বার্জ্জ্ আর হেন্‌রী হপকীনস্ লাবীন উভয়েরই

আকৃতির সৌসাদৃশ্য আছে। আমরা তাঁকে প্রেসিডেণ্টের চেয়ারে গম্ভীর ভাবে বসে থাকৃতে দেখতে পাই। মানুষ জলের ভিতর ডুবেও কি করে সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে সেই উপায় উদ্ভাবন করেছেন বলে যখন একজন আমেরিকান প্রেসিডেণ্টের কাছে এলো, প্রেসিডেণ্ট তার বক্তব্য শুনে ঘণ্টা দিতেই পাশের ঘরের পর্দ্দা সরিয়ে কন্‌রাদ বারনাবাস বেরিয়ে এলেন। কন্‌রাদ বারনাবাস যেন তখনও বেঁচে আছেন এবং সেই আড়াইশ' বছর পরে গণতন্ত্র মূলক ব্রিটীশ দ্বীপের তিনিই হয়েছেন অর্থ-সচিব। জীবনের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনিই তখন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। কাজে কাজেই সেই আমেরিকানের আবিষ্কার সম্বন্ধে তার সঙ্গে তিনিই কথা কইতে গেলেন। তাঁরা দুজনে চলে যাবার পর প্রধান কর্ম্ম-সচিব 'কন্‌ফিউশিয়াস্' এলেন প্রেসিডেণ্টের কাছে। প্রেসিডেণ্ট 'বার্জ্জ লাবীন্' তাঁকে বললেন যে, দেশের লোকেরা যাতে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের চর্চ্চাটা খুব বেশী ক'রে করে তাঁর সেইরূপ ইচ্ছা।

কনফিউশীয়াস্—কিন্তু আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলুম না। ইংরেজের প্রকৃতি ঠিক রাজনীতি বোঝবার উপযুক্ত নয়। যেদিন থেকে শাসন সংক্রান্ত সরকারী কাজকর্ম্ম সব চীনেরা এসে তত্ত্বাবধান ও পরিচালন করছে, সেদিন থেকে দেশটা সুশাসিত ও সৎ চালিত হচ্ছে—আর কি চাই বলুন।

বার্জ্জ-লাবীন্—কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে 'চায়না' যে তবু কেন একটা সবচেয়ে কুশাসিত দেশ, এইটে আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনি।

কন্‌ফিউশীয়াস্—না, এ কথা ঠিক নয়। বিশ বছর আগে সম্ভবতঃ চায়নার ওই হালই ছিল; কিন্তু যেদিন থেকে আমরা সরকারী কাজে চীনের প্রবেশ নিষেধ করে দিয়ে স্কটল্যাণ্ড থেকে লোক আনিয়ে সেই কাজ করাচ্ছি, সেদিন থেকে আমাদের দেশ বেশ সুশাসিত।

বার্জ্জ-লাবীন্—দেশের লোকেরা ঠিক তাদের নিজেদের শাসনভার পরিচালনে তেমন পারদর্শী নয়!—কেন যে—তা জানিনি। বলতে পারো এর কারণ কী?

কনফিউশীয়াস্—কারণ—শাসন ও বিচার মানে নিরপেক্ষতা এবং বিদেশীরাই কেবল সে বিষয়ে নিরপেক্ষ হ'তে পারে।

নাটকের এই উদ্ভট অংশে অন্যান্য যে সব চরিত্র আছে, তার মধ্যে স্বাস্থ্য-বিভাগের মন্ত্রী একটি উল্লেখযোগ্য লোক। ইনি একজন সুন্দরী নিগ্রো মহিলা! তারপরই দেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক—আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত পাদ্রী হাস্লাম্! তাঁর বয়স এখন ২৮৩ বৎসর! অথচ দেখলে ষাট্ বছরের বেশী বলে মনে হয় না। তিনি হিসেব করে বলেন যে, তাঁর জ্ঞাতি-কুটুম্বের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষের উপর!

আর একজন আছেন গৃহস্থালী বিভাগের মন্ত্রী। এঁর নাম শ্রীমতী লিউটষ্ট্রীং! ইনি একজন সুন্দরী এবং দেখতে অল্পবয়স্কা যুবতীর মতো! প্রধান ধর্ম্মযাজক হাস্লাম এঁর তরুণ কান্তি দেখে মুগ্ধ হ'য়ে এঁর সঙ্গে অতীত কাল নিয়ে আলোচনা সুরু করেন। শ্রীমতী বলেন, তিনি হাস্লাম্‌কে চেনেন। তাঁকে আগে দেখেছেন। অনেকবার তাঁর ডাকে দরজা খুলে দিয়েছেন। ইনি সেই বার্‌নাবাস ভায়াদের কাজে ইস্তাফা দেওয়া পরিচারিকা। এখন এঁর বয়স প্রায় ২৭৫ বৎসর!

এই রকমের সব আরও অনেক মজার ব্যাপার আছে এই অংশে।

তার পর তৃতীয় খণ্ড। এ খণ্ডের নাম হচ্ছে 'জনৈক প্রাচীন ব্যক্তির শোচনীয় কাহিনী'। সময়ের হিসাব দেওয়া আছে তখন ৩০০০ খৃষ্টাব্দ। এবং ঘটনা সংস্থান হচ্ছে আয়ার্লাণ্ডের 'গলওয়ে বে' নামক এক উপসাগব-তীর! প্রথম দৃশ্যেই আমরা দেখতে পাই—প্রাচীন ভদ্রলোকটী একটি প্রাচীন শিলাখণ্ডের উপর বসে রয়েছেন। তিনি ইংরাজ উপনিবেশের রাজধানী বোগ্দাদসহর থেকে তাঁদের পিতৃ-পিতামহদের রাজ্যের নানা প্রদেশ পরিভ্রমণ করতে এসেছেন। একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে তিনি কথা কইছিলেন; কিন্তু সে স্ত্রীলোকটী তাঁর কথা কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। তাই একটু মৃদু হাস্য ক'রে বললেন—এই দেড়শ' বছর পরে তিনি আবার হাসলেন! হাসবার মতো বয়েস আর তাঁর নেই। তার পর একজন পুরুষকে ডেকে আনা হ'লো যদি সেই বৃদ্ধ লোকটির কথা কিছু বুঝতে পারে! কিন্তু সেও কিছু বুঝতে পারলে না। তখন "ভ্রমণকারী সমিতির সহকারী সভাপতি" সেই অহঙ্কারী-গর্ব্বী প্রাচীন ভদ্র লোকটি আর একটি যুবতীকে ডেকে কথা কইতে লাগলেন।

এই যুবতীটি অনেকটা সেই হাজার বছর আগেকার বারনাবাস ভায়াদের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী স্যাভী বারনাবাসের মতোই দেখতে। এই যুবতীটির নাম 'জু'! জু কিন্তু সেই প্রাচীন ভদ্রলোকটির কথা সব বুঝতে পারছিল।

প্রাঃ ভদ্রলোক—আচ্ছা বলুন ত'—সাদাসিধে সহজ ইংরেজি কথা বুঝতে পারে—এমন কোনও লোক কি এই দ্বীপে নেই?

'জু'—আজ্ঞে না, ঐ দৈববাণী-বাচকেরা ভিন্ন আর কেউ পারেন না। কারণ তাঁদের একটা বিশেষ ঐতিহাসিক গবেষণা করতে হয় আবার আমাদের লুপ্ত চিন্তা সম্বন্ধে।

প্রাঃ ভদ্রলোক—লুপ্ত চিন্তা! সে কি? আমি 'লুপ্ত ভাষা'র কথা শুনিছি বটে, কিন্তু 'লুপ্ত চিন্তা'র কথা কখনও শুনিনি!

জু'—'ভাষার' চেয়ে 'চিন্তা' অনেক আগে মরে যায় কি না! আমরা হয় ত আপনাদের 'ভাষা' বুঝতে পারি, কিন্তু আপনাদের 'ভাব' বা 'চিন্তাধারা' সব সময়ে বুঝিনি। কিন্তু যাঁরা ঐ 'দৈববাণী' শোনান দেশের লোককে, তাঁরা আপনাদের সবটাই বুঝতে পারবেন। দৈববাণী-বাচকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কি?

প্রাঃ ভদ্রলোক—আমি তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি তো সুন্দরী! আমি বেড়ানোর আনন্দটুকুর জন্যে এসেছি। সঙ্গে আমার মেয়ে আছে, সে ইংরাজের প্রধান মন্ত্রীর স্ত্রী। আর সঙ্গে আছেন সেনাপতি আউফ্‌ষ্টাইগ্! ইনি হচ্ছেন—তোমায় কেবল বিশ্বাস করে চুপি চুপি বলছি শোনো—ইনি প্রকৃতপক্ষে তুরাণীয়ার সম্রাট! বর্ত্তমান যুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিকবিজ্ঞ ও যুদ্ধবিশারদ রণপ্রতিভাশালী লোক।

জু'—আপনি আনন্দের জন্য বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন কেন গৃহে বসে কি আনন্দ উপভোগের সুযোগ পান না আপনি!

প্রাঃ ভদ্রলোক—আমি এই জগৎ দেখতে বেরিয়েছি।

জু'—এ যে প্রকাণ্ড বড়; যেখান থেকে ইচ্ছে আপনি তো এর খানিকটা দেখতে পেতে পারেন।

প্রাঃ ভদ্রলোক—(অধৈর্য্য হয়ে) ড্যাম্ ইট্ ম্যাডাম! আপনি কি আপনার সারাটি জীবন পৃথিবীর সেই একই টুক্‌রো টুকু দেখে কাটাতে পারেন? (প্রকৃতিস্থ হয়ে)—আমাকে মাপ ক'র্ব্বেন, আমি আপনার সামনে মুখ খারাপ করিছি!

জু'—ওঃ বটে! ওকেই মুখ খারাপ করা বলে? আমি ও বিষয়ে বইয়ে পড়িছি বটে। কেন, ও তো শুনতে বেশ মিষ্টি লাগল! 'ড্যামিট্‌মাড্যাম্' চমৎকার! আপনি যতবার ইচ্ছা বলুন, আমার বেশ ভাল লেগেছে!

প্রাঃ ভদ্রলোক—(একটা আরামের সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে) ভগবান আপনাকে সুখী করুন! ও কথাগুলো একটু নোংরা হ'লেও আমাদের কিন্তু বড় পরিচিত কথা! আপনাকে ধন্যবাদ,—বারবার ধন্যবাদ! আমি এইবার যেন স্বগৃহে এসেছি বলে মনে হচ্ছে!

এই খণ্ডের মধ্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল অংশ হ'চ্ছে ঐ প্রাচীন ভদ্রলোকটীর মুখে আয়ার্ল্যাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনা। সে আলোচনা অত্যন্ত দীর্ঘ বলে স্থানাভাবে তার নমুনা তুলে দিতে পারা গেল না। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, নাট্যকার স্বয়ং আইরীশম্যান নাহ'লে আয়ার্ল্যাণ্ডের কথা এমন ক'রে আর কেউ বলতে পারতো না।

তারপরের দৃশ্য হচ্ছে বোগদাদের দল এসে একটি মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়েছে দৈববাণী শোনবার জন্য,—জু' মেয়েটিও এদের সঙ্গে আছে। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখে বোগদাদীরা সেটীর পরিচয় জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করাতে, জু' তাদের বুঝিয়ে দিলে যে হাজার বছর আগে যখন এই পৃথিবীতে স্বল্পায়ু লোকেরা বাস করতো, তখন যুদ্ধ বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে তারা এক ভীষণ যুদ্ধ করেছিল। সেই যুদ্ধের ফলে জগৎ থেকে কপট খৃষ্ট সভ্যতার ধাপ্পাবাজী লোপ পেয়ে গেছে। সভ্যজগতের সর্ব্বশেষ দান যা তখনকার রাষ্ট্রনেতারা আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে 'কাপুরুষতাই' স্বদেশ-প্রেমিকদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব! যে মনীষী এই সত্য সর্ব্বপ্রথম প্রচার করতে সাহসী হ'য়েছিলেন, সেই পুরাকালের বিশালকায় বিজ্ঞ সার জন্ ফলষ্টাফ (!) মহাশয়ের স্মৃতির সম্মানার্থ তাঁর এই মর্ম্মর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল!

এর পরের খণ্ডেও এই দলেরই সব হাস্যকর উদ্ভট আলোচনা ও কথা-বার্ত্তার ভিতর দিয়ে গভীর চিন্তাপ্রসূত কতকগুলি নির্ম্মম সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়!

শেষ পর্য্যন্ত বোগদাদীরা 'দৈববাণী' শুনলে।

দৈববাণী তাদের, শুধু বললে যে—"বোকারা, বাড়ী ফিরে যা!"

জু' তাদের বললে যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর একদল বোগদাদী এসেছিল 'দৈববাণী' শুনতে। তারাও সেদিন ঠিক এই কথাই শুনেছিল। কিন্তু সেই প্রতিনিধি দলের রাজদূত পৌত্রী সে কথায় আপত্তি করে বললে—"না, তারা শুনেছিল, "ব্রিটেন যখন প্রতীচ্যের ক্রোড়ে শৈশব দোলায় দুলছিল, তখন 'পূবে হাওয়াই' তাকে বলিষ্ঠ পুষ্ট ও শ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। 'পূবে হাওয়া' যতকাল অনুকূল হয়ে বইবে, ততদিন ব্রিটেনের সবরকমে বাড়-বাড়ন্ত হবে! এই 'পূবে হাওয়াই' বিরোধের দিন ব্রিটেনের শত্রুপক্ষকে বিনাশ করবে।"

পঞ্চম খণ্ডে সময় দেওয়া আছে ৩১৯২০ খৃঃ অব্দ! এই খণ্ডের নাম হচ্ছে "চিন্তা যতদূর পৌঁছতে পারে!" (As far as thought can reach) এই তিরিশ হাজার বৎসর পরের ঘটনা কল্পনা করে নেওয়া একটু কঠিন। এই অংশে যে সব চরিত্র আছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে 'পীগ্-মেলীয়ন্' (Pygmalion)। সে একজন অদ্ভুত শক্তিশালী ভাস্কর-শিল্পী। সে একটি কৃত্রিম মানুষ তৈরী করেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে মানুষটী একটি ভয়ানক পশু হ'য়ে উঠলো। কাজে কাজেই তাকে মেরে ফেলতে হ'ল। তার পর এক কৃত্রিম দম্পতী-যুগল আছে। তারা খানিকটা পর্য্যন্ত বেশ ছিল; কিন্তু পরে স্ত্রীলোকটী তার সৃষ্টিকর্ত্তা পীগমেলীয়নকে এমন দংশন করলে যে, পীগ্মেলীয়ন্ মরে গেল। কাজে কাজেই বাধ্য হয়ে এই কৃত্রিম দম্পতীকেও বধ করতে হ'ল। সুতরাং 'পীগ্মেলীয়নের' কীর্ত্তি ধ্বংস হয়ে গেল। কারণ তিনি মানুষ তৈরী করেছিলেন বটে, কিন্তু তাদের 'আত্মা' সৃষ্টি করতে পারেন নি। সম্ভবতঃ বার্ণাড্ শ'র এই নাটকের তাৎপর্য্য এই রহস্যের মধ্যেই নিহিত আছে বলে মনে হয়। তবে আমি এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ নই। সর্ব্বশেষ দৃশ্যে এ্যাডাম, ইভ, ও সেই অজগর প্রভৃতির প্রেতাত্মার আবির্ভাব হয়। অজগর ছাড়া আর সকলেই কিছু না কিছু বলে।

ইভের শেষ কথা হচ্ছে—আমার সুচতুরা উত্তরাধিকারিণীরা বিশ্ব অধিকার করেছে—ভালই হয়েছে!

অজগর বলে—"আমি পরম সন্তুষ্ট হয়েছি; কারণ এখন আর 'পাপ' বলে কিছু নেই! সৎ ও চিৎ এখন এক হ'য়ে গেছে!

কেইন্ বলে—আমার সময়ে আমার খেলা যে চমৎকার ছিল, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না!

এ্যাডাম বলে—আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনে! এ সব কিসের জন্য? কেনই বা? কোথা থেকেই বা—এবং কখনই বা হ'ল? আমার মনে হয় এ সবই বোকামী!

সর্ব্বশেষ কথা লিলীথের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। সে বলে—"জীবনেরই কেবল কোনও সমাপ্তি নেই!...... তবে এই টুকুই যথেষ্ট যে তার 'ওপার' আছে!

যবনিকা

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

পরাণ-বাবু তাঁর বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিবার যে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন, তা রামযাদু প্রথমতঃ ততো গ্রাহ্য করেনি। রামযাদু বুঝ্তে পারেনি যে সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্লে তার কিছু স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা থাক্তে পারে; বিনা স্বার্থে কোনো কাজ কর্বার মতন স্বভাব রামযাদুর ছিলো না।

রামযাদুর চেহারা তার স্বার্থপর স্বভাবকে ছেলেবেলা থেকে সাহায্য করে' করে' তার স্বভাবকে একেবারে পাকা করে' গড়ে' তুলেছিলো। তার চেহারাটাই ছিলো এমন যে তাকে দেখ্লেই লোকের মনে করুণার উদ্রেক হতো, আহা বলে' মমতা দেখাতে ইচ্ছা কর্তো। তার রংটা ছিলো ফ্যাকাশে, শরীরটা ভয়ানক কৃশ, নাকটা দন্ত্য-স উল্টে ধর্লে যেমন দেখায় তেমনি বঁড়্শীর মতন বাঁকা আর ছুঁচোলো, চোখ দুটো ছিলো ছল্ছলে—যেনো একটা কিছুর দুঃখ-ব্যথা তার অন্তরে গোপন থেকে চোখের আয়নায় আপনার ছায়া ফেলেছে; তার মুখের মোট ভাবটা ছিলো

নিরীহ, মনটা ছিলো সাবধানী, স্বভাবটা ছিলো সংসারী—যেখানে যেমনটি হলে সুবিধা হতে পারে সেখানে ঠিক তেম্‌নিটি হুঁশিয়ার হয়ে চারদিকের তাল সাম্‌লে সে চল্‌তে পার্‌তো,—এ ছিলো তার সহজাত বুদ্ধি, স্ব-ভাব, ইংরেজিতে যাকে বলে ইন্‌ষ্টিংক্‌ট্‌। সে যার কাছে যে কাজের জন্যে হাজির হতো, তারই এমন করুণা আকর্ষণ কর্‌তো, যে কেউ তাকে একেবারে অগ্রাহ্য বা উপেক্ষা করে' ছেঁটে ফেল্‌তে পার্‌তো না। তার এই ঈশ্বরদত্ত সুবিধা তার কাছে ধরা পড়েছিলো তার ছেলেবেলাতেই—যখন তার বয়স সবে ষোলো বছর।

রামযাদুর বাড়ী ছিলো যশোর জেলায় চিত্রা নদীর তীরে একটা ছোট গাঁয়ে। তাদের সাংসারিক অবস্থা ভালো না হলেও মন্দ বলা যায় না; তাদের ছিলো চার ভিটায় চারখানা চালা ঘর, গোয়ালে দুধালো দুটি গাই, কয়েক বিঘা লাখেরাজ ব্রহ্মত্র জমিতে সম্বৎসরের ধানের সংস্থান, খেজুর-গাছে গুড়, আর সুপারী ও নারিকেল-গাছের একটা বাগান,—যার ফলকর বেচে তেল নুন কাপড়ের পয়সা জোগাড় হতে পার্‌তো; এর উপরে রামযাদুর বাবা নড়ালের বাবুদের জমিদারীতে দূর মফস্বলে গোমস্তার কাজ কর্‌তো—সেই কাজের মাইনে সামান্য হলেও রামযাদুর মা বেশ ভারী ভারী খানকতক সোনা-রূপার গহনা গায়ে পরে আপন এয়োতের পয় আর জোর জানাতো। রামযাদুর বাবা মারা গেলে আয় অনেকটা কমে' গিয়েছিলো বটে, কিন্তু তবু তাদের কষ্টে পড়্‌তে হয়নি—পরিবারে তো তারা মাত্র দুজন—মা আর ছেলে; রামযাদুর এক বড়ো বোন ছিলো, কিন্তু তার বাবা থাক্‌তেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিলো।

রামযাদুর দিদির শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা ভালো ছিলো না মোটেই। তার ভগ্নীপতি ছিলো যশোরের এক উকিলের মুহুরী—এই চাকুরীটুকু ছাড়া তার আর কোনো সঙ্গতিই ছিলো না। তাই বোন যখন বিধবা হলো তখন ভাইএর আশ্রয় ছাড়া তার আর কোনো গতি রইলো না।

এই পরিবার-বৃদ্ধির সম্ভাবনাতে বালক রামযাদু একটু ক্ষুণ্ণ ও চিন্তিত হয়ে উঠ্‌লেও মার আদেশে দিদিকে নিজেদের বাড়ীতে আন্‌বার জন্য তাকেই যশোরে যেতে হয়েছিলো। বিধাতা একএকজনের উপর অকারণেই প্রসন্ন থাকেন; রামযাদুর অদৃষ্টটাও ছিলো তেমনি; সে ক্ষুণ্ণ মনে যশোরে গিয়ে খুশী হয়েই ঘরে ফিরেছিলো।

যশোরে গিয়ে যখন সে পৌছালো, তখন রাত প্রায় দশটা। পথ অন্ধকার, নির্জ্জন; ষ্টেশন থেকে তার দিদির বাসা পর্য্যন্ত অনেকখানি পথ। রামযাদুর একলা যেতে ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো, অথচ এইটুকু পথের জন্যে গাড়ী ভাড়া কর্‌তেও তার ইচ্ছে হচ্ছিলো না—সেই ছেলেবেলাতেই সে দস্তরমতো হিসাবী সংসারী,—এই গুণটি সে উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে নিজের শোণিত-মজ্জার মধ্যে বিনা চেষ্টাতে, কেবল জন্মাধিকারেই পেয়েছিলো। রামযাদু ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে হনহন করে' পথ চল্‌ছে, তার গাটা ছম্‌ছম্‌ কর্‌ছে, কিন্তু সে মনের মধ্যে কোনো ভয়ের চিন্তাকেই আকার ধরে' স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌তে দিচ্ছে না। হঠাৎ তার কানে আওয়াজ এলো,—"মাণিকপীর মুস্কিল আসান!" মুস্কিল আসান ফকিরদের মোটা চড়া গলার চাৎকার রামযাদুর মনে ছেলেবেলা থেকেই আতঙ্ক উৎপন্ন কর্‌তো; এই ফকিরেরা ভিক্ষায় বাহির হয় তখন, যখন রাত্রের অন্ধকার ছেলেদের জুজুর ভয় দেখিয়ে জড়োসড়ো করে' ঘুম পাড়াবার জোগাড় করে, যখন শিশু-কল্পনার আড়াল আবডাল থেকে আলো-আঁধারের মধ্যে উঁকি মেরে ভূত পেত্নী শাঁকচিন্নি ভয় দেখাতে থাকে। রামযাদুর বয়স এখন শৈশব পেরিয়ে যৌবনের দিকে পা বাড়ালেও, এই নিশুত নিঝুম রাতে নির্জ্জন পথে একলা চল্‌তে চল্‌তে মুস্কিল-আসানের রব শুনেই শৈশব-সংস্কারের বশে তার মনটা ছ্যাঁত করে' উঠ্‌লো। সে চকিত দৃষ্টিতে চারিদিকে একবার তাকিয়ে একটু এগিয়ে যেতেই দেখ্‌লে মুস্কিল-আসান ফকির তার চারমুখো চেরাগ হাতে ধরে' ভিক্ষা সেবে বাড়ী ফির্‌ছে—চারমুখো চেরাগের আলোতে ফকিরের প্রকাণ্ড চওড়া মুখের এক-বোঝা কাঁচা-পাকা দাড়ি আর তার লম্বা ঝল্‌ঝলে আল্‌খাল্লার সামনেটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রামযাদু বাল্য সংস্কারের ভয়টা চট করে' দমন করে' হনহন করে' ফকিরের কাছে এগিয়ে গিয়েই বলে' উঠ্‌লো—এই যে মুস্কিল-আসান ফকির! তোমাদেরই একজনকে আমি সন্ধ্যে থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ফকির উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেনো বাবা, কেনো? কিসের জন্তি?

রামযাদু একটুও না ভেবে তৎক্ষণাৎ বললে—মা আমার কল্যেণে সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি মানসিক করেছিলো, তাই দেবার জন্তি।

সওয়া পাঁচ আনা! পীরের দোয়ায় দমকা লাভের আশায় উৎসাহিত হয়ে ফকির বললে—দাও বাবা দাও, বাবা মাণিকপীর তোমাদের সকল মুস্কিল আসান করবেন—মাণিকপীর মুস্কিল আসান!"—ফকির উল্লাসে আজান দিয়ে উঠলো।

রামযাদু পয়সা বাহির করবার জন্য কোটের ডান দিকের পকেটে হাত ভরলো, তার পর যেনো সেই পকেটে পয়সা না পেয়ে বাঁ দিকের পকেটে হাত দিলে; তার পর সেখানেও যেনো পয়সা না পেয়ে বুক-পকেটে খুঁজলে; অবশেষে কোথাও যেনো পয়সা না পেয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে এ-পকেট সে-পকেট হাঁটকে দেখতে দেখতে মুখ কাচুমাচু করে' বললে—পয়সাগুলো বাড়ীতেই ফেলে এসেছি দেখছি। যাকগে, কাল আর-কাউকে ডেকে দিয়ে দেবো।

সওয়া পাঁ—চ আনা পয়সা! কাল কোন্ ফকিরকে ডেকে দিয়ে দেবে তার তো ঠিক নেই। ফকির চিন্তান্বিত হয়ে কেমন একরকম ঝিমানো স্বরে বললে—তা চলো বাবা, তোমার বাড়ীতেই যাই, মানসিকের পয়সা ফেলে রাখতি নেই।

রামযাদু বললে—কিন্তু আমাদের বাড়ী যে এখান থেকে অনেক দূর—সেই কাছারীর কাছে। এত রাত্রে তুমি আবার অত দূর যাবা?

রামযাদুর ছলছলে চোখ আর হাবলাটে মুখ দেখে ফকির ভুলে গিয়েছিলো; সে বললে—তা হোক বাবা। লোকের মানসিকের ধার শোধ করিয়ে মাণিকপীরকে খুশী করে' দেওয়াই তো আমাদের কাজ। মাণিকপীর খুশী হলি কারো কোনো মুস্কিল থাকে না—বাবা মাণিক-পীর মুস্কিল আসান!" ফকির সওয়া পাঁচ আনা পয়সা পাবার লোভের আনন্দে আবার ডাক ছেড়ে হেঁকে উঠলো।

রামযাদু আর দ্বিরুক্তি মাত্র না করে' ফকিরের চার-মুখো চেরাগের জোর আলোতে পথ দেখে দেখে একজন আগলদার সঙ্গী পেয়ে নির্ভয় খুশী মনেই দিদির বাড়ীর দিকে চললো।

দিদির বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে রামযাদু ফকিরকে বললে—এখানডা বড়ো গলি ঘুঁজি; আমার গাডা ছমছম করতি লেগেছে, তুমি আমার আগে আগে কাছে কাছে চলো ফকির।

ফকির সাহস দিয়ে বললে—ভয় কি বাবা, মুস্কিল-আসানের চেরাগের রোশ্‌নী যতদূর যায় তার চৌহদ্দীর মধ্যি জিন দানা ভূত পেরেত কেউ আস্‌তি পারে না। আমি আগে আগে যাচ্ছি—তোমার কিচ্ছু ডর নেই।

ফকির রামযাদুর আগে গিয়ে কিছুদূর যেতেই রামযাদু নিঃশব্দে ও সত্বর পদে সুট্ করে' পাশের এক শুঁড়ি গলির অন্ধকারের ভিতর সরে' পড়লো। ফকির খানিক দূর গিয়ে পিছনে রামযাদুর পায়ের শব্দ না শুনতে পেয়ে পিছন ফিরে দেখলে রামযাদু নেই। প্রথমে সে মনে করলে রামযাদু বোধ হয় একটু পিছিয়ে পড়েছে। তাই সে ফিরে দাঁড়িয়ে চেরাগটা একটু উস্কে দিলে, এবং আলো-আঁধারের মধ্যে দৃষ্টি পাঠাবার চেষ্টা করে' রাম-যাদুর তল্লাস করতে করতে ঝিমানো মোটা স্বরে বললে—কৈ বাবা, আস্‌তিছো?

শ্রীবৎস রাজার বনবাসে রাণী চিন্তাদেবীর হাত থেকে পোড়া শোল-মাছ জলে পালিয়ে গেলে তাঁর মনের অবস্থা যেমন হয়েছিলো, রামযাদুর কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে মুস্কিল-আসান ফকিয়ের মনের অবস্থা ততোঽধিক শোচনীয় হয়ে পড়লো। পরের মুস্কিল আসান করতে এসে সেই পড়লো মুস্কিলে! ফকির হতাশার ক্ষোভে কাতর হয়ে আর্তনাদ করে' ডাকতে লাগলো—ও মানসিকওয়ালা বাবা! কনে গেলে বাবা? ও মানসা-করা বাবা! জবানে কবুল-করা মানসিক দাও বাবা!

আর বাবা! বাবা তখন এ-গলি থেকে ও-গলির বাঁক ফিরে সে-গলি দিয়ে ছুটে চলেছে। এক-একবার ফকিরের আর্তনাদ তার কানে এসে পড়ে, আর তার গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।

ফকিরের আওয়াজ চার-পাঁচ বারের পর রামযাদু আর শুনতে পেলে না। তখন সে নিশ্চিন্ত খুশী মনে দিদির বাড়ীর দরজায় গিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

ফকিরের ব্যাকুল চীৎকারে পাড়ার লোকেদের নিরুপদ্রব নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে পাঁচ-সাত দিক থেকে পাঁচ-সাত জনে একসঙ্গে সমস্বরে এমন ধমক দিয়ে উঠ্‌লো যে ফকির বেচারা দ্বিতীয় নূতন মুস্কিলের ভয়ে হঠাৎ চুপ করে' গেলো। কিন্তু সে অস্পষ্ট স্বরে গজ্‌গজ্ কর্‌তে কর্‌তে মানসিক-ওয়ালা ছোঁড়ার চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে নানাবিধ সামাজিক অসামাজিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতাতে পাতাতে তাদের জন্ম বিবিধ অখাদ্য খাদ্যরূপে বরাদ্দ কর্‌তে কর্‌তে সেই দীর্ঘপথ উজান বেয়ে আবার ফির্‌তে লাগ্‌লো। নিরুপায় ক্ষুণ্ণ মনকে সে এই বলে' সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লো যে বাবা মাণিকপীরের নাম নিয়ে ঠকামি—তিন রোজের মধ্যে এর সাজা হাতে হাতে পেতে হবে না!

কিন্তু বুদ্ধিমান লোককে বিধাতাও এঁটে উঠ্‌তে পারেন না—সে বুদ্ধির জোরে সবাইকে ঠকিয়ে নিজের সুযোগ আবিষ্কার করে' নেয়। মাণিকপীর তাঁর ভক্ত-ফকিরের আর্‌জি সত্ত্বেও রামযাদুকে মুস্কিলে না ফেলে তার বিশেষ আসানই কর্‌বার সূত্রপাত করে' দিলেন।

রামযাদুর ভগ্নীপতি ছিলো যশোরের উকিল কিরণ-বাবুর মুহুরী। কিরণ-বাবুর মনটা ছিলো এমন বড়ো যে তিনি বাড়ীর চাকরকেও নিজের আত্মীয়ের মতন দেখ্‌তেন। তাঁর মুহুরীর অসুখের সেবা থেকে মৃত্যুর পর সৎকার পর্য্যন্ত তিনি নিজের হাতে ও নিজের খরচে করেছেন; মুহুরীর মৃত্যুতে কেঁদে আকুল হয়েছেন।

রামযাদুর দিদি ভাইএর সঙ্গে বাপের বাড়ী যাবার উদ্‌যোগ করে' ভাইকে বল্‌লে—যা, একবার বাবুকে বলে' আয়, তিনি আমাদের অনেক করেছেন।

রামযাদু কিরণ-বাবুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিতেই কিরণ-বাবুর চোখ জলে ভরে' উঠ্‌লো। তিনি রামযাদুর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন, কিছু বল্‌তে পার্‌লেন না।

কিরণ-বাবুর চোখের জল গড়িয়ে না পড়্‌লেও তাঁর চোখের ছলছলে ভাব রামযাদুর চোখ এড়ালো না। সে বল্‌লে—দিদিকে আমি নিয়ে যাবো তাই আপনার অনুমতি নিতে এসেছি।

কিরণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তোমার দিদি এখন কোথায় যাবেন? শ্বশুরবাড়ী, না তোমাদের বাড়ী?

রামযাদু বল্‌লে—দিদির শ্বশুরবাড়ীতে কেউ নেই; আর ওখানকার অবস্থাও তো ভালো নয়। দিদিকে আমাদের কাছেই থাক্‌তে হবে। আমাদেরও অবস্থা ভালো নয়। কিন্তু এক মায়ের পেটের বোন, তাকে তো আমি ফেল্‌তে পার্‌বো না—এক মুঠো ভাত জুটলে তাই দুভাগ করে' খেতে হবে।

ছেলেমানুষের মুখে জ্যাঠামির কথা শুনেও কিরণ-বাবু খুশী হয়ে বল্‌লেন—এই তো চাই বাবা! যার এমন মন তার কখনো কোনো অভাব ভগবান রাখেন না। তোমার বাবা কি করেন?

রামযাদু মুখ মলিন করে' বল্‌লে—বাবার দু বচ্ছর হলো কাল হয়েছে। তিনি নড়ালের বাবুদের জমিদারীতে গোমস্তার কাজ কর্‌তেন। বাবার কাল হওয়ার পর মা ধান ভেনে কষ্ট করেও আমায় পড়াচ্ছিলেন। এখন দিদিকে নিয়ে যাচ্ছি; আমায় এখন পড়া ছেড়ে একটা কাজকর্ম্মের জোগাড় কর্‌তে হবে।

রামযাদুর চোখের জল ছিলো হাতধরা; তার চোখের স্বাভাবিক ছলছলে ভাবটা ইচ্ছা করলে একটুতেই জলধারায় পরিণত হয়ে গড়িয়ে ঝরে' পড়্‌তে পার্‌তো। এখানে সে সেই দুর্লভ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে কিরণ-বাবুর কোমল করুণাপ্রবণ মনে অমোঘ অস্ত্র আঘাত কর্‌লে। কিরণ-বাবু জান্‌তেন তাঁর মুহুরীর অবস্থা কিরকম বিষম দরিদ্র ছিল; তার হাতে যারা মেয়ে সম্প্রদান করেছিলো তাদের অবস্থাও যে ভালো নয় এ কথা বিশ্বাস কর্‌তে তাঁর একটুও দ্বিধা বোধ হলো না। তিনি ব্যথিত হয়ে বল্‌লেন—না না বাবা, এই বয়সে তুমি লেখাপড়া ছেড়ো না। তুমি যদি বরাবর পাস্ করে' যেতে পারো, আমি মাসে মাসে তোমায় দশ টাকা করে, দেবো।

রামযাদুর মুখে চোখে হর্ষগদ্‌গদ কৃতার্থতার ভাব ফুটে উঠ্‌লো। রামযাদু বিনীত ভাবে বল্‌লে—আপনার দয়ার কথা দিদির কাছে শুনেছি। আপনি দিদিকে দেখ্‌বেন—আপনিই এখন তার অভিভাবক।

কিরণ-বাবু এ কথার কোনো জবাব দিলেন না, একটু অন্যমনস্ক হয়ে কি যেনো চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

কিরণ-বাবুকে অন্যমনা দেখে রামযাদু বল্‌লে—আজ্ঞে এখন তবে আসি।

কিরণ-বাবু একটা টিনের হাত-বাক্স খুলতে খুলতে বল্‌লেন—দাঁড়াও ঠাকুর, পায়ের ধুলো না দিয়ে যাবে কোথায় ?

কিরণ-বাবু কায়স্থ ; ব্রাহ্মণের উপর তার গভীর ভক্তি। তিনি বাক্স থেকে তিন-খানি দশ-টাকার নোট বা'র করে' বাঁ-হাতে রাখ্‌লেন এবং ডান-হাতে রামযাদুর পায়ের ধুলো মাথায় দিলেন ; তার পর রামযাদুর হাতে একে একে গুণে গুণে তিনখানা নোট দিতে দিতে বল্‌লেন—এই নাও ঠাকুর, তোমার পায়ের ধুলোর দক্ষিণা। এই তোমাদের পথ-খরচ। আর তোমার দিদিকে বোলো, বদ্দিনাথ আমার কাছে যা মাইনে পেতো তার অর্দ্ধেক আমি তোমার দিদিকে মাসে মাসে পাঠিয়ে দিতে থাক্‌বো। তোমাদের বাড়ীর ঠিকানাটা কি বলো তো, লিখে রাখি।

রামযাদু অপ্রত্যাশিত ভাবে তিন দশে ত্রিশ টাকা পেয়ে পরম উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। তার চেয়ে সকল রকমে বড়ো কিরণ-বাবুকে অসঙ্কোচে পায়ের ধুলো দিয়ে ঠকিয়ে সে চলে' এলো। পথ-খরচের টাকা পাওয়া ও ভবিষ্যতে তার পড়ার সাহায্য ও দিদির মাসহারা পাবার বন্দোবস্তের কোনো খবরই সে তার দিদি বা মাকে জানানো আবশ্যক মনে কর্‌লে না। সে বাড়ীতে ফিরে গিয়েই পোষ্ট অফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে নিজের নামে একটা হিসাব খুল্‌লে।

(ক্রমশঃ)

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সাইকেল-কস্‌রত—

আমেরিকাতে ফুটবল খেলোয়াড়দের এক অভিনব প্রণালীতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ফুটবল খেলা কেবল কায়দার উপর চলে না, ইহাতে প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়কে কায়দাতে ধাক্কা দিবার দরকার থাকিলেও তাহাতে শরীরের তাগৎ আবশ্যক হয়। খেলোয়াড়দের এক একটি মোটর সাইকেলের সামনের চাকাতে কাঁধ লাগাইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসান হয়। তার পর মোটর সাইকেল আস্তে আস্তে জোর দিয়া চালানো হয়। খেলোয়াড় সাইকেল পিছু দিকে হটাইয়া দিবার চেষ্টা করে। অবশ্য খেলোয়াড় পরাস্ত হয়—কিন্তু এই রূপ কসরতে ছাতির জোর খুব বাড়ে এবং খেলোয়াড়ের দমও বৃদ্ধি পায়। ছবিতে দেখুন—একদল খেলোয়াড় সাইকেল-কসরত কেমন করিয়া করিতেছে।

সাইকেল-কস্‌রত

অশ্ব মুষ্টিযোদ্ধা—

আমেরিকার একজন বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা একটি

ঘোড়াকে মুষ্টিযুদ্ধের দস্তানা পরাইয়া মুষ্টিযুদ্ধ করিতে শিখাইয়াছে। ঘোড়াটি এখন প্রায় মানুষের মতই দুই পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মুষ্টিযুদ্ধ করিতে পারে। কালে, এই অশ্ব বোধ হয় অশ্ব-জগতের শ্রেষ্ঠ মুষ্টি-যোদ্ধা হইবে।

অশ্ব-মুষ্টিযোদ্ধা

প্রথম ব্রহ্মদেশীয়া আইন-ব্যবসায়িনী মহিলা --

সকল দেশেই নারীদের ভিতর জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নারী আর কোনো কাজেই পুরুষের পিছনে পড়িয়া থাকিতে চায় না। ব্রহ্ম-দেশীয়া নারীরাও ইহাতে যোগ দিয়াছে। মা প্য হ'মি—ব্রহ্মদেশের নারীদের মধ্যে প্রথম আইন-ব্যবসায়িনী সম্প্রতি আরো অনেক ছাত্রী আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।
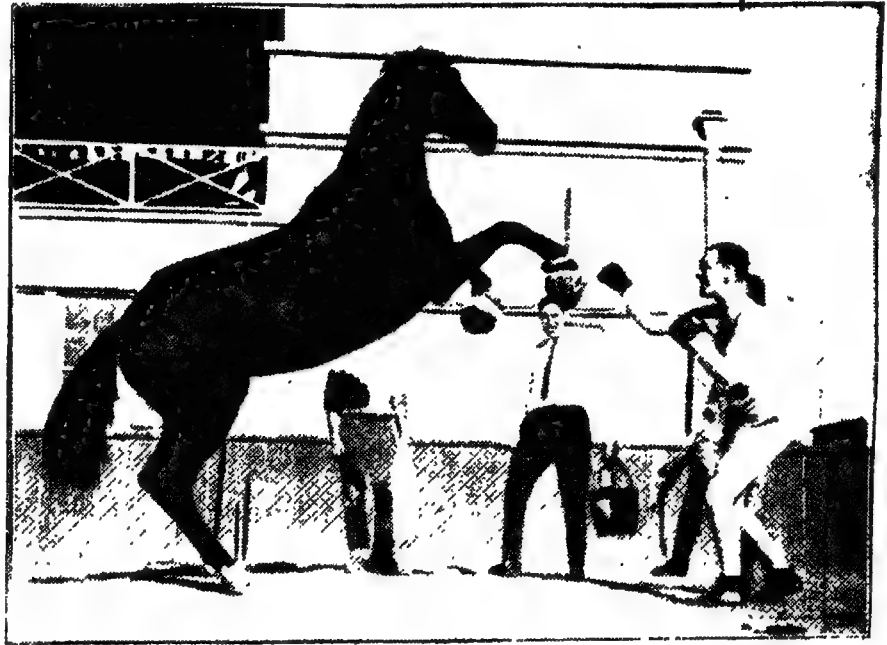
প্রথম ব্রহ্মদেশীয়া আইন-ব্যবসায়িনী মহিলা

বালক বিমানবীর—

ফার্মান্ পার্কার বয়স ১৪ বৎসর। এই বালক এই

বালক বিমান-বীর

বয়সেই এরোপ্লেন চালনায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছে। বিমান-চালনার অধিকার লাভ করিতে হইলে, পরীক্ষায় পাস করিয়া অনুমতি-পত্র লইতে হয়। এই বালক পরীক্ষায় সসম্মানে পাশ করিয়া বিমান-চালকের লাইসেন্স পাইয়াছে। এই মার্কিণ বালক প্রথমবার ইণ্ডিয়ানাপলিস হইতে ওয়াশিংটন পর্য্যন্ত এরোপ্লেন চালায়।

সর্ব্বকনিষ্ঠ এরোপ্লেন-চালক

পাকা ছেলে

সর্ব্বকনিষ্ঠ এরোপ্লেন-চালক—

ফ্রাঙ্ক রিপিন্‌গিল্‌ নামক একজন ১৩ বৎসর বয়স্ক আমেরিকান ছাত্র জগতের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ বিমান-চালক। এই চালক নির্ভয়ে তাহার ছোট এরোপ্লেন লইয়া আকাশে ইচ্ছামত উড়িয়া বেড়ায়।

পাকা-ছেলে—

পাশের ঘরে ছোট ছেলে তাহার গাড়ীতে বসিয়া আছে, এমন সময় অন্য ঘর হইতে তাহার বাপ মা দৌড়িয়া আসিল—খুব জোরে কে শীস দিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য। বাপ মা আসিয়া দেখিল—তাহাদের ৭মাসবয়স্ক পাকা ছেলে গাড়ীতে বসিয়া মনের আনন্দে শীস দিতেছে। শীসের শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন কোন বয়স্ক লোক শীস দিতেছে। এই শিশু শীস দিয়া নিজেকে নিজেই ঘুম পাড়ায়।

নারী সাঁতারী

নারী-সাঁতারী—

সম্প্রতি একজন নারী ৫৮ ঘণ্টাতে ১৫০ মাইল সাঁতার দিয়াছেন। এই মহিলার নাম মিসেস লটি মুর স্যামেল্। ইনি হাড্সননদীতে অ্যালবানি হইতে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত (১৫০ মাইল) সাঁতার দিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কেহ একটানা ৫৮ ঘণ্টাতে এত দূর সাঁতার দিয়াছে বলিয়া জানা নাই। সাঁতারের ঠিক পরেই ভদ্র মহিলার (পাশে তাঁহার সন্তানেরা) ছবি তোলা হয়। তাঁহার মুখে ক্লান্তির চিহ্ন মাত্র নাই। স্বাধীন দেশের নারী—ইঁহাদের কথাই আলাদা।

সাইকেল-ফুটবল

সাইকেল-ফুটবল—

সম্প্রতি বেল্‌জিয়ামে সাইকেল চড়িয়া ফুটবল খেলার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথম ম্যাচ যেদিন খেলা হয়—হাজার হাজার দর্শক এই খেলা দেখিয়া প্রচুর আনন্দলাভ করে। ছবি দেখিলে এই অভিনব ফুটবল খেলার সামান্য পরিচয় পাইবেন। আমাদের দেশেও ইহার আগমন হইতে বেশী সময় লাগিবে বলিয়া মনে হয় না।

সাঁতার-না জানা ব্যক্তির সাঁতার-পোষাক—

সাঁতার যাহারা কোনো রকমেই শিখিতে পারে না, তাহাদের উপযোগী এক প্রকার পোষাক আবিষ্কার হইয়াছে। এই পোষাক পরিয়া জলে নামিলে সাঁতারীর ডুবিয়া যাইবার কোনো আশঙ্কা নাই। সাঁতার-পোষাক এমন দ্রব্যের তৈয়ারী, যাহা কোনো মতেই জলে ডুবে না। এই পোষাকে পাম্প করিয়া হাওয়া ভরিবার কোনো দরকার হয় না, নিজে হইতেই ভাসে। খুব ছোট ছেলেও এই সাঁতার-পোষাক পরিয়া গভীর জলে ভাসিয়া থাকিতে পারে। ছবিতে দেখুন—কয়েকজন লোক সাঁতার না জানা সত্বেও কেমন জলে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।
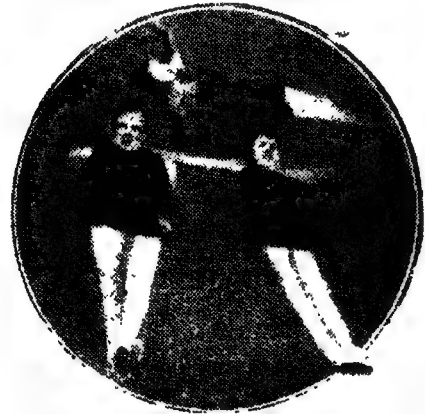
সাঁতার-না-জানা ব্যক্তির সাঁতার-পোষাক

হাউডিনি—

কিছুকাল পূর্ব্বে হাউডিনির মৃত্যু হইয়াছে। আমেরিকা এবং ইয়োরোপে হাউডিনিকে লোকে "The Handcuff-King" বলিয়া জানিত। হাউডিনির ম্যাজিক দেখাইবার ক্ষমতা ছিল অত্যাশ্চর্য্য। মনে হইত—তিনি বুঝি সত্যই একজন যাদুকর, মন্ত্রবলে যাহা ইচ্ছা,—সম্ভবকে অসম্ভব এবং অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। হাউডিনির কতকগুলি আশ্চর্য্য ম্যাজিকের বর্ণনা এই স্থানে করা হইল। ম্যাজিক

হাউডিনি (পাঠাগারে)

দেখাইবার ষ্টেজের উপর একটি হাতী আনিয়া দাঁড় করান হইল, তার পর মুহূর্ত্তে সেই বিরাট হাতী শূন্যে মিলাইয়া গেল। আবার খানিক পরে হয় ত দেখা গেল—হাতী ঠিক যেখানে ছিল, সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

৬টি ছুঁচের প্যাকেট, প্যাকেট-বাঁধা অবস্থায় তিনি গিলিয়া ফেলিলেন। তার পর একটা সূতার গুলিও মুখে ভরিয়া দিলেন। মিনিট দুই পরে দর্শকদের একজনকে ডাকিয়া বলিলেন, সূতার একটা খুঁট ধরিয়া মুখ হইতে টানিয়া বাহির করিতে। সূতা টানিবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল যে, প্রত্যেকটি ছুঁচ সূতাতে গাঁথা হইয়া বাহিরে আসিতেছে। সমস্ত ছুঁচগুলি সূতাতে গাঁথা অবস্থাতে মুখের বাহিরে আসিবার পর, হাউডিনি আবার সেইগুলি মুখে ভরিয়া দিলেন, এবং পর মুহূর্ত্তেই ছুঁচের সবগুলি প্যাকেট এবং সূতার গুলি মুখ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। কেমন করিয়া যে কি হইল, তাহা কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না।

একবার একজন লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে যে কেমন করিয়া তিনি তাঁহার আশ্চর্য্য ম্যাজিক করেন। হাউডিনি বলেন, "আমি যাহা করি, তাহা সাধারণ পদার্থ এবং জড়বিজ্ঞানের সাহায্য লইয়া করি। ইহাতে অসাধারণ কিছুই নাই। আমার কোনো প্রবাব মন্ত্রবল নাই। আমি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে এমন অনেক কিছু করিতে পারি, যাহাতে সাধারণ লোকে আমাকে অন্তর্দর্শী বলিয়া ভ্রম করে।"

হাউডিনি (হস্ত-শৃঙ্খল-মোচন)

হাউডিনির মত নানা বিদ্যায় পণ্ডিত লোক বিরল। তিনি বাজীকরের বিদ্যার চরম দেখাইয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের বাজীকরদের বিষয় কেহ বিশেষ

করিয়া ভাবেন না। আমাদের দেশেও এমন অনেক বাজীকর ছিল এবং আছে, যাহারা নানা বিদ্যায় পণ্ডিত না হইলেও বাজীকর হিসাবে খুব উচ্চ স্থান পায়।

হাতকড়া খুলিয়া ফেলিবার ক্ষমতা ছিল তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য। একবার তাঁহাকে হাতে পায়ে হাতকড়া দিয়া বাঁধা হয়। তার পর একটি বস্তায় ভরিয়া বস্তাকে দড়ি দিয়া ভাল করিয়া বাঁধা হইল। তার পর হাউডিনিকে মাথা মাটির দিকে করিয়া একটি জলপূর্ণ লম্বা পিপার মধ্যে ভরিয়া

হাউডিনি (নিম্নদিকে লম্বমান)

দেওয়া হইল, এবং পিপার উপরের ঢাকনি শক্ত করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এই সমস্ত হইবার পর পিপাকে একটি পরদা দিয়া আবৃত করিয়া দিয়াই, এক মিনিট পরে পরদা খুলিয়া দেওয়া হইলে দেখা গেল, আপাদ-মস্তক জলসিক্ত অবস্থায়—হাতে হাতকড়ি লইয়া তিনি হাসিমুখে পিপার বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। পরদা দিয়া যখন পিপা ঢাকা দেওয়া হয়, তখন কোনো লোক সেখানে ছিল না, এবং পরদা সরাইবার পরও কোনো লোক ছিল না। হাতকড়ি গুলি সব নতুন, একজন দর্শক বাজার হইতে সদ্য সদ্য কিনিয়া আনেন। এই প্রকার অদ্ভুত দৃশ্য কয়জন বাজীকর দেখাইতে পারেন জানি না।

হাউডিনিকে অনেকে অনেক রকম কঠিন হাতকড়া পরাইয়া খুলিতে বলিয়াছে—তিনি তাহা মুহূর্ত্তে খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিজের কোনো গোপন কলকব্জাওয়ালা হাতকড়ি ছিল না। হাতকড়া দর্শকদের কেহ আনিত। হাউডিনি কেবলমাত্র বাজীকর ছিলেন না। তিনি পাকা খেলোয়াড়, বৈজ্ঞানিক, ব্যবসায়ী এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি যে গ্রন্থাগার রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য কম করিয়া ধরিলেও প্রায় ১০ লক্ষ টাকা হইবে।

ম্যাজিক দেখাইয়া হাউডিনি যে পরিমাণ টাকা রোজগার করেন, ইচ্ছা করিলে তিনি তাহার একশত গুণ অধিক টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। কিন্তু ম্যাজিক দেখাইয়া অর্থ উপার্জ্জন করা অপেক্ষা তিনি নানাবিধ পুস্তক পাঠে অধিকতর সময় কাটাইতেন। তিনি পৃথিবীর ছয়টি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। যে ছয়টি ভাষা জানিতেন, সেই ছয়টি ভাষার পণ্ডিতদের লেখা সকল পুস্তক তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। হাউডিনির নিজের লেখা বই আছে। তিনি নানা দেশ ভ্রমণ করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণাও তিনি অনেক করিয়াছেন।

পা-ঘড়ি—

হাত-ঘড়ির ব্যবহার সকলেরই জানা আছে, কিন্তু

পা-ঘড়ি

পা-ঘড়ির কথা বোধ হয় অনেকেই শোনেন নাই। একজন বিখ্যাত বায়স্কোপ অভিনেত্রী সম্প্রতি তাহার জুতার বগলসে

একটি চমৎকার ছোট সুইস্ ঘড়ি লাগাইয়া এক নাচে যোগদান করে। ঘড়িটি জুতার বগলসের সঙ্গেই তৈরী করা হয়। নাচিবার সময় নাচের তাল ঠিক রাখিবার পক্ষে এই ঘড়ি না কি বহু সাহায্য করিয়া থাকে। নাচিবার সময় কেহ যদি পা মাড়াইয়া দ্যায়, তবে এই ঘড়ির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইবে বলিয়া মনে হয়।

নষ্টোদ্ধার—

১৯১১ খৃঃ অব্দে মেরিডা নামক জাহাজ অনেক সোনা লইয়া ডুবিয়া যায়। এই সোনাকে সমুদ্রতল হইতে উদ্ধার করিবার চেষ্টা হইতেছে। সমুদ্রের উপর জাহাজ হইতে ডুবুরি নামাইয়া সমুদ্রতলে জাহাজের সোনা রাখিবার ঘরের দেওয়াল কাটিবার চেষ্টা চলিতেছে। এই দেওয়াল কাটা হইলে পর ঘরের ভিতরকার সোনার সিন্দুক তারের দড়িতে বাঁধিয়া উপরে তোলা হইবে। সোনা রাখিবার ঘরের দেওয়াল যদি কাটিতে না পারা যায়, তবে ডিনামাইট দ্বারা লোহার দেওয়াল উড়াইয়া দেওয়া হইবে।

নষ্টোদ্ধার

সমুদ্রতল হইতে সোনা উদ্ধার করা সম্পর্কে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক আলোচনা এবং গবেষণা এবং আবিষ্কারও হইয়াছে। একজন বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন যে, সমুদ্রজলে কোটী কোটী মণ সোনা আছে। এই সোনা উদ্ধার করা সম্ভব, কিন্তু তাহার প্রথম খরচা এত বেশী যে, কেহ সাহস করিয়া উহাতে নামিতে পারে না। এই বৈজ্ঞানিকের হিসাবে দেখা যায় যে, প্রতি ৫০০ টন জলে ৩০৲ টাকা আন্দাজ মূল্যের সোনা আছে।
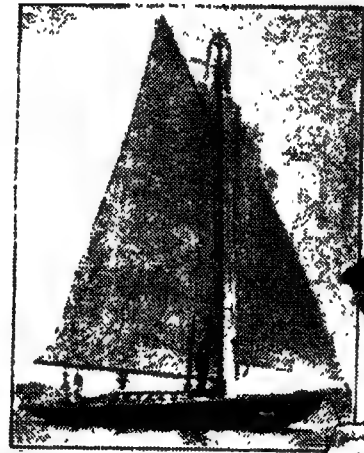
সমুদ্রতল হইতে লুপ্ত রত্নোদ্ধার

সমুদ্রের জলে কেবল যে সোনা রূপা এবং নানা প্রকার লবণ ইত্যাদি আছে, তাহা নয়, কত কোটী প্রকারের জীব জানোয়ার যে সমুদ্রে বাস করে তাহার সংখ্যা নাই। ডাঙ্গার তুলনায় সমুদ্রের বাসিন্দাদের সংখ্যা অনেকগুণ বেশী।

সমুদ্রতলে কত জাহাজের এবং ডাঙ্গার মানুষের সমাধি যে হইয়াছে, তাহারও সংখ্যা নাই।

সমুদ্রতলে নামিবার জন্য কত রকমের কল কব্জা, ডুবুরি পোষাক ইত্যাদি হইয়াছে। এখন এক প্রকার ডুবুরি পোষাক হইয়াছে, যাহা পরিয়া ডুবুরি সমুদ্রের মধ্যে ৬০০ ফিট নামিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে ইহা কল্পনাতীত ছিল।

সমুদ্রের জলের ভিতর ছবি তুলিবার ক্যামেরারও আবিষ্কার হইয়াছে। পূর্ব্বে সমুদ্রের ভিতরের ছবি অনেকটা কল্পনার সাহায্যে আঁকিতে হইয়াছে; এখন ক্যামেরাতে ফটো তুলিতে পারা যায়। ইহাতে সমুদ্রের ভিতরের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

এমন কলও আছে যাহার সাহায্যে সমুদ্রের উপর হইতেই বিশেষ বিশেষ স্থানের গভীরতা কত তাহা স্থির করিতে পারা যায়। দড়ি ফেলিয়া জল মাপিবার দরকার হয় না।
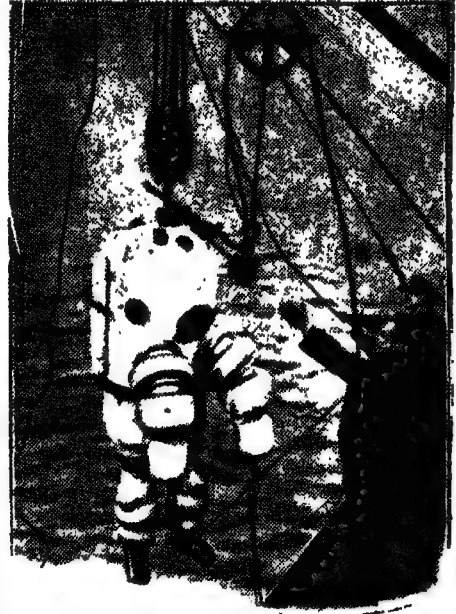
ডুবুরি পোষাক

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২০

সুকুমারী এবং নরেশ কলিকাতা যাইবার কিছুকাল পরে এক দিন সন্ধ্যার পর সরমা রাধামাধবের মন্দিরে কথকতা শুনিতে গিয়াছিল। গৃহে রমাপদ তাহার পুত্রকে লইয়া ছিল। স্বামী-পুত্রকে গৃহে ফেলিয়া একা প্রতিবেশীদের সহিত কথকতা শুনিতে যাওয়ায় সরমা প্রথমে কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু এরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন সরমার পক্ষে কথকতা শোনা সম্ভবপর নহে বলিয়া রমাপদ জোর করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

পৌষ পূর্ণিমা। প্রখর শীতের আক্রমণ হইতে যথাসম্ভব আত্মরক্ষার জন্য উর্দ্ধে ঘন পুরু সামিয়ানা এবং চতুর্দ্দিকে কানাত দিয়া পরিবেষ্টিত হইয়া শ্রোতৃবর্গ একান্তচিত্তে কথকতা শুনিতেছিল। ছিন্ন এবং অনাবৃত অংশ দিয়া যে-টুকু পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্রবেশ করিতেছিল তাহার চতুগুণ প্রবেশ করিতেছিল শীত-রাত্রের কন্‌কনে হিম। কিন্তু সে দিকে কাহারো দৃষ্টি ছিল না; আত্মবিস্মৃত হইয়া সকলে শুনিতেছিল জড়-ভরতের করুণ কাহিনী। মাতৃ-স্নেহের প্রবলতার কথা বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে কথক তখন বলিতেছিলেন জাম্ববতীর উপাখ্যান।

তিনি বলিতেছিলেন, 'সন্তান-স্নেহ প্রবলতায় অন্য সমস্ত শক্তিকে অতিক্রম করে—এমন কি পতি-প্রেমকেও। আমাদের এই পুণ্যাশ্রিত ভারতবর্ষে আর্য্যজাতির মধ্যে স্বামী-ভক্তির মহিমান্বিত ইতিহাসের বিরুদ্ধে কোনো কথাই বলবার নেই; কিন্তু পৃথিবীর ভিতর এমন স্থান এখনও দুর্লভ নয় যেখানে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ভক্তি অথবা ভালবাসা আমাদের দেশের চেয়ে অনেক দুর্ব্বল; সন্তান-স্নেহ কিন্তু সে-সকল দেশেও কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নয়—ঠিক আমাদের দেশেরই মত প্রবল। স্বামী-ভক্তির মধ্যে

ংস্কারের কিছু যোগ আছে—সন্তান-স্নেহের উৎপত্তি কিন্তু একেবারে জননীর রক্ত-মাংসের মধ্যে নিহিত; কোনো ংস্কার অথবা যুক্তি-বিবেচনার সঙ্গে তার যোগ নেই—তার যোগ নাড়ীর মধ্যে। একান্ত সহজ বলেই তা অত্যন্ত প্রবল।'

সরমার মনে পড়িল কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন রমাপদ তাহার সহিত এইরকম একটা প্রসঙ্গের সামান্যভাবে আলোচনা করিয়াছিল। নিরতিশয় কৌতূহলে সে তাহার ন্স্তাবিষ্ট চিত্তকে একাগ্র করিয়া লইয়া গভীর মনোযোগের হিত শুনিতে লাগিল।

কথক বলিতেছিলেন, 'এ কথার প্রমাণের জন্ম অন্য দেশে যাবার প্রয়োজন নেই, আমাদের ভারতবর্ষেই স্বামীভক্তি এবং পুত্রস্নেহের মধ্যে শক্তি-পরীক্ষা অনেকবার হয়ে গিয়েছে। উপস্থিত একটা ঘটনার প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়ে নিজগৃহে একবার এ বিষয়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। শয়ন-কক্ষে একটি পালঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করে রয়েছেন এবং অপর একটি পালঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ পত্নী জাম্ববতী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাঁর নবজাত পুত্র শাম্বকে স্তন্যপান করাচ্ছেন, এমন সময়ে শ্রীকৃষ্ণ পদসেবার জন্য জাম্ববতীকে আহ্বান করলেন। স্বামী সমীপে যাবার জন্য জাম্ববতী বারম্বার চেষ্টা করলেন, কিন্তু শাম্ব কিছুতেই ছাড়লে না; অধীর হয়ে রোদন করতে লাগল। তখনো তার ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়নি। তখন জাম্ববতী স্বামীকে বললেন যে পুত্রকে শান্ত করে অবিলম্বেই তিনি স্বামীর পদ-সেবায় নিযুক্ত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করলেন না, বললেন, "ক্ষুধিত পুত্রকে ছেড়েও তোমাকে এখনি আসতে হবে। মনে রেখো তোমার সঙ্গে আমার সর্ত্ত আছে যে আমার কথার অবাধ্য হলেই আমি তোমাকে পরিত্যাগ করব।" স্বামীর এই অসঙ্গত উপরোধে ব্যথিত হয়ে জাম্ববতী পুত্রকে শান্ত করে স্বামীর নিকট যাবার জন্য আর একবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ক্ষুৎপীড়িত শাম্ব স্তন্যপানে বঞ্চিত হয়ে আরও অধীর হয়ে কাতর স্বরে রোদন করতে লাগল। জাম্ববতী একমুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে পুনরায় পুত্রের পার্শ্বে শয়ন করে পুত্রকে স্তন্যপান করাতে লাগলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "আমি তাহলে তোমাকে পরিত্যাগ করে চললাম জাম্ববতী!" জাম্ববতীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; ঈষৎ দৃপ্তস্বরে তিনি বললেন, "আমি কিন্তু প্রভু আপনার মত অন্যায় ভাবে ক্ষুধিত পুত্রকে পরিত্যাগ করে যেতে পারলাম না! কিন্তু যদি আপনার প্রতি আমার ভক্তি অচলা থাকে—"

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে সরমা অপেক্ষা করিতেছিল এই কঠিন সমস্যার জাম্ববতী কি সমাধান করেন তাহা শুনিবার জন্য। সমাধানের স্বপক্ষে জাম্ববতীর যাহা কিছু যুক্তি তর্ক অথবা বক্তব্য ছিল তৎপ্রতি আর কর্ণপাত না করিয়া সে কথকতা হইতে তাহার একাগ্র মনোযোগ নিমেষের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, 'ভুল করলে জাম্ববতী! ছেলের জন্য একেবারে স্বামীত্যাগ! ভুল করলে! অন্যায় করলে!' কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাহার নিজ পুত্রের মুখ মনে পড়িল তখন সে মনে মনে আপনাকে প্রশ্ন করিল, 'আচ্ছা, তুমি যদি এইরকম সঙ্কটে পড়তে তা হলে কি করতে?' উত্তর নিরূপণের দুরূহতার মধ্যে পড়িয়া প্রশ্নটা সহসা বিকটতর মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইয়া দেখা দিল। 'আচ্ছা, হঠাৎ যদি এইরকম একটা অবস্থা উপস্থিত হয়: যম যদি এসে বলে তোমার স্বামী এবং পুত্রের মধ্যে একজনকে নিশ্চয়ই ছাড়তে হবে, তাহলে কা'কে রেখে কা'কে ছাড়?' এই অসঙ্গত এবং মর্ম্মন্তুদ প্রশ্নের চিন্তা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সরমা অধীরভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু না ভাবিতে চেষ্টা করিবার সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যেই সে মনে মনে অন্ততঃ দশবার প্রশ্নটি ভাবিয়া লইল। এমন কি, অবশেষে তাহার অবাধ্য মন উত্তর নিরূপণেও নিযুক্ত হইল। পুত্রকে রাখিয়া স্বামীকে ত্যাগ করিবে? সরমা শিহরিয়া উঠিল! অসম্ভব! অসম্ভব! তা হয় না! তবে কি স্বামীকে রাখিয়া পুত্রকে ত্যাগ করিবে? পুত্রের মুখ স্মরণ করিয়া সরমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল! তা'ও হয় না! তা'ও হয় না! সে মনে মনে যমকে কাতরভাবে বলিল, "প্রভু, এক কাজ কর না! দুজনকে রেখে আমাকে নেও না!" যম হাসিয়া বলিল, "সময় হলে তোমাকেও নোব। কিন্তু উপস্থিত ত সে কথা নয়!" দুশ্ছেদ্য চিন্তার জালে জড়িত হইয়া সরমা মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

কথকতার অবশিষ্ট অংশ সরমা অন্যমনস্ক হইয়া

কাটাইল। পথে আসিতে আসিতে তাহাকে চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া তাহার এক সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "অত একমনে কি ভাবছ ভাই? ঘিণ্টুর কথা, না ঘিণ্টুর বাপের কথা?"

প্রতিবেশিনীর প্রশ্নে মৃদু হাস্য করিয়া সরমা বলিল, "না, আমি ভাবছি জাম্ববতীর কথা। কি করে সে ছেলের জন্যে স্বামীকে ছাড়লে? আশ্চর্য্য!"

প্রতিবেশিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, "আশ্চর্য্য কি রকম? স্বামী ও-রকম অন্যায় আব্দার করলে স্বামীকে না ছেড়ে নাড়ী-ছেঁড়া ধন যে ছেলে—তাকে ছাড়তে হবে না কি?" তাহার পর মাতৃত্ব-মহিমার জয়ে গর্ব্ব অনুভব করিয়া বলিল, "কিন্তু যেমন জাম্ববতী জাঁক করে বলেছিল তেমনি অবশেষে শ্রীকৃষ্ণকে নিজে এসে মিলতে হোল ত!"

সকৌতূহলে সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "শ্রীকৃষ্ণ শেষকালে জাম্ববতীর সঙ্গে মিলেছিলেন বুঝি?"

প্রতিবেশিনী পুনরায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। "মেলেন নি ত' কি করেছিলেন? তবে এতক্ষণ শুনলে কি? সে সময়ে ঘুমচ্ছিলে তুমি?"

সরমা কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

গৃহে পৌঁছিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিয়া সরমা ডাকিল, "বিশ্বনাথ!"

বিশুয়া দ্বারের নিকটেই সর্ব্বাঙ্গ কম্বলে আবৃত করিয়া শুইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া সরমা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ঘিণ্টু ঘুমিয়েছে না কি?"

শয্যার উপরে লেপের মধ্যে ঘিণ্টু তখন পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। রমাপদ বলিল, "হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে।"

"দুধ খেয়েছিল?"

"খেয়েছিল।"

লেপের একাংশ ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া একবার পুত্রের মুখ দেখিয়া লইয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁদে নি ত' আমার জন্যে?"

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া রমাপদ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "তোমার জন্যে আর একটি প্রাণী কি করেছিল সে বিষয়ে কি একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবে না সরমা?"

রমাপদর প্রশ্নে হর্ষোদ্ভাসিত মুখে সরমা বলিল, "সে বিষয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই।"

"কেন? দরকার নেই কেন?"

"সে ত আমার নিজের মন দিয়েই বুঝতে পারছিলাম" বলিয়া সরমা হাসিয়া ফেলিল।

কপট গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া মাথা নাড়িয়া রমা[illegible] বলিল, "অনেক কম বুঝছিলে। ঠিক যদি বুঝতে তা হ[illegible] ঘিণ্টুর চেয়ে আমার জন্যেই বেশী ব্যস্ত হয়ে বাড়ী ফিরতে[illegible]

সরমা সহাস্যমুখে বলিল, "তা হলে কি তুমি কেঁদেছি[illegible] কি না বাড়ী এসে সেই কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করতাম[illegible] তাহার পর সহসা গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তু[illegible] যখন বাড়ী ফেরো তখন কার জন্যে বেশী ব্যস্ত হয়ে ফেরে[illegible] ঘিণ্টুর জন্যে, না আমার জন্যে? বেশ ঠিক করে বল ত[illegible]

রমাপদ বলিল, "আমার কথাটা না হয় কাল যখন ব[illegible] ফিরব তখন জিজ্ঞাসা ক'রো—ঠিক করে বলব; কিন্তু [illegible] ত' আজ টাট্‌কা এখনি ফিরেছ—তুমি কার জন্যে বেশী [illegible] হয়ে ফিরছিলে শুনি?"

কিছু পূর্ব্বে কথকতা শুনিতে শুনিতে যমের স[illegible] সরমার যে কাল্পনিক কথোপকথন হইয়াছিল তাহা [illegible] পড়িয়া গেল; সে বলিল, "দুজনেরই জন্যে সমান ব্যস্ত হ[illegible] তাহার পর এ প্রসঙ্গ শেষ করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে কোনো কথা বলিবার অবসর না দিয়া বলিল, "যাক্ গে, বড় গোলমেলে কথা! আজ কথকতাতেই ঐ ধরণের উঠেছিল—ভাল করে কিন্তু কিছুই বোঝা যায় না!"

"আমার কথাটা কিন্তু আমি বেশ ভাল করেই [illegible] পারি।" বলিয়া রমাপদ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

কোনো উত্তর না দিয়া একান্ত তৃপ্তির সহিত স্বামীর প্রণয়োদ্ভাসিত মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহি[illegible]

রমাপদ হাসিয়া বলিল, "কি দেখছ অমন করে?"

ঈষৎ লজ্জিত হইয়া সরমা বলিল, "কিচ্ছু না।"

"কিচ্ছু না? এই নাক-চোখ-কাণওয়ালা এত বড় মু[illegible] কিচ্ছু না?" বলিয়া রমাপদ গভীর বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ ক[illegible]

"বাপ্‌রে! অমন মোটা মোটা দুজোড়া গোঁফ[illegible] মুখকে কি কিচ্ছু না বলতে পারি!" বলিয়া কৌতুকে হাসিয়া ফেলিয়া সরমা প্রস্থান করিল। যাইবার সময়ে [illegible] চাহিয়া বলিয়া গেল, "এস, খাবার দিচ্ছি, খাবে এস।"

স্ত্রীর পরিহাস-বচনে সপুলক কৌতুকে রমাপদর [illegible] ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

([illegible]

সাময়িকী

এবার 'ভারতবর্ষের' নিচোলে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তাঁহার শোচনীয় দেহাবসানের কথা এখনও সকলের স্মৃতিপটে বিরাজ করিতেছে;—তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, মহা-ত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ। গত ২৩শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে দিল্লীতে তিনি তাঁহার নিজ গৃহে আবদুল রসিদ নামক জনৈক মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছেন। তাঁহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাঁহার ভৃত্য ধরম সিং গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি নিউমোনিয়া রোগে ভুগিতেছিলেন। গত ২৩শে ডিসেম্বর বেলা পৌনে চারিটার সময় আবদুল রসিদ স্বামীজীর গৃহে আসে। সে স্বামীজীর সহিত মুসলমান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চাহে। স্বামীজী বলেন যে তিনি অসুস্থ, অন্য সময় কথা বলিবেন। অতঃপর আবদুল রসিদ জলপান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। স্বামীজীর ভৃত্য ধরম সিং তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে জলপান করাইবার জন্য লইয়া যায়। সে জলপান শেষ করিয়াই দৌড়িয়া স্বামীজীর ঘরে আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া চারি পাঁচটী গুলি ছোড়ে। তাহাতে স্বামীজী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভৃত্য ধরম সিং পার্শ্বের গৃহ হইতে ছুটিয়া আসিয়া হত্যাকারীকে ধরিয়া ফেলে। তখন আবদুল রসিদ ধরম সিংহের উরুদেশে গুলি করে। ইতিমধ্যে অন্যান্য লোকজন ও পুলিশ আসিয়া পড়ায় হত্যাকারী ধৃত হয়। আবদুল রসিদ বলিয়াছে, "স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মুসলমান ধর্ম্মের শত্রু,—কাফের; সেইজন্য আমি তাহাকে বধ করিয়াছি। আমার দুঃখ নাই। আমি এই পুণ্যকার্য্যের জন্য স্বর্গে যাইব। এই হত্যার জন্য আর কেহ দায়ী নহে।" অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইয়াছে, আবদুল রসিদ দিল্লী ফৈজ-বাজারের প্রেসিডেন্ট। নয় বৎসর পূর্ব্বে সে হেজারৎ করিতে কাবুল গিয়াছিল, সেখানে সে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শুধু হিন্দুর নহেন;—তিনি ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমানের। তাঁহার মৃত্যুতে শুধু হিন্দুর ক্ষতি নয়,—জাতীয়তার উপরে আঘাত পড়িয়াছে। তিনি যদি হিন্দুকে শক্তিমান করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে মুসলমানদেরও শক্তিমান হইবার কথা, কারণ হিন্দু-মুসলমান ভারতের জাতীয়তার দুই প্রধান অঙ্গ। যে হত্যাকারী ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্বামী শ্রদ্ধানন্দের প্রাণসংহার করিয়াছে, সে পক্ষান্তরে মুসলমান সমাজেরই শক্তি হরণ করিয়াছে।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ জলন্ধর জেলায় তালবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। তাঁহার পিতা কাশীর পুলিসের ইনস্পেক্টার ছিলেন। স্বামীজী সেখানেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি উকিল হন এবং বহুকাল জলন্ধরে ওকালতি করেন। স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর তিনি আর্য্য-সমাজে প্রবেশ করেন এবং অল্পকাল মধ্যেই আর্য্য সমাজের প্রধান নেতা মনোনীত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে শ্রদ্ধানন্দের চেষ্টায় গুরুকুলের উদ্বোধন হয়। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে যখন ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘোর প্রতিবাদ হয়, তখন তিনি সেই প্রতিবাদে যোগ দেন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদ-কল্পে ইনি দিল্লীতে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। দিল্লীতে জনসাধারণ যখন ঘোর প্রতিবাদ করিতেছিল সেই সময় পুলিসের সহিত তাহাদের হাঙ্গামা হয়। সে সময়ে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অকুতোভয়ে পুলিসের বন্দুকের নিকট বুক পাতিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর পাঞ্জাব হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধীর সহিত অসহযোগ আন্দোলন প্রচারে ব্রতী হন। সে সময় হিন্দু-মুসলমান মিলনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। অতঃপর তিনি কংগ্রেসের সহিত সমস্ত সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া হিন্দু-সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। সংগঠন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে; কিন্তু অন্য ধর্ম্মের লোককে হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্মান্তরিত করিবার রীতি না থাকায় হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। তিনি দেখিলেন যে যদি হিন্দু-সমাজের এই ক্ষয় রোধ করা না যায়, তবে হিন্দু জাতির ধ্বংস অনিবার্য্য।

তখন তিনি শুদ্ধি আন্দোলনের সূত্রপাত করিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে আসগরী বেগম নাম্নী জনৈক বিদুষী মুসলমান মহিলা আসিয়া স্বামীজীর আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই মহিলা শান্তিদেবী বলিয়া পরিচিত। শান্তিদেবীর ধর্ম্মান্তর সম্পর্কে স্বামীজীর বিরুদ্ধে এক মামলা হয়। মামলায় স্বামীজী বে-কসুর খালাস পান। স্বামীজীর দুই পুত্র এবং এক কন্যা। প্রথম পুত্রের নাম হরিশ্চন্দ্র—তিনি রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সেক্রেটারী। বর্ত্তমানে তিনি কোথায় আছেন জানা নাই। দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত ইন্দ্রনাথ দিল্লী হইতে প্রকাশিত দৈনিক 'অর্জ্জুন' পত্রিকার সম্পাদক। কন্যাটি জীবিত নাই।

গত ১৪ই ডিসেম্বর 'বেনারস হিন্দু-সোসাইটী'র অনুষ্ঠিত ৪৫ মাইল নিখিল ভারত-ভ্রমণ টুর্ণামেণ্টে বাঙ্গালীর গৌরব ভ্রমণপটু শ্রীমান্ বাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যায় মির্জ্জাপুর হইতে বেনারস পর্য্যন্ত ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হিন্দুর গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। ইহাতে ৩৮জন প্রতি-যোগী ছিল, তন্মধ্যে বোম্বাইয়ের হাউলেট সাহেব উপর্য্যুপরি দুই বৎসর প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এবার তাঁহাকে পরাজিত করিতে না পারিলে ভারতবর্ষের ভিতর 'বিজয়ীর সম্মান' (Champion) তিনিই পাইবেন, ইহা একরূপ স্থির ছিল। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রদেশের সুদক্ষ ভ্রমণ-বীরেরা, বাঁশরীভূষণ এই প্রতিযোগিতায় নাম দিতেছেন শুনিয়া, ইহাতে এবার যোগ দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে শ্রীমান্ ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে নিখিল-ভারত ৭৮ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় বর্দ্ধমান হইতে বালীগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া দিল্লীর প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী আসাদ আলী ও পৃথিবী-পর্য্যটক ডি, ষ্টেপলটন সাহেবকে পরাজিত করিয়া ২১ ঘণ্টায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুনাম অর্জ্জন করেন। তৎপরে ৩০শে অক্টোবর তারিখে নিখিল-ভারত ৩০ মাইল ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের ভ্রমণকারীদের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা কম সময়ে ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটের মধ্যে আসিয়া ভারতের রেকর্ড করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে জে, এল, স্যাণ্ডেলটন সাহেব এই পথ ৫টা ২২ মিনিটে আসিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ-বীরকে পরাজিত করিয়া শ্রীমান 'ভ্রমণবীর' আখ্যা পাইয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ ভ্রমণকারী এই পথ ৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট ১১৩ সেকেণ্ডে আসিয়াছেন। এবারেও তিনি যুক্ত প্রদেশের শ্রেষ্ঠ প্রথম বীর শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম দাস ও নর্থ

শ্রীমান্ বাঁশরীভূষণ মুখোপাধ্যায়

ষ্টাফোর্ড গোরাদলের বিখ্যাত রিগবী সাহেব ও ই, আই, রেলওয়ে ফেচার প্রভৃতি ভ্রমণ-বীরদিগকে পরাজিত করেন। ১৩ই ডিসেম্বর কাশী-নরেশ হিন্দু প্রতিযোগীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য একটী উদ্যান-ভোজের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, এই ছয় বৎসর প্রতিযোগিতায় একবারও হিন্দু প্রথম স্থান অধিকার করিয়া হিন্দুর মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন নাই। যে হিন্দুরা ধর্ম্মের জন্য ভারতের সর্ব্বত্র পাদচারণা করিয়া যাইতেন, সেই হিন্দুদের বংশধরেরা ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় অপর জাতির নিকট পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, ইহার অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে। যাহা হউক একজন বাঙ্গালী কাশী-

নরেশের আশাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন। এবারেও শ্রীমান্ ৭ ঘণ্টা ৮ মিনিটে এই পথ আসিয়াছেন এবং মাদ্রাজের বিখ্যাত ম্যাকফারলেন, পাটনার হ্যান্লে, বোম্বাইয়ের হাউলেট ও রাণীগঞ্জের বল সাহেবকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিয়াছেন।

বড়দিনের সময় সাহেবেরা আমোদ-আনন্দে কয়েকটী দিন অতিবাহিত করেন, আর ভারতের অধিবাসীগণের মধ্যে সভাসমিতির মরসুম পড়িয়া যায়। যেখানে যত জ্ঞাত অজ্ঞাত সভাসমিতি আছে, এই সময় তাহাদের বার্ষিক উৎসবের আয়োজন হইয়া থাকে। এই সকল সভাসমিতির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কন্‌গ্রেস্; আর যেখানে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হয়, সেখানেই আরও ছ-দশটা সভার বার্ষিকী হইয়া থাকে। এবার কন্‌গ্রেসের বৈঠক বসিয়াছিল আসাম গৌহাটীতে। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আসামে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন পূর্ব্বে আর কখন হয় নাই। প্রকৃতির লীলা-কানন আসামের নৈসর্গিক শোভা অনেককে এবার গৌহাটীতে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার পর, যাঁহারা রাজনীতি-চর্চ্চা করেন, তাঁহারা এবার গৌহাটী কন্‌গ্রেসে কি ভাবে কার্য্য করিবার প্রণালী বিধিবদ্ধ হয়, তাহাই জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। ভারত-বিখ্যাত রাজনীতিক-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় এবার কন্‌গ্রেসের সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধী বহুদিন রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন-বাস করিতেছিলেন; এবার তাঁহার নির্জ্জন-বাস শেষ হইয়াছে; তিনি গৌহাটী কন্‌গ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অতঃপর পূর্ব্বের মত সমস্ত কার্য্যেই যোগদান করিবেন। গৌহাটী কন্‌গ্রেসের কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি মহাশয় অবশ্য নূতন কথা কিছুই বলেন নাই; কিন্তু তিনি কোন প্রকার ঘোরপ্যাচ না দিয়া স্পষ্ট ভাবে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার অভিভাষণের শেষ অংশের মর্ম্ম নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার মহাশয় তাঁহার অভিভাষণের শেষে বলিয়াছেন—'আমি নির্ব্বন্ধ সহকারে সকল নেতাকে, সকল দলের কর্ম্মীকে কংগ্রেসে ও কংগ্রেসের বাহিরে সকলকে এক বৎসরের জন্য মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া একযোগে কাজ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা সকলেই স্বরাজ লাভ করিতে ব্যগ্র। সেই জন্য আমি সকলকেই অনুরোধ করিতেছি—তাঁহারা আমার সহিত একমত হউন, বা নাই হউন, মিলন-কামনার সহিত স্বরাজলাভ কামনার সমন্বয় করিয়া ভারতে ও বিলাতে সরকারকে পরাভূত করা সম্ভবপর কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। স্বরাজ ভাবের জিনিষ, প্রগাঢ় বিশ্বাসসহ ইহাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ, রোষ, স্তুতি ও নিন্দা, এ সকলে যেন আমাদের দেশহিতৈষিতা মন্দীভূত না হয়। আমাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। সেই উন্নতির গতিরোধ হইবে না, কারাদণ্ডে তাহা ভীতিগ্রস্ত হইবে না, অসাফল্যে তাহা অবসাদগ্রস্ত হইবে না।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বড়দিনের ছুটীতে অনেক সভাসমিতি হইয়া গিয়াছে; তাহার সমস্তের পরিচয় দেওয়া দূরে থাক, নাম করিবার স্থানও আমাদের নাই। তবুও আমরা দুই একটীর কথা উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না; ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমরা অপরগুলির কার্য্যকারিতা অস্বীকার করিতেছি। প্রথমেই 'বঙ্গীয় মোস্‌লেম মহিলা-সঙ্ঘে'র নাম উল্লেখ করিতেছি। এই সঙ্ঘের সভানেত্রী হইয়াছিলেন শ্রীযুক্তা নুরন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী সাহিত্য-সরস্বতী। তিনি তাঁর অভিভাষণের এক স্থানে বলিয়াছেন—"আমরা বাঙ্গালী, এ কথা ব'লে আমাদের গৌরবান্বিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়াটা কোন রকমেই আমাদের হীনতা প্রকাশক নয়।" আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন "বাঙ্গালা ত আমাদের মাতৃভাষা।" বাঙ্গালা-ভাষা-বিদ্বেষী মুসলমান ভ্রাতৃগণকে আমরা এই বিদুষী মুসলমান মহিলার কথা কয়টী প্রণিধান করিতে বলি।

আর একটী সভার কথা উল্লেখ করিতে হইতেছে। এটী নিখিল-ভারত কায়স্থ-সম্মেলন। এই সম্মেলনের সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত চিট্‌নীশ মহোদয়। এই সভার এই

মর্ম্মে একটী মন্তব্য গৃহীত হইয়াছে যে, কোন কায়স্থ-রমণী কোন দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক ধর্ষিতা হইলে তাহাকে পতিতা বলিয়া সমাজচ্যুত করা হইবে না; সেই অসহায়া রমণীকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে কতবার বলিয়াছি; বিগত অগ্রহায়ণমাসের 'ভারতবর্ষে' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি-আই-ই মহাশয় 'আতঙ্ক নিগ্রহ' নামক প্রবন্ধে শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ধর্ষিতা রমণীদিগকে সমাজে পতিতা করিবার বিধান শাস্ত্রে নাই। যাহা হউক, মন্তব্য ত গৃহীত হইয়াছে; এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেই হয়। কায়স্থ-সমাজ এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে অন্যান্য সমাজেও এই বিধান গৃহীত হইবে।

এবার বড়দিনের ছুটীতে দিল্লী রাজধানীতে প্রবাসী-বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান হইতে বাঙ্গালী-সাহিত্য-সেবকগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গালা দেশ হইতে অতি অল্প কয়েকজন সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন; ইহা বড়ই লজ্জার কথা। আমাদেরই পরমাত্মীয়গণ কার্য্যোপলক্ষে প্রবাসী; তাঁহারা বৎসরান্তে প্রবাসেরই কোন স্থানে মিলিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনা করিয়া থাকেন এবং সেই উপলক্ষে পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় ও ভাবের আদান-প্রদান করেন। ইহাতে যে বাঙ্গালাদেশবাসী সাহিত্যিকগণের অধিক সংখ্যায় যোগদান সর্ব্বপ্রকারেই বাঞ্ছনীয়, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? কিন্তু, এই প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্য-সম্মেলন যেন আমাদের কাছে নিতান্ত পরই হইয়া আছেন। ইহা কোন প্রকারেই শোভন নহে। বাঙ্গালার এবং প্রবাসের বাঙ্গালীদিগের সম্মেলন যে বাঙ্গালা সাহিত্যের মহোপকার সাধিত করিতে পারে, এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এবার যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে; আগামী বর্ষে যাহাতে অধিক সংখ্যক বঙ্গদেশবাসী সাহিত্যিক এই সম্মেলনে যোগদান করেন, তাহার জন্য প্রবাসী-সম্মেলনের কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে অবহিত হইবার জন্য আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উপর এ ভার দিলে, আমাদের মনে হয়, অনেক বাঙ্গালী-সাহিত্যিক এই সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন।

বিগত ২রা জানুয়ারী কলিকাতা খাদি-প্রতিষ্ঠানের কলাশালার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই কলাশালা কলিকাতার উপকণ্ঠে সোদপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। খাদি-প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্ম্মী, প্রতিষ্ঠানে উৎসর্গীকৃত-জীবন শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের অতুলনীয় অধ্যবসায় ও আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় এই কলাশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহাত্মা-গান্ধী সে দিন এই কলাশালার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে সোদপুরে বহুলোক-সমাগম হইয়াছিল। এই কলাশালা একটী দর্শনীয় স্থান। এখানে খাদি প্রস্তুতের জন্য যে সমস্ত যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহার অনেকগুলিই শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু স্বহস্তে এখানে প্রস্তুত করিয়াছেন, সে সমস্ত বিলাতী যন্ত্র অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে, অথচ এখানে প্রস্তুত হওয়ায় তাহাদের ব্যয় অনেক কম হইয়াছে। বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কি ভাবে খাদি প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা এই কলাশালা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এখানে রঞ্জন-বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমরা ইহার বিভিন্ন যন্ত্রশালা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছি। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের সাধনা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে, এ-দেশে খাদির প্রতিষ্ঠা কেহ রোধ করিতে পারিবেন না।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী-সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "বঙ্গপল্লী"—মূল্য ২৷০

কবি নজরুল ইসলাম প্রণীত কাব্যগ্রন্থ "সর্ব্বহারা"—১৷৵০ আনা

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত নাটক "নর-নারায়ণ"—১৷০

শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "চণ্ডীদাস"—১৲

শ্রীযুক্ত ননীলাল ভট্টাচার্য্য প্রণীত নাটক "দ্রোণাচার্য্য"—১৷০

শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "মিলন-পূর্ণিমা"—২৲

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শ্রদ্ধা তোমারে—গুরুকুলস্বামি! জানি না, কি ব'লে জানাবো আজ,
হত্যা তোমার, কে বলিবে নাথ!—গর্ব্ব, অথবা মোদের লাজ?
তেত্রিশ কোটী দেবতার প্রতি সাগর প্রমাণ শ্রদ্ধাভার
কোটী কোটী প্রাণী কোটী কল্পেও বহিবারে যাহা পারে না আর,
সঞ্চিত হ'য়ে উঠিয়াছে যাহা সে কোন্ আদিম প্রভাত হ'তে,
মনে হয় আজ তুচ্ছ সে কত—মহামানবের জীবন-স্রোতে!
তুমি কি দেবতা?—তুমি কি গো বীর?—বীর কারে বলে নাহি যে জানা!
শুনেছিনু হেথা বীর-সম্ভব পলাশীর পরে হ'য়েছে মানা!

* * * *

দিল্লী-পথের প্রান্তে একদা, হাতিয়ার হাতে বর্ব্বরেরা
এনেছিল যবে নিষ্ঠুরতার প্রেত-বিভীষিকা অনল-ঘেরা
তাদের শাণিত-শস্ত্র-সমুখে—প্রকাশি সে কোন্ অভয় ভাতি
রক্ষা করিতে লক্ষ-জীবন দাঁড়াল' যে জন বক্ষপাতি
বিশ্ব-ত্যাগীর বিজয়-কেতন—গৈরিক—তার উত্তরীয়,
কোন্ কৈলাস-উদাস-করা-সে-শঙ্কর-সখা দেবীর প্রিয়!
সেদিন সবাই সভয়ে হেরিল, আছে—আছে—আজও এখানে বীর,
বিপুল শ্রদ্ধা বিস্ময়ে দেশ নোওাইল তব চরণে শির!

* * * *

মরণ করে না বরণ বীরের রোগ-লাঞ্ছিত শয়ন ঘিরে;
অস্ত্রের মুখে লহে তুলে বুকে, শোয়ায় সে সুখে সমাধি-তীরে!
পীড়ার প্রবল পীড়ন পীড়িতে পারিল না তাই তোমারে শূর!
ধর্ম্ম-বিপাকে মর্ম্ম ছেদিয়া করেছিনু মোরা যাদের দূর
তুমি আনিয়াছ ফিরায়ে তাদের হে সাহসী পুন আপন ঘরে।
আপনার জনে অবহেলা করি অভিশাপে পাছে এ জাতি মরে
মহা-সাম্যের শঙ্খ বাজায়ে সত্য-দ্রষ্টা ফিরেছ তাই
তোমার 'শুদ্ধি' সাধু-সাধনার বিশ্ব-জগতে তুলনা নাই!

* * * *

অমোঘ তোমার হিন্দু-মন্ত্র অচলায়তন দু'পায়ে দলি,
জাতির প্রলয় ধ্বংস উতরি অমৃতের লোকে গিয়েছে চলি!
সবল করিতে বলহীনে যোগী, তোমার নূতন আর্য্য-ব্রত
মৃতের জীবনে করেছে আবার জীবনী-শক্তি ওতঃপ্রোত!
তুমি হিন্দুর নবীন জনক, করেছো তাহারে আয়ুষ্মান্
কুল-বৃদ্ধির সিদ্ধি 'শুদ্ধি' হে তাপস, তব বিপুল দান!
মৃত্যু তোমারে বরিয়াছে আজ অস্ত্র-আঘাতে অমর করি,
বীরের যোগ্য যাত্রা এ তব ব্যথায় বক্ষ লয়েছে হরি।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
Of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.

ঋষির মেয়ে
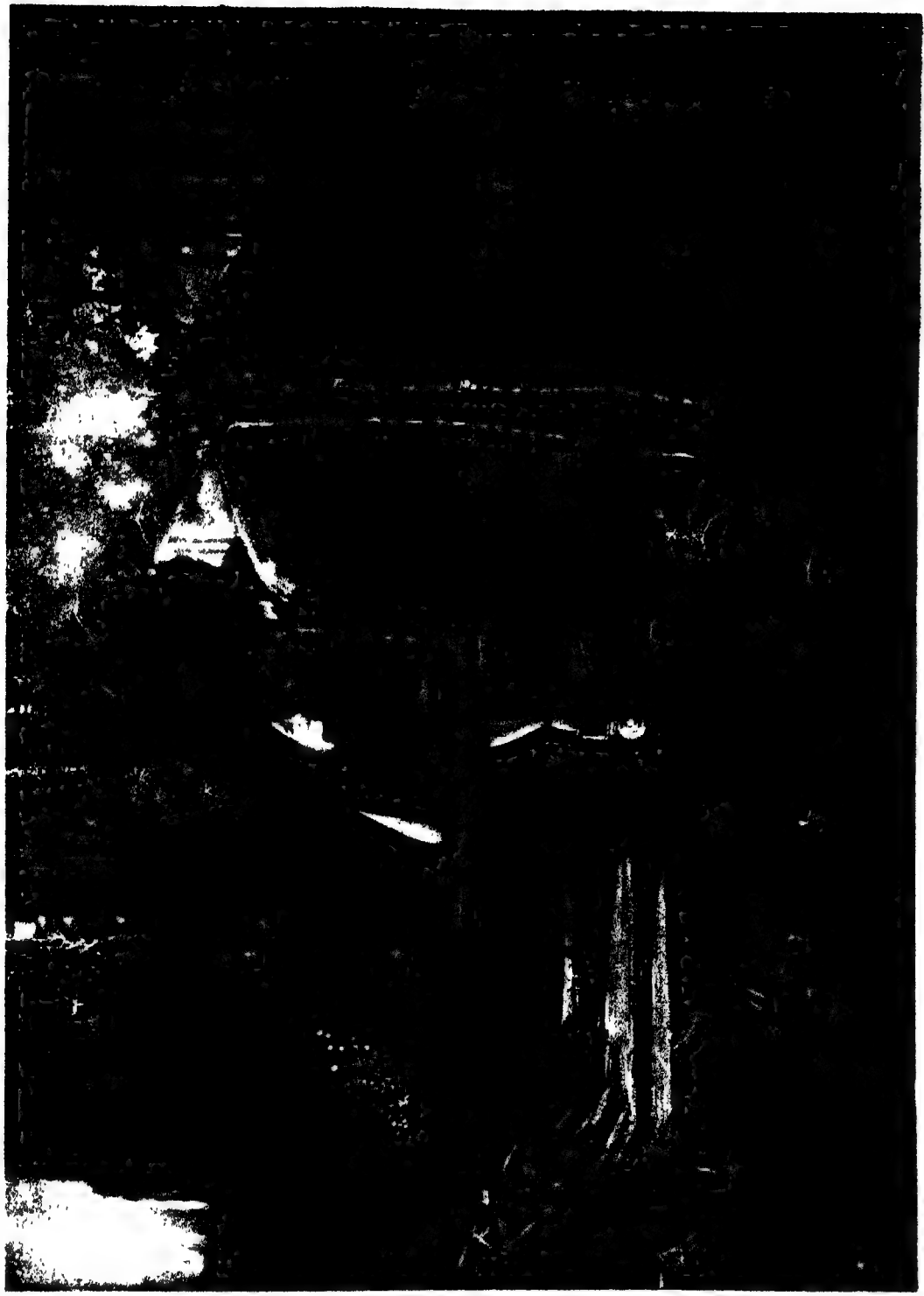
ফাল্গুন, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

মানব-ধর্ম্ম

শ্রীরমেশচন্দ্র জোয়ারদার বিদ্যাবিনোদ

মহাপ্রলয়ের অবস্থায় এই বিশ্বজগতের বা ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় অণুপরমাণু বিশাল শূন্যে একটা অসীম অনন্ত তেজের বহুধা-বিক্ষিপ্ত অণু সকলের ন্যায় পরস্পরকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনাতীত বেগে আবর্ত্তন করিতেছিল। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য মনীষিগণ এই বিক্ষিপ্ত তেজকণাসমূহকে Electron বা 'তড়িদণু' নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ এই তেজাণু সমষ্টিকেই 'আদ্যাশক্তি' (Original or primitive energy) নামে পরিকল্পনা করিয়াছেন। আর্য্য ঋষিগণ লোক সকলের মনে সহজে কোনও বিষয়ের ধারণা বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক পদার্থের এক একটা স্বরূপ বা কাল্পনিক মূর্ত্তি দিয়াছেন। সেই জন্যই এই বিশাল শক্তির আধারভূত তেজাণু (Electron)কে একটি শক্তিময়ী নারী-মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। এই রমণীই এই বিশাল বিশ্বের প্রসবিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

আদ্যাশক্তি বা ব্রহ্মাণ্ড-প্রসবিনী বিশ্বজননী সর্ব্বপ্রথমে তিনটি পুত্র প্রসব করেন; অর্থাৎ প্রাগুক্ত (electron) তড়িদণুসমূহ ক্রমশঃ তিন অবস্থায় প্রকাশ পাইল। কঠিন (ক্ষিতি solid গঠনশীলতা বা সৃষ্টির প্রতীক বা ব্রহ্মা), তরল (অপ্ liquid স্থিতিশীলতার প্রতীক বা বিষ্ণু), বায়বীয় (মরুৎ—gas ধ্বংসশীলতার প্রতীক বা মহেশ্বর)। আর্য্য ঋষিগণের অত্যাশ্চর্য্য কল্পনা-সাহায্যে এই ত্রিবিধ অবস্থা-সম্পন্ন তড়িদণুপুঞ্জ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব বা মহেশ্বর আখ্যায় উক্ত আদ্যাশক্তির তিনটি পুত্র রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা বিশাল শূন্যে অবস্থিত হইয়া ক্রম-বিবর্ত্তন-(evolution)

পন্থায় কালে কাল বর্ত্তমান বিশ্বে পরিণত হইয়াছে। যে শূন্যে ইহারা অবস্থিত, তাহা প্রত্যেক তড়িদণুকে অপরটি হইতে পৃথক বা 'অন্তরিত' করিয়া রাখিয়াছিল; এজন্য ইহার নাম অন্তরীক্ষ্য, আকাশ বা ব্যোম।

এখন দেখুন, জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভে কঠিন, তরল, তেজ, বায়বীয় ও অন্তরীক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ কল্পিত হয় নাই। তাই আর্য্য ঋষিগণ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ ভূতকে জগতের বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদিভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ও-দিকে আদ্যাশক্তির পুত্রত্রয়—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ক্রম-বিবর্ত্তনে বিশ্ব-সৃজনে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহারা ধ্যানে নিমগ্ন আছেন বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। শুধু পুরুষে সৃষ্টি অসম্ভব, এজন্য মহাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি সর্ব্বপ্রথমে শিবকেই আশ্রয় করিলেন বা পতিত্বে বরণ করিলেন; অর্থাৎ তড়িদণু আদৌ বায়বীয় আকার ধারণ করিল, ইহাই বুঝাইতেছে।

ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলেই (electron) তড়িদণু (পুরুষ ও প্রকৃতি বা positive and negative ভেদে দ্বিবিধ) নানা প্রকার (element) মূল পদার্থের পরমাণু (atom) রূপে প্রকটিত হইয়া বায়বীয় রূপ ধারণ করিল। ক্রমশঃ মূল পদার্থ (element) সমূহ পরস্পরের সংঘাত-বিলয়ে (chemical actionএ) যৌগিক পদার্থে (compound) পরিণত হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমবিবর্ত্তন-ফলে বহুকাল পরে দৃষ্টতঃ জড়জগৎ হইতে এক দিন চেতনার উদ্ভব হইল। অর্থাৎ জড়ের মধ্যে এতকাল যে চেতনা সুপ্ত ছিল, তাহা এক দিন জাগ্রত হইল (যেমন ডিম্ব মধ্যে শ্বেতসার ও পীত কুসুমের মধ্যে দৃষ্টতঃ কোনও চেতনার আভাস পাওয়া না গেলেও, এক দিন সেই জড়ের মধ্যেই চেতনার সাড়া পাওয়া যায় প্রত্যক্ষ করিতেছি)। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থান্তরও ঐ একই প্রকারে হয়। আদৌ যাহা শুক্র ও শোণিতের মিশ্রিত এক জড়পিণ্ড মাত্র ছিল, তাহাই ক্রমশঃ দেহবিশিষ্ট হইয়া চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। এই ক্রম-বিবর্ত্তনকেই শাস্ত্রকারগণ মহা-সমুদ্রশায়ী বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চেতনার নূতন সৃষ্টি হয় না, মাত্র সুপ্ত চেতনা জাগ্রত হয়। পাশ্চাত্যগণ এই সুপ্তাবস্থাকে latent বলিয়া থাকেন।

এই চেতনারও দুইটি অবস্থা আছে। প্রথম অবস্থায় মাত্র জীবনের স্পন্দন প্রকাশ পায়। দ্বিতীয় অবস্থায় আত্মার শেষ পরিণতি হয়। গর্ভস্থ ভ্রূণের পঞ্চম মাসের পরে প্রাণের সাড়া বা জীবনের স্পন্দন প্রকাশ পায়; কিন্তু আত্মার বিকাশ তাহাতে থাকে না। ভূমিষ্ঠ হইয়াও বহুদিন তাহার পূর্ণ বিকাশ হয় না, ক্রমশঃ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও পূর্ণ বিকাশ হয়। অনেক সময় দেখা যায়, দেহ-বৈকল্যবশতঃ দেহী মূঢ়ভাবে থাকে। ইহাতেই সপ্রমাণ হয় যে, সুপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ দেহ ভিন্ন আত্মার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নহে। আত্মাই জীবদেহের কর্ত্তা বা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলা যাইতে পারে। দেহী যাহা কিছু করে তজ্জন্য আত্মাই দায়ী। এদিকে দেহ সুপুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ না হইলে আত্মার স্ফূর্ত্তি হয় না। তাই আর্য্য ঋষিগণ তার স্বরে বলিয়াছেন, 'শরীর রক্ষাই মূল ধর্ম্মের সাধন'।

নানাবিধ জীবও জগতে এক দিনে উৎপন্ন হয় নাই। সর্ব্ব প্রথমে প্রস্তরাদি জড় পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে। ক্রমশঃ প্রবাল (coral) প্রভৃতির ন্যায় দৃষ্টতঃ প্রস্তর সদৃশ উদ্ভিজ্জাতীয় পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে। তৎপরে বৃক্ষলতাদি ক্রমবিবর্ত্তনে উদ্ভূত হইয়াছে। এ যাবৎ দৃষ্টতঃ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় নাই। প্রথম প্রাণের সাড়া পাওয়া গেল মীন প্রভৃতির দেহে। তাই আর্য্য ঋষিগণ ভগবান বিষ্ণুর প্রথম অবতারকে মৎস্যরূপী কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মৎস্য কোথা হইতে আসিল? জগতের প্রত্যেক পদার্থেরই আদিভূত কারণ সেই পূর্ব্ববর্ণিত আদ্যাশক্তি বা তড়িদণু। যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সনাতন কিছু থাকে, তবে তাহা সেই আদ্যাশক্তি। তাহা স্বয়ং জাত বা 'স্বয়ম্ভু'। পারস্য ভাষায় তাহাকেই 'খোদা' (খোদ + আ = স্বয়ং আগত বা জাত) বলে। এই 'খোদা' কথার সহিত ইংরাজগণের God (Cod, Khoda) কথাটির উচ্চারণ সাদৃশ্যে বুঝা যাইবে, যে ও-দুটি শব্দ একই মূল শব্দ-জাত। তবেই দেখা যাইতেছে যে, এ জগতে যাহা কিছু দেখিতেছি বা অনুভব করিতেছি, সে সমস্তই এই 'স্বয়ম্ভু' হইতেই উদ্ভূত বা তাহারই বিকার বা অংশ সম্ভূত। তবেই দেখুন, আর্য্য ঋষিগণের 'ভগবান্ সর্ব্বভূতময়' কথাটা কত বড় সত্য কথা। এখন ঈশ্বরকে নিরাকার বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নির্দ্দিষ্ট কোনও আকারে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 'পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন' বলিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই কল্পনা করিতে হয়। বিশ্বের কোনও পদার্থকেই বাদ দিলে চলিবে না। তবেই দেখুন, পূর্ণ ভগবানকে কল্পনায়

আনা কি দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন, তিনি 'অবাঙ্মনসোগোচর'—বাক্য ও মনের অগোচর।

প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ ভারতবর্ষকেই মর্ত্ত্যলোক বা পৃথিবী বলিতেন,—স্পষ্টভাবে পৃথিবীর আকার 'ত্রিভুজ' বলিয়া গিয়াছেন। সাগর-বেষ্টিত ভারতবর্ষই তাঁহাদের পৃথিবী বা সসাগরা ধরা ছিল। তিব্বত, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশ সমূহকে তাঁহারা গন্ধর্ব্ব লোক, কিন্নর রাজ্য ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত করিতেন। ঐরূপ কোনও দুর্গম স্থানকেই তাঁহারা স্বর্গ কল্পনা করিতেন। সে স্বর্গ কাশ্পীয়ান হ্রদ-সান্নিধ্যে কোনও সুরম্য স্থান হইবে। এই সুরম্য স্থানেই আর্য্যগণের পূর্ব্বনিবাস ছিল। তাঁহারা আপনাদিগকে স্বর্গের অমৃতের নন্দন বা 'দেবতা' বলিয়া আখ্যাত করিতেন। ক্রমে যখন তাঁহারা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন, এবং এখানকার আদিম জাতি (দানব বা দৈত্য অথবা রাক্ষস) গণকে পরাস্ত করিয়া স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন, তখন তাঁহাদের সংখ্যা ৩৩ কোটি ছিল, তাই আজও তাঁহারা বলিয়া থাকেন '৩৩ কোটি দেবতা' (এখনও ভারতের লোকসংখ্যা তাহাই)। কিন্তু কোনও দিন কোনও হিন্দু ভ্রমেও '৩৩ কোটি ঈশ্বর' বলেন না। অথচ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণ বলিয়া থাকেন, 'হিন্দুগণ বহু-ঈশ্বরবাদী'। আর্য্য-সন্তানগণ চিরদিন বলিয়া আসিতেছেন, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। মুসলমানগণও বলিয়া থাকেন 'লা ইলাহা ইল্ আল্লা' (আল্লা বা একমাত্র উপাস্য ভগবানের কোনও সরিক বা অংশী নাই)। আমার বিশ্বাস, জগতে কোনও সভ্যজাতির ধর্ম্মই ঈশ্বরকে এক ভিন্ন বহু বলেন নাই। তবে বলিবেন, "হিন্দুগণ নানাবিধ মূর্ত্তি পূজা করেন কেন?" তাহার তাৎপর্য্য এই যে, সসীম মানব-মন অসীমের কল্পনা সহজে করিতে পারে না; এবং ঈশ্বর সর্ব্বভূতময়। তাই যিনি যে মূর্ত্তিকে অধিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন, তিনি সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহাকে ভজনা করেন,—পূজা সেই এক স্থানেই পৌঁছায়। কেন না, ব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর কিছুই ত নাই। 'ব্রহ্মসত্য, জগন্মিথ্যা'—একমাত্র ইহাই হিন্দু দর্শনের প্রতিপাদ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্ব্ব প্রথমে মৎস্য মধ্যেই দৃষ্টতঃ প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। তাই আর্য্য ঋষিগণ মৎস্যকেই প্রথম অবতাররূপে কল্পনা করিয়াছেন। তাহার ক্রম-বিকাশে কূর্ম্মের উৎপত্তি। তাই কূর্ম্ম দ্বিতীয় অবতার। ইনি জলচরও বটেন, কিন্তু স্থলেও চলিতে পারেন। তৃতীয় অবতার হইলেন বরাহ। ইনি স্থলচর হইলেও অনেক সময় জলেই থাকেন। ক্রমশঃ পশুশ্রেষ্ঠ সিংহ সহ মনুষ্যবুদ্ধির কল্পনা ফলে নৃসিংহ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়া চতুর্থ অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তার পরে মানবের বাল্যাবস্থা বা বামনকে পঞ্চম অবতার কল্পনা করা হইয়াছে। ইনি ব্রাহ্মণ-সন্তান। ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম ব্রাহ্মণ-ঔরসে জাত হইলেও ক্ষত্রিয়-কন্যার গর্ভজাত। এখানে হিন্দু শাস্ত্র ক্ষাত্র শক্তির উপরে ব্রাহ্মণ্য শক্তির ঔৎকর্ষ্য দেখাইয়াছেন। সপ্তম অবতার শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয়-সন্তান,—অসভ্য রাক্ষসী-শক্তির উপর সভ্য ক্ষাত্র শক্তির প্রাধান্য দেখাইয়াছেন। তবে শুধু সভ্যতায় রাক্ষসী। শক্তি দমন করা অসম্ভব। তাই তাঁহার পশু-স্বভাব বানরের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হইয়াছিল। অষ্টম অবতার বলরাম ক্ষত্রিয়-সন্তান হইয়াও ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্য-কন্যার গর্ভজাত নন্দ* মহারাজ কর্ত্তৃক পালিত হইয়াছেন; এবং কনিষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ সহ প্রবৃত্তি-চালিত পাপের দমন করিয়া নিবৃত্তি-চালিত ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিয়াছেন। ঐ সঙ্গে জগতে বৈশ্য-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার্থ স্বহস্তে হলচালনা ও গোপালন করিয়া গিয়াছেন। নবম অবতার রাজপুত্র গৌতম রাজ্য সম্পদ ভোগবিলাস ত্যাগীর মুক্তি পথ প্রদর্শনার্থ কঠোর তপ করিয়া জগতে অহিংসার মহাবাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু স্বার্থপর মানবগণ যখন ভগবান বুদ্ধদেবের এই মহাবাণী না মানিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পরস্পর আত্মকলহে লিপ্ত হইবে, তখন তিনি কল্কীরূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট দুরাচারগণকে নিহত করিয়া

যদুবংশীয় মহারাজ দেবমুঢ়ের দুই পত্নীর গর্ভে দুইটী পুত্র হয়। প্রথম শূরসেন ক্ষত্রিয়া-পত্নী-গর্ভজাত। দ্বিতীয় পর্জ্জন্যদেব বৈশ্যা-পত্নী-গর্ভজাত। শূরসেনের পুত্র বসুদেব, পর্জ্জন্যদেবের পুত্র নন্দঘোষ। এই বসুদেব ও নন্দ এক পিতামহের পৌত্র। বসুদেব-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বলরাম ও নন্দ কর্ত্তৃক পালিত। হরিবংশ।

শান্তির রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। আর্য্য ঋষিগণ এই অবতারবাদের মধ্যেও জগতের ক্রমবিকাশ ও শেষ পরিণতি যাহা হইবে, কল্পনা-বলে তাহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে আমরা জগতের বর্ত্তমান অবস্থায় আগত হইয়াছি।

অতঃপর কি ভাবে মানবগণ ধর্ম্মাচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিব।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, ক্রম-বিবর্ত্তনের ফলে পশু হইতেই মানবের বিকাশ। আদি মানব সুতরাং অনেকাংশে পশুভাবাপন্ন ছিলেন। ইঁহারা কতদিন যে এইরূপ পশু-প্রকৃতি-বিশিষ্ট ছিলেন, তাহা বলা সুকঠিন। ক্রমে ইঁহাদের মধ্যে হিতাহিত-জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। এই জ্ঞান-বিকাশকেই খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে আদি জনক-জননীর জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আদি মানব দম্পতির কর্ম্মফলেই যদি মানব-জাতির মনে লজ্জার উদ্ভব হইত, তবে, এখনও অসভ্য নরনারীগণ বিকারশূন্য চিত্তে নগ্ন অবস্থায় থাকিত না। অথবা স্বীকার করিতে হয়, অসভ্য মানবগণ আদি পিতা-মাতার (Adam and Eve) বংশসম্ভূত নহে, তাহারা পৃথক কোনও বংশসম্ভূত, এবং এখনও তাহারা নিষিদ্ধ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খায় নাই, সুতরাং নিষ্পাপ আছে। বস্তুতঃ তাহা নহে, মানব সমস্তই এক-ভাবে জাত। জ্ঞান-লাভের ফলে ভাল-মন্দ বা পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিবার শক্তি হওয়ায়, উহার ফলভাগী হইতে হইয়াছে। জ্ঞানহীন পশুগণও অপকর্ম্মের ফল ভোগ করে। তবে তাহারা বুঝে না যে সেটা তাদের নিজেদেরই কুকর্ম্মের ফল। অথবা সু বা কু কোনও জ্ঞানই তাহাদের নাই। উত্তপ্ত খাদ্য দ্রব্য খাইতে গেলে মুখ ও জিহ্বা দগ্ধ হইবেই, তা সে জ্ঞাতসারেই হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক। মানব জ্ঞান বশতঃ বুঝে সেটা নিজের মূর্খতা, তজ্জন্য অনুতপ্ত হয়। মানবশিশু বা পশু অজ্ঞতা নিবন্ধন কষ্ট পাইলেও অনুতপ্ত হয় না, এই মাত্র পার্থক্য। এই অনুতাপই পাপের ফল বলিয়া কথিত হয়। শিশু ও পাগলের কোনও পাপ নাই, কেন না তাহারা অবোধ। কাজেই তাহাদের অনুতাপও হয় না। তাই বলিয়া তাহারা কর্ম্মফল ভোগ করে না এমন নয়। পুণ্যশীল ব্যক্তি সংসারে অনেকরূপ ক্লেশ ভোগ করেন, কিন্তু তজ্জন্য কোনও দিন তাঁহারা অনুতাপ করেন না; কেন না অনুতাপ পাপেরই ফল। দৈবাৎ কোনও আঘাত প্রাপ্ত হইলে ব্যথা হয় সত্য, কিন্তু অনুতাপ হয় কি? কিন্তু কাহারও প্রতি অন্যায় করিবার ফলে আহত হইলে ব্যথা ত হয়ই, সেই সঙ্গে অনুতাপও হয়। এই অনুতাপই পাপের ফল। কোনও বিষয়ে অনুতাপ হইলেই বুঝিতে হইবে যে কিছু পাপ ছিল। তাই অনেকের মতে অনুতাপই পাপের যথাযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত। কথাও ঠিক। মানবগণ প্রথমে সম্পূর্ণরূপে পশুবৎ আচরণ করিতেন, বস্ত্রাদি পরিধানের আবশ্যকতা বোধ করিতেন না, আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ইহাই ছিল জীবনের সার ব্রত। 'ধর্ম্ম' বলিয়া কোনও বিষয় বুঝিতেন না। কিন্তু কালক্রমে যখন দেখিলেন, আহার্য্য সংগ্রহে বা স্ত্রী পুরুষের অবাধ মিলনে পরস্পর দ্বন্দ্ব, কলহ, মারামারি করিয়া হতাহত হইতে লাগিলেন, তখন বুদ্ধিজীবী মানব, ক্রমশঃ নিয়ম ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে লাগিলেন। এ নিয়মই (নি + যম) ধর্ম্ম নামে কথিত হইল। তাই ধর্ম্মরাজ বা যমরাজ মৃত্যুপতি, অর্থাৎ নিয়মানুসারেই সমস্ত ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

প্রথম নিয়ম হইল এই যে, একজন যদি খাদ্য পায় বা সংগ্রহ করে, তবে অন্যে তাহার খাদ্য কাড়িয়া লইবে না। তবে তাহার ভোজনশেষে বাঁচিয়া গেলে বা আবশ্যক বোধে তাহার অনুমতি-ক্রমে কিছু অংশ লইতে পারিবে। এই হইতেই ক্রমে অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইল। ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আসিলে স্বয়ং অভুক্ত থাকিয়াও তাহাকে দিতে হইবে। এরূপ সুন্দর ব্যবস্থা না থাকিলে অহরহ মারামারি ও নরহত্যা অবাধে চলিত। যতদিন এই বিধি লোকে মানিয়া চলিয়াছে ততদিন জগতে শান্তি ছিল। যখন হইতে বলপ্রয়োগে অপরের অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইবার ব্যবস্থা হইল, তখন হইতেই পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি হইল। পৃথিবীর সকলেই যদি প্রয়োজন মত আহারে সন্তুষ্ট থাকিয়া বাকী অংশ অন্যকে দেয়, তবে এখনও জগতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহাতে কাহারও অন্নকষ্ট হয় না। এমন কি কোনও পশু পক্ষী কীট পতঙ্গকেই বোধ হয় অভুক্ত থাকিতে হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মানবগণ অধুনা অতিমাত্রায় লোভ-পরতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। অল্পে আর তাহাদের মন উঠে না। তাই অন্যের সুখের সংসারে দুঃখের অনল জ্বালিয়া দিয়া পৃথিবীকে নরকে পরিণত

করিয়াছে। এই লোভের ফলেই যত যুদ্ধ বিগ্রহ নরহত্যা অত্যাচার অনাচার চলিতেছে। জানি না ইহার শেষ পরিণতি কোথায়! দ্বিতীয় নিয়ম এই হইল যে, যদি কোনও পুরুষ এবং কোনও নারী পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহারা উভয়ে কোনও নিভৃত স্থানে রতিক্রিয়া করিবেন। লোকচক্ষুর সম্মুখে হইলে অপরের মনেও কামের উদ্রেক হইতে পারে; ফলে দ্বন্দ্ব ও রক্তপাত অবশ্যম্ভাবী। ঐ সঙ্গে জননেন্দ্রিয় আবৃত রাখিবার ব্যবস্থাও হইল। নারীর পক্ষে কুচযুগল আবরণেরও আদেশ দেওয়া হইল। কেন না, ঐ সকল অঙ্গ দর্শনে স্বতঃই মনে কামের উত্তেজনা আসে। ইহা হইতেই ক্রমে বস্ত্র বয়নের বিধান চলিল। তখনও স্ত্রী-পুরুষে অবাধ মিলনই চলিত।—কিন্তু তাহাতে এক অসুবিধা হইতে লাগিল। মানবশিশু এতই অসহায় অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে যে বহুদিন যাবত তাহার মাতার সাহায্যের ও যত্নের আবশ্যক হয়। এবং প্রসবের পরে প্রসূতিও এত দুর্ব্বলা হইয়া পড়েন যে, তৎকালে অপরের সাহায্য ব্যতিবেকে তাঁহার নিজের জীবন রক্ষা করাই দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় সাহায্যকারী কেহ না থাকিলে উভয়েরই মৃত্যু সুনিশ্চয়। তাই নিয়ম হইল যে, অবাধ মিলন চলিবে না। যে পুরুষ যে নারীতে আসক্ত হইবেন, তাঁহাকে উক্ত নারীর সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হইবে। এই ভার বহনের নাম হইল বিবাহ (বি+বহ+ঘঞ্)। এই তৃতীয় নিয়ম বিবাহের ফলে স্বামী (বা প্রভু) স্ত্রীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেন,—স্ত্রী স্বামীর এক সম্পত্তি মধ্যে পরিগণিতা হইলেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর আজ্ঞাকারিণী হইলেন। যতদিন স্বামী জীবিত থাকিবেন, বা তাঁহাকে পরিত্যাগ না করিবেন, ততদিন তিনি অন্য পুরুষে রত হইতে পারিবেন না; তবে স্বামীর ইচ্ছা বা আদেশক্রমে অন্যপুরুষে রত হইতে পারিতেন। ক্ষুধাতুর অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে যেমন স্বীয় আহার্য্য দিয়া তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তির বিধান আছে, পূর্ব্বে কামাতুরকেও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার অনুমতি দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা ছিল। পরিশেষে শ্বেতকেতু নামা একজন মুনিকুমার ঐ বিধি রহিত করিয়া দেন। উহাতে একটি দোষ দাঁড়াইত এই যে, অনেক সময়ে অভ্যাগতের ঔরসে হীনপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট পুত্র জন্মিয়া পিতা (মাতার স্বামী) ও মাতার পীড়ার কারণ হইত। এবং অভ্যাগতের কোনও রোগ থাকিলে উহাও পত্নীতে সংক্রামিত হইতে পারিত। কাজেই শ্বেতকেতু বিচার-বুদ্ধি দ্বারা উহার অপকারিতা পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ নিয়ম রহিত করিয়া দেন। অতঃপর একের স্ত্রীকে অপরের মাতৃতুল্যা জ্ঞান করিবার আদেশ দেওয়া হইল। এমন কি বিবাহের পূর্ব্বে স্বীয় স্ত্রীকেও মাতৃবৎ দৃষ্টিতে দেখা উচিত। এই শাসন বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, নারীজাতির প্রতি সাধারণের মনে একটা ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে।

স্বামী জীবিত থাকিতে বা স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করিলে, অথবা অন্য কোনও কারণ বশতঃ পত্নীর যাবতীয় অভাব দূরীকরণে অশক্ত না হইলে, কোনও স্ত্রী স্বীয় পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষ ভজনা করিতে পারিতেন না। পূর্ব্ব পতি হইতে কোনও কারণে বিচ্ছিন্ন হইলে স্বেচ্ছামত অন্য পুরুষ আশ্রয় করিয়া থাকিবার ব্যবস্থা ছিল। অনেকে পূর্ব্ব পতির প্রতি সমধিক প্রেমাসক্ত বা শ্রদ্ধা সম্পন্ন থাকায় তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান স্বরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস করায় ঐকান্তিকতা প্রযুক্ত এবং কোনও অভাব অনুভব না করায় পতির মৃত্যুর পরে আর বিবাহ করিতেন না। তাঁহাদিগকে সমাজ আদর্শ সতী বলিয়া বিশেষ সম্মান করিত। অনেকে আবার পতির শোকে আত্মহারা হইয়া পতির চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিতেন। তাঁহাদিগকে সাধারণে 'দেবী' আখ্যা দান করিত। ক্রমে সকলেই এই সকল উচ্চ আদর্শ অনুকরণে যত্নবতী হওয়ায়, পত্যন্তর গ্রহণ করাটা কিছু হেয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ক্রমে উহা এতই ঘৃণ্য হইয়া উঠিল যে, বিশেষ প্রয়োজন বোধ করা সত্বেও লোক-নিন্দার ভয়ে এবং নারী-সুলভ লজ্জা বশতঃ কেহ মুখ ফুটিয়া পুনর্ব্বিবাহের কথা উচ্চারণও করিতে পারিতেন না। কালে কালে উহা সমাজ হইতে লোপ পাইল, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে কিছু কিছু রহিয়া গেল। অনেকে এ বিষয়ে শাস্ত্রকার পুরুষগণকে দোষী করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। বিবাহেচ্ছু বিধবা না থাকাতেই পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ উহা রহিত করিয়া দেন। যেমন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ পুনঃ প্রচলনের ব্যবস্থা দিলেও লজ্জা বশতঃ কোনও নারীই সহজে স্বীকৃতা হন নাই, তাই এতদিন বিধবা-বিবাহ তেমন চলে নাই। আজকাল শিক্ষা-দীক্ষার ফলে অনেকেই সত্যকে কুসংস্কারের

মধ্য হইতে বাছিয়া লইতে শিখিয়াছেন। তাই গোপন ব্যভিচারের প্রশ্রয় না দিয়া স্পষ্টতঃ পত্যন্তর গ্রহণে সম্মতি দিতেছেন, এবং ক্রমশঃ বিধবা-বিবাহের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। আরও এক কথা, বহুদিন কোনও প্রথা উঠিয়া গেলে পুনরায় সে প্রথা চালাইতে অনেকেরই মনে হয় যে বোধ হয় ধর্ম্মহানি হইতেছে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা উচিত যে-ধর্ম্ম জিনিসটাই জ্ঞানবান মানবের সমাজ-হিতার্থ একটা বিধান মাত্র। ইহার সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। ঈশ্বর বলিতে যাঁকে বুঝি, তিনি চিরদিনই নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার। যাহাতে সমাজের হিত হয় তাহাই ধর্ম্ম। নচেৎ জীব-হত্যায় পাপ আছে সকলেই জানেন; অথচ প্রত্যহ রাশি রাশি জীব-হত্যা করিয়া আহারের সংস্থান করা হইতেছে। তজ্জন্য মনে এতটুকুও অনুতাপ আসে কি? বিধবাগণ মৎস্য ভোজন করেন না, কিন্তু স্বীয় পুত্র কন্যা প্রভৃতির জন্য প্রত্যহ অসংখ্য জীবিত মৎস্যের প্রাণ সংহার করিতেছেন,—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহাদের অনুতাপ হয় কি? জিজ্ঞাসা করি, একটা জীব-হত্যা করাই অধিক অন্যায়, কি অপরে মারিয়া দিলে তাহা খাওয়াই অধিক অন্যায়? আসল কথা, এই মৎস্য আহারে রজঃ শক্তির বৃদ্ধি হয়। তাহাতে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা। তাই মৎস্য মাংস আহার নিষেধ। মৎস্য হত্যায় তাহার কোনও আশঙ্কা নাই। বলিবেন; 'হিংসা বৃত্তি বাড়ে', সে কথাও সত্য নহে, কেন না মাছের প্রতি তাঁহার কোনও রূপ হিংসা বা ক্রোধের কোনও কারণ নাই। এবং তিনি নিতান্ত নির্ব্বিকার চিত্তেই মৎস্য হত্যা করিয়া থাকেন, যেন কলা মুলা কাটিতেছেন। যুধিষ্ঠির শত শত নরহত্যা করিয়াও পাপী হইলেন না। দু' দুবার 'নির্জ্জলা' মিথ্যা কথা কহিয়াও (কুম্ভকার গৃহে 'ব্রাহ্মণ' পরিচয়ে বাস; বিরাটগৃহে 'কঙ্ক' প্রভৃতি নামে পরিচয় দান) পাপী হইলেন না, পাপী হইলেন আঠার আনা সত্য কথা বলিয়া। 'অশ্বত্থামা মরিয়াছে' এই ত ষোল আনা সত্য কথা। 'ঐ নামের হাতী মরিয়াছে' এটুকু ত ফাউ ৵০। এতে পাপ হল, কেন না, তিনি জেনে শুনে দ্রোণাচার্য্যকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। তবেই দেখুন, কোনও কাজকেই 'সৎ' বা 'অসৎ' বলা চলে না। যে উদ্দেশ্যে কার্য্য করা হয় সেই উদ্দেশ্য সৎ কি অসৎ তাহাই দেখিতে হইবে। মন্দ উদ্দেশ্যে কোনও কার্য্য করিতে গেলেও অনেক সময় ভাল ফল হইয়া থাকে। তবু আমার মতে কাজটিকে অসৎই বলিতে হইবে। আবার হয় ত একজন ভাল করিবার উদ্দেশ্যে কোন কার্য্য করিল, কিন্তু তাহার ফল খারাপ হইয়া গেল। এ ক্ষেত্রেও তাহাকে অসৎ কর্ম্মী বলা চলে না। উদ্দেশ্য লইয়াই কার্য্যের বিচার করিতে হইবে। এই কষ্টিপাথরে সামাজিক রীতি নীতি ব্যবস্থা প্রভৃতি যাচাই করিয়া লইলেই দেখা যাইবে যে, অনেক প্রথারই, কোনও কালে প্রয়োজন থাকিলেও, দেশ-কাল-পাত্র পরিবর্ত্তনে তাহা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় ও দুষ্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ কখনও অন্ধের মত বিনা বিচারে প্রাচীন প্রথা মানিবেন না। আপনাদের বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সময়োপযোগী নিয়মকানুন গঠন করিয়া সমাজ শাসন করিবেন। কালে এই সকল শাসন-বাক্যেই শাস্ত্ররূপে পরিণত হইবে। ইহাই চিরদিন হইয়া আসিয়াছে।

অনেকে নারী বা নরের সংখ্যার ন্যূনাধিক্যের দোহাই দিয়া বলিয়া থাকেন, বিধবা-বিবাহ হওয়া অনুচিত। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত, যে একজন নারী একবার গর্ভবতী হইলে প্রসবকাল পরেও অন্ততঃ ২।৪ মাস অতীত না হইলে দ্বিতীয়বার গর্ভধারণ করিতে পারেন না। কিন্তু পুরুষের পক্ষে সে রীতি খাটে না। এক পুরুষ ইচ্ছা করিলে এক মাস মধ্যে বহু নারীতে গর্ভোৎপাদন করিতে পারেন—একটি বৃষ একটি পুং ছাগল যেমন বহু গাভী বা ছাগীতে গর্ভোৎপাদন করিয়া থাকে। সংসারে নারীর সংখ্যাধিক্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমাজে পুরুষের সংখ্যা কম থাকিলেও নারীর সংখ্যাধিক্যেই দ্রুতগতি জন-সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইলেই জাতি শীঘ্র ধ্বংসের পথে যায়। এই কারণে সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে স্ত্রীপশু বধ নিষেধ, পুং পশুই সাধারণতঃ যজ্ঞাদিতে বা আহারার্থ বধ করা হয়। রাজবিধানেও স্ত্রী-হরিণ শিকারে নিষেধ আছে। নারীর সংখ্যাধিক্য হইলে, পুরুষের বহু বিবাহই সহজ সরল পন্থা। নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইলে বিধবা-বিবাহ অবশ্য করণীয়। এমন কি দেশ বিশেষে নারীর বহু বিবাহ (একযোগে বহু পতি গ্রহণ, দ্রৌপদীর ন্যায়) প্রচলিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে। প্রমাণ তিব্বত দেশ। সেখানে

বিধান আছে, প্রথম স্বামাই তাঁহার সন্তানের পিতৃ আখ্যা পাইবে, অন্যান্যেরা জন্মদাতা হইলেও পিতৃত্বের অধিকারী নহেন, এরূপ বিধান না করিলে পিতৃ নির্ণয় করা লইয়া মহামারী কাণ্ড হইয়া যাইত। যখন জগতে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সকলেই জানেন অস্ত্রবলেই তাহা করিতে হইয়াছিল। যেখানে যুদ্ধ সেখানেই নরহত্যা। ফলে পুরুষের সংখ্যা নারীর এক চতুর্থাংশ হইয়া পাড়িয়াছিল। তাই মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রকার নিয়ম করেন—একজন পুরুষ চারিজন নারী পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারিবে। প্রেমে বিস্তৃত খৃষ্টধর্ম্মে নরনারী সংখ্যা সমতায় স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে বহু বিবাহ একেবারে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতিকার মহাযুদ্ধের ফলে পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে হয় পুরুষের বহু বিবাহ চালাইতে হইবে, না হয় ব্যভিচারোৎপন্ন সন্তানকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোনও কালে কেহ পারে নাই, পারিবেও না। বিধবা-বিবাহ রদের ফলে কোন কোন স্থলে কিরূপ ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যার স্রোত বহিয়া চলিয়াছে সহজেই অনুমেয়। ধরিয়া বাঁধিয়া হরিভক্তি হয় না।

যেখানেই অন্যায় করিয়া মানবের স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া হইবে, সেইখানেই বিদ্রোহের অনল জ্বলিয়া উঠিবে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম, ইহাই মানবধর্ম্ম। অন্যায়ের প্রতিবিধানার্থ যুদ্ধে নরহত্যাকে এই জন্যই নিষ্পাপ বলা হইয়াছে। অযথা উৎপীড়িত বা আক্রান্ত জাতি এই জন্যই জগতের নিরপেক্ষ জাতির সহানুভূতি পাইয়া থাকে। লুব্ধ আক্রমণকারীকে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে।

অতঃপর কার্য্য সৌকর্য্যার্থ জাতি বা বর্ণের বিভাগ হইল। গুণ ও কর্ম্মানুসারে মানবগণ যথাযোগ্য কার্য্যের অধিকারী। সত্ত্বগুণ প্রধান জ্ঞানবলে বলী মানবগণই সমাজের গুরুস্থানীয় ও শিক্ষক। তাই তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বর্ণ ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মবিদ্) বলা হইয়াছে। ইঁহারা সমাজ-দেহের মুখস্বরূপ। তাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত বলিয়া কথিত। বাহুবলে বলী শক্তিশালী রজোগুণ-প্রধান ও কিছু সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট মানবগণই সমাজের রক্ষক, তাই তাঁহাকে দ্বিতীয় বর্ণ 'ক্ষত্রিয়' বলা হইয়াছে। ইঁহারা সমাজের বাহুস্বরূপ, তাই সৃষ্টিকর্ত্তার বাহু হইতে জাত বলিয়া উক্ত। কিন্তু কেহ কখনও কোনও ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিয়াছেন কি, যে, ব্রহ্মার বাহু হইতে কোনও সময়ে কেহ জন্মিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? অনেক গোঁড়ার দল প্রাচীন গ্রন্থের প্রত্যেক বাক্যের সহজ অর্থ করিয়া মহাভ্রম করিয়া থাকেন। মনে করুন, এখন যদি কেহ বলেন যে, "মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষকে স্বায় মুষ্টিমধ্যে আনিয়াছেন" এ কথাটা কি মিথ্যা বলিবেন? অথবা ইহার তাৎপর্য্যার্থই গ্রহণ করিবেন? "হনুমান সূর্য্যদেবকে কুক্ষিগত করিয়াছিল" ইহারও কি সোজাসুজি অর্থ করিতে হইবে? অথবা, উহার সহজগ্রাহ্য তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে হইবে? হনুমান এত ক্ষিপ্রগতি ঔষধসহ আসিয়াছিল যে সূর্য্যদেবও উদয়ের অবকাশ পান নাই। তেমনি ঔষধ চিনিতে না পারিয়া গন্ধমাদনের কোনও বৃক্ষের মূলই সে বাদ দিয়া আসে নাই, অর্থাৎ গন্ধমাদনে যাহা যাহা ছিল, হনুমানের সঙ্গেও তাহা ছিল। সেও প্রকাণ্ড বোঝা। ইহাই সহজ, সরল ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা। তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ না করিলে অনেক কথারই সামঞ্জস্য রক্ষা করা ভার হইয়া উঠে।

এইরূপ রজঃ ও তমোগুণের আধিক্যে ব্যবসায় ও কৃষিকার্য্যে নিপুণ মানবগণ তৃতীয় বর্ণ 'বৈশ্য' বলিয়া কথিত। সর্ব্বশেষ তমোগুণের আধিক্যে অপরের আজ্ঞাবাহী জ্ঞানহীন মানবগণকে চতুর্থ 'শূদ্র' জাতি বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। ইঁহারা যথাক্রমে সৃষ্টিকর্ত্তার উরু ও পাদদেশজাত বলিয়া কথিত। শাস্ত্রকারগণ স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, গুণ ও কর্ম্মানুসারে বর্ণের বিভাগ; কিন্তু মানবগণ ও-সব ছাড়িয়া দিয়া বংশানুসারে বর্ণ-বিভাগ করিয়াই মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। সেই ভ্রমের ফলে সমাজে এই মহাবিশৃঙ্খলা। প্রথম প্রথম দেখা গিয়াছিল যে, পিতার গুণ ও কর্ম্মই পুত্রের গুণ ও কর্ম্ম হইয়া পড়ে। ইহার ব্যতিক্রম যে স্থানে হইয়াছে, সেই স্থানেই ভাঙ্গা-গড়া হইয়া যোগ্যতানুসারে বর্ণান্তরে লইয়া শাস্ত্রবাক্য পালিত হইয়া আসিতেছিল। বহু ক্ষত্রিয়-সন্তান ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। তবে ব্রাহ্মণ সন্তান ক্ষাত্র-বৃত্তি অবলম্বন করিলেও আপনার উচ্চ বর্ণের আখ্যা বা দাবী ত্যাগ করেন নাই। যেমন আজকাল দেখা যায়, কোনও নিম্ন জাতীয় লোক উচ্চ জাতির কার্য্য করিলে নিজের পূর্ব্ব উপাধি ছাড়িয়া উচ্চ জাতির উপাধি ধারণ করেন। কিন্তু উচ্চ জাতীয় কেহ হীন ব্যবসায় গ্রহণ করিলেও নিজের উপাধি ত্যাগ করেন না। এটা মানবগণের

স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য। কালক্রমে বর্ণাদি বংশগত হইয়া জ্ঞানকাণ্ডহীন, ধর্ম্মবুদ্ধিপরিশূন্য ব্রাহ্মণ-সন্তানও 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত। দুর্ব্বল, ভীরু, কাপুরুষ ক্ষত্রিয়-সন্তানও 'ক্ষাত্রয়' নামে খ্যাত। বৃত্তিশূন্য বৈশ্য-পুত্রও 'বৈশ্য' আখ্যাধারী। শূদ্রবংশজাত জ্ঞানবান ধার্ম্মিক ব্যক্তিও 'শূদ্র' পদবাচ্য। ফলে ক্রমশঃ উচ্চ জাতীয়গণ নাম-সর্ব্বস্ব হইয়া রহিয়াছেন,—কার্য্যতঃ সকলেই শূদ্রবৎ। তাই আজ ভারত পরপদদলিত। কেন না, সমাজের শিক্ষকতা করিবার প্রকৃত শক্তি যাঁর আছে, তাঁহাকে সে অধিকার না দিয়া,—যাঁর শিক্ষাদানের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নাই—বংশ-গুণে, তাঁহাকেই শিক্ষকের পদে স্থাপন করা হইয়াছে। ফলে যে শিক্ষা হইতেছে সকলেই দেখিতেছেন। যাঁহার দেশ রক্ষা করিবার শক্তি ছিল, তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়া বংশানুসারে শক্তিহীনকে দেশ রক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছিল। রাজ্যশাসনে অপারগ ব্যক্তিকে বংশ-মর্য্যাদার খাতিরে রাজ্যশাসনে নিয়োগ করা হইয়াছিল। তাই তাহারা রাজ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য হারাইয়া পরপদদলিত। ব্যবসায়-বুদ্ধিহীন, কৃষিকার্য্যে অপারগকে বাণিজ্য ও কৃষিতে স্থাপন করায় সে সমস্তও লোপ পাইয়া দেশ অর্থশূন্য। কাজেই আজ ভারতবাসী পূর্ব্ব গৌরব হারাইয়া জগতের কাছে অস্পৃশ্য। এখনও যদি শাস্ত্রের নির্দ্দেশ পালন করিয়া সমাজ-সংস্কারে মন দিই, এখনও যদি গুণের সম্মান রক্ষা করিয়া যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যথাযোগ্য কার্য্যের ভার দিই, তবে এখনও লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশা আছে। এখনও হীন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া যদি দেশের স্বার্থ-রক্ষায় মনোনিবেশ করি, তবে এখনও আশা হয়, ভারত আবার যশঃ সৌরভে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। আর্য্যগণের ধর্ম্মানুশাসন যেমন উদার ও মহৎ, এ পর্য্যন্ত তেমন ধর্ম্মানুশাসন কোনও কালে কোনও জাতি করিতে পারেন নাই। কেবল আমাদের বুদ্ধির দোষে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া আমরা সমস্ত নষ্ট করিয়াছি। জীবমাত্রেই শিব। মানুষ হইয়া মানুষকে ঘৃণা করার মত মহাপাপ আর নাই। অস্পৃশ্যতা মানব-জাতির, বিশেষতঃ বর্ত্তমান উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণের একটা দুরপনেয় কলঙ্ক। অতি সত্বর এই কলঙ্ক ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়া যথাযোগ্য গুণানুসারে বর্ণবিভাগ করিয়া পুনরায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা আশু প্রয়োজন। জজের ছেলেই জজ হয় না, বা অধ্যাপকের ছেলেই অধ্যাপক হয় না। উকীলের ছেলেও ডাক্তার হয়, মুদীর ছেলেও হাকিম হয়। আবার সাত্ত্বিক প্রকৃতির পণ্ডিতের পুত্রও রজোগুণ-সম্পন্ন মহাবল যোদ্ধা হইতে পারেন। ভৃত্যের পুত্রও বিচক্ষণ চিকিৎসক হইতে পারেন। সত্যকে গোপন রাখিতে চেষ্টা করা বাতুলতা। ইহাতে আত্মপ্রতারণা করা হয়। তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল পরাধীনতা।

আহার বিহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। যিনি যে রূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট তাঁহার জন্য সেই রূপ আহারের ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্র মদ্য, মাংস ভোজনে বা অবাধ মৈথুনে নিষেধ করেন নাই বটে, তবে স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিলে মহা ফল পাওয়া যায়। কোনও বিষয়ে নিষেধ না থাকিলেই যে তাহা করিতেই হইবে, এমন কোনও কথা নাই। প্রত্যেক জিনিসেরই একটা সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলে ফল বিষময় হয়। অবস্থা-বিশেষে মদ্য পরিমিত ভাবে ব্যবহারে সুধার কার্য্য করে। বিনা বিচারে মদ্য-পানের ফল যে কি ভীষণ, অহরহ তাহা দেখা যাইতেছে। তেমনি মাংস ভোজন ও মৈথুনাদি সম্বন্ধেও মিতচারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সকল নিয়ন্ত্রণ জন্যই জ্ঞানী শিক্ষকের প্রয়োজন। এবং সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী যাঁহারা তাঁহাদের উপযুক্ত শিক্ষকের নির্দ্দেশমত কার্য্য করা উচিত। নিয়ম লঙ্ঘনকারী ব্যভিচারীর সামাজিক ও রাজদণ্ডের বিধান করিয়া শৃঙ্খলা রক্ষা করা কর্ত্তব্য। অযথা হিংসা করা মহা পাপ, কিন্তু অত্যাচারীর দণ্ডবিধানে কোনও পাপ নাই। তাই পূর্ব্বে বিধান ছিল, পরস্বাপহারীর হস্তচ্ছেদ, সম্মানী ব্যক্তির কুৎসা প্রচারে জিহ্বাচ্ছেদ, পরনারী বিমর্দ্দকের মেঢ্রচ্ছেদ, এই সমস্ত গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। ইহাতে দুষ্কৃতকারীর যেরূপ দণ্ড হয়, তাহাতে সহজে অপরে আর ঐ সমস্ত কুকার্য্য করিতে সাহসী হইত না। আজকাল নরঘাতকের প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যে দুষ্ট প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া কোনও দুষ্প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নরহত্যা করে, প্রাণদণ্ডকে সে দণ্ড বলিয়াই গ্রাহ্য করে না। বরং যদি এমন কোনও ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে জীবিত থাকিয়াই সে তাহার কৃত-কার্য্যের ফল ভোগ করে, তাহাতে আমার মনে হয় দণ্ড অধিক হয়। প্রাণে মারিলে ত মুহূর্ত্তের মধ্যেই

তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল। দীর্ঘজীবী হইয়া যদি সে কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে, তবেই সে তাহার দণ্ড হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারে। এবং অপরেও তাহার ঐ কঠোর শাস্তি দেখিয়া ঐরূপ দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে। দণ্ড দেওয়ার উদ্দেশ্য বৈর-নির্য্যাতন নহে; দণ্ডের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান—যাহাতে কোনও অপরাধ পুনরায় আর না অনুষ্ঠিত হয়।

অভাব একটি পদার্থ যাহা লোককে অপরাধে প্রবৃত্ত করে। পেটের দায়ে লোকে চুরি করে, ডাকাতি করে, নরহত্যা প্রভৃতিও করে। সে সমস্ত ক্ষেত্রে অন্য কোনও দণ্ড না দিয়া তাহার অভাব পূরণ করাই সঙ্গত। নচেৎ দণ্ডে কোনও উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। বরং এমন একটা সামাজিক বিধান থাকা উচিত যে, প্রকৃত অভাবগ্রস্ত লোক অকপটে তার আপন অভাব জানায়, এবং সমাজের দিক হইতেও তাহার অভাব মোচনের একটা সুব্যবস্থা করা হয়। দণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া ইহাই কি প্রকৃত ব্যবস্থা নয়! অভাব আবার অনেকের হাতগড়াও আছে; সে অভাবের জন্য কেহ সমাজের কৃপার পাত্র হইতে পারে না।

ইন্দ্রিয়-সম্ভোগের অভাবও একটা গুরুতর অভাব। ইহাতে অনেককে এমন দানব-প্রকৃতির করিয়া তুলে যে তখন তাহাদের অসাধ্য কোনও কার্য্য থাকে না। এ সম্বন্ধেও সামাজিকগণ চেষ্টা করিলে যে কোনও সুব্যবস্থা করিতে পারেন না এমন নয়। তবে অনেকের প্রবৃত্তি এত প্রবল ও হীন যে বল-প্রয়োগ ভিন্ন তাহাদের অযথা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা রোধ করা যায় না। অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করাই কর্ত্তব্য। 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি'। স্বীয় প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদির আকাঙ্ক্ষা করার ন্যায় মহাপাপ আর হইতে পারে না। পরমপিতা পরমেশ্বর সংসারে যত জীব সৃজন করিয়াছেন, প্রত্যেকের প্রয়োজনানুযায়ী পদার্থেরও সৃজন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একজন যদি অযথা প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য দখল করিয়া বসেন, তবে একজনকেও অন্ততঃ অভাব বোধ করিতে হইবে। প্রায়ই দেখা যায়, নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ হৌক, খাদ্য হৌক, পোষাক পরিচ্ছদ হৌক, দাসদাসী হৌক, পাইবার জন্য লোকে প্রাণপাত করিতেছে। এই অতিরিক্তের আকাঙ্ক্ষাই পৃথিবীতে অভাব আনিয়া দিয়াছে। এই অযথা আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে জগতে শান্তির প্রত্যাশা করা বৃথা। প্রত্যেকেই যদি নিজের দৈনন্দিন অভাব পূরণান্তে সাধ্যমত অন্যের অভাব দূরীকরণে চেষ্টা পান, তবে অচিরেই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হয়। আর্য্য ঋষিগণ চিরদিন এই ত্যাগের আদর্শ ছিলেন। তাই তাঁহারা জগৎপূজ্য ছিলেন। সংসারে সুখ সমৃদ্ধও ছিল। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। সকলেই অপরকে বঞ্চিত করিয়া নিজের অধিকার বাড়াইতে সচেষ্ট, কাজেই সখের অভাব কাহারও দুর হয় না। কেহই সুখী নহেন। অথচ ইহারই মধ্যে যিনি অল্পে সন্তুষ্ট, এবং নিজের প্রয়োজনাতিরিক্ত কিছু থাকিলে দশজনকে বিতরণ করেন, তিনিই প্রকৃত সুখী, তিনি চিরশান্তিতে জীবন কাটান। ভোগীর শান্তি নাই, ত্যাগীর শান্তির অভাব হয় না। এই মহাসত্য জানিতেন বলিয়াই প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ শতমুখে ত্যাগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। এখনও ভারতে বহু ক্রোরপতি নিত্য অভাবে জর্জ্জরিত, অথচ সামান্য ধনী অন্ন-বস্ত্র বিতরণ করিয়া শান্তিসুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

ভয়ার্ত্তকে অভয়দান এবং নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দান হইতেই ৪র্থ ও ৫ম নিয়ম বা ধর্ম্মের উৎপত্তি। আমি আর অধিক লিখিয়া আমার প্রবন্ধ বাড়াইতে চাহি না। আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন এই চারিটি সাধারণ প্রবৃত্তি হইতেই লোকের নানা অভাব অভিযোগের সৃষ্টি হয়। সমাজ-শিক্ষকগণ, যাহাতে এই বিষয়-চতুষ্টয় হইতে মানবগণ আত্মকলহে লিপ্ত না হইয়া মিলিয়া মিশিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, তাহার যথাযথ ব্যবস্থা করিতে গিয়াই দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে বিশেষ-বিশেষ নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাই ধর্ম্মশাস্ত্র নামে কথিত। লোকশিক্ষার জন্য ইতিহাস ও কাহিনী দ্বারা উদাহরণ প্রয়োগে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাই নানাবিধ পুরাণ নামে উক্ত। লোক শিক্ষার জন্য অনেক স্থলে মানসিক প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রভৃতির রূপকও ধর্ম্মশাস্ত্রাদিতে স্থান পাইয়াছে। প্রকৃত গুরুর নিকটে তাহার তাৎপর্য্য জানিয়া লওয়া আবশ্যক। নচেৎ সহজার্থ করিতে গিয়া মহাভ্রমে পতিত হইবার সম্ভাবনা। যথাযথ তাৎপর্য্য না বুঝিতে পারিলেই শাস্ত্রবাক্যগুলি জটিল সমস্যায় পরিণত হয়। বিশেষ গবেষণা ও চিন্তা দ্বারা প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেই সমস্ত জলবৎ তরল হইয়া আইসে। বাজে গোঁড়ামি ছাড়িয়া দিয়া সমস্ত বুঝিবার চেষ্টা করিলে,

কিছুই কঠিন হইবে না। নিজে কিছু বুঝিতে না পারিলে এবং নিজের দুর্ব্বলতা অন্যের নিকট প্রকাশে লজ্জা বশতই অনেকে নানাবিধ 'আধ্যাত্মিক', 'স্থূল', 'সূক্ষ্ম' প্রভৃতি আভিধানিক শব্দাড়ম্বর প্রয়োগ করিয়া সহজবোধ্য বিষয়টিকেও জটিল করিয়া তোলেন। আবার অনেক সময় স্বার্থহানির সম্ভাবনায়, বুঝিয়াও সরল ব্যাখ্যা না করিয়া আধ্যাত্মিকতার আশ্রয় লইয়া শ্রোতাকে 'ত্রিপান্তর মাঠে' নিক্ষেপ করেন। বেচারি তার মধ্যে সত্যপথ খুঁজিয়া না পাইয়া বাধ্য হইয়াই অন্ধবৎ গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। ফলে বর্ত্তমানের হিন্দুগণের কথায় ও কার্য্যে কোনও সামঞ্জস্য দেখা যায় না। হিন্দুরা মুখে বলেন, জীব মাত্রেই শিব, কার্য্যে নিজেকে ছাড়া প্রায় সমস্ত জীবকেই হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন। দয়ার তুল্য ধর্ম্ম নাই—মুখে বলা হইতেছে। অথচ নিরাশ্রয় মানবকে পর্য্যন্ত হীনবংশে জাত বলিয়া আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, ঘৃণিত পশুর চেয়েও অবজ্ঞা করিয়া বাড়ীর ত্রিসীমানার বাহির করিয়া দেন। স্ত্রী-কন্যা মাতা-ভগিনীগণকে সর্ব্বথা রক্ষা করা উচিত জানিয়াও, নিজ দুর্ব্বলতায় রক্ষায় অসমর্থ হইয়া, নিগৃহীতাকে সমাজচ্যুতা করিয়া ধর্ম্মের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেছেন। গোপন ব্যভিচার ও ভ্রূণহত্যার প্রশ্রয় দিবেন, অথচ বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করিবেন না। যুবতী সাবিত্রী, সীতা, দ্রৌপদী, এমন কি রজস্বলা (পুত্রবতী) কুন্তী, সত্যবতী (মৎস্যগন্ধা) প্রভৃতির মহিমা শতমুখে গাইবেন, অথচ স্বীয় কন্যা-ভগিনীকে বালিকা বয়স পার হইবার পূর্ব্বেই বিবাহ দিয়া সন্তানের জননী দেখিতে চাহেন। মুখে বলিবেন, 'বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভাবে দেশ মজিতে বসিয়াছে' অথচ গুণ ও কর্ম্মের কষ্টিপাথরে বর্ণের যাচাই করিয়া বর্ণ মানিতে চাহেন না। যেখানে স্বার্থ ছাড়িতে হয়, সেইখানেই শাস্ত্রের কথা মানিয়া লইতে আর চাহেন না। তখন নানা অবান্তর ব্যাখ্যার ধুয়া ধরেন। এ সমস্ত ভণ্ডামীর দিন চলিয়া গিয়াছে। সকলেই নিজ নিজ অধিকার বুঝিয়া লইতে অগ্রসর। নিজের পাওনা আদায় না করিয়া কেহ ছাড়িবেও না, এবং দেনা শোধ না করিয়া দিলেও আর অব্যাহতির উপায় নাই। তাই বলি, যাহার যাহা ন্যায্য পাওনা বুঝাইয়া দিয়া, নিজের যথা-প্রাপ্য অংশে সুখী হইতে চেষ্টা করিলেই জগতে আবার সুখ আসিবে।

হিমালয়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

হে গিরি, কোথায় আজি তব গিরিরাজ,
মায়ের ব্যথার মূর্ত্তি মা-মেনকা আজ
কোথা গেল—কোথা গৌরী শিবসীমন্তিনী—
অচলনন্দিনী উমা—কৈলাশ-বাসিনী ?
সত্যই কি মিথ্যা সব, কবির কল্পনা
ঋষির মানসী মূর্ত্তি—ধ্যানের ধারণা ?
মিথ্যা যদি—সত্য চেয়ে সেই মিথ্যা মোর
জন্ম জন্ম হোক্ কাম্য, তারি মায়া-ডোর
বাঁধুক জীবনে মোর চির-তন্দ্রাজালে ;
মাগিবনা অন্য সত্য কভু কোন কালে।
মিথ্যা যদি—নিত্যশিব বাঁধা তার সাথে ?
সুচির-সুন্দর—সে কি মিলিত তাহাতে !
শিব-সুন্দরের সঙ্গে যে বা সুসঙ্গত
সেই মোর মহাসত্য—বাকী মিথ্যা যত।

হিমালয়, মনে হয়, সবশুদ্ধ তোরে
পারিতাম বক্ষে যদি টানিতে আদরে
আজি এ মাহেন্দ্রক্ষণে ! এত বড় বুক
বেড়েছে আমার, লভি' তব সঙ্গ-সুখ।
মনে হয়, আজ আমি—তোরও চেয়ে বড়,
এত সর্ব্বগ্রাসী স্নেহ হইয়াছে জড়'
আমার এ বক্ষোমাঝে, মিথ্যা ইহা নয়।
এই মুহূর্ত্তের শক্তি লভিয়া সঞ্চয়
তিলে তিলে দিনে দিনে সাধনার বলে
হইত অক্ষয় যদি স্থায়ী পুণ্যফলে,
সম্ভব হইত বুঝি সাধে আজিকার ;
কিন্তু সে কি সাধ্য কভু ! হে প্রিয় আমার !
এই ত নামিয়া গেনু, হৃত সর্ব্ববল ;
ফিরিয়া আসিছে চক্ষে সেই অশ্রুজল।

দ্বন্দ্ব

৩৭

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণের ডায়েরী হইতে—

অমাবস্যা রজনীর গভীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের পর শুক্লা তিথির শশধর যেমন জোছনার সুধাধারায় পৃথিবী প্লাবিত করে তোলে, আমার জীবনাকাশের অমানিশার ঘোর কৃষ্ণ স্তর ভেদ করে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত ফুটে উঠে লীলা তেমনি তার প্রেম ও হাসির কিরণে, আমার এ হতাশ মরুময় জীবন আবার বর্ণে গন্ধে গানে ভরে দিয়েছিল! অনাকাঙ্ক্ষিতকে পাওয়ার তীব্র সুখে অন্তর তখন পরিপূর্ণ—অন্ধের চিরদুঃখ সে সুখের বন্যায় ভেসে গেছে! নিত্য নব নব উৎসবে নবীন জীবনকে বরণ করে নেবার আগ্রহে বাহ্য-জগৎ যেন বিস্মৃতির অতল সাগরে ডুবে গিয়েছিল! হায়! তখন তো জানতুম না সুখের অন্তরালে দুঃখ, হাসির ভিতর অশ্রু, নিয়ন্তার নিয়মে চিরন্তন কাল থেকে চলে আসছে! তাই কি আজ আমার সে জাগ্রত স্বপ্ন মায়ার খেলার মত এক মুহূর্ত্তে শূন্যে মিলিয়ে গেল?

কলকাতায় এসে চক্ষু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ প্রবীণ চিকিৎসকের মত জানলুম। তিনি বল্লেন, এ রকম আরোগ্য হওয়ার দৃষ্টান্ত,তাঁহাদের অভিজ্ঞতায় অত্যন্ত বিরল,—নেই বল্লেও চলে। যা হোক্, এই নূতন দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত সাবধানে রাখতে হবে। চোখের অতিরিক্ত পরিশ্রম, মনের কোন প্রকার উত্তেজনা বা দুঃখ,—এক কথায়, শারীরিক বা মানসিক যে-কোন প্রকার কষ্ট একে নষ্ট করে দিতে পারে। এ সব জিনিস যথাসাধ্য পরিহার করে চলবেন। সুস্থ শরীর, প্রফুল্ল মন, পুষ্টিকর খাদ্য—এই সব সাধারণ স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম মেনে চললে চসমা ব্যবহার করে চিরজীবন দেখতে পাবেন। চলে আসবার সময়ও তিনি আবার ডেকে বারবার সাবধান থাকতে বলে দিলেন। ভেবেছিলুম, আরো দু' এক দিন থেকে বেড়িয়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু আর ভাল লাগলো না। কি যে হয়েছে—লীলাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও একা থাকা যেন অসহ্য বলে মনে হয়। সে যেন দিন দিন আমার জীবনের সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে যাচ্ছে!

কাজ শেষ হতেই পাটনায় ফিরবো বলে হাওড়া ষ্টেসনে চল্লুম। ট্রেন ছাড়তে দেরী ছিল। সামনের প্লাটফরমে একটু পায়চারি কচ্ছি,—হঠাৎ কিরণের সঙ্গে দেখা। সে একটা ছোট সুটকেস হাতে নিয়ে বেগে আস্‌ছিল—বোধ হয় ট্রেন ধরতেই। আমার উপর দৃষ্টি পড়তেই, সে একেবারে অবাক

হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে গেল! হাওড়া ষ্টেসনের প্লাটফরমে আমি একা স্বাধীনভাবে বেড়াচ্ছি—সে বোধ হয় এ ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্ত কেটে গেলে, কিরণ আমার সামনে এসে আমার হাত ধরলে। আমার সৌভাগ্যের কথা বলে তার মনের আনন্দ জানিয়ে সে আমায় অভিনন্দন করলে!

আমি কিন্তু তাকে দেখে সুখী হতে পারলুম না। তার ব্যবহারে পূর্ব্বের সে আন্তরিকতার লেশমাত্র ছিল না। তার মুখের সে সদা-প্রফুল্ল আনন্দময় ভাবের পরিবর্ত্তে যেন একটা অদৃষ্ট-পূর্ব্ব বিষম কঠোরতার ছায়া!

আমার অজ্ঞাতসারে বুকের ভিতর দিয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ঠেলে উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। আমরা দুজনে যে একটি মাত্র নারীকেই ভালবেসেছি! সেই ভালবাসা আমাদের উভয়ের মধ্যে একটা প্রতিবন্ধকের মত ঠেলে উঠে আমাদের সমস্ত হৃদ্যতার অবসান করে দিয়েছে! সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমি বুঝলুম, অন্ধ হবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের উভয়ের যে বন্ধুত্বের আমরা গর্ব্ব করতুম, অন্ধ হয়ে, ও সারা সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধহীন হয়েও, যে বন্ধুত্বের অগাধ স্নেহের শীতল ছায়ায় আমি আশ্রয় পেয়ে জুড়িয়েছিলুম,—সহোদর ভায়ের চেয়েও অধিক সেই স্নেহ, সেই বন্ধুত্ব, এ জীবনে আর কোন দিন ফিরে আসবে না!

কিরণের কথা থেকে বুঝলুম, সে এতদিন ব্রহ্মদেশ ও ভারতের অন্যান্য অংশে শান্তিহীন, বিরামহীন প্রেতের মত তার অশান্ত চিত্তের বিক্ষোভ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সম্প্রতি তার জমিদারী-সংক্রান্ত কোন বিশেষ কাজে প্রয়োজন হওয়ায় সে বাড়ী ফিরছে!

আমার এতদিনের সব কথা সে নীরবে শুনলে, কিন্তু সে লীলার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনলে না। আমি দু' একবার তার সম্বন্ধে কথা বলতে যাওয়ায়, অন্য কথা পেড়ে আমায় থামিয়ে দিলে। তার সেই অসম্ভব রকম কঠিন ও গম্ভীর মুখ দেখে, আমি তাকে তার নিজের বিষয়ে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না!

আমরা দুজনে একই গাড়ীতে উঠলুম। নিজেদের সম্বন্ধে সব কথা শেষ হলে, সাধারণ ভাবে সাময়িক প্রসঙ্গ ও যুদ্ধের কথার আলোচনা করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে এলো!

লীলা আমায় নিয়ে যাবার জন্য গাড়ী নিয়ে ষ্টেসনে অপেক্ষা করছিল। আমায় গাড়ী থেকে নামতে দেখে সে হাসিমুখে চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটে আসছিল। সহসা আমার পিছনে কিরণকে নামতে দেখে সে মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই মধ্যপথে স্তব্ধ হয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় নীল হয়ে গেল! তার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গিয়ে তাকে অসম্ভব রকম সাদা দেখাচ্ছিল। তার সমস্ত দেহের প্রবল কম্পন আমি দূরে দাঁড়িয়েও দেখতে পাচ্ছিলুম! সে দৃশ্য দেখে আমার মনে হলো, চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে ফেলে' আমারও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসছে!

আমার এতদিনের সাজান তাসের প্রাসাদ একটা ফুৎকারে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল! আজ আমি সবই বুঝলুম! সবই নিজের চোখে দেখলুম! ভগবন্, এই দৃশ্য দেখাবার জন্যই কি আমার এতদিনের নষ্ট-দৃষ্টি আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলে! ওঃ! কি প্রতারিত হয়েছি আমি! যে নারী নিশিদিন মনে মনে অন্য পুরুষের ধ্যান করছে, আমি কি না তারই জন্যে—হায়! এ দৃশ্য দেখবার আগে আমি আবার অন্ধ হলুম না কেন?

বুকের ভিতর একটা প্রকাণ্ড আঘাত লেগেছিলো! আমি নিজেও মূর্চ্ছাগ্রস্তের মত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলুম,—কিরণের কণ্ঠস্বরে আমার চৈতন্য ফিরে এলো! সে তখন লীলার কম্পিত হাতখানি ধরে গাড়ীতে তুলে দিতে যাচ্ছিল। আমায় ডাকতে, আমিও নীরবে তাদের সঙ্গে চলুম। লীলার সেই একই ভাব। তার মুখে কথা ছিল না। কিন্তু কিরণ যেন অকস্মাৎ কথায় গল্পে মুখর হয়ে উঠলো!

তার এ চালাকি আজ আমি সবই বুঝতে পারলুম! তার উপস্থিতি লীলাকে যে কি রকম বিচলিত করেছে, তা সে বুঝেছিল! যাতে লীলা সুস্থ হতে সময় পায়, আর তাদের এ ভাবান্তর আমি যাতে না বুঝতে পারি, সেই জন্যই তার এ প্রচেষ্টা!

তার মোটর বাহিরে তাকে নিয়ে যাবার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের মোটরে আমাদের দুজনকে তুলে দিয়ে সে নিজের গাড়ীতে উঠে চলে গেল।

লীলা বোধ হয় আমার এ ভাব লক্ষ্য করেছিল। সে একটু সুস্থ হয়েই তার হাতের উপর আমার হাতখানা টেনে নিয়ে সস্নেহে আমার চোখের কথা জিজ্ঞাসা করলে!

আর চোখ! চোখের কথা তখন আমার মনেও ছিল

না। দারুণ অভিমানে আমার চোখ জলে ভরে এল। অনেক কষ্টে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আমি তার হাত দুটি ধরে জিজ্ঞাসা করলুম—লীলা, সত্য করে বল—আমি তোমার হাত ধরবো, এ কি এখনো তোমার ইচ্ছা হয়?

নিশ্চয়ই! কিন্তু এ কথা কেন বল্লে অরুণ? লীলা এত সহজ ও অকুণ্ঠিত ভাবে কথাটা বলে আমার মুখের দিকে চাইলে, যে, সে সময় আমি আর কোন কথা বলতে পাবলুম না।

শুধু প্রাণপণ আগ্রহে সজোরে তার হাত দুটি জড়িয়ে এমন চেপে ধরে রইলুম, যেন কে তাকে আমাব কাছ থেকে জন্মেব মত ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

সেই দিন থেকে আমার মনের সমস্ত সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়ে সর্ব্বদা যেন একটা বিষের দাহন আরম্ভ হল। যখন আমি জেনেছিলুম, কিরণ লীলাকে ভালবাসে, তখন আমাব তার উপব কোন বাগ বা ঈর্ষা ছিল না। কিন্তু ষ্টেসনে সেদিন লীলার অবস্থা দেখে পর্য্যন্ত আমার ধারণা হল, লীলাও কিরণকে ভালবাসে! না হবেই বা কেন— তারা দুজনে বহুদিন থেকে দুজনের বন্ধু,—সকল দিক থেকেই তারা দুজন পরস্পবেব উপযুক্ত। কিন্তু কথাটা এই— কিরণ লীলার—লীলা কিরণের—এই যদি হয়, তবে এদের মাঝখানে আমি কে? আমি তবে কোথায় দাঁড়াই!

এক এক সময় আমার মনে হত, আমার জন্য তারা উভয়েই হয় ত কষ্ট পাচ্ছে, আমার উচিত এখন নিজে থেকে সরে দাঁড়িয়ে লীলাকে তার সর্ত্ত থেকে মুক্তি দেওয়া। যদি আমি এ সংকল্প-মত কাজ করতে পারতুম, তাহলে সেটা খুব ভালই হত। কিন্তু আমায় প্রচণ্ড ঈর্ষার তাড়নায় অন্তরের এ উদারতা বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। লীলাকে কিরণের হাতে তুলে দেবার কথা মনে হলেই আমার ভিতরকার সমস্ত পৌরুষ গর্জ্জন করে উঠতো! লীলা স্বেচ্ছায় এসে আমার কাছে ধরা দিয়েছে, সে আমার বাগ্দত্তা পত্নী, তার উপর সব দিক থেকে আমার অধিকার পূর্ণতর, আমি তাকে কার খোস-খেয়ালের জন্য অপরের হাতে তুলে দিতে যাব?

বাড়ী এসে সেদিন তাকে সে কথা বল্লুম,—তোমার কিরণকে দেখে যে অবস্থা হলো, আমি যে সে দৃশ্য দেখে কি আঘাত পেয়েছি, সে তোমায় না বলাই ভালো। এক জনের বাগদত্তা পত্নী যদি অন্যের সম্বন্ধে এ ভাব পোষণ করে, তার ভাবী স্বামীর সেটা কি রকম লাগে—সে আমিই বুঝেছি; আমি তোমাকে কোন শক্ত কথা বলতে চাই না লীলা, কিন্তু সেদিন আমার মনে হল, আমি যদি আবার অন্ধ হয়ে যেতুম, ত ভালই হত!

তার মুখে তীব্র বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠলো! সে শিউরে উঠে বলে উঠলো—ছি! অরুণ! অমন কথা আর কখনো মুখে এনো না! তার পর সে খুব সরল ভাবেই বল্লে—বাস্তবিক—সেদিন অতর্কিতভাবে তাকে দেখে কেন যে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লুম, তা নিজেই বুঝতে পাচ্ছি না! কিন্তু অরুণ! আমাব উপর কি তোমার এতটুকুও বিশ্বাস নেই? এই সামান্য বিষয় নিয়ে তুমি কি করে এত অসম্ভব সব কথা ভাবলে?

আশ্চর্য্য! সে যখন আমার কাছে থাকে, তখন তার মুখ দেখে, তার কথা শুনে আমার মন পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন আমার বিশ্বাস হয়—সে আমারই; আমি হিংসায় অধীর হয়ে তার সম্বন্ধে এই সব বিরুদ্ধ ভাব পোষণ কচ্ছি!

আমি সেই মুহূর্ত্তে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে বল্লুম, মাপ করো লীলা! আমি হয় ত বড় অকৃতজ্ঞ! হয় ত এ সবই আমাব কদর্য্য মনের দোষ! আমি কিন্তু আগে এ রকম ছিলুম না। এখন যে একটুতেই আমার আঘাত লাগে সে শুধু তোমায় অত্যন্ত ভালবাসি বলে! আর কেউ তোমায় আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে—এ চিন্তাও যেন আমায় পাগল করে তোলে!

লীলা বল্লে,—কেউ আমায় তোমার কাছ থেকে নিতে পারবে না অরুণ! তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক!

লীলা মুখে যাই বলুক, আমি কিন্তু তাকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি—কিরণ আসবার পর থেকে সে যেন দিন দিন অবসন্ন ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছিল। এতদিন সে প্রায় সর্ব্বক্ষণ আমারই কাছে কাছে থেকে, আমার বই পড়া শুনে, বেশ আনন্দে ও স্ফূর্ত্তিতেই কাটাতো। এখন আর তার সে প্রফুল্লতা দেখতে পাই না। সে যেন সব সময়ই কেমন উন্মনা—সর্ব্বদাই যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব!

আরো একটা বিষয় প্রায়ই আমার চোখে ধরা পড়তো,— লীলা কিছুতে কিরণের সঙ্গে মিশতে বা দেখা করতে চাইত না। পাছে তার সঙ্গে হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায়, তার জন্য সে সর্ব্বদা বিশেষ চেষ্টা করে সতর্ক হয়ে

চলে। হয় ত সে আমার জন্তই এত সাবধান হয়ে থাকে, হয় ত তাকে কিরণের সঙ্গে দেখলে আবার আমার মনে ঈর্ষা জেগে উঠবে, সেই আশঙ্কা তাকে প্রতিনিয়ত এ-ভাবে দূরে দূরে রাখতো। কিন্তু সে জানে না, যে, তার এই অতি সতর্কতাই আমায় প্রতি দিনে প্রতি পলে অন্তরের অন্তর মধ্যে তুষানলের জ্বালায় জ্বালিয়ে তুলছে! নিশিদিন এই সংশয়—এই ঈর্ষা—আমায় যেন পাগল করে তুলছিল। আমার লেখাপড়া, আমার রচনা, আমার মনের শান্তি সবই এই সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, লীলা কিরণের সঙ্গে কোন্ ভাবে চল্‌লে আমি সুখী হই, তা আমি নিজেই জানি না। যখন সে তার সঙ্গ ছেড়ে তফাৎ হয়ে থাকতো, তখন দেখে দেখে আমার যেন গাত্রদাহ হত—কেন, সে তাব আর পাঁচটা পুরুষ-বন্ধুর সঙ্গে যেমন করে মেশে, গল্প করে, টেনিস খেলে, কিরণের সঙ্গে তেমনি সরল ভাবে মিশলেই ত হয়! আমি কি তাকে সে ভাবে মিশতে বারণ করেছি যে, সে সর্ব্বক্ষণ তাকে পরিহার করে চলছে? সে যে তার সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবহার করে, তা থেকেই ত মনে হয় যে, কিরণের সঙ্গে আর সবাইয়ের মত তার শুধু বন্ধুত্বের সম্বন্ধই নয়! সে নিশ্চয়ই কিরণকে অন্ত সবার চেয়ে বিশেষভাবে দেখে—না হলে তার সঙ্গে সহজ ভাবে মেশে না কেন?

আবার যদি কখনো দৈবাৎ তাদের দুজনকে আমি কাছাকাছি দেখতে পেতুম, যদি তারা নিতান্ত সাধারণ ভাবে দু একটা কথা বলছে—বা কোন কথার ছলে হাসছে, এ দৃশ্য যদি আমার চোখে পড়তো, অমনি যেন আমার শরীরের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ফুটতে থাকতো, মাথার শিরা সব দপ্ দপ্ করে জ্বালা করতে থাকতো, একটা ভীষণ জিঘাংসায় ও প্রচণ্ড আক্রোশে কিরণকে ছিঁড়ে ফেলবার উদ্দাম বাসনা আমাকে তখন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পাগলের মত করে তুলতো। তার সঙ্গে আমার এতদিনের বন্ধুত্ব, তার আমার প্রতি এত স্নেহ-ভালবাসা—সে সবই তখন মন থেকে মুছে গিয়ে, কেবল ভীষণ প্রতিহিংসা ও রাগ যেন আমায় রক্তপিপাসু দানবের চেয়েও ভীষণতর দুর্দ্দম করে তুলতো! এ কি হলো? আমার এ যে কি ভয়ানক অবস্থা হলো—আমি কিছু বুঝতে পারতুম না।

লীলার আদরে ও ভালবাসায় ভুলে গিয়ে আবার যখন আমি প্রকৃতিস্থ হতুম, তখন আমার নিজের অন্তরের পরিচয় পেয়ে ভয় ও ভাবনায় আমায় বিমর্ষ করে দিত। আমি কি অবশেষে এমন ভয়ানক স্বার্থপর—নরাকারে ঘোর হিংস্রক রাক্ষসে পরিণত হলুম? আমার এতদিনের এত উচ্চ শিক্ষা, সাধনা, সংযম, ভদ্রতা—সে সবের অবশেষে এই চরম ফল ফললো? আমার ভিতরে এমন দানবীয় প্রকৃতি, এত হিংসা—এত দিন কি করে সুপ্ত হয়ে ছিল?

লীলার আমার কাছে যাওয়া-আসা, আমার কাছে থাকা—সবই দিন দিন সংক্ষেপ হয়ে আসছিল। আগে সে দিনের বেশির ভাগ সময় আমার কাছেই কাটাতো। এখন অনেক সময় দিনান্তে একটিবারও তার দেখা পাওয়া দুর্লভ হয়ে উঠেছে। যদি বা কখনো আসে, খানিক বসেই ব্যস্ত হয়ে উঠে যায়!

আমার ভাগ্যে শান্তি-সুখ হবে না, এবার তা ভাল করেই বুঝতে পাচ্ছি! কিন্তু আমার অবস্থা এমনি হয়ে উঠেছে, যে, লীলার আশা ছাড়াও আমার পক্ষে অসম্ভব! কেবল আমার মনে হয়—কোন রকমে আমাদের বিবাহ চুকে গেলে, তাকে এই সব সংস্রব থেকে একবার দূরে নিয়ে যেতে পারলে বাঁচি! আমার খুব বিশ্বাস, সে কিছুদিন শুধু আমার কাছে থাকলেই, এ সব ভুলে আবার আবার প্রফুল্ল হয়ে উঠবে!

সেদিন বিকেলে বসে বসে এই কথাটাই ভাবছিলুম। টেবিলের উপর আমার উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়ে ছিল, তাতে আর মন লাগছিল না। লীলার সঙ্গে না হলে আজকাল আর আমার কোন কাজই হতে চায় না। সে আজকাল আর এ সবে মন দিতে পারে না,—তাই আমারও সব উৎসাহ কমে গেছে!

লীলা এসে আমার কাছে বোসল। কয়দিন আমি তার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিনি। যদি আমার সঙ্গ তার ভাল না লাগে, তো মিছে জোর করে আর কি হবে?

কিন্তু আজ আমার মনে তার এ উপেক্ষা বড়ই বাজছিল। তাই থাকতে না পেরে বল্লুম,—আজকাল তুমি প্রায়ই আমার কাছ থেকে দূরে থাক! আমি অবশ্য সেজন্য তোমায় কিছু বলছি না,—তুমি সুখী আছ

জানলেই আমি সন্তুষ্ট থাকি। তবে এক এক সময় মনে হয়, তোমার বুঝি আর আমায় ভাল লাগছে না!

লীলার মুখ ম্লান হয়ে গেল। সে বল্লে—তুমি এ-সব কথা কি করে ভাব, অরুণ? তোমার সঙ্গে আমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ। এ কি ছেলেখেলা, যে, দু'দিন ভাল লাগলো—তিন দিনের দিন ভাল লাগলো না—তফাৎ হয়ে গেলুম? দেখ দেখি—যত সব বাজে কথা ভেবে ভেবে এই কদিনে কি রকম রোগা হয়ে গেছ?

লীলা আমার মাথাটা তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে কপালে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

তার স্পর্শের মধ্যে কি কিছু মায়ামন্ত্র আছে? তার প্রতি আমার মর্ম্মান্তিক সন্দেহ, আমার নিজের মনের দুর্নিবার জ্বালা—সব যেন এই মধুর স্পর্শে ও আদরে জুড়িয়ে গেল!

সে যখন আমার কাছে থাকে, আমি যেন তখন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ হয়ে যাই! তাকে কাছ থেকে তফাৎ হলেই যত সব অসম্ভব কল্পনা ও অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথার মধ্যে গজিয়ে ওঠে। আমার মনের এই সহজ ভাষাটা সে যদি এমনি করে বুঝতো!

খানিক চুপ করে থেকে লীলা বল্লে,—আমার মনটাও কদিন থেকে ভাল নেই অরুণ। বীণা একটা অত্যন্ত মন্দ লোকের সঙ্গে মিশছে! তাকে সেই লোকটার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমি বড় ব্যস্ত আছি। সেই জন্য তোমার কাছে থাকতে সময় পাই না। মেয়েরা সে লোকটার কাছে শুধু খেলার জিনিস। বীণা বড় দুর্ব্বল—তার জন্য আমার ভয় হয়।

আমি বল্লুম, বীণা যে প্রকৃতির মেয়ে, আর সে যে ভাবে চলে, তাতে তার বিপদে পড়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আমি যে তোমা ছাড়া থাকতে পারি না। তুমি এই সব কাজে চারিদিকে ব্যস্ত থাক, আর একলা থেকে থেকে আমার মন খারাপ হয়ে যায়,—কত সব অদ্ভুত অসম্ভব কথা মাথায় আসে। তুমি আর তোমার চিন্তা আমায় সর্ব্বক্ষণ জাগ্রত স্বপ্নে ঘিরে আছে! আমি শুধু একটি মাত্র আশা ও চিন্তায় বেঁচে আছি—কবে আমি তোমায় এখান থেকে ও এখানকার সকলের কাছ থেকে নিজের স্ত্রী বলে জোর করে বাড়ী নিয়ে যেতে পারবো!

লীলা একটা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—সেদিনটা এলে আমিও এ সব ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচি! আমার শরীর মন ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছে। তবু আমার এমনি স্বভাব—কাজ হাতের কাছে থাকলে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। ভাল কথা—কাল সকালে আমি তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাব না অরুণ! কাল আমাকে একবার এখানকার জেনানা-মিশনের কর্ত্রী মিস নেল্‌সনের কাছে যেতে হবে।

কাল সকাল থেকেই লীলা আবার কোথায় যাবার বন্দোবস্ত করছে? কথাটা ভাল লাগলো না! বল্লুম—কেন? সেখানে কি দরকার?

লীলা তার উত্তরে এক অদ্ভুত গল্প আমায় শুনিয়ে শেষে বল্লে,—জোছনার দুর্গতি আমায় বড় আকুল করে তুলেছে। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে মিশনের আশ্রয়ে রেখে আসতে পারলে আমি এখন নিশ্চিন্ত হই। সেই বিষয়ে কথা স্থির করতে কাল আমি মিস নেল্‌সনের কাছে যাব।

আমি আর কিছু না বলে চুপ করে রইলুম। বিশ্বসংসারের সকল ভার, সকল বোঝা সামলাবার কাজটা কি একা লীলার ঘাড়েই পড়েছে? আশ্চর্য্য মেয়ে যা হোক্! যে দুনিয়াশুদ্ধ লোকের কথা নিয়ে অহরহ মাথা ঘামিয়ে বেড়াচ্ছে, তার মনে আমার জন্য স্থান কতটুকু? আমার কথা ভাববার তার অবসরই বা কোথায়?

আজ যেমন সে জোছনার কথা শুনে অযাচিত ভাবে তার মঙ্গলের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে, প্রথম প্রথম আমার কথা শুনেও এমনি করে সে আমার কতটুকু ভাল করতে পারে, তাই দেখতে আমার কাছে গিয়েছিল! আমি আজ বেশ বুঝছি, এর মধ্যে হৃদয়ের সম্বন্ধ কোন দিনই ছিল না—থাকবেও না! আমার একান্ত আগ্রহে, আমায় নিতান্ত অসহায় দেখে, সে শুধু দয়া করে এ বিবাহে মত দিয়েছে! তার মনের আসল টান যে কোন্ দিকে—সে কি জানতে আমার আর বাকি আছে?

সমস্ত রাত ভাল করে ঘুম হলো না। শুয়ে শুয়ে শুধু ভাবছিলুম,—খামকা একটা খেয়ালের মাথায় আমার সঙ্গে এ মিথ্যা অভিনয় করবার লীলার কিছু কি দরকার ছিল? আমি ত সংসারের সঙ্গে সব দেনা-পাওনা চুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই বসেছিলুম! আমার সে সময়কার আশাহত উদাস চিত্তে বাসনার কোন লক্ষণ, কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাই

ছিল না ত। নিয়তি আমার ভবিষ্যতের জন্য যে জীবন নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিল, সেই জীবনে নিজেকে অভ্যস্ত করে নেবার প্রাণপণ সাধনায় আমি যখন কৃতকার্য্য-প্রায় হয়েছি, তখন লীলা গিয়ে আবার আমার প্রাণে নতুন সুখ, নতুন আশা জাগিয়ে সংসারের পথে টেনে নিয়ে এলো। আমি ত তাকে জানতুম না, আমি ত তাকে কোন দিন চাইনি! আজ আমি যে মর্ম্মবেদনা ও হিংসার তাড়নায় অধীর হয়ে উঠেছি, এর মূল ত সে নিজেই! তখন নিজের একটা খেয়ালের বশে আমায় অত আশা দিয়ে ফিরিয়ে এনে আজ সে আমার সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছে! তার কারণ এখন সে বেশ বুঝেছে আমি এখন সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে! আমি যতই রাগ করি, যতই যা করি, তাকে ছেড়ে যাবার আমার সাধ্য নেই! ভগবন্! এই নারী জাতটাকে তুমি কি দিয়েই যে সৃষ্টি করেছিলে! এদের কি মায়া দয়া বলে, হৃদয় বলে কোন জিনিস নেই? মানুষের জীবন, মানুষের সুখ-দুঃখ এদের কাছে শুধু খেলা করবার জিনিস? হা!

ভেবে ভেবে ও রাতে ঘুম না হয়ে মাথার মধ্যে—চোখের ভিতর বড় যন্ত্রণা হচ্ছিল! শিরগুলো সব টন্ টন্ করতে লাগলো! ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া দিতেই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লুম!

মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে বেড়াতে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়া গেল। বাড়ী বসে বসে করবই বা কি? একলা বসে বসে অনর্থক কতকগুলো ভাবনা ছাড়া আর ত কোন কাজই নেই! কেনই যে বৃথা এখানে থেকে মিঃ রায়ের অন্ন ধ্বংস করছি, তাও জানি না।

অনেক দূর পর্য্যন্ত একলা হেঁটে হেঁটে চলে গেলুম! সকালের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে শরীর ও মন যেন অনেক হাল্কা বোধ হলো! একটু রোদ চড়তেই বাড়ী ফেরবার জন্য মন ব্যস্ত হয়ে উঠলো! লীলাও হয়ত এতক্ষণ বাড়ী ফিরেছে! এত যে দুর্গতি হচ্ছে, তবু-রাতদিন মনে লীলার কথাই জাগতে থাকে!

বাড়ার কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালুম! রাস্তার ধারে মোড়ের মাথায় লীলা ও কিরণ পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে গল্প করতে করতে আসছে! তারা আমায় দেখতে পায়নি! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠলো! তাল সামলাতে আমি পিছিয়ে এসে একটা গাছের উপর মাথাটা রাখলুম! তারা আমার পাশ দিয়ে মৃদু কদমে ঘোড়া চালিয়ে চলে গেল!

আমি প্রথমটা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম! আমার বাগদত্তা পত্নী—আমার এতদিনের বিশ্বস্ত বন্ধু—তাদের এই কাজ! এইজন্য আমায় ভুলিয়ে রেখে অন্য যায়গায় যাবার নাম করে তারা দুজনে পূর্ব্বের কথামত এখানে এসে মিলিত হয়েছে! লীলা—যাকে স্বর্গের দেবী বলে আমার এত দিন ধারণা ছিল,—সেও যদি নিতান্ত চপল-প্রকৃতি সাধারণ মেয়ের মত এই জঘন্য প্রতারণা আর ছলনার খেলা খেলতে পারে, তবে আর আমার জীবনে ফল কি? এমন পাপের সংসারে থেকে অহরহ চাতুরী ও মিথ্যার মুখোস পরে এ বীভৎস অভিনয় করবার জন্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরা শতগুণে ভালো! আমি সেই গাছতলায় সংজ্ঞাশূন্যের মত বসে পড়লুম! বাড়ী ফিরতে আর ইচ্ছা ছিল না—ফিরেই বা হবে কি? তার সঙ্গে দেখা হলেই, আমি কোন কথার মধ্যে এ কথা তাকে বলে ফেলবো, আর সে তখনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে, আদর করে, দু'কথায় আমায় ভুলিয়ে দেবে—এই ত? এ-সব ত এতদিন যথেষ্ট হলো—আর কেন?

ধীরে ধীরে আমার ক্লান্ত অবসন্ন অন্তরে আবার সেই আগের মত উদাস ভাবের ছায়া ঘনিয়ে আসছে! অনেক দিনের অনেক বোঝা, অনেক জঞ্জাল জীবনের সঙ্গে জট পাকিয়ে গিয়েছে। হৃদয় আমার তার ভারে রক্তাক্ত, ক্ষত-বিক্ষত। ভগবান্—এবার আমায় মুক্তি দাও! এ ব্যর্থ জীবনের বোঝা আর আমি বইতে পাচ্ছি না!

সংসারে এসে মানুষ সুখের আশায় কেবল তৃষিত অন্তরের বুকফাটা পিপাসায় মরীচিকার পিছনে উন্মাদপ্রায় হয়ে ছুটতে থাকে,—তৃষ্ণা কিন্তু তার কখনো মিটলো না! কি করেই বা মেটে? এখানে কিই বা পাবার মত আছে—যা সে পেতে পারে? স্নেহ, দয়া, মায়া—ও-সব কথার কথা! জননীর স্নেহ, বন্ধুর বিশ্বস্ত ভালবাসা, স্ত্রীর নিঃস্বার্থ প্রেম—এসব বড় বড় কথা কাব্যে, সাহিত্যেই লাগে ভাল। এ সবের উপর, রং ফলিয়ে অনেক কথার জাল বুনে বুনে, বেশ একটা চমৎকার উপভোগ্য বিষয় রচনা করা যেতে পারে,—কিন্তু বাস্তব জীবনে এ সবের মূল্য কতটুকু?

প্রত্যেক মানুষই তার জীবন দিয়ে এ কথার সত্যতা অল্প-বিস্তর বুঝেছেই; তবু তাদের কেমন যে স্বভাব—এই বড় কথাগুলো বলা চাই-ই। আমি কিন্তু এর আগাগোড়াই ভুয়োবাজি বলে বুঝেছি। জীবন ভোর যে তৃষ্ণায় মন জ্বলতে লাগলো—কথনো সে জ্বালার শান্তি ত হলো না। কোন দিন কোন কিছুই পেলুম না।

কিন্তু কোন দিনই পাই নি কি? একবার হয় ত কিছু পেয়েছিলুম—তবে তার মর্য্যাদা ত আমি রাখি নি। হয় তো বা তারি ফলে আমার আজ এ দশা! লিজির কথা মনে হলেই আমার মনে হয়—যেন সুদূর সমুদ্রপার থেকে সে সেই বিদায়-দিনের সন্ধ্যার শিশিরাপ্লুত শতদলের মত অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে! কিন্তু তার কথা আজ আর ভেবে কি হবে?

তারা এতক্ষণ হয় তো বাড়ী ফিরে গেছে! আমার এত দেরি দেখে লীলা কি ভাবছে কে জানে? আমার প্রতি তার সত্য মনের ভাবটা কি, তা যদি একবার নিশ্চিত জানতে পারতুম! কত দিন কতবার এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেছি, কোন দিনই স্পষ্ট উত্তর পাই নি। সে খালি আমায় ভালবাসি বলে ভুলিয়ে রাখতে চায়! অথচ এখনো সে যে কিরণকে ভুলতে পারে নি, মনে মনে যে সে এখনো তার প্রতিই অনুরাগিণী—তা তো প্রতি পদেই বোঝা যাচ্ছে!

মনের এই দ্বন্দ্ব নিয়ে, সর্ব্বক্ষণ সংশয়ের জ্বালায় সুখ-শান্তি সব বিসর্জ্জন দিয়ে সংসার আঁকড়ে পড়ে থাকা আর পোষায় না। নিজের ভাগ্যের ফল নিজেরই নীরবে সহ্য করা উচিত। আমি আর এই সব নিয়ে বোঝাপড়া করে অন্যের শুদ্ধ শান্তি নষ্ট করতে চাই না।

তখন সেই নবীন প্রভাতে, উদাস চিত্তে উদাস ভাবে এই সব কথা ভাবতে ভাবতে আমার অভিমান-ক্ষুব্ধ অন্তরে বার বার কেবল এক কথাই উদয় হতে লাগলো—আজকের এই মধুর প্রভাতে এমনি নির্জ্জনতার মধ্যে এখনি আমার এ ব্যর্থ জীবনের অবসান হোক্! (ক্রমশঃ)

তিব্বত-পর্য্যটকের ডায়েরী

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় বি-এ, বি-টি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

নবেম্বর ১২

অস্পষ্ট পদচিহ্ন ধরিয়া চড়াই পথে এখন অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কতিপয় ভারতীয় শস্যক্ষেত্র ও লিম্বুদের কয়েকটি জীর্ণ কুটীর পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা পথ চলিতে লাগিলাম। মাত্র একজন স্ত্রীলোকের সহিত আমাদের পথে সাক্ষাৎকার ঘটিল। তাহার মস্তকে একঝুড়ি বন্য বদরী। দিবা দুই ঘটিকার কালে আমরা শৈল-শৃঙ্গে উপনীত হইলাম। আমাদের দক্ষিণ-ভাগে শৈল-সীমান্তে চ্যাঙ্গা চেলিং মঠ, অদূরে পথিপার্শ্বে শৈবালাবৃত প্রাচীন পবিত্র স্তূপ।

অতঃপর সুনিবিড় ওক ও দেবদারু বন অতিক্রম করিয়া বিচুটি ঝোপের ভিতর দিয়া পথ চলিতে চলিতে দুই ঘণ্টার পর টেইল নামক পল্লীতে পৌঁছিলাম। এ স্থলে ন্যূনাধিক বিশটী বাড়ী দেখিতে পাইলাম। বাড়ীর চৌদিকে কয়েকটি মহিষ, শূকর ও ঘোটক, এবং অনেকগুলি গরু ঘাস খাইতেছে। এখানে গ্রামবাসিগণ দেশীয় মদ্যের বিনিময়ে আমাদের নিকট হইতে লবণ লইতে আসিল। অক্টোবর মাসের দারুণ তুষারপাত হেতু ইয়াংপঙ্গের লবণ-ব্যবসায়ীরা সেই অঞ্চলে আসিতে পারে নাই বলিয়া, লবণ তথায় মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আমাদের নিকট প্রয়োজনাতিরিক্ত লবণ না থাকায় তাহাদিগকে বিমুখ করিতে হইল।

নবেম্বর ১৩

তৈইল পল্লীর ভিতর দিয়া আমরা রিঙ্গবী নদীর অভিমুখে পথ চলিতে লাগিলাম। রিঙ্গবী কালাইু নদীর মতই খরস্রোতা। ইহার উপর একটি সুদৃঢ় বংশ-সেতু নির্ম্মিত রহিয়াছে। নদীটি যে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা স্বল্প-পরিসর, তথায় কয়েকটি বাঁশ ফেলিয়া উহা পার হইলাম। উক্ত

গ্রামের উত্তর-পশ্চিম দিকে সমান্তরাল শৈলমালার উপর নাম্বুরা গ্রাম অবস্থিত। আমরা নদীর তীর দিয়া লোকের পদচিহ্ন অনুসরণ পূর্ব্বক আঁকা বাঁকা পথে পাঁচ মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলাম। তৎপরে নাম্বুরা পল্লীর একটু নিম্ন দিকে পুনরায় রিঙ্গবী পার হইয়া দক্ষিণ তীরে উঠিলাম। এখন একটি সরলোন্নত শৈল-পার্শ্ব দিয়া আমাদের পথ। পিচ্ছিল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে আরোহণ করিতে আমাদের কি বিষম কষ্টই না হইয়াছিল। প্রস্তরের ফাঁকে ফাঁকে পা দিয়া, লতা ও তৃণগুচ্ছ হস্তে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া, আমরা অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তৎপরে নদী-প্রবাহ অনুসরণ করিতে করিতে পার্ব্বত্য পথে রিঙ্গবী গ্রামের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের নিকট হইতে বহু সহস্র মাইল উর্দ্ধে পর্ব্বত-পৃষ্ঠে অবস্থিত তৈইল, নাম্বুরা এবং আরো কতিপয় গ্রাম দেখা যাইতেছে।

একটি বিশাল শিলাস্তূপের নিম্নদেশ দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। আরো নিম্নে বহু-নালা-বিশিষ্ট এক স্রোতস্বতী। কয়েকটি বাঁশ ও কাঠের মইয়ের সাহায্যে নদীটি উত্তীর্ণ হইলাম। একবার উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পাহাড়ের এক ফাটলে কয়েকটি আহারযোগ্য মসলাপূর্ণ (pheasant) পাখী ও লোহিত-বস্ত্র-নির্ম্মিত একটি তিব্বতীয় সার্ট পড়িয়া রহিয়াছে। কোন শিকারী এইগুলি এভাবে লুকাইয়া রাখিয়া থাকিবে। এ স্থানের জঙ্গলে অসংখ্য চিত্রিত-পক্ষ বিহঙ্গ ও নানাবিধ pheasant পাখীর বাস। শিকারীরা শিকার উদ্দেশে সতত তথায় যাতায়াত করিয়া থাকে; এবং মসলায় পক্ষীর উদর পূর্ণ করিয়া সেগুলি দার্জিলিঙে লইয়া গিয়া বিক্রয় পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

আর এক মাইল পথ চলিবার পর আমরা রিঙ্গবী গ্রামে পৌঁছিলাম। ইহা সুরম্য সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। পশ্চাতেই ভগ্নশিলা-পরিপূর্ণ পাহাড়। উত্তর ও পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া রিঙ্গবী নদী কুলু কুলু রবে অনেক নিম্নদেশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বন্য কদলী, বৃহৎ বেতসবন, অগণ্য দেবদারু ও ওক বৃক্ষশ্রেণীতে তটিনীর দুই কূল আবৃত রহিয়াছে। এখানে লিম্বুদিগের গুটিছয় বাড়ী দেখিতে পাইলাম। ইহারা ধান্য, ভারতীয় শস্য, মারোয়া ভুট্টা প্রভৃতি ফসলের চাষাবাদ করিয়া থাকে।

ভৃত্য ফুরচুঙ্ মাটিতে বোঝা নামাইয়া তাহার পরিচিত এক বাড়ী হইতে আমার জন্য কয়েক বোতল বীয়ার মদ্য কিনিতে গেল। তাড়াতাড়ি সে তিন বোতল মদ্য লইয়া ফিরিয়া আসিল। এই তিনটার একটি যে তাহারই প্রাপ্য, সে তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। নদীর কূলে সমতল ক্ষেত্রের উপর আমাদের তাঁবু খাটান হইল। আমি কম্বল বিছাইয়া আরামের সহিত লম্বভাবে শুইয়া পড়িলাম। পথ-ক্লান্তি তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া গেলাম। ভৃত্যেরা নানা দিকে ছুটিল,—কেহ জ্বালানি কাঠের অন্বেষণে গেল, কেহ বন্য তরকারী সংগ্রহে রওনা হইল, আবার কেহ সান্ধ্য আহারের জন্য শাক-সবজী ক্রয় করিতে বাজারে গমন করিল। তখন প্রকৃতি নিস্তব্ধ; কিন্তু নিম্নস্থ তটিনীর কলকল ধ্বনি সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছিল। অতীতের চিন্তা ত্যাগ করিয়া আমার মন ভবিষ্যতের চিন্তায় মগ্ন হইল। শীঘ্রই আমার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া পড়িল, আমি সুষুপ্তি সম্ভোগ করিলাম।

নবেম্বর ১৪

সেদিন প্রভাতে আকাশ মেঘমুক্ত ছিল। চতুর্দ্দিকের দৃশ্য কি মনোরম! শৈল-শোভা সন্দর্শনে অভ্যস্ত হইলেও আমার নেত্রযুগল এই স্বভাব-সৌন্দর্য্য অবলোকনে একটু ক্লান্ত হইল না। খাদ্য-দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য ফুরচুঙ্কে নাম্বুরা গ্রামে পাঠাইয়াছিলাম। তাহার অপেক্ষায় আমরা কয়েক ঘণ্টা কাল বৃথাই বসিয়া রহিলাম। দুপুরের মধ্যেও সে ফিরিল না দেখিয়া সেদিন বাহির হওয়ার আশাটা একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম। বৈকালে সে রাশিকৃত তণ্ডুল, ভুট্টা, ডিম্ব এবং তরিকারী মাথায় করিয়া ও চারি টাকা মূল্যে ক্রীত একটী ভেড়ী সঙ্গে লইয়া আসিয়া হাজির। ফুরচুঙ্ সেদিন অতিরিক্ত সুরাপান করিয়াছিল; কিন্তু সে নিজের অন্যায়টা বেশ বুঝিতে পারিয়া আমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। অসংখ্যবার আমাকে সেলাম করিয়া এবং তিব্বতীয় প্রথানুসারে মুখ হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া দিয়া সে আমাদের দৃষ্টির অন্তরাল হইল।

এ স্থানেও কতিপয় লিম্বু আসিয়া এক প্রকার রঞ্জন-লতার বিনিময়ে কিঞ্চিৎ লবণ প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইল। উক্ত লতা তথায় প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। লিম্বুরা উহা সংগ্রহ করিয়া আটি বাঁধিয়া আনিয়াছিল। যাহা হউক,

এবারও আমরা ইহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে অসমর্থ হইলাম।

ফুরচুঙের তথাকার জনৈক লিম্বু বন্ধু এক উদ্বাহ-উৎসবে যোগদানার্থ সে দিন দূরবর্ত্তী গ্রামে গমন করিয়াছিল। ফুরচুঙ্ দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, এই বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিলে, সেও কত প্রয়োজনীয় কার্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া ইহাদের সবিশেষ সাহায্য করিতে পারিত।

লিম্বুদের বিবাহ-ব্যাপার বড় অদ্ভুত ও কৌতূহলোদ্দীপক। কেহ কেহ বিবাহের কালে জ্যোতিষীর পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে। বিবাহের অভিলাষ জন্মিলে যুবক-যুবতীগণ মাতা-পিতার মতের অপেক্ষা না করিয়াই নিকটস্থ কোন বাজারে মিলিত হয়। সেখানে একে অন্যকে রস-সঙ্গীতের দ্বারা পরাজিত করিবার চেষ্টা করে। প্রতিযোগিতায় পুরুষ পরাস্ত হইলে লজ্জায় অধোবদন হইয়া চলিয়া যায়। আর জয়লাভ করিলে কোনরূপ আচার-অনুষ্ঠান ব্যতীতই যুবতীকে হস্তে ধারণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। সাধারণতঃ যুবতীর একজন সহচরীও তদ্‌সঙ্গে গমন করিয়া থাকে। কন্যার সুকণ্ঠের বিষয় পুরুষ পূর্ব্বেই অবগত থাকিলে, কখন কখন এই সহচরীকে ঘুষ দিয়া বশীভূত করা হয়। কারণ প্রতি-যোগিতায় রায় দিবার ভার এই সঙ্গিনীর উপরই ন্যস্ত।

পত্নী লাভের অপর প্রকার পদ্ধতিও প্রচলিত আছে। তদনুসারে বর কন্যার পিতৃগৃহে গমন করিয়া কন্যার মনো-রঞ্জন পূর্ব্বক তাহার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। এক্ষেত্রে সেই গৃহবাসিনী কন্যার কোন নিকট আত্মীয়কে শূকরের মৃতদেহ উপঢৌকন দিয়া তথায় অবাধ প্রবেশের অধিকার লাভ করা হয়। বর ধনাঢ্য হইলে বিবাহের দিন একটি মহিষ বা শূকর বধ করিয়া কন্যার পিতামাতাকে উপহার দিয়া থাকে। পশুটির কপালে এই সঙ্গে আবার একটি দেশীয় মুদ্রাও সংবদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে কন্যা যত দিন পর্য্যন্ত তাহার বন্দিকারক স্বামীর গৃহ হইতে প্রত্যাগমন না করে, তত দিন পর্য্যন্ত বালিকার পিতামাতা বিবাহের কথায় বিন্দু-বিসর্গও জানিতে পারে না। তৎপরে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আত্মীয় বন্ধুবর্গ সুপরিসর অঙ্গনে সম্মিলিত হয়। ইহাদের কেহ চাউলের ঝুড়ি, কেহ হয়ত মদের বোতল আনিয়া উপহার দেয়। তৎপরে বর ঢাকের বাদ্য করিতে থাকে। আর কন্যা তালে তালে নৃত্য করে। বাহিরের লোকও নৃত্যে যোগদান করে। এই কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গেলে ফেডাং বা পুরোহিত কতিপয় ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রথম মন্ত্র এই—"চির প্রচলিত প্রথানুসারে এবং বংশপতিদিগের আচরণাবলম্বনে অদ্য আমরা আমাদের পুত্র-কন্যাকে উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতেছি।"

পুরোহিত যখন বিবাহ-মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন বরকন্যার একজনের করতলের উপর অপরের করতল স্থাপন করে। বরের হস্তে সে সময় একটি মোরগ ও কন্যার হস্তে একটি মোরগী থাকে। অতঃপর সেগুলি পুরোহিতের হস্তে দেওয়া হয়। মন্ত্রোচ্চারণ সমাপ্ত হইলে, কুক্কুটদ্বয়ের গলদেশ কর্ত্তন করিয়া সেগুলি দূরে নিক্ষেপ করা হয়। তখন যাহার ইচ্ছা সেই উহা লইয়া যায়। কদলীপত্রে রক্ত সংগৃহীত হয়; তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ শুভাশুভ নির্দ্ধারিত হয়। অন্য একটি পত্রে সিন্দুর দ্বারা রঙ্ করা হয়। বর মধ্যমাঙ্গুলি সিন্দুর-সিক্ত করিয়া আঙ্গুলটি পুরোহিতের কপালের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইয়া আনিয়া কন্যার নাসাগ্রের নিকট স্থাপনপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকে—"কুমারী, অদ্যাবধি তুমি আমার পত্নী হইলে।" তৎপরে সে কন্যার ভ্রূমধ্যে সিন্দুরের একটি চিহ্ন দিয়া যায়। পরদিন প্রভাতকালে পুরোহিত কোন মঙ্গলকামী আত্মার আরাধনা করিয়া নব দম্পতীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন—"অদ্যাবধি যতদিন তোমরা দুইজন এই ধরাধামে আছ ততদিন পতি-পত্নীভাবে জীবন যাপন করিবে।"

'আমরা আপনার আদেশ পালন করিব' বলিয়া তাহারাও সম্মতি জ্ঞাপন করে। ইহারা জীবনের কতকাল এভাবে যাপন করিবে, পুরোহিত যদি ইহার উল্লেখ না করে, তবে এই বিবাহ নিতান্ত অশুভজনক বিবেচিত হয়। তখন ইহা মঙ্গলজনক করিতে হইলে আরো ধর্ম্মক্রিয়ানুষ্ঠানের আবশ্যক হয় এবং পুরোহিতেরও কপাল লাগে।

বিবাহ ভোজে প্রথমতঃ মারোয়া দেওয়া হয়। তৎকালে সাধারণতঃ শূকরের মাংসই প্রদত্ত হইয়া থাকে। সর্ব্বশেষে প্রত্যেককে একথালা ভাত দেওয়া হয়।

বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে কন্যা সর্ব্বপ্রথম

বন্দিকারক স্বামীর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মাতা-পিতার নিকট গমন করে। বিবাহ ব্যাপার সম্বন্ধে ইহারা যেন কিছুই অবগত নহে এরূপ মনে করা হয়। কন্যার প্রত্যাগমনের দুই তিন দিন পরে একজন ঘটক আসিয়া উপস্থিত হয় এবং কন্যার পিতার সহিত ব্যাপার মিটাইয়া লয়। এই হেতু কন্যার পিতামাতাকে প্রদান করিবার জন্য সে সাধারণতঃ তিনটি জিনিস লইয়া আসে,—এক বোতল মদ্য, একটি নিহত শূকর ও একটি রৌপ্য মুদ্রা। সে উপহার দিতে উদ্যত হইলে কন্যার জনক-জননী-মাত্রই ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাকে প্রহারের ভয় দেখায়। ঘটক তখন অনুনয়-বিনয়পূর্ব্বক আর একটি মুদ্রা প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিতে চেষ্টা করে। তখন ইহারা ক্রোধের সহিত 'কেন আমাদের কন্যাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেলে' ইত্যাদি উক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। যা হউক, শীঘ্রই ইহাদের ক্রোধের উপশম হইয়া গেলে, ঘটক কন্যার মূল্য স্বরূপ কয়েকটি মুদ্রা প্রদান করে। এই মূল্যের পরিমাণও বরের পিতার অবস্থানুযায়ী ১০৲ হইতে ১২০৲ পর্য্যন্ত। টাকার পরিবর্ত্তে সময় সময় উক্ত মূল্যের দ্রব্য সামগ্রীও প্রদত্ত হইয়া থাকে। সব সময়েই একটি শূকর তৎসঙ্গে দিতেই হইবে। তৎপরে সভাস্থ লোক এবং গ্রাম্য মণ্ডলদিগের জন্য বারটি টাকা বা উক্ত মূল্যের জিনিস প্রদান করা হয়।

লিম্বুদের ভাষায় এই উপহারকে 'তুরায়িমবাগ্' (কন্যা অপহরণার্থ পিতামাতার সন্তোষ-সামগ্রী) কহে। যদিও ইহা কন্যার পিতামাতারই প্রাপ্য, কিন্তু আজকাল তাহা গ্রাম্য কর্ম্মচারীগণই আদায় করিয়া লইয়া যায়।

তিব্বতীয়দিগের ন্যায় লিম্বুগণও, বিবাহের সহিত যাহারা ঘনিষ্ঠ ভাবে সংসৃষ্ট, তাহাদিগকে শ্বেত কার্পাস-বস্ত্র প্রদান করিয়া থাকে। ঘটকের প্রস্থানের সময় যখন কন্যাকে আনিয়া দেওয়ার কথা হয়, তখন তাহার জনক-জননী বলিয়া উঠে "হায়! হায়! আমাদের কন্যাটি কোথায় হারাইয়া গেল! তাহাকে যে আর পাইতেছি না। বালিকাকে খুঁজিয়া আনিবার জন্য এখনই লোক না পাঠাইলে চলিবে না।" তখন ঘটক আরো কয়টি রজত মুদ্রা প্রদান করে। তার পর কন্যার একজন আত্মীয় ইহাকে ভাণ্ডার-গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া দেয়! সাধারণতঃ ঐ ভাণ্ডার-গৃহই কন্যার পলায়নের স্থান। আজকাল ঘটকের উক্তরূপ অর্থদান মাত্রই কন্যা স্বেচ্ছায় গুপ্তস্থান হইতে চলিয়া আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়, কিন্তু তার আগে নহে।

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামযাদু ক্রমে ক্রমে বি-এ পাস করেছে এবং কিরণ-বাবুর কাছ থেকে বরাবর মাসে মাসে টাকা আদায় করে' এসেছে, অথচ এই টাকা পাওয়ার কথা সে আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে ব্যক্ত করে নি—এমনি তার মন্ত্রগুপ্তির সাবধানতা!

এণ্ট্রান্স পাস ক'রেই রামযাদু বিয়ে করেছিলো। তার শ্বশুর বেচারা কন্যার পিতা হওয়ার দণ্ড স্বরূপ জামাইকে পড়ার খরচ বলে' মাসে মাসে দশ টাকা ঘুষ জুগিয়ে এসেছে।

এই রকম দু-তরফা সাহায্য পেয়ে রামযাদু বেশ নির্ভাবনায় লেখাপড়া করে' চলেছিলো। বাল্যে তার চরিত্রে যেসব গুণ অস্ফুট ইঙ্গিত মাত্র ছিলো, বয়স জ্ঞান ও বিদ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেইসব গুণ অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারা তার চরিত্রগত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন সে মহা লোভী ও ধনবানের প্রতি অতি ভক্তিমান হয়ে পড়েছে। আবার দরিদ্র যারা, যাদের কাছ থেকে তার কোনো লাভের সম্ভাবনা নেই, তাদের কাছে সে নিজের ধনশালিতার বড়াই করতে ছাড়ে না। সে মাসে মাসে তিন বার টাকা পায়—কিরণ-বাবুর কাছ থেকে, শ্বশুরের কাছ থেকে, এবং নিজের মায়ের কাছ থেকে। এই ব্যাপারটার ব্যাখ্যা সে ধনী ও দরিদ্র ভেদে দুরকম করতো। সে ধনীদের বলতো যে সে এমন গরিব যে তাকে পরের কাছে হাত পেতে তবে

লেখাপড়া করতে হচ্ছে। আর গরিবদের কাছে পাকে প্রকারে জানাতো যে তার বাড়ী থেকে তো খরচ আসেই, তা ছাড়া তার শ্বশুর বিয়ের পণ একেবারে দিতে না পেরে কিস্তিবন্দী করে' মাসে মাসে দেনা শোধ কর্‌ছে, এবং সে এমনি মহানুভব যে পণের টাকা থোকে না নিয়ে শ্বশুরকে কন্যাদায়মুক্ত করেছে; আর কিরণ-বাবুকে রামযাদুর বাবা সাহায্য করে' লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, সেই' ঋণই কিরণ-বাবু মাসে মাসে শোধ কর্‌ছেন—কিরণ-বাবুকে বেশ কৃতজ্ঞ ভদ্রলোক স্বীকার কর্‌তেই হবে, কারণ রামযাদুদের কতো টাকা কতো লোকে কতো দিকে যে বে-ওজর মেরে খেয়েছে তার তো ইয়ত্তাই নেই।

কোনো মাসে কোনো জায়গা থেকে টাকা আস্‌তে কিছু দেরী হয়ে গেলে অথবা বরাদ্দর অতিরিক্ত কিছু খরচ হয়ে গেলে রামযাদু ধার করে—পোষ্ট-অফিসের সেভিংস্‌-ব্যাঙ্কে সে এ পর্য্যন্ত কেবল টাকা জমাই রেখে এসেছে, একদিনের তরেও একটি পয়সা সেখান থেকে তুলে নেয়নি। যাদের সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে অথচ চামেশা দেখাসাক্ষাৎ হয় না, এমন লোক বেছে বেছে সে ধার চাইতে যায়। ধনীর কাছে ধার চাইবার বেলা সে ধোপার বাড়ী কাপড় ধুতে দেবার দিন নিজের ময়লা কাপড় পরে' যায়; ধার কর্‌তে যাবার দিন যদি নিজের কাপড় নেহাৎ ফর্সা থাকে, তবে অপরের কাপড় ময়লা দেখে ধার করে' পরে' ধনীর কাছে ধার কর্‌তে যায়; আর গরিব সাধারণ গৃহস্থদের কাছে যেদিন ধার নিতে যায় সেদিন তার মেসের প্রতিবাসীদের প্রত্যেকের যে জিনিসটি সব চেয়ে ভালো তাই বেছে বেছে নিয়ে দামী জামা কাপড় জুতো আংটি শাল ছড়ি ঘড়ী চেন এসেন্স প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে বড়মানুষী ঢঙে আমিরী চালে যায়। মেসের প্রতিবাসীদের কাছে সজ্জা ধার নেবার বেলা সে বলে—সে শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের কারো না কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে চলেছে, তাই তার এই বিলাসবেশ, এই বরসজ্জা। রামযাদুর আর-একটি গুণ ছিলো—সে ধার নিয়ে অতি সহজে ও সত্বর সে কথাটা ভুলে যেতে পার্‌তো, অনেক গরিব রামযাদুর মতন একজন ধনীকে গোটা কতক টাকা ধার দিয়ে সেটা ফেরত চাইতে লজ্জা বোধ কর্‌তো, মনে কর্‌তো তার মতন একজন বড়োলোকে কি আর গরিবের টাকা মার্‌বে?—মনে হলেই দিয়ে দেবে; আর তাদেরও তো অদিন অসময় আছে, একজন বড়লোককে হাতে রাখা ভালো। আর যারা বড়োলোক তারাও রামযাদুকে ধার দিয়ে উশুলের জন্যে তাগাদা কর্‌তে চাইতো না—একজন গরিব ভদ্রলোককে ধারের নামে যে সাহায্য কর্‌বার সুযোগ পাওয়া গেছে এতেই তারা সন্তুষ্ট হয়ে পাওনার কথা মুখে আনে না। আর রামযাদুও ঐ সব দেনাপাওনার তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে পড়াব চাপে পাড়ু স্মৃতিকে একটুও ব্যস্ত বিব্রত হতে দেয় না। তবে যারা চক্ষুলজ্জা ভুলে বার বার তিন বার তাগাদা করে তাদের ঋণ রামযাদু আর একদিনও রাখে না, নিজের হাতে টাকা থাক্‌লে তাই থেকে ধার শোধ করে, আর নিজের হাতে না থাক্‌লে ধার করে' ধার শোধ করে। সুতরাং খাঁটি খাড়া লোক বলে' তার একটা খ্যাতিও হয়ে গিয়েছে, এবং তার জন্যে তার ধার পেতেও অসুবিধা হয় না।

বিধাতা রামযাদুকে যে স্বার্থসিদ্ধির বুদ্ধি দিয়েছিলেন তা অভাবের অভাবে চর্চ্চা কর্‌বার অবকাশ সে পাচ্ছিলো না, অব্যবহারে তা প্রায় ভোঁতা হয়ে আসছিলো। নিজের দান নিষ্ফল হয়ে যায় দেখেই যেনো বিধাতা তাড়াতাড়ি কিরণ-বাবু আর রামযাদুর শ্বশুরকে পরলোকে ডেকে নিলেন।

রামযাদু ইতিমধ্যে ওকালতী পাস করেছিলো, এবং যশোরের উকিল কিরণ-বাবুর আশ্রয়ে থেকেই পসার জমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো। কিরণ-বাবু বর্ত্তমানে তাঁর সুপারিশে সে যাও বা দু-একটা মোকদ্দমা পেতো, কিরণ-বাবুর মৃত্যুতে তাও পাওয়া তার বন্ধ হয়ে গেলো। এদিকে মা-ষষ্ঠীর কৃপাদৃষ্টিতে তার ঘরে আহারের অংশীদারের সংখ্যা বছর-বছরই বেড়ে চ'লেছিলো। তখন সে ওকালতী ব্যবসায়ে পসারের অনিশ্চিত প্রতীক্ষায় আর থাক্‌তে পার্‌ছিলো না; সে চাকরীর সন্ধানে বেশ একটু ব্যস্ত হয়েই উঠেছিলো—মুন্সেফী জুটে তো ভালোই, নয় তো জমিদারের ম্যানেজারী বা আপিসের কেরাণীগিরি যা জোটে তাই এখন স্বাগত।

মধ্যে মধ্যে সে চাকরীর চেষ্টায় চাকরীর আড়ত কল্‌কাতায় আসে। কল্‌কাতায় এসে সে তার পরিচিত কারো মেসে ওঠে এবং দুচারদিন চাকরীর বাজারের হাল চাল একটু যাচাই করে' সরে' পড়ে—সুযোগ কর্‌তে পার্‌লে

মেসের দেনা প্রায়ই শোধ করে না এবং যে মেসকে একবার ঠকিয়ে যায় তার ত্রিসীমানায় আর পা দেয় না।

এমনি একটা চাকরীর খোঁজে কল্‌কাতায় এসে হ্যারিসন-রোডের মোড়ে থাকোহরি আর পরাণ-বাবুর সঙ্গে রামযাদুর আলাপ হবার সুযোগ হয়।

পরাণ-বাবু যে রামযাদুকে তাঁর বাড়াতে পায়ের ধূলা দিতে নিমন্ত্রণ ক'রেছিলেন রামযাদু সে নিমন্ত্রণ গ্রাহ্যই করেনি। সেই মুদির মতন চেহারার লোকের বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে গেলে যে কিছু স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে এমন আন্দাজ কর্‌তে সে পারেনি এবং বিনা স্বার্থে কোনো কাজ করার মতন স্বভাব রামযাদুর ছিলো না। পরাণ-বাবুর নাম ঠিকানাটা থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের উল্টা পিঠে তবু সে লিখে রেখে দিয়েছিলো, অবসর হলে সেখানকার অবস্থাটা একবার যাচাই করে' আস্‌বে, কারণ তার মূলমন্ত্র ছিলো—

"যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো ভাই,
মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন।"

কিন্তু সে পরাণ-বাবুর বাড়ীর সন্ধানে যাবার অবসর কর্‌বার আগেই কল্‌কাতা ছেড়ে পালানো তার দর্‌কার হয়ে পড়্‌লো। সে তার এক সহপাঠীর মেসে এসে ফ্রেণ্ড্‌ হয়ে ছিলো—রোজ তার পাঁচ আনা করে' ফ্রেণ্ড্‌-চার্জ দেবার কথা। রামযাদুর মনে একটু ক্ষীণ আশা ছিলো যে তার সহাধ্যায়ী চক্ষুলজ্জার খাতিরে তার কাছ থেকে পয়সা নাও নিতে পারে হয়তো। কিন্তু তার বন্ধুর মেসের ম্যানেজার যেদিন তার কাছে এসে বল্‌লে—রামযাদু-বাবু, ফ্রেণ্ড্‌-চার্জটা রোজ রোজ মিটিয়ে দেওয়াই আমাদের মেসের নিয়ম, আপনার আজ সাতদিন থাকা হলো।—তখন রামযাদু ভীষ্মের মতন বুঝেছিলো এই বাক্যবাণ অর্জ্জুন বন্ধুরই, শিখণ্ডী ম্যানেজার কেবল তাকে যুদ্ধে নিরস্ত ও পরাস্ত করার উপলক্ষ্য মাত্র। পাঁচ-সাতে পঁয়ত্রিশ আনা—দু টাকা তিন আনা!—তাকে দিতে হলেই তো সর্ব্বনাশ! লোকের দ্বারে দ্বারে টহল দিয়ে আর ধন্না পেড়ে চাকরী তো একটা মিল্‌লো না—উপরন্তু লাভ হবে গায়ের রক্তের চেয়েও প্রিয় গাঁটের পয়সা নষ্ট! রামযাদু মেসের ম্যানেজারকে বল্‌লে—আজকেই আমি বাড়ী যাবো; আপনাদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েই যাবো। মা মরণাপন্ন—আমি খবর পেয়েছি।

রামযাদু একটা ঝাঁকা-মুটে ডেকে তার ঝাঁকায় আপনার ব্যাগ আর বিছানা চাপিয়ে ট্যাঁক থেকে কতক-গুলো টাকা পয়সা বার করে' গুণ্‌তে গুণ্‌তে তার বন্ধুর দিকে ফিরে বল্‌লে—তোমাকে এই টাকাটা বাড়ী গিয়ে পাঠিয়ে দিলে হবে না ভাই? আমাদের পাড়াগাঁয়ে তো ওষুধ পথ্য কিছুই পাওয়া যায় না, মার জন্যে মকরধ্বজ আর কিছু বেদানা আঙুর কিনে নিয়ে যেতাম। মা মৃত্যুর আগে বেদানা আঙুর খেতে চেয়েছেন—আমি গিয়ে মাকে দেখ্‌তে পেলে হয়!

রামযাদুর ছলছল চোখের হাতধরা জল টলটল করে' উঠ্‌লো, সে ঘনঘন, দুচারবার চোখের পাতা বুজে খুলে চোখ মিট্‌মিট করে' চোখের জল গড়িয়ে ফেল্‌লে; তার পর সেই সজল চোখে তার বন্ধুর দিকে একবার চেয়ে ম্যানেজারের দিকে দুটাকা তিন আনা বাড়িয়ে ধরে' ধরা গলায় বল্‌লে—এই নিন ম্যানেজার বাবু।

এমন কে কশাই আছে যে মুমূর্ষু রোগীর ঔষধ পথ্যের সম্বল নিজেদের সামান্য ঋণের জন্য কেড়ে নিতে পারে? রামযাদুর সহপাঠী বন্ধু বলে' উঠ্‌লো—থাক্‌, ও টাকা থেকে তোমায় এখন দিতে হবে না; বাড়ী গিয়ে যখন সুবিধা হবে পাঠিয়ে দিয়ো।

রামযাদুকে আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ কর্‌তে হলো না। সে টাকা দেবার জন্য প্রসারিত হাত অমনি তৎক্ষণাৎ গুটিয়ে হাতের টাকা পকেটে ফেল্‌লে। মনের মুখ যদি দেখা যেতো তা হলে দেখা যেতো যে বন্ধুর কথায় রামযাদুর মনের মুখ এক গাল হাসিতে ভরে' উঠেছে। কিন্তু রামযাদুর যে মুখ দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছিলো সে মুখের বিষণ্ণ ভাবের একটুও পরিবর্ত্তন কেউ ধর্‌তে পার্‌লে না, তার মুখের পেশীবিন্যাস যেমন হওয়াতে তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিলো তার একচুলও পরিবর্ত্তন কারো চোখে পড়্‌লো না। রামযাদু মুটের মাথায় ঝাঁকাটা তুলে দিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতে বাড়াতে তার বন্ধুকে বল্‌লে—আমি বাড়ী গিয়ে মাকে একটু ভালো দেখ্‌লেই তোমার টাকাটা পাঠিয়ে দেবো ভাই।

এই ব'লেই সে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়্‌লো—তার নিজের উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ তার নিজের মনে যে রকম উথ্‌লে উঠ্‌ছিলো তাতে সে সফলতার সন্তোষের

ও আত্মপ্রসাদের হাসি আর সাম্‌লে রাখ্‌তে পার্‌ছিলো না। রামযাদু রাস্তায় পৌঁছোতেই তার মুখ চাপা হাসির আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো।

রামযাদু মুটের দিকে নজর রেখে হনহন করে' শিয়ালদহের দিকে চ'লেছিলো, হঠাৎ পথের মাঝে তার সাম্‌নে কে একজন গড় হয়ে প্রণাম কর্‌লে। চলার বেগ হঠাৎ বাধা পাওয়ায় রামযাদু সাম্‌নে ঝুঁকে হুমড়ি খেয়ে পড়া সাম্‌লে নিয়ে থ'ম্‌কে দাঁড়ালো। প্রণাম করে' উঠে দাঁড়ালো থাকোহরি।—রামযাদু অবাক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে রইলো; সে এমন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলো যে তার মুটে যে তার মোট নিয়ে এগিয়ে চলেছে তার দিকে তার খেয়াল রইলো না।

থাকোহরি রামযাদুর অবাক বিস্ময় দেখে হেসে বল্‌লে—আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছেন না? আমার নাম শ্রীথাকোহরি জানা। হ্যারিসন রোডের মোড়ে আপনি আমায় খবরের কাগজ কিনে পাসের খবর দেখ্‌তে দিয়েছিলেন……

রামযাদুর সঙ্গে কোনো লোকের একদিন আলাপ হলে সে তাকে ভোলে না; সে থাকোহরিকে দেখ্‌বামাত্রই চিন্‌তে পেরেছিলো। কিন্তু বিস্ময় তার চোখ মুখ থেকে ঠিক্‌রে বের হচ্ছিল এই সাত দিনের ভিতর থাকোহরির চেহারার ভোল ফেরা দেখে। থাকোহরির সেই ময়লা ছেঁড়া অত্যল্প পরিচ্ছদ, কৃশ মলিন দুঃখাচ্ছন্ন মুখ, আর দারিদ্র্যজন্ম শঙ্কিত সঙ্কুচিত ভাব একেবারে বদল হয়ে গেছে!—তার গায়ে তসরের পাঞ্জাবী, গরদের চাদর; পরণে জরি রেশমে মিশিয়ে বোনা ফুল-পাড় দেশী ধুতি; পায়ে নতুন বাদামী রঙের সেলিমশাহী জুতো, রোজ পালিশে আয়নার মতন চক্‌চকে; মাথার কোঁক্‌ড়ানো চুলে টেড়ীর বাহার না থাক্‌লেও বেশ পরিপাটী করে' আঁচ্‌ড়ানো; তার তোব্‌ড়ানো গাল ভরাট, ঝুলেপড়া নাক তীক্ষ্ণ, সঙ্কুচিত চোখ উজ্জ্বল, কুণ্ঠিত মুখ সপ্রতিভ—মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর; তার নিশ্চিন্ততা ও অভাবমোচনের সুখ ও আনন্দ তার মুখের দর্পণে আপনাদের ছায়াপাত করেছে। ভালো খোলস ও খোলসা পথ পেয়ে যৌবনের শ্রী ও লাবণ্য যেনো থাকোহরির অঙ্গে অঙ্গে বাসা বেঁধেছে! রামযাদু অবাক হয়ে কেবল ভাব্‌ছিলো এই থাকোহরি ছোঁড়া এমন ভোল বদ্‌লালো কেমন করে'! সে যে টাকা যাদুকরীর মোহন স্পর্শ পেয়েছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কেমন করে' পেলে সেই ইতিহাসটা জান্‌বার কৌতূহল রামযাদুর মনে প্রবল হয়ে উঠ্‌ছিলো। যে লোক মাত্র সাত দিন আগে দু আনা দিয়ে একখানা কাগজ কিনে পাশফেলের খবর দেখ্‌তে পারেনি আজ তার এই রাজবেশ কোন্ আলাদীনের প্রদীপের দান, তার সন্ধান জান্‌বার আগ্রহে রামযাদু তার প্রবল বিস্ময়কে হাসির আড়ালে ঠেলে ফেলে থাকোহরির কাঁধের উপর হাত রেখে বল্‌লে—একদিন একটুক্ষণের তরে দেখা সাক্ষাৎ, তার পর আবার তোমার বিলক্ষণ পরিবর্ত্তন হয়েছে, হঠাৎ চিন্‌তে না পার্‌বারই কথা। বেশ ভালোই আছো বোধ হচ্ছে। কোথায় থাকা হয় এখন ভায়ার?

থাকোহরির মুখে তার হঠাৎ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের লজ্জায় সঙ্গে কৃতজ্ঞতার প্রফুল্লতা ফুটে উঠ্‌লো, সে বল্‌লে—আজ্ঞে, আপনারই আশীর্ব্বাদে আমি মহতের আশ্রয় পেয়েছি। মার্টিন্ এণ্ড কাট্‌থ্রোট্ কোম্পানির হেড্-আপিসের বড়োবাবু পরাণচন্দ্র বিশ্বাস—অতি মহাশয় লোক তিনি—তাঁর বাড়ীতে আমি আছি এখন। সেদিন হ্যারিসন রোডে আপনি আমাকে কাগজ কিনে দিয়ে আমার অবস্থা সম্বন্ধে যে-সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেইসব কথা পরাণবাবু শুনে নিজে আমাকে ডেকে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন। আমার মতন অসংখ্য লোককে তিনি কতো রকমে সাহায্য করে' থাকেন। মার্টিন কাট্‌থ্রোটের আপিসের চাকরী তো তাঁর হাতে দানছত্তর!

এই কথা শুনে রামযাদুর মনটা ছাঁৎ করে' উঠ্‌লো। তার মনে পড়্‌লো এই পরাণ তাকেও তার বাড়ীতে পায়ের ধূলা দিতে আপনি সেধে এসে নিমন্ত্রণ করেছিলো; মূর্খ সে এতদিন অবহেলা করে' তার বাড়ীতে যায়নি যার হাতে মার্টিন কাট্‌থ্রোটের আপিসের চাকরী দানছত্তর! সে একটা চাকরীর জন্যে কতো লোকের দ্বারে দ্বারে ফ্যা ফ্যা করে' ফিরেছে, অথচ যে রাস্তায় অচেনা লোককে ডেকে চাকরী দ্যায় তার যেচে নিমন্ত্রণ সে অবহেলা করেছে! এতো বড়ো বিশ্রী ভুল সে জীবনে এই প্রথম কর্‌লেও ধিক্কারে তার অন্তর ভরে' উঠ্‌লো। সে কি জান্‌তো ছাই যে ঐ মোষের মতন কালো মোটা লোকটার এতো মহিমা! এই ভুল করার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত সে যে কি কর্‌বে তা মনের মধ্যে

চকিতে ঠিক করে' নিয়ে রামযাদু থাকোহরির কথার শেষে বলে' উঠ্‌লো—ও! তা বেশ ভাই বেশ! তোমার যে কষ্ট ঘুচেছে এতেই আমি খুসী।

থাকোহরি বল্‌লে—কর্ত্তা আপনার কথা প্রায়ই বলেন যে—মুখুজ্জে মশায় পায়ের ধুলো দিতে এলেন না একদিনও; মহৎ ব্যক্তির সাক্ষাৎলাভ পরম সৌভাগ্য না থাক্‌লে ঘটে না। তিনি সেদিন আপনার ঠিকানা জেনে নেননি বলে' কতো আপ্‌শোষ করেন—বলেন, মুখুজ্জে মশায় নিজে দয়া করে' না এলে আর আমি তাঁর পায়ের ধুলো পাবো না।

পরাণ এখনো তার পায়ের ধূলার আকাঙ্ক্ষা ছাড়েনি এই শুভ সংবাদে হর্ষগদ্‌গদ হয়েও রামযাদু সে ভাব তার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতায় দমন ও গোপন করে' বল্‌লে—আর ভাই, নিজের দুঃখধান্দাতেই ব্যস্ত থাকি, সময় পেয়ে উঠি না। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, পথের মাঝের সেই একটা কথা অতো মনেও ছিলো না, আর তার জন্যে একজনের বাড়ীতে যাবার কোনো আবশ্যকও বোধ করি নি।

থাকোহরি বল্‌লে—না না, আপনি যাবেন একদিন, কর্ত্তা ভারী খুশী হবেন, আপনিও খুশী হবেন কর্ত্তার সঙ্গে পরিচয় হলে—আপনি যেমন মহৎ, তিনিও তেমনি......

এমন সময় মুটে তর্জ্জন করে' উঠ্‌লো—আরে চলো না বাবু, রাস্তা পর খাড়া হো কর গপ্‌ লাগায়া, হাম মাথা পর মোট লে কর কেৎনা ঘড়ী খাড়া রহেগা। টিরেন্‌ নেহি মিলেগা ফিন্‌।

রামযাদু ও থাকোহরি দুজনেই মুটের বিরক্ত মুখের দিকে ফিরে দেখ্‌লে।—রামযাদু থাকোহরিকে বল্‌লে—তবে এখন আসি ভাই। পরাণ বাবুকে বোলো ফুরসৎ মতন একদিন দেখা কর্‌বো।

থাকহরি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?

রামযাদু চলবার উপক্রম করে' বল্‌লে—যাচ্ছি ভাই একটু বাড়ী।

থাকোহরি রামযাদুর সঙ্গে সঙ্গে চল্‌তে চল্‌তে বল্‌লে—আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা বলুন, আমি কর্ত্তাকে বল্‌বো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—আমার বাড়ী যশোর জেলায় নড়ালের কাছে সীমাখালি গ্রামে। আমি দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরে আস্‌ছি, তার পর পরাণ-বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বো একদিন।

থাকহরি জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আপনার এখানকার ঠিকানা কি?

রামযাদু বল্‌লে—এখানে এসে বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে কি মেসে দু চারদিন থাকি—কবে কোথায় থাকি তার তো ঠিক নেই।

তার পর একটু ভেবে রামযাদু বল্‌লে—আমি এবার এসে কাঙালী সরকারের গলিতে ১৭ নম্বর বাড়ীতে আমার এক বন্ধুর মেসে থাক্‌বো।

থাকোহরি রামযাদুকে আবার প্রণাম করে' বল্‌লে—আচ্ছা আমি কর্ত্তাকে বল্‌বো।

রামযাদু হন্‌ হন্‌ করে' চল্‌তে আরম্ভ কর্‌লো। তাকে চল্‌তে দেখে মুটেও ছুটে চল্‌লো।

কিছুদূর এগিয়ে পথের একটা মোড় ফিরেই রামযাদু একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নিয়েই মুটেকে ডেকে বল্‌লে—এই মুটিয়া, ঘুম্‌কে চলো, হাম আউর নেহি যায়েগা।

মুটে আশ্চর্য্য হয়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লে—আর বাবু, ফিন্‌ কি ভেলো?

রামযাদু মুটেকে মুখ ভেঙ্‌চে বল্‌লে—ভেলো ভালো, তুই এখন ফিরে চ তো।

মুটে রামযাদুর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চল্‌লো।

রামযাদু মেসে ফিরে আস্‌তেই সকলে আশ্চর্য্য হয়ে ও ভীত স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি রাম-বাবু, ফিরে এলেন যে?

রামযাদু মুটের ঝাঁকা ধরে' নামিয়ে ঝাঁকা থেকে ব্যাগ বিছানা তুলে নিতে নিতে বল্‌লে—রাস্তায় আমাদের গাঁয়ের একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো, সে আজই এসেছে বাড়ী থেকে, সে বল্‌লে মা ভালো আছেন। তাই আর গেলাম না।

রামযাদু মেসের ম্যানেজারের সাম্‌নে তিন্‌টে টাকা ধরে' বল্‌লে—এই নিন ম্যানেজার বাবু আপনার মেসের দেনা। বাকী পয়সাও আপনার কাছে অ্যাড্‌ভান্স্‌ জমা থাক্‌।

মেসের যে সব লোকের ধারণা হয়েছিলো রামযাদু মেসের দেনা মেরে পালাচ্ছে, তারা নিজেদের সন্দেহ মিথ্যা হতে

দেখে লজ্জিত হলো, তাদের কাছে রামযাদু বেশ বিশ্বাসযোগ্য ভদ্রলোক বলেই প্রতিপন্ন হয়ে গেলো।

রামযাদু তার পর মুটের হাতে দশটা পয়সা গুণে গুণে দিলে।

মুটে দশ পয়সা পেয়ে রামযাদুর সামনে পয়সা সুদ্ধ হাত ও রামযাদুর মুখের দিকে 'বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ মেলে বল্‌লে—এ ক্যা বাবু?

রামযাদু মিষ্ট ভৎ'সনার সুরে বল্‌লে—কেনো বাপধন, তোমার সঙ্গে দশ পয়সাই তো ফুরান্ হয়েছিলো।

মুটে একটু কড়া কর্কশ স্বরে বল্‌লে—সো ত সহি! লেকিন্ ওতো দূর গেলো, ফিন্ আইলো···

রামযাদু মুটেকে ভেঙিয়ে বল্‌লে—আধপথ থেকে তো ফিরে আইলে চাঁদ। যাও সরে' পড়ো।

রামযাদু চলে' যায় দেখে মুটে কাকুতি করে' বল্‌লে—আচ্ছা আউর একঠো পয়সা দেও বাবু সাহেব—আপলোক বড়া আদমী, ভদ্দর লোক, হামলোগ নোকর চাকর, একঠো পয়সা জল খানেকে লিয়ে হামি মেঙে লিস্‌সে আপসে।

রামযাদু পিছন ফিরে চলে' যেতে যেতে বলে' গেলো—ঐ দশ পয়সা দিয়েই জল খেয়ো, আর পয়সা পাবে না।

'আরে বাবু!' বলে' হতাশায় অসন্তুষ্ট মুটে ঝাঁকা তুলে নিয়ে চলে গেলো।

কি করা যায়

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুস্তফী

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক্ হ'লো—সাইকেলে বেনারস পর্য্যন্ত যেতে হবে। আমাদের ইচ্ছা—কোন রকমে এই পূজার ছুটি-টা—চারিদিকে দেখতে দেখ্‌তে—সাইকেলে কাটান।

১৮ই অক্টোবর ভোর সাড়ে চারটের সময় বাড়ী থেকে একসঙ্গে বেরুলুম। তখনও রাস্তায় গ্যাসের আলো পথ দেখাচ্ছে। কোথাও বা কোন বাড়ীর রোয়াকে, কোথাও বা ফুটপাথে গাছের গায় হেলান দিয়ে, লালপাগড়ীওয়ালারা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে,—কখন সকাল হয়ে তাদের সঙ্গী এসে রেহাই দেবে,—বোধ হয় সেই স্বপ্নই দেখ্‌ছে। আর মাঝে মাঝে দু-একটা 'রিক্‌স'—ঠং ঠং শব্দে চলেছে। বাল্‌তি ঝাঁটা হাতে নিয়ে, রাসভারি সুরে 'রামা হো, রামা হো' কর্‌তে কর্‌তে ঝাড়ুদার সবে মাত্র বেরিয়েছে। তখন কোথা থেকে লাঠি হাতে একটা লোক ছুট্‌তে ছুট্‌তে রাস্তার গ্যাসে লাঠিটাকে ঠেকাতেই,—টুপ্ করে আলোটা ছুটি পেয়ে বাঁচল, যখন আমরা গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোডে এসে পৌছলুম।

অন্ধকারে যেতে প্রথমটা কষ্ট হচ্ছিল; কিন্তু যখন পিচের রাস্তায় এসে পড়া গেল, তখন আমরা বেশ আরামের সহিত জোরে যেতে লাগ্‌লুম।

কিছুক্ষণ যেতেই রাস্তার পাশ দিয়ে গঙ্গা। ওপারের আকাশটায় লাল আভা ক্রমশঃই ফুটে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বালিতে এসে হাজির হলুম। পিচের রাস্তাটা বালি পর্য্যন্ত এসে সাঙ্গ হয়েছে। তার পর রাস্তা তত ভাল নয়। রাস্তা খারাপ থাকা সত্ত্বেও আমরা ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। যখন চন্দননগর (২৩ মাইল) এসে পৌছলুম, তখন বেলা প্রায় আটটা। এখানে সত্যেন বসু মহাশয়ের বাড়ীতে আগে থাক্‌তে বলা-কওয়া ছিল।

এখানে পৌছেই আমরা যে যার গাড়ীগুলা পরিষ্কার করে স্নান করতে গেলুম। স্নান সেরে এসে ঘরে ঢুক্‌তেই দেখি,—আমাদের জন্যে চা ও জলখাবার প্রস্তুত। কিছুক্ষণ গল্প গুজব ও ভাতের চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে যখন ডাক পড়্‌ল, তখন বেলা ১২টা। খেতে বস্‌তে গিয়ে দেখি যে, নানান আয়োজন। মাছ-মাংস থেকে সুরু করে দই সন্দেশ অবধি। আমরা ত যে যা পার্‌লুম ঠেসে খেয়ে, ভদ্রলোকদের খুবই ধন্যবাদ দিলাম।

তারপর যখন একটা বাজে, আমরা তখন যাবার জন্যে সাইকেলগুল ঘর থেকে বের কচ্ছি, এমন সময় চ্যাঙারি

হাতে এক ভদ্রলোক, বিস্তর লুচি আলুর দম আমাদের পথের ক্ষুধা নিবারণের জন্তে এনে দিলেন। আমরা তাঁহাকে ধন্তবাদ দিয়েই খপ্ করে চ্যাঙারি শুদ্ধ তুলে সাইকেলে বাঁধলাম। আর অমনি আমাদের Bugle বেজে উঠল্। এই Bugle আমাদের ১৫ মিনিটের ভেতর প্রস্তুত হবার জন্তে জানিয়ে দিলে। আমরা একরকম প্রস্তুতই ছিলাম। তাই অন্ত সকলের মত হ'তেই, এই পনের মিনিটের ভেতর, সত্যেনবাবুর বাড়ীকে পেছুনে রেখে একটি ফটো তোলা হ'ল।

Bugleএ হুটো ফুঁ পড়্তেই আমরা সার-বেঁধে দাঁড়ালুম। তিন্‌টে ফুঁয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সত্যেনবাবু ও ইত্যাদি ভদ্রলোক দিগকে প্রণাম জানিয়ে যখন বিদায় নিলাম, তখন বেলা দেড়টা।

পাণ্ডুয়াতে এসে সত্যেনবাবুর দেওয়া লুচি-আলুর দম পেটে পুর্‌তে বাধ্য হয়েছিলুম; কারণ, তাঁদের বাড়ীর ভাত-মাংস তখন কোথায় তলিয়ে গেছে। জল-যোগের পর যখন বর্দ্ধমানের দিকে রওনা হলুম, তখন সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিক চাঁদের আলোয় ভরে গেল। সারাদিনের শ্রান্ত দেহে ঠাণ্ডা মেঠো হাওয়া লাগ্‌তেই নূতন বলের সঞ্চার হয়ে, বর্দ্ধমান-রাঙ্গামাটির রাস্তার উপর দিয়ে হুহু করে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় বাঁশীর শব্দে আমাদের থাম্‌তে হল। ভাবনা হ'ল যে, কার কি বুঝি বিপদ ঘটলো।

গাড়ীর 'ব্রেক' কস্‌তে না কস্‌তেই আমাদের জহর,—"একটা ছাতি পড়ে আছে" বলে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে, তার গাড়ীটা কোন রকমে আমার হাতে ঠেকিয়ে দিয়ে, এক গাছতলা থেকে একটা নূতন ছাতি নিয়ে হাজির কর্‌লে। পথের স্মৃতি স্বরূপ ছাতিটাকে সাইকেলের সঙ্গে বেঁধে নিয়ে আবার যাত্রা সুরু হ'ল।

বামদিক হইতে—দেবেন্দ্র মুস্তোফী (কাপ্তেন), রাধারমণ দত্ত, ব্যোমকেশ দাস, মণীন্দ্র শুঁই, মণীন্দ্র মুস্তোফী, জহরলাল দত্ত, বলাইচন্দ্র বসু, কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী।

তখন রাত সাড়ে ন-টা। দূরে কতকগুলি আলো এগিয়ে আস্‌তে লাগল। যতই কাছে যাই, ততই আলো। দু একটা গরুর গাড়ী কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ কর্‌তে কর্‌তে তার গন্তব্য পথে চলেছে। ক্রমে ক্রমে লোকজন, গাড়ী-ঘোড়া, ঘর বাড়ী দেখা যেতে লাগল্। রাস্তায় খেঁকি কুকুরগুলো আমাদের দেখে ঘেউ ঘেউ কর্‌তে কর্‌তে আমাদের বর্দ্ধমানে পৌছান সংবাদ সহরের লোকদের জানিয়ে দিলে।

বর্দ্ধমান ষ্টেসনে এসে একটা চায়ের দোকানে হাজির হয়ে চা খাওয়া গেল। চা খাওয়ার পর এখানকার পুলিস-সুপারিণ্টেন্‌ডেণ্ট তপেন্দ্র নাথ ঘোষচৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হওয়া গেল। তিনি ঘুমুচ্ছিলেন। আমাদের খবর তাঁর কাছে যাওয়াতে, তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে এসে আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

বলা বাহুল্য যে তপেনবাবু ঐ রাত্রে আমাদের জন্ত নানাবিধ খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করেছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর বৈঠকখানাতে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিলাম।

১৯শে অক্টোবর।—ঘুম থেকে উঠে দেখি—চমৎকার লুচি-ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে। তখন বেলা সাতটা। প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করে যে যার গাড়ী পরিষ্কারে লেগে গেলুম। এমন সময় তপেনবাবু এসে বল্লেন, চা তৈরী।

একটা মস্ত বড় গোল টেবিলের ধারে চেয়ারগুলতে আমরা গোল হ'য়ে বস্‌লুম। কিছুক্ষণের পর চা, গরম গরম ফুল্‌কো লুচি, মিষ্টান্ন ইত্যাদি হাজির হলো। তার পর আমরা, আমাদের নিয়ম-অনুসারে, Bugleএর তিনটে ফুঁএর সঙ্গে সঙ্গে, আসানসোলের দিকে রওনা হলুম।

হঠাৎ আমার গাড়ীর সামনের টিউবটা লিক্ হওয়াতে বাঁশী দিতে বাধ্য হলুম। আমার বাঁশী শুনে সকলে থামতে বাধ্য হল। রাস্তার ধারে একটা গাছের গায় গাড়ীটী রেখে রাধু খুব শীঘ্রই লিক্‌টা সেরে ফেল্লে। কাপ্তেনের হুকুম মাত্র Bugleএ তিনটে ফুঁ পড়্‌ল—আর সঙ্গে সঙ্গে আমরাও আবার যাত্রা সুরু কর্‌লুম।

চলেছি ত চলেছিই! ক্রমশই সূর্য্যের তেজ বাড়্‌তে সুরু করেছে। এমন সময় একটি গ্রাম দেখা গেল। শরীর বড় গরম হওয়াতে সকলের স্নান কর্‌বার ইচ্ছা হল। গ্রামে ঢুকে জানা গেল, এই গ্রামের নাম 'গোল্‌সি' (৮৭ মাইল)।

তখন বেলা প্রায় ১১টা। গ্রামের ভেতর ঢুকে পুকুর খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে একটি ব্রাহ্মণের আশ্রয় জুটে গেল। এঁদের একটি বেশ বড় পুকুর আছে। সেইখানে গিয়ে খুব একচোট সাঁতার দেওয়া হল। আমাদের সাঁতার কাট্‌তে দেখে অনেকেই আশ্চর্য্য হয়ে বলেছিলেন,—"কোলকাতার লোক আপনারা, কি করে সাঁতার শিখ্‌লেন, ওখানে পুকুর-ঘাট কোথায়!" আমরা তাঁদের বুঝিয়ে দিলাম—কল্‌কাতায় অমন 'ন্যাশানাল সুইমিং ক্লাব' থাকতে সাঁতার শেখার ভাব্‌না!

ব্রাহ্মণ ঠাকুরের বাড়ী থেকে কলাইয়ের ডাল, তেঁতুলের অম্বল, শিঙী মাছের ঝোল, ভাত ইত্যাদি খেয়ে বেরুতে বেলা তিনটে বাজ্‌লো।

যখন পানাগড় (১০৩ মাইলে) পৌছলুম, তখন রাত হয়ে গেছে। পানাগড় ছাড়িয়ে চার মাইল জঙ্গল। রাত হয়ে যাওয়াতে সেদিন আর এগুনো হ'ল না। ঐ পানাগড় ষ্টেসনের কাছে একটি খাবার দোকানে গিয়ে পুরি ইত্যাদি কিনে খাওয়া হ'ল। দোকানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—তিনি সেখানকার ডাক্তার। ডাক্তারবাবুর কৃপায় সে রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা তাঁর বাড়ীতেই হয়ে গেল।

২০শে অক্টোবর।—সকাল সাতটায় চা-মুড়ি খেয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ। মাঝে দুর্গাপুর জঙ্গল পড়্‌ল। এই জঙ্গলটা চার মাইল। এখানে নাকি ভয়ানক শূকরের ভয়। এখান থেকে রাস্তা উঁচু-নীচু হয়ে চলেছে। এই জঙ্গলে বানর ও শৃগাল ছাড়া কিছুই নজরে পড়ে নি। এটা পার হতে প্রায় কুড়ি মিনিট লেগেছিল। এই জঙ্গল পেরিয়েই ফরিদপুর থানা। আমাদের জলের বোতল খালি হওয়ায় এই থানার ধারে ইঁদারা থেকে জল নিয়ে বোতল ভর্ত্তি কর্‌লাম।

কিছুদূর যেতেই ডানদিকে একটা সাদা বাড়ী দেখ্‌তে পেলুম। বাড়ীটা রাস্তা থেকে কিছু দূরে। একদিকে ধানের ও অপরদিকে আকের ক্ষেতের মাঝখানের আলের ওপর দিয়ে পেরিয়ে এসে গ্রামের মধ্যে ঢুক্‌লুম।

গ্রামটার নাম 'ভিরিঙ্গী' (১২৭ মাইল)। সাদা

রতিবাটী সাধারণ দৃশ্য—(এখান হইতে আসানসোল পাঁচ মাইল)

বাড়ীটা গ্রামের জমিদারের। জমিদার মহাশয় আমাদের ভ্রমণের বিষয় শুনে, খুব সন্তুষ্ট হয়ে, ভাতের বন্দোবস্ত করলেন। এখানেও সাঁতার ও খাওয়া নেহাৎ মন্দ হয়নি। এখান থেকে বেরিয়ে যখন 'আসানসোল' (১৩৭ মাইলে) পৌঁছলুম, তখন বিকাল ছয়টা।

এখানে এসে পোষ্ট-অফিসে চিঠি ফেলবার জন্যে থামতেই, আমাদের দেখতে অনেক লোক আসতে আসতে ভিড় করে ফেললে। সেই ভিড়ের ভেতর থেকে, একজন সাইকেল হাতে ও আর একজন তাঁর সঙ্গে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করে সেখানকার Railway Indian Instituteএ নিয়ে গেলেন। তাঁরা আমাদের চা পান করিয়ে পরিশ্রম দূর করলেন।

হঠাৎ দেখি, ম্যানেজার বাবু পাকা রাস্তা ছেড়ে মেঠো রাস্তা ধরলেন। আমরাও তাঁর পেছু পেছু চললুম। এই রাস্তা অতি ভয়ঙ্কর! আমরা অতি সাবধানে এই রাস্তা পেরিয়ে এক নদীর ধারে এসে পড়লুম।

নদীতে এক হাঁটু জল। সকলে মোজা জুত খুলে, গাড়ী কাঁধে করে পার হয়েই দেখি, চারিদিকে খোলা জায়গার উপর একটি মাত্র বাংলো। ম্যানেজার বাবু এই বাংলোয় ঢুকতেই জানলুম— এই বাংলাটি তাঁরই।

সেদিন রাত্রে খুব গান-বাজনা করে, খুব মজা করে পাখীর মাংস আর ভাত যে কি চমৎকার লাগল—তাহা বলা যায় না।

২১শে অক্টোবর।—সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে, তাড়াতাড়ি চা পান করে, সাইকেল নিয়ে কোলিয়ারি দেখতে সকলে ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। ম্যানেজারের সঙ্গে এসেছি বলে, সেখানকার অনেকে আমাদের শুদ্ধ লম্বা লম্বা সেলাম ঠুকতে লাগল।

রতিবাটী—কয়লার খনি

যিনি সাইকেল হাতে এসেছিলেন, তিনি রতিবাটি কোলিয়ারির ম্যানেজার। রতিবাটি আসানসোল থেকে পাঁচ মাইল। ম্যানেজারবাবুর রতিবাটি নিয়ে যাবার প্রস্তাব শুনে, আমরা অতি আহ্লাদের সহিত যাবার জন্যে প্রস্তুত হলুম—কারণ, আমাদের ভাগ্যে কোলিয়ারি দর্শন হ'বে।

তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। আমরা সাইকেলের আলোগুলো জেলে নিয়ে, আবার যে দিক দিয়ে এসেছিলুম, সেই দিকে প্রায় তিন মাইল গিয়ে ডান দিকে একটা রাস্তা ধরলুম।

আধঘণ্টা পরে ম্যানেজার বাবু আমাদের নিয়ে এলেন এক Liftএর কাছে। Liftএর কাছে একটা লোক সর্ব্বদাই দাঁড়িয়ে আছে। ম্যানেজার বাবুর হুকুম মাত্র সে একটা তার ধরে কয়েকবার নাড়া দিতেই একটা খাঁচা নীচে থেকে উপরে উঠে এল। আমরা তখন খাঁচার ভেতর গিয়ে দাঁড়ালুম। কিছুক্ষণ পরে খাঁচাটা নীচের দিকে নামতে সুরু করলে। যত নীচে যাচ্ছি আর অন্ধকার হতে থাকছে। গর্ত্তের গাঁথুনির গা দিয়ে বৃষ্টির মত জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। ক্রমশঃই রাতের মত অন্ধকার হয়ে গেল।

আমরা কেউ কারুকে দেখ্‌তে পাচ্ছিলুম না। ম্যানেজারের কথামত আমরা সাইকেলের আলো নিয়ে এসেছিলুম। তখন সেইগুলো জ্বালা হল। সুড়ঙ্গটা ২৭৫ ফিট্ নীচু।

নীচে এসে আলো হাতে সুড়ঙ্গের ভেতর যেতে লাগ্‌লুম। এক এক জায়গায় ব'সে ব'সে যেতে হচ্ছিল। অনেক লোক সেখানে কাজ কর্চ্ছে। কুলিরা যখন কয়লা কাটে, তখন একটা বড় ঝুড়ি নিয়ে পায়ের কাছে বাগিয়ে রেখে কয়লার দেওয়ালে ঘা দিতে থাকে, যাতে, কয়লা না গড়িয়ে এসে তাদের পায় লাগে। ঐ সুড়ঙ্গের ভেতর Trolley যাবার লাইন পাতা রয়েছে। Trolleyতে কয়লা বোঝাই করে Liftএর দ্বারা ওপরে ওঠান হয়। কোলিয়ারি দেখা সাঙ্গ করে Liftএ উঠে কোলিয়ারি সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে ওপরে এলুম। চারিদিক দেখে শুনে বাংলার দিকে রওনা হলুম।

আবার সেই বদ্‌খদ্ রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একজন রাস্তার এক হাত জলে গিয়ে ধুপ্ করে পড়ে জুত-মোজা ভেজালে। আর একজন পাথরে ধাক্কা খেয়ে পা ছড়ালে। আর একজন পড়ে গিয়ে আর উঠ্‌তে চায় না। ব্যাপার কি দেখ্‌বার জন্যে কাছে গিয়ে দেখি, সে সটাং চোখ বুজে শুয়ে আছে। প্রথমটা আমাদের তার এই অবস্থা দেখে ভয় হয়েছিল। তার পর তার চালাকি বুঝতে পেরে কাতুকুতু দিয়ে ওঠান হল। যখন বাংলোয় পৌঁছলুম তখন বেলা সাড়ে এগারটা।

সাইকেল পরিষ্কার করে খেয়ে-দেয়ে রতিবাটিকে যখন বিদায় দিলুম, তখন বেলা ৩টা। জুত মোজা খুলে সাইকেল কাঁধে নদীটা অনায়াসে পেরিয়ে গেলুম। কিন্তু, আমাদের রাধুর বোধ হয় ভিমরতি চেপেছিল। সে বল্লে—আমি সাইকেল চড়ে পার হ'ব। যাই না পেরুতে যাবে, অমনি তার গাড়ীর চাকা বালিতে বসে গেল, আর তার একটা পা জুত মোজা শুদ্ধ ঝপাৎ করে জলের ভেতর গিয়ে থাম্‌লো। আর আমরা আহ্লাদে আট-খানা হয়ে বললুম—"কেমন জব্দ—কেমন জব্দ!" কিন্তু, তবু সে একটা পা গাড়ীতে রেখে আর একটা পায় লেংচাতে লেংচাতে পার হ'য়ে গেল। বালি-মাখা জুতো মোজা জলে ধুয়ে নিয়ে ভিজে অবস্থায় পায়ের ভেতর সে গলিয়ে নিলে। তার পর মেঠো রাস্তা পেরিয়ে পাকা রাস্তায় পড়্‌লুম।

আসানসোলে এসে সাইকেলের তেল কেন্‌বার জন্যে একটা দোকানে গেলুম। তাঁরা আমাদের বিনা পয়সায় যথেষ্ট তেল দিয়ে দিলেন।
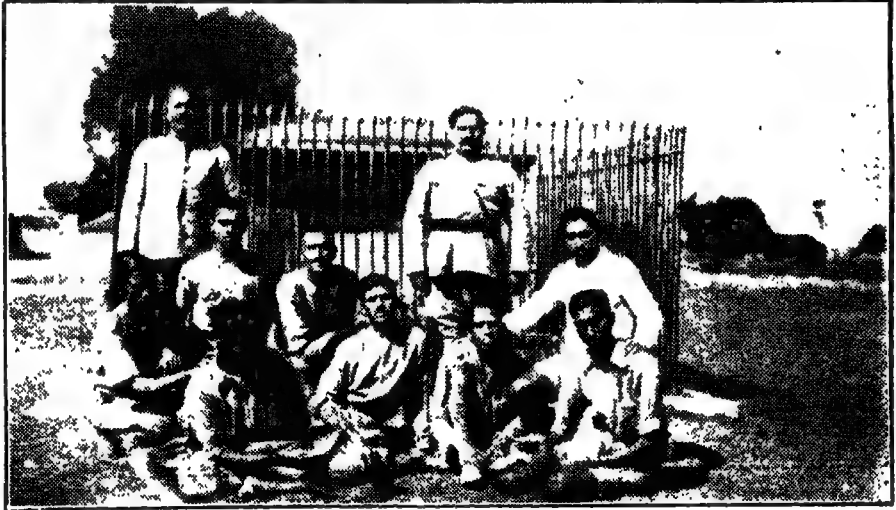
মদনপুরে—বিশ্রাম

সাড়ে ছটা নাগাদ 'কুল্টি' (১৪৬ মাইলে) পৌঁছুলুম। তখন সবে চারিদিক অন্ধকার হয়েছে। কুল্টির লোহার কারখানা নানা রকম শব্দে মুখর। সহরটি নেহাৎ মন্দ নয়; কিন্তু রাস্তায় আলোর অভাব। লোহার কারখানা দেখ্‌বার অভিপ্রায়ে ডাক্তার রায়েরই বাড়ী অতিথি হলুম।

ডাক্তারবাবু তাঁর বাড়ীর পাশেই স্কুল বাড়ীতে আমাদের থাক্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌লেন। আর খাওয়া দাওয়া সেদিন যে কি রকম আরামের সহিত হয়েছিল তাহা বর্ণনাতীত।

২২শে অক্টোবর।—চা-টা খেয়ে কারখানা দেখ্‌তে বেরুন হল। কারখানাটি প্রকাণ্ড; তবে অবশ্য সিংভূম জেলার

টাটার কারখানার মত নহে। তার পর এখানকার সহর বাজার ইত্যাদি দেখে বাড়ী ফেরা গেল। খাওয়া দাওয়ার পর, আমাদের ভেতর একজন ম্যাজিসিয়ান আছে জেনে, এই রাত্রে দেখাবার হুকুম হ'ল।

রাত্রে একটা জায়গা ঠিক্ করে মাষ্টার পিকৃমুব (অর্থাৎ ম্যাজিসিয়ানের) সামান্য রকমের ম্যাজিক ও হরবোলার ডাক (অর্থাৎ mimicries) হয়ে গেল। ম্যাজিকের পর গান বাজনা আর হরদম স্ফূর্ত্তি। তার পর পেটপূজা করে শুতে রাত এগারটা বাজলো।

২৩শে অক্টোবর।—সকাল সাতটার সময় ডাক্তারবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে, কুল্টি থেকে তোপচাঁচির দিকে রওনা হলুম। মাঝে রাজগঞ্জ (১৫৯ মাইলে) আস্তেই সকলকার
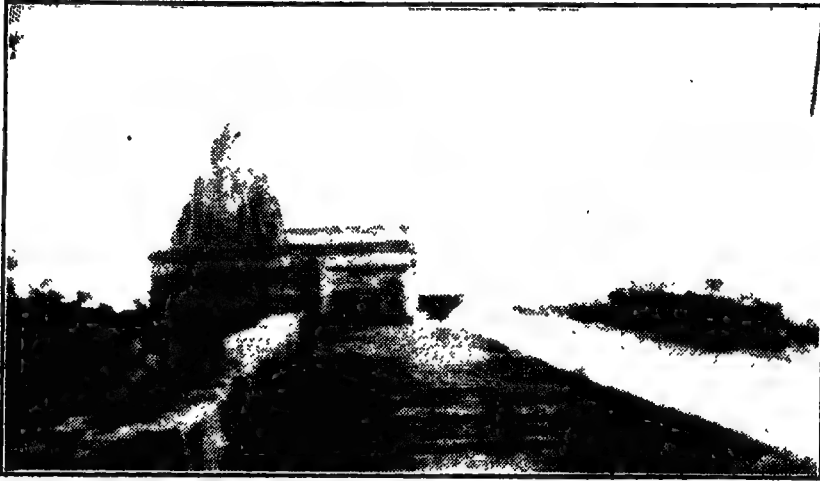
পরেশনাথ মন্দির—পর্ব্বত-শিখরে

খিদের জন্যে থামতে হ'ল। এখানে এক ঘর মাত্র বাঙ্গালী। আমরা তাঁর কাছে আশ্রয় পেলুম। স্নান করে খেতে প্রায় দুটো বাজল। খাওয়ার পর যখন বেরুলুম, তখন বেলা সাড়ে তিনটে বাজে।

তখন বেলা পড়ে আসছে। ভয়ানক উঁচু-নীচু রাস্তা। দু-দিকের পাহাড়গুলো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ; আর মাঝে মাঝে ছোট-খাট জঙ্গল। কিছুদূরে পরেশনাথ পাহাড়। সাইকেলের চাকার টায়ারের রবারটাকে কাঁকোরের রাস্তায় চাঁচতে চাঁচতে তোপচাঁচি (১৯০ মাইলে) হাজির হলুম।

আমরা পরেশনাথ পাহাড়ে উঠবো বলে সেদিন তোপচাঁচিতে থাকবার চেষ্টা দেখতেই এক-ঘর বাঙ্গালী দেখতে পেলুম। তাঁহারই অনুগ্রহে স্কুল-বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়া গেল। আমরা সেখানে গিয়েই মুখ-হাত-পা হোমিওপ্যাথিক ডোজে ধুয়ে নিলাম ; কারণ, ওখানে বেশ শীত। মাটির মেঝের ওপর কম্বল বিছিয়ে, খাবারের চেষ্টায় কয়েকজন দোকান খুঁজতে বেরুলুম। দোকান পেতেই সেখান থেকে 'পুরি' কিনে নিয়ে স্কুলে ফিরে একসঙ্গে সব খাওয়া হ'ল। আর সেদিন একটু মোষের দুধ পাওয়াতে হোমিও ডোজেই সকলে সারলুম।

তার পর ত, কম্বলের ওপর শুয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়েও শীত ভাঙ্গে না। কি করা যায়—তখন যে যার মাথার বালিস্—সোয়েটারগুলকে টেনে নিয়ে গায় দিলুম ; আর পায়ের জুতোকে মাথার বালিসে পরিণত করে আরামে শোয়া গেল।

রাত্রি একটা দেড়টার সময় শীতের চোটে কম্বল টানাটানিতে সকলকার ঘুম ভেঙ্গে গেল। শীতের জ্বালায় অস্থির হয়ে, ভীমের কীচক বধের মত পেঁটলা পাকিয়ে, রাতটা এক রকম জেগেই কাটিয়ে, সকালে নটা নাগাদ নিমিয়াঘাট (১৯৪ মাইলে) এসে পৌছলুম।

২৪শে অক্টোবর।—নিমিয়াঘাটে পৌছে সাইকেল-গুলা ইনেস্পেক্সান্ বাংলোর নিজেদের তালাচাবি দিয়ে একটা ঘরে রাখা হল। বাংলোর চৌকিদারকে সাইকেল সম্বন্ধে সাবধান করে 'গাইড্' খুঁজতে বেরুলুম ; কারণ, পাহাড়ের চূড়ায় পরেশনাথ ঠাকুর দর্শন করবো।

একটা গাইড্ ত পেলুম। তাকে খাবার কোথায় পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে—নিমিয়াঘাট ষ্টেশনে। তার মানে এখান থেকে ছ মাইল। আমাদের ত চক্ষু চড়ক-গাছ! কারণ, ছ মাইল পার খাবার খেতে, খেয়ে ফিরতে ছ-মাইল, পাহাড়ে উঠতে ছ-মাইল, আবার নামতে ছ-মাইল। তাহলে মোট ষোল মাইল ; তার মধ্যে ছ-মাইল একেবারে খাড়াই!

ষ্টেসনের পাশে একটা মাত্র পুরির দোকান। সে ত এক যুগ ধরে বিস্তর আধ-কাঁচা অবস্থায় জলের মত পাত্‌লা মটর ডাল সহ এনে দিলে।

খাওয়া সাঙ্গ হবার পর পুরিওয়ালা তার উচিত-মত দাম চেয়ে বস্‌লো। দাম শুনেই ত চম্‌কে গেলাম। জিজ্ঞাসা করে জানা

ধান্নাবন

গেল—প্রত্যেকে প্রায় এক-সেরের কাছাকাছি নাকি পুরি ভক্ষণ করেছি।

যা হোক—তার দাম্‌টা চুকিয়ে দিয়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আবার নিমিয়াঘাটে এসে উপস্থিত হলুম। এবার ছ-মাইল খাড়াই। এখন ঘড়িতে ঠিক্ সাড়ে এগারটা।

আমাদের গাইড্ বল্লে, "বাবুরা এ সময় কেউ পাহাড়ে ওঠে না. এখন সব নাম্‌তে সুরু করবেক্। আপনি সব দেরী করে ফেল্লে। এখানে সব বড় বড় বাঘ-ভালু আছেন। এখন উঠ্‌বেক্—নাম্‌তে রাত হয়ে যাবেন।" এই কথা বল্‌বামাত্র ফক্কোড়্ বন্ধুটা ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চ এর আলো—চট করে গাইডের মুখে ফেলেই বল্লে, "আরে মিতে চল্ চল্, জানোয়ার আসে ত এই ত্থাখ্। এর এক আলোতে সে ব্যাটা চোখ ঝল্‌সে বাড়ী গিয়ে চিংপটাং হয়ে থাক্‌বে।"

সেদিন যদিও সকলের মনে ভয় হচ্ছিল, কিন্তু সকলেই বল্লুম—অত ভয় খেতে গেলে চল্‌বে না। যখন এসেছি তখন পাহাড়ের চূড়ার মন্দিরে ঠাকুর দর্শন না করে ফির্‌বো না। এই বলে আমাদের সম্বল, একটা দার্জ্জিলিংএর ভোজালি, পাউরুটি ও কতকগুলি পেন্‌সিল কাটা ছুরি ও একটা মাংস-থোড়া মজবুত বড় গোছের ছুরির সাহায্যে গাছের ডাল কেটে কতকগুলি লাঠি তৈয়ারী করে নেওয়া হল।
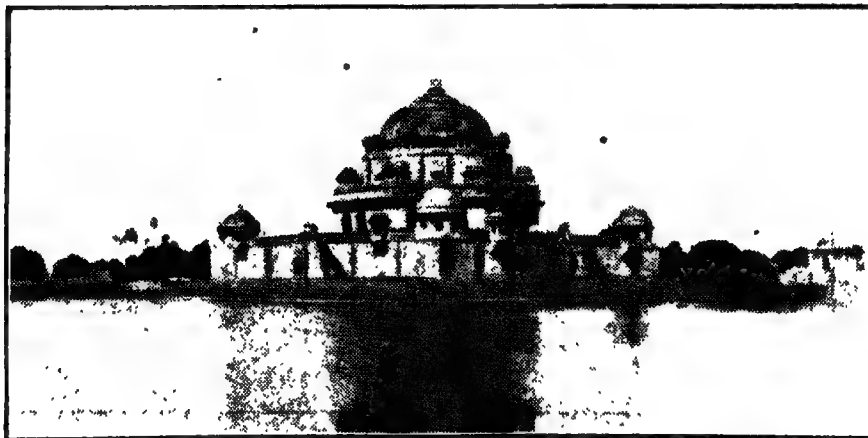
এদিক্ ওদিক্ ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে রাস্তা কেবলি ওপর দিকে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভীষণ খাড়াই। কো-থাও বা কাঠ-ফাটা রোদ; আবার কোথা-ও বা কখনও রোদ্‌ ঢাড়াতে পায় না। হাত-

সেরশাহের সমাধি—সাসারাম

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল্ কলেজ—বেনারস

চারেক চওড়া রাস্তা আর তার দু-পাশে অতি ভীষণ জঙ্গল। জঙ্গল নানারকম গাছ-পালায় ভর্ত্তি। এটা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ঐ দারুণ পাহাড়ি জঙ্গলে আমাদের চিরপরিচিত 'কলা'গাছও বিস্তর।

যখন প্রায় সাড়ে তিন মাইল পৌছলুম, তখন একটি ঝর্ণা দেখা গেল। ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হওয়ার মত ঝর্ণা দেখ্বার মাত্র বড্ড Tired বলে ধপ্ করে বসে পড়লুম। অথচ যতক্ষণ না ঝর্ণা পেয়েছিলুম ততক্ষণ বেশ যাচ্ছিলুম। ঝরণার জল খুব ঠাণ্ডা ও চৎকার। জলের বোতলে জল ভরে নিয়ে এক পেট খাওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর চল্‌তে সুরু করা গেল।

প্রায় পৌছব পৌছব হয়েছি, তখন কয়েক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা হ'ল। তাঁরা আমাদের অসময়ে পাহাড়ে ওঠার দরুণ অনেক কিছু বল্‌লেন।

পা চালাতে চালাতে ৫½ মাইলে এসে দেখি একটা ডাক্‌-বাংলো রয়েছে। বাংলো ছাড়িয়ে মন্দিরের সিঁড়ি পাওয়া গেল। গাইডের কথানুযায়ী তার জিম্মায় আমাদের জুতগুলি রেখে মন্দিরে গেলুম। মন্দিরটি প্রকাণ্ড। মন্দিরের ওপর থেকে নীচের দৃশ্য অতি চমৎকার।

মন্দিরের ভেতরে মার্ব্বেল পাথরের মেঝে ভয়ানক ঠাণ্ডা। এখানে ঠাকুরের মূর্ত্তি নেই; কেবল মাত্র দু-টি পায়ের চিহ্ন রয়েছে। একজন পূজারী ও একজন দারোয়ান মন্দিরে থাকেন। পূজারী আমাদের প্রসাদ খেতে দিয়ে, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনে খুবই খুসি হলেন। প্রসাদ বড় অদ্ভুত রকমের—চাল, নারিকেল-কুচি, ছোট এলাইচ ও লবঙ্গ হলুদ জলে মেশান। কিন্তু ঐ একটু, আর বোতল থেকে ঝরণার জল, খেয়ে শরীরে বেশ বল পাওয়া গেল।

এখানে আধঘণ্টা জিরিয়ে নিয়ে, মন্দিরের একটি ফটো তুলে নাম্‌তে সুরু কর্‌লুম।

বেনারসে

ওঠার চেয়ে নামা অতি ভয়ঙ্কর। অনবরত নীচের দিকে যেতে যেতে পেটের নাড়ী ছেঁড়্‌বার উপক্রম করছিল। ঝাঁকানির চোটে শরীরটা ধক্ ধক্ কর্‌তে কর্‌তে আমরা অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে,—মাইল পাথর চোখে পড়্‌তে হিসেব করে দেখি,—আর মাইল দুই পেরুলেই নেমে পড়্‌বো। তখন দিনের আলো পাহাড়ের গায়-গায় ঘেঁস্‌তে ঘেঁস্‌তে কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে গিয়ে, চারিদিক অন্ধকার করে ফেল্‌লে। তখন আমরা টর্চের আলো চারিদিকে ফেল্‌তে ফেল্‌তে এগুতে লাগ্‌লুম। টর্চের আলোয় হঠাৎ দেখি,—দূরে সাদা সাদা কি সব চল্‌ছে। কাছে গিয়ে আশ্চর্য্য না হয়ে থাকা গেল না। উঠবার সময় যাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁরা তখনও নাম্‌ছেন। তাঁরাও আমাদের দেখে আশ্চর্য্যন্বিত হয়ে বল্লেন, "এ কি মশাই! আপনাদের পায়ে কি ঘোড়া বাঁধা আছে? এরি মধ্যে এতখানি পথ এসে আমাদের ধরে ফেল্‌লেন!" আমরা তাঁদের কথায় না হেসে থাক্‌তে পার্‌লুম না। তাঁদের পেছুনে রেখে নির্বিঘ্নে নিমিন্নাঘাট বাংলোয় যখন এসে পৌঁছলুম তখন রাত সাতটা।

বাংলোয় পৌঁছে বলাই টিঞ্চার আয়ওডাইন খোঁজ কর্‌তেই, তার পায়ের তলা দেখে দুঃখ হ'ল। কারণ, তার ডান পায়ের বুড়-আঙ্গুলে নখকুনি হওয়াতে, সে বেচারা খালি পায়ে আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছিল। আমরা তার পায়ের কাটায় আয়ওডাইন লাগিয়ে দিয়ে তার ধৈর্য্যের প্রশংসা না করে থাক্‌তে পারলুম না।

গাইডের মুখে এ বাংলো নিরাপদ নয় শুনে, আমরা কারণ কি জিজ্ঞাসা করায়, জান্‌তে পার্‌লুম, এখানে না কি বাঘ-ভালুক ছাড়া ডাকাতেরও ভয় আছে।

কাপ্তেনের হুকুম—এখানে থাকা চল্‌বে না শুনে,—সাইকেলগুলা ঘর থেকে বের কর্‌লুম। গাইডের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে 'ইস্‌রি'র দিকে রওনা হওয়া গেল।

'ইস্‌রি' (২০১ মাইলে) পৌঁছুতে দেরী হ'ল না। আজকের দিনে খাবার মধ্যে একটু খোয়া-ক্ষীর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। সেদিনকার মত ধর্ম্মশালায় গা-ঢেলে স্বর্গ-সুখ পাওয়া গেল।

২৫শে অক্টোবর।—সকাল সাতটা থেকে, বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সাইকেলের সঙ্গে কুস্তি কর্‌তে কর্‌তে 'বাগোদার' (২২৬ মাইলে) এসে আব্‌গারি-ইনেস্‌পেক্টরের ভাত ধ্বংস করে, যখন বাগোদারকে পেছুনে রেখে 'বর্হির' দিকে রওনা হলুম তখন বেলা তিনটা।

বাগোদার ও বর্হির পথে 'আট্‌কা' নামে এক বাঘে-ভাল্লুকে ভরা ভীষণ জঙ্গল সাত মাইল ধরে পেরুতে হয়। আমরা যখন বাগোদার থেকে বেরুই, তখন হিসেব করে দেখেছিলুম যে, সন্ধ্যের আগেই জঙ্গল পার হয়ে যাব। কিন্তু জঙ্গলে প্রবেশ করেই বাধ্য হয়ে আমাদের সাইকেলের আলো জ্বাল্‌তে হল। দারুণ অন্ধকার! নিবিড় জঙ্গল! পথ চলা ভার!

আমরা এক সার বেঁধে চারিদিকে টর্চের আলো ফেল্‌তে ফেলতে চলেছি। এই ভাবে টর্চের আলো মাইল পাথরে পড়্‌তেই হিসেব করে দেখি যে, মোটে দেড় মাইল জঙ্গল পার হয়েছি—এখনও সাড়ে পাঁচ মাইল। গা-টা শিউরে উঠল। আমরা সাইকেলের গতি বাড়ালুম্। কিন্তু আমরা যত চাই শীঘ্র যেতে, আর ভগবান ততই বাধা প্রদান করেন। অসময়ে—সেই বাঁশী! বাঁশীর শব্দে এই ভয়াবহ স্থানে উৎসুক হয়ে সাইকেল চালান স্থগিত রেখে একত্র হতেই দেখা গেল যে, বলাইয়ের গাড়ীর free wheelএর spring কেটে গেছে। একে ভীষণ জঙ্গল; তাতে আবার রাত। এই সময় এই অবস্থা হওয়ায়, আমাদের বড় ভয় হ'ল—এবার বুঝি আমাদের হেঁটে যেতে হ'বে! কিন্তু, আমাদের ওস্তাদ 'রাধু' কারু কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে বলাইয়ের গাড়ীর পেছুনকার চাকা তাড়াতাড়ি খুলে ফেল্‌লে। প্রায় সাতসের ভারি যন্ত্র-পাতির ব্যাগটা সাইকেল থেকে খুলে নিয়ে সে কাজে লেগে গেল; আর জহর তাকে সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌ল। কাশীর গাড়ীর কার্ব্বাইট্ আলোটা খুলে নিয়ে, বলাই উৎসুক নেত্রে তার প্রাণাধিক গাড়ীর খোলা চাকাটার ওপর আলো ফেল্‌তে লাগল। আর আমরা পাঁচজন তাদের চারিদিকে গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে, যে যার পাউরুটি ও পেন্‌সিল-কাটা, মাংস-খোড়া ও দার্জ্জিলিংএর ছোরা-ছুরিগুলো বাগিয়ে ভাবী শত্রুর অপেক্ষায় রইলুম।

বনের ভেতর মাঝে মাঝে ঘুস্‌ঘাস্ আওয়াজ যাই না হচ্ছে, আর অমনি আমরা টর্চের আলো ফেল্‌তেই দেখি না,—শৃগাল ভায়ারা আমাদের দিকে চোখ-রাঙ্গিয়ে পোঁ পোঁ দৌড় দিয়ে অন্ধকারে মিশিয়ে গেল। এই ভাবে ত কিছুক্ষণ কাটল।

এমন সময় একজন তার নিজের স্থান ছেড়ে উৎব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে বলে উঠ্‌ল,—"রাধু, রাধু! এখানে আর এক মিনিট নয়, তাড়াতাড়ি চাকাটা পরিয়ে ফেল। এই ঝোপটায় নিশ্চয় কোন জানোয়ার এসেছে। কি রকম একটা শব্দ পেলুম!" আমরা প্রথমটা তার কথা হেসে উড়িয়ে দিলুম। কিন্তু একটু এগিয়ে যেতেই শুন্‌তে পেলুম ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ করে আওয়াজ আস্‌ছে। ঘুমিয়ে নাক ডাক্‌লে যেরূপ শব্দ হয় ঠিক সেই রকম শব্দ। আমরা সেই শব্দ লক্ষ্য করে সেই টর্চের আলো ফেল্‌তে যাব, আর অম্‌নি সেই দিকের গাছপালাগুলো নড়ে উঠ্‌ল।

রাধুর কাজ প্রায় সাঙ্গ হয়ে গেছল। সে আর দেরী না করে পাঁচ মিনিটের ভেতর গাড়ীর চাকাটা ফ্রেমের মধ্যে পরিয়ে ফেল্‌লে। ঝোপের ভেতর বাঘই থাক্ আর শৃগালই থাক—আমরা আর এক মিনিট বিলম্ব না করে সে স্থান পরিত্যাগ কর্‌লুম্।

আমাদের সাইকেল কির্ কির্ শব্দ করে পাথর সরাতে সরাতে এগিয়ে চলেছে, এমন সময় দেখি, ভর্ ভর্ কর্‌তে কর্‌তে একটি মোটর গাড়ী, তার হেড্ লাইট জ্বেলে সাম্‌নের দিকে এগিয়ে আস্‌ছে।

আমাদের বিউগ্‌লের করুণ শব্দ আগন্তুক বুঝতে পেরে মোটরগাড়ী এক পাশে দাঁড় করিয়ে তার হেড লাইটটি নিবিয়ে দিলেন।

মোটরগাড়ীর কাছে গিয়ে দেখি, একটা Baby Austin Carএ কয়েকজন বাঙ্গালী। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় জান্‌তে পার্‌লুম, এঁরা হাজারিবাগ থেকে মোটরে কল্‌কাতায় যাচ্ছেন। আমাদের কাছে বন্দুক না থাকায়, এই রকম দুঃসাহসিক কার্য্য করা ঠিক্ নয় জানিয়ে, তাঁদের বন্দুকটি দেখিয়ে দিলেন। এইরূপ কথাবার্ত্তার পর তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে যত যাই—বন তত ভীষণাকার ধারণ করে। খানিকক্ষণ চলতে চলতে হঠাৎ টর্চের আলো বাঁ দিকে পড়্‌তেই দেখি যে, 'সঙ্করেজ' ইনেস্‌পেক্‌সান বাংলো (২৩৭ মাইল)। এই জঙ্গলে একটা আশ্রয় জুট্‌ল দেখে সেদিন আর এগুলুম না। এইখানে রাতটা দুজন করে জেগে জেগে কাটান গেল।

২৬শে অক্টোবর।—ভোর সাড়ে ছটায় এখান থেকে বেরিয়ে যখন 'বহি' (২৪৭ মাইল) পৌছলুম, তখন বেলা আটটা। এখানে আস্‌তেই সাব্‌ডিভিসনাল অফিসারের বাড়ীতে চা-লুচি জুটে গেল। এখান থেকে বেরিয়ে যখন 'চৌপারান' (২৫৯ মাইলে) এসে, রামগড় জমিদারির তশীলদার মহাশয়ের অতিথি হলাম তখন বেলা এগারটা।

আমাদের কপাল নিতাই ভাল; কারণ, আমরা আস্‌বার মিনিট দশ আগে তশীলদার মহাশয় তাঁর দেশ থেকে ফিরেছেন। চৌপারান জায়গাটা মন্দ নয় বটে, কিন্তু, খাবার জিনিস কিছুই পাওয়া যায় না বল্লেই চলে। যা হোক—সবে মাত্র দেশ থেকে ফিরে আর কোন যোগাড় না থাকায়, তবুও তাঁর নানান বিষয়ে অতিথিসেবা দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে থাকা যায় না। ইনি পশ্চিম দেশীয় হিন্দু।

স্নান করার পর, ভিনিগারে ডোবান পেঁয়াজ ও ভাত আরামের সহিত উদরস্থ করে যখন বেরুলুম, তখন বেলা দেড়টা বেজে গেছে। এইবার আমাদের হাজারিবাগের শেষ আঠারো মাইল জঙ্গল 'ধানোয়া-ভুলুয়া' পথে পড়্‌ল। এই জঙ্গলে নানা রকম পশু-পক্ষীর বাস। কিন্তু, আমরা ময়ুর, হরিণ, টিয়াপাখী ও বুনো মুরগী ছাড়া কিছুই দেখ্‌তে পাই নি। এখানে না কি আগে ডাকাতের ভয়ও ছিল।

এই বনে পড়্‌বার আগে রাস্তা ক্রমাগত উঁচুর দিকেই চলেছে; কিন্তু, বন আরম্ভ হতেই রাস্তাটা একেবারে পাঁচ মাইল নীচুর দিকে গেছে। আর এত এঁকেবেঁকে চলেছে যে, সাইকেল খুব সাবধানে না রাখ্‌লে, একবার যদি পড়ে, তবে বাঁচা ভার হবে।

পাঁচ মাইল নীচুর পর আমরা সেখানে আম্‌লকির ঝাড় দেখ্‌তে পেয়ে নেমে পড়্‌লুম। আম্‌লকি পেড়ে খাওয়া হল বটে, কিন্তু, এত কষা যে থু থু কর্‌তে কর্‌তেই অস্থির। এখানে একটি ফটো তোলা হল। জঙ্গল খুবই ভীষণ; কিন্তু রাত্রিতে আট্‌কা জঙ্গল অতি ভয়ঙ্কর দেখেছিলুম বলে, এটা তত চোখে লাগ্‌ল না। এই আঠার মাইল জঙ্গল দিনে দিনে পেরুতে আমাদের বিশেষ সময় লাগ্‌ল না।

গয়ার রাস্তা ডানদিকে ফেলে রেখে যখন আমরা 'সেরঘাটি' (২৯২ মাইলে) হাজির হলুম, তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে। দুপাশে দুটি নদীর মাঝখানে এই সেরঘাটি সহরটি অতি চমৎকার। ট্রাঙ্ক রোডের ডানদিক দিয়ে সহরে ঢোক্‌বার রাস্তা। এখানে অনেক মুসলমানের বাস।

তা ছাড়া পশ্চিম দেশীয় হিন্দুও যথেষ্ট। আবার তিন চার ঘর বাঙ্গালীও আছে।

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আমাদের বিশেষ খাতির করে তাঁর বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। এঁর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া প্রচুর পরিমাণে হয়েছিল। এখানে তখন বেশ শীত পড়ে গেছে; তবে অবশ্য হাজারিবাগ জেলার তোপচাঁচির মত নহে।

২৭শে অক্টোবর।—রাতটা বেশ আরামে কাটিয়ে, ভোরের ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে থানার পাশ দিয়ে ট্রাঙ্ক রোডে উঠ্‌তে যাব, কিন্তু পুলিস ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের ডাক পড়্‌তেই থাম্‌তে হ'ল।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার দরুণ চা খাবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল; তাই ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের ডাক পড়্‌তেই ভাবলুম, বুঝি তিনি আমাদের মনের কথা জান্‌তে পেরে ডেকেছেন। কিন্তু সে গুড়ে বালি দিয়ে, তিনি আমাদের দুটো মিষ্টি কথায় নাম-ধাম লিখে নিয়ে বিদায়ের সেলাম দিয়ে বস্‌লেন।

সহরের নদী দুটির পুল পেরিয়ে কিছু দূর যেতে না যেতেই একজনের সাইকেলে গণ্ডগোল হওয়ায় বাঁশীর শব্দে থাম্‌তে হ'ল। যা হোক—গাড়ী তো ঠিক্ হয়ে গেল। আবার কিছুদূর না যেতে যেতে ফের বাঁশী! দেখা গেল, একজনকার টিউব লিক্ করেছে। আবার টিউব সারানর পর কিছুদূর যেতে যেতে রাস্তার ধারে একটা দোকান পাওয়ায় সেখানে কিছু গুড়-ছাতু খেয়ে যখন বোতলে জল ভর্ত্তি কর্‌বার জন্যে 'মদনপুর' (৩১৬ মাইলে) এলুম, তখন বেলা সাড়ে দশটা।

মদনপুর গ্রামটি একটি পাহাড়ের কোলে অবস্থিত। এখানকার থানার রাজপুত ইনেস্‌পেক্টরের বাড়ীতে জল নিতে গিয়ে, বর্‌বটির চচ্চড়ি, পেঁয়াজ দেওয়া ওল-ভাতে, তাতে আবার নেবুর রস, অড়হর ডাল ও ভাত জুটে গেল। এখানে ইনেস্‌পেক্টর ও তাঁহার এসিস্‌টেন্ট সহ একটি ফটো নেওয়া হল।

এখান থেকে যখন বেরুলুম, তখন বেলা দুটো বেজে পনের মিনিট। কিছু দূর যেতে না যেতেই, ভীষণ চেঁচামেচি শুন্‌তে পেয়ে, পেছু ফিরে দেখি যে, কতকগুলি রাখাল প্রায় পাঁচ ছটা শেয়ালের পেছুতে নানারূপ হৈ-চৈ কর্‌তে কর্‌তে ছুটে চলেছে। একটি গাছতলায় গরুর পিঠে বোঝা চাপিয়ে দুটি লোক বসে ছিল। তাদের শেয়ালের পেছুতে ঐ ভাবে তেড়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, তারা বল্‌লে, "আরে বাবু, উ তো সিয়ার নেহি হ্যায়—উ তো 'ভেড়িয়া'—বাছোয়া পাক্‌ড়েক্ আয়া থা; ইহমা তো বহুত ভেড়িয়া হ্যায়।" হাজারিবাগ্ জেলার অত ভীষণ বনে বাঘ দেখি নি, সেখানে বাঘ না দেখাই আশ্চর্য্য; কিন্তু গয়া জেলার এই সামান্য বনে অতগুলি নেকড়ে বাঘ দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম।

এবার রাস্তা বেশ চমৎকার, উঁচু-নীচু নেই—সমানভাবে চলেছে। এখান থেকে যাত্রা করে একেবারে সন্ধ্যা সাতটায় শোণ নদীর ধারে উপস্থিত হলুম। এ পর্য্যন্ত কত নদী পেরিয়ে এলুম, সবেতে পুল পেয়েছিলুম; কিন্তু এখানে এসে দেখি নদীর কাছ অবধি রাস্তা এসেছে বটে, কিন্তু পুলের চিহ্নমাত্র নেই। অনেকখানি বালি পেরিয়ে নদীর জল। সেখানে নৌকা পাওয়া যায়; কিন্তু আমাদের রাত হয়ে যাওয়ার দরুণ ভাগ্যে যোটে নাই।

শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক ষ্টেসনে (৩৩৫ মাইলে) এসে ট্রেণের জন্যে টিকিট কিনে, ট্রেণের দেরী থাকায় ষ্টেসনের দোকানে পেট ভোরে খাওয়া গেল। আমাদের সাইকেলের ভাড়া দিতে হল বটে, কিন্তু, রেল কর্ম্মচারীদের কৃপায় সাইকেলগুলো মালগাড়ীতে চাপাতে হয় নি; তাঁরা আমাদের একটি কামরা খালি করে দিয়েছিলেন। রাত সাড়ে আটটায় ট্রেণ এল। শোণ নদীর পুল আট মিনিট ধরে পেরিয়ে 'ডেরি'তে পৌঁছলুম।

আমাদের রাতের খাওয়া আগেই হয়ে গিয়েছিল। তাই আমরা রাতটা কাটাবার জন্যে, ডেরি ষ্টেসনে সুবিধা না হওয়ার দরুণ, একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে স্থান চাইলুম। কিন্তু, বড়ই দুঃখের বিষয় যে, 'স্থান হবে না' বলে আমাদের প্রথমে বিদায় দিতে চাইলেন। যা হোক, তাঁর কাছে আর একটি ভদ্রলোক থাকায়, তিনি তাঁর সঙ্গেই কি সব-কথাবার্ত্তার পর আমাদের অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এসে এক জায়গায় একটি ঘর ঠিক্ করে দিয়ে বিদায় নিলেন।

২৮শে অক্টোবর।—কোন রকমে বাধ্য হয়ে সেইখানেই রাত কাটিয়ে, সকাল বেলায় ডেরি সহরটা একটুখানি দেখে

নিয়ে সাসারামের দিকে রওনা হলুম। ধুলা খেতে খেতে—সাসারামে (৩৫০ মাইলে) উকিল বন্ধু মহাশয়ের বাড়ীতে যখন এসে হাজির হলুম, তখন বেলা সাড়ে আট্টা। এখানে বন্ধু-মহাশয়ের আদর-যত্ন দেখে আশ্চর্য্য হতে হল।

সাসারাম সহরটি মস্ত বড়। যাঁর তৈরী রাস্তা দিয়ে এতটা পথ পেরিয়ে সাসারামে এসে হাজির হয়েছি, সেই শের খাঁর সমাধি স্থান দেখ্‌বার জন্তে সমাধি স্থলে এসে হাজির হলুম। সমাধিটী দেখ্‌তে বড়ই সুন্দর। ইহার একটি ফটো নেওয়া হল।

বন্ধু মহাশয়ের বাড়ীতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়া দাওয়া করে, আড়াইটের সময় মোগল সরাইএর দিকে রওনা হলুম। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে হু হু করে চলেছি, যেতে যেতে সন্ধ্যা হল, সন্ধ্যার পর রাত হয়ে গেল—তবু বিশ্রাম নেই; সেই একঘেয়ে ভাবে চলেছি। কার্ব্বাইটের আলোটা পথ দেখিয়ে ঐ ভীষণ অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছিল; আর এমন সময়, আস্তে আস্তে নিভে গিয়ে আমাদের একরকম কাণা করে দিলে; কারণ তেলের আলোগুলোর তেল কম হয়ে যাওয়াতে সেগুলাও প্রায় নিব্‌বো নিব্‌বো হয়েছে। অন্ধকারে পথ দেখা ভার হয়ে উঠ্‌ল—কেবলি মনে হচ্ছে সামনে কি রয়েছে। এবার সত্য সত্যই তাই হল,—সাম্‌নে যে যাচ্ছিল হঠাৎ সে "আরে আরে থামো থামো!" বলে ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই পরের পর সাইকেল শুদ্ধ এ ওর ঘাড়ে ধুপ্‌ ধাপ্‌ করে পড়্‌তে লাগ্‌লুম। পরে উঠে দেখি যে, রাস্তা যুড়ে প্রকাণ্ড এক পাতা-শুদ্ধ বাব্‌লা গাছের ডাল! কোন গ্রামের কাছ দিয়ে তখন যাচ্ছিলুম তা জানি না,—সেই গ্রামের মিউনিসিপ্যাল্ অফিসাররা রাস্তা মেরামতের দরুণ বাবলা গাছ রেখে গাড়ী চলার পথ বন্ধ করেছেন বটে, কিন্তু, সেখানে যে একটা লালই হোক্ আর হলদেই হোক্ আলো রাখা উচিত ছিল, সে কথা তাঁরা বোধ হয় ভাবেনই নি।

রাস্তা খোঁড়ার দরুণ অনেকটা পথ হাঁটতে হল। পথ ভাল পেয়ে আবার গাড়ীতে উঠে কিছুদূর যেতে না যেতেই সেই বাঁশী! সকলে থেমে পড়ে দেখ্‌লুম যে, যে সাম্‌নে ছিল, তার ঘাড়ের ওপর সকলে পড়ার দরুণ তার হাঁটুতে ছড়ে গেছে ও বড় ব্যথা করছে; তাই জন্ম গাড়ী চালাতে কষ্ট হচ্ছে।

কি করা যায়! এই মাঠের মাঝখানে কোথায় থাক্‌বো—এ এক মহা ভাবনা উপস্থিত। আস্তে আস্তে কিছুদূর হেঁটে আস্‌তেই ডান দিকে কতকগুলি আলো দেখা গেল। আলো লক্ষ্য করে সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখি, একটা ষ্টেসন্। এ ষ্টেসনের নাম দেখেই আমরা চম্‌কে উঠ্‌লুম! কারণ, নাম হচ্ছে 'কর্ম্মনাশা' (৩৯২ মাইল)।

ষ্টেসনের কাছে গোটাকতক খোলার বাড়ী দেখ্‌তে পেয়ে, দোকানের চেষ্টায় সেখানে গেলুম। গিয়ে দেখি—কেউ কোথাও নেই—সব দরজায় খিল এঁটে ঘুমচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল—একটা লোক আধভাঙ্গা একটা চৌকির ওপর আগাপাশ্‌তলা মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছে। তাকে ত ওঠান গেল। সে ত উঠেই প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে উঠে, পরে লম্বা এক সেলাম ঠুকে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, তার আধভাঙ্গা চৌকিটা এগিয়ে দিয়ে খাতির করলে। তাকে আমরা দোকানের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে তারই দোকান ছাড়া আর কোন দোকান এখানে নেই। তার দোকান থেকে ভীষণ শক্ত চিঁড়ে আর বালির মত গুড় ছাড়া কিছুই পাওয়া গেল না,—আমরা ত তাই একটু একটু খেয়ে ষ্টেসনের দিকে রাত কাটাবার জন্তে এগুলুম। সেখানে এসে রেলওয়ে কর্ম্মচারীর বুকিং-অফিসের ভেতর কম্বল বিছিয়ে যখন শুলুম, তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে।

২৯শে অক্টোবর।—সকাল সাতটাব সময় কর্ম্মনাশা থেকে বেরিয়ে পৌনে ন'টায় একেবারে মোগলসরাই (৪১২ মাইলে) এসে পৌছলুম। এখানে পৌছে খাবারের দোকানে গিয়ে তিন পো করে 'পুরি' প্রত্যেকে খেলুম, আর তাই না দেখে এক ভদ্রলোক আমাদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন! কিন্তু, এ যে সব ক্ষীণ-ক্ষুধার দল তা তিনি জানেন না।

বাঁ পাশে রেলের লাইনকে রেখে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে যেতে দেখা গেল,—বেণীমাধবের ধ্বজা; আর অম্‌নি আমরা স্ফুর্ত্তির সহিত গান গাইতে গাইতে চারিদিকে ধুলা ছড়িয়ে, পথের পথিককে দাঁড় করিয়ে,—সাঁই সাঁই শব্দে, আমরা 'কলিকাতা হুইলার্স'এর আটজন,—বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে বেলা এগারটার সময় তাঁহারি রাজত্ব কাশীধামে (৪১৭ মাইলে) এসে এবারকার ভ্রমণে ক্ষান্ত দিলুম।

বারাণসী

শ্রীমানকুমারী বসু

১

নমো কাশী চির-আরাধিতা—
ত্রিশূলী ত্রিশূলোপরি-স্থিতা!
জগতের কত উর্দ্ধে,
পুণ্যদাত্রী শুভ-বুদ্ধে,
পাপ-তাপ-সংহারিণী রূপে বিরাজিতা!
উত্তরে বরুণা বসি,
দক্ষিণে বহিছে অসী,
কলুষ-নাশিনী মণিকর্ণিকা সংস্থিতা;
তুষিবারে বিশ্বনাথে,
বিশ্বকর্ম্মা নিজ হাতে,
গড়িলা আনন্দ-পুরী বিশ্ব-প্রপূজিতা—
সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠতমা তীর্থ
স্মরণে পবিত্র চিত্ত,
মরণে সালোক্য-মুক্তি—যম-বিজয়িতা,
নমো কাশী বারাণসী ত্রৈলোক্য-পূজিতা!

২

নমো কাশী বারাণসী আনন্দ-কানন,
শিব-ক্ষেত্র বিষ্ণু ক্ষেত্র,
হেরি চির-তৃপ্ত নেত্র,
বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা পুণ্য-সম্মিলন!
শত তাপতপ্ত জীব,
ডাকিয়া শিবানা শিব,
সিদ্ধি ঋদ্ধি দানে করে কৃতার্থ জীবন!
ধূলি-ধূসরিত মাঠে,
দশাশ্ব, কেদারঘাটে,
বাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দ-মিলন!
সাধু সাধ্বী সতী কত,
করিয়াছে পুণ্য ব্রত,
মা অহল্যা ভবানীর কীর্ত্তি অতুলন!
কত যতী মনস্বীর,
উপদেশ কি গভীর,
ভক্ত রামকমলের মধুর কীর্ত্তন;
দীন দুঃখী ক্ষুদ্র দানে,
কি আনন্দ পায় প্রাণে,
নাহি মাগে—অন্য স্থানে যাচক যেমন!
(যদি কোথা "গঙ্গাপুত্র"
করে কত ছল সূত্র,
যদিও পাণ্ডার মাঝে গুণ্ডা কোন জন!)
তবু কাশী প্রাণারাম,
অনিন্দ্য, আনন্দ-ধাম,
স্মরণে আরাম, মুক্তি লভিলে মরণ,
নমো কাশী বারাণসী শঙ্কর-সদন!

৩

আজি মা, তোমার পদে মাগিয়া বিদায়,
চলিলাম বহু দূরে,
নীরব শ্যামল পুরে—
শত তাপ-তপ্ত মোর দীন বাঙ্গালায়;
প্রণমি বিশ্বের নাথে,
অন্নপূর্ণা মা'র সাথে,
প্রণমি মা স্বর্ণ-কাশী পূর্ণ দেবতায়!
দেশে বসি বাতায়নে,
পূজিব মা মনে মনে,
রত্নমণি চিন্তামণি প্রাপ্য তপস্যায়!
এই চাহি—মৃত্যুঞ্জয়!
যবে দেহ শেষ হয়,
শেষ নিদ্রা লভি যেন ও চরণ-ছায়,
মিশাইও ভস্ম মর্ম মণি-কর্ণিকায়!
দিদিমা মাসীমা সহ,
মিশি র'ব অহরহঃ,
পবিত্র বাতাসে ব্যাপি—তাই মন চায়!
নমো কাশী বারাণসী! ভুল না আমায়!

ব্যথার পুজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬

বৈকালে ধীরুর যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখন রুদ্র রৌদ্রের উষ্ণ প্রবাহ শীতল বায়ুর স্পর্শে কতক পরিমাণে স্নিগ্ধ হইয়া আসিয়াছে। ধীরু উঠিয়া বসিয়া জামার পকেট হইতে পেন্সিল বাহির করিয়া নারাণীর লিখিত খাতাখানার উপর, এখানে কি লাগিবে, কবিরাজের ঔষধের কত দাম বাকী ইত্যাদির একটা মোটামুটি হিসাব করিতে বসিল।

নারাণী একখানা গামছায় হাত মুছিতে মুছিতে দয়াদেবীর ঘরে আসিয়া কহিল "পিসীমা, জেগে আছ?"

"হ্যাঁ, আমায় একটু তুলে বসিয়ে দে ত মা! আর শুয়ে থাকতে পারি না, গায়ে একটু হাওয়া লাগুক! তুই এতক্ষণ কি করছিলি? তোর মুখ চোখ যে রাঙ্গা হয়ে উঠেছে!"

"কাজ করছিলাম গো" বলিয়া নারাণী বাহিরে যাইতেই দয়াদেবী কহিলেন "ধীরু এখনও ওঠেনি বুঝি? খানিক বাদে দাদার সঙ্গে বেরিয়ে বিশ্বেশ্বর দর্শন করে আসে যেন।"

নারাণী বিস্ময়-পূর্ণ কণ্ঠে কহিল "বাঃ, জল না খেয়েই বুঝি? আমি সব তৈরী করলুম···তা হবে না—হ্যাঁ .."

দয়াদেবীর পাণ্ডুব মলিন মুখে একটা পরিতৃপ্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল! তিনি গদ্‌গদভাবে কহিলেন "সময় করে এরই মধ্যে করতে পেরেছিস কিছু? লক্ষ্মী মা আমার। বেশ করেছিস! বিদেশে এসে দোকানের ঐ সব যাতা খাবার খেয়ে অসুখ করে বসলেই মুস্কিল।...তা কি খাবার করেছিস? আমার ত ভাবনাই হচ্ছিল।"

"নিম্‌কী আর গজা! আর কিছু না! উনুনের আঁচ পড়ে গেল যে! আমি আর কি দিয়ে কি করব!" বলিয়া নারাণী মুখ ভার করিল।

দয়াদেবী কহিলেন "যা করেছিস মা, এই ঢের.. কে বা দেখে আর কেই বা করে। একা যে তুই গুছিয়ে সব করতে পেরেছিস এই না কত!"

নারাণী কহিল "উনি কি বিকেলে চা খান্?"—

দয়াদেবী বাধা দিয়া কহিল "বোধ করি খায়! বাড়ীতে থাকতে ওর কোন ঝঞ্ঝাটই ছিল না! খান চারেক লুচী আর একবাটি দুধ হলেই বাছা আমার হাসিমুখে খেয়ে উঠত! খাওয়া নিয়ে ওর কোন বালাই নেই! এমন লাজুক, বাড়ীতেও কোন দিন কোন জিনিস চেয়ে খায়নি! পোড়া অদেষ্ট মা! না হলে ওদের বাড়ী কত লোক খেয়ে মানুষ হয়েছে, সাত ভূতে এখনও খাচ্ছে ..আর বাছা আমার .. ঘরবাড়ী ছেড়ে···বিদেশ বিভুঁয়ে"·· দয়াদেবী আর বলিতে পারিলেন না! শুষ্ক চক্ষু ভিজিয়া কয়ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল, তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

মানুষের দুঃখভরা চক্ষের জল বুঝি এমনই সংক্রামক! কি জানি কেন নারাণীর চোখদুটিও অকারণে ছল ছল করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আঁচলে চোখ মুছিল!

স্মৃতির কঠিন আকর্ষণ দয়াদেবীর ব্যাধি জর্জ্জরিত বুকখানির মধ্য হইতে শত ভগ্ন মনকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া সুদূর খড়দহে...আজন্মের সুখদুঃখ বিজড়িত মায়া-মমতাঘেরা পল্লীগৃহের মাঝে লইয়া চলিল। মনে পড়িল সেই আপন হাতে গুছাইয়া-তোলা ঘর-সংসার, কবে কোন্ অতীত জীবনের এক শুভ মুহূর্ত্তে বাল্য-কৈশোরের সন্ধিক্ষণে জ্ঞান অজ্ঞানের মাঝে একটা আনন্দের অনুভূতি লইয়া পরকে আপন করিতে চলিয়া যাওয়া···বৎসর না ঘুরিতেই, হাসির উৎস না শুকাইতেই, আনন্দের উচ্ছ্বাস না মিলাইতেই, হাতের শাঁখা ভাঙ্গিয়া, সিঁথার সিঁদুর মুছিয়া, চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া, নূতনের শান্তি-সাজে দেহ মন আবরিত করিয়া চিরপুরাতনের মাঝে ফিরিয়া আসা;—সেই একদিন! তারপর আষাঢ়ের কোন্ এক ঘনঘোর বরষায় আঁধার-ঘেরা কালরাত্রিতে সতী সাধ্বী গুণময়ী ভ্রাতৃজায়া বালক

খীরুকে ফেলিয়া এ পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। সে আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সহোদরও একদিন সংসার কাঁদাইয়া চক্ষু বুজিলেন। দেখিতে দেখিতে বর্ষ কাটিল, যুগ কাটিল, ক্রমে নূতন আসিয়া পুরাতনকে ঢাকিয়া ফেলিল! তারপর কত ভাঙ্গা-গড়া, কত ওলট-পালট, কত পরিবর্ত্তন। দয়াদেবীর মুখ দিয়া একটা অফুট শব্দ বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর হতাশের নিঃশ্বাসও বাহির হইল। তিনি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নারাণীকে ডাকিয়া ভগ্নস্বরে কহিলেন "যা, তাহলে শিগ্‌গির শিগ্‌গির বারান্দাটা পরিষ্কার করে রেখে খীরুকে তুলে দে মা। দিনের বেলা এত ঘুমুলে কি আর রাত্রে ঘুমুতে পারবে!"

নারাণী কোন কথা না বলিয়া আঁচলের প্রান্ত কোমরে জড়াইয়া বারান্দা পরিষ্কার করিতে করিতে কহিল "এখন বোধ করি পিসী তোমার শরীর একটু ভালই বোধ হচ্ছে, না? আর যদি জ্বর না আসে, তাহলে বেশ হয়...... কি বল?"

উদাসভাবে দয়াদেবী কহিলেন "কি করে বলব মা; যা করেন বাবা বিশ্বনাথ তাই হবে; সে জন্তে ভাবি না কিছু;—তবে এতদিন পরে ছেলেটা এল, দুটো যে রেঁধে একটু ভাল করে খাওয়াব...তা এমনি বরাত, সে গতরও ভগবান ভেঙ্গে দিলেন। এই এসেছে, কদিনই বা থাকবে এখানে···কদিনই বা বাঁচব···আর দেখা হবে কি না···কাছে পেয়েও বাছার কিছু করতে পারলুম না, এমনি পোড়াকপাল করে এসেছিলুম।"

নারাণী মাথা নাচু করিয়া 'ন্যাতা' জলে ভিজাইয়া কহিল "হ্যাঁ, তোমার এক কথা বাপু। অসুখ কি লোকের হয় না?···না—অসুখ হলেই লোকে মরে যায়? এই ত সুখোদি···দেখেছিলে ত সেবার কি ব্যামোটাই না হয়েছিল · ডাক্তার কবরেজ জবাব দিলে; সকলে বল্লে বাঁচবে না··· যায়-যায় অবস্থা; তুমিও ৩।৪ রাত সেখানে কাটিয়ে এলে, মনে আছে? কেমন? দেখলে—মরল? অসুখ ত সেরে গেলই, আবার দেখতে দেখতে কেমন শরীর ফিরে গেছে, এখন ত চেনাই যায় না...যেন সে সুখোদি নয়। এই নাও, তোমার বারান্দা পরিষ্কার হয়ে গেল। এখন আমি যাচ্ছি কিন্তু অন্য কাজে—বুঝলে?"

দয়াদেবী অন্যমনস্কভাবে কহিলেন "আজ কি বার লা নারাণী? ··বুধবার, নয়?" নারাণী দয়াদেবীর কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল "হ্যাঁ, কেন পিসী, বুধবারে কি?"

"আজ না সুখদার আসবার কথা আছে রে? সেই সেদিন বলে গেল বুধবার সন্ধ্যেবেলা আসবে—সেই কাদের নিয়ে আসবে?"

"কাদের আনবে?"

"সেই যে লো, ওদের বাড়ীর কাছে সাদা বড় বাড়ীটায় কারা জমীদার ভাড়াটে এসেছে না? তাদের আনবে!"

কৌতূহলী ভাবে নারাণী কহিল "কেন?"

"ও মা, তোর মনে নেই? তারা বড়লোক, কত দান-ধ্যান করছে কাশীতে এসে। তারা যে কুমারী পুজো করতে তোকে নিয়ে যাবে তাদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে। পেন্নামী দেবে, নতুন কাপড় দেবে!"

নারাণী কহিল "ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে! কিন্তু আমি যাব না!" বলিয়া তাহার মাথাটায় একটা ঝাঁকুনী দিল।

"ওমা, যাবি না কি? তাঁরা বড়লোক, আমাদেরই স্বজাতি, কত আদর-যত্ন করে তোকে নিয়ে যাবে, কত জিনিস দেবে—"

নারাণী বাধা দিয়া বিরক্তভাবে কহিল "তা দিক্ গে, আমার ভারী গরজ পড়েছে কি না সেখানে যেতে···হ্যাঁ···"

"সে কি রে, ভদ্রলোকের মেয়েরা আসবে, তাদের কি ফেরানো চলে?"

"আমি গেলে এখানে রাঁধবে কে?"

দয়াদেবী হাসিয়া কহিলেন "কেন, আমি বুঝি আর একবেলা পারি না?"

"ঈস্, কতদিন পেটে ভাত পড়েনি, ভারী ক্ষেমতা কি না"—নারাণী ঈষৎ হাসিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই দয়াদেবী কহিলেন "ওলো, শোন্, সে যা হয় হবে, তুই এখন খীরুকে ডেকে দে দেখি, বেলা গেল আর কত ঘুমুবে?"

"যাচ্ছি বাপু···"বলিয়া নারাণী কোমরে জড়ানো আঁচলের কোণটা খুলিয়া গায়ে ভাল করিয়া জড়াইয়া অস্ফুটস্বরে কি একটা কথা বলিয়া দেয়ালের চুণ-বালী-ওঠা একটা স্থানে আঙুল দিয়া খুঁটিতে লাগিল। আকাশে তখন আলো ও ছায়ার লুকোচুরী খেলা চলিতেছিল। দূর আলোর পশ্চাতে

ছায়া তাহাকে ধরিবার ব্যর্থ প্রয়াসে ছুটিয়া আসিয়া আবার পিছাইয়া গেল। দয়াদেবী বিরক্তভাবে কহিলেন "দাঁড়িয়ে রইলি কেন?—যা তুলে দিগে, দেখ্ ত, সন্ধ্যে হয়ে এল।"

নারাণী অবনত মুখে লজ্জাজড়িত স্বরে কহিল "আমার বাপু লজ্জা করছে···আমি বরং বাবাকে বলছি গিয়ে···"

দয়াদেবী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "ওমা, তোর আবার লজ্জা কি। ক্ষেপা মেয়ের কথা শোন!"

"হ্যাঁ···তাই ত...কি বলে ডাকব···" নারাণীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, সে তাহার অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল।

দয়াদেবীর ম্লান মুখের উপর দিয়া সহসা একটা হাসির রেখা অন্ধকার আকাশের বুকে বিদ্যুতের মত মুহূর্ত্তে চমকিয়া মিলাইয়া গেল। একটুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি কহিলেন "যখন সে দূরে ছিল, তখন যা বলে ডাকতিস, তাই বলে ডাকবি। এর পর যদি···"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি চুপ কর বাপু, তোমার কিছু বলতে হবে না···সবই নারাণীকে করতে হবে,···ভারি কি না হ্যাঁ" বলিয়া নারাণী মুখ চোখ লাল করিয়া পাশের ঘরের দিকে দু এক পা মাত্র অগ্রসর হইয়াই সহসা জিব কাটিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইবার সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও সে একটি পাও বাড়াইতে পারিল না। দ্রুততর বক্ষস্পন্দন তাহার কাণে ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দে বাজিয়া আরও তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। সে মুখ ফিরাইয়া দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, বাহিরে আসিয়া কহিল "ওঃ, বেলা শেষ হয়ে গেছে যে!"

ধীরুর সাড়া পাইয়া দয়াদেবী হাতে ভর দিয়া বারান্দার দিকে মাথা আগাইয়া কহিলেন "ধীরু, উঠেছিস, আয় এদিকে, আমি আবার নারাণীকে বলছিলুম তোকে তুলে দিতে।"

নারাণী আর সেখানে দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি দয়াদেবীর ঘরের সামনে দিয়া পাশের ভাঁড়ার-ঘরে গিয়া দরজার কাছে চুপ করিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর একটা আলোড়ন দুলিয়া দুলিয়া তাহাকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

"এই যে পিসী, উঠে বসেছ, কেমন আছ এখন?" ধীরু দয়াদেবীর নিকট আসিল। তিনি কহিলেন "আয়, আমার কাছে বস্ একটু, তারপর মুখহাত ধুয়ে খাবার খেয়ে দাদার সঙ্গে গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে ফেরবার পথে বিশ্বনাথ দর্শন করে আয়। এখানে এলেই আগে ঠাকুর দর্শন করতে হয়।"

ধীরু হাসিয়া কহিল "তিনি ত আর পালিয়ে যাচ্ছেন না পিসী, সে যাওয়া যাবে। আগে কবিরাজের সঙ্গে দেখা করে শুনি তোমার ওষুধ-পত্রের কি ব্যবস্থা করছেন। যদুবাবুকে ত দেখতে পাচ্ছি না; বেরিয়েছেন না কি?"

দয়াদেবী কহিলেন "না, ঘরেই আছেন। ও নারাণী!"

ভাঁড়ার-ঘর হইতে নারাণী উত্তর দিল "কি বলছ!"

"ধীরুকে মুখ ধোবার জল এনে দেনা না মা!" নারাণী তাহার নিবিড়-কৃষ্ণ এলোচুলের গোছা পিঠে দোলাইয়া চঞ্চল-পদে বারান্দা দিয়া ধীরুর পাশ কাটাইয়া সিঁড়ি দিয়া নামিবার সময় একবার পেছন ফিরিয়া চাহিতেই ধীরুর চোখে চোখ পড়িল। এমন ভাবে দৃষ্টি-বিনিময়ের জন্য বোধ হয় দু-এর কেহই প্রস্তুত ছিল না। ধীরু চক্ষু নত করিল। নারাণী কি ভাবিয়া রান্নাঘরের দিকে কয়েক পা যাইয়া আবার ফিরিয়া কলতলার দিকে গেল। ধীরু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল "মেয়েটি ত বেশ চটপটে দেখছি—"

"মন্দ হলে কি আর তোকে আমি লিখতুম রে। আমার কথা শোন্ বাবা, পাগলামী ছেড়ে দিয়ে এইবার বিয়ে—"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "এই নাও, আবার তোমার সেই ভাবনা উঠল।"

দয়াদেবী কহিলেন "আমি ভাবব না ত তোর ভাবনা কে ভাববে শুনি? তোর এই একগুঁয়েমীর জন্যেই কলির মাকে কথা দিতে পারিনি—আহা অমন মেয়ের অদেষ্টে একটা বুড়ো বরের সঙ্গে বিয়ে হল। বিয়ের পরের দিন আমি বাছার মুখের পানে চাইতে পারিনি। মিছে কথা বলব না, দেবু কত ভাল সম্বন্ধ আনলে, তুই বেঁকে বসলি, তার লোকের কাছে অপমান হল। মেজ-বৌমা বড়মুখ করে তার বোনের না কার সঙ্গে তোর বিয়ে দিতে চাইলে, তোর সেই ধনুক-ভাঙ্গা পণ। সাধ করে কি ওরা তোর ওপর চটে গেছে। যা খুসী কর্ বাবা। ছোট ছিলি বড় হয়েছিস, আপনার পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিস, এখন যা ভাল বুঝিস কর্। আমি আর কদিন। তোর একটু ঘর-

"দাও পিয়ালা প্রিয়া আমার, পূর্ণ ক'রে এই অধরে,

যাক অতীতের অনুতাপ আর ভবিষ্যতের ভাবনা ম'রে।" ওমর খৈয়াম— নরেন্দ্র দেব

শিল্পী— শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ দস্তিদার

Bharatvarsha Ptg. Works, Calcutta.

সংসার দেখে যেতে পারলে নিশ্চিন্দি হয়ে মরতে পারতুম !” দয়াদেবী শূন্য-দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নারাণী একটা বালতী করিয়া জল আনিয়া একটু দূরে তাহা শব্দ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া কহিল “খাবারটা নিয়ে আসছি পিসী, চা তৈরী করতে হবে কি না বল।” নারাণীর কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

ধীরু কহিল “না খুকী, চা আর করতে হবে না।”

নারাণী মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। কেহ যদি তাহার মুখের দিকে চাহিত, তবে দেখিত, তাহার মুখখানার উপর লজ্জা, দুঃখ এবং অভিমানের একটা অভিনব মিশ্রিত রূপ মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে !

দয়াদেবী কহিলেন, “তা তুই যদি চা খাস, তাহলে করে দিক না ?”

ধীরু নিম্নস্বরে কহিল “না না বাপু, কেন মেয়েটাকে অনর্থক খাটানো !”

“জল দিয়েছে, যা—হাত মুখ ধুয়ে নে।” খট খট্ শব্দে খড়ম পায়ে যদুবাবু আসিয়া কহিলেন “ওঃ, খুব ঘুমিয়ে উঠলে। ভাবলুম, একবার ডেকে দিই,—তা আবার রাত জেগে এসেছ···কাজেই আর ডাকলুম না !”

ধীরু মুখ মুছিয়া কহিল “ইচ্ছে ছিল একবার কবিরাজের সঙ্গে দেখা করে ওষুধপত্রের কথা শুনে আসব, আর অমনি ২।১টা জিনিস কিনে আনব।”

“তা বেশ ত, যাও না,—আমি ওবেলা কবিরাজকে তোমার কথা বলে এসেছি। এই ত কাছেই···দশাশ্বমেধ-ঘাটের ওপরেই ডানহাতের বড় লাল বাড়ীখানা,...কাণাতে দেখিয়ে দিতে পারবে···আর কাছেই দু-সারি দোকান, যা কিনতে চাও, পাবে।”

দয়াদেবী কহিলেন “ও নতুন এসেছে; কাশীর পথঘাট চিনতে পারবে না,—তুমি না হয় ওর সঙ্গে একবার যাও না দাদা।”

ধীরু বাধা দিয়া হাসিয়া কহিল “কিছু দরকার নেই, আমি ঠিক চিনতে পারব।”

নারাণী একটা রেকাবীতে খানকতক নিম্‌কী ও গজা লইয়া অপর হাতে এক গ্লাস জল আনিয়া ধীরুর সম্মুখে রাখিল।

ধীরু একটু আশ্চর্য্যভাবে কহিল “এ কি পিসী ! এত সব কি করিয়েছ ? এখন এগুলো খেলে কি আর রাত্রে ক্ষিদে হবে ? কি এমন দরকার ছিল খাবার করাবার ? নিজে রয়েছ বিছানায় পড়ে, তোমার যেমন সব কাণ্ড।”

যদুবাবু কহিলেন, “বেশী আর কি দিয়েছে···ওই সামান্য একটু খাবার···হ্যাঁ। তাহলে আমি ধীরুর সঙ্গে যাব না কি দিদি ? তবে ওই কারা সব আসবার কথা আছে না ?”

নারাণী আস্তে আস্তে কহিল “তাঁরা না হয় একটু অপেক্ষাই করবেন।”

“হ্যাঁ···হ্যাঁ···ঠিক বলেছিস। তারা না হয় অপেক্ষাই করবে। যে অগস্ত্য কুণ্ডুর গলি, ও ধীরু ঠিক করতে পারবে না। চল ধীরু, আমি গায়ের কাপড়টা নিই।”

ধীরু কহিল “না, না, আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, আমি ঠিক চিনে যেতে পারব। এই গলিটা ধরে গিয়ে ডান দিকে বেঁকে যে রাস্তাটা গিয়ে মিশেছে, সেইটাই ত দশাশ্বমেধের পথ ?”

যদুবাবু কহিলেন “হ্যাঁ, আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই কবিরাজের বাড়ী।”

দয়াদেবী কহিলেন “দেখিস, পথ হারাসনি যেন ! তাহলে অমনি বাবা বিশ্বনাথকে দর্শন করে আসিস।”

“দেখি—সে তোমার বাবার দয়া।” বলিয়া ধীরু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

ধীরু বাহির হইয়া গেলে যদুবাবু কহিলেন “না দিদি, তোমার ধীরু খাসা ছেলে। দেখতেও যেমন সুশ্রী, আর কথাবার্ত্তায় তেমনি নম্র, স্বভাবও ধীর শান্ত, আমার বড্ড পছন্দ হয়েছে ছেলেটিকে, ..আমার নারাণীকে তোমায় নিতেই হবে।”

নারাণীর মুখখানা লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি সেখান হইতে উঠিয়া যাইতেই দয়াদেবী কহিলেন “কোথায় যাচ্ছিস আবার ? চুলটা বেঁধে নে,—”

“হ্যাঁ, আমার অন্য কাজ নেই বুঝি ?” দয়াদেবী ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন “তা থাক্‌, চুলটা বেঁধে, গা ধুয়ে, আলোর যোগাড় করে রাখ্‌, এর পর তারা সব এসে পড়লে আর সময় পাবি না !”

“আচ্ছা, আগে ত তোমার ঘরটা পরিষ্কার করে দিই !” বলিয়া ঝাঁটা দিয়া ঘরের একদিক পরিষ্কার করিতে লাগিল।

দয়াদেবী কহিলেন “ধীরুর শোবার বিছানাটা এ'ঘরের

এক দিকটায় না হয় পেতে রাখ ; কি জানি রাত্রে যদি আবার ওঠবার দরকার হয়, শরীরটা যেন কেমন লাগছে—"

নারাণী কহিল "কেন, আমিই ত তোমার কাছে শোব, ওঁর বিছানা ত ও-ঘরে করে রেখেছি !"

দয়াদেবী কহিলেন "তুই আর কত রাত জাগবি মা, এক মাস ধরে সমানে এক দিকে সংসারের ঝঞ্ঝাট, আর এক দিকে আমার সেবা করছিস, ধীরু যখন এসেছে···"

"এ কি পিসী, তুমি যে কাঁপছ ? আবার জ্বর এল না কি ? দেখি···" নারাণী দয়াদেবীর গায়ে হাত দিয়া কহিল "ওমা, তাই ত—কপাল যে আগুন হয়ে উঠেছে ! ওঠ, আর বসে থেক না, এস শুইয়ে দিই !" নারাণী দয়াদেবীকে বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া তাঁহার গায়ে একখানা গরম কাপড় চাপা দিল। দয়াদেবী মুড়ি দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন "আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ধীরুকে ডেকে খাওয়াস মা ! নইলে ধীরুর—"কম্পিত কণ্ঠের অস্পষ্টতায় অবশিষ্ট কথাগুলি নারাণী বুঝিতে পারিল না। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে ধীরুর জলখাবার যায়গাটা পরিষ্কার করিয়া গেলাস ও রেকাবীখানা লইয়া কলতলায় চলিয়া গেল।

রাস্তায় বাহির হইয়া ধীরু যদুবাবুর নির্দ্দেশ-মত বরাবর সোজা খানিকটা পথ চলিয়া মোড়ের মাথায় পৌছিতেই, একজন ভিক্ষুক তার অবনত দেহ লাঠিতে ভর দিয়া কোনমতে একটু সোজা করিয়া, শিরা-বহুল কম্পিত হাতখানা কপালে ঠেকাইয়া কহিল "ভূক্‌খা হ্যায়, দয়া করে বিশ্বনাথজী"

···ধীরু জামার পকেটে হাত দিয়া দেখিল কাছে একটি পয়সাও নাই। তাহার মনে পড়িল মনিব্যাগ এবং রুমালে বাঁধা খুচরা টাকা পয়সা আজ সকালে পিসীমাকে দিয়াছে। ভিক্ষুক ধীরুকে পকেটে হাত দিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল "বাবা ভালা রাখখে !"···

ধীরু দুঃখিতভাবে তাহার দিকে চাহিয়া কহিল "মাফ করো বাবা, কুছ সঙ্গে নেহি হ্যায়।"

ভিক্ষুক চলিয়া গেল। ধীরু ভাবিল তাই ত, এখন কি করা যায় ! সমস্ত দিন পিসী উপবাস করিয়া আছেন, তাঁহার জন্ত কিছু ফল কেনা দরকার, একটা হ্যারিকেনও কিনতে হবে ! এখন আবার বাসায় ফিরিয়া গেলে...ছিঃ ছিঃ যদুবাবুই বা কি মনে করিবেন। যাহাদের আসিবার কথা ছিল, হয় ত এতক্ষণ তাহারা আসিয়া থাকিবে···সকলের সম্মুখে রোগাতুরা পিসীর কাছে যাইয়া টাকা চাওয়া।···দূর ছাই, ব্যাগটা পকেটে রাখিলেই সকল গোল চুকিয়া যাইত···অন্ততঃ নারাণীর কাছে থাকিলেও··· নারাণী...বেশ মেয়েটি ! কি স্নেহ মমতায় ভরা অন্তরখানি তাঁর···কি একান্ত সাহচর্য্য, নিঃস্বার্থ উপকার,···অন্তর-বাহিরের দ্বিধাশূন্য কর্ম্মনিষ্ঠা ! কিন্তু নারাণী কে তাহাদের ? কেউ নয়···পরের মেয়ে, পথের পরিচয়,·· অথচ ইহারই আন্তরিক সেবা যত্ন না পাইলে এই অপরিচিত দেশে, স্বজনহীন স্থানে পিসীমার ক্ষীণ জীবন-প্রদীপটি পুড়িয়া পুড়িয়া নিভিয়া যাইত ! সে মেয়েটি পর হইয়াও আপনার করিয়া লইয়াছে · হয় ত ইহারই বিনিময়ে সে কিছু আশা করিয়া থাকিবে, হয় ত পিসীমাও সযত্নে তার এই আশালতাটির মূলে জল সিঞ্চন করিয়া আসিতেছেন ! তাই কি ? হতেও পারে ! কিন্তু তাহা যে হইবার নহে। দিবার যে কিছুই নাই ! সে যে সর্ব্বস্ব দান করিয়া রিক্ত হইয়াছে। ধূমকেতুর মত ছুটিয়া চলিয়াছে উদভ্রান্তভাবে একটা লক্ষ্যহীন পথে।··· সহায়হীন, শান্তিহীন, ব্যর্থতায় ভরা একটা নিঃসঙ্গ জীবন তার। না না, দিবার কিছুই নাই !—ধীরুর মৌন অন্তর মথিত করিয়া একটা গভীর নিঃশ্বাস বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, রাস্তার ওপারে একখানা বড় বাড়ীর সম্মুখে জনতা হইতে সহসা সমস্বরে "রাণীমায়িজী কি জয়" চীৎকার শব্দে ধীরুর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইল ! ধীরু দেখিল, সেই বাটী হইতে বহু ভিক্ষুক, খঞ্জ, অন্ধ প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষ মহা উল্লাসে বাহির হইতেছে ! সকলেরই হাতে নূতন কাপড়, মুখে আনন্দের অপরিসীম উচ্ছ্বাস ! শ্বেত চন্দনের ফোঁটা-কাটা অর্দ্ধমলিন চাদর অথবা নামাবলী গায়ে নগ্নপদে ব্রাহ্মণের দল হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতেছে। ধীরু চলন্ত অবস্থায় ঘাড় ফিরাইয়া তাহার উদাস দৃষ্টি একবার সেদিকে নিক্ষেপ করিতেই চমকিয়া উঠিল,—চলন্ত পা দুখানা অচল হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ! মুহূর্ত্তের জন্ত তার সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া দ্রুতবেগে রক্ত সঞ্চালিত হইল, বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অনুচ্চস্বরে অস্ফুটভাবে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—কল্যাণী...এখানে ?...এ ভাবে...অসম্ভব ! কিন্তু এতখানি দৃঢ়তার অন্তরালে তাহার আন্দোলিত বক্ষের মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল অতীত স্মৃতির একটা উন্মাদনা ! শত অসম্ভব ও অবিশ্বাস দূরে ঠেলিয়া একটা অনির্দ্দিষ্ট সত্যের

সুখানুভূতি তাহার অন্তর-বাহির ছাইয়া ফেলিল! মুহূর্ত্তে হর্ষ ও বেদনার একত্র সংমিশ্রণে উদ্বেলিত আবেগে ধীরু মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সত্যই এ যে কল্যাণী! লাল চেলীর অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মাঝে এ মুখখানি তাহার চিরপরিচিত! খোলা জানালার মুক্তপথে অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্তাভা তাহার সুন্দর মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়াছে, চূর্ণ অলকরাজি মৃদু-মন্দ বায়ু-সঞ্চালনে সিন্দুর-শোভিত ক্ষুদ্র কপোলখানি ত্রস্ত ভাবে স্পর্শ করিতেছে। অবনত চক্ষুদুটি নিম্নে গৃহদ্বারে কোলাহলপূর্ণ ভিক্ষুকশ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ! স্বর্ণালঙ্কার-সজ্জিত একখানি সুগোল বাহু জানালার গরাদের উপর ন্যস্ত, মুখে মৃদু হাসি! যৌবনভারাবনত দেহখানি রূপশ্রীতে আজ কানায় কানায় পূর্ণ! মুগ্ধ বিস্ময়ে ধীরু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া জোর করিয়া অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরাইল! আকাশের আজ নূতন রূপ, খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি অস্তমিতপ্রায় রবিরশ্মি-প্রভায় স্বর্ণরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সারা আকাশখানির উপর কে যেন সিন্দুর ঢালিয়া দিল! দূরে...জাহ্নবীর পরপারে ঐ শুভ্র বালুচর; তাহার পশ্চাতে আরও দূরে দিগন্তের প্রান্ত হতে ঘন নীল বনরেখা আচ্ছাদিত করিয়া নিশীথের মসি-যবনিকা নামিয়া আসিতেছে। পিপাসু চক্ষের দৃষ্টি ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই বাতায়ন-পথে আসিয়া ব্যর্থ আশায় মর্ম্মাহত হইয়া ফিরিল...কল্যাণী সেখানে নাই! তাহার পরিবর্ত্তে এক শুভ্র-বসনা নিরাভরণা বিধবা যুবতী দাঁড়াইয়া আছে। ধীরু দৃষ্টি ফিরাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। অন্যমনস্ক ভাবে চলিয়াছে। মনে কেবল এই কথাটাই উঠিতে লাগিল,—তবে কি তাহার দৃষ্টি-ভ্রম হইল? সে কি কল্যাণী নহে? কিন্তু সে ত ঠিক তাহারই মত দেখিতে...নিশ্চয়ই সে কল্যাণী। কিন্তু কল্যাণী কাশী আসিবে কেন? আর এ রকম ভাবে দান-ধ্যানই বা করিবে কেন? কিন্তু যদি সে কল্যাণী...তবে পলাইল কেন? আমাকে দেখিয়া কল্যাণীর ত পলাইবার কোনই হেতু নাই! না......নিশ্চয়ই সে কল্যাণী! যাহাকে বালিকা অবস্থা হইতে সেদিন পর্য্যন্ত দেখিয়াছি, আজ বৎসরের অদর্শনে তাহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিব না?......বাড়ীখানা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিলেই হইত। তাহাতেই বা লাভ কি?......ইচ্ছা করিলেই ত তাহার সাক্ষাৎ-লাভ এখন সম্ভব নয়! কিন্তু সে ত আমার........ধীরুর মাথার ভিতরটা জ্বালা করিয়া উঠিল!

যে বেদনাকে এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যেও একেবারে নিঃশেষ করিয়া মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই, অন্তরের কোন্ এক গোপন দেশের এতটুকু স্থান যে বেদনার অনুভূতি অধিকার করিয়া আছে, আজ সেই বেদনাক্লিষ্ট স্থানে এ আঘাত বড় বাজিল। ধীরু যেন তার অবশ পা দুটোকে আর টানিয়া লইতে পারিতেছিল না, সে যে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে তাহাও তাহার খেয়াল নাই! পার্শ্বের বাড়ীগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল দুইএকটা বাড়ীর দরজায় দুইচারি জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে।

ধীরু অপ্রস্তুত ভাবে ফিরিবার উপক্রম করিতেই একজন স্ত্রীলোক আগাইয়া আসিয়া কহিল "এস না, ফিরছ কেন?"

ধীরু অভিভূত হইয়া কহিল "সোনারপুরার রাস্তা—"

স্ত্রীলোকটা হাসিয়া অপরা স্ত্রীলোককে কহিল "ওলো, একে সোনারপুরায় নিয়ে যাবি?"

সেই বাড়ী হইতে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষ বাহির হইয়া কহিল "এত হাসি কিসের রে নলী?" লোকটা ধীরুর মুখের পানে চাহিতেই ধীরু কহিল "আমায় সোনারপুরার রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে পারেন?"

লোকটি কহিল "আপনি নতুন এখানে এসেছেন বুঝি? এর আগের গলিটা দিয়ে যান, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে!"

ধীরু স্বল্প আলোকে কোন রকমে পথ লক্ষ্য করিয়া চলিল! যখন বাড়ী গিয়া পৌছিল তখন রাত্রি দশটা! দয়াদেবীর ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল তিনি ঘুমাইয়া আছেন। মেঝের উপর একখানা আসন পাতা, এক গ্লাস জল, ও খাবার ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে! পাশেই নারাণী আঁচল প্যাতিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া আছে; ছেঁড়া মহাভারতখানা মাথার কাছে তখনও খোলা পড়িয়া আছে! প্রদীপের আলো ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছিল; তাহারই মৃদু জ্যোতিঃ নারাণীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে! শিথিল বক্ষবাস গভীর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মৃদু আন্দোলিত হইতেছিল! ধীরু গেলাসের সবটুকু জল এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া একবার ঘুমন্ত বালিকার মুখের পানে চাহিল! পরে ডাকিল "খুকী, খুকী, ওঠ, ঘরে গিয়ে শোওগে!"

নারাণী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া ধীরুকে দেখিয়া জিব কাটিয়া তাড়াতাড়ি আঁচলখানা গায়ে দিল। ধীরু তাহার জামার বোতাম খুলিতে খুলিতে কহিল "আমি আর কিছু খাব না খুকী, তোমাদের খাওয়া হয়েছে ত ?"

নারাণী কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িল। ধীরু তখন জামা খুলিতেছিল, তাহা দেখিতে পাইল না। মহাভারতখানা উল্টাইয়া রাখিয়া নারাণী কহিল "শোবার বিছানা ও-ঘরে করা আছে...পিসীর কাছে আমিই থাকব।"

ধীরু বাহির হইয়া গেল। নারাণী প্রদীপটা যথাস্থানে রাখিয়া দরজায় খিল দিয়া, তাহার ছোট বিছানায় শুইয়া পড়িল।

১৭

কাশী আসিবার কয়েক দিন পরে একদিন বৈকালে যখন জগদীশ বাবু দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে একখানি সুন্দর বাড়ীর বৈঠকখানায় বসিয়া অম্বুরী তামাকের সুগন্ধি ধূমে ঘরখানি আমোদিত করিতেছিলেন, আর মাঝে মাঝে আফিমের নেশার আবেশে এক-একবার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঢুলিতে-ছিলেন, মাথায় পাগড়ী-বাঁধা কপালে বড় রকমের সিন্দুরের ফোঁটা-কাটা ঈষৎ খর্বাকৃতি একজন হিন্দুস্থানী লোক খালি পায়ে ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। জগদীশ বাবু যখন তাহাকে দেখিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন "আইয়ে মিশিরজী!"

মিশিরজী ওরফে পাণ্ডা শিবশঙ্কর মিশ্র তাহার পাকা গোঁপে একবার চাড়া দিয়া ফরাসের এক কোণে মাটিতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ঈষৎ হাস্যে আধ-বাংলা আধ-হিন্দি ভাষায় কহিল "আপনার ত কুচ তকলীফ হোতা নেহি! হাম্ সব বন্দোবস্ত করিয়েছে, কাল মায়ীলোককো মন্দিরমে লে যাগা; ভাল দর্শন হোবে মহারাজ!"

জগদীশ বাবু হাসিয়া বলিলেন "হ্যাঁ—বাড়ীতে বলছিল বটে যে কাল মন্দিরে যাবে! তা অমনি একদিন দুর্গাবাড়ী দেখিয়ে আনবার বন্দোবস্ত কর!"

পাণ্ডা ঠাকুর তাহার বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল "উস্‌মে ক্যা আছে, হুঁয়া রাজা পাণ্ডা হ্যায়, ও হামার শালা আছে, ভাল বন্দোবস্ত হোবে।"

জগদীশ বাবু কোমরে হাত দিয়া কহিলেন, "ওই মেয়েরাই যাবে—আমার যাওয়া হবে না, কোমরের ব্যথাটা আবার বেড়েছে। মেয়েদের সঙ্গে হরি ঠাকুর যাবে, আর দরওয়ান যাবে!"

"হরি ঠাকুর? কে?—হরিয়া পাণ্ডা?" পাণ্ডা ঠাকুর জগদীশ বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় একজন কুড়ি একুশ বছরের বেশ মোটা গোলগাল ধরণের ছোকরা, মাথায় বাবড়ী চুল, ছেঁড়া চটি পায়ে পট্ পট্ শব্দ করিয়া আসিয়া হাজির হইল। তাহার একটি চোখ কাণা, গায়ের রংটা তামাটে, কাণে একটা আধপোড়া বিঁড়ী।

"এই যে হরি, তোমার কথাই পাণ্ডা ঠাকুরের সঙ্গে হচ্ছিল! পাণ্ডাজী, এই এর নামই হরি ঠাকুর; পাশের লাল ছোট বাড়ীখানা হচ্ছে এদের। এদের বাড়ীর মেয়েরা খুব ভাল, আমাদের বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে ভারী আলাপ হয়েছে।"

পাণ্ডা ঠাকুর হরিকে জিজ্ঞাসা করিল "আপ্ হিঁয়াকা রয়নেওলা হ্যায় বাবু?"

হরি হাসিয়া কহিল "হাঁ পাণ্ডাজী; হামারা নাম নেহি শুনা হ্যায়? কাণা হরিকে জান্তা নেই, এমন লোক কাশীতে হ্যায়?"

পাণ্ডাজী হাসিয়া কহিল "হাঁ হাঁ বাবু, আব্ মালুম হুয়া। ও-বরষ ডালকি মুণ্ডিমে যো মারপিঠ হুয়াথা—"

হরি বাধা দিয়া কহিল "হাঁ উসমে হাম্ থা। মারকে ভূত ভাগায় দিয়া। জানেন বাবু, এক মাগী এক ভদ্রলোকের ঘড়ীচেন কেড়ে নিয়েছিল। আমাদের দলে খবর আসতে সবাই হৈ হৈ করে গিয়ে ভদ্রলোকের ঘড়ী আদায় করলুম! এই সব বাবুরা এখানে আমোদ করতে আসে; কিন্তু এখান-কার লোক যদি সঙ্গে না থাকে মশাই, এমন সব বেমক্কা যায়গা আছে বুঝলেন কি না—হ্যাঁ!"

জগদীশবাবু বাধা দিয়া কহিলেন "সে থাক্‌গে! শোন হরি, কাল মেয়েরা সব মন্দিরে যাবে, তাহলে তুমিও ওদের সঙ্গে থেকো। এই পূজার ভিড়, আর গয়াতে যা নাকালটা হয়েছিলুম, মনে হলেও গায়ে জ্বর আসে! আর গয়ালী পাণ্ডাদের যা জুলুম!"

পাণ্ডা ঠাকুর গোঁফে চাড়া দিয়া কহিল "হিঁয়া ওসব কুছু নাই মহারাজ! হামরা আপকো তাঁবেদার! আপকো মজামে দর্শন করাবে, হুকুম তামীল করবে, আপ্ খোস

হো কর্ যানেকা বকত ব্রাহ্মণকো যা দিবেন মাথা পাতি লেব! একদিনকা কাম ত নাই মহারাজ!"

জগদীশবাবু হাসিয়া কহিলেন "সে ত ঠিক পাণ্ডাজী! কি হে হরি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

"আজ্ঞে না আর বসব না, দিদিমণি ডেকে পাঠিয়েছিলেন, যাই বাড়ীর ভেতর দেখি কি ফরমাস করেন! বোধ হয় কাল পূজার জন্ম সব জিনিস কিনতে বলবেন। দিদিমণির যা ঠাকুর-দেবতাকে ভক্তি, বাবু বুঝলেন কি না রাস্তায় ভাঙ্গা নুড়িটিকে পর্য্যন্ত মাথা ঠুকবেন!"

জগদীশবাবু একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "বিধবা মানুষ, কি নিয়ে থাকব বল; এই বয়সেই কপাল পুড়লো—"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ত বটেই—আচ্ছা বসুন তাহলে—দেখি"

জগদীশবাবু বাধা দিয়া কহিলেন "তোমাদের ওপর আমরা বড্ডই জুলুম করছি—না হে? তা আমরা বিদেশী লোক, তোমাদের এখানে এসেছি, একটু বিরক্ত করব বৈকি!"

হরি তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষুটা বন্ধ করিয়া কহিল "হ্যাঁ... হ্যাঁ...কি বলেন বাবু...এর আর বিরক্ত কি!"

পাণ্ডা ঠাকুর এতক্ষণ বসিয়া গোঁফে চাড়া দিতেছিল, কহিল "তব্ মহারাজ হাম্ আয়, কাল সকালে আ যাবে!"

"আচ্ছা, কাল সকালে এস, এরা মন্দিরে যাবে! দেরী করো না যেন, আবার এদের কুমারী-ভোজনের হেঙ্গাম আছে!"

"না মহারাজ, হাম বড় ভোর আসবে।" পাণ্ডা ঠাকুর চলিয়া গেল!

জগদীশবাবু ডাকিলেন "ওরে নেতা, কল্‌কেটা বদলে দিয়ে যা! হ্যাঁ হরি, তাহলে তুমি বাড়ীর ভেতর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করে 'কুমারী পূজোর' কি সব জিনিস আনতে হবে একটা ফর্দ্দ করে ফেল! তোমার বৌদির কাছ থেকে টাকা নিয়ে জিনিসগুলো আজই কিনে ফেল, কি বল?"

হরি উৎসাহভরে কহিল "আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই পাণ্ডা বেটাদের হাতে টাকা দিতে আছে? অমন কাজও কখনও করবেন না মশাই! ওদের চেনেন না মশাই। ওই যে দেখছেন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, আর মুখে কথায় কথায় রাজা মহারাজা বানিয়ে দেয়, ধর্ম্মের নাম করে বেটারা কি কম পয়সাটা ফাঁকি দিয়ে নেয়? এই দিদিমা বল্লে সেদিন অন্নপূর্ণার মন্দিরে বৌরাণী পাণ্ডা বেটাকে ২৮৲ টাকা দিয়েছেন! আমি থাকলে ও নিতে পারত? ব্রাহ্মণ খাবে না আর কিছু! ওই বেটারই পেট-পূজো হবে! যা আপনাদের দরকার হবে, হয় আমাকে না হয় আমার দিদিমাকে বলবেন, সব বন্দোবস্ত করে দেব!"

"আচ্ছা!" হরি ঠাকুর অন্দরাভিমুখে চলিয়া গেলে জগদীশবাবু তামাক টানিতে টানিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন "হরি ঠাকুর যাহা বলিল, তাহাই ঠিক! পাণ্ডারা যাত্রীদের কাছে দু'পয়সা রোজগার করিবে বলিয়াই এই ব্যবসা পুরুষানুক্রমে চালাইয়া আসিতেছে। হরি ঠাকুর ও তাহার দিদিমা সুখদা ঠাকরুণ, এখানকার বাসিন্দা ভদ্রলোক, ইহারা সুবিধা করিয়াই দিবে! ইহাদের লোভ বড় জোর দুই-এক দিন এখানে নিমন্ত্রণ খাইবার," দুই-পাঁচ টাকার উপর; তাহার বেশী নহে! আর কল্যাণীও সুখদা ঠাকরুণকে পছন্দ করে।" কল্যাণীর কথা মনে আসিতেই জগদীশবাবুর চক্ষের সম্মুখে তাহার পূজারতা মূর্ত্তিখানি ফুটিয়া উঠিল! "আহা লাল বেনারসী শাড়ীখানি পরে পূজাকালে ওকে কি সুন্দরই দেখায়! এতদিনে কল্যাণীর মন ফিরিয়াছে... নিশ্চয়ই ফিরিয়াছে।" একটা সুখের অনুভূতিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল! তিনি উঠিয়া ডাকিলেন, "ওরে নেতা, ঘর বন্ধ কর্।"

নেত্য চাকর হাজির ছিল, কহিল "যে আজ্ঞা কর্ত্তা।"

জগদীশ বাবু অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে কহিলেন "আর গড়গড়াটা ওপরে নিয়ে আয়!"

হরি ঠাকুর অন্দরে প্রবেশ করিয়াই ডাকিল "কই গো দিদিমণি কোথায়?" জগদীশবাবুর মামী সদু ঠাকুরাণী তখন এক বাটি গরম দুধ পাখার বাতাস দিয়া ঠাণ্ডা করিতে-ছিলেন। তিনি হরিঠাকুরকে দেখিয়া একটা বিরক্তিপূর্ণ কটাক্ষ করিলেন। এবং মুখভঙ্গী করিয়া কহিলেন "এখানে তোমার...দিদিমণি ফিদিমণি কেউ নেই বাবু, দেখগে ওদিকে" হরিঠাকুর উঠান পার হইয়া ওদিকে গেলে পার্শ্বস্থ একটা বিড়ালকে সজোরে পাখার আঘাত করিয়া কহিলেন "ছোঁড়া সাতপুরুষের দিদিমণি পেয়েছে! মড়িপোড়া বামুনের সময় নেই অসময় নেই, ঠ্যাঙ্গ ঠ্যাঙ্গ করে এসে দিদিমণি কই গো, দিদিমণি কই গো। মর, আমি তার কি জানি? আমার কাছে কেন? আমি কি তোদের কোন শলা-পরামর্শে আছি...না থাকতে চাই?

খা, দশজনে লুটে পুটে…আমার কি! আর ওই যে যব সোমত্ত মেয়ে সকাল নেই সন্ধ্যে নেই টেঙ্গস-টেঙ্গস করে ওই ছোঁড়ার সঙ্গে বেরিয়ে কাশী সহর তোলপাড় করছিস্, এতে লোকেই বা বলে কি? বলতে গেলেই মামী ত ভারী মন্দ হবে, ভায়ের কাছে সাতখানা করে লাগাবি! এমনি ত লোকের কাছে বলে বেড়াস 'আপনার মামী নয়, গাঁ সম্পর্কে মামী।' তা না হয় কেউ নাই হলুম, তোদের বাড়ী গতর খাটাই খাই, তাই বলে নেয্য-অনেয্য বলব না? তোর বাবা যে এই রাঁড়ি বামনীকে আদর করে হাতে ধরে এনেছিল লো, তখন সব ছিলি কোথায়?…বারণ করতে পারিসনি? সদু বামনি আজকের নয় লো!"

"কি গো মামী, আপন মনে বিড়-বিড় করে কি বকছ? এরপর দেখছি লোকে তোমায় পাগল বলবে।" কাদম্বিনী সদুঠাকরুণের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আমাদের আর পাগল হবার বয়েস নেই বাছা; আর হলেও মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলে দেখবে কে বল? দশটা দাসী বাঁদীও নেই, দরদের লোকও নেই! গতর খাটিয়ে খাই—"

কাদম্বিনী বাধা দিয়া কহিল "কি আর বলেছি মামী যে লাখ কথা শুনিয়ে দিচ্ছ? তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই দায়। ওই জন্যে তোমার সঙ্গে কথা কই না!"

"তা আমার সঙ্গে কথা কইবি কেন? ওই কানা ছোঁড়ার সঙ্গে রাতদিন মুখোমুখি হয়ে বসে খুব কথা কও! আমি যদি বলতে যাই, দশ ঝাঁটা আমার মুখে গুণে মেরো! আপনার জন বলেই বলতে যাই, সত্যি ত আর রাঁধুনী নই। ভগবান মেরেছেন তাই…না হলে…আমারও…"সদুঠাকরুণ আর বলিতে পারিলেন না, আঁচলে মুখ ঢাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"দেখ মামী, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, সব সময় শুধু শুধু চক্ষের জল ফেল কেন বল ত? এতে কি গেরস্থর কল্যেণ হয়? বৌদি ত মিছে বলে না যে মামীর ভীমরতি হয়েছে।"

সদুঠাকরুণ ক্রন্দন জড়িত স্বরে কহিল "সে ত বলবেই, আজ উড়ে এসে জুড়ে বসে গিন্নী হয়েছেন। বলে, শশা-বেচুনী বেচত শশা, তার হয়েছে সুখের দশা! দুহাতে দান ধ্যান হচ্ছে, ওই সুখদা মাগী আসছে উঠতে বসতে সন্দেশ রাবড়ী মুখে তুলে ধরছে, কানা ছোঁড়াটার ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা জল-খাবার। সব দেখছি! টাকাগুলো খোলামকুচীর মতন হরিলুট হচ্ছে। চোখে দেখতে পারি না তাই বলা! সত্যি, জগু ত আমার পর নয়, গেলে তারই যাবে! নাহলে আমার কি লা! ভিক্ষে মাগলে দিন চলে যাবে! তখনই ত জগুকে বলেছিলুম—বাবা আবার বিয়ে করছ,—এ লেকাপড়াউলী বউয়ের সঙ্গে আমার বনবে না, আমায় বিন্দাবনে পাঠিয়ে দাও। তখন জগু বল্লে, না মামী, বউকে ফেলতে পারব তবু তোমায় ফেলতে পারব না! এখন আমায় এই হেনস্তা! হাঘরের মেয়ে এসে—"

কাদম্বিনী বাধা দিয়া কহিল "দেখ মামী, দাদা শুনলে একটা কেলেঙ্কারী হবে। বউএর নামে এই সব বলছ—"

সদুঠাকরুণ গালে হাত দিয়া কহিল "ওমা, অবাক করলি কাদি? বউএর নামে আমি আবার কখন কি বল্লুম? অমন অধম্মে কথা সদু বামনী বলে না। জিব খসে যাবে। যাই দেখি একবার জগুর কাছে, আমার পেছনে এত করে লাগিস কেন বল্ তো? তোরাই ভাঙ্গিস, তোরাই গড়িস, আমি ত কারুর সাতেও নেই, পাঁচেও নেই!" দুধের বাটি লইয়া সদু ঠাকরুণ তাড়াতাড়ি যাইতেই অসাবধানতা বশতঃ দুধের বাটি হাত হইতে পড়িয়া গিয়া সব দুধ দালানে গড়াইয়া গেল। কাদম্বিনী মুখ টিপিয়া হাসিয়া সদুঠাকরুণের দিকে চাহিয়া কহিল "দাদা এখনি দুধ খাবে, আর সব দুধ ফেলে দিলে? বউদি দেখলে কি বলবে?"

কাঁদ কাঁদ ভাবে সদুঠাকরুণ কহিল "আমি ফেলে দিলুম? অমন মিথ্যে কথা আমার নামে বলিসনি কাদি? আমি তোর মার বয়িসী, তোর মা আমায় কি ভালটাই বাসত!"

তাড়াতাড়ি একঘটি জল আনিয়া সদুঠাকরুণ সে স্থান পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। উপর হইতে কল্যাণী কহিল "দুধ জাল দেওয়া হয়েছে মামী, তাহলে নিয়ে এস, উনি এসেছেন!"

সদুঠাকুরানী কাদম্বিনীর দুটো হাত ধরিয়া কহিলেন "ওমা বল্ না কাদি…কি বলে ছাই…যে কাল বেড়ালটা দুধ সব খেয়ে গেছে!"

কাদম্বিনী হাসিয়া কহিল "আমি নেতাকে পাশেরদিয়ে

দোকান থেকে চট্ করে দুধ আনিয়ে দিচ্ছি, তুমি চেঁচিও না। কিন্তু মনে থাকে যেন কাদীর সঙ্গে আর লেগো না।”

“ওমা, তুই আমার পেটের মেয়ের মতন...তোর সঙ্গে... হ্যাঁ কি যে বলিস। আমি জপটা সেরে নিইগে···তুই তাহলে দুধ দিয়ে আসিস মা।” সদুঠাকরুণ দীর্ঘ পা ফেলিয়া ঠাকুর-ঘরে ঢুকিলেন। কাদম্বিনী হাসিয়া উপরে গেলেন।

দোতালার জানালার ধারে কল্যাণী মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া বসিয়া ছিল। সম্মুখে একখানা কম্বলের আসনে সুখদা ঠাকুরাণী বসিয়াছে। একধারে একখানা টুলের উপর পা ঝুলাইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া হরিঠাকুর বসিয়া ছিল। এক-রাশ কাল চুলের গোছা পিঠে ফেলিয়া কাদম্বিনী সেখানে আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিঠাকুর একবার তাহার দিকে চাহিয়া মুখ ফিরাইয়া কোঁচার কাপড় দিয়া মুখখানা মুছিয়া লইল। তারপর তাহার লম্বা লম্বা কোঁকড়া চুলগুলো কপালের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া কহিল “বেশ, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? আমাদের সব ঠিক-ঠাক হয়ে গেল, আপনার সঙ্গে ত দেখাই নেই। আপনি ত যাবেন আমাদের সঙ্গে?”

কাদম্বিনী ঈষৎ হাসিয়া কল্যাণীকে কহিল “কোথায় বৌদি?”

“শঙ্কটার বাড়ী।”

হরি ঠাকুর চোখ মুখ ঘুরাইয়া কহিল “বুঝছেন কি না— অমনি বজরায় যেতে যেতে বেণীমাধবের ধ্বজা দেখিয়ে দেব।”

সুখদা ঠাকরুণ বিরক্ত ভাবে কহিল “আঃ, তুইথাম্ না হরিচরণ!”

“না তাই বল্‌ছি” বলিয়া হরিচরণ পা নাচাইতে লাগিল; আর মাঝে মাঝে তাহার একচক্ষু দিয়া নিজের আধময়লা কাপড় ও ফতুয়ার দিকে চাহিয়া লজ্জা বোধ করিতেছিল। কাদম্বিনী সরিয়া আসিয়া কল্যাণীর কাণের কাছে মুখ লইয়া আস্তে আস্তে কি বলিতেই কল্যাণী আঁচল হইতে চাবির রিং খুলিয়া দিয়া কহিল, “বাক্স থেকে বার করে নাওগে!”

কাদম্বিনী বাক্স হইতে গোটা পাঁচেক টাকা বাহির করিয়া লইয়া যাইবার সময় কহিল “বৌদি শোন!” কল্যাণী উঠিয়া আসিতেই তাহাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া কাদম্বিনী কহিল “ভাল রাবড়ী সন্দেশ আনা নেত্যর কর্ম্ম নয়। আমি বলি যে, হরি ঠাকুরকে দিয়ে কচুরী গলি থেকে আনিয়ে নাও।”

কল্যাণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল “আবার ওকে বলতে যাওয়া কেন?”

“তাতে কি হয়েছে?”

কল্যাণী গম্ভীরভাবে বলিল “আমি কিছু ওকে বলতে পারব না।”

“আচ্ছা, তুমি কেন বলবে, আমিই বলছি।”

কল্যাণী ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল “সে যা হয় কর; কিন্তু কিছু আবার মনে না করে!”

তাচ্ছিল্যভাবে কাদম্বিনী কহিল, “হ্যাঁ, মনে আবার কি করবে? ভারী ত কাজ—”

কল্যাণী চাবির গোছা আঁচলে বাঁধিয়া আর কোন কথা না বলিয়া ঘরের ভিতর আসিল। কাদম্বিনী দরজার পাশে সরিয়া ঈষৎ হাস্যে কহিল “হরিঠাকুর, শোন!”

“কি—আমায় ডাকছেন?” বলিয়া হরিঠাকুর তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় কাছার কাপড় টুলের কোণে বাধিয়া খটাশ করিয়া টুলখানা পড়িয়া গেল। সেদিকে দৃকপাত না করিয়া একহাতে তাহার ঢলঢলে কাছাটা খানিকটা টানিয়া আঁটিয়া কাদম্বিনীর নিকট আসিতেই নিম্নস্বরে কাদম্বিনী কহিল “এস—বলছি।”

হরিচরণের ব্যস্ততা দেখিয়া কল্যাণী হাসি চাপিয়া মুখ ফিরাইল। সুখদা ঠাকরুণ কহিল “সব তাতেই ব্যস্তবাগীশ।”

কাদম্বিনী সিঁড়ী বহিয়া নামিতে লাগিল। হরিচরণ কহিল “কি দরকার বলুন?”

“এস না গো—বলছি” বলিয়া নীচে আসিয়া কাদম্বিনী কহিল “আজ ওই সামনের বাড়ীর মেয়েদের খেতে বলেছি। তাই তুমি যদি কচুরী গলি থেকে দুটাকার ভাল রাবড়ী আর সন্দেশ কিনে এনে দাও, একটু কষ্ট যদি আমাদের জন্য কর!”

হরিচরণ কহিল “এর আর কি—আমি এখনি যাচ্ছি!” টাকা লইয়া হরিচরণ একটু আগাইয়া গিয়া পুনরায় ফিরিয়া কহিল “আপনার যখন যা দরকার হবে আমায় বলবেন, আপনার কাজ করতে আমার ভারী আনন্দ হয়!”

কাদম্বিনী হাসিয়া কহিল “সত্যি বলছ?”

“যা দিব্যি করতে বলেন···মাইরী”

"আচ্ছা, দেখব!" বলিয়া কাদম্বিনী মুচ্‌কী হাসিয়া চঞ্চল চরণে সে স্থান ত্যাগ করিল!

সুখদা ঠাকরুণ কল্যাণীকে কহিল, "তাহলে ভাই আজকে উঠি, বেলা গেল, আবার হিমীটা বাড়াতে একলা রয়েছে!"

কল্যাণী কহিল "তাঁকেও সঙ্গে করে আনেন না কেন? এখানে ত আমাদের আর কোন বেটাছেলে নেই—আনতে বাধা কি!…কর্ত্তা · তিনি ত .."

বাধা দিয়া সুখদা ঠাকরুণ কহিল "না সে জন্যে নয়, তবে এই বছরখানেক হল কপাল পুড়েছে কি না, তাই কোথাও বড় একটা যেতে চায় না! আচ্ছা, তাকে আমি কাল থেকে নিয়ে আসব।"

"তাই আনবেন, কথাবার্ত্তাতে মনটাও অনেকটা ভাল থাকবে। তা তিনি এত কম বয়সেই যে কাশী এসেছেন?… শ্বশুরবাড়ী না থেকে…

সুখদা ঠাকরুণ একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল "সে কথা আর বল কেন বৌদি! তারা কি মানুষ! চামারের বেহদ্দ!…বেঁচে থেকে ত আর সে কথা কাণে শুনে চুপ করে থাকতে পারিনে…তাই এনেছি এখানে…যা জোটে বরাতে…একবেলা দুটো ..সম্পর্ক ত আর ফেল্‌না নয়!" সুখদা ঠাকুরাণী একটা বড় রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

কল্যাণী অন্যমনস্কভাবে কহিল "তা ত সত্যিই!"

সুখদা ঠাকরুণ আসন হইতে উঠিয়া কহিলেন "তাহলে ঐ কথাই ঠিক রইল। আমি কুমারী ঠিক করে নিয়ে আসব—সে জন্যে তোমার কোন ভাবনা নাই! ওসব পাণ্ডার কথায় বিশ্বাস কি ভাই! কে জানে কোন্ জাতের মেয়ে ধরে নিয়ে এসে বলবে "বামুনের মেয়ে"! তোমার পয়সাগুলো একেবারে নয় ছয় বাজে খরচ হবে…তুমি বলো কর্ত্তাকে, হরে আমার তোমাদের সব কাজ করে দেবে! একা আমার হরে একশ জনের কাজ করতে পারে। এই সে বছর গেরণের সময় কোথাকার রাণীই হবে বুঝি, না তোমাদের মতন বড়লোকই হবে—একজনরা এসেছিল, একা হরে দশ হাতে সব গুছিয়েঠিক করে বামুন ভোজন, এয়োতী ভোজন, কুমারী পুজো, এই যতকিছু উনকুট-পঁয়ষট্টি কাজ কাশীর আছে সমস্ত নিঝঞ্ঝটে করিয়ে দিলে। অবিশ্যি তাতে ও কিছু পেয়েও ছিল!…মিথ্যা কথা বলব কেন!" বলিয়া সুখদা ঠাকুরাণী হাসিল! কল্যাণীর মনের মধ্যে হরিঠাকুরের সম্বন্ধে যে একটা বিরুদ্ধ ধারণা ছিল, তাহা কাটিয়া গেল।

সুখদা ঠাকুরাণী কহিল "বিশ্বনাথের আরতি দেখতে যাবে ত?"

"যাব। আপনি আসিবেন!"

সুখদা ঠাকরুণ চলিয়া গেলে কল্যাণী জানালার ধারে দাঁড়াইয়া উদভ্রান্তচিত্তে দূরে গঙ্গার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া গঙ্গার উপর পড়িয়াছে! তটভূমি সংলগ্ন ঘাটের দীপাবলী জ্বলিয়া উঠিয়াছে। তাহারই আলোক-রেখা গঙ্গার জলে স্রোতের মুখে আঁকিয়া বাঁকিয়া সাপের মত খেলা করিতেছে। দূরে মাঝগঙ্গায় ছোট ছোট পান্‌সী ও বজরা ভাসিয়া যাইতেছে। একখানি বজরা ঘাটের সন্নিকট দিয়া যাইতেছিল—তাহাতে দুইজন আরোহী। বজরার ছাদে দুইটি বেতের মোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। একজন পুরুষ। একজন স্ত্রী! বোধ হয় উহারা স্বামী স্ত্রী হইবে। হ্যাঁ নিশ্চয়ই স্বামী স্ত্রী! ওই যে মেয়েটি উহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া কি বলিতেই পুরুষটি হাসিয়া উঠিল! কি সুখের জীবন ওদের! এমনই ভাসমান বজরার মতন ওদের জীবন-তরণীও বুঝি আনন্দের একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে! উভয়ে উভয়কে ভালবাসে, উভয়ের এক লক্ষ্য, এক গতি! কত আশা আকাঙ্ক্ষায় জড়িত দুটি প্রাণ সংসারের সুখ দুঃখ ঝঞ্ঝা দুইজনে ভাগাভাগি করিয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে জীবনের দিনগুলি কাটাইতেছে। এমনিভাবে হাত-ধরাধরি করিয়া মৃত্যুর পরপারে পর্য্যন্ত যাইবে, আবার আসিবে, আবার যাইবে,—যুগ যুগান্ত ধরিয়া হয় ত এই আসা-যাওয়া চলিবে! আর তাহার জীবন?—একটা…কল্যাণী আর ভাবিতে পারিল না, একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

যৌন-তত্ত্বে পুরুষ ও নারী

শ্রীনির্ম্মল দেব

পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন-সঙ্গমের দ্বারা সন্তান উৎপন্ন হয়—এই-ই সৃষ্টির চিরন্তন ধারা, এবং জন্ম-মৃত্যুর পথ বাহিয়া এই উপায়েই মানব-জগত চির-স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। তাই মানব-জাতির আদিম দিনে—যখন সমাজ, সংস্কার, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, নীতি, এ সকল কিছুরই উদ্ভব হয় নাই, তখন কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ছাড়া পুরুষ ও নারীর মধ্যে অপর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তখন নারী ছিল পুরুষের প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি—তাহার ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার খাদ্য, তাহার পরিশ্রমের যন্ত্র, তাহার বাণিজ্যের পণ্য, তাহার আদান-প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপহার। তখন মানুষের জীবনে নীতি বা শ্লীলতা বলিয়া কিছুই ছিল না। তখন মানুষ ও পশুর মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্যই ছিল না,—পশুর মত কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, মৈথুনই তখন ছিল মানুষের কার্য্য, এবং শুধু বংশ-বিস্তারই ছিল তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা!

তা'রপর ক্রমে-ক্রমে সংখ্যায় বর্দ্ধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষের জীবন-সংগ্রাম সুরু হইল এবং প্রতিযোগিতা দিন-দিন প্রবলতর হইতে লাগিল, তখন মানুষ দেখিল যে সে সংগ্রামে নিছক দৈহিক শক্তির দ্বারা জয়ী হওয়া যায় না, সেই সঙ্গে মানসিক শক্তিরও একান্ত প্রয়োজন। এইরূপে প্রয়োজন-চক্রে মানুষের অন্তরের নিদ্রিত বুদ্ধি ও চিন্তা-বৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠিল। বুদ্ধি, বিবেক ও চিন্তা-বৃত্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে যখন মানুষের চরিত্রে একটা নীতি ও শ্লীলতার জ্ঞান বিকশিত হইয়া উঠিল, তখন মানুষ প্রথম উপলব্ধি করিল যে, ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া একটা প্রগাঢ় আনন্দ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে আনন্দ শরতের রৌদ্রের মত বড়ই ক্ষণিক, অন্তরের মধ্যে সে কোনো স্থায়ী সুখ আনিয়া দেয় না। দেহের ক্ষণিক আনন্দকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মধ্যে এই যে একটা স্থায়ী মানসিক তৃপ্তির সন্ধান—সেই সন্ধানই মানুষের প্রেমের প্রথম উন্মেষ! তাই প্রেমের যদি কোনো যথার্থ সংজ্ঞা থাকে তো সে এই—মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও ভাবুকতার দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত আদিম দিনের দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার শান্ত সংযত রূপই প্রেম। এই খাঁটি সত্য কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র অতি সহজ সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—"সেই দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির তাড়নাকেই সৌখীন কাপড়-চোপড় পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দাঁড় করালেই উপন্যাসের নিখুঁত ভালবাসা তৈরী হয়।" * মজ্জাগত ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা হইতে ক্রম-বিকশিত এই যে প্রেম—সেই মূল প্রেমই স্থান কাল পাত্র ভেদে মাতৃ-স্নেহ, পিতৃ-স্নেহ, ভ্রাতৃ-স্নেহ, ভগ্নী-স্নেহ, বন্ধু-প্রীতি, স্বদেশ-প্রেম প্রভৃতি নানা রূপে নানা মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইতেছে। এমন কি বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে হইলেও প্রেমের চরম অভিব্যক্তি—ভগবৎ-প্রেমও এই দেহজ প্রেমেরই পূর্ণ পরিণতি!

প্রেমের মূল ভিত্তি যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষা, তাই অন্তরের মধ্যে প্রেমের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিকাশের জন্য ভিন্ন লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর একান্ত প্রয়োজন। সম-লিঙ্গের মধ্যে যে প্রেম, তাহা প্রেম নহে, তাহা বন্ধুত্বেরই নামান্তরমাত্র। যেখানে পুরুষ বা নারী অপরের অলক্ষ্য প্রভাব হইতে বঞ্চিত বা বিচ্ছিন্ন, সেখানে অন্তরের বিকাশ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। চির-কুমার বা চির-কুমারী এই অসম্পূর্ণ মনোবিকাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যে প্রেম মানুষের ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সে প্রেম সার্থক ও সুন্দর;—মানব-হৃদয়ের যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু উদার, যাহা কিছু সুন্দর, তাহাকেই এই প্রেম সঞ্জীবিত করে। অপর পক্ষে যে প্রেম ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত তাহা কুশ্রী ভীষণ, কেবলমাত্র পাশবিক লালসা ছাড়া তাহার মধ্যে আর কিছুই নাই। মানব-চরিত্রের সমস্ত জঘন্যতা কদর্য্যতা এই প্রেম হইতেই উদ্ভূত,—এই লালসাময় প্রেমই সমাজের মহামারী!

আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও পুরুষ ও নারীর মনের

---

* চরিত্রহীন—৩১শ পরিচ্ছেদ

ধারা ও প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই বৈসাদৃশ্যের মূল কারণ জীব-জগতে উভয়ের কার্য্যের ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা। পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভ-সঞ্চার করা, এই গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলেই জীব-জগতে পুরুষের অস্তিত্ব সার্থক হয়। কিন্তু কেবলমাত্র গর্ভ-সঞ্চার হইলেই নারীর কার্য্য সমাপ্ত হয় না,—নিয়মিত কাল পর্য্যন্ত তাহাকে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করিতে হয়, তা'রপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে স্তন্য দিয়া সে সন্তানকে সবল ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হয়; এবং যে পর্য্যন্ত সন্তান আপনি জীবন-ধারণক্ষম না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সমস্ত আপদ-বিপদ হইতে তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিতে হয়। জীব-জগতে পুরুষ ও নারীর কার্য্যের এই মৌলিক বৈষম্যই তাহাদের চরিত্রগত ও প্রকৃতিগত সকল বৈষম্যের মূল।

যৌন-সম্মিলনে পুরুষ সক্রিয় পক্ষ (active agent) এবং নারী নিষ্ক্রিয় পক্ষ (passive agent)। এই কারণে পুরুষের প্রেম দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতির এবং পুরুষের যৌন-ক্ষুধা নারীর অপেক্ষা অনেক প্রবল ও অধিক। বয়ঃসন্ধির কাল হইতেই পুরুষ স্বতঃই একটা অদম্য বেগে নারীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সময়ে তাহার প্রেম সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জ এবং নারীর দেহের সৌন্দর্য্যই তাহাকে মুগ্ধ করে। অপর পক্ষে, নারীর দৈহিক ও মানসিক গঠন যদি সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়, তাহা হইলে সে কোনো কালেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য পুরুষের দিকে ছুটিয়া যায় না। এই মানসিক বৈশিষ্ট্যই "বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না"—এই প্রবাদের মধ্যে সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে। নারী কখনও পুরুষের ন্যায় সহজে ও সুস্পষ্ট ভাষায় প্রেম নিবেদন করে না; সে হাবে, ভাবে, লীলায়, ভঙ্গিমায় পুরুষের প্রেমকে উদ্দীপ্ত করে এবং সচেতন রাখে। এই মজ্জাগত প্রবৃত্তি হইতেই নারীর বিলাস চাতুরীর (coquetry) উৎপত্তি। সংযত এবং মার্জ্জিত অবস্থায় বিলাস চাতুরী একটি মোহন ও লোভনীয় বস্তু। যে নারীর মধ্যে বিলাস-চাতুরীর সম্পূর্ণ অভাব, সেখানে পুরুষের প্রেম আপনি নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। সে নারীর অপর যত গুণই থাকুক পুরুষের প্রাণকে সে কিছুতেই পরিপূর্ণ দিতে পারে না। এই বিলাস-চাতুরীর নৈতিক অবনতি ঘটিলে, যাহাকে চলিত ভাষায় "ছেণালি" বলে, সেই জঘন্য কদর্য্য পদার্থে পরিণত হয়।

নারীর যৌন-ক্ষুধা (Sexual appetite) পুরুষের চেয়ে অনেক কম হইলেও তাহার যৌন-চেতনা (Sexual consciousness) পুরুষের চেয়ে অনেক বেশী। জীব-জগতে পুরুষ ও নারীর কার্য্যের যে বৈষম্যের কথা উপরে বলা হইয়াছে, তাহাই ইহার কারণ। এই কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষের প্রেম অস্থায়ী ও প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়জ, কিন্তু নারীর প্রেম স্থায়ী ও ভাবপ্রবণ। নারীর দৈহিক সৌন্দর্য্য, নিটোল যৌবন চিরদিনই পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ধন, কিন্তু পুরুষের হৃদয়হীন সৌন্দর্য্যে নারী কোনো দিনই তৃপ্তি পায় না। পুরুষের দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের সৌন্দর্য্য নারীকে ঢের বেশী মুগ্ধ করে। পুরুষ নারীকে প্রধানতঃ ভালবাসে তাহার স্ত্রী-হিসাবে, তা'রপর ভালবাসে তাহার সন্তানের জননী-হিসাবে। কিন্তু নারীর অন্তরে পুরুষের প্রথম স্থান তাহার সন্তানের জনক-হিসাবে, তা'রপর তাহার ভর্ত্তা হিসাবে। নারী-চরিত্রের চরম বিকাশ মাতৃত্বে। যেখানে দাম্পত্য-মিলন-প্রসূত শিশু আসিয়া নারীর অন্তরকে ফুলে ফলে ভরাইয়া না দেয়, সেখানে নারীর মন অবিকশিত—চির-অতৃপ্ত! বন্ধ্যা নারীর তীব্র মনোবেদনা জগতের কোনো আনন্দই ঘুচাইতে পারে না—স্বামীর পরিপূর্ণ প্রেমও নয়! কিন্তু সন্তানের অভাব পুরুষের অন্তরে বিশেষ কোনো পীড়া দেয় না, বরং এমন দেখা গিয়াছে সন্তানের জন্মের পর নারীর সেবা যত্ন ভালবাসা যদি অধিক পরিমাণে স্বামী হইতে সন্তানে চলিয়া যায়, তখন পুরুষ নিজের ঔরসজাত সন্তানের প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় একটা তীব্র ঈর্ষা ভাব পোষণ করে! সন্তানের জন্ম হইলেও পুরুষের ইন্দ্রিয়-ক্ষুধার কোনো বৈলক্ষণ্য হয় না। কিন্তু নারীর পক্ষে, তাহার প্রেম স্বামীর অপেক্ষা সন্তানের প্রতিই বেশী প্রবাহিত হয়। Krafft Ebing, Forel প্রভৃতি খ্যাতনামা যৌন তত্ত্ববিদগণের মতে নারীর ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা মাতৃ-স্নেহের মধ্যে মগ্ন হইয়া যায়। তাঁহারা বলেন—সন্তান জন্মের পর নারীর যৌন-জীবনে এক তুমুল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। তখন নারী স্বামীর সঙ্গম স্বীকার করে স্বামীর ক্ষুধা মিটাইবার জন্য এবং স্বামীর প্রেমের নিদর্শন-স্বরূপে—নিজের সঙ্গমেচ্ছার পরিতৃপ্তির জন্য নয়। *

* "Sensuality is merged in the mother's love. Thereafter the wife accepts marital intercourse not so much as a sensual gratification than as a proof of her husband's affection"—Krafft Ebing—"Psycopathic Sexualis"—12th Edition page 14.

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পুরুষের প্রেম প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়জ, নারীর প্রেম ভাবপ্রবণ। সেইজন্য নারী ভালবাসে তাহার সমস্ত প্রাণ, মন, চেতনা দিয়া। Krafft Ebing বলিয়াছেন "To woman love is life, to man it is the joy of life"। এইখানেই পুরুষ ও নারীর প্রেমের গঠন-বৈচিত্র্যের প্রধান পার্থক্য। এইজন্য ব্যর্থ প্রেম পুরুষের অন্তরে কিছুদিনের জন্য পীড়া দেয়,—কোনো স্থায়ী রেখা রাখিয়া যায় না। কিন্তু নারীর ব্যর্থ প্রেম তাহার হৃদয়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়, তাহার সুখশান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট করিয়া দেয়। এই কারণে, নারী তাহার জীবনে একাধিক পুরুষকে যথার্থই ভালবাসিতে পারে কি না—ইহা মনস্তত্ত্ববিদ-গণের একটা চিরন্তন সমস্যা। বিধবা বিবাহ সমর্থনকারীর ইহা একটা গুরুতর ভাবিবার বিষয়। কিন্তু পুরুষ অনায়াসে একাধিক নারীকে ভালবাসিতে পারে, পূর্ব্ব-প্রেমের স্মৃতি পুরুষের মন হইতে অতি শীঘ্র বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেইজন্য নারীর প্রেমের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি একপতিমুখী (monandrous) এবং পুরুষের প্রেম বহুপত্নীমুখী (polygamous)।

জীব-তত্ত্ব হিসাবে নারীর প্রেমের এই একনিষ্ঠত্বের আরও গভীরতর কারণ আছে।—ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, জীব-জগতে পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভ সঞ্চার করা এবং নারীর কার্য্য গর্ভ ধারণ করা। নারীর এই গর্ভ ধারিণী শক্তিকে সার্থক করিতে একাধিক পুরুষের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু পুরুষের গর্ভ-সঞ্চারক শক্তিকে সম্পূর্ণ পরিমাণে ফলবতী করিতে বহু পত্নীর প্রয়োজন হয়; কারণ, এক শক্তিশালী পুরুষ বহু নারীর গর্ভোৎপাদন করিতে পারে। তা'রপর নারীর একটা গর্ভ-ধারণকাল আছে; সে সময়ে কোনো পুরুষের সঙ্গ তাহার একেবারেই প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সে সময়ে পুরুষের গর্ভোৎপাদক শক্তিকে সচেতন রাখিতে আরও নারীর প্রয়োজন হয়। জীব-তত্ত্বের এই গূঢ় কারণে নারী স্বভাবতঃই এক-পুরুষাভিমুখী, এবং পুরুষ স্বভাবতঃই বহু-নারী-অভিমুখী!—এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে, জীব-জগতে একমাত্র মানুষ ছাড়া অপর কোনো জীবের পুরুষ গর্ভবতী স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করে না,—গর্ভবতী স্ত্রী ও পুরুষের যৌন-সঙ্গম জীব-জগতে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং একেবারেই অবিদ্যমান।

পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভোৎপাদন করা, সেই জন্য পুরুষের সমস্ত যৌন-অনুভূতি জননেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত এবং সেই কারণে, পুরুষের যৌন ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হইলে যৌন-মিলন এবং বীর্য্য-ক্ষরণ বিনা তাহা আদৌ পরিতৃপ্ত হয় না। অপর পক্ষে, নারীর কার্য্য গর্ভ-ধারণ করা, সন্তান-প্রসব করা, সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া স্তন্য দেওয়া, আদর করা ও আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা করা। এই সকল বিভিন্নমুখী কার্য্য সানন্দে সমাধা করিতে সক্ষম করিবার জন্য প্রকৃতি নারীর যৌন-অনুভূতিকে কেবলমাত্র জননেন্দ্রিয়ের মধ্যেই নিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, নারীর সারা অঙ্গে তাহা সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে। নারীর যৌন-তৃপ্তি তাই তাহার সমস্ত চেতনার মধ্যে এবং অগ্র-মস্তিষ্কে (Cerebrum) একটা গভীর রেখা আঁকিয়া দেয়; পুরুষের ক্ষেত্রে যৌন-চেতনা যৌন-তৃপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্য, পুরুষের যতই নৈতিক অধঃপতন হউক, সে ইচ্ছা করিলেই যে কোনো দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া পুনরায় শুদ্ধ-শুচি জীবন যাপন করিতে পারে; কিন্তু নারীর একবার চরিত্র-স্খলন হইলে বা সমাজের বিধান লঙ্ঘন করিয়া পর-পুরুষ গমন করিলে নারী কোনো দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারে না;—তাহার সেই স্খলনের ইতিহাস তাহার চেতনা-রাজ্যে চির-জাগরূক থাকে, এবং দুর্ব্বলচিত্ত নারী হইলে তাহার পুনঃপতনের সম্ভাবনা থাকে। পতিতা-সমস্যার ইহা একটা অতি গুরুতর চিন্তনীয় ব্যাপার! নারী-চরিত্রের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য শরৎচন্দ্র তাঁহার "পিয়ারী"র মধ্যে অতি মনোজ্ঞভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।—অদৃষ্ট-দুর্ব্বিপাকে সে একদিন সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। তা'রপর অকস্মাৎ একদিন জীবনের শুভ-লগ্নে যখন শুদ্ধ-শান্ত প্রেমের অমৃত-পরশে সঞ্জীবিত হইয়া তাহার উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল পতিত জীবনটাকে জীর্ণ-বস্ত্রের ন্যায় পরিহার করিয়া সে তাহার লুপ্ত মহিমা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল, তখন সেই স্নেহে, দয়ায়, মায়ায়, প্রেমে পূর্ণ-বিকশিতা মহীয়সী নারী আবার সকলেরই সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরামের প্রতি আন্তরিক যত্নশীলা;—তাহার যত নিষ্ঠুর উদাসীন্য একমাত্র তাহার নিজের প্রতি। নিজেকে সকল দিক হইতে সর্ব্বতোভাবে তাড়না করিয়া, বঞ্চিত করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইতেছিল না। এই যে তাহার দুর্ব্বিষহ কৃচ্ছ্রসাধন,—ইহার অন্তরালে আর কিছুই নাই, আছে শুধু

তাহার সেই কলুষিত অতীত জীবনের তীব্র জ্বালাময়ী স্মৃতি—যাহাকে সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না, যাহা তাহার সকল সংযম, সকল শুদ্ধাচারের মধ্যেও প্রতিক্ষণে তাহাকে পীড়া দিতেছিল।

চিরদিনই নারীর যৌন-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ—বিবাহ। নারী যতই শিথিল-চরিত্র হউক, পাপের পঙ্কে সে যতই ডুবিয়া যা'ক, তবু চিরদিন তাহার মনের কোণে অলক্ষ্যে গোপনে একটা বিবাহের ক্ষুধা জাগিয়া থাকে, এবং সে অবস্থায়ও যদি কোনো পুরুষ অন্তরের মহিমায় তাহাকে মুগ্ধ করিতে পারে, বিবাহ-অনুষ্ঠান না হইলেও তাহাকেই সে সম্পূর্ণ হৃদয় দান করে। ইহার গূঢ় কারণ এই যে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ক্ষুধা মিটিলেই নারীর সকল প্রয়োজন মেটে না। তাহার নিজের এবং তাহার সন্তানের রক্ষক ও ভারক হিসাবে একজন সাহসী, শক্তিমান ও উদার পুরুষের আশ্রয় তাহার প্রয়োজন হয়। অনেকের ধারণা যে, যে পুরুষ ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে নারীকে পরিপূর্ণ যৌন-আনন্দ দিতে পারে, সে-ই নারীর হৃদয় অনায়াসে জয় করিতে পারে। ইহা অতি ভ্রান্ত ধারণা। পুরুষের কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-শক্তি বা অন্তঃসারবিহীন বাহ্য-সৌন্দর্য্য নারীর হৃদয়কে কোনো দিনই মুগ্ধ করিতে পারে না; কারণ পুরুষের দেহের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তরের মহত্ত্বের দিকে নারীর লক্ষ্য ঢের বেশী। বিবাহ-বন্ধনের প্রতি পুরুষের আকর্ষণ নারীর অপেক্ষা অনেক কম। উপরে পুরুষের যে বহু-নারীমুখী প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাই ইহার মূল কারণ।

পুরুষের বিবাহের একমাত্র আদর্শ নারীর সতীত্ব। অসতী নারী পুরুষকে যতই ইন্দ্রিয় তৃপ্তি দিক, পুরুষ তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারে, কিন্তু কোনো দিন কোনো অবস্থায়ই তাহাকে বিবাহ করিতে চাহে না—তাহাকে ভালবাসিতে পারে না! নিছক সতীত্বে পুরুষ পরিতৃপ্ত না হইলেও, বিবাহ করিতে হইলে এমন নারী সে চায়, যাহার সতীত্বে তাহার কণামাত্রও সন্দেহ নাই! নারী পুরুষকে ভালবাসে পুরুষের ভিতর দিয়া তাহার কল্পনার আদর্শকে—বালিকা যেমন করিয়া ভালবাসে তাহার খেলা-ঘরের পুতুলকে! কিন্তু পুরুষ যতক্ষণ না নারীর বাস্তব জীবনে তাহার আদর্শকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে নারীকে কিছুতেই ভালবাসিতে পারে না। তাই, অসৎ পুরুষকে নারী বিশ্বাস করিতে পারে, কিন্তু অসতী নারীকে পুরুষ কখনও বিশ্বাস করে না! এই বিশ্বাস-প্রবণতার বশেই হতভাগিনী নারীরা লালসা-লোলুপ পুরুষের প্ররোচনায় নিশ্চিন্ত-সরল-চিত্তে গৃহত্যাগ করে, কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষ অবশেষে একদিন তাহার উন্মাদনায় অবসাদ আসিলে সেই অসহায়া নারীর সকল বিশ্বাসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়া চোরাবালিতে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়! অনেক কুলত্যাগিনী নারীর হতভাগ্য জীবনের এই ইতিহাস!

নারী-হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য সতীত্ব! সতীত্বের রূপের কোনো নির্দ্দিষ্ট উপমান নাই। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন যুগে তাহাদের সমাজের রীতি-নীতি, জীবন-যাত্রার ধারা ইত্যাদির প্রয়োজন অনুসারে ইহাকে নানা রূপে গড়িয়াছে। তথাপি বস্তুতঃ সতীত্বের যত রূপই থাকুক, সকল যুগে, সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যে সতীত্বের একমাত্র আদর্শ এক-নিষ্ঠত্ব,—এক-নিষ্ঠ প্রেমই সতীত্ব! নারীর এক-পুরুষাভিমুখী জৈবিক প্রবৃত্তিই সতীত্বের মূল। প্রথমেই বলা হইয়াছে মানব-জাতির আদিম যুগে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক ছাড়া আর কোনো সম্পর্ক ছিল না! তখন তাহাদের মধ্যে বিবাহ বা অপর কোনো প্রকার বন্ধন ছিল না; সুতরাং নারী তখন বহু পুরুষের ভোগ্যা ছিল এবং কেবলমাত্র দৈহিক সৌন্দর্য্যই পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করিত। তা'রপর নীতি, শ্লীলতা ও চিন্তা-বৃত্তির উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে পুরুষ নারীকে কেবলমাত্র তাহার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির যন্ত্র না ভাবিয়া তাহাকে জীবনের সুখ-দুঃখের সাথীভাবে দেখিতে লাগিল। তখন নারী পুরুষের সম্পত্তি না হইয়া স্বতন্ত্র ব্যক্তিভাবে পরিগণিত হইতে লাগিল। তখন দৈহিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি পড়িল এবং গায়ের জোরে নারীকে জয় না করিয়া পুরুষ তাহার সম্মিলিত দৈহিক ও মানসিক সৌন্দর্য্য নারীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়া নারীর মন মুগ্ধ করিয়া তাহাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিত। এই হইতে পূর্ব্ব-রাগের (Courtship) উৎপত্তি। এই অবস্থায় নারী তাহার অন্তরে প্রথম অনুভব করিল যে, তাহার দেহ ও প্রেম তাহার "মনের মানুষের"ই প্রাপ্য এবং সে বহু পুরুষের ভোগ্যা নহে—সেই প্রিয় পুরুষেরই ভোগ্যা। ইহাই সতীত্বের প্রথম সূচনা। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে মানুষের

রুচি ও নীতিজ্ঞান যতই উন্নত ও মার্জ্জিত হইতে লাগিল এবং বিবাহ, সমাজ, সংস্কার, ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রভাব দৃঢ়তর হইতে লাগিল, পুরুষ ততই নারীকে সমাজে ও তাহার ব্যক্তিগত জীবনে প্রীতি ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিল এবং নারীও তাহার দেহ ও মন পরিপূর্ণ নিষ্ঠায় একটিমাত্র পুরুষকে—তাহার বিবাহিত স্বামীকে উৎসর্গ করিয়া দিতে লাগিল।—ইহাই সতীত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি।

পুরুষ অপেক্ষা নারীর প্রতি সমাজের শাসন কঠোরতর। পুরুষের চরিত্র-স্খলন সমাজ ক্ষমা করে, কিন্তু নারীর স্খলন সমাজ কোনো দিনই ক্ষমা করে না,—প্রায় সকল সভ্য সমাজেই চরিত্রহীনা নারী পরিত্যজ্যা। বাস্তবতঃ সমাজের এ বিচার পক্ষপাত-দুষ্ট মনে হইলেও ধীরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে একটা সু-বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষের চরিত্রহীনতার চেয়ে নারীর চরিত্রহীনতার গুরুত্ব অনেক বেশী। পুরুষের চরিত্র-বিচ্যুতি ঘটিলে সে কেবল নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করে; কিন্তু নারী সন্তানের জননী, সুতরাং নারীর চরিত্র দুষ্ট হইলে সে যে কেবলমাত্র নিজের মর্য্যাদা নষ্ট করে, তাহা নয়,—তাহার স্বামীর মর্য্যাদা, তাহার গৃহের মর্য্যাদা, তাহার বংশের মর্য্যাদা, সকলই নষ্ট করে; উপরন্তু তাহার সন্তানের জন্মকে চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখে। তাই কোনো উন্নত সমাজে চরিত্রহীনার স্থান নাই,—থাকা উচিতও নয়! কিন্তু সমাজে যখন উদারতার অভাব হয়, যখন সমাজের দৃষ্টি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন এই সতীত্বের নামে নারীর প্রতি অনেক অন্যায় অবিচার উৎপীড়ন হয়। আদিম দিনে যখন পুরুষ কেবলমাত্র গায়ের জোরে তাহার অধিকার বজায় রাখিত, তখন দুর্ব্বল পুরুষের মনে একটা অবিচ্ছিন্ন ভয় ছিল পাছে তাহার সেই নারী-রূপী সম্পত্তিটি অপর কোনো সবল পুরুষ আসিয়া লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়। মানুষের সেই প্রাচীন জীবন-ধারা আজ বিস্মৃতির অন্ধকারে যতই অদৃশ্য হইয়া যা'ক, মানুষ যতই সভ্য, শিষ্ট, উন্নত হো'ক, আদিম দিনের সেই মজ্জাগত ভয়ের একটা ক্ষীণ রেখা আজও পুরুষের মনের কোণে নীরবে ঘুমাইয়া আছে। তাই যখন সমাজের উদারতা ও নৈতিক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন সেই সুপ্ত ভয় মাথা নাড়া দিয়া ওঠে। তখন সমাজ সতীত্বের দোহাই দিয়া নারীর প্রতি নানা নির্ম্মম অত্যাচার করে। অনেক দুর্ব্বল পুরুষের ব্যক্তিগত জীবনেও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখা যায়। ঘটনা-চক্রে বা পুরুষের ষড়যন্ত্রে যে সকল নিরীহা নারী অকস্মাৎ একদিন সমাজ হইতে বিচ্ছিন্না হইয়া পড়ে, তাহাদের প্রতি এবং স্বেচ্ছায়-কুলত্যাগিনী নারীর প্রতি একই দণ্ড সমাজের এই নির্ম্মমতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত! তাই, সমাজকে পুরুষের স্বার্থের উপরে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া সত্য ও ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, নারীর প্রতি সমাজের বিধান যতই কঠোর হো'ক, সে বিধানের মধ্যে করুণা ও হৃদয় চাই!—অকরুণ বিধানই সমাজের সকল অশান্তি, সকল বিদ্রোহের মূল!

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১০

রাত্রি শেষে উপেন্দ্রনাথের বাড়ী পৌঁছিবার কথা ছিল। ঘুমাইয়া পড়াতে দেবী বা ভবানীর সে কথা মনেই ছিলনা। ভোর বেলা আগে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল দেবীর। জানালার ফাঁক দিয়া, উপরের ভাঙ্গা চালার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

গায়ের লেপ ফেলিয়া দিয়া দেবী ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল,—"ঠাকুর ঝি, ও ঠাকুর ঝি—,"

ভবানীর গায়ে ঠেলা দিতে, সে একবার চাহিয়া আবার পাশ ফিরিয়া ভাল করিয়া শুইল।

দেবী আবার তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল, "আবার ঘুমাচ্ছো যে; বাবা আসেন নি?"

তাই তো! এ কথাটা ভবানীর মোটে মনেই ছিল না! সে আড়ামোড়া ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল—"আসেন নি?"

দেবী বলিল, "আমিই তো তোমায় জিজ্ঞাসা করছি।"

ভবানী বলিল, "কই, আমি তো জানিনে।"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া উভয়েই বাহির হইল।

ভবানী পিতার গৃহের পানে তাকাইয়া বলিল, "না, বাবা আসেন নি দেখছি। এই মাঘ মাসের ভীষণ শীতে প্রকাশদা রাত্রে যে বাবাকে ছেড়ে দেন নি, খুব ভালই করেছেন। বুড়ো মানুষ, রাত্রে ভাল চোখে দেখতে পান না, তাতে এই শীত—আসা কি বড় মুখের কথা? আজ এই দিনের ট্রেনে নিশ্চয়ই আসবেন। আমার মনে হচ্ছে ছোড়দাও আসবে, এতে ছোড়দারও একটু হাত আছে।"

দেবী হাসিমুখে বলিল, "হুঁ, তোমার ছোড়দা আর আসছে।"

ভবানী জোর করিয়া বলিল, "না, আসবে না বই কি? বাবাকে একবার দেখলেই ছোড়দা যা-তাই হবে। বড়দা, বড়-বউদির কথায় ভুলে ছোড়দা একটা অকাজ করতে যাচ্ছিল, বাবার কথা শুনলেই আবার তাকে ঘরে ফিরতেই হবে।"

দেবী তাহার কথার উত্তর দিল না, কিন্তু সে কোন মতেই এ কথাটার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। তাহার স্বামী আর ফিরিবে না—এই ধারণাটাই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

ভবানী মুখ ধুইয়া আসিয়া বারাণ্ডায় পা ছড়াইয়া বসিল, বলিল, "কিন্তু তোর ওপরে আমার বড্ড রাগ হয় ভাই বউ, তুই-ই তো ছোড়দাকে মাটি করলি। পড়তে বলে' নিজের গায়ের গয়নাগুলো সব দিয়ে দিলি, সে সব বিক্রী করে যা হোক কিছু পেয়েছে। পড়া তো শেষ হয়ে গেছে, এখন বিলেত গেলেই চতুর্ব্বর্গ লাভটা হয়ে যায়। তুই যদি সে সময়টা অমন করে গলে না যেতিস, গয়নাগুলো যদি না দিতিস, তাহলে ছোড়দার মাথায় হয় তো এ কুমতলব জাগত না।"

দেবী উত্তর করিল না, শান্তভাবে ঘরের কাজ করিতে লাগিল।

স্নানান্তে আসিয়া উনানে আগুন দিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল "ক'ত চাল নেব ঠাকুরঝি?"

ঠাকুরঝি তখন দামোদরের পূজার যোগাড় করিতেছিল, বলিল, "বাবার আর ছোড়দার ভাত এখন রাঁধতে হবে না, ওরা যদি আসে—যখন আসবে তখন ভাত চড়িয়ে দিলেই হবে। তোমার আমার ভাত শুধু রাঁধ। তরকারী একটু বেশী করে রেঁধে রেখো, তা হলেই হবে এখন।"

তাহার আদেশানুসারে ভাত চড়াইয়া দিয়া দেবী তরকারী কুটিতে বসিল। ভবানী জল আনিবার জন্য ঘড়া লইয়া বাহির হইল।

"ভবানী!—"

শ্বশুরের কণ্ঠস্বর না? বিকৃত হইলেও দেবী চিনিতে পারিল, সন্ত্রস্তে তাড়াতাড়ি বাহির হইল। গামছা-বাঁধা কাপড়খানা ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ বারাণ্ডার ধারে বসিয়া পড়িলেন,—"ভবানা কোথায় গেছে বউমা?"

দেবী উত্তর দিল, "ঠাকুরঝি ঘাটে গেছে বাবা।"

তাড়াতাড়ি সে তামাক সাজিয়া আনিয়া দিতে গেল। বাধা দিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "থাক মা, এখন তামাকের দরকার নেই।"

নিকটবর্ত্তী ঘাট হইতে ভবানী পিতার কথা শুনিয়াছিল, তাড়াতাড়ি জল লইয়া সে ফিরিয়া আসিল।

"এই যে বাবা, তুমি এসেছ। কাল রাত্রে আসার কথা ছিল যে তোমার—" ঘড়াটাকে ত্রস্ত করিয়া রান্নাঘরে নামাইয়া ফেলিয়া ভবানী পিতার কাছে আসিল।

বিকৃতকণ্ঠে পিতা বলিলেন, "কাল রাত্রে ষ্টেসনে আসতে দেরী হয়ে গিয়েছিল, ট্রেণ ধরতে পারি নি।"

ভাইয়ের কথা ভবানী সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিল না। উপেন্দ্রনাথ হুঁকাটা লইয়া নিঃশব্দে তামাক টানিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ের গোপন ব্যথা ভাষায় প্রকাশ না হইলেও, মুখে চোখে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভবানী তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বুক ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছিল। সেটাকে চাপিয়া ফেলিয়া সরল নিঃশ্বাসের মত ছাড়িয়া দিয়া—যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "জানিস ভবানী, সত্য আজকাল বিলেতে রওনা হচ্ছে।"

ভবানী নিস্তব্ধভাবে পিতার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

উপেন্দ্রনাথ তাহার পানে চাহেন নাই। মুখ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া কথাটার উপর জোর দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সে যাবেই। কেবল তোদের জন্যেই ভবানী, নিজের সম্মান নষ্ট করে তাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালুম,—দ্বারোয়ান দিয়ে

আমায় হাঁকিয়ে দিলে,—সাহেবদের সঙ্গে আমার মত পথচারী ভিক্ষুকের দেখা হতে পারে না। অপমানে আমার মাথা কাটা গেল, মুখ আর তুলতে পারলুম না, মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে ফিরে এলুম। বুক ফেটে তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বার হয়ে আসছিল,—করছি কি? আমার এই দীর্ঘনিঃশ্বাসে যে তাদের সুখশান্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ওরে সন্তান, তোরা এমনই অকৃতজ্ঞ, যারা বুকের স্নেহ ঢেলে তোদের লালন-পালন করে যায়, তাদেরই বুক তোরা এমনই করে কঠোর আঘাত দিয়ে ভেঙ্গে দিস। তারা তবু একটা কথা বলতে পারে না, দীর্ঘনিঃশ্বাসও যেন না পড়ে,—কারণ আমাদের দীর্ঘশ্বাস তোদের উন্নতির পথে প্রাচীর তুলে দিতে পারে। তোরা সব নিস, তবু তো খুসি হস নে, একবার চোখের দেখা দিতে—তাও পারিস নি? হা ভগবান—এই তো তোমার সংসার প্রভু, এখানে কেউ যদি কারও নয় তবে বাপ মায়ের বুক কেন স্নেহ দিয়ে ভরে দিয়েছ?"

কথাগুলা বলিয়াই তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

বরাবরই তিনি চাপা, গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজেকে তিনি ছেলে, মেয়ে, বধূ কাহারও নিকট ধরা দেন নাই, বরাবর তফাতেই থাকিতেন। কখনও তিনি নিজেকে হালকা করিতে পারেন নাই বলিয়াই সকলে তাঁহাকে আন্তরিক ভয় করিত।

ভবানী যাহা শুনিল তাহাই যথেষ্ট। প্রকাশ বাড়ী আসিলে তাহার মুখে সব কথা শুনিতে পাওয়া যাইবে। ভবানী ভাবিল, প্রকাশ আসিলেই খোঁজ লইতে হইবে।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে দেবীর নিকটে আসিল। দেবী তখন আবার ভাত চড়াইবার উদ্যোগ করিতেছিল। ভবানীর দিকে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, "শুনলে তো, আমি আগেই এ কথা বলি নি কি?"

ভবানী বলিল, "আমি আজই বড়দার বাড়ীর ঠিকানায় ছোড়দাকে একখানা পত্র দেব।"

শান্তকণ্ঠে দেবী বলিল, "কেন দেবে? তুমি বুঝি ভাবছো তোমার দাদা তোমার কথা শুনবেন?"

ভবানী ধরিয়া বসিল, "তোমাকেও একখানা পত্র দিতে হবে বউ।"

দেবী ঘৃণাপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ছিঃ!"

ভবানী বলিল, "ছিঃ কেন? দেওয়া উচিত নয় বলেই কি তুমি বিবেচনা কর?"

দেবী বলিল, "নিশ্চয়ই! যেখানে বাবা পারলেন না—সেখানে তুমি কি মনে কর আমাদের চেষ্টা ফলবতী হবে? যে কোন দিকে না চেয়ে একমাত্র লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করে ছুটে চলেছে, তাকে তার সেই ঝোঁকের মুখে যত বাধা দিতে যাবে সে ততই দুর্জ্জয় হয়ে উঠবে। আমি বলছি—এতে কোন ফল হবে না, আমাদের ওপরে তোমার ভাইয়ের ঘৃণাই আসবে।"

ভবানী হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া বলিল, "নতুন কথা শুনালে বউ—আমাদের তিনি ঘৃণা করবেন! আবার ভাবছি—এও সম্ভব হতে পারে। আমার কাছে নতুন হলেও এটা জগতের কাছে চিরপুরাতন কথা; নচেৎ এ কথাটা তুমি পেলে কোথায়? তবে তাই ভাল বউ, আমরা কেউই আর তাঁকে পত্র দিয়ে বিরক্ত করব না।"

বৈকালে কাপড় কাচিবার জন্য দেবী যখন ঘাটে গিয়াছিল, তখন ঘাটে রীতিমতভাবে মেয়েদের একটা সভা বসিয়াছিল। এই ঘাটটী মেয়েদেরই একচেটিয়া—পুরুষেরা দুপুর ভিন্ন এ ঘাটে আসিতে পারেন না। এই ঘাটে সকল প্রকার সমালোচনা চলিত। কাহার সংসার কিরূপ, কাহারা খাইতে পায় না, কাহার স্বামী অত্যন্ত বদ, কাহার ছেলেমেয়ে দুরন্তের একশেষ, কোন্ শাশুড়ী বধূ-নির্য্যাতন করেন, কোন্ বধূ অত্যন্ত মুখরা, এই সব আলোচনা এই ঘাটের মহিলাদের নিত্য কার্য্যের মধ্যে গণ্য। গ্রামের যত মেয়ে দুই বেলাই এই ঘাটে পদার্পণ করেন, এবং ঘাটটি কথায়-বার্ত্তায়, হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। অবগুণ্ঠিতা চিরলজ্জাশীলা অনেক বধূর লজ্জার বাঁধও এখানে ভাঙ্গিয়া যায়।

দেবী নির্জ্জন বলিয়া নিজেদের পুষ্করিণীতেই বরাবর যাইত,—আজ শ্বশুর ঘাটে রহিয়াছেন বলিয়া বাধ্য হইয়া তাহাকে এই প্রকাশ্য ঘাটে আসিতে হইল।

অবগুণ্ঠিতা দেবীকে দেখিয়া প্রসঙ্গের মুখ অন্য দিকে ফিরিয়া গেল। প্রতিবেশিনী কালীদাসী বলিল, "কাকা কাল যে কলকাতায় গিয়েছিলেন,— দাদা বললে তিনি না কি সত্যদাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন,—সত্যি না কি বউ?"

নরেনের বৃদ্ধা পিসীমা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, "কেন, সত্য বাড়ী আসবে না বলে তাকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন? সত্য রাগ করে এবার বাড়ী হতে গেছে বুঝি?"

কলিকাতা হইতে সদ্য-প্রত্যাগতা ইন্দুবালা বলিল, "না গো, সত্য কাকা যে বিলেতে যাচ্ছে।"

নরেনের পিসীমা গালে হাত দিয়া বলিলেন, "তুই বলছিস কি লো ইন্দি, বিলেতে যাবে—খৃষ্টান হবে না কি! ওই তো সেইখানেই না ওর বড় ভাই জিতেন গিয়েছিল! ও মা, এরা দুটি ভাইয়ে করছে কি? আহা—বুড়োটাকে দেখতে কেউ রইল না গো, বুড়োর ব্যথা কেউ বুঝলে না। শুনেছি জিতু বউ নিয়ে গিয়েছিল,—সত্যও তো বউ নিয়ে যাবে? লোকে সেখানে কথায় বলে যে বিলেতে গেলেই জাত যায়! কালে কালে সব হল কি! এ সব মেয়েরা বিলেতে চলল যে!"

ইন্দুবালা একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "না গো, না, সত্য কাকা নিজেই যাবে, বউ নিয়ে যাচ্ছে না। তবে আর বলছি কি? আমাদের যে নতুন বাসা হয়েছে না, এর সামনেই জিতেন কাকাদের বাড়ী,—তাইতেই আমি অনেক কথাবার্ত্তা শুনতে পাই। আমার এক দেওর আছে, সে ওদের বাড়ীর বাজার-সরকার। ওদের বাড়াতে যে কথাটী হয়, তা আগেই এসে বাড়ীতে বলে। শুনছি, সত্য কাকা না কি বিয়ে করছেন, বিয়ের পরে বিলেতে যাবেন। সে মেয়েকেও আমি কতদিন ওদের বাড়ী আসতে দেখেছি,—মা গো, সত্যকাকা আবার তার হাত ধরে সাহেবি ঢংয়ে না কি বেড়াতে যায়। মেয়েটী কিন্তু যা সুন্দর তা আর কি বলব, আর না কি তেমনি লেখাপড়া জানে। এক এক দিন ওদের বাড়ীতে গান যে গায়,—শুনলে মনে হয় না সরে যাই। সে না কি সত্যকাকাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না বলে পণ করেছে—তাই তার বাপ তার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে এত খরচপত্র করেও সত্যকাকাকে বিলেতে পাঠাচ্ছে। তাদের বাড়ীর সব বিলেত-ফেরত কি ন', তার মধ্যে বিলেত-ফেরত নইলে মানাবে কেন?"

দেবী আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মাথা ঘুরিতেছিল, পায়ের তলা হইতে পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতেছিল। স্বামী তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি আবার বিবাহ করিতেছেন—এ কথা সকলেই জানিল? এই যে লোকে সহস্রমুখে তাহার স্বামীর নিন্দা করিতেছে, হা ভগবান, এ নিন্দা তাহাকে শুনিতে হইল?

সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না, শূন্য কলসী লইয়া কাপড় না কাচিয়াই সে স্খলিতপদে বাড়ী ফিরিল।

বিস্মিতা ভবানী বলিল, "এ কি বউ, ফিরলে যে?"

দেবী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "ও ঘাটে অনেকে অনেক কথা বলছে—তাই চলে এলুম।"

সে রাত্রে সে মোটেই ঘুমাইতে পারিল না। সেই শ্রুতিকঠোর কথাগুলো থাকিয়া থাকিয়া শেলের মতই তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। সত্য আবার বিবাহ করিতেছে, তাহার সহিত সম্পর্ক চুকাইয়া লইতেছে—এ কি সত্য?

হৃদয়কে বরাবর অত্যন্ত দমনে রাখা সত্ত্বেও কোন এক অতর্কিত সময়ে সে সকল বাঁধন কাটিয়া ফেলে—সকল মানা অগ্রাহ্য করে। তাই চোখের জল সামলানোর এত চেষ্টা করা সত্ত্বেও হঠাৎ শ্রাবণের ধারার মত এক-পসলা অশ্রুধারা কখন হু হু করিয়া আসিয়া পড়িয়া বালিশটা ভিজাইয়া দিয়া গেল।

সত্যর মনে বরাবরই আশা ছিল—সে তাহার আদর্শানুযায়ী সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়েকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া জীবনটা সুখময় করিয়া তুলিবে। তবে কেন অশিক্ষিতা গ্রাম্যবালাকে বিবাহ করিল,—শুধু গৃহের কাজ করিবার জন্যই কি?

আজ দেবী স্বামীর কথা, তাহার বিবাহের কথা ভাবিয়া দেখিল। মানুষের জীবনে যখন কোনও আঘাত কেহ পায়, তখন সে অতীতের পানে ফিরিয়া চায়। সুখের সময় অতীত মনে থাকে না, কিন্তু দুঃখের সময় বেদনাদগ্ধ চিত্তে শান্তির প্রলেপ দিতে অতীত ছাড়া আর কেহই নাই।

তিন বৎসর আগে একটা চিরস্মরণীয় দিন আসিয়াছিল, যেদিন সে তাহার চিরপূজ্য দেবতা স্বামীকে লাভ করিয়াছিল। ছোটবেলা হইতে সে শিবপূজা করিয়াছিল। শুভদৃষ্টির সময়ে সম্মুখে গৌরকান্তি সত্যকে দেখিয়া জীবন্ত শিব বলিয়া তাহার ধারণা হইয়াছিল। সে তখনই নিজের মাথা দেবতার চরণে নত করিয়া ফেলিয়াছিল। নিজের হৃদয়কে দেবতার অর্ঘ্য স্বরূপ ধরিয়া দিয়াছিল। বিবাহের পর এই তিন বৎসর স্বামীকে সে দেবতার মতই পূজা করিয়া আসিয়াছে। সে

যথার্থ ভালবাসিয়াছিল, কিন্তু সত্য,—সে কি তাহাকে যথার্থ ভালবাসিতে পারিয়াছিল?

এই প্রথম সে স্বামীর ভালবাসায় সন্দেহ করিল। না, স্বামী তাহাকে কখনও ভালবাসেন নাই, তাহার সহিত বরাবর ছলনাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। যদি প্রকৃত ভালবাসিতে পারিতেন, তবে কখনই অন্য নারীকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস দেবীর বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল, সত্যই সে স্বামীর যোগ্যা নহে। তাহার দেবতা স্বামীর পায়ের তলায় দাঁড়াইবার যোগ্যতা পর্য্যন্ত তাহার নাই। তাহার আছে কি? না আছে অনিন্দ্য রূপ, না আছে গুণ। সে স্বামীর মনের উপযুক্ত কথা বলিতে পারে না, সে কোনও নূতন কথা কহিয়া স্বামীর অন্তরকে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে না। সে জানে শুধু দাসীর ন্যায় সংসারের কাজ করিতে, মুখ বুজিয়া থাকিতে। কিন্তু তাহার শিক্ষিত স্বামী তো শুধু কাজ চান না,—কাজ যে দাসীতেও করিতে পারে।

আজ মনে পড়িল স্বামীর কথা, স্বামী এ জন্য কত দিন কত কথা বলিয়াছেন। ভগবান, তাহাকে রূপ দাও নাই, কিন্তু স্বামীর উপযুক্ত হইবার মত শিক্ষা পাইবার সুযোগটুকু দিলে না কেন প্রভু?

চোখের জলে বালিস আর্দ্র হইয়া গেল, কাঁদিতে কাঁদিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রাতে বিছানা তুলিবার সময় আর্দ্র বালিসে হাত দিয়াই ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "তোর মাথার বালিস ভিজে কেন রে বউ, কাল সারারাত ধরে কেঁদেছিলি বুঝি?"

কুণ্ঠিত হাসি হাসিয়া দেবী বলিল, "বাঃ, কাঁদব কেন?"

ভবানী পরিহাসের লোভ সামলাইতে পারিল না, বলিল, "দাদার জন্যে—"

অবজ্ঞার ভাবে দেবী বলিল, "যাঃও ঠাকুরঝি, বকিয়ো না। ভারি দায় পড়েছে আমার কি না—তাই কাঁদতে যাব।"

ভবানী স্পষ্ট সব বুঝিয়াও দুঃখপূর্ণ ব্যাপারটা লইয়া আর নাড়াচাড়া করিতে পারিল না।

সেই দিন বীথির একখানা পত্র আসিয়া পৌঁছিল।

পত্রখানি অজানিতা কাকিমার নামে। ইহাতে বীথি প্রথমতঃ—সে যে কে তাহা জানাইয়াছে, তাহার পর ধীরে ধীরে সত্যর বিবাহের কথা, বিলাত যাওয়ার কথা তুলিয়াছে। সে লিখিয়াছে—কাকার বিয়ে আজ দু'দিন হল হয়ে গেছে কাকিমা,—একটা বড় জুয়াচুরীর মধ্যে দিয়ে এই ব্যাপারটা এগিয়েছে। এখানকার কেউই জানে না কাকা বিবাহিত। আমার বাবা প্রকাশ করেছেন—কাকার এখনও বিয়ে হয় নি। সকলে তাঁকেই চেনে—তাই তাঁর কথা বিশ্বাস করেছে। জানি নে এমন ব্যাপার আর কোথাও কখন ঘটেছে কি না। কাকা ঝোঁকে পড়ে প্রথমটায় এগিয়ে গিয়াছিলেন, এখন প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। তাঁর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। তিনি যে জায়গায় এখন রয়েছেন—তা তুমি সহজেই বুঝতে পারবে। তাঁর মনে সদাই ভয়—পাছে কোনও আঘাতে এই ভণ্ডামীর মুখোসটা খসে যায়, আর সবাই তাঁর প্রকৃত রূপ দেখতে পায়। তিনি আজ আমার কাছে এসেছিলেন। দেখলুম, তাঁর মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে,—চোখ একেবারে বসে গেছে। এখন তোমার ওপরেই তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করছেন, তোমার ওপরেই তাঁর মান-প্রাণ ন্যস্ত। যদি কোনও ক্রমে এখানকার কেউ জানতে পারেন তিনি বিবাহিত, তাঁর স্ত্রী বর্ত্তমান,—তিনি আর মুখ দেখাতে পারবেন না, বাধ্য হয়ে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হবে; কেন না, প্রাণের চেয়ে মান বড় জিনিস। কাকিমা, হিন্দুর মেয়ে তুমি, স্বামীর জন্যে হিন্দুর মেয়ে সব করতে পারেন। এখানে তোমার স্বামীকে বাঁচানোর জন্যেই তোমায় স্বামী ত্যাগ করতে হবে, স্বামীর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না, পত্রাদি দিতেও পারবে না। পারবে কি তুমি—এই কথা রাখতে, তোমার স্বামীর মান-প্রাণ রক্ষা করতে? একটা দারুণ বোঝা ঠিক তাঁর মাথার ওপরে ঝুলছে, তোমারই দ্বারা এর অবলম্বন ছিঁড়ে তাঁর মাথায় পড়তে পারে—যার ফল মৃত্যু। হিন্দু নারী সাবিত্রী মরা স্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন; হিন্দু নারী সীতা দময়ন্তী স্বামীর জন্যে স্বামীর অনুগামিনী হয়েছিলেন; সীতা অগ্নি প্রবেশ করেছিলেন। তুমিও কাকিমা,—সেই হিন্দু নারী, তোমার স্বামীকে সকল অপমানের হাত হতে রক্ষা করতে একমাত্র পারবে তুমি, আর কেউ পারবে না।"

পত্রখানা পড়িয়া দেবী দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া

রহিল, তাহার মনটা তখন কোন অসীমের পথে উধাও হইয়া গিয়াছিল।

"কার পত্র বউ,—দেখি।"

চমকিয়া উঠিয়া দেবী চোখ নামাইয়া দেখিল—ভবানী। পত্রখানা সে ভবানীর হাতে ফেলিয়া দিল, একটা শব্দ তাহার মুখে আসিল না। এক নিঃশ্বাসে পত্রখানা পড়িয়া উত্তেজিত কণ্ঠে ভবানী বলিল, "কখ্‌খনো হবে না বউ, এ কখ্‌খনো সম্ভব হতে পারে না। বীথি তোমায় পত্র দিতে নিষেধ করেছে, ছোড়দা বীথিকে অনুরোধ করেছে—কেন না এ পত্র তার শিক্ষিতা নতুন স্ত্রীর হাতে পড়লে একটা তুমুল কাণ্ড বেধে যাবে। তোমায় পত্র নিশ্চয়ই লিখতে হবে বউ, আজই লিখতে হবে। সে পত্র কাল ওরা পাবে। গোলমালে পড়ে ছোড়দাই বিশেষ করে জব্দ হবে। এ রকম লোকদের জব্দ করাই দরকার, তা জেনো।"

দেবী শান্ত অবিচল কণ্ঠে বলিল, "আমি পত্র লিখতে পারব না ঠাকুরঝি।"

অবাক হইয়া গিয়া ভবানী বলিল, "লিখতে পারবে না? যে পাপিষ্ঠ তোমার নারী-জন্মটাকে এক নিমেষে ব্যর্থ করে দিয়ে গেল,—মুখের হাসি, বুকের আনন্দ ধুয়ে মুছে নিয়ে গেল,—দেবতার মত বাপের বুক একবারে গুঁড়ো করে দিয়ে গেল,—তার সর্ব্বনাশ করতে তোমার ইচ্ছে হচ্ছে না, তারও হাসি আনন্দ ঘুচিয়ে দিতে চাও না?"

দেবী তেমনই শান্ত ধীরকণ্ঠে বলিল, "না ঠাকুরঝি, আমার মোটেই ইচ্ছে হচ্ছে না। দেবতা মানুষের মাথায় যা খুসি দণ্ডের বোঝা চাপাতে পারেন, মানুষ অধীন বলে সবই সয়ে যেতে পারে। তা বলে দেবতাকে মানুষ তো ইচ্ছামত দণ্ডিত করতে পারে না ঠাকুরঝি—কেন না, সে দেবতার বশ,—দেবতা তো তার অধীন নন। প্রতিহিংসা নেওয়ার ইচ্ছে আমার মনে কখনও জাগে নি ঠাকুরঝি! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, সে ইচ্ছে যেন আমার না হয়। তিনি আমায় কখনও ভালবাসেন নি, ভালবাসতে পারেন নি; কারণ, যথার্থ তাঁর যোগ্যা স্ত্রী হওয়ার মত কিছুই আমার নেই। তিনি তাঁর যে আদর্শ স্ত্রীর ছবি মনে এঁকে রেখেছিলেন, আমি সে রকম হতে পারি নি। তাইতেই তো তিনি সুখী হতে পারেন নি। তিনি জোর করে—"সুখী হয়েছি" বললেই কি হয় ভাই ঠাকুরঝি? আমি তাঁর চোখে, তাঁর মুখে, তাঁর ভাষায় বেদনাকে যে মূর্ত্ত হয়ে উঠতে দেখেছি। তিনি নিজে উপযুক্ত হয়েছেন, নিজে নির্ব্বাচন করে, জীবনের আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে একটী নারীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেছেন। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি, এঁদের মিলন শান্তিময় হোক। আমার জীবন ব্যর্থ কিসে দিদিমণি? আমার জীবন আমার স্বামীর স্মৃতিতে পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি সুখে আছেন—এ কথাটা শুনলে আমি যথার্থই বড় সুখী হব। তবে—বড় কষ্ট পাচ্ছি বাবার কথা ভেবে। শেষ বয়সটায় তিনি আবার এই যে আঘাত পেলেন, এর ধাক্কাটা সইতে পারলে হয়।"

তাহার মুখখানা একটা পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুগ্ধা ভবানী তাহার দীপ্ত সেই মুখখানার পানে চাহিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল, "বউ!"

দেবীর অধর-প্রান্তে শুধু একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। ভবানী তাহার গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার সুন্দর মুখখানা নিজের বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল; রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "দাদার অদৃষ্ট বড় মন্দ, তাই তিনি এমন স্ত্রীকে চিনতে পারলেন না! হীরা বলে কাঁচ তুলে বুকে পরলেন, আঁচলে ফস্কা গেরো দিলেন। কিন্তু এ ভুল তাঁর এক দিন ভাঙ্গবেই ভাই! সেদিন তাঁকে নিশ্চয়ই স্বীকার করতে হবে—তিনি আগাগোড়া ভুলই করে এসেছেন! তিনি ভাববেন খড়ো ঘরে সোণা ফেলে সহরে এসে রাং নিয়েছেন।"

দেবী তাহার আলিঙ্গন-পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি—যেন সে কথা ভাববার দিন তাঁর জীবনে না আসে।"

১১

সংসারের জন্য যেটুকু ভাবনা ছিল তাহাও ঘুচিয়া গেল, আপনার বলিয়া আকর্ষণের বস্তু আর কিছুই রহিল না। উপেন্দ্রনাথ দেহ-প্রাণ সংসারের আকর্ষণ হইতে সরাইয়া লইলেন, ভাবিতেছিলেন—কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ—

সংসারের অসারতা এমন স্পষ্টভাবে কখনও তাঁহার মনে প্রতিফলিত হয় নাই, এমন গভীর ভাবে রেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ তিনি নিজেকে সকল বন্ধন হইতে

মুক্ত ভাবিতেছিলেন। অনেকখানি দূরে সরিয়া গিয়া গম্ভীর কণ্ঠে তিনি পড়িতে লাগিলেন—

মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্

আবার

নলিনী দলগত জলমতিতরলম্
তদ্‌বৎ জীবনমতিশয় চপলম্।

জগতে একমাত্র সার ব্রহ্মপদ, পরমব্রহ্মে লীন হইয়া যাওয়া আর কিছুই না। কি-সব মায়া, কে তাঁহার? পুত্র কন্যা, সংসারে কেহই তাঁহার নয়।—এই যে আঘাত দিয়াই তাহারা সরিয়া গেল, কেহ একবার ফিরিয়াও চাহিল না।

দুর্ব্বহ যাতনায় হৃদয় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিত তখন গুরুগম্ভীর কণ্ঠে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিতেন—

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ।

হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্য কত না আয়াস, কত না যত্ন! না,—কিছুতেই আর নয়, আর যেন কাহারও মায়ায় জড়াইয়া পড়িতে না হয়, সংসারের বশ আর না হইতে হয়।

ভবানী পিতার ভাব দেখিয়া ভয় পাইল। চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার এ কি হলো বউ?"

দেবী একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সংসারকে সর্ব্বস্ব দিয়ে বড় দাগা পেয়ে বাবা এখন মন ফিরিয়েছেন দিদিমণি, বাবা এখন ব্রহ্মে লীন হতে চলেছেন। সংসারের কাজে আর ফিরে চাইবেন না। দেখছ না—কি রকম ভাব হয়েছে?"

ভবানী হতাশ ভাবে বলিল, "আমাদের উপায়?"

দেবী ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া বলিল, "ভগবান করিবেন। আমি উপলক্ষ হয়ে ঠাকুর জামাইকে পায়ে ধরেও আনব।"

ভবানী বলিল, "আর তোমার—।"

দেবী অঙ্গুলী সঙ্কেতে গৃহে নারায়ণকে দেখাইয়া বলিল, "দামোদর করিবেন। যতক্ষণ দামোদর আমার কাছে থাকবেন ঠাকুরঝি, ততক্ষণ আমার জন্যে কাউকেই ভাবতে হবে না।"

সামান্য কিছু জমীজমা ছিল মাত্র,—একরকম ইহা হইতে উৎপন্ন ফসলে এই সংসারটী চলিত। উপেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে জমীজমাগুলি দেখাশুনা করিতেন; কাজেই ভাগিদারেরা কখনও ফাঁকি দিতে পারে নাই। উপেন্দ্রনাথের সংসারে অনাসক্তি এখন ভাগিদারেরাও লক্ষ্য করিল, তাহারাও ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিল।

ভবানী সজল নেত্রে পিতার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। পিতা উদাসীন হইয়াছেন—কিন্তু তাহাদের উদাসীন হইলে তো চলে না। সংসার এখন তাহাদেরই চালাইতে হইবে, অথচ পিতার সাহায্য নহিলে যে চলে না,—জমীজমা দেখা-শোনা স্ত্রীলোকের কাজ নয়।

গভীর মনোনিবেশের সহিত উপেন্দ্রনাথ তখন উপনিষৎ দেখিতেছিলেন ও জটিল বিষয়গুলির সরল ব্যাখ্যা করিয়া হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন।

ভবানী যে পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না। মন তখন পারমার্থিক বিষয়ে এতই নিমগ্ন যে, সম্মুখে যদি একটা সর্প ফণা উদ্যত করিয়াও আসিত, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন না।

ভবানী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। পিতা তাহার আগমন ও অবস্থিতির কথা কিছুই জানিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিতে পারিয়াও সে সাহস করিয়া কতক্ষণ ডাকিতে পারিল না।

অনেকক্ষণ পরে মৃদুকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা!"

উপেন্দ্রনাথ সে মৃদু আহ্বান শুনিতে পাইলেন না।

ভবানী সঙ্কুচিতভাব ত্যাগ করিয়া এবার সরল উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"বাবা!"

এবার তিনি বই হইতে মুখ তুলিলেন, কন্যার প্রতি তাকাইলেন। ভবানী সে মুখ—সে দৃষ্টি দেখিয়া দমিয়া গেল, যাহা বলিতে আসিয়াছিল তাহা হারাইয়া ফেলিল।

উপেন্দ্রনাথ তাহার মুখের ভাব দেখিয়া অন্তরের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। শান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি ডাকছিস বাণী?"

সেই আদরের নাম,—বহুকাল পূর্ব্বে পিতা তাহাকে এই নামেই সম্বোধন করিতেন। আজ বহুকাল পরে আবার সেই নামে ডাকিলেন। সংসারের নানা গোলমালে পিতার মাথা বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, তিনি অতীতের কথা

একেবারেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অনেককাল পরে আজ আবার সেই পরিচিত আদরের সম্বোধন,—ভবানীর হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাহার ছুটি চোখ জলে ভরিয়া আসিল, সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

আজ ঝাঁ করিয়া উপেন্দ্রনাথের মনে পড়িয়া গেল—ইহাদের কেহ নাই। আজ কয় মাস তিনি বাড়ী থাকিয়াও নাই, সংসারের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্কই নাই। সংসার কি ভাবে চলিতেছে, এই দুইটী তরুণী মিলিয়া কি ভাবে চালাইতেছে, কোথা হইতে কি যোগাড় করিতেছে, এ খবরটা নেওয়া যে বাড়ীর কর্ত্তা হিসাবে তাঁহার একান্ত প্রয়োজনীয়—তাহা তিনি একেবারেই যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। আজি মনে হইল—তাঁহার কাজ এখনও ফুরায় নাই। শুষ্ক দেহপিঞ্জরে যতদিন প্রাণটা আটকাইয়া থাকিবে, ততদিন তাঁহার বিশ্রাম নাই। কেবলই খাটিতে হইবে; কেন না, তাঁহার পিছনে আকর্ষণ করিবার লোক আছে। ফুরাইয়াছে—এ কথা তিনি জোর করিয়া বলিলেই চলিবে না। সকল বাঁধন কাটিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু অন্তর যে একটী সূক্ষ্ম বাঁধনে এখনও বাঁধা, সে আকর্ষণে তিনি যে অন্তরের অন্তস্তলে বেদনা অনুভব করিতেছেন। তিনি বাহিরের কথা শুনিতে চান না; কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল হইতে যে চীৎকার উঠিতেছে, এ শব্দকে আড়াল দিবেন কেমন করিয়া? এ শব্দ যে কাণে বাজে না, যেখানে ইহার উৎপত্তি সেই-খানেই আঘাত করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

আজ উপেন্দ্রনাথ চোখ তুলিয়া ভাল করিয়া ভবানীর মুখপানে তাকাইলেন,—তাই তো! মুখখানা যেন অত্যন্ত মলিন, শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে।

"আয় মা বাণী, আমার কাছে একবার বস দেখি, একবার তোর মুখখানা দেখি।"

ভবানী পিতার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল। চোখের জল সে আর কিছুতেই লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। তাহার দুটি আরক্ত গণ্ড প্লাবিত করিয়া দরদর ধারে অশ্রুপ্রবাহ ছুটিল।

পিতা তাহার মুখখানার পানে তাকাইয়া ছিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। অতি কষ্টে তিনি অশ্রুকে ধারারূপে প্রবাহিত হইতে দিলেন না।

"বাণী, বউ মা কোথায়, সে তো আর আমার কাছে আসে না?"

রুদ্ধকণ্ঠে ভবানী বলিল, "আমরা কেউ ভয়ে তোমার কাছে আসতে পারি নে বাবা। বউ আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে তোমায় দেখে ফিরে যায়। রোজ সকালে তোমার পাদোদক নিয়ে যায়, তুমি তার পানে চেয়েও দেখ না, কথা বলা তো দূরে থাক্! সেও নিঃশব্দে তোমার পায়ে মাথা তার ছুঁইয়ে তেমনি নিঃশব্দে চলে যায়।"

উপেন্দ্রনাথ উপনিষদখানা টানিয়া লইয়া তাহার পাতা উল্টাইয়া যাইতেছিলেন, একটা কথাও বলিলেন না। ভবানী খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "বাবা, তোমার দিন তো বেশ স্বচ্ছন্দে গীতা-উপনিষদ নিয়ে কেটে যাচ্ছে,—আমাদের দিন কাটছে কি করে তা তো একবার ভেবেও দেখছ না—"

গভীর আবেগে তাহার কণ্ঠ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গেল। উপেন্দ্রনাথ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন; ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি করতে বলিস মা?"

"আমরা যে না খেয়ে মরি বাবা—"

সে বালিকার ন্যায় উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া উঠিল, "তুমি এখনও বর্ত্তমান থাকতে—উপায় থাকতে—আমরা তোমার মেয়ে—তোমার পুত্রবধূ হয়ে—না খেয়ে মরব, কিম্বা পেটের দায়ে কারও বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে যাব বাবা? আমরা কিছু না পেলে তোমায় কি খেতে দেব?"

বিস্মিত উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কেন ভবানী, আমি তোদের সংসার চলার সব বন্দোবস্ত ঠিক করে দিয়ে বসেছি!"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ভবানী বলিল, "তুমি যা বন্দোবস্ত করেছিলে বাবা, সব উল্টে গেছে। ঘরে সামান্য ধান ছিল তাও ফুরিয়ে এল। আর দিন সাত আট কোন রকমে চলতে পারে। যারা যা দেয়, তারা এবারে কিছু দেয় নি। আমরা কি করে দিন চালাব বাবা, আমরা কি করে উপায় করব?"

শূন্য দৃষ্টিতে কন্যার মুখের পানে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "এই সাত আটটা দিন চলবে,—তুই বলছিস কি ভবানী? আমি তো বড় কম ধানের জমি করি নি,—যাতে বছরে চার-পাঁচটা বড় ধানের গোলা ভরে যায়। এবারে আমায় বিমনা দেখে কেউ কিছু দিলে না, সবাই ফাঁকি দিলে?"

কম্পিতকণ্ঠে ভবানী বলিল, "কেউ কিছু দিলে না বাবা, সবাই ফাঁকি দিলে। এবার তুমি দেখতে যাও নি, তারা আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেল এবার একটা ধান হয় নি। আমায় তো বলতে এসেছিলুম বাবা, তুমি সেদিন শুধু নির্ব্বাকে আমার মুখের ওপর দুটি চোখ তুলে ধরেছিলে, একটা কথাও তো সেদিন তুমি বললে না।"

স্তম্ভিত উপেন্দ্রনাথ কন্যার পানে তাকাইয়াই রহিলেন—না, কর্ত্তব্য এখনও ফুরায় নাই, সংসারের দেনা এখনও শোধ হয় নাই। এখনও খাটিতে হইবে, ছুটাছুটি করিয়া অন্নের সংস্থান করিতে হইবে। হায় ভগবান,—বৃদ্ধ এতই কি অপরাধ করিয়াছে প্রভু, চরণ উঠিতে চাহে না তবু টানিয়া তুলিতে হইবে? যাহাদের করিবার কথা তাহারা সরিয়া গেল,—যাহার বিশ্রামের সময় সে এতটুকু সময় পাইল না। এ কি বিচিত্র বিধান তোমার জগদীশ, এ কি শাস্তি!

"হ্যাঁ, তুই এক দিন বলেছিলি বাণী, সে কথা আমি ভুলে যাই নি রে, আমার তা মনে আছে—"

দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া তিনি খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তবে উঠি মা, আবার চলি তবে? সামনে অনন্ত পথ,—জানি নে কতকাল আর মাথায় তোদের বোঝা নিয়ে এই পথ বেয়ে চলতে হবে। আচ্ছা, তাই চলছি, আর বিশ্রাম নেব না,—জানছি বিশ্রাম এ অদৃষ্টে নেই। বড় হাসি আসছে এই ভেবে—কার বোঝা কে বয়? কার জন্যে ছিল—কে তুলে নিল? কিন্তু মা, দুর্ব্বল শুষ্ক দেহ,—প্রাণপাখী কোন্‌দিন আমার অনিচ্ছায় উড়ে চলে যাবে,—তখন কি হবে তোদের, কে তোদের দুটিকে দেখবে, খেতে দেবে—আমি আজকে নতুন করে তাই ভাবছি।"

ভবানী মাথা নীচু করিয়া রহিল, তাহার চোখ দিয়া শুধু টপ টপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বই কয়খানা পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া উঠিতে উঠিতে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দে বাণী, আমার চাদর জুতো দে মা, একবার বার হই। অনেক দিন বিশ্রাম করেছি, আজ একবার যুবকের উদ্যম নিয়ে দেখি, কতদূর কি করতে পারি। আঃ! তোরা যতদিন পেছনে থাকবি ততদিন আমার এতটুকু শান্তি নেই! তোরা আমায় শুধু খাটাবি। শান্তি আছে চিতার কোলে—যেদিন তোদের ডাক কাণে আসবে না, আগুনের গর্জ্জনে সব ঢেকে যাবে। হ্যাঁ রে, কাঁদছিস আমার কথা শুনে! ছি মা, বুড়ো বাপ তোর, কিছু মনে করিস্ নে। আমার মাথার মধ্যে সময় সময় কি রকম হয়ে যায়, আমি বুঝতে পারি নে কাকে কি বলছি। উঃ! বুকের দু' দিককার পাঁজর ভেঙ্গে গেছে যে, একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে, আমাতে আর আমি নেই।"

কটকি জুতাজোড়াটা পায়ে দিয়া, গায়ে চাদরখানা জড়াইয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল, ধরার বুকে কোমল আঁধারের ছোপ ধরাইয়া দিতেছিল। পল্লীর গৃহে গৃহে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল, শঙ্খ নিনাদে অনন্ত ব্যোম পূর্ণ হইয়া গেল।

দেবী গলায় অঞ্চল জড়াইয়া তুলসী-তলায় প্রদীপ দিয়া সেখানে লুটাইয়া পড়িল। এটা তাহার প্রাত্যহিক কাজ। দিনে গৃহকর্ম্মের মাঝে যত বেদনা তাহার মনের ফাঁকগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলে, সবগুলি সে প্রতি সন্ধ্যায় এইখানে ও গৃহ-দেবতা দামোদরের কাছে, নিবেদন করিয়া দেয়। তাহার বেদনাপূর্ণ এই নীরব পূজার নৈবেদ্য হয় চোখের জল।

ভবানী বারাণ্ডার ধারে পা ঝুলাইয়া একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া দূর আকাশের পানে চাহিয়া ছিল। সন্ধ্যালোক তখন বহুরঙ্গে চিত্রিত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমের আকাশ ঘেঁসিয়া কালো রেখাবৎ একখানা মেঘের উপরে পঞ্চমীর ক্ষীণ চাঁদখানা ইহারই মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া দীপ্তিহীন আলো বিতরণ করিতেছিল।

এই সময়ে উপেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন। দেবী তাড়াতাড়ি তুলসীতলা ছাড়িয়া উঠিল। ভবানী আসন দিয়া, সজ্জিত কলিকায় আগুণ দিয়া লইয়া আসিল।

তাহার হাত হইতে হুঁকো লইয়া উপেন্দ্রনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আজ বেশী কিছু করতে পারলুম না মা, তবে একটা কাজ করে এলুম।"

ভবানী জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ বাবা?"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "শুনলুম সুরেশ এখানে এসেছে, লজ্জায় সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারছে না।

তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্মে রায় মশাইকে বলে দিয়ে এলুম।"

ভবানী চুপ করিয়া রহিল।

উপেন্দ্রনাথ তাহাকে শুনাইয়া আপনা আপনিই বলিলেন, "শুনলুম নাকি সে তোকেই নিতে এসেছে। তা যদি হয়, যদিই তোকে নিয়ে যায় বাণী—নিয়ে যাক, আমি তোর দায় হতে অব্যাহতি পাই। তুই যে কত বড় বোঝা হয়ে আমার বুকে রয়েছিস, তা তুই বুঝতে পারবি নে। তোকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই, তুইও সেখানে সুখে থাকবি।"

ভবানী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না বাবা, আমি তোমায় এ অবস্থায় ফেলে যেতে পারব না।"

শান্ত হাসিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন "কেন, তোর বাবার কি হয়েছে বাণী! ভয় নেই, আমি জানছি আমি এখন মরব না। ভবিষ্যৎ আমার কাণে এসে অনেক কথা বলে গেছে রে,—তখনি শুনেছি আমার এখনও অনেক কষ্ট সইতে হবে। তুই আমার জন্মে স্বামীর ঘরে যাবি নে—এ কি একটা কথা হতে পারে পাগলী! যার হাতে তোকে সমর্পণ করেছি, তুই এখন তার। আমার সঙ্গে তোর তো কোন সম্পর্ক নেই—আমার সুখ দুঃখের ভাগ তোর আর নেওয়ার কথা তো নয়। আমাদের শাস্ত্রে বলে স্বামী নারীর একমাত্র দেবতা,—তোকেও যে সেই শাস্ত্রের কথা মেনে নিতে হবে মা। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এমনি নয় মা, যে, টেনে ছিঁড়তে পারবি! এরই জন্মে তোকে তোর স্বামীর আলয়ে যেতেই হবে। মা বাণী, তোর বাপ সব হারিয়েছে, সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্মে উপযুক্ত দুই ছেলেকে বিসর্জ্জন দিয়েছে, তোর জন্মে তোর বাপকে পতিত করিস নে। আমি যে কথা দিয়েছি—এই কথাটা মনে করে—তোর বাপের সত্যকে অটুট রাখতে—তোকে স্বামীর অনুগমন করতেই হবে। মা, আমি যে কথা দিয়ে এসেছি,—কাল তোকে সুরেশের সঙ্গে পাঠাব,—তুই কি আমায় মিথ্যাবাদী করবি?"

ভবানীর মাথা নুইয়া পিতার পায়ের উপর পড়িল। সে বিকৃতকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমি তোমার মেয়ে, তোমার সত্যকে অটুট রাখতে আমি সেখানে যাব। আমার জন্মে তুমি তোমার ধর্ম্ম, তোমার সত্য হারাবে না। আমার যত কষ্টই হোক, যত দুঃখই হোক, শুধু তোমার জন্মেই বরণ করে নেব বাবা। আমি যাব বাবা, কাল যে সময় আমায় পাঠাবে আমি সেই সময়েই যাব।"

সে ছুটিয়া পলাইল;—পাছে চোখের জল আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে সেই ভয় হইতেছিল।

পিতা স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। (ক্রমশঃ)

দৃষ্টি-বিভ্রম

শ্রীহরিহর শেঠ

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে সচরাচর আমরা যাহা দেখি এবং উপলব্ধি করি, তাহা সকল সময় ঠিক হয় না। যাহা সত্য তাহা বিকৃত ভাবে, এবং যাহা বিকৃত হয় ত তাহাকেও কতকটা সোজা মত দেখিয়া থাকি। আমাদের চক্ষু ও দ্রষ্টব্য সামগ্রীর মধ্যে কোন না কোন দৃশ্য বা অদৃশ্য পর্দ্দা থাকিয়াই সাধারণতঃ এই বিভ্রম ঘটাইয়া থাকে। রক্তবর্ণ চশমা পরিহিত লোক যেমন সমস্তই রক্তিমাভ দেখেন, নীল বা কৃষ্ণবর্ণ চশমাধারীরও চক্ষে তেমনই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড তমিস্র-মাখা বোধ হয়। এই স্বেচ্ছাকৃত দৃষ্টি-বিভ্রমের ঘটনায়—তা লালই হৌক আর কৃষ্ণবর্ণ হৌক,—বড় কিছু আসিয়া না যাইলেও, এমন অনেক অজ্ঞতাপ্রসূত অদৃশ্য যবনিকা আমাদের মনশ্চক্ষুর সমক্ষে থাকিয়া আমাদের বিভ্রান্ত করে, যাহার কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহা দ্বারা জগতে কত সত্যই যে নিত্য লাঞ্ছিত হইতেছে, কত মিথ্যার প্রাবল্য জনিত মহা অনিষ্টের সৃষ্টি হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। প্রমাদের বশে কত দেবতা ও দানবের স্বরূপ না দেখিয়া না চিনিয়া যে অশুভের সৃষ্টি হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত।

একের নিকট অপরের স্বরূপের বিকৃতির উদাহরণ সংসারের বহু ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। সেক্সপীয়র, কালিদাস, বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের অতি সামান্ত
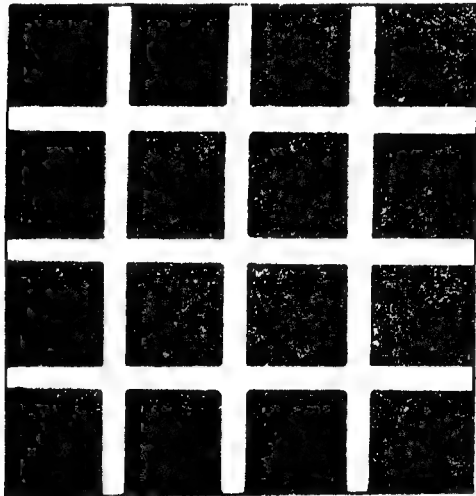
প্রথম চিত্র

গ্রন্থকারের গ্রন্থের মধ্যেও সেরূপ চরিত্র-সৃষ্টির অভাব নাই। উদাহরণ দ্বারা তাহা দেখান এখানে আমার
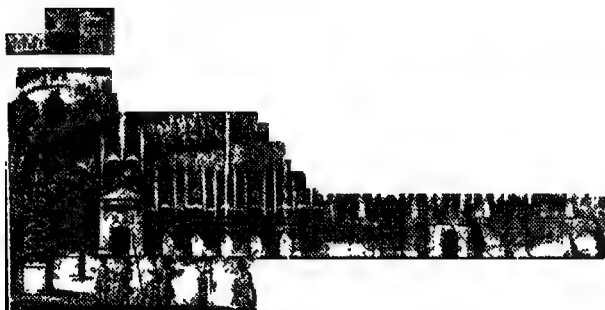
দ্বিতীয় চিত্র

উদ্দেশ্য নহে। * বিনা চশমায় নগ্ন-দৃষ্টিতে আমাদের যে সব দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, তাহারই বিষয় কতিপয় চিত্র-সহযোগে দেখাইবার চেষ্টা করিব মাত্র। মরুভূমে মরীচিকা, মুকুরে বা অন্য স্বচ্ছ পদার্থে প্রতিবিম্বের ন্যায় সত্তাবিহীন দৃশ্যের কথা অথবা অসমতল দর্পণ-ফলকে দৃষ্ট ভগ্ন বা বিকৃত প্রতিবিম্বের কথাও আমার বলিবার বিষয় নহে। ফটোগ্রাফারের কৌশলে এমন অনেক জিনিসের প্রতিচিত্র প্রস্তুত হইতে দেখা যায়, যাহা দেখিয়া উহা প্রকৃত কোন্ দ্রব্যের ছবি তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। * এখানে তাহার কথার আলোচনা করাও আমার উদ্দেশ্য নহে। পরীক্ষিত, প্রমাণিত বা জ্যামিতিক সত্য, যাহা আমরা বিভিন্ন প্রকারে দেখি, তাহাই সংগ্রহ করিয়া দেখাইতে চাহি।

প্রথম চিত্রে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভুজ সমান ব্যবধানে পাশাপাশি চিত্রিত আছে। সাদা কাগজের উপর সাধারণ কৃষ্ণ বর্ণে এগুলি মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু প্রতি চতুর্ভুজের মধ্যে ব্যবধানের শ্বেত অংশ যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, অর্থাৎ কোলের কাছে, তাহা কতকটা কৃষ্ণাভ মনে হয়, কিন্তু উহা প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এইরূপ দ্বিতীয় চিত্রে বৃত্তস্থিত সকল অংশ একই প্রকার স্থূলরেখায় কৃষ্ণবর্ণে মুদ্রিত হইলেও, সম্মুখস্থ লম্বরেখাময় বৃত্তাংশদ্বয়ের বর্ণ উভয় পার্শ্বস্থ অংশের রেখাগুলির তুলনায় গাঢ় বলিয়া বোধ হয় এবং পার্শ্বস্থ অংশ যেন ধূসর বর্ণে মুদ্রিত বলিয়া ভ্রম হয়। উহাই আবার ঘুরাইয়া ধরিয়া দেখিলে বিপরীত দেখায়।

যথাযথ বর্ণ সম্বন্ধে ভ্রান্তির আরও উদাহরণ পাওয়া যায়। তৃতীয় চিত্রখানি কাটিয়া লইয়া যদি একখানি কার্ডে আঁটিয়া একটি লাটিমের মাথায়

* আমার 'প্রমাদ' নামক পুস্তকে এইরূপ উদাহরণ বিস্তর দেওয়া হইয়াছে।

* ১৩২৯ সালের 'মৌচাকে' এইরূপ বহু চিত্র সমন্বিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আটকাইয়া বা মধ্যে একটি পিন দিয়া বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে ঘুরান যায়, তাহা হইলে শেষের অর্থাৎ সর্ব্ব-পার্শ্বের রেখাগুলি লাল এবং ভিতরের অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম বৃত্তের রেখাগুলি নীল বর্ণের মনে হইবে। উহা বিপরীত দিকে রাইলে ঠিক বিপরীত বর্ণের দেখাইবে।
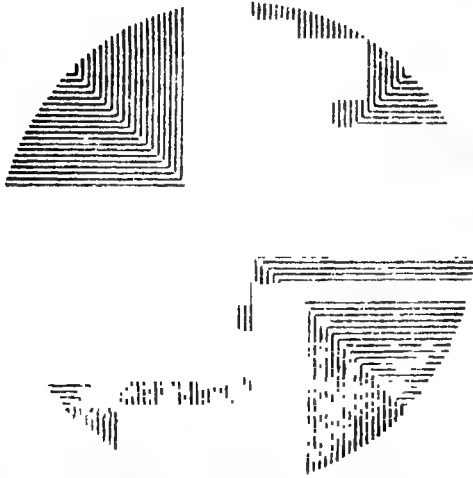
অসমতল দর্পণে বিকৃত প্রতিবিম্ব

আতস বাজী

সেইরূপ চতুর্থ চিত্রখানিও বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে ঘুরাইলে শ্বেত অংশগুলি রঞ্জিতাভ মনে হইবে।

পঞ্চম চিত্রখানি একটি টুপির পার্শ্বরেখার ছবি। উহার উচ্চতা ও প্রস্থের মাপ এক হইলেও, স্পষ্ট মনে হয় যে, উহার উচ্চের মাপ বড়। ষষ্ঠ চিত্রে দুইটি সরল রেখা একটির উপর একটি দণ্ডায়মান ভাবে অঙ্কিত আছে। দৈর্ঘ্যে দুইটি ঠিক সমান হইলেও লম্বরেখাটি নিয়ের রেখা অপেক্ষা স্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। সপ্তম চিত্রে উভয় মধ্য রেখাই ঠিক এক মাপের ; কিন্তু যেটি দুইটী বড় রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ সেইটি বড় এবং যেটি দুইটী ছোট রেখা দ্বারা
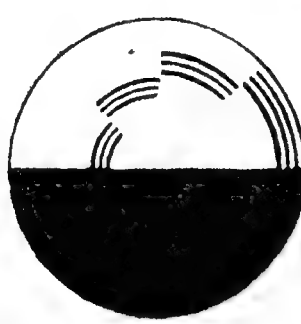
তৃতীয় চিত্র

চতুর্থ চিত্র
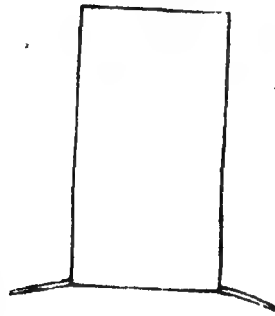
পঞ্চম চিত্র
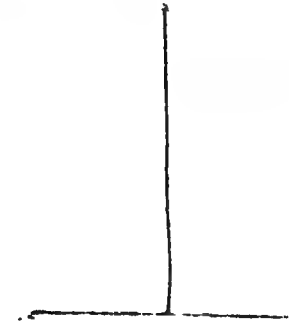
ষষ্ঠ চিত্র

সপ্তম চিত্র

অষ্টম চিত্র

নবম চিত্র

সীমাবদ্ধ সেটি ছোট দেখা যায়। পরবর্ত্তী (অষ্টম) চিত্রের উভয় মধ্যাংশের সরল রেখা দুইটি সমান লম্বের ; কিন্তু উপরের দিকেরটি বড় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। নবম চিত্রও ঠিক উহার অনুরূপ, উহার মধ্যাংশ সমান
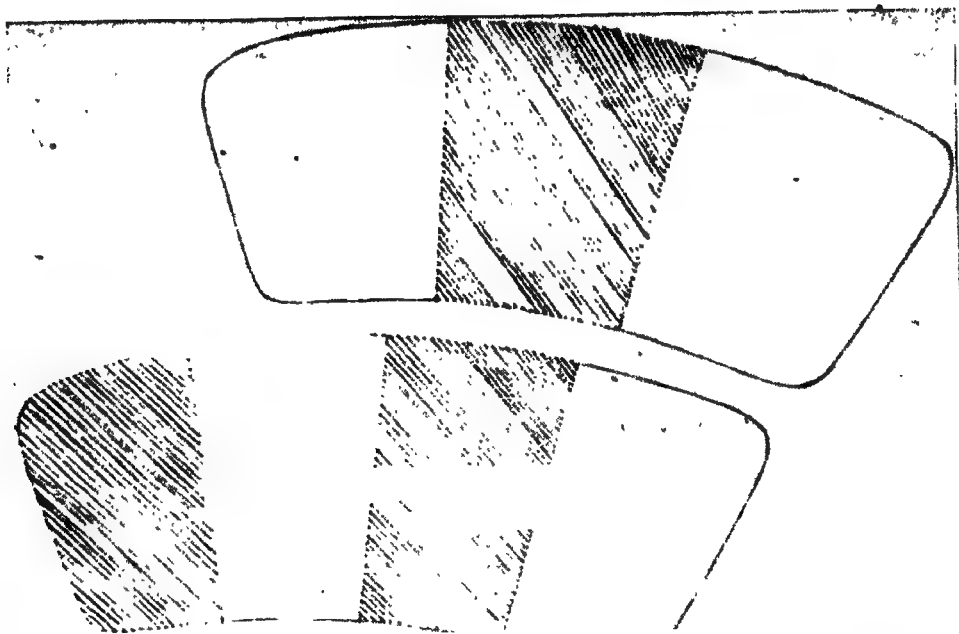
দশম চিত্র
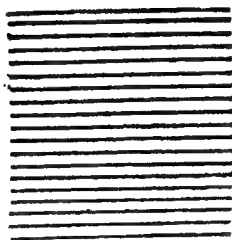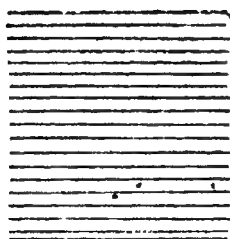
একাদশ চিত্র

দ্বাদশ চিত্র

সমান মাপের হইলেও দক্ষিণ দিকেরটি ছোট বলিয়া মনে হয়।

দুইটি সমপরিমিত ক্ষেত্রও অবস্থাভেদে ভিন্ন আকারের দেখাইয়া থাকে। দশম চিত্রে যে দুইটি ক্ষেত্র অঙ্কিত আছে, তাহা সর্ব্বাংশে আকারে ও পরিমাণে এক। কিন্তু উহা দেখিয়া তাহা মনে হয় না। দক্ষিণ দিকেরটি আকারে ছোট বলিয়া ভ্রম হয়। সম আয়তন-বিশিষ্ট চতুর্ভুজ ক্ষেত্র লম্ব ও আড়ভাবে কতকগুলি সমান্তরাল সরল রেখা দ্বারা খণ্ডিত হইলে, ঐ ক্ষেত্রের আকার সম্বন্ধে দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। একাদশ চিত্রে দক্ষিণ পার্শ্বের ক্ষেত্রটি প্রকৃত পক্ষে একটুও বড় না হইলেও, দেখিবা-

ত্রয়োদশ চিত্র
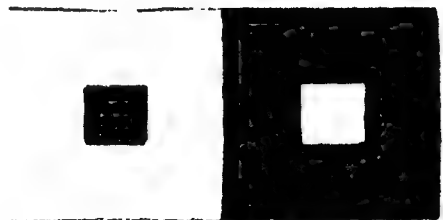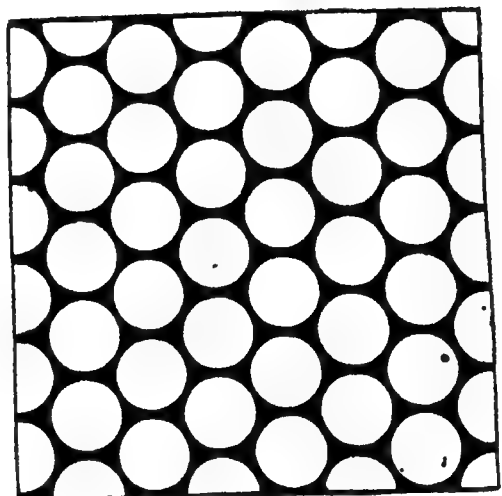
মাত্র মনে হয় উহা কিঞ্চিত উন্নত। দ্বাদশ চিত্রের উভয় চতুর্ভুজের মধ্যাংশ একই আকারের হইলেও উজ্জ্বল বর্ণেরটি কিছু বড় এবং কৃষ্ণ বর্ণেরটি একটু ছোট দেখায়। নগ্ন চক্ষে অনেক সময় উজ্জ্বল বর্ণের কোন চিত্রের পার্শ্বরেখা কিছু অস্বাভাবিক দেখায়। ত্রয়োদশ চিত্রখানি পাঁচ সাত ফিট দূর হইতে দেখিলে শ্বেত বৃত্তগুলি কতকটা ষড়্‌ভুজ মনে হইয়া ছবিখানিকে মধুচক্রের কোষগুলির মত দেখাইবে।

চতুর্দ্দশ চিত্র
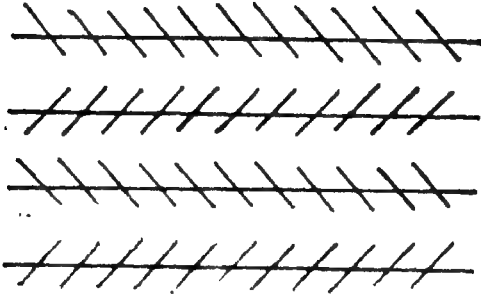
চতুর্দ্দশ চিত্রে যে চারিটি দীর্ঘরেখা দেখা যাইতেছে, উহা প্রকৃত সমান্তরাল ভাবে অঙ্কিত। কিন্তু উহা আর কতকগুলি ছোট ছোট সমান্তরাল সরল রেখা দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায়, অতীর্য্যক ভাবে অঙ্কিত দীর্ঘ রেখা-চতুষ্টয় সমান্তরাল বলিয়া মনে হয় না। নিম্নভাগ একটু উন্নত করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টতর রূপে বুঝিতে পারা যায়।

পঞ্চদশ চিত্র

পঞ্চদশ চিত্রে স্প্রীংয়ের মত একটি রেখা অঙ্কিত আছে। উহা অবশ্যই নিশ্চল, কিন্তু ছবিখানি ঠিক চক্ষুর নিম্নে ধরিয়া উহা এক সমতলে ঘুরাইলে মনে হইবে রেখাটি আপনা হইতেই ঘুরিতেছে। ইহাও দেখার ভুল ভিন্ন আর কিছু নহে। ষোড়শ চিত্রেও এইরূপ মনে হইবে।

উল্লিখিত সকল গুলিই কিছু বিচিত্র চিত্র হইলেও, উহা আমাদের ভুল দেখার উদাহরণ মাত্র। বৈজ্ঞানিকগণ এই দৃষ্টি-বিভ্রমের যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্ত্তী পর্দ্দার (Retina) দুর্ব্বলতা একটি প্রধান। জানি না ইহাই আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম কি না। এই দুর্ব্বলতার জন্য স্বাভাবিক দৃশ্যাবলীর মধ্যেও আমাদের বহু ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই দুর্ব্বলতা আছে বলিয়াই কোন উজ্জ্বল-দৃশ্য বস্তু দৃষ্টি বহির্ভূত হওয়ার পরেও উহার ছায়া অল্পকালের জন্য চক্ষের পর্দ্দায় অঙ্কিত থাকিয়া যায়। এবং সেই জন্যই আমরা হাউয়াই চরকি প্রভৃতি বা উহা হইতে প্রস্তুত এবং অন্য বহু প্রকার আতসবাজীর সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে বা বায়স্কোপের জীবন্ত দৃশ্য দেখিতে সমর্থ হই বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। *

ষোড়শ চিত্র

* George Lindsay, Johnson M. A., M. D, L. S. Lewis এবং Alfred Whitmanএর প্রবন্ধ ও The Book of Knowledge হইতে চিত্রগুলি সংগৃহীত হইল।

সুদূরে

মিশ্র কীর্ত্তন···একতালা

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভাবি আর কি আসিবে ফিরে

রণি ও চরণ মঞ্জীরে ?

গেছ জীবন প্রভাতে গোধূলি বিছায়ে কোন্ সুদূরের তীরে !

যবে নীরস করম সাধি' আপনারে গণিয়াছি নিরুপম

তব আঁখির কিরণ মোর সে গরবে দিল লাজ নিরমম।

আগে কে জানিত বল এ আতুর চিত ছিল তব পথ চেয়ে

যবে উঠিল বাজিয়া তোমার পরশ-রণন নিখিল ছেয়ে ;—

প্রিয় সেইদিন হ'তে ও-নয়ন-দিঠি নিতুই নূতন রূপে

কত অতল তলের বারতা সেঁচিয়া আনি' দেছে চুপে চুপে !

তব অধরের হাসি, রেখার কামনা, অশ্রু লাস্য ধারা,—

হৃদে আনি দেছে বহি নিতি নব রূপে কি মহোৎসব-ভারা !

মোর এ জীবনে যত সাধ না মিটেছে লুটায়েছে যত আশা,

সব ক্ষতির পূরণ ক'রেছে গো তব দরশ-পরশ-ভাষা।

যদি রূপের মাঝারে বাণী তব প্রিয় না ধরে মূরতি আজি,

তব অরূপ লাবণী ধরা দেয় না কি নিতি নব রূপে সাজি !

বুঝি তাই চিরবাঞ্ছিত ! এ ব্যথার তিলক পরালে ভালে ?—

শুধু ফুটাতে মিলন-কমল এ তব বিরহ অন্তরালে !

০ ১ +
সা | -া সা -া | সা রা গা | -া গা -া | গা মা গা | রা গা -া | সা রা গা | পা পা -া |
ভা - বি - আ - র - কি - আ - সি - বে - ফি - - - - রে -

৩ ০ ১
-া গা মা | -া ধপা মপা | II গা -া মা | -া রগা -া | রগা -া রসা | -া রা -া |
- - ভা - বি - আ - র কি - আ - সি - বে

+ ৩ ০
সা রা গা | পা পা -া | -া -া II মগা | -া মা -া | পা -া না | -া না -া |
ফি - - - রে - - - র - ণি' - ও - চ - র -

১ + ৩
না -া না | -া না র্সা | না ধা পা | ধা পা -া | গা -া মা | -া ধপা মপা | II II
ণ - ম - - - শ্রী - - - রে - - - ভা - বি -

০ ১ +
পা | -া পা -া | মপা ধা ধা | -া ধা -া | ধা -া ধা | -া ধা না | পা না না | -া না র্সা |
গে - ছ - জী - ব - ন - প্র - ভা - তে - গো - ধূ - লি -

৩ ০ ১ +
না -া না | -া ধপা -া | পগা -া পা | -া পা -া | পা -া পা | -া ধা না | পা -া ধা |
বি - ছা - য়ে - কো - - ন্ সু - দূ - রে - - র তী - -

-া র্সা না | ধা পা মা | গা মা ধপা | II II { পা | -া পা -া |
- রে - - - - - - - - য - বে -
মো - র

০ ১ +
র্সা -া র্সা | -া ণা -া | ধা -া ধা | -া ণধা ণপা | পা -া ধা | -া ধা -া | ধা -া ণধা | ণধা ণধা পা |
নী - র - স - ক - র - ম - সা - ধি - আ - প - না - রে -
এ - জী - ব - নে - য - ত - সা - - ধ না - মি - টে - ছে -

০ ১ +
পা -া ধা | ণা পধা -া | পমা গা গা | -া মা -া | মা পা পা | -া -া -া | -া -া }
গ - ণি - য়া - ছি - নি - ক - প - ম - - - - - -
লু - টা - য়ে - ছে - য - ত - আ - শা - - - - - -

০ ১ +
র্সা] -া র্সা -া | র্সা -া র্রা | -া র্রা -া | র্রা -া র্রা | -া র্গর্রা র্গর্সা | র্সা -া র্রা } -া র্রা -া |
ত - ব - আঁ - খি - র - কি - র - ণ - মো - র - সে -
স - ব - ক্ষ - তি - র - পূ - র - ণ - ক' - রে - ছে -

৩ ০ ১ +
র্সর্রা র্গর্মা র্গা | -া র্রর্সা -া | র্সা র্রা র্সা | -া ণা -া | ধা পা পা | -া ধা ণা | পধা -া পা | -া -া -া | -া -া
গ - র - বে - দি - ন - লা - জ - নি - র - ম - ম - - - - -
গো - ত - ব - দ - র - শ - প - র - শ - ভা - ষা - - - - -

০ ১ +
{ পা ; -া পা -া | পা -া ঋপা | মা গা -া | গা -া মা | -া গা -া | রা গা রগপা | ধনা ধা পা |
আ - গে - কে - জা - নি - ত - ব - ল - এ - আ - ভু -
য - দি - রূ - পে : র - মা - ঝা - রে - বা - ণী - ত -

৩ ০ ১ + ৩
ঋা গা মা | -া গা -া | সা -া গা | -া গা -া | গা মা গা | রা গা -া | সা রা গা | পা পা -া | -া -া }
র - চি - ত - ছি - ল - ত - ব - প - থ - চে - - - যে - - -
ব - প্রি - য় - না - থ - রে - মূ - র - তি - আ - - - জি - - -

০ ১ + ৩
{ পা | -া পা -া | পা -া ধা | -া ধা -া | ধা -া ধা | -া নধা নপা | গপা -া র্সা | -া না -া | ধা না পধা |
য - বে - উ - ঠি - ল - বা - জি - য়া - তো - মা - র - প - র
ত - ব - অ - রূ - প - লা - ব - ণী - ধ - রা - দে - য় - না

০ ১ + ৩
না ধা পা | পা -া পা | ধা পা মা | গা রা রা | -া গা মা | ঋগা -া রা | -া -া -া | -া -া }
- শ - র - ণ - ন - নি - খি - ল - ছে - য়ে - - - - -
- কি - নি - তি - ন - ব - রূ - পে - সা - জি - - - - -

০ ১ +
পা | -া পা -া | পা -া -া | -া পা -া | পা -া পা | -া ধনা র্সর্রা | পা র্সা র্সা | -া র্সা -া |
প্রি - য় - সে ই - - দি - ন - হ' - তে - ও - ন - য় -
বু - ঝি - তা ই - - চি - র - বা - - - ছি - ত - এ -

৩ ০ ১ + ০
র্সা -া র্সা | না র্রর্সা নর্সা | পা -া র্সা | -া -া -া | না -া না | -া র্সনা র্সধা | ধা না ধা | না র্রা র্সা |
ন - দি - ঠি - নি - তু ই - - নূ - ত - ন - রূ - পে - - -
ব্য - থা - - র তি - ল - ক - প - রা - লে - ভা - লে - - -

৩ ○ ১ +
না ধা পা | ক্ষা পা পা | পা -া পা | ধা ধা -া | ধা -া ধা | -া নধা নপা | পা -া র্রা | -া র্সা না |
- - - - ক ত অ - ত - ল - ত - লে - র - বা - র - তা -
- - - - শু ধু ফু - টা - তে - মি - ল - ন - ক - ম - ল -

৩ ○ ১ + ৩
ধা না পধা | না ধা পা | পা -া পা | ধা পা মা | গা রা রা | -া গা মা | রা গা রা | -া -া -া | -া
সেঁ - চি - য়া - আ - নি - দে - ছে - চু - পে - চু - পে - - - -
এ - ত - ব - বি - র - হ - অ - - ন্ ত - রা - লে - - - -

○ ১ + ৩
া সা | -া সা -া | সা -া গা | -া মা -া | পা -া ধা | গা -া -া | রা -া গা | -া পা -া | ধা -া না , -া ধা -া |
- ত - ব - অ - ধ - রে - য় - হা সি - - রে - খা - র - কা - ম - না -

○ ১ + ৩
গা -া পা | -া পা -া | পা -া -া | -া ধা না | পা ধা র্সা | না ধা পা | মা গা রগা | মা গা গা |
অ - - - শ্রু - লা - - - স্তু - ধা - রা - - - - - - - হৃ দে

○ ১ + ৩
গা -া গা | পা পা -া | পা -া পা | ক্ষা ধপা গা | গা -া পা | -া ধা -া | র্সা -া না | -া নধা পা |
আ - নি - দে - ছে - ব - হিঁ - নি - তি - ন - ব - রূ - পে -

○ ১ + ৩
পা -া পা | ধা পা মা | গা রা রা | গা রগা মা | রগা -া রা | -া -া -া | -া -া
কি - ম - হো - - ত্ স - ব - ভা - রা - - - - -

প্রথম ও শেষ

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রাবস্তীপুরীর জেতবন-বিহার-সংলগ্ন অশোকারাম চিকিৎসাগারে রোগশয্যায় শয়ান আছে অচেতন মূর্চ্ছাপন্ন তরুণ শ্রেষ্ঠীকুমার প্রীতিকেতু। তার অপরিসর খট্বার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা আছে তার বৃদ্ধা মাতা প্রজাবতী আর তরুণী ভিক্ষুণী সেবাব্রতা উৎপলবর্ণা। প্রজাবতী পুত্রের শুশ্রূষাকারিণী তরুণী উৎপলবর্ণার কাছে পুত্রের ইতিহাস বল্‌ছিলো—একটা সাধারণী নগর-বনিতার জন্যই বাছার ঐ দুরবস্থা হয়েছে মা! আমার সোণার চাঁদ ছেলে—রূপে গুণে সুন্দর!—রূপ তো তুমি নিজের চোখেই দেখ্‌ছো মা! সে ছেলে-বেলা থেকে শান্ত সুশীল নম্র মধুবাক্ সদানন্দ; কিন্তু সেই নগর-নটী শতরূপা রাক্ষসীকে দেখা অবধি ওর স্বভাব একেবারে উল্টো গেলো—মেজাজ হলো খিট্‌খিটে, মুখ হলো গম্ভীর বিষণ্ণ! সে বিপণি থেকে বাড়ীতে আসে, কিন্তু পূর্ব্বের মতন দৈনিক উপার্জ্জন আমার হাতে আর

এনে দেয় না, কতো রকম যে কাল্পনিক ব্যয়ের গল্প করে তার আর ইয়ত্তা নেই। তার পর তার বিপণি থেকে বাড়ীতে ফিরতেও বিলম্ব হতে লাগ্‌লো; সন্ধ্যা থেকে রাত্রি, রাত্রি থেকে নিশীথ হতে লাগ্‌লো তার বাড়ী ফির্‌তে, আমি বাছার খাবার কোলে করে' বসে' বসে' ঝিমাই; গভীর রাত্রে সদর দরজা খোলার শব্দ পাই; কিন্তু বাছা আর আগের মতন মা বলে' কাছে আসে না, চোরের মতন চুপিচুপি পা টিপে টিপে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। আমি তার ঘরে গেলে ঘুমের ভাণ করে' চোখ বুজে পড়ে' থাকে। আমি দেখি বাছার চোখে জল, চোখ দুটি ফুলো-ফুলো—বাবা আমার কেঁদেছে! আমি ডাকলে ধড়মড়িয়ে ওঠে, চোখ কচ্‌লে' বলে—"দোকান থেকে এসে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!" সে মনে করে মাকে বুঝি মিথ্যা কথায় বোকা বুঝিয়ে দেওয়া যায়!

প্রথম প্রথম আমার সন্দেহ হতো ব্যবসায়ে বুঝি কিছু ক্ষতি হয়েছে। বিপণিতে সন্ধান নিয়ে জান্‌লাম, তেমন কিছু লোক্‌সান হয় নি; বিপণির কর্ম্মাধ্যক্ষ বল্‌লে—শ্রেষ্ঠী আগের মতন আজকাল আর কাজকর্ম্ম দেখেন না; হয় তো কোনো অসৎ-সঙ্গে মিলেছেন।

আমারও সেই সন্দেহ হলো। আমি ওকে জান্‌তে দিলাম না, কিন্তু আমি সচেতন হয়ে ওর গতিবিধি লক্ষ্য কর্‌তে লাগলাম, ওর অজ্ঞাতসারে ওর পিছনে গোয়েন্দা লাগালাম। আমি শীঘ্রই জান্‌তে পার্‌লাম সে এক ডাইনীর পাল্লায় পড়েছে—একজন সামান্যা··· থেরী তুমি, তোমার কাছে ও-পাপ নাম উচ্চারণ কর্‌তেও মুখে বাধে···নিশাচরী বারবনিতার মোহে অভিভূত হয়েছে!

সেই রমণী যদি অঘরের ভদ্রমহিলা হতো, যদি আমার ছেলের চেয়ে বয়সে বড়োও হতো অথচ তাকে ভালো-বাস্‌তো, যদি আমার ছেলে তাকে পেয়ে আমাকে আর নাও দেখ্‌তো, তা হলেও আমি ওদের দুজনের বিয়ে দিতাম নিজেই উদ্‌যোগী হয়ে। কিন্তু ডাইনীর হাতে পো সমর্পণ কর্‌তে মায়ে তো প্রাণ ধরে' পারে না!

একদিন আমি সেই পাপ-পুরীতে পাপিনীর সঙ্গে দেখা কর্‌তেও গেলাম। আমি মিনতি করে' রাক্ষসীকে বল্‌লাম—মা আমার, লক্ষ্মী আমার, বিধবার আঁচলের সোণা সবে-ধন ঐটুকু; ওকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ো না, তাকে আমারই স্নেহের ছায়ায় আমারই কোলে থাকতে দিয়ো!

ডাইনী ছুঁড়ি আমাকে অকথা কুকথা বলে' গালাগালি দিয়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে।

আমি চোখের জল মুছে মুছে পথ দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে ফিরে আস্‌ছি, সে আমাকে ফিরে ডেকে বল্‌লে—এই মাগী! আমি তোর গুণধর ছেলেকে কেড়ে নিয়েছি? বেশ করেছি কেড়ে নিয়েছি। আবার যখন খুশী হবে শাঁস-চোবা খোসার মতন ছুড়ে ফেলে দেবো, তুই কুড়িয়ে হারানিধি পেটারিকায় পুরে রাখিস!···

সেই দিনই গভীর রাত্রে বাছা আমার রাক্ষসীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বাড়ীতে ফিরে এলো, কিন্তু অচেতন রক্তা-প্লুত অবস্থায় পাল্কীতে শুয়ে! শুন্‌লাম, রাক্ষসী ডাইনী প্রীতিকেতুর কাছে টাকা চেয়েছিলো; কিন্তু সর্ব্বস্ব দিয়েও দরিদ্র রিক্ত প্রীতিকেতু রাক্ষসীর বিশ্বগ্রাসিনী ক্ষুধা মেটাতে পারে নি; এই জন্যে সেই শতরূপা আমার কথা তুলে প্রীতিকেতুর সঙ্গে ঝগড়া করে এবং তাকে বাড়ী থেকে দূর করে' দেবে বলে। প্রীতিকেতু অনেক কাকুতি-মিনতি করে; পরে অর্থ উপার্জ্জন করে' তাকে দেবে অঙ্গীকার করে; তবু মায়াবিনীর মায়া-মমতা উদ্রেক কর্‌তে পারে নি। তখন সে হতাশ হয়ে নিজের হাতে নিজের বুকে বৃহৎ ছোরা বসিয়ে দিয়ে রাক্ষসীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে; নিজের হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তার পা ধুইয়ে দিলে, তবু বজ্রকঠোরার চিত্ত আর্দ্র হলো না। সে লোক ডেকে দোলায় চাপিয়ে মরণাপন্ন বাছাকে মার কাছে ফিরিয়ে দিলে—সেই ফিরিয়ে দিলে, কিন্তু বাছাকে একেবারে শেষ করে'! আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই দারুণ দুর্দ্দৈব আমারও বুকে বজ্রের মতন বেজেছে!

মাতা প্রজাবতী সাদা থানের আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে লাগ্‌লো। থেরী উৎপলবর্ণা নিস্পন্দ অচেতন প্রীতিকেতুর মুখের উপর করুণার্দ্র স্নিগ্ধ দৃষ্টি অবনমিত করে' তাকে নিরীক্ষণ কর্‌তে লাগ্‌লো।

প্রজাবতী চোখ মুছে অশ্রুদ্রব স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—থেরী, বৈদ্য-কবিরাজেরা কি বলেন? বাছা আমার বাঁচ্‌বে তো?

যৌবনে সংসারত্যাগিনী নিরাসক্তা ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা

সন্তানের প্রতি মাতার মমতায় মুগ্ধ হয়ে কোমল করুণ স্নিগ্ধ স্বরে বল্‌লে—মা, তোমার ছেলের অবস্থা অতীব আশঙ্কাজনক। কিন্তু বৈদ্যেরা এখনো আশা ত্যাগ করেন নি। রোগী তরুণ, যৌবনের সতেজ প্রাণশক্তি তাকে সাহায্য করছে; তার সঙ্গে বৈদ্যের ভেষজ ঔষধ, আর আমাদের শুশ্রূষা যুক্ত হয়ে হয়ে তাকে সঙ্কট থেকে উত্তীর্ণ করে' দিতে পারবে বোধ হয়……

প্রজাবতী অধীর হয়ে কেঁদে ফেলে বল্‌লে—ঐ গুঁড়োটুকু ছাড়া আমার আর কেউ নেই, কিছু নেই মা! তোমার হাতে ধরে' মিনতি করছি…তুমি আমার মেয়ের বয়সী, নইলে তোমার পায়ে ধরতাম—তুমি আমার বাছাকে ফিরিয়ে দাও! পাপিয়সী ওকে মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে; তুমি পুণ্যবতী, তুমি ওকে মৃতসঞ্জীবনী অমৃত-প্রলেপ দিয়ে প্রাণ দান করো!—

উৎপলবর্ণা সুখদুঃখাতীতা বৈরাগিনী; তবু সে মায়ের দুঃখে ব্যথিত হয়ে মৃদুস্বরে বল্‌লে— তুমি বাড়ী ফিরে যাও মা। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। ভগবান্ বুদ্ধদেবের দাসী আমরা; সেবাই তো আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত! শত ভিক্ষুণী এই চিকিৎসাগারে সেবায় নিযুক্ত আছেন, মহাথেরী অভয়মাতা আমাদের কর্ম্ম নিয়মিত করেন। তোমার পুত্রের কোনো অযত্ন হবে না; তাঁকে নিরাময় করতে কোনো চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

প্রজাবতী উৎপলবর্ণার হাত ধরে' থেকেই বল্‌লে—তা জানি মা, জানি; আরো জানি যে এই চিকিৎসাগারের নাম আশোকারাম! কিন্তু তোমাকে দেখে,' তোমার সঙ্গে কথা বলে,' তোমার উপর আমার কেমন একটা মায়ার টান হয়েছে; তুমি আমার বাছাকে দেখ্‌বে, এই কথা স্বীকার করলে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী যেতে পারি।

উৎপলবর্ণা একবার প্রীতিকেতুর সুষুপ্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে' বল্‌লে—আচ্ছা তাই হবে; আমি এঁর সেবার ভার নিলাম; কায়মনোবাক্যে এঁর সেবায় আমি দিবারাত্রি নিযুক্ত থাকবো। আপনি এখন বাড়ী যান। যদি এঁর হঠাৎ জ্ঞান হয়, তা হলে আপনাকে দেখে এঁর মনে যে উত্তেজনা জন্মাবে তা এঁর দুর্ব্বল শরীরের পক্ষে সহ্য করা কঠিন হবে।…আপনি আবার কাল আসবেন…প্রত্যহই না হয় অল্পক্ষণের জন্ম এসে একবার করে' দূর থেকে দেখে যাবেন—

চিকিৎসাগারে রোগীদের আত্মীয়দের বেশীক্ষণ বিলম্ব করা নিয়ম নয়; রোগীদের ক্লেশের আশঙ্কায় কারো এখানে কোলাহল করাও নিষেধ। তাই শোকবিহ্বলা মাতা নীরবে ফুলে' ফুলে' কাঁদতে কাঁদতে দাঁতে ঠোঁটে চেপে কাতর শব্দ রোধ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে চল্‌লো—কিন্তু মায়ের প্রাণ কি মরণাপন্ন পুত্রকে পরের কাছে ফেলে যেতে যায়? সে চুপা চলে আর ফিরে ফিরে দেখে আর ফুলে' ফুলে কেঁদে ওঠে।

চিকিৎসাগার নিস্তব্ধতায় নিমগ্ন হলো। সন্ধ্যার ছায়া ঘনীভূত হয়ে আসছে। পাখীরা কোলাহল করতে করতে কুলায়ে ফিরে চলেছে। একটা পুষ্পিত নিমগাছের পল্লব-পুঞ্জের ফাঁক দিয়ে শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্রকলা দেখা যাচ্ছে। একজন ভিক্ষুণী ঘরের দেয়ালের গায়ে কোলঙ্গায় কোলঙ্গায় দীপবৃক্ষের উপর সন্ধ্যাদীপ জেলে দিয়ে গেলো। একজন ভিক্ষুণী ধুনাচীতে করে' চন্দন-কাষ্ঠের গুঁড়া মিশ্রিত ধূপ ও গুগ্‌গুলের ধোঁয়া ঘরময় বুলিয়ে বুলিয়ে বেরিয়ে চলে' গেলো। একজন বৃদ্ধা থেরী হাতজোড় করে' ঘরে প্রবেশ করে' মৃদুস্বরে বল্‌তে বল্‌তে চলে গেলো—

অচিরং বতয়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্‌সতি।
ছুদ্ধো অপেতবিঞ্ঞাণো নিরত্থং ব কলিঙ্গরং॥
কুম্ভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগরূপম্
চিত্তমিদং ঠপেত্বা।
যোজেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন জিতঞ্চ রক্‌খে
অনিবেসনো সিয়া॥

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।

অচির শরীর হায় হয়ে জ্ঞানহীন
তুচ্ছ কাষ্ঠ সম রবে ধরণী নিলীন॥
এ শরীর কুম্ভবৎ ভঙ্গুর জানিয়া
সুরক্ষিত দুর্গতুল্য চিত্ত সমাধিয়া
প্রজ্ঞায়ুধে মার সহ যুদ্ধে রহ রত,
অনাসক্ত আপনারে রক্ষিবে সতত॥
বুদ্ধের শরণ যাচি, ধর্ম্মের শরণ,
সঙ্ঘ মোরে অনুদিন করুন রক্ষণ!

ভীলের ছেলে
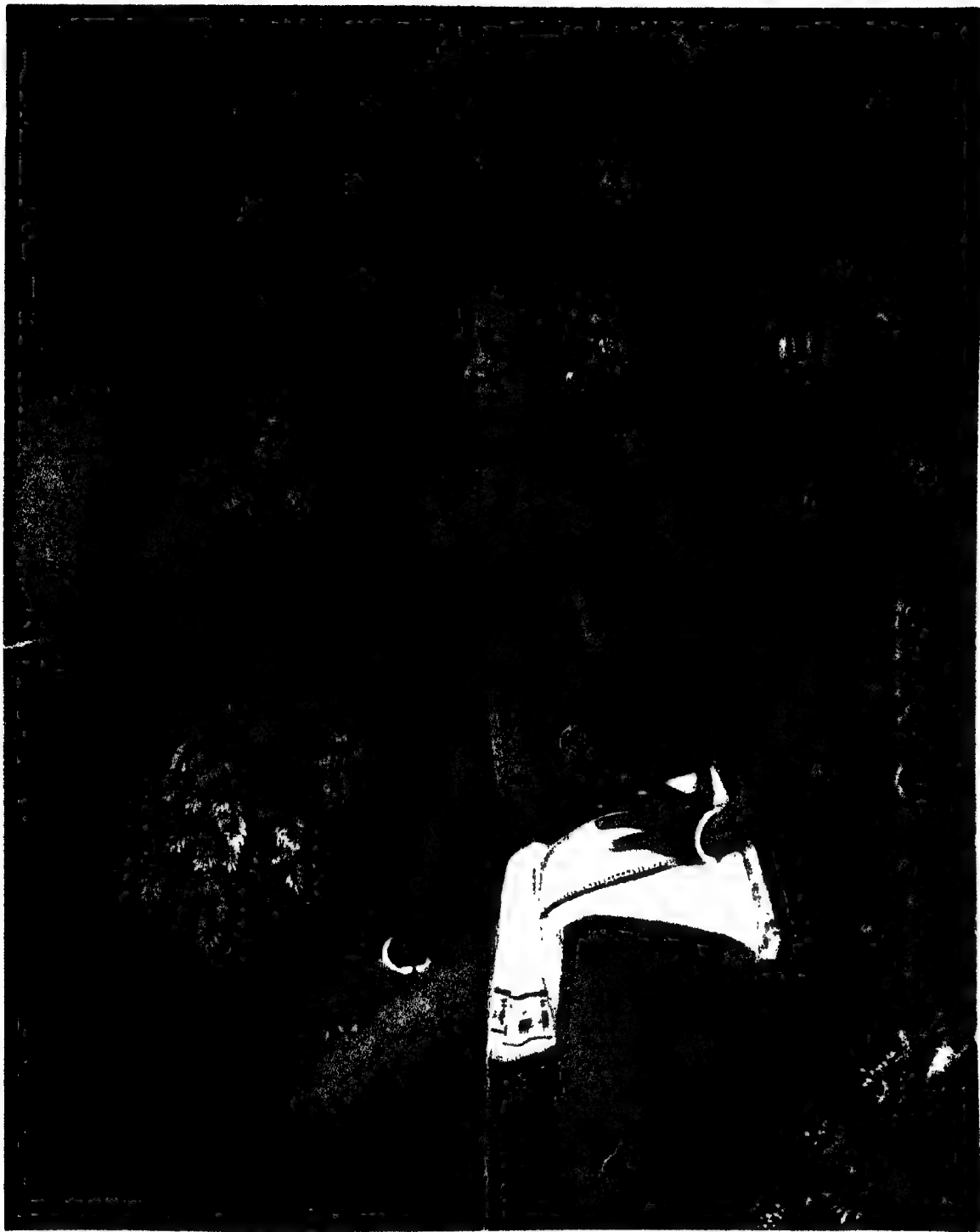
শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

আবার ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। ঘরের মধ্যে রোগীরা ছাড়া আর রইলো শুধু ভিক্ষুণী উৎপলবর্ণা। থেরী উৎপলবর্ণ ধীরে সন্তর্পণে প্রীতিকেতুর শয্যার একান্তে শিয়র-দেশে উপবেশন কর্‌লো।

উৎপলবর্ণা রূপসী তরুণী; ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা; কুমারী; সংসারে অনাসক্তা সন্ন্যাসিনী। তার চোখ দুটি স্ফটিক-গুটিকার ন্যায় স্বচ্ছ উজ্জ্বল; শিশুর দৃষ্টিতে যেমন অনভিজ্ঞ চিত্তের আশ্চর্য্যজনক বিস্ময় ও কৌতূহল ছলছল করে, তার দৃষ্টিও তেমনি সরল ও তুচ্ছ ব্যাপারকেও আশ্চর্য্য বোধে বিস্মিত। উৎপল-পর্ণের মতন তার ঠোঁট দুখানি পাত্‌লা রাঙা আর বাঁকানো; নিরন্তর ত্রিশরণ-মন্ত্র জপ করে' করে' এখনো তার ঠোঁট দুখানি কঠিন হয়ে কোমলতা পরিহার করে নি। তার মুখখানি পদ্মকোরকের মতনই আকারে ও বর্ণে; তার পিতা-মাতার রাখা নাম তার রূপের সঙ্গে অন্বর্থ হয়েছে। তার গৈরিকবর্ণের কষায়বাসের মধ্য থেকে তার দেহলাবণ্য ঢলঢল করে। তার বাক্য কোমল মধুমাখা; পীড়িত রোগীর সঙ্গে সে একটি কথা বল্‌লে কবিরাজের ভেষজের চেয়ে অধিক উপকার হয়—রোগী রোগযন্ত্রণা ভুলে' যায়, তার কণ্ঠস্বরে তারা মাতা বা ভগিনীর স্নেহ-মমতা ক্ষরিত হতে অনুভব করে।

উৎপলবর্ণা ধনবান্ গৃহপতির কন্যা। ধনবানের সুন্দরী সুশীলা কন্যার পাণিপ্রার্থী হয়ে বহু রাজা রাজপুত্র শ্রেষ্ঠী শ্রেষ্ঠীপুত্র পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর্‌ছিলো। উৎপলবর্ণার পিতা বিবেচনা কর্‌লেন এতোগুলি পাত্রের মধ্যে একটিকে নির্বাচন করে' নেওয়া কঠিন; যারা প্রত্যাখ্যাত হবে তারা শত্রু হবে, প্রার্থীদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব লাগ্‌বে; অতএব কন্যাকে চিরকুমারী রাখাই শ্রেয়। এই ভেবে তিনি কন্যাকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়ে ভিক্ষুণী সঙ্ঘে প্রেরণ করেছেন। উৎপলবর্ণা নিজের শীল ও ব্যবহার দ্বারা তথাগত বুদ্ধদেবের এক অগ্রশ্রাবিকা বলে' গণ্য ও সম্মানিতা।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় প্রীতিকেতুর চেতনা সঞ্চার হলো। উৎপলবর্ণা তখনও প্রীতিকেতুর শিয়রে বসে'। প্রীতিকেতু চক্ষু উন্মীলন করে' শরীরিণী মমতার মতন ও স্বর্গের সুষমার মতন উৎপলবর্ণাকে শয্যার উপবিষ্ট দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কথা বল্‌তে উদ্যত হলো। প্রীতিকেতুর বাক্যোদ্যম দেখেই উৎপলবর্ণা স্নিগ্ধ কোমল মধুর মৃদুস্বরে তাকে বল্‌লে—তুমি কথা ক'য়ো না; তুমি এখনো দুর্ব্বল আছো, কথা কইলে কষ্ট হবে……

প্রীতিকেতু শান্ত শিশুর মতন উৎপলবর্ণার আদেশ মান্য করে' চুপ ক'রে রইল এবং উৎপলবর্ণার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার চক্ষু নিদ্রায় মুদ্রিত হয়ে গেলো।

প্রথম প্রথম কয়েক দিন প্রীতিকেতু যখনই চেতনা পেয়ে চোখ খোলে তখনই দেখে তার শয্যাপার্শ্বে বসে' আছে সুন্দরী শ্রাবিকা মমতারূপিণী উৎপলবর্ণা। উৎপলবর্ণা প্রায় সর্ব্বক্ষণই প্রীতিকেতুর সেবায় নিযুক্ত আছে। প্রীতিকেতু চোখ খুলে দেখেই আবার চোখ মুদ্রিত করে; উৎপলবর্ণার দিকে তাকাতে তার কেমন লজ্জা-লজ্জা করে। সে নিস্পন্দ হয়ে চক্ষু বুজে পড়ে' থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ-উদ্বুদ্ধ চেতনাতে সে উৎপলবর্ণার উপস্থিতি উপলব্ধি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে কর্‌তে অতি সত্বর সচেতন হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। উৎপলবর্ণার চলা-ফেরার শব্দ কানে গেলেই তার আশঙ্কা হয় সে বুঝি তার শয্যাপার্শ্ব থেকে চলে' যাচ্ছে; কেবল তখনই সে চোখ খুলে দেখে তার আশঙ্কা অমূলক না সত্য। তার পর যখন দেখে যে উৎপলবর্ণা চলে' যাচ্ছে না, তাকেই ঔষধ-পথ্য দেবার আয়োজন কর্‌ছে, তখন তার আশঙ্কা-বিস্ফারিত চক্ষুর উপর অক্ষিপল্লব সুখাবেশে ধীরে ধীরে অবনমিত হয়ে পড়ে।

কয়েক দিন এইরূপ চুপ করে' কেবল চোখ চেয়ে দেখে দেখে একদিন প্রীতিকেতু লজ্জাকুণ্ঠিত মৃদুস্বরে উৎপলবর্ণাকে ডাক্‌লে—শ্রাবিকা……

উৎপলবর্ণা তার মুখের কাছে মুখ নত করে মৃদু কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি ভদ্র, কি বল্‌ছো?

তখন প্রীতিকেতু লজ্জিত দৃষ্টি নত করে' কুণ্ঠিত মৃদু হাস্যে সঙ্কোচ লুকাবার চেষ্টা করে' বল্‌লে—না থেরী, কিছু নয়……

সেইদিন থেকে প্রীতিকেতু প্রত্যহ দু-একবার উৎপলবর্ণাকে আহ্বান করে; কিন্তু উৎপলবর্ণা আহ্বানের কারণ জান্‌তে চাইলে সে আর কিছু বল্‌তে পারে না।

একদিন প্রাতঃকালে সদ্যস্নাতা উৎপলবর্ণা তার নিজের হাতে সঙ্ঘারামের উদ্যান হতে চয়ন-করা এক সাজি ফুল এনে প্রীতিকেতুর শয্যার চারিদিকে সজ্জিত করে' রাখ্‌ছে,

প্রীতিকেতু যেদিকে দৃষ্টিপাত করবে সেইদিকেই পুষ্পের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি বিনিময় হবে; প্রীতিকেতু চক্ষু অর্দ্ধ-উন্মীলিত করে' উৎপলবর্ণার সেবার নিষ্ঠা লক্ষ্য করতে করতে চক্ষু উন্মুক্ত করে' অথচ দৃষ্টি অপর দিকে ফিরিয়ে মৃদু কুণ্ঠিত স্বরে ডাকলে—দেবী শ্রাবিকা……

উৎপলবর্ণা এক অঞ্জলি পুষ্প তুলে এক স্থানে বিন্যাস করতে যাচ্ছিলো; প্রীতিকেতুর আহ্বানে পুষ্প-বিন্যাসে বিরত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি হাতে ধরে' তার দিকে মুখ ফিরিয়ে উৎপল-বর্ণা কোমল স্নিগ্ধ স্বরে বললে—কি ভদ্র, কি বলছো?

প্রীতিকেতু একটু ইতস্ততঃ করে' লজ্জিত দৃষ্টি অপর দিকে ফিরিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আমি এই অশোকারাম চিকিৎসাগারে আসার পর……কেউ……কোনো দিন……আমার তত্ত্ব নিতে কি এসেছিলো?

উৎপলবর্ণা উৎফুল্ল ভাবে উত্তর দিলে—আসেন বৈ কি...নিশ্চয় আসেন...তোমার মা ··রোজ আসেন···আমি তাঁকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দিই না, পাছে তোমার মনের উত্তেজনায় তোমার ক্ষতের কোনো ক্ষতি হয়; তুমি ঘুমিয়ে থাকলে তিনি চুপিচুপি এসে তোমাকে দেখে যান; তুমি জেগে থাকলে তিনি ঐ দূরের দরজার বাহির থেকে তোমাকে দেখে যান। আজকে তিনি এলে……

প্রীতিকেতু ইতস্ততঃ করতে করতে অস্ফুটস্বরে বললে—আর কেউ কি……

উৎপলবর্ণা বুঝতে পারলে এই আর-কেউটি কে। সে ব্যথিত স্বরে উত্তর দিলে—না ভদ্র, আর কেউ তো··· ··

প্রীতিকেতু প্রশ্ন করে' কুণ্ঠাকাতর উৎসুক দৃষ্টি ফিরিয়ে উৎপলবর্ণার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো; উৎপলবর্ণার উত্তর শুনে তার দৃষ্টির ঔৎসুক্য লুপ্ত হয়ে গেলো এবং উৎপলবর্ণার বাক্য সমাপ্ত হবার পূর্ব্বেই সে তার দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে।

উৎপলবর্ণা দেখতে পেলে প্রীতিকেতুর চোখের পক্ষ্ম-জালে অশ্রুবিন্দু টলটল করছে।

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর ব্যথায় ব্যথিত হয়ে মিষ্ট কোমল স্বরে বললে—তোমার চোখে জল কেনো ভদ্র? এখন তো তোমার মন খারাপ করলে চলবে না; এতে যে তোমার সুস্থ হতে বিলম্ব হবে।

প্রীতিকেতু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—আর সুস্থ হওয়া! আমি মরলেই বাঁচি··· ··

উৎপলবর্ণা মমতাপূর্ণ তিরস্কারের সঙ্গে বললে—ছি ভদ্র, মৃত্যুকামনা করতে নেই……

প্রীতিকেতু উৎপলবর্ণার মমতার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে বলতে লাগলো—বাঁচবার বাঞ্ছাই বা কিসের লোভে করবো বলো? জগৎসংসারটা এমন মমতাহীন নিষ্ঠুর নির্দ্দয়!…… তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, তুমি সংসারে অনাসক্ত, তুমি মমত্ববোধবর্জ্জিত; কিন্তু তোমার কাছে আমি যতো-খানি স্নেহ মমতা পেয়েছি, আমি যে তার শতাংশও আর কোথাও পাই নি। তাই তো আমি হতাশ হয়ে নিজের জীবন নাশ করতে গিয়েছিলাম। জীবনে ধিক্কার হয়ে গেছে। মা কিন্তু জানেন না যে আমি আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম……

উৎপলবর্ণা ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে—না, তিনি জানেন……তিনি আমাকে আগেই বলেছেন……

প্রীতিকেতুর দৃষ্টিতে বেদনা ও বিস্ময় ফুটে উঠলো, সে বললে—অ্যাঁ? মা জানেন?

উৎপলবর্ণা ব্যথিত দৃষ্টিতে প্রীতিকেতুর মুখের দিকে চেয়ে মুখ বিষণ্ণ করে' মাথা নেড়ে নীরবে তার কথার উত্তর দিলে।

প্রীতিকেতু খানিকক্ষণ চুপ করে' থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ক্লিষ্ট স্বরে বলতে লাগলো—মা তবে জানতে পেরেছেন? আহা মা আমার বড়ো হতভাগিনী··· আমি তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছি……তবু তাঁর আমার উপর বিরাগ নেই, তাঁর স্নেহের অন্ত নেই। আমি এমন বিষম ব্যথা পেয়েছিলাম যে সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম।……তোমার কাছে আমি স্নেহ মমতা পেয়েছি, তোমাকে আমার সব কথা বলতে ইচ্ছা করছে··· আমি এক রমণীকে ভালোবাসি, শুধু ভালোবাসি বললে সব বলা হয় না, তাকেই আপ্রাণদক্ষিণা দিয়ে পূজা করেছি; সে যখন আমাকে তার বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে, তখন আমার কাছে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে' যাওয়া ঢের সহজ ও শ্লাঘ্য বলে' মনে হলো।……তার জন্যই আমি আজ এখানে শয্যাগত হয়ে পড়ে' আছি, কিন্তু সে একদিনও আমাকে দেখতে আসে নি, আমি বেঁচে আছি কি মরে'

গেছি এ খোঁজটাও সে করে নি।......আমার যখন চেতনা হলো, তুমি আমার শয্যার পার্শ্বে চলা-ফেরা কর্‌তে আর আমার মনে হতো সে বুঝি এসেছে, আমি চোখ খুল্‌লেই বুঝি তার মুখ দেখ্‌তে পাবো।......সে এতোদিন যখন আসে নি, তখন আর সে আস্‌বে না ...তা না আসুকগে, আমার তাতে আর দুঃখ নেই......আমি আর তাকে ভালোবাসি না......

প্রীতিকেতু কথা বলে' ক্লান্ত হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থাম্‌লো। সে যদিও মুখে বল্‌লে যে শতরূপা তাকে দেখ্‌তে না এলেও তার আর দুঃখ নেই, সে আর তাকে ভালোবাসে না, তথাপি তার দীর্ঘনিশ্বাস পড়্‌তে শুনে ও তার মুখের কাতর ভাব ও সজল চক্ষু দেখে উৎপলবর্ণা বুঝ্‌লে যে প্রীতিকেতু অভিমানে ব্যথিত চিত্তে যা বল্‌লে তা একটুও সত্য নয়।

প্রীতিকেতু ক্ষণকাল চুপ করে' থেকে বল্‌লে—আচ্ছা শ্রাবিকা, আত্মহত্যা করা কি পাপকর্ম্ম?

উৎপলবর্ণা বল্‌তে লাগ্‌লো—মহৎ পাপকর্ম্ম ভদ্র। বিনয়পিটকে আত্মহত্যাকে গর্হিত কর্ম্ম বলা হয়েছে। আত্মহত্যাকারী ব্যক্তি অবীচি নরকে অশেষ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। ধম্মপদ সর্ব্ববিধ সংযমের প্রশংসা করেছেন—

কায়েন সংবরো সাধু, সাধু বাচায় সংবরো।
মনসা সংবরো সাধু, সাধু সব্বৎথ সংবরো॥
সব্বত্থ সংবুতো ভিক্‌খু সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি।

কায়-সংযম উত্তম, বাক্‌সংযম উত্তম, মনঃসংযম উত্তম, সর্ব্ববিধ সংযমই উত্তম; সর্ব্বপ্রকারে সংযত ব্যক্তি সর্ব্বদুঃখ থেকে পরিত্রাণ পায়। তথাগতের শ্রেষ্ঠ অনুশাসন অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ—আত্মহিংসাও তো হিংসা।

আরোগ্যা পরমা লাভা, সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং।
বিস্‌সাস পরমা ঞাতী, নিব্বাণং পরমং সুখং॥

প্রীতিকেতু ক্ষণকাল নীরব থেকে বল্‌লে—কিন্তু জীবনে যদি কোনো সুখ না থাকে, তাহলেও কি জীবন বহন কর্‌তে হবে?......ভগবান্ তো অন্তর্যামী, তিনি কি......

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর গায়ে সস্নেহে হস্তার্পণ করে' বল্‌লে—থাক থাক ভদ্র ও-সব আলোচনা। তুমি এখনো দুর্ব্বল...বৃথা চিন্তায় ক্লান্ত হয়ে পড়্‌বে......তুমি চোখ বুজে চুপ করে' শুয়ে থাকো...একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো...

প্রীতিকেতু পরম বাধ্য শিশুর মতন চোখ বুজে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌লে এবং নিদ্রিতের মতন চুপ করে' রইলো।

ভোর রাত্রে প্রীতিকেতু বড়ো আন্‌চান ছটফট কর্‌তে লাগ্‌লো, এবং কাতর শব্দ কর্‌তে লাগ্‌লো।

রাত্রি-প্রহরী সত্বর গিয়ে উৎপলবর্ণাকে সংবাদ দিলে।

উৎপলবর্ণা সত্বর শয্যা ত্যাগ করে' প্রীতিকেতুর শয্যাপার্শ্বে ছুটে এলো এবং দেখ্‌লে সে যন্ত্রণাকাতর অস্ফুট শব্দ করে' শয্যায় ছট্‌ফট কর্‌ছে। উৎপলবর্ণা তার শয্যার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার দিকে ঝুঁকে তার গায়ে স্নেহকোমল হস্তার্পণ করে' স্নিগ্ধ মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কিছু কি যন্ত্রণা হচ্ছে ভদ্র? তোমার কী অসুখ বোধ হচ্ছে?

প্রীতিকেতু চক্ষু বিস্ফারিত করে' ক্ষণকাল উৎপলবর্ণার মুখের দিকে চেয়ে রইলো; তার পর হঠাৎ হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে থেমে বল্‌তে লাগ্‌লো—শতরূপা......ধনপতি...... কিসের জন্যে......তাই তো আমি একেবারেই চলে' এলাম ......বুকের সবখানি রক্ত ঢেলে দিয়ে এলাম......খুশীই তো ...বেঁচে গেলো......পথের কাঁটা......

উৎপলবর্ণা দেখ্‌লে প্রীতিকেতু প্রলাপ বক্‌ছে, তার শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়েছে। সে প্রীতিকেতুর একখানি হাত তুলে নিজের হাতে ধরে' অপর হাতে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিতে দিতে কোমল স্বরে বল্‌লে—ভদ্র, তুমি শান্ত হও, একটু সহ্য করো। বেশী কথা বল্‌লে ক্লান্ত হয়ে পড়্‌বে, আরও শ্বাসকষ্ট বাড়্‌বে...

প্রীতিকেতু ক্লান্ত হয়েই হোক অথবা উৎপলবর্ণার স্নেহপূর্ণ আদেশে বাধ্য হয়েই হোক, সে চুপ কর্‌লো, শান্ত হয়ে রইলো, যেনো উৎপলবর্ণার স্পর্শ ও বাক্য তাকে মুগ্ধ করেছে।

কিন্তু ক্ষণকাল পরেই প্রীতিকেতু আবার প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌লো; কিন্তু এবার তার বাক্য অনেকটা সুসঙ্গত ও মৃদু—হাঁা, আমি তো স্বীকারই কর্‌ছি যে আমি তোমাকে যথেষ্ট অর্থ দিতে পার্‌ছি না......তার জন্যে তো দায়ী তুমিই ......তোমাকে ছেড়ে বিপণিতে বাণিজ্যে যেতে পারি না ......ব্যবসায়ে ক্ষতি হচ্ছে......সিন্দুক শূন্য......কিন্তু আমার প্রাণ তো এখনো প্রীতিতে পূর্ণ হয়ে আছে...... আমার প্রীতির মতন পুষ্প-উপহার তুমি চাও না?......

আগামী বৈশাখীপূর্ণিমায় আমরা নদীর তীরে বনভোজন করতে যাবো......তখন তুমি বুঝতে পারবে আমি তোমাকে কতো ভালোবাসি!......

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নিগ্ধস্বরে অনুরোধ করলে—শান্ত হও ভদ্র, শান্ত হও; বেশী কথা বোলো না, ক্লান্ত হয়ে পড়ছো ...

প্রীতিকেতু উৎপলবর্ণার কথা শুনে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকে উঠে চোখ মেলে উৎপলবর্ণার দিকে তাকালো; তার দৃষ্টি থেকে যেনো বিস্ময় কৌতূহল ও প্রীতি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো; সে স্নিগ্ধ স্বরে বলতে লাগলো—তুমি এসেছো!... তোমাকে আমি ভালোবাসি......ভালোবাসি ...বড়ো ভালোবাসি......আমার প্রীতিকেতু নাম সার্থক হয়েছে তোমাকে ভালোবেসে......তুমি সুন্দর!......তোমার নাম সুন্দর......তোমার বেশ সুন্দর..... তোমার দৃষ্টি সুন্দর... ...বাক্য সুন্দর... ...তুমি সুন্দর!......তোমার অঙ্গে পদ্ম-সুরভি......তোমার নিশ্বাসে পুষ্প-সুবাস!......

প্রীতিকেতুর প্রলাপ প্রণয়ের স্তুতির মতন কোমল সুন্দর ভাবাবেগে ভরে' উঠলো, তার স্বর গাঢ় গদ্গদ হয়ে পড়লো।

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর কথা শুনতে শুনতে অনিচ্ছাতেও লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো, তার স্নেহকোমল দৃষ্টিতে চিন্তাকাতরতা ফুটে উঠলো, সে তাড়াতাড়ি প্রীতিকেতুর শয্যাপার্শ্বে বসে' মৃদু মধুর স্বরে প্রার্থনা করতে লাগলো—

তং বো বদামি ভদ্দং বো যাবন্তেত্থ সমাগতা। তোমরা যারা এখানে সমাগত হয়েছো তাদের সকলের কল্যাণ হোক!—নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স—সেই ভগবান্ অর্হৎ সম্যক্-সম্বুদ্ধকে নমস্কার করি!......

উৎপলবর্ণার এই প্রার্থনার ভিতর থেকে মৈত্রী ও কল্যাণ যেনো ক্ষরিত হয়ে প্রীতিকেতুর অঙ্গে বর্ষিত হলো।

কিন্তু উৎপলবর্ণাকে প্রার্থনা করতে শুনে প্রীতিকেতু অত্যন্ত অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠে বসতে গেলো। উৎপলবর্ণা তাকে দুই হাতে তাড়াতাড়ি ধরে' সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে ডাকলে—ভদ্র......

প্রীতিকেতু চক্ষু বিস্ফারিত করে' হাঁপাতে হাঁপাতে তাড়াতাড়ি স্খলিতবচনে বলতে লাগলো—আমাকে তুমি দূর করে' দিচ্ছো!..... তোমার কাছে আর আমাকে থাকতে দেবে না!......তোমায় আর কখনো দেখতে পাবো না?... আমার এই আপ্রাণদক্ষিণা পূজা অবহেলা করে' যাবে?...

প্রীতিকেতুর ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে, তার কথা এড়িয়ে এসেছে, সে হাঁপাচ্ছে।

উৎপলবর্ণা তাড়াতাড়ি একটা প্রদীপ হাতে তুলে প্রীতিকেতুর মুখের কাছে ধরে' দেখলে প্রীতিকেতুর সুন্দর মুখের উজ্জ্বল বর্ণ ফেকাশে রক্তশূন্য হয়ে গেছে, তার চোখ ঘোলা ও দৃষ্টি স্থির হয়ে এসেছে, চোখের কোলে কালী মেড়ে দিয়েছে, ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেছে, আর কপালের দুপাশের রগ বসে' গেছে, তার কপাল ও চুল ঘামে ভিজে উঠেছে, তার নাসারন্ধ্র স্ফুরিত হচ্ছে, এবং এক-একটা নিশ্বাসের টানে তার সর্ব্বাঙ্গ যেনো তার বুকের মধ্যে ঢুকে যেতে চাচ্ছে। হায়! এই জীবন-মৃত্যুর দ্বন্দ্বের লক্ষণ চিকিৎসাগারের অগ্রসেবিকা উৎপলবর্ণার তো বিলক্ষণই জানা আছে! সে তাড়াতাড়ি প্রীতিকেতুর নাড়ী ধরে' দেখলে, নাড়ী অতি ক্ষীণ, থেমে থেমে চলছে, তার হাত হিমশীতল স্বেদসিক্ত। উৎপলবর্ণা অতি মৃদু স্বরে রাত্রি-প্রহরীকে বললে—চট্ করে' নিশাবৈদ্যকে ডেকে আনো......যাও, যাও,......চট করে' ......মহাস্থবির সুগত ভিক্ষুকেও সংবাদ দিয়া......মুমূর্ষুর পাপদেশনা শ্রবণ করবেন .....

রাত্রি-প্রহরী নিঃশব্দ দ্রুতপদে ঘর থেকে বাহির হয়ে গেলো।

উৎপলবর্ণা প্রীতিকেতুর শয্যাপার্শ্বে জানু পেতে বসে' মৃদু স্বরে প্রার্থনা করতে লাগলো—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি! নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স!......

প্রীতিকেতু উৎপলবর্ণার প্রার্থনারত যুক্তকর দুই হাতে চেপে ধরে' বলতে লাগলো—কিন্তু এখন তার বাক্য যেনো বহুদূরস্থ পরলোক থেকে ভেসে আসছে, অথচ সে যেনো এই শেষ মুহূর্ত্তে তার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত বাসনার আবেগ প্রকাশ করছে, এমনি ভাবে সে বলতে লাগলো—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিও না......তোমাকে আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিলাম, আর তুমি কি চাও?......তুমি আমাকে ছেড়ে গেলে আমার প্রাণও আমায় ছেড়ে যাবে..... তুমি আমার প্রাণের প্রাণ......তুমি আমার দ্বিতীয় জীবন ..... তুমি আমার প্রিয়া...প্রেয়সী...প্রিয়তমা...

প্রীতিকেতু বালিশ থেকে মাথা নামিয়ে উৎপলবর্ণার হাতের উপর মাথা দিয়ে শুলো; উৎপলবর্ণার প্রার্থনানত মুখ প্রীতিকেতুর মস্তক স্পর্শ করলো, যেনো সে প্রীতিকেতুর শিরশ্চুম্বন করছে, তার ঘন নিশ্বাস প্রীতিকেতুর মাথায় পুষ্পসুরভির মতন বর্ষিত হতে লাগ্‌লো।

হঠাৎ পুষ্পকেতু মাথা ঘুরিয়ে উৎপলবর্ণার মুখের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে' উঠ্‌লো—প্রিয়া……প্রেয়সী…প্রিয়তমা…

উৎপলবর্ণার প্রার্থনানত চক্ষুর পক্ষ্মজাল প্রীতিকেতুর ললাট স্পর্শ করে' প্রজাপতির পক্ষের মতন ঘন ঘন কম্পিত হতে লাগ্‌লো।

প্রীতিকেতু উৎপলবর্ণার প্রার্থনাস্ফুরিত অধর চুম্বন করবার জন্য মাথা উঁচু করে' তুল্‌লে।

উৎপলবর্ণা চম্‌কে উঠ্‌লো, সে উঠে দাঁড়াতে গেলো।

কিন্তু প্রীতিকেতু দুই হাত তুলে উৎপলবর্ণার কণ্ঠ আলিঙ্গন করে' ধর্‌লে; সে মরণমুহূর্ত্তের সংজ্ঞাহারা অবস্থায় পরকালের কল্পলোকে উপনীত হয়ে মিনতির স্বরে বললে—ওগো, তুমি যেও না,……তোমাকে আমি ভালোবাসি……তুমি সুন্দর!……তুমি প্রিয়তমা!……

মুমূর্ষুর আকর্ষণে উৎপলবর্ণার মুখ নত হয়ে পড়্‌লো; সে চক্ষু মুদ্রিত কর্‌লে। প্রীতিকেতু সমস্ত জীবনের সঞ্চিত তৃষ্ণা মৃত্যুমুহূর্ত্তে মিটিয়ে নেবার আগ্রহে উৎপলবর্ণার পদ্মপর্ণ তুল্য অধরে গভীর দীর্ঘ নিঃশব্দ চুম্বনে নিজের ওষ্ঠাধর মুদ্রিত কর্‌লে……এ সেই সুদুর্লভ চুম্বন যে চুম্বনের গভীর সুখাবেশে দুটি প্রাণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ও নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে নিমজ্জিত মগ্ন হয়ে যায়! গণিকার উদ্দেশে নিবেদিত চুম্বন অগ্রশ্রাবিকার অধরে মুদ্রিত হলো! প্রীতিকেতুর শেষ চুম্বন উৎপলবর্ণার প্রথম ও শেষ চুম্বনে সম্মিলিত হলো! পাপিয়সীর স্পর্শকলুষিত প্রীতিকেতুর অধর পুণ্যশীলা উৎপলবর্ণার অধর-তীর্থে অবগাহন করে' ধন্য হলো! উৎপলবর্ণার ওষ্ঠাধর এক-বার কম্পিত হয়ে স্ফুরিত হলো—কিন্তু তা প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চা-রণে অথবা প্রণয়-প্রতিবেদনে তা তার অন্তর্যামী জানেন!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে জেতবন-বিহারের বৃক্ষে বৃক্ষে শত শত পক্ষী উষালোকে জাগ্রত হয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো, উষাকালের স্নিগ্ধ মৃদুল বায়ুর স্পর্শ পেয়ে বনলক্ষ্মীর অশ্রুবিন্দুর মতন শেফালিকা-ফুল ঝরে' পড়্‌লো; থেরী অভয়মাতা ও তাঁর বাল্যসঙ্গিনী সহযোগিনী অভয়া প্রীতিকেতুর কক্ষের দিকে আস্‌তে আস্‌তে মৃদু গুঞ্জনে সমস্বরে উচ্চারণ কর্‌ছিলেন—

> অভয়ে ভিদুরো কায়ো, যথ সত্তা পুথুজ্জনা।
> নিক্‌খিপিস্‌সামিমং দেহং সম্পাজানা সতীমতী॥
> বহুহি দুক্‌খধম্মেহি অপ্‌পমাদ-রতায় মে।
> তনহ-ক্‌খয়ো অনুপ্‌পত্তো কতং বুদ্ধস্‌স সাসনং॥

এই শরীর ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর, তবু একে জগতের লোক সৎ ও সার বস্তু বলে' মনে করে; আমি এই দেহের সহিত সমস্ত মমত্ব বিসর্জ্জন করে' সত্যের শরণাপন্ন হই; বহু-দুঃখনিকেতন প্রমাদ-পথভ্রষ্ট আমার, বুদ্ধের শাসনে তৃষ্ণাক্ষয় হোক, অপ্রমাদে রত হয়ে সংসারদুঃখ দূর হোক!

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বিবাহ ও সমাজ-প্রসঙ্গ

শ্রীচারুচন্দ্র মিত্র বি-এ, এটর্ণি-এট্-ল

"ভারতবর্ষে"র বিগত পৌষ সংখ্যায় "বিবাহ ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে—যাবৎ স্ত্রীপুত্রাদিকে সম্যক প্রতিপালন করিবার ক্ষমতা না হয় তাবৎ বিবাহ করা উচিত নয়—এই মতবাদ আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইলে, আমাদের সমাজের কত ভয়ানক অনিষ্ট হইবে এবং আমাদের অস্তিত্বই লোপ পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা কতক পরিমাণে দেখাইয়াছি। এই মতবাদ প্রবর্ত্তিত হইলে আর কত প্রকার অমঙ্গল হইবে তাহা দেখানই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, আমাদের ভিতর কত অল্প সংখ্যক লোক আছে, যাহারা স্ত্রীপুত্রকন্যাদিকে সম্যক প্রতিপালন করিতে সমর্থ। সুতরাং অতি অল্প সংখ্যক লোকই যৌবনারম্ভে বিবাহ করিতে অনুমতি পাইতে পারে। শতকরা নব্বই জনের অধিককেই ভাল সময়ের আশায় বহুদিবস কাটাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে বেশ বেশী বয়সে বিবাহ করিতে হইবে। বেশীর ভাগ পুরুষ যদি বেশী বয়সে বিবাহ করে, তার বেশীর ভাগ স্ত্রীলোক অনেককাল অবিবাহিত থাকিবে। বেশী বয়সে বিবাহ করিতে হইলে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে হয়। আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের অনেকেই

মনে করেন যে, এইরূপে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিলে, বিবাহিত জীবনে সুখ ও শান্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী ; এবং এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াই বাঞ্ছিত সংস্কার। এই প্রথা প্রথম দৃষ্টিতে ভাল বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু বিলাতী-সমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ মকদ্দমার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া তাহার ফল কার্য্যতঃ ভাল হয় না বলিয়া প্রমাণিত হয় ; এবং অনুধাবন করিয়া দেখিলে, এইরূপ প্রথার ফল কার্য্যতঃ ভাল না হওয়ার কতকগুলি নৈসর্গিক কারণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

বিবাহার্থ পছন্দ করিতে হইলে দেখিতে হয় যে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পর সহায়শীল ও প্রীতিপ্রদ হইয়া আজীবন ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারিবে কি না। এইটি পূর্ব্ব হইতে জানা নানা কারণে প্রায় দুঃসাধ্য। প্রথমতঃ আমি নিজেই নির্দ্দেশ করিতে পারি না, কি কি গুণ থাকিলে আর একজনের সহিত বহুদিন পরস্পর সহায়শীল ও প্রীতিপ্রদ হইয়া ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ যদি বা নির্দ্দেশ করিতে পারি, সেগুলির একত্র সমাবেশ প্রায় দেখিতে পাইব না। তৃতীয়তঃ, যদি বা মনে করি যে, কোথাও সেই সকল গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছে, হয় তো সে আমাকে চাহিবে না। আমি তো তিলোত্তমার মত সুন্দরী, রম্ভার মতন নৃত্যগীত-পারদর্শিনী, সরস্বতীর মত পণ্ডিতা, লক্ষ্মীর মতন বিভবসম্পন্না, সাবিত্রীর মত পতিপরায়ণা স্ত্রী চাহিতে পারি ; কিন্তু সেরূপ স্ত্রীলোক পাই বা কোথায় ? আর যদি বা কোথাও পাই, মনে করি, সে আমাকে চাহিবে কেন ? এইরূপ অনেক গুণ চাহিয়া এবং না পাইয়া ক্রমে নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা অনেক কমাইয়া লইতে হয়। কমাইয়া, আমার পক্ষে সুবিধাজনক কতকগুলি গুণের সমাবেশ, যাহা মনে করি পাওয়া যাইতে পারে, সেইগুলির উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। সেই গুণগুলির ভিতর কতকগুলি প্রকাশ্য ; যথা, রূপ, সঙ্গীত-বিদ্যা, অর্থস্বচ্ছলতা ইত্যাদি ; আর কতক অপ্রকাশিত মানসিক গুণ, যাহা কার্য্য দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। যাঁহারা কিছুদিন বিবাহিত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, প্রকাশ্য গুণগুলির উপর বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি অতি অল্পই নির্ভর করে। এই সকল গুণের নিজে হইতে বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি দিবার ক্ষমতা অতি সামান্য। সেই কার্য্য দেখিয়া অনুমেয় মানসিক গুণগুলি থাকিলে প্রকাশ্য গুণগুলি বিবাহিত জীবনের সুখ ও শান্তি বাড়াইতে পারে। কিন্তু নিজে বড় বেশী কিছু দিতে পারে না। অঙ্কশাস্ত্রে শূন্যের মত অন্য কোন সংখ্যাবাচক অঙ্কের পশ্চাতে থাকিলে তবে তাহার মূল্য আছে ; নচেৎ কোন মূল্যই নাই। সেই মানসিক গুণগুলি কার্য্য দেখিয়া অনুমান করিয়া লইতে হয়। এইরূপ কার্য্য দেখিয়া চরিত্র অনুমান করা বড় শক্ত কাজ ; ইহাতে সকলেরই ভুল হয়—অতি অল্প লোকেই তাহা ভালরূপে করিতে পারে। দুঃসাধ্য যে অনুমান-ক্রিয়া আছে, তাহাও আবার অনেক কারণে আচ্ছাদিত হয়। প্রথমটি কামজ মোহ। যৌবনারম্ভ হইতে কামজ মোহের আকর্ষণ প্রকৃতির নিয়মে মধ্যে মধ্যে বিশেষভাবে দেখা দিবে। তখন যাহার দ্বারা সে আকৃষ্ট হইবে, তাহার কোন ত্রুটিই নয়নগোচর হইবে না—তাহাকে সর্ব্বগুণের আকর বলিয়া মনে হইবে ; সুতরাং ভুল হইবার সম্ভাবনা বাড়িয়া যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, বয়স বাড়িয়া গেলে, আমাদের আসল প্রকৃতি কিরূপ, তাহা আমাদের বাহিরের কার্য্যে ও বাক্যে সরলভাবে প্রকাশ পায় না—ভিতরের অনেক ভাব অপ্রকাশিত থাকে। সাংসারিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত আমাদের আটপৌরে ও পোষাকী কাপড়ের মত, আমাদের আটপৌরে ও পোষাকী প্রকৃতিও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। যখন যেরূপ সমাজে থাকি তাহাদের অনুরূপ কথাই বলি, না হয়, চুপ করিয়া যাই। বিশেষ প্রতিকূল কথা বলাটা একরূপ সভ্যনীতিবিরুদ্ধ। আমাদের প্রকৃতিতে যে সকল দোষ আছে, তাহা চেষ্টা করিয়া সমাজে গোপন করি। যদি কেহ কাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে বা তাহাকে পাইলে তাহার সুবিধা হইবে বিবেচনা করে,—সে যেরূপ চায়, সেইরূপ নিজেকে দেখাইতে চেষ্টা করে। তাহার নিমিত্ত অপরের মনে অনেক স্থলেই ভুল ধারণা হয়। তৃতীয়তঃ বয়সাধিক্যের সহিত জীবনের উপর কাহারও কাছে অর্থের, কাহারও কাছে সামাজিক প্রতিপত্তি পাওয়ার, প্রভাব বাড়িয়া যায়। যাহার অর্থস্বচ্ছলতা আছে বা যাহার দ্বারা সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ করা যাইতে পারে মনে হয়, তাহার শত দোষ ও ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্তি আসে। যে সকল গুণ থাকা বাঞ্ছিত মনে হইয়াছিল, তাহা না থাকা সত্ত্বেও তাহাকে পাইতে ইচ্ছা আসে ; এবং অনেকেই সে ইচ্ছা করিয়া বসে। ইহার প্রভাব বয়স্থা যুবতীদিগের উপর অত্যন্ত অধিক হয়। তাহার অনেক কারণ আছে। বেশী বয়সে নিজে নিজে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিতে হইলে, যেরূপ স্থানে নানা লোকের সমাগম হয়, যেখানে তাহারা মেলামেশা করিতে পারে, এরূপ স্থানে উত্তম উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া যাইতে হয়। যাহাদিগকে পছন্দ-সই মনে করা হয়, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হয়। এই সকলই ব্যয়-সাপেক্ষ। পিতামাতারা বেশী অর্থস্বচ্ছলতা না থাকিলে উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উঠেন ও কন্যাদিগকে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলেন। এ দিকে ওইরূপ সাজসজ্জা করিয়া নানা লোক-সমাগমস্থলে গিয়া অন্য স্ত্রীলোকদিগের বিলাস-বৈচিত্র্য দেখিয়া এবং পুরুষদের উপর বিলাস-বৈচিত্র্যের প্রভাব দেখিয়া তাহাদেরও ওইরূপ পাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। যাহার তাহাকে মনোমত বিলাস-সামগ্রী দিবার ক্ষমতা নাই, তাহার হৃদয়-আকর্ষণকারী অত্যন্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও তাহার সহিত বিবাহিত হইতে মন উঠে না। অর্থের মোহ প্রবল হয়—মনের দিকের দিকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়—হৃদয়ের আবেগ রুদ্ধ করা হয়। কিছুদিন ধরিয়া হৃদয়-আবেগ রুদ্ধ করার ফলে হৃদয়ই শুষ্ক হইয়া আসে—প্রকৃত প্রেমের আকর্ষণই মন্দীভূত হইয়া আসে—নিজেকে বিলাইয়া দিবার ক্ষমতাটাই লোপ পায়। যে নিজেকে বিলাইয়া দিতে না পারে, সে কখন প্রেমের আস্বাদন পাইতে পারে না ; তাহার স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিতে পারে না। বিবাহটা একটা পরস্পরের সুবিধা দেখিয়া কেনাবেচার ব্যাপারে পরিণত হয়। তাহারা প্রধানতঃ কি চায়—রূপ চায়,

কি অর্থ চায়, কি সামাজিক সুবিধা চায়—তাহা অপর পক্ষ কি পরিমাণে দিতে পারে তাহা খতাইয়া দেখিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইতে হয়। অর্থাৎ এই বিবাহে তাহার কিরূপ সুবিধা হইবে, সেইদিকে লক্ষ্য থাকে—সেই হিসাব করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। এইরূপ হিসাব কিতাব করিয়া প্রেম হয় না—আত্মদানই প্রেমের অন্তরঙ্গ লক্ষণ। যাহার পাওনার দিকে লক্ষ্য, তাহার প্রেম পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু পৃথিবীর সহিত সংঘর্ষণে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত এইরূপ নিজের সুবিধা দেখিয়া কার্য্য করাটাই তখন অভ্যস্ত হইয়া যায়। সেইরূপ যেখানে পাওয়া যাইতে পারে—তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে দিন কাটিয়া যায়। এক দিকে পিতামাতার উদ্‌ব্যস্তভাব—অন্য দিকে প্রকৃতির তাড়না আছে—কাম চরিতার্থ করিতে গেলে গর্ভ হইবার ভয় ও অবমাননা আছে। তাই যখন কোন অর্থস্বচ্ছল প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি পাণিপ্রার্থী হয়, তখন তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে অধিকাংশ স্ত্রীলোকই পারে না—তাহার মাতা বা অন্য শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরাও প্রত্যাখ্যান করিতে দেয় না—তাহার শত ত্রুটি মার্জ্জনা করিতে একরূপ বাধ্য হয়। এই সকল দেখিয়াই মহাত্মা Tolstoy সাহেব লিখিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য দেশে স্ত্রীলোকেরা ক্রীতদাসীরই ন্যায় বিক্রীত হয়। তাহাদিগকে পুরুষ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া থাকিতে হয় (see Kreutzer Sonata)। পছন্দ করিয়া বিবাহটা কাগজে কলমেই আছে—অধিক স্থলেই প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হইতে পায় না। এইরূপে নিজের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া হৃদয়ের আবেগ ও আকর্ষণ রুদ্ধ করিয়া যখন তাঁহারা বিবাহিত হয়েন এবং বিবাহিত জীবনে পরস্পর একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে হয়, তখন অল্প দিনের মধ্যেই নানারূপ সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ক্রমে তাহা প্রবল কলহে পরিণত হয়—পরস্পর পরস্পরকে ঠকাইয়াছে এইরূপ মনে হয়। মনে মনে আপশোষ উপস্থিত হয়। অন্য যাহাদের প্রতি আকর্ষণ আসিয়াছিল, প্রতিক্রিয়ার ফলে হৃদয় সেইদিকেই ধাবিত হয়। অনেকস্থলে বিবাহ-বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। না হয় লোক-সমাজে পরস্পর মৌখিক ভদ্রতা রাখিয়া ভিতরে পৃথকভাবে থাকিয়া অন্যত্র সুখের আশায় ফিরিতে হয়। অল্পসংখ্যক যাহারা ওইরূপ ভাবে পার্থিব সুবিধার নিমিত্ত হৃদয়কে বলি দিতে প্রস্তুত হয় না, তাহাদের অনেকেরই মনের মতন লোক খুঁজিতে খুঁজিতে দিন কাটিয়া যায়—অনেকেরই যৌবন কাটিয়া যায়—কাহারও বা জীবন কাটিয়া যায়। যাহাদের মনের মানুষ মিলিল বলিয়া বোধ হইল, তাহাদের হয় তো অনেকের বিবাহে নানারূপ প্রতিবন্ধক আসিয়া জোটে। নাটক নভেলে সেইরূপ প্রেমিক প্রেমিকার কথাই বেশীর ভাগ লিখিত হয়। কিন্তু বাস্তব জগতে নাটক নভেলের মত অদ্ভুত অদ্ভুত উপায়ে সেই সকল প্রতিবন্ধক অনেকেরই কাটিয়া যায় না—মিলনের পরও কাল্পনিক স্বর্গীয় সুখে জীবন কাটিয়া যায় না। আশায় আশায় বহুকাল হা হুতাশ করিয়া কাটিয়া যায়। সেই বিচ্ছেদের সময় নায়ক নায়িকাদের হৃদয় বিদারণকারী দুঃখ কষ্ট বহু নাটক নভেলেই বর্ণিত আছে,—সেই দুঃখ কষ্ট ভোগটা অনেকের ভাগ্যে ঘটে; কিন্তু তাহার পর মিলনের স্বর্গীয় সুখের যে আভাষ দিয়াই গ্রন্থকারেরা ক্ষান্ত হন—বর্ণনা করিতে সাহস পান না—সেরূপ সুখ পৃথিবীতে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়াই তাহার বর্ণনা করাটা বড় শক্ত ব্যাপার। সেই সুখ অতি অল্প লোকেরই ভাগ্যে ঘটে। বহুকাল বিচ্ছেদের ভিতর তাহাদের অনেকের মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে—হয় তো তাহাদের একজন অন্য আকর্ষণে পতিত হন—অপরের হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া সরিয়া পড়েন। যদি বা কোথাও বিবাহ সংঘটিত হয়, তাহাতেও যে তাঁহারা তাহার পর চিরকালের জন্য সুখসাগরে ভাসেন তাহাও বলা যায় না। এতকাল পরস্পর পরস্পরকে একটা কাল্পনিক উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছিলেন। এখন দীর্ঘকাল ব্যবধানে বিবাহিত জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে গিয়া দেখিতে পান তাঁহারা উভয়েই রক্ত মাংসে গঠিত—তাঁহাদেরও অনেক দোষ আছে। তখন তাঁহারা কল্পনার রাজত্বের কমনীয়তা হইতে বাস্তব জগতের কঠোরতায় উপস্থিত হয়েন। তাঁহাদেরও বিবাহিত জীবনাকাশ ভাদ্রের আকাশের মত,—সচরাচর লোকেদের মত, কখনও বা শুভ্র প্রেমালোকে উদ্ভাসিত, কখন বা কালমেঘাচ্ছাদিত হয়।

পুরুষরা, যাবৎ মনের মতন অর্থস্বচ্ছলতা না আসে তাবৎ বিবাহ না করিলে, তাহাকে অনেকস্থলেই যেখানে তাহার হৃদয়ের আকর্ষণ হইবে সেখান হইতে হয় দূরে দূরে থাকিতে হইবে, না হয় তাহার সহিত বিবাহিত না হইয়াও সঙ্গত হইতে হইবে—না হয় বিবাহের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া ভাল সময়ের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে। শেষোক্ত প্রকার কার্য্য করিলে তাহার ফল কিরূপ হয় তাহা বলা হইল। যদি বিবাহ না করিয়াই পরস্পর সঙ্গত হয় তাহার ফল জারজ সন্তান এবং তাহার ভোগ ভুগিতে সেই স্ত্রীলোকদিগকেই হয়। George Bernard Shaw যথার্থই লিখিয়াছেন যে, এখনও কোন লোক জন্মায় নাই যাহাকে সম্পূর্ণভাবে দেখিতে পাইলে তাহাকে পূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারা যায়। সকলেরই কিছু না কিছু দোষ আছে। সুতরাং যখন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে গিয়া কামজ রঙীন প্রলেপ খসিয়া উঠিয়া যায়—কাম চরিতার্থ হওয়ার ফলে প্রকৃতিগত প্রতিক্রিয়া আসে, তখন অনেক স্থলেই সামান্য কারণে কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়—সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং বিবাহের বাঁধন না থাকায় ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। আর যাঁহারা দূরে দূরে থাকেন, তাঁহাদিগকে হৃদয়ের আবেগ চাপিতে হয়—চাপিয়া চাপিয়া হৃদয়ই সঙ্কুচিত, শুষ্ক হইয়া আসে—ভালবাসিবার ক্ষমতাই নষ্ট হইয়া যায়—যৌবন অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে না। যৌবনই উপভোগের সময়। যাহা যৌবনে পাইলে সোচ্ছ্বাস সুখভোগ হয়, তাহা অধিক বয়সে পাইলে তাহার সামান্য অংশও হয় না। এই অবিসম্বাদী সত্যটা মনে রাখিলে দেখিবেন যে অর্থস্বচ্ছলতার নিমিত্ত অপেক্ষা করিলে জীবনের প্রধান উপভোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন—ইহা যে কত বড় ঠকা তাহা বলা যায় না। তাহার পর যখন অর্থস্বচ্ছলতা আসিল, তখন বহুকাল একা একা

থাকার ফলে জীবন একটা অপরিবর্ত্তনীয় অভ্যাসগ্রস্ত—অনেক সময় বেশ্যাসক্তি নিমিত্ত যৌনব্যাধিগ্রস্ত। তখন বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহারা দেখিতে পান যে, যাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা হয় তো ইতিমধ্যে বিবাহিত হইয়াছেন—নয় তো বহু পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছেন। তখন সেই অর্থস্বচ্ছল ব্যক্তি অনেক স্থলেই কোন ভোগ-লালসাপরায়ণা চমকপ্রদ গুণসম্পন্না খেলওয়াড় স্ত্রীলোকের মোহাবর্ত্তে পড়েন। যে সমাজে বহুলোক বহুকাল পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে, সেখানে এরূপ খেলওয়াড় স্ত্রীলোকও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের মত ন তাহারা বারবনিতাদের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। দুই জনেই অর্থদেবতার নিকট হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি বলি দিয়া আসিয়াছে। অপর কেহ হয় তো তাহাদের হৃদয় দগ্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এ অবস্থায় বিবাহ করিয়া সুখী হওয়ার প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। যদি বা কেহ ওইরূপ ফাঁদে না পড়ে, তাহা হইলেও তাহাদের বহুকাল একা একা থাকার ফলে একা থাকাটাই অভ্যস্ত হইয়া যাওয়ায়—বিবাহিত জীবনে ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে হইলে যে পরস্পরের সুবিধার নিমিত্ত সর্ব্বদা নিজেদের ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, সেটা বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। অর্থস্বচ্ছলতা থাকার নিমিত্তই স্ত্রীলোকদিগকে সাংসারিক কর্ম্মে বেশী ব্যাপৃত থাকিতে হয় না; সুতরাং পরস্পর সাহচর্য্যে অধিক সময় কাটাইতে হয়; নূতনত্বের আকর্ষণ শীঘ্রই কাটিয়া যায়; অধিক মেশামেশির ফলে পরস্পরের সঙ্গ বিরক্তিকর হইয়া উঠে—পরস্পরের মনের গতির ও স্বভাবের পার্থক্যের দিকে দৃষ্টিপাত হয়; সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়; ক্রমে তাহা কলহে পরিণত হয়। তাই কোন কোন স্থলে Honeymoon যাইতে না যাইতেই তাঁহারা পৃথক হইয়া যান দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ ঘনিষ্ঠভাবে থাকায় যে আন্তরিক বিরক্তি আসে, তাহা চাপা দিবার নিমিত্ত নানারূপ খেলা, আমোদ, নাচ, নাট্যশালা, বায়স্কোপ প্রভৃতি স্থানে গিয়া সময় অতিবাহিত করিবার চেষ্টা পাইতে হয়। এদিকে এইরূপ আমোদ স্থলে যাইতে হইলে স্ত্রীদের নূতন নূতন পোষাক ও আনুষঙ্গিক খরচের নিমিত্ত পুরুষরা ক্রমে উত্যক্ত হইয়া উঠেন। পুরুষদের অন্য নানারূপ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়—সকল সময়ে স্ত্রীদের সহিত যোগ দেওয়া সম্ভবপর হইয়া উঠে না। স্ত্রীরা কার্য্যাভাবে নানারূপ আমোদে সময় অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়। ক্রমে স্ত্রীদের এই আমোদপ্রিয়তা পুরুষদের বিরক্তিকর হইয়া উঠে। চরিত্রে সন্দিগ্ধতাও আসে। স্ত্রীপুরুষদের অবাধ মেশামিশি ও আমোদপ্রিয়তা হইতেই প্রলোভন আসে ও পদস্খলন হয়। অনেক সময়ে তাহার পরিণাম বিবাহ বিচ্ছেদ আদালতের আশ্রয় গ্রহণ। ইহাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে দেখা যাইতেছে।

যৌবনের আরম্ভ হইতেই স্ত্রীপুরুষদের ভিতর আকর্ষণ আরম্ভ হয়। তন্মধ্যে কাহার কাহারও মধ্যে আকর্ষণটা প্রগাঢ় হয়। এক জন আর এক জনের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইল; কিন্তু সে হয় তো তাহার প্রতি সেরূপ আকৃষ্ট হইল না—তাহাকে পাইবার আশায় ও চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। তাহার পর ব্যর্থ চেষ্টায় উপেক্ষিতের অবমাননায় ভার বহন করিতে হয়। এইরূপে কত স্ত্রীপুরুষের জীবন বিষময় হইয়া যায় তাহার সংখ্যা কে করে? অনেক বিলাতী উপন্যাসেই এই আখ্যায়িকা দেখা যায়। তাহা হইতে অনুমান হয় এরূপ অনেক ঘটনা ঘটে। কিন্তু উহাদের স্মৃতি তাহাদের হৃদয়ের গভীরতম দেশে অঙ্কিত থাকিয়া যায়। পরে অন্যস্থলে বিবাহিত হইলেও তাহা বিবাহিত জীবনের তৃপ্তির ও সুখের অন্তরায় হয়। এইরূপে কত স্ত্রীপুরুষের বিবাহিত জীবন অতৃপ্তি-কর হয় তাহার সংখ্যাই বা কে করে?

যাঁহারা দীর্ঘকাল অবিবাহিত থাকেন, তাঁহাদের ভিতর অনেকেই প্রকৃতির তাড়নায় অন্য স্ত্রী বা পুরুষগামী হন। এরূপ করিলে স্ত্রীলোক-দিগের পুরুষের উপর ও পুরুষদের স্ত্রীলোকের উপর যে প্রকৃতি-প্রদত্ত উচ্চাসন দেওয়া থাকে, যে সহজ সসম্মান ব্যবহার থাকে, তাহাও লোপ পায়। তাহারা চিরকালই পরস্পরের চরিত্রের প্রতি সন্দিগ্ধ থাকে। নিজেদের চরিত্রদোষের ফলে এই পরস্পর সন্দিগ্ধচিত্ততা কিরূপ ভয়ানক ভাবে লক্ষ লক্ষ লোকের সুখ ও শান্তি নষ্ট করে তাহা আমরা সচরাচর বুঝি না। মহাত্মা Tolstoy সাহেব তাহা তাঁহার Kreutzer Sonata পুস্তকে দেখাইয়াছেন। আবার যাহারা বহু স্ত্রী বা পুরুষগামী হইয়াছে, তাহাদের এই অভ্যাসগত দোষ সংযত করাও বড় শক্ত ব্যাপার। পরকীয়া প্রেমের একটা আকর্ষণ, একটা উন্মাদনা আছে, যাহা তাহাদিগকে সহজেই বিপথগামী করে। তাহার ফলেও বিবাহিত জীবন সুখ ও শান্তিময় হইতে পায় না।

১৩৩২ সালের "ভারতবর্ষের" মাঘ সংখ্যায় "বিবাহ ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাতৃত্বের উপযোগী করিয়া গঠিত। সুতরাং তাহাদের মাতৃত্বের বিকাশ না হইতে পাইলে জীবনটাই যেন ব্যর্থ হইয়া যায়। সেই জন্য প্রাকৃতিক নিয়মে তাহারা মাতৃত্বের জন্য লালায়িত। ক্ষুধার সময় আহার না পাইলে ক্ষুধাই যেমন লোপ পায়, শরীর যেমন শুষ্ক হয়,—শরীর যখন মাতৃত্ব বিকাশের উপযোগী হইল, তখন মাতা হইতে না পাইলে, স্ত্রীলোকদিগের মাতা হইবার ইচ্ছা, মাতা হইবার উপযোগী মমতা-মাখান সেবা করিয়া সুখী হইবার ক্ষমতাই লোপ পাইতে থাকে। মাতৃত্ব আর সেরূপ সুখকর হয় না, মাতৃভাবটা লোপ পাইতে থাকে, হৃদয়টাই শুষ্ক হইয়া যায়। স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ কোমলতা, যাহা পুরুষদিগের কাছে তাঁহাদের প্রধান আকর্ষণ, তাহাই লোপ পাইতে থাকে; পুরুষ-সুলভ একটা কঠোরতা আসে। কর্ম্মী স্ত্রীলোকদিগের আরও অধিক পরিমাণে সেই কঠোরতা আসে। বিলাতী প্রায় সকল উপন্যাসেই old maid দের বর্ণনায় তাহাদিগকে crotchety and irascible করিয়া দেখাইয়াছেন। আমাদের দেশেও সচ্চরিত্রা বলে বিধবারা প্রায়ই অত্যন্ত খিটখিটে ও ঝগড়াটে হয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই কাঠিন্যের নিমিত্ত তাহাদের বিবাহিত জীবন তত সুখকর ও তৃপ্তিদায়ক হইতে পায় না। মাতৃত্বের অঙ্গীভূত কোমলতা ও মমতামাখা সেবাপরায়ণতার অভাবে তাহাদের সহবাসে গৃহের সুখ ও তৃপ্তি হইতে পায় না—হোটেলের বা মেসের সুবিধা হইতে পারে

কঠিনে কঠিনে সংঘর্ষ হয়। মোটা পাকা ডালে জোড়কলম ভাল হয় না।

বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া বিবাহিত জীবনে পরস্পর সহায়শীল হইয়া ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারিবার ও তাহার সুখ শান্তি ও তৃপ্তি পাইবার সম্ভাবনা কত কারণে কম—কত প্রতিবন্ধক তাহাতে আছে তাহা দেখিলাম। এ সকল প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও বিবাহিত জীবন সুখ ও শান্তিময় হইতে পারে যদি তাহাদের ভিতর গভীর প্রেম থাকে। সেই জন্য সকলেই তাহা পাইতে চান। কিন্তু গভীর প্রেম অতি অল্প লোকেরই হয়,—পৃথিবীতে তাহা অতিশয় দুর্লভ। তাহা সম্পূর্ণ রকমে নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে—অতি অল্প লোকই তাহা পারে। স্পেন দেশীয় বিখ্যাত উপন্যাস-প্রণেতা ইবানেজ্ সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন, পৃথিবীতে অসাধারণ প্রতিভা যেমন দুর্লভ—গভীর প্রেম তেমনই দুর্লভ। বেশীর ভাগ লোকই কামজ মোহকে প্রেম বলিয়া বোঝেন—ভুল করিয়া বসেন। নাটক-নভেলে বেশীর ভাগ কামজ মোহই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেমপূর্ণ থম্থমে জোয়ার—শান্ত, গভীর, ধীর—তাহাতে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবার স্থিরবুদ্ধি লোপ পায় না—কর্ত্তব্য-কর্ম্মেও পরাঙ্মুখ করে না। কামজ মোহ অসীম বেগবতী হড়্কা—তাহাতে লোকদিগকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাহাতে একটা মাদকতা আছে। যাহার হৃদয়ে প্রেম আছে—কি স্ত্রী-পুরুষের প্রেম, কি স্বদেশপ্রেম, কি ভাগবৎ-প্রেম,—সে পরের দুঃখ, কষ্ট, শোকে সহানুভূতিশীল হইবেই, তাহা যথাসাধ্য অপনোদন করিতে যত্নশীল হইবেই। তাহার সাহায্যদানে এমন মমতা মাখান থাকে, যাহাতে সাহায্যপ্রার্থীর একটা তৃপ্তি আসে, যাহা অন্যের অধিক দানেও আসিতে পারে না। যে কামজ মোহাবিষ্ট তাহার পরের বিষয়ে চিন্তা করিবার, পরের কার্য্য করিবার অবসর নাই। সে আপনাই বিভোর, কখন বা অসাধারণ পরদুঃখকাতর—অধিক সময়েই কিন্তু সম্পূর্ণ উদাসীন। দুইয়েতেই পূর্ণতার আনন্দ আছে। কিন্তু জোয়ার কেবল অসীম সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীতেই সম্ভব—ত্যাগী পরার্থপর ভগবানের নিকটবর্ত্তী মহৎ লোকেই প্রেম সম্ভব। হড়্কা অনেক নদীতেই আসে—কামজ মোহ অনেক লোকেই সম্ভব। জোয়ার অসীম সমুদ্রের আপূরণেই পূর্ণ—হড়্কা সসীম পার্থিব আবর্জ্জনাযুক্ত জলেই পূর্ণ। যে নদীতে জোয়ার আসে সেখানে নিত্যই জোয়ার আসে—হড়্কার মত দুই দিনেই ফুরাইয়া যায় না। হড়্কা বর্ষাকালেই বেশী হয়—যৌবনেই কামজ মোহ বেশী আসে। সকল লোকের পক্ষে প্রেম পাইবার প্রত্যাশা করা আর বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাওয়া একই কথা। আমরা এই কথাটা জানিতাম বলিয়াই প্রেম পাইবার বৃথা চেষ্টায় ধাবিত হইতাম না। যে সকল নদীতে হড়্কা আসে তাহার উৎপত্তি স্থলে ইঞ্জিনিয়ারী করিয়া হড়্কার জল ধরিয়া রাখিলে নদীর পূর্ণতা কতক পরিমাণে সংরক্ষিত হইতে পারে—তাহার চতুর্দ্দিকের সরসতা উর্ব্বরতা থাকে—অল্প দিনে সেই নদী কঙ্কালসার ধূসর বালুকাবৃত হইয়া যায় না। সেইরূপ আমরা কামজ মোহকে সংরক্ষণের চেষ্টা পাই। নদীতে অনেক খাল কাটা থাকিলে নদী শীর্ণ হইয়া যায়, তাহার পূর্ণতা থাকে না। লোকেরা যদি অন্য বা বহু স্ত্রী বা পুরুষগামী হয়, তাহাদের কামজ মোহ দীর্ঘকাল পূর্ণ থাকিতে পায় না, তাহার পূর্ণতার সুখ হইতে তাহারা বঞ্চিত হয়। কামজ মোহ কেবল একই স্ত্রী বা পুরুষে জড়িত থাকিলে তাহাকে চিরকালই মনোরম রাখিতে পারে—যাহা অন্য স্ত্রী বা পুরুষগামী হইলে হইতে পায় না। সেইজন্য চরিত্রের পবিত্রতা রাখা নিজেদেরই সুখের নিমিত্ত আবশ্যক। এই চরিত্রের পবিত্রতা সকলের পক্ষে যাহাতে সহজে রক্ষিত হইতে পারে, তাহাই অল্প বয়সে বিবাহ দিবার অন্যতম কারণ আরও কতকগুলি কারণ আছে। তাহা পরে বলিতেছি।

পরস্পর প্রীতিপ্রদ ও সহায়শীল হইয়া ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতে পারা তাহাদের নিজেদের বিলাইয়া দিবার ও পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লওয়ার ক্ষমতার তারতম্যের উপর নির্ভর করে। এই দুই ক্ষমতাই অল্প বয়সে বেশী থাকে। পৃথিবীর কঠিন সংঘর্ষে, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত, নিজেকে বিলাইয়া দিবার ক্ষমতা কতকটা আপনা আপনিই কমিয়া আসে; কতকটা নিজেকে সতর্ক হইয়া কমাইতে হয়। তাহা না করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে বড় ঠকিতে হয়। অল্প বয়সে সে জ্ঞান থাকে না। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লওয়ার ক্ষমতা বয়োবৃদ্ধির সহিত কমিয়া যায়। আমরা ছেলেবেলায় অনেক রকম লোকের সহিত মিশিতে পারি, যাহা বেশী বয়সে সম্ভব হয় না। বয়োবৃদ্ধির সহিত আমরা যাহা চাই, যাহাতে অভ্যস্ত, তাহা না পাইলে আমাদের বেশী কষ্ট হয়। আমরা বেশী বয়সে সমপ্রকৃতি সমমতানুবর্ত্তী ব্যক্তি না হইলে কাহারও সহিত বেশী মেশামিশি করিতে পারি না—অল্প বিভিন্নতাতে বিচ্ছেদ হয়। বাল্যবন্ধুত্ব সেই জন্য দীর্ঘকাল-স্থায়ী। এই জন্য অল্প বয়সে বিবাহ হইলে, এই মাখামাখি মেশামিশি করিবার ক্ষমতা যখন বেশী থাকে, নিজেকে বিলাইয়া দিবার ক্ষমতা যখন বেশী থাকে, তাহার সাহায্য আমরা পাই। স্ত্রীপুরুষ সমস্বভাব, সমমতানুবর্ত্তী না হইলেও আমরা বেশ সুখে ও শান্তিতে কাটাইয়া দিতে পারি, যাহা বেশী বয়সে সম্ভব হয় না। আবার আমরা যৌথ পরিবারে সচরাচর থাকি—তাহাতে অনেক রকমের লোক থাকে। তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে একরূপ অভ্যস্ত—ভিন্ন প্রকৃতি, ভিন্নমতাবলম্বী লোকের সহিত থাকিতে হইলে যেরূপ ভাবে চলা উচিত তাহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। এই সকল কারণে আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষরা সমস্বভাব, সমমতানুবর্ত্তী না হইলেও, আমরা পরস্পর সহায়শীল হইয়া সুখ ও শান্তিতে থাকিতে পারি—কলহ অবশ্যম্ভাবী হয় না। আবার আমরা প্রথম কামজ মোহের আবির্ভাব—যাহার রমণীয়তা, স্থিতিশীলতা সকল কবিই স্বীকার করেন—বিলাতী কবিরা তো এই first loveএর মাহাত্ম্য বর্ণনায় শতমুখ—তাহার সাহায্য আমরা লইয়া থাকি—তাহা অপ্রাপ্য বা অনুপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিয়া হৃদয় নিষ্পেষিত করিয়া যাইতে দিই না। সংসারাভিজ্ঞ জ্যেষ্ঠদের দ্বারা নির্ব্বাচিত ক্ষেত্রে

যেখানে সমপ্রকৃতিসম্পন্ন সমমতাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা বেশী—সেইরূপ জাতকুলশীল সমজীবনাদর্শ স্বজাতীয় স্থলে—যখন পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের সহিত নিজেকে মিলাইয়া লওয়ার ক্ষমতা বেশী থাকে—যখন নিজেকে বিলাইয়া দেওয়ার ক্ষমতা বেশী থাকে—সেই প্রথম যৌবন স্ফুরনের সময়ে প্রথম কামজ মোহকে উৎপন্ন হইতে দিই। সেই অল্প বয়সে কামজ মোহের সময়ে পরস্পর পরস্পরকে সুবিধামত, আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করান সহজ হয়। সেই কামজ মোহে তাহাদের একেবারে গা ঢালিয়া দিতে দেওয়া হইত না—দিনের বেলায় তাহাদের মিশিতে দেওয়া হইত না—মধ্যে মধ্যে বধূকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া অধিক মেশামিশির ফলে পরস্পরের সাহচর্য্য বিরক্তিকর হইতে দেওয়া হইত না; স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আসিতে দেওয়া হইত না। এইরূপে কামজ মোহের দীর্ঘকাল সংরক্ষণ ফলে জীবনটা বহুকাল সরস থাকিতে পায়—পরস্পর প্রীতিপ্রদ থাকিতে পায়; এবং তাহার ভিতরে পরস্পরে পরস্পরের সাহচর্য্যে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, বিশেষ মত বিরোধেও তাহাদের পৃথক করিতে পারে না। যাহাদের হৃদয়ে প্রেম আছে তাহাদের সেই প্রেম কামজ মোহ দ্বারা পুষ্ট হইয়া ইহজীবনেই তাহাদিগকে স্বর্গের সুখ উপভোগ করাইয়া দেয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারে থাকার ফলে স্ত্রীলোকদিগকে কোন কালেই নিষ্কর্ম্মা নিঃসঙ্গ হইতে হয় না এবং সেই নিঃসঙ্গতার জন্ত সময় কাটাইতে আমোদ পাইবার আশায় প্রলোভনের স্থলে যাইতে হয় না—পদস্খলনও অনেক কম হয়। এই সকল কারণেই আমরা বিবাহিত জীবনে পরস্পর সহায়শীল ও প্রীতিপ্রদ হইয়া কাটাইয়া দিতে পারি, যাহা অন্তপ্রকার সমাজে সচরাচর সম্ভব হয় না। আমাদের জীবন কোন কালেই কঙ্কালসার, ধূসর, বালুকাবৃত হইয়া যায় না। আমাদের যুবক সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জীবনে কামজ মোহের অল্পদিনস্থায়ী অবাধ পূর্ণতায় আনন্দ উপভোগ দেখেন—আমাদের সমাজে সেই পূর্ণতায় উপভোগের সুবিধা পান না বলিয়া চটিয়া যান—সমাজের অত্যাচার মনে করেন; কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনের পূর্ণতায় অবাধ উপভোগের পরে যে আজীবন শুষ্কতা আসে তাহা দেখিতে পান না—সে অভিজ্ঞতা তাঁহাদের নাই। সেই শুষ্কতা যে সভ্যতার সবুজ মখমলের আবরণে আচ্ছাদিত থাকে—দূর হইতে শৈবালশোভিত উদ্যান বলিয়া ভ্রম হয়, তাহা তাঁহারা দেখেন না।

বেশী বয়সে বিবাহ করিলে বিবাহ বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে যে শুধু সুখপ্রদ ও শান্তিপূর্ণ হইতে পায় না, তাহা নহে; তাহার আরও একটি ভয়ানক দোষ আছে। বেশী বয়সে বিবাহ করিয়া যখন পুত্রকন্যা জন্মিতে থাকে, তখন তাহাদের মানুষ করাটা মাতাদের পক্ষে বড় বিরক্তিকর হইয়া উঠে—তাহাদিগকে অনেক স্থলেই ধাত্রী বা দাসীদিগের হস্তে ফেলিয়া দেওয়া হয়; কিম্বা অল্প বয়স হইতে ইস্কুলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তাহার ফলে পুত্রকন্যা ও পিতামাতার মধ্যে ভালবাসার দীর্ঘকালস্থায়ী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জন্মিতে পায় না—তাহাদেরও পিতামাতার উপর সেরূপ টান ও শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে না। এদিকে পুত্রকন্যারা যখন বড় হইল, নিজের নিজের কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল, তখন তাঁহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন। বার্দ্ধক্যে শরীর যখন অপটু হইল—পরের সেবা শুশ্রূষা আবশ্যক হইল, তখন আপনার লোক কেহ দেখিবার, যত্ন করিবার রহিল না—দাসী সেবিকা ভিন্ন, হাসপাতাল ভিন্ন গত্যন্তর নাই; সকলের, বিশেষতঃ একের অবর্ত্তমানে অপরের, জীবন অত্যন্ত কষ্টকর হইল,—সহানুভূতিহীন, লক্ষ্যহীন, আশাহীন—প্রায় নির্জ্জন কারাবাস তুল্য। তাহার পর ভাড়াটিয়া সেবা ও হাসপাতালে মৃত্যু। এইজন্ত বৃদ্ধ বয়স পাশ্চাত্যদিগের কাছে এত ভয়াবহ। সে সময়ে নাতি-নাতিনীরা আমাদের সহচর থাকে—তাহাদের সহিত খেলায়, আমোদে ও গল্পে আমাদেরও সময় আনন্দে কাটিয়া যায়—উহারাও কিছু কিছু শিখিতে পারে। তাহার পর পুত্রবধূ নাতি-নাতিনী, ভ্রাতৃজায়া, ভ্রাতুষ্পুত্র ও তাহাদের বধূরা আছে,—তাহাদের সশ্রদ্ধ, মমতামাখান সেবা পাইয়া মরিতে পারি—কোন কালেই নির্জ্জন কারাবাস হয় না। সকল সময়েই ভালবাসার আস্বাদন ও সেবা পাই।

অর্থ-স্বচ্ছলতা না হইলে বিবাহ না করার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইলে অনেক গরীব লোকই বিবাহ করিতে পাইবে না। একে তো তাহারা পৃথিবীর প্রায় সকল সুখেই বঞ্চিত। তাহার উপর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিলে তাহাদের জীবন দুর্ব্বিষহ হইবে। তাহাদের বাঁচিবার, উপভোগ করিবার কি রহিল? শুধু কি তাহারা ধনীদের জন্ত খাটিয়া খাটিয়া মরিতে আসিয়াছে? এই সাম্যবাদের দিনে, এই গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের দিনে, তাহাদিগকে এত বঞ্চনা করা, তাহাদিগের উপর এত বড় অত্যাচার করা, কিরূপে সাম্যবাদী নব্যতন্ত্রীরা বিধেয় বিবেচনা করেন, তাহা অসাম্যবাদী হিন্দুরা বুঝিতে পারে না। প্রকৃত ধনশালী পাশ্চাত্যে এই ভালবাসা হইতে অনেকে বঞ্চিত হয় বলিয়াই সেখানে শ্রমিক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।

সুতরাং দেখা গেল যে এইরূপ মতবাদ কাহারও পক্ষে বড় সুবিধাজনক নয়। ইহাতে গরীবদের জীবন দুর্ব্বিষহ করা হয়। যুবক যুবতীরা যৌবনে—জীবনের প্রধান উপভোগের সময়ে—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জিনিস—ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হয়। তৎপরিবর্ত্তে ভাড়াটিয়া প্রেমাভিনয়ে তাহাদের জীবন কাটিয়া যায়—যৌনরোগ ভয়ানক বাড়ে—দেশের স্বাস্থ্যহানি হয়—জারজ সন্তানদের সংখ্যা বাড়ে—তাহাদের মৃত্যুহার অনেক বেশী হয়। বৃদ্ধ বয়সে প্রায় সকলেরই নির্জ্জন কারাবাস হয়—সকলকেই ভাড়াটিয়া সেবার উপর নির্ভর করিতে হয়—আত্মীয় স্বজনের মমতামাখান সেবা—যাহাতে রোগের অর্দ্ধেক কষ্টই চলিয়া যায়, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়—হাসপাতাল বা nursing home-এ মৃত্যু হয়। বিবাহটা অধিকাংশ লোকের সুখের হয় না। যত বেশী বয়সে বিবাহ হইতেছে—ততই বিবাহ-বিচ্ছেদ বা আইনানুযায়ী পৃথক হওয়া বাড়িতেছে। স্ত্রীলোকদিগের জীবন অসহ্য অশান্তিদায়ক হইতেছে। বিবাহটাই যে সুখকর হয় না, তাহার আর একটি প্রমাণ—বিবাহ-

পদ্ধতিটাই ভুল (Failure) কি না—এই কথা বেশী বয়সে বিবাহিত পাশ্চাত্য দেশেই কেবল উঠিয়াছে। স্ত্রীলোকরা মাতৃত্বের সময়ে মাতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া রুদ্ধ প্রকৃতির বিষময় ফলে মাতৃত্বের অঙ্গীভূত মমতামাখান সেবাপরায়ণ হওয়ার পরিবর্ত্তে আমোদ বিলাস ও উত্তেজনাপ্রবণ হইতেছেন। মাতৃত্বভাবই শুষ্ক হওয়ায় মাতৃত্বই বিরক্তিকর হইয়াছে—তজ্জন্য এবং চতুর্দ্দিকে তাহারা পুরুষদের দ্বারায় বঞ্চিত হইতেছে দেখিয়া এখন প্রভুত ধনশালী পাশ্চাত্যেই কি উপায়ে গর্ভ না হয় তাহা লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা হইয়াছে। এবং পুরুষদের সহিত বি-সম প্রতিযোগিতার কর্ম্মক্ষেত্রে বাধ্য হইয়া নামিতে হইতেছে বলিয়া পুরুষরা তাহাদের শত্রু, তাহাদের সহিত সাপে নেউলের মত যুদ্ধ করা আবশ্যক—এই জ্ঞান তাহাদের হইয়াছে। Suffregette সম্প্রদায়ের সৃজন হইয়াছে। নীচশ্রেণীর জীবে স্ত্রী ও পুরুষ একই শরীরে ছিল—উচ্চ শ্রেণীর জীব মনুষ্যের ভিতর তাহারা দুইয়ে মিলিয়া এক হইয়া এতকাল জীবন মধুময় করিয়া আসিয়াছিল—পৃথিবীতে স্বর্গ টানিয়া আনিয়াছিল। মাতৃজাতীয়া স্ত্রীলোক-দিগের মনে কেবল এই উত্তরোত্তর বেশী বয়সে বিবাহিত পাশ্চাত্য দেশেই পুরুষ-বিদ্বেষ জন্মিয়াছে, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহাতেও কি আমাদের পাশ্চাত্যের মোহান্ধ চক্ষু উন্মীলিত হইবে না? ভীষণ নরবলিলোলুপ অর্থদেবতার প্রীত্যর্থ স্ত্রীলোকদিগকে, গরীবদিগকে, বৃদ্ধদিগকে, বলি দিতেই হইবে?

স্বরাজ-প্রসঙ্গ

শ্রীপদ্মনাভ

ভবঘুরে পদ্মনাভের ভ্রমণের পিপাসা শুধু ভারতবর্ষ চরিতার্থ করিতে পারে নাই; তাই একাধিকবার পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াও পুনরায় সেদিন জীবন সংগ্রামের তাড়নায় ইয়োরোপের মহাসমরক্ষেত্র স্বচক্ষে দেখিতে গিয়াছিলাম। আপনারা সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন, আমি স্বচক্ষে দেখিলাম,—ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান, ইটালীয়ান এবং রুশিয়ান প্রভৃতি সংগ্রামকারী জাতিদের রাজ্যের সীমানা পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে। তবে কেন এত বড় যুদ্ধটা হইল? কেন ইয়োরোপের এত স্ত্রীলোক পতিহারা, প্রেমাস্পদহারা, পুত্রহারা, ভ্রাতৃহারা ও পিতৃহারা হইল? কেন কোটী কোটী টাকা ভস্মে পরিণত হইল? ইহার যথার্থ কারণ যখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, তখন এই মরিয়া-অমর লোকগুলির জন্য যত না ব্যথা অনুভব করিলাম, তাহার শতগুণ দুঃখ অনুভব করিলাম আমাদের এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারতের বিশেষতঃ হতভাগিনী বাংলার জন্য। দেশে ফিরিবার জন্য দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া জেনোয়া সহরে জাহাজে উঠিলাম। পথে বেতার সংবাদের বিজ্ঞাপনে জানিতে পারিলাম—চীন দেশেও ভয়ানক মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হইয়াছে। যে কারণে ইয়োরোপে এই লক্ষ লক্ষ জীবনক্ষয়, চীনদেশের মারামারি কাটাকাটির কারণও তাহাই—'স্ব স্ব শিল্প ও বাণিজ্যের রক্ষা ও প্রসারণ'। বর্ত্তমান যুগে পৃথিবীর সমস্ত সভ্যজাতিই ধনে, ঐশ্বর্য্যে বড় হইবার জন্য লালায়িত। এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই বিজ্ঞানকে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর করিতেছে। আমাদের স্বরাজ আন্দোলনের কারণও যে মূলতঃ তাহাই, তাহা স্বরাজ-ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইয়োরোপ লক্ষ লক্ষ জীবন ডালি দিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই, আফিংখোর চীনবাসী জীবন দিতে উদ্যত, আমাদের নেতৃগণ দুই চারিটা বক্তৃতা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য—আমাদের নিকট যাহা জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান,—সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী। কেন নেতৃগণের এইরূপ মতিচ্ছন্ন, কেন দেশের এইরূপ দুর্দ্দশা, এবং ইহার প্রতীকারের প্রকৃত উপায় কি, সেই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য আপনার ভারতবর্ষের বক্ষে কিছু স্থান প্রার্থনা করিতেছি।

মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু তাঁহাদের অমানুষিক স্বার্থত্যাগ, অনুপমের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম, দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা দ্বারা ইহাই বুঝাইয়াছিলেন যে, স্বরাজের একমাত্র উদ্দেশ্য এই মৃত্যুমুখীন পদদলিত দেশের দুঃখ দৈন্য দূর করা, ইহার শৃঙ্খল মোচন করা, ইহার উন্নতি সাধন করা এবং ইহাকে সমৃদ্ধিশালী করা। উহা তাঁহাদের নিজেদের, বা ব্যক্তিগত কাহারও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। দেশের গুরু মহাত্মা গান্ধী স্বরাজের যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন দেশবন্ধু আদর্শ গুরুর আদর্শ শিষ্যরূপে, ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিজ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সেইপথই অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিলেন। বাহ্যদৃষ্টিতে ইহার কিছু ব্যতিক্রম হইয়াছিল বলিয়া মনে হইতে পারে; কারণ দেশবন্ধু, নিজের সহচরদিগের মধ্যে যাহারা নিজ স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া গুরু-প্রদর্শিত পথে চলিতে অসমর্থ হইয়া ভিন্ন পথে যাইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাদেরও স্থানের জন্য গুরুনির্দ্দিষ্ট পথটাকে কিছু বিস্তৃত করিয়াছিলেন—কাউন্সিলে প্রবেশ, স্বরাজ রাস্তার অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন, নিজ জীবনের উদাহরণ দ্বারা ক্রমে ইহাদিগকেও গুরুনির্দ্দিষ্ট পথের মধ্যস্থানে আনিতে পারিবেন। মহাত্মার একনিষ্ঠ অনুচরগণ ইহাতে খুবই বিরক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু মহাত্মা নিজে, দেশবন্ধুর ক্ষমতা ও শুভেচ্ছার উপর নির্ভর করিয়াই ইহা অননুমোদন করেন নাই। বিস্তৃত আলোচনা পরে করিতেছি।

মহাত্মা-নির্দ্দিষ্ট স্বরাজের পথ কি, এবং তিনি কেন উহাকেই একমাত্র পথ বলিয়া ধার্য্য করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, মোটামুটী ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাত্মা দেখিলেন;—

১। "যারই শিল তারই নোড়া তারই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" এই উপায়ে এ দেশ শাসিত হইতেছে। আর গোলা বারুদ দ্বারা বা রাজনৈতিক চালবাজী দ্বারা স্বরাজ লাভের ক্ষমতা বা ইচ্ছা এ দেশবাসীর নাই। তাই নিজেদের দাঁতের গোড়া বাঁচাইবার জন্য শিলনোড়ার কার্য্য

হইতে দেশবাসীকে বিরত থাকিতে উপদেশ দিলেন। দেশে নন্-ভায়োলেণ্ট নন্-কো-অপারেশন প্রচারিত হইল।

২। যাঁহারাই ইংরাজীশিক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারাই নিজেদের নিত্য নব ভোগ বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্য দেশের অর্থ বিদেশে পাঠাইয়া এ দেশকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবার জন্য বিশেষরূপে দায়ী, এবং এই ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতি এ দেশবাসীকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইবার ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া ইংরাজের উপর নির্ভরশীল করিতেছে। তাই তিনি এই ইংরাজীশিক্ষার উপর খড়্গহস্ত হইলেন এবং এই শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয় শিক্ষা—মানুষ গড়িবার শিক্ষা, প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী হইলেন।

৩। ভারতের এই যে অন্নকষ্ট, ইহা খাদ্যের অভাবে নয়, অর্থের অভাবই ইহার কারণ। ভারত যে খাদ্য উৎপন্ন করে, তাহা তাহার পক্ষে প্রচুর, কিন্তু তাহা সে ভোগ করিতে পারে না অর্থের অভাবে। তাই এ দেশের দুর্দ্দশা দূর করিতে হইলে, এ দেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী করিতে হইলে, এ দেশে অর্থ উৎপাদন, রক্ষা এবং বৃদ্ধি করিবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক, অন্য রাস্তা নাই। ভারত, ইহা করিয়াই এক সময় সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল, এবং পৃথিবীর অন্যান্য সমৃদ্ধিশালী যে-কোনও দেশই ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

উক্ত তিন প্রকার কার্য্যের জন্য প্রথম দরকার কৃষি ও শিল্প. দ্বিতীয় স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার, তৃতীয় বহির্বাণিজ্য—নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য সকল বহির্দেশে বিক্রয় করিয়া নিজদেশে ধনানয়ন। নূতন কোনও ভাষা শিক্ষা করিতে হইলে যেমন তাহার আগুক্ষরের লিখন ও পঠন আগে শিখিতে হয়, সেইরূপ নূতন কোনও কাজ শিখিতে হইলে তাহার সুরু হইতেই আরম্ভ করা একান্ত আবশ্যক। মহাত্মা অনেক চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা চরকায় সূতা কাটা, এই পরনির্ভরশীল, অধঃপতিত জাতিটাকে আবার নূতন করিয়া আত্মনির্ভরশীল ও উন্নত করিবার প্রধান এবং আদি কাজ রূপে নির্দ্ধারণ করিলেন (ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তিনি চরকা চালান নবজাগরণের আদি 'কাজ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা যদি কেহ মনে করেন, তবে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। চরকা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহাই এক সময় ভারতবর্ষকে উন্নতির চরম সীমায় উঠাইবার প্রধানতম যন্ত্র ছিল, এবং সেই চরকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতেই ভারতবর্ষের শারীরিক ও মানসিক এত অধঃপতন); এবং চরকা চালান শিক্ষার ও খদ্দর ব্যবহার করিবার জন্য এদেশবাসীকে আহ্বান করিলেন। যে হস্ত পরপদ সেবনে বা পরের পকেট অনুসন্ধানে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই হস্ত নিজের চরকায় তেল প্রদানে নিয়োজিত করিতে দেশবাসীকে শুধু মুখে অনুরোধ জানাইলেন, তাহা নহে,—নিজ হস্তে চরকায় সূতা কাটা আরম্ভ করিলেন এবং খদ্দরে অঙ্গ আবৃত করিয়া প্রকৃত লজ্জা নিবারণে প্রয়াসী হইলেন।

দেশে একটা মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল; দলে দলে শিক্ষিত নামধারী লোক সকল সরকারী চাকরী পরিত্যাগ, ওকালতী বর্জ্জন ও স্কুল কলেজের সংস্রব ত্যাগ করিয়া চরকা-হস্তে মহাত্মার আহ্বানে সাড়া দিল। বিদেশী বণিক আতঙ্কে দিশাহারা হইল, মহাত্মাও আনন্দে একেবারে আত্মহারা হইলেন। তাই বড় গলায় বলিলেন 'এই অমুক তারিখের মধ্যেই স্বরাজলাভ হইবে।' কিন্তু হায়! অচিরেই মহাত্মার বাণী উপহাসে পরিণত হইল; কারণ মহাত্মা এ কথাটা ভাবিয়াই দেখেন নাই যে, তাঁহার পুণ্যোত্তয়া একটি মাত্র জীবন-স্রোতের শক্তি, এই শত বৎসরের পুতিগন্ধযুক্ত কোটী কোটী গোভাগাড়ের দূষিত জল বিশুদ্ধ করিবার পক্ষে কত ক্ষুদ্র! তাহাতে আবার পর্ব্বত-প্রমাণ প্রস্তর-খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহার জীবন-স্রোতের বেগ হ্রাস করিবার জন্য অন্য এক শক্তি অলক্ষ্যে কার্য্য করিতেছে। পরস্কন্ধে আরোহণ করিয়া চলিতে যাহারা আজন্ম অভ্যস্ত হইয়াছে, পরের পকেটে দু'একবার হাতটা বুলাইলেই যাহাদের অজস্র অর্থ উপার্জ্জন হয়, তাহারা দুইপাক চরকা চালাইয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এ দিকে আবার, চৌষট্টী হাজারের মুক্তার মালার মখমল-মোড়া বাক্সের ডালা উন্মোচিত হইল। আর কি এই পরান্ন-পালিত জীবগণ স্থির থাকিতে পারে? নিজ নিজ আরামপ্রদ কার্য্যে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাহারা ব্যস্ত হইল। বিদেশী বণিক হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। চরকা বিবাহের একটি যৌতুকের সামগ্রীর মধ্যে স্থান পাইল। যাঁহারা তখনও মহাত্মার একনিষ্ঠ সহচররূপে রহিলেন, তাঁহারা নগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এমন সময়, দেশবন্ধু তাঁহার সর্ব্ব-মন-প্রাণ দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি দেখিলেন, এই গলাবাজীপ্রিয় লোকগুলিকে হাতে-কলমের কাজ দিয়া কিছুতেই স্থির রাখা সম্ভবপর নয়; কেননা, সে সব কাজ ইহাদের আয়ত্তের বাহিরে। তাই তিনি, যাহাতে এই লোকগুলিকেও দেশের কাজে নিয়োজিত রাখিতে পারেন, এরূপ একটা কাজ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। নন্-কো-অপারেশনের প্রোগ্রাম হইতে কাউন্সিল এনট্রি, রহিতাজ্ঞা উঠাইয়া দেওয়া হইল, এবং নিজে অগ্রগামী হইয়া, অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য করিয়া, ইহাদের কাউন্সিল প্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত ও পরিষ্কার করিয়া দিলেন। ইহাদের কার্য্যপ্রণালী স্থির হইল যে, ইহারা খদ্দর পরিধান করিবে এবং সমস্বরে উচ্চ চীৎকার করিয়া দ্বৈতশাসন প্রণালীকে 'ঞাষ্ট টু মেণ্ড অর এণ্ড' করিবে। দেশবন্ধু মনে করিলেন যে, এই হুজুগে মাতাইয়া এই লোকগুলিকে যদি অন্ততঃ বিদেশীর পরিবর্ত্তে দেশী জিনিসের ব্যবহারও করাইতে পারেন, তবে তাহাও দেশের পক্ষে মহালাভ। তা ছাড়া, ইহারা গলাবাজী করিয়া যদি গভর্ণমেণ্টকে একটুকুও অন্যমনস্ক রাখিতে পারে, তবে তাঁহার যে প্রথম কাজ—গ্রামসংস্কার করিয়া স্বরাজের ভিত্তিপত্তন,—সেই কাজে একটু কম বাধা পাইবেন। বিদেশী বণিকগণ আবার একটু চিন্তিত হইয়া পড়িল। লাট সাহেব দয়াপরবশতা বশতঃই হউক, কিম্বা পার্লিয়ামেণ্টের নিয়ম অনুকরণেই হউক, চৌষট্টী হাজারের মালা দেশবন্ধুর গলায় পরাইতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু—দেশবন্ধু বিনয়-বাক্যে লাটমহোদয়কে জানাইলেন যে, তাঁহার প্রদত্ত মালা বহুমূল্য বটে, কিন্তু তিনি (দেশবন্ধু) ইহাকে শৃঙ্খল মনে করেন, তাই স্ব-ইচ্ছায়

তাহা গলায় পরিতে অনিচ্ছুক। এবং লাট সাহেবকে ইহাও বুঝাইয়া দিয়া আসিলেন যে, দেশের অন্য লোককেও তিনি যদি এই মুক্তার মালা পরাইয়া দেশের নামে মেকিকে খাঁটি বলিয়া চালাইতে চাহেন, তবে সে কাজে তিনি প্রাণপণে বাধা দিবেন। এ কথা তিনি শুধু মুখেই বলিয়া আসিলেন তাহা নহে, কার্য্যক্ষেত্রে, মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও চলৎশক্তিহীন অবস্থায় পঙ্গুবাহক দোলায় বাহিত হইয়া কাউন্সিলে উপস্থিত হইলেন, এবং মেকি চালান বন্ধ করিলেন। তথা-কথিত দ্বৈতশাসন ভাঙ্গিয়া গেল। দেশের একদল লোক ইহাতে খুবই উত্তেজিত এবং বিরক্ত হইল, এবং দেশবন্ধু পাগল হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়া দেশের নিকট তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য প্রয়াস হইল। দেশবন্ধু তাহাদিগকে তাঁহার ভারতবিদিত ফরিদপুরের বক্তৃতায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, তিনি পাগল হয়েন নাই, মেকির পরিবর্ত্তে খাঁটি দিতে নারাজ বটে, কিন্তু খাঁটির সহিত খাঁটির বিনিময় অর্থাৎ অনারেবল কো-অপারেশন করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। জনরব উঠিল, গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু হায়! তাঁহার অনুচরগণের মতি পরিবর্ত্তন এবং গভর্ণমেণ্টকে অনুমনস্ক করিবার কাজেই দেশবন্ধুর শরীর এমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল যে, প্রকৃত কাজের—স্বরাজের ভিত্তিপত্তন পর্য্যন্ত করিবার অবসর তিনি পাইলেন না। ভগবান তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এবং কঠিনতর কাজের জন্য অধিকতর বলশালী করিবার ইচ্ছায় অকালে এই মরজগত হইতে তাঁহাকে অমরধামে ডাকিয়া লইলেন। দেশবন্ধু এখন পরপারে; তাঁহার এ পারের কার্য্যবিবরণী পর্য্যালোচনা করিয়া এই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি নিজে মহাত্মার নির্দ্দিষ্ট স্বরাজের রাস্তা হইতে কখনই একপদ অন্যদিকে গমন করেন নাই—

১। স্বরাজের জন্য ফকীর হইয়াছিলেন।

২। শিল নোড়ার কাজ কখনও করেন নাই বা করিবার ইচ্ছাও করেননাই। ব্যারিষ্টারী বর্জ্জন করিয়া তাহা পুনরায় গ্রহণ করেন নাই।

৩। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তে জাতীয় শিক্ষাকেন্দ্র খুলিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিয়াছিলেন।

৪। স্বদেশী শিল্পের ব্যবহার গৃহে ও বাহিরে সর্ব্বদাই করিয়া-ছিলেন; শুধু কর্পোরেশন বা কাউন্সিলে ব্যবহার করিবার জন্য এক প্রস্থ পোষাকী খদ্দর ক্রয় করিয়া দেশকে কৃতার্থ করেন নাই। নিজগৃহে চরকায় সুতা কাটা কাজের প্রচলন করিয়াছিলেন।

৫। নিজের একমাত্র পুত্রকে, সে যেরূপই হউক, শিল্প-বাণিজ্যের কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিলে নিজে স্বয়ং চেষ্টা না করিয়াও, অন্য কিছু না হয়, তাহাকে একটা খুব বড় রকমের সরকারী চাকুরী অনায়াসেই জুটাইয়া দিতে পারিতেন, এবং পুত্র অবাধ্য এই কথা বলিয়া, বাহ্যিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া, দেশকে অনায়াসেই বুঝাইতে পারিতেন যে, পুত্রের কার্য্যের জন্য পিতা দায়ী নয়।

এক, কাউন্সিলে প্রবেশ করা,—তাহা কেন করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমি যেরূপ বুঝিয়াছি তাহা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

স্বরাজ অন্তরালে রক্ষক বেশী ভক্ষক

বর্ত্তমান নেতৃগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া,—কেহ নাম লইয়াছেন স্বরাজিষ্ট, কেহ রেসপন্সিভিষ্ট, কেহ ন্যাশনালিষ্ট, কেহ লয়েলিষ্ট, কেহ রহিমিষ্ট, কেহ টমাকিষ্ট, কেহ বা আবার খিচুড়ীষ্ট,—সেই স্বরাজেরই সাধনায় না কি নিজেদের নিযুক্ত করিতে প্রয়াসী। কিন্তু ইঁহাদের কার্য্যকলাপ, চাল চলন, ধরণ ধারণ ও হাবভাব, ডাক হাঁক দেখিয়া শুনিয়া ইঁহাদের সাধনাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির একটা কারণ বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। ইঁহারা নানারূপ নাম গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইঁহাদের অধিকাংশই আইন-পেশাকর *, অল্পাংশ চিকিৎসা-পেশাকর, এবং দুই একজন খাজনা-পেশাকর। মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধুও এক সময় এই আইন-পেশাকরই ছিলেন বটে, কিন্তু পবিত্র স্বরাজ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, উক্ত পেশাকে আবর্জ্জনার মত ঘৃণাকারজনক বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করতঃ শুদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছিলেন, এবং জীবনে আর কখনও সে বিষ্ঠা অঙ্গে মাখেন নাই। অতীতে ও বর্ত্তমানে দেশের জন্য—প্রকৃত স্বরাজের জন্য এই বর্ত্তমান নেতৃগণ কি করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহার আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাদের স্বরাজ স্বরাজ করিয়া চীৎকার করিবার উদ্দেশ্য কি! দেশকে সর্ব্ব বিষয়ে উন্নত করাই যে প্রকৃত স্বরাজের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ইহাতে বোধ হয় কাহারও মতদ্বৈধ নাই; এবং অর্থই যে এই উন্নতি দানের প্রধানতম সহায়, সে কথাও, বোধ হয়, এই জীবন সংগ্রামের দিনে, কোনও বাঙ্গালীকে নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। দেশের এই অর্থ বা ধন উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য অতীতে ও বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ কখনও এই নেতৃগণ কিছু করেন নাই, এ কথা বলিলে হয় ত অত্যুক্তি হইবে না। কিন্তু অন্য দিকে দেশের ধন বিদেশে পাঠাইয়া ভারতের কোটী কোটী নরনারীকে কুকুর-বিড়ালের অবস্থায় নীত করিতে ইঁহারা যত দায়ী, অন্য কেহ তত নহেন। ইঁহাদের কার্য্যের দৃষ্টান্ত,—গৃহের আসবাব, গায়ের পোষাক, ভ্রমণের যান, বিলাস সামগ্রী এবং অন্যান্য অনাবশ্যক দ্রব্য তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কেন! ইহারা এইরূপ প্রকৃতির লোক রূপে পরিণত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলে অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে, ইহাদের প্রকৃতির ভবিষ্যতেও কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইবার আশা আছে কি না, এবং ইহাদের স্বরাজ ব্যক্তিগত রাজের নামান্তর কি না।

এই আইন-পেশাকর ও চিকিৎসা-পেশাকরগণ ইংরাজের হাতে গড়া অভিনব জীব। সুচতুর ইংরাজ বণিক এ দেশে পদার্পণ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এ দেশের লোকগুলি অত্যন্ত মেধাবী ও শিল্প-বাণিজ্যে অনেক উন্নত। পৃথিবী-বিখ্যাত তাজমহল ইহাদের হস্ত নির্ম্মিত, ঢাকার মসলিনের সূক্ষ্ম সূত্রগুলি ইহারা শুধু অঙ্গুলির সাহায্যে

* দ্রব্যের সহিত দ্রব্যের বিনিময়—ব্যবসা।
দ্রব্যের সহিত কার্য্যের বিনিময়—পেশা।

প্রস্তুত করিতে সমর্থ, এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ও নানা প্রকার কারুকার্য্যখচিত গৃহদ্রব্য ও বিলাস-সামগ্রীসমূহ,—সমস্তই ইহাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। যদি ইহাদের মেধা শিল্প বাণিজ্যের দিকে প্রসারিত হইতে আরও সুযোগ পায়, তবে বিদেশী বণিকের পক্ষে এ দেশ লুণ্ঠন করা কিছুতেই সম্ভবপর হইবে না। তাই যাহাতে শিল্প-বাণিজ্যের দিক হইতে এ দেশবাসীর দৃষ্টি অন্য দিকে আকৃষ্ট হয়, সেরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইল। কতকগুলি কার্য্যের উপর এরূপ চাকচিক্য লেপন করিয়া দেওয়া হইল যে, সমস্ত দেশের দৃষ্টি বিশেষভাবে সেই সমস্ত কার্য্যের দিকে আকৃষ্ট হইল। সরকারী চাকুরী ও আইন-পেশাকরীর উপর শুধু অতিরিক্ত সম্মান ও ক্ষমতার আভা প্রদান করা হইল তাহা নয়, যাহাতে বিনা আয়াসে এবং বিনা দায়িত্বে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায় তাহারও সুযোগ দেওয়া হইল। বিদ্যালয়ে সেইরূপ শিক্ষারই প্রবর্ত্তন করা হইল। এইরূপে উক্ত অভিনব জীবদের সৃষ্টি আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে দেশের তথাকথিত সাহিত্য অর্থাৎ উপন্যাস সকল এই সব পেশাকরদের গুণগানে কলেবর বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রায় সকল উপন্যাসেরই নায়ক, হয় উকীল কিম্বা ডিপুটী বা মুন্সেফ বা ডাক্তার বা ঐ সব কার্য্যে উপযুক্ত হইতে প্রয়াসী ছাত্র। এই সব উপন্যাসের কল্যাণে ভিতর বাড়ীতেও ইঁহাদের প্রতিপত্তি বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিল। গৃহিণী, এই জাতীয় লোকদিগকে জামাতা করিবার জন্য আগ্রহান্বিতা হইয়া উঠিলেন, কন্যার নিকট ইঁহারাই আদর্শ বররূপে ধ্যানের বস্তু হইল। বাহিরে ও ভিতরে সম্মান, বিনা আয়াসে ও বিনা দায়িত্বে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন,—তাই দলে দলে লোক পঙ্গপালের ন্যায় সেইদিকে ছুটিল।" ইহাতে ইংরাজ বণিকের দুই প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। এক, যাহারা দেশের মণি, যাহারা শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষা পাইলে দেশকে দিন দিন উন্নত হইতে উন্নততর সোপানে আরোহণ করাইতে পারিত, তাহাদিগকে শিল্প-বাণিজ্যের রাস্তা হইতে প্রকারান্তরে সরাইয়া দেওয়া হইল। আর গ্রামে গ্রামে উচ্চ মূল্যের বিদেশী দ্রব্য পরিচালনের অসাধ্য কাজ হইতে ইংরাজ বণিকেরা নিজেরা অব্যাহতি পাইল। কেননা, এমন একদল লোক তাহারা পাইল, যাহারা গ্রামের পয়সা ছলে বলে কৌশলে কুড়াইয়া আনিয়া উচ্চ মূল্যের বিলাস দ্রব্যের বিনিময়ে, বিদেশী বণিকের পাদপদ্মে অম্লান বদনে ঢালিয়া দিয়া, মানব জন্ম সার্থক করিবে। ইংরাজী চালে চলিলে সভ্য নাম পাওয়া যায়, ইংরাজ খাতির ক'রে, পয়সা উপার্জ্জন বেশী হয়, দেশের লোকের নিকট সম্মান পাওয়া যায়,—এই আদর্শ বিশেষরূপে বিলাত-প্রত্যাগত ব্যারিষ্টার ও সিভিলিয়ানগণ তাহাদের কার্য্যকলাপ ও চালচলন দ্বারা দেশে প্রচার করিলেন। ক্রমে এই রোগ সংক্রামিত হইয়া ডেপুটী, মুন্সেফ, উকীল, ডাক্তার এমন কি কেরাণীদের হৃদয়ও অধিকার করিল। জমীদারগণ দেখিলেন—শিক্ষিত নামধারী লোকেরা এরূপ নূতন চালে বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে; তখন তাঁহারাই শুধু পাড়াগাঁয়ে বসিয়া ভূত আখ্যা বহন করেন কেন? অচিরে রক্তবর্ণ, প্রশস্ত রাজবর্ত্ম, নন্দন-কানন-সদৃশ প্রমোদ-উদ্যান এবং উর্ব্বশী-মেনকা-নিন্দিত অপ্সরাশোভিত ভূমণ্ডলের ইন্দ্রপুরী স্বরূপ নগরগুলিতে নিজেদের আস্তানা উঠাইয়া আনিয়া বিলাতী বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিলেন। মুখে বিলাতী বুলি ও সিগারেট, পরণে বিলাতী পোষাক, রুমালে বিলাতী সুগন্ধি, ভ্রমণে বিলাতী গাড়ী, আহারে বিলাতী কায়দা, পানে বিলাতী তরল দ্রব্য ও গৃহে বিলাতী আসবাবপত্র,—এইরূপে বিলাতী সাহেব হইবার আশায় একদল দেশী সাহেবের সৃষ্টি হইল। তাহাদের কল্যাণে রাশি রাশি বিলাতী দ্রব্য দেশে আমদানী হইতে লাগিল। দেশের খাঁটি শিল্প রসাতলে প্রবেশ করিল। যে দুই একজন স্বদেশ-বৎসল রহিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বেশী লাভের আশায় দেশে নকল শিল্পীর অভ্যুদয় হইল। এই শিল্পীদের কাজ হইল বিদেশী জিনিসের উপর দেশী লেবেল মারিয়া দেশী জিনিস বলিয়া প্রচলন করা। বাণিজ্যের অর্থ দাঁড়াইল বিদেশী জিনিস আমদানী ও বিক্রয় করা। এইরূপে এই সব অভিনব জীবদের চক্রান্তে গ্রামের কৃষকের, মজুরের রক্ত-দিয়া-গড়া পয়সা জাহাজে চড়িয়া শ্বেতদ্বীপে রওনা হইতে সুরু করিল। বণিকরাজের প্রসাদে এই অভিনব জীবেরা বেশ আরাম ভোগ করিতে লাগিল সত্য, কিন্তু দেশের পৌনে ষোল আনা লোক অর্দ্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাইতে বাধ্য হইল। অনাহার-ক্লিষ্ট শরীর দিন দিনই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, এবং নানা প্রকারের নূতন নূতন ব্যাধি সুযোগ পাইয়া গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া বসিয়া অনাহার-ক্লিষ্ট লোকগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিল। আয়ুর্ব্বেদ অসভ্যদের চিকিৎসা-শাস্ত্র, তাহাতে এই সভ্য রোগ প্রতীকারের বিধান অনুসন্ধান করা না কি বাতুলতা মাত্র! তাই তাহাকে উৎসাহ দেওয়া ত দূরের কথা, প্রশ্রয় দেওয়াই অমার্জ্জনীয় অপরাধ। সভ্য দেশজাত ঔষধের ব্যবস্থা ছাড়া এ রোগ প্রতীকারের অন্য উপায় নাই। তাই তাহা প্রচলিত করিবার জন্য এলোপ্যাথ চিকিৎসকগণ সৃষ্ট হইল,—কেল্লায় তোপ পড়িল, দেশের বক্ষে শোণিত নিঃসারণের আর একটি প্রশস্ত ছিদ্র কর্ত্তিত হইল। এই নিঃসারণপথ দিন দিন আয়তনে যত বৃদ্ধি হইতেছে, দেশের সভ্যরোগের প্রতীকার ত দূরের কথা, সংখ্যায় দ্বিগুণহারে বাড়িয়াই চলিয়াছে।

এই যে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশ প্রবলবেগে মৃত্যুর দিকে চলিয়াছে, ইহাকে রক্ষা করিতে হইলে যে দেশে ধন উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন, ইহার কোনও কাজেই এই দেশের শিরোমণিদের শুধু যোগ্যতা বা শিক্ষা নাই তাহা নহে, মস্তিষ্ক পরিচালনের ক্ষমতা বা ইচ্ছাও নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার "বাঙ্গালী মস্তিষ্কের অপব্যবহার" বক্তৃতায় দুঃখ ও ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন যে "যখন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি এবং গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, তখন বাংলার সেকালের শিরোমণিগণ আট বৎসর বয়স্কা বিধবার পক্ষে নির্জ্জলা একাদশী, না, একবেলা ফলাহারের ব্যবস্থা করা হইবে এই ভয়ঙ্কর জটিল সমস্যার মীমাংসায় এবং টিকটিকিটা মাথায় পড়িয়া হাঁচিয়াছিল, না, পড়িবার পূর্ব্বে হাঁচিয়াছিল তাহার ফলাফল বিচারে তাঁহাদিগের সটিকি মস্তিষ্ক ঘামাইতেছিলেন।" এসব

ত গেল পুরাকালের কথা। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমরা কি দেখিতে পাই? যে সৌদামিনীকে মেঘের কোলে খেলা করিতে দেখিয়া আমরা কখনও আনন্দিত ও কখনও শঙ্কিত হইতাম, সেই সৌদামিনীকে বর্ত্তমান ইয়োরোপের পণ্ডিতগণ আলোবাতির কাজে, পাখা টানার কাজে, বার্ত্তাবহর কাজে, কলকব্জা চালাইবার কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন। এখন আর তাঁহারা গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পরিদর্শন শুধু মাটীর উপর দাঁড়াইয়া করিয়াই ক্ষান্ত নহেন—এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়া গ্রহনক্ষত্রের দেশে যাইবার উপায় নির্দ্ধারণে ইহাদের মস্তিষ্ক নিয়োজিত। আর, আমাদের বর্ত্তমান শিরোমণিগণ, আসামীর বুটের ঠোক্করে লোকটা আগে মরিয়াছিল, না, তাহার প্লীহাটা আগে ফাটিয়াছিল, তাহা দর্শাইয়া বুটধারীর দোষের তারতম্য নির্দ্ধারণ, এবং সেই হত্যার জন্ম বুটধারী দায়ী, না, যে বুট প্রস্তুত করিয়াছে সে দায়ী, কিম্বা ম্যালেরিয়া দায়ী, তাহার মীমাংসায় তাঁহাদের সামলামণ্ডিত মস্তিষ্ক সকল ঘর্ম্মাক্ত করিতেছেন। শাস্ত্র মানে বোধ হয় আইন। পূর্ব্বে শিরোমণিগণ একাদশীর আলোচনা দ্বারা শাস্ত্র আলোচনাই করিতেন, এবং এখনকার শিরোমণিগণ প্লীহা কাটার আলোচনা দ্বারা শাস্ত্রই আলোচনা করিতেছেন। তবে পূর্ব্বের শিরোমণিগণ টিকি নাড়িয়া শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাহা দেশের কাজে, টোল চতুষ্পাঠী খুলিয়া, স্বদেশী জিনিস ক্রয় করিয়া ব্যয় করিতেন; কিন্তু বর্ত্তমান শিরোমণিগণ স‚মলা ঘুরাইয়া শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন করেন তাহা বিদেশী বণিকের সেবায় নিয়োজিত করিতেছেন। টিকি দ্বারা হয়ত মুষ্টিমেয় বালবিধবা নির্য্যাতিত হইত; কিন্তু সামলা, সমস্ত দেশটাকে বিধবা করিয়া মৃত্যুর মুখে টানিয়া লইতেছে। সত্য বটে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় শ্বেত আইনজ্ঞ আমলাগণই এদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, কিন্তু যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন যে, প্রকৃত রাজত্ব চালাইতেছে ইংরাজ বণিকগণ—যাহারা ইংলণ্ডের মত প্রকৃতি-লাঞ্ছিত দেশটাকে, বাহির হইতে ধনৈশ্বর্য্য আনিয়া, ভূস্বর্গে পরিণত করিয়াছে। কিছুদিন আগে কলিকাতার দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় এ দেশীয় কত হমরো চুমরো লোক কত আবেদন নিবেদন, কত কান্না-কাটি, কেহ বা চোখরাঙানি দ্বারাও শৈল শিখরে লাটের আসন একটুও টলাইতে পারেন নাই; কিন্তু যেই ইংরাজ বণিকের আঁধারে আলো চৌরঙ্গী-চেরাগ জ্বলিয়া উঠিল, অমনি লাট সাহেব সদল বলে কলিকাতায় আসিয়া হাজির হইলেন, এবং বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদের বুটের মচ্‌মচ্ মচ্‌মচ্ আওয়াজে বড় বাজারের এঁদোগলি পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্বেত আইনজ্ঞগণ শ্বেতবণিকের আজ্ঞাবহ বিশ্বস্ত প্রতিনিধির মত তাহাদের দেশের ধনবৃদ্ধির চেষ্টা ও সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আর আমাদের আইন-পেশাকরগণ দেশের মণিরূপে দেশের পয়সা ছলে বলে কৌশলে আদায় করিয়া নিজেদের ভোগ বিলাসিতা চরিতার্থ করিবার জন্ম বিদেশে প্রেরণ করিয়া দেশকে রাস্তার ভিখারীরূপে পরিণত করিতে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহারা দেশের ধনবৃদ্ধির কাজে অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্যের কাজে মস্তিষ্ক নিয়োজিত করিবার অবসর না পাইতে পারেন, কিন্তু অর্থ দিয়া তাহার সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ নহেন। সত্য বটে, ইহারা হয়ত কিছু টাকা কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য, হাতে হাতে ডিভিডেণ্ডের আশায় দিতে পারেন, কিন্তু শুধু টাকায় যে শিল্পবাণিজ্য হয় না তাহার প্রমাণ বাংলা দেশে হাতে হাতে পাওয়া গিয়াছে। ১৯১৯।২০ সালে ছয়মাসের মধ্যে শিল্প বাণিজ্যের জন্য লিমিটেড কোম্পানীর মারফতে টাকা উঠিয়াছিল দেড়শত কোটী। কিন্তু আজ কোথায় তদনুরূপ শিল্প ও বাণিজ্য আর কোথায় সেই টাকা? সত্য বটে অনেক টাকা এই সুযোগে ধনীর পকেট হইতে বিপন্ন ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত শ্রমজীবীদের হস্তে গিয়া তাহাদের অনাহার-ক্লিষ্ট উদরে দুই মুঠা অন্ন অন্ততঃ দুই চার দিনের জন্যও দিতে পারগ হইয়াছে; তাই গোটা দেশের পক্ষে তাহাতে বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই। এবং যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য ইয়োরোপে লক্ষ লক্ষ জীবন ক্ষয় এবং কোটী কোটী টাকা ধ্বংস হইতেছে তাহার তুলনায় এই সামান্য ক্ষতি ক্ষতির মধ্যেই গণ্য নয়; কিন্তু শিল্প-বাণিজ্য যে আঁধারে সেই আঁধারে। তাই ইহা অকাট্য প্রমাণ যে শুধু টাকায় শিল্পবাণিজ্য হয় না—তজ্জন্য উপযুক্ত ও শিক্ষিত লোক চাই। কিন্তু এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কঠোর সাধনা-সাধ্য কাজের কাজী হইবার জন্য কখনই মেধাবী লোক পাওয়া যাইবে না, যে পর্য্যন্ত না, বিনা আয়াসে বিনা দায়িত্বে পরস্কন্ধে আরোহণ করিয়া সসম্মানে আমীরী করিয়া জীবিকা অর্জ্জনের রাস্তা বন্ধ না হয়। হায়, এ রাস্তা কে বন্ধ করিবে? আচার্য্য প্রফুল্ল যতই চীৎকার করুন, পলতা পাতার ঝোলে এত শক্তি কখনই দান করিবে না যাহাতে তাঁহার চীৎকার এত উচ্চ হইবে যে, এই কপট নিদ্রিত লোকগুলির ঘুম ভাঙ্গিবে।

ইঁহাদের কেহ কেহ দেশকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে, যে পর্য্যন্ত না রাজনৈতিক পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন করা যায়, সে পর্য্যন্ত শিল্পই বল আর বাণিজ্য-কৃষিই বল কিছুরই কোনও উন্নতির আশা নাই; তাই সকল কাজের আগে তাঁহারা ইংরাজকে এদেশ ছাড়া করিতে প্রয়াসী। আমাদের মনে হয় ইঁহাদের এই কথাগুলিও অতীব কৃত্রিম। বোধ হয়, শিল্প বাণিজ্যের কাজে নিজেদের অক্ষমতার আলোচনাটা ধামা চাপা দিবার জন্য এই সব কথা বলা হয়; কারণ, প্রথমতঃ—ইঁহারা এত মূর্খ নহেন যে, এই কথাটা বুঝিতে অপারগ যে, গায়ের জোরে ইংরাজকে এদেশ ছাড়া করা তাঁহাদের অসাধ্য; দ্বিতীয়তঃ এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই যে, ইঁহারা দধীচির মত পরোপকারী, তাই দেশের জন্য—পরের জন্য নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইঁহারা বিশেষরূপেই জানেন, ইংরাজী আমল চলিয়া গেলে ইহারা ষাঁড়ের গোবরে—না যজ্ঞে না হোমে,—পরিণত হইবেন; কারণ, ইংরাজী আইনের ইন্‌টারপ্রিটেশনের কদর বুঝিবার লোক পাওয়া যাইবে না এবং বিলাতী ঔষধের প্রেসকৃপশন্ কাগজ, উৎসাহের অভাবে, সহানুভূতির অভাবে বেণের দোকানে পাঁচন জড়াইবার মোড়কের কাজে ব্যবহৃত হইবে। আর, যে ইংরাজী বুলি কণ্ঠস্থ করিয়া ইঁহারা নিজেদের শিক্ষিত ও গর্ব্বিত মনে করেন, সেই ইংরাজী বুলিরও কোনও কদর থাকিবে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—অতীত এবং বর্ত্তমানের মত ভবিষ্যতেও ইঁহাদের মতি পরিবর্ত্তনের কোনও আশা নাই। তাই

ইঁহাদের দ্বারা দেশের দুঃখ কষ্ট নিবারণকারী প্রকৃত স্বরাজ লাভের আশা করা বাতুলতা মাত্র।

ইঁহাদের স্বরাজ স্বরাজ বলিয়া চীৎকার করিবার উদ্দেশ্য আমাদের মনে হয়, বড় বড় কথায় দেশের লোককে মুগ্ধ করিয়া কাউন্সিলে প্রবেশ করা—কেহ কেহ নামের জন্য, কেহ বা পশার বৃদ্ধির জন্য এবং অনেকেই নিজেদের জন্য চৌষট্টি হাজারের মুক্তার মালা এবং নিজেদের আত্মীয় স্বজন ও দলের লোকদিগের জন্য সরকারী ছোট বড় সোণা রূপার মালা যোগাড় করিবার আশায়—যদিও ইঁহারা বাহিরে দরদ দেখাইয়া দেশবাসীকে বুঝাইতে চাহিতেছেন—কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া গ্রামের জলকষ্ট নিবারণ, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও দেশবাসীর সর্ব্বপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতার বন্দোবস্ত করিবেন, এবং তাঁহাদিগকে আকাশের চাঁদ হাতে দিবেন, এইরূপ আরও কত কিছু।

পদ্মনাভের আবেদন

পদ্মনাভ জিজ্ঞাসা করিতে চায়—গ্রামের লোকগুলির পুকুর কাটিবার মত পয়সা নাই কেন? দেশের যাহা কিছু সামান্য পয়সা তাহা ত তাহারাই উৎপাদন করে, তোমরা—এই সব অভিনব জীবেরাই ত তাহা ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করিয়া বিদেশী বণিকের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিতেছ। সেই পয়সাগুলি কেন তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও না? তজ্জন্য তোমাদিগের কাউন্সিলে যাইবার দরকার কি? রাজনৈতিক চালবাজীতে ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারিবে বা তাহাকে ঠকাইতে পারিবে এরূপ দুরাশা ভুলেও কখনও কর কি? এক হাতে বিদেশী জিনিসের উপর শুল্ক বসাইয়া, তুলাজাত শিল্পের এক্সাইজ শুল্ক উঠাইয়া দিয়া দেশী শিল্পের প্রোটেক্‌শন্; আবার অন্য হাতে এক্সচেঞ্জ হার বাড়াইয়া দিয়া দেশী শিল্পের ডেস্‌ট্রাক্‌শন; ইহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পার কি? তোমাদের নেতা হয়ত বলিবেন 'রেডিং সাহেব এদেশবাসীদের মনে এ পর্য্যন্ত অনেক কষ্ট দিয়াছেন, তাই যাইবার আগে ইহাদিগকে একটু সন্তুষ্ট করিবার জন্য দেশী শিল্প প্রটেক্‌শনের ভান করিয়া গেলেন; আর আরউইন্ সাহেব এদেশে নূতন আসিয়াছেন, এবং অনেক আশার কথা শুনাইয়া এদেশবাসীকে ইতিমধ্যেই অনেকটা মুগ্ধ করিয়াছেন, তাই এই সুযোগে যে অবিচারের ভানটা রেডিং সাহেব ল্যাঙ্কেশায়ার, বার্মিংহাম, সেফিল্ড ও ওয়েলস্‌এর উপর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা তিনি সংশোধন করিয়া লইবেন; কিন্তু তোমাদের চৌধুরী বা মুখার্জ্জ বা আরও অনেক হমরো চুমরো নেতা যে একবার সায় দেয় না, ষ্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ তাহার সাক্ষী। আর তাঁহারা যদি তাঁহাদের বিদ্যা জাহির নাও করিতেন, তাহা হইলেও কি মনে কর ইহার প্রতীকার করিবার তোমাদের ক্ষমতা আছে? না, ইংরাজ তোমাদের সেরূপ ক্ষমতা দিবেন বলিয়া আশা কর? তবে এই যে এক একটা প্রদেশ হইতেই অন্ততঃ তিন চৌষট্টি হাজার অতিরিক্ত টাকা তোমাদের পকেটে গ্রহণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছ, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে, এই টাকা কি শ্বেতদ্বীপ হইতে আমদানী হইবে? না, ওই অশিক্ষিত নামপ্রাপ্ত চাষাভুষা, যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই মৃত্যুর রাস্তায় দাঁড় করাইয়াছ, তাহাদিগের শেষ রক্তের ফোঁটা দিয়া প্রস্তুত হইবে? ইহা ত প্রমাণ হইয়া গিয়াছে যে ধন উৎপাদন করিবার তোমাদের ক্ষমতা নাই, তোমরা পরস্কন্ধে আরোহণ করিয়া চলিবার জীব (parasite)। গ্রামবাসীর রোগের প্রতীকার কিসে হইবে তাহা জানা আছে কি? বিলাতী ঔষধ খাওয়াইয়া তাহাদের শেষ রক্তটুকু শোষণ করিবে মাত্র, তাহাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না। বুঝিতে পার কি? তাহাদের ঔষধের তত দরকার নহে—দরকার পথ্যের, এবং সে পথ্য তোমরাই দিনদিন কাড়িয়া লইতেছ। আর গরীবের হাতে আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিতেছ—তাহাদিগকে বড় বড় চাকুরী দেওয়াইবে—ইংরাজের পরিবর্ত্তে দেশী লোক বড় বড় চাকুরী পাইবে। জান কি দেশের লোক, বড় বড় চাকুরীতে যে টাকা উপার্জ্জন করিবে তাহা কোথায় যাইবে? ইংরাজ কর্ম্মচারীরা যে পয়সা এদেশে উপার্জ্জন করে, তাহার প্রায় সমস্তই তাহারা এ দেশেই ব্যয় করে, কিন্তু সে পয়সা প্রকারান্তরে যায় তাহাদের নিজের দেশে। তোমার দেশের লোকেও তাহা সেই স্থানেই অর্থাৎ বিদেশেই পাঠাইবে। তাহাতে গোটা দেশের কিছু লাভ হইবে কি? এখন শ্বেত হস্তের মারফতে যায়, তখন কাল হস্তের মারফতে যাইবে, এই মাত্র পার্থক্য, কিন্তু যাইবে সেই এক স্থানেই। তাই বলি, কপটতা ছাড়। যদি প্রকৃতই দেশের প্রতি দরদ হইয়া থাকে, তবে পয়সা উৎপাদন করিবার মত কিছু কাজে হাত দাও এবং পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়, স্বজনকে সেই সব কাজের উপযুক্ত হইবার মত শিক্ষা দাও। দেখিবে, এক বিঘা জমীতে এখন কৃষক তাহার মাথার ঘর্ম্ম দিয়া যে এক মণ শস্য উৎপাদন করে, তোমাদের সন্তান-সন্ততিগণ শিক্ষা পাইলে তাহাদের মাথায় মগজ দিয়া সেখানে পাঁচ মণ উৎপাদন করিতে পারিবে। ঔষধপত্রের জন্য তখন সাগর পারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে না, এবং নিত্য নূতন বিলাস-দ্রব্য তখন হাতের কাছেই পাওয়া যাইবে। তাহারাও সুখে থাকিবে এবং দেশেরও দুর্দ্দশা ঘুচিবে। আর যদি তাহা না করিতে পার, তবে যাহাতে দেশের পয়সা বিদেশে যাইতে না পারে, অন্ততঃ সেরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হও। 'এক দেশের সহিত অন্য দেশের বাণিজ্য বিনিময়, উভয় দেশেরই উন্নতির কারণ; এই কথাটা তোতাপাখীর মত কণ্ঠস্থ করিয়া বিজ্ঞ ইকনমিষ্ট্‌ সাজিও না। মনে রাখিও, ও-কথা সমানে সমানে খাটে, তোমাদের মত অধঃপতিত দেশের উন্নতি সে নিয়মে হইবে না। ভুলিয়া যাইও না যে, বর্ত্তমান সময়ে তোমরা যাহা বিদেশকে দাও, তাহা বিদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য; নতুবা তাহাদের পক্ষে অনাহার। আর তাহারা তোমাদিগকে যাহা দেয় তাহা গ্রহণ করা, তোমাদের দেশের পক্ষে অনাহার। তাই বর্ত্তমান সময়ে তাহাদের গ্রহণ এবং তোমাদের বর্জ্জন একান্ত দরকার। পরে যখন তাহাদের সমান হইতে পারিবে, তখন দেশে দেশে 'বাণিজ্য বিনিময়ের' থিওরিটা খাটাইবার সময় আসিবে। তাই বলি, অন্ততঃ তোমাদের দলের লোকেরা বিদেশী জিনিসের ব্যবহার ছাড়। খাঁটী দেশী কাপড়—সে খদ্দরই হউক আর মিলেরই হউক,—ব্যবহার কর। তোমরা কোট প্যান্ট

পরিতে অভ্যস্ত, তাই মোটা খদ্দরে সে কাজ সুচারুরূপেই সম্পন্ন হইবে। গৃহের সব আসবাবপত্র দেশী জিনিসে প্রস্তুত কর। তোমরা বড় মানুষ, কাচের বাসন ছাড়িয়া সোণারূপার বাসন ব্যবহার করিয়া না হয় বাবুগিরী কর। মোটর ছাড়িয়া বড় বড় জুড়ী গাড়ী কর। সিগারেট ছাড়িয়া গড়গড়া ধর; তোমাদের অনেক দাসদাসী আছে, চব্বিশ ঘণ্টা কলিকার পর কলিকা বদলাইতে পারিবে। মফঃস্বলে যাইবার সময় নীলরংয়ের থলিয়ায় ত একবোঝা আইনের কেতাব বা অফিসের নথি লইয়া যাও, সেইরূপ না হয় একটা কাল রংয়ের থলিয়ায় গড়গড়াটাও সঙ্গে নিলে। জাহাজে রেলে তোমাদের চাকরেরা তামাক সাজিয়া দিবে। সঙ্গের যাত্রী যদি সাহেব থাকে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে পারিবে—তামাক খাওয়া কত বেশী বিজ্ঞানসম্মত। তোমরা দেশের বড় বড় মণি বলিয়া আখ্যা পাইয়াছ, তোমাদের দৃষ্টান্তে আরও হাজার হাজার ছোট ছোট মণিরা দেশী জিনিসের ব্যবহার আরম্ভ করিবে। ক্রমে দেখিবে গ্রামে গ্রামে কৃষক মজুর, যাহাদের ভিতরেও তোমাদের বিষ কম-বেশী প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা মোটা খদ্দরের গড়া পুনরায় আনন্দের সহিত পরিধান করিতেছে, কৃষকপত্নী কাচের চুড়ী খুলিয়া ফেলিয়া আগের মত রূপার চুড়ী ও রূপার পৈঁচা গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে অধিকতর সুন্দরী মনে করিতেছে। রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং করিতে হইবে না, তাই তোমাদের জেলে যাইবার ভয় নাই। এইরূপে দেশের বেকার সমস্যার মীমাংসা সহজেই হইবে। তোমাদেরও বাবুগিরী চলিবে এবং দেশের লোকেও দুঃখ দৈন্য হইতে অনেকটা অব্যাহতি পাইবে। এবং যে ইংরাজকে তাড়াইবার জন্য এত গলাবাজী করিয়া অনর্থক কণ্ঠ বিদীর্ণ করিতেছ,—তোমরা মানুষ হইয়াছ বুঝিতে পারিলে, ভূতের ব্যাপার খাটিবার জন্য তাহারা এক মুহূর্তও এদেশে থাকিবে না।

ইংরাজের নিকট মানুষ হইবার অর্থ কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছ কি? তোমরা হাইকোর্টের উচ্চতম বিচারাসনে বসিবার যোগ্য হইয়াছ, প্রিভি কাউন্সিলে বিচারকের আসন পাইবারও তোমরা অনুপযুক্ত নও। রাজকার্য্য পরিচালনে বড় ছোট লাটদের খাস দরবারে তোমাদের লোকেরা পরামর্শদাতা হইবারও যোগ্য হইয়াছে। তোমাদের হাজার হাজার লোক আইন সভার সভ্য হইবার উপযুক্ত। ডাক বিভাগের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইবারও যোগ্যতা তোমাদের আছে—তাহাও ইংরাজ অস্বীকার করে না। অন্য কাজের কথা ত দূরের কথা, তোমাদের মধ্যে লাট সাহেবের পদ পাইবার উপযুক্ত লোকও আছে, তাহারও প্রমাণ ইংরাজেরাই তোমাদিগকে দেখাইয়াছে। সর্ব্বোপরি—ভারত-শাসন কার্য্যের বল্গা যাহাদের হাতে, তাহাদের একজন হইবারও তোমাদের যোগ্যতা হইয়াছে, ইহা দেখাইতেও ইংরাজ কার্পণ্য করে নাই। তথাপি ইংরাজের চক্ষে তোমরা মানুষ হও নাই। কারণ, তাহারা জানে, উপরিউক্ত কাজ সকল যন্ত্র দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থ, ঐ সকল যন্ত্র অনায়াসেই চালাইতে পারে। তাই তাহাদের মতে প্রকৃত মানুষ তাহারাই যাহারা যন্ত্র-পরিচালক অর্থ উৎপাদন, রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত। ইংরাজেরা যে বলে, তোমরা মানুষ হইলে তাহারা এদেশের ট্রাষ্টিশিপ্ ছাড়িয়া সেই মুহূর্ত্তেই চলিয়া যাইবে, এ কথা অতীব সত্য! ইহা অবিশ্বাস করিয়া আত্মপ্রতারিত হইও না; মানুষ হও। মনে আছে কি? ভঙ্গ-বঙ্গ কে যোড়া লাগাইয়াছিল? আর, এ কাজও যদি না পার, তবে অন্য যাহা হয় কর, কিন্তু, দেশের জন্য স্বরাজ স্বরাজ করিয়া চীৎকার করিয়া দেশের লোকগুলিকে আরও প্রতারিত করিয়া তোমাদের পাপের বোঝা বাড়াইও না—এই পদ্মনাভের আবেদন।

হয় ত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

হয় ত আমার এ পথে আর হবে না ক আসা,
দুধারে যাই রোপণ করে বুকের ভালবাসা।
ধূলার এ পথ যাই ভিজায়ে,
শ্যামল আসন যাই বিছায়ে;
অমর করে যাই রেখে যাই ক্ষণিক কাঁদা হাসা।

সরায়ে দিই পথের কাঁটা ছড়ায়ে যাই ফুল;
নিকায়ে যাই স্নেহের বেদী ছায়া-তরুর মূল।
মমতা মোর পথের কীটও
পায় যেন হায় পায় যেন গো
বনবিহগের কণ্ঠে আমার অমর হউক ভাষা।

ভক্তিবিহীন সম্বলহীন দুঃখী অকপট
শক্তি নাহি গড়তে দেউল, সান্ত্বনারি মঠ।
দরদী এই দীনের হিয়া
নিঝরে যাক্ প্রণয় দিয়া,
হয় ত কোনো তৃষিতেরি মিট্‌তে পারে তৃষা।

জানিনে এই মানব জনম আবার পাব কি না;
নিরুদ্দেশের যাত্রী রাখি প্রণয়-রাখীর চিণা।
অনুভূতির ছিন্ন সত্র
যাই রয়ে যাই যত্রতত্র
পারবে না যা করতে পরশ কালের কর্ম্মনাশা।

হয় ত কারো হরবে ক্ষুধা আমার তরুর ফল
স্নিগ্ধ কারো করবে দেহ অশ্রু দীঘির জল।
ঝরা ফুলের গন্ধে ওরে
হয় ত কেহ স্মরবে মোরে,
ভাবুক পথিক বলবে হেসে—লোকটা ছিল খাসা।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বার্ণাড্‌শ—

"শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশা" (Mrs. Warren's Profession) নাটকখানি বার্ণাড্‌শ' ১৮৯৪ সালে রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নাটকখানি দুনীতিমূলক বিবেচিত হওয়ায় ইংলণ্ডের সাধারণ নাট্যশালায় এর অভিনয় নিষিদ্ধ হয়েছিল। শুধু এক গণিকার জীবন নিয়ে এই নাটক রচিত বলেই নয়,—এই নাটকের নায়িকা শ্রীমতী ওয়ারেণ তাঁর গণিকাবৃত্তিকে অলঙ্ঘনীয় যুক্তি-তর্কের দ্বারা নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন বলেই Censor বিভাগের প্রধান রাজকর্ম্মচারী এ নাটকের অভিনয়ে আপত্তি জানিয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করেছিলেন। সাধারণ নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁর এই নাটকখানির অভিনয়ে রাজ-অনুমতি না পাওয়াতে এ নাটকখানি দীর্ঘ আট বৎসরকাল অনভিনীত পড়েছিল। তারপর 'ষ্টেজ সোসাইটীর' কয়েকজন উৎসাহী সভ্যের চেষ্টায় "নিউ লিরিক ক্লাবের" নাট্যমঞ্চে ১৯০২ সালের ৫ই ও ৬ই জানুয়ারী "শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশার" সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য অভিনয় হয়েছিল।

যে সব ভাগ্যবান দর্শকেরা এই নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এই শক্তিশালী নাট্যকারের যশোগাথা না গেয়ে থাকতে পারেন নি। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁদের বিভিন্ন পত্রিকায় সে নাটকখানির যে প্রচণ্ড বিরুদ্ধ সমালোচনা প্রকাশ করলেন তার মর্ম্মার্থ Censorএর কর্ত্তৃপক্ষের মতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র!—অর্থাৎ, এ নাটক অভিনয় হ'লে সমাজে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হবে! দুঃস্থ দরিদ্র বালিকাদের বারবিলাসিনী-বৃত্তি অবলম্বনে প্রলুব্ধ করা হবে, মানুষের প্রচলিত ন্যায় অন্যায় ও উচিতানুচিতের আদর্শ সর্ব্বপ্রকারে ক্ষুণ্ণ হবে, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মযাজকদের প্রতি লোকের ভক্তি ও বিশ্বাস শিথিল হ'য়ে পড়বে—ইত্যাদি।

কিন্তু বার্ণাড্‌শ'র সঙ্গে একমত হ'য়ে আমরা এ কথা জোর ক'রে বলতে পারি যে এই সব সমালোচনা একেবারে মূল্যহীন ও নিরর্থক। সমাজের ভিতরের গলদ্—তার আভ্যন্তরীণ বিষাক্ত ক্ষত—যে লেখক অনাবৃত করে দেখাবার চেষ্টা করে, সমাজের ক্ষতি সে কিছু করুক বা না করুক,—সমাজের ক্ষতি ক'রে তারাই সকলের চেয়ে বেশী—যারা সেই গরল-ক্ষত কেবলই চাপা দিয়ে রেখে—নিজেদের সমস্ত সমাজ শরীরকে পচিয়ে তোলায় যত্নবান!—যারা নিজেদের ঘরের গলদ নীতির আড়ালে লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে নিজেদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা—শ্লীলতার আবরণে গোপন করতে চায়!

সমাজের মঙ্গল-চেষ্টার ভাণ ক'রতে গিয়ে সেই সব কাপুরুষেরাই সমাজের সকলের চেয়ে বেশী অপকার করে! তাদের দুর্ব্বল অন্তরের ভণ্ডামীই মানব পরিবারের শুভ ও কল্যাণের প্রকৃত পরিপন্থী। যারা এ সত্য মনে প্রাণে অবগত আছে—এমন কি, প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছে যে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে কেমন করে মনের সমস্ত সৎ ও পুণ্য আদর্শ ক্রমশঃ ম্লান হ'য়ে পড়ছে এবং ধনবান অসচ্চরিত্রের দল তাদের অপর্য্যাপ্ত অর্থের বলে পাপের প্রলোভনকে প্রতিদিন কেমন উজ্জ্বল করে তুলছে—যার সংঘাতে সমাজ-হিতৈষীরা ছোটখাটো আশ্রম খুলে, দু' চারজনকে আশ্রয় দিয়ে—ধনভাণ্ডার খুলে অভাবগ্রস্তদের যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করে, ধর্ম্মকথা, তত্ত্বকথা, সদুপদেশ প্রভৃতি শুনিয়ে—এ জীবনে মহাব্যাধির বিভীষিকা এবং দেহান্তে স্বর্গের প্রলোভন ও নরকের ভয় দেখিয়েও কিছুতেই সতীত্বকে পণ্য ক'রে তোলা অথবা নারীত্বের ব্যাভিচার হওয়া রোধ করতে পারছেন না। ধনী ক্রেতার নিত্যনব লুব্ধকর প্রস্তাব—দুঃখ দুর্দ্দশার দুর্ব্বিষহ জ্বালার মধ্যে অসহায়াদের মুক্তির অভয়বাণী শুনিয়ে তাদের নারীর যৌন আকর্ষণ বৃত্তিরই ব্যবসায়ী করে তুলে।

"শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশায়" মনীষী বার্ণাড্‌শ' নারীর

জীবন-সমস্যার এই দিকটাই বিশদভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। এই নাটকের পাত্র পাত্রী মোটে ছ'জন। শ্রীমতী ওয়ারেণ ও তাঁর কন্যা ভাইভী, শ্রীমতী ওয়ারেণের বন্ধু বিখ্যাত ধনী সার জর্জ্জ ক্রফট্‌স এবং স্থাপত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত প্রেড্‌। এছাড়া আরও ছ'জন আছেন, রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গার্ডনার ও তাঁর পুত্র ফ্রাঙ্ক্‌। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ গার্ডনার হচ্ছেন হ্যাশলেমেয়ার গ্রামের ধর্ম্ম রক্ষক, গীর্জ্জাপালক ও তত্ত্বজ্ঞানের তত্ত্বাবধায়ক। তাঁরই একমাত্র আদরের পুত্র স্বেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল তরুণ যুবা ফ্র্যাঙ্ক।

শ্রীমতী ওয়ারেণ তাঁর কন্যা ভাইভীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতা করে তুলেছিলেন। ভাইভী এতদিন তার মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পায়নি; কারণ সে ইস্কুল কলেজের বোর্ডিংয়েই মানুষ হয়েছিল। এবার সে কলেজের লেখাপড়া সব শেষ ক'রে অঙ্কশাস্ত্রে র‍্যাংলার ট্রাইপোজ হ'য়ে দিনকতকের জন্য তার মার বিশেষ অনুরোধে হ্যাশলেমেয়ারে বিশ্রাম করতে এসেছিল। এখানে সে একাই ছিল। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই গৃহ-সংলগ্ন উদ্যানের একটী ছায়া-শীতল অংশে একটি দোল্‌নায় (Hammock) তরুণী ভাইভী অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানি বই পড়ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পেন্সিলে কি সব টুকছে!

এই সময় বাগানের বেড়ার ধারে 'প্রেড' এসে হাজির হল। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে তার বয়স, দেখতে অনেকটা শিল্পী গোছেরই বটে। পোষাক পরিচ্ছদ খুব কেতা-দোরস্ত না হ'লেও বেশ সুপরিচ্ছন্ন ও সযত্নবিন্যস্ত। গোঁফ আছে কিন্তু দাড়ী কামানো। মাথায় রেশমী চিকণ কালোচুল, তার মধ্যে স্থানে স্থানে পাক ধরতে সুরু হয়েছে। গোঁফ জোড়াটি কিন্তু এখনও বেশ কুচ্‌-কুচ করছে কালো। বেড়ার ওধার থেকে অনেকক্ষণ চারিদিক দেখে দোলনার উপর ভাইভীকে লক্ষ্য ক'রে মাথার টুপী খুলে অভিবাদন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন "মাপ করবেন, আপনাকে বিরক্ত করছি,—শ্রীমতী এ্যালিসনের "হাইণ্ডহেড্‌ ভিউ" কুটীরটি কোন্‌দিকে ব'লতে পারেন?

একবার মাত্র বই থেকে মুখ তুলে—"এইটেই সেই বাড়ী" বলে ভাইভী আবার নিজের কাজে মন দিলে।

প্রেড্‌ বললে "ও! বটে! তাহ'লে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনার নামই কি কুমারী ভাইভী ওয়ারেণ?" একটু কঠোর ভাবে "হ্যাঁ" বলে ভাইভী এবার দোলনার উপরই একটু পাশ ফিরে ভাল ক'রে প্রেডের চেহারাটা দেখে নিলে।

প্রেড বিনীত ভাবে বললে, "আপনাকে বড় জ্বালাতন করা হ'চ্ছে, আমার নাম প্রেড—"

নাম শুনেই ভাইভী হাতের বইখানা পাশের একখানা চেয়ারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দোল্‌না থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল'। প্রেড্‌ তাড়াতাড়ি বলে উঠল "থাক্‌-থাক্‌, আমার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না!"

"আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন। আপনাকে দেখে খুশী হলুম মিঃ প্রেড্‌!" বলতে বলতে করমর্দ্দন করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভাইভী বেড়ার ফটকের দিকে এগিয়ে গেল, প্রেড্‌ তখন ভিতরে ঢুকেছে। মেয়েটি যখন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রেডের হাতখানি নিজের মুঠোর মধ্যে বাগিয়ে ধরলে, প্রেড চেয়ে দেখলে মেয়েটি সুন্দরী না হ'লেও বেশ একটা শ্রী আছে, চোখ দুটি দেখলে তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিমতী বলে মনে হয়, বয়স বছর বাইশ। সুস্থ, সবল, আত্মসংযত, দৃঢ়চিত্ত, কর্ম্ম-তৎপর নারী। পরিধানে তার একটি সাদাসিধে কাজের লোকের মতো পোষাক বটে, কিন্তু সেটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুদৃশ্য! কটিতে একটি কোমরবন্ধ আঁটা, তা থেকে সরু চেনে বাঁধা একটি ফাউণ্টেন পেন আর একখানি কাগজকাটা ছুরি ঝুলছে।

তারপর ভাইভী প্রেডকে খাতির করে চেয়ার দিয়ে বসিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতে সুরু করে দিলে। তাদের কথাবার্ত্তার কতক কতক অংশ এইখানে তুলে দিচ্ছি, তাথেকে এই ভাইভী মেয়েটির চরিত্র অনেকখানি বোঝা যাবে—এবং তাদের মাতা ও কন্যার সম্বন্ধও উপস্থিত কী রকম তাও কতকটা জানতে পারা যাবে।

প্রেড—আপনার মা এসে পৌছেছেন?

ভাইভী—মা আসছেন নাকি?

প্রেড—সেকি! আমরা আসছি আপনি জানেন না?

ভাইভী—না!

প্রেড—বাঃ! আপনার মা'ই তো সব ব্যবস্থা করেছেন, যে; তিনি আজ লণ্ডন থেকে এখানে এসে পৌছবেন, আর

আমি হর্স্‌হাম্ থেকে আসবো। আপনার সঙ্গে তিনি আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেবেন কথা ছিল!

ভাইভী—তাই নাকি! হুঁ! মার ঐ এক চালাকী—আমাকে অবাক্ করে দেবার মৎলব! তিনি না থাকলে আমি কী ভাবে চলি সেইটেই বোধ হয় তাঁর দেখবার উদ্দেশ্য! আচ্ছা, আমিও একদিন মাকে এমন জব্দ করবো! আমাকে আগে কিছু না ব'লে—বিন্দু বিসর্গ না জানিয়ে তিনি কেন আমার সম্বন্ধে এরকম সব ব্যবস্থা করেন!

* * * * *

প্রেড্—আচ্ছা, চলুন না—আপনার মাকে আনতে ষ্টেশনে গেলে হয় না?

ভাইভী—কেন? এ বাড়ীর পথ তো মার অচেনা নয়!

মেয়ের মুখে এ রকম উত্তর পেয়ে প্রেড্ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল'। ভাইভী সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলতে লাগল—"দেখুন, মার বন্ধুদের মধ্যে আমি কারুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে চাইনি, শুধু আপনার কথা শুনে আপনার সঙ্গেই দেখা করতে ও আলাপ করতে চেয়েছিলেম। আপনি জানেন না বোধ হয়—আপনাকে আমি মনে মনে ঠিক যেমনটি দেখবো বলে আশা করেছিলুম, ঠিক সেই মানুষটি মিলিয়ে পেয়েছি! আচ্ছা, আমার সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে বোধ হয় আপনি অনিচ্ছুক নন, কেমন?

প্রেডের মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে খুসী হ'য়ে হাসি মুখে বললে—"বেশ-বেশ! ধন্যবাদ কুমারী ওয়ারেন, ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার মা যে আপনাকে এখনও নষ্ট করেন নি—এ দেখে আমি ভারি খুসী হলুম।

ভাইভী—কী রকম?

প্রেড—অর্থাৎ—আপনাকে সভ্যতার কপট আদপ-কায়দা শিখিয়ে আপনার সরলতাটুকু এখনও তিনি মাটি করে দেননি। দেখুন, আমি একজন আজন্ম 'বিদ্রোহী!' শাসনের বাধ্যতা আমি মোটেই পছন্দ করি না! ওইটের জন্যেই পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের যে স্নেহের সম্বন্ধ—সেটা শুদ্ধ নষ্ট হয়ে যায়! এমন কি, জননী ও কন্যার মধ্যেও! আমার বরাবরই একটা আশঙ্কা ছিল যে, আপনার মা বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনাকে প্রাণপণ যত্নে একটা সামাজিক কেতা-দুরস্ত কলের পুতুল করে তুলবেন। কিন্তু এসে দেখছি—তিনি আপনাকে এখনও সে রকম একটি জীব করে তুলেন নি। আঃ! যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম!......আপনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে র‍্যাংলার পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন শুনে আপনাকে দেখবার জন্য, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমার একটা বিপুল আগ্রহ ছিল মনে! স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সম্মান অর্জ্জন করা একটা কত বড় গৌরবের কথা! নারীর শিক্ষার কতখানি উৎকর্ষ লাভ!

ভাইভী—শিক্ষার উৎকর্ষ! রামঃ! আপনি কি তাই মনে করেন মিঃ প্রেড্? অঙ্কশাস্ত্রে এই ত্রিগুণ সম্মানের অধিকারী হওয়া মানে কি আপনি কিছু জানেন? মানে—প্রতি দিন ছ'ঘণ্টা, আটঘণ্টা ধরে অঙ্কের ঢেঁকিতে মাথা কোটা—শুভঙ্করের যাঁতায় নিষ্পেষিত হওয়া! লোকে মনে করে আমি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু কিছু জানি, কিন্তু যথার্থ কথা বলতে গেলে—আমি কেবল বিজ্ঞান সংক্রান্ত অঙ্ক বিভাগ ছাড়া আসল বিজ্ঞানের কিছুই জানি না! ইঞ্জিনীয়ারদের হয়ে, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর হয়ে, ইনসিওরেন্স্ কোম্পানীর হয়ে, আমি কষা-মাজার হিসেব সব করে দিতে পারি বটে, কিন্তু ইঞ্জিনীয়ারীং, ইলেক্‌ট্রিসিটি বা ইনসিওরেন্সের সম্বন্ধে প্রকৃত পক্ষে কিছুই জানি নি! আরে ছাই, অঙ্কই কী ভাল রকম জানি? পরীক্ষায় পাশ করিছি বটে, কিন্তু যারা এই অঙ্কশাস্ত্রে ত্রিগুণ সম্মান অর্জ্জনের চেষ্টা দেখাতে যায় নি, সে সব মেয়েদের চেয়ে আমি যে কত বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ তার আর পরিমাণ হয় না। অঙ্কশাস্ত্রের বাহিরে—জানি আমি কেবল—খাওয়া, ঘুমোনো, টেনিস খেলা, সাইকেলে চড়া আর হাঁটা!

প্রেড্—(চটে উঠে) কি সর্ব্বনেশে, বেয়াড়া, বিশ্রী ব্যবস্থা আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির? আমি এ বরাবর জানতুম! যা কিছু জগতের নারীত্বকে সৌন্দর্য্যময় ক'রে তোলে,—এর চাপে সে সমস্তই নষ্ট হয়ে যায়!

ভাইভী—আরে সেজন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। আপনি দেখে নেবেন—আমি এই বিদ্যেটা কি রকম কাজে লাগাই!

প্রেড—সে কি রকম—কি করে?

ভাইভী—আমি লণ্ডনে গিয়ে এক অফিস খুলে বস্‌বো। সেখানে যত কোম্পানীর হিসাব-নিকাশ দেখা, কষা-মাজার

কাজ, এ সমস্ত দস্তুর মতো চল্‌বে। এ ছাড়া আইন সংক্রান্ত কাজও ক'রবো, ষ্টক্ এক্স্‌চেঞ্জেও নজর রাখবো। আমি কি এখানে ছুটীতে হাওয়া খেতে এসেছি মনে করেন? মা তাই ভাবছেন বটে, আমি কিন্তু এখানে এসেছি একটু বেশ নিরি-বিলি থেকে আইন অধ্যয়ন করতে। ছুটী আমার ভাল লাগে না।

প্রেড—আপনার কথা শুনে আমার দেহের রক্ত হিম হয়ে গেল! বলেন কি আপনি! আপনার জীবনে কোনও রঙীন স্বপ্ন নেই? কোনও শোভা, কোনও সৌন্দর্য্য উপ-ভোগের ইচ্ছা নেই?

ভাইভী—নাঃ! ওসব চাই না। আমি কাজ চাই, কাজ করতে ভালবাসি, খেটে উপার্জ্জন করতে ভালবাসি। কাজ করে পরিশ্রান্ত হ'লে, আমি চাই একটি আরাম কেদারায় বেশ হেলান দিয়ে, একটি সিগার, একটু হুইস্কী, আর একখানি বেশ গোয়েন্দা-কাহিনী গোছ উপন্যাস নিয়ে বসতে!

প্রেড্—(চঞ্চলভাবে) না না, এ হতেই পারে না! এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না! আমি—একজন আর্টিষ্ট হয়ে কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করতে পারবোনা, মিস্ ওয়ারেণ্! আপনি এখনও জানেন না—আবিষ্কার করতে পারেন নি, কিন্তু আমি বেশ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—শিল্পরাজ্য আপনার জন্য এক অভিনব বিস্ময়কর জীবন গড়ে দেবে!

ভাইভী—সেও হয়েছে। গেল বছর ফাল্গুন-চোতে দেড়মাস লণ্ডনে আমার বন্ধু শ্রীমতী হনোরীয়া ফ্রেজারের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছি। মা ভেবেছিল আমরা দুজনে বুঝি শহর দেখে বেড়াচ্ছি,—কিন্তু আমি থাকতুম সারাদিন চান্সারী লেনে হনোরীয়ার আপিসে। সেখানে তার যত কষামাজা—হিসেবের কাজ—সেই সবে তাকে সাহায্য করতুম। সন্ধ্যের সময় দু'জনে মুখোমুখী হয়ে বসে চুরুট খেতুম আর গল্প করতুম, খানিকটা ব্যায়ামের প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বেরুতুমই না। আঃ! কী আরামেই ছিলুম সেই ছ'টা সপ্তাহ! সেই দেড়মাস লণ্ডনে থাকার সমস্ত খরচ আমি নিজে রোজগার করে দিয়েছি, তাছাড়া, হনোরীয়ার ব্যবসাটাও তো বিনাপয়সায় শিখে ফেলা গেল—কি বলেন?

প্রেড্—হাঁ, কিন্তু—অন্তর্যামী জানেন—মিস্ ওয়া-রেণ্—ওকে কি আপনি আর্টের জগতে থাকা বলেন?—

ভাইভী—আহা, শুনুন না,. তারপর; আরও আছে—এখনও সুরুই হয়নি! ফিট্‌জন এ্যাভেনিউ থেকে জন-কতক কলা-সেবকের নিমন্ত্রণ পেয়ে আমি দিনকয়েক মফঃস্বলে গেছলুম। শিল্পীদের মধ্যে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে নিউনহামে পড়তো। তারা আমাকে জাতীয় চিত্র-শালায় ঘুরিয়ে নিয়ে এল, একদিন গীতিনাট্যের অভিনয় শোনাতে নিয়ে গেল, একদিন সেখানকার গানবাজনার জল্‌সায় যাওয়া হল। বাজিয়েরা সারাটা সন্ধ্যে কেবলই 'বীথোভেন', 'ওয়াগনার্' করলে! আমি তো লক্ষটাকা দিলেও আর সে দলের পাল্লায় গিয়ে পড়ছি না! নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরে অতি কষ্টে আমি তেরাত্রি কাটিয়েছিলুম। তারপরই দে-পিট্টান! একেবারে লণ্ডনে চান্সারী লেনে এসে হাজির আবার!...এখন বুঝতে পারছেন তো যে কীরকম একালের হ্যালফ্যাশানের নিখুঁৎ মেয়ে আমি? আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, মার সঙ্গে আমার—ব'নবে? কি রকম বলুন তো!—

প্রেড্ এ প্রশ্নের উত্তরে একটু ইতস্ততঃ করছিল; কিন্তু ভাইভীর পেড়াপীড়িতে শেষ বলে ফেললে সে—হাঁা, তা আপনার মা একটু হতাশ হবেন বটে! অবশ্য সেটা আপনার কোনও গুণের অভাব দেখে নয়, তাঁর আদর্শের সঙ্গে আপনার পার্থক্য খুব বেশী ব'লে!

ভাইভী—মার আদর্শটা কীরকম?—

প্রেড্—দেখুন, আপনি বোধ হয় এটা লক্ষ্য করে থাকবেন—যেসব লোক তাদের বাল্যজীবনটায় তেমন সন্তোষজনক ভাবে মানুষ হ'তে পারেনি বলে মনের মধ্যে একটা আক্ষেপ পোষণ করে—তাদের ধারণা যে—সবাই যদি ঠিক 'ভাল' ভাবে মানুষ হবার সুযোগ পায়, তাহলে, পৃথিবীতে আর কোনও অবিচারের অভিযোগ থাকে না! তাই, আপনার মার প্রথম জীবনটা—আপনি বোধ হয় নিশ্চয় জানেন—

ভাইভী—আমি তার কিছুই জানি না। সেই তো হচ্ছে আমার মুস্কিল! আপনি ভুলে যাচ্ছেন মিঃ প্রেড্ যে আমি আমার মাকে মোটেই জানি না। শিশুকাল থেকে আমি ইংলণ্ডে আছি। ইস্কুল কলেজেই আমার প্রথম জীবনটা কেটেছে। বোর্ডিংয়ে আমি বরাবর বাস করে এসেছি। মা চিরকাল ব্রাশেলী কিম্বা ভীয়েনায়

থাকতেন। কদাচ কখন তিনি ইংলণ্ডে এলে তবে তাঁর সঙ্গে হু'চার দিনের জন্ম আমার দেখা-সাক্ষাৎ হ'তো। তবে সেজন্ম আমার অভিযোগ করবার কিছু নেই। আমার কোনও অভাব তিনি রাখেন নি। বেশ আরামে—আনন্দে—সুখেই আমার শৈশব কেটেছে! জলের মতো তিনি আমার জন্মে টাকা খরচ করেছেন। কিন্তু মার সম্বন্ধে আমি একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আপনি তাঁকে যতটা জানেন, আমি তাও জানি না!

ভাইভী তার মার ইতিহাস কিছু জানেনা শুনে, প্রেড্ কথাটা পেড়ে বড় আহাম্মুকী করেছে বুঝতে পেরে, সে প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্ম অন্য কথা পাড়লে। কিন্তু ভাইভী বোকা মেয়ে নয়; সে বললে "দেখুন, মিঃ প্রেড্, আপনার এই কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা যে আমি বুঝতে পারছি না, আমাকে আপনি এতটা গাধা মনে করবেন না, কিন্তু এতে আপনি বরং মার সম্বন্ধে আমার একটা বিষম সন্দেহ আরও বাড়িয়ে তুলছেন!"

প্রেড্ অনেকরকমে ভাইভীকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগল যে ভাইভীর উচিত তার মার কাছ থেকেই এসব শোনা! প্রেডের পক্ষে, মেয়ের কাছে তার মার সম্বন্ধে কিছু বলা উচিতও নয় এবং শোভনও নয়।

কিন্তু ভাইভী নাছোড়বন্দা। অগত্যা প্রেড্ অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে যখন শ্রীমতী ওয়ারেণের কথা ভাইভীকে বলতে উদ্যত হয়েছে, ঠিক সেই সময় শ্রীমতী ওয়ারেণ এবং সার জর্জ্জ ক্রফ্‌ট্‌স্ এসে হাজির হলেন।

শ্রীমতী ওয়ারেণের বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। দেখতে রূপসী—সুন্দরী; পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ দামী ও সুদৃশ্য। হাবভাব ঈষৎ বেচাল। চোখেমুখে একটা বিজয়িনার গর্ব্ব প্রতিভাত। মোটের উপর তার চালচলন অনেকটা ভদ্র সমাজের মেয়েদের মতোই!

সার্ জর্জ্জ ক্রফ্‌ট্‌স্ বেশ লম্বা চওড়া বলিষ্ঠ পুরুষ, বয়স পঞ্চাশের বেশী হবে না। তরুণ যুবকদের মতো হাল ফ্যাশানের পোষাক পরা। ঈষৎ নাকীসুরে কথা কন। গোঁফ দাড়ী কামানো, বুলডগের মতো চওড়া চোয়াল, বড় বড় চ্যাপ্টা কান, মোটা ঘাড়। দেখলেই শহরের বয়াটে ভদ্রলোক বলে চেনা যায়।

শ্রীমতী ওয়ারেণ কন্যার সঙ্গে সার্ জর্জ্জ ক্রফ্‌ট্‌সের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সার জর্জ্জ ভাইভীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এক ফাঁকে মা ও মেয়ে উপস্থিত নেই দেখে ক্রফ্‌ট্‌স্ প্রেডকে জিজ্ঞাসা করলেন "এ মেয়েটি কার তুমি জানো প্রেড্? কিটীর কাছে কখনও শুনেছো।"

শ্রীমতী ওয়ারেণের বন্ধুরা তাঁকে তাঁর ডাক নাম 'কিটী' বলেই সম্ভাষণ করতেন।

প্রেড্—না, কখনও শুনিনি।

ক্রফ্‌ট্‌স্—কার মেয়ে বলে তোমার ধারণা হয়—বলতে পারো?

প্রেড্—না, তাও পারলুম না।

ক্রফ্‌ট্‌স্ কিন্তু প্রেডের কথা বিশ্বাস না ক'রে, প্রেড নিশ্চয়ই জানে, বলছে না, ভেবে তাকে বলবার জন্ম মহা পীড়াপীড়ি সুরু করলে। প্রেড ক্রমাগতই বলে সে কিছু জানে না! তখন ক্রফ্‌ট্‌স্ তাকে গম্ভীরভাবে বললে, দেখো ভাই, এতক'রে জিজ্ঞাসা করছি কেন জানো?—মেয়েটাকে দেখে পর্য্যন্ত ওরওপর কেমন—কেমন যেন আমার একটা টান পড়েছে—

প্রেড্ এ কথা শুনে চম্‌কে উঠল্ দেখে ক্রফ্‌ট্‌স্ বললে "ভয় নেই; এ নিষ্পাপ আকর্ষণ! এইজন্যই ত আমি বড় ধোঁকায় পড়িছি! কে জানে বলো, হয় তো বেটী আমারই মেয়ে—তারই বা ঠিক কি?"

প্রেড্—না না! সে হতেই পারে না! তোমার সঙ্গে ওর আকৃতি প্রকৃতির তো কোনও সৌসাদৃশ্য নেই!

ক্রফ্‌ট্‌স্—আরে, সে ধরতে গেলে ওর মার সঙ্গেও তো ওর কিছুই মেলে না? আচ্ছা, ও তোমার মেয়ে নয় ত?"

প্রেড্ প্রথমটা ঘৃণাভ'রে তার দিকে চেয়ে পরে শান্ত ও গম্ভীরভাবে বললে "দেখো, তোমায় আজ একটা স্পষ্ট কথা বলি শোনো—শ্রীমতী ওয়ারেণের সঙ্গে আমার সেরকম কিছু সম্পর্ক কোনও দিনই ছিল না এবং এখনও নেই। তার জীবনরহস্যের গুপ্ত দিকটা আমি কোনও দিনই জানতে চাইনি; সেও বলেনি। তবে এ কথা বোধ হয় তোমায় ব'লে বুঝিয়ে দিতে হবে না যে, কোনও অসহায়া সুন্দরী স্ত্রীলোকের এমন দুএকজন বন্ধুও থাকা দরকার—যাদের সঙ্গে তার দেহের কোনও সম্বন্ধ নেই! নইলে তার রূপই যে তার পক্ষে প্রধান যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠবে। যদি সে মাঝে

মাঝে তার সৌন্দর্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল থেকে অব্যাহতি না পায় তাহ'লে নারীর পক্ষে জীবন যে দুর্ব্বহ হবে! কিটীর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ যখন আমার চেয়ে ঢের বেশী ঘনিষ্ঠতর, তখন তুমি তো নিজেই তাকে এ প্রশ্ন করতে পারো?"

এইরকম আলোচনা চলছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে শ্রীমতী ওয়ারেণ তাদের ডাক দিলেন 'চা হয়েছে' বলে। ক্রফটস্ তাড়াতাড়ি চলে গেল, প্রেড্‌ও আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, এমন সময় ফ্রাঙ্ক্ এসে উপস্থিত হলো। প্রেডের সঙ্গে ফ্রাঙ্কের পূর্ব্ব হতেই আলাপ পরিচয় ছিল, কিন্তু এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে উভয়ের সাক্ষাৎ হতে দুজনেই সবিস্ময়ে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করলে "কি হে, তুমি এখানে কি মনে করে?"

ফ্রাঙ্ক্ ছোক্‌রা। বয়স বছর কুড়ি, দেখতে সুশ্রী সুপুরুষ। পোষাকটি ভাল। কণ্ঠস্বর বেশ সুমিষ্ট। একটু যেন আহ্লাদে,—দেখলেই মনে হয় অপদার্থ যুবক।

ফ্রাঙ্ক্ বললে সে এখানে তার বাপের কাছে এসে আছে। তার বাপ এখানকার গির্জ্জার গোঁসাই (Rector)। হাতে পয়সাকড়ি কিছু নেই বলে বাধ্য হয়ে সে এইখানে পালিয়ে এসে ভাল ছেলে হয়ে আছে। অনেক টাকা তার দেনা হয়ে গেছল। বাবা সে সব দেনা তার পরিশোধ করে দিয়েছেন, কাজে কাজেই তাঁরও বড় টানাটানি যাচ্ছে! ফ্রাঙ্কেরও অবস্থা তদ্রূপ! কিন্তু প্রেড্ এখানে কেন?—এ প্রশ্নের উত্তরে প্রেড যখন বললে—সে মিস্ ওয়ারেণ বলে একটি মেয়ের সঙ্গে একটি দিন অতিবাহিত করছে—তখন ফ্রাঙ্ক তাকে বল্‌লে "কে? ভাইভী? ভাইভী খাসা মেয়ে, ভারি আমুদে! আমার কাছে রোজ সে বন্দুক ছুঁড়তে শিখছে! এই দেখো"—ব'লে ফ্রাঙ্ক তার হাতের বন্দুকটা প্রেডকে দেখালে। তার পর কথায় কথায় ফ্রাঙ্ক যে ভাইভীর প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এ কথাও ব'লে ফেললে। তারা কথা কইছে, এমন সময় বেড়ার বাইরে থেকে ফ্রাঙ্কের বাপ রেভারেণ্ড স্যামুয়েল গার্ডনার উকি মেরে ডাকলেন—"ফ্রাঙ্ক!"

ফ্রাঙ্ক বাপকে ভিতরে আসতে বললে, রেভারেণ্ড্ বললেন "কার বাগান না জানলে তো আমি ভেতরে যেতে পারি না।" ফ্রাঙ্ক তখন পরিচয় দিলে যে—তার বন্ধু কুমারী ওয়ারেণের বাড়ী এটা। রেভারেণ্ড বললেন "কই, তাঁকে তো একদিনও উপাসনার সময় গির্জ্জায় আসতে দেখি নি!" ফ্রাঙ্ক বললে—"সে একজন র‍্যাংলার! মস্ত বিদ্বান। তোমার চেয়ে ঢের বেশী লেখাপড়া জানে বাবা, সে আবার তোমার বক্তৃতা কি শুনতে যাবে?"

তারপর পিতা পুত্রে অনেক কথা হ'লো। ফ্রাঙ্ক বাপকে স্পষ্টই বললে যে সে এই কুমারী ওয়ারেণকে বিবাহ করবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। রেভারেণ্ড ছেলেকে কত বোঝালেন যে "তুমি আগে উপার্জ্জনক্ষম হও, তারপর দেখেশুনে কোনও অবস্থাপন্ন ধনীর মেয়েকে বিবাহ কোরো।" ফ্রাঙ্ক বললে "এ মেয়েটির বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিই তার পক্ষে মস্ত সম্মান জ্ঞাপক এবং যথেষ্ট পয়সাও আছে এর।"

রেভারেণ্ড্ বিদ্রূপ করে বললেন "তোমার ওড়াবার মতো পয়সা এ মেয়েটির আছে কি না আমার সন্দেহ!"

ফ্রাঙ্ক এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, "কী আর আমি এমন উড়িয়েছি? কিন্তু তুমি আমাদের বয়সে কী কাণ্ড করেছ বলো তো? আমি তো তবু মদ খাইনি—জুয়া খেলিনি—তোমার মতো রোজ নিশাচর হ'য়ে ঘুরে বেড়াইনি! আর সেই 'রেড্ হিলের' শুঁড়ীর দোকানের ছুঁড়ীটার সঙ্গে দিনকতক যে আহাম্মুকী ক'রেছিলুম—সে বয়সের দোষ! তুমিও তো সেদিন বলছিলে যে একটা মেয়েমানুষকে যৌবনে তুমি যে সব চিঠি লিখেছিলে সেগুলো পরে ফেরত পাবার জন্য তাকে পঞ্চাশ পাউণ্ড পর্য্যন্ত দিতে চেয়েছিলে—"

রেভারেণ্ড ভীত হ'য়ে পুত্রকে সে আলোচনা করতে নিষেধ করে বললেন—"তোমাকে সাবধান করে দেবার জন্যই তোমাকে আমার যৌবনের আহাম্মুকীর দৃষ্টান্ত সব শুনিয়েছিলুম; আমাকে অপমান করবার জন্য নয়! আমি সে স্ত্রীলোকটিকে যে সব পত্র লিখে আজীবন তার হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়ে পড়িছি—সে কিন্তু আজ বিশবছরের মধ্যে কখনও তার সুযোগ নিয়ে আমাকে অপদস্থ করতে আসেনি, আর তোমাকে আমি সেই কথা তোমারই ভালর জন্যে বলিছি বলে তুমি তার সুযোগ নিয়ে আমাকে অপদস্থ করতে চাও?"

ফ্রাঙ্ক্ বললে, "আমাকে আপনি যে রকম রাতদিন আপনার সদুপদেশের ঠেলায় অস্থির করে তুলেছেন, তাকে কি কখনও সে রকম করেছিলেন?"

রেভারেণ্ড হতাশভাবে বললেন "নাঃ তোমার সম্বন্ধে আমাকে হাল ছেড়ে দিতে হ'লো! তুমি একেবারে অত্যন্ত

বেয়াড়া হ'য়ে গেছো।" এই বলে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন সেই সময় ভাইভী, প্রেড্, ক্রফটস্ আর শ্রীমতী ওয়ারেণ্ বাগানে বেরিয়ে এলেন।

ভাইভী ফ্রাঙ্কের কাছে ছুটে এসে বললে "ফ্রাঙ্ক্ উনিই কি তোমার বাবা? ওঁর সঙ্গে আমার ভারি আলাপ করবার ইচ্ছে!"

ফ্রাঙ্ক পিতার সঙ্গে ভাইভীর পরিচয় করিয়ে দিলে। ভাইভী তখন আবার ফ্রাঙ্ক্ ও রেভারেণ্ডের সঙ্গে তাদের বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। সার্ জর্জ্জ ক্রফট্স্ ও প্রেডের সঙ্গে রেভারেণ্ডের পরিচয় শেষ হ'তে না হ'তে শ্রীমতী ওয়ারেণ্ এগিয়ে এসে রেভারেণ্ডের হাতখানি ধ'রে অত্যন্ত পরিচিতের মতো বলে উঠলেন "আরে কেও—সাম্ গার্ডনার যে! গির্জ্জেয় ঢুকেছো বুঝি? আমাদের চেন না? এ যে সেই জর্জ্জ ক্রফট্স্—as large as life and twice as natural! আচ্ছা আমাকে কি তোমার মনে পড়্ছে না?"

রেভারেণ্ডের চোখমুখ লাল হয়ে উঠ্ল। তিনি কেমন যেন ভীত হ'য়ে আম্তা আম্তা করতে লাগলেন।

শ্রীমতী ওয়ারেণ বলে উঠলেন—আরে, নিশ্চয় তোমার আমাকে মনে আছে! আমার কাছে যে তোমার একটি গাদা চিঠি রয়েছে আজও! সে দিন হঠাৎ আমার নজরে সেগুলো পড়ল!"

রেভারেণ্ড (শোচনীয় অবস্থায় রুদ্ধ কণ্ঠে) তুমি কি মিস্ ভাভাসাওর!

শ্রীমতী ওয়ারেণ (অনুচ্চ স্বরে তাকে সাবধান করে দিয়ে)—"চুপ চুপ! আহাম্মুক! মিসেস্ ওয়ারেণ বলো? এখানে আমার মেয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?" এইখানেই প্রথম অঙ্কের যবনিকা এসে পড়ে।

মধ্যপ্রদেশের খনিজ সম্পদ

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত, এম-এ

(২)

ম্যাঙ্গানিজ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) *

যে সমস্ত রাসায়নিক শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল—

(ক) ক্লোরিন, ব্রোমিন, ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুত করণে।

(খ) বার্নিশ ও রংএ শীঘ্র শুকাইবার নিমিত্ত যে পদার্থ ব্যবহৃত হয় তাহা ম্যাঙ্গানিজ।

(গ) বিদ্যুৎ-উৎপাদক লেকল্যান্স সেল (Lechlanche Cells) ও অন্যান্য বিদ্যুতাধার যন্ত্রে যাহাদিগকে Dry battery বলে।

(ঘ) রোগাণু, বিষ ও দুর্গন্ধনাশক ঔষধাদিতে; যথা, Permanganate of Potash, Condey's fluid (Permanganate of Sodium) ইত্যাদি।

(ঙ) বস্ত্রাদির উপর ছাপ দিবার ও রং করিবার মশলায়।

(চ) কাচ, মাটির বাসন, টালি, ও ইঁট প্রভৃতি রং করিবার মশলায়।

(ছ) সবুজ ও ভায়লেট রং প্রস্তুত করণে।

(জ) অল্প পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রস্তুত করণে।

---

* পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রবন্ধে ১৩০ পৃষ্ঠায় খনিজ ম্যাঙ্গানিজে প্রাপ্ত পদার্থের তালিকায় ৪। ফস্ফরাস্ বা অঙ্গারজান না হইয়া কেবল ফস্ফরাস হইবে। ১৩৭ পৃষ্ঠায় নীচের ছবিতে, উচ্চ গিরিচূড়ায় ম্যাঙ্গানিজ না হইয়া, বাছাই করা ম্যাঙ্গানিজের স্তূপ হইবে।

(ঘ) খনিজ রৌপ্য ও তাম্র গলাইবার flux রূপে।

ধাতব যে শ্রেণীর ম্যাঙ্গানিজ রাসায়নিক শিল্প ও প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, তাহাকে Pyrolusite ও Psilomelane বলে। এ দুটীতে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) প্রচুর পরিমাণে থাকে। Pyrolusite ও Psilomelane প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায়। ইহার প্রধান উপকরণ, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড। এই উপকরণের তারতম্য অনুসারে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়, এই দুই ধাতুর উপযোগিতা নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে যে অক্সিজেন থাকে, তাহা সহজে বিশ্লিষ্ট করিতে পারা যায়। সহজে অক্সিজেন পাওয়া যায় বলিয়াই, এই শ্রেণীর খনিজ ম্যাঙ্গানিজ রাসায়নিক শিল্পে এত মূল্যবান।

ইংলণ্ডে ক্লোরিণ প্রস্তুত করিবার কারখানায় ধাতব ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার কমিয়া যাইতেছে। রাসায়নিকগণ খনিজ ম্যাঙ্গানিজের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের অপ্রাচুর্য্যই লাভজনক বলিয়া মনে করেন। অর্থাৎ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় ধাতব ম্যাঙ্গানিজের আধিক্য যেমন মূল্যবান, রাসায়নিক শিল্পে অক্সাইড ম্যাঙ্গানিজ তেমনি মূল্যবান। বাজারে এই সব উপকরণের উপর লক্ষ্য রাখিয়া, খনিজ ম্যাঙ্গানিজের মূল্য নির্দ্ধারিত হয়। রাসায়নিকগণ শতকরা ৬০, ৭০, ৮০, প্রধানতঃ ৮০ অংশ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO) পছন্দ করেন। যে দেশের খনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ৮০ ভাগ এই পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়। জাপানে brown stone (ইহা Pyrolusite) নামক যে খনিজ ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়, তাহার আদর রাসায়নিক শিল্পে খুব বেশী। যে পাইরোলুসাইটে শতকরা ৭০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড থাকে, তাহার দ্বিগুণ মূল্যে জাপানী brown stone বিক্রীত হয়। রাসায়নিকগণ খনিজ ম্যাঙ্গানিজে আর যে সব গুণের সন্ধান করেন তাহা এই :—

(১) প্রাপ্ত ore যেন সহজে বিশ্লিষ্ট করা যায়।

(২) চূণ, লোহা, ফস্ফরাস প্রভৃতি যেন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত না থাকে।

(৩) লৌহযুক্ত এমন পদার্থ যেন না থাকে, যাহা, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সময়, ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডকে খাইয়া ফেলে।

মোট কথা, যে খনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ৮০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড পাওয়া যায়, রাসায়নিক শিল্পের জন্য বাজারে তাহারই কদর খুব বেশী। ব্যবসায়ের হিসাবে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, খনিজ ম্যাঙ্গানিজের এই গুণ দেখিয়া, বাছিয়া ore রপ্তানি করা উচিত। তাহা হইলে এই পদার্থের কারবারে বেশ লাভ হইবার সম্ভাবনা। ভারতে প্রাপ্ত খনিজ ম্যাঙ্গানিজ রাসায়নিক শিল্পে সময় বিশেষে ব্যবহৃত হইলেও, সাধারণতঃ ইহার বেশীর ভাগ ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ তৈয়ারী করিবার জন্য, ও লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় কাজে লাগে।
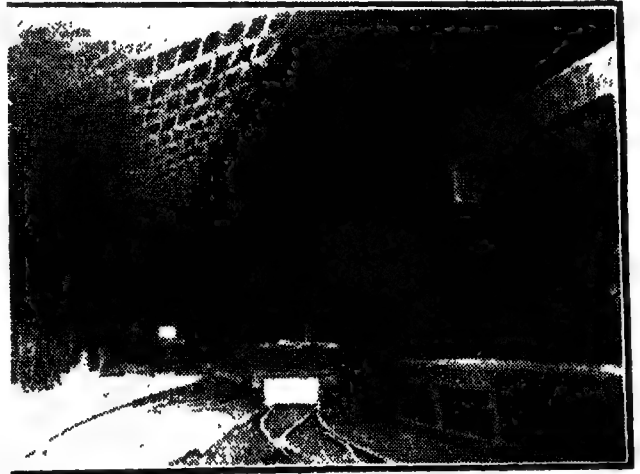
ওপেনহার্থ ইস্পাতের চুল্লী ও মিক্সার। ফার্ণেস হইতে গলিত ইস্পাত নিষ্কাসনের সময় ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ যোগ করা হয়। তাতা কোম্পানী।

বৈদ্যুতিক শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বৈদ্যুতিক Dry battery ও Leclanche Cell তৈয়ারী করিতে খনিজ ম্যাঙ্গানিজের ব্যবহার খুব বিস্তৃত। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে Dry battery তৈয়ারী করিবার কারখানায় বৎসরে কুড়ি হাজার টন ম্যাঙ্গানিজ ওর (ore) লাগে। এই কাজের জন্য খনিজ ম্যাঙ্গানিজে খুব অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড থাকা চাই। আমেরিকার বরাদ্দ অনুসারে, এই কারবারে লাগাইবার উপযোগী খনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ছিয়াশী অংশ ডাই-অক্সাইড থাকা চাই। উপরন্তু,

ইহাতে ধাতব লৌহের পরিমাণ শতকরা এক ভাগের বেশী থাকিবে না। তাম্র, নিকেল, ও কোবাল্ট (Cobalt) প্রভৃতি ধাতু অত্যন্ত অল্প পরিমাণে থাকিলেও দূষনীয়। যুদ্ধের সময় যখন ককেশিয় (Caucasian) খনি হইতে এই পদার্থের রপ্তানী বন্ধ ছিল, তখন বিলাতে মাত্র ভারতবর্ষীয় Pyrolusiteএর উপর এই শিল্পকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ভারতীয় খনির মালিকগণ ও খনিজ ম্যাঙ্গানিজের ব্যবসায়ীগণ অনভিজ্ঞতা বশতঃ এই পদার্থের কারবারে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। বিলাতে কতকগুলি দালাল চালানি মাল হইতে বাছিয়া বাছিয়া, ৫ হইতে ১০০ টন করিয়া লাটে, অতি উচ্চ দরে এই পদার্থ বিক্রয় করিয়াছিলেন। ভারতীয় ভূতত্ত্ববিভাগের

ইস্পাত Casting হইতেছে। যে বিশ টন কটাহ ক্রেন হইতে ঝুলিতেছে ঐ কটাহে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ছুঁড়িয়া ফেলা হয়। তাতা কোম্পানী।

তদানীন্তন কর্ত্তা Dr. Fermor মনে করেন যে, ভারতীয় Pyrolusite যত্নপূর্ব্বক বিশ্লেষণ করিয়া বাছিয়া রপ্তানি করিলে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা। খনির অধিকারী ম্যাঙ্গানিজের কারবারীগণ এ বিষয়ে পরীক্ষা করিলে সুফল পাইবেন বলিয়া মনে হয়। বিলাতে এবং এ দেশে সরকারী তার ও ডাক বিভাগেও pyrolusite প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের সময় টনকরা ৫৫০ টাকা মূল্যে বিলাতে এই খনিজ পদার্থ বিক্রীত হইয়াছে। বর্ত্তমানে টন প্রতি ২৫০৲ টাকা হইতে ৩৫০৲ টাকা মূল্যে Pyrolusite বিক্রীত হইতেছে। তবে এ কথা মনে রাখা দরকার যে, গোঁজামিল দিলে লাভ না হইয়া লোকসানই হইবে। যত্নপূর্ব্বক নির্ব্বাচন করিয়া, বিভিন্ন স্থান হইতে উত্তোলিত আকরজাত Pyrolusiteএর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া, খরিদ্দারদের নির্দ্দেশ ও বরাদ্দমত মাল পাঠান উচিত। ইহার ব্যতিক্রম করিলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতি ত আছেই, তাহা ছাড়া, ম্যাঙ্গানিজের বাজারে ভারতীয় Pyrolusiteএর স্থায়ী বদনাম হইবার খুব আশঙ্কা আছে। এরূপ হইলে, এই পদার্থের ভবিষ্যৎ ব্যবসায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। (যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ তথ্য অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের জিয়লজিক্যাল সার্ভে বিভাগে পত্র লিখিলে সংবাদ পাইবেন।)

কাচের কারখানায় ম্যাঙ্গানিজ

কাচ তৈয়ারী করিবার জন্য যে সমস্ত কাঁচা মাল ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কোন কোন খনিজ পদার্থে ধাতব লৌহ অল্প বিস্তর থাকে। সেই জন্য তৈয়ারী কাচে ঈষৎ সবুজ রং ধরিয়া যায়। এই দোষ নাশ করিবার জন্য ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের প্রয়োজন হয়। কাজেই, কাচ প্রস্তুত শিল্পে সেই শ্রেণীর খনিজ ম্যাঙ্গানিজের দরকার, লৌহের পরিমাণ যাহাতে নাই বলিলেও হয়। ইয়োরোপে কাচশিল্পীর নির্দ্দেশ এই রকম—

(১) ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ শতকরা ৫২ ভাগের কম হইবে না।

(২) এই ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের আকারে থাকিবে। এবং ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, অন্ততঃ শতকরা ৮০ ভাগের কম না হয়।

(৩) ধাতব লৌহ (Ferrous Iron) মোটেই থাকিবে না।

(৪) অম্লজানযুক্ত লৌহের পরিমাণ শতকরা ১ ভাগেরও কম থাকিবে।

লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করণে ম্যাঙ্গানিজ

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পৃথিবীতে প্রতি বৎসর যত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইতেছে, তাহার মধ্যে শতকরা

৯০ ভাগ লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় কাজে লাগিতেছে। বাকী দশভাগ রাসায়নিক শিল্পে ও অন্যান্য কাজে লাগিতেছে। যদি খনিজ ম্যাঙ্গানিজের রাসায়নিক শিল্পের প্রয়োজন মত গুণ না থাকে, তাহা হইলে লৌহ ও ইস্পাত তৈয়ারী করিবার কারখানায় তাহা অনায়াসে লাগাইতে পারা যায়। সুতরাং লোকসান নাই। গতবারে এই শিল্পে ম্যাঙ্গানিজ ও ম্যাঙ্গানিজ-যুক্ত মিশ্র ধাতুর ব্যবহারের কথা বলা হইয়াছে। ব্যবহার প্রণালীর সামান্য পরিচয় এখানে দেওয়া যাইতেছে।

ইয়োরোপে অনেক লৌহ ও ইস্পাত নিষ্কাসনের কারখানায় কাঁচা লোহা তৈয়ারী করিবার চুল্লীতে (blast furnaces), এবং ইস্পাত তৈয়ারী করিবার খোলা ভাটায় (open-hearth steel furnaces), আকর-জাত অসংস্কৃত ম্যাঙ্গানিজের বিস্তৃত ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে, যথা, ইংলণ্ড, যুক্তরাজ্য ও আমাদের দেশেও, লৌহ ও ইস্পাতের কারখানায় প্রাকৃতিক খনিজ ম্যাঙ্গানিজ কাঁচা অবস্থায় লাগান হয় না। ইহাকে প্রথমে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও স্পাইগেল আইসেনএ পরিণত করা হয়। ফেরোম্যাঙ্গানিজে, শতকরা ২০ হইতে ৮৫ ভাগ পর্য্যন্ত ম্যাঙ্গানিজ মূলধাতু, ৬০ হইতে ৮ ভাগ ধাতব লৌহ, এবং ৬-৭ ভাগ অঙ্গার (carbon) থাকে। স্পাইগেল-আইসেনে, ৫ হইতে ২০ ভাগ ধাতব ম্যাঙ্গানিজ, ৭০ হইতে ৮৫ ভাগ ধাতব লৌহ, ও ৪ বা ৫ ভাগ কার্ব্বন থাকে। যে শ্রেণীর খনিজ ম্যাঙ্গানিজে ম্যাঙ্গানিজ মূল ধাতুর পরিমাণ খুব বেশী, তাহাতে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত হয়। যাহাতে কম, তাহা স্পাইগেল-আইসেনে পরিণত করা হয়।

ইস্পাত প্রস্তুত করিবার জন্য দুই রকম প্রক্রিয়া সাধারণতঃ অনুসৃত হয়। একপ্রকার প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক নাম, basic open-hearth method, অপর প্রক্রিয়াকে Acid Bessemer process বলে। Basic প্রণালীতে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ব্যবহৃত হয়। Acid প্রক্রিয়ায় স্পাইসেন ব্যবহার করা হয়। খনিজ লৌহে ফস্ফরাসের তারতম্য অনুসারে acid বা basic প্রণালী দ্বারা তাহা গলান হয়।

ভারতে ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ

মিঃ এইচ, ডি, কগ্যান বলেন যে, India can never be a large producer of ferromanganese unless economical electric production becomes possible." কগ্যান সাহেব ম্যাঙ্গানিজ ব্যবসায়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি সত্য হইতে পারে। তবে ইহাও সত্য যে, বিগত যুদ্ধের সময় তাতা-কোম্পানীর batalle blast furnaceএ, এবং কুলটিতে বেঙ্গল আইরন কোম্পানীর কারখানায়, প্রচুর পরিমাণে ফেরোম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত হইয়াছিল। এখনও তাতা-কোম্পানী তাঁহাদের ইস্পাতের চুল্লীতে ব্যবহারের

তাতা কোম্পানীর অন্যতম Blast-furnace ইহাতে যুদ্ধের সময় প্রায় চৌদ্দ হাজার টন ফেরোম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত হইয়াছে।

নিমিত্ত আবশ্যক ফেরোম্যাঙ্গানিজ নিজেদের ফার্নেসেই প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন। এ কথাও সত্য যে, কাঁচা খনিজ ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানী অপেক্ষা তাহা ফেরোম্যাঙ্গানিজে পরিণত করিয়া রপ্তানী করিলে বেশী লাভ হইবে। অতএব ভারতে, বিশেষ করিয়া মধ্যপ্রদেশের ম্যাঙ্গানিজ-কেন্দ্রে, ফেরোম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা যায় কি না, এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা দরকার। শুনা যাইতেছে যে, মধ্যপ্রদেশে ম্যাঙ্গানিজের কারবারী কোনো এক বড় ইয়োরোপীয় কোম্পানী এইরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ করিতেছেন। মন্দের ভাল যে, এই

বিষয়ে গবেষণার জন্ম একজন কৃতী বাঙ্গালী রাসায়নিক নিযুক্ত হইয়াছেন। বাঙ্গালী ধনকুবেরগণ এ দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন কি? মিল,কারখানা সমস্তই অ-বাঙ্গালীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকিলে, বাঙ্গলার বেকার-সমস্তার সমাধান কোন কালেই হইবে বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, openhearth বা basic প্রক্রিয়ায় ফেরোম্যাঙ্গানিজ দেওয়া হয়। বিসিমার বা acid প্রক্রিয়ায় স্পাইগেল আইসেন লাগে। ম্যাঙ্গানিজ মিশ্র-ধাতুর কার্য্য এইরূপ—

(১) ভাটার মধ্যে দ্রবীভূত ইস্পাতের মধ্যে যে অম্লজানযুক্ত লৌহ থাকে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ধাতব লৌহকে পৃথক করিয়া দেয়।

তাতা কোম্পানীর Duplex Steel furnace ও Bessemmer Converter। ইহাতে স্পাইগেল আইসেন ব্যবহৃত হয়।

(২) দ্রবীকরণে অনেক অঙ্গার (carbon) ব্যয়িত হইয়া যায়, তৈয়ারী ইস্পাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অঙ্গার :পূরণ করিয়া দেয়।

(৩) তৈয়ারী ইস্পাতে যে পরিমাণ ধাতব ম্যাঙ্গানিজ থাকা দরকার তাহা যোগায়।

(৪) দ্রবীভূত ইস্পাত হইতে গন্ধক সরাইয়া দেয়।

(৫) ভাটার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুমণ্ডল সৃষ্ট হইতে দেয় না।

(৬) লৌহ ও ইস্পাতের মলকে দ্রব অবস্থায় রাখে, এবং সহজে নির্গমন হইতে সাহায্য করে। ভাটা বা ফার্নেশ হইতে যখন তরল ইস্পাত বড় বড় firebrick-lining যুক্ত কটাহে পড়ে, সেই সময়ে ফেরোম্যাঙ্গানিজ বা স্পাইগেল আইসেন আবশ্যক মত পরিমাণে সংযোগ করা হয়। সাধারণতঃ শতকরা একভাগ ধাতব ম্যাঙ্গানিজ তৈয়ারী ইস্পাতে থাকে। এক টন মিশ্র ম্যাঙ্গানিজ ধাতু তৈয়ারী করিতে আড়াই টন খনিজ ম্যাঙ্গানিজ লাগে। তাহা হইলে চল্লিশ টন তৈয়ারী ইস্পাতে এক টন শতকরা-৫০-ভাগ-মূলধাতু-যুক্ত খনিজ ম্যাঙ্গানিজের দরকার হয়।

সভ্যজগতে ইস্পাতের প্রচলন দিন দিন বাড়িতেছে। উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২২ পর্য্যন্ত ৩০ বৎসরে প্রতি পাঁচ বৎসরের গড়পড়তা ধরিয়া সমগ্র পৃথিবীর উৎপন্ন ইস্পাতের বাৎসরিক পরিমাণের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

১৮৯২——১২, ৮০০০০০, টন
১৮৯৭——২০, ৪০০, ০০০ ”
১৯০২——৩৩, ০০০, ০০০ ”
১৯০৭——৫১, ২০০, ০০০ ”
১৯১২——৭২, ৬০০, ০০০ ”
১৯১৭—— ৮৪, ৯০০, ০০০ ”
১৯২২—— ৬৭, ০০০, ০০০ ”
১৯২৩——৭৪, ৫০০, ০০০ ”

দেখা যায় যে ১৯১৭ সালে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে ইস্পাত তৈয়ারী হইয়াছিল। পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধই তাহার কারণ। যুদ্ধের পর, যুদ্ধেরই ফলে, ১৯২১ সালে উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ কমিয়া মাত্র ৪ কোটী টন হইয়াছিল। তাহা হইলেও, বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, এখন কিছুদিনের জন্ম অন্ততঃ জগতের উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণ গড়ে বাৎসরিক ৭ কোটী টন করিয়া ধরা যাইতে পারে। সুতরাং এই পরিমাণ ইস্পাত তৈয়ারী করিতে গড়ে বাৎসরিক সাড়ে সতর লক্ষ টন খনিজ ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজন। হিসাবের জন্ম ধরা হয় যে, প্রাপ্ত খনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ৫০ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মূলধাতু থাকিবে। প্রকৃত পক্ষে, এইরূপ উচ্চাঙ্গের খনিজ ম্যাঙ্গানিজ সর্ব্বত্র ও সকল সময় পাওয়া

যায় না। সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ ইস্পাত উৎপন্ন করিতে কুড়ি লক্ষ টন খনিজ ম্যাঙ্গানিজের প্রয়োজন হইবে, ইহা ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়

১৯১৪ খৃঃ অব্দে ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল, দক্ষিণ রাশিয়া, ও ভারতবর্ষ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যাইত। যুদ্ধের পূর্ব্বে পাঁচ বৎসরের গড় হিসাবে, এই সমস্ত দেশে যত ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ এইরূপ হইবে—

ব্রেজিল——১৮৬, ০০০ টন।
রাশিয়া—— ৭৪১, ০০০ টন
ভারতবর্ষ—- ৭১৩, ০০০ টন।

যুদ্ধের সময় হইতে এই পরিমাণের তারতম্য হইয়াছে। ভারতে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ, মোটামুটি হিসাবে, বছরে ছয়লক্ষ টন করিয়া হইতেছে। ব্রেজিলে উত্তোলিত ধাতুর পরিমাণ তিন লক্ষ টনে উঠিয়াছে। রাশিয়ার পরিমাণ সওয়া লক্ষ টনে নামিয়াছিল। শেষোক্ত প্রদেশে হালে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

যুদ্ধের সময় নূতন নূতন অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজের অনুসন্ধান চলিতেছিল। তাহার ফলে, পশ্চিম আফ্রিকার গোল্ডকোষ্ট (Gold Coast) অঞ্চলে উচ্চাঙ্গের ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া গিয়াছে। তথা হইতে গড়ে এক লক্ষ টন করিয়া খনি ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানি হইতেছে। ইজিপ্টের সিনাই পেনিনসুলায় ম্যাঙ্গানিজের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তথা হইতে বছরে এক লক্ষ তিরিশ হাজার টন করিয়া ম্যাঙ্গানিজ চালান হইতেছে। গোল্ড কোষ্টের ম্যাঙ্গানিজে শতকরা একান্ন বায়ান্ন ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মূল ধাতু পাওয়া যায়। দোষের মধ্যে খনিজ ম্যাঙ্গানিজ খুব বেশী ভিজা অবস্থায় পাওয়া যায়। সিনাইএর খনিজ ম্যাঙ্গানিজে শতকরা ৩২ ভাগ ম্যাঙ্গানিজ মূলধাতু ও শতকরা ২৫ভাগ লৌহ আছে। সুতরাং ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজ যে যে শিল্পে লাগে,ইজিপ্টের ম্যাঙ্গানিজ তাহাতে লাগিবে না।

আরও কোনো কোনো দেশে ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যায়। তবে তাহার পরিমাণে অল্প ও তাহা নিম্নশ্রেণীর। সমগ্র পৃথিবীর দরকারের তুলনায় তাহা একেবারে অবহেলার যোগ্য। ব্রেজিলের ম্যাঙ্গানিজ ডিপজিট (deposit) জগতের মধ্যে বিশাল। তবে এখন ব্রেজিলে এই ধাতু যে পরিমাণে উত্তোলিত হইতেছে, তাহা আমেরিকাতেই লাগিয়া যায়। মাল চলাচলের তেমন সুবিধাও নাই। সেইজন্য বাধ্য হইয়া আমেরিকাকে রাশিয়া ও ভারতের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছে।

শুনিতে পাওয়া যায় যে, এক বিরাট আমেরিক্যান সিণ্ডিকেট, ককেশশ অঞ্চলের Tchiatouri নামক স্থানের সুবিস্তৃত ম্যাঙ্গানিজ ডিপজিট ইজারা লইয়াছেন। আপাততঃ সোভিয়েট ইঞ্জিনিয়ারগণ গড়ে পাঁচ লক্ষ টন করিয়া ম্যাঙ্গানিজ তুলিতেছেন। প্রকাশ যে আমেরিক্যান কোম্পানী ইহা দশ লক্ষ টনে পরিণত করিবেন। ইহার জন্য নূতন রেলরাস্তা, নূতন ডক, নূতন বন্দর প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে অনেক অর্থ ও সময় লাগিবে। সেই জন্য বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, অদূর-ভবিষ্যতে, উপরিউক্ত আমেরিক্যান কোম্পানী খুব বেশী পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ রপ্তানী করিতে পারিবেন না। চারিদিকের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, খনিবিৎ পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করেন যে, এখন কয়েক বছর পর্য্যন্ত

তাতা কোম্পানীর অন্যতম Blast furnace। এই ফার্ণেশে নিজেদের আবশ্যকমত ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত হয়। উপরকার মঞ্চের দৃশ্য। গলিত ধাতু ফার্ণেশ হইতে নিষ্কাসিত হইতেছে।

বিভিন্ন দেশ হইতে নীচের তালিকামত ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যাইবে—

ভারতবর্ষ	...	...	ছয় লক্ষ টন।
রাশিয়া	...	...	পাঁচ লক্ষ টন।
ব্রেজিল	...	...	তিন লক্ষ টন।
পশ্চিম আফ্রিকা		...	দেড় লক্ষ টন।
ইজিপ্ট	...	...	ঐ
অন্যান্য দেশ	...	...	দুই লক্ষ টন।
		মোট	উনিশ লক্ষ টন।

পূর্ব্বে বর্ত্তমান জগতে ম্যাঙ্গানিজের মোট বাৎসরিক খরচের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে—এই তালিকা হইতে অনুমান করা যায় যে, দরকারের বেশী ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে রাশিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার খনির কাজের বর্ত্তমান অসুবিধা দূর হইলে, খনিজ ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ আবশ্যকের অতিরিক্ত হইতে পারে। এরূপ হইলে ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের রপ্তানী কমিয়া যাইতে পারে। তাহাতে ইয়োরোপীয় বণিকদের ক্ষতি হইতে পারে, তবে দেশের বিশেষ লোকসান নাই।

এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীতে প্রতি বছরে মোট কুড়ি লক্ষ টন করিয়া ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইয়াছে। যুদ্ধের সময় হইতে ভারতবর্ষ ও ব্রেজিলই বেশীর ভাগ মাল যোগাইয়াছে। যুদ্ধ শেষ হইবার পর, পৃথিবীতে মোট উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ কমিয়া চৌদ্দ লক্ষ টন হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতবর্ষ শতকরা ৪৫ ভাগ, ব্রেজিল ২১ ভাগ ও রাশিয়া মাত্র ৯ ভাগ যোগাইয়াছে। অন্যান্য দেশে উত্তোলিত ধাতুর পরিমাণ কম-বেশী হইয়াছে, কিন্তু ভারতের পরিমাণ মোটের উপর বাড়িয়াছে, কমে নাই। পৃথিবীর বাজারে ১৯১৪ সাল হইতে ভারতবর্ষ যত অংশ ম্যাঙ্গানিজ সরবরাহ করিয়াছে, তাহার হিসাব এই রকম—

টনের হিসাব।

বছর	জগতের মোট	ভারতের অংশ
১৯১৪	১, ৮৪১, ৪৭৯,	৩৭·১ শতকরা
১৯১৫	১, ৩৯৩, ৪৭৯,	৩২·৩
১৯১৬	১, ৬৭৩, ০৫০,	৪০
১৯১৭	১, ৮৬৩, ৫৪৯,	৩১·৭
১৯১৮	১, ৭৫১, ৬৯৮,	২৯·৬
১৯১৯	১, ১৬৩, ৫৫৩,	৪৬·২
১৯২০	১, ৭২২, ০৬৮,	৪৪·৮
১৯২১	১, ১২৪, ০৫৯,	৬০·৪
১৯২২	১, ১৮২, ৬৯৪,	৪০·১
১৯২৩	১, ৭৬৫, ০০০,	৩৯·৪
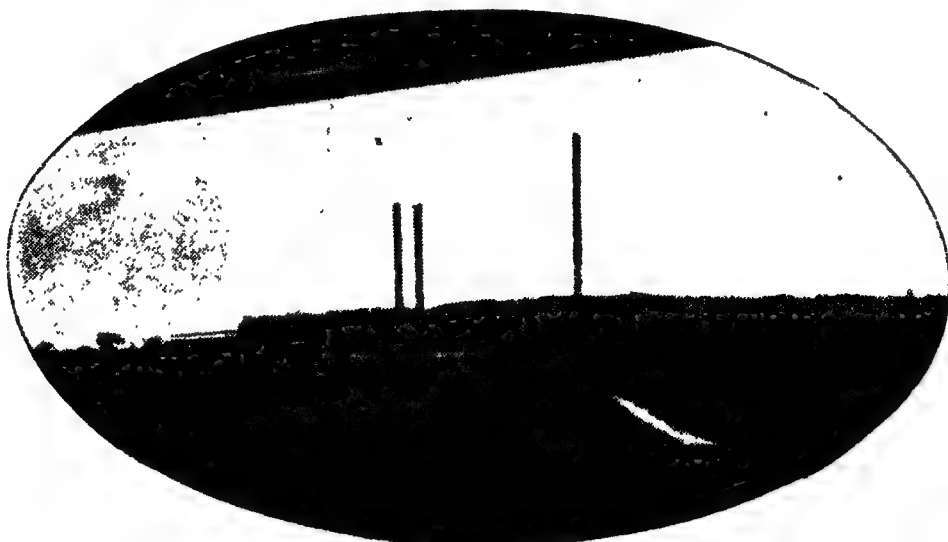
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত কাটনির চুণ ও সিমেন্টের কারখানা। এখানকার চুণা পাথর খুব উচ্চাঙ্গের। রেল ভাড়ার আধিক্যবশতঃ, লৌহর কারখানা সমূহে এই অঞ্চলের dolomite ব্যবহৃত হইতেছে না

ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের ব্যবসায়ীগণ অনুমান করেন যে, এই খনিজ পদার্থের কারবারে বুম্ (boom) কাটিয়া গিয়াছে। এক্ষণে, কারবারের গতি স্থির হইয়া ভারতীয় খনিজ পদার্থের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজের ব্যবসায় লাভজনক ও মূল্যবান হইয়াছে।

ভারতীয় ম্যাঙ্গানিজের ভবিষ্যৎ

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উপজাত ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল —

টনের হিসাব

প্রদেশ	১৯০৯—১৩,	১৯১৪—১৮,	১৯১৯—২৩	১৯২৪	১৯২৫
মধ্যপ্রদেশ	৪৮৮,৪৮৫,	৪৯৫,৮৮০,	৫০৫,৪০২,	৫৮৪,১০৬,	৭২২,৪৪২
বোম্বাই	৩৫,৬৭২,	৩৫,০৪৩,	৫৭,২৯২,	৩৮০৮১,	৫৬,৮৪৫
মহীশূর	৲৮,২৮০,	২৪,২০৫,	২১,৭০৩,	৪০৫৭৯,	——
মান্দ্রাজ	১১৯,৬৯৪,	১৩,৩৯৫,	১৯,৭৮২,	৮১৪৩৪,	৮৪,৯১০
বিহার ও ওড়িশা	৩২,১১২,	৭,৫৩২,	২০,৪৫৩,	৩৮০৮১,	৩৫৮৪৫
মধ্যভারত	৮,৫৫,	১,৪০২,	——	২২৬৩,	৬২০৬
মোট	৭১২,৭৯৮,	৫৭৭,৪৫৭,	৬২৪,৬৩৫,	৮০৩,০০ ,	৮৩৯,৪৬১

ম্যাঙ্গানিজের খনিমুখে রসায়নাগার (Laboratory)। উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করা হয়। এবং তাহা বাছাই করিয়া, গ্রেড অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত হয়। পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে এই লেবরেটারীর পরিচালক একজন বাঙ্গালী রাসায়নিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতের মধ্যে মধ্যপ্রদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ উত্তোলিত হইতেছে। সমগ্র ভারতের খনিজ ম্যাঙ্গানিজের শতকরা ৮৫ ভাগ মধ্যপ্রদেশের আকরসমূহ হইতে উত্তোলিত হয়।

ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও স্পাইগেল আইসেন প্রস্তুত করিবার জন্য সমগ্র জগতে উত্তোলিত খনিজ ম্যাঙ্গানিজের শতকরা ৯০ ভাগ ব্যবহৃত হয়। ভারতে মোট দশ লক্ষ টন ইস্পাত প্রতি বৎসর ব্যবহারে লাগে। অল্পদিনের মধ্যে ভারতে প্রস্তুত ইস্পাতের পরিমাণ বৎসরে চারি লক্ষ টন হইবে আশা করা যায়। মধ্যপ্রদেশজাত দশ হাজার টন খনিজ ম্যাঙ্গানিজ এই পরিমাণ ইস্পাত তৈয়ারী করিতে লাগিবে। ভারতে উত্তোলিত ম্যাঙ্গানিজের যাট ভাগের

এক ভাগ মাত্র যদি ভারতীয় ইস্পাতের কারখানায় লাগে, তাহা হইলে বাকী মাল বিদেশে রপ্তানী হইবেই। যদি ধরা যায় যে ভারতবর্ষের প্রয়োজনীয় সমস্ত ইস্পাতই দেশেই অচিরে প্রস্তুত হইতে পারে এবং হইবে, তাহা হইলেও, ইংরাজ খনিবিৎ পণ্ডিতগণের মতে, ভারতে ইস্পাত প্রস্তুত করণের এই প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের অভাব পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে হইবার আশঙ্কা নাই। মধ্যপ্রদেশের খনিসমূহে কত ম্যাঙ্গানিজ পাওয়া যাইতে পারে, তাহা সঠিক নির্ণীত হয় নাই। মিঃ এইচ, ডি, কগ্যান (Mr. H. D. Coggan) বলেন—"No accurate estimates of the quautities of manganese ore available in India have been made, but in the Central Provinces, they run into many millions of tons, and seeing that one million tons would be sufficient to supply the requirements of India for 50 years, even if she manufactured the whole of her own requirements, there need be no apprehension that the export of the raw material from India is likely to affect her future supplies for many hundreds of years."

হয় ত এ অনুমান ঠিক। কিন্তু যখন প্রাপ্তব্য ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই, তখন মধ্যপ্রদেশের মূল্যবান ম্যাঙ্গানিজ ডিপজিট ক্ষয় করা দেশের পক্ষে কল্যাণকর কি না বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। মনে রাখা দরকার যে বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্যের সুবিধা ও দরকারের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই সরকারী পণ্ডিতগণ এ সব বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। সময় থাকিতে সাবধান না হইলে ভারতীয় অনেক মূল্যবান খনিজ পদার্থ নিঃশেষে উত্তোলিত হইয়া, বৈদেশিক শিল্পকে পুষ্ট করিয়া, বিদেশী বণিকের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া, ভারতকে চিরকালের জন্ম পরমুখাপেক্ষী ভিখারী করিয়া রাখিবে।

এই যে ম্যাঙ্গানিজের বিশাল কারবার, ইহাতে কয়জন ভারতবাসী নিযুক্ত আছেন? আদিতে মান্দ্রাজের ভিজাগাপাটান হইতে একজন ইংরাজ খনিজ ম্যাঙ্গানিজ বিদেশে রপ্তানী করিয়াছিলেন। আজও বার আনা রকম কারবার ইংরাজ ব্যবসায়ীর করতলগত। শুনিতেছি, বেশী লাভের আশায় মধ্যপ্রদেশের এক ইংরাজ কোম্পানী এ দেশেই ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ তৈয়ারী করিবার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন। তাতা কোম্পানী নিজেদের আবশ্যক মত ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ নিজেদের blast furnaceএই প্রস্তুত করিয়া লন। হয় ত তাঁহারা মধ্যপ্রদেশের প্রস্তাবিত কারখানা হইতে ভবিষ্যতে এই পদার্থ সংগ্রহ করিবেন। ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ কি ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ প্রস্তুত করিবার জন্ম দুই চারিটা ফার্ণেশ খুলিতে পারেন না? *

* এই প্রবন্ধের কতক কতক অংশ, জেমসেদপুর সাহিত্য সভার বিভিন্ন অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ সঙ্কলনে, গবর্ণমেণ্টের Records of the Geological Survey of India, Dr. J. Coggin Brownএর Notes on Manganese Ores, Mr. H. D. Cogganএর on Manganese ore Industry of India, ও শ্রীযুক্ত বলরাম সেন, এম-এস্‌সি প্রদত্ত বহুবিধ নোট ও বর্ণনা হইতে সবিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।—লেখক।

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

২১

মিণ্টুর প্রতি যে প্রবল আকর্ষণ বহন করিয়া সুকুমারী কলিকাতায় গিয়াছিল, দূরত্বের জন্ম তাহার বেগ যে কিছুমাত্র কমে নাই, চিঠিপত্র এবং পার্শ্বেলের সাহায্যে ডাকঘরের মারফৎ তাহার প্রমাণ নিয়মিত ভাগলপুরে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। পূর্ব্বে কদাচিৎ কখনো রমাপদর নামে ডাক আসিত, এখন দুই তিন দিন অন্তর চিঠি এবং সপ্তাহে সপ্তাহে পার্শ্বেল লইয়া ডাক-পিওন তাহার গৃহে উপস্থিত হয়। পার্শ্বেল খুলিয়া বাহির হয় কোনো বার খেলনা, কোনো বার খাদ্য, কোনো বার পশমী সুট্, কোনো বার বা আর কিছু। এই সকল অনাবশ্যক এবং মূল্যবান দ্রব্যাদির

শিল্পী — শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ চৌধুরী

অপরিমিত আমদানিতে রমাপদ মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়;—দুধের যোগান যে ছেলের যথোচিত নাই, চকোলেটের প্রচুরতা তাহার পক্ষে দুলক্ষণ বলিয়া সে মনে করে। সরমা কিন্তু পার্শেল আসিলেই সোৎসুক চিত্তে পার্শেল খোলার কাছে আসিয়া দাঁড়ায় এবং পার্শেল হইতে বাহির হইয়া কোনো-কিছু উপাদেয় বস্তু তাহার পুত্রের মুখে পড়িলে অথবা হাতে উঠিলে মনে মনে খুশী হয়। অপরের প্রসাদ-জাত অথবা নিজ অবস্থার অনুপযোগী বলিয়া পুত্রের আনন্দের মধ্যে যেটুকু অন্যায়ের যোগ থাকে, মাতৃস্নেহের অন্ধতায় সেটুকু সে চন্দ্রে কলঙ্কের মত সহ্য করে।

রমাপদ বলে, "যে চাল তোমার পক্ষে অনুচিত নিজের পয়সায় সে চাল ভোগ করলে কোনো মঙ্গল নেই। পরের পয়সায় ভোগ করলে ত' আরো নেই!"

এ কথা সত্য বলিয়া সরমা এত বেশী বিশ্বাস করে যে ইহার কোনো প্রতিবাদ না করিয়া সে শুধু নিঃশব্দে হাসিতে থাকে।

রমাপদ বলে, "পরের মিহি চাল হঠাৎ যে দিন বন্ধ হবে, নিজের মোটা চাল সে দিন একেবারেই মুখে রুচবে না।"

এ কথায় সরমা উত্তর দেয়; বলে, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে খোকার মিহি চাল কোনো দিন বন্ধ হবে না।"

উচ্ছ্বসিত হইয়া রমাপদ বলে, "পরের মিহি চালে খোকা চিরকাল মানুষ হবে, এই আশীর্ব্বাদ তুমি ভগবানের কাছে চাও না কি সরমা?"

সহাস্য মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে সরমা বলে, "একেবারেই চাই নে। তাও কি কোনো মা চেয়ে থাকে?"

"তবে?"

রমাপদর মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া মৃদু হাসিয়া সরমা বলে, "খোকা তার বাপের মিহি চালেই মানুষ হবে। চিরকালই কি তোমার অবস্থা এমনি যাবে বলে মনে কর?"

রমাপদ বলে, "অবস্থা যেদিন বদলাবে চালও না হয় সেদিন বদলাবে; কিন্তু কথা হচ্ছে, অবস্থা বদলানোর আগে চাল বদলানো উচিত কি না।"

সরমা উত্তর দেয়, "দেখ, বরাত বলে একটা জিনিস আছে যা না মেনে উপায় নেই। অবস্থার বিপরীত কোনো ব্যবস্থা ভগবান যদি খোকার জন্যে করে থাকেন, কে তা আটকাবে বল? মা বলতেন, যিনি খান চিনি, তাঁর চিনি যোগান চিন্তামণি।"

রমাপদ হাসিয়া বলে, "আমার বলবার উদ্দেশ্য সেই চিন্তামণির কুলী নরেশ বাঁড়ুয্যে না হয়ে রমাপদ বাঁড়ুয্যে হলেই ভাল হয় না কি?"

সরমা হাসিয়া বলে, "ব্যস্ত হয়ো না, তাই হবে। তা ছাড়া, খোকার মাসা কি খোকার এতই পর?"

এই শেষোক্ত যুক্তিতে রমাপদ একেবারে হার মানিয়া চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর সহাস্যমুখে বলে, "স্ত্রীর সহোদরা বোনকে পর বলবে এমন দুঃসাহস কার আছে বল?"

সুকুমারীর চিঠি আসে। চিঠি খুলিয়া পড়িয়া সরমা রমাপদর হাতে দিয়া বলে, "দিদি খোকার জন্যে কত ভেবে চিঠি লিখেছেন দেখ!"

চিঠি পড়িয়া রমাপদ বলে, "তাই ত! কালই একটা চিঠি লিখে দিয়ো। বড় বেশী ভাবছেন!" মনে মনে ভাবে 'ভাবনার যদি ভার থাকৃত তা হলে চার পয়সা মাশুলে এ চিঠি পোষ্টাল ডিপার্টমেন্ট্ কখনই ছাড়ত না!"

এমনি করিয়া প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে ঘিণ্টুর স্বাস্থ্য কতকটা ভাল ছিল, কিন্তু কয়েক দিন হইতে অল্প অল্প করিয়া জ্বর এবং যকৃত-বিকার পুনরায় দেখা দিয়াছে। যে-সকল ঔষধ-পত্র ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহা নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইয়াছে এবং যথাপূর্ব্ব রমাপদ প্রত্যহ প্রাতে নিয়মিতভাবে টেম্পারেচারের ফিরিস্ত্ লইয়া ডাক্তার বাড়ী হাজির হইতেছে। ফলে কিন্তু কোনো সুবিধা দেখা যাইতেছে না, ডাক্তারখানায় ঔষধের বিলের সহিত টেম্পারেচারের ফিরিস্তে উত্তাপের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে।

কয়েকদিন হইতে দেওকীলালের পুত্রকে পড়ানো বন্ধ হইয়া গিয়াছে; মাসাধিক হইল ভাড়াটিয়া গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া বাড়ী বন্ধ করিয়া দেশে গিয়াছে—কবে ফিরিবে—অথবা আদৌ ফিরিবে কি না—তদ্বিষয়ে স্থিরতা নাই; গত দুই তিন মাসের মিতব্যয়ে যে সামান্য অর্থ সঞ্চিত হইয়াছিল এবং কলিকাতা যাইবার সময়ে সুকুমারী জোর করিয়া ঘিণ্টুর হাতে যাহা কিছু দিয়া গিয়াছিল

প্রতিদিবসের অনিবার্য্য ক্ষয় ভোগ করিয়া তাহার কলেবর ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, অথচ নূতন কোনো উপার্জ্জনের আশু সম্ভাবনা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। অর্থ-সঙ্কটের এই রুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে পুত্রের অসুখের পুনরাক্রমণে রমাপদ এবং সরমা উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

প্রত্যূষে উঠিয়া সরমা নিয়মিত ঘিন্টুর টেম্পারেচর লইতেছিল, রমাপদ নিকটে আসিয়া বলিল, "শরৎবাবুকে একবার দেখালে হয় না সরমা?"

থার্ম্মোমিটারের রেখাঙ্কনে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সরমা বলিল, "দেখছো! আজ জ্বর আরো বেশী—একশো দুই!" তাহার পর খাপের ভিতর থার্ম্মোমিটার ভরিয়া রাখিয়া রমাপদর দিকে চাহিয়া বলিল, "হোমিওপ্যাথী করাতে চাও?"

"কেন, হোমিওপ্যাথীতে তোমার বিশ্বাস নেই? ছোট ছেলেদের অসুখে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ত' খুব উপকারী। তা ছাড়া, শরৎবাবু একজন ভাল ডাক্তার।"

সরমা সম্মত হইল; বলিল, "বেশ, দিনকতক তাই না হয় করে দেখ।"

উপকারের প্রত্যাশায় চিকিৎসা পরিবর্ত্তন করিতে তাহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু এ পরিবর্ত্তন যে শুধু সেই কারণেই নহে, অর্থ সমস্যাও গুপ্তভাবে ইহার মূলে নিহিত আছে, সেই চেতনা তাহার মনে বেদনার একটা সূক্ষ্ম বাষ্প ধূমায়িত করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে শরৎবাবু ঘিন্টুকে দেখিতে আসিলেন। রোগীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, প্লীহা, যকৃৎ পরীক্ষা করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল আলমারীতে সজ্জিত একরাশ শিশি-বোতলের উপর।

রমাপদর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এইগুলি সমস্তই খোকাকে খাইয়েছ না কি?"

মৃদু হাসিয়া রমাপদ বলিল, "হ্যাঁ।"

ক্ষণকাল গম্ভীরমুখে অবস্থান করিয়া শরৎবাবু বলিলেন, "আমি ত আজ রুগীকে গোটা কতক গুলি খাইয়ে দিয়ে তিন দিন রুগীর বাপেরও মুখদর্শন করব না। কিন্তু এতদিন ষোড়শোপচারে চিকিৎসা চালিয়ে এখন পঞ্চোপচারের চিকিৎসায় তোমরা সুস্থির থাকতে পারবে ত?"

রমাপদ সহাস্যমুখে মৃদুস্বরে বলিল, "ষোড়শোপচারের দেবতা ত এতদিনেও প্রসন্ন হলেন না।"

শরৎবাবু বলিলেন, "তা বুঝি জানো না রমাপদ? সামান্য একটু দূর্ব্বা আর ফুলের পূজোয় সময়ে সময়ে দেবতা যেমন সাড়া দেন, সজোরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে হাঁক ডাক করলেই তেমন দেন না—বিশেষতঃ এই সব ধ্রুব প্রহ্লাদের মত ছোট ছেলেদের বেলায়।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ঘিন্টুকে ক্রোড়ে লইয়া সরমা বসিয়া ছিল। রোগীকে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার বলিলেন, "ভয় নেই বউমা, তোমার ছেলে ভাল হবে; কিন্তু কিছু সময় নেবে। রোগের এ অবস্থা দু-চার দিনে হয়-ও না, যায়-ও না। ওষুধ ত আমার চলবেই; কিন্তু আমি বলি, চিকিৎসার সঙ্গে একটা কিছু শান্তি স্বস্ত্যয়নও যোগ করে দাও। শান্তি স্বস্ত্যয়নের কথা আমি আর কি বলব—সে তোমাদের গ্রহাচার্য্যকে ডেকে যা হয় পরামর্শ ক'রো—উপস্থিত আমার যেটা মনে হচ্ছে করে দেখতে পার। একজন শিশিবোতলওয়ালাকে ডেকে আলমারীর ওই শিশি বোতল গুলি বিক্রী করে যে পয়সা হবে তাই দিয়ে বুড়নাথের পূজা পাঠিয়ে দিয়ো—তোমার ছেলের মঙ্গল হবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন; তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমাপদকে বলিলেন, "যে ওষুধটা দিয়ে যাচ্ছি, কাল সকালে খালি পেটে খাইয়ে দিয়ে কেমন থাকে, তিন দিন পরে আমাকে জানিয়ো।"

ডাক্তার প্রস্থান করিবার অর্দ্ধঘণ্টা পরে টেলিগ্রাফ পিওন আসিয়া হাঁকিল, "তার হ্যায় বাবু!"

রমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া সই করিয়া তার লইল—তাহার পর খুলিয়া পড়িতে পড়িতে ভিতরে আসিয়া সরমাকে বলিল, "কাল সকালে তোমার দিদি আসছেন—ষ্টেশনে হাজির থাকতে লিখেছেন।"

হর্ষের একটা অনুগ্র প্রভা সরমার মনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল, এবং তাহার একটা তরঙ্গ-হিল্লোল মৃদু হাস্যরূপে ওষ্ঠাধরে আসিয়া দেখা দিল। কি বলিবে সহসা ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, "হঠাৎ আসছেন যে?"

রমাপদ বলিল, "তা' ত বলতে পারি নে।" মনে মনে বলিয়া ফেলিল, "উৎপাত হঠাৎ-ই আসে।" (ক্রমশঃ)

রাশিয়া

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(৩)

রাশিয়ান্‌রা যে একা কাজ করা অপেক্ষা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে অধিকতর ভালবাসে, তাহা রাশিয়ার artel অর্থাৎ যৌথ-কর্ম্ম-সঙ্ঘের সভ্য-সংখ্যা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। এক একটি এমন কর্ম্মসংঘ আছে, যাহার সভ্য সংখ্যা দুই কোটীরও বেশী হইবে। চাষা এবং মজুরদিগের সংঘই বেশী দেখা যায়।

রাশিয়ার একটা গ্রীক ক্যাথলিক গীর্জ্জার অভ্যন্তর ভাগ

রাশিয়ান চাষারা একমাত্র কুঠারের সাহায্যে গাছ কাটিয়া তক্তা করিতে পারে, এবং সেই তক্তার সাহায্যে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে পারে। অন্য কোনো প্রকার অস্ত্রের প্রয়োজন তাহারা অনুভব করে না। কুঠার চালাইতে ইহাদের মত ওস্তাদ জগতে আর কোনো জাতি আছে বলিয়া মনে হয় না। গাছ কাটিয়া একটি সম্পূর্ণ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে রাশিয়ান চাষাদের এক সপ্তাহেরও কম সময় লাগে। কয়েকজন মিলিয়া একসঙ্গে কাজ আরম্ভ করে। কেহ কাটে গাছ, কেহ সেই গাছ হইতে তক্তা ইত্যাদি বানায়। আর কেহ বা এই সকল লইয়া গৃহ নির্ম্মাণের কাজে লাগিয়া যায়।

শীতকালে যখন সমস্ত দেশ বরফে ঢাকা পড়িয়া যায়, তখন রাশিয়ান চাষারা খেলনা তৈয়ার করিয়া তাহাদের সময় কাটায়। এই সময় চাষবাসের কাজ সব বন্ধ থাকে। জ্বালানী কাঠ কাটা, গৃহপালিত পশুদের খাওয়ান এবং অন্যান্য দু একটি কাজ ছাড়া আর কোন কাজই বিশেষ করিবার থাকে না। খেলনা তৈয়ারীতে রাশিয়ান চাষাদের অসাধারণত্বের এবং রসের পরিচয় পাওয়া যায়। পুরুষেরাই বেশীর ভাগ খেলনা তৈয়ার করে। স্ত্রীলোকেরা

শীতকালে লেস্ ইত্যাদি বুনা এবং সেলাইএর কাজ করিয়া থাকে। রাশিয়ান লেস, রাশিয়াতে যা আদর পায়, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আদর পায় রাশিয়ার বাহিরে। সুন্দর করিয়াই তৈয়ার করিতে পারিত। ধনীরা মনে করিত, ভায়েনার জিনিস না হইলে ভাল হইতেই পারে না, এবং ভায়েনার জিনিস না হইলে তাহা ঘরে রাখিবার মতনও

ল্যাপ বাহক

রাশিয়াতে পূর্ব্বে ধনীদের খাট, পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি সকল গৃহ-সরঞ্জাম ভায়েনা হইতে তৈয়ার হইয়া আসিত, যদিচ রাশিয়ান ছুতারমিস্ত্রিরা এই সকল দ্রব্যাদি খুব নয়। বর্ত্তমানে এই অদ্ভুত মনোভাবের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। রাশিয়ানদের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যই রাশিয়ানরা নিজেরাই রাশিয়াতে তৈয়ার করিতেছে।
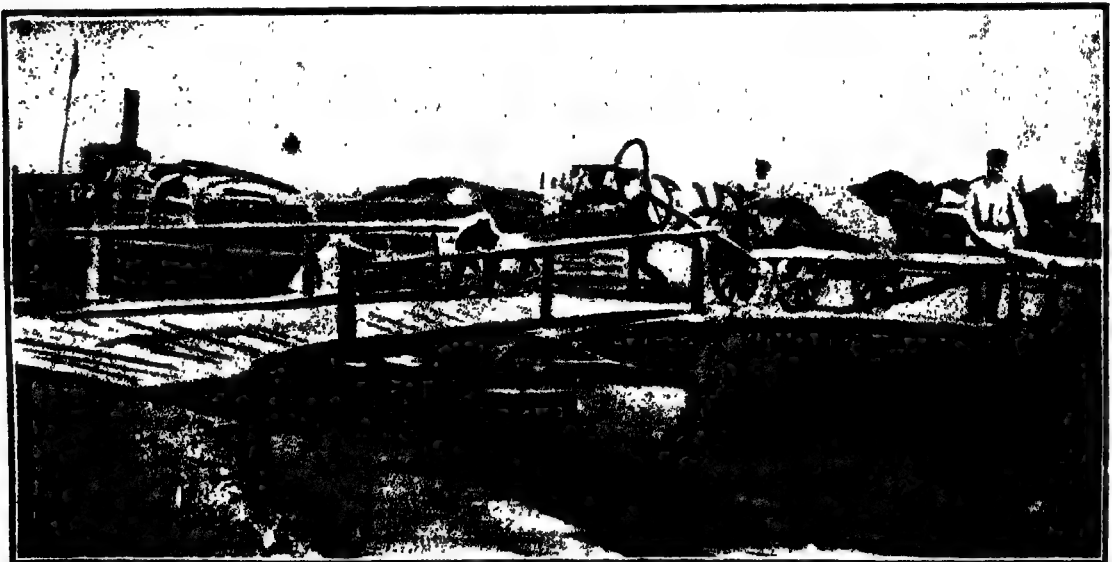
সেকেলে ঘোড়ার গাড়ী

সহরে এবং গ্রামে, উভয় স্থানেই রাশিয়ান্ চাষারা প্রায় একই ভাবে জীবন যাপন করে। শীতকালে তাহারা ছোট ছোট এবং অত্যন্ত বেশী গরম ঘরে বাস করে; গরমকালে আবার প্রায়ই তাহারা ঘরের বাহিরে সময় কাটায়। তাহাদের খাদ্য বাঁধা কপির ঝোল, মোটা রুটি এবং গম ঘাঁটা (ইহাকে রাশিয়ানরা 'কাসা' বলে)। বিশেষ উৎসবাদিতে এই বাঁধাকপির ঝোলে মাংসের টুকরা মিশান হইয়া থাকে। চাষারা চা অত্যন্ত বেশী পান করিয়া থাকে। ইহাদের চা বলিতে যাহা বুঝায়, আমাদেব চা বলিতে তা বুঝায় না। চায়ে যে যত পারে চিনি ঢালিয়া দ্যায়। : সাধ্যে কুলাইলে গেলাসের মুখ পর্য্যন্ত চিনি দেওয়া হয়, এবং লেবু সস্তা হইলে এক টুকরা লেবুও এই চায়ে দেওয়া হয়। এই প্রকার চা পান করিতে রাশিয়ান কৃষকেরা অত্যন্ত ভালবাসে। রুটি হইতে এক প্রকার মদ তৈয়ার করিয়া ইহারা পান করে। এই মদে কোনো প্রকার গন্ধ নাই; তবে ইহা গরমকালে পান কবিলে শরীরে স্ফূর্ত্তি আসে।

কৃষক রমণী

গরিবের গৃহস্থালী

কৃষকদের প্রধান আনন্দ নৃত্য করা এবং গান শোনা। সহরে সাধারণ উদ্যান-সমূহে ব্যাণ্ড বা কন্সার্ট থাকিলে উদ্যান লোকারণ্য হইয়া যায়। কাজ ফেলিয়াও লোকে ব্যাণ্ড এবং কন্সার্ট শুনিতে যায়। রাশিয়ার প্রত্যেক লোকই নাচিতে জানে। গ্রীষ্মকালে পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই দেখা যায়, একদল যুবক এবং

একদল যুবতী মনের আনন্দে নৃত্য করিতেছে। খোলা মাঠে ইহাদের নাচ অত্যন্ত মনোরম দেখিতে হয়। নাচ এক সঙ্গে মিলিয়াও হয় এবং একলা-একলাও হইয়া থাকে।

নদীপথে কাঠের চালান

রাশিয়ান ballet নৃত্য অভিনয়-জগতের একটি অতি চমৎকার সম্পত্তি। রাশিয়ান জাতীয় নৃত্যকলা হইতেই এই

ভল্গার মৎস্যজীবী

ব্যালেটের জন্ম। জারদের সময়ে সম্রাটের তহবিল হইতে টাকা খরচ করিয়া লোককে নাচ শিখান হইত। তাহা ছাড়া দেশের ধনী দরিদ্র সকলেই সকল স্থানের নাচে যোগ দিত এবং টাকা দিয়া নৃত্যকারীদের যথেষ্ট সাহায্য করিত।

পেট্রোগ্রাড্ এবং মস্কাওএর থিয়েটারগুলিতে সপ্তাহে দুইটি করিয়া ব্যালেট রজনী থাকিত। এই দুই রজনীতে নাট্যশালাগুলিতে তিল ধারণের স্থান থাকিত না। ব্যালেট নাচকে রাশিয়ার ছোট-বড় সকলেই এক ভাবে দেখিয়া থাকে। সকলের কাছেই ইহার সমান আদর। এই একটি

মাত্র ব্যাপারে ছোট বড়, ধনী দরিদ্র সকলে সমান ভাবে মিশিত।

অপেরাও রাশিয়ানদের কাছে অত্যন্ত আদরের জিনিস। জার দ্বিতীয় নিকোলাস "People's palace" নামে একটি নাট্যশালা পেট্রোগ্রাডে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই
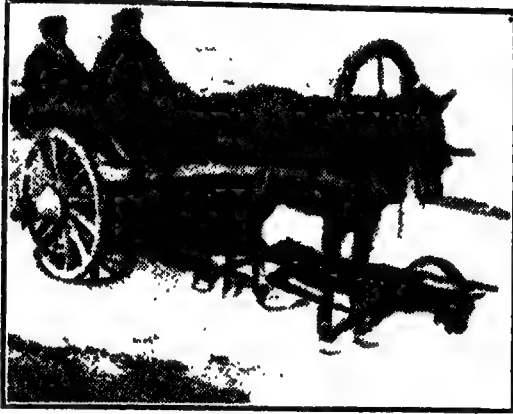
মাল বহিবার গাড়ী

নাট্যশালাতে লোকে সামান্য পয়সা খরচ করিয়া ভাল ভাল স্বদেশী এবং বিদেশী অপেরা দেখিবার সুযোগ লাভ করিত। এইস্থানে যে কেবলমাত্র অভিনয়ই হইত, তাহা নহে; অনেক সময় বিখ্যাত গায়কদের গানও হইত।

রাজনৈতিক ব্যাপারে রাশিয়ান জনগণের স্থান জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির নীচে হইলেও, শিল্পজগতে তাহাদের স্থান এমন আর কোনো জাতি পারে না—যদিও রাশিয়ান সাধারণ লোকদের ঘরদ্বার দেখিলে তাহাদের সৌন্দর্য্যপ্রীতির

শস্য বোঝাই গাড়ী

বিষয়ে সন্দিহান না হইয়া পারা যায় না। অভিনয়-জগতে রাশিয়ান অভিনেতাদের স্থান জগতের অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ
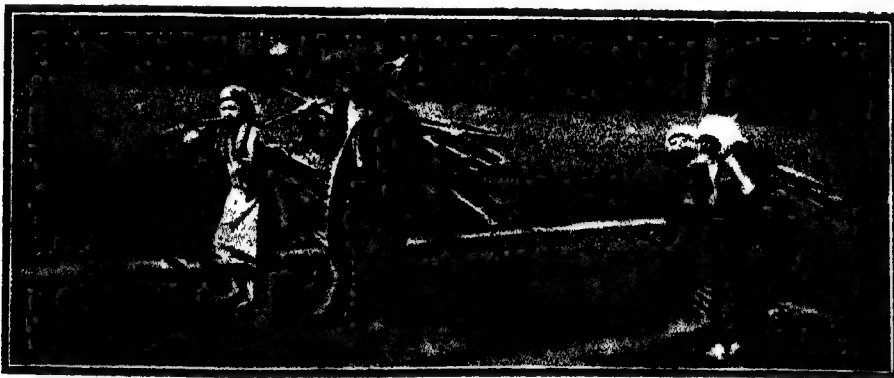
জঙ্গল হইতে কাঠ কুড়ানো

বোধ হয় সকলের উপরে। সৌন্দর্য্যের প্রতি রাশিয়ানদের একটা স্বাভাবিক টান আছে। সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অভিনেতাদের নীচে ত নয়ই, বরং অনেক স্থানে উপরে বলিলেও দোষ হয় না। ইহা হইতে কেহ যেন মনে করিবেন

না যে, রাশিয়ায় যাহা কিছু অভিনীত হয়, সকলই অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের। তাহা নয়। অন্যান্য দেশের মত এখানেও ভাল ভালর দিকেও তেমনি বলা যায় যে, মস্‌কাও আর্ট থিয়েটারে যেমন উচ্চাঙ্গের অভিনয় হইয়া থাকে, জগতের অন্য কোনো

সাধারণ কৃষক রমণী

মন্দ দুই আছে। অনেক স্থানে এমন অভিনয় হয়—যাহা অপেক্ষা কুৎসিত অভিনয় বোধ হয় আমাদের দেশেও হয় না। স্থানে তেমন হয় বলিয়া শুনা যায় না। পেট্রোগ্রাড্‌ এবং মসকাও আর্ট থিয়েটারের অভিনয়গুলিকে নিখুঁত বলা

রাশিয়ার অবস্থাপন্ন রমণীবৃন্দ

চলে। কোনো দিকে কোনো দোষ কেহ দেখিতে পায় না। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় বোধ হয় জগতের অন্য কোন নাট্যশালায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত রাশিয়ার অধিকাংশ নাট্যশালাতে বিদেশী নাটকের অনুবাদ অভিনয় করা হইত। জাতীয় নাটকের আদর প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। ফরাসী এবং ইংরেজী নাটকের চলন অত্যন্ত বেশী ছিল। বর্ত্তমানে রাশিয়াতে আবার জাতীয় সকল জিনিসের আদরের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাটকাদিরও অত্যন্ত আদর হইয়াছে; এবং ভাল ভাল নাট্যশালাতে রাশিয়ান নাটক ছাড়া অন্য নাটকের অভিনয় হয় না।

অবস্থাপন্ন কৃষক রমণী

উত্তর-রাশিয়ার কাষ্ঠ-কুটীর

সকল কার্য্যের মধ্যেই রাশিয়ান চরিত্রের খামখেয়ালির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঁধাবাধির মধ্যে ইহারা থাকিতে ভালবাসে না। খেয়াল এবং খুসী মত কাজ করিতে ইহারা অত্যন্ত ভালবাসে। ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির মধ্যে যে discipline দেখা যায়, রাশিয়ান জাতিতে তাহার একান্ত অভাব চারিদিকে দেখা যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করার ফলেই হয় ত ইহা হইয়া থাকিবে। জাররা যে সকল সময়েই প্রজাপীড়ক ছিল, তাহা নয়, অনেকে প্রজারঞ্জকও ছিল—কিন্তু মোটের উপর ইহা বলা যায় যে, জারদের শাসনে রাশিয়ার জনগণ অত্যাচারই বেশীর ভাগ সময় পাইয়াছে। জারদের শাসন কঠিন হইলেও তাহাতে কোনো নিয়ম বা আইন ছিল না। রাজকর্ম্মচারীরা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিত, তাহাদের যথেচ্ছাচারে বাধা দিবার কেহ ছিল না। জারদের

শাসনের যখন অবসান হইল, তখন যাহারা শাসন ভার গ্রহণ করিল, তাহারা তখন তখনই এত বড় একটা খামখেয়ালী লাগিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এই অনিয়ম এবং অরাজকতার মাঝখানে নিয়ম এবং সুশাসন দেখা দিল। বর্ত্তমানকালে

জেটি হইতে মাল নামানো

এবং যুগ যুগ পীড়িত জাতিকে বাঁধা নিয়মকানুনের মধ্যে ফেলিতে পারিল না। দেশময় যথেচ্ছাচারের স্রোত বহিতে রাশিয়াতে জারদের আমলের কঠিন শাসন এবং অত্যাচার নাই বটে, কিন্তু তাই বলিয়া অরাজকতাও নাই। দেশের
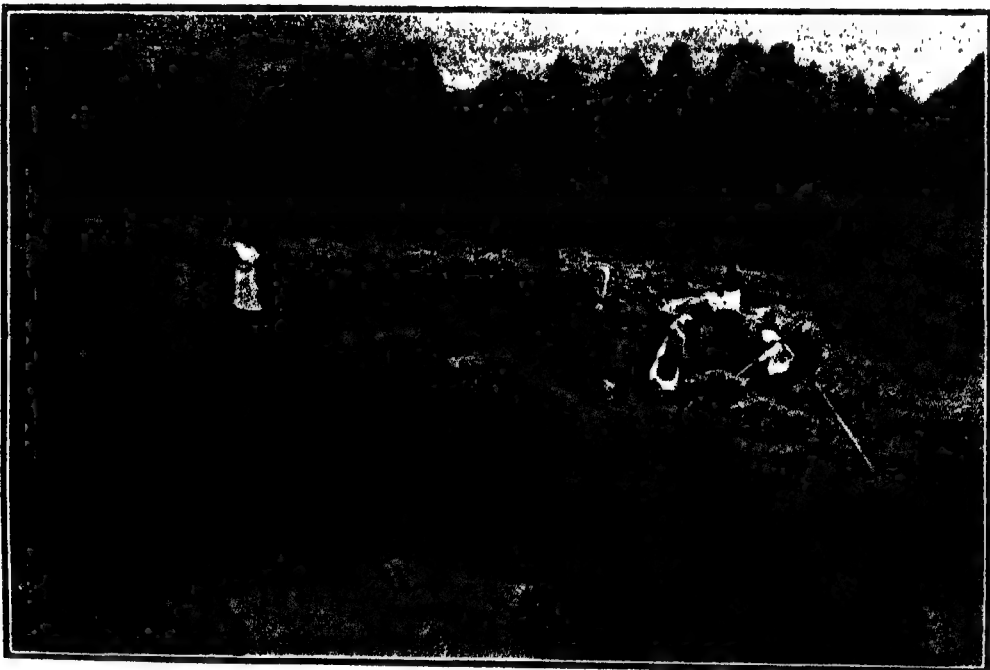
রাশিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য

মধ্যে শান্তি আসিয়াছে,—বাণিজ্য উন্নতি লাভ করিয়াছে। দেশের লোকদের সাধারণ অবস্থারও বহু পরিমাণে উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

উপায় ছিল না। অনুমতি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ রাজকর্ম্মচারীকে কিছু ঘুস যোগাইতে পারিলে প্রয়োজনীয় অনুমতি পাইতে তিলমাত্র বিলম্ব হইত না।
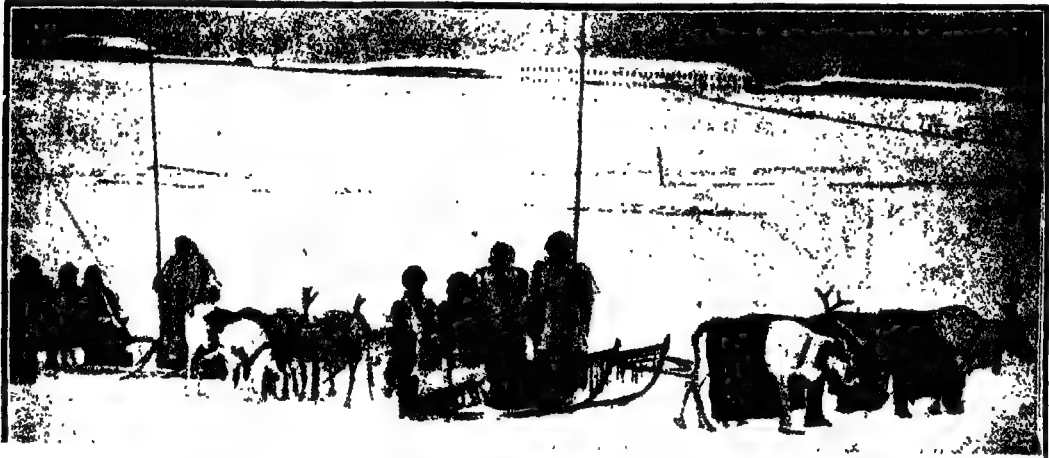
হরিণ-বাহিত গাড়ী

জঙ্গল-রক্ষকের গৃহ ও পরিবার

কিন্তু ঘুস না দিতে পারিলে কাহারো কোনো কাজ করিবার অনুমতি রাজসরকার হইতে পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অনেক সময় অল্প কিছু ঘুস পাইবার আশা না থাকিলে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী সামান্য দুই চারিটা সিগারেট ঘুস লইতেও আপত্তি করিত না। অনেক সময় অনুমতির জন্য আবেদনকারীকে রাজকর্ম্মচারী বলিতেন "তুমি আমার বাড়ীতে আমার সঙ্গে দেখা করিও—সেইখানে ভাল করিয়া কথা বলা যাইবে"—ইহার মানে আর কিছু নয়—ঘুস কি দিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া বলা যাইবে। বর্ত্তমানে দেশের সরকারী

পূর্ব্বকালে রাজ-সরকার হইতে কোন কিছু করিবার জন্য অনুমতি গ্রহণ করিতে হইলে একজন লোককে বিস্তর অর্থব্যয় করিতে হইত। ঘুস ছাড়া কোনো কাজ হইবার

কর্ম্মচারীদের এরূপ মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহারা তাহাদের বেতন ছাড়া আর কোনো প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করে না।

রাশিয়ানরা মনে করিত যে গভর্ণমেণ্ট একটা বাহিরের জিনিস, তাহাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। গভর্ণমেণ্ট যে তাহাদের এবং তাহারাই গভর্ণমেণ্ট ভাঙিতে বা গড়িতে পারে, এই বোধ মাত্র কয়েক বৎসর হইল ইহাদের জন কয়েকের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে ইহারা যেখানে নিতান্ত অনুপায় হইয়া পড়িত, কেবলমাত্র সেইখানেই সরকারের আজ্ঞা পালন করিত; কিন্তু সুবিধা পাইলেই ফাঁকি দিতে তাহারা কসুর করিত না। এখন পর্য্যন্ত বেশীর ভাগ লোকেরই এই মনোভাব রহিয়াছে। এবং মনে হয় যে এই বিচিত্র মনোভাব দূর হইতে এখন অনেক বৎসর সময় লাগিবে। যে জিনিস হাড়েমাসে জড়াইয়া আছে, তাহাকে দূর করা বড় সহজ কথা নয়।

ঘাস সংগ্রহ

১৯১৭ খৃঃ অব্দের মহাবিদ্রোহের পর জার-রাজত্বের অবসান হইয়াছে। এই সময় যাঁহারা দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা দেশের সকল দিক সামলাইতে পারেন নাই। পূর্ব্বে যে সমস্ত বিষয় অত্যন্ত খারাপ এবং অরাজক অবস্থায় ছিল, তাহাদের অনেকের মধ্যে নিয়ম এবং সুশাসন আসিয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক বিষয় করিবার রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে সকল দিকের উন্নতি হইবে, এ আশা করা যাইতে পারে। এখনও অনেক স্থানে জমিদারগণ সমবেত ভাবে তাহাদের পূর্ব্ব অবস্থা ফিরিয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছে। দেশের কৃষক এবং অন্যান্য সাধারণ লোকদের উপর তাহাদের মনোভাবের কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই। মহা-বিদ্রোহের পর ফ্রান্সের অরাজকতা সম্পূর্ণ ভাবে দূর করিতে প্রায় শত বৎসর কাল সময় লাগিয়াছে। রাশিয়াতেও অরাজকতা একেবারে দূর করিতে বেশ কিছুকাল সময় লাগিবে ইহা বিচিত্র নয়।

জারদের আমলে সৈন্যদের জন্য কোনো প্রকার ভাল বন্দোবস্ত ছিল না। নিয়মিত বেতন পাওয়া দূরের কথা, তাহারা নিয়মিত খাওয়া এবং শুইবার যায়গাও পাইত না। যে যেখানে পারিত, রাত্রিকালে মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া

থাকিত। রাজা মনে করিতেন, সৈন্যরা তাঁহার ক্রীতদাস। সৈন্যগণও তাহা নত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। সহরে থাকিবার সময়েই তাহাদের বেশী কষ্ট ভোগ করিতে হইত। এখন যেমন তাহাদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট ব্যারাক হইয়াছে—জারের আমলে সে রকম প্রায় ছিল না বলিলেই হয়। ব্যারাক যা দু' একটি ছিল, তাহা সেনানায়কগণ দখল করিয়া থাকিত। সৈন্যদের মনে ইহাতে অসন্তোষের বীজ পড়িয়াছিল। গত মহাবিদ্রোহের সময় তাহারা সেই বিষ উদ্‌গার করে।

দরিদ্র বালক বালিকা

চাকরদের মধ্যে বড়লোক এবং বড় বড় হাউসের দারোয়ানরা বেশ সুখে থাকিত। তাহাদের কাজ ছিল—বাহির হইতে কেহ আসিয়া বাড়ীর বা হলের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় তাহার জুতাবরণ এবং ওভারকোট খুলিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা। এই কার্য্যে তাহারা মাসিক নিয়মিত বেতন ছাড়া যথেষ্ট বক্‌সিস্‌ও লাভ করিত। রাশিয়ানরা রাস্তার বরফ এবং কাদা হইতে জুতাকে রক্ষা করিবার জন্য এক প্রকার জুতাবরণ ব্যবহার করে। গরীব লোকে অবশ্য অনেক সময় জুতাই পরে না,—এখানে কেবল বড় লোকদের কথাই বলিতেছি। এই জুতাবরণকে goloshes বলে। জুতাবরণ না খুলিয়া ঘরের ভিতর যাওয়া ইয়োরোপের সকল স্থানেই অভদ্রতা বলিয়া গণ্য হয়। রাশিয়াতে জুতাবরণএর সঙ্গে ওভার-কোটও হলের বা ঘরের বাহিরে খুলিয়া না যাওয়া অত্যন্ত অভদ্রতা। তাহা ছাড়া রাশিয়ার ঘরের ভিতর গরম এত বেশী যে ওভারকোট দায়ে পড়িয়াই খুলিতে হয়। ওভারকোট গায়ে রাখিয়া ঘরে অল্পক্ষণ থাকিলে গা দিয়া ঘাম পড়িতে থাকে। যে সকল বাড়ীতে দারোয়ান নাই, সেখানে চাকরাণী দ্বারা এই কাজ হয়। ইহাদের বক্‌সিস্ দেওয়া এক রকম বাধ্যতামূলক বলা যায়। যে সকল বাড়ীতে খুব বেশী লোকজন যাওয়া আসা করে, সেই সকল বাড়ীর মালিকেরা চাকর এবং দারোয়ান নিযুক্ত করিবার সময় কম বেতন দিয়া বলেন—"তোমার কম বেতনে কোনো ক্ষতি হইবে না, কারণ মাসে এতজন লোক আমাদের বাড়ীতে যাওয়া আসা করে।" অনেক স্থানে এই জামা এবং জুতাবরণ খোলার জন্য প্রাপ্য বক্‌সিস্‌কে বেতনের অংশ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। বনিয়াদী ঘরের অনেকে যাহারা এখন দুরবস্থায় পড়িয়াছে, তাহারা বক্‌সিস্ দিবার

ভয়ে বেশী লোকের বাড়ী যাওয়া আসা একরকম বন্ধ করিয়াছে।

বড় বড় তিনতলা চারতলা বাড়ীর নীচেতলায় যে বাস করে, সে পুলিসের নিকট বাড়ীর উপরের লোকদের সকল রকম খোঁজ দিতে বাধ্য থাকে। কে কখন বাড়ী থাকে বা বাহিরে যায়, কাহার কি পেশা ইত্যাদি সকল প্রকার খোঁজই তাহাকে রাখিতে হয়। বাড়ীর উপরতলার লোকদের কোনো খবর বা সংবাদ দিতে হইলে নীচের doornik বা উঠান-রক্ষকের কাছে বলিলেই হয়। সে সংবাদ ঠিক লোকের নিকট পৌছাইয়া দিবে। কয়লা জল ইত্যাদিও দরকার মত তাহাকে উপরের লোকদের নিকট পৌছাইতে হয়। এই সমস্ত কাজের জন্ম সে উপরতলার বাসিন্দাদের নিকট বক্‌সিস্ এবং বেতন মাসে মাসে পাইয়া থাকে। 'এই উঠান-রক্ষকরা সাধারণতঃ ভদ্র এবং ভাল লোকই হইয়া থাকে—কিন্তু মাঝে মাঝে উপরতলাবাসীদের ব্যবহারের জন্ম ইহারা বদমেজাজী হইয়া যায়। Doornikকে ভাল-রকম বক্‌সিস্ না করিলে উপরতলাবাসীদের নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

রাশিয়ান পাচক মোটামুটি বেশ ভাল রান্না করিতে পারে। সে হয় ত ১০০ প্রকার রান্না জানে না, কিন্তু যাহা পাঁচ রকম জানে, তাহা বেশ ভাল করিয়াই জানে। ঝোল রান্নায় রাশিয়ান পাচক সিদ্ধহস্ত। ছোট ছোট পাখীর মাংসও ইহারা খুব সুস্বাদু করিয়া পাক করিতে পারে। যে সকল পাচক গ্রাম হইতে সহরে পাচকবৃত্তি করিতে আসে—তাহারা সঙ্গে করিয়া এমন অনেক কুসংস্কার আনে, যাহাতে মুনিবদের অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

একবার এক বাড়ীতে একটি নতুন পাচিকা নিযুক্ত করার পর দেখা গেল যে ঘরময় চারিদিকে শুবুরে পোকা কিলকিল করিয়া গড়াইতেছে। সন্ধান করিয়া জানা গেল যে পাচিকাটি সৌভাগ্য লাভের আশায় গ্রাম হইতে আসিবার সময় এক ঝুড়ি শুবরে পোকা সঙ্গে করিয়া লইয়া আসে। তাহারাই বাড়ীর চারিদিকে সৌভাগ্য ছড়াইয়া বেড়াইতেছে।

দুইটী শিশু

বড় বড় সহরগুলির রাস্তাতে গরুর এবং ঘোড়ার গাড়ীর প্রাচুর্য্য দেখা যায়। অনেক সময়ে এক সারিতে এত গাড়ী থাকে যে কাহাকেও রাস্তা পার হইতে হইলে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। রাশিয়ান বাজারগুলির সহিত আমাদের দেশের বাজার বা হাটের অনেক মিল আছে। শত শত স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা রং-বেরঙের পোষাক পরিয়া বাজারে আসে। সকলেই যে বাজার

করিতে আসে তাহা নয়—অনেকে বেড়াইতেই আসে। চারিদিকে হাসি, গল্প, গান ইত্যাদি শোনা যায়। যাহারা পল্টনী মেজাজের লোক, তাহারা এই প্রকার বাজার দেখিতে ভালবাসিবে না, কিন্তু তাহা ছাড়া বিদেশীয় প্রায় সকলেরই রাশিয়ান বাজার দেখিতে খুব ভাল লাগে। রাশিয়ানদের মন এবং স্বভাব এমন চমৎকার যে তাহাদের ভাল না বাসিয়া পারা যায় না। ইহাদের ঘৃণা এবং ভালবাসার মাঝামাঝি কিছু করিবার উপায় নাই। হয় ঘৃণা করিতে হইবে, না হয় ভালবাসিতে হইবে। সেইজন্য যাহারা রাশিয়ানদের ভালবাসে না তাহারা ইহাদের সোজাসুজি ঘৃণা করে। ইহাদের কাছে খোলা-মন এবং সরল স্বভাব হওয়া গাধামো মাত্র। এবং গাধামো পশুর চিহ্ন।

ডাক্তারের ভিজিট

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

(১)

এলাহাবাদ, সিভিল লাইন্‌স্‌এ থর্ণহিল রোডের উপর একটী বাংলা ;—চারিদিকে বাগান, বাগানে বড় বড় গাছ, ফুল-গাছের কেয়ারী, লতার জাফরী, সুন্দর, সুবিন্যস্ত।

প্রাতঃকাল, চৈত্রের প্রারম্ভ, এখনো বেশ ঠাণ্ডা। হাইকোর্টের প্রৌঢ় উকিল রামসুন্দর বাবু বালাপোষ গায়ে মালির কাজের তদারক করিতেছেন। পার্শ্ববর্ত্তী মেয়ো হলের সম্মুখস্থ ইয়োরোপীয় স্কুলে "ঢং ঢং" করিয়া সাতটা বাজিয়া গেল।

একটী সাত আট বৎসরের মেয়ে আসিয়া ডাকিল, "বাবা, কোকো যে জুড়িয়ে গেল।"

"চল মা, যাই", বলিয়া রামসুন্দর বাবু তাঁহার আফিস ঘরে ঢুকিলেন। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, শুধু পাখীর কাকলির সহিত দূর হইতে একটী ভিখারীর করুণ সুর ভাসিয়া আসিতেছিল, "ভাইয়া, একো পায়সা মিলে,—এ ভাইয়া।"

রামসুন্দর বাবু আরামচৌকিতে বসিয়া সবেমাত্র কোকোর পেয়ালা হাতে লইয়াছেন, এমন সময় বাহিরে ফটক খুলিবার শব্দ হইল। কন্যা তাহা দেখিয়া শঙ্কিতভাবে পিতাকে বলিল, "বাবা,—ডাক্তার বাবু আসছেন,—ডাক্তার বাবু!" রামসুন্দর বাবু ত্রস্তে বালাপোষ ফেলিয়া একটী গরম কোট পরিলেন। কন্যা বালাপোষটী লইয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল।

রামসুন্দর বাবু টেবিলের উপর খবরের কাগজ দিয়া কোকোর পেয়ালা ঢাকা দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিতে করিতে মাথায়-কম্ফর্টার-জড়ান, চায়না কোট ও সাদা পেন্টালুনে সজ্জিত ষ্টেথস্কোপ হাতে ডাক্তার বাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "গুড মর্ণিং রামসুন্দর বাবু, এই যে, আপনি তোমার গিয়ে গায়ের কাপড় ছেড়েছেন দেখছি। এই তো চাই। You people তোমার গিয়ে খোকড়া জড়িয়ে বড়ই জবড়জঙ্গ হয়ে থাকতে ভালবাসেন। এদিকে খোকড়ার ফাঁকে ফাঁকে যে ঠাণ্ডা ঢোকে, তা তো বুঝবেন না। দেখুন দেকি, কোট পরে কেমন ঝাড়াঝাপ্টা দেখাচ্ছে! কিন্তু ও কি! তোমার গিয়ে, আবার কোকো!! না—আপনাদের আর কোন আশা নেই! কতবার বলেছি—চা ধরুন। চা হচ্ছে, তোমার গিয়ে, সর্ব্বরোগহর। কিন্তু আপনি আর কোকোর মায়া ত্যাগ করতে পারেন না। আমার Dispensaryতে তোমার গিয়ে দেড় টাকা পাউণ্ডের যা চা আছে, উৎকৃষ্ট quality, আজই পাউণ্ড দুই আনিয়ে নিন। আর যদি একসঙ্গে তোমার গিয়ে পাঁচ পাউণ্ড নেন, তো পাউণ্ড পিছু এক আনা সস্তা—"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত হলধর "পেন" (payne, পাইনের বিলাতী সংস্করণ) মাস সাত আট হইল এলাহাবাদে প্র্যাকটীস জমাইতে আসিয়াছেন। লয়েন্সগঞ্জের বাঙ্গালী পল্লীর মধ্যে বাসা, সেখানে একটী ডাক্তারখানাও খুলিয়াছেন। পসার বাড়াইবার জন্য ইনি প্রবাসী বাঙ্গালীদের নিকট ভিজিট

গ্রহণ করেন না, তবে রোগী দূরের হইলে টাঙ্গা ভাড়া লইয়া থাকেন মাত্র। ইনি কিন্তু প্রেসক্রিপসন্ দিয়া সকলকে স্পষ্টই অনুরোধ করেন যেন ঔষধ তাঁহার ডিসপেনসারী হইতেই ঔষধ লওয়া হয়,—কারণ বলিয়া থাকেন, তাঁহার ব্যবস্থা-পত্রে লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ঔষধ এ যুদ্ধের বাজারে (আমি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিতেছি) এক মাত্র তাঁহার কাছেই প্রাপ্তব্য। নিন্দুকেরা কিন্তু কানাকানি করে যে মিকশ্চারে রংকরা জলের সহিত যৎকিঞ্চিৎ যাহা মিশ্রিত থাকে, তাহা কলিকাতার নিলামে ক্রীত রদ্দি ঔষধ মাত্র।

কথার স্রোত থামাইয়া ডাক্তারকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার কোকোর পেয়ালার দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া রামসুন্দর বাবু বলিলেন, "আপনাকেও এক পেয়ালা আনিয়ে দিই না? খেয়ে দেখুন, আসল ইংলিশ Cocoa, বিশেষ আমি ঘন দুধ দিয়ে খেয়ে থাকি, বেশ ভালই লাগবে।"

দুই পাটী দন্ত বিকশিত করিয়া হাসিতে গিয়া টপ্ করিয়া এক ফোঁটা মুখামৃত ডাক্তারের মুখ হইতে কোটের ব্রেষ্ট পকেটের উপর পড়িল। তাড়াতাড়ি বাম হস্তে তাহা ঢাকিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আপনি যে নাছোড়বান্দা, তোমার গিয়ে, না খেয়ে করি কি! তবে জানেনই তো, আমি, তোমার গিয়ে, Empty Stomachএ আবার চা, কোকো, কফি, কিছুই খাই না, কেউ যে খায়, তাও পছন্দ করি না। আপনাকে, তোমার গিয়ে, আমি তো কতবারই—"

আবার বক্তৃতা আরম্ভ হয় দেখিয়া রামসুন্দর বাবু হাঁকিলেন, "কান্হাইয়ালাল, এক পিয়ালী কোকো, ঔর দোনো টোষ্ট লা'না।"

অন্দর হইতে কান্হাইয়ালাল সাড়া দিল "বহুত আচ্ছা হাজুর।"

ডাক্তার তখন নিশ্চিন্তে জাঁকাইয়া বসিয়া বলিলেন, "দেখি, রামসুন্দর বাবু, আপনার হাতটা—জানেনই তো, আমি যা তা ডাক্তারের মত নই। Common ডাক্তাররা, তোমার গিয়ে, নাড়ী দেখার জানে কি? আমি দস্তুর মত কবিরাজী মতে নাড়ী দেখে থাকি। আমার, মশায়, prejudice নেই—যাদের যা ভাল দেখি, তোমার গিয়ে তাই accept করি। M. B. একজামিনে সোনার মেডেল পেয়েছি বলে কি কবিরাজী আর হাকিমীকে গালাগাল দেব? সে রকম ডাক্তার, তোমার গিয়ে, আমি নই মশাই। জলটুকু মেরে ক্ষীরটুকু আমি নিতে চাই। হ্যাঁ—আর ঐ মেডেলের কথা, সেবার কলকেতা থেকে এসবার সময় তোমার গিয়ে কি হল জানেন, ঐ সন্ধ্যের এক্স্প্রেসে ছেড়েছিলুম কি না, তা তোমার গিয়ে আসানসোলে বড় ক্ষিদে পেলে। কেলনারের খানসামা বেটার কাছ থেকে কিছু খাবার নিয়ে অন্ধকারে, তোমার গিয়ে, কি বলে ভাল, —ঐ টাকা দিতে গিয়ে মেডেলটাই ছাই ভুল করে দিয়ে ফেল্লুম। তাইতেই সেটা আমার গেল। নইলে তোমার গিয়ে বুঝলেন কি না, সে চমৎকার ছিল। এ কথা তো আপনাকে বলেছি, না? আর first stand করবার ডিপ্লোমাটা, তোমার গিয়ে, সেটাও কলকেতায় পড়ে রয়েছে। ঐ যে, কাঁশারী পাড়ায় আমার শ্বশুর বাড়ী, সেইখেনে।

"হাঁা, দেখি হাতটা একবার,—আসল কথাই ছাই ভুলে যাই। (হাত দেখিতে দেখিতে) এই যে pulse একটু তোমার গিয়ে irregular দেখছি,—a bit unsteady, যারে কোবরেজেরা বলে বায়ুগ্রস্ত, আর কি! You require something তোমার গিয়ে to buck you up, Sir. এ সব ঐ চা না খাবার ফল, আর কি। তা আচ্ছা, এক কাজ করুন। পরশু যে মিকশ্চারটা দিয়েছি, তোমার গিয়ে সেটা আর খাবেন না। একটা নূতন মিকশ্চার আর তার সঙ্গে দুই পাউণ্ড চা আমার লোকটার হাতে এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি। তাকে আনা দুই দিয়ে দেবেন, তাহলেই তোমার গিয়ে সে খুসি হয়ে যাবে, আর তার হাতে ওমনি যদি cash paymentটাও করে দেন, তা হলে তো তোমার গিয়ে—"

কান্হাইয়ালাল এই সময় কোকো ও মাখন-দেওয়া টোষ্টকটী লইয়া আসায় বাধা পড়িল। আবার নূতন মিকশ্চার আসিবে শুনিয়া রামসুন্দর বাবু কি বলিবেন ভাবিয়া না পাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে একটু কাসিলেন। আর যাবে কোথা? ডাক্তার একমুখ রুটী চিবাইতে চিবাইতে রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে, কাসিও আবার আছে দেখছি। Mixtureএ তোমার গিয়ে একটু ইয়ে করে দিতে হবে। আর কোর্টে যাবার সময় টাঙ্গার বেশ করে পরদা ফেলে যাবেন, গায়ে যেন রোদ না লাগে।

"হ্যাঁ, আর কি বলে ভাল বলছিলুম, ঐ তোমার গিয়ে

cash paymentটা যদি নাও করতে পারেন আজ, ক্ষেতি নেই, মাসকাবারে দিলেই হবে এখন। আপনি তো তোমার গিয়ে কখনো বেশী দিন ফেলে রাখেন না। সবাই ওরকম হলে বড় সুবিধে হত। খরচ পত্র চালান, তোমার গিয়ে, বড়ই কঠিন,—এই আমার কম্পাউণ্ডারটা, দেখুন না কেন, তোমার গিয়ে পাজীর পা ঝাড়া, এই সেদিন ডিসেম্বর মাসের মাইনে নিলে, আর আজ সবে মার্চের ২১শে তারিখ, তোমার গিয়ে পেড়াপিড়ি লাগিয়েছে জানুয়ারীর টাকার জন্যে। ছেলেমেয়েগুলো কোথা ? তাদের একবার—"

কয়েকটী মক্কেল আসিয়া পড়ায় ডাক্তার বাবুর আর ছেলেমেয়েদের চিকিৎসা করা ঘটিয়া উঠিল না, চুপচাপ পেয়ালা ও প্লেট খালি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন; কিন্তু যাইবার সময় ঔষধ ও চা যাহা পাঠাইবেন তাহার cash payment সম্বন্ধে আর একবার বলিতে ভুলিলেন না।

উপস্থিত মক্কেলদের মধ্যে সেখ রিয়াজুদ্দীন বলিলেন "বাবু সাব্ আপনে কেঁও ইয়ে জানবরকি এৎনে লিহাজ্ করতে হেঁ!"

রামসুন্দর বাবু উত্তর দিলেন, "মেরে দেশকে আদমি হ্যায়, মিয়া সাব্।" বলিয়া প্রশান্ত হাস্যে মক্কেলদের কাগজ পত্রে মনোনিবেশ করিলেন।

(২)

তিন চারি মাস পরে,—অতি প্রত্যুষে রামসুন্দর বাবু মোটরের শব্দে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন "পাইওনিয়র" হস্তে ব্যারিষ্টার-শ্রেষ্ঠ মুখার্জ্জী সাহেব রাত্রিবাসের উপর কিমোনো চড়াইয়া উপস্থিত। রামসুন্দর-বাবুকে দেখিয়া তিনি উত্তেজিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "রামসুন্দর, Western India War Loan Sweepএ তোমার ticketএর number কত? three five seven seven নয় ?"

রামসুন্দরবাবু একটু ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ,—কালকের drawingএ উঠেছে নাকি ?

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন, "Excited হয়ো না, বস, দেখাচ্ছি।"

অল্প হাসিয়া রামসুন্দরবাবু বলিলেন, "আমার কবে তুমি Excited হতে দেখলে যে বলছ ? তুমিও দেখছি হলধর ডাক্তারের মত আমার heart weak দেখতে আরম্ভ করলে।"

হলধর ডাক্তারের উল্লেখে হাসিয়া মুখার্জ্জী সাহেব Pioneer খুলিয়া দেখাইলেন, বোম্বাইয়ের telegram,—রামসুন্দর বাবুর ৩৫৭৭ নং টিকিটে দ্বিতীয় পুরস্কার প্রায় ছয় লক্ষ টাকা উঠিয়াছে !

মুখার্জ্জী সাহেবের ব্যস্তসমস্ত ভাবে আগমনে কৌতূহলী হইয়া রামসুন্দর বাবুর পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ক পুত্র দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ব্যাপার শুনিবামাত্র সে চীৎকার করিতে করিতে লাফাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল। বাড়ীতে একটা ছুটাছুটী গোলমাল পড়িয়া গেল, স্বয়ং গৃহিণী আসিয়া পরদার আড়ালে দাঁড়াইলেন।

রামসুন্দরবাবু গোলযোগ শুনিয়া বিরক্তি প্রকাশ করায় মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন, "ওহে, বারণ কোরো না, তোমার মত সকলেই ও-রকম স্থির-প্রকৃতির নয়। তোমার যায়গায় আমি হলে যে কি করতুম, জানি না।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি, যে রকম হড়তে পুড়তে তুমি খবর নিয়ে এলে, আমি তো ভেবেছিলুম না জানি কি হল। Drawingএর result জানবার জন্যে বোধ হয় তোমার সমস্ত রাত ঘুম হয় নি। আমার তো মনেও ছিল না,—ঐ দেখ না আমার Pioneerখানা এখনো পড়ে রয়েছে, খোলাও হয় নি।"

মুখার্জ্জী সাহেব বলিলেন, "আমি চল্লুম টেলিগ্রাফ আফিসে, Western India Turf Clubএর Secretaryকে একখানা Prepaid Express telegram করে দিই। এ সব ব্যাপারে Confirmation দরকার। ওদের নিজে হতে তোমাকে wire করা খুব উচিত ছিল।"

রামসুন্দর বাবুর কন্যা অণিমা আসিয়া বলিল, "মা বল্লেন আপনি বসুন, মিষ্টিমুখ করে চা খেয়ে যাবেন। দাদা বাইসিক্লে তার করতে যাবে বলছে।"

রামসুন্দরবাবু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ হে, তুমি বোস, যে মিষ্টি খবর এনেছ, মিষ্টিমুখ আগে করা দরকার। সুশীল যাক telegram নিয়ে।"

সুশীল যাইবার মিনিট পাঁচ সাত পরেই টেলিগ্রাফ পিওন উপস্থিত, হাতে বোম্বাই হইতে সেক্রেটারী কর্ত্তৃক পূর্ব্ব দিনে

প্রেরিত telegramএ রামসুন্দর বাবুর সৌভাগ্যের খবর। উপরে "delayed in transmission" ছাপ মারা।

দুই-একজন করিয়া দেখিতে দেখিতে বিস্তর ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধিকাংশই স্থানীয় আইন ব্যবসায়ী। ডাক্তার হলধরবাবুও আসিলেন। মিষ্টান্ন ভোজনের ধুম পড়িয়া গেল। চায়ের স্রোত বহিল (ডাক্তারবাবু কোকো ছাড়াইয়া তবে ছাড়িয়াছিলেন)। ক্রমে চাঁদার খাতা হাতে দাতব্য সভা সমিতির লোকও আসিতে লাগিল। কলিকাতার Statesman, Englishman ও বোম্বাইয়ের Times of Indiaর সংবাদদাতারা আসিয়া ফোটোগ্রাফের জন্য রামসুন্দরবাবুকে বিব্রত করিয়া তুলিল। তিনি অনেক কষ্টে তাহাদের বিদায় করিলেন। সমস্ত দিনে রামসুন্দরবাবু এক মুহূর্তও বিশ্রাম করিতে পাইলেন না।

রাত্রি নয়টার পর প্রতিবাসী উকিল প্রিয় সুহৃৎ পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া রামসুন্দরবাবু মুখার্জ্জী সাহেবের বাটী উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি এলাহাবাদের বাস উঠাইয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন; এবং কিছু নগদ টাকা ও এলাহাবাদস্থ গাড়ী ঘোড়া আসবাবপত্রাদি সমস্তই দান খয়রাতে দিয়া যাইবেন। রামসুন্দরবাবু বলিলেন, "দেখ মুখার্জ্জী, আমি তোমায় একটা লিষ্ট দিয়ে যাব, কাকে কি দেবার তাতে সব থাকবে। লিষ্টে যাদের নাম পাবে, আমি চলে যাবার দিন দুই পরে তাদের ডেকে পাঠিয়ে তুমি, অযোধ্যা আর ইউনিভার্সিটির চারুবাবু, তিনজনে দাঁড়িয়ে থেকে যাকে যা দেবার দেবে। কাকে কি দেব তা আগে থাকতে জানাতে চাই না, অনর্থক আমায় সকলে জ্বালিয়ে মারবে বই ত নয়। এইটুকু ভার তোমার উপর।"

(৩)

রামসুন্দরবাবু চলিয়া গিয়াছেন। মুখার্জ্জী সাহেব, পণ্ডিত অযোধ্যাপ্রসাদ ও ইউনিভার্সিটীর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ রামসুন্দরবাবুর পরিত্যক্ত বাড়ীতে তালা দিয়াছেন। মাসের শেষ পর্য্যন্ত ভাড়া দেওয়া আছে, সুতরাং বাড়ীওয়ালা কোন আপত্তি করে নাই। তালিকানুযায়ী বেঙ্গলী বয়েজ স্কুল, বালিকা বিদ্যালয়, লাইব্রেরী, বাঙ্গালা পাঠাগার, জনসভা, হিতকরী সমিতি, অনাথ আশ্রম, প্রভৃতি নানা দাতব্য সভাসমিতির সেক্রেটারীকে নির্দ্ধারিত দিনে উপস্থিত থাকিতে পত্র লেখা হইয়াছে। আলমারী সমেত রাশিকৃত আইন পুস্তক বার লাইব্রেরীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। বার লাইব্রেরীর সেক্রেটারী অযোধ্যাপ্রসাদ স্বয়ং। তালিকায় ডাক্তার হলধরবাবুর নামও পাওয়া গেল। তাঁহার নামাঙ্কিত একটী কাষ্ঠের বাক্সে যাহা কিছু আছে, তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছে।

নির্দ্ধারিত দিনে সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। হলধরবাবু ফিটফাট হইয়া আসিয়াছেন, তিনি "তোমার গিয়ে"র বুকনির চোটে সকলকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার নামাঙ্কিত বাক্স খুঁজিয়া বাহির করিলেন,—দেখিলেন, তালা-বন্ধ বৃহৎ সিন্দুক ও বিষম ভারি। তাঁহার মুখে হাসি আর ধরে না, তিনি তাহারই উপর বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই ডেস্প্যাচ বাক্স খোলা হইল। স্কুল, লাইব্রেরী, প্রভৃতি নানা সভা সমিতির নামে একরাশি শীলকরা পত্র দেখিতে দেখিতে বিতরিত হইয়া গেল। প্রত্যেকটী হইতে নানা অঙ্কের চেক বাহির হইল। সর্ব্বশুদ্ধ দেখা গেল নগদ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা রামসুন্দরবাবু দান করিয়া গিয়াছেন।

হলধরবাবু এতক্ষণ তাঁহার সিন্দুকের উপর বসিয়াছিলেন, আর থাকিতে না পারিয়া আসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে আমার বাক্সটা এইবার ওর নাম কি দেখলে হয় না?"

মুখার্জ্জী সাহেব তাঁহাকে এক তাড়া দিয়া বলিলেন, "তোমার ওর নাম কি সব শেষে হবে, এখন চুপ করে বসে থাক, জালিও না।"

হলধরবাবু আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না, বিরস বদনে গিয়া আপন সিন্দুকের উপর বসিলেন।

একে একে পুস্তকাদি, আসবাবপত্র, ও গাড়ী ঘোড়ার বিলি ব্যবস্থা হইয়া গেলে সকলে হলধরবাবুর সিন্দুক খুলিলেন।

বাহির হইল একরাশি ছোট বড় মিকশ্চারের শিশি-বোতল,—অধিকাংশই ঔষধে পরিপূর্ণ, এক দাগও ব্যবহৃত হয় নাই। আর তাহার সহিত একখানি বাঙ্গালা পত্র ও পঁচিশ টাকার একখানি চেক। পত্রে লেখা—"হলধরবাবু বিনা ভিজিটে বরাবর আমার চিকিৎসা করিয়াছেন; সে জন্য আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ সামান্য উপহার রাখিয়া যাইতেছি।"

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

অদ্ভুত কারুকার্য্য—

একটি ইলেক্‌ট্রিক বাতির মধ্যে একটি সম্পূর্ণ যুদ্ধ-জাহাজ তৈয়ার করা বড় সহজ কথা নহে। বালব্‌টির কাচে একটি ছোট ছিদ্র করিয়া লইয়া তাহার মধ্যে দিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চালাইয়া এই ক্ষুদ্রতম যুদ্ধ-জাহাজ তৈয়ার করা হইয়াছে। কতখানি ধৈর্য্য লইয়া যে এই কাজ করিতে

অদ্ভুত কারুকার্য্য

হইয়াছে তাহা বলা যায় না। ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়া ছোট ছোট কাঠি ইত্যাদি চালাইয়া জাহাজের খোলের উপর যথাস্থানে বসান কম কেরামতির কথা নয়। যুদ্ধ-জাহাজের যাহা কিছু থাকিবার সবই এই অতি-ক্ষুদ্র জাহাজে আছে। সম্প্রতি নিউইয়র্কের এক প্রদর্শনীতে এই জাহাজ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ফাউন্‌টেন্‌ পেন গ্যাস-বন্দুক—

দেখিতে ঠিক কলমের মত—অথচ হঠাৎ আক্রান্ত হইলে কলটিপিবামাত্র এই কলম হইতে কাঁদন-গ্যাস বাহির হইয়া আক্রমণকারীকে অভিভূত করিয়া ফেলিবে। ব্যাঙ্কের কেরাণীদের ইহা অত্যন্ত উপকারী। পাঁচ হাত দূর হইতেই ইহা হইতে গ্যাস ছুড়িতে পারা যায়। আক্রমণকারী হয়ত পিস্তল লইয়া আসিয়াছে—সে কেরাণীর হাতে সামান্য কলম দেখিয়া কখনই ভয় পাইবে না—কিন্তু কেরাণী আক্রমণকারী পাঁচ ছয় হাত দূরে থাকিতে থাকিতে গ্যাস দ্বারা অভিভূত করিতে পারিবে। এই গ্যাস মানুষকে একেবারে হত্যা করিতে পারিবে না, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মত প্রায় অজ্ঞান
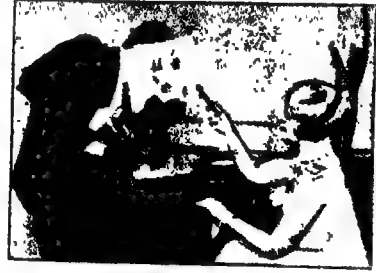
ফাউটেন্‌ পেন গ্যাস-বন্দুক

করিয়া রাখিবে। আমাদের দেশের পুলিসদের হাতে দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় গোলগুলি না দিয়া কাঁদন-গ্যাস পিস্তল দিলে ঢের বেশী কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

সাঁতার শিখিবার নতুন উপায়—

জার্ম্মাণীতে নতুন সাঁতারীদের কোমরের পেটীর সঙ্গে উপরের একটি কাঠে দড়ি বাঁধিয়া জলে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই দড়ি সাঁতারীকে বেশী দূর যাইতে দেয় না এবং

সাঁতার শিখিবার নতুন উপায়

জলের উপরে টানিয়া রাখে। ডুবিবার ভয় না থাকিলে শিক্ষার্থী খুব তাড়াতাড়ি সাঁতার শিখিতে পারে। কোমরের দড়ি তাহাকে জলের উপর টানিয়া রাখে বলিয়া সে নির্ভয়ে হাত পা ছোড়া অভ্যাস করিতে পারে। সাঁতার শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে দড়ির মাত্রা বাড়াইয়া দেওয়া হইতে থাকে।

মিস্ত্রীর কেরামতি—

জার্ম্মাণীর এক মিস্ত্রী ভাঙ্গা বাসন, কেটলি ইত্যাদির দ্বারা একটি পুরাতন দুর্গের চমৎকার মডেল নির্ম্মাণ
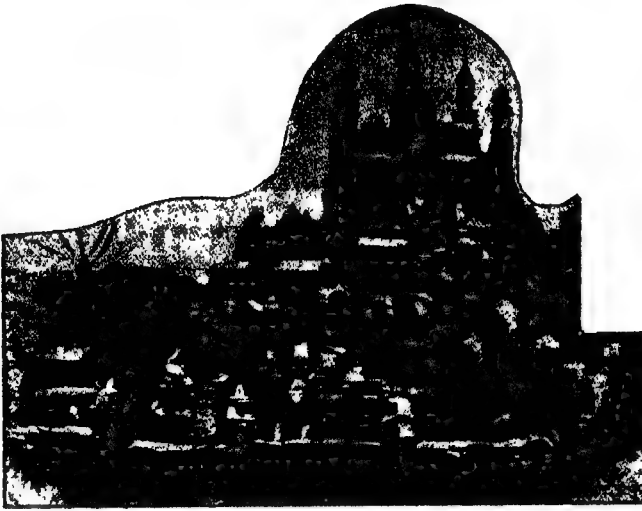
মিস্ত্রীর কেরামতি

করিয়াছে। দুর্গের মধ্যে সবই আছে। সৈন্যদের থাকিবার ঘর, অস্ত্রাগার ইত্যাদি কোনো কিছুরই অভাব নাই। প্রত্যহ অনেক লোক এই দুর্গ দেখিতে আসে। দুর্গের মডেলটির চারিপাশে নানাপ্রকার মূর্ত্তিও বসান আছে। মূর্ত্তিগুলি ভাঙ্গা পিয়ালা ইত্যাদি দ্বারা তৈয়ার হইয়াছে। ছবি দেখিলে ইহার সামান্য পরিচয় পাইবেন।

ডুবো জাহাজের অদ্ভুত ছবি—

এরোপ্লেন হইতে একটি চলন্ত ডুবো জাহাজের ছবি তোলা হয়। ডুবো জাহাজ ছবি তুলিবার সময় জলের উপর দিয়া অত্যন্ত বেগের সহিত চলিতেছিল। আকাশ হইতে ছবি তোলার ফলে ছবিতে ডুবো জাহাজের গতির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ডুবো জাহাজের অদ্ভুত ছবি

পশু-চিকিৎসা—

পশু চিকিৎসকের জন্তুশালায় ডাক পড়িলে তাহাকে নানাপ্রকার কলকব্জা লইয়া যাইতে হয়। নিউইয়র্কের জন্তুশালায় একটি বাচ্চা হাতীর দাঁতে ব্যথা হয়—তাহার মাড়ি কাটিয়া

হাতীর দাঁত চিকিৎসা

একটি পোকা-ধরা দাঁত বাহির করিতে হয়। জন দশেক লোকের সাহায্য লইয়া এই সামান্য কাজটি করা হয়।

কুমীরের চিকিৎসা

একটি ডাকহাঁস জাতীয় পাখীর পেটের অসুখ হয়। ডাক্তার তাহাকে ছোলা খাওয়াইবার লোভ দেখাইয়া তাহার মুখে ওষুধ ঢালিয়া দেন। শিশি দেখিলে এই পাখীটি কোনো প্রকারেই ডাক্তারের কাছে আসিত না।

ডাকহাঁস চিকিৎসা

একটি বাচ্চা কুমীরের একটি দাঁত পাথরের সঙ্গে ঠোকর লাগিয়া ভাঙিয়া যায়। ডাক্তার তাহাকে হাতে তুলিয়া ধরিয়া সাঁড়াসি দিয়া তাহার ভাঙ্গা দাঁতের বাকিটুকু বাহির করিয়া দেন।

পশু-চিকিৎসা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, তাহাদের ভাব-ভঙ্গী এবং ব্যবহার দেখিয়া রোগ ঠিক করিতে হয় বলিয়া—পশু জীবনের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় না থাকিলে ইহা সম্ভব নহে।

ঘোড়ার ছাতা—

১৮৮৮ খৃঃ অব্দে এক ভদ্রলোক তাঁহার ঘোড়াকে রোদ বৃষ্টি হইতে বাঁচাইবার জন্য এক অদ্ভুত ঘোড়া-ছাতার
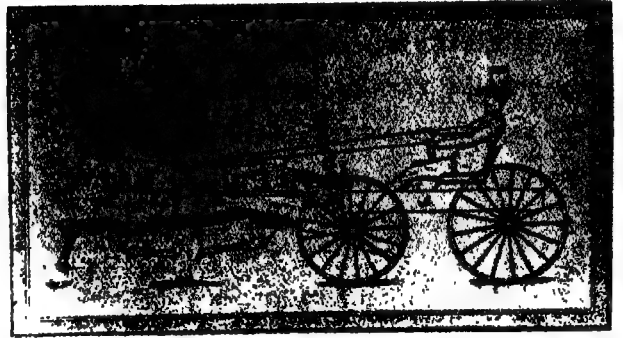
ঘোড়ার ছাতা

আবিষ্কার করেন। দরকার না হইলে ছাতা ঘোড়ার পিছনের দিকে মুড়িয়া রাখা চলিত। দুঃখের বিষয় আবিষ্কারক ছাড়া অন্য কেহ ঘোড়ার দুঃখ দূর করিবার প্রয়োজন অনুভব না করাতে এই ঘোড়া ছাতার ব্যবহার হয় নাই। আমাদের দেশে যেমন রোদ—এইখানে গরুর, মহিষের এবং ঠিকা গাড়ীর ঘোড়াদের জন্য এই প্রকার ছাতা ব্যবহার আরম্ভ করিলে ভাল হয়। কলিকাতার S. P. C. A. বাজে কাজ না

করিয়া এই ছাতা ব্যবহার বিধিবদ্ধ করিতে পারিলে সত্যিকার কিছু কাজ হয়।

বৃহত্তম এঞ্জিন—

আমেরিকার ভার্জ্জেনিয়ান্ রেলওয়েতে সম্প্রতি একটি ১৫২ ফিট লম্বা এঞ্জিন নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর এঞ্জিন পৃথিবীতে আর নাই। বাঁক ঘুরিবার সুবিধার জন্য ইহাকে তিন ভাগে কাটা হইয়াছে। প্রতি-ভাগেই স্বতন্ত্র কলকব্জা আছে। প্রতি সেক্সনে দুইটি করিয়া সমগ্র এঞ্জিনটিতে মোট ৬টি মোটর আছে। এই ছয়টি মোটরে মোট ৭১২৫ হর্স পাওয়ার উৎপন্ন হয়। এই বৃহত্তম এঞ্জিন দুই মাইল লম্বা ট্রেন অনায়াসে টানিয়া লইয়া যায়। এই এঞ্জিনটির আর একটি গুণ আছে। ঢালুতে নামিবার সময় চাকা হইতে ইহা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া সেই বিদ্যুত কাজে লাগাইতে পারে। ইহার ওজন ১২,০০০০০ পাউণ্ডেরও বেশী। এঞ্জিনের প্রধান চাকাগুলির ব্যাস পাঁচ ফিট। উপরে যে লোকগুলি দাঁড়াইয়া আছে—ইহারা

বৃহত্তম ইঞ্জিন

সকলেই এই এঞ্জিনের কাজে নিযুক্ত। এঞ্জিনের উপরে ইহাদিগকে পুতুলের মত মনে হইতেছে।

অভিনব ফটোগ্রাফ—

একজন বৈজ্ঞানিক এক ফটোগ্রাফিক প্লেট সন্ধ্যা রাত্রি হইতে ভোর পর্য্যন্ত আকাশ-মুখো করিয়া এক্স্‌পোজ্ করিয়া রাখেন। তাহার পর সেই প্লেটটিকে ক্যামেরা হইতে বাহির করিয়া ডেভেলপ করা হয়। ছবি তুলিলে পর গ্রামোফোন রেকর্ডের মত চক্রাকার দাগওয়ালা একটি ছবি পাওয়া যায়। ইহাতে প্রমাণ হয় আমাদের মাথার
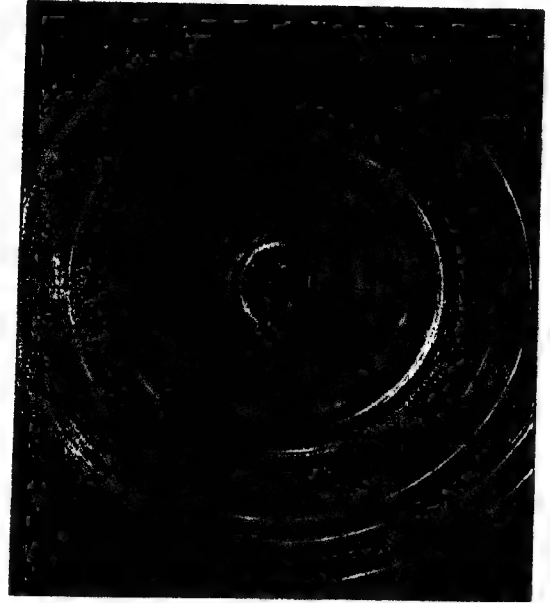
অভিনব ফটোগ্রাফ

উপরে আকাশের তারাগুলি সকল সময় বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে। এই চক্রগুলি নক্ষত্রমণ্ডলীর ভ্রমণের পথ।

উভচর মোটর ট্র্যাকটর

ইংলণ্ডে এক অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন ট্র্যাকটর নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মোটরের শক্তি ১০০ ঘোড়ার জোরের। ইহা খাল বিল নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত সকল স্থানে সমান ভাবে চলিতে পারে। উঁচু ডাঙ্গা কেমন উঠিতে পারে ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষ করিয়া একটি খাল কাটা হয়। খালের পাড় ৩২ ফিট উঁচু ছিল। ট্র্যাকটর খালের একদিকের পাড় দিয়া খালের মধ্যে অবতরণ করিল এবং অন্যদিকের উঁচু পাড় দিয়া অনায়াসে উঠিয়া গেল—কেবল তাহাই নহে, আবার পিছন হটিয়া খালের যে পাড়

দিয়া নামিয়াছিল সেই পাড় দিয়া সোজাসুজি উঠিয়া গেল। এই সকল করিতে মোটরের কোনো প্রকার অসুবিধা হইল না। সোজা রাস্তায় যেমন করিয়া মোটর দৌড়ায় ঠিক তেমনি করিয়াই এই চড়াই উতরাই করিল। ভবিষ্যতের যুদ্ধে এই ট্র্যাক্টার বিশেষ সাহায্য করিবে। বালির উপর দিয়া সাধারণ মোটর চলিতে পারে না—এই অভিনব ট্র্যাক্টার তাহাও অনায়াসে করিয়া থাকে। অসমতল ভূমিতে এই গাড়ী ব্যবসা বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বহন করার কার্য্যেও প্রচুর সাহায্য করিবে।

উভচর মোটর ট্র্যাক্টর

অদ্ভুত ছবি—
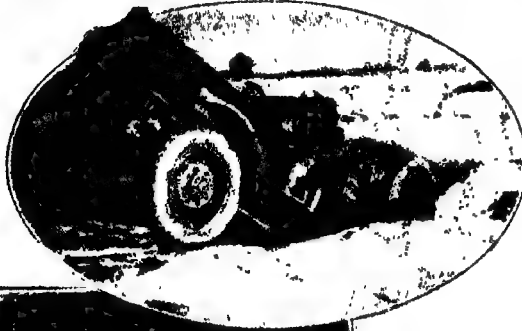
ছবিতে দেখুন, মনে হইবে যেন ছেলে দুটি এবং মেয়েটি বরফের ছাপের মধ্যে জমিয়া গেছে। আসলে তাহা নয়। ইহারা বরফের চাপগুলির পিছনে বসিয়া আছে। বরফ কতদূর পরিষ্কার হইতে পারে, ইহা তাহার একটি নিদর্শন। বরফ জমাইবার সময় তাহার মধ্যে হাওয়া চালাইয়া দিলে বরফ এই প্রকার পরিষ্কার হয়।

ইস্পাতের মত রবার—

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এক প্রকার নতুন ধরণের রবার আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রবার ইস্পাতের মত শক্ত এবং ভারসহ। যে সমস্ত কাজে ইস্পাতের এবং অন্যান্য ধাতুর চেন তার ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়, সেই সমস্ত কাজে এই রবার ব্যবহার করিবার চেষ্টা এবং পরীক্ষা চলিতেছে। খুব সম্ভবতঃ অতি অল্পকাল মধ্যেই ইহা কার্য্যে পরিণত হইবে। ছবিতে দেখুন, একজন বলিষ্ঠ লোক প্রাণপণ শক্তিতে একটা রবারের ফালিকে টানিয়া ছিঁড়িতে পারিতেছে

ইস্পাতের মত রবার

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান

শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত বি-এ

নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে যে মিলন-সেতু তৈয়ার করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আজ দু'একটী কথা বলিব।

মৃত্যুর পরেও জীবন আছে,—বিজ্ঞানের সাহায্যে যখন এই সত্য প্রমাণিত হইল, তখন অধ্যাত্মবাদীগণ সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া, পরলোকবাসী আত্মিক ও ইহজগতের মানবের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় কি না, সেই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। পাশ্চাত্য জগতে কিরূপে এই নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জন্ম হয়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। একজন পরলোকগত ফেরিওয়ালা, পার্থিব বস্তুর সাহায্যে তাহার দুঃখ-কাহিনী মানুষের নিকট বিবৃত করে। সুতরাং ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে ভাবের আদান-প্রদান চলিতে পারে, তাহা প্রথম হইতেই প্রমাণিত হইল। বৈজ্ঞানিকগণ জড় বস্তুর সাহায্যে আত্মিকদের নিকট হইতে নানাবিধ পারলৌকিক কাহিনী জানিতে লাগিলেন।

পৃথিবীর সকল দেশেই নানাবিধ ভৌতিক কাহিনী প্রচলিত আছে এবং কোন না কোনও আকারে পৃথিবীর সকল দেশের লোকেই ভূতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মানুষ ভূতগ্রস্ত হয়, এ বিশ্বাসও প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও 'ভূত নামান' প্রভৃতির কথা সকলেই জানেন। কিন্তু শিক্ষিত সমাজে এই সকল বিষয় কুসংস্কার বলিয়াই পরিগণিত হইত। এবং কোন কোনও স্থলে এখনও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানটাই নিছক কুসংস্কার বলিয়া মনে করা হয়। বৈজ্ঞানিকরা এত সহজে কোন বিষয়কে গ্রহণ বা বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী নহেন। প্রচলিত ভৌতিক কাহিনীর প্রতি তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি পড়িল। জড় বস্তুর—যেমন টেবিল, পেন্সিল প্রভৃতির—সাহায্যে আত্মিকগণ ইহলোকে সংবাদ প্রেরণ করিতে পারেন; কিন্তু জীবন্ত মানুষের সাহায্যে কি তাঁহারা সংবাদ দিতে পারেন না? ভৌতিক গল্পের ভিতর কি কিছুই সত্য নাই—এ সবই কি অন্ধ বিশ্বাস ও ভয়জনিত কুসংস্কারের রচনা মাত্র? আচ্ছা, অনুসন্ধান করিয়াই দেখা যাক্।

অনুসন্ধান ও গবেষণা চলিতে লাগিল। তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, 'ভূতে পাওয়ার' কাহিনী সবগুলিই

একেবারে মিথ্যা নয়, বা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের উদ্ভট বিজৃম্ভন মাত্র নয়। তাহার পিছনেও সত্য আছে। সত্যের সেই ক্ষীণালোকে তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। অবশেষে ইহা আবিষ্কৃত হইল যে, ইহজগতের মনুষ্যের মধ্য দিয়া ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান চলিতে পারে। তখন মহোৎসাহে seance অথবা আত্মিক চক্রের অধিবেশন হইতে লাগিল। তাহাতে নানা শ্রেণীর আত্মিকের কাহিনী গৃহীত হইতে লাগিল। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে, এই সকল ভৌতিকাধিবেশনের (seance) সবগুলিই বিশ্বাসযোগ্য নহে, এবং সকল মধ্যবর্ত্তীর (Medium) কথাও বিনা বিচারে গ্রহণ করা যায় না। মানুষের মধ্যেও 'ভূত' আছে, অর্থাৎ 'জীবন্ত 'ভূত' আছে, এই কথা মনে রাখিয়া চলিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

এই পর্য্যন্ত গেল শুধু সংবাদ আদান প্রদান। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান এইখানেই শেষ হয় নাই। ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে পার্থক্য ঘুচাইয়া দেওয়াই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য। অন্ততঃ ব্যক্তির পক্ষে যে তাহা সম্ভবপর, তাহা সিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবনী পাঠ করিলেই জানা যায়। কিন্তু যাহা কেবলমাত্র জনকয়েক ঐশীশক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষের সম্পত্তি, তাহা জনসাধারণকে বিলাইয়া দেওয়াই অধ্যাত্মবাদিগণের লক্ষ্য। সুতরাং শুধু সংবাদ আদান-প্রদানে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—আরও অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আত্মিকদের ছায়াচিত্র তোলা গেল, এবং আত্মিকগণ মায়া মূর্ত্তি * পরিগ্রহ করিয়া আত্মীয়-স্বজনকে দেখা দিতে লাগিলেন। আজ কাল অনেকে এটাকে একটা ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন, এবং আত্মিকের ব্যবসায়ী ফটোগ্রাফারের বিজ্ঞাপনও দেখা যায়।

এই বিষয়ে আর অধিক দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে, কি ভাবে এই সংবাদ আদান-প্রদান চলে সে সম্বন্ধে দু'এক কথা বলার প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাও একটু বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

টেবিল চালা (Table Spilting)

পরলোকগত আত্মা সর্ব্বপ্রথমে একখানা টেবিলের সাহায্যে আপনার বক্তব্য ইহ-জগতে প্রচার করে তাহা পূর্ব্বেই (ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩১ বাং) বলিয়াছি। সুতরাং টেবিল, টুল প্রভৃতিকেই সর্ব্বপ্রথম সংবাদ আদান-প্রদানের যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা যাইতে লাগিল। এই প্রক্রিয়ার নাম দেওয়া হইল Table Spilting অথবা টেবিলের সাহায্যে সংবাদপ্রেরণ। আমরা তাহাকে 'টেবিল চালা' বা 'টুল চালা' বলিতে পারি, যদিও এই অনুবাদ খুব সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ 'বাটি চালা' প্রভৃতিতে বাটি ইত্যাদি বস্তুর চলন বা গতি বুঝায়। অবশ্য এখানেও টেবিল প্রভৃতির একপ্রকার গতি উপস্থিত হয় এবং এইটুকু লক্ষ্য করিয়াই Table spiltingকে 'টুল চালা' বলিলাম। এর চেয়ে সঙ্গত কোন পারিভাষিক শব্দ পাওয়া গেলে তাহাই ব্যবহৃত হইবে।

টুল চালার প্রক্রিয়া।—দুই বা তিনজন লোক একখানা ছোট টুলের উপর হাত উপুড় করিয়া রাখিয়া বসেন। যাহাতে মনে স্বচ্ছন্দতা জন্মে, অথবা কোন কারণে মানসিক চাঞ্চল্য না ঘটে, তাহার উপায়-বিধান করা কর্ত্তব্য। ঘরে যেন বেশী লোকজন না থাকে অথবা গোলমাল না হয়। অর্থাৎ মন যাহাতে একাগ্র হয় তাহাই করিতে হইবে। প্রথম প্রথম শুচিতা পবিত্রতার দিকে একটু লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন।

* অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এই অংশের নাম Philosophy of apparition. ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাহার অনুবাদ করিয়াছেন, "ছায়াদর্শন।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অনুবাদের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আত্মিকের যে মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা প্রকৃতপক্ষে 'ছায়া' নয়। আত্মিক ইচ্ছাপূর্ব্বক নানাবিধ মূর্ত্তি ধরিতে পারেন, উহা প্রকৃতপক্ষে মায়ামূর্ত্তি। কোন আত্মিক যেরূপভাবে আততায়ীর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন সেই ভাবে আসিয়া তাহার কোন আত্মীয়কে দেখা দিলেন। আবার হয়ত সেই এক আত্মিকই অন্য মূর্ত্তিতে অন্য জনকে দেখা দিলেন। এই মূর্ত্তিগুলির প্রকৃতপক্ষে কোন বাস্তব সত্তা নাই—উহা আত্মিকের ইচ্ছাধৃত মায়ামূর্ত্তি। এইজন্য আমাদের মনে হয় যে Philosophy of apparition' এর বাংলা অনুবাদ 'মায়া-দর্শন' এবং apparition' এর অনুবাদ 'মায়া-মূর্ত্তি' হওয়া উচিত। অবশ্য এই অনুবাদও যে নির্দ্দোষ নয় তাহা জানি। কেহ এই শব্দদ্বয়ের বাংলা প্রতিশব্দ প্রদান করিলে খুব উপকৃত জ্ঞান করিব।

টুলের উপর হাত রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া সকলকে একাগ্রভাবে কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বিষয় চিন্তা করিতে হয়। সাধারণতঃ পরলোকগত পরিচিত আত্মীয়-স্বজনের কথাই চিন্তা করা হয়। প্রায় পনর মিনিট (কোন কোনও স্থলে পাঁচ মিনিট হইতে একঘন্টা) পরে টুলখানা একটু নড়িয়া উঠে, অথবা একটা পায়ার নীচে খট্ করিয়া শব্দ করে। তখনই বুঝিতে হইবে যে, টুলে আত্মার বা কোন অজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। সত্য সত্য টুলে কোন আত্মার আবির্ভাব হয় কি না, তাহার আলোচনা পরে করা যাইবে। এখন সুবিধার জন্ম ধরিয়া লওয়া যাউক যে, টুলে কোন আত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। এখন টুলকে প্রশ্ন করিতে থাকুন। প্রশ্ন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় হওয়া চাই। প্রশ্ন করার প্রণালী এইরূপ—"আচ্ছা বল ত 'ক' বাবু কলিকাতায় আছেন কি না? যদি কলিকাতায় থাকেন, তবে ডানদিকের পা (অর্থাৎ পায়া) দিয়া তিনটা ঠুকা দিবে, নচেৎ একটা।" ইত্যাদি। এরূপ টুল চালার প্রধান অসুবিধা এই যে, উত্তরগুলিকে শব্দের সংখ্যা দ্বারা বুঝিতে হয়। প্রকৃত পক্ষে উহাতে হাঁ, না, এই দুই উত্তর ব্যতীত আর বিশেষ কিছু পাওয়া শক্ত। অবশ্য ধৈর্য্যের সহিত টেলিগ্রাফিক সঙ্কেত ব্যবহার করিলে বহু তথ্য অবগত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সাধারণতঃ টুল চালাতে এত মনোযোগ দেওয়া হয় না।

পেন্সিল চালা। উহা টুল চালারই একটু সুবিধাজনক সংস্করণ মাত্র। পূর্ব্বোক্তভাবে টুলের উপর একখানা সাদা কাগজ রাখিয়া তাহার উপর দুইজনকে আল্‌গা ভাবে একটা পেন্সিল খাড়া করিয়া ধরিতে হয়। কিছুক্ষণ বাদে ধীরে ধীরে পেন্সিলটী নড়িতে থাকে। তখন বুঝিতে হইবে যে, প্রশ্ন করিবার সময় হইয়াছে। টেবিল বা পেন্সিল চালার সময় সাধারণতঃ কোন আত্মিক বা আত্মিকার চিন্তা করা হয়। তাই আত্মিককে সম্বোধন করিয়াই প্রশ্ন করা হয়। পেন্সিল চালার সুবিধা এই যে, প্রশ্নের উত্তর লিখিত ভাবে পাওয়া যায়; এবং যে রকম ইচ্ছা প্রশ্ন করা চলে। একটা কথা এখানে বিশেষ ভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, যাহারা চক্রে বসিবে, তাহাদের অখণ্ড মনোযোগের উপর সফলতা নির্ভর করে। এই পেন্সিল চালার সহিত Automatic writingএর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

এখানে প্রশ্ন এই যে,—পেন্সিল লিখে কিরূপে অথবা টেবিল বা টুল কিরূপেই বা শব্দ করে? যাঁহারা সন্দেহ করেন যে মধ্যবর্ত্তী (Medium) জুয়াচুরী করিতে পারে, তাঁহারা নিজেই একা পেন্সিল ধরিতে পারেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে একজনের অপেক্ষা দুই তিনজন একত্র বসিলে কাজ সহজ হয়। যাহা হউক, একাও পেন্সিল বা টুলের সাহায্যে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই পেন্সিল বা টুল চালার মধ্যে যথেষ্ট জুয়াচুরী থাকা সম্ভবপর; কিন্তু আমি নিজে পরীক্ষা দ্বারা বুঝিয়াছি যে, উহাতে সত্যও আছে। টুল আপনা-আপনি শব্দ করে। পেন্সিল আপনা-আপনি লেখে। শব্দ বা লেখার সাহায্যে এই উত্তর দেওয়া—কোন্ শক্তি বলে সম্ভব হয়? তাহা কি বাস্তবিকই কোন আত্মিকের শক্তি,—না মানুষের ইচ্ছাশক্তি মাত্র? না অন্য কিছু?

প্রথমতঃ মোটামুটী কয়েকটী পরীক্ষার ফল বিবৃত করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,—(১) কোন কোনও স্থলে পেন্সিল নড়ে বটে, কিন্তু কিছুই লিখিতে পারে না। প্রশ্ন করিয়া জানা যায় যে—পেন্সিলে আবির্ভূত শক্তি লিখিতে জানে না।

(২) যাঁহারা ইংরেজী জানেন না, এরূপ মধ্যবর্ত্তী (medium) দ্বারা ইংরেজী লিখা হয় নাই।

(৩) ইহলোকে যিনি ইংরেজী জানিতেন না, তাঁহার আত্মাকে আহ্বান করায়, ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবর্ত্তীর সাহায্যেও ইংরেজী লিখিতে পারেন নাই।

(৪) বহু স্থলে লিখিতে লিখিতে পেন্সিল থামিয়া গিয়াছে, অথবা হিজিবিজি দাগ কাটিয়াছে, যেন লেখক পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। পেন্সিল ছাড়িয়া দিয়া নূতন ভাবে আরম্ভ করায় ঠিক এক মধ্যবর্ত্তীর দ্বারাই পুনরায় লিখিত উত্তর পাওয়া গিয়াছে।

(৫) প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া টুল মধ্যবর্ত্তীর ইচ্ছামত অথবা আদেশ মত শব্দ করিয়াছে; কিন্তু কোন কোনও স্থলে মধ্যবর্ত্তীর আদেশ অনুসারে শব্দ করে নাই।

(৬) বহুক্ষণ ধরিয়া থাকিলে টুলে বা পেন্সিলে বিরক্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়, উত্তর দিতে চাহে না, অথবা যাহা ইচ্ছা উত্তর দেয়। অনেক সময় টুল ঠেলিয়া দিয়া

আত্মিক বা অজ্ঞাত শক্তি অন্তর্হিত হয়। টুল বা পেন্সিলের নিকট হইতে কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

(৭) কোন কোনও স্থলে ক্রোধ বা বিরক্তির চিহ্ন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, এবং মধ্যবর্ত্তী অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

(৮) পেন্সিল মধ্যবর্ত্তীর অজ্ঞাত অনেক বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

টেবিলে বা পেন্সিলে কোন আত্মিকের আবির্ভাব হয় কি না, সে সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে কিছু বলিতেছি না। তবে এখন এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, পেন্সিল বা টেবিলের মধ্যে কোন অদৃশ্য শক্তির আবির্ভাব হয়। আমাদের প্রদত্ত সপ্তম সিদ্ধান্ত হইতে এই শক্তির প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনার সুবিধা হইবে। সেই জন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ঘটনাটি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইল।

আমি আমার দুইজন আত্মীয়াকে লইয়া 'টেবিল-চালা'র অনুষ্ঠান করি। ইহাকে একপ্রকার—আত্মিক চক্র (seance) বলা যাইতে পারে। একখানা টুলের (তেপায়া) উপর আমরা তিনজনের তিনখানা হাত রাখিয়া বসিলাম। বসিবামাত্রই টুল শব্দ করিয়া উঠিল। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, এই দুইজন আত্মীয়ার মধ্যে একজনের (ধরুন তাঁহার নাম 'ক') মধ্যবর্ত্তীর উপযোগী শক্তি (Mediumistic power) যথেষ্ট ছিল। তিনি টুল বা পেন্সিল ধরিলেই ২।৩ মিনিটের মধ্যে শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইত। এবারেও তাহাই হইল। টুল পা তুলিয়া জোরে জোরে শব্দ করিতে লাগিল। পেন্সিল ধরা গেল, তাহাতে কেবল হিজিবিজি দাগ কাটিতে লাগিল। দর্শকদের মধ্যে একজন বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "ও একেবারে গো-মূর্খ, লেখাপড়া জানে না।" এই সময় হইতেই ক্রোধের সূচনা দেখা গেল।

'ক' এর শক্তির জন্যই টুলে অতিরিক্ত শক্তি-সঞ্চার হয়—আমার এইরূপ ধারণা ছিল। তাহা সত্য কি না তাহার পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। 'ক'কে সরাইয়া দিয়া আমরা দুইজন যখন ধরিতাম, তখন টুলে মৃদুভাবে শব্দ হইত, আবার 'ক' টুল ধরিলেই জোরে জোরে শব্দ হইত। বলা বাহুল্য যে, এই পরীক্ষার মধ্যে প্রতারণার সম্ভাবনা ছিল না। যাহা হউক, টুলের শক্তি কি পর্য্যন্ত তাহাও দেখিতে লাগিলাম। টুলের উপর বিশেষ কয়টা শব্দ করিবার আদেশ দিয়া 'ক' ব্যতীত আমরা দুইজনে আমাদের সমগ্র শক্তির সহিত টুল চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু আমাদের দুইজনকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া টুল নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী শব্দ করিল। নানা ভাবে কয়েক প্রকার প্রক্রিয়ার সাহায্যে টুলের মধ্যে আবির্ভূত শক্তির পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। এই সমস্ত সময়েই 'ক' এর হাত বা একটা অঙ্গুলীমাত্র টুল স্পর্শ করিয়াছিল। পরীক্ষায় ইহাই বুঝিলাম যে, টুলে আবির্ভূত শক্তি আমাদের দুইজনকে অনায়াসে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারে। অবশেষে 'ক' মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পরীক্ষাও এইখানে বন্ধ হইল।

আবার সেই এক প্রশ্নই উঠে—এই শক্তির উৎস কোথায়? সে শক্তি কি মধ্যবর্ত্তীর (Medium), না—আহূত আত্মিকের? না—তাহা চক্রস্থ সকলের সমবেত ইচ্ছাশক্তি মাত্র? যদি ইচ্ছাশক্তি মাত্র হয়, তাহা হইলে সাধারণ অবস্থায় পেন্সিল বা টুল ধরিয়া মধ্যবর্ত্তী তাহার জ্ঞানের অতীত বিষয় কিরূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারে? মধ্যবর্ত্তী তখন জাগরিত সাধারণ স্বাভাবিক অবস্থায় (Normal State) থাকে। সুতরাং তখন তাহাতে সুপ্ত চৈতন্যের (Subliminal Consciousness) ক্রিয়া হয় বলা যায় না। সুতরাং এক দিক দিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে উহা মধ্যবর্ত্তীর শক্তি নয়। সমবেত ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধেও উহা প্রযোজ্য। 'টুল' চালায়' বা 'আত্মিক চক্রের' মধ্যে মনের একাগ্রতা অথবা মানসিক শক্তি স্ফুরণের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে স্বীকার করি, কিন্তু সাধারণ অবস্থায় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অজ্ঞাত বিষয় জানা যায় বলিয়া মনে করি না; অন্ততঃ ইহার বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। সুতরাং টুল বা পেন্সিলের মধ্যে কোন বাহিরের শক্তির আবির্ভাব হয় বলিয়া আমরা ধরিয়া লইতে পারি। এই বাহ্য শক্তির আবাহন করিবার শক্তি সকলের সমান ভাবে নাই। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, পূর্ব্ববর্ণিত 'ক' এর মধ্যে এই শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। তিনি বাহ্যশক্তিকে আবাহন করিতে পারেন মাত্র, কিন্তু সেই শক্তির সৃষ্টি করিতে পারেন না।

এই 'টুল চালা' বা 'পেন্সিল চালা' দ্বারা যে সমস্ত উত্তর পাওয়া যায়, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছু বলা যায় না। আমরা পূর্ব্বেই (৪নং ও ৬নং সিদ্ধান্ত দেখুন)

বলিয়াছি যে, দীর্ঘকাল ধরিয়া পরীক্ষা করিতে থাকিলে, টুল বা পেন্সিল হইতে সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। আবার সকল অধিবেশনের ফলও সমান হয় না। সুতরাং এই সকল অধিবেশনের উত্তরের উপর নিশ্চিন্ত ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করা সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাই সত্য না হওয়ার সম্ভাবনা। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধীয় উত্তর সম্পূর্ণ সত্য না হইবার কারণ আছে। সে সম্বন্ধে এখানে আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আত্মা আনয়নের জন্য নানাবিধ যন্ত্রও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্ল্যাঞ্চেটের নাম অনেকেই জানেন। এক সময় প্ল্যাঞ্চেটের খুই আদর ছিল। এখন এই আদর অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। অন্যান্য ভবিষ্যৎ গণনার ন্যায় প্ল্যাঞ্চেটের ভবিষ্যদ্বাণীও সম্ভবতঃ সমস্ত সত্য হয় না। আদর কমিয়া যাইবার ইহাও একটা কারণ হইতে পারে। আরও একটা যন্ত্র আছে,—Psycho-graph। তাহার দাম প্ল্যাঞ্চেটের চেয়ে অনেক বেশী এবং ইহার নির্ম্মাতারা সেইজন্য ইহাকে প্ল্যাঞ্চেটের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী বলিয়া প্রচার করেন। যাহা হউক, সম্পূর্ণরূপে নির্ভর-যোগ্য নির্ভুলভাবে ভবিষ্যৎ জানা যায় বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। সুতরাং এই সকল যন্ত্রের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সময় একটু সতর্ক হওয়া উচিত। অন্যান্য আরও যন্ত্র আছে যাহা দ্বারা নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, কিন্তু তাহার সহিত আত্মিকের কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি না, যদিও ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত যন্ত্রকে আত্মা আনয়নের যন্ত্র বলিয়া বিক্রয় করেন।

আমাদের দেশে প্রচলিত 'নখদর্পণ' 'পানদর্পণ' প্রভৃতির কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই সমস্তও বহু উচ্চমূল্যে বিক্রীত বিদেশী অনেক যন্ত্রের সমান কার্য্য-কর। এই উভয়বিধ—দেশী ও বিদেশী উপায়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য আছে। নানাবিধ ভৌতিক আয়না প্রভৃতির ন্যায় হাতের নখ বা পান ব্যবহার করিতে হয়। নখ বা পানের মধ্যে নানাবিধ দৃশ্য দেখা যায় এবং তাহার দ্বারা প্রশ্নের উত্তরও পাওয়া যায়। অবশ্য উত্তরের সত্যাসত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

আত্মা-আনয়নের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বিত হয়, তন্মধ্যে টেবিল প্রভৃতির উল্লেখ করা গিয়াছে। কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটী কথা বলার প্রয়োজন। টেবিল, পেন্সিল প্রভৃতিতে যে শক্তির আবির্ভাব বা বিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাহা অন্য বহুবিধ জড়বস্তুর মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। তাই অনেকের ধারণা যে, জড়বস্তুর মধ্যে যে শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোন আত্মিকের শক্তি নয়, উহা মধ্যবর্ত্তীর (Medium—মিডিয়াম) চুম্বক-শক্তি (Magnetic power অথবা Animal Magnetism) মাত্র। মধ্যবর্ত্তীর শরীর হইতে শক্তি নিঃসৃত হইয়া টেবিল প্রভৃতি বস্তুতে ক্রিয়া করে। তাই স্পর্শ ছাড়িয়া দিলে টুল প্রভৃতি কার্য্যকর হয় না। অর্থাৎ তখন চুম্বকশক্তি-প্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং টেবিল প্রভৃতি আর সাড়া দেয় না। কোন কোনও স্থলে এ কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু চুম্বকশক্তি বলে মধ্যবর্ত্তীর অজ্ঞাত বিষয় জানাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। এই চুম্বকশক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আলোচনা করিতে হইবে। সুতরাং সে সম্বন্ধে এখানে আর কিছু বলার প্রয়োজন নাই।

আত্মা আনয়নের যে সমস্ত উপায় পূর্ব্বে বর্ণিত হইল, তাহাতে অনেকের মনে এই সন্দেহ থাকিয়া যাইতে পারে যে, মাধ্যমিক বস্তুতে (Instrumental medium) যে শক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা আত্মিকের শক্তি না হইতেও পারে। আত্মিকের শক্তি ব্যতীত অন্য যে সমস্ত শক্তি এরূপ অবস্থায় ক্রিয়া করিতে পারে, তাহারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যে সকল শক্তি ক্রিয়াশীল হইতে পারে, তাহাদের মধ্যে সুপ্ত-চৈতন্য (Subliminal consciousness) এবং চুম্বকশক্তি (Magnetic power) এই দুইটার বিকাশ হওয়ারই সম্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আত্মা আনয়নের বিভিন্ন অবস্থায় সুপ্ত চৈতন্য কিরূপে কার্য্যকর হইবে তাহার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্তু অনেকের ধারণা, আত্মা আনয়ন প্রভৃতি ব্যাপারে যে শক্তির ক্রিয়া লক্ষিত হয় তাহা চুম্বকশক্তিরই বিকাশ মাত্র। অবশ্য এই মত-বাদের মধ্যে যে অনেকটা যৌক্তিকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এমন কি, অনেক স্থলে চুম্বকশক্তি ভিন্ন অনেক ঘটনার কোন সঙ্গত ব্যাখ্যাই দেওয়া

যায় না। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে একটী অতি সাধারণ পরীক্ষার বিষয় বিবৃত হইল।

একটী পাতলা পিতলের ঘটী জলশূন্য করিয়া, দুই জন লোক দুই দিকে বসিয়া চার অঙ্গুলের দ্বারা ঘটীটিকে ঝুলাইয়া রাখুন, এবং একাগ্রভাবে ঘটীর বিষয় চিন্তা করিতে থাকুন। উদ্দেশ্য—মনের একাগ্রতা সম্পাদন করা। অন্য যে-কোন বিষয়েও চিন্তা করিতে পারেন। কিছুক্ষণ—প্রায় ১০।১৫ মিনিট পরে ঘটীটিকে ডান বা বাঁদিকে ঘুরিতে আদেশ করুন—ঘটী ঘুরিতে থাকিবে। আবার থামিতে আদেশ করুন—তখনই থামিয়া যাইবে। এখানে ঘটীতে আত্মিকের আবির্ভাব হইয়াছিল, এরূপ ধারণা করা যায় না। সুতরাং এখানে যে শক্তির বিকাশ হইল, তাহাকে চুম্বকশক্তির (অথবা ইচ্ছাশক্তির) ক্রিয়া ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

এই সকল ঘটনায় বা শক্তি-বিকাশের উল্লেখ করিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক আত্মিক আবির্ভাবকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহেন। তাঁহাদের মত—আমরা আত্মিক শক্তি বলিয়া যাহা গ্রহণ করি, তাহা চুম্বকশক্তি বা ইচ্ছাশক্তির প্রকারভেদ মাত্র। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে নব অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের জন্ম ঘটনার কথা স্মরণ করিতে বলি। সেখানে তো কাহারও ইচ্ছাশক্তির বা চুম্বকশক্তির ক্রিয়া ছিল না। তবে আত্মিক আবির্ভাবকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কিরূপে?

কিন্তু আত্মিক আবির্ভাব আজ আর শুধু তর্ক-বিতর্কের বা মতবাদের ব্যাপার নয়। পূর্ব্বে যে সমস্ত উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত তর্ক-বিতর্কের অতীত, চাক্ষুষ-প্রমাণ-সিদ্ধ আরও উপায় আছে। ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্যবহৃত কয়েকটী পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। আমরা Medium (মিডিয়াম) শব্দের বাংলা অনুবাদ করিয়াছি—'মধ্যবর্ত্তী'। প্রকৃতপক্ষে 'মিডিয়াম' শক্তি ও শক্তির দ্রষ্টার বা ভোক্তার মধ্যে মিলনসূত্র। 'মিডিয়ামের' মধ্য দিয়াই শক্তির বিকাশ সম্ভবপর হয়। তাই 'মিডিয়ামের' বাংলা অনুবাদ 'মধ্যবর্ত্তী' হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই 'মিডিয়াম' মানুষ হইতে পারে, অথবা অন্য কোন জড়বস্তুও হইতে পারে। এই উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য রাখিবার জন্য এবং আলোচনার সুবিধার জন্য জড় 'মিডিয়াম'এর বাংলা অনুবাদ করিয়াছি—মাধ্যমিক। প্রকৃত পক্ষে মধ্যবর্ত্তী এবং মাধ্যমিকের মধ্যে ভাবগত কোন পার্থক্য নাই। কেবল ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র Philosophy of apparition এবং ইহার অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। যদি কেহ এই পারিভাষিক শব্দ সম্বন্ধে ভুল ভ্রান্তি প্রদর্শন করেন এবং উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন করিয়া দেন, তবে যথেষ্ট উপকৃত হইব; এবং তাহাতে বাংলা ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি পাইবে। এবারে নিম্নলিখিত শব্দগুলি গৃহীত হইয়াছে,—

Medium—মধ্যবর্ত্তী; জড়মিডিয়াম বা Instrumental Medium—মাধ্যমিক; Philosophy of Apparition—মায়াদর্শন; Apparition—মায়ামূর্ত্তি; Seance—আত্মিক চক্র বা আত্মিকাধিবেশন; Table Spilting—টুল চালা, টেবিল চালা; ইত্যাদি।

খাদি-প্রতিষ্ঠান—কলাশালা

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

কয়েক বৎসর আগে দেশে একটা নবযুগ আসিয়াছিল। নবযুগ বলিতেছি, কারণ যুগটা সম্পূর্ণরূপেই একালের

প্রবেশ-তোরণ
(উদ্বোধন উৎসব উপলক্ষে সাঁচী স্তূপ-তোরণের অনুকরণে নির্ম্মিত)

আবহাওয়া হইতে বিভিন্ন। এ নবযুগের প্রারম্ভেই হঠাৎ একদিন শোনা গেল—দেশের স্বাধীনতা চাই—কিন্তু সে স্বাধীনতার যুদ্ধে হাতিয়ার না হইলেও চলিবে,—বিনা রক্তপাতেই আমরা লড়াই কত্ত্বে করিব। কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। কিন্তু দেখিলাম, দেশের লোক সত্যসত্যই নিরুপদ্রব স্বাধীনতার যুদ্ধে মাতিয়া উঠিয়াছে; এবং তাহারা যে শক্তির পরিচয় দিতেছে তাহাও সহজ নহে। সে সুখের স্বপ্ন অবশ্য ভাঙিয়া গেল;—কিন্তু এই সময়েই অসহযোগ-যুদ্ধের নেতা মহাত্মা গান্ধী একটা হাতিয়ারের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের আশা শিবরাত্রির শলিতার মত এখনও তাহাকেই জড়াইয়া ধরিয়া জাগিয়া আছে।

মহাত্মা বলিলেন—ঘরে ঘরে চরকা ঘোরানো আরম্ভ কর, তোমরা স্বাধীনতা পাইবে—তোমাদের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইবে। চরকার দ্বারা স্বাধীনতালাভ হইতে পারে, এ কথা কখনও কল্পনায় আসে নাই। কিন্তু চরকার দ্বারা যে দারিদ্র্য দূর হইতে পারে তাহা বিশ্বাস করিতাম। কারণ বয়স প্রায় ৭০এর কাছাকাছি পৌঁছিতে চলিয়াছে। জীবনের গোড়ার দিকটায় এই চরকার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। চরকার যৌবন তখন চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু তাহার স্থবির হাড়ে যে শক্তি ছিল, তাহাই দারিদ্র্যকে ঢের দিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল। নিজে চরকা ধরিতে পারিলাম না, কিন্তু তাড়াতাড়ি খাদি কিনিয়া পরা সুরু করিয়া দিলাম।

কলাশালার অফিস গৃহ

তারপর সে ঢেউ-ও চলিয়া গেল—খাদির ভিতর ভেজাল আরম্ভ হইল—দেশী ও বিদেশী মিলের ধুতি আবার তাহাদের নিজেদের স্থানে জাঁকিয়া বসিল। মনে মনে ভাবিলাম বুদ্ধিশক্তিতে ঘুণ ধরিয়াছে, তাই অত সহজে সব কথায় বিশ্বাস হয়। চোখের উপর যান্ত্রিক সভ্যতার অদ্ভুত শক্তি প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি—তথাপি চরকার মোহে পড়িয়া গেলাম!

কিন্তু চরকার শক্তি যে সত্য সত্যই মোহ নহে, তাহা একদিন চোখে আঙুল দিয়া বুঝাইয়া দিলেন আমার অনুজপ্রতিম শ্রীমান্ হেমেন্দ্রলাল রায়। 'ভারতবর্ষ'র একটা প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল। শুনিলাম ভায়াকে খাদি-প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যায়। সুতরাং দুপুর

কাপড় ইস্তিরি করিবার যন্ত্র

বেলায় একদিন প্রতিষ্ঠানেই তাঁহার কাছে গিয়া হাজির হইলাম।

কাজ মিটাইয়া চলিয়া আসিব, ভায়া বলিলেন, দাদা, প্রতিষ্ঠানে যখন আপনাকে পাইয়াছি, তখন দয়া করিয়া প্রতিষ্ঠানের পণ্যসম্ভার দেখিয়া যাইতে হইবে। কতকটা

কলাশালার কয়েকজন কর্ম্মী

ভদ্রতার খাতিরেই স্বীকৃত হইলাম। প্রকাণ্ড আফিস—এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া কাজ-কর্ম্মের বহর দেখিয়া মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়ের বস্তু যে এইখানেই আছে—তাহা জানিতাম না। তাহা বুঝিলাম গুদাম-ঘরে পা দিয়া। প্রকাণ্ড ঘর খাদির স্তূপে পরিপূর্ণ। খাদির কথা মনে হইলেই যেমন মোটা অসমান সূতার কাপড়ের কথা মনে হয়—এ তো তাহা নয়। খাদির চেহারা যে একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কাপড় ঢের পুরু, বুননী চমৎকার জমাট, জামার থানের ভিতর বৈচিত্র্যের অভাব নাই;—নানা রকমের রং-এর সমাবেশে সেগুলি মিলের বস্ত্রের মতই সুন্দর।

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এগুলি সত্যসত্যই খাদি তো?

ভায়া হাসিয়া উত্তর দিলেন—তাতে সংশয় নাই।

সেদিন একটা সত্যকার আনন্দ লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়াছিলাম। মনে হইতেছিল—স্বপ্ন সফল হওয়া হয় তো অসম্ভব না-ও হইতে পারে। বৃদ্ধ হইয়াছি। সুতরাং আগের বাংলা কি ছিল আর এখনকার বাংলা কি হইয়াছে, উত্তেজিত না হইয়া ধীরভাবে আজ তাহা আলোচনা

করা আমার পক্ষে যত সহজ, যুবকদের পক্ষে তত সহজ হয় তো না-ও হইতে পারে। বিজ্ঞানের ঢের উন্নতি হইয়াছে অস্বীকার করি না—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিলাসও যেন পাল্লা দিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে মানুষের
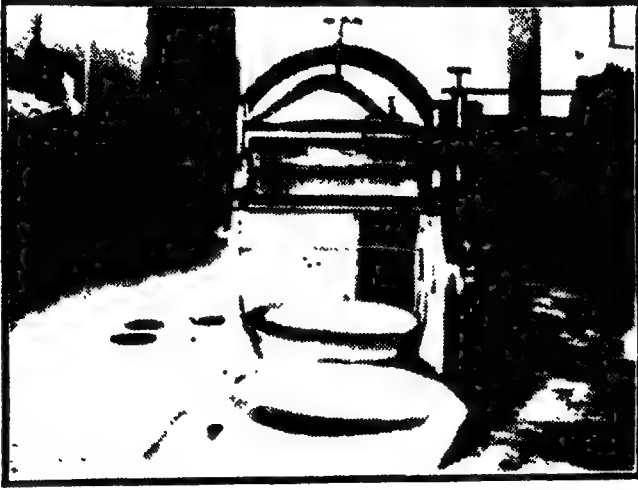
কাপড় হইতে জল নিংড়াইবার যন্ত্র

দুঃখ যত বাড়িয়াছে, সে অনুপাতে সুখ যে বাড়ে নাই—সন্তোষ যে বাড়ে নাই তাহা নিশ্চিত। এবং এ কথাও ঠিক যে, দেশ যদি ফিরিয়া চলার পথ না ধরে—তবে তাহার কল্যাণ স্বয়ং বিধাতাও দিতে পারিবেন না। খাদি দেশকে হয় তো সেই ফিরিয়া চলার পথেরই সন্ধান দিতে পারিবে; তাই খাদির উন্নতি দেখিয়া সেদিন অত আনন্দিত হইয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পরেই সোদপুর কলাশালার উদ্বোধনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। মহাত্মা স্বয়ং কলাশালার উদ্বোধন করিবেন। এখন আর কোথাও বেশী যাতায়াত করিতে ইচ্ছা করে না—বিশেষতঃ ট্রেণের হাঙ্গামা থাকিলে এই অনিচ্ছা আরও প্রবল হইয়া উঠে। তথাপি খাদি-প্রতিষ্ঠান দেখিয়া মনের ভিতর যে কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, তাহাই কলাশালার উদ্বোধন-ক্ষেত্রেও টানিয়া লইয়া গেল। সেদিন ট্রেণেও বেজায় ভিড়—সব কলা-শালার উদ্বোধন দর্শন কামনায় সোদপুর-যাত্রী। সোদপুরে পৌঁছিয়াও দেখি বিস্তীর্ণ মাঠ লোকের মাথায় ভরিয়া গিয়াছে।

প্রথমেই প্রবেশ-তোরণটি চোখে পড়িল। অত্যন্ত সাদাসিধা জিনিস, কিন্তু তাহারই ভিতর তাহার সৌন্দর্য্য ভারি চমৎকার খুলিয়াছে। মোট কলাশালাটি ত্রিশ বিঘা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অত বড় স্থান তবুও কোথাও তার শ্রীর অভাব নাই—সবটা দেখিয়া একটা আশ্রম বলিয়া মনে হয়। তোরণ পার হইয়াই একটি ঘর; তাহার ভিতর কতকগুলি বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। তার পরের ঘরটিতে বাষ্পের সাহায্যে কাপড় ধোলাই করা হয়। তার পরেই রঞ্জন গৃহ। এ ঘরটি প্রকাণ্ড। এখানে রংএর নানাপ্রকার পাত্র বসিয়াছে—কালো, হলুদ, লাল, নীল, পাটল কোনো রংএরই অভাব নাই। বস্ত্রে রং চড়াইয়া প্রথমে তাহাকে সূর্য্যের উত্তাপে তাতাইয়া তাহার স্থায়িত্ব পরীক্ষা করা হয়। তারপর সাবান দিয়া দেখা হয় রং উঠে কি না। শেষ পরীক্ষা বস্ত্রের অগ্নি পরীক্ষা—বাষ্পের ভিতরে দেহ ডুবাইয়াও যদি রং বিবর্ণ না হয় তখনই

গুদামে রক্ষিত বস্ত্রের পাহাড়

তাহার গায়ে পাকা রংএর পাশপোর্ট আঁটিয়া দেওয়া হয়। এমনি করিয়া নানা রঙের সম্বন্ধে সেখানে পরীক্ষা চলিতেছে।

এই ঘরে ইস্তিরিরও ব্যবস্থা। মিলের কাপড়ের ফিনিস্ যে অত সুন্দর হয় তাহার কারণ খুব ভারী কলের চাপে ফেলিয়া তাহাকে পাট করা হয়। এখানেও ইস্তিরির কাজ বাষ্পের সাহায্যেই নিষ্পন্ন হইতেছে। মিলের বস্ত্র অপেক্ষা বাহিরের চেহারাতেও খাদি যাহাতে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, সেইজন্য ইঁহারাও কলে খাদি ইস্তিরির ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুনিলাম এখানকার কল-কব্জা অধিকাংশই শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের পরিকল্পিত। এ সমস্তর জন্য যে সব বৈদেশিক যন্ত্র-পাতি কল-কব্জা আছে, তাহা হাজার হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। বিদেশে হাজার হাজার টাকা

রঞ্জন-গৃহ

যন্ত্রের সাহায্যে কাপড় রং করা হইতেছে

না পাঠাইয়া তিনি দেশেই সেগুলি অতি সস্তায় তৈরী করাইয়া লইয়াছেন।

কোন একখানি সাময়িক পত্রে এই সম্বন্ধে একটা মন্তব্য দেখিয়াছিলাম। এখানে সে সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলা সঙ্গত মনে করি। মন্তব্যে খাদির কাজেও কল-কব্জা ব্যবহারের জন্য একটু উপহাসের ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু ইহা লইয়া উপহাসের কোনই কারণ নাই। যে সব কল-কব্জা ঘরে-ঘরে চলিতে পারে এবং যাহা দরিদ্রকে শোষণ না করিয়া অন্নদান করে এবং চরকাকে আশ্রয় দিয়া বস্ত্র-শিল্পের মত একটা বিরাট শিল্পকে জাগাইয়া রাখে, তাহার ব্যবহার দোষের হইতে পারে না। যান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধী মহাত্মা গান্ধীর উদ্বোধনও এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিতেছে। এই

বিরাট ঘরের অর্দ্ধেকটাকে বর্ত্তমানে গুদামে পরিণত করা হইয়াছে। কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে হয় ত ধীরে ধীরে সমস্ত ঘরটাই যন্ত্রগৃহে পরিণত হইবে।

কলাশালায় নূতন একটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এই অট্টালিকার নানা প্রকোষ্ঠে নানা রকমের কাজ হয়। একটির ভিতর যন্ত্র-সাহায্যে সূতার পাক, সমতা, নম্বর, বস্ত্রের দৃঢ়তা প্রভৃতি নির্ণয় করা হয়। বস্ত্রের উন্নতির পক্ষে এই সমস্ত পরীক্ষা অপরিহার্য্য। মিলের সূতার সহিত চরকার সূতার তফাৎ কোথায়, তাহা জানিয়া চরকার সাধারণ সূতাও যাহাতে

প্রতিষ্ঠান-কর্ম্মীদের বাস-গৃহ
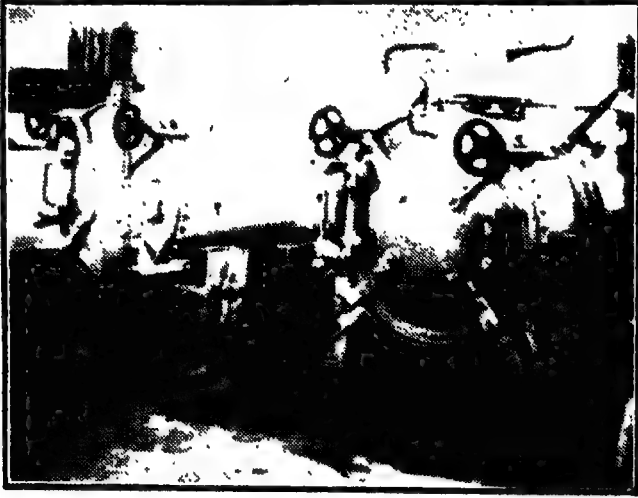
বাষ্পাধার—ইহার ভিতরে বাষ্পের সাহায্যে খাদির রং পাকা করা হয়

কোন অংশে মিলের সুতার অপেক্ষা হীন না হয়, তাহার চেষ্টা করা হইতেছে। একটি ঘর লাইব্রেরী। নানা রকমের গ্রন্থে ইহার আলমারীগুলি পরিপূর্ণ। এখানে একটি 'ডার্করুম'ও তৈরী করা হইয়াছে। ম্যাজিক লণ্ঠনের শ্লাইড তৈরী করার সম্পর্কে এই ঘরটির প্রয়োজন। খাদি-প্রতিষ্ঠানের ম্যাজিক লণ্ঠন শ্লাইড গোটা ভারতবর্ষে ঘুরিতেছে। শুনিলাম একসেট শ্লাইড নাকি ইতিমধ্যে ৮ হাজার মাইল ঘুরিয়া আসিয়াছে। একটি ঘরে মিউজিয়াম। নানা রকমের তুলা, চরকা, পিঞ্জন, পুরাতন ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি এই ঘরে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠান হইতে দুইশত নম্বর সুতার দ্বারা যে মসলিনখানি তৈরী হইয়াছে, এই ঘরে তাহারও দর্শন মিলিল।

কলাশালার পিছনের দিকে সতীশবাবুর থাকার স্থান। তিনখানি মাত্র খোলার ঘর। বেঙ্গল কেমিকেলে থাকা কালীন তাঁহার বাসগৃহের আড়ম্বরও আমাদের দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু এই স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের ভিতর তাঁহার এই অনাড়ম্বর কুটীর মনে যে শ্রদ্ধার রেখা টানিয়া দিয়াছে বেঙ্গল কেমিকেলে থাকা কালীন অত জাঁক-জমকের ভিতরেও তাহা দুর্লভ ছিল।

তাঁত ও চরকা ঘর

সভায় খাদিপ্রতিষ্ঠানের ১৯২৫ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট বিতরণ করা হইতেছিল। আমাকে একখানা রিপোর্ট তাঁহারা দিয়াছিলেন। এই রিপোর্টখানিতে তাঁহাদের কাজের যে পরিচয় পাইলাম, তাহাতেও মনটা খুসিতে ভরিয়া গেল। কয়েকটা হিসাবের অঙ্ক এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাঁহাদের হাতে খাদি যে ক্রমাগতই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, এই অঙ্কগুলির দিকে তাকাইলে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

কুলী কর্ম্মীদের থাকিবার ঘর

উৎপাদন ও বিক্রয়ের তুলনা-মুলক হিসাব

কেবল জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত পাঁচ মাসে ;—

	১৯২৪	১৯২৫	১৯২৬
বিক্রয়	১৭,৬৮৭৲	৫৭,১৯৪৲	১,০৪,৮১১৲
উৎপাদন	৫৫ মণ	৩০০মণ	৮২৩ মণ

দেখিলাম ১৯২৪ সালে জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরে প্রতিষ্ঠান ৮৫৩৫৮৲ টাকার খাদি বিক্রয় করিয়াছেন এবং তাঁহাদের ১৯২৫ সালের বিক্রয়ের পরিমাণ ১, ৭৯৲ ২৬০৲ টাকা। ১৯২৬ সালের বিক্রয়ের মোট অঙ্কটা এই হিসাবের বহিতে নাই। পরে হেমেন্দ্র ভায়াকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম ১৯২৬ সালে প্রতিষ্ঠানে ২,৬১,৯৩২৲ টাকার খাদি বিক্রয় হইয়াছে। দুই বৎসরের ভিতর ৮৫ হাজারকে ২ লক্ষ ৬১ হাজারে পরিণত করাতে যে কি বিপুল অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার দরকার—ব্যবসায় সম্বন্ধে যাঁহাদের এতটুকুও ধারণা আছে তাঁহাদের কাছে তাহা সহজেই অনুমেয়। খাদির প্রসারের পরিচয় এই রিপোর্টের ভিতর আরও অনেক স্থলে পাইয়াছি। কলিকাতা ছাড়া বাংলার আর কোথাও শুদ্ধ খাদি পাওয়া যায় সে ধারণা আমার ছিল না। কিন্তু রিপোর্ট পড়িয়া বুঝিলাম—কেবল বাংলার সহরগুলিতে নহে অনেক মহকুমাতেও ইঁহাদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনবৎসরের ভিতর প্রতিষ্ঠানের
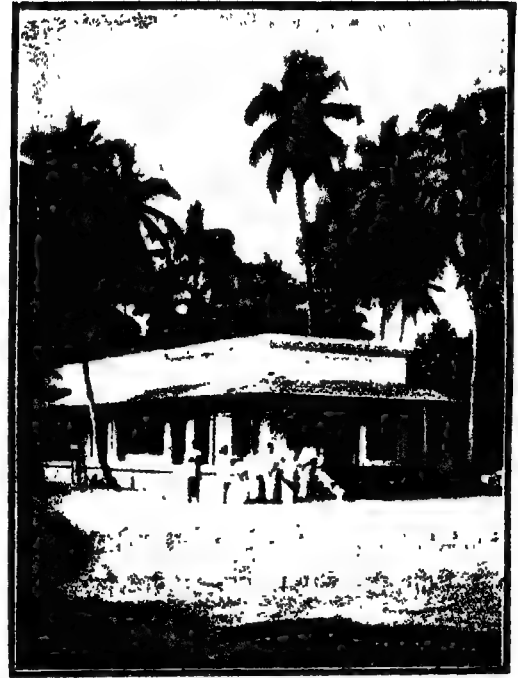
বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষাগারের একাংশ

বিক্রয়-কেন্দ্র বাড়িয়া ২০টিতে এবং উৎপাদন-কেন্দ্র ১৩টিতে পরিণত হইয়াছে।

খাদি প্রচারের জন্য ইঁহারা যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাও প্রশংসনীয়। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে অন্ততঃ ৯৬টি স্থানে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা করা হইয়াছে। প্রচার বিভাগ এক বৎসরে ইংরেজী ও বাংলায় অন্যূন ৪৫০টি প্রবন্ধের দ্বারা খাদির বাণী প্রচার করিয়াছেন।

কাঁমার ও সূতারের কাজ করিবার গৃহ

খুঁত ধরিতে গেলে খুঁত যথেষ্ট ধরা যায় এবং এ মক্ষিকাবৃত্তি কেহ কেহ যে না করিতেছেন তাহাও নহে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এরূপ সুনিয়ন্ত্রিত, সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠান বাংলার গৌরব। প্রতিষ্ঠান সাধারণের সম্পত্তি। ইহার লাভের সহিত ট্রষ্টিদের ব্যক্তিগত লাভের সম্বন্ধ নাই। তথাপি যে উৎসাহ, একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং শ্রদ্ধার সহিত ইঁহারা প্রতিষ্ঠানের কাজ করিতেছেন মানুষ একান্ত স্বার্থের খাতিরেও

কলাশালার রাসায়নিক ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার

কিছু সঞ্চিত ছিল তাহাও ব্যয় করিয়া তিনি আজ নিঃস্ব। কিন্তু অর্থে নিঃস্ব হইলেও কর্ম্মের সম্পদে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার ভরিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ কলাশালা নিঃস্বার্থ কর্ম্মীদের একটি তীর্থ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ভারতের আশ্রমের মতই কোনো ব্যক্তি বিশেষের নহে—দশের ও দেশের হিতে ইহার সমস্ত কাজ উৎসর্গীকৃত। কর্ম্মীরা ভোরে ৪টার সময় প্রার্থনার দ্বারা কাজ আরম্ভ করেন এবং সন্ধ্যা ৭টায় প্রার্থনার দ্বারা কাজ শেষ করেন। মনের ভিতর অসন্তুষ্টি নাই কোন জিনিসের উপরে সেরূপ ভালবাসা দেখাইতে পারে না। খাদি-প্রতিষ্ঠানে ত্যাগের যে আদর্শ আমি দেখিয়াছি, তাহাই আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা যে ত্যাগ ও নিষ্ঠাকে ধারণ করিয়াই যুগে যুগে সার্থক হইয়াছে, এখানে আসিলে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। সতীশ বাবু বহু অর্থ এবং অর্থের অপেক্ষাও মানুষের পক্ষে যাহা লোভের বস্তু—অজস্র সম্মান, প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করিয়াই খাদির যজ্ঞে আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছেন। যাহা

উপাসনার প্রাঙ্গণ

—গ্লানি নাই—বিরক্তি নাই। বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক কাজের উদ্দেশ্যে পরস্পরের কাছে থাকিয়া ভেদ ভুলিয়াছে, বৈষম্য ভুলিয়াছে—এক পরিবারের লোকে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার অনুকরণের পথ হইতে ফিরিয়া চলার একটা সাড়া যে আমাদের চিন্তাশীল লোকদের মাথার ভিতর জাগিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু কাজের ভিতরে তাহার প্রতিষ্ঠার স্পষ্ট পরিচয় পাইলাম সোদপুরের এই কলাশালায়। তাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে

কাপড় ধোলাইএর ঘর

হৃদয়ের আনন্দ দিয়া অভিনন্দিত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ১৯২০ সালে ভারতবর্ষ যে নিরুপদ্রব সত্যাগ্রহের স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কে জানে হয় ত ইহার কর্ম্মীরাই তাহা বাস্তবে পরিণত করিবেন। বৃদ্ধের মনে অনেক স্বপ্নই জাগে। তাহার সব স্বপ্ন যদি সত্যে পরিণত হইত!

সতীশ বাবু সর্ব্বসাধারণের জন্য নিজে যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, জনসাধারণ যদি সেই ত্যাগের উপযুক্ত মূল্য প্রদান করেন, তবেই সতীশ বাবুর ত্যাগ স্বীকারও স্বার্থক হয়, জনসাধারণেরও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়। সে জন্য বেশী কিছু করিতে হইবে না, যাঁহার যখন সুবিধা হইবে, তিনি যেন একবার গিয়া খাদি-প্রতিষ্ঠান কলাশালা দেখিয়া আসেন, এবং যথাসাধ্য খাদি ব্যবহার করেন।

সতীশচন্দ্র দাস গুপ্তের বাস-কুটির

বসন্ত

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ

এস শীতঘন-কম্পিত ভয় ভীতি শঙ্কিত জগজীবানন্দিত হে।
এস বিনাশনকুজ্ঝটি জটাজুটধূর্জ্জটি সমলোকবন্দিত হে॥
এস নভোনীলনির্ম্মল বায়ুপথস্বচ্ছল ঋতুরাজবাঞ্ছিত হে।
এস দশদিশিউজ্জ্বল উষাবধূচঞ্চল বালারুণলাঞ্ছিত হে॥
এস প্রমুদিতহিল্লোল ফুলবালাহিন্দোল সুখরসলুণ্ঠিত হে।
এস মধুলিহগুঞ্জন বধূমধুকূজন লাজমানকুণ্ঠিত হে॥
এস বিবসনখণ্ডিত ফুলপাতামণ্ডিত বনরাজিবান্ধব হে।
এস মনসিজঅঙ্কিত প্রিয়ালাগিশঙ্কিত প্রজাপতিতাণ্ডব হে॥
এস ছায়াপথালঙ্কৃত মুকতারাঝঙ্কৃত ঝিকিমিকিউচ্ছল হে।
এস ধরাননচুম্বিত স্বর্ণদেহবিম্বিত সিতাননপ্রোজ্জ্বল হে॥
এস নবতৃণসজ্জিত রূপশোভালজ্জিত গোঠমাঠরঞ্জন হে।
এস চূততরুমুঞ্জরী মধুপানগুঞ্জরি বধূমানভঞ্জন হে॥
এস কুহুকুহুউচ্ছ্বাস সকরুণনিশ্বাস ব্যথান্তরাচ্ছন্নিত হে।
এস সুশীতলনির্ঝর পথক্লেশজর্জ্জর কবিজনবন্দিত হে॥

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৬

ডাক্তার বাবুর ব্যবস্থায় ও সহৃদয় ব্যবহারে এবং জয়হরির সেবাযত্নে গণেনবাবু সত্বরই সারিয়া উঠিলেন। আগন্তুক যুবক দুইটির কর্ম্ম বিমুখ উদাসীন ভাবটা আমরা বুঝিতে না পারিলেও তাহারা উভয়েই শিক্ষিত ও সাহায্য-তৎপর। তাহাদের সহিত আলাপ আলোচনায় গণেন বাবুর চিন্তা-পীড়িত দুর্ব্বহ দিনগুলি সহজেই অতিবাহিত হইতেছিল ও তাহা তাঁহার স্বাস্থ্য সঞ্চয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেছিল।

গণেন বাবুর জন্ম ডাক্তার বাবুর ঔষধের ব্যবস্থা না করাটা জয়হরির মনঃপুত হয় নাই। তিনি ঔষধ না দিলেও জয়হরি সে কাজটা নিজের বিশ্বাসমত করিয়া চলিয়াছিল। শিব-গঙ্গায় স্নান করিয়া প্রত্যহই বাবা বৈদ্যনাথের চরণামৃত আনিয়া গণেনবাবুকে খাওয়াইত। এখন সে তাঁহাকে লইয়া সকাল-সন্ধ্যা একটু বেড়ায়।

আমার ভয় হয়,—কোন্‌দিন না মাড়োয়ারিদের মোটার-লরিতে হাওয়া খাওয়াইবার সখ চাপে ও গণেনবাবুকে ঢুমকায় চালান দিয়া বসে! তাই নিত্যই তাহাকে সে সম্বন্ধে সতর্ক করিয়াছি।

সে বলে—"আমি কি এম্‌নি মুখখু! উনি না পারেন লাফাতে, না পারেন ঝুলতে!" অর্থাৎ এই দুইটি গুণ না থাকিলে মোটার-লরি চাপা চলে না, ইহাই তাহার ধারণা। তাহার এই ধারণাটা দৃঢ় থাকিলেই বাঁচি।

গণেন বাবুর পথ্যাদির পরিবর্ত্তন ও ক্রমোন্নতিটা ডাক্তার বাবুর ব্যবস্থামত প্রথমে তাঁহার বাসাতেই পাকিত ও পাক-স্পর্শ ঘটিত। পরে সেই প্রয়োজন্ মত মধ্যে মধ্যে আমাদের বাসাতেও তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ানো হইত। এ বিষয়ে সর্ব্বত্রই জয়হরির উৎসাহ ও সহযোগ সমান থাকিত। ক্রমে আহারাদি সম্বন্ধে আর কোনো বিধি-নিষেধ রহিলনা।

*　　*　　*

আমি আজ কয়েকদিন লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেন বাবু যে-পরিমাণে স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পাইতেছিলেন, আহারাদি সম্বন্ধে বাধামুক্ত হইতেছিলেন, এবং ডাক্তার বাবু ও আমরা—তাঁহাকে বিবিধ ভোজ্য খাওয়াইয়া আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম,—তিনি সেই পরিমাণে স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া পড়িতেছিলেন! শয্যাগত দুর্ব্বল ও চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি যে ভাবে ও যত কথা কহিতেন,—এখন সুস্থ সবল অবস্থায় তাহা দিন দিন যেন মৃদুমন্থর হইয়া আসিতেছে। দীনভাবে মাথা নীচু করিয়া আসেন যান, কিছু জিজ্ঞাসা করিলে ধীরে দু'একটি কথায় উত্তর দেন। সে-ভাবটা এতই সুস্পষ্ট যে জয়হরি পর্য্যন্ত তাহা লক্ষ্য করিয়াছে এবং সে-জন্য চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

ভাবিলাম—ইহাই ত স্বাভাবিক। শিক্ষিত ভদ্র লোক—পীড়া কাতর অক্ষম অবস্থায় অপরের সেবা যত্ন, বাধ্য হইয়া, সহজেই লইতে পারেন,—এমন কি প্রার্থী হইতেও পারেন; কিন্তু সুস্থ সবল অবস্থায় তাহা কৃপার ভারের মত তাঁহাকে চাপিতে থাকে। দয়া গ্রহণ করার একটা দারুণ পীড়াও আছে; সক্ষম অবস্থায় সেটা বেশিদিন সহিতে হইলে মানুষের মনুষ্যত্ব আঘাত পায়; সে হীন ও অপমানিত বোধ করিতে থাকে। সক্ষমের অক্ষমতার পরিচয় লজ্জা সঙ্কোচই বাড়ায়,—তাহাকে নত করিতে থাকে।

ডাক্তার বাবু অভয় দিলেন, তাঁহাকে এখন দেশে পাঠানই উচিত। গণেনবাবু বোধ হয় ভদ্রতার সঙ্কোচ ভেদ করিয়া কথাটা পাড়িতে পারিতেছেন না। খুব সম্ভব—সেই না-পারাটাই তাঁহাকে পীড়া দিতেছে।

*　　*　　*

সকাল সাতটা আন্দাজ গণেন বাবুকে দেখিতে গেলাম।

দেখি যুবক দুইটি "মুলার্স-সিষ্টেমে" (Muller's System এ) কসরৎ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সহাস্যে বন্ধ করিল। আমি নিষেধ করিলে বলিল—"পনের' মিনিট হয়ে গেছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"গণেনবাবু কোথায়?" শুনিলাম জয়হরি বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন, রোজই যান—ফিরতে ন'টা হয়।

আমাকে বসিতে বলিল। তাহাদের সহিত কথা কহিতে আমার ভালও লাগে,—দেশের ও দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথাই তাহাদের প্রধান কথা।

কথার ফাঁকে বীরেন্দ্র সহসা বলিয়া উঠিল—"দেখুন—গণেনবাবু সত্বর সেরে উঠলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর প্রফুল্লতা ফুটতে দেখলুম না। জোর ক'রে হালকা হাসি হাসলেও তার মাঝে একটা চিন্তা যেন অনুস্যূত রয়েছে বলে মনে হয়।"

বলিলাম—আমার চুলই পেকেছে, বুদ্ধি কি অভিজ্ঞতাটা তোমাদের বয়সের নীচে যে স্থানে ছিল তার চেয়ে বড় বেশী নড়েনি,—নড়তে চায়ওনি,—সুতরাং আমার অনুমানটায় ভুল থাকাই সম্ভব। আমিও ওটা লক্ষ্য করেছি, তাতে আমার মনে হয়—গণেনবাবু ঠিকই সেরে উঠেছেন। আর, সেরেছেন বলেই—মাথাটায় অন্য চিন্তাকে স্থান দিতে পেরেছেন। সঙ্কট পীড়ায় অবস্থায়—জীবনের আশা যখন অল্পই ছিল বা ছিলই না,—ছিল কেবল যন্ত্রণা আর অনিশ্চিত অবস্থার অস্পষ্ট বিক্ষেপ,—ধারাবাহিক কিছু ছিলনা; তখন,—থাকে তো, একমাত্র নিজের চিন্তাই প্রধান ছিল। যে নিজেই যেতে বসেছে,—স্ত্রীপুত্রের চিন্তা তার কাছে কতক্ষণ স্থায়ী হয়! এলেও—এক মর্ম্মভেদ দীর্ঘশ্বাসেই তার পরিসমাপ্তি। কিন্তু—সামর্থ্য এলে—আশা উৎসাহ দুই-ই আসে, সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীপুত্রের চিন্তাই তখন প্রবলতর হয়,—নিজের ভাবনা পেছিয়ে পড়ে।"

বীরেন সঙ্গীটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে বললে—"আপনি ঠিক্ ঠাউরেছেন।"

বলিলাম—"কিসে বুঝলে! তা কি বলা যায়—অনুমান বইতো নয়। জীবনে হতাশ হ'লে কেউ কেউ তো রামধন তুলির জমিটের কথাই ভাবে; কেউ বাড়ুয্যেদের থৎখানা বদলে নিতে তাড়া দেয়; এই রকম কত কি। বড় বড় সম্পত্তিশালী নৈষ্ঠিক জাপকেরা নায়েবকে ডেকে মৃদু-মন্দ জপ দ্রুত চালান,—বিধবা বড় বধূ ঠাকুরাণীর পুত্রটির অকাল বৈরাগ্যের ব্যবস্থা করেন—যাতে সত্বর তার ধর্ম্মে মতি হয়। যাক্,—ঠিক্ কিছু কি বলা যায়! তবে—ঠিকটা আর দিনকতক পরে স্বয়ং জানতে পারব' বলে আশা করছি বটে।"

যুবকদ্বয় হাসিয়া বলিল—"না—আপনি ঠিক্ই ঠাউরেছেন,—এই দেখুন না।"

এই বলিয়া রোল্ করা একসীট্ ফুলিস্কেপ্ আমার হাতে দিল।

খুলিয়া দেখি—পেন্সিলে আঁকা একখানি চিত্র; ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃক্ষাদিতে পরিবেষ্টিত বাঙ্গলার একটি পল্লী। কয়েকখানি কোটা আর চালাঘর। একটি রোগজীর্ণা হৃতযৌবন-শ্রী যুবতী পুকুরঘাটে বসিয়া একবোঝা বাসন মাজতেছেন, যেন'—

"ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,—
তবুও সময় তার নাহি কাঁদিবার!"

ছোট একটি মেয়ে—মায়ের সাহায্যার্থে একখানি থালা মাথায় লইয়া বাড়ীতে রাখিতে চলিয়াছে। রুগ্ন একটি বালক একবোঝা বিচালি মাথায় করিয়া, আর এক হাতে গরুর দড়ি ধরিয়া—গরুটি লইয়া বাড়ী ঢুকিতেছে। সকলেরি ম্লান মুখ, ছিন্নবস্ত্র,—কোথাও কাহারো আশার আনন্দটুকুও নাই। বন, নদী, গিরি প্রান্তর ভেদ করিয়া একটি অস্পষ্ট আত্মার উন্মাদ দৃষ্টি সুদূর হইতে তাহা লক্ষ্য করিতেছে।

সমাবেশগুলি—অবসান সূচনা করিতেছে, দেখিলেই প্রাণের মধ্যে বিষাদ-ঘন সান্ধ্যরাগিণী সাড়া দিয়া উঠে; বুক-ভাঙ্গা গভীর শ্বাস বাহির হইয়া আসে।

চিত্রের নিম্নে নামকরণ ছিল—"আমার সাধের সংসার", পরে "সাধের" স্থলে "সুখের" করা হইয়াছিল। শেষ, সবটা কাটিয়া লেখা হইয়াছে—"হতভাগার সংসার!"

শিহরিয়া উঠিলাম। গণেনবাবু বলিয়াছিলেন—"পেন্সিল দে ছবি এঁকেও সময় কাটাতুম"। তখন ভাবিতে পারি নাই—চিত্রাঙ্কনে তিনি একজন দক্ষ শিল্পী, ছবিকে জীবন দান করিতে পারেন।

তাঁর প্রথম দিনের সকল কথা মনে পড়িয়া আমার চক্ষে

চিত্রখানি এতই সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া দেখা দিল যে, আমি আর সে দৃশ্য সহিতে পারিলাম না। প্রাণটা ব্যথা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি কাগজখানি রোল্ করিয়া বীরেনের হাতে দিয়া বলিলাম—"এ তাঁর ব্যথার রূপ,—যেখানে ছিল সেই খানেই রেখে দাও।"

"এখন চললুম" বলিয়া উঠিয়া পড়িলাম।

* * * *

অনিশ্চিত চলা! মনটা পথ খুঁজিতেছে—পথ পাইতেছেনা। বাহিরে পা ফেলিতেছে—ভিতরে ঘুরিয়া মরিতেছে!

ডাক্তার বাবু কোথা হইতে ফিরিতেছিলেন। মোটার থামাইতে থামাইতে বলিলেন—"আমি আপনাকেই চাইছিলুম,—আসুন, কথা আছে।"

বলিলাম—"আজ বেড়ানো হয়নি—আমি হেঁটেই যাচ্ছি, বিলম্ব হবে না।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

এই তো খুঁজিতেছিলাম! বিচলিত ভাবটা কাটিয়া গেল।

দু'চার কথার পর ডাক্তার বাবু বলিলেন—"গণেন বাবুর শারীরিক পীড়া সম্বন্ধে চিন্তার আর কোনো কারণ নেই—তিনি ভাল হ'য়ে গেছেন, আর নিজেই সেটা আমাদের চেয়ে বেশী বুঝচেন। এখন আট্‌কে রাখলে বোধ হয় তাঁর মানসিক পীড়া বাড়ানো হবে। নয় কি?"

"আমারো তাই মনে হচ্ছে। তা-ছাড়া তাঁকে আর বেশী আটকালে তাঁর আত্মসম্মানকে অবনত করা হবে। খুব সম্ভব—ভদ্রতা আর অবস্থা তাঁকে নীরব থাকতে বাধ্য করছে। কিন্তু কর্ত্তব্যের ওপর গেলেই সেটা বোধ হয় মানুষকে অপমানই করতে থাকে।"

"'বোধ হয়' বলছেন কেন,—ঠিকই তাই!"

গণেন বাবুর মানসিক পরিবর্ত্তন ও চিত্রখানির কথা ডাক্তার বাবুকে বলিলাম। তিনি একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন—"এ অবস্থায় কিন্তু একজন কেহ সঙ্গে যাওয়া উচিত,—জয়হরি বাবু"—

বাধা দিয়া বলিলাম,—"মাপ করবেন, তাকে আমি বোধ হয় বেশী জানি। ভাবের আতিশয্যে একটা অভাবনীয় কিছু ঘটাইয়া বসা তার পক্ষে খুব অসম্ভব নয়। না হয়, যদি ফেরে তো—ছয়মাস কি বছর খানেক পরে।"

ডাক্তার বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আমিও ওইরূপই কিছু বল্‌তে যাচ্ছিলুম,—আপনি বাধা দিয়ে আমার মনোভাবটাই প্রকাশ করেছেন। যাক্, কিন্তু চাই একজন,—সে সম্বন্ধে ভাববেন। কাল দেখা হবে কি? সময়টা জান্‌লে আমিই আপনার কাছে যেতে পারি।"

"সময়ের কথা বল্‌ছেন? দেখুন—কোনো কিছুকে প্রচুর পরিমাণে পেতে হ'লে তাকে—চাইনা বলে ত্যাগ করাটাই তার সহজ উপায়। সময়টাকে তাই ছেলেবেলা থেকেই ত্যাগ করেছিলুম—ঘেঁসতে দিইনি। কখন যে "দিন যায় রাত্তি আসে," সে খোঁজ কোনো দিনই ছিলনা। অনেককে দিয়ে সে অনেক কিছু বলালে;—"একবার গেলে আর ফিরিবার নয়"; বললুম—বেশ, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তিনি তো আর "অপান বায়ু" নন, অনায়াসে যেতে পারেন। আবার ইংরিজিতে বলালেন,—"Take time by the forelock" (ঝুঁটি ধরে ফেল)। কেনরে বাবা,—সহিস্ নাকি! তার পর যখন—বাঁশী ফুঁকে, ভোঁ বাজিয়ে, তোপ দেগে সে সাড়া পেলেনা, তখন নিজেই এসে—"আমি তোমারি" বলে আত্মসমর্পণ করেছে। এখন সে আমার অধীন—সব সময়টাই আমার। আপনি যখন ইচ্ছা আসতে পারেন। তবে—আপনাকে আর আস্‌তে হবে না,—আমিই আসব' অখন।"

ডাক্তার বাবু নির্ব্বাক্ শুনিতেছিলেন,—এইবার সশব্দ হাস্যে বলিলেন,—"সেই ভালো,—কিন্তু আমি যে এখনো সময়ের অধীন!"

"বেশ বারাণ্ডায় একখানা 'ইজিচেয়ার' রাখিয়ে দেবেন,—আপনাকে সারাদিন না পেলেও আমি uneasy হ'বনা।"

"কাল দেখা হবে," বলিয়া তাড়াতাড়ি বিদায় লইলাম।

৫৭

ধর্ম্মশালা হইতে যে অস্বস্তি লইয়া বাহির হইয়াছিলাম—চিকিৎসা-শালায় তাহার প্রতিকারের আশা পাইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিলাম।

পথেই পোষ্ট-আপিস্। একখানি পত্রের আশা করিতেছিলাম। দেখিয়াই যাই।

পোষ্ট আপিসে তখন 'ওভার-কোটের' হাট ভাঙ্গিয়াছে, কেবল 'কাসি' আঁটা, চুল ফেরানো বাবু-চাকরের দল—কে

একজনকে ঘিরিয়া, বারাণ্ডার বাহিরে গোলমাল করিতেছিল।

বারাণ্ডায় উঠিবার সময় কানে আসিল,—"ইনি মস্ত লোক, এঁকে ধর্‌লেই কাজ হবে।"

এত বড় সুমধুর অপবাদটা শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া চাহিতেই হইল;—'বরং বুগ্‌' বলিবার অবকাশ পাইলামনা।

একটি স্ত্রীলোক ঝড়ের মত আসিয়া পা জড়াইয়া ধরিল, বিধবা—বয়স্থা। কি আপদ—পাগল নাকি! "ব্যাপার কি—ছাড়ো, ছাড়ো।"

বলিল,—"বাবা—বিমলির চিটিখানা আমাকে দিতে বল,—এ পোড়ারমুখোরা আমায় দেবেনা। পাঁচ মাস তার খবর পাইনি। আমি কেন মর্‌তে এসেছিলুম গো!"—চীৎকার কান্না!

কি বিপদেই পড়িলাম! পা ছাড়েনা, বলে,—"আমি মন্দ জাত নই গো—সদ্‌গোপের মেয়ে, তোমাকে নাইতে হবেনা।"

সেটা ম্যাথরে ধরিলেও হইতনা। কিন্তু এ কি বন্ধন!

বলিলাম,—"তুমি কে বাছা?"

"ওগো আমি ব্যাটরার বিমলির মা,—সে যে এই পেরথম পোয়াতী গো! আমি কেন মর্‌তে এসেছিলুম গো।" আবার চীৎকার কান্না!

কি মুস্কিলেই পড়িলাম! জাসি-জমায়েৎ হাসিমুখে মজা দেখিতেছিল। তাহাদের দিকে চাহিলাম—জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কিছু জানো?"

শুনিলাম,—ও ওই বোমপ্লাস টাউনের * * বাবুদের বাড়ী কাজ করে। পাঁচ মাস এসেছে, না পায় মেয়ের চিটি, না পায় মাইনে। ও বলে,—চিটি আসে—ওকে কেউ দেয়না।"

"মিছে কথা বলিনি বাবা—তীথি স্থান" ইত্যাদি। সে যে নেকা-পড়া জানা মেয়ে, পাড়ার মেয়েদের চিটি নিকে দেয় আর আমাকে নেখেনা।"

পোষ্ট আপিসের একটি বাবু বারাণ্ডায় আসিয়া মজা উপভোগ করিতেছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাই না কি?"

"কি করে জান্‌বো মশাই। বাবুদের চিটি আর তাঁদের 'কেয়ারে' যে চিটি আসে,—সবই তাঁদের লোক নিয়ে যায়। 'কেয়ারে'র চিটি স্বতন্ত্র কারুকে দেবার তাঁদের হুকুম নেই।"

বললুম,—"এ স্ত্রীলোকটি যখন—পায়না বল্‌ছে, তখন ওর নামের চিটিখানা ওকে দিতে আপত্তি আছে কি?"

"আপনি তো বেশ লোক! কার চিটি কাকে দেব মশাই! ওই যে বিমলির মা তার ঠিক্ কি,—চেনে কে, identify (সনাক্ত) কর্‌বে কে!" ইত্যাদি।

আমি অবাক্ হইয়া লোকটিকে দেখিতে লাগিলাম,—বাঙ্গালী কি? খুব কড়া কর্ত্তব্যপরায়ণ তো! যে আজ পাঁচ মাস পত্রের জন্য পাগল হইয়া বেড়াইতেছে, তাহাকে তার নামের পোষ্টকার্ডখানা দিতে identification চায়! "হুকুম" তামিলের অভ্যাসও আছে। সত্বর উন্নতি কর্‌বে দেখ্‌ছি।

স্ত্রীলোকটি বলিয়া উঠিল,—"শুন্‌লে কথা! বিমলিকে বিউলুম—আজ আমি তার মা নই! এরা দিনকে রাত করে গো! ওগো আমার কি হবে গো!" (কান্না)

যা হ'বে তা তো বুঝিতেই পারিতেছি, এখন আমাকে ছাড়িলে যে বাঁচি। আর কিছুক্ষণ থাকিলে আমাকেও না—ওই বলিয়া চীৎকার করিতে হয়!

নিমক-নিষ্ঠ বাবুটির মাথায় টুপি না থাকায়—আপিস ঘরে ঢুকিবার সময় আমাকে সন্দেহ-মুক্ত করিয়া গেলেন।

"যখন ধানের গোলা ভরা ছিল, তখন রাখাল সামন্তও পিসি পিসি কর্‌তো। বিরাজ মিছে কথা কবার মেয়ে নয় বাবা—এখনো বেঁচে আছে—"

কি জ্বালা, বাধা দিয়া বলিলাম,—"সে সব তো ঠিক কথা, তা একবার দেশেই যাওনা!"

"আ—আমার পোড়া-কপাল,—সব বুদ্ধিমানই সমান! তবে আমি কার কাছে যাব গো—" (কান্না)।

"কি হ'ল?"

"আমার মাথা হল—কোনো পোড়ারমুখোই আমার কথা বুঝবেনা গো!—আমায় যেতে দেবে কে,—দিচ্ছে কই! 'এখানে চোর ডাকাতের ভয়' বলে—গেঁটের ২০৲ টাকা আর ঊনিস গণ্ডার হারছড়াটাও নিয়ে রেখেছে,—দেয়না। দিলে ত' চলে যাই,—আমার মাইনের কাজ নেই।—

"বিমলি বলেছিল গো—'হারছড়াতো সেই আমাকেই দিবি,—কোথায় কে কবে নিয়ে নেবে—রেখে যা মা।' আমি বললুম,—তুই এই তিনমাস পোয়াতী—সাধের সময় দেবো। আমি তো মাসখানেক পরেই তিথি করে ফিরে আস্‌ছি,—এমন ভদ্দোর নোকের সঙ্গ আমার আর কত মিল্‌বে।

"ওগো কেনো মর্‌তে তার কথা শুনিনি গো! আমায় খুব তিথি করিয়েছে! এখানে এসে ডেরা গাড়লে, আর নোড়লো না। গিন্নি বলে—খাসির মাস পর্য্যন্ত হজম হয়—এমন তিথি আর আছে নাকি! তোকে খাওয়া-পরা আর সাতটাকা মাইনে দেবো—থাক্।

"যাবার নাম কর্‌লে বলে—যা দিকিন দেখি,—জানিস তো আমার ছেলে টিপিটি—লাটসায়েব কথা শোনে। যাবার নাম কর্‌বি তো রাস্তায় স্থাংটো করে বেত মার্‌বে,—তোর কোনো বাবা রক্ষে কর্‌তে পারবে না!—

"ওগো তোমরা দেখনি,—সে সত্যিকার টিপিটি গো—সত্যিকার টিপিটি,—যেন হাওড়ার পুলের বয়া, ভ্যাঁটার মতো চোক। দেখলে ভয় করে।—

"খাসির মাস খেয়ে খেয়ে মাগীর মুখখানাও যেন বাগের মুখ দাঁড়িয়ে গেছে,—কথা কয় যেন খেতে আসে! আমাকে দিয়ে সেই সব অখাদ্যির এঁটো নেওয়ায়! ওগো আমি কি তিথি কর্‌তে এলুম গো,—আমার কপালে এই ছিল গো!" (চীৎকার কান্না)

তাই তো, বিদেশে এনে গরীব স্ত্রীলোকের ওপর এ কি জুলুম!

বিমলির মা মাখেওনা, পাও ছাড়েনা। বলে—"ওরা আবার আমায় যেতে দেবে,—আমার টাকা দেবে,—মাইনে দেবে? হারছড়া দিলে যে বাঁচি! শীতে মরুচি একখানা পুরুনো চাদরও দিলেনা,—যে করে কাটাচ্চি মা কালীই জানেন। একটু কাঁদতেও দেয়না গো, বলে—অকল্যেণ কর্‌ছিস্! তাই—রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াই। কোনো পোড়ারমুকোর দয়া হলনা! বিমলিকে আর দেখতে পেলুম-না,—আমি কেনো মর্‌তে এসেছিলুম গো!" (কাতর ক্রন্দন)

বন্ধন ভুলিয়ে দিলে। তীর্থের লোভ দেখিয়ে এনে—অসহায়া স্ত্রীলোককে এই অবস্থায় ফেলেছে! এর আর পাগল হ'তে বাকি কি! এর কি কোনো উপায় হয়না?

শেষ বিমলির ঠিকানাটা লিখিয়া লইয়া বলিলাম, "ভেব না, এক সপ্তাহ মধ্যে তার চিটি পাবে। তার পর অন্য উপায় দেখবো।"

অনেক আতঙ্কপ্রদ শুভ-কামনা লাভের সহিত, অর্থাৎ—সোনার দোত-কলম, দীর্ঘজীবন, রাজা হওন,—পা দুখানাও ফিরিয়া পাইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম! মুক্তি পাইয়া তাহারা আর এক পাও দাঁড়াইতে চাহিলনা। যে পত্রের আশায় আসিয়াছিলাম তাহার জন্য কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ কর্ম্মচারীটিকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইল না। বাসা-মুখে রওনা হইলাম।

মাতুলের কথা মনে পড়িল, তিনি বলিয়াছিলেন,—"এখানে থাকায় আর সুখ নেই, এক মাগীর জ্বালায় নিশ্চিন্তে পথে পা বাড়াবার যো নেই। ঘরের পয়সা ফেলে—সখের হাওয়া খেতে এসে, ফ্যাঁসাদ পোয়ানো কেন রে বাবা!" এখন দেখিতেছি—এই বিমলির মাই ছিল তাঁর নম্বর টু অন্তরায়।

দেখি অদূরে রেলওয়ে ক্রসিংসের পরে—বম্পাস্ টাউনের পথে,—বিমলির মার সহিত কথা কহিতে কহিতে ধর্ম্মশালার বীরেন চলিয়াছে। সে আবার কোথা হইতে জুটিল! পরিচিত না কি?

দূর করো,—আর মাথা খারাপ করা নয়—সকাল থেকে অনেক হয়েছে। বাসায় ঢুকিয়া পড়িলাম। ক্রমশঃ

শাহ লালন ফকিরের গান

মুহম্মদ মন্‌সুর উদ্দীন বি-এ

লালন ফকিরের নাম এখন বাঙলা সাহিত্যে অজ্ঞাত নহে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই তাঁহার গান বাঙলার প্রধান প্রধান মাসিক-সমূহে প্রকাশিত করিয়াছেন।

লালনের গান অসংখ্য এবং অমূল্য। ভাবের মাধুর্য্য ও সাধনার সৌন্দর্য্য সুগন্ধ তাঁহার প্রতি গানের প্রতি ছত্রের পরতে পরতে রহিয়াছে।

তাঁহার কয়েকটী গান নিয়ে দিলাম।

(১)

মন আমার কি ছার গৌরব করছ ভবে।
দেখনা রে সব হাওয়ার খেলা, হাওয়া বন্ধ হতে দেরী কি হবে?
থাকতে হাওয়ার হাওয়াখানা,
মওলা (১) বলে ডাক রসনা,
মহাকাল বসে ছেরানায়, কখন যেন কু ঘটাবে॥
বন্ধ হলে এ হাওয়াটী,
মাটীর দেহ হবে মাটী,
দেখে শুনে হও না খাঁটী
মন কে তোরে কত বুঝাবে॥
ভবে আসার আগে যখন,
বলেছিলে কর্ম্ম সাধন, (২)
লালন বলে সে কথা মন,
ভুলেছ এই ভবের লোভে॥

(২)

প্রেমের সন্ধি আছে তিন।
সরল রসিক বিনে জানা হয় কঠিন॥
প্রেম প্রেম বল্লি কিবা হয়,
না জানলে সেই প্রেম পরিচয়,
আগে সন্ধি করতে প্রেমে মজরে,
আছে সন্ধি স্থানে মানুষ অচীন॥
পঙ্ক, জল, পল, সিন্ধু, বিন্দু,
আগু মূল তার শুষ্ক সিন্ধু,
ও তার সিন্ধু মাঝে আলেক পেচবে,
উদয় হচ্ছে রাত্রদিন॥
সরল প্রেমিক হইলে,
চাঁদ ধরা যায় সন্ধিমূলে,
অধীন লালন ফকির, পায়না ফিকির,
হয়ে সদাই ভজনে বিহীন॥

(৩)

যে রূপে সাঁই আছে মানুষে।
তালার উপরে তালা, তাহার ভিতরে কালা,
মানুষ ঝলক দেয় সে দিনের বেলা,
শুধু রসেতে ভাসে॥
"লামোকামে" (৩) আছে নুরী (৪)
সে কথা অকথ্য ভারী,
লালন কয় সে দ্বারের দ্বারী
নইলে কি জান্‌তে সে॥

---

(১) মওলা—উপাস্য;—খোদাতায়ালা।

(২) খোদা তায়ালা প্রথমে সমস্ত রুহকে এই জগতে পাঠাইবার আগে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমাদের উপাস্য কে?" আত্মাগণ বলিয়াছিলেন "তুমিই আমাদের একমাত্র উপাস্য এবং আমরা তোমার বান্দা।" বান্দার কাজ বন্দেগী করা। মানুষ মায়ায় ভুলিয়া মওলার উপাসনা ও আরাধনা করিতেছে না, ইহাই ফকিরের বক্তব্য।

(৩) মুসলমান সাধারণের বিশ্বাস যে খোদা "লামোকামে" আছে। 'লামোকাম' অর্থ non-space 'লামোকাম' বলিয়া কোন স্বর্গ বা স্থানের নাম নাই।

(৪) নুরী শব্দ নুর শব্দ হইতে উদ্ভুত। নুর অর্থ আলো, নুরী আলোময়।

আশীর্ব্বাদ

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

হঠাৎ চার দিনের আগে-পাছে রমেশচন্দ্রের ভাই এবং তাঁহার ভ্রাতৃবধূ যখন দুইখণ্ড উল্কার মতই যৌবন-মধ্যাহ্নে মৃত্যুর অন্ধকারের ভিতর হারাইয়া গেলেন, কল্যাণীর বয়স তখন মোটে তিন বৎসর। সেই সময়েই বাড়ীর বড়বধূ রাধালক্ষ্মী মাতৃহারা এই মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইয়াছিলেন। তাহার পর বুকে বুকে মানুষ হইয়া কল্যাণী আজ চৌদ্দ বৎসরে পা দিয়াছে। কল্যাণীর যে মা নাই, এই চৌদ্দ বৎসর বয়সেও সে তাহা জানে কি না সন্দেহ। জানিলেও রাধালক্ষ্মীর ভিতর মাতৃস্নেহ সে এত পর্য্যাপ্ত পরিমাণেই পাইয়াছিল যে, তাহার সত্যকার মা থাকিলেও সে তাহার বুকের এতটা স্থান জুড়িয়া বসিতে পারিত না।

কল্যাণীদের পরিবার খুব বড় নয়। তাহার জ্যাঠামশাই, জ্যাঠাইমা, একটি জ্যেঠতুত ভাই ও জ্যেঠতুত বোন কমলাকে লইয়া সংসারটি গড়িয়া উঠিয়াছে। কমলা প্রায় তাহারই সমবয়সী—মাত্র মাস কয়েকের ছোট। মার কাছে কমলার যে দাবী ছিল, কল্যাণীর দাবী তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম ত ছিলই না, বরং অনেক বিষয়েই ছিল ঢের বেশী। রাত্রিতে রাধালক্ষ্মীর বুকের পাশটিতে শুইবার স্থানের মৌরশী-পাট্টা ছিল কল্যাণীর; খাবার জিনিষ ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া ডাক দিবার সময় তাঁহার মুখে আগে যে নামটি বাহির হইত তাহা কল্যাণীর; ভাল কাপড়, ভাল খেলনা, ভাল গহনা—এগুলি বাছিয়া লইবার জন্ত সকলের আগে আহ্বান আসিত কল্যাণীর। এমনি করিয়া মা-হারা মেয়েটিকে তিনি আপনার করিয়া লইয়াছিলেন; তাহার যে মা নাই, সে কথাটা একদিনের জন্তও তাহাকে বুঝিতে দেন নাই।

হিন্দুর ঘরে চৌদ্দ বছরের মেয়ে—সুতরাং তাহাদের বিবাহের কথাও ভাবিতে হয়। রমেশবাবু কল্যাণী ও কমলা উভয় মেয়েরই সম্বন্ধ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু রাধালক্ষ্মী তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন—কল্যাণী বড় মেয়ে, তার বিবাহ শেষ না ক'রে আমি কমলার বিবাহে হাত দিব না। তাছাড়া, এ বিবাহে ব্যয়-সংক্ষেপ করাও চল্‌বে না। আমার যে রকম খুশী ধুমধাম করব। তাতেও তোমরা আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

গৃহিণীর মনের ইচ্ছা কর্ত্তা বুঝিলেন। তাই প্রথমে কল্যাণীর বিবাহই স্থির হইয়া গেল। এক ফাল্গুনের সন্ধ্যার শুভ শঙ্খধ্বনির সঙ্গে মহা জাঁক-জমকে সুন্দর ও সুশিক্ষিত পাত্রের সঙ্গে কল্যাণী পরিণীতা হইল। বাদ্যভাণ্ড, কল-কোলাহলে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। রমেশবাবু সাধ্যাতি-রিক্ত ব্যয় করিয়াও পাত্রকে যৌতুক দিলেন। গ্রামের লোকে বিস্মিত হইয়া কহিল—ভা'র মেয়ের জন্ত ও-বাড়ীর বড়-বৌ যে খরচ করিয়াছে, নিজের মেয়ের বিবাহেও তাহা কেহ করে না। এরূপ ধুমধাম এ গ্রামে অনেক দিন হয় নাই। বর-কনেকে বিদায় দিবার সময় রাধালক্ষ্মী প্রথমে কল্যাণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাকে অশ্রুজলে ভিজাইয়া দিলেন, তাহার পর তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন—"ভগবান তোদের সুখের নদী জোয়ারের জলেই যেন চিরদিন পূর্ণ করিয়া রাখেন, কখনও ভাটার টান যেন তোকে সহ্য করিতে না হয়।"

কিন্তু মানুষের মনের কামনা হয় বিধাতার কানে পৌঁছায় না, অথবা পৌঁছিলেও এক কানে প্রবেশ করিয়া অন্ত কান দিয়া বাহির হইয়া যায়—হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। তাই রাধালক্ষ্মীর অমন একাগ্র প্রার্থনাও ব্যর্থ হইল। বিবাহের পর একমাসও পার হইল না! কল্যাণীর জীবনাকাশে সুখের সূর্য্যের প্রথম রেখাটি ফুটিতে-না-ফুটিতেই অনন্ত দুঃখের গাঢ় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। হতভাগিনী সীঁথির সিন্দুর মুছিয়া, হাতের লোহা খসাইয়া, আবার তাহার জ্যাঠাইমার কোলের কাছেই ফিরিয়া আসিল। থান-পরিহিতা সেই সদ্য-বিধবা মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া রাধালক্ষ্মীর চোখে একবিন্দু জল ঝরিল না—মুখ হইতে

একটিও কথা বাহির হইল না ; কেবল বজ্রাহতের মত অসাড় হইয়া তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। বুকের ভিতর যখন আগুন জ্বলিতে থাকে, তখন তাহার উত্তাপে অশ্রুর উৎস পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়।

২

কল্যাণী বিধবা হওয়াতে মৈত্র বাড়ীতে শোকের যে ঝড় বহিয়া চলিল, তাহার নীচে আর সকলই চাপা পড়িয়া গেল। কমলার বিবাহের দিকেও সুতরাং সঙ্গে-সঙ্গে কিছু দিনের জন্য কাহারও নজর রহিল না। কিন্তু শোককে ছাপাইয়াও অবশেষে বয়স বড় হইয়া উঠিল। মেয়ের বিবাহের জন্য আবার রমেশবাবু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রাধালক্ষ্মী কিন্তু স্বামীর এই ব্যস্ততাতে যোগ দিলেন না। কল্যাণীর বিধবা হওয়ার পর হইতে রাধালক্ষ্মীকে কেহ কখনো হাসিতে দেখে নাই। সুতরাং মেয়ে কমলার বিবাহের উৎসবে বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি কল্যাণীর চোখের সম্মুখে আবার হাসির উৎসে বান ডাকিবে, এ কল্পনাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য ছিল। তাই যতদিন পারা যায় মেয়ের বিবাহের দিন তিনি কেবলই পিছাইয়া দিতেছিলেন।

কিন্তু সমাজ বলিয়া একটা জিনিষ আছে—মানুষের মনের দিকে চাহিয়া সে বিচার করে না। সুতরাং কমলা যখন ষোল পার হইয়া সতেরোতে পা দিয়াও অবিবাহিত রহিয়া গেল, তখন তাহা লইয়া সমাজের ভিতরেও ধীরে ধীরে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইতে লাগিল। রাধালক্ষ্মীর কানেও সে সব কথা পৌঁছিতে দেরী হইল না। কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কমলার জীবনটাকে ব্যর্থ করিবারই বা তাঁহার অধিকার কি, সে কথাটাও তিনি ভাবিয়া দেখিলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়াই তিনি স্বামীকে ডাকিয়া কহিলেন—"এইবার তোমার মেয়ের বিবাহের জোগাড় কর, আমি আর তাহাতে বাধা দিতে চাইনে।"

বহুদিন পরে মৈত্র-পরিবারে আবার উৎসবের ঢেউ লাগিল। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ী ভরিয়া গেল। সদর দরজায় নহবৎখানা আকাশে মাথা তুলিয়া উৎসব-বার্ত্তা ঘোষণা করিল। পাড়ার ছেলেরা ভিয়ানের ঘরে ঝুঁকিয়া পড়িল, বুড়ারা সামাজিক ঘোট পাকাইবার উৎসাহে মাতিয়া উঠিল এবং মেয়েরা শাড়ী ও গহনার ফর্দ্দ লইয়া বসিল।

এই ভিড়ের ভিতরেও রাধালক্ষ্মী কল্যাণীকে চোখে চোখে রাখিতেছিলেন। পাছে কেহ কোন উপলক্ষ্যে তাহার মনে আঘাত করে, সেই ভাবনায় তাঁহার অসোয়াস্তির অন্ত ছিল না। আর দশজনের সঙ্গে সে যাহাতে মিশিতে না পারে, সেইজন্য কাজের পর কাজ দিয়া তিনি তাহাকে ব্যাপৃত রাখিতেছিলেন। কাজ না থাকিলে নূতন কাজের সৃষ্টি করিয়া তিনি নিজেও খাটিতেছিলেন এবং তাহাকেও আবদ্ধ রাখিতেছিলেন।

কিন্তু, যে জন্য তাঁহার এত সতর্কতা, তাহা একদিন একান্ত আকস্মিক ভাবেই ব্যর্থ হইয়া গেল। বিবাহের গহনাপত্র আনিয়া রমেশবাবু রাধালক্ষ্মীকে ডাকিয়া কহিলেন—ওগো তোমার কমলার অলঙ্কার দেখে যাও।

কল্যাণী কোথায় ছিল, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—দিন জ্যাঠামশাই, আমার কাছে, আমি মাকে দেখাইয়া আনি।

কিন্তু, সে তাহা স্পর্শ করিবার আগেই কমলার দূর-সম্পর্কীয়া এক মাসী বলিয়া উঠিলেন—তুমি থামো বাছা, অমন ক'রে শুভকার্য্যের জিনিষ তুমি ছুঁয়ো না। ও-সব জিনিষ তোমার ছুঁতে নেই।

কথাটা শুনিয়া কল্যাণীর পা ত থামিয়া গেলই, তাহার মুখও রোদের আঁচে শুকাইয়া যাওয়া ফুলের মতই একমুহূর্ত্তে শুকাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার অপেক্ষাও ম্লান হইয়া গেলেন রমেশবাবু। মেয়েটার বুকে যে কি খোঁচা বিঁধিল, তাহা বুঝিয়াই তাঁহার হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি কল্যাণীকে আস্তে আস্তে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন—তুমি নিয়ে যাও মা, এগুলো তোমার মাকে দেখাবার জন্যে। উনি জানেন না যে কমলার জিনিষ তুমি ছুঁলে দোষ হয় না।

কিন্তু রাধালক্ষ্মী তখন সেখানে আসিয়া পড়িয়াছেন। তিনি ধমক দিয়া কল্যাণীকে কহিলেন—আর নিতে হবে না ও-গুলো। মেয়েকে এলাম আমি কাজ দিয়ে, আর উনি এলেন কি না এখানে ধিঙ্গি হ'য়ে গয়না দেখ্‌বার জন্যে! গয়না দেখনি কখনো সাতজন্মে?

তাহার পর তাহাকে হাতে ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া ঘরের ভিতর টানিয়া লইয়া গিয়া তিনি বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। চোখের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া

গেল। মেয়েটাকে বুকের উপর চাপিয়া-ধরিয়া তিনি ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কল্যাণী ধীরে ধীরে তাঁহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া কহিল—মিছিমিছি তুমি কেঁদ না মা! বড়মাসী জানেন না তাই ও-কথা বলেছেন। আর সত্যই তো আমারও দোষ আছে। এত বড় হলাম, তবু যদি আমার কোনো বুদ্ধি থাকে! আমি জানি, আমি ছুঁলে তাতে কমলার কখনো ক্ষতি হবে না। তবু সামাজিক বিধি-নিষেধগুলো না মানাও তো ঠিক নয়।

রাধালক্ষ্মী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—ওরে তুই থাম্—তুই থাম্, আর বলিসনি। আমার বুকটাকে তুই কি ভেঙ্গে চৌচীর করে দিতে চাস্!

৩

বিবাহের মাত্র দুইদিন বাকি থাকিতে হঠাৎ রাধালক্ষ্মী একদিন কল্যাণীকে লইয়া তাঁহার বাপের বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণে বাড়ীর সমস্ত লোকে প্রথমে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কনের মা, বাড়ীর গৃহিণী বাড়ীতে না থাকিলে বিবাহ কি করিয়া হইতে পারে, তাহা কেহ ধারণাও করিতে পারিল না। সুতরাং তাঁহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ মান অভিমানেরও কোন ত্রুটি হইল না। কিন্তু রাধালক্ষ্মীর পন টলিল না। বিবাহ কি জিনিষ তাহা না জানিতেই যে বিধবা হইয়াছে, সেই বঞ্চিতার চোখের সম্মুখে উৎসব হইবে, আর সেই উৎসবে সে যোগ দিতে পারিবে না, যোগ দিতে গেলে পদে পদে লাঞ্ছিত হইবে—কল্যাণীর এই দুর্দ্দশার ছবি তিনি চোখের উপর প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না বলিয়াই কল্যাণীকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

তিনি না থাকাতেও বিবাহ হইয়া গেল বটে, কিন্তু তাঁহার গৃহ-ত্যাগের ভিতর দিয়া বেদনার যে একটা খাপ-ছাড়া সুর জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই ফলে উৎসব তেমন জমিল না। মঙ্গল-কার্য্য সমস্তই যথারীতি সম্পন্ন হইল, কিন্তু যে স্বতঃ উচ্ছ্বসিত আনন্দ বিবাহের প্রধান অঙ্গ, তাহাতেই যেন কোথায় একটু খুঁত রহিয়া গেল।

বাসর-ঘরের কল-কোলাহল তখন থামিয়া গিয়াছে। বর-কনেকে ঘরে একলা ছাড়িয়া দিয়া মেয়েরা যে যাহার স্থানে ফিরিয়া গিয়াছেন। কনের সলজ্জ মুখের দিকে তাকাইয়া ম্লানকণ্ঠে কমলার স্বামী প্রভাত কহিলেন—আমাকে বুঝি তোমাদের পছন্দ হয় নি কমলা! তাই তোমাদের উৎসব এত প্রাণহীন ব'লে মনে হচ্ছে। তোমার মাও তো এলেন না—একবার আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্য।

কমলা নত আঁখি দুটি স্বামীর মুখের উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে কহিল—মা বাড়ী নেই, তাই তিনি আসেন নি। কিন্তু যাবার সময় আমাকে ব'লে গেছেন তোমাকে তাঁর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ জানাতে। পাছে তুমি অপরাধ নাও, তাই তিনি যে কেন গেছেন তাও তোমাকে খুলে বল্‌বার জন্য আদেশ ক'রে গেছেন; এবং এ কথাও ব'লে গেছেন যে তোমার শিক্ষার উপর তাঁর শ্রদ্ধা আছে—সব শুন্‌লে তুমি তো তাঁর উপর রাগ কর্‌বেই না, বরং তাঁর ব্যবহারই যে অনুমোদন করবে তাতেও তাঁর সন্দেহ নেই।

তাহার পর স্বামীর বিস্মিত চোখ দুইটির দিকে তাকাইয়া কল্যাণীর শৈশব, তাহার বৈধব্য, তাহার বিবাহের গহনা স্পর্শ করার অপরাধে তাহার দূর-সম্পর্কীয়া মাসীর মন্তব্য, তাহাকে সঙ্গে করিয়া মাতার পিতৃগৃহে গমন প্রভৃতি সমস্ত ঘটনাই কমলা স্বামীর কাছে ধীরে ধীরে বর্ণনা করিয়া গেল। তাহার ছল ছল চোখ ও ব্যথার আবেগে অবরুদ্ধ ভাষার ভিতর দিয়া হতভাগিনী কল্যাণীর দুঃখে তাহার মুখে যে গভীর সমবেদনার ছবি ফুটিয়া উঠিল, প্রভাতের চোখে তাহাই তাহাকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ভরিয়া তুলিল। যে আনন্দের অভাব দেখিয়া এতক্ষণ তাহার মনে ব্যথার অন্ত ছিল না, একমুহূর্ত্তে সেই ব্যথা যে তাহার কোথায় অন্তহিত হইয়া গেল, তাহা সে টেরও পাইল না। ধীরে ধীরে কমলার মুখখানা বুকের উপর টানিয়া লইয়া প্রভাত কহিল—কাল আমার সঙ্গে মাকে ও দিদিকে প্রণাম কর্‌তে যাবে কমলা?

কমলা স্মিত হাস্যে কহিল—সে তো খুব ভালো হয়। কিন্তু তুমি সত্যিই যাবে?—আমার সঙ্গে উপহাস কর্‌ছ না?

প্রভাত তাহার মাথাটা তেমনি ভাবে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াই কহিল—না। কিন্তু আজ আর রাত্রি জাগে না—এখন তুমি ঘুমোও।

৪

রাধালক্ষ্মী স্তব্ধ হইয়া রোয়াকের উপর বসিয়া ছিলেন। বিবাহ-বাসরে মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন নাই, এ ব্যথাটা তাঁহার বুকের ভিতর কাঁটার মত খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে আরও কত রকমের চিন্তা যে তাঁহার মনের ভিতর তোলপাড় করিতেছিল, তাহার অন্ত নাই।

কল্যাণীও মায়ের কাছেই বসিয়া ছিল। সে রাধালক্ষ্মীর চিন্তাকুল মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে কহিল—কেন মা, মিছেমিছি বাড়ী ছেড়ে এলে? কোনো জিনিষ আমি নাই বা স্পর্শ কর্‌তাম—তবু তো কমলার বিয়েটা দেখা হ'তো। আমার পক্ষে সেও তো কম আনন্দের বিষয় হ'তো না। কিন্তু যা হবার সে তো হ'য়ে গেছে। এইবার বাড়ী ফিরে চল। বিবাহ তো দেখ্‌তে দিলেই না—কমলার বরকেও বুঝি দেখ্‌তে দেবে না।

হঠাৎ কে পিছন হইতে কোমল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"দিদি—"

মা ও মেয়ে উভয়ে বিস্মিত হইয়া পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিতে পাইলেন—অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবৃত কমলা নববর-বেশে সজ্জিত একটি যুবককে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। যুবকের মুখ স্নিগ্ধ কোমল মৃদু হাস্য-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

রাধালক্ষ্মী ও কল্যাণী উঠিয়া দাঁড়াইতেই যুবক প্রথমে রাধালক্ষ্মী ও তাহার পরেই কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—দিদি, কাল আমাদের বিবাহের বাহ্যিক অনুষ্ঠান-গুলি শেষ হয়েছে মাত্র, আমাদের সত্যকার বিবাহ কাল হয় নাই। তোমার আশীর্ব্বাদ ছাড়া আমাদের মিলন তো সম্পূর্ণ হ'তে পারে না। তাই আমি আর কমলা সকলের আগে তোমার আশীর্ব্বাদের জন্যই এখানে ছুটে এসেছি।

কল্যাণী কমলাকে বুকের ভিতর টানিয়া লইয়া অবনত-নেত্রে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিতেই, মুক্তার মত দুই বিন্দু অশ্রু কমলার উজ্জ্বল ললাটে ঝরিয়া পড়িল; প্রভাত-রৌদ্রে সেই শুভ্র অশ্রুবিন্দু ঝলমল করিয়া উঠিল; যেন বিধাতা অলক্ষ্যে থাকিয়া তাঁহারই স্নেহাশীষের অরুণ কিরণে তাহা অনুরঞ্জিত করিলেন।

রামানন্দ

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাস নানাদিক দিয়াই বহু বিশেষত্ব-মণ্ডিত। রাজনৈতিক দৃষ্টি হইতে মনে হয় ইহা হিন্দুর পতনের যুগ; এক হিসাবে একথা সত্য; কিন্তু হিন্দুর হিন্দুত্বের উপরেও যে একটা কিছু আছে তাহাকে মাপকাটি লইয়া দেখিলে মনে হয় ভারতবর্ষের এই যুগ তাহার শাশ্বত ধন-ভাণ্ডারে অনেক কিছু সম্পদ দিয়াছিল। হিন্দুত্ব ছোট এ কথা বলিতেছি না; কিন্তু ভারতীয়ত্ব তাহার চেয়ে বড়, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। ভারতের কাল্‌চারের (সংস্কৃতির) ইতিহাসে—অবশ্য এখানে কাল্‌চার কথাটার এক উদার সংজ্ঞা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা হিন্দুর শ্রেষ্ঠদান, মুসলমানের শ্রেষ্ঠ অর্দ্ধ, বৌদ্ধ ও ভারতবাসী অন্যান্য জাতি ও ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অবদান লইয়া গঠিত একটা সমগ্র পরিপূর্ণ ভাণ্ডাররূপেই পরিকল্পিত হইয়াছে—এই যুগের দান বৈদিক, বৌদ্ধ বা পৌরাণিক যুগের দান অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এই এক যুগ গিয়াছে যখন জগতের সর্ব্বদেশে নূতন ভাবের বন্যা পুরাতনের জঞ্জাল, আবর্জ্জনা ভাসাইয়া দিয়া নবীন উদার আদর্শবাদের সৃষ্টি করিয়াছে। য়ুরোপেও তখন ঠিক একটা পরিবর্ত্তনের যুগ চলিয়াছে; তখন গ্রীক ও রোমক সভ্যতা য়ুরোপের অন্যান্য দেশের অসংস্কৃত সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া জ্ঞানের ও চিন্তার জগতে এক যুগান্তর আনিয়া দিতেছিল। য়ুরোপের এই রেনাসাঁর কাহিনী লইয়াই নবীন য়ুরোপের জ্ঞানের ইতিহাস আরম্ভ; তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের

ইতিহাস dark age—অন্ধকারের যুগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

য়ুরোপের এই রেনাসাঁর সহিত ভারতের এই নবজন্মের কোন আন্তরিক যোগ আজও পর্যান্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঠিক সেই সময়ে ভারতেও জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও চিন্তার ক্ষেত্রে এমন একটী উদার আদর্শবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী যুগের ইতিহাসের উপর যাহার প্রভাব, য়ুরোপীয় রেনাসাঁর প্রভাবেরই ন্যায় বিপুল হইয়াছিল।

ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে তখন মোগল-পাঠানের বিরোধের প্রায় অবসান হইয়াছে; সমগ্র ভারত অন্ততঃ তাহার অধিকাংশ তখন ধীরে ধীরে মোগলের একচ্ছত্র শাসনাধীনে আসিতেছে; দেশে অরাজকতা অনেক পরিমাণে নিবারিত হইয়াছে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এই বোঝাপড়ার সমসময়েই ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও এক প্রকার বোঝাপড়া হইতেছিল। যে নূতন ভাবের বন্যা মধ্যযুগে ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, তাহা ভারতের সমগ্র জীবনকে একটা নূতন রূপ দিবার চেষ্টা করিতেছিল। কবীর, দাদু, মীরা, রইদাস, নানক, শ্রীচৈতন্য, তুলসীদাস প্রভৃতি সেই যুগের সৃষ্টি।

নানক পাঞ্জাবে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে মিলাইয়া এক অভিনব জাতি ও ধর্ম্মের সৃষ্টি করিতেছিলেন। নিরক্ষর জোলা কবীর সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এক অরূপের লীলার সন্ধানে মত্ত হইয়া ফিরিতেছিলেন, তাঁহার নিকট সকল ধর্ম্ম সমান হইয়া গিয়াছিল, জাতিভেদ দূর হইয়া গিয়াছিল; তিনি জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব্ব সমন্বয় সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের ইতিহাসে এক নবীন যুগের পত্তন করিতেছিলেন। মুসলমান ধর্ম্মেও তখন সুফীবাদের প্রাধান্যের যুগ চলিতেছিল; চিস্তী-সম্প্রদায় ও সিন্ধের সুফীগণ তখন জগতের মায়ার অন্তরালে গোপন বিশ্বপতির লুকাচুরীর প্রেমলীলা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য—বাংলাকে ভক্তির মন্দাকিনী ধারায় সিঞ্চিত করিতেছিলেন, তাহার স্রোত পশ্চিম ভারত পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছিল। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে এমনই এক সময়ে অস্পৃশ্য মুচির সন্তান রইদাস সরল সহজ ভক্তির আদর্শ প্রচার করিতেছিলেন। তুলসীদাস তাঁহার অমর রামচরিত-মানসে ভারতীয় ভক্তিবাদের রামধারাকে এবং সুরদাস সুরসাগরে কৃষ্ণধারাকে বিশিষ্ট মূর্ত্তি দিয়াছিলেন।

এই সময়েই রামানন্দ আসিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কবীর ও রইদাসের গুরু এবং নবভক্তিবাদের ভাবধারার গোমুখী। ভারতীয় ধর্ম্মসাধনার ইতিহাসে কবীরের স্থান কত উচ্চে তাহা অনেকেই জানেন। ধর্ম্মের দৃষ্টিতে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিলাইয়া দিবার এই চেষ্টা প্রথম ও অভিনব। অবশ্য বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে এ বিরোধ কোন দিনই ছিল না সত্য; কিন্তু বেদান্ত কোন দিনই দার্শনিক মতবাদ ছাড়া দেশের জনসাধারণের ধর্ম্মে পরিণত হয় নাই; স্মৃতির ও আচারের নাগপাশে দেশের লৌকিক ধর্ম্ম তাহার বৈদান্তিক ভিত্তিকে অস্বীকারই করিয়া আসিয়াছিল; অস্পৃশ্য রইদাস এখনো গুজরাত ও রাজপুতানার লক্ষ লক্ষ নরনারীর গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া তাহাদের অন্তরের ক্ষুধা মিটাইয়া আসিতেছেন; তাঁহার বাণী, তাঁহার পদাবলী এখনও গুজরাত ও রাজস্থানের মন্দির, দেবালয়, গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহাঁদের বাণী নরনারীকে এমন যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিয়াছে যেখানে উচ্চনীচ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্রে প্রভেদ নাই, হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য নাই। পরবর্ত্তী যুগে জাতিভেদের কঠিন বাঁধন উপেক্ষা করিয়া যে ভক্তিবাদ সকল মানুষকে এক করিয়া দিয়াছিল, তাহার আরম্ভ এইখানেই।

জাত পাঁত পূছে ন কোই।
হরিকো ভজৈ সে হরিকা হোই॥

রামানন্দ ছিলেন এই নবযুগের প্রবর্ত্তক; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, য়ুরোপে ইর‍্যাসমাস্ প্রভৃতি রেনাসাঁ-প্রবর্ত্তকদিগের জীবনের কাহিনী সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায়, আমাদের ভারতবর্ষের নবযুগপ্রবর্ত্তক এই মহাপুরুষদের তাহার তুলনায় কত অল্পই না আমরা জানি। আজও রামানন্দ, কবীর, দাদু, মীরা প্রভৃতির জীবনের কাহিনী চিররহস্যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের জীবনের সনতারিখ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া গিয়াছে; শুধু রহিয়াছে লোকের অন্তরে তাঁহাদের বাণী; তাহাই মূর্ত্তিমতী হইয়া অনির্ব্বাণ জ্যোতিতে তাঁহাদের জীবনের মূল কথাটী প্রচার করিয়া আসিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার এই একটী অপূর্ব্ব বিশেষত্বের ফলে সনতারিখের ইতিহাসের

আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে; কিন্তু এ দেশের লোক কোন দিনই সেদিকে দৃক্‌পাত করে নাই।

আরো আশ্চর্য্যের কথা এই যে, রামানন্দের মাত্র একটী রচনা আমরা পাইয়াছি; কিংবদন্তীমূলক কয়েকটী কাহিনী ও তাঁহার রচিত এই পদটী ছাড়া তাঁহার জীবনীর কোন উপাদানই আমরা পাই নাই। কিন্তু এই সামান্য একটী মাত্র পদেই তাঁহার অন্তরের সমগ্র পরিচয় আমরা পাই।

এতবড় একটা আন্দোলনের প্রবর্ত্তন যিনি করিলেন, তাঁহার জীবনের মাত্র এইটুকু পরিচয় আমরা পাই, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু রামানন্দ তাঁহার জীবনের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে; সে পরিচয় ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই। কবীর, রইদাস, তাঁহার শিষ্য; তাঁহারা উভয়েই গুরুর বাণী যে ভাবে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গৌরবময় পরিচয়ের দাবী অতি অল্প গুরুই করিতে পারেন।

রামানন্দের জীবনের সম্বন্ধে অন্য কথা বলিবার পূর্ব্বে সেই সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মের ও তাঁহার গুরুগোষ্ঠীর সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলার প্রয়োজন।

শঙ্কর ও কুমারিল ভট্টের চেষ্টায় প্রকাশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। শঙ্কর নব্য বেদান্তের প্রচারে লৌকিক ধর্ম্মের এক অভিনব ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন; কিন্তু জ্ঞানপ্রধান বেদান্ত প্রাকৃত জনসাধারণের ধর্ম্মের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে পারে নাই; শঙ্করের এই জ্ঞানবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভক্তিবাদের প্রচার করিলেন। এই ভক্তির স্রোত সমগ্র দেশের মন সিক্ত করিয়া দিল। রামানুজের পঞ্চম শিষ্য রামানন্দ। রামানুজ ও রামানন্দের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ ছিলেন আচারী বৈষ্ণব; অর্থাৎ তাঁহারা ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সামাজিক আচার-বিচার ও ভেদাভেদ তাঁহারা পুরা মাত্রায় স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

কিন্তু রামানন্দ এই জাতিভেদ স্বীকার করিয়া লইলেন না। লৌকিক ধর্ম্মের ইতিহাসের এ একটী অভিনব ব্যাপার। ধর্ম্মাচার ইহার পূর্ব্বে কোন দিনই সকলের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল না, অন্ততঃ এমন ভাবে কোন দিনই ছিল না। রামানন্দ মুসলমান জোলা কবীর, চামার রুইদাস, শিষ্য করিলেন; কসাই সাধনা, নাপিত সেনকে মন্ত্র দিলেন; তাঁহার শিষ্যরা জাতিবিচার রাখিল না, তাহাদের নিকট হিন্দু মুসলমান সকলই সমান হইয়া গেল। অস্পৃশ্য শূদ্র অধ্যাত্মবিদ্যায় ব্রাহ্মণের গুরু হইল। ভারতে ধর্ম্মের ইতিহাসে এমন ঘটনা পূর্ব্বে ঘটে নাই।

এই উদারতার মূলে কতখানি বৌদ্ধ প্রভাব প্রচ্ছন্ন আছে তাহা চিন্তা করিবার বিষয়।

রামানন্দের এই উদারতার একটী যুক্তি বোধ করি পরবর্ত্তীকালে কল্পিত হইয়াছিল।

রামানুজপন্থীদের মধ্যে জাতির বাঁধন, খাওয়া-পরার অনুশাসন অত্যন্ত কঠিন ছিল। মন্ত্র গ্রহণের পর রামানন্দ যখন দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া, সমগ্র ভারত ঘুরিয়া গুরুর কাছে ফিরিয়া গেলেন, তখন তাঁহার গুরুভাইরা জিজ্ঞাসা করিল, দেশ-ভ্রমণে তিনি সমাজের সমস্ত অনুশাসন বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন কি না। সত্যনিষ্ঠ রামানন্দ উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহারই ফলে তিনি সমাজচ্যুত এবং পন্থ হইতে বহিষ্কৃত ও নির্ব্বাসিত হইলেন; এবং তাহার ফলে তিনি তাঁহার নব্য মতবাদের প্রচার করিলেন।

ব্যাপারটা ঠিক এইভাবেই ঘটিয়াছিল কি না, এবং তিনি সত্যই এমনি অনাচারের অপরাধে সমাজ বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন কি না, আজ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এমন কি, তিনি যে রামানুজপন্থী ছিলেন, তাহাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না। অবশ্য এ কথা ঠিক যে, তাঁহার মতবাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আমাদের কিছুই নাই; কিন্তু তাহার যে পরোক্ষ পরিচয় আমরা তাঁহার শিষ্যগণের রচনার মধ্যে পাই, তাহাতে তাহার সঙ্গে রামানুজী মতবাদের বিশেষ ঐক্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

রামানন্দ রামের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন বলা হইয়াছে। He was the populariser of the worship of Rama (Grierson). অথচ কবীর এই রামেরই কথা গাহিয়া বলিয়া গিয়াছেন—

যহ রাম ন দশরথ উপজে।
ন যহ সীতা বিহাজে॥

এক্ষেত্রে রামানন্দকে কতখানি রামধারার প্রবর্ত্তক বলা

যায়, তাহা বিচার্য্য। রামানন্দের যে একটী পদ আমরা পাই, তাহাতে তাঁহাকে মূর্ত্তিপূজার বিরোধী রূপেই দেখিতে পাই। এই পদটী শিখদের গ্রন্থসাহেবে পাওয়া গিয়াছে। নানক যে পৌত্তলিকতা-বিরোধী একেশ্বরবাদের প্রচারক ছিলেন, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই; এবং শিখ ধর্ম্মগ্রন্থে তাঁহাদের ধর্ম্মমতের অনুকূল বাণীই সংগৃহীত হইয়াছে, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ। অথচ রামাৎ বৈষ্ণবেরা পরবর্ত্তী যুগের মূর্ত্তিপূজার প্রধান প্রবর্ত্তক ও উদ্যোক্তা বলিয়া পরিগণিত; এবং আজও তাঁহারাই মূর্ত্তিপূজার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে রামানন্দ কিরূপে রামাৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক হইতে পারেন?

রামানন্দ বৈষ্ণব ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি স্বীয় বৈষ্ণবমতবাদকে সার্ব্বজনীনতার রূপ দিয়াছিলেন। কবীর তাহারই উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া যে মতবাদ প্রচার করেন, তাহা রামানন্দী মতবাদ হইতে কিছু পরিমাণে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহারও মধ্যে তাঁহার গুরুর ঔদার্য্যের কয়চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে।

রামানন্দের পদটী এইখানে উদ্ধৃত করা হইল।

কত জাইয়ৈ রে ঘর লাগে রংগু।
মেরা চিতু ন চলৈ মন ভয়ে পংগু॥
এক দিবস মন ভঈ উমংগ।
ঘসি চন্দন চোবা বহু সুগংধ॥
পূজন চালি ব্রহ্ম ঠাই।
সো ব্রহ্ম বতায়ো গুরু মনহী মাঁহি॥
জঁহ জাইয়ে তঁহ জল পষান।
তু পূরি রহ্যো-হৈ সব মাঁহি॥
বেদ পুরাণ সব দেখে জোই।
উহাঁ তেই জাইয়ৈ জো ইহাঁ ন হোঈ॥
সৎগুরু মৈঁ বলিহারী তোর।
জিন সকল বিকল ভ্রম কাটে মোর॥
রামানন্দ স্বামী রমত ব্রহ্ম।
গুরুকে শব্দ কাটে কোটী করম॥

কবীরের বহু পদের মধ্যে এই পদের ছায়া আমরা পাই; এবং কবীরের ন্যায় বহু পরবর্ত্তী যুগের বহু সন্ত কবির অন্তরের খাদ্য এই পদই হয়ত' জোগাইয়াছে।

এইখানে উল্লেখযোগ্য যে, বহু অনুসন্ধানে রামানন্দের দ্বিতীয় পদের সন্ধান আমরা পাই নাই।

এই কয়েকটী পংক্তির মধ্যে কবীর-প্রচারিত মতবাদের সমস্ত মূল কথাগুলিই পাওয়া যাইতেছে।

মিথ্যা চন্দন চুয়া, মিথ্যা পূজার সকল বাহ্য উপকরণ। ধর্ম্ম অন্তঃকরণেরই জিনিস, অন্তরই তাহার প্রধান অর্ঘ্য। যেখানেই যাই সেইখানেই পাষাণের খণ্ড দেবতার পূজা দেখিতে পাই। তুমি যে, হে প্রভু, সর্ব্বঘট ব্যাপিয়া আছ, সে কথা লোকে ভুলিয়াছে। মানুষ এখনও তাঁহাকে না দেখিয়া বেদ পুরাণ খুঁজিয়া মরিতেছে। ইহার উপায়?

সৎগুরুকে সন্ধান কর; তিনি বলিয়া দিবেন।

এই একেশ্বরবাদ ও সৎগুরুবাদ, ইহার মূল কোথায়, কে জানে? কিন্তু ইহা অবলম্বন করিয়া রামানন্দ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ের যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা উত্তর কালে বহু সাধকের জীবনের সাধনার মূলমন্ত্র হইয়াছিল। যে উদার দৃষ্টি লইয়া রামানন্দ লৌকিক ধর্ম্মকে এই অপরূপ রূপ দিয়াছিলেন, তাহার কল্যাণে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণবধর্ম্ম আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়া জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে লক্ষ লক্ষ নরনারী-চিত্ত আলোড়িত করিয়া তাহাদের মুক্তিপথের সহযাত্রী করিয়া তুলিয়াছে; এবং যুগে যুগে রামানন্দের এই উদার বাণী সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সাধক-গণকে এক সূত্রে গাঁথিয়া দিয়াছে।

শোক-সংবাদ

সার কৈলাসচন্দ্র বসু

বিগত ৬ই মাঘ কলিকাতার স্বনামখ্যাত চিকিৎসক সার কৈলাসচন্দ্র বসু সি-আই-ই, ও-বি-ই মহোদয় ৭৭ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন; ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ডাক্তারী পাশ করেন। প্রথমে তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালের রেসিডেণ্ট মেডিক্যাল অফিসার নিযুক্ত হন। পরে সে চাকরী ছাড়িয়া দিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি ও ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন ও কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার মনোনীত হ'ন। তিনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ছিলেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সি-আই-ই উপাধি লাভ করেন, ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্যার উপাধি পান—তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন ভারতীয় ডাক্তার স্যার উপাধি পান নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কাইজার-ই-হিন্দ স্বর্ণপদক এবং ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ও-বি-ই উপাধি পা'ন। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার পশু-চিকিৎসা-কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল ক্লাব ও কো-

অপারেটিভ এণ্টি-ম্যালেরিয়া সোসাইটীর সভাপতি এবং বেঙ্গল ষ্টেট মেডিক্যাল ফ্যাকালটীর গভার্ণিং বডীর সদস্য ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কলিকাতা ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলের জন্য বহু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল। কারমাইকেল হাসপাতালে তাঁহার নামে একটি ওয়ার্ড খোলা হইয়াছে। কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল, সোদপুর পিঞ্জরাপোল, কুষ্ঠ-নিবাস প্রভৃতিও তাঁহার চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মাড়োয়ারী মহলে তাঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। গত কলিকাতা দাঙ্গার সময় তিনি নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া

৺সার কৈলাসচন্দ্র বসু

বড়বাজারের মাড়োয়ারীদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ মাড়োয়ারী হাসপাতালের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতায় দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যার্থ তিনি বৎসরে বহু টাকা ব্যয় করিতেন। তাঁহার বিধবা পত্নী, ছয় পুত্র ও তিন কন্যা বর্ত্তমান। আমরা তাঁহাদের শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

রমেন্দ্রমোহন রায়

পরলোকে রমেন্দ্রমোহন

কাকিনার স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় মহাশয়ের দৌহিত্র ডাঃ জে, এম্, রায়ের একমাত্র পুত্র রমেন্দ্রমোহন সন্নিপাত জ্বরে মাত্র ১৭ বৎসর ৩ মাস বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই বয়সে তাহার ন্যায় সুগঠিত দেহ ও শক্তিমান্ বাঙ্গালীবালক বড় দেখা যায় না। এই বালকের নানা পুরুষোচিত গুণরাজি ও সর্ব্বতোমুখী কর্ম্মপ্রতিভা কালে দেশের ও দশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিত। আজন্ম বিলাসিতার ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়াও রমেন বিলাসিতায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

রমেন্দ্রমোহন বিদ্যাসাগর কলেজে বিজ্ঞানের মধ্য পরীক্ষার (I. Sc.) জন্য অধ্যয়ন করিতেছিলেন। যেমন তাঁহার তীব্র কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তেমনি তাঁহার অদম্য জ্ঞানপিপাসা ছিল। আমরা রমেন্দ্রমোহনের আত্মীয়গণের এই গভীর শোকে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি।

সাময়িকী

এ মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি সেকালের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন ; এখন অনেকেই হয় ত তাঁহার পরিচয় জানেন না। স্বর্গীয় প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয় একজন আদর্শ জমিদার ছিলেন। তিনি ১১৭১ সালের ২রা মাঘ জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১২৪২ সালের ১লা ফাল্গুন দেহত্যাগ করেন। কিছু কম এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি 'প্রাণ-তোষিণী' 'প্রাণকৃষ্ণশব্দাম্বুধি' 'প্রাণকৃষ্ণ ক্রিয়াম্বুধি' 'প্রাণকৃষ্ণ বৈষ্ণবামৃত' প্রভৃতি অনেক পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকাশিত 'শব্দাম্বুধি'তে এমন অনেক শব্দ আছে, যাহা প্রসিদ্ধ 'শব্দকল্পদ্রুমে'ও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শব্দকোষখানি সে সময়ে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছিল। বিশ্বাস মহাশয়ের খড়দহস্থ বাসভবন ও দেবালয় এখনও তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই দেবালয় এমন সুন্দর যে, ১৮৭৪ অব্দে তদানীন্তন বড়লাট শ্রীযুক্ত নর্থব্রুক মহোদয় এই দেবালয় দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই দেবালয়ের রত্নবেদীর জন্য পরলোকগত বিশ্বাস মহাশয় আশি হাজার শালগ্রামশিলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সেগুলি এখনও দেবালয়ে সুরক্ষিত আছে। তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিংশতি শিবমন্দিরের মধ্যভাগে এই রত্নবেদী প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ণয় করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় পিতার আরব্ধ কার্য্য সত্বরই শেষ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। স্বর্গীয় বিশ্বাস মহাশয়ের অকাতর দানের কথা এখনও লোকে ভুলিতে পারে নাই। আমরা এই মহাপ্রাণ, ধার্ম্মিক, ও বাঙ্গালা সাহিত্যের হিতৈষী মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া তাঁহার পবিত্র স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলাম।

এবারের সাময়িকীর সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার চীনে যুদ্ধের আয়োজন। চীন দেশে সৈন্য প্রেরিত হইতেছে, অথচ বৃটিস গবর্ণমেণ্ট সন্ধির কথাও বলিতেছেন। কি উপলক্ষে এই গোলযোগ বাধিয়াছে এবং কোন্ পক্ষ সে জন্য অপরাধী, তাহা লইয়া চীন ও ইংরাজের মধ্যে মতভেদ আছে। আমরা চীন গোলযোগ সম্বন্ধে নিজেরা কোন কথা না বলিয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, তাহারই সার মর্ম্ম নিম্নে দিতেছি। ইহা হইতেই সকলে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিবেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—"ইংরাজের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য চীন যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে ইহা এশিয়ার নব অভ্যুদয়ের সূচনা। সাম্রাজ্য-লোভী শ্বেতজাতিগণের রাজ্য-লিপ্সার আক্রমণে এশিয়ার যে সকল রাজ্য বিব্রত, চীনের এই জীবন-মরণ-সংগ্রাম তাহাদের সকলেরই মুক্তির পথ প্রশস্ত করিবে। সুতরাং চীন এই সঙ্কটকালে সমগ্র এশিয়ার সহায়তার দাবী করিতে পারে। অথচ এই সময়ই ভারতীয় সৈন্যগণ চীন সমর দমন করিতে প্রেরিত হওয়ায় যে সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার সমস্ত দিকটা আমরা এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। ইহার পশ্চাতে যে কূটবুদ্ধি আছে তাহা চীন দমন করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, পরন্তু বহুকালের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ ভারত ও চীন এই দুইটী দেশে অলঙ্ঘনীয় ভেদের সৃষ্টি করিবে। চীন সম্বন্ধে যাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে এবং বিশ্বদরবারে ভারতবর্ষের স্থান কোথায় তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই কর্ত্তব্য এই দিকে লক্ষ্য করা এবং ইহার ফল যে কতদূর অনিষ্টকর হইতে পারে তাহা লোককে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া।"

তাহার পর রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"যুগযুগান্ত ধরিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রচারকগণ চীনে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী লইয়া গিয়াছে; কিন্তু আজিকার এই দুর্দ্দিনে ভারতীয় সৈন্যগণ যখন ইংরাজের বাহন হইয়া চীনে উপস্থিত হইবে, তাহাতে সেই বহু কালের আন্তরিক সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। অত্যাচারের যন্ত্র যাহারা তাহারাই প্রত্যক্ষ, কিন্তু যাহারা যন্ত্রী তাহারা থাকে পশ্চাতে। এই জন্য যখন শিখ কনেষ্টবলগণ চীনে অত্যাচার করে, তখন তাহারা নিমিত্ত মাত্র হইলেও তাহারাই সমুচিত ঘৃণা, অশ্রদ্ধা অর্জ্জন করে। ভারতবর্ষের প্রতি চীনারা বর্ত্তমানে এরূপ অসন্তুষ্ট যে তাহারা ভারতীয়গণকে দৈত্য বলে। মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে এই অভিযানে যে ভারতবর্ষকে সহায়তা করিতে হইতেছে, আমাদের অধঃপতনের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় পরিচয় আর কিছুর দ্বারাই সম্ভবপর হইত না। ন্যায় ও ধর্ম্মের বিরোধী এই ব্যাপারে সহায়তা করা ভারতবর্ষের পক্ষে আত্মহত্যা অপেক্ষাও অনিষ্টকর। এই যে বিপুল অর্থক্ষয় ও রক্তপাত, ইহার পরিবর্ত্তে আমাদের লাভ—ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে চীনের দারুণ ঘৃণা। ভারতবর্ষের বিপুল বল ইংরাজ শক্তির হাতে ক্রীড়নক হওয়ায় এশিয়ার অন্যান্য দেশ ভারতবর্ষকে এশিয়ার স্বাধিনতার পরিপন্থী বলিয়া মনে করে। যে সাম্রাজ্যের মধ্যে আমরা বাস করি—ইহা সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে অংশীদারী সম্বন্ধ বলা চলে না। যে সকল দেশে স্বায়ত্ত-শাসন আছে, তাহারা যখন সাম্রাজ্য রক্ষার সহায়তা করে তখন তাহাদের দান স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু ভারতবর্ষের এই সহায়তার মধ্যে স্ব-ইচ্ছার কোনও স্থান নাই। সুতরাং ইহার জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা পর্য্যন্ত দাবী করিতে পারি না। এই জন্যই অষ্ট্রেলিয়া অক্লেশেই ইংরাজের সহায়তা করিতে অস্বীকার করিতে পারে, আর ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যের জন্য প্রাণ দিয়া প্রতিদানে পায় জালিয়ানওয়ালাবাগ।"

বর্ত্তমান যুদ্ধে চীনই আক্রমণকারী বলিয়া একটা রব উঠিয়াছে, কবির মতে ইহা সর্ব্বৈব অসত্য—প্রকৃতপক্ষে চীন আত্মরক্ষার জন্যই চেষ্টা করিতেছে। কবি বলিয়াছেন, "যে সকল বৈদেশিক জাতি চীনকে জোর করিয়া আফিমখোর করিবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহারাই সর্ব্বপ্রথম অপরাধী, কারণ তাহাদের এই অমানুষ প্রভাবে চীন যখন বাধা দিয়াছিল, তখন তাহারাই চীনের নিকট হইতে হংকং কাড়িয়া লয়। এখন চীন তাহার নিজস্ব ফেরৎ চাহিলে তাহাকে [illegible]কারী বলা শোভা পায় না। কোনো কোনো সভায় চীনের [illegible] একটু আলোচনা হইয়াছে। কবি বলেন, আমরা যে চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিব ইহাতে ধর্ম্মের কোনো প্রশ্ন নাই। চীনের উপর

ইংরাজের এই আক্রমণ মনুষ্যত্বের, ন্যায়ধর্ম্মের বিরোধী; সুতরাং চীনের ধর্ম্ম যাহাই হউক, আমাদের কর্ত্তব্য এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করা। আইন ও শৃঙ্খলার নামে যে অত্যাচার আমাদিগকে প্রত্যহ মাথা পাতিয়া লইতে হইতেছে তাহা ভারতবর্ষের চতুঃ সীমানার মধ্যেই আবদ্ধ থাকুক; কিন্তু অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে সহায় হওয়া যে দুর্গতির লক্ষণ, জগতের সমক্ষে আমাদের সে দুর্গতিকে নগ্নমূর্ত্তিতে উপস্থিত করা আমরা কোন মতেই সহ্য করিব না।"

বাঙ্গলার ব্যবস্থাপক সভার এক অঙ্কের অভিনয় পূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে,—ভোট-রঙ্গেই সে অঙ্কের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। তাহার পর সেদিন দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ও হইয়াছে। এ অঙ্কটী এমন ভাবে অভিনীত হইবে, তাহা আমরা মনে করি নাই; ইহা ট্রাজেডি ও কমেডির সমাবেশে অতি উপাদেয় হইয়াছিল। ভোটে জয়ী হইয়া যাঁহারা এম-এল-সি অর্থাৎ সদস্য হইলেন তাঁহারা দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথমেই রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলেন, সভাপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপার লইয়া। প্রথমে এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন দশজন রথী; কার্য্যকালে তাহার মধ্যের আটজন (এ আট জনই মুসলমান সদস্য) রঙ্গমঞ্চ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন; অবশিষ্ট রহিলেন দুইজন—সন্তোষের রাজা শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভোটে রাজা বাহাদুরেরই জয় হইল; তিনি ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি হইলেন। এ গর্ভাঙ্কের অভিনয় কিন্তু তেমন জমিল না।

তাহার পর যে ব্যাপার হইল, তাহা একেবারে চরম! বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে ব্যবস্থাপক সভায় এক প্রস্তাব করা হইল যে, জানুয়ারী মাসের শেষের কয়দিন ও ফেব্রুয়ারী মার্চ্চ মাসের জন্য দুইটী মন্ত্রীর বেতন মঞ্জুর করা হউক। তখনও কিন্তু, কে কে এই দুই ভাগ্যবান ব্যক্তি, তাহা লাটসাহেব স্থির করেন নাই। পূর্ব্বে তিন জন মন্ত্রী ছিলেন, মধ্যে ত দেশবন্ধুর চেষ্টায় মন্ত্রীই ছিল না; এবার আবার দ্বৈ-ইরারকির প্রতিষ্ঠায় চেষ্টা হইল দুইজন মন্ত্রী দিয়া। সরকারী, মুসলমান ও লিবারেল সদস্যেরা এ বেতন মঞ্জুর করিলেন; স্বরাজী দল একযোগে আপত্তি করিয়াও হারিয়া গেলেন।

মন্ত্রী মনোনয়ন করিবার কর্ত্তা স্বয়ং লাট-সাহেব; এখানে ভোট চলে না। লর্ড লিটন মুসলমান দলের মধ্য হইতে সার আব্‌দর রহিমকে আহ্বান করিলেন। তিনি ত প্রস্তুত হইয়াই বসিয়া ছিলেন। তিনি মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। তাহার পর ডাক পড়িল শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের। তিনিও মন্ত্রী হইতে রাজী হইয়া ঘরে ফিরিলেন। কিন্তু বাড়ী আসিয়া তাঁহার মত বদলাইয়া গেল; তিনি লাট সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, তিনি সার আব্‌দর রহিমের সহিত একযোগে কাজ করিতে পারিবেন না। লাট-সাহেব তখন মহা মুস্কিলে পড়িলেন। যাহা হউক, এ মুস্কিল তখনকার মত আসান করিলেন সার আব্‌দর রহিম। স্থির হইল যে, সেইদিনই রহিম সাহেব হস্তান্তরিত সমস্ত বিভাগের ভার লইবেন এবং অত্যল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন হিন্দু মন্ত্রী স্থির করিয়া লইবেন; কিন্তু, লাট বাহাদুর বলিলেন যাহাকে-তাহাকে মন্ত্রী করিলেই হইবে না; এমন লোক চাই, যাঁর পিছনে অধিক সদস্য-বল আছে অর্থাৎ দুই মাস পরে বজেট-বিচারের সময় যিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যবস্থাপক সভায় যথেষ্ট ভোট সংগ্রহ করিতে পারবেন, এমন লোক চাই। এই রকম হিন্দু-মন্ত্রী যদি তিনি সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। সার আব্‌দর তখন 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া গদি অধিকার করিলেন এবং হিন্দু-মন্ত্রী সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। কিন্তু, কি দুর্ভাগ্য, কোন হিন্দু সদস্যই তাঁহার কাতর অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না, সকলেই একবাক্যে বলিলেন "মশাই ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে আমরা কাজ করব না।" সার রহিম মহা বিপদে পড়িলেন—মন্ত্রীত্ব যায়-যায় হইল। তাঁহার চারিদিনের চেষ্টাতেও যখন কিছু হইল না, তখন লাটসাহেব বলিলেন, আর কেন, আপনি কার্য্য ত্যাগ করুন। এক সপ্তাহও গেল না, সার রহিমের মন্ত্রীত্ব শেষ হইল। ভদ্রলোকের জন্য সত্যসত্যই বড় আপশোষ হয়।

এইবার দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কের অভিনয়। সার রহিম যেদিন পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তার পরের দিনই লাট সাহেব ঘোষণা করিলেন যে, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হাজি গজনবী সাহেব মন্ত্রী নিযুক্ত

হইলেন। লাট-সাহেবও আপাততঃ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। উপরিউক্ত দুই মহাত্মাই এখন মন্ত্রী হইলেন; অবশ্য মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত। সেই সময়েই বজেটে মন্ত্রী-দ্বয়ের তিন বৎসরের বেতনের ব্যবস্থা হইবে। যদি বেতন পাশ হয়, তাহা হইলে মন্ত্রীদ্বয় নিরাপদ; আর যদি পূর্ব্ববারের মত বেতন নাকচ হয়, তাহা হইলে ঐখানেই মন্ত্রীত্ব শেষ! সুতরাং, এই নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয় এখনও বাকী রহিল; বজেট-বিতণ্ডায় তাহার পরিসমাপ্তি হইবে।

মন্ত্রী ত হইয়া গেল; কিন্তু গোল মিটিল না। শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এবং আরও দুই চারিজন হিন্দু সদস্য যে সার রহিমের সহিত কাজ করিতে অস্বীকার করিলেন, ইহাতে রহিমী দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন, জাতি-বিদ্বেষই ইহার কারণ; চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা মুসলমান সমাজকে এ ব্যবহারের দ্বারা অপমানিত করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত হাজি সাহেবও ভর্ৎসনার ভাগ পাইতেছেন। এক দল মুসলমান সকল দিক বিবেচনা না করিয়া গোল করিতেছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, জাতি-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সার রহিমের সহিত কার্য্য করিতে অসম্মত হন নাই—বজেটের সময় ধোপে টিকিবে না ভয়েই তিনি অসম্মত হইয়াছিলেন, কারণ সে সময় সদস্যগণের অধিকাংশই সার রহিমের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন বলিয়া তাঁহার ধারণা। তাহা হইলেই দ্বৈরাজিক রক্ষা পাইবে না। হাজি সাহেবের দল ভারী আছে; সুতরাং তিনি হয় ত সব ঠিক করিয়া লইতে পারিবেন। ইহার মধ্যে জাতি-বিদ্বেষ বা ব্যক্তি-বিদ্বেষ নাই; ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই চক্রবর্ত্তী মহাশয় সার রহিমের সহিত কাজ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ইহার অন্যায় অর্থ করিয়া জাতি-বিদ্বেষকে আরও বাড়াইবার চেষ্টা করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

গত ৩১শে জানুয়ারী বোম্বাই সহরে ভারতীয় সংবাদপত্র-সেবীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এক সভায় আলোচনা হয়। স্যার ষ্টানলী রীড্ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, একমাত্র সংবাদপত্র-সেবাই ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা গণতন্ত্র-মূলক ব্যবসায়। সংবাদপত্র-সেবা শিক্ষার শ্রেষ্ঠস্থান। সংবাদপত্র কার্য্যালয়ে যদি সংবাদপত্র শিক্ষা দিবার কোন শিক্ষালয় থাকিত, তাহা হইলে আরও ভাল হইত। মিঃ কে নটরঞ্জন বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন, এক কথায় সংবাদপত্রসেবীদের কর্ত্তব্য এই, দেশের অধিবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ও শুভবুদ্ধির প্রেরণা জাগাইয়া তোলা। একটী সংবাদপত্র কার্য্যালয়ের বিভিন্ন স্থলাভিষিক্ত কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তা বলেন, সহকারী সম্পাদকগণ যদি সংবাদের শিরোনামা বসাইবার সময় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কাঁপাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিরত থাকেন, তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহ্নি নির্ব্বাপিতকল্পে তাঁহারাও অনেক কিছু করিতে পারেন। সংবাদপত্রের মারফত যে ইঙ্গিত প্রচার করা হয়, লোকে এখন তাহার মর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারে; এবং সংবাদের মাথায় যে শিরোনামা দেওয়া হয়, উহার মধ্যে অনেকখানি ইঙ্গিত লুক্কায়িত থাকে। সম্পাদকগণ সর্ব্বতোভাবে উত্তেজক ও কর্কশ ভাষা ব্যবহার পরিহার করিবেন, কেন না উহা দুর্ব্বলেরই ভাষা—সম্পাদকের উচিত, ঘটনাগুলি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে চিন্তা করিতে শিক্ষা করা। সম্পূর্ণ সংযম অবলম্বনই একজন ভারতীয় সম্পাদকের সাফল্যলাভের একমাত্র উপায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ও বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউটের জন্ম হয়। এক্ষণে উভয় প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী যাদবপুর নামক স্থানে রহিয়াছে। পরলোকগত স্যার রাসবিহারী ঘোষ মৃত্যুকালে বহুলক্ষ টাকার সম্পত্তি উক্ত বিদ্যালয়ে দান করিয়া যান। তদবধি উহার উন্নতি হইতেছে। যাদবপুরে বৃহৎ কারখানা, ছাত্রাবাস ও বিদ্যালয় গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়টী বাংলার নব জাগরণের প্রথম অরুণালোক। আজ তাহার প্রভাব সমগ্র বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা করপোরেশন ১৯২৬।২৭ সাল হইতে এই বিদ্যালয়ে বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা করপোরেশনের এই কার্য্যে আনন্দিত হইয়াছি।

সাইকেলে পৃথিবী-ভ্রমণকারীগণ বিহার, মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশ ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া গত ১৯শে জানুয়ারী

দিল্লীতে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা গোয়ালিয়র দরবারে ও ঢোলপুরের মহারাজা কর্ত্তৃক অতিশয় সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। বড়লাট ও প্রধান সেনাপতির সঙ্গেও তাঁহাদের দেখা হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ করিয়াছেন। এই ভ্রমণকারীদল ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র লইয়া গিয়াছেন।

আমাদের দেশের দেবতাগণ যে কথা কহিয়া থাকেন, সেই 'আকাশবাণী' নহে, বিদ্যুতের শক্তিতে বিনা-তারে বর্ত্তমান সময়ে যে বহুদূর পর্য্যন্ত সংবাদ প্রেরণ ও কথাবার্ত্তা কহিবার কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমরা তাহারই কথা বলিতেছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহার সাহায্যে কত মঙ্গলজনক কার্য্য হইতেছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। আমাদের দেশে এখন এই বিনা-তারে সংবাদ প্রেরণ কৌশলের সাহায্যে সাধারণ লোকে বাড়ী বসিয়া একটু গান বাজনা শুনে এই মাত্র। কিন্তু বিলাতে তাহা নহে। সে দেশের লোক নানাবিধ হিতকর কার্য্যে এই নবোদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক কৌশলকে নিয়োজিত করিয়াছে। স্কুল কলেজের ছাত্রগণ ইহার দ্বারা বড় বড় পণ্ডিত লোকদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। পল্লীগ্রামের কৃষকেরা প্রতিদিন কৃষি সম্বন্ধীয় নানা প্রকার প্রয়োজনীয় সংবাদ পায়। জনসাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে বহুবিধ তত্ত্ব অবগত হইতে পারে। ব্যবসায়ীরা জিনিষের বাজার-দর, আমদানী রপ্তানীর সংবাদ ইত্যাদি জানিতে পারে। তারপর ঋতু ও আবহাওয়ার বিবরণ, সাধারণ সংবাদ, সময় জ্ঞাপক শব্দিক চিহ্ন ও বিপদ আপদের সতর্কীকরণ প্রভৃতি সকল বিষয় জানা যায়। বিশেষতঃ পুলিশের লোকেরা আসামী ধরিতে এই আকাশবাণীর কৌশল খুব ব্যবহার করে।

বিগত ৭ই জানুয়ারী তারিখে ঢাকায় বিভাগীয় সমবায় সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল। এই সম্মেলনের সভাপতি সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় যে সারগর্ভ ও দীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহাতে তিনি পাট সম্বন্ধে বলিয়াছেন—বাঙ্গালা ছাড়া আর প্রায় কোথায় ও পাট জন্মেনা, সুতরাং পাট বাঙ্গালা দেশেরই একচেটিয়া ব্যবসা। বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ গাঁইট বা ৩ কোটী মন পাট এ দেশের চটকলগুলিতে ব্যবহার হয় এবং ৪০ লক্ষ বেল বা ২ কোটী মন বিদেশে রপ্তানী হয়। যদি বৎসরে ১০০ লক্ষ বেল বা ৫ কোটী মনের বেশী পাট জন্মান না হয় এবং পাট চাষীগণ সমবায় প্রথায় পাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারে তবে পাটের ব্যবসায়ে যে কোটী কোটী টাকা ফটকাবাজ (Speculator) ও দালাল ও ফড়িয়ায়া খাইতেছে তাহা চাষাদের ঘরেই থাকিয়া যাইবে। ১০০ লক্ষ গাঁইটের দাম খুব কম করিয়া ধরিলেও ৫০ কোটী টাকা। গড়ে বছরে যে পাট জন্মে তাহা যদি ১০০ লক্ষ গাঁইট ধরা যায়, তবে মোটামুটী হিসাব করিলেও তাহার দাম দাঁড়ায় ৫০ কোটী টাকা। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, পাটের শেষ দামের অন্যূন শতকরা ২৫ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১২॥০ কোটী টাকা যায় সেই সব শত শত দালালের পকেটে। ইহারা পাটের ব্যবসাটীকে একেবারে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যদি এই কেনাবেচা ব্যাপারটী সমবায় নিয়মানুসারে চালান যায় তবে ঐ টাকা পাট চাষীদের হস্তগত হইতে পারে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত ; নাটক—অজাতশত্রু—১৲

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদকুমার রায় প্রণীত রহস্য-লহরী সিরিজের শতাধীর খাঁই ও ভূতের ব্যাপার—মূল্য প্রত্যেকখানি—৸০

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত প্রহসন জারবী টিকিট—।০

শ্রীযুক্ত বেণীমাধব রায় প্রণীত পিতাজিমর পাণ্ডব পরাজয়—১।০

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত উপন্যাস নিরঞ্জন—১।০

কুমার চিদানন্দ প্রকাশিত শিক্ষা—১৲

দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত রাগের গঠন শিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ—৩৲

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjee.**
of Messers. Gurudas Chatterjee & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

আপন-হারা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

চৈত্র, ১৩৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

সাংখ্য ও গীতা

শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ

গীতাকে যাঁহারা কেবল অতি উচ্চ অঙ্গের দার্শনিক গ্রন্থ বলিয়া ভাবিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধারণা ঠিক নহে। বাস্তবিক পক্ষে গীতা কঠিন দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সূক্ষ্ম আলোচনার গ্রন্থ নহে, এবং কেবল দার্শনিক তত্ত্বালোচনা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তির তৃপ্তির উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করিতে যাইলে, আমরা গীতাপাঠের ঠিক ফল লাভ করিতে পারি না। গীতা মূলতঃ যোগশাস্ত্র, অর্থাৎ মানুষ যে ভাবে চলিলে নিজের সত্তার ক্রমোন্নতি সাধন করিয়া দিব্য জ্ঞান, দিব্য শক্তি, দিব্য আনন্দ লাভ করিতে পারে, এক কথায় দিব্য জীবনের অধিকারী হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারে, গীতায় তাহারই ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে; এবং যোগের এই ব্যবহারিক প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্তই যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকুই তত্ত্বকথার অবতারণা করা হইয়াছে। গীতা নিজস্ব যোগ-প্রণালী বুঝাইবার নিমিত্ত যে সকল দার্শনিক তত্ত্বের ও দার্শনিক ভাষার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা ভারতের তৎকাল-প্রচলিত দর্শনসমূহ হইতেই গৃহীত। ভারতের সেই দর্শন আর নাই, তাহার মর্ম্মার্থ ঠিক ভাবে গ্রহণ করাও এখন আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। অতএব, গীতাকথিত দার্শনিক তত্ত্ব ও মতবাদসমূহের পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক (Academic) সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া এখন আর বিশেষ কোন লাভ আছে বলিয়া মনে হয় না। শুধু দর্শনচর্চ্চার জন্য গীতা পাঠ করিতে না গিয়া, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের নিমিত্ত, মানবাত্মার পূর্ণবিকাশ সাধনের নিমিত্ত গীতার মধ্যে যে অপূর্ব্ব উপদেশরাজি

সমুদ্রের মাঝে অসংখ্য রত্নের ন্যায় নিহিত রহিয়াছে, তাহাই যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া কার্য্যতঃ আমাদের জীবনে প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্যে গীতা পাঠ করিলেই তাহা সার্থক হইতে পারে। তবে যুগধর্ম্মের প্রভাবে তর্কবুদ্ধির উপরই আমরা এতটা নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছি যে, আমাদের জিজ্ঞাসাপ্রবণ মনকে কতকটা শান্ত করিতে না পারিলে কার্য্যতঃ যোগের পথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কঠিন হয়। ভারতীয় ষড়দর্শনের মূলতত্ত্বগুলির সহিত যাঁহাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে, তাঁহারা অনেক স্থলে ঐ সকল তত্ত্বের সহিত গীতার অসামঞ্জস্য দেখিয়া বিষম সংশয়ে পতিত হইয়া থাকেন। অতএব, প্রচলিত দর্শনসমূহের সহিত গীতার কি সম্বন্ধ, গীতা তাহাদের কতখানি গ্রহণ করিয়াছে, কতটুকু বর্জ্জন করিয়াছে, যতখানি গ্রহণ করিয়াছে তাহারও মধ্যে কি পরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাতে কতটুকু যোগ করিয়াছে, মোটামুটি যতদূর সম্ভব তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই বুঝার প্রয়োজন। নতুবা গীতা যেখানে সাংখ্যের কথা বলিয়াছে বা যোগের কথা বলিয়াছে, সেখানে যদি আমরা ঈশ্বরকৃষ্ণ-রচিত সাংখ্যকারিকার সাংখ্যমত বুঝি বা পাতঞ্জলের যোগদর্শন বুঝি, তাহা হইলে গীতা-শিক্ষার মর্ম্ম গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। বেদান্ত-জ্ঞান সম্বন্ধে যে তিনখানি গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া পরিচিত, গীতা তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু সেইজন্য যদি আমরা শঙ্করের মায়াবাদের আলোকে গীতার অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে গীতার প্রধান কথাগুলিই আমরা ধরিতে পারিব না। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা, সাংখ্যের সহিত গীতার ঠিক কি সম্বন্ধ, তাহারই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

গীতার যোগ সাংখ্যের বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত; সাংখ্য হইতেই ইহার আরম্ভ, এবং বরাবর ইহার অনেকটা মত ও পদ্ধতি সাংখ্যেরই অনুরূপ। তথাপি গীতা সাংখ্যকে অনেক দূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সাংখ্যের কোন কোন মূল কথা অস্বীকার করিয়াছে এবং সাংখ্যের নিম্নস্তরের বিশ্লেষণ-মূলক জ্ঞানের সহিত উচ্চ ব্যাপক বৈদান্তিক সত্যের সমন্বয় করিয়াছে। কার্য্যতঃ সাংখ্যের সহিত গীতার যে পার্থক্য হইয়াছে, প্রথমেই সেগুলি সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে। সাংখ্যমতে সংসার দুঃখময়—এই দুঃখের চরম নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। সংসারে থাকিয়া নানা উপায়ে এই দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে হইলে সংসারের খেলা বন্ধ করিতে হইবে; যে সকল বন্ধন আমাদিগকে সাংসারিক জীবনের মধ্যে টানিয়া রাখে সে সব ছিন্ন করিতে হইবে; এক কথায়, সংসারের দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে, দুঃখময় সংসারকেই পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। রোগীকে নাশ করিয়া রোগ উপশমের এই ব্যবস্থা গীতার অনুমোদিত নহে। এই বিশ্ব-লীলাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার জন্যই যে আমরা এই লীলার মধ্যে আসিয়াছি, গীতা বিশ্ব-লীলাকে এরূপ নিরর্থক বলিয়া স্বীকার করে না। তবে, মানুষ সাধারণতঃ যে জীবন যাপন করে তাহা সাংখ্যের বর্ণনানুযায়ী দুঃখময় বটে; এবং সে জীবন ছাড়াইয়া আমাদিগকে উপরে উঠিতে হইবে; কিন্তু, তজ্জন্য জীবনলীলা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার কোন প্রয়োজনই নাই। মানুষের মধ্যেই দিব্যসত্তা, দিব্যশক্তি রহিয়াছে,—সাধনার দ্বারা মানুষ নিজের দিব্যভাব বিকশিত করিয়া তুলিতে পারে,—এই দুঃখ-দ্বন্দময় জীবনের উপরে উঠিয়া দিব্য আনন্দময় জীবন যাপন করিতে পারে,—বিশ্বপ্রকৃতির লীলার মধ্যে থাকিয়া, ইহলোকে এই মর্ত্ত্যধামে থাকিয়াই অফুরন্ত অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে,—অকয়ম্ অমৃতমশ্নুতে। সাংখ্য পুরুষার্থ লাভের পথ দেখাইয়াছে। জ্ঞান, কর্ম্ম সন্ন্যাস,—সাংখ্যের সাধনায় কর্ম্মের কোন স্থান নাই। গীতার মতে কর্ম্ম সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। সাংখ্যের সাধনায় ঈশ্বরে ভক্তির কোন স্থান নাই, ঈশ্বরই নাই। গীতার মতে ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু; বিশ্বসংসারের যাহা কিছু সব সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমেশ্বর হইতেই আসিয়াছে; সেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ ও ভক্তিই মুক্তিলাভের প্রধান উপায়। সাংখ্যের মতে মুক্তির পর সংসার নাই, জীবনলীলা নাই,—পুরুষ তখন নিজের শান্ত নিষ্ক্রিয় সত্তায় প্রতিষ্ঠিত। গীতার মতে মুক্তির অর্থ ভগবানের সহিত মিলন, ভগবানের মধ্যে বাস, মায্যেব নিবসিষ্যসি—আত্মার ভগবানের সহিত ঐক্যলাভ, প্রকৃতিতে দিব্যভাব, ভগবানের ইচ্ছার যন্ত্র হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সম্পাদন, সর্ব্বভূতে আত্মাকে এবং ভগবানকে দেখিয়া, বাসুদেবঃ সর্ব্বম্ এই জ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বভূতে প্রেম, সর্ব্বভূতের হিতসাধন, ইহাই পরম পুরুষার্থ।—সাংখ্যের

বিশ্লেষণ-লব্ধ জ্ঞানকে স্বীকার করিয়াও গীতা কেমন করিয়া এই সকল সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে, এইবারে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই বিভিন্ন সত্তা। এই বিশ্বসংসারে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় যাহা কিছু হইতেছে, সবই পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধের ফল। বহির্জগতে বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি স্থূল ভূতসমূহ, এবং তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়া যে সকল প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক ব্যাপার চলিতেছে, এবং অন্তর্জগতে ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ দুঃখ, সঙ্কল্প বিকল্প প্রভৃতি যে সব মনের ও প্রাণের ব্যাপার চলিতেছে—সে সবই প্রকৃতির ক্রিয়া। প্রাকৃত জগতে নিম্নতন অচেতন জড় পদার্থ হইতে ক্রমবিকাশের ফলে যে বৃক্ষলতা পশুপক্ষী শেষে মানব মন ও বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছে, এ সবই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের পরস্পর মিশ্রণ ও ঘাত-প্রতিঘাতের ফল। কিন্তু, প্রকৃতি একা নড়িতেই পারে না; পুরুষ যদি তাহার কাজ না দেখে, যদি না অনুমতি দেয়—তাহা হইলে প্রকৃতির কোন কাজই চলে না। পুরুষকে দেখাইবার জন্য, ভোগ করাইবার জন্য প্রকৃতির সমস্ত ক্রিয়া—নতুবা তাহার কার্য্যের কোন প্রেরণা নাই। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতিই সব করে; কিন্তু, প্রকৃতি পুরুষের অনুমতির অপেক্ষা করে। পুরুষ অনুমতি না দিলেই সংসার-খেলা বন্ধ হইয়া যায়; কিন্তু, প্রকৃতির খেলাতে পুরুষ এমনিই আসক্ত হইয়া পড়ে, যে, পুরুষ নিজের স্বতন্ত্র সত্তার কথা ভুলিয়া যায়, আত্মহারা হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকে; তাই জন্মজন্মান্তর ধরিয়া সেই খেলা চলিতে থাকে। যখনই পুরুষ নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে, প্রকৃতির খেলার মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে না চায়, তখনই প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া যায়। মোহিনী রমণী যেমন প্রণয়ীকে মুগ্ধ করিবার নিমিত্তই নানারূপে নিজের হাবভাব বিস্তার করে; পুরুষ তাহার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইলে, তাহার যেমন ছলনা বিস্তার করিবার আর কোন প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন থাকে না; সেইরূপ এই বিশ্বজগতে পুরুষ যতক্ষণ মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকে, ততক্ষণই সে খেলা চলিতে থাকে। প্রকৃতির খেলায় পুরুষ কার্য্যতঃ কোনরূপে যোগদান করে না,—পুরুষ শান্ত, নিষ্ক্রিয়, শুদ্ধ চৈতন্যময়; তথাপি প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় তাহার চৈতন্য এরূপ সমাচ্ছন্ন হয়, যে, তাহাতেই পুরুষের ভ্রম হয়—বুঝি ঐ সমস্ত ক্রিয়া তাহারই নিজের। শুভ্র স্ফটিকের পার্শ্বে জবাফুল রাখিলে—ঐ স্ফটিক যেমন দৃশ্যতঃ রক্তবর্ণ ধারণ করে, কিন্তু বস্তুতঃ সে শুভ্রই থাকে, তাহার মূল সত্তার কোনরূপ ব্যতিক্রমই হয় না, জবাফুল সরিয়া গেলেই সে তাহার আদিম শুভ্র সত্তা আপনা হইতেই ফিরিয়া পায়; তেমনিই প্রকৃতির সংস্পর্শে আসিয়া পুরুষ সংসারলীলায় বদ্ধ হয়, সুখদুঃখ ভোগ করে—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহার কোন বন্ধন নাই, কোন ভোগ নাই;—সে নিত্য, শান্ত, অচল, অক্ষর, চৈতন্যময়। পুরুষ যখন এই সাংখ্যোক্ত জ্ঞান লাভ করে, প্রকৃতিকে নিজ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে, সে যখন নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করে, তখন প্রকৃতির খেলা হইতে তাহার অনুমতি প্রত্যাহৃত হয়, সংসার-খেলা বন্ধ হইয়া যায়, সংসারের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে, সংসারের সমস্ত সুখদুঃখের আত্যন্তিক ও ঐকান্তিক নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। প্রকৃতির এই তিন গুণ যখন সাম্যাবস্থায় থাকে, তখন প্রকৃতির কোন ক্রিয়া নাই, সংসারলীলা নাই; প্রকৃতি তখন অব্যক্ত। পুরুষের সান্নিধ্যে আসিলে গুণত্রয়ের এই সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে, তখন এই তিন গুণের দ্বন্দ্ব হইতেই সংসারের খেলা ফুটিয়া উঠে, পুরুষ এই গুণের দ্বারা বদ্ধ হয়। জ্ঞানলাভের ফলে পুরুষ যখন উপলব্ধি করে যে, এই তিনগুণের খেলা তাহার নহে—প্রকৃতির, তখন গুণগুলি আবার সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া যায়, পুরুষ মুক্তি পায়।

সাংখ্যের এই বিশ্লেষণমূলক জ্ঞানই গীতার যোগের ভিত্তি। প্রকৃতিকে পুরুষ বা আত্মা হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া দেখা, তিনগুণের খেলাকে বাহিরের খেলা বলিয়া উপলব্ধি করা, সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে, আমার ভিতরে বাহিরে যাহা কিছু ঘটিতেছে—নৈসর্গিক ঘটনাপুঞ্জ, আমার অন্তরের সুখদুঃখ, কাম, ক্রোধ, চিন্তা, ভাবনা, ইচ্ছা, দ্বেষ—তাহা আমার নহে—প্রকৃতির,—আমি বস্তুতঃ নিত্য, সনাতন, অচল, অক্ষর আত্মা,—প্রকৃতির অনিত্য খেলা আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না—সাংখ্যের এই ভাবের উপলব্ধি গীতার মতে যোগের প্রথম সোপান। গীতার প্রথম অংশেই

অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন। কিন্তু, গীতা এখানেই থামে নাই; এখানে থামিলে—গীতোক্ত সাধনায়, কর্ম্ম ও ভক্তির কোন স্থানই হইত না, ত্রিগুণের খেলার উপরে দিব্যজীবনলীলার সন্ধান গীতা দিতে পারিত না।

সাংখ্যের মতে পুরুষের দুই অবস্থা—বদ্ধ অবস্থা ও মুক্ত অবস্থা। প্রকৃতির ত্রিগুণময়ী ক্রিয়াতে পুরুষ যখন নিমগ্ন, পুরুষ যতক্ষণ আসক্তি ও অহঙ্কারের বশে দেখে এ খেলা তাহারই নিজের, ততক্ষণ সে সংসারের বদ্ধ জীব, অনিত্য সংসারের সুখ-দুঃখ-রূপ দ্বন্দ্বে পড়িয়া সে অশান্তি ভোগ করে। পুরুষ যখন জ্ঞানলাভ করিয়া প্রকৃতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন প্রকৃতির খেলা বন্ধ হইয়া যায়, পুরুষ তাহার শান্ত, নীরব, নিষ্ক্রিয়, অক্ষর অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। গীতা এই দুই অবস্থার উপরে আর এক অবস্থার সন্ধান দিয়াছে। সেখানে পুরুষ প্রকৃতির ঈশ্বর,—স্বাধীন ভাবে ও সজ্ঞানে প্রকৃতিকে ধরিয়া লীলা করিতেছে।

সাংখ্যের পুরুষের বদ্ধ অবস্থাকে গীতা বলিয়াছে ক্ষর, সাংখ্যের পুরুষের মুক্ত অবস্থাকে গীতা বলিয়াছে অক্ষর। আর এই ক্ষর ও অক্ষরের উপরের যে অবস্থা তাহাকে গীতা বলিয়াছে পুরুষোত্তম।

> দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
> ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥
> উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
> যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
> যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
> অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥
>
> ১৫।১৬,১৭,১৮

সাংখ্যের মতে কূটস্থ বা অক্ষর অবস্থা লাভই নিঃশ্রেয়স। ইহার উপরে আর কিছুই নাই। গীতা বলিয়াছে, আত্মার ঊর্দ্ধগতিতে কূটস্থ অবস্থালাভ একটি সোপানমাত্র, পুরুষোত্তমের সহিত মিলিত হইতে পারিলেই তাহার চরম সিদ্ধি। এই পুরুষোত্তম কি? পুরুষ হইতেছে ভগবানেরই নিজের সত্তা—তিনটি স্তরে বা চেতনার ক্ষেত্রে তিন প্রকার সত্তা—ক্ষর, অক্ষর, উত্তম।—ক্ষর পুরুষ হইতেছে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতির লীলার মধ্যে যে পুরুষ বাঁধা পড়িয়াছে,—ভোক্তা, ভর্ত্তা প্রভৃতি হইয়া অনিত্যের আনন্দ গ্রহণ করিতেছে। অক্ষর পুরুষ হইতেছে প্রকৃতির উপরে,—প্রকৃতি হইতে মুক্ত, বিযুক্ত যে পুরুষ। তিনি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নিমজ্জিত। ক্ষর পুরুষের সহিত সংযুক্ত আছে প্রকৃতি। অক্ষর পুরুষের কোন প্রকৃতি নাই। আর পুরুষোত্তম হইতেছে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ যাহাতে যুগপৎ স্থান পাইয়াছে। পুরুষোত্তমের ভিতরের দিকে প্রতিষ্ঠারূপে রহিয়াছে যে অচল শান্তি, যে অনন্ত ঐক্য, যে অবিকল্প সাম্য, তাহাই অক্ষর পুরুষ; আর প্রকাশের জন্য, লীলার জন্য যখন প্রকৃতিকে ধরিয়া নামিয়া আসিয়াছেন, বাহিরে চলিয়াছেন, তখন প্রকৃতির মধ্যে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন ক্ষর রূপ।

জীবেরও আছে এই তিন অবস্থা,—কারণ, জীব ভগবানেরই অংশ, ব্যষ্টির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভগবানের বিশেষ রূপধারণ। জীব যখন অজ্ঞানের খেলায় মগ্ন, প্রকৃতির দ্বারা অবশ হইয়া চলিতে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন তাহার ক্ষরের অবস্থা—ইহাই সাধারণ মানুষের অবস্থা, সাংখ্যের বদ্ধ পুরুষের অবস্থা। জীব যখন নিজেকে প্রকৃতির খেলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আত্মার নিষ্কম্প, অচল, শান্ত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত, তখন তাহার অক্ষরের অবস্থা—ইহাই সাংখ্যের মুক্ত পুরুষের অবস্থা, বৌদ্ধমতে নির্ব্বাণের অবস্থা, মায়াবাদীদের নির্গুণ ব্রহ্মের অবস্থা। আর যখন জীবের ভিতরে থাকে ভগবানের অনন্ত সত্তার সহিত ঐক্য, অটুট শান্তি, অবিকল্প সাম্য, আর বাহিরে প্রকৃতিতে ফুটিয়া উঠে দিব্যরূপ, প্রকৃতি সজ্ঞানে ভগবানের হস্তের যন্ত্র হইয়া, নিমিত্ত হইয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া চলে—তখনই হয় তাহার পুরুষোত্তমের অবস্থা—মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।

সাংখ্য বলে, পুরুষ যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণই প্রকৃতি তাহাকে লীলা দেখাইয়া মুগ্ধ করিয়া রাখে। পুরুষ যদি জ্ঞানলাভ করে, তাহা হইলে প্রকৃতির এই মোহিনী লীলা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। পুরুষের যদি বাসনা না থাকে, অহঙ্কার না থাকে, আসক্তি না থাকে—তাহা হইলে প্রকৃতি তাহাকে আর বন্দী করিতে পারে না। অতএব, প্রকৃতির লীলার প্রবৃত্তি ফুরাইয়া যায়। গীতা বলে, পুরুষকে আসক্তিতে বদ্ধ করিয়া অবশভাবে সংসার ভোগ করানই প্রকৃতির একমাত্র খেলা নহে; ইহা কেবল প্রকৃতির অজ্ঞানের খেলা, অবিদ্যা

মায়ার খেলা। ইহা ছাড়াও প্রকৃতির এক সন্তান খেলা আছে,—মুক্ত পুরুষের বশীভূত হইয়া পুরুষের সাক্ষাৎ নির্দ্দেশ অনুসারেও প্রকৃতি লীলা করিয়া থাকে; এবং কেবল তখনই হয় তাহার দিব্য-রূপের, দিব্য-লীলার বিকাশ। বিদ্যা মায়ার খেলা। মানুষ যতক্ষণ বাসনা, আসক্তি, অহঙ্কারের বশে কর্ম্ম করে, ততক্ষণ সে প্রকৃতির অধীন জীবন যাপন করিয়া সংসারের অনিত্যম্ অসুখম্ খেলায় নিমগ্ন থাকে। বাসনা ও অহঙ্কারকে জয় করিয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রকৃতিকে বশ করিয়া যখন মানুষ জীবন-লীলা করে, তখনই সে জীবন হয় দিব্য-জীবন, ভাগবত-জীবন।

তাহা হইলে সাংখ্যের মতে প্রকৃতি এক, গীতার মতে প্রকৃতি দুই, অথবা একই প্রকৃতির দুই রূপ, বিকৃত রূপ ও স্বরূপ, অপরা ও পরা। সাংখ্যের মতে প্রকৃতির খেলা বন্ধ করিয়া সংসারের পারে যাইতে হইবে,—গীতার মতে অপরা প্রকৃতির খেলা ছাড়িয়া, পরা প্রকৃতির খেলা বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে। আরম্ভে সাংখ্য ও গীতার কোন তফাৎ নাই। সাংখ্যের যে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, তাহাই গীতার অপরা প্রকৃতি;—সাংখ্যের ন্যায়ই গীতাও বলিয়াছে যে, এই প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে—ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ছাড়িয়া যাইবার নিমিত্ত সাংখ্য যে জ্ঞান ও অভ্যাসের পথ দেখাইয়াছে, গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই। তবে নীচের এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে পরা প্রকৃতির দিব্য-জীবন লাভ করিতে হইলে সাংখ্যের কর্ম্ম-সন্ন্যাস অপেক্ষা গীতা কর্ম্মযোগেরই প্রশংসা করিয়াছে।

> সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
> তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ৷৷৫৷২

সাংখ্যের মতে পুরুষের মুক্ত অবস্থায় কোন কর্ম্ম নাই, সাধনার অবস্থাতেও কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-ত্যাগের মার্গই সাংখ্য মতে অবলম্বনীয়। গীতা কিন্তু বুঝিয়াছে যে, কর্ম্ম ত্যাগ অত সহজ ব্যাপার নহে; বিশ্ব জুড়িয়া প্রকৃতি যে কর্ম্মপ্রবাহ চালাইয়াছে, তাহা বন্ধ করা অসম্ভব। কর্ম্ম যখন চলিবেই,—ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ,—তখন কর্ম্ম বন্ধ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কি ভাবে কর্ম্ম করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হইবে না, পরন্তু সে কর্ম্মের দ্বারা প্রকৃতি শুদ্ধ ও রূপান্তরিত হইবে, তাহারই নির্দ্দেশ গীতা দিয়াছে; এবং ইহাই গীতার কর্ম্মযোগ। কিন্তু গীতা দেখাইয়াছে যে, এই কর্ম্মযোগের সঙ্গে মূলতঃ সাংখ্যের সন্ন্যাসের কোন বিরোধই নাই। প্রকৃতিই যখন সব করিতেছে, পুরুষ কিছুই করিতেছে না—তখন কর্ম্ম করা বা না করা পুরুষের পক্ষে দুই-ই সমান। পুরুষ যখন এই জ্ঞান লাভ করে, সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতির উপর আরোপ করে, তখনই হয় প্রকৃত কর্ম্ম-সন্ন্যাস। গীতার মতে ভিতরের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ সম্ভবও নহে এবং তাহার প্রয়োজনও নাই। যে ব্যক্তি ভিতরে আসক্তি ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়াছে, সমস্ত কর্ম্ম প্রকৃতিতে আরোপ করিয়াছে, কোন কর্ম্মই তাহাকে আর বদ্ধ করিতে পারে না, ঘোর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিলেও তাহাকে পাপ স্পর্শ করে না—

> ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
> লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ৷৷৫৷১০

কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কর্ম্মের প্রয়োজন কি? আসক্তি ও বাসনার বশে কর্ম্ম হইলে যদি তাহা বন্ধনের কারণ হয়, এবং অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করা কঠিন, তখন নিতান্ত যতটুকু না করিলে নয়, কেবল ততটুকু কর্ম্ম অনাসক্ত ভাবে সম্পাদন করিয়া, অন্যান্য কর্ম্ম হইতে দূরে থাকাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নহে? কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধে রত হইয়া সহস্র সহস্র প্রাণী বধ করিয়া আত্মার কি কল্যাণ সাধিত হইবে? সাংখ্যের এই নিষ্কর্ম্মের ঝোঁককে কাটাইয়া গীতা পুনঃ পুনঃ কেন সকল প্রকারের কর্ম্ম, সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি, করিবার উপদেশ দিয়াছে তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। গীতার ভাব এই;—সাংখ্য বলিতেছে প্রকৃতিই সব করে, পুরুষ কিছুই করে না। তাহাই যদি হইল, তবে মানুষ যে কর্ম্মই করুক না কেন, প্রকৃতিই সব করিতেছে, এই ভাব ভিতরে থাকিলেই ত সাংখ্য মতের কোন প্রত্যবায় করা হয় না। অথচ, গীতার যে লক্ষ্য তাহা সাংখ্য হইতে বিভিন্ন, গীতা সাংখ্যের মুক্তি বা নিঃশ্রেয়সের উপরে উঠিতে চায়; এবং তাহার জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন,—কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। এই কর্ম্মের প্রয়োজনের উপর গীতা কেন এত ঝোঁক দিয়াছে তাহা বুঝার প্রয়োজন। সাংখ্যের উদ্দেশ্য প্রকৃতিকে ছাড়িয়া যাওয়া, জীবন-লীলা বন্ধ করা। গীতার উদ্দেশ্য নীচের প্রকৃতিকে শুদ্ধ, রূপান্তরিত করিয়া উপরের প্রকৃতির দিব্য খেলা বিকাশ করিয়া তোলা। নীচের

প্রকৃতির অশুদ্ধি দূর করিবার নিমিত্তই যোগীরা আসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া থাকেন—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।

যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥৫।১১

নীচের প্রকৃতির অশুদ্ধি দূর করিতে পারিলে, অজ্ঞান, অহঙ্কার, বাসনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলে, আমরা দিব্যজীবন লাভ করিব, আমাদের ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি দিব্য প্রকৃতিতে পরিণত হইবে। এই দিব্য প্রকৃতিই আত্মার প্রকৃত স্বরূপ, স্বভাব, স্বধর্ম্ম। আমরা যতক্ষণ নীচের প্রকৃতিতে আছি, ততক্ষণ আমরা স্বরূপ হারাইয়া বিকৃত জীবন যাপন করিতেছি, জরামৃত্যুদুঃখময় সংসারে পড়িয়া অমৃতে বঞ্চিত হইয়া আছি। নির্ম্মম ভাবে এই নীচের খেলা বর্জ্জন করিয়া, আত্মার প্রকৃত স্বরূপে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে—ইহার জন্য চাই জ্ঞান, চাই কর্ম্ম, চাই ভক্তি। জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়ে দিব্য-জীবনলাভের যে সাধনা, তাহাই গীতার পূর্ণযোগ। ইহার মধ্যে সাংখ্যের জ্ঞান ও সন্ন্যাসের স্থান আছে; কিন্তু গীতার সমন্বয় যোগের অঙ্গ হইয়া সে জ্ঞান ও সন্ন্যাস আরও উদার, গভীর ও মহান্ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে।

আমাদিগকে জানিতে হইবে যে, প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, প্রকৃতির খেলার উপরে আমাদের আত্মা রহিয়াছে। এই নীচের দ্বন্দ্বময় ত্রিগুণের খেলাই আমাদের জীবনের সব নহে। বুঝিতে হইবে, বিশ্বজগতের যাহা কিছু সবই ভগবান হইতে আসিয়াছে, সবই ভগবান—বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। আমরা ভগবানেরই অংশ। আমাদের আত্মসত্তায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করা, আমাদের প্রকৃতিতে ভগবানের ইচ্ছার নিখুঁত যন্ত্র হওয়া, ইহাই নিঃশ্রেয়স, ইহাই নীচের প্রকৃতি হইতে মুক্তি ইহাই নীচের অহঙ্কারের নির্ব্বাণ। কিন্তু, এই জ্ঞান একটা মানসিক ধারণা মাত্র নহে, বিচার বিতর্কের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করা যায় না। শুদ্ধ আচারে ভিতর হইতে যে আলোক স্বতঃ প্রকাশিত হয় তাহাই প্রকৃত জ্ঞান,—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা। এই শুদ্ধি ও জ্ঞানের জন্য চাই কর্ম্ম, চাই ভক্তি। সাংখ্য মতে প্রকৃতিই যখন সব করিতেছে, পুরুষের যখন কোন কৃতিত্ব, কোনই দায়িত্ব নাই, তখন কি কর্ম্ম হইল না হইল, কিরূপ ভাবে কর্ম্ম হইল তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। গীতা কিন্তু কর্ম্মের সার্থকতা দেখাইয়াছে; কর্ম্মের দ্বারা আত্মশুদ্ধি করিতে হইবে, নীচের প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিয়া দিব্য-প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে। অতএব যেমন তেমন ভাবে কর্ম্ম করিলে চলিবে না। আমরা সাধারণতঃ বাসনার বশে, অহঙ্কারের বশে যে সব কর্ম্ম করি, তাহা আমাদিগকে নীচের জীবনে, অপরা-প্রকৃতির মধ্যে বাঁধিয়া রাখে। অতএব যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিতে হইবে। প্রথমে সমস্ত কর্ম্মফল, ক্রমে সমস্ত কর্ম্ম পর্য্যন্ত ভগবানে অর্পণ করিতে হইবে। তাঁহার ইচ্ছার যন্ত্র ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহাই কর্ম্মযোগ। এইরূপ নিষ্কাম ঈশ্বরার্থে কর্ম্মের দ্বারা আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয়, জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়। আবার জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম আরও নিষ্কাম হয়, অনাসক্ত হয়। জ্ঞান কর্ম্মকে শুদ্ধ করে, কর্ম্ম জ্ঞানকে পূর্ণ করে। এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরা ক্রমশঃ দিব্য জীবনের দিকে অগ্রসর হই।

কিন্তু, এই জ্ঞান ও কর্ম্মের মূলে থাকে ভক্তি এবং ইহাদের চরম পরিণতি ভগবানের সহিত ঐকান্তিক মিলন। কেবল অক্ষরের শান্ত কূটস্থ অবস্থায় উপনীত হওয়াই গীতার লক্ষ্য নহে। পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করিতে হইবে,—ময্যেব নিবসিষ্যসি। পুরুষোত্তমের ভাব লাভ করিতে হইবে; জ্ঞানে, প্রেমে, কর্ম্মে পুরুষোত্তমের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইতে হইবে। ইহার জন্য আমাদের সমস্ত আধারকে, সমস্ত জ্ঞানকর্ম্মকে ভগবন্মুখী করিতে হইবে, ভগবানকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া,—মামাশ্রিতা,—আমাদিগকে সমস্ত জীবন যাপন করিতে হইবে; এবং এইরূপেই আমরা ক্রুত নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া দিব্য ভাগবত জীবন লাভ করিতে পারিব।

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত চেতসাম্ ॥

সাংখ্যের লক্ষ্য ছিল দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তির সন্ধান পাইয়াই সাংখ্য থামিয়া গিয়াছে। এই নিবৃত্তি সাধনের নিমিত্ত যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন তাহার অধিক কিছুর সন্ধান সাংখ্য করিতে চায় নাই। সকল তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা হইল না, দুঃখ নিবৃত্তির

উপরেও আরও কিছু আছে কি না তাহা দেখা হইল না। সাংখ্য সে সব লইয়া আর ব্যস্ত হয় নাই। তাই সাংখ্যে আছে গভীর বিশ্লেষণ, কিন্তু, সমন্বয় নাই। সাংখ্যে দেখান আছে মুক্তির পথ, কিন্তু, তাহা শ্রেষ্ঠ রহস্যে লইয়া যায় না। গীতা সাংখ্যের এই অপূর্ণতাকে বৈদান্তিক জ্ঞানের আলোকে পূর্ণ করিয়াছে। সাংখ্য, বিশ্বতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া অক্ষর পুরুষ পর্য্যন্ত গিয়াই থামিয়া গিয়াছে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলে যে অবিকল্প শান্তি, ঐকান্তিক দুঃখ নিবৃত্তি লাভ করা যায়, তাহার সন্ধান পাইয়াই সাংখ্য সন্তুষ্ট হইয়াছে; এবং কি করিলে সেই অক্ষরের শান্তি, কৈবল্য লাভ করা যায়, তাহার পথ নির্দ্দেশ করিয়াই নিবৃত্ত হইয়াছে। প্রকৃতি এক, পুরুষও যদি এক হয়, তাহা হইলে সকলেই কেন সমানভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করে না, একজন মুক্ত হইলে সকলে কেন মুক্ত হয় না—ইহার কোন ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না দেখিয়া সাংখ্য বলিয়াছে, প্রকৃতি এক কিন্তু পুরুষ বহু। কিন্তু, এই বহুপুরুষ ও প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল—সাংখ্য তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করে নাই। পুরুষ নিজে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত—প্রকৃতির সম্পর্ক আসিলেই তাহার সংসার ভোগের অনিত্য অসুখময় খেলা আরম্ভ হয়। কিন্তু, পুরুষ ও প্রকৃতি দুই বিভিন্ন সত্তা—ইহারা উভয়ে উভয়ের সম্পর্কে কেমন করিয়া আইসে? সাংখ্য এইখানে ঈশ্বরতত্ত্বের অবতারণা করিতে পারিত, বলিতে পারিত—এই প্রকৃতি ও এই সকল পুরুষ এক পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; এবং সেই পরম পুরুষের ইচ্ছাতেই প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হয়। সাংখ্য তাহার কৈবল্য সাধনায় এরূপ ঈশ্বরতত্ত্বের কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই। সাংখ্য বলিয়াছে পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি, চিরকাল রহিয়াছে। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ অদৃষ্টের বশে হয়, অর্থাৎ কি করিয়া হয় তাহা জানা যায় নাই, তাহা "অদৃষ্ট", Unknown। পুরুষ যখন জ্ঞান লাভ করে তখনই সে মুক্ত হইয়া যায়, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার এই মুক্তিলাভে ঈশ্বরের সহিত কোন সম্পর্ক নাই।

সাংখ্য এইরূপ বিশ্লেষণ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু, গীতা এই সকল তত্ত্বকে গুছাইয়া বৈদান্তিক সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া অপূর্ব্ব সমন্বয় করিয়াছে। সাংখ্য প্রকৃতির যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বর্ণনা করিয়াছে, গীতার মতে ত্রিগুণময়ী বিশ্ব-প্রকৃতির বাহ্য কার্য্যাবলী সেইরূপই বটে। সাংখ্য পুরুষ ও প্রকৃতির যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছে, তাহাও ঠিক এবং বন্ধনমুক্তি ও প্রত্যাহারের জন্য কার্য্যতঃ এই সাংখ্যজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কিন্তু, ইহা শুধু নীচের অপরা প্রকৃতি। তাহা—ত্রিগুণময়ী, অচেতন। ইহা অপেক্ষা উচ্চ প্রকৃতি আছে—তাহা পরা, চেতন, দেবী প্রকৃতি এবং সেই পরা প্রকৃতিই জীব (individual soul) হইয়াছে। নীচের প্রকৃতিতে প্রত্যেকেই অহংভাবে প্রতিভাত, উপরের প্রকৃতিতে তিনি একমাত্র পুরুষ। সাংখ্যের মতে বহুপুরুষই বহুজীব; গীতার মতে বহু জীব সেই এক পরম পুরুষেরই প্রকৃতির মধ্যে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ। যে শক্তি সহায়ে ভগবান বহুরূপের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল তাহাই প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সাংখ্যের প্রকৃতির মত স্বতন্ত্র নহে। ইহা ভগবানেরই বিশ্বলীলার শক্তি। প্রকৃতি যে কেবল পুরুষের অনুমতি ও দৃষ্টি পাইলেই কাজ করে তাহা নহে, প্রকৃতি পুরুষের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে পরিচালিত হয়—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥ ৯।১০

কিন্তু, পুরুষ ও প্রকৃতির এই যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, ইহা উপরের সম্বন্ধ; বহুজীবরূপে ভগবান যখন সংসারের অনিত্য লীলা উপভোগ করেন, তখন তিনি অবশভাবে প্রকৃতির দ্বারা চালিত হন; ইহাই অপরা প্রকৃতির খেলা, অজ্ঞানের খেলা।—কিন্তু, এই বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা, এই পরা ও অপরার খেলা—এ সবই যুগপৎ এক ভগবানের মধ্যেই স্থান পাইয়াছে; এবং ইহা পরম রহস্যময়—পশ্য মে যোগমেশ্বরম্। যিনি জীবরূপে অপরা প্রকৃতির খেলায় বদ্ধ, তিনিই ঈশ্বর-রূপে পরা প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। আবার তিনিই পরা ও অপরা সকল খেলার উপরে। একাধারে যুগপৎ এ সব কেমন করিয়া সম্ভব, আমাদের মানসিক বুদ্ধিতে তাহা ধারণা করা যায় না। যাঁহারা ভগবানে প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়া যোগসাধনা করিতে পারেন, তাঁহারাই ভগবানকে সমগ্রভাবে অসংশয়ে জানিতে পারেন।—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ৭।১

জীব যখন অজ্ঞান তখন সে প্রকৃতির অধীন; আসক্তি, বাসনা ও অহঙ্কারের দ্বারা অবশ করিয়া প্রকৃতি জীবকে পরিচালিত করে, এবং সংসারে ভগবানের গূঢ় ইচ্ছা সম্পাদন করে। এই প্রকৃতি স্বাধীন নহে। ইহা ভগবানেরই ইচ্ছা পূরণের যন্ত্র, ভগবানের দ্বারাই পরিচালিত। অজ্ঞানের বশে জীব ভাবে সে বুঝি স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামতে যাহা কিছু করিতেছে—কিন্তু, বস্তুতঃ ভগবানই প্রকৃতির দ্বারা তাহাকে চালিত করিতেছে—যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। এই যে ভগবান আমাদের হৃদ্দেশে গুপ্তভাবে থাকিয়া সকল সময়ে আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন,—যখন অবিদ্যার আবরণ ছিন্ন করিয়া এই ভগবানের সহিত আমরা যুক্ত হই, তখনই হয় আমাদের দিব্যজীবন,—তখন আত্মসত্তায় আমরা ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করি,—তখন আমাদের প্রকৃতির দিব্য স্বরূপ ফুটিয়া উঠে,—আমাদের প্রকৃতি তখন হয় দিব্যজ্ঞানে উদ্ভাসিত, দিব্য প্রেমে পরিপূর্ণ, ভগবানের ইচ্ছাপূরণের দিব্যযন্ত্র। এই দিব্যজীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে না, জীবনলীলা বর্জ্জন করিতে হইবে না,—সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্ম্ম করিয়াও আমরা সেই পরম পদ লাভ করিতে পারি যদি আমরা ভগবানের নিকট পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ করিতে পারি—

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্‌ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌॥ ১৮।৫৬

সান্ত্বনা

শ্রীবীণাপাণি রায়

ছিন্ন আজি সে ডোর—
তিল তিল করি সঞ্চিয়া যাহা
গাঁথিনু জীবন-ডোর;
বসি' আনমনে তরুটির তলে
ভাসি' আজীবন নয়নের জলে
হরষ-বেদন-প্রেম-ফুলদলে
রচেছিনু মালা মোর,
তুমি, ছিঁড়িলে ঘৃণায় সে মালা আমার?
হে মোর সকল-চোর।

পুলকাঞ্চিত জীবনে—
জীবনাম্বুধি পূর্ণ-সাধনা
অঞ্জলি ভরি' যতনে
লহরে লহরে খেলিয়াছে যাহা
উপল? রতন? জান তুমি তাহা,
যাহা কিছু মোর, তোমা হ'তে পাওয়া
অর্পিয়াছিনু চরণে,
সেই, ঢেউগুলি মোর বেলা-ভুমি হ'তে
প্রতিহত অবহেলনে।

মোর বেদনার গান—
পড়িল না তার চরণের তলে,
গলিল না তার প্রাণ?
ভুলিল সে মোর এ তান করুণ,
নাহি বিস্ময়, সে যে অকরুণ
সহনাতীত এ ব্যথা নিদারুণ
হিয়া ভাঙ্গি-খান্‌-খান্‌।
ওগো, জীবনের কি গো এই পরিণতি
বেদনার অবসান?

হবে না-ব্যর্থ হবে না—
একাগ্র তোর হৃদি-আহ্বানে
বক্ষ-অচল রবে না।
হউক ছিন্ন সঙ্গীত-হার,
সুর প্রতিহত হোক্‌ বার বার,
ঢেউ ফিরে এলে চুমিয়া কিনার
নাই-নাই তোর ভাবনা;
পুন, সন্ধ্যায় সবি উঠিবে ফুটিয়া
সাথে অম্লান জ্যোছনা।

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

১২

কোথাও কিছু না,—যখন যতীশ আসিয়া দেবীর সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন দেবী একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—"এ কি দাদা, হঠাৎ তুমি যে?"

যতীশ বলিল, "তোকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

দেবী অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "আমায় নিয়ে যেতে এসেছ,—মানে বুঝতে পারছি নে।"

যতীশ গভীর অবজ্ঞা-ভরে বলিল, "সত্যি তোকে নিয়ে যেতেই এসেছি দেবি! সত্য আবার বিয়ে করেছে শুনলুম, বিলেতে গেছে, তাই ভাবলুম—কেন, আমার কি কিছু নেই, একটা বোনকে দুবেলা দু' মুঠো ভাত আর দু'খানা কাপড় আমি দিতে পারব না? ভগবানের ইচ্ছায় এমন সামর্থ্য আমার আছে বোন—তোকে আজীবনকাল আমি রাখতে পারব। সে বিয়ে করেছে বলে তোকে ত্যাগ করে চলে যাবে, আর তুই যে সেই অপদার্থ স্বামীর ঘরে তার কেনা দাসীর মত মাটি কামড়ে পড়ে থাকবি, আর ভূতের মত খাটবি, এমন কোন কথা হতে পারে না। তোর ওপরে তার যে দাবী আছে, সে দাবী সে ছেড়ে দিয়ে গেছে। তুই পরিত্যক্তা তার। তাই আমি তোকে নিয়ে যেতে এসেছি। তোকে আমি আজই নিয়ে যাব, কিছুতেই এখানে রেখে যাব না।"

দেবী একটু হাসিল। সে হাসি তখনই মিলাইয়া গেল, কিন্তু সে একটাও কথা বলিল না।

যতীশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল, "চুপ করে রইলি যে, ওঠ,—তোর যা জিনিষপত্র আছে সব গুছিয়ে নে, গাড়ী এনেছি যে।"

দেবী শান্তকণ্ঠে বলিল, "বাবার সঙ্গে দেখা করেছ?"

যতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু দরকার দেখছি নে। সত্যর জন্যেই তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক; নইলে তিনি আমার কে? সত্য নিজেই যখন সম্পর্কের বাঁধন কেটে দেছে, তখন আমাদের আর গায়ে পড়ে সম্পর্ক ঝালিয়ে নেবার কোন দরকার দেখছি নে। তোর আর কোন সম্পর্ক নেই দেবি, তুই ওঠ, চল আমার সঙ্গে।"

তরুণমতি যুবক মাত্র সে, রক্ত তাহার গরম হইয়া উঠিতে বেশী দেরী হইত না।

দেবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "ঠিক সত্যি কথাই তুমি বলছো; অর্থাৎ তোমার জ্ঞানে তুমি জানছো এই সত্যি। কিন্তু আমার জ্ঞানে আমি তো সেটা ভাবতে পারছি নে দাদা! আমার ওপরে আর তোমাদের কোন অধিকার আছে কি? যেদিন আমার দান করেছ, সেইদিনই আমার

ওপরে অধিকার হারিয়েছ। দানের জিনিসের ওপরে আর কোন দাবী-দাওয়া চলতে পারে না, তাও তো জানো। আমার স্বামী আমায় ত্যাগ করেছেন, তাই বলে মনে ভেব না, আমিও মনে করব আমারও সম্পর্ক উঠে গেছে। আমার সামনে জাগছে আমার কর্ত্তব্য, আমার স্বামীর বাপের সেবা আমাকেই করতে হবে, এই ঘর-দুয়ার আমাকেই দেখতে হবে। দাদা, তোমরাই আমায় আমার দেবতা নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছিলে, আমিও তোমাদের কথামত তাঁকে প্রথমেই দেবতা বলে ভেবেছি, এখনও ভাবছি। আমি এখান ছেড়ে এখন কিছুতেই যেতে পারব না। তোমার ভগ্নিপতি যেখানেই যান, এক দিন তাঁকে ফিরে আসতেই হবে। তখন তাঁর বাড়ী ঘর, তাঁর বাপকে তাঁর হাতে দিয়ে—যদি তিনি অনুমতি করেন, আমি জন্মের মতই বিদায় নিয়ে যাব। তিনি আবার বিয়ে করেছেন, আমায় কোথাও চলে যাওয়ার অনুমতি তো দেন নি দাদা, বিনা অনুমতিতে আমি কি করে যাব বল।"

যতীশ বড় বেশী রকম রাগ করিল, বলিল, "আর—যদি যাওয়ার অনুমতি না দেন, যদি এখানে ফিরে না আসেন—তাহলে তোমার এখানেই না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে,—পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে হবে। তুই এ আশা করিস নে দেবি,—বিলেত হতে ফিরে এসে সে এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ফিরবে, তোকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে, বাপকে বাবা বলে ডাকবে। বিলেতে গেলেই এ দেশের ছেলেদের চাল বদলে যায়, তারা মানুষে হতে গিয়ে অদ্ভুত জীব হয়ে ফিরে আসে শুনেছি। আমি বেশ জানি বলেই বলছি যে—"

বাধা দিয়া একটু অসহিষ্ণুভাবে দেবী বলিল, "না আসেন, জানব—আমিই একা তাঁর পরিত্যক্তা নই, আমিই শুধু একা ব্যথা পাই নি,—আমার চেয়ে কত লক্ষগুণ বেশী ব্যথা তাঁর অভাগা বাপ ভোগ করছেন, করবেন—সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ দাদা? তাঁর ব্যথায় প্রলেপ দিতে আজ আর কেউ নেই দাদা,—আমি ছাড়া ওই পুত্র-শোকাতুর বুড়োকে দেখতে আজ আর কেউ নেই। তুমি কি নিষ্ঠুর দাদা! তোমার বোন হিসেবে তুমি আমার দিকটা দেখলে, মানুষ হিসেবে এই বুড়োর পানে চাইতে পারলে না,—তাই অক্লেশে একা এই জরাজীর্ণকে ফেলে রেখে আমায় যেতে বলছো! আমি কার হাতে এঁকে দিয়ে যাব, কে এঁকে দেখবে? আমার ননদ কাল শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। দুটি ছেলে থেকেও নেই। আমি যদি না থাকি—কে এঁকে দুটি ভাত খাওয়াবে, তৃষ্ণার সময় কে জোর করে জল খাওয়াবে দাদা? না দাদা, তোমার দুখানি পায়ে পড়ি, তুমি গাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাও, আমি যাব না—যেতে পারব না। মরি যদি—এইখানেই মরব; কারণ এ আমার স্বামীর ভিটে, আমার পরম তীর্থ। যদিও তিনি আর না আসেন, তবু এ আমার বড় আদরের, বড় প্রিয়—জগতের একমাত্র শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। আমার সাধনার সিদ্ধি পরজন্মে আমি লাভ করব, যদি এ জন্মটা এই তীর্থে কাটাতে পারি। না দাদা, আমি যাব না, যেতে পারব না, অভাগিনী বোনকে তোমার মাপ কর।"

চোখের জলে সে যতীশের যে হাতখানা ধরিয়াছিল সেখানা ভিজাইয়া দিল। অন্তরটা দ্রব হইয়া আসিতেছিল, মুখখানা কঠোর করিয়া কৃত্রিম তীব্র স্বরে যতীশ বলিল, "তবে থা, মর গিয়ে—আমার কি তাতে? একটা কথা বলে যাই, মনে রাখিস। আসল কথা—সত্য তোকে আসলে দেখতে পারে না, জানিস্ তো। নেহাৎ কেবল দায়ে পড়ে সে তোকে বিয়ে করেছে—এ কথা সে স্পষ্ট বলতেও কুণ্ঠিত হয় নি। তোর জন্তেই সে এই বুড়ো ধর্ম্মভীরু বাপকে এমনভাবে নির্য্যাতন করছে। যদি তুই এখানে না থাকতিস, তবে দেখতিস, এই বাপকে সে কি রকম যত্ন করত, দেখত-শুনত।"

দেবীর অধরে মৃদু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিল, "বাঃ, বেশ কথা বলেছ দাদা। কোথায় তোমার ভগ্নিপতি রইল বিলেতে—সেই সাত সমুদ্র তের নদী পারের দেশে,. বাপ রইলেন এখানে—যত্ন করবেন কি করে—শুনি?"

যতীশ একটু ভাবিয়া বলিল, "তুই নেই শুনলে চট করে আসত।"

দেবী চুপ করিয়া রহিল,—এই তুচ্ছ অনিশ্চয়তাবোধক একটা কথা নাড়াচাড়া করিয়া এতখানি করিয়া বাড়াইয়া মনটাকে তিক্ত করিতে সে প্রস্তুত ছিল না।

যতীশ বলিল, "তা হলে সত্যিই তুই যাবি নে দেবী?"

দেবী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "এখন নয় দাদা। যখন শুনব তোমার ভগ্নিপতি দেশে ফিরেছেন, তখন আপনিই আমি চলে

যাব। তোমার আশ্রয় ছাড়া আমার আর আশ্রয় কোথায় দাদা? তোমার বাড়ীতে আমার জন্তে একটু জায়গা রেখো,—এখন আমি গেলে বুড়ো শ্বশুর না খেতে পেয়ে মারা যাবেন।"

তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

যতীশ অন্তমনস্কভাবে অন্তদিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেবী ডাকিল—"দাদা—"

যতীশ মুখ ফিরাইল। তাহার চক্ষু দুইটী তখন সজল হইয়া উঠিয়াছে। আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "তবে আমি যাই দেবী। তুই তবে তখন আমার কাছে যাস, ভাইয়ের ঘরের দরজা বোনের জন্তে সর্ব্বদাই খোলা আছে, মনে জানিস।"

গাড়ী লইয়া যতীশ ফিরিয়া গেল।

উপেন্দ্রনাথ তখন গৃহমধ্যে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন, দেবী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

হায় দেবতা, তুমি যে এই ভক্তি কুড়াইতেছ, এ কি সবই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে? তোমায় অনেকে—কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তোমায় অনেকে—পাথরের নুড়ি বলিয়া বিদ্রূপ করে—তাই কি সত্য,—সত্যই কি তোমার মধ্যে দেবতার শক্তি নাই? তুমি না কি নিমেষে পৃথিবী উলট-পালট করিয়া দিতে পার,—সে কি শুধু গল্প-কথা, না সত্য? নারায়ণ, আর যে বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমায় যেমন দেখিয়াছি তেমনিই রহিয়াছ, এতটুকু জীবনের লক্ষণ তো কোন দিনই দেখাইতে পার নাই? তোমার কাছে কত লোকে কত চোখের জল ঢালিয়াছে, সবই কি ওই সিংহাসনের মূলে জমা হইয়া আছে; কত প্রার্থনা কত লোকের—সবই তোমার সিংহাসনের চারিদিকে জমাট হইয়া রহিয়াছে? মিথ্যা করিয়া নিজেকে দেবতা নামে পরিচিত করা, লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি কুড়ানো—এই কি তোমার কাজ গো?

দেবী ভাবিতে ভাবিতে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। তাহার সেই তন্ময়তা ঘুচিয়া গেল উপেন্দ্রনাথের সম্বোধনে। পুত্রবধূর মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্মিতমুখে তিনি বলিলেন, "তা হলে এখনই যাচ্ছো মা লক্ষ্মী, বিদায় নিতে এসেছ?"

বিস্মিত চোখ দুটি তাঁহার মুখের উপর পলকের জন্ত রাখিয়া তখনই নামাইয়া দেবী বলিল, "কোথায় যাব বাবা?"

উপেন্দ্রনাথ তেমনি শান্তস্বরে বলিলেন, "তোমার ভাইয়ের সঙ্গে তার বাড়ীতে যাবে শুনলুম। যাবে—যাও মা, তাতে আমার এতটুকু আপত্তি নেই,—বরং এতে আমি আরও খুসি হব। আমিও অনেক দিন হতে ভাবছি—আমার দগ্ধ অদৃষ্টের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে কেন তোমরাও কষ্ট পাবে। তোমার মা—সব সুখ, আশা গেছে, এখানে থাকলে দুটো খাওয়া আর পরা, দুদিন বাদে তাও জুটবে কি না কে বলতে পারে? তবু যতীশের বাড়ীতে থাকলে স্বচ্ছন্দে খেতে-পরতে পাবে তো মা, সেও যে বড় একটা সান্ত্বনার কথা। যাও মা, নারায়ণ তোমার ভাল করুন, তোমার প্রাণে শান্তি দিন।"

দেবী ধীরকণ্ঠে বলিল, "না বাবা, আমি দাদাকে ফিরিয়ে দিয়েছি,—আমি কোথাও যাব না। সেখানে যাওয়ার চেয়ে এখানে থেকে যদি অনাহারেও মরি, সেও যে আমার ভাল বাবা। আপনি আমায় এমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দেবেন না বাবা, আপনার বাড়ী ছাড়া জগতে আর কোথাও আমার জায়গা নেই।"

বৃদ্ধের পায়ের কাছে সে লুটাইয়া পড়িল।

উপেন্দ্রনাথের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। তাঁহার শুষ্ক নয়ন দুটিও ধীরে ধীরে সজল হইয়া আসিতেছিল। চকিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, "বেশ কথা মা, ঠিক আমার মায়ের মত কথাই বলেছ। পাগলি, আমি কি তোমায় তাড়াতে পারি! এ যে তোমার ঘর, আমি যে তোমারই ছেলে মা,—আমারই সকল ভার আমি যে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি।"

পুত্রবধূর মাথায় হাত দিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "ওঠো মা লক্ষ্মী, আমার আশীর্ব্বাদের যদি এতটুকু জোর থাকে, তবে নিশ্চয়ই তুমি সুখী হবে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও মা, মানুষের ব্যথার ঔষধ তিনিই দেন, আর কেউই দিতে পারে না।"

গোপনে চোখ মুছিয়া দেবী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। আজ তাহার হৃদয়ের গোপনীয় ব্যথা অশ্রুর আকারে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে চাহিতেছিল,—কোন সান্ত্বনার বাঁধ দিয়া সে আজ ইহাকে থামাইয়া রাখিতে পারিতেছিল না। গৃহ হইতে বাহির হইতে—শ্রাবণের আকাশ হঠাৎ যেমন প্রচুর বারি বর্ষণ করে—তেমনি করিয়া উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা তাহার সমস্ত মুখখানা ভাসাইয়া দিয়া গেল।

বীথি অনেক দিন আগে একখানা পত্র লিখিয়া তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল—স্বামী হিন্দুমেয়ের প্রত্যক্ষ দেবতা। স্বামীর যাহাতে তৃপ্তি, তাহা হিন্দুমেয়ের অবশ্য কর্ত্তব্য কাজ। দেবী প্রাণপণে নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছে, আজীবনকাল করিয়া যাইবেও। স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন, ভুলিয়া গিয়াছেন,—বৃদ্ধ পিতাকে ভুলিলেন কেমন করিয়া?

মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতই বেশী, পিতামাতার স্নেহও তখন সে ভুলিয়া যায়। এই যে পিতা,—ছোটবেলা হইতে জননীর স্নেহ, পিতার ভালবাসা যুগপৎ ঢালিয়া দিয়া সন্তান কয়টীকে মানুষ করিয়া তুলিলেন, সে কি এই বেদনা পাইবার জন্য? হায় অকৃতজ্ঞ সন্তান, উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে সবই বিসর্জ্জন দিয়াছ?

আজ ভবানী এখানে নাই যে দেবী দুইটা কথা কহিয়া বাঁচিবে। শূন্য গৃহে বাতাস আসিয়া হাহারবে কাঁদিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। গৃহে যে একটী মাত্র মানুষ আছেন, তিনি সম্পূর্ণ পৃথকভাবে থাকিয়া গীতা উপনিষদ লইয়া তন্ময় হইয়া আছেন। একা দেবী আকাশের পানে চাহিয়া শূন্য হৃদয়ে ভাবিতেছে,—শান্তি, সুখ? নাই রে, নাই, কিছু নাই; সবই নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে, যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিবে না।

সে বিবাহের পর একবার কয়েক দিনের জন্য মাত্র পিত্রালয়ে গিয়াছিল। বিবাহের আগে যেমন পিত্রালয় ছিল, গিয়া আর তেমনটি দেখিতে পায় নাই,—তাহার চোখের সামনে তখন সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেবী পিত্রালয়ে থাকিতে পারে নাই, এখানে আসিয়া সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল।

দেবীর বিবাহের কিছুদিন পরেই তাহার মা মারা যান। মায়ের অমূল্য উপদেশগুলি এখনও তাহার মনে আছে, জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত মনে থাকিবে। মা তাহাকে জীবনের সম্বল এই গৃহখানি দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন,—সেও এই গৃহখানিকে জীবনের অবলম্বন স্বরূপ জড়াইয়া ধরিয়াছে।

আজ যদি মা থাকিতেন, সে দুদিনের জন্যও তাঁহাকে এখানে আনিত,—তথাপি এই বৃদ্ধকে ফেলিয়া যাইতে পারিত না,—এ যে তাহার কর্ত্তব্য।

"বউ মা, বাড়ী আছ কি বাছা?"

দোকানি হরিশের মা আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। আজ তিন চারি মাস হইতে দোকানে ধার পড়িয়া আসিতেছে,—এ কথাটা সাহস করিয়া ভবানী বা সে কেহই উপেন্দ্রনাথকে জানাইতে পারে নাই। ঋণকে উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ভয় করিতেন, অথচ সংসারে একটী পয়সা আয় নাই। বাঁচিতে গেলে খাইতে হয়, এই কথাটী সার মনে করিয়া, ভবানী দরকারের সময় উঠ্‌না জিনিস আনিয়া সংসার চালাইত। যখন সে শ্বশুরালয়ে যায়, তখন বলি বলি করিয়াও পিতাকে কথাটা সে বলিতে পারে নাই।

দেবী হরিশের মাকে দেখিয়া প্রমাদ গণিল। মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, তিন চারি মাসে অনেক টাকা তাহারা পাইবে। মনে মনে প্রমাদ গণিলেও মুখে সে শান্ত হাসিয়া বলিল, "এসো হরিশের মা, ভাল আছ তো? বারাণ্ডায় উঠে বসো।"

হরিশের মা মুখখানা নেহাৎ অপ্রসন্ন করিয়া—নিতান্ত কেবল কথা রাখিবার জন্যই বারাণ্ডার ধারে বসিল। তেমনি অন্ধকার পূর্ণ মুখে বলিল, "আর ভালো থাকা। তা—হ্যাঁ গা বউ মা, নিত্যি চাওয়া-চাওয়ি কি ভালো দেখায় বাছা? সেদিন নাতিটাকে পাঠিয়েছিলুম; তাকে বলে দিলে—আসছে হপ্তার মধ্যেই সব মিটিয়ে দিয়ে দেব, অথচ দু তিন হপ্তা কেটে গেল বাছা—একটী পাই পয়সা আজও খসাতে পারলে না। তা—দেখ বাছা, এমন ধারা করলে আমাদের গরীব লোকের দিন কি করে চলবে তা বল।"

দেবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তা কি করব মা, থাকলে কেউ কি লুকিয়ে রেখে পরের কথা সয়? আমি কি বুঝতে পারছি নে আমরাও যা—তোমরাও তাই। নেহাৎ হাতে নেই বলেই দিতে পারছি নে, আর দু'এক হপ্তা দেরী কর—"

এবার হরিশের মা স্পষ্ট ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—"না গো বাছা, দু'এক হপ্তা দূরের কথা—দু চার দিনও আমি থাকতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি। যদি বাছা, কাল দুপুরের মধ্যে টাকা পয়সা সব চুকিয়ে না দাও, তা হলে বাধ্য হয়ে আমায় ঠাকুরকে জানাতেই হবে।"

দেবী ভারি শঙ্কিতা হইয়া উঠিল, "না হরিশের মা, বাবাকে কিছু জানিয়ো না। আহা, বেচারা বুড়ো বামন বড় জালায় জলছেন, আর তাঁর জ্বালা বাড়িয়ো না। আমার

একগাছি সোণা-বাঁধানো লোহা আছে, সেটা বিক্রি করে আজই তোমার দেনা শোধ করে দেব। তুমি বিকেলের দিকে একবার এসো, তোমার টাকা তুমি পাবে। এখন যাবার সময় একবার শান্তিকে ডেকে দিয়ে যেয়ো তো মা, তার কাছেই দেব।"

হরিশের মায়ের মুখখানা আজই বৈকালে টাকা পাইবার আশায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে উঠিতে উঠিতে বলিল, "তা আমি এখুনি ডেকে দিয়ে যাচ্ছি। তবে বাছা, বিকেলে যাতে পাই তাই কোরো,— আবার যেন শুধু হাতে আমায় ফিরে যেতে হয় না।"

হরিশের মা সন্তুষ্ট মনে চলিয়া গেল।

প্রথমটায় এই সোণা-বাঁধানো লোহাটার কথা দেবীর মোটেই মনে হয় নাই। যদি মনে পড়িত, তবে আগেই সে এটি বিক্রয় করিয়া দেনা শোধ দিয়া দিত। আজ হঠাৎ এই লোহাটার কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

তাহার মায়ের শেষ দান এইটি,—বুকের একখানা পাঁজরের মতই সে ইহা রক্ষা করিয়া আসিতেছে; কখনও স্বপ্নেও ভাবে নাই—এক দিন দায়ে পড়িয়া ইহাকেই বিক্রয় করিতে হইবে। কিন্তু উপায় নাই যে,—দেবী চারিদিকে চাহিয়া আর কোন পথ দেখিতে পাইতেছে না,—বাধ্য হইয়া তাহাকে আয়ুষ্মতীর চিহ্ন,—মায়ের এই শেষ দান ঘুচাইতেই হইবে যে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবী উঠিল। গৃহমধ্যে গিয়া বাক্স খুলিয়া সে একটী বড় সিঁদুরের কৌটা বাহির করিল। সিন্দূরে রঞ্জিত তাহার মায়ের এই শেষ দানটী কৌটা খুলিতেই ঝকমক করিয়া উঠিল।

সন্তর্পণে সে সেটী তুলিয়া লইল। অতৃপ্ত নয়নে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া সেটী সে ললাটে স্পর্শ করাইল। তাহার চোখ দিয়া দুটি ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে সে ক্ষিপ্রহস্তে তাহা মুছিয়া ফেলিল।

না, কেন এ দুর্ব্বলতা? এত দুর্ব্বলতা তাহার তো আর সাজিবে না। তাহাকে এখন কঠিনা হইতে হইবে যে,—হৃদয়কে পাষাণের চেয়েও শক্ত করিতে হইবে যে।

বাহির হইতে শান্তি ডাকিল, "আমায় ডেকেছ না কি, কাকিমা?"

এই বৃদ্ধা কৈবর্ত্ত নারীটি গ্রাম্য সম্পর্ক ধরিয়া দেবীকে কাকিমা বলিয়া ডাকিত; কারণ, তাহার মাতা না কি কোন্ কালে উপেন্দ্রনাথকে পিতৃ সম্বোধন করিয়াছিল।

হৃদয়কে শক্ত করিয়া দেবী বাহিরে বারাণ্ডায় আসিল, "হ্যাঁ ডেকেছি শান্তি, একটা কাজ তোমায় করতে হবে।"

শান্তি প্রসন্নমুখে বলিল, "সে তো জানিই বাছা, আমিও ঠিক তাই ভেবে এসেছি। দরকার না পড়লে তো শান্তির কথা তোমাদের মনে পড়ে না। কি কাজ বল, এখনই করে দিচ্ছি।"

দেবী বলিল, "কাজটা এমন কিছু নয়,—আমার এই জিনিসটা বিক্রি করে দিতে হবে।"

সোণা-বাঁধানো লোহাটা সে শান্তির সম্মুখে ধরিল। সবিস্ময়ে শান্তি বলিল, "এ কি মা,—এয়োরাণী ভাগ্যধরী তুমি,—হাতের এয়োতির চিহ্ন লোহা বিক্রি করবে?"

দেবী একটু হাসিয়া বলিল, "ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর আমার লোহার খাড়ু যেন অক্ষয় হয়ে থাকে মা, সোণাতে কি দরকার মা? বড় দায়ে পড়েছি এখন, এ বিক্রি না করলে আমার কিছুতেই নিস্তার নেই। লক্ষ্মী মা আমার, বাবা যেন না জানতে পারেন, চুপি চুপি এটা আমায় বিক্রি করে এনে দাও।"

তাহার মনের ব্যগ্রতা চোখে-মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। শান্তি একবার তাহার উৎকণ্ঠাকুল মুখের পানে তাকাইয়া আর একটীও কথা না বলিয়া জিনিসটী লইয়া চলিয়া গেল।

ঘণ্টা দুই বাদে সে দুইখানি দশ টাকার নোট আনিয়া দেবীর হাতে দিল।

সজলনেত্রে দেবী বলিল, "ভগবান তোমায় ভাল করবেন শান্তি। আজ তুমি আমার যে উপকার করলে, এ আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না।"

বৈকালে সে দোকানের দেনা ষোল টাকা মিটাইয়া দিয়া একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

১৩

প্রশংসার সহিত বীথি ম্যাট্রিক পাস করিল। মায়া স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মেয়ের এখন বিয়ে দেবে, না, আরও পড়াবে?"

জিতেন্দ্রনাথ বলিলেন, "এইটুকু পড়ানো তাকে আমার উদ্দেশ্য নয় মায়া, আমার ইচ্ছে—আমি তাকে উচ্চশিক্ষিতা

করব। সে যদি পড়তে ইচ্ছা করে, তবে তাকে এম-এ পর্য্যন্ত পড়াব।"

মায়া বলিলেন, "আমি আজ ও-বাড়ী যাচ্ছি। তাকে কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার জন্তে প্রস্তুত হতে বলি গিয়ে। তুমি তার কি কি বই লাগবে সেগুলো দেখে শুনে ঠিক করে রাখো।"

মোটর আনিতে আদেশ দিয়া তিনি কাপড় বদলাইতে গেলেন।

গীতি বোর্ডিংয়ে থাকিয়া পড়িত। বাড়ীতে সে ভারি দুষ্টামি করিত। মায়া এই দুর্দ্দান্ত মেয়েটাকে কিছুতেই বশে আনিতে পারেন নাই বলিয়া, রাগ করিয়া তাঁহার বাল্যবন্ধু বেথুনের প্রিন্সিপালের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ে থাকিয়া গীতির এখন একটু বুদ্ধি হইয়াছে, দুষ্টামী প্রায় নাই বলিলেও চলে। সেদিন শনিবার থাকায় স্কুলের ছুটির পরে সে বাড়ী আসিয়াছিল। মায়ার সঙ্গে দিদিমার বাড়ী যাইবার জন্ম সেও প্রস্তুত হইয়া লইল।

বীথি তখন দিদিমাকে উপনিষদের সরল ব্যাখ্যা পড়িয়া শুনাইতেছিল। এখানি তাহার ঠাকুরদা অনেক পরিশ্রমের পর লিখিয়া প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন। কয়েক দিন আগে বইখানি তিনি প্রকাশের হাতে দিয়া বীথির কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—উপহার-পৃষ্ঠায় তাঁহার হাতের লেখা রহিয়াছে। বীথিও ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত ঠাকুরদার এই স্নেহের দান গ্রহণ করিয়াছে এবং কয়দিন হইতে সরলাকে পড়িয়া শুনাইতেছে।

রমা নীচে কি করিতেছিল, দুপ-দাপ করিয়া সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদিমণি,—মাসীমা, গীতাদি সব এসেছেন যে।"

বীথি ত্রস্তভাবে বইখানা মুড়িয়া ফেলিল। জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া বলিল, "কে—মা এসেছেন?"

সরলা একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন, দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিলেন, "যা বীথি, তোর মাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে বড় ঘরটায় বসা গিয়ে, আমিও এখনি সেখানে যাচ্ছি।"

বীথি বইখানা সেখানেই নামাইয়া রাখিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, "তুমি শীগগির করে এসো দিদি, যেন দেরী করো না।"

সিঁড়ির সম্মুখে আসিতেই সে মা ও ভগিনীকে দেখিতে পাইল। বীথি মাতাকে প্রণাম করিল, মা আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, তাহার সুন্দর ললাটে একটা স্নেহচুম্বন রেখা আঁকিয়া দিয়া, স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "দিন দিন যত রোগা হয়ে যাচ্ছিস, তত যেন ঢেঙ্গা হচ্ছিস। আমার চেয়ে মাথায় বড় হয়ে গেলি এর মধ্যে,—এখনও যে অনেককাল বাকি রয়েছে। মা বুঝি এই ঘরে বীথি?"

গীতি ছোট ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, বীথি বাধা দিয়া বলিল, "এই দিককার বড় ঘরটায় চল গীতি, এ ছোট ঘরটায় বসবার মত কিছু নেই।"

"কেন, এ ঘরটায় কি আছে?"

বীথি বাধা দিবার আগেই তিনি মুক্ত জানালাপথে ঘরের মধ্যে উঁকি দিলেন। চশমার আড়ালে হইলেও তাঁহার চোখ দুইটী যে দারুণ বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল এবং ভ্রূ দুইটা কুঞ্চিত হইয়া গেল, তাহা বীথি দেখিল। সে ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল।

"এ ঘরটায় কি হয় বীথি?"

বীথি অস্পষ্ট স্বরে কি বলিল তাহা বোঝা গেল না।

বিরক্ত মায়া বলিলেন, "যাই হোক গে, তোকে আমি আর এখানে রাখব না। এখানে মার কাছে থেকে তুই দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছিস। তোর মনের এতটুকু উন্নতি হওয়া দূরে থাক, দিন দিন অধোগতি হচ্ছে। আমি বেশ জানি, আমার মা কুসংস্কারের গোঁড়া। ওঁর কাছে থেকে কেউই যথার্থ সৎ শিক্ষা লাভ করতে পারবে না। এখানে থেকে তোরও অনেকগুলো দোষ জন্মে গেছে। তাই ভাবি—এর পর তোর উপায় কি হবে? হয় তো এমন ঘরে বিয়ে হবে, যেখানে তোর এই সংস্কারগুলোর জন্যে তোকে লাঞ্ছিতা হতে হবে বড় কম নয়। এই জন্মগত শিক্ষাগত সংস্কারগুলো তখন কাঁটার মত তোর বুকে বিঁধে তোকে ব্যথা দেবে। চল এখন, কোন্ ঘরে বসতে দিবি দেখিয়ে দে।"

বীথির পা দুখানা জড়াইয়া আসিতেছিল। তথাপি সে অগ্রসর হইল। বড় ঘরটার মধ্যে তাঁহাদের লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, "একটু বসো মা, আমি দিদিকে ডেকে আনছি।"

গর্ব্বিতা মায়ের সামনে থাকিতে সে ভারি সঙ্কুচিতা হইয়া উঠিয়াছিল। এখন দিদিমাকে এখানে আনিয়া ফেলিতে

পারিলে তাঁহাকে সম্মুখে দিয়া সে পিছনে থাকিতে পারে; একেবারে সামনাসামনি থাকিবার সাহস তাহার ছিল না।

কুঞ্চিত মুখে মায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করছিলি এতক্ষণ? কলেজে ভর্ত্তি হওয়ার কি করছিস?"

বীথি নতমুখে উত্তর দিল, "আমি আর পড়ব না মা।"

বিস্মিত হইয়া গিয়া মায়া বলিলেন, "পড়বি নে—সে কি কথা? ম্যাট্রিকটা পাস করেই মনে করলি বুঝি সব পড়া শেষ হয়ে গেল, আর পড়বার দরকার নেই? এই লেখাপড়াটুকু শিখে মনে করেছিস তুই উচ্চশিক্ষিতা হয়েছিস্? এ জ্ঞান তোকে দিলে কে বল দেখি,—মা বোধ হয়?"

বীথি মুখ তুলিল, নিজের মায়ের নামে অনায়াসে মায়াকে দোষ দিতে দেখিয়া সে বাস্তবিকই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সেই বেদনাটুকু পাইল বলিয়াই তাহার অন্তর হইতে সঙ্কোচটা অত অত শীঘ্র সরিয়া যাইতে পারিল। সে স্থির কণ্ঠে বলিল, "এ জ্ঞান কেউই দেয় নি মা, দিদিমারও খুব ইচ্ছে আমি যেন আরও পড়ি। কিন্তু আমার আর পড়বার ইচ্ছে নেই মা। বেশী পড়লেই যে বেশী শেখা যায় তা আমার মনে হয় না। যা শিখেছি এই আমার পক্ষে যথেষ্ট শেখা হয়েছে।"

গালে হাত দিয়া মায়া বিস্ময়ে কন্যার পানে তাকাইয়া রহিলেন, যেন এ কথাটা শুনিবার আশা তিনি কিছুতেই করিতে পারেন নাই। এমন আশ্চর্য্য কথা তাঁহারই কন্যা হইয়া বীথি মুখে আনিল কি করিয়া? হতাশায় মায়ার বুকটা ভরিয়া উঠিল,—না, বীথি যখন শিক্ষায় উদাসীনতা দেখাইতেছে, তখন আর উহার উন্নতির আশা করা একেবারেই বৃথা। এ রকম যে ঘটা সম্ভব, তাহা ত তিনি পূর্ব্ব হইতেই জানেন। তবে এখানে কেন বীথিকে রাখিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন? মায়ার যেন নিজের হাত নিজে কামড়াইবার ইচ্ছা হইতেছিল,—ছিঃ, মানুষ নিজের কাছেও কি এমন করিয়া প্রতারিত হয়? তিনি তো জানেন, যে মায়ের কাছে তিনি বীথিকে রাখিয়াছেন, সে মায়ের মনটা বরাবরই এই এক ধরণের,—বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার জন্মগত সংস্কারটা আরও বাড়িয়াছে বই কমে নাই। মায়া হাঁ করিয়া শুধু মেয়ের পানে তাকাইয়া রহিলেন,—আর একটা কথাও কহিলেন না। বীথিও নির্ব্বাকে দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময়ে সরলা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন। মায়া দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গীতির দিকে ফিরিয়া শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "এখান হতেই প্রণাম কর গীতি, দেখিস—যেন নিষ্ঠাচারিণী দিদিমাকে ছুঁয়ে ফেলিসনে, তা হলে আবার এই বিকেল বেলায় মাকে স্নান করতে হবে।"

এই শ্লেষপূর্ণ কথা শুনিয়াও সরলার মুখভাব বদলাইল না, তাঁহার মুখের মৃদু-মধুর হাসিও লুপ্ত হইল না—কিন্তু বীথির হৃদয়টা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মায়ের মন এরূপ কেন হইল? সে এই মায়েরই কন্যা ভাবিয়া যেন অনেকটা কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

"না মায়া, ওসব কথা অনর্থক বলছো মা,—কোন দিন আমি তোমাদের ছুঁয়ে স্নান করতে পারি কি? আমার জপ তপ পূজা মন্ত্র সকলের উপরে যে তোমরা, সেটা বোধ হয় জানো না। এসো গীতাদি, আমার বুকের মধ্যে এসো ভাই, একবছর তোমরা কেউ আমার বাড়ীতে এস নি,—কি কষ্টে যে দিন কাটিয়েছি, তা আজ বলতে গেলে একখানা বই হয়ে যায়।"

গীতাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া তিনি তাহার মুখখানা চুম্বনে ভরাইয়া দিলেন।

মায়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বসো মা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

সরলা কন্যার পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, "বাড়ীর সব ভাল তো মায়া, জিতেন ভাল আছে?"

মায়া তেমনি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "হাঁ, সব ভাল আছে।"

বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া সরলা বলিলেন, "খোকাকে আন নি কেন মায়া?"

মায়া বলিলেন, "তার কি কোথাও যাওয়ার সময় আছে? সকাল হতে বেলা নয়টা পর্য্যন্ত মাষ্টারের কাছে পড়বে, দশটায় স্কুলে যাবে, বাড়ী ফিরে এসেই মাষ্টারের সঙ্গে খেলতে যাবে, সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে আবার পড়তে বসবে। আমিই একটু সময় পাইনে যে আসি। কিছুদিন আগে আসব বলে বাড়ী হতে বার হব,—মিস দত্ত এসে পড়লেন, আর আসা হল না,—এমনি এক একটা ব্যাঘাত ঠিক এসে পড়বেই। বীথি আগে তবু সপ্তাহে এক দিন করেও যেত, এখন সাফ ওদিক আর মাড়ায় না। ওকে যে কে কি করেছে জানি নে,—মা বাপ, ভাই বোনগুলোর

ওপর পর্য্যন্ত এতটুকু মায়া নেই। কি দাদামশাই দিদিমাকে সে চিনেছে—!"

কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বীথির মুখের উপর একটা তীব্র কটাক্ষপাত করিলেন।

সরলা বীথির কুণ্ঠিত মুখখানার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "কে আবার কি করবে মা? আমি তো প্রায়ই ওকে তোমার ওখানে যেতে বলি তাকে যেতে নিষেধ তো কোন দিনই আমরা কেউ করি নি।"

মায়া তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিলেন, "বুড়ো হয়ে মা—তোমরা যেমন আজকাল সংসারের সঙ্গে সব সম্পর্ক কাটাচ্ছ—ওর এই তরুণ বয়সে ওকেও তেমনি করে তুলছো। কোথায় এখন সমাজে মেলামেশা করবে, দশজনের কাছে প্রশংসা নেবে, তা নয়—তোমাদের বুড়োর দলে মিশে বুড়ি হয়ে রয়েছে। যেমন কুসংস্কারে ভরা তোমার মনখানি, ওর মনখানিও ঠিক তেমনি করে তুলছো। আগে তো তোমার এত বেশী সংস্কার রোগ ছিল না,—আজকাল এত বেশী হলো কি করে?"

সরলা শান্ত ভাবে হাসিলেন মাত্র।

সে হাসি দেখিয়া মায়া আরও জলিয়া গেলেন, তীব্র-সুরেই বলিলেন, "আজকাল নতুন নতুন সংস্কার কে তোমার মাথায় দিচ্ছে শুনি? এ বাড়ীতে কখনও পূজার্চ্চনা দেখি নি,—সেদিন শুনতে পেলুম, তোমাদের কে গুরুদেব এসে দীক্ষা দিয়ে গেছেন, মহা সমারোহে তুমি এখন মন্ত্রজপ কর, পূজার্চ্চনা কর। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি—বাবার মত লোক এতে প্রশ্রয় দেবেন; কারণ, বরাবরই তিনি কিছু মানতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কোন দিন ব্রহ্মোপাসনাও করেন নি, কোন দিন নারায়ণ শিবপূজাও করেন নি। তোমাদের মত হওয়ার চেয়ে তাঁর যে সেই নাস্তিক হয়ে থাকাই ভাল ছিল। ছিঃ—"

শান্তসুরে সরলা বলিলেন, "তাঁকে এর মধ্যে জড়িয়ো না মায়া, তিনি আগেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি আছেন,—আগে যেমন যে যা করছে শুধু দেখে যেতেন, এখনও তেমনি সব দেখে যান। আমায় তুমি বকতে পার বটে, কিন্তু তুমি তো জানো—তোমার মায়ের এই গোঁড়ামী-টুকু বরাবরই আছে; আর এরই জন্যে বীথির দাদামশাই এখনও সংযত আছেন; নইলে তিনিও যৌবনে কি করতেন বলতে পারি নে। তবু অনেকটা উচ্ছৃঙ্খলতার পথ বেয়ে চলেছিলেন,—আমি সব দিক তাঁর বন্ধ করতে পারি নি। সেই পথে তিনি চলছিলেন,—হয় তো চিরকাল চলতেনও, কিন্তু এই সময়ে বুকে একটা বড় রকমের আঘাত পেলেন, তখন দেখলেন ভুলের পথ বেয়ে তিনি চলেছেন,—সত্য পথে চলতে হবে। তাঁর সে কড়া শাসন তাই আজ শিথিল হয়ে পড়েছে,—তিনি এখন আমার ইচ্ছার উপরেই সব ছেড়ে দিয়েছেন। কিছু বিশ্বাস তিনি কখনই করেন নি, এখনও করেন না,—নির্লিপ্ত ভাবে তিনি তাঁর বাইরের ঘরটীতে বসে লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছেন।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘা পেয়েছেন?"

তেমনি অবিচলিত কণ্ঠে সরলা বলিলেন, "সে বড় ভীষণ আঘাত মা,—আমি বুঝতে পারি সে আঘাতে তাঁর বুকের পাঁজর সব ভেঙ্গে গেছে। উচ্চ মোহে ভুলে যখন তিনি জিতেনের সঙ্গে তোমায় বিলাতে পাঠাতে চেয়েছিলেন, তখন আমি তাঁর পা দু'খানা চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলুম—যেন তোমায় তিনি সেখানে না পাঠান। যেখানে গিয়ে দেশের তরলমতি ছেলেরা নিজেদের অনেক সময় ঠিক রাখতে পারে না, সেখানে গিয়ে মেয়েরাও যে নিজেদের ভুলে যাবে তাতে সন্দেহ নেই। আমার কথা তিনি কাণে নিলেন না, শুধু একটু হেসে বললেন, 'তুমি কাঁদছো কেন? মায়ার জীবনের ভিত্তি আমি নিজের হাতে গেঁথে তুলেছি, এ ইমারত কাঁচা নয়,—পাকা; এর ওপর যতই কেন ভার চালাও না, এ কখনও ভেঙ্গে পড়বে না। দেশের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা আমার বীজমন্ত্র। তুমি দেখো, মায়া উপযুক্ত শিক্ষিতা হয়ে এসে এই দেশকে সুশিক্ষা দেবে, দেশের মেয়েদের উন্নত করে তুলবে।' তিনি আরও বলেছিলেন,—'আমার মায়া বিলাসিনী হতে পারবে না, কারণ, আমি তাকে বিলাসে ঘৃণা করতে শিখিয়েছি।' আমার সব কথা ঝেড়ে ফেলে তিনি আমার বুক হতে আমার চিরশান্তশীলা, লজ্জানম্রা ধর্ম্মিষ্ঠা মেয়েকে কোথায় পাঠালেন, সেখানে গিয়ে সে কি হয়ে এলো? ঘৃণায় লজ্জায় মনের দুঃখে তিনি নিজেই আমার হাত দুখানা ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আমি যা ভেবেছিলুম তার কিছু হ'ল না।' তাঁর দু'চোখ বেয়ে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল,—সে কি রকম আঘাতের ফলে

মায়া, মনে বুঝে দেখ—ধার্ম্মিকা সংযতা লজ্জাবতী মেয়ের পরিবর্ত্তে তিনি আজ দেখছেন যাকে—এ ধর্ম্ম হারিয়েছে, সংযম হারিয়েছে, লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়েছে, একমাত্র ভোগ-বিলাসকে নিজের জীবনের কাম্য বলে জেনেছে। আর অজস্র অর্থব্যয়ে নিজের লালসা পরিতৃপ্ত করছে। এ কি আমার সেই মেয়ে,—না তার দেহের মধ্যে এক ক্ষুধার্ত্তা রাক্ষসী নিজের বাসনা মিটানোর আশায় এসে আশ্রয় নিয়েছে?"

মায়া নত মস্তকে স্থাণুর ন্যায় বসিয়া রহিলেন। সরলা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তার পর—তুমি মা হয়ে যাদের বিলাসিতা শিক্ষা দিচ্ছো—মনে করো—তারা আবার এক একটী সংসারের পিতামাতা হবে, তাদের দ্বারা এই বিলাসিতা আত্মতৃপ্তির বীজাণু বহুতে ছড়িয়ে পড়বে। একে এর উদ্ভব, বহুতে বিস্তার। কতগুলি সংসার তোমার দ্বারা অশান্তিতে পূর্ণ হবে সেটা ভেবে দেখ। যাক গিয়ে,—আর এ বিষয়ে কথা বলব না। আজ তুমি অনেক দিন পরে আমার কাছে এসেছ, এ স্মরণীয় দিনটাকে তিক্ত করে তোলা উচিত নয়। হ্যাঁ, বীথির কথা তুমি কি বল্‌তে চাচ্ছিলে, বল।"

মায়া অবনত মুখ তুলিয়া বীথির পানে তাকাইলেন। মনের মধ্যে যে সঙ্কোচ লজ্জা আসিয়াছিল, জোর করিয়া তাহা দূর করিয়া দিয়া শান্ত-কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ—সেই কথাই হোক। তোমার জামাই একটা কথা বল্‌তে পাঠিয়েছেন মা, সেই কথাই আজ তোমায় বল্‌তে এসেছি। বীথির বিয়ের কথা হচ্ছে, তিনি—"

যেমন বিবর্ণ মুখে সরলা মায়ার পানে চাহিলেন, তাহাতে মায়া প্রথমটা থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেলেন। একটু পরে ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "তাই তিনি বলে পাঠিয়েছেন—বীথিকে নিয়ে যেতে হবে, ও-বাড়ীতে আমাদের কাছে তাকে এখন থাকতে হবে, কারণ, ওখান হতেই বিয়ে হবে কি না।—"

বীথি মাথা নাড়িয়া সবেগে বলিয়া উঠিল, "না মা, আমি বিয়ে করব না। কতদিনই তো বলেছি যে—"

কন্যাকে কোলের দিকে টানিয়া লইয়া সযত্নে তাহার ললাট হইতে চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে মায়া সস্নেহ হাসিয়া বলিলেন, "দূর পাগলি, বিয়ে করবি নে এ কথা কখনও হতে পারে?"

বীথি ব্যাকুল ভাবে দিদিমার পানে চাহিয়া বলিল, "না, সত্যি দিদিমা, তুমি তো জানো—"

অশ্রুভারে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। সরলা ব্যথাভরা হাসি হাসিয়া বলিলেন, "তাই কি হয় দিদিমণি, ও কথা তোমার বলা সাজে না। তোমায় তবে এতকাল ধরে শিখালুম কি, বুঝালুম কি, যদি নাই কিছু বুঝলে, শিখলে?"

বীথি একটু নীরব রহিল, তাহার পর বলিল, "বেশ, বিয়ে হয় হবে, তা ও-বাড়ীতে গিয়ে কেন, এ-বাড়ীতে হতে পারবে না?"

মায়ার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, কঠোর স্বরে তিনি বলিলেন, "বেশ, ও-বাড়ীতে কি আছে যে তুমি ও-বাড়ীতে যেতে চাও না?"

বীথি কি বলিতে যাইতেছিল, মাঝখানে বাধা দিয়া সরলা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "ও বীথি, সব তাইতে ও-রকম ছেলেমানুষি করলে কি চলে? অবুঝের মত তুমিও যদি ও-রকম করবে তবে যাই কোথায়? পাগলামী করো না, তোমার মায়ের কথা শোনো। সকল গুরুর গুরু মা,—মায়ের সঙ্গে যেমন নিকটতম সম্পর্ক তোমার, এ রকম আর কারও সঙ্গে নয়। তুমি বুঝতে পারছ না, এতে তুমি আমাদের মা-সন্তানের মাঝখানে কতটা দূরত্ব জাগিয়ে দিচ্ছ। যদি মানুষ হও, যদি তোমার প্রকৃত জ্ঞান থাকে, তবে এইখানেই তোমার সেই জ্ঞানের পরিচয় দাও। তোমার দিদিমাকে যদি ভালবেসে থাক, তবে সকল রকম আঘাতের হাত হতে তোমার দিদিমাকে বাঁচাও।"

বীথি মায়ার সম্মুখে মাথা নত করিল, "আমি যাব মা, আর আমার কোনও আপত্তি নেই।"

নিজের মেয়ের উপর নিজের চেয়েও মায়ের আধিপত্য বেশী দেখিয়া মায়ার হৃদয়খানা নিমেষের তরে জ্বলিয়া উঠিল, তথাপি শান্তমুখে তিনি বলিলেন, "শুনে ভারি খুসি হয়েছি। তা হলে কাল সকালে গাড়ী আসবে—যেয়ো। কাল অনিলও আসবে লিখেছে, তোমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেব, তখন নিশ্চয়ই তুমিও বুঝবে, মাও বুঝবেন—আমরা অপাত্রে তোমায় দেবার কামনা করি নি। আমি যাই হই না কেন, তবুও, মা যেমন আমার ইষ্ট ছাড়া ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন না, আমিও তেমনি তোমাদের দুটি বোন আর একটী ভাইয়ের ভাল ছাড়া

প্রার্থনা করি নে। তুমি আমায় পর বলে ভাবতে পার বীথি, কেন না, আমি তোমায় গর্ভেই ধরেছি মাত্র, তোমায় লালন পালন করি নি, তবুও জেনো—আমি তোমার মা, এতটুকু কিছু হলে আমার বুকটা অসহ্য ব্যথায় কেটে যায়। তোমার ভাল হলে আমার বুকটা দশহাত হয়ে ওঠে,—কেউ তোমার প্রশংসা করলে আমি আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি; কারণ, আমি তোমার লালন পালন না করলেও আমি তোমার মা।"

মায়ার কণ্ঠস্বরটা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া অন্যমনস্ক ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

গৃহমধ্যে কেহই অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারেন নাই,—মায়ার কথাগুলি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে সরলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "অনিল কে?"

মায়া শুষ্ককণ্ঠে উত্তর দিলেন, "তাকে চেন না মা? সে বি, চৌধুরীর একটী মাত্র ছেলে, অগাধ সম্পত্তি তার। তার ওপর ছেলেটী সেদিন বিলেত হতে মস্ত বড় ডাক্তার হ'য়ে ফিরেছে। ভারি সুন্দর ছেলে, চমৎকার স্বভাব, নিখুঁত চরিত্র। হাজারের মধ্যে তার মত বিনয়-নম্র অথচ মিগুনে স্বভাবের একটী ছেলে পাওয়া যায় না। কাল তার বহে হ'তে আসবার কথা আছে। তুমি একদিন যেয়ো না মা, দু' দণ্ড কথাবার্ত্তা বলে দেখ, শেষে নিজেই তাকে আর ছাড়তে চাইবে না।"

আরও ঘণ্টাখানেক থাকিয়া মায়া বিদায় লইলেন।

তাঁহাদের মোটরে উঠাইয়া দিয়া আসিয়া বীথি নিজের গৃহে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। (ক্রমশঃ)

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী *

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বি-এ

"Man may come and man may go
But I go on for ever."

ইহাই হইতেছে প্রেমের চিরন্তন শাশ্বত বাণী। জগতের বিবিধ প্রকার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে; একের পর অন্য আসিতেছে, কিন্তু প্রেম সেই চির-পুরাতন পোষাক লইয়াই সকলকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। সৃষ্টির আদিম প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমের এই চিরক্রন্দন ও মিলন-খেলা চলিতেছে।

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী প্রেমিক কবি। খোদা-তায়ালার জন্য যে বিরহ-বেদনা তাঁহার প্রাণে বাজিয়াছে, তাহাই তাঁহার অতুলনীয় "মসনভী"তে রূপ পাইয়াছে। তাঁহার ব্যাকুল বাঁশরী সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ "মসনভী"র প্রথমেই গাহিয়াছেন,—

"বশোনো আজ্ নায় চুঁ হেকায়েত মি কুনাদ,
ও আজ্ জুদাহায় শেকায়েত মি কুনাদ।
কে আজ্ নিস্তান তা মারা ববুরিদা আন্দ,
আজ্ নফিরম্ মর্দওজন্ নালিদা-আন্দ।
সিনা খাহাম্ শরহে শরহে আজ্ ফারাক্,
তা বগোয়েম্ শরেহ দরদে ইস্তিয়াক।
হর কাসে কে দূর মানদ আজ্ আসলে খেশ,
বাজ জুয়েদ্ রোজগারে ওস্‌লে খেশ।
মান বহরে জমিয়তে নালাঁ শোদাম,
জোফ্‌তে খোশ্ হালাঁ ও বদ হালাঁ শোদাম।
সেনূরে মান্ আজ্ নালায়ে মান্ দূর নিস্ত,
লায়েক্ চশ্‌ম্ ও গোশ্‌রা আঁনূর নিস্ত।
তন্ যে জান্ জান্ যে তন্ মস্তর নিস্ত,
লায়েক কাস্‌রা দিদ্ দস্তর নিস্ত।

Hearken to the reed flute, how it discourses
When complaining of the pains of separation—
Ever since they tore me from my osier bed,
My plaintive notes have moved men and
women to tears.

* এই প্রবন্ধ লিখিতে অধ্যাপক আগা মোহাম্মদ কাজেম সিরাজী সাহেব ব্যক্তিগতভাবে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।—লেখক।

I burst my breast, striving to give vent to sighs,
And to express the pangs for my yearning
for my home.
He who abides far away from his home
Is ever longing for the day he shall return.
My wailing is heard in every throng,
In concert with them that rejoice and
them that weeps.
Each interprets my notes in harmony with
his own feelings.
But not one fathoms the secrets of my heart.
My secrets are not alien from my plaintive notes,
Yet they are not manifest to sensual ear.
Body is not veiled from soul, neither soul
from body,
Yet no man hath ever seen a soul. *

(২)

মৌলানা রুমীর পিতার নাম বাহাউদ্দীন। তাঁহাদের আদিম বাসস্থান বল্‌খ সহরে ছিল। তাঁহার পিতা অত্যন্ত বিদ্বান, শক্তিশালী বক্তা এবং অসামান্য ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। সম্রাট হইতেও তাঁহার প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তি বেশী ছিল। (১) তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াই বল্‌খেশ্বর তাঁহার একমাত্র কন্যারত্নের সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। (২) তিনি ইসলামে নূতন প্রথার (বেদায়তে) সহিত আপ্রাণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; এইজন্য তৎকালীন ভণ্ড "ওলামা" (মুসলমান শাস্ত্রবিদ্) গণের নিকট প্রিয় ছিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন। সম্রাটকে তিনি কিছুমাত্র ভয় করিতেন না; এমন কি ইসলাম-বিরুদ্ধ কোন কাজ করিলে তাঁহারও রক্ষা ছিল না। এই সব নানাবিধ কারণে বল্‌খ-সম্রাট তাঁহাকে ছলে-ছুতায় রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। তাঁহার শহর পরিত্যাগের সংবাদ শ্রবণ করিয়া দলে দলে লোক তাঁহার অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তিনি তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া নিরস্ত করেন এবং মাত্র কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া যাত্রা করেন। (৩)

এশিয়া-মাইনরে আসার পথে তৎকালীন বিখ্যাত সুফী ও কবি ফরিদউদ্দীন আত্তারের সহিত নিশাপুরে বাহাউদ্দীন সাহেবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সময় জালাল-উদ্দীনের বয়স ছয় বৎসর ছিল। (৪) কবি আত্তার অন্তদৃ'ষ্টি-বলে জালালউদ্দীন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন, "এই বালক কালে একজন মহাপুরুষ হইবে।" (৫) উত্তরকালে যে তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ করিবারও কোন কারণ নাই। সুফী আত্তার তাঁহার বিখ্যাত "আসরার-নামা" বালককে স্নেহাশীষ স্বরূপ উপহার দিয়াছিলেন। (৬)

১২১২ খৃষ্টাব্দে বাহাউদ্দীন এশিয়া-মাইনরে কিছুদিন অবস্থান করেন। মালাটায় কিছুদিন বাস করিবার পর তিনি আর্ম্মেনিয়ার আরজিনগাতে অবস্থান করেন। এশিয়া-মাইনরের লরান্দা কলেজের অধ্যক্ষ হইবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ আসিলে তিনি লরান্দায় চলিয়া যান। (৭)

মৌলানা বাহাউদ্দীন নিশাপুর পরিত্যাগ করিয়া বাগদাদে চলিয়া আসেন। এইখানে পৌছিয়াই চেঙ্গিসখান কর্ত্তৃক বল্‌খ ধ্বংসের খবর শুনিতে পান (৬০৮ হিঃ); (৮) এবং বাগদাদে কিছুকাল অবস্থান করেন। বাগদাদের সমস্ত আমির ওমরাহ, আলেম ফাজেল (বিদ্বানমণ্ডলী) তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মারেফাত (তত্ত্বজ্ঞান) বিষয়ক আলোচনা শুনিতেন।

* The Masnavi by E. H. Whinfield. M. A., I. C. S.

(১) Encyclopædia Britannica (11th. Edition) P 850. Masnavi by E. H. Whinfield. P. xii.

(২) Masnavi by Sir James Redhouse. p. viii.

(৩) Diwan-i-Shams i-Tabriz by R. A. Nicholson. p. xvi.

(৪) Vide Sawanehi Mowlana Rum by Prof. Shibli Noamani. p. 3.

(৫) Vide Literary History of Persia, vol. II, by Prof. E. G. Browne. p. 515. Rumi by F. H. Davis. p. 34.

(৬) Ibid

(৭) Encyclopædia Britannica p. 850.

(৮) Vide Masnavi by E. H. Whinfield pp xxxix—xl. Diwan—i—Shames-i-Tabriz by R. A. Nicholson. p. xvii.

ঘটনাক্রমে রুমের (Iconium) সোলতান-প্রেরিত দুইজন লোক মৌলানা সাহেবের এই আলোচনায় গোপনে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা দেশে যাইয়া সম্রাটকে সমস্ত খুলিয়া বলিলে তিনি মনে মনে তাঁহার মুরিদ (শিষ্য) হইয়া গেলেন (৯) এবং তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্ম লোক প্রেরণ করিলেন। শেখ বাহাউদ্দীন বাগদাদ হইতে হেজাজ, হেজাজ হইতে শাম হইয়া জন্‌জানে আসেন। জনজান্‌ হইতে আক্‌ শহরে আগমন করেন। এই স্থানে সম্রাট কখর-উদ্দীনের স্ত্রী তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করেন। এইস্থানে তিনি পূর্ণ এক বৎসর কাল থাকেন। জন্‌জান হইতে মৌলানা লরান্দায় চলিয়া আসেন। এই সময় মৌলানা রুমীর বয়স ১৮ বৎসর *। এই বৎসরই বাহাউদ্দীন সমরখন্দবাসী লালা সরফ-উদ্দীনের কন্যা জওহর খাতুনের সহিত তাঁহার পুত্র মৌলানা রুমীর পরিণয় কার্য্য সমাধা করেন। মৌলানা রুমীর পুত্র সোলতান ওয়ালেদ এইখানেই ৬২৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম স্ত্রীর অকাল-মৃত্যুর পর কীরা খাতুন নাম্নী মহিলাকে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। (১০) সম্রাট কায়কোবাদের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়া বাহাউদ্দীন কুনিয়ায় চলিয়া আসেন। কায়কোবাদ তাঁহার আগমন-সংবাদ শুনিয়া সমস্ত পারিষদসহ অগ্রসর হইয়া শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে শহরে লইয়া আসেন। শহরের নিকটবর্ত্তী হইয়া কায়কোবাদ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে তাঁহার রেকাবের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অবস্থানের জন্ম সম্রাট এক জাঁকজমকশীল প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য দিয়াছিলেন। (১১) ৬২৮ হিজরীতে ১৮ই রবিয়স্‌সানী জুমার দিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৯) Vide Sawanehi Mowlana Rum, by Prof. Shibli Noamani, p. 5.

*অধ্যাপক শিব্‌লী নোমানী মৌলানার বয়স ১০ বৎসর বলিয়াছেন; কিন্তু অধ্যাপক ই, জি, ব্রাউন সাহেব ২১ বৎসর লিখিয়াছেন। Vide Literary History of Persia. Vol. ii by E. G. Browne, p. 515.

(১০) Vide Diwan-i-Shams. Tabriz. by R. A. Nicholson. p. xvi.

(১১) Vide Sawanehi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noamani. Pp. 5—6.

(৩)

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী ৬০৪ হিজরীতে বল্‌খ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। সইয়দ বোরহানউদ্দীন শেখ বাহাউদ্দীনের একজন প্রতিভাশালী ও অসামান্ত পণ্ডিত শিষ্য। তাঁহার হস্তেই শেখ বাহাউদ্দীন তাঁহার পুত্র রুমীর শিক্ষার ভার অর্পণ করেন। সইয়দ বোরহানউদ্দীন মৌলানা রুমীর উস্তাদ। রুমী তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮ কি ১৯ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার পিতার সহিত কুনিয়া চলিয়া আসেন। যখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর। উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় তিনি শামদেশে যান। (১২)

এই সময় দামেস্ক ও হেলবেবো জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল। (১৩) ইবনে জুবের যখন ৫৭৮ হিজরীতে ভ্রমণ করিতে করিতে দামেস্কে উপনীত হন, তখন এই একমাত্র শহরেই অনেক বড় বড় মাদ্রাসা কলেজ দেখিয়াছিলেন। (১৪) সুলতান সালাহ্‌ উদ্দীনের পুত্র আল-মালেক অল জাহের, কাজী আবুল হোসেনের চেষ্টায় ৫৯১ হিজরীতে অনেকগুলি বড় বড় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। [ইব্‌নে খাল্লিকান দ্রষ্টব্য।] এক কথায় হেলবেবোও দামেস্কের মত বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছিল।

মৌলানা রুমী প্রথমে হেল্‌বেবো যাইয়া 'মাদ্রাসা-ই-হালিয়া'র 'দারুল-কামতায়' (Boarding House) অবস্থান করেন। (১৫) এই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক কামালউদ্দীন ইবনে আদিম হলবী ছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ নাম ওমর-বিন্‌-আহমদ-বিন্‌-হাতিবিল্লা। ইব্‌নে খাল্লিকান লিখিয়াছেন "তিনি একজন বিখ্যাত 'মহাদেস, হাফেজ, ফকিহ, মুফ্‌তী, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও কাতিব ছিলেন।" তিনি হেল্‌বেবোর যে ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার এক অংশ ইয়োরোপে ছাপা হইয়াছে। (১৬)

(১২) Ibid p. 6.

(১৩) Vide Munaqabil Arafin p. 52 quoted by Prof. Shibli.

(১৪) Vide Damasc in Safar-Namah-i-Ibn Zabir quoted by Prof. Shibli.

(১৫) Vide Sepah Salar p. 39 quoted by Prof. Shibli.

(১৬) Vide Sawanehe Mowlana Rum. by Prof. Shibli, Pp. 6—7.

মৌলানা রুমী মাদ্রাসা-ই-হালবিয়া ব্যতীত হেলেবোর অন্যান্য মাদ্রাসায়ও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রজীবনে আরবী, ফেকাহ ও তফসিরে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, কোন কঠিন মসলা (ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন) অন্য কেহ সমাধান করিতে না পারিলে, তখন তাহা তাঁহার নিকট লইয়া আসা হইত। (১৭) দামেস্কে তিনি সাত বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। (১৮)

(৪)

মৌলানা সাহেবের পিতা যখন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তখন সইয়দ বোরহানউদ্দীন আপন জন্মভূমি তিরমিজে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর খবর পাইয়া তিনি তিরমিজ হইতে কুনিয়া চলিয়া আসেন। মৌলানা রুমী এই সময় লবান্দায় ছিলেন। সইয়দ বোরহান-উদ্দীন মৌলানাকে পত্র লিখিলেন এবং নিজের পৌঁছা সংবাদ দিলেন। মৌলানা পত্র পাইয়াই রওয়ানা হইলেন এবং কুনিয়া আসিলেন। সাগরেদ ও উস্তাদে মিলন হইল, পরস্পর পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইলেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বাহ্যজ্ঞান-বিবর্জিত হইয়া রহিলেন। ইহার পর সইয়দ, মৌলানাকে পরীক্ষা করিলেন; এবং যখন তাঁহাকে সমস্ত বিষয়ে সুপণ্ডিত দেখিলেন, তখন বলিলেন "ইল্‌মেবাতেনী (আধ্যাত্মিক বিদ্যা) শিক্ষা তোমার বাকী আছে। তোমার পিতা আমার নিকট ইহা গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তোমাকে ইহা শিক্ষা দিব। আর সমস্ত বিদ্যাই তুমি শিখিয়াছ।" তিনি নয় বৎসর তাঁহাকে সলুক, তরিকত সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। (১৯)

এতদিন পর্য্যন্ত মৌলানার উপর জাহেরী বিজ্ঞানের প্রভাবই বেশী ছিল। কিন্তু এই বিজ্ঞান তাঁহাকে আত্মার আনন্দ ও প্রাণের শান্তি দান করিতে পারিতেছিল না। জ্ঞানের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিলেও কি যেন একটা অভাব তিনি সর্ব্বদা অনুভব করিতেছিলেন। কাজেই ক্রমে ফিরিয়া আসিয়া তসওয়াফের (Sufi-ism) আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। (২০) তসওয়াফ বা সুফী ধর্ম্ম-মতবাদ কঠোর ইস্‌লাম ধর্ম্মভূমিতে উপ্ত হইয়াছিল; কালে ইহা প্রাচ্য সৌন্দর্য্য ও পুষ্পলতা লইয়া পরিপূর্ণ রূপে বিকশিত হইয়াছিল। (২১)

ক্রমে তিনি যথাক্রমে তিনটী কলেজের অধ্যাপকতা করেন। (২২) তাঁহার চারিশত মুরিদ ছিল। (২৩) তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবনের এক অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইতে চলিল, এক কথায় জীবনের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। শামস্ তেব্রিজের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াই তাঁহার এ পরিবর্ত্তনের কারণ। ঐতিহাসিক ও চরিত-আখ্যায়িকেরা এরূপ পরস্পর-বিরোধী ঘটনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। (২৪)

শামস তেব্রিজের সহিত মৌলানা রুমীর আলাপ ক্রমে হইয়াছিল। দামেস্কে তাহার পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বাক্যালাপ করেন নাই। তেব্রিজের সহিত রুমীর সৌহার্দ্দ দিন দিন অধিকতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং পনর মাসকাল স্থায়ী ছিল। পনর মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়। (২৫)

"জওহর-ই-মজিলা" হানাফী আলেমদের একখানি প্রামাণিক ও বিশ্বাস্য গ্রন্থ। তাহাতে লিখিত আছে যে, একদিন মৌলানা রুমী আপন ঘরে বসিয়া ছিলেন; চতুর্দ্দিকে কিতাব-পত্রাদি ছড়ান ছিল। ঘটনাক্রমে শামস-ই-তেব্রিজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মৌলানার দিকে মুখ ফিরাইয়া কিতাবগুলির দিকে লক্ষ্য করিয়া

(১৭) Vide Sepah Salar p. 16.

(১৮) Vide Munaqabil Arafin Pp. 55-56.

(১৯) Vide Sawanehi Rum. p. 8.

(২০) Vide Ency. Britannica. p. 850. Diwan-i-Shams-Tabriz by R. A. Nicholson. p. xviii.

(২১) Vide Diwan-i-Shams-Tabriz. by Nicholson p xviii.

(২২) Vide Ency. Britannica p. 850.

(২৩) Vide Diwan—i—Sham-Tabriz, by Nicholson p. xviii.

(২৪) Vide Sawanehi Mowlana Rum. by Prof. Shibli Noaman pp. 8—9.

(২৫) Literary History of Persia vol. II, by Prof. E. G. Browne p. 517.

বলিলেন "এ সব কি ?" মৌলানা উত্তর দিলেন, "এ সব এমন জিনিষ যা আপনি জানেন না।" এই কথা বলা মাত্র সমস্ত কিতাবে আগুণ লাগিয়া গেল। মৌলানা বলিলেন "এ কি ?" শামস বলিলেন "ইহা তুমি জান না।" এইমাত্র বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। মৌলানার এমন অবস্থা হইল যে, তিনি ধনসম্পত্তি স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। দেশবিদেশে শামসের সন্ধান লইতে লাগিলেন, কিন্তু কোন খোঁজই পাইলেন না। কেহ কেহ বলেন যে, মৌলানার মুরিদদিগের মধ্যে কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া থাকিবে। (২৬)

মৌলানা জয়নাল আবেদীন শিরওয়াণী মৌলানা রুমীর "মসনভির" ভূমিকায় লিখিয়াছেন, শামসউদ্দীনের পীর বাবা কামালউদ্দীন তাঁহাকে হুকুম করিয়াছিলেন যে, রুমে একজন 'দিলসুখ্তা' (heart-burnt) আছে, তাহাকে তুমি সঞ্জীবিত করিয়া আইস।" শামস ভ্রমণ করিতে করিতে রুমে আসিয়া পড়িলেন এবং চিনি-বিক্রেতাদের চটীতে রহিলেন। একদিন মৌলানা রুমীর সোয়ারী অত্যন্ত জাঁক-জমকের সহিত চলিয়া যাইতেছিল। শামস রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মজাহদ (ভক্ত) ও রিয়াজাতের (সাধকের) কি পরিণতি ?" মৌলানা বলিলেন "শরিয়ত অনুসরণ।" শামস বলিলেন "ইহা ত সকলেই জানে।" মৌলানা বলিলেন "ইহা হইতে বড় আর কি হইতে পারে ?" শামস বলিলেন "জ্ঞানের অর্থ তোমাকে গন্তব্য পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া।" তৎপরে বিখ্যাত পারস্য কবি হাকিম সানাইএর নিম্নলিখিত কবিতা ছত্র বলিলেন

"ইলম কেজ তু তারাণা বস্তান্দ,
জেহল আঁজা ইলম বেহ্ বুদ বেসিয়ার।"

[যদি তোমার খোদা-জ্ঞান তোমার নিজের সত্ত্বাকে ভুলাইয়া না দেয়, তবে জ্ঞানহীনতাই সে জ্ঞান হইতে ভাল।]

মৌলানার উপর এই কথার এতদূর প্রভাব পড়িল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ শামসের হাতে 'বইয়ত' করিয়া মুরিদ হইলেন। (২৭)

অন্য গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে, মৌলানা হাউজের কিনারে বসিয়া ছিলেন; সম্মুখে কয়েকখানা কিতাব ছিল। শামস জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কি কিতাব ?" মৌলানা বলিলেন "ইহা জঞ্জাল। ইহাতে আপনার কি গরজ পড়িয়াছে ?" শামস কিতাবগুলি উঠাইয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে মৌলানা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন "মিঁয়া দরবেশ! আপনি এমন জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন যে, কোথাও আর ইহা পাওয়া যাইবে না। এই কিতাবসমূহে এমন অমূল্য আলোচনা ছিল যে, তাহার তুলনা নাই।" শামস হাউজের মধ্যে হস্ত নিক্ষেপ করিলেন এবং সমস্ত কিতাব বাহির করিয়া আনিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিতাব যে রকম শুষ্ক ছিল ঠিক্ তদ্রূপই আছে, সিক্ত হইবার কোন চিহ্নই নাই। মৌলানা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া গেলেন। শামস বলিলেন "ইহা আধ্যাত্মিকতা। তুমি ইহার কি জান ?" ইহার পর মৌলানা তাঁহার শিষ্য শ্রেণিভুক্ত হইলেন। (২৮)

ইবনে বতুতা ভ্রমণ করিতে করিতে যখন রুমে গিয়াছিলেন, তখন মৌলানা রুমীর কবর জিয়ারত করিয়াছিলেন। তিনি মৌলানা সম্বন্ধে এই উপলক্ষে কিছু বলিয়াছেন এবং মৌলানা ও শামসের মিলন প্রসঙ্গে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল, তাহা অতি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। "মৌলানা আপনার মাদ্রাসায় শিক্ষা দান করিতেন। এক দিবস এক হালুয়া-বিক্রেতা মাদ্রাসায় আসিয়াছিলেন। তিনি হালুয়া টুকরা টুকরা করিয়া বিক্রয় করিতেছিলেন। মৌলানা এক টুকরা লইয়া আহার করিলেন। এদিকে হালুয়াকর চলিয়া গেলে মৌলানা অনিচ্ছা সত্বেও দণ্ডায়মান হইলেন, এবং কোন্ দিকে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে যখন তিনি ফিরিলেন, তখন প্রায়ই কোন কথাবার্ত্তা বলিতেন না। যখন কথা বলিতেন, তখন কবিতাই বলিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ কবিতা লিখিয়া লইতেন,—সেইগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া মসনভী নামে অভিহিত হইয়াছে।" এই বিষয় বর্ণনা করিয়া ইবনে বতুতা লিখিয়াছেন যে, ঐ মুলুকে মসনভির যথেষ্ট সমাদর; লোকে খুব সম্মান সহকারে ইহা অধ্যয়ন

(২৬) Sawanehi—i—Mowlana Rum by Prof Shibli. Noaman p. 9.

(২৭) Vide Sawanehi Mowlana Rum p. 9—10.

(২৮) Ibid pp. 9—10.

করে এবং জুমার রাত্রিতে লোকে খানকায় (চণ্ডীমণ্ডপ বা আশ্রম) একত্র হইয়া তালাওয়াত (অভিনিবেশসহকারে অধ্যয়ন) করে। (২৯)

যে সমস্ত গল্প উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটী বিশ্বস্ত গ্রন্থ হইতে, কতকগুলি তাজকেরা হইতে এবং কতকগুলি মৌখিক গল্প হইতে গৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের বিশ্বাস হয়, তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন এবং যাঁহাদের অবিশ্বাস হয়, তাঁহারা পরিত্যাগ করিতে পারেন। তবে সিপাহসালার যাহা বলিয়াছেন তাহা গ্রহণযোগ্য—কেন না তিনি মৌলানার শিষ্য ও সমসাময়িক ব্যক্তি এবং শামস তেব্রিজকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

(৫)

শামস তেব্রিজের বংশ-বিবরণ অনিশ্চিত। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পিতা কিয়া রোজর্গ গোষ্ঠী-উদ্ভূত। আলা-উদ্দীন তাঁহার গোত্র (Sect) ইসমাইলী সম্প্রদায় পরিত্যাগ করেন এবং তাহাদের পুস্তক পোড়াইয়া ফেলেন এবং খোদা-বিদ্রোহীদের মধ্যে খাঁটী ইস্‌লামের প্রচার করেন। এইজন্য তাঁহার নাম "নও মুসলমান" হইয়াছিল। (৩০) তিনি অলোকসামান্য রূপবান শামস তেব্রিজকে গোপনে তেব্রিজে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়া দেন। (৩১) এই মত অনুসারে তিনি তেব্রিজে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় তাঁহার পিতা কাপড়-ব্যবসায়ী (বজ্জাজ) ছিলেন।

বিখ্যাত পারস্য কবি মৌলানা জামী তাঁহার 'নহফাতুল উন্‌স' নামক গ্রন্থে শামসউদ্দীনের সম্পূর্ণ নাম শামস-উদ্দীন-মহম্মদ বিন-আলি-বিন-মালিকদার তেব্রিজ লিখিয়াছেন। বিখ্যাত "তাজকেরা তোশ্‌শোয়ারা" লেখক ঐতিহাসিক দৌলতশাহ লিখিয়াছেন "শামস স্ত্রীলোকদের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে স্বর্ণ-খচিত কারুকার্য্য শিখিয়াছিলেন। এই জন্যই তাঁহার ডাক নাম 'জরদোর'। (৩২) বাবা কামাল উদ্দীন জোনাদীর নিকট তিনি শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত হন। তিনি অনেক দেশ-ভ্রমণ করিয়াছিলেন; এই জন্য 'পরিন্দা' (flier) উপাধি পাইয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারময় ছিল। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত তীব্র ও তীক্ষ্ণ। তিনি বিশেষ শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক শক্তি এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, তিনি খোদা-তায়ালার বিশেষ নিয়োজিত ব্যক্তি এবং মুখপাত্র। এই বিশ্বাসই সাধারণের উপর অত্যন্ত কার্য্যকরী হইয়াছিল। যাঁহারা তাঁহার দলে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা তাহা অনুভব করিতেন।" (৩৩) অধ্যাপক নিকল্‌সন তাঁহাকে সক্রেটীসের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শামস তেব্রিজ কাল চর্ম্মের জামা পরিতেন। কুনিয়ার দাঙ্গায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৬)

মৌলানা রুমী শামসকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরহে তাঁহার গুপ্ত কবি-প্রতিভা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। "তাজকেরা" লেখকেরা লিখিয়াছেন, পাথরের মধ্যে যেমন আগুন নিহিত থাকে, তেমনি মৌলানার মধ্যে কবিত্বশক্তি লুক্কায়িত ছিল; কিন্তু শামসের সংস্পর্শ ও বিরহ-চকমকির আঘাতে তাহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রকাশ হইয়া পড়ে। (৩৪)

একদিন মৌলানা শামসের বিরহে অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায়ই সালাহউদ্দীন জর-কোবের (স্বর্ণকার) দোকানে যাইয়া উপনীত হন। হাতুড়ীর তালে তালে আঘাত তাঁহার নিকট গানের মত প্রতীয়মান হইতেছিল। সালাহউদ্দান ইহা বুঝিতে পারিয়া ক্রমাগত রৌপ্যপাত কাটিতে লাগিলেন। তাহাতে যথেষ্ট রৌপ্য নষ্ট হইয়া গেল, তবুও তিনি তাহা হইতে বিরত হইলেন না। তিনি বাহিরে আসিয়া মৌলানার সহিত আলিঙ্গন-বদ্ধ হইলেন। মৌলানা আনন্দ-আতিশয্যে এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

"একে গঞ্জে পদিদ আমাদ আজ ইঁ দোকানে জরকুবি,
জহী সুরত জহী মানী জহী খুবী জহী খুবী।"

[এই স্বর্ণকারের দোকান হইতে এক অমূল্য রত্ন আমার নিকট প্রকাশ হইয়াছে। তাহার আকৃতি কি সুন্দর, তাহার অন্তর কত মধুর এবং সে কত মহৎ।]

(২৯) Vide Ibid pp. 10—11.
(৩০) Vide Literary History of Persia vol, II by Prof Browne p. 516-517.—Rum by Prof. Shibli pp. 12-13.
(৩১) Vide Diwan—i—Shams Tabriz by Prof. Nichogon p. xx.
(৩২) Ibid p. xx.
(৩৩) Ibid.
(৩৪) Vide—Rum; by Prof. Shili p. 18.

সালাহউদ্দীন সেই দিন তাঁহার দোকানের সমস্ত দ্রব্যাদি বিলাইয়া দিলেন এবং মৌলানার সঙ্গী হইয়া গেলেন। সইয়দ বোরহানউদ্দীনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল; এই হিসাবে তিনি মৌলানার 'হাম-ওস্তাদ' (Co-teacher) এবং মৌলানার পিতার শিষ্যের শিষ্য ছিলেন। (৩৫) তাঁহার সাহচর্য্যে ও সহবাসে মৌলানার যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। নয় বৎসর পর্য্যন্ত পরস্পর পরস্পরের বন্ধুত্বে যুক্ত ছিলেন। তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া মৌলানা অনেক গজল্ লিখিয়াছিলেন। মৌলানার শিষ্যগণ একজন অশিক্ষিত স্বর্ণকারের সহিত তাঁহার এতাদৃশ মেলামেশা দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছিল এবং ইহা নিবারণের জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা জানিতে পারিল যে, সে চেষ্টা করিলে মঙ্গলজনক হইবে না, তখন তাহারা নিরস্ত হইয়াছিল। বন্ধুত্বের দশম বৎসরে শেখ সালাহউদ্দীন অসুস্থ হওয়ার জন্য মৌলানার নিকট বিদায় গ্রহণ করেন এবং অচিরকাল মধ্যে পরলোক গমন করেন। মৌলানা তাঁহার শিষ্যদলসহ তাঁহার জানাজায় (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) উপস্থিত হইয়া খোদাতায়ালার কাছে তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (৩৬)

মৌলানারও দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে রিউ লিখিয়াছেন,—

"In the latter part of his life Mowlana was worshipped as a saint by a crowd of devoted disciples and was treated with utmost regard by the Moghal Governor Moinuddin Parvana who was at that time the virtual leader of Siljuk Empire." (37)

সালাহ্উদ্দীনের মৃত্যুর পর হাসামউদ্দীন তাঁহার 'হাম-রাজ' (Secretary) এবং 'হাম্দম্' (Personal Assistant) হন। তাঁহাকে মৌলানা অত্যন্ত বিশ্বাস ও সম্মান করিতেন এবং তিনিও মৌলানাকে যৎপরোনাস্তি সেবা-শুশ্রূষা ও শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহারই অনুরোধে মৌলানা 'মসনভি' লিখিতে আরম্ভ করেন।

(৩৫) Ibid p. 19-20.

(৩৬) Vide—Rumi by Prof. Shibli pp. 20-23.

(৩৭) Vide Catalogue of the Persian Mss in the British Museum vol. II by Rieu p. 585.

এক সময় দুনিয়ায় ভীষণ ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। ইহা প্রায় চার দিন ধরিয়া ছিল। লোকে চারিদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল এবং তাহাদের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তাহারা মৌলানার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, "পৃথিবীর ক্ষুধা লাগিয়াছে। খুব ভাল আহার চায়, তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" ইহার কিছুদিন পরে মৌলানার শরীর খারাপ হইয়া পড়ে। তৎকালীন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কামালউদ্দীন ও গজ্রাফর তাঁহার চিকিৎসায় নিযুক্ত হন। তাঁহারা ঔষধের পর ঔষধ প্রয়োগ করিতে থাকেন, কিন্তু কোনই ফল হয় না। তৎপরে তাঁহারা মৌলানাকে তাঁহার শরীরের আভ্যন্তরিক অবস্থা বর্ণনা করিতে বলিলেন। তিনি তাহার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "এই দুনিয়ায় কয়দিনের অতিথি?" * তাঁহার অসুস্থ সংবাদ যখন সকলে শুনিতে পাইল, তখন শহরের সকল লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতে লাগিল। বিখ্যাত শেখ সদরউদ্দীন সমস্ত মুরিদসহ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন এবং বলিলেন "খোদা আপনাকে শীঘ্র নীরোগ করুন।" মৌলানা বলিলেন "খোদা আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যে যে পর্দ্দার আড়াল রহিয়াছে, তাহা কি আপনাদের ইচ্ছা নহে যে বিদূরিত হয়।" পরে এই কবিতা আবৃত্তি করিলেন—

"চেদানী তু কে দর বা তেন চে শাহী হামনশীন দারম
রুখে জররীনে মান্ মানেগর্ কে পায়ে আহ্নীন দারম"

[তুমি জান না কোন্ মহারাজ আমার অন্দরের সঙ্গী। আমার পাণ্ডুবর্ণ মুখের দিকে চাহিও না, আমার পা লৌহের মত সবল।]

শহরের সমস্ত পদবীর লোকই তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার উত্তরাধিকারী কে হইবেন?" যদিও মৌলানার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলুক ও তসওয়াকে (আধ্যাত্মিক জ্ঞানে) অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন, তথাপি মৌলানা হাসামউদ্দীন চেলবীর নাম করিলেন।

* "It is to be expected that complete aktemosure, poverty, and the rejection of all material goods, are regarded of the greatest importance by these people (sufis)……Bodily ails must not arouse in them the desire of alleviation by medical aid……Resist no evil." Dr. Ignaz Goldziher in Mohammed and Islam, p. 164.

সকলে দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিলেন, মৌলানা একই উত্তর দিলেন। (৩৮)

মৌলানা পঞ্চাশ বৎসর বয়সে ৬৭২ হিজরীর ৫ই জমাদিয়স্‌সানী সন্ধ্যার সময় ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সময় পুত্রগণকে তিনি এই উপদেশ (ওসিয়ত) দিয়া যান—

"তোমরা ভিতর বাহিরে খোদাতায়ালার ভক্ত হও। তোমরা অল্প আহার, অল্প নিদ্রা এবং অল্প কথা বলিও; মন্দ ও পাপ হইতে দূরে থাকিও; সর্ব্বদা রোজা রাখিও এবং রজনী জাগিয়া খোদার উপাসনা করিও; তোমরা পাশব প্রবৃত্তি হইতে দূরে থাকিও; অপমান অসম্মান অম্লান বদনে সহ্য করিও; দুষ্ট ও দুর্ম্মতিগণের সহবাস পরিত্যাগ করিও এবং মহৎ ও সৎ ব্যক্তিদের সহবাসে থাকিও। মানুষের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ, যে মানুষের মঙ্গল চেষ্টা করে; বাক্যের মধ্যে তাহা সুন্দর, যাহা সুদীর্ঘ নয় অথচ লোককে সৎপথে পরিচালিত করে। খোদার প্রশংসাকর, তিনি মাত্র একজন।" (৩৯)

সমস্ত রাত দফন কাফনের আয়োজন হইল; প্রভাতে তাঁহার জানাজা ও কবর হইল। আমির ওমরাহ, ফকির বাদশা, ইহুদী খৃষ্টান সকলেই তাঁহার শবদেহ অনুসরণ করিয়াছিলেন। একজন খৃষ্টানকে লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তোমরা কেন এত দুঃখিতচিত্তে ইঁহার কবরের উপর ক্রন্দন করিতেছ?" জওয়াবে সেই খৃষ্টান বলিয়াছিল, "ইনি আমাদের যুগের মসিহ (Messiah)। আমরা ইঁহাকে এ যুগের মুসা ও দাউদ বলিয়া শ্রদ্ধা করি। আমরা সকলেই তাঁহার শিষ্য।" (৪০) বাস্তবিক ইহা তাঁহার মত মহাজন ব্যক্তির যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল-আফ্‌লাকী একটী ঘটনা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর। একদিন মৌলানা রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, ক্রীড়ারত বালকেরা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি তাঁহাদিগকে দোয়া করিলেন। একটী ছোট বালক দূরে ছিল, তাহার খেলার সাথীদের সম্মানলাভ দেখিয়া সে উচ্চস্বরে বলিল "আমি যে পর্য্যন্ত না আসি, আপনি সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন।" মৌলানা তাহাই করিলেন। বালক আসিয়া তাঁহাকে সালাম করিল, তিনি তাহাকে সানন্দ চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিলেন। (৪১)

(৭)

মৌলানা জালালউদ্দীন রুমী তাঁহার আধ্যাত্মিক গুরু শামস-ই-তেব্রিজের স্মৃতি-রক্ষার্থে এবং মৃত্যু উপলক্ষে 'মেভলভী' দরবেশ সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। (৪২) তিনি ইহাতে বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান বাজনা ও নৃত্য প্রথা প্রচলিত করেন। (৪৩) এই দরবেশরা ভারতীয় শোকচিহ্ন প্রকাশক পোষাকের অনুরূপ পোষাক গ্রহণ করেন। এই দরবেশ হিলকায় (circle) অন্তের গজল গীত হইত। হাসামউদ্দীনের অনুরোধে তিনি 'মসনভি' লিখিতে সুরু করেন। দৌলত-শাহ লিখিয়াছেন, মৌলানার গৃহে একটী স্তম্ভ ছিল। মৌলানা যখন বিভু-প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, তখন সেই স্তম্ভ ধরিয়া চারিদিকে ঘুরিতেন এবং মসনভি বলিয়া যাইতেন, শিষ্যেরা তাহা লিখিয়া লইতেন। (৪৪)

মৌলানার মসনভি ব্যতীত দিওয়ান-ই-শামস তেব্রিজও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। শামস তেব্রিজের নাম হইতে তিনি নিজের তখাল্লুস (nom de plume) গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্ (orientalist) অধ্যাপক ব্রাউন সাহেব বলিয়াছেন,—

"The most eminent Sufi poet whom Persia has produced." (45)

[পারস্য কবিদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুফী কবি।]

অধ্যাপক নিকলসন সাহেব তাঁহার সম্বন্ধে বলেন,—

In sublimity of thought and grandeur of expression he challenges the greatest master of songs; time after time he strikes a lofty note without effort; the clearness of his vision gives a wonderful exaltation to his verse, which beats against the sky, his odes throb with passion and rapture enkindling power, his diction is choice and unartificial. (46)

---

(৩৮) Vide—Rum by Prof. Shibli Noaman pp. 24-25.

(৩৯) Vide Masnavi by E. H. Whinfield p. xli.

(৪০) Vide Rumi by F. H. Davis, 39.

(৪১) Ibid p. 45.

(৪২) Vide Diwan—i Shams Tabriz by R. A. Nicholson p. x vi. Encyclopoedea Britannica p. 850.

(৪৩) Ibid, Masnavi by E. H. Whinfield p. xl.

(৪৪) Vide. Diwan—i—Shams-i Tabriz by R. A. Nicholson p. xl.

(৪৫) Vide Literary History of Persia vol. II by Prof E. G Browne p. 515.

(৪৬) Vide Diwan—i Shams Tabriz by R. A. Nicholson p. xlvi.

কিসে জয়

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায়

ভীমপলশ্রী ভৈরবী—ঝাঁপতাল

প্রিয় তোমার কাছে যে হার মানি সেই ত মোর জয়।
প্রেমে জয়বিভব দাবীতে যে সে সুধারি অপচয়।
প্রেমে জয়বিভব দাবীতে প্রেম জয়ী কি কভু হয়।
নিতি তব পাশে মানি পরাভব মিলে যে মোর জয়গরব
অপরে ঘোষিলে জয়রব চিত্তে বিঁধি রয়;
শুধু তোমার সাথে আমার নহে নহে সে পরিচয়।
তুমি যে দানগৌরবে ভরি দেছ এ হৃদয়,
তার প্রতিদানেতে নোয়াতে মাথা রহে কি দ্বিধা ভয়?
আমি তোমার কাছে পেয়েছি যত তার পায়ে এ অভিমান ত
লুন্ঠি' নত চাহে যে শত মানিতে পরাজয়
তাই তোমার কাছে জিতিলে হারি হারিলে সেথা জয়।

+ ৩ ০ ১

II সা রা | গ্‌া সা -া মজ্ঞা মা | পা পা -া পদা পা | পা দা মপা মজ্ঞা মা | মা -া -া II
প্রি য় তো মা র কা ছে যে হা র মা নি সে ই ত মো র জ য় -

মজ্ঞা মা | পা ণা ণা ণা ধণা | র্সণা ণদা দপা পদা মপা | পা পর্সা ণধা পা দা | পা -া -া
প্রে মে জ য় বি ভ ব দা বী তে যে সে সু ধা রি অ প চ য় -

মজ্ঞা মা | পা ণা ণা ণা ধণা | পণর্সর্রা র্সা ণা পদা মপা | পা পর্সা ণধা পা দা | পা -া সা II II
প্রে মে জ য় বি ভ ব দা বী তে প্রে ম জ য়ী কি ক ভু হ - য়

মা মা | পা পা পা মজ্ঞা মা | পা ৣণা ণর্সা র্সা -া | ণা র্সা জ্ঞর্রা র্সা -া | ণা র্সণা ধা পা -া |
নি তি　ত ব পা শে　মা　নি প রা　ভ　ব　মি লে যে　মো র　জ য়　গ র ব
আ মি　তো মা র কা　ছে　পে য়ে ছি　য　ত তা র পা　য়ে এ　অ ভি　মা ন ত

ণা ণা ণা ণা ণধা | র্সণা ণদা দপা পদা মপা | পা র্সা ণধা পা দা | পা -া -া পা পা |
অ প রে ঘো ষি　লে　জ　য়　র　ব　চি -　ত্তে বি থি　য় - য় শু ধু
লু - ণ্ঠি ন ত　চা　হে　যে　শ　ত　মা নি　তে প রা　জ - য় তা ই

পা র্মজ্ঞা র্মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মজ্ঞা মজ্ঞা মজ্ঞা মা পা | ণ্া সা মজ্ঞা মা পা | পা সা -া II II
তো মা র　সা　থে　আ　মা　র　ন　হে　ন　হে সে　প রি　চ - য়
তো মা র　কা　ছে　জি　তি　লে　হা রি　হা রি লে　সে থা　জ - য়

। । | ণ্া সা সা মজ্ঞা রজ্ঞা | ঋা -া সা সা সঋা | ণ্া সা সজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞমা | জ্ঞা মা -া
- -　তু　মি যে দা　ন　গৌ - র বে ভ　রি দে ছ　এ হৃ　দ য় -

-া মা | জ্ঞা মা পা পা পা | মা পা দা দা দা | পা দা ণা দণা দা | পা -া -া
- তার　প্র　তি দা　নে তে　নো য়া তে মা থা　র হে কি দ্বি ধা　ভ য় -

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮

পরদিন সকালে উঠিয়া ধীরু যেন কতকটা মুক্তির স্বস্তি অনুভব করিল। যে অতীত সুখ-দুঃখের জড়িত চিন্তা সমস্ত রাত্রি একটা দারুণ অশান্তিময় ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার চিত্তকে জর্জ্জরিত করিয়াছিল, প্রভাতের সূর্য্যালোকে কুহেলিকা-রাশির মত তাহা ধীরে ধীরে অপসারিত হইয়া গেল।

ধীরু দয়াদেবীর কাছে বসিয়া ছিল,—নারাণী আসিয়া কহিল "চা খেতে বাবা ডাকছেন!"

ধীরু আসিতেই যদুবাবু কিছুক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার এমনধারা দেখাচ্ছে যে! রাত্রে বুঝি ভাল ঘুম হয় নি! নতুন যায়গায় এলে ২।৩ দিন ও-রকম হয়ে থাকে।...চা-টা খাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে!"

ধীরু অন্যমনস্কভাবে কহিল "তা হবে।"

যদুবাবু হুঁকা টানিতে টানিতে কহিলেন, "শুনলাম, কাল রাত্রে কিছুই খাও নি! দেখছি বিদেশে থেকে তোমার শরীর-টা মাটি হয়ে গেছে! দিদির মুখে যেমন তোমার খাওয়ার গল্প শুনেছি, এখন ত তার বিপরীত দেখছি!"

ধীরু একটু হাসিল মাত্র! যদুবাবু পুনরায় কহিলেন, "কাল ঘুরে-ফিরে কি দেখে এলে? মন্দিরে গিছলে না কি?"

ধীরু উদাসভাবে কহিল "না"—

"তবে কি ঘাটের ধারে বেড়াচ্ছিলে?"

"তাই হবে—আচ্ছা দেখুন, বাড়ী থেকে বেরিয়ে বরাবর খানিকটা গেলেই ত রাস্তার মোড়। আচ্ছা, তার পরে ডান দিকের রাস্তায় আরও কিছু দূর গেলে রাস্তাটা আবার দুদিকে ফিরে গেছে নয়?"

"হ্যাঁ, ডাইনেটায় গেলে পড়বে গিয়ে ঘোড়ায় ঘাটে,

আর ওটা গেছে গোধূলীয়ার দিকে...এই ধর না···ভূতেশ্বরের গলি পার হয়েই"......

বাধা দিয়া ধীরু কহিল···"থাক্‌গে···আমি ডাইনের রাস্তাটার কথাই বলছি...ওটাও খানিকটা এসে আবার দুভাগ হয়ে গেছে......"

"হ্যাঁ, এই ধর না, বাঁদিক দিয়ে গেলে ত্রিপুরা-ভৈরবীর রাস্তা পড়ে। তার আগেই কাছ-বরাবর একটা শিব-মন্দির আছে···ঠিক তার পাশ দিয়ে—বেরিয়ে গেছে···ওর নাম কি......

কতকটা উৎসাহভরে ধীরু কহিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক—একটা শিব-মন্দির আছে বটে...ও যায়গাটার নাম কি বলুন ত ?"

"ওঃ—ঐ দিকটাতে গিছলে তুমি ? তা ওটাকে মান-মন্দিরের রাস্তাই বলে বুঝি। চেনা আছে সবই, তবে রাস্তাগুলোর ঠিক নাম মনে থাকে না। কোন্‌টা কোন্ মহল্লা, এইটে জানা থাকলেই যথেষ্ট !"

চায়ের পেয়ালাটা নামাইয়া রাখিয়া ধীরু কহিল "তা বটেই ত···ওখানটার নাম কি মহল্লা বল্লেন যেন ?··· আচ্ছা সব নাম যাহোক্,—মনেই থাকে না !"

"ঘোড়ার ঘাট, মান-মন্দির—যা বল ! হ্যাঁ, কবরেজ-বাড়ী তাহলে কাল তোমার যাওয়া হয় নি ?"

ধীরু কোন কথা না বলিয়া শুধু মাথা ঝাঁকাইল। তাহার শূন্য দৃষ্টি তখন চায়ের শূন্য পেয়ালার দিকে স্থিরভাবে নিবদ্ধ ছিল। আর তাহার চোখের উপর তখন ভাসিতেছিল··· সেই বৃহৎ বাড়ী, দোতালার জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণীর স্থির মূর্ত্তিখানি ! সেই চিরপরিচিত মুখ !

এমন সময় নারাণী আসিয়া যদুবাবুকে কহিল "এইবেলা কবিরাজকে একবার খবর দিয়ে এস, এরপর হয়ত বেরিয়ে যাবে সে, দেখা পাবে না। পিসীমার জ্বরটা খুব বেড়েছে।"

"হ্যাঁ যাচ্ছি। বুঝলে ধীরু, তুমিও কাল বেরুলে, দিদিরও খুব জ্বর এল,—সুখদা যখন কাল এল, তখন দিদি একেবারে অজ্ঞান !"

নারাণী কহিল "আচ্ছা বাবা, সেবার সুখদিকে কে দেখেছিল ? তাকে দিয়েই পিসীমার চিকিৎসা করাও না কেন ? সুখদিকে কেমন আরাম করে দিলে।"

উৎসাহিতভাবে ধীরু কহিল "বেশ ত, তাঁকেই দেখান যাক্, কি বলেন ?" যদুবাবু দেওয়ালে হুঁকাটা রাখিয়া কহিলেন, "দেখাতে চাও, দেখাতে পার, কিন্তু এই রমানাথ কবিরাজ, যিনি দেখছেন, একেবারে ধন্বন্তরী বল্লেই হয় !"

নারাণী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "হ্যাঁ, ভারী ত তোমার বদ্দি, এক মাস হয়ে গেল, তবু পিসীর জ্বর বন্ধ করতে পারলে না।"

যদুবাবু কহিলেন "রোগের ত একটা ভোগ আছে ! আর বুঝেছ ধীরু, উনি ওষুধই খান না, তা রোগ সারবে কি করে ! তা দেখ, যাকে ইচ্ছা হয় দেখাও,—তবে আমার মতে আরও ৫।৭ দিন এর হাতে রাখলে মন্দ হয় না। লোকটা প্রাচীন আর বিচক্ষণ। অসুখটা ঠিক ধরেছে, তবে আরাম হতে ত সময় লাগে !"

ধীরু কহিল, "বেশ, তাই—ইনি আরও ক'দিন দেখুন !" পরে নারাণীকে কহিল "যাও ত খুকী, পিসীমার কাছে আমার ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা এনে দাও ত !"

নারাণী চলিয়া যাইলে যদুবাবু বলিলেন, "বুঝলে ধীরু, নারাণী হচ্ছে আমাদের দুজনেরই, সিন্ধুকই বল আর ব্যাঙ্কই বল···সব ! এক আধলা পয়সার গোলমাল হবার যো নেই—রোজ রোজ খাতায় জমাখরচ রাখছে—বুঝলে ?"

ধীরু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, বেশ চালাক চতুর দেখছি !"

নারাণী পাঁচটি টাকা আনিয়া ধীরুর নিকটে রাখিল। যদুবাবু কহিলেন, "চল—তাহলে যাওয়া যাক্ !" দুজনে বাহির হইয়া গেল।

উভয়ে রাস্তায় কিছু দূর আসিলে ধীরু একবার এদিক ওদিক চাহিয়া রাস্তার দুই পার্শ্বের বাড়ীগুলি দেখিতে দেখিতে চলিল। খানিকদূরে মোড় ফিরিতেই ধীরু কহিল, "আচ্ছা, এটা বোধ হয় সে রাস্তা নয়, যেটার কথা আমি আপনাকে বলছিলাম ?"

"না, ওই আগের রাস্তাটা দিয়ে ওদিকে যাওয়া যায় !"

ধীরু একবার বিশেষভাবে সে স্থানটা দেখিয়া লইল, কোন কথা বলিল না। খানিকদূর আসিয়া যদুবাবু কহিলেন, "এই হল বাজার,—ফেরবার বেলা বাজার করে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

ধীরু অন্যমনস্কভাবে কহিল "আচ্ছা !"

যাইতে যাইতে পাশের একটা বাড়ীর জানালায় উঁকি

দিয়া যদুবাবু কহিলেন "ওঃ সাড়ে আটটা বেজে গেছে, কবরেজ আবার বেরিয়ে না যায়...চল, এই পাশের গলি দিয়ে যাওয়া যাক্!"

যাইতে যাইতে ধীরু কহিল "এঃ—কি বিশ্রী গলি? ·· তেমনি এঁধো রাস্তা; কি করে লোকে এখানে বাস করে?...চলুন, একটু হেঁটে চলুন—যে দুর্গন্ধ!"

যদুবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "বাবা বিশ্বনাথের রাজ্যে যেন তেন প্রকারেণ একটু মাথা গুঁজে থাকা··· তাহলেই মুক্তি!"

কখনও ডাইনে কখনও বামে কতকগুলি ছোট গলি পার হইয়া, যদুবাবু রাস্তায় আসিয়া একটা বাড়ীর সামনে দাঁড়াইতেই ধীরু দেখিল, একটা সাইন বোর্ডে বড় বড় অক্ষরে কবিরাজের নাম লেখা রহিয়াছে! ধীরু যেন হাঁফ ছাড়িল! যদুবাবু কহিলেন "বসবার ঘরটা বন্ধ দেখছি, কোথাও বেরুল নাকি? দেখি একবার ডেকে!"

কড়া নাড়িয়া যদুবাবু কবিরাজের নাম করিয়া ডাকিতেই একটি স্ত্রীলোক দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া কহিল, "বাবু পূজোয় বসেছেন! বসবেন কি?"

"হাঁ" বলিয়া যদুবাবু বাহিরের ঘরটায় গিয়া বসিলেন! ধীরু ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—একটা কাচের আলমারীতে কতকগুলো শিশির গায়ে সাদা ছোট ছোট কাগজ দিয়া আঁটা এবং বড় বড় বাংলা অক্ষরে "শ্বেতচূর্ণ", "ভাস্কর লবণ" ইত্যাদি সব ঔষধের নাম লেখা রহিয়াছে! আলমারীর মাথায় কতকগুলো পুরান পুঁথি! তাকের উপর দুইটা কাল পাথরের বড় বড় খল, ফরাসের এককোণে একটা পুরানো বিস্কুটের বাক্স, তাহাতে দাবা খেলিবার ঘুঁটীগুলি ও পাশেই একটা সতরঞ্চ ছক। গোটা দুই মোটা-সোটা আধময়লা খেরোর তাকিয়া।

কিছুক্ষণ বাদে একটা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে ঝি আসিয়া কহিল "বাবুর আহ্নিক হয়ে গেছে, আসছেন— আপনারা বসুন।"

যদুবাবু কহিলেন "দে কলকেটা—ততক্ষণ তামাক ধরাই! আজ বংশে বেটাকে দেখছি না, সে কোথায় রে?"

একটা ঝঙ্কার দিয়া ঝি বলিল, "মুখপোড়া কাল রাত থেকে যে কোথায় মরতে গেছে—এখনও ফেরেনি! বল্লে "দেশওয়ালী" আয়া, দেখা করকে আয়ে! ছিষ্টি কাজ আমাকে করতে হচ্ছে!" বলিতে বলিতে যুবতী ঝি তাহার বক্র চক্ষুর গোপন দৃষ্টি দিয়া ধীরুকে দেখিতেছিল! কবিরাজের খড়মের শব্দে ঝি কহিল "ওই বাবু আসছেন!" বলিয়া দ্বারপথে বাহির হইয়া গেল!

একটা বেনিয়ান গায়ে, গোঁপ-দাড়ী-কামানো, শীর্ণদেহ রমানাথ কবিরাজ ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার দন্তবিহীন মুখে হাসি ফুটাইয়া কহিলেন, "এই যে, এস যদুবাবু, তার পর তোমার দিদির খবর কি বল? কেমন আছে?" বলিয়া এক টিপ নস্য নাকে দিলেন।

"দিদির আবার কাল থেকে জ্বর বেড়েছে! ভাগ্যক্রমে ওঁর ভাইপো এসে পড়েছে—এই ইনিই"—যদুবাবু ধীরুকে দেখাইয়া দিলেন।

কবিরাজ ধীরুকে কহিলেন, "দেখুন, আপনার পিসীর রোগের অবস্থা যা দেখতে পাচ্ছি তাতে এবার তেমন সুবিধে বুঝছি না। তবে লোকের জীবনের কথা ত কেউ বলতে পারে না···আমরা হলুম চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, শেষ নিঃশ্বাসটুকু রোগীর যতক্ষণ থাকবে, চিকিৎসা করতে হবে! না হলে আমাদের দায়িত্ব থাকে না!"

ধীরুর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। সে ব্যগ্র কাতর কণ্ঠে কহিল "এরই মধ্যে কি এতখানি সাংঘাতিক হয়েছে? দেহে ত আর কিছু নেই যে রোগের সঙ্গে যুঝতে পারবেন!"

যদুবাবু কহিলেন, "তবুও ওষুধ খেলে তার কিছু ফল হতে পারে; কিন্তু উনি যে মোটেই ওষুধ খেতে চান না!"

কবিরাজ মাথা ঝাঁকাইয়া কহিলেন..."সেই ত হল কথা! নইলে প্রথম থেকে যে ওষুধ দিয়েছিলুম, তা যদি রীতিমত খাওয়ান হত, তবে কি আর এতখানি বাড়াবাড়ি হতে পারে? কখ্খনও না...এ কথা আমি জোর গলায় বলতে পারি···তেমন ধারাই চিকিৎসা আমার নয়...কত রুগী এই বয়সে দেখলাম বাপু!"

যদুবাবু গম্ভীরভাবে কহিলেন ··"এ কথা হাজার বার!"

ধীরু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "যাই হোক, একবার অনুগ্রহ করে আজ যাবেন—দেখে, যা ওষুধ দেবেন, আমি তার খাওয়াবার ভার নিলুম। রীতিমত ওষুধ খেলে এখনও আরাম হবার আশা আছে—কি বলেন কবিরাজ মশায়?"

কবিরাজ গম্ভীরভাবে কহিলেন..."এর চেয়েও কত

কঠিন রোগ সব আরাম করে দিয়েছি……যাই ত বিকেল বেলা—দেখি ..তার পর ওষুধ বদলে দিয়ে আসছি।"…

"এবেলা পিসীকে কি খেতে দেওয়া যায় ?" বলিয়া ধীরু কবিরাজের মুখের দিকে উত্তরের প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল।

…"খেতে আর বিশেষ কি দেবে বল ?……ওই যা খাচ্ছেন, একটু দুধ না হয় একটু সাগু মিছরী…এই সবই দিতে হবে! আর অন্য পথ্য দেওয়া চলে না বাপু!"

"দুটো আঙ্গুর কি একটু বেদানার রস ?"

কবিরাজ চক্ষু বুজিয়া কহিলেন "ফলের রস ?…… হ্যাঁ, তা একটু দিতে পার। তবে কি না একটু রসস্থ… কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মার প্রকোপ রয়েছে কি না……যাক্ দিতে পার, তাতে কোন ক্ষতি হবে না।"

"আপনি বিকেলবেলা তা হলে অনুগ্রহ করে গিয়ে পিসীকে একবার দেখে আসবেন। আর যদি এখন একবার যেতে পারেন"… ..

বাধা দিয়া কবিরাজ কহিলেন, "না—এখন আর হয়ে উঠবে না; আমি বিকেলেই যাব" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ধীরু উঠিয়া দরজার কাছে যাইয়া পুনরায় ফিরিয়া কহিল "এখনও তেমন ভয়ের কিছু নেই…কি বলেন ?"

ঈষৎ হাসিয়া কবিরাজ কহিলেন "না—ভয় আর কি! আমাদেরও ত মরবার বয়েস হয়েছে, তবে এখনও যে বেঁচে আছি এই আশ্চর্য্য! বুড়ো বয়সে বেশী দিন বেঁচে থাকাটাই ভয়ের, কি বল হে যদুবাবু ?"

যদুবাবু একটু হাসিলেন মাত্র!

কবিরাজ-বাটী হইতে বাহির হইয়া ধীরু কহিল… "কবিরাজের কথায় যা বুঝলুম—রোগ কঠিন হলেও এখনও তেমন সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ায় নি! কি বলেন ?"

"না, ভয়ের কিছু নেই" বলিয়া যদুবাবু যে পথে আসিয়াছিলেন সেই গলির পথ ধরিলেন! অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর আসিয়া ধীরু হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "চলুন, এবার সদর রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাক! আর ফলের দোকান থেকে কিছু বেদানা আর আঙ্গুর নিয়ে যাওয়া যাবে! হ্যারিকেনটাও দিনের বেলা দেখেশুনে কিনতে পারা যাবে!"

"তাই চল, কিন্তু একটু ঘুর হবে! আমার আবার বাজারটা সেরে নিতে হবে কি না—বেলাও অনেকটা হয়েছে……কাল রাত্রে তোমার খাওয়া হয় নি"…

যদুবাবুর অনিচ্ছা বুঝিয়া ধীরু কহিল "আচ্ছা, তাহলে বরং আপনি এক কাজ করুন—এই তিন টাকা রাখুন, কিছু বেদানা আঙ্গুর কিনে নিয়ে যাবেন।"

যদুবাবু কহিলেন "আচ্ছা দাও, ফিরতে কি তোমার দেরী হবে না কি ?…কাল কিছু খাও নি"…

বাধা দিয়া ধীরু কহিল "না—দেরী আর কি হবে… আমি একটু ঘুরেই যাচ্ছি!……আচ্ছা এই সামনের রাস্তাটা ধরে গেলে কোথায় গিয়ে পড়া যাবে ?"

"এটা তোমার পড়েছে গিয়ে ঘোড়ার ঘাটে!……তুমি যাবে কোন্ দিকে ?"

"দেখি ত" বলিয়া ধীরু গলি ছাড়িয়া সামনের রাস্তা ধরিয়া চলিল!

কোথায় যাইতেছে, কেনই বা যাইতেছে—এ প্রশ্নের কোন উত্তর ধীরু মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। ধীরু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে দয়াদেবীর কথা। তাহার অন্তর আজ একটা অজানিত ব্যথার অনুভূতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল! দয়াদেবীর দুর্ব্বল দেহখানি যে কোন মুহূর্ত্তেই হোক মৃত্যু আসিয়া গ্রাস করিতে পারে—এ কথা যে ধীরু কোন দিনও না ভাবিয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু সে দুর্ব্বল চিন্তা তাহার অগাধ ভক্তি-স্নেহের অতলতলে পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া হৃদয়কে এমনভাবে পীড়ন করিতে পারে নাই। তাই আজ জীবনের সর্ব্বপ্রথমে সেই বেদনাজড়িত চিন্তার স্বরূপ ভাবিতেই ধীরুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। যে অপরিমেয় স্নেহের রজ্জুতে এই বৃদ্ধা তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল, সে বন্ধনের প্রত্যেক গ্রন্থি যে তাহার দেহের শিরায় শিরায় জড়িত হইয়া প্রতি অণুপরমাণুতে নিবদ্ধ!…কিন্তু মানুষ বুঝি তাহার স্নেহের বস্তুটির এই অতিনিশ্চিত পরিণামের কথা এতখানি কঠোরভাবে নিশ্চয় করিয়া ভাবিতে পারে না। শত নিরাশার মধ্যেও আশার একটা ক্ষীণ আলোকরেখা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ শিখার মত আঁধারকে দূরে ঠেলিয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করে।…ধীরু পরক্ষণেই ভাবিল, হয় ত বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দেখিবে পিসীর জ্বর বিরাম হইয়াছে। তিনি কতকটা ভাল আছেন।

কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল মনে একবার দুশ্চিন্তা আশ্রয় করিলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া মুক্তি পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। দুর্ভাবনা ধীরুকে ছাড়িল না। ধীরু ভাবিল, হায়

আর কিছুদিন আগে আসিলে হয় ত পিসীর শরীরের অবস্থা এতখানি খারাপ হইতে পারিত না। রীতিমত চিকিৎসা হইলে…কিন্তু কবিরাজ যাহা বলিল, তাহাতে মনে হয়, উপস্থিত কোন আশঙ্কার কারণ নাই……কিন্তু যদি এই অসুখ বৃদ্ধি পায়……যদি পিসীমা……ধীরু আর ভাবিতে পারিল না। এই বিরাট বিশ্বের বুকে তাহা হইলে সে একাকী কেমন করিয়া এই ব্যর্থ জীবনের দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিবে? একটা রুদ্ধ আবেগ ধীরুর বুকের মধ্য হইতে ঠেলিয়া কণ্ঠ পর্য্যন্ত আসিল। হায়, যদি কল্যাণী এ সময় পিসীমার নিকট থাকিত? যদি একবার তাহার দেখা পায়, আর পিসীমার অসুখের কথা বলিতে পারে, তাহা হইলে কল্যাণী না আসিয়া থাকিতে পারিবে না! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কেন সে আসিবে?…তাহাদের সহিত তাহার আর কি সম্বন্ধ! কোন সম্বন্ধ নাই! কিন্তু তবু বুঝি এ পৃথিবীতে সেই একজন আছে, যে তাহার হৃদয়ের বেদনা বুঝিতে পারিবে, যাহার কাছে সে তাহার অন্তরের গুরুভার নামাইতে পারিলে বাঁচিয়া যায়……আজ এই দুর্দ্দিনে কল্যাণীর অভাব ধীরু সারা অন্তর দিয়া অনুভব করিল! আগুন বুঝি বাতাসের অপেক্ষায় এতক্ষণ তাহার লেলিহান শিখা সম্বরণ করিয়া অন্তরে অন্তরেই জ্বলিতেছিল, বাতাস পাইতেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ধীরু ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে অনির্দ্দিষ্ট স্থানে, অনির্দ্দিষ্ট ইচ্ছার প্রেরণায়! শতবার ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া সে তাহার মর্ম্মমথিত স্নেহ-ভালবাসার মাপকাঠিতে উভয়ের মধ্যে দূরত্বের পরিমাণ কমাইয়া আনিতেছিল, কিন্তু তাহার মনে আসিল না—বাস্তব জগতে সত্যকারের একটা কত বড় ব্যবধান উভয়ের মাঝে পড়িয়া রহিয়াছে। উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষার প্রেরণা তাহাকে পথ হইতে পথান্তরে লইয়া চলিয়াছে, তাহার মুখে কি একটা চিন্তাকুলতা, দৃষ্টিতে কি একটা উদাস আবেগ। অনেকগুলি রাস্তা ও গলি পার হইয়া, তাহার নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটি খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, পথ সেইখানেই শেষ হইয়াছে। সম্মুখেই একটা ঘাট… বেগবতী গঙ্গার বুকে উচ্ছ্বসিত প্রবাহ ছুটিয়াছে—তাহারই মত অনির্দ্দিষ্ট পথে কোথায় কাহার সহিত মিলিতে—কে জানে! স্নানার্থী স্ত্রী-পুরুষগণ তখনও যাইতেছে আসিতেছে, স্নান সমাপনান্তে কেহ্ বা তটভূমিতে দাঁড়াইয়া স্তোত্র পাঠ করিতেছে। একটা কর্ম্ম-কোলাহলময় জগৎ! যেন সামঞ্জস্য ও শৃঙ্খলার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া প্রকৃতির বুকে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে…আর এই শৃঙ্খলার মধ্যে শুধু সেই যেন উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দেশ্যবিহীন, নিতান্ত অনাবশ্যক রূপে এই কর্ম্ম-শোভন পূত জাহ্নবী-তটে চিন্তা-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া পড়িয়াছে। সহসা গুরুগম্ভীর রবে অদূরে দামামা বাজিয়া উঠিল, শঙ্খ, কাঁসর, ঘণ্টার মিলিত ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ছাইয়া গেল! সকলে সেই দিকে চলিয়াছে। ধীরু এতক্ষণ অনমনস্কভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কি একটা আকর্ষণের অনুভূতি তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে জুতা খুলিয়া গঙ্গার ঘাটের নিম্নস্তরে সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া মাথায় গায়ে গঙ্গাজল ছিটাইয়া জনতার সঙ্গে চলিল! বিশ্বনাথের মন্দির সন্নিকটে আসিয়া ধীরু দেখিল, সেখানে বহু স্ত্রীপুরুষ ভিতরে প্রবেশ লাভের জন্য সঙ্কীর্ণপরিসর দ্বারের কাছে ঠেলাঠেলি করিতেছে! কি যেন অন্তরের একটা নিগূঢ় প্রেরণা শত বাধা উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। দলে দলে ইতর ভদ্র যুবক যুবতী বালক বালিকা এমন কি নতদেহী বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকল বয়সের পুরুষ স্ত্রী, কেহ ফুল বিল্বপত্র, কেহ কমণ্ডলু-পূর্ণ গঙ্গাজল লইয়া চলিয়াছে! সকলেরই মুখে একটা হর্ষের দীপ্তি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ধীরুর মনে হইল, এই পুণ্য-সঞ্চয়কামী জনশ্রেণীর মধ্যে শুধু বুঝি সে একাই ভক্তিহীন ও উদ্দেশ্য-বিহীন! ধীরু উদভ্রান্ত ভাবে একবার বাহিরের দিকে গেল, কি ভাবিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বারান্দার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মন্দির-দ্বারে জনতার প্রতি চাহিয়া রহিল। দ্বারে তখনও ভয়ানক ভীড়। স্ত্রী পুরুষের গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি, মেশামিশি…ভ্রূক্ষেপ নাই,—ভিতরে প্রবেশ লাভের জন্য সকলেই বিপুল চেষ্টায় রত! হয় ত কোন রমণীর বসনাঞ্চল মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কাহারও বা মস্তকাবরণ খসিয়া পড়িয়া মুক্ত বেণী পৃষ্ঠ বাহিয়া দুলিতে দেখা যাইতেছে! কাহারও বা শ্লথ বাসের অন্তরালে উন্মুক্ত যৌবনোন্নত বক্ষ পার্শ্ববর্ত্তী পুরুষের দেহের সহিত পেষিত হইতেছে…লক্ষ্য নাই সেদিকে! যেন একটা প্রবল বাসনার তীব্র আবেগ বাহিরের সকল জ্ঞান লুপ্ত করিয়াছে। এই সুযোগে কোন কোন চরিত্রহীন পুরুষ তাহাদের অঙ্গ স্বেচ্ছায় স্পর্শ করিয়া আপনাদের অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় কামনায় দেবদর্শনে চলিয়াছে।

একজন পাণ্ডা ধীরুকে লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার ধীরু দৃষ্টি ফিরাইতেই, লোকটা হাসিবার ভঙ্গীতে কহিল, "হাম্‌সে খেয়াল কিজিয়ে বাবুজী, ওরোজ "কাণ্টুন টিশন" পর আপকো সাথ্ আয়াথা। বাবাকো দর্শন করেগা? আইয়ে, খাড়া কাহে, আরতি সুরু হুয়া...আইয়ে ওহি দরজা সেকে"...

পাণ্ডার সাহায্যে ধীরু যখন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন দ্বিপ্রহরের আরতি আরম্ভ হইয়াছে। নরজন পুরোহিত সমস্বরে বেদগানের সঙ্গে আরত্রিক দীপ লইয়া আরতিতে নিযুক্ত। ধূপ, কর্পূর, অগুরুর সুগন্ধে মন্দির পরিপূর্ণ। পট্টবস্ত্রাবৃত বহু স্ত্রী পুরুষ যুক্তকরে স্থির দৃষ্টিতে বিগ্রহের পানে চাহিয়া আছে। ব্রাহ্মণগণ সুললিত সুরে স্তোত্র পাঠ করিতেছেন। চক্রবেদীর মধ্যস্থানে পুষ্পমালা-শোভিত চন্দন-বিভূষিত বিশ্বনাথের পাষাণ মূর্ত্তি বিল্বদল সজ্জায় মণ্ডিত। একজন স্থূলকায় পাণ্ডা শ্বেত চামর ব্যজন করিতে করিতে ভাবমগ্ন হইয়া অনর্গল ব্যোম্ ব্যোম্ শব্দ করিতেছে; আর তাহার দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতেছে। ধীরু অভিভূত চিত্তে এই সকল দেখিতেছিল, সহসা তাহার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরাইতেই ধীরু চমকিয়া উঠিল!...এ কি! যাহার সন্ধানে সে পথে পথে এতক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে যে সম্মুখে। লাল বেনারসী সাড়ীর অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের মাঝে সেই মুখ...এই ত কল্যাণী। চিত্তের মিথ্যা কল্পনা নয়, দৃষ্টির ভ্রম নয়...চক্ষের উপরে অতি নিকটে। গললগ্নীকৃত বসনাঞ্চল বক্ষ-সংলগ্ন করযুগলে মধ্যে ফুল বিল্বপত্র ধারণ করিয়া নমিত চক্ষে বিশ্বনাথের পাষাণ মূর্ত্তির প্রতি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে কল্যাণী। জীবনের সর্ব্ব প্রথমে আজই বুঝি ধীরু এমন করিয়া কল্যাণীর দিকে পলকহীন নেত্রে চাহিয়া দেখিল। কি সুন্দর! যেন মূর্ত্তিমতী আরাধনা দেবতার চরণ-পূজার জন্য সমাগতা। যেন কোন নিপুণ শিল্পী-রচিত এক পূজারতা অপূর্ব্ব মর্ম্মর প্রতিমা—স্থির, ধীর, গম্ভীর মূর্ত্তি। সেই হাস্য-কৌতুকময়ী বালিকার কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ধীরু মুগ্ধনেত্রে একদৃষ্টে কল্যাণীর দিকে চাহিয়া রহিল। আনন্দে শ্রদ্ধায় তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। সে চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। সে বিশ্ব-জগৎ ভুলিয়া গেল...বিশ্বনাথ দর্শন ত দূরের কথা। আরতি শেষ হইল, সকলে প্রণামের জন্য নত হইল, কল্যাণী তাহার নত মুখ তুলিয়া একবার সম্মুখে চাহিতেই ধীরুর দৃষ্টির সহিত তাহার দৃষ্টি মিলিল। হর্ষ, দুঃখ, সুখ ও বেদনা, ইচ্ছা এবং বাধা একসঙ্গে সহসা কল্যাণীকে ঘিরিয়া ধরিল...উদ্বেলিত বক্ষের দ্রুততর স্পন্দন-শব্দ বাহিরের কোলাহল ঢাকিয়া তাহার কানের ভিতর নির্দ্দয়ভাবে আঘাত করিতে লাগিল। একটা অস্ফুট শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অবশ হাত হইতে লঘু পুষ্প-অর্ঘ্য-বিল্বদল পায়ের কাছে পড়িয়া গেল...বিশ্বনাথের চরণে অঞ্জলি দেওয়া হইল না। কাদম্বিনী পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল, আশ্চর্য্যভাবে কহিল "এ কি! সব ফুল পড়ে গেল যে!—এস, আমরা এদিকে সরে দাঁড়াই, ভীড় কমলে প্রণাম করব!"

কল্যাণী কোন কথা কহিল না। একবার শুধু মুখখানা ঈষৎ উঁচু করিয়া কুণ্ঠিত ভাবে আবার নত করিল। অবনত দৃষ্টিতে হস্তস্খলিত ফুল বিল্বপত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। সুখদা ঠাকুরাণীও কাছেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন "কি হল বৌদি? ধাক্কা লেগে ফুল বেলপাতা পড়ে গেল বুঝি। তা যাকগে, সরে এস,—এই ভীড়ের ভেতর আর থেকে কাজ নেই, চোখ মুখ যে রক্ত-জবা হয়ে উঠেছে? কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে, এস, এস বেরিয়ে এস—"

পাশের দু একজন লোক কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল। একজন বর্ষীয়সী বিধবা কহিল, "ওঁকে নিয়ে যাও না বাছা, এই ভীড়ের ভেতর থেকে সরিয়ে...পরেই না হয় অঞ্জলী দেবে।"

সুখদা ঠাকুরাণী কোন কথা না বলিয়া কল্যাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিলেন। তাহার পশ্চাতে আসিল কাদম্বিনী, আর সকলের শেষে কতকটা আগুলিয়া রাখিবার ভঙ্গীতে উভয় পার্শ্বে দুই হাত প্রসারিত করিয়া উল্টোমুখো এঞ্জিনের মতন একপ্রকার সকলকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে শ্রীমান হরিচরণ। যাইতে যাইতে কাদম্বিনী মুখ ফিরাইয়া ভ্রুকুঞ্চিত সঙ্কোচ দৃষ্টিতে হরিচরণের দিকে চাহিতে হরিচরণ একটু হাসিল মাত্র।

ধীরু দেখিল কল্যাণী কয়েকজন স্ত্রীলোকের সহিত ভীড়ের ভিতর হইতে পিছনে সরিয়া গেল।

বিবেচনা-শক্তিকে পরাজিত করিবার মত বস্তু এ সংসারে প্রেম ভালবাসার মত বোধ করি কিছুই নাই। যে আশা,

সের আফগানের সমাধি
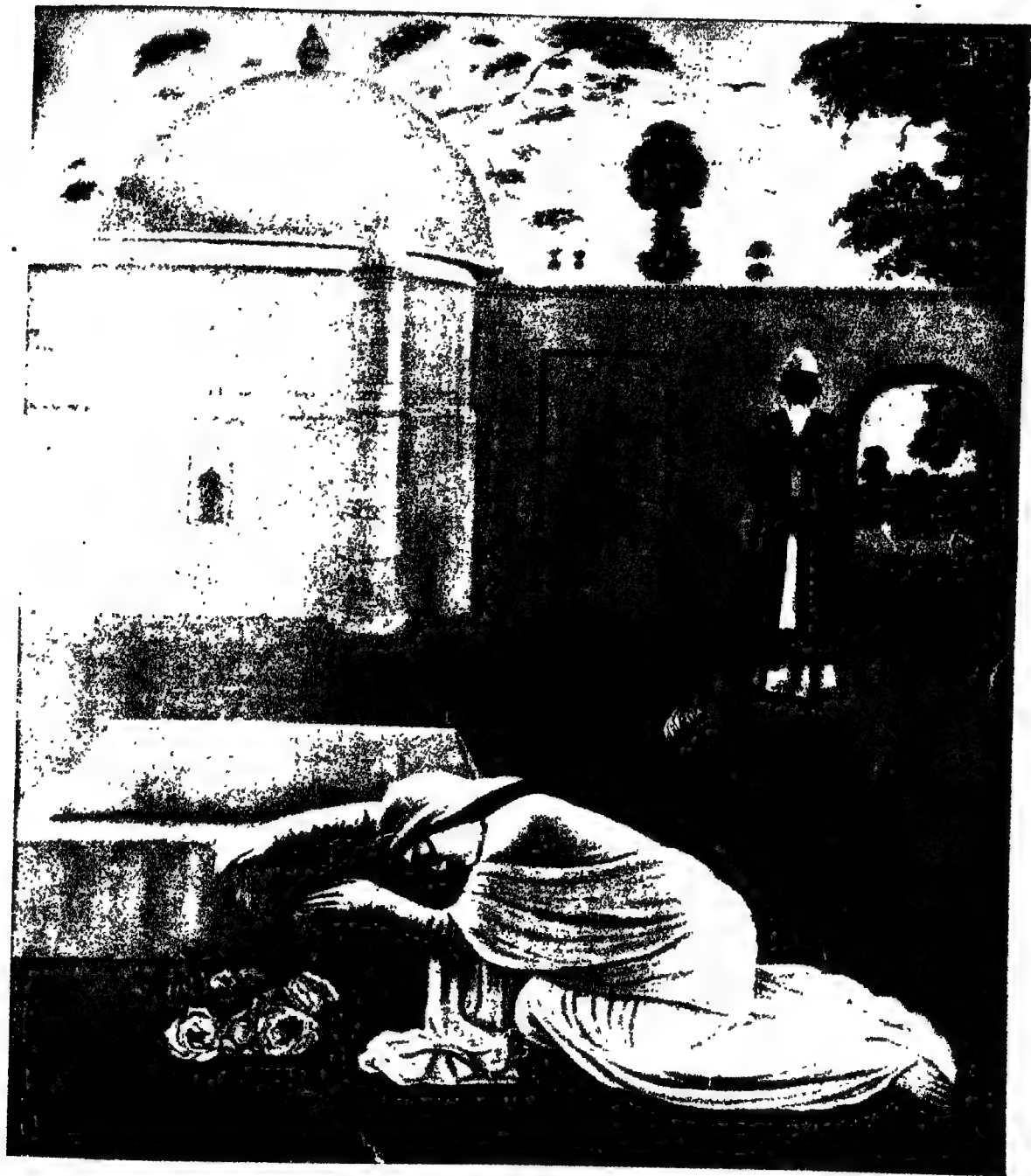
শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ
মহাশয়ের অনুগ্রহে প্রকাশিত।

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

আশঙ্কা, উদ্বেগ বুকে করিয়া ধীরু এই দেখার প্রতীক্ষায় ব্যাকুলই হইয়া উঠিয়াছিল, সেই দর্শন যে এমন নিষ্ঠুর ভাবে তাহার হৃদয়ে আঘাত করিবে, তাহা সে কখনও চিন্তা করে নাই। শুধু এই কথাটাই ধীরুর মনে বার বার খোঁচা মারিতে লাগিল,—এতদিন বাদে কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইল, অথচ সে তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না। পাণ্ডা ধীরুর হাতের মধ্যে ফুল-বিল্বপত্র গুঁজিয়া দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল। ধীরু তাহার কতক বলিল, কতক শুনিল, আর কতকাংশ না-শোনা না-বলার ভিতর দিয়াই হাতের ফুল বেলপাতা বিশ্বনাথের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কোন প্রকারে অঞ্জলি প্রদান কার্য্য শেষ করিল। পাণ্ডা হাত পাতিতে তাহাকে একটা টাকা দিয়া ভীড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া উঠানের এক পাশে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইচ্ছা, আর কোন কথা না হোক্, অন্ততঃ তার পিসীর সঙ্কটাপন্ন ব্যায়রামের সংবাদটা কল্যাণীকে জানাইয়া দেয়।···কিন্তু এই সহজ সরল কাজটার মধ্যে যে কতখানি বাধা বিপত্তি পড়িয়া আছে, ধীরু তাহা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল না।

ক্রমে যখন ভীড় কমিয়া গেল, সুখদা ঠাকরুণ কল্যাণীর হাত ধরিয়া বিশ্বনাথের সম্মুখে লইয়া আসিল। হরি ঠাকুর পাণ্ডাকে ডাকিয়া আনিতেই সে তাহার গামছায় বাঁধা কয়েকটা ফুল বিল্বপত্র লইয়া কল্যাণীকে মন্ত্র পড়াইতে লাগিল। অন্যমনস্কভাবে অঞ্জলিপূর্ণ হস্তে কল্যাণী মন্ত্র পড়িতে লাগিল, পূজায় নিবিষ্টচিত্ত হইতে পারিল না। সে তাহার মহাপূজার শুভ মুহূর্ত্তে যে এমন করিয়া বাধা পাইবে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে আজ ভক্তিপ্লুত হৃদয়েই মন্দিরে আসিয়াছিল,—তার অন্তরের নিভৃত কোণের লুকাইত ব্যথাভার, ব্যর্থ কামনা, দুঃখ অশান্তি উজাড় করিয়া বিশ্বনাথের চরণে সমর্পণ করিতে। কিন্তু একটি মুহূর্ত্তে সব ওলটপালট হইয়া গেল। সে বিশ্বনাথকে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল "পাষাণ ঠাকুর, আমার প্রাণটাকে পাষাণ করে দাও, আমি আর কিছু চাই না।" তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।

একে একে সকলের পূজা যখন শেষ হইল, জগদীশবাবু তাঁহার স্থূল দেহখানি কোন প্রকারে বিশ্বনাথের সম্মুখে টানিয়া আনিয়া অতি কষ্টে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "উঃ এই ভীড়ে মানুষ আসে! ভাগ্যিস আমি আগে থাকতেই বাইরে বেরিয়ে এসেছিলুম, নইলে দম আটকেই মারা যেতুম। সাধ করে কি আর আমি মন্দিরে আসতে চাই না...তোমরা বল বটে কিন্তু"···তার পর কল্যাণীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আবার কি অন্নপূর্ণার মন্দিরে যেতে হবে না কি!"

কল্যাণী কোন উত্তর না দিয়া মাথা নত করিল। কাদম্বিনী কহিল "হ্যাঁ, তা না গেলে চলে? আজকের একটা দিন!"

হরিঠাকুর উৎসাহভরে কহিল "এই ত কাছে ..চলুন না ...সেখানে এত ভীড় হবে না।"

জগদীশ বাবু সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "এখনও যে ভীড় জমে আছে হে!"

পাণ্ডা তাহার গোঁফে চাড়া দিয়া কহিল, "আইয়ে মহারাজ, কুছ তক্‌লীফ নেই হোগা"—পাণ্ডা সকলকে বাহির করিয়া লইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ধীরু মন্দিরের বারান্দায় অপেক্ষা করিয়া ক্রমে বিরক্ত হইয়া উঠিল। জনতা হ্রাস হইল, একে একে সকলেই চলিয়া যাইতেছে, ধীরু তখনও দাঁড়াইয়া আছে অধীর চিত্তভার লইয়া। কল্যাণীকে বাহির হইতে না দেখিয়া ধীরু পুনরায় মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে কতকগুলি স্ত্রীলোক পূজা করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কল্যাণী নাই। ধীরু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বাহিরে আসিল,—রাগে, অভিমানে দুঃখে তাহার অন্তর ভরিয়া উঠিল। আপন মনে কহিল "আশ্চর্য্য, কল্যাণী একটা মুখের কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, এত পরিবর্ত্তন!" ধীরু ক্ষুণ্ণমনে গৃহাভিমুখে চলিল।

কল্যাণী যখন অন্নপূর্ণার মন্দিরে আসিল, তখন মন্দিরের ভিতর ভীড়। জগদীশবাবু সকলকে লইয়া নাট-মন্দিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কল্যাণীর বুকের মধ্যে তখন ঝড় বহিতেছিল।······বুঝি তার শত চেষ্টার বাঁধন আজ ছিঁড়িয়া যায়। কণ্ঠস্বর না কাঁপে, দুর্ব্বলতা না ধরা পড়ে—এজন্য সে তাহার সমস্ত শক্তি দিয়া হৃদয়কে দৃঢ় করিল। কাদম্বিনী লক্ষ্য করিল, কল্যাণীর মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, এবং কল্যাণীর চক্ষের কোণে উদ্বেল অশ্রু। কল্যাণীর ইচ্ছা হইল, জগদীশ বাবুকে বলিয়া ধীরুকে ডাকিয়া আনে, কিন্তু সহস্র ইচ্ছা সত্ত্বেও কথাটা মুখ হইতে

বাহির করিতে পারিল না। তাহার মনটা ক্ষুদ্র শিশুর মতন আবার বিশ্বনাথের মন্দিরের পানে ছুটিয়া যাইতে চাহিল; কিন্তু আছাড় খাইয়া পিছাইয়া পড়িল,—তবুও সেই যাইবার আগ্রহ তাহাকে যেন বিরত করিতে পারিতেছে না। এমন সময় হরিচরণ একগাছি ফুলের মালা ও কিছু ফুল কল্যাণীর হাতে দিল। কাদম্বিনীকে দিতে যাইলে সে কহিল, "আমার ত হাতেই ফুল আছে···দেখছ না?"

সুখদা ঠাকরুণ হাসিয়া কহিলেন, "তা হোক্, বামুন মানুষ দিচ্ছে···তুমি ঠাকুরকে দেবে বলে"......কাদম্বিনীর মুখের উপর দিয়া একটা মৃদু হাসির চঞ্চল রেখা খেলিয়া গেল। সে হরিচরণের দিকে চাহিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফুল লইয়া কহিল, "এইবার চল, ভীড় কমেছে।"

অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জগদীশবাবু কহিলেন, "এইবার বাড়ী চল বাপু, বেলা হয়েছে, এক দিনে আর সব পুণ্যি করে না।" কল্যাণীও সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল!

কাদম্বিনী কহিল "ওমা, কাল-ভৈরবের বাড়ী যাওয়া হল না!"

জগদীশবাবু হাসিয়া কহিলেন "কাল যাস, কালভৈরব তো পালাচ্ছে না!" সকলে গৃহে ফিরিল।

ঘণ্টাখানেক পরে কল্যাণী জগদীশ বাবুকে খাবার দিতে যাইলে তিনি কল্যাণীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন, "সত্যি, আজ তোমার কি সুন্দরই দেখিয়েছে,—কি চমৎকার মানিয়েছে নতুন বৌ!" কল্যাণী নিজের লাল বেনারসী শাড়ীর পানে একবার চাহিয়া ম্লান হাস্যে কহিল "বেশ গিন্নীবান্নির মতন দেখাচ্ছে, না?···তা আমার পানে চাইলে ত পেট ভরবে না, ওই থালার পানে চাও!" জগদীশ বাবু হাসিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেই কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল "আমি পাণ নিয়ে আসি" বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী বড় ঘরটায় আসিয়া পাণ বাহির করিল, কিন্তু নিজেকে পুনরায় স্বামীর নিকটে কোনমতে লইয়া যাইতে পারিল না! ঝিএর দ্বারা জগদীশ বাবুকে পাণ পাঠাইয়া দিয়া, তেতালায় ঠাকুর-ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া জানালার ধারে বসিয়া অদূরে গঙ্গার পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল...কেন এমন হইল? এই ইচ্ছাগুলো বুকের মাঝে তোলাপাড়া করিতেছে কেন? কেন এই ক্ষুদ্র বাসনাগুলো কাঁটার মতন আজও বুকে বিঁধিয়া আছে? কেন সে আর-সবাইকার মতন স্বামী ও সংসার লইয়া সুখী হইতে পারিতেছে না? তাহার অভাব কি?..... এতবড় সংসারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী সে,—স্বামীর ভালবাসার অন্ত নাই......তবু সে শান্তি পায় না কেন? ইহার যথাযথ উত্তর কল্যাণী মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইল না। তাহার প্রাণটা সেই অতীতের মাঝে ছুটিয়া গেল, যেমন মরুভূমি-যাত্রী গমনের পূর্ব্বে পানীয় সঞ্চয় করিয়া লয়! মুখের আলাপ, চোখের দেখা, ইহাতে কিই বা যায় আসে? কারো কোন ক্ষতি নাই···তবে?···তাহারই বা লাভ কি? লাভ লোকসান হয় ত কিছুই নাই, শুধু চক্ষের একটু তৃপ্তি, ক্ষুদ্র বাসনার একটুখানি সফলতা! তাহার মনটা ঝাঁকানী দিয়া বলিয়া উঠিল, 'ছিঃ, তুমি না বিবাহিতা, তোমার না স্বামী আছে? এখনও তাহার চিন্তা?' স্বামী! কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিল!...হ্যাঁ, তাঁহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে জানি, পালন করিব,···আমরণ তাঁর ক্রীতদাসী, মৃত্যুর এপারে মুক্তি নাই,—সবই স্বীকার করিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া আমার যে একটা স্বাধীন চিন্তা পর্য্যন্ত থাকিতে পাইবে না—এ নিষ্ঠুর বিধান কেন? যে শাস্ত্রকার কথার বাঁধন দিয়া নারীকে পুরুষের পাশবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, নিষ্ঠুর পুরুষ! নারীর সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াও কি তোমার তৃপ্তি হয় নাই, তাই ভগবানের দেওয়া তাহার মনটার উপরেও জোর খাটাইতে চাও? কল্যাণীর কাণের কাছে ধ্বনিত হইতে লাগিল—

"যদিদং হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"

ওগো এ মিথ্যা, মিথ্যা,···এ সব মিথ্যা! কল্যাণী দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

১১

বেলা এগারটার সময় সুখদা ঠাকরুণ গুটি দশেক কুমারী আনিয়া কাদম্বিনীকে কহিল "বৌদি কোথায় দিদি?"

"ওপরে গুরুদেবের কাছে আছেন! চল এদের বসাই।"

"বউদির মন্তর নেওয়া হয়ে গেছে?"

"হাঁ, এদের নিয়ে ওপরে এস।"

কাদম্বিনী সকলকে লইয়া উপরের বড় ঘরটায় বসাইয়া

পাশের ঘরে দরজার নিকট গিয়া কহিল "কুমারীরা এসেছে বৌ, তোমার এধারের কাজ সারা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ,—তাদের বসাও, আমি যাচ্ছি।" কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

কল্যাণী এই মাত্র যাঁহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিল, তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী,—তাঁহার বয়স প্রায় ৭০এর কাছাকাছি। দীর্ঘ গৌরবর্ণ চেহারাখানি, সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি,—দেখিলেই আপনা হইতেই কেমন একটা ভক্তি আসে। তিনি হাসিয়া কহিলেন "দেখ মা, সংসারের কাছে অনেক কিছু আশা করলেই ঠকতে হবে। যতটুকু পাবে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থেকো, তাতে প্রাণে শান্তি পাবে। তোমার প্রারব্ধে যা আছে, তা তুমি পাবেই। তার জন্ম ছুটোছুটি করতে হবে না।"

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল, "আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন বাবা!" কল্যাণী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

"নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন। তাহলে মা আমি এখন উঠি। আজ আবার আশ্রমে ২।৪জন গুরুভাই হরিদ্বার থেকে আসবেন।"

"আবার কবে আপনার চরণ দর্শন পাব বাবা ?"

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন, "ছেলের ক্ষিধে পেলেই মার কাছে ছুটে আসবে, কিছু ভাবতে হবে না মা।" গুরুদেব চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী বড়ঘরে আসিয়া দেখিল, গুটি দশেক মেয়ে বসিয়া আছে। সকলেরই বয়স প্রায় ১৫ হইতে ১৮র মধ্যে, কেবল একটি মেয়ের বয়স বছর ১৩ হইবে এবং সেই সকলের চেয়ে দেখিতে সুশ্রী ও লাজনম্র। কল্যাণী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার নামটি কি খুকী ?"

মেয়েটি ধীরকণ্ঠে কহিল "শ্রীনারায়ণী দেবী।"

"বেশ নামটি ত।"

সুখদা ঠাকরুণ কহিল, "ভারী ঠাণ্ডা মেয়ে বউদি! মা নাই, বুড়ো বাপ আছে, সংসারের সব কাজই ও একা করে। আবার ওদের বাড়ী একটা মেয়ে মানুষ বছরখানেক হল ভাড়া আছেন, তাঁর প্রায় এক মাস অসুখ, ও তার যা সেবা'টা করছে, কি বলব বৌদি!"

কল্যাণী কহিল "তাঁর দেশ কোথায় খুকী ?"

নারাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল "খড়দায়।"

কল্যাণী সাশ্চর্য্যে কহিল, "তাঁর এক ভাইপো এখানে এসেছে না ?" নারাণী গভীর বিস্ময়ে কল্যাণীর মুখের পানে চাহিল।

সুখদা ঠাকরুণ কহিল, "হ্যাঁ—এই কদিন হল এসেছে, তার নাম ধীরু! তুমি কি তাদের চেন না কি বৌদি ?"

"হ্যাঁ—আমার মামার বাড়ী হচ্ছে ওঁদের গাঁয়ে।"

সুখদা ঠাকরুণ গালে হাত দিয়া কহিল, "ওমা, কি ভাগ্যি! বলবখ'ন আজ দিদিকে, আহা রোগামানুষ—শুনলে কত খুসী হবে।"

কাদম্বিনী আসিয়া কহিল, "সব যোগাড় হয়েছে বৌদি, আর মিছে বেলা করে পিত্তি পড়াচ্ছ কেন ? এদের নিয়ে এস।"

সকলকে নববস্ত্র পরাইয়া পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া কল্যাণী কুমারী-পূজা সাঙ্গ করিল। ঘণ্টা দুই বাদে তাহাদের সকলকে লইয়া সুখদা ঠাকরুণ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, কল্যাণী সুখদাকে কহিল, "নারাণী থাক্ একটু, আমি ওকে লোক দিয়ে পাঠিয়ে দেব।"

"বেশ ত বৌদি! তোমার কাছে থাকবে তার আর কথা কি ? থাক লো নারাণি, এর পরে যাস।"

সকলে চলিয়া গেলে কল্যাণী নারাণীকে লইয়া উপরে আসিল। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া দয়াদেবীর এখানে আসা হইতে ব্যায়রাম হওয়া, ধীরুর আগমন প্রভৃতি অনেক কথাই জানিয়া লইল। কল্যাণী নারাণীকে কহিল, "পিসীমাকে বলবে ত ভাই যে কল্যাণী দিদি এখানে এসেছে!"

নারাণী মাথা দোলাইয়া কহিল "বলব।"

"আমি একদিন তোমাদের বাড়ী যাব পিসীমাকে দেখতে।"

"বেশ ত, কালই চলুন না।"

"উনি আর কতদিন এখানে থাকবেন ? ধীরুর পিসীমার অসুখ না সারলে ত আর যাবেন না ?"

ধীরুর উল্লেখে নারাণী মাথা নীচু করিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, "তা ত জানি না।" নারাণীর এই সলজ্জভাব কল্যাণী লক্ষ্য করিল।

"তুমি তাঁর সঙ্গে কথা কও না ?"

নারাণী ঘাড় হেঁট করিয়া মাথা নাড়িয়া জানাইল "না।"

"কেন ? তুমি ত ছেলে মানুষ।"

নারাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল "আমার লজ্জা করে।"

"তোমার বিয়ের সম্বন্ধ আসছে না ?"

নারাণী মাথা নীচু করিয়া রহিল। কল্যাণী হাসিয়া কহিল, "আমার কাছে কি লজ্জা করতে আছে, আমি যে তোমার দিদি !"

নারাণী সলজ্জভাবে মৃদুকণ্ঠে কহিল, "বাবার টাকা নাই কি না…তাই…

"তাই কোথাও ঠিক হচ্ছে না ?"

নারাণী মাথা নাড়িল।

কল্যাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বাঙ্গালীর ঘরে অর্থহীন পিতার কন্যা হয়ে জন্মানো যে কতবড় অভিশাপ, সে যে কি লজ্জা ও বেদনা, তাহা ত তাহার অজানা নাই! সে যে নিজেই তাহা প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছে। সমস্ত কল্পনার অবসান, সকল বাসনার সমাধি…ব্যর্থ জীবনের মৌন বেদনা…আমরণ কাল পর্য্যন্ত…কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া কহিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, বলবে নারাণী ?"

নারাণী চোখ নীচু করিয়া কহিল "কি ?"

"ওঁকে তোর পছন্দ হয় ?"

নারাণী আর্ত্তকণ্ঠে কহিল "ছিঃ, দিদি—"

"কেন ? তাকে বিয়ে করতে তোর ইচ্ছে"—

নারাণী বাধা দিয়া ক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল, "না—আমার ইচ্ছে থাকতে নাই, থাকা উচিত নয়। আমার বাবা আমায় যার পায়ের তলায় ফেলে দেবেন, সেইখানেই"—নারাণী আর বলিতে পারিল না।

কল্যাণী গভীর বিস্ময়ে নারাণীর পানে চাহিয়া ভাবিল "এ কি! এ ত বালিকার সহজ সরল সুর নয়, এ যে এক অভিমানিনী নারীর চাপা কান্নার শব্দ,—এই বালিকার ভেতরই মুখ লুকিয়ে সে কাঁদছে, এ বুঝি তাহারই প্রতিধ্বনি। তবে কি সেই ঝড় এখানেও বহিয়া গেছে ? আশ্চর্য্য কি ? বিবাহিত জীবনের কর্ত্তব্য, সংযম ও সংস্কারের পাঁচিল দিয়া যে ঝঞ্ঝা থেকে নিজেকে সে আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, কিসের ধাক্কায় তাহা একটি মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইল ? তবে ?—এই বালিকার কি ক্ষমতা যে সে শক্তিকে প্রতিহত করিতে পারে ?

"আমি বাড়ী যাব—পিসীমাকে ওষুধ খাওয়াবার সময় হল !"

কল্যাণীর চমক ভাঙ্গিল। মৃদুকণ্ঠে কহিল "আচ্ছা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠাকুরঝি! নেতাকে নারাণীর সঙ্গে দাও—ও বাড়ী যাবে।"

নারাণী কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "পিসীমাকে বলব কাল আপনি আমাদের বাড়ী যাবেন ?"

"কাল যদি না পারি—এক দিন যাব।"

নারাণী চলিয়া গেল। কল্যাণী দৃষ্টি ফিরাইয়া গঙ্গার পানে চাহিয়া রহিল। সূর্য্য তখনও অস্ত যায় নাই। গঙ্গার অপর পারে বালির চড়ার শেষে গাছগুলোর গায়ে তখনও রক্তরশ্মি খেলা করিতেছিল। কল্যাণী একদৃষ্টে তাহাই দেখিতেছিল, আর তাহার মনটা বহুদিন—বিস্মৃত-অতীত জীবনের আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। বিক্ষুব্ধ সাগরের মতন তার মন এই কদিন ধরিয়া কেবলই তোলাপাড়া করিয়াছে। আজ সে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। মনে পড়িল সেই ছেলেবেলার কথা! সেই খেলাধূলো, চেঁচামেচি, ভাবনাবিহীন দিনগুলো। সকাল বেলা উঠেই পুতুল-খেলা, দৌড়াদৌড়ি, তারপর পুকুরের জল মাতিয়ে তোলা! সমস্ত দিন ছুটোপাটি। দিন শেষে বিছানায় এসে মার কোলের কাছে ঘুম। কত শিগ্‌গির সে দিনগুলো কেটে গেল! তার পর এক নূতন জীবন! কত সুখের কল্পনা…দেহ মনে কি এক অনুভূতি—শেষে সে সব এক দিন ওলট পালট হয়ে গেল, ছায়াবাজির মতন কোথায় মিলাইয়া গেল! আকাশের আর নূতন রং নাই, স্বপ্ন-সাগরের সে ঢেউ নাই, রহিল কেবল বাস্তবের কঠিন সত্য! যতদূর দৃষ্টি যায়—কল্যাণী দুই চোখ মেলিয়া দেখিল! কিন্তু সবই যেন খালি হইয়া গেছে। কিছুতেই যেন তাহার প্রয়োজন নাই; কিছুই যেন মরণকাল পর্য্যন্ত তাহার কোনই কাজে লাগিবে না। এই বিশ্বব্যাপী শুষ্কতার শূন্যতায় তাহার কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নাই। অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সব নিশ্চল, সব নিষ্ফল হইয়া গেছে,—পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই, তাহার কোন কাজ নাই, জীবনে কোন সাধ নাই,—তবু তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কেন? কোন কাজ নাই—শুধু বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই বাঁচিতে হইবে? এ কি শাস্তি! এ কি বিড়ম্বনা! বিধাতার এ কি নিষ্ঠুর দণ্ড!! কখন সন্ধ্যা হইয়াছে, কখন হরির মা আসিয়া ঘরে আলো দিয়াছে—কল্যাণীর কোনই খেয়াল নাই। চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তাহার নিজের চক্ষের জলে! আঁচলে চোখ মুছিয়া জানালার গরাদের মাথা রাখিয়া বাহিরের স্তব্ধ অন্ধকারের পানে চাহিয়া সে তেমনি বসিয়া রহিল।

অদূরে গঙ্গার ঘাট হইতে কে তখন গাহিতেছিল—

"সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে,
দিবস গেলে করব নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন—" (ক্রমশঃ)

মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী

শ্রীহরেন্দ্রকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ

১

আজকাল খবরের কাগজে মেয়েদের সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা হইয়া থাকে। শিক্ষার অভাব, শারীরিক দুর্ব্বলতা, ভ্রমাত্মক নীতিজ্ঞান, অনাবশ্যক লজ্জাশীলতা এবং পর্দ্দা প্রথাই যে বিশেষভাবে এ দেশের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায়, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সব বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আজ এইমাত্র বলিতে চাই যে, উক্ত সব কারণে আমাদের উপযুক্তা মেয়েরা জাতির উন্নতি-বিধায়ক একটী সুমহৎ কাজের সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যা হইয়াও একেবারে সর্পদষ্ট অঙ্গুলির ন্যায় সমাজ কর্ত্তৃক দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, আমি স্থায়ী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর কথা বলিতেছি। গত বৈশাখের ভারতবর্ষে আমি পুনর্ব্বিবাহে অনিচ্ছুক অথচ কার্য্যক্ষম বিধবা মেয়েদের স্বাধীনভাবে সসম্মানে জীবিকা অর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশের কল্যাণকর একটী কাজের উল্লেখ করিয়া অন্ততঃ কয়েকজন মা-বোনের সহানুভূতি-সূচক পত্র পাইয়াছিলাম, ইহা লেখকের সৌভাগ্য না বলিয়া দেশের শুভলক্ষণ বলা যায়। এবারকার প্রস্তাবটীও বিশেষভাবে তাঁহাদের সম্মুখেই উপস্থিত করিতেছি।

স্বেচ্ছাসেবকের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন কিছু বলিতে গেলে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ দৃশ্যের কথাটা মনে হওয়া স্বাভাবিক। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের যে মূল্য, সেবকের মূল্য তাহা অপেক্ষা কম নহে। অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নির্দ্দয়ভাবে কতকগুলি জীবকে হত্যা করিয়া অপর কতকগুলি জীবের সুখশান্তি বিধান করা, আর কোন প্রাণীকেই হিংসা না করিয়া সেবা-শুশ্রূষা দ্বারা কতকগুলি প্রাণীকে দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি হইতে মুক্ত করা—এই দুইটী আপাত-দৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী কাজের মধ্যে কোনটী স্ত্রীজাতির কমনীয় স্বভাবে অধিকতর শোভন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। প্রথমটী সৈনিকের কাজ, দ্বিতীয়টী স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। যুদ্ধক্ষেত্রের বাহিরে সৈনিকের কর্ত্তব্য বড় একটা নাই বলিলেই চলে; কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকের কর্ম্মক্ষেত্র অনন্ত ও অসীম। রুগ্ন ক্ষুদ্র শিশুর সংকীর্ণ শয্যাপার্শ্ব হইতে জাতীয় মহাসমিতির বিরাট সভামণ্ডপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্বেচ্ছাসেবকের কঠোর কর্ত্তব্য রহিয়াছে। সেবার পবিত্র ধর্ম্মে মাতৃজাতিরই বিশেষ অধিকার।

২

"মেয়েরা সৈনিক হইতে পারে কি?"—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অপেক্ষা "মেয়েরা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গঠন করিতে পারে কি?"—প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনেকাংশে সহজ। প্রশ্ন দুইটা সম্পূর্ণ পৃথক্—যদিও আপাত-দৃষ্টিতে

ইহাদিগকে পরস্পর আপেক্ষিক বলিয়া মনে হয়। প্রথমটীর নিশ্চিত উত্তর দেওয়া সত্য সত্যই বড় কঠিন। কোনরূপ উত্তর দিতে গেলেই নানা প্রকার সন্দেহ আসে। দুই একটী কারণেরও উল্লেখ করা যাইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত দেশসমূহেও যথারীতি মহিলা সৈন্তবাহিনী তৈয়ার করা হয় নাই। এমন কি এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়াও মনে হয় না। সম্প্রতি ইয়োরোপীয় মহাসমরের সময় বিবদমান কোন কোন জাতি যুদ্ধক্ষেত্রেও যথাসম্ভব মেয়েদের সাহায্য লইতে বাধ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখনও তাঁহাদিগকে প্রকৃত সৈনিকের কাজে নিযুক্ত করা হয় নাই। প্রধানতঃ গুলি বারুদ ও রসদ সরবরাহ, আহতের সেবাশুশ্রূষা, অস্ত্রাদি সংগ্রহ, সংবাদপত্র পরিচালন, পরিখা-খনন—প্রভৃতি কাজ মেয়েদের দ্বারা করানো হইত। আমেরিকার কোন কোন অংশে অধুনা মেয়েদের সামরিক ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তীর-ধনু চালনা প্রভৃতি শিক্ষারও বন্দোবস্ত আছে বটে, কিন্তু তাহাও অনেকটা দর্শকের পরিতৃপ্তির জন্মই বলা যায়।

অপর পক্ষে, মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। আমাদের মতে বিগত মহাসমরের মহিলা-সংঘকে সৈনিকবাহিনীর অন্তর্ভূত না করিয়া মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর পর্য্যায়ে স্থান দিলে ভাল হইত। এ ছাড়া, সাংসারিক নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে কর্ম্মে আমরা মাতৃজাতির সেবাকার্য্যপ্রবণতার স্বাভাবিক পরিচয় পাইয়া থাকি, ইহার প্রমাণ অনাবশ্যক। এ সব কারণে দ্বিধাশূন্য হইয়া আমরা বলিতে পারি যে, স্বেচ্ছাসেবকের কর্ত্তব্যপালনে মহিলা-সঙ্ঘ পুরুষ-সঙ্ঘ অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকর হইবে।

স্বেচ্ছাসেবক বলিতে আমরা তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করি, যিনি পরার্থে, শান্তিপূর্ণভাবে, এবং ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ উপায়ে প্রত্যেক সৎকাজের জন্য সর্ব্বতোভাবে নিজের ইচ্ছায় সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকেন। মোটামুটি হিসাবে ইহাকেই স্বেচ্ছাসেবকের সরল সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে। বড় বড় সামাজিক বা জাতীয় আত্মত্যাগের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবলমাত্র স্ব স্ব পরিবারের দিকে তাকাইলেই আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারি যে, পুরুষজাতি অপেক্ষা নারী জাতির মধ্যে পরের কল্যাণার্থে আত্মহারা হওয়ার স্পৃহাটা অধিকতর স্বাভাবিক। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মাতৃজাতি পরের জন্যই সকল কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যেন পরের কল্যাণার্থেই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। যে নারী জীবনে কখনও অপরের সেবা করিবার সুযোগ পান নাই, তাঁহার নারীত্বই অসম্পূর্ণ থাকে। নারীর সেবায় আন্তরিকতা আছে বলিয়া সেবিত ব্যক্তি সহজেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আরও একটা ভাবিবার কথা এই যে, সাধারণতঃ দেখা যায়, মেয়েরা যত সহজে সৎকার্য্যের দ্বারা লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে পারে, পুরুষেরা তত সহজে পারে না। মেয়েরা সরল বিশ্বাসের সহিত প্রাণ-মন ঢালিয়া অপরের কল্যাণ কামনায় আত্মনিয়োগ করিতে অভ্যস্ত থাকায়, সহজেই লোকপ্রিয় হইতে পারে। লোকপ্রিয়তা স্বেচ্ছাসেবকের কর্ত্তব্যপালনে অন্যতম প্রধান সহায়। ইহা কৃতকার্য্যতার পরিচায়ক।

স্বেচ্ছাসেবকের মানসিক ও শারীরিক উভয়বিধ শক্তি প্রচুর পরিমাণে থাকা আবশ্যক। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, দৈহিক অপেক্ষা মানসিক শক্তির অধিক প্রয়োজন। নিয়মিত সংযম এবং উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা মনকে শক্তিশালী করা যায়। সাবধানতার সহিত স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন এবং যথারীতি ব্যায়াম চর্চ্চা দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন ও দৈহিক বল অর্জ্জন করা যায়। নারীর কি তেমন দেহ বা মন নাই? নারী কি ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে কর্ম্মশক্তির সম্যক বিকাশ সাধন করিতে পারে না? সুশিক্ষা দ্বারা মনটীকে সংযত করিয়া আত্মাকে জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত করিতে নারী কি অসমর্থ? সংযমের দ্বারা প্রবল ইচ্ছাশক্তিকে সুপরিচালিত করিয়া নারী কি কোন সৎ ও মহৎ কার্য্যের দায়িত্ব বহন করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না? ইহা নিশ্চয় যে স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ পুরুষজাতির অন্তঃকরণ অপেক্ষা স্বভাবতঃ দৃঢ়তর ও মহত্তর। ইহাকে সুনির্ম্মল এবং চির-পবিত্র রাখিবার জন্য মাতৃজাতির স্বভাবসুলভ আন্তরিক যত্নের কখনও অভাব হয় না।

আপাত-দৃষ্টিতে মেয়েদিগকে মানসিক শক্তিতে দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। তাঁহাদের লক্ষ্য সর্ব্বদাই স্থির, অচঞ্চল। তবে, লক্ষ্য-বস্তু লাভের উপায়গুলি মাত্র পরিবর্ত্তনশীল হইতে দেখা যায়।

পরিবারের কেহ সাংঘাতিকরূপে অসুস্থ হইলে মেয়েরা যেমন অনন্যমনা হইয়া সেবাশুশ্রূষা করিতে পারে, পুরুষদের দ্বারা তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। ব্রত-নিয়ম পালনে অথবা পূজা-অর্চ্চনায় সরল বিশ্বাসী মেয়েরা যেরূপ একাগ্রতা ও সংযমের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা ভাবিতেও মনে আনন্দ হয়। বিশ্বাসহারা সন্দিগ্ধচেতা পুরুষজাতি সে একনিষ্ঠতার পরিচয় কিরূপে দিবে? অবশ্য স্ত্রীলোকের আচার নিয়ম অনেক সময় সামাজিক হিসাবে বাতুলতার সমতুল্যই অহিত-

বরদার মেয়েদের ব্যায়াম-চর্চ্চা।

কর বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত শক্তিটাকে সুপরিচালিত করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইতেও দেখা যায়।

(৩)

বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম-চর্চ্চার যথারীতি সুযোগ দিলে শারীরিক শক্তিতেও মেয়েরা যথাযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবে। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কুমারী তারাবাইএর উল্লেখ করা যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বাংলাদেশের নানা স্থানে অসাধারণ শারীরিক শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া প্রাচীন ও আধুনিক, দেশের এবং বিদেশের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বরদা ও বোম্বাইএর কোন কোন বালিকা-বিদ্যালয়ে অধুনা যথারীতি ব্যায়াম-চর্চ্চার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয়।

স্বাস্থ্য-নীতি পালন দ্বারা মেয়েরা অন্ততঃ পুরুষের সমান স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অগ্নিকাণ্ডে দ্রুত সাহায্য প্রদান, ঘোড়-দৌড়, সাইকেল দৌড়, বন্যার স্ফীত নদী সাঁতরাইয়া পার হওয়া, অশ্বরথ বা বাষ্পীয়যান চালনা প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় সাহসিক কাজগুলি পুরুষের একচেটিয়া বলিয়া আজও লোকের ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। যথারীতি ব্যায়াম দ্বারা বলিষ্ঠদেহ মেয়েরা প্রয়োজন মত এসব কাজে অনায়াসে পুরুষের প্রতিযোগিতা করিতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বেও একজন আমেরিকান মহিলা মাত্র কয়েক ঘণ্টায় 'ইংলিশ প্রণালী' অনায়াসে সাঁতরাইয়া পার হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আরও ৩।৪ জন মহিলা উক্ত প্রণালী

পায় হইয়াছেন। স্বেচ্ছাসেবিকার পক্ষে এরূপ শারীরিক শক্তির খুব বেশী দরকার নাও হইতে পারে; কিন্তু প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবিকার সময় সময় এরূপ দুঃসাহসিক কাজও দরকার হইতে পারে, এই কারণেই এখানে উল্লেখ করিলাম।

৪

অটুট স্বাস্থ্য এবং সুদৃঢ় মানসিক শক্তি এই উভয়ই স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর একমাত্র মূলধন, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকের উপযোগী অন্যান্য ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গুণসমূহেরও অভাব আছে বলিয়া মোটেই মনে হয় না। আত্মসম্মান-জ্ঞান, আত্ম-বিশ্বাস, আত্মতৃপ্তি, আত্ম-সংযম, আত্মত্যাগ, আত্মোৎ-সর্গ, দুর্ব্বল এবং অসহায়ের প্রতি অনুকম্পা, রুগ্ন ও অত্যাচারিতের প্রতি স্নেহ-প্রবণতা, উদারতা, সহিষ্ণুতা, বাধ্যতা, বিনয়—প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশি মেয়েদের স্বাভা-বিক ধর্ম্ম। এসব গুণাবলীর অধিকাংশ মেয়েরা জন্ম হই-তেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহাদের স্নিগ্ধ কোমল অন্তঃ-করণ যেন ইহাদের সার দ্বারাই গঠিত।

কুমারী নাজীরবাই সেখ, ইনি বরদার প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-বীর শ্রীযুক্ত মাণিক রাওয়ের সহায়তায় ভারতীয় নারীদের উপযোগী ব্যায়াম-প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবক আত্মত্যাগের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার তদনুযায়ী অসীম মানসিক ক্ষমতা থাকা চাই। মাতৃজাতির বিশেষত্বই এই যে তাঁহারা বাল্যে, যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে কোন সময়েই নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে মোটেই দৃক্‌পাত করেন না। তাঁহারা সর্ব্বদা ভ্রাতা, স্বামী, সন্তানাদি ও অন্যান্য পরিবারবর্গের সেবাশুশ্রূষা বিধানে তৎপর থাকিয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন তেমন আর কিছুতেই নহে। পরের জন্ত নিজের স্বার্থ কি করিয়া স্বেচ্ছায় অম্লানবদনে ত্যাগ করিতে হয়, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত স্ত্রীজাতি। অপর দিকে, আত্মসম্মান রক্ষণে এবং স্বপরিবারের গৌরব বর্দ্ধনে স্ত্রীজাতি সর্ব্বদাই অতি সাবধান। নারীর অন্তঃকরণ স্বভাবতই অতি কোমল। নারীজাতি সহজেই দুর্ব্বলের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন, দরিদ্রের প্রতি দয়ালু এবং রুগ্ন বা অত্যাচারিতের প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া থাকেন। এইসব কারণে অপরের কল্যাণার্থ নারী অসীম দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও অসমসাহসিক (এমন কি অমানুষিক) কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নারী যে-কোন কষ্টদায়ক দুর্ব্যবহার হেলায় সহ্য করিতে পারে, ইহার প্রমাণ আমরা সমাজে সর্ব্বদাই পাইতেছি।

ধৈর্য্য, বাধ্যতা, বিনয় প্রভৃতি গুণে নারী অতুলনীয়। পুরুষ এসব বিষয়ে কখনই নারীর সমকক্ষতা আশা করিতে পারে না। স্বেচ্ছা-সেবকমাত্রেরই এসব গুণ থাকা চাই। শিশুসুলভ সরলতা, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং দেহের বিশুদ্ধতা নারীর মনে অতি দৃঢ় বিশ্বাসের সৃষ্টি করে। এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলে নারী মনোনীত মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত না করিতে পারে এমন কাজ নাই। প্রয়োজন অনুসারে স্ত্রীজাতিতে ত্যাগ, সংযম, সৎসাহস, দক্ষতা প্রভৃতি সকল গুণেরই পর্য্যাপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব, পুরুষ অপেক্ষা নারী দুর্ব্বল—এ ভ্রান্ত ধারণা সমর্থন করার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

এতদ্ব্যতীত অন্য একটা কথাও স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে জোর করিয়া বলা যায়। পুরুষেরা যেমন নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে

বিবিধ পাপকার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, রমণীরা সেরূপ কাজ করিতে গেলে তাঁহাদের চরিত্রগত স্বাভাবিক লজ্জাই প্রবল প্রতিবাদ করিবে, আশা করা যায়। আমাদের বিশ্বাস, সুদৃঢ় স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পবিত্রতম আদর্শ উপাদান কেবলমাত্র স্ত্রীজাতিতেই সম্ভব। আশানুরূপ একটী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী সুগঠিত হইলে প্রধানতঃ স্বজাতির কল্যাণে ইহাকে নিয়োজিত করা যাইতে পারে; এবং ক্রমে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে ইহা সমগ্র মানব-সমাজেরও মঙ্গল সাধন করিতে পারে। এমন দিনও হয় ত আসিতে পারে, যখন এই মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী তাঁহাদের মাতৃহৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহধারার খরস্রোতে আধুনিক শূন্যগর্ভ বিশ্বপ্রেমবাদের সমস্ত পঙ্কিলতা ধৌত করিয়া এক অভিনব উদার ও পরমতসহিষ্ণু বিরাট মানব-সমাজ গঠন করিতে পারে।

(৫)

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, কিরূপে এবং কাহার দ্বারা এরূপ অভিনব বৈচিত্র্যবিশিষ্ট মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন করা সম্ভব? ইহা সত্য যে আমরা ভারতবাসী জাতি হিসাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া বিজাতীয়ের অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। সুতরাং, আমাদের অধীন নারী-সমাজ দাসের দাস বলিলেও ক্ষমা পাইতে পারি। এরূপ মজ্জাগত দাসত্ব-মুগ্ধ নারী-জাতিকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বীজমন্ত্রদানে সঞ্জীবিত করিবে কে? এ বিকট প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, যিনি ভাঙ্গা-গড়া বা উত্থান-পতনের আদি কারণ, সেই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই আমাদের যুগযুগান্তের পরাধীন নারী-সমাজে নবজীবনের উদ্দাম প্রেরণা সঞ্চারিত করিবেন। নবজাগরণের সূচনা ইতিমধ্যেই আমরা দেখিতে পাইতেছি।

এই নবজাগ্রত নারী-সমাজকে আমাদের সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। কে বলিতে পারে যে ইহা এক দিন সমগ্র মানব-সমাজের হিতসাধন না করিবে? আমাদের দেশে তেমন ব্যাপক ভাবে নারী-আন্দোলন আজও অগ্রসর হইতেছে না। তাহার কারণ, আমাদের দেশে শিক্ষিতা মেয়ের সংখ্যা খুবই কম (অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে লেখা-পড়া-জানা পুরুষের সংখ্যাই ত উল্লেখের অযোগ্য, তার পর মেয়েদের কথা ভাবিতেও চক্ষে জল আসে)। সৌভাগ্যের বিষয়, এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মহিলারাই তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য ক্ষমতা-নুযায়ী যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। এই কারণে পুরুষেরাও আজকাল কোন কোন স্থলে সমাজ ও রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে নারীর স্বাভাবিক অধিকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে।

মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী, কাণপুর কংগ্রেস অধিবেশন।

(৬)

দেশের রাজশক্তি এবং পুরুষশক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেও অদূর-ভবিষ্যতে নারী কেবলমাত্র আত্মশক্তির প্রভাবে নিজের জন্মগত স্বাভাবিক অধিকার লাভ করিবে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। যখন একটী জাতিতে বা সমাজে কালোপযোগী শ্রেষ্ঠ সভ্যতার সহিত ব্যাপক ভাবে প্রতি-যোগিতা করিবার জন্য স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভূত হয়, তখন অভীষ্ট বস্তু লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে পারে না, এমন কি শক্তির অভাবও অনুভব করে না। নারী-সমাজের উন্নতির জন্য আজ সেই বিশ্ব-প্রেরণা দেশময় দেখা দিয়াছে। ইহার কৃতকার্য্যতা অবশ্যম্ভাবী। পুরুষেরা যদি নারীর বর্ত্তমান সমস্যা-সময়ে চির-উদাসীন থাকে, তাহা

হইলেও নারীজাতির অগ্রগতিতে বাধা পড়িবে না; তবে, লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে সময় একটু বেশী লাগিতে পারে। নারীজাতির উন্নতি যত শীঘ্র হইবে, দেশের ও সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল। মেয়েদিগকে সাহায্য করা পুরুষদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ সামান্ত কয়েকজন কর্ম্মঠ, শিক্ষিত, এবং উৎসাহী মহিলাকে তাঁহারা কার্য্যোপযোগিনী করিয়া তুলিতে পারেন। ঐ মহিলারাই ক্রমে স্বজাতীয়াদের মধ্যে নবজীবনের অমিত শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। এইরূপে কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে মহিলারাই নিজেদের দলের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে পারিবেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ শিক্ষাবিভাগের উল্লেখ করা যায়। মেয়েরা প্রথমতঃ বালকদের স্কুল কলেজেই শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। অবশ্য ইহাতে অগ্রগামী মেয়েদের যেমন সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি মেয়েদের উন্নতিকল্পে অভিভাবকের উদারতাও অতি প্রশংসনীয়। পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে অধুনা প্রায় সর্ব্বত্রই মেয়েরা অল্পাধিক পরিমাণে শিক্ষার সুযোগ পাইতেছে। অধিকাংশ স্থলেই মেয়েদের পরিচালিত স্কুল-কলেজ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে মেয়েদের স্থাপিত এবং মেয়েদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানও আজকাল বিরল নহে। শিক্ষা-বিভাগে যাহা সম্ভব হইয়াছে, অন্যান্ত বিভাগেও তাহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইবে, সন্দেহের কোন কারণ নাই। বর্ত্তমান যুগের পুরুষেরা মেয়েদিগকে কালোপযোগী স্বাবলম্বী করিবার জন্ত সর্ব্বতোভাবে আন্তরিক চেষ্টা করিতেছেন, ইহা খুবই আশার কথা।

(৭)

আমাদের প্রস্তাবিতরূপ স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে আপাততঃ যুবক-যুবতীর সম্মিলিতভাবে কাজ করাটা কাহারো কাহারো পক্ষে একটু বিসদৃশ বা লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু কর্ত্তব্য কর্ম্মের গুরুত্ব ও দায়িত্বের কথা ভাবিলে ইহাতে এরূপ সন্দেহের কোন স্থান থাকিবে না। ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়, যে সব কর্ম্মী স্বেচ্ছায় সেবাধর্ম্মরূপ একটা গুরুতর দায়িত্ব মাথায় লইতে যাইবে, তাহাদের কঠোর সংযম, কর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সর্ব্বোপরি গভীর আত্মত্যাগ থাকা চাই। ভোগ-বিলাস-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্ত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিবার কাহারো প্রয়োজন হয় না। তবে মানুষ-মাত্রেরই সাময়িক ভ্রম বা পদস্খলন হওয়া সম্ভব—এই বিবেচনায় পরিচালকদের যথাসম্ভব সতর্ক থাকা উচিত। প্রথমেই কর্ম্মক্ষেত্র খুব বিস্তৃত না করিয়া উদ্যোগীরা স্ব স্ব ভ্রাতাভগিনীদিগকে স্বেচ্ছাসেবকধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারেন। তৎপরে, যথাসম্ভব নিকট-আত্মীয় এবং প্রতি-বেশীদিগকে লইয়া একটা ছোট রকমের সমিতি গঠন

কাণপুর মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর অধ্যক্ষা শ্রীমতী তৈবাই দীক্ষিত।

করা যাইতে পারে। এইরূপে ক্রমে স্বগ্রামে মেয়েদের ও ছেলেদের স্বতন্ত্র স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী অনায়াসেই প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।

(৮)

মহিলা-স্বেচ্ছা-সেবিকা-বাহিনীর কর্ত্তব্য সাধারণতঃ নারী-সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক, জাতীয়, রাষ্ট্রীয় প্রভৃতি বিষয়ে স্ত্রীজাতির অভাব-অভিযোগ ও দুঃখ-যন্ত্রণা অফুরন্ত, ইহা সহজেই অনুমেয়। মেয়েরা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া নীরবে কত যে অত্যাচার অবিচার সহ্য করিয়া আসিতেছে তাহা বর্ণনার অতীত। স্ত্রীজাতির দুঃখ লাঘব করিতে মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-

বাহিনী খুবই কার্য্যকরী হইবে, আশা করা যায়। দেশের ও জাতির স্বাধীনতা যদি বস্তুতঃই আমাদের কাম্য হইয়া থাকে, তবে আমাদের নারী-সমাজকে যথাসম্ভব কাজে লাগানো দরকার। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া প্রত্যেক নারীকে সর্ব্বতোভাবে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিতে প্রত্যেক দেশপ্রেমিক পুরুষের আন্তরিক চেষ্টার ও প্রত্যক্ষ কর্ম্ম-প্রবণতার নিতান্ত প্রয়োজন। ইতিপূর্ব্বে সকল দেশেই নারীসমাজকে কর্ম্মক্ষেত্রের বাহিরে রাখা হইত। কেবলমাত্র পুরুষজাতির সংখ্যানুসারেই একটা সমগ্র জাতির শক্তি নিরূপিত হইত। কিন্তু এখন অন্যান্য সভ্যদেশে স্ত্রীজাতিকেও পুরুষের সমকক্ষ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনা হইয়াছে।
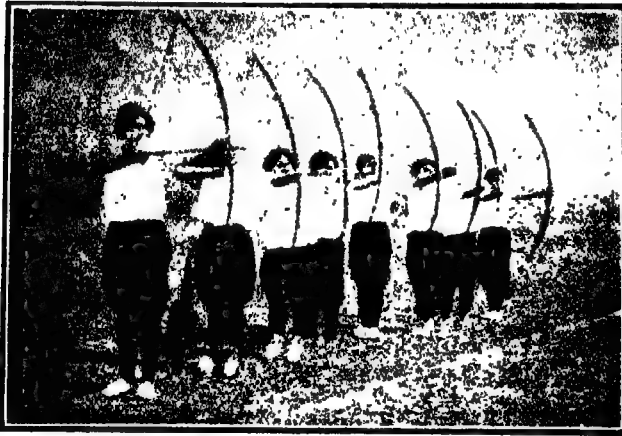
আমেরিকার মহিলা-তীরন্দাজ।

সুতরাং, তাহাদের শক্তি মোটামুটি হিসাবে দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। আজ সভ্য-জগতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে আমাদের এ বিষয়ে উদাসীন থাকিলে চলিবে না। দেশের ও জাতির কল্যাণার্থ (পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্য ছাড়াও) পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে শ্রম-বিভাগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। নবযুগের আহ্বানকে অবহেলা করিলে আমাদের স্বরাজ-স্বপ্ন কল্পনা-রাজ্যেই থাকিয়া যাইবে, বাস্তব জগতে ইহার অস্তিত্ব কখনও অনুভব করা যাইবে না।

(৯)

মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন কল্পে মোটামুটি ভাবে মেয়েদের বয়স ১০ হইতে ২০ ধরা যাইতে পারে। দশ বৎসর বয়সের যে কোন মেয়ে, স্বেচ্ছাসেবিকার তালিকা-ভুক্ত হইয়া ৩।৪ বৎসর যথারীতি শিক্ষালাভের পর বিবাহিত অবস্থায়ই বেশ যোগ্যতার সহিত আরও ৫।৬ বৎসর উক্ত বাহিনীতে কাজ করিতে পারিবে। দুর্ভাগ্য বশতঃ ইতিমধ্যে যাঁহারা বিধবা হইবেন এবং যাঁহাদের অপরিহার্য্য অপর কোন সাংসারিক বন্ধন থাকিবে না, তাঁহারা ইচ্ছানুসারে উক্ত পবিত্র ধর্ম্মের সেবিকা রূপেই সসম্মানে জীবন যাপন করিতে পারিবেন। অন্য দিকে বিবাহিত মেয়েরা সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-কল্পে স্বীয় অভ্যস্ত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন। ইহাতে এক দিকে যেমন স্থায়ী মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠনের সহায়তা হইবে, অপর দিকে তেমনি, সমাজের বালক-বালিকাদের মধ্যে আদর্শ স্বেচ্ছাসেবক হইবার জন্য একটী তীব্র প্রেরণা স্বতঃই দেখা দিবে।

সৌভাগ্যের লক্ষণ এই যে, নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধীনে একটী স্থায়ী মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা চলিতেছে। উক্ত বাহিনীর হস্তে কতকগুলি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার অর্পণ করা হইয়াছে। এই ক্রম-বর্দ্ধিষ্ণু মহিলা-বাহিনীর সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা আমরা করিতেছি।

নেতৃবৃন্দের কর্ম্মকুশলতা, গঠন-নৈপুণ্য, আগ্রহ প্রভৃতির উপর প্রধানতঃ প্রত্যেক আন্দোলনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। কোন একটী আন্দোলনের স্থায়ী ফললাভ করিতে হইলে, সর্ব্বোপরি অন্ততঃ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জীবনব্যাপী নিঃস্বার্থ সাধনা চাই। এই সব আত্মত্যাগী ও অক্লান্ত কর্ম্মীরা এক দিকে যেমন অধীনস্থ মেয়েদিগকে সুপরিচালিত করিবেন, তেমনি অন্য দিকে, প্রয়োজনীয় অর্থাগমের সুব্যবস্থা রাখিবেন। আমাদের দেশে অর্থের অভাবেও অনেক মঙ্গলকর প্রতিষ্ঠান অকালে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

(১০)

মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে একটীমাত্র উদাহরণ দিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই এক স্থানে বলিয়াছি যে, মেয়েদের এমন কতকগুলি বিশেষ দুঃখ আছে, যাহা মোচনার্থ কেবলমাত্র মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকার দ্বারাই সাহায্য করা যাইতে পারে। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে একবার

পূর্ব্ববঙ্গে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুতে এবং উত্তরবঙ্গে ভীষণ বন্যায় বিস্তর ক্ষতি করিয়াছিল। শত শত গ্রামের অধিবাসীরা অনেক দিন পর্য্যন্ত গৃহশূন্য ছিল। আকস্মিক দুর্ঘটনার সময় বিশেষভাবে মেয়েরা অত্যন্ত ভয় পাইয়া থাকে। এ অবস্থায় গর্ভিনী মেয়েরা অকালে প্রসব করিয়া থাকে। সেই নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রসবের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, কোন কোন গ্রামে উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া তো দূরের কথা, অনেক স্থলে প্রাথমিক সাহায্যের জন্যও মেয়ে কর্ম্মীর নিতান্ত অভাব হইয়াছিল। শুধু এই কারণেও অনেক প্রসূতি ও শিশু অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুর কোলে চির আশ্রয় লইয়াছে। সে যে কি করুণ দৃশ্য, তাহা লেখার সাহায্যে বুঝানো বড়ই শক্ত। পাঠকবর্গ অনুমানের সাহায্যে বরং অনেকটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মহিলা-স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনীর একটীমাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দিলাম। সাধারণ কর্ত্তব্য ছাড়া এরূপ বিশেষ কর্ত্তব্যেরই যথেষ্ট উদাহরণ দেওয়া যায়।

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

এর দুদিন পরে তেসরা দিনের সকাল বেলা রামযাদু ময়লা জামা কাপড় পরে' পরাণ-বাবুর বাড়ীতে যাবে বলে' রওনা হলো। গত দুদিন সে তেল মাখে নি, মাথার চুল রুক্ষ উস্কোখুস্কো; তাতে তার চেহারাটা হয়েছিলো অনাহারক্লিষ্ট রুগ্নের মতন।

রামযাদু হলধর হালদারের ষ্ট্রীট খুঁজে বার ক'রে ৩২ নম্বর বাড়ীর সামনে এসেই দেখ্‌লে মস্ত বড়ো বাড়ী। বাড়ীর দরজা পার হয়ে দেউড়িতে ঢুকেই রামযাদু দেখ্‌লে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের পাটায় সাদা রং দিয়ে ইংরেজী ও বাংলায় লেখা আছে—

Paranchandra Biswas.	শ্রীপরাণচন্দ্র বিশ্বাস
In.	বাড়ীতে আছেন,
Please come in.	আসিতে আজ্ঞা হউক।

ইংরেজদের ও ইংরেজী কায়দার দেশী বড়লোকদের বাড়ীর সাম্‌নে গৃহকর্ত্তা বাড়ীতে আছেন কি না জানাবার জন্যে in বা out লেখা থাকে রামযাদু দেখেছে; কিন্তু গৃহকর্ত্তা বাড়ীতে আছেন এই সংবাদ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক অনুসন্ধানীকে গৃহে অভ্যর্থনা কর্‌বার ব্যবস্থা এই নতুন দেখে রামযাদুর মন অত্যন্ত খুশী হলো। গৃহকর্ত্তা বাড়ীতে না থাক্‌লে কি জানানো হয় জান্‌বার কৌতূহলে রামযাদু একবার পথের এদিক ওদিক দেখে নিয়ে চট্‌ করে' কাঠের টানা ঢাক্‌নাটা একপাশে টেনে দিলে—"in আছেন" ঢেকে গিয়ে বার হলো—Out, please call at another time; বাড়ীতে নাই, অনুগ্রহ করিয়া অন্য সময় আসিবেন। এই লেখার পাশেই ঝুল্‌তে কাগজের খাতা একখানা, শক্ত রেশমী সুতোয় বাঁধা ঝোলানো আছে, আর খাতার প্রত্যেক পাতার উপর লেখা আছে—Please leave your name and address—অনুগ্রহ করিয়া আপনার নাম ঠিকানা রাখিয়া যাইবেন। সেই খাতার পাশে একটা রূপালী সরু শিকলে বাঁধা একটা পেন্‌সিল ঝুলছে।

রামযাদু এই সব দেখতে দেখতে এক মুহূর্ত্ত ভেবে নিয়ে ঠিক কর্‌লে—সে যে পরাণ-বাবুর নামের পাটার ঢাক্‌নি সরিয়ে তিনি বাড়ীতে না থাকার সংবাদ প্রকাশ করেছে, সেটা আর বদল কর্‌বে না; তা হলে তার পরে আর কোনো লোক পরাণ-বাবুর কাছে গিয়ে ভিড় বাড়াবে না; এর পরে যারা আস্‌বে তারা দেউড়ি থেকেই ফির্‌বে; এখনো বেশী বেলা হয়নি, এখনো বেশী লোক এসে জোটেনি নিশ্চয়; যারা এসেছে তারা চলে' গেলে সে একলাই পরাণ-বাবুর সঙ্গে নিরিবিলি কথা কর্‌বার সুযোগ পাবে।

রামযাদু মিনিট পাঁচ সাত দেউড়িতে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনো লোকের সাক্ষাৎ বা সাড়া পেলে না। দেউড়িতে দরোয়ানের উপদ্রব নেই—এ কী-রকম-বড়োলোক!

রামযাদু ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে একটু এগিয়ে গেলো—দেখ্‌লে দেউড়ির দুপাশে দুটো দালান উঠে গেছে এবং দালানের কোলে দুটো বড় বড় ঘর, কিন্তু সেখান থেকে জনমানবের সাড়া পাওয়া যায় না। দেউড়ির গলিটার পরেই প্রকাণ্ড উঠান, তার এক ধারে একটা ঠাকুর-দালান; উঠানের অন্য দুই পাশের ঘরগুলো বোধ হয় অন্দরমহলের সামিল। কতকগুলো শাদা পায়রা উঠানের মাঝখানে গলা ফুলিয়ে লেজ ছড়িয়ে চরে' বেড়াচ্ছে, আর দুটো শাদা খরগোশ লম্বা লম্বা কান আর বেঁড়ে লেজ নেড়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে;—এ ছাড়া কোথাও আর জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই, সাড়াশব্দও নেই—সমস্ত বাড়ীটা যেনো জনশূন্য; অথচ এটা যে পোড়ো বাড়ী নয় তা এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঝক্‌ঝকে অবস্থা দেখ্‌লেই জানা যায়।

রামযাদু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে একদিকের দালানের উপর উঠে দাঁড়ালো। রামযাদু মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ছিলো। নিজে সেধে ভদ্রলোককে ডেকে বাড়ীতে নিয়ে আসে, অথচ তার যে দেখা পাওয়া যাবে কেমন করে' তার কোনো বিলি ব্যবস্থাই নেই!……ন চাষা সজ্জনায়তে!

রামযাদু দারোয়ান না বেয়ারা কি বলে' চীৎকার কর্‌বে ঠিক কর্‌তে না পেরে ভাবছে, এমন সময় বাড়ীর ভিতর থেকে একজন চাকর বেরিয়ে এসে তার সাম্‌নে দিয়ে চলে' গেলো; একজন ভদ্রলোক যে বাড়ীতে এসে দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে সে লক্ষ্যই কর্‌লে না, আগন্তুককে একটা প্রশ্ন করে' জান্‌লেও না যে তার কি দরকার।

রামযাদু চাকরটার এই আচরণ বড়োমানুষের চাকরের দেমাকভরা উপেক্ষা মনে করে' অসহিষ্ণু ও উষ্ণ হয়ে উঠ্‌ছিলো, কিন্তু পরাণের কাছে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনার আভাস থাকোহরির চেহারার ও পোশাকের বিলক্ষণ ভোল ফেরার মধ্যে পেয়ে সে বিরক্তি ও অধৈর্য্য দমন করে' আত্মসম্বরণ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লো।

চাকরটা রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে পরাণ-বাবুর নামের পাটার সাম্‌নে গিয়েই সেইদিকে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল এবং তৎক্ষণাৎ নাম-পাটার টানা-ঢাক্‌নিটা সরিয়ে দিয়ে পরাণ-বাবু বাড়ীতে আছেন জানিয়ে সেখান থেকে চলে' গেলো! রামযাদু তাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌বার আর অবসরও পেলে না।

তখনই একজন ভদ্রলোক বাইরে থেকে বাড়ীতে এসে ঢুক্‌লো; সে একবার পরাণ-বাবুর নামের পাটাটার উপর চোখ ফেলে দেখে নিলে পরাণ-বাবু বাড়ীতে আছেন কি না; তার পর রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে হনহন করে' যেতে যেতে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দালানের শেষের দিকের একটা দরজার মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। রামযাদু সেই লোকটির পায়ের শব্দ শুনে সেখান থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌লে সে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। উপরে উঠ্‌বার সিঁড়ি তা হলে ঐ দরজার ওপারে আছে। তবে সেও কি সটান উপরে উঠে যাবে না কি? রামযাদুর রাগ হতে লাগ্‌ল থাকোহরির উপর—সে ছোঁড়াটারও তো কোথাও টিকি দেখ্‌বার জো নেই, সেটাকে পেলেও তো তাকে কাণ্ডারী করে' পরাণের কাছে পৌঁছানো যেতো।

রামযাদু ইতস্ততঃ কর্‌তে কর্‌তে দালান থেকে আবার দেউড়ির গলিতে নেমে আস্‌ছিলো; সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিতেই সে দেখ্‌লে একটি স্ত্রীলোক আপাদমস্তক কাপড় মুড়ি দিয়ে বাইরে থেকে সেই দিকে আস্‌ছে। রামযাদু আবার সিঁড়ির ধাপ বেয়ে দালানে উঠে দাঁড়ালো, আর সেই স্ত্রীলোকটি তার সাম্‌নে দিয়ে হনহন করে' বাড়ীর ভিতর চলে' গেলো।

রামযাদু আবার দালান থেকে নীচে নাম্‌লো—আরো অপেক্ষা কর্‌বে, না চলে'ই যাবে, ঠিক্ কর্‌তে না পেরে ভাবছে; দেখ্‌লে একটি ছোট ছেলে বাহির থেকে বাড়ীর ভিতর আস্‌ছে। ছেলেটি রামযাদুর বিরক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে একটু থতোমতো খেয়ে আস্তে আস্তে অন্দরের দিকেই চল্‌তে লাগ্‌লো।

ছেলেটিও চ'লে যায় দেখে রামযাদু হাতছানি দিয়ে ছেলেটিকে ইসারা করে' ডাক্‌লে—এই ছোক্‌রা, শোনো।

সেই ছেলেটি ফিরে এসে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো। ছেলেটির দৃষ্টিতে ভয় ও বিস্ময় ফুটে বার হচ্ছিলো।

রামযাদু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বাবু কোথায় বসেন বল্‌তে পারো?

ছেলেটি রামযাদুর মুখের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে নীরবে ঘাড় নেড়ে জানালে যে সে বাবুর কোনো খোঁজখবর রাখে না।

রামযাদু ছেলেটির কাছে এসে তার মুখের সাম্‌নে মুখ আন্‌বার জন্য সামনে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—তুমি কি এ বাড়ীর ছেলে নও?

ছেলেটি ভয়ে সঙ্কুচিত শুষ্কমুখে অস্ফুট মৃদুস্বরে বল্‌লে—না।

রামযাদু নাছোড়বান্দা, সে ছেলেটিকে আবার প্রশ্ন কর্‌লে—তবে তুমি কোথায় যাচ্ছ।

ছেলেটি সব কথা একেবারে চট করে' বলে' ফেল্‌বার চেষ্টায় থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অসংলগ্ন কথা যা বল্‌তে পার্‌লে সেসব জুড়েতেড়ে রামযাদু এই বুঝ্‌লে যে ছেলেটির বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে অনেক দিন, তার মা রোজ রোজ এসে কর্ত্তামার কাছ থেকে ওষুধপথ্যের সাহায্য নিয়ে যেতো, কাল থেকে তার মারও খুব জ্বর হয়েছে, তাই আজ বালককে পিতামাতার সেবা-শুশ্রূষার আয়োজনের সাহায্য ভিক্ষা কর্‌তে আস্‌তে হয়েছে। তাই কচি ছেলের প্রথম ভিক্ষার সঙ্কোচ তার সর্ব্বাঙ্গে দীনতার ভয় তার দৃষ্টিতে এবং অপরিচয়ের কুণ্ঠা তার কণ্ঠে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রামযাদুর মনটা কেমন করুণার্দ্র হয়ে উঠ্‌লো, সে পকেট থেকে একটা টাকা বার করে' সাম্‌নে ঝুঁকে সেই ছেলেটির হাতে দিয়ে বললে—যাও বাবা, যাও।

ছেলেটি টাকাটি পেয়ে তার ভয়চকিত দৃষ্টিতে কুণ্ঠিত মুখে কৃতজ্ঞতার একটু সঙ্কুচিত আনন্দ প্রকাশ করে' বাড়ী ফিরে চল্‌লো।

রামযাদু তাড়াতাড়ি তাকে ধরে' ফিরিয়ে বল্‌লে—তুমি কর্ত্তামার কাছে যাবে না? ও তো আমি দিলাম। তুমি কর্ত্তা-মাকে কি বল্‌তে এসেছো তা বলোগে।

বালক রামযাদুর এই সদয় সস্নেহ ব্যবহারে সাহস পেয়ে, শৈশবের অস্বাভাবিক সঙ্কোচ অনেকখানি ঝেড়ে ফেলে প্রফুল্ল মুখে অন্দরের দিকে চলে গেলো। রামযাদু আবার একলা দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাব্‌তে লাগলো—আহা! ঐ ছেলেটার মা যদি মরে' যায় তা হলে তার পক্ষাঘাতগ্রস্ত বাবার ও তার নিজের কি গতি হবে!

একটু পরেই অন্তঃপুর থেকে একজন উড়ে বাহির হয়ে এলো। তার মাথায় মস্ত বড়ো একটা ঝুঁটি; গলায় কাঠের মালার মাঝে মাঝে ছোট ছোট সোনার মাদুলি গাঁথা; সে কাপড় উরুতের উপর গুটিয়ে পরেছে, তার উপর একখানা লাল ডুরে অতিময়লা গামছা জড়ানো; তার হাতে একগাছা মোটা ময়লা গোবর-মাখা দড়ি—দড়ির দুমুখে দুটো মোটা মোটা গেরো বাঁধা। রামযাদু তাকে দেখেই বুঝ্‌তে পার্‌লে এ এ-বাড়ীর কেউ নয়, এ গয়লা, গাই দুয়ে দিয়ে যাচ্ছে; অতএব একে কিছু জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

উড়ে গোয়ালা বাড়ী থেকে বাহির হয়ে যেতে না যেতে একটা বাছুর তিড়িং তিড়িং করে' লাফিয়ে লাফিয়ে বাহিরের বিস্তীর্ণ উঠানে বেরিয়ে এলো এবং এসেই সেখানে রামযাদুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখ্‌তে পেয়েই ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ছিট্‌কে যে পথে এসেছিলো সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রামযাদু স্মিত প্রফুল্ল মুখে বাছুরের প্রাণচঞ্চল লীলা দেখ্‌ছিলো, হঠাৎ তার পিছন দিকে কার জুতোর খটখট শব্দ শুন্‌তে পেয়েই সে মুখ ফেরালে; কিন্তু সেই আগন্তুকের কেবল পিঠের দিকটাই সে দেখ্‌তে পেলে এবং তাকে দেখ্‌তে না দেখ্‌তে সে ব্যক্তি সেই পূর্ব্বাগত ভদ্রলোকটির পদাঙ্ক অনুসরণ করে' পাশের একটা খোলা দরজার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলো আর তার পায়ের শব্দে রামযাদু জান্‌তে পার্‌লে যে সেও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে।

রামযাদু সেই সিঁড়ির দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে কি কর্‌বে, আবার তার পিছন দিকে কার পায়ের শব্দ সে শুন্‌তে পেলে। চট্ করে' পিছন ফিরেই রামযাদু দেখ্‌লে একটি ছোট মেয়ে আস্‌ছে—সে ভয়ানক কালো ও আশ্চর্য্য কুৎসিত—তার কপালটা বিষম উঁচু, নাকটা নিতান্ত খাঁদা, চোখ দুটো গোল গোল, ঠোঁট দুটো পুরু ও উল্টানো, কান দুটো খুব বড় ও সাম্‌নের দিকে ফেরানো—এমন কুৎসিত চেহারা সে জন্মে কখনো দেখেনি। এই মেয়েটিকে দেখেই রামযাদুর মনটা কুরূপ মেয়েটির উপর এমন বিরূপ হয়ে উঠ্‌লো যে সে হঠাৎ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে জিভ বার করে' বিকট মুখভঙ্গী করে' উঠ্‌ল ও সঙ্গে সঙ্গে দু পা ফাঁক করে' ও দু হাত ছড়িয়ে জগন্নাথমূর্ত্তির অনুকরণে থ্যাব্‌ড়া হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ রামযাদুকে এই উৎকট ভঙ্গী কর্‌তে দেখে মেয়েটি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে পালিয়ে গেলো। মেয়েটি পরাণবাবুরই আদরের দুলালী কন্যা কৃষ্ণকলি!

কৃষ্ণকলি চলে' যেতেই রামযাদু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আপন মনেই বলে' উঠ্‌লো—রক্ষাকালীর বাচ্চা! বাপ্‌স্!

রামযাদু এক মুহূর্ত্ত চুপ করে' দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে বল্‌লে—যে দুর্লক্ষণ দেখা হলো, আজ আর কোনো সফলতার আশা নেই। যাত্রা পাল্‌টে আসা যাবে। "প্রাতরেবানিষ্টদর্শনং জাতং, ন জানে কিম্ অনভিমতং দর্শয়িষ্যতি!"

. তার পর একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে সে বাড়ী থেকে বাহির হয়ে চল্‌লো। দেউড়ির দরজার চৌকাঠে পা দিয়েই সে দেখ্‌লে সাম্‌নের বাড়ীর ছাদের উপর একটি তরুণী স্নান করে' এসে ভিজা কাপড় শুকাতে দিচ্ছে; রামযাদু থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেলো। একটা মিন্‌সে হাঁ করে' দাঁড়িয়ে তাকে দেখ্‌ছে দেখে তরুণীটি ঘোমটা টেনে ভিজা কাপড়খানা তাড়াতাড়ি ছাদের আল্‌সের গায়ে মেলে দিয়ে নীচে নেমে গেলো। রামযাদু কিন্তু রমণীর রূপ-মুগ্ধ হয়ে দাঁড়ায় নি, সে পরাণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবার জন্য বিলম্ব কর্‌বার উপলক্ষ্য খুঁজ্‌ছিলো মাত্র।

রামযাদু আবার যাবে বলে' দু পা এগিয়েছে, এমন সময় সেই যে ছেলেটি পীড়িত মা-বাপের জন্যে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছিলো ও রামযাদু যাকে একটি টাকা দিয়েছিলো সে, তার খাটো কাপড়ের খুঁটটিকে একটি প্রকাণ্ড পোঁটলায় পরিণত করে' প্রফুল্ল মুখে বাড়ীর ভিতর থেকে বাহির হয়ে এলো, এবং যেতে যেতে বার বার প্রসন্ন মুখের হাসিমাখা দৃষ্টি ফিরিয়ে ফিরিয়ে রামযাদুকে নিজের সফলতার আনন্দ জানিয়ে দিতে চাইছিলো। রামযাদু তার ভাব দেখে কোমল স্বরে বল্‌লে—"কর্ত্তামার কাছে পেয়েছো বাবা?" ছেলেটি স্মিতমুখে নীরবে, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চলে' গেলো। রামযাদুর আর চলে' যাওয়া হল না,—কল্পতরুর তলায় এসে সেই কি কেবল রিক্তহস্তে ফিরে যাবে? সে থম্‌কে ফিরে দাঁড়ালো।

এবার সিঁড়িতে লোক নামার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। রামযাদু উৎসুক হয়ে একটু এগিয়ে এলো। যে লোকটি রামযাদুর সাম্‌নে দিয়ে প্রথম উপরে উঠে গিয়েছিলো সে-ই ফিরে যাচ্ছে—চোখে মুখে তার সফলতার সন্তোষ যেনো ফুটে বেরুচ্ছে।

রামযাদু তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—মশায়, পরাণ বাবু…?

সে লোকটি একবার রামযাদুর শীর্ণ মূর্ত্তি ও মলিন বেশের দিকে কটাক্ষপাত করে' তাকে তার জিজ্ঞাস্য শেষ কর্‌তে না দিয়েই তাকে অতিক্রম করে' যেতে যেতেই বলে' গেলো—ওপরে আছেন…

রামযাদু আবার তার দিকে ফিরে তার পিছনে মুখ খিঁচিয়ে জিভ ভেঙিয়ে অস্ফুট স্বরে বলে' উঠ্‌ল—ওপরে আছেন তো নেহাল করেছেন!

তখনই একজন চাকর সেইদিকে আস্‌ছিলো। তার আসার পায়ের শব্দ পেয়েই রামযাদু সম্বৃত হয়ে ফিরে দাঁড়ালো। সেই লোকটা কাছে এলেই তাকে সে বাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের উপায় ও সম্ভাবনার তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কর্‌বে বলে' উদ্যত হয়েছে, কিন্তু তার উদ্যম দমিয়ে দিয়ে তখনই দোতলার এক জান্‌লা থেকে সেই কুৎসিত কালো মেয়েটার মিষ্ট কোমল কণ্ঠ ডেকে উঠ্‌লো—ও বোঁচা দাদা, তোমাকে মা ডাক্‌ছেন।

বোঁচা চাকর তৎক্ষণাৎ "আজ্ঞে যাই" বলে'ই চোঁচা অন্দরমুখো দৌড় দিলো।

রামযাদু বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলে' উঠ্‌লো—"ধুত্তোর! সব শালা বড়লোকই সমান আর তাদের বাড়ীর চাকর-গুলো পর্য্যন্ত সমান পাজি—সমস্ত দুনিয়াকেই তাদের অগ্রাহ্য! সেই থাকোহরি ছোক্‌রাই বা গেলো কোথায়? সেও যে দুদিন বড়মানুষের ছোঁয়াচ লাগিয়ে লাট হয়ে উঠেছে দেখ্‌ছি! দূর হোক্‌গে, মরুক্‌গে, আর তীর্থের কাগের মতন হাপিত্যেশে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না।

রামযাদু যদিও বল্‌লে যে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তবু সে দরোজার কাছে দাঁড়িয়ে যাই কি না-যাই ভাব্‌তে লাগ্‌লো। সে দেখ্‌ছিলো—পরাণ-বাবুর সদর দরোজার ধারে একটা বড় ঝাঁপালো কামিনী-গাছের ঝাড় ফুলে ফুলে একেবারে শাদা হয়ে উঠেছে আর তার গন্ধে সেখানকার বাতাস যেনো ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে; গোটা দুই মৌমাছি, একটা প্রজাপতি আর একটি সরু লম্বা ঠোঁটওয়ালা সবুজ রঙের অতি ছোটো পাখী কল্‌কাতার এই গলির মধ্যে থেকেও ফুলের সন্ধান খুঁজে বার করে' উড়ে উড়ে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছে—কোথাও কিছু পাবার সম্ভাবনা থাক্‌লে

এমনি একান্ত তপস্যাই করতে হয়! রামযাদুর আর যাওয়া হলো না,' সে দৃঢ়সঙ্কল্প করলে যে যেমন করে' হোক আজ পরাণ-বাবুর সঙ্গে দেখা সে করবেই। কিন্তু এতো বড়ো লোক, দেউ'ড়িতে একটা দারোয়ানও নেই যে তাকে দিয়ে এত্তেলা পাঠাবে। এমন কিপ্‌টে মানুষের সঙ্গে দেখা করে' কিছু লাভ হবে? কিন্তু থাকোহরি? তবে কি সে বেয়ারা দারোয়ান বলে' চেঁচামেচি করবে? কিন্তু সমস্ত বাড়ীটা এমন নিস্তব্ধ শান্ত যে তার সেই ছন্দ ভঙ্গ করা রামযাদুর কাছে কেমন অশোভন বেখাপ্পা বোধ হলো। সে চুপ করে' দাঁড়িয়েই রইলো। তার অন্যমনস্ক দৃষ্টির সাম্‌নে পাড়ার কতো বাড়ীর উঁচু নীচু বাঁকা-চোরা কম বেশী অংশ উদাস ভাবে দাঁড়িয়ে আছে; একটা বাড়ীর এক কোণ থেকে একটা নারিকেল-গাছের ঝাঁকড়া মাথা উঁকি মারছে, তার ডালে বসে' একটা চিল আর্ত্তনাদ করছে, একখানা ঘুড়ি সেই ডালে আট্‌কে ঝুল্‌ছে।···

হঠাৎ পিছন দিকে লোক ছুটে আসার শব্দ শুনে রামযাদু মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লে সেই বোঁচা। বোঁচাকে আস্‌তে দেখেই রামযাদু বলে' উঠ্‌লো—"ওহে বাপু বোঁচ্‌চন্দর!···"

বোঁচা রামযাদুর কথা শেষ হবার অপেক্ষা না করে'ই জিজ্ঞাসা করলে—আপনি কি কত্তার সঙ্গে দেখা করবেন?

রামযাদু বিরক্ত স্বরে বল্‌লে—ইচ্ছে তো ছিলো বাপধন! কিন্তু কত্তা তো দেখা দেবার কোনো উপায়ই রাখেন নি। তোমরা তো দেখে গেলে যে একটা ভদ্রলোক ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে···

বোঁচা কৌতুকের হাসি ঠোঁটের কোণে চেপে বল্‌লে—রোজ পঞ্চাশ ষাট জন বাবু কত্তার কাছে আসেন, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে কত্তার বারণ আছে; যিনি আসেন তিনি সটান উপরে বাবুর বৈঠকখানায় চলে' যান। পাছে কেউ বাধা বোধ করেন বলে' বাবু দারোয়ান রাখেন না···

রামযাদু প্রীত ও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তবে তুমি যে এখন জিজ্ঞাসা করতে এলে?

বোঁচা বল্‌লে—গিন্নি-মার হুকুমে। আপনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তিনি খুকীকে আপনার কাছে পাঠিয়েছিলেন·········

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ঐটি কি কর্ত্তার মেয়ে?

বোঁচা বল্‌লে—হ্যাঁ, ঐ এক মেয়ে, আর ছেলেপিলে নেই।

রামযাদুর মনটা অনুশোচনায় শিউরে উঠ্‌লো—ইস্! করেছি কি! সর্ব্বনাশ! সে যদি গিয়ে মাকে বলে দিয়ে থাকে যে আমি মুখ ভেংচেছি!

রামযাদু আপনার কৃতকর্ম্মের জন্ম ভয়ানক পস্তাতে লাগ্‌লো, তার মনটা অত্যন্ত খিচ্‌ড়ে মুষ্‌ড়ে গেলো। সে নিজেকে এই বলে' একটু সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলে যে—যে চেহারা মেয়েটার! আঁৎকে না উঠে উপায় কি?—কিন্তু এতেও সে স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বস্তি বোধ করতে পারলে না।

রামযাদুকে নীরব অন্যমনস্ক দেখে বোঁচা বল্‌লে এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেই বাবুর দেখা পাবেন।

ক্রমশঃ

কৃষ্ণবরণ

শ্রীঅমরেশচন্দ্র সিংহ

কণ্ঠ ভরি করে যে পান গরলভরা দুঃখ, ধন্য সে যে ধন্য!
আতুর, ক্ষীণে টানিয়া নিতে নাচিয়া উঠে বক্ষ,—পুণ্য সে যে পুণ্য!
দুঃখে শোকে শান্তিরসে ভরিয়া হৃদিকক্ষ, সৌম্য মহামান্য!
শান্ত চোখে বিধির মুখে তাহার রহে লক্ষ্য,—কামনা নাহি অন্য!—
সত্য-প্রেম পথ যে সদা কালার সমকক্ষ,—কৃষ্ণ বলে গণ্য!

শিবনিবাস

শ্রীসুজননাথ মুস্তোফী

অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি—নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিবনিবাসের বৃহৎ শিব ও মন্দিরের ন্যায় শিবলিঙ্গ ও মন্দির সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বিরল। এতদিন শিবনিবাসে যাইবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। আমার জ্ঞাতিভ্রাতা প্রফুল্ল দাদা কার্য্যোপলক্ষে শিবনিবাসের নিকটবর্ত্তী মাঝদিয়ায় থাকেন। বৈষয়িক ব্যাপারের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হওয়ায়, দোলের দিন
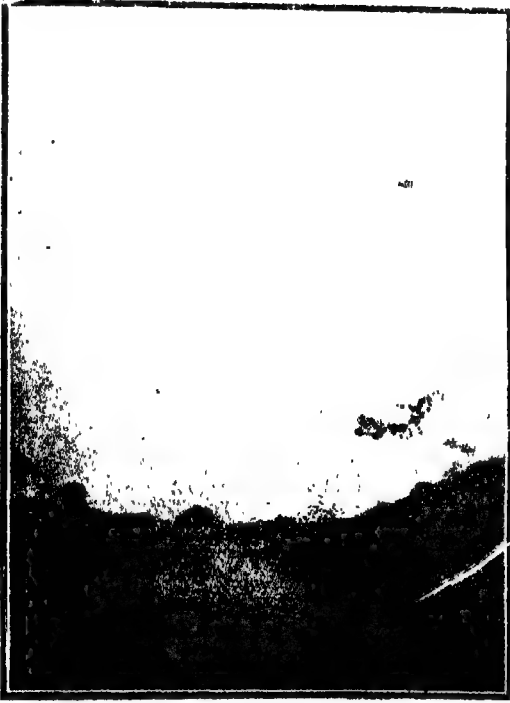
শিবনিবাসের পার্শ্বস্থ চূর্ণ নদী

তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব স্থির করিলাম; এবং সুবিধা হইলে এই যাত্রায় শিবনিবাস দেখিয়া আসিব তাহাও ভাবিয়া রাখিলাম।

২৭শে ফেব্রুয়ারী দোল পূর্ণিমা। রাত্রি ১২টা ৪৯ মিনিটের সময় যে ট্রেণ শিয়ালদহ হইতে ছাড়ে, ঐ ট্রেণে যাইবার জন্য যথেষ্ট সময় থাকিতে শিয়ালদহ ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। দোলের সময় কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী ঘোষপাড়ায় কর্ত্তাভজাদিগের উৎসব উপলক্ষে মেলা হয়। ঘোষপাড়ায় যাইবার জন্য এত রাত্রেও এত লোক টিকিটের জানালায় ভীড় করিয়া আছে যে, উহার নিকটবর্ত্তী হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। ট্রেণ ছাড়িবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে অতি কষ্টে একখানি রিটার্ণ টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে স্থান সংগ্রহ করিলাম। যথা সময়ে ট্রেণ ছাড়িল। এক ব্যক্তি গাড়ীর এক কোণায় গাত্রবস্ত্র মুড়ি দিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়া ছিল। আমরা ভাবিয়াছিলাম লোকটি বুঝি ঘুমাইতেছে। ট্রেণ শিয়ালদহ ষ্টেসন ছাড়াইবা মাত্র নিদ্রার অভিনয়ে নিবিষ্ট সেই ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিল ও টিকিট চেক করিতে লাগিল। বিনা টিকিটে যাহারা রেল গাড়ীতে চড়ে, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য এতক্ষণ সে ছলনা করিয়া বসিয়া ছিল। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এই অপদেবতাটি ততোধিক কৃষ্ণবর্ণের কোট প্যান্টালুন পরিয়া সমস্ত রাত্রি যাত্রীদিগকে যন্ত্রণা দিল। যেই একটু তন্দ্রা আসে, অমনি সে নূতন করিয়া টিকিট চেক করিতে আরম্ভ করে,—ফলে, তৎক্ষণাৎ ঘুম ছুটিয়া যায়। এইরূপে শিয়ালদহ হইতে রাণাঘাট পর্য্যন্ত পাঁচ বার টিকিট চেক হইল। শুনিলাম ট্রেণের অন্যান্য গাড়ীতেও এইরূপ এক একটি অপদেবতা যাত্রীদিগকে সমস্ত রাত্রি জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছে। ঘন ঘন টিকিট চেক করিবার ছলে যাত্রীদিগকে জ্বালাতন করাই ইহাদিগের একমাত্র কার্য্য নহে,—পরন্তু, প্রত্যেক ষ্টেসনে ইহারাই ষ্টেসনের দ্বারে দাঁড়াইয়া টিকিট সংগ্রহ করিতে লাগিল। শুনিলাম, জুয়াচুরী নিবারণের জন্যই ই, বি, রেলওয়ে এইরূপ অদ্ভুত ব্যবস্থা করিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় গভীর রাত্রে এরূপ অভদ্রভাবে ঘন ঘন টিকিট চেকের ব্যবস্থা আছে কি না জানি না,—সম্ভবতঃ নাই; কিন্তু যদি থাকে, তবে এক দিন কোন খাজা গোরার হাতে পড়িয়া জ্বালাতন করার ফল তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে, ইহা এক প্রকার নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

পরদিন প্রাতে মাঝদিয়া ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিবামাত্র রাত্রের সেই মূর্ত্তিদিগের মধ্যে একজন আসিয়া টিকিট লইয়া গেল।

মাঝদিয়া ষ্টেসনের বাহিরে কোটচাঁদপুরগামী একখানি "মোটরবাস" গাড়ী যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। ষ্টেসনের পূর্ব্ব পার্শ্বে অনেকগুলি দোকান-ঘর রহিয়াছে। বাজারের প্রান্তভাগে মাঝদিয়ার পোষ্টাফিস আছে। প্রফুল্ল দাদার বাসায় প্রাতঃক্রিয়া ও চা পানাদি শেষ করিয়া শিবনিবাস যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একজন ভদ্রলোক আমার সঙ্গী হইলেন।

ষ্টেসনের পূর্ব্ব দিকের রাস্তা দিয়া কিয়ৎদূর দক্ষিণ দিকে গেলাম। তৎপরে রেলের পুলের নীচে দিয়া পশ্চিম দিকে চলিলাম। এই পথ দিয়া এক ক্রোশের অধিক যাইলে শিবনিবাসে উপস্থিত হওয়া যায়।

মাঝদিয়ায় অনেক ভদ্রলোকের বাস আছে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টার ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার লাহিড়ীর পৈত্রিক বাটী এইখানে। ইনি স্ব-গ্রামের উন্নতির জন্য সচেষ্ট। এখানে একটি ম্যাট্রিক স্কুল, ঘোড়া ও গরু প্রভৃতির জন্য একটি পশু-চিকিৎসালয় এবং জনসাধারণের জন্য একটি দাতব্য ঔষধালয় আছে। এই ঔষধালয়ের নাম "পুলিনবিহারী লাহিড়ী দাতব্য চিকিৎসালয়"। বসন্তকুমার লাহিড়ীর পিতার নাম পুলিনবিহারী। এই সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত বসন্তকুমারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। মাথাভাঙ্গা নদীর পূর্ব্ব দিকে রাস্তার পার্শ্বে উক্ত দাতব্য চিকিৎসালয়টি অবস্থিত।

অতঃপর আমরা মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে উপস্থিত হইলাম। নদীর অপর পারে কৃষ্ণগঞ্জ। ইহা নদীয়া জেলার একটি বিখ্যাত গঞ্জ। এখানে বহু লোকের বাস। এখানে পুলিশের একটি থানা আছে। কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামটি প্রায় একটি দ্বীপ। ইহার পূর্ব্ব দিকে মাথাভাঙ্গা, দক্ষিণ দিকে চূর্ণি ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক দিয়া ইছামতী নদী প্রবাহিত।

খেয়া নৌকায় মাথাভাঙ্গা পার হইয়া কৃষ্ণগঞ্জের ভিতর দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। তৎপরে গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়া একটি মাঠের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে চলিলাম। কিয়ৎদূর অগ্রসর হইয়া চূর্ণির পূর্ব্ব তীরে উপস্থিত হইলাম। চূর্ণির পূর্ব্ব পারে কৃষ্ণগঞ্জ ও পশ্চিম পারে শিবনিবাস অবস্থিত। এই স্থান হইতে চূর্ণির তীরের সন্নিকটে অবস্থিত শিবনিবাসের কৃষ্ণাভ মন্দিরগুলি অভিশপ্ত দৈত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। খেয়া নৌকায় শীর্ণকায়া চূর্ণি পার হইয়া পরপারে উপস্থিত হইলাম। পরপারে পাবাখালি নামক একটি গ্রাম আছে। বেণুবন-বেষ্টিত এই গ্রামের উত্তর প্রান্তের কাঁচা পথ ধরিয়া শিব-নিবাস অভিমুখে পশ্চিম দিকে চলিলাম। পাবাখালি হইতে প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে শিবনিবাসের মন্দিরগুলি অবস্থিত।

দুইবার নদী পার হইয়া ক্রোশাধিক পথ অতিক্রম করিয়া শিবনিবাসে পঁহুছিতে এক ঘণ্টা সময় লাগিল। গ্রামের

শিবনিবাস—অতি বৃহৎ রাজরাজেশ্বর শিবের অষ্টকোণ উচ্চ মন্দির

ভিতরে সামান্য দূর প্রবেশ করিলে তিনটি বৃহৎ মন্দির পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্দির কয়টির জন্য এবং উহাদিগের অভ্যন্তরস্থ অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গ ও রামচন্দ্রের মূর্ত্তির জন্য শিবনিবাস বিখ্যাত হইয়া আছে।

এই স্থানে নদীয়ার মহারাজার যে চারিটি মন্দির পাশাপাশি দণ্ডায়মান আছে, তন্মধ্যে পশ্চিম দিকেরটির অধিকাংশ ভাজিয়া গেলেও, ইহার গর্ভমন্দিরটি চূড়াসহ আজও বর্ত্তমান আছে। ইহার চূড়া ৺রামচন্দ্রের মন্দিরের চূড়ার ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট। ইহা ৺অন্নপূর্ণার মন্দির।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শুনিলাম, উক্ত অন্নপূর্ণা-মূর্ত্তি এক্ষণে কৃষ্ণনগরে ৺আনন্দময়ী কালীর বাটীতে আছেন। অন্নপূর্ণার এই মন্দিরটি এই স্থানের অপর তিনটি মন্দির অপেক্ষা অনেক ছোট।

অন্নপূর্ণার ভগ্ন মন্দিরের অতি সন্নিকটে, উহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণার দিকে একটি অষ্টকোণ-বিশিষ্ট অত্যুচ্চ মন্দির আছে। প্রায় ১।০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ই, বি, রেলের লাইন হইতে এই মন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের মুখে শুনিলাম, এই মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে যে একটি বৃহৎ শিবমন্দির আছে, উহা এই মন্দিরটি অপেক্ষা বড়, কিন্তু আমার চক্ষে তাহা বোধ হইল না। এই অষ্ট-

শিবনিবাস—রাজ্ঞীশ্বর শিবের চতুষ্কোণ মন্দির
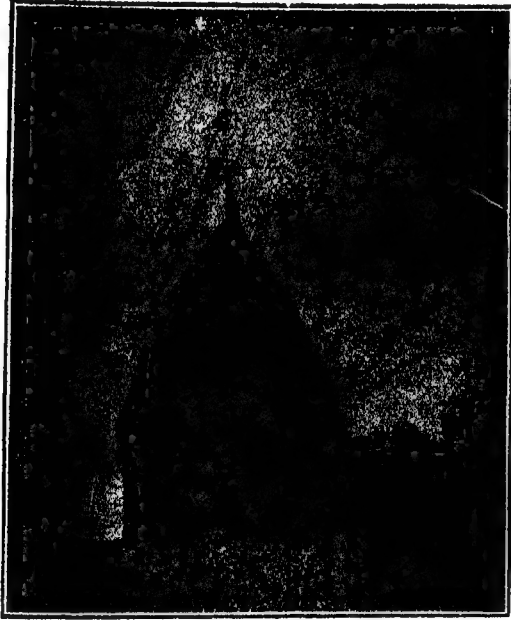
কোণ মন্দিরটিই এই স্থানের সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ। নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ইহার এবং ইহার পূর্ব্ব দিকস্থ ৺রাজ্ঞীশ্বর শিবের মন্দিরের ও ৺রামচন্দ্রের মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফিট বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই উক্তি কতদূর সত্য তাহা মাপিয়া দেখা কর্ত্তব্য। এই মন্দিরটি অপর মন্দিরগুলি অপেক্ষা উচ্চতর। ইহার উচ্চতা অনূন ৭৫।৮০ ফিট হইবে। মন্দিরের শিখরদেশে একটির উপরে একটি করিয়া চারিটি পিতলের কলস বা ঘড়া বসান আছে। কলসগুলির উপরে একটি সুন্দর ও বৃহৎ পিতলের ত্রিশূল শোভা পাইতেছে। এগুলি আজিও সূর্য্য-কিরণে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। সম্ভবতঃ এগুলিতে সোণালি গিল্টি করা হইয়াছিল। মন্দিরের চূড়ার গাত্রে কতকগুলি ফুটা হইয়াছে। এগুলির মধ্যে বহু টিয়া পাখী বাস করিয়া থাকে। মন্দিরের চূড়ায় নানা স্থানে অশ্বত্থ ও বটের গাছ হওয়ায়, অদূর-ভবিষ্যতে উহার ধ্বংস অনিবার্য্য—ইহাই সূচিত হইতেছে। মন্দিরের আটটি কোণায় এক একটি করিয়া সরু মিনার আছে। এগুলি দেখিতে মুসলমানদিগের মসজিদের মিনারের ন্যায়। মিনারগুলির শিখর-দেশে পিতলের হুঁকার ন্যায় বা বড় নিম্ব ফলের ন্যায় পদার্থ শোভা পাইতেছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে, উহার পাদদেশে সুবিস্তৃত ও অর্দ্ধভগ্ন অষ্টকোণ রোয়াক আছে। রোয়াকের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরের দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে এক একটি সুবৃহৎ দ্বার আছে। কিন্তু দক্ষিণ দিকই ইহার সম্মুখ-দেশ বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ, দক্ষিণ দিকের দ্বারের ললাটে একটি প্রস্তরের স্মৃতি-ফলক আছে। মন্দিরাভ্যন্তরের অষ্টকোণ দেওয়ালের একটি কোণা হইতে অপর কোণার মাপ ৫।০ হাত। ইহার দেওয়াল ৪||০ হাত স্থূল। মন্দিরটি ইষ্টক-নির্ম্মিত। ইহার গাঁথনির মসলা চূণ ও সুরকী মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মন্দিরাভ্যন্তরের উপরের খিলানটির গঠন সুন্দর। মেঝের মধ্যস্থলে একটি বৃত্তাকার বেদীর উপরে কষ্টি-পাথরের একটি অতি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছেন। ইহাঁর নাম ৺রাজরাজেশ্বর। ইহাঁর উচ্চতা ৯ ফিট। শিবের উপরে ফুল ও বেলপাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুঝিলাম, আজিও শিবের পূজা হইয়া থাকে। কলিকাতার নিমতলার ৺আনন্দময়ী কালীর গৃহের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব দিকে গলির মধ্যে প্রবেশ করিলে গলির মুখের নিকটে পশ্চিম দিকের বাটীতে যে একটি অতিকায় কৃষ্ণ প্রস্তরের শিবলিঙ্গ আছেন (শুনিয়াছি ইহা হাটখোলার দত্তদিগের শিবলিঙ্গ), এবং খিদিরপুরের নিকটস্থ ভূকৈলাসের রাজবাটীতে যে বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছেন, তদপেক্ষা এই শিবলিঙ্গটি বড় বলিয়া বোধ হইল। শিবের পাদদেশে সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু বাঙ্গালা অক্ষরে যাহা লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিতে পারা গেল না। এই বৃহৎ শিবমন্দিরটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রধানা মহিষীর জন্য ১৬৭৬ শকাব্দে (= অনুমান ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করেন।

মন্দিরটি একচুড়, কিন্তু ইহার আটটি মিনারের ক্ষুদ্র চূড়া ধরিলে ইহা নবচুড়। মিনারগুলি বাদ দিলে এই মন্দিরের নিম্নার্দ্ধ ভাগ দেখিতে মুর্শিদাবাদের বড় নগরে রাণী ভবানী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভবানীশ্বর শিবের বৃহৎ অষ্টকোণ মন্দিরের ন্যায়।

উক্ত রাজরাজেশ্বর শিবের মন্দিরের পূর্ব্ব দিকে একটি চতুষ্কোণ ও উচ্চ শিবমন্দির আছে। স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তি ইহাকে শিবনিবাসের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মন্দির বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু তাহা কতদূর সত্য, তাহা মাপিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া প্রতীয়মান হইল যে, এই মন্দিরটি রাজরাজেশ্বরের অষ্টকোণ মন্দির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট, এবং তাহাই স্বাভাবিক ; কারণ, এই মন্দিরটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয়া মহিষীর ও রাজরাজেশ্বরের মন্দির প্রথমা মহিষীর জন্য নির্ম্মিত হয়। নদীয়া গেজেটিয়ারে এই মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফিট লিখিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা তদপেক্ষা উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। ইহার উচ্চতা রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা অপেক্ষা ৩।৪ ফিট কম হইবে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে যে উচ্চ চতুষ্কোণ রোয়াক ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ভগ্ন রোয়াকের পশ্চিম দিকের গাত্রে একটি প্রস্তরের স্মৃতিফলক আছে। মন্দিরটি ইষ্টক-নির্ম্মিত ও একচুড়। ইহার শিখরদেশে তিনটি পিতলের ঘড়া বা কলস একটির উপরে একটি করিয়া বসান আছে ; এবং সর্ব্বোপরি একটি পিতলের সুশ্রী ও বৃহৎ ত্রিশূল অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় হেলিয়া পড়িয়া আছে। ত্রিশূল ও কলসগুলিতে সোনার গিল্টি করা ছিল বলিয়া বোধ হয়। মন্দিরের চূড়ায় অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া ইহাকে ধ্বংস-পথে লইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে। চূড়ার পূর্ব্ব দিকে বজ্রাঘাত হইয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে ইহার কোনই ক্ষতি হয় নাই,—কেবলমাত্র কার্ণিসের নিকটে এক স্থানের সামান্য চুণ সুরকী খসিয়া পড়িয়াছে। আজিও সেই ভগ্ন স্থানটি পথিককে দেখাইয়া দেওয়া হয়। মন্দিরের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে একটি করিয়া উচ্চ দ্বার আছে। দক্ষিণ দিক এই মন্দিরের সম্মুখভাগ। মন্দিরাভ্যন্তরের মেঝের মাপ প্রত্যেক দিকে ৮৷৷০ হাত। ইহার দেওয়ালের স্থূলতা ৪৷৷০ হাত। উপরে মধ্যস্থলে সুবৃহৎ গোলাকার একটি খিলান আছে ও উহার নিম্নভাগের চারি কোণায় চারিটি ত্রিকোণ-প্রায় ক্ষুদ্র খিলান আছে। মন্দির মধ্যে মেঝের মধ্যস্থলে বৃত্তাকার বেদীর উপরে কষ্টি-পাথরের একটি বৃহৎ শিবলিঙ্গ আছেন, ইহাঁর নাম ৺রাজ্ঞীশ্বর। ইনি পূর্ব্বোক্ত ৺রাজরাজেশ্বর শিব অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ইহাঁর উচ্চতা ৭৷৷০ ফিট। শিবের গৌরী-পাটের উপরে ২।৪টি ফুল ও বেলপাতা পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বুঝিতে
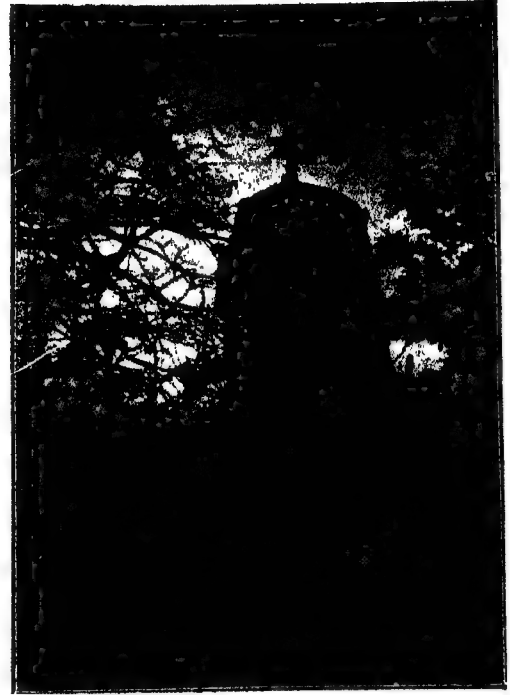
শিবনিবাস—রামচন্দ্রের মন্দির

পারা গেল যে, আজিও ইহাঁর অদৃষ্টে প্রত্যহ ফুল বেলপাতা জুটিয়া থাকে। এই মন্দিরটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার দ্বিতীয়া মহিষীর জন্য ১৬৮৪ শকাব্দে (অনুমান ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করেন।

পূর্ব্বোক্ত অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বর ও রাজ্ঞীশ্বরের মন্দির তিনটি একটি উন্মুক্ত ভূমিখণ্ডের উপর দণ্ডায়মান আছে। রাজ্ঞীশ্বরের মন্দিরের পূর্ব্ব দিক দিয়া উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সাধারণের ব্যবহার্য্য একটি পথ আছে। এই পথের পরপারে অর্থাৎ পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট উচ্চ মন্দির আছে। উহা ৺রামচন্দ্রের মন্দির। উহার উচ্চতা রাজ্ঞীশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা অপেক্ষা ২।৩ ফিট কম বলিয়া

বোধ হয়; কিন্তু নদীয়া গেজেটিয়ারে ইহারও উচ্চতা ৬০ ফিট বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এই মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহার চূড়ার উপরিভাগে মসজিদের গুম্বজের ন্যায় একটি গুম্বজ আছে; কিন্তু উহা অত্যন্ত চ্যাপ্টা হওয়ায়, এরূপ উচ্চ মন্দিরের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন ও দৃষ্টিকটু হইয়াছে। এই মন্দিরের উপরিভাগের গঠন মুর্শিদাবাদের সপ্ত-গুম্বজ চক মস্‌জিদের শেষের দুইটি গুম্বজের উপরিভাগের ন্যায় চ্যাপ্টা। দূর হইতে মন্দিরটি দেখিতে সমুদ্রগামী জাহাজের পথ-প্রদর্শক আলোক-স্তম্ভের (Light-houseএর) ন্যায়। ইহার শিখর দেশে দুইটি পিতলের কলস ও তদুপরি পিতলের একটি

শিবনিবাস—ভগ্ন রাজবাটীর একাংশ

বৃহৎ চক্র শোভা পাইতেছে। এই মন্দিরের মধ্যস্থলের গর্ভমন্দিরের দেওয়াল ও উপরের খিলান আলকাতরার ন্যায় পদার্থ দিয়া ঘোর কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে। ইহার ফলে মন্দিরাভ্যন্তর অত্যন্ত অপরিষ্কার ও কদর্য্য দেখাইতেছে। রাজা মহারাজাদিগের যে সকল মন্দিরে নিত্যসেবার ব্যবস্থা আছে, তাহা যে এরূপ অপরিষ্কার অবস্থায় রাখা হয়, তাহা অন্য কুত্রাপি দেখি নাই। মন্দিরাভ্যন্তর দেখিলে মনে হয়, উহার মধ্যে ভূতে বাসা করিয়া থাকে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ চতুষ্কোণ। ইহার প্রত্যেক দিকের মাপ ৭ হাত ও দেওয়াল ৩॥০ হাত স্থূল। গর্ভমন্দিরটির বহির্দ্দেশের মাপ প্রত্যেক দিকে ১৪ হাত। ইহার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে এক একটি বৃহৎ দ্বার আছে। ইহার মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ আসনের উপরে কষ্টি-প্রস্তর নির্ম্মিত কৃষ্ণবর্ণের একটি বৃহৎ রামচন্দ্র মূর্ত্তি উপবিষ্ট আছেন। উপবিষ্ট অবস্থায় ইহার উচ্চতা প্রায় ৪ ফিট। রামচন্দ্রের বাম পার্শ্বে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত সীতাদেবী দণ্ডায়মানা আছেন। এতদ্ব্যতীত স্ফটিক-নির্ম্মিত একটি ছোট শিবলিঙ্গ, তদপেক্ষা ছোট কয়েকটি কৃষ্ণপ্রস্তরের শিবলিঙ্গ, মৃত গ্রামবাসীদিগের কতকগুলি শালগ্রামশিলা ও রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ আছেন। আজিও রামচন্দ্রের ও তৎসহ অন্য বিগ্রহগুলির কোন প্রকারে পূজা হইয়া আসিতেছে। দেখিয়া মনে হইল, শিবনিবাসে রামচন্দ্রই প্রধান দেবতা। গর্ভমন্দিরের চতুর্দ্দিকে খিলান-করা ছাদ-বিশিষ্ট বারান্দা আছে। উহা পাঁচ হাত প্রশস্ত এবং উহার উপরিভাগে খড়়য়া ঘরের বারান্দায় চালের ন্যায় ঢালু ছাদ আছে। পূর্ব্ব দিকের বারান্দার ছাদটি পড়িয়া গিয়াছে। এই বারান্দার বহির্দ্দেশে যে দেওয়াল আছে, উহা ২ হাত স্থূল। এই মন্দিরের সম্মুখভাগ পশ্চিম দিকে। পশ্চিম দিকে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত স্মৃতিফলকে লিখিত আছে যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই মন্দিরটি ১৬৮৭ শকাব্দে (অনুমান ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মাণ করেন।

এই স্থানের মন্দিরগুলি হইতে সামান্য দূরে উত্তর-পূর্ব্বদিক দিয়া ক্ষীণা চূর্ণি-সুন্দরী বহিয়া যাইতেছে। সত্য মিথ্যা জানি না, কিন্তু স্থানীয় কোন কোন ভদ্রলোকের নিকট শুনিলাম যে, এই মন্দিরসমূহের বিগ্রহগুলির নিত্য সেবার বন্দোবস্ত সন্তোষজনক নহে। মন্দিরগুলি নির্ম্মিত হইবার পর হইতে এগুলি যে কোন কালে মেরামত হইয়াছিল তাহা দেখিয়া বোধ হয় না। ইহাদের রোয়াক ও গৃহাদি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চূড়ায় বহু ফুটা ও "গাছ-পালা" হইয়াছে; কিন্তু তৎপ্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। সমগ্র নদীয়া জেলার—তথা বাঙ্গালা দেশের—গৌরবের সামগ্রী এই মন্দির কয়টিকে এরূপ অযত্নে ধ্বংস-পথে যাইতে দেওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য হইতেছে না। শুনিলাম, মধ্যে মধ্যে মন্দিরগুলি মেরামতের জল্পনা হয়, কিন্তু কার্য্যতঃ কিছুই হয় না। নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া দেখিয়াছি যে, রাজা মহারাজা ও জমিদারদিগের বাসস্থান হইতে দূরে অবস্থিত দেবালয় ও

দেবতাগুলির দুর্দ্দশা অধিকাংশ স্থলে এইরূপ। সেবার মহম্মদপুরে যাইয়া নাটোরের মহারাজার অধিকার মধ্যে অবস্থিত বিখ্যাত রাজা সীতারাম রায়ের মন্দিরাদির এবং জেলা ২৪ পরগণা ও হুগলীর কয়েকজন জমিদারের জমিদারীর মধ্যে অবস্থিত মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যশোহর রাজ্যের মন্দিরাদির ও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির দুর্দ্দশার চরম অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া এবং এক্ষণে শিবনিবাসের মন্দিরগুলির প্রতি অযত্ন দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত ধারণা বদ্ধমূল হইতে বসিয়াছে।

এই মন্দির কয়টি ব্যতীত শিবনিবাসের পশ্চিমপাড়ায় আরও দুইটি ছোট শিবমন্দির আছে। তন্মধ্যে একটিতে একটি শিবলিঙ্গ আছেন। পূর্ব্ববর্ণিত চারিটি প্রধান মন্দিরের সন্নিকটে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১০৮টি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। কিন্তু বর্ত্তমানে পূর্ব্বোক্ত কয়টি মন্দির ব্যতীত অন্য কোন মন্দিরের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশপ হিবারের (Bishop Heber's Journal) ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের শিবনিবাস বর্ণনায় ১০৮টি মন্দিরের কোন উল্লেখ দেখা যায় না, অথচ তাঁহার শিবনিবাসে যাইবার মাত্র ৪২ বৎসর পূর্ব্বে (১৭৮২ খৃষ্টাব্দে) এই সকল মন্দির-নির্ম্মাতা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যু হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় নরপতি নিজের জীবিতাবস্থায় স্বপ্রতিষ্ঠিত কোন মন্দির নষ্ট হইতে দেন নাই, ইহা এক প্রকার ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ মন্দিরগুলিও অত্যন্ত প্রাচীন ছিল না; কারণ, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ৺রাজরাজেশ্বরের অষ্টকোণ মন্দিরটি মাত্র ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মৃত্যুর পরে পূর্ব্বোক্ত ৪২ বৎসরের মধ্যে যে ১০২টি মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া মাত্র ৬টি অবশিষ্ট রহিল, ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়; এবং সে কারণ ১০৮টি মন্দির নির্ম্মাণ করা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়।

পূর্ব্বোক্ত রাজরাজেশ্বর শিবের মন্দিরের উত্তর দিকে "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতল বাটী আছে।

অন্নপূর্ণার মন্দিরের পশ্চিম দিকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বংশ আছে। এই বাটীতে একটি একতলা ঘরে একটি ক্ষুদ্র কালী মূর্ত্তি আছেন, তাঁহার নিত্য সেবা হয়।

এই বাটীর সামান্য দূর পশ্চিম দিকে প্রাচীন রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। রাজবাটীটি দ্বিতল। ইহার অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ইহার এক দিকে একতলা-প্রমাণ প্রকোষ্ঠ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হইয়া আছে। শুনা যায় যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে ঐ প্রকোষ্ঠে যজ্ঞ হইত। এক্ষণে এই ভগ্ন রাজবাটীতে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের দৌহিত্র ও দৌহিত্রের দৌহিত্রাদি কেহ কেহ বাস করিয়া থাকেন।

শিবনিবাসের উত্তর ও পশ্চিম দিকে চূর্ণি বহিয়া যাইতেছে; এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে কঙ্কণ নদীর খাত মাত্র অবশিষ্ট আছে। পূর্ব্ব দিকে কঙ্কণের উপরে সেতু ছিল এবং কঙ্কণের দক্ষিণে কৃষ্ণপুর নামক গ্রামে পাঠান এবং রাজপুতদিগের বাস ছিল। ইহারা বর্গীর আক্রমণ হইতে শিবনিবাস রক্ষার্থে এই স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল।

শিবনিবাসের অভ্যুদয়ের বিবরণ এইরূপ শুনা যায়—খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই স্থানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পল্লীনিবাস ও বিশ্রাম বাটিকা ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মৃগয়াকালে দৈবাৎ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, এই স্থানে প্রাসাদ ও দেবালয়াদি নির্ম্মাণ করেন। অপর কেহ কেহ বলে যে, এই স্থানের তিন দিকে নদী থাকায় ইহা নিরাপদ স্থান ও বর্গীর আক্রমণ হইতে ইহাকে রক্ষা করা সহজসাধ্য বুঝিয়া, কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্দ্র এই স্থান ত্যাগ করার পর হইতে ইহার অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে এই স্থান দুর্দ্দশার চরম সীমায় উঠিয়াছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ শিবচন্দ্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণনগরে বাস করেন। দ্বিতীয় শম্ভুচন্দ্র হরধামে বাস করেন। তৃতীয় ভৈরবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ছিলেন। চতুর্থ মহেশচন্দ্র, পঞ্চম হরচন্দ্র, এবং ষষ্ঠ ঈশানচন্দ্র শিবনিবাসে বাস করিয়াছিলেন। শিবনিবাসবাসী কেবলমাত্র মহেশচন্দ্রের দুইটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে উমেশচন্দ্রের পুত্র গঙ্গেশের দৌহিত্র-বংশ আজিও শিবনিবাসে বর্ত্তমান।

পাদ্রী হিবার সাহেব (Bishop Heber's "Journal") লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি জলপথে কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার কালে গঙ্গা হইতে চূর্ণি নদীতে পড়িয়া হরধাম, রাণাঘাট ও শিবনিবাসের পার্শ্বদেশ

দিয়া গমন করিয়াছিলেন। হিবার এই স্থানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক বংশধরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন এবং চারিটি মন্দির দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই চারিটি মন্দিরই যে পূর্ব্বোক্ত অন্নপূর্ণা, রাজরাজেশ্বর, রাজ্ঞীশ্বর ও রামচন্দ্রের মন্দির তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। হিবার রামচন্দ্র-বিগ্রহের পুরোহিতের নিকটে শুনিয়াছিলেন যে, এই মন্দিরগুলি ৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিনি রামচন্দ্রের মন্দিরের দক্ষিণ দিকে দ্বার দেখিয়াছিলেন। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন যে, পদ্মপুষ্পের উপরে রামচন্দ্র সমাসীন। তাঁহার মস্তকে গিল্টি-করা কিন্তু কলঙ্ক-মলিন ছত্র শোভা পাইতেছিল, এবং তাঁহার পার্শ্বে জনকনন্দিনী বিরাজমানা ছিলেন। হিবার রাজরাজেশ্বর ও রাজ্ঞীশ্বর শিবলিঙ্গ দুইটি ও তাঁহাদিগের অত্যুচ্চ মন্দির দুইটি দেখিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্র-বিগ্রহের পুরোহিতের সহিত রাজপ্রাসাদ দেখিতে গমন করেন। তিনি এই রাজপ্রাসাদের বৃহৎ দরওয়াজার উপরে লতাগাছ উঠিয়াছে দেখিয়াছিলেন। তিনি এই দরওয়াজার সহিত রুষ দেশের প্রাচীন রাজধানী মস্কো নগরের "ক্রেমলিন" প্রাসাদের দরওয়াজার তুলনা করিয়াছেন। এই দরওয়াজার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া হিবার দেখিলেন যে, দুই দিকে বৃক্ষ-শোভিত পথ রহিয়াছে। তাহার দুই পার্শ্বে ভগ্নস্তূপ ও বন-জঙ্গল এবং অট্টালিকাসমূহের উপরে বৃহৎ বৃক্ষাদি জন্মিয়াছে—চতুর্দ্দিকে অনিবার্য্য ধ্বংসের একটা বিষাদ-মাখা কিন্তু মহান ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কে এই সকল কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছে জিজ্ঞাসা করায় হিবার শুনিলেন যে, নবাব সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক এগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে। তৎপরে হিবার ডাইন দিকে যাইয়া একটি অতি বৃহৎ ভগ্ন প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এই প্রাসাদের কোন কোন অংশ তাঁহার নিকটে ইংলণ্ডের বোল্টন আবের (Bolton Abbey) এবং কনওয়ে দুর্গের (Conway castle) ন্যায় প্রতীয়মান হইল। তিনি দেখিলেন, এই প্রাসাদে কনওয়ের অনুরূপ কিন্তু তদপেক্ষা ছোট বুরুজ আছে এবং মজবুত ও সুদীর্ঘ খিলানের সারি আছে। সর্ব্বত্র বনজঙ্গল ও ছাদবিহীন গৃহশ্রেণী বিগত গৌরবের ধ্বংসের পরিচয় দিতেছিল। তিনি এমন একটি চত্বরে উপস্থিত হইলেন, যাহার প্রাচীন কবাট-শোভিত বৃহৎ দরওয়াজা তখনও বর্ত্তমান ছিল। এই স্থানে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুইটি অল্পবয়স্ক প্রপৌত্র আসিয়া উপস্থিত হইল এবং পারস্য ভাষায় বিনয়নম্র বচনে তাঁহাকে তাহাদিগের পিত্রালয়ে প্রবেশ করিতে সাদরে আহ্বান করিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া হিবার চতুর্দ্দিকে সৌধশ্রেণীর ধ্বংস দেখিতে পাইলেন এবং সন্ধ্যাগমে চতুর্দ্দিকে শৃগালের হাহাকার স্বর শুনিতে পাইলেন। ইহাতে তাঁহার বোধ হইল, এই স্থানে শৃগালদিগেরই প্রভুত্ব। বালকদ্বয় তাঁহাকে তাহাদিগের পিতা রাজা উমেশচন্দ্রের (Omichand) নিকটে লইয়া গেল। তৎকালে উমেশচন্দ্রের বয়ঃক্রম অনুমান ৪৫ বৎসর। তিনি দেখিতে খর্ব্ব ও স্থূল, তাঁহার নগ্ন দেহে যজ্ঞোপবীত এবং ললাটে সুবর্ণ পত্রসহ শ্বেত ও রক্তচন্দনের রেখাবলি (besmeared with chalk vermilion and goldleaf) শোভা পাইতেছিল। তাঁহাকে "মহারাজা" বলিয়া সম্বোধন করায় তিনি বিশেষ খুশী হইলেন। ইত্যাদি।

পূর্ব্বে এই গ্রামে ১০০ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ইহাঁরা সকলেই নদীয়ার মহারাজার আত্মীয় ছিলেন। বর্ত্তমানে এখানে প্রায় ৪৮ ঘর ব্রাহ্মণ, ১ ঘর কায়স্থ, ১ ঘর বেণিয়া, ১২ ঘর তাঁতি, ৩ ঘর ধোপা, ২ ঘর চাঁড়াল, ১০ ঘর মুসলমান ও ১৪ ঘর মুচি আছে। গ্রামে কয়েকটি প্রধান পাড়া আছে; যথা—রাজবাড়ীপাড়া, মাঝেরপাড়া ও পশ্চিমপাড়া। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি খণ্ড পাড়া আছে; যথা—বামুনপাড়া, কায়েত-পাড়া, তেলিপাড়া, ও মুসলমান-পাড়া প্রভৃতি। গ্রামে একটি মাইনর স্কুল আছে। উহাতে ৬৭ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করে। একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার বা লাইব্রেরি আছে এবং একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টাফিস আছে। গ্রামটি এক্ষণে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের আবাসস্থল, কিন্তু কোন দাতব্য-চিকিৎসালয় নাই। পূর্ব্বে বাজার হাট ছিল, এক্ষণে নাই। ভৈমী একাদশীতে এখানে একটি বৃহৎ মেলা হয়। উহাতে ১৪।১৫ সহস্র লোক সমাগম হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় স্বরূপচন্দ্র সরকার চৌধুরী এই গ্রামটি ক্রয় করেন। তাঁহার পুত্র বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রবল প্রতাপ ছিল। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণ আছেন বটে কিন্তু সে প্রতিপত্তি ও প্রতাপ আর নাই। গ্রামের পূর্ব্বোক্ত প্রধান দেবালয় ও বিগ্রহগুলি নদীয়ার মহারাজার।

প্রায় ১৷৷০ ঘণ্টাকাল শিবনিবাসের দ্রষ্টব্য প্রাচীন

কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া, পূর্ব্ব-বর্ণিত পথ ধরিয়া মাঝদিয়া গ্রাম অভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। মাঝদিয়ার রেলষ্টেসনের পশ্চিম দিকে একটি বিল আছে। উহার সন্নিকটে উত্তর দিকে "দেওয়ানের বেড়" নামক একটি গ্রাম আছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার পরিত্রাতা প্রভুভক্ত দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রকে এই গ্রামটি পুরস্কার স্বরূপ দান করিয়াছিলেন। শিবনিবাস ও রঘুনন্দন সম্বন্ধে একটি ছড়া প্রচলিত আছে :—

"শিব্‌নিবাসী তুল্য কাশী, তাহে নদী কঙ্কণ।
কোথা হতে এলে তুমি রাঢ়ের রঘুনন্দন॥"

রঘুনন্দন মিত্র জেলা বর্দ্ধমানের ডাঁইহাটের নিকটবর্ত্তী চাঁড়ুল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রণীত "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে" তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে প্রথমে নদীয়ার রাজ-সরকারে অতি সামান্ত কর্ম্ম করিতেন। দেনার দায়ে কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলাবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইলে, প্রধান রাজকর্ম্মচারীগণ কেহই ২২লক্ষ টাকা দেনা পরিশোধ করতঃ তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। কায়স্থ-জাতীয় সামান্ত কর্ম্মচারী রঘুনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন, "মহারাজ! যদি কিছুদিনের জন্ত আপনার রাজ-অধিকার ও ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি আপনাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি আপনার ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি রাজার নিকটে প্রকাশ করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে দেওয়ানের পদ ও স্বীয় ক্ষমতা অর্পণ করিয়া নদীয়ার রাজধানী কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন।

সেকালে রাজপুত্র, রাজভাগিনেয় ও আত্মীয়গণ জমিদারীর অধিকাংশ ইজারা রাখিতেন এবং নিয়মমত কর প্রদান করিতেন না। রঘুনন্দন কৃষ্ণনগরে আসিয়াই প্রথমে এক রাজজামাতার নিকটে প্রাপ্য খাজনা চাহিয়া পাঠাইলেন। জামাতা পুঙ্গব উত্তর করিলেন, "এক্ষণে আমার টাকা দিবার সামর্থ্য নাই।" তখন রঘুনন্দন উক্ত জামাতাকে ডাকিয়া আনিবার জন্ত একজন কর্ম্মচারীকে প্রেরণ করিলেন। জামাতা উপেক্ষা করিয়া উক্ত কর্ম্মচারীকে কহিলেন "এখন আমার যাইবার সময় নাই।" সুযোগ্য দেওয়ান তৎক্ষণাৎ কয়েকজন পাইককে উপযুক্ত আদেশ দিয়া জামাতার নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাহারা জামাতাকে কহিল "আপনাকে লইয়া যাইবার জন্ত দেওয়ানজী আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" দেওয়ান সহজ পাত্র নহে বুঝিয়া জামাতা বাবাজীউ তাঁহার নিকটে আসিয়া দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহা দেখিয়া অন্ত জামাতা বাবাজীবনগণ আপন আপন দেয় দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিলেন।

তৎপরে রঘুনন্দন রাজপুত্রদিগের নিকট হইতে বাকী কর চাহিয়া পাঠাইলেন। কুমার বাহাদুরগণ সগর্ব্বে বলিয়া পাঠাইলেন "এখন টাকা নাই।" ইহা শুনিয়া দেওয়ান দ্বারবানদিগকে এইরূপ আদেশ দিলেন যে, রাজকুমারগণের নিত্য পূজার দ্রব্যাদি কেহ যেন অন্দরে লইয়া যাইতে না পারে। তৎপরে তিনি কুমারদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনাদিগের পিতা কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকিবেন, আর এদিকে আপনারা সুখে দিন কাটাইবেন, ইহা অত্যন্ত বিসদৃশ। আপনারা তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া পূজা করুন। যদি আপনাদের তহবিলে অর্থ না থাকে এবং কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে রাজপুত্রবধূদিগের অলঙ্কার বন্ধক দিয়াও অর্থ সংগ্রহ করুন।" ইহা শুনিয়া রাজকুমারগণ আপন আপন দেনা পরিশোধ করিলেন। এইরূপে রঘুনন্দন অল্পকাল মধ্যে বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা নবাব-সরকারে দাখিল করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগার হইতে উদ্ধার করিলেন।

রঘুনন্দন সমগ্র নদীয়া রাজ্য জরিপ করিয়া ভূমির উর্ব্বরতা অনুসারে কর ধার্য্য করিলেন ; এবং যে সকল ভূমি প্রকৃত রাজদত্ত নিষ্কর তাহার ছাড়পত্র দিলেন। তাঁহার স্বাক্ষরিত এই ছাড়পত্রগুলি পরবর্ত্তীকালে "রঘুনন্দনী ছাড়" বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ; এবং উহা আজি পর্য্যন্ত ভূমির নিষ্করত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে। রাজ্যের জরিপ শেষ হইলে কৃষ্ণচন্দ্র এক দিন রঘুনন্দনকে কহিলেন, "দেওয়ান, জরিপের কার্য্যটি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে।" ইহার উত্তরে রঘুনন্দন কহিলেন, "মহারাজ! ইহা তত সুন্দর হয় নাই, এবং তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি জরিপের রসির একপ্রান্ত মহারাজ স্বয়ং ও অপর প্রান্ত কুমারদিগের মধ্যে কেহ ধরিতেন, আর এ অধীন চিঠা লিখিতে বসিত, তবে জরিপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত।"

রঘুনন্দন যেমন রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমন ব্যয়েরও হ্রাস করিয়াছিলেন। এজন্য রাজপরিবারবর্গের ও কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়াছিল।

এক দিন মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে নানা প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও রাজাদিগের দেওয়ানগণ উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় রঘুনন্দন দরবার-গৃহে প্রবেশ করিলেন। সভার সঙ্কীর্ণ শূন্য স্থানের মধ্য দিয়া যাইতে তাঁহার চাপকানের নিম্নভাগ বর্দ্ধমানের রাজার দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গ স্পর্শ

আক্রান্ত হইয়া লুণ্ঠিত হইল। দেওয়ান মাণিকচাঁদ নবাবকে বুঝাইলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারীর মধ্যে সংঘটিত এই দুর্ঘটনার জন্য তদীয় দেওয়ান রঘুনন্দন দায়ী। ইহার ফলে হুকুম হইল যে, রঘুনন্দনকে অবমাননা করিয়া তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হউক।

অধঃপতনের সময় ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা অনেকের থাকে না। রঘুনন্দনের এই দুর্দ্দশায় রাজকুমার-গণ আনন্দিত হইলেন। যখন রঘুনন্দনকে গর্দ্দভের পৃষ্ঠে
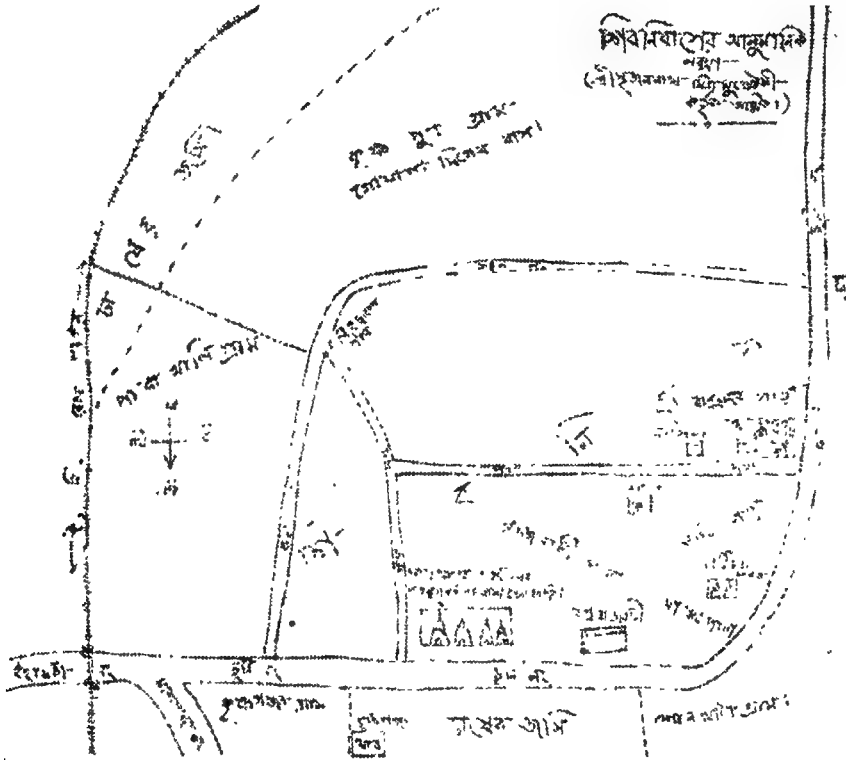
শিবনিবাসের মানচিত্র

করিবামাত্র মাণিকচাঁদ বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্‌তে নেহি পাজি।" রঘুনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ, নওকর সবহি পাজি, কোই বড়া কোই ছোটা।" উপযুক্ত উত্তর শুনিয়া সভাস্থ সকলে হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু ইহার ফলে মাণিকচাঁদ রঘুনন্দনের বিষম শত্রু হইলেন। পরবর্ত্তীকালে মাণিকচাঁদ নবাবের দেওয়ান হইয়া শত্রু নিপাতের উপায় ভাবিতে লাগিলেন। বর্দ্ধমানের রাজার দেয় রাজস্বের টাকা হুগলি হইতে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইবার কালে পথে কৃষ্ণচন্দ্রের জমিদারী পলাশীতে রাত্রিকালে দস্যু কর্ত্তৃক

আরোহণ করাইয়া মুর্শিদাবাদ সহরের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, সেই সময় তিনি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আবাসের নিকটস্থ হইলে, নির্ব্বোধ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র শিবচন্দ্র তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। ইহাতে রঘুনন্দন অতীব দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে কহিলেন, "এই অবমাননাতে আমার যত যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, তাহার সহস্রগুণ যন্ত্রণা তোমাদের ব্যবহারে পাইলাম। অবোধ রাজকুমার, আমার এই অবমাননাতে কাহার অবমাননা হইতেছে ইহা যে তুমি বুঝিলে না, এই বড় পরিতাপের বিষয়। আমি এ গর্দ্দভে

আরোহণ করি নাই, তোমার পিতাই আরোহণ করিয়াছেন জানিবে।" শুনা যায় যে, এই অবমাননার পরে কর্ত্তব্যপরায়ণ প্রভুভক্ত রঘুনন্দনকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। রঘুনন্দনের দেওয়ানের-বেড় এখন একপ্রকার জনশূন্য হইয়াছেন। তাঁহার বংশে এখন নাম করিবার মত আছেন, পাবনার সব-জজ শ্রীযুক্ত মোহিনীকান্ত মিত্র বি-এল্ মহাশয়; ইনি দেওয়ান রঘুনন্দনের প্রপৌত্র। শ্রীযুক্ত মোহিনীবাবুর জ্যেষ্ঠতাত-কন্যাকে 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর প্রথম পক্ষে বিবাহ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনকে স্মরণ করিয়া "দেওয়ানের-বেড়" উদ্দেশে নমস্কার করিয়া মাঝদিয়ায় উপস্থিত হইলাম। তৎক্ষণাৎ স্নান আহার শেষ করিয়া দুইপ্রহরের ট্রেণে কলিকাতাভিমুখে রওনা হইলাম।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৮

কুমার গুণেন্দ্রভূষণকে সেই পত্র জোর করিয়া লিখাইয়া লইবার পর হইতে বীণা আর লীলার ধারে আসিত না। বৈকালে ক্লাবে যাওয়া বা টেনিস্ খেলা সে প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিল। সে সর্ব্বদা নিজের ঘরে বসিয়া লেখাপড়া বা চিঠিপত্র লেখার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করিয়া রাখিত। লীলা কিন্তু তাহাকে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিত না। তাহার সন্দেহ হইত, হয় ত বীণা প্রকাশ্যে কুমারের সঙ্গে আলাপ না রাখিয়া পত্র দ্বারা গোপনে সম্বন্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু সে ত তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহার চিঠিপত্র লইয়া দেখিতে পারে না, কাজেই তাহাকে কেবল বীণার প্রতি কড়া নজর রাখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত।

মিসেস রায় কুমারের এত দিনের অদর্শনে মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। লীলা তাঁহাকে বুঝাইয়াছিল, কুমার বিশেষ কাজের জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।

লীলা নিজে সব চেয়ে বিপদে পড়িয়াছিল অরুণকে লইয়া। কিরণের পাটনায় আবার ফিরিয়া আসার পর হইতে অরুণ লীলার প্রতি বিষম সন্দেহ ও ঈর্ষার জ্বালায় উন্মাদপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। লীলা নিজে তাহার দুর্ব্বলতার বিষয় জানিত, এবং অরুণের এ ঈর্ষা যে একেবারে অমূলক নয়, তাহা বুঝিয়া, সে সেই প্রথম দিনের পর হইতে সাধ্যমত কিরণকে পরিহার করিয়া চলিত। কিন্তু তাহার কোনও চেষ্টাই অরুণকে সুখী করিতে পারিত না। লীলার তাহার নিকট আসিতে একটু দেরি হইলেই সে রাগিয়া অভিমান করিয়া অনর্থ বাধাইয়া তুলিত। বীণার জন্য ভাবনা, তাহাকে সর্ব্বদা দৃষ্টির মধ্যে রাখা, এই সব কার্য্যে ব্যস্ত থাকায়, সে আজকাল পূর্ব্বের মত সর্ব্বক্ষণ অরুণের নিকটে থাকিতে পারিত না। অরুণ সেইজন্য দুর্জ্জয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া নিজে মনে মনে নানা অসম্ভব কল্পনা ও চিন্তায় নিরর্থক তাহাদের মধ্যে একটা বিষম অশান্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিত। এই মানসিক ব্যাধির জন্য এই কয়েক দিনের মধ্যেই তাহার স্বাস্থ্য পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

এই সব বিসদৃশ চিন্তার ফলে আবার হয় ত তাহার চক্ষুর ক্ষতি হইতে পারে, সেই ভয়ে লীলা প্রাণপণে অরুণকে আদর করিয়া বুঝাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু সর্ব্বক্ষণ অরুণের বিষম বিরক্তি ও ঈর্ষার ফলে তাহারও মন অবসন্ন হইয়া পড়িত; ও এই স্বার্থপর প্রেমের তুলনায়, যাহাকে সে ভুলিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে তাহার নিঃস্বার্থ মহৎ প্রেম, ও তাহারই নাম অহরহ তাহার অন্তরে বাজিতে থাকিত।

সেদিন মিস নেল্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া জোছনার বিষয় সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লীলা যখন বাড়ী ফিরিতেছিল, সেই সময় পথের মোড়ে কিরণের সহিত তাহার দেখা হইল। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া লীলা অন্য পথে পলাইতে যাইতেছিল; কিন্তু কিরণ সত্বর ঘোড়া ছুটাইয়া তাহার পাশে

আসিয়া পড়ায়, অগত্যা লীলা হাসিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিল।

কিরণ সহজভাবে তাহাকে বলিল যে, সে এই সপ্তাহে শিশুদের জন্ম একটি উৎসবের আয়োজন করিতেছে। সেই উপলক্ষে ক্লাবঘর সাজান, আলোর বন্দোবস্ত, এবং ভোজের আয়োজন করা ইত্যাদি কাযে লীলার তাহাকে সাহায্য করিতে হইবে। এই কথা বলিবার জন্ম সে আজ দুই দিন হইতে লীলাকে খুঁজিতেছিল।

সহরের ছোট ছোট ছেলেরা কিরণের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে প্রতি বৎসর দেওয়ালী পর্ব্বের সময় তাহাদের জন্ম একটি বিরাট উৎসবের আয়োজন করিত। আলো দেওয়া, বাজি, নানা প্রকার খেলা, বাজনা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকিত। এ বৎসর সে দেওয়ালীর সময় বাহিরে থাকায় সে উৎসব হয় নাই। কিন্তু এখন সে যখন ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন শিশুদের আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে সে চায় না। দেওয়ালী হইয়া গেলেও তাহারা ক্লাবঘরে ঠিক সেই মত একটা আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছে।

কিরণ যখন কথা বলিতেছিল, লীলা সেই অবসরে তাহাকে দেখিয়া লইল। তাহার মুখে যে অন্তরের বেদনার ছায়া, তাহা আর আরোগ্য হইবার নয়! সে পূর্ব্বাপেক্ষা কি কৃশ হইয়া গিয়াছে! তাহার উন্নত প্রসন্ন ললাটে চিন্তা ও বিষাদের গভীর রেখা! শুষ্ক মুখ ও অধরোষ্ঠের দিকে চাহিলে মনে হয় হাসি ও আনন্দ যেন ও-মুখ হইতে জন্মের মত বিদায় লইয়াছে!

কিন্তু তবু এই মুখ লীলার কত প্রিয়! পৃথিবীতে সকলের চেয়ে এই মুখই সে একান্ত ভালবাসিয়াছে! কিন্তু আজ? আজ ভালবাসা দূরে থাক, তাহার চিরদিনের বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে সে পূর্ব্বের মত স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করিতেও পারিবে না! আজ সে অন্যের বাগ্দত্তা। পরে যখন আবার তাহার সহিত দেখা হইবে, তখন হয় ত সে অপরের বিবাহিতা পত্নী!

লীলার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতেছিল। সে তাহার কম্পিত অধর-ওষ্ঠ দাঁতে চাপিয়া প্রকৃতিস্থ হইতে চেষ্টা করিতেছিল।

কিরণ তাহার সহিত সাধারণ বন্ধুর মতই কথা বলিতেছিল। যে বাধা তাহাদের মধ্যে ব্যবধান তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে যাওয়া অসম্মানজনক। কিন্তু স্মৃতি তাহার হৃদয়ে পূর্ব্বের কথা অনুক্ষণই জাগাইয়া রাখিয়াছে!

কিরণের কথা শেষ হইলে লীলা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া বলিল, ভালই হল! একটা দিন সবাই মিলে রান্না-খাওয়া, ঘর-সাজানো—সব কাজ ভাগাভাগি করে বেশ আমোদে কাটান যাবে! তা হলে কখন যেতে হবে?

কিরণ বলিল, একটু সকাল সকাল যাবার চেষ্টা করো! আমি ত সেদিন সকাল থেকেই সেখানে থাকবো।

অরুণকেও নিয়ে যাব ত?

লীলার এ কথায় কিরণ কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া শেষে বলিল, হাঁ! তাকেও নিয়ে যেও!

এ প্রসঙ্গ শেষ হইলে তাহারা দুইজনে বাড়ী ফিরিবার জন্ম দুই বিভিন্ন পথে চলিয়া গেল। লীলার মনে হইতেছিল, একবার সে তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে আগের মত সহজ ভাবে কিরণ বলিয়া ডাকে! আর সে তাহার সঙ্গে এত চাপিয়া চাপিয়া চলিতে পারে না। কিন্তু তবু সে মনের আবেগ মনেই চাপিয়া রাখিল, এটুকু ঘনিষ্ঠতা করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না।

বাড়ী আসিয়া লীলা দেখিল, অরুণ তখনো বেড়াইয়া ফেরে নাই। ক্রমে বেলা বাড়িয়া রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল; অরুণ তখনো বাড়ী আসিল না। লীলা ক্রমে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছিল—আজ সে একলা কোথায় কোন্ দিকে গেল? এত দেরি ত সে কোন দিনই করে না? কান্ত আসিয়া বলিল, বামা আজ সহরের দিকে এসেছিল। তা সে তোমাকে বলতে বলে গেছে, সে লোকটা বামার হাতে টাকা দিয়ে কেবলই রোজ বলছে, তুই জোছনাকে আমার বাড়ী থেকে সরিয়ে নিয়ে যা! তা হ্যাঁ গা দিদিমণি, চুলোয় হোক সে ভদ্দর লোকের মেয়ে, ভদ্দর লোকের বউ,—আমার বোন তাকে নিয়ে রাস্তায় কোথায় দাঁড়াবে, বল ত? সে মুখপোড়া তা বুঝবে না, খালি নিয়ে যা আর নিয়ে যা, এই করছে! তা তুমি যে বলেছিলে সে ছুঁড়ির একটা ব্যবস্থা করবে? যদি কিছু করতে পার ত একবার চেষ্টা করে দেখ না। মেয়েটা ত কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে।

লীলা সেইমাত্র জোছনার ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়াছে।

সে কান্তকে বলিল, আমি সে সব ঠিক করেছি। আর দুচার দিনের মধ্যেই তার বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তোর বোনকে বলিস তার জন্ম আর ভাবতে হবে না।

কান্ত হৃষ্ট চিত্তে চলিয়া গেল। লীলা কুমারের পৈশাচিক প্রকৃতি ও এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল! বীণাকে তাহার কবল হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে তাহারও এই দশা অনিবার্য্য।

অরুণ সেদিন অনেক বেলায় শ্রান্ত অবসন্ন দেহে ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে শুইয়া পড়িল। লীলা অনেক চেষ্টা ও যত্ন করিয়াও তাহাকে কিছুতেই প্রফুল্ল ও প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল না। সে তাহাকে প্রফুল্ল করিবার জন্ম কিরণের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বলিল,—তাহার উৎসবের কথা, ও কিরণ তাহাদের সে উৎসবে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, সে সব বলিল।

অরুণ তাহার কোন কথাতেই যোগ দিল না, শুধু বলিল, আমি সবই জানি। যখন তোমরা আলাপ করছিলে, তখন আমি সবই দেখেছি। যাতে তোমরা সুখী হও, তাই করো, আমি কারো সুখের অন্তরায় হতে চাই না।

তাহার মুখ দেখিয়াই লীলা তখনি তাহার মনের ভাব বুঝিয়া লইল। সে মিশনে একা যাইবে বলিয়াছিল, কিন্তু অরুণ তাহাকে পথে কিরণের সঙ্গে দেখিয়া অন্যরূপ ভাবিয়া লইয়াছে!

বিষম বিরক্তি ও অপমানে লীলা নিস্তব্ধ হইয়া গেল! তাহার প্রতি অরুণের যদি সামান্ম বিশ্বাসও না থাকে, সে যদি তাহাকে নিতান্ত চপল স্ত্রীলোকের মত অসার বলিয়াই জানিয়া থাকে, তবে তাহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হওয়াই উচিত।

এবারে লীলা অন্যান্য বারের মত অরুণকে ভুলাইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা না করিয়া নীরব হইয়া রহিল। তাহার এই ভাবান্তরে অরুণ আরও দমিয়া গেল। তিন চার মিনিট নিস্তব্ধ ভাবে কাটাইয়া অবশেষে সে যখন লীলার সঙ্গে আবার কথা বলিতে গেল, তখন লীলা বলিল, অরুণ! তুমি মনে দুঃখ করো না, আমি বাধ্য হয়ে হয় ত দু একটা রূঢ় কথা বলে ফেলেছি। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, তাতে আমার উপর যদি তোমার সামান্ম বিশ্বাসও না থাকে, তা হলে অনর্থক এ বন্ধনে বদ্ধ হবার সার্থকতা কি, আমি ত বুঝতে পারি না। যারা এত হিংসা করে, তারা এতে নিজেদের যে ক্ষতি করে, জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি নষ্ট করে যে কি অভিশাপগ্রস্ত জীবন বহন করে, সেটা যদি তারা একবার বুঝতো, তা হলে হয় ত এ রকম পাগলামী কখন করতো না।

অরুণ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া বলিল, হয় ত এটা এক রকম পাগলামী বা মানসিক ব্যাধিই হবে লীলা! আমি কিছুতে এ সংশয় থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না। তুমি যখন আমার কাছে থাক, তখন এ সব কিছু আমার মনে হয় না। কিন্তু তার কাছে তোমায় দেখলেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়, আমার মনে তখন কোন সময় দুর্জ্জয় প্রতিহিংসার ভাব জেগে উঠে আমায় পাগল করে তোলে। আবার কখন বা মন উদাস হয়ে গিয়ে আত্ম-হত্যা করে মরবার প্রবৃত্তি হয়। এ হয় ত আমারি মনের দোষ; কিন্তু এর মূলে কেবল তোমার প্রতি আমার প্রবল আসক্তি ছাড়া আর কিছু নেই। আমার নিজের মনে হচ্ছে, আর কিছু দিন এ ভাবে থাকলে হয় আমি পাগল হয়ে যাব, নয় ত আত্মহত্যা করে মরবো।

অরুণের বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া ও ঈর্ষার এমন প্রচণ্ড পরিণাম দেখিয়া লীলা মনে মনে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। অরুণের মনের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার পক্ষে এরূপ কিছু করা অসম্ভব নয়।

তাহার করুণ স্নেহপ্রবণ হৃদয় অরুণের দুঃখে কাতর হইয়া উঠিল। তাহার উপর আর রাগ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। সে তখন আবার পূর্ব্বের মত আদরে ও যত্নে তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিন চারি দিন তাহার নিকটে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প করিয়া, বই পড়িয়া, অরুণের উপন্যাস সংশোধন করিয়া কাটাইল। অরুণ আবার সব ভুলিয়া গেল।

বড়দিনের ছুটিতে সকলে এক দিন শিকার করিতে যাইবে, কথা ছিল। লীলা এ দলের সহিত যোগ দিবে না, স্থির করিল। কিরণ এখানে যখন আছে, তখন সে নিশ্চয় ইহাদের সঙ্গে থাকিবে। তাহার সহিত কিরণের সাক্ষাৎ ঘটিলে অরুণ হয় ত আবার কি একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিবে। তার চেয়ে না যাওয়াই ভাল।

কিন্তু বীণার কথা ভাবিয়া তাহার মন সুস্থ হইতেছিল

না। কুমার সম্ভবতঃ এখানেই আছে। সে এ দলে মিশিয়া শিকারে গেলে বীণার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিতে পারে, তাহা সে জানে। সুতরাং মনে হয়, এ সুযোগ সে ছাড়িবে না। সম্পূর্ণ একটি দিন আবার তাহাদের নিভৃত আলাপের এমন অবসর দিতে লীলার মন চাহিতেছিল না।

অরুণ এই শিকারের আমোদে যাইবার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছিল। কিরণ তাহার আস্তাবল হইতে একটি ভাল ঘোড়া বাছিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়াছিল। সে জানিত, লীলাও তাহাদের সঙ্গে যাইবে।

কিন্তু যাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে লীলা বলিল—তুমি যাবার সময় বীণার কাছে কাছে থেকো—কুমার লোক ভাল নয়। তার সঙ্গে বীণা ঘনিষ্ঠতা করবে, সেটা আমি মোটে ভালবাসি না। আমি আজ বাড়ীতেই থাকবো মনে করছি। শরীরটা বিশেষ ভাল নেই।

লীলা যাইবে না শুনিয়া অরুণের সব স্ফূর্ত্তি চলিয়া গেল। সে বিষণ্ণ হইয়া বলিল, তবে আমিও যাব না! তোমায় ছাড়া একলা কোথাও গিয়ে আমার কোন সুখ বা তৃপ্তি নেই।

লীলা বলিল—না! না। তুমি যাও! বেশ ত! একটু আমোদ পাবে! কত দিন এ সব খেলা তোমার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

অরুণ বলিল—তুমি না গেলে আমি যাব না। তুমি এখন যদি না যাও, কিছু পরে গিয়েও তো আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পার। তাই যাবে?

লীলা বলিল, না—আমার শরীর ভাল নেই। আজ আর আমি কোথাও বেরোব না। তুমি কিন্তু যাও! সকলে যাচ্ছে, আর তুমি না গিয়ে বাড়ী বসে থেকে কি করবে? বীণার সঙ্গে সঙ্গে তুমি আছ জানলে আমি বাড়ীতে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবো।

অরুণ বলিল, বেশ! তুমি যা বোলছো তাই হবে। তবে আমি বলেছিলুম কি—তোমার কি আমাকে একলা তার সঙ্গে ছেড়ে দিতে একটু ভয় করে না? সে যদি আমার উপর তার মোহিনী শক্তির প্রভাব বিস্তার করে?

অরুণের ইচ্ছা হইত, বীণা ও তাহার পূর্ব্ব সম্বন্ধের কথায় লীলার মনে একটু সন্দেহের ছায়া আসে, কিন্তু লীলার মনে কোন দিন এসব কথা উঠিত না।

অরুণের পরিহাসে সে হাসিয়া উঠিয়া সকৌতুকে বলিল, তা তুমি যদি তার বশে যেতে চাও, আমি তখনি তোমার উপর সব দাবী ছেড়ে দেব। ভাগাভাগিতে আমি নেই! তা ছাড়া, যে আমায় বিবাহ করবে, সে কোন দিন আমার ঈর্ষা উদ্রেক করতে পারে না, সে বিশ্বাস আমার যথেষ্ট আছে!

তুমি বড় সাহসী! আর কেউ হলে এত সাহস করতো না! বলিয়া অরুণ হাসিয়া বীণার সন্ধানে চলিয়া গেল!

তাহারা চলিয়া গেলে লীলা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! তাহার বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে! এই দিনটা চুকিয়া গেলে তাহার সহিত কিরণের সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তাহার পর হইতে সব উদ্বেগের অবসান! আর তাহাকে এমন ভয়ে ভয়ে লুকাইয়া ফিরিতে হইবে না! এ জীবন যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে!

একলা ঘুরিতে ঘুরিতে লীলার জোছনার কথা মনে হইল! এই অবসরে তাহাকে একবার দেখিয়া আসিলে মন্দ হয় না! খুব জোরে ঘোড়া ছুটাইয়া গেলে সে শিকারিদের অনেক আগেই বাড়ী ফিরিয়া আসিবে!

লীলা তাহার ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল। বীণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার ফলে কুমার আর তার দিকে মন দেয় না! লীলার পক্ষে তাহার দুঃখ ও নিরাশ্রয় অবস্থার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব।

লীলা একবার তাহার অসম সাহসের কথা ভাবিয়া দেখিল। তাহার মত কোন অবিবাহিত মেয়ের একজন পুরুষের বাড়ীতে এরূপ ভাবে যাওয়া এবং সেই কুৎসিত ব্যাপার উপলক্ষে সমাজে এ ব্যাপার সকলে কি চক্ষে দেখিবে? আর অরুণ? সেই বা এ কথা শুনিলে তাহাকে বলিবে কি?

কিন্তু এ সব কথা লীলা এক পাশে সরাইয়া রাখিল। যখন তাহার উদ্দেশ্য ভাল তখন জগৎ যাহা ইচ্ছা বলুক, সে সর্ব্ব বিষয়েই অগ্রসর হইবে!

লীলা ধানের ক্ষেত ও বাঁশবনের ভিতরের সরু পথ দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল। মাঝে মাঝে বিস্তৃত আমবাগান। এই ছায়াশীতল পল্লীপথ তাহার অপরিচিত নয়! কতবার সে কিরণের সঙ্গে এ পথে অশ্বারোহণে আসিয়াছে! কুমারের জমিদারীর ভিতর কতদিন তাহারা দুইজনে

চড়ুইভাতি করিয়া গিয়াছে। তাহার প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক কাজের মধ্যেই কেবল কিরণের কথাই বার বার মনে পড়িয়া যায়। উচ্চ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে কুমারের উন্নত গৃহচূড়া দেখা যাইতেছিল। লীলা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিল—বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ী—যোড়া যোড়া থামের উপর প্রশস্ত বারাণ্ডা ও ছাত—কম্পাউণ্ডের এক ধারে চাকরদের থাকিবার ঘরের সারি ও আস্তাবল দেখা যাইতেছে।

ফটকের মধ্যে ঢুকিয়া রাশ টানিতেই ভৃত্যেরা ছুটিয়া আসিল। লীলা তাহাদের বলিল, এখানে যে একটি মেয়ে আছে, সে তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া ভৃত্যের দল অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে ত এত দিন এই বাড়ীতে রহিয়াছে, কোন দিন ত কেহ তাহার সহিত দেখা করিতে আসে না।

লীলা ব্যাপার দেখিয়া দমিল না, ঘোড়া হইতে নামিয়া একজনকে ঘোড়াটা আস্তাবলে রাখিতে বলিয়া অপরকে বলিল, সেই মেয়েটির কাছে আমাকে নিয়ে চল। তার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

বামা ঘর ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল; বিছানার উপর একটি সুন্দরী মেয়ে বসিয়া ছিল। কান্তর বর্ণনামত তাহাকেই জোছনা বলিয়া চিনিয়া লইতে লীলার কষ্ট হইল না। তাহার গভীর কালো বড় বড় চোখ দুটি কোটরগত, কৃশ ও পাণ্ডুর মুখের হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রুক্ষ কালো চুলের রাশি অযত্নে তাল পাকাইয়া জটা পাকান—ফুটন্ত গোলাপের মত সরস ও সুন্দর মুখ শুকাইয়া মলিন ও বিবর্ণ। এই বয়সেই সে যেন জীবনের সমস্ত আনন্দ, আশা, সুখ—সব হারাইয়া মৃত্যুর অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

লীলা সোজা গিয়া তাহার পাশে বসিল। বলিল—তোমার নাম জোছনা—নয়?

জোছনা তাহাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া ছিল। সে বলিল—আমিই জোছনা—কিন্তু আপনাকে ত আমি চিনতে পারছি না?

লীলা বলিল, তুমি ছেলেমানুষ, কাকেই বা চেন? আমি এই কাছেই থাকি, শুনলুম—তুমি বড় কষ্টে আছ, তাই আমি এসেছি, যদি তোমার ভাল কিছু করতে পারি।

আমার ভাল? আর কি আমার ভাল হবার কিছু আছে দিদি? বলিয়া জোছনা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

দাসী বলিল, এই আবার আরম্ভ হল! খাওয়া দাওয়া বন্ধ—ঘুম নেই—কেবল চব্বিশ ঘণ্টা কান্না—আর কান্না? এমন করলে মানুষের প্রাণ বাঁচে কখনো?

লীলা বলিল, ও কেন এমন করছে?

বামা নিজের কপালে দুটি আঙ্গুল ঠেকাইয়া বলিল—ললাটের লেকা ছিল—তাই—তা ছাড়া আর কি বোলবো গো মা? বাড়ীতে কি আদরে ছিল ও—শুধু খেয়ে আর খেলা করে হেসে হেসে বেড়িয়েছে! আর আজ ওর এই দশা? এই যে ওর সোয়ামি বিলেত থেকে এক মেম নিয়ে ফিরেচে—তাকে কি আর কেউ বলবে কিছু? আর এই একটা ছেলেমানুষ মেয়ে—জোর করে ঘর থেকে টেনে এক মুখপোড়া পথে বসাল—যত দোষ তারই! আত্মীয়-স্বজন সব হারিয়ে কেঁদে কেঁদে মরতে বসেছে? কত বড় ঘরের মেয়ে—কত বড় ঘরের বৌ—আজ ওর এমন হাল যে দাঁড়াবার জায়গা নেই! আর আমায় খালি সে হতভাগা বলে—ওকে নিয়ে যা! তুই যেখানে হোক ওকে নিয়ে যা! আমি ওকে কোথায় নিয়ে যাব—বল ত মা? নেহাত হাতে করে মানুষ করেছিলুম, ফেলতে পারি নি—তাই পড়ে আছি। তা বলে ওকে নিয়ে যাবার মত জায়গা কি আমার আছে?

লীলা বলিল—জোছনা! যদি আমি তোমায় নিতে লোক পাঠাই, যাবে ত তা হলে?

জোছনা বলিল—কোথায় যাব?

লীলা বলিল—ভাল জায়গায়। সেখানে সকলেই তোমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে।

জোছনা বলিল—আমার আত্মীয়-স্বজনরা আর আমাকে তাদের কাছে যেতে দেবে না। কিন্তু আমার শুধু নিজের বাড়ীতেই যেতে ইচ্ছে করে। আর কোথাও আমার সুখ নেই। দিদি! তুমি কি তাদের একবার আমার কথা বলে দেখবে? আমি ত ইচ্ছে করে এখানে আসি নি, আমায় কেন তারা দোষ দেয়? এ বাড়ী, এ সব যেন বিষ বলে মনে হচ্ছে আমার। হয় আমায় মরবার ওষুধ দাও, আর না হয় ত আমায় আবার বাড়ী ফিরে যাবার উপায় করে দাও দিদি! আমি আর এমন করে থাকতে পাচ্ছি না।

জোছনা আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বলিল, আমার একটা পাখী ছিল, সে আমার কত চিনতো। উড়ে এসে আমার হাত থেকে খাবার খেত।' আমার ছোট ভাইটি এখন অনেক বড় হয়েছে বোধ হয়—সে হয় ত এখন চলতে পারে। কথা বলতেও শিখেছে হয় ত। তাদের কথা মনে হলে আমি আর এক দণ্ড এখানে স্থির হয়ে থাকতে পারি না। দিদি! তোমার পায়ে পড়ি—তুমি আবার আমার বাড়ী ফিরে যাবার উপায় করে দাও।

তাহার মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে লীলা নিজেও কাঁদিয়া আকুল হইল। দাসী বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—মিছেই কেঁদে মরছো বাছা। যদি তুমি সত্যিই মাথা কুটে হত্যে হয়ে মরে যাও, তবু আর সেখানে ফিরে যেতে পারছো না। যতই কাঁদ। সবই মিথ্যে—

লীলা চোখ মুছিয়া বলিল—জোছনা। শোন। তোমার বাপের বাড়ী আর তুমি যেতে পার না। আমি বল্লেও তাঁরা সে কথা শুনবেন না। তবে অন্ত বাড়ীতে আমি তোমায় রাখতে পারি। সেখানে তুমি ভাল থাকবে, তোমার মত অনেক মেয়ের সঙ্গ পাবে, কোন কষ্ট হবে না তোমার।

দাসী বলিল—তাই কর বাছা। আমি ত বাঁচি তা হলে। ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে।

লীলা বলিল—কাল দুপুরে আমি পাল্কী পাঠাব। তুমি একে নিয়ে চলে যেও। যেখানে থাকতে হবে, যা করতে হবে, সে সব আমি ঠিক করে রাখবো। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। জোছনা, আজ তবে আমি আসি! তুমি কেঁদো না! মন স্থির করে থাক। আর তোমায় এখানে থাকতে হবে না। যেখানে তোমায় রাখবো—খুব ভাল থাকবে সেখানে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে তোমায় দেখে আসবো। কেমন?

কথায় কথায় অনেক দেরি হইয়া গিয়াছিল, লীলা তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে বারাণ্ডায় আসিবামাত্র কুমার শুণেন্দ্রভূষণের সঙ্গে তাহার দেখা; সেই মাত্র কুমার বাড়ী ফিরিয়াছে।

লীলাকে দেখিয়া প্রথমে সে ঘোর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। পর মুহূর্ত্তেই সে ভাব সামলাইয়া লইয়া সে আগাইয়া আসিয়া অতি বিনীত ভাবে লীলাকে নমস্কার করিল। বলিল—এ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের গৌরবে আমি ধন্ত। কিন্তু কেন এ সম্মান পেলুম, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

তাহার কালো চোখে ও ঠোঁটে বিদ্রূপের মৃদু হাসি ফুটিয়া উঠিল; লীলার মনে হইল—সে যেন কোন সুন্দর—নৃশংস জন্তু!

কুমার লীলার মুখের উপর তাহার উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় চক্ষুর তীব্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল; বীণা যে দৃষ্টির সম্মুখে মোহাবিষ্ট হইয়া অভিভূত হইয়া পড়িত, লীলা সতেজে তাহার সেই মোহপূর্ণ চক্ষুর দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, কোন উত্তর দিল না।

তাহাদের চারিদিকে বাড়ীর লোকজনেরা জড় হইয়া চিত্রাপিতের ন্যায় চাহিয়া ছিল। এখনই যেন একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটিবে—এইরূপ সন্ত্রস্ত ভাব।

লীলা পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে কুমার আসিয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। লীলার দিকে চাহিয়া অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে হাসিয়া বলিল, আমায় আজ্ঞা করুন, মিস রায়! এখানে আপনার কিছুক্ষণ বিশ্রাম ও জলযোগ করে যাবার জন্ত আয়োজন করি। বহুদিন আমার বাড়ীতে এমন সম্মানিত অতিথির আগমন হয় নি। আজকার এই সাক্ষাতের ফলে হয় ত আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে যেতেও পারে।

লীলা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলিল, আপনি পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ান্। আমি এখনি যেতে চাই।

ক্ষেপেছেন আপনি। জজ-সাহেবের মেয়ের উপযুক্ত ভাবে আদর অভ্যর্থনা না করে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলে তিনিই বা কি মনে করবেন?

লীলা বলিল, আমি অভ্যর্থনা চাই না। আমার পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ান আপনি!

'অসম্ভব। মিস রায়। সে হতেই পারে না। সেই সাত আট মাইল দূর—কোথা থেকে আসছেন—একটু জল না খাইয়ে কখনো ছেড়ে দিতে পারি? প্রাণটা ত আমার লোহা দিয়ে গড়া নয়? তার উপর আবার যে সে অতিথি নয়—জজ-সাহেবের মেয়ে!

লীলার চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল—আমার ঘোড়াটা কাকে আনতে বলবেন? না—আমি অমনি চলে যাব? আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে দাঁড়াব না।

তাহার উত্তেজিত মুখের দিকে চাহিয়া কুমার বলিল—বাঃ! কি সুন্দর! রাগ হলে আপনাকে কি চমৎকার মানায়! আপনি আমায় বুঝলেন না মিস রায়! এই বড় দুঃখ থেকে গেল!

লীলা আর কিছু না বলিয়া অন্য দিক দিয়া বারাণ্ডা হইতে নীচে নামিয়া পড়িল! চকিতের মত কুমারও নামিয়া আসিয়া আবার তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল!

কুমার বলিল, বৃথা চেষ্টা মিস রায়! যতক্ষণ আপনি এখানে আসবার কারণ না বলবেন, ততক্ষণ আমি আপনাকে কিছুতে ছাড়বো না! আর এত তাড়াই বা কিসের? এখানে আসার গল্প এতক্ষণে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে! এখনই যান্ আর দুঘণ্টা পরেই যান্—ফল সমানই। বলুন—কেন এখানে এসেছিলেন?

লীলা তাহার ঘোড়ার চাবুক মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সজোরে ধরিল! বলিল—তোমার সঙ্গে সে আলোচনা আমি করতে চাই না! আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি আমাকে আটকে রাখবার সাহস কর? রাগে তাহার কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল!

আমি অনেক দুঃসাহসিক বিষয়েও সাহস করি! যখনি আপনি এখানে পা দিয়েছেন, তখনই এর গুরুত্বের কথা আপনার ভাবা উচিত ছিল। বলুন—কি ভেবে এখানে এসেছেন?

লীলা অগ্নিময় চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—কখনো বলবো না। কি করতে পারেন আপনি—দেখা যাক্!

কুমার ধূর্ত্তামির হাসি হাসিয়া বলিল—আহা! বলবেন বৈ কি! অত চটে যান কেন বলুন দেখি? আপনি না বলেন—আমি বলছি আমার বাড়ীতে একটা গোয়েন্দাগিরি করবার উদ্দেশ্যই ছিল বোধ হয়? না হলে আমি এ ত আশা করতে পারি না যে, আপনি আমায় দেখবার জন্যই এখানে এসেছিলেন?

লীলা কোন উত্তর না দেওয়ায় কুমার আবার বলিল, আর একান্তই না বলেন যদি, তা হলেও কিছুক্ষণ থাকবেন বৈ কি! আমি ত আপনার পূর্ব্বের ব্যবহার ভুলেই গেছি—আসুন—সে সব ভুলে একটু আমোদ আহ্লাদ করা যাক্। তার পরেও যদি লেফটেনেণ্ট সাহেব রাজি হন, তখন না হয় আপনাকে তাঁর হাতে দিয়ে আসা যাবে!

তাই না কি? তবে তার পুরস্কার কিছু আগে নাও? বলিয়াই লীলা বিদ্যুৎবেগে তাহার ঘোড়ার চাবুক কুমারের মুখের উপর সজোরে বসাইয়া দিল!

চোখের উপর হইতে গাল পর্য্যন্ত চামড়া ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ছুটিল!

যাতনায় অধীর হইয়া কুমার দুই হাত চোখে ঢাকা দিতেই লীলা এক ধাক্কায় তাহাকে সরাইয়া তাহার ঘোড়া খুলিয়া লইল, ও এক লাফে তাহার পিঠে উঠিয়া কয়েক ঘা চাবুক বসাইয়া দিতেই সুশিক্ষিত অশ্ব বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতিতে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

কুমারের হাত বহিয়া রক্ত ঝরিতেছিল। সে চোখে হাত দিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল—ধর! ধর শয়তানীকে! ব্যাটারা সব হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? ছুটে যা! ধর!

ভৃত্যের দল কিন্তু এক চুল সরিল না! লীলাকে সবাই চিনিত। তাহাকে ধরিতে যাইয়া কে জজ-সাহেবের বিষ নেত্রে পড়িতে যাইবে? (ক্রমশঃ)

জীবন

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

জীবন চলে কালের পথে
কাল-বিজয়ী গতির ধারা,—
দু'কূল-হারা ব্যাকুল বেগে
এক যে পাগল নদীর পারা।
মাঝে মাঝে মরণ-আগে
শৈল-শিলা মরণ জাগে,
বেগের মুখে কে দেয় বাধা—
স্রোত হয় আরো তূর্ণ-খর;
জীবন চলে পাগ্‌লা-ঝোরা—
পথের পাথর চূর্ণতর!

জীবন চলে জগৎ-পথে
জরা-হরণ একটা জ্যোতি,
জীবন গলে স্বাতীর সুধা—
শুক্তি-মরণ শেষটা মোতি।
জীবন বহে মধু-র বাতাস
গন্ধে ভরি' সুদূর আকাশ,
শীতের সাদার পাথায়' পরি
সবুজেরি সৃষ্টি আনে;
জীবন সেযে তিমির হরি'
নিত্য নবীন-দৃষ্টি দানে!

জননী
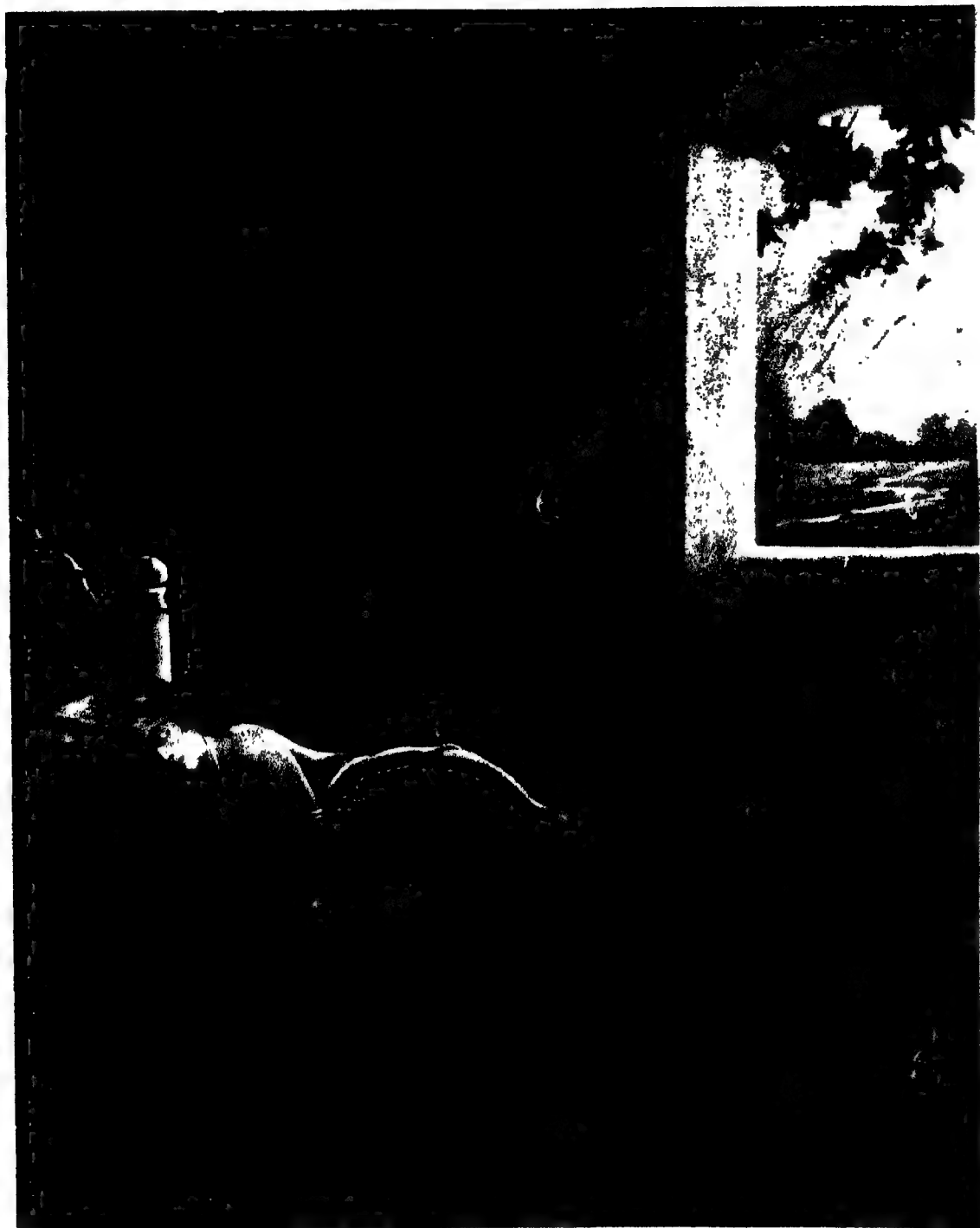
শিল্পী—শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাঙ্গালা ভাষার শব্দ-সম্পদ এবং তাহাদের মৌলিকতা

প্রত্নতত্ত্ব-বারিধি শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ এম-আর-এ-এস (লণ্ডন)

বিষয়টীর আলোচনার উপযুক্ত সময় অত্যাপি আসিয়াছে কি না, সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আসিতে পারে। কেন না, সম্ভবতঃ তাঁহাদের মনে হইতেছে যে, আমদানী সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ না হইতে এখনই আগন্তুকবর্গের প্রকৃতি সমালোচনা কিরূপে সম্ভবপর হয়? কিন্তু অন্যপক্ষ মনে করিতেছেন, এতদালোচনার সময় বুঝি বহিয়াই যায় প্রায়; এখনও তৎপ্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিলে—আগন্তুকেরা যেভাবে তাহাদের পূর্ব্ব-পূর্ব্ববর্ত্তী দল তথা আদিম অধিবাসীদের সহিত মিশিয়া যাইতেছে, তাহাতে এখনই চিহ্নিত করিবার চেষ্টা না করিলে আর কিছুদিন পরে কোন্‌টী স্বকীয় সম্পত্তি, আর কোন্‌টীই বা পরকীয় বেনামী মাল, বিচারকের পক্ষে ত বটেই, কর্ত্তার উত্তরাধিকারীদের পক্ষেও নিঃসংশয় নিষ্পত্তি হয় ত অসম্ভব হইয়া পড়িবে। বাস্তবিক ধরিতে গেলে প্রচলিত (current) ভাষায়, বিশেষতঃ বর্ত্তমান অবাধ বাণিজ্য তথা অবাধ সংমিশ্রণের যুগে আমদানী বন্ধ হইতেই পারে না। অবশ্য এই সাবধানী দলের কতিপয় মহাত্মা তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত আসরের যথার্থ সদ্ব্যবহার পূর্ব্ব হইতেই করিয়া আসিতেছেন, তন্মধ্যে স্বর্গতঃ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন এবং বর্ত্তমান রায় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু তাঁহাদিগের প্রায় সকলেই একই ভাবে—মাত্র বাঙ্গালা লেখ্য ভাষার উপকরণাবলী লইয়া বিচারপথে অগ্রসর হইয়াছেন। ভাষায় যাহা প্রধান সম্পত্তি এবং যাহাতে মৌলিকতার সন্ধান অধিকতররূপে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই কথ্য-শব্দ-সম্ভারই তাঁহাদের আলোচনা হইতে প্রায় অবজ্ঞাতভাবে বাদ পড়িয়া আছে। বস্তুতঃ কথ্য ভাষাকে জাতীয় ভাষার কাণ্ডস্বরূপ মানিয়া লইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি আসিতে পারে না—তাহা হইতেই যেন শাখাপুষ্প ও ফলসম্পদে সকলকার তৃপ্তিসাধন করিতেছে। সুতরাং সেই কাণ্ড ধরিয়াই মূলের অনুসন্ধান করা সুসঙ্গত; শাখা পুষ্প ফল অর্থাৎ ভাষার লিখিত রূপ লইয়া বাদবিচার করিলে মূলতত্ত্ব মিলিবে কেন? আর বোধ হয়, ইহাও সকলে লক্ষ্য করিতেছেন যে, কেবল উহাদের অবজ্ঞাহেতু নহে, উপরন্তু শিক্ষিতসমাজ এবং তাঁহাদিগের অনুকরণে পারিপার্শ্বিক সম্প্রদায়গুলিও খাস দেশীয় কথার ব্যবহার যথাসাধ্য পরিমাণে পরিত্যাগ করিতেছেন বলিয়া কথ্য-ভাষায় শব্দ-সম্পদ বর্ত্তমানে অতি দ্রুতগতিতে বিলয় পাইতেছে! তাই বলিতেছিলাম, পল্লীর কোণে হেঁসেলে এখনও যে ২।৪ জন জরাজীর্ণ বৃদ্ধের সন্ধান পাওয়া যায়—তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া পূর্ব্বপুরুষবর্গের জীবনী সংগ্রহে তৎপর হওয়া দেশহিতৈষী মাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য নহে কি?

এ কথা বলাই বাহুল্য যে উন্নত ভাষা মাত্রই কথ্য ও লেখ্যভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। অনেকে এই কথ্য ভাষাকে 'আটপৌরে' এবং লেখ্য ভাষাকে পোষাকী ভাষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহাতে বস্তুতই উভয়বিধ ভাষার অতি স্বল্প অথচ প্রাঞ্জল কথায় ব্যাখ্যা ত করা হইয়াছে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন যে, পোষাকী ভাষা হইতে ভাষার বাস্তব পরিচয়ের কিরূপে সন্ধান লাভ করা যাইতে পারে! উদাহরণ স্বরূপ এই বাঙ্গালাদেশে হেট-কোট পরিহিত সকলকেই ইয়োরোপীয় মনে করিয়া লইলে কি যথার্থ পরিচয় লাভ হয়? সুতরাং পোষাকের দ্বারা জাতির পরিচয়-লাভের ন্যায় পোষাকী-ভাষা দিয়াও ভাষার প্রকৃত পরিচয়লাভ করা প্রায়ই অসম্ভব। বস্তুতঃ ধরিতে গেলে সেই "আটপৌরে" অর্থাৎ কথ্যভাষার মধ্যেই ভাষার বাস্তব মৌলিকতা নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ সমাজের শিক্ষা বা বিজাতীয় সভ্যতার আভাস পায় নাই—সেই অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর রমণীদিগের ভাষাই প্রকৃতপক্ষে দেশের কথা। তৎসমুদায় কথা কিছু কিছু করিয়া যোজনান্তরে বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত—তাই "যোজনান্তরে ভাষা" এবং সেই সকল স্বরবিন্যাসে বাস্তব ভাষার গতি লক্ষ্য করিতে পারা যায়। তাই আমি মাতৃভাষার হিতানুসন্ধিৎসুবর্গকে তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের ধারা পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি। পক্ষান্তরে, তাঁহারা এতাবৎ-কাল পথান্তর অবলম্বন করিয়া যাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাহার সহিত বর্ত্তমান পথের অভিজ্ঞতা তুলনায় সমালোচিত হইতে পারিবে। সম্ভবতঃ আপনারা অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে ওজনের দৃঢ়নিষ্পত্তির নিমিত্ত স্বর্ণকারেরা নিক্তির উভয় পার্শ্ব পালটিয়া মাপিয়া দেখে।

এস্থলে আমি কেবল উন্নত ভাষাগুলিই কথ্য ও লেখ্যভেদে বিভক্ত বলায় কেহ কেহ বা তাহার একটা কৈফিয়ত চাহিতে পারেন। বস্তুতঃ লেখ্যসৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কেবল বৈদিক ভাষার কথা বলিতেছি না, তাহা ছাড়াও কথা ও লেখায় সম্পূর্ণ অভিন্নরূপে ব্যবহৃত ভাষার সংখ্যা এই পৃথিবীবক্ষে অত্যাপি কম প্রচলিত নাই। আমার বিশেষ পরিচিত চাক্‌মাভাষীর কথা এস্থলে উদাহরণস্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে উপস্থিত করিতেছি। তাহাদিগের স্বতন্ত্র বর্ণাবলী থাকা সত্ত্বেও আপনারা হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, তাহারা মুখে যাহা বলে—বর্ণাবলী যোগেও ঠিক তাহাই লিখিয়া যায়, 'আটপৌরে' ও পোষাকীতে কোন পার্থক্য নাই। আসামী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় এই বিভাগদ্বয়ে ততটা সামঞ্জস্য না থাকিলেও পার্থক্য যে বাঙ্গালার ন্যায় 'আকাশ-পাতাল' নহে, তাহাও আশা করি আপনাদের অনেকেই অবগত আছেন। অধিকন্তু কোন ভাষা নূতন লেখ্য আকারে পরিবর্ত্তিত হইবার কালে কথ্য ভাষার সহিত ব্যবধান যে থাকেই না, তাহা আমরা পালি ভাষার

ইতিবৃত্ত হইতেও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। তাহার একটী শ্লোক আছে—

সা মাগধী মূলভাসা নরা যা যাদি কাপ্পীকা।
ব্রাহ্মণা চাসুহুত্তালাপা সম্বুদ্ধাচাপি ভাসরে॥

অর্থাৎ যাহাতে (মগধের) সকলে কথোপকথন করিত, সেই মূল-ভাষার নামই মাগধী। শ্রীমৎ বুদ্ধদেব সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের সৌকর্য্যার্থ মগধের প্রাকৃত সেই মাগধী ভাষাতেই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তদীয় অনুজ্ঞাক্রমে (১) সেই কথ্যভাষাই লিখিয়া রাখিবার বন্দোবস্ত হইলে উত্তরকালে খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃতানুরাগী প্রতিযোগী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মীদের দ্বারা উহা পালি অর্থাৎ পল্লীর ভাষা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সেই খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পালি ও মাগধীতে কোন পার্থক্য ছিল না। অনন্তর বৌদ্ধ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পালিভাষা মাগধীকে ছাড়াইয়া কতকটা পরিমাণে পোষাকী হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালাও যে আরও বেশী রকমের 'আটপৌরে' সকল শব্দ লেখ্যশ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছিল, আমরা ইহা হইতে অনুমান করিয়া লইতে পারি।

পৃথিবীর আদি গ্রন্থ বেদ হইতে আমরা তৎকালীন আর্য্য ঋষিদিগের কথ্য ভাষারই সন্ধান পাইতেছি। বোপদেব গোস্বামী তাই বলিয়াছেন,

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ"।

তাহা ছাড়াও একান্ত গোঁড়া না হইলে হিন্দু সমাজের আমরা সকলেই বেদসমূহের বিশেষতঃ মন্ত্রভাগ অমিতধী ঋষিগণের কথোপকথনের ভাষায় রচিত বলিয়া মনে করিয়া থাকি। আবার গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও ঘোষণা করিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" অর্থাৎ সামবেদই সর্ব্বাদৌ বিরচিত। বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত হইতেও আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই, গীতই সর্ব্বপ্রথম ভাষাকে রচনার পথে লইয়া যায়। তাই মহর্ষি জৈমিনীর "গীতিষু সামাখ্যা" সংজ্ঞা হইতে মনে হইতেছে দৃষ্টমন্ত্রক সেই পুণ্যশ্লোক ঋষিবর্গের উদ্গীত সরলপ্রাণের অভিব্যক্তিনিচয়ই উত্তরকালের বেদবিভাগ সময়ে সামবেদ নামে পরিচিত হইয়াছে; এবং সুসংবদ্ধ পদ্যভাগ ঋক্ আর গদ্যময়ভাগ যজুঃ আখ্যায় অভিহিত। পুরুষসূক্তে তাই স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে—

"তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জাজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জাজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাৎ অজায়ত॥"

মীমাংসাকারও বলেন "শেষে যজুঃ শব্দ" অর্থাৎ যজু বা গদ্যভাগ সর্ব্বশেষে রচিত হইয়াছিল। আর এই ত্রিবিধ রচনাবিশিষ্ট বলিয়াই বেদের এক নাম 'ত্রয়ী'; যথা—"ত্রয়ীবৈ বিদ্যা ঋচো যজুংষি (২) সামানি" (শতপথ ব্রাহ্মণ)।

পরন্তু লিখন-ব্যবস্থার অভাবে ঐ সকল মন্ত্রভাগ তৎকালে অপৌরুষেয় ভাবে গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল; তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি। পরবর্ত্তীকালে সেই মন্ত্র সকলের অর্থ ও বিনিয়োগাদির অভিধায়ক ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সকল প্রণীত হইয়াছিল। তখন বোধ হয় লিখিত আকারে প্রচার আরম্ভ হইয়াছে—উভয়ের ভাষাগত বৈষম্য ও কম কৌতূহলোদ্দীপক নহে! তাহা হইলেও এই মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ—উভয়ের (৩) মিলিত নামই বেদ। উত্তরকালে তাহাও দুর্ব্বোধ হওয়ায় ক্রমে উপনিষদ, সূত্র, ষড়ঙ্গ, পুরাণ প্রভৃতি বেদ-ব্যাখ্যা সকল প্রণীত হইয়াছে। (৪) সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের অনেকেই উক্ত বেদ ও বেদব্যাখ্যাসমূহের ভাষাগত পার্থক্য বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। এমন কি উভয় শ্রেণীর ভাষাকে একভাষা বলিতেও সাহস হয় না; উপরন্তু বেদের অভিধান (নিঘণ্ট) এবং ব্যাকরণ (মাহেশ) পৃথগ্‌ভাবে সঙ্কলিত হইয়া সংস্কৃতভাষা হইয়া বৈদিকভাষার স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

এক্ষণে বিচার প্রয়োজন যে, সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি কোথায়? কেহ কেহ বোধ হয় আমার প্রাগুক্ত মন্তব্য-নিচয় হইতে আমি সংস্কৃতকে বেদাতিরিক্ত ভাষা স্বরূপেই প্রমাণিত করিতে যাইতেছি বলিয়া মনে করিতেছেন। বস্তুতঃ তদ্বিধ বিচারে অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে আমি প্রাকৃতিক প্রমাণপুঞ্জের প্রতি পাঠকবর্গের উদারদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সর্ব্বাদৌ, সকলে ইহা সম্ভবপর বা প্রাকৃতিক ধর্ম্মসম্মত কি না ভাবিয়া দেখুন যে, আর্য্যগত সেই আদিম আর্য্যসম্প্রদায় তাঁহাদের পূর্ব্বনিবাস হইতে যে মুষ্টিমেয় শব্দসম্পদ লইয়া এদেশে আগমন করিয়াছিলেন, সেই বীজ হইতেই অঙ্কুরোদ্গত হইয়া বিরাট শব্দকল্পদ্রুম সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া শাখাপল্লব বিস্তৃত করিয়া আছে। সহজ মীমাংসার্থ ইহা মানিয়া লইলে, আমরা কি সংস্কৃতভাষায় বৈদিক তাবৎ শব্দই অবিকৃত ভাবে পাইতাম না? তজ্জন্য স্বতন্ত্র শব্দকোষেরই বা প্রয়োজন কি ছিল? তা' ছাড়া, সংস্কৃতভাষা যখন বৈদিক ব্যাকরণের প্রভাবকেও ছাড়াইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ঠিক বৈদিকভাষা হইতেই সংস্কৃতের উৎপত্তি বলিলে সম্ভবতঃ সত্যের অপলাপ করা হয়।

ইতিহাস আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছে যে, বিজেতৃজাতি যেখানেই বিজিত দেশকে আপনার করিয়া লইয়া তথায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহারা বিজিতদিগের ভাষাকেও অল্পবিস্তর পরিমাণে, কোন কোন স্থানে বা প্রায় সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের মালদহ অধিবেশনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত যদুনাথ

(১) বুদ্ধদেব শিষ্যবর্গকে তদীয় উপদেশবাণী তদানীন্তন লেখ্যভাষা সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিয়া লিপিবদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

(২) যজ্ঞাদি প্রক্রিয়ার প্রথম প্রকাশক অঙ্গিরসঃ গোত্রীয় অথর্ব্ব নামক ঋষি যজ্ঞের হোতা, অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতার ব্যবহার্য্য মন্ত্রাংশ পৃথগীকৃত করিয়া অপর ঋত্বিক ব্রহ্মার নিমিত্ত বেদের অবশিষ্ট মন্ত্রসমুদায় একত্র নিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহা পরবর্ত্তীকালে অথর্ব্ব সংহিতা বা "আথর্ব্বাঙ্গিরসী শ্রুতিঃ" (মনুসংহিতা) নামে আখ্যাত।

(৩) এতদ্ভিন্ন অরণ্যে অধীতব্য অর্থাৎ উপাসনার মাত্র প্রয়োজনীয় আরণ্যক নামে বেদের আরও একটী ভাগ আছে, তাহা মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগের বিশেষ বিশেষ অংশযোগে গঠিত।

(৪) অনন্তর তৎসমস্ত বেদব্যাখ্যা সমুদায়ও ক্রমে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ায় যাস্ক সায়ণ, মহীধর, দয়ানন্দ, রমানাথ এবং বাঙ্গালার রমেশচন্দ্র প্রভৃতি মনীষিগণ বিভিন্ন টীকা প্রণয়নে বেদপাঠ আধুনিকযুগে সম্ভবপর করিয়া গিয়াছেন।

সরকার মহোদয় কথাটা অতি বিস্তৃত আলোচনায় বুঝাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গের অনতিপূর্ব্ব বিজেতা মুসলমানবর্গের আধুনিক মাতৃভাষা যে বাঙ্গালাই (৫) কেবল তাহা লক্ষ্য করিলেই যথেষ্ট. হইবে। এক্ষেত্রে ইংরাজদিগের কথা উঠিতেই পারে না; কেন না তাঁহারা কদাপি এতদ্দেশে ভারতীয় স্বরূপে বসবাস করেন না, কায়মনোপ্রাণে এদেশের প্রবাসী মাত্র। বিশেষতঃ Home কথায় বিলাত বুঝাইয়া তাঁহাদিগের প্রবাসিত্ব চিরজাগরূক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথাপি যে তাঁহাদিগের ভাষায় ২।৪টা এতদ্দেশীয় শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহা কতকটা তুল্যার্থক শব্দের অভাব বশতঃও বটে, কিন্তু অধিকাংশই এতদ্দেশপ্রবাসীদিগের পক্ষে পার্শ্বচরগণের সহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থ গৃহীত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডাক্তার হর্ণলি বিজেতা নর্ম্ম্যাণগণ ইংলণ্ডে, আরব ও তুর্কীরা আর্য্যাবর্ত্তে এবং ফরাসীরা গলে বিজিতদিগের ভাষাগ্রহণের তথ্য স্বীকার করিয়াও নিজেদের কথা স্মরণ করিয়া আর্য্যগণের পক্ষে বিজিত অনার্য্যদিগের ভাষাগ্রহণের কথা বিশ্বাস করেন নাই। পক্ষান্তরে ডাক্তার কল্ডওয়েল যে আর্য্যগণের আর্য্যাবর্ত্ত জয়ের সঙ্গে সঙ্গে অনার্য্যভাষা সমুদায় সংস্কৃত শব্দৈশ্বর্য্য দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাও মানিয়া লইতে সম্মত নহি। আমরা দেখাইব যে আর্য্যগণের সেই পূর্ব্বাগত শাখা এতদ্দেশ অধিকার করিয়াই অনার্য্যসমাজকে নির্ব্বাসিত করেন নাই। আদিম অধিবাসীদের মুষ্টিমেয় সংখ্যক ভয়ে বা স্বাধীনতারক্ষার্থ বনে জঙ্গলে পলাইয়া গেলেও, তাহাদের অধিকাংশকেই তাঁহারা ক্ষমা ও প্রেমের বন্ধনে বশীভূত করিয়াছিলেন। এবং তাহাদের মনোরঞ্জনার্থ তথা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাহাদিগের ভাষাও বহু পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে কয়েক পুরুষের মধ্যে মূল বেদ-কথা শ্রুতি-পরম্পরায় চলিয়া আসিলেও তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার আবর্ত্তে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব খিচুড়ি বনিয়া যায়।

এখানে 'প্রাকৃত' কথার অর্থোপলব্ধি সর্ব্বাদৌ আবশ্যক বোধ হইতেছে। প্রসিদ্ধ আভিধানিক পণ্ডিত হেমচন্দ্র প্রাকৃত কথায়—প্রকৃতিঃ সংস্কৃতম্, তত্র ভবং তত আগতং বা প্রাকৃতং সংস্কৃত মূলকমিত্যর্থঃ" রূপ যে অর্থনির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও আমাদের কদাচ সঙ্গত মনে হইতেছে না। কেন না তাহা হইলে দেশের আসাধারণ সকলেই সংস্কৃতাভিজ্ঞ বলিয়া প্রথমেই মানিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ যদি সংস্কৃত ভাষাই মূল হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংস্কৃত সংজ্ঞায় অভিহিত করাই ঠিক হয় নাই। 'সংস্কৃত', শব্দটা নিজেই, তাহা যে বিশুদ্ধীকৃত (Refined) অর্থাৎ আদত (Raw) নহে, তাহাই প্রকাশ করিতেছে। ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"ইত্যুক্ত্বাসীদ্ধরী তূষ্ণীং ভগবানাত্ম মায়য়া
পিত্রোসংপশ্যতোঃ সদ্যো বভূব প্রাকৃত শিশুঃ"।

অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানমতে যেভাবে আদিম মানব-সমাজের কথাবার্ত্তার শব্দ-সমূহ সৃষ্ট হইয়াছিল, ভাগবতের মতে প্রাকৃত ভাষাও ঠিক সেইভাবে সৃষ্ট। তাই আমরা প্রাকৃত কথাটাকে প্রকৃতিপুঞ্জের সাধারণ (Common) ভাষা বলিয়াই নির্দ্দেশ করিতেছি। সংস্কৃত নাটক-কারেরা অশিক্ষিত জনসাধারণের কথা প্রাকৃত এবং শিক্ষিতগণের কথা সংস্কৃত ভাষায় সঙ্কলিত করিয়া ঠিকই করিয়াছেন; তাহাতে আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ সহজ হইয়া পড়িয়াছে। এস্থলে ইহাও বলা বাহুল্য যে "যোজনান্তর ভাসা" বলিয়া এই ভারতবর্ষেই আর্য্যগণের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে বহু সংখ্যক প্রাকৃতভাষার ব্যবহার ছিল, বর্ত্তমানেও ৪৭টার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা আবার বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত ছিল, যথা—বাঙ্গালা, উড়িয়া, মাগধী, পাঞ্জাবী ইত্যাদি। শাস্ত্রকারেরা এই ভাষান্তর হইতেই দেশান্তর গণনার বিধান করিয়াছেন। "উদ্বাহতত্ত্বধৃত বৃহন্মনুবচনে" আছে—"বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে………তদ্দেশান্তরমুচ্যতে।" আবার বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি কতকগুলি প্রাকৃতের গঠনপ্রণালীতে সৌসাদৃশ্য থাকায় তৎসমুদায়কে এক 'গৌড়ীয়' কথায় পরিচিত করা হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপকভাবে গৌড়ীয় পদবী লাভ করিলেও তাহাদের প্রাকৃত খ্যাতি অদ্যাপি ঘুচে নাই। "কাব্যাদর্শে" শ্রীমৎ দণ্ডাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

শৌরসেনী চ গৌড়ী চ লাটী চান্যা চ তাদৃশী।
যান্তি প্রাকৃত মিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিম॥"

এতদ্ভিন্ন প্রাকৃতই যে মূলভাষা, আমরা পালিভাষার ইতিবৃত্ত হইতে "সা মাগধী মূলভাসা" কথায় প্রথমেই তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমগ্র ভারতের মূল প্রাকৃত ভাষা সংখ্যাতীত হইলেও কালক্রমে যাতায়াতের সুব্যবস্থা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন পরস্পরের মধ্যে আচার-ব্যবহার বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, এবং বাণিজ্য ব্যবসা ও রাজনৈতিক সাধারণ স্বার্থে যখন পরস্পর পরস্পরের ভাষার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে বাধ্য হইতেছিল—তখন হইতেই প্রাকৃতভাষা সমূহের সাধারণ বিভিন্নতা লোপ পাইয়া আসিতেছে, এবং সাধারণ বিভিন্ন প্রাকৃতসমূহ একই সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ দেখা যায়, চট্টগ্রাম শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ রাজসাহী-মালদহ-বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরের প্রাকৃত কথা নিচয়ে যথেষ্ট ব্যবধান বিদ্যমান থাকিলেও কোন্ পূর্ব্বকাল হইতে সমুদায়ই এক বাঙ্গালা আখ্যায় পরিচিত হইতেছে।

সে যাহা হউক, আর্য্যগণের মধ্যে ভাষা লিখিয়া প্রকাশের উপায় উদ্ভাবিত হইলে, তখন তাঁহারা কেবল বেদের মন্ত্রভাগ লিপিবদ্ধ করিয়া নিরস্ত হইলেন না, তাঁহাদের বিভিন্ন শাখা যে যে দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া তদ্দেশীয় প্রাকৃত ভাষায় মিশিয়া গিয়াছিলেন—সেই সকল জাতি-বর্গের বোধযোগ্য এক সাধারণ ভাষা গঠনপূর্ব্বক, তাহাতে উক্ত বেদ ব্যাখ্যাদি প্রচারে মনোযোগী হইলেন। তখন তাঁহাদের (বিশেষভাবে

(৫) সার আবদর রহিম যদিও এ সম্বন্ধে বিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে তাঁহার নিজসম্প্রদায় হইতেও যেরূপ প্রতিবাদ হইয়াছে, সম্প্রতি তদতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন বোধ হইতেছে না। তা'ছাড়া তদীয় মতানুসারে উর্দ্দুকেই তাঁহাদের বর্ত্তমান মাতৃভাষা বলিয়া মানিয়া লইলে, তাহাও যে ভারতীয় ভাষার যোগে উৎপন্ন, তৎসম্বন্ধে মতভেদ নাই।

আর্য্যাবর্ত্তবর্ত্তী (৬) সেই সমুদায় দেশের প্রাকৃত ও আর্য্যভাষা যোগে উৎপন্ন খিচুড়ী ভাষার শব্দগুলিকে বিশোধন করিয়া লওয়া ছাড়া উপায়ান্তরও ছিল না। আমাদের মতে ইহাই সংস্কৃত ভাষার সংক্ষিপ্ত জন্ম-বিবরণ। সংস্কৃত অবশ্য তখনও শব্দসম্ভারে ধনী হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালেই ব্যাকরণকারগণের কৃপায় ইহার শব্দ-সম্পদ অপরিমেয়-প্রায়! অমর টীকাকার শ্রীমন্ ভরত সংস্কৃত কথার অর্থ নির্দ্দেশে বলেন, "পাণিন্যাদি কৃত ব্যাকরণ সূত্রেণ উপেত উপগতো লক্ষণোপেতঃ সাধু শব্দঃ"। ইহা হইতেও সংস্কৃত যে মূলভাষা নহে, সহজে উপলব্ধি করা যাইতেছে। তা'ছাড়া ইহার ছন্দ ও অলঙ্কারাদিও যে পরে পরে আসিয়া জুটিয়াছে, তাহাও আপনাদের অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

এতাবৎকাল যে সংস্কৃত প্রাকৃতের অবিসংবাদী জননী বলিয়া সর্ব্ববাদী-স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল, এখন তাহাকে একরূপ প্রাকৃতেরই সভ্যমূর্ত্তি বলিয়া ঘোষণায় আমি যে অনেকেরই বিদ্রূপভাজন হইতেছি, সন্দেহ নাই। এক্ষেত্রে তাঁহারা আমার জন্য বাতুলাগারের ব্যবস্থা না করিলে, ভবিষ্যতে অধিকতর প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে মদীয় উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদনে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি। পক্ষান্তরে আমি কদাচ পুর্ব্বসূরী বা তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ অগ্রসর হই নাই; বরং পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিতেছি যে, যে লক্ষ্যহীন অন্ধকারে এবং যে সঙ্কীর্ণ উপাদান-যোগে তাঁহারা তাদৃশ সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহারা সমাজের যথেষ্ট কৃতজ্ঞতাভাজন। সরল কথায় বলিতে গেলে, আমি তাঁহাদিগেরই সত্যালোক অবলম্বনে এই মহত্তর সত্যের সন্ধান পাইয়াছি।

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের সম্বন্ধের ন্যায় প্রাকৃত ও বঙ্গভাষার মধ্যেও তাদৃশ ভ্রমাত্মক ধারণা প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এবং প্রধানতঃ তাহাই সপ্রমাণের নিমিত্ত আমাদিগকে এই পর্য্যন্ত অনেক অতিরিক্ত কথা, বাঙ্গালাদেশের ব্যবস্থায় 'ধান ভানিতে শিবের গীত' গাইতে হইয়াছে। বস্তুতঃ এতদ্দেশে লিখন-ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়া অবধি সকলকার বোধ সৌকর্য্যার্থ গঠিত একমাত্র সংস্কৃত ভাষাই লেখ্যাধিকার পাইয়াছিল, অর্থাৎ যিনি যে ভাষাতেই কথা বলুন না কেন, তাঁহাকেই যা' কিছু লিখিয়া প্রকাশ করিতে হইলে সংস্কৃতে ভাষান্তরিত করিয়া লিখিতে হইত। এক কথায়, তদানীন্তন ভারতের লেখ্য ভাষা বলিতেই সংস্কৃত এবং প্রাকৃতভাষা নামেই কথ্যভাষা সমুদায়কে বুঝান হইত। এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হইয়া গেলেও কেহই ঋষি-ব্যবস্থার অন্যথাচরণ করিতে সাহস পায় নাই। অবশেষে আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর গত হইতে চলিল ভগবান্ বুদ্ধদেবের নব-প্রচারিত ধর্ম্মের দুন্দুভি-নির্ঘোষে যখন সহস্র সহস্র মুমুক্ষু আসিয়া তদীয় শ্রীপদপ্রান্তে সমবেত হইতেছিল, তিনি তাহাদিগের সহজবোধ্য মগধীয় প্রাকৃতভাষায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। এবং পরবর্ত্তী কালেও যাহাতে তদীয় মহার্ঘ উপদেশমালা সাধারণের দুর্ব্বোধ হইয়া না পড়ে, তজ্জন্য তিনি প্রধান শিষ্যনিচয়কে তৎসমুদায় গাথা সংস্কৃতে কদাপি ভাষান্তরিত না করিয়া প্রাকৃত আকারেই লিপিবদ্ধ করিবার নিমিত্ত বিশেষভাবে আদেশ দিয়া যান। তাই প্রধান বৌদ্ধগ্রন্থ ত্রিপিটক অবিকৃত মাগধী ভাষাতেই সঙ্কলিত। অনন্তর বৌদ্ধ সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান পালিভাষা বহু পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিলেও ত্রিপিটকের ভাষা তেমনই অবিকৃত রহিয়াছে।

প্রাকৃতের এই যে একটী ধারা বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিল, তাহা ত ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করিলই, উপরন্তু তাহার দেখাদেখি প্রায় সমশক্তিশালী অপরাপর প্রাকৃত ভাষাগুলিও লেখ্যাধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নপর হইল। অবশ্য তাহাদের সকলেই যে একসঙ্গে লেখ্য সম্মান লাভ করিতে পারে নাই, সামান্য চিন্তা করিলেও তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। সেই তথ্যানুসন্ধান বর্ত্তমান আলোচনার লক্ষ্য নহে। তবে সেই সুযোগে বঙ্গভাষা যে পার্শ্ববর্ত্তিনী অপরাপর প্রাকৃতভাষার পুর্ব্বেই আপনার যোগ্যস্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ নাই। ঠিক কোন্ সময়ে যে বাঙ্গালার ভাগ্যে এহেন সুবর্ণ সুযোগ ঘটিয়াছিল, আমরা সেই তারিখ নির্ণয়ের বৃথা চেষ্টা করিব না। স্থূলতঃ আমরা যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি, তাহাতে বলিতে পারি ইহা খ্রীষ্ট জন্মের পুর্ব্বে ত বটেই, বুদ্ধদেবের লীলাবসানেরও দু'এক শতকের মধ্যে বলিয়াই অনুমিত হয়; আমাদের মতে মৌর্য্য বংশাবতংস মহারাজ অশোকেরও পুর্ব্বে বঙ্গভাষা লেখায় প্রকটিত হইয়াছিল। কেহ যেন আমি ইহাকে বঙ্গভাষার উৎপত্তি সময়রূপে নির্দ্দেশ করিতেছি বলিয়া ভ্রম না করেন; কেন না আমরা বঙ্গদেশে মনুষ্য বসবাসের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার উৎপত্তি ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করি। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার সহিত সেই ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য থাকিতে পারে ও রহিয়াছে সত্য; কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে তাহাই মূল বঙ্গভাষা; সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহারই নানারূপ গড়াপেটা হইয়া বর্ত্তমানে উভয়ের মধ্যে হয়ত কোন সাদৃশ্যই পাওয়া যাইতেছে না।

এখন কথা হইতেছে, আদিম বঙ্গবাসীদিগের খাস কথা সমুদায় অর্থাৎ বঙ্গীয় প্রাকৃত শব্দসম্পদ অধুনা বাছিয়া লইতে পারা যায় কি না। যদি তাহা সম্ভবপর হয়, তবে বঙ্গভাষায় প্রকৃত ইতিহাস তখনই আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে। আমরা প্রথমেই বলিয়া আসিয়াছি—পোষাকী ভাষা হইতে মূল ভাষার খোঁজ কিছুতেই মিলিতে পারে না। মালী যখন তোড়া বাঁধিতে যায়, কদাচিৎ হয়ত কোন ফুলকে অবিকৃত রাখে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই কোন ফুলের অফুটন্ত ভাগের সহিত অপর কোন ফুলের বাহিরের পাপড়িগুলি যোগে তাহার কার্য্য শেষ করে; ফুলগুলির যাথার্থ্য রক্ষিত হইতেছে কি না সেইদিকে তাহার খেয়ালও থাকে না। তাহার লক্ষ্য কেবল দর্শকের চিত্তপ্রসাদন। যে মালী যত অধিক পরিমাণে দর্শক-চিত্তপ্রসাদনী বিদ্যার পটুতা লাভ করিয়াছে—মালী সমাজে সে-ই তত অধিক পরিমাণে প্রশংসিত। সেইরূপ ভাষাগঠন-কার্য্যেও যাঁহারা

(৬) দাক্ষিণাত্যের প্রধান ভাষা দ্রাবিড় ভাষার সহিত সংস্কৃতের কোন সম্বন্ধই নাই বলিয়া কল্ডওয়েল প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃঢ় ধারণা। আমরা অতঃপর তাঁহাদের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদনের চেষ্টা করিব। তবে আমরাও স্বীকার করি যে, সেই সংস্রব তত অধিক নহে।

অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর পরিমাণে উক্ত মার্গীয় পথ অবলম্বন করিয়াছেন। অবলম্বিত ভাষার শব্দটীকে পোষাকীস্বরূপে গ্রহণের পূর্ব্বে পড়িয়া পিটিয়া ত রূপান্তরিত করিয়াছেনই; অধিকাংশ স্থলে হয়ত মূল শব্দগুলিকে দূর হইতেই বিদায় দিয়া তৎস্থলে আপনাদের মনোমত অন্য ভাষার শব্দগ্রহণেও শ্লাঘা বোধ করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা কায়মনোপ্রাণে বাঙ্গালী, আমার মনে হয়, বঙ্গভাষার এত বিজয়-ডঙ্কানুমোদিত অভ্যুন্নতিতেও তাঁহারা মায়ের গায়ে এত 'স্যামিজ' 'বডি'র আবির্ভাবে আঘাত না পাইয়া থাকিতে পারেন না। তবে করা যায় কি? মায়ের গায়ে অপর কেহ হাত দিতে আসিলে না হয় বাধা দেওয়ার কথা ছিল, এ যে লব্ধপাণ্ডিত্য সহোদরেরাই মাতৃ-অঙ্গসজ্জার ভার গ্রহণ করিয়া এরূপ বিকৃত রুচির পরিচয় দিতেছেন; অথচ তাঁহারা একটু কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক মায়ের তোরঙ্গ পেটারাগুলি এখনও ভালরূপে খুঁজিয়া দেখিলেই আমাদের মাতৃদেবীর সেকেলে পোষাকের সন্ধান পাইতেন। (৭)

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

(দৃশ্যকাব্য ও ধর্ম্মানুষ্ঠান)

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

(১)

বৈদিক যুগের বিবরণ :—

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি কোথায় কিরূপে হইল, তাহার মীমাংসা করিতে গিয়া প্রত্নতত্ত্ববিশারদ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ প্রায় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছেন। নিত্য নূতন মতবাদের সৃষ্টি হইতেছে, আবার পরক্ষণেই তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া দূরে পরিহৃত হইতেছে। মীমাংসা যে কতদিনে হইবে—আসলেই হইবে কি না, তাহা এক ভগবানই বলিতে পারেন।

নাট্যসাহিত্যের এবং অভিনয়ের আলোচনা যে এখন্ এ দেশে খুবই প্রসার লাভ করিয়াছে, তাহা দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। কিন্তু নাট্যশাস্ত্রের ইতিহাস লইয়া নীরস আলোচনা করাটা অনেকেই পণ্ডশ্রম মনে করেন—বিশেষতঃ এ যখন সেই পুরাতন মান্ধাতার আমলের কথা। সাহিত্যকে পুরামাত্রায় জানিতে হইলে তাহার ইতিহাসকে একেবারে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। তাই এ পর্য্যন্ত এদিকে যে সকল প্রধান প্রধান তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহাদের একটা মোটামুটি আলোচনা করা যাইতেছে।

[প্রবন্ধটিকে সাধারণ পাঠক যাহাতে নীরস বলিয়া মনে না করেন, সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই গাহিয়া রাখিতেছি যে, ইহা একটি মধুচক্রবিশেষ। পাঁচ ফুল হইতে বেমালুম পরের অজ্ঞাতে মধু সংগ্রহ করিয়া ইহার রচনা। যেখানে স্বীকার না করিলে ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা, সেইখানেই পাদটীকা প্রদত্ত হইবে। তাহা ছাড়া অবশিষ্ট সবটুকু মৌলিক—পরস্ব হইলেও নিজস্বীকৃত। তবে, গবেষকগণ এদিকে সানুগ্রহ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ইহা ভীমরুলচক্রের আকারও ধারণ করিতে পারে।]

এ প্রবন্ধে আমরা সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়াই আলোচনা করিব।

এ দেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ শুধু নাট্য-সাহিত্যের চুলচেরা ভাগ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না; দৃশ্য কাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস লইয়া আলোচনা করিতেও তাঁহারা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ধারা পরের যুগে বজায় থাকে নাই। বোধ হয়, এ বিষয়ে ভরতের নাট্যশাস্ত্রই প্রথম পথ-প্রদর্শক; অন্ততঃ অধুনা উপলভ্যমান গ্রন্থরাজির মধ্যে উহাতেই এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রয়োগতত্ত্বালোচক অন্যান্য গ্রন্থগুলিতে এ বিষয়ের আর বিশেষ কোন উচ্চ-বাচ্য দেখা যায় না। অতএব, নাট্যশাস্ত্র রচনার পরেই যে এ আলোচনা লোপ পাইয়াছিল, তাহা বেশ সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। "লোপের পর আর সন্ধি হয় না"—এই বিধিবাক্যের অন্ধ অনুবর্ত্তী নব্য আলঙ্কারিকগণও "কাকদন্তগণনা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন" ভাবিয়া আর এ আলোচনা পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইলেন না! এইরূপে ক্রমশঃ দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির ইতিহাস নিবিড় তিমিরে আবৃত হইল। যাহাই হউক, নাট্যশাস্ত্রে রূপকোৎপত্তির যে রূপকমিশ্রিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। উহার কতকটা রূপকথার ছায়াবিমিশ্রিত—কতকটা বা রূপকপ্রধান; তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট এ বিবরণের কোন মূল্য নাই।

নাট্যশাস্ত্রের বিবরণ

পূর্ব্বকালে ইন্দ্রাদি দেবগণ শূদ্রকে বেদপাঠে অনধিকারী দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া সার্ব্ববর্ণিক পঞ্চম বেদ সৃষ্টির জন্য পিতামহকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে ভগবান্ পদ্মযোনি চতুর্ব্বেদের সারসংগ্রহ-পূর্ব্বক নাট্যাখ্য পঞ্চম বেদ রচনা করেন। ঋগ্বেদ হইতে পাঠ্য, সামবেদ হইতে গীত, যজুর্ব্বেদ হইতে অভিনয় ও অথর্ব্ববেদ হইতে রস গৃহীত

---

(৭) প্রবন্ধলেখক এতদুদ্দেশ্যে আজ দশ বৎসরেরও অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা-ভাষাভাষী স্থান মাত্রেরই প্রাদেশিক শব্দসম্পদ-যোগে এক বিরাট কোষগ্রন্থ সঙ্কলনের চেষ্টায় আছেন। এ পর্য্যন্ত বহু শব্দ সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও বিষয়ের গুরুতায় তাহা যথেষ্ট নহে বোধে, তিনি সম্প্রতি দ্বিসহস্রাধিক সাধারণ ব্যবহার্য্য কথার তালিকা মুদ্রিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষাভাষী তাবৎ স্থানেরই প্রতিশব্দ (synonyms) সংগ্রহে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। মাতৃভাষার হিতকামী যে-কেহই ঘণ্টা দুই সময় ব্যয় করিলেই উক্ত তালিকাখানিতে স্বদেশীয় প্রতিশব্দ যোগ করিয়া দিতে পারেন। এবংবিধ সাহায্যকারী মাত্রেরই নাম উক্ত কোষগ্রন্থে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হইবে। রাঙ্গামাটী (চট্টগ্রাম) ঠিকানায় লেখককে সাহায্য প্রদানের অভিপ্রায় জানাইলেই তিনি উক্ত শব্দতালিকা পাঠাইতে প্রস্তুত।

হইয়াছিল। অতঃপর মুনিশ্রেষ্ঠ ভরতকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রধ্বজ-মহোৎসবে উহা প্রয়োগ করিতে আদেশ দেন। প্রয়োগে দৈত্যগণের পরাভব ও দেবগণের বিজয় প্রদর্শিত হইতেছিল; তাহাতে দৈত্যগণ ক্ষুব্ধ হইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিতে থাকে। এতদ্দর্শনে ইন্দ্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ধ্বজ গ্রহণপূর্ব্বক প্রহারে দৈত্যগণকে জর্জ্জর করেন, এবং তাহার পর হইতে ইন্দ্রধ্বজ মহোৎসবের নাম হয়—"জর্জ্জরোৎসব"। এই সময় দৈত্যগণের মুখপাত্র বিরূপাক্ষ ব্রহ্মার নিকট অনুযোগ করেন যে, তাঁহার পঞ্চম বেদই অসুরবংশোচ্ছেদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পিতামহ তাহাতে উত্তর দেন, "বাপু হে, ইহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই। বাস্তবিক তোমাদের পরিভবের নিমিত্তই আমি উহার সৃষ্টি করি নাই। সমস্ত জগতের ইহা ভাবানুকীর্ত্তনস্বরূপ। অতএব, অনর্থক দুঃখ করিয়া ফল কি?" ইত্যাদি—(১)

এই সময় যে দুইখানি রূপক দেবলোকে ভরতের কর্ত্তৃত্বে অভিনীত হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথাক্রমে "সমুদ্রমথন" সমবকার ও "ত্রিপুরদাহ" ডিম (২)।

ইহা ত' গেল দেবলোকের কথা। এইবার—মনুষ্যলোকে কিরূপে উহার প্রচার ও ক্রমশঃ প্রসার হইল, তাহা নাট্যশাস্ত্রের ৩৬ ও ৩৭ সংখ্যক অধ্যায়ে বিবৃতভাবে বর্ণিত আছে। শতসংখ্যক ভরতপুত্র তপঃপরায়ণ ঋষিবরগণকে ব্যঙ্গ করায় ঋষিশাপে তাঁহারা পতিত ও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হ'ন। [তদবধি তাঁহাদের অভিশপ্ত বংশধরগণই নট ও নর্ত্তক নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন, এবং তদবধি তাঁহাদের বৃত্তি সমাজে ঘৃণ্য ও নিন্দিত বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। নতুবা পূর্ব্বে তাঁহাদের প্রতিপত্তি শিষ্ট সমাজে যথেষ্টই ছিল।] ইহার কিছুদিন পরে নহুষ নামক জনৈক প্রখ্যাত চন্দ্রবংশীয় নৃপতি (যিনি ইন্দ্রের অভিশপ্ত অবস্থায় দেবরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন) প্রথম পৃথিবীতে রূপকাভিনয় সম্পন্ন করান; তদুপলক্ষে শতসংখ্যক অভিশপ্ত ভরতপুত্র মহর্ষি ভরতের আদেশ-বশে মর্ত্তে আসিয়া মর্ত্ত্যরমণীগণসহ (অপ্সরাগণের পরিবর্ত্তে) নাট্যপ্রয়োগ করেন। এই সকল রমণীর গর্ভে তাঁহাদিগের ঔরসে যে সকল পুত্রাদি উৎপন্ন হ'ন তাঁহারাই বংশানুক্রমে নটের কার্য্য করিতেন। আর মর্ত্ত্য স্ত্রী-সম্ভোগে ভরতপুত্রগণও শাপমুক্ত হ'ন। ইহাই নাট্য-শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস। একেবারে পুরা উপকথা বলিয়া ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কয়েকটি বিষয় ইহাতে লক্ষ্য করিবার আছে—

১। নাট্য বেদান্তর্ভুক্ত—বেদ-বিরুদ্ধ বা বেদ-বহির্ভূত নহে;

২। নাট্য প্রয়োগকালে স্ত্রী ও পুরুষ—এই উভয়েরই প্রয়োজন হইত;

৩। নটগণ সমাজের অতি হীনস্তরে অবস্থিত ছিল; তাহাদের বৃত্তি অতিশয় ঘৃণ্য ছিল; সাধারণতঃ উহাদিগকে "পুংশ্চলীপোপজীবী" বলা হইত;

৪। প্রথম দৃশ্যকাব্যের অভিনয় কোনও ধর্ম্মোৎসবে প্রদর্শিত হইয়াছিল; সুতরাং দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তির সহিত ধর্ম্মের বিশেষ সম্বন্ধ;

৫। নাট্যশাস্ত্রের জন্মভূমি দেবলোক।

নাট্যশাস্ত্রের মধ্যেই আমরা প্রথম দশবিধ রূপক ও অষ্টাদশবিধ উপরূপকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেখিতে পাই। অতএব, বর্ত্তমান আকারে প্রচলিত ভরতের নাট্যশাস্ত্র সঙ্কলিত হইবার বহুপূর্ব্বেই যে প্রাচীন ভারতে নাট্যসাহিত্য বেশ প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়। "ঘটনা যেমন ইতিহাসের জননী, ভাষা যেমন ব্যাকরণের ভিত্তি, নাটকও তেমনি নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী" (৩)। নাট্য শাস্ত্র রচনার কাল লইয়া পণ্ডিত সমাজে মতদ্বৈধ আছে। তবে সাধারণতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় হইতে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের মধ্যে কোন সময় উহার রচনাকাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (৪)। Keith প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ইহার রচনাকাল

---

(১) "মহেন্দ্র প্রমুখৈর্দেবৈরুক্তঃ কিল পিতামহঃ।
* * * *
নবা-(ন চ?)-বেদবিহারোঽয়ং সংশ্রাব্যঃ শূদ্রজাতিষু।
তস্মাৎ সৃজাপরং বেদং পঞ্চমং সার্ব্ববর্ণিকম্॥ ১২॥
* * * *
নাট্যবেদং ততশ্চক্রে চতুর্ব্বেদাঙ্গ সম্ভবম্॥ ১৬॥
জগ্রাহ পাঠ্যমৃগ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ।
যজুর্ব্বেদাদভিনয়ান্ রসানাথর্ব্বণাদপি॥ ১৭
* * * *
* * প্রত্যুবাচ পিতামহঃ।
অয়ং ধ্বজমহঃ শ্রীমান্মহেন্দ্রস্য প্রবর্ত্ততে।
অত্রেদানীময়ং বেদো নাট্যসংজ্ঞঃ প্রযুজ্যতাম্॥ ২১॥
* * * *
এবং প্রয়োগে প্রারব্ধে দৈত্যদানবনাশনে।
অভবন্ ক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে দৈত্যা যে তত্র সঙ্গতাঃ॥ ৩০॥
* * * *
অথাপশ্যৎ সদো বিঘ্নৈঃ সমন্তাৎ পরিবারিতম্।
সহেতরৈঃ সূত্রধারং নষ্টসংজ্ঞং জড়ীকৃতম্॥ ৩৪॥
অথোত্থায় দ্রুতং ক্রোধাদ্দিব্যং জগ্রাহ স ধ্বজম্।
জর্জ্জরীকৃতদেহাংস্তানকরোজ্জর্জ্জরেণ সঃ॥ ৩৬॥
* * * *
যস্মাদনেন তে বিঘ্নাঃ সাসুরা জর্জ্জরীকৃতাঃ।
তস্মাজ্জর্জ্জর এ বেতি নামতোঽয়ং ভবিষ্যতি॥ ৩৯॥
* * * *
প্রত্যাদেশোঽয়মস্মাকং সুরার্থং ভবতা কৃতঃ॥ ৬১॥
* * * *
ভবতাং দেবতানাঞ্চ শুভাশুভবিকল্পকৈঃ।
কর্ম্মভাবান্বয়াপেক্ষী নাট্যবেদো ময়া কৃতঃ॥ ৭২॥
* * * *
ত্রৈলোক্যস্যাস্য সর্ব্বস্য নাট্যং ভাবানুকীর্ত্তনম্॥ ৭৩॥
—(নাট্যশাস্ত্র, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ, প্রথম অধ্যায়।)

(২) নাট্যশাস্ত্র, অধ্যায় ৪, শ্লোক ৩—৯ পৃঃ ২৪।

(৩) শকুন্তলার নাট্যকলা—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু—পৃঃ ১৩১।

(৪) Calcutta Review—May 1928, p. 189.

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ফেলিতে চা'ন (৫)। কেহ বা আবার ইহাকে অগ্নিপুরাণ হইতে গৃহীত বলিয়া মনে করেন (৬)। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে "প্রাচীন গ্রন্থ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (৭)। কিন্তু উহা কত প্রাচীন তাহার একটা ধরা-ছোঁয়া হিসাব দেন নাই। যাহাই হউক, ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত সংস্করণ যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন নহে, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। কালিদাস ও তৎপরবর্ত্তী কবিগণের নাট্যরচনা দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহারা সকলেই নাট্যশাস্ত্রের নিদেশ মানিয়া চলিয়াছেন; অতএব, নাট্যশাস্ত্রকে কালিদাসাদির পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যাইতে পারে। এদিকে আবার কালিদাসের আবির্ভাবকাল লইয়াও যথেষ্ট গোলমাল;—খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ সাত শত বৎসরের মধ্যে ঠিক কোন্ সময়ে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার স্থিরতা নাই। এজন্য এদিক দিয়া নাট্যশাস্ত্র রচনার কাল-নির্ণয় করিতে যাওয়া, আর অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপ—একই কথা। কেহ কেহ মহাকবি ভাসকেও বর্ত্তমান নাট্যশাস্ত্র অপেক্ষা অর্ব্বাচীন মনে করেন। তাহা হইলেও নিস্তার নাই। ভাসের সময় কেহ বলেন খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী, কেহ বা বলেন খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী। যে দিক্ দিয়াই ধরা যা'ক্ না কেন, নাট্যশাস্ত্রের সময় ৭০০ বৎসরের মধ্যে Oscillate করিতে থাকে। আর শুধুই "ভরতবাক্যম্" কথাটির উপর নির্ভর করিয়া ভাসকে নাট্যশাস্ত্র অপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলা শোভা পায় না; কারণ তাহা হইলে তিনি স্বীয় নাটকচক্র মধ্যে বধ, বন্ধন, নিদ্রা প্রভৃতি অঙ্কে নিষিদ্ধ বস্তুর পুনঃ পুনঃ অবতারণা করিয়া পদে পদে নাট্যশাস্ত্রোক্ত নিদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইতেন না। বলিতে পারেন—প্রতিভা কোনও বন্ধন স্বীকার করে না। কিন্তু তাহার উত্তরে আমরাও বলিতে পারি—

"শিল্প বা কলাবিদ্যা স্বাধীনহইলেও উচ্ছৃঙ্খল নহে। তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত, প্রকৃতি সংযত, সৌষ্ঠব এবং সামঞ্জস্য তাঁহার জীবন। অতি প্রাচীন যুগে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য এই সকল নিয়মে শৃঙ্খলিত হইয়াছিল। কিন্তু কবির গঠিত শৃঙ্খল নিগড় নয়—নুপুর।" (৮)

কালিদাসও শকুন্তলার প্রসাধন রঙ্গমঞ্চে দেখাইয়া নাট্যশাস্ত্রের নিদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন;—ভবভূতিও রঙ্গমঞ্চে শম্বুক বধের অবতারণা করিয়াছেন;—মৃচ্ছকটিকেও রাত্রির ঘটনা প্রদর্শন, বসন্তসেনার মোটন প্রভৃতি কার্য্যে নাট্যশাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। মৃচ্ছকটিকের সহিত ভাসের "চারুদত্তের" না হয় সম্পর্ক আছে, কিন্তু অপরগুলির সেরূপ কোন justification নাই। তবে সকলগুলির বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য আছে দেখা যায়; নাটকীয় প্রয়োজনেই নাট্যশাস্ত্রের নিদেশ লঙ্ঘন করা হইয়াছে। এই জন্য রসহানিও ঘটে নাই। কবি নাট্যশাস্ত্রের নিদেশ অনুসারে না চলিয়াও স্বীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভাসের পক্ষে ঠিক এ কথা বলা যায় না। কারণ, তাঁহার রচনা দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন নাট্যশাস্ত্রের সহিত পরিচিত নহেন; তাঁহার technique সম্পূর্ণ অন্য ধরণের;—অবশ্য তাহাতে তাঁহার গৌরবের বিন্দুমাত্র হানি সংঘটিত হয় নাই।

নাট্যশাস্ত্রে "পহ্লব", শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। দেখা যাউক, ইহার সাহায্যে উহার রচনা-কাল নিরূপিত হয় কি না? "পহ্লব" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নাট্যশাস্ত্রকার খুব সম্ভব Parthian গণকে লক্ষ্য করিয়াছেন—ইহাই বৈদেশিক পণ্ডিতগণের অভিমত (৯)। আবার এই "পহ্লব" শব্দটি মনুসংহিতায় প্রযুক্ত "পহ্লব" শব্দের (১০) প্রাচীনতর রূপমাত্র। সুতরাং নাট্যশাস্ত্রের প্রচলিত সংস্করণ মনুসংহিতার প্রচলিত সংস্করণ অপেক্ষা প্রাচীন। Buhler সাহেবের মতে মনুসংহিতার প্রচলিত সংস্করণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর পরে সঙ্কলিত হয় নাই; পরন্তু তাহা অপেক্ষা আরও পুরাতন—এমন কি খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতেও উহার সঙ্কলন সম্ভব বলিয়া অনুমান করা যায়। নাট্যশাস্ত্রকে তাহা অপেক্ষাও প্রাচীন বলিতে হইলে, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর রচনা বলিতে হয়। যদি অতদূর স্বীকার না করা যায়, তবে নাট্যশাস্ত্রকে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফেলা বিশেষ অসঙ্গত হইবে না। অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতে রূপকাভিনয় বেশ পুরা মাত্রায় প্রচলিত ছিল।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহার পূর্ব্বেও ভারতে রূপক রচনা হইত কি না? বিশ বৎসর পূর্ব্বে এ প্রশ্ন উঠিলে খুব সহজেই তাহার উত্তর দেওয়া যাইত—"না"। কিন্তু আজ আর সে উত্তরে লোকের মন ভুলিতে চাহে না। তখন মৃচ্ছকটিক বা শকুন্তলাই ভারতের প্রাচীনতম দৃশ্য-কাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। অধুনা আরও কয়েকখানি প্রাচীনতর দৃশ্যকাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (১১)। অশ্বঘোষ ও ভাস ইহাদের রচয়িতা। ভাসের গ্রন্থগুলির সন্ধান প্রথম পাইয়াছিলেন দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য

(৫) Sanskrit Drama—Keith—

(৬) Weber, History of Indian Literature, p, 231.

(৭) শকুন্তলায় নাট্যকলা—ভূমিকা—অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিত।

(৮) শকুন্তলায় নাট্যকলা—পৃঃ ৭৮।

(৯) Pahlava Parthava Partthins—History of Indian Literature, Weber p. 187—8.

(১০) মনুসংহিতা—১০।৪৪।

(১১) (ক) ভাসের—স্বপ্নবাসবদত্তা, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ, প্রতিমা, অভিষেক, অবিমারক, চারুদত্ত, পঞ্চরাত্র, বালচরিত, দূতবাক্য, মধ্যম-ব্যায়োগ, দূতঘটোৎকচ, কর্ণভার ও ঊরুভঙ্গ।

(খ) অশ্বঘোষের—(১) শারিপুত্রপ্রকরণ অথবা শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ; (২) একখানি রূপকপ্রধান (allegorical) ও (৩) আর একখানি গণিকা-ঘটিত দৃশ্যকাব্য (Hetaera drama)। ইহাদিগের কোনখানিই সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই। শেষ দুইখানির নাম পর্য্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। Prof. Luders এগুলি প্রকাশ করিয়াছেন।

হইতে তিনি গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিয়া সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। অশ্বঘোষের দৃশ্যকাব্যগুলির ছিন্নাংশ তুরফানে আবিষ্কৃত হয়, এবং অধ্যাপক Luders জার্মান দেশ হইতে আলোক-চিত্র সহযোগে সেই খণ্ডাংশই প্রকাশ করিয়াছেন। এখন এই কবিদ্বয়ের আবির্ভাবকাল লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া আবশ্যক।

ভাস ও অশ্বঘোষের দৃশ্যকাব্য

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক, কবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষের বিবরণই প্রথমে ধরা যাউক। মনীষিগণের বিশ্বাস তিনি কানিষ্কের সমসাময়িক। অতএব খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষার্দ্ধ বা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ তাঁহার আবির্ভাবকাল বলিয়া সাধারণতঃ হিসাব করা হইয়া থাকে (১২)। তাঁহার "শারিপুত্রপ্রকরণ"খানি নাট্যশাস্ত্রোক্ত প্রকরণের লক্ষণ অনুসারে রচিত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার অপর দুইখানি দৃশ্যকাব্যের নাম অদ্যাবধি উদ্ধার করা যায় নাই। উহাদের একখানি রূপকপ্রধান—অনেকটা কৃষ্ণমিশ্রের "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র অনুরূপ। দ্বিতীয়খানি অনেকাংশে শূদ্রকের "মৃচ্ছকটিক" ও ভাসের "চারুদত্তে"র অনুরূপ; তবে ইহার বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং সেজন্য ইহাও মৃচ্ছকটিক বা চারুদত্তের মত সম্পূর্ণ সামাজিক না হইয়া ধর্ম্মমূলক হইবার সম্ভাবনা। অতএব অশ্বঘোষের দৃশ্যকাব্য তিনখানিই ধর্ম্মমূলক—এরূপ অনুমান বিশেষ অসঙ্গত হয় না। কিন্তু দৃশ্যকাব্যগুলি এতই খণ্ডিত, যে, একমাত্র শারিপুত্র প্রকরণ ব্যতীত অপর দুইখানি গ্রন্থের আখ্যানভাগ সম্বন্ধে কোন আভাসও পাওয়া সম্ভব নহে।

এইবার ভাসের কথা। পনর বৎসর পূর্ব্বেও ভাসের নামমাত্রই সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট শ্রুত ছিল; তাঁহার গ্রন্থ কখনও লোকচক্ষুর গোচর হইবে কি না, কেহ জানিত না। সহসা ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় গণপতি শাস্ত্রী ভাসের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে শুরু করিলেন। তাহা দেখিয়া অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিত শাস্ত্রীজীর সৌভাগ্যের হিংসায় গ্রন্থগুলি জাল (১৩) ও এমন কি গণপতি শাস্ত্রীর নিজস্ব রচনা বলিয়া মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু বহ্নি কি ভস্মাচ্ছাদিত করিয়া রাখা যায়? রচনানৈপুণ্য, নাট্যকলার অদ্ভুত বিকাশ, ভাষার সারল্য ও মাধুর্য্যে শীঘ্রই প্রমাণিত হইল যে, গ্রন্থগুলি নিশ্চয়ই কোন মহাকবির রচনা; এবং নবাবিষ্কৃত গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যবহৃত প্রাকৃতাংশ মৃচ্ছকটিক বা কালিদাসাদিকৃত অন্যান্য দৃশ্যকাব্যের প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীনতর। অতএব ধীরে ধীরে বিরুদ্ধবাদিগণও নিজ নিজ মত পরিবর্ত্তন করিতেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা Prof. Winternitzএর মত পাদটীকায় উদ্ধৃত করিতেছি (১৪)। বিরুদ্ধবাদিগণের সকলের পক্ষ হইতে তিনি ইহা প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপই বলিয়াছেন। গ্রন্থগুলি প্রকৃতই ভাসের রচিত কি না,—উহা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর রচনা কি বিংশ শতাব্দীতে গণপতি শাস্ত্রীর রচনা—কিংবা উহা সংস্কৃত মূলের তামিল অনুবাদের সংস্কৃত অনুবাদ—অথবা উহা পাঁচজনের মিলিত রচনা কি না, তাহা এক জগদীশ্বরই বলিতে পারেন। তবে আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, উহা মূলই বটে, ভেল নহে। গ্রন্থগুলি যিনি পড়িয়াছেন, অথবা যিনি উহাদিগের অভিনয় দেখিয়াছেন (১৫) তিনিই এ কথা স্বীকার করিতে বাধ্য। মহাকবি ব্যতীত অপর যে কোন কবির রচনায় এরূপ গুণসম্ভার কখনই থাকা সম্ভব নহে।

যাহা হউক, এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধের

---

(১২) Cambridge History of India, i, 483. Prof. Leviর মতে তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। Ludersএর মতে তিনি বিক্রম সংবতের (খ্রীঃ পূঃ ৫৭) প্রবর্ত্তক।

(১৩) "The anonymous plays found by Ganapati Sastri, are not the works of Bhasa but were written by some unknown author or authors of the 7th century.........''

Barnett's opinion quoted by Prof. Winternitz, in his Readership lecture delivere at the Calcutta University—16th Sep., 1923.

এরূপ সন্দেহের অবকাশও যথেষ্ট আছে; কারণ, এই ১৩খানি দৃশ্যকাব্যের কোনটির প্রস্তাবনাতেই কবি অথবা গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হয় নাই। তাহার পর 'সুভাষিত' গ্রন্থাদিতে ভাস রচিত বলিয়া যে সকল শ্লোক দেখা যায়, তাহাদের কোনটিই এই প্রকাশিত গ্রন্থাবলী মধ্যে পাওয়া যায় না। ইত্যাদি—

(১৪) "It appears highly probable that all the thirteen plays have one author. The author must have been a great poet and above all a dramatic genius....... All the classical dramas are more or less book dramas, while these plays are one and all the works of a born dramatist, wonderfully adapted to the stage. We have it on good authority, that Bhasa was the author of a drama with the title Svapnavasavadatta. If we take out Svapnasavadatta to be the work of Bhasa, we shall also have to adopt the hypothesis that the other twelve plays are composed by the same author.........(ইহাই তাঁহার মূল যুক্তি। ইহা ছাড়া অন্যান্য অনেক যুক্তিও আছে)........'nearly all the plays are works of great poetical merit, worthy of the name of Bhasa. And let me say this : If it should be finally proved, that Bhasa cannot be the author of these plays, they will yet always have to be counted among the most valuable treasures of Indian Literature ;......''

Bhasa—Winternitz—Calcutta Review—
Dec. 1924., pp. 348—9.

(১৫) কলিকাতায় সংস্কৃত সাহিত্যপরিষদের সভ্যগণ ভাসের প্রতিমা, বালচরিত, দূতবাক্য, দূতঘটোৎকচ, মধ্যমব্যায়োগ, উরুভঙ্গ, কর্ণভার প্রভৃতির অভিনয় করিয়া যথেষ্ট সুযশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য নহে ; প্রসঙ্গতঃ এ সকল কথার উত্থান হইয়াছে। আমাদিগের আপাততঃ আলোচ্য বিষয় ভাসের কাল। বাণভট্ট (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী), বাক্‌পতি (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী), রাজশেখর (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দী), ভামহ (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী), বামন (খ্রীঃ ৮ম শতাব্দী) ও অভিনব গুপ্ত (খ্রীঃ ১১শ শতাব্দী) ভাসের নামোল্লেখ করিয়াছেন। উঁহাদের কেহ কেহ (অভিনব গুপ্ত, রাজশেখর ও বামন) তাঁহার কোন কোন পুস্তকেরও (স্বপ্নবাসবদত্তা ও চারুদত্ত) উল্লেখ করিয়াছেন। ভামহ প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণের সুতীব্র সমালোচনাও করিয়াছেন। আর স্বয়ং বাণী বরপুত্র কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ভাসের নাট্যকুশলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে সঙ্কোচভাবও দেখাইয়াছেন। সুতরাং ভাস কালিদাস (খ্রীঃ ৫ম শতাব্দী) অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভাসকে অশ্বঘোষ ও কালিদাসের মাঝামাঝি ফেলিতে চাহেন। তদনুসারে উঁহার আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়া ধরা হয়।

কিন্তু ভাসকে অশ্বঘোষ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলা কতদূর সঙ্গত তাহা তাঁহারা বিচার করেন নাই। গণপতি শাস্ত্রী মহোদয় ভাসকে পাণিনি ও কৌটিল্য অপেক্ষাও প্রাচীন বলিতে চাহেন। পাণিনির সময় Goldstückerএর মতে খ্রীঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী। কিন্তু গণপতি শাস্ত্রী সম্ভবতঃ এ মত গ্রহণ করেন নাই। পাণিনি ও কৌটিল্যকে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক ধরিয়াই তিনি নিজ মত ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। (১৬) আমরা আবার অতটাও অগ্রসর হইতে সাহস করি না। অশ্বঘোষের প্রাকৃত অতি প্রাচীন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভাসের প্রাকৃত উহা অপেক্ষা অনেক মার্জ্জিত ও সুখোচ্চার্য্য। পক্ষান্তরে ভাসের প্রাকৃত অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক, সুখোচ্চার্য্য ও মার্জ্জিত হওয়ার নিমিত্তই Keith উহাকে অশ্বঘোষের প্রাকৃত অপেক্ষা অর্ব্বাচীন বলিতে চাহেন। মার্জ্জিতত্ব তাঁহার মতে Phonetic decay। (১৭) Winternitz প্রমুখ অধিকাংশ মনীষিগণই আজকাল এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণই এ বিষয়ে মীমাংসা করিবার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু এই একটিমাত্র বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া এত বড় বিষয়ের নিষ্পত্তি করা উচিত নহে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বহু যুক্তিপূর্ণ বিচারের পর স্থির করিয়াছেন যে, কালিদাসকে খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে নহে) ফেলাই উচিত। (১৮) সুতরাং কালিদাসই যখন অশ্বঘোষের পূর্ব্ববর্ত্তী, তখন ভাস ত' অবশ্যই আরও প্রাচীন। তবে ভাসকে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী অপেক্ষাও প্রাচীন বলা সঙ্গত নহে। কয়েকটি অপাণিনীয় শব্দের প্রয়োগ তাঁহার গ্রন্থমধ্যে দেখিয়া, অথবা অর্থশাস্ত্রের একটি সংগ্রহ শ্লোক তাঁহার গ্রন্থবিশেষে আবিষ্কার করিয়া তাঁহাকে পাণিনি অথবা কৌটিল্য অপেক্ষা প্রাচীন বলা কি যুক্তিযুক্ত হইতে পারে? পক্ষান্তরে মহাভাষ্যকারকে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিতে দেখিয়া মহাভাষ্যকার অপেক্ষা তাঁহার প্রাচীনত্ব কল্পনা করিতে ইতস্ততঃ বোধ হয়। মহাভাষ্যকার অভিনয় প্রসঙ্গে অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন—কংসবধ, বলিবন্ধন প্রভৃতি ঘটনা কিরূপে অভিনেতৃগণ কর্তৃক প্রদর্শিত হইত, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিয়াছেন, অথচ ভাস বা তদ্রূপ কোন প্রসিদ্ধ নাট্যকারের কোন উল্লেখই করেন নাই—ইহা একটু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি? কালিদাস যাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছেন, তিনি মহাভাষ্যকারের পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াও তাঁহার গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হ'ন নাই, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে? কেহ কেহ বলেন যে, ভাস দাক্ষিণাত্যের ও পতঞ্জলি আর্য্যাবর্ত্তের লোক বলিয়া উভয়ে উভয়কে চিনিতেন না। কিন্তু ভাস পাণিনি অপেক্ষাও যদি প্রাচীন হ'ন, তবে তিন শত বৎসর পরেও পতঞ্জলির নিকট তিনি অপরিচিত থাকিবেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। Megasthenes ভারতে শিবোপাসনা ও কৃষ্ণোপাসনার প্রচলন স্বচক্ষে দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাস সেই কৃষ্ণোপাসক দলের একজন মূল ব্যক্তি, ইহা তাঁহার গ্রন্থ দেখিয়া বুঝা যায়। সুতরাং ভাসকে কৃষ্ণোপাসনার যুগের লোক বলা যায়। এই যুগ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় হইতে প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আর কালিদাস যদি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীর লোক হ'ন, তাহা হইলে ভাসকে তাঁহার এক শতাব্দী পূর্ব্বে ফেলিলেই চলে। অতএব, ভাস ও পতঞ্জলি প্রায় সমসাময়িক বলিয়াই ধরিতে হয়। ভাসের পূর্ব্বেও যে ভারতে নাট্যসাহিত্যের প্রসার হইয়াছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ ভাসের "স্বপ্নবাসবদত্তা"র মত নাটক কোন দেশেই দৃশ্যকাব্যের প্রথম নমুনা হইতে পারে না।

প্রাচীন যে সকল অপর রূপক (play) আমরা এখন সচরাচর দেখিতে পাই, সে সকলগুলিই সুমার্জ্জিত; কয়েকখানি আবার প্রাচীনতর কবিগণের অধুনা-বিলুপ্ত দৃশ্যকাব্যের নবীন সংস্করণরূপে লিখিত বলিয়া প্রস্তাবনাতে আভাষ পাওয়া যায় (১৯)। কিন্তু এই প্রাচীনতর মূল গ্রন্থগুলি (যাহা নাট্যশাস্ত্রে নাট্যসাহিত্যের প্রথম নমুনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে) অধুনা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত। সুতরাং ভাস, কালিদাস, অশ্বঘোষ ও শূদ্রকের দৃশ্যকাব্যই অধুনা সংস্কৃত রূপকের প্রাচানতম নিদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদিগের অপেক্ষা প্রাচীনতর রূপক অধুনা বর্ত্তমান নাই। অতএব, আপাততঃ প্রাচীন রূপকের

(১৬) Introduction to Svapnavasavadatta by G. Shastri, Second Edition, pp. xxix, xlii—xliv.

(১৭) Classical Sanskrit Literature, Keith—p. 15.

(১৮) The Date of Kalidasa (Reprint from the Allahabad University Studies Vol. II) K. C. Chatterjee M. A.

(১৯) তাঁহার অপাণিনীয় প্রয়োগগুলির সম্বন্ধেও পতঞ্জলি কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই—ইহাও দ্রষ্টব্য।

নমুনার (Concrete exampleএর) খোঁজ ছাড়িয়া দিয়া, সে সম্বন্ধে ভারতীয় সাহিত্যে কি কি মত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

'ভিটামিন'

শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, বি-এস্‌সি

শরীর ধারণের জন্য যে সকল পদার্থ অত্যাবশ্যক, 'ভিটামিন' তাহাদের অন্যতম। শরীরতত্ত্বে 'ভিটামিনে'র প্রভাব অত্যন্ত অধিক। অনেক দিন পূর্ব্বে 'ভিটামিন' বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-জগতে কেহ জানিত না। তৎকালে আমিষ জাতীয়, শর্করা জাতীয়, ও চর্ব্বি জাতীয় খাদ্যই জীবন ধারণের জন্য পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু যখন দেখা গেল উপরিউক্ত খাদ্যগুলি উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া সত্ত্বেও কোন কোন প্রাণী ঠিকমত বাড়িয়া উঠিতেছে না, তখনই প্রথম সন্দেহ হয় যে, এগুলি ছাড়া আরও এমন কিছু আবশ্যক, যাহা না হইলে শরীর সম্পূর্ণরূপে বৃদ্ধি পায় না। কতকগুলি খরগোষ-শাবককে শুষ্ক ঘাস খাইতে দেওয়া হইত; ইহার ফলে দেখা গেল যে, তাহারা দিন দিনই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। যাহারা কাঁচা ঘাস খাইতে পায় তাহারা বেশ বাড়িয়া উঠে। শুষ্ক ঘাস খাইয়া যাহারা কৃশ হইয়া গিয়াছে—তাহাদিগকে সবুজ ঘাস খাইতে দিলে আবার তাহারা স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়া উঠে। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তাহাদের জীবন ধারণের জন্য এমন কিছুর প্রয়োজন, যাহা শুষ্ক ঘাসে নাই, এবং সবুজ কাঁচা ঘাসে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই জিনিসটি কি, সে সম্বন্ধে শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন; কিন্তু ইহার প্রকৃত স্বরূপ আজও অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ এই অজ্ঞাত পদার্থটি 'ভিটামিন' অর্থাৎ 'জীবন ধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যক সামগ্রী' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ম্যাক ক্যালামের ধারণা ছিল, এ রকম দুই শ্রেণীর ভিটামিন আছে—যথা 'চর্ব্বিতে দ্রবণীয় এ' এবং 'জলে দ্রবণীয় বি'; কিন্তু পরবর্ত্তী কালে 'জলে দ্রবণীয় সি' বাহির হয়। অনেক অনুসন্ধানের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে, খাদ্যে এই সকল ভিটামিনের অল্পতা হেতু নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়।

'ভিটামিন বি' চালের বাহিরে লাল রংএর যে একটি পাতলা খোসা (Pericarp) থাকে, তাহাতেই প্রচুর পরিমাণে থাকে। ইহা জলে, মদে (alcohol) দ্রব হয়, এবং অনেক খাদ্য সামগ্রীতেই আছে। 'বেরিবেরি' রোগের কারণ বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, খাদ্যে এই জাতীয় ভিটামিনের অভাবের জন্যই প্রধানতঃ ঐ রোগ হইয়া থাকে (১)। প্রায়ই দেখা যায়, কলে-ভাঙ্গা বেশী পরিষ্কার চাল যাহারা খায়, তাহাদেরই এই রোগ বেশী হয়। কতকগুলি কুক্কুটকে ঐ প্রকার 'ভিটামিন'বিহীন চাল খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, কিছুদিন পরেই তাহারা 'বেরিবেরি'র মত লক্ষণযুক্ত রোগে আক্রান্ত হয় এবং তাহাদের শরীরে 'পলিনিউরাইটিস্' নামক স্নায়বিক রোগ দেখা দেয়। যদি পরে তাহাদিগকে শুধু চালের খোসা খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ রোগ সারিয়া যায়। এই জন্য উপরিউক্ত 'ভিটামিন বি'কে 'এন্টি-নিউরাইটিক' বা স্নায়বিক রোগের প্রতিষেধক বলা হয়। বেরিবেরি রোগেও এই 'ভিটামিন বি' সম্পন্ন খাদ্য দেওয়ার পর আশ্চর্য্যজনক ফল দেখা গিয়াছে। পূর্ব্বে সিঙ্গাপুর, মালয় উপদ্বীপ, পিনাং প্রভৃতি অঞ্চলে খুবই বেরিবেরি হইত। এইজন্য কর্ত্তৃপক্ষ তত্রত্য অধিবাসীদের আহারের জন্য হাতে-ভাঙ্গা অপরিষ্কার চালের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে ঐ সকল অঞ্চলে এই রোগের প্রকোপ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

'ভিটামিন বি' খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে, ক্ষুধা অল্প হয় অথবা একেবারেই হয় না; উদরাময়, আমাশয়, কোষ্ঠবদ্ধতা, অজীর্ণ ও নানা প্রকার ক্রিমি রোগ দেখা দেয়। শরীরের ওজন কমিয়া যায়, এবং শরীর বীর্য্যহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। মাথা ব্যথা, রক্তশূন্যতা ও নানাবিধ চর্ম্মরোগ দেখা দেয়। হাত পা ফুলিয়া যায়, বুক ধড়ফড় করিতে থাকে ও স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

'ভিটামিন এ' ঘী, মাখন, মাংসের চর্ব্বি ও শাকসব্জী হইতে প্রস্তুত নানাবিধ তৈলে প্রচুর পরিমাণে আছে। কাহারও কাহারও মতে এই ভিটামিন প্রাণী দেহে জন্মায় না, শুধু শাক সব্জী তরীতরকারিতেই হয়। খাদ্যে এই ভিটামিনের অল্পতার দরুণই রিকেট রোগ হয়। তাহাতে শরীর উপযুক্ত মত বৃদ্ধি পায় না, এবং শীর্ণ হইতে থাকে। নানাবিধ রোগের সহিত দেহের সংগ্রামের শক্তি কমিয়া যায়, অস্থিগুলি শক্ত হয় না এবং সময় সময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিকৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে রক্তশূন্যতা ও নানাবিধ চক্ষু রোগ দেখা দেয়। শিশুদেরই এই রোগ বেশী হয়। 'ভিটামিন এ' ব্যতীত এই রোগ প্রায়শঃ ভাল হয় না। এই জন্য ইহার অপর নাম রিকেট প্রতিষেধক ভিটামিন।

'ভিটামিন সি' নানাবিধ ফলমূল ও তরীতরকারীতেই প্রচুর পরিমাণে থাকে। খাদ্যে ইহার অল্পতা নিবন্ধন রিকেটের মতই 'স্কার্ভি' নামক রোগ জন্মে। তাহাতে বর্ণ ফ্যাকাসে হইয়া যায় ও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে। দেহ উদ্যমহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংযোজন স্থলে সময় সময় ব্যথা হয়। এই রোগেও শিশুরাই অধিক আক্রান্ত হয়। 'ভিটামিন সি'ই ইহার একমাত্র প্রতিষেধক।

কিছুদিন পূর্ব্বে 'ভিটামিন ডি' নামক আরও একটি ভিটামিন বাহির হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইহা 'ভিটামিন এ'র অন্তর্গত একটি শ্রেণী ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে তফাৎ এই যে—এই ভিটামিনের অল্পতা নিবন্ধন রিকেট রোগের লক্ষণ ছাড়া আরও অনেক লক্ষণ প্রকাশ পায়। 'ভিটামিন এ'র ন্যায় কড্‌লিভার অয়েল, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, পেনক্রিয়াস প্রভৃতিতেই উক্ত ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

---

(১) বেরিবেরির কারণ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ বর্ত্তমান। কাহারও কাহারও মতে, ভিজা চালে 'এমাইড' জাতীয় এক প্রকার বিষ প্রস্তুত হয়—তাহাতেই এ রোগ হয়। কেহ কেহ আবার এই রোগের বীজাণুর জন্য অনুসন্ধান করিতেছেন—কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন বীজাণু আবিষ্কার হয় নাই।

অতি অল্প দিন হইল আমেরিকায় ভিটামিন ই' বাহির হইয়াছে। (২) বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে 'প্রজনন বৃদ্ধিকারক ভিটামিন' (Reproductive Vitamin) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। খাদ্যে ইহা পরিমাণমত না থাকিলে প্রাণীদের সন্তান উৎপাদনের শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও অবশেষে একেবারে লোপ পায়। অবশ্য সময় সময় গর্ভ সঞ্চার হয়—কিন্তু গর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

'ভিটামিন' সম্বন্ধে আমেরিকা ও ইয়োরোপে নানাবিধ গবেষণা চলিতেছে। আশা করা যায়, তাহার ফলে অচিরেই ভিটামিন সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে ও তাহার প্রকৃত স্বরূপ বাহির হইবে। কালে হয় ত 'এ, বি, সি, 'ডি ও ই'র' ন্যায় অসংখ্য ভিটামিনের খবর আমরা পাইব।

ক্রমাগত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলে 'ভিটামিন' সম্বন্ধে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে এটকু সকলেই স্বীকার করেন, শরীর ধারণের জন্য এণ্ডক্রিন গ্রন্থি-মণ্ডলের কার্য্য অত্যাবশ্যক। আবার এই এণ্ডক্রিন গ্রন্থিমণ্ডলকে কার্য্যক্ষম করিতে হইলে 'ভিটামিন' ব্যতীত হয় না। অবশ্য সূর্য্যের আল্‌ট্রা ভায়োলেট রশ্মিও অনেকটা কাজ করে। সুতরাং শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ আজকাল শরীর যাহাতে উপযুক্ত মত 'ভিটামিন' পায়—রুগ্ন দেহে ও সুস্থ শরীরে তাহারই প্রতি খরদৃষ্টি রাখিতে বলিতেছেন। আবার ভিটামিনের সাহায্য ব্যতীত আমাদের খাদ্যে যে সকল চূণ জাতীয়, লোহা, 'আইডিন' 'মেগনেশিয়াম,' 'সোডিয়াম' 'পটাসিয়াম' ও 'ফস্ফরাস' আছে, সেগুলি শরীর সংগঠনে একটুও কাজ করিতে পারে না। এই কারণে ও এণ্ডক্রিন গ্রন্থিমণ্ডল উপযুক্ত কার্য্য করিতে না পারায়, রক্তশূন্যতা, কার্য্যে আলস্য, স্মৃতিশক্তি হ্রাস, উদ্যমহীনতা, এবং নানাবিধ কষ্টদায়ক স্ত্রীরোগ দেখা দেয়। এই সকল লক্ষণ ও রোগের উৎপত্তির জন্য ভিটামিনের অল্পতাই অনেকাংশে দায়ী—এ সম্বন্ধে চিকিৎসকদের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আর বিশেষতঃ শারীরিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ভিটামিন যে একান্ত আবশ্যক, তাহাও সকলে স্বীকার করেন। এই জন্য শিশুদের ও রোগীর পথ্যে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে নানা জাতীয় 'ভিটামিন' থাকে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তা না হইলে শারীরিক ও নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। আজকাল বাংলা দেশে যে অতি অল্প বয়সেই দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতা, শুভ্র কেশ দেখা যায়, বাঙ্গালীর খাদ্যে 'ভিটামিনে'র অল্পতাই তাহার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

সুতরাং খাদ্যে যাহাতে সর্ব্বদাই উপযুক্ত পরিমাণে 'ভিটামিন' থাকে তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। এইটুকু মনে রাখা উচিত—শুষ্ক, পেটেন্ট, দুইবার জ্বাল দেওয়া দুধ, কলে ভাঙ্গা চাল ও ময়দা, বাসি অথবা অধিক সিদ্ধ মাংস অথবা তরী তরকারীতে 'ভিটামিন' মোটেই থাকে না। ১৫ মিনিটের বেশী সিদ্ধ হইলে 'ভিটামিন' নষ্ট হইয়া যায়। আজকাল উপরিউক্ত 'ভিটামিন' বিহীন খাদ্যগুলিই আমাদের দেশের অধিকাংশ দরিদ্র লোকের দৈনন্দিন নির্দ্দিষ্ট খাদ্য; সুতরাং ইহাতে যে রিকেট রক্তশূন্যতা, দাঁত হইতে পুঁয পড়া, 'টনসিল' বড় হওয়া, 'ক্যান্সার' যক্ষ্মা, প্রসবকালীন গুরুতর কষ্ট, বাত, এপেণ্ডিসাইটিস্ ইত্যাদি রোগ দেখা দিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুতরাং এ সকল রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উপরিউক্ত 'ভিটামিন' বিহীন খাদ্যগুলি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় ও ভিটামিন-পূর্ণ খাদ্য সামগ্রী সর্ব্বদা আহার করা উচিত। নিম্নে ভিটামিনের শ্রেণী অনুযায়ী একটি তালিকা দেওয়া গেল।

'ভিটামিন এ'—স্তনদুগ্ধ, মাখন, ডিমের কুসুম, কাঁচা শাকসব্জী, অল্প-সিদ্ধ মাংস, কই, মাগুর, ইলিশ প্রভৃতি মৎস্য, চর্ব্বি, গরুর দুধ, ছাগলের দুধ, কড্‌লিভার অয়েল, পক্ষীর মাংস, পাঁঠার মাংস, হরিণের মাংস ইত্যাদি।

'ভিটামিন বি'—মটর, সিম, ছোলা, মুসরী, মুগ, বেগুন, বেড়েল, ডিমের কুসুম, বাদাম ও অন্যান্য ফলমূল, ভূট্টা, গম, যব, ইত্যাদি।

'ভিটামিন সি'—ফল—কমলা, আঙ্গুর, আনারস, বেদনা, বিলাতী বেগুন, কাঁচা শাক সব্জী, মূলা, পেঁয়াজ, কপি, আলু, শালগম প্রভৃতি সিদ্ধ শাক সব্জী (১৫ মিনিটের বেশী সিদ্ধ নয়—এবং কোন 'এলকেলি' মিশাইলে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়)।

'ভিটামিন ডি'—কড্‌লিভার অয়েল, পেনক্রিয়াস, হৃৎপিণ্ড, মূত্রাশয়, যকৃৎ, প্রভৃতি।

'ভিটামিন ই'—ডিম, মাখন, মৎস্য, মৎস্যের ডিম, মাংস, ফলমূল ইত্যাদি।

(২) American Journal of Physiology, Vol. Lxxvi, 1926.

সন্ধ্যার অন্ধকারে

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

ভাগিনেয়ের উপনয়ন-উপলক্ষে সোনাখালি গিয়াছিলাম। মদনপুর ষ্টেশনে নামিয়া প্রায় তিন-চারি ক্রোশ পথ গরুর গাড়ীতে পাড়ি দিতে হয় সোনাখালি পৌছিতে। ষ্টেশনের পরই দু'ধারে প্রশস্ত ক্ষেত—বহু দূরে গ্রাম-সীমা সবুজ গাছে বোনা পাড়ের মত, তার উপর অস্তগামী সূর্য্যের রক্তচ্ছটা পড়িয়াছে—সহরে-বদ্ধ মন সে মুক্ত শোভা-সৌন্দর্য্যে মজিয়া মশ্‌গুল হইয়া উঠিল।

আমি তখন মেডিকেল কলেজে পড়িতেছি। পাঁচ

সাত দিনের ছুটী ছিল। বাঁধা-ধরা কাজ-কর্ম্মের অন্তরালে পল্লীর এই সরল জীবন প্রাণের উপর ফাগুন-হাওয়ার পরশ বুলাইয়া দিল!

বাড়ীর সামনে মেটে পথ। পথের ধারে প্রকাণ্ড আম-বাগান। গাছে থোলো থোলো কাঁচা আম—ছেলের দল মহা-উৎসাহে আম পাড়িতে গাছে চড়িয়াছে। কাল অপরাহ্ন। আমি বাড়ীর সামনের খোলা মাঠটায় ডেক্-চেয়ার পাতিয়া একখানা রোমাঞ্চকর উপন্যাস-পাঠে তন্ময়।

ছ' পেনি বিলাতী উপন্যাসের আমি নিয়মিত পাঠক! পকেটে ষ্টেথেসকোপের সঙ্গে একখানা নভেল সর্ব্ব সময়েই বিরাজ করে। কলেজে নাইট্-ডিউটী পড়িলে সন্ধ-সন্ধ একখানা নভেল পড়িয়া শেষ করি।

হঠাৎ ছেলের দলে কলরব উঠিল—এবং মটরু আসিয়া খপর দিল, ভট্‌চায্যিদের হাবুল গাছ হইতে পড়িয়া পা কাটিয়াছে, হাত ভাঙ্গিয়াছে! সর্ব্বনাশ! নভেলখানা হাতে লইয়াই অগ্রসর হইলাম। কোথায় পাই এখানে এখন কাঠ, ব্যাণ্ডেজ, আয়োডিন!

মটরু বলিল,—ও-পাড়ায় ডাক্তারখানা আছে।

পাড়াগাঁর ডাক্তারখানা! সে তো যমের একটি ক্ষুদ্র ঘাঁটি! পরাণ চাকর বলিল,—ডাক্তারবাবুটি কলকাতার পাশ করা। লোক ভালো।

হাবুলকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিলাম। মস্ত আটচালা ঘর, সামনে কালো রঙের সাইন-বোর্ড; বাংলায় লেখা—

সোনাখালি দাতব্য চিকিৎসালয়।

বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

শ্রীকীর্ত্তিচন্দ্র খাস্তগীর এম-বি।

এম-বি! অবাক হইলাম। অর্থব্যয়ে এম-বি পাশ করিয়া এই বনালয়ে দাতব্য চিকিৎসালয় খুলিয়াছে! লোকটার মাথা ঠিক আছে তো!

খাস্তগীর। কীর্ত্তি খাস্তগীর!···ঠিক। কলেজে এককালে প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন এক কীর্ত্তিচন্দ্র খাস্তগীর···বহু মেডেল্ আয়ত্ত করিয়াছিলেন! তিনিই···!

সংবাদ লইয়া জানিলাম, ডাক্তারবাবু গৃহে নাই; বেলা আটটায় চাকদায় গিয়াছেন একটা 'কলে'।

উপায়! কম্পাউণ্ডারকে ডাকিয়া ব্যাপার বলিলাম। সে কাঠ আনিয়া দিল, কিন্তু ফ্রাক্‌চার বাঁধিবার দুঃসাহস বা স্পর্দ্ধাপ্রকাশে কুণ্ঠিত হইল। আমি কহিলাম—আমি বাঁধছি···

পায়ের কাটা ঘায়ে আয়োডিন লেপিয়া ব্যাণ্ডেজ পাকাইয়া কাঠ লইয়া হাত বাঁধিতে উদ্যত হইয়া কম্পাউণ্ডারকে কহিলাম, হাতটা ধরিয়া টানো···

সে রাজী হইল না। নিজেই তখন কোনোমতে হাবুলের হাতটা টানিয়া কাঠ লাগাইতেছি, এমন সময় সামনে গরুর গাড়ী আসিয়া হাজির। ডাক্তারবাবু ফিরিয়াছেন!

হাবুলকে তিনি চিনিতেন, প্রশ্ন করিলেন,—কি হয়েছে? হাবুল, না?

আমি কহিলাম,—গাছ থেকে পড়ে হাত ভেঙ্গেছে।

ডাক্তারবাবু তখনি হাত ধুইয়া হাবুলের পরিচর্য্যায় মনোনিবেশ করিলেন।

আমি কহিলাম,—এখনি আসচেন, আপনি নয় জিরুন···

তিনি কহিলেন,—না বাবা, এ কাজ আগে দেখা দরকার।

আমি কহিলাম,—আপনার এই মেহনৎ গেছে...

তিনি কহিলেন,—কর্ত্তব্যের ডাক আগে—তার পর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য! মৃদু হাসিয়া ভাবিলাম, মাথা খারাপই বটে! সহরের ডাক্তারবাবুদের জানি তো—মোটরে-চড়া বড়-বড় ডাক্তার নড়িতে-চড়িতে বহু পয়সা কী লন্! তাঁরা নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যটুকু সারিয়া তবে পরের বেদনা বা পীড়ায় মনোযোগ দেন,—তাও অল্প পয়সা লইয়া নয়! আর ইনি বিনা-পয়সায় এই ব্যাপারটার দিকেই···

আমায় আর কিছু করিতে হইল না। ডাক্তারবাবু হাবুলের হাত বাঁধিয়া তার পরিচর্য্যার সব ভার গ্রহণ করিলেন। আমি একটা বেঞ্চে বসিয়া নভেল খুলিলাম; নায়িকা তখন হারানো নায়কের সন্ধানে কি অসাধ্য সাধনেই না ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে! আমার মনও অধীর কৌতূহলে তার সঙ্গে পাহাড়ে চড়িতেছে, জঙ্গলে ঘুরিতেছে, আবার পরক্ষণেই তরঙ্গোচ্ছল নদীর বুকে অবলীলায় ভাসিয়া চলিয়াছে!···

হঠাৎ ডাক্তারবাবু কহিলেন,—আপনাকে নতুন দেখচি···

চোখ তুলিয়া দেখি, হাবুলের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তখন সারা হইয়া গিয়াছে—সদলে তারা বিদায় লইয়াছে।

আমি বই মুড়িয়া পরিচয় দিলাম। ডাক্তারবাবু কহিলেন,—মেডিকেল কলেজে পড়ছেন! কোন্ ইয়ার?

—ফোর্থ ইয়ার।

কলেজের তিনি খবর লইলেন। মনরো সাহেব এখনো আছেন? ঐ সাহেব যখন প্রথম আসেন, তখন তিনি মেডিকেল কলেজের জুনিয়র হাউস সার্জ্জন। সার্জ্জারিতে সাহেবের বেশ হাত ছিল।...

কম্পাউণ্ডার আসিয়া কহিল,—আপনি স্নান করবেন তো?

ডাক্তারবাবু কহিলেন,—না, স্নানাগার হয়েছে। তুমি চা তৈরী করতে বল। আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন,—চা খাবেন তো?

আমি কহিলাম,—চায়ে অনিচ্ছা বা অরুচি নেই।

ডাক্তারবাবু কহিলেন—দু'পেয়ালা তৈরী করাবে হে উমেশ...

আমি কহিলাম,—আপনার নাম কলেজে খুবই শুনেছি। তা, এখানে আপনি প্রাক্‌টিশ করছেন...! সবিস্ময়ে তাঁর পানে চাহিলাম।

ডাক্তারবাবু হাসিলেন, কহিলেন,—খেয়াল ভাবছেন! খেয়াল শুধু নয়, বাবা ..বলিয়া তিনি উঠিলেন, কহিলেন,—আসছি।

ডাক্তারবাবু উঠিয়া গেলেন। আমি আবার নভেল খুলিলাম।

কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে ডাক্তারবাবু তখনি বাহির হইয়া আসিলেন, কহিলেন,—ঐ ওষুধ দুটো তৈরী করিয়ে এখনি এই লোককে দাও। বাংলায় লেবেল এঁটো—কখন্ কোন্‌টা খাবে, লিখে দিয়ো। আর এক প্যাকেট তুলোও এই সঙ্গে দিয়ো!

কম্পাউণ্ডার চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি কহিলেন,—একটা ডেলিভারী কেশ্ ছিল চাকদায়। রোগীর রক্তহীন দেহ; নোংরার মধ্যে বাস—ব্যাপার সাংঘাতিক হয়েছিল। ডেলিভারী হয়েছে—ছেলেটা বাঁচেনি। রোগী আছে,...তবে এখনো কিছু বলা যায় না! ওষুধ-পত্তর দিচ্ছি। আবার কাল ভোরেই যেতে হবে।...গরীব গোয়ালা! শোবার ঘর আর গোয়ালঘর এক—কি কুসংস্কারেই যে সব আচ্ছন্ন, প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকে কি করে, আশ্চর্য্য...!

আমি কহিলাম,—ভাবতুম, পল্লীগ্রামে সহজ সরল আবহাওয়ায় এ কেশগুলো খারাপ হয় না!

ডাক্তারবাবু কহিলেন,—খুবই হয়। বেঘোরে প্রাণ দেয়—কে তার খপর রাখে! পেঁচোয় পাওয়া, নজর লাগা—এই সব আন্দাজ করে মনকে সান্ত্বনা দেয়! কত কেশ এ-রকম যে হচ্ছে...আমি একা কত খপর রাখি!... তা, একটু মাপ করুন, আমি কাপড়টা বদলে আসি!

ডাক্তারবাবু বাড়ীর মধ্যে গেলেন। আমি আবার নভেল খুলিলাম। প্রায় পনেরো মিনিট পরে তিনি আসিয়া বসিলেন, কহিলেন,—ওটা কি? নভেল?

বই বন্ধ করিয়া কহিলাম,—হাঁ।

—কার লেখা?

—রবার্ট সাট্‌ক্লিফের।

—কি বই?

—The Missing Hero.

হাসিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন,—খুব sensational?

—ভয়ঙ্কর!

হাসিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন,—কিন্তু ডাক্তার হতে গেলে নভেল পড়া ছাড়তে হবে। ও ভারী নেশা...বদ নেশা!

ডাক্তারবাবু স্তব্ধ হইলেন। তারপর কহিলেন,—আমি এই বনালয়ে কেন পড়ে আছি, জিজ্ঞাসা করছিলেন না? লোকে বলে, আমি পরোপকার-ব্রত নিয়েছি! সেদিন 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' আমার প্রশংসা করে কে খুব ক'লাইন লিখে ছাপিয়ে দেছে। হুঃ!...কিন্তু আমিও একদিন সহরে থেকে গাড়ী-ঘোড়া হাঁকিয়ে ডাক্তারী ব্যবসা ফেঁদে বসার কল্পনায় বিভোর ছিলুম, মস্ত বাড়ী করবো...জুড়ি গাড়ী! হয়তো এতদিনে মোটরও করতুম...কিন্তু এত-বড় একটা ট্রাজেডি আমার সে-সব কল্পনাকে ভেঙ্গে-চুরে আমায় এ পথে পাঠিয়ে দিলে...! এ আমার নিঃস্বার্থ ব্রত-পালন নয়—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার ক্ষীণ চেষ্টা মাত্র!

কাছেই গাছের ঝোপে একটা পাখী হাঁকিতেছিল, ফটি-ঈক-জল, ফটি-ঈক-জল...তার সুরে এমন আর্ত্ত বেদনা ফুটিতেছিল যে নিমেষে আমার মন হইতে উপন্যাসের নায়ক-

নায়িকা, সে পথ-ঘাট, থানা-পুলিশ…মুছিয়া কোথায় যে সরিয়া গেল!

ডাক্তারবাবু কহিলেন,—আপনি ডাক্তার হচ্ছেন, তায় নভেলের উপর আপনার এত ঝোঁক, কাজেই আপনাকে আমার সব কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে ..হয়তো কাজে লাগবে!

আমি কহিলাম,—বলুন, শুনি…। আপনাকে এখানে দেখে মনে কৌতূহলও অল্প জাগছে না! এত বড় পণ্ডিত আপনি…

সে কথা কাণে না তুলিয়া ডাক্তারবাবু কহিলেন,—এই ডাক্তারীটা—ব্যবসার চোখে যিনি দেখবেন, তিনি মহা স্বার্থপর হবেন! ঢের অকল্যাণের সৃষ্টি করবেন তিনি! এ তো ব্যবসা নয়! কি দায়িত্ব যে এতে…মানুষের প্রাণ নিয়ে খেলা…শুধুই কি রোগীর প্রাণ! তা নয়। এক-একটা গৃহ, সংসার, তার সঙ্গে আরো পাঁচটা গৃহ,—অসংখ্য নর-নারী-শিশুর সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ… হাসি-অশ্রু…ওঃ, কতখানি…কতখানি যে!

ডাক্তার বাবু স্তব্ধ হইলেন। পাখীটা তখনো হাঁকিতে-ছিল, ফটি-ঈক জল…গ্রামের পথে রমণীরা দল বাঁধিয়া ঘোমটা টানিয়া কলসী কাঁখে বিলে জল লইতে চলিয়াছে .. অদূরে একটা গাছে কাঠঠোকরা পাখীর কাঠ ঠোকরানোর একটা কর্কশ একঘেয়ে শব্দ সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শান্তির বুকে যেন কালো দাগ টানিয়া দিতেছিল!

ডাক্তার বাবু কহিলেন—প্রথম প্রথম কত রোগীর ঘরে গেছি। কত মা, কত বাপ, কত স্ত্রী, কত স্বামী কেঁদে পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলেছে, বাঁচিয়ে দিন ডাক্তার বাবু, বাঁচিয়ে দিন—ওর সঙ্গে আমার যে কতখানি গাঁথা…ও গেলে কত কি যাবে…এ কথাগুলো প্রাণকে যে খুব বেশী স্পর্শ করতো, তা বলতে পারি না। কিন্তু একদিন এক মুহূর্ত্ত এলো, যখন ঐ সব কথার সঙ্গে সারা দুনিয়ার আর্ত্ত হাহাকার প্রাণের মধ্যে জেগে উঠে প্রাণটাকে বিষম চকিত সন্ত্রস্ত করে তুললে! আর্ত্ত দুনিয়ার সে কি করুণ হা-হা-স্বর! এই কান্নার রোল যদি কিছু থামাতে পারি!…পয়সা রোজগার করা, আর সে পয়সায় নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য কামনা করা—এর মধ্যে আর বৈচিত্র্য কি আছে! কিন্তু আমাদের এ পয়সা দেয় কারা? দেয় কেন?…কত প্রাণের মূল্য, কত হাসি-কান্নার সুখ-দুঃখের দাম আমাদের হাতে মানুষ তুলে দেয়। সে পয়সায় আমরা কতখানি সুখ পাই, স্বাচ্ছন্দ্য পাই, অথচ তার বদলে কি দিই… কতটুকু…!

ডাক্তার বাবু আবার স্তব্ধ হইলেন। আমি তাঁর পানে কেমন বিহ্বলের মত চাহিয়া ছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারের মধ্যে একটা মস্ত নিরুপায়তা যেন কালো পাখা মেলিয়া বিশ্ব-চরাচরকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল!

চা আসিল। ডাক্তার বাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—চা-টা খেয়ে নিন্ আগে। গরম চা…

চা পান করিলাম। চা-পানান্তে ডাক্তারবাবু কহিলেন—শুনুন, তবে বলি। ছোট্ট কাহিনীটুকু! তরুণ বয়স—আমি তখন হাওড়ার হাসপাতালে জুনিয়র হাউস সার্জ্জন। সেদিন রাত্রে ডিউটী ছিল। ঐ নভেল পড়ার মস্ত বাতিক ভূতের মত আমায় পাইয়া বসিয়াছিল। রাত্রি দশটায় আসিয়া হাসপাতালের ঘরে বসিলাম। হাতে ছিল একটা নভেল—ডিটেক্‌টিভ্ নভেল, ভারী কৌতূহলে ভরা। কোনো রোগী ছিল না,—নিশ্চিন্ত আরামে বইখানা খুলিয়া পড়িতে বসিলাম।…

প্রতি পরিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়-কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়া চলিয়াছিল। হাসপাতাল, রোগী, ডিউটি, সব ভুলিয়া বিলাতের পথে-পথে জুয়ার আড্ডায়, বার-হোটেলে, থিয়েটারে, চীনা-ডেনে এমন রুদ্ধ নিশ্বাসে মনটাকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিলাম—আতঙ্ক, দুশ্চিন্তা, আশার স্পর্শে মন ক্ষণে ক্ষণে এমন বৈচিত্র্যে ভরিয়া উঠিতেছিল…সে আর বলিবার নয়!…

কতক্ষণ পরে…ঠিক খেয়াল ছিল না,…তবে দুর্দ্ধর্ষ দুর্বৃত্ত দস্যুটা তখন এক সান্ধ্য-পার্টিতে এক মস্ত ধনীর আদরের দুলালীর হৃদয় প্রায় জয় করিয়া ফেলিয়াছে, তরুণী নায়িকা সরম-ভরে দস্যুকে তার প্রাণের চিরাকাঙ্ক্ষিত প্রিয়তম ভাবিয়া গ্রীবা বাঁকাইয়া তার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়াছে, মুখে তার মৃদু হাসির জ্যোৎস্না…ওদিকে দুর্দ্ধর্ষ ডিটেকটিভ্ ভন্ কার একটা থামের আড়াল হইতে দস্যুকে লক্ষ্য করিয়া হাতে পিস্তল বাগাইয়া তার দিকে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে, দস্যুটা কি করিয়া তা বুঝিয়া ডান হাতে তরুণীর হাত ধরিয়া বাঁ হাতে সকলের অলক্ষ্যে পিস্তল বাগাইতেছে…

হঠাৎ কুলিরা ধরাধরি করিয়া এক রোগীকে অপারেশন-টেবলে ফেলিয়া আমাকে আসিয়া খবর দিল। বিরক্ত হইয়া

বই ফেলিয়া উঠিলাম। ঘড়ির পানে চাহিয়া দেখি, তিনটা বাজে।

টেবিলের সামনে গিয়া দেখি, একটা ইতর শ্রেণীর লোক বেহুঁশ পড়িয়া আছে। তার সঙ্গে দু'জন লোক ছিল। তারা বলিল, রোগী গরুর গাড়ী হাঁকায়। তার নাম করিম। বাকড়দায় বাড়ী—মোট লইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া তারা কয়জনে এদিকে আসিতেছিল। পথে করিমের গাড়ী লাইট-রেল-লাইনের লাইনে কি করিয়া আটকাইয়া পড়ে। মাল-বোঝাই গাড়ী কিছুতেই কায়দা করা গেল না। শেষে কয়জনে ধরাধরি করিয়া গাড়ী ঠিক করিতে গেলে করিমের পায়ের পাতার উপর দিয়া গাড়ীর চাকা চলিয়া যায়। 'বাপ্ রে' বলিয়া করিম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। তার মুখে-চোখে বহুৎ জল দিয়া, পায়ে কেরোসিন ঢালিয়া মালিশ করিয়াও কোনো ফল না পাইয়া একটা গাড়ীর মাল খালি করিয়া সেই গাড়ীতে তুলিয়া করিমকে লইয়া হাসপাতালে আসিয়াছে।...

পা দেখিলাম,—হাড় ভাঙিয়া চুর হইয়া গিয়াছে। নানা লট্‌খট্! ওদিকে ডন্ কার এমন সঙ্গীন মুহূর্ত্তে আসিয়া দেখা দিয়াছে! বেচারী নায়িকা সারা...! মনটা তাদের ভাবনায় এমনি ব্যাকুল...লোশনে করিমের পা ধোয়াইয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলাম। একটা ইঞ্জেক্‌শন্...! তা ছাড়া একবার মনে হইল, এই ছ্যাঁচা পাটা কাটিয়া বাদ দিলেই ভালো হয়—কিন্তু সে অনেক পরিশ্রমের কাজ...অনেকখানি সময়ও লাগিবে...ওদিকে ডন্ কারের সেই পিস্তল হাতে সন্তর্পণে আগাইয়া আসা...আগ্রহে মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিলাম, এখন তিনটা...আর চার ঘণ্টা পরেই রেসিডেণ্ট সার্জ্জন আসিবেন...ক' ঘণ্টা মাত্র...কেন বৃথা খাটিয়া মরি...এদিকে বইখানার আর ক'খানা পাতাই বা বাকী! না হয় বইখানা শেষ করিয়াই দেখা যাইবে! এতক্ষণ তো এমনি কাটিয়া গিয়াছে...আর চার ঘণ্টা...! যদি এরা ভোরের সময়ই আসিত! তা ছাড়া নিয়তি...ওর যদি বাঁচবার আয়ু থাকে, বাঁচবেই, চার ঘণ্টার এমন কিছু আসিয়া যাইবে না ..

কুলি বলিল—পা কাটিবেন না বাবু?

আমি কহিলাম,—না,—একটু দেখি। তোরা ওকে শুইয়ে দিয়ে আয় ৭১

ডোম কহিল—কিন্তু জ্ঞান তো হয় নি...

একটু ব্রাণ্ডি দিলাম। তার পর করিমের নাকে স্মেলিং সল্ট ধরিলাম—তার চমক হইল। তার পরই গ্যাঙানি সুরু করিল। সেই গ্যাঙানির মধ্য দিয়াই তাকে তুলিয়া একটা শয্যায় শোয়াইয়া দেওয়া হইল। আমি আসিয়া বই খুলিয়া বসিলাম।

বই তেমন জমিল না। মনটা ক্ষণে ক্ষণে উঠিয়া ঐ করিমের শয্যার ধারে গিয়া দাঁড়ায়। ডন্ কারের সহিত দস্যুর অমন যে সংগ্রাম, সারার বাধা দেওয়া, সবগুলা যেন একটা অস্পষ্টতার আবছায়ায় থাকিয়া থাকিয়া ঢাকিয়া যাইতেছিল!...

বই শেষ হইল—তখন ভোরের আলো ফুটিয়াছে। করিমের বিছানার পাশে গিয়া দাঁড়াইলাম। তখনো তার সেই বিশ্রী গ্যাঙানি...থাকিয়া থাকিয়া চুপ করিতেছে, আবার সেই গ্যাঙানি...! মনের মধ্যে কি যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। বাহিরে আসিলাম। দেখি, করিমের সেই সঙ্গী দুজন গাছতলায় পড়িয়া আছে! ভোরের আলোর পাখীর কূজন জাগিয়া উঠিয়াছে! নবজীবনের একটা চঞ্চল প্রবাহে সারা বিশ্ব আবার ভাসিয়া উঠিতেছে!...

করিমের কাছে আসিলাম। একটা ইঞ্জেক্‌শন্...কুলিকে ডাকিলাম,—কহিলাম—এ্যাণ্টি-টিটানিক ইঞ্জেক্‌শন্ একটা...

কুলি চলিয়া গেল। আমি করিমের বেদনায়-কাতর মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। রেসিডেণ্ট সার্জ্জন আসিলেন। তিনি ভোরে উঠিয়াই রাউণ্ড দিতে আসিয়াছেন। আমায় দেখিয়া কহিলেন—এই রোগী রাত্রে এসেছে?

আমি কহিলাম,—হাঁ।

করিমকে তিনি পরীক্ষা করিলেন, পরীক্ষান্তে কহিলেন, —এর পায়ের পাতাটা কেটে বাদ দেন্ নি কেন?...কখন এসেছে?

আমি কহিলাম—রাত তখন তিনটে...

কুলি ইঞ্জেক্‌শনের সরঞ্জাম লইয়া আসিল। করিম তখন হাত-পা ছুঁড়িতেছে! অমন অচেতন স্পন্দনহীন ছিল, অথচ হাত পা নাড়ার এত শক্তি...

মন আমার অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল।

রেসিডেণ্ট কহিলেন,—ইঞ্জেক্‌শন্ না দিয়ে এমনি ফেলে রেখেছিলেন?

মুখে কোনো কথা ফুটিল না। বলিবার কিছু ছিলও না।

রেসিডেন্ট কহিলেন—দেখেছেন, গ্যাংগ্রিন্ সুরু হয়ে গেছে! ভারী অন্যায় করেছেন—বোধ হয়, রক্ষা করা যাবে না!…চার ঘণ্টা পড়ে আছে এমনি…

রেসিডেন্ট ক্ষিপ্র আয়োজনে তার পায়ের হাঁটু অবধি কাটিয়া বাদ দিলেন; দিয়া কহিলেন,—আরো advance করে গেছে…

হতাশভাবে তিনি একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তার পর উদ্যোগ-আয়োজনের কি সমারোহ পড়িয়া গেল। আমার ডিউটির টাইম ফুরাইয়াছিল, তবু নড়িতে পারিলাম না। পায়ে যেন কে স্ক্রুপ আঁটিয়া দিয়াছিল…নড়িবার শক্তি ছিল না। রেসিডেন্টের আদেশে কলের পুতুলের মতই এটা-ওটা করিতে লাগিলাম।

বেলা বারোটায় করিমের জীবনের ক্ষীণ দীপশিখাটুকু নিবিয়া গেল! মৃত্যু…নিত্যই কত ঘটিতেছে—জলে-স্থলে সর্ব্বক্ষণই মৃত্যুর খেলা সমানে চলিয়াছে! আমারি চোখের সামনে, আমারি হাতের তলে কত লোক মৃত্যুকে বরণ করিয়াছে… তবু এর মৃত্যু…সারা পৃথিবী যেন প্রকাণ্ড একটা আর্ত্ত রব তুলিল…আমার বুকের হাড়গুলা অবধি সে আর্ত্ত রবে কাঁপিয়া ঝন্-ঝন্ করিয়া উঠিল!…

বিমূঢ়ের মত করিমের শয্যার সামনে কতক্ষণ যে দাঁড়াইয়া রহিলাম…হাসপাতালের ঐ ঘর জেলের মত বোধ হইতেছিল, তবু সে ঘর ছাড়িয়া নড়িতে পারিলাম না। সকলে বিস্মিত! সকলের মুখে এক কথা,—ওহে খাস্তগীর, হলো কি?

কোনো জবাব দিতে পারিলাম না। কি যে হইয়াছিল, তা আমিও বুঝি নাই!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক-গাড়ী লোক আসিয়া হাজির। করিমের মা, বহিন, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে…করিমের দেহ তখন কম্পাউণ্ডের একধারে বস্ত্রাবৃত পড়িয়া ছিল।…কাঁদিয়া তারা আকাশ ফাটাইয়া দিল। এত বড় পরিবার…তাদের একমাত্র ভরসা ছিল যে ঐ করিম…আজ সে করিম নাই—তাদের আশ্রয়…তাদের সব! সে নাই! তাদের যে আজ পথে বসিতে হইবে!…

সে কান্নার রোল আমার চোখের সামনে হইতে সমস্ত দুনিয়াটাকে কোথায় যে হঠাইয়া দিল!… বুকের উপর কার প্রকাণ্ড চাবুক পড়িতেছিল—কাঁটার চাবুক! বুকের মাংস চিরিয়া হাড় ভাঙিয়া সে চাবুক কি আঘাত দিতে লাগিল…

মনে হইল, বিশ্বে সুখ নাই, হাসি নাই, আশ্রয় নাই, কিছু নাই! আছে শুধু মৃত্যুর করাল কঠিন হাত, আর অসহায় আর্ত্তের অশ্রুর সাগর…

বাক্সে দেড়শো টাকা মজুত ছিল, আগের দিন মাহিনা পাইয়াছিলাম, আর মাসে মাসে উদ্বৃত্ত কিছু—সে সমস্ত টাকা আনিয়া করিমের মার হাতে ধরিয়া দিলাম, কহিলাম—বহিন্, এগুলি নাও। আবার টাকার দরকার হইলে আমার কাছে আসিয়ো...তোমার এক করিম গিয়াছে, কিন্তু জানিয়ো, আর এক করিম এখনো এখানে বাঁচিয়া আছে— আমি সেই করিম………

করিমের কথা ভুলিতে পারিলাম না। বন্ধুরা অনেক সান্ত্বনা দিলেন, অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু…বুঝিবার কিছু ছিলও না।

নভেলের রাশি ছিল ঘরে—সব পুড়াইয়া ফেলিলাম। চাকরি ছাড়িয়া দিলাম, অপদার্থ আমি, অপদার্থতার জন্ম সরকারের পয়সা লইয়া এত বড় পাপের উপর জুয়াচুরির পাপটা আর বাড়াইব না, স্থির করিলাম।

তাই এখানে আসিয়া পড়িয়া আছি, আর্ত্ত অসহায়ের কোনো সাহায্য যদি করিতে পারি...একটা নিরীহ প্রাণ নষ্ট করিয়া, একটা প্রকাণ্ড পরিবারের মস্ত আশ্রয় ভাঙিয়া দিয়া যে পাপ করিয়াছি, যদি তার একটু প্রায়শ্চিত্তও হয়……

খাস্তগীর মহাশয় স্তব্ধ হইলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ তখন ঘনাইয়া উঠিয়াছে। চারিধার শান্ত, স্তব্ধ…শুধু ঝিল্লীর ধ্বনি আর সেই কাঠঠোকরা পাখীটার কাঠ ঠোকার শব্দ এই স্তব্ধতার বুক চিরিয়া একটা কর্কশ রুক্ষতার সৃষ্টি করিতেছিল!

বাংলায় সমুদ্র-স্নান

শ্রীমতিলাল গুপ্ত, বি-এল

(কক্সবাজারে ও পথে)

(১)

বন্ধুবরের পূজার ছুটী মাত্র বার দিন, অথচ 'দেশ ভ্রমণে' যাওয়া চাই। সেই যে লোকে কথায় বলে—আড়াই গজ কাপড়, তাতে আবার চেষ্টারফিল্ড কোট্। হঠাৎ তিনি এক দিন আমার কাঁধে চাপিয়া বলিলেন, "এবার কোথাও যেতেই হবে—নইলে আর মুখ থাকে না। সবাই কার্শিয়াং, পুরী, দেওঘর চলে যাচ্ছে—আর আমরা কি শুধু ঘরে ব'সে থেকে তা শুনেই তৃপ্ত থাক্‌ব? তা হ'তে দিচ্ছি না। বল দেখি কোথায় যাওয়া যায়?" বন্ধুবরের বক্তৃতার শেষে আবার একটা কিন্তু রইল—"কিন্তু খরচ কম পড়া চাই।" উনি যে নাছোড়বান্দা, তা ছোট-বেলা হইতেই দেখিয়া আসিতেছি। তাই এটা ঠিক বুঝিয়া লইলাম যে, কোথাও যাইতেই হইবে; তা না হইলে নিস্তার নাই। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "তবে চল, বাংলা দেশের একমাত্র sea resort—বাংলার সাগর-পাড়ের সবেধন নীলমণি কক্‌স্ বাজারেই যাওয়া যাক্। যে'তে ঝঞ্ঝাটও কম, খরচও তোমার পকেটের মাপ মতনই হবে।"

আদিনাথ মন্দির

"কক্‌স্ বাজার? সে যে মগের মুল্লুক হে!"

এর পূর্ব্বে কক্‌স্ বাজারের কথা অনেকের মুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম। তাই বন্ধুবরকে অনেক কষ্টে বুঝাইয়া বলিলাম, "পুরী থেকে জগন্নাথ, পুরীর পাণ্ডা আর হৈ চৈ টা বাদ দাও—দিয়ে যা থাকে তাই কক্‌স্ বাজার।" এই Method of differenceএর যুক্তির উপর সেরা যুক্তি—খরচের হিসাবটা দেখাইয়া দিয়া তবে তাঁহাকে কক্‌স্ বাজারে যাইতে রাজি করান গেল। তৎক্ষণাৎ প্রোগ্রেম ঠিক হইয়া গেল। সমুদ্রের উন্মত্ত নর্ত্তন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য পথে কিছুটা পুণ্যি সঞ্চয় করিয়া যাওয়া দরকার। বিশেষতঃ তাঁহার আঙ্গিনা দিয়াই যখন যাইতে হইবে, তখন তাঁহাকে একটা ভেট পর্য্যন্ত না দিয়া গেলে, বাবা চন্দ্রনাথ বা বাঁকিয়া বসেন। তাই কথা রহিল—পথে সীতাকুণ্ডে নামিয়া, বাবা চন্দ্রনাথের মন্দির দ্বারে মাথা ঠেকাইয়া, বাবার মাথায় অন্ততঃ একটা বিল্বপত্র দিতেই হইবে। তারপর চট্টগ্রাম সহরটা দেখিয়া কক্‌স্ বাজার যাওয়া যাইবে।

বিজয়া দশমীর দিন ৺মায়ের বিসর্জ্জন নির্ব্বিঘ্নে সমাহিত হইতে দেখিয়া মায়ের নাম স্মরণ করিয়া রওয়ানা হইলাম। বন্ধুবর বর্ণশ্রেষ্ঠ তাই ঘটী ও গামছা লইতে ভুলিলেন না।

মধ্যম শ্রেণীর একখানা কাম্‌রা খালি দেখিয়া, শুভ বিজয়া দশমীতে যাত্রার ফলটা হাতে হাতেই মিলিয়া গেল মনে করিয়া, বন্ধুবর কুলীর মাথা হইতে তল্পিতল্পা গাড়ীতে নামাইয়া বিছানা অবধি পাতিয়া ফেলিলেন। আমি আসিয়া চাহিয়াই দেখি "Ladies only"! দেখিয়াই চক্ষু স্থির। বন্ধুবর বলিলেন, "তাই ত হে," গাড়ী প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, এ সময়

বিছানাপত্র গুটাইয়া তল্পাতল্পা লইয়া ভিন্ন গাড়ীতে যাওয়া অসম্ভব। কি আর করি—তাড়াতাড়ি "Ladies only" কাঠখানা সরাইয়া গাড়ীটাকে Lad এর করিয়া লওয়া গেল। যদি নেহাৎই গাড়ী বদ্‌লাইতে বাধ্যই করে, তবে কুলী ডাকাইয়া মালটা লইয়া যাইবার অবকাশটা তো নিশ্চয়ই মঞ্জুর করিবে—এ ভরসাটুকুতেই মনটাকে আশ্বস্ত করিয়া সটান শুইয়া পড়িলাম।

(২)

"ধুম্ ষ্টেসনে প্রথম ঘুম ভাঙ্গিল, সীতাকুণ্ডে রাত পোহাইল। টিকেটের অর্দ্ধেকখানা মাষ্টার বাবুকে অর্পণ করিয়া বাহিরে আসিতে না আসিতেই মহাভারত পাণ্ডা, হরকিশোর পাণ্ডা আরও কত পাণ্ডার চীৎকার আমাদিগকে "পুরাতন ভৃত্যে"র সেই……

"দক্ষিণে বামে পিছনে সম্মুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।"

কথা মনে করাইয়া দিল। বন্ধুবরের নিকট হইতে ধার-করা এণ্ডিখানা গায়ে দেখিয়াই বোধ হয় তাহারা আমাকে মূলাধার চক্র সাব্যস্ত করিয়া এমন সপ্তরথীর বেষ্টনে বেষ্টিত করিয়া ফেলিল যে, অগত্যা নিষ্কৃতির অন্য কোন পথ না দেখিয়া সঙ্গীকে দেখাইয়া বলিলাম যে, উনি আমার পুরোহিত, আমি শুধু ওঁর সঙ্গে আসিয়াছি। ভাগ্য চক্রে তাঁহার যজ্ঞোপবীত খানাও তখন আংশিকরূপে বাহির হইয়া ছিল। তাহাতেই আমি সে যাত্রার মতন বাঁচিয়া গেলাম। যাহা হউক, মীমাংসা হইল যে, যে প্রথম দাবী করিয়াছে, তাহার দাবীই গ্রাহ্য হইবে। "রায়" মুখ হইতে বাহির হইতে না হইতেই বিষম সমর-বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষের মতন বুক্ ফুলাইয়া শ্রীযুত ক্ষুদিরাম পাণ্ডা তাহার নোংরা কাপড়খানাতে গায়ের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া ততোধিক নোংরা যজ্ঞোপবীতখানা বাহির করিয়া আমাদের সম্মুখে পথ দেখাইয়া চলিল।

পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়ীর সদর দরজা পার হইয়াই দেখিলাম যে, আরও বহু শিকার তিনি জুটাইয়াছেন। আমরা দু'জন ছাড়া বাকী সকলেই সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করিতে আসিয়াছেন।

খবর লইয়া জানিলাম, সম্প্রতি তাঁহারা কামাখ্যা হইতে আসিতেছেন। তীর্থে পুণ্য করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। আমাদের মতন "দেশ ভ্রমণ করিতে" তাঁহারা বাহির হন নাই। তাঁহাদের দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখিয়াই মনে হইল, পাণ্ডা ঠাকুর "fall in" এর আদেশ দিয়া নূতন শিকারের আশায় ষ্টেসনে গিয়াছিলেন—এবার 'quick march' এর আদেশ দিবেন। ঘটিলও তাই। বাড়ী ঢুকিয়াই তিনি আমাদিগকে, জামা জুতা ছাড়িয়া, কাপড় গামছা বগ্‌লে লইয়া রওয়ানা হইবার জন্য তাড়া-হুড়া আরম্ভ করিলেন। কি আর করি—তল্‌পী-তল্‌পা পাণ্ডা ঠাকুরের নিজ ঘরে রাখিয়া, জুতা ছাড়িয়া, গাম্‌ছা কাপড় লইয়া দলে ঢুকিয়া পড়িলাম।

সমুদ্রতীরে ঝর্ণা—কক্সবাজার

পাণ্ডা ঠাকুরকে বলিয়া দিলাম—আহারের ব্যবস্থাটা তাহার সরকারে হইলেই ভাল হয়।

যাত্রা সুরু হইল—

সীতাকুণ্ডের প্রধান রাস্তা একটা। তাহাই পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তার লাভ করিয়া, পশ্চিমাংশ সহরে ও পূর্ব্বাংশ চন্দ্রনাথের মন্দির পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রথমেই পাহাড়ের পাদদেশে ব্যাসকুণ্ড; স্নানের জন্য মহিলাদের ভিন্ন ব্যবস্থা থাকা সত্বেও, আমাদের সঙ্গীর মহিলারা কটিদেশে গাম্‌ছা বেষ্টন্ করিয়া কুণ্ডে নামিয়া

পাড়লেন। অগত্যা আমরাহ একটু আড়ালে সরিয়া দাঁড়াইলাম। পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকেও স্নান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা বলিলাম, "ঐটুকুই মাপ্‌ কর্‌তে হচ্ছে ঠাকুর! ব্যাসদেব মাথায় থাকুন। এমন ভোরে এমন ঠাণ্ডায় আমাদের ধাতে স্নানের পুণ্যি সইবে না।" বন্ধুবর তবুও মাথায় জল ছিটাইয়া ঝাঁকি দিয়া স্নানের পুণ্যি করিয়া লইলেন। সে সময় হইতেই পাণ্ডা ঠাকুর আমাদিগকে পাষণ্ড ঠাওরাইয়া এর পর আর কোথাও কোন ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করেন নাই।
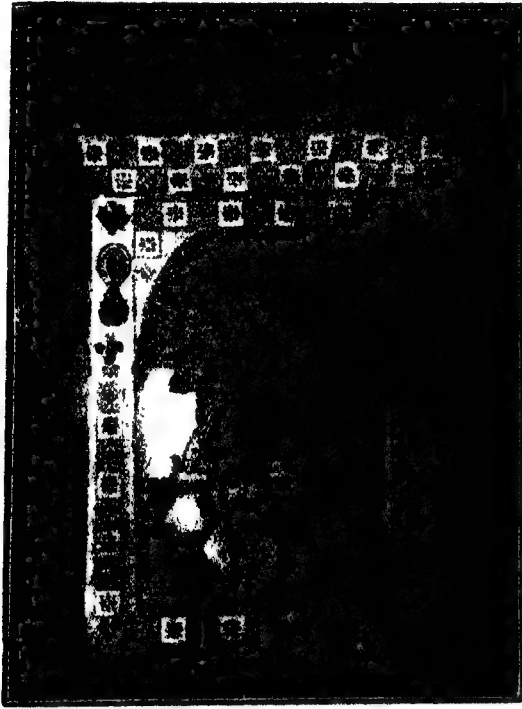
আদিনাথ মন্দিরে দেবীমূর্ত্তি

এবার সম্মুখেই পাহাড়ের শ্রেণী। দুই দিকে উঁচু পাহাড়, মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়াছে। দূরে চাহিয়া দেখিলাম পাহাড়ের গা ক্রমে পাথরে পরিণত হইয়া অতি উচ্চ প্রাচীরের আকার ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া ভরতপুরের দুর্গ-প্রাকারের চিত্র মনে পড়িল। শুনিলাম, এই পাহাড়ের মাঝামাঝি পথ বাহিয়াই আমাদিগকে উনকোটী শিবের বাড়ী যাইতে হইবে। ভারী ভয় হইল। ভাবিয়া পাইলাম না—এই প্রকার উঁচু খাড়া পাহাড়ের কটিদেশে রাস্তা কোথায়?

আমরা সীতাকুণ্ড দক্ষিণে রাখিয়া প্রথমে শম্ভুনাথের বাড়াতে উঠিলাম। দেখিলাম, মন্দিরের দরজা বন্ধ। তাই উনকোটী শিবের বাড়ী হইয়া পথে বিরূপাক্ষের মন্দির দেখিয়া সর্ব্বশেষে সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসীন বাবা চন্দ্রনাথের মন্দির দ্বারে বিশ্রাম করাই স্থির হইল। শম্ভুনাথের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিতেই বুঝিলাম, কলিযুগে কৈলাসের চিরন্তন পাহারাদার নন্দী ভৃঙ্গী বিদায় লইলেও, বাবার রাস্তায় পাহারার অভাব নাই। পা বাড়াইতেই পদে পদে ছিনে জোঁকের দংশন সহিয়া তবে চন্দ্রনাথের মন্দিরে পৌঁছিতে হয়।

শম্ভুনাথের মন্দির ছাড়াইয়া কিছু দূর গেলেই, বাম দিকে উনকোটী শিবের বাড়ী হইয়া বিরূপাক্ষের বাড়ী যাইবার কাঁচা রাস্তা ও দক্ষিণ দিকে চন্দ্রনাথের মন্দিরে যাইবার পাকা রাস্তা। আমরা কাঁচা রাস্তা ধরিয়াই চলিলাম। এই রাস্তাই একটী উচ্চ গিরিশৃঙ্গের মাঝামাঝি অগ্রসর হইয়া উনকোটী শিবের বাড়ী পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। কতক-দূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, আমাদের ভয় নেহাৎই ভিত্তিহীন নহে। তবে কোন এক মহানুভব ব্যক্তি রাস্তাটী রেলিং দিয়া ঘেরাও করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই রক্ষা। আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে উনকোটী শিবের বাড়ীতে পৌঁছিলাম।

উনকোটী শিবের কোন মন্দির নাই। চতুর্দ্দিকে অতি প্রকাণ্ড গোলাকার প্রস্তর বেষ্টিত কোটরের মধ্যেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত। উপর হইতে ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া অনবরত ঝরণার জল গড়াইয়া পড়িতেছে। আমার মনে হয়, তাহাতেই প্রস্তর ক্রমে ক্ষয়ীভূত হইয়া শিবলিঙ্গের আকার ধারণ করিয়াছে। সংখ্যায় ত উনকোটী, আমরা কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও একজন শিবকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। বুঝি বা পাপীর চক্ষে উঁহারা ধরা দেন না। উনকোটী শিবের বাড়ী হইতে পাহাড়ের গা বাহিয়া যে খাড়া রাস্তা বিরূপাক্ষের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, সেই রাস্তাটাই একটু বিপজ্জনক। শুধু গাছের শিকড় আশ্রয় করিয়া এই খাড়া পাহাড়ে চলিতে হয়। একটু অসাবধান হইলেই বিপদ—কীচক বধের পুনরভিনয়!—একবারে মাংসপিণ্ড! আমাদের দলে যে সকল বৃদ্ধা ভদ্র মহিলা ছিলেন, তাঁহাদের তো প্রাণান্ত! এঁদের এমন রাস্তায় লইয়া আসায় আমরা পাণ্ডা ঠাকুরের কৈফিয়ৎ তলপ্‌ করিলাম। উনি বলিলেন যে,

তাঁহারা জানিয়া শুনিয়াই এই রাস্তায় আসিয়াছেন। পাশেই একটী বৃদ্ধা লাঠিতে ভর করিয়া উঠিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন "ওগো, যে রাস্তায় নাবতে হয় ও রাস্তায় উঠা যায় না। তা হ'লে পুণ্যি হয় না।" বৃদ্ধার অসাধারণ ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।

বিরূপাক্ষের বাড়ীতে দুইটি মন্দির দেখিলাম। একটি অতি পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ। পুরাতন মন্দিরটীর গায়ে হিন্দু যাত্রীদের বাবা চন্দ্রনাথের উপর অগাধ বিশ্বাসের চমকপ্রদ নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে। কলিকাতায় যে যে বাড়ীর দেওয়ালে "stick no bill" লেখা থাকে, সেই সকল দেওয়ালেই যেমন যথা সম্ভব যত্ন সহকারে বিজ্ঞাপন লাগান হইয়া থাকে, তেমনি বিরূপাক্ষের পুরাতন মন্দিরটীর গায়ে "বাবা চন্দ্রনাথের শপথ, এ দেয়ালে কিছু লিখিবেন না" কথা কয়টী লিখিয়া দেওয়াতেই যেন বিনা পরিশ্রমে ও চেষ্টায় ও বিনা খরচে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার প্রয়াসী ভক্তের দল মন্দিরের আপাদমস্তক নানা বিচিত্র বর্ণে তাহাদের নাম লিখিয়া এমন কি খোদাই পর্য্যন্ত করিয়া মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।

বিরূপাক্ষের বাড়ী হইতে চন্দ্রনাথের বাড়ী যাইবার রাস্তা বেশ বাঁধান। পাহাড় খুব উঁচু বটে তবে উঠিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। চন্দ্রনাথের বাড়ীর কাছাকাছি পৌছিতেই, পাণ্ডাদের চীৎকার ও গঞ্জিকার উগ্র গন্ধ আমাদিগকে সম্বর্দ্ধনা করিল। একটু অগ্রসর হইয়া মন্দিরের ভিতর চাহিয়া দেখিলাম, একদল পাণ্ডা যাত্রীদিগকে বাবা চন্দ্রনাথের স্তোত্র অশুদ্ধ পাঠ করাইয়া সারিয়াই, যাত্রীরা বাবা চন্দ্রনাথের মাথায় নারিকেল জল দিবামাত্র, নারিকেলটী তাহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া মন্দিরের ভিতরই কাড়াকাড়ি করিয়া আহার সুরু করিয়া দিয়াছে।

কান্ত কবি সত্যই গাহিয়া গিয়াছেন—

অশুদ্ধ চণ্ডীপাঠ এল, এল মূর্খ পূজক
পুরুত সঙ্গে টিকি এল বিশুদ্ধাচার সূচক!
রেশমী নামাবলী এল নিষ্ঠাবত্তার সাক্ষী
"ইদং ধূপ" এবম্প্রকার এল শুদ্ধ বাক্যি।

*   *   *   *

ব্রাহ্মণদের কলায় এল বিধবাদের উপোস
পকেট কাটার কাঁচি এল বদমাইসের মুখোস্
শাক্তের এল বাঁয়া তবলা বৈরাগীদের খোল্
কেবল একটী জিনিস এল না তাই দেখে গণ্ডগোল।

এখানেও ঐ ভক্তি জিনিসটীর অভাব। হায় রে ভক্তি! তবে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়া উঠে, চন্দ্রনাথের শিখরে দাঁড়াইয়া প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিলে। কি অনির্ব্বচনীয় দৃশ্য! দূরে কর্ণফুলী তাহার ভরা যৌবন লইয়া সমুদ্রের বুকে লুটাইয়া পড়িয়াছে। মধ্যে সবুজ ধান্য ক্ষেত্রের আভরণ, আর এখানে আকাশস্পর্শী চন্দ্রনাথের উচ্চ শিখর নীরব নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া। বর্ণনার ভাষা নাই—কবির সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে গেলে বলিতে হয়—

বৌদ্ধ মন্দির—কক্সবাজার

"আমি শুদ্ধ চেয়ে চেয়ে দেখি আর শুধু স্তব্ধ হয়ে রহি।" হিন্দুর তীর্থ সকল ভারতের সেরা জায়গা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে।

(৩)

আমরা ৩ টার গাড়ীতে সীতাকুণ্ড হইতে চট্টগ্রাম চলিয়া আসিলাম। পরদিন সারাদিন ভরিয়া চট্টগ্রাম সহর দেখিয়া তার পর দিন প্রাতে কক্স্ বাজার রওয়ানা হইলাম।

টার্নার মরিশন্ ঘাট হইতে ষ্টিমারে কক্স্ বাজার যাইতে

হয়। সাধারণতঃ (Nilla ও Mallard) "নীলা ও মেলার্ড" নামক দুইটী ষ্টীমার কক্‌স্ বাজারে যাতায়াত করিয়া থাকে। মেলার্ড অসুস্থ হইয়া কলিকাতা যাওয়ায় (Mavis) "মেভিস্" নামক অন্য একটী ষ্টীমারই তাহার পরিবর্ত্তে কাজ করিতেছে। "মেভিস্" একতলা ছোট ষ্টীমার। তাই কক্‌স্ বাজারের পূজার যাত্রার দল পারতপক্ষে কেহই "মেভিসে" যাইতে চাহে না। নীলা দ্রুতগামী। আমরাও নীলার যাত্রী। ভোরে ৮টায় ষ্টীমার ছাড়িবার কথা। ডাক আসিতে দেরি হওয়ায় ষ্টীমার ৯টায় ছাড়িল।

কর্ণফুলী নদী বাহিয়া কয়েক মাইল গেলে খোলা সমুদ্র। সমুদ্রে মাত্র কুতুবদিয়া পর্য্যন্ত ঘণ্টা দুই আড়াই চলিয়া চ্যানেলে ঢুকিতে হয়। বাকী রাস্তা কয়েকটা চ্যানেলের বুক চিরিয়া ভোলা ও তীর্থস্থান আদিনাথ ছুঁইয়া তবে কক্‌স্ বাজার পৌঁছিতে হয়। কক্সবাজার পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই "মহিষখালি" চ্যানেলের উপর আদিনাথ পাহাড় শান্তিপূর্ণ পুণ্যমন্দির বুকে লইয়া উন্নত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। চন্দ্রনাথ পাহাড় হইতে সমুদ্রের শোভা সুদূর চিত্রপটের ন্যায়। আর এখানে সমুদ্র আদিনাথের পাদধৌত করিয়া সূর্য্যাস্তের মনোরম চিত্রফলকে রঞ্জিত হইয়া জীবন্ত ভাবে অবিরাম নৃত্য করিতেছে।

আমরা যে দিন রওয়ানা হইলাম, সে দিন সমুদ্র খুব শান্ত ছিল। তাই ষ্টীমার মোটেই দোলে নাই। আর এ রাস্তাটুকুতে ষ্টীমার বর্ষার সময় ছাড়া বড় একটা দোলে না। ফলে, এ রাস্তায় সামুদ্রিক পীড়ায় কাহাকেও ভুগিতে শুনা যায় না। সামুদ্রিক পীড়া ত দূরের কথা—যাহার সাধারণ ডিঙ্গি নৌকা চড়িলে নদী-পীড়া হইতে আরম্ভ করিয়া খাল-পীড়া অবধি হইয়া থাকে, এ হেন আমি যখন নির্ব্বিঘ্নে কক্‌স্ বাজার পৌঁছিতে পারিলাম, তখন অন্য কাহারও ভয়ের যে কোন কারণই নাই, তাহা শপথ করিয়া বলিতে পারি।

সমুদ্রতট হইতে কক্সবাজার

আমাদের ষ্টীমার ৩॥০ টায় "বাঁকখালি" (নামটা বাঁকখালি হইলেই বেশ মানাইত) নদীর মোহনায় পৌঁছিল। বাঁকখালি নদীর দক্ষিণ তীরেই কক্‌স বাজার অবস্থিত। মোহনা হইতে ষ্টীমার ষ্টেসন (কস্তুরা ঘাট) প্রায় ২।৩ মাইল ভিতরে। পূর্ণ জোয়ার না পাইলে 'নীলা' কস্তুরা ঘাট পর্য্যন্ত যাইতে পারে না। ষ্টীমার থামিলেই বহু 'সাম্পান্' আসিয়া ষ্টীমারের গায়ে ভিড়িতে লাগিল। সাম্পান্ সমুদ্রের নৌকা—তাই একটু অদ্ভুত। পূর্ব্বকালে নৌকার "পক্ষীরাজ" নামটা যদি আকারেরও নির্দ্দেশক হয়, তবে সাম্পান্‌কে "পক্ষীরাজ" শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে

পারে। 'সাম্পানের সম্মুখ-ভাগ পাখীর মাথা হইতে বুক পর্য্যন্ত,—পশ্চাৎভাগ লেজের অনুরূপই বটে। নৌকার মাঝামাঝি আরোহীদের বসিবার জন্য হেলান দেওয়া চেয়ারের ব্যবস্থা আছে। আবার অধিক সংখ্যক আরোহী হইলে চেয়ার সরাইয়া লম্বা ফরাশের বন্দোবস্তও করা চলে। মাঝি পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে দুই দাঁড় ঠেলিয়া নৌকা চালাইয়া থাকে।

আমরা একটা সাম্পানে চাপিয়া বসিলাম। কতকদূর যাইতে দেখিলাম, এক দল লোক 'বাঘখালি'র মুখেই নামিয়া পড়িতেছে। খোঁজ লইয়া জানিলাম, এখান হইতেই

পাহাড়ে বৌদ্ধ-মঠ—কক্সবাজার
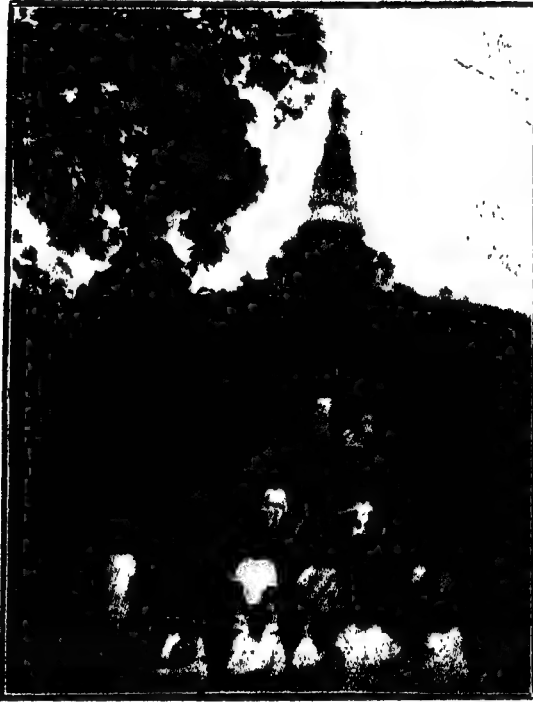
সমুদ্রের তীর ধরিয়া কক্সবাজারে যাওয়া যায়। আমাদেরও ওপথে যাইবার ভারি প্রলোভন হইল,—কিন্তু সঙ্গে যে লট-বহর! সাম্পান্ চলিতে লাগিল। বাঘখালির মুখে কিয়দ্দূর ঢুকিতে না ঢুকিতেই তাড়াতাড়ি পকেট হইতে রুমাল খুলিয়া নাকে গুঁজিতে বাধ্য হইলাম। ভবিষ্যতে যাত্রীদেরও সাবধান করিয়া দিতেছি—"সাম্পানে" উঠিয়াই রুমালে নাক ঢাকিবেন, নতুবা অন্নপ্রাশনের অন্ন অবধি বাহিরে লাফাইয়া আসিতে চেষ্টা করিবে। বাঘখালির মোহনায়' কক্সবাজারের প্রবেশ-দ্বারে মগদের মাছ শুকাইবার আড্ডা। অতি চমৎকার ব্যবস্থা। এ যেন যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শন। স্বর্গে যাইতেও নরক দেখিয়া যাইতেই হইবে। আমরা তো অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া 'কাঁচকলা' দেখাইলে ক্ষেপিয়া অস্থির হই। শুনিয়াছি, জাভার লোকেরা আবার এই অঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া বাহবা দিয়া থাকে। ও-দেশে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইলেই বুঝিতে হয়, তাহারা করতালি দিতেছে। মগদেরও এহেন সুবাস বিতরণ করিয়াই অতিথির অভ্যর্থনা করার রীতি কি না কে বলিবে? বিচিত্র জগৎ বিচিত্রতাময়!

যাহা হউক, কস্তুরা-ঘাট পৌঁছিতে বেলা ৪৷৷৹টা অতীত হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি কুলীর মাথায় বিছানাপত্র চাপাইয়া দিয়া বাসায় চলিলাম। প্রথম পোষ্টাফিস্ (পৌঁছ খবরটা পৌঁছা মাত্রই দেওয়া যাইতে পারে), তার পর থানা (অভিযোগের কারণ থাকিলে কাল-ব্যয় না করিয়াই করা চলে), তার পর ৺কালী-বাড়ী (নিরাপদে পৌঁছার জন্য তৎক্ষণাৎ সভক্তি প্রণাম জানান যায়)—এই ত্রয়ী বামে রাখিয়া তবে সহরে ঢুকিতে হয়। আবার কালী-বাড়ী বামে রাখিয়া ডান্ দিকে চলিয়া গেলে ঝাউ-গাছের avenue—দুপাশে ঝাউগাছে ঘেরা অতি প্রশস্ত রাস্তা। আমরা এই রাস্তা ধরিয়াই চলিলাম। বাসায় পৌঁছিতেই কুলীর মাথা হইতে মোট বহর নামাইয়া তাহাকে বিদায় করিয়া সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম—ভাবিলাম, এবার বিশ্রাম। কিন্তু বিশ্রামের যো কই? বন্ধুবর বলিয়া উঠিল "চল সমুদ্রে!" বেশ একটু বিরক্তি আসিল। কিন্তু সমুদ্রতীরে যাইতেই বন্ধুবরের উপর বিরক্তি তিরোহিত হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সারাদিনের শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলিয়া গেলাম। সমুদ্রের সে সময়ের মহান্ দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে সমুদ্রের বুকে নামিয়া আসিতেছিল। উপরে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ, নিম্নে গর্জ্জনশীল অনন্ত নীল জলরাশি। সমুদ্র বেলায় দাঁড়াইয়া মনে পড়িল দ্বিজুবাবুর—

"উপরে নির্ম্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটী কোটী নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির—
নিষ্ফল চীৎকার ক্ষুদ্র আস্ফালন পরে,
রহে সে গম্ভীর গাঢ় অনুকম্পা ভরে॥"

* * * * *

ঈশ্বর দেখেন যথা করুণা নীরব

গাঢ় স্নেহে মানুষের দম্ভ অভিমানে—

আছে সে চাহিয়া ক্ষুদ্র জলধির পানে।

(৫)

কক্স্ বাজার চট্টগ্রাম জেলার অতি ক্ষুদ্র মহকুমা। এখানে একজন সব্-ডিভিশ্যনাল আফিসার, একজন সেকেণ্ড অফিসার, একজন অনারেরী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও একজন মুন্সেফ্ বিচার কার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। বার জন উকীল ও তের জন মোক্তার তাঁহাদের বিচারকার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকেন।

সহরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক ঘেরিয়াই পাহাড় ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইয়া দিগন্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-দিক্‌টার খানিক্‌টা পাহাড়ের উপরেই যাবতীয় সরকারী আফিস্, স্কুল, জেলখানা ও সরকারী ডাক্তারখানা। একজন এসিষ্ট্যাণ্ট্ সার্জ্জনই ডাক্তারখানার চার্জ্জে আছেন। সমুদ্রের হাওয়া তাঁহার ব্যবসাটাকে একেবারেই মাটী করিয়া ফেলিয়াছে। শুধু বর্ষাকালটাই না কি তাঁহার পক্ষে একটু সুসময়।

কাছারী পাহাড় হইতে সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাড়ীগুলি—কক্সবাজার

কক্স্ বাজারের আদিম অধিবাসী মুসলমান। শুনা যায়, আরাকান্ যুদ্ধের সময় কয়েক দল মিরজাফর শ্রেণীর মগ্ ইংরেজদিগকে খুব সহায়তা করিয়াছিল। তাহাদের কৃত কর্ম্মে তাহারা ক্রমে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হইয়া পড়ে। কর্ণেল কক্স্ সাহেব প্রত্যেক বিশ্বস্ত (?) মগকে কতক ভূমি বিনা করে মগোত্তর (কি বলিব—দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর তো বলা যায় না) করিয়া দিয়া এই সহরেই তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তৎকাল হইতেই এই স্থানের "কক্স্ বাজার" নামকরণ হইয়াছে। আদিম অধিবাসী মুসলমান হইলেও মগেরাই এখন প্রধানতম অধিবাসী। মগপাড়া কক্স্ বাজারে নবাগতদের প্রধান দ্রষ্টব্য। এমন ছোট সহরে মগের নয়টী সুশোভিত কিয়াংঘর ; অথচ মুসলমানের অশোভিত মস্‌জিদও বিরল।

মগেরা বড় বিলাসী জাতি। পরিধানে বিচিত্র বর্ণের রেশ্‌মী লুঙ্গী। মাথায় রেশ্‌মী রুমাল, গায়ে রেশ্‌মী জামা। তবে মগ্ রমণীরা বিলাসী হইলেও পুরুষদের মতন এত অলস নহে। মগপাড়ার মধ্য দিয়া একটু বেড়াইয়া আসিলেই দেখা যায় যে, মগ্ পুরুষেরা দিব্যি সিগার মুখে দিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া আড্ডা জমাইতেছে। আর মগ্ রমণীরা ঘরকন্না হইতে আরম্ভ করিয়া লুঙ্গী তৈরী আদি সকল কাজই নীরবে করিয়া যাইতেছে। সিগার অবশ্য মগ্‌দের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই পান করিয়া থাকে ; এমন কি ৩।৪ বৎসর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদেরও সিগার টানিতে দেখা যায়। তবে একটা আশ্চর্য্য—আমাদের পাড়াগাঁয়ের ছেলে-মেয়েদের মতন একটী মগ বালক-বালিকাকেও দিগম্বর বেশে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতে দেখিলাম না।

মগ্ পাড়ার প্রতি বাড়ীই এক ছাঁচে ঢালা। কারো ভাঙ্গা খড়ের ঘর, আর কারো সেগুন কাঠে ঘেরা ঢেউ-টিনের ঘর—এই পার্থক্য। পাকা বাড়ী তো গবর্ণমেণ্টের আফিস ভিন্ন বড় একটা দেখিতেই পাওয়া যায় না। নীচে খুঁটী পুঁতিয়া তাহার উপর কাঠের পাটাতন করিয়া তাহারা ঘরের ভিটা রচনা করে। পাটাতনের নীচেটা সাধারণতঃ তাঁতের কাজেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মগ্‌দের তাঁতও আসামের পাহাড়িয়াদের তাঁতের মত কোমরে-বাধা তাঁত

(নন্ কো-অপারেশনের পর এ তাঁত গামছার তাঁত নাম লইয়া আমাদের বাঙ্গালীর ঘরেও শুভ পদার্পণ করিয়াছে)।

আহারেও মগেরা কম বিলাসী নয়। তাহারা ঝিনুক হইতে আরম্ভ করিয়া ঝিঁঝিঁ পোকা অবধি সব কিছুই খায় বটে, তবে যে চাউলের ভাত তাদের নিত্য আহার্য্য, তাহা অতি সুচিকণ ও সুগন্ধ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখানে কিয়াংঘর নয়টী। প্রতি কিয়াংঘরেই একজন করিয়া পূজারী তাহার শিষ্য-সেবক লইয়া বাস করে। পূজারীদিগকে মগেরা ফুঙ্গি বলিয়া থাকে। প্রতি কিয়াংঘরে একটী করিয়া ঘর ও ২।৩টী মঠ থাকে। ঘরে বৌদ্ধমূর্ত্তিও আছে, আবার ফুঙ্গীরাও বাস করে। আর মঠে শুধু বৌদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ঘরের বৌদ্ধমূর্ত্তি রীতিমত দৈনিক পূজা পাইয়া থাকে। যে পাড়াতে যে কিয়াংঘর সে পাড়ার লোকদেরই পালা অনুসারে সেই কিয়াংএর ফুঙ্গীদের আহার যোগাইতে হয়। প্রাতে এবং সন্ধ্যায় কিয়াংঘর হইতে একটী ঘণ্টা (শুনিলাম কাঠের) নিনাদিত হয়। সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিলেই বুঝিতে হয় যে, ফুঙ্গীদের আহারের সময় হইয়াছে। আহার্য্য বহিয়া লইয়া যাইবার জন্ত একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত সুগঠিত সুন্দর পাত্র ব্যবহৃত হয়। এই পাত্রের ভিতরে আবার ভিন্ন ভিন্ন আহার্য্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সাজাইয়া লইয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে।

ফুঙ্গীরা গৃহত্যাগী, অবিবাহিত সন্ন্যাসী। আবাল্য তাহাদিগকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়া, রীতিমত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া, ব্রহ্মদেশ হইতে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া, তবে ফুঙ্গীত্বের সার্টিফিকেট লইয়া আসিতে হয়। কক্স বাজারের ফুঙ্গীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যভিচারের অভিযোগ এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। তবে তাহারা যে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় নিত্য রাজ-ভোগ করিয়া থাকে, এ কথাটা নিছক্ মিথ্যা বলিয়া আমার মনে হয় না। কারণ, তাহাদের আহারের যেরূপ ব্যবস্থা, তাহাতে পালানুসারে প্রতি মগ গৃহস্থকে মাসে একবার করিয়াই বোধ হয় ফুঙ্গীর আহার যোগাইতে হয়। তাই যেদিন যাহার পালা সে দিন সে যথাসাধ্য যত্ন ও ব্যয় সহকারেই আহারের আয়োজন করিয়া থাকে। ফলে ফুঙ্গীদের প্রতিদিনই বিরাট ভোজের অনিচ্ছাকৃত ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

বাঁকখালি নদীতে "মেভিস্" ষ্টীমার ও সাম্পান্

প্রতি কিয়াংঘরের সঙ্গেই একটা পাঠ-গৃহ আছে। তাহাতে মগ বালক-বালিকারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকে। এ যেন ফুঙ্গীদের ঋণ পরিশোধ—আহার্য্যের পরিবর্ত্তে শিক্ষাদান!

কিয়াংঘরে যাইতে হইলে জুতা একেবারে সীমানার বাহিরে রাখিয়া তবে বাড়ীর চত্বরে ঢুকিতে হয়। কলিকাতার পরেশনাথের মন্দিরের মতন রাজবংশীয়ের জন্য

ফ্ল্যাগষ্টাফ হিল্—কক্সবাজার (Flagstaff Hill)

এখানেও মকমলের জুতার ব্যবস্থা আছে কি না জানি না। আমার পায়ে চর্ম্মহীন নিরামিষ পাদুকা ছিল। ভাবিলাম, ইহাতে কিছু বাধিবে না। কিন্তু কিয়াংঘরে ঢুকিতেই আর যায় কোথায়—পঙ্গপালের মত মগ ছেলের দল দৌড়িয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া তাহাদের অধিগত পুঁথির ভাষায় বলিতে লাগিল—"জুতা পরিধান করিয়া এই কিয়াংঘরে আসিবে না।" শুধু কি তাই! জাতি-সুলভ বিচিত্র মুখভঙ্গী আদি আরও এমন অনেক কিছু বিশিষ্ট ব্যবহার করিতে সুরু করিল যে, আমরা সে যাত্রার মত সেই কিয়াংঘর দেখা স্থগিত রাখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

মগ পাড়ার মধ্যে উঁচু পাহাড়ের উপরে কিয়াং ও ৺মাগন দাস বাবুর বাড়ীর পাশের কিয়াং এই দুইটি আমার চোখে বেশ ভাল লাগিল।

মগদের শ্মশানে কোন কিয়াং নাই; কিন্তু একজন ফুঙ্গীকে সেখানে বাস করিতে দেখিলাম। মগদের মধ্যেও কি তান্ত্রিক উপাসনা প্রচলিত আছে? আমরা তাহার সঙ্গে আলাপ করার জন্য একটু অগ্রসর হইতেই, সে তাহার বাস-গৃহের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল,—আমরা থাকা অবধি আর বাহিরে আসিল না। শুনিলাম, মগেরা হিন্দুদের মত মৃত দেহ দাহই করিয়া থাকে। কিন্তু তথায় কয়েকটা কবরও দেখিতে পাইলাম।

মগেরা শব-দেহকে নাকি খুব উৎসবের সহিত শোভা-যাত্রা করিয়া শ্মশান পর্য্যন্ত বহিয়া আনে। সেই প্রসেসনে সহরের সমস্ত মগ—আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাহাদের উৎসবের পোষাকে সজ্জিত হইয়া, ফুলসাজে সাজিয়া শবের অনুগমন করে। শুনিলাম, ইতিমধ্যে একজন ফুঙ্গী দেহ-রক্ষা করিয়াছে। তাহার মৃত্যুতে আমোদ-প্রমোদের জন্যই ২০।২৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হইবে। আগামী বৈশাখ মাসে সে উৎসব সম্পন্ন হইবে। স্থানীয় লোকদের মুখে শুনিলাম, এ উৎসব অতি বিরাট্—দেখ্বার মতন ব্যাপারই হইবে।

কক্স বাজারে প্রতিদিন ভোরে হাট বসে। হাটে তরিতরকারী, মাছ, পায়রা, হাঁস, পেঁপে, কলা, আনারস ইত্যাদি সব রকমের আহার্য্যই প্রচুর পরিমাণে বেশ সুলভে পাওয়া যায়। বিস্কুট মাখন জেম্ জেলি, এমন কি, সসেরও (sauce) এখানে অভাব নাই। তবে একটু

কিয়াংঘর

অসুবিধা তাহাদের, যাহারা ময়রার দোকানের পক্ষপাতী! বাজারে অনেক মগ রমণীকে এক রকম ভাত বিক্রয় করিতে দেখিয়াছি। তাহা না কি চিনি সহযোগে আহার করিতে

হয়। শুনিলাম, বেশ সুস্বাদু; কিন্তু স্বাদ গ্রহণে সাহস হইল না। মিষ্টান্নভোজী কেহ সাহস করিয়া চাখিয়া দেখিতে পারেন।

(৬)

কক্স বাজারের প্রধান উপভোগ্য ভোরে স্নান ও অপরাহ্নে ভ্রমণ।

প্রথম দিনের স্নানের অভিজ্ঞতাটুকু এ জীবনের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়াও এমনি উজ্জ্বল ভাবে মনে পড়িবে। সে দিন ২।৪টা ঢেউ ঘাড়ে লইয়া একরাশ নোনা জল উদরস্থ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে বালু মাখাইয়া সর্ব্বশেষে তোয়ালেখানা সমুদ্রকে ঘুষ বাবদ দান করিয়া তবে আসিয়া তীরে দাঁড়াইলাম। সমুদ্র-বেলার বালুর উপর বসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে তেমন দুরবস্থায়ও মনে পড়িল, কবি সত্য গাহিয়াছেন—

"অগাধ অস্থির প্রেমে আসো তুমি বক্ষে ধরণীর
বিপুল উচ্ছ্বাসে মত্তবেগে দৈত্যসম তুমি বীর।
চাহ বক্ষে চাপিতে তাহারে ঘন গাঢ় আলিঙ্গনে
বুঝনা সে ক্ষীণদেহী এত প্রেম সহিবে কেমনে।"

আমরা তো ক্ষীণজীবী মানব। "এত প্রেম সহিব কেমনে"। তবে একবার স্নানের কায়দাটুকু আয়ত্ত করিতে পারিলে সে যে কি আনন্দ! কি আরাম! আমিও শেষে প্রায় এক ঘণ্টা স্নানে কাটাইতাম্।

জোয়ারের সময় স্নান করিতে হয়। আমরা ভোর হইতেই জোয়ারের আশায় বসিয়া থাকিতাম; আবার ওদিকে ১১টা বাজিয়া গেলেও বিপদ্। সমুদ্র-তীরে বালি এত গরম হইয়া উঠে যে পা ফেলাই দায় হয়। তাই যেদিন একটু বেলাতে জোয়ার আসে, সেদিন জোয়ারের প্রারম্ভেই স্নান সারিয়া ফেলিতে হয়। কক্স বাজারের স্নান পুরীর স্নানের মতন মোটেই আশঙ্কাজনক নহে। পুরীতে সমুদ্রের অতলে সলিল-সমাধি লাভ করার বিবরণ প্রায়ই শুনা গিয়া থাকে। কিন্তু কক্সবাজারে এমন দুর্ঘটনা একটিও ঘটে নাই। কক্স বাজারের সমুদ্র-বেলা ক্রমে ঢালু হইয়া সমুদ্রে মিলিয়া গিয়াছে—পুরীর মতন হঠাৎ সমুদ্রে লাফাইয়া পড়ে নাই। তাই ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া সাহসী সন্তরণকারী সবারই স্বচ্ছন্দ স্নানের আরাম কক্স বাজারে লাভ করা যায়। ইহাই কক্স বাজারে স্নানের সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

বেলা ৪টায়ই বেড়াইতে বাহির হইবার ধুম পড়ে।

"সিন্ধু-কুটীর"—কক্স বাজার

এখানে একটু সুবিধা,—বেড়াবার জন্য "সাজ সাজ" রব বড় একটা তুলিতে হয় না (মেয়েদের বেলা অবশ্য এ আইন থাকে না)। এখানে রিক্তপদে অতএব সাদাসিদা পোষাকেই বেড়ান চলে, কারণ বালির উপরে সপাদুকা হাঁটা কষ্টসাধ্য।

কক্স বাজারের দক্ষিণে সমুদ্র-বেলা ছুঁইয়া ফ্ল্যাগ্‌ষ্টাফ হিল্ (Flagstaff Hill) নামে একটী উচ্চ গিরি-শিখর দাঁড়াইয়া আছে। আমরা শেষ কদিন সারা বৈকাল বেলা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঠিক সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে ঐ গিরিশিখরে আরোহণ করিতাম। Storm signal দেওয়ার স্তম্ভের পাদদেশে দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিতাম—সূর্য্য কেমন অনন্তের গর্ভে ডুবিয়া যায়। ফ্লাগষ্টাফ্ হিল্ হইতে আরও অনেক গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রের গা বাহিয়া দক্ষিণে চলিয়া গিয়াছে। এই সকল পাহাড়ের বুক চিরিয়া কয়েকটী সুন্দর ছোট ঝরণা সমুদ্রে নামিয়া আসিয়াছে।

পূর্ব্বে কক্স বাজারের স্থানীয় অধিবাসীদের কতকগুলি অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাহারা ভাবিত, সমুদ্রের জলে অসুখ করে, সমুদ্রের বাতাসে সর্দ্দি হয়, সমুদ্রে নামিলেই হিংস্র জীবের উদরস্থ হইতে হয়,—ইত্যাদি নানা কারণে

তাহারা পারতপক্ষে সমুদ্রের ধারে ভিড়িত না। মুসলমানেরা সমুদ্রের তীরে বাড়ী করিত; কিন্তু সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরাইয়া। আর বাড়ীর চারিদিকে বৃক্ষাদি লাগাইয়া একটা প্রকাণ্ড জঙ্গল সৃষ্টি করিয়া রাখিত। সমুদ্রের তীরে আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট রাস্তা ছিল না। মিষ্টার প্রফুল্ল শঙ্কর সেন এখানকার সবডিভিস্যনাল্ অফিসার থাকার কালে বিদেশী সমুদ্র-স্নানার্থীদের পরিধেয় পরিবর্ত্তনের জন্ম রামুর "খেজারী" নামক জনৈক ধনবান মগের অর্থে একখানা ঘর তৈরী করাইয়া দেন। ইহাই "খেজারী বিচ হাউস্"। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্ট সেটেল্‌মেণ্টের কাজের জন্ম ইহাও বৎসরের কড়ারে ভাড়া লইয়াছেন। ১৯১৬ ইং পর্য্যন্ত

সূর্য্যাস্ত—কক্স বাজার

এই খেজারী বিচ হাউস্ই একমাত্র সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বাড়ী ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লার স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত মহাশয় একবার কক্স বাজারে বেড়াইতে আসেন। তিনি তখন বাণীগ্রামের জমিদার বাবুদের বাড়ীতে থাকিতেন। সেখান হইতে সমুদ্র বহু দূরে। সমুদ্রে স্নান করিতে আসিয়া স্নানের আনন্দটুকু লইয়া আর বাসায় ফিরা যাইত না—পথেই নিঃশেষ হইত। তিনি দেখিলেন, সেখান হইতে সমুদ্রোপভোগ করা সম্ভবপর নহে। রাত্রিদিন তো আর সমুদ্রের নির্ম্মল বাতাস এতদূর পৌঁছিবে না। তাই তাঁহারই প্রথম খেয়াল হইল যে, সমুদ্রতীরে বাড়ী করা যায় কি না? যেই ভাবা সেই কাজ।

তৎক্ষণাৎ তিনি তথায় নাম মাত্র মূল্যে কয়েক খণ্ড জায়গা খরিদ করিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা শুনিয়া বলিল, "টাকা কয়টাই জলে গেল।" তার পর যখন তিনি সেখানে তাঁবু খাটাইয়া তাঁবুতে থাকিয়া বাড়ী তৈরী করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অনেকে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "আপনি বিদেশী ভদ্র সন্তান, আমরা আপনাকে এ ভাবে মরুতে দেখ্‌তে পারি না। আমাদের অনুরোধ, আপনি এখানে অনর্থক বাড়ী কর্‌বেন না। বাড়ী তো প্রথম ঝড়েই উড়াইয়া লইবে। আর এখানে এত হাওয়ায় শক্ত রকমের অসুখ করিয়া আপনার জীবন শঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিবে।" তবুও যখন তিনি তাঁহার বাংলা তৈরীর কাজ বন্ধ না করিয়া পূর্ণ উদ্যমে চালাইতে লাগিলেন, তখন তাহাদের সদুপদেশ না শুনার পরিণামে তাঁহার কি দুর্দ্দশাই যে হইবে তাহার বর্ণনা করিয়া তাহারা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখাইতে লাগিল। ইন্দুবাবুর "সিন্ধু কুটীর" সকলের অনুরোধ তাচ্ছিল্য করিয়া, ভয় দেখানকে এক পাশে সরাইয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে পরিসমাপ্ত হইল।

তার পর কয়েক বৎসরের ঝড়েও যখন "বাংলার" বিশেষ কোন অনিষ্ট সাধিত হইল না, ইন্দুবাবুও যখন সমুদ্রের হাওয়ায় অসুস্থ হইয়া না পড়িয়া উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন, তখন সকলেরই কিছুটা বিশ্বাস জন্মিল যে, না—সমুদ্র-তীরেও বাড়ী করা যাইতে পারে। সেবার ইন্দুবাবু কক্স বাজার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া "ভারতবর্ষে" কক্স বাজার শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিলেন। অনেকেরই মন কক্সবাজারের দিকে আকৃষ্ট হইল। সমুদ্রতীরে বাড়ী উঠিতে লাগিল। স্থানীয় উকীল ও টার্ণার মরিশন্ কোম্পানীর এজেণ্ট শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোম্পানী দ্বারা ভ্রমণকারীদের থাকিবার জন্ম একখানা বাংলা করাইলেন, নিজেও একখানা বাড়ী করিলেন। ক্রমে বাহাচুছড়ায় (সমুদ্রতীরের স্থানীয় নাম) অতি সুন্দর একখানা বাঙ্গালী পল্লী সৃষ্ট হইল। কিন্তু ভাবিলে অবাক্

হইতে হয় যে, অনেক প্রফেসার ও দীনবন্ধু বাবু ভিন্ন চাটুর্গায়ের কেহই এখনও ককস্ বাজারে বাড়ী করিতেছেন না। চট্টগ্রামের ধনী মহোদয়েরা এই পল্লীতে আরও কয়েকখান বাড়ী করাইয়া দিলে নিজেরাও থাকিতে পারেন, আর ভ্রমণকারীদেরও থাকার বেশ সুবিধা হইয়া যায়। কক্স্ বাজারে খাওয়ার সুবিধা খুবই আছে। এখন থাকার সুবিধাটুকু হইয়া উঠিলেই স্থানটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে।

(৭)

ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সমুদ্রের নুন অনেক খাইয়াছি। তাই গুণ গাইতে ক্রটী করি নাই। এবার মধুরেণ সমাপয়েৎ অর্থাৎ মুখরোচক নিন্দার কথা ব্যক্ত করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

কক্সবাজারে কয়েক দিন বাস করিলেই "আজোরা" রিপব্লিকের কথা মনে পড়ে। কয়েকজন বিদেশী সে দেশে সংবাদপত্রের অভাব দেখিয়া একখানা সংবাদপত্র বাহির করিতে চাহিয়াছিল। যেমনি কাগজের আফিস্ খোলা, তেমনিই বাড়ী চড়াও! শেষে প্রাণ লইয়াই ঘরের ছেলের ঘরে ফিরা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। ও দেশে সংবাদপত্রের কথাটাই লোকের 'কর্ণশূল।' এখানেও প্রায় তাই—খবরের কাগজের বেশী বালাই নাই। প্রবল ভূমিকম্পে কলিকাতার মনুমেণ্ট আমূল উৎপাটিত হইলে কক্স বাজারে ছাপার হরপে ঐ খবর পৌছিতে না পৌছিতে মনুমেণ্ট পুনর্গঠনের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যাইবে।

"জর্জ্জ এণ্ড্ মেরী" হলে একটী ছোট খাট লাইব্রেরী আছে। লাইব্রেরীটী না কি ছোট হইলেও মন্দ নয়; কিন্তু 'অভাগার কপাল দোষে' তাহারও বার দিনের অবকাশ। তাই আমাদের নছিবে অবসর কাটাইবার জন্ত শোয়া বসা গল্প গুজব ভিন্ন আর কিছুই জুটিল না। 'দিনের দারুণ দীর্ঘতায়' আমাদের অবস্থাও রসিক কবি দ্বিজেন্দ্রলালের 'নবকান্ত রায়ের' গোছ হইয়া দাঁড়াইল। তবে আমাদের তাঁবেদারিতে তো আর কোন দফাদার খাটে নাই—তাই "ও দফাদার তুম্ শালা তো বৈট্‌কে বৈট্‌কে খাতা হায়" বলিয়া চীৎকার করিয়াই বা সময় কাটাইবার যো কই! তাই ভবিষ্যৎ যাত্রীদের প্রতি একটা অমূল্য উপদেশ এই—সুট্‌কেস্ (তুরঙ্গ এখন অচল—নেহাৎ সেকেলে) ভরা গাদা গাদা বই লইয়া যাইবেন। নতুবা পেটের আহার পরিপাটী মতে মিলিলেও মনের আহার মিলিবে না।

এখনকার নবাগতদের আলাপের বিষয় "জোয়ার, ভাটা" "নীলা", "মেলার্ড্" "মেভিস্", কড়ি, শঙ্খ, মগের লুঙ্গী; আর সময় সময় সমুদ্র গর্জ্জনের তর্জ্জমা। সর্ব্বশেষে কক্স বাজারের প্রত্নতত্ত্ব—মগদের সমালোচনা।

আমাদের অদৃষ্টগুণে (বন্ধুবর বলিলেন বিজয়াতে যাত্রার ফলে!) এক সুরসিক ভদ্রলোক আমাদের আড্ডায় জুটিয়া গেল। তাহার শরীরের পরিধি ও গায়ের রংএর খাতিরে আমরা তাহাকে (অবশ্য তাহার পরোক্ষে) "কালাপাহাড়" বলিয়া অভিহিত করিতাম। তাহার প্রকাণ্ড ভুঁড়ির ভিতর দুনিয়ার যত আজগুবি গল্পের আস্তানা। কবে সমুদ্রে কোন জেলের পায়ে পাঁচমুখো জোঁক লাগিয়া তাহার সমস্ত রক্ত শুষিয়া খাইয়াছিল, কি ভাবে নামজাদা চিকিৎসকের দল তাহাদের বিদ্যার বহর শূন্য করিয়াও সফলকাম না হইয়া হাঁ করিয়া সে দৃশ্য দেখিয়াছিল, কবে কে বিষাক্ত "জেলী" ফিসের (Jelly fish) বন্ধুতায় অমানুষিক অঙ্গ-ভঙ্গী সহ মরণ পথের যাত্রী হইবার উপক্রম করিয়াছিল, হাতীর খেদায় কবে কোন ভীষণ ঘটনা ঘটিয়াছিল ইত্যাদি লোমহর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্র্যে আমাদের দুপুরের পরবর্ত্তী সময়টা বেশ এক রকম কাটিয়া যাইত।

কক্স বাজার ছাড়িয়া আসিয়াছি—সেও বেশ কদিন হইল। কিন্তু এখনও সে ছবি ভুলি নাই। বাস্তবিক কক্স বাজার অতি রমণীয় স্থান। কক্স বাজার এই সামান্য সময়ে জীবনের এই সামান্য স্মৃতির সঙ্গে যে মাধুরিমা মাখাইয়া দিয়াছে, সে মাধুরিমা জীবনের বহু ভবিষ্যৎ মুহূর্ত্তকে রমণীয় করিয়া তুলিবে। ধূলিময় কর্ম্মস্থানে গাড়ীর ঘড় ঘড়, লোকের হৈ চৈ ও কর্ম্ম-ক্লান্তির মধ্যে অনবরতই কক্স বাজারের শান্ত মধুর স্মৃতিটুকু জাগিয়া উঠে। মনে হয় আবার সেখানে ছুটিয়া যাই। আর যাওয়া হইবে কি না ভবিতব্য বলিতে পারে।

কমলাকান্তের পত্র

কমলাকান্ত

"দূর নেহি দেখ্‌তা"

নসীরাম বাবু পাহাড়ে হাওয়া খেতে গিয়েছিলেন। ফিরে আস্‌বার সময় একটা পাহাড়ী ছেলেকে চাকর ক'রে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। এক রকম কুড়িয়ে নিয়ে আসার মতন। কেন না এই পর্ব্বতবাসীদের মধ্যে সংসার-বন্ধনটা খুব আল্‌গা—কে কার ছেলে, কে কার মা, কে কার ভাই বোন, সব সময় আমরা ঠিক ধরতে পারি না। পর্ব্বত-গৃহ থেকে যখন নসীরাম বাবুর সুটকেস্‌ ব'য়ে খারসান্‌ ষ্টেশনে সে আসে, অজানা দেশের সেই যাত্রীটার মনে কি হয়েছিল তা বলা শক্ত। কিন্তু তার মুখের সরল হাসি দেখ্‌লে কেউ সন্দেহ করতে পারত না যে, পাহাড় ছেড়ে সমতল ভূমিতে নেমে আসবার পূর্ব্বক্ষণে, তার আশৈশবের বিহার-ভূমির সঙ্গে বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় তার মনে এতটুকু বিচ্ছেদ-ব্যথার মেঘ দেখা দিয়েছে।

তোড়ে বৃষ্টির পর নর্দ্দমা দিয়ে যেমন জল নামে, দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান রেলপথের খেলাঘরের গাড়িগুলা যখন হুড় হুড় ক'রে এসে শিলিগুড়ি পৌছাল—আর দূরে, অতি দূরে আকাশের গায় হিমালয় মেঘের সঙ্গে মিশিয়ে গেল, তখন বেচারার মুখখানা কেমন একটু যেন বিশুষ্ক হয়ে উঠল। শিলিগুড়ি ছেড়ে ডাক গাড়িখানা যখন হাওয়ার গতিতে কেবলই দৌড়াতে থাকৃল, তখন সেই পাহাড়ী বালকের মুখ দেখলে বোঝা যেত যে, তার প্রাণটা শূন্য হ'য়ে গিয়েছে। সে দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বসে ছিল,—খুব কাছের জিনিসগুলাও সে যেন দেখ্‌তেই পাচ্ছিল না। রাত্রি এল, সে ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রভাত হ'লে গাড়ি এসে থামল শিয়ালদা ষ্টেসনে—বিপুল জনতা আর কোলাহলের মধ্যে বেচারা দিশেহারার মত হ'য়ে গেল। নসীরামবাবু একখানা খোলা গাড়িতে তাঁর সমস্ত মালপত্র নিয়ে বালকটীকে পাশে বসিয়ে, এ-গলি সে-গলি করতে করতে একটা খুব সরু গলির ভিতর তাঁর বাড়ীর দরজায় এসে উপস্থিত। বেচারা পাহাড়ী ছেলেটার তখন মুখ দেখ্‌লে মনে হত—যেন কত দিনের বিরহবিধুর যক্ষ জীর্ণ কারা-প্রাচীরের মত পথের উভয় পার্শ্বের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম ক'রে, মাথার উপর যে সুনীল আকাশ দেখা যাচ্ছিল, সেই দিকে তাকিয়ে কোন্‌ মেঘদূতের প্রতীক্ষায় চেয়ে রয়েছে। নসীবাবু তাকে বাড়ীর ভিতর আস্‌তে বল্লেন;—বাড়ীর সঙ্কীর্ণ উঠানে দাঁড়িয়ে সে সেই সুনীল আকাশের দিকেই বার বার চেয়ে দেখ্‌তে লাগল।

দিনের পর দিন চলে গেল, বালকের প্রফুল্লতা ফিরে এল না। এক দিন পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করার পর বালক উত্তর দিলে যে, তার এ জনবহুল, গৃহবহুল, শব্দবহুল, ধূলি-বহুল, ধূম্রবহুল, দুর্গন্ধবহুল বিরাট জনপূর্ণ অরণ্যটাকে মোটেই ভাল লাগ্‌চে না।

নসীবাবু জিজ্ঞাসা কল্লেন—"কেন?"

বালকটী অতি করুণ সুরে উত্তর দিলে—"বাবুজী, দূর নেহি দেখ্‌তা!" এই কথা ব'লে সে একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্লে।

নসীবাবু তার কথা কিছুই বুঝলেন না; তিনি বল্লেন—"দূর নেহি দেখ্‌তা কি রে?"

বালক। বাবুজী, যেদিকে তাকাই সেই দিকেই উঁচু দেওয়াল—আমার চোখ যেন ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে—দূর দেখ্‌তে পাই না।

নসীবাবু। সে কি রে? পাগল হলি না কি?

নসীবাবু বালকের দুঃখ বুঝলেন না,—আমি বুঝলাম। সে হিমালয়ের শিখরে দাঁড়িয়ে দেখত—উপরে আকাশ এবং হিমগিরির চূড়ার পর চূড়া, নীচে শিখরের পর শিখর, উপত্যকার পর উপত্যকা—সুগভীর সমুদ্রের তরঙ্গ-বিভঙ্গের ন্যায় বিশাল বিপুল বিস্তার দিগন্ত পর্য্যন্ত চলে গিয়েছে। নয়ন কোন দিকেই প্রতিহত হয় না। নীল আকাশের শুভ্র মেঘ, ভেসে ভেসে সেই দিগন্তে গিয়ে সংলগ্ন হয়। ঝর্ণার কুলু কুলু স্রোত অবিরাম ব'য়ে ব'য়ে, উপত্যকার পর উপত্যকা অতিক্রম ক'রে, প্রথমে শীর্ণ, ক্রমে স্ফীত, স্ফীততর রজত-ধারায় ঐ দিগন্তে মেঘের সঙ্গে মিশে যায়। বালক সেই

সীমাহীন বিশালতা দেখে দেখে বিমোহিত, মুগ্ধ হয়ে যেত,—তারই বিরহ আজ তাকে বেদনা দিচ্ছে—সে দূর দেখতে পাচ্ছে না, তার প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠচে।

আবার এমন লোকও আছে, যাকে কারাগৃহের মত ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রাচীর, পথের ধূলা, অবিরাম ঘর্ঘর কল-কোলাহল মোহিত করে,—এবং ফাঁকায় দাঁড়িয়ে যার প্রাণটাও ফাঁকা হ'য়ে যায়।

কিন্তু এই দূর দেখাই মানুষের স্বভাব,—দূর দেখাই মানুষের প্রকৃতি। চোখের দৃষ্টি প্রতিহত হ'লেও কল্পনার ত বাঁধ নাই—যেখানে চোখ হার মানে, ঠিক সেইখান থেকে কল্পনা বল্গাহীন অশ্বের মত ছুটতে আরম্ভ করে।

মানুষ আজকের শত কার্য্য-জালের বেড়া থেকে যেমন এক মুহূর্ত্তের ছুটী পায়, অমনি কাল্‌কের কথা ভাব্‌তে থাকে—এই থেকে সঙ্কল্প, এই থেকে জীবনের ধারা নির্ণয়, এই থেকে অনাগতের জন্য আয়োজন আপনি আসে। যদি বর্ত্তমানই—অর্থাৎ যেটাকে দেখা যাচ্ছে, যা করা যাচ্ছে, যা উপভোগ করা যাচ্ছে, যা সহ্য যাচ্ছে—সেইটাই শেষ হত, তাহলে কাল্‌কের জন্য কেউ প্রস্তুত হত না—কল্পনা, আশা ব'লে কোন কিছু মানুষকে প্রলোভিত, আকৃষ্ট, বদ্ধ করত না। আবার এইখানেই শেষ নহে—মানুষ জীবনের ব্যবস্থা ক'রে, আবার জীবন-জলধির পরপারের কল্পনাও করে, তার জন্য প্রস্তুতও হয়। অতএব দূর দেখাই মানুষের স্বভাব। যেখানে দূর দেখার ব্যাঘাত,—নিশ্চিন্ত হয়ে চিন্তা করবার অবসর পেলেই মানুষ সেইখানে চিন্তাকুল। দূর-ভবিষ্যতের কথা পরে, নিকট-ভবিষ্যৎও না দেখতে পেলে চোখে অন্ধকার দেখে, আর তার অন্তর হতাশ হয়ে বলে—দূর নেহি দেখ্‌তা।

আমরা সকলেই দূর দেখতে পাচ্ছি না; দেখতে পাচ্ছি না,—চোখের সন্নিকটে যে বিরাট প্রাচীর আমাদের দৃষ্টিকে প্রতিহত কচ্ছে, তাকে ভেদ ক'রে—দূরে—ভবিষ্যতে—দিগন্তের কোলে কোলে আমাদের জন্য কিসের পস্‌রা নিয়ে দিক্‌-বালিকাগণ আমাদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা কচ্চেন—সুখের না দুঃখের, মানের না অপমানের, জীবনের না মরণের—তা আমরা কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ আমাদের কল্পনা, আমাদের দৃষ্টি আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আভাষ পর্য্যন্ত পাচ্ছে না—আমরা বাঁচব কি মরব তার ইঙ্গিত পর্য্যন্ত পাচ্ছে না।

যারা সেই কথা ভাবচে, তাদের হয় ত অনেকে বল্‌বেন—পাগল! যে দিন যায় সেই দিনই ভাল, তার পর কি হবে ভাব্‌বার কি প্রয়োজন? কিন্তু এ প্রয়োজনের কথাই নয়—ভাবতেই হ'বে—গড়েচেন যিনি তিনি এমনি করে গড়েচেন আমাদের, যে, না ভেবে কেউ থাক্‌তেই পারে না। ক্ষণিক ভুলে থাক্‌তে পারে মানুষ, কিন্তু এক সময় না এক সময় তার সে দুর্ভাবনা আস্‌বেই আস্‌বে।

বর্ত্তমানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ভেদ ক'রে দৃষ্টি অগ্রসর হচ্চে না—অথচ যারা দূর না দেখ্‌তে পেলে কিছুতেই স্বস্তি লাভ কর্‌তে পারে না—তারা হয় পাহাড়ী বালকটির মত বিস্ফারিত নেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দূর-দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে কথঞ্চিৎ প্রশমিত কচ্চে—নয় ত, চোখ বুজে কল্পনায় অনাদি অতীতের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বর্ত্তমানকে, বাস্তবকে উপেক্ষা করচে, ভুলে যেতে চেষ্টা করচে।

কিন্তু বলাই বাহুল্য—এই দুই শ্রেণীর লোককেই অনেকে পাগল বল্‌চে—অতীত বা অন্তরীক্ষ দেখে দেখে চক্ষু ক্ষরিয়ে ফেল্লেও বর্ত্তমানের কারা-প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে না। কিন্তু মানুষ করে কি? দূর না দেখলে সে বাঁচবে না, অতএব হয় কল্পনায় অতীতকে দেখা, নয় ত কল্পনায় আশায় মিশিয়ে অন্তরীক্ষের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকা।

আমি নসীবাবুকে বল্লাম—"এই পাহাড়ের ছেলেটাকে পাহাড়ে ছেড়ে দিয়ে আসুন—সে দূর দেখে তার প্রাণ রক্ষা করুক।" কিন্তু হায়, কে আমাদের এই কারা-প্রাচীরের বাহিরে যে মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, সেখানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেবে? স্বচ্ছন্দ দৃষ্টি, স্বচ্ছন্দ বিহারের ব্যবস্থা করবে? প্রাচীর ভাঙ্গ বল্লে, লোকে বলে—পাগল! বাহিরে চল বল্লে লোকে বলে,—সেটা অনিশ্চিতের রাজ্য, কোথায় যাবে? কিন্তু অনিশ্চিত ত অতীতকে ফিরিয়ে আনা, অনিশ্চিত ত পরপারের প্রহেলিকা। কিন্তু তা বল্লে কেউ শোনে না।

Nations grown corrupt
Love bondage more than liberty
Bondage with ease than strenuous liberty

দূর দেখা, সুদূর অনাগতের আহ্বানে কর্ণপাত করা যেমন স্বাভাবিক, অনেক দিনের অভ্যাসের বাঁধন কাটানোও তেমনি কঠিন। এ বাঁধন শুধু রাজার বাঁধন নয়, সকল রকম অবিদ্যার বাঁধন—কে মুক্ত করবে?

রাশিয়া

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

রাশিয়ার গ্রাম্য সঙ্গীতের সহিত এসিয়ার নানা দেশের গ্রাম্য সঙ্গীতের অদ্ভুত মিল দেখিতে পাওয়া যায়। গানের মধ্যে ভাব বা ভাষার সম্পদ বিশেষ নাই,—আছে কেবল সুরের এক বিচিত্র উন্মাদনা-শক্তি। অনেকের মতে রাশিয়া এসিয়ার একেবারে পাশে পড়াতে, ইয়োরোপের অন্তর্গত হইয়াও, তাহাকে এসিয়ার প্রভাব বেশী মাত্রায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাশিয়ার সঙ্গীতের সহিত যেমন পূর্ব্ব মহাদেশের সঙ্গীতের বহুল সাদৃশ্য বর্ত্তমান, রাশিয়ান গ্রাম্য লোকদের চরিত্রের সহিত তেমনি এসিয়ার লোকদের চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রাশিয়ান চরিত্রের মধ্যে ইয়োরোপের লোকদের চরিত্রের ধূর্ত্ততাও নাই। ইহারা অত্যন্ত বেশী সরল এবং সোজা। ভণ্ডামিও রাশিয়ান চরিত্রে নাই। ভাল হউক মন্দ হউক—ইহারা যাহা করে, তাহা খোলাখুলি ভাবেই করিয়া থাকে। গোপনতার কোনো দরকার আছে বলিয়া ইহারা মনে করে না। স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে প্রকার সম্বন্ধ পৃথিবীর অন্যদেশে লোকে গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে—রাশিয়ানরা তাহা গোপন করিবার কোনো প্রয়োজনই মনে করে না।

প্রাচীন-তন্ত্রী রাশিয়ান নর-নারী

এমন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে দুইজন স্ত্রী পুরুষ একত্র স্বামী-স্ত্রীর মতই বসবাস করিতেছে—কিন্তু খোঁজ লইলেই জানা যায় যে তাহারা বিবাহিত নহে। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত ইহা খুব বেশী পরিমাণে দেখা যাইত; বর্ত্তমান সময়ে কিছু কমিয়াছে। ইহাদের জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা বলিত যে, বিবাহ করিতে হইলে ধর্ম্মযাজক যে পরিমাণ টাকা চায়, তাহা দিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই, কাজে কাজেই তাহারা বিবাহের অনুষ্ঠান বাদ দিয়াই এক সঙ্গে বাস করিতেছে। ইহাতে লজ্জা করিবার কিছু নাই।

জারের আমলে ঘুষ গ্রহণ রাজকর্ম্মচারীদের প্রথা হইয়া গিয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত এমন হয় যে ঘুষ না লইলে তাহাদের সংসার অচল হইত। চাকরী দিবার সময় রাজসরকার হইতে ঘুষের পরিমাণ বাদ দিয়াই কর্ম্মচারীর বেতন ঠিক করা হইত। যদি কোনো রাজকর্ম্মচারী ঘুষ না লইত তবে তাহার অবস্থা চাকরি পাইবার পূর্ব্বেও যেমন ছিল—পরেও তেমনি থাকিত। উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা এই প্রকার কর্ম্মচারী সম্বন্ধে বলিত যে "ঘোড়াকে জলের কাছে আনিলাম, ঘোড়া যদি এখন জল পান না করে, তবে আর আমরা কি করিতে পারি।"

জারের শাসন কালে রাশিয়ায় অরাজকতাই রাজত্ব করিত। মন্ত্রীদের ক্ষমতা ছিল প্রচুর। মন্ত্রীদের মধ্যে "Minister of the Interior"এর ক্ষমতা বোধ হয়

সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। এই মন্ত্রীর হাতে সরকারী গোয়েন্দা বিভাগ থাকিত। মন্ত্রী এই গোয়েন্দাদের সাহায্যে যে কোনো প্রজার—তিনি যত বড়ই হউন না কেন—সর্ব্বনাশ করিতে পারিত। গোয়েন্দাদের সংবাদ সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইত, এবং সেই সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া শাসন-কার্য্য অনেক সময়েই পরিচালিত হইত। দেশের কোথায় কি হইতেছে, কোনো ষড়যন্ত্র চলিতেছে কি না, ইত্যাদি সকল খবর এই মন্ত্রীর গোচরে থাকিত। অনেক সময় এই মন্ত্রী উৎকোচ দানে বশীভূত করিয়া লোককে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিত।

রাজ্যের কোনো লোক ভরসা করিয়া কোনো কাজ করিতে পারিত না। মন খুলিয়া কথা বলার সাহসও অনেকের ছিল না। যত অত্যাচার অনাচার সকলি নীরবে সহ্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। অপরাধীকে ধরিয়া যদি তাহার বিচার খোলা আদালতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয় লোকেরা এত ভয় পাইত না। আদালতে অপরাধী স্বপক্ষে বলিবার সুযোগ পায়। কিন্তু জারের অধীন রাশিয়াতে যদি কোনো লোকের উপর সন্দেহ হইত, তাহা হইলে তাহাকে হঠাৎ গ্রেপ্তার করিয়া সাইবেরিয়ার কোন্ প্রান্তে যে নির্ব্বাসন দেওয়া হইত, তাহা নির্ব্বাসিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও জানিবার উপায় ছিল না। গোয়েন্দা বিভাগের চর কোথায় যে নাই, তাহা কেহ বলিতে পারিত না। সকল সময়েই যে এই সকল চরেরা রাজার স্থনের গুণ রাখিত, তাহা নয়,—অনেক সময় তাহারাই বিদ্রোহী দলভুক্ত হইয়া পড়িত, অথচ সরকারের বেতনও ভোগ করিত। এই সকল চরেরা বিদ্রোহী এবং ষড়যন্ত্রকারীদের অনেক সাহায্য করিত।

রাশিয়ান কৃষক

নাগরিকের গ্রীষ্মনিবাস—(অরণ্য মাঝারে)

পৃথিবীর আর কোনো দেশের লোক সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগকে এত ভয় করিত বলিয়া মনে হয় না। রাজ্যের মধ্যে বিচার বলিয়া কিছু ছিল

না। পুলিশের কথার উপর আর কাহারো কোনো কথা চলিত না। পুলিশের এই ক্ষমতার অপব্যবহার রাশিয়াতে জারের সময় চরম পরিণতি লাভ করে।

রাশিয়ান কৃষকের চক্রহীন ঠেলাগাড়ী

কসাক সেনাদল

জারের সময়েও যদি রাশিয়াতে ইটালির ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডি, ক্যাভুর ইত্যাদির মত রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি জন্মলাভ করিত, তাহা হইলে রাশিয়াতে জার শাসনের অবসান খুব সম্ভবত হইত না। জারের সময়ে যাহারা বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারা নিজের স্বার্থ লইয়া থাকিত, দেশের এবং দশের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় তাহাদের ছিল না। যাহারা দেশের মঙ্গলের জন্য চিন্তা করিত, তাহারা চিন্তায় বেশী আর কিছু করিতে পারিত না। মুখ ফুটিয়া কিছু বলার নামই ছিল রাজবিদ্রোহ করা।

ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারেও রাশিয়ানদের প্রাচ্য দেশের লোকদের সহিত মিল দেখা যায়। রাশিয়ান বণিকের সহিত ব্যবসা করিতে হইলে প্রথমে তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে। প্রথমবার দেখা করিবার সময় তাহার সহিত ব্যবসা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয়ে কথা বলাই বুদ্ধিমানের কাজ। প্রথম সাক্ষাতেই ব্যবসায়ের কথা পাড়িলে, রাশিয়ান বণিকের মন বিগড়াইয়া যায়, এবং একবার মন বিগড়াইলে আবার তাহাকে সোজা করা অত্যন্ত কষ্টকর কাজ।

দ্বিতীয়বার সাক্ষাতের সময় দুপাঁচটা বাজে কথার সঙ্গে একটু ঠাট্টা তামাসার চেষ্টা মন্দ নয়। তার পর ক্রমে ক্রমে একটু আধটু ব্যবসার কথা পাড়া যাইতে পারে। কিন্তু বেশী কিছু বলা সুযুক্তি-সঙ্গত নয়। বার দুএক দেখা সাক্ষাতের পর বণিককে নিমন্ত্রণ করা উচিত। নিমন্ত্রণে খাওয়া দাওয়ার প্রচুর আয়োজনের সঙ্গে অন্ত পাঁচ রকম আমোদ করিবার ব্যবস্থা যত থাকিবে ততই ভাল। খাওয়া দাওয়া শেষ হইবার পর রাশিয়ান বণিকের কাছে যাহা কিছু প্রয়োজন সবই আদায় করা যাইতে পারে। একবার ব্যবসায় সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে আর চিন্তার কারণ নাই। ইহারা যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে তাহাকে সহজে ভোলে না, এবং তাহার উপকার করিবার জন্ত নিজের ক্ষতি স্বীকারও করিতে পারে।

কসাক সেনানী ও তাহার আরদালী

মস্কাও সহরেই বেশীর ভাগ পাকা রাশিয়ান বণিক দেখা যায়। ইহাদের অধিকাংশই প্রথম বয়সে চাষা ছিল, এবং হয় ত মাত্র কয়েক বছর গ্রাম ছাড়িয়া সহরে ব্যবসা করিতে আসিয়াছে। ইহাদের ব্যবসায়-বুদ্ধি ইয়োরোপের অন্যান্ত দেশের ব্যবসায়ীদের তুলনায় কম নয়, অথচ ইহারা নিজের দেশ ছাড়া অন্ত কোনো দেশের বিশেষ

রাশিয়ান সেনার ক্রীড়া-কৌতুক

(বরফের উপর ঘানিগাছের মতন যন্ত্রে দুইজন লোক চড়িয়া বসিয়া আছে—দুয়জন সেনা তাহাদের ঘুরাইতেছে। যন্ত্রের চক্র যদি হঠাৎ থামিয়া যায়, আরোহী দুইজন অমনি তৎক্ষণাৎ পপাত তুষার-সমুদ্রে!)

খবর রাখে না। লেখা পড়াও ইহাদের না জানার মধ্যে। অবশ্য সকলের সম্বন্ধে ইহা বলা হইতেছে না।

মসকাওএর বণিকেরা সাধারণতঃ অতিথিপরায়ণ হয়। কাহাকেও ভাল লাগিলে তাহার জন্ম তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। অনেক বণিকের শিল্প সম্বন্ধে আশ্চর্য্য রুচি আছে। এবং শিল্পের উন্নতির জন্মও ইহারা অনেক অর্থব্যয় করিয়া থাকে।

এই সমস্ত বণিকদের পুত্রেরা প্রায় সকলেই শিক্ষালাভ করিবার জন্ম বিদেশে যাইতেছে। বেশীর ভাগ যায় জার্ম্মাণি। সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া ইহারা মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। জাতীয় রীত নীতি, আচার ব্যবহার, শিক্ষা-পদ্ধতি ইত্যাদি অবহেলার জিনিস নয়, এই বোধ অনেকের জন্মিতেছে। যাহা কিছু বিদেশের, তাহা সব শ্রেয়—এই অতি-ভ্রান্ত ধারণা ঘুচিয়া যাইতেছে। রাশিয়ার এই অবস্থার সহিত আমাদের দেশের লোকের প্রথম ইংরেজি শিক্ষালাভ করার সময়ের তুলনা করা যাইতে পারে। হঠাৎ নতুন শিক্ষা লোকের চোখে এমন ভীষণ ধাঁধা লাগাইয়া দেয় যে, তাহারা দেশের সব কিছুকেই অত্যন্ত তাচ্ছিল্য করে। আমাদের দেশেও ঠিক এই অবস্থা হইয়াছিল।

রাশিয়ান সেনাদের নৃত্য-গীত-বাদ্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা রাশিয়ার বাহিরে গিয়া শেষ করিয়া লয়। বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহারা পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবেশ করে, কিন্তু অনেকেই বর্ত্তমান পদ্ধতিতে কাজ চালাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাহারা শিক্ষাতেও যেমন নব্য-তন্ত্রের, ব্যবসা-বাণিজ্যও তেমনি নতুন ভাবে চালাইতে হয়।

যে সকল রাশিয়ান পূর্ব্বে বিদেশের শিক্ষা লইয়া দেশে ফিরিত, তাহারা নিজেদের দেশের সব জিনিসের উপরেই একটা বিষম ঘৃণার ভাব দেখাইত। দেশের রীতি নীতি, শিক্ষা, লোকের আচার ব্যবহার সবই অত্যন্ত সেকেলে— এই ছিল তাহাদের মত। এখন আবার ক্রমে ক্রমে এই

বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত রাশিয়ানরা নিজের দেশে বিদেশের রাজনীতি, আচার-ব্যবহার চালাইবার চেষ্টা পাইয়াছিল কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। কত কতক বিষয়ে অবশ্য তাহারা যৎসামান্য কৃতকার্য্য হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত রাশিয়ান যুবক বাণিজ্য বিদ বিদেশ হইতে শিক্ষা পাইয়া আসে, তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। চেষ্ট ফল কি হইবে তাহা এখনও বলা যায় না। তবে অনে ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, হঠাৎ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিয়া তাহারা অসম্ভব রকম ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে প্রাচীনেরা পুরান পদ্ধতিতেই বিশ্বাসী, তাহারা সেই ভা

নিজেদের ব্যবসা চালাইতে চায়। নবীনেরা নতুন ভাবে সব করিতে চায়; কিন্তু প্রচলিত ধারাকে পরিবর্ত্তন করিয়া নতুন ধারা চালাইতে হইলে যে প্রকার শিক্ষা এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন, তাহা অনেকেরই নাই। এই প্রবীণ এবং নবীনের দ্বন্দ্বে কে জয়ী হইবে—তাহা আরো কিছুকাল পরে বলা সহজ হইবে,—এখনও স্থির করিয়া কিছু বলা যায় না।

বর্ত্তমান শিক্ষিত রাশিয়ান যুবক ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের শিক্ষিত যুবক অপেক্ষা অনেক বেশী পড়াশুনা করে এবং অনেক বেশী জানে। তাহারা প্রায় সকল বিষয়েই কিছু না কিছু জানে। কেবল যে পুস্তক বা বিষয় ক্লাশে পড়িতে হইবে, তাহা পড়িয়াই সে ক্ষান্ত থাকে না। যুগ যুগ ধরিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিবার ফলেই বোধ হয় ইহাদের পড়াশুনাতে এত আনন্দ, জ্ঞানলাভে এত উদ্যম। এই উদ্যম এবং আনন্দ যদি স্থায়ী হয়, তবে আশা হয়, কয়েক বছরের মধ্যেই রাশিয়া শিক্ষা-দীক্ষায় জগতের অন্য কোনো দেশের পিছনে পড়িয়া থাকিবে না। এমন কি, আগাইয়া যাইবার সম্ভাবনাও কম নয়।

রাশিয়াতে এখনও বিবিধ দোকানের সামনে বিচিত্র সাইন-বোর্ড টাঙ্গান আছে দেখা যায়। দোকানের নাম বা কি দ্রব্য বিক্রয় হয়, তাহা এই সাইন-বোর্ডে লেখা নাই, তাহার বদলে দোকানের দ্রব্য-সম্ভারের কতকগুলি দ্রব্যের ছবি রঙ্ বেরঙে এই সাইন-বোর্ডে আঁকা থাকে। বছর দশ আগে রাশিয়ার অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর ছিল বলিয়া এই প্রথায় সাইন-বোর্ড টাঙ্গান হইত, যাহাতে লোকে সাইন-বোর্ড দেখিয়াই দোকানে দ্রব্য খরিদ করিবার সাহায্য পাইতে পারে। যে দোকানে তরী-তরকারী বিক্রয় হয়, সেখানে নানা প্রকার শাক্-সব্জীর ছবি সাইন-বোর্ডে আঁকা থাকে—আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি সুমিষ্ট ফলের ছবি। পূর্ব্বে বণিক এবং সাধারণ ক্রেতা সকলকেই এই সাইন-বোর্ড দেখিয়া দোকান স্থির করিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে ক্রমে

রাশিয়ান সেনাদলের রুটী প্রস্তুত করিবার তুন্দুর

ক্রমে দোকানের বিবরণ-লেখা সাইন-বোর্ড টাঙ্গান আরম্ভ হইতেছে। পূর্ব্বকালে বণিক-সম্প্রদায়ের বিশেষ পোষাক ছিল। আইন করিয়া এই পোষাক স্থির হয় নাই। বণিক-সম্প্রদায় নিজেরাই তাহাদের পোষাক সাধারণ লোক অপেক্ষা একটু অন্য রকমের করিয়া লইত। তাহারা ফ্রক-কোটের মত এক প্রকার জামা পরিত; উঁচু বুটের মধ্যে পায়জামার পা ঢুকাইয়া রাখিত। দাড়ি কামাইত না। চুল ঘাড় পর্য্যন্ত লম্বা করিয়া ছাঁটিত। বড় রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য যাহা-কিছু সবই বিশেষ বিশেষ চায়ের দোকানে বা আড্ডাতে হইত। দিনের একটি

বিশেষ সময়ে বড় বড় ব্যবসায়ীরা এই চায়ের আড্ডাতে আসিয়া ব্যবসা সংক্রান্ত কথা-বার্ত্তা এবং চা পানাদি

রাশিয়ান তাতার জাতীয় লোক

করিতেন। প্রায় সকল বড় বড় সহরেই এই প্রকার চায়ের দোকান একটি করিয়া থাকিত। গত মহাবিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য এই প্রকার চায়ের দোকানে বসিয়াই চলিত।

কিন্তু পেট্রোগ্রাড সহরের ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশই জার্ম্মাণ, ইংরাজ এবং সুইডদের হাতে ছিল। ইহাদের মধ্যে আবার জার্ম্মাণরাই বেশীর ভাগ ব্যবসা হাতে রাখিয়াছিল। জার্ম্মাণরা অতি তাড়াতাড়ি অন্য দেশের লোক এবং আচার-ব্যবহারের সহিত নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে। জার্ম্মাণদের ব্যবসা-সংক্রান্ত অফিসগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সদা-সর্ব্বদা ফিটফাট থাকিত। তাহারা এই অফিসে বসিয়াও ব্যবসা চালাইত; আবার দরকার হইলে চা-এর আড্ডাতে বসিয়াও সকল কাজ-কর্ম্ম করিতে পারিত। জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদের কর্ম্মচারী এবং ক্যানভাসারেরা চমৎকার রাশিয়ান বলিতে পারিত। বেশী দিনের জন্য ধারে জিনিসপত্র বিক্রিও ইহারা বিনা আপত্তিতে করিত। খরিদ্দারের সুবিধা সকল দিক্ দিয়াই এই জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীরা দেখিত। এই কারণে রাশিয়ান খরিদ্দার প্রথমেই জার্ম্মাণ দোকানে প্রবেশ করিত। এই সকল কারণে রাশিয়ান ব্যবসা বাণিজ্যের উপর জার্ম্মাণদের প্রভাব বড় কম ছিল না। সহরের বড় বড় দোকানের ভাষাও ছিল জার্ম্মাণ। রাজসভাতে জার্ম্মাণ আদব-কায়দার প্রচলন ছিল। জার, তাঁহার আমীর-ওমরাহদের জার্ম্মাণ উপাধি দ্বারা গৌরবান্বিত করিতেন। জারের Foreign office জার্ম্মাণদের হাতে ছিল। মোটের উপর রাশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের উপর জার্ম্মাণদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। জার্ম্মাণি ইচ্ছা করিলে তাহার এই প্রচণ্ড প্রভাব ক্রমশঃ বিস্তার করিয়া রাশিয়াকে তাহার করতলগত করিয়া রাখিতে পারিত। গত মহাযুদ্ধই ইহা নষ্ট করিয়া দেয়।

খাঁটি রাশিয়ান সহর বলিতে হইলে মসকাও সহরকেই বলিতে হয়। পেট্রোগ্রাড সহরে বহির্জগতের প্রভাব অত্যন্ত বেশী, ইহা সহর দেখিবামাত্র বুঝিতে পারা যায়। মসকাও সহরের বাজার একটি দেখিবার জিনিস।

ক্রিমিয়ায় সমুদ্রতীরে তাতার জাতীয় গ্রাম্য সরাই

এমন জিনিস নাই যাহা বাজারে পাওয়া যায় না। কেবল কোথায় কোন্ দ্রব্য পাওয়া যাইবে, তাহা জানা থাকা চাই। বাজারের সম্বন্ধে এই জ্ঞান না থাকিলে নতুন লোক হয় ত সমস্ত দিন ঘুরিয়াও তাহার দরকারী দ্রব্যের সন্ধান পাইবে না। রবিবার দিন বাজারে হাট বসে। এই দিন চার পাঁচ ঘণ্টা সময় এই হাট দেখিয়া যে কোনো লোক বেশ কাটাইয়া দিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে যদিও এই হাটের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা হইলেও এখনও এইখানে খুব বেশী পরিমাণে কেনা-বেচা হইয়া থাকে। সহরের লোকেরাও নানা বিচিত্র পোষাক পরিয়া, এই হাটে কিছু কিনিবার না থাকিলেও, বেড়াইতে আসে।

পেট্রোগ্রাড সহরের বাজারগুলির কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন মহা বিদ্রোহের পরেও হয় নাই। পেট্রোগ্রাডের বাজারেও স্থায়ী দোকান ইত্যাদি আছে—কতকটা কলিকাতার নিউ-মার্কেটের মত। প্রধান বাজারের পাশেই ইহুদিদের বাজার আছে। ইহুদিদের বাজারে অত্যন্ত মহার্ঘ এবং দামী জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া খুব সাধারণ দ্রব্যাদিও বিক্রয় হয়। পুরান জিনিসই এই বাজারে বেশী থাকে।

পেট্রোগ্রাড সহর এমনি দেখিতে বিশেষ মনোরম নহে। কিন্তু কতকগুলি খাল থাকাতে খালের জলে সন্ধ্যাবেলায় যখন দুই পাশের গাছপালার এবং ঘর বাড়ীর আলোর ছায়া পড়ে, তখন বাস্তবিকই ইহা দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর হয়। শীতকালে এই খালের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়। তখন পেট্রোগ্রাড সহরের দৃশ্য আর এক দিক দিয়া বেশ সুন্দর দেখিতে হয়। চারিদিকে শাদা। বরফের উপর অনেকে এই সময় "স্কেটিং" করিয়া থাকে।

"স্কেটিং" করিবার ক্লাব আছে। প্রত্যেক ক্লাবের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। নিজ নিজ স্থান প্রত্যেক ক্লাব রেলিং দিয়া ঘিরিয়া রাখে। চা খাইবার ঘর, কাপড় ছাড়িবার ঘর, ব্যাণ্ড বাজিবার স্থান—সবই এই সময় এই বরফের উপর তৈয়ার হয়। দেশের সাধারণ লোকেরা এক সময় এই সকল আনন্দে যোগ দিতে পাইত না, আজকাল গণতন্ত্রের দিনে পায়। পেট্রোগ্রাড হইতে সমুদ্র অতি নিকটে। গাল্ফ্ অব্ ফিন্‌ল্যাণ্ড্ এই সহর হইতে অতি নিকট। এই গাল্‌ফে নেভা নদী গিয়া পড়িয়াছে। নদী যেখানে সমুদ্রে গিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে

ক্রিমিয়ার সমুদ্রোপকূলে

কয়েকটা দ্বীপ আছে। পেট্রোগ্রাড সহর যাহারা দেখিতে যায়, তাহারা এই দ্বীপগুলি না দেখিয়া পারে না। দ্বীপে একবার অন্ততঃ তাহাদের যাইতেই হয়। পূর্ব্বে এই সমস্ত দ্বীপে পান-ভোজন এবং নৃত্যগীতাদির জন্ত বহুবিধ ব্যবস্থা ছিল। ধনীরা শীতকালে বরফের উপর দিয়া স্লেজে চড়িয়া এই সকল দ্বীপে আমোদ আহ্লাদ করিতে গমন করিত।

পেট্রোগ্রাড সহরে এবং তাহার কাছাকাছি স্থানগুলিতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ঋতুর কোনো স্থিরতা নাই। নব বৎসরের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর ভালর দিকে পরিবর্ত্তন হয়। এপ্রিল মে মাসে বরফ গলিয়া ভাঙিতে সুরু হয়। এই সময় এক মাস প্রকৃতি স্তব্ধ থাকে—কোনো দিকে কোনো সাড়া নাই। প্রকৃতি প্রতীক্ষমানা বলিয়া মনে হয়। তার পর হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে চারি দিকের কাল কাল গাছের ডালগুলি সবুজে ভরিয়া যায়। গাছ পাতা ফুলে ভরিয়া ওঠে। মনে হয়, যেন যাদুকরের সোণার কাঠির ছোঁয়াচ পাইয়া এক রাত্রিতে মৃত প্রকৃতির বুকে প্রাণ সঞ্চার হইয়াছে। দারুণ শীতকাল হইতে ঋতু যেন একলাফে বসন্তকে ডিঙ্গাইয়া একেবারে গ্রীষ্মে আসিয়া পড়িয়াছে। রাশিয়ার সর্ব্বত্রই প্রায় এই প্রকার হয়। তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হয়। রাশিয়ার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলে একই সময়ে কোথাও শীত, চারিদিক বরফে শাদা, কোথাও বসন্ত, চারিদিকে সবুজ, গাছপালা ফুলে ফলে ভরা, কোথাও বা বর্ষার জলধারায় চারিদিক আচ্ছন্ন। একই সময়ে এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থা পৃথিবীর খুব কম স্থানেই দেখা যায়।

সহায়-সম্পত্তিহীন নিরাশ্রয় রাশিয়ান নরনারী।

ছেলেদের কাণ্ড

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল্

১

বড় ভাই জীবনকৃষ্ণ ছিলেন সওদাগরী হৌসে মুছুদ্দি, এবং ছোট ভাই বিলাস কাষ্টম হাউসে এপ্রেসার।

দুই ভাইএর চেহারা এবং প্রকৃতিও ছিল চাকুরীর অনুরূপ। জীবনকৃষ্ণ মোটা সোটা, ঢিলে-ঢালা প্রকৃতির—যাহা ঘটিতেছে ঘটুক এই ধরণের। বিলাসচন্দ্র রোগা, লম্বা, সাহেবী ফ্যাসান, চটপটে, এবং সকল জিনিসকে ভাল করিয়া পরীক্ষা না করিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন।

অথচ এই দুটি ভিন্ন-প্রকৃতির ভাইএর মধ্যে এতাবৎ কোন বড় রকমের গরমিল হয় নাই,—সংসার-চক্র একরকম মন্থর-গতিতে চলিয়া আসিতেছিল।

চক্র চলে চক্রীর ইঙ্গিতে; এবং এতদিন চক্রীরা চুপচাপ

ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল, এবং যেখানে এতদিন বহিয়া আসিতেছিল মলয়ানিল, সেখানে উঠিল ঝড়।

ছোট গিন্নী সুরমার খরচ দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছিল। থিয়েটার, সিনেমা—এ ত প্রায় প্রাত্যহিক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তদুপরি আফিসার মানুষের ট্রামে যাওয়া শোভা পায় না বলিয়া স্বামীর জন্য মোটর আসিল। বিলাস যখন মোটরে করিয়া সাঁ করিয়া কাষ্টম হাউসে চলিয়া যাইতেন, বড় ভাই জীবনকৃষ্ণ তখন চাপকানের উপর চাদর জড়াইয়া মন্থর-গতিতে ট্রামের পথে যাত্রা করিতেন।

বিলাসের চক্ষেও এটা বিসদৃশ ঠেকিয়াছিল। সেইজন্য এক দিন বড় ভাইকে বলিলেন, "দাদা, আমি তোমাকে মোটরে পৌঁছে দিয়ে আপিস যেতে পারি।"

জীবনকৃষ্ণ হাসিয়া বলিলেন, মোটরে গেলে সওদাগরী আপিসের চাকুরি থাকা কঠিন হবে, ভায়া, আমার ট্রামেই ভাল।

বিলাসচন্দ্র মুখ গম্ভীর করিয়া মোটরে আরোহণ করিলেন, এবং জীবনকৃষ্ণ পায়ে হাঁটিয়া ট্রামের উদ্দেশে চলিলেন।

এটাও হয়ত কোনও রকম করিয়া সহিয়া যাইত, কিন্তু পর মাসের গোড়ায় যখন বিলাস তাঁহার দেয়'র অর্দ্ধেকের অপেক্ষা কম দিলেন, তখন অন্দর-মহলে উঠিল ভীষণ ঝড়।

সংসারটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন জীবনকৃষ্ণ। তাঁহার আয় ছিল ছোট ভাইয়ের চেয়ে সর্ব্বপ্রকারে বেশী, কিন্তু খরচ ছিল সর্ব্বপ্রকারে কম। সুতরাং সকল রকমের অভাব পূরণ করিবার ভার ছিল তাঁহার উপর, এবং বড় ভাইয়ের কর্ত্তব্য মনে করিয়া তিনি তাহা নির্ব্বাক্ ভাবেই করিয়া আসিতেন।

কিন্তু তাঁহার পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া এবং বিলাসের মোটরে চড়িয়া যাওয়া, সব চেয়ে বেশী আঘাত দিয়াছিল জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী মোক্ষদাকে। বিলাসের এই বিসদৃশ ব্যবহারে এই নারীর অন্তর ভিতরে ভিতরে ক্রোধে ফুঁসিয়া উঠিত, এবং পর মাসের গোড়ায় সেই ক্রোধ অন্তরের আবরণ ভেদ করিয়া একেবারে বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল।

উত্তরে সুরমা যে সকল কথা বলিল, তাহা মনের মিলের পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে, এবং সুরমা এ কথাও জানাইতে ভুলিল না, যে যৌথ সংসার যদি তাহাদের দোষে চলিতে রাজী না হয়, ত' তাহার পৃথক হইতে আপত্তি নাই।

বিলাস আপিস হইতে ফেরার পর সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মোটা এবং সরু গলায় দুই ক্রুদ্ধ নরনারীর উচ্চ আলাপের স্বর বিষধরের গর্জ্জনের মত ফুঁসিতে লাগিল।

২

সকালবেলা বাড়ীর চেহারা বর্ষার মেঘের মত থম্‌থমে—অদূর-ভবিষ্যতে একটা প্লাবনের সূচনা করিতেছিল।

জীবনকৃষ্ণ বাহিরের বারান্দায় একটা চেয়ারে শুষ্ক মুখে বসিয়া ছিলেন। সংসার কোন পথে চলিয়াছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু, ভিতরে ভিতরে যে ক্ষয় অনেক দিন ধরিয়াই চলিতেছে, তাহার কুৎসিত প্রকাশের মুহূর্ত্ত যে সন্নিকট এই কথা মনে করিয়াই তাঁহার অন্তর যেন শিহরিয়া উঠিতেছিল।

বিলাস আসিয়া অদূরে আর একটা চেয়ারে বসিয়া খানিকক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কথা কাহারও মুখ দিয়া কিছুক্ষণ বাহির হইল না। বিলাস আকাশের নীলিমা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং জীবনকৃষ্ণ দেওয়ালের একটা ভাঙ্গা ফাটলের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন।

অর্থাৎ উভয়েই বুঝিয়াছিলেন যে মুহূর্ত্ত আসন্ন।

কথা কহিলেন বিলাস। বলিলেন, এবার একটা বন্দোবস্ত করতে হয়।

জীবনকৃষ্ণের বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। বিলাসের মুখের পানে চাহিয়া কহিলেন, কিসের বন্দোবস্তের কথা বলচ।

বিলাস বিপদে পড়িলেন। যে লোক বুঝিয়াও বোঝে না তাহাকে বোঝান কঠিন। অথচ কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও মুখে বাধে।

ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, একসঙ্গে থাকার অসুবিধা হ'চ্ছে।

জীবনকৃষ্ণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এতদিন ত হয়নি। এটা তোমার নতুন অনুভব।

বিলাস কঠিন হইয়া কহিলেন, নতুন হ'তে পারে, কিন্তু মিথ্যা নয়।

জীবন কহিলেন—কি চাও?

একসঙ্গে থাকার যখন অসুবিধা হ'চ্ছে, তখন একত্র থাকার প্রয়োজন দেখি না।—

তোমার অভিরুচির বিরুদ্ধে আমি যেতে চাইনে—বাবার ক্ষমতাও নেই বোধ হয়।—শেষের দিকটা জীবনকৃষ্ণের গলা কাঁপিয়া উঠিল।

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিলাস কহিল, তাহ'লে কাল থেকেই।

জীবন কহিলেন, ভাল।

পাড়ার দু'চার জনকে ডেকে জিনিসপত্রগুলো ভাগ ক'রে নিলে ভাল হয় না?

জীবন চুপ করিয়া রহিলেন। চোখ দুটো ঝাপসা হইয়া উঠিল। তাহার পর সহসা বিলাসের মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, না—না, পাড়ার লোককে আর জানাতে হবে না বিলাস! এ লজ্জা আমাদের মধ্যেই থাক। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি বিলাস। জিনিসপত্র তুমি যেমন বোঝ নিও—আমার কোন আপত্তি নেই।

বেশ, কিন্তু বাড়ী? মাঝে একটা দেওয়াল তুলে দিলেই, ঠিক দু' ভাগ হ'য়ে যাবে। কি বলেন?

যন্ত্রের মত কথাটার পুনরাবৃত্তি করিয়া জীবন কহিলেন, দেওয়াল তুলে দিলেই হবে।

দিন চার-পাঁচের মধ্যেই দেওয়াল উঠিল।

৩

এই বাড়ীর দুইটি প্রয়োজনীয় লোকের কথা বলা হয় নাই,—তাহারা সুধীর ও বিমল। সুধীর জীবনকৃষ্ণের পুত্র, এবং বিমল বিলাসের। সুধীর বিদ্যাসাগর কলেজের থার্ড ইয়ারে এবং বিমল সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। দুইজনেই বুদ্ধিতে যেমন তীক্ষ্ণ, চরিত্রে তেমনি মধুর। এবং দুই ভাইএর মধ্যে ভালবাসা, সেও দেখিবার জিনিস—যেন একবৃন্তে দুটি ফুল। তাহারা খায় একত্র, শয়ন করে একত্র এবং সুখ ও দুঃখ ভোগ করে একত্রই।

সংসারের অন্তরে ও বাহিরে বিরোধের কঠিন মূর্ত্তি রূপী প্রাচীর যখন উঠিল, তখন দুই ভাই সুধীরের মামার বাড়ী কোন্নগরে গ্রীষ্মের ছুটি যাপন করিতেছে।

মা-বাপেদের মধ্যে যখন বিভাগ হইয়া গেল, তখন মামাদের বিভাগও স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং বিলাস কঠিন তাগিদ দিয়া বিমলকে চিঠি লিখিলেন, সুধীরের মামার বাড়ী থেকে তুমি অবিলম্বে চলে আসবে।

চিঠিটা এমনি অভিনব, যে এই দুই অনভিজ্ঞ যুবকের মনেও একটা খট্‌কা বাধিল। তাহারা অবিলম্বেই কলিকাতায় ফিরিল।

বাড়ী ঢুকিয়া বিমল ডাকিল, জেঠাইমা! জেঠাইমা ছুটিয়া আসিতেই তাহারা দু'জনে প্রণাম করিল। তাহাদের আদর করিয়া চুমা খাইয়া মোক্ষদা কহিলেন, তোমরা খেয়ে এসেছ ত' বাবা!

ততক্ষণে দুইজনেই মাঝখানের সেই প্রাচীর দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছে। বিমল কহিল, ওটা আবার কি জেঠাইমা!

এই দুটি ছেলে যেন দুইটি অনাঘ্রাত সুন্দর ফুল, সংসারের পঙ্কিল কদর্য্যতার বহু উর্দ্ধে! ওই প্রাচীরের যে কুৎসিত অর্থ, কেমন করিয়া তিনি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিবেন? জেঠাই মা চুপ্ করিয়া রহিলেন।

এমন সময় দেওয়ালের অবরোধ ডিঙ্গাইয়া ও-বাড়ী হইতে সুরমার কঠিন আদেশ শোনা গেল,—বিমল শোন!

বিমল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, ওরে বাস্‌রে! এক দিনে এসব কি হ'য়ে গেছে জেঠাইমা! তোমাদের বুঝি আড়ি হ'য়ে গেছে? বলিয়া খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ও-পার হইতে আবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠের আহ্বান আসিল, বিমল!

বিমল সুধীরকে কহিল, চল না দাদা, মা বোধ হয় রেগেছেন, তুমি সঙ্গে না গেলে আমি ভারী বকুনি খাব।

সুধীর কহিল, এখন তুমি একলাই যাও ভাই, আমি না হয় পরে যাব।

তাহার চেয়ে যে সুধীর কম ভয় পায় নাই, বিমল তাহা বুঝিল, কহিল, আচ্ছা তাই ভাল।

ও-বাড়ীতে যাইতেই সুরমা গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, কখন আসা হ'ল?

বিমলের আবার হাসি আসিল। কহিল, মা, অত রাগ করছ কেন! এই ত' এলাম,—জান না?

সুরমা সুর চড়াইয়া কহিলেন, শোন আমার কথা। তুমি ও-বাড়ীতে আর যেতে পাবে না, আর, তোমার দাদার সঙ্গে আর মিশতে পাবে না।

বিমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন মা? কি হয়েছে তোমাদের?

সুরমা গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, ও-সব কথায় তোমার দরকার কি? যা বলি শোন, ও-বাড়ী আর মাড়াবে না, আর তোমার দাদাকে এ-বাড়ীতে আস্‌তে মানা ক'রে দিও!

বিমলের চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরিয়া আসিল। সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তা হবে না মা, দাদাকে ছেড়ে থাকতে পারবো না।

গলার স্বর আরও কঠিন করিয়া কহিলেন, ও-সব বাহাদুরি রাখ! ভারী রাম-লক্ষ্মণ ভাই হয়েছেন! কেমন তুমি কথা না শোন—দেখি ত'!

বিমল আধ-কান্নার স্বরে কহিল, মা, তোমাদের কি ঝগড়া হয়েছে, তার জন্তে আমাদের ওপর রাগ কর কেন? না—দাদাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

সুরমার গলার আওয়াজে বোধ হইল সহের সীমা অতিক্রম করার আর বিলম্ব নাই। কহিলেন, দেখব কার কথা থাকে! তুমি যদি ও-দিকে যাও, আর তোমার দাদার সঙ্গে মেশ, ত' তোমার পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখব। অবাধ্য ছেলে কোথাকার!

বুকের ভিতর কান্না ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। জোর করিয়া উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন নিবারণ করিতে করিতে বিমল পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

৪

বাইরের যৌথ বৈঠকখানার মাঝেও দেওয়াল উঠিয়াছিল। ছেলেরা রাত্রে এই বৈঠকখানা ঘরে শুইত, কিন্তু সম্প্রতি ব্যবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। সুধীরের বিছানা নিজেদের অংশের বৈঠকখানাতেই হইয়াছিল, কিন্তু বিমলের বিছানা হইয়াছিল বাড়ীর ভিতরে। পাছে দুই ভাইয়ে কথাবার্ত্তা হয়।

জিদ যখন মানুষকে পায়, তখন এমনি করিয়াই পাইয়া থাকে। তখন উচিত-অনুচিত ন্যায়-অন্যায়ের বিচার লোপ পাইয়া যায়।

কর্ত্তারা আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া যে যার অংশে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসিয়া পূর্ব্বের মত কথাবার্ত্তার উপায় নাই, প্রবৃত্তিরও একান্ত অভাব। সমস্ত ব্যাপারটাই সুধীর এবং বিমলকে যেন স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিল।

সুধীর স্পষ্ট শুনিতে পাইল—বিলাস বিমলকে নানাপ্রকারে বুঝাইতেছেন ও শাসন করিতেছেন। তাঁহার ও সুরমার কথার অবাধ্যতা করিলে তাহাকে যে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে, সে ইঙ্গিতও বারংবার করিতে ভুলিতেছেন না। জীবনকৃষ্ণর শাসন অত কড়া না হইলেও, তিনি সুধীরকে জানাইয়া দিলেন যে, দুই ভাইয়ে মেলামেশা করিবার চেষ্টা না করাই ভাল, কারণ তাহাতে কাহারও মঙ্গল নাই।

* * * *

শেষ রাত্রে সুধীরের যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন মনে হইল—যেন বুকের উপর একটা কঠিন ভার চাপিয়া বসিয়াছে। রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই,—এই একটা অপ্রত্যাশিত ওলট্-পালট্ যেন দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত অন্তরটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

পাশ ফিরিয়া আবার শুইল। কাল রাত্রে কোন্নগরেও তাহারা দুই ভাইএ একত্র শুইয়াছে। সুধীর ভাবিয়া দেখিল,—যত দিনের কথা মনে হয়, একটি দিনও দুই ভাইএর নিবিড় ভালবাসার মধ্যে এতটুকু ফাঁক নাই। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল যে, নিশ্চয়ই আজ বিমল তাহারই মত জাগিয়া আছে। এবং এই কথা মনে করিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

"দাদা—"

সুধীর চকিতের মধ্যে উঠিয়া বসিয়া দেখিল—পাশে বিমল।

বিস্মিত ও ভীত হইয়া সুধীর কহিল, তুই এখানে এলি যে বিমল?

বিমল হাই তুলিয়া কহিল, সমস্ত রাত্তির ঘুমুতে পারিনি দাদা।

তোর এখানে আস্‌তে ভয় করল না বিমল?

একটু একটু করছিল বই কি! কিন্তু সবাই ত ঘুমুচ্ছে। আচ্ছা দাদা ভাই, তোমার আমার জন্তে মন-কেমন করে না?

সুধীর দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, করে না আবার?—খুব করে।

তবে আমি আসব না কেন?

সুধীর তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল, তা হ'লে তুমি যে ভারী বকুনি খাবে—হয় ত বা মারও খাবে। তাতে যে আরও কষ্ট হবে ভাই।

বিমলের দুই চোখে জল আসিয়াছিল। সে কহিল, আচ্ছা দাদা, এ সব কেন হ'ল? বেশ ত' ছিলাম আমরা।

সুধীর কহিল, কেন হ'ল তা ত জানিনে। কিন্তু আমাদের যে কি দোষ তাও ত' বুঝিনে।

বিমল ঘাড় নাড়িয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, না—এমন করে থাকতে পারব না দাদা। ওঁরা যদি আড়ি করে থাকেন ত করুন, কিন্তু আমরা কখ্খনো আড়ি করব না, কি বল দাদা!

সুধীর বিমলের দুই হাত আপনার হাতের ভিতর লইয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, কখ্খনো না।

বিমল কহিল, কিছুতেই আমরা ছাড়াছাড়ি হব না।

সুধীর কহিল.কিছুতেই নয়। কিন্তু বিমল তুই যা ভাই—ওঁরা যদি জান্‌তে পারেন যে তুই এসেছিস, তা হ'লে তোকে ভারি দুঃখ দেবেন।

বিমল কহিল,—দিন গে। দাদা, দিনের বেলায় ত দেখা হবে না, আমি ওপরের ঘরের দোরের ফাঁক দিয়ে তোমাকে চিঠি দোবো—জবাব দিও—কেমন?

সুধীর বলিল, দোবো—কিন্তু তুই যা ভাই।

বজ্রপাত হইলেও বোধ করি দুই ভাই তত বিস্মিত হইত না, যত বিস্মিত হইল,পাশের ঘর হইতে সুরমার কঠিন আহ্বানে,—বিমল!

আসন্ন বিপদের ভয়ে দুই ভাই নির্নিমেষে পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিল।

আবার সক্রোধ আহ্বান—বিমল!

এই প্রতিহিংসা-পরায়ণা নারীর মনের গভীর সন্দেহ তাহার চোখ হইতে ঘুমকেও তাড়াইয়াছিল। শেষ রাত্রে দেখিতে আসিয়া যখন সে দেখিল যে বিমল ঘরে নাই, তখন ক্রোধের আর অপমানের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

ও-বাড়ীতে সমস্ত সকাল ধরিয়া বিমলের উপর যতই শাসন ও অত্যাচার চলিতে লাগিল, এ-বাড়ীতে সুধীরের চোখ ফাটিয়া ততই অবিরল জল পড়িতে লাগিল।

৫

পরদিন শেষ রাত্রে সুরমা আবার বিমলের ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল—বিমল নাই!

রাগে সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আজ তাহাকে যে শাস্তি দিতে হইবে,তাহার কথা মনে করিয়া সুরমার নিজের বুকের ভিতরটাই শিহরিয়া উঠিল।

বৈঠকখানা ঘরে নিজেদের অংশে দাঁড়াইয়া সুরমা কাণ পাতিয়া শুনিতে চেষ্টা করিল, দুই ভাইয়ে কি কথা হইতেছে। কিন্তু আজ আর কোন শব্দ পাওয়া গেল না,—বৈঠকখানা ঘর নিস্তব্ধ।

তখন সুরমা ডাকিল—বিমল! কোনও উত্তর নাই,—শুধু নিজের স্বর বৃহৎ বৈঠকখানা-ঘরে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল।

তখন আরও জোর করিয়া ডাকিল, বিমল, সুধীর!

কোনও উত্তর নাই!

ভয় করিতে লাগিল, বুকের ভিতর কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। তখন সুরমা ফিরিয়া গিয়া স্বামীকে উঠাইয়া কহিল—বিমল আজ আবার নেই।

বিলাস মার-মূর্ত্তি হইয়া উঠিয়া বসিলেন, "রাস্কেল আজ আবার গিয়েছে?—দেখ্‌ব তাকে।"

সুরমা কহিল, "কিন্তু বৈঠকখানা ঘরেও ত নেই। দুজনকে ডেকে কারুর সাড়া পেলাম না।" সুরমার স্বর নরম।

বিলাস কহিলেন, নেই! সে কি? কোথায় গেল?

কোথায় গেল তা কি জানি! ওগো তুমি দেখ না একবার!

তখন খোঁজ পড়িয়া গেল। এ-বাড়ী ও-বাড়ী দুই বাড়ীর লোক পাতি পাতি করিয়া সমস্ত বাড়ী খুঁজিল, কিন্তু কোথাও তাহাদের পাওয়া গেল না। চারিদিকে খোঁজা-খুঁজিতে সকাল হইয়া খানিকটা বেলাও বাড়িয়া গেল।

অবসন্ন মনে বিলাস জীবনকৃষ্ণের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তাদের ত' কোথাও পাওয়া গেল না দাদা!

জীবন কহিলেন, তারা কোথাও চলে গেছে বোধ হয়।

বিলাস কহিলেন এখন উপায়?

জীবন কহিলেন, উপায় এখন তারাই। যদি দয়া করে ফিরে আসে। বিলাস, তারা আসবে কি না জানি না, কিন্তু আমাদের ভারী শিক্ষা দিয়ে গেল। আমরা তাদের বাপরা, কিন্তু আমাদের চেয়ে তারা ঢের উঁচু। আমরা

ভাঙনটাকে পারা-পোক্ত করতে কিছুমাত্র অবহেলা করি নি, জোর করে অত্যাচার করে তাদের এই বিরোধের মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টার ত্রুটি করি নি, কিন্তু এই ছুটি ছোট ছেলের কাছে আমরা একেবারে হেরে গেলাম। তোমার মত আমার চোখেও জল আসছে বিলাস, কিন্তু আমি এটাও বুঝছি যে আমরা কাঁদবার মতই পাপ করেছি।

এখন কি করা যায়? পুলিশে খবর দোবো কি? না আরও একটু দেখব? খাবার সময় পর্য্যন্ত না হয় দেখি।

তারা খাবার লোভে যে এ বাড়ীতে ফিরবে না তা নিশ্চয়। পুলিশে খবর যদি দিতে হয় ত' দেরী করায় কোন লাভ নেই। কিন্তু পুলিশেও যে তাদের নাগাল পাবে, তা' মনে হয় না। আমার মনে হয় তারা যতক্ষণ না জানবে যে আমরা আমাদের সংশোধন করেছি—ততক্ষণ তারা ফিরবে না। তাদের পরস্পরের ভালবাসার পথে দাঁড়াব, এ সন্দেহ যতদিন তাদের থাকবে, ততদিন তাদের কেউ ফেরাতে পারবে না।

কিন্তু কি ক'রে তাদের সে কথা জানান যায়?

তাদের জানাবার আগে, আমাদের নিজেদেরই একটা লেখাপড়া হ'য়ে যাওয়া দরকার; নিজেদের ঘর না সামলালে তাদের ডেকে কোন লাভ নেই।

আপনি যা বলবেন সেই মতই হবে।

জীবন কহিলেন, অধীর হ'য়ে কোন লাভ নেই। তুমি পুলিশে খবর দেওগে। আমি তাদের বন্ধুদের কাছে যদি খবর নিতে পারি দেখি। এই জরুরী কাজগুলো সেরে এ সম্বন্ধে ভাবা যাবে।

৬

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। এই বাড়ীর দুর্ভাগা নারী দুইটি সমস্ত দিন কাঁদিয়া কাটাইয়াছেন, বিশেষ সুরমা। ছেলের উপর যত শাসন যত অত্যাচার করিয়াছেন, তাহা সুদে আসলে ফিরিয়া পাইতেছেন। এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হয় নাই যে এই ছুটি ছেলের হাতে এত বড় অস্ত্র ছিল, —মাতৃহৃদয়-সঞ্চিত সুগভীর স্নেহরাশিই এই ছুটি বালকের আজ অমোঘ গাণ্ডীব!

শোক মানুষের পার্থক্য ঘুচাইয়া দেয়, মানুষকে নীচতার ঊর্দ্ধে তোলে। আজ এই দুঃখের দিনে সুরমার কাছে মোক্ষদাই সব চেয়ে বড় নির্ভর-স্থল, দুইজনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছাড়াছাড়ি হয় নাই। জীবনকৃষ্ণ ও বিলাস সকাল সকাল আপিস হইতে ফিরিয়া, ছেলেদের খোঁজে বাহির হইয়াছেন; তাঁহাদের ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া এই ছুটি নারীর বক্ষ মুহুর্মুহু আশা ও নিরাশায় কম্পিত হইয়া উঠিতেছে।

অবশেষে সন্ধ্যার পর কর্ত্তারা ম্লান-মুখে ফিরিয়া যখন সংবাদ দিলেন যে পুলিশ এ পর্য্যন্ত কোনও উপায় করিতে পারে নাই, এবং বন্ধুরা তাহাদের কোনও সংবাদ জানে না, তখন আবার চাপা-কান্নার শব্দ শোনা গেল।

জীবনকৃষ্ণের বসিবার ঘরে আজ সকলেই সমবেত হইয়াছেন। বহু যত্নে তিলে তিলে রচিত অভ্রভেদী বিরোধ এক মুহূর্ত্তে যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

বিলাস কহিলেন,—আপনার কি মনে হয় তারা আর ফিরবে না?

জীবন কহিলেন, আমার মনে হয় তারা নিশ্চয়ই ফিরবে। তারা এমন ছেলে নয় যে অকারণ আমাদের দুঃখ দেবে। তারা যে কত ভাল ছেলে বিলাস, তা আমরা আজ বেশ অনুভব করছি। আমরা যা কিছুতেই পারিনি, তা তারা সহজেই করলে। কাল কে ভাবতে পেরেছিল বিলাস, যে আমরা আজ রাত্রে সবাই একসঙ্গে বসে একই দুঃখ সমান ভাবে ভোগ করব? বাতান্তর ছেলে তারা, তাদের তুলনা নেই। বাপেদের শিক্ষা দিলে এই ছুটি কচি ছেলে! তারা তখনই ফিরবে যখন তারা জানতে পারবে যে আমরা সব এক সঙ্গে রয়েছি, যখন তারা বুঝবে যে এ সংসারে বিরোধ আর নেই, এবং বড়র সম্মান আর ছোটর কল্যাণ বজায় থাকবার আর কোন বাধা নেই। এ করতে পারব কি আমরা, বিলাস?

বিলাস মাথা নীচু করিয়া কহিলেন, পারব।

সুরমা মোক্ষদার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া কহিল, দিদি—নিশ্চয়ই হবে।

জীবন কহিলেন, আর ঐ বিরোধের মূর্ত্তিমান্ চিহ্নগুলো?

বিলাস কহিলেন, কাল সকালেই মিস্ত্রী ডেকে আমি ওগুলো ভাঙিয়ে দোব দাদা।

জীবন কহিলেন, কথা তা'হলে ঠিক রৈল ভাই।

বিলাস তাঁহার অস্খলিত প্রতিশ্রুতির প্রমাণস্বরূপ জীবনকৃষ্ণের পায়ে হাত দিয়া সংক্ষেপে কহিলেন, ঠিক।

সুরমা মোক্ষদার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, দিদি, আমি আর তোমার কোনও কথার অবাধ্য হব না।

মোক্ষদা তাহাকে উঠাইয়া চিবুক স্পর্শ করিলেন।

জীবন কহিলেন, তা হ'লে আমি তাদের ফিরিয়ে আনতে পারব বিলাস। যত শীঘ্র আমরা আমাদের এই কাজগুলো সেরে ফেলতে পারব তত শীঘ্রই তারা ফিরবে। তা নইলে কিছুতেই নয়। আমাকে তারা বিশ্বাস করে, আমার কথা যাতে মিথ্যে না হয়, তোমাদের এইটুকুই দেখতে হবে। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরে আমি তাদের একটা চিঠি পেয়েছি।

বিলাস আগ্রহে কহিলেন, চিঠি? কি লিখেছে তারা?

যে কথাগুলো আমি বললাম তারা ঠিক সেই সব কথাই লিখেছে। তারা চারদিনের সময় দিয়েছে—এ চারদিন তাদের সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে না, কিন্তু এ সময়টুকু হারালে তাদের খোঁজ পাওয়া মুস্কিল হবে। আমরা যদি এদিকের ব্যবস্থাগুলো ঠিক করে নিতে পারি ত' আমি কাল পরশুই তাদের নিয়ে আসতে পারব।

সুরমা কহিলেন, দিদি, এ দিকের জন্যে কিছু আটকাবে না, কালই ওদের নিয়ে আসুন।

বিলাস কহিলেন, কালই আমি সব ঠিক ক'রে দোবো।

জীবনকৃষ্ণ কহিলেন, বেশ।

৭

সকালবেলা অনেক মিস্ত্রী লাগাইয়া বিলাস বিরোধের প্রাচীরগুলা ভাঙাইয়া পরিষ্কার করিয়া দিলেন। বাড়ীর আবার পূর্ব্বশ্রী ফিরিল। ভাঁড়ারের চাবি মোক্ষদার হাতে আসিল, এবং সুরমা সলজ্জে সংসারের বাকী দেয় টাকাগুলো মোক্ষদার পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন।

মোক্ষদা সস্নেহে কহিলেন, ওগুলো এখন রাখ বোন্—দরকার হ'লে নোব তখন।

আপিস হইতেই জীবনকৃষ্ণ ছেলেদের আনিতে চলিয়া গিয়াছেন।

বিকালের পর সন্ধ্যা, সন্ধ্যার পর রাত্রি আসিয়া পড়িল, সময় যেন আর কাটিতে চাহিতেছে না। এই বাড়ীর উন্মুখ নরনারী সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন সেই মুহূর্ত্তের জন্য যখন জীবন ছেলেদের লইয়া ফিরিবেন।

রাত্রি দশটা আন্দাজ গাড়ীর আওয়াজ শুনিয়া সকলেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জীবনকৃষ্ণ ছেলেদের লইয়া ফিরিয়াছেন।

মধ্যে দুইটি দিনের ব্যবধান, তবুও যেন মনে হইতেছিল কতদিন ছেলেদের দেখা হয় নাই।

ছেলেরা গিয়া মোক্ষদা, বিলাস ও সুরমাকে প্রণাম করিল। তাঁহারা স্নেহের অশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মোক্ষদা কথা কহিলেন, কোথায় তোরা ছিলি বাবা।

সুধীর হাসিয়া কহিল, আমরা বেশ জায়গায় ছিলাম মা। মামার বাড়ীতে। দিব্বি আরামে ছিলাম।

আচ্ছা মজা করিয়াছে এই ছেলে দুটো! তাহারা নিজেরা কাটাইয়া আসিল দিব্য আরামে, অথচ কি জব্দই না করিয়াছে দু'দিন ধরিয়া এই বাড়ীর লোকেদের!

তাহাদের মামার বাড়ীতে পরম আরামে থাকার কথা শুনিয়া সকলে হো—হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং নিস্তব্ধ রাত্রে সেই আনন্দের উচ্চ হাসির কলরোল বৃহৎ বাড়ীর চারিদিকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া ইহার সমস্ত ক্লেদ এবং মলিনতাকে যেন মুহূর্ত্তে ধুইয়া পুঁছিয়া সাফ করিয়া দিল।

বকুল তরু

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

(এই বিশাল বকুল তরুটী শ্রীপাট কোগ্রামে লোচন দাস ঠাকুরের আখড়ার নিকটে অজয় নদের তীরে প্রায় পাঁচশত বৎসর অবস্থিতি করিতেছিলেন। কোনো পুণ্যবতী তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অজয়ের সর্ব্বগ্রাসী ভাঙ্গন তরুটীকে গ্রাস করিয়াছে। বকুল তলটী সমস্ত গ্রামবাসীর মিলন, আনন্দ ও বিশ্রামের স্থল ছিল, শাস্ত্রকথা সংকীর্ত্তন প্রভৃতির জন্ত ব্যবহৃত হইত।)

পাঁচশো বছর হেথায় ছিলে
প্রাচীন বকুল গাছ,
অজয় নদের ভাঙ্গনেতে
পড়লে ভেঙ্গে আজ।
কালও ছিলে নিবিড় শ্যামল
লোহার মত দৃঢ়,
ফুলের রাজা প্রফুল্ল মুখ
লাখো পাখীর গৃহ।
কালও ছিল সত্র তোমার
জমাট মনোহর,
সারা দিবস অতিথ ভ্রমর-
গুঞ্জন-মুখর।
কালও ছিল তোমার তলে
ছেলে মেয়ের ভিড়,
আজকে নত নদীর জলে
অভ্রভেদী শির।
সিদ্ধ না হও তুমি মোদের
বৃদ্ধ বকুল গাছ,
বক্ষ উঠে টন্‌টনিয়ে
চললে তুমি আজ।
তুমি মোদের অক্ষয় বট
তুমি বোধিদ্রুম,
পিতামহের পিতামহ
তোমায় নমো নমঃ।
শৈশবেরি গোকুল তুমি,
স্নেহের ব্রজধাম,
বার্দ্ধক্যের প্রভাস তুমি,
পুণ্য তব নাম।

অক্ষ-রণের কুরুক্ষেত্র
দেখলে হত ভ্রম,
রামায়ণের তুমিই মোদের
বাল্মীকি আশ্রম।
পুরাণের নৈমিষারণ্য
তুমিই ব্যাসাসন,
সংকীর্ত্তনে তুমি মোদের
শ্রীবাস-অঙ্গন।
তুমি মোদের সুহৃদ সখা
তুমি গুরুর গুরু,
তোমার চরণ-তলেই মোদের
ভক্তি-জীবন সুরু।

২

লোচন দাস যে তোমার তলে
করেছিলেন খেলা,
বাদল দিনে নালার জলে
ভাসিয়েছেন ভেলা,
তোমার ফুলে মালা গেঁথে
ছেলে খেলার ছলে,
অলক্ষ্যেতে পরিয়েছেন
বনমালীর গলে।
তোমার তলে পড়িয়াছে
তাঁহার চোখের জল,
তুমিই প্রথম শুনিয়াছ
'চৈতন্ত মঙ্গল'।
কাছেই তোমার শিবের দেউল
তুমিই মোদের কাশী,

ঘরের কাছেই স্বর্গ মোদের
তোমায় ভালবাসি।

৩

শুনিয়াছ যুগের যুগের
ছেলে বুড়ার কথা,
উৎসবের আনন্দ ও
ভাঙ্গা বুকের ব্যথা।
প্রাচীনতম বাসিন্দা যে
তুমি গ্রামের বুড়া,
একটী তোমার কেশ পাকেনি
চির শ্যামল চূড়া।
সুদূর থেকে তোমায় দেখে
উঠতো ভরে বুক,
তুমিই সবার গৃহস্বামী
আদর-মাখা মুখ।
আজকে তোমার স্বর্গারোহণ
ওগো বনস্পতি,
আজকে গোটা গ্রামের অশৌচ
গোটা গ্রামের ক্ষতি।
মনে পড়ে তোমার স্নেহ
তোমার শীতল ছায়া,
মনে পড়ে ফুলের সুবাস
স্নিগ্ধ মধুর হাওয়া।
জমছে মনে হারিয়ে যাওয়া
চেনা মুখের ভিড়,
প্রিয়জনের বিচ্ছেদেরি
যন্ত্রণা নিবিড়।

৪

তুমি গোটা গ্রামের দায়াদ
অযুত নাতি পুতি,
চোখের জলে স্বর্গগামী
করি তোমার স্তুতি।

নন্দনেতে ঠাঁই হবে হে
কল্পতরুর কাছে,
গ্রামের সকল বৃদ্ধ বালক
স্বর্গ তোমার যাচে।

স্বর্গ থেকে বকুল তরু
মর্ত্ত্য পানে চেয়ে,
আশীর্ব্বাদী তোমার ফুলে
বুকটী দিয়ো ছেয়ে।

মিত্র ও দৌহিত্র তোমার
ভুলতে তোমায় নারি,
আমায় করো তোমার প্রেমের
উত্তরাধিকারী।

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

"শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশা" (বার্ণাড্‌শ)

প্রথম অঙ্কের ঘটনাকাল ছিল প্রভাত। দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়েছে রাত্রে। ফ্রাঙ্‌কে সঙ্গে করে নিয়ে শ্রীমতী ওয়ারেণ খুব খানিকটা বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে গায়ের শাল-খানা খোলবার চেষ্টা করতে করতে বলছেন, "এই পাড়াগাঁয়ে এসে চুপটি করে ঘরের মধ্যে বসে থাকা কিম্বা ঘুরে বেড়ানো কোনটা যে বেশী কষ্টকর তা আমি ঠিক জানি না। এখন একটু হুইস্কী আর সোডা পেলে বড় ভাল হতো, কিন্তু এখানে কি সে জোগাড় আছে?"

ফ্রাঙ্ক্ সযত্নে শ্রীমতী ওয়ারেণের অঙ্গ থেকে তাঁর শাল-খানি খুলে দিতে দিতে তাঁর সুগঠিত শুভ্র সুন্দর কোমল গ্রীবায় অতি সন্তর্পণে আপন লোলুপ অঙ্গুলীর সাদর স্পর্শ দিয়ে বললে "তা হয়ত ভাইভীর কাছে হুইস্কী আর সোডা থাকলেও থাক্‌তে পারে।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ তাঁর কমনীয় গ্রীবায় ফ্রাঙ্কের হাতের লালস-পরশ অনুভব ক'রে মুহূর্ত্তের জন্ত একবার আড়-চোখে তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন "দুর্ বোকা; সে একরত্তি মেয়ে হুইস্কী সোডা রাখতে যাবে কিসের জন্তে? থাক্‌গে, আমার দরকার নেই, না হ'লেও চল্‌বে।" তার পর অত্যন্ত পরিশ্রান্তের মতো একখানা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন "মেয়েটা কি করে যে একলা এখানে দিন কাটায় আমি তো ভেবে পাই না। আমার তো ভীয়েনায় যাবার জন্ত প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে। সেখানে থাক্‌তে আমার বেশ ভাল লাগে।" ফ্রাঙ্ক এ কথা শুনেই বলে উঠ্‌ল, "চলুন আপনাকে আমি সেখানে নিয়ে যাই।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ তাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, "দূর হ' হতভাগা। যেম্‌নি বাপ তার তেমনি ব্যাটা দেখছি।"

ফ্রাঙ্ক্ বললে "কর্ত্তাও কি এই রকম ছিলেন—এঁ্যা?"

শ্রীমতী ওয়ারেণ বললেন "তোমার সে খোঁজে দরকার নেই। তুমি ছেলেমানুষ, তোমার এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা কি?"

ফ্রাঙ্ক্ আব্দার করে বলতে লাগ্‌ল—"না না—চলুন, আমার সঙ্গে আপনাকে ভীয়েনায় যেতেই হবে। ওঃ তাহ'লে কী মজাই যে হবে।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ গম্ভীর ভাবে বললেন, "না, তুমি এখনও ভীয়েনায় যাবার উপযুক্ত হওনি। আরও একটু বড় না হ'লে ভীয়েনায় যাওয়া তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়।"

ফ্রাঙ্ক্ এ কথা শুনে যেন কতই দুঃখিত হ'লো এমনি ভান করে শ্রীমতী ওয়ারেণের মুখের দিকে চেয়ে রইল; কিন্তু তার চোখের চোরা-হাসি তার মনের কৃত্রিমতাটুকু ধরিয়ে দিচ্ছিল। শ্রীমতী ওয়ারেণ ক্ষণকাল ফ্রাঙ্কের মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন। তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে তার মুখখানি উঁচু করে তুলে ধরে বললেন "দেখো, তোমায় বলি শোনো মাণিক, তোমার বাবার সঙ্গে তোমার অদ্ভুত সাদৃশ্ত থেকে আমি তোমায় যতটা চিনতে পারছি তুমি নিজে হয়ত' নিজেকে ততটা চেন না। আমার সম্বন্ধে তুমি খবরদার যেন কোনও রকম খেয়াল মাথার ভিতর ঢুকিও না—বুঝ্‌লে?"

ফ্রাঙ্ক্ গলার সুর নরম ক'রে তোষামোদীর কণ্ঠে বললে, "কি করবো আমি শ্রীমতী ওয়ারেণ, তোমাকে না ভালবেসে যে আমার উপায় নেই। এ যে আমার রক্তের দোষ।" শ্রীমতী ওয়ারেণ এবার ফ্রাঙ্কের কাণ মলে দেবার ভান করলেন, তার পর সেই সহাস্ত সুন্দর তরুণ মুখখানির দিকে ক্ষণকাল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে মোহাভিভূতা হয়ে পড়লেন, শেষে দু'হাতে তিনি সেই মুখখানি ধ'রে সাগ্রহে ফ্রাঙ্ককে চুম্বন করলেন! কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের দুর্ব্বলতায় নিজের প্রতি বিরক্ত হ'য়ে তিনি ফ্রাঙ্কের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ালেন। একটু পরে নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে আবার তার দিকে ফিরে বললেন "তাই ত। ভারি অন্তায় করলুম। এটা উচিত হয় নি। যাক্‌গে। কিছু মনে কোর না বাছা, এ শুধু মায়ের স্নেহ-চুম্বন। তুমি যাও; ভাইভীর কাছে যাও, তাকে তোমার ভালবাসা জানাওগে।"

কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ফ্রাঙ্ক্ তাঁকে জানালে যে ভাইভীকে সে ইতিপূর্ব্বেই তার প্রণয় জ্ঞাপন করেছে এবং তারা দু'জনেই পরস্পরের প্রেমানুরাগী!—শ্রীমতী ওয়ারেণ তখন আবার বেঁকে দাঁড়ালেন, উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন, "খবরদার! সে কিছুতেই হবে না। তোমার মতো একটা বিটলে ছোঁড়া যে আমার কচি মেয়েটাকে নষ্ট করবে সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না।"

ফ্রাঙ্ক্ বেশ সহজ ভাবেই বললে, "আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আমার কোনও বদ্‌মতলব নেই। আমি তাকে শাস্ত্রসম্মত বিবাহ ক'রে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করতে চাই—" তাদের মধ্যে এই রকম কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় সেখানে রেভারেণ্ড্ স্যামুয়েল এবং স্যার জর্জ্জ ক্রফ্‌টস্ এসে উপস্থিত হ'লেন। শ্রীমতী ওয়ারেণ তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা দু'জনে যে কেবল ফিরে এলে? প্রেড্ আর ভাইভী কোথায় গেল?" স্যার জর্জ্জ বললে, "তারা দু'জনে পাহাড়ের উপরে উঠে গেছে, আমরা শুধু গ্রামটুকু বেড়িয়ে এলুম।" তার পর শ্রীমতী ওয়ারেণ ক্রফ্‌টস্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাত্রে কোথায় শোবে ঠিক করলে? আমার এখানে ত' তোমার থাকা চলবে না জানো।" ক্রফ্‌টস বললেন, "আজ রাতটা স্যাম্ গার্ডনারের বাড়ীতেই কাটিয়ে দেবো স্থির করেছি।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ ব'ললেন, "তোমার তো ব্যবস্থা করে নিয়েছো দেখছি, কিন্তু প্রেডের কি গতি হবে? স্যাম্। তুমি কি প্রেডকেও একটু স্থান দিতে পারবে না?"

খেলার সাথী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

রেভারেণ্ড্ সামুয়েল এ প্রশ্নের উত্তরে একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—"তাই ত!...কি জানো?—আমি হলুম এখানকার ধর্ম্ম-যাজক, আমার তো স্বাধীন ভাবে কিছু করবার অধিকার নেই।...আচ্ছা, মিঃ প্রেডের সামাজিক পরিচয় কি বলতে পারো?"

শ্রীমতী ওয়ারেণ বললেন, "সে দিকে ও বড় সামান্য লোক নয়! ও একজন স্থাপত্য-শিল্পী! কিন্তু, আরে চ্যাঃ সাম্! তুমি যে দেখছি নেহাৎ একেবারে সেই সেকেলে কুসংস্কারের কাদামাখা একটি শুচি-বায়ুগ্রস্ত মানুষ!

ফ্র্যাঙ্ক্ এই সময় মধ্যস্থ হ'য়ে ঠিক করে ফেললে যে

সার জর্জ্জ ক্রফটস
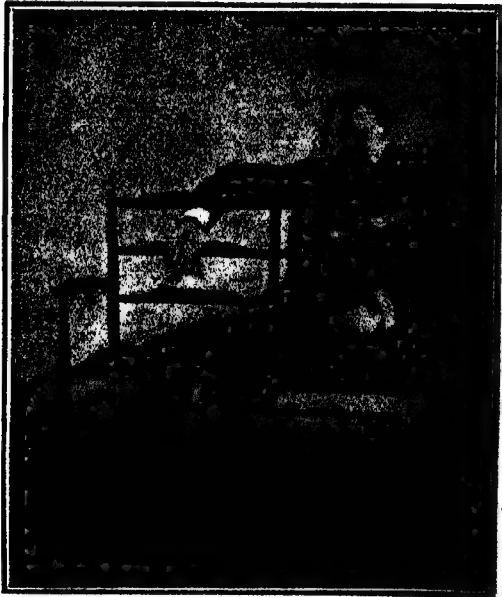
প্রেডও তাদেরই ওখানে থাকবে। বড় বড় সব ডিউক ব্যারণ মারকুইসের সঙ্গে প্রেডের আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব আছে এই সব মিথ্যা পরিচয় দিয়ে সে তার পিতাকে সম্মত করিয়ে ফেললে।

এই সময় ভাইভী আর প্রেডের আর একবার খোঁজ পড়লো। মিসেস্ ওয়ারেণ কেবলই বলতে লাগলেন—"রাত হয়ে এল, এতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা দু'জনে মিলে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,—এতো ভাল নয়!"

কথার পিঠে এ কথাও উঠল যে ফ্রাঙ্ক ভাইভীকে বিবাহ করতে চায়! রেভারেণ্ড্ সামুয়েল গার্ডনার এতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে পুত্রকে বললেন, "এ আশা তুমি ত্যাগ করো। এ বিবাহ হওয়া অসম্ভব! শ্রীমতী ওয়ারেণ তোমাকে বুঝিয়ে দেবেন যে ভাইভীর পাণিপ্রার্থনার কল্পনাও তোমার করা উচিত নয়।"

সার জর্জ্জ ক্রফট্স্ও রেভারেণ্ড্কে সমর্থন ক'রে বললেন—"নিশ্চয়! এ বিবাহ কিছুতেই হতে পারে না।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ কিন্তু গম্ভীর ভাবে বললেন, "তা, দেখো সাম্, আমার মেয়ে যদি ওকেই বিয়ে করবার জন্ম ইচ্ছুক হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তার সে ইচ্ছায় বাধা দিয়ে বিশেষ কিছু ভাল হবে বলে তো আমি মনে করি না।"

রেভারেণ্ড্ সামুয়েল আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিন্তু তাই বলে কি ওর সঙ্গে? তোমার মেয়েকে বিবাহ করবে আমার ছেলে? ভেবে দেখো তুমি—এ যে অসম্ভব!"

সার জর্জ্জ এবারও বললেন, "নিশ্চয়! অসম্ভব! কী তুমি পাগলের মতো বোল্‌ছো কিটী?"

শ্রীমতী ওয়ারেণ রাগে জ্বলে উঠে বললেন—"কেন হতে পারে না শুনি? আমার মেয়ে কি তোমার ছেলের যোগ্য নয়?"

রেভারেণ্ড্ সামুয়েল তখন অত্যন্ত বিনীত ভাবে শ্রীমতী ওয়ারেণকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন যে কেন যে এ বিবাহ হ'তে পারে না সে কারণ তো কিটীর নিজের অবিদিত নয়?

শ্রীমতী ওয়ারেণ এ কথায় আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠে বললেন, "কারণ! কারণ-টারণ আমি কিছু জানি না! তোমার যদি কিছু জানা থাকে তুমি তোমার ছেলেকে সে কথা বলতে পারো কিম্বা আমার মেয়েকেও বলতে পারো, অথবা চাই কি তোমার গির্জ্জের উপাসনার দিন সমবেত সমস্ত ভক্তদের ডেকেও বলতে পারো, আমার কোনও আপত্তি নেই!"

রেভারেণ্ড্ সামুয়েল এবার বিনীতভাবে বললেন "সে কারণ যে আমি কারুর কাছে কখনও প্রকাশ করে বলতে পারবো না সে কথাও তো তুমি ভালরকম জানো!......"

এইখানে ফ্রাঙ্ক্ আর একবার জানিয়ে দিলে যে এ বিবাহ সে করবেই—একেবারে দৃঢ়-সঙ্কল্প!

এবার সার জর্জ্জ ক্রফটস্ শ্রীমতী ওয়ারেণকে বুঝিয়ে দিলেন যে এ বিবাহে প্রথম আপত্তি হচ্ছে—এ ছোকরা

মেয়ের চেয়েও বয়সে ছোট! দ্বিতীয় ও প্রধান কারণ হচ্ছে যে—এর এক পয়সাও সংস্থান নেই। উল্টে এর ঋণের দায়ে এর বাপ শুদ্ধ বিব্রত। তখন শ্রীমতী ওয়ারেণ ফ্রাঙ্ককে স্পষ্টই বলে দিলেন যে তাহ'লে এ বিবাহ হতেই পারে না।

ফ্রাঙ্ক তখন প্রেমের দোহাই দিলে, বললে পয়সাই কি সব? ভাইভী পয়সা চায় না, সে আমাকে চায়, আমরা দু'জনে যে পরস্পরকে ভালবাসি!

শ্রীমতী ওয়ারেণ এবার ছোক্‌রাকে ধমক দিয়ে বলে উঠলেন—"থামো, ভালবাসা অত সস্তার খেলো বিলাসিতা নয়। পত্নী প্রতিপালনে যে অক্ষম তার হাতে আমি ভাইভীকে কিছুতেই দেবো না জেনো।"

ফ্রাঙ্ক শ্রীমতী ওয়ারেণের এ কথায় একটুও হতাশ না হয়ে বেশ হাসি মুখেই শ্রীমতীকে জানিয়ে দিলে যে তাহ'লে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তাকে তার ভাবি-পত্নীর মায়ের বিনা অনুমতিতেই বিবাহ করতে হবে।

শ্রীমতী ওয়ারেণ একথায় অত্যন্ত চটে উঠলেন। ফ্রাঙ্ক তাঁকে আরও চটিয়ে দেবার জন্য আবার একটা গান ধরলে! এমন সময় প্রেডের হাত ধরে ভাইভী বেড়িয়ে ফিরে এলো।

শ্রীমতী ওয়ারেণ মেয়েকে একটু মৃদু ভর্ৎসনা ক'রে—ভবিষ্যতে আর না-ব'লে এত রাত্রি পর্য্যন্ত বাইরে গিয়ে থাকতে নিষেধ করে দিয়ে রাত্রের ভোজনের আয়োজন করতে বলে দিলেন।

টেবিলে চারজনের বেশী অতিথির স্থান হবে না বলে ভাইভী আর ফ্রাঙ্ক পরে খেতে বসবে বলে অপেক্ষা করতে লাগল, আর সকলে পাশের ঘরে খেতে চলে গেল। সেই ফাঁকে ভাইভী আর ফ্রাঙ্কের মধ্যে অনেক কথা হয়ে গেল।

ফ্রাঙ্ক—আমার কর্ত্তাটিকে কেমন দেখলে?

ভাইভী—তাঁর সঙ্গে আমার এখনও ভাল করে কথাই কওয়া হয় নি। তবে ওঁকে দেখে তো আমার বিশেষ কাজের লোক বলে বোধ হয় না।

ফ্রাঙ্ক—ওঁকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয় উনি কিন্তু ততটা নির্ব্বোধ নন। তবে কিনা, উনি এখানকার ধর্ম্মযাজক—কাজেই সেইরকম ভাবে থাক্‌বার চেষ্টা করতে গিয়ে উনি একটু বেশী গাধা হ'য়ে পড়েছেন। কর্ত্তা কিন্তু লোক ভালো। আহা, বুড়ো বেচারা! তোমরা যতটা মনে করো—আমি কিন্তু ওঁকে ততটা অশ্রদ্ধা করি না। উনি যা করেন তা ভাল ভেবেই করেন। আচ্ছা ওঁর সঙ্গে তোমার কেমন ব'নবে বলে মনে করো?

ভাইভী (গম্ভীরভাবে)—আমার ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে ওঁর বা আমার মা'র ওই বৃদ্ধ বান্ধব দলের কারুর যে বিশেষ কোনও সম্বন্ধ থাকবে আমি তো তা মনে করি না, অবশ্য ওদের মধ্যে কেবল প্রেড্‌ ছাড়া। আচ্ছা, আমার মাকে তোমার কেমন লাগল?

ভাইভী

ফ্রাঙ্ক—সত্যি করে বলবো? নির্ভয়ে?

ভাইভী—হ্যাঁ, সত্যি ক'রে বলো, নির্ভয়ে।

ফ্রাঙ্ক—উনি খুব আমুদে লোক। তবে—একটু যেন অতিরিক্ত সাবধানী—না? আর ওই ক্রফ্‌টস্‌! বাপরে! কী চেহারাই এই ক্রফ্‌টসের!

ভাইভী—কি রকম দলটি দেখ্‌ছ তো ফ্রাঙ্ক!

ফ্রাঙ্ক—কী বেয়াড়া ঝাড়!

ভাইভী—(অত্যন্ত ঘৃণাভরে) আমি ভাবছিলুম—আমাকে যদি ওই রকম হ'তে হ'তো—অর্থাৎ এমনি জীবনের অপব্যয়ী—অকারণ শুধু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় মুখ বদলে বেড়ানো—চরিত্রবলহীন—আত্মশক্তি শূন্য—আমি তো তাহ'লে মুহূর্ত্ত মাত্র দ্বিধা না করে আত্মহত্যা করে ফেলতুম।

ফ্রাঙ্ক এইবার ভাইভীর সঙ্গে একটু রঙ্গ-রস করবার চেষ্টা করলে; কিন্তু ভাইভীর মনের অবস্থা ও মেজাজ দুইই তখন পরিহাস রসের ঠিক অনুকূল ছিল না। সে তাই

কি, ফ্রাঙ্ক!

তার মাকে ডেকে ফ্রাঙ্ককে চটপট্ খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রতে বলে রস-ভঙ্গ করে দিলে।

সার জর্জ্জ ক্রফটসের খাওয়া হ'য়ে গেছল, তিনি উঠে পড়লেন, শ্রীমতী ওয়ারেণও তার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন এবং ভাইভী ও ফ্রাঙ্ক দুজনকেই খেতে পাঠিয়ে দিলেন।

সার জর্জ্জ ক্রফটস্ খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই শ্রীমতী ওয়ারেণকে বললেন আচ্ছা, ও ছোঁড়াটাকে তুমি কিসের জন্তে এতো আস্কারা দিচ্ছ বলো তো?" শ্রীমতী ওয়ারেণ এর উত্তরে একেবারে কঠোর ভাবে বললেন—"দেখো জর্জ্জ, তোমায় বলি শোনো—মেয়েটার ওপর অতটা নজর রাখ্‌ছ কেন বলো তো? তোমার মৎলবখানা কি? তুমি যেরকম লুব্ধ-দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে চাইছ'—আমি সব লক্ষ্য করছি। কিন্তু ভুলো না যে তোমাকে আমি ভালরকম জানি আর তোমার এই চাউনীর অর্থ কি তাও আমি বুঝি।"

ক্রফ্‌টস্—আচ্ছা, দেখ্‌তে কী দোষ? ওর দিকে চাইলে কি ক্ষয়ে যাবে?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—তোমাকে যদি আমি কিছু বাঁদরামী করতে দেখি তাহ'লে তৎক্ষণাৎ পাত্‌তাড়ী শুদ্ধ তোমাকে লণ্ডনে চালান ক'রে দেবো জেনো! তোমার সমস্ত জীবনের চেয়েও আমার মেয়ের ক'ড়ে-আঙ্গুলটি আমার কাছে বেশী প্রিয়, বুঝলে?

কিন্তু সার জর্জ্জ তাঁর একথায় একটুও দমে গেলেন না দেখে তখন শ্রীমতী ওয়ারেণ সুর একটু নরম করে বললেন "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—ছোঁড়াটারও যেমন কোনও আশা নেই—তোমারও তথৈবচ!"

ক্রফ্‌টস্—কোনও ভালো মেয়ের প্রতি পুরুষ মানুষের কি আকর্ষণ হ'তে পারে না?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—তা ব'লে তোমার বয়সী পুরুষ-মানুষের নয়।

ক্রফ্‌টস্—কেন, তোমার মেয়ের বয়স কত?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—তোমার সে খোঁজে দরকার কি?

ক্রফ্‌টস্—তোমারই বা সেটা লুকোবার দরকার কি?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—আমার খুশী!

ক্রফ্‌টস্—দেখো, আমার বয়স এখনও পঞ্চাশ হয়নি। আমার বিষয় সম্পত্তিও যেমন প্রচুর ছিল তেমনিই আছে—

বাধা দিয়ে শ্রীমতী ওয়ারেণ বললেন—"হ্যাঁ, তার কারণ তুমি যেম্‌নি কঞ্জুস্ তেমনিই বদ্‌মায়েস!"

ক্রফ্‌টস্—(কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়ে) তাছাড়া আমার মতো একজন 'ব্যারোনেট্' রাস্তায় পড়ে পাওয়া যায় না, যে, যেদিন ইচ্ছে কুড়িয়ে নেবে? আমার মতোন আর কোনও উচ্চপদস্থ লোকেই তোমাকে শাশুড়ী বলে গ্রহণ করতে সম্মত হবে না, সুতরাং এতো গুলো সুবিধে যদি পায় তোমার মেয়ে আমাকে বিয়ে করবে না কেন?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—তোমাকে!

সার জর্জ্জ ক্রফ্‌টস্‌ একথার কোনও উত্তর না দিয়ে শ্রীমতী ওয়ারেণকে বলতে লাগলেন যে তিনি তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি এই মেয়ের নামেই লেখাপড়া করে দেবেন। আর বিয়ের দিন শ্রীমতী ওয়ারেণ যদি নিজে কিছু টাকা চান তাহ'লে যতটাকা তিনি চাইবেন তত টাকারই একখানি চেক্‌ তিনি তাঁকে দেবেন,—অবশ্য তাঁর প্রার্থনাটা যদি বেহিসাবী না হয়!

শ্রীমতী ওয়ারেণ সার জর্জ্জের এই প্রস্তাবে বিষম চটে উঠে তাঁকে অত্যন্ত কটু ভাষায় এমন একটা অপমানকর কথা বললেন যে সার্‌ জর্জ্জ তাঁকে গাল দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এমন সময় রেভারেণ্ড্‌ সামুয়েল গার্ডনার, ভাইভী, ফ্রাঙ্ক্‌, প্রেড্‌, এরাও খাওয়া দাওয়া শেষ করে সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলে। তারপর দু'চার কথা ক'য়ে রেভারেণ্ড্‌ সামুয়েল সকলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে নিজের গির্জ্জার বাড়ীতে শোয়াবার ব্যবস্থা ক'রতে চলে গেলেন। ফ্রাঙ্কও সেই সঙ্গে বাড়ী গেল।

শ্রীমতী ওয়ারেণ তখন যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একখানা চেয়ারে এসে বসলেন এবং ভাইভীকে ডেকে বললেন "ফ্রাঙ্ক্‌ ছোঁড়াটা ভারি বাজে বকে, বড় বিরক্ত বোধ হয়। একটা আপদ না? তুমি ওটাকে আর আস্কারা দিও না, ছোঁড়াটা কোনও কাজের নয়!"

ভাইভী—হাঁ, সে কথা ঠিক, ফ্র্যাঙ্ক্‌টা একেবারে অপদার্থ। ওকে তাড়াতেই হবে, তবে ওর জন্য আমার একটু মনে মনে কষ্টও হবে। ও যদিও কোনও কাজের নয় তবু—আহা, বেচারা! আর ঐ ক্রফটস্‌ লোকটা! ওকেও তো আমার বিশেষ কাজের লোক বলে মনে হ'লো না। ও লোকটাও কি ফ্রাঙ্কের মতো অপদার্থ নয়?

শ্রীমতী ওয়ারেণ (ভাইভীর মুরুব্বীয়ানা চালের কথাবার্ত্তা শুনে বিরক্ত হয়ে) তুমি ছেলেমানুষ, তুমি আবার লোক চিনতে শিখলে কবে? কজন লোক দেখেছো যে তাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করতে বসেছো? সার জর্জ্জ আমার বন্ধু, ক্রফটসের সঙ্গে পরে তোমার আরও অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ হবে সে জন্যে প্রস্তুত থাকো।

ভাইভী—(কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে) কেন? তুমি কি মনে করো আমরা, অর্থাৎ তুমি আর আমি খুব বেশী দিন একসঙ্গে থাক্‌বো?

শ্রীমতী ওয়ারেণ (ভাইভীর মুখের দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে) নিশ্চয়! যতদিন না তোমার বিবাহ হ'চ্ছে—থাকবে বৈ কি! আর তো তোমাকে কলেজ যেতে হবে না!

ভাইভী—তুমি কি মনে করো যে আমার জীবন-যাত্রার ধারা তোমার মনের মতো হবে? আমার তো সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে!
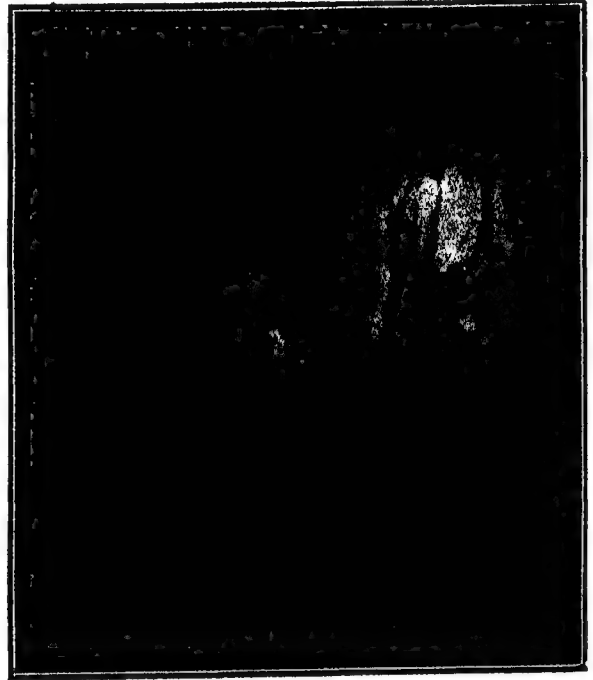
শ্রীমতী ওয়ারেণ—তাই না কি! তোমার জীবন-যাত্রার ধারা?—সে আবার কি রকম? তোমার এ কথার অর্থ কি ভাইভী?

তোমার মত মানুষ নয়

ভাইভী—(তার কোমরে বাঁধা কাগজ-কাটা ছুরিখানি দিয়ে হাতের একখানি বইয়ের পাতা কাটতে কাটতে) আচ্ছা মা, তোমার কি এ কথা একবারও মনে হয়নি যে আমি কি ভাবে জীবন যাপন করবো সে সম্বন্ধে আমার একটা কল্পনা থাকতে পারে—যেমন আর পাঁচজনেরও থাকে।

শ্রীমতী ওয়ারেণ—আমি তোমার কোনও কথা শুনতে

চাই না, মুখটি বুজিয়ে বসে থাকো, আমি যেমন ব্যবস্থা করে দেবো সেইভাবে তোমাকে চলতে হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ে নাম কিনেছো, র‍্যাংলার হয়েছো, ট্রাইপোজ পেয়েছো, তাই জন্যে যে আমি তোমাকে ভয় ক'রে চ'লবো, তা ভেবো না।

ভাইভী—(তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) তারপর? এ ছাড়া আর কিছু তোমার বলবার নেই তো?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—(ভয়ানক রেগে উচ্চৈঃস্বরে) "মুখ সাম্‌লে কথা ক' বলছি! কার সঙ্গে তুই কথা কইছিস জানিস?"

ভাইভী—না, জানি না। তুমি কে?…কী তুমি?…

তুই শয়তানী!
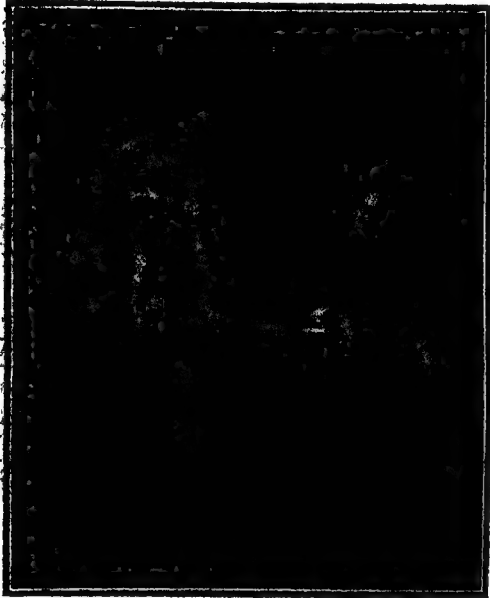
শ্রীমতী ওয়ারেণ—(দাঁড়িয়ে উঠে রাগে ফুলতে ফুলতে) বটে! বটেরে ছুঁড়ি! শয়তানী মেয়ে!

ভাইভী—আমার সম্বন্ধে সবাই সব জানে। আমার যশ, প্রতিপত্তি, সামাজিক সম্ভ্রম, এবং আমি ভবিষ্যতে যে কী করতে চাই—এ কারুর অবিদিত নেই, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে তো আমি কিছুই জানি না! তুমি আর ঐ স্যার জর্জ ক্রফ্‌টস্ কী ভাবে জীবন যাপন করো?—যার ভাগ নেবার জন্য তুমি আবার আমাকে আহ্বান করছো—বল'তো শুনি?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—সাবধান ভাইভী, আমি শেষটা এমন কিছু ক'রে ব'সবো যে জন্যে পরে আমাকে দুঃখ পেতে হবে আর তোকেও অনুতপ্ত হতে হবে।

ভাইভী—তবে এ সব কথা এখন বন্ধ থাক্। তুমি আগে প্রকৃতিস্থ হও। তোমার শরীর ও মন দুইই ঠিক্ স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তোমার হাত তো একেবারে মাখনের দলার মতো নরম!—আর আমার কি রকম কব্জীর জোর একবার চেয়ে দেখো দেখি—

শ্রীমতী ওয়ারেণ—(হতাশভাবে মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে কান্নার সুরে) ভাইভী—

ভাইভী—দোহাই তোমার, আর কান্না জুড়ো না! আর যা ইচ্ছে তাই করো—কান্না আমি মোটে সইতে পারি না। তুমি যদি কাঁদো তাহ'লে আমি এঘর থেকে বেরিয়ে যাবো।

শ্রীমতী ওয়ারেণ—(কাতরভাবে) ভাইভী, ওরে আমি যে তোকে বড্ড ভালবাসি! তুই কী ক'রে আমার ওপর এতটা রূঢ় হয়ে উঠতে পারলি! তোর ওপর কি আমার কোনও অধিকার নেই? আমি যে তোর মা!

ভাইভী—তুমিই কি আমার মা?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—(বিস্ময়-বিমূঢ়ার মতো) এ্যাঁ! কি বল্‌লি—আমি তোর মা কি না?—ওঃ! ভাইভী!

ভাইভী—বেশ, তাহ'লে আমাদের সব আত্মীয়-বন্ধু কোথায়? আমার বাবা কোথায়? তুমি আমার মায়ের অধিকার দাবী ক'রছো—আমাকে ছেলেমানুষ, বোকা, এ সব সম্ভাষণেও সম্ভাষিত করবার স্পর্দ্ধা রাখো—কলেজের কোনও উচ্চপদস্থ মহিলা শিক্ষয়িত্রী তাঁর ন্যায্য অধিকার থাকা সত্ত্বেও কখনও আমার সঙ্গে যেভাবে কথা কইতে সাহস করেন নি তুমি সেভাবে ও কথা কইছো—আমার নিজের জীবন আমি কি ভাবে চালাবো—সেটাও তুমিই নির্দ্দেশ করে দিতে চাও, শহরের একটা দুশ্চরিত্র পশুর সঙ্গে তুমি আমাকে জোর করে মিশতে ও আলাপ পরিচয় রাখতে বাধ্য করতে চাও—তোমার এ সব দাবী অস্বীকার করবার আগে আমি স্পষ্ট করে জানতে চাই, যে সত্যিই তোমার এ সব অধিকার আছে কি না?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—(অবসন্নভাবে নতজানু হ'য়ে) ওরে না রে না, না। চুপ কর্, তুই চুপ কর্—আমি তোর মা—দিব্য করে বলছি! ওরে তুইও কি আমার বিরোধী হবি—আমার নিজের পেটের মেয়ে! এ যে অস্বাভাবিক! তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস তো—করিস্‌নি কি? বল্ না! আমার কথা তুই বিশ্বাস করবি?

ভাইভী—আমার বাবা কে ছিলেন?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—তুমি জানো না যে তুমি আমাকে কী প্রশ্ন করছো। আমি সে কথা তোমাকে ব'লতে পারবো না।

ভাইভী—নিশ্চয় পারবে—যদি ইচ্ছে করো। আমারও সে কথা জানবার অধিকার আছে! তুমি অবশ্য না বলতেও পারো—যদি তোমার সেই অভিপ্রায়ই থাকে—কিন্তু তাহলে, কাল সকাল থেকে আর এ বাড়ীতে তুমি আমার দেখা পাবে না।

শ্রীমতী ওয়ারেণ—তোর মুখে এ সমস্ত কথা শুনলে বড় ভয় পাই। না—না, এ হতেই পারে না। তুই কখনই আমাকে ফেলে যেতে পারবি নি।

ভাইভী—(কঠোরভাবে) হ্যাঁ, নিশ্চয় পারি, তুমি যদি আমাকে এই রকম একেবারে নগণ্য বলেই মনে করো, তাহ'লে মুহূর্ত্তের জন্ম কোনও দ্বিধা না করে আমি চলে যেতে পারি। (অধৈর্য্য হ'য়ে) কে জানে হয়ত ওই কুৎসিত পশুটার দূষিত রক্ত আমার শিরায় শিরায় বইছে!

শ্রীমতী ওয়ারেণ—ওরে না না—শপথ করে বলছি আমি, সে নয়—তোর সঙ্গে যাদের পরিচয় হয়েছে তাদের কেউ নয়—এ আমি একেবারে নিশ্চিত জানি।

ভাইভী—(শ্রীমতী ওয়ারেণের মুখের দিকে কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) হুঁ। অন্ততঃ এটা তুমি নিশ্চিত জানো দেখছি! (শ্রীমতী ওয়ারেণ দু'হাতে মুখটি ঢাকা দিয়ে বসলেন।) থাক্ থাক্ ওটুকু আর দেখাবার কোনও দরকার নেই মা। আমি জানি, তুমিও জানো—এতে তুমি একটুও কিছু দুঃখিত হওনি।...থাক্, আজ এই পর্য্যন্তই থাক্।—যথেষ্ট হয়েছে। কাল কখন 'ব্রেক্‌ফাষ্ট' করবে বলো? সাড়ে আটটা কি তোমাদের পক্ষে বড্ড বেশী সকাল সকাল হ'য়ে পড়বে?

শ্রীমতী ওয়ারেণ—(বিমূঢ়ভাবে) হা ভগবান! তুই কী পাষাণী মেয়ে?

শ্রীমতী ওয়ারেণ কন্যার অশিষ্ট আচরণ, ঔদ্ধত্য ও হৃদয়হীনতার অনুযোগ ক'রে অনেক কথাই বললেন। বললেন "বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ পেয়ে তুই আজ আমাকে অবজ্ঞা করছিস, আমি যেন তোর মা হবার যোগ্যই নই। আমার কাছেও তুই এতটা স্পর্দ্ধা, এতটা দম্ভ দেখাবি? ওরে, কে তোকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিয়ে আজ এমন গণ্যমান্য ক'রে তুলেছে সে কথাটাও ভুলে গেলি? আমি কি তোর মতন এমন সুযোগ পেয়েছিলুম মানুষ হবার? ছিঃ ধিক্ তোকে, তুই এমন বদ্ মেয়ে।"

ভাইভী এবার একটু যেন নরম হ'য়ে তার মাকে বুঝিয়ে

হাঁ, খুব ভাল খুড়ী বটে!

বলতে লাগল যে "তোমারই তো দোষ। তুমি কেন মা'গিরি ফলাতে এলে আমার কাছে? কাজে-কাজেই আমাকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্ম কতকগুলো কড়া কথা বলতে হ'লো। তুমি যদি এ রকম আহাম্মুকী না করতে—তাহ'লে কোনও কথাই হতো না। আমি তো ব'লছি তোমাকে—আমি তোমার ইচ্ছা ও মতামতের কোনও দিন প্রতিবাদ করবো না। তুমি যেভাবে যে ধারায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছো আমি তাতে কখনও আপত্তি করবো না। কিন্তু তুমিও কখনও আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বললেন—

"আমার ইচ্ছা—আমার মতামত? আমার জীবনযাত্রার ধারা!—কী বল্‌ছিস্ তুই? তুই কি মনে করিছিস যে আশৈশব আমি তোর মতোই লালিত পালিত হ'য়েছি? এই জীবনযাত্রার পথ আমি নিজে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি? এতে কি আমার কোনও হাত ছিল! এ কি আমার ভাল লাগে বলে বা এতে আমি কোনও অন্যায় দেখি না বলে এই রকম জীবন বরণ ক'রে নিয়েছি? তুই কি মনে করেছিস যে তোর মতো সুযোগ পেলে আমিও কলেজে থেকে লেখাপড়া শিখতুম না?

এ কথার উত্তরে ভাইভী তার মাকে বললে যে,

ক্রাঙ্ক
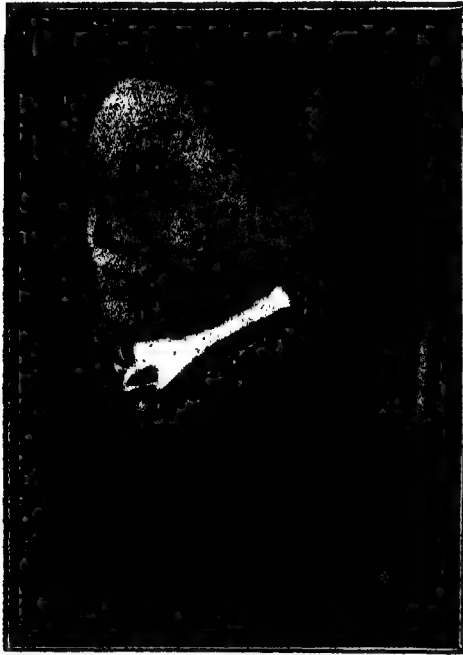
"তোমার এ অনুযোগ বৃথা। দুরবস্থার দোহাই দেওয়া মিছে। যে অত্যন্ত গরীব অত্যন্ত দুঃখীর মেয়ে—সে কোনও দিন রাজরাণী হবার বা লেখাপড়া শিখে মেয়েদের কলেজের সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক হবার দুঃস্বপ্ন না দেখতে পারে, কিন্তু সকলেরই তো নিজের একটা পছন্দ আছে? কেউ হয়ত' রাস্তার ধারের আস্তাকুঁড় থেকে ছেঁড়া-পচা, নোংরা ন্যাকড়া কুড়িয়ে জীবিকা অর্জ্জন করে, আবার কেউ হয়ত' পথে পথে ফুল বেচে বেড়িয়ে দিন গুজরাণ করে! আমি ও তোমার অবস্থা বিপর্য্যয়ের অজুহাত মানতে চাই না। সংসারে যারা যে রকম মানুষ হ'তে চায় তারা সেই রকম সুযোগ খুঁজে নেয়! যদি না পায় তখন নিজেরাই একটা খাড়া করে নেয়।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ তখন কন্যাকে বুঝিয়ে বললেন যে "ওসব মুখে বলা খুবই সহজ কিন্তু কাজের বেলা নয়। যারা ভুক্তভোগী তারাই কেবল জানে যে সে কী কঠিন! কী অসম্ভব!" তারপর তিনি কন্যাকে তাঁর জীবনের ইতিহাস বলতে আরম্ভ করলেন—কেমন করে তাঁর মা একখানি ভাজা মাছের দোকান চালিয়ে নিজেকে আর তাঁর চারটি মেয়েকে প্রতিপালন করতেন। চার বোনের মধ্যে তাঁরা দুজনে ছিলেন সহোদরা, আর দুজন ছিল বৈমাত্র ভগ্নী। বৈমাত্র ভগ্নীদুটী দেখতে সুন্দরী ছিলেন না; কিন্তু তাঁরা দুই সহোদরাই ছিলেন রূপসা! বৈমাত্র ভগ্নীর মধ্যে একজন সপ্তাহে নয় শিলিং রোজে প্রতিদিন বারো ঘণ্টা ক'রে একটী সীসার কারখানায় কাজ করতেন, পরে সীসার বিষেই তাঁর অকাল মৃত্যু হ'লো। আর একজন একটি সরকারী মজুরকে বিবাহ করেছিলেন। তাঁর স্বামী সপ্তাহে মাত্র আঠারো শিলিং মজুরী পেতেন, তাইতেই কায়ক্লেশে সে তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতো, কিন্তু কিছুদিন পরেই তার স্বামীটি বেজায় মাতাল হ'য়ে পড়লো! আমরা দুই বোন একটা গির্জ্জের ইস্কুলে বিনা মাইনেয় পড়তে যেতুম। একদিন রাত্রে লিজ্ বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল, আর ফিরলো না। সেই ছিল বড়, আমি ছিলুম ছোট। গির্জ্জের পাদরী বললেন লিজ্ যে পথে গেছে সে বড় কণ্টকময় পথ। তার পরিণাম বড় বিষময়! একদিন হয়ত' শুনবে সে জলে ডুবে মরেছে! তিনি আমাকে এক সুরানিবারিণী সভার ভোজনালয়ে পরিচারিকার কাজ জুটিয়ে দিলেন। তারপর আমি এক হোটেলের দাসী হয়েছিলুম। সেখান থেকে গেলুম এক মদের দোকানে সুরা-সংবাহিনীর কাজ করতে! সেখানে আমাকে রোজ চোদ্দ ঘণ্টা করে খাটতে হ'তো!. দিনরাত কেবল মদ পরিবেশণ করা আর গ্লাস ধোয়া ছিল আমার কাজ। তারা আমাকে খেতে দিতো আর সপ্তাহে চার শিলিং ক'রে মাইনে দিতো। লোকে বলতো এই চাকরীটা নাকি আমার খুব ভাল হয়েছে! সে যা হোক্, একদিন শীতকালের রাত্রে আমি শ্রান্ত হয়ে মদের দোকানের বেঞ্চিতে বসে ঘুমে ঢুলছি, এমন সময় বহুমূল্যবান পশমী পোষাক পরা একটি সুন্দরী মেয়ে এসে

এক গ্লাশ খুব ভাল মদের ফরমাস করলে, তার হাতের ব্যাগে একরাশ স্বর্ণমুদ্রা ঝন ঝন্ শব্দে বাজছিল। আমি তাকে খাতির করে মদের গ্লাশটি দিতে গিয়ে দেখি সে আমারই সেই পালানো বোন্—আমারই দিদি লিজ্।—তোমার মাসী! সে এতদিনেও জলে ডুবে মরেনি। এখনও বেঁচে আছে, আর বেশ ভালই আছে। উইক্তেষ্টারে তার মস্ত বাড়ী। তার মানসম্ভ্রম ইজ্জৎ দেখে কে? সে এখন একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত মহিলা। তোমার সঙ্গে তোমার মাসীর অনেকটা আদল আসে। সে ছিল পাকা মেয়ে। বিষয়কর্ম্ম খুব বুঝতো। গোড়া থেকেই টাকা জমাতে সুরু করে দিয়েছিল। সে যে কী ভাবে কোথা থেকে কী উপায় করে, তা কাউকে বড় একটা ধরতে-ছুঁতে দিতো না, অথচ সুযোগ কখনও ছাড়তো না। আমি বেশ বড়-সড় হয়েছি দেখে, এবং যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার রূপও উথ্‌লে উঠেছে দেখে দিদি আমাকে বললে "তোর এই রূপ আর বয়সের প্রলোভন দেখিয়ে এই শুঁড়ি বেটা যত মাতাল ভুলিয়ে বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করে নিচ্ছে, আর তুই পোড়ারমুখী না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরছিস, খেটে খেটে রোগা হয়ে গেলি। চল্ আমার সঙ্গে।" দিদি আমাকে নিয়ে গিয়ে নিজে টাকাকড়ি খরচ ক'রে আমার জন্য বাড়ী সাজিয়ে দিয়ে আমাকে ব্যবসায় নামিয়ে দিলে। আমিও আস্তে আস্তে অর্থ সঞ্চয় করতে সুরু করে দিলুম। প্রথমেই দিদির ঋণ সমস্ত পরিশোধ করে দিলুম, তারপর দিদির সঙ্গে ভাগে কারবার সুরু ক'রে দেওয়া গেল। ব্রাসেলে আমাদের সে বাড়ী ইন্দ্রভবন তুল্য। চমৎকার সাজানো। মেয়েদের থাকবার পক্ষে অমন আরামপ্রদ আবাস আর হয় না! যে সব মেয়ে কারখানায় চোদ্দ ঘণ্টা ক'রে প্রতিদিন খেটে আমাদের সেই সতাতো বোন্‌টীর মতো অকালে শুকিয়ে মরে যায়—তাদের চেয়ে অনেক সুখে থাকতো আমাদের 'ব্যারাকের' মেয়েরা। আমি শৈশবে নিজেদের বাড়ীতে যতটা নির্য্যাতিতা হয়েছি, সুরাপান নিবারিণী সভার ভোজনালয়ে, কিম্বা ওয়াটারলু ষ্ট্রীটের শুঁড়ির দোকানে আমার যে লাঞ্ছনা—যে অপমান—যে পীড়ন সহ্য ক'রতে হ'য়েছে, আমাদের কারবারের মেয়েরা তার তুলনায় রাণীর হালে থাকে! আচ্ছা ব'লতো—আমি যদি সেই দুঃখ দুর্দ্দশা মাথায় ক'রে, প্রতিদিন শতলাঞ্ছনা সয়ে রোগে কষ্টে চল্লিশ পার হবার আগেই অকাল বার্দ্ধক্যে মুয়ে আতুর অসহায় হ'য়ে পড়তুম সেইটাই কি ভালো হ'তো?"

ভাইভী জোর ক'রে মাথা নেড়ে বললে "না—তা কখনই হ'তো না। কিন্তু মা, ঐ ব্যবসাটাই বা কেন বেছে নিলে বলো তো? ভাল করে দেখে শুনে চালাতে পারলে—যে কোনও ব্যবসাতেই তো লাভবান হ'তে পারা যায় এবং তা থেকে সঞ্চয়ও হ'তে পারতো।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ মৃদুহেসে বললেন "হ্যাঁ—সে কথা ঠিক, কিন্তু বিনা পয়সায় তো অন্য কোন ব্যবসাই সুরু করা যেতো না? এক দীনহীনা অসহায়া মেয়ে ব্যবসা করবার মতো

ফ্রাঙ্ক, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, আমি আমার মাকেই চিনি না।

মূলধন পাবে কোথা থেকে? সপ্তাহে চার শিলিংমাত্র যার উপার্জ্জন—সে কি তার পোষাক পরিচ্ছদ ও হাতখরচের ব্যয় সঙ্কুলান ক'রে তা থেকে আবার কিছু কিছু সঞ্চয় করতে পারে? বিশেষতঃ যে নিতান্ত সাদাসিধে সাধারণ মেয়ে, যার আর অন্য কোনও রকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছু উপায় করবার সম্ভাবনা নেই! অবশ্য যে সব মেয়ে গাইতে বাজাতে জানে, অভিনয় করতে পারে কিম্বা লেখাপড়া শিখেছে তাদের কথা স্বতন্ত্র! আমি আর লিজ্ আমাদের দু'বোনেরই শুধু রূপ যৌবন ছাড়া আর কোনও সম্পদই সেদিন ছিল না। তুমি কি বলতে চাও যে আমাদের সেই সৌন্দর্য্য সম্পদের সুযোগ নিয়ে

অন্ত লোকেরা লাভবান হবে আর আমরা উপবাস করে থাকবো? পসারিনী হয়ে (Shopgirls) সুরাসংবাহিনী হয়ে (Barmaid) প্রতিহারিণী হ'য়ে (Waitress) আমরা দশজনের মন যোগাবো, আর লাভের অংশ ভোগ করবে অন্ত লোকে?...আমরা যখন দেখলুম যে এই বিধাতার দেওয়া সম্পদের বেসাতী করে আমরা নিজেরাই ধনী হ'তে পারি তখন আর নিজেরা উপবাসী থেকে অপরকে সে সুযোগ নিতে দিয়ে আহাম্মুকী ক'রতে রাজী হইনি!"

ভাইভী সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললে "হাঁ৷ বিষয়বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা ক'রে দেখলে ব্যবসার দিক থেকে তোমরা ঠিক কাজই করেছিলে।"

শ্রীমতী ওয়ারেণ বললে—"কেন, যে কোনও দিক দিয়েই তুমি বিবেচনা করে দেখ না, দেখবে, আমরা অনুচিত কিছু করিনি। আচ্ছা তুমিই বল'—ভদ্র ও সম্রান্ত ঘরের মেয়ে যারা তাদের আশৈশব যে শিক্ষা দেওয়া হয়, যে ভাবে তাদের গড়ে তোলা হয়—তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী?...না—যাতে মেয়েটি বিবাহ-যোগ্যা হ'লে কোনও বড়লোকের ছেলের মন ভুলিয়ে—তাকে পরিণয়ের ফাঁদে ফেলে—তার পয়সায় বিনা পরিশ্রমে জীবন যাপন করতে পারে......এই তো? যেন বিবাহের একটা অনুষ্ঠান ঘটাতে পারলেই মেয়েদের সেই পুরুষ ভোলাবার সমস্ত নির্লজ্জতা ও অপরাধ বা দোষগুণ সব নগণ্য হয়ে পড়বে......কেন বলো তো? উঃ! সমাজের এই ভণ্ডামীই আমাকে সব চেয়ে বেশী পীড়া দেয়!...লিজ্‌কে আর আমাকে আর পাঁচজনেরই মতো এই ব্যবসায় খাটতে হ'তো, পরিশ্রম করতে হ'তো, আর ব্যয়ের হিসাব করে সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হ'তো! তা নইলে আজ যৌবনের অবেলায় আমাদেরও সেই সব বেহিসেবী নির্বোধ মেয়েদের মতোই পথের ভিখারিণী হ'তে হ'তো, যদি আমরা তাদেরই মতো মনে করতুম যে—যৌবনের এ সৌভাগ্য আমাদের চিরস্থায়ী! আমি এই সব মেয়েগুলোকে ঘৃণা করি! এরাই প্রকৃত অসচ্চরিত্রা! মেয়েমানুষের যদি চরিত্রবল না থাকে, তাহ'লে তার চেয়ে ঘৃণার পাত্রী আর নেই!

ভাইভী গম্ভীর ভাবে বললে "আচ্ছা মা, সত্যি করে মন খুলে বলো দেখি—যে, এভাবে অর্থ উপার্জনটা অপছন্দ করাই কি সুচরিত্র মেয়েদের একটা লক্ষণ নয়?"

এ কথার উত্তরে শ্রীমতী ওয়ারেণ বললেন "সে তো বটেই! পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করাটাকে সবাই অপছন্দ করে। কিন্তু, তবু তারা খেটে রোজগার করতে বাধ্য হয়—তা'ছাড়া যে উপায় নেই! তাদের দুঃখ দেখে—তাদের প্রতি সহানুভূতিতে আমার দুই চক্ষু কত দিন জলে ভরে উঠেছে! কত দিন যখনই দেখেছি যে—কোনও অভাগিনী তরুণীকে শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহ-মন নিয়েই এমন কোনও অবাঞ্ছিত পুরুষের মনোরঞ্জন করতে নিযুক্ত হ'তে হয়েছে, যার সঙ্গ বা সাহচর্য্য তিলেকের জন্তও তার কাছে আনন্দদায়ক নয়;...... কোথাকার কোন্ এক বওয়াটে গোঁয়ার নীরেট মূর্খ মাতাল —যে হয় ত তখন মনে করছে যে সে তার সঙ্গিনীটিকে তার বদরসিকতার জোরে কী খুশীই না করে তুলছে—অথচ প্রকৃতপক্ষে সে তখন সে মেয়েটিকে তার অজ্ঞাতসারে এতই বিরক্ত, কাতর ও উৎপীড়িত করে তুলছে যে, সেটা সহ্য করার মূল্য কোটী টাকার মাপকাঠিতেও পরিমিত হতে পারে না!—আমি তখন কেঁদেছি!...কিন্তু সে সবও তাদের সহ্য করতে হয়! মনের মতো বা অমনোনীত, গোঁয়ার বা ভদ্র, সর্ব্ব রকমের লোকেরই নির্ব্বিবাদে সেবা ও পরিচর্য্যা করতে হয় তাদের!......ঠিক যেমন হাসপাতালের শুশ্রূষা-কারিণীদের সর্ব্ব রকম রোগীরই তত্ত্বাবধান করতে হয়! এই যে কাজ—তুমি কি মনে করো এ কোনও স্ত্রীলোক আনন্দ পাবার জন্ত করে?......ভগবান জানেন—সে কথা সত্য নয়! কিন্তু ধর্ম্মভীরু লোকদের মুখে এ সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনো দেখি, মনে হবে—আর্ত্ত, আতুর ও রোগীর সেবা করা যেন কুসুম-শয়নের মতোই সুখকর!"

ভাইভী বললে "কিন্তু কাজটাকে তুমি নেহাৎ মন্দও বলতে পারো না। ওতেও অর্থ উপার্জন হয়!"

শ্রীমতী ওয়ারেণ বললেন—"নিশ্চয়ই! গরীবের মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে আর কী ভাল কাজ হতে পারে, বিশেষ যদি সে প্রলোভন জয় করতে পেরে থাকে, এবং দেখতে সুন্দরী হ'লেও যদি সুসংযত স্বভাব ও বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়! নিরহঙ্কারী মেয়েদের জীবিকা অর্জ্জনের যতগুলি পথ আছে, আমি তো মনে করি এটা সকলের চেয়ে ভালো। মেয়েদের অর্থ উপার্জ্জনের আরও কোনও সদুপায় কেন থাকবে না?—আমি এই নিয়ে অনেক ভেবেছি! এ ঠিক নয়, এ ভারি অন্যায় ভাইভী! কিন্তু উপায় নেই! ভালই হোক্, আর মন্দই হোক্, যোগ্যতা

অনুসারে মেয়েদের ওরই মধ্যে যা হয় একটা করতে হয়। কিন্তু তা বলে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মেয়েদের এ কাজ করা উচিত নয়। তুমি যদি এ কাজ করতে চাও, তাহ'লে আমি তোমাকে আহাম্মুক বলবো; অথচ আমি যদি জীবিকা উপার্জ্জনের জন্ত অন্ত কোনও পথ বেছে নিতুম, তাহ'লে আমার পক্ষেও সেটা খুবই আহাম্মুকীর কাজ করা হ'তো।"

ভাইভী তার মার কথা শুনতে শুনতে ক্রমেই অভিভূত হ'য়ে পড়ছিল। এবার সে অত্যন্ত বিনীতভাবে বললে "আচ্ছা মা, ধরো তুমি আমি আজ যদি তোমার সেই ছেলে বেলার দুঃখ দুর্দ্দশার দিনের মতোই দুঃস্থ ও দরিদ্র হতুম, তাহ'লে তুমি কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারো যে—আমাকে তুমি সেই শুঁড়ীর দোকানে মদ জোগাবার কাজে কিম্বা কোনও গরীব মজুরকে বিয়ে করে সংসারী হতে—এমন কি সীসের কারখানার কাজেতেই লেগে যেতে পরামর্শ ও উপদেশ দিতে না?"

শ্রীমতী ওয়ারেণ সদর্পে বললেন "নিশ্চয়ই নয়! তুমি তোমার মাকে কী মনে করো? ওই রকম মুখ দিয়ে রক্ত তুলে খেটে—ওই রকম দিন রাত দাসত্ব করে—অত অল্প আয়ে কি কেউ কখনও তার আত্ম-সম্মান বজায় রেখে চলতে পারে? নারীর মূল্য কী? বেঁচে থেকেই বা সুখ কী—যদি স্ত্রীলোকের আত্ম-সম্মানই না থাকে—তাহ'লে আর তার রইল কী? আমি যে আজ এই নিজের ইচ্ছা মতো স্বাধীনভাবে চলতে পারছি—এই যে আমার মেয়েকে দেশের সর্ব্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পেরেছি—এ কিসের জোরে? অথচ আমারই মতো কেবল রূপ যৌবন মাত্র সম্বল ছিল যাদের, এমন কত মেয়েই তাদের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্তে আজও দুঃখ দুর্দ্দশার নিষ্ঠুর গহ্বরে পড়ে আছে কেন? তার কারণ আর অন্ত কিছুই নয়, আমি আমার নিজের রাশ ঠিক মতো টেনে চলতে জানতুম, আমি নিজেকে কোনও দিনই ছোট বলে স্বীকার করে আত্মাবমাননা করিনি। লিজ্ আজ এক পাদ্রী-প্রধান সহরে সসম্মানে বাস করছে কিসের জোরে? ওই একই কারণ! ছেলেবেলায় সেই ধর্ম্মযাজকের নির্ব্বোধ উপদেশ শুনে যদি চলতুম, তাহ'লে আজ আমাদের কোথায় পড়ে থাকতে হ'তো বল' তো? বড় জোর না হয় এক শিলিং ছ' পেন্স রোজে কারুর বাড়ী দাসীবৃত্তি করতে হ'তো, আর বুড়ো বয়সে আতুর আশ্রমের শরণাপন্ন হ'য়ে মরতে হ'তো। সংসারের অভিজ্ঞতা যাদের নেই, জগতের হালচাল যে জানে না, সে রকম কোনও লোকের পরামর্শ শুনে তুই যেন কখনও চলিস্ নি খুকী! স্ত্রীলোকের ভদ্রভাবে জীবন যাপন করবার একমাত্র উপায় হ'চ্ছে—এমন কোনও পুরুষকে সুখী করবার চেষ্টা করা—যে লোকের সেই নারীকে সুখে রাখবার মতো সঙ্গতি ও সাধ্য আছে। যদি সেই নারী ও পুরুষের সামাজিক অবস্থা একই স্তরের হয়, তাহ'লে সে নারীর উচিত তাকে পত্নী রূপে গ্রহণ করে বিবাহ করবার জন্ত সেই পুরুষকে বাধ্য করা। কিন্তু সামাজিক অবস্থায় সে নারী যদি নিম্ন-স্তরের হয়,তাহ'লে তার সে আশা করা বা চেষ্টা করা অনুচিত। কেনই বা ক'রবে? তাতে সেও সুখী হ'তে পারবে না, আর যাকে সুখী করতে সে চায় তাকেও সুখী করতে পারবে না! যার গৃহে একাধিক বিবাহযোগ্যা কন্তা আছে, শহরের এমন যে-কোনও সম্ভ্রান্ত মহিলাকে জিজ্ঞাসা করগে—সেও তোমাকে ঠিক এই কথাই বলবে! তবে আমি তোমাকে যেমন সাদা কথায় স্পষ্টাস্পষ্টি সব খুলে বলছি, তাঁরা তা পারবেন না, তাঁরা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাঁকা কথায় এই মন্তব্যই দেবেন। এইটুকুই যা তফাৎ—বুঝলে?

ভাইভী (মুগ্ধ মোহাভিভূতের মতো)"মা-মা!—মা আমার!—অসাধারণ মেয়ে তুমি! আশ্চর্য্য নারী তুমি!—সারা দেশের মেয়ের শক্তি আমি তোমার মধ্যে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি! আচ্ছা, সত্যি বলো তো মা—ঠিক করে বলো আমায়—তোমার মনে তো একটুও দ্বিধা নেই—একটুও কুণ্ঠা নেই—একটুও সঙ্কোচই নেই? তুমি এ জন্তে কণামাত্রও লজ্জিত নও তো?"

এ কথার উত্তরে শ্রীমতী ওয়ারেণ মৃদু হেসে বললেন "কি জানিস মা, লজ্জিত হওয়া না হওয়াটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে মানুষের সদাচার ও নীতি-বোধের মনস্তত্বের উপর। স্ত্রীলোকের কাছ থেকে মানুষ এইটেই আশা করে বটে। অন্তরে যেটা কোনও দিন তারা অনুভব করে না—অথবা যেটুকু মাত্র করে সমাজের খাতিরে তার চেয়েও অনেক বেশী ক'রে তাদের সেটা বাইরে প্রকাশ করতে হয়!"……তারপর আরও অনেক কথা তাদের মায়ে-ঝীয়ে হ'লো। ভাইভী বেশ প্রসন্ন ও প্রশান্ত চিত্তে তার জননীর অপরাধ মার্জ্জনা করেছে দেখে প্রফুল্ল হ'য়ে শ্রীমতী ওয়ারেণ কন্তাকে বললেন,

"আমি তোকে সংসারে স্বাধীনভাবে চলবার মতো ক'রে মানুষ করিছি কি না বল খুকী ?"

ভাইতী। হ্যাঁ মা।

শ্রীমতী ওয়ারেণ। তুই সেজন্যে তোর এই অভাগিনী দুঃখিনী মাকে বরাবর সুচক্ষে দেখবি তো ?

ভাইভী। হ্যাঁ মা।···চলো শোবে চলো তুমি—রাত হ'য়েছে।

শ্রীমতী ওয়ারেণ। ভগবান তোকে সুখী করুন। ওরে বাছা আমার। তুই যে আমার বড় দুঃখের বুকের ধন। মায়ের আশীর্ব্বাদ তোকে চিরদিন ঘিরে থাকুক। (কন্যাকে সস্নেহে আলিঙ্গন ক'রে চুম্বন করলেন।)

এইখানে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা।

(ক্রমশঃ)

দোল-পূর্ণিমা

শ্রীবীণাপাণি রায়

এক

আজ দোল-পূর্ণিমা। কত যুগযুগান্তর-সঞ্চিত হাসি-রাশি, এবং রঙের মেলায় পরিপূর্ণ, যৌবনের রঙিন্ স্বপন দোল-পূর্ণিমা। কে জানে, সেই হারানো দিনের মলয় সমীরণ সেই কুসুম-সুবাস আজও বহিয়া আনিতেছে কি না। এই কৌমুদী-বিধৌতা মধুময়ী যামিনীর মধু-মহোৎসব কত-কত যুগ-যুগান্ত বাহিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু, এই হতভাগ্যের অদৃষ্টে এই মধুযামিনী যে কিরূপ অশুভ নিশায় পরিণত হইয়াছিল, তাহাই আজ বলিব।

আমি আমার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। আমার পিতা পল্লীর একজন বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ ছিলেন.। জমী-জমার আয় হইতেই তাঁহার সাংসারিক ব্যয় এবং আমার পাঠের ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়াও উদ্বৃত্ত অর্থ সঞ্চিত হইত। পিতা, তাঁহার জীবদ্দশাতেই একটি নিরক্ষরা গ্রাম্য বালিকাকে আমার সঙ্গিনী করিয়া দিয়াছিলেন।

ইচ্ছা করিলেই তিনি আমার বিবাহ—তাঁহার একটি মাত্র পুত্রের বিবাহ—দিয়া পাত্রীর পিতার নিকট হইতে বর-পণ স্বরূপ অনেক অর্থই গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। অতি দরিদ্র এক ভদ্র ব্যক্তির দায় উদ্ধারের নিমিত্ত, তিনি নিরলঙ্কারা তাঁহার মেয়েটিকেই পুত্র-বধূ রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার তখন থার্ড-ইয়ার চলিতেছিল।

তাহার পর আমি গ্র্যাজুয়েট্ হইবার পরই তিনি অনন্তের পথে মহা-প্রস্থিত হইয়াছিলেন। সে আজ দীর্ঘ সাতটি বৎসরের কথা।

তাহার পর আইন পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া আমি উচ্চ আদালতে গমনাগমন করিতে লাগিলাম।

এই সময় আমার এক সহপাঠী এবং পরম সুহৃদ্ পরেশচন্দ্র ঘোষ তাহার পিতার সহিত আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিল।

তাহার পিতা মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তখনকার দিনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল ছিলেন।

পরেশ কর্ত্তৃক আমি তাঁহার নিকট পরিচিত হইলে, সানন্দে তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি তাঁহার Devil (সহকারী) হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলাম। বৎসর খানেক গত হওয়ার পর, মহেশবাবুর মহানুভবতায় আমি বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে লাগিলাম।

সেই বাড়ীতে আমার আর একটি আকর্ষণ ছিল, প্রতিনিয়তই যাহার গুরুত্ব আমি উপলব্ধি করিতে লাগিলাম।

মহেশবাবুর কন্যা সুলতা যখন স্কুলের পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা হইয়া, শুভ্র শতদলের মত অম্লান রূপরাশি লইয়া, শরীরিণী রূপরাণীর মত মোটরে উঠিত—দূর হইতে বিহ্বলের ন্যায় দাঁড়াইয়া আমি তাহা দেখিতাম। সে যখন সন্ধ্যায় অর্গ্যান-সহযোগে বিশুদ্ধ তান-লয়-সহকারে ইমন রাগিনীতে গাহিত—

তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন-বিহারী।
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে ক'রেছি রচনা ;—
তুমি আমারি যে
তুমি আমারি,
তুমি অসীম গগন-বিহারী।

তখন কি জানি কি এক পুলক-শিহরণে আমার সকল অঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। আমি নথীপত্র, ব্রীফ্—আইনের ধারা সমস্তই ভুলিয়া গিয়া, একাগ্র চিত্তে সেই অমরা-বাঞ্ছিত সঙ্গীত-সুধাসাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া যাইতাম।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। আমার চিত্ত প্রতি-নিয়তই এই ধ্যানাতীতার পানে আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

যে বালিকা বধূ সুধাকে, যে স্নেহময়ী আমার জননীকে দেখিবার জন্ম আমি প্রতি শুক্রবার রাত্রেই দেশে গিয়া রবিবারে ফিরিয়া আসিতাম, সেই আমার আপন জনদের প্রতিও আমার আর আকর্ষণ রহিল না।

ক্রমশঃ বাড়ী যাওয়া মাসের মধ্যে আমার একবারও ঘটিয়া উঠিত কি না সন্দেহ।

বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের বাড়ী কলিকাতার সন্নিহিত কোন পল্লীগ্রামে ছিল।

চিত্ত-চক্রের দুঃসহ আবর্ত্তনে যখন আমি ঘূর্ণ্যমান, সেই সময় অপ্রত্যাশিত এক আশার বাণী আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। মহেশবাবুর মুহুরী, গদাধর পালিত মহাশয় একদিন আমাকে বলিলেন—"আপনার উপর বাবুর এতটা অনুগ্রহ কেন তা জানেন ?"

আমি বলিলাম—"তা জানি না ত।"

গদাধর বাবু বলিলেন—"তাঁর মনোগত ইচ্ছা এই, আপনার প্রসার-প্রতিপত্তি আর একটু বাড়লেই আপনার সঙ্গে তিনি তাঁর মেয়েটির বিবাহ দেবেন। বুঝলেন ?—"

আমি মৌন হইয়া রহিলাম।

পুনশ্চ তিনি কহিলেন—"বাবু আমার কাছে এই কথা ইঙ্গিতে আভাসে জানিয়াছেন। স্পষ্টাস্পষ্টি কিছুই বলেন নি। কিন্তু দেখবেন, আমি যে আপনার কাছে এসব ভাঙ্লাম—তা যেন তিনি জানতে না পারেন।"

আমি বলিলাম—"সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।—"

এ কি অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল ? এ কি পুলকোচ্ছ্বাস আমার প্রাণে বহিয়া গেল ? আমার সেই ধ্যানের দেবী আমারই হইবে ? কিন্তু হায়, তাহা ত হইবার নয় ? আমি যে বিবাহিত ! এই নিদারুণ 'সত্য' আমি কেমন করিয়া ভুলিব ?

আজ প্রথম, আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উপর এমনই রাগ হইতে লাগিল যে তাহা বর্ণয়িতব্য নহে। তিনি যদি আমার অপরিণত বয়সে, এমন করিয়া একটি অশিক্ষিতা বালিকাকে আমার গলদেশে ঝুলাইয়া না দিতেন, তাহা হইলে ত আজ এই দুর্লভ রত্ন লাভ করা আমার পক্ষে আকাশকুসুমবৎ অলীক হইত না ?

দুই

সেই রাত্রের গাড়ীতেই আমি বাড়ীতে পলায়ন করিলাম। পাছে মহেশবাবু আমার সম্মুখে উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন, এই আশঙ্কায় সেই দিনই আমি চলিয়া আসিলাম। তিনি বিবাহের প্রস্তাব উঠাইলে আমি কি উত্তর দিব ? আমি বিবাহিত জানিলে, আর কি তিনি আমার প্রসার-প্রতিপত্তির জন্ম এতটা চেষ্টা করিবেন—যাহা এক্ষণে করিতেছেন ?

তাই, আমি মনে মনে স্থির করিলাম, বিবাহের কথাটা এখন ভাঙা হইবে না। উত্তমরূপ প্রসার না হইলে বিবাহ করিব না—এই অজুহাতে আরো একটা বৎসর কাটাইতে পারিলেই, ব্যবসায়ে আমি অধিকতর সফলকাম হইব।

বাড়ীতে আসিয়াও চিত্ত-স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারিলাম না। আমার মা বলিলেন—"এত রোগা হ'য়ে গেছিস্ যে অশোক ? খাওয়া-দাওয়া ভাল হয় না বুঝি ?"

আমি বলিলাম—"না মা, খাওয়া ভালো আর কি কোরে হবে ? যা রান্না ঠাকুরটা রাঁধে, মুখে দেওয়া যায় না।"

মা বলিলেন—"এবার তবে আমাদেরও তোর সঙ্গে নিয়ে চল্ না অশোক ?—চাকর বামুন রেখেছিস্, একটা বাড়ীর

অংশও ভাড়া নিয়েছিস্, তবে কেন আমাদের এখানে ফেলে রাখিস্ ?"

"—হ্যাঁ, আমি এবার শীগ্‌গিরিই তোমাদের সেখানে নিয়ে যাব মা।"

রাত্রে শয়নকক্ষে গিয়া দেখিলাম, সুধা একখানি বই পড়িতেছে। আমি সকৌতুকে প্রশ্ন করিলাম—"কি পড়া হ'চ্ছে তোমার ?"

সুধা আমাকে দেখিয়া ক্ষিপ্রহস্তে বইখানি লুকাইল। তাহার পর ধীরে ধীরে সে আমার সামনে আসিয়া মস্তক অবনত করিয়া আমার পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

তাহার পর সে একটি ছোট বাটিতে করিয়া একটু জল আনিয়া আমার সামনে রাখিয়া আমার চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি সেই জলে ডুবাইতে বলিল। আমি তাহার নির্দ্দেশ-অনুসারে তাহাই করিলাম। তাহার পর সে সেই জলটুকু মস্তকে ঠেকাইয়া নিঃশেষে পান করিল।

আমি বিরক্ত ভাবে বলিলাম—"ওসব আড়ম্বর না শিখে, যদি একটু আধটু পড়া-শুনো কর্ত্তে সুধা, তবে এর চেয়ে অনেক বেশী উপকার হোত।"

আমার এই কথায় সে একটু যেন আহতই হইল। তাহার পর বলিল—"কি হবে লেখাপড়া শিখে ?"

আমি বলিলাম—"এ কথার মানে ?"

সে মৌন হইয়া রহিল।

আমার বারম্বার প্রশ্ন সত্ত্বেও সে আর একটা কথাও বলিল না। কেবল নির্নিমেষ নয়নে সে আমার পানে চাহিয়া রহিল। তাহার চোখের নীরব ভাষা যেন বলিতেছিল 'কি হবে লেখাপড়া শিখে ? তুমিই ত আমার লেখাপড়া।'

কিন্তু হায়, ভ্রান্ত আমি—তখন সে ভাষা বুঝি নাই,—মূঢ় আমি—তখন সে হৃদয় চিনি নাই। আর আজ ? থাক্ এখন সে কথা।

আমি আবার বলিলাম—"কি বই পড়্‌চ ?"

সে বলিল—"কৃত্তিবাসী রামায়ণ।"

আমি বলিলাম—"পড় ত একটু—শুনি ?"

প্রথমটায়, সুধা জোরে পড়িতে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তাহার পর আমার একান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অতি সন্তর্পণে এবং ভয়ে ভয়ে সে যাহা আবৃত্তি করিয়া গেল, তাহা শুনিয়া হাস্য-সংবরণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল।

হো—হো—করিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম। নিদারুণ লজ্জায় তাহার মুখখানি আরক্ত হইয়া রক্তজবায় পরিণত হইল।

আমি স্নেহের সহিত বলিলাম—"আরো কিছুদিন 'বর্ণ-পরিচয়' দ্বিতীয় ভাগটা পড়, যুক্তাক্ষরগুলোর সঙ্গে সম্যক্ পরিচয় হোক্, তার পর এসব পোড়ো।"

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে আর কিছুই বলিল না। আমি টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া—ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোকে টেনিসনের 'Enoch Arden' পড়িতেছিলাম। গ্রাম্য বালিকার অন্তস্তলে কিসের ব্যথা বহ্নি ধূমায়মান হইতেছিল, তাহা বুঝিবার সাধ্য আমার আর তখন ছিল না। পুস্তকান্তর্গত চরিত্র—হতাশ প্রেমিক 'ফিলিপে'র বেদনার কাহিনীতে আমি তখন ডুবিয়া গিয়াছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আবার সে বলিল—"এবারে তোমার কাছে আমাদের নিয়ে চল না ? আজ-কাল ত মোটে বাড়ীতে এসই না। কত দিন আর এম্‌নি ভাবে আমাদের দূরে দূরে রাখ্‌বে ?"

আমি বলিলাম—"হ্যাঁ, তোমাকে নিয়ে গিয়ে সোসাইটির মধ্যে লজ্জায় মাথা হেঁট করি আর কি ? যখন পরেশ দেখ্‌তে চাইবে, যখন আর সকল বন্ধু দেখ্‌তে চাইবে, তখন এই অপরূপ জানোয়ারটিকে দেখালেই আমি গেছি আর কি ? পরেশের বোন কত লেখাপড়া জানে,—ক্লাসে বরাবর ফার্ষ্ট থাকে। এইবারে পরীক্ষাও দিয়েছে। আর গান যা গায় ! যেন কিন্নরী গাইছে। তাদের চলা, বলা, এমন কি কাপড় প'রবার ভঙ্গীটিও কেমন সুন্দর !—হায় রে !"

মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত সে যেন দেখিতে পাইল। পাঁজরা-ভাঙ্গা সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া সে বলিয়া উঠিল—"তাই হোক্—হে ভগবান্, তাই হোক্। যে-কোন রকমে হোক্, ওঁর পথ থেকে আমায় তুমি সরিয়ে দাও গো, সরিয়ে দাও—। যে ওঁর মনের মত, তাকেই মিলিয়ে দাও ওঁর সঙ্গে। হে ভগবান্—হে দয়াময়, তাই কর, তুমি তাই কর।" বলিতে বলিতে তাহার যেন কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল—সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

আমি তদগত চিত্তে ভাবিতে লাগিলাম—তাই কি হবে ?

এমন শুভদিন কি আমার অদৃষ্টে আসবে? হায় মূঢ় মানবের বাসনা!

আমি ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ করিতেই আমার সেই উপেক্ষিতা পত্নী সুধা ধীরে ধীরে উঠিয়া, তাহার সকল বেদনা, সকল গ্লানি যেন নিঃশেষে হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, আমার পদসেবায় নিযুক্ত হইল।

আমি সজোরে পা টানিয়া লইয়া বলিলাম—"ভুলে যাচ্ছ কেন সুধা, তুমি আমার মাইনে দিয়ে রাখা পরিচারিকা নও,—তুমি আমার স্ত্রী—আমার সঙ্গিনী। এম্‌নি ক'রেই ত তোমরা নিজেদের নারীত্ব, নিজেদের মর্য্যাদা হারাও। এসব না ক'রে যদি একটু বিদ্যার চর্চ্চা করো, তবে এসবের চাইতে বেশী সুখী হব আমি। ভুলে যেও না তুমি, যে তুমি আমার দাসী নও।"

সুধা ধৈর্য্য হারাইয়া বলিল—"তুমিই বা ভুলে যাচ্ছ কেন, আমি আমার নারীত্বের চাইতে দাসীত্বকেই বেশী উঁচু আসন দিতে চাই?—বরাবরই ত আমি তোমার পদ সেবা করি?—তখন ত কিছু ব'লতে না—এখন আমাকেই বিষ চোখে দেখ্‌ছ, তাই আমি যা করি, তাই তোমার কাছে খারাপ লাগচে। তাই তুমি আমাকে এই পদসেবার অধিকারটুকু দিতেও কুণ্ঠিত হ'চ্ছ।—আমি লেখাপড়া জানি না, পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার আমি চাই না, হিঁদুর মেয়েদের যা শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার বস্তু—পতিসেবা,—দোহাই তোমার, তার থেকে আমাকে তুমি বঞ্চিত কোরো না। আর, তুমি যে কেবল লেখাপড়ার কথা উঠিয়ে আমাকে আঘাত ক'রছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লেখাপড়া শেখাতে কোন দিনের জন্যে চেষ্টা ক'রেছিলে কি?—নিজে নিজে আমি কি ক'রে শিখ্‌ব বল? তুমি ইচ্ছে করলেই ত ক'ল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে আমাকে লেখাপড়া শেখাতে পারো। তা কি তুমি করবে—আমার মুখ দেখ্‌তেও যে তোমার ঘৃণা বোধ হয় এখন।"

আমি বিদ্রূপ-ভরা কণ্ঠে বলিলাম—"হ্যাঁ, আমার ত আর খেয়ে-দেয়ে কায নেই, এখন এত বড় মেয়েকে নতুন ক'রে পড়াব। মজা বটে!"

তার পরদিন আবার আমি কলিকাতায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সেদিন সুধা আরো বেশী করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল ছায়ার মত।

মা বিধবা মানুষ, পূজা-অর্চ্চনা লইয়াই থাকিতেন। নানা প্রকার সুস্বাদু ব্যঞ্জন এবং স্বহস্ত-প্রস্তুত মিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা সেই আমাকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইল। সঙ্গে-লইয়া যাইবার মত খাদ্যদ্রব্য গুছাইয়া দিল। যন্ত্র-চালিতার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত উপকরণ যোগাইয়া দিয়া আমার যাত্রার আয়োজন সুসম্পন্ন করিল।

যাত্রার সময়ে মাকে প্রণাম করিয়া যখন তাহার নিকট আসিলাম, তখন দেখিলাম, অঞ্চল-প্রান্ত দ্বারা সে তাহার ইন্দীবর-সন্নিভ আঁখি দুটি ঘন ঘন মার্জ্জনা করিতেছে। আমি তাহার সাম্‌নে দাঁড়াইবামাত্রই সে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া আমার পদতলে মস্তক ঠেকাইল। এবং বলিল——"আশীর্ব্বাদ করো, এই পোড়ারমুখীর মুখ আর যেন তোমায় না দেখ্‌তে হয়।"

সহসা যেন কিসের একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় আমি চমকিত হইলাম।

তাহার মুখের পানে আর একবার চাহিয়া দেখিলাম, মার্জ্জন করিতে করিতে চোখ্‌ দুটি তাহার রক্ত-করবীর মত হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ যেন মনে হইল—তুলনা নাই—এ মুখের তুলনা নাই! এই অনন্ত অন্তর্বাহিনী প্রেমের অধিকারিণীর সহিত ত আর কাহারও তুলনা নাই!—

আমি সম্মোহিত ভাবে তাহার দিকে একখানি হাত বাড়াইয়া দিতেই, সে তাহা তাহার আপন হাতের মুঠায় চাপিয়া ধরিয়া তাহার মস্তকে স্পর্শ করাইল। আমি তাহাকে আমার নিকটে আকর্ষণ করিব কি না ভাবিতেছি,—এমন সময়ে সে ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

সেই সময়ে তাহাকে দেখিতে ঠিক্‌ যেন মহীয়সী সম্রাজ্ঞীর মতই বোধ হইল।—তাহাকে কাছে পাইতে আমার এই ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়াই যেন সে জানাইয়া দিয়া গেল যে, আমার অবহেলার দান, ভিক্ষার দান—সে লইবে না, লইবে না!

যথা সময়ে আমি কলিকাতায় রওনা হইলাম।

তিন

উল্লিখিত ঘটনার পর, আরো কয়েকটি মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে।

আমার গুভাদৃষ্ট বশতঃই হোক্ আর যে কারণেই হোক্,

সুলতাকে বিবাহ করিবার জন্ত এখনও পর্য্যন্ত আমি মহেশবাবু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হই নাই। তবে প্রসার-প্রতিপত্তির পথে অধিকতর দ্রুতবেগে যে আমি অগ্রসর হইতেছিলাম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

মহেশবাবু হয় ত ভাবিতেছিলেন, প্রস্তাবটি আমার তরফ হইতেই প্রথম উত্থাপিত হইবে। কারণ, তিনি দাতা—আমি গ্রহীতা। তাঁহার তরফ হইতে যদি এই প্রস্তাব প্রথম উত্থাপিত হয়, তাহা হইলে আমি হয় ত মনে করিতে পারি, এই জন্তই বুঝি মহেশবাবু আমার এত উপকার করিতেছেন।

মহেশবাবু হৃদয়বান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। কাজেই, হৃদয়ের এতটা অনুদারতা প্রকাশ করিতে তিনি কুণ্ঠা বোধ করিতেছিলেন। উপকৃতের নিকট প্রত্যুপকারের আশা, অন্তরে উদিত হইলেও, বাহিরে প্রকাশ হইলেই, তাহা 'দাবী'র আকার ধারণ করে।

ক্রমে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল। দোলের ছুটিতে বাড়ী যাইবার জন্ত মা আমাকে বিশেষ করিয়া লিখিলেন। এদিকে পরেশ ধরিল—দোলের ছুটির দিন সে, সুলতা আর আমি,—এই তিনজন একত্র হইয়া সিনেমা হাউসে গিয়া ছুটির আনন্দটা পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া আসিব। পরেশের এই প্রস্তাব আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। ধরিতে গেলে—আমার এতটা সৌভাগ্যের মূলই সে। তাহার পর, যে আমার আরাধ্যা, তাহাকে নিকটে—অতি নিকটে দেখিতে পাইবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, এবং সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার এই সুবর্ণ সুযোগ আমি হেলায় হারাইতে পারিলাম না। তবে, এ কথাটাও মনে মনে আমি যে না বুঝিলাম তাহা নহে যে, এই রকম করিয়াই ঘনিষ্ঠতার বৃদ্ধি হয়। আজ আমার সঙ্গে সুলতা আর পরেশ সিনেমা হাউসে যাইবে, কাল হয় ত বিবাহের প্রস্তাবও উত্থাপিত হইবে।

মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিলেও, হস্তগত সুখ ক্ষণিক হইলেও, তাহার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিলাম না। বোধ হয় কেহই তা পারে না। ভক্তের মত এতদিন দূর হইতে দেবীদর্শন করিয়াছি—তাহাকে নিকটে পাইবার, তাহার সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা আমি এত দিনের মধ্যে না করিলেও, সেই বাসনানল যে অহর্নিশ আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে—এ কথাটা অস্বীকার করিবার ত উপায় নাই,—উপায় নাই!

হায়, তখন ত জানিতাম না, সেই দোল-পূর্ণিমার রাত্রে সেই শত শত কৌতূহলী দর্শক পরিশোভিত, আলোকোজ্জল প্রেক্ষা-গৃহে, সেই আমার আরাধ্যা দেবীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, বায়স্কোপের প্রণয়-দৃশ্যাবলি-সমন্বিত অভিনয় দেখিয়া যাহা পাইলাম,—হারাইলাম তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী।

দোল-পূর্ণিমার দুই দিন পরে, আমার জননীর একখানি পত্র যে নিদারুণ সংবাদ বহন করিয়া আনিল, তাহা অননুভূত-পূর্ব্ব ত বটেই,—তেমনই আবার হৃদয়-বিদারক।

মা লিখিয়াছেন,—"বাবা, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। কৈলাস খুড়া—যিনি আমাদের অভিভাবক-স্বরূপ রাত্রে আমাদের বাড়ীতে শয়ন করেন, তিনি এবং আমাদের ভৃত্য রামকান্ত উভয়েই 'যাত্রা' শুনিবার জন্ত দোলের রাত্রে বাহির হইয়া যায়। আমরা দুই শাশুড়ী-বৌ মিলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া নিতান্ত ভয়ে ভয়ে অবস্থান করিতেছিলাম।

অর্দ্ধ রাত্রে দ্বার ভাঙ্গিয়া তিন জন ভীষণাকৃতি গুণ্ডা বলপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করিয়া, আমার সোণার প্রতিমাকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার পর, কত সন্ধান করাইলাম, আর তাহার কোন চিহ্নই পাইলাম না।—এ পোড়ামুখ আর তোমাকে কেমন করিয়া দেখাইব বাবা?"—ইত্যাদি ইত্যাদি।

মর্ম্মভেদী যাতনায় তাঁহার হৃদয়-ব্যথা জানাইয়া তিনি তাঁহার পত্র শেষ করিয়াছেন!

যাক্, সব শেষ! বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় সেইখানে আমি সম্বিৎহারা হইয়া ভূপতিত হইলাম।

কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম জানি না। তাহার পর উঠিয়া আবার চিঠিখানি হাতে লইলাম, আবার পড়িলাম। মা লিখিয়াছেন,—"এ পোড়ারমুখ তোমাকে কেমন করিয়া দেখাইব?"

কেন মা, তুমি আত্ম-গ্লানি বোধ করিতেছ? তোমার ত কোন অপরাধই নাই মা? দোষ ত সবই এই হতভাগ্যের। দোলের ছুটিতে বাড়ী যাইবার জন্ত ত কত সাধ্য-সাধনা করিয়াছিলে, ক্ষণিক সুখের আশার মোহে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমিই ত তাহা যাই নাই! সেই নির্দ্দোষ

বালিকা, আর তুমি, যুগপৎ উভয়ে মিলিয়াই ত—তোমাদের কলিকাতায় আনিবার জন্ত কত অনুনয় করিয়াছিলে, আমিই ত তাহা আনি নাই ? দোল-পূর্ণিমার রাত্রে আমি যদি সেই স্থলে থাকিতাম, দুর্ব্বৃত্তগণের কি সাহস হইত—সে বাড়ীতে মাথা গলাইতে ?

মুহূর্ত্ত মধ্যে হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল—অর্দ্ধস্ফুট সেই যূথিকার মত পেলব অম্লান শুভ্র ক্ষুদ্র মুখখানি! সেই কাতরতাপূর্ণ, অন্তর্ভেদী চাহনি, সেই অক্লান্ত সেবা, ছায়ার ন্যায় আমার অনুগমন, আর সেই অপরিসীম ভক্তির সঙ্গে আমার পাদোদক পান!

হায় রে হায়, মানব-চিত্তের বিপর্য্যয়! আজ সর্ব্বপ্রথম আমার অন্তর, আমার বিবেক আমার কশাঘাতে প্রহৃত হইল—এই বলিয়া ওরে মূঢ়—ওরে ভ্রান্ত—ওরে পিশাচ, সুশীতল পানীয় পশ্চাতে রাখিয়া ছুটিয়াছিলি মরীচিকার পিছে ; অনন্ত অনুশোচনা তোর সম্মুখে!

চার

পরদিন, প্রাত্যহিক অভ্যাসমত, মহেশবাবুর বাড়ীতে পঁহুছিতেই, তিনি আমার দুইটি হাত ধরিয়া তাঁহার অফিস-ঘরে না গিয়া তাঁহার বিশ্রাম-কক্ষে লইয়া গেলেন।

আমাকে একখানি চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া তিনিও একখানি চেয়ার গ্রহণ করিলেন।

তাহার পর গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"অশোক, আজ তোমাকে আমার কিছু ব'লবার আছে। তাই তোমায় এই ঘরে এনেছি।"

আমি বলিলাম,—"বলুন, কি বোলবেন ?"

তিনি বলিলেন,—"তুমি কি বিবাহিত ?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ।"

—"কই, এত দিন আমরা ত তা জান্‌তে পারি নি ?"

—"আপনি ত কোন দিন আমার কাছে তা জান্‌তেও চান নি, বা এ বিষয়ে কোনই প্রশ্ন করেন নি ?"

মহেশবাবু একটু যেন চিন্তান্বিত হইলেন—তৎপরে বলিলেন, "হ্যাঁ তা বটে।" বলিয়া, তিনি একখানি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের একটি সংবাদস্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"পড়।"

আমি পড়িলাম—তাহাতে লেখাছিল—"গ্রামের অবস্থা-পন্ন গৃহস্থ শ্রীঅশোককুমার বসুর বালিকা পত্নী শ্রীমতী সুধাহাসিনীকে বিগত দোল-পূর্ণিমার রাত্রি ১২টার সময় তিনজন পরাক্রমশালী গুণ্ডায় মিলিয়া অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।—তদন্ত চলিতেছে।"

আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম।

তিনি সস্নেহে আমার পৃষ্ঠদেশে হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন,—"বড়ই শোচনীয় ঘটনা। এ যে অত্যাচার এর কি কোন প্রতীকার নাই ? যাক্, তার জন্যে ভেবে ত কোন ফল নেই এখন আর। এখন তুমি কি করবে ?"

আমি বলিলাম,—"কাল একবার বাড়ী যাব ভাব্‌ছি। মা একা আছেন, তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখ্‌ব।"

মহেশবাবু বলিলেন,—"তুমি আবার বিবাহ ক'র্‌বে ত ?—"

আমি অবনত মস্তকে বসিয়া রহিলাম,—সহসা এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না।

আমাকে নীরব দেখিয়া পুনরায় তিনি বলিলেন,—"বিবাহ যদি করো—তবে আমার সুলতাকে করিতে পারো।"

আশার অতীত লোভনীয় প্রস্তাব আমার সম্মুখে! শত শত পর্ব্বতচুম্বী ঊর্ম্মিমালা আমার হৃদয়তটে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল,—কিন্তু তটপ্রান্ত তাহাতে কিছু আর্দ্র হইল মাত্র, কঠিন মৃত্তিকার বাঁধ তাহাতে ভাঙ্গিল না। মুহূর্ত্তমধ্যে কাহার সেই মরমভাঙ্গা শেষবাণী আমার সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দুয়ারে আঘাত করিয়া উঠিল,—"আশীর্ব্বাদ করো—এ পোড়ামুখ আর যেন তোমায় না দেখ্‌তে হয়।"

অভিমানিনি! তোমার এই আকাঙ্ক্ষা সফল হ'তে আমি দিব না। পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্তে যেখানেই তুমি থাক না কেন, আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। আবার তোমার সেই পোড়ামুখ (?) আমি দেখিব। তোমার জন্ত অনন্ত প্রতীক্ষাই এখন হইতে আমার জীবনের সম্বল হইল।

আমাকে মৌন থাকিতে দেখিয়া সম্মতির লক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন,—"তোমার উপর আমার স্নেহটা বড়ই জন্মে গেছে,—তাই আমার ইচ্ছা আমার মেয়েটিকে তুমিই গ্রহণ কর। তোমার স্ত্রীকে আর যদি তুমি না পাও, বয়েসই বা তোমার কি, এই ভাবেই কাটাবে কেমন ক'রে ? তার পর

ধরো,—দু'চার মাস পরে তোমার সেই স্ত্রীকে যদি পাওয়াই যায়, 'হিন্দু' ধর্ম্মমতে তুমি আর তাকে গ্রহণ কর্ত্তে পারবে না ত ?"

আমি অবিচলিত কণ্ঠে বলিলাম—"হাঁ, গ্রহণ করব।"

বিস্ময়-বিমূঢ়ভাবে আমার পানে চা হয়া তিনি বলিলেন, —"সে কি, তাকেই আবার তুমি গ্রহণ করবে ?"

"নিশ্চয়।"

আমার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা লক্ষ্য করিয়া তিনিও একটু উগ্রভাবে বলিলেন,—"আমার এমন মেয়ে তোমার পছন্দ হয় না ? আমার মেয়ের উপযুক্ত পাত্রের বঙ্গদেশে অভাব হবে না। তবে তুমি আমার হাতে গড়া, আর সেইজন্ত তোমার ওপর একটু স্নেহ এসে পড়েছে ব'লেই তোমাকে এত ক'রে বলছি। 'পাত্র' হিসাবে তুমি বরণীয় হ'লেও আমার মেয়েও পাত্রী হিসাবে যে অতুলনীয়া, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

আমি যুক্তকরে বলিলাম,—"আপনার মেয়ের যোগ্য আমি কখনই নই। আর, আপনার উপকার আমি এ জীবনেও ভুলতে পারব না,—অশেষ ঋণে আমি আপনার কাছে ঋণী, প্রয়োজন হ'লে আপনাদের জন্ত প্রাণ দিতেও আমি কুণ্ঠিত হব না, কিন্তু এই কাজটিই শুধু পারবো না।"

সস্নেহে আমার হাত ধরিয়া মহেশ বাবু বলিলেন,— "মামলা মোকর্দ্দমা ক'রে স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনবে তুমি ?"

আমি বলিলাম,—"ক্ষতি কি ?"

"ভদ্রলোকের ঘরে সেটা বড়ই লজ্জার বিষয় হবে যে।"

আমি বলিলাম,—"আমার আর কে আছে বলুন, এক ত বুড়ো মা। আর যাই হোক্ না কেন, বিনা দোষে নিরপরাধকে ত্যাগ করলে আর যিনিই হোন্, ঈশ্বর আমার ওপর সন্তুষ্ট হবেন না, এটা ঠিক।"

তিনি বলিলেন,—"কিন্তু, যখন তোমার ছেলে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, তখন গোলযোগে পড়বে না কি ? আর ধরো—তার কোন সন্ধানই আর যদি তুমি না পাও, তা হ'লে ? তার সন্ধান না পেলে যদি তুমি বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত থাক, তা হ'লে আমি তোমাকে সন্ধান করবার সময় দেওয়ার জন্ত আরো এক বৎসর অপেক্ষা করতে পারি। কারণ, আমার মেয়ে ত পড়বে,—তাড়াতাড়ি কিছু নেই। তুমি যদি শুধু বল যে এক বৎসর পরেও সে স্ত্রীকে না পেলে আবার বিবাহ করবে।"

"মাপ করবেন আমায়—আবার বিবাহ করতেই আমার আর ইচ্ছে নাই,—তাকে ফিরে পাই বা না পাই।" বলিয়াই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আবার আমি আফিস ঘরে আসিয়া বসিলাম।

তাহার পর ? তাহার পর সেই অভিশপ্ত দোল-পূর্ণিমার পর, দীর্ঘ একটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, কত স্থানে ঘুরিলাম—কত অনুসন্ধান করিলাম—কই, তাহাকে ত আর পাইলাম না!

আজ আবার সেই দোল-পূর্ণিমা। এই মহোৎসবে কত নরনারী পুলকোদ্বেল হৃদয়ে যোগদান করিয়াছে, আকাশে-বাতাসে একটা পুলকের হিল্লোল বহিয়া যাইতেছে,—আর আমারই এই তাপদগ্ধ প্রাণে শুধু অনল-শিখা জ্বলিতেছে! এই ভীষণ শিখা কি এ জীবনে নির্ব্বাপিত হইবে না ? আমার হারানিধি কি আর ফিরিয়া পাইব না ?—বুকের মধ্যে যে চিতা স্বহস্তে জ্বালিয়াছি, রাবণের চিতার মতই কি তাহা যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া জ্বলিতে থাকিবে ?

পিকবর গাহিয়া উঠিল—'কুহু'!

মলয় সমীরণ আমাকে তাহার স্নিগ্ধ পরশ বুলাইতে কার্পণ্য করিল না। দূরে—বহু দূরে—কাহার ঘুমহারা বাঁশী, সুচির-বিরহীর মত সকরুণ সুরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল—যেন আমারই বিরহী আত্মার সন্ধান পাইয়া সমস্ত প্রকৃতিও সেই সুরে যোগ দিয়া উঠিল। পাশের বাড়ীর কক্ষ হইতে সেতারের ধ্বনি শ্রুত হইল। তরুণী-কণ্ঠ গাহিয়া উঠিল—

বিদায় ক'রেছ যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে ?
মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার
সে জন ফিরে না আর যে গেছে চ'লে।
এখন ফিরাবে আর কিসের ছলে ?

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

প্রাচ্যের বাজীকর আমেরিকায়—

রহমন বে প্রাচ্যের একজন বিখ্যাত বাজীকর। ইনি সম্প্রতি আমেরিকাতে বাজী দেখাইবার জন্ম গিয়াছেন। ইঁহার নানা প্রকার অত্যাশ্চর্য্য বাজী দেখিয়া সেখানকার লোকেরা ইঁহাকে দৈবশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেছে। ইঁহার কতকগুলি খেলার কথা বলিব।

মাটিতে দুইখানি ধারাল তলোয়ার পোঁতা হইল। বাটের দিক মাটিতে এবং ডগার দিক উপরে। তার পর সেই দুইখানি তলোয়ারের উপর রহমন বে'কে শোয়ান হইল। তার পর বাজীকরের বুকের উপর তিন ফিট চওড়া একটা পাথরের চাপ রাখিয়া প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ির আঘাতে সেই পাথর ভাঙিয়া ফেলা হয়। এত কাণ্ডের পর দেখা যায় যে, বাজীকরের শরীরে সামান্ত আঁচড়ও লাগে নাই। পাথর ভাঙা হইবার পর বাজীকর বেশ উঠিয়া দাঁড়ান এবং চলাফেরা করেন। এই বাজীকর নিজের অঙ্গে ছুরি, কাঁচি, বড় বড় ছুঁচ ঢুকাইয়া দিতে পারেন; অথচ ছুরি ইত্যাদি অঙ্গ হইতে বাহির করিয়া লইলে পর রক্ত পড়ে না, কেবল সামান্ত একটু দাগ থাকে মাত্র।

রহমন বে'র আর একটি কাণ্ড দেখিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গিয়াছে। তিনি ইচ্ছামত তাঁহার দুই হাতের নাড়ীর গতি দুই প্রকার করিতে পারেন। ডান হাতে হয় ত মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন ৯০বার পাওয়া গেল, এবং ঠিক সেই মিনিটেই বাঁ হাতে নাড়ী চ'লে ৭২ বার। প্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণও, ইহা যে কেমন করিয়া সম্ভব, তাহা বলিতে পারেন নাই।

প্রাচ্যের বাজীকর আমেরিকায়

রহমন বে'কে সকলের সামনে একটি বালিভরা বাক্সের মধ্যে কবর দিয়া প্রায় ২০ মিনিট কাল রাখা হইল। তার পর বালি সরাইয়া তাঁহাকে বাহির করা হইল। কবর হইতে বাহির হইয়াই তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। এই বাজীকর বলেন যে, তিনি মাটির মধ্যে ১ ঘণ্টা কিম্বা তারও বেশী সময় থাকিতে পারেন—কিন্তু যে সময় বলিয়া তাঁহাকে কবর দেওয়া হইবে, ঠিক সেই সময় শেষ হইবামাত্র তাঁহাকে কবর হইতে বাহির করিতে হইবে। এক মিনিট সময় বেশী হইলেই তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবেন না। কবরে যাইবার সময় তিনি শুভ্র পোষাক পরিধান করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ান—কয়েকটা শিরা ফুলাইয়া কিছু একটা করেন,—তার পর

তাঁহার সঙ্গের লোকেরা তাঁহাকে কবরে শোয়াইয়া মাটি চাপা দায়।

দর্শকদের মধ্যে কেহ একটা জলন্ত মশাল লইয়া আসে। রহমন সেই জলন্ত মশালে তাঁহার হাত প্রবেশ করাইয়া যতক্ষণ ইচ্ছা রাখিতে পারেন। দশ-বারো মিনিট পরে আগুনের ভিতর হইতে হাত বাহির করিবার পর দেখা গেল—হাতে সামান্য ফোস্‌কাও পড়ে নাই।

ইঁহার আর একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। দর্শকদের মধ্যে যে কোনো লোককে তিনি সম্মোহিত করিয়া তাহাকে দুইখানি তলোয়ারের ডগায় শোয়াইয়া তাহার বুকের উপর হাতুড়ি দিয়া পাথর ভাঙিতে পারেন। তার পর সেই সম্মোহিত ব্যক্তির অঙ্গে ছুরি ইত্যাদিও চালানো হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার শরীরেও রক্ত পড়ে না, বা কোনো প্রকার ক্ষতি হয় না। চিকিৎসক এবং বৈজ্ঞানিকগণও এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন।

এইবার রহমন-বাজীকরের আর একটি অত্যাশ্চর্য্য বাজীর কথা লিখিব। ইহা দড়ির বাজি। দর্শকদের সামনে রহমন তাঁহার একটি বালক সহকারী এবং এক তাল দড়ি লইয়া হাজির হইলেন। তার পর বাজীকর দড়িটাকে এক প্রান্ত হাতে ধরিয়া অন্য প্রান্ত উপর দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। দড়ি আকাশের গায়ে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। তার পর বাজীকরের আদেশে সহকারী বালক দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে অবশেষে শূন্যে মিলাইয়া গেল। তার পর ফকীর বালককে হাঁক দিয়া ডাকিতে থাকেন। তাহার কোনো জবাব না পাইয়া তিনি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া একটা ছুরি লইয়া দড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে শূন্যে মিলাইয়া যান। দর্শকগণ হাঁ করিয়া দেখে—এইবার কি হয়। তার পর আকাশের অনেক উচ্চ হইতে একটা ভয়ানক কান্নার শব্দ আসে। সকলে ভয়ানক ভয় পাইয়া যায়। পর মুহূর্ত্তেই দেখা যায় যে, সহকারী বালকের দেহ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িল। তাহার সামনে ক্ষণ বাদেই বাজীকর দড়ি বাহিয়া নামিয়া আসেন। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই এমন নিষ্ঠুর কাণ্ড দেখিয়া বাজীকরকে মারপিট করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই ফকীর বালকের ছিন্নভিন্ন দেহের উপর মন্ত্র পড়িয়া তাহাকে বাঁচাইয়া দেন। বালক হাসিমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। এই সমস্যার মীমাংসা এখন পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারেন নাই। আমেরিকার বিখ্যাত বাজীকর হুডিনি পর্য্যন্ত বলিয়াছিলেন যে, "রহমনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে—তবে দৈবশক্তির কথা আমি বিশ্বাস করি না। চেষ্টা করিলে আমিও ঐ প্রকার বাজী দেখাইতে পারি।" দুঃখের বিষয় হুডিনি এই চেষ্টা করিয়া যাইতে পারেন নাই—তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।
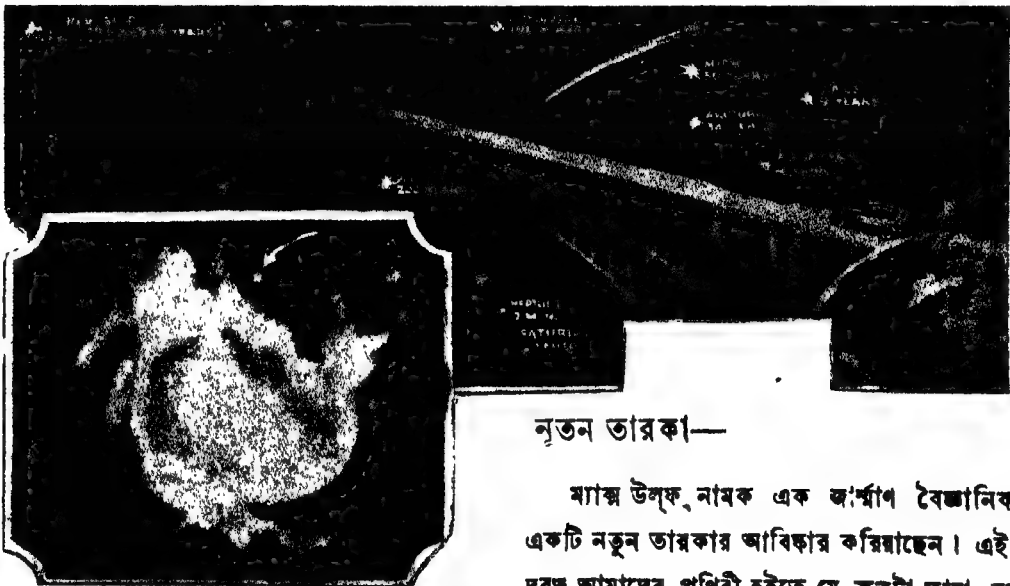
নূতন তারকা

নূতন তারকা—

ম্যাক্স উল্‌ফ্ নামক এক জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক সম্প্রতি একটি নতুন তারকার আবিষ্কার করিয়াছেন। এই তারকার দূরত্ব আমাদের পৃথিবী হইতে যে কতটা তাহা বুঝা শক্ত। এই তারকার আলোক-রশ্মি সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল

বেগে ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের পৃথিবীতে এক কোটী বৎসরে পৌঁছিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত তারকার আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই তারকার দূরত্বই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

—পিপার মধ্যে ঘর

অভিনব আবাস—

(১) আমেরিকার ওহিও প্রদেশে কতকগুলি লোক মদের ব্যবসা করিত। ক্রমে তাহাদের ব্যবসা বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা মদ চুয়াইবার পিপা ইত্যাদিকে বাস করিবার গৃহে পরিণত করিয়াছে। ছবিতে এই অভিনব আবাসের সামান্য পরিচয় পাইবেন।

গাছের গুঁড়ির মধ্যে ঘর

(২) আর একটি লোক একটি বড় গাছের গুঁড়ির মধ্যে নিজের থাকিবার ঘর প্রস্তুত করিয়াছে। গুঁড়ির গায়ে দরজা, জানালা ইত্যাদি সবই লাগান আছে। বিদেশী লোকেরা এই অভিনব জিনিসটি কি বুঝিতে না পারিয়া গৃহস্বামীকে মাঝে মাঝে বড় জ্বালাতন করে।

ডাইনী বুড়ীর গৃহ

(৩) পুরাকালের ডাইনি বুড়ীদের গৃহাদির যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহারই অনুকরণে এই অভিনব গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই গৃহটি অত্যন্ত আরাম-দায়ক, যদিও বাহির হইতে ইহাকে অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার বলিয়া মনে হয়।

কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষুদ্র সংস্করণ—

(১) ছবিতে ছোট একটি ক্যামেরা দেখুন। মইএ চড়িয়া

ছোট্ট ক্যামেরা

ইহাতে ছবি তুলিতে হয়। এই ক্যামেরার যে সকল ছবি তোলা হয়, তাহা সকল বিষয়ে নিখুঁত হয়। ক্যামেরাটি জার্ম্মাণির তৈরী।

ছোট্ট জুতা

(২) একটি জুতার ছবি দেখুন। এই জুতার মধ্যে একজন লোক গলা পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। এই জুতা যাহার পায়ে ঠিক হইবে তাহার যোগ্য চুরুটের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ছবিতে দেখুন, একজন মহিলা একটি চুরুটিকা ধরিয়া বসিয়া আছেন।

চুরুটিকা

অদ্ভুত বাজীকর—

ছবিতে যে ঘড়িটি দেওয়া হইল—ইহার আকার পার্শ্বস্থিত বালিকার সহিত তুলনা করিলে বুঝা যাইবে।

এক টন ওজনের একটী ঘড়ি

ঘড়ির ওজন কিন্তু বালিকার ওজন অপেক্ষা অনেক বেশী। ঘড়ির ওজন ২৮ মণ। গ্যাল কাউলার্স নামক একজন বাজীকর এই ঘড়িটিকে বাজী দেখাইবার সময় দর্শকদের

সামনে আনিয়া উড়াইয়া দিতে পারেন। ঘড়িটি যে কোথায় যায়, অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহা কেহই ধরিতে পারে নাই নাই।

অদ্ভুত ডিম—

এক ভদ্রলোক সকালে তাঁহার মুর্গা-ঘর হইতে ডিম আনিতে গিয়া একটি অদ্ভুত আকারের ডিম প্রাপ্ত হইলেন। ডিমের ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় ডিমটি কি অদ্ভুত। নিউজার্সির (আমেরিকা) এথেনিয়া নামক স্থানে এই ডিমটি পাওয়া যায়। পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত এ রকম ডিম পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই।

অদ্ভুত ডিম

অদ্ভুত জন্তু—

হাতের উপর যে জন্তুটি বসিয়া আছে—উহাকে দেখিলে মনে হয় খরগোসের বাচ্চা। আসলে উহা "Chinchilla",

অদ্ভুত জন্তু

নামক জন্তু। অত্যন্ত দামী। চাপিয়া ধরিলে হাতের মুঠায় মধ্যে রাখা যায়।

সত্যযুগের বৃক্ষ—

আমেরিকার উটা কৃষি কলেজের ছাত্রগণ সম্প্রতি একটি ২০ ফিট পরিধিওয়ালা বৃক্ষ আবিষ্কার করিয়াছে। বিখ্যাত

সত্যযুগের বৃক্ষ

বৈজ্ঞানিক ডাঃ হেন্‌রি সি কাউল্‌স্ নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন যে এই বৃক্ষটির বয়স ৬০০০ বৎসর। তাঁহার মতে এই বৃক্ষ পৃথিবীর প্রাণবান বৃক্ষাদির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ।

অভিনব বসন—

"নরম কাচের" (Flexible glass) দানা বসান

অভিনব বসন

একপ্রকার কাপড় তৈয়ারি হইতেছে। এখন আর কাপড়ে পুঁতি বসাইবার দরকার হইবে না। কাচ কাপড় বুনিবার সময়েই কাপড়ের মধ্যে সেলাই হইয়া যাইবে। কাপড় ময়লা হইলে কাচ সমেত কাপড় কাচা যাইবে—কাচ ভাঙিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। ইস্ত্রী করা এবং কাচা সত্ত্বেও নাকি এই কাচের শুভ্রতা নষ্ট হইবে না।

বৃহত্তম ঘুড়ি—

ছবিতে যে ঘুড়িটি দেওয়া হইল, ইহা ১৪ ফিট ২ ইঞ্চি উঁচু। এই ঘুড়িটি উড়াইতে তিনজন লোকের দরকার হয়। সম্প্রতি এক ঘুড়ি-প্রদর্শনীতে এই ঘুড়ির নির্ম্মাতা প্রথম পুরস্কার পাইয়াছে।

বৃহত্তম ঘুড়ি

খেলোয়াড়দের কসরৎ—
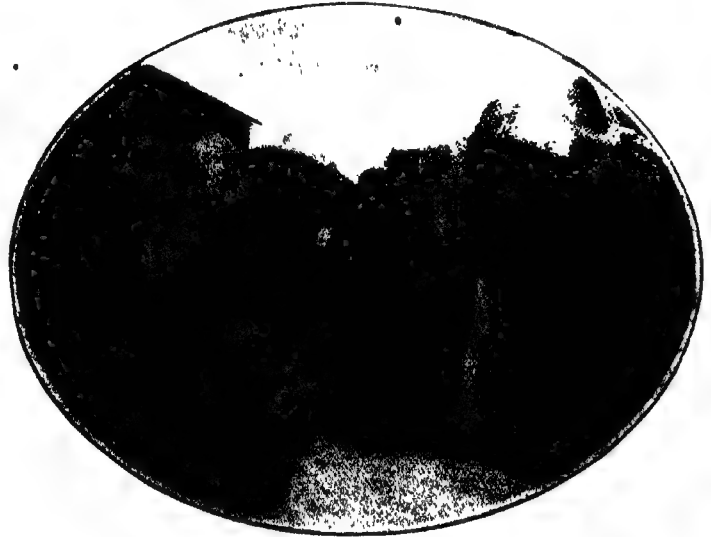
ফুটবল খেলোয়াড়দের ধাক্কা দেওয়ার শক্তি বাড়াইবার জন্য তাহাদের পোষা হাতীর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কির খেলা হয়। বলা বাহুল্য যে এই খেলাতে মানুষের দল হাতীকে এক ইঞ্চিও সরাইতে পারে না। কিন্তু এই কসরতের ফলে ধাক্কা দিবার কায়দা এবং জোর এত বাড়িয়া যায় যে, ফুটবল ম্যাচের সময় বিপক্ষদল ধাক্কার চোটে তাহাদের সামনে দাঁড়াইতেও পারে না।

খেলোয়াড়দের কসরৎ

ঈগল পাখীর ছবি—

মেক্সিকোতে একটি ঈগল পাখী ভেড়ার পালের উপর

ঈগল পাখীর ছবি

ছোঁ মারিতেছিল। সেই সময় একজন তাহার একটি ফটো তোলে। ফটোতে এমন চমৎকার ছবি খুব কমই পাওয়া যায়। ঈগল পাখীটিকে দেখিলে মনে হয় যে পুরাকালের একটি গরুড় পাখী কলিকালে বেড়াইতে আসিয়াছে।

নিরাপদ রাস্তা

যে সকল রাস্তা দিয়া খুব বেশী গাড়ী-ঘোড়া চলাচল করে, সেই সকল পথ দিয়া ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের চলা-ফেরা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক—বিশেষ করিয়া রাস্তা পার হইবার সময় ভয় আরো বেশী। এই সকল রাস্তা এপার-ওপার করা বালক-বালিকাদের পক্ষে নিরাপদ করিবার জন্য আমেরিকায় এক সহরে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থানে একটি করিয়া গেট—রেল লাইনের উপর রাস্তার দুই দিকে যেমন গেট থাকে—খাড়া করা থাকে। কয়েকজন ছেলে রাস্তা পার হইবার জন্য সেইখানে জমা হইলেই একজন বালক পাহারাওয়ালা এই গেট রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে নামাইয়া দেয়; ফলে, গাড়ী চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। সকলে পার হইয়া গেলে পর গেট আবার খাড়া করিয়া উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিশেষ করিয়া ছোট ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তার উপর এই প্রকার নিরাপদ গেটের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতা সহরের পথঘাট দিন দিন যেমন ভয়ানক বিপদসঙ্কুল হইয়া পড়িতেছে—তাহাতে কলিকাতা পুলিস লোকের, বিশেষ করিয়া ছেলে-মেয়েদের, জন্য এই প্রকার ব্যবস্থা করিলে অনেক দুর্ঘটনা কমিয়া যায়। বিশেষ করিয়া বড় বড় রাস্তার উপর ইস্কুলগুলির সামনে এই প্রকার ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় মোটর ডাকাত ধরিবার গেটগুলিকেও এই কাজে লাগান যাইতে পারে।

নিরাপদ রাস্তা

স্বপন-মরীচিকা

শ্রীরাধারাণী দত্ত

হে সুন্দর! এ জীবন-যজ্ঞ শেষে তপঃকৃচ্ছ্র-তনু
শীর্ণ দীন বেশে,
যেদিন দাঁড়াব তব আসন সম্মুখে জুড়ি' পাণি
ক্লান্ত ম্লান কেশে!
সেদিন তোমার দু'টি আঁখি হ'তে করুণার বারি
পড়িবে কি ক্ষরি' ?
সে ধারায় সিক্ত হ'য়ে বিদগ্ধ এ দেহ প্রাণ মম
উঠিবে শিহরি'!

প্রখর নিদাঘ-অন্তে বরষার স্নিগ্ধ-বরিষণে
সব দাহ জ্বালা
যাবে তো জুড়ায়ে বন্ধু! তব মুগ্ধ-স্নেহ-পরশনে
শান্তি সুধা ঢালা!
তপস্বীর ক্রুদ্ধশাপ কোনও দিন হবেই মোচন,
হে প্রাণ-পাথেয়
দুষ্মন্ত! বিরহ-শীর্ণা অভাগিনী বনবালাটিরে
চিনিবে তো ঠিক ?

জানি জীবনের এই দীর্ঘ অন্ধকার নিশা শেষে
স্মিত মৃত্যু-ঊষা,
দিবে দেখা শুভলগ্নে অভিসার-প্রসাধিত বেশে
অঙ্গে পুষ্পভূষা।
তিল তিল মৃত্যু ভরা এ জীবন প্রকাণ্ড মরণ—
কোনও একদিন,
নবীন-জীবন-সিক্ত সুমধুর মরণের বুকে
সুখে হবে লীন।
দুঃখময় জীবনের হতাশার কালো কালি রেখা
ব্যর্থতার ব্যথা,
একদিন সমুজ্জ্বল সার্থকতা রূপে দিবে দেখা
নবলোকে সেথা।
নিষ্পেষিত বিদলিত রক্তঝরা বিক্ষত এ প্রাণ
হবে পুনঃ তাজা
রবিকরে কমল যেমতি মেলে দল; শূন্য গেহে
দেখা দিবে রাজা।

মোর অশ্রু-মৌন-হিয়া রুদ্ধ-বাক্ এ' বেদনা-ভাষা
বুঝিবে তো প্রিয়?
দক্ষিণ-সমীর ওগো, মাধবীর হিম-ঋতু-ব্যথা
হরিয়া লইয়ো।
আমার ধ্যানের ধন! অন্তর্যামী আখি দিঠি তব
মোর মূক ভাষা
আপনি করিবে পাঠ, প্রেমের আলোকে অভিনব,
সেই মোর আশা।
বিশ্ব যদি ভ্রম বুঝি' অবিচারে-করে ভুল সব
তাহে নাহি ক্ষতি!
কারে না বুঝাব কিছু, নীরবে সবা'র ঘৃণা লব;
শুধু এ' মিনতি—
তুমি না বুঝিও ভুল, তুমি নাহি কোরো অবিচার
একদিন যবে,

মরণের সেতু বাহি' তোমার মিলন-স্বর্গলোকে
গতি মোর হবে,
আমার যা কিছু সত্য একা শুধু তোমারেই ক'ব
আর কারে নয়।
সেদিন দোঁহার নামে ধ্বনিয়া উঠিবে স্বর্গলোকে
'জয় জয় জয়'।

নয়ন-পল্লব ভরি' নিদ্রা ভেজা স্বপ্ন নেমে আসে
অতি ধীরে ধীরে
নিদাঘ-আকাশে যথা নামে নব-আষাঢ়ের মেঘ
দিগন্তেরে ঘিরে।
শ্রান্তশির লুটে পড়ে জ্যোৎস্না-ভাঁকা বাতায়ন-তলে
উপধান-হারা,
অশ্রুহীন আঁখি আগে নিঃসীম নিশীথাকাশে জ্বলে
সংখ্যাহীন-তারা।
শূন্য-বর্ত্ম আন্দোলিয়া চলে যায় রাত্রিচর-পাখী
নিরুদ্দেশ পানে,
পক্ষ-চালনার ধ্বনি স্তব্ধতা'র ধ্যান ভঙ্গ করি
মৃদু শব্দ আনে।
স্বপ্ন-সুপ্ত পুষ্পবনে সমীরণ সতর্ক-চরণ
করে আনাগোনা,
রুদ্ধ-কক্ষে বর-বধূ প্রথম মিলন-রাত্রে যেন
নব-জানাশোনা।
আপনার কর্ণে পশে আপনার হৃদয়-স্পন্দন
বক্ষ দুরু দুরু;
নিঃশব্দ দক্ষিণা বহে ফুলরেণু গন্ধ অপহরি'
সৌরভ অগুরু।
স্বপ্ন রূপে এসো যদি অই বন-মর্ম্মর সঙ্গীতে
গুঞ্জিয়া রবে,
স্বপন বাস্তব চেয়ে আমার জাগ্রত-সত্য হবে
তোমার পরশে।

কুজ্ঝটিকা

শ্রীপ্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়

হরিশবাবুর ভুবন-ডাঙায় হঠাৎ আসা যেমন আশ্চর্য্যের, তেমনি তাঁর চরিত্রও আশ্চর্য্যের।

সেদিন তখন সবে মাত্র সূর্য্যদেব নিদ্রার ঘোর কাটিয়ে লাল চোখে নিদ্রালস গতিতে ধীরে ধীরে পৃথিবী ভ্রমণের জন্ম বের হ'য়েছিলেন। পাখীরা তখনও সবাই ভালো ক'রে জাগেনি। বীরভূম সীমান্তের এই ক্ষুদ্র নির্জ্জন গ্রামখানি তখনও সুপ্তিমগ্ন। গ্রামখানির উপর কুয়াসা মহাজনের মতো নির্ম্মমভাবে চেপে বসেছে।

ভুবন ডাঙা গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নেই—সমস্তই প্রায় সাঁওতাল জাতীয় লোক। কেবল ভদ্রলোকের ভিতর আছেন এক ডাক্তার সপরিবারে। তিনিই সেখানকার সব,—বিচারক, পরামর্শদাতা ইত্যাদি।

সেদিন অতো ভোরেই পাড়াটা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লো একজন নবাগতের আগমনে। হরিশবাবু তাঁর একমাত্র ছেলের হাত ধ'রে এই গ্রামে এসে আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌লেন। একজন সাঁওতাল তাঁকে ডাক্তার বাবুর বাড়ী নিয়ে গেলো। ডাক্তার বাবু সাদরে অভ্যর্থনা কর্‌লেন এবং নিঃসঙ্গ জীবনে স্বজাতীয় সঙ্গী পেয়ে খুশী হ'য়ে উঠ্‌লেন।

কিন্তু হরিশবাবুর ব্যবহারে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। প্রথমতঃ হরিশবাবু নিজের কোনো পরিচয় দিলেন না,—তিনি কে, কোথা থেকে এসেছেন এবং কেনো এসেছেন কিছুই বল্‌লেন না। দ্বিতীয়তঃ ডাক্তার বাবুকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, তিনি যে-কদিন না পৃথক থাক্‌বার ব্যবস্থা কর্‌তে পার্‌ছেন, সে-কদিন তাঁ'কে যেনো সমস্ত কিছু কাজ নিজে কর্‌বার অধিকার দেওয়া হয়। এমন কি তাঁর রান্না পর্য্যন্ত তিনি নিজে কর্‌বেন। তিনি কোনও স্ত্রী-লোকের স্পৃষ্ট জিনিষ ছোঁবেন না বা স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে আস্‌বেন না। হরিশবাবু এই কথাগুলো এমন দৃঢ়তার সঙ্গে বল্‌লেন যে, ডাক্তার বাবু অপ্রতিবাদে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন।

* * * *

হরিশ বাবুর ভুবন-ডাঙায় আসার পর কয়েক মাস কেটে গেছে। নিজে আলাদা একটি বাড়ী করেছেন। বাড়ীটি গ্রামের প্রান্তে—সকলের বাড়ী থেকে দূরে। সেইখানে তিনি এবং তাঁর ছেলে তরুণ থাকেন। গ্রামের লোকের খোঁজ তিনিও রাখ্‌তেন না, তা'রাও তাঁর খোঁজ রাখ্‌তো না।

তরুণকে তিনি নিজের মতো ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন,—স্বল্পভাষী এবং চাপা। তা'কে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন যে, সে যেনো কোনো অবস্থাতেই কোনো রকমেই স্ত্রীলোকের সংস্পর্শে না আসে; এবং ভালোবাসা ব'লে যে কোনো কিছু আছে তার অস্তিত্বও সে যেনো ভুলে যায়। তাঁর মতে—পৃথিবীতে ভালোবাসা ব'লে কিছু নেই। এমন কি তরুণ যদি কখনো তাঁর প্রতি ভক্তি বা ভালোবাসা দেখাতো তো তিনি তা'কে যৎপরোনাস্তি বক্‌তেন। তাঁর সঙ্গে তরুণকে ঠিক পরের মতো ব্যবহার কর্‌তে হ'তো। যেটুকু শুধু কর্ত্তব্যের খাতিরে করা দরকার, তা'র বেশী কিছু কর্‌তে দেখলেই হরিশবাবু চ'টে যেতেন।

তরুণ এই সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে মানুষ হ'লেও, তা'র ভিতর একটা স্বাতন্ত্র্য ছিলো। তারই জন্ম সে সব সময় বাপের যুক্তি ঠিক ব'লে মেনে নিতে পার্‌তো না। স্বল্পভাষী হ'লেও সময় সময় তর্ক লাগিয়ে দিতো; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা'কেই বাধ্য হয়ে হার মান্‌তে হ'তো।

কোথায় যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনা অন্তর্নিহিত আছে—এ হরিশ বাবুর ব্যবহারে বেশ বোঝা যেতো। কিন্তু তিনি এরূপ সংযত ভাবে চল্‌তেন যে, অন্যের কথা দূরে থাক, নিজের ছেলেকে পর্য্যন্ত জান্‌তে দেননি যে, সে বেদনা কোথায়। তিনি সংসারে দুটি জিনিস পছন্দ কর্‌তেন না,—ভালোবাসা এবং স্ত্রীলোক। এই দু'টির যে কোনো মূল্য আছে এ তিনি মান্‌তেন না। বরং এ বিষয়ে কোনো

কথা হ'লে তিনি এতো চ'টে যেতেন যে, সকলে বিস্মিত না হ'য়ে থাকতে পারতো না।

কেবল একমাত্র তরুণ বুঝতো যে, হরিশ বাবুর হৃদয়ের ভালোবাসা কতো গভীর। আর কেউ তা' বুঝতে পারতো না। সময় সময় সেই গুপ্ত ভালোবাসা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতো,—হরিশবাবু চেষ্টা ক'রেও তা লুকোতে পারতেন না, তরুণের কাছে ধ'রা প'ড়ে যেতেন। তরুণ সেই সময় যদি সেই ভালোবাসার কথা উত্থাপন ক'রে বলতো যে, তাঁর প্রাণে ভালোবাসা যথেষ্টই আছে, কেবল তিনি নিজেকে সেই ভালোবাসার বিরুদ্ধে জোর ক'রে বঞ্চনা ক'রে, পরকে যতখানি ঠকাবেন ভাবছেন, তা'র ঢের বেশী নিজেকে ঠকাচ্ছেন—তবে তরুণের এই কথায় তিনি তা'কে শুধু মারতে বাকি রাখতেন। দোষ ধরা পড়লে তা'কে চাপতে যাওয়াই মানুষের স্বভাব। কিন্তু তা'তে নিজের ত্রুটি অন্যের কাছে আরো পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। হরিশবাবুও যতো চাপতে যেতেন, ততই নিজেকে খুলে ফেলতেন।

হরিশবাবু জোর ক'রে দেখাতে চাইতেন যে, ছেলের এবং বাপের উভয়েরই উভয়ের প্রতি কর্ত্তব্যটুকু ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। যা কিছু করতে হ'বে—কর্ত্তব্যের খাতিরে। এই কর্ত্তব্যও যে ভালোবাসার একটা অংশ, এও তিনি স্বীকার করতেন না।

বয়স তাঁর বেশ-ই হ'য়েছিলো। তবে নিজেকে জোর ক'রে খাড়া ক'রে রাখতেন। কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যেতো যে, ভিতর ফোঁপরা হ'য়ে গেছে। শুধু বাইরের কাঠামোখানা কোনো রকমে খাড়া হ'য়ে আছে। সামান্য আঘাতেই কোন্ দিন ঝ'রে প'ড়ে যাবে।

* * * *

বেলা শেষের পড়ন্ত লাল রোদ ভুবন-ডাঙার ঢেউ-খেলানো মাঠের উপর ছড়িয়ে পড়েছিলো। কবেকার-জমা বৃষ্টির জলের চুইয়ে-পড়া ঝরণা-ধারার ক্ষীণ স্রোত ব'য়ে চলেছে—একটি ছোট্ট আঁকা বাঁকা বালি-ভরা নদীর বুকের উপর দিয়ে।

ঝরণার জল উঁচু থেকে চুঁইয়ে প'ড়ে নীচে এক জায়গায় জমে আছে। সেখানে অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট মাছ অপূর্ব্ব লীলা-ভঙ্গীতে খেলা করছে।

সেইখানে ব'সে একটি মেয়ে একমনে মাছের খেলা দেখছে। কখনো জল ছিটিয়ে তাদের তাড়া দিচ্ছে। হঠাৎ সেই জলের উপর এক অপরিচিত মুখের ছায়া পড়লো। মেয়েটি চমকে মুখ তুলে চেয়ে মুখ ব্রীড়ানত করলে।

যে এসেছিলো সে তরুণ। আপন মনে বেড়াতে বেড়াতে এইখানে এসে পড়েছে। মেয়েটিকে দেখে ফিরে যাবে কি এগুবে ভাবতে ভাবতে এগিয়েই এসেছে। একটু আশ্চর্য্যও হ'লো তা'কে একলা দেখে। যৌবন-ধর্ম্মের পরিচয় নেবার ইচ্ছা তা'কে খোঁচা দিতে লাগলো, কিন্তু লজ্জা বাধা দিলে। সে ফিরে যাবে যাবে করছে এমন সময় পিছন থেকে কে ব'লে উঠলো—কে তরুণ না কি? তোমায় এক-ঘরে বাবা তোমায় একলা ছেড়ে দিলে যে?

তরুণ মুখ ফিরিয়ে দেখলে ডাক্তারবাবু। ডাক্তারবাবুর প্রশ্নের কোনো উত্তর সে দিতে পারলে না।

ডাক্তারবাবু বললেন—এটি আমার মেয়ে, কণিকা। তুমি চেনো না নিশ্চয়। তোমার বাবা তো তোমায় গণ্ডী দিয়ে ঘিরে রেখেছে। চল, একটু বেড়ানো যাক্।

তিনজনে বেড়াতে বেড়াতে কথাবার্ত্তা বেশ জমে উঠলো। কণিকা ও তরুণ ডাক্তার বাবুকে মাঝে রেখে আলাপ জমিয়ে তুললে।

সেই দিন থেকে তরুণ আর কণিকার ভাব জমে উঠলো—অবশ্য হরিশবাবুর আড়ালে। দু'জন দু'জনকে সঙ্গী পেয়ে নিঃসঙ্গ জীবনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কণিকা এক এক দিন জিদ্ ধরতো—তরুণের বাড়ী দেখতে যাবে। তরুণ ভারী মুস্কিলে প'ড়ে যেতো। নানা অছিলায় কণিকাকে ভুলিয়ে রাখতো।

বিকেল বেলার ক্লান্ত রোদ যখন ভুবন-ডাঙার পলাশ-বনে রক্ত-রাঙা পলাশ-ফুলের উপর প'ড়ে সমস্ত বনে রঙের আগুন ধরিয়ে দিতো, তখন তরুণ আর কণিকা সেখানে বেড়াতে যেতো।

এমনি ক'রেই হরিশবাবুকে লুকিয়ে তাদের মেলামেশা চললো। তরুণ কিন্তু সদা সশঙ্কিত থাকতো—পাছে হরিশ-বাবু জানতে পারেন। জানতে পারলে তরুণের নির্য্যাতন তো আছেই, উপরন্তু হয়তো কণিকাকেও তা'র ফল ভোগ করতে হবে। তরুণ বেড়াতে বেড়াতে কিছু একটু শব্দ শুনলেই উচ্চকিত হ'য়ে ওঠে,—ভ্রম হয়, বুঝি তা'র বাপের

পায়ের শব্দ। কণিকা তরুণের এই ভাব দেখে উচ্চ হাস্তে তা'কে আরো ব্যস্ত ক'রে তুল্তো। কণিকা এর কারণ জিজ্ঞাসা কর্লে, তরুণ শুধু ব্যথা-ভরা ম্লান দৃষ্টি মেলে কণিকার দিকে চাইতো। কণিকার হাসিও ম্লান হ'য়ে যেতো—প্রশ্নের জবাব শোন্বার স্পৃহা মন থেকে চ'লে যেতো।

তরুণের এক একদিন মনে হ'তো যে, কণিকাকে সব কথা খুলে বলে। কিন্তু বাপের এই খাম্খেয়ালী মতের কথা তা'র কাছে প্রকাশ কর্তে কেমন লজ্জা বোধ কর্তো। কাজেই কণিকার কাছেও সব ঘটনাই অপ্রকাশ থেকে গিয়েছিলো।

তরুণ আর কণিকা তাদের প্রথম মিলন-স্থানের ঝর্ণা-ধারার জমা জলে মাছের খেলা দেখ্ছিলো। দু'জনেই তন্ময় হ'য়ে দেখ্ছে, এমনি সময় হঠাৎ তাদের চমক ভাঙলো,—জলের উপর কার ছায়া পড়্লো। কণিকা একটু আশ্চর্য্য হ'য়ে আগন্তুক ব্যক্তির দিকে চাইলে। তরুণ কিন্তু যেমন ঘাড় গুঁজে ব'সে ছিলো তেমনি ব'সে রইলো। মনে হ'লো সে যেনো জলের ভিতর মাথা লুকোতে চায়। সে নিস্পন্দ হ'য়ে ব'সে রইলো।

জলে যাঁর ছায়া পড়েছিলো তিনি হরিশবাবু! বেড়াতে বেড়াতে এদিকে এসেছিলেন। তরুণের ব্যাপার দেখে তিনি স্তম্ভিত ও বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। প্রথম কিছুক্ষণ রাগে ও বিস্ময়ে মুখ দিয়ে কথা বের কর্তে পার্লেন না। তাঁর ছেলের যে এতদূর স্পর্দ্ধা হবে, সে বিশ্বাসঘাতকতা কর্বে—এ তাঁর ধারণাতীত। নিজেকে সাম্লে নিয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে বল্লেন—তরুণ, উঠে এসো।

তরুণ এ আদেশ উপেক্ষা কর্তে না পেরে আস্তে আস্তে উঠে এলো।

হরিশবাবু কণিকার দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে তরুণকে বল্লেন—আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর, আর কোনো দিনও এর সঙ্গে দেখা কর্বে না এবং সর্ব্বতোভাবে ভুলে যাবে যে, এর সঙ্গে কোনো দিন তোমার পরিচয় ছিলো।

পাছে রাগের মাথায় হরিশবাবু আর কিছু অপ্রিয় কথা ব'লে ফেলেন এই আশঙ্কায়,—এবং কণিকাকে এই সমস্ত লজ্জাকর ঘটনার হাত হ'তে বাঁচাবার জন্তেও, তা'কে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতিজ্ঞা কর্তে হ'লো।

হরিশবাবু আদেশের স্বরে বল্লেন—এস, আমার সঙ্গে চ'লে এসো।

হরিশবাবু ও তরুণ চ'লে গেলে কণিকা ব্যাপার কিছু বুঝ্তে না পেরে অবুঝ-বিস্ময়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হ'য়ে ব'সে রইলো। এত চট্ ক'রে সমস্ত ঘটনা হ'য়ে গেলো যে, সে ঠিক তলিয়ে বুঝ্তে পার্লে না ব্যাপার কি।

* *
*

বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়্ছিলো। কালো মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎ-রক্ত ঝল্কে উঠ্ছিলো। মেঘ দারুণ অন্তর্বেদনায় গুম্‌রে উঠ্ছিলো। সমস্ত রাত্রি একটা গভীর দুঃখের দীর্ঘশ্বাসের মতো হ'য়েছিলো।

হরিশবাবু শুয়েছিলেন। ক'দিন থেকে তাঁর কর্মঠ শরীর ভেঙে পড়েছে,—তাঁকে শয্যাশায়ী ক'রে দিয়েছে। যে শরীরকে মনের জোরে এতদিন সোজা ক'রে রেখে-ছিলেন, আজ তাই একেবারে অকর্মণ্য হ'য়ে পড়েছে। তাঁর বুকের অজানা গোপন ব্যথার মতোই ক্ষয়রোগ তাঁর বুকে লুকিয়ে ছিলো। আজ সে হরিশবাবুর সঙ্গে বোঝা-পড়া কর্তে চায়। হরিশবাবুর বুকের সমস্ত ব্যথা আজ জমাট রক্ত হ'য়ে ঝ'রে পড়্ছে। তিনি মৃত্যু দিয়ে সকল ব্যথা জয় কর্তে চলেছেন ব'লে মুখের উপরকার ম্লান হাসি তখনো মিলিয়ে যায়নি।

হরিশবাবুর এক পাশে তরুণ আর এক পাশে কণিকা। আজ তিনি নিজে কণিকাকে ডেকে এনে কাছে বসিয়েছেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে দেখ্তে এসেছিলেন—তাঁকে তিনি জোর ক'রে বিদায় দিয়েছেন।

কণিকা ও তরুণ দু'জনেই উদ্বিগ্ন ও বিস্মিত হ'য়ে চুপ ক'রে ব'সে আছে। হরিশবাবু চোখ বুজে শুয়ে আছেন। কিছুক্ষণ পরে জোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তরুণ ও কণিকার হাত দুটো নিজের বুকের উপর চেপে ধর্লেন। খানিক চুপ ক'রে থেকে বল্লেন—তোরা আমার আজকের ব্যবহার দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছিস—না? কিন্তু আজ তোদের আরো আশ্চর্য্য হ'তে হবে।—ব'লে চুপ কর্লেন।

তরুণ ও কণিকা বিস্মিত ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলো।

হরিশবাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন—তা'র সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিলো খুব ছোটবেলায়। দু'জনের মধ্যে বনিবনাও মন্দ হয় নি। তা'র গুণ অনেক ছিলো। কিন্তু দোষের মধ্যে সে একটু একরোখা ছিলো। নিজে যা জিদ্ ধর্‌তো তাই কর্‌তো। কিছুতেই তা থেকে তাকে টলাতে পারা যেতো না। সেই জন্যে সময় সময় তা'র সঙ্গে আমার ঝগ্‌ড়া হ'তো। কিন্তু ঝগ্‌ড়া বেশী দিন স্থায়ী হতো না। মোটের উপর এক রকম সুখেই দিন কাট্‌ছিলো। কিন্তু সুখ বেশী দিন সইলো না।

এই পর্য্যন্ত ব'লেই হরিশবাবু আবার চুপ কর্‌লেন। একটু দম্ নিয়ে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন—তখন তুই সবে মাত্র বছর দুয়ের। সেই সময়ই সে আমার সামান্য অপরাধের জন্য আমার জীবনকে ভেঙে চুরে দিয়ে চ'লে গেলো।

হঠাৎ আমি কুসঙ্গে প'ড়ে নেশাখোর চরিত্র-হীন হ'য়ে পড়্‌লাম। সে যথেষ্ট তিরস্কার কর্‌তো, অনুযোগ কর্‌তো, কিন্তু কিছুতেই আমায় শোধরাতে পার্‌লে না। আমাকে সে ক্রমাগত চরিত্র-হীন ব'লে তিরস্কার কর্‌তো, আমি তা'তে ভয়ানক রেগে যেতাম। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে চরিত্রহীন নেশাখোর তা'কে চরিত্র-হীন বল্‌লে সে কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পারে না। আমিও সহ্য কর্‌তে না পেরে তা'কে যা তা' ব'লে গাল দিলাম। এমন কি তা'র সতী-ধর্ম্মের প্রতিও ব্যঙ্গ কর্‌তে ছাড়্‌লাম না। শুধু তা'তেই ক্ষান্ত হ'লাম না। শেষে যৎপরোনাস্তি প্রহার ক'রে অন্ধকার রাত্রে বাড়ীর বাইরে বের ক'রে দিয়ে দোরে খিল লাগিয়ে দিলাম। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়্‌ছিলো। আমি একবারও ভেবে দেখ্‌লাম না যে, তা'র অবস্থা কি হ'লো বা হবে। লোকে বৃষ্টির রাতে একটা কুকুর বেড়ালকে বাড়ী থেকে তাড়ায় না, আমি কিন্তু তা'কে অম্লান বদনে তাড়িয়ে দিলাম। তখন আমার মনের অবস্থা এতো নৃশংস।

যখন নেশা ছুট্‌লো, তখন তা'র আর সন্ধান পেলাম না, —সে নিরুদ্দেশ। কত লোক কত কথা বল্‌লে, কিছুই বিশ্বাস কর্‌লাম না। আমি তো জানি সে কি ছিলো। তা'র দ্বারা এ কাজ কখনই সম্ভব নয়। নেশাখোর হ'লেও তা'কে আমি ভালো ক'রেই চিন্‌তাম। অভিমান হ'লো। এমনি ক'রেই কি আমায় শাস্তি দিতে হয়। আমায় না হয় ফেলে গেলো, কিন্তু তোকে সে ছাড়্‌লে কি ক'রে। তুই তো তা'র প্রাণ ছিলি। তোকে বুকে ক'রে তা'কে খুঁজতে বের হলাম। অনেক দিন পরে তা'র খোঁজ পেলাম। সে তখন মৃত্যু-শয্যায়। আমার পা ছুঁয়ে সে সব বল্‌লে,—মুহূর্ত্তের ভুলে সে নিজের ও আমার জীবন অভিশপ্ত করেছে। ঘর ছেড়ে এসেই সে বুঝতে পেরেছিলো, কি অন্যায় সে করেছে। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে অশেষ চেষ্টা করেছে,—অনেক প্রলোভন দূর করেছে, এবং তা'র ফলে নিজের জীবনকে ধ্বংস কর্‌তে বসেছে। ক্ষণিক দৌর্ব্বল্য-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ছে। তা'র প্রতি কথাই যে সত্য এ আমি মেনেছিলাম। তা'র দ্বারা যে কোনো অসৎ কাজ সম্ভবে না। মৃত্যুর মতোই সে চির সত্য। আজ তাই মৃত্যুকে বরণ ক'রে সে সত্যজয়ী হ'তে চলেছে। আমি তা'কে ঘরে ফিরে নিয়ে যেতে চাইলাম, সে রাজী হ'লো না। আমার কাঁধের উপর লোকাচারের মিথ্যা পাপের বোঝা চাপাতে সে চায় না। তার পর এক দিন নিঃশেষে সমস্ত পাপের জের মিটিয়ে, তা'র নিজের এবং আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজে শেষ ক'রে, সমস্ত পাপ-পুণ্যের বাইরে চ'লে গেলো।

তরুণের আর কণিকার হাত দুটো নিজের বুকের উপর চেপে ধ'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন—সেইদিন থেকে আমি এই মেয়েদের বড়ো ভয় করি, বড়ো শ্রদ্ধা করি। তা'রা এতো ভাবপ্রবণ, তাদের ভালোবাসা সহজে এতো গভীর হয় যে, তা'রা সেই সবের জন্যে সব সময় নিজেকে ঠিক রাখ্‌তে পারে না। আবার তা'রা ক্ষণভঙ্গুর। একটু আঘাতেই কাচের পেয়ালার মতো ভেঙে পড়ে, তখন আর যোড়া দেওয়া চলে না। সেই জন্যেই ওদের সঙ্গে খুব সাবধানে সকল দিক বাঁচিয়ে চল্‌তে হয়। ওদের মহিমা অনন্ত, সেই জন্যেই তো ওদের বলি—শক্তি। ওরা আমাদের শাস্তি দিতেও পারে, আত্মার রক্ষা কর্‌তেও পারে। এই জন্যেই এত দিন আমি ওদের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে কঠোরতার আবরণ দিয়ে দূরে রেখেছিলাম। কিন্তু থাক্‌বার উপায় কি। ওরা মায়াবী। এক মুহূর্ত্তে বশ ক'রে ফেলে। আমাকেও শেষে বশ ক'রে ফেল্‌লে।

ব'লে কম্পিত হাত কণিকার মাথায় দিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌লো। পরে তরুণকে বল্‌লেন—এদের শ্রদ্ধা করিস, ভুলেও কখনো অবহেলা করিস্‌নে।

এদের মূল্য সহজে দেওয়া যায় না। আর তু'জনে সত্যকে কখনো ছেড়ো না,. এই আশীর্ব্বাদ ছাড়া আমি আর কোনো আশীর্ব্বাদ জানিনে। কারণ সে আমায় এই কথাই শিখিয়ে গেছে।

তরুণ ও কণিকা বিস্ময়-আনন্দ-পূত হৃদয়ে মাথা নত করলে।

হরিশবাবু আরো কি বল্‌'তে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পারলেন না। ঠোঁট্ একবার কেঁপে স্থির হ'য়ে গেলো।

পুস্তক-পরিচয়

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ।—(দ্বিতীয় খণ্ড) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের রচিত। মূল্য বার আনা। রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর সর্ব্বজন-পরিচিত, আচার্য্য-স্থানীয় সাহিত্য-রথী। তিনি বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রে যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার কয়েকটী 'ক্ষুদ্র ও বৃহতের' প্রথম খণ্ডে ছাপাইয়াছিলেন; একণে আরও আটটী প্রবন্ধ একত্র করিয়া এই দ্বিতীয় খণ্ড ছাপাইয়াছেন। ইহাতে রাণী বিশেশ্বরী, দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা জন্ম ও মৃত্যু, ইতিহাসের ক্রম, স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ, বর্ম-পথ, আমাদের দৃষ্টি-শক্তি ও ১৩০৪ সালের ভূমিকম্প, এই আটটী প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ কয়টীর নাম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, আচার্য্য রায় মহাশয়ের প্রতিভা কেমন সর্ব্বতোমুখী। প্রকৃত পক্ষেই, বিভিন্ন বিষয়ে এমন গবেষণাপূর্ণ সুচিন্তিত প্রস্তাব অতি কম সাহিত্যিকই লিখিতে পারেন। এই সংগ্রহ-পুস্তকখানির বিশেষভাবে পরিচয় দিতে গেলে অল্প কথায় বলা যায় না। যাঁহারা চিন্তাশীল পাঠক, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া যে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

বঙ্গ-পল্লী।—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত; মূল্য আড়াই টাকা। শ্রীমতী প্রভাবতী দেবীর এই উপন্যাসখানি একটু নূতন ধরণের; ইহাতে উপন্যাসের মাল মসলা সবই আছে, কিন্তু এখানির প্রধান উদ্দেশ্য —আমাদের দেশ যে ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে, তাহারই বিবরণ প্রদান। শুধু তাহাই নহে, এই ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, উপন্যাসের মধ্যে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। ম্যালেরিয়া নিবারণ সম্বন্ধে পুস্তক-পুস্তিকা বিতরিত হইতেছে, ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হইতেছে; তাহাতে বিশেষ সুফলও হইতেছে। সরস্বতী মহোদয়া উপন্যাসের ভিতর দিয়া এই সদুদ্দেশ্য প্রচার করিতেছেন। আমরা তাঁহার এই প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিতেছি। তাঁহার লেখার আর কি পরিচয় দিব? বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা গল্প-সাহিত্যের পাঠক, তাঁহারা সরস্বতী মহোদয়ার সুন্দর লেখার সহিত বিশেষ পরিচিত। বর্ত্তমান গ্রন্থেও সে পরিচয় পাইবেন। আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

নিরঞ্জন।—শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এই উপন্যাসের যিনি নায়ক, তাঁহারই নামে উপন্যাসের নামকরণ হইয়াছে। গ্রন্থকার উপন্যাস লেখায় নূতন ব্রতী; সুতরাং প্রথম লেখকের পক্ষে যে সকল ত্রুটী অপরিহার্য্য, ইহাতেও তাহা আছে। তবুও এই নবীন গ্রন্থকারের উপন্যাসের আখ্যানভাগ ভাল, রচনা স্থানে স্থানে অতি বিস্তৃত হইলেও অসঙ্গত হয় নাই। নিরঞ্জনের চরিত্র-চিত্রণেও গ্রন্থকার যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

মনের পরশ।—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত, মূল্য তিন টাকা। 'মনের পরশে'র প্রথম দুই ভাগ অর্থাৎ কেম্ব্রিজ ও লণ্ডন ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশিষ্ট অংশ অর্থাৎ প্যারিস, বার্লিন, রোম, ভেনিস প্রভৃতি নূতন লিখিত হইয়াছে। পল্লব নামে একটী যুবক মামুলী শিক্ষালাভের জন্য বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার পিতা সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি পুত্রের স্বাধীন ইচ্ছায় কখনও বাধা দেন নাই। তবুও তাঁর ইচ্ছা ছিল ছেলেটী ব্যারিষ্টার বা ঐ রকম কিছু হইয়া আসে। কিন্তু, পল্লব সে সকল পথে না যাইয়া সঙ্গীত-শাস্ত্র শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। এই উপলক্ষে তাহাকে কেম্ব্রিজ, লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, রোম, ভেনিস প্রভৃতি স্থানে যে সকল পুরুষ-রমণীর সহিত মিশিতে হইয়াছিল, চিরাগত পথ পরিত্যাগ করিয়া সঙ্গীত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য তাহাকে যে সমস্ত চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, তাহার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছিল, সে সমস্তই এই বইখানিতে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। নবীন যুবকেরা বিলাতে যাইয়া যে সকল প্রলোভনের সম্মুখীন হয়, তাহারও দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে আছে। বইখানি পড়িতে উপন্যাসের মত লাগে, অথচ ইহা উপন্যাস নহে এবং, ঠিক জীবন-চরিতও নহে; ইহাতে উপন্যাস ও জীবন-চরিতের সমস্ত উপাদানই আছে। বইখানি আমাদের কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছে, আর সকলেরও নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে।

দ্বন্দ্বে মাতরম্।—শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত, মূল্য ছয় আনা। নাম দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, রসরাজ বসু মহাশয় বাঙ্গালা দেশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সদস্য নির্ব্বাচনের তুমুল দ্বন্দ্ব হইতে সর্ব্ব-

প্রবন্ধে দূরে থাকিয়া দর্শকভাবে এই রঙ্গ উপভোগ করিয়াছেন। সত্য বলিতে কি, এই হাস্যোৎসবের নামকরণে তিনি যে বাহাদুরী দেখাইয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা দেশে আর কোন রথীই পারেন না। তাহার পর, তাঁহার দ্বিতীয় বাহাদুরী এই যে, বিগত ইলেক্‌সনের দলের যাঁহারা নায়ক অর্থাৎ সদস্য-পদপ্রার্থী, তাঁহাদের কাহাকেও রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করান নাই, মাতন দেখাইয়াছেন যোগাড়েদের, সাধু-ভাষায় যাহাকে ক্যানভাসার বলে, আর মাতানাবুদ দেখাইয়াছেন গরিব ভোটারদের। বাঙ্গালা দেশে এমন রহস্য-চিত্রাঙ্কনে রসরাজ বসু মহাশয় একমেবাদ্বিতীয়ম্; তাঁহার রহস্যের মধ্যে হাস্যরস আছে, কিন্তু ঈর্ষা নাই; রসিকতা যথেষ্ট আছে, কিন্তু ইতরামী নাই। এমন পাকা হাতের তৈরী 'বন্দে মাতনম্' সকলের হাতে হাতে দেখিতে চাই, ইহার কথা সকলের মুখে মুখে শুনিতে চাই।

ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা।—শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। শ্রীমান্ দিলীপকুমার ইয়োরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া এতদিন ভারতবর্ষের নানা সহরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাহারই বিবরণ এই 'দিন-পঞ্জিকা'য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পঞ্জিকার অনেকগুলিই ইতঃপূর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকায় কোন স্থানেরই বিশেষ বিবরণ নাই; দিলীপকুমার সে উদ্দেশ্যেও ভ্রমণ করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, ভারতবর্ষের যে সকল স্থানে বড় বড় ওস্তাদ গায়িয়ে আছেন, তাঁহাদের সাহচর্য্য লাভ করা, তাঁহাদের গান শোনা এবং তাঁহাদের নিকট হইতে যেটুকু দরকার আদায় করা; সুতরাং এই পঞ্জিকায় ভারতবর্ষের নানা নগরে যে সকল প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-নায়ক আছেন, তাঁহাদেরই কলা-কৌশলের কথা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাহা হইলেও, এই পঞ্জিকায় ভ্রমণ-বৃত্তান্তেরও অভাব নাই। দিলীপকুমার তাঁহার স্বাভাবিক সুন্দর ভাষায় ও ছাঁদে এই পঞ্জিকা এমন ভাবে লিখিয়াছেন যে, ইহা উপন্যাসের মতই চিত্তাকর্ষক।

মাসফল।—শ্রীযুক্ত জ্যোতি বাচস্পতি প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এই পুস্তকে কোন্ মাসে জন্ম হইলে জাতকের মতিগতি, আকৃতি, স্বাস্থ্য, ভাগ্য, আয়ু, উন্নতি কিরূপ হয়, তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকে বর্ণিত ফলগুলি বাস্তবের সহিত এতটা মিলে যে চমৎকৃত হইতে হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আদৌ ছিল না; গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়া বঙ্গভাষায় একদিককার একটি বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। পুস্তকখানিতে গ্রন্থকারের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকিলেও, ইহা এরূপ সরল ও মধুর ভাষায় লিখিত যে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বোধগম্য ও অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের গবেষণা ও জ্যোতিষিক অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সেইজন্য ফলগুলি বাস্তবের সহিত এত অধিক মিলে। আমাদের বহু বন্ধু বান্ধব এই পুস্তক পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছেন ও মুক্তকণ্ঠে ইহার যশ কীর্ত্তন করিয়াছেন। সত্যসন্ধ ও চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই যে এই পুস্তকের আদর করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শকুন্তলায় নাট্যকলা।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য এক টাকা। প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এতদিন পরে একখানি লিখিবার মত পুস্তক লিখিয়াছেন। এত দিন তিনি কবিতা ও গল্পই লিখিয়াছিলেন; মধ্যে একবার সেক্‌সপীয়রের 'ওথেলো' নাটকের অতি সুন্দর অনুবাদ লিখিয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার কথা এতকাল প্রকাশিত হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে নাট্য-সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যয়ন ও গবেষণা দেবেন্দ্র বাবুর মত আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের জানা নাই। এতদিন পরে এই শকুন্তলায় নাট্যকলা গ্রন্থে তিনি তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের আংশিক পরিচয় দিয়াছেন। এখানি শুধু শকুন্তলা নাটকের কলা-পরিচয়ই নহে, হিন্দু-নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসও বটে। এই বৃদ্ধ বয়সে দেবেন্দ্র বাবু যে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এমন পুস্তকের পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের, বিশেষতঃ নাট্য-সাহিত্যের অনুরাগী, তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি পড়িতেই হইবে।

উলা বা বীরনগর।—শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। উলা বা বীরনগর নদীয়া জেলার একটী প্রধান গ্রাম। বহু দিন পূর্ব্বে এই গ্রামখানি মহামারীতে একেবারে শ্মশান হইয়া গিয়াছিল। গ্রামের লোকে যাহারা পারিয়াছিল, পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইয়াছিল; যাহারা তাহা পারে নাই, তাহারা ঘরে পড়িয়া মরিয়াছিল। এতকাল পরেও বীরনগর সে মহামারীর প্রকোপ সামলাইতে পারে নাই। এই পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত সুজন বাবু উলার সুপ্রসিদ্ধ মুস্তৌফী বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বহু আয়াস স্বীকার করিয়া তাঁহার জন্মভূমির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া এই সুন্দর পুস্তকখানি ছাপাইয়াছেন। যাঁহারা ভবিষ্যতে বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস লিখিবেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের বিশেষ কাজে লাগিবে। সুজন বাবুর বর্ণনাগুণে পুস্তকখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি ছবিও দেওয়া হইয়াছে।

বিদ্যালয় বিধায়ক বিবিধ বিধান।—রায় বাহাদুর শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। রায় বাহাদুর অঘোর-নাথ পদবাতেও অধিকারী, বিদ্যালয় বিধায়ক বিধান লিখিবারও সম্পূর্ণ অধিকারী। এই বইখানি শিক্ষকগণের নিকট দিন-পঞ্জিকার মত মূল্যবান হওয়া উচিত। শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ পবিত্র ব্রত কেমন করিয়া উদ্‌যাপন করিতে হয়, বহুদর্শী শিক্ষক অধিকারী মহাশয় তাহা বিশদ ভাবে এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা পুস্তকখানির আদ্যন্ত পাঠ করিয়া কোথাও কিছু অধিক বলিবার সুযোগ পাইলাম না, বইখানি এমনই সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ।

দার্জ্জিলিং-এর পার্ব্বত্য জাতি।—শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার বি-এ প্রণীত, মূল্য পাঁচ সিকা। এই পুস্তকখানিতে নেপালী, পাহাড়িয়া, লেপচা, তিব্বতীয় ও ভূটিয়া জাতির অত্যাশ্চর্য্য সামাজিক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থকারের অধ্যবসায় প্রশংসনীয় তিনি অনেক অনুসন্ধান করিয়া উপরিউক্ত পার্ব্বত্য জাতিদিগের রীতি নীতি আচার ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই উদ্যমের প্রশংসা করিতেছি। পুস্তকখানির রচনাও বেশ মনোরম হইয়াছে।

বংশ-পরিচয় (চতুর্থ খণ্ড)।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার সঙ্কলিত, মূল্য ৫৲ টাকা। এই চতুর্থ খণ্ড বংশ-পরিচয়ে শ্রীযুক্ত কুমার মহাশয় কলিকাতার ঠাকুর বংশ, বলিহার রাজবংশ, টাকীর মুন্সী বংশ প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা বংশের পরিচয় দিয়াছেন। এই বংশ-পরিচয় সংগ্রহ করিয়া শ্রীযুক্ত কুমার মহাশয় বাঙ্গালার বিস্তৃত ইতিহাস লেখার যথেষ্ট উপকরণ গোছাইয়া রাখিলেন।

আলোর আঁধার।—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মজুমদার প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। উপন্যাসের আখ্যান ভাগ অতি সুন্দর, চরিত্র-চিত্রণও মনোরম। রমার চরিত্র অঙ্কনে লেখক মহাশয় বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আজকাল প্রতিদিন যে সকল উপন্যাস ছাপা হইতেছে, 'আলোর-আঁধার' সে শ্রেণীর নহে ; ইহাতে গ্রন্থকারের বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাগজ ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদপট সবই সুন্দর।

নারী।—শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত, মূল্য দেড় টাকা। এখানি কবিতা পুস্তক, ইহা বলিলেই এই 'নারী'র পরিচয় দেওয়া হয় না ;—ইহা অতি মনোরম কয়েকটী কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি পরস্পর এমন সংসৃষ্ট যে ইহাকে একটী মূল কবিতার ধারা বলিলেই ঠিক পরিচয় দেওয়া হয়। লেখকের দুই একটী কবিতা পূর্ব্বে সাময়িক পত্রে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইতে লেখকের কবিত্ব-শক্তির সম্যক্ পরিচয় পাই নাই। এক্ষণে এই 'নারী' পাঠ করিয়া আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালার কাব্য-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। বইখানির কাগজ ছাপা ও বাঁধাই অতি সুন্দর।

বঙ্গদেশে বর্ত্তমান শিক্ষা-বিস্তার।—শ্রীগোপালচন্দ্র সরকার বি-এ প্রণীত, মূল্য ২৷৵০। স্কুল সমূহের অবসর-প্রাপ্ত ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় শিক্ষা-বিভাগে সুদীর্ঘকাল কার্য্য করিয়া বঙ্গদেশের বর্ত্তমান শিক্ষা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ; শুধু তাহাই নহে, এই পুস্তকখানিতে বাঙ্গালা দেশে ইংরাজ আমলের পূর্ব্বে কি প্রকার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল এবং তাহার পর হইতে একাল পর্য্যন্ত শিক্ষা-ব্যাপারের পর পর কি ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অনেক পুরাতন তথ্য জানিতে পারিলাম। এখানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

বিলাসিনী।—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য এক টাকা চারি আনা। সুপ্রসিদ্ধ গল্প লেখক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত নয়টী ছোট গল্প এই 'বিলাসিনী'তে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। গল্পগুলি যে প্রভাতবাবুর লেখনীরই উপযুক্ত, তাহা না বলিলেও চলে। কারণ ছোট গল্প লিখিয়া প্রভাতবাবু বাঙ্গালা গল্প-সাহিত্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক তাঁহার গল্প অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া থাকেন। সুতরাং 'বিলাসিনী' তাঁহাদের আগ্রহ পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে, এ কথা সকলেই বলিবেন।

স্মৃতি-রেখা।—শ্রীফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য আড়াই টাকা। অনেক দিন পরে শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র বাবু সাহিত্য-ক্ষেত্রে পুনরায় দেখা দিয়াছেন, এবং যাহা হাতে করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই 'স্মৃতি-রেখা' উপন্যাসখানি তাঁহার ন্যায় সুধী সাহিত্যিকের লেখনীর উপযুক্ত। তিনি বেদের মেয়ে মনুয়ার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা সত্যসত্যই অতি সুন্দর হইয়াছে। উপন্যাসখানির আখ্যান-ভাগের বিশ্লেষণ করিবার স্থান আমাদের নাই, তবে এ কথা বলিতে পারি, কি আখ্যান-ভাগ, কি চরিত্র-চিত্র, কি ভাষা নৈপুণ্য, সকলই পরিপাটী হইয়াছে। এতদিন পরে তিনি যাহা দিয়াছেন, সাহিত্য-রসিকগণ তাহা পরম সমাদরে গ্রহণ করিবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

মাথুর-কথা।—শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত বিরচিত। মূল্য আড়াই টাকা। পুস্তকখানির নাম দেখিলেই মনে হয়, এখানি হয় ত রাধা-কৃষ্ণ লীলা-কাহিনী ; কিন্তু তাহা নহে। এখানি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি মথুরার ইতিহাস। লেখক মহাশয় বেদ-পুরাণ ও চৈনিক ভ্রমণকারীদিগের গ্রন্থ হইতে আদিম কালের, এবং বর্ত্তমান সময়ের ইংরাজ লেখকদিগের গ্রন্থাবলী হইতে একালের মথুরার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্রশংসনীয়। তাঁহার দুই চারিটী কথার সহিত আমাদের মতভেদ থাকিলেও পুস্তকখানি যে সুলিখিত এবং অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে।

বিপ্লবের পথে।—শ্রীনলিনীকিশোর গুহ প্রণীত। দাম পাঁচ সিকা। ভারতবর্ষের সমাজে, ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে আজ বিপ্লব জাগিয়াছে, ভাঙ্গন আরম্ভ হইয়াছে। এ বিপ্লব যে কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহারই চিন্তায় আজ ভাবুকের মনে সোয়াস্তি নাই। বিপ্লব—যাহা কুৎসিত, যাহা বীভৎস তাহাই দূর করিয়া যদি ক্ষান্ত হয়, তবে তাহার মত কল্যাণকর আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু এই ভাঙ্গনের কাজে যদি, যাহা সুন্দর তাহাতেও টান ধরে, তবে তাহাতে জাতির পক্ষে আবার তেমনি বিষময় ফল প্রসব করিবে। এই যুগ-সন্ধিতে ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে বাঙ্গালীর কোথায় কি কর্ত্তব্য আছে, বিপ্লবের পথে গ্রন্থকার তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি অন্ধ নয়, চিন্তা দেশের প্রতি মমত্বে পরিপূর্ণ, কর্ত্তব্যের ইঙ্গিতে দূরদর্শিতার ছাপ সুস্পষ্ট। ভাষা যেমন সরল তেমনি জোরালো। এই দুর্দ্দিনে দেশের কথা ভাবা ও

ভাবিয়া কাজ করা দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমরা এই গ্রন্থখানির সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এগুলির আলোচনা করিলে দেশ-সেবার আদর্শ সম্বন্ধে অনেক ধোঁয়া দূর হইবে। সত্যকার পথের সন্ধানও যে অনেকের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা।—স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত। দাম আড়াই টাকা। গ্রন্থখানি যে জন-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে, ইহার দ্বিতীয় সংস্করণই তাহার প্রমাণ। এক পৃষ্ঠায় মূল সংস্কৃত শ্লোক, অন্য পৃষ্ঠায় পদ্যে তাহার অনুবাদ। অনুবাদ যেমন সহজ তেমনি সুন্দর; অথচ মূলের অর্থ কোথাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহা অনুবাদকের অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক। গ্রন্থের প্রথমে একটি উপক্রমণিকায় গীতার অনেক জটিল জিনিস ঢের সহজ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ যে কতবড় ভাবুক, চিন্তাশীল ও পণ্ডিত লোক ছিলেন, গীতার এই অনুবাদ গ্রন্থ হইতেই তাহা বোঝা যায়। বইখানির ছাপা বাঁধাই ভারি চমৎকার। গীতার এত ভাল সংস্করণ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

ঐন্দ্রজালিক।—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। দাম পাঁচ সিকা। বইখানি ১৫টি ছোট গল্পের পশরা। লেখক ভাষায় ঐন্দ্রজালিক তো বটেনই, ভাবেরও যাদুকর। যে ঘটনায় কোনো বৈচিত্র্য নাই, তাঁহার কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে তাহাও সজীব সুন্দর হইয়া রস-মাধুর্য্যে ভরিয়া উঠিয়াছে। সুরেশ বাবুর ভাষা নিরাভরণা সুন্দরী নহে, বরং বিচিত্রাভরণা রূপসী। স্থানে স্থানে ভূষণ-বাহুল্য যে নাই তাহা বলা যায় না। তবে শিল্পীর হাতের কসরতে অধিকাংশ স্থলেই তাহাও দেহের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছে—বে-মানান হয় নাই। বইখানির বহিরাবরণও ভারি চমৎকার।

বাংলার কৃষকের কথা।—শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত। দাম এক টাকা। বইখানি অসংখ্য জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। এত জ্ঞাতব্য তথ্যের সমাবেশ বাংলার খুব কম পুস্তকেই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার নানা দিক দিয়া বাংলার কৃষকদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহাকে অনেক পড়িতে হইয়াছে; এবং কেবল পড়া নহে—পঠিত জিনিসকে হজম করিয়া নিজের কাজে লাগাইবার উপযোগী করিয়া তুলিতে হইয়াছে। বইখানির প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু পরিশ্রম ও সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বাংলার কৃষকদের অবস্থা ক্রমে ক্রমে কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, ইহা তাহারই ইতিহাস। কিন্তু এমনি বুকের দরদ দিয়া যত্ন করিয়া লেখা যে ইহাকে ইতিহাসের মত নীরস জিনিস বলিয়া মনে হয় না—অতি সহজেই ইহা পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। আজিকার দিনে এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

লড়ায়ের নতুন কায়দা।—শ্রীহারাধন বক্সী প্রণীত। দাম বারো আনা মাত্র। বইখানি বর্ত্তমান যুদ্ধ-পদ্ধতির একখানি চমৎকার নক্সা। গ্রন্থকার গত ইয়োরোপীয় মহাযুদ্ধে স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করিয়াছেন। এত চমৎকার করিয়া লড়ায়ের স্বরূপ বর্ণনা করা তাই তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হয় নাই। ভাষা ভারি সহজ ও অত্যন্ত ঝরঝরে। বলিবার কথাও কোথাও আড়ষ্ট নহে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার গুণে সমস্ত জটিলতাকে ভেদ করিয়া তাহা একটি স্বাভাবিক স্বচ্ছতায় সরস হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান লড়ায়ের কায়দা স্থানে স্থানে এমন ঘোরালো যে মন কাঁপিয়া উঠে, বুক দুলিয়া উঠে। বইখানি বর্ত্তমান যুদ্ধপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক আলোচনা। কিন্তু গ্রন্থকার লিখিবার গুণে ইহাকে উপন্যাসের মত হৃদয়গ্রাহী করিয়া তুলিয়াছেন। যুদ্ধ করা এখনও যাহাদের ধাতস্থ হয় নাই, সেই বাঙ্গালীর পক্ষে বইখানি যে অবশ্য পাঠ্য, এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

ভার উত্তোলন ও শরীর সাধনা।—শ্রীসুধীরকুমার দাস প্রণীত। দাম আড়াই টাকা। কিছুদিন হইতে বাঙ্গালী তাহার স্বাস্থ্যকে অতিমাত্রায় অবহেলা করিয়া চলিয়াছে। তাহার ফলে জাতি হিসাবে সে কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রতি দিন তাহার পরিচয় আমরা পাইতেছি। দেহে যে দুর্ব্বল, বর্ত্তমান জগতে কোথাও তাহার স্থান নাই। জাতির এই দুঃসময়ে শরীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে যত সুলিখিত পুস্তক বাহির হয়, সমাজের পক্ষে ততই কল্যাণকর। এই গ্রন্থখানিতে দেহের বল বাড়াইবার কতকগুলি পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে। ব্যায়ামপদ্ধতির কতকগুলি ছবিও আছে। বইএর ভাষা সহজ সরল, বর্ণনা-ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক, ছাপা কাগজ উৎকৃষ্ট। এ ধরণের গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বে বাংলা ভাষায় আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। বইখানির দ্বারা দেশের তরুণ সমাজের যদি কোনো উপকার হয় তবে আমরা যথার্থ আনন্দিত হইব।

সাহিত্য-সেবক।—শ্রীশিবরতন মিত্র সঙ্কলিত। ইহা জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ৫০০০ মৃত বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবকগণের গ্রন্থপরিচয় ও রচনাদর্শ সহ, বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান। সুদীর্ঘ ভূমিকা ও ৬০টি অতি প্রয়োজনীয় প্রস্তাবসহ পরিশিষ্ট আছে। বঙ্গভাষায় এ জাতীয় পুস্তক এই প্রথম। ৩০ বৎসরের পরিশ্রমে, বহু প্রাচীন পুঁথি হইতে নাম ও বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে। ডিঃ ৫০ পৃঃ আকারে অন্যূন ত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। প্রতি খণ্ডের মূল্য ।০। কেবল মাত্র প্রকাশিত (১—১১) খণ্ডগুলির মূল্য লইয়া গ্রাহক করা হয়।

হাত দেখা

শ্রীজ্যোতিঃ বাচস্পতি

হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলা আমাদের দেশে নতুন কথা নয়; কিন্তু আজ বাংলায় শিক্ষিত সমাজের কাছে তা নতুন করে বলা দরকার হয়েছে। এটা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা ঠিক বলা শক্ত। যে বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং পূর্ণ পরিণতি ভারতবর্ষে, তার সম্বন্ধে ভারতীয় ভাষায় একখানিও ভাল বই নেই। গোপন রাখার ঠেলায় প্রাচীন গ্রন্থগুলি উই এবং কীটের খোরাক জুগিয়েছে বা মাটীর স্তূপে পরিণত হয়েছে। এখনও যা দুই একখানি হাতের লেখা গ্রন্থ আছে, তাও অধিকারীরা সযত্নে এবং সতর্কতার সঙ্গে গুপ্ত রেখেছেন। দু'চার বছর পরে তাও লুপ্ত হবে। এখন বাংলা বা অন্য প্রাদেশিক ভাষায় যে খান-কতক ছাপানো বই বাজারে পাওয়া যায়, তাও সস্তা ইংরাজি বইয়ের ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। হাত দেখা যে একটী বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত—এ সব বই দেখে তা বোঝবার কোন উপায় নেই। আজকাল হাত দেখা সম্বন্ধে যাঁরা কিছু জানতে চান—তাঁদের পাশ্চাত্য দেশের কাছে হাত পাত্‌তে হয়। কেরো, বেন্‌হাম, ম্যালেম প্রভৃতির লেখা বই ছাড়া তাঁদের গতি নেই। অথচ এই বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং চরম উন্নতি এই ভারতেই হ'য়েছে; এবং পাশ্চাত্যের লেখকদের মধ্যে গোড়াতেই যথেষ্ট গলদ বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য লেখকেরা যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন বটে এবং তার জন্য বহু ধন্যবাদ তাঁদের প্রাপ্য, তবুও হাত দেখাকে তাঁরা পুরো বৈজ্ঞানিক আকার দিতে পারেন নি। তাঁদের লেখার মধ্যে যে অনেক ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, তার কারণ সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা। তাঁদের যদি ভারতীয় দর্শন এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকতো, তা হলে তাঁরা অনেক ভুল ভ্রান্তি হতে মুক্ত হতে পারতেন। হাত দেখার যে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, তা আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজ হয় ত স্বীকার করতে চাইবেন না; অথচ এও সত্যি—তাঁরা এ বিষয়ে কোন বিশেষ চিন্তা করেন নি—পরীক্ষা বা গবেষণা ত দূরের কথা। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাব তাঁদের উপর খুব বেশী এবং ইংরাজি সাহিত্যের মধ্যে হাত দেখায় অবিশ্বাস স্পষ্ট প্রকটিত। ইংরাজের পার্লামেন্টের আইন আছে যে "যারা গণকের বা হাত দেখার ব্যবসা করবে তাদের কারাদণ্ড হবে"। এই আইন যে বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করে প্রণীত হয়েছে তা নয়—"এই সব শক্তিগুলো শয়তানের সাহচর্য্যে লাভ হয়" খৃষ্টীয় ধর্ম্মগত এই অন্ধ

কুসংস্কারই আইনটির ভিত্তি। ইংলণ্ডে এই বিজ্ঞানের যুগেও পার্লামেণ্টের ঐ আইন বাহাল আছে—তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে এখনও এমন লোক বিরল নন, যাঁরা মনে করেন, শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বাঁধা না রাখ্‌লে এ সব বিদ্যা কেউ আয়ত্ত করতে পারে না। আইন-প্রণেতাদের যুক্তিও ছিল চমৎকার! যারা শয়তানের কবলে পড়েছে, তাদের শয়তানের কবল থেকে উদ্ধার না ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ করা অথবা পুড়িয়ে মারাই হচ্ছে শ্রেয়। আমেরিকা না কি এখন সভ্য দেশের অগ্রণী। এই আমেরিকাতেই প্রসিদ্ধ হস্তরেখাবিদ্ কাউণ্ট অফ্ হামণ্ডের সঙ্গে দুজন পাদরী এসে দেখা করেন এবং বলেন, তিনি যদি হাত দেখা ছেড়ে দেন তাহ'লে তাঁরা (পাদরীরা) উপাসনা এবং প্রার্থনা দ্বারা তাঁর আত্মাকে শয়তানের গ্রাস থেকে উদ্ধার করবেন। হাত দেখাই তাঁর উপজীবিকা—এই কথা বলাতে, তাঁরা বলেন যে তাঁকে গীর্জ্জার কেরাণীর কাজ দেওয়া হবে—বেতন অবশ্য যৎসামান্য। আমেরিকারই যখন এই দশা—তখন অন্য সব দেশের ব্যাপার সহজেই অনুমেয়।

বর্ত্তমান শিক্ষিত ভারত এই পাশ্চাত্য জাতিগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। সে শিষ্যত্ব আবার কেমন! কালোয়াতের অক্ষম সাকরেদ যেমন ওস্তাদের স্বর-মাধুর্য্য যত না পারুক তাঁর মুদ্রাদোষগুলি হুবহু নকল করে—বর্ত্তমান শিক্ষিত ভারতও তেমনি পাশ্চাত্য জাতির ভিতরকার গুণগুলি ছেড়ে দিয়ে বাইরের চালচলন আর বুলি আওড়াতে শিখেছে। কাজেই পাশ্চাত্য জাতি যখন আইনে জ্যোতিষী অথবা হস্তরেখাবিদ্‌কে জুয়াচোর বলে নির্দ্দেশ করেছে, তখন শিক্ষিত ভারতবাসীও তাই করতে বাধ্য; নইলে সুসভ্য (?) জাতিরা তাদের অসভ্য মনে করবে। শিক্ষিত ভারতবাসীর মনোভাব এই রকম।

তাই আজ শিক্ষিত ভারতবাসীর কাছে প্রমাণ করা দরকার হয়েছে যে, হাত দেখার একটা বিজ্ঞান আছে—তা আন্দাজী যা-তা বলা নয়। হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলায় যথেষ্ট মাথা ঘামানো দরকার এবং তার জন্য উঁচু দরের মানসিকতা ও শিক্ষার দ্বারা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন। পণ্ডিত হিস্পানাস বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দর শাহকে সামুদ্রিক বিষয়ক একখানি গ্রন্থ উপহার দেন। তাতে স্বর্ণাক্ষরে এই কটী কথা ক্ষোদিত ছিল—"It is a study worth the attention of an elevated and enquiring mind."—"এই আলোচনা উন্নত ও অনুসন্ধিৎসু মনের প্রণিধানযোগ্য।" বাস্তবিক এই বিজ্ঞানটী অজ্ঞ ও নিরক্ষর শ্রেণীর হাতে ফেলে না রেখে যদি মনস্বী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এর গবেষণার ভার নেন, তাহলে এর দ্বারা পৃথিবীর যে কত উপকার সাধিত হতে পারে, তা বলা যায় না।

আমরা বিজ্ঞানের বা দর্শনের অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত উপপত্তি নির্ব্বিচারে গলাধঃকরণ করছি—সে সব উপপত্তি হয় ত দুদিন পরে পরিত্যক্ত হচ্চে—কিন্তু তবুও হাত দেখায় বিশ্বাস করে উঠতে পারি না। অথচ, একটু চিন্তা করলেই হাত দেখার স্বপক্ষে সহস্র সঙ্গত যুক্তি পাওয়া যেতে পারে। আসলে "হাত দেখা" ব্যাপারটা কি? হাতের কতকগুলি চিহ্ন দেখে যে সব ব্যাপার জীবনে ঘটে গেছে, যা ঘটচে এবং যা ঘটবে তা নির্দ্দেশ করা। এখন দেখা যাক হাত দেখেই হোক বা অন্য কোন রকমেই এগুলি বলা সম্ভব কি না।

প্রথমে আমরা অতীত ঘটনার কথাই ধরব। একজন লোকের অতীত ঘটনার কতকগুলি কেবল তার চেহারা দেখেই ধরা যেতে পারে। যদি কারো মুখে বসন্তের দাগ থাকে, তা দেখে এ কথা বলা যায় যে, অতীতে তাকে বসন্ত রোগে ভুগতে হয়েছে এবং দাগের প্রকৃতি দেখে রোগের গুরুত্বের পরিমাণ নির্ণয় করাও অসম্ভব হয় না। এই রকম শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব লক্ষ্য করে কত বৎসর পূর্ব্বে জন্ম হয়েছে তাও আন্দাজ করা যেতে পারে। ডাক্তারেরা অনেক সময় একজন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করে তার বয়স সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। একজন ব্যক্তির রক্ত পরীক্ষা করে বলা যেতে পারে কখনও তার উপদংশ ব্যাধি হয়েছিল কি না। এই রকম বহুবিধ উপায়ে একজন লোকের অতীত কতক কতক ঘটনা অনুমান করা সম্ভব।

হাত দেখার প্রথম উপপত্তির ভিত্তি হচ্ছে মনস্তত্ত্বের উপর। একজনের জীবনে যা কিছু অনুভূতি হয়েছে—ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক্, তার ছাপ আমাদের মেরুদণ্ড মস্তিষ্কের মধ্যে থেকে যাবে; এবং উপযুক্ত উত্তেজক কারণ পেলেই সেই সব ছাপ স্মৃতিরূপে আমাদের মনের মধ্যে এসে উপস্থিত হবে। জীবনের অধিকাংশ অনুভূতিই আমাদের সজাগ মনের (conscious mind) গণ্ডীর বাহির সুপ্ত মনের (subconscious mind) মধ্যে শীতকালের

সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে—কতকগুলা খুব বড় এবং তীব্র অনুভূতিই সজাগ মনের মধ্যে বরাবর নিজেদের জাগিয়ে রাখ্‌তে পেরেছে। এই অনুভূতিগুলিকেই আমরা নিজেদের পূর্ণ মন বলে ভাবি; এবং মনে করি,আমরা আমাদের নিজেদের মনের রহস্য সব বুঝেছি। অধিকাংশ স্থলেই যে আমাদের প্রবৃত্তি, মতিগতি ইত্যাদি সেই বহুদিন-বিস্মৃত অতলে নিক্ষিপ্ত সুপ্ত অনুভূতিগুলির দ্বারাই পরিচালিত হয়, তা আমরা নিজেদের সজাগ মন দিয়ে সহজে বুঝ্‌তে পারি না। কিন্তু আমাদের সজাগ মনের কাছে সুপ্ত অনুভূতিগুলি লুপ্ত বলে মনে হলেও, বাস্তবিক তারা কখনও লোপ পায় না। যত ক্ষুদ্র জিনিসই হোক্, যত সামান্য ব্যাপারই হোক্, যত অকিঞ্চিৎকর কল্পনাই হোক্, যা মনের মধ্যে একবার অনুভূত হয়েছে, তার দাগ সে মনের মধ্যে সারা জীবনের মত রেখে গিয়েছে। আজ হয় ত তা মনে না পড়্‌তে পারে; কিন্তু যদি সমস্ত মনটা আগাগোড়া একবার পূর্ণ সজাগ হয়ে ওঠে, তাহ'লে আমাদের স্মৃতির সামনে সুদূর অতীতের ক্ষুদ্রতম ঘটনাগুলিও জলজল করতে থাক্‌বে। তখন অনায়াসেই মনে করতে পারব—বিশ বছর আগে কবে আমার পায়ে একটা কাঁটা ফুটেছিল, বা পনের বছর আগে একদিন কি দিয়ে ভাত খেয়েছিলুম, বা দশ বছর আগে একদিন রাত্রে শুয়ে শুয়ে কি আকাশ-কুসুম রচনা করেছিলুম। সম্মোহনের (Hypnotism) দ্বারা অনেক সময় এই রকমের সুপ্ত স্মৃতি সম্মোহিতের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। কোন কোন রোগীর বিকারের অবস্থায়ও এই ধরণের সুপ্ত স্মৃতির উদ্বোধন চিকিৎসকগণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।—মনস্তত্ত্বের এ ব্যাপারগুলি বৈজ্ঞানিকরা এখন স্বীকার করছেন।

হাতদেখা বিজ্ঞানের প্রথম উপপত্তি এই যে, মস্তিষ্কের এই ছাপগুলির দাগ হাতে প্রকটিত হয়। কাজেই হাত দেখে অতীত বলা সম্ভব।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, দেহের এত জায়গা থাক্‌তে হস্ত তলেই যে দাগগুলি পড়বে, অন্য জায়গায় পড়বে না, তার মানে কি? তারও সঙ্গত উত্তর আছে। আমাদের শরীরের যতগুলি অবয়ব আছে তার মধ্যে মস্তিষ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির; এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলির মধ্যে আবার হাতের সম্বন্ধ মস্তিষ্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতম। মনের ভাব হাত যেমন প্রকাশ করতে পারে, এমন আর কেউ নয়—মনের ভাব প্রকাশ করতে হাতের কাছে জিভ্‌ও হার মেনে যায়। আমাদের দেশে একটা প্রচলিত কথা আছে "যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" অর্থাৎ মানুষের মধ্যেই অসীম ব্রহ্মাণ্ড ঘনীভূত হয়ে আছে। তেমনি এ কথাও বলা যেতে পারে "যা নেই হাতে তা নেই মানুষে"—হাতের মধ্যেই সমস্ত মানুষটা প্রকটিত। দেবারোল (Desbarolles) বলেছেন "As man is a condensation of the universe, a microcosm, So is the hand a condensation of the man."—"মানুষ যেমন বিশ্বের ঘনীভূত রূপ, হাত তেমনি মানুষের ঘনীভূত অভিব্যক্তি।"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ নাড়ীতত্ত্ববিদ্ (Neurologist) সার চার্লস বেল তাঁর বিখ্যাত ব্রিজওয়াটার ট্রিটিজের গোড়াতেই লিখছেন "We ought to define the hand as belonging exclusively to man, corresponding in its sensibility and motion to the endowment of his mind,"—অর্থাৎ "হাতের এই সংজ্ঞা দেওয়া উচিত যে, তা মানুষের একেবারে নিজস্ব এবং হাতের অনুভূতি ও গতির সঙ্গে মানুষের মানসিক গুণের মিল আছে।" অবশ্য হাতের সঙ্গে মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বোঝবার জন্য বৈজ্ঞানিকের কাছে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। সামান্য লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যায়। আমাদের এক এক রকম মনের ভাবের সঙ্গে হাতের এক এক রকম ভঙ্গী হয়; এবং কথা না কইলেও হাতের ভঙ্গী দ্বারা অনেক জিনিস বোঝান যায়। বুদ্ধির যত কাজ, শিল্পকলা প্রভৃতির অধিকাংশই আমরা হাতের সাহায্যে করে থাকি। এমন কি সঙ্গীত, বক্তৃতা, অভিনয় প্রভৃতি কলাতেও ভাব প্রকাশের জন্য হাতের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন।

সমস্ত হাতের মধ্যে আবার হাতের তালুর অনুভব ও বোধশক্তি সব চেয়ে প্রবল। হাতের তালুতে মস্তিষ্ক থেকে যত বেশী নাড়ী এসে শেষ হয়েছে, এত আর দেহের অন্য কোন জায়গায় নয়। দেহতত্ত্ববিদেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, অনেক অন্ধ ব্যক্তির আঙ্গুলের ডগায় ঠিক মস্তিষ্কের মতই ধূসর পদার্থ পাওয়া যায়। অতএব মস্তিষ্কে যে সকল অনুভূতির ছাপ পড়েছে, তার চিহ্ন যদি কোথাও থাকে, তা হাতের তালুতেই থাকা উচিত। কাজেই হাত দেখা

বিজ্ঞানের প্রথম উপপত্তি ভিত্তিহীন বা অযৌক্তিক নয়। এই উপপত্তি সত্য কি না তা প্রমাণিত হতে পারে শুধু গবেষণামূলক পরীক্ষা দ্বারা। যাঁরা পরীক্ষা করেছেন তাঁরা যখন বল্‌ছেন যে এর মধ্যে সত্য আছে—তখন যিনি পরীক্ষা করেন নি তিনি এ বিজ্ঞানকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারেন না।

এখানে কেউ হয়ত বলতে পারেন—'স্বীকার করলুম যে মস্তিষ্কের ছাপের অনুরূপ দাগ হাতে পাওয়া যায়; এবং তা দিয়ে না হয় যে সকল অনুভূতির ছাপ মস্তিষ্কে পড়েছে অর্থাৎ অতীত ও বর্ত্তমান বলা গেল;—কিন্তু ভবিষ্যৎ কি রকম করে বলা যাবে?—মস্তিষ্কে ত অতীতেরই ছাপ আছে—ভবিষ্যৎ ত মস্তিষ্কের কাছেও অন্ধকার!'—এর উত্তরে এই বলা যেতে পারে যে, আমাদের মধ্যে এমন বহু জিনিস আছে, যা আমরা জানি না, কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক জানে। আমাদের নিত্য কাজের মধ্যেই এমন অনেক ব্যাপার হচ্চে, যার প্রকৃত অর্থ আমরা মোটেই বুঝি না; কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক স্পষ্ট বোঝে। রোজ আমাদের ক্ষুধা পায় এবং আমরা আহার করি, অথচ আমরা জানি না এবং অনুভবও করতে পারি না যে, ক্ষুধা কিসের জন্য, অথবা প্রত্যেক ক্ষুধার সময় কি খাওয়া উচিত আর কি খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমাদের মস্তিষ্ক সব জানে, শরীরের কোথায় কি অভাব, তা তার অবিদিত নেই, খাদ্য শরীরের মধ্যে আসবার পূর্ব্ব হতেই শরীরের মধ্যে এমনি বন্দোবস্ত করা হয়েছে যে, খাদ্য ভিতরে প্রবেশ করাবার পরই তার দরকারী অংশগুলি ক্রমশঃ বিশ্লিষ্ট ও রূপান্তরিত হয়ে যথাস্থানে পৌছয় এবং বেদরকারী অংশগুলি পরিত্যক্ত হয়। এই ব্যাপারের কিছুই আমাদের সজাগ মনের গোচর নয়; অথচ মস্তিষ্কের দ্বারা তা অভ্রান্ত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হচ্চে। একজন লোকের শরীরে পাঁচ বছর আগে থেকে এমন বিশেষ পরিবর্ত্তন সুরু হ'তে পারে, যাতে পাঁচ বছরের শেষে তার কোন বিশেষ ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ হ'ল। তার সজাগ মন পাঁচ বৎসর আগে এর কোনই খবর রাখে নি, কিন্তু ব্যাপারটি তার মস্তিষ্কের নজর মোটেই এড়ায় নি, মস্তিষ্ক সেই মুহূর্ত্ত থেকেই তার সব বন্দোবস্ত করতে লেগে গেছে। সজাগ মন যদিও জানে নি যে পাঁচ বছর পরে শরীরে ব্যাধির উৎপত্তি হবে, মস্তিষ্ক তা জেনে রেখেছিল—অর্থাৎ সজাগ মনের কাছে ভবিষ্যৎ অন্ধকার থাকলেও, মস্তিষ্কের কাছে তা দিনের আলোর মত স্পষ্ট ছিল। অতএব মস্তিষ্কের সঙ্গে যদি হাতের কোন সম্বন্ধ থাকে, তা হলে হাতেও তার রেখা পড়বে; এবং সেই জন্যই হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলা সম্ভব।

অব্যক্ত চৈতন্য (Subconscious) মন এবং মস্তিষ্কের ব্যাপার এখনও বৈজ্ঞানিকের কাছে রহস্যময়—এখনও তার বিষয় বিশেষ কিছুই জানা যায় নি। একমাত্র সিদ্ধযোগীই তার রহস্য জানেন। যোগশাস্ত্র বলে যে অব্যক্ত-চৈতন্য মন সর্ব্বজ্ঞ—তার কাছে ভূত ভবিষ্যৎ সব বর্ত্তমানের মতই প্রত্যক্ষ। অব্যক্ত-চৈতন্য মনের দৈহিক প্রতিরূপ নিম্ন মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড—এদের কাজ আমাদের সজাগ মনের কাছে ধরা পড়ে না। এরা যদি কোন মতে জাগ্রত হয়ে উঠে, তাহলে অব্যক্ত-চৈতন্য মনও সজাগ মনের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়; এবং তা হলে ভূত ভবিষ্যৎ কিছুই অবিদিত থাকে না। এই ব্যাপারকেই কুণ্ডলিনীর চৈতন্য বলে তন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। মেরুদণ্ডের জাগরণ বা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য হলে আমরা ভূত ভবিষ্যৎ ঠিক বর্ত্তমানের মতই স্পষ্ট বুঝতে পারি—অনুভব করতে পারি, কিন্তু তা যদি নাও হয়, হাতের তালুতে সুপ্ত-মস্তিষ্ক মেরুদণ্ডের অঙ্কিত চিহ্ন দেখে বিচারের দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনুমান করাও আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

মস্তিষ্ক হাতের তালুতে যে ভাবে রেখাপাত করে বা অঙ্ক বসায়, তার একটা ধারা বা রীতি আছে। সেই রীতিকে যদি আমরা ধরতে পারি, তা হলেই হাতের রেখার অর্থ আমরা বুঝতে পারব।—এবং সেই ধারা বা রীতির অনুসরণ করে যদি আমরা হাতের রেখা, গঠন প্রভৃতিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাতে পারি, ও তা দিয়ে যদি অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ ঘটনার নির্দ্দেশ মিলে যায়, তাহলে সকলে স্বীকার করতে বাধ্য যে, হাত দেখা কলাটি একটি বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত।

যেহেতু একজন হাত দেখা শেখবামাত্রই তার যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে না, এবং অতীত বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বলতে ভুল করে বসে, অথবা যেহেতু অনেক অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক সাধারণের অজ্ঞতার সুযোগটুকু ধরে বুজরুকি করে, সেহেতু হাত দেখা বিজ্ঞানকে অপবাদ দেওয়া কোন

বিজ্ঞ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য নয়। বিজ্ঞানমাত্রই ক্রমোন্নতিশীল। হাত দেখা যদি বিজ্ঞান হয়, তাহলে তারও ক্রমশঃ উন্নতি হতে বাধ্য। কাজেই হাত দেখা বিজ্ঞানেও অনেক ত্রুটি অসম্পূর্ণতা আছে, যা গবেষণা দ্বারা ক্রমশঃ দূরীভূত হতে পারে। হাত দেখা বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক ব্যাপার নির্ণয় করা যায়; কিন্তু আরও সূক্ষ্মতর ও জটিলতর ব্যাপারগুলি নির্ণয় করতে হলে গবেষণার প্রয়োজন। সে গবেষণা সম্ভব হবে তখনই, যখন শিক্ষিত সম্প্রদায় একে একটি সত্য বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করবেন।

এক সময় ভারতবর্ষে শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায় একে বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করেছিলেন। তখন ভারতে সভ্যতা ও সমৃদ্ধির পূর্ণ অভ্যুদয়। যখন দুষ্মন্তের সভায় সগর্ভা শকুন্তলা উপস্থিত হয়ে নিজেকে রাজার পরিণীতা পত্নী বলে পরিচিত করছেন অথচ রাজা নিজে তাকে পরিণীতা পত্নী বলে চিন্‌তে পারছেন না, তখন কবি কালিদাস পুরোহিতের মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন "ত্বং সাধুনৈমিত্তিকৈরুপদিষ্ট পূর্ব্বঃ প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসীতি। স চেন্মুনি দৌহিত্র স্তল্লক্ষণোপপন্নো ভবিষ্যতি ততোহ ভিনন্দ্য শুদ্ধান্তমেনাং প্রবেশয়িষ্যসি বিপর্য্যয়ে ত্বস্যা পিতুঃ সমীপগমনং স্থিরমেব।" অর্থাৎ "মহারাজ, আচার্য্যগণ পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছেন যে, তোমার প্রথম পুত্র চক্রবর্ত্তিলক্ষণবিশিষ্ট হবে। এই মুনি-দৌহিত্রের যদি সেই লক্ষণ পাওয়া যায়, তাহলে এঁকে (শকুন্তলাকে) অভিনন্দন করে রাজশুদ্ধান্তে গ্রহণ করবে—অন্যথা এঁর পিতার নিকট গমনই স্থির রইল।" রাজা তাই মাথা পেতে স্বীকার করলেন। জ্যোতিষ ও হাত দেখা বিজ্ঞানের সত্যতায় পূর্ণ বিশ্বাসের এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর নেই। রাজা—নিজের মনের কোন কোণে শকুন্তলার স্মৃতির চিহ্ন মাত্রও পাচ্ছেন না—অথচ তিনি এ কথা মেনে নিচ্ছেন যে, সন্তানের যদি রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ পাওয়া যায়, তা হলে তাঁর স্মৃতিই প্রতারক। যে সময়কার কথা লেখা হচ্ছে, সে সময়ে যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা ছিল না, বা তখনকার লোকেরা যে মানসিকতায় এখনকার লোকেদের চেয়ে হীন ছিল, এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং তার উল্টো সাক্ষ্যই আছে। তখনকার লেখা যে সকল উপনিষদ দর্শনাদি পাওয়া যায়, তা আজকালকার যে-কোন মনীষীর পক্ষেও অত্যুচ্চ গৌরবের বিষয় বলে মনে হত। বাস্তবিক তখনকার দিনেও সুতীক্ষ্ণ ধীশক্তি এবং সু-উচ্চ মনীষা বিরল ছিল না। অথচ সেই ধীশক্তিমান্ ও মনীষা-সম্পন্ন পণ্ডিতেরাও হাত দেখায় বিশ্বাস করতেন।

জ্যোতিষ এবং হাত দেখা তখন শিষ্ট সম্প্রদায়ের শিক্ষা বা কালচারের অঙ্গীভূত ছিল। "অভিজ্ঞান শকুন্তলমে"র মধ্যেই আমরা পাই, দুষ্মন্ত সর্ব্বদমনের হাত দেখে বলছেন "কথং চক্রবর্ত্তি লক্ষণমপ্যনেন ধার্য্যতে...জালগ্রথিতাঙ্গুলিঃ করঃ ইত্যাদি।" অর্থাৎ "এই বালকের হাতেও যে চক্রবর্ত্তি-লক্ষণ দেখছি—এর হাতের অঙ্গুলিগুলি ঘন সংবদ্ধ ইত্যাদি।" এ থেকে আর কিছু প্রমাণ হোক আর নাই হোক, এটা প্রমাণ হয় যে, হাত দেখা বিজ্ঞানটি সেকালের রাজাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজ যে খৃষ্টিয়ান পাদরীর প্রভাবে আমরা সেই হাত দেখাকে বিনা বিচারে নির্ব্বাসিত করেছি, তাতে আমাদের লাভ হয়েছে না লোকসান হয়েছে, তা ভাববার বিষয়।

হাত দেখার বৈজ্ঞানিক আলোচনায় পৃথিবীর প্রকৃত উপকার হতে পারে। অন্য সব ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে যদি রোগের নিদান ও পরিণতিতে (Diagnosis and prognosis) হাত দেখার সহযোগিতা চিকিৎসকেরা গ্রহণ করেন, তাহলেও এর দ্বারা হয়ত অনেক সময় রোগীর জীবন রক্ষা হতে পারে। আমি আজকালকার একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ চিকিৎসককে জানি, যিনি তাঁর পসারের জন্য হাত দেখার কাছে অনেকটা ঋণী। তিনি অনেক ক্ষেত্রে হাতের নির্দ্দেশ অনুসরণ করে ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সুফল পেয়েছেন। কিন্তু এ ব্যাপারটি তিনি গোপন রেখেছেন লোকনিন্দা ও প্রসারহানির ভয়ে। তিনি যার সাহায্যে কৃতকার্য্যতা অর্জ্জন করেছেন—প্রয়োজন হলে প্রকাশ্যে তার নিন্দা করতেও হয় ত পশ্চাৎপদ নন। তিনি মনে মনে জানেন ও মানেন যে, হাত দেখার পাকা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে। কিন্তু সহযোগী চিকিৎসকদের বিদ্রূপের ভয়ে তা প্রকাশ করতে নারাজ।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক আয়ুর্ব্বেদের সহযোগী শাস্ত্র ছিল এবং চিকিৎসকের পক্ষে জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক না জানাই নিন্দার বিষয় ছিল। কিন্তু তেহি নো দিবসাগতাঃ। আবার কবে আস্‌বে কে জানে?

চিকিৎসার মত আর একটা বড় বিষয়েও 'হাত দেখার' উপযোগিতা আছে। আজকাল সকলেই বলে থাকেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যদি বাল্যকাল থেকে নিজের যোগ্যতার অনুরূপ শিক্ষা পায়, তাহলে তার জীবন সফল ও সার্থক হয়। কোন্ দিকে কার সহজ যোগ্যতা আছে, তা হাত দেখে অতি সহজেই নির্ণীত হতে পারে। একজন বালককে দেখে তার সহজাত প্রবৃত্তি বা ঝোঁক নির্ণয় করবার সাধারণ কোন উপায় আছে কি না জানি না। যদিও থাকে, তাহলেও হাত দেখার মত সহজ এবং অভ্রান্ত উপায় যে একটিও নেই, তা নিশ্চয়। ফলিত জ্যোতিষের দ্বারাও একজন ব্যক্তির স্বাভাবিক মতিগতি নির্ণীত হতে পারে; কিন্তু তাতে পরিশ্রম অনেক বেশী। তা ছাড়া, যদি ঐ ব্যক্তির জন্ম সময় অভ্রান্তরূপে জানা না থাকে—যা অধিকাংশ ব্যক্তিরই থাকে না—তা হলে ফলিত জ্যোতিষ কোন কাজেই আসবে না। হাত দেখায় কেবল হাতটা পেলেই হ'ল! বর্ত্তমান বিজ্ঞানের দ্বারা এ ব্যাপার নির্ণয় করবার যা চেষ্টা হ'চ্চে, তাও এখন গবেষণা ও পরীক্ষার বিষয়; এবং হাত দেখার উপর তার চেয়ে ঢের বেশী নির্ভর করা যায়।

অন্ততঃ এই উপযোগিতার জন্যও হাত দেখার বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। যাঁরা হাত দেখায় অবিশ্বাস করেন, তাঁরা এই বিভাগে দু'দশটা পরীক্ষা করলেই এর সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। হাতের ও আঙ্গুলের গড়ন এবং রেখা-সংস্থানের বিভিন্নতা দ্বারা চরিত্রের ও সহজাত প্রবৃত্তির যে কিরূপ প্রভেদ হয়, তা যিনি গোটা-কতক হাত দেখেছেন তিনিই বেশ জানেন। কিন্তু হাতের বা আঙ্গুলের গড়ন ও হাতের রেখা-সংস্থান যে বৈজ্ঞানিক ধারায় শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে, তা হয় ত অনেকে জানেন না।

হিন্দু যোগীদের কাছে হাত দেখার যে বিজ্ঞান লুক্কায়িত আছে, তার বৈজ্ঞানিক রীতি ও শৃঙ্খলা দেখলে আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়। সে বিজ্ঞান আজ পর্য্যন্ত সাধারণের মধ্যে প্রকাশিত হয় নি—গুরু হতে শিষ্যে মুখে মুখে চলে এসেছে; এবং গুরু শিক্ষা দেবার সময় বরাবর শিষ্যকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে, তা যেন উপযুক্ত শিষ্য ভিন্ন কারো কাছে প্রকাশ করা না হয়। গুরু মুখে মুখে শিক্ষা দিয়েছেন; কোন কোন শিষ্য হয় ত তা পুঁথির আকারে লিখে নিয়েছেন; কিন্তু তা প্রচারের জন্য নয়—নিজের মনে রাখবার সুবিধার জন্য। গুরুর উপদেশ ভিন্ন তা পড়ে সহজে কেউ কিছু বুঝতে পারবে না।

আমার আশ্চর্য্য মনে হয় যে, যে বিজ্ঞানের দ্বারা জগতের প্রভূত উপকার হতে পারে, তাকে এমনভাবে লুকিয়ে রাখতে সংসারত্যাগী যোগী পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিচ্চেন! কি মানসিকতা থেকে যে এটা সম্ভব হয়েছে, তা বলা শক্ত। সম্ভবতঃ "গুরু বলেছেন গোপন রাখতে অতএব গোপনীয় মাতৃজারবৎ" এই হচ্চে আসল মনের ভাব। রামানুজের মত কেউ সাহস করে বলতে পারেন নি "গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্য সহস্রবার অনন্ত নরক হোক—আমি এ বার্ত্তা জগতের সুখের জন্য প্রচার করব।"

আজকাল "হাত দেখা" শিখতে হলে সকলেই বিলিতি বই নিয়ে বসেন। কিন্তু তার প্রণালী পূরো বৈজ্ঞানিক নয়; অন্ততঃ তার গোড়া-পত্তনেই বিশেষ ভ্রম আছে। তাঁরা গোড়াতেই যে সাতের বিভাগ করেছেন, তা যুক্তি এবং প্রত্যক্ষের বিরুদ্ধ। এই জন্যই হিন্দুদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক প্রণালী আমি সাধারণের মধ্যে প্রচার করতে চাই।

মিশ্র ধাতু

(Alloy)

শ্রীকালীপদ ঘোষ

প্রতি বৎসর বহু পরিমাণে ধাতু ধাতুপ্রস্তর (Ore) থেকে তৈরী হয় এবং অধিকাংশই ধাতু হিসাবে ব্যবহৃত হলেও অনেকটা মিশ্র ধাতু তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। মিশ্র ধাতু হ'চ্ছে কতকগুলি ধাতুর কঠিন সংমিশ্রণ (Solid solution)। এই মিশ্র ধাতু প্রস্তুতের কারণ হ'চ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে খাঁটী ধাতুতে ঠিক আবশ্যক গুণ সব না থাকায়, বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে গুণের পূর্ণতা লাভ করে।

আজকাল বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মিশ্র ধাতুর

ব্যবহার শিল্প-জীবনের একটা অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। লোহার অধিকাংশই সাদা ইস্পাত হিসাবে ব্যবহৃত হ'লেও তার অনেক মিশ্রধাতু তৈরী হ'য়েছে; যেমন—ম্যাংগানিজ-ইস্পাত, নিকেল-ইস্পাত, ক্রোম-ইস্পাত, লৌহ-ম্যাংগানিজ-টাঙ্গষ্টেন্-ইস্পাত ইত্যাদি। তাম্র শুধু ধাতু হিসাবে অনেক কাজে চললেও, প্রায় তার তিন ভাগের এক ভাগ মিশ্র ধাতুতে যায়—যেমন কাঁসা, পিতল, ব্রঞ্জ, ইত্যাদি। এ্যালুমিনিয়ম্ ধাতুর সাদা ব্যবহার থাকলেও খানিকটায় তামা-এ্যালুমিনিয়ম্ মিশ্র ধাতু তৈরী হয়। সোনা, রূপাও প্রায়ই খাঁটী ভাবে ব্যবহৃত হয় না। তাও হয় তামার সঙ্গে, কিম্বা পরস্পরে মিলিয়ে মিশ্রধাতু তৈরী হয়। রাং ঝাল্, ছাপার অক্ষর, ভার-সহ ধাতু (Bearing metal) প্রভৃতি তৈরী করবার জন্ম সীসা ব্যবহৃত হয়। দস্তা, রাং প্রভৃতিও এমনি মিশ্রধাতু তৈরীর জন্ম ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মিশ্র-ধাতু তৈরী না হ'লে আজকাল আমাদের অনেক কাজই বন্ধ হ'য়ে যায়।

মিশ্রধাতু তৈরী করতে হ'লে, সাধারণতঃ যে ধাতুটা পরিমাণে বেশী সেইটাকে গলিয়ে তার পর কম দ্রব-সীমার (melting point) ধাতুগুলোকে কঠিন অবস্থাতেই তার সঙ্গে মিশান হয়। এই প্রথাই প্রায় তামার সকল মিশ্র-ধাতুতেই প্রয়োগ করা হয়। উচ্চতর দ্রব-সীমার জন্ম এটাকেই প্রথমে গলিয়ে তার পর তার সঙ্গে রাঙ, সীসা, দস্তা, এ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি যোগ করা হয়, এবং এদের দ্রব-সীমা নিম্নতর থাকায় গলে মিশে যায়।

আয়াস-দ্রবণীয় পদার্থ সব গ্রাফাইট্ মুচিতে গলান হয়, অথবা বদ্ধ চুল্লী, যার উত্তাপ খুব বেশী উঠে, তাতে গলান হয়। সহজ-দ্রবণীয় ধাতু, যথা—দস্তা, রাঙ, সীসা প্রভৃতি লোহার হাঁড়িতে (Kettles) গলান হয়। মুচি সব গ্রাফাইট্ কিম্বা প্লাম্বেগো এবং কাদার সহিত কিছু বালি মিশ্রিত ক'রে তৈরী করা হয়। প্লাম্বেগো মুচির দ্রব-সীমাকে খুব বাড়িয়ে দেয়, এবং তাপ সঞ্চালনের শক্তিও বাড়িয়ে দেয়। কখনও বা আবার সমস্তটা কাদার মুচিই তৈরী হয়, কিন্তু তার পরমায়ু অল্প; কারণ, তাপ ভেদ ক'রে ধাতুর কাছে যাবার জন্ম তার দেহটাকে পাতলা করা আবশ্যক। এই কাদার মুচি চুনকো ব'লে প্রথমতঃ সস্তা ঠেকলেও কার্য্যতঃ অন্যান্য মুচির চেয়ে দামে বেশী প'ড়ে যায়। মাটীর মুচি কোন ধাতুপ্রস্তরে ধাতুর পরিমাণ জানবার পক্ষে বেশ সুবিধাজনক; কারণ, মুচিতে ধাতুপ্রস্তর দিয়ে তাকে গলাবার জন্ম অন্য জিনিস দিয়ে তাকে গলিয়ে পাকা ক'রে (reduce) হয় কোন ছাঁচে ঢালা হয় কিম্বা মুচিশুদ্ধ রেখে দিয়ে ঠাণ্ডা হ'লে সেটাকে ভেঙ্গে ফেলা হয়। আমাদের দেশে প্রায়ই দেশীয় প্রাচীন প্রথায় কাদার মুচিতেই মিশ্রধাতু তৈরী হয়।

মুচি সব চুল্লিতে গরম করা হয়, এবং গরম করবার জন্ম বাষ্প, তেল, কোক্ কয়লা, শক্ত কয়লা, বিদ্যুৎ কিম্বা কাঠ কয়লা ব্যবহৃত হয়। এবং মুচিগুলি সাঁড়াসী ক'রে বা'র ক'রে উল্টে ধাতু ছাঁচে ঢালা হয়। এই প্রকার গলাবার জন্ম অনেক আকারের ও পরিমাণের মুচি আছে। মুচিতে গলাবার জন্ম ধাতুর পরিমাণ ঠিক ক'রে দেওয়া দরকার; কারণ, বেশী হ'লে গ'লে উপ্‌চে প'ড়ে যায়; আবার কম হ'লেও লোকসান। সেই জন্ম মুচির তরল পরিমাণ (liquid pints) বা আয়তনকে ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব দিয়ে গুণ ক'রে পরিমাণ ঠিক করতে হয়।

খুব বেশী পরিমাণে ধাতু গলাতে হ'লে বড় বড় মুচি ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে এক একটা মুচিতে প্রায় ৩৷৹ মণ ধাতু গলান যায়। এমন কি উল্টান চুল্লিতে (tilting furnace) প্রায় ১৮।১৯ মণ ধাতুও মুচিতে গলান হয়; কিন্তু সাধারণতঃ পাঁচ মণ সাড়ে পাঁচ মণ ধাতুর মুচিই চাপান হয়।

তেল বা বাষ্প-ইন্ধন-চালিত চুল্লি দু রকমের—এক রকম হ'চ্ছে যা থেকে গলিত ধাতু একটা মুখ দিয়ে বা'র ক'রে নেওয়া হয়, আর এক রকম হ'চ্ছে চুল্লিটাকে ঘুরিয়ে ধাতুটা ঢেলে নেওয়া হয়।

M. A. Combs সাহেব বিবেচনা করেন যে, বাষ্প-চালিত চুল্লীই সব চাইতে কম খরচে চলে। বাষ্প গন্ধক-বিহীন কিন্তু তেল গন্ধকবিহীন নয়। আর তেলের মত বাষ্পকে জমা ক'রে রাখতে হয় না, একেবারে নল (pipe) থেকেই ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার E. L. Crosley সাহেব বলেন যে, তড়িৎ-চালিত চুল্লী বাষ্প-চালিত চুল্লী অপেক্ষা ভাল—এবং খরচ হিসাবেও তিনি কম খরচ দেখিয়েছেন।

আর এক রকম চুল্লী আছে, তার নাম ইংরাজিতে

বলে—রিভার্বারেটরী (reverberatory) চুল্লী। প্রাচীন-কালে ইয়োরোপে খুব বেশী পরিমাণে ধাতু গলাবার জন্ত ইহা ব্যবহৃত হ'ত। এবং কাঠের দ্বারা তাহা প্রজ্জ্বলিত করা হ'ত। এই চুল্লাতেই পৃথিবীর অন্ততম আশ্চর্য্য মস্কোর ঘণ্টার ধাতু গলান হ'য়েছিল। ঘণ্টাটার ওজন ৪৪৩৭৯০ পাউণ্ড এবং তার জন্ত চারটা উপরিউক্ত চুল্লী দরকার হ'য়েছিল। এই চুল্লীতে ৫০০ পাউণ্ড থেকে অনেক টন পর্য্যন্ত মাল গলান যেতে পারে।

অধিকাংশ স্থলে গ্রাফাইত্ কিম্বা গ্রাফাইত্ও কাদায় মিশিয়ে তৈরী মুচিতেই মূল্যবান ধাতু গলান হয়। কিন্তু এই গ্রাফাইত্ মুচির একটা দোষ এই যে, ইহা কখন কখন ফেটে যায়। কখন কখন এমন হয় যে, চুল্লীতে দেবার কিছুক্ষণ পরেই একটা বিষম শব্দে মুচি ফেটে গেল এবং ধাতু সমস্ত আগুণে প'ড়ে গেল। এটা অবশ্য খুব কম ক্ষেত্রেই মুচি তৈরীর দোষের জন্ত ঘটে। তবে এর প্রধান কারণ হ'চ্ছে, এর দেহের ভেতর জলকণার (moisture) উপস্থিতি। এই জন্ত মুচিগুলি যাহাতে জলকণাসিক্ত না হয় সেজন্ত ভালরূপ গুদামজাত করা উচিত। এবং ব্যবহার করবার পূর্ব্বে মুচিকে পান (anneal) দিয়ে নেওয়া উচিত। এবং এই পান দিতে হ'লে মুচিগুলিকে ২১২° বা গরম ফুটন্ত জলের উত্তাপ পরিমাণের কিছু উপরের তাপে গরম ক'রে নিলেই হয়।

এই পানের অভাবে যে মুচি ফাটে সেটা এমন প্রচলিত হ'য়েছে যে অনেক কারখানায় বিশেষ চুল্লী আছে যেখানে মুচিগুলিকে যথা সময়ে ব্যবহারের উপযুক্ত রাখবার জন্ত রেখে দেওয়া হয়। আবার পান দেওয়া মুচি হ'লেও চুল্লীতে নতুন্ কয়লা দেওয়া হ'লে তার উপর যেন বসান না হয়; কারণ; কয়লার সঙ্গেও জলকণা থাকতে পারে; তাই মুচিতে লেগে মুচির চটা উঠে যেতে পারে।

আমেরিকা প্রভৃতি দেশে মুচিতে ধাতু গলালেও, এখন অনেক পরিমাণে ধাতু গলাবার চুল্লী ব্যবহৃত হ'চ্ছে। এবং সেই সব চুল্লীকে প্রধান তিন ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে; যথা—(১) কঠিন-ইন্ধন-প্রজ্জ্বলিত চুল্লী, (২) তেল বা বাষ্প-প্রজ্জ্বলিত চুল্লী (৩) বিদ্যুৎ-প্রজ্জ্বলিত চুল্লী। এই সব চুল্লীকে আবার দুই ভাগে পুনর্বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা—এক প্রকার যাতে মুচিতে ধাতু গলান হয়, এবং আর এক প্রকার যাতে বিনা মুচিতে ধাতু গলান যায়। মুচি ব্যবহারের চুল্লী আবার দু রকমের—(১) যার ভিতর থেকে মুচিকে সরিয়ে নিয়ে ধাতু ঢালা হয়; (২) যার ভিতরে শুধু মুচিটাকে ঘুরিয়ে ধাতুটা হাতায় বা বালতিতে ঢেলে নেওয়া হয়।

অনেক কাঁসারি বা লোহার (smelter) ভাবেন যে, এতে ইন্ধন খরচ বড় বেশী; কারণ কাঁসা গলাতে গেলে ধূমায়মান পাকা (reducing) শিখার প্রয়োজন। কারণ, ভস্মশিখায় (oxidizing flame) ধাতু অনেকটা নষ্ট হয়, বিশেষতঃ দস্তা গলাবার সময়। সেইজন্ত ধূম-সংযুক্ত শিখা বেশী ইন্ধন দিয়াও বজায় রাখা কর্ত্তব্য।

এই চুল্লী প্রস্তুতের নক্সা—যতটা ধাতু গলান হবে তার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ চুল্লীর মেঝের আয়তন এবং গলিত ধাতু-সংস্থানের খোল প্রভৃতির বিবেচনা আগে আবশ্যক। তার পর ধাতুর পরিমাণ এবং কার্য্যের গতি (rate of working) অনুসারে শিক (grate) নির্ম্মাণ নির্ভর করে। তার পর তার ভিতরে কাঠগুলো পোড়াবার জন্ত বাতাস যাবার বিশেষ বন্দোবস্ত দরকার; এবং বাতাসের গতি এরূপ হওয়া উচিত, যেন সেটা চুল্লীর ভিতর দিয়ে শিখার সঙ্গে যোগ হ'য়ে ধাতুর উপরে গিয়ে পড়ে; এবং বাতাসের স্রোত এমন হওয়া উচিত, যেন ধাতুর উপরে পূর্ণ মাত্রায় উত্তাপ দিতে পারে। এ থেকে বেশ বুঝা যায় যে, চুল্লীর আকার এবং বাতাসের স্রোতের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে। যে রকম ধরণের কয়লা ব্যবহার করা হয়—তার উপরে শিক নির্ম্মাণ নির্ভর করে। অনেকের মতে, যদি প্রত্যেক ঘণ্টায় ২৫ পাউণ্ড কয়লা, শিকের প্রত্যেক বর্গফুটে পোড়ে, তা হ'লে ছটী অগ্নি দণ্ডের (fire-bars) মধ্যে প্রত্যেক পাউণ্ড কয়লার জন্ত ২৩০ ঘন ফিট বাতাস যাবার রাস্তা রাখ্‌তে হবে।

বিনা মুচিতে, চুল্লীতে ধাতু গলাতে হ'লে এটা বিশেষ আবশ্যক যে, তেল এবং বাতাস এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যে, শিখা যেন অধিক ভস্মকারী না হয়। অনেক কাঁসারি আবার পাকা শিখা (reducing flame) পছন্দ করে; এবং এতে উদ্‌জানের ভাগ কম থাকায় কিছু ধোঁয়া হয়। এ ক্ষেত্রে অবশ্য সামান্ত তাপ, বা অন্ত ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারত, নষ্ট হয়ে যায়; কিন্তু একটা মস্ত লাভ এই

হয় যে, বাষ্প ধাতুর উপর দিয়ে যাবার সময় উদ্‌জান গ্রহণ করে এবং ধাতু ঠিক ধাতব অবস্থায় থাকে। পূর্ব্বে বলা হ'য়েছে যে, মিশ্রিত ধাতু তৈরী করতে হ'লে উচ্চতম দ্রবসীমার ধাতুটাকে আগে সম্পূর্ণরূপে গলিয়ে তার পর পর্য্যায়ক্রমে নিম্নতর দ্রবসীমার ধাতু এক একটা গলবার পর পর তাতে যোগ করা হয়; কিন্তু এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। ধাতু সকলের বিভিন্ন আপেক্ষিক গুরুত্বের জন্ত বিভিন্ন ধাতুকে মিলিয়ে একটা সমতা-পিণ্ড তৈরী করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। অনেক ক্ষেত্রে ধাতুতে ধাতুতে রাসায়নিক মিশ্রণে খানিকটা নষ্ট হয়ে যায় এবং বাকিটায় এমন একটা মিশ্র ধাতু তৈরী হয়, যেটার ঠিক দরকার থাকে না।

খুব বেশী আপেক্ষিক গুরুত্বের ব্যবধানযুক্ত দুটো ধাতু যদি গলিয়ে মিশ্রিত ক'রে স্থিরভাবে ঠাণ্ডা করতে দেওয়া হয়, তবে দেখা যাবে যে, ঠাণ্ডা হবার পর তার ভেতরে স্তর পড়ে গেছে। সেই স্তরগুলোকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিভিন্ন পরিমাণের ধাতু তাদের ভিতর আছে। এই সব ক্ষেত্রে সমতাযুক্ত (homogenous) মিশ্র ধাতু পেতে হ'লে গলিত অবস্থায় তাদের স্থির ভাবে না রেখে সর্ব্বদা নেড়ে নেড়ে নিবিড় ভাবে মিশ্রিত করতে হবে। কতক মিশ্রধাতুতে লোহার ডাণ্ডাতেই চলে, কিন্তু সব ব্রঞ্জের বা কাঁসার বেলায় গ্রাফাইতের ডাণ্ডা ব্যবহার করা উচিত। ফস্ফর-ব্রঞ্জ তৈরী করতে হ'লে সর্ব্বদাই গ্রাফাইতের ডাণ্ডা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য; কারণ, ফস্ফরাস্ লৌহ ডাণ্ডাকে আক্রমণ করে। ম্যাংগানিজ ও এ্যালুমিনিয়ম্ ব্রঞ্জে লোহার ডাণ্ডাই উপযুক্ত; কারণ, এদের মিশ্র ধাতুতে প্রায়ই একটু লোহা থাকে; সুতরাং সামান্ত কম বেশীতে বিশেষ আসে যায় না। কাঠের ডাণ্ডা ব্যবহার করা সম্ভব নয়; কারণ, কাঠ পুড়ে তা থেকে বাষ্প বেরিয়ে ধাতুকে ছিট্‌কে ফেলে।

অনেক সময় কয়েকটা প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত ভাগের মিশ্র ধাতু তৈরীর কাজ এগিয়ে দেয়। যেমন মিশ্র ধাতুকে ঠাণ্ডা ক'রে আবার তাকে গলান। ছাঁচে ঢালবার সময় যে সব টুকরা বাদ পড়ে, সেগুলোকে কাজে লাগাতে হ'লে আবার গলান দরকার। পুরানো, ব্যবহারের অনুপযুক্ত ধাতু গলিত অবস্থায় সহজেই ভস্মে পরিণত হয়। তাদের পক্ষে এটা বিশেষ প্রয়োজনীয়। কারণ যথেচ্ছ ভাবে কাজ করলে ধাতুর যতটা ভস্ম হ'য়ে যায়, তাতে সেটা আর মিশ্র ধাতু হয় না; সুতরাং পরিমাণ মত ধাতুগুলি দিলেও মিশ্র ধাতু ঠিক অংশ মত তৈরী হয় না।

মুচিতে অল্প পরিমাণে ধাতু তৈরী করতে হ'লে ধাতু ভস্মের বিরুদ্ধে একটা উপায় অবলম্বন করতে হবে। এর জন্তে ধাতুর উপরটা এমন একটা জিনিস দিয়ে ঢেকে দিতে হবে, যাতে ক'রে আর বাতাস ঢুকতে পারবে না; এবং সেই ধাতুর উপর সেটারও কোন ক্রিয়া হবে না। অনেক ক্ষেত্রে নির্জ্জলা সোহাগা (anhydrous borax) দেওয়া হয়। কিন্তু এটা দামী এবং মিশ্র ধাতুর দাম বাড়িয়ে দেয়। সে কথা ছেড়ে দিলেও এর কতকগুলো কুক্রিয়া আছে। এটা জানা কথা যে, সোহাগায় খানিকটা সোহাগায় পূর্ণ (saturated) না থাকায়, ধাতুর সঙ্গে মিশে কাচের মত একটা জিনিস তৈরী হয়। সুতরাং তাতে খানিকটা ধাতু নষ্ট হয়।

কাচ যদি দ্রবমান ধাতুর উপর দেওয়া যায়, তা হ'লে সেটা ধাতুর উপর একটা পর্দ্দা তৈরী ক'রে তাকে বাতাস থেকে রক্ষা করে। কাচ অবশ্য যদিও ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত হয়, তবুও সমপরিমাণ সোহাগার চেয়ে কিছু কম। আবার যেখানে ধাতু অঙ্গারের সঙ্গে মিশালে ক্ষতি হয় না, সেখানে গলিত ধাতুর উপর গুঁড়া কয়লা ছড়িয়ে দিয়ে তাকে বাতাস থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। অনেক ঢালাইকর নিম্ন-দ্রবসীমার মিশ্রধাতু গলাবার আগে তার উপর খানিকটা চর্ব্বি ছড়িয়ে দেয়। সেই চর্ব্বি তাপে গলে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে অনেকটা বাষ্প তৈরী ক'রে ধাতুটাকে রক্ষা করে। আবার বাষ্প উঠা শেষ হ'য়ে গেলে খুব সূক্ষ্ম অঙ্গার-কণিকা ধাতুটাকে ভস্ম হওয়া থেকে রক্ষা করে। মিশ্রিত ধাতুর দ্রব্য প্রায়ই পুনরায় গলান হয়। এই দ্বিতীয়বার গলানোর পরিণামে এই ধাতুর কিয়ৎপরিমাণে, এই প্রকারের যে ধাতু গলান হবে, তাতে দিলে, ধাতুর গুণের কিছু উপকার হয়। যে সব ধাতু দিয়ে মিশ্রিত ধাতু তৈরী হয়, তারা দ্রবসীমায় এলে উদ্‌জান বাষ্প গ্রাস করে, আবার তাদের অনেকে তাদের নিজেদের ভস্ম গালিয়ে নেয় এবং তার দ্বারা তাদের ব্যবহারিক শক্তি কিছু নষ্ট নয়। ধাতুকে যত গলান যাবে ততই সে ভস্ম গলিয়ে নেবার সুবিধা পাবে। সুতরাং পুরানো ধাতু নতুন ধাতুর সঙ্গে না মিশিয়ে তখন গলান সম্ভব যখন ভস্মকে কোন ধাতু গলিয়ে না নেয়। পুরানো ও নতুন ধাতু গলাতে হ'লে পরিমাণ কিরূপ হবে, সে বিষয়ে কোন নিয়ম খাটতে

পারে না ; কারণ, পুরানো ধাতু প্রায়ই অনেকবার গলান হ'য়ে যায়।

যখন বেশী পরিমাণের একটা ধাতু, কম পরিমাণের আর একটা ধাতুর সঙ্গে মিলিয়ে মিশ্র ধাতু তৈরী হয়, তখন প্রথমে সমান ওজনের দুটো ধাতুকে গলান, এবং তার পর দ্বিতীয়বার গলিয়ে তার সঙ্গে বাকি ধাতুটা মিশিয়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত। যেখানে দুটী ধাতুর দ্রবসীমার ব্যবধান খুব বেশী, সেখানে এই নিয়ম প্রায়ই পালন করা হয়। যেমন খুব অল্প পরিমাণ তামার সহিত বেশী পরিমাণ রাং মিশাতে হ'লে, প্রথমে সমপরিমাণ তামা এবং রাং গলান হয় এবং পরে তার সঙ্গে বাকিটা রাং মিশান হয়। তিন বা ততোধিক ধাতু (বিভিন্ন দ্রবসীমা যুক্ত) মিলাতে হ'লেও এই উপায় অবলম্বন করা হয়। যেমন ৩ ভাগ সীসা (দ্রঃ সী—৬.৮.৮° ফা) ১ ভাগ রাং (দ্রঃ সী ৪৪৬° ফা) এবং এ্যান্টিমণি (দ্রঃ সী ১১৬৬° ফা) দিয়ে মিশ্রিত ধাতু তৈরী করবার সুবিধাজনক উপায় হ'চ্ছে, প্রথমে ১ ভাগ সীসায় সমস্ত এ্যান্টিমণিটা গলিয়ে পরে বাকি সীসাটা মিলান। এবং তার পর দ্রবসীমা খুব কম ব'লে রাং সীসা এ্যান্টিমণির মিশ্রিত ধাতুর সঙ্গে গলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়। দাম বেশী ব'লে রাং ভস্মে পরিণত যাতে না হ'তে পারে সে উপায় করা বিধেয়। উপরিউক্ত উদ্দেশ্য এই ভাবেও সিদ্ধ করা যেতে পারে—১ ভাগ সীসা ও সমস্ত এ্যান্টিমণির মিশ্রিত ধাতু তৈরী ক'রে তার পর সীসা এ্যান্টিমণি মিশ্র ধাতু, এবং সীসা রাং মিশ্র ধাতু মিলিয়ে নেওয়া।

যদি বেশী পরিমাণ তামা (দ্রঃ সী ১৯৮৩.২° ফা) খুব কম পরিমাণ নিকেলের (দ্রঃ সী ২৭৩২° ফা) সঙ্গে মিশাতে হয় ও দস্তার (দ্রঃ সী ৭৭৯° ফা) সঙ্গে মিশাতে হয়, তাহলে প্রথমে ১ ভাগ তামা সমস্ত নিকেলের সঙ্গে গলাতে হবে, এবং আর এক ভাগ (দস্তার সমপরিমাণ) দস্তার সঙ্গে মিশাতে হবে, এবং পরে তামা-নিকেল ও তামা-দস্তা মিশ্রিত ধাতু মিশিয়ে মিশ্র ধাতু তৈরী করতে হবে। এই প্রক্রিয়া সমতা পিণ্ড (uniform mass) প্রস্তুতের সহায়ক এবং যে সব ধাতুর দ্রবসীমা উচ্চ তাদের দ্রব সীমা নেমে আসে এবং যে সব ধাতু সহজে ভস্ম হয় বা আগুণে উবে যায়, যথা—দস্তা, তাদের খাঁটী অবস্থার চেয়ে ভস্ম হবার বা উবে যাবার সম্ভাবনা কম।

পূর্ব্বে খুব কম সংখ্যকই মিশ্র ধাতু জানা ছিল। এখন শিল্পের জন্য অনেক প্রকারের মিশ্রধাতু তৈরী হ'য়েছে। তার কোনটা শক্ত, কোনটা ঘাতসহ, কোনটা টানসহ আবার কোনটার দ্রবসীমা যতদূর সম্ভব কম। এবং এই সব কারণে ধাতু সব বিশেষ বিশেষ অংশে মিশ্রিত করা হয়।

নতুন নতুন মিশ্র ধাতু তৈরী করতে হ'লে নিম্নলিখিতরূপ উপায়ই শ্রেষ্ঠ।—

এটা জানা কথা—প্রত্যেক জিনিসই (element) একটা পরিমিত ওজনে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। এবং সেটা হ'চ্ছে অণুর ওজন (atomic weight)। এইরূপ সমত্বজ্ঞাপক (equivalent) পরিমাণে ধাতু সব মিশ্রিত করলে কতকগুলি স্থিরগুণবিশিষ্ট মিশ্রধাতু পাওয়া যায়। এতেও যদি ইচ্ছা মত গুণ না মেলে তবে কোন একটা ধাতুর দ্বিগুণ, তিন গুণ বা বেশী গুণ সমত্বজ্ঞাপক ওজন মিলিয়ে দেখা কর্ত্তব্য। অবশ্য এ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে, বিশেষতঃ যেখানে খুব সামান্য পরিমাণ একটা ধাতু, খুব বেশী পরিমাণে সমস্ত মিশ্র ধাতুটারই গুণাগুণ বদ্‌লে ফেলে। এ সব ক্ষেত্রে সহস্র ভাগের ভাগ বদলে মিলিয়ে দেখা উচিত।

এই মিশ্রধাতু সম্বন্ধে এত দিনে যা জানা গিয়েছে সে জ্ঞানও খুব কম, এবং ফলিত রসায়নের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক জিনিস আশা করা যায়।

আমাদের ভারতবর্ষে আজ পর্য্যন্ত মিশ্র ধাতু তৈরীর কারখানা কোথাও নাই। তবে কাঁসা বা পিতলের কারখানা যা আছে তা কুটীর-শিল্প ভিন্ন আর কিছু নয়। কাঁসা পিতলের জিনিস ভারতে এত চল্‌তি, অথচ একটা যে মিশ্র ধাতুর কারখানা চলতে পারে, এ বিষয় নিয়ে কেউ চিন্তাও করেন নি। ভারতে তামা, দস্তা, রাং প্রভৃতির ধাতু প্রস্তরের অভাব নেই, অথচ আমরা তাদের ব্যবহারে আনবার চেষ্টা করি না। এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের আর কি আছে?

সাময়িকী

এবারের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল তিনি দানবীর, অনাথপালক নামে চির-স্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার নাম তারকনাথ প্রামাণিক। ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে কংসবণিক। ইঁহার পিতা গুরুচরণ প্রামাণিক দেবদ্বিজে ভক্তিমান ও বহু সদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন। পাঠশালায় কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তারকনাথ ব্যবসায়-কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার চাঁদনীতে ইঁহার পিতৃব্য স্বরূপচন্দ্র প্রামাণিকের একখানি বাসনের দোকান ছিল; ইনি সেই দোকানে প্রথমে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর ১২৭৬ সালে ইনি বড়বাজারে একটী বাসনের দোকান স্থাপিত করিয়া প্রচুর ধন উপার্জ্জন করেন। ব্যবসায়-কার্য্যে ইঁহার অসীম অধ্যবসায় ছিল। বাল্যকালে রীতিমত বিদ্যাশিক্ষা না করিলেও শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। বিলাসিতা কাহাকে বলে, ইনি তাহা জানিতেন না; হাঁটুর উপর টেঁটি কাপড় পরিতেন, একবেলা নিরামিষ আহার করিতেন। কাঙ্গালী ও নিরাশ্রয়দিগের দুঃখ মোচন তারকনাথের জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। তিনি প্রকাশ্যে এবং অধিকাংশ স্থলেই অপ্রকাশ্যে যে কত টাকা দান করিতেন, তাহার হিসাব করা যায় না; দরিদ্র ছাত্রদিগের পড়ার ব্যয় স্বরূপ অনেক টাকা ইনি মাসে মাসে দিতেন। সে সময় কলিকাতা সহরে ইনি দানবীর তারকনাথ নাম পাইয়াছিলেন; তাঁহার অবারিত দ্বার হইতে কেহ রিক্তহস্তে ফিরিত না। ১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র গঙ্গাতীরে এই স্বনাম-ধন্য মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। ইঁহার শব-সৎকার কালে চিতা প্রজ্বলিত হইবামাত্র সূর্য্য-মণ্ডল সমীপে পরিবেষ লক্ষিত হইয়াছিল এবং চিতা নির্ব্বাপিত হইলে ঐ পরিবেষ অদৃশ্য হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র কালীকৃষ্ণ প্রামাণিকও পিতার অশেষ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ বাবুও লোকান্তরিত হইয়াছেন।

* * * *

আগামী বৎসরে গবর্ণমেণ্টের আয় ব্যয়ের বিবরণ অর্থাৎ বজেট প্রকাশিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট ও বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের বজেটের আয়তন এত বড় যে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা অতি সংক্ষেপে দুই বজেটের কথাই বলিতেছি। প্রথমে ভারত-গবর্ণমেণ্টের বজেটের কথাই বলি।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থাপক মণ্ডলীতে স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে মিঃ ব্রেণ ভারত সরকারের আয়-ব্যয়ের বিবরণ প্রদান করেন। এই বিবরণ হইতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসরের (১৯২৭-২৮) জন্য প্রাদেশিক দেয় কতক টাকা রেহাই হইয়াছে এবং কর আদায়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। আয়-ব্যয়ের বিবরণ দিয়া অর্থসচিব বলেন যে, ১৯২৫-২৬ সালে দুই কোটি টাকার বেশী উদ্বৃত্ত হইয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে (১৯২৬-২৭) চিনি এবং সংরক্ষণ শুল্ক হইতে ১৩০ লক্ষ টাকা ও অহি-ফেনের রপ্তানী শুল্ক হইতে ৮৬ লক্ষ টাকা বেশী পাওয়া গিয়াছে। আয়কর এবং লবণ কর হইতে ২৯ এবং ৩০ লক্ষ টাকা কম পাওয়া গিয়াছে। সামরিক বিভাগে ৬৭ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় হইয়াছে। বজেটে পাঁচ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল; সেই স্থলে ৩১০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। স্যার বেসিল মনে করেন যে, আগামী বৎসরের অবস্থা বেশ সচ্ছল। আগামী বর্ষে ভারত সরকারের ২৭ কোটি টাকা মূলধনের আবশ্যক হইবে। এই মূলধন এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টসমূহের মূলধন ও আগামী বর্ষে পরিশোধনীয় ঋণের জন্য গবর্ণমেণ্টকে মাত্র ১০ কোটী টাকা ধার করিতে হইবে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মে মাস হইতে বাহির হইতে টাকা ধার করার প্রথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আগামী বর্ষেও বাহির হইতে কোন টাকা ধার করা হইবে না। আগামী বর্ষে (১৯২৭-২৮) বিলাতে ৩ কোটী ৫৫ লক্ষ পাউণ্ড পাঠাইতে হইবে। বর্ত্তমান বর্ষে ২ কোটী ৭৫ লক্ষ পাউণ্ড পাঠাইতে হইয়াছিল। আগামী বর্ষের আনুমানিক আয় ১২৮ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকা। বর্ত্তমান বর্ষে আয় ১৩০ কোটী

২৫ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ আগামী বর্ষে আয় বর্ত্তমান বর্ষ অপেক্ষা ১২৯ লক্ষ টাকা কম হইবে। লৌহশিল্পে সংরক্ষণ শুল্ক তুলিয়া দেওয়ার ফলে ৪২ লক্ষ টাকা এবং গত বৎসরের ঘোষণা অনুসারে অহিফেনের রপ্তানী হ্রাস করার ফলে উক্ত পরিমাণ টাকা কম আয় হইবে। আগামী বর্ষে আনুমানিক মোট ব্যয় হইবে ১২৫ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা। এই ব্যয়ের মধ্যে সমর বিভাগে মোট ব্যয় হইবে ৫৪ কোটী ৯২ লক্ষ টাকা। অর্থসচিব মহোদয় বলেন যে এই টাকার কমে সমর বিভাগ যথোপযুক্ত কার্য্যক্ষম রাখা সম্ভব নহে। ডাক ও তার বিভাগ এই নীতি অনুসারে পরিচালিত হয় যে, এই বিভাগ যেন সাধারণ করদাতাদের ভারস্বরূপ না হয়। সুতরাং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ বিভাগের আয় বৃদ্ধি না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মাশুল হ্রাস করা সম্ভবপর নহে। আগামী বর্ষে আনুমানিক উদ্বৃত্ত ৩৭০ লক্ষ টাকা। টাকার মূল্য ১৮ পেনী ধরিয়া এই অনুমান করা হইয়াছে। যদি ১৬ পেনী হার ধরা যায়, তবে ৫২৬ লক্ষ টাকা কম আয় হইবে; অর্থাৎ ১৫৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। অতঃপর অর্থ-সচিব মহোদয় ঘোষণা করেন যে, ট্যাক্স তদন্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে চর্ম্মের রপ্তানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইল, ফলে ৯ লক্ষ টাকা লোকসান হইবে। চায়ের উপর রপ্তানী কর তুলিয়া দেওয়ায় ৫০ লক্ষ টাকা লোকসান হইবে। কিন্তু চা কোম্পানীর আয়ের কর মোট আয়ের উপর শতকরা ২৫ টাকার স্থলে ৫০ টাকা করায় ৪৫ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। মোটর গাড়ীর উপর আমদানী শুল্ক মূল্যানুসারে শতকরা ৩০৲ টাকা স্থলে ২০৲ টাকা এবং টায়ারের মূল্যানুসারে শতকরা ৩০৲ টাকা স্থলে ২০৲ টাকা করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধে একটি উদীয়মান শিল্পের সাহায্যকল্পে রবারের বীজের আমদানী শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইল। উপস্থিত করা মাত্র পরিশোধনীয় চেক ও বিল অফ এক্সচেঞ্জের উপর ষ্ট্যাম্প ডিউটী আগামী জুলাই মাস হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। তামাকের উপর প্রতি পাউণ্ডে এক টাকার স্থলে দেড় টাকা করিয়া আমদানী কর ধার্য্য করা হইল। ইহাতে ১৮ লক্ষ টাকা লাভ হইবে। এই সমস্ত পরিবর্ত্তনের ফলে ৬ লক্ষ টাকা লোকসান হইবে। ফলে আগামী বর্ষের উদ্বৃত্ত টাকা হ্রাস পাইয়া ৩৬৪ লক্ষ টাকা হইবে। অর্থ-সচিব মহোদয় বলেন যে, এই উদ্বৃত্ত স্থায়ী। সাধারণ অবস্থায় ইহা প্রাদেশিক টাকা রেহাই করার জন্ত ব্যয়িত হওয়া কর্ত্তব্য। সমস্ত দেয় একেবারে রেহাই দিতে হইলে আরও ১৮১ লক্ষ টাকার আবশ্যক। বয়ন শুল্ক তুলিয়া না দিলে ঐ টাকাটা পাওয়া যাইত। কিন্তু বোম্বাই হইতে সাহায্যের আবেদন আসিয়াছে। ভারতসরকার অন্যান্য প্রদেশকে বঞ্চিত করিয়া বোম্বাইকে অনুগ্রহ করা সমীচীন মনে না করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান বর্ষের উদ্বৃত্ত টাকাটার কিয়দংশ ঋণ পরিশোধ কার্য্যে ব্যয় না করিয়া কেবল আগামী বর্ষের জন্ত বিভিন্ন প্রদেশের দেয় টাকা মকুব করিয়া দিবেন। প্রত্যেক প্রদেশে নিম্নলিখিতভাবে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে দেয় টাকা রেহাই দেওয়া হইয়াছে, যথা:— মাদ্রাজ ১১৬ এবং ৪৯ লক্ষ, বোম্বাই ১৯ এবং ৩৭ লক্ষ, বঙ্গদেশ ৯ এবং ৫৪ লক্ষ, যুক্তপ্রদেশ ৯৯ এবং ৫২ লক্ষ, পাঞ্জাব ৬০ এবং ২৬ লক্ষ, ব্রহ্মদেশ ৩১ এবং ১৯ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ৮ এবং ১৪ লক্ষ, আসাম ৮ এবং ৭ লক্ষ। কুর্গের ১২০০০৲ মকুব করা হইয়াছে। বোম্বাইকে বিশেষ করিয়া কেবল বর্ত্তমান বর্ষের জন্ত ২৮ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত সাহায্য করা হইয়াছে। এই ভাবে বিভিন্ন প্রদেশে মোট ৫৪৫ লক্ষ টাকা রেহাই দেওয়া হইয়াছে। এই টাকাটা প্রদেশসমূহ সংগঠন কার্য্যে ব্যয় করিতে পারিবে। বর্ত্তমান বর্ষের উদ্বৃত্ত টাকার অবশিষ্ট ১০১ লক্ষ টাকা স্বর্ণমান এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্ত মজুদ রাখা হইবে।

ভারত-গবর্ণমেণ্টের বজেটের কথা বলা হইল; এইবার বাঙ্গালার বজেটের কথা একটু বিস্তৃতভাবে বলিতে চাই। অন্ত বিষয়ের খরচের কথা উল্লেখ না করিয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি-বিভাগের ব্যয়ের কথাই আমরা উল্লেখ করিব।

শিক্ষার জন্য ব্যয়

সংরক্ষিত বিভাগ	১৪,৫৬,০০০৲
হস্তান্তরিত বিভাগ	১,২৫,৯৭,০০০৲
মোট	১,৪০,৫৩,০০০৲

নূতন কার্য্যের তালিকা

সংরক্ষিত বিভাগ—কারসিয়ংস্থিত ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কুল ও ডৌ হিল গার্লস স্কুলের বিবিধ কার্য্যের জন্ত ৫ হাজার টাকা।

হস্তান্তরিত বিভাগ।—জগন্নাথ ইণ্টার মিডিয়েট কলেজ ও হোষ্টেল, ঢাকা মাদ্রাসা, ঢাকা ডফারিণ হোষ্টেল—ইহাদের জন্ম ময়লা জল নিকাশের বন্দোবস্ত ৩৬,০০০৲

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রাঙ্গণের উন্নতির জন্ম ৫৯,০০০৲

রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপালের বাসস্থান নির্ম্মাণের জন্ম ২৫,০০০৲

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের আর্টস্ লাইব্রেরীর উন্নতির জন্ম ২৪,০০০৲

ভোলা গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের স্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ ৪০,০০০৲

জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের হিন্দু ছাত্রদের জন্ম হোষ্টেল নির্ম্মাণ ১৯,০০০৲

যে সকল কার্য্য চলিতেছে তাহার তালিকা

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের পরিসর বৃদ্ধির জন্ম জায়গা খরিদ ১,৫৪,০০০৲

ঢাকা ইণ্টার মিডিয়েট কলেজকে নূতন গবর্ণমেণ্ট হাউসে লইয়া যাওয়া ৮,০০০৲

চট্টগ্রাম কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্ম হোষ্টেল নির্ম্মাণ ১৬,০০০৲

কৃষ্ণনগর কলেজের জন্ম হিন্দু হোষ্টেল নির্ম্মাণ ২১০০০৲

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের জন্ম নূতন গৃহ নির্ম্মাণ ৫২,০০০৲

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলের স্থায়ী গৃহের জন্ম ১৭,০০০৲

ঢাকা আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের হোষ্টেল নির্ম্মাণ ২,০০,০০০৲

মেদিনীপুর, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, হাবড়া, যশোহর, খুলনা ও কাটোয়া এই সকল স্থানে গুরুট্রেণিং স্কুল স্থাপন ৬০,০০০৲

অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের জন্ম ৪৫,০০০৲

আগামী বৎসরে কলেজের প্রফেসারগণের বেতন বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ১৯২৬-২৭ সালের সংশোধিত হিসাবের অপেক্ষা ১,৯৪,০০০ টাকা বেশী বরাদ্দ হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্ম যে টাকা বরাদ্দ হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের মঞ্জুরী টাকা অপেক্ষা ৩৩৭,০০০ টাকা বেশী। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাবতে ১৯২৭-২৮ সালের বজেটে ১০,৩৮,০০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরী ৩,৫৮,০০০ টাকা; ইসলাম সাহিত্য অধ্যাপনার জন্ম ৮,০০০ টাকা; ছাত্রদের সংবাদ পরিষদের জন্ম ২,৮৫৬ টাকা; অনুন্নত শ্রেণীর ছাত্রদের হোষ্টেলের জন্ম ৩,০০০ টাকা; মেসসমূহ তত্ত্বাবধানের জন্ম ১৩,১২৮ টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরী ৫,৫০,০০০ টাকা, তথাকার ছাত্রদের সংবাদ পরিষদের জন্ম ৩,০৪৬ টাকা। ময়লা জল নিঃসারণের ও মোসলেম হলের জন্ম প্রাথমিক মঞ্জুরী ১ লক্ষ টাকা।

চিকিৎসার জন্য ব্যয়

মোট ৫৬,৯৮,০০০ টাকা।

নূতন কার্য্যের তালিকা

ঢাকা মেডিকেল স্কুলের গৃহ পরিবর্ত্তন ও মেরামতাদির জন্ম ২৫,০০০৲

জল ও গ্যাসের বন্দোবস্ত ১৩,০০০৲

বর্দ্ধমানের সিবিল সার্জ্জনের বাসস্থান ৪০,০০০৲

ক্যাম্পবেল হাসপাতালের নার্সগণের বাসগৃহের দোতালা নির্ম্মাণ ৯৯,০০০৲

যে সকল কাজ চলিতেছে তাহার তালিকা

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে ময়নামুখ নামক স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ৭,০০০৲

হাসপাতাল ও ডিস্পেন্সারী সমূহের জন্ম ১৯২৬-২৭ সালের সংশোধিত হিসাব অনুসারে ৪,৪৮,০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল। ১৯২৭-২৮ সালে তাহা কমাইয়া ৪ লক্ষ টাকা হইয়াছে। দাই ট্রেণিংএর জন্ম ১৯২৭-২৮ সালে ১১,৫০০ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই টাকার পরিমাণ ১৯২৬-২৭ সালের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ৫০০ টাকা কম। কলিকাতা হাসপাতাল নার্সদিগের ইনষ্টিটিউটের জন্ম এক লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের ব্যয়

মোট ৩৩,২৯,০০০ টাকা।

নূতন কার্য্যের তালিকা

টীকার বীজ রক্ষা করিবার যন্ত্র স্থাপন	১৮,০০০৲

স্বাস্থ্যবিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়ে ১৯২৭-২৮ সালে খরচের বরাদ্দ হইয়াছে—

শিলিগুড়ী সরকারী মহালে ইন্দারা খনন	৩,০০০৲
দার্জ্জিলিং পাবলিক্ হেল্থ লেবরেটরী	২,০০০৲
দার্জ্জিলিং জেলাবোর্ডের বর্দ্ধিত মঞ্জুরী	৯,০০০৲
হেষ্টিংসে স্বাস্থ্যোন্নতি ব্যবস্থার জন্য	৫,০০০৲
মুর্শিদাবাদ ময়লা নিঃসারণের জন্য	৪,০০০৲
বিনা খরচে টীকা দিবার জন্য জেলাবোর্ড প্রভৃতি	৫০,০০০৲
কলিকাতার চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের জলনিঃসারণের জন্য	৪৫,০০০৲
পল্লীগ্রামের পানীয় জলের সরবরাহের জন্য	২,৫০,০০০৲
প্রসূতি ও শিশুমঙ্গলের জন্য	৩০,০০০৲
জেলাবোর্ডসমূহের বর্দ্ধিত মঞ্জুরী	৯,০০,০০০৲
জেলাসমুহে স্বাস্থ্য সংগঠনার্থ	৩০০,০০০৲
টীকার জন্য বর্দ্ধমান জেলাবোর্ড	৪,০০০৲
নৈহাটী জলের কলে	৪৯,০০০৲
চাঁদপুর জলের কলে	২০,০০০৲
পাবনা জল সরবাহের জন্য	৭০,০০০৲
খুলনায় জল সরবরাহের জন্য	২০,০০০৲
টীকা পরিদর্শক কর্ম্মচারীদের জন্য (বর্দ্ধমান ব্যতীত) সমস্ত জেলাবোর্ড	৬২,০০০৲
সিউড়ী পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্ত	১০,০০০৲
ফরিদপুর পানীয় জল সরবরাহের জন্য	৪৮,০০০৲
তমুলক পানীয় জল সরবরাহের জন্য	৭,০০০৲
নারায়ণগঞ্জ জলের কলের পরিসর বৃদ্ধির জন্য	১,০০,০০০৲
আসানসোল জল সরবরাহের বন্দোবস্ত	৭৫,০০০৲

সংক্রামক ব্যাধির সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট বজেটে নিম্নলিখিত-রূপে ব্যবস্থা করিয়াছেন :—

কুইনাইনের জন্য বরাদ্দ	১,২০,০০০৲
ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে	৮০,০০০৲
কালাজ্বর নিবারণার্থ	১,৯০,০০০৲

কৃষি বিভাগের ব্যয়

মোট ২৩,৬৩,০০০৲ টাকা

নূতন কার্য্যের তালিকা

ঢাকা কৃষি বিদ্যালয়ে গৃহাদি নির্ম্মাণ	২৭,০০০৲

যে সকল কার্য্য চলিতেছে তাহার তালিকা

মালদহে কৃষি গোলা তৈয়ারী	১,০০০৲
ঢাকা কৃষি গোলায় বিদ্যুতের আলোক ইত্যাদি স্থাপন	৫,০০০৲
পূর্ব্ব সার্কেলের কৃষির ডিপুটী ডাইরেক্টরের আফিস নির্ম্মাণ	৩,০০০৲
কৃষ্ণনগর কৃষি গোলায় গৃহাদি নির্ম্মাণ	২০,০০০৲
ঢাকা কৃষি গোলায় একটী নলকূপ খনন	১৩,০০০৲
বেলগাছিয়া বেঙ্গল ভেটারিনারী কলেজের প্রিন্সিপালের বাসগৃহ নির্ম্মাণ	১২,০০০৲
অপরাপর ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য	২১,০০০৲

একজন কৃষি বিষয়ক ইঞ্জীনিয়ার নিযুক্ত করিবার জন্য ৪০,৮০৪ টাকা ও মধ্য ও উচ্চ ইংরাজী স্কুলে কৃষি শিক্ষার প্রচলনের জন্য ৫৮৩০ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে।

শিল্প ও ব্যবসায় বিভাগের ব্যয়

মোট ১২,৯৩,০০০৲ টাকা

নূতন কার্য্যের তালিকা

শ্রীরামপুর বয়ন বিদ্যালয়ের জন্য অতিরিক্ত গৃহ নির্ম্মাণ	৩০,০০০৲

যে কার্য্য চলিতেছে তাহার তালিকা

ঢাকাতে একটী বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা	১৪,০০০৲
কুমিল্লা ময়নামতীতে সার্ভে স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ	৩০,০০০৲
আসানসোলে খনি বিদ্যার শিক্ষকের গৃহ নির্ম্মাণ	১২,০০০৲
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের জন্য	৬,০০০৲

উপরি উক্ত বজেট আলোচনায় দেখা যাইতেছে গবর্ণমেণ্ট আগামী বৎসর শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য ও কৃষি প্রভৃতি বিভাগে যত টাকা খরচের বরাদ্দ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বত্র সন্তোষজনক হয় নাই। পল্লীগ্রামের দাইদের শিক্ষার জন্য মাত্র ১১৫০০৲ অথচ কলিকাতা হাসপাতালের নার্সগণের ইনষ্টিটিউটের জন্য

একলক্ষ টাকা খরচ ধরা হইয়াছে। প্রসূতি ও শিশুমঙ্গলের টাকার পরিমাণও অতিশয় অল্প। মফঃস্বল সহরের জল সরবরাহের জন্ত যে টাকার বরাদ্দ হইয়াছে তাহার পরিমাণ কম। সমস্ত বঙ্গদেশে জল সরবরাহের জন্ত আড়াই লক্ষ টাকায় কিছুই হইবে না। কৃষির উন্নতির জন্ত যেসকল কার্য্যের উপর খরচ ধরা হইয়াছে, তাহা কেবল উচ্চ কর্ম্মচারীদের বাস-গৃহাদি নির্ম্মাণেই শেষ হইবে। যাহাতে কৃষিকার্য্যের যথার্থ উন্নতি হয় এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান বজেটে উল্লিখিত হয় নাই।

১৯২৭ ২৮ সালের বজেটে পুলিশের দরুণ মোট খরচ ধরা হইয়াছে ১,৮৮,৮৭০০০ টাকা। ইহার মধ্যে অনেক অতিরিক্ত ও নিষ্প্রয়োজন খরচ আছে;—আমরা তন্মধ্যে কয়েকটী মাত্র উল্লেখ করিতেছি,—

কলিকাতা ও বেঙ্গল পুলিশ ফৌজ বৃদ্ধি করণ	৭৩,০০০৲
কলিকাতায় সশস্ত্র পুলিশের ৪র্থ দল গঠন করা	৩৮,০০০৲
সাবইনস্পেক্টার ও বেঙ্গল পুলিশের কর্ম্মচারীদের ঘর ভাড়া	৩৪,০০০৲
লালবাজার থানায় বিবাহিত পুলিশ কর্ম্মচারীদের বাসস্থান নির্ম্মাণ	১,৫০,০০০৲
কপালীটোলায় (কলিকাতা) বিবাহিত পুলিশ সার্জ্জেণ্টদের বাসস্থান নির্ম্মাণ	১,০০,০০০৲
পল্তায় (২৪পরগণা) পুলিশ বিল্ডিং তৈয়ারী	১০,০০০৲

গবর্ণমেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর ফলে দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অশান্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। তার জন্ত হস্তান্তরিত বিভাগের অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে টাকা আনিয়া পুলিশের খরচ জোগাইতে হইবে এমন কথনও হইতে পারে না।

* * * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত কনভোকেশনে নব-নিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার সি-আই-ই মহোদয় বেশ একটী মর্ম্মস্পর্শী অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ঘরোয়া কথার আলোচনার পর সমাগত উপাধিপ্রার্থী ছাত্র-সমাজকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদিগের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকটি সুমধুর উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কৃতবিদ্য ছাত্রগণের জাতীয় জীবনের মূল মন্ত্র কি,—ভাইস-চ্যান্সেলার মহোদয় বেশ সুস্পষ্ট ভাষায় তাহাই বিবৃত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া সেই শিক্ষা কর্ম্ম-জীবনে কি ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে—তিনি তাহার নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে একটী সাধারণ চিন্তাধারার সূত্র রহিয়াছে, অধ্যাপক সরকার মহোদয় ছাত্র-গণকে তাহার সন্ধান করিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আধুনিক বিজ্ঞান বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, এবং তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রও স্বতন্ত্র। তথাপি তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সনাতন নিয়ম বর্ত্তমান, যাহা বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যেই এক ও সাধারণ। সেইরূপ, বৈজ্ঞানিক সত্যগুলিও সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে এক এবং সাধারণ ভাবেই সর্ব্বজনমান্ত। একটী দেশের জাতীয় জীবনেও সেইরূপ একটী সাধারণ চিন্তাধারা প্রবাহিত। ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বর্ণ, জাতির হিসাবে পরস্পরের মধ্যে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, তাহার মধ্যেই যে একটী ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইয়া থাকে, শিক্ষার দ্বারা তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিয়া কার্য্য করিলেই জাতি তাহার জীবন-পথে জয়-যাত্রা করিয়া লক্ষ্য স্থলে পৌঁছিতে পারে। রোম এক সময়ে এই ধারার অনুসরণ করিয়া চলিয়া পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। গ্রেট বৃটেনও আজ সেই একই পথের পথিক। তাই গ্রেট বৃটেনও আজ এই কারণেই পৃথিবীর ঈশ্বর। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া সেই একই লক্ষ্যের সাধনা ছাত্র সমাজের আদর্শ হউক। তাহাতেই জাতির অবধারিত মুক্তি।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত উপন্যাস অভিশপ্ত-সাধনা—৩৲

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস প্রেমময়ী—১৸৹

জনৈক লেখক প্রণীত উপন্যাস মধুচক্র—২৲

শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত সরল যোগসাধনা—২৸৹

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত প্রণীত বাঁকা-লেখা—২৲

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত নাটক পঞ্চবটী—১।৹

শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত গল্পপুস্তক দুলালী—১৲

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
Of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

যৌবন-স্বপ্ন

চিত্রাধিকারী—রায় কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর

শিল্পী—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works.

বৈশাখ, ১৩৩৪

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

দেব-নির্ম্মাণ

পরশুরাম

চাই বাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তজনত্রাতা,
নাহি চাই নির্ব্বিকার অবোধ্য বিধাতা—
গুণহীন পরমাত্মা, যাঁরে তর্কপটু দার্শনিক জ্ঞানী
ধরিতে ছুঁইতে নাহি পারে, তবু লয়ে করে টানাটানি।
চাই দেব হেন শক্তিমান যাঁর সনে চলে কারবার,
বিপদে সম্পদে বারবার যাঁর কাছে চলে আবদার—
অশুভ যা কিছু ফিরে নাও,
শুভ যত আছে সব দাও,
তাহার উপরে কিছু ফাও
আরো দাও মোরে আরো দাও।

ভূলোকে দ্যুলোকে তাই করিনু সন্ধান
কোথায় দেবতা যিনি বহুশক্তিমান।
জলে স্থলে মেঘলোকে নভে বিশ্বদেব তোমারে সম্ভাষি
হে অনল-সলিল-বিহারী, হে ওষধি-বনস্পতিবাসী,—
বধিয়াছি অগণিত পশু মন্ত্রপূত যজ্ঞবেদীপরে
ঢালিয়াছি হবির আহুতি, অগ্নিশিখা উঠিল অম্বরে,
দাও পুত্র ধন ধান্য ধেনু, দাও ব্রীহি শস্যের সম্ভার,
দূর কর অমঙ্গল-ভয়, শত্রু মোর কর হে সংহার,

কৃষ্ণধূমে দৃষ্টি হয় নাশ,
সোমপানে আসিল জড়তা,
মেদগন্ধে না পড়ে নিঃশ্বাস,
দেখা দাও যজ্ঞের দেবতা।
কোথা ওহে বিশ্বদেবগণ ?
হা বধির, হা রে অচেতন।

হে অদৃশ্য দেব, এই মুক্তাকাশ তলে
ধরা নাহি দিবে তুমি মোর মন্ত্রবলে।
গড়িয়াছি বিপুল আয়াসে অভ্রভেদী তব নিকেতন,
পত্র পুষ্প ফল জল দিয়া করিয়াছি অর্ঘ্য নিবেদন,
রচিয়াছি বিশ্বরচয়িতা দৃশ্যমান তব কলেবর
ধাতু শিলা কর্দ্দমপ্রলেপে সুগঠিত মূরতি সুন্দর,
মণিময় নানা আভরণে সাজায়েছি বিগ্রহ তোমার,—
ওহে স্রষ্টা তব সৃষ্টি মম, লও পূজা দাও পুরস্কার।
আর যদি ওহে নিরাকার, নাহি চাও মূরতি সুঠাম,
আছে ঐ অবয়বহীন সুবর্ত্তুল শিলা শালগ্রাম।

যেথা ইচ্ছা কর অধিষ্ঠান,
ধর ধর অর্ঘ্য উপহার,
কথা কও ওহে মূর্ত্তিমান
মনোবাঞ্ছা পূরাও আমার!—
হা রে মূক জড় ভগবান,
হা বিমুখ অচল পাষাণ!

বুঝিয়াছি হে দ্যুলোকবাসী ভগবান,
মূরতি পূজায় শুধু তব অপমান।
নররূপী তব দূত মুখে পাইয়াছি বার্ত্তা অভিনব
মানবেরে করেছি দেবতা, দেবতারে করেছি মানব।
সব কথা নারিনু বুঝিতে, এই টুকু বুঝিয়াছি প্রভু—
নিজস্ব মোদের তুমি শুধু, অপরের নহ তুমি কভু।
ত্রাণ কর সন্তানে তোমার—স্বর্গলোকবাসী হে জনক,
প্রতিবেশী পাপীজন তরে দাও প্রভু অনন্ত নরক।

বীর যত তোমার সন্ততি
শত্রু নাশি' করিছে উল্লাস,
জয় জয় প্রভু গোষ্ঠিপতি—
এ কি দেব, এ কি পরিহাস ?
ভ্রাতা বধ করিছে ভ্রাতায়,
তব রাজ্য রসাতলে যায়।

শুনিব না কোনো কথা অপরে যা কয়,
বিশ্বাসে তোমারে আমি লভিব নিশ্চয়।
তুমি সর্ব্বগুণের আধার, হে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান,
তুমি সর্ব্বভয়পরিত্রাতা, হে অপার করুণানিধান।
পাইয়াছি তোমারি দয়ায় ধরাতলে ভাল কিছু যাহা,
অমঙ্গল যা কিছু দিয়েছ আমারি উন্নতি তরে তাহা—
সে কেবল তব লীলাখেলা, অথবা সে মোর কর্ম্মফল।
হে ঈশ্বর, নাহি কি হে তব আর কোনো উপায় সরল ?
সোজাসুজি কর না উদ্ধার যদি তুমি এত শক্তিমান।
ওহে শুষ্ক বাঞ্ছাকল্পতরু গৃহস্থের পোষ্য ভগবান,
ভক্তি চায় ধরিতে তোমারে, যুক্তি কাটে তোমার বন্ধন,
হায় প্রভু, টিকিলে না তুমি, আবাহনে হ'ল নিরঞ্জন।
হে অক্ষম ভয়-পরিত্রাতা, হে অথর্ব্ব নিয়মের দাস,
হে দুর্ব্বল মহাকারুণিক, হে নিষ্ঠুর শক্তির বিকাশ,
হে কৃত্রিম মানস-বিগ্রহ,
হে নরের বাঞ্ছিত বিধান,

এক চক্ষু মুদি অহরহ
কেমনে করিব তব ধ্যান?

হে বিধাতা, পার নাই গড়িতে ঈশ্বর,
ফেলিয়াছ এই ভার আমার উপর।
অতি দীন আয়োজন মোর, তবু নাহি মানি পরাভব,
যুগে যুগে তিল তিল করি' অসম্ভবে করিব সম্ভব।
হে অব্যয়, কর কিছু ব্যয়, দাও মোরে শ্রেষ্ঠ উপাদান—
মন প্রাণ, ধৈর্য্য নিরবধি, যথাসাধ্য করিব নির্ম্মাণ।
আপনার সমস্ত অভাব দেবতায় চাই মিটাইতে,
সুন্দর যা কিছু আছে যেথা দেবতায় চাই ফুটাইতে।
অঙ্গে তার দিতেছি লেপিয়া শ্রেয় প্রেয় কামনা আমার,
দেবোত্তম রচিবার ছলে নরোত্তমে দিতেছি আকার।
এখনো অনেক ত্রুটি আছে, কেমনে সে দিবে ইষ্টফল?
তবু আশা আছে ক্রমে হবে অনবদ্য সুন্দর সবল।
অখণ্ড সে মানসবিগ্রহ, খণ্ড তার হেরেছি নয়নে
নানা পাত্রে, নানা দেশে কালে; নমি সেই খণ্ড-নারায়ণে।

সর্ব্বশক্তি নাহি থাক তার,
তথাপি সে বহুশক্তিমান।
না পারুক করিতে উদ্ধার,
তথাপি সে করুণানিধান।
এখনো সে বহুধা খণ্ডিত,
তবু মহা মহিমামণ্ডিত।
নাহি হোক সর্ব্বফলদাতা,
তবু তারে কহিব দেবতা।

বৈষ্ণব-দর্শন

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ভগবান হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া ইহা ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, জগতের প্রতি অণুপরমাণু ভগবানের আয়ত্ত এবং ভগবানের দ্বারা পরিচালিত; ভগবান জ্ঞানস্বরূপ; তাঁহার সমান বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন বস্তু নাই; তিনি ব্যতীত আর কোন বস্তুরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই,—এই সকল কথা হিন্দুধর্ম্মের সকল সম্প্রদায়ই স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল কথা শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"

যাঁহা হইতে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে,

"সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"

জগতে যাহা কিছু আছে সকলই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন

"তৎসৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ"

এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অণুপ্রবেশ করিলেন

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্"

এই সকলই ব্রহ্ম—সকল বস্তুই তাঁহা হইতে উৎপন্ন (তজ্জ) হয়, (প্রলয়ের সময়) তাঁহাতেই বিলীন হয় (তল্ল) এবং (প্রলয়ের পূর্ব্বে) তাঁহাতেই অবস্থান করে (তদন)

"ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"

তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই দেখা যায় না

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"

ব্রহ্ম সত্য, তিনি জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত

এই সকলই শ্রুতিবাক্য—অতএব সকল হিন্দুরই স্বীকার্য্য। কিন্তু এই বিষয়গুলিতে সকল সম্প্রদায় একমত হইলেও অপর কতকগুলি বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা যায়। ব্রহ্ম বা ভগবান কি জীব হইতে ভিন্ন? ভগবানের স্বরূপ নির্বিশেষ না সবিশেষ, নির্গুণ না সগুণ? ভগবানকে লাভ করিলে জীবের কিরূপ অবস্থা হয়?—তখন জীব কি ভগবানের সহিত এক হইয়া যায়, কিম্বা তখনও ভগবান জীব হইতে পৃথক ভাবে অবস্থান করেন? ভগবানকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায় কি? জীব এবং জগতের প্রকৃত কোন অস্তিত্ব আছে, না, ইহারা কেবল মাত্র মনের ভ্রম?—এই সকল বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত করা যায়। এক দলের মত—ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন নহেন; ব্রহ্ম নির্গুণ, নির্বিশেষ। ব্রহ্মকে লাভ করিলে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায়, কোনরূপ প্রভেদ থাকে না। মোক্ষ লাভ করিবার উপায় হইতেছে—"জীব ও ব্রহ্ম এক" "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অনবরত চিন্তা করা। যাঁহারা জ্ঞান বা যোগমার্গ অবলম্বন করেন তাঁহাদের এই মত। শাক্তদিগের মতও এইরূপ। অপর দলের মত—ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। ভগবানকে লাভ করিলে জীব ভগবানের সহিত এক হইয়া যায় না; ব্রহ্ম বা ভগবানের উপাসনা করা, তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ডাকাই তাঁহাকে লাভ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক, তাঁহাদের এই মত। প্রথম দলের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক শঙ্করাচার্য্য। দ্বিতীয় দলের মধ্যে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য এবং শ্রীচৈতন্য অত্যুজ্জ্বল রত্নস্বরূপ। এই দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। রামানুজ-প্রচারিত মতাবলম্বিগণ শ্রীবৈষ্ণব নামে পরিচিত; মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায় দ্বৈতবাদী; এবং শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত মতাবলম্বী গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচিত। রূপ, সনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি পণ্ডিতগণ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত সমূহের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

শ্রুতি ব্রহ্মকে কোথাও নির্বিশেষ, আবার কোথাও সবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন,—যে শ্রুতিবাক্যগুলি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই শ্রুতিবাক্যগুলিই ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রতিপাদন

করেন; এবং যে শ্রুতিবাক্যগুলি ব্রহ্মকে সবিশেষ এবং সগুণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সেই বাক্যগুলি ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ যথার্থ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করেন না, মায়াযুক্ত ব্রহ্মকে বর্ণনা করেন। মায়াযুক্ত ব্রহ্মই ঈশ্বর বা ভগবান। ঈশ্বর বা ভগবান ব্রহ্ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট তত্ত্ব, কারণ ঈশ্বর বা ভগবানের সহিত মায়ার সংশ্রব আছে। ব্রহ্মের যে যথার্থ স্বরূপ, যাহার সহিত মায়ার কোন সংশ্রব নাই, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। বৈষ্ণব বলেন—ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি দুই-ই এক বস্তু; ব্রহ্মের শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্ম কখনও থাকেন না। শক্তিযুক্ত যে ব্রহ্মের স্বরূপ ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, ইহারই নাম ভগবান। ব্রহ্মের যে নির্বিশেষ অভিব্যক্তি তাহা অপকৃষ্ট তত্ত্ব; এই নির্বিশেষ অভিব্যক্তিকে ভগবানের অঙ্গকান্তি বলিয়া বৈষ্ণবেরা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভগবান যে কেবলমাত্র সবিশেষ তাহা নহে, তাঁহার বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ আছে; কিন্তু সে দেহ পার্থিব পদার্থের সমষ্টি নহে; তাহা চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং নিত্য। জগতে যে সকল পদার্থ আমরা দেখিতে পাই সে সকল পদার্থ মায়ার সৃষ্টি; তাহারা স্থূল, এবং অনিত্য। কিন্তু ভগবানের ধামে মায়ার কোন অধিকার নাই: সেখানে সকলই চিন্ময় এবং নিত্য। কেবল যে ভগবানের দেহ চিন্ময় এবং নিত্য তাহা নহে। ভগবানের ধামে যাঁহারা থাকেন, যাঁহাদিগকে লইয়া ভগবান লীলা করেন, তাঁহারা সকলেই নিত্য। এবং সেখানকার লীলার বস্তুগুলিও নিত্য। সেখানকার ফলফুল, বাতাস জল সকলই নিত্য এবং চিন্ময়। ভগবান সর্বশক্তিমান। তাঁহার ইচ্ছায় এই সকল বস্তু নিত্য হইবে ইহা বিচিত্র কি?

বৈষ্ণব-দর্শনের সিদ্ধান্ত শ্রুতি এবং পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতির কোন কথা বৈষ্ণবেরা অগ্রাহ্য করেন নাই। শ্রুতিতে যে সকল কথা আছে তাহা ব্যতীত স্মৃতি ও পুরাণে অনেক নূতন কথা আছে। এই সকল স্মৃতি ও পুরাণ সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের রচনা। এজন্য এগুলিও হিন্দুর পক্ষে প্রামাণিক। কেবল যেখানে শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় সেখানে স্মৃতি ও পুরাণ প্রামাণিক নহে। যেখানে শ্রুতির সহিত বিরোধ নাই, সেখানে স্মৃতি ও পুরাণের উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই এ বিষয়ে একমত। শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদিত তত্ত্বগুলির সমর্থন করিবার জন্য অনেক স্থলে স্মৃতি এবং পুরাণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব বৈষ্ণব দর্শনের কতকগুলি সিদ্ধান্ত স্মৃতি এবং পুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করা যায় না।

জগৎ-সৃষ্টি সম্বন্ধে শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা মোটামুটি এই—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কোনও স্বতন্ত্র উপাদান হইতে জগৎ সৃষ্ট হয় নাই। ঈশ্বরই জগতের উপাদান; ঈশ্বরই জগতের কর্ত্তা। এজন্য প্রলয়ের সময় জগৎ ঈশ্বরের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। তখন ঈশ্বরই থাকেন, আর কিছুই থাকে না। এইরূপে ঈশ্বর একবার জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, আবার জগতের প্রলয় করিতেছেন। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিয়া আসিতেছে—সৃষ্টি এবং জগৎ অনাদি। সৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—ঈশ্বর প্রথমে আকাশ সৃষ্টি করেন, আকাশের পর বায়ু, বায়ুর পর অগ্নি, অগ্নির পর জল, জলের পর ক্ষিতি। তাহার পর অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহের সৃষ্টি হয়। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ প্রভৃতি সাতটি উর্দ্ধ লোক; অতল, বিতল প্রভৃতি সাতটি অধোলোক; জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি চারি প্রকার জীবের দেহ;—এই সকল ক্রমশঃ সৃষ্টি হয়। বৈষ্ণব দর্শনে এ সকল কথাই স্বীকার করা হইয়াছে। অধিকন্তু স্মৃতি ও পুরাণ হইতে সৃষ্টি সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন তত্ত্ব ইহার সহিত সংযোজিত করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন "পাদস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অর্থাৎ এই বিশ্ব-জগৎ এবং জীবনসমূহ ঈশ্বরের এক পাদ বা এক চতুর্থ অংশ; তাঁহার অপর তিন পাদ অমৃত স্বরূপ, উহা দ্যুলোকে অবস্থান করে। এই তিনপাদ যে কি, তাহার বিশেষ বিবরণ শ্রুতিতে পাওয়া যায় না। বৈষ্ণব-দর্শনে ঈশ্বরের এই তিন পাদকে পরব্যোম বলা হইয়াছে। ইহা নিত্য, অর্থাৎ চিরস্থায়ী বস্তু; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন ইহা "অমৃত স্বরূপ"। ইহা মায়ার রচনা নহে। ইহা ঈশ্বরের চিন্ময় বিভূতি—মায়ার সেখানে কোন প্রতিপত্তি নাই।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে এই বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের এক চতুর্থ অংশ মাত্র। এই বিশ্বজগতের মধ্যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আছে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ ৫০ কোটি যোজন। কিন্তু সকল ব্রহ্মাণ্ডের পরিমাণ সমান নহে। কোনটি ১০০ কোটি যোজন, কোনটি লক্ষ কোটি যোজন, কোনটি নিযুত কোটি, কোনটি কোটি কোটি। এই সকল

ব্রহ্মাণ্ড কত বিশাল তাহা বুঝাইবার জন্য শ্রীচৈতন্যদেব সনাতন গোস্বামীকে নিম্নলিখিত পৌরাণিক আখ্যায়িকাটি বলিয়াছিলেন। একদিন ব্রহ্মা কৃষ্ণকে দেখিবার জন্য দ্বারকায় গিয়াছিলেন। দ্বারপাল কৃষ্ণকে জানাইলেন, "ব্রহ্মা আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন।" শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী, কে আসিয়াছেন তাহা বিলক্ষণ জানিতেন; তথাপি ব্রহ্মাকে কিছু নূতন কথা শিখাইবার অভিপ্রায়ে দ্বারপালকে বলিলেন, "দ্বারপাল, তুমি তাঁহাকে বল যে আপনি কোন্ ব্রহ্মা, আপনার নাম কি—শ্রীকৃষ্ণ তাহা জানিতে চাহিয়াছেন।" দ্বারপাল ব্রহ্মার নিকট গিয়া তাহাই বলিল। ব্রহ্মা ত শুনিয়াই আশ্চর্য্য! ব্রহ্মা আবার কয়জন আছেন? তাহার আবার কি বলিয়া পরিচয় দিবেন? যাহা হউক, কিছু চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা বলিলেন, "দ্বারি, তুমি শ্রীকৃষ্ণকে বলিও যে সনকের পিতা চতুর্মুখ ব্রহ্মা আসিয়াছেন।" দ্বারী গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাহাই বলিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "তাঁহাকে লইয়া আইস।" ব্রহ্মা গিয়া দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও ব্রহ্মাকে যথোচিত মান্য দেখাইয়া বসিতে বলিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোন্ প্রয়োজনে আসিয়াছেন বলুন।" ব্রহ্মা বলিলেন, "তাহা পরে বলিব। প্রথমে আমার একটি সংশয় অনুগ্রহ করিয়া ছেদন করুন। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন 'আমি কোন্ ব্রহ্মা'। আমি ইহার অর্থ বুঝিলাম না। আমি ভিন্ন জগতে কি আর কোনও ব্রহ্মা আছেন?" শ্রীকৃষ্ণ একটু হাসিয়া বলিলেন, "আছেন। আপনি বসুন—এখনই তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন।" এই বলিয়া কৃষ্ণ ক্ষণকালের জন্য ধ্যান করিলেন। অমনি অসংখ্য ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহারও কুড়িটি মুখ, কাহারও একশত মুখ, কাহারও সহস্র মুখ, কাহারও অযুত, কাহারও লক্ষ, কাহারও কোটি। এইরূপ অসংখ্য শিব, অসংখ্য ইন্দ্রও উপস্থিত হইলেন। আমাদের চতুর্মুখ ব্রহ্মার ত চক্ষু স্থির। তিনি যে কত ক্ষুদ্র—আজ তাহা অনুভব করিলেন। যে সকল ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র প্রভৃতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া স্তব করিলেন, এবং বলিলেন, "প্রভো, আপনাকে দেখিয়া আমরা সকলে কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে বলুন কি আজ্ঞা।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "তোমাদিগকে একত্র দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই ডাকিয়াছিলাম। তোমরা সকলে সুখী হও। এক্ষণে সকলে নিজ নিজ স্থানে যাইতে পার।"

এক দিকে এই সকল অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অপর দিকে পরব্যোম; উভয়ের মধ্যে বিরজা নামে নদী আছে। পরব্যোমের দুই ভাগ। এক ভাগের নাম কৃষ্ণলোক; অপর ভাগের মধ্যে অনন্ত কোটি বৈকুণ্ঠ বিদ্যমান। কৃষ্ণলোকের তিন ভাগ—(১) গোলোক বা গোকুল (২) মথুরা (৩) দ্বারকা। গোকুলে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ যশোদা রাখালগণ শ্রীরাধিকা গোপীগণ এবং অন্য ব্রজবাসিগণের সহিত নিত্যলীলা করেন। মথুরায় মথুরা-লীলা এবং দ্বারকায় দ্বারকালীলা হয়। কৃষ্ণলোক এবং অনন্ত বৈকুণ্ঠ ইহারা সকলেই মায়াতীত এবং নিত্য।

বৈষ্ণব মতে শ্রীকৃষ্ণই ভগবানের স্বরূপ। ভগবানের অপর এক রূপ হইতেছেন বলরাম। ভগবান বলরামের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণ ও বলরাম একই বস্তু—কেবল রূপ ভেদ। ভগবান কৃষ্ণরূপে প্রধানতঃ মাধুর্য্য ভোগ করেন; বলরামরূপে প্রধানতঃ জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন। জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পৌরাণিক বৃত্তান্ত বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠের বাহিরে একটি সমুদ্র আছে। এই সমুদ্রের নাম কারণার্ণব। এই সমুদ্র প্রাকৃত বস্তু নহে। ইহার জল চিন্ময় এবং নিত্যপদার্থ। বলরাম মহাবিষ্ণু রূপ ধারণ করিয়া সেই কারণার্ণবে শয়ন করেন এবং জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কারণার্ণবের বাহিরে অবস্থিত মায়া বা প্রকৃতিকে 'ঈক্ষণ' করেন, অর্থাৎ মায়ার দিকে চাহিয়া দেখেন। তাঁহার ইচ্ছাতে মায়া অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করেন। মহাবিষ্ণুর প্রতি নিঃশ্বাসের সহিত এই সকল ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে প্রকাশিত হয়, আবার মহাবিষ্ণু যখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন তখন এই সকল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাতে বিলীন হইয়া যায়। গবাক্ষের রন্ধ্রের মধ্য দিয়া যেমন অসংখ্য ধূলিকণা ভিতর হইতে বাহিরে এবং বাহির হইতে ভিতরে যাতায়াত করে, সেইরূপ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের সহিত তাঁহার দেহের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাহিরে আসে।

মহাবিষ্ণু এইরূপে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক স্থান তিনি

নিজ স্বেদ জলে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন করেন। ভগবানের এই রূপের নাম গর্ভোদশায়ী। ইঁহার অপর নাম—হিরণ্যগর্ভ, বা সহস্রশীর্ষ। ইঁহার নাভি হইতে একটী পদ্ম উৎপন্ন হয়। ব্রহ্মা সেই নাভিপদ্মে জন্মগ্রহণ করিয়া চতুর্দশ ভুবন সৃষ্টি করেন।

নারায়ণের নাভিপদ্মে যে চতুর্দশ ভুবন উৎপন্ন হয় তাহার মধ্যে সপ্ত সমুদ্র থাকে। ক্ষীরোদ সমুদ্র তাহাদের মধ্যে একটি। এই ক্ষীরোদ সমুদ্রের মধ্যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান যে রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহার নাম ক্ষীরোদকশায়ী। ইনি জগৎ পালন করেন। অধিকন্তু ইনি প্রত্যেক জীবের মধ্যে অন্তর্যামীরূপে অবস্থান করেন। এজন্য ইঁহার অপর নাম অন্তর্যামী। ইনি বিভিন্ন মন্বন্তরে এবং বিভিন্ন যুগে অবতাররূপে আবিভূ্ত হন এবং ধর্ম সংস্থাপন এবং অধর্ম সংহার করেন। দেবগণ দৈত্য কর্তৃক পীড়িত হইলে ক্ষীরোদক-তীরে গিয়া ইঁহার স্তব করেন। তখন ইনি দেবগণকে দর্শন দেন।

হিন্দুধর্মে দেশের কল্পনা কি বিশাল, তাহা পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে। দেশের অনুরূপ কালের কল্পনাও চমৎকার। আমাদের যেমন ১২ ঘণ্টায় দিন, এবং ১২ ঘণ্টায় রাত্রি হয়, পিতৃপুরুষদের সেইরূপ এক কৃষ্ণপক্ষে এক দিন এবং এক শুক্লপক্ষে এক রাত্রি হয় (১)। উত্তরায়নের ছয় মাসে দেবতাদের এক দিন, দক্ষিণায়নের ছয় মাসে এক রাত্রি হয় (২)। আমাদের এক বৎসরে, দেবতাদের এক অহোরাত্র। অতএব আমাদের ৩৬৫ বৎসরে দেবতাদের এক বৎসর। দেবতাদের ৪০০০ বৎসরে এক সত্য যুগ হয়। প্রতি যুগের পূর্ববর্ত্তী কালকে সন্ধ্যা এবং উত্তরবর্ত্তী কালকে সন্ধ্যাংশ বলে। সত্যযুগের সন্ধ্যার পরিমাণ ৪০০ দৈব বৎসর; সন্ধ্যাংশেরও পরিমাণ তাহাই। ত্রেতাযুগের পরিমাণ ৩০০০ দৈব বৎসর; ত্রেতাযুগের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণ ৩০০ বৎসর করিয়া। দ্বাপর যুগের পরিমাণ ২০০০ দৈব বৎসর; ইহারও ২০০ বৎসর করিয়া দুই সন্ধ্যা। কলি-যুগের পরিমাণ ১০০০ দৈব বৎসর; ইহারও ১০০ বৎসর করিয়া দুই সন্ধ্যা। অতএব চারি যুগ এবং আট সন্ধ্যার মোট পরিমাণ এইরূপ

সত্যযুগে	৪০০০	দৈব বৎসর
সত্যযুগের দুই সন্ধ্যা	৮০০	”
ত্রেতাযুগ	৩০০০	”
ত্রেতাযুগের দুই সন্ধ্যা	৬০০	”
দ্বাপর যুগ	২০০০	”
দ্বাপরযুগের দুই সন্ধ্যা	৪০০	”
কলিযুগ	১০০০	”
কলিযুগের দুই সন্ধ্যা	২০০	”
মোট—	১২,০০০	”

অতএব ১২,০০০ দৈব বৎসরে, অর্থাৎ ১২,০০০ × ৩৬৫ মানব বৎসরে এক চতুর্যুগ হয়। ১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক দিবস হয়; ১০০০ চতুর্যুগে এক রাত্রি হয়। ব্রহ্মার এক দিবস পরিমাণ কাল সৃষ্টি থাকে; ব্রহ্মার রাত্রিকালে প্রলয় হয়, পুনরায় দিবসে সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার এক দিবসে চৌদ্দ মন্বন্তর—এক এক মন্বন্তর এক এক মনুর অধিকার।

এইবার একবার হিসাব করিয়া দেখা যাউক।

৩৬৫	মানব বৎসর =	১ দৈব বৎসর
১২,০০০	দৈব বৎসর =	১ চতুর্যুগ
১,০০০	চতুর্যুগ =	১ ব্রহ্মার দিন
৩৬৫	ব্রহ্মার দিন =	১ ব্রহ্মার বৎসর
১০০	ব্রহ্মার বৎসর =	ব্রহ্মার পরমায়ু

= মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাস পরিমাণ কাল।

প্রলয় দুই প্রকার। ব্রহ্মার রাত্রিকালে যে প্রলয় হয়, তাহাতে জগতের প্রলয় হয় কিন্তু ব্রহ্মা বিদ্যমান থাকেন। ইহা খণ্ড-প্রলয়। ব্রহ্মার পরমায়ুর অবসান হইলে যে প্রলয়

---

(১) আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারা জানেন যে চন্দ্র এক মাসে নিজ মেরুদণ্ডের (Axis) চারিদিকে ঘুরে। অতএব চন্দ্র-মণ্ডলে যদি কোন অধিবাসী থাকেন, তাঁহাদের এক মাসে এক অহোরাত্র হইবে। যাঁহারা পুণ্য কর্ম করেন তাঁহারা মৃত্যুর পর চন্দ্রলোকে গিয়া বাস করেন—ইহাও বেদান্তের সিদ্ধান্ত। অতএব পিতৃগণের এক মাসে এক অহোরাত্র হওয়া যুক্তিযুক্ত।

(২) মেরুর অধিবাসিগণের ছয় মাসে এক দিন, ছয় মাসে এক রাত্রি। দেবতাদের বাসস্থান স্বর্গভূমি কি মেরু প্রদেশে অবস্থিত?

হয়, তাহাতে ব্রহ্মাও বর্ত্তমান থাকেন না। ইহা মহাপ্রলয়।

ব্রহ্মার এক দিবস = ১০০০ চতুর্যুগ

= ১০০০ × ১২০০০ দৈব বৎসর

= ১০০০ × ১২০০০ × ৩৬৫ মানব বৎসর

= ৪৩৮ কোটি মানব বৎসর।

অতএব ৪৩৮ কোটি মানব বৎসর কাল সৃষ্টি বর্ত্তমান থাকে, তাহার পর খণ্ডপ্রলয় হয়।

ব্রহ্মার পরমায়ু = ১০০ ব্রহ্মার বৎসর

= ১০০ × ৩৬৫ ব্রহ্মার দিবস

= ১০০ × ৩৬৫ × ৪৩৮ কোটি মানব বৎসর

= ১৫৯৮৭০০০ কোটি মানব বৎসর

এই পরিমাণ কাল পরে মহাপ্রলয় হয়। এবং এই পরিমাণ কাল মহাবিষ্ণুর এক নিঃশ্বাসের সময়। মহাবিষ্ণু যখন নিঃশ্বাস গ্রহণ করেন তখন মহাপ্রলয় হইয়া যায়, তখন ব্রহ্মাও থাকেন না। তিনি যখন নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন সৃষ্টি হয়। মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাসের অবধি নাই। এখন অনুমান করুন—কাল কত বিশাল। এই বিশাল কাল এবং দেশের ধারণা করিতে পারে মানবের এরূপ ক্ষমতা নাই। তবে ইহা ধারণা করিতে চেষ্টা করিলে মানব বুঝিতে পারে—সে কত ক্ষুদ্র; তাহার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের জন্য সে কখনও অহঙ্কার করিতে পারে না।

বৃন্দাবনে, মথুরাতে এবং দ্বারকাতে শ্রীকৃষ্ণ যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, সে সকল লীলা নিত্য বলিয়া বৈষ্ণবেরা বিশ্বাস করেন। সংশয় হইতে পারে,—তাহা কিরূপে সম্ভব হইবে? বৃন্দাবন, মথুরা এবং দ্বারকা ত পৃথিবীর ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; এবং পৃথিবী একটী মাত্র অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্র অংশ! বৈষ্ণব গোস্বামীগণ এই সমস্যার এই ভাবে মীমাংসা করিয়াছেন—সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই স্বীকার করেন যে, ভগবান বিভু; অর্থাৎ ভগবান সকল স্থানে সকল সময়েই অবস্থান করেন। বৈষ্ণব-দর্শনের মতে ভগবান যেমন বিভু, তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধাম কৃষ্ণলোকও সেই প্রকার বিভু। অর্থাৎ ভগবানের বাসস্থান গোকুল, মথুরা এবং বৃন্দাবন সকল সময়ে সকল স্থানে বিদ্যমান থাকে। আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বত্রই সর্ব্বসময়েই ভগবানের নিত্যধাম অর্থাৎ কৃষ্ণলোক বিদ্যমান থাকে। কিন্তু মায়ার দ্বারা তাহা আবৃত থাকে, এ জন্য আমরা তাহা দেখিতে পাই না। ভগবানের যখন কোন এক স্থানে কৃষ্ণলোক প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি সেইখানে মায়ার প্রভাব অপসারিত করেন। তখন সেখানে কৃষ্ণলোকের প্রকাশ হয় এবং মানুষ চর্ম্মচক্ষেও তাঁহার নিত্যলীলা দর্শন করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ যখন আমাদের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন এইরূপে মায়ার আবরণ বিনষ্ট হইয়াছিল। দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে,—ভগবান, তাঁহার ধাম এবং লীলা দেশকালাতীত বা Transcendental.

অচল-পথের যাত্রী

শ্রীহরিধন মিত্র

নভঃপাতে, রবি লাল মসী দিয়া
লিখেছে বিদায়-লেখা,
সায়রের বুকে তরীখানি খুলে
মাঝি বে'য়ে যায় একা।
নীরব নিথর চারিদিক ভরা,
ছবির মতন নিশ্চল ধরা,
মাঝি যেন আজ কুহকে পেয়েছে
স্বপন-পুরীর দেখা!

এপারের তটে ডুবে যায় যায়
বন-বীথিকার সার
দূরের ওপারে কোথা কিছু নাহি
শুধু সাদা জলধার।

উপরে মুক্ত নভোমণ্ডল
সুনীল জলধি নীচে টলমল
তরী 'পরে বসে মাঝি যায় ভেসে
কোথা যাবে নাহি শেখা!

তবু তবু, মাঝি তরী বেয়ে যায়
কূল-হারা পার পানে,
যেন কা'র স্ফুট আশার বচন
পশেছে উহার কাণে!
সীমা-ছাড়া সেই সলিলের কোলে,
ওর প্রাণখানি হরষেতে দোলে,
ও যেন পেয়েছে সে অচল-পথে
কি এক কনক-রেখা!

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৪)

অনিলের স্বভাবটী বাস্তবিকই মধুর ছিল। তাহার কোথাও এতটুকু বাধিত না, অতি সহজেই সে লোকের সহিত গভীর আলাপ করিয়া লইতে পারিত; এবং লোকের মনে একটা ছাপ দিতে পারিত। তাহার মত মিশুক স্বভাব খুব কম ছেলেরই দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার এই আশ্চর্য্য স্বভাবের জন্যই সে জিতেন্দ্রনাথের পরিবারের মধ্যে অতি সহজে প্রবেশাধিকার পাইয়াছিল; এবং মজবুত আসন গড়িয়া লইয়াছিল।

বীথি এখানে আসিয়া যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। অনিলের এমন মধুর স্বভাব থাকা সত্ত্বেও সে কিছুতেই তাহাকে অন্তরের মধ্যে স্বামী রূপে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না, কোথায় যে তাহার বাধিয়া যাইতেছিল তাহা সেই জানে। বিবাহের দিন ঠিক হইয়া গিয়াছিল, নিমন্ত্রণ কার্ড বিতরণ আরম্ভ হইয়াছিল,—আপত্তি করিবার এমন কোন হেতু তাহার নাই, যাহা দর্শাইয়া সে এই আসন্ন বিবাহের হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারে।

না, সে অমত করিবে না, যথার্থই সে দিদিমার দুঃখের হেতু হইবে না। সে বুদ্ধিমতী, তাই ভাবিয়া দেখিল, সে যদি বিবাহের বিরুদ্ধে একটা কথা বলে, তবে দর্পিতা মায়া মাতাকে অপমান করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। বিবাহই যদি নারী-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে বিধাতার ইচ্ছা, মানুষের ইচ্ছা পূর্ণ হোক। অনিল কেন—পিতা মাতা যদি কন্যার জন্য নিকৃষ্ট একটা ছেলেকেও মনোনীত করিতেন, সে মানুষের উপর—বিধাতার উপর—রাগ করিয়া তাহারই হস্তে চির-জীবনের মত আপনাকে সমর্পণ করিয়া দিত।

অভিমানে হৃদয়খানা তাহার পূর্ণ হইয়া গেল,—দিদিমা সব জানিয়া শুনিয়াও অনায়াসে তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি একবার ভাবিয়া দেখিলেন না—সে কি ভাবে কেমন করিয়া তাহার জীবন-তরণীখানা সংসার-সমুদ্রে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে? সেদিন মায়া যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি একেবারেই মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন। যখন বীথি আসে, তখন তাহার স্কন্ধের উপর হাতখানা রাখিয়া বলিয়াছিলেন—"যাচ্ছিস—যা দিদি, আমি একেবারে তোর বিয়ের দিনে যাব, তোর মাকে বলে দিস।"

মনের এই পুঞ্জীভূত বেদনার কতকটা সে প্রকাশ করিল ঠাকুরদাকে যে পত্রখানা লিখিল তাহার মধ্যে। আজ সে জোর করিয়া সকলের কাছ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। আজ সে জগতের মধ্যে ঠাকুরদা ভিন্ন আর কাহাকেও আপনার বলিয়া ভাবিতে পারিতেছিল না। তাহার দিদিমা, মা, সবাই আজ তাহার পর।

পত্রের উত্তর আসিতেই সে কভারখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পড়িয়া ফেলিল। উপেন্দ্রনাথ তাহার বিবাহের কথা শুনিয়া লিখিয়াছেন—

"দিদিমণি, দুঃখ করো না, কষ্টকে কাছে এগুতে দিয়ো না। জানো না সে একটা ভীষণ রাক্ষস, একবার তোমার বুকের রক্তের আস্বাদ পেলে আর তোমায় ছাড়বে না। তোমার মধ্যে সার পদার্থ যা আছে সবটুকু চুষে খেয়ে ফেলে তোমায় একেবারে ব্যর্থ মানুষ করে ছেড়ে দেবে। প্রথম হতে বিশ্বাস রাখ—এ সবই ভগবানের দান। তাঁর দেওয়া বস্তু অবশ্যই তোমায় মাথা পেতে নিতে হবে, না বলতে পারবে না। মনে সন্তোষ জাগাও দিদিমণি, আনন্দকে জাগিয়ে রাখো, কেবল ভাবো—হে প্রভু, তুমি করাচ্ছ আমি করছি। আমি কিছু নই, আমি উপলক্ষ্য মাত্র। যদি এই কথাটা ঠিক করে মনে রাখতে পারো দিদিমণি, তা হলে তুমি যাকে মরণ বলে উল্লেখ করেছ, তাই তোমার কাছে অমৃত হয়ে উঠবে, সত্য মরণকেও তুমি জয় করতে পারবে। তুমি দূরে যাচ্ছ বলছ দিদিমণি,—কিন্তু না, আমি দেখছি তুমি আমার আরও কাছে আসছ। তোমার এই আত্মদান আমার সঙ্গে তোমার বাঁধন আরও দৃঢ় করে তুলছে। বড় আনন্দ পাচ্ছি যে তুমি আমার যোগ্যা নাতনী। তুমি বাপ মা দিদিমার আদেশ অবহেলা কর নি, দুঃখময় জেনেও সাদরে মাথা পেতে গ্রহণ করছ। ভয় কি দিদিমণি, ভগবান তোমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, পিতার মত তোমার হাত ধরবেন। তুমি শুধু দৃঢ়পদে দাঁড়াও; চাই শুধু তোমার জোর।

সত্যকে ছেড় না, তোমার দাদার এই একটীমাত্র আদেশ। এ ফুলের হারের মতই তোমার গলায় থাক। সর্ব্বদা সত্যকে মনে জাগিয়ে রেখো, তার কাছে অত্যাচার অনাচার সকলকেই মাথা নোয়াতে হবে। মনে রেখো—সকলের উপরে সত্য। তোমার নিজের জীবনও মিথ্যা; কিন্তু সত্য চিরকালই সত্য। মাঝে মাঝে পত্র দিয়ো। আমার স্নেহাশীসে তোমার সকল বাধা বিঘ্ন দূর হয়ে যাক—ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করি।

তোমার বুড়ো দাদা"

এই পত্রখানা বীথির বুকে অসীম বল আনিয়া দিল। সেখানা ললাটে রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, "তাই আশীর্ব্বাদ কর দাদা, তোমার সকল কথা যেন সত্য হয়।"

সকল দ্বিধা সঙ্কোচ ঝাড়িয়া ফেলিয়া বীথি বিবাহের জন্য প্রস্তুত হইল,—তাহার মুখের লুপ্ত হাসি আবার ফিরিয়া আসিল।

বিবাহের দিনে সরলাও নিমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন। আসিবেন না ঠিক করিয়াও স্বামীর জেদে তাঁহাকে আসিতে হইল।

বীথিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার ললাটে একটী স্নেহচুম্বন দিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বিয়েতে তুই সুখী হয়েছিস তো দিদি?"

বীথি গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, জোর করিয়া প্রচুর হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল, "সুখী হয়েছি বই কি দিদি? দেখ দেখি, আমার স্বামীর মত কয়টী মেয়ে স্বামী পেয়েছে! সত্যি কথা দিদি, তুমি যেমন আমার মায়ের সুখ-স্বচ্ছন্দতার দিকে দৃষ্টি রাখ, তিনিও তো তেমনি আমাদের উপর দৃষ্টি রাখেন। মা হয়ে কেউ তো সন্তানকে অসুখী করতে পারে না দিদিমণি।"

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া সরলা বুঝিলেন, সে কথাগুলা আন্তরিক বলিতেছে না। অনিলের প্রকৃতির সহিত তাহার প্রকৃতি ঠিক যে মিলিবে না, তাহা তিনিও যেমন বুঝিতেছিলেন, বীথিও তেমনি বুঝিতেছিল। সেইজন্য সন্দেহ উৎকণ্ঠায় তাহার তরুণ মনখানা ভরিয়া উঠিয়াছিল।

তাহার ললাট হইতে চূর্ণ চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে সরলা বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ করছি দিদিমণি, তুই সুখী হ। এখন নিজের স্বাধীন সত্ত্বা তোর আর কিছুই রইল না, এটুকু মনে রাখিস। তুই এখন স্বামীর স্ত্রী। তোর দিদিমার দেওয়া শিক্ষার সার্থকতা এখন হতে নিজের জীবনে তুই ফুটিয়ে তুলবি বীথি, সংসারকে দুঃখময় না করে সুখময় করে তুলবি। শুনছি এই সপ্তাহের মধ্যে অনিল তোকে নিয়ে বম্বে চলে যাবে।"

বীথি মাথা কাত করিয়া জানাইল—কথাটা সত্য।

সরলার বুক চিরিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বীথির মাথায় পড়িল,—"সত্যি সপ্তাহ মধ্যেই তুই চলে যাবি? আবার কবে আসবি বীথি?"

বীথি শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "কি করে বলব দিদিমণি? তুমিই তো শিখিয়েছ স্বামী দেবতা, স্বামীর আদেশানুসারে

আমায় চলতে হবে। তিনি যখন আসতে দেবেন, তখন আসতে পাব, নইলে আসতে পাব না।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "রমাকে আমার সঙ্গে দেবে দিদি? নইলে, সেখানে—সেই বিদেশে আমি একলা থাকব কি করে?" তাহার কণ্ঠস্বরটা অশ্রুজলে ভিজিয়া উঠিল।

ব্যগ্রভাবে সরলা বলিলেন, "দেব বৈ কি দিদি। তুই যদি তাকে নিয়ে যেতে চাস, নিশ্চয়ই যাবে সে। আজ সে আমার সঙ্গে আসে নি। তুই যেদিন এখান হতে যাবি—খবর পেলে তার আগের দিন আমি তাকে এখানে পাঠিয়ে দেব।"

গীতি আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, মা আপনাকে খাওয়ার কথা বলছেন।"

সরলা একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমি জল খেয়েছি তো দিদিমণি; আর কিছু খাব না, তোমার মাকে বল গিয়ে।"

গীতি চলিয়া গেল।

একটু পরেই মায়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার মুখখানা বড় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—"আচ্ছা মা, কি রকম আক্কেল তোমার বল দেখি? সকলে তোমার অপেক্ষায় বসে আছেন, তোমার অথচ দেখা নেই। গীতি ডাকতে এল, তাকে বললে জল খেয়েছি আর কিছু খাব না। কেন মা, আর কিছু খেলে কি তোমার জাত যাবে, ধর্ম্ম থাকবে না? তাঁদের সামনে গীতি যখন এই কথা গিয়ে বললে—তখন আমার মুখখানা কোথায় রইল বল দেখি? ছিঃ, এই যদি তোমার মনে ছিল, তুমি না এলেই পারতে, ঘরে ঘরে কৈফিয়ৎ দিলে চলতো। কিন্তু পরের কাছে আজ কি রকম ভাবে আমায় অপমানিত করলে ভাব দেখি।"

সঙ্কুচিতা সরলা বলিলেন, "সত্যিই মা, আমি এখানে জলখাবার যথেষ্ট খেয়েছি, আর কিছু খাওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই।"

"সেই কথাটাই বল যে আমার বাড়ীতে কিছু খাওয়ার প্রবৃত্তি তোমার নেই। তোমার মনের ইচ্ছে—তুমি আমায় সকলের কাছে অপদস্থ করবে। বেশ হয়েছে, তোমার ইচ্ছেই পূর্ণ হল। ছিঃ, এর চেয়ে না এলেই আজ ভাল হতো। জামাই মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করা—সে আর একদিন করে গেলেই পারতে।"

রাগতভাবে মায়া বাহির হইয়া গেলেন। কন্যার নিকট হইতে এই তাড়না পাইয়া সরলার মুখখানা শুকাইয়া উঠিল,—শূন্য নয়নে নির্ব্বাকে তিনি বীথির পানে তাকাইয়া রহিলেন।

জড়ভাবাপন্না দিদিমাকে একটা ধাক্কা দিয়া বীথি বলিল, "তবুও বসে রইলে দিদিমা? ওঠো, তোমার গাড়ী তো আছে, এখনি তুমি চলে যাও। আমাদের আশীর্ব্বাদ করতে এসেছিলে, আশীর্ব্বাদ অনেকক্ষণ হয়ে গেছে, এতক্ষণ তোমার যাওয়া উচিত ছিল।"

অভিভূতার ন্যায় সরলা বলিলেন, "চলে যাব?"

দৃঢ়কণ্ঠে বীথি বলিল, "হ্যাঁ, চলে যাও। তোমার যথার্থ এখানে আসা অন্যায় হয়েছে দিদিমা। তোমার প্রকৃতির অনুযায়ী এ স্থান যখন নয়, তখন তোমার আগে ভাবা উচিত ছিল—এখানে এলেই অপমান সইতে হবে।"

অব্যক্ত বেদনা ও রোদনোচ্ছ্বাসে তাহার কণ্ঠস্বর একেবারেই রুদ্ধ হইয়া আসিল। তখনি সে তাহা সামলাইয়া লইয়া তেমনি দৃঢ় কোমলতাহীন কঠোর স্বরে বলিল, "ওঠ বলছি, যাও এখনি,—আরও থাকলে তোমায় আরও কথা শুনতে হবে সেটা মনে কোরো।"

"কিন্তু বীথি—"

বীথি এক রকম প্রায় তাঁহাকে ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল, "না, আর কথা বলো না। মনে কর—তোমার বীথি মরে গেছে, বীথির জন্যে কারও সঙ্গে তোমায় সম্প্রীতি রাখতে আসতে হবে না। তোমার বীথির মায়ায় ভুলে আর তুমি এমন করে যেখানে সেখানে অপমান সইতে পারবে না—পারবে না,—পারবে না। যাও তুমি, আর এক মিনিট তোমায় আমি এখানে থাকতে দেব না।"

ধীরে ধীরে সরলা অগ্রসর হইলেন। গোলমালের মধ্যে কেহ দেখিতে পাইল না—চোখ মুছিতে মুছিতে কখন তিনি চলিয়া গেলেন।

ডাইনিংরুমে বীথি একা প্রবেশ করিতেই মায়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা কোথায় গেল রে?"

বীথি মিসেস মিত্রের পাশের খালি চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িয়া রুমালে মুখ মুছিতে মুছিতে বলিল, "তিনি চলে গেছেন।"

"চলে গেছেন—?"

মায়া স্তব্ধভাবে কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন। মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন—বীথিই বৃদ্ধা দিদিমাকে তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া দিয়াছে। তাহার দিদিমাটিকে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখিতে চায়, কিছুরই মধ্যে জড়াইতে চায় না।

আর কিছু না হোক, মায়ের এই নিষ্ঠাটা তাঁহার মনে অত্যন্ত আঘাত দিয়াছিল। ক্ষুব্ধকণ্ঠে তিনি শুধু বলিলেন, "বেশ করেছেন, আমায় কিছু বলেও গেলেন না। আজ হতে তিনি নিজের হাতে মাঝখানে একটা পাঁচিল গেঁথে তুললেন।"

কথাটা আর কেহ বুঝিল না, বীথি বুঝিল মাত্র।

(১৫)

সুদীর্ঘ দিনগুলা আর যেন কিছুতেই কাটিতে চায় না। তবু সঙ্গে রমা আসিয়াছে। সে যদি না আসিত, তাহা হইলে বীথি এখানে একটা দিনও টিকিতে পারিত কি না সন্দেহ।

দিন দিন অনিলের স্বভাবের পরিচয় জানা যাইতেছিল। দিন দিন বীথিও তত শুকাইয়া উঠিতেছিল। প্রথমে সে দিদিমাকে রীতিমত পত্রাদি লিখিত। ইহাতে অনিল যে দিন পরিহাস করিল, সেই দিন একখানি শেষপত্র পাঠাইয়া দিয়া আর পত্র লিখিতে বসে নাই। এই পত্রখানি শত ফোঁটা চোখের জলে ভিজাইয়া ফেলিয়া সে লিখিয়াছিল—দিদিমা যেন আর তাহাকে পত্র দেন না,—তিনি যেন সত্যই মনে করেন বীথি নাই।

এখানে আসিয়া সে ঠাকুরদাকে একখানিমাত্র পত্র দিয়াছিল। সে পত্রখানি এইরূপ,—

স্নেহময় দাদা আমার, বলেছিলুম প্রায়ই আপনাকে পত্র দেব; কিন্তু এই ছয় সাত মাসের মধ্যে আপনাকে পত্র দিইনি—এতে যেন মনে ভাববেন না, আপনার সেই এক দিন মুহূর্ত্তের দেখা মূর্ত্তিটি আমার মন হতে অন্তর হয়ে গেছে। তা নয় দাদা, যত ধাক্কা খাচ্চি, যত জ্বলছি,—আপনার সেই শান্ত সৌম্যমূর্ত্তিখানা আমার অন্ধকার অন্তরের মাঝখানে ততই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠছে। আপনার সেই স্থির অচঞ্চল মূর্ত্তিখানা প্রভাতে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মনে ভেসে ওঠে। আমি প্রার্থনা করি—দাদা শক্তি দিন, আমি যেন আপনার মত সবই সহ্য করে যেতে পারি। যা যায় আর যা কিছু থাকে—সবই যেন ভগবানের চরণে অর্পণ করে আপনাকে মুক্ত করে রাখতে পারি।

বুঝি আমার সে প্রার্থনা ব্যর্থ হয়ে গেল দাদা, কারণ আমি জড়িয়ে পড়েছি, মুক্ত থাকতে তো পারলুম না। সেই জন্যেই পাওয়ার সুখে আমার হৃদয় ভরে ওঠে, হারানোর ব্যথায় ভেঙ্গে পড়ে। দাদা, সে ব্যথা সময় সময় বড় অসহ্য হয়ে ওঠে। তাই মনে হয় ছুটে পালাই।

জীবন যাতনাভরা—সত্যই দাদা, আমি সুখী হতে পারলুম না, কারণ ত্যাগ-মন্ত্রে দীক্ষিতা হতে পারি নি। যদি আপনার মন্ত্র নিতে পারতুম অন্তরের মধ্যে—ওগো আমার গুরু, এ সবই যে আমার কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতো। পাওয়ার আনন্দ, যাওয়ার ব্যথা কিছুই যে আমার বুকে বাজত না। দাদা, আজ সব হারানোর কূলে দাঁড়িয়ে শক্তি চাচ্ছি—আমায় শক্তি দিন, আমায় সাহস দিন, আমি যেন ভেঙ্গে না পড়ি। আপনার আশীর্ব্বাদে আবার আমার মনুষ্যত্ব আমাতে ফিরে আসবে, আমি সব অন্যায়কে সয়ে যেতে পারব অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করে। আপনি আমায় শুধু আশীর্ব্বাদ করুন দাদা, আপনার আশীর্ব্বাদে আমি দাঁড়াতে পারব।

আপনার বীথি।

কখনও যে কোনও আঘাত পায় নাই, সামান্য একটু আঘাতে সে যেমন বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে, বীথির হইয়াছিল তাহাই। স্বামীর চাল-চলন, আচার ব্যবহার তাহাকে যেন কঠোর আঘাত করিতেছিল। সে দিন দিন মুসড়িয়া পড়িতেছিল। নিজেকে সে কিছুতেই অনিলের প্রকৃতির সহিত মিলাইতে পারিতেছিল না। ফলে সে অনিলের স্ত্রী হইয়াও যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইতে পারে নাই। নিজের সহিত যুদ্ধ করিয়া সে নিজেই ক্ষতবিক্ষত হইতেছিল। যাতনায় তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল।

উচ্চশিক্ষিত অনিলের স্ত্রীকে লইয়া গিয়া সাহেব-সমাজে মিলিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বীথি স্বামীর সহিত ক্লাবে যাইত।

সে দিন ক্লাবে সন্ধ্যার পরে নিমন্ত্রণ ছিল। বৈকালে অনিল স্ত্রীকে একবার সে কথা জানাইয়া কাজে গিয়াছিল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইবার আদেশ দিয়া নিজে প্রস্তুত হইতে গেল।

ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বীথি তখনও টেবলে ভর দিয়া

চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অনিল বিস্মিতভাবে বলিল, "বাঃ, তুমি এখনও চুপ করে বসে আছ বীথি? কোথায় তোমায় বিকেলে বলে গেছি তাড়াতাড়ি করে নিতে, আটটায় ক্লাবে পৌছান চাই, তুমি এখনও বসে কি ভাবছ বল দেখি?"

শান্তকণ্ঠে বীথি বলিল, "আমিও তো বিকেল বেলাই তোমায় বলেছি—আমি ক্লাবে যাব না।"

অতিরিক্ত বিস্মিত হইয়া অনিল বলিল, "যাবে না কি রকম?"

বীথি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না। পরাভূত অনিল আরক্তমুখে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া বীথির স্কন্ধের উপর একখানা হাত রাখিয়া বলিল, "বীথি, আজকের দিনটা আমায় মাপ করো, আজকের দিনটা তুমি চল। আর কোন দিন না গেলেও কথা হবে না,—কিন্তু আজ আমি কথা দিয়েছি—যদি না যাও, আমি আর মুখ দেখাতে পারব না। আজ অনেক বড় বড় সাহেব বিবি ক্লাবে নিমন্ত্রিত হয়েছেন। এঁদের সবারই কাছে আমার মান প্রতিপত্তি আছে। আজ যদি তুমি না যাও, এঁরা আমায় কি বল্‌বেন, সেটা একবার ভেবে দেখ। তুমি স্ত্রী, আমার সমানাংশভাগিনী,—আমায় নিন্দা করলে সেটা কি তোমার প্রাণে বাজবে না বীথি?"

তাহার অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে বীথিকে উঠিতে হইল, আর সে 'না' বলিতে পারিল না।

রমা কোন দিনই ক্লাবে যায় নাই, আজও সে গেল না, সে বাড়ীতেই রহিল।

রমার এদেশে বাস করিবার ইচ্ছা একটুও ছিল না; নেহাৎ কেবল দায়ে পড়িয়াই তাহাকে এখানে বাস করিতে হইত। বালবিধবা সে, ছোটবেলা হইতে সরলা তাহাকে যে সংযম শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন, সেই ত্যাগ ও সংযম তাহার মজ্জাগত হইয়া গিয়াছিল। অনিল তাহাকে সভ্য শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রমা তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারে নাই। বীথি তাহার পক্ষে দাঁড়াইয়া অনিলকে বাধা দিয়াছিল,—রমাকে কাহারও সম্মুখে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাহির হইতে দিত না। এই কিশোরীটিও সর্ব্বদা গোপনে থাকিতে চাহিত, কাহারও সম্মুখে বাহির হইতে সে একেবারেই নারাজ ছিল।

বীথি এখন রমাকে দেশে পাঠানোর চেষ্টায় ছিল। ইদানিং বিধবা রমার উপর স্বামীর কিছু বেশী রকম পক্ষপাতিত্ব সে লক্ষ্য করিয়াছিল। রমাও ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহার নিভৃত পবিত্র স্থান সরলার কোলে ফিরিয়া যাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বীথিরও তাহাকে লইয়া বড় ভাবনা হইয়াছিল। দেবতার এই পবিত্র নির্ম্মাল্যটিকে সে এখন পবিত্র তাহার স্থানে পৌছাইয়া দিতে পারিলে যেন বাঁচে।

বীথি চলিয়া গেলে রমা বাহিরের কাজ সারিয়া নিজের গৃহে গিয়া শুইয়া পড়িল। দেশের কথা, সরলার কথা ভাবিতে ভাবিতে সে কখন ঘুমাইয়া পড়িল তাহার ঠিক নাই। অনেক রাত্রে দ্বারে করাঘাতের শব্দে তাহার গভীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, সন্ত্রস্তে সভয়ে সে বলিয়া উঠিল—"কে?"

"আমি। রমা, দরজা খোল।"

জড়তাপূর্ণ এ কণ্ঠস্বর বীথির। সে বড় চাপাস্বরে উত্তর দিয়াছিল—যেন তাহার কণ্ঠস্বর একমাত্র রমার কাণ ছাড়া আর কাহারও কাণে গিয়া না পৌছায়। রমা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল। মুক্ত জানালা পথে নক্ষত্রের মৃদু আলো গৃহের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া জমাটবাঁধা ঘন অন্ধকারকে একটু তরল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাতে সে এক রকম করিয়া অগ্রসর হইয়া আগে দরজাটা খুলিয়া দিল। হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দেয়ালে সুইজ খুঁজিয়া টিপিয়া দিতেই গৃহাভ্যন্তর উজ্জ্বল আলোকে পূর্ণ হইয়া গেল।

গৃহে প্রবেশ করিয়াই বীথি সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শ্রান্তভাবে রমার বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া হাঁফাইতে লাগিল। তাহার মুখখানা তখন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই কয়েক ঘণ্টা যেন কয়েকটা বছরের মত তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে।

তাহার সেই বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইয়া রমা স্তব্ধ হইয়া গেল,—কোন কথা সে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

খানিকক্ষণ হাঁফাইয়া বীথি একটু প্রকৃতিস্থ হইল। রমার পানে তাকাইয়া বলিল,—"একবার দেখ তো রমা, আর কেউ

জানে নি তো? যে রকম করে এসেছি, তাতে সকলেরই ছুটে আসবার কথা।"

রমা মাথা নাড়িয়া বলিল, "কেউ জানতে পারে নি দিদিমণি! শুনুন না—ওরা শঙ্করের ঘরে বসে সব রূপকথা শুনছে। ওরা জানে তোমরা ঠিক বারটার সময় আসবে। এখন এগারটা বেজেছে, এক ঘণ্টা দেরী আছে জেনে ওরা এখনও বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু তুমি অমন করে পায়ে হেঁটে এসেছ কেন দিদিমণি, দাদাবাবু এখনও আসেন নি তো।"

একটা কালো ছায়া বীথির মুখের উপর ঘনাইয়া আসিল, —"না রে, সে এখনও আসে নি, এখনই আসবে। উঃ, কি লোক সে—আমি যে আজ কেবল তাই ভাবছি রমা। সে আমার এমন করেও সর্ব্বনাশ করতে বসেছিল, আমি যে এ কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি রমা, স্বামী হয়ে সে কি না—"

দুই হাত মুখের উপর চাপা দিয়া সে ক্ষুদ্র বালিকার মত ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার চম্পকাঙ্গুলির ফাঁক দিয়া অশ্রুধারা মুক্তার মত ঝরিয়া তাহার শুভ্র রেশমী শাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল।

সুখে দুঃখে তাহার সমানাংশভাগিনী রমা,—সে তাহার হাত দুখানা দুই হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি হয়েছে দিদিমণি, কেন তুমি এমন করে কাঁদছ,—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।"

বীথি অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে কান্নাভরা স্বরে বলিল, "বুঝতে পারবি কি রমা? তুই তো আমার মতন অবস্থায় কোন দিন পড়িস নি। আমার কথা হয় তো কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না; কেন না, আমার মত অবস্থা তো কোন মেয়েরই হয় না। এক মাইল দূর ক্লাব হতে আমি একা—এই অন্ধকারে কি করে ছুটে পালিয়ে এসেছি, তা তোরা তো কেউ বুঝবি নে; কারণ, আমার যে এমন করে ছোটবার শক্তি আছে, তা যে আমিই জানতুম না। রমা, আমার স্বামী—আমার দেবতা—তাঁর বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নীকে অপরের হাতে তুলে দিয়ে—না রমা, আমি আর বলতে পারব না, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।"

সে রমার বিছানায় উপুড় হইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া আবার বলিল, "আমি যে কি করে পালিয়েছি, তা মা সতীরাণী জানেন। কোন দিন মাকে ডাকি নি, আজ প্রাণ ভরে মাকে ডেকেছিলুম, মা আমার বুকে সাহস দিয়েছিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যে জ্ঞানহারা হয়ে পড়েছিলুম। তখনি আমার লুপ্ত শক্তি ফিরে এল, আমি বিপুল বলে এক নরপশুর বাহুপাশ ছিন্ন করে তাকে এক ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে ফেলে ছুটে পালালুম। আমার সতীধর্ম্ম আমি রক্ষা করতে পেরেছি; কিন্তু আমার বুকে যে বড় আঘাত লেগেছে রমা, এ আঘাতের ব্যথা তো আমি সামলাতে পারব না।"

নিদারুণ মর্ম্মযন্ত্রণায় সে দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। ভীতা তরুণী তাহার পিঠে হাত দিয়া ঠেলিতে ঠেলিতে ভীতকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, "দিদিমণি—দিদিমণি—"

"বীথি—"

ত্রস্তা বীথি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল, "চুপ—চুপ কর রমা, সে এসেছে।"

রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া অনুনয়ের স্বরে অনিল বলিল, "দরজা খুলে দাও বীথি, এখনকার মত আমায় মাপ কর। যা ব্যাপার ঘটেছে—আমাদের দুজনের মধ্যেই এ থাক, চাকরদের কাণে যেন না যায়। সব কথা শুনলে তুমি আমার ওপর রাগ করে থাকতে পারবে না,—তোমায় আমাকে ক্ষমা করতেই হবে।"

রুদ্ধকণ্ঠে বীথি বলিল, "দরজাটা খুলে দে রমা, যা বলবার আছে ঘরের মধ্যে এসে বলবে এখন।"

রমা দরজা খুলিয়া দিল। অনিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "এ ঘরে নয়, ও ঘরে চল,—আমি সব কথা তোমায় বলছি।"

বীথি বলিল, "না, ও ঘরে আমি যাব না। যা বলবার তোমার, তা এইখানে অনায়াসে বলতে পার।"

অনিল একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "না, তুমি অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে তুলছো বীথি, এতটা ভাল নয়,—তোমার মত শিক্ষিতা একটা মেয়ের পক্ষে এ রকম রাগটা কিছুতেই উচিত হয় নি। এই রাত্রে ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী তুমি, একা এই পথ দিয়ে দৌড়ে আসা কি উচিত হয়েছে বলে মনে কর?"

বীথি স্থিরকণ্ঠে বলিল, "না,—এ আমার উচিত কাজ হয় নি। যদি সেই অপদার্থ ইংরাজটার বাহুপাশে বদ্ধ হয়ে পড়ে থাকতুম, সেইটেই ভদ্রলোকের মেয়ে—ভদ্রলোকের স্ত্রীর

উপযুক্ত কাজ হতো।" তাহার কণ্ঠে ব্যঙ্গটাই ফুটিয়া উঠিল।

নরম হইয়া গিয়া অনিল বলিল, "না,—তুমি আমার জন্যে অপেক্ষা করলেই পারতে।"

দীপ্তকণ্ঠে বীথি বলিয়া উঠিল, "তোমার জন্যে অপেক্ষা করব—কিন্তু তখন তুমি কোথায়? যতক্ষণে তুমি আসতে, ততক্ষণে আমার ধর্ম্ম শূকরের পদদলিত হতো। থাক, এখন সে কথা বলে কাজ নেই। তুমি আমার নারী-মর্য্যাদায় হাত দিয়েছ, বার বার তুমি আমায় অপদস্থ করে তুলেছো। এর বেশী আর কি অপমানের বিষয় থাকতে পারে যে স্বামী হয়ে তুমি—"

ক্রোধে তাহার মুখ চোখ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—সে কথাটাকে আর শেষ করিতে পারিল না। সে উঠিয়া পড়িল, অগ্রসর হইয়া বলিল, "চল—তোমার সঙ্গে ও-ঘরে যাচ্ছি। কিন্তু তোমায় বলে রাখছি, এবার হতে আমার সম্বন্ধে যা ভাববার, যা করবার, তা আমিই করব। যেখানে আমার খুসি হবে যাব,—তোমার জিদে বা অনুরোধে আমায় আর বিচলিত করতে পারবে না। তোমায় স্বামীত্বে বরণ করেছি বলে তুমি যে আমার ওপর যথেচ্ছাচার করবে, আমায় সংসার নির্ব্বাহের একটা আবশ্যক যন্ত্র বলে ব্যবহার করবে, তা কিছুতেই হবে না। এতদিন নিজেকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে দেখলুম আমায় তুমি কি ভাবে ব্যবহার কর। এখন দেখছি, মানুষ ক্ষমতামদে অন্ধ হয়ে যায়,—তার তখন হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মনে রেখো—নারীর একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা জ্ঞান আছে। সে মর্য্যাদায় হাত দিতে গেলে, যত অধম প্রকৃতির নারীই হোক না—সে ফোঁস করে উঠবে। তুমি আমার সেই মর্য্যাদা নষ্ট করতে এসেছিলে, এর জন্যে তোমায় আমি কখনই ক্ষমার চোখে দেখতে পারব না। স্বামীর কর্ত্তব্য স্ত্রীকে রক্ষা করা; কিন্তু তুমি কি করলে স্বামী, অনায়াসে নিজের ধর্ম্মপত্নীকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে, নিঃশব্দে পিছন হতে সরে গেলে! ঠিক—আমি তো তোমার রক্ষিতা নারী নই, আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী। তোমায় আবার বলে দিচ্ছি—যদি ধর্ম্মপত্নীর মান-মর্য্যাদা রাখবার উপযুক্ত বলে নিজেকে মনে করো, তবে কাছে এসো—নইলে দূরে থেকো।"

অনিলকে অতিক্রম করিয়া সে ক্ষিপ্রপদে আগেই বাহির হইয়া গেল। অনিল স্তব্ধভাবে খানিক দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাহির হইল। [ক্রমশঃ

সমাজ ও সংস্কার

শ্রীসাহানা দেবী

সেদিন কবিবর রবীন্দ্রনাথের 'সমাজ' গ্রন্থখানি পড়তে পড়তে নিজের অবরুদ্ধ অনেক ধারণাই মনের কোণে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল। এতদিন যে সব ধারণা, মনে সত্য জানলেও, বাইরে প্রকাশ করবার সাহস পাই নি, আজ কবিবরের প্রবন্ধ ('সমাজ') কয়েকটী পাঠ করিবার পর নিজের ধারণা সম্বন্ধে মতামত যে অমূলক নয়—জানতে পেরে সেটাই ব্যক্ত করবার বল ও সাহস অনেকটা পেয়েছি। অনেকবার এ সব কথা নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছে হয়েছে; কিন্তু সে ইচ্ছে মনের কোণেই রুদ্ধ ছিল; কেন না, এ সব বিষয় নিয়ে বাইরে আলোচনা করবার অধিকার তাদেরই আছে, যাঁরা সাধারণের চোখে নিজেদের উচ্চতা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছেন। আমাদের, বিশেষতঃ মেয়েদের, এ সব আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার বিপদ যে অনেক, তা যে জানি না, তা নয়। তবু, রবীন্দ্রনাথের মতামতের সঙ্গে আমার ধারণাগুলির অনেক সাদৃশ্য আছে বুঝতে পেরে, তারই বিষয়ে ২।১টী কথা আজ লিখতে সাহসী হয়েছি! পাঠকবৃন্দ যেন মনে না করেন যে, সমাজ সম্বন্ধে কোনও গুরুতর গবেষণা করার জন্যই আমি এ প্রবন্ধ লিখতে বসেছি,—আমি কেবল নারীর দিক্ দিয়ে সমাজ ও সংস্কার সম্বন্ধে যে কতকগুলি ধারণা আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে, তার সুর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছে

জানতে পারার ভরসাতেই আজ নিজের সেই সব অবরুদ্ধ ধারণাকে লিপিবদ্ধ করে সাধারণের সামনে একবার মেলে ধরবার ইচ্ছে প্রকাশ করছি মাত্র।

আমরা বলি সমাজ শাস্ত্রমতে চলে। কিন্তু প্রতিপদেই দেখতে পাই—শাস্ত্রের আবহাওয়ায় মানুষ হলেও লোকাচার ও যুক্তির বলেই সে চলে থাকে। আমাদের সমাজ বলতে আজকাল হয়েছে সাধারণের মতামত ও তার সঙ্গে নিজেদের যুক্তি-সম্পদ। অর্থাৎ নিজেদের মনের সঙ্গে যেখানেই বেখাপ হয়, সেখানেই যুক্তি দেখিয়ে সমাজের দোহাই দিয়ে—সেটাকেই শাস্ত্র বলে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করি। শাস্ত্রালোচনা আমাদের মধ্যে ক'জন করে থাকেন? সত্যিকারের শাস্ত্র ক'জন জানেন, এবং জানলেও ক'জন মানেন? যেখানে মানলে নিজের সুবিধে, সেখানে সেটুকু তাঁরা মানেন; বাকিটুকু নিয়ে মাথা ঘামাবারও দরকার মনে করেন না। আমাদের দেশে একটা কথা আছে—'সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল।' আমাদেরও হয়েছে তাই। সেই সোয়াস্তি খুঁজতে গিয়ে নিজেদের চিন্তাজগৎ থেকে এত দূরে এসে পড়েছি যে, ভাল মন্দ কোনও চিন্তাই এখন আর সহজে মাথায় আনতে চাই না—দূর থেকে তাকে নমস্কার করে বলি—আমার সুখের দরকার নেই, সোয়াস্তিই ভাল। এতে ক'রে আমরা এতই সুখপ্রিয় হ'য়ে প'ড়েছি যে, যে চিন্তা দ্বারা, মনের পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ অতিমানুষের উপচে-পড়া অনন্ত শক্তির আভাষ পায়—সে শক্তি ক্রমশঃ হারাতে বসেছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে এতই অসহায় হয়ে পড়ছি যে, বদ্ধমূল ধারণাগুলির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করবার কোনও চেষ্টা একবারও না করেই, শুধু শাস্ত্রের নজীরে তাতেই আত্ম-সমর্পণ করে থাকতে ভালবাসি। সে আত্ম-সমর্পণ যে সব সময় বিশ্বাসের উপর করি তাও নয়,—কেন যে করি—তাও জানবার ইচ্ছে করি না, কেন না—আমরা যে সোয়াস্তি চাই। এবং সেই সোয়াস্তিকেই আমরা সুখ বলে ভুল করি! আমরা ভাবি নিশ্চিন্ততাই বুঝি সুখ! তাই কেবল নিশ্চিন্ত হতে গিয়ে নিজেকে ক্রমেই দরিদ্র করে ফেলি, শক্তিহীন করে ফেলি! দুর্লভ মানব-জীবনে যে শক্তি-সম্পদ নিয়ে আমরা জন্মগ্রহণ করি, তাকে সার্থক করে তোলা তো দূরের কথা, উপরন্তু, সমস্ত শক্তি হারিয়ে নিঃসম্বল হয়ে একটী জড় পদার্থের মতোই প্রাণহীন অসাড় হয়ে পড়ি! আমরা যে অনন্তের সন্তান, অনন্ত শক্তির আধার, আমাদের যে অনন্ত সম্পদ বুকে! সেই সম্পদ, সেই শক্তির স্ফুলিঙ্গ যে আমাদের জীবনে তারই সাধনার দ্বারা উৎসারিত হবে,—সে কথা আমরা সর্ব্বদাই ভুলে থাকতে চাই, কেন না—আমরা সোয়াস্তি চাই!

আমরা প্রথমেই ভুল করি অথবা জেনেই ভুল করি,—আমাদের বিকাশের শেষ আছে। অর্থাৎ একটী গণ্ডী টেনে বসে থাকি—এরই মধ্যে আমাদের বিকাশের সম্পূর্ণতা হবে বা আসবে ভেবে। প্রথম কথা, যে গণ্ডী আমরা টানি, তাকেই সমাজ বলে অনেক সময় ভুল করি। কারণ, প্রত্যেকেই সেই গণ্ডীটীকে খানিকটা নিজের মনের মতন করে টানি (কেউ বেশি, কেউ কম)। কাজেই যেটা ভাব্‌বার কথা সেটা এই যে, আমরা যেটাকে সমাজ বলি, সেটাই যথার্থ সমাজ কি না? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "সমাজ শাস্ত্রমতে চলেন।" এ কথাটী খুবই সত্য মনে হয়। অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির প্রবলতার সঙ্গে যখন কর্ম্মশক্তির দুর্ব্বলতা অনুভব করি, তখনই অনেক সময় 'শাস্ত্রে'র দোহাই দেই।

দ্বিতীয় কথা, আমাদের বিকাশের শেষ আছে কি না? এর উত্তর রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর দিয়েছেন "নিখুঁত সম্পূর্ণতা মানুষের জন্য নহে। কারণ সম্পূর্ণতার মধ্যে শেষ আছে। মানুষ ইহজীবনের মধ্যেই সমাপ্ত নয়। যাঁরা পরলোক বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও স্বীকার করবেন একটী জীবনের মধ্যেই মানুষের উন্নতি সম্ভাবনার শেষ নাই।" ('সমাজ') কথাগুলি ভারি সুন্দর। বাস্তবিকই আমাদের বিকাশের শেষ নেই। আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার তো শেষ নেই। আমাদের কামনানুসারে প্রতি পদেই তো আমরা নিজেদের উন্নতির আশা করি, তার কোথায় শেষ তা নিজেরাই জানি না। কারণ, একটা কথা আছে—"যত পাই আরো তত চাই।" কাজেই, চাওয়া আমাদের ফুরোয় কি? আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়? ইচ্ছা যেখানে অনন্ত, বিকাশের সম্ভাবনা কি সেখানে অশেষ নয়? অথচ এই ভুল আমরা নিত্য নিয়তই করি। যেখানে নিজের উন্নতির সীমা জানতে পারি না, সেখানে অপরের উন্নতির বা বিকাশের শেষের সন্ধান বলে দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। এটাই যথার্থ অহঙ্কারের কথা। আমাদের জীবনের প্রতি কর্ম্মের মধ্য দিয়ে আমাদের বিকাশও অশেষ। এই কর্ম্ম শুধু লোকাচার দিয়েই গঠিত

নয়,—এ কর্ম্ম, প্রতি বাহ্য কর্ম্মের মধ্যেও আত্ম-দর্শনের নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তির আলোক-স্পন্দন! এই উপলব্ধি অহঙ্কারের কথা নয়, এটাই পরম আত্মবিশ্বাসের উচ্চ আদর্শের কথা।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "কে বলে লোকাচার যুক্তি বা শাস্ত্র মেনে চলে?" (সমাজ)—এ যে কত বড় সত্য কথা, কিন্তু আমরা কজনই বা তা চিন্তা করতে অগ্রসর হই? আমরা ভাবি যে আমরা যুক্তি বুঝে কাজ করি, এবং অনেক সময় নিজেদের বুদ্ধিকে শাস্ত্র ভেবে নেবার সুবিধাকে হাতছাড়া করতে চাই না। কারণ, আমরা এতই দুর্ব্বল যে, নিজেদের মতামত বা ধারণাকে, অন্তরের সত্য উপলব্ধিকে, সত্য বলে স্বীকার করবার সাহস থেকে নিজেদের বঞ্চিত করি। চিন্তা শক্তিকে অনাহারে শুকিয়ে মেরে ও ব্যক্তিত্বকে চেপে নষ্ট করে, আমরা এমনই অসার বার্দ্ধক্যে নিজেদের নিয়ে চলেছি যে, আমাদের অন্তরের সত্য সম্পদের চাইতে লোকাচারের অনুশাসনই আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। ফলে, আমরা নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে কেবল পরমুখাপেক্ষী হতে শিখেছি,—আমরা অন্তরে বাইরে পরাধীন হয়ে উঠেছি!

মানুষ আজ পর্য্যন্ত যে-কোনও বড় কাজ করেছে, তা সমাজের (আমরা যাকে সমাজ ভাবি) গণ্ডির ভিতরে থেকে, বা "শাস্ত্র অথবা যুক্তির বলে করেনি, করেছে নিজের চরিত্র-বলে।" (রবীন্দ্রনাথ) মানব-জীবনে যে কোনও উন্নতি, যে কোনও দিকে, যে কেউ করেছেন,—প্রথমেই তাঁকে অসামাজিক অপ্রিয় অখ্যাতিতে নিপীড়িত হতে হয়েছে। কারণ, অসাধারণ হতে হলে, তাকে সাধারণের সীমা অতিক্রম করতেই হবে। তবু, আমরা যাকেই সমাজ বলি, তারও দরকার আছে। কেন না, লোকমত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে না। তার প্রথম কারণ, তারও একটা মূল্য আছে, কেন না, সাধারণতঃ জীবনকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে গড়ে তোলবার জন্য খানিকটা বন্ধনের দরকার হয়। আমাদের জীবনে প্রথম চলার পথে, অনেক বল, সাহস ও আত্ম-নির্ভরতার সহায়তা, এই লোকমত থেকে আমরা সংগ্রহ করে থাকি। কেন না, আমাদের প্রথম চেষ্টা, লোকের মনের মতন হওয়া। এবং তার থেকেই পরে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ ক'রে তারই বিকাশ বা সাধনার পথে অগ্রসর হতে থাকি। দ্বিতীয় কারণ, লোকমত উপেক্ষা করার যে সাহসের দরকার, বা তাই থেকে যে দুঃখ এবং আঘাত আসে, তাকে বরণ করবার শক্তি অনেকেরই নেই, বা অনেকেই পায় না। সেজন্য তাদের দোষ দেওয়া চলে না। কারণ, আমাদের মধ্যে কজনই বা নিজেদের মধ্যেকার নিহিত শক্তির স্বরূপটার বিষয় জানেন? তাছাড়া, প্রত্যেক মানুষ যদি সমান ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করত, তাহলে এ জীবনে সবাই বড় হয়ে উঠতে শক্তি পেতো বা উঠতো। তাই জীবনে ক্ষুদ্র ও সুন্দরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় থাকা দরকার, বড় ও সুন্দরের মূল্য বোঝবার জন্য। কিন্তু তাই বলে আমাদের মধ্যেকার দেবত্বটিকে অস্বীকার করা চলে না। আমাদের মধ্যে অসাধারণত্বকে স্বীকারের সাহস ও তার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করাটাকে অনেক সময় অন্তরে বিশ্বাস করলেও, আমরা কার্য্যতঃ তাকে সোয়াস্তির জন্যে বিসর্জ্জন দিতেই ভালবাসি। মানবজীবনে বিকাশের পথ তো একই নয়। এই শক্তির লীলা এবং তার গতি যে বহুমুখী,—কাজেই, এ পথ অন্যে কি ধার্য্য করে দিতে পারে? নিজ নিজ প্রকৃতির ধর্ম্ম অনুসারে আমাদের নিজের নিজের বিকাশের পথ আমাদের নিজের নিজের আলাদা আলাদা বেছে নিতে হয়। গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ এ কথা বলেছেন

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"

অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্মাপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্মও শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, তথাপি পরের ধর্ম্ম ভয়েরই কারণ। তাই আমাদের মধ্যে জীবনদেবতা যাকে যে পথে যেতে ইঙ্গিত করেন, সেই পথেই চলবার সাহস ও বল আমরা অর্জ্জন করি আমাদের দুঃখ ও আঘাতের যুদ্ধের ভিতর দিয়েই—তাকে এড়িয়ে নয়। আমাদের জীবনের প্রতি চলার পথেই আমাদের বাধা, যুদ্ধ। সেখানেই তার শক্তির পরীক্ষা আরম্ভ। জীবনে বাধাকে এড়িয়ে বিকাশ লাভ করা যায় না। কোনও যোগী মহাপুরুষ বলেছেন "যত বাধা, তত বিকাশ"। কারণ আমরা যা চাই তার জন্য যে মূল্য দিতে হবে। সস্তা দরে চাইলে যে আমরাও সস্তা জিনিসই পাবো। তাই অরবিন্দ তাঁর গীতায় বড় সুন্দর লিখেছেন "জীবন একটী বিশাল যুদ্ধক্ষেত্র এবং ইহাই মৃত্যুভূমি—ইহাই কুরুক্ষেত্র। আমাদিগকে এই

কুরুক্ষেত্র স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।······জগৎ যে প্রকৃত কি তাহা সোজাসুজি দেখিবার ও বুঝিবার সাহস ও সততা অর্জ্জন করিতে হইবে। প্রকৃতির করাল রূপ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইলে তাঁহার রুদ্রমূর্ত্তিকে অস্বীকার করা হয়।······ বিশ্বশক্তি শুধু সর্ব্বমঙ্গলা দুর্গা নহে, করালী কালীও বটে।··· ভগবানের রুদ্রমূর্ত্তির পূজা করিতে পারিলে হৃদয়ে বলের সঞ্চার হয়।"—জীবনে এই সকল স্তূপীকৃত দুঃখ ব্যথা ও বাধার অশ্রুজলের ভিতর দিয়েই যে কেবল সে শক্তির উৎস খুলে যায়। ব্যথার বা আঘাতের ঝড়-ঝঞ্ঝার সংঘর্ষণে বিদ্যুৎশিখা জ্বলে ওঠে, তারই আলোক-সম্পাতের ভিতর দিয়েই আমরা সেই নিহিত শক্তি-সম্পদের স্বরূপটীকে দেখিতে পাই। তাই দুঃখ ব্যথা দরকার। পতন পরাভব দরকার। কারণ তারা মানুষকে পরিশুদ্ধতর হওয়ার সহায়তা করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "স্বাধীনভাবে আমরা যা লাভ করি তাই যথার্থ লাভ। অবিচারে অন্যের নিকট থেকে যা গ্রহণ করি তা আমরা পাই না। ধূলি কর্দ্দমের উপর দিয়ে, আঘাত সংঘাতের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হতে যে বল সঞ্চয় করি, সেই বলই আমাদের চিরজীবনের সঙ্গী" ('সমাজ')।

সহজ আরামের লোভে দুঃখকে এড়িয়ে চললে মানুষ সত্য লাভ করে না কিছু। দুঃখকে অন্তর্মুখী করে গ্রহণ করতে পারলে মনের ও অন্তরের ঐশ্বর্য্য বেড়ে যায়। আমাদের দেশে অসামাজিক কাজ করার অশেষ দুঃখ-ব্যথা পাওয়াকে আমরা এতই বড় করে দেখে থাকি, এবং নিজের বাহ্য মঙ্গল স্মরণ করে তাকে এড়ানের জন্য এতই ব্যস্ত হয়ে উঠি যে,তাতে করে দুঃখটা আমাদের বাইরের হয়ে উঠে কেবল দুঃখই থেকে যায়। তাকে অন্তরে গ্রহণ করে, আনন্দ করে তোলার সম্পদ থেকে নিয়তই বঞ্চিত হ'য়ে ক্রমেই নির্বীর্য্য হ'য়ে পড়ি। সুখকে আমরা যে ভাবে আলিঙ্গন করে থাকতে চাই সদা-সর্ব্বদা, দুঃখকেও সেই ভাবেই আমাদের অন্তরকে আদর করতে শিক্ষা দিতে পারলেই দুঃখ-পাওয়াকে যথার্থ সার্থক করে তোলা যায়।

কোনও বড় সাধক বলেছেন "যে মুহূর্ত্তে মানুষ ভাবতে পারে আমি বড়, সে মুহূর্ত্তে সে উচ্চ হবার শক্তি পায়।" 'আমার যোগ্যতা নেই' 'আমি শক্তিহীন' 'আমি ক্ষুদ্র' দিবানিশি এই ভাব লোকচক্ষে নম্রতা ব'লে সহজ প্রশস্তি পেতে পারে। কিন্তু আমাদের উন্নত হওয়ার পথে বাধা হয়ে ঘিরে থাকে সন্দেহ নেই। আমরা মনে প্রাণে ছোটই থেকে যাই। অনেকের চোখে 'আমি বড়' এই ভাবটী অহঙ্কারের কথা মনে হতে পারে বা 'নিজেকে নিয়ে ক্রমাগত ব্যস্ত' থাকাটা স্বার্থপরতা ব'লে গণ্য হতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে দেখা যায়, এটা অহঙ্কারের কথা নয়। এটাই স্বর্গীয় আত্ম-বিশ্বাসের কথা। অহঙ্কার নিজের স্তরের নীচের জীবকে অবজ্ঞা করে।—আত্মবিশ্বাস সদাই উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখে। অহঙ্কার খোঁজে কোথায় কে হীন আছে তার উপর প্রভুত্ব করতে—আত্মবিশ্বাস খোঁজে কোথায় কে শ্রেষ্ঠ আছে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেবত্বের সন্ধানে অভিসার যাত্রা করতে। অহঙ্কার চায় উচ্চ-নীচের ব্যবধানটাকেই সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে দেখতে—আত্মবিশ্বাস চায় আদর্শকে উচ্চ হতে উচ্চতর ক'রে ধরতে। অহঙ্কার ছিল অর্জ্জুনের যে, কর্ণকে হীন-কুলোদ্ভব ব'লে অবজ্ঞা করতেই প্রয়াসী হয়েছিল। আত্ম-বিশ্বাস ছিল কর্ণের, যে অর্জ্জুনকে বীরশ্রেষ্ঠ জেনে তার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কামনা ক'রে ব'লেছিল "দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং হি পৌরুষম্।" তাই বড় হবার উচ্চাশা অহঙ্কার নয়, এ স্বর্গীয় অভিমান। বিবেকানন্দ বলেছেন "আত্মবিকাশ—আত্মোন্নতিই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ বিকাশ।" 'আমি যে তাঁরই অংশ তিনি যে বিশ্বের আত্মা ও আমার মধ্যে আংশিকরূপে প্রাণ হয়ে আছেন' এ কথা বিশ্বাস করলে আমি ছোট বা হীন কিসে? কাজেই 'আমি বড়' এ স্বর্গীয় আবদার আমার তাঁরেই কাছে, মানবের কাছে নয়। স্বার্থপরতা সম্বন্ধেও প্রচলিত ধারণার একটু সমালোচনা করা চলে।" একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় না কি নিঃস্বার্থ বলে যথার্থ কিছু নেই; এবং যদিও থাকে তো সেইটাই যথার্থ মিথ্যার অহঙ্কার? কারণ, বাস্তবিকই কি মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কিছু চাইতে পারে? ত্যাগ ব'লে যে কর্ম্ম আমাদের নিঃস্বার্থতার অর্থ বরাবর বুঝিয়ে এসেছে, সেটা কি যথার্থ মনকে চোখঠারা দেওয়া নয়? ত্যাগ মানুষ করতে পারে কখন?—যখন যা ছাড়ে তার চাইতে আরো বড় উপলব্ধির জন্য তার অন্তর ব্যাকুলিত হয়। অর্থাৎ যখন কোনও উচ্চতর উপলব্ধির আশায় অন্তর অনুসন্ধিৎসু হয়, তখনই তার চাইতে অপেক্ষাকৃত ছোটকে সে বাদ দিতে সক্ষম হয়। আমরা এই বাদ দেওয়াটাকেই বড় করে দেখে থাকি, কিন্তু

এরই অন্তরালে অন্তর যে আরো বড় শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে, তার খোঁজ রাখি না। ত্যাগ বড় ত্যাগের জন্য নয়,—ত্যাগ বড়, তার ভিতর দিয়ে মানুষ যা লাভ করে তারই জন্য। তাই "নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকা" তখনই যথার্থ স্বার্থপরের কথা বলা যেতে পারে, যখন আমরা কেবল বাইরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই বিব্রত থেকে আভ্যন্তরীন কোনও সম্পদ লাভ করবার না করি চেষ্টা না খুঁজি উপায়!

আমরা মনের সত্য অস্বীকার করে কত বেশি সময়েই বাইরের বিধিব্যবস্থাকেই বড় করে দেখে থাকি, তারই সম্বন্ধে সামান্য যা দু একটি কথা আমার মনে হ'য়েছে, সেগুলি একটু পরিষ্কার ক'রে বল্‌বার চেষ্টা করব।

একটু তলিয়ে ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখা যায় যে, বিবাহে যথার্থ সুখী আমাদের দেশে খুবই কম। তার কারণ, আমাদেব দেশে বিবাহে প্রেমের বরটির চেয়ে মন্ত্রোচ্চারণটাই আজকাল বড় হয়ে উঠেছে দেখ্‌তে পাই। দাম্পত্য প্রেমের দেবতা যে প্রেম বা ভালবাসা, তার আসন কোথায় তার খোঁজ রাখতে না চেয়ে, আমরা শুধু মন্ত্রোচ্চারণটাকে প্রেমের বেদীতে বসিয়ে তাকেই প্রেম বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করি। এটা করবার সময় আমরা ভেবে দেখি না যে, মন্ত্রটা মৌখিক ও বাইরের জিনিষ; ভালবাসা বা প্রেমই সত্য। অন্তরের বন্ধন। মন্ত্র, মানুষের তৈরী, বাইরের বন্ধনেরই জন্য। ভালবাসা ভগবানের সৃষ্টি —তা স্বর্গীয়! তা ইচ্ছে করলেই হয় না তাঁর দয়া বা করুণা ভিন্ন। মানুষ ইচ্ছে করলেই অন্যকে ভালবাসতে পারে না, আবার ইচ্ছে করলেও ভাল না বেসে থাকতে পারে না। কাজেই এ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটী অনুপম সৃষ্টি। অন্তরের এই যে বড় সত্য—এই প্রেম, এর মূল্য আমরা কতটুকু দেই?—আমরা শুধু সেই মন্ত্রোচ্চারণটাকেই বৃহৎ করে দেখি। ফলে এই বন্ধন আমাদের মুক্তি না হ'য়ে ভয়ের হয়ে উঠে ভীষণ হয়ে দাঁড়ায়। মিলিত জীবনের প্রধান আধার যে ভালবাসা, প্রেম, তার অভাবে আন্তরিক বন্ধন যে গড়ে উঠতে পারে না বা শিথিল হয়ে আসতে বাধ্য, তার খবর আমরা কজন রাখতে চেষ্টা করি? অন্তরের বন্ধন আমরা শিথিল জেনেও বাইরের বন্ধনকে অটুট রাখবার চেষ্টা করি—এটাই কি আমাদের সত্য স্বীকারের সাহসের অভাব নয়? বাস্তবিক অন্তরের বন্ধন দৃঢ় না হলে কি বাইরের বন্ধন আমাদের জীবনে কেবল শূন্য সোয়াস্তি ছাড়া অন্য কোনও সার্থকতা বা বৈভব এনে দিতে পারে? যে বন্ধন প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাকে বাদ দিয়ে তার ভিত্তি কোথায়? অথচ এই সত্য স্বীকার করতে আমরা কি রকম ভয়েই না বিবর্ণ হয়ে উঠি! শুধু তাই নয়— বাইরের বন্ধনকে অটুট রাখতে গিয়ে এ সত্য স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিতই হয়ে উঠি যে "প্রেমের আসন পাতা হয়নি,"— মন্ত্র যখন পড়েছি, তখন এ অসত্যও স্বীকার আমরা সগৌরবেই করে থাকি 'ভালবাসতেই হবে'। ভালবাসা বা প্রেম যে জোরের বস্তু নয় বা তার উপর জোর চলে না, সেটা আমরা ভুলে থাকতেই ভালবাসি। ফলে আমরা বাইরেই বড় হয়ে উঠতে চাই—অন্তরকে ফাঁকি দিয়ে সত্যকে গোপন রেখে! এ ফাঁকি আমরা কাকে দিই? যেখানে প্রেম গড়ে ওঠেনি বা মনের এক তিল মিল নেই, সেখানে ঐ মন্ত্রের দোহাইয়ে কোনোমতে একটা সামঞ্জস্য করে পড়ে থাকার মানে কি জীবনের সার্থকতাকে শুকিয়ে মেরে অসারতাকেই বরণ করা নয়? তাই গভীর ও উচ্চ প্রেমের প্রভায় বাইরের একটি সামান্য মন্ত্রও ধীরে ধীরে দীপ্তিময় হয়ে অন্তরকে আলোতে উদ্ভাসিত করে তোলে।—যে মন্ত্র, সেই মহাশক্তির আলোক-স্পন্দনে নিত্য নতুন বেশে রঙীন হয়ে দেখা দেয়,—যে শক্তির মহাবলে তিলে তিলে সেই মন্ত্র সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, এক কথায় যে মহাশক্তি সেই মন্ত্রকে জীবন দান করে—তাকে আমরা অনায়াসে অস্বীকার করি। আর যাকে বাদ দিলে মন্ত্র শুধু মন্ত্রই থেকে যায়, তাকেই জোরের সঙ্গে সত্য বলে ঘোষণা করে বেড়াতে ভালবাসি। তাই আমরা প্রায়ই মমতাকে প্রেম বলে চালাবার প্রয়াস পাই; এবং প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনে এই মমতাটাকে প্রেম বলে ভুল করবার দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিয়ে অনবরত মনকে চোখঠার দিই।

আমাদের প্রায়ই ছোট বেলা থেকে এই ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয় যে, আত্মীয়ের ভালবাসার কাছে অনাত্মীয়ের ভালবাসা পাণ্ডুর হয়ে যাবেই। ভেবে দেখলে দেখা যায়, এটা আমাদের নিছক একটা সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা প্রতি পদেই স্বীকার করি, শরীরের চাইতে মন বড়। কাজেই মনের মিলের ভিতর দিয়ে যে প্রীতি বা ভালবাসা গড়ে ওঠে, তা ন্যূন হবার অন্য কোনও কারণ নেই; বরং

তা আরো বড় ও গভীর হতে পারে। আত্মীয়ের ভালবাসার মধ্যে একটী রক্ত-সম্বন্ধের গর্ব্ব থাকে—যে গর্ব্ব সত্য সহানুভূতির মস্ত অন্তরায়। এবং এই সহানুভূতির অভাবের জন্য প্রায়ই আত্মীয়ের স্বরূপটী আত্মীয়ের কাছে চিরদিনই অস্পষ্টই থেকে যায়। তাছাড়া আত্মীয়ের ভালবাসার মধ্যে একটী দাবী দাওয়ার ভাব নিহিত থাকে—যেটা আত্মীয়ের কাছে আত্মীয়কে ছোটই করে রাখে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমরা অতি সহজে এ কথাটি ভুলে যাই যে, যদি আমাদের মধ্যে কোনও আত্মীয় সত্যিকারের বড় হয়ে ওঠেন, তখন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আমরা উপলব্ধি করি সেই বাইরের আদরের দরুণই—রক্তের সম্বন্ধের অহমিকার গুণে নয়। আত্মীয়ের ভালবাসার মধ্যে প্রভুত্বের গর্ব্ব সর্ব্বদাই মাথা চাড়া দিয়ে থাকতে ভালবাসে। অনাত্মীয়ের ভালবাসার মধ্যে এ গর্ব্ব বা অহমিকা না থাকার দরুণ, সহানুভূতির অবদান তাকে আরও স্নিগ্ধ মধুর গভীর ও শুভ্র করে তোলে।

ব্যথার পূজা

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

২০

কবিরাজ আসিয়া দয়াদেবীর অবস্থা দেখিয়া বলিয়া গেলেন, জীবনের মেয়াদ আর বড়-জোর তিন-চার দিন। ধীরু বাড়ীতে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল, যদি পিসীমাকে শেষ দেখার ইচ্ছা থাকে, তবে এখনি চলিয়া এস। নারাণী দয়াদেবীর মাথার কাছে বসিয়া ছিল, ধীরু বাহিরে যদুবাবুর সহিত কথা কহিতেছিল। দয়াদেবী নারাণীকে ক্ষীণ বাক্যে কহিলেন, "সন্ধ্যে হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ পিসীমা !"

"ধীরু কোথায় ?"···

"বাইরে বাবার সঙ্গে কথা কইছেন···ডেকে দোব ?"

"না, থাক্"—দয়াদেবী একদৃষ্টে নারাণীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

নারাণী কহিল "আমি কাল যাঁদের বাড়ী গিয়েছিলুম, তাঁরা কে—জান পিসী ?"

"কে তারা ?"

"কল্যাণীদিদি! তোমাদের গাঁয়ে তাঁর মামার বাড়ী; তোমাদের তিনি চেনেন। আমায় বল্লেন—পিসীমাকে বলো, আমি দেখা করতে যাব।"

"কল্যাণী ?··এখানে ? ··ডাক্ ত মা ধীরুকে !" নারাণী ধীরুর নিকট গিয়া মৃদু বাক্যে কহিল "পিসীমা ডাকছেন।"

ধীরু ঘরের ভিতর দয়াদেবীর নিকট আসিতেই, দয়াদেবী কহিলেন "কলি এখানে এসেছে ধীরু·"

"জানি পিসীমা !"

"কেমন করে জানলি ?···তোর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে ?······"

"হ্যাঁ, সেদিন মন্দিরে তাকে দেখেছিলুম"······

"ওমা, আমায় ত তুই কিছুই বলিসনি ? তাকে আমার কথা বলেছিলি ?···"

ধীরু নতবদনে কহিল, "তার সঙ্গে আমার কোন কথা হয়নি।"

"ওমা, কি বোকা ছেলেরে তুই ?···তার সঙ্গে দেখা হল আর বলতে পারলিনি পিসীমার অসুখ ?"

ধীরু কোন কথা কহিল না। একটা দুঃখের প্রবাহ তাহার বুকের মধ্যে বহিয়া গেল। হায়, কেমন করিয়া সে পিসীমাকে জানাইবে, যে, কল্যাণী আর সে কল্যাণী নাই, সে এখন বড়লোক হইয়াছে জমীদার-গৃহিণী···অতীতের যত কিছু সমস্তই সে মন থেকে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে; কবে খড়দহ গ্রামে কে দয়াদেবী তাহাকে স্নেহ করিত, সে ক্ষুদ্র কথা কি এখন তাহার মনে থাকিতে পারে ? কেন থাকিবে ? ধীরু একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দয়াদেবী কহিলেন "নারাণী কলির বাড়ীতেই গিছল কুমারী হতে, নারাণীর কাছে শুনে কলি বলেছে এক দিন আসবে!"

ধীরু কোন কথা কহিল না।

"তুই কাল না হয় একবার যা না, তবু তার সঙ্গে একবার দেখাটা করে নিই ··আর দেখা হবে কি না আহা, কতদিন তাকে দেখিনি ·· "

ধীরু বলিতে পারিল না যে যাইবে,—কারণ, সেদিনকার আঘাত সে আজও ভুলিতে পারে নাই; অথচ না যাইবার কারণটাই বা কেমন করিয়া বলিবে? কি করিয়া বলিবে যে, কলি তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না—চিনিয়াও সম্পূর্ণ অপরিচিতের মত ব্যবহার করিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গিয়াছে? বলিলে পিসীমা মনে দুঃখ পাইবেন, হয় ত এ কথা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। ধীরুর মন যখন এইরকম অভিমান ও দ্বিধা-সঙ্কোচের দোলায় দুলিতেছিল, তখন যদুবাবু বাহির হইতে কহিলেন "ও নারাণী, কারা এসেছেন দেখ্!"

নারাণী বাহির হইয়া গেলে ধীরু দয়াদেবীকে কহিল "সে যা হয় হবে, এখন তুমি কেমন আছ পিসী? বাড়ীতে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, যদি বড়বৌদি আসেন!"

"কেন আর মিছিমিছি তাদের বিরক্ত করে টেলিগ্রাম করলি? আমি ত ভালই আছি।"

নারাণী দরজার কাছে আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল "ও পিসী, কল্যাণী দিদি এসেছেন।"

"কই রে?" নারাণীর সঙ্গে কল্যাণী কম্পিত চরণে ঘরে ঢুকিয়া দয়াদেবীর কাছে যাইলে, ধীরু উঠিয়া ঘাড় হেঁট করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দরজার পাশে সুখদা ও কাদম্বিনী দাঁড়াইয়া ছিল। ধীরু তাহাদের পাশ কাটাইয়া ওধারে ছাদে চলিয়া গেলে, সুখদা ও কাদম্বিনী ঘরে ঢুকিল।

কল্যাণী দয়াদেবীর কম্পিত হাতখানা নিজের দুই হাতে চাপিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল "এ কি চেহারা হয়ে গেছে পিসীমা তোমার?" কল্যাণীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

সুখদা দয়াদেবীকে কহিল "কথায় কথায় পরিচয় বেরিয়ে পড়ল দিদি! ওমা আগে কি ছাই জানতুম, তাহলে কবে নিয়ে আসতুম।"

কাদম্বিনীকে দেখাইয়া দয়াদেবী কহিলেন "এটি কে কলি?"

"আমার ননদ!"

কাদম্বিনী দয়াদেবীকে প্রণাম করিলে দয়াদেবী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "কি আর আশীর্ব্বাদ করব মা, ধর্ম্মে তোমার মতি থাক্। আহা, এই বয়েসেই···"

দয়াদেবী আর বলিতে পারিলেন না। কাদম্বিনী মাথা নীচু করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল। সুখদা ঠাকরুণ কল্যাণীকে কহিল "আরতির সময় হয়েছে বৌদি, বেশি দেরী হলে আবার " নীচে হইতে হরিচরণ কহিল "দেরী করবেন না, এর পর ভীড় হবে।" কল্যাণী সুখদাকে কহিল, "তোমরা যাও, আমি পিসীমার সঙ্গে কথা কই! যাবার বেলায় আমায় ডেকে নিয়ে যেও।" কাদম্বিনী কল্যাণীর মুখের পানে চাহিতেই দয়াদেবী কল্যাণীকে কহিলেন "আরতি দেখতে বেরিয়েছিস? তা যা না মা, আবার না হয় একদিন·· "

কল্যাণী বাধা দিয়া কহিল "আরতি আমার দেখা আছে, না হয় আর একদিন যাব। যাও ঠাকুরঝি, তোমরা আর দেরী কর কেন?" কাদম্বিনী উঠিয়া দাঁড়াইতেই দয়াদেবী ম্লানহাস্যে কহিলেন, "আহা কতদিন দেখেনি কি না ছেলেবেলা থেকেই আমায় · "

সুখদা কহিল "তা ত বটেই দিদি! আচ্ছা বউদি, তুমি থাক, যাবার বেলা ডেকে নিয়ে যাব।" সুখদা ও কাদম্বিনী চলিয়া গেলে দয়াদেবী কল্যাণীকে কহিল "এই ধীরুকে বকতে লেগেছিলুম কলি, বলছিলুম, তোর সঙ্গে দেখা হল, আর আমার কথা তোকে বলতে পারলে না। নারাণী, ধীরুকে ডাক ত!" নারাণী বাহির হইতে ঘুরিয়া আসিয়া দরজার কাছ হইতে কহিল "তিনি নেই, বাবা বল্লেন,—বেরিয়ে গেছেন।"

"কই আমায় ত কিছু বল্লে না যে বেরুচ্ছে? কলি এল, আর সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল! আচ্ছা ছেলে ত!"

নারাণী কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল।

কল্যাণীর বুকের ভিতরটা দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। কেন যে ধীরু হঠাৎ বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল, ইহার সঠিক কারণটা কল্যাণী না জানিলেও, তাহাকেই যে উপেক্ষা করা হইয়াছে, এই ধারণাটাই তাহার অন্তরকে পীড়ন করিল। কল্যাণী বার বার নিজেকে এই প্রশ্নটাই করিতে লাগিল—তাহার অপরাধ কি? কিসের জন্য তাহাকে এরূপ আঘাত করা হইল? একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গেও বুঝি কেহ এ রকম ব্যবহার করে না।

দয়াদেবী কল্যাণীকে কহিলেন "জামাই ভাল আছেন কলি ?"

কল্যাণী নত বদনে মাথা নাড়িল।

"শুনলুম, এখানে এসে খুব দান ধ্যান করলি..."

কল্যাণী গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিল..."না পিসী, মন্তর নিলুম কি না তাই..."

"ওমা, এই বয়েসেই মন্তর নিলি ?...তা বেশ মা—ধর্ম্মে কর্ম্মে মন দেবে তার আর বয়েসের বিচার কি ? ভাল থাক মা, সুখে থাক, হাতের নো অক্ষয় হোক্, একটি সোণার চাঁদ ছেলে কোলে কর্...আহা, তোকে দেখে আমার কি আনন্দই হল মা! তাই ত ধীরুকে বলছিলুম, যে কলি এখানে এসেছে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না ? আর কদিনই বা বাঁচব ? ধীরু কবিরাজ ডাকছে...ওষুধ খাওয়াচ্ছে...মুখ ফুটে বলতে পারছি না তাহলে একেবারে বসে পড়বে আমি ছাড়া আর ওর কেই বা আছে ? আমি গেলে কি যে ও করবে,—" দয়াদেবী চুপ করিলেন।

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল "বাড়ীতে একবার খবর দিলে বড়দি..."

দয়াদেবী বাধা দিয়া কহিলেন "ধীরু তার করেছে, কিন্তু কি দরকার ছিল মা! আমার নিজের শরীরের অবস্থা আমি কি বুঝতে পারছি না ?...আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। শুধু এক ভাবনা হচ্ছিল ধীরুকে নিয়ে.. এই বিদেশ বিভুঁয়ে একা সে কি করবে...বড্ডই শোকটা পাবে, কে ওকে দেখবে ?...নারাণীরা হাজার করলেও ওদের সঙ্গে তার কদিনের পরিচয় ? তুই এসেছিস কলি, আমি নিশ্চিন্ত হলুম। তুই যে তার ভাল চাইবি, তাকে দেখবি এ বিশ্বাস আমার আছে মা। ..আর এ আজকের নয় ..অনেক দিনের...সেই জন্যেই একদিন ইচ্ছে করেছিলুম ওকে তোর হাতে চিরকালের মতই তুলে দোব, কিন্তু মানুষ মনে করে এক, হয় আর; ভগবান আমার সে সাধ পূর্ণ করলেন না; না হক, তুই যে সুখী হয়েছিস, রাজরাণী হয়েছিস মা এও আমার মস্ত সুখ। ওর বরাত..."; দয়াদেবী আর বলিতে পারিলেন না।

কল্যাণী নত বদনে বসিয়া ছিল, একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন তাহার বুকের কাছে ঠেলিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল, দয়াদেবীর চরণ দুটির উপর মুখ রাখিয়া বলে 'ওগো, এ মিথ্যা, এই অলঙ্কার, ঐশ্বর্য্য—জমীদার-গৃহিণীর গর্ব্ব, এ সবের সঙ্গে তার অন্তরের এতটুকুও যোগ নাই,—সে যেন রঙ্গমঞ্চে আসিয়া অভিনয় করিয়া যাইতেছে।'

"নারাণী বেশ মেয়ে কলি,—ও আমার যা করেছে, ওর ধার শুধতে পারব না। তাই ত ধীরুকে বলছিলুম, এইবার বিয়ে করে সংসারী হ, "

"বেশ ত পিসী, ওর সঙ্গেই বিয়ে দাও না .."

"আমার দ্বারা আর হয়ে উঠবে না মা ..তুই সে ভারটা নে, তুই বলে কয়ে ওকে সংসারী করিস মা। না হলে ও ভেসে ভেসে বেড়াবে, আমার মরেও সুখ হবে না।"

"কিন্তু আমার কথা কি থাকবে পিসীমা ?"

"তুই জানিস না কলি, যদি কারুর কথা ও শোনে, তবে এক তোর কথাই শুনবে। ছেলেবেলা থেকে ও আমার বুকে মানুষ হয়েছে আমার কাছে ওর কোন কিছুই কোন দিন ছাপা থাকে নি। ও যে কত ব্যথা পেয়ে, কত দুঃখে গাঁ ছেড়ে এসেছে, তা আমার মতন কেউ ত জানে না মা। লোকে হয় ত মনে করলে দেবুর সঙ্গে তুচ্ছ ঝগড়াটাই...থাক, সে আর কি শুনবি মা ? আমারই পোড়া অদৃষ্ট,...বুঝেও বুঝলুম না।"

কল্যাণী চুপ করিয়া রহিল, কোন কথা বলিতে পারিল না। কি আর বলিবে সে ? বলিবার কি আছে ?

পিসীমা যাহা শুনাইলেন, সে ত তাহারও অজ্ঞাত নহে। সে কি না জানিয়া না বুঝিয়া তাহার ভরা বুকখানা এমন করিয়া খালি করিয়া দিয়াছে ? ভক্ত দেবতার চরণে অর্ঘ্য সাজাইয়া দিয়াই শান্তি পায়, সেই তার সুখ। সে জানিতে চাহে না—দেবতা তাহার পূজা গ্রহণ করিলেন কি না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা কহিয়া দয়াদেবী শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি স্তব্ধভাবে অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে বুকের উপর হাত রাখিয়া স্পন্দহীনের মত চুপ করিয়া রহিলেন, কল্যাণীও সে স্তব্ধতা ভঙ্গ করিল না।......

হঠাৎ দরজার কাছে গলার সাড়া পাওয়া গেল,—"তারা চলে গেছে নারাণী ?"

সচমকে কল্যাণী মাথা তুলিয়া দেখিল, ধীরু আসিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিতেছে!......কল্যাণী তখনো যায় নাই

দেখিয়া, ধীরু ভিতরে প্রবেশ করিয়াই অপ্রস্তুতভাবে আবার দাঁড়াইয়া পড়িল।……

কল্যাণী সহজ ভাবেই বলিল, "আমাকে এখান থেকে তাড়াবার জন্যে আপনি এত ব্যস্ত কেন বলুন ত?" কল্যাণী উঠিয়া আসিয়া ধীরুকে প্রণাম করিল।

এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া ধীরু চকিত চোখে কল্যাণীর মুখের পানে তাকাইল—তার পরেই আবার মুখ নামাইয়া মাটির দিকে নীরবে চাহিয়া রহিল।

কল্যাণী ম্লান হাস্যে বলিল, "কি হয়েছে বলুন ত যে আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন?"

ধীরুর বুকের ভিতর যেন কেমন একটা অভিমানের উচ্ছ্বাস উপরে ঠেলিয়া উঠিতে চাহিতেছিল। ভাবিল, সেও বলে,—'সে দিন যখন দেখা হল, তখন তুমিই কি কথা কয়েছিলে?' কিন্তু পরমূহূর্ত্তেই আপনাকে সামলাইয়া লইয়া যেমন নীরব ছিল তেমনি নীরব হইয়াই রহিল।

কল্যাণী ধীরুকে নিরুত্তর দেখিয়া পুনরায় বলিল "আমার সঙ্গে কথা বলুবেন না না কি? আমি যে আপনার কাছে কি এমন অপরাধ করেছি, তা ত জানি না। আর অপরাধ করলেও কেউ কি বাড়ীতে পেয়ে এমনি করে অপমান করে?"

ধীরু আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল "না—না, তা নয়, পিসীমার অসুখের জন্যই মনটা…"

ধীরুকে আর কারণ প্রকাশের অবকাশ না দিয়া কল্যাণী বলিল, "যাক্—রাগ করেন নি ত? বাঁচলুম!"

ধীরু কহিল "না—রাগ কি··তার পর তুমি ভাল আছ?"

কল্যাণী মাথা নাড়িয়া হাসিয়া কহিল "ভাল না থাকবার ত কোন কারণ নাই, যখন আমি জমিদার-গিন্নী! আপনাদের কিন্তু এখনো আমি চিনতে পাচ্ছি দেখেছেন?…এতে আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন না?…বাঃ…সে কি?"

কল্যাণী হাসিতে হাসিতে স্বাভাবিক ভাবেই কথাগুলি বলিল বটে, কিন্তু ইহাতে যে প্রচ্ছন্ন বেদনা জড়িত ছিল, তাহা ধীরুর বুকে বাজিল! তাহার স্মরণ হইল, এ যেন তার নিজেরই মুখের কথা! কল্যাণীর বিবাহের সম্বন্ধের সময়ে সে যেন এমনি কি কতকগুলো কথা দিগম্বরী ঠাকুরাণীর কাছে বলিয়াছিল; এবং এই কথা লইয়া কল্যাণীও সেদিন তাকে বেশ দু-কথা শুনাইয়া দিয়াছিল!…কিন্তু সেই দিন আর এই দিন! এর মাঝে যেন কত কত যুগের সুদীর্ঘ ব্যবধান! সেদিন ছিল তারা এক বোঁটায় ফোটা কচি দুটি ফুলের মত…আর আজ? কবেকার এক ঝড়ের ঝাপটে ঝরিয়া পড়িয়াছে ফুল দুটি সংসার স্রোতের মাঝখানে,—কে কোথায় কতদূরে, কোন্ ধূ ধূ মরুর তাতল তটের দিকে ভাসিয়া আর ভাঙ্গিয়া চলিয়াছে—তা জানে শুধু সেই নিষ্ঠুর নিয়তি! ধীরুর চোখে জল আসিল।

কল্যাণী বলিল "চুপ করে আবার কি ভাবছেন?"

যেন স্বপ্নের মাঝখান থেকে এক ধাক্কায় জাগিয়া উঠিয়া ধীরু বলিল, "কই না, কিছু ভাবিনি তো! তুমি ভাল আছ কলি?"

কল্যাণী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "এক কথা আর কতবার জিজ্ঞাসা করবেন বলুন ত? চলুন পিসীমার কাছে গিয়ে বসিগে।"

কল্যাণী ঘরের মধ্যে পা বাড়াইয়াই পুনরায় থমকিয়া পিছন ফিরিয়া কহিল "পিসীমার সঙ্গে আমার এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল··তাঁর সাধ আপনি বিয়ে করেন·· তিনি থাকতে থাকতেই··"

ধীরু বাধা দিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল "বিয়ে?··বিয়ে করতে হবে?"

"হাঁ,—আমি বলছি···পিসীমারও শেষ সাধ ·আর চিরকাল খেয়ালের বশে না চলে সংসারী হওয়া উচিত,··· অসুখ বিসুখ করলে দেখবে কে?"

ধীরু কল্যাণীর মুখের পানে চাহিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভিতর চাপিয়া ভগ্নস্বরে বলিল "পথেই মরি আর হাঁসপাতালেই মরি—সে আর হয় না!

কল্যাণী স্থির দৃষ্টিতে ধীরুর পানে চাহিয়া গম্ভীরভাবে বলিল "কেন হয় না বলুন ত?"

ধীরু কোন কথা বলিতে পারিল না, নতবদনে দাঁড়াইয়া রহিল।

কল্যাণী পুনরায় বলিল "আপনার কোন কথা শোনা হবে না···আপনাকে বিয়ে করতেই হবে···আর এই নারাণীকেই···"

তীর্থযাত্রার প্রত্যাবর্ত্তন

শিল্পী—শ্রীফণীভূষণ গুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ধীরু মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল "পারব না।"

"জানেন, নারাণী পিসীমার কি সেবাটা করেছে? তার কৃতজ্ঞতার ঋণ…"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "পরিশোধের কি অন্য উপায় নাই?"

"টাকা দিয়ে না কি?…ও, আমি ভুলে গিছলুম, আপনি যে এখন বড়লোক…অনেক টাকা রোজগার করেন…এ আপনারই শোভা পায়। কিন্তু দেখুন, টাকার মাপকাটিতে সব জিনিষের যাচাই হয় না। থাকৃগে, আমি যখন অনুরোধ করছি…"

"তুমি আমার কে যে অন্যায় অনুরোধ করলেই…"

"কেউ নয়?…আমি আপনার কেউ নয়?…হ্যাঁ, সত্যিই আমি আপনার কেউ নয়, আজ থেকে এই জেনে রাখুন,—আর আমি ইচ্ছে করি—আপনার সঙ্গে আমার যেন আর কখনও দেখা না হয়…"

এমন সময় নীচে হইতে হরিচরণের গলার সাড়া পাওয়া গেল "বৌরাণী, আসুন, এঁরা আর উপরে যাবেন না…রাত হয়ে গেছে।"

কল্যাণী দ্রুত নীচে নামিয়া গেল। ধীরু বারাণ্ডায় রেলিংটা ধরিয়া যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার মুখখানা এক নিমেষে মৃত্যু-বিবর্ণীকৃত মুখের ন্যায় কালো হইল, দুই চোখ বাহিয়া কয় ফোঁটা তপ্ত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

২১

দিন দুই কাটিয়া গেছে, কল্যাণী আর নারাণীদের বাড়ী যায় নাই এবং দয়াদেবীর কোন খবরই সে জানে না। কিন্তু তাহার মনটা এই দুই দিন ধরিয়া আর সব বিষয় ঠেলিয়া কেবল ধীরুর কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়াছে। কেন যে আর ধীরু বিবাহ করিবে না, ইহা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতন পরিষ্কার হইলেও কল্যাণী সে দিকে চাহিতে সাহস করিল না—জোর করিয়া তাহার দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরাইল। তাহার বুকটা গর্ব্ব ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিতে চাহিলেও, কি জানি কেন, তাহার অন্তরাত্মা ইহাতে যোগ দিতে পারিল না। ধীরুর দুঃখটাই বেশী করিয়া তাহার বুকে বাজিল। তাহার মনে হইল 'ছিঃ ছিঃ অমন রূঢ় কঠিন কথা সে বলিয়া আসিল কি করিয়া! পিসীমার অসুখে তাহাকে দুটো সান্ত্বনার কথা না বলিয়া, পাশে থাকিয়া সাহায্য না করিয়া, এই বিপদের সময় তাহার গায়ে জ্বলন্ত আগুন ছড়াইয়া দিয়া আসিলাম? পিসীমাকে হারানো যে তার কতখানি ব্যথা, সে যে কত বড় সর্ব্বনাশ ইহা ত নিজের অবিদিত নাই! জানিয়া, বুঝিয়া, তাহাকে এরূপ নিষ্ঠুর ভাবে আঘাত করিলাম? কেন?… কিসের এ জ্বালা?' ভাবিতে ভাবিতে কল্যাণী শিহরিয়া উঠিল। হায়, যে তাহার জীবনের প্রতি অণুপরমাণুতে মিশাইয়া আছে, তাহাকেই বলিয়া আসিলাম "তোমার সঙ্গে আমার আর কখনও যেন দেখা না হয়!" কল্যাণীর মনটা নিজের প্রতি ক্ষোভে ও ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল এবং ধীরুর কাছে অপরাধের ক্ষমা চাহিবার জন্য সে অধীর হইল। কাদম্বিনী ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল, "বউ, দাদা বল্লেন, তৈরী হয়ে নাও, গাড়ী এসেছে, সারনাথ দেখতে যাবে! নাও, ওঠ, আর দেরী ক'রো না, আমাদের হয়ে গেছে।"

"আমি যাব না, তোমরা যাও।"

কাদম্বিনী বিস্ময়ে কল্যাণীর পানে চাহিয়া কহিল "সে কি? কাল বল্লে যাব,—গাড়ী ঠিক করা হল আর আজ বলছ যাব না?…নাও, ঢং রাখ, ওঠ!"

"আমি যাব না, বিরক্ত করো না।"

"কেন?…এর মধ্যে কি হল?"

"জানি না, বকিও না, যাও!"

কাদম্বিনী মুখ ভার করিয়া চলিয়া গেল! কল্যাণী ভাবিল, "ছিঃ ছিঃ, পিসীমাই বা কি ভাবিতেছেন? হয় ত মনে করিয়াছেন, কল্যাণী আজ ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া স্নেহ, মমতা, কৃতজ্ঞতা, সব বিসর্জ্জন দিয়াছে। এত যে তাহাকে ভালবাসিতাম, সব ভুলিয়া গেল!"

জগদীশবাবু আসিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন "এক ঘণ্টা ধরে গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চীৎকার করে গলা ফাটালুম, গ্রাহ্য হচ্ছে না?"

"আমি ত ঠাকুরঝিকে বলে দিলুম যাব না, তোমরা যাও!"

"যাবে না কেন? তবে কাল গাড়ী ঠিক করতে বল্লে কেন?"

"আমার বাট হয়েছে! তোমরা যাও না বাপু, তোমাদের পায়ে ত শেকল দিইনি?"

চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া ধপাস্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া

জগদীশবাবু বলিলেন "দেখ নতুন বৌ, তুমি কি ভেবেছ তা জানি না; কিন্তু মানুষের সহ্যর একটা সীমা আছে। তুমি কি মনে কর, তোমায় বিয়ে করেছি বলে তোমার কাছে একটা মস্ত বড় অপরাধ করেছি! তোমাদের কি এতে কিছু উপকার হয় নি? একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোককে—"

বাধা দিয়া কল্যাণী চোখমুখ লাল করিয়া কহিল "তোমরাই বা কি মনে করেছ? আমি ত তোমাদের কেনা বাঁদী নই, যে আমার সুখ অসুখ থাকতে নাই, সদাই তোমাদের হুকুমে চলতে হবে···· "

জগদীশ বাবু কল্যাণীর পানে চাহিয়া হতাশভাবে বলিলেন "কি বলছ নতুন বৌ? আমরা তোমার সঙ্গে দাসী বাঁদির মতন ব্যবহার করি? এই কথা তুমি বল্লে?"

কল্যাণী নিরুত্তর রহিল।

জগদীশবাবু বলিলেন "তোমার কি হয়েছে বল ত? আজ দুদিন ধরে মুখ শুকিয়ে বেড়াচ্ছ,—কাদী বলে ভাল করে খাও না, কি হয়েছে? খুলে বল।"

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে বলিল "কি আবার হবে?"

"নিশ্চয় কিছু হয়েছে···মামী কিছু বলেছে?···লক্ষীটি বল " জগদীশবাবু উঠিয়া আসিয়া কল্যাণীর পিঠে হাত দিয়া স্নেহপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন "ছিঃ, এ রকম করে না, বল—কি হয়েছে?"

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সত্যি কিছুই হয় নি, আমার মনটা ভাল নেই, তাই যাব না। তুমি রাগ করো না।"

"মন ভাল নেই কেন? বুড়োর সঙ্গে ঘর করা "

একটা ভ্রূকুটি করিয়া কল্যাণী বলিল "যাও—"

"তা যাচ্ছি, কিন্তু কি হয়েছে বল ত? না বল্লে আমি ছাড়চি না।" কল্যাণী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "আমাদের গাঁয়ের পিসীমা এখানে আছেন, সেদিন অসুখ দেখে এসেছি বলেছিলুম না; আজ দুদিন যেতে পারিনি, কোন খবরও পাই নি··· ···বুড়ামানুষ কেমন আছেন—এই বিদেশে··· "

বাধা দিয়া জগদীশবাবু বলিলেন "তুমি একটি আস্ত পাগল! যেতেই বা কে মানা করেছে, আর খবরই বা নাওনি কেন? কোথায় তাঁরা আছেন, চল ··"

"তোমাকে আর যেতে হবে না, নেত্য ও হরির মাকে নিয়ে আমি যাচ্ছি। তুমি এদের নিয়ে সাবনাথ যাও!"

জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "অর্দ্ধ অঙ্গই যখন এখানে থাকল, তখন আর আমি কই গেলুম!"

"না, যাও, ছিঃ···মামী, ঠাকুরঝি এরা সব কি মনে করবে?"

"মনে করবে তোমার পোষা······"

বাধা দিয়া কল্যাণী বলিল "দেখ, আবার ওই সব কথা বল্লে—" জগদীশবাবু হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, বলব না, মনে মনেই জানা থাক্, কেমন? এস, তাহলে ওই গাড়ীতেই যাবে।" কল্যাণী জগদীশবাবুর অনুসরণ করিল।

গাড়ীখানা আসিয়া গলির মোড়ে লাগিতেই কল্যাণী নামিয়া পড়িল ও হরির মাকে সঙ্গে লইয়া চলিল যদুবাবুর বাড়ী। বুক তার প্রচণ্ড দোলে দুলিতেছিল। বাড়ীর কবাট ঠেলিয়া ভিতরে আসিতেই দেখিল, নীচে কেহ নাই। একটা ঝি থালা মাজিতেছিল, সে একবার কল্যাণীর পানে চাহিল। হরির মা বলিল "আমি তাহলে নেত্যর সঙ্গে বাজার চল্লু, বউদি, আমার হারর জন্যে একটা ডিবে কিনবো তার মেয়েটার জন্যে—"

"আচ্ছা তুই যা, বাজার করে আয়!" কল্যাণী উপরে উঠিয়া দয়াদেবীর ঘরের সামনে আসিয়া দেখিল, ঘর শূন্য—নারাণী বসিয়া বটি দিয়া ফল কাটিতেছে! সে খানিকটা বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল··নারাণী কল্যাণীর পানে চাহিতেই কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল "পিসীমা? "

"নাই!"

কল্যাণীর পায়ের তলায় মেঝেটা দুলিয়া উঠিল! সে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া বসিয়া পড়িল! নারাণী ক্রন্দন-জড়িত-স্বরে কহিল "আপনিও সেই চলে গেলেন, পিসীমাও কেমন নিঝুম হয়ে পড়লেন, তার পর আর প্রায় জ্ঞান ছিল না: শেষে কিছুক্ষণের জন্য একটু জ্ঞান হয়েছিল!"

কল্যাণী বলিল "কখন হল?"

"কাল ভোরবেলা।"

কল্যাণীকে কে যেন চাবুক মারিল। সে ভাবিল, কেমন করিয়া আর ধীরুকে সে মুখ দেখাইবে? তাহার এই বিপদে, বিদেশে, সহায়হীন অবস্থায় কাছে থাকিয়াও কোন উপকার করিতে পারিলাম না, পিসীমার সঙ্গে শেষ দেখাটাও হইল না। পিছনে পদ শব্দে মুখ তুলিতেই দেখে—ধীরু কতকগুলি মালসা, পাঁকাটি লইয়া আসিতেছে, এবং তাহার পশ্চাতে

একজন যুবক, তাহারও হাতে কি সব রহিয়াছে। কল্যাণী মাথার কাপড় টানিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, তাহার বক্ষ দ্রুতভাবে স্পন্দিত হইতে লাগিল। ধীরু ঘরের সামনে আসিয়া জিনিষগুলা দরজার কাছে রাখিয়া নারাণীকে বলিল "এই নাও, সব জিনিষ কেনা হয়েছে, তোমার বাবা বাজার করে আসছেন।" পরে কল্যাণীর দিকে ফিরিয়া সহজভাবেই বলিল "এই যে কলি, সব শুনেছ ত? এখন দাঁড়িয়ে থেকে যাতে পিসীমার কাজ উদ্ধার হয় কর! নারাণী একা ছেলেমানুষ—তোমরা এখন এখানে আছ ত?"

"হ্যাঁ; বাড়ী থেকে কেউ এলেন না?"

"না, বড় বউদির অসুখ, না হলে হয়ত তিনি আসতেন। আমার বন্ধু মণিকে টেলিগ্রাম করেছিলুম, ও খুব সময়েই এসে পড়েছিল, ও আর যদুবাবু সব করেছেন, আমাকে কিছু দেখতে হয়নি!" একটু থামিয়া পুনরায় ভারী গলায় বলিল, "শেষ সময়ে পিসীমা একবার তোমাকে খুঁজেছিলেন; কিন্তু অত রাত্রে আর সময়ও ছিল না, তারই খানিকক্ষণ বাদেই কি না ..."

কল্যাণী আঁচলে চোখ মুছিল। তাহার মনটা অনুশোচনায় ভরিয়া উঠিল। সে নিজেকে সহস্র ধিক্কার দিয়া মনে মনে বলিল 'ওরে হতভাগী, তোর অভিমানটাই বড় হইল? আর এ অভিমান কাহার উপরে? যে তোকে সুখী দেখিবে বলিয়াই অনন্ত দুঃখের বোঝা নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহার এই দুঃসময়ে পাশে না থাকিয়া... ...'

ধীরু পুনরায় বলিল "তোমার কাছে আমার যত অপরাধই হয়ে থাক্, এইটা শুধু বিশ্বাস করো, যে ইচ্ছে করে কোনও দিন আমি তোমায় কষ্ট দিতে পারি না! যে যন্ত্রণার মাঝে ও যে অবস্থায় দিন কেটেছে, তোমার ত অজানা নাই, তাই মনে করে ক্ষমা করতে চেষ্টা করো!"

কল্যাণীর বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। ক্ষমা? অপরাধ কোথায়? ওগো, অসীম ভালবাসা বুকের মধ্যে পুষিয়া রাখিয়াছিলে বলিয়াই ত অনন্ত দুঃখের বোঝা নিজের মাথায় তুলিয়া লইয়াছ। চির স্নেহশীল অন্তর দিয়া কেবল বাহিরের দুঃখটাই বড় করিয়া দেখিলে, একবার ভাবিলে না যে এই তুচ্ছ অলঙ্কার ঐশ্বর্য্য কোনও দিনই আমার অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারিবে না। এই মিথ্যা যে সত্যের মুখোস পরিয়া যৌবনের প্রথম আনন্দ, জীবনের সমস্ত সুখকে বিকৃত করিয়া দিয়াছে, তাহা সে কি করিয়া বলিবে। কল্যাণী ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, কয় ফোঁটা জল তাহার চোখের কোণ হইতে ঝরিয়া পড়িল। এমন সময় হরির মা আঁচলে করিয়া কি লইয়া উপরে আসিয়া দাঁড়াইতেই ধীরু জিজ্ঞাসা করিল "কে গা?"

মাথায় কাপড়টা টানিয়া দিয়া হরির মা বলিল "আমি বউমার সঙ্গে এসেছি!"

"ওঃ...তোমার ঝি এসেছে কলি।"

কল্যাণী বাহিরে আসিয়া মণিকে দেখিয়া আবার পিছাইয়া আসিতেই, ধীরু বলিল "মণিকে আর লজ্জা করতে হবে না। মণি, এই কল্যাণী!" মণি আসিয়া কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া কহিল "আমি আপনার ছোট ভাই...দিদি!"

কল্যাণী মৃদুকণ্ঠে কহিল "বেঁচে থাক ভাই, রাজা হও।" পরে হরির মাকে কহিল, "তুমি বাড়ী যাও হরির মা, ঠাকুর-ঝিকে বলো আমি বিকেলে যাব। আমার পিসীমা মারা গেছেন।" হরির মা কহিল "আহা"!—ঝি চলিয়া গেলে কল্যাণী নারাণীকে কহিল, "মালসা গুলো ধুয়ে রাখ নারাণী, আমি ফলগুলো কাটছি।"

ধীরু নারাণীকে বলিল "মণিকে একটু চা খাওয়াও নারাণী, আর কিছু খাবার..."

বাধা দিয়া মণি কহিল "খাবার খাব না, শুধু একটু চা হলেই হবে!"

নারাণী ঘাড় হেঁট করিয়া নীচে চলিয়া গেল। কল্যাণী হাত ধুইয়া ফল কাটিতে লাগিল। ধীরু কহিল "মনে করছি—শ তিনেক ব্রাহ্মণ আর একশো দণ্ডী খাওয়াব।"

কল্যাণী কহিল "সে ভালই হবে, কিন্তু কাঙ্গালীদেরও .."

"হ্যাঁ, তাদের জন্যে কি রকম কি করা যায় বল ত?"

"চিঁড়ে মুড়কী সন্দেশ আর পয়সা দিলে মন্দ হয় না।"

"বেশ বলেছ, সেই ব্যবস্থাই কর। পিসীমার কাজ আমি ভাল করে করতে চাই। তাঁর যে কত পয়সা আমি নষ্ট করছি সে ত জান? আর ছেলেবেলায় মা গেছেন—মনেও নেই, পিসীমাই আমায় মার আদরে..." ধীরুর গলাটা ধরিয়া আসিয়া চোখের পাতা ভিজিল।

যদুবাবু বাড়ীতে ঢুকিয়া বাজার রাখিয়া উপরে আসিয়া ধীরুকে কহিলেন "ভটচায্যি মশাই ব্রাহ্মণদের নিমন্ত্রণ করবেন বলেছেন। আর মঠে মহারাজের সঙ্গে দেখা করে দণ্ডীদের

আসবার ব্যবস্থা করবেন! এই যে মা লক্ষ্মী এসেছেন! কতক্ষণ মার আসা হল ?"

কল্যাণী মৃদু কণ্ঠে কহিল "এই ঘণ্টাখানেক হল এসেছি।"

ধীরু উঠিয়া ওঘরে মণির নিকট গেল।

যদুবাবু কহিলেন, "তার পর সব শুনেছ ত মা ? আহা, দিদি ছিলেন, নারাণীর ভাবনা আমায় ভাবতে হয় নি !"

কল্যাণী কোন কথা কহিল না।

যদুবাবু পুনরায় বলিলেন "দিদির বড় ইচ্ছে ছিল,. ধীরুর সঙ্গে নারাণীর বিয়ে দেন, আমাকে আশাও দিয়েছিলেন··· তাই বলি মা, কাজ কর্ম্ম চুকে গেলে, তুমি যদি ধীরুকে বলে একটা পাকাপাকি কর·· "

বাধা দিয়া কল্যাণী কুণ্ঠিতভাবে বলিল "আমাকে আর এর মধ্যে জড়াবেন না বাবা, আপনিই "

"হাঁ, হাঁ, আমি ত বলবই, তবে কি না তুমিও থেকে মা জোর করে বলে কয়ে আমার দায় উদ্ধার করে দাও। আমার মেয়েকে ত দেখছ, দেখতে শুনতে ত আর মন্দ নয়, কিন্তু পয়সা নেই বলেই · আর মেয়েটাও বড় হয়ে উঠেছে, আর রাখা চলে না।" কল্যাণী কোন কথা বলিল না। যদুবাবু বলিলেন "কাজকর্ম্ম মিটুক, এর পর কথা হবে। তুমি ত এখন কাশীতে থাকবে মা!" কল্যাণী নতবদনে ঘাড় নাড়িল। যদুবাবু চলিয়া গেলে নারাণী আসিয়া কহিল "হবিষ্যির যোগাড় হয়ে গেছে দিদি !"

"তাহলে চান করে হবিষ্যি চড়াতে বল্ না !"

"তুমি বল দিদি, আমি ওঘরে যাব না !"

"কেন, যা না, বল্গে না · "

"ওঘরে আর কে যে আছে "

"কে আবার ? শুধু মণি আছে! আচ্ছা আমিই যাচ্ছি।" কল্যাণী উঠিয়া পাশের ঘরে যাইয়া ধীরুকে বলিল "হবিষ্যির যোগাড় হয়েছে, স্নান করে আসুন, চড়িয়ে দেবেন !"

"চল" বলিয়া ধীরু কল্যাণীর অনুসরণ করিল।

বৈকালে ধীরু ছোট ঘরখানায় একখানা কম্বলের উপর শুইয়া ছিল, অদূরে মণি তাহার শয্যায় ঘুমাইতেছে। যদুবাবু সকালে নারাণীর বিবাহ লইয়া কল্যাণীকে যাহা বলিতেছিলেন তাহার কতকাংশ ধীরু শুনিয়াছিল। এখন সে সেই বিষয় লইয়াই তোলাপাড়া করিতে লাগিল। কি করা যায়! কেমন করিয়া এ ঋণ পরিশোধ হয়! এই সমস্যার মীমাংসা হইলেই সকলের সঙ্গে তাহার দেনা-পাওনা একরকম মিটিয়া যায়, সে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে। কোন বন্ধন নাই, কোন আকর্ষণ নাই, কালের প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে চলিবে, যেখানে যতদূরেই হউক না কেন, তাহার জন্য কাহারও আর উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা নাই! সত্যই কি কেহ তাহার কথা আর ভাবিবে না ? কল্যাণীও না ? কল্যাণীর কথা মনে হইতেই তাহার প্রাণটা মর্ম্মভেদী স্বরে বলিয়া উঠিল·· "তাহাকে যদি আর না দেখিতাম, তাহা হইলে ভাল হইত! কেন আবার দেখিলাম ? হৃদয়বীণার প্রতি তারে এক দিন যে ঝঙ্কার উঠিয়াছিল, আজও ত সে সুরের রেশ থামিয়া যায় নাই·· তেমনি মধুর তেমনি করুণ না, তাহার নিকট হইতে পলাইতে হইবে, যত শীঘ্র হয়, দূরে বহুদূরে!· কল্যাণীর সেদিনের কথাটা তাহার মনে হইল "আর আপনার সঙ্গে আমার কখনও দেখা না হয়।" দুইজনে বাঁচিয়া থাকিবে, এই পৃথিবীতে থাকিবে, তবু আর কখনও দেখা হইবে না ? এ যে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ানক শাস্তি! বেশ, তাহাই হইবে, এ পারে তোমাতে আমাতে এই শেষ সাক্ষাৎ!· ধীরু দুই হাতে মুখ ঢাকিল। কতক্ষণ কাটিয়া গেছে, তাহার খেয়াল নাই, সহসা মৃদুস্পর্শে মুখ তুলিতেই দেখিল—মণি তাহার পাশে বসিয়া আছে।

মণি বলিল "ছিঃ ওঠ, রাতদিন এমনি পড়ে কাঁদবে ? কেউ চিরদিন বেঁচে থাকে না !"

ধীরু উঠিয়া বসিল, চোখ মুছিয়া বলিল "মণি, আমার একটা কথা রাখবি ?"

"বল, তোমার কোন্ কথাটা রাখিনি ?"

"সে জানি বলেই বল্‌ছি! তোর ঋণ আমি এ জীবনে শুধতে পারব না···" বাধা দিয়া মণি বলিল, "যাও—বাজে বকো না, এখন কি কর্‌তে হবে বল ?"

ধীরু মণির হাত দুটো চাপিয়া ধরিয়া মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল, "আমার পিসীর ঋণ তোকে শুধতে হবে,—তোকে নারাণীকে বিয়ে কর্‌তে হবে।"

মণি ধীরুর দিকে চাহিতেই ধীরু কহিল, "আমার কোন কিছুই তোর ত অজানা নাই,···আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর ভাই,···আর আমি জোর করে বল্‌ছি···তুই কখনও অসুখী হবিনি নারাণী বড় ভাল মেয়ে ;আমি নিজের বোনের

চেয়ে ওকে কম মনে করি না! ওর কাজ, কর্ম্ম, যত্ন সেবা......"

মণি হাসিয়া বলিল, "তোমার আর সার্টিফিকেট দিতে হবে না, আমার চোখ আছে।"

"তা হলে কি বলিস—তুই ওকে বিয়ে কর্‌বি?"

"ওঁদের যদি কোন আপত্তি না থাকে, তা হলে আমার অমত নেই।"

ধীরু আনন্দে মণিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "বাঁচালি ভাই, তোর ভাল হবে আমি বলছি দেখিস" বলিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া যদুবাবুর কাছে গিয়া বলিল "মণির সঙ্গে নারাণীর বে দিতে আপনার কোন আপত্তি আছে? মণি বাপের এক ছেলে ল পড়ছে আর ওদের যথেষ্ট টাকা কড়ি আছে জানেন?"

যদুবাবু হতবুদ্ধির মতন ধীরুর পানে চাহিয়া বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলিলেন "মণির সঙ্গে নারাণীর বিয়ে? আমার আপত্তি? কিছুমাত্র না! এত সৌভাগ্য নারাণী তোমার বোনের মতন—তার যাতে ভাল হয়।"

ধীরু বাধা দিয়া কহিল "হ্যাঁ—আমি শপথ করে বলছি, মণি নারাণীর অযোগ্য নয়, সে সুখী হবে।"

"বেশ বাবা, তুমি দাঁড়িয়ে থেকে তোমার বোনের বিয়ে দাও!"

ধীরু আর না দাঁড়াইয়া সেখান হইতে একরকম ছুটিয়া দয়াদেবীর ঘরে গেল। কল্যাণী নারাণীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। কোন কথা না বলিয়া ধীরু গিয়া একেবারে নারাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "এস, তোমার বিয়ে, দেখবে এস কালি, পিশার ঋণ শোধ করছি, আর কিছু তুমি আমায় বলতে পারবে না।" নারাণীকে একেবারে মণির সামনে দাঁড় করাইয়া ধীরু কহিল "এই নে মণি, একে গ্রহণ কর! আমি আশীর্ব্বাদ করছি তুই সুখী হবি।" এই বলিয়া নারাণীর হাত লইয়া মণির হাতের উপর রাখিল। লজ্জায় সঙ্কোচে নারাণী কাঁপিতেছিল। ধীরুর কথা শেষ হইতেই, সে নত হইয়া তাহাকে প্রণাম করিল; ও তাহার বড় দুটি চোখ হইতে কয় ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। ধীরু তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল "আশীর্ব্বাদ করি, সুখে থাক, পিসীমাও তোমায় স্বর্গ থেকে...আশীর্ব্বাদ করছেন! যার হাতে তোমায় আজ তুলে দিলুম জেনো, সে দেবতা!"

যদুবাবু আসিলে মণি তাঁর পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। কল্যাণী অদূরে দাঁড়াইয়া ছিল। মণি কল্যাণীর পায়ের ধূলা লইয়া হাসিয়া বলিল "কৈ দিদি, আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন না?"

"দীর্ঘজীবী হয়ে দুজনে সুখে থাক ভাই, এর বড় আশীর্ব্বাদ আমি জানি না।" নারাণী আসিয়া কল্যাণীকে প্রণাম করিয়া তাহার কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইতেই, কল্যাণী তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইল; আর তাহার সজল দৃষ্টি ঘরের মধ্যে একজনের প্রতি নিবদ্ধ ছিল.. যাহার খাম-খেয়ালী জীবনের অন্তরালে একটা ত্যাগশীল প্রাণ লুকানো আছে, যাকে কেহ কোন দিন খুঁজিয়া পায় নাই, কেহ কোন দিন পাইবে না! তপস্বিনী কল্যাণী আজ দুই চোখ মেলিয়া তাহাকেই দেখিতে লাগিল—আর তাহার চক্ষের জল শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য লইয়া এই নীরব উপাসনার মাঝে আপনার ব্যথার পূজা সাঙ্গ করিল।

সমাপ্ত

জলপথে ক'দিন

শ্রীজয়শ্রী ঘোষ

আমাদের দেশে কত যে সুন্দর যায়গা, কত যে সুন্দর দৃশ্য আছে, তা বোলে শেষ করা যায় না; কিন্তু কেহই নূতন দেশে যেতে চান না। না হোলে, আজকাল যে রকম হাওয়া-খাওয়ার রেওয়াজ উঠেছে, তাতে বৎসরের মধ্যে একবার সকলেই বাড়ীর বাহিরে বিদেশে পদার্পণ করেন; কিন্তু সে কেবল কয়েকটী দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আবার তারিই মধ্যে যাঁদের একটু বেশী দূরে যাবার ইচ্ছা থাকে, তাঁরা ভারতের মধ্যে তেমন উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর দেশ একেবারেই দেখতে পান না,—তা যতই স্বাস্থ্যকর এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভূষিত যায়গা দেশের মধ্যে থাকুক না কেন। কাজেই তাঁরা একেবারে পশ্চিমে ধাওয়া করেন। অথবা তাঁরা দেশের চারিদিক দেখার চেয়ে বাহিরে যাওয়া এবং দেখা সব চেয়ে সৌভাগ্য মনে করেন।

আমার এ পথের দৃশ্য বাঙ্গালীর কাছে একেবারে নূতন

নয়। যখন রেল কোম্পানী এদিকে রেল খোলেন নাই, তখন আসাম যেতে হোলে সকলকে এই পথেই যেতে হোত। রেল হোয়ে এই পথ সকলেই বর্জ্জন কোরেছেন। কেবল ইয়োরোপীয়েরাই এখনও মধ্যে মধ্যে এই পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করবার জন্য এবং শিকারের সখ পুরা-মাত্রায় মেটাবার জন্য গিয়ে থাকেন। দুএকজন দেশীয়ও কখনও কখনও এদিকে কেবল শিকার করবার জন্য এসে থাকেন।

আমার মতে, কেবল শিকার করবার জন্য আমার দেশের লোক এদিকে না এসে, যদি স্বাস্থ্য সঞ্চয়ের জন্যও এদিকে আসেন, তাহলে সে সম্বন্ধে তাঁদের ঠকতে হবে না। এই পথে যদি অন্ততঃ দশ দিনের জন্যও কেউ আসেন, তাহলে একমাস পুরীতে থাকায় যে স্বাস্থ্যলাভ হয়, তার দ্বিগুণ স্বাস্থ্য লাভ হতে পারে।

প্রথমতঃ সুন্দর দৃশ্য উপভোগ হয়,—গঙ্গার, পদ্মার, ব্রহ্মপুত্রের নির্ম্মল হাওয়ায় শরীরের সমস্ত গ্লানি ধুয়ে ফেলা যায়, এবং সর্ব্বোপরি দেশের সঙ্গেও অনেকটা পরিচয় হয়। সেইজন্য আমি সকলকে অনুরোধ করি যে, যাঁরা কেবল প্রকৃতির লীলাভূমি আসামে বেড়াতে যেতে চান, তাঁরা যেন রেলপথে না গিয়ে জলপথেই যান।

কলিকাতার ম্যাকনীল কোম্পানীর আসাম-সুন্দরবন ডেসপ্যাচ নামে ষ্টীমার লাইনে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। অনেকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত এই ষ্টীমারে গিয়ে গোয়ালন্দ হোতে রেলে কলিকাতায় ফিরে আসেন।

গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যাঁরা যান, তাঁরা কেবল সুন্দরবন দেখতে ও সুন্দরবনে শিকার কোরতেই যান। যাঁদের শিকারের সখ আছে, এই পথে তাঁদের সে সখ খুব মিটিতে পারে। কারণ সব রকম শিকার এ পথে পাওয়া যায়, এবং ষ্টীমারের লোকেরাও শিকারে অনেক সাহায্য করে। তবে সুন্দরবন পর্য্যন্ত গেলে বেশী শিকার পাওয়া যায় না। ব্রহ্মপুত্রে শিকার অজস্র।

সুন্দরবন পর্য্যন্ত গেলে অনেক সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখবারও বাকি থেকে যায়। সেই কারণে, আমার মতে, গৌহাটি পর্য্যন্ত যাওয়াই ভাল। তা হোলে কলিকাতা থেকে আসাম পর্য্যন্ত দেশের দৃশ্য উপভোগ করা যায়।

সাধারণতঃ এ ষ্টীমারে যাত্রী বড় থাকে না। দু একজন যাঁরা থাকেন, তাঁরা সবই ইয়োরোপীয়; এবং এঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়ে থাকেন।

আমাদের সঙ্গে দুটী ইয়োরোপীয় মহিলা যাত্রী ছিলেন। তাঁরা গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। আর কেউই ছিলেন না।

ষ্টীমারে থাকবার বন্দোবস্ত বেশ ভাল এবং সারেঙ্গ, লস্কর ও কর্ম্মচারীরা যাত্রীদের বেশ যত্ন নিয়ে থাকেন।

এখন আর বেশী কথা না বাড়িয়ে, আমার দিনলিপির সাহায্যে পথের দৃশ্যের বর্ণনা করবার চেষ্টা করি।

৬ই ফেব্রুয়ারি—গত কল্য রাত্রি ১০টার সময় জগন্নাথ ঘাটে এসে ম্যাকনীল কোম্পানীর "তারকী" নামক ষ্টীমারে এসে নিজেদের ক্যাবিন দখল কোরে উঠা গেছে। আজ ভোরে ৬টার সময় ষ্টীমার ছাড়বার কথা ছিল, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে দেখি যে, ঘাট থেকে ষ্টীমার মাঝ-গাঙ্গে এসে নোঙ্গর কোরে দাঁড়িয়ে আছে—হাবড়ার পুল খুলবার অপেক্ষায়। হাওড়ার পুল খুলতে বেলা ৮টা বাজল। ৮টার সময় ষ্টীমার হাওড়া থেকে ছাড়ল। কলিকাতা ছাড়বার পরেই গঙ্গার দুধারে অসংখ্য জুট-মিল ও ইটখোলা। সব জুটমিলগুলাই ইংরাজদের:—একটীও বাঙ্গালিদের নাই। কলিকাতা হোতে চেঙ্গাইল পর্য্যন্ত গঙ্গার এক পার্শ্বের তীরে সবই জুটমিল। আর অপর পার্শ্বে ইটখোলা; এবং বজবজের তেল ও পেট্রোলের গুদাম। ডায়মণ্ডহারবার ও পোর্ট ক্যানিং ছাড়বার পরই সমুদ্রগামী বড় বড় জাহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতে লাগল। তখন বুঝলাম যে, সমুদ্রে আসতে আর বেশী দেরী নেই। গঙ্গার মুখও এখানে খুব চওড়া,—একূল ওকূল দেখা যায় না। তার পর খানিক পরেই অল্পক্ষণের জন্য সমুদ্রে এসে পড়া গেল। এইখানে এক দিকে কেবল জল—কোথাও লাল ও কোথাও নীল; এবং খুব ঝড়ের মত বাতাস। এইখানে বড় চমৎকার দেখতে। না দেখলে কেবল লিখে বর্ণনা হয় না—এত সুন্দর। এইখানে খুব Seagull দেখা যেতে লাগল। একটুক্ষণ পরেই আমাদের ষ্টীমার ঘুরে সুন্দরবনের খালের মধ্যে যাবার জন্য নদীর মধ্যে চললো। খানিক যাবার পরই mudpointএ এসে সুন্দরবনের খালের মধ্যে এসে পড়া গেল। দিনের বেলা হোলে এখানকার ফোটো লওয়া যেতো,—যায়গাটা এত সুন্দর; কিন্তু সন্ধ্যে হোয়ে যাওয়ায় ছবি নেওয়া হোলো না।

এইখানে বেশ বড় একটা গ্রাম আছে। তখন সেখানে কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে, আলো দিয়ে কোনো দেবালয়ে আরতি হোচ্ছিলো—ধূপ ধুনার গন্ধ পর্য্যন্ত ষ্টীমারে ভেসে আসছিলো। এই গ্রামেই ষ্টীমার থেকে আড়কাটী (Pilot) নেমে গেল। ডাঙ্গা থেকে নৌকা এসে তাকে নামিয়ে নিয়ে গেল। তার পর অন্ধকারে আর কিছুই দেখবার উপায় থাকলো না। খানিক পরেই জল মাপবার ধুম পোড়ে গেল।

৭ই—আজ উঠেই দেখি চারিদিকে কেবল জল,—ডাঙ্গার মূর্ত্তি বড় দেখা যায় না। এইখানে নদী খুব চওড়া—ভোরে নদীর উপর ঘন কুয়াসার ফাঁকে এইখানে সূর্য্যোদয় দেখতে যে কত সুন্দর, সে দৃশ্য না দেখলে বোঝান যায় না। মাঝে মাঝে চড়া; আর তাতে কাদাখোঁচা ও টাল পাখী সব ডাকাডাকি কোরছে। এই সব পাখী দেখে বোট থেকেই আমরা গুলি করলুম; কিন্তু একটা জখম হওয়া ছাড়া আর সবগুলাই পালালো।

এইখানে দুধারেই ঘন সবুজ গাছের জঙ্গল। কেবলই সবুজ,—একটা শুকনা গাছও নেই। মাঝে মাঝে নানারকম পামগাছের কুঞ্জ দেখা যেতে লাগলো। খুব সম্ভব এই পাম-গাছের পাতা এখান থেকে লোকে কেটে নৌকা বোঝাই কোরে নিয়ে যায়; এবং সাধারণে তাকেই গোলপাতা বোলে থাকে। এই সবুজ গাছের রঙ্গে নদীর জলও কতক ভাগ একেবারে সবুজ। এই দৃশ্য যে কি সুন্দর এবং কি অপরূপ—তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। মাঝে মাঝে ছাই-রঙ্গের বড় হাঁসও দেখতে পাওয়া যেতে লাগলো। এই হাঁস দেখে আবার গুলি করা গেল; কিন্তু গুলি ততদূর পোঁছাল না,—হাঁসগুলি শব্দ শুনেই উড়ে পালাল। মানুষের চিহ্নও নাই—কেবল জঙ্গল।

বেলা হোতে নদী ক্রমে সরু হোয়ে এল, আর তার সঙ্গে ষ্টীমারও অনবরত গোলকধাঁধার মত ঘুরে ঘুরে চোলতে লাগল। এইখানে মাঝে মাঝে কাঠ বোঝাই নৌকা ও কাঁচা গোলপাতা-বোঝাই নোকা দেখা যেতে লাগলো। নৌকার উপর বড় বড় জল-ভরা তিজেল। এখানকার জল লোনা সেই জন্য কাঠুরিয়ারা ঐ অঞ্চলে আসবার সময় খাবার জল সঙ্গে কোরে আনে। এইখানে আবার হাঁস দেখে রাইফেল চালাতে গিয়ে রাইফেল আটকে গেল। তখনই রাইফেল ঠিক কোরতে গিয়ে ষ্টীমার এগিয়ে চোলে এল, কাজেই পাখী আর মারা হোল না। দুপুর বেলা একটা হাঁস মারা হোল; সুন্দরবনে এই প্রথম শিকার আমাদের হোল।

বিকাল বেলা মাঝে মাঝে হরিণের পাল জঙ্গলের মধ্যে নির্ভয়ে খেলা কোরছে, আর ষ্টীমারের দিকে তাকিয়ে দেখছে দেখা গেল। জঙ্গলের ভিতর এদের খেলা দেখবার জিনিস। হরিণ দেখেই আবার আমাদের শিকারের সখ বেড়ে উঠল। গুলি কোরতে ততদূর গুলি পোঁছাল না। বন্দুকের শব্দ শুনে হরিণগুলা খেলা বন্ধ কোরে একযোগে সকলে থমকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। খুব সম্ভব তাদের এভাবে এই রকম কোরে কেউ বিরক্ত করে না, তাই তারা ভয় না পেয়ে অবাক হোয়ে চেয়েই রইল। ষ্টীমার খানিক এগুবার পর আর এক পাল হরিণ আমাদের চোখে পড়তে আবার গুলি করা হোল। সেই গুলি একটা হরিণের পায়ে লাগাতে সকলে দৌড়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গেল। এই পর্য্যন্ত সুন্দরবনের শিকারের পর্ব্ব।

এদিকে নদী কোথাও খুব সরু, আবার কোথাও খুব চওড়া। আর এই নদীতে অসংখ্য খাল এসে পোড়েছে। এই সব খালের মধ্য দিয়াই কাঠুরিয়ারা নৌকা নিয়ে গিয়ে জঙ্গল থেকে কাঠ আনে।

৮ই—কাল রাত্রি ১০ টায় খুলনায় পৌঁছান গিয়াছিল। সে সময় ঘুমের পূজায় ব্যস্ত থাকায় কেবল মাল উঠান ও নামানর শব্দই কাণে ভেসে আসছিল। তার পর সকালে উঠেই দেখি যে, আমাদের ষ্টীমারের সঙ্গে একটী মাল-বোঝাই গাধাবোট জোড়া হয়েছে। গাধা বোটটীর নাম "সুলতানা"। এই লেজুড়টী খুব সম্ভব খুলনায় জোড়া হয়েছিল। আজকে দুধারেই ছোট ছোট গ্রাম ও আবাদ, জঙ্গলের চিহ্ন বড় নাই। এখানে বেশীর ভাগ বাড়ীই টালার উপর,—টীনের সীট দিয়ে তৈরী। এদিকে কিন্তু একটা জিনিস দেখতে পাওয়া গেল না। উলুবেড়ের পর নারিকেল গাছ একেবারে দেখা যায় না। সবই খেজুর গাছ। সকালে ৭টা বাজতেই আমাদের ষ্টীমার ও গাধাবোট চড়াতে আটকে গেল। এসব যায়গায় ষ্টীমার আটকালে যতক্ষণ না জোয়ার আসে ততক্ষণ ষ্টীমার এক পাও নড়ান যায় না। কাজেই ১২টার সময় জোয়ার আসলে পর ষ্টীমার ছাড়ল। এই পথের অসুবিধা কেবল এইটুকুই যে মাঝে মাঝে ষ্টীমার আটকে যাওয়াতে ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্দিষ্ট যায়গায় পৌঁছায় না। সেই জন্য ধৈর্য্য ও অবকাশের বিশেষ প্রয়োজন।

এখানে মোটেই জঙ্গল নাই। মাঝে মাঝে টেলিগ্রাফের পোষ্টও দেখা যেতে লাগল, কোঠা বাড়ীও দুএকটা দেখা গেল। এইখানে একবার ফোটো তোলা হোল। ক্রমে ক্রমে উলপুর, জলাপুর, ও কালীগ্রাম ষ্টীমার ষ্টেসন ছাড়িয়ে এসে সন্ধ্যে ৬টার সময় একটা বড় নদীর মুখে ষ্টীমার আবার আটকে গেল। ষ্টীমার ষ্টেসনগুলি সব ছিটে বেড়ার ও তিন দিকে বেড়া দেওয়া—নামে মাত্র ষ্টেসন। বর্ষার সময় জল বাড়লে এই সব ষ্টেসন তুলে নিয়ে যেতে হয়—তাই এভাবে তৈরী।

৯ই—কাল সন্ধ্যেবেলা ষ্টীমার আটকাবার পর আজ ভোর ৫টার সময়, জোয়ার আসবার পর আবার ষ্টীমার ছাড়ল। এই সময় এই দুই নদীর মুখে সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য বড় সুন্দর। জলের রং ঠিক যেন লাল আবিরগোলা; আর সূর্য্যের রং ঠিক যেন গলান লোহার মত। আজ মাদারিপুরে পৌছান গেল। এখানে নদী বেশী চওড়া নয়। দুধারেই কেবল বড় বড় পাটের গুদাম, আর ছোট টিনের বাড়ী। এখানেও সব বাড়া টীলার উপর তৈরী। এখানেও পাটের গুদাম ইংরাজদের ও মাড়োয়ারীদের। বাঙ্গালীদের একটাও নাই। অথচ পাট বাঙ্গালার একেবারে নিজস্ব জিনিস। এক যায়গায় নদীর কাছে বড় প্রকাণ্ড পাইপ বসান হোয়েছে এবং মস্ত বাঁধ বাঁধা হোয়েছে —দেখে মনে হোল, এখানে water works হবে। এই যায়গাটায় অনেক বড় বড় কোঠাবাড়ী দেখা গেল। এই সমস্ত ছাড়িয়ে আসবার খানিক পরেই ষ্টীমার একটা বড় নদীতে এসে পোড়ল, এবং এখানে তাহার সহচরী "সুলতানা"কে মাঝ-গাঙ্গে ছেড়ে দিয়ে "গঙ্গাম" নামক আর একখানা গাধাবোটকে সহচরী কোরে খানিক এগোবার পরেই আবার নদীতে আটকে গেল। এদিকে একেবারে জঙ্গল নাই—কেবল বড় বড় মাঠ। খুব সম্ভব সব মাঠেই পাটের চাষ হয়।

এখন বেলা ১২টা। এখানে গ্রামের অনেক ছেলে মেয়ে বউ, ঝি ষ্টীমার দেখতে ডাঙ্গায় জড় হোল; এবং একটা ছোট্ট মেয়ে ষ্টীমারে উঠে এসে আমার সামনে উপস্থিত হোল। জিজ্ঞাসা করায় বোললে যে সে আমাকে দেখতে এসেছে। খুব সম্ভব এর পূর্ব্বে তারা আমার মত এমন অদ্ভুত জীব দেখে নাই। ডাঙ্গার উপর জলের ধারে একটা লোক একটা ছোট হাঁড়ীতে একটা সরু ছোট সবুজ রঙ্গের গায়ে কালো কালো চক্রের মত দাগওলা সাপ এনেছিল। সে সাপটিকে বার কোরে জল খাওয়াতে লাগল। জিজ্ঞাসা করায় বোললে যে তারা কলিকাতায় সাপ চালান দেয়—২ টাকা ২॥০ টাকা এক একটা সাপের দাম পড়ে। আমরা জিজ্ঞাসা কোরলাম যে সাপের বিষদাঁত নিশ্চয় ভেঙ্গে দেওয়া হোয়েছে। তাতে সে বোললে যে না দাঁত ভাঙ্গা হয় নাই,—তারা ঔষধও মন্ত্র জানে, তাই তাদের সাপ কামড়ায় না। একজন কয়েকটা বোয়াল মাছ ও একটা ছোট কালবোস মাছ নিয়ে যাচ্ছিল। বিক্রী কোরবে কি না জিজ্ঞাসা করায় বোললে যে ১০৲ টাকা কোরে এক একটা বেচতে পারে। কাজেই মাছের আশা ছাড়তে হোল। ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদের এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় বোললে যে ওরা ষ্টীমারের লোকদের পারতপক্ষে কোন জিনিস বিক্রী কোরতে চায় না, তাই অত দাম বোললে। তার পর বেলা ৪টার সময় ষ্টীমার ছাড়ল এবং সন্ধ্যে ৭টা আন্দাজ পদ্মায় এসে পোড়ল। রাত হওয়ায় এখানে কিছুই দেখতে পাওয়া গেল না। তার পর রাত ১১টার সময় কোন এক যায়গায় ষ্টীমার দাঁড়িয়ে, মাল উঠাবার নামাবার পালা আরম্ভ কোরল, এবং আর একটা নামগোত্রবিহীন গাধাবোটকে সহচরী কোরল।

১০ই—আজ সকালে উঠে দেখি—পদ্মার উপর ষ্টীমার কাদিরপুর গ্রামের পাশে দাঁড়িয়ে মাল নামাচ্ছে। এই কাদিরপুরেই ভাগ্যকুলের রাজাদের বাড়ী। আমরা ডাঙ্গায় খানিকক্ষণের জন্য নামলাম। এখানে পদ্মার পাড় সব ভাঙ্গা এবং বাড়ীগুলা সব টীলার উপর তৈরী এবং বাড়ীর চারিধারে বিচেকলার গাছ ও খেঁসারীর ক্ষেত। একটী লোক এক-ধামা খেজুরে গুড় নিয়ে বাজারে বিক্রী কোরতে যাচ্ছিল। আমরা কিছু গুড় কিনতে চাইলাম। প্রথমে কিছুতেই সে দেবে না। তার পর অনেক বলা-কহার পর, দশ আনা কোরে সের যদি আমরা দিতে রাজি হই, তাহলে বিক্রী কোরতে পারে জানাল। তখন আমরা তাতেই রাজি হোয়ে ৫ সের গুড় সওদা কোরলাম। তার পরে মাছের জন্য খানিকক্ষণ চেষ্টা করা হোল, কিন্তু মাছ পাওয়া গেল না। ভাগ্যকুলের রাজাদের বাড়ী দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ষ্টীমার রাজপ্রাসাদের বিপরীত তীরে নোঙ্গর করায় দেখা হোল না; তবে সেখানকার লোকেরা বোললে

যে প্রাসাদ বরাবরই বন্ধ থাকে, কেবল বৎসরান্তে ৺পূজার সময় যখন একবার রাজারা সপরিবারে কলিকাতা হোতে ভাগ্যকুলে পদার্পণ করেন, তখনই যা জল-জল্লাট দেখা যায়। রাজাদের নিজেদের ষ্টীমার আছে, তাইতেই তাঁরা আসেন। এর পর ষ্টীমার ছাড়বার ভোঁ দিতে, ষ্টীমারে এসে আবার আসন গাড়া হোলো। তার পর ষ্টীমার নিজের সহচরদ্বয় গঞ্জাম ও গাধাবোটটীকে মাঝ দরিয়ায় রেখে এগিয়ে চোললেন। এইবার কুতবপুর পদ্মা নামক ষ্টেসনে এসে দাঁড়ান গেল। এখানে খুব কাছাকাছি ছোট ছোট গ্রাম আছে। এদিকে রেল লাইন নাই—ষ্টীমারেই যাওয়া-আসা কোরতে হয়। এখানে খুব বড় বড় মাছ পোড়ে রোয়েছে দেখা গেল। এগুলা চালানের মাছ, তাই কিনবার ইচ্ছা সত্ত্বেও কেনা হোলো না। এই সময় আর একখানা ষ্টীমার—নাম "শিখ"—অনেক যাত্রী ও পার্শ্বেল নিয়ে এল এবং যাত্রী ও পার্শ্বেল নামিয়ে ও উঠিয়ে চোলে গেল। তার পর বিকালে মৈনট নামক আর একটা গ্রামে ষ্টীমার নোঙ্গর কোরলো। এখানে অনেক Seagull দেখতে পাওয়া গেল। ষ্টীমারের লোকেরা এঁকে Seagull মারতে বলায়, ইনি বোললেন যে জাহাজের লোকদের Seagull মারতে নাই। তখন ষ্টীমারের লোকেরা বোললে যে আমরা ত কেরাণী। বড় বড় জাহাজের লোকদের মারতে না থাকে—আমাদের মারতে দোষ কি? তখন ইনি বোললেন যে, বিলাতি জাহাজের লোকেরা কখনও Seagull মারে না; কারণ, Seagull-ই তীর আসন্ন হওয়ার খবর দেয়। কাজেই Seagull মারা স্থগিত রইল। এখানেও "শিখ" এলো এবং যাত্রী উঠিয়ে ও নামিয়ে চোলে গেল। এই সব যায়গায় গ্রাম অনেক দূরে—চারিদিকে ক্ষেত—বেশীর ভাগ খেঁসারী ও সরিষা। ষ্টীমারের ষ্টেসন ছিটে বেড়ার ও করগেট সীটের। শুনলাম যে বর্ষার সময় এই সব যায়গা জলে ভেসে যায়—ষ্টীমার ষ্টেসন আরও দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় এবং ষ্টীমার তখন সেইখানে লাগে। সেইজন্য সব ষ্টেসনই ছিটেবেড়ার—যাতে কোরে ষ্টেসন তুলে নিয়ে যাবার সুবিধা হবে। অর্থাৎ এদিককার সব ষ্টীমার-ষ্টেসনগুলিই যাযাবর। আমাদের ষ্টীমার আবার এখান থেকে ফিরে, তার সহচর "গঞ্জাম" ও গাধা-বোটটাকে নিয়ে গোয়ালন্দের অভিমুখে যাত্রা কোরলেন। আমাদের সহযাত্রিনী দুটী ত ষ্টীমারকে পূর্ব্বের যায়গায় ফিরে যেতে দেখে অধীর হোয়ে উঠলেন। তাঁদের না কি কলিকাতা ষ্টীমার কোম্পানীর আফিসে বোলেছিল যে, তিন দিনে গোয়ালন্দ পৌছান যায়। তাই তাঁরা বুঝি তাঁদের কোন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করবার বন্দোবস্ত কোরেছিলেন। এদিকে তিন দিনের স্থলে কাদির-পুর পৌছাতেই ৪ দিন লেগে গেল দেখে এবং গোয়ালন্দে সেদিন রাত্রি ১০ টার পূর্ব্বে পৌছান সম্ভব হবে না শুনে তাঁরা ত একেবারে অস্থির। অবশ্য যদি ষ্টীমার দুদিন ওইভাবে না আটকাত তাহলে তৃতীয় দিন রাত্রে গোয়ালন্দ পৌছান যেত। একে ত মাল-বোঝাই ষ্টীমার—মেলবাহী ষ্টীমার হোলে হালকা হয়—আটকাবার সম্ভাবনা কম হয়। কিন্তু মালবাহী ষ্টীমার একে বড় ষ্টীমার—তাতে মাল বোঝাই হওয়াতে আরো ভারী হয়। সেই জন্য এর পৌছাবার নির্দ্দিষ্ট সময় সম্বন্ধে বিশ্বাস করা চলে না। কাজেই এখানে ওরকম সময় হিসাব কোরে আসা চলে না। তাতে এই লাইনে আসার সমস্ত মাধুর্য্যই নষ্ট হয়।

বশিষ্ঠ আশ্রম

এই সময় সন্ধ্যে হোয়ে আসায় সূর্য্যদেব অস্ত যাচ্ছেন।

এখন যা পদ্মার বাহার সে উপভোগ করবার জিনিস—বর্ণনা করবার নয়। নীল জলে কে যেন আবির গুলে ছেড়ে দিয়েছে। চারিদিকে সবুজ তীর। চড়াগুলাও সবুজ ঘাসে ঢাকা থাকায় ছোট ছোট দ্বীপের আকার ধারণ কোরেছে। লালে সবুজে মিলে বড় চমৎকার দৃশ্য।

প্রায় রাত্রি ১১টার সময় গোয়ালন্দে এসে পৌছান গেল। তখন ইনি ডাঙ্গায় নেমে চিঠি ডাকে ছাড়লেন। আমার ধারণা ছিল যে গোয়ালন্দ খুব সম্ভব বড় ষ্টীমার ষ্টেসন হবে,—জেটীতে আলো থাকবে। কিন্তু এখানেও সেই ছিটে বেড়ার ষ্টেসন, বাঁশের জেটী, আলোর নামও নাই! দু'চারটা যাও আছে, সে কেবল অন্ধকার বাড়াবার জন্য। গুড় কলিকাতায় চালান যায়। আরিচাতে উনি নামলেন শিকার করবার জন্য। গোটাকতক ঘুঘু শিকার কোরলেন, আর ৪টা ডাব ।৶০ আনা দিয়ে কিনে আনলেন। কলিকাতায়, বোধ হয় ৶০ আনায় এই ৪টা ডাব পাওয়া যেত, কিন্তু এদিকে নারিকেলের অভাব মনে হোল। আবার ষ্টীমার ছাড়ল। এখন কেবলই জলের রাশি আর মাঝে মাঝে চড়া। নদীর পাড় দেখতেই পাওয়া যায় না। চড়াগুলাতে কোন-কোনটায় দুই একটা বাড়ী আছে, ক্ষেত আছে। সেইজন্য দেখতে ছোট ছোট দ্বীপের মত হোয়েছে। এদিকে চড়ার অল্প নীচে জেলেরা বেড়া জাল দিয়ে গোঁটা পুঁতে মাছ ধোরছে। চারিদিকে ডিঙ্গি,

ষ্টীমারের কর্ম্মচারিবৃন্দ

এও পদ্মার অনুগ্রহের জন্য বর্ষার সময় তুলে নিয়ে যেতে হয়। কখনও এক জাগায় থাকে না। তখন হতাশ হোয়ে সেদিনকার মত বিশ্রাম।

১১ই—আজ সকালে উঠে দেখি—গোয়ালন্দেই আছি। প্রায় বেলা ৮টার সময় গোয়ালন্দ ছাড়া গেল। তার পর "আরিচা" নামক এক গ্রামে এসে পৌছান গেল। এদিকে নারিকেল গাছ দু একটা দেখা গেল। এত দিন নারিকেল গাছ একটাও দেখতে পাওয়া যায় নাই,—কেবলই খেজুর গাছ। সেই জন্যই বোধ হয় এদিকে গুড় এত সস্তা এবং প্রচুর পাওয়া যায়, এবং খুব সম্ভব এদিক থেকেই বেশী নৌকা, ও বড় বড় মাল বোঝাই নৌকাও দেখতে পাওয়া গেল। ইতি পূর্ব্বে বড় নৌকা দেখতে পাওয়া যায় নাই। খানিক পরে "নূতন ভারঙ্গা" বোলে আর একটা ষ্টেসনে আসা গেল। এখানে বিশেষ কিছুই নাই। বিকালে ৫টার সময় "বিনানি" বোলে আর একটা ষ্টেসনে এসে পড়া গেল। এইখানে প্রথম সারেঙ্গ নেমে গেল। সে ছুটী নিয়ে বাড়ী গেল। তার যায়গায় তার সহকারী সারেঙ্গ কাজ কোরবে। এখানে উনি নেমে ১২টা পাখী শিকার কোরলেন। তিনটা ষ্টীমারের লোকদের দেওয়া গেল, বাকিগুলা নিজেদের সদ্ব্যবহারে লাগান হোল। এখানে লাউ, বেগুন, মুরগী,

হাঁস ও ডিম খুব বেচতে এসেছিল। এই প্রথম ষ্টীমারের কাছে জিনিস বেচতে দেখলাম,—না হোলে সাধারণতঃ ষ্টীমারের লোকদের কাছে বড় কেউ জিনিস বেচতে আসে না। যা কিছু দরকার—দূরের বাজার থেকে আনতে হয়। চড়া। চড়াগুলোকে অনেক সময় তীর বোলে ভ্রম হয়। চড়াতে খুব পাখী বোসে ছিল, কিন্তু range এর বাহিরে থাকায় মারা গেল না। এদিকে নৌকা খুবই কম। চড়াগুলা সাদা বালিতে ভরা, সবুজের চিহ্নও নাই।

শুক্রেশ্বর

ঘাটের উপরই অনেক দোকান। কাছেই একটা মিষ্টান্নের দোকানের কাছে খুব জটলা হচ্ছিল, আর তার সঙ্গে মিষ্টিমুখও অনেকেই কোরছিলেন। তার পর সন্ধে হওয়ায় ষ্টীমার এখান থেকে ছাড়ল।

পদ্মার চড়াতে যেমন সবুজ ঘাস ও গাছ পালার বাহার, সে রকম দৃশ্য এদিককার চড়াতে নাই। একটা চড়ায় কতকগুলা হাঁস বোসে ছিল,—গুলি করা হোল—কিন্তু অতদূরে গুলি পৌছাল না। ৮টার সময় একটা ছোট ষ্টেসনে এসে পড়া গেল। নাম দেখতে গেলাম; কিন্তু বোর্ডে লালরং ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। কাজেই এ যায়গার কি নাম জানতে পারলাম না। এখানে শিকার করবার জন্য ডাঙ্গায় নামা হোল; কিন্তু কোন শিকারই পাওয়া গেল না।

মাদারিপুর

তার পর বেলা ১২টা নাগাদ পোড়াবাড়ী নামক আর একটা ষ্টেসনে আসা গেল। এখানে নেমে শিকার কোরতে যাওয়া হোল। দুটা ঘুঘু ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। একটা ষ্টীমারের কেরাণীকে দেওয়া হোল, আর একটা নিজেদের রাখা হোল। একটা সারস পাখীর বাসায় গোটাকতক সারস দেখা গেল। সেখানে তারা ডিম দিয়েছে এবং

১২ই—আজ ভোরে দেখি—পদ্মা ছেড়ে যমুনায় এসেছি। যদিও পদ্মা থেকে যমুনায় যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, তবুও আমরা যমুনায় এলাম। অর্থাৎ এটা ব্রহ্মপুত্রেরই খানিক ভাগ, তবে লোকে একে যমুনাই বলে। এখানে নদী ভয়ানক চওড়া, তীর দেখাই যায় না, মাঝে মাঝে কেবলই

অনেক দিন থেকে আছে বোলে সারস পাখীগুলা গ্রামের লোকেরা মারতে দিলে না।

বেলা ৫টার সময় সিরাজগঞ্জ এসে পৌছান গেল। সিরাজগঞ্জ ষ্টেসন খুব বড় হবে মনে কোরে টাকাকড়ি নিয়ে ডাঙ্গায় নামা গেল। কিন্তু ঘাটে উঠে শুনা গেল যে, ঘাটের উপর গাড়ী ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না। সমস্তই সহরের মধ্যে। প্রায় দেড় দু মাইল হেঁটে গেলে পর পাওয়া যায়। ষ্টীমার ষ্টেসন থেকে কেবল গরুর গাড়ীই সহরে যায়। সাধারণতঃ সকলেই আজকাল ট্রেণেই সিরাজগঞ্জ যাতায়াত করেন। কাজেই গাড়ী, পাল্কী রেল ষ্টেসনে সব পাওয়া যায়। ষ্টীমার ষ্টেসনে কেবল মাল নিয়ে যাবার জন্য গরুর গাড়ী যাতায়াত করে। তখন সহর দেখবার আশা ছেড়ে দিয়ে ঘাটেই অল্প বেড়ান হোল। ঘাটের উপর ছিটেবেড়ার ঘরে চিঁড়ে, গুড় ও মনিহারির দোকান। আর মাত্র মালগাড়ী ও বড় বড় নৌকা দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছুই নাই। যে রকম ষ্টেসন হবে মনে আশা করা গিয়াছিল সে সব কিছুই নয়। এও গোয়ালন্দের মত বর্ষার সময় দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়।

ঘাটে একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হোল। তাঁর সঙ্গে অনেকরকম কথা হোল। তিনি ধান, চাল, চিনি ইত্যাদির ব্যবসা করেন।

১৩ই—আজ ভোরে উঠে দেখি—ষ্টীমার জগন্নাথগঞ্জে। রাত ২টা থেকে ষ্টীমার এখানে রোয়েছে। বেলা ৯টার সময় ষ্টীমার এখান থেকে ছাড়ল। এখানে শিকার কোরতে নামা হোল। ঘুঘু, পানকৌড়ি, বক মেরে আনা হোল।

এইবার ব্রহ্মপুত্রে আসা গেল। এদিকে কেবলই জল, আর নীল আকাশ। মাঝে মাঝে সাদা চড়া,—তীর দেখাই যায় না। আকাশ ও জলের মাঝে চড়াগুলা ঠিক যেন সাদা মেঘের মত—বড় সুন্দর দৃশ্য। সবুজ কিছুই চোখে পড়ে না। ডাঙ্গা চড়া থেকে প্রায় ১॥ মাইল দূরে। অনেক লক্ষ্য কোরে দেখলে অল্প ধোঁয়ার মত একটু তীরের রেখা দেখতে পাওয়া যায়। না হলে কেবল জল ও আকাশ। যখন ষ্টীমার চড়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছে, তখন ষ্টীমার চলার জন্য জলের ঢেউ লেগে চড়া থেকে ঝরণার মত ঝুর ঝুর কোরে বালি ধ্বসে পোড়ছে।

ষ্টীমার "তারকী"

বিকালের দিকে সবুজ চড়া নজরে পোড়তে লাগল। তীরও অল্প অল্প দেখা যেতে লাগল। এই সব চড়ায় খুব হাঁস, চকাচকী ও চাহা ছিল। এদিকে খুব শিকার। যাঁদের শিকারের সখ, তাঁরা যদি সারেঙ্গকে বোলে ষ্টীমার থেকে জালিবোট নিয়ে নেমে গিয়ে শিকার করেন, তাহলে অনেক শিকার পান। ষ্টীমার থেকে এই সব পাখী এত দূরে বসে আছে যে খালি চোখে দেখা যায় না, দূরবীণ দিয়ে দেখতে হয়। আর ষ্টীমারও সে দিকে যেতে পারে না; কারণ, সে দিকে জল বড় কম। আমাদের তত সময় না থাকায়,

সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা যায় নাই। হাঁসের ঝাঁক খুব বোসে ছিল, যেন ঠিক জলের উপর কে কাল জাল রেখে দিয়েছে। এক একটা ঝাঁকে প্রায় ৫০০।হাঁস। এই রকম একটা ঝাঁকে ষ্টীমার থেকে গুলি চালান হোল, কিন্তু একটাও পোড়ল না।

খারিয়া পরিবার

এবার ফুলছড়ি ঘাটে আসা গেল। এখানে ঘাটে নেমে খানিক বেড়ান গেল। এই ঘাটে একটা সুন্দর কেবিন দেওয়া flat ছিল, তাতে বোধ হয় এই ষ্টীমার কোম্পানীর কোনও officer পরিবার নিয়ে বোয়েছেন। তাঁর কয়েকটী ছেলেমেয়ে ঘাটের উপর খেলা কোরছিল। খানিকটা বেড়াবার পর একটা মাঠে পড়া গেল। সেখানে একটা আস্ত গরুর কঙ্কাল পোড়ে রোয়েছে। বর্ষার সময় যখন জল বাড়ে, তখন খুব সম্ভব এই গরুটা এইখানে ডুবে যায়, তারই কঙ্কাল পোড়ে আছে বোধ হয়।

এখানে কয়েকটা ড্রেজার রোয়েছে। খুব সম্ভব, ষ্টীমার যাতায়াতের যায়গাটার বালি এই ড্রেজারে কোরে পরিষ্কার করা হয়। না হোলে, যে রকম চড়ার আধিক্য, তাতে মনে হয়, ড্রেজ না কোরলে ষ্টীমার যাওয়ার উপায়ই থাকবে না।

একটা flatএর উপর কয়েকটা goods train বোঝাই রয়েছে। কোথায় নিয়ে যাবে জানতে পারলাম না। তবে trainগুলা দেখে বোধ হল meter gaugeএর গাড়ী।

আজকাল খুব কই ও ইলিশ মাছ খাওয়া হোচ্ছে। এদিকে মাছ খুব, কিন্তু একেবারে স্বাদবিহীন। পদ্মার মত মাছের স্বাদ নয়।

১৪ই—আজ উল্লেখযোগ্য কিছুই নেই,—সমস্তই কালকের মত। কেবল মাঝে মাঝে গ্রাম আজ দেখা যাচ্ছে। না হোলে, সেই জলের রাশি, জল ও আকাশকে সাদা চড়ায় ভাগ কোরে রেখেছে।

আজ দুপুর বেলা হঠাৎ ষ্টীমারের এঞ্জিন বন্ধ হোয়ে ষ্টীমার থেমে গেল; ব্যাপার দেখে কর্ত্তা নেমে গিয়ে কিছু এঞ্জিনিয়ারিং কোরে এলেন। তার পর একটা নৌকা নিয়ে চড়ায় গিয়ে গোটাকতক চাহা মেরে আনলেন। এই নৌকা

বিশপ জল-প্রপাত

কোরে কতকগুলি লোক ষ্টীমার দেখতে এসেছিল। তারা নৌকা বাইতে রাজি না হওয়ায় ষ্টীমারের গোটকতক খালাসী নিয়ে নৌকা বেয়ে চড়ায় গেলেন। নৌকার লোকগুলা ষ্টীমারের আগাগোড়া বেশ ভাল কোরে দেখে চোলে গেল।

আজ সারেঙ্গের ও ষ্টীমারের সমস্ত কেরাণীর এমন কি Butlar এর পর্য্যন্ত ফোটো লওয়া হোল।

১৫ই—কাল রাত্রে "ধুবড়ি ঘাটে" পৌছাতে এক বাঙ্গালী Civil Surgeon ষ্টীমারে উঠেছিলেন। তিনি বিলাসীপাড়া পর্য্যন্ত যাবেন।

আজ সকালে উঠে দেখি—ষ্টীমার স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রোয়েছে, এবং চারিদিক ঘন কুয়াসায় ঢাকা,—এক হাত দূরে কি আছে দেখবার উপায় নাই এমনি কুয়াসা। সেই জন্য ষ্টীমার মধ্য রাত্রি থেকে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় বেলা ১২টার সময় কুয়াসা পরিষ্কার হবার পর ষ্টীমার আস্তে আস্তে চোলতে আরম্ভ কোরলো এবং বেলা ১২টা আন্দাজ বিলাসীপাড়ায় পৌছাল। এইবার পাহাড়ের রাজ্যে আসা গেল। এখন দূরে পাহাড় দেখা যেতে লাগল। Civil Surgeon মহাশয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের খুড়শ্বশুর, আমার ৺পিতৃদেবের সঙ্গে এঁর খুবই জানাশোনা ছিল,—তাঁর বিষয় অনেক কথাই বোলছিলেন। মেজ পিশে মহাশয়দের সঙ্গে খুব আলাপ আছে। লোকটী খুব গল্প কোরতে পারেন।

উমানন্দ দ্বীপ

আজ সারেঙ্গ ও ষ্টীমারের কর্ম্মচারীদের *feast* করবার জন্য কিছু বকশিশ দেওয়া হোয়েছিল; কারণ, এরা যাত্রীদের যত্ন খুবই করে এবং সাধ্যমত সকল বিষয়ে সাহায্য করে। বিশেষ কোরে শিকার করবার সময় নৌকা দিয়ে এবং ষ্টীমার দাঁড় কোরিয়ে অনেক রকমে সাহায্য করে। এরা একটা খাসি ও ভাল চাল এনে বেশ ভাল কোরে পোলাও ও কালিয়া রেঁধে খাওয়া-দাওয়া কোরল।

বিকালে ৫টার সময় "গোয়ালপাড়া" পৌছান গেল। এইবার বেশ বড় বড় পাহাড় দেখতে পাওয়া যেতে লাগল। প্রায় নদীর উপরেই পাহাড়—ঘন-জঙ্গলে ভরা। পাহাড়ের কোলে ছোট ছোট লাল বাঙ্গলা বাড়ী এবং পাহাড়ের পাশ দিয়ে লাল মাটির রাস্তা, বড় সুন্দর দেখতে।

ঘাটের উপর একটা যায়গাতে অনেক তুলা বস্তাতে বোঝাই হচ্ছিল। খুব সম্ভব, এখানে তুলার চাষ হয় এবং তুলা চালান যায়। এদিকে ব্রহ্মপুত্রে খুব স্রোত।

আজ এখানে হাটবার ছিল। মস্ত হাট বোসেছিল। হাট থেকে রসগোল্লা ও নিমকি কিনে আনা হোল। কলিকাতা ছাড়বার পর আজ প্রথম রসগোল্লা খাওয়া হোল। ষ্টীমার যদি আর কুয়াসার জন্য না দাঁড়ায়, কিম্বা বালিতে না আটকায়, তাহলে কাল বেলা ১২টা নাগাদ গৌহাটী পৌছান যাবে।

১৬ই—আজ ভোরবেলা "খেলাবান্দা" বোলে একটা ষ্টেসনে এসেছি দেখলাম। এখান থেকে "পলাশবাড়ী" যাবার পথে, বেলা ৬টার সময় ষ্টীমার আবার চড়ায় আটকে গেল। এখানে কেবল ষ্টীমারের লোকদের এবং আড়কাটীর দোষে ষ্টীমার আটকায়; না হোলে আজ বিকেলে গৌহাটী পৌছান যেত। এদিকের দাঁড়ি মাঝি এবং আড়কাটী সমস্তই হিন্দুস্থানী,—পাটনা থেকে কাটিহার হোয়ে এদিকে আসে। পদ্মা ছাড়বার পর আর বাঙ্গালী দাঁড়ি-মাঝি দেখা যায় না। ষ্টীমার যখন যাচ্ছিল তখন তার প্রায় ২০০ গজ দূরে একটা খড়-বোঝাই নৌকা চড়ায় আটকে রোয়েছে এবং কতকগুলা লোক সেই নৌকা টানাটানি কোরছে দেখা গেল। জল সেখানে লোকগুলার মাত্র হাঁটু পর্য্যন্ত পৌছেছে—যদিও সেই দিকেই ষ্টীমার যাবার চিহ্ন রোয়েছে। কলিকাতা ছাড়বার পরই নদীর উপরে বাঁ-ধারে ষ্টীমার যাবার নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় কাঠের

পোষ্ট গাঁথা আছে। সুন্দরবন পর্য্যন্ত এই পোষ্টে সাদা রং করা টীন লাগান আছে যাতে কোরে রাত্রে ষ্টীমার দিক ভুল না

অরুন্ধতী-গুহা

করে। সুন্দরবন ছাড়বার পর এই পোষ্টগুলায় কেবল ক্রসের মত কাঠ লাগান আছে; এবং রাত্রে এই কাঠগুলাতে তেলের লণ্ঠন জেলে দেওয়া হয়। এই লণ্ঠন জ্বালবার জন্য ষ্টীমার কোম্পানীর লোক আছে; এবং পদ্মা ছাড়বার পর আড়কাটীর (Pilot) ব্যবস্থা আছে—জল চিনে যাবার জন্য। কিন্তু আড়কাটীরা কখনও বোধ হয় জল দেখে না যে কোথায় কত আছে,—যদিও এর জন্য ষ্টীমার কোম্পানী তাদের নৌকা দিয়েছে। তা না হোলে ওইখানে খড়-বোঝাই নৌকাটার অমন অসহায় অবস্থা দেখেও সেইখান দিয়েই ষ্টীমার নিয়ে যেতে লাগল—যদিও তার কিছু পাশে বেশী জল ছিল। যতক্ষণ আড়কাটী ষ্টীমারে থাকে, ততক্ষণ তার নির্দ্দেশ মত সারেঙ্গকে ষ্টীমার নিয়ে যেতে হয়। কাজেই অল্প দূর যাওয়ার পরই ষ্টীমার আটকে গেল; এবং হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও ষ্টীমার একেবারে অচল হোয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। ইতি মধ্যে বেলা ১২টা নাগাদ গৌহাটী থেকে "শিলওয়ারী" নামক আর একটা ষ্টীমার ফিরে আসছিল। সে এসে অনেক টানাটানি কোরে আমাদের ষ্টীমারখানাকে সন্ধ্যে ৭টার সময় চড়া থেকে টেনে বার কোরলে। ষ্টীমার চড়া থেকে বেরিয়েও যাবার নাম কোরলে না,—এইখানেই রইল। কারণ, "শিলওয়ারীর" সারেঙ্গ আমাদের সারেঙ্গকে বোললে যে এই রাত্রে আর কোথা যাবে—এইখানেই আজ থাক। ও দিকে জল কম—আবার আটকে যাবে। তার চেয়ে এইখানেই আজ বিশ্রাম কর। কাজেই ইনিও থেকে গেলেন।

এই সব শুনে আমরা ত অস্থির হোয়ে পড়লাম; কারণ, আমাদের অবকাশ শেষ হোয়ে আসছে। কাজেই আমরা ষ্টীমারের কেরাণীদের ডেকে অনুযোগ করাতে, তারা বোললে যে—আমরা আর কি কোরতে পারি? কলিকাতায় বা গৌহাটীতে কোম্পানীর কাছে অনুযোগ কোরে চিঠি দিন। এই ষ্টীমারে এই রকম হোয়ে থাকে। তখনই ষ্টীমার কোম্পানীর নামে চিঠির খসড়া কোরতে লেগে যাওয়া গেল। গৌহাটী পৌঁছে চিঠি পাঠান হবে।

বিডন-জল-প্রপাত

আজ সকালে ষ্টীমার গোহাটী পৌঁছাবার জন্য ছাড়ল। আমরাও নিজেদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে বাক্সবন্দী কোরে এসে স্থির হোয়ে বোসলাম।

ইতিমধ্যে চড়ার দিকে চেয়ে দেখি—চড়াতে কালো কালো কাঠের মত কি সব পোড়ে রয়েছে। দূরবীণ দিয়ে দেখি যে মস্ত বড় বড় কুমীর প্রকাণ্ড হাঁ কোরে চড়ায় শুয়ে রোয়েছে। কুমীরের নাম শুনবামাত্র উনি বন্দুকের বাক্স খুলে বন্দুক রাইফেল গুলি ইত্যাদি নিয়ে কুমীরের উপর গুলি করবার জন্য প্রস্তত। কিন্তু কুমীরগুলা অনেক দূরে,—গুলি অতদূর পৌঁছাবে কি না সন্দেহ। তবুও সারেঙ্গ যতদূর পারলে ততদূর ষ্টীমার চড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। তার চেয়ে বেশী নিয়ে গেলে গোহাটী পৌঁছানর আশা দু একদিনের মত ছেড়ে দিতে হয়; কারণ, জল এত কম যে ষ্টীমার আটকাবার ষোলআনা সম্ভাবনা। এক জালিবোট খুলে নিয়ে তাতে কোরে চড়ার কাছে গেলে হোতে পারে; কিন্তু তাতেও অন্ততঃ দু এক ঘণ্টা সময় চাই। কাজেই ষ্টীমার থেকেই গুলি চালাতে আরম্ভ কোরলেন। গুলি কিন্তু একটাও পৌঁছাল না, আর কুমীরগুলিও বেশ নির্ভাবনায় হাঁ কোরে পোড়ে রয়েছে দেখতে পাওয়া যেতে লাগল। প্রায় পনরটী গুলি করবার পর একটী কুমীরের গায়ে লাগল, এবং যেমন গুলি লাগা—সেও তখনি চড়া থেকে জলে ডুবে গেল। অতঃপর এইখানেই শিকারের শেষ। তার পর আরো কয়েক-বার কুমীর দেখা গেল। কিন্তু গুলি কোরে কোনও লাভ নাই দেখে সে দিনকার মত বন্দুক রাইফেল আবার বাক্সবন্দী হোল।

আসাম কাউন্সিল-গৃহ

বেলা তিনটার সময় "আমিনগাঁও" পৌঁছান গেল। আমিনগাঁওএর বিপরীত দিকেই "পাণ্ডুঘাট" ষ্টেসন। কলিকাতা হোতে আসামে রেলে আসিলে এই আমিনগাঁও পর্য্যন্ত রেলে এসে, এইখানে ষ্টীমারে কোরে ওপারে পাণ্ডুঘাট গিয়ে আবার রেলে চোড়তে হয়।

এই আমিনগাঁও থেকে গোহাটী ঘাট ও উমানন্দ মন্দির দেখা যায়। আমিনগাঁও থেকে বেলা প্রায় ৪॥০টা আন্দাজ ষ্টীমার ছাড়ল। প্রায় ৫টার সময় "গোহাটী" এসে পৌঁছান গেল। গোহাটী সহর ঠিক ব্রহ্মপুত্রের উপর। ঘাটের সামনেই ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে দ্বীপের মত একটী পাহাড় উঠেছে। এই পাহাড়ের উপর উমানন্দের ও উর্ব্বশীর মন্দির। উমানন্দের পাশ দিয়ে ষ্টীমার ডিব্রুগড়ে যায়। জলের মধ্যে কালো পাথরের পাহাড়ের উপর সাদা মন্দির এবং পাহাড়ের গায়ে বড় বড় সবুজ গাছ বড় সুন্দর দেখতে। ব্রহ্মপুত্রের বাহার এখানে সব যায়গা থেকেই সুন্দর। জেটীর কাছেই শুক্রেশ্বর ঘাট। এও একটী ছোট ঘাট—উমানন্দের মতই। তবে এর তিন দিকে জল; আর উমানন্দ ঠিক নদীগর্ভে। আজ আর গোহাটীর কিছু দেখা গেল না,—কেবল ফাঁসী-বাজার ও কটন কলেজ। ফাঁসী-বাজারই এখান-কার বড় বাজার। অনেক দোকানপাট আছে—বেশীর ভাগ দোকানই মাড়োয়ারীদের। মাড়োয়ারীদের বাসও সব এইখানে। সেইজন্য এই অঞ্চলটা বড় নোংরা। এখানকার বাড়ী-ঘর সব খুবই হাল্কা। কোঠাবাড়ী কিম্বা দোতলা বাড়ী নাই। সব বাড়ীর ছাদ করগেট সীটের। বাড়ীর দেওয়াল কাঠের ফ্রেমে হোগলা দিয়ে তার উপর মাটীর লেপ দিয়ে চূণকাম করা। জমির উপর তক্তাপোষের মত বড় বড় কাঠের থামের উপর বাড়ীর বনিয়াদ করা। মাটীর মধ্য থেকে গাঁথুনী নাই। ভূমি-কম্পের আধিক্য এখানে বেশী বোলে সব বাড়ীই এই ভাবে তৈরী। কেবল Telegraph Officeটী দোতলা; তাও

কাঠের তৈরী। সেই জন্য এদিককার বাড়ীতে গরমের সময় বড় আগুন লাগে।

১৮ই—আজ সকালে উঠে বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে যাবার জন্য তৈরী হওয়া গেল। সহরের বাইরে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। এই মন্দিরের অবস্থা বড় ভাল নয়; কারণ, আয় একেবারে নাই বোললেই হয়।

মন্দিরের পাশ দিয়ে একটী ঝরণা বয়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময় খুব জল থাকে বোধ হয়। এখন খুব সামান্য জল। আমরা ঝরণার মধ্যেই পাথরের উপর দিয়ে গিয়ে ছবি নিলাম। এই ঝরণার জল তিনটি ধারায় নেমে বশিষ্ঠদেবের আসনের নীচে এক হোয়ে অরুন্ধতীর পাশ দিয়ে একটী ছোট নদীর আকারে বোয়ে চলেছে। এই তিন ধারার নাম—"ললিতা" "কান্তা" ও "সন্ধ্যা"।

বশিষ্ঠদেবের মন্দির

একজন পাণ্ডা এসে আমাদের ঝরণার কাছে একখানা বড় পাথর দেখিয়ে বোললেন যে, সেখানে পূজা দিলে এবং সে পাথর স্পর্শ কোরলে পুনর্জন্ম হয় না; কারণ, সেই পাথরটির উপরে বশিষ্ঠদেব তপস্যা কোরতেন; এবং এই পাথরের নীচেই ওই তিন ধারা এসে মিশেছে; এবং এই পাথরই বশিষ্ঠদেবের আসন। সেখানে পূজা দিয়ে পাথর স্পর্শ করা হোল। ঝরণার মধ্যেকার এক একটী পাথরে খিচুড়ী রেঁধে খেতে হয়। আমরা তা করবার সময় পাই নাই।

তার পর মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের সামনেই ছোট নাটমন্দির। সেখানে পিতলের লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্ত্তি ও মহাদেবের ত্রিশূল পোঁতা আছে। পাণ্ডারা পূজা করেন। সেখানেও পূজা দেওয়া হোল।

তারপর বশিষ্ঠদেবের মন্দিরের মধ্যে যাওয়া গেল। সেখানে একটা কুলুঙ্গির উপর একটী ছোট মাটির মূর্ত্তি আছে। কি মূর্ত্তি বুঝতে পারলাম না। পাণ্ডা ঠাকুর বোললেন বাসুদেবের মূর্ত্তি। তার পর গোটাকতক সিঁড়ি নামবার পর একটী প্রকাণ্ড পাথর রোয়েছে। তিনিই বশিষ্ঠদেব। সেখানে পূজা দিয়ে অবশেষে অরুন্ধতী দেখতে রওনা হওয়া গেল। বশিষ্ঠ থেকে ঝরণার ধারা বোয়ে এসে ছোট একটী নদীর মত হোয়ে এই অরুন্ধতীর নীচে দিয়ে বোয়ে চোলেছে। অরুন্ধতীতে কোনও মন্দির বা দেবদেবী নাই। কেবল পাহাড়ের নীচে মস্ত একটী ত্রিকোণাকার কালো পাথর দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে ঠিক একটী ছোটখাট পাহাড়। সামনেই নীচেটায় টোল খাওয়া মস্ত গর্ত্ত আছে। তার মধ্যে ৫।৬ জন লোক অনায়াসে বোসে থাকতে পারে, এত বড়। এইখানে একটী সাধু বাস করেন। এক যায়গায় কিছু ফুল ছড়ান রোয়েছে এবং অল্প কাঠের ছাই রোয়েছে। বোধ হয় সাধু পূজা অর্চ্চনা কিছু কোরেছিলেন। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন সাধু সেখানে ছিলেন না।

এই অরুন্ধতীতে যাত্রীরা কেউ আসে না, বোধ হয় দেব-দেবী নাই বোলে। কিন্তু যায়গাটা বড় সুন্দর। উপরেই খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে কমলা লেবুর বাগান এবং চা-বাগান। কমলা লেবুর ফল গোহাটীতে তখন শেষ হোয়ে গিয়েছিল, গাছ সব ছেঁটে দিয়েছে। চা গাছ দেখতে ঠিক টগর ফুলের মত। আমি ত প্রথমে টগর গাছই ভেবেছিলাম। তার পর শুনলাম যে ওগুলো চা-গাছ। কতকগুলি আসামী কুলি চা-বাগানে কাজ কোরছিল। বেলফুলের গাছের মত চা-গাছ সব ছাঁটা রোয়েছে।

১৯শে—আজ দুপুর বেলা শিলং রওনা হওয়া গেল। শিলং সম্বন্ধে আমার বেশী কিছু বলবার নাই ; কারণ, অনেকে অনেকবার শিলংএর পরিচয় এবং তার পথের ও প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা দিয়াছেন। এতে কোরে অনেকেরই মোটামুটি শিলং সম্বন্ধে আভাসে অনেকটা ধারণা হোয়ে গিয়েছে। তবুও সামান্য কিছু শিলং সম্বন্ধে না বোললে আমার এ কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

গৌহাটী মোটর ষ্টেসন ছাড়বার ১ মাইল পর থেকেই গৌহাটী সহরের পাহাড়ের প্রাচীর চারিদিকে দেখতে পাওয়া যায়। গৌহাটী সহর ঠিক পাহাড়ের মধ্যে। চারি দিকে উঁচু পাহাড়—আর মধ্যের সমতল ভূমিতে সহরটি। বড় বড় পাহাড়ের মাথা পর্য্যন্ত কলা ও আনারসের বাগান এবং সেই সব বাগানে আসামী ও গারো কুলিরা কাজ কোরছে। কোন কোন পাহাড়ে অল্প জঙ্গল। তার মধ্যে গরু চোরছে। আবার কোন কোন পাহাড়ে এত ঘন জঙ্গল যে, পাহাড়ের গা দেখা যায় না, —কেবল গাছের সার ও বাঁশের ঝাড়। এখানে পাহাড়ের গায়ে সরু বাঁশের ঝাড় খুবই আছে।

মোটর রাস্তার ধারেই নাগকেশর, চাঁপার গাছ ও পলাশ গাছের ঝাড়ে ভরা। গৌহাটী থেকে ৯ মাইল যাবার পর পাহাড়ের উপরে মোটর উঠিতে থাকে। অর্থাৎ এই থান থেকেই চড়াই আরম্ভ হয়। চড়াই আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডান ধারে পথের সঙ্গে সঙ্গে একটী ছোট নদী অনেক দূর পর্য্যন্ত বাঁশ ঝাড় ও পাইন বনের সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাওয়া যায়। তার পর শিলং সহরের কাছাকাছি এই নদীটী অদৃশ্য হোয়ে যায়।

গৌহাটী থেকে শিলংএর অর্দ্ধেক রাস্তায় নাংপো মোটর ষ্টেসন। এই স্থানে মোটর প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়ায়। এখানে Tea shop দুটী আছে, একটী ডাক-বাঙ্গলার ও একটী প্রাইভেট্। নাংপো ছাড়বার পর থেকেই পাইন গাছের সারি আরম্ভ হয়।

পথের দৃশ্য বড় সুন্দর। লাল রাস্তা,—একদিকে সবুজ ফার্ণে ভরা খাড়া পাহাড়, আর এক দিকে ২০০ ফিট নীচু খাদ এবং খাদে মাথা উঁচু করে পাইনের সারি দাঁড়িয়ে। খুব সুন্দর দেখতে। রাস্তার মজুররা পাথর ভেঙ্গে রাস্তা মেরামত করবার জন্য প্রস্তুত রাখছে। মোটর যদি একটু সরে যায়, তাহলে একেবারে খাদে পতন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে মৃত্যু। এমনি ভয়ানক রাস্তা।

পাহাড়ের গায়ে নানা রকমের মস্ ও নানা রকমের ফার্ণ। এত রকমের ফার্ণ কোথাও দেখি নাই। ইচ্ছা হোতে লাগল—ফার্ণগুলা বাড়ীতে তুলে আনি। এক যায়গায় পাহাড়ের গা থেকে রাস্তার কাছেই একটী ঝরণা রোয়েছে। রাস্তার নীচে পাইপ দিয়ে ঝরণার জল সেই নদীতে ফেলা হোচ্ছে। না হোলে রাস্তা ভেসে যাবার ভয়।

চেরাপুঞ্জির পথে

যত শিলংএর কাছাকাছি আসা যেতে লাগল, তত পাহাড়ের উপর আলুর ক্ষেত দেখা যেতে লাগল। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে পাইনের জঙ্গল কেটে আলুর চাষ করা হয়। এখানে বৎসরে দুবার আলু হয়। একবার শীতকালে, ও একবার বর্ষার গোড়ায়। পাইনের ফল ও পাতা মাটীতে পুঁতে তাতে আগুণ জ্বালিয়ে দিয়ে, সেই পাইনের ক্ষার সারের মত ব্যবহার করা হয়। এই সার না কি খুব ভাল। খাসিয়া

মেয়ে-পুরুষে এই সব ক্ষেতে কাজ কোরছে, আর কেমন অক্লেশে পাহাড়ের উপর পিঠে বোঝা নিয়ে নামা-উঠা কোরছে। কপালে একটা বেতের ফিতে দিয়ে পিঠের বেতের ঝুড়ি আটকে পাহাড়ে উঠা-নামা কোরছে। অনেক সময় এই ঝুড়িতে কোরে মানুষ বসিয়ে খাসিয়ারা পাহাড়ে নামা-উঠা করে। একে আপা বলে। এই সব দেখতে দেখতে সন্ধ্যে ৬টার সময় শিলং পৌছান গেল। আজ আর কিছু দেখা হোলো না।

২০শে—আজ ভোরে ৬ টার সময় উঠে দেখি—চারিদিক সূর্য্যের আলোয় ছেয়ে গেছে। প্রথমে ভাবলাম—বেলা ৮টা হোয়ে থাকবে,—বোধ হয় আমার ঘড়ি বন্ধ হোয়ে রোয়েছে। কিন্তু ঘড়িতে কাণ দিয়ে দেখি যে ঘড়ি ঠিক চোলছে,—সত্যই ৬টা বেজেছে। এত ঠাণ্ডায় একটুকুও কুয়াসা নাই—পরিষ্কার সূর্য্যের আলো—ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়। তখন এখানকার বাসিন্দাদের কাছে শুনলাম যে এখানে কখনও কুয়াসা হয় না। খুব সম্ভব কাছাকাছি কোন নদী নাই বোলে কুয়াসা হয় না।

তার পর স্নান কোরতে গিয়ে দেখি—জলটা খুব নরম। অর্থাৎ সাবান জলে গুললে জল যেমন নরম হয়, সেই রকম। সাবান মেখে যতবার জল দিয়ে ধোওয়া যাক না কেন, হড়হড়ানি কিছুতেই যায় না, যতক্ষণ না তোয়ালে বা গামছা কোরে মুছে দেওয়া যায়। পরে শুনলাম যে এখানের জল ওই রকম এবং এখানে কোন water works নাই। ঝরণার জল পাহাড়ের উপর জমা করা আছে। সেখান থেকে পাইপে কোরে নীচে চারিদিকে জল পাঠান হয়।

স্নান ও খাওয়া সেরে সহর দেখতে বেরুনো গেল। এখানে এই সুবিধা যে মোটরে কোরে ঘোরা যায়। অসুবিধা কেবল রাস্তায় বড় ধূলা। ধূলার চোটে একেবারে লাল হোয়ে যেতে হয়। রাস্তার দুধারে মেহেদি গাছের মত এক রকম গাছের কেয়ারি আছে, কিন্তু ধূলায় একেবারে লাল হোয়ে গেছে; গাছের সবুজত্ব একেবারে নাই।

এখানেও বাড়ী সব করগেট সীট ও পাইন কাঠের তৈরী। কোঠা একেবারে নাই। এখানেও ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। বাড়ীগুলা বিলাতী কটেজের ধরণে তৈরী,—দ্বার জানালা সবই বিলাতী ধরণের।

শিলং শিখর

প্রথমে এখানকার ইলেকট্রিক পাওয়ার-হাউস দেখতে যাওয়া গেল। Beadon fall-এর জল বেঁধে, সেই জলের শক্তিতে এই পাওয়ার-হাউস চোলছে। ঝরণার সামনে মস্ত পাহাড়, তলা থেকে নীচে পর্য্যন্ত পাইনের সার। পাইন গাছ থেকে ঝড়ো হাওয়ার মত শব্দ আসছে। প্রথমে ভাবলাম যে ঝড়ই বা বুঝি আস্‌ছে। তার পর শুনলাম যে, না—পাইনের শব্দ।

তার পর সেখান থেকে পাস্তুর ইনষ্টিটিউট, গল্‌ফ লিঙ্ক, পোলো গ্রাউণ্ড, রেস্ কোর্স, ক্লাব ও এখানকার বিখ্যাত হোটেল দেখে, শিলং শিখর দেখতে যাওয়া গেল। অর্দ্ধেক উঠে বাকিটা উঠবার আশা ছাড়লাম। চারিদিকে সবুজ গাছ, আর পাহাড়ে থাকে থাকে বাড়ী ছবির মত দেখতে। এক যায়গায় কতকগুলা কমলা লেবুর গাছ কমলা লেবুতে ভরে রোয়েছে। সবুজ গাছে লাল ফলগুলি দেখতে বড় চমৎকার। শুনলাম, এখানকার বড় বাজারের দিকে অর্থাৎ বড় হাটে, কমলা ফুলের মধু পাওয়া যায়। তবে আমরা যেদিন সন্ধ্যায় পৌছাই সেই দিন বড়বাজার হোয়ে গেছে, এবং আমাদের উপস্থিতির মধ্যে হবে না জেনে, কমলা মধুর আশা ছাড়তে হোল।

বিকালে Elephant falls দেখতে যাওয়া গেল। ভেবেছিলাম, বোধ হয় খুব হাতীর মতই জল ঝরণা থেকে পোড়ছে। কিন্তু সে সব কিছুই নাই, ঝরণা একেবারে শুকনা। বর্ষার সময়ই যা খুব জল হয়,—তবে নামের অনুরূপ নয়। এখানটায় ছোট্ট বাঁশের বন খুব আছে। এতক্ষণ বাঁশের ঝাড় দেখতে পাই নাই। এখানে আসতে রাস্তার দুধাবে ধানের ক্ষেত,—ধান কাটা হোয়ে গেছে। কতকগুলা খাসিয়া মেয়ে-পুরুষে বনভোজন করতে এসেছিল। ঝরণার রাস্তার উপরেই একটী ছোট বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে Summer Houseএর মত আছে। সেখানে চেয়ার টেবিল পাতা আছে। সেইখানেই খাসিয়া মেয়ে-পুরুষে সকলে খাওয়া-দাওয়া কোরছিল।

খাসিয়ারা বেশীর ভাগ কৃশ্চান। মিশনারিরাই এই দেশটার এত উন্নতি কোরেছে, এবং বাড়ী ঘরও সেই কারণে বিলাতী আদর্শে তৈরী এবং মিশনারিরা খাসিয়াদের মধ্যে অনেক শিক্ষা-বিস্তারও কোরেছে। এরা কিন্তু কৃশ্চান হোয়েও বিলাতী পোষাক পরে না, নিজেদের পোষাকই ব্যবহার করে। পোষাকে এদের খরচও বেশী, ঠাণ্ডা দেশ বোলে পোষাকের বাহুল্য বেশী। যারা কৃশ্চান নয়, তারা মাথায় ছাতি ব্যবহার করে না, এবং বিলাতী সু ব্যবহার করে না। এরা মাথায় কুলার মত আকৃতির বেতের ছাতা ব্যবহার করে এবং মারহাট্টি চটির মত জুতা ব্যবহার করে।

খাসিয়াদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাই উত্তরাধিকারিণী হয়। পুত্র উত্তরাধিকারী হয় না। কনিষ্ঠা কন্যার স্বামী বরাবর ঘরজামাই থাকে। সেই জন্য সকলেই বিষয় পাওয়ার জন্য সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করবার জন্য লালায়িত হয়।

খাসিয়াদের মধ্যে অনেক বড় বড় জমিদার আছেন। শিলংএ অনেক লক্ষপতি খাসিয়া আছেন, কিন্তু এঁরা সকলেই কৃশ্চান।

খাসিয়ারা পাণ খুব খায়। কাঁচা সুপারি দিয়ে এরা পাণ খায়। এখানে গৌহাটীর থেকে ভাল পাণ পাওয়া যায়, কিন্তু পাণের বরজ কাছাকাছি কোথাও চোখে পোড়ল না। বোধ হয় শ্রীহট্ট থেকে পাণ চালান আসে।

এখানে বাঙ্গালী খুব কম। যাঁরা আছেন, তাঁরা বেশীর ভাগই আফিসে চাকুরি করেন। দুটা মাত্র বাঙ্গালীর দোকান আছে। বাঙ্গালীরা সকলে "লাবান" বোলে যায়গায় থাকেন। পাঞ্জাবী শিখ অনেক আছে। বেশীর ভাগ ট্যাক্সির অধিকারী এবং চালক শিখ। দু একটী খাসিয়াও আছে।

২১শে—আজ সকালে উঠে দেখি, মেঘলা কোরে রোয়েছে। আজই আমাদের চেরাপুঞ্জি যাওয়ার কথা। এখান থেকে চেরাপুঞ্জি ২৭ মাইল দূর। ছেলেবেলায় পোড়েছিলাম যে চেরাপুঞ্জিতে পৃথিবীর মধ্যে বেশী বৃষ্টিপাত হয়, এবং চেরাপুঞ্জি মেঘের দেশ।

একজন বাঙ্গালী আই-এম-এস ডাক্তারের সঙ্গে কাল আমাদের দেখা হয়। আমরা চেরাপুঞ্জি যাব শুনে তিনি বোললেন যে খুব গরম কাপড় চোপড় পোরে এবং ঢেকে ঢুকে যাই যেন; কারণ, তিনি যেদিন যান, সেদিন মেঘের মধ্য দিয়ে গিয়ে নিউমোনিয়ায় এক মাস বিছানায় পোড়েছিলেন। কাজেই সকালে মেঘ দেখে ত চক্ষুস্থির। ভাবলাম—ওই ডাক্তারের দশা আমাদেরও না হয়। একবার ভাবলাম আজ গিয়ে কাজ নাই। তার পর ভাবা গেল—যখন বন্দোবস্ত সব করা গেছে, তখন আর কোনও রকম দ্বিধা না কোরে ভগবানের উপর নির্ভর কোরে যাওয়াই যাক,—যা হয় হবে।

তখন তোড়জোড় কোরে গলা পর্য্যন্ত গরম কাপড়ে মুড়ে শিলং থেকে মোটরে কোরে বেরুনো গেল। বেলা ১টা পর্য্যন্ত মোটরের শিলং থেকে চেরাপুঞ্জি যাবার আদেশ আছে। তার পর আর কোনও মোটর যাবার হুকুম নাই। বেলা তিনটা থেকে সব মোটর শিলং আসতে পারে। তার পূর্ব্বে আসবার হুকুম নাই। এ রকম বিধি নিষেধ না থাকলে ওসব রাস্তায় মোটর চালান বিভ্রাট।

যে রকম ঠাণ্ডা পাওয়া যাবে ভাবা গিয়েছিল, সে রকম ঠাণ্ডা শিলং থেকে বেরিয়ে ৫ মাইলের বেশী পাওয়া যায় নাই। তার পরই বেশ রৌদ্র বেরিয়ে পোড়ল,—আমরাও আনন্দে যেতে লাগলাম।

এদিকেও প্রায় ১০।১২ মাইল পাইনের রাজ্য। তার পর পাইন আর দেখা যায় না। এখানে ৪ মাইল ভয়ানক রাস্তা। একদিকে প্রায় ৫০০শ ফিট্ উঁচু সোজা খাড়া পাহাড়; আর একদিকে ৫০০ ফিট্ নীচু খাদ। মোটর একটু এদিক ওদিক হোলে আরোহী ও মোটরের কোন চিহ্নই পাওয়া যাবে না। খাদের দিকে রাস্তার ধারে ১ ফুট উঁচু পাথরের বেড়া দেওয়া আছে। কিন্তু সে থাকা না থাকা সমান।

এখানে রাস্তার ভীষণত্ব চোখে না দেখলে অনুমান করা যায় না। শিলংএর রাস্তা এ রাস্তার চেয়ে অনেক ভাল।

এই ভয়ানক রাস্তা পার হোয়ে কিছুক্ষণ পরে চেরাপুঞ্জিতে আসা গেল।

এখানে সবই খাসিয়া বাসিন্দা। মিশনারিরা এখানেও অনেক শিক্ষা-বিস্তার কোরেছেন। নূতন চেরাপুঞ্জির বাড়ীঘর ঠিক শিলংএর মত। বাসিন্দা এখানে খুব কম। একটী ছোট গির্জ্জা ঘর আছে। নূতন চেরাপুঞ্জি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—রাস্তা ঘাট ভাল। একটী দাতব্য চিকিৎসালয়ও আছে।

পুরান চেরাপুঞ্জির ঘরবাড়ীর দেওয়াল পাথরের গাঁথুনি। ছাদে খড় দেওয়া। রাস্তাঘাট বড় অপরিষ্কার ও সরু সরু।

এখানে খুব ভাল কলা পাওয়া যায়। কমলালেবু, আনারস ও কলার চাষ খুব হয়; আর সস্তাও খুব।

এখানে গাছে খুব চমৎকার চমৎকার আর্কিড্ আছে। দেখে ইচ্ছা হোতে লাগল—তুলে আনি। একটী প্রকাণ্ড ঝরণা আছে। এতবড় ঝরণা শিলংএ একটাও নাই। বাঁশ ঝাড় এদিকেও খুব। চেরাপুঞ্জির অর্দ্ধেকের উপর জঙ্গল; বাকিটায় বাসিন্দা আছে। বৃষ্টির জ্বালায় লোকে থাকতে পারে না বোধ হয়।

এই বড় ঝরণাটীর কাছে একটী বড় পাহাড় আছে। তার উপর থেকে শীলেট (শ্রীহট্ট) দেখা যায়। শীলেট যাবার পায়ে-হাঁটা রাস্তাও এখান থেকে দেখা যায়। শীলেট থেকে অনেকে এই হাঁটা-রাস্তায় শিলং আসেন। এই রাস্তায় মোটর যাবার উপায় নাই—হয় হেঁটে না হয় মানুষের পিঠে (আপায়) যেতে হয়। এই হাঁটা-রাস্তার পাশ দিয়ে একটা নদী ওই বড় ঝরণা থেকে বেরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে গিয়েছে। চেরাপুঞ্জি থেকে ওই রাস্তাটী একটী গেরুয়া ফিতার মত এবং নদীটি একটী গেরুয়া রঙ্গের শাড়ী—যেন কেউ ঘাসের উপর মেলে দিয়েছে মনে হয়। এই সব দেখা শোনা কোরে ৪টার সময় আবার সেই ভয়ানক রাস্তা পার হোয়ে শিলংএ ফিরে আসা গেল। তার পর দিন অর্থাৎ ২২শে গোহাটী ফিরে ট্রেণে কোরে দেশে ফিরে আসা গেল। এই পর্য্যন্ত আমার "**জলপথের কাহিনী**।"

জবা

শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর বি-এ

তুমি—যুগে যুগে পুজিত জীব বলি-শোণিমায়
রঞ্জিত, বেদনায় ফুল্ল,
বঙ্গের অঙ্গনে গঙ্গার তীর-বনে
রুদ্রের রোষরাগ তুল্য।

চণ্ডীর মন্দিরে বন তার বুক চিরে
খর্পরে জবা তোমা অর্পে,
ধরা তার স্তন-রস মথি, নব রক্তিম
নবনীতে তারা মা'য়ে তর্পে।

যজ্ঞদেবের পায়ে শঙ্কিত সমিধের
অরুণ নয়নে যেন ভিক্ষা,
অশ্বমেধের হোতা বিশ্ববিজয়ী শূর
ক্ষত্রের যেন রণদীক্ষা।

বধ্যের বুকে ভাতি, মদ্যের চির সাথী,
সদ্য-ছিন্ন শিশু-মুণ্ড,
জল্লাদ ঘাতকের পুষ্পিত আহ্লাদ
শ্মশান প্রেতের তুমি তুণ্ড।

বীরাচারী কৌলের কাপালিক অঘোরীর
স্বৈরাচারের হ্রীং মন্ত্র,
বহু শাখে ভাগ হয়ে জ্বলিলে কি বেদজয়ে
তুমি মহানির্ব্বাণতন্ত্র?

বিপ্রের গৃহে তুমি ফিরে এলে, ভেদি' ভূমি
ভার্গবী হিংসার তৃষ্ণা,
অরিন্দম্ বিদারক বৃকোদর অঙ্গুলি?
হাসে লতাকুন্তলা "কৃষ্ণা"।

পিপাসিত লেলিহান মহাকাল রসনা কি
জাগিয়াছ জীবনের কুঞ্জে?
গহনের স্ফুট ব্যথা মৃগ্যের অভিশাপে
কিরাতের দুষ্কৃতি পুঞ্জে?

তীর্থঙ্কর জিন পদরেণু করিল না
ও-বুকে সুরভি রেণু সৃষ্টি,
রজোরাগ হরিল না, হেরে গেল বুদ্ধের
সত্ত্ব বিমল প্রেম-দৃষ্টি।

নিমাইএর আঁখিজল নিষ্ঠুর বুকে তব
সৃজিতে নারিল মধুগন্ধ,
গেল বৃথা গুঞ্জরি ভক্তের মাধুকরী
কবিদের প্রেমগীতিছন্দ।

শুভ্র সুরভি হবে পুণ্য পরাগে কবে
পাবে মধু বৃন্তের রন্ধ্রে,
সে শুভ দিনের লাগি ব'সে আছি, কবে জবা
তোমাতে পূজিব শ্যামচন্দ্রে।

বসন্তের বঁধু

এস, ওয়াজাদ আলি, বি-এ, এল্‌এল্‌-বি (ক্যাণ্টাব)

বসন্ত মলয়ের মধুর প্ররোচনায় যখন গোলাপ-কলিকা তার লজ্জাকাতর মুখটী তুলে বুলবুলের দিকে আড়চোখে চাইছিল, আর নিজের দুঃসাহসের কথা ভেবে থেকে থেকে শিউরে লাল হয়ে উঠছিল, কোকিল যখন তার প্রিয়ার মন পাবার জন্য তার গানের লহরে বাগানকে কাঁপিয়ে তুলছিল, প্রজাপতি যখন তার বিচিত্র বেশ পরে, ভয় ভাবনা ছেড়ে মনের আনন্দে ফুল-সুন্দরীদের সঙ্গে প্রেমের লঘু খেলা খেলিয়ে বেড়াচ্ছিল, সেই আবেগ, আনন্দ, সুরভি ভরা এক মধুর প্রভাতে তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

ইন্দ্রধনু রংএ রঞ্জিত বিচিত্র এক স্বপ্নের মত আমাদের সেই দিনগুলি কেটেছিল। সমীরণ তার অব্যক্ত সঙ্গীতের মধুর মূর্চ্ছনায় আমাদের প্রাণকে কাঁপিয়ে দিয়ে যেতো। বিশ্বের বিচিত্র বর্ণসম্পদ আমাদের মনকে কোন্ সুদূর কল্প-লোকে নিয়ে চলে যেতো। বিহঙ্গের উচ্ছ্বসিত কলরব আমাদের তরুণ হৃদয়ে নিত্য-নূতন ভাবের লহর তুলতো। আমরা তন্ময় হয়ে জীবনের সেই মধুর আব-হাওয়া পান করতুম।

উত্তরের তীক্ষ্ণ বাতাস এসে শেষে কিন্তু সোঁ সোঁ করে বইতে লাগলো। গোলাপের কোমল পাপড়িগুলি বোঁটা থেকে ঝরে মাটিতে পড়ে গেল। বুলবুল তার প্রিয়ার সন্ধানে বাগান ছেড়ে কোন্ সুদূর অজানা দেশে চলে গেল। মাশু-কাকে হারিয়ে কোকিল তার গান ভুলে গেল। প্রজাপতি তার বসন্তের সঙ্গীদের সঙ্গে বাগান ছেড়ে চলে গেল।

আর আমরা? আমাদের সুখ-স্বপ্নও বসন্তের সঙ্গে শেষ হলো। নিয়তির তাড়নে আমরা দুইজনও পৃথিবীর দুই অন্তে গিয়ে পড়লুম।

জীবনের সেই মধুর বসন্তের কথা কিন্তু সেও ভুলেনি, আমিও ভুলিনি। ভুলতে কি কেউ তা পারে? পৃথিবীর বসন্ত ফিরে আসতো। বুলবুল বাগানে এসে তার প্রিয়ার সঙ্গে মিলতো। গোলাপ-কলিকা তার সলজ্জ মুখটি তুলে আড় চোখে তার প্রিয়ার দিকে চাইতো। প্রিয়াকে দেখে কোকিলের মুখ ফুটে প্রেমের গান বেরুতো। প্রজাপতি ফুল-সুন্দরীদের সঙ্গে তার প্রেমের খেলায় ব্যস্ত হতো। নূতন বছরের সঙ্গে সঙ্গে আবার নূতন আমোদে মেতে যেতো। আমাদের বসন্ত কিন্তু আর ফিরেনি—নিয়তি সাত সমুদ্রের নদীর খাল কেটে আমাদের দুজনকে তফাতে রেখেছিল।

প্রাণের বাসনা আর বিরহের বেদনা প্রকাশ করতুম আমরা পত্রে—বসন্তের সেই সম্ভাষণ পত্রে, যা ছিল আমাদের অশরীরি অভিসারের আদরের দূত।

বছরের পর বছর কেটে গেল। যৌবনের গড়া এক একটী আশার পুতুল কালের নিষ্ঠুর আঘাতে মাটিতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল। সঙ্গীহীন, দরদী-হীন জীবন আমার শুকনো গাঙ্গের মত ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ভাবলুম বেঁচে আর কি হবে? মৃত্যুতেই আমি শান্তি পাব।

পৃথিবীর বসন্ত আবার ফিরে এলো। মলয় বাতাস আবার প্রেমের বার্ত্তা নিয়ে আশেক মাশুকদের মধ্যে ছুটো-ছুটি করতে লাগলো। আবেগভরা কণ্ঠে বুলবুল আবার তার প্রিয়াকে ডাকতে লাগলো। গোলাপ-কলিকা সলজ্জ মুখটী তুলে আবার তার আশেকের দিকে মিটিমিটি চাইতে লাগলো। কোকিল-বধূ আবার এসে তার প্রেমিকের পাশে বসলো। প্রজাপতি আবার তার রং বেরংএর পোষাক পরে ফুল-সুন্দরীদের সাথে তার প্রেমের খেলা খেলিয়ে বেড়াতে লাগলো। প্রেমের মধুর উৎসবে আবার সবাই মেতে গেল।

আর আমি থাকতে পারলুম না। উচ্ছ্বসিত আবেগ এসে মনের সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। টাটকা হৃদয়ের রক্তে কলমটী লাল করে আমি তাকে লিখলুম "বসন্তের বঁধু হে আমার, তোমায় ছেড়ে আর আমি থাকতে পারবো না। এবার আমি আসবো, তোমার কাছেই আসবো। বসন্তের মধুর মিলনে আমাদের জীবন দুটীকে আর একবার সার্থক করবো।"

দরদ আর করুণায় ভরা এক চিঠি তার কাছ থেকে পেলুম। সে লিখেছে "বন্ধু হে আমার! জীবনের সব ফুলগুলিই শুকিয়ে ঝরে গেছে! আমাদের সেই সুদূর অতীত মিলনের স্মৃতি ফুলটাই এখন কেবল বেঁচে আছে। তারই সুরভি এখনও বসন্তের কথা আমার মনে করিয়ে দিচ্ছে। সখা হে, সেটি যাদুর ফুল, হাত দিয়ে তাকে ছুঁয়ো না। সে ফুলটী শুকুলে, আমি আর বাঁচবো না।"

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

রামযাদু যার প্রসাদপ্রার্থী তার একমাত্র সন্তানকে মুখ ভেংচে যে অন্যায় অপকর্ম্ম করে ফেলেছে তার জন্যে তার মনে অনুশোচনা ও অস্বস্তির অন্ত ছিলো না। এতে কিন্তু তার অনিচ্ছায় ও অজ্ঞাতসারে সুবিধাই হয়ে উঠলো, তার রুক্ষ শীর্ণ শুষ্ক মূর্ত্তি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন বিমর্ষ দেখাতে লাগলো।

রামযাদু বোঁচার নির্দ্দেশ অনুসারে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তেই সিঁড়ির পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেলে যে-ঘরে পরাণ-বাবু বসে আছেন সেটি বেশ বড়ো দৌড়-ঘর; ঘরে দেশী বিলাতী দু রকম আসনই আছে—ঘরের এক ধারে চেয়ার টেবিল বেঞ্চি সোফা কৌচ আছে, অপর ধারে খুব নীচু তক্তপোষের উপর জাজিম-বিছানো ফরাশও আছে, ঘরের দেয়ালগুলি ছাদ-ছোঁওয়া উঁচু উঁচু আল্‌মারীতে ঢাকা; সকল আলমারীই বইএ ঠাসা, খাড়া করে' সাজানো বইএর সারির মাথায় আবার কাত করে' বই রাখা হয়েছে, তাতেও বইএর জায়গা কুলোয় নি, অনেক বই বেঞ্চিতে চেয়ারে মেঝের ধারে ধারে স্তূপাকার করে' রাখা হয়েছে; পরাণ-বাবু খালি গায়ে একখানা প্রকাণ্ড বড়ো চওড়া চেয়ার একেবারে ভরাট করে' বসে' আছেন, তাঁর প্রকাণ্ড কালো বেঁটে শরীরের তাল তাল মাংসপিণ্ড চেয়ারের কাঠের ফাঁক ও ফুকোর দিয়ে এদিকে ওদিকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে ফেঁপে ফুলে বেরিয়ে পড়েছে, যেনো একতাল তিলকুটো সন্দেশ আহ্লাদী পুতুলের ছাঁচে ফেলা হয়েছে। পরাণ-বাবুর সাম্‌নে ও পাশে দশ-বারো জন লোক চেয়ারে বেঞ্চিতে বসে' আছে,—আগন্তুকদের মধ্যে দুজন ইউরোপীয়ও আছে;. পরাণ-বাবু তাঁর প্রকাণ্ড ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে তাদের সকলের সঙ্গে প্রসন্নমুখে আলাপ কর্‌ছেন নিজের ভাষাতেই—দুজন ইউরোপীয় যে আছে তার জন্যে তাঁর খালি-গায়ে থাক্‌তে ও নিজের ভাষায় কথা কইতে একটুও সঙ্কোচ দেখা যাচ্ছে না।

রামযাদু ঘরের দরোজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই পরাণ-বাবু মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখলেন; তাকে দেখ্‌বা মাত্রই তাঁর ছোটো ছোটো চোখ দুটি অমায়িক হাসির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো; খোঁয়াড়ের ঝাঁপ খোলা পেলে ভেড়ার পাল যেমন গম্ভীর স্বরে ডাক্‌তে ডাক্‌তে বেরিয়ে আসে, তেমনি তাঁর ঝাঁপালো গোঁপের তলা থেকে ভারী আওয়াজ আনন্দে উছ্‌লে বেরিয়ে এলো—এই যে রামযাদু বাবু, আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্; আমি থাকোহরির কাছে যে অবধি শুনেছি যে আপনি একদিন পায়ের ধূলো দিতে আস্‌বেন সে অবধি আমি রোজই আপনার দর্শন প্রত্যাশা কর্‌ছি।

ঘরের পঁচিশ জোড়া চোখ একেবারে ঘুরে এসে আঢাকা মিষ্টান্নের উপর মাছির মতন রামযাদুকে ছেঁকে ধর্‌লো। রামযাদু এতোগুলি উৎসুক চোখের কৌতূহল দৃষ্টির সাম্‌নে একটু সঙ্কুচিত হয়ে লজ্জিত হাসিমুখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ কর্‌লো। পরাণ-বাবু তাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বল্‌লেন—বসুন।

তারপর সমবেত লোকদের দিকে ফিরে পরাণ-বাবু বল্‌লেন—হাঁ, আমাদের যে কথা হচ্ছিলো। সত্যি, আজ-কাল সব এম-এ, এম-এসসি পাশ করে' পঞ্চাশ ষাট টাকার জন্যে আপিসে চাক্‌রীর উমেদার, কিন্তু এতো খরচপত্র আর কষ্ট করে' যে বিদ্যে শিখছে তা কি শুধু রেড়ির-খোলের আর ছাতার বাঁটের রপ্তানি আমদানীর হিসেব লেখবার জন্যে? এতে আমার ভারি কষ্ট হয়।

একজন লোক বল্‌লে—কি কর্‌বে বলুন, কিছু একটা করে' খেতে তো হবে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তা তো জানি: কিন্তু যে যা বিদ্যে শিখেছে তার চর্চ্চা আলোচনা অনুসন্ধান গবেষণা কর্‌লে টাকা আর যশ দুই যে হতে পারে। আমার দুঃখ হয় যে এত ছোক্‌রা আমার কাছে চাকরীর উমেদারী কর্‌তে আসে, একজন কেউ বলে না যে মশায়, আমি এই বিষয়ের গবেষণা কর্‌ছি, আপনার লাইব্রেরীতে আমি কাজ কর্‌তে চাই, কিংবা আমি যাতে এই কাজই কর্‌তে পারি তার একটা ব্যবস্থা ক'রে' দিন।

ঘরের সমস্ত লোক একটু লজ্জিত সঙ্কুচিত হয়ে পড়্‌লো। রামযাদু বুঝ্‌লে এরা সবাই পরাণ-বাবুর এই কথায় নিজেদের অপরাধী বিবেচনা কর্‌ছে।

পরাণ-বাবু একটু হেসে আবার বল্‌তে লাগলেন—এই দেখো এই সাহেবরা—এরা কেউ কিছু বিদ্যে শিখে, কেউ কিছু না শিখেও সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে লক্ষ্মীর সন্ধানে আস্‌ছে; দুহাতে যেমন জেব ভর্ত্তি কর্‌ছে, যেদেশে কাজ কর্‌ছে সেদেশের সন্ধানও কর্‌ছে তারাই;—ভারতবর্ষের পুরাতন ও বর্ত্তমান সকল বিষয়ের তন্ন তন্ন সন্ধান করেছে ও কর্‌ছে কারা? ওরা সব সরস্বতীকে সহায় করে' লক্ষ্মীকে বশ করে, তবে না হয় ওরা লাখপতি! আর আমরা সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা কর্‌তে চাই, তাই পাই শুধু পেঁচার মুখভ্রষ্ট উচ্ছিষ্ট উঞ্ছ এতোটুকু।

তার পরে পরাণ-বাবু হা হা করে' হেসে বল্‌লেন—বৃথা আক্ষেপ! এখন আপনাদের সব ছুটি, বেলা হলো। রামযাদু-বাবুর সঙ্গে আমার এখন কাজ আছে। Well Mr. Marris, I shall remember your request, and shall try my best. And you Mr. Kebble, please see me this day week, in the mean time I shall speak to Mr. Cottle. Good bye.

পরাণ-বাবু ইংরেজ দুজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে উঠে সম্মুখে নত হয়ে তাঁর হাত ধরে' বিদায় নিয়ে চলে' গেলো। অন্য সকলেও কল-টেপা পুতুলের মতন এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো ও একে একে নমস্কার করে' করে' ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে লাগ্‌লো। যাবার সময় সকলেই একবার করে' রামযাদুকে দেখে নিচ্ছিলো,—তাদের সকলেরই ঈর্ষা ও কৌতুহল হচ্ছিলো—কে এই ভাগ্যবান্‌, যে সকলকে বিদায় করিয়ে একলা কর্ত্তার কাছে রয়ে গেলো!

সকল লোক চলে' গেলে পরাণ-বাবু চর্কী-চেয়ার ফিরিয়ে রামযাদুর দিকে মুখ করে' বসে' বল্‌লেন—আমার বড় সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করে' পায়ের ধূলো দিতে এসেছেন। সেদিন থেকে আপনার পরিচয় জান্‌বার জন্যে আমি ভারি উৎসুক হয়ে আছি।

রামযাদু তার শীর্ণ মুখে শুষ্ক হাস্যে বড় বড় দাঁত বিকশিত করে' বল্‌লে—আমরা সামান্য লোক, আমাদের পরিচয়ও যৎসামান্য। আপনি মহাশয় ব্যক্তি, তাই পথের লোককে ডেকে বাড়ীতে আন্‌তে চান।

পরাণ-বাবু স্মিতমুখে বল্‌লেন—পথে রত্ন কুড়িয়ে পেলে কে ছাড়ে বলুন।" পরাণ-বাবু হো হো করে' উচ্চ হাস্য কর্‌লেন।

রামযাদু পাল্টা জবাব দিলে—কিন্তু জহুরীই কেবল রত্ন চিন্‌তে পারে।

রামযাদুর জবাবে পরাণ-বাবু আবার জোরে হেসে উঠ্‌লেন; সে হাসি যে খুশীর তা তাঁর চোখ মুখ দেখেই রামযাদু বুঝ্‌তে পার্‌লো। পরাণ-বাবু দীপ্ত মুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—মশায়ের বিষয়কর্ম্ম কি করা হয়?

রামযাদু বল্‌লে—নামে যশোরে ওকালতী করি। কিন্তু Law is a jealous mistress, তাঁর একাগ্র উপাসনা না কর্‌লে তিনি প্রসন্ন কিছুতেই হন না।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার আর কিছু কাজ আছে কি?

রামযাদু মুখভাব একটু অপ্রতিভ করে' বল্‌লে—আজ্ঞে, ঠিক কাজ নয়, একটু বাতিক আছে। যশোরের বারে এর জন্যে আমাকে কি কম উপহাস সহ্য কর্‌তে হয়।

পরাণ-বাবু কৌতূহলী হয়ে উৎসুক স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার বাতিকটা কি শুন্‌তে পাই কি?

রামযাদু যেন গোপনীয় কথা অনিচ্ছায় বল্‌ছে এমনি সঙ্কুচিত ভাবে বল্‌লে—আজ্ঞে সে শোন্‌বার মতন কিছু নয়। কতকগুলো খেয়ালের বশে ভূতের বেগার খাট্‌ছি—তিনখানি বই লেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি আজ বারো বচ্ছর ধরে'। ঘরে এমন পয়সা নেই যে ওকালতী ছেড়ে শুধু বই লিখি, আবার বই লেখার দিকে মন থাকাতে ওকালতীও ভালো লাগে না—কাজেই পসারও জমে না—সত্যিকে মিথ্যে আর মিথ্যেকে সত্যি সাজাতে প্রবৃত্তিও হয় না—আমার হয়েছে এখন দু নৌকোয় পা।

রামযাদু নিজের ব্যবসার ক্ষতি করে'ও বা-রো বচ্ছর ধরে' বই লিখ্‌ছে আর তার প্রবঞ্চনার ব্যবসায়ে প্রবৃত্তিও নেই এই খবর জেনে, রামযাদুর উপর পরাণ-বাবুর ভক্তি শ্রদ্ধা দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। তিনি সম্ভ্রমভরা স্বরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কি কি বিষয়ে বই লিখ্‌ছেন।

রামযাদু বিনয়ের স্বরে বল্‌লে—সে বল্‌বার মতন নয়;

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাতে কারো কিছু উপকার হবে না। তবু লিখ্ছি—ভূতে পাওয়ার মতন খেয়ালে পেলে তো আর রক্ষা নেই।—একখানার নাম দিয়েছি—পৌরাণিক উপাখ্যান; তাতে এক একটা পৌরাণিক উপাখ্যান ধ'রে' তার development trace কর্‌বার চেষ্টা করেছি; বেদ, ব্রাহ্মণ, কল্পসূত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, লৌকিক কাব্য আর জনপ্রবাদের ভিতর দিয়ে কালানুক্রমে একটি আখ্যান সামান্য বীজ থেকে কেমন করে' অঙ্কুরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে পল্লবিত হয়েছে তারই ধারাগুলি আমি ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।·····

পরাণ-বাবুর ছোটো ছোটো গোল গোল দুই চোখ বিস্ময়ে প্রশংসায় আনন্দে যেনো ফেটে ঠিক্‌রে পড়্‌বার মতন বিস্ফারিত হয়ে উঠ্‌লো, ঝাঁপের মতন তাঁর ঝোলা গোঁপ ফুলে বেঁকে উঠ্‌লো, তিনি উল্লসিত কণ্ঠে বলে' উঠ্‌লেন—এ যে অসাধারণ আশ্চর্য্য বই হচ্ছে!

রামযাদু নিজের ধূর্ত্ততায় নিজের উপর পরম সন্তুষ্ট হয়ে বল্‌লে—কবি-রবি বলেছেন—'যত সাধ ছিলো সাধ্য ছিলো না।' মনের মতন করে' লিখ্‌তে পার্‌ছি কই? থাকি যশোরে, না আছে সেখানে কারো ভালো লাইব্রেরী, আর না আছে আমার টাকা যে বই কিন্‌বো। কালে ভদ্রে একখানা বই কিনি, থেকে থেকে কল্‌কাতায় ছুটে আসি—তাতে ওকালতীরও ক্ষতি হয়, বই লেখার কাজও এগোয় না।

পরাণ-বাবু জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—তা এর কতোটা লেখা হয়েছে?

রামযাদু বল্‌লে—তা হয়েছে অনেকখানি, একটা বেশ বড়ো বই হয়। কিন্তু হলে হবে কি? টাকাও নেই যে বই ছাপি, আর রোজই দেখ্‌ছি যে আজকের চেয়ে কালকের জ্ঞান আমার অসম্পূর্ণ ছিলো, তাই ছাপ্‌তে সাহসও হয় না।

পরাণ-বাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আপনার আর দুখানা বই কি কি বিষয়ে?

রামযাদু বল্‌লে—দ্বিতীয়খানা লিখ্‌ছি—বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভগ্নাবশেষ সম্বন্ধে; সহজিয়া, বাউল, নেড়ানেড়ি, ধর্ম্মঠাকুর, চণ্ডী, শীতলা, মনসা প্রভৃতি ধর্ম্ম যে বৌদ্ধধর্ম্মেরই ভগ্নাবশেষ তা প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা করেছি; অনেক গান ছড়া, প্রবাদ সংগ্রহ করে' আমার মত সমর্থন করেছি; এর জন্যে আমাকে গাঁয়ে গাঁয়ে মেলায় মেলায় অনেক ঘুর্‌তে হয়েছে।

পরাণ-বাবু প্রশংসমান দৃষ্টিতে রামযাদুর মুখের দিকে চেয়ে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—আর তৃতীয় বই?

রামযাদু বল্‌লে—তৃতীয় বই লিখ্‌ছি যশোর-খুলনার ইতিহাস। যশোর-খুলনা আমাদের বাংলার শেষ বীরত্বের ক্ষেত্র; এখানে প্রতাপাদিত্য, সীতারাম বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর জন্যে আমাকে জঙ্গলে জঙ্গলে বেড়াতে হয়েছে। অনাহারে অনিদ্রায় পরিশ্রমে ম্যালেরিয়ায় শরীর একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে। এ শুধু আমাদের জেলার পলিটিক্যাল্ ইতিহাস নয়, এতে সামাজিক এবং সাহিত্যিক ইতিহাসও আছে; জেলার কৃষি শিল্প বাণিজ্য যা ছিলো ও আছে ও যা হতে পারে তারও বিস্তারিত বিবরণ আছে।

পরাণ-বাবু আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—ও! তিনখানার একখানা লিখ্‌তে পার্‌লেও যে একজন লোক অন্য দেশে ধনী আর অমর হয়ে যেতো। আপনি কাল যদি বই তিন খানা একবার নিয়ে আসেন তা হলে আমি একবার দেখে ধন্য হই।

রামযাদু বল্‌লে—সে বই তো আমার সঙ্গে নেই। আমি এসিয়াটিক্ সোসাইটী থেকে কিছু বই নিয়ে যাব বলে' কল্‌কাতায় এসেছি। আমি তো নিজে এসিয়াটীক সোসাইটীর মেম্বর নই; একে তাকে ধ'রে' বই সংগ্রহ করি···

পরাণ-বাবু একটু কুণ্ঠিত স্বরে বল্‌লেন—তা হলে আমায় আপনার একটু অনুগ্রহ কর্‌তে হবে। কি বই আপনার দর্‌কার আমাকে বল্‌লে হয়তো আমি আমার লাইব্রেরী থেকে দিতে পার্‌বো, নয় তো আমিই আনিয়ে দেবো। আর যশোরে গিয়ে বই তিনখানা যদি দয়া করে' নিয়ে আসেন, তা হলে আমি সেগুলি দেখে নয়ন মন সার্থক করে' বিশেষ উপকৃত হবো।

রামযাদু বল্‌লে—এর জন্যে আপনি অতো অনুরোধ কর্‌ছেন কেনো? যশোরে তো শুধু লোকের উপহাস পাই; আপনি দয়া করে' আমার কৃতকর্ম্ম যে দেখ্‌তে চাইছেন এই আমার সৌভাগ্য। নিজের লেখা নিজের সন্তানের মতন, একজন কেউ তার আদর কর্‌লে মন খুশী হয়ে ওঠে। আমি আজই যশোর গিয়ে কাল আপনাকে এনে বই দেখাবো।

পরাণ-বাবু ব্যগ্র হয়ে বল্‌লেন—আপনার কাজের যদি কোনো ক্ষতি না হয়……

রামযাদু বল্‌লে—যে অকাজ ঘাড়ে নিয়ে আছে তার আবার কাজের ক্ষতি! একজন সমঝদার লোককে যদি আমার পরিশ্রমের ফল দেখাতে পারি সে তো আমারই পরম সৌভাগ্য।…আজকে তা হলে উঠি; ঢের বেলা হলো। আপনাকে তো আবার আপিস যেতে হবে?

পরাণ-বাবু বললেন—হ্যাঁ, এখন চান কর্‌বো।…… অ বোঁচা-আ-আ!

পরাণ-বাবুর বজ্রগম্ভীর চীৎকারের উত্তরে—এজ্ঞে যাই—বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বোঁচা দৌড়ে এসে সাম্‌নে কাঠের পুতুলের মতন আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়ালো।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আমার হাত-বাক্‌স দে।

বোঁচা একটা দেরাজ খুলে একটা ছোট ক্যাশ-বাক্‌স বাহির করে' এনে পরাণ-বাবুর সাম্‌নে টেবিলে রাখ্‌লো। পরাণ-বাবু বাক্‌স খুলে দশখানি দশ টাকার নোট গুণে বার করে' বাক্‌স বন্ধ কর্‌লেন। বোঁচা বাক্‌স তুলে নিয়ে দেরাজে রাখ্‌তে গেলো। রামযাদু যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো। পরাণ-বাবু রামযাদুকে বল্‌লেন—আপনার যশোর যাওয়া-আসার খরচ আপনাকে নিতে হবে।

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লে—সে আপনাকে দিতে হবে না।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আমার জন্যে আপনি কষ্ট করে' যাওয়া আসা সময়-নষ্ট কর্‌বেন, এই আপনার অশেষ অনুগ্রহ। যেটা আমি বহন কর্‌তে পারি সেটা আমাকে বহন কর্‌তে আপনি অনুমতি করুন।

রামযাদু বল্‌লে—তা অত টাকা কি হবে? আমরা তো থার্ড ক্লাশে যাতায়াত করি……

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—সে নিজের কাজে। কিন্তু আমার কাজে আমি আপনাকে পাঠাচ্ছি—ফার্ষ্ট ক্লাশের পাথেয় আপনাকে দিতে আমি বাধ্য। আর তা ছাড়া আপনাকে আমি ওকালতী ছাড়াবো হয়ত, কতোদিনে যে আপনি আমার কবল থেকে ছাড়ান পাবেন তা বল্‌তে পারিনে। সৎসঙ্গের প্রতি আমার বড়ো লোভ আছে রামযাদু-বাবু।

পরাণ-বাবু হো হো করে হেসে রামযাদুর হাতে নোটগুলি গুজে দিলেন।

রামযাদু নোটভরা অঞ্জলি তুলে পরাণ-বাবুকে নমস্কার করে' বল্‌লে—আপনি আমাকে চেনেন না, শোনেন না, এতোগুলি টাকা আমাকে দিচ্ছেন! আমি যদি আর এমুখো না হই? আপনি আমার বিদ্যা বুদ্ধি গবেষণা সম্বন্ধে আমার নিজের মুখের কথা ছাড়া আর কোনো পরিচয় পান নি; আমার কথা যদি মিথ্যা হয়, ভুয়ো হয়? শেসকালে প্রতারিত প্রবঞ্চিত হয়েছেন বলে' দুঃখ পাবেন। আপনার মতন মহৎ ও সরল লোককে আমি ঠকাতে পারবো না। আমি আগে আমার পরিচয় দি, যদি যোগ্যতা প্রমাণ কর্‌তে পারি তবে আপনার দান আমি গ্রহণ কর্‌বো।

পরাণ-বাবু রামযাদুর কথায় পরম সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—দেখুন রামযাদু-বাবু, রোজ দুবেলায় আমার কাছে পঞ্চাশ ষাট জন লোক স্বার্থসিদ্ধির সন্ধানে আসে। আমি যথা-সাধ্য তাদের সাহায্য করি। সবাই কিন্তু ভাবে আমি ভারি বোকা, তারা সেয়ানা, আমাকে তারা ঠকিয়ে ভোগা দিয়ে গেলো! আমিও জেনে শুনে সকলের কাছে ঠকি, অথচ প্রকাশ করিনে। আপনার মতন সরল অকপট স্পষ্ট কথা আমি কারো কাছে শুনিনি। একবার না হয় আমাকে সত্যি সত্যি ঠক্‌তে দিন।

রামযাদু এইবার নোটগুলি পকেটে গুঁজ্‌তে গুঁজ্‌তে হেসে বল্‌লে—নেহাৎ যখন ঠক্‌বেনই আপনি, তখন কি কর্‌বো বলুন। তবে আজ বিদায় হই।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—প্রণাম হই। কাল আবার পায়ের ধূলো পাবো এই প্রতীক্ষায় থাক্‌বো।

রামযাদু হেসে বল্‌লে—পায়ের ধুলোর যেরকম মোটা বায়না আজ দাদন কর্‌লেন, তাতে পায়ের ধূলো খুব ঘন ঘন পড়্‌বে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌বেন। কাঙালকে শাগের ক্ষেত দেখিয়েছেন; শেষকালে মনে হবে আপদ বিদায় হলে বাঁচি।

পরাণ-বাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে বল্‌লেন—এমন পষ্ট সত্যি কথা আমি কারো কাছে কখনো শুনিনি মুখুজ্জে মশায়। যদি আপদ বোধ হয় তা হলে আমিও পষ্ট সত্যি কথা বল্‌তে চেষ্টা কর্‌বো। আচ্ছা, আজ ছুটি।

পরাণ-বাবুর গুরুগম্ভীর উচ্চ হাস্যরোলে ঘর ভরাট হয়ে গমগম কর্‌তে লাগ্‌লো।

রামযাদু এক মন হাসি মনের মধ্যে চেপে রেখে বেরিয়ে

যাবে, এমন সময় পাশের এক দরজা দিয়ে কৃষ্ণকলি সেই ঘরে এসে ঢুকলো। রামযাদু অমনি ফিরে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণকলিকে টপ করে' কোলে তুলে নিলে, এবং পরাণ-বাবুকে জিজ্ঞাসা করলে—এটি আপনার ছোটো মেয়ে বুঝি?

পরাণ-বাবু হেসে বললেন—হ্যাঁ, আপনাদের আশীর্ব্বাদে ঐটিই এখন সম্বল।...

কৃষ্ণকলির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই রামযাদু তাকে যে মুখ ভেঙিয়ে ভয় দেখিয়েছিলো সে কথা কৃষ্ণকলি ভোলে নি। তাই এখন রামযাদু তাকে কোলে তুলে নেওয়াতে সে কতক ভয়ে ও কতক বিরক্তিতে ও ঈষৎ লজ্জায় ব্যস্ত হয়ে রামযাদুর কোল থেকে নেমে পড়বার জন্যে ছটফট করছিলো। কৃষ্ণকলিকে ব্যস্ত দেখে পরাণ-বাবু হেসে বললেন—ওকে ছেড়ে দিন মুখুজ্জে মশায়, ওর পা আপনার গায়ে লাগছে, ওর অকল্যাণ হবে।

এই অতি কুৎসিত মেয়েটাকে কোলে করে' রামযাদুর সমস্ত দেহমন কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করছিলো। সে কৃষ্ণকলিকে মুখ ভেঙিয়ে যে অন্যায় করেছিলো তার সংশোধনের চেষ্টাতেই সে একরকম মরিয়া হয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলো; কিন্তু কৃষ্ণকলিকে তার আক্রমণে ধড়ফড় করতে দেখে ও পরাণ-বাবুর অনুরোধ শুনে সে কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে যেনো বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে বাঁচলো। রামযাদু কৃষ্ণকলিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে নত হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে বললে—এমন বাপের মেয়ের কখনো অকল্যাণ হবে না।

কৃষ্ণকলি ছাড়া পেয়েই রামযাদুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে বাবার চেয়ার ঘেঁসে দাঁড়ালো। পরাণ-বাবু রামযাদুর কথা শুনে সস্নেহে কন্যাকে হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বললেন—সে আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

রামযাদু মুখে হাসি মাখিয়ে এবার বিদায় হয়ে ঘর ছেড়ে বেরুলো।

রামযাদু অদৃশ্য হবামাত্র কৃষ্ণকলি বলে উঠলো—ও লোকটা বড় দুষ্টু বাবা!......

পরাণ-বাবু কন্যাকে কোলে তুলে নিয়ে মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললেন—ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। জগতের সবাই ভালো, কেউ দুষ্টু না।

কৃষ্ণকলি প্রতিবাদের স্বরে বলে' উঠলো—তবে ও আমাকে...

পরাণ-বাবু মনে করলেন কৃষ্ণকলিকে কোলে তোলার জন্য সে রামযাদুর উপর বিরক্ত হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণকলির কথা শেষ হবার আগেই সেই ঘরে একজন লোক এসে প্রবেশ করলো। তাকে দেখেই পরাণ-বাবু বলে' উঠলেন—এই যে প্রতাপ বাবু, আসুন আসুন, অনেক দিন পরে যে...

কৃষ্ণকলির নালিশ আর শেষ করা হলো না, সে আস্তে আস্তে বাবার কোল থেকে নেমে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলো। পরাণ-বাবু আগন্তুকের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলেন। রামযাদুর অদৃষ্ট তার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে তাকে এ-যাত্রা বাঁচিয়ে দিলে!

(ক্রমশঃ)

যৌন-ক্ষুধার প্রস্ফুরণ

শ্রীনির্ম্মল দেব

পূর্ব্বের প্রবন্ধে বলিয়াছি—আদিম দিনের উন্মত্ত ইন্দ্রিয়-ক্ষুধাই মানুষের প্রেমের মূল ভিত্তি। যে অদম্য বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টির কোন্ সেই বিস্মৃত যুগ হইতে চিরদিন ধরিয়া পুরুষ ও স্ত্রীকে এক রুদ্র পুলকে পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট করিয়া আসিয়াছে, সেই চিরন্তনী যৌন-ক্ষুধাই মানুষের বুদ্ধি, বিবেক ও চিন্তা-বৃত্তির দ্বারা সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া মানব-হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মহত্ত্বের মধ্যে পরিস্ফুরিত হইতেছে। আবার সেই যৌন-ক্ষুধাই যখন ভাবুকতা ও নীতি-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হয়, তখন সেই বিকৃত যৌন-ক্ষুধা হইতেই মানব-চরিত্রের সমস্ত কদর্য্যতা ও সমস্ত জঘন্যতার উৎপত্তি হয়।

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় লিঙ্গ-ভেদ (Differentiation of Sex) ছিল না। যৌন-সঙ্গমের দ্বারা প্রজনন-ক্রিয়ার তখনও উদ্ভব হয় নাই। তখন একলিঙ্গী জীবগণের জীবদ্দশায়

একমাত্র কার্য্য ছিল যথেচ্ছ-পরিমাণে উদর-পূর্ত্তি করিয়া নিজেকে সবল ও পরিপুষ্ট করা। পরে পরিণত অবস্থায় তাহাদের দেহের একাংশ মূল দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বা অপরের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন হইয়া কোষের সংমিশ্রণে নূতন জীবের উৎপত্তি হইত। এইরূপ অযৌন (asexual) উপায়েই তখন সৃষ্টি-ক্রিয়া চলিত। তখন সেই একলিঙ্গী জীবগণের মধ্যে আত্মপরতাই (egoism) একাধিপত্য করিত। পরে ক্রমে ক্রমে তাহাদের দেহের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ অপর অংশ হইতে পৃথক আকারে চিহ্নিত হইতে লাগিল,—ইহাই লিঙ্গ-ভেদের প্রথম সূচনা। তা'রপর ধীরে ধীরে ক্রম-বিকাশের ধারা বাহিয়া একলিঙ্গী জীবগণের দেহের সেই বিশিষ্ট অংশ দুইটি ভিন্ন আকৃতিতে পূর্ণ পরিণত হইয়া পুরুষ ও স্ত্রী এই দুই স্বতন্ত্র লিঙ্গে বিভক্ত হইয়া গেল। এইরূপে লিঙ্গ-ভেদের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অযৌন প্রজনন রহিত হইয়া যৌন-সঙ্গমের দ্বারা প্রজনন-ক্রিয়ার উদ্ভব হইল। এবং জন্ম-মৃত্যুর পথ বাহিয়া যে বিচিত্র সৃষ্টি-লীলা অনাদি কাল ধরিয়া নিখিল বিশ্বে লীলায়িত হইতেছে, সেই সৃষ্টির ধারা যাহাতে কোনোদিন প্রতিহত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রকৃতি পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন-সম্মিলনের মধ্যে এক উচ্ছল আনন্দের সঞ্চার করিয়া দিয়া এই দুই লিঙ্গকে চিরদিন ধরিয়া এক অদম্য আবেগে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। জীব-তত্ত্বে ইহাই যৌন-ক্ষুধার ধারাবাহিক ইতিহাস।

যৌন-প্রজননের প্রথম অবস্থায়ও ভিন্নলিঙ্গী জীবগণের মধ্যে একলিঙ্গী জীবের আত্মপরতা একান্ত প্রবল ছিল। এই বৈশিষ্ট্য নিম্নতর প্রাণীগণের মধ্যে আজ পর্য্যন্তও প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। উদাহরণ স্বরূপ মাকড়সার নাম উল্লেখ করা যায়। ইহাদের পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন-সঙ্গমে পূর্ণ-রতির (Venereal Orgasm) সময় পুরুষ-মাকড়সা যদি অতিশয় সতর্ক না থাকে, তবে স্ত্রী-মাকড়সা তাহাকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে—যাহাতে পুং-মাকড়সার গর্ভ-সঞ্চারক শক্তির একটুও অপচয় না হয়। পুরুষের প্রতি এই নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও সন্তানের প্রতি স্ত্রী-মাকড়সার একটা সহানুভূতি দেখিতে পাওয়া যায়, এমন কি ডিমগুলি ফুটিবার পূর্ব্বেও স্ত্রী-মাকড়সা সেগুলিকে আগলাইয়া থাকে। যৌন-মিলন-সঞ্জাত এই সহানুভূতিই (Sympathy) মাতৃ-স্নেহের প্রথম প্রকাশ এবং যৌন-ক্ষুধার প্রথম প্রস্ফুরণ।

ক্রম-বিকাশের উচ্চতর স্তরে এই সহানুভূতির ভাব যৌন-আনন্দের সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া পুরুষ ও স্ত্রীকে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত করে। প্রথমে এই অনুরাগ অতি ক্ষণ-স্থায়ী ছিল, তখন কেবলমাত্র যৌন-ক্ষুধা উদ্দীপ্ত হইলেই পুরুষ ও স্ত্রী পশুর ন্যায় পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইত এবং ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হইলেই সে আসক্তি অন্তর্ধান করিত। তখনও মানুষের অন্তরের ঘুমন্ত বুদ্ধি ও চিন্তা-বৃত্তি জাগ্রত হইয়া উঠে নাই। পরে জীবন-সংগ্রামের প্রয়োজনে এই সকল বৃত্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যৌন-জীবনে এক তুমুল পরিবর্ত্তন সুরু হইল। তখন যৌন-সঙ্গমের ক্ষণস্থায়ী দৈহিক আনন্দটুকুতেই মানুষ আর সম্পূর্ণ তৃপ্ত থাকিতে পারিল না,—সেই ক্ষণিক আনন্দকে অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির মধ্যে একটা স্থায়ী আনন্দের সন্ধান করিতে লাগিল। এইরূপে নিছক ইন্দ্রিয়-ক্ষুধা মানুষের ভাবুকতা ও বুদ্ধি-বৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ধীরে ধীরে সংযত ও পরিমার্জ্জিত হইতে লাগিল এবং মানুষের মনোজগতে তাহার অলক্ষ্য প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। ইহাই প্রেমের প্রথম উন্মেষ। (১)

প্রেমের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও স্ত্রীর যৌন-আসক্তি কেবলমাত্র সঙ্গমের সামান্য কালটুকুর মধ্যে আর আবদ্ধ রহিতে চাহিল না—তাহা দীর্ঘতর কালের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। তখন আত্মপরতার প্রভাব ক্রমে ক্রমে ক্ষীণতর হইয়া সহানুভূতিকে নিবিড়তর করিতে লাগিল। তখন পুরুষ কেবলমাত্র নিজের উদর-পূর্ত্তি করিয়া এবং ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না;—ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির প্রতিদান স্বরূপে নারীর এবং তাহাদের যৌন-মিলন-জাত

---

(১) "Reason, as soon as it had become active, did not delay to exert its influence also in the sexual sphere. Man soon discovered that the stimulus of sex, which in animals depended merely on a transient and for the most part periodic impulse, was in his own case capable of prolongation, and indeed of increase, by the force of imagination. This influence works more moderately, it is true, but with more persistence and more evenness the more the affair is withdrawn from the dominion of the senses, so that the satiety produced by the gratification of a purely animal passion is avoided."—Kant—"The Probable Beginning of Human History."

সন্তানের জন্যও আহার সংগ্রহ করিত, কাঠ-পাতা কুড়াইয়া আনিয়া তাহাদের আশ্রয়ের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিত এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে তাহাদের রক্ষা করিত। নারীও কেবলমাত্র সন্তানের জন্ম-দান করিয়াই নিশ্চেষ্ট থাকিত না,—তাহাকে আদরে বক্ষে ধরিয়া স্তন্য দিত, শিশুর আরামের জন্য পাতা বিছাইয়া শয্যা রচনা করিত এবং ঝড়, বৃষ্টি, হিমের সময় গাছের ছাল দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিত। ইহাই মানুষের পারিবারিক জীবনের বিকাশ এবং সমাজের ইহাই প্রথম সূচনা। সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে বিষম মতভেদ আছে। Lubbock, Bachofen, Bloch প্রভৃতি যৌন-তত্ত্ব-রথীগণের মতে মানুষ প্রথমে দল-বদ্ধ হইয়া বাস করিত। তখন বহু পুরুষ ও বহু নারী একত্র জীবন-যাপন করিত এবং তাহাদের মধ্যে অবাধ যোনি-সংশ্রব (Promiscuity) ছিল, অর্থাৎ সেই দল-ভুক্ত যে-কোনো পুরুষ ও যে-কোনো নারী যথেচ্ছ যৌন-সঙ্গম করিতে পারিত। তখন সেই দলের নারীগণ পুরুষগণের যৌথ-সম্পত্তি ছিল। তাঁহাদের মতে এই দলগত জীবন (clan) হইতেই সমাজের উদ্ভব। অপর পক্ষে Forel, Westermarck প্রভৃতি খ্যাতনামা মনীষীগণ উচ্চ-কণ্ঠে বলিয়াছেন—মানুষের মধ্যে কোনো কালেই অবাধ যোনি-সংশ্রব ছিল না। (২) পরিবার (family) অর্থাৎ পুরুষ, নারী ও তাহাদের যৌন-মিলনোদ্ভূত সন্তানের সমাবেশই সমাজের মূল এবং এবম্বিধ বহু পরিবারের সমষ্টিই সমাজ। (৩) উভয় পক্ষই প্রবল প্রমাণ খাড়া করিয়া তাঁহাদের মতের সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও এ সমস্যার কোনো স্থির মীমাংসা হয় নাই। পরিবার বা দল—যাহা হইতেই সমাজের উদ্ভব হউক, আদিম দিনের চরম আত্মপরতার প্রাবল্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়া যৌন-সহানুভূতির দ্বারা ধীরে ধীরে পরার্থপরতায় পরিণত হওয়াতেই যে সমাজের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই।

সমাজের অভিব্যক্তির সঙ্গে মানুষের সহানুভূতির ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে যে সহানুভূতি যৌন আনন্দের দ্বারা সঞ্জীবিত হইয়া কেবলমাত্র পুরুষ ও নারীর পরস্পরের মধ্যে এবং তাহাদের যৌন-মিলন-জাত সন্তানের প্রতি নিবদ্ধ ছিল, সমাজ প্রতিষ্ঠার পর তাহা আত্মীয় প্রতিবেশী ও ক্রমে ক্রমে অনাত্মীয় প্রতিবেশীর প্রতিও সঞ্চারিত হইল। এইরূপে সেই মৌলিক সহানুভূতিই পাত্রভেদে ভ্রাতৃ-স্নেহ, ভগ্নী-স্নেহ, বন্ধু-প্রীতি, প্রতিবেশী-প্রীতি প্রভৃতি নানা রূপে ও নানা মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইতে লাগিল।

তখনও স্বদেশ-প্রেম বলিয়া কোনো বৃত্তি মানুষের অন্তরে জাগে নাই, কারণ তখনও মানুষ ভবঘুরে ভাবেই জীবন কাটাইত, তাহার কোনো নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। আদিম দিনের মানুষের মনে স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি কোনো কোমল ভাব ছিল না। তাহাদের প্রকৃতি তখন একান্ত হিংস্র ছিল। এই হিংস্র প্রবৃত্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, মানুষ তখন কেবলমাত্র শত্রুকে হত্যা করিয়া বা ক্রীতদাস করিয়াও ক্ষান্ত হইত না,—বহুবিধ বীভৎস উপায়ে তাহাকে নিগ্রহ করিত, অশেষ যাতনা দিয়া তাহার প্রাণ হরণ করিত, এমন কি হত শত্রুর মাংস পর্য্যন্তও ভক্ষণ করিত। (৪) নর-মাংস-ভোজী মানব-জাতি এখনও পর্য্যন্ত মধ্য-আফ্রিকায় বর্ত্তমান আছে। তখন সেই হিংস্রতার যুগে বহির্শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য মানুষ ক্রমে ক্রমে এক স্থানে দল-বদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিল, এবং কোনো শত্রু আক্রমণ করিলে সকলে মিলিত হইয়া সমবেত শক্তির দ্বারা তাহার প্রতিরোধ করিত। এইরূপে মানুষের সাধারণ স্বার্থ সহানুভূতির সঙ্গে সংমিশ্রিত হইয়া সমাজের বন্ধনকে দৃঢ়তর করিতে লাগিল। ক্রমে যে স্থানে মানুষ দল-বদ্ধ হইয়া জীবন-যাপন করিত, সেই স্থানের উপরেও তাহাদের একটা সহানুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। এই সহানুভূতি মানুষের অধিকার-জ্ঞানের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া বাস-ভূমির প্রতি মানুষের আকর্ষণকে কঠিনতর করিল। তখন সেই বাস-

(২) "At no period of human existence has family life been replaced by clan life."—Westermarck —"History of Human Marriage."

(3) "Originally, human societies were composed of families, or rather associations of families. In primitive man these families play the fundamental role and constitute the nucleus of society."—Forel— "The Sexual Question."

(4) "Primitive men were so destitute of all humanitarian sentiment that they not only killed one another and practiced mutual slavery, but also mårtyred, tortured and even devoured one another."—Forel—"The Sexual Question."

ভূমিকে মানুষ নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে লাগিল এবং তাহার উপরে তাহার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মানুষ প্রাণ বিসর্জ্জনেও পশ্চাৎপদ হইত না।—ইহাই স্বদেশ-প্রেমের প্রথম উন্মেষ।

ক্রমে ক্রমে মানুষের অন্তরে বিবেক-বৃত্তির জাগরণের সঙ্গে যৌন-সহানুভূতি সূক্ষ্মতর ও গভীরতর হইয়া কর্ত্তব্য-জ্ঞানে বিকশিত হইয়া উঠিল। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সময়ে মানুষের অপর সকল উচ্চ বৃত্তির ন্যায় ইহা যৌন-মিলনাসক্ত পুরুষ ও নারীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তখন পুরুষ প্রথম অনুভব করিল যে, যে নারী তাহাকে এতটা আনন্দ, এতখানি তৃপ্তি দেয়, তাহার প্রতিদানে সে নারীকে তাহারও কিছু দেয় আছে। সে নারীকে ভরণ-পোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ করা তাহার কর্ত্তব্য,—ইচ্ছা না হইলেও, ভাল না লাগিলেও ইহা তাহাকে করিতে হইবে। নারীও অন্তরে অনুভব করিল যে, যে পুরুষ তাহাকে ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে, তাহার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আরামের প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহার উচিত। কর্ত্তব্য-জ্ঞানই খুব সম্ভব নারীর অন্তরে সতীত্ব-জ্ঞানকে প্রথম প্রবুদ্ধ করে। তখন নারী অনুভব করিল যে, যে পুরুষ তাহার সকল ভার বহন করিতেছে, তাহার দেহ মন সেই পুরুষেরই প্রাপ্য, অপরকে তাহা দিয়া সেই পুরুষের মনে পীড়া দেওয়া তাহার উচিত নয়। কর্ত্তব্য-পালনের আনন্দ এবং কর্ত্তব্য-অবহেলার গ্লানি মানুষের কর্ত্তব্য-জ্ঞানকে সুদৃঢ় করিল।

ক্রমে পুরুষ ও নারীর কর্ত্তব্য-জ্ঞান পরস্পরকে ছাপাইয়া তাহাদের যৌন-মিলন-প্রসূত সন্তানের প্রতি প্রবাহিত হইল। পূর্ব্বে নারীর মনে সন্তানের প্রতি যে আকর্ষণ ছিল, সে আকর্ষণের মধ্যে কোনো যুক্তি ছিল না, পশুর মাতৃস্নেহের ন্যায় তাহা একটা স্বতঃ-উদ্ভূত প্রবৃত্তি (Instinct) মাত্র ছিল। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বিকাশের পর পুরুষ ও নারী উভয়েই অনুভব করিল যে, যে ক্ষুদ্র অসহায় জীবটিকে কোন্ অদৃশ্য লোক হইতে তাহারা এই পৃথিবীতে ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহার সকল প্রয়োজনের ভার তাহাদের লইতে হইবে। এই অনুভূতি পিতৃ-স্নেহ ও মাতৃ-স্নেহকে নিবিড়তর করিয়া মানুষের পারিবারিক জীবনকে শান্ত ও সুন্দর করিয়া তুলিল। ক্রমে সমাজ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মানুষের এই কর্ত্তব্য-জ্ঞান পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীটুকুকে অতিক্রম করিয়া যৌন-অনুভূতির সূত্র ধরিয়া সমাজের অপর পুরুষ ও নারী এবং অপরের সন্তানের প্রতি সঞ্চারিত হইল। এইরূপে আদিম দিনের হিংস্র প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া মানুষের অন্তরে দয়া, মায়া, করুণা প্রভৃতি স্নিগ্ধ মানবীয় ভাবগুলি ক্রম-বিকশিত হইয়া উঠিল।

কর্ত্তব্য-জ্ঞানের চরম বিকাশ ত্যাগে। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে শিক্ষা দীক্ষা ও ভাবুকতার প্রভাবে মানুষের অন্তর্জীবন যতই সুদূর-প্রসারিত হইতে লাগিল, ততই তাহার ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র সত্তা সমষ্টিগত বৃহত্তর সত্তায় মগ্ন হইয়া যাইতে লাগিল। তখন নিজের চিন্তা ভুলিয়া পরের চিন্তাই মানুষের মনে জাগিতে লাগিল। এই ত্যাগ-প্রবৃত্তি জাগ্রত না হইলে পুরুষ কখনও প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া স্ত্রী-সন্তানের আহার উপার্জ্জন করিত না, স্ত্রী কখনও নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া স্বামীর সেবা করিত না, নিজেকে অনাহারী রাখিয়া স্বামী-সন্তানের মুখে আহার দিত না,—জাতির কল্যাণের জন্য মানুষ কখনও নিজেকে কাঙ্গাল করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিত না, দেশকে রক্ষা করিবার জন্য—জাতিকে স্বাধীন করিবার জন্য মানুষ কখনও হাসিমুখে কামানের মুখে ছুটিয়া যাইতে পারিত না। সৃষ্টির প্রথম যুগে যে আত্মপরতা মানুষের অন্তরে একান্ত প্রবল ছিল, এই ত্যাগ-প্রবৃত্তির যাদুদণ্ড-স্পর্শে তাহা ধীরে ধীরে বিদূরিত হইয়া তাহার স্থানে পরার্থপরতার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইহাই মানুষের চরম বিকাশ,—এই আত্ম-বিসর্জ্জনই যৌন-ক্ষুধার শ্রেষ্ঠ পরিণতি!

যে অন্ধ আকর্ষণ একদিন শুধু কয়টি ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের দৈহিক আনন্দের জন্য পুরুষ ও নারীকে এক উন্মাদ আবেগে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করিত, সেই চির-রহস্যময়ী শক্তিই কত সহস্র শতাব্দীর অবিচ্ছিন্ন বিবর্ত্তনে মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি নীতি, বিবেক ও ভাবুকতার পরশে সোণা হইয়া উঠিয়া মানব-হৃদয়কে আজ এক বিপুল ঐশ্বর্য্যে ভরিয়া তুলিয়াছে। আবার অন্তহীন কালের ভিতর দিয়া এই অবিশ্রান্ত ক্রম-বিকাশের পথ বাহিয়া শত-সহস্র শতাব্দী পরে যখন সুদূর ভবিষ্যতের সভ্যতর, মহত্তর, উদারতর নর-নারী আমাদের আজিকার এই সভ্য-উন্নত দিনকে আদিম দিনের মধ্যে গণনা করিবে, অতি দূর অতীতের যে পশুত্বটুকু মানুষের অন্তরে এখনও লুকাইয়া আছে, সে দিন তাহা নিঃশেষে

অন্তর্হিত হইয়া মানুষের সকল সুপ্ত মনুষ্যত্ব পরিপূর্ণ গৌরবে বিকশিত হইয়া উঠিবে। তখন প্রাচীন দিনের সকল অপূর্ণতা অঙ্কুরিত বীজের মত অতীতের অন্ধকারে মাটির নীচে চাপা পড়িয়া গিয়া শুধু যোগাইবে রস ও খাদ্য, আর তাহাই আহরণ করিয়া উপরে সবুজ পাতার মাঝখানে গন্ধ-বর্ণ-মধু-ভরা ফুলের মত ফুটিয়া থাকিবে জগৎ-জোড়া শান্তি, তৃপ্তি ও প্রীতির মাঝখানে—ভবিষ্যতের পূর্ণ মানব!

পাখীর গান

শ্রীমানকুমারী বসু

১

আজ পাখি! তোর গানের তানে
কাবেই যেন মনে আসে;
ধোর্‌তে গেলে যায় না ধরা,
লুকিয়ে পড়ে মেঘের পাশে।
তেমনি ধারা হাসি মুখে,
সে কি আছে তৃপ্ত বুকে,
সে কি চাহে চাঁদের পানে
ফাগুন সাঁঝে ফুল-বাতাসে,
যাব ধরা না ধরায় মিলে
স্বপন হেন মর্ম্মে ভাসে!

২

সে কি পাখি! তোর মত অই
চির পরিচিত সুরে,
ডাকে কারও, বনের মাঝে,
নীল আকাশে পরাণ পূরে
সে কি ডাকে গভীর রেতে,
ভোরের আলোর নেশায় মেতে,
সে কি ডাকে বাঁশীর রবে
বিজন বনে—অনেক দূরে!
সে কি ডাকে ফুলের বনে,
সে কি ডাকে নদীর স্বনে,
সে কি ডাকে শ্যাম শ্মশানে
চিতার পাশে ঘুরে ঘুরে,
দিগ দিগন্ত গ'লে পড়ে
পরাণ-গ'লা করুণ সুরে!

৩

সে কি পাখি! গাইছে আজও
তোর ঐ মধুর গানের মত,
তার হাসিতে তার বাঁশিতে
ফুটছে বনে কুসুম যত?
সে কি ফুলে ফুল মিশিয়ে,
মলয় সমীর চামর দিয়ে,
অগুরু চন্দন গন্ধে নিত্য করে পুণ্যব্রত?
তেম্‌নি গাঁথি মোহন মালা,
সাজিয়ে রাখে পূজার ডালা,
কভু রহে ধ্যান-মগ্ন, সর্ব্বত্যাগী যোগীর মত,
অরূপ স্বরূপ বিশ্বরূপ কি ধ্যেয় তারি অবিরত

৪

এক দিন সেই শুভ্র উষায়,
তপন তখন অরুণ রথে
তার সেই দেখা মনে পড়ে
তরুণ-আলোক-উজল পথে
অম্‌নি অশ্রু-সজল আঁখি,
উঠ্‌লি গেয়ে ভোরের পাখি,
হারানো এক পুরানো সুর
উঠ্‌ল বেজে মরমেতে;
হারিয়ে গেছে সে সব চিন্‌,
চলে গেছে অনেক দিন,
এখন কেন পাইনি পাখি,
সেই পুরানো পরাণ হ'তে,
আমি কি আর তেম্‌নি আছি—
রইচি বেঁচে কোনমতে!

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

[২২]

ফাল্গুন চৈত্র মাসে পশ্চিম প্রদেশে মাঝে মাঝে দুই তিন দিন ধরিয়া দিবাভাগে সমস্ত দিন প্রবল পশ্চিমা বাতাস বহে। তখন আকাশ ধূলি-পিঙ্গল, সূর্য্য অলস-নেত্র এবং বৃক্ষলতা বায়ু-বিক্ষুব্ধ হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতি ক্রোধোন্মত্ত উন্মুক্ত-জটা ধূর্জ্জটির মত এমন তাণ্ডব-লীলা আরম্ভ করে যে, মনে হয় না, সন্ধ্যা পুনর্ব্বার তাহার দিনান্তরম্য শান্ত-শ্রী লইয়া পৃথিবীর সেই প্রলয়-ধূসর বক্ষে উপস্থিত হইতে পারিবে। কিন্তু সমস্ত দিন তপ্ত নিশ্বাস ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া ঝটিকা অন্তর্হিত হওয়ার পর যখন দেখা যায় যে আকাশ সতারা, সলিল সুশীতল এবং পবন সুনির্ম্মল হইয়া উঠিল, তখন মনে হয় রোষোদ্দীপ্ত পিতার শাসন-নিপীড়নই চরম বস্তু নহে, তাহার পরও জননীর শীতল করস্পর্শ থাকিতে পারে। এমনই একটা প্রখর দিবসের মধ্যাহ্নে সুকুমারী সরমার হৃদয়ের মধ্যেও একটা উদ্দাম ঝটিকার সৃষ্টি করিল। দুঃখে, ক্ষোভে, লোভে, লজ্জায় তাহার সমস্ত চিত্তভূমি আলোড়িত করিয়া একটা উন্মত্ত ঝঞ্ঝা ফুঁসিয়া উঠিল!

যে কল্পনা মনের মধ্যে সংগোপনে বহন করিয়া সুকুমারী ভাগলপুরে উপস্থিত হইয়াছিল, রমাপদর সংসারে অর্থ-সঙ্কটের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া তাহাকে বাস্তবতায় পরিণত করিবার একটা উপায় সে খুঁজিয়া পাইল। প্রথমে সে তাহার স্বামীর নিকট মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিল। সুকুমারীর প্রস্তাব শুনিয়া নরেশের সহৃদয়তায় আঘাত লাগিল। ব্যস্ত হইয়া সে বলিল "না, না, সুকু, এমন কথা ওদের কখনো বোলো না! দেখেছ ত' পুত্র-গত-প্রাণ; ভারী কষ্ট পাবে।"

সুকুমারী বলিল, "পুত্র-গত-প্রাণই যদি হয় তা হলে ত' কষ্ট না পাওয়াই উচিত। কারণ এ কাজ করলে পুত্রেরই খুব বড় রকমের মঙ্গল করা হবে।"

নরেশ বলিল, "মঙ্গলের রূপ সকলের চক্ষে সমান নয়। মানুষের মন বড় বেশী রকম জটিল ব্যাপার; ভাল-মন্দর সমাধান সেখানে সব সময়ে অর্থ-সূত্রের হিসাবেই হয় না।"

ইহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীতে বাদ-প্রতিবাদ চলিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া সুকুমারী বলিল, "এ বিষয়ে তোমারই আপত্তি সকলের চেয়ে বেশী হবে বলে কি মনে হয়?"

নরেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "কথাটা সকলের কাছে না উঠলে এ কথার উত্তর কেমন করে দিই? তবে যদি কোনো ছেলে তোমার নিজের ছেলের স্থান অধিকার করে, সে আমারও মনে আমার নিজের ছেলের মত স্থান পাবে, এ কথায় সন্দেহ করো না! কিন্তু আমার একটা কথা মনে রেখো। কথাটা যদি একান্তই তোলো তা হলে সরমারই কাছে প্রথমে তুলো—আর যতদূর সম্ভব সাবধানে। যদি দেখ সে কষ্ট-বোধ করছে, তা হলে আর বেশী কষ্ট না দিয়ে সামলে নিয়ো। রমাপদর কাছে কথাটা কখনো প্রথমে তুলো না।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সুকুমারী বলিল, "কেন, মার চেয়ে বাপের দরদ বেশী বলে মনে কর না কি তুমি?"

এ তর্ক এমনভাবে উঠিলে অনর্থক কথা বাড়িয়া চলিবে সেই আশঙ্কায় নরেশ বলিল, "দরদের কথা ছেড়ে দাও। সন্তানের মঙ্গলের জন্য মা যতটা নিজেকে বঞ্চিত করতে পারে, বাপ ততটা পারে না তা' স্বীকার কর ত?"

এ কথায় প্রসন্ন হইয়া সুকুমারী বলিল, "হ্যাঁ, সে কথা স্বীকার করি।—তা হলে বলব ত?"

নরেশ বলিল, "সে তোমার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু যদি বল ত খুব সাবধানে।"

সুকুমারী ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "তুমি যখন তোমার ভায়রা-ভায়ের সঙ্গে কথা বলবে তখন খুব সাবধানে বোলো! আমার ত' আর ভায়রা-বোন নয়, আমি সহজভাবেই বলব।"

কিন্তু স্বামীর নিকট হইতে এই অনিচ্ছা-জাত অনুমতি কাড়িয়া লইবার পর যখন সরমার নিকট কথাটা উত্থাপিত করিবার সময় আসিল, তখন সুকুমারী দেখিল, যতটা সহজভাবে বলিবে বলিয়া দম্ভ করিয়াছিল, তত সহজে বলিতে পারিতেছে না। বলিতে গেলে অন্য কথা মুখ দিয়া বাহির হয়। দিনের বেলা মনে হয়, দিবালোকে যে-কথা বলিতে চক্ষে লজ্জা উপস্থিত হইতেছে, রাত্রির অন্ধকারে তাহা অনায়াসে বলিতে পারিবে; রাত্রিকালে মনে হয়, অন্ধকারের আশ্রয়ে চক্ষুলজ্জা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া সরমা অসম্মত হইবার সুবিধা পাইবে। এমনি করিয়া কয়েকদিন কাটিয়া যাওয়ার পর সুকুমারী কোনো রকমে কথাটা সরমার কাছে বলিয়া ফেলিল।

ধূলি এবং বায়ুর ভয়ে ঘরের প্রায় সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ ছিল। শুধু পূর্ব্বদিকের একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ অর্দ্ধোন্মুক্ত থাকায় ঘরটা সামান্য আলোকিত হইয়াছিল। শয্যার উপর নিজের বিছানায় শুইয়া ঘিণ্টু নিদ্রা যাইতেছিল; এবং সুকুমারী ও সরমা, দুই ভগ্নী, তাহার দুই পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতেছিল। হঠাৎ সুকুমারী ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা আছে সরো!"

সুকুমারীর কণ্ঠস্বরের গাঢ়তায় উৎসুক হইয়া সরমা বলিল, "কি কথা দিদি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুকুমারী বলিল, "তোর ছেলেকে আমাদের দিবি?"

কথা শুনিয়া কিন্তু সরমা হাসিয়া উঠিল; বলিল, "এই কথা? এ আর এমন কি ব্যাপার, নাও না! আর নিতে ভারী ত' বাকিই রেখেছ!"

সুকুমারী হাসিতে পারিল না; শুষ্ক ভাবে বলিল, "সে নেওয়া নয় রে—একেবারে নেওয়া।" তাহার পর বিমূঢ়ভাবে তাড়াতাড়ি বলিল, "একেবারে নেওয়া নয়, তোদের ছেলে তোদেরই থাকবে, শুধু—" কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া সুকুমারী থামিয়া গেল।

বিস্মিত স্বরে সরমা বলিল, "শুধু কি, বলো?"

এবার সুকুমারী সাহস সঞ্চয় করিয়া কথাটা খুলিয়া বলিল। সরমা প্রথমে মনে করিল সুকুমারী পরিহাস করিতেছে; কিন্তু অবশেষে যখন বুঝিল পরিহাস নয়—বলিতেছে সত্যই বলিতেছে, তখন তাহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে চিন্তার একটা নিবিড় কালিমা ঘেরিয়া আসিল।

অর্দ্ধান্ধকারে তাহা লক্ষ্য করিতে না পারিয়া অধীরভাবে সুকুমারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস্?"

সুপ্ত পুত্রের মুখের উপর উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নতমুখে ব্যগ্রস্বরে সরমা বলিল, "ঘিণ্টুকে পুষ্যিপুত্র নেওয়া! সে কি করে হবে দিদি? তিনি কখনই রাজী হবেন না!"

দৃঢ়কণ্ঠে সুকুমারী বলিল, "রাজী যদি না হন, তা হলে ছেলের তিনি মন্দই করবেন। এ একটা রাজার যোগ্য সম্পত্তি, তা জানিস! মাসে প্রায় বারো হাজার টাকা আয়—তিনটে হাইকোর্টের জজের সমান! এ সমস্ত তোর ছেলেরি হোত। এমন নয় যে পরে আমার কিছু হলে তার ভাগ কমে যাবে—সে পথে ত' ভগবান চিরদিনের জন্য কাঁটা দিয়েছেন। জ্ঞাতিরা ত সম্পত্তি পাবার লোভে হাঁ করে এঁর দোরে ধন্না দিচ্ছে। তা ছাড়া, আজ যদি আমি মরে যাই—পুরুষের মন ত, কাল কিছু করে বসলে তখন ছেলেটার ভোগে একটা কানা কড়িও আসবে না—অথচ ছেলেটার ওপর এমনই মায়া পড়ে গেছে যে, ও যদি অর্থাভাবে কষ্ট পায়, তা হলে আমি মরেও সুখ পাব না! তাই আমি চাচ্ছিলাম—সম্পত্তিটা একেবারে পাকাভাবে ওর করে দিই। তোরা যদি নিজেদের একটা কাল্পনিক দুঃখের ছলে ছেলেটাকে এতটা বঞ্চিত করতে চাস, তা হলে আমি আর কি বলব বল?"

এত কথার কোন উত্তর না দিয়া সরমা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া সুকুমারী পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, "তা ছাড়া, তোদের যা অবস্থা, তা' ত চোখে দেখতেই পাচ্ছি। এমন করে কি চিরদিন চলবে? সংসার ক্রমশঃ বাড়বে বই ত' কমবে না? চাকরীর বাজার যা হয়েছে, তা' ত সকলেই জানে। বলছিলি রমাপদর ব্যবসা করবার ইচ্ছে; তোরা যদি আমার এ কথায় রাজী হ'স, তা হলে আমি দশহাজার টাকা রমাপদকে দোবো ব্যবসা করবার জন্যে—ধার নয়, একেবারে দোব।"

একবার সুকুমারীর প্রতি চাহিয়া দেখিয়া সরমা চক্ষু নত করিল। অর্থলোভের তড়িৎ-স্পর্শ বোধ হয় নিমেষের জন্য তাহাকে অজ্ঞাতসারে উত্তেজিত করিয়াছিল।

সুকুমারী বলিতে লাগিল, "কথাটা অত সহজে উড়িয়ে দিসনে—বেশ করে ভেবে দেখিস্ সরো। ছেলের এ রকম মঙ্গলের জন্যে কত বাপমা একেবারে পরের ঘরে ছেলেকে সঁপে দেয়, আর তুই ত দিবি তার নিজের মাসীকে। তোদের ছেলে তোদেরই থাকবে, নামে শুধু আমাদের হবে। বড় হয়ে সে যখন শুনবে যে, এই অগাধ সম্পত্তি তার নিজের হতে পারত, শুধু তোদের খেয়ালের জন্যে হয় নি, তখন সে তোদের কি ভাববে বল দেখি ?" তাহার পর সহসা খপ্ করিয়া সরমার দক্ষিণ হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া কাতরস্বরে বলিতে লাগিল, "লক্ষ্মী সরো, আমার কথা রাখ—ছেলেটাকে আমাকে দে! ভগবান তোকে অনেক ছেলে মেয়ে দেবেন—কিন্তু আমার ত সে আশা নেই! আমার কি মনে হয় জানিস? আমার মনে হয়—যে-ছেলে আমি ডাক্তারের অস্ত্রের মুখে হারিয়েছি, তোর ঘিণ্টু আমার সেই ছেলে! আমরা না হয় তোর ছেলে নিয়ে তোদেরি কাছে বাস করব—তুই রাজী হ ভাই!" একরাশ অশ্রু সুকুমারীর চক্ষু হইতে ঝর্ঝর্ করিয়া সরমার হস্তের উপর ঝরিয়া পড়িল।

ঘিণ্টুর প্রতি সুকুমারীর এই দুরন্ত আকর্ষণ দেখিয়া সরমা প্রথমে একটা অনির্ণীত আতঙ্কে এবং বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া রহিল; তাহার পর সহসা তাহার চক্ষু হইতে টপ্‌টপ্ করিয়া বড় বড় অশ্রু-বিন্দু ঝরিতে লাগিল। সে যে তাহার কঠিন বিরূপ হৃদয়ের কোন্ দুর্ব্বল স্থান কিরূপে ভেদ করিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না! শুধু তাহাই নহে; অবশেষে সে প্রতিশ্রুত হইল রমাপদকে সম্মত করিবার জন্য চেষ্টা করিবে।

বৃহৎ জলের মাছ সঙ্কীর্ণ জলপাত্রে অবরুদ্ধ হইয়া যেমন অস্থির ভাবে নিরন্তর নড়িয়া বেড়ায়, ঠিক সেইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া এই দুরন্ত চিন্তা সরমার হৃদয়ের মধ্যে সর্ব্বক্ষণ আলোড়িত হইয়া ফিরিতে লাগিল। কখনো লোভ, কখনো ক্ষোভ, কখনো আসক্তি, কখনো বিরক্তি তাহাকে বিদ্ধ করিয়া করিয়া চঞ্চল করিয়া রাখিল। এত বড় দুশ্চিন্তার ভার একা বহন করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামীর ইচ্ছামূলে তাহাকে নামাইয়া ধরিবার জন্য সে অধীর হইয়া উঠিল; এবং রাত্রে আহারাদির পর শয়ন-কক্ষে উপস্থিত হইয়া তদ্বিষয়ে কাল-বিলম্ব করিল না।

শয্যার উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রমাপদ একখানা বই পড়িতেছিল, গভীর মনোযোগের সহিত সরমার কথা শুনিয়া সে ধীরে ধীরে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল, "কখনো না! ভাল করে বলে দিয়ো, কিছুতে না! দশহাজার কেন, দশলাখ টাকা দিলেও নয়। ওঃ এখন দেখছি এত বড় একটা দুরভিসন্ধি নিয়ে এঁরা ভাগলপুরে আসা-যাওয়া করছেন!"

শুনিয়া প্রথমে সরমার বুকের ভিতরটা হাল্কা হইয়া গেল—সে মনে মনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল! লোভ এবং করুণা তাহার দুই হস্ত ধরিয়া যে গভীর মনস্তাপের অর্দ্ধপথে তাহাকে লইয়া গিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু এই নিশ্চিন্ততাই সহানুভূতির পথ দিয়া তাহাকে সুকুমারীর পক্ষে লইয়া গেল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "না, না, দুরভিসন্ধি কেন বলছ? এর দ্বারা তিনি ত কারো মন্দ করতে চাচ্ছেন না; ভালই করতে চাচ্ছেন! এ দুরভিসন্ধি কেন হবে?"

চাপা গলায় রমাপদ গর্জ্জিয়া উঠিল, "দুরভিসন্ধি আবার কাকে বলে? টাকার লোভ দেখিয়ে পরের ছেলেকে কেড়ে নেবার মতলব খুব সাধু সঙ্কল্প বল না কি তুমি?"

বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ স্বরে সরমা বলিল, "একে তুমি কেড়ে নেওয়া বল? হাত চেপে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে ভিক্ষা চাওয়াকে কেড়ে নেওয়া বল?"

উদ্ধত কণ্ঠে রমাপদ বলিল, "বলি! ভিক্ষার ছল করে পৃথিবীতে কত বড় বড় ডাকাতি হয়ে গেছে তা তুমি জান? রাবণও ত' সীতার কাছে ভিক্ষা চাইতে গিয়েছিল—ভিক্ষা দিতে গিয়ে সীতার খুব মঙ্গল হয়েছিল কি?"

এ কথার কোনো উত্তর সহসা খুঁজিয়া না পাইয়া সরমা বলিল, "চেঁচিয়ো না! এখনো হয় ত' তাঁরা জেগে আছেন। এ সব কথা শুনতে পেলে এই রাত্রেই তোমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন!"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদর ক্রোধোদ্দীপ্ত মুখে ব্যঙ্গের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল; অপেক্ষাকৃত নিম্ন কণ্ঠে বলিল, "ঠিক উল্টো! এসব কথা শুনলে একদিনেই বাধার আধখানা কেটে গিয়েছে দেখে বাকি আধখানা কাটাবার আশায় দশদিন অপেক্ষা করবেন। অধিকার করতে যারা চায়, চক্ষুলজ্জা করলে তাদের চলে না!"

সরমার দুই চক্ষের মধ্যে দুইটি অগ্নিকণা ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল; একমুহূর্ত্ত রমাপদর প্রতি প্রজ্জ্বলিত নেত্রে চাহিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিল, "আধখানা বাধা কে? আমি? আধখানা বাধা যদি সত্যসত্যই কেটে গিয়ে থাকে, তা হলে বাকি আধখানা কেটে গেলেই ছেলের পক্ষে মঙ্গল তা তুমি জেনো! মার মনের সব কথা তুমি যদি জানতে, তা হলে কখনই এ কথা বলতে পারতে না!"

সরমার এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের আশ্রয়ে রমাপদ নিজের উচ্ছ্বসিত হৃদয়কে কতকটা শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "কলকাতার কোনো বড়লোক যদি তোমার হাতে দশহাজার টাকা গুঁজে দিয়ে আমাকে দুধ-ঘি খাওয়াবার জন্যে গলায় সোনার শিকল বেঁধে নিয়ে যেতে চায়, তুমি কি সেটা আমার আর তোমার পক্ষে খুব মঙ্গলজনক বলে মনে করবে? সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে—এমন কি দামী পোষাক-পরিচ্ছদ পরে ঘি-দুধ খাওয়ারো! বাপের মনের সব কথা তুমি যদি জানতে, তাহলে তুমিও আমার দুঃখ বুঝতে সরমা! ঘিণ্টুকে যথোচিত ভাবে মানুষ করবার ক্ষমতা আমার যদি থাকৃত—আর ঘিণ্টুর দাম বাবত দশহাজার টাকা দেবার কথা যদি না উঠ্‌ত, তাহলে বোধ হয় আমি এত বিচলিত হতাম না!" তাহার পর ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কতকটা নিজ মনে বলিতে লাগিল, "নাঃ!—এ অবস্থা যেমন করে হ'ক বদলাতেই হবে! তেমন বেশী-কিছু না হ'লেও, অন্ততঃ যাতে ছেলেকে বিলিয়ে দেবার প্রলোভন না হয়, এমন অবস্থা করতেই হবে! তা যদি না পারি, তা হলে দেখছি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে সাধারণ কর্ত্তব্য পালন করা—তা-ও আমার হবে না!"

অতঃপর সরমা আর কোনো কথা বলিল না—এক পসলা অশ্রু-বর্ষণের দ্বারা সে সেদিনকার মত পালা সাঙ্গ করিল।

পরদিন প্রভাতে অনতি-বিলম্বে সরমার মুখে সুকুমারী এবং সুকুমারীর ভাবে নরেশচন্দ্র রমাপদর অসম্মতির কথা অবগত হইল। নৈরাশ্যে, দুঃখে, অভিমানে এবং কতকটা নিষ্ফলতার অপমানে সুকুমারী সমস্ত দিন শ্রাবণ মাসের আকাশের মত বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে স্তব্ধ হইয়া কাটাইল। কাহারো সহিত সে ভাল করিয়া কথা কহিল না, ভাল করিয়া আহার করিল না, এমন কি যে ঘিণ্টুকে লইয়া সে সমস্ত দিন নিরন্তর ব্যস্ত থাকিত, তাহার প্রতি একবার চাহিয়া পর্য্যন্ত দেখিল না। ব্যথিত অপ্রতিভ সরমা সুকুমারীর পিছনে পিছনে ফিরিতে লাগিল—কিন্তু তাহার দুরধিগম্য মূর্ত্তি দেখিয়া আর বেশী কিছু করিতে সাহস করিল না।

দূর হইতে নরেশচন্দ্র গভীর সহানুভূতির সহিত বিভিন্ন ব্যথায় ব্যথিত এই দুইটি প্রাণীর দুরবস্থা দেখিতেছিল। ঔষধ প্রয়োগ করিতে গিয়া পাছে রোগের প্রকোপ বাড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সে আপনাকে দূরে রাখিয়াছিল। কিন্তু অপরাহ্নে যখন সরমা চা লইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন সে প্রবীণ চিকিৎসকের মত দুইচারি বিন্দু ঔষধ প্রয়োগ করা সমীচীন বোধ করিল।

চায়ের পেয়ালা হস্তে লইয়া নরেশ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিল, "বড় বিপদে পড়ে গেছ সরমা?"

সরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, নরেশ তাহার দিকে চাহিয়া কুঞ্চিত নেত্রে মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছে। যে কথা নরেশ বলিতে চাহিতেছিল, তাহা সে নিঃসংশয়ে বুঝিল; কিন্তু উত্তরে কোনো কথা বলিতে পারিল না। শুধু নিমেষের জন্য বিষণ্ণ ওষ্ঠাধরে মেঘ-মলিন বর্ষাদিনের নিষ্প্রভ সূর্য্যকিরণের মত বিষাদের ম্লান হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

স্নিগ্ধস্বরে নরেশ বলিল, "এমন ত কিছুই দুঃখ অথবা লজ্জার কারণ হয়নি ভাই! যে ঘটনাটি তোমাদের তিনজনের মধ্যে ঘটেছে, তার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে ঘিণ্টুর প্রতি তোমার দিদির আকর্ষণ, তোমার দিদির প্রতি তোমার ভালবাসা, আর নিজের প্রতি রমাপদর কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা। যদি কারো আচরণ অসঙ্গত হয়ে থাকে ত সে তোমার দিদির। কিন্তু তার মনের মধ্যে কত-বড় একটা ক্ষোভ বাস করছে সেটা মনে করে, যে লোভটুকু সে প্রকাশ করেছে, তা তোমরা মার্জ্জনা কোরো!"

সরমা তাহার আনমিত মুখ নরেশের প্রতি উত্থিত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মার্জ্জনা জামাইবাবু! দিদির কষ্ট দেখে দুঃখে লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে! মনে হচ্ছে এর চেয়ে ঘিণ্টু যদি " ভাবাধিক্যে তাহার বাক্‌রোধ হইল।

স্নেহভরে সরমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া একটু নাড়িয়া দিয়া নরেশ বলিল, "মনে হবার একমাত্র কারণ—মনের মধ্যে করুণা যতখানি আছে, বিবেচনা তার অর্দ্ধেকও

নেই! তা' যদি থাক্‌ত, তা হ'লে তোমার দিদির অন্যায় আব্দারটি রমাপদর কাছে বহন করে তাকে বিপদে না ফেলে, নিজেই সে কথার শেষ করতে। করুণার কারবার কোরো, কিন্তু নিজেকে একেবারে দেউলে করে দিয়ে নয়।"

এই করুণার উল্লেখে সরমার হৃদয়ের নিভৃত-তম প্রদেশ হইয়া অশ্রু-বন্যা নামিয়া আসিল। করুণা! কই, সে ত করুণার কোনো কার্য্য করে নাই! শুধু যে তাহার স্বামীকে সম্মত করিতে পারে নাই তাহা নহে, স্বামীর অসম্মতিতে সে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল! তবে করুণা কোথায়? গভীর দুঃখে এবং সহানুভূতিতে তাহার বিগলিত চিত্ত সুকুমারীর প্রতি আকৃষ্ট হইল; এবং তাহার উপস্থিত ফল-স্বরূপ নিঃশব্দে দুই চক্ষু দিয়া টপ্‌ টপ্‌ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সরমার কান্না দেখিয়া নরেশ হাসিতে লাগিল; বলিল, "বৃষ্টির জলে আকাশ পরিষ্কার হয়। আশা করি, এবার চোখের জলে তেমনি তোমার মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। বহুক্ষণ থেকে তোমার মেঘাচ্ছন্ন মুখ দেখে মনে মনে ভাবছিলাম, ডেকে দুটো বচন-টচন দিই—কিন্তু সাহসে ঠিক কুলিয়ে উঠছিল না।"

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া সরমা বলিল, "আমাকে কিছু বলতে হবে না জামাইবাবু! দিদিকে আপনি একটু বুঝিয়ে দিন।"

মাথা নাড়িয়া নরেশ বলিল, "তাতে কোনো লাভ হবে না ভাই! বাড়ীর ডাক্তারের ওষুধে রোগ সারে না—তা সে যত ভাল ওষুধই হোক্‌। সমস্ত জীবন তোমার দিদিকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে এইটুকু বুঝেছি যে, তিনি যত সহজে আমাকে বুঝিয়ে দেন, তার ঢের সহজে আমি তাঁকে উল্টো বোঝাই!"

নরেশের এই প্রহেলিকাময় কাতরোক্তি শুনিয়া এত দুঃখেও সরমা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "বলা যায় না জামাই বাবু, আপনিই হয় ত উল্টো বোঝেন!"

সরমার মুখে পুলকের মিষ্ট হাস্য দেখিয়া খুসী হইয়া নরেশ সরমার মন্তব্যের কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করিয়া বলিল, "আকাশের সঙ্গে মানুষের মনের আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য আছে সুরমা! কিছুক্ষণ আগে মেঘরূপ বিষাদে তুমি বিষণ্ণ হয়েছিলে, তারপর বৃষ্টিরূপ চোখের জলে সেটা কেটে গিয়ে এখন রৌদ্ররূপ হাসি দেখা দিয়েছে!"

নরেশের সভঙ্গী পরিহাস বচনে পুলকিত হইয়া সরমা আপাততঃ তাহার দুঃখ বিস্মৃত হইয়া হাসিতে লাগিল; বলিল, "আর কিছু-রূপ কিছু মনে পড়ল না? ধন্য জামাই-বাবু, এতরকমও আপনি জানেন!"

গম্ভীরমুখে নরেশ বলিল, "তবু ত এই রূপক-বিদ্যে আমি যাঁর কাছে শিখেছি তাঁর কথা শোন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন, জ্ঞান-রূপ বৃক্ষের সত্য-রূপ ফলের কাঠিন্য-রূপ খোসা ভক্তি-রূপ চঞ্চুর দ্বারা ছিন্ন করে আনন্দ-রূপ সার উপভোগ কর!"

সরমা সকৌতুকে হাসিতে লাগিল। পূর্ব্বদিন হইতে যে তীব্র মানসিক উত্তেজনার মধ্যে কষ্ট পাইতেছিল, তাহা হইতে সহসা এইরূপে মুক্তি পাইয়া আনন্দ তাহার নিকট অতি সহজে ধরা দিতেছিল।

নরেশ বলিল, "এ কথা কে বলেছিল জানো?"

"কে?"

"একজন পক্ষী-রূপ কথক।"

শুনিয়া সরমা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, "জ্ঞান-রূপ চঞ্চু বলে না কি? দোহাই জামাইবাবু, এর পর আরো কিছু যদি আপনার জানা থাকে—দয়া করে বলবেন না। আর হাসতে ভাল লাগছে না!"

নরেশের কিন্তু সরমার এই অসংহত আনন্দ বড় ভাল লাগিতেছিল। অশ্রু-সিক্ত মুখের উচ্ছলিত হাস্যচ্ছটা দেখিয়া তাহার মনে হইতেছিল, জল-ভিজা বনানী যেন মেঘান্তরিত সূর্য্য-কিরণে স্নান করিতেছে! তাহার সদয় করুণ চিত্ত তাহার কাণে-কাণে বলিতেছিল, 'আহা হাসুক, হাসুক! অকারণ বেচারা ভারী কষ্ট পাচ্ছিল! মনটা একটু হাল্কা হয়ে যাক!'

(ক্রমশঃ)

কথাওসুর—শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন **স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী**

পিলু বারোঁয়া—একতালা

কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জ বনে;
হৃদি মোর উঠ্‌ল কাঁপি চরণের সেই রণণে !
কোয়েলা ডাক্‌ল আবার, যমুনায় লাগল জোয়ার;
কে তুমি আনিলে জল ভরি মোর দুই নয়নে ?
আজি মোর শূন্য ডালা, কি দিয়ে গাঁথব মালা;
কেন এই নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে !
হয় তুমি থামাও বাঁশী, নয় আমায় লওহে আসি—
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারিনে !

১ ২´ ৩ ০
[জ্ঞরা সন্‌া]
।। { ন্‌া । ন্‌া ন্‌া -া । সা ন্‌সা রজ্ঞা । রা জ্ঞরা জ্ঞা । সা -া সা ।
কে আ বা র্‌ বা জা য় বাঁ শী- - - এ

১ ২ ৩
রা সরা গমা । গা -া মগা ০। রা সা - । ।। }
ভা ঙা- - কু - ঞ্জ- ব নে -

২´ ৩
১ [গমা পধা পা মা গপা মগা] ০ ১
{ সা । গা গা -া । গা মা মা । মা মাঃ গঃ । মগা । সা । রা সরা
হৃ দি মো র্‌ উ ঠ্‌ ল্‌ কাঁ পি - - চ র ণে-

২´ ৩ ০
গমা | গা -া মগা | রা সা -া | া া } ॥
র্ সে ই র- ণ গে -

৩
১ ২´ [মপনা ধা পা -া] ০ ১
{ সা | রা মা -া | মা পা পা | পা পমা পা | -া া মা | মা
কো য়ে লা - ডা ক্ ল আ বা- র্ য মু
আ জি মো র্ শূ - ণ্য ডা লা- - কি দি
হয় তু মি - পা মা ও বাঁ শী - নয় আ

২´ ৩
[মমা পধা পা মা গপা মগা] ০ ১
পা -া | মা ধা পা | মা মাঃ গঃ রগা সা } } জ্ঞা | জ্ঞ
না য়্ লা গ্ ল জো য়া - - র্ কে তু
য়ে - গা থ্ ব মা লা - - - কে ন
মা য় ল ও ছে আ সি - - - ঘ রে

২´ ৩ [মজ্ঞা রসা -া] ১ [সরপা মপা মগা]
জ্ঞা -া | রা রা জ্ঞা | রা জ্ঞরা জ্ঞা | সা -া সা | রা সরা গমা | গা -া
মি - আ নি - লে জ- - ল্ - ভ রি মো- -র্ দুই -
এ ই নি ঠু র খে লা- - - থে লি লে- - আ মা
তে - প র - বা সী- - - থা কি তে- - আ য়

মগা | রা সা -া | া া } ॥
ন - য় নে -
য় স নে -
পা- রি নে -

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৫৮

বৈকালে গণেন বাবুকে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম। অনেক কথাই হইল,—দেশ, বর্ত্তমান যুগ, আশার আলোক (প্রাণের প্রকাশের দিক হইতে) বাঙ্গালীর জটিল ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু এখনো এলোমেলো; ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেষ গণেন বাবু বলিলেন—"মানুষ থাকলেই সব আপনি গড়ে' উঠবে—উঠতে বাধ্য। মানুষের ভেতর দিয়েই মনুষ্যত্ব বলুন—মানবতা বলুন, সময়ে আপনি দেখা দেয়,—সব তার মধ্যেই আছে। শিক্ষা কি অনুশীলন তাকে কেবল এগিয়ে দেয়—শ্রী দেয়। আত্মার মধ্যে এমন একটা বিশ্বব্যাপী আত্মীয়তা আছে যা অজান্তেও সম-বেদনাশীল। সেখানে দেশ জাতি বা চেনা অচেনা বিচার নেই। দুঃখে কষ্টেই তার পরিচয়টা ভালো মেলে। গত তিন বৎসরে তার প্রত্যক্ষ পরিচয় আমি অনেকবার পেয়েছি।"

"একটা বলুন না শুনি।"

"শুনবেন?" বলিয়া গণেন বাবু মিনিটখানেক অন্যমনস্ক থাকিবার পর বলিলেন—"একবার পৌষের শেষে আলমোড়া চলেছি—যদি উপকার পাই। শীতবস্ত্রের মধ্যে একটি ফ্লানাল্ সার্ট, আর একখানি পুরাতন র‍্যাপার। কন্‌কনে ঠাণ্ডা—আমি তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। ফি ইষ্টেসনেই লোক নাবছে উঠছে,—অধিকাংশ দোর-জান্‌লা খোলাই থাকে—গাড়ি ছাড়লেই হু হু করে' হাওয়া ঢোকে। রাত ১১টার মধ্যেই আমার হাত পা অসাড় হয়ে এল',—হাত পায়ের কাজ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল',—উঠে দোর-জান্‌লা বন্ধ করতে পারি না। হতাশ হয়ে ভাবলুম—রাত একটার মধ্যে নিশ্চয়ই heartএর action (হৃদ্‌যন্ত্রের কাজ) বন্ধ হয়ে যাবে।···

"একখানা ছেঁড়া কম্বল পেলে তখন যেন রাজত্ব পাই! কোথায় পাব!···

"আমার সামনেই একটি পাহাড়ী যুবক বসে ছিল,—দুস্থতির ময়লা মের্জাই, পাজামা আর টুপি পরা। পায়ে জুতার পরিবর্ত্তে এক-পা ধুলো, গায়ে একখানি মোটা কম্বল—যার ধূসর রংয়ের ওপরও ময়লার প্রলেপ সুস্পষ্ট। এই সবগুলি একত্র হয়ে এমন একটা দুঃসহ দুর্গন্ধ ছাড়ছিল যা আমাকে অতিষ্ঠ করে রেখেছিল,—শক্তি থাকলে আর স্থান পেলে আমি অন্যত্র সরে যেতুম।—

"রাত বারোটার পর আমার হৃদ্‌কম্প সুরু হল',···ঠিক্ বুঝলুম · এই-টি বেড়ে, সহসা সব থেমে যাবে। বুকে হাত দুখানা চেপে রাখবার চেষ্টা করছি·· পারছি না!···

"যুবকটি বোধ হয় আমার অবস্থা লক্ষ্য করছিল;··· বেঞ্চির ওপর-নীচে দেখলে·· যদি আমার আর কিছু আসবাব থাকে। তারপর তাড়াতাড়ি নিজের গায়ের সেই কম্বলখানা খুলে বলা নেই কওয়া নেই আমার গায়ে বেশ করে জড়িয়ে দিলে। অন্য সময় হলে সেই ছোটলোকের এই ইতর ব্যবহারটা কি ভাবে নেওয়া হত' তা বলাই অনাবশ্যক। আমি কেবল মাত্র কোন' প্রকারে বললুম···'তোমাকে ঠাণ্ডা লাগবে!'···

"সে মৃদু হেসে বললে···'আমি পাহাড়ী চাষী-মজুর লোক···ঠাণ্ডা আমার সওয়া আছে।'···

"আগের ইষ্টেসনে গাড়ি থামতেই, খুব গরম এক-ভাঁড় চা এনে আমাকে খাওয়ালে, আর কম্বলখানা টেনে আমার নাকমুখ ঢেকে দিলে। বললে···'কিছুক্ষণ ঢাকা থাক্।'···

"না হল' তায় কষ্ট,·· না পেলুম কোন গন্ধ,···আরামই বোধ করলুম! আসন্ন মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচলুম। কী প্রতিশোধ!··

"আমি সেই ঢাকা অবস্থাতেই বেশ আরামে ছিলুম! সে যে কখন অন্য ইষ্টেসনে নেবে চলে গেছে···জানতে পারিনি,···সেও জানতে দেয়নি!"···

গণেন বাবু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চুপ করায় চেয়ে দেখি···কোঁচার-কাপড়ে চোখ মুছচেন।

এখন গণেন বাবুর চোখে জল পড়ে।

বললেন···"মানুষের চেয়ে বড় কিছু নেই।"

এতক্ষণ এত' কথা হইল···বাদ পড়িল কেবল পারিবারিক প্রসঙ্গ। না গণেন বাবু সে বিষয় উত্থাপন করিলেন,···না আমার সাহসে কুলাইল! সেটা ঠিক এড়ানই হইল!

দেখি—বম্পাস্ টাউনে ঢুকিয়া পড়িয়াছি। মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিল,···বিকালটা না আবার সকাল হইয়া দাঁড়ায়। কি জানি কখন্ কোন্ এক 'সদন' হইতে বিমলির-মা বাহির হইয়া পড়িবে! প্রত্যেক ভবন, সদন বা নিকেতন আমাকে সচকিত করিয়া তুলিতে লাগিল,···যে হেতু কোনো সৌধই "টিপিটির" অযোগ্য নয়! অস্বাচ্ছন্দ্য আসিয়া গেল।

বলিলাম,—"এইবার ফেরা যাক্,—আপনার অতিরিক্ত হয়ে যাবে।"

"এখন আমি বেশ সেরে উঠেছি—শরীরে বলও পেয়েছি, একটুও কষ্ট হচ্ছে না তো। তবে—ফিরতেও ত' এতটাই, ফেরাই ভালো। আপনার পক্ষেও বেশি হচ্ছে।"

"সে ভয় পাবেন না,—ঘোরাতেই আমার স্থিতি,—উটি বন্ধ হলেই পতন ;—গ্রহের সামিল কিনা! তাঁরা গতি নিয়ে আছেন—দুর্গতিটা নেবারও ত' কেউ চাই। এই দেখুননা—তাঁরা শূন্যে ঘোরেন—পাশ-কাটাবার যথেষ্ট জায়গা পান, আমাকে মাটির ওপর ভিড় ঠেলে ঘুরতে হয়, জুতোও ছেঁড়ে কম্ নয়—পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, তাঁদের সঙ্গে এই-যা প্রভেদ।"

গণেন বাবুকে আজ সশব্দে হাসিতে শুনিলাম। বলিলেন—"জীবনটাকে গায়ে মাখেন নি দেখছি—বেশ উড়িয়ে দিয়ে চলেছেন!"

"তা কি হয় গণেনবাবু। যা মাখা হয়েছে তা মুছতেই কয়েক জন্ম নেবে। যিনি যখন দয়া করে ঘাড়ে এসে পড়েন—তাঁকে চিনতে পারাই যথেষ্ট। তাহলেই তাঁর রংটা কামড়ে ধরতে পারেনা—ফিকে হয়ে যায়, দু'এক ধোপেই সাফ্। সেই টুকুই যথালাভ। এড়াতে কি পারা যায়, তার যে ওই পেসা!"

গণেনবাবু একটু নীরব থাকিবার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "মনে হচ্ছে তিন বচরে রোগ আর দুঃখ কষ্টটা আমাকে কত সত্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিলে—কত' অজানারে আপন করে' পাওয়ালে, যা তিন জন্মের সুখৈশ্বর্য্যের মধ্যে মিলত'না! কিন্তু তাতে হ'ল কি! যেখানে ছেড়েছিলুম—আবার তো সেইখান থেকেই সুরু করতে হবে! এক পা'ও তো এগুলুম না!"

মুখে বিষণ্ণতার ছায়া লইয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক হইতে দেখিয়া বলিলাম—"সে কি গণেনবাবু, মানুষের বাইরের এগুনোটা তো মোটারের মোসন্ আর মূল্যের মাপ্ ধরে,—সেটা গড়ের মাঠ মুখো! তার সত্যিকার এগুনোর স্থান ভেতরে। কে বললে—আপনি এগোন নি! হ্যাঁ—কাজ চাই বই কি,—পুরুষের পৌরুষই কাজে। যে পাহাড়ী চাষী যুবকটির কথা বললেন—আপনার কষ্ট দেখে তার হৃদয় কাতর হয়ে উঠেছিল সে মানুষ বলে—সমবেদনায়, আত্মার টানে। কিন্তু কে বলতে পারে,···তার অজ্ঞাতে তার কর্ম্মশক্তি তাকে কম্বলখানি ত্যাগ করবার সাহস যোগায় নি! অন্যান্য প্রবৃত্তির পেছনে তার অলক্ষ্যে তার শ্রম-নির্ভরতা থাকা অসম্ভব কি!"

"দেখুন—আমি যেন কেমন্ হয়ে গেছি,—অমন করে ভাবতে পারিনা! সুস্থ সমর্থ বোধ করলে—মানুষের কর্ম্ম-কামনা, কার্য্য-চাঞ্চল্য বোধ হয় আপনিই আসে। আমি যে বেশ সেরে উঠেছি—এটাও তার একটা প্রমাণ। এতদিন আত্মীয় স্বজন কি বন্ধুবান্ধব কাকেও একখানা পত্র লিখতেও ইচ্ছা হ'তনা। সেদিন কিন্তু আপনা-আপনিই একটি সহপাঠী বন্ধুকে পত্র লেখবার চাঞ্চল্য এল,'—না লিখে থাকতে পারলুম না,—এতদিন না লিখে যেন অন্যায় করেছি! সুধাংশু এখন এটর্ণী। এই দেখুননা,—সকলেই ঠিক্ করেছে—আমি বেঁচে নেই! সত্বর যাবার জন্যে জেদ্ করেছে। বাড়ীতে তার এখন আর কেউ নেই,—স্ত্রী পুত্রের শরীর ভাল না থাকায়—শ্বশুরের কাছে হাজারিবাগে পাঠিয়ে দিয়েছে; লিখেছে—

"সত্যি বলছি গণেন—তোমার পত্রখানি যেন কৃপার মত পেলুম। বড়ই ফাঁকা বোধ হচ্ছে, তোমাকে পেলে বড়ই সুখী হব। কেবল কাজ আর কাজ,—জীবনটা বড়ই একঘেয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সময় তোমাকে পেলে বেঁচে যাই। তোমার তরে না হয়, অন্ততঃ আমার তরে এসো।

স্রোতের মুখে

চিত্রাধিকারী—শ্রীসুরীন্দ্রনারায়ণ নিয়োগী
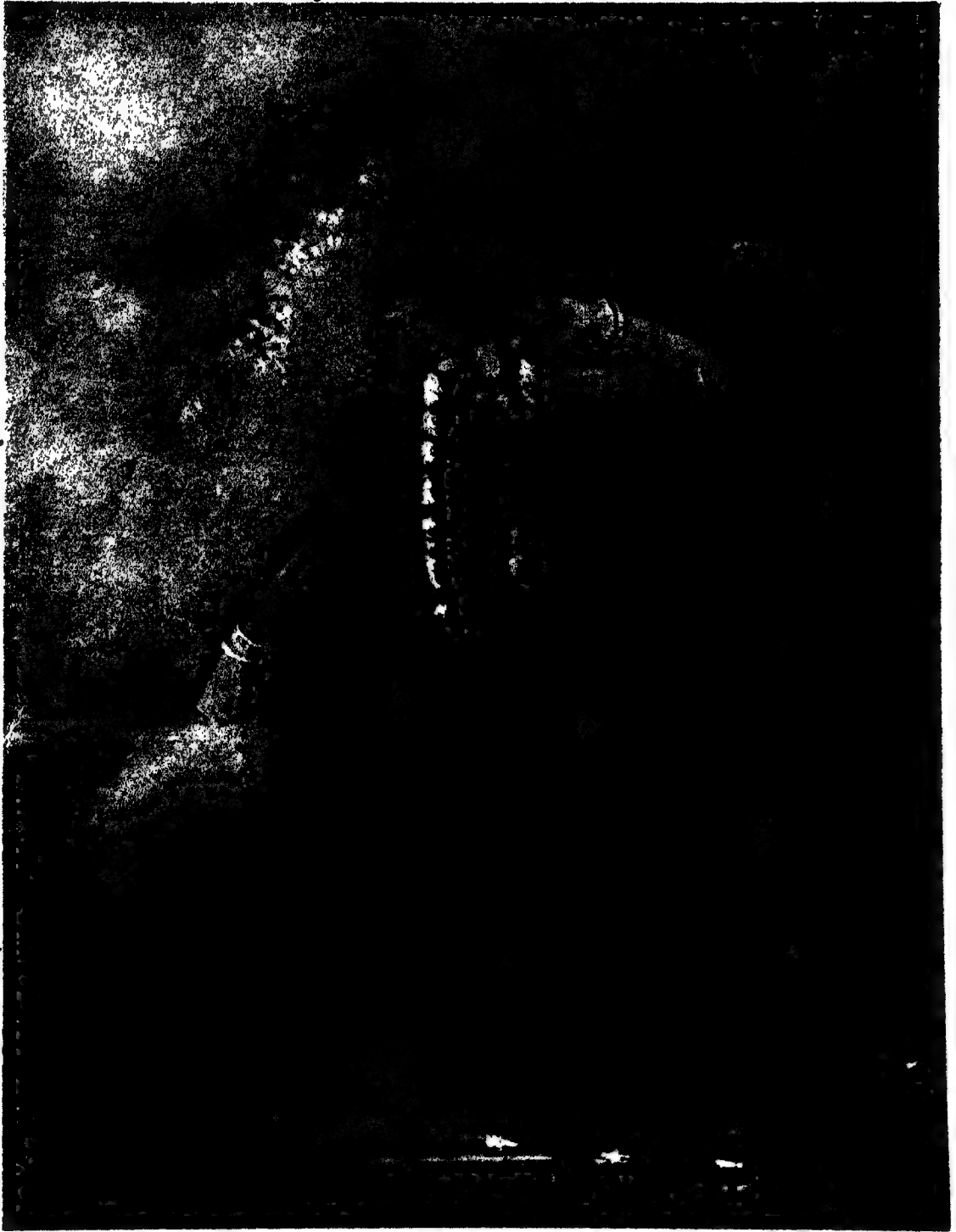
বঞ্চিত করনা ভাই—সত্বর চলে আসা চাই। হাতে কাজও বিস্তর—আমি তোমার সাহায্য চাই।। আমি দিন গুণবো। আশা করি—আমার কথাগুলো পূর্ব্বের মত' অসঙ্কোচে নিতে পারবে।"

পাঠান্তে গণেন বাবু আমার দিকে চাহিলেন। আমি তখন মস্ত একটা তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম—যে বিষয়টার উত্থাপন পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে সমস্যার মত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আপনার মধ্যেই সহজ মুক্তি লাভ করিয়াছে!

গণেন বাবুই কথা কহিলেন—"ডাক্তার বাবু যদি"—

বলিলাম—'আমিই তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে তাঁর মতামত জানব'খন,—ও কাজ আমার রইল'। আপনি নিজে যদি বেশ সুস্থ সবল অনুভব করে থাকেন, তা হলে এ রকম বন্ধুর ওরূপ প্রস্তাব আর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে বলা কারুরই উচিত হবে না।"

"জয়হরি বাবুকেও"—

"সে ডাক্তার বাবু বললেই হবে।"

৫৯

গণেন বাবুকে ধর্ম্মশালায় পৌছাইয়া দিয়া ডাক্তার বাবুর বাসায় চলিলাম।

সন্ধ্যা হইয়াছে,—আকাশে সপ্তমীর চাঁদ। চাঁদ দেখিয়া হাঁ করিয়া গাড়ি চাপা পড়িবার সখের দিন গিয়াছে,—এখন সে লাণ্ঠানের কাজ করে—তাই তার খোঁজ আর খাতির।

গিয়া দেখি—বারাণ্ডায় 'ইজি-চেয়ার' রাখা আছে, পাশেই একটি বেতের টেবিলে··; সিগারেটের কৌটা আর দেশালায়ের বাক্স! কেবল ডাক্তার বাবু নাই।

যিনি এতটা করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার হইয়া আমি না হয় একটু করিলাম। নিজেকে নিজেই "বসুন" বলিয়া চেয়ারে গা ঢালিলাম। এতটা ঘোরার পর বড়ই আরাম বোধ হইল। সিগারেট সহযোগে সেটা উপভোগ করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার বাবু আসিয়া···চেয়ার-জোড়া মূর্ত্তি দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন··"তুমি আবার কি চাও,···রাত্রে কোথাও যাবার-টাবার কথা কয়োনা বাপু।"

বলিলাম··"আজ্ঞে··যাবার কথা আমি মুখেও আনব' না,···indoor patient করে নেন তো বাঁচতেও পারি,···এখানে বড় ঠাণ্ডা।"

তিনি সশব্দ হাস্যে বলিয়া উঠিলেন··"আপনি! অন্ধকার কি না···বুঝতেই পারিনি, মাপ্ করবেন। চাকর ব্যাটারা একটা আলোও দেয়নি! এই ভিখন্,···ভিখন্"···

বলিলাম···"আমি চুপচাপ এসে বসে পড়েছি,···ওরা কেউ টেরও পায়নি, ওদের কোনো দোষ নেই।"

"ঘুরে ঘুরে মাথার ঠিক্ ছিল না,·· চলুন চলুন···ভেতরে চলুন। কতক্ষণ এসেছেন?"

"এই তিনটে সিগারেট তিন দিকে রওনা করেছি মাত্র!"

ঘরে বসিয়া গণেন বাবু সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সুধাংশু বাবুর পত্রের মর্ম্ম শুনিয়া তিনি খুবই খুসি হইলেন,···কারণ ওইরূপ একটা কিছু বড়ই প্রার্থনীয় ছিল। বলিলেন···"গণেন বাবু এখন অনায়াসেই যে-কোনো কাজ করতে পারেন,·· কাজ করা তাঁর স্বাস্থ্যের জন্যও দরকার। তিনি এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। একজন সঙ্গী মিললে ভালো হত,' না পেলেও শঙ্কার কোন কারণ নেই।"

* * * *

বাসায় ফিরিলাম···প্রায় নয়টা। ঘরের মধ্যে দুই পদ মাত্র অগ্রসর হইয়াই বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! তড়াক্ করিয়া এক লাফে আবার বাহিরে আসিয়া পড়িলাম!

এ কথা তো একদিনও ভাবি নাই। পাহাড়-ঘেরা সাঁওতালের দেশ,·· এটা আবার তায় শিবভূমি, সাপ তো থাকবেই·· থাকবারই কথা! বাবাই রক্ষা করেছেন! একেবারে বিছানার মাঝখানে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ফণা বিস্তার,···বাপ! অভ্যাস মত' সরাসরি গিয়ে বিছানায় বসবারই তো কথা! উঃ গিয়েছিলুম আর কি! ওর এক ছোবলেই ধ্যাওড়া প্রাপ্তি হত! বুকটা দুর্‌দুর্ করতে লাগল।

বাইরে থেকে যতই দেখি·· ততই তার ফণা ফোলে আর দোলে! ল্যাম্পটা দোরের পাশেই ছিল;·· পেসাদার টানিয়ের হাত থেকে হুঁকোটা পাবার প্রত্যাশায় হাত যেমন এগোয়, আর তাঁকে ততই চক্ষু বুজে প্রগাঢ় ধ্যানস্থ হতে দেখে পেছয়,·· আলোটা দু-প্যাঁচ বাড়িয়ে দেবার জন্যে আমারো সেই অবস্থা দাঁড়াল'। শেষ বাবাকে স্মরণ করে, কম্পিত হস্তে, এক প্যাঁচ বাড়িয়ে ফেললুম। সাপ নড়েনি। শুনেছি আলো দেখলে স্থির হয়ে থাকে।

এক পা বাড়াইয়া কাজটা করিয়াছিলাম। পা-টা সট করিয়া টানিয়া লইবার সময় একটা কি পায়ে লাগিয়া দোরের মাঝখানে আসিয়া পড়িল! আবার লাফ—একদম রাস্তায়!

কেহই নড়েনা। কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া উঁকি মারিয়া দেখি—জয়হরির এগারো ইঞ্চি জুতোর একপাটি! রক্ষা,—কিন্তু আর একপাটি কোথা!

বিছানায় ফণা বাগানই আছে। জুতো নাকি! তিন আনা ভয় তিরোহিত। তবু—কি জানি? সাবধানের মার নাই,—অসম্ভব কিছুই নয়। বেহুলার গানে তো শোনাই আছে—"লোহার বাসরে কাটে বাছা লখিন্দর।"

চশমা মুছিয়া,—সন্তর্পণে ঘরের মধ্যে এক পা বাড়াইয়া ফোকস্ ফেলিলাম। এ কি,—জুতোই তো! উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে। হাফসোল্ লাগান হইয়াছিল,—তিন ভাগ বাঁধন ছিঁড়িয়া সে বেঁকিয়া ফণা তুলিয়াছে!

অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—কবির এত বড় কথাটা "এখন বাঁধন ছিড়িতে হবে" মানুষে শুনলে না—জুতোয় শুনলে!

নিকটে গিয়া দেখি তার চতুষ্পার্শ্ব চাদরখানির দুই বর্গফুট ধূলায় অন্ধকার করিয়া তিনি পড়িয়া আছেন। ব্যাপার কি—সে নিজে গেল কোথায়! সেবার লেপের মধ্যে প্রাণের সাড়া আবিষ্কার করিয়াছিল,—এবার জুতোর জান্ বাতলাবে নাকি!

যাক্, ভাগ্যে গোলমাল করি নাই—কুটুম্বের বাসায় কি কেলেঙ্কারিই করা হইত!

কপালের ঘাম মুছিতেছি,—বাহিরের র'কে দুপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল। চমকিয়া চাহিয়া দেখি—জয়হরি একলম্ফে রকে উঠিয়া—"এই যে আপনি!" বলিয়া ঝড়ের ঝাপটার মত ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে—

"উঃ বাঁচলুম,—কি করে এলেন? তারা যে বললে—সকালে এসে চিনে নিয়ে যেও! আচ্ছা সে শুনব'খন। পাঁচটা পয়সা দিন—বাতাসা এনে আগে হরিরলুট দিয়ে ফেলি।"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে এতগুলো কথা একটানেই বলিয়া গেল। আমি তো অবাক। পাগল হ'ল নাকি! বলিলাম—

"বোসো,—একটু শান্ত হও; ব্যাপার কি?"

"আপনি আমার ওপর রাগ করেই এই সব করছেন। আমি কি মা'র কাছে আর মুখ দেখাতে পারতুম! ফিরতুমই না! সেদিন তো বললেন—তাড়াতাড়ি নেই।"

"হ্যাঁ—তা হয়েছে কি?"

"এই তো একলা বেরিয়ে কি রকম বিপদে পড়েছিলেন! বিপদটি তো আপনার একলার নয়! আমাকে ডাকলেই তো হ'ত। সেদিন কতবার বারণ করে গেলুম—একলা বেরুবেন না। তবে আর কি করে থাকা হয়! কাজ নেই—আপনি চলুন। আমার আজ সব রক্ত শুকিয়ে গেছে!"

আমার জন্য তার দুর্ভাবনা দেখিয়া হাসিও পাইল—দুঃখও হইল,—কারণ তার আন্তরিকতায় আমার সন্দেহ ছিলনা। বলিলাম—

"বিপদটা কি পেলে?"

"সে আমার জানতে বাকি নেই,—খোঁজ না নিয়ে আর ফিরিনি। এবার কর্ত্তাকে নিয়ে যেতুম। আপনি কুপুত্তুরদের হাত থেকে ফিরলেন কি করে বলুন দিকি! অনেকগুলি টাকা গেছে তো? আমি সঙ্গে থাকলে আর"—

বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, কিন্তু ব্যাপারটা শুনিবার জন্য এবং নূতন আবার কি ঘটাইল জানিবার জন্য বলিলাম—

"সবটা খুলেই বলনা শুনি।"

বলিল—"সাতটার পর এসে দেখি—আপনি নেই। বাণেশ্বর বললে—চারটের আগে বেরিয়ে গেছেন। মাথা ঘুরে গেল,—চারটের আগে! ট্রেণের সময়ই তো ওই! ছুটলুম ইষ্টিসনে।—

"বাবুরা বললেন—'না, তাঁকে আজ দেখিনি—ইষ্টিসনেই আসেন নি।' তবে! আমি বসে পড়লুম!

"কি সব ভালোলোক মশাই—একটা কিনারা করেই দেন! আমার অবস্থা দেখে লগেজ-বাবু বললেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গে, এলে আমার হাতে পড়তেই হবে। ভাববেন না।'

"সেদিন বললুম—ফোটো তোলানো যাক,—কথা তো শুনবেন না! আপনার কি! যাকে পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা শুনো করতে হয়—ভুগতে হয় তাকে। টিকিট্‌বাবু জিজ্ঞেস করে বসলেন—করবেনই তো···'ফোটো আছে?'

বোকার মত মাথা নাড়তে···মাথা কাটা গেল। কাল আপনার ফোটো তুলিয়ে তবে অন্য কাজ! আর 'না' বলতে দিচ্ছি না।···

"তখন ট্রেণের সময় নয়, সকলে এসে ঝুঁকে পড়লেন। তীর্থস্থান কিনা—যদি কারো উপকার করতে পারেন।

"ইষ্টিসন-মাষ্টার কী চিন্তিতই হয়ে পড়লেন! ভেবে ভেবে বললেন···'উহু ভালো বুঝছিনা,—যাই হোক্ থানায় খোঁজটা নেওয়া দরকার মনে হচ্ছে। কিছু হারালে শেষ তাদের হাতেই পড়ে,···চালান্ না হয়ে যায়, আপনি চট্ একবার দেখুন। এখানে এমন হামেশা হয়।'

"পুণ্যস্থান—তাই না এমন মতিগতি! কে করে মশাই! কোম্পানীর লোক কিনা,—ওরা লোক চিনতে বরাবরই ওস্তাদ। ওরাই তো সব প্রথম—আমাদের চিনে এতবড় দেশের মাটির বোঝা মাথায় করে নিয়েছিল।···

"ছুটে বাসায় আসছিলুম,···যদি এসে থাকেন। কে দেখেছে মশাই···একটা গাধা রাস্তার মাঝে শুয়েছিল; ···বেটা গাধা কিনা! তার পিটে ঠোকোর লেগে, তাকে ডিঙিয়ে টোপকে ঠিক্‌রে গিয়ে পড়লুম। এই দেখুন না"···

দেখি, ডান্ হাতের কনুইটা ঘেঁসড়ে ছাল উঠে বক্তারক্তি হয়েছে!

"এখনো জলছে মশাই। তখন কি ওসব দেখবার সময় ছিল! তখন·· হে মা কালি···এনে দাও!·

"সঙ্গে সঙ্গে বেটার আবার চীৎকার কি! আর খটাখট্ শব্দ। কামড়াবে নাকি? টেনে ছুটলুম। বেটা গাধা—জুতোটা এমন বিগড়ে দিলে···এগুতে আটকায়—পেছটান্ ধরে। সবাইকে চেনা হয়ে গেল মশাই!···

"এসে দেখি···আপনি আসেন নি! তাড়াতাড়ি আপুদে জুতো দুর করে ফেলে ধূল পায়েই থানায় ছুটলুম।

"আহা—গিয়ে যেন তপোবনে ঢুকলুম! আপনি তো দেখেইছেন,—গরু, বাচুর, ছাগল, শূওর, গাধা, টাটু, মানুষ···সব এক ঠাঁই,—যেন রামরাজ্যি! সব উর্দ্ধমুখ, স্থিরনেত্র,—খাই খাই নেই—যে যার চিন্তায় চুপচাপ। কি শান্ত ভাব মশাই! যমের বাড়ী না গেলে আমাদের আর ও-ভাব আসবেনা···ছুটোছুটি থেকে ছুটি পাবনা। মানুষগুলি যেন সাধনের-ধন লাভ করে বেশ নিশ্চিন্ত বসে আছেন। বললেন···

'কেয়া মাংতা?'

"বললুম···'এখানে কোইকো নিয়ে আসা হায় কি? কোথাও মিলতা নেই।'

"বললেন···'ক্যায়সা রং?'

"নিজেকে দেখিয়ে বললুম—'এই হাম্‌সা রং।'

"বললেন—'তোম্‌কো কোন্ পয়ছান্‌তা;—রাতমে নেহি মিলে গা। সবেরে আস্‌কে পছানকে লে জানা। দশগণ্ডা লাগি।'

"যাক্, পাওয়া তো যাবে,—বাঁচলুম। কিন্তু এই রাত্রিকালে কি খাবেন, কোথায় শোবেন, সিগারেট সঙ্গে আছে কি না,—ভেবে কান্না পেতে লাগলো।—

"ছুটে কর্ত্তাকে নিতে এলুম। তিনি যেরকম গলিঘুঁজি মেরে বেড়ান,—কতবার থানায়ও গিয়ে থাকবেন, থানার লোক তাঁকে চেনেই। তিনি গেলে—ছেড়ে দেবেই। দেরি করাও চলে না, কি জানি,—ইষ্টেসন্-মাষ্টার বাবুতো কোনো কথা রেখেঢেকে ক'ননি,···আপনার লোকের মত' সব কথা খুঁটিয়েই বলে দেছেন। দেরি হলে—চালান দিয়ে বস্‌তে পারে। এতটা কে বলে মশাই!—

"যাক্,···এখন ধড়ে প্রাণ এলো! স্থান মাহাত্ম্য আছেই···তীর্থের প্রভাব! সব ডিপার্টমেণ্টই জেণ্ট্ (gent) বলতেই ছেড়ে দিয়েছে! তা—আমার আগে এলেন কি করে!"

সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছিল। হাসিব কি শাসিব, কি ব্রাহ্মণীর এই মিনিষ্টার নির্ব্বাচনের বাহবা দিব! জয়হরি তার অনুমান ও আক্কেল মত' যথাসাধ্যই করিয়াছে দেখিতেছি!

ভূতে পাওয়া কথাটা শোনাই ছিল,···অদৃষ্টেও যে ছিল তাহা আজ জানিলাম।

বাণেশ্বর গরম জলের বালতি লইয়া উপস্থিত হইল। বলিল··· হাতমুখ ধুয়ে আসুন···ঠাঁই হয়েছে। সে চলিয়া গেল।

জয়হরিকে বলিলাম···"এ বিষয়ের উল্লেখ যেন কাহারো কাছে না-করা হয়।"

"রামঃ, আমাকে কি এম্‌নি মুখখু পেলেন! ভদ্রলোকের পুলিশে যাওয়া! ও একটা গেরো ছিল—হয়ে গেল। আমি কি এমনি নির্ব্বোধ! ও ওই আপনি গেলেন আর আমি জানলুম···বস্।"

"ষ্টুপিড!" (ক্রমশঃ)

বিশ্ব-সাহিত্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

শ্রীমতী ওয়ারেণের পেশা (বার্ণাড্ শ’)

তৃতীয় অঙ্ক আরম্ভ হয়েছে পরদিন প্রভাতে রেভারেণ্ড্ সামুয়েল গার্ডনারের গির্জ্জাসংলগ্ন গৃহের প্রাঙ্গণে। বেলা তখন প্রায় সাড়ে এগারটা। ফ্রাঙ্ক তাদের গৃহ-প্রাঙ্গণস্থ উদ্যানে একখানি চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পাঠ করছিল, এমন সময় তার পিতা রেভারেণ্ড সামুয়েল নিদ্রাভঙ্গে নীচে নেমে এলেন। তাঁব চোখ দুটি তখনও জবা ফুলের মতো লাল এবং শরীর সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ নয়। দেখলেই বোঝা যায় যে কাল তিনি সারারাত্রি জেগে অতিরিক্ত সুরাপান করেছিলেন।

ফ্রাঙ্ক তার পিতাকে দেখে পকেট থেকে ঘড়ী বার করে খুলে উপহাস করে বললে, "বাঃ বেশ! বেলা সাড়ে এগারটার সময় পাদ্রী সাহেব ঘুম থেকে উঠলেন! মন্দ নয়!"

রেভারেণ্ড সামুয়েল পুত্রের কথায় একটু অপ্রতিভ হ’য়ে পড়লেন, এবং তার উপহাসের প্রতিবাদ ক’রে বলতে যাচ্ছিলেন—"আমি—আমি আজ একটু—"

ফ্রাঙ্ক তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—"একটু বে’এক্তার হয়ে পড়েছো না?".

রেভারেণ্ড—না, না, আমি আজ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছি! তোমার মা কোথায় ফ্রাঙ্ক?

ফ্রাঙ্ক।—ভয় নেই, তিনি বাড়ী নেই। কি সব বাজার হাট করতে বেসিকে নিয়ে এগারোটার গাড়ীতে শহরে চলে গেছেন। যাবার আগে তোমাকে বলবার জন্যে আমায় অনেক কথা বলে গেছেন। তুমি কি সেসব কথা এখন শুনতে চাও, না, আগে প্রাতরাশটা সেরে নেবে?

রেভারেণ্ড।—আমার প্রাতরাশ হ’য়ে গেছে। কিন্তু, আমি বড় আশ্চর্য্য হচ্ছি যে, বাড়ীতে এতগুলি অতিথি রয়েছে জেনেও তোমার মা আজ শহরে চলে গেলেন কি বলে? এরা সব কি মনে করবে?

ফ্রাঙ্ক।—মা বোধ হয় সেই জন্যেই শহরে গেছেন। ক্রফট্স্ যদি আরও দু’এক দিন এখানে থাকে, আর তুমি, যদি এই রকম রোজ রাত্রি চারটে পর্য্যন্ত বসে তার সঙ্গে তোমার দৃপ্ত-যৌবনের কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করতে থাকো, তাহ’লে সু-গৃহিণীর কর্ত্তব্য পালনের জন্য মা’কে বাধ্য হ’য়ে শহরে গিয়ে একটি পিপে মদ আর শ’খানেক সোডার বোতল ‘অর্ডার’ দিয়ে আসতেই হবে।

রেভারেণ্ড।—সার জর্জ্জ যে অতো বেশী মদ্যপান করেছিলেন, আমি সেটা লক্ষ্য করিনি।

ফ্রাঙ্ক।—তোমার কি আর তা লক্ষ্য করবার মতো অবস্থা ছিল তখন?

রেভারেণ্ড—(উত্তেজিত হ’য়ে) তুই কি মনে করিস্ যে আমি—ও—

ফ্রাঙ্ক—(শান্তভাবে) একজন গীর্জ্জার ধর্ম্মযাজক পাদ্রীকে আমি অত বেশী মাতাল অবস্থায় আর কখন দেখিনি, আর তোমার অতীত জীবনের ইতিহাস যা নেশার মুখে তুমি কাল বলে যাচ্ছিলে, সে সব এমন ভয়ানক কথা যে, প্রেড সে সব শোনবার পর বোধ হয় আমাদের বাড়ীতে আর একরাত্রিও বাস করতে চাইতেন না, যদি আমার মা’য়ের সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার পর থেকেই তাঁদের পরস্পরের প্রতি কেমন একটা নিবিড় টান না হ’তো!

রেভারেণ্ড— বাজে বোকোনা, থাম! সার জর্জ্জ আমার বাড়ীতে অতিথি, আমাকে তো তাঁর উপযুক্ত খাতির করতে হবে? আর, ও ছাড়া অন্য কি কথা কইবো তাঁর সঙ্গে, তাঁর যে ওই সব কথাই কেবল ভাল লাগে! আচ্ছা, প্রেড কোথায় গেল? তাকে দেখতে পাচ্ছিনা কেন?

ফ্রাঙ্ক—তাকে সঙ্গে নিয়েই মা ষ্টেশনে গেছেন। সেই ত ওঁদের টম্‌টম্ হাঁকিয়ে ট্রেনে তুলে দিতে নিয়ে গেছে!

রেভারেণ্ড—ক্রফটস্ উঠেছে?

ফ্রাঙ্ক—অনেকক্ষণ! তাঁর অবস্থা এক চুলও এধার ওধার

দেখলুম না। সে তোমার চেয়েও পাকা মাতাল! চিরকালই বোধ হয় তার এই রকম টানা অভ্যেস!

রেভারেণ্ড—আচ্ছা ফ্রাঙ্ক—

ফ্রাঙ্ক—কি বাবা?

রেভারেণ্ড—কাল রাত্রে তাঁদের সঙ্গে যে রকম আলোচনা হ'য়ে গেছে, তারপর শ্রীমতী ওয়ারেণ আর তাঁর কন্যা কি আশা করতে পারেন যে আমাদের বাড়ী তাঁদের নিমন্ত্রণ হবে?

ফ্রাঙ্ক—তাঁদের ইতিমধ্যেই নিমন্ত্রণ করা হ'য়ে গেছে! ক্রফটস্ প্রাতরাশের সময় মাকে জানালে যে তোমার আদেশে ও অনুরোধেই তিনি শ্রীমতী ওয়ারেণ আর তাঁর কন্যা ভাইভীকে আজ এবাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে এসেছেন!·· এই কথা শোনবার পরই তো মা এগারোটার গাড়ীতে শহরে পালাবার দরকার মনে করলেন।

রেভারেণ্ড। (হতাশভাবে আপত্তি জানিয়ে) আরে না না, আমি কখনই তাদের নিমন্ত্রণ করে আসবার কথা বলিনি। আমি এ কখন স্বপ্নেও ভাবিনি!

ফ্রাঙ্ক। কাল রাত্রে কি আর তোমার কিছু জ্ঞান ছিল বাবা! কি বলেছো কি করেছো তা কি তুমি জানো? আরে! এই যে প্রেড যে! এর মধ্যেই পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলে? এস—এস—"

প্রেড। (এগিয়ে এসে) সুপ্রভাত! রেভারেণ্ড!

রেভারেণ্ড। সুপ্রভাত প্রেড!

তারপর, সকালে প্রাতরাশের সময় তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি, তাঁর আজ উঠতে একটু বেলা হ'য়ে গিয়েছে, কারণ তার শরীরটা তেমন ভাল নেই, এই সব বলে তিনি প্রেডের কাছে মাপ চেয়ে নিয়ে আগামী রবিবারের উপাসনার বিষয়টা এই বেলা নিরিবিলি বসে লিখে ফেলবার অনুমতি নিয়ে চলে গেলেন।

রেভারেণ্ড চলে যাবার পর প্রেড বললে—এই এক বড় বিশ্রী কাজ! প্রতি সপ্তাহে এই উপাসনার বাঁধি-গৎ সব লেখা!

ফ্রাঙ্ক বললে—'তুমি ক্ষেপেছো? ওরা কি ওসব লেখে নাকি! অন্য লোককে টাকা দিয়ে লিখিয়ে নেয়! বাবা ঐ ব'লে—গেল এখন নিরিবিলি একটি সোডার বোতল নিয়ে বসতে!

প্রেড। আহা, ফ্রাঙ্ক, কী যে করো তুমি! বাপের সম্বন্ধে একটু সমীহা হ'য়ে কথা বলতে পারো না!

ফ্রাঙ্ক। কি জানো প্রেড, তোমরা তো আজ এসেছো, কাল চলে যাবে। আর আমাদের বাপ বেটাকে একলাটি যখন এই নির্ব্বান্ধব পুরীতে বারোমাস একসঙ্গে বাস করতে হবে, তখন আমাদের মধ্যে অতো পিতা-পুত্র সম্পর্ক মেনে চলা কি সম্ভব? আমার তো মনে হয় বাপ-বেটাই হোক আর স্বামী-স্ত্রীই হোক বা ভাই-বোনই হোক্—দুটী প্রাণীকে যদি বরাবর একসঙ্গে থাকতে হয়, তাহলে তাদের মধ্যে অতো শিষ্টাচার বজায় রেখে চলা সম্ভব নয়! * * * * তাছাড়া আবার কর্ত্তাটির একটু যদি কাণ্ডজ্ঞান থাকে! আচ্ছা তুমিই বলো না প্রেড—শ্রীমতী ওয়ারেণ আর তাঁর মেয়েকে আজ আমাদের বাড়ী নিমন্ত্রণ-করাটা কি ওঁর উচিত হয়েছে? কাল এমনি মাতাল হ'য়ে পড়েছিলেন যে নেশার ঝোঁকে ক্রফটস্‌কে হুকুম দিয়েছেন তাঁদের আজ এখানে নিয়ে আসতে! তুমি তো আমার মা'কে চিনে নিয়েছো ভাই, আচ্ছা বলতো, মা কি ওদের মুখদর্শন পর্য্যন্ত করতে চাইবেন?

প্রেড। কিন্তু তোমার মা'তো ওদের সম্বন্ধে কিছু জানেন না!—জানেন কি?

ফ্রাঙ্ক। তা আমি জানিনি, কিন্তু ওরা আসছে শুনেই তিনি যখন বাড়ী ছেড়ে শহরে যাবার নাম ক'রে পালালেন, তখন সন্দেহ হচ্ছে যে বোধ হয় জানেন।

এই সময় রেভারেণ্ড সামুয়েল হন্তদন্ত হ'য়ে বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে এসে বললেন "ফ্রাঙ্ক, আমি পড়বার ঘরের জানালা থেকে দেখলুম, শ্রীমতী ওয়ারেণ তাঁর কন্যাকে নিয়ে ক্রফ্‌টসের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আসছেন! তোমার মাকে খুঁজলে আমি কি বলবো ওঁদের—তাই ভাবছি!"

ফ্রাঙ্ক বাপকে খুব উৎসাহ দিয়ে বললে "মায়ের অভাব তুমিই মিটিয়ে দাও বাবা! খুব খাতির যত্ন ক'রে অভ্যর্থনা করো ওঁদের। মা'র জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলো যে হঠাৎ একটী আত্মীয় বড় অসুস্থ হয়ে পড়াতে তিনি তাড়াতাড়ি বেসিকে নিয়ে শহরে চলে গেছেন। আপনারা আসবেন বলে আমি কিম্বা ফ্রাঙ্ক কাউকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন না। আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না বলে তিনি কত আপশোস্ করতে করতে গেলেন—এই রকম সব যা মনে আসে গুছিয়ে বোল না বাবা,—দেখো, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও যেন

সত্যি কথা কিছু বলে ফেল না!···তার পর যা ভগবানের মনে আছে তাই হবে।"

রেভারেণ্ড। সে না হয় আজকের মতো হোলো, কিন্তু, তার পরে? ভবিষ্যতে ওদের এবাড়ীতে আসা বন্ধ করা যাবে কী করে?

ফ্রাঙ্ক। সে কথা ভাববার এখন সময় নেই, সে পরের কথা পরে হবে। তুমি এখন একটু এগিয়ে যাও, তাদের নিয়ে এসো, আমি আর প্রেড ভিতরে থাকি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করবার জন্যে।

* * * *

রেভারেণ্ড্‌ সামুয়েল স্বয়ং শ্রীমতী ওয়ারেণ, ভাইভী ও ক্রফট্‌স্‌কে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেই ফ্রাঙ্ক আর প্রেড্‌ তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা করে ভিতরে ডেকে নিলেন। কিছুক্ষণ হাস্যপরিহাস ও রহস্যালাপের পর ফ্রাঙ্কের প্রস্তাবে তাঁরা সকলে মিলে রেভারেণ্ড্‌ সামুয়েলের উপাসনা মন্দির দেখতে চলে গেলেন। কিন্তু ভাইভী সে দলের সঙ্গে গেল না দেখে ফ্রাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে "তুমি আসবে না?"

ভাইভী। না, শোনো, তোমাকে আমি একটা বিষয়ে সাবধান করে দিতে চাই ফ্রাঙ্ক্‌! তুমি আমার মাকে প্রায়ই দেখি ঠারে-ঠোরে উপহাস করো। এইমাত্র তাঁকে তুমি ঠাট্টার ছলে একটু বিদ্রূপ করলে আমি শুনলুম। তোমার এ চালাকী আর চলবে না। ভবিষ্যতে আমার মা'র সঙ্গে তুমি নিজের মা'র মতো সসম্মানে কথা কইবে, বুঝলে?

ফ্রাঙ্ক। উনি কিন্তু তা মোটেই পছন্দ করবেন না ভিভ্‌! ওঁর প্রকৃতি ঠিক আমার মায়ের মতো নয়। ওঁর সঙ্গে ঠিক সে রকম ব্যবহার করলে চলবে না! কিন্তু সে যাই হোক্‌, কাল তোমার মা'র আর তাঁর পারিষদবর্গের সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে যে কথা হয়েছিল, আজ দেখছি তোমার মায়ের সম্বন্ধে তোমার একেবারেই আর সে ভাব নেই! ব্যাপার কি? মত বদ্‌লে গেল' নাকি?

ভাইভী। হ্যাঁ, আমার মত পরিবর্ত্তন করিছি ফ্রাঙ্ক। কাল আমি মায়ের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিছিলুম।

ফ্রাঙ্ক্‌। আর আজ?—

ভাইভী। আজ আমার মাকে আমি ভাল করে চিনেছি। তুমি তাঁর পরিচয় পাওনি।

ফ্রাঙ্ক্‌। দেখো, যত সব চরিত্রহীন দুর্নীতিপরায়ণ লোক—তাদের সকলের মধ্যেই বেশ একটা সৌহার্দ্দ বন্ধন আছে; তুমি নেহাৎ লক্ষ্মী মেয়ে, এসব ব্যাপার তো কিছু জানোনা। তোমার মা'র সঙ্গে আমার সেই সূত্রেই প্রধান সম্বন্ধ! আর সেই জন্যেই আমি তাঁকে যতটা চিনি, তুমি তা কোনও জন্মেই চিনতে পারবে না!

ভাইভী। এ তোমার অত্যন্ত ভুল ধারণা ফ্রাঙ্ক্‌—তুমি আমার মার সম্বন্ধে কিছুই জানোনা। তুমি যদি জানতে যে কী দারুণ অবস্থা বিপাকে প'ড়ে মাকে—

ফ্রাঙ্ক্‌। (বাধা দিয়ে) আহা, তুমি তো ব'লতে চাও যে তাঁকে আজ আমি যা দেখছি তা' যে তিনি কেন হয়েছেন সেটা আমার জানা দরকার?—কিন্তু তাতে কী আসে যায় বলো তো? যে অবস্থায় পড়েই তাঁকে এরকম হ'তে হোক্‌না কেন, তুমি তোমার মাকে কিছুতেই নিতে পারবে না ভাইভী!

ভাইভী। কেন পারবো না?

ফ্রাঙ্ক। কারণ তিনি একটি পুরোনো পাপী। আমি যদি আর কোনও দিন দেখি যে তুমি আজকের মতন তোমার ঐ মার কোমরটি জড়িয়ে ধরে আসছো, তাহ'লে কিন্তু আমি তোমার সামনে খুন হবো বলে রাখলুম। ও দৃশ্য আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না!

ভাইভী। তাহ'লে কি তুমি বলতে চাও যে, হয় আমি তোমার সঙ্গে মেশা ছেড়ে দেবো—নয় আমার মাকে ত্যাগ করবো?

ফ্রাঙ্ক্‌। আরে না না, তাহ'লে যে বুড়ী একেবারে দমফেটে মারা যাবে! না ভাইভী, তোমার প্রেমে পাগল আমি, তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারবো না। তবে কি জানো, তুমি যাতে একটা কিছু ভুল ধারণা ক'রে না বোসো, সেই হচ্ছে আমার সব চেয়ে বড় ভাবনা! মিছে তর্ক করে কোনও লাভ নেই ভাইভী, তোমার মা'কে নিয়ে কিছুতেই চলবেনা! হ'তে পারে হয়ত তিনি নিজে তত খারাপ লোক নন, কিন্তু ওঁদের সম্প্রদায়টা বড় খারাপ—ভাইভী, বড় খারাপ!

ভাইভী। ফ্রাঙ্ক্‌! আমার মা'কে কি তবে সবার ঘৃণিত, সবার পরিত্যক্ত হ'য়েই থাকতে হবে? কারণ, তাঁর অপরাধ, যে তিনি যে সমাজে মিশতে বাধ্য হ'য়েছেন, সেটা বড়

খারাপ! তাঁর কি তবে বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই বলতে চাও?

ফ্রাঙ্ক। সে ভয় কোরো না ভাইভী, ওঁকে আর যাই হ'তে হোক্—পরিত্যক্তা হয়ে পড়ে থাকতে হবেনা কোনও দিন!

ভাইভী। কিন্তু, তুমি যে বলছো আমায় তাঁকে ত্যাগ করতে হবেই!

ফ্রাঙ্ক। (ছোট ছেলেদের মতো আদুরে সুরে প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠে) তাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে বাস করতে পাবেনা—এই পর্য্যন্ত। তা'তে তোমাদের মা'য়ে-ঝীয়ের ছোট্ট সংসারটি কোনও দিনই সার্থক হ'য়ে উঠবে না, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও ছোট্ট সংসারটির আর শান্তি থাকবে না!

ভাইভী। আমাদের ছোট্ট সংসার আবার কী!

ফ্রাঙ্ক। অর্থাৎ·· কুঞ্জ কাননের দু'টী অরণ্য শিশু—ভাইভী আর ফ্রাঙ্ক এই দু' বেচারার!···(বলতে বলতে ফ্রাঙ্ক ভাইভীর কোমরটি জড়িয়ে ধরে তার বুকের উপর মাথাটি রেখে তেমনিই সুর ক'রে বললে—) "চল যাই, আমরা দু'জনে পাতার আড়ালে লুকোই গিয়ে!"

ভাইভী। (তার গলাটি জড়িয়ে ধরে আদরে দোল দিতে দিতে সুরে সুর মিলিয়ে) চলো দু'টিতে হাত ধরাধরি ক'রে তরুতলে গাঢ় ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়িগে—

ফ্রাঙ্ক। "বুদ্ধিমতী বৌয়ের পাশে বরটি বড় বোকা!"

ভাইভী। "হাব্‌লা খুকীর সঙ্গে যে তার মনের মতন খোকা!"

ফ্রাঙ্ক। "আঃ কি আরাম! চিরদিন যদি এমনি শান্তিতে থাকতে পাই,—বরের বাপের বোকামীর হাত থেকে উদ্ধার হ'য়ে এবং কনের মা'য়ের ঐ সন্দেহজনক—"

ভাইভী। (বাধা দিয়ে) "চুপ চুপ্! ক'নে বউটি তার মা'র কথা একেবারে ভুলে থাকতে চায়!"

তার পর কিছুক্ষণ তারা দুজনে নীরবে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'য়ে মৃদু মৃদু দোল খেতে লাগল! হঠাৎ ভাইভীর যেন চমক্ ভাঙ্‌ল! সে ধড়মড়িয়ে ফ্রাঙ্কের আলিঙ্গন-মুক্ত হ'য়ে বললে—"কী ছেলেমানুষী করছি আমরা—! নাও ওঠো, ভাল হ'য়ে বোসো। মাগো! তোমার চুলগুলো সব একেবারে উস্কোখুস্কো হ'য়ে গেছে—বোসো, ঠিক করে দিই! ছিঃ, আমার এমন লজ্জা করছে! কেউ কোথাও নেই বলে কি—আমাদের মতো বুড়ো ধাড়ী ছেলেমেয়েতেও এই রকম খোকাখুকীর মতো জড়ামড়ি ক'রে খেলে? আমি কিন্তু ছোট-বেলায় কখনও কারুর সঙ্গে এমন ক'রে খেলিনি!—

ফ্রাঙ্ক। আমিও না! তুমিই হ'লে জীবনে আমার এই প্রথম খেলুনী!—

ফ্রাঙ্ক এই বলে আদর ক'রে ভাইভীর হাত দু'খানি ধ'রে যেই চুম্বন করতে যাবে—সামনেই দেখলে ক্রফট্‌স্ এসে দাঁড়িয়েছে! * * * *

ক্রফট্‌স্ ভাইভীর সঙ্গে নিভৃতে কিছু আলোচনা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করাতে ফ্রাঙ্ক সেখান থেকে চলে গেল, কিন্তু যাবার সময় বলে গেল যে, যদি ভাইভীর কোন চাকর বাকরকে দরকার হয় তাহ'লে বাগানের ফটকের মাথায় যে ঘণ্টা ঝুল্‌ছে সেইটাতে ঘা দিলেই কেউ না কেউ আসবে।

ফ্রাঙ্ক চলে যাবার পর সার্ জর্জ্জ ক্রফট্‌স্ বেশ পাকা ব্যবসাদারের মতোই গুছিয়ে ভাইভীকে তাঁর বিবাহ করবার ইচ্ছাটি প্রকাশ ক'রে জানালেন, কিন্তু ভাইভী ক্রফট্‌স্‌কে বিবাহ করতে স্বীকৃত হ'লোনা!

ক্রফট্‌স্ তখন ভাইভীকে ভেবে দেখে উত্তর দিতে বললেন; জানালেন যে তিনি অপেক্ষা করবেন, তাঁর তাড়া নেই, কেবল ফ্রাঙ্ক পাছে ভাইভীকে ভাঁওতায় ভুলিয়ে ফেলে, এই জন্যেই কথাটা তিনি আগে থাকতে পেড়ে রাখলেন।

কিন্তু ভাইভী বললে এ সম্বন্ধে তার ভাববার কিছু নেই, 'না' যা বলেছে সে—তা' আর 'হাঁ' হবেনা কিছুতেই!

ক্রফট্‌স্ তখন ভাইভীকে অনেক রকম প্রলোভন দেখাতে লাগলেন, ভাইভী তবুও যখন একগুঁয়ে মেয়ের মতো কেবলই 'না' বলতে লাগল, তখন ক্রফট্‌স্ বললেন যে ভাইভীকে তিনি এমন ঘটনা শোনাতে পারেন যে ভাইভীকে তাঁর প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলতেই হবে, কিন্তু তিনি সে ভাবে সুযোগ নিয়ে ভাইভীকে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন না, তিনি ভাইভীকে ভালবেসে স্নেহে জয় ক'রে নিতে চান! তারপর তিনি ভাইভীকে বললেন যে তিনি তার মা'র একজন কি রকম হিতৈষী বন্ধু! তার মা যে এত অর্থশালিনী হয়ে উঠতে পেরেছেন এর মূলে কে, সে কি জানে? সে তিনিই! তিনি তার মা'র কারবারে প্রায় ছ'লক্ষ টাকা মূলধন ফেলেছেন। তিনি যে ভাবে ভাইভীর মাকে সাহায্য করেছেন, খুব কম

লোকই আছে যারা সেভাবে তাঁকে সাহায্য করতে পারতো বা করতে চাইতো! গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমিই তার সঙ্গে ছায়ার মতো আছি বলেই তিনি আজ দাঁড়াতে পেরেছেন! ব্যবসায়ে এতটা সাফল্য লাভ করতে পেরেছেন!

ভাইভী এসব শুনে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি কি মা'র সেই কারবারের অংশীদার ছিলেন?

ক্রফট্‌স্ বললেন—"হাঁ।" তাছাড়া আরও বললেন যে ভাইভী যদি ক্রফট্‌স্‌কে বিবাহ করে তাহলে এ ব্যাপারটা সব তাদের পরিবারের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হ'য়ে থাকবে, বাইরের লোকেরা আর কেউ এ সব জানতে পারবেনা। জানতে পারলে নিন্দে হবে! অন্যের কাছে এ কারবারের কথা যে প্রকাশযোগ্য নয়, একথা সত্য কিনা তা ভাইভী তার মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌তে পারে!

ভাইভী এ কথার উত্তরে ক্রফট্‌স্‌কে জানালে যে, সে কারবারের কথা সবই সে শুনেছে,—কিন্তু সে জন্যে ক্রফট্‌স্‌কে বিবাহ করবার কোনও প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করেনা, কারণ সে ব্যবসা অনেকদিন গোলো তুলে দিয়ে এখন সেই টাকা অন্যভাবে সুদে খাটানো হ'চ্ছে!

কিন্তু ক্রফট্‌স্ যখন ভাইভীকে বললে যে—না; সে ব্যবসায় শতকরা ৩৫৲ টাকা লাভ! সে কি তুলে দেওয়া যায়,—কে তাকে ব'লেছে যে সে ব্যবসা উঠে গেছে? সে ব্যবসা এখনও বেশ জোর চলছে এবং তার মার অদ্ভুত কার্য্য-কৌশল ও সুতত্ত্বাবধানের গুণে তাদের এই ব্যবসার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে!—

ভাইভী শুনে অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে বললে—"আর সেই ব্যবসায়ে যোগ দেবার জন্যে তারই অংশীদার হবার জন্যে আপনি আমায় অনুরোধ করছেন?—"

ক্রফট্‌স্। না, না, সে কারবারের সঙ্গে আমার স্ত্রীর কোনও যোগ থাকবে না; কেবল যেটুকু সম্পর্ক তোমার বরাবর আছে তাই থাকবে।

ভাইভী। যেটুকু সম্পর্ক আমার বরাবর আছে! তার মানে?—

ক্রফটস্। অর্থাৎ, তুমি মানুষ হ'য়েছো—লেখাপড়া শিখেছো—প্রতিপালিত হ'য়েছো—সেই কারবারের আয় থেকেই! তুমি কারবারটার ওপর অতটা বিরূপ হোয়ো না। এ কারবার না থাকলে তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আর এই রকম বড়-মানুষী চালে থাকা চলতো না!

ভাইভী। থামুন আপনি। আপনাদের ঐ কারবার যে কিসের সে আমি জানি!

ক্রফট্‌স্। কে বলেছে তোমাকে?

ভাইভী। আপনার অংশীদার! আমার মা ঠাকরুণ!

ক্রফটস্ এ কথা শুনে রেগে উঠে···শ্রীমতী ওয়ারেণের উদ্দেশে কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় ভাইভী বললে—"যাক্ সে কথা; আজ থেকে আপনি আর আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করবেন না। আপনার সঙ্গে আমি কোনও পরিচয় রাখতে ইচ্ছে করি না!

ক্রফট্‌স্। কেন? কী অপরাধে? তোমার মাকে সাহায্য করিছি ব'লে নাকি?

ভাইভী। মা ছিলেন গরীবের মেয়ে, তিনি যা করে-ছিলেন সে অভাবের তাড়নায়; সে অবস্থায় তাঁর পক্ষে ও ছাড়া আর অন্য কোনও উপায় ছিল না; কিন্তু আপনি? আপনি ধনী; আপনার অগাধ পয়সা; কিন্তু তবু ঐ শতকরা ৩৫৲ টাকা লাভের লোভে আপনি এই নোংরা কারবারে ঢুকেছেন! আপনার সম্বন্ধে আমার কি অভিমত জানেন—আপনি একজন পাকা বদ্‌মাইস্ লোক। অতি হীন—অতি নীচ—!

ক্রফট্‌স্ এ কথায় খুব হেসে উঠে বললেন "বলে যাও—বলে যাও—তার পর? তোমার কথা শুনে আমার রাগ হওয়া দূরে থাক্ হাসিতে পেট ঘুলিয়ে উঠছে! বলি, আমার টাকা আছে সে কথা সত্য, কিন্তু সে টাকা কি আমি কাউকে কারবারে খাটাতে দিতে পারবো না—যখন দেখছি যে তা' থেকে আমার বেশ দুপয়সা আয় হচ্ছে? আর পাঁচজনের মতো আমিও আমার টাকার সুদ ভোগ করছি; তুমি কি মনে করো যে ঐ নোংরা কারবারে আমার টাকা খাটছে বলে আমি নিজে ওর মধ্যে আছি? রামঃ! একটু মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে দেখো—এই যে আমার এক মামা যিনি বেল্-গ্রেভিয়ার ডিউক, তাঁর যে সব বাড়ী ভাড়ার আয় আছে তার মধ্যে আমি জানি যে অনেক বাড়ীতেই ভদ্র গৃহস্থ ভাড়াটে থাকে না, তাই বলে কি তুমি তার সঙ্গে পরিচয় রাখবে না? এ যে তোমার ছেলে-মানুষের মতো কথা! অমন যে ক্যানটারবুরির প্রধান ধর্ম্ম-যাজক (Arch Bishop

of Canterbury) তাঁর সব দেবোত্তর সম্পত্তির মধ্যে এমন অনেক ভাড়াটে আছে যারা পাপী অধার্ম্মিক গণিকা মাতাল। সেই অপরাধে কি তুমি আর্কবিশপের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখবে না? তোমাদের ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের যে সব জলপানি দেওয়া হয় তার মধ্যে "ক্রফট্‌স্ স্কলারশিপ" বলে একটা বৃত্তি আছে জানোতো? সে আমারই ভাইয়ের দেওয়া—তিনি আবার পার্লামেণ্টের সভ্য; কিন্তু সে বৃত্তি সে দিয়েছে কোথা থেকে সে খবর রাখো কি? সে টাকা আসে তাঁর সেই কারখানার আয় থেকে যেখানে অন্ততঃ ৬০০ মেয়ে সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনী খাটছে অথচ তাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যে তার খাওয়া পরা আর ঘর ভাড়া চালাতে পারে—এমন মজুরী পায়! অতি সামান্যই তাদের আয়, কিন্তু তবু তারা কি করে বেঁচে আছে? কি করে চালাচ্ছে? জানো?—না জানো তো তোমার মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো।—টাকা আসছে কোথা থেকে, সে খোঁজে আমার দরকার কি; যেমন করেই আসুক না, সবাই যখন বিনা আপত্তিতে বুদ্ধিমানের মত তা পকেটস্থ করছেন, আমিই বা আমার শতকরা ৩৫৲ টাকা লাভের অংশ ছেড়ে দেবো কেন? আমি এত গাধা নই! তুমি যদি নীতির দোহাই দিয়ে লোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় রাখতে বা ভাঙতে চাও তাহ'লে তোমাকে দেশ ছেড়ে সমাজ ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করতে হবে জেনে রেখো! তা ছাড়া আর উপায় নেই!"

ভাইভী এ কথা শুনে একটু দমে গেল; হতাশ ভাবে বললে, "তাহলে আপনি কি বলতে চান যে আমি যে টাকা খরচ করিছি তা কোথা থেকে কেমন করে আসছে—সে খোঁজ রাখিনি বলে আমিও আপনাদেরই দলের একজন, —আপনাদের মতন আমিও ঐ কারবারের লাভেই পুষ্ট হয়েছি?

ক্রফট্‌স্ (উৎসাহিত হয়ে)। নিশ্চয়! সে কি আর একবার ক'রে বলতে? কিন্তু তাতে ক্ষতি কি হয়েছে?—

তারপর ক্রফট্‌স্ ভাইভীকে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে সমস্ত জগৎ সংসারই এইভাবে চলছে, এতে কোনও দোষ নেই। সমাজের বুকের উপর বসে প্রকাশ্য ভাবে যদি কেউ তার বিরুদ্ধাচরণ না করে তাহলে সমাজ তাকে কোনদিনই অপমান করে না। যারা খোলাখুলি অন্যায় করে সেই পাজী গুলোকেই কেবল সমাজ ঘৃণা করে। সমাজের মজা হচ্ছে—যেটার সম্বন্ধে সে বেশী সন্দিহান হয়··· সেইটেই সে চিরকাল গোপন রাখে!—তারপর তিনি এ কথাও ভাইভীকে বলে দিলেন যে, তাঁকে বিবাহ করলে ভাইভী এমন একটা উচ্চ সমাজে স্থান পাবে, যেখানে ভুলেও কেউ কোনও দিন তাঁদের কারবার বা তার মায়ের সম্বন্ধে কোনও প্রশ্নই করবে না!

* * * *

ভাইভী এর উত্তরে কিছু না ব'লে উঠে পড়ল, এবং বাগান থেকে চলে যাবার জন্যে ফটকের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে ক্রফট্‌সের দিকে ফিরে যখন বেশ ধীর-ভাবে বললে যে, সে রকম সমাজকে সে ঘৃণা করে—যেখানে ক্রফট্‌সের মতো লোক অপাংক্তেয় বলে বিবেচিত হয় না, সে দেশের বিধি-বিধানকে সে মানতে পারে না যার বলে ক্রফট্‌স্ আর তার মা যাদের হাতে পড়লে দশ জনের মধ্যে অন্ততঃ ন'জন মেয়ের সর্ব্বনাশ হয়···অথচ তাদের—সেই অসচ্চরিত্রা নারী আর তার ধনী বখরাদারের কোনও শাস্তিই হয় না···

ক্রফট্‌স্ এখানে একেবারে ক্রোধে অধৈর্য্য হয়ে ভাইভীকে বলে উঠল · "তুমি উচ্ছন্ন যাও!"

ভাইভী ব'ল্‌লে···"সে কথা আর আপনাকে কষ্ট করে বলতে হবে না। আমার মনে হচ্ছে—যাদের জীবন উচ্ছন্ন গেছে আমিও তাদেরই মধ্যে একজন!"

এই বলে আবার এগিয়ে গিয়ে ভাইভী বাগান থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য ফটকের খিল খুলে ফেলতেই ক্রফট্‌স্ উঠে এসে দরজা আটকে দাঁড়ালেন এবং রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন···"তবে রে পাজী মেয়ে! তোমার না-কিছু-করিছি বলে, তুমি কি মনে করেছো তোমার এই অপমান আমি চুপ করে স'য়ে যাবো?"

ভাইভী শুধু গম্ভীর ভাবে বললে··"স্থির হোন্; ঘণ্টা বাজালে কেউ না কেউ আসবেই মনে আছে কি,···" বলতে বলতে ভাইভী ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক হাতে করে ফ্রাঙ্ক ছুটে এসে বললে "তুমি নিজে হাতে মারবে, না আমিই গুলি ক'রে মারবো ওটাকে ভাইভী?"

ভাইভী বুঝতে পারলে যে ফ্রাঙ্ক আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথাই শুনেছে। বললে···"বন্দুক রেখে দাও ফ্রাঙ্ক, কোনও প্রয়োজন নেই।"

ক্রফট্‌স্ কিন্তু দাঁতে দাঁত দিয়ে বলে উঠলো "এখনি হাত মুচড়ে ঐ বন্দুক কেড়ে নিয়ে তোমার মাথায় আছড়ে ভেঙে দিতে পারি !"

এই নিয়ে ফ্রাঙ্কের সঙ্গে ক্রফট্‌সের একটু কথা কাটাকাটি হ'লো ! ক্রফট্‌স্ শেষকালে যাবার সময় ফ্রাঙ্ককে বলে গেল —যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ' সে তোমারই বোন্ ! তোমার বাপ রেভারেণ্ড সামুয়েল গার্ডনারের মেয়ে এই ভাইভী !"

ক্ষণকাল বিস্ময়-বিমূঢ়ের মতো অপেক্ষা করে পরক্ষণেই বন্দুকটা তুলে ক্রফট্‌সকে লক্ষ্য করে ফ্রাঙ্ক ব'ললে "ভাইভী, তুমি থানায় এজেহার দিও যে দৈবাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটে গেছে !" ভাইভী বন্দুকের নলটা টেনে নিজের বুকের উপর ধ'রে বললে—"নাও এইবার গুলি করো !" ফ্রাঙ্ক শশব্যস্ত হ'য়ে বন্দুক নামিয়ে নিয়ে বললে "সর্ব্বনাশ ! এখুনি কি হ'তো বলো তো ?"

ভাইভী বললে "সে ভালই হ'তো —বন্দুকের গুলি যদি আমার বুক বিঁধে চলে যেতো, তাহলে আমি বুকের ভিতর যে যন্ত্রণা পাচ্ছি তার একটু উপশম হ'তো !"

ফ্রাঙ্ক এ কথাব উত্তরে ভাইভীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে বলতে লাগল যে—"এ কি বলছ ভাইভী ? ও কথা তুমি কাণেই তুলোনা ! কি হয়েছে তাতে প্রিয়তমে, ক্রফট্‌সের কথা যদি সত্যই হয়—তাতেই বা কি এসে যাচ্ছে ? চলো, আমরা দুটি বনের শিশু আবার পাতার আড়ালে গিয়ে লুকোই গে"—ব'লতে ব'লতে ফ্রাঙ্ক দু'হাত বাড়িয়ে ভাইভীকে তার আলিঙ্গনের মধ্যে আহ্বান করলে।

ভাইভী ঘৃণায় ও বিরক্তিতে উত্যক্ত হ'য়ে বলে উঠল "আঃ ! থামো···থামো· তোমার কথা শুনে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠ্‌ছে !—আমি চল্‌লুম···"

ফ্রাঙ্ক ব্যাকুল হয়ে ডাকতে লাগল—"ভীভ্ ! দাঁড়াও, যেওনা, কোথায় চললে ? কোথায় তোমায় দেখতে পাবো ·"

ভাইভী যেতে যেতে বলে গেল ··"৬৭ নং চান্সারী লেনে হনোরীয়া ফ্রেজারের অফিসে জীবনের বাকী দিনক'টা কাটিয়ে দেবো !"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটা কথা বলি শোনো······ শোনো···"

বলতে বলতে ফ্রাঙ্ক ভাইভীর পিছনে ছুট্‌ল—এইখানে তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা এসে পড়ে।

চতুর্থ অঙ্কে বার্ণাড্ শ' আমাদের একেবারে চান্সারী লেনে হনোরীয়া-ফ্রেজারের চেম্বারে নিয়ে গিয়ে হাজির করেছেন। এখানে আমরা ভাইভীকে একেবারে হনোরীয়া ফ্রেজারের অফিসের অংশীদার রূপে দেখতে পাই ! আফিসের নাম বদলে এখন "ফ্রেজার ও ওয়ারেণ" নাম হয়েছে। তাদের কাজ হচ্ছে সব রকম হিসাব নিকাশ, কষা-মাজা, আয় ব্যয় ও লাভের অঙ্ক নিরূপণ প্রভৃতি !

ভাইভীর আশায় ফ্রাঙ্ক এখানেও ছুটে এসেছিল। ভাইভী ফ্রাঙ্ককে জানালে যে সে বিনা মূলধনে কেমন করে হনোরীয়া ফ্রেজারের অংশীদার হ'য়েছে ; এবং ফ্রাঙ্কের কাছে এ খবরটাও সে জেনে নিতে ভুললে না যে সে হঠাৎ হাশলেমিয়ার ছেড়ে চলে এসেছে ব'লে সেখানে কোনও রকম আলোচনা চলছে কি না ?—ফ্রাঙ্ক তাকে সে সম্বন্ধে সুসংবাদ দিয়ে নিশ্চিন্ত করে দিলে। তার পর সে যখন শুনলে যে ভাইভী আর তার মা'র কাছে ফিরবে না—জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই কাজ নিয়েই এখানে কাটিয়ে দিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে,—তখন সে গম্ভীরভাবে বললে—"শোনো ভাইভী, সেদিন তুমি এমন ক'রে চলে এলে যে ব্যাপাবটা বড় গোলমেলে হয়ে রইল ! ওটার সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একটা স্পষ্ট আলোচনা হ'য়ে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাওয়া উচিত নয় কি ?"

ভাইভী—বেশ—পরিষ্কার কো—

ফ্রাঙ্ক—ক্রফট্‌স্ যাবার সময় যা ব'লে গেছ'ল মনে আছে তো ?

ভাইভী—হ্যাঁ।

ফ্রাঙ্ক—সেকথা শোনবার পর আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তা একেবারে বদলে যাওয়া উচিত। আমাদের সম্পর্ক শুধু ভাই-বোনের মতোই হয়ে দাঁড়ায়।

ভাইভী—হ্যাঁ।

ফ্রাঙ্ক—তোমার কোনও ভাই ছিল কখনও ?

ভাইভী—না।

ফ্রাঙ্ক। তাহ'লে ভাই-বোনের সম্বন্ধ যে কি তা তোমার জানা নেই ! কিন্তু আমি জানি, আমার অনেকগুলি বোন আছে কিনা ? তাই সোদর-প্রীতি যে কি রকম সে অভিজ্ঞতা আমার আছে। আমি তোমার গা ছুঁয়ে বলছি ভাইভী, তোমার প্রতি আমার যে মনোভাব সে মোটেই তা

নয়! ভাই-বোনের সম্বন্ধ কি রকম জানো?—বোনেরা যে যার নিজেদের বেছে-নেওয়া ঘর-সংসার করতে চলে যায়, ভাই নিজের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আপনার ধান্দায় থাকে। পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ যদি দৈবাৎ মাঝে মাঝে হলো তো ভালোই। আর যদি না হয় কখনও—তাতেও কোনও পক্ষেরই কিছু এসে যায় না! এই হলো ভাই-বোন! জগতে ভাই বোনের সম্বন্ধ এইটুকু! কিন্তু তোমার বেলা তো তা নয়! তোমাকে যে এক সপ্তাহ না দেখতে পেলে আমার মন অস্থির হ'য়ে ওঠে! এতো ঠিক বোনের উপর ভাইয়ের টান নয়! ক্রফটসের মুখে ওকথা শোনবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার প্রতি আমার যে অনুরাগ ছিল—সে প্রেমের যৌবন-স্বপ্ন ভাইভী!

ভাইভী—(নিষ্ঠুর বিদ্রূপের কণ্ঠে) হ্যাঁ, ঠিক সেই অনুরাগ ফ্রাঙ্ক,—যার টানে তোমার বাবা আমার মায়ের পায়ে মাথা নীচু করেছিলেন—ঠিক সেই রকম, না?

ফ্রাঙ্ক ভাইভীর এ কথায় ঘোর আপত্তি ক'রে বললে যে—তার মনোভাবের সঙ্গে সে অপর কারুর মনোভাবের তুলনা করাটা মোটেই পছন্দ করে না, এমন কি তার পিতা রেভারেণ্ড সামুয়েল গার্ডনারের সঙ্গেও না! এবং ভাইভীর তুলনা দেওয়া তার ঐ মা'র সঙ্গে—সেটা আরও ঘোরতর আপত্তিজনক তার কাছে! সে ওসব বাজে কথা, বানানো গল্প বিশ্বাস করে না। সে তার বাপকে এ সম্বন্ধে অনেক জেরা করেছিল। তার বাপ তো একরকম অস্বীকারই করেছে! ভাইভী এ কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলে—"কি বলেছেন তিনি?"

ফ্রাঙ্ক—তিনি বলছেন—নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু ভুল হয়েছে!

ভাইভী—তুমি তাঁর কথা বিশ্বাস করো?

ফ্রাঙ্ক—ক্রফটসের চেয়ে তাঁর কথা আমি সত্য বলে মানতে প্রস্তুত আছি!

ভাইভী—আচ্ছা, তাই যদি সত্য হয়, তাতেই বা কি? এতে কি তোমার মনে কোনও সঙ্কোচ এসেছে, বা তোমার বিবেক-বুদ্ধিতে কোথাও বাধছে? কিছু তফাৎ বোধ ক'রছো কি? এতে প্রকৃতই কোনও প্রভেদ আছে কি?

ফ্রাঙ্ক—আমার কাছে তো কোনও তফাৎ আছে বলে মনে হয় না!

ভাইভী—আমার কাছেও না!

ফ্রাঙ্ক—(অবাক হয়ে) তাই নাকি?—কি আশ্চর্য্য! অথচ আমি ভেবেছিলুম যে সেই ছোটলোক জানোয়ারটার মুখ থেকে ওকথা শোনবামাত্র নিশ্চয় তোমার মনের ভাব আমার প্রতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়েছে!

ভাইভী—আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি;—কিন্তু, হায়—যদি করতে পারতুম!

ফ্রাঙ্ক—এ্যাঁ! সেকি?

ভাইভী—আমাদের মধ্যে ভাই-বোনের সম্পর্কটাই ঠিক খাপ খাবে।

ফ্রাঙ্ক এ কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ ক'রে ব'ললে—ভাইভী যে আর কাউকে ভালবাসে এ কথা সে আগে কেন বলেনি? তাহ'লে সে তাকে এমন করে প্রেম জানিয়ে বিরক্ত ক'রতো না, যাক্,—যা হবার হয়ে গেছে, যতদিন তার এই নূতন প্রণয় পাত্রটিকে আর ভাল না লাগে—ততদিন সে ভাইভীকে তার ভালবাসা জানিয়ে অপরাধ বাড়াবে না। ভাইভী এর উত্তরে যখন ফ্রাঙ্ককে জানালে যে সে আর কাউকেই ভালবাসে না, এমন সময় প্রেড এসে হাজির হ'ল! প্রেড ইটালিতে চলে যাচ্ছে, তাই ভাইভীর কাছে বিদায় নিতে এসেছিল। কথা-প্রসঙ্গে ভাইভীকে তার সঙ্গে ইটালি যাবার জন্য প্রেড বিশেষ করে অনুরোধ করলে। ভাইভী তখন ফ্রাঙ্ক আর প্রেডকে স্পষ্টই বলে দিলে যে তারা যদি ভাইভীর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে চায়—তাহ'লে, তাকে যেন তারা কেবলমাত্র একজন কাজের লোক বলেই জেনে রাখে; এবং সে যে চিরদিন একলা থাকতে চায় এ কথাটা তারা যেন কোনও দিন না ভোলে!

কথায় কথায় শ্রীমতী ওয়ারেণের কথা উঠলো। প্রেড অনুযোগ ক'রে বললে যে মা'কে এতটা ঘৃণা করা ভাইভীর খুবই অন্যায়। হলেনই বা তিনি অবিবাহিতা মাতা, প্রেড সেজন্যে কোনওদিনই তাকে হীন রমণী ব'লে মনে করে না, বরং সে তাঁকে আরও বেশী শ্রদ্ধা ও সম্মান করে!

তখন ভাইভী অধৈর্য্য হ'য়ে বলে উঠল "তোমরা জাননা যে আমার মা কি? তাই এ কথা বলতে পারছ'! আমি তোমাদের এখনি দু'কথায় তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু কি ক'রবো আমার ঠোঁটের আগে সে কথা এলেও আমি মুখে তা উচ্চারণ করতে পারছিনি! স্ত্রীলোকের

মুখে সে সব কথা উচ্চারিত হওয়া নিষেধ! আঃ সভ্যতার এই অন্যায় বিধানগুলো আমাকে যেন পাগল করে তোলে!"

তারপর ভাইভী একখানা কাগজ টেনে নিয়ে তাইতে তার মা'র এবং সার জর্জ্জ ক্রফ্‌টসের কীর্ত্তি-কলাপ সব লিখে তাদের জানালে। জানাবার আগে প্রেড তাকে নিষেধ করেছিল, বলেছিল মা'র কলঙ্ক কথা কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কাণে না তোলাই ভাল। কিন্তু ভাইভী তার সঙ্গে একমত হ'তে পারেনি। ভাইভী বলেছিল—সে যতদিন বেঁচে থাকবে—বিশ্বের লোককে ডেকে তার এই লজ্জার কথা সে বলবে, সে এদের কলঙ্ক এদের ললাটে এমন করে দেগে দেবে যে—আজ যে লজ্জা—যে গ্লানির অসহ্য যন্ত্রণায় সে মনে প্রাণে দগ্ধ হচ্ছে—তার জ্বালাটা তারাও যাতে একটু অনুভব করতে পারে।

শ্রীমতী ওয়ারেণের ব্যাপার শুনে ফ্রাঙ্ক ও প্রেড দুজনেই ব'ললে যে—তারা ভাইভীর দুঃখ বুঝতে পেরেছে। তা'রা তা'র তেজস্বিতা ও সাহসের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছে না, তা'রা—বরাবর ভাইভীর চির-অনুগত হ'য়েই থাকবে।

এই সময় ভাইভী একবার নিজেকে সামলে নেবার জন্য "এখনি আস্‌ছি আমি, তোমরা একটু অপেক্ষা করো।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তখন ফ্রাঙ্ক আর প্রেডের মধ্যে—তা'রা ভাইভীর কাছে এইমাত্র যা শুন্‌লে, তাই নিয়ে একটু আলোচনা চ'ল্‌লো! ফ্রাঙ্ক কথায় কথায় বললে, "তাই ত' প্রেড্, এরপর আমি ত' আর ওকে বিয়ে করতে পারিনি!"

প্রেড—"এখন যদি তুমি ওকে ত্যাগ করো—তাহ'লে তোমার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় করা হবে ফ্রাঙ্ক! তা আমি বলে দিচ্ছি!"

ফ্রাঙ্ক তখন প্রেডকে বুঝিয়ে দিলে যে সে শ্রীমতী ওয়ারেণের অনেক টাকা আছে জেনেই ভাইভীকে বিবাহ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল, কিন্তু আর তো সে অগ্রসর হ'তে পারে না। বুড়ীর ও টাকা তো সে আর ছুঁতে পারবে না! ভাইভীকে যদি সে এখন বিয়ে করে তাহ'লে তাকে স্ত্রীর উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করেই জীবন ধারণ করতে হবে! প্রেড তাকে বোঝালে যে, সে ছেলেমানুষ! এখনও সমস্ত জীবন তার প'ড়ে রয়েছে সম্মুখে, এমন বুদ্ধিমান চালাক ছেলে সে! ইচ্ছে করলে অনায়াসে সেও যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পারবে।

ফ্রাঙ্ক বল্‌লে—হ্যাঁ, তা সে পারবে, কিন্তু সে বড় শক্ত কাজ! জুয়া খেলেই সে কেবল উপার্জ্জন ক'রতে পারে। কিন্তু তারই বা দরকার কি? ও যেমন থাক্‌তে চায় থাক্, আমি ওর আশা ছেড়ে দিয়ে ওর 'ভাই' হ'য়েই থাকবো। মাঝে মাঝে এসে দেখে-শুনে যাবো।

এমন সময় মেয়ের খোঁজে শ্রীমতী ওয়ারেণও এসে উপস্থিত হ'লেন সেখানে।

তখন ফ্রাঙ্ক আর প্রেড বিদায় নিয়ে চলে গেল। এবং মা'য়ে ঝী'য়ে আবার একটা বোঝাপড়া সুরু হ'ল।

শ্রীমতী ওয়ারেণ জানতে চাইলেন যে ভাইভীর কি হয়েছে? সে কেন তাঁকে না ব'লে পালিয়ে এসেছে? সার জর্জ্জ ক্রফটস্‌কে সে কি বলেছে? সার জর্জ্জ ক্রফটস্ কিছুতেই তাঁর সঙ্গে এখানে আসতে চাইলে না, উল্টে তাঁকে শুদ্ধ সে ভাইভীর কাছে আসতে বারণ করছিল! ক্রফটসের তাকে এত ভয় কেন? আর এরই বা মানে কি? হাত খরচের টাকা সে এবার ফেরত দিয়েছে কেন? ও টাকায় যদি তার না কুলোয় তাহ'লে বললেই তো হ'তো, তিনি না হয় ওটা বাড়িয়ে ডবল করে দিতেন!

ভাইভী এ কথার উত্তরে তার মাকে কঠোরভাবে জানিয়ে দিলে যে এখন থেকে সে স্বকৃত উপার্জ্জনের অর্থে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ করবে। আজ থেকে তার সঙ্গে ভাইভীর আর কোনও সম্বন্ধ থাকবে না! শ্রীমতী ওয়ারেণ কাতরভাবে বললেন—যে সে হতভাগা বুড়ো কি বলতে কি বলেছে ভাইভীকে, ভাইভী কেন তাই শুনে এমন করছে? তিনি তো তাঁর জীবনের সমস্ত ইতিহাসই তাকে বলেছেন, সে তো সব শুনে তার মা'কে ক্ষমা করেছে। তবে কেন—

ভাইভী এবার তার মাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে ক্ষমা করেছিল তাঁর অপরাধ, কারণ, সে শুধু শুনেছিল যে, কেমন করে তার মা এপথে এসেছিলেন। কিন্তু সে তো জানতো না যে তার মার এখনও এই পেশা?—এ মাকে সে চায় না, এ মার টাকাও সে আর ছোঁবে না, মুখও আর দেখবে না। এই বলে সে শ্রীমতী ওয়ারেণকে বিদায় করে দিলে। এইখানেই নাটকের যবনিকা।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

৩৯

মানুষ যেখানে অত্যন্ত বেশি আশা করে, সেখানে প্রায়ই তাহাকে নিরাশ হইতে হয়। লীলার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল! এ সপ্তাহের প্রতি দিনটি সে একান্ত আশা করিতেছিল যে কিরণের উৎসবের দিনটা সে সমস্ত দিনটি সম্পূর্ণ উপভোগ করিবে। সেদিন সে সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ কিরণের কাছে কাছে থাকিয়া তাহার সব কাজে সাহায্য করিবে,—সেই বহুদিন পূর্ব্বের অতীত কালের মত। যাহার সঙ্গে সে অল্প দিনের মধ্যেই চিরকালের মত বিচ্ছিন্ন হইবে, বিদায়ের আগে একটি দিন ঠিক আগের মত তাহার সঙ্গে বন্ধুভাবে কাটাইবার আশা ও আনন্দ তাহাকে উৎফুল্ল করিয়া তুলিয়াছিল। অরুণও সেখানে উপস্থিত থাকিতে রাজি আছে। সকলে মিলিয়া রান্না খাওয়া, ক্লাবঘর সাজান ইত্যাদি আমোদে তাহাদের সে দিনটি অতি আনন্দে কাটিবে!

কিন্তু সেই বিশেষ দিনেই অরুণের ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর হইল—মাথায় প্রবল বেদনা হইল। তবু সে লীলাকে যাইতে অনুরোধ করিল। তাহার আমোদ ও আনন্দ নষ্ট করিতে অরুণের ইচ্ছা হইল না। চাকররা তাহার আবশ্যক কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবে, আর মিসেস রায় একটু দেখিলেই চলিবে।

কিন্তু লীলা এ সব কথায় কাণ দিল না। অরুণ তাহার একান্ত আপনার জন—সে অসুখের জন্য বিছানায় পড়িয়া থাকিবে, আর লীলা নিশ্চিন্ত মনে তাহাকে ফেলিয়া আমোদ করিতে যাইবে, সে কখনো হইতে পারে না। কাজেই বীণা একলা গেল,—লীলা তাহার অনুপস্থিতির কারণ ভাল করিয়া কিরণকে বুঝাইয়া বলিতে বীণাকে অনুরোধ করিল।

অরুণ বলিল, আমার জন্য তোমার আজকার আনন্দটা মাটি হয়ে গেল—আমার এমন দুঃখ হচ্ছে!

আমোদটাই কি এত বড় জিনিস অরুণ? তুমি রোগের যাতনায় বিছানায় পড়ে ছটফট করছো, তা জেনেও আমি সেখানে গিয়ে সুস্থচিত্তে আমোদ করতে পারি?

অরুণ বলিল—সে কথা সত্য! তুমি চলে গেলে আমার অসুখ আরো দ্বিগুণ বলে মনে হত। তুমি যদি কাছে থাক, তাহলে বহুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হলেও আমি কাতর হই না।

সেদিন সমস্ত দিন লীলা অরুণের ঘরেই কাটাইল। তাহার শীতল কোমল হস্তে অরুণের মাথা টিপিয়া, তাহাকে খাওয়াইয়া, গল্প করিয়া বই পড়িয়া শুনাইয়া সমস্ত দিন কাটিয়া গেল।

বৈকালে অরুণের জ্বর ছাড়িয়া গেল, ও সে একটু সুস্থ হইল। তখন সে আবার লীলাকে উৎসবে যাইতে অনুরোধ করিল। লীলা এবার আর কোন আপত্তি না করিয়া তাহার পিতা মাতার সঙ্গে ক্লাবে গেল। বহুদিন পরে আবার এই উৎসব-গৃহের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আসিয়া লীলার এতদিনের জমানো বিষাদের ভার যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল।

ছোট ছোট শিশুগণে পূর্ণ একটি হলের মধ্যে দাঁড়াইয়া লীলা আবার নিজেকে তাহাদেরই মত একটি শিশু বলিয়া মনে করিল। তাহাদের আনন্দ উৎসবে লীলা ঠিক তাহাদেরই মত লঘু প্রফুল্ল চিত্তে যোগ দিল। হলের ভিতর দাঁড়াইতেই কিরণের সঙ্গে একবার তাহার দেখা হইল।

তখন কিরণ বড় ব্যস্ত,—লীলার কাছে দাঁড়াইবার বা তাহার সঙ্গে কথা বলিবার তাহার সময় ছিল না। সে একবার সেই উচ্চ কোলাহল-মুখরিত গৃহে লীলার উৎফুল্ল মুখ, ও হাসিভরা স্নিগ্ধ চোখের দিকে সস্নেহে চাহিয়া তৃপ্ত ও প্রসন্ন চিত্তে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

উজ্জ্বল আলোকমালায় ভূষিত গৃহে গৃহে নানাবিধ শিশু-

জনোচিত খেলা ও আমোদের আয়োজন ছিল। ম্যাজিক, বায়স্কোপ, ব্যাণ্ডখেলা ইত্যাদি সব শেষ হইলে ভোজ আরম্ভ হইল।

সমস্ত শেষ হইলে বীণা, চৌধুরী ও তাহার অন্য বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করিতেছিল,—কুমার গুণেন্দ্রভূষণ সেই অবসরে গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে বীণার দিকে অগ্রসর হইল।

লীলা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল! তাহার নিজের হস্তের আঘাত কুমারের সুগৌর মুখের উপর চামড়া কাটিয়া একটি লম্বালম্বি গভীর কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে!

কুমার বীণার সঙ্গে এমন ভাবে কথা কহিতেছিল, যেন তাহারা সবে মাত্র কিছুক্ষণ আগে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। চৌধুরী তাহাদের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া মুখ অন্ধকার ও গম্ভীর করিয়া দূরে সরিয়া গেল। বীণার অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবরাও একে একে অন্যদিকে চলিয়া যাইতে কুমার ও বীণা সেখানে একলা বসিয়া রহিল।

লীলার মনে হইল, কুমার কোন বিষয় বীণাকে দৃঢ় ভাবে বলিতেছে ও বীণা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

লীলা তখনি উঠিয়া বীণাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য দাঁড়াইল। ঠিক সেই সময় কিরণ একটু অবসর পাইয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিল; বলিল, একটু দাঁড়াও লীলা! সন্ধ্যা থেকে একবারও তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে সময় পাই নি! বোস এইখানে! দুটো কথা বলা যাক্! কোথায় যাচ্ছিলে তুমি? দরকার আছে কিছু?

লীলা বলিল, কিরণ! বীণার সঙ্গে কুমারের এত মেশামেশি আমি মোটে সহ্য করতে পারি না! তুমি বোসো একটু! আমি বীণাকে ওর কাছ থেকে ডেকে আনি।

কিরণ লীলার হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইল; বলিল, থাকতে দাও না। এখানে ও বীণাব কোন ক্ষতি করতে পারবে না! তুমি আবার অতিরিক্ত সাবধানী হয়ে উঠেছ!

লীলা তবুও বলিল, আমি ও লোকটাকে একটুও বিশ্বাস করি না। যেমন ইতর, তেমনি জঘন্য কথাবার্ত্তা ও ব্যবহার! কিরণের এ সম্বন্ধে কোন আগ্রহ ছিল না। বীণাকে সে মনে মনে ঘৃণা করে, আর কুমার ত কথা বলিবারও উপযুক্ত নয়! সে শুধু লীলাকে চায়··লীলার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই সে উৎসুক! এখন সকলেই নিজের কথায় ব্যস্ত···নিভৃতে কথা বলিবার সুযোগ এখনকার মত আর পাওয়া যাইবে না।

তাই কিরণ লীলাকে যাইতে না দিয়া বলিল, এখান থেকে ওদের উপর নজর রাখ! তুমি আজ দিনভোর এলে না··· সব আমোদটাই মাটী হয়ে গেল!

কি করে আসি বল? অরুণের অত জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা,—তাকে একলা ফেলে কি আসা যায়? কিন্তু বীণা ত বলছিল আজকার দিনটা খুব আনন্দে কেটেছে। আমোদ মাটি হল তবে কি করে?

বীণার কথা ছেড়ে দাও! তাকে···কিম্বা তার কোন কথা আমি গ্রাহ্য করি না। আমার আমোদ কেন নষ্ট হল··· তাও কি তোমায় বলে দিতে হবে? কিরণ গভীর দৃষ্টিতে লীলার মুখের দিকে চাহিল।

তাহার সেই দৃষ্টিতে অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া লীলা মুখ নীচু করিয়া বলিল···আজ দিনভোর তোমাকে একলা অনেক খাটতে হয়েছে···নয়? মেয়েরা এসে কি তোমায় কোন সাহায্য করে নি?

কিরন বলিল, লীলা! বাজে কথা বলে সময় নষ্ট কর না! আমার তোমাকে বলবার অনেক কথা আছে! আজ কয়েকদিন থেকে আমার মনে নূতন একটা কথা উঠেছে! তোমায় বলতে আমি সময় পাচ্ছি না। তুমি বড় অন্যায় পথে যাচ্ছ···লীলা!

লীলা এবার বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল!

কিরণ বলিল···আমি বুঝতে পারছি না লীলা! কেন তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছো! তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না? আমি আবার বলছি···তুমি জীবনের পথে মস্ত বড় ভুল করছো···

লীলা মুখ ফিরাইয়া গম্ভীর হইয়া বলিল,···আমাদের এ সব কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো কিরণ!

না! তা নয়! এ বিষয় বেশ ভাল করে ভেবে ও বুঝে দেখে আলোচনা করা উচিত! এটা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবার জিনিস নয় লীলা! কিরণ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল · তোমার খুব পরিষ্কার করে বোঝা উচিত·· যে তুমি কি করতে যাচ্ছ! অন্য দিক দিয়ে এ ব্যাপারটা দেখ দেখি ···তুমি অরুণকে এখনো ঠকিয়ে যাচ্ছ কি না?

লীলা এবার অত্যন্ত রূঢ়ভাবে তাহার দিকে চাহিল… কিরণ!

কিরণ বলিল…তুমি না বল যে সর্ব্বদা ন্যায় ও সত্যের পথে চলো? আর এটা কি হচ্ছে? তুমি অরুণকে বোলছো যে তুমি তাকেই ভালবাস, সে তাই বিশ্বাস করে' আনন্দে আছে! আর তোমার মনের সত্য কথাটা কি? যাকে তুমি ভালবাস… সে অরুণ নয়…সে…

লীলার মাথা তাহার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল! সে দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া মৃতবৎ নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল! কিরণের মুখে সে অবশিষ্ট কথাটি শুনিবার মত তাহার সাহস বা ধৈর্য্য ছিল না। এ কথা যে সবই সত্য—মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করিবার উপায় তো তাহার নাই! কিন্তু সে কিই বা করিতে পারে?

কিরণ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, কেন তুমি এমন করছো লীলা? কেন ভেবে দেখছো না? একজনের জন্য দু-দুটো জীবন নষ্ট করা কোন সৎগুণের পরিচায়ক নয়। অরুণ মানুষের মতই তার এ নিরাশা সহ্য করবে। সে তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। যখন সে অন্ধ ছিল, তখন তার যাতনা ও অভাব আমি ভাল করেই বুঝেছিলুম। তার যে তখন তোমাকে কত দরকার, সে কথা ত আমি তোমার মতই বুঝেছিলুম… লীলা? সেদিন তাকে হিংসা করবার আগে আমি নিজেকে গুলি করতেও দ্বিধা করতুম না। কিন্তু আজ আর ত সে দিন নেই? এখন কেন আমরা দুজনে তার জন্যে এত সহ্য করবো বল?

লীলার দ্রুত হৃৎস্পন্দন তাহার কথা বলাব অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিল! সে যে এই সব অনুচিত কথা বন্ধ করিয়া দিবে, সে শক্তিও তাহার ছিল না! কিরণের প্রস্তাব ও সে নিরাশা যে অরুণ সহ্য করিতে পারিবে না, তাহা লীলা খুব জানে। সে সৈনিক, সে বীর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে নারী অপেক্ষাও কোমল। এ আঘাত সহ্য করা তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

বহুক্ষণ পরে সে একটু সংযত হইয়া মাথা তুলিল; বলিল, কিরণ! তুমি কি চাও যে আমি আমার সম্মান নষ্ট করি?

কিরণ বলিল, না লীলা! আমি চাই—তুমি তোমার নারীত্বের সম্মান বজায় রেখে চলো! আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝছো না!

লীলা দৃঢ়স্বরে বলিল, আমি বুঝেছি! তুমিও আমার কথা বোঝ—কিরণ! আমি বিশ্বাস করি, মানুষ যখন একবার তার কথা দেয়—তখন সে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয়। সে তখন—ঘটনাচক্র যাই হোক—সেই কথা মত চলতে বাধ্য। আমি আমার কথা দিয়েছি—যখন সে অন্ধ ছিল, তখন আমি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় অযাচিত ভাবে তাকে সুখী করতে গিয়েছিলুম। আমার সে কাজ সার্থক হয়েছে—আমি যা আশা করেছিলুম, তার চেয়ে সে ঢের বেশী সুখী হয়েছে। তার দৃষ্টি সে যে আবার ফিরে পেয়েছে—সেও শুধু তার মন সুস্থ হয়েছে বলে। তা ছাড়া, আমি জানি, সে চোখে দেখতে পেলেও, আমায় কি রকম ভালবাসে—তার যে এ আঘাত কত লাগবে, ও তার কত ক্ষতি আবার হওয়া সম্ভব—এ জেনেও কি আমি তাকে ছেড়ে অন্য কোনও অবস্থায় কখনো সুখী হতে পারবো? তুমিই বলো?

কিরণ বলিল, লীলা! আমি আবার বলি—আমার কথাটা তুমি ভাল করে বোঝ! তোমার উচিত—যাকে তুমি বিবাহ করবে বলে কথা দিয়েছ, সর্ব্বান্তঃকরণে তাকেই ভালবেসে তাকে বিবাহ করা;—তাকে বঞ্চনা করা তোমার উচিত নয়। আমি চাই, এ ক্ষেত্রে তুমি নিজের মনের বলের উপর নিভর করে চলো। তাকে সব কথা খুলে বলো! সব কথা তার জানা উচিত নয় কি? এমন লোক সংসারে কে আছে, যে,—যে মেয়ে অন্য লোককে ভালবাসে বলে নিজে স্বীকার করছে—যতই তাকে ভালবাসুক—তাকে বিবাহ করতে চায়?

লীলা আবার উভয় হস্তে মুখ ঢাকিল। তাহার মনের বল ক্রমেই কমিয়া আসিতেছিল। কিরণের কাছে থাকিলে ও তাহার এই সব একান্ত অনুরাগের কথা শুনিলে লীলার পক্ষে মনের ধৈর্য্য রাখা দায় হইয়া ওঠে।

তাহাকে নীরব দেখিয়া কিরণ নিরাশার স্বরে বলিল—আমি দেখছি, তুমি ইচ্ছা করে দিন দিন আমায় ভুলে যাচ্ছ! তোমার উপর অরুণের কোন অধিকার নাই—তোমার উপর সম্পূর্ণ অধিকার আমার! ভালবাসাই কেবলমাত্র এ অধিকার দিতে পারে! লীলা! শুনছো কি? আমি তোমায় কিছুতেই তার হাতে ছেড়ে দিতে পারবো না! আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, মন আমার নিয়ত

এই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেছে! আর আমি পারি না! কিন্তু তুমি কেন সর্ব্বক্ষণ কেবল তার কথাটাই ভাবছো? আমার কথা—যাকে তুমি ভালবাস,—তার দিক একবারও দেখছো না কেন? এ কথা কি তুমি অস্বীকার করতে পার? লীলা! মুখ তোল! আমার দিকে ফিরে চাও!

লীলা মুখ তুলিতে সাহস করিল না! তেমনি হাতে মুখ ঢাকিয়া নিস্পন্দের মত পড়িয়া রহিল! পিছনের জানালা হইতে মৃদু বাতাস তাহার কুন্তলজাল উড়াইয়া বহিতেছিল। সে মুহূর্ত্তে তাহার দৃষ্টির উপর হইতে বীণা, কুমার, জনতা ও উৎসবের সমস্ত চিত্র মুছিয়া গেল! আর সমস্ত শব্দ ডুবাইয়া দিয়া কেবল কিরণের প্রেমপূর্ণ কণ্ঠস্বর তাহার কাণে মধুর—মধুরতর সুরে বাজিতে লাগিল! অরুণের তাহার প্রতি অন্ধ অনুরাগ, তাহার কোমল হৃদয়, তাহার আবার অন্ধত্ব পাইবার সম্ভাবনা—সবই ভুলিবার উপক্রম হইল। এই দুস্তর বিপদের মুখে পড়িয়া লীলা অত্যন্ত দীনভাবে তাহার সাহস ও শক্তি ফিরিয়া পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিল। সে মুখ তুলিল না। কিরণের কথার কোন উত্তর দিল না।

কিরণ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বলিল, লীলা! মুখ তোল! আমার কথা শোন! যেদিন তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়, তার পর থেকে এক একটি দিনের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকটি কথা আমার মনের ভিতর দাগ দেওয়া রয়েছে! কোন দিন সে সব কথা ভুলতে পারবো না! যেদিন তুমি রাজবাড়ীতে জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে, সে কথা? সেদিন আমি তোমাকে একান্তভাবে আমারই বলে জেনেছিলুম,—আমি কখনো ভাবিনি, আর কেউ এসে সহসা তোমাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে! লীলা! সত্য করে বল, কেন তুমি আমি দুজনেই তার জন্য এত বড় জীবনব্যাপী ত্যাগ করতে যাব? আমি তোমায় ভালবাসি! সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে! বোঝ—ভুল করো না! চাও আমার দিকে!

কিরণ লীলার চোখে তাহার মনের কথা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিছুক্ষণ জোর করিবার পর কিরণের প্রবল আকর্ষণী শক্তির প্রভাবে লীলা অবশেষে মুখ তুলিতে বাধ্য হইল, ও একান্ত অনুনয়পূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

ছেলেরা দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতেছিল,—দিকে দিকে তাহাদের আনন্দপূর্ণ উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছিল। হলের মধ্যে কে পিয়ানোর সহিত উচ্চকণ্ঠে গান ধরিয়াছে!

লীলা কথা বলিতে যাইবে, এমন সময়ে সমস্ত গোলমাল ও চীৎকারের শব্দ ছাপাইয়া সহসা রমণীকণ্ঠনিঃসৃত উচ্চ আর্ত্তনাদের শব্দ চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিল।

লীলা ও কিরণ সেই মুহূর্ত্তে নিজেদের কথা ভুলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল! আর সকলেও যে যেখানে ছিল, সবাই ছুটিয়া আসিল! তাহারা সভয়ে দেখিল, চারিদিকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা তীব্র দীপ্তি বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে! তাহার মধ্যে এক নারী উন্মত্তের মত ছুটাছুটি করিতেছিল! তাহার দেহের পরিচ্ছদের সর্ব্বত্র আগুন জ্বলিতেছে।

চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি উঠিল! লোকেরা ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইল! ছেলেদের টানিয়া আনিয়া নিরাপদ স্থানে ফেলা হইতেছিল, কারণ আগুন ক্রমশঃ দরজার দিকে পর্য্যন্ত আগাইয়া আসিতেছিল!

অগ্নিদগ্ধা নারী ভয়ে আতঙ্কে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পাগলের মত যত চারিদিকে ছুটিতেছিল, বাতাসে তাহার বস্ত্রের আগুন ততই প্রদীপ্ত হইয়া দ্বিগুণবেগে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছিল! বাতির উজ্জ্বল আলো তাহার মুখে পড়িতে লীলা সভয়ে দেখিল—সে বীণা!

কিরণ দেখিয়াই তখনি সম্মুখে লাফাইয়া পড়িল! দরজার পর্দ্দা ছিঁড়িয়া লইয়া সে বীণাকে চাপিয়া ধরিতেই অনেকে নিজের কোট ও জামা খুলিয়া ছুঁড়িয়া দিতে লাগিল। কিরণ তাহাকে সেই সব কাপড় দিয়া ঢাকিয়া সজোরে মেঝের উপর শোয়াইয়া রাখিল। তাহার নিজের হাত এই কাজে পুড়িয়া ঝলসাইয়া যাইতেছিল। বীণা কিন্তু তাহার হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য বিষম ধ্বস্তাধ্বস্তি করিতেছিল। কিছুক্ষণ হুড়াহুড়ির পর সে হীনবল ও অচৈতন্য হইয়া মৃতবৎ মেঝের উপর লুটাইয়া পড়িল।

তাহার পোষাক দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, মুখ এমন ভীষণভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে যে চিনিবার কোন উপায় ছিল না। সে বীভৎস দৃশ্যের দিকে চাহিবার কাহারও শক্তি ছিল না।

লীলা উচ্ছ্বসিত অশ্রুর আবেগে অন্ধপ্রায় হইয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল, ও বার বার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল।

মিসেস রায় গোলমাল শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রিয়তমা কন্যার এই দশা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মিঃ রায় অন্য ঘরে ব্রীজ খেলায় ব্যস্ত ছিলেন। ব্যাপার শুনিয়া তিনি সদলে ছুটিয়া আসিলেন, ও তাঁহার খেলার সঙ্গী জেলার সিভিল সার্জ্জন তখনি বীণার চিকিৎসায় নিযুক্ত হইলেন। কিরণ লীলাকে টানিয়া বারাণ্ডায় লইয়া আসিতেছিল। লীলা অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতেছিল। বীণার সমস্ত চাঞ্চল্য, সব দোষ সে ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল সে যে তাহাকে চিরদিন কত কঠোর কথা বলিয়াছে, কত অপ্রিয় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাই তাহার মনে পড়িতেছিল। সে যে বীণার নির্ব্বুদ্ধিতা ও শত দোষ সত্ত্বেও তাহাকে বড় ভালবাসিত!

বীণা কি বাঁচবে না কিরণ? অশ্রুসজল নয়ন তুলিয়া লীলা বলিল—এ রকম করে পুড়ে গেলে মানুষ কি বাঁচে?

কিরণ গম্ভীরমুখে বলিল—মন্দ কথাটাই আগে ভাবছো কেন লিলি? যতক্ষণ জীবনের কণামাত্র থাকে ততক্ষণ আশাও করা যায়।

আমি কি রাগী ও অসহিষ্ণুস্বভাব কিরণ? কত যে তাকে বকেছি, কত অন্যায় করেছি, সে আর কি বোলবো? সে যদি না বাঁচে, আমি কোন দিন নিজেকে মাপ করতে পারবো না।—তাহার চোখের জল আবার দ্বিগুণ বেগে বহিল।

কেন কাঁদছো লিলি? এতে ত তোমার দোষ কিছুই নেই। দোষ দেখলে সব আত্মীয়-স্বজনই বকে থাকে। কিরণ শান্তভাবে কথাটা বলিল। তাহার পূর্ব্বের সে প্রেমিকের আচরণ ও কথাবার্ত্তা সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। বিপদের দিনে সে এই পরিবারের চিরদিনের বন্ধুভাবেই লীলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ডাক্তার বীণার পিতামাতা ছাড়া আর সকলকে সে গৃহ হইতে সরাইয়া দিয়াছিলেন। আশে পাশে দাঁড়াইয়া সকলে চুপি চুপি কথা বলিতেছিল। মুখে মুখে গল্প বাড়িয়া চলিল—"কুমারের সঙ্গে একটা আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো। হঠাৎ একটা জ্বলন্ত মোমবাতি খসে তার কাপড়ে পড়ায় এই কাণ্ড ঘটলো।"

"না! না! তা নয়! সে অন্যমনে কথা বলতে বলতে একটা জ্বলন্ত বাতির উপর এসে পড়েছিলো। কাপড় ধরে গেছে, তবু অন্য লোক না দেখা পর্য্যন্ত সে জানতেই পারে নি।"

"কাপড়ের কোণটা একটু ধরেছিল। প্রথমে কুমার স্বচ্ছন্দে সেটুকু নিবিয়ে দিতে পারতো। কেবল বীণা ভয় পেয়ে ছুটোছুটি করতে গিয়েই বাতাসে বাতাসে আগুন জোরে ধরে উঠলো।"

"আরে রাখ তোমার কুমারের কথা! সে কি একটা কম কাপুরুষ! এমন একটা কাণ্ড ঘটলো,—তুই পুরুষ মানুষ সঙ্গে রইছিস্—কোথায় তৎপর হয়ে আগুনটা নিভানোর চেষ্টা করবি—না, ব্যাপার দেখে ভয়ে অস্থির! আমি আমার স্বামীর জন্য বিলিয়ার্ড-রুমের দরজায় অপেক্ষা করছিলুম—সে দেখি তখন হল্ থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছে! কিরণ না এসে পড়লে আরো যে কি কাণ্ড হতো, তার ঠিক নেই!"

বীণার তৎকালীন চিকিৎসা ও ব্যাণ্ডেজ করা শেষ হইলে তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ গাড়িতে তুলিয়া ধীর মৃদুগতিতে বাড়ীর দিকে লইয়া যাওয়া হইল। মিঃ রায়ের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

কুমার যে এই গোলমালে কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। (ক্রমশঃ)

শিকার-কাহিনী

শ্রীগণনাথ-রায়

অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম যে পূজার ছুটিটা কবে আসবে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাজের মধ্যে দিয়ে দিনগুলো যে কি রকমে কেটে গেল তা ভেবেই পাচ্ছি না। অবশেষে পূজার ছুটি সত্যি সত্যিই এল। চারদিকে দেখি যে সকলেই পূজার ছুটিতে বাড়ী, না হয়ত হাওয়া খেতে কোথাও চলেছেন। এই সব দেখে আমার ইচ্ছা হল, আমিও কোথাও গিয়ে গায়ে একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি। কোথায় যাব তা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই দু চারদিন কেটে গেল। এমন সময় হঠাৎ একখানা চিঠি পেলাম। চিঠিটা পেয়ে বুঝলুম যে, আমার মাতুলমহাশয় নিশ্চয় কিছু চেয়ে পাঠিয়েছেন। চিঠিটা খোলা গেল। চিঠি খুলে দেখ্‌লাম যে, তিনি আমায় ক্যাম্পে শিকারে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছেন। পাছে উত্তর পৌঁছাতে দেরী হয় বলে, তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করে দিলাম। তাড়াতাড়ি করে সব গুছিয়ে নিয়ে সাহেবদের মত ৫ মিনিট আগে গুরুজনের কাছে বিদায় নিয়ে মনের আনন্দে রওনা হলাম।
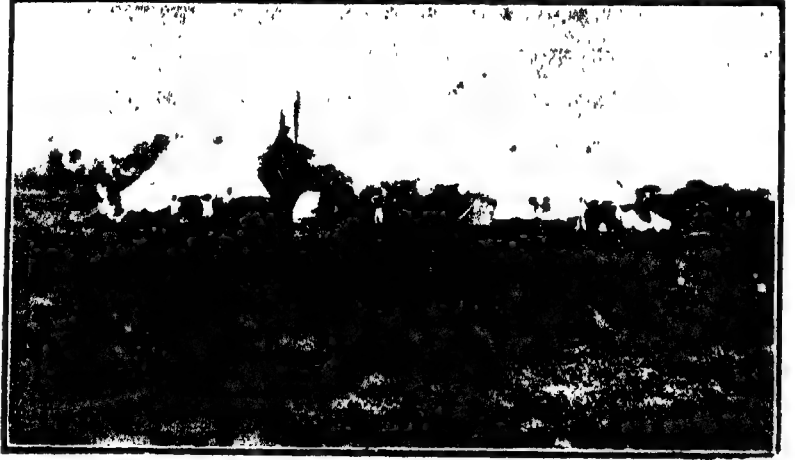
আমাদের ক্যাম্প

নৌ-বিহার

রেল গাড়ীতেও পূজার ভীড়—কোন রকমে বসবার একটু জায়গা করে নিলাম। গাড়ী ত ছাড়ল। গাড়ীতে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে করতেই প্রায় রাত্রি ২টা বাজল। ক্রমশঃ সকলেই ঢুল্‌তে সুরু করলেন। ঢুল্‌তে ঢুল্‌তে মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকির যোগাড় হয়ে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পরেই সকলেই প্রায় নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়লেন। পরে ক্রমশই উত্তর দিক্‌টা লাল হতে দেখে ভাবলাম, এইবার বুঝি ভোর হয়। উঠে দেখি, চারধারে পাখীগুলি উড়ে বেড়িয়ে গান গাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আমি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম।

গাড়ীর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে মাতুলালয়ের দিকে চলিলাম।

মামার বাড়ীতে দুএক দিন থাকার পর আমরা ক্যাম্পে যাবার জন্য যাত্রা করলাম। ক্যাম্পে যাবার রাস্তা

মর্ণিং টি

কল্‌কাতার রেডরোডের মত নয়। সে রাস্তায় আবার গরুর গাড়ীও সব সময় চলে না—হাতীর পিঠেই যেতে হয়। হাতীর পিঠে চড়া কখনও অভ্যেস ছিল না। প্রথম দিন হাতীর পিঠে চড়ে গায়ে ব্যথা হয়েছিল। সকালে হাতীর পিঠে চড়ে গোধূলির পরে ক্যাম্পে পৌঁছিলাম। তখন পরিশ্রান্ত হয়ে কিছু আহার করে শুয়ে পড়লাম।

গাঢ় নিদ্রায় রাত্রিটা কেটে গেল। সকালে উঠে দেখি, চারধারে এক নূতন দৃশ্য। ক্যাম্পের চারধারে বেড়াতে লাগলাম। ক্যাম্পটা তুটো নদীর ধারে ফেলা হয়েছিলো। ক্যাম্পের চারধারে বড় বড় গাছ আর ঘন বন। কিছুক্ষণ পরে ক্যাম্পের অন্যান্য লোকেরা আলস্য ত্যাগ করে বিছানা ছেড়ে বাহিরে এলেন। তার পর কিছু খাওয়ার বন্দোবস্ত করা গেল। খাওয়া শেষ হলে নৌকায় ঘুরতে বেরোন হল। তার পর ক্যাম্পে ফিরে এসে স্নানের বন্দোবস্ত করা গেল। কেউ কেউ নদীতে লাফিয়ে পড়লেন। আর কেউ বা ক্যাম্পের ভিতরে স্নান করলেন।

আমাদের স্নানের পর হাতীদের স্নানের পালা পড়ল। হাতীর স্নান বড় মজার ব্যাপার। মানুষ যে ঢালু পথে নাম্‌তে একটু সতর্ক হয়ে থাকে, হাতী কিন্তু সে ঢালু পথে বেশ স্বচ্ছন্দে নেবে যেতে পারে দেখা গেল। হাতী জলে পড়ে যেন স্বর্গ পেল; মনের আনন্দে জল নিয়ে খেলা সুরু করে দিল।

বিকালে শিকারে যাবার ব্যবস্থা করা গেল। কোথায় যাব, কি শিকার কর্‌তে যাব, এই রকম ভাবতে ভাবতেই বেলা প্রায় যায় যায় হয়ে দাঁড়াল। আমরা বেশী দূরে না গিয়ে কাছেই পাখী শিকার কর্‌তে গেলাম। কতকগুলি পাখী শিকার করে ক্যাম্পে ফেরা গেল।

হাতীর জলকেলী

প্রাতঃকালে, উঠেই আবার শিকারে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌তে আরম্ভ করলাম। এমন সময় বাহিরে "হুজুর" "হুজুর" ডাক শুনলাম। বাহিরে বেরিয়ে দেখি—এক চাষী দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে, সে কি একটা কথা বলল—আমি ত প্রথমে বুঝতে পার্‌লাম না; কিছুক্ষণ পরে, তার কথার ভাবে বুঝলাম, সে একটা বুনো শুয়োরের খবর এনেছে। মনে বড়ই আহ্লাদ হলো। বিশেষ ভদ্রতা করে তাকে বস্‌তে বললাম। তাড়াতাড়ি মাহুতকে হাতী আন্‌তে বললাম। তখন প্রায় সকলকে ব্যস্ত করে তুলেছিলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা সকলে যাত্রা করলাম; প্রায় ২০।৩০ মিনিটেই আমরা গন্তব্য স্থানে—একটী ধানক্ষেতে পৌঁছিলাম। আমার মাতুল মহাশয় হাতীকে যে রকম করে দাঁড় করাতে বলেছিলেন, আমরা হাতীকে সেই রকমে দাঁড় করালাম। তার পরে একটী হাতী সমস্ত ধানক্ষেত খুঁজতে সুরু করে দিলে। আমি দেখলাম, দূরে কতকগুলি ধানের শিষ নড়ে নড়ে চোলেছে। আমি ভাবলাম এটা পবনদেবের খেলা; এই ভেবে চুপ করে রইলাম। তার পর কিছুক্ষণ চলাফেরা করতে করতে একবার দেখলাম—ভাগ্যক্রমেই আমার মাতুল মহাশয়ের হাতীর সাম্‌নেই ধানের শিষগুলি নোড়ে উঠল। মাতুল মহাশয় বল্লেন, "এইবার পাওয়া গেছে, এইবার ঘিরে ফেল।" আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ছোট ছেলেটির মত জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায়—আমি ত দেখতে
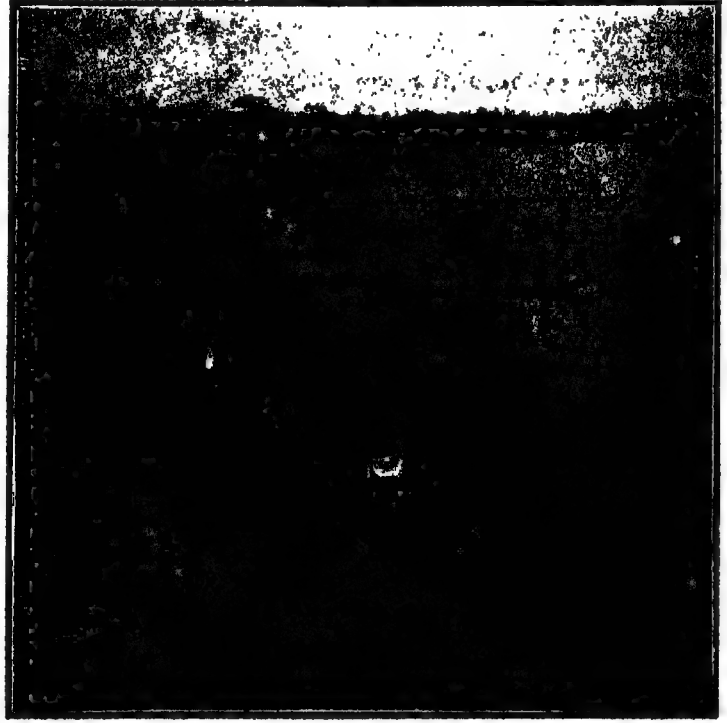
নদীতে স্নান-পর্ব্ব

হাতী স্নানের পথে

পাচ্ছি না।” মাতুলমহাশয় হেসে বল্লেন, “ওরে, কল্‌কাতার বাঙ্গালরা দেখতে পায় না।” আমি লজ্জা বাঁচাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বল্লাম, “আমি অনেক আগে দেখেছি। তবে আপনি কেমন দেখেছেন, সেটা জিজ্ঞাসা করছিলাম।”

শিকারের পর

মাতুল বল্লেন, “কেন, আমি দেখলাম, এইখানকার ধানের শিষগুলো নোড়ে উঠল।” তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, তা’হলে আমি ঠিক দেখে-ছিলাম। তখন আর বেশী কথা বল্লাম না।

অনেকক্ষণ পরে দেখলাম, মাতুল-মহাশয় একটা গুলি ছাড়লেন। গুলি ছাড়ামাত্রই একটা ঝটপট ধ্বনি শুনতে পেলাম। আর একটা গুলির পর আর কিছুই শুনতে পেলাম না। তখন কাছে গিয়ে দেখি, একটা বড় বুনো শুয়োর। আবার কাছেই দেখলাম, আর একটা বুনো-শুয়োর পালাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা খুব শীঘ্রই তাকে ঘিরে ফেললাম। এই শুয়োরটা মারতে আমাদের কিছু বেগ পেতে হয়েছিলো। আমাদের অনেক চেষ্টা বৃথা হয়েছিলো। শেষকালে দু’একটা গুলি খাওয়ার পর শুয়োরটার প্রতিহিংসার ভাব বেশ পূর্ণ-মাত্রায় জেগে উঠল। দেখলাম, রাগের মাথায় সে হাতীকেও ভয় খেলো না, দৌড়ে এসে হাতীর পেট ফুঁড়বার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তার মরণ ছিলো,—সে দূর থেকে যেমন একটা মোশান নিয়ে ছুটে আসবে, এমন সময় একটা Contractile bullet তাকে ছিট্‌কে নিয়ে দূরে ফেলে দিলো। এইবারে সে চিরঘুম ঘুমাল। তার পর সেই শুয়োর দুটোকে ক্যাম্পে আনা হল।

মধ্যাহ্নে আহারান্তে জ্বরভাব-গ্রস্ত হয়ে সকলেই শুয়ে পড়ল। আমিও দলকে ভারী করলাম, অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ বুজে পড়ে রইলাম। খানিকক্ষণ পরে উঠে নদীর ধারে গাছতলায় বসবার জন্যে গেলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। দূর থেকে ফুরফুরে হাওয়ার সঙ্গে চাষাদের
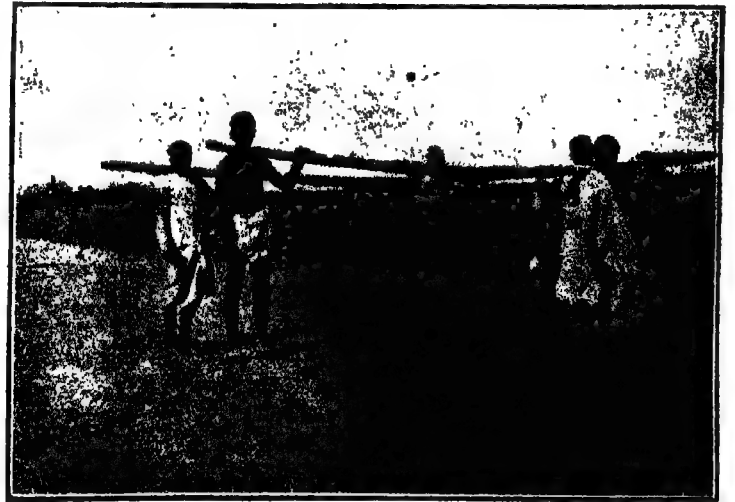
লীলাবসান

গান শোনা যাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ দেখলাম, নদীর জলটা ভীষণ ভাবে নড়ে উঠল্। আমার মনে একটু ভয় হলো বটে, কিন্তু আমি সেখানে বসে রইলাম। তার পরে দেখি, একটা কুমীর আস্তে আস্তে উঠে এল, উঠে এসে মরার মত হয়ে পড়ে রইল। আমি ভাবলাম, বুঝি মরে গেল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থাকার পর দেখলাম যে, কুমীরটা একটু নড়ল। আমি আস্তে আস্তে ক্যাম্পে গিয়ে মাতুল মহাশয়কে ও আর সকলকে ঘুম থেকে তুললাম। তখন একটু মেঘ-মেঘ করে আসছিলো। বেরোতে বেরোতে দুএক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়তে লাগল। আমি আর ক্যামেরা নিতে পারলাম না। আমাদের পৌছোনর সঙ্গে সঙ্গে ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি আরম্ভ হলো,—কুমীরটা ত জলে নেবে গেল, আমারও মন ভেঙ্গে গেল।

বৃষ্টিটা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই থামল। বৃষ্টির পর দেখি, এক চাষী একটা বড় মাছ এনেছে। আমি তাকে দাম জিজ্ঞাসা করে, অনেক বাক্যালাপে বুঝলাম যে, সে দাম চায় না, মাছটা দিয়ে মাতুল মহাশয়কে প্রণাম করতে চায়। মাছটা দেখে একটু লোভ হলো, তাড়াতাড়ি মাতুল মহাশয়কে ডাকলাম। মাতুল মহাশয় এসে তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করে, মাছটি ভিতরে নিয়ে যেতে বললেন। সন্ধ্যার সময় আগের দিনের মত গান-বাজনা সুরু করা গেল।

ক্যাম্পে আনয়ন

দ্বিতীয় বরাহ অবতার

সেই দিন রাত্রিতে বেশ একটু ঝড়ের মত দেখা দিয়েছিলো। ঝড়ের সময় তাঁবুর চারধার দেখতে হয়েছিলো। রাত্রিতে বাহিরে যাওয়াতে, গাটা কেমন ছম্ ছম্ করতে লাগল। ভীষণ অন্ধকার, ভীষণ ঝড়; তার সঙ্গে গাঢ় নিদ্রার ঘোর। কোন রকমে একটা Punch light তো জ্বালানো গেল। Punch lightএর সাহায্যে বাহিরে বেরিয়ে এক ভয়ানক দৃশ্য দেখলাম, দূরে গরু-ছাগলের ডাক, আর মানুষের "হুট্টা হুট্টা" শব্দ শুনতে পেলাম। আর চারধারে মিশ্‌মিশে কালো,—ঝাঁ ঝাঁ করছে অন্ধকার; আর তার সঙ্গে প্রবল বায়ু। আমি একটু ভয় পেয়ে তাঁবুর ভিতরে গিয়ে মাতুল মহাশয়কে সব বল্‌লাম। মাতুল মহাশয় শুনে বল্‌লেন, "এখন এই রকম ঝড়ের সময় বাঘেরা প্রায় বন ছেড়ে এসে গ্রামের লোকদের বাড়ীতে আশ্রয় নেয়।" ভয়ে আমি বললাম, "তাহলে আমাদের ক্যাম্পেও তো আসতে পারে।" মাতুল মহাশয় বেশ বুঝেছিলেন যে আমি একটু ভীত হয়েছি। তিনি বল্‌লেন, "আমাদের এখানে এতো strong light আছে—এইখানে কিছুতেই বাঘ আসবে না।"

ঝড় ক্রমশই বাড়তে সুরু করল। কিছুক্ষণ পরে চারধারে মড় মড় শব্দ শুনতে পাওয়া গেল,. তখন বুঝলাম cycloneএ গাছ-পালা পড়ছে। আর মধ্যে মধ্যে এক একবার মানুষের চীৎকার শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। আমাদের ক্যাম্প প্রায় উড়ার যোগাড়,—সকলেই ভয় পেয়েছিলো। তখন আমরা বাহিরে বেরিয়ে এক একজন এক একটি খুঁটির কাছে গিয়ে

শিকারী ও শিকার

দাঁড়ালাম। এক একবার দম্‌কা বাতাসের দাপটে আমিও ওড়ার যোগাড়। কোন রকমে ভয়ে ভয়ে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম। যা হোক্‌, ঝড়টা ঘণ্টা দুয়ের পর থেমে গেল। ঝড় থামার পর ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হলো—সকলেই তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতবে ঢুকলাম। তাঁবু ফুটো হয়ে জল পড়াব যোগাড় হয়ে দাঁড়াল। কোন রকমে বৃষ্টির চট্‌পট্‌ধ্বনি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দ্বিপ্রহরে মাতুল মহাশয়ের কাছে পূর্ব্বদিনের দেখা সেই কুমীরের কথাটা তুললাম। তিনি বল্লেন "বেশ ত, তুই নদীর ধারে বসে থাকগে যা—যখন কুমীর উঠবে, আমায় ডাকিস্‌।" আমি cameraটী হাতে করে নদীর ধারে বস্‌লাম। বসে বসে বিরক্ত হয়ে গেলাম। তখন ভাবলাম, যাই,খেয়ে এসে আবার বস্‌ব। উঠ্‌ব উঠ্‌ব মনে করছি, এমন সময় দেখলাম দূরে একটা কুমীর এসে ডাঙায় উঠ্‌ল। কুমীরটাকে দেখে মনে যে কি আনন্দ হলো, তা আর বলে শেষ করা যায় না। দৌড়ে ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে মাতুল মহাশয়কে খবর দিলাম। খবর শুনে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মাতুল মহাশয় বল্লেন, কুমীরটা অনেক দূরে আছে,—বোধ হয় নদীর পাড় দিয়ে যাওয়া যাবে না। তা শুনে আমরা সব ঠিক করলাম, তা হলে নৌকা করে যাওয়া হোক্‌। নৌকা আনতে দেরী হতে দেখে আমার মনটা একটু খারাপ হলো,—ভাবলাম, কুমীরটা বোধ হয় নেবে যাবে। তার পরে দেখলাম, আর একটা কুমীর উঠব উঠব করছে। দেখলাম, সেটা কাছেই উঠল। তখন আমি ঠিক করলাম, দুটোকেই একসঙ্গে মারা যাক্‌ না কেন,—আমাদের মধ্যে শিকারীর ত অভাব নেই। মাতুল

কৌতূহলী দর্শকগণ

মহাশয় বল্লেন, "তাই হোক্‌। কিন্তু একসঙ্গে বন্দুক fire করা চাই—তা না হলে শব্দ শুনে একটা পালিয়ে যাবে।" আমরা দুভাগ হলাম। আমি মাতুল মহাশয়ের সঙ্গে থাকিলাম। তার পর অন্য দল পৌঁছে ইঙ্গিত করলে' একসঙ্গে fire করা হলো। ভাগ্যক্রমে দুইটি গুলিই ঠিক লেগেছিলো। সুদক্ষ শিকারী মাতুল মহাশয়

এক গুলিতেই কুমীরটাকে শেষ করেছিলেন। কিন্তু অন্তধারে আর একটি গুলির আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম। ভাবলাম, বোধ হয় ওরা প্রথম গুলিটা ঠিক লাগাতে পারেনি। তার পরে ওরা চীৎকার করলে—"তাড়াতাড়ি এসো, কুমীর মারা পড়েছে।" এই কথা শুনে মনে আনন্দ হলো। আমি দৌড়ে গিয়ে দেখি, সত্যি সত্যিই কুমীরটা মরে পড়ে রয়েছে। অতি কষ্টে কুমীর দুটোকে একত্র করা গেল। মাতুল মহাশয় বল্লেন, "ঘড়িয়াল" অর্থাৎ মেছো-কুমীর। তার পরে সেইখানে একটা Snapshot নেবার বন্দোবস্ত করলাম। কুমীর দুটোকে অনেক কষ্টে তাঁবুতে আনা গেল। কুকুরগুলো চারধারে মহা কলরব সুরু করে দিলো। দিনান্তের ক্লান্ত রবি প্রায় ডুবুডুবু হল, এমন সময়ে আমরা কতকগুলি ছবি তুলিলাম। তার পর তাড়াতাড়ি স্নান করে খাওয়া শেষ হলে কুমীর শিকারের বিষয় আলোচনা করতে বসা গেল। আলোচনা করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

সেই রাত্রে মাতুল মহাশয় বল্লেন, "কাল নিশ্চয় বাঘের খবর আসবে। বন পুড়েছে—বাঘ বন থেকে বেরিয়ে গ্রামে গ্রামে উৎপাত করবে।" একটু পরেই Torch light নিয়ে বাহিরে গিয়ে দূরে দেখি, কালোয় হল্‌দেতে মিশান একটা কম্বলের মত কি যেন ছুটে পালাল। আমার বড়ই ভয় হলো। তখন দৌড়তে যাই—পা আগায় না। কিছু দূর গিয়ে আর যেতে

এক গুলিতে কুপোকাৎ
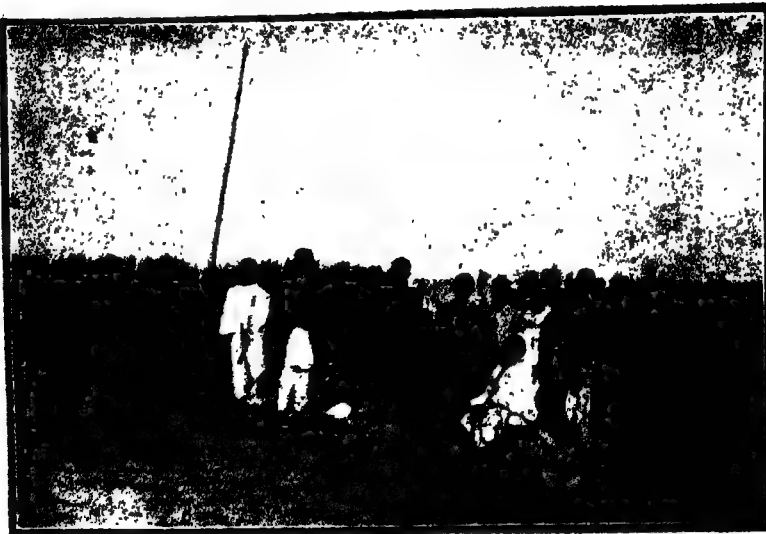
পারলাম না,—মাতুল মহাশয়কে ডাক্‌লাম। মাতুল মহাশয় বেরুলে আমি হাঁপাতে হাঁপাতে জানালাম। তিনিও বুঝলেন যে নিশ্চয়ই বাঘ এসেছিলো। তিনি আর কিছু না বলে, আমায় ক্যাম্পের ভিতরে নিয়ে গেলেন। ক্যাম্পে গিয়ে আমার ধড়ে প্রাণ এলো। আমি মনকে সান্ত্বনা দিয়ে অতি কষ্টে ঘুমালাম।

ঘড়িয়াল-দর্শনে ক্যাম্পে উল্লাস

পরদিন দ্বিপ্রহরের পর বাহিরে বসে আছি, এমন সময় এক চাষা দৌড়তে দৌড়তে এসে বল্লে, "হুজুর, এলায় হট্যা কাঁদে।" আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে দেশীয়

চাকরটাকে বল্লাম "ওরে, ও লোকটা কি বলছে দেখ ত।" সে তাকে জিজ্ঞাসা করে এসে বল্লে, "এই লোকটা বাঘের খবর এনেছে।" আমি তখন বুঝলাম "হুট্যা এলায় কাঁদে" মানে "এখানে বাঘ ডাকছে।" আমি দেরী না করে মাতুল মহাশয়কে খবর দিলাম। মাতুল মহাশয়কে নিয়ে শীঘ্রই হাতী চড়ে রওনা হওয়া গেল। পথে যেতে যেতে মাতুল মহাশয় শিকারের বিষয় অনেক কিছু বল্লেন।

শিকার সম্বন্ধে আলোচনা

কিছুক্ষণ যেতে যেতে বনের কাছে আসা গেল। হাতীগুলিকে ঠিক ভাবে দাঁড় করিয়ে মাতুল মহাশয় আর একটা হাতীকে বিট্ করতে বল্লেন। আমার হাতীটা এমন যায়গা দিয়ে গেল যে, সেখানে কাঁটা গাছ ছাড়া আর কিছু নেই। এক যায়গায় আমি কাঁটায় আটকে গেলাম। গায়ে দু এক যায়গা দিয়ে কিছু রক্তও বেরিয়েছিলো। কিন্তু বাঘ মারার আশায় সব ভুলে গিয়েছিলাম। বিট্ করতে করতে এক যায়গায় দেখা গেল, বাঘটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আবার এক যায়গায় গিয়ে দেখলাম, একটা মোষ পড়ে রয়েছে। সেটা দেখে বুঝলাম যে, নিশ্চয়ই এখানে বাঘ আছে। বাঘের সন্ধানে অনেকক্ষণ ঘোরার পর একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি

বাঘ শিকারের পর

গুলির আওয়াজ শুনলাম। তখন বুঝলাম যে দুটো বাঘই মারা পড়েছে। তার পরে ঘুরতে ঘুরতে মাতুলের হাতীর সঙ্গে দেখা হলো। মাতুল মহাশয় বল্লেন, "একটা বাঘ মারা পড়েছে।"

আবার একটা বাঘ খুঁজতে আরম্ভ করা গেল। খুঁজতে খুঁজতে হাতীটা একটা মৌমাছির চাক্ শুঁড় দিয়ে ভেঙ্গে ফেল্লো। চাক্ ভাঙ্গা মাত্রই হাজার হাজার মৌমাছি বেরিয়ে পড়ল।

শিকারী পরিবার

তার পর যাকে সাম্‌নে পেলে, তাকেই কামড়াতে সুরু করে দিলে। আমাদের সকলকেই কামড় খেতে হয়েছিলো। সে যে কি যাতনা—নিজে না পরীক্ষা

শিকার পর্য্যবেক্ষণ

করলে ঠিক বোঝা যায় না। যাতনায় প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। এই সময় বাঘটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে' একটা হাতীর কাণ ধরে ঝুলে পড়ল। আমি দূরে ছিলাম—মারতে পারলাম না; কিন্তু, আমার মাতুল এক গুলি মারতেই বাঘটা পড়ে যায়, কিন্তু তবুও দৌড়ে পালাতে লাগল। একবার গুলি খাওয়ার পর বাঘটি বড় সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। এধারে প্রায় বেলা যায় যায়। অনেক খোঁজার পর দেখলাম, বাঘটা একটা ঝোপে বসে রয়েছে। লক্ষ্য করে গুলি মারা গেল। গুলিটাও ঠিক লেগেছিলো। অনেকক্ষণ ঝট্‌পট্ করে সে আস্তে আস্তে শেষ নিঃশ্বাস ফেললে। বাঘটার শেষ অবস্থা অর্থাৎ Last gaspটী দেখে সত্যি সত্যিই আমার মনে বড় আঘাত লেগেছিলো। সেটা যে কি ভয়ানক দৃশ্য, তা নিজে না দেখলে বলে ঠিক বোঝান যায় না।

দুটো বাঘকে একত্র করা গেল। চাষাদের দল দৌড়ে এল। খানিকক্ষণ খুব গোলমাল হলো। এদিকে সূর্য্যদেব অস্ত যান যান, এমন সময় একখানা ছবি তুললাম। শিকারী হাতী বাঘ দেখে বিশেষ ভয় করলো না, তবে একটা নূতন হাতী একটু গোলমাল করেছিলো। বাঘ দু'টোকে হাতীর পিঠে বেঁধে তাঁবুতে ফেরা গেল। সকলেই দেখতে এল। কেবল কুকুর বেচারারা গন্ধ পেয়েই ভয়ে পালাতে সুরু করল। দূরে গিয়েও তাদের ডাকবার ক্ষমতা ছিলো না।

বাঘ দুটোকে তাঁবুর সাম্‌নে রেখে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর কিছু খাওয়া গেল। খাওয়ার শেষে দিনের ঘটনার আলোচনা আরম্ভ করা গেল। তখন একটু ভাল করেই বেশ বুঝতে লাগলাম, যে মৌমাছির কামড়টি কি জিনিস। তার পর দেশী ঔষধ লাগান গেল। জ্বালা-যন্ত্রণা

পরিশ্রমের ফল

কমতে কিছু সময় লেগেছিলো। বসে আছি, এমন সময় দেখি, একদল লোক এসে দাঁড়াল। আমি বুঝলাম, এই মহাপ্রভুরাই বুঝি যাত্রা করবেন। ভিতরে গিয়ে খাবার বন্দোবস্ত করে যাত্রা শুনবার জন্য প্রস্তুত হলাম। কিছুক্ষণ পরেই যাত্রা নাচ গান সুরু হলো। তাদের নাচ দেখলাম অনেকটা সাঁওতালি আর খাসিয়া নাচের মাঝামাঝি। খাসিয়া আর সাঁওতালি নাচ একসঙ্গে নাচলে তাদের নাচের একটু পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। গান যদিও বোঝা গেল না, তবুও সুরগুলি বেশ মনে লেগেছিলো। তারা বল্লে, "হুজুরের দয়ায় আজ আমরা সমস্ত রাত্রি যাত্রা করবো।" ভাবলাম, আনন্দময়ীর শুভ আগমনে শুভ লগ্নে একবার রাজা প্রজায় শুভ আনন্দোৎসবে শুভ সম্মিলন হউক। এই ভেবে আর তাদের বাধা দিলাম না। তার পরে খাওয়া শেষ করে অনেকক্ষণ যাত্রা শুনলাম। অনেকক্ষণ বসার পর ঘুম ধরল—চোখ কি রকম যেন জড়িয়ে এলো,—আমি আস্তে আস্তে ঘুমাতে গেলাম। সমস্ত দিন খুব পরিশ্রম হওয়াতে প্রকৃতি দেবীর নিয়মানুসারে ভীষণ অবসাদ এলো, আমি খানিকক্ষণ বাদেই ঘুমিয়ে পড়লাম। শুনলাম, সমস্ত রাত্রি যাত্রা হয়েছিলো। মাতুল মহাশয় তাদের খাবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। রাত্রি জাগরণে সকালে

ক্যাম্পের সম্মুখে শিকারী পরিবার

শুভ সম্মিলন

উঠতে দেরী হয়ে গিয়েছিলো। উঠে দেখি, চন্চনে রোদ। কোন কারণ বশতঃ মাতুল মহাশয়কে সেদিন Subdivisionএ আসতে হয়েছিলো। আমরাও সকলে যাবার ঠিক করে, তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে গুছোতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু বিকাল বেলায় আকাশ ভেঙ্গে জল পড়তে আরম্ভ করল, আর যাওয়া হলো না। সেদিন বৃষ্টির জন্য আর বাহিরে যেতে পারলাম না। রাত্রিতে খুব আমোদ আহ্লাদ করা গেল। পরের দিন সকালে Subdivisionএ পৌছান গেল। পথে পাখী অনেক শিকার করা হয়েছিলো। রাত্রিতে সে সব খাবার ব্যবস্থা করা গেল। Subdivisionএ পৌছে বাড়ীর ভেতর দু একখানা বাঘের ছবি তোলা হলো। ক্রমশই আকাশে সন্ধ্যামণি দেখা দিল। অনেক দিন Camp lifeএর পর Home lifeটী বেশ লাগল।

বাসন্তিকা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী বি-এ

দখিণ হাওয়া রঙিন হাওয়া নূতন রঙের ভাণ্ডারী,
জীবন-রসের রসিক বঁধু, যৌবনেরি কাণ্ডারী!
সিন্ধু থেকে সদ্য বুঝি আসছ আজি স্নান করি'
গাং-চিলেদের পক্ষধ্বনির সন্‌সনানির গান করি',
মৌমাছিদের মনভুলানি গুণগুণানির সুর ধরে'
চল্লে কোথায় মুগ্ধ পথিক পথটি বেয়ে উত্তরে?
লক্ষ ফুলের গন্ধ মাখি' বক্ষ আঁকি' চন্দনে,
যাচ্ছ ছুটে' কোন্ প্রিয়ারে বাঁধ্‌তে ভুজ-বন্ধনে!

অনেক দিনের পরে দেখা, বছর পারের সঙ্গী গো,
হোক্ না হাজার ছাড়াছাড়ি, রেখেছ সেই ভঙ্গী তো!
তেম্‌নি সরস ঠাণ্ডা পরশ, তেম্‌নি গলার হাঁকটি সেই
দেখ্‌তে পেলেই চিন্‌তে পারি, কোনোখানেই ফাঁকটি নেই!

কোথায় ছিলে বন্ধু আমার, কোন্ মলয়ের বন ঘিরে'
নারিকেলের কুঞ্জে-বেড়া কোন্ সাগরের কোন্ তীরে!
লক্‌লকে সেই বেতস-বীথির বলো তো ভাই, কোন্ গলি,
এলালতার কেয়াপাতার খবর ত সব মঙ্গলই?

ভালো কথা, দেখ্‌লে পথে, সবাই তোমায় বন্দে তো,
বন্ধু বলে' চিন্‌তে কারো হয়নি তো সে সন্দেহ?
নরনারী তোমার মোহে তেম্‌নি তো সব ভুল করে?
তেম্‌নিতর পরস্পরের মনের বনে ফুল ধরে!

আস্‌তে যেতে দীঘির পথে তেম্‌নি নারীর ছল করা,
পথিক-বধূর চোখের কোণে তেম্‌নি তো সেই জলভরা?
যুবতীরা ডাগর আঁখির কাজল-লেখা মন্তরে
আজো তো সে আগের মতন প্রিয়জনের মন হরে?
পলাশ ফুলে হঠাৎ দেখে' নখ-ক্ষতের চিহ্ন কা'র
ঈষৎ হেসে কণ্ঠে বাঁধে পূর্ব্বরাতের ছিন্ন-হার!

রঙ্গনে সেই রং তো আছে, অশোকে তাই ফুট্‌ছে তো,
শাখায় তারি দুল্‌তে দোলায় তরুণী দল যুট্‌ছে তো?
তোমায় দেখে তেম্‌নি ডেকে উঠ্‌ছে তো সব বিহঙ্গ,
সবুজ ঘাসের শীষটি বেয়ে রয় তো চেয়ে পতঙ্গ?

তেম্‌নি সবি তেম্‌নি আছে!···হ'লাম্ শুনে' খুস্‌খুসী,
প্রাণটা উঠে চন্‌চনিয়ে, মনটা উঠে উস্‌খুসি;
নূতন রসে রস্‌ল হৃদয়, রক্ত চলে চঞ্চলি'
বন্ধু, তোমায় অর্ঘ্য দিলাম উচ্ছ্বসিত অঞ্জলি।
গ্রহণ করো গ্রহণ করো বন্ধু আমার দণ্ডেকের,
জানিনাক আবার কবে দেখা তোমার সঙ্গে ফের।

জীবনের নিত্য-স্রোতে

শ্রীভূপতি চৌধুরী

ঘড়ির দোলকের মতো যাওয়া-আসা একেবারে সীমাবদ্ধ, স্থান ও কাল উভয় দিক থেকেই। ৮-৩০ মিনিটের লোকাল ট্রেণ ধরবার জন্যে, সমস্ত হিসেব করে দশ মিনিট আগে বাড়ী থেকে বার হওয়া চাই। পথে শ্যাম বাবুকে একটা ডাক দিয়ে, দোকান থেকে একটা সিগারেট কিনে, ধরিয়ে, যখন ষ্টেশনের প্লাটফরমে পা দিই, তখন গাড়ীর ধোঁয়া সিগনালের মাথা ছাড়িয়ে আকাশে মিলিয়ে যায়। ট্রেণ এখানে থামে এক মিনিট; এই সময়টুকুর মধ্যে সমস্ত ডেলিপ্যাসেঞ্জারকে এই গাড়ীর মধ্যে স্থান করে নিতে হয়। এতে কোন অসুবিধা হয় না। গাড়ী যদি এক মিনিট না দাঁড়িয়ে আধ মিনিট মাত্র থামত, তা হ'লেও কোন অসুবিধায় পড়তে হত না। কারণ এক ব্যবস্থা অনুসারে চলতে চলতে এই ব্যাপারটুকু মুহূর্ত্তে সমাপন হ'য়ে যেত। তাই প্রত্যহই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রায় একই জায়গায় বসবার ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হ'য়ে পড়েছিল। গাড়ীর কামরার প্রত্যেকটী আরোহী প্রত্যেকের পরিচিত। অপরিচিত সেখানে কেউ বড় ছিল না। গত দশ বছর এই গাড়ীতে যাওয়া-আসার মাঝে পরিচয়ের বন্ধন-সূত্রটীর সুরু হয়েছিল। ফলে আমাদের মধ্যে কোনো অব্যবস্থা ছিল না। রোজই উঠে দেখতুম, হরিবাবু তাঁর বাঁধা দলটী নিয়ে তাস খেলা সুরু করে দিয়েছেন। অনেকখানি আসতে হয়, সময় কাটান চাই ত! পুরঞ্জন বাবু একটু ভারিক্কি চালের লোক। তিনি এসব ছেড়ে একটী কোণে বসে সেদিনের খবরের কাগজের খবরের মধ্য দিয়ে সময়টাকে উপভোগ করেন। আর জন কয়েক আছেন,—তাঁরা কেশ তৈলের সঙ্গে উপহার-প্রাপ্ত উপন্যাসে মশগুল হয়ে থাকেন। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে স্বল্প-কথার মধ্যে দিয়ে যাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তিনি হচ্ছেন দেবী বাবু। এ সমস্ত কাজ নিতান্ত অসার ভেবে তিনি একটু সুপ্তিসুখ অনুভব কর্ব্বার চেষ্টা করতেন এই সময় ও গণ্ডগোলের মধ্যে। আমার আশ্চর্য্য লাগত, কিন্তু অবিশ্বাস করতুম না; কারণ, অভ্যস্ত হয়ে পড়লে সবই সম্ভব, এ তথ্য আমার অজ্ঞাত ছিল না। তবে সবচেয়ে কৌতূহল লাগত যখন দেখতাম, ঘুমোতে ঘুমোতে বুড়ো দেবীবাবু বলতেন—কে নিতাই—এস এস। তার পর তাঁর আর কোনো হুঁস থাকত না। ট্রেণের চলার শব্দ ছাপিয়ে, মাঝে মাঝে তাঁর নাকের গর্জ্জন আমাদের কাণে এসে পৌছাত। তার পর ট্রেণ এসে কলকাতায় থামামাত্র দেবী বাবু সটান উঠে ট্রামের দিকে ছুটতেন।

কতখানি সাধনা করলে তবে এতটা সহজ হ'য়ে পড়া যায়, এ সত্যটা জানবার জন্যে দেবী বাবুকে একদিন প্রশ্ন করেছিলুম—দাদা, আপনার মতো লোক বড় দেখি না। ট্রেণে কলিসন হলেও যে ঘুম ভাঙে না, এমন ঘুমের বাঁধন ছিঁড়ে আপনি কেমন করে গাড়ী থামলেই উঠে পড়ে ট্রামের দিকে দৌড় দেন—বুঝতে পারি না। দেবী বাবু ঘুমোতে ঘুমোতে জবাব দিলেন—ও কিছু না, ভায়া, মায়ার বাঁধন, রাখলেই আছে, নইলে নেই—

আমিও আজকাল ঐ রকমই প্রায় ভাবতে সুরু করেছিলুম। মায়ার বাঁধন সবখানেই—বিশেষ করে চাকরীতে—রাখলেই আছে নইলে নেই। তবুও এরই টানে এত লোক গড্ডালিকার মতো একত্র হ'য়ে চলেছি। অপূর্ব্ব! এ এক অদ্ভুত জীবন। ভেবে কোন কূলকিনারা পেতাম না। যখন ভাবতাম এর চেয়ে মন্দ ভাগ্য আর হতে পারে না, তখন মনে হত, আমরা যেন কোন অতলে তলিয়ে গেছি। আশার রশ্মিরেখাও যেন দৃষ্টি-পথে আর পড়ে না। আবার যখন ভাবতাম এই বা মন্দ কি, তখন মনে হত, বেশ ত একরকম স্বচ্ছন্দে কেটে যাচ্ছে। জগতে কত লোক ত অনাহারে নিরাশ্রয়ে দিন কাটায়!

কিন্তু এমন করে কি শুধু মনকে প্রবোধ দিয়ে রাখা চলে। যখনই কোনো নতুন পথিককে এ পথে দেখি, তখনই এসব কথা মনে জাগে। ভাবি, তাকে সব বলে দিই। তাই সেদিন আমাদের গাড়ীতে একটী নতুন অপরিচিত মুখ দেখে, তাকে

ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম—কোন্ আপিসে কাজ করেন আপনি?—

যাকে আপনি বললাম, তার বয়স বোধ হয় আঠারো—বড় জোর বিশ। মুখের ভাব খুব সাধারণ বাঙালীর ছেলের মতো, না তেজে উজ্জ্বল, না নিরাশায় শুষ্ক। যে বয়সে লোকের চোখে যৌবনের রঙের ঘোর লাগতে সুরু ক'রে জগৎকে সুন্দর বোধ হয়, সেই রঙের সমস্ত জাল ছিন্ন করে এই মাটীর পৃথিবীর বিশ্রী নগ্ন-বাস্তবতার সামনে মুখোমুখি একে দাঁড়াতে হয়েছে।—সে আপিসের নাম উল্লেখ করলে।

আপিসের নামটা কাণে এল বটে কিন্তু মনে রইল না; কারণ, মনে করে রাখার জন্যে ত প্রশ্ন করিনি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চললাম—কত দিন কাজ কচ্ছে'ন?

উত্তর পেলাম—চারমাস।

ও—মোটে চার মাস; তাহলে এখনও ঠিক মতো রপ্ত হতে পারেন নি?

তার পরই হঠাৎ মুখ থেকে বার হয়ে পড়ল—আর এ বয়সে রপ্ত হতে পার্ব্বেনও না। কিন্তু এর মধ্যে আপিসের কাজে ঢুকলেন যে? দেবীবাবু ঘুমোতে ঘুমোতে বললেন—বরাত রে ভাই বরাত! মায়ার বাঁধন—

এইবার আরম্ভ হল সেই পুরাতন কাহিনী যার সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালীই অল্প-বিস্তর পরিচিত।

আঠারো বছর বয়সে মাথার ওপর হঠাৎ সংসারের ভার এসে পড়ল। বাঙালীর সংসার—সভ্যের সংখ্যা বড় কম নয়। একটী অবিবাহিতা ভগিনী, মা এবং আরও কয়েকজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া।

এতদিন পর্য্যন্ত কোনো রকমে যার উপার্জ্জনে সংসার চলে এসেছে, সে যখন হঠাৎ একদিন সমস্ত ত্যাগ করে, চিন্তা ও ঋণের ভার পুত্রের উপর চাপিয়ে চলে গেল, তখন অবশ্য পুত্রের পক্ষে চিরাচরিত বাঁধা পথের পথিক হওয়া ছাড়া উপায় নেই। এ ভার তাকে নিতেই হবে। এ সম্বন্ধে কোনো কথা বলা মানে—মিথ্যা তর্কের জাল তৈরি করা; কিন্তু এ ত ঠিক যে সে জালে কোনো 'সত্য' ধরা যাবে না। তাই জিজ্ঞাসা করলাম—আপিস কি রকম মনে হচ্ছে।

যৌবনের তেজটুকু নিরাশার মেঘে নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি। তার মুখ হতে বার হল—জঘন্য—আমাদের প্রাপ্য সম্মান আমরা পাই না। এক এক সময় এমন মনে হয় যে, চাকরী ছেড়ে দিই দু'চারটে কথা শুনিয়ে—

কথার সুর ট্রেণের চলার শব্দ ছাপিয়ে উঠেছিল। খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে পুরঞ্জন বাবু বল্লেন—ওহে সুশীল, অতটা তেজ ভাল নয়; একটু নরম হতে হবে। নইলে কবে খাবে আপিস থেকে তাড়ুনি। তখন ত আবার এদেরই দোরে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরতে হবে; নইলে আহার বন্ধ হবে যে!

সুশীল স্মিত-হাস্যে উত্তর করলে—কিন্তু, অনাহার ত কেউ বন্ধ করতে পারে না।

কেউ কেউ কথাটায় হেসে উঠল, আবার কেউ কেউ উপেক্ষায় একবার দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

"ঐ কথার বাঁধুনিই সম্বল, তা জানি" বলে পুরঞ্জনবাবু তাঁর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর করে কাগজের ওপর চোখ রাখলেন।

সুশীলের উত্তর শুনে সত্যই বড় তৃপ্তি পেয়েছিলাম। ভাবলাম বলি—চাকরী যদি করতেই হয়, ঠিক এ দৃঢ়তা নিয়েই করা উচিত। কিন্তু কথাটা বলতে পারলাম না, মনে বড় সংশয় এল। মনে হল—এ মুখের কথা বই ত নয়। কাজে কি আর কেউ করতে পারবে। স্থির হ'য়ে ভাবলে আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, মন এত ছোট হ'য়ে গেছে যে, কিছু না জেনে, লোকের দুর্ব্বলতাকেই বড় করে দেখি; তাদের অন্তরের কথায় সন্দেহ করি। শুধু কথায় কেন, সত্যই যখন বিকালে ফেরবার পথে শুনলাম, সুশীল চাকরী ছেড়ে দিয়েছে, তখন আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি।

ট্রেণে উঠে দেখি, অনেকে মিলে সুশীলকে ঘিরে বোঝাতে বসেছে—কত বড় নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ সে করেছে। এর জন্যে তাকে কত কষ্ট পেতে হবে।

সুশীল তখন জোর গলায় বললে, এর জন্যে যত কষ্টই হ'ক না কেন, আমি তা সইতে তৈরি আছি।

এর পর আর কোন কথা বলা চলে না। সকলে চুপ হ'য়ে গেল। শুধু দেবীবাবু বললেন—মায়ার বাঁধন খস্‌লো নাকি? ভাল—ভাল। তাহ'লে ঘুমোনো যাক।

দেবী বাবু চোখ বুজলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাকের গর্জ্জন সুরু হ'য়ে গেল।

ব্যাপারটা কি—স্পষ্ট ভাবে জানবার জন্যে আমি আবার সুশীলকে প্রশ্ন করলাম—হয়েছিল কি ?

সুশীল বললে—সাহেব আজ এক হুকুম দিয়েছে, যে, সাহেবের ঘরে ঢোকবার আগে জুতো খুলে যেতে হবে। আমাদের জুতোর তলায় নাকি অত্যন্ত কাদা প্রভৃতি থাকে। তাতে ঘর নোংরা হয়। আমি এ হুকুম মানি নি। শুধু এই নয়—সাহেবের টেবিল আমাদের ছোঁবার অধিকার নেই। তাঁর কাছে গিয়ে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে আলগোছে কাজ সারতে হবে। এমনিতর আমাদের সম্মান ও মনুষ্যত্বের হানিকর—

শীতের শেষে গাছের পাতায় হঠাৎ সবুজের ছোঁয়াচ দেখে যেমন মনে হয় বসন্ত এল, এ যে তার রঙীণ বসনের প্রান্ত—আজও তেমনি হঠাৎ কী জানি মনে হল—আশা আছে, আশা আছে—এ হচ্ছে সেই মুক্তি-পথের অগ্রদূত—এরই হাতে শোভা পাবে সেই বিজয়-আলোক-বর্ত্তিকা।

এমনি ধরণের আরও কত কথা মনের আবেগে স্মরণ হ'ল। ইচ্ছে হল—তার হাত দুটী চেপে ধরে বলি—বড় খুসি হলুম ভাই। কিন্তু এতটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা শোভন ভাবলাম না। তাই বললাম—কাজ আপনি মন্দ করেছেন বলতে পারি না। কিন্তু এজন্যে যতখানি চিন্তা করা দরকার, তা আশা করি করেছেন। উত্তেজনার বশে অনেক সময় কাজ ক'রে ফেলে পরে আবার সেই জন্যে অনুশোচনার অন্ত থাকে না।

সুশীল তখন তার কৃত কর্ম্মের গরিমায় উৎফুল্ল। আমার কথায় বোধ হয় একটু উপেক্ষার হাসি হেসে বললে—আমি ভাল করে ভেবেই তবে এ কাজ করেছি।

তাহলে ত আর কোনো চিন্তার কারণ নেই।

ট্রেণ একটা ষ্টেশনে এসে থামল। কামরার মধ্যে নামবার জন্য একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল। প্রভাতে যারা বাসি ফুলের তাজা আবরণ নিয়ে এসেছিল, তারা সে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে, সারাদিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহ ও অবসাদকে সাথী করে নেমে গেল। এদের সঙ্গে নামলেও সুশীলের ভঙ্গী আজ একটু স্বতন্ত্র ছিল। ট্রেণ থেকে নামবার সময় সে বলে গেল—আচ্ছা চললুম, নমস্কার।

তার বলার ভঙ্গীতে অনেকে আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে দেখলে। অনেকে গ্রাহ্যই করলে না। দেবীবাবু একবার চোখ খুলে চেয়ে দেখে আবার চোখ বুজলেন।

"আচ্ছা চললুম" কথাটার মধ্যে হয়ত একটা অর্থ ছিল; কিন্তু এর অর্থ সন্ধান করে ফল কি ? হয় ত সত্যই সে এই পথ থেকে বিদায় নেবার জন্যে এই অভিবাদন করে গেল। এবং আনন্দ কি না জানি না, তবে উত্তেজনার বশে সে অন্য-দিনের অপেক্ষা দ্রুত পথ অতিক্রম করে গেল।

প্রতি সন্ধ্যায় পল্লীতে পল্লীতে যখন শঙ্খের শব্দ বিলীন হয়ে যায়, তখন যে আসে, আজ তার পূর্ব্বেই সে এসে পড়ায়, মা প্রশ্ন করলেন—কে সুশীল, আজ এত আগে এসে পড়লি যে ? শরীর কি ভাল নেই !

—না, শরীর ত ভালই আছে।

—তবে গাড়ী বুঝি আগে এসে পড়েছিল ?

—হবে।

—তুই ও রকম করে কথা কইছিস যে ? আয় দিকিনি, দেখি তোর গাটা।

চাকরী ছাড়ার অপ্রিয় সংবাদটা সে কেমন করে জানাবে—মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে সেই হ'ল তার সবচেয়ে বড় সমস্যা। মা ব্যাপারটাকে কী-ভাবে গ্রহণ করবেন—এই হ'ল তার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। কী-ভাবে ব্যাপারটা বললে তার মায়ের সহানুভূতি পাওয়া যাবে, এ চিন্তার কোনো মীমাংসা না করতে পেরে, অবশেষে প্রায় একনিঃশ্বাসে সে বলে ফেললে—না না, শরীর ভালই আছে—তবে একটা কথা মা,—আজ চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলুম।

—চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলি! কেন? প্রশ্নের প্রত্যেকটা অক্ষরের মধ্যে দিয়ে মায়ের বিস্ময় ও নিরাশার স্বর যেন ফুটে বার হ'ল। এ কথার কোনো উত্তর তখন দেওয়া তার সাধ্যাতীত। সে শুধু তার মায়ের মুখের দিকে তাকালে।

রাত্রির অন্ধকারে স্বল্পালোকিত কেরোসিনের আলোতে কিছুই বোঝা গেল না। সে মুখে কতখানি বেদনা, কতখানি বিস্ময়, কতখানি নিরাশা। তাদের সমস্ত অবস্থা জেনেও,—কাল কি খাব এর সংস্থান যাদের নেই, সে যে এতবড় নির্বুদ্ধিতা করতে পারে, এ যেন তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। মা কি ভাবছিলেন তা তিনিই জানেন; কিন্তু মায়ের প্রশ্নের স্বরে সুশীল এই ধারণাই করে নিলে। এখন তাঁর নিজেকে অপরাধী মনে হল।

রাত্রির সেই অন্ধকারে যেন তার সমস্ত ভবিষ্যৎ লুপ্ত হয়ে গেল। মায়ের সামনে আর দাঁড়িয়ে থাকতেই তার লজ্জা বোধ হল। কোন কথা না বলতে পেরে সে ঘরে প্রবেশ করলে। পুত্রের এই নিরাশ নীরব কাতরতায় ব্যথিত হ'য়ে মায়ের চক্ষু সজল হয়ে উঠল। এ অশ্রু লুকোবার জন্য তিনিও তাড়াতাড়ি রান্না-ঘরের দিকে ফিরলেন, পুত্রের আহারের ব্যবস্থা করবার জন্যে।

সন্ধ্যার স্তব্ধতা সমস্ত বাড়ীটাকে আচ্ছন্ন করে আছে। কোথাও যেন প্রাণের স্পন্দন নেই। শুধু প্রত্যহই যে নিস্পন্দভাবে কাজ করে যায়, আজও সে নিয়মিত ভাবে তার কর্ম্ম করে যাচ্ছে। সে হচ্ছে সুশীলের ছোট বোন মালতী। তেরো বছরের এই অনূঢ়া মেয়েটী সংসারকে যেন তার নিজের ঘাড়ের ওপর টেনে এনেছে। সংসারের ছোটবড় সমস্ত খুঁটিনাটী কর্ম্মের ভার নিজের ইচ্ছায় সে করে যায়। এতে তার কোনো আপত্তি নেই; সমস্তই সে যন্ত্রের মতো করে যায়।

সন্ধ্যার প্রদীপটাকে হাতের আড়ালে বাঁচিয়ে সে যখন ঘরে প্রবেশ করলে, তখন দেখলে যে তার দাদা বিছানাটীতে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে।

এর কারণ মালতীর জানা ছিল না; তবে কোনো একটা কিছু অপমানের আঘাতে যে তার দাদা ব্যথিত হয়েছে, এটুকু বোঝবার মতো শক্তি তার ভাল করেই হয়েছিল। এবং তার দাদার অনেক-কিছু অপমানের কারণ যে তার অনূঢ়া ভগিনীটী, এ তথ্যও তার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তবুও দাদার অসুস্থতা কল্পনা করে সে ধীরে ধীরে জ্যেষ্ঠের কপালে তার স্নেহার্দ্র পরশের আলিম্পন এঁকে দিলে।

মালতীর স্নেহ-শীতল এই কর পরশে চমকে উঠে সুশীল ঘাড় তুলে প্রশ্ন করলে—কি মালতী?

অত্যন্ত শান্ত অথচ সংযত স্বরে মালতী বললে—তুমি এমন অসময়ে শুয়ে যে?

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থেকে সে বললে—আমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এলাম ভাই!

মালতী এ কথার কোনো জবাব দিলে না। ঝড়ের রাতে নীড়হারা পাখী যেমন করে তার সাথীর দিকে তাকায়, ঠিক তেমনি করুণ ব্যথিত দৃষ্টিতে সে সুশীলের দিকে চেয়ে রইল।

—তুই চুপ করে রইলি যে?—সুশীল তখন এমন একটা অবস্থায় এসে পড়েছে, যখন সে তার অবস্থা সম্বন্ধে কোন একটা কথা বলতে পেলে যেন বেঁচে যায়। এমন একটা বলবার পথ পেলেই হয়। তাই সে এই প্রশ্ন করে উৎসুক নয়নে মালতীর দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু মালতী এ কথার কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। তার দাদা তাদের অবস্থার কথা সমস্তই জানে; এবং তা জেনেও যখন সে এতবড় একটা দুঃসাহসের কাজ করে ফেলেছে, তখন যে তার পশ্চাতে একটা বড় রকমেরই কারণ আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সে কারণ জেনে তারই বা প্রয়োজন কি? তবুও দাদার কথার একটা উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এই ভেবে সে বললে—তোমার কাজের বিচার আমি কী কর্ব্ব দাদা। তুমি ত সব বোঝ, তবুও যখন—

—সত্যি ভাই, সব বুঝেও না ছেড়ে থাকতে পারলাম না। দেহে চাবুক মারলে লাগে জানি; কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্বের ওপর চাবুক চালালে তা যে কত বড় একটা মর্ম্মন্তুদ ব্যাপার হ'য়ে ওঠে, তা তোকে কী ক'রে বোঝাব। এ সহ্য করেও কি থাকতে হবে! সকলে বলবে—উপায় কি? অবিশ্যি এও একটা ভাববার কথা—কি কর্ব্ব? কি করে সংসার চালাব—

মা ধীরে ধীরে এসে ডাকলেন—সুশীল, সে কথা পরে ভাবিস। এখন খাবি আয়। সেই কোন্ সকালে দু'টী খেয়ে গেছিস। মায়ের গলার স্বরে যেন স্নেহ-মমতার অমৃত স্রোত। আবেগে তার চক্ষু সজল হয়ে উঠল। তার অবস্থা মায়ের কাছে প্রকাশ করবার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে উঠল। কিন্তু কি ভাবে যে সে সব কথা প্রকাশ করে বলবে, তা সে স্থির করতে পারলে না। আহারে যেন তার রুচি অন্তর্হিত হয়ে গেল। অস্থির ভাবে অর্দ্ধেক খেয়ে যখন সে উঠে পড়ছে, তখন মা বললেন—সুশীল, চাকরী ছেড়েছিস বলে যে খাওয়াও ছাড়তে হবে, এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে? বসে ভাল করে খা দেখি।

মায়ের পরিহাস-তরল আন্তরিকতায় তার মন যেন কতকটা সুস্থ হয়ে এল। আবার খাওয়া সুরু করে সে বলতে সুরু করে দিলে—মা, আমার চাকরী ছাড়ার কারণ কি জান? যেখানে আমি চাকরী করতাম—আপিসে আজ পর্য্যন্ত যত কিছু অত্যাচার তাকে সহ্য করতে হয়েছিল,

তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব দাখিল করে সে তার কারণ শেষ করলে।

মা হেসে বললেন—আমি তো তোর এত সাত-সতেরো শুনতে চাইনি। তুই ছেড়েছিস এবং অকারণে যে ছাড়িস নি—এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি ত তোর কাছে কৈফিয়ৎ চাইনি।

এ কথার উত্তরে সুশীল খুব হালকা ভাবেই বললে—সে নয় আমি নিজে থেকেই দিলাম। কিন্তু মা, কী করা যায় বল দেখি ?

সে তুই জানিস ভাল—

এর পর আর কথা চলে না। খাওয়া শেষ করে সুশীল তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু কি করা যায়—ভবিষ্যতের এই চিন্তা তার মস্তিষ্কে একটা বিপ্লবের সূত্রপাত করে দিলে। ঘুম আর তার চোখে এল না। শুয়ে শুয়ে কতক্ষণ জেগে থাকা যায় ? বিরক্ত হয়ে সে উঠে খানিকক্ষণ বারান্দায় পাদচারণ করে আবার শুয়ে পড়ল। রাত দু'টার মেল হুঁ হুঁ করে চলে গেল। সে শুয়ে শুয়ে ঝিঁ ঝিঁ পোকার আওয়াজ কাণ পেতে শুনতে লাগল। এই নিষ্ক্রিয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে কখন সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম যখন তার ভাঙল তখন সাতটা বেজে গিয়েছে। অন্যদিন সে এর পূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ ক'রে ; কিন্তু আজ যেন কেমন একটা আলস্যে সে জড়বৎ শুয়ে রইল।—আপিস ত' আর নেই।

মা এসে দেখে গেলেন—সে ঘুমুচ্ছে। মালতী বিছানা তুলতে এসে দেখে—দাদা তখনও শুয়ে আছে। আর কোনো রকম সাড়া না দিয়েই সে ফিরে এল। পিসিমা প্রশ্ন করলেন, সুশীল বুঝি ঘুমুচ্ছে এখনও।

মালতী ঘাড় নেড়ে বললে—হাঁা।

—আহা তা একটু ঘুমুক একটা দিন। আবার কাল থেকে চাকরীর ধান্ধায় ঘুরতে হবে ত।

কথাগুলো আধ-জাগরণ আধ-নিদ্রার জাল ভেদ করে সুশীলের কাণে এল। যে আলস্যকে অবলম্বন ক'রে সে শুয়ে ছিল, এই "আহা"র আঘাতে তার সে আশ্রয় ভেঙে পড়ল। সে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল।

আলনা থেকে জামাটা নিয়ে গায়ে দিতে দিতে তার মনে হ'ল, জামা প'রে কি হবে ? কোথায়ই বা সে যাবে। তবুও যখন জামাটা গায়ে দেওয়া হয়েছে, তখন বার হ'য়ে পড়াই ভাল।

অনির্দ্দিষ্টভাবে সে পথ চলতে সুরু করলে।

আপন মনেই সে চলেছিল, এমন সময় একটা ডাক শুনে সে থেমে দেখলে, ডাকছে তার ভূতপূর্ব্ব সহপাঠী অমল।

ছাত্রজীবনে এই ছেলেটীরই সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা চলত। এতদিন সে তার সঙ্গে সমান ভাবে পাল্লা দিয়ে এসেছিল ; কিন্তু চারমাস হ'ল ও-পথে আর তার পাল্লা দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। তাকে পিছিয়ে পড়তে হল। আজ হঠাৎ সেই অমলের সঙ্গে দেখা হওয়ায় তার যেন কেমন লজ্জা বোধ হতে লাগল।

হাতের একখানা মোটা বই দোলাতে দোলাতে অমল প্রশ্ন করলে—কি সুশীল, এদিকে কোথায়—

এর কোনো উত্তর ছিল না ; তাই তাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল—না এমনি—

অমল বেশ মুরুব্বিয়ানার ভাবে বললে—আপিস ছুটী না কি ?

সত্য কথাটা বলতে অকারণে যেন কেমন বাধ বাধ ঠেকল। তবুও এই চাকরী ছেড়ে দেওয়ার সাহসটুকু প্রকাশ করবার সুযোগ ত্যাগ করবার প্রলোভন সংবরণ না করতে পেরে সে বললে—না, চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছিস্ ! কেন রে ?

সাহেবের সঙ্গে ব'নল না।

বেশ, বেশ। তার পর কি কর্ব্বি মনে করেছিস।

—এখনও কিছুই ঠিক করিনি।

—'ও' বলে অমল সুশীলের দিকে একবার তাকালে।

অমলের এই মুরুব্বিয়ানার ভাব তার যেন অসহ্য মনে হল। তবুও ভদ্রতা রক্ষা ক'রে, নিজেকে সংযত করে, 'আচ্ছা আসি' বলে সুশীল যে পথে এসেছিল, ঠিক সেই পথেই হন হন করে ফিরে চলল।

ছাত্রজীবন ও এই কেরাণী জীবনের প্রভেদটুকু আজ যেন বড় বেশী স্পষ্ট হ'য়ে তাকে দাগা দিয়ে গেল। তার মনে হল—এর চেয়ে চাকরী না ছেড়ে দিলে যে ভাল হ'ত। তাহ'লে অন্ততঃ সহপাঠীর এই উপেক্ষাটুকু তাকে আঘাত করবার অবসর পে'ত না।

ফিরে আসার পথে তার চোখে পড়ল—ডেলি প্যাসেঞ্জারের দল ষ্টেশনের দিকে ছুটছে। ছাত্রজীবনে—শুধু ছাত্রজীবনে কেন গত কাল পর্য্যন্ত এদের এই ব্যস্তসমস্ততার হাস্যকর অংশটুকু যে ভাবে তার চোখে ফুটে উঠত, আজ আর সেটুকু তার চোখে পড়ল না। আজ তার মনে এদের জন্য সমবেদনা জাগল। মনে হ'ল—জগতে এরা নীরবে কর্ত্তব্য করে যায়, অথচ সেজন্য এরা কখনও স্পর্দ্ধার কোলাহল তোলে না।

তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসে সে স্নান সমাপন করে যখন রান্না ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়াল, তখন মা বললেন—

—কি সুশীল, এখখুনি ভাত চাই ?

—হ্যাঁ মা। চাকরীর চেষ্টায় যখন ঘুরতেই হবে, তখন একটু সকাল সকাল বা'র হওয়াই ভাল।

মা একবার তার মুখের দিকে চেয়ে ভাত বেড়ে দিলেন।

আবার সুরু হল হাঁটাহাটি। আপিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে যখন ব্যর্থতার ক্লান্তিতে সে বাড়ী ফিরে আসত, তখন এক-একবার মনে হত—দুর ছাই আর কাল থেকে ঘুরব না। কিন্তু উপায় কি ?

সহপাঠীর উপেক্ষা, সংসারের চিন্তা সমস্ত একত্রিত হ'য়ে আবার তাকে এই পথে তাড়িত করত।

এতদিনে ব্যর্থতার আঘাতে তার আর অনুশোচনার অন্ত ছিল না। তার মনে পড়ল—পুরঞ্জন বাবুর কথাই ঠিক। ঠিক অতটা তেজ তাদের শোভা পায় না, যাদের এই সকল লোকের দয়ার ও মর্জ্জির ওপরেই নির্ভর করতে হবে।

অবশেষে অনেক ঘুরে অনেক রূঢ় প্রত্যাখ্যানের সাক্ষাৎ লাভ করে তার আশা সফল হল।

মা শুনে সত্য নারায়ণের পূজা মানত করলেন। মালতী সকলের অসাক্ষাতে একবার উর্দ্ধ দিকে চেয়ে কপালে হাত ঠেকালো।

পরের দিন থেকে আবার সেই ৮-১০ মিনিটের গাড়ীতে তার যাওয়া সুরু হল। হরিবাবু তাস দিতে দিতে বললেন—বেশ বেশ, যাক, একটা চাকরী পেয়েছ তাহলে। পুরঞ্জন বাবু মুখের সামনে থেকে কাগজটা একবার নামিয়ে সুশীলের দিকে চেয়ে আবার তাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন। দেবী বাবু একবার চোখ চাইলেন—"মায়ার বাঁধন বড় শক্ত রে ভাই।" আবার তাঁর চোখ বন্ধ হ'য়ে গেল।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। কেন যেন মনে হল—সুশীল চাকরী না পেলেই ভাল হত। অন্য কিছু একটা করতে পারত। এ আশার কোন কারণ ছিল কি ? আর এতেই বা কি ? সমুদ্রে এক বিন্দু জল বাড়ল বৈ'ত নয় ?

ভ্রাম্যমানের জল্পনা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

নালদেরা জাহাজ
৭ই মার্চ্চ, ১৯২৭

এ জাহাজে নিঃসঙ্গতার মধ্যে কতরকম চিন্তাই না মনে উদয় হয়। মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের বিচিত্র মনটির খেয়ালগুলির দিশা কি সত্যিই পাওয়া যায় ? মনের ভিতর থেকে উত্তর আসে "কম বেশি যায় বই কি, নইলে এ দিশা-পাওয়া নিয়ে মানুষ সৃষ্টির আদিমকাল থেকে কেনই বা এত মাথা ঘামিয়ে আসচে ?" আমাদের সাবধানতা ব'লে বসে যে কোনও অধ্যবসায় জগতের মানুষের মনে যদি বহুকাল ধ'রে বিরাজ ক'রে এসে থাকে, তা'হ'লে তাকে একান্ত অর্থহীন মনে করাটা হয়ত খুব নিরাপদ না হ'তেও পারে। তাই মনে হয়—আমাদের মনের অতল তলের বিচিত্র লহরী-লীলার দিশা হয়ত একটু আধটু পাওয়া যায় যদি জীবন-বিধাতার কাছে আন্তরিকতার বরটি মনেপ্রাণে চাইতে শেখা যায়।

অবশ্য আমাদের মনটির স্বরূপ পরিচয় পাওয়াটা হচ্ছে—যাকে ইংরাজীতে বলে a question of degree অর্থাৎ কেউ বেশি পায় কেউ কম পায়, যেহেতু কেউ বেশি আন্তরিক কেউ কম আন্তরিক।

কিন্তু ··কিন্তু···এ দিশা পাওয়ার সার্থকতা কোথায় ? সংসারে জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাইরের সহস্র-রকম কর্ম্ম

কাণ্ডের দাবীদাওয়ার একটা সুসমঞ্জস মর্য্যাদা রাখাই যদি জীবনের পরম পুরুষার্থ হয়, তবে নিজের মনকে নিয়ে এরকম চুলচেরা বিচার করতে যাওয়াটা কি সময়ের একটা মস্ত অপব্যবহার নয়? সময়ে সময়ে সত্যিই মনে হ'তে পারে যে অণুবীক্ষণ-যোগে মনকে এভাবে তন্ন তন্ন ক'রে বিশ্লেষণের বালাই-ই বা কেন? সংসারে এমন কত দেশের সুসন্তান দেখা যায় যাঁরা জীবনে ঈপ্সিতের দর্শন পেয়েছেন ব'লে লোকে দৃঢ় বিশ্বাস করে, অথচ যাঁরা রবীন্দ্রনাথ বা অরবিন্দ বা রোলাঁ বা ডষ্টয়েভ্স্কির মতন নিজেদের মনটির অভিসারে কখনও যাত্রা করার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি। কারণ তাঁদের সময়ের মূল্য যে ঢের বেশি। জগতের বহু প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক এরূপ অশ্রান্ত-কর্ম্মীর উজ্জ্বল জীবনের তারিফ করতে গিয়ে ব'লে থাকেন "There's no nonsense about him." কারণ সময় যে অমূল্য—সময়ের সদ্ব্যবহার, সমাজের সেবা, জগতের উন্নতিসাধনে প্রাণপাত করা—যে বর্ত্তমান ডিমক্রাসির মন্ত্রনীতি!...

কিন্তু তবু প্রতি সভ্যতায়ই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মার্কাস অরেলিয়াস, সক্রেটিস, প্লেটো, যাজ্ঞবল্ক্য, শুকদেব, ভীষ্ম, শেক্ষপীয়র, দান্তের মতন মানুষ জন্মগ্রহণ ক'রে এসেছেন যাঁরা বাইরের শত কর্ম্মকাণ্ডের দাবীদাওয়াকেও উপেক্ষা ক'রে নিজেদের মনের এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের কাজেই তাঁদের সময়ের বার আনা অংশ নিয়োজিত করার অদম্য অধ্যবসায় দেখিয়ে এসেছেন। এ দৃশ্যতঃ অসঙ্গতির সমাধান কোথায়?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে যেতে হয় সেই মূল প্রশ্নে যাকে ইংরাজীতে একটি ছোট্ট সুন্দর কথায় বলা হয় "Question of values"—অর্থাৎ কি কি গোড়াকার জিনিষকে আমরা প্রত্যেকে জীবনে সবচেয়ে বেশি কাম্য মনে করি আমাদের সেইখানে যেতে হবেই হবে যদি এ-রকম প্রশ্নের শ্রেষ্ঠ উত্তর পেতে চাই।

এক সময়ে মানুষ মনে করত—বিশেষতঃ য়ুরোপে বিগত শতাব্দীতে—যে সব মানুষকেই বুঝি উন্নতি, সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব প্রভৃতিতে বিশ্বাস করতেই হবে। সে-সময়ে তাই জগতের মানুষের কাছে জগতকে কি ক'রে বরেণ্য ক'রে তোলা যায় সেটা একটা সমস্যা ছিল না। কিন্তু আজকের দিনে ক্রমাগত আশাভঙ্গ, যুগ-যুগের গঠনের মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হওয়া, শত শিক্ষা সত্ত্বেও মানুষের উন্মত্ততা ও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের হাহাকারের দৃশ্যে মানুষের মনে সংশয় জন্মেছে। সে সংশয়টি এই যে সব মানুষকে অদূর ভবিষ্যতে একটা একমাটা দীক্ষায় দীক্ষিত করা কার্য্যতঃ সম্ভব কিনা? তাই question of valuesটা আজকের দিনে প্রথম সত্য সমস্যার রূপ ধারণ ক'রে এসেছে। যতদিন মানুষ মনে করে যে সব মানুষেরই চোখে সৎশিক্ষার ফলে গুটিকতক নির্দ্দিষ্ট জিনিষই চরম-কাম্য ব'লে প্রতীয়মান হ'তে বাধ্য ততদিন সংসারে শত দুঃখ দৈন্যের মাঝেও অন্ততঃ এই একটা মস্ত সান্ত্বনা তার থাকে যে জগতের সহস্র দুঃখ মালিন্য আজই দূর হ'তে পারছে না কেবল এই শিক্ষার অভাবে। তখন question of values আসে না, যেমন আমেরিকানদের কাছে আজ এ সমস্যাটা তার বৃহৎ রূপ নিয়ে দেখা দেয় নি। তারা সমগ্র জগতকে আমেরিকান মূলমন্ত্রে দীক্ষিত করতে আজও বদ্ধপরিকর।

কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে মানুষের মনে এই উপলব্ধিটি ধীরে ধীরে রূপ গ্রহণ করে থাকে যে শেষকালটায় সব মানুষই যে কোনও ধরাবাঁধা মূলমন্ত্রে সায় দেবে এমন কোনও কথা নেই, তখন সে বাধ্য হ'য়ে নানারকম মানুষের জন্যে নানারকম বিধি বিধান ও নীতি মন্ত্র তৈরী করতে বাধ্য হয়। তাই রাসেল এক স্থলে ব'লেছেন যে জীবনে তিনি সবচেয়ে মূল কাম্য বলতে যা বোঝেন আর একজন যদি সে-সবের বাঞ্ছনীয়তা স্বীকার না করেন, তবে তাঁকে স্বমতে টেনে আনার কোনও অস্ত্রবিদ্যাই তাঁর জানা নেই। অর্থাৎ সেরূপ ক্ষেত্রে ভিন্ন মতাবলম্বীকে বল্‌বার আমাদের প্রায় কিছুই থাকে না। তখনই আমরা ঠেকে শিখি যে অন্ততঃ জগতের বর্ত্তমান পরিণতির অবস্থায় এমন কোনও মহৎ বাণীই থাকতে পারে না, যে বাণীতে সকলের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে একত্রে সাড়া দেওয়া সম্ভব। সুতরাং তখন মাথাব্যথা পড়ে সমব্যথী ও সমধর্ম্মীদের খোঁজ নিয়ে, যেহেতু দুচারজন সমধর্ম্মী নইলে মানুষ বাঁচতেই পারে না। রাসেল ললিতকলা, জ্ঞান, ভালবাসা ও জীবনে আনন্দ এই চারটি মূল মন্ত্রে বিশ্বাস করেন। অরবিন্দ সম্ভবতঃ মুক্তি ধ্যান ও একাকিত্বে বিশ্বাস করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ প্রেমের সূক্ষ্ম সৌরভ ও বিশ্বমানব-মৈত্রীতে বিশ্বাস করেন। হেনরি ফোর্ড সম্ভবতঃ অজস্র অর্থাগমে বিশ্বাস করেন। নেপোলিয়ন সম্ভবতঃ বিশ্বাস করতেন ক্ষমতার সুরাপানে। এঁদের একজন অপরজনকে কখনই

কোনও যুক্তিবলেই নিজের মতে টেনে আন্‌তে পারবেন না, অথচ এঁরা জগতের মনীষীদের মধ্যে নিজের ক্ষেত্রে বরেণ্য মানুষ সন্দেহ নেই।

তাই মনে হয় নিজের মনকে নিয়ে বেশি মাথা-ঘামানো, অন্তর্মুখিতা প্রভৃতি মনোভাবের সমর্থন খুঁজতে গেলে যেতে হয় ঐ গোড়াকার কথায়—অন্য সমাধান নেই।

জাহাজে উঠে এক্‌লা নানারকম উদ্ভট চিন্তা করতে করতে মনে হচ্ছিল যে তথাকথিত দেশের সুসন্তানদের সঙ্গে যে দুচারজন অন্তর্মুখী মানুষের জীবনে কাম্যতা সম্বন্ধে গোড়ায়ই গরমিল তারা পরস্পরের কাছে অন্ততঃ বহুকাল দুর্বোধ্য ঠেক্‌বেই ঠেক্‌বে। শুধু এদের ক্ষেত্রেই বা কেন জীবনে প্রতি পদেই ত এই ভুল বোঝার পরিচয় মেলে।

আমার একটি আত্মীয় আছে। সে বাল্যকাল থেকে চুপচাপ থাক্‌তে, গঙ্গার শোভা দেখ্‌তে, অন্য দুচারজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে ও আপনমনে গান গাইতে ভাল বাস্‌ত। তাকে অনেকদিন বুঝতে পারি নি। তার সঙ্গে কত তর্কই করেছি—জীবনে তার কোনও উচ্চাশা না থাকার দরুণ। পরে আর একটি বন্ধুর সাহিত্যের দিকে অসামান্য পারদর্শিতা থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যকে একান্ত অবহেলা করার জন্যে তা'র সঙ্গে বিস্তর তর্ক ক'রেছি। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে আমার যুক্তি অখণ্ডনীয় এ বিশ্বাস আমার নিজের মনের মধ্যে দৃঢ়মূল থাকা সত্ত্বেও আমি কোনোমতেই এঁদের দুজনের কাউকেই বোঝাতে পারি নি যে তাঁদের প্রত্যেকের জীবন সম্বন্ধে out lookটি ভ্রান্ত!

আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে যে এ দুই ক্ষেত্রেই তর্কে কোনও ফল ফলে নি বোধহয় এই জন্যে যে এঁদের দুজনের মনো-জগতের মূল কাম্য বস্তুর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণার বেশ বড় একটা গরমিল ছিল। এখন তাই বুঝতে আরম্ভ ক'রছি যে এরূপ ক্ষেত্রে তর্ক নিষ্ফল, যুক্তিবাদ নিষ্ফল —তা যুক্তিবাদীরা যুক্তির objectivity বা বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন।

সকলেই জানেন একজন বড় গ্রীক দার্শনিক একটি স্নানের টবের মধ্যে দাঁড়িয়ে বরদানোদ্যত জগতের সম্রাটের কাছে শুধু একটু স'রে-যাওয়ার বর চেয়েছিলেন; কারণ স্নানের টবের পাশে সম্রাটের উপস্থিতিতে তিনি বিধাতার আলোহাওয়া থেকে অকারণ বঞ্চিত হচ্ছিলেন।

মনে আছে বাল্যকালে যখন এ গল্পটি প'ড়েছিলাম তখন প্রথমটায় হেসেই কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বসম্রাটের কাছে যে চাইলে কি না পেত সে কি না শুধু তাঁর একটু স'রে-যাওয়ার বেশি কিছু চাওয়ার কথা ভাব্‌তেও পার্‌ল না! এতই তার স্থূল মস্তিষ্ক! লোকটা নিশ্চয়ই পাগল ছিল!

কিন্তু আজ দেখ্‌ছি যে ডায়োজিনিস পাগল ছিলেন না, জ্ঞানী ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আজ এ সমস্যাটা অন্ততঃ একটুও সহজবোধ্য হ'য়ে এসেছে ব'লে মনে হয়, যদিও অনেক অনুরূপ ক্ষেত্রেই ভিন্নমতাবলম্বীকে আমরা পাগল মনে ক'রে হেসে উড়িয়ে দিতেই চাই—যদি না সে নিতান্ত আমাদের শ্বাসরোধ করে আমাদের কাঁদাবার উপক্রম করে। কারণ আজকাল মনে হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে যে প্রতি মানুষের আসল স্বরূপটি বোধহয় অপরিবর্ত্তনীয়—অন্ততঃ কোনও গভীর পরিবর্ত্তন যদি হয় তবে সেটা এক জন্মে হয় না। এবং সেই জন্যেই সম্ভবতঃ কাম্য কি সে সম্বন্ধে অপরের মূল ধারণাগুলির সারবত্তা নিয়ে তার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা ক'রে লাভ হয় এত কম। যে-সব ক্ষেত্রে একটু গোড়াকার মিল থাকে বোধহয় কেবল সেই সব ক্ষেত্রেই আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদান ক'রে লাভবান্‌ হওয়া যায়। যে ক্ষেত্রে গোড়ায়ই গলদ সে ক্ষেত্রে কে-ই বা ভুল প্রদর্শন করে আর কেই বা তা শোনে!···

তাই মনে হয় যে যারা নিজেদের মনকে নিয়ে উল্‌টে পাল্‌টে নেশার আগুনে চাপিয়ে আলস্যের রসে ভেজে, ভাবালুতার রঙে রঙিয়ে চেখে চেখে আস্বাদন করতে ভালবাসে তাদের এ দুর্নিবার প্রবণতাটি স্বয়ংসিদ্ধ হ'তে বাধ্য—তাতে দেশের লাভই হোক্‌ বা আমাদের শক্তির অপব্যয়ই হোক্‌। সৃষ্টির লীলা বিচিত্র, তাই মানুষের প্রকৃতিও বিচিত্র। এ অফুরন্ত বৈচিত্র্যের জন্যে কার কাছে নালিশ কর্‌ব?···

এ বৈচিত্র্যের কথা বিশেষ ক'রে মনে হ'ল—আমার এ জাহাজের ক্যাবিন-সঙ্গী একটি পাঞ্জাবী ডাক্তারের প্রশ্নে। তিনি কাল রাত্রে হঠাৎ আমাকে বল্‌লেন যে আমার সঙ্গে তিনি নীসে ও পারিসে যেতে রাজী আছেন, যদি আমি তাঁকে কথা দিই যে তাঁর সময় যাতে আনন্দে কাটে সে দিকে আমি একটু খরদৃষ্টি রাখ্‌ব। দেখলাম এ বিষয়ে আমার মনোযোগের কার্য্যকারিতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস!···

আমি তাঁকে আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর সময় কিসে আনন্দে কাটে সে বিষয়ে আমি কেমন ক'রে এমন অন্তর্দৃষ্টি পাবার ভরসা করতে পারি ?—

তিনিও বাধা দিয়ে বল্‌লেন : "Come come, you dont mean it all. Why do we go to Paris if not to have a fine time, eh ?"

(লোকটি ভাল ইংরাজী বলেন ও ভাল রকম ইঙ্গিত করতেও জানেন।)

আমি তাঁর এ ইঙ্গিতে একটু ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে কুণ্ঠিতভাবে বল্‌লাম যে আমি ঠিক সেজন্যে পারিসে যাচ্ছি না—কাজেই—

লোকটা সোজা হেসে উড়িয়ে দিল এ কথা।

তখন মনটা একটু ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিল—ও একবার এমনও মনে হ'য়েছিল যে জ্বলন্ত ভাষায় একবার তাঁকে একচোট নীতিশিক্ষা দিয়ে দেই যে সকলেই এক ছাঁচে তৈরী হয় নি—এমন মানুষও থাকে যারা পারিসে অন্য উদ্দেশ্যেও যায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে সে-রকম সারগর্ভ বক্তৃতা না দিয়ে ভালই হ'য়েছে—সেটা মোটেই বিজ্ঞের মতন কাজ হ'ত না। কারণ তাঁর কাছে এরকম কথা নিশ্চয়ই মনে হ'ত—Sheer humbug.

বস্তুতঃ তাঁর মুখে আমার বিরুদ্ধে যে ভাবটি প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ল তা অবিমিশ্র ভণ্ডামির অভিযোগেরই স্পষ্ট ছায়াপাত।

মনে তখন একটু আত্মপ্রসাদের ভাব যে উদয় না হ'য়েছিল এমন নয় যে এরকম মনোভাব না নিয়েও যে একজন পারিসে যেতে পারে, তা এই তরলচিত্ত যুবকের কল্পনাতীত। ভাবলাম ব্যাপারটা একবার জলের মতন যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেই।

কিন্তু আজ ভাবতে ভাবতে মনে হচ্ছে যে এ আমার যুক্তির অকাট্যতার আত্মপ্রসাদের মধ্যে একটা নিহিত অহমিকা ছিল। যদি তাঁর জীবনে সবচেয়ে কাম্য হয় যাকে তিনি বলেন having a fine time, তবে তাঁর মনোভাবটি যে অসার এমন কথা তাঁকে বিশ্বাস করানো দূরে থাকুক তাঁর কাছে জোর ক'রে বলিই বা কেমন ক'রে ? বস্তুতঃ এটাও কি একটা question of values নয় ? অর্থাৎ আমি নিজে এরূপ মনোভাবকে অসার মনে করতে পারি, কিন্তু তাঁর কাছে কোন্ যুক্তিবলে প্রমাণ করতে পারি যে আমিই ঠিক্ ও তিনিই ভুল ?

অথচ আশ্চর্য্য এই যে এ সব বুঝেসুঝেও আমাদের মনে অহমিকার ভাব আসে ও আমরা ভাবি গম্ভীরভাবে তর্কাদি ক'রে এরকম মনোভাবের মূল শিকড়টি উপ্‌ড়ে ফেলা যায় !

৮ই মার্চ্চ, ১৯২৭

কিন্তু কেনই বা আমরা আমাদের ভাবনাচিন্তারূপ বুদ্‌বুদগুলিকে জলের অতলতল থেকে ডেকে এনে বাইরের আলোতে স্থায়ী করবার প্রয়াস পাই ?—বোধ হয় এইজন্যে যে এতে ক'রে আমাদের অনেক অস্পষ্ট প্রতীতিকেই একটু স্পষ্ট ক'রে তোলা হ'য়ে থাকে।...

তাই কি ?...হবেও বা।

কিন্তু হয়ত শুধু সেইজন্যেই নয়। কে জানে ? নিজের মনের নাগাল পাওয়াটা এত কঠিন ব্যাপার যে ঠিক্ ক'রে বলাও কঠিন।...

কিন্তু বোধহয় ঠিক্ সেইজন্যেই—অর্থাৎ নিজের মনের নাগাল পাওয়াটা দুঃসাধ্য ব'লেই—তার একটু পরশ পাওয়ার মোহ এত দুর্দ্দম্য হ'য়ে ওঠে কারুর কারুর কাছে। এবং সেইজন্যেই হয়ত নিজের মনের ছায়ান্ধকার প্রদেশে হাতড়ে চল্‌তেও ভাল লাগে—বারবার ঠোকর খাওয়া সত্ত্বেও। কারণ এ চলার-পথে নেশার ঘোরেও অলব্ধ ধনের খনির দর্শন মেলা সম্ভব এইরকম একটা আশাচিত্র আমাদের মানসচক্ষুর সাম্‌নে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে যে !... যা সকলেরই নয়নগোচর তাকে বেশি ক'রে প্রকাশ করার মধ্যে একটা অবিসংবাদী তৃপ্তি আছে মানি। যার সঙ্গে সকলেই বরাবর কমবেশি পরিচিত তার মধ্যেও অনাবিষ্কৃত কোনও উপাদান আবিষ্কার করার প্রয়াসের মধ্যে একটা মোহ আছে জানি। কিন্তু যে-সব জিনিষ অস্পষ্ট ব'লে সাধারণতঃ অবজ্ঞাত তাকে স্পষ্ট ক'রে ধরার মধ্যে যে মাদকতাটুকু নিহিত আছে সেটা বোধহয় একটু ভিন্ন শ্রেণীর। নয় কি ?...আর অস্পষ্ট অনাবিষ্কৃত প্রদেশ যদি খুঁজতে হয় তবে নিজের মনের মতন এমন বিশাল বিরাট্ অন্তহীন রাজ্য আর কোথায় পাওয়া যাবে ?—তার ওপর যখন প্রত্যেকের চোখে এ-রাজ্যটির কোনও না কোনও অদৃষ্ট অংশ একটু-না-একটু ধরা দেয়ই যদি সে আন্তরিক

ভাবে খোঁজে, তখন ভরসা হয় যে এ অকেজো কাজটিও হয়ত বস্তুতঃ নিতান্ত বাজে কাজ না হ'তেও পারে।

তাছাড়া নিজের মনের অতল তলের তলস্পর্শ করার প্রয়াসের মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য সার্থকতার আস্বাদ মেলে না কি? প্রতি উপলব্ধিতে অস্পষ্টতার ছায়ালোক হ'তে উদার আলোর রাজ্যে টেনে-আনার ফলে কি তাকে আরও নিবিড় ক'রে পাওয়া যায় না?···নিশ্চয়ই যায়। কেন না প্রকাশে যদি উপলব্ধির একটা মস্ত সার্থকতা না থাকত তাহ'লে সৃষ্টিলীলাই যে একটা মস্ত পরিহাস হ'য়ে দাঁড়াত! সৃষ্টি মানেই ত—প্রকাশের ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে অরূপের নিজেকে নতুন-ক'রে পাওয়ার সেই চিরপুরাতন চিরনূতন ইতিহাস। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র মঞ্জরী ও লতিকাটি থেকে মহিমময় দার্শনিক ও কবির বিকাশের চিত্তোন্মাদী দৃশ্যের মধ্যে কি এই বিরাট সত্যটি রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে না যে একটা অদৃশ্য শক্তি নিত্যনিয়ত রূপের মধ্যে দিয়ে, প্রকাশের মধ্যে দিয়ে, সীমার মধ্যে দিয়ে নিজের অমূর্ত্ত অসীম অরূপ সত্তাটিকে উত্তরোত্তর উপলব্ধি করতে চাইছে? কেন চাইছে, এ প্রশ্নেরই যে কোনও অর্থ নেই, যেমন কেন আছি এ প্রশ্নটি অর্থহীন। উপলব্ধি আপনাতেই আপনি সার্থক, নিজের অভিব্যক্তিতেই স্বয়ংসিদ্ধ। গুণী যখন গান গায়, কবি যখন ছন্দ রচে, শিল্পী যখন বর্ণ বোনে, দ্রষ্টা যখন সত্য দেখে—তখন কি আর তার মনে এ প্রশ্ন ওঠে যে এ-সব কেন? তার মন ব'লে বসেই বসে—"এই-ই বটে, এইতেই যে আমার সার্থকতা, কেন না যুগ-যুগান্তর ধ'রে একেই যে আমি খুঁজছিলাম।"

সাম্‌নের নীলবারিধির সমাপ্তিহীন কলোচ্ছ্বাস, আকাশের প্রতি বর্ণসম্পাতের তালে তালে মুগ্ধ নৃত্যে তার রঙের ঝরণার সাড়া দেওয়া, বাতাসের প্রতি নূপুরস্পর্শে তার উদ্বেল বুকের গেয়ে ওঠা—এ সবই কি আপনাতেই আপনি সার্থক নয়? নীলিমার হাতছানিতে নীলাম্বুর উদ্দাম অভিসারের দৃশ্যে মনে কি কখনও এ প্রশ্ন ওঠে যে "এ কেন?" মন গেয়ে ওঠে "এই ত বটে সুন্দরের বাঁশিতে অভিসারিকার গতিছন্দ! এই ত বটে আলোর ডাকে তরঙ্গরেখার উদাস তানে সাড়া দেওয়া! এই-ই ত বটে নিত্যনব ব্যঞ্জনার মধ্যে দিয়ে সেই চিরপুরাতন রূপকারের বর্ণতুলিকার গরিমাময় ইতিহাস!"

সৃষ্টির সর্ব্বত্রই ত এই রূপের খেলা, রেখার লীলা, বর্ণের দোলা! তাই একে অস্বীকার করার মানে সৃষ্টিকেই অস্বীকার করা।

মনের ক্ষুদ্রতম চিন্তাও তাই নগণ্য নয়। কেন না তার মধ্যে যে অসীমের পরশটি ওতপ্রোত। তাই আমাদের প্রতি অকিঞ্চিৎকর চিন্তাকেও রূপ দেবার ইচ্ছাটা সৃষ্টিলীলার একটা চিরন্তন ইচ্ছা, আমাদের প্রতি অস্পষ্ট কল্পনাচিত্রকেও ফুটিয়ে তোলার প্রেরণা সৃষ্টিলীলার একটা আদিম প্রেরণা, আমাদের প্রতি আবছা স্বপ্নকেও মূর্ত্ত ক'রে তোলার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিলীলার একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা!···

রাশিয়া

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(শেষ)

জারের রাজত্ব শেষ এবং বল্‌শেভিজম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ার জাতীয় জীবনে নবধারার সূচনা হইল। কিন্তু এই প্রবল ধাক্কা রাশিয়ার লোকদের মূল জাতীয় ভাবের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।

১৯১৭ সালের মার্চ্চ মাসে জারের পতন হইল এবং সোস্যালিষ্ট গণতন্ত্র স্থাপিত হইল। কিন্তু এই সোস্যালিষ্ট গণতন্ত্রের আয়ু মাত্র কয়েক মাস ছিল। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসেই কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপিত হইল। এই কমিউনিষ্টদেরই অপর নাম বল্‌শেভিষ্ট। ইহারা পুরাতন প্রণালী সব একদিনে উড়াইয়া দিল। যাহারা শত শত বৎসর ধরিয়া আমীর ওমরাহদের পায়ের তলায় পড়িয়া ছিল—তাহারাই হইল এই রাষ্ট্রের কর্ত্তা, এবং যাহারা এতদিন কেবল বংশের দাবীতে রাজার হালে হাজার লোকের মাথার উপর পা দিয়া দিন গুজরান করিত, তাহারা হইল পদানত। তাহাদের গর্ব্ব

করিবার আর কিছু রহিল না। যাহারা মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ছিল, তাহারা শ্রমিক শ্রেণীর সহিত মিশিয়া এক হইয়া গেল।

সমগ্র রাশিয়াতে নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া আর কিছু রহিল না। জমি, জমা, সমস্ত প্রকার জিনিসপত্র সবই হইল রাষ্ট্রের সম্পত্তি। ঘরের তৈজসপত্রও রাষ্ট্রের। ব্যক্তিগত অধিকার বলিয়া আর কিছু রহিল না। যাহারা এতদিন খাট পালঙ্ক ইত্যাদি নানাপ্রকার আরামের জিনিসপত্র লইয়া দিন কাটাইতেছিল, তাহাদের সবই প্রায় কাড়িয়া লওয়া করিল। দেনা-পাওনা যা কিছু ছিল, সব ধুইয়া মুছিয়া সাফ করিয়া দেওয়া হইল। টাকা বলিয়া কিছু রহিল না। খরিদ বিক্রি জিনিসের বদলা-বদলিতে হইতে লাগিল।

যাহারা জমিদার ছিল—তাহাদের জমি গেল। যাহারা মহাজন ছিল, তাহাদের গেল মূলধন। পূর্ব্বে বড়লোকদের জীবন ধারণ করিবার মত যাহা ছিল, তা একদিন ভোজবাজির মত লোপ পাইল। তাহারা হইল পথের ভিখারী। অনেকে আবার এই মহাবিদ্রোহের সময় সঞ্চিত টাকা গোপন করিয়া ফেলে। তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া এই টাকা ভাঙ্গাইয়া

রাশিয়ান রাজভাণ্ডারের রত্নাবলী—অধুনা সোভিয়েট গবর্মেণ্টের হস্তগত।

হইল। যাহারা কষ্টে ছিল—তাহাদের কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করা হইল। এক প্রকার অনাহারে থাকিয়া দিন যাপন করা কত কষ্টের—মাতার সামনে সন্তান না খাইয়া মরার মতন পড়িয়া আছে এ দৃশ্য কি ভীষণ, তাহা পূর্ব্ব বড়লোকদের বুঝান হইতে লাগিল। অনেক স্থানে বড় লোকদের তাহাদের গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াও হইল। তাহাদের জন্য পর্ণকুটীরের ব্যবস্থা করা হইল। ইহাদের বলা হইল, "ভাল জিনিস এবং আরাম প্রাপ্যেরও বেশী ভোগ করিয়াছ—এখন কিছুদিন তাহার উল্টা ভোগ কর।"

ব্যাঙ্ক হয় উঠাইয়া দেওয়া হইল, না হয় রাষ্ট্র দখল দিন চালাইতে লাগিল। কিন্তু অতি অল্প দিন পরেই টাকার দর নামিয়া গেল। পূর্ব্বে যে টাকা তিন পুরুষ বসিয়া খাইলেও কমিত না, তাহা এই সময় সামান্য কয়েক মুদ্রার সমান হইয়া পড়িল।

কমিউনিষ্ট সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইবার পর তিন বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব মুদ্রার দাম অসম্ভব রকম পড়িয়া যায়। পূর্ব্বে যে মুদ্রার দাম ছিল ২০,০০০ পাউণ্ড, এই সময় তাহার দাম হইল ১পাউণ্ড মাত্র। ১৯২৩ সালের গোড়ার দিকে যখন ইংলণ্ড এবং রাশিয়ার বিবাদ শেষ সীমায় পৌছিয়াছে, তখন পূর্ব্বেকার ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের দাম পড়িয়া হয় মাত্র ১ পাউণ্ড।

পূর্ব্বে যাহারা ছিল বিচারক, উকিল, মোক্তার ইত্যাদি, এই সময় তাহারা একেবারে বেকার হইয়া পড়িল। পূর্ব্বেকার বিচার-পদ্ধতি এবং আইন-কানুনাদি ত্যক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উকিল মোক্তার জজ ইত্যাদিও বাতিল হইয়া গেল। পূর্ব্বেকার বিচারালয়ের বদলে এখন শ্রমিকদের দ্বারা নতুন বিচারালয় স্থাপিত হইল। বিচার-কার্য্যও ইহাদের বুদ্ধির দ্বারাই চলিতে লাগিল। চিকিৎসকেরা রাষ্ট্রের বেতনভোগী হইল—সামান্য বেতন এবং খোরাকীই হইল তাহাদের সম্বল। "ফি" বলিয়া কিছু আর রহিল না। ইহাতে গরীব দুঃখীরাও অনায়াসে ডাক্তারদের সাহায্য পাইতে লাগিল। যে সকল অধ্যাপক এবং শিক্ষকের চাকরি টিকিয়া থাকিল তাহাদের বেতনও রাষ্ট্র হইতে দিবার ব্যবস্থা হইল।

জার-রাজত্বের অবসানের পর রাশিয়ার অবস্থা কি প্রকার হয়, তাহার বর্ণনা একজন ইংরেজ ভ্রমণকারী কি প্রকারে করিয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। অবশ্য এই সময়ে রাশিয়ার অবস্থা যথার্থ কি ছিল, তাহা বলা কঠিন ব্যাপার।

পয়লা মে'র মহামহোৎসব

"দেশের ব্যবসা বাণিজ্য সব বন্ধ হইয়া গেল। দোকান পাট উঠিয়া গেল। হোটেল, সরাইখানা, কাফিখানা ইত্যাদি সবই এক রকম অচল হইল। টাকার দরও পড়িতে লাগিল। বহির্জগতের সহিত রাশিয়ার সকলপ্রকার সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া গেল। আমদানি রপ্তানি যে কি, তাহা লোকে ভুলিয়া গেল! যে সকল লোক এই সকল কার্য্য করিয়া দিন গুজরান করিত, তাহারা এই সঙ্গে বেকার হইয়া পড়িল।

বোলশেভিক শাসনের "রামরাজ্য"!

[দেশে খাদ্যাভাব। নারীরা ও শিশুরা পাত্র হস্তে সরকারী ছত্রে "ঝোল" (soup) লইতে আসিয়াছে; কিন্তু 'ভাঁড়ে মা ভবানী'।]

রাষ্ট্র হইল সকল লোকের এবং দেশের অন্নদাতা, শিক্ষাদাতা এবং কার্য্য দাতা। প্রত্যেক লোককে সরকার হইতে খাদ্য বস্ত্র এবং শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইল। বড় বড়

নটীর পূজা

শিল্পী — শ্রীসুধাংশুশেখর চৌধুরী

বাড়ীতে খাদ্যাদি পাক হইত; এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক এক স্থানের লোকেরা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাজির হইয়া দরকার মত খাদ্যাদি লইয়া আসিত। খাদ্য পাইবার জন্য সময় সময় লোকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। বন্দোবস্ত খুব ভাল হইয়াছিল, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হইবার পর হইতে দেশের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। মাঝখানে অজন্মা হওয়াতে লোকদের নির্দ্দিষ্ট খাদ্যের পরিমাণও ভয়ানক কম হইয়া গেল। ১৯১৯—২০ সালে একজন লোক ২ আউন্স রুটি এবং সামান্য একটু আলু পাইত! এই ছিল তাহাদের সমস্ত দিনের খাদ্য।

যুগ যুগ ধরিয়া অত্যাচারে পেষিত হইয়া রাশিয়ার লোকেরা প্রথম যখন স্বাধীনতার আস্বাদন লাভ করিল, তখন তাহারা একেবারে পাগল হইয়া গেল। সুখ-স্বপ্ন সত্য হইলে লোকের যেমন অবস্থা হয়, ইহাদের ঠিক তাহাই হইল। এই সময় ইহারা অনেক বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। শ্রমিকেরা কারখানা হইতে পূর্ব্ব প্রভুদের এবং কর্ম্মকর্ত্তাদের তাড়াইয়া দিয়া, কমিটি করিয়া কারখানার কার্য্য চালাইতে লাগিল। তাহাদের ইচ্ছাই হইল সর্ব্বময়। পরের প্রভুত্বে বা আজ্ঞায় তাহারা কোনো কার্য্য করিবে না। ছেলেদের বিদ্যালয়েও এই অবস্থা হইবে। ছাত্রদের কমিটি স্থির করিবে কেমন ভাবে বিদ্যালয় চলিবে, কি বই পড়ানো হইবে, কি পড়ানো হইবে না। কোন্ সময় পড়া হইবে, কোন্ সময় খেলার, তাহাও ছাত্রদের ইচ্ছা মত নির্দ্ধারিত হইবে। শিক্ষকেরা

রাশিয়ান কমিউনিষ্ট

সরকার হইতে বেতন পাইলেও তাহাদের ছাত্রদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে হইবে। হাসপাতালেও রোগীদের কমিটি নিযুক্ত হইল। ডাক্তার রোগীর ইচ্ছামত অনেক কাজ করিতে বাধ্য হইতেন। স্বাধীনতার চূড়ান্ত হইল।

১৯১৯-২১ সালে লোকদের দিন বড় দুঃখে কাটিয়াছিল। জারের আমলের ধনী লোকেরা, বড় বড়

৯৪ রাশিয়ার "মুক্তি"

বণিকরা ইত্যাদি আরো অনেকে রাশিয়া হইতে পলায়ন করিয়া জার্ম্মাণি, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। যাহারা দেশে রহিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে দেশদ্রোহী বলিয়া ধৃত হইয়া নিহত হইল; এবং অনেকে সাধারণ লোকদের দলে মিশিয়া পূর্ব্ব গৌরব ভুলিয়া গিয়া হীন কার্য্য করিয়া দিন কাটাইতে লাগাইল। অনেক রাজকুমারী ধোপার ব্যবসা আরম্ভ করে। বড় ঘরের মেয়েরা কুলী রমণীদের মত রাস্তা-ঘাট ঝাঁট দিবার কাজ পাইল। শিক্ষিত পুরুষ এবং নারী তাহাদের শিক্ষা-গৌরব ভুলিয়া কেহ বা দরজী, কেহ বা গাড়োয়ান, আর কেহ বা চা-বিক্রেতার কাজ গ্রহণ করিল। বসিয়া থাকিলে কাহারও বাঁচিবার উপায় নাই। না খাটিলে—কেহ খাদ্য-ভাণ্ডার হইতে কোনো খাদ্য পাইবে না। কালের গতিকে তাহারা রোধ করিতে পারিল না। এক পা চলিতে যাহাদের পাঁচখানি গাড়ী থাকিত, তাহারা ক্রোশের পর ক্রোশ বরফের উপর দিয়া সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া খাদ্য ভাণ্ডার হইতে প্রাপ্য খাদ্য লইতে আসিতে লাগিল।

[পেট্রোগ্রাডে বিদ্রোহীদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা।

মস্কোর রাজপথ পরিষ্কার

[শনিবারটা প্রায় সব দেশের লোকে আমোদেই কাটাইতে চায়। কিন্তু রাশিয়ায় মস্কো নগরে এইটী বিশেষ পরিশ্রমের দিন। প্রতি শনিবারে সমর্থ রাশিয়ান পুরুষ মাত্রেই স্বেচ্ছাসেবক রূপে কঠোর পরিশ্রম সহকারে সরকারী কার্য্য করে।]

এই সময় দেশের চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগিল। ডেনিকিন, কোল্‌চাক, র‍্যাঙ্গেল ইত্যাদি জারের আমলের সেনাপতিরা বলশেভিকদের বিরুদ্ধে ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিল। এবং এক এক সময় এমন ভাবে বলশেভিকদের পরাজয় হইতে লাগিল যে, সকলেই মনে করিয়াছিল—বলশেভিক রাজত্ব বুঝি শেষ হইবে। কিন্তু বলশেভিকরা সাধারণ শ্রমিক সৈন্য লইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য জীবন মরণ ভুলিয়া লড়াই করিতে করিতে অবশেষে সকল বিরুদ্ধ দলকে পরাজিত করিল। অনেক যায়গায় কৃষক-সম্প্রদায়ও বিদ্রোহ

করিয়াছিল। তাহাদের প্রধান আপত্তি ছিল যে, তাহারা চাষ করিয়া মরিবে—কিন্তু প্রয়োজনের বেশী যাহা থাকিবে—তাহাতে তাহাদের কোনো অধিকার থাকিবে না। ইহাদের বিদ্রোহও সফল হয় নাই। কিন্তু বলশেভিক নীতির কিছু পরিবর্ত্তন ইহাতে ঘটিয়াছিল।

সমস্ত পুস্তক বলশেভিক নীতি-পুস্তক নহে—জগতের নানা দেশের নানা ভাল ভাল বইএর রাশিয়ান অনুবাদ। কিন্তু অর্থাভাবে অনেক কার্য্যই অসমাপ্ত পড়িয়া রহিল। ব্যবসা বাণিজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিবার সময় নেতারা দেখিলেন যে, নতুন লোক দ্বারা এই সকল কার্য্য সুচারু রূপে চালানো যায় না। কারখানা খুলিবার চেষ্টা করিতে গিয়া দেখা গেল যে, নতুন লোকেরা ম্যানেজার এবং ফোরম্যানের কার্য্য সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ।

রাশিয়ান বোলশেভিষ্ট দল

এই সমস্ত কার্য্য এবং দেশের শাসন-যন্ত্র চালাইবার জন্য নেতাদের বহু অ-বলশেভিককে নিযুক্ত করিতে হইল। ইহারা গোপনে গোপনে বলশেভিক নীতির ক্ষতি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে ১৯২১ সালে লেনিন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাঁহার সহচরদিগকে বুঝাইলেন যে, বর্ত্তমানে যে ভাবে দেশের শাসন ইত্যাদি কার্য্য চালানো হইতেছে, তাহাতে আর বেশী দিন চলিবে না। "থিওরি" সকল সময় কার্য্যক্ষেত্রে খাটানো নিরাপদ নয়। বলশেভিক মূল

বলশেভিক নেতাদের প্রধান চেষ্টা হইল—দেশের ধন-দৌলত সমানভাবে বণ্টন করা; এবং দেশের মধ্যে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। সকল লোকের অধিকার সকল বিষয়েই সমান—এই ছিল ইহাদের মূলমন্ত্র। সমস্ত দেশে গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। সকলকেই লেখাপড়া শিখিতে আইন করিয়া বাধ্য করা হইল। সকলের ছেলে-মেয়েদেরও বিদ্যালয়ে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইল। ছাপাখানা দেশে যত ছিল, সমস্তই দেশের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা হইল। এই সমস্ত ছাপাখানা হইতে লক্ষ লক্ষ পুস্তক মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইতে লাগিল। এই

লাইবনেটের ঘাতকের কুশ-পুত্তলিকার ফাঁসী

নীতির কিছু পরিবর্ত্তন করিলে, দেশের পক্ষে তাহা কল্যাণকর হইবে। দেশের চাষীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত চাষ বন্ধ করিল; কারণ, অতিরিক্ত যাহা শস্য উৎপন্ন হইত, তাহা অন্য লোকে ভোগ করিত। যন্ত্রপাতি, কারখানা বাড়ী সব হয় অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল, আর না হয় ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল। রেলগাড়ী, যন্ত্রপাতি, হাতিয়ার, লাঙ্গল, কোদাল ইত্যাদি সবই পুরান হইয়াছিল; এবং আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়াও আসিতেছিল। সবই নতুন কিনিতে হইবে, অথচ দেশে টাকা নাই। দেশের লোকেরা শীতে অনাহারে মৃতপ্রায়। হাসপাতালে রোগীদের জন্য সাধারণ ঔষধপত্রের টানাটানি। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কাগজ পেনসিল ইত্যাদির অভাব। ব্যবস্থার ক্রটি নাই—কিন্তু যোগাড়ের অভাব।

রেড স্কোয়ারে রাজকর্ম্মচারীর বক্তৃতা

এ ভীষণ অবস্থার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। দেশের লোকও পরিবর্ত্তন চায়; কিন্তু জার-রাজত্বে ফিরিয়া যাইতে চায় না। এই সময় দেশের লোককে স্বাধীন ভাবে সামান্য সামান্য ব্যবসা, দোকান ইত্যাদি খুলিবার অনুমতি দেওয়া হইল। মুদ্রাকে লোপ করিবার যে চেষ্টা চলিতেছিল, তাহাও এই সময় চির- স্থায়ী ভাবে ত্যাগ করা হইল। নেতাদের এই সকল কার্য্যে দেশের লোকে প্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করে; কিন্তু ক্রমশঃ তাহাদের এই সন্দেহ দূর হইল। ১৯২১ সালের শরৎকাল হইতে দেশে ভাল করিয়া দোকানপাট বসিতে লাগিল। নিজের নিজের ঘরবাড়ীও অনেকে ফিরিয়া পাইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা হইল—এখন সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার পর্য্যন্ত পুনঃ স্বীকৃত হইল। দেশের বড় বড় ব্যবসাগুলি রাষ্ট্রের অধীন থাকিলেও, অনেক মাঝারি ব্যবসা লোকে স্বাধীন ভাবে করিতে লাগিল। ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা হইল। তেজারতি কারবারও ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। সরকার হইতে খাদ্য বিতরণ বন্ধ হইল। প্রয়োজন হইলে দাম দিয়া খাদ্য কিনিতে হইবে—এইরূপ ব্যবস্থা হইল। খাদ্য কিনিবার অর্থ খাটিয়া উপার্জ্জন করিবার আদেশ হইল। এইরূপে দেশের অবস্থা অনেকটা সামলানো হইল।

রাজধানী পেট্রোগ্রাড হইতে মসকাওএ স্থানান্তরিত

হইল। ভ্রমণকারিগণ এই সময় রাশিয়ান সহরগুলির অবস্থা দেখিয়া অবাক হইতেন। রাস্তাঘাট পরিষ্কার। পুলিশের সুবন্দোবস্ত। জিনিসপত্রের দর সস্তা।' খাদ্যদ্রব্য প্রচুর

একজন বোলশেভিষ্ট বক্তা

এবং সুলভ। মহাবিদ্রোহের চিহ্নও কোথাও নাই। চারিদিক দেখিলে মনে হইত—দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছে। এই সময় মসকাওএ ট্রামের সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সময় লোকে কেবল গুটান ফিল্‌ম্‌, বিদেশী সংবাদপত্রাদি এবং বিদেশী নতুন পুস্তক—এই কয়টি জিনিস ইচ্ছামত কিনিতে পাইত না।

রাশিয়ার এই মহাবিদ্রোহের মধ্যেও রাশিয়ার বড় বড় নাট্যশালাগুলি তাহাদের উচ্চ স্থান হইতে বিন্দুমাত্র নামিয়া আসে নাই। কলার অনাদর দেশের ভীষণতম অবস্থার মধ্যেও কেহ করে নাই। বিখ্যাত নাটকাদির অভিনয় কখনও বন্ধ হয় নাই। অভিনয় দেখিবার উৎসাহও লোকদের কিছুমাত্র কমে নাই। মসকাওএর আর্ট থিয়েটার, ক্যামারনি থিয়েটার, মেয়ারকোল্ড থিয়েটার এই সময় অভিনয়-জগতে অনেক অভিনব বিষয়ের সূচনা করে। এই তিনটি নাট্যশালাকে জগতের শ্রেষ্ঠ নাট্যশালা বলা যায়। নাট্যকলার পূর্ণতা যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে তাহা এইখানে। জগতের অন্যান্য দেশের "ষ্টার" অভিনেতারা এইখানে সামান্য ছাত্রের মত আসিয়া অভিনয়-কলার অনেক নতুন কিছু শিক্ষা করিয়া যাইতে পারেন।

মসকাওএ এই সময় নতুন ধনী সম্প্রদায় জন্মলাভ করিল—তাহাদের নাম হইল "নেপমেন।" ইহারা প্রায় সকলে ব্যবসায়ী এবং "স্পেকুলেটার।" ধনীদের জন্য সহরে হোটেল, সরাবখানা; নৃত্যশালা ইত্যাদি বসিল। এই সকল স্থানে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নাচগান চলে। সাধারণ লোকেদেরও এই সকল স্থানে অবাধ গতি—কাহারও পক্ষে বাধা নাই। তবে পয়সা খরচ না করিলে

পাগলের ধ্বংস-লীলা

আমোদে যোগ দেওয়া চলিবে না। নারীরাও এই সময় হইতে প্যারীস-ফ্যাসানে পোষাক পরিতে আরম্ভ করে। মামুলি পোষাক তাহাদের ভাল লাগিল না।

সহরগুলির অবস্থা ভাল হইলেও ১৯২১-২২ সালে রাশিয়ার ভিতরের প্রদেশগুলির অবস্থা অত্যন্ত ভীষণ হয়। ১৯২১—২২ সালে ভোলগা প্রদেশে ভয়ানক অজন্মা হইল।

রেড স্কোয়ারে সামরিক প্রদর্শনী—
জনসঙ্ঘের "মুক্তি" ঘোষণা।

তাহা ছাড়া "লাল পল্টন" এবং "সাদা পল্টনের" যুদ্ধও বহু গ্রাম প্রান্তরকে ছারখার করিয়া দেয়। ভোলগার তীরবর্ত্তী প্রদেশগুলিতে অজন্মা প্রায়ই হয়। কিন্তু জারের আমলে শস্যাদি সঞ্চয় করিয়া রাখা হইত বলিয়া লোকদের খাদ্যাভাব ভীষণতম ভাব ধারণ করিতে পারিত না। মহা-বিদ্রোহের সময় নেতারা যুদ্ধাদি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। এই সময় তাহারা অন্য কোনো প্রচার কার্য্যে খুব বেশী সময় এবং মনোযোগ দিতে পারে নাই। নেহাত যাহা না হইলেই নয়, তাহাই করার সময় কোনো প্রকারে পাওয়া যাইত।

১৯২১ সালে যে মহা দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল, তাহার বর্ণনা অসম্ভব। লোকে গ্রাম এবং চাষ-আবাদ ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া জমা হইতে লাগিল। স্থানাভাব হওয়াতে তাহারা গরু ছাগলের মত গাদাগাদি হইয়া বাস করিতে লাগিল। পিতা পুত্রকে ত্যাগ করিয়া পলাইল, স্বামী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া পলাইল, মাতা শিশুকে ত্যাগ করিয়া পলাইল। ক্ষুধার তাড়না মানুষকে বনের পশু অপেক্ষাও ভীষণ করিয়া তুলিল। দেশময় হাহাকার! রাস্তায় ঘাটে মৃতদেহের পর মৃতদেহ পড়িয়া আছে! তাহাদের সৎকার করিবার কেহ নাই, কোনো ব্যবস্থা নাই। রাজপথে কুকুর শৃগাল নেকড়ে আসিয়া মৃতদেহ খাইতে লাগিল! এই সময় রাশিয়ার যে কি ভীষণ অবস্থা, তাহা চোখে দেখিলে বুঝিতে পারা যায়—লিখিয়া তাহার বর্ণনা অসম্ভব।

এই সময় রাশিয়ান গবর্ণমেণ্ট সাহায্যের জন্য বাহিরের দেশসমূহে আবেদন করিল। আমেরিকান সরকার এই সময় রাশিয়াকে রক্ষা করিল। আমেরিকান সরকার প্রায় ১৪,০০০,০০০ পাউণ্ড খরচ করিয়া রাশিয়ার বিপুল জনসঙ্ঘের দারুণ ক্ষুধা নিবারণ করিল। হাসপাতালে ঔষধপত্র আমদানি হইল, রোগীদের জন্য পথ্য আসিল। ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত আমেরিকা এবং অন্যান্য দু-একটি দেশ রাশিয়াকে প্রাণপণ সাহায্য করিল। তাহার পর রাশিয়ার অবস্থা আবার ক্রমশঃ ভালর দিকে ফিরিতে আরম্ভ করিল এবং সাহায্যকারীরাও তাহাদের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এই সময় হইতে দেশে শান্তি এবং সুশাসন স্থায়ীভাবে থাকিবার মত হইল। গীর্জ্জার ক্ষমতা লোপ করা হইল।

যে সমস্ত ভূমি গীর্জ্জার পাদরীরা নিষ্কর ভাবে ভোগ করিত, তাহা কাড়িয়া লইয়া দেশের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য

রাশিয়ান "রেড্ রোজা"

[রাশিয়ান বিদ্রোহের অন্যতম নায়িকা রূপে এই নারী স্বহস্তে বহু শত রাশিয়ান রাজকর্ম্মচারীর প্রাণবধ করায় "দেবী"র পদে উন্নীত হইয়াছেন !]

করা হইল। গীর্জ্জার অনেক ধন-রত্নও বাজেয়াপ্ত করা হইল। দেশে ধর্ম্ম বিষয়ক কড়াকড়ি উঠাইয়া দেওয়া হইল। এ বিষয়ে লোকে স্বাধীনতা লাভ করিল। রাষ্ট্রের ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা গীর্জ্জার সহ্য হইল না। পাদরীর দল ভীষণ ভাবে ইহাতে বাধা দিতে লাগিল। অবশেষে সোভিয়েট সরকার বাধ্য হইয়া অনেক পাদরীকে কারারুদ্ধ করিল।

মস্কো নগরে বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা

নতুন-রাশিয়ার স্বাধীনতার পথে চলিতে চলিতে অনেক ভুলচুক হইয়াছে এবং হইবেও। কিন্তু ইহা বেশ বলা যায়—এই সমস্ত ভুলচুক করা সত্ত্বেও রাশিয়ার অনেক বিষয়ে বহু উন্নতি হইতেছে। ১৯২৩ সালের পরই রাশিয়ার যে অবস্থা হয়, তাহাতেই বুঝা যায় যে রাশিয়ার ভবিষ্যৎ আর যাহাই হউক, এই দেশ আর কোনো দিনও জারের রাজত্বে ফিরিয়া যাইবে না। জারের রাজত্বের চিরকালের জন্য অবসান হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের সোভিয়েট-রাষ্ট্রকে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। রাশিয়ার অর্থবল, জনবল, শিক্ষা এবং শিল্পকলা এখন আর কোনো দেশ অপেক্ষা বিশেষ কম নহে, বরং কয়েক বিষয়ে বেশী বলা যায়। রাশিয়ায় বর্ত্তমান সময়ে সকল মানুষ সমান, সকলের অধিকার সমান। ইহা অপেক্ষা বড় জিনিস আর কি হইতে পারে জানি না।

অনধিকার

শ্রীগিরিজাকুমার বসু

আজ আমি সম্বোধন-হারা ;
"বন্ধু, প্রিয়া, প্রিয়তমা, নয়নের তারা
বুকের শোণিত মোর,
প্রণয়ের মৃত্যুহীন ডোর,"
সুধায় মাখিয়া
কত নামে কতবার ডাকিয়া ডাকিয়া
মানিয়াছি পরাজয়, রাণি !
অপরাধী নহে—ভালোবাসা,
দীন ভাষা
রচে নাই আজো হেন বাণী
বুঝাইতে, হে মোর-বল্লভী,
কী যে তুমি ; কি করিবে কবি ?

লীলায়িত কৈশোরের মুকুলিত চারু নিদর্শন
বিমোহিয়া মন,
অনিন্দ্য ও দেহে তব যেইদিন জাগিল চকিতে,
তোমার কল্যাণতরে দেবতার প্রসাদ মাগিতে
আছি রত সেইদিন হ'তে,
বিশ্বভরা তমোহরা আলোকের স্রোতে
বিচিত্র বরণী
জীবনের সুন্দরী তরণী
ওই রাঙা চরণের পরশ যাচিয়া
মাধুরীর বন্যা ভেদি' চলিয়াছে পুলকে নাচিয়া।

গিরি-শির-বিহারিণী,
ছিলে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
উপল-গুণ্ঠিতা
বাধায় কুণ্ঠিতা,
শুনিয়াছি সেইদিন তব মৃদুতান—
করিয়াছি পান
যতনে আহরি'
তব স্নিগ্ধ নীর-ধারা পাণিপুটে ভরি',
দেখিয়াছি নিরবধি
কোন্ মন্ত্রে উৎস হয়—শ্রাবণের খর'গতি নদী।

তিলে তিলে হইয়া ডাগর,
আজি উৎস—প্রবল সাগর ;
আজি আর গতি তার শিলার বন্ধনে
নাহি বাধে ব্যথার ক্রন্দনে,

আজি সে যে আঁখি-অভিরাম
উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত, তরঙ্গিত, আকুল, উদ্দাম
মণিমুক্তা, শোভন লোভন
বুকে তার রাখিয়া গোপন
আলিঙ্গন দিতে এসে
আজি সে যে তট'তলে পড়ে লুটি' নিমেষে নিমেষে।

আজি যদি সব ভুলি'
সরমের গুরুভার আবরণ খুলি'
নির্ব্বিচারে বুকে তার পড়ি' ঝাঁপাইয়া,
যাই হারাইয়া
অতল অন্তরে তার,
ত্রিলোকের ভ্রূকুটির ভার
নিরুপমে, কি মোর করিবে ?
বৃথা করি আস্ফালন নিজ বিষে নিজেই মরিবে।

বাঞ্ছিতের চির-আরাধিকা
মানস-রাধিকা
ধায় যবে প্রাণের তৃষাতে
শ্যাম-প্রেম-পারাবারে জীবন মিশাতে,
কোন্ মহাবিঘ্ন অগণন
পারে তারে করিতে বারণ ?
সুন্দরের গীরিতি-কৌতুকে
মেদিনীর বুকে
আয়ানের নয়ানের আগে
বংশীধারী কালোশশী অসি-করে কালী হ'য়ে জাগে।

কহে বন্ধু, রূপের এ মোহ ;
লেশমাত্র নাহি দ্রোহ
তার সনে মোর, মনোরমে
জানিয়া বা ভ্রমে
শিখারে চুমিয়া যদি দ্রুত সুখ করিয়া অর্জ্জন
প্রাণ-বিসর্জ্জন
কাম্য বলি' পতঙ্গের হয় মনে প্রিয়া,
তারি পায়ে আপনারে বলিদান দিয়া,
ধরার মাঝারে—
পূর্ণ হোক্ আশা তার, প্রেম হ'ক্ ধন্য বারে বারে।

চা'এর দোকানে

শ্রীঅমিয়ভূষণ বসু

"ছ্যাঃ, নিখ্‌লে, পরের ধনে পোদ্দারী করিস্ নি। দিদিমার কাছে আছিস্, খা, দা, চুপ চাপ থাক্। তা না, ও কি? বুড়ি দিদিমার বিষয় পাবি বলে ধরাখানা সরা জ্ঞান করিস? ওরে, পরের বিষয়ের ওপোর লোভ করিস্ নি, যদি ফস্কায়, শেষে দম ফেটে সারা হবি। আমার বিবেণী পেরিয়ে তিবেণী বছর বয়েস হল, আমার কথা শুনে চললে আখেরে পস্তাতে হবে না।

"হল আবার কি? দেখ না, একটু আগে একপাল ছোঁড়া জুটিয়ে তাদের চা খাওয়ালে। পয়সা কি ও নিজে রোজগার করে? আর আমি যে এত উপদেশ দিই, ভুলেও আমার দিকে চেয়ে দেখে না। তখন চায়ের মোচ্ছোব লাগিয়েছে দেখে বল্লুম, 'বুড়োকে ভুলিস্ নি'; তা কথা কাণেই তুল্লে না।

"আঃ, সকালে এক পেয়ালা ও আমায় খাইয়েছে তো এবেলা কি? সকালে ভাত খেয়ে রাত্রে ভাত খাস্ না? ওরে, আমি তোদের সুপবামর্শ দিই, আমায় অমান্যি করিস্ নে।

"অ্যাঁ, লঙ্কা, তুই খাওয়াবি? কার মুখ দেখে আজ উঠেছি রে! ও প্রিয়বাবু, বাবা, এক পেয়ালা আমায় দিতে বল এই লঙ্কার একাউণ্টে;—আহা, ঐ তো স্পষ্টই বল্লে, আবার ফের জিজ্ঞাসা করছ কি? লঙ্কা, তুই বড় ভাল ছেলে; নিখলেটার মত হস্ নি। ও খালি দিদিমার বিষয় কবে পাবে, হা পিত্তেশ করে বসে আছে। ওর কি হবে জানিস্? সেই ভুতো পালের মত দশা শেষে হবে। পরের বিষয়ের জন্যে যারা থলে তৈরি করে রাখে, তাদের থলের দুটো মুখই ফাঁক হয়। শেষে হাতেরও যায় পাতেরও যায়।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ;—ভুতো পালের গল্প আর ঠাকুর্দ্দার গ্যাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দিতে পারবে না। খোদ এই প্রিয়বাবু সাক্ষী। কেন? সব গল্পই তো আমার গ্যাঁজা-খুরি বলিস্, তবে আবার শোনবার জন্যে পেড়াপিড়ি লাগাস্ কেন? এ গগন বড়াল না হলে চায়ের আড্ডা জমেও না, আবার গল্প বল্লেই বলবে গ্যাঁজাখুরি গল্প।

"ঐ প্রিয়বাবুকে জিজ্ঞাসা কর, ওঁর দোকানেই সে সব হয়। প্রিয়বাবু, আমায় বলতে বলছ বটে, কিন্তু গ্যাঁজা-ট্যাঁজা যেন ওরা আর না বলে, সাবধান করে দিচ্ছি। শেষ তাল বাবু তোমায় সামলাতে হবে, মনে থাকে যেন।

"সে আজ ১৪।১৫ বছরের কথা;—আরো বেশী? হ্যাঁ, তা ১৬।১৭ বছর হল বই কি। আর প্রিয়বাবু, sight gone, hearing gone, memory gone; সময়ের কি আর আন্দাজ আছে ছাই?

"হ্যাঁ, সে ১৭ বছর আগের কথা, তখন অলিতে গলিতে এত চায়ের দোকান ছিল না। তখন এ ব্যবসাটা কলকেতায় নতুন। প্রিয়বাবু সেই প্রথম দোকান খোলেন,—এ বৌবাজারে নয়, কলুটোলার হ্যালিডে ষ্ট্রীটে। এখন তার উপর দিয়ে সেণ্ট্রাল আভেনিউ বুক ফুলিয়ে চলে গেছে। সে ভাঙ্গা ঘরের চিহ্ন মাত্তর নেই,—কোন্ মাড়োয়ারীর এক পাঁচ-তালা বাড়ী সেখানে উঠেছে। সেইখেনে প্রিয়বাবুর দোকানের প্রথম পত্তন। আর সেইখেন থেকেই আমার সঙ্গে আলাপ।

"কি বল্লি ফিস্‌ফিস্ করে? সেই পর্য্যন্ত আমি জিওলের আঠার মতন প্রিয়বাবুর ঘাড়ে নেপ্টে আছি? বেশ করেছি। এক ফোঁটা এক ফোঁটা ছোঁড়া আমার সঙ্গে—

"হ্যাঁ, বল ত লঙ্কা, এ রকম করলে কি গল্প বলা যায়? শুনতেও ছাড়বে না, আবার কথায় কথায় পেছনেও লাগবে। লঙ্কা, তুই বড় লক্ষ্মী ছেলে, দেখিস্ তোর ভাল হবে।

"এই যে বলি। তখন 'সন্ধ্যা' উঠে যাবার পর আবার ঘুরে ফিরে গিয়ে বঙ্গবাসীতে ঢুকেছি। ওঃ, তার আগে পঁচিশ তিরিশ বছর বোধ হয় ওদিক মাড়াই নি। সব সেকালের কথা মনে পড়ে, সেই যখন বঙ্গবাসী প্রথম বেরুল, তখন যোগেন বোসের ডান হাতই আমি। প্রিণ্টারি করতে করতে বুড়ো হলুম, কত খাটলুম, কত দেখলুম,—

"এই যে দাদা, এই যে বলি। আসল গল্পের খেই হারাব কেন? বুড়ো মানুষ, সেকালের কথা হলেই মনটা কেমন হয়ে উঠে কি না।

"ঐ বঙ্গবাসীর কাজের ফাঁকে গিয়ে প্রিয়বাবুর চায়ের দোকানে বসতুম। এখন কেক, বিস্কুট, চপ, কাটলেট, ডিম, কত কি দেখছিস্, তখন এত কাণ্ড ছেল না, ছেল শুধু চা, নেড়ে বিসকুট আর চিনি। কিন্তু তখনো এখনকার তোদের মতন নিষ্কর্ম্মার দলের অভাব ছেল না। এখনকার মতন ঠিক সব এসে জুটে আড্ডা করত, আর রাজা উজির মারত।

"আর আমি গ্যাঁজাখুরি গল্প করে তাদের মাতাতুম? দেখলে, প্রিয়বাবু, দেখলে, আবার সেই গ্যাঁজার কথা! ওরে, তারা নিষ্কর্ম্মা হলেও আমায় কত খাতির করত, তা জানিস্? তোদের মতন এতটা বোয়ে তারা যায় নি।

"তা, সেখেনে ভূতো পালও যেত। তাইতে তার সঙ্গে আলাপ হয়। সে আমাদের সোণার বেণের ঘরেরই ছেলে, তখন তার ছোকরা বয়েস। বাপ কিছু টাকা আর কলুটোলায় একখানা বাড়ী রেখে যায়। রাতারাতি ফেঁপে উঠবার মতলবে কার পরামর্শে ভূতো রেস খেলে খেলে দুদিনেই ফতুর হয়। বাড়ীখানাও হয় ত যেত, কিন্তু সেটা মার নামে থাকায় মাথা গোঁজবার যায়গা টুকুর অভাব আর হল না। ছোকরা শেষে হিতবাদীর পুস্তক বিভাগে টাকা পোনের মাইনেতে একটা কাজও জোগাড় করে।

"আমাদের ঘরে আর কিছু হোক আর না হোক, বিয়েটা আগেই হয়। তাই সে সময় ভূতোর দু দুটো মেয়ে। বাড়ীখানার খানিকটা ভাড়া দিয়ে, আর বোধ হয় তার মার হাতে কিছু টাকা ছেল, তাইতে, কোন রকমে চলত, মাইনের টাকা কটা তার নিজের খরচেই ফুঁকে যেত। তখনো রাতারাতি ফেঁপে ওঠবার খেয়াল ছাড়েনি,—মাঝে মাঝে রেসেও দৌড়ুত।

"এক দিন বিষম বাদল, দোকানে আমরা দুচারজন বাঁধা খদ্দের ছাড়া আর কেউ নেই। ভূতো বল্লে, 'ঠাকুর্দ্দা, আর তো পারা যায় না, এ রেসে তো কিছু হল না, বছর বছর ডার্ব্বির টিকিট কিনেও হায়রান হয়ে গেলুম। কি করে বরাৎ ফেরাই বল ত?'

"ভবানী সেন নিজের মনে বসে চা খাচ্ছিল, কুক্ষণে বলে উঠল, 'ভূতো তোর সেই এক জ্যেঠা না কে পশ্চিমে গিয়ে টাকার কুমীর হয়েছিল শুনেছিলুম। সে তো সংসার-টংসার করেনি বলেই গুজোব। বুড়ো মরলে তার টাকাকড়ি কে পাবে রে?'

"অন্ধকার রাত্তিরে পথ হারিয়ে শেষে এক দিকে আলো দেখতে পেলে মানুষের যেমন হয়, ভূতো এই কথা শুনে উঠে দাঁড়াল। প্রথমে তো তার মুখে কথাই সরে না। শেষে দুবার ঢোঁক গিলে বল্লে, 'তাই ত, এ কথাটা আমার কখনো মনে হয় নি,—আর মনেই বা হবে কোত্থেকে,—জ্যেঠা যখন ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে ঝগড়া করে নিজের বখরার হিসেবে টাকা নিয়ে পাঞ্জাব যায়, তখন বাবার বয়েস বছর ১০।১২ হবে। আমি তো দূরের কথা, মা পর্য্যন্ত কখনো তাকে দেখেন নি। বাবার সঙ্গে চিঠি-পত্তর কখনো চলতো না। তবে লোকের মুখে শুনতুম, গুজরানওয়ালায় নাকি রোকড়ের দোকান আর জহরতের কাজ করে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বে থা তো করেছে বলে শুনি নি, আর বয়েস তো গড়িয়ে গেছে। ভাল মনে করেছিস্ ভাই,—রামশরণ পাল, পোদ্দার, গুজরান-ওয়ালা বলে একখানা চিঠি ফেলেই দেখি, কি খবর আসে।'—

"ভূতো সেই ঝড় জলেই যায় আর কি! প্রিয়বাবু আর আমি বসিয়ে অনেক করে বোঝালুম যে, সেদিন ৬টা বেজে গেছে, চিঠি ডাকে দিলে পাঞ্জাব মেল ধরতে পারবে না। অনেক বলা কওয়ায় সে বসল বটে, কিন্তু ক্রমাগতই তার মাথায় ঐ ঘুরতে লাগল।

"পাড়ার গোকুল মণ্ডল বসে বসে হাসছিল আর টিপ্পনি কাটছিল,—এই সময় ট্যাক্ করে বলে বসল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভূতোর জ্যাঠা আজও ছাই বেঁচে আছে। আর যদিই থাকে, তোদের গুষ্টির জ্বালায় সে বাড়ী ছাড়ে। সেই ঝাড়ের কঞ্চিকে যে সে এক পয়সা দিয়ে যাবে না, এ আমি তাঁবা তুলসী নিয়ে বলতে পারি।'

"আর যাবে কোথা? ভূতো আর গোকুলে মারামারি বাধে আর কি! শেষে প্রিয়বাবু উঠে দুজনকেই বিদেয় করে দিলেন।

"তার পরদিন নানা ভণিতে করে, জ্যাঠার জন্যে ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না জানিয়ে এক মোলায়েম চিঠি লিখে ভূতো কবে তার জবাব পাবে, দিন গুণতে লাগল। এক দিন দু দিন করে

দশ বার দিন কেটে গেল,—জবাব আর এল না। ভূতো তো অস্থির,—ডাকওয়ালা দেখলেই গিয়ে ধরে। শেষে জালাতন হয়ে এমন হল যে পিওন যদি দূর থেকে দেখত যে ভূতো আসছে, অমনি যেখানে হোক লুকিয়ে পড়ত। এদিকে চিঠিখানাও ফিরে এল না দেখে ভূতোর মনে আশারও কমি রইল না যে সেটা ঠিক যায়গায় পৌঁছেছে।

"দিন কুড়ি পঁচিশ বাদে এক দিন সন্ধ্যাবেলা ভূতো মুখটী চূণ করে বসে আছে, আর আমরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছিলুম যে আর একখানা চিঠি এবার রেজেষ্টী করে পাঠাতে। এমন সময় নিতাই ঘোষ বলে উঠল, 'গোকুল মণ্ডলের বাড়ী আজ ক'দিন থেকে যে কেসো-রুগী বুড়োকে দেখা যায়, সে কে? গোকুলেরও একটা জ্যাঠাট্যাটা জুটেছে না কি?'

"ন্যাড়া বল্লে, 'হ্যাঁ আমিও দেখেছি, সেদিন সকালে একটা থার্ডক্লাশ গাড়ীর মাথায় মোটমাটরি চাপিয়ে এল। গোকুল ভাড়া নিয়ে গাড়োয়ানের সঙ্গে চেঁচামেচি করছিল, তাইতে কথায় কথায় বুঝলুম হাবড়া ষ্টেসন থেকে এসেছে।'

"গোকুল সেখানেই ছিল, সে চোখমুখ কাল করে 'আমার বাড়ী যেই আসুক, তোমাদের সে সব খবরে দরকার কি?' বলে বেরিয়ে গেল।

"সামান্য কথায় তার এই ভাব দেখে, বিশেষ হাবড়া ষ্টেসন থেকে মোটমাটরি নিয়ে এসেছে শুনে ভূতো লাফিয়ে উঠল, বল্লে 'নিশ্চয়ই ঐ বুড়ো আমার জ্যাঠা, গোক্‌লো ভোগা দিয়ে তাকে নিয়ে গেছে'—

"তার এত সাধের পেয়ালা-ভরা চা'র এক চুমুক খেয়েছিল মাত্তর, বাকিটা সেই অবস্থায় ফেলেই সে বেরিয়ে গেল—

"কি বল্লি তুই? বাকিটা আমি খেয়ে ফেল্লুম? হতভাগা ছোঁড়ারা, আমি দুনিয়ার লোকের এঁটো খেয়ে বেড়াই, দেখতে পাস্ না? প্রিয়বাবু, এরকম করলে আমি গল্প বলতে পারব না, পাক্কা বলে দিচ্ছি। এবার যদি বাধা দেয়, আমি উঠে যাব।

"তার পর থেকে পাড়ার ছোঁড়াদের, বিশেষ করে ভূতোর, আর অন্য কাজ নেই, খালি গোকুলের বাড়ীর আশপাশে উঁকি মারত, কখন বুড়োকে দেখতে পাবে। কিন্তু গোকুলের এমনি কড়া পাহারা যে বুড়োকে দূর থেকে দেখতে পেলেও ভূতো এক দিনও তার সঙ্গে কথা কইবার সুবিধে পেলে না।

"এক দিন বিকেলে বুড়ো হ্যালিডে পার্কে বেড়াচ্ছে, খবর পেয়ে ভূতো গিয়েছিল বটে, কিন্তু তখনি কোথা থেকে গোকুল এসে সরিয়ে নিয়ে গেল।

"এই সব দেখে-শুনে আমরাও ভূতোর সঙ্গে এক মতই হলুম যে ভূতোর জ্যাঠাকে নিয়ে গোকুল এক খেলা খেলছে বটে। আমরা সবাই, প্রিয়বাবু শুদ্ধ, ভূতোর দিক নিয়েছিলুম। চায়ের আড্ডায় তার সঙ্গে গোকুলের রোজই ঝগড়া রাগারাগী, এমন কি মারামারির লক্ষণ দেখে, শেষে প্রিয়বাবু গোকুলকে আসতে বারণ করে দিলেন। ভূতো ডাকওয়ালার পিছনে তখনো লেগে ছিল। খবর পেলে যে বুড়োর নাম বাস্তবিকই রামশরণ পাল। ঐ নামের দুখানা চিঠি গোকুলের ঠিকানায় বুড়োর কাছে এসেছে।

"ভূতো তো আকুল হয়ে উঠল,—খেতে শুতে সুখ পায় না,—মুখটী চূণ করে ঘুরে বেড়ায়। ভাত না হলেও চলে; কিন্তু চা না হলে তো আমাদের এক দণ্ড চলে না,—সেই যে এ হেন চা, তাও রোজ খেতে তার মনে থাকে না। কাজে গাফিলির জন্যে তার চাকরিটুকু যায় যায় হয়ে উঠল। মুখে আর অন্য কথা নেই,—খালি 'ঐ গোকুল আমার সর্ব্বনাশ করলে' বুলি। এক দিন বল্লে, 'ঐ দেখ গোক্‌লো পম্প-সু পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যাঠার সর্ব্বনাশ করে আমার পাওনা ভোগা দিয়ে কেমন বাবুগিরী করছে।' আর একদিন বল্লে, 'আজ গোকুলের পরিবার একটা নতুন নথ নাকে দিয়ে ছাতে উঠেছিল। এত টাকা গোক্‌লোর কোথা থেকে হল?' উকিলের পরামর্শ নিতে গেল, কিন্তু সেখান থেকেও কোন ভরসা পেল না,—খামকা গোটাকতক টাকাই ফি গুঁজতে তার গেল।

"শেষে আমরা গোকুলকে ডাকিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে বাগ মানলে না। বুড়োর নাম যে রামশরণ পাল, এ কথা সে স্বীকারও করলে না বা অস্বীকারও করলে না; কিন্তু সে জোর করে বলতে লাগল যে বুড়ো তার দাদাশ্বশুর, ভূতোর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

"এই রকমে দিন যায়,—এক দিন সন্ধ্যের পর আমরা চা খাচ্ছি, ভূতো কি গোকুল কেউ নেই, এমন সময় লাঠি ঠক্‌ঠক্ করতে করতে সেই বুড়ো সশরীরে দোকানে এসে এক পেয়ালা চা ফরমাজ করলে, আর বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ে কাসতে সুরু করে দিলে! আমাদের মুখে তখন কথা নেই, খালি

এ ওর মুখ চাওয়া-চাওই করছি। হঠাৎ ন্যাড়ার বুদ্ধি যোগাল, চট করে উঠে সে ভূতোর সন্ধানে দৌড়ুল।

"দেখতে দেখতে ভূতো এসে হাজির। বুড়োকে দেখেই একেবারে ভূমিষ্ঠ হয়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে প্রণাম করে ধূলো নিলে। বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কে?'

"ভূতো বল্লে, 'জ্যাঠামশাই, আমায় চিনতে পারছেন না? আমি যে ভূতনাথ পাল, আপনার কনিষ্ঠ শিবশরণ পালের ছেলে, আমি যে আপনাকে গুজরানওয়ালায় চিঠি লিখেছিলুম—'

"বুড়ো বল্লে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার চিঠি পেয়েই আমি সেখানকার চাটিবাটি তুলে এসেছি,—সে গঙ্গাহীন দেশে শেষ বয়সে আর থাকতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু এখানে এসে আমার ছেলেবেলার বন্ধু ৺পরাণমণ্ডলের ছেলে গোকুলের কাছে তোমার মতলব জানতে পেরে আর তোমার মুখ দর্শন করতে ইচ্ছে করে না। আমার টাকাগুলোর লোভেই না তোমার এত দরদ উথলে উঠেছে, বটে? পাষণ্ড, আমি তোমার বাড়ী যাই আর তুমি আমায় বিষ খাওয়াও?'

"ভূতো চীৎকার করে বল্লে, 'আপনার পা ছুঁয়ে দিব্যি করে বলছি, আমার সে মতলব নয়। দোহাই জ্যাঠামশাই, আমায় পায়ে ঠেলবেন না, আপনার শেষ বয়েসে আমায় সেবা করতে দিন। ঐ পাজি শয়তান গোকুলের কথা শুনবেন না, এখানকার সবাই জানে ও বাপের কুপুত্তুর, ভুলেও একটা সত্যি কথা বলে না—'

"হঠাৎ ঝড়ের মতন গোকুল এসেই বুড়োকে জড়িয়ে ধরলে,—'এই যে, দাদামশাই, আপনি এখেনে, আমি খুঁজে খুঁজে হালাক-পালাক। এই কাসি নিয়ে কি একলা বেরতে আছে? চলুন, বাড়ী চলুন—'

"ভূতো পা দুটো জড়িয়ে ধরে বল্লে, 'কোথা যাবেন জ্যাঠামশাই? আমি আপনার বাবার বংশধর, আমায় ফেলে আপনি কোথা যাবেন?"

"তার পর যা আরম্ভ হল, তার কাছে কোথা লাগে মহাভারতের গজকচ্ছপের যুদ্ধ, তোদের আজকালকার টগ অফ ওয়ার! গোকুল বুড়োর দুই বগল ধরে, আর ভূতো দু'পা ধরে বুড়োকে তো চ্যাংদোলার মত শূন্যে তুলে ফেল্লে, তার পর টানা আর টানি, টানা আর টানি। বেঞ্চি উল্টে পড়লো, দুজনের চীৎকার আর বুড়োর কাসির ফাঁকে ফাঁকে গালাগাসিতে প্রিয়বাবুর দোকান সরগরম, রাস্তায় লোক জমে গেল; পাশেই একটা উড়ের তেলেভাজা ফুলুরির দোকান ছিল, সে তো ব্যাপার দেখে 'পওড়োলা, পওড়োলা' করতে করতে হ্যারিসেন রোডের দিকে দৌড়ুল! হৈ—হৈ ব্যাপার, শেষে প্রিয়বাবু দুই ধমকে গোকুল আর ভূতোকে সরিয়ে বুড়োকে উদ্ধার করে বসালেন।

"বুড়োর তখন দুচোখ কপালে উঠেছে; হেঁপো-কেসো রুগী, কাসির ধমকে নাজেহাল। আমরা পাখা এনে হাওয়া করতে লাগলুম। অনেকক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হয়ে বুড়ো তো আচ্ছা করে ভূতোকে একচোট গালাগালি দিলে। সে গালাগাল শুনলে মরা মানুষেরও বোধ হয় রাগ হয়, কিন্তু এমনি বিষয়ের লোভ, ভূতো একটা কথাও বল্লে না। তাড়াতাড়ি নিজের একাউণ্টে একস্ট্রা দুধ চিনি দিয়ে এক পেয়ালা চা বুড়োকে দিয়ে ক্রমাগতই তার পা ধরতে লাগল। আমরা সবাই মিলে অনেক বুঝিয়ে বুড়োকে শান্ত করলুম, এমন কি বুড়ো ভূতোর বাড়ী গিয়ে থাকতেও রাজি হয়ে গেল। কিন্তু সর্ত্ত করলে এই যে তার হাতবাক্স ছাড়া আর সব জিনিষ গোকুলের হেফাজাতে থাকবে, আর আপাততঃ কাপড় চোপড় বিছানা পত্তর সবই ভূতোকে জুগিয়ে পেরমাণ করতে হবে বুড়োর বিষয়ের লোভ সে রাখে না। যদি সে টাকার কথা মুখে কখনো আনে, সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো চলে যাবে। তাই—তাই, ভূতো তাইতেই রাজী।

তখনকার মতন তো মধুরেণ সমাপয়েৎ,—বুক ফুলিয়ে ভূতো গোকুলকে কলা দেখিয়ে জ্যাঠাকে নিয়ে বাড়ী গেল। সেবা করার চোটে ভূতো যেন ডুমুরের ফুল হয়ে উঠল, তার দেখা পাওয়াই যায় না। পাড়ার নিতাই, ন্যাড়া, মাধবের মুখে শুনতুম, ভূতো, তার মা, স্ত্রী, সবাই মিলে রামশরণ পালের খুব যত্ন-আত্তি করছে। বুড়ো কিন্তু রোজই একবার করে গোকুলের বাড়ী যায়, আর মাঝে মাঝে টাকাটা সিকেটা ভূতোর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে তাদের দিয়ে আসে! ভূতো আপত্তি করলেই, কি টাকা দিতে না চাইলেই চলে যাবার ভয় দেখায়। এক দিন শুনলাম, ভূতোদের অনেকগুলো সাবেক পিতল কাঁসার বাসন নিয়ে বুড়ো গোকুলদের দিয়ে এসেছে। ভূতোর মা মুখ ফুটে আপত্তি করায় মহামারি কাণ্ড ঘটবার উপক্রম হয়েছিল।

মাস দুই পরে একদিন সকালে গিয়ে শুনলাম, তার

আগের রাত্তিরে বুড়ো হঠাৎ দম-আটকে মারা গেছে,—শেষ রাত্রে ভুতো লোকজন নিয়ে পোড়াতে গেছে।

তিনটের সময় আফিষ থেকে বেরিয়ে একবার ভুতোর বাড়ীর দিকে গেলুম। দেখি—ভুতোর বাড়ীর সামনে বিষম ভীড়,—ভুতো কাছা-গলায় দাঁড়িয়ে, তার চোখ মুখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে,—সামনে দাঁড়িয়ে গোকুল আর তার জন চার পাঁচ ইয়ার দাঁত বার করে হাসছে! বাড়ীর ভেতর থেকে ভুতোর মা চীৎকার করে গোকুলের চোদ্দপুরুষের ছেরাদ্দ করছে!!

"ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় গোকুল খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে, 'আমি, ঠাকুর্দ্দা, ভুতোকে বারণ করতে এলুম, কেন কাছা গলায় দিয়ে নিজের বাপ-পিতেমোর অপমান করছে,—ও রামশরণ পালের সঙ্গে ভুতোর কোন সম্পর্ক নেই! আমি অনেকবার বলেছি—তিনি আমার পরিবারের দাদামশাই, তা ও কখনো বিশ্বাস করলে না। ওর জ্যাঠার নাম রামশরণ বলে কি আর রামশরণ পাল থাকতে নেই? কোথায় গুজরানওলা জানিনা, কিন্তু আমার দাদাশ্বশুর রামশরণ পাল তো চুঁচড়োর ষণ্ডেশ্বরতলা থেকে আমার কাছে এসেছিলেন। যে হাতবাক্স ভুতোর কাছে আছে, সেটার ভেতর চিঠিপত্তর দুচারখানা যা আছে, দেখলেই সত্যি মিথ্যে জানতে পারবে। তাই ভেতরে গিয়ে দেখে এসে মায়ে পোয়ে এত রাগ! আমার দাদাশ্বশুর তোখোড় লোক, বয়েসকালে সমস্ত চুঁচড়োর লোককে জ্বালিয়েছেন। আমার কাছে সব কথা শুনে বলেছিলেন, ভালই তো, দিনকতক ওর ঘাড়ে চেপে মজা করে থাকা যাক। তবু ত আমি ভুতোকে বরাবর বারণ করে এসেছি, ও কিন্তু নিজেই যেচে বুড়োকে ঘাড়ে নিয়ে আমায় নিষ্কৃতি দিলে। এখন রাগ করলে চলবে কেন!—'

"নেঃ তোরা সব গল্প শুনেই হেসে গড়িয়ে গেলি, সেখানে হাজির থাকলে যে কি করতিস জানি না। সেদিন হাসির চোটে কলুটোলা ফাটবার যোগাড় হয়েছিল। তাই বলছি নিখলেকে সাবধান হতে—"

প্রেম

হুমায়ুন কবির

আমার অন্তর মথি' বেদনায় বাজে যেই গান
প্রেম তারে কহি।
অনন্ত আঁধার ভেদি' করি যবে আলোর সন্ধান
দুঃখ ব্যথা সহি'।
ভুলে যাই জীবনের ছোট ছোট বেদনার কথা
স্বার্থের সংঘাত,
পুষ্পহাসি বিকশিয়া মুঞ্জরিয়া কণ্টকিত লতা
ওঠে অকস্মাৎ।
সংসারের পথ মাঝে বারে বারে মূর্চ্ছি পড়ে হিয়া
স্বপ্ন টুটে যায়,
দিনের আলোক নিভে, অন্ধকার ওঠে গুমরিয়া
অশ্রু লুটে হায়।
কণ্টক-বিকীর্ণ পথে প্রতি পদে আহত চরণ
রক্ত পড়ে ঝরি,
তরঙ্গ উদ্বেল সিন্ধু প্রতি পদে লঙ্ঘিয়া মরণ
চলে মোর তরী।
নিমেষে নিমেষে শঙ্কা জাগে মোর সকল অন্তরে
মনে লাগে ভয়,
আঁধারে বেড়ায় ফিরি' জীবনের গভীর গহ্বরে
সন্দেহ সংশয়।

জীবনের অর্থ খুঁজে চিন্তা মোর ব্যর্থ ফিরে আসে
চিত্ত দিশাহারা,
দুঃখ বেদনায় ভরা এ ভুবন হেরিয়া হতাশে
ঝরে অশ্রুধারা!
তারি মাঝে ক্ষণে ক্ষণে নিমেষের লাগি প্রাণে মোর
গভীর অন্তরে,
কি স্বপ্ন নয়ন ছায়—চেয়ে থাকি আপনা বিভোর—
সুখ-অশ্রু ঝরে।
যাহারা বেসেছে ভালো অন্তরে প্রেমের দীপখানি
জ্বালালো যতনে,
তাদের প্রেমের স্মৃতি অন্ধকারে জাগাইল বাণী
আজি মোর মনে।
আমারো হৃদয় মথি' বেদনার বীণাতারে বাজে
আনন্দ ঝঙ্কার,
সন্দেহ সংশয় চিন্তা মিটে যায় নিমেষের মাঝে
অন্তরে আমার।
মনে হয় এ ভুবনে মৃত্যু আছে, ব্যথা আছে জানি,
জানি আছে ভয়,
তবু চিত্তে আশা জাগে, বাজে শুধু শেষহীন বাণী
প্রেমের বিজয়।

মানব-বিজ্ঞান

(Anthropology)

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় বি-এ

মানব-বিজ্ঞানের উৎপত্তি

মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের লোকের এই বিশ্বাস যে, প্রথমে ভগবান একজন নারী ও একজন পুরুষ সৃজন করেন; তাহাদের সন্তান-সন্ততিদের বংশ-বৃদ্ধি হবার দরুণ কালক্রমে ধরাপৃষ্ঠ মানবে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে। মনুসংহিতায়, বাইবেলে এবং অন্যান্য পুরাতন পুস্তকে এই প্রকার বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম মানব আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত, জ্ঞানী, ভগবানের প্রিয়পাত্র ও সর্ব্বপ্রকার গুণের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল; মানব ক্রমশঃ পাপে লিপ্ত হয়ে সেই পূর্ণাবস্থা হতে এই বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫৩ সালে গ্রীক কবি লুক্রেসিয়াস (Lucretius) এক কবিতায় কিন্তু এক নূতন কথা লিখে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে মানবের প্রথম পুত্রগণ অসভ্য ছিল, বন্য জন্তর মত বিচরণ করত; চাষ করতে বা বস্ত্র বয়ন করতে জানত না, উলঙ্গ থাকত; গৃহ-নির্ম্মাণ করতে জানত না, বনে বা পর্ব্বতের গুহায় নিজেদের লুকিয়ে রাখত। প্রস্তর-খণ্ড বা বৃক্ষের শাখা দিয়ে বন্য জন্তু শিকার করে এবং ফলমূল আহরণ করে জীবন-ধারণ করত। তাহার পর তাহারা ক্রমশঃ গৃহ-নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন এবং অগ্নি প্রস্তুত করতে শিখলে। নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করতে লাগল। ছেলে-মেয়েদের সহাস্য বদনে তাহাদের গৃহ আলোকিত হয়ে উঠল। পারিবারিক জীবনের মধুর স্পর্শ তাহাদের বর্ব্বরতার উপর কোমলতার ছাপ এনে দিলে।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৫ সালে হোরেস (Horace) এক বিদ্রু-পাত্মক কবিতায় আরও একটু এগিয়ে গিয়ে লিখেছিলেন যে, মানব যখন ধরণীর গর্ভ হতে জন্ম নিলে, তখন সে পশুর মত ছিল। তাহার আকৃতি মানুষের মত ছিল না। তাহার কথা বলবার শক্তি ছিল না। নখ ও মুষ্টি দ্বারা পশুর মত যুদ্ধ করত, গর্ত্তে নিশাযাপন করত। কালক্রমে সে ধীরে ধীরে কথা বলতে শিখলে, গৃহ, বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করতে জানলে, নগর নির্ম্মাণ করে শত্রু হতে নিজেদের এবং স্ত্রী-

পুত্র ও ধন-সম্পত্তি রক্ষা করতে আরম্ভ করলে, আইন কানুন তৈয়ার করে সমাজ গঠন করে বসবাস করতে লাগল।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৫০০ সালে এস্‌কাইলাসও (Æschylus) এই-রূপ ভাবের একটু আভাস দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সকল ধারণা কবির কল্পনা বলে লোকে ধরে নিয়েছে। এর ভিতর যে কিছু সত্য থাকতে পারে, তার কল্পনাও কেহ কোন দিন করে নি। তাহার পর বহু শত বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে আর কেহ কিছু বলে নাই।

১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে এক পর্ত্তুগীজ নাবিক আফ্রিকার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সিম্পাঞ্জির কথা বলতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, এই জন্তুর সঙ্গে মানবের এত সাদৃশ্য আছে যে, এই দুইয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে; কিন্তু তাহার কথা হাস্যজনক বলে লোকে তাহা উড়িয়ে দিলে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে যখন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হল, তখন মানবের একটী দিব্য-চক্ষু লাভ হল। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (natural sciences) চর্চ্চা পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হল। লিনেয়াস (Linaeus) নামক একজন প্রকৃতিবিদ্ সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদ-রাজ্যকে নানা শ্রেণীতে (class) বিভক্ত করলেন, এবং প্রত্যেক শ্রেণীকে আবার নানা বর্গে (order), এবং প্রত্যেক বর্গকে নানা পরাজাতিতে (genus), এবং প্রত্যেক পরাজাতিকে নানা জাতিতে (species) বিভক্ত করলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, এই সবগুলা জাতিকেই ভগবান সৃষ্টি করে ধরাপৃষ্ঠে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। জীবের উৎপত্তির ধারণা তিনি বাইবেল হতে নিয়েছিলেন। যদিও তাঁহার ঐ প্রকার বিশ্বাস ছিল, তথাপি তিনি পরোক্ষভাবে ক্রমোন্নতিবাদের একটু ইঙ্গিত করে গেলেন। কারণ তিনি তাঁহার শ্রেণী বিভাগে মানবের স্থান শুধু জন্তুদের মধ্যে স্থাপন করলেন, তাহা নয়; পরন্তু তিনি মানব এবং নর-বানরদিগকে এক গণ্ডির ভিতর ফেল্‌লেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ফরাশী ক্রমোন্নতিবাদী বাফুনও (Buffon) মানবের সঙ্গে পশুদের যে সম্বন্ধ রয়েছে, তাহার একটু ইঙ্গিত করেছিলেন; কিন্তু সরকারী কাজে নিযুক্ত থাকায় তাঁহার গবেষণা অধিকদূর অগ্রসর হতে পারে নাই; কিন্তু ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে বনমানুষ (Orang) সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করে-ছিলেন, তাহাতে তিনি লিখেছিলেন যে মানব এবং বনমানুষ (লেজহীন বানর) একই পূর্ব্ব-পুরুষ হতে জন্মগ্রহণ করেছে।

বিখ্যাত ফরাশী বৈজ্ঞানিক কুভিয়ার (Cuvier) সেই সময়ে প্রথম তুলনামূলক দেহতত্ত্বের (comparative anatomy) ভিত্তি স্থাপন করেন এবং তাহার পর প্রাচীন জীবজন্তু বিষয়ক বিজ্ঞান-শাস্ত্রের (Palaeontology) জন্ম দেন। পৃথিবীর স্তরে স্তরে প্রাচীন যুগের যে সমস্ত প্রাণী-কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা অধ্যয়ন করিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যে সকল প্রাণী যত নীচের মাটির স্তরে পাওয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহারা যত পূর্ব্বযুগের, তাহাদের দৈহিক গঠনে বর্ত্তমান প্রাণীদের সহিত তত অধিক প্রভেদ। তিনি এই ঘটনাকে এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন যে, মাঝে মাঝে খণ্ড-প্রলয়ের দ্বারা এক এক যুগের জন্তুসমূহ (Fauna) ধ্বংস হয়ে গিয়েছে; এবং প্রলয়ের পর আবার নূতন জন্তু-সমূহের সৃষ্টি হয়েছে। এক জাতি হতে যে অন্য জাতির সৃষ্টি হতে পারে, তাহা তিনি অস্বীকার করলেন; অতএব ক্রমোন্নতিবাদকেও তিনি অস্বীকার করলেন। তাঁহার মতে সকল জন্তুরই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হয়েছে।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে গোথি (Goethe) উদ্ভিদের আকৃতি পরিবর্ত্তন (metamorphosis) লক্ষ্য করে বলিলেন যে, আমরা যখন উদ্ভিদের অঙ্গ সকল একটীর সহিত অন্যটির তুলনা করি এবং তাহাদের মধ্যে কি ঐক্য আছে অনুসন্ধান করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে, প্রথমে তাহারা সকলেই এক মৌলিক আকারে থাকে; এবং তাহা পরে আকারান্তরিত হয়ে নানা অঙ্গের সৃষ্টি করে—যেমন একটী বীজপত্র ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত হয়ে কাণ্ডে, শাখায়, প্রশাখায় রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ-জগতে যেমন এইরূপ হয়, প্রাণীজগতেও তদ্রূপ হয়। তিনি বলিলেন যে, জন্তুদের মাথার খুলি মেরুদণ্ডের একটা বর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত অবস্থা; এবং এই নিয়ম প্রয়োগ করে তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এক জাতি বর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে অন্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। এইভাবে পৃথিবীর সমস্ত জন্তুদের সৃষ্টি হয়েছে—তাহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সৃষ্ট হয় নাই।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এরাসমাস ডারউইন (Erasmus Dar-win) তুলনামূলক দেহতত্ত্বের আলোচনা করে বলিলেন যে, মানবের বাহু এবং পাখীর ডানার মধ্যে এত সাদৃশ্য

দেখা যায় যে, তাহাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন সংযোগ রয়েছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ফরাসী ক্রমোন্নতিবাদী ল্যামার্ক (Lamarck) জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিলেন যে, একজাতি ক্রমোন্নতিতে অন্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমরা যে নানাপ্রকার প্রাণীদের মধ্যে বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করছি, তাহার কারণ, আমরা প্রাণী-জীবন অল্প সময়ের জন্য এই অবস্থায় দেখছি। তাহারা পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের (environment) জন্য অবিরত পরিবর্ত্তিত হতেছে; কিন্তু এত ধীরে সেই পরিবর্ত্তন হতেছে, যে তাহা আমরা টের পাই না। এক জাতি তাহার গুণাবলী তাহার বংশধরগণকে দিতেছে; এবং নৈসর্গিক কারণে তাহারা একটু পরিবর্ত্তিত হতেছে; এবং তাহারাও আবার তাহাদের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত গুণাবলী তাহাদের বংশধরগণকে দিতেছে। এইরূপে বহু বৎসরে এক জাতি তাহার পূর্ব্বপুরুষ হতে বিভিন্ন হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সকল জাতিই এই ভাবে সৃষ্ট হয়েছে। তিনি নির্ভয়ে ঘোষণা করলেন যে, মানব নিজেই নর-বানরের (Anthropoid ape) বংশধর। তাহার মানসিক বৃত্তিগুলা ঐ সকল জন্তুদের চেয়ে বড় বেশী নয়; তাহাদের সহিত মানবের প্রভেদ শুধু পরিমাণে,—গুণে নয়। এই পরিমাণ কমবেশী পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের জন্য হয়েছে। কোন অঙ্গের চালনার দরুণ তাহা পুষ্টিলাভ করেছে; এবং কোন অঙ্গের চালনা না করার দরুণ তাহা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে; যেমন জিরাফ গলা উঁচু করে বৃক্ষের পাতা খেতে অভ্যাস করাতে বহুকাল পরে তাহার গলা এত বড় হয়েছে। এবং এক জাতি বানর লেজের ব্যবহার না করার দরুণ তাহা লুপ্ত হয়েছে। তিনি দেখালেন যে, মানব এবং নর-বানরের মধ্যে দৈহিক গঠনে এত সাদৃশ্য রয়েছে যে, মানব তাহাদের চেয়ে একটু পরিবর্ত্তিত অবস্থা বই নয়। মানবের ক্রমোন্নতিতে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবার মধ্যে একটু গূঢ় তত্ত্ব লক্ষ্য করলেন। বানরেরা মাঝে মাঝে দাঁড়াইতে পারে এবং ছেলেরাও সেই প্রকার করিতে পারে; কিন্তু বেশী দূর হাঁটিতে পারে না। মানব-শিশু কিছু দিন অভ্যাসের পরে হাঁটিতে পারে; এবং তাহাতেই মনে হয় যে, একজাতি নর-বানর ছেলেদের মত ক্রমশঃ সোজা হয়ে হাঁটিবার শক্তি অর্জ্জন করাতে, তাহাদের দুই হস্ত মুক্ত হইল এবং অন্যান্য অঙ্গের পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। দুই হস্তের সাহায্য পেয়ে সেই জাতি পশুদের উপর প্রভুত্ব করে পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পরে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করলে; বাক্‌শক্তির বিকাশ হওয়াতে মনের ভাবের আদান প্রদান করতে লাগল; নানা প্রকার অভাব বোধ হওয়াতে শিল্পের দিকে মন নিবিষ্ট করলে; এবং ক্রমশঃ কৃতকার্য্য হয়ে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করলে এবং ইহার ফলে তাহারা পূর্ব্বপুরুষ নরবানর হতে বিভিন্ন হয়ে পড়ল।

ল্যামার্কের এই ক্রমোন্নতিবাদের বিরুদ্ধে কুভিয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তর্ক-যুদ্ধে আহ্বান করাতে ল্যামার্ক তাহাতে যোগদান করেন। তাঁহাদের তর্ক-যুদ্ধ সুদীর্ঘ ছয় মাস কালব্যাপী ছিল; পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকগণ আগ্রহ সহকারে ইহা শুনিলেন। কুভিয়ার তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং বহু তথ্য সংগ্রহের ফলে ল্যামার্ককে পরাভূত করে নিজের গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ল্যামার্কের ক্রমোন্নতিবাদ উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ধূলায় ধূসরিত হয়ে যায়।

ল্যামার্কের কল্পনা প্রকাশিত হবার কিছু পরে ১৮২৮ সালে এবং ১৮৩৩ সালে ফ্রান্সে ও বেলজিয়ামে আদিম যুগের গুহাবাসী মানবের নির্ম্মিত দ্রব্য আবিষ্কৃত হওয়াতে মানবের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া গেল।

বুচার দি পার্থেজ (Boucher de Perthes) নামক এক অবসর-প্রাপ্ত ফরাসী চিকিৎসকের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করবার ভারি খেয়াল ছিল; এবং তিনি তাহারই খোঁজ করে বেড়াতেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি এক মাটির স্তরে পৃথিবী হতে লুপ্ত বহু প্রাচীন কালের এক বৃহদাকার হস্তীর কঙ্কালের সহিত একখানা পাথরের টুকরা আবিষ্কার করেন। তিনি সেই পাথরের টুকরার মধ্যে মানব-হস্তের কারিগরির চিহ্ন দেখতে পেলেন। আবিষ্কারের পরের বৎসরেও সেই স্তর হইতে আরও অনেকগুলা সেই প্রকার কুঠার আবিষ্কৃত হয়। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এগুলা আদিম মানবের হস্ত-নির্ম্মিত; কিন্তু লোকে তাঁহার এই মত গ্রহণ করিল না,—যদিও এখন তাহা মানবের নির্ম্মিত বলে স্থিরীকৃত হয়েছে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ডাসেলর্ডফে (Dusseldorf) নিয়েন-ডার্থেল (Neanderthal) নামক স্থানে আদিম এক লুপ্ত

মানবজাতির প্রস্তরীভূত মস্তকের খুলি আবিষ্কৃত হইলে মানবের প্রাচীনত্বের এক নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল।

ল্যামার্কের থিওরী ভূতত্ত্ববিদ লায়েলের (Lyell) মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হয়। তিনি তুলনামূলক দেহতত্ত্ব এবং ভূতত্ত্বের দিক দিয়ে এ বিষয়ের বিশদ ভাবে আলোচনা করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি "The Geological Evidences of the Antiquity of Man" নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন এবং তদ্দ্বারা ক্রমোন্নতিবাদকে বিজ্ঞানে প্রয়োগ করবার পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি মাটির স্তর অধ্যয়নের পর কুভিয়ারের জলপ্লাবনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে নানা প্রমাণ দেখালেন যে, পৃথিবী ক্রমশঃ নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এই বর্ত্তমান অবস্থায় এসে পড়েছে, এবং কোন তথাকথিত জলপ্লাবন হয় নাই।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহামতি ডারউইন (Charles Darwin) তাঁহার "Origin of Species নামক পুস্তক প্রকাশ করে' বৈজ্ঞানিক জগতে এক নূতন আলোক প্রদান করেন। তিনি তাহাতে মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেন নাই; কিন্তু তাহাতে এ বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাষ দিয়েছিলেন। লায়েলের পুস্তক প্রকাশিত হবার আট বৎসর পরে তিনি "Descent of Man" নামক পুস্তকখানি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।

ল্যামার্কের পর ক্রমোন্নতিবাদকে আর কেহ বিশেষভাবে প্রমাণ করিতে পারে নাই। ডারউইন বহু বৎসর গবেষণা ও অধ্যবসায়ের পর ক্রমোন্নতিবাদ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহা মানিয়া লয়। আমাদের মানব-বিজ্ঞান তাঁহারই ক্রমোন্নতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেই হতেই মানব-বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

ডারউইন ল্যামার্কের ক্রমোন্নতিবাদই স্বীকার করেন; কিন্তু কি করে এক জাতি অন্য জাতিতে পরিবর্ত্তিত হয়, সেই বিষয়ে ল্যামার্কের সহিত একমত হতে পারেন নাই। তাঁহার মতে "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" (natural selection) এবং যৌন নির্ব্বাচন (sexual sedection) দ্বারাই তাহা সাধিত হয়। তাহার মূল সূত্রগুলি এই—

১। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতে দেখা যায় যে, তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে সাধারণ এক মিল থাকিলেও, প্রত্যেকে প্রত্যেকের চেয়ে বিভিন্ন আকৃতির হয়। দুটা জীব কখনও একপ্রকার হয় না। প্রত্যেকের কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত রূপ তাহার বংশধরগণের মধ্যে সংক্রমণ করে। এইরূপে বহু-পুরুষ পর তাহারা এত রূপান্তরিত হয়ে পড়ে যে, তাহাদের প্রথম জন্মদাতা হতে বিভিন্ন হয়ে পড়ে' এক নূতন জাতির সৃষ্টি করে।

২। কোন অঙ্গের রূপান্তর যত অল্পই হউক না কেন, তাহা কোন বিশিষ্ট নিয়মে তাহার বংশধরগণের মধ্যে সংক্রমিত হতে পারে।

৩। কৃত্রিম উপায়ে মানব দুটী বিভিন্ন জাতির সংযোগে এক নূতন জাতির সৃষ্টি করিতে পারে এবং তাহা মৌলিক জাতি হতে অনেক বিভিন্ন হয়ে পড়ে। একই জাতির মধ্যে সংমিশ্রণের দ্বারা এক স্থায়ী জাতির সৃষ্টি করা যায়।

৪। আমাদের এই পৃথিবী অপরিবর্ত্তনশীল নয়, ইহা সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তিত হতেছে।

৫। উদ্ভিদ এবং প্রাণী এত বহুসংখ্যক সন্তানের জন্মদান করে যে, তাহাদের সকলের বেঁচে থাকা অসম্ভব। যদি একটী কড মাছের সমস্ত ডিমগুলা ছানায় পরিণত হত, তবে কয়েক বৎসরের মধ্যে সাগরের জল কড মাছে পূর্ণ হয়ে যেত।

৬। যেহেতু একটী জাতির বংশধরগণ সকলেই এক-রকম হয় না, তখন তাহাদের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন (natural selection) আরম্ভ হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতিগত একটু সবল, তাহাদের জীবন ধারণের পক্ষে প্রকৃতি অনুকূল হওয়াতে তাহারাই টিকিয়া যায় এবং অন্য সকলে ধরাপৃষ্ঠ হতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে।

৭। যাহারা এইরূপ টিকিয়া যায় তাহারা আবার তাহাদের গুণাবলী ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মধ্যে সংক্রমিত করে দেয়।

৮। বার বার এইরূপ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে প্রথমে বিভিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং তাহা ক্রমশঃ এক একটী স্থায়ী জাতিতে পরিণত হয়। অবশেষে বহুকাল পরে তাহারা পরস্পরে এত বিভিন্ন হয়ে পড়ে যে তাহারা এক একটী নূতন জাতিতে পরিণত হয়।

৯। যদি আমরা স্বীকার করি যে কাল অনাদি, তবে ইহা অনুমেয় যে, পৃথিবীতে যত সব বিভিন্ন প্রকার প্রাণী বা উদ্ভিদ আছে, তাহারা প্রথমে কয়েকটী অথবা একটী আদিম

জীব হতে এই প্রকারে বহুকাল ধরে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে সৃষ্ট হয়েছে।

"প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" থিওরীর দ্বারা অনেক ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। ডারউইন এই ত্রুটি দেখতে পেয়ে "যৌন নির্ব্বাচন" (sexual selection) থিওরীর আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বললেন যে অনেক প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে, একটী স্ত্রী-প্রাণীকে লাভ করিবার জন্য পুরুষদের ভিতর যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং সেই যুদ্ধে যে জয়ী হয় স্ত্রী-প্রাণী তাহাকেই প্রেমদান করে। বিশেষ কোন গুণ (শক্তি অথবা আক্রমণের উপযুক্ত অস্ত্র) থাকার দরুণ নিশ্চয়ই সে জয়ী হয়। তাহার সন্তান-সন্ততিতে সেই গুণাবলী সংক্রমিত হয়ে তাহাদিগকে আরও উপযুক্ত করে তুলে এবং বহুকাল পরে এইরূপ পরিবর্ত্তনের ফলে এক নূতন জাতি গঠিত হয়। এই নির্ব্বাচনে নারী উদাসীন থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে পুরুষ ও নারী পরস্পর পরস্পরকে নির্ব্বাচন করে লয়। অনেক জাতির প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে নারীই নিজের স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কোন বিশেষ পুরুষকে বাছিয়া লয়। এখানে পুরুষ উদাসীন থাকে অথবা নারীর কৃপা লাভ করবার জন্য নানা প্রকার হাবভাবে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করে। দৈহিক সৌন্দর্য্য, গায়ের রং, গায়ের সুগন্ধ বা সুকণ্ঠের দ্বারা পুরুষ নারীকে মোহিত করতে চেষ্টা করে। কোন-না-কোন গুণে মুগ্ধ হয়ে নারী বহুর মধ্যে একটী পুরুষকে বাছিয়া লয়। তাহাদের বংশধরগণও পিতার সেই গুণাবলী প্রাপ্ত হয় এবং বংশানুক্রমে তাহা অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে এক নূতন জাতিতে পরিণত হয়।

ডারউইন যে ক্রমোন্নতিবাদ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা বৈজ্ঞানিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল; কিন্তু তিনি যে এই ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এবং যৌন নির্ব্বাচন দ্বারা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাহা এখন অনেকেই স্বীকার করেন না। নানা বৈজ্ঞানিক তাঁহার পর নানা থিওরী বাহির করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও বাহির হবে; কিন্তু সকল বৈজ্ঞানিকই ইহা স্বীকার করেন যে, এক আদিম জীবাণু হতে ক্রমোন্নতির ফলে মানব ও সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে।

বৈরাগ্য-সাধন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সুধীর-রঞ্জন খাস্তগীর

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

সমুদ্রতলের কথা—

ডাঃ উইলিয়াম চিব নামক একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সমুদ্রের ১ মাইল নীচে নামিবার জন্য এক উপায় ঠাওরাইয়াছেন। কাচের জানালাযুক্ত একটা ইস্পাতের সিলিণ্ডারের মধ্যে বসিবার ব্যবস্থা থাকিবে। জাহাজ হইতে লোহার দড়ির সাহায্যে এই সিলিণ্ডার জলের মধ্যে ৫০০০ ফিট নীচে পর্য্যন্ত নামাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। ইস্পাতের সিলিণ্ডার এবং কাচ এমন করিয়া তৈয়ার হইবে যে, এই দুইটি পদার্থ এত নীচে জলের ভীষণ চাপ সহ্য করিতে পারিবে। লোহার দড়ির মধ্যে দিয়া টেলিফোন তার থাকিবে। অক্সিজেনের কল সিলিণ্ডারের ভিতর থাকিবে বলিয়া হাওয়ার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করা হইবে না, তাহার দরকারও হইবে না। ইহাতে সিলিণ্ডার নামাইবার কাজ বহু পরিমাণে সরল হইবে।

সমুদ্রতলের কথা

জলের এত নীচে এ পর্য্যন্ত কেহ নামিবার কল্পনা পর্য্যন্ত করে নাই। জলের নীচে এতদূর নামিয়া কোনো দিক দিয়া কোনো লাভ নাই বলিয়াই এই কার্য্যে কেহ এতদিন হাত দেয় নাই।

ডাঃ চিব বলিতেছেন যে জলের এতদূর নীচে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য নানাপ্রকার মাছ এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বিচিত্র জীবজন্তু বাস করে। এমন অনেক মাছ আছে যাহাদের দেহ হইতে একপ্রকার ফিকা-সবুজ আলো বাহির হয়। এই সকল মাছ জলের বেশী উপরে বাঁচিতে পারে না। কিন্তু ডাঃ চিব একবার এইপ্রকার একটি মাছকে জলের উপরে তুলিয়া প্রায় ১০ মিনিট বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। এই মাছটির দেহ হইতে ফিকা-সবুজ

আলো বাহির হয়। বিভিন্ন প্রকার মাছের দেহ হইতে বিভিন্ন প্রকার আলো বাহির হয়। সমুদ্রের তলায় ভীষণ অন্ধকার। মাছের দেহ হইতে এই স্বাভাবিক আলো বাহির হয় বলিয়া তাহারা চলাফেরা এবং খাদ্যসংগ্রহ সহজেই করিতে পারে।

এতদিন পর্য্যন্ত মানুষের চোখে পড়ে নাই। সমুদ্রতলের বিচিত্র দৃশ্যাবলীর বর্ণনা তিনি টেলিফোন সাহায্যে উপরের লোককে বলিবেন—তাহারা তাহা লিপিবদ্ধ করিবে।

সমুদ্রতলের জীবজন্তু ও উদ্ভিদ

ডাঃ বিব আশা করিতেছেন যে এইবার জলের নীচে হইতে তিনি যাহা সংগ্রহ করিবেন, তাহা

তা' দিয়া Eel মাছের ডিম ফোটানো

আগুনলাগা বাড়ী হইতে নীচে নামিবার অভিনব উপায়—

আগুনলাগা বাড়ী হইতে লোককে নীচে নামাইবার জন্য দড়ি ব্যবহার করা হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি নূতন উপায় আবিষ্কার হইয়াছে। একটি লম্বা থলিয়ার মধ্যে লোককে চারিদিকে দড়ির সাহায্যে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইবে। তার পর থলিয়াকে মুড়িয়া দেওয়া হইবে। এইভাবে
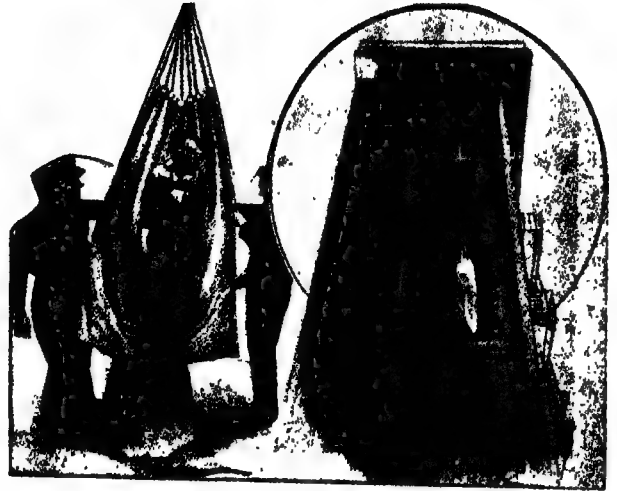
আগুনলাগা বাড়ী হইতে নীচে নামিবার সহজ উপায়

চারতলা পাঁচতলা বাড়ী হইতে খুব সহজে লোককে নীচে নামান যায়।

ধাতুর অভিনব ব্যবহার—

ক্রোমিয়ম ধাতু নতুন না হইলেও ইহার নাম আমরা অনেকেই বোধ হয় জানি না। এই ধাতু অতি অদ্ভুত। ইহার ব্যবহার ভাল করিয়া আরম্ভ হইলে ধাতু জগতে যুগান্তর আসিবে! নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা হইতে এই ধাতুর সামান্য পরিচয় পাওয়া যাইবে—

ক্রোমিয়ামের গিল্‌টি করা তৈজসপত্র

১। ক্রোমিয়মের রং প্ল্যাটিনামের মত।

২। কঠিনতম ইস্পাত অপেক্ষাও ইহা কঠিনতর।

৩। ইহা লোহা, ইস্পাত, তাঁমা, পিতল ইত্যাদি ধাতুর উপর "প্লেট" করা যায়।

৪। ইহার উপর লোনা জলের কোন প্রভাব নাই। কেবলমাত্র বিশেষ দুইটি এ্যাসিড ছাড়া অন্য কোনো অ্যাসিডেরও ইহার উপর কোনো প্রভাব নাই।

৫। ইহাতে কোনো প্রকার আঁচড় লাগে না। ইহা কাচ টিকতে পারে।

৬। ৩০০০ ডিগ্রি তাপে ইহা গলে। ইহার কম তাপে এই ধাতুর কোনো ক্ষতি হয় না।

বিশুদ্ধ ক্রোমিয়াম ধাতু দ্বারা কাচের উপর দাগ কাটা

যে সকল ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের ব্যবহার খুব বেশী, এখন হইতে সেই সকল দ্রব্য ক্রোমিয়াম-প্লেট করাইয়া লইলে, তাহার আর ক্ষয় বলিয়া কিছু হইবে না। কড়াই, তাওয়া ইত্যাদি বাসনের হাজারবার আগুনে পুড়িলেও কোনো প্রকার পরিবর্ত্তন হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। একজন মোটরকারওয়ালা মোটরের সমস্ত কলকব্জা ক্রোমিয়ম প্লেট
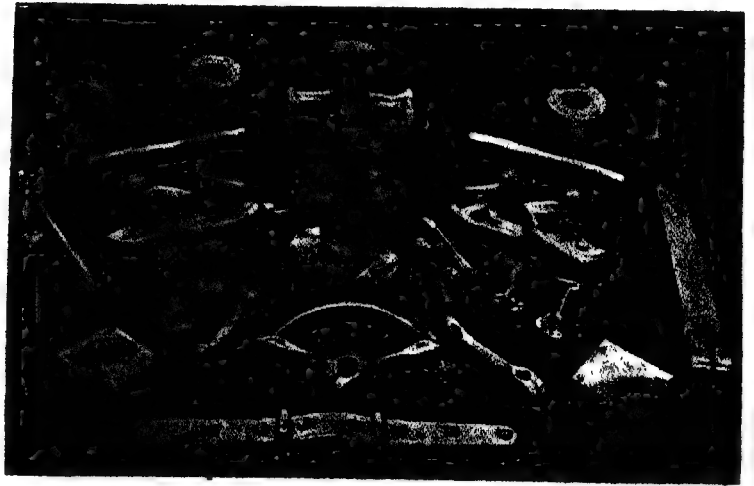
ক্রোমিয়ামের গিল্‌টি করা মোটর-বোটের ধাতব অংশ সমূহ লোণা জলে ইহাদের কোন ক্ষতি হয় না

করিয়া তৈরী করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সম্ভব হইলে গাড়ীকে একরকম চিরস্থায়ী করা চলিবে। হুড, গদি ইত্যাদি সামান্য দু-একটি জিনিস ছাড়া আর কিছু বদলাইবার প্রয়োজন কোনো দিনও হইবে না। ছুরি, কাঁচি, হাতা, বেড়ী ইত্যাদি, সকল প্রকার কলকব্জা, রেল গাড়ীর চাকা, রেল লাইন ইত্যাদি সকল জিনিসকেই ক্রোমিয়ম প্লেট করিয়া লইতে পারিলে—সবই চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া মনে হয়। বাসনপত্রে কোনো প্রকার খাদ্যদ্রব্যের দাগ লাগিবে না বলিয়া তাহাদের শুকনো করিবার জন্য ঝাড়নেরও দরকার হইবে না।

ক্রোমিয়ামের কলাই করা মোটর গাড়ীর আলো ও আয়না ইহাতে মরিচা ধরে না

ঘূর্ণি সিঁড়ি—ছেলেদের খেলনা

অভিনব খেলনা—

ছবিতে একটি অভিনব খেলনা দেখুন। পাশের মই দিয়া ঐ পাকান জিনিসটির উপরে পৌছান যায়। ঐখানে উহার মধ্যে বসিবামাত্র ছেলে পাক খাইতে খাইতে নীচে নামিয়া আসিবে। দুইপাশে ঘেরা আছে বলিয়া ছিটকাইয়া পড়িবার কোনো আশঙ্কা নাই। আমাদের দেশে এই খেলনাটি চালাইলে মন্দ হয় না।

মেরামতের জন্য মোটর গাড়ী উঠাইবার কল—

মোটরকার মেরামত করিবার জন্য অনেক সময় মিস্ত্রিকে গাড়ীর নীচে ঢুকিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া কাজ করিতে হয়। ইহাতে এক ঘণ্টার কাজে পাঁচ ঘণ্টা লাগে, এবং মিস্ত্রিকে
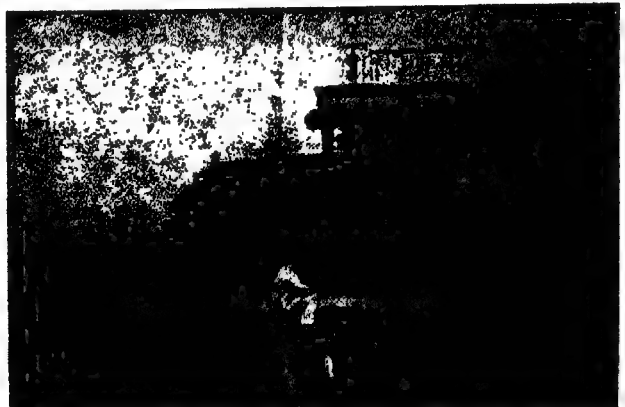
মোটর গাড়ী তুলিবার জ্যাক-কল

অত্যন্ত কষ্ট সহিয়া কাজ করিতে হয়। একজন ইঞ্জিনিয়ার মোটর গাড়ীকে তুলিয়া রাখিবার জন্য একপ্রকার কলের আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে মিস্ত্রি মোটরকারের তলায় বসিয়া আরামে কাজ করিতে পাইবে। কলটি এমন ভাবে তৈরী যে একজন লোক সহজেই ইহার উপর মোটর রাখিয়া তুলিতে পারিবে। হঠাৎ গাড়ী পড়িয়া যাইবারও ভয় নাই।

পথ-নির্দ্দেশক চিহ্ন

জার্ম্মাণীর এক গ্রামে মোটরকার এবং বিদেশীদের রাস্তা চিনাইবার জন্য একটি অদ্ভুত পথ-প্রদর্শক মূর্ত্তি রাখা

পথনির্দ্দেশক কাঠের প্রহরী

হইয়াছে। ইহার তিনটি হাতে পথের পরিচয় লেখা আছে। মুণ্ডটি মাঝে মাঝে হাওয়াতে নড়ে। তাহাতে মনে হয় যে সে ঘাড় নাড়িয়া পথ বলিয়া দিতেছে। এটি একটি অতি অদ্ভুত জিনিস।

আকাশের গায়ে ষ্ট্যাচুর প্রতিবিম্ব—

ফিলাডেলফিয়া সহরের উইলিয়াম পেন্ ষ্ট্যাচুকে একবার বিশেষ করিয়া আলোকিত করা হয়। হঠাৎ সকলে দেখিল আকাশের বহু উচ্চে মেঘের উপর আর একটি ষ্ট্যাচু ঝুলিতেছে। ইহা কোনো যাদুকরের কাণ্ড বলিয়া মনে হইল। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ষ্ট্যাচুর প্রতিবিম্ব—তীব্র আলোকের সাহায্যে মেঘের গায়ে প্রতিফলিত হয়।

মেঘের গায়ে প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব

রেড ইণ্ডিয়ান রসিকতা—

একজন লাল-মানুষ (আমেরিকার) নিজের কার্য্য-কলাপ, বীরত্ব সম্বন্ধে বড়াই করিয়া সকলের কান ঝালাপালা করিয়া দিয়াছিল। ইহাকে ঠাট্টা করিবার জন্য তার গ্রামবাসীরা,

মুখ-সর্ব্বস্ব "হামপদ্দ রায়!"

একটি কাঠের মূর্ত্তি তৈয়ার করে। মূর্ত্তিটির সর্ব্বাপেক্ষা মজার জিনিস হইতেছে তাহার প্রকাণ্ড মুখ। ইহার মানে এই যে লোকটি মুখ-সর্ব্বস্ব। ইহা বহু শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। বর্ত্তমানে ইহা নিউ ইয়র্কের এক যাদুঘরে আছে।
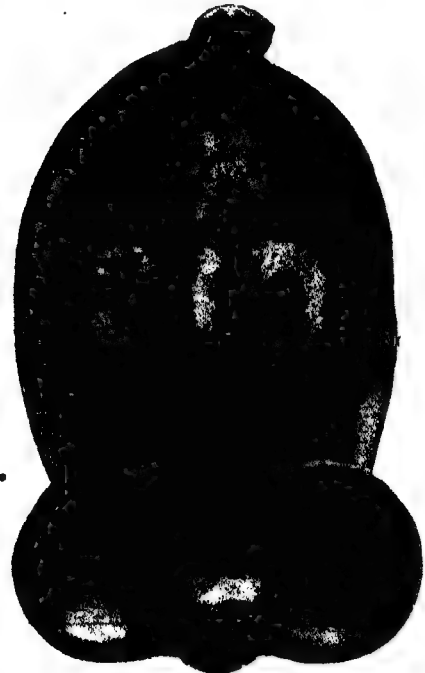
দুইভাগে বিভক্ত জাহাজ

জাহাজ দুই ভাগে বিভক্ত

ড্যালিসিয়া নামক একখানি জাহাজ বারি দ্বীপের কিনারায় পড়িয়া ছিল। জাহাজখানিতে কয়লা বোঝাই করা ছিল। ক্রমাগত জলে ঠোক্কর লাগিতে লাগিতে অবশেষে জাহাজখানি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এরকম ভাবে ঢেউএর ধাক্কায় জাহাজ ভাঙ্গার কথা প্রায়ই শোনা যায় না।

বিরাট চিত্র

একদল মার্কিন যুদ্ধ-জাহাজ অষ্ট্রেলিয়ায় বেড়াইতে যায়।
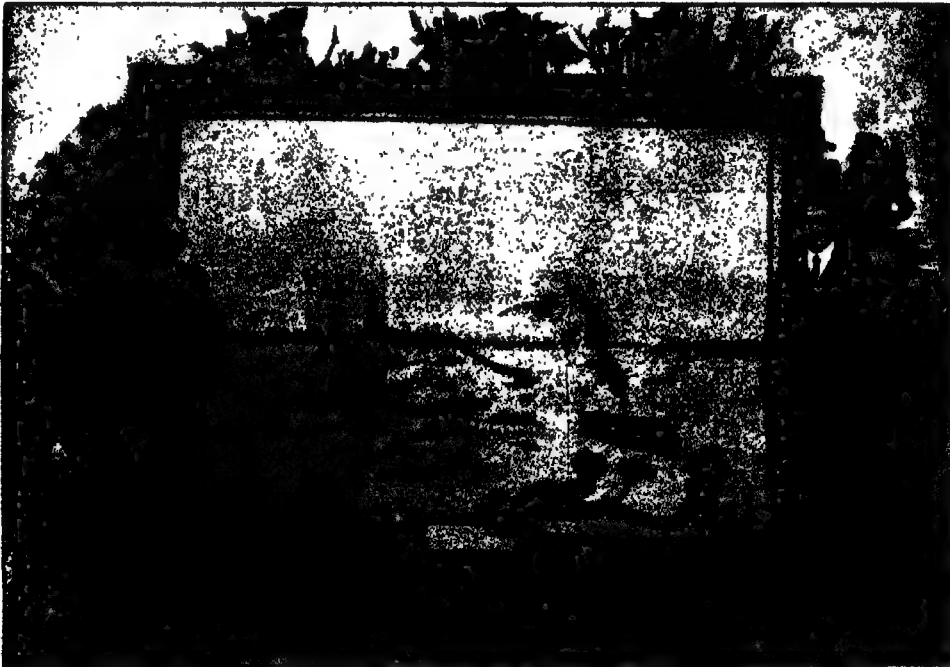
মার্কিন রণতরী-বহরের বিরাট-চিত্র

এই ঘটনা স্মরণ রাখিবার জন্য নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌এর একজন শিল্পী, চার্লস ব্রিয়াণ্ট, যুদ্ধজাহাজগুলির এক প্রকাণ্ড ছবি আঁকিয়া তাহা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট কুলিজকে দান করিয়াছেন। পাশে দণ্ডায়মান লোকগুলির সহিত তুলনা করিলে ছবিখানির পরিচয় পাইবেন।

পাহাড় কাটিয়া ভজনা-স্থান

কালিফোর্ণিয়ার সান ডিগো নামক স্থানের নিকটে একটি ১৩৮০ ফিট উচ্চ পাহাড় কাটিয়া ঈষ্টার পর্ব্ব উপলক্ষে প্রার্থনা করিবার স্থান করা হইয়াছে। পাথর কাটিয়া বসিবার স্থান এবং কনক্রিট ঢালিয়া সিঁড়ি তৈয়ার করা হইয়াছে। এই স্থানে ২০০০ লোক বসিয়া প্রার্থনা করিতে পারিবে। এই স্থানটির দৃশ্য বড় মনোরম। দূর হইতে ইহাকে অতি বিচিত্র দেখায়। ছবিতে ইহার কিছু পরিচয় পাইবেন।
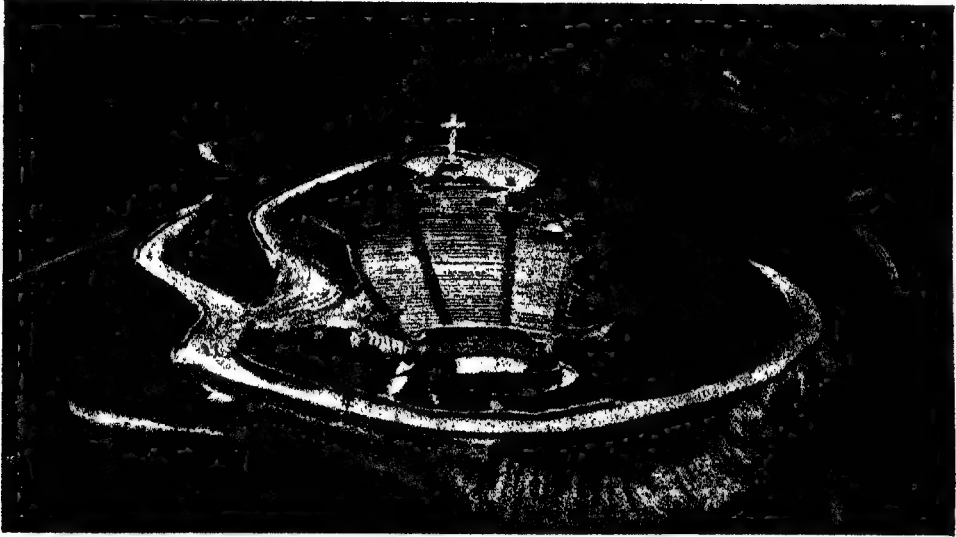
পাহাড়ের উপর ভজনা-স্থান

ঘুম পাড়ানি কল

একজন ফরাসি বৈজ্ঞানিক একটি ঘুম পাড়ানি কল আবিষ্কার করিয়াছেন। এক কালো ব্যাগের মধ্যে একটি নীল আলো আছে। ইহা নিদ্রার্থীর চোখের উপরে ধরা হয়। ইহার সঙ্গে একটি কাঁপানি-কল যুক্ত আছে। এই আলো এবং কাঁপানির ফলে লোকে আট মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রামগ্ন হইয়া যায়।

ঘুম-পাড়ানি কল

বিবিধ-প্রসঙ্গ

বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের প্রভাব

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এম-এ

২

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে সাধারণ ভাবে, ব্যাঙ্ক টাকার যোগাড় করিয়া বাণিজ্যের সাহায্য করিতে পারে···ইহা বলা হইয়াছে। কি কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ব্যাঙ্ক এই সাহায্য করে, কাহাকেই বা এই সাহায্য করে ও দেশের ব্যবসার উপর এই সাহায্যের কি প্রভাব,—বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে প্রয়াস পাইব।

স্কুল-পাঠ্য ইংলণ্ডের ইতিহাসে যেদিন পড়ান হইল—১৬৯৪ খৃঃ অব্দে Bank of England স্থাপিত হয়, শিক্ষক মহাশয় বলিয়া দিলেন···ইহা একটী বিশেষ ব্যাপার—সকলেরই ইহা মনে রাখা দরকার। কি জন্য শিক্ষক মহাশয় ইহাকে একটী বিশেষ ব্যাপার বলিলেন, তাহা বুঝাইয়া দিলেন না। আমরা মনে করিলাম, বাৎসরিক পরীক্ষায় এই ঘটনাকে একটী বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইবে ; সেই জন্যই হয়ত শিক্ষক মহাশয় ইহার কৌলিন্য আখ্যা দান করিলেন। তার পর পরীক্ষান্তে সমস্ত এক প্রকার ভুলিয়াই গেলাম। সময়ের ফেরে আবার এক দিন এই ছাত্র ও শিক্ষক সম্বন্ধ উল্টাইয়া হইল আমি শিক্ষক ও আমার শ্রোতা কোনও কলেজের ইতিহাসের ছাত্রবৃন্দ। প্রশ্ন হইল—Bank of England স্থাপিত হওয়া Englandএ একটী বৃহৎ ব্যাপার কেন? William III তখন নিজের রাজত্ব রক্ষার জন্য চিন্তিত ও বিপন্ন। Patterson এই ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া অর্থ-সাহায্য দ্বারা তাঁহাকে অর্থ-চিন্তা হইতে মুক্ত না করিলে Englandএর যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। এই Bank of Englandএর দ্বারাই Englandএর মান ও মর্য্যাদা রক্ষা পাইয়াছিল। এই ব্যাপারটিকেই একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বর্ণনা করিলাম। Pattersonকে দূরদর্শী, স্বদেশ হিতৈষী ইত্যাদি আখ্যা দিয়া আরও একটু রং ফলাইয়া তখনকার মত—নিজের মনকে ভাল রকম বুঝাইতে না পারিলেও—ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, কিংবা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। বাস্তবিক পক্ষে Patterson দেশ-হিতৈষিতার জন্যই এই Bank স্থাপিত করিয়াছিল কি না তাহা সন্দেহের বিষয়। রাজা তখন ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ-নিরত, টাকাকড়ির সেরূপ স্বচ্ছলতা নাই, অথচ অর্থবল না হইলে সৈন্যবল হয় না। কাজেই তিনি টাকার সন্ধান করিতেছিলেন। Patterson এই সময়ে ১,২০০,০০০ পাউণ্ড (প্রায় ১৮০ লক্ষ টাকা) গবর্ণমেণ্টকে যোগাড় করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। যাঁহারা সম্মিলিত হইয়া এই টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন, তাঁহাদের নাম হইল Bank of Englandএর গভর্ণর ও কোম্পানী। তাঁহাদের সমস্ত টাকা গভর্ণমেণ্ট শতকরা বার্ষিক ৮৲ টাকা হার সুদে ধার লইয়া Bank of Englandকে ১২ বৎসরের জন্য কতকগুলি বিশেষ সুবিধা প্রদান করিলেন। তার পর সময় সময় এই সুবিধা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে···এই হইল Bank of Englandএর উৎপত্তির ইতিহাস। ট্যাক্স প্রভৃতি স্থাপন ও আদায় করা সময়-সাপেক্ষ ; কিন্তু এই প্রকার জাতীয় বিপদের সময় অর্থের প্রয়োজন নিত্য। এই অর্থ-সমস্যা হইতে গভর্ণমেণ্টকে মুক্তিদান করিয়া Bank of England William IIIএর উপকার করিল, ও Englandকে যুদ্ধে জয়লাভ করিতে সহায়তা করিল। কেবলমাত্র এই সাহায্যের কারণ বলিয়াই কিন্তু Bank of Englandএর স্থাপন একটী বিশেষ ঘটনা বলিলে ইহার বিশেষত্বের সম্যক উল্লেখ করা হয় না।

এই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হওয়ার পূর্ব্বে ইংলণ্ডের বণিকগণ বাণিজ্যলব্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি নিরাপদে (Safe cut ody) রাখিবার জন্য সরকারি টাঁকশালে গচ্ছিত রাখিত। কিন্তু Charles I এই গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রতি প্রজার বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেন। কিন্তু বিশ্বাসই গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি। এই ভিত্তি ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই দেশ বিপ্লবের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। কাজেই যাহারা কোন কার্য্য দ্বারা গভর্ণমেণ্টের প্রতি এই লুপ্ত বিশ্বাসের উদ্ধার করে তাহারা দেশের সম্মানার্হ। Pattersonএর কীর্ত্তির বিশেষত্ব এই বিশ্বাসের পুনরুদ্ধার। বাহিরের দিক দিয়াও এই ঘটনার বিশেষত্ব আছে। দেশের Credit বাহিরে তখন নষ্ট হইয়াছিল। অনেকে মনে করিতেছিল William III প্রজার মন আকৃষ্ট করেন নাই। কাজেই কোন শত্রু সদলবলে দেশ আক্রমণ করিলে সহজেই England রাজার পক্ষ পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু যখন দেখা গেল, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কেবলমাত্র William III নহেন, দেশের প্রজাগণও তাঁহাদের সম্মিলিত অর্থবল লইয়া দণ্ডায়মান,—তখন বাহিরেও এই দেশের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব দূরীভূত হইয়া গেল। যুদ্ধ-বিগ্রহের শান্তি হইলে Englandএর বণিকগণ টাকার পরিবর্ত্তে এই ব্যাঙ্কের Note ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই নোটের চলনই সর্ব্বপ্রধান ব্যাপার। কথা থাকিল, এই নোটের পরিবর্ত্তে Bank যে-কোনও সময় সোণা দিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই অঙ্গীকার পালনে Bank সমর্থ কি না, তাহা কেহ পরীক্ষা করিতে যায় না। একবার বিশ্বাস জন্মিয়া গেলে লোকে নির্ব্বিবাদে ইহা স্বীকার করিয়া লয়, যে চাহিলেই সোণা পাওয়া যাইবে। কাজেই ব্যাঙ্ক-নোট নগদ

টাকার ন্যায় চলিতে থাকে। ভাল বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলে তহবিলে টাকা যৎ-সামান্য থাকিলেও নোট চলনের কোন বাধা থাকে না। কিন্তু বিদেশে নোট চলে না। বিদেশের জন্য স্বর্ণের প্রচলন রাখিয়া দেশে এই নোট চলিতে পারে। গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহাতে বিশেষ সুবিধা,—ইচ্ছা করিলে সমস্ত সোণা সমুদ্র-পারে পাঠাইয়া কাগজ দ্বারাই দেশের অভাব মিটাইতে পারে। ইহা কতদূর সম্ভব, ও সোণার কত অংশ হাতে রাখা উচিত, ইহা বিষয়ান্তর হইয়া পড়ে। রাজা কিম্বা গভর্ণমেণ্ট যেমন টাকার পরিবর্ত্তে নোটের ব্যবহার দ্বারা কাজ চালাইয়া লয়, জনসাধারণ কিম্বা বণিকগণ "cheque" দ্বারা সেই কাজ করিয়া থাকে। Bankএ টাকা জমা থাকিলে Depositorগণ এই চেক কাটিবার অধিকারী; কিন্তু সব সময়েই যে জমা টাকার উপর চেক কাটা হইয়া থাকে বা হইতে পারে, তাহা নহে। Bankএর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকিলে ও নিজের ব্যবসায়ে সততা ও কার্য্যক্ষমতা দ্বারা Bankএ ও বাজারে credit জন্মাইতে পারিলে, জমা ব্যতিরেকেও একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত চেক কাটিবার অধিকার দেওয়া হইয়া থাকে। Scotlandএ এই প্রকার creditএর উপর চেকের বহুল প্রচলন আছে। এই প্রকার creditএর উপর চেক কাটাকে over-draft বলে। এই overdraft না থাকিলেও চেক দ্বারা অল্প সময়ের জন্য প্রায় অজ্ঞাতসারে টাকা ধার লওয়ার কার্য্যই হইয়া থাকে। স্থান ও কাল অনুসারে চেকগুলি ২।১ দিনের জন্য হাণ্ড নোটের ন্যায় কার্য্য করে। হাণ্ড নোট শুনিলেই কিন্তু একটা বিশেষ কিছু বলিয়া মনে হয়। যিনি উহা গ্রহণ করিবেন, তিনি সাত পাঁচ অনেক ভাবিতে বসেন। কিন্তু চেক দ্বারা সেই কাজ হইলেও ইহা নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়। এই অল্প সময়ের জন্য creditই ব্যবসায়ের প্রাণ। আর এই জন্যই chequeএর এত আদর। মনে করুন, একজন বণিক এক কিংবা দুই দিন পরে টাকা পাইবে, এই-রূপ সর্ত্তে কিছু মাল বিক্রয় করিল। এমন সময় সে সংবাদ পাইল—এক যায়গায় সস্তায় কিছু মাল কিনিতে পারে। বিলম্ব না করিয়া সেখানে গিয়া সে মাল খরিদ করিল। কিন্তু সে মূল্য দিবে কি প্রকারে? তাহার টাকা আসিবে ২।১ দিন পরে, অথচ তাহাকে তখনই বিক্রেতার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। এরূপ স্থলে সে একখানি চেক দিল। এই চেক দ্বারা তাহার creditএর কাজ চলিয়া যাইবে…আর উহা পরদিন যখন Bankএ হাজির হইবে, তখন হয়ত ক্রেতা মহাশয়ের টাকা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কার্য্যতঃ হইল এই চেকখানি একদিনের হাণ্ডনোট। সকলেরই কাজ চলিয়া গেল একখানি কাগজের দ্বারা। এইরূপ short credit অর্থাৎ অল্প সময়ের জন্য ধার না হইলে ব্যবসায় চলিতে পারে না।

আজকালকার ব্যবসায়ের ধরণটাও বদলাইয়া যাইতেছে। বড় বড় কারখানা কিংবা কারবার আজকাল ব্যক্তিবিশেষের হাত হইতে ক্রমে ক্রমে কোম্পানি কিংবা যৌথ কারবারের হাতে আসিতেছে। পৃথিবীময় যে প্রকার প্রতিযোগিতা চলিতেছে, সম্মিলিত শক্তি ব্যতীত ইহার ভিতর দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত। Ford সাহেবের কথা ছাড়িয়া দিন। আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রধান দুইটী ব্যাঙ্ক…Imperial Bank of India ও Central Bank of Indiaর মোট ডিপোজিট ১২০ কোটী টাকা। Ford সাহেবের কেবলমাত্র ব্যাঙ্কে রক্ষিত টাকার সমষ্টিই এই দুইটী Bankএর মোট ডিপোজিট অপেক্ষা বেশী। ইহাদের কথা ছাড়িয়া দিয়া আজকাল দাঁড়াইয়াছে এইরূপ—পিছনে অর্থবল কিংবা অর্থ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে কোনও বৃহৎ অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা কম। আর কারবারগুলিও যেভাবে গঠিত হইতেছে…একজন কিংবা দুইজনের অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া সেগুলিকে দাঁড় করাইয়া রাখা যায় না। আবার এই ২।১ জনেরও সব সময় বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করিতে সাহসও জন্মে না। এরূপ স্থলে মিলিত অর্থবলের ব্যবহারই প্রশস্ত। এই অর্থ একত্র করিয়া সুনিয়োগ করা Bank গুলির কাজ,…কাজেই ব্যবসাতে ব্যাঙ্কের প্রভাব এত বেশী হইয়া পড়িতেছে। এই প্রকার ব্যবসায়ে ছোট, বড় ও মাঝারি সকল বণিকেরই Bankএর সহিত কারবার একান্ত প্রয়োজনীয়। ব্যবসায়ের প্রাণ short credit। ব্যাঙ্ক এই সুবিধা দিতে পারে বলিয়াই Bank ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড।

কিন্তু সব Bankই ব্যবসায়ীর পক্ষে সুবিধাজনক নহে। পূর্ব্বে যে সমস্ত ব্যাঙ্কের নাম করা হইয়াছে, তাহারা সকলেই ব্যবসায়ীর সুবিধার জন্য সৃষ্ট। কাজেই সেগুলিকে "বাণিজ্য" ব্যাঙ্ক (Commercial Bank) বলে। এই সমস্ত Bankএ জমা টাকা উঠাইবার উপায় অতীব সহজ ও সরল। ব্যবসায়ীর পক্ষে short credit পাইবার প্রণালীও জটিল নহে। বেশী দিনের জন্য ধার ইহারা দেয় না; কারণ, তাহাদের আমানতও তাহারা বেশী দিনের জন্য লয় না। কোনও কারবার স্থাপনের জন্য ইহারা টাকা দেয় না; কিন্তু কারবার চলিতে চলিতে হঠাৎ প্রয়োজন হইলে অল্প সময়ের জন্য টাকা দিতে ইহারা প্রস্তুত। ইঞ্জিন্‌কে কার্য্যক্ষম রাখিতে ইহারা তৈল সরবরাহ করে; কিন্তু ইঞ্জিন্ তৈয়ারী করিবার জন্য ইহারা অর্থ সাহায্য করিতে রাজী নহে। এই ইঞ্জিন্ তৈয়ারী করিবার জন্য টাকা দেওয়া Industrial Bankএর কাজ। তাহারা কারবার স্থাপন করিতে সহায়তা করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করে। আমাদের দেশে এইরূপ Bank নাই। একমাত্র Tata Industrial Bank এই কাজ আরম্ভ করিতে করিতেই বন্ধ হইয়া যায় ও একটী Commercial Bankএর অন্তর্ভুক্ত হয়।

চাষবাসের উন্নতির জন্য কৃষককে সাহায্য করিতে এই দুই Bankএর কেহই রাজি নহে। অল্প সংস্থান বিশিষ্ট কৃষকের এরূপ সঙ্গতি নাই যে তাহার turn over দ্বারা Commercial Bankএর ধার পাইবার অধিকারী হয়। আর এমন প্রতিপত্তিও করিতে পারে না যে তাহার গরু, লাঙ্গল, জমি ও সারের একত্রীকরণকে Industry আখ্যা প্রদান করিতে পারে। কাজেই তাহার সহায় অতিকায় Commercial Bank ও Industrial Bank নহে। তাহাকে যাইতে হইবে Agricultural Loan Bankএ কিংবা Co-operative Societyতে। কৃষকের উৎপন্ন শস্য জামিন রাখিয়া কিংবা ২।৪ জনের সম্মিলিত সম্পত্তির জামিন রাখিয়া ইহারা কৃষকের প্রয়োজন মত টাকা ধার দিয়া থাকে। ইহারা টাকা ধার দেয় ৩।৪ মাস হইতে ১।১॥০ বৎসর পর্য্যন্ত। কাজেই জমাও ২।৩

বৎসরের জন্য লইয়া থাকে। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশে কৃষির উন্নতির জন্য এইপ্রকার Bankএর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। অনেক কৃষকের আবার প্রয়োজন মত জমিটুকু পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া টাকা উঠাইতে হয়। বেশী সুদে মহাজনের নিকট হইতে এই টাকা লইলে প্রায়ই চক্রবৃদ্ধির মহিমাতে ইহার পুনরুদ্ধার হয় না। আবার জমি বন্ধক ব্যাপারটাও বড় সহজ নহে। দলিল, ষ্টাম্প, উকিল খরচ প্রভৃতি সহজসাধ্য নহে। কাজেই কৃষক অল্প সুদে ও সহজভাবে যাহাতে জমির উপর টাকা উঠাইতে পারে, তাহার জন্য 'জমি বন্ধক' (Land Mortgage) Banks আছে। বাঙ্গলাদেশে খাঁটী Land Mortgage Bank নাই। আজকাল ভারতবর্ষে এরূপ ২।১টী ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবার চেষ্টা হইতেছে, তন্মধ্যে মহিবুর রাজ্যে 'মালনদ' তালুকে ইহার স্থাপনের চেষ্টা বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত। জমি যদি সহজেই হস্তান্তর করা আবশ্যক হয়, তাহার জরিপ, খাজনার পরিমাণ, পরিচয় প্রভৃতিও সহজ হওয়া প্রয়োজন, বিচারালয়ে স্বত্ব হস্তান্তর হইবার প্রমাণও যাহাতে সহজসাধ্য হয়, তাহাও আবশ্যক। এই সমস্ত ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে কার্য্য হওয়া অসম্ভব। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় প্রায় সমস্ত প্রকার অর্থসাধ্য কর্ম্মেই সময়োপযোগী সাহায্য করিবার জন্য ব্যাঙ্ক আছে। কৃষকের গরু, লাঙ্গল প্রভৃতি কিনিতে হইবে—কৃষি-ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে। জমি বন্ধক রাখিতে হইবে—Land Mortgage Bank সাহায্য করিতে প্রস্তুত। বণিক ব্যবসার জন্য টাকা চায়—Commercial Bankএর দ্বার তাহার সাহায্যার্থ উন্মুক্ত; শক্তিশালী, কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি—যাহারা Captains of industry নামের উপযুক্ত, তাহারা তাহাদের কার্য্য-প্রণালী লাভজনক বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিলে Industrial Bank তাহাদের সাহায্য করে। যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহার সেই প্রকার ব্যবস্থা। যাহার সে প্রকার নামযশ নাই, সেও দুই এক জনের সহিত মিলিত হইয়া Co operative Bank হইতে অর্থ লইতে পারে। নিজের শক্তি স্বল্প পরিমাণে দেখাইতে পারিলেই অর্থ সাহায্য জুটিয়া যায়। আমাদের দেশে Bankএর সে প্রকার উন্নতি হয় নাই,…কিন্তু হইতে কোন বাধা আছে বলিয়াও মনে হয় না। একটু চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কাজে লাগিলেই সাহায্যের অভাব হয় না। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইহাই রীতি ও নিয়ম।

কেবল মাত্র ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির জন্যই Bank—ইহা ঠিক নহে। পশ্চিমে Building Association নামে গৃহ-নির্ম্মাণ সমিতি আছে। ইহারা গ্রামে কিংবা নগরে সুন্দর সুন্দর গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে সাহায্য করে। অনেকে পুরুষানুক্রমে ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করে, তাহাদের প্রদত্ত ভাড়ার টাকায় হয়ত দুই-চারিখানি বাড়ীর মূল্যই উঠিয়া যায়। কিন্তু তবুও ভাড়াটিয়া পূর্ব্বেও যেমন পরেও তেমন,—নিজের বাসস্থান বলিতে কিছুই নাই। কাহারও বা অল্প সঙ্গতি আছে—আর কিছু সাহায্য পাইলেই একখানি বাড়ী তৈয়ারী করিতে পারে। এসব ক্ষেত্রে Bank তাহাদের মনোনীত নক্সা অনুসারে গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দেয়। এই বাড়ী Bankএর সম্পত্তি। কিন্তু কথা থাকে, মায় সুদ তাহাদের টাকা ভাড়া হইতে পরিশোধ হইয়া গেলেই বাড়ী ভাড়াটিয়ার। কিংবা বাড়ী Bank এর কাছে mortgage রাখিয়া, যে টাকার অভাব তাহা লইলে, বাড়ীর মালীক মাসিক অথবা কিস্তি অনুসারে টাকা শোধ দিতে থাকে। শোধ হইলেই বাড়ীর উপর mortgage উঠিয়া যায়। দেশকে সুন্দর, স্বাস্থ্যকর করিতে ও দেশকে শ্রীসম্পন্ন করিতে যাহা প্রয়োজন Bank তাহাই জুটাইয়া দিতে প্রস্তুত। আমরা এই সাহায্যের উপযুক্ত কি না, ও উপযুক্ত হইলে এই সাহায্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে দিতে ব্যাঙ্ক প্রস্তুত কি না, তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়; কারণ, তাহার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এ কার্য্য অন্যের উপর ন্যস্ত রাখিলে চলিবে না। আমাদের কাজে কিন্তু অন্যরূপ। অল্প কিছু টাকা জমিলেই আমরা দৌড়াই বিদেশী ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে—যাহারা স্বভাবতঃ বিদেশীয়দিগেরই সাহায্য করিবে। এই বিদেশী Bank আমাদের টাকার কি ব্যবহার করিতেছে, তাহা ভাবিবার আমাদের অবসরও নাই, ইচ্ছাও নাই। কিন্তু আমরাই আবার বাহিরে দেশীয় ব্যবসা ও শিল্পের উন্নতির জন্য সভাসমিতিতে চীৎকার করি। আমাদের অর্থ বল দিই বিদেশীয় ব্যাঙ্কে বিদেশী ব্যবসায়ীর সাহায্যার্থ, আর দোষ দিই আমাদের পোড়াকপালের আমাদের অবনতির জন্য। আমাদের ডিপোজিটে পুষ্ট হইয়া বিদেশী ব্যাঙ্ক সাহায্য করে তাহাদের দেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দকে, আর শত গ্লানি ও অপমান সহ্য করিয়াও আমরা যাই আমাদের দেশের লোকের গ্রাস দূরে রাখিতে। দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি অপটু কিংবা অক্ষম বলিয়া যাঁহারা সেদিকে যাইতে চাহেন না, তাঁহাদের নিকট অনুরোধ—তাঁহারা নিজেরাও ত ২।১টা ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে পারেন। তাঁহাদের সাধুতা ও ক্ষমতা দ্বারা নিজেদেরও উপকার করিতে পারেন; সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও দশেরও উপকার করা হয়। যাহাদের নিকট তাহাদের টাকা গ্রাহ্য হইলেও তাঁহারা তুচ্ছ, তাঁহাদের দ্বারস্থ হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ মনে হয় না।

অনেকে ভাবিবেন, ধার করিয়া কি কারবার চলে? ব্যাঙ্ক দেশের লোকের বাণিজ্যে আর কতই সাহায্য করে? ৯।১০ বৎসর পূর্ব্বে লেখকও মনে করিতেন, ধার করা উচিত নয় ও ধার যাহারা করে তাহারা ভাগ্যহীন। ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক, ব্যবসাক্ষেত্রে দেখিতেছি অন্যপ্রকার। আমাদের ধার হইলেই লোকে বলে ঋণী; কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে এইপ্রকার গোপন ঋণের বা ঋণ পাইবার অধিকারের নাম credit। Creditএর মূল্য অনেক বেশী। এই creditই টাকা উপার্জ্জন করিতে সাহায্য করে। 'টাকায় টাকা আনে' ইহার অর্থ creditএর সাহায্যে টাকা লইয়া তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা অর্থোপার্জ্জন। অবশ্য ইহাতে প্রথম প্রয়োজন সততা ও ক্ষমতা। ইহার ব্যবহার ও অপব্যবহার অন্য কথা। টাকার দ্বারাও এই উপকার ও অপকার দুইই করা যায়। আমাদের উন্নতি ইহার ব্যবহার করিবার ক্ষমতার উপরই নির্ভর করিতেছে এবং তাহার প্রধান সহায় আমাদের নিজেদের ব্যাঙ্ক।

—

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য*

বৈদিক সংহিতার সংবাদসূক্ত

হিন্দুর নিকট বেদ অনাদি, অপৌরুষেয়, মহেশ্বরের নিঃশ্বাসস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, বৈদিক সাহিত্যকে ভারতের···শুধু ভারতের কেন জগতের—প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন বলা যায়। দুই একজন ব্যতীত (১) অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ বৈদেশিক পণ্ডিতই এইরূপ মত পোষণ করেন। বৈদিক সাহিত্য মধ্যে আবার ঋগ্বেদ-সংহিতাই প্রাচীনতম···ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহাই অভিমত।

ঋগ্বেদ-সংহিতা মধ্যে এমন কয়েকটি সূক্ত আছে, যাহাতে দুইজনের কথোপকথনের আভাষ পাওয়া যায়। এই সূক্তগুলির কোন প্রকার বিনিয়োগ (ritual application) নাই। সাধারণতঃ এগুলি সংবাদ-সূক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যম ও যমী (১০।১১), পুরূরবা ও উর্ব্বশী (১০।৯৫), নেম ভার্গব ও ইন্দ্র (৮।১০০), অগস্ত্য, লোপামুদ্রা ও তাঁহাদের পুত্র (১।১৭৯), ইন্দ্র, বসুক্র ও তৎপত্নী (১০।২৮), ইন্দ্র, অদিতি ও বামদেব (৪।১৮), ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী ও বৃষাকপি (১০।৮৬), সরমা ও পণিগণ (১০।১০৮), অগ্নি ও দেবগণ (১০।৫১-৫৩), বিশ্বামিত্র ও নদীগণ (৩।৩৩), বশিষ্ঠ ও তাঁহার পুত্রগণ (৭।৩৩), ইন্দ্র ও মরুদ্গণ (১।১৬৫ ও ১৭০) প্রভৃতিই বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহা ছাড়া কয়েকটি "একজনের উক্তি" (monologue) আছে। আবার dialogueগুলির মধ্যেও দুই ব্যতীত তিন বা ততোধিক ব্যক্তির কথোপকথনও দেখা যায়। ইহাদিগকে খাঁটি dialogue বলা চলে না। এ সংবাদসূক্তগুলির অধিকাংশই অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ ১০।৮৬ সংখ্যক সূক্তটির ত' কথাই নাই (২)। অথর্ব্ববেদেও (৫।১১) এইরূপ সূক্ত একটি আছে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Max Muller প্রথম মত প্রকাশ করেন যে, ১।১৬৫ সূক্তের বিনিয়োগ এখন যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে ; বহু প্রাচীন যুগে মরুদ্গণের উদ্দেশে যজ্ঞ করিবার সময়ে এই dialogueটির (১।১৬৫) আবৃত্তি করা হইত ; এবং খুব সম্ভব ঋত্বিকেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একদল ইন্দ্রের উচ্চার্য্য বাক্যগুলির ও অপর দল মরুদ্গণের উচ্চার্য্য বাক্যগুলির আবৃত্তি করিতেন। কালক্রমে এই রীতি যখন ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া আসিল, তখন আর এই সূক্তগুলির বিনিয়োগ ঠিক হইল না। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক Levi ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন যে; সামবেদ-দর্শনে বুঝা যায়···বৈদিক যুগে সঙ্গীত কিরূপ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিল। ঋগ্বেদে (১।৯২) বিচিত্রবসনোজ্জ্বলা, নৃত্যকুশলা প্রেমিকহৃদয়হারিণী বালাগণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অথর্ব্ববেদেও (১২।১।৪১) নৃত্য, গীত ও তৎসহ বাদ্যের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সুতরাং বৈদিকযুগে ধর্ম্মের আবরণে আবৃত নাটকীয় কোনরূপ ব্যাপার চলিত তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং পুরোহিতগণ ছিলেন এ ব্যাপারের অভিনেতা। যজ্ঞসময়ে দেবগণের ভূমিকা গ্রহণ ছিল তাঁহাদিগের রীতি।

অধ্যাপক Schroeder ইহারই উপর রঙ্‌ চড়াইয়া বলিয়াছেন যে, এই বৈদিক রহস্যময় কথোপকথনগুলি (mysteries) প্রাচীনতম ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান্ যুগ হইতে বীজাকারে সংগৃহীত। জাতিতত্ত্ববিজ্ঞানের (Ethnology) সাহায্যে জানা যায় যে, বিভিন্নজাতির মধ্যেও নৃত্য, গীত ও অভিনয়ে বেশ একটা ঐক্য আছে। যজ্ঞকালীন নৃত্য জগৎসৃষ্টি-বর্ণনার রূপকমাত্র·· ইহার স্পষ্ট আভাষও তাঁহার উক্তি হইতে পাওয়া যায় (৩)। গ্রীস্ ও মেক্সিকোতে লৈঙ্গিক নৃত্যই (Phallic dances) নাট্যোৎপত্তির বীজস্বরূপ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ঋগ্বেদে ঐ ধরণের নৃত্যের বা লিঙ্গ-পূজার বিশেষ কোন আভাষ না পাওয়া গেলেও (একেবারে যে পাওয়া যায় না, তাহাও নহে ; এ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় ক্ষেত্রেশ বাবুর "বৃষাকপিসূক্ত" ও সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের চার্ব্বাকদর্শনের অধ্যায় দ্রষ্টব্য) এই সকল সংবাদসূক্তই রীতিমত রূপকের কার্য্য করিত ("With actual Dramatis Personæ and stage direction")। অতএব তাঁহার মতে যাজ্ঞিক দৃশ্যকাব্য ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান্ নাট্যবীজের মূল অঙ্কুর না হইলেও একেবারে তৎসম্পর্করহিত নহে। তবে ঐ সুপ্রাচীন ইন্দো-ইয়োরোপীয় যুগের নাট্যধারার লৌকিকাংশ বাঙলার খাঁটি যাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু বৈদিক অভিনয়ের ধারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাত্রাকে আমরা সেই প্রাচীন নাট্যের বংশধর বলিতে পারি ; এবং প্রাচীন ভারতীয় নাট্যে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা প্রভৃতির যে উল্লেখ দেখা যায়, তাহাতে ভারতীয় নাট্য সাহিত্যে লৈঙ্গিক (phallic) দেবতার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

Dr. Hertel সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাবে উক্ত সংবাদসূক্তগুলিকে "mystery plays in nuce" বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সূক্তগুলিই নাট্যকলার আদি, এবং ইহাদিগের স্বরূপের সহিত গীতগোবিন্দের বেশ তুলনা করা চলে। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহার বিশ্বাস "সুপর্ণাধ্যায়" একখানি সুবিস্তৃত প্রকৃত দৃশ্যকাব্য।

এই সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে,

---

(১) যথা, Weber প্রভৃতি। Weberএর মতে শুক্ল যজুঃ সংহিতার রচনা-কাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী !!! ইঁহাদিগের যুক্তি একরূপ অকাট্য ! History of Indian Literature—Weber—P. ১০.

(২) এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "The Vrsakapi Hymn" (Allahabad University Journal) দ্রষ্টব্য।

(৩) "...the curious phenomenon that Vedic religion knows of Gods as dancers cannot be explained satisfactorily save on the assumption that the priests were used to see performed ritual dances, in themselves imitations of the cosmic dance in which the world was, on one view, created "—Sanskrit Drama, p. 16.

সংবাদ-সূক্তগুলি যে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের আদি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে ইন্দ্রের মত্ততা বর্ণনের সহিত Cora জাতির মত্তোৎসবের ঐকরূপ্য দেখাইয়া Ethnological সাদৃশ্য দেখাইতে যাওয়া, বা "সুপর্ণাধ্যায়" মধ্যে একখানি রূপকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিতে যাওয়া, সুবিবেচকের কার্য্য নহে। অধ্যাপক Keith এ সম্বন্ধে যে সকল যুক্তিযুক্ত কথা বলিয়াছেন, তাহা সর্ব্বদা স্মরণীয় (৪)। তাহা ছাড়া ১।১৬৫, ১৭০, ১৭১—এই তিনটি সূক্তে ইন্দ্রের-সহিত বৃত্রের যুদ্ধ। বৃত্রবধ ও মরুদ্গণের নৃত্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে অস্ত্র-নৃত্যের আভাষ পাওয়া যায়। অস্ত্রধারী যুবকগণ মরুদ্গণের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। এই অস্ত্রনৃত্য রূপকমাত্র—শস্যোৎসবের স্মারক—পুরাতন বর্ষের, শীত ঋতুর, বা মৃত্যুর পরাজয়-সূচক। Roman Salu, Greek Kouretes, Phrygian Korybantes এবং German তরবারি নর্ত্তকগণের নৃত্য—এ সকলই অস্ত্রনৃত্য হইতে উদ্ভূত। আগের সিদ্ধান্তগুলি মানিতে গেলে এই অস্ত্রনৃত্যকেও নাট্যের আদি বলিতে হয়। সুতরাং ওরূপ যৎ-কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য দর্শনেই একটা ত্বরিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক নহে।

অধ্যাপক Windisch Oldenberg এবং Pischelএর ধারণা অন্যরূপ। এ সূক্তগুলি অবশ্য তাঁহাদের মতে অতি প্রাচীন—ইন্দো-ইয়োরোপীয়ান্ গন্ধ ইহাতে বর্ত্তমান। সূক্তগুলি আসলে কাব্য। উহাদের ঋক্‌সমূহ পূর্ব্বে নাটকীয় গদ্য বাক্যাংশ দ্বারা পরস্পর সংযোজিত ছিল। গদ্যাংশগুলি সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাধরা ছিল না বলিয়া (অর্থাৎ সূক্তগুলির মত সেগুলিকে ততদূর পবিত্র, অপৌরুষেয় মনে করা হইত না) কালবশে হতাদরে সেগুলি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; শুধু অসংবদ্ধ পদ্যাংশ অবশিষ্ট আছে। Pischel সাহেবের মতে এই সূক্তগুলি লৌকিক দৃশ্য ও শ্রব্য এই উভয়বিধ কাব্যেরই উৎপত্তিস্থল। Oldenbergও এই মতের একজন প্রধান পরিপোষক; বিশেষতঃ তাঁহার গদ্যোৎপত্তির সিদ্ধান্ত ইহারই উপর স্থাপিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেপোপাখ্যান ও শতপথ ব্রাহ্মণের পুরূরবা ও উর্ব্বশীর উপাখ্যানের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, সংবাদ-সূক্তমধ্যস্থ বীজভূত গদ্যাংশ কিরূপে গদ্য বা পদ্যকাব্যের আকারে বিস্তৃতিলাভ করে। পালি জাতক হইতেও অনুরূপ ব্যাপারের উল্লেখ করিয়া তিনি এ বিষয় দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে মোটামুটি এইরূপ যুক্তি দেওয়া যাইতে পারে—

পদ্যাংশগুলির সংযোজক গদ্যাংশগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। পালি জাতকের উদাহরণও এই ব্যাপারের ঠিক অনুরূপ নহে; বরং প্রশ্নোপনিষদে এইরূপ ঘটনার আভাষ পাওয়া যায় বলা চলিতে পারে।

Geldner সাহেব এক সময়ে Oldenbergএর একজন প্রধান ভক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনিও ক্রমশঃ পুরাতন মত পরিত্যাগ করিয়া সূক্তগুলিকে "চারণ গীতি" (ballad) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে নাটকীয় ঘটনার আভাষ

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৈদিক সংবাদ-সূক্তে দৃশ্যকাব্য রচনার যথেষ্ট উপাদানই বর্ত্তমান।

সোমযজ্ঞে এইরূপ একটি অপূর্ব্ব ঘটনার উল্লেখ দৃষ্ট হয়; সোমবিক্রেতা অবশেষে, হয় মূল্য হইতে একেবারে বঞ্চিত হ'ল, অথবা ইটপাটকেলের প্রহারে জর্জ্জরিত হ'ল। ইহাতে অবশ্য সোমের ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আপত্তির সূচনা পরিস্ফুট। সে যাহা হউক, সোমরক্ষক গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে সোম প্রাপ্তি প্রভৃতি ব্যাপারে, অভিনয় না হউক, mimeএর আভাষ বেশ পাওয়া যায়। অনেকে আবার (যথা, Hillebrandt সাহেব) প্রহৃত ও বঞ্চিত ক্ষুদ্র সোমবিক্রেতার সহিত মধ্যযুগের রহস্যাভিনয়ের (mystery plays) "শয়তানে"র সাদৃশ্য দেখিয়া থাকেন। যাঁহারা এই সকল নব-নব মতবাদের আবিষ্কর্ত্তা, তাঁহারা এইরূপ "চরিত্রানুকরণে"র সহিত প্রকৃত রূপকাভিনয়ের কি পার্থক্য তাহা বড় সহজেই ভুলিয়া যান। যখন অভিনেতৃবৃন্দ আপনাদিগকে ও সঙ্গে সঙ্গে পরকে আনন্দ-দানের নিমিত্ত এবং অভিনয় করিতেছি জানিয়া অভিনয় করেন, তখনই তাহা প্রকৃত "অভিনয়" বলিয়া গণ্য হয়। আর যখন এরূপ চরিত্রানুকরণের উদ্দেশ্য বিমল আনন্দ অথবা শুধুই অভিনয় না হইয়া কোনরূপ সূক্ষ্ম দৈব-ফলাদি হইয়া থাকে, তখন তাহাকে "যাজ্ঞিক অনুকরণ" বলা যাইতে পারে। অভিনয়ের খাতিরে অভিনয় একের উদ্দেশ্য, অদৃষ্ট ফলের খাতিরে অভিনয় অন্যের উদ্দেশ্য। দুইটি পরস্পর এক সূত্রে সংবদ্ধ হইলেও একটি অন্যটি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বৈদিক "মহাব্রত" যজ্ঞানুষ্ঠানে আমরা দৃশ্যকাব্যের যথেষ্ট উপাদান পাইতে পারি। শ্বেতবর্ণ গোলাকৃতি চর্ম্মখণ্ড লইয়া বৈশ্য ও শূদ্রের বিবাদ এবং অবশেষে বৈশ্যের জয়—ইহাই মহাব্রতের মূল ঘটনা। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে এইরূপ আরও বহু অভিনয়ানুকূল অবস্থার (dramatic situation) আভাষ পাওয়া যায়। মহাব্রতের এই ঘটনা রূপকমাত্র। আর্য্যবংশ-সম্ভূত, অতএব গৌরবর্ণ, বৈশ্যের সহিত অনার্য্য, অতএব কৃষ্ণবর্ণ, শূদ্রের বিবাদ—আর আলোকের সহিত অন্ধকারের, গ্রীষ্মের সহিত শিশিরের সংঘর্ষ, একই নহে কি? শুধু ইহাই নহে; ইহার আনুষঙ্গিকভাবে এক ব্রহ্মচারী ও এক গণিকার পরস্পর অকথ্য ভাষায় গালাগালিও বর্ণিত আছে। প্রাচীনকালে এতদুভয়ের সম্মিলনও প্রদর্শিত হইত,—পরের যুগে অশ্লীল বলিয়া উহা পরিত্যক্ত হয়। ইহার অনুরূপ ঘটনা অশ্বমেধে দৃষ্ট হয়। প্রধানা রাজমহিষী পুত্রলাভাশায় ছিন্নশির অশ্বের সহিত মিলিত হইতে বাধ্য হ'ন। এগুলি "উর্ব্বরতাসাধক অনুষ্ঠানের" রূপকমাত্র। ইহাদিগকে দৃশ্যকাব্যের উপাদান বলা চলে, কিন্তু পুরামাত্রায় দৃশ্যকাব্য বলা চলে না। ইহার আরও কারণ আছে। যজুর্ব্বেদে নানাজাতীয় পেশা ও পেশাদারের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, অথচ "নট" কথাটির বা নটের ব্যবসায়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পুরাদস্তুর অভিনয় তখন বর্ত্তমান ছিল, কিরূপে বলা চলে?

পক্ষান্তরে যজুর্ব্বেদে "শৈলূষ" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়

(৪) Sanskrit Drama—pp. 17—20.

বলিয়া (৫) অধ্যাপক Hillebrandt এ সকলকে প্রকৃত ধর্ম্মবিষয়ক দৃশ্যকাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অধ্যাপক ভট্ট শৈলকণের (Steu Konow) মতও এইরূপ; পরন্তু তিনি বলেন যে ইহাদের উপাদান তৎকালে প্রচলিত লৌকিক নির্ব্বাক্ আঙ্গিক অভিনয় (popular mime) হইতে গৃহীত। পরস্পর কথোপকথন, গালাগালি, মারপিট, নৃত্য, গীত ও বাদ্য এ সমস্তই এই লৌকিক অভিনয়ের অঙ্গীভূত ছিল; এবং শেষের তিনটিকে কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (৬) "কলা" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। পারস্কর গৃহ্যসূত্রে (৭) উহা প্রধান তিন বর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। জগতের কোন দেশেই লৌকিক নির্ব্বাক্ অভিনয় ধর্ম্মবিষয়ক অভিনয় অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। সুতরাং Hillebrandt-এর মত বরং গ্রাহ্য হইলেও Konow-এর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য হওয়াই উচিত।

বৈদিক সাহিত্যমধ্যে দৃশ্যকাব্যের অন্যান্য উপাদানগুলির অস্তিত্বও উপলব্ধি করা যায়। তাহার মধ্যে সামবেদে গীত ও যাজ্ঞিক নৃত্যের কথা সর্ব্বাগ্রে করণীয়। মহাব্রতে বৃষ্টি উৎপাদনের জন্য অগ্নির চারিদিকে কুমারীগণের নৃত্য, বিবাহোৎসবে সধবা গৃহিণীগণের বরবধূর সৌভাগ্যোৎপাদক নৃত্য—মৃত্যুর পরে আধার মধ্যে মৃতের শেষ স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে শোকনৃত্য—প্রভৃতি নানাবিধ নৃত্যপ্রয়োগের কথা প্রাচীন সাহিত্যে দৃষ্ট হয়। ভারতীয় রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার সহিত নৃত্যের অতি নিগূঢ় সম্পর্ক; আবার শিব অথবা বিষ্ণু-কৃষ্ণোপাসনায় নৃত্য একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য। অধ্যাপক Oldenberg এইজন্যই ধর্ম্ম-নৃত্যকেই দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির মূল বলিয়াছেন। ক্রমশঃ ইহার সহিত নির্ব্বাক্ অঙ্গসঞ্চালনের সংযোগ; পরে সঙ্গীতের মিশ্রণ, অবশেষে কথোপকথন—এইরূপে পূর্ব্বাদস্তুর দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি (৮)।

অধ্যাপক শ্রীপাদকৃষ্ণ বিল্বাবলিকর (S K. Belvalkar) বলেন যে, বৈদিকযুগে যে ধর্ম্মবিষয়ক দৃশ্যকাব্যের উপাদান যথেষ্ট ছিল, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক Winternitz যাহা বলিয়াছেন, তাহাও বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। "Some of the dialogue hymns are ballads.. others are remnants of a narrative .....; while still others are speeches that belonged to a ritualistic drama." (৯) অর্থাৎ "সংবাদ-সূক্তগুলির মধ্যে কোনটি বা চারণগীতি, কোনটি বা টানা গল্প, আবার কোনটি বা যাজ্ঞিক দৃশ্যকাব্যের কথোপকথনাংশ।" ইঁহার মত চতুরতার সহিত কার্য্যোদ্ধার করিতে আর কোন পণ্ডিতই পারেন নাই।

এই সুবিস্তৃত আলোচনার পর ইহাই একবাক্যে স্বীকার করিতে হয় যে, ভরত-নাট্যশাস্ত্রে যে কাহিনী পাওয়া যায়, তাহা শুধুই উপকথা নহে। নাট্যশাস্ত্র বেদ-বহির্ভূত নহে, পরন্তু ভারতীয় দৃশ্যকাব্যের মূল উপাদানগুলি সমস্তই বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগৃহীত—ইহাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইল। ইহার পর, মেক্সিকোতে যেরূপ যাজ্ঞিক দৃশ্যকাব্যের প্রচলন ছিল, ভারতেও তদনুরূপ কিছু ছিল—এরূপ অনুমানে বিশেষ কোন হানি হইবে না। তবে পার্থক্য এই যে, মেক্সিকো দেশে যাজ্ঞিক অভিনয়ে কেবল দৃশ্যকাব্যের উপাদানই ছিল—আর ভারতের পারিপ্লব সংবাদসূক্ত দৃশ্য ও শ্রব্য—উভয়বিধ কাব্যেরই উৎপত্তির হেতু বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

(৫) বা সং ৩০।৪; তৈ ব্রা ৩।৪।২

(৬) কৌ ব্রা ২৯।৫

(৭) পা. গৃ সূ. ২।৭।৩

(৮) শকুন্তলায় নাট্যকলা, পৃঃ ১৩২।

(৯) Clcutta Review, May 1922, p. 195.

চরে বসতি

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গুহ বি-সি-এস্

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য অর্থকে সকল অনর্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিলেও, এই কঠিন সংসারে অর্থের অভাবও যে অনেক অনর্থের মূল, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "অন্নচিন্তা চমৎকারা" রূপে ধারণ করিয়া অমরকবি কালিদাস প্রমুখ অনেক মনস্বী লেখকের ও ভাবুকের কবিতার ও ভাবের স্রোতে ভাটা পড়াইয়া দেয়; বিশেষতঃ, বর্ত্তমান যুগে অন্নাভাব না কি সভ্যজগতে পাপের মধ্যেই পরিগণিত। ভারতবর্ষের ধর্ম্মপ্রবণ প্রাচীন সভ্যতা দারিদ্র্যদোষকে পাপ বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলেও, ইহা যে প্রভূত গুণরাশির ধ্বংসকারী, তাহা অনেক চিন্তাশীল বহুদর্শী ব্যক্তিই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান কালেও দেখিতেছি, ভারত-গৌরব ঋষিকল্প স্যার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয়ও তাঁহার সমগ্র শক্তি ও উদ্যম দেশের দারিদ্র্য নিবারণ কল্পেই ব্যয় করিতেছেন। সুতরাং দেশের এই দুর্দ্দিনে অর্থাগমের কোনও নূতন উপায় নির্দ্দেশক প্রস্তাব বর্ত্তমান কালের অনুপযোগী বলিয়া বিবেচিত না হইতেও পারে। পাঠক পাঠিকাগণ এ কথা শুনিয়া মনে করিবেন না যে, এই প্রবন্ধে তাঁহারা এমন কিছু "সোণার কাঠির" সন্ধান পাইবেন, যাহার স্পর্শে দারিদ্র্য রাক্ষসী দেশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইবে এবং স্বপ্নসম্ভব রাজপুরীতে স্বচ্ছন্দতা বিরাজ করিবে তথাপি এই প্রবন্ধ পাঠান্তে এক ব্যক্তির মনেও যদি ইহার লক্ষ্যীভূত বিষয়ের জন্য কিঞ্চিন্মাত্র অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

অনেকেই অবগত আছেন যে পদ্মা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি বড় বড় নদীর অংশবিশেষ কালক্রমে শুষ্ক হইয়া ছোট বড় অনেক চরের উৎপাদন করে; প্রথম অবস্থায় এই সব চর প্রায়ই সাধারণ মনুষ্যবাসের অনুপযোগী থাকে এবং ইহাতে এক প্রকার ঘাস (ইহা পূর্ব্ববঙ্গে "খাইলা" ঘাস বলিয়া পরিচিত) জন্মে; চরের মালিকগণ এই সব ঘাস দিয়াও যথেষ্ট লাভবান হয়েন। ২।৪ বৎসর পরে এই সব চরে লোকের বসতি হইতে আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ অতিশয় সাহসী ও বলবান লোকসমূহই প্রথম

প্রথম এখানে বাস করিতে আরম্ভ করে। জমিদারেরাও এই সব লোককে তাঁহাদের প্রবল প্রতিপক্ষের কবল হইতে চর দখল করিবার জন্য পছন্দ করিয়া থাকেন। উক্ত অধিবাসিগণও এই হেতুতে বিনা খাজনায় কিম্বা নামমাত্র খাজনায় চরের জমি ভোগ করিয়া থাকে। চরের অধিবাসীর মধ্যে শতকরা নব্বইজন মুসলমান এবং অবশিষ্ট দশজন নমঃশূদ্র প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা একরূপ নাই বলিলেই হয়। ছেলেবেলায় কোনও এক যাত্রার দলে "প্রহ্লাদ চরিত্রের" অভিনয়ে শুনিয়াছিলাম, প্রহ্লাদের গুণধর গুরুমহাশয় তারস্বরে তাহাকে শিখাইতেছিলেন যে "লিখিবে পড়িবে মরিবে দুঃখে, মৎস্য ধরিবে খাইবে সুখে" ; চরের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রাও যেন এই নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই মনে হয়। চরের উর্ব্বরা ভূমিতে যথেষ্ট শস্য উৎপাদন করিয়া, নদী হইতে টাট্‌কা মাছ ধরিয়া, এবং পরিপুষ্ট গাভীসমূহের নির্জ্জলা খাঁটী দুগ্ধ পান করিয়া ইহারা সুস্থ সবল দেহেই জীবন যাপন করে। জমিদারে জমিদারে লড়াই বাধিলেই ইহাদের সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হয়। তখন ইহারা অত্যধিক মূল্য আদায় করিয়া কোনও এক জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করে এবং লাঠালাঠি ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া অনেক সময় নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে। নূতন চরের ইতিহাস এরূপ অনেক রক্তপাতে রঞ্জিত। আদালতে মামলা করাও চরের অধিবাসীদের জীবনে নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। মোকদ্দমাপ্রিয়তা যে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা কোনও একজন চরের অধিবাসীর জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট অনুভূত হইবে। চরের স্বাভাবিক উর্ব্বরতা বশতঃ ও নিজ পরিশ্রমগুণে সে যথেষ্ট উপার্জ্জন করে সত্য, কিন্তু শিক্ষার অভাবে অতি সামান্য কারণেই প্রতিবেশীর সহিত মামলা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং উকীল, মোক্তার তদ্বিরকার ও পেয়াদা প্রভৃতি আদালত সংশ্লিষ্ট প্রাণীসমূহের খোরাক জোগাইতেই সমস্ত নিঃশেষ করিয়া বসে। পরে সেই পতিত পাবন "সাইলকের" জাতভাই হৃদয়হীন কুসীদজীবীর নিকট অত্যধিক হারে সুদ দিবার অঙ্গীকারে ঋণ গ্রহণ করে ; এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ পরিণামে সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখন পুত্র পরিবার প্রভৃতি লইয়া সে হয় ত কোনও সুবিধাজনক নূতন চরে পলায়ন করে, নতুবা আজীবন কষ্ট ভোগ করিয়া উক্ত মহাজনদিগের উদরপূর্ত্তি করে। ইহার প্রতীকারের কথা এখন কিছু বলা দরকার। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, চরের জমি সাধারণতঃ উর্ব্বরা। তাহার একটী কারণ এই যে, প্রতি বৎসর নদীর পলী দ্বারা এই সব জমি পুষ্ট হয় এবং সূর্য্যালোক ও উত্তাপ যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। এই সব উর্ব্বরা জমিতে শস্যাদি "আস্‌লি" (চর হইতে বিভিন্নতা বুঝাইবার জন্য এতদ্দেশে "আস্‌লি" শব্দের প্রয়োগ হয়) জমি অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যায়। উন্নত কৃষিপদ্ধতির প্রচলন করিতে পারিলে, "আস্‌লী" জমি অপেক্ষা যে চরের জমিতে চতুর্গুণ বেশী শস্য পাওয়া যাইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এখন কথা এই যে, এই উন্নততর কৃষি-প্রণালী কে প্রবর্ত্তন করিবে? বর্ত্তমানে যে সমস্ত লোক চরে বাস করিতেছে, তাহাদের দ্বারা ইহা অসম্ভব ; কারণ, তাহারা নিরক্ষর,—নিজেদের চর ও আদালত-গৃহ, উকীল, মোক্তার এবং জমিদারের নায়েব প্রভৃতি ব্যতীত পৃথিবীতে যে অন্য কিছুর অস্তিত্ব আছে, তাহাই বোধ করি তাহারা অবগত নহে। আমাদের শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি যদি এদিকে আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা যদি ২০।২৫৲ টাকা বেতনের কেরাণীগিরির মায়া পরিত্যাগ করিয়া অথবা ভবিষ্যতে রাসবিহারী ঘোষ কিম্বা লর্ড সিংহ হইবার আশায় প্রলুব্ধ হইয়া ব্যবহারাজীবের সংখ্যা বর্দ্ধিত না করিয়া, এইসব চরের মাটী হইতে সোণা ফলাইবার চেষ্টায় বদ্ধ-পরিকর হয়েন, তবে এই দরিদ্র দেশে যে ধনাগমের একটী প্রকৃষ্ট উপায়ের উদ্ভব হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই চরগুলির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হয়। যাঁহারা কখনও পূর্ব্ব কিম্বা উত্তরবঙ্গে অবস্থান কালে এই সকল চরের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা কখনই ইহাদের মনোরম দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন না। খরস্রোতা তরঙ্গসঙ্কুলা স্রোতস্বিনীর তীরে বালুকাপূর্ণ ধবলাকৃতি চরসমূহের দৃশ্য অতীব মনোরম বলিয়াই মনে হয়। জল-যানে আরোহণ করিয়া দিগন্তব্যাপী সলিলরাশি অতিক্রম করিবার সময় উক্ত চরসমূহ বেশ এক মনোরম আশ্রয়ের ধারণা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া থাকে ; ও তখন স্বভাবতঃই চরের অধিবাসীদের গ্রাম্য জীবনের একটী সুন্দর ছবি কল্পনানেত্রে সমুদিত হয়। বিশ্ববিখ্যাত কবিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কবিতাতেও ইহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। চরসমূহ স্বভাবতঃ বেশ স্বাস্থ্যকর। নির্ম্মল উন্মুক্ত বায়ু এবং অকৃত্রিম খাদ্য যদি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হয়, তবে চরে বসতি যে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি-বিধায়ক হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। নষ্ট স্বাস্থ্য উদ্ধার মানসে আমার জনৈক বন্ধু মধুপুরী, দেওঘর ও দার্জ্জিলিং প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়াও যত উপকার প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি পদ্মার চরের স্থানে স্থানে কিছুদিন যাপন করিয়া তদপেক্ষা অনেক বেশী উপকার পাইয়াছিলেন। এই ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বঙ্গদেশে ইহা সামান্য সুবিধার কথা নহে। কিন্তু কি রকম আমাদের চির মজ্জাগত অভ্যাসের দোষ,—ম্যালেরিয়াতে গ্রাম উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, সেখানেও এক ইঞ্চি জায়গার জন্য হাইকোর্ট পর্য্যন্ত লড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইব, তথাপি প্রকৃতি-প্রদত্ত নির্ম্মল উন্মুক্ত বায়ুতে বিস্তৃত ভূমি লইয়া বসবাস করিতে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কারণ, ইহা নূতন ব্যাপার বলিয়া কিছু মনের বলের প্রয়োজন। কারণ স্বতঃই আশঙ্কা হইতে পারে মুসলমান নমঃশূদ্র অধ্যুষিত চরে কি ভদ্রলোক বাস করিতে পারে ? যাঁহারা মনে করেন, এক দিনও মুসলমান কিম্বা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর ঘরে (যাহারাই প্রকৃতপক্ষে দেশের মজ্জা এবং চৌদ্দ আনা অধিবাসী) বাস করিলেই কিম্বা তাহাদের স্পৃষ্ট জলে কোনও কাজ করিলেই জাতি যাইবে এবং নিরয়গামী হইতে হইবে, তাহাদের জন্য এ প্রস্তাব নহে ; কারণ, চরে বাস করিতে গেলে জাত্‌টা একটু টনক্ (শক্ত) হওয়া দরকার এবং not touchism religion টা (অর্থাৎ "ছুঁৎমার্গ ধর্ম্ম- ছুঁলেই জাতিধর্ম্ম নষ্ট হইবে এই ভাবেরই ধর্ম্ম") পরিত্যাগ করিতে হইবে। যাঁহারা উদার মত পোষণ করেন এবং জাতি যাবার আশঙ্কাতে সন্ত্রস্ত নহেন, তাঁহারা যদি দলবদ্ধ হইয়া সুবিধামত চরে বাস করিয়া সেখানকার অধিবাসীদিগকে একটু শিক্ষিত করেন এবং উন্নততর

কৃষিপদ্ধতির প্রচলন পূর্ব্বক বর্ত্তমান কালোপযোগী বাণিজ্যের নিয়মাদি অবলম্বন করেন, তবে চরেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং নিজেরাও বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন। যদি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের এ দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তবে কালক্রমে উক্ত চরাদি স্থানে স্কুল, হাসপাতাল লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপিত হইতে পারে; এবং যে চরের নাম করিলে লোকের মনে এই ধারণা হয় যে, সেখানে শুধু মারামারি এবং কাটাকাটি হইয়া থাকে, সেই স্থানই সময়ে ভদ্রলোকের বাসোপযোগী ভূখণ্ডে পরিণত হইতে পারে; এবং নিরন্ন বঙ্গবাসীর একটা আশার স্থল হইতে পারে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে রাজকার্য্যোপলক্ষে চিকন্দি (ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধ স্থান) প্রবাস কালে শুনিয়াছিলাম, কয়েকটী শিক্ষিত উৎসাহী যুবক নাকি চরে বাস করিবার জন্ত উত্তোগী হইয়া অনেক জমি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কি ফল হইয়াছে, বলিতে পারি না;…জানি না বাঙ্গালীর মজ্জাগত হুজুগপ্রিয়তাতেই তাঁহাদের উৎসাহ পর্য্যবসিত হইয়াছে কি না।

বোধন-বাণী

শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্‌সি

হে জগৎ,
তোমার সাক্ষাতে আজ করিব স্বীকার—
"দীনাহীনা জন্মভূমি জননী আমার।"
বলি বলি করিয়াছি ফুটে নাই মুখ,
স্বীকার করিতে যে গো ভেঙে যায় বুক—
"অতীত গৌরবময়ী জননী আমার
জগতের অধিরাণী নহ তুমি আর।"
জননি জনমভূমি! তোমারি সন্তান
আমরা জীবিত, তবু হয় অপমান।
আশ্চর্য্য! তবুও গর্ব করি মোরা কত
"মানুষ আমরা!"—লাজে মাথা হয় নত।
আমরা মানুষ বটে!—গভীর ব্যথায়
ভূমিতে লুটায়ে যবে কাঁদ হায় হায়—
আমরা কবির দল, গাহি প্রেমগান
গড়িয়া ফুলের বীণা কুসুমবিতান!
কোথায় নিভৃত কুঞ্জে গাহিছে মদন
কোথা দিয়ে বহে যায় মলয় পবন—
দুখিনী জননী, তোরে না দিয়া সান্ত্বনা
খুঁজিয়া বেড়াই তাহা, নাহিক চেতনা।
অবোধ শিশুও চেনে নিজ জননীরে,
আমরা কবির দল, চিনি না তোমারে।
আমরা চলেছি ভেসে কল্পনার রথে—
মধুপ বসন্ত আর মলয়ের সাথে।

থাম গো, থাম গো কবি, গাহিছ কি গান
বিলাসের লাস্যবীণে তুলিতেছ তান?
কাঁদিছে জননী হেথা বিষণ্ণ বদনে
ফিরিয়া না দেখি তাহা, আপনার মনে
ভ্রমিতেছ মদনের পুষ্পবাণ হাতে,
লালসার পঙ্ক মধ্যে চাহিছ ডুবাতে
পবিত্র দেশেরে মোর?—আশ্চর্য্য প্রয়াস!
সাধ করে' নিজ গলে নিজে দাও ফাঁস?
যে দেশে লাগিয়া আছে নিত্য হাহাকার—
যে দেশে হাজার লোক পায় না আহার—
যে দেশের নিত্যসাক্ষী রোগ শোক মারী
যে দেশে অন্নের তরে চলে কাড়াকাড়ি—
যে দেশ ডুবিয়া আছে অধীনতা মাঝে
সে দেশে প্রেমের গান কেমনে বা সাজে?

থামাও, থামাও কবি, লালসার তান!
দেশের দারিদ্র্য দেখি কাঁদে না পরাণ?
শুধুই নিজেরে লয়ে কাটাতেছ দিন
না বুঝি নিজেরে নিজে করিতেছ হীন।
স্বর্গ হতে বীণাপাণি আপনার বীণা
দিলেন তোমারে সঁপে, নাহি বিবেচনা?
কোথায় বাজাবে তাতে উদাত্ত মধুর
দেশের উন্নতিকল্পে কল্যাণের সুর—

কোথায় উদাত্তসুরে মাঙ্গলিক গান
গাহিয়া জাগাবে দেশে মুমুর্ষু পরাণ,
তা না করি মত্তপ্রায় ডাকিছ বিনাশে
গাহিয়া প্রেমের গান এ দরিদ্র দেশে!!
ভুলেছ কি নিজ দেশে? নাহি কি স্মরণ
একমুষ্টি অন্নতরে কাঁদে অনুক্ষণ
তোমারি আপন ভাই? তুমি কি না কবি,
লালসার তুলি হাতে পঙ্কময় ছবি
আঁকিছ, লাগে না লাজ, গাহ তাই গান
বিনাশের অগ্রদূত বিলাসের তান!
ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও—যাক্ রসাতলে
লালসার চিত্রলেখা; সাগরের জলে
ভাসায়ে দিয়ে ও বীণা শুদ্ধ হয়ে আজ
গাহিয়া উঠ গো পুনঃ হে প্রিয় সমাজ—
"জননি মহিমময়ি, করিতেছি পণ
আবার জগৎমাঝে তব সিংহাসন
প্রতিষ্ঠা করিব মোরা, ভুলিব না আর
তোমার দুখের কথা। জননী আমার!
বাজিবে দিবসরাতে আমার হিয়ায়
দুখের কাহিনী তব, বৃথা হায় হায়
করিব না, করিব না—করে যাব কাজ
ঘুচাতে তোমার দুঃখ;—করিলাম আজ
কঠোর প্রতিজ্ঞা এই; মনে দাও বল—
করিতে পারি গো যেন দেশের মঙ্গল।"

টাকার কথা

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায়

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত এই পুস্তকখানি যেমন সময়োপযোগী তেমনই উপাদেয়। গ্রন্থকর্ত্তা ধনবিজ্ঞান সম্পর্কীয় অনেক জটিল বিষয় অতি সরল ও সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ইনি অর্থনীতিশাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়াছেন। আজকাল যে সব প্রশ্ন সর্ব্বদাই আলোচিত হইতেছে…যথা দ্বিধাতু পরিমাণ (Bimetallism), বিনিময় হার (exchange rote), ধার (credit), গোল্ড্ ষ্ট্যাণ্ডার্ড রিজার্ভ ফণ্ড, পেপার কারেন্সি রিজার্ভ ফণ্ড, কাউন্সিল্ বিল্, রিভার্স কাউন্সিল্ বিল্… ইত্যাদি বিষয় অতি সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমি যতদূর জানি, এ প্রকার পুস্তিকা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। বাংলাদেশের একটী বিশেষত্ব এই—যাঁহারা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত যেমন তিলি, সাহা, গন্ধবণিক্, কাপালী প্রভৃতি সম্প্রদায়…তাঁহারা প্রায়ই ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ। এখন ইচ্ছা করিলে এই পুস্তক হইতে তাঁহারা যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থশাস্ত্রের বাঙ্গালী ছাত্রগণও ইহা হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইবেন। গ্রন্থকর্ত্তা মাতৃভাষায় এই অভিনব জিনিস সৃষ্টি করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আশা করি, তিনি এই বিষয় লইয়া আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিবেন, এবং তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আরও মূল্যবান গ্রন্থ তাঁহার লেখনীপ্রসূত হইবে।*

* 'টাকার কথা'…শ্রীনরেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত; মূল্য এক টাকা মাত্র।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া

শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্‌-এম্‌-এস্‌

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কি ?

"ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" কথাটি ইংরাজী। ইহার অর্থ, পরিপাক-কৃচ্ছ্রতা—কষ্টে পরিপাক।

ইহার ঠিক্‌ বাঙ্গালা কি, তাহা বলা শক্ত। মোটামুটি ভাবে—এ দেশের "অম্বলের ব্যারাম" ও "অজীর্ণ" রোগকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরিলেও, অনেক সময়ে "সূতিকা" ও ক্ষয়-রোগজনিত "গ্রহণী" (টিউবারকুলার ডায়ারিয়া) এবং সাধারণ ক্ষয়কাশের অবস্থা-বিশেষও এই "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" নামে চলিয়া যায়! এই জন্য যাঁহার তথাকথিত "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" হইয়াছে, তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য—বড় ব্যারাম-গুলিকে বাদ দেওয়া যায় কি না তদ্বিষয়ে কৃত-নিশ্চয় হওয়া। অর্থাৎ, দীর্ঘসূত্রিতা না করিয়া বা গতানুগতিক পথে না চলিয়া, ক্ষয়ের কোনও বীজ ভিতরে উপ্ত হইতে কি না, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ডাক্তারি মতে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া স্থূলতঃ তিন প্রকারের; যথা—(১) তরুণ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া—যাহাকে "বদ্‌হজম" বলে; এক আধ দিনের খাওয়ার অত্যাচারে ইহা হয় এবং সাবধান হইলে ইহা সারিয়া যায়। (২) পুরাতন (ক্রনিক) ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। (৩) স্নায়বিক বা নার্ভাস্‌ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। ইংরাজীতে ইহাকে নিউরোসেস্‌ অফ্‌ দি ষ্টম্যাকও বলে। আমাদের দেহের যে কোনও যন্ত্রের বিকৃতি ঘটিলে, সুধু সেই যন্ত্রেই উহার কল ফলে না—সারাদেহের সমস্ত সূক্ষ্মাংশও আত্মীয়তার-সূত্রে দেহের প্রত্যেক অংশের সঙ্গে বাঁধা আছে। এই জন্য, পেটের ডানদিকের নিম্নভাগের অ্যাপেন্‌ডিক্‌সে, বা ডানদিকের উপরভাগে পিত্তকোষে (গল-ব্ল্যাডারে) কোনও গোলযোগ ঘটিলে, বমন, অক্ষুধা, অজীর্ণ প্রভৃতি দেখা দেয়। আবার পরিপাক-যন্ত্রের সম্পূর্ণ বাহিরে স্থিত বৃক্ক-গ্রন্থিতে (কিড্‌নীতে) কোনও উত্তেজনার কারণ হইলে—যেমন পাথরীর বেদনা (রিনাল্‌-কলিক্‌)—অথবা জরায়ুতে কোনও বিপত্তির স্থলে—ক্ষুধানাশ, অজীর্ণ, বমন বা বিবমিষা উপস্থিত হয়। হিষ্টিরিয়া ব্যাধিতে, রক্তে ক্ষারের অংশ কমিয়া যাইলে (যাহাকে ইংরাজীতে অ্যাসিডোসিস্‌ কহে), চক্ষের দোষ থাকিলে, মৃগী ব্যাধিতে, আধকপালে ব্যারামে (মিগ্রেণে), ভয় পাইলে বা মন্দ ঘটনা ঘটিলে, বা অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়-সেবন করিলে বা অপর কারণে শুক্রক্ষয় ঘটিলে—প্রভৃতি নানা রকম অবস্থায় পরিপাক-ক্রিয়ার যে বিকৃতি আসে, সে সবগুলিই এই পর্য্যায়ভুক্ত। এক কথায়, তাবৎ দেহের যে কোনও যন্ত্রের বিকৃতির ফলে সমবেদনা-সূত্রে যে অজীর্ণ উপস্থিত হয়, তাহাকেই স্নায়বিক ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বলে।

এই খানে ইহাও বলা প্রসাঙ্গিক হইবে যে, (১) মধুমেহ (ডায়াবিটিজ্‌), (২) বাত (গাউট ও রিউম্যাটিজম্‌), (৩) হাঁপানি (ব্রঙ্কিয়াল্‌ অ্যাজ্‌মা), (৪) স্থূলতা (ওবিসিটি)—এই বিভিন্ন জাতীয় ব্যাধিগুলি ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার গোষ্ঠিভুক্ত। অর্থাৎ ডিস্‌পেপসিয়া যেমন অধিকাংশ স্থলেই আহারের দোষে হয়, উপর্য্যুক্ত ব্যাধিগুলিও তাই।

পরিপাক-ক্রিয়া

নিতান্ত নীরস হইলেও, এইখানে কিঞ্চিৎ দেহতত্ত্বের আলোচনা করা অনিবার্য্য বোধ হইতেছে। সেই জন্য, অতি সংক্ষেপে, দেহের যে যে যন্ত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে পরিপাক-কার্য্যের সহায়ক বা পোষক, সেই গুলির বিবরণ দিলাম। যাঁহারা এ সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিতে চাহেন, এবং ছবির সাহায্যে এই তথ্যগুলি বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, তাঁহারা মৎপ্রণীত "ম্যাট্রিকুলেশন হাইজীন" (দ্বিতীয় সংস্করণ) নামক তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

মুখগহ্বরে দুই পাটিতে বত্রিশটি দাঁত আছে। তন্মধ্যে কষের দিকের পেষণকারী দাঁতগুলিই আমাদিগের পক্ষে বিশেষরূপে প্রয়োজনীয়। মুখের মধ্যে যে জিহ্বা আছে, উহার

কায দুইটি। উহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য—খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা; খাদ্যের স্বাদ যে পরিমাণে হৃদ্য হইবে, সেই পরিমাণে মুখের মধ্যে লালা নিঃসরণ হইবে। জিহ্বার দ্বিতীয় কায—খাদ্যদ্রব্যটিকে মুখের ভিতরে নাড়া-চাড়া করা, ওলোট-পালোট করা। এই প্রসঙ্গে লালার কথা বলিয়া রাখি। মুখের লালার উদ্দেশ্য দুইটি; প্রথম উদ্দেশ্য, খাদ্যদ্রব্যকে নরম করা; দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, খাদ্যের মধ্যে শালিজাতীয় খাদ্যকে কতকটা পরিপাক করা। শালি জাতীয় বলিলে—ধান ও ধান্য-জাত সকল খাদ্য, তরী-তরকারী, ফলমূল, কন্দ, মিষ্টরস ও মিষ্টান্ন, সাগু, বার্লি, এরোরুট, শঠি প্রভৃতিকে বুঝায়। আমাদের দেশে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই শালিজাতীয় খাদ্যই প্রধান। অতএব আমাদের পক্ষে মুখের লালার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যে কত, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা যে-কিছু শালিজাতীয় খাদ্য খাই না কেন, উহারা ক্রমশঃ "মল্টোজ" নামক মিষ্টরসে পরিণত হইলে তবে রক্তে শোষিত হইতে পারে। লালার কার্য্যই শালিজাতীয় খাদ্যকে ক্রমশঃ মিষ্টরসে পরিণত করা। যদি কেহ এক গ্রাস ভাত লইয়া মুখের মধ্যে তাহাকে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া চিবাইতে থাকেন, তবে দেখিবেন যে ভাতের স্বাদ ক্রমশঃই মিষ্ট হইতেছে—এবং চর্ব্বণ করিতে করিতে উহা প্রায় ঘনরসের আকারে পরিণত হইয়া হঠাৎ গলার নিম্নে নামিয়া যায়। এই খানে পাঠকগণকে দুইটি অত্যাবশ্যক কথা স্মরণ রাখিতে বলি; প্রথমটি এই যে, মুখে যে পরিপাক-ক্রিয়া আরব্ধ হয়, সেই কার্য্যটি যদি অসম্পূর্ণ বা অবহেলার ভাবে সম্পাদিত হয়, তবে, পর-পর সমস্ত পাক-ক্রিয়াই অসম্পূর্ণ ও অবহেলার ভাবে সম্পাদিত হইবে। এবং দ্বিতীয় কথাটি এই যে, মুখে খাদ্য দ্রব্যটির যত স্বাদ গৃহীত হইতে থাকিবে, সেই পরিমাণে, এবং ততক্ষণ, পাকস্থলীতে পাকাশয়িক রস (গ্যাষ্ট্রিক যুষ) নিঃসৃত হইতে থাকিবে। কাযেই, মুখের মধ্যে খাদ্য দ্রব্যটির যথাযথ চর্ব্বণ ও যথেষ্ট পরিমাণে লালার সহিত মিশ্রণ, সুচারুরূপে পরিপাক হওয়ার পক্ষে একমাত্র উপায়।

তাহার পরে পাকস্থলী। ইহা মাংসপেশী দ্বারা আবৃত অর্থাৎ রবারের মত টানিলে ইহার খোল বাড়ান যায়; এবং ইহার কার্য্য, খাবারটিকে লইয়া রীতিমত ময়দাঠাসার মত দলন করা। রবারকে যেমন প্রত্যহ বেশী বেশী টানিলে অথবা এক দিন অতিমাত্রায় টানিলে উহার স্থিতি-স্থাপকতার হানি হয়, তেমনি, নিত্য বেশী (পরিমাণে) খাইলে—অথবা পান করিলে—ক্রমশঃ পেটের খোলটি বাড়িয়া যায়; তাহার ফলে, পাকস্থলীর দুইটি ক্ষতি হয়। গর্ভাবস্থায় পেটের উপরের চর্ম্মের উপরে অতিমাত্রায় টান ধরায় চামড়ায় যে-যে ফাট ধরে সেগুলি জন্মে আর যায় না; এবং সেই গুলির জন্য ছেলেপিলের মায়েদের তলপেটের চামড়াটি চিরকালের মত ঢিলা হয়। নিত্য অতি-ভোজনের ফলেও, পাকস্থলীর গায়ের মাংসগুলি কতক-কতক ছিঁড়িয়া যায়। তাহার ফলে, পাকস্থলীর খাদ্যদ্রব্যকে চটকাইবার ক্ষমতা ত কমেই, পরন্তু পাকস্থলীটি নিজের খাদ্য-ভার লইয়া নড়িতে অনেকটা অক্ষম হয়। ইহার ফল খুব খারাপ। প্রথম ফল, খাবারগুলি অনেকক্ষণ ধরিয়া পাকস্থলীর মধ্যে থাকিতে বাধ্য হয় বলিয়া, পচিতে থাকে; সকালে খোল-মাখান বিচালীতে জল বা ফেন মিশাইয়া রাখিলে, বৈকালে তাহা পচিয়া উঠে; এ বেলার ভাতে জল দিয়া রাখিলে, ওবেলা "আমানি" হয়। পাকস্থলীর মধ্যেও খাদ্যগুলি পচিয়া কতকগুলি গ্যাস (বায়ু) ও কতকগুলি কটু অম্লের সৃষ্টি করে। এবং যদি মাংস, ডিম, মাছ, দুধ, ছানা প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্যাংশ থাকে, তবে সেই-সেই খাদ্যের অ্যাল্‌ব্যুমেনের (বা অণ্ডলালা জাতীয় খাদ্যের) সঙ্গে পাকস্থলীর গাত্র হইতে স্রুত পেপসিন মিশিয়া টক্‌স্‌-অ্যাল্‌ব্যুমেন নামক বিষময় পদার্থ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় ফল, পাকস্থলীর গাত্রের মাংসগুলি ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ায়, তাহারা আর ভুক্তান্নকে তেমন চটকাইয়া দলিয়া তরলাকারে পরিণত করিতে পারে না। আমরা এ যাবৎ পাকস্থলীর বহিরাবরণ মাংসপেশীর কথাই বলিয়াছি। কিন্তু পাকস্থলীর ভিতরে যে সুকোমল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (বা মিউকাস্ মেম্‌-ব্রেণ) আছে, তাহার উল্লেখও করি নাই। মুখে যে পরিমাণে ক্ষারধর্ম্মী (অ্যাল্‌ক্যালাইন্) লালা নিঃসৃত হয়, এবং যে পরিমাণে রসনা খাদ্যের আস্বাদ-সুখ অনুভব করে, তাহারই অনুপাতে, পাকস্থলীর ভিতর-গাত্রস্থ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির পাকাশয়িক রস স্রুত হয়। পাকাশয়ের রস অম্ল-ধর্ম্মী (অ্যাসিড)। ইহার উপাদান তিনটি;—(১) হাইড্রো-ক্লোরিক্ অ্যাসিড নামক খনিজ অম্ল; (২) পেপসিন্; (৩)

রেনীন্—ইহার কার্য্য তরল দুধকে দধি বা ছানায় পরিণত করা। পাকস্থলীতে প্রধানতঃ দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত খাদ্যসমূহ এবং আমিষজাতীয় খাদ্যগুলি হজম হয়। পাকস্থলীর পরিপাক-ক্রিয়া সংক্রান্ত দুইটি কথা স্মরণ-যোগ্য। প্রথমতঃ, পাকস্থলীতে যে খাদ্য পড়ে, সে খাদ্য যখন বিষমরূপে অম্লরসাত্মক হয়—তখন (তাহার পূর্ব্বে নহে)—পাকস্থলীর দক্ষিণ দিকে যে ফটক থাকে, সেই ফটকের মুখ খুলিয়া যায়—পাকস্থলীর সমস্ত খাদ্য পাকস্থলী ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্রান্ত্রের ডিওডিনাম্ নামক অংশে যাইয়া পড়ে। তাহা হইলে প্রথম কথা হইল যে, মুখের লালার অনুপাতে পাকাশয়িক রসের সঞ্চার হয় এবং পাকাশয়ে (ষ্টম্যাকে) সমস্ত খাদ্যদ্রব্যগুলি যতক্ষণ সম্পূর্ণভাবে বিষম অম্লাত্মক না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত খাদ্যদ্রব্যগুলিকে পাকাশয়েই থাকিতে হয়। দ্বিতীয় কথা, পাকাশয়ে দুইটি দ্বার আছে; একটি উহার ঊর্দ্ধভাগে—যে পথ দিয়া মুখ হইতে খাদ্য আসিয়া পাকস্থলীর মধ্যে যাইয়া পড়ে; অপরটি উহার দক্ষিণ পার্শ্বে—যে পথ দিয়া পাকস্থলী হইতে খাদ্য বাহির হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে (স্মল ইন্‌টেস্‌টাইনে) চলিয়া যায়। মুখে অতিমাত্রায় ক্ষার-ধর্ম্মী লালা ক্ষরিত হইলে পাকস্থলীর উপরের দ্বার খুলিয়া যায়; এবং পাকস্থলীর ভিতরে অতিমাত্রায় অম্লধর্ম্মী পাকাশয়িক রস জন্মিলে তবে সে অম্লরসের উত্তেজনায় উহার দক্ষিণ দিকের দ্বার খুলে। এই দক্ষিণ দিকের দ্বারটির নাম—পাইলোরিক্ দ্বার; ইহা অতীব দৃঢ় এবং স্থূল মাংসপেশী দ্বারা রচিত এবং ইহার ফাঁদ খুব বেশী বড় নয়। যদি মুখে ভাল করিয়া না চিবানর ফলে বড় বড় খণ্ড খাদ্য-দ্রব্য পাকাশয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে-যতক্ষণ সেই খণ্ডগুলি পাকাশয়ের রসে জীর্ণ হইয়া না যায়, অথবা পাকাশয়ের গায়ের মাংসপেশী দ্বারা পিষ্ট না হয়, ততক্ষণ পাকাশয় হইতে তাহারা ক্ষুদ্রান্ত্রে (ডিওডিনামে) বাহির হইয়া যাইতে পায় না; তাহার ফলে পাকস্থলীতে খাদ্যটি পচে ও অতিমাত্রায় অম্লের সৃষ্টি করে। পাকাশয়ে অতিমাত্রায় অম্লের সৃষ্টি হইলেই, হয় মুখ হইতে, উহার উল্টা ধর্ম্মী (অর্থাৎ ক্ষারধর্ম্মী) থুথু অনবরত গিলিবার প্রয়োজন হয়, নতুবা ক্ষুদ্রান্ত্র (ডিওডিনাম্) হইতে ক্ষারধর্ম্মী পিত্ত উজান বহিয়া পাকস্থলীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়—অম্লরসাত্মক পাকাশয়িক রসের সঙ্গে ক্ষারধর্ম্মী থুথু (লালা) বা পিত্ত মিশিলে, লেবুর রসে "সোডা" দিলে যেমন লেবুর রসের অম্লের উগ্রতার হ্রাস হয়, সেই ফল ফলে। আর যদি নিত্যই অতিমাত্রায় অম্লাত্মক পাকাশয়িক রসের উদ্বেগ এই ভাবে উক্ত পাইলোরিক দ্বারের মাংস-পেশীকে ভোগ করিতে হয়, তবে তথায় ক্ষত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। পাইলোরিক দ্বারের ক্ষত শুকাইলে, সেই স্বল্প-ফাঁদ দ্বারের ফাঁদের সঙ্কোচ ঘটে। তাহার ফলে সহজে পাকাশয়ের খাদ্য আর ডিওডিনামে যাইতে পায় না। কাযেই অতিভোজনেরও যা' ফল, অতি বেশীক্ষণ খাদ্য দ্রব্যকে নিষ্কাশিত করিবার বিফল প্রয়াসে পাকাশয়িক গাত্রস্থ মাংসপেশীর নিষ্ফল সঙ্কোচেরও সেই ফল—অর্থাৎ পাকাশয়ের ফাঁদ বৃদ্ধি (ডাইলেটেশন অফ ষ্টম্যাক)।

পাকাশয়ের পরে, ক্ষুদ্রান্ত্র (স্মল-ইন্‌টেস্‌টাইন্‌স্)। ইহার প্রথমার্দ্ধের নাম ডিওডিনাম্। অন্নভোজী বাঙ্গালীর পক্ষে এইটি পরম প্রয়োজনীয় অংশ। পাকাশয় হইতে কতকাংশে পচিত খাদ্যদ্রব্য এইখানে আসিলেই, ক্ষারধর্ম্মী পিত্তরস, ও ক্লোমরস তাহার সঙ্গে মিশে। পিত্তের কায স্নেহজাতীয় পদার্থকে অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করা (ইমাল্‌সন প্রস্তুত করা)। আর ক্লোমরসের (প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ রসের) কার্য্য—শালিজাতীয়, আমিষজাতীয় ও স্নেহজাতীয় পদার্থকে পরিপাক করা। অন্নের অধিকাংশ পরিপাক-ক্রিয়া এখানেই সাধিত হয়। কাযেই, মাংসাশী সাহেবদিগের পক্ষে পাকাশয়িক রস (পেপ্‌সিন্) যে পরিমাণে উপকারী, অন্নভোজী বাঙ্গালীর পক্ষে সেই অনুপাতে ক্লোমরসের (প্যান্‌ক্রিয়াটিক্ যূষের) প্রয়োজন। অন্নের বারো আনা ভাগ পরিপাক ক্রিয়া এইখানেই সাধিত হয়। বাকী পরিপাকটা এই ক্ষুদ্রান্ত্রের অপরাংশের রস (যাহাকে সাকাস্ এণ্টারিকাস্ কহে) সাহায্যে এবং কতকটা অন্ত্রস্থিত জীবাণু দ্বারা পচিত হয়। থোড়, এঁচোড়, ডাঁটা, আলু প্রভৃতির খোসা, গমের চোকর, শাক, প্রভৃতি এই জীবাণুগণ দ্বারাই বেশীর ভাগ পচিত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের পরে, বৃহদন্ত্র (লার্জ ইন্‌টেস্‌টাইন্ বা কোলন)। ইহারই শেষ প্রান্তটিকে মলদ্বার কহে। এবং ইহার আরম্ভ-স্থান অ্যাপেন্‌ডিক্‌স্‌কে লইয়া। এই অ্যাপেন্-ডিক্‌স্‌টি মানুষের কি কাযে আসে জানা নাই। তবে যাহারা ভাল করিয়া না চিবাইয়া খায়, যাহারা সুপারির কুচি বা পেয়ারা প্রভৃতির বীজ গেলে, তাহাদিগকে জব্দ করিবার

ফাঁদ বলিলে অন্যায় হয় না। বৃহদন্ত্রে পরিপাক-কায কিছু হয় না—এখানে পরিপাক করা খাদ্যের তরল সার শোষিত হয়।

যথা সম্ভব সংক্ষেপে পরিপাক-ক্রিয়ার বর্ণনা করিয়া, তৎসংক্রান্ত কয়েকটি আবশ্যক কথার আলোচনা করিব। (১) আজ যে খাবার খাওয়া গেল, পরশুর আগে তাহা মল হইয়া বাহির হয় না। অনেক সময়ে তাহার চেয়েও দেরী লাগে—কিন্তু বেশী দেরী লাগা ব্যারামের লক্ষণ। (২) মানুষের ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় ২০ ফিট ও বৃহদন্ত্র ৫—৬ ফিট, একুনে ইন্‌টেস্‌টাইনগুলি ২৫—২৬ ফিট লম্বা। এই দীর্ঘপথে স্বভাবতঃই নানা জীবাণুর বাস; কাযেই যত বেশীক্ষণ খাদ্যদ্রব্য বা মল এই পথে আবদ্ধ থাকিবে, ততই গ্যাস ও বিষের সৃষ্টি করিবে। এবং সেই গ্যাস ও বিষ বাহির হইতে যত দেরী হইবে, ততই তাহারা "গায়ে বসিবে"—সমস্ত রক্তকে দূষিত করিবে। (৩) আমরা যাহা খাই তাহার অধিকাংশই কঠিন; "পরিপাক" করা বলিলে দুইটি কায বুঝায়—কঠিন খাদ্য দ্রব্যকে তরল করা এবং তরল দ্রব্যকে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা রক্তে শোষণোপযোগী করা। বস্তুতঃ ইংরাজী কথা "ডাইজেষ্ট"এর অর্থ তরলীকরণ। অতএব পরিপাক-ক্রিয়ার প্রথম থাক বা শ্রেণী হইতেছে কাটিয়া, কুটিয়া, ভিজাইয়া, পেষণ করিয়া নানা উপায়ে কঠিন খাদ্যকে তরল করা; এবং দ্বিতীয় স্তর হইতেছে তাহাদের শোষণ (অ্যাবসরপ্‌সান্) ও তৎপরে রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রণ (অ্যাসিমিলেসান্) করায় সাহায্য করা। (৪) পরিপাক-ক্রিয়ার পরস্পর সাপেক্ষতা লক্ষণীয়। মুখের লালা ক্ষারধর্ম্মী; পাকস্থলীর রস অম্লধর্ম্মী; ডিওডিনামের রস ক্ষারধর্ম্মী। একটি রস অপর রসের সহায়ক। (৫) খাদ্যদ্রব্যের সাধারণতঃ নিম্নগতি—অর্থাৎ মুখ হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃই নিম্নগামী হয়। এবং ইন্‌টেস্‌টাইনগুলিরও নিম্নাভিমুখে ক্রিমিগতিতে সঞ্চার হইয়া থাকে। দারুণ উত্তেজনার ফলে অন্ত্রস্থিত দ্রব্যের উজান গতিও হয়—তাহার ফলে মুখ দিয়া মল নির্গত হইতে পারে।

লক্ষণাবলীর ব্যাখ্যা

ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে যতগুলি লক্ষণ দেখা যায়, সেগুলির মূলতত্ত্বটা কি, অর্থাৎ তাহার আসল ব্যাখ্যাটি কি, তাহা দিয়া নিম্নে প্রধান প্রধান লক্ষণগুলিও দিলাম।

১। ময়লা জিহ্বা।—জিবের উপরে যে চামড়ার মত "ছাতা" পড়ে তাহা কি? তাহা রোগ-জীবাণু + জিহ্বার উপরের ছাল উঠিয়া যাওয়া! সেই ময়লা যদি সাদা রঙের হয়, তবে পাকস্থলী ও ইন্‌টেস্‌টাইনের জড়তা (সাময়িক অক্ষমতা) বুঝায়। সেরূপ স্থলে "টনিক" (যেমন কুঁচিলা ঘটিত ঔষধ) প্রযোজ্য। কিন্তু যদি জিবটি কাঁচা মাংসের মত টক্‌টকে লাল হয় এবং তাহার উপরে দানা দানার মত দেখায়, তবে বুঝিতে হইবে যে পাকস্থলী ও ইন্‌টেস্‌টাইন অত্যন্ত রুক্ষ (উত্তেজিত) অবস্থায় আছে। তেমন অবস্থায় বিস্‌মাথ, হাইড্রোসায়ানিক্ অ্যাসিড প্রভৃতি শান্তিপ্রদ ঔষধ ব্যবহেয়। জিব যদি খুব বড় হইয়া সারা মুখের মধ্যে এমন এলাইয়া পড়ে, যে, দুপাশের দাঁতের দাগ তাহার গায়ে বসিয়া যায় এবং সেই জিব যদি রক্তহীন দেখায়, তবেও টনিক ঔষধ প্রযোজ্য।

২। মুখের আস্বাদের বিকৃতি।—যাহাদের মুখের ভিতরে একাধিক "পোকা খাওয়া" (কেরিয়াস্) দাঁত আছে, তাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় এবং তাহাদের মুখের আস্বাদও বিকৃত হয়। যাঁহারা "বাঁধান দাঁত" ব্যবহার করেন, তাঁহারা যদি ঐ দাঁতের পাটিগুলিকে যথাযথ পরিষ্কার রাখিতে না পারেন, তবে তাঁহাদেরও মুখে দুর্গন্ধ ও বিস্বাদ বোধ হয়। যদিও পিত্তের কোনও স্বকীয় স্বাদ নাই, তথাপি অবস্থা-বিশেষে "পিত্ত পড়ার" দরুণ মুখে তিক্তাস্বাদ অনুভূত হয়। যাঁহারা দুধ "পেপ্‌টোনাইজ" করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, উক্ত পেপটোনাইজিং প্রক্রিয়ার আধিক্যে দুধ তিক্ত ও বিস্বাদ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ আমিষজাতীয় খাদ্য অধিকক্ষণ পাকস্থলীতে থাকার ফলে, উহার উপরে যদি পাকস্থলীর পরিপাক রসের পেপ্‌সিনের ক্রিয়াধিক্য হয়, তবে উক্ত আমিষজাতীয় খাদ্য কতকটা তিক্তাস্বাদ-যুক্ত হইয়া পড়ে; এমন স্থলে মুখও তিক্ত হইয়া যায়। ইন্‌টেস্‌টাইনে (অন্ত্রের মধ্যে) খাদ্য পচিয়া বা বদ্ধ-মল থাকিয়া যে বিষ সৃষ্টি করে, তাহাও রক্তে শোষিত হইয়া মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে। [যে দাঁতে কাল দাগ দেখা যায়, যাহাতে ফুটা বা ফাট ধরে, এবং যে দাঁতে আস্তে আস্তে ঘা দিলে বেদনা অনুভূত হয়, মোটামুটি সেই দাঁতগুলি "পোকা ধরা" বুঝিতে হইবে।]

৩। ক্ষুধার বিকার।—খুব সাদা কথায় বলা যাইতে পারে যে, যে পরিমাণে পাকস্থলীতে রক্ত চলাচল করে, সেই

পরিমাণে ক্ষুধাবোধ হয়। লবণ, গরম মসলা, রাইসর্ষপ চূর্ণ, তিক্ত দ্রব্য, আর্সেনিক, লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি খালি পেটে দিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহারা পাকস্থলীতে যাইবার পরেই, পাকস্থলীতে রক্তাধিক্য হয় এবং সেই সঙ্গেই ক্ষুধার উদ্রেক হয়; শূন্যোদরে খুব সামান্যভাবে পাকস্থলীর গাত্রে আঁচড় দিয়াও সেই ফল পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু অধিক মাত্রায় উত্তেজনার বিপরীত ফল,—যদিও সত্যকার ক্ষুধা থাকে তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। অল্প গরম খাদ্য পাকস্থলীর রক্ত-চলাচল বৃদ্ধি করিয়া ক্ষুধা ও পরিপাক-কার্য্যকে বিশেষরূপে সাহায্য করে; কিন্তু অতিমাত্রায় গরম জিনিস নিত্য খাইলে ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তির নাশ হয়। বরফ যেখানে লাগে, সেখানটা নিরক্ত হয়। এই জন্য নিত্য বরফ বা অত্যন্ত ঠাণ্ডা জিনিস খাইলে ক্ষুধার লোপ ও পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়। তার পরে যকৃত প্রভৃতির অবস্থার উপরে ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তির তেজ নির্ভর করে। আমরা যাহা কিছু খাই, তাহার বেশীর ভাগ যকৃতে যাইয়া উপস্থিত হয়; যদি অতিমাত্রায় নিত্য খাই, অথবা, নিত্য মন্দ-পাক খাদ্যাংশ যকৃতে যাইয়া উপস্থিত হয়, তবে যকৃতের উত্তেজনা ও তথায় রক্তাধিক্য ঘটে। যকৃতে রক্তাধিক্য ঘটিলে পাকস্থলীর রক্ত-চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে; কাযেই যকৃতের উৎপাতে পরিপাক-শক্তির হ্রাস হয়। যাঁহাদের হৃৎপিণ্ডের (হার্টের) রোগ আছে, তাঁহাদের যকৃতে বারোমাসই রক্তাধিক্য; কাযেই তাঁহাদেরও ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি ঠিক থাকে না। আমরা যে-কোনও বিষাক্ত দ্রব্য ভোজন করি না কেন, যকৃতে যাইয়া তাহার ব্যবস্থা হয়। রীতিমত কোষ্ঠবদ্ধ ব্যাধি থাকিলে, বৃক্ক ব্যাধি (প্রস্রাবের দোষ) থাকিলেও ক্ষুধামান্দ্য ও অজীর্ণ অবশ্যম্ভাবী; যেহেতু কোষ্ঠবদ্ধ ব্যাধিতে অন্ত্র হইতে নানা জাতীয় বিষাক্ত পদার্থ রক্তে শোষিত হয় এবং প্রস্রাবের দোষ থাকিলেও তাই ঘটে। এ সকল ছাড়াও আর একটি কথা আছে। দেহের যত ক্ষয় হয় তত ক্ষুধা হয়—ঐ ক্ষয় পূরণের জন্য। এই জন্য যাহারা বেশ পরিশ্রমী, তাহাদিগের ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি বেশ থাকে। মধুমেহ (ডায়াবিটিজ) ব্যাধিতে অহর্নিশই দেহের ক্ষয় হয় বলিয়া, উক্ত ব্যাধিতে ক্ষুধার প্রকোপ যথেষ্টই থাকে। শীতকালে অথবা শীতপ্রধান দেশে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যাইলে ক্ষুধাও বাড়ে এবং পরিপাক-শক্তিও ভাল থাকে। তাহার কারণ দেহকে গরম রাখিবার জন্য দেহের ক্ষয় হয় এবং সেই ক্ষয় পূরণের জন্যই ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি বাড়ে। কিন্তু বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অতি-শ্রমে (যাহার ফলে দেহের ক্লান্তি ও অবসাদ আসে) এবং অতি মাত্রায় ঠাণ্ডা লাগানর ফলে ক্ষুধা ও পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়। মোট কথা, অতি ক্ষুধাবোধ বা ভোজনের অল্পক্ষণ পরেই ক্ষুধাবোধ হইবার কারণ, প্রধানতঃ, অতি মাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের স্রাব; এবং অনেক স্থলে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তির পাকস্থলীর দৌর্ব্বল্য হেতু আহারে রুচি ছিল না, সে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়া দুই এক গ্রাস খাওয়ার ফলে তাঁহার পাকস্থলীতে রক্ত-চলাচল বেশী হওয়ার ফলে সে ব্যক্তির আহারে রুচি জন্মায় এবং সে সেই খাদ্য পরিপাকও করিয়া ফেলে। যে ব্যক্তি খুব ক্ষুধা লইয়া খাইতে বসে অথচ দু এক গ্রাস খাইয়াই তৃপ্ত হয়, সে ব্যক্তির ভোজন না করাই ভাল ছিল; কেন না তাহার পাকস্থলী উত্তেজিত অবস্থায় ছিল।

৪। বিবমিষা বা বমন।—পাকস্থলীর উপরের দ্বারটি খুলিয়া গিয়া পাকস্থলীর ভিতরে যাহা কিছু খাদ্যদ্রব্য ছিল সে সমস্ত বাহির হইয়া আসাকেই বমন কহে। কিন্তু যদি বমনের চেষ্টা হয় অথচ পাকস্থলীর উপরের পথটি সজোরে বন্ধ থাকে, তবে রোগী "হোয়াক্ হোয়াক্" করিয়া বমি করিবার চেষ্টা করে, অথচ কিছু বাহির হয় না; শেষোক্তটিকে ইংরাজীতে "রেচিং" কহে। বমনের কারণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগের কারণ পরিপাক-যন্ত্রের বাহিরে; যথা—মাথা ধরিলে, আধকপালে হইলে (মিগ্রেণ), মাথায় আঘাত পাইলে, মস্তিষ্কের মধ্যে ক্ষয়রোগজনিত প্রদাহ হইলে (টিউবারকুলার মেনিন্‌জাইটিস্), "হার্ণিয়া" নামিলে, গর্ভাবস্থায়, বৃক্ক ব্যাধিতে, জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কারণ পরিপাক-যন্ত্রের কোনও-না-কোন অংশে উত্তেজনা ঘটার ফলে; যথা, ভাল করিয়া না চিবাইয়া খাওয়ার ফলে বড় বড় খাবারের টুকরা বেশীক্ষণ পাকস্থলীর ভিতরে থাকিলে; পাইলোরাস্ বা পাকস্থলীর দক্ষিণ দিককার পথের ফাঁদ যদি ছোট হইয়া যায় তাহার ফলে, অথবা নিয়মিত অতি ভোজনের ফলে পাকস্থলী যদি সম্প্রসারিত হইয়া পড়ে (ডাইলেটেসন্ অফ ষ্টম্যাক); বদহজমের ফলে পেটের মধ্যে খাবার পচিলে; আকস্মিক অতিমাত্রায় ভোজন করিলে; গলার ভিতরে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলে; যকৃতের দোষ ঘটিলে; অন্ত্রমধ্যে কোথাও ক্ষত, প্রদাহ প্রভৃতি ঘটিলে;

অথবা অন্ত্রসংক্রান্ত পিত্তকোষে বা অ্যাপেন্‌ডিক্‌সে কোনও উত্তেজনা থাকিলে; রীতিমত মদ্যপান করিলে; প্রভৃতি।

৫। পেট ব্যথা বা অস্বস্তি।—ইহার প্রধানতঃ দুইটি কারণ; প্রথমটি হইতেছে বায়ুর দ্বারা পাকস্থলী ফাঁপিয়া উঠা; দ্বিতীয়টি হইতেছে অম্ল। যখন পাকস্থলীর যে অংশে তীব্র অম্লরস লাগে, তখন সেইখানে জ্বালা বা বেদনা অনুভূত হয়। এই জন্য এক পাশে থাকায় পেটে যন্ত্রণা হইলে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলে তাহার ক্ষণিক উপশম বোধ হয়। সময়ে সময়ে অম্লাত্মক পাকাশয়িক খাদ্যদ্রব্য যখন পাকাশয়ের উপরকার মুখটিতে বেশী করিয়া লাগে, তখন বুকজ্বালা বোধ হয়; এমন কি দাঁত ও মুখ টক বোধ হয়।

৬। অম্লবোধ।—পাকস্থলীতে অম্ল দুই রকমের দেখা যায়। বেশীর ভাগ স্থলে লোকেরা যে অম্লের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা খাবার পচিয়া যে টক্ রসের সৃষ্টি হয়, সেই অম্লকেই বুঝায়। ইহাদিগকে ফার্ম্মেন্টিং অ্যাসিড বা পচন-জনিত অম্ল বলা যায়। এইটি দোষের। দ্বিতীয় প্রকারের যে অম্ল দেখা যায়, তাহাকে ইংরাজীতে "হাইপার-ক্লোর-হাইড্রিয়া" বা পাকাশয়িক অম্ল-রসের আধিক্য বলে। এই অম্লরস পচনের ফল নহে; ইহা হাইড্রো-কোরিক দ্রাবকের মাত্রাধিক্য মাত্র। ইহা কখনো ঘটে আবার কখনো থাকে না। যাহাদের এই ব্যাধি ঘটে তাহারা মুহুর্মুহু কিছু খাইতে না পাইলে কষ্ট অনুভব করে। এবং তাহাদিগকে মুহুর্মুহু আমিষজাতীয় সামান্য খাদ্য দিলে অপকার কিছুই হয় না—পরন্তু উপকারই হয়।

৭। পেটফাঁপা (উদরাধ্মান)।—পেটের মধ্যে হাওয়া দুই যায়গাতে থাকিতে পারে; (ক) পাকস্থলীতে (খ) ইন্‌টেস্‌টাইনে বা অন্ত্রে (আঁতে)। পাকস্থলীতে যে বায়ু থাকে, তাহা খাদ্য-পেয়ের সঙ্গে পেটের মধ্যে যায়—প্রত্যেক গ্রাস খাবারের সঙ্গে এবং প্রত্যেক ঢোঁক পানীয়ের সঙ্গে পেটের মধ্যে হাওয়া যায়। কেহ বা বেশী পরিমাণে, কেহ কম পরিমাণে হাওয়া গিলিয়া থাকেন। ইহার প্রমাণ, খাইতে খাইতে যখন পাকস্থলীটা প্রায় বারো আনা ভর্ত্তি হইয়া আসে, তখন খাইবার কালে পেটে যে হাওয়া ঢুকিয়াছিল, তাহা ঢেঁকুর হইয়া বাহির হইয়া যায়; এই জন্য সুস্থ থাকিবার জন্য হিন্দুদিগের প্রতি আদেশ আছে যে, প্রথম ঢেঁকুরের পরেই খাওয়া বন্ধ করা উচিত। লোভবশতঃ আরো খাইলে দ্বিতীয় বার ঢেঁকুর উঠে—তখন খাওয়া বন্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সে যাহা হউক, "ঊর্দ্ধবায়ু" অর্থাৎ ঢেঁকুরের অর্থ দুইটি; একটি—যে বায়ু গেলা যায় তাহাই নিঃসৃত হয়, এবং অপরটি—অম্ল-ঘটিত বায়ু; অর্থাৎ পেটে খাবার পচিলে তাহার দরুণ যে "খৈ ঢেঁকুর," "ধোঁয়া ঢেঁকুর" বা "চোঁয়া ঢেঁকুর" উঠে, তাহা কোনও-না-কোন গন্ধযুক্ত—খাবারের গন্ধ বা অম্লের গন্ধ বা পচা গন্ধযুক্ত। যদি ঢেঁকুরে কোনও গন্ধ না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে ঢেঁকুর গেলা-হাওয়ার বহির্গমন-হেতু। অনেকের অভ্যাস আছে অনবরত ঢেঁকুর তোলা এমন কি একান্ত খালিপেটেও তোলা। তাঁহারা একটা ঢেঁকুর তোলেন ত পাঁচবার ঢেঁকুর চাপিবার বা তুলিবার চেষ্টায় পাঁচবার হাওয়া গেলেন; তাঁহারা মনে করেন যে, পাকস্থলী বায়ুতে পূর্ণ—কিন্তু, অধিকাংশ সময়ে, পাকস্থলীতে কিছুই থাকে না। বায়ুর দ্বিতীয় স্থান অন্ত্রে; ইহা নিম্নাভিমুখে বাতকর্ম্ম বা অধোবায়ুরূপে নির্গত হয়। ইহাদের একমাত্র কারণ পেটের মধ্যে বদ্ধমল থাকা অথবা খাদ্য যথার্থরূপে পরিপাক না হওয়া। শাকান্নভোজীদেরই পেটে বেশী বায়ু হয়। কাহারো দুধ পান করিলে, কাহারো ডিম খাইলে, কাহারো কপি, মূলা প্রভৃতি খাইলে পেটে বায়ু হয়; প্রত্যেক স্থলেই বুঝিতে হইবে যে, ঐ ঐ খাদ্যগুলি তাঁহাদের পেটে ঠিক্ পরিপাক হয় না।

৮। মুখ দিয়া জল উঠা—পাকস্থলীতে অতিমাত্রায় অম্ল সঞ্চারিত হইলে মুখে আপনাআপনিই, ঘুমের অবস্থাতেও থুথু জমে। এই থুথু কতকটা গেলাও হয়; এই গেলা থুথু অনেক সময়ে পাকস্থলীতে না যাইয়া উহার কাছাকাছি গলনলীর প্রান্তে জমা হয়। পরে সেখান হইতে হঠাৎ মুখে উঠিয়া আসে।

৯। প্রস্রাবের সঙ্গে অতিরিক্ত পরিমাণে ফস্‌ফেট্, অগ্-জেলেট্ প্রভৃতি নির্গত হওয়া। এই গুলি ধাতব লবণ—অম্ল না হইলে জন্মায় না। ইহারা নির্গত হইতেছে দেখিলে রোগীরা ভয় পান,—মনে করেন যে, দেহের সারাংশ বাহির হইয়া যাইতেছে। ইহাতে ভীত হইবার কিছুই নাই; তবে ভবিষ্যতে কোনও কোনও স্থলে ইহারা "পাথরী" ব্যারামের সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র।

ডিস্পেপ্‌সিয়ার কারণ

প্রথমতঃ স্নায়বিক ও মানসিক কারণগুলির উল্লেখ করিয়া, পরে স্থানিক (অর্থাৎ পাকস্থলী ও অন্ত্র-সম্পর্কিত কারণগুলি বলিব।

(১) আমাদের দেহের প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশের সঙ্গে, দেহের অপর সূক্ষ্ম অংশের যাহাকে বলে "নাড়ীর সম্পর্ক" এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তন্মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে, জীবের জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য—জীব জন্ম দিবার জন্য। অতএব সমস্ত দেহে যত কিছু যন্ত্রপাতি আছে তন্মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। যাঁহারা ঊর্দ্ধরেতাঃ (অর্থাৎ জীবনে যাঁহাদিগের একবিন্দু শুক্র ক্ষরণ হয় নাই) তাঁহাদের শারীরিক পুষ্টি, মানসিক বিকাশ ও দেহের লাবণ্য অনন্যসাধারণ। ইহার বিপরীত ভাব—অর্থাৎ অতিমাত্রায় শুক্রক্ষয়ের ফল—শরীরকে ফোঁপরা করা। দেহের পক্ষে রক্ত যত বা উপকারী, শুক্র তদপেক্ষা বহুগুণে উপকারী। এই শুক্র পরিমিত পরিমাণে ও স্বাভাবিক উপায়ে ক্ষয় হইলে দেহের কিছুই অপকার হয় না;—পরন্তু, অবস্থা বিশেষে স্বাস্থ্যের অনুকূল। কিন্তু অস্বাভাবিক উপায়ে, অথবা অতিমাত্রায় ইহার ব্যয় হইলে, দেহের সমস্ত যন্ত্রেরই কার্য্যের ক্ষমতা কমিয়া যায়। বস্তুতঃ, দেহের জীবনীশক্তি, ও দেহের ওজঃ এই শুক্রের ধারণের উপরে নির্ভর করে—এমন কি পুরুষের পৌরুষও এই জিনিসেরই উপরে নির্ভর করে। যদি অণ্ডকোষ নষ্ট করা যায়—তাহাকে কাটিয়াই হউক বা তাহাকে অতিমাত্রায় খাটাইয়াই হউক—তবে পুরুষ আর পুরুষ থাকিতে পারে না—রমণীত্বও রাখিতে পারে না—ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়। কাযেই এই জিনিসের অসাধারণ ও অস্বাভাবিক ক্ষয়ে চিরকালের মত দৈহিক তাবৎ যন্ত্রের কার্য্য মলিন হইয়া পড়ে। অনেক পিতামাতা হয় ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তাঁহাদের পুত্রেরা ১৩ হইতে ১৬ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ ডিস্পেপসিয়াগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সে ডিস্পেপসিয়ার কারণ অস্বাভাবিক উপায়ে অপরিমিত শুক্র ক্ষয়! যে বয়সেই ইহা হইবে, সেই বয়সেই ডিস্পেপসিয়া দেখা দিবে—তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালে ভদ্রে স্বপ্নদোষ হওয়াও দোষের; কিন্তু যদি অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় বন্ধ করা যায়, তবে এই দৈবাৎ স্বপ্নদোষে তত দোষ হয় না—যদিও এমন অবস্থায় স্বপ্নদোষ বজায় থাকিবার দুইটি অর্থ কাহারো বুঝিতে কষ্ট হয় না; অর্থাৎ—প্রথম চোট যৌবনের অপরিমিত ইন্দ্রিয়ভোগের পর বলপূর্ব্বক সংযম অভ্যাস করিলেও, যাহাদিগের ইন্দ্রিয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া গিয়াছে, এবং যাহাদের প্রাণের নিভৃত কোণে ইন্দ্রিয়-লালসা উকিঝুঁকি মারে—শুধু তাহাদিগেরই বেলায় স্বপ্নদোষ বজায় থাকে।

২। মানসিক অবসাদ।—কোনও দুর্ঘটনা ঘটিলেও মানসিক অবসাদ আসে এবং অতিমাত্রায় পরিশ্রম করিলেও মানসিক অবসাদ আসে। আমাদের দেশে আজ ঘরে ঘরে ছেলেদের মধ্যে যে ডিস্পেপসিয়া দেখা যায়, তাহার কারণ বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী। সকালে নিদ্রাত্যাগ হইতে বেলা ৯।৯৷৷০ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন; স্কুলে বেলা ১০৷৷ হইতে ৪টা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন; বাড়ীতে সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত—এ তো রীতিমত বারোমাসই আছে। তাহার উপরে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষার "বাঁধা রোসনাই" আছে; এ ছাড়া "হোম টাস্ক," "ছুটির টাস্ক" প্রভৃতির বালাইও আছে! এই দুর্জ্জয় পরিশ্রম করিলে—তাও আড়ষ্ট হইয়া এক যায়গায় বসিয়া করিলে—ভীমেরও লোহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায়! এ কথা কাহাকেই বা বলিব—কেই বা শোনে! চাকরীর হ্যাংলা বাঙ্গালী, তাহার ছেলেকে বিশ্ববিদ্যালয়-রূপ যাঁতাকলে ফেলিয়া মারিবেই—তবে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? আজ ছাত্রদিগের পরীক্ষার দুর্ভাবনা, চাকুরীয়াদিগের মনিব সন্তুষ্ট রাখিবার ও খরচ কুলাইবার দুর্ভাবনা, মেয়েদের বৎসরে দোফলা হইবার সাধ—তাহার সঙ্গে সংসারের খাটুনি এবং চির-দারিদ্র্য—কাযেই দেশময় যে ডিস্পেপসিয়া দেখা দিবে—তাহাতে বিচিত্রতা কি? কায করিতে করিতে দৌড়িয়া আসিয়া নাকে মুখে গুঁজিয়া খাইয়াই দৌড় দেওয়া—ইহাও ডিস্পেপসিয়ার পোষক।

৩। ভেজাল খাদ্য।—টাট্‌কা তরকারী, মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ পাইলে শরীর ভাল থাকে; তা' সে সম্ভাবনা আর নাই! তাহার উপরে খাদ্যে ভেজালের চোটে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে! ঘৃত ও তৈল বলিয়া কোনও জিনিস আজ বাঙ্গালা দেশে নাই। পাঁচখানা মশলা সংযোগে যেমন পাঁচন তৈয়ারী হয়, আজকাল ঘৃত বলিতে চর্ব্বির পাঁচন ও তৈল বলিতে কেরোসিনের পাঁচন বুঝায়! আটা ময়দা বলিতে রামখড়ির পাঁচন বুঝায়, দুধ বলিতে দুধ ও পানাের হোমিও-প্যাথিক মতে পাঁচন বুঝায়! হায়—মানুষের পেট ত! কতটা অত্যাচার সহ্য করিবে? তবুও পেটকে নিত্য যত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে হয়—শরীরের অপর কোনও যন্ত্রকে তাহা করিতে হয় না!

৪। অপুষ্টিকর খাদ্য।—আমরা সৌখিন জাতি কি

না, তাই মাজা ধব্‌ধবে চাউল খাই। সে চাউলকে একবার চাষীরা সিদ্ধ করে এবং দ্বিতীয়বার আমরা সিদ্ধ করিয়া তাহার ফেণ ফেলিয়া দিই! প্রকৃত পক্ষে, খাই তুঁষ সিদ্ধ!!! আমরা আটা না খাইয়া গমের নিঃসার অংশ ময়দাই খাই। আমরা ডাইল না খাইয়া খেলা-ঘরের বেলেখেলার ডাল খাই···অর্থাৎ আমাদের রান্না ডালে "একরত্তি জলে" ২।৪টা ডালের দানা কিল্‌বিল করে! আমাদের দুধে কতটা জল থাকে তাহা বলা সহজ···তাহাতে কতটা দুধ থাকে বলা শক্ত। ঘিয়ে ঘৃতত্ব নাই, সর্ষের তৈলে সর্ষপতৈলের অভাব; মাছ খাওয়া আজকাল মাছের আঁশ খাওয়ার সামিল হইয়াছে; পয়সার অভাবে ফলমূল খাওয়া উঠিয়া গিয়াছে। এক কথায়, জাতি হিসাবে আমরা খাদ্যের পুষ্টি পূরামাত্রায় না পাওয়ায়, আমাদের জীবনী-শক্তির হ্রাস ঘটিয়াছে এবং তজ্জন্য দৈহিক কার্য্যেরও অপহ্নব ঘটিতেছে। কর্ণেল ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় খুলনা জেলে কয়েদীদের উপরে পরীক্ষা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মৎস্যাহারী বাঙ্গালীর খাদ্য হইতে অকস্মাৎ মৎস্য উঠাইয়া লইলে তাহাদের উদরাময় ঘটে। কর্ণেল আর, সি, চন্দ্র মেডিক্যাল কলেজে কায করিবার সময়ে একটি হিন্দুস্থানীর পেটের অসুখ কিছুতেই সারাইতে পারিতেছিলেন না; সে ব্যক্তি জলসাগু পথ্য পাইত। এক দিন চুরি করিয়া সে ছোলার ছাতু খায়···তাহার পর হইতেই তাহার ব্যারাম আরাম হইতে থাকে। অর্থাৎ বারোমাস ফেণ-গালা পুরাতন চাউলের গলা ভাত ও সিঙ্গিমাছের তরল ঝোল খাইয়া আমাদের ডিস্পেপ্‌সিয়া ধরিয়াছে!

৫। এক দিকে দুধ ঘি ও মাছের এবং টাটকা তরকারী ও ফলমূলের অভাব যেমন হইয়াছে, অন্য দিকে বিলাতী খাবার খাইবার স্পৃহা তেমনি জন্মিয়াছে। কথায় কথায় চপ-কাটলেট, ডিমের ডেভিল, ফাউল কারী, কোর্ম্মা ও রাবড়ী নামে দুধ-রুটি খাইবার ধুম পড়িয়াছে। এই সকল খাদ্য যে কিসে ও কি অবস্থায় তৈয়ারি হয়, তাহা 'ভারতবর্ষে' ইতঃপূর্ব্বেই "খাদ্যে ব্যভিচার" প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। খাদ্যের ভেজাল সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা মল্লিখিত "হাইজিন্ ও পাবলিক্ হেল্‌থ্" নামক পুস্তক পাঠ করিতে পারেন।

তাহা ছাড়া, স্যাঙ্গাটোজেন্, ওভালটিন্, উইন্‌কার্নিস্, বভ্রিল্, পুরাতন পোর্ট ওয়াইন, ওয়ামপোলস্ ফসফোলে-সিথিন্, ভাইব্রোণা, মল্ট একষ্ট্র্যাক্ট্, চ্যবনপ্রাশ, মদনানন্দ-মোদক প্রভৃতি কত রকম-বেরকমের খাদ্য ও ঔষধ যে নিত্য ব্যবহৃত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এই সকল ভোজনের সময়ে সাধারণে চিকিৎসকের পরামর্শের অপেক্ষা রাখে না—তাহারা রং-বেরঙের শিশি-বোতল ও তাহাদের মূল্যাধিক্যের চটকে প্রলুব্ধ হইয়া যখন ইচ্ছা ও যত ইচ্ছা—এবং সব চেয়ে বড় কথা, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে—ভোজন করে! তাহারা ভুলিয়া যায় যে, মানবের পরিপাক-যন্ত্র কত সুকোমল ও কত সুকুমার—তাহারা ভুলিয়া যায় যে, মানবের মুখ নর্দ্দমার ঝাঁঝরি-মুহুরি নয়—এবং কিছুকাল এই অত্যাচার করার ফলে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ভোগে! ইহাকেই বলে সোণা ফেলিয়া আঁচলে গিরা বাঁধা! খাদ্য সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধে বহুবার আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এতৎ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিব না।

৬। চা, দোক্তা ও চুরুট সেবন।—আসল ভাল চা যাহাকে বলে, তাহা কিনিবার মত অবস্থাপন্ন লোক এ দেশে খুব কম। কাজেই, সবচেয়ে খারাপ চা ও চায়ের বাগানের ঝড়তি পড়তি লইয়া আমাদের দুধের সাধ ঘোলে মিটান হয়। তাহার পরে, চা তৈয়ারি করিতে খুব অল্প লোকই জানেন। আর যাঁহারা দোকানের চা পান করেন, তাঁহারা কি পান করেন, তাহা উক্ত "খাদ্যে ব্যভিচার" প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। দোকানের চা পান করিলে অতি-বড় পরিপাক-শক্তির লোপ হয়। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে দোক্তা খাওয়া ও গুল মুখে রাখার অভ্যাসটা খুব বেশী। দোক্তায় যত শীঘ্র ও সম্পূর্ণরূপে পাকস্থলীর সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এত শীঘ্র ও এত বেশী করিয়া আর কোনও নেশার দ্বারা হয় না। ধূম পান করিলেও ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পথ পরিষ্কার হইয়া থাকে।

৭। মেসে খাওয়া।—নিত্য আধ-সিদ্ধ, আধ-পোড়া, অথবা যা-তা করিয়া পাক করা হোটেলে বা "মেসের" বাসায় খাইলে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া অনিবার্য্য। পাঁচজন বন্ধুবান্ধব মিলিয়া যখন তখন হোটেলে বা রেস্তরাঁতে খাইলেও ঐ ভয়। এই সকল যায়গা যে কি ভীষণ তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন।

৮। পাল্লা দিয়া খাওয়া বা "নিমন্ত্রণ গ্রহণের পেশা" করিলে; অতি মাত্রায় মিষ্ট ভোজনের অভ্যাস করিলে; যখন তখন বরফ বা কুল্পী বরফ খাইলে; খাইতে বসিয়া বা

আহারান্তে পেট ভরিয়া অনেকটা জল বা সোডাওয়াটার বা ডাব খাইবার অভ্যাস করিলে; অলস জীবন যাপন করিয়া নিত্য কালিয়া পোলাও খাইলে; আপিষের বা স্কুলের তাড়ায় নিত্য "গোগ্রাসে" খাইলে; ক্ষুধার উদ্রেক হউক আর না হউক "সময়ের চারিটি অন্ন" খাইলে; প্রভৃতি কারণেও ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ঘটে।

৯। ইংরাজী ঢংয়ে স্কুল ও আপিষের সময় হওয়ায় দেশে এত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। আপনাদের দেশে, ইংরাজরা এক রকম বিছানাতে বসিয়াই প্রাতে ৬টায় একবাটি চা, দুইটা ডিম ও মাখন-লাগান ২খানা পাঁউরুটির টোষ্ট খায়। পরে ৯টায় কাজ কর্ম্মে বাহির হইবার সময়ে সামান্য মাছ, মাংসের কারি ও ওটমিল নামক গুঁড়ার পায়স (পরিজ্) খাইয়া অনেকটা হালকা থাইয়া কাজ করে। পরে, সারাদিনের কাজের প্রথম চোটের ঝোঁকটা সামলাইয়া, বেলা দুইটা আন্দাজ সময়ে মদ্য, সুপ, মাংস, পনির, মাছ ও মাখন-রুটি পেট ভরিয়া খায়। ইহার দুই ঘণ্টা পরে আপিষ বা স্কুল হইতে আসিবার সময়ে একপেয়ালা গরম চা পান করে। তাহার পরে, যাহা গিলিয়াছে তাহা পরিপাক করিবার জন্য ৫ হইতে ৭॥০টা পর্য্যন্ত খেলা-ধূলা, লাফালাফি করিয়া ঘরে ফেরে। ঘরে আসিয়া স্নান ও বিশ্রাম করিয়া রাত্রি আটটায় সুপ, মাছ, মাংস, ফলমূল, ও পুডিং এবং মদ্য খায়। তাহার পরে তাহারা গাল-গল্প করে বা থিয়েটার বায়স্কোপে যায় বা বেড়ায়; এবং কেহ কেহ শয়নের পূর্ব্বে রাত্রি ১১টা নাগাদ বাদাম পেস্তা জাতীয় "নাট্", ফলমূল ও কফি খাইয়া শয়ন করে। তাহাদের দেশের আবহাওয়া ও সামাজিক প্রথামত ইংরাজ এ দেশেও চলে। অথচ আমাদিগের চালচলন অন্যরূপ। এ দেশে বারো মাসের মধ্যে ৮ মাস গরম এবং "কায়-ক্লেশে" ৪ মাস শীত। যেখানে গরম, সেখানেই ক্লান্তি; যেখানে গরম, সেইখানেই ক্ষুধামান্দ্য এবং আহারে রুচি কম; যেখানে গরম, সেখানেই চারিদিকের জিনিস সহজে পচিয়া উঠে। কাজেই, এ দেশে দুপুরে স্কুল বা আপিষ করা যে কত বড় অন্যায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। অনেকেই সকালে উঠিয়া কিছু খান; আর সে "কিছু" অধিকাংশ স্থলে সস্তার চা, নতুবা বিষাক্ত "দোকানের খাবার"। তাহার পরে ক্ষুধা লাগুক আর না লাগুক—৯|৯॥০টায় যেমন-তেমন করিয়া তাড়াতাড়ি "ছমুঠা" খাওয়া হয়। আমাদের সকল কাজই "ধীরে সুস্থে" করা হয়—খোস-গল্প করিয়া, পর-চর্চ্চা করিয়া যথেষ্টই সময় হরণ করা হয়—আর যত তাড়া ধরে ভোজনের সময়ে! অত সকালে সকল সংসারে সকল রান্না হইয়া উঠে না; এবং অনেক স্থলে ভাল করিয়াও রান্না হয় না; কাজেই দুপুরে "পেট বাপন্ত করিতে থাকে।" কিন্তু উপায় কি? সকলের ঘরে বাবুর্চ্চি. বা বেহারা থাকে না; কাজেই সেই বিষ—দোকানের খাবার খাইতে হয়; তাও পোড়া পয়সার অভাবে পেট ভরিয়া খাওয়া হয় না! তার পর সারাদিন খাটা-খাটুনির পর শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে যখন পেটের ক্ষুধা পেটেই মরিয়া যায়, তখন ভোজন! আর ভোজনের পরে হয় পড়া মুখস্থ, নতুবা আপিষের কাজ, নতুবা হিসাব, নতুবা স্তনহীন গৃহিণী সাজিয়া ষষ্ঠীবুড়ীর মত পুত্র-কন্যার "ন্যাবা"! ক্ষুধার সময়ে খাইতে পাই না, অক্ষুধায় জবরদস্তি খাইতে হয়; এবং খাওয়ার পর থেকে মাথায় ঢেঁকীর পাড় দেওয়া। যে রক্ত ষোলআনা রকম পাকস্থলীতে যাওয়া উচিত ছিল, সেই রক্তকে মাথায় চালান দেওয়া হয়। ইহাতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইবে না ত কি?

১০। নিমন্ত্রণ ভোজন।...গরম দেশে রাত্রে যত কম খাওয়া যায়, স্বাস্থ্য ততই ভাল থাকে। একে ত নিদ্রার সময়ে পরিপাক-শক্তি স্বভাবতঃই কম হয়। তাহার উপরে গ্রীষ্মদেশে ও গ্রীষ্মকালে পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়। এমন অবস্থায় এ দেশে বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত ভুরি-ভোজনটা রাত্রিকালে হওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ কাজ। সাহেবদের পাল্লায় পড়িয়া রাত্রে ভিন্ন অপর কোনও সময়ে আমরা পাঁচজনকে একত্র করিতে পারি না। সুধু এ পর্য্যন্ত হইলেও তাদৃশ দোষের হইত না। তাহার উপরে, যে অনুপাতে আমাদের মন্দাগ্নি জন্মাইতেছি, তাহার বিপরীত অনুপাতে ভোজনের বহরটা... অর্থাৎ ভোজনবিলাসিতা ও লোভ বাড়িয়া যাইতেছে। যেমন-তেমন গৃহস্থের ঘরে ভুরি-ভোজনে এত রকমারি ব্যঞ্জন হয়...বিশেষ করিয়া মাছ ও মিষ্টান্নের...যে আজকাল আমাদের ভোজনটা দেখিয়া বলা বড় শক্ত যে আমরা হিন্দু, কি সাহেব, কি মোগল-পাঠানদের আত্মীয়! তাহার উপরে ভেজাল খাদ্য, সস্তার ঘি তেল প্রভৃতির ব্যবহারের জন্য, সত্য সত্যই আজ কাল ভুরি-ভোজন করিয়া ভাল থাকিলে "ফাঁড়া" কাটিল বলিতে পারা যায়। অধিকাংশ লোকের ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার যে গোড়া-পত্তন এখানেই হয় না, তাহা কে বলিবে?

১১। দিবা-নিদ্রা।···ব্রাহ্মণদিগের উপনয়নের সময়ে গুরু যে আদেশগুলি দেন, তাহার মধ্যে "মা দিবা •সাপ্সী" (দিনে ঘুমাইও না) অন্যতম। আহারান্তে বিশ্রাম করা চাইই; কিন্তু ঘুমাইলেই, অজীর্ণ হইবেই হইবে। কেন না, নিদ্রাকালে স্বভাবতঃই পরিপাক-শক্তি কমিয়া যায়। যাঁহারা আহারান্তে পড়িতে বা কর্ম্ম করিতে ছুটেন, তাঁহাদেরও যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, যাঁহারা আহারান্তে নিদ্রা যান, তাঁহাদেরও সেই পরিমাণে ক্ষতি হয়।

১২। ভাল করিয়া না চিবাইয়া খাওয়া; অত্যন্ত গরম গরম খাওয়া; আজ ৯টায়, কাল বেলা ১টায়···প্রত্যহ ৯৷৷০ টায় খাইয়া রবিবারে বা ছুটির দিন অত্যন্ত বেলা করিয়া খাওয়া; আহারে রুচি নাই তবু খাওয়া; উপরোধে পড়িয়া অনিচ্ছায় বেশী বা অসময়ে খাওয়া; নেশা করা; বহুবার চা ও দোক্তা খাওয়া; আহারের পরে নিয়মিতরূপে এক গ্লাস জল বা ডাব বা সোডাওয়াটার পান করা; নিত্যই পিত্ত বাড়াইয়া আহার করা; প্রভৃতিও ডিস্পেপ্সিয়ার কারণ।

১৩। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া যাঁহাদের গায়ে রক্ত নাই, তাঁহাদের ডিস্পেপ্সিয়া হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। যাঁহারা অনেকবার আমাশয়ে ভুগিয়াছেন; যাঁহাদের যকৃত তাদৃশ কর্ম্মক্ষম থাকে না; যাঁহাদের রক্তে পারার "দোষ" (সিফিলিস্ বা উপদংশ) আছে; এই জাতীয় লোকেরাও ডিস্পেপ্সিয়াগ্রস্ত হন।

১৪। যাঁহাদের অ্যাপেন্‌ডিক্স্ নামক ক্ষুদ্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলস্থ যন্ত্রবিশেষে বারম্বার ব্যারাম হয়; যাঁহাদের পিত্ত-কোষের ব্যাধি আছে; যাঁহাদের বারোমেসে কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু; যাঁহাদের বসিয়া বসিয়া বেশীর ভাগ সময় কাটে—এ জাতীয় ব্যক্তিদিগেরও ডিস্পেপ্সিয়া ধরে।

১৫। ক্রমাগত "নাইট ডিউটি" করিলে ডিস্পেপ্সিয়া হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। অতি মাত্রায় শারীরিক পরিশ্রম করিলেও ডিস্পেপ্সিয়া হয়।

১৬। অম্বলবোধ হইলেই আন্দাজী বেশী করিয়া বাজারের "সোডা" খাইলে পাকস্থলীর সর্ব্বনাশ হয়। বাজারের (এমন কি বিলাতী আমদানী ডাক্তারি) অধিকাংশ তথাকথিত "সোডার" সঙ্গে "কার্ব্বনেট" অফ সোডার অতিমাত্রায় সংমিশ্রণ থাকে।

রোগ-নির্ণয়

সাধারণের মনে ঔষধের উপরে অত্যন্ত বেশী শ্রদ্ধা আছে; সে শ্রদ্ধাটা কতটা আরোগ্যমূলক অভিজ্ঞতার ফল, আর কতটা সুবিধাবাদের ফল, তাহা বলা শক্ত। এক শিশি ঔষধ আনিয়া নিয়ম করিয়া খাওয়া; আর খাইয়া তেমন উপকার না পাইলে চিকিৎসককে অনুযোগ করা, খুব সহজ কাজ। সেই জন্য লোকেরা ঔষধটাকেই বড় করিয়া দেখেন ও বেশী করিয়া খোঁজেন। এবং এই জন্যই ডিস্পেপসিয়া হইলে রোগীরা রাজ্যের "পেটেণ্ট ঔষধ" পেটে পূরিয়া, তবে চিকিৎসকের নিকটে আসেন। তাঁহারা রোগের তাড়নায় বিস্মৃত হন যে, ঔষধের কাজ প্রকৃতিকে সাহায্য করা··· প্রকৃতিকে ছাঁটিয়া বাদ দেওয়া নয়; এবং এই দেহের সমস্ত অংশই অতি সুকুমার··যা'-তা' ঔষধ খাইলে অনেক সময়ে অপকারেরই বেশী সম্ভাবনা। তাহা ছাড়া, খাদ্যেও যেমন ভেজাল বেশী বেশী দেখিতে পাওয়া যায়, ঔষধেরও তদবস্থা দাঁড়াইয়াছে। "পেপ্সীন," "প্যান্‌ক্রিয়াটীন্," "রেনীন্" প্রভৃতি পাচক ঔষধগুলি লোহিত ও ভূমধ্যসাগরের উত্তাপ খাইয়া এ দেশে আসিলে দেখা যায় যে, তাহাদিগের মধ্যে চৌদ্দ আনা রকম ঔষধ নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে—উহাদের দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়া অতি সামান্য মাত্রাতেই সাধিত হয়। বাজারে "সোডা বাইকার্ব্বনেট্" বলিয়া যে ঔষধ চলিত আছে, তাহার সঙ্গে "কার্ব্বনেট" বা সাজিমাটিই সব !!!

তাহার পরে চিকিৎসকদিগের কথা। চিকিৎসক দুই শ্রেণীর দেখিতে পাওয়া যায়; এক শ্রেণীর যথেষ্ট "নাম-ডাক" আছে; তাঁহাদিগের নিকটে বহুসংখ্যক রোগী যায়—কাযেই যত্ন করিয়া দেখিবার বা রোগীর কথা ভাবিবার অবসর তাঁহাদিগের কম। তাঁহারা রোগীর মুখ দেখিলে তাহার মধ্যে রোগের যতটা পরিচয় না পান, "চাঁদীর" পরিচয় তাহার চেয়ে বেশী পান। কাযেই তাঁহারা রোগীর দরজায় এক পা এবং মোটরে আর এক পা রাখিয়া চিকিৎসা করেন—তাঁহারা দেখেন যে, এটি গড্ডালিকার দেশ—লোকে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইবেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর চিকিৎসকদিগের তাদৃশ "পসার-প্রতিপত্তি" না থাকায় লোক সহজে সেদিকে ঘেঁসে না—যে বা যায়, সে মনে করে যে, সে ব্যক্তি সেই চিকিৎসককে বিশেষ রূপে অনুগৃহীত করিতে আসিয়াছেন! ফল কথা, এ দেশের লোকেরা "বিনা পয়সায়" চিকিৎসা

করাইতে চায়—কাজেই অধিকাংশ স্থলে প্রতারিত হয়। এ কথাটা খুলিয়া বলিতেছি।

এ দেশে লোকে এক সের চাউল ক্রয় করিতে হইলে পাঁচটা দোকানে যায়—কাপড় কিনিবার সময়ে, গহনা তৈয়ারি করিবার সময়ে, ছেলেকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার সময়ে, বাড়ী ঘর তৈয়ারি করিবার সময়ে, পুত্রকন্যাদের বিবাহ দিবার সময়ে—এক কথায়, সকল বিষয়েই, বেশ করিয়া জানিয়া শুনিয়া, পাঁচটা পরামর্শ লইয়া তবে কায করে; কিন্তু অসুখ হইলে আপনার ইচ্ছায় যা-তা ছাইভস্ম পেটেণ্ট ঔষধ খায়,—এ-বেলা একজন চিকিৎসককে দেখায়, ও-বেলায় অপর লোকের কাছে যায়—ইত্যাকার করিয়া, ধনে ও প্রাণে মারা যায়। চিকিৎসার জন্য ব্যয় করিতে হইলে, এ দেশের লোকের গায়ে ফোস্কা পড়ে; কিন্তু স্বচ্ছন্দে উকীলের মোটা পেট ভরাইতে কষ্ট হয় না!

যাঁহার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া হইয়াছে, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? তাঁহার সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য—বেশ করিয়া নিজের ব্যারামের সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান সঞ্চয় করা। আজকাল বই কেতাবের অভাব নাই, চিকিৎসকেরও অভাব নাই। মকদ্দমা রুজু করিবার আগে যেমন তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যেক বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দর্শন করা হয়, তদ্বিষয়ে পোষক ও বিরুদ্ধ মতামত সংগ্রহ করা হয়, সলাপরামর্শ করা হয়—নিজের ব্যারামের বিষয়ে তেমনটি হয় না কেন? আর সেইটি হয় না বলিয়াই আমরা যত ঠকি!

ব্যারাম হইলে দ্বিতীয় কর্ত্তব্য—সমস্ত কথাগুলি এবং দৈনন্দিন রিপোর্ট ("ডায়ারির" আকারে) নিয়মিতভাবে লিখিয়া রাখা। এ সম্বন্ধে ১৩৩০ সনের "স্বাস্থ্য" পত্রিকায় "রোগীর রিপোর্ট" নামক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। স্মরণ রাখিতে হইবে যে "রামায়ণ" "মহাভারতের" মত ফেণাইয়া লেখা পড়িবার ধৈর্য্য রোগীর থাকিতে পারে—চিকিৎসকের থাকে না।

ব্যারাম হইলে, তৃতীয় কর্ত্তব্য—নিজের রোগ সম্বন্ধে যথাসম্ভব ওয়াকিব-হাল হইয়া, উক্ত সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট সঙ্গে লইয়া, কোনও সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া। এবং তাঁহাকে দেখাইয়া, নিজ বমন, প্রস্রাব, মল ও রক্ত রীতিমত পরীক্ষা করান চাই। এ বিষয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। আবশ্যক হইলে, রঞ্জন-রশ্মি দ্বারা সমগ্র পরিপাক-যন্ত্রের পরীক্ষা করান চাই। আমি যখন বালক ছিলাম, তখন এক দিন এক সওদাগরী আপিষের বড় সাহেবের সম্বন্ধে সংবাদপত্রে পড়িলাম যে "গত ২।৩ দিন হইতে প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিতে অনিচ্ছা (আলস্য) বোধ হওয়ায়, অমুক সাহেব স্বাস্থ্য লাভার্থ বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাইতেছেন!" তখন এ কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম—সাহেবের 'আধিক্যতা" (আদিখ্যেতা) বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। আর আজ বিলাতে অনেকে বৎসরে বৎসরে রীতিমত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান দেখিয়া, এখন বুঝিতেছি যে, আমরা সুধু "দুধে আঁচান, ঘোলে ছোঁচান"ই জানি—শরীরের যত্ন কি করিয়া করিতে হয়, তাহা আমাদের শিখিতে এখনো অনেক দেরী!

এই সমস্ত পরীক্ষাগুলি হইয়া গেলে তবে চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলিতে হইবে। আমি এখানে প্রেস্ক্রপসন দিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিব না; তবে মোটামুটিভাবে কতকগুলি কথা বলিব।

চিকিৎসা

সমস্ত পরিপাক যন্ত্রের কোন্‌খানটায় রোগ হইয়াছে, সেটা নির্ণয় না করিয়া, সুধু রোগের লক্ষণ শুনিয়া চিকিৎসা করা ভুল। যদি কোনও ব্যারাম সম্বন্ধে "Tis not the *body* but the *man* is ill" এ কথা বলা খাটে, তবে তাহা ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতেই প্রযোজ্য। কাযেই ভাল ল্যাবরেটারীর সাহায্যে বমন, মল, মূত্র ও রক্ত পরীক্ষা করাইয়া তবে চিকিৎসা আরম্ভ করা চলে। মোটামুটি নিম্নলিখিত কথাগুলি অনেক স্থলেই খাটে বলিয়া উহাদিগকে লিখিয়া দিলাম।

(১) খাইবার সময় ঠিক করিয়া লইবে। যদি ৯।৯॥০টায় ক্ষুধা না হয়, খাইও না। দুপুরে বেশ করিয়া খানিকটা বিশ্রাম করিয়া তবে খাইতে পার। কোনও প্রফেসর প্রাতে ৭টায় চা, পাঁউরুটি মাখন ও ডিম খাইয়া ৯॥০টায় অক্ষুধার উপরেই খাইয়া ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত হন। আমার পরামর্শানুসারে, তিনি প্রাতে আরো ২।১ টুকরা রুটি বেশী খাইয়া, বেলা ১টায় ভোজন করিতে আরম্ভ করিয়া সারিয়া গিয়াছেন। তবে এখানে সাধারণভাবে দুইটি কথা বলিব। বেলা ১২টা বাজিয়া গেলে ও রাত্রে ৯টা

বাজিয়া গেলে—কখনো ভাত খাইতে নাই এবং ভরদম্ (পুরাপুরি) কোনও খাবার খাইতে নাই।

(২) প্রত্যহ ভোজন করিয়া দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কোন্ খাবারের ঢেঁকুর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উঠিতেছে ;—অর্থাৎ, কোন্ খাদ্য তোমার পক্ষে গুরুপাক। সেই খাদ্যটিকে যথাসম্ভব ত্যাগ করা উচিত।

(৩) অনেকের পেটে ভাত সহ্য না হইলেও আটা ময়দা সহ্য হয়। ঘৃতহীন অন্ন সহ্য না হইলেও স্বল্প ঘৃতে পাক করা অন্ন সহ্য হয়। সিদ্ধান্ন সহ্য না হইলেও হবিষ্যান্ন সহ্য হয়। শাস্ত্রে ঘৃতহীন অন্নকে নিন্দা করা হইয়াছে। কুকারে চাউল, জল ও সামান্য ঘৃতের ছিটা দিয়া ভাত রাঁধিয়া খাইলে অনেক সময়ে সে খাদ্য বেশ সহ্য হয়। ঘুঁটের "পোড়ে" ভাত রাঁধিয়া সফেণ তাহা খাইলে সহ্য হয়।

(৪) অনেকের মনে হয়, না খাইলে দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে ;—এই আশঙ্কাতে অনেকে রাত্রে খাইয়া কষ্ট পাইলেও তাহা ক্ষণেকের জন্য ত্যাগ করিতে সাহসী হন না। অথচ, খাইয়া সেই খাওয়া পরিপাক না হওয়ার জন্য, সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত হইয়া যে দৌর্ব্বল্য আসে, ২।১ রাত্রি না খাইলে তাদৃশ দৌর্ব্বল্য আসে না। রাত্রের খাওয়া সহ্য না হইলে নানা রকম ফিকির করিয়া দেখা উচিত ; সুধু জল সাগু, "হর্লিক" বা কোকো বা "ওভালটীন," ছানা (চিনি সংযোগে অথবা সুধু), একবাটি মাছের ঝোল বা বোন্সুপ, খৈ, মুড়ি (ঘৃত তৈলহীন), পাঁউরুটির টোষ্ট (মাখনহীন), ২।৪টা ভাল সন্দেশ, কয়েকটা মনক্কা সহ দুধ বা দুধসাগু, ২।৪ খানা বিস্কুট, পাণিফলের পালো সিদ্ধ অথবা পাণিফলের পালোর রুটি, খ্যামাদানা দুধে সিদ্ধ করিয়া ; পাকা পেঁপে ; "জেলি" (jelly)—প্রভৃতি একটা না একটা খাইয়া কিছুদিন কাটাইয়া দেওয়া যায়। অনেক স্থলে, রাত্রে এই ভাবে লঘু পথ্য খাইয়া পাকস্থলীকে বিশ্রাম দিলে ডিস্পেপ্সিয়া আপনিই কমিয়া যায়।

(৫) যাঁহারা অত্যন্ত বেলা করিয়া বা পরিশ্রান্ত হইয়া ভোজন করেন, বা খুব দ্রুত ভোজন করেন, বা যাঁহাদের "অম্ল" হইয়াছে,—এমন লোকরাই আহারে বসিয়া প্রচুর পরিমাণে জল পান করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আহারে বসিয়া বা আহারের ৩।৪ ঘণ্টার মধ্যে কখনো এককালীন, জলীয় কোনও পদার্থ খাইতে নাই। যদি বেশ ভাল করিয়া গণিয়া গণিয়া প্রত্যেক গ্রাসকে একশত বার চর্ব্বণ করিয়া গেলা যায়, তবে কখনো এক ফোঁটা জলের প্রয়োজন হয় না। চিকিৎসা-শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে, মুখের ভিতরের খাদ্যদ্রব্যকে এমন করিয়া চিবাইবে যে, উহা একেবারে এমন তরল হইবে, যেন হঠাৎ গলার ভিতরে আপনিই চলিয়া যায়! আমাদের দেশে একটা কথা আছে—মুড়ি খাইয়া জল খাইতে নাই। কথাটা খুব ঠিক। মুড়িও যে খাদ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, চাউল, তরীতরকারীও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—এ সোজা কথাটা আমরা ভুলিয়া যাই কেন?

(৬) পেট ফাঁপিলে কখনো তাহার উপরে খাইতে নাই। অম্লবোধ হইলে কখনো তাহার উপরে "খাবার চাপা দিবার" দুর্ম্মতি করিতে নাই। অম্লবোধ হইলে অল্প গরম জল খাইলেই উহা কতকটা কমে। তেমন বেশী হইলে ১০।১৫ গ্রেণ হাওয়ার্ডের সোডা বাই কার্ব্বনেট বা ২।১ আউন্স চুণের জল খাওয়া যায়। কিন্তু সব চেয়ে ভাল একপেট গরম জল খাইয়া গলায় আঙ্গুল দিয়া পেটটাকে খালি করিয়া দেওয়া। যাহাদের ডিস্পেপ্সিয়া আছে, তাঁহাদের পক্ষে—প্রাতে শূন্যোদরে একবার এবং বৈকালে শূন্যোদরে দ্বিতীয়বার—পেট ভরিয়া গরম জল খাইয়া পেট ধৌত করা কর্ত্তব্য। সাইফন নল দ্বারা স্বয়ংই তাহা করা যায়। যদি তাহা করা অসুবিধা বা কষ্টজনক হয়, তবে ঐ দুই সময়ে ১৫ গ্রেণ সাইট্রেট অফ সোডা এবং আধসের গরম জল খাইলে, পেট ধুইয়া সেই জল প্রস্রাব হইয়া বাহির হইয়া যায়—রোগী অনেকটা সুস্থ বোধ করেন।

(৭) ডিস্পেপ্সিয়াগ্রস্ত রোগীর পেটে, পায়ে ঠাণ্ডা লাগান অন্যায়।

(৮) শাক, রাঁধা অম্ল, ডাইল, কলা, ডিম ডিস্পেপ্সিয়াগ্রস্তদের না খাওয়াই ভাল। যদি একদম কাঁচা (অথবা বড় জোর পোচ করা) খাইতে পারেন, তবে ডিম খাওয়ায় দোষ নাই। ডিম যত বেশী সিদ্ধ হইবে তত গুরুপাক হইবে। সন্দেশ ব্যতীত ময়রার দোকানের কোনও খাবার খাইতে নাই। পাঁউরুটী খাইতে হইলে, টোষ্ট করা এবং অপেক্ষাকৃত বাসি পাঁউরুটিই প্রশস্ত। দুধ বলক দেওয়া সহ্য না হইলেও ঘন দুধ অনেকের সহ্য হয়। দুধ সহ্য না হইলেও, স্বল্প

পরিমাণে ঘরে-পাতা টাটকা দৈ কাহারো কাহারো সহ্য হয়। ডাল বা ডালের তৈয়ারি ধোঁকা, বড়ি, বড়া, পাঁপর প্রথম প্রথম ত্যাজ্য।

(৯). সিদ্ধপাকে ভোজনই সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। ভাজা, সাঁৎলান প্রভৃতি গুরুপাক। এই জন্য, "একপাকে যা' হয়" (যেমন হবিষ্যান্ন) সেইরূপ খাওয়াই প্রশস্ত। য়ুরোপীয়েরা সিদ্ধ বা ঝলসান মাংস খায়—আর আমরা মসলা দিয়া গুরু-পাক করিয়া খাই—এই জন্য য়ুরোপীয়েরা মাংস খাইয়া পীড়িত হয় না, অথচ আমরা পীড়িত হই!

(১০) প্রত্যহ রীতিমত কোষ্ঠশুদ্ধি হওয়া চাই। "চোকর" সমেত হাতে-ভাঙা আটার রুটি, পেঁপে, বেল, আম, কাঁঠাল, কলা, খেজুর, কিস্‌মিস্‌, মনক্কা, থোড়, এঁচোড়, ওল, কচু, শাক পাতা, পানের সুপারি ও মসলা—এ সমস্তই কোষ্ঠশুদ্ধ-কারক। কিন্তু কোষ্ঠশুদ্ধি না হওয়ার কারণ কি? প্রথম কারণ, এমন খাদ্য খাওয়া, যাহার অসার অংশ কম। এই মাত্র যে যে জিনিসগুলির নাম দিলাম, ইহারা স্বয়ং কোষ্ঠশুদ্ধ-কারক, কারণ, এই খাদ্য-সমূহে অসার অংশ অধিক থাকায়, মলের সহায়তা করে; আর "শুধু মাছের ঝোল ভাত" খাইলে,তাহার অসার (মল) অংশ কম হওয়ায়, কোষ্ঠশুদ্ধি কম হয়। দ্বিতীয়তঃ, নিতান্ত "শুক্‌না" খাইলে, কোষ্ঠশুদ্ধি ভাল হয় না। তৃতীয়তঃ, যাহারা দেহকে ভাল করিয়া খাটায় না, তাহাদের সমস্ত দেহের মাংসপেশী ঢিলা থাকে—এবং অন্ত্রের গায়ের মাংসও ঐ রকম ঢিলা হইয়া যায়। কাযেই, তাহাদের অন্ত্রের ভিতরে মল আর নড়িতে চাহে না। এমত স্থলে, ব্যায়াম করিয়া সমস্ত দেহকে কর্ম্মঠ করা, পেটের পেশীগুলি যাহাতে বেশী খেলে তেমন বিশিষ্ট প্রকারের ব্যায়াম করা, ও পেটে বেশ করিয়া তৈল মর্দ্দন করান উপকারী।

(১১) দাঁত খারাপ হওয়ার জন্যই হউক অথবা রাত-দিন পান সুপারি খাওয়ার জন্যই হউক অথবা তামাকের গুলের গুঁড়া, ছাই প্রভৃতি যা'-তা' দিয়া—যেমন তেমন করিয়া একবেলা দাঁত মাজার দরুণ—যে কারণেই হউক না কেন—মুখে দুর্গন্ধ থাকিলে, ডিস্‌পেপসিয়া সারে না। রীতি-মত দাঁতন বা টুথব্রাস দিয়া সকালে একবার ও রাত্রে শয়নের সময়ে আর একবার—এই দুইবার দাঁত মাজা চাই। "স্বাস্থ্যসমাচারে" "দাঁতের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছি এবং মৎপ্রণীত "ম্যাটি্‌কুলেশন হাইজীনে"ও ইহার সবিশেষ বিস্তারিত আলোচনা পাইবেন।

(১২) আজকাল "পুষ্টিকর" খাদ্য ও "ভাইটামীন"-যুক্ত খাদ্য খাইবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। মল্লিখিত "সুর্য্যিমামা" শীর্ষক প্রবন্ধ গত পৌষ মাসের "স্বাস্থ্যে" প্রকাশিত হইয়াছে। এখানে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে স্থূলভাবে এই কথাটি বলি যে, যাঁহাদের ক্ষয়ের মূর্ত্তি ডিস্‌পেপসিয়ার আকার ধরিয়াছে, তাঁহারা পুষ্টিকর খাদ্য লইয়া আপাততঃ মাথা ঘামাইবেন না। তাঁহারা "ক্ষুদ কুঁড়ো" যাহাই পরিপাক করিতে পারিবেন, তাহাতেই তাঁহাদের পুষ্টি—"সোণাদানা" হজম করিতে না পারিলে, সুধু "পুষ্টি" "পুষ্টি"করিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে?

(১৩) খাদ্য পরিপাকের জন্য এই এই ঔষধগুলির বিশেষ খ্যাতি আছে:—

(ক) নাইট্রো-হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ডাইলিউট্—আহারান্তে ১৫।২০ মিনিট অন্তর ৩০—৬০ ফোঁটা করিয়া ২।৩ ঘণ্টা ধরিয়া খাইতে পারা যায়।

(খ) ডাইলিউট্ নাইট্রো-হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিড ৩০ ফোঁটার সঙ্গে পেপ্‌সিন ২০ গ্রেণ, ভোজনের আধ ঘণ্টা পরে।

(গ) প্যান্‌ক্রিয়াটিন ২০ গ্রেণ
(ঘ) মল্ট ডায়াষ্টেজ ২০ } ১৫ গ্রেণ সোডা বাই-কার্ব্ব সহ, ভোজনের ২।৩ ঘণ্টা পরে।

(ঙ) সিক্রিটোজেন্ ট্যাবলেট আহারের পূর্ব্বে ২।১ টা।

(১৪) মিষ্টসামগ্রী মাত্রেই, ঘৃত, তৈল, গরম মসলা, রাঁধা অন্ন—ইহারা অম্লবৃদ্ধিকারক।

(১৫) ক্ষুধামান্দ্য থাকিলে বিস্‌মাথ্ কার্ব্বোনেট ৫ গ্রেণ, সোডা বাই কার্ব্বোনেট ৫ গ্রেণ, পাল্‌ভ্ রিআই ১ গ্রেণ, পাল্‌ভ্ নাক্‌স্ ভমিকা ৷৷০ গ্রেণ, পাল্‌ভ্ সিনামন্ কোঃ ১৷৷ গ্রেণ একত্রে মিশাইয়া প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা আহারের ১৫।২০ মিনিট পূর্ব্বে খাওয়া যায়।

(১৬) কোষ্ঠ কাঠিন্যের জন্য, রীতিমত প্রত্যহ এ-বেলা ৷৷০—১ আউন্স লিকুইড প্যারাফিন্ এবং ও-বেলায় তাই—যখন সুবিধা, খাওয়ার অভ্যাস করা ভাল। দুই এক দিন অন্তর তিন পাইণ্ট ঈষদুষ্ণ জলের ডুস লইয়া পেট ধৌত করা উচিত। নিয়মিতভাবে ডুস লইলে "বদ অভ্যাস"

হইয়া যাইবে, এ ভীতি অমূলক। যদি শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য বরাবর যষ্টি ব্যবহারে ক্ষতি না হয়, তবে কোষ্ঠবদ্ধতার জন্য ডুস লওয়ায় ক্ষতি কি ?

উপসংহারে বক্তব্য

স্মরণ রাখিবেন—(১) ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ঔষধে সারে না ; ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারে খাদ্য বিষয়ে অবহিত হইলে।

(২) ক্ষুধা হইলে খাওয়া, ক্ষুধার অনুযায়ী খাওয়া এবং সময়ে অসময়ে উপবাস বা অর্দ্ধাশনই যৌক্তিক।

(৩) দুটি বেলা গরম জল খাইয়া পাকস্থলীকে ধোয়া এবং ২।৩ দিন অন্তর ডুস দিয়া পেট ধৌতি পরম উপকারী।

(৪) কষ্টের উপশম ব্যতীত অন্য কোনও কারণে ঔষধ খাওয়া অনুচিত।

(৫) পরিশ্রম করিতেই হইবে। কিন্তু, যে পরিশ্রমে শ্রান্তি আসে, যে শ্রমে অপকার করে। খাইবার অন্ততঃ আধঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে বিশ্রাম করা উচিত ; এবং আহারান্তে দুই ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিতে হইবে···দেহকে শুধু বিশ্রাম করাইলে চলিবে না···মনকেও তাই।

আনমনা

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

সাময়িকী

এবারের 'ভারতবর্ষে'র নিচোলে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তিনি স্বনাম-খ্যাত রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ্যে তিনি কে, এম, বানার্জি (Rev. K. M. Banerji) নামে পরিচিত ছিলেন। কৃষ্ণমোহনের পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১২২১ সালের বৈশাখ-মাসে কৃষ্ণমোহন কলিকাতা শ্যামপুকুরে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তথায় অবস্থান করিয়াই প্রথমে হেয়ার স্কুলে, পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। পিতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় বাল্যে কৃষ্ণমোহনকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ডিরোজিয়ো নামক জনৈক ফিরিঙ্গী-যুবক হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন; তিনি ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে এক নূতন ভাব জাগাইয়া দেন। কৃষ্ণমোহন এই নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থাহীন হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃহীন হইয়া পর বৎসর হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইনি দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত পাদরি ডফ্ সাহেব কলিকাতায় আগমন করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। কৃষ্ণমোহন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর তারিখে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। চারি বৎসর পরে ইঁহার স্ত্রীও খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বন করেন। তাহার পর ১৫ বৎসর ইনি খৃষ্টীয় আচার্য্যের পদে কাজ করেন। ইঁহার যাজন-ক্ষেত্র স্বরূপ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটী গির্জ্জা স্থাপিত হয়। উহা এখনও 'কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জ্জা' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ১৮৫২ হইতে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি শিবপুর বিশপস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাঁহাকে ডি-এল (Doctor of Law) উপাধি দান করেন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সি-আই-ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত, আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটীন, গ্রীক, হিব্রু, উড়িয়া, তামিলী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি ইংরাজী পত্র ও পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। তদ্ব্যতীত ইনি সর্ব্বার্থ-সংগ্রহ, ষড়-দর্শন্ প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নারদ-পঞ্চরাত্র ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১২৯২ সালের ২৯শে বৈশাখ ৭২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

বিগত ১লা ফেব্রুয়ারী দিল্লীর রাষ্ট্রীয় পরিষদে মাননীয় সদস্য শ্রীযুক্ত হরবিলাস সরদা 'হিন্দুবিবাহ আইন' নামে একখানি বিলের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং ২৪শে মার্চ্চের কলিকাতা গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। এই পাণ্ডুলিপির সার মর্ম্ম এই যে—যদি কোন হিন্দু বালিকার বিবাহের দিনে তাহার বয়স ১২ বৎসর পূর্ণ না হয় অর্থাৎ ১২ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি কোন হিন্দু বালিকার বিবাহ হয়—তবে সেই বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। ১৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে যদি কোন হিন্দু বালকের বিবাহ হয়, তবে সেই বিবাহ অসিদ্ধ হইবে। পূর্ণ ১১ বৎসর যে বালিকার বয়স কেবল তাহারই সম্বন্ধে তাহার অভিভাবক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লিখিত দরখাস্ত ও এফিডেবিট করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দিলে সেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে। এই বিলে যে 'হিন্দু' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দু, জৈন, শিখ, ব্রাহ্ম, আর্য্যসমাজী ও বৌদ্ধদিগকে বুঝাইবে। এই আইনের সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা ও বিচার হওয়া প্রয়োজন। আমরা কেবল একটা কথা বলিতে চাই যে, আইন হিসাবে এই পাণ্ডুলিপিতে একটি প্রধান দোষ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐরূপ বিবাহ বন্ধ করিবার কোন উপায়ই ইহাতে নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। শুদ্ধ বিবাহ অসিদ্ধ হইলে যে ঐরূপ বিবাহ বন্ধ হইবে তাহা মনে হয় না। আইনের চক্ষে অসিদ্ধ

হইলে ঐরূপ বিবাহ-জাত সন্তানাদি তাহাদের পিতামাতার সন্তান বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং আইনের যাহা উদ্দেশ্য যে ঐরূপ বিবাহ বন্ধ করা, তাহা সার্থক হইবে না। উপরন্তু ঐরূপ বিবাহ-জাত সন্তানাদির উপরই সম্যকরূপে ঐ অসিদ্ধ বিবাহের দোষ বর্ত্তিবে। এবং বিবাহকারিগণ অথবা যাহাদের উদ্যোগে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহাদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না। মাননীয় এম্, হরবিলাস সরদা মহাশয় এই পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করিবার সময় প্রধান কারণ দেখাইয়াছেন যে, কমবেশী ১২ বৎসর বয়স্কা হিন্দু বালবিধবার সংখ্যা অধিক। অপরিণত বয়সে বালিকার বিবাহ হইলে যে সব কুফল ফলে, তাহাও বোধ হয় দূরীভূত করা এই পাণ্ডুলিপির উদ্দেশ্য। এক্ষণে হিন্দু সমাজ এইরূপ আইন কতদূর গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করুন। "ভারতবর্ষে" হিন্দু কন্যার বিবাহ কোন্ বয়সে হওয়া উচিত, তাহা লইয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে। তবে আইন দ্বারা বিবাহের এইরূপ বয়স নির্দ্ধারণ কতদূর যুক্তিযুক্ত এবং হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত তাহাই পাঠকবৃন্দের বিবেচ্য।

বিশ্ব-কবি, বরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্মতিক্রমে শান্তি নিকেতন বিশ্ব-ভারতী হইতে শ্রীযুক্ত অমিয় চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন—"রবীন্দ্রনাথের "ছিন্নপত্র" বাঙালীর ঘরে ঘরে সমাদর লাভ করিয়াছে। কবির বিভিন্ন সময়ে লেখা বহুসংখ্যক পত্র একত্র চয়ন করিলে সাহিত্যের দিক্ হইতে তাহা যে বিশেষ উপাদেয় হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মনে করিয়া সকলের কাছে আজ আমাদের অনুরোধ, রবীন্দ্রনাথের কোনো চিঠির সংগ্রহ যাঁহার আছে, তিনি যেন তাহা যথাযথ নকল করিয়া তারিখ শুদ্ধ আমাদের পাঠাইয়া দেন, বা কোনো মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশিত করেন। মূল পত্রগুলি কেহ পাঠাইলে তাহা ফেরৎ দিবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিব ; এবং আপত্তি না থাকিলে পত্রগুলি যাঁহাদের নিকট প্রাপ্ত, যথাস্থানে তাঁহাদের নামোল্লেখ থাকিবে।"

বিগত দোলের ছুটীতে [illegible] মুখার্জ্জী সেমিনারী ভবনে বিহারী বাঙ্গালী সাহিত্য সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ছাপরা, ভাগলপুর, মতিহারী, বেতিয়া, পাটনা, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, গয়া প্রভৃতি জেলা হইতে প্রায় শতাবধি প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে নাট্যকলা-সুধাকর অমৃতলাল বসু, রায় বাহাদুর জলধর সেন, অধ্যাপক অমূল্য বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু প্রভৃতি কয়েকজন সাহিত্যিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্মিলনীর দুই দিন অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস সম্বন্ধীয় কয়েকটী সুললিত প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনেই স্থানীয় মহিলাবৃন্দ সুলেখিকা শ্রীমতী অনুরূপা দেবীকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। সাহিত্য সম্মিলনের সহিত একটী শিল্প প্রদর্শনী হয়। এই সাহিত্য সম্মিলন সম্বন্ধে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র-চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন সিংহ, শ্রীযুক্ত হরিসাধন ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত ভূপতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। কেবল ইঁহাদের অসীম উৎসাহ, অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলেই এই সম্মিলনী সফলতা লাভ করিয়াছে। ইঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। স্থানীয় কানাইলাল স্বেচ্ছাসেবক দলেরও নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রতি বৎসরই এই সময় বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণ কোন না কোন স্থানে সমবেত হইবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। আমরা এ প্রকার সম্মিলনীর সাফল্য প্রার্থনা করি।

আমরা অনেক দিন হইতেই ক্রমাগত বলিয়া আসিয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা বলিতে গেলে, কিছুই করেন নাই। প্রবেশিকা, আই-এ, বি-এ প্রভৃতি পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষা গৃহীত হয়, কিন্তু বিদ্যালয়ে বা কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা নাই বলিলেই হয়,—কোন রকমে নাম রক্ষা মাত্র হইয়া থাকে। এমন কি, বাঙ্গালায় এম-এ পরীক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় ভাষার পাঠ্যও নির্ব্বাচিত হইয়াছে, কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয়েও অধ্যাপনার

ব্যবস্থা তেমন হয় নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাদানের যিনি অন্যতম কর্ণধার, সেই প্রবীণ ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর মহাশয় এতদিন পরে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগে বাঙ্গালা শিক্ষা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা আছে, তাহার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আনন্দবাজার পত্রিকায়. লিখিয়াছেন—"বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার স্থান সম্বন্ধে এখনও অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা রহিয়া গিয়াছে। বাঙ্গলায় এম-এ পরীক্ষা চলিতেছে, কিন্তু বাঙ্গলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় যাহা ব্যয় করিতেছেন—তাহা এত সামান্য যে. তাহার উল্লেখ করিতে গেলে কষ্ট ও লজ্জা হয়। আমি এখানে কয়েকটি বিষয়ের তুলনামূলক ব্যয়ের হার দেখাইতেছি। তদ্দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার অবস্থা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। আমরা নিম্নলিখিত বেতনের তালিকায়, কারমাইকেল প্রফেসার (ইতিহাস বিভাগে), মিণ্টো প্রফেসার (ইকনমিকস বিভাগে), এবং কিং জর্জ্জ প্রফেসার (দর্শক বিভাগে), ইহাদেরও বেতন ধরিয়া লইয়াছি। ইতিহাসের দুই বিভাগ আছে—সাধারণ ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস,—এই দুই বিভাগকে আমরা একত্র করিয়া দেখাইয়াছি।

	অধ্যাপকের সংখ্যা	—মাসিক খরচ
ইংরেজী	১৩	৪৫৫০৲
গণিত	১১	৪৩৫০৲
ইতিহাস	২৪	প্রায় ৮০০০৲
ফিলজফি	১১	প্রায় ৫০০০৲
এক্সপেরিমেণ্টাল-সাইকলজি	৮	২৫২৫৲
সংস্কৃত	১৪	৪১০০৲
ইকনমিক্স্	১০	৩৬৭৫৲
বাঙ্গলা	২২	১৮৫০৲

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষার জন্য খরচ সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন, অথচ অধ্যাপকের সংখ্যা খুবই বেশী। ২২ জন অধ্যাপক ১৮৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইয়া থাকেন। কিন্তু এখানে আরও দুই একটি কথা বলিবার আছে। এই যে ২২ জন অধ্যাপক ইহাদের মধ্যে ১২ জন বাঙ্গলা পড়ান না। তাঁহাদের অধিকাংশ লোক অপরাপর বিভাগের অধ্যাপক। তাঁহাদের কেহ পড়ান গুজরাটী, কেহ মালয়ালম, কেহ তামিল, তেলেগু, কেহ হিন্দী, কেহ মৈথিল, কেহ উর্দ্দু, কেহ উড়িয়া, কেহ আসামী, কেহ মারহাটী, কেহ সিংহলী এবং কেহ কেনারিজ। বাঙ্গলা ভাষার উপর এই প্রকাণ্ড বোঝা চাপাইয়া দিয়া এতদুপলক্ষে অপরাপর বিভাগের অধ্যাপকগণ বঙ্গবিভাগের সামান্য টাকার অনেকটা অংশ গ্রহণ করিতেছেন। মোট মাসিক খরচ ১৮৫০ টাকার মধ্যে ৬০০৲ টাকা তাঁহারা বঙ্গভাষা বিভাগ হইতে গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষার জন্য মাসিক ১২৫০ টাকা মাত্র রহিল। এই টাকার মধ্যে আবার প্রাকৃত ও পালী পড়াইবার অধ্যাপকদের বেতন আছে। সুতরাং খাস বাঙ্গালার জন্য কি রহিল তাহা বুঝিতেই পারেন। প্রায় সমস্ত বিভাগেই প্রফেসর আছেন, যাহাদের বেতন ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। বাঙ্গালায় একটি প্রফেসার আছেন, তাঁহার বেতন মাসিক ২০০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়াছেন, সেই অধ্যাপককে আমরা 'প্রফেসার' পদবী দিয়া গৌরবান্বিত করিলাম, কিন্তু প্রফেসারের বেতন তাঁহাকে আমরা দিতে পারিব না। বাঙ্গলা ভাষার উপর তাঁহাদের প্রীতি মৌখিক এ কথা আমরা অবশ্যই বলিতে বাধ্য। অন্যান্য সমস্ত বিভাগেই দুই তিন এবং ততোধিক করিয়া লেকচারার আছেন, তাঁহাদের বেতন ২০০ হইতে ৫০০, বাঙ্গলায় সেরূপ একটি লেকচারারও নাই।

বঙ্গভাষার অধ্যাপকগণ অতি কুণ্ঠিত ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কোণে একটু স্থান পাইয়া কথঞ্চিত ভাবে জীবন রক্ষা করিতেছেন। আধুনিক শিক্ষিত লোকের বিশ্বাস—বঙ্গভাষা একটা কিছুই নহে, ইহার যাহা কিছু গৌরব—তাহা রবিবাবুকে লইয়া; এই বাঙ্গলা ভাষায় এমন কিছু নাই, যাহা পড়াইবার জন্য কোন অধ্যাপকের দরকার হইতে পারে,—কেবল স্বদেশ-প্রীতির বশীভূত হইয়া রীতিরক্ষার জন্য এই ভাষাকে বিশ্বপণ্ডিতদের সভায় স্থান দেওয়া হইয়াছে।"

বিগত ২০শে চৈত্র রবিবার বিপুল আড়ম্বরের সহিত যাদবপুরস্থিত কলেজ প্রাঙ্গণে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা

দিবস উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে টেক্‌নিক্যাল স্কুলের খোলা মাঠে একটী বিশাল মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ছাত্রগণ পত্রপুষ্পাদি দ্বারা এই মণ্ডপ সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। বেলা ১টার সময় হইতেই তথায় বিপুল জনসমাগম হইতে থাকে। অপরাহ্ন ৫টার সময় সেই সভামণ্ডপ বিশাল জনসমুদ্রে পরিণত হয়। অপরাহ্নে অধ্যাপক গুহ এবং তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী শারীরিক ব্যায়াম প্রদর্শন করেন। এই সঙ্গে সঙ্গীতাদির বন্দোবস্তও করা হইয়াছিল। কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া বহুসংখ্যক গণ্যমান্য ভদ্রলোক তথায় সমবেত হইয়াছিলেন। সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় পরিষদের বার্ষিক সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতায় বলেন,—'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সাহায্যে কার্য্যকরী শিক্ষার প্রসার করাই বর্ত্তমানে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যে এ পর্য্যন্ত এই ইনষ্টিটিউটে তিনটী বিভাগ খোলা হইয়াছে। যথা:— মিকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এতদ্ভিন্ন একটি কৃষি-বিভাগ খুলিবার চেষ্টা হইতেছে। এইজন্য একশত বিঘা জমি চাই। কর্পোরেশন এবং ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের নিকট এইজন্য আবেদন করা হইয়াছে। কলিকাতা কর্পোরেশন আমাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এই বৎসর হইতে তাঁহারা বার্ষিক ৩০০০০ টাকা হিসাবে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আজ আমরা যে স্থানের উপর দাঁড়াইয়া আছি, তাহাও কলিকাতা কর্পোরেশন নামমাত্র খাজনা লইয়া ৯৯ বৎসরের জন্য আমাদিগকে বন্দোবস্ত দিয়াছেন। আরও নানা স্থান হইতে আমরা সাহায্য পাইয়াছি। তাহার ফলেই আজ এই প্রতিষ্ঠান এতটা অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। ইহা গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও অনেক কাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। লেবরেটারী পূর্ণাঙ্গ করার জন্য টাকার প্রয়োজন। আরও কতিপয় শিক্ষক নিযুক্ত করা প্রয়োজন এবং সর্ব্বোপরি ছাত্রাবাস সম্প্রসারণ দ্বারা সমস্ত ছাত্রের বাসস্থান এখানে করা প্রয়োজন। তাহা না করিতে পারায় আমাদের উদ্দেশ্যানুরূপ শিক্ষাদানের বিঘ্ন ঘটিতেছে। তারপর এখনও শিক্ষাপরিষদের ঋণের পরিমাণ প্রায় চারিলক্ষ। এই সমস্ত অভাব অভিযোগ পূরণ করা দেশবাসীর উপর। আমি আশা করি দেশের ধনী, মানী ভদ্রমহোদয়গণ এদিকে মনোযোগ দিবেন এবং যাহাতে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার উপায় করিবেন।'

যাদবপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ গবর্ণমেণ্ট কিম্বা বিদেশী কর্ত্তৃক পরিচালিত কলকারখানায় চাকুরী পান না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এদিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"স্থায়ী আয়ের জন্য তোমরা বড় ব্যস্ত। একটি চাকুরী পাইলেই তোমরা বাঁচিয়া যাও। ইহা তোমাদের ভুল ধারণা। যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন, নিজে নিজে ব্যবসায় করিতে শিখ। সেই জন্যই তো এখানে তোমাদিগকে হাতেকলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। চাকুরী খুঁজিতে গিয়া তোমরা এই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া থাক। তোমরা বলিবে মূলধন কোথায়? আমার মনে হয়, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ও একাগ্রতা থাকিলে মূলধনের অভাব হয় না। মনে রাখিবে—এই দুইটি গুণই জীবনে সাফল্যলাভের সোপান।"

বিগত ২০ শে ও ২১ শে চৈত্র বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-সভার একটী অধিবেশন কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট ভবনে মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় কলিকাতা ও মফঃস্বলের অনেক হিন্দু সমবেত হইয়াছিলেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে তাঁহার ন্যায় সুধী, মনীষী, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের উপযুক্ত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধের একটী অংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বর্ত্তমান অস্পৃশ্য ব্যক্তির উন্নয়ন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবু বলিয়াছেন—

"আমাদের নিজের দিক্ হ'তে কেহ কেহ হয়ত আপত্তি করবেন—এ তোমরা কর্‌চ কি? হিন্দু ধর্ম্ম ত' কোনদিন প্রচারক ধর্ম্ম (Proselytising religion) ছিল না—যে হিন্দু-গণ্ডীর বাহিরে সে বাহিরেই থাকুক—এমন কি যদি সে একপুরুষেরও অহিন্দু হয়, যদি সে নিজেই যৌবনের ভ্রান্তিবশে

বা প্রলোভনে প্র[illegible] গ্রহণ ক'রে থাকে, এবং এখন অনুতপ্ত চিত্তে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে স্বধর্ম্মে ফিরে আসতে চায়, তথাপি তাকে আমরা জোর করে বাহিরেই রাখব। ভাল কথা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এ কি হিন্দুর উপযুক্ত কথা? আর জিজ্ঞাসা করি, এ কি ভারত-ইতিহাসের সমঞ্জস কথা? রাজপুতনার অগ্নিকুল ক্ষত্রিয়, কোকনের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ এবং ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের শাকদ্বীপী বিপ্রের কথা নাই বা তুলিলাম। কিন্তু গারো, নাগা, কোল, ভিল প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতি এবং কেরল, কুরুম্বা প্রভৃতি আর্য্যেতর জাতির কথা মন থেকে কি ক'রে মুছে ফেলি? তা' ছাড়া যদি চিন্তা রথে চ'ড়ে ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন যুগে বিচরণ করি, তবে কি দেখতে পাই? সেই সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে যখন আর্য্যজাতি এই ভারতবর্ষে উপনিবিষ্ট হ'ল, তখন তারা একটা সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির ও ভিন্ন রকমের সভ্যতার সংস্পর্শে এল। কিছুদিন দ্রাবিড়দের সঙ্গে খুব সংঘর্ষ চল্‌ল—অনার্য্য জাতি 'দাস' 'দস্যু' এই সব আখ্যায় আখ্যাত হ'তে লাগল; কিন্তু কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই অনার্য্যেরা আর্য্যসমাজের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করলে—এমন কি অনার্য্য দেবতারা পর্য্যন্ত আর্য্যদের মণ্ডলীর মধ্যে আসন পেতে বস্‌ল। কিছুদিন পরে শোনা গেল যে, আর্য্যদের যে 'শেবধি'—সাধনার নিধি বেদ—শূদ্রদের তা থেকেও বঞ্চিত করা হবে না।

যথেমাং বাচং কল্যাণীম্ আবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চরণায়॥

যজুঃ, ২৬।২

আপস্তম্ব তখনকার আর্য্য সমাজে প্রচলিত রীতির অনুসরণ ক'রে সূত্র করলেন—ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণম্ আপদ্যতে জাতিপরিবৃত্তৌ। বস্তুতঃ যে জাতি উল্লিখিত ভাবে ভাবিত হয়, যে ভগবানের ব্যাপকতা ও জীবের ঘনিষ্ঠতা—Immanence of God and Solidarity of man অনুভব করতে পারে, তার মন থেকে গণ্ডী ও গোষ্ঠীর সংকীর্ণতা দূর হ'য়ে চিত্ত-বীণায় একটা উদাত্ত উদার সুর নিয়ত ঝঙ্কৃত হ'তে থাকে; সে দ্বৈপায়ন (Insular) থাকতে পারে না, সে আন্তর্জ্জাতিকতা বা Internationalism এর জন্য উৎসুক হয়।

কেহ কেহ আশঙ্কা করছেন যে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন করলে ও শুদ্ধির প্রচলন করলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হ'বে। এ আশঙ্কা আমি অমূলক মনে করি। যে বিকৃত বর্ণাশ্রমের ফলে ধর্ম্ম ঠাকুরঘর ছেড়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করছেন (স্বামী বিবেকানন্দ যাকে ছুঁৎধর্ম্ম বলতেন) হয়ত ঐ বিকৃত ধর্ম্মের গায়ে একটু আধটু আঁচ লাগতে পারে; কিন্তু প্রকৃত বর্ণাশ্রম—ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্মের এতে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণতা হবে না।"

ঢাকা 'মুস্‌লিম সাহিত্য-সমাজের' বার্ষিক সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত তসদ্দক আহ্‌মদ মহাশয় যে অভিভাষণ করিয়াছিলেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই যুক্তিপূর্ণ। আমরা সেই সুন্দর অভিভাষণের কয়েকটী স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বাঙ্গালা ভাষাই যে বঙ্গীয় মুসলমানগণের মাতৃভাষা, এই সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—"বাঙ্গালা যে আমাদের মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখনও হয় নাই। তবু নাকি এই বাঙ্গালা দেশে এমনও অনেক মুস্‌লিম আছেন যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমান বোধ করেন! তাঁহারা নাকি বলেন "শরিফ" অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদ্‌লাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব, "অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদ্‌লাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমান-জনক হইবে?" এই বাঙ্গালা দেশের লোক সংখ্যা ৪,৭৫, ৯২, ৪৬২, তার মধ্যে ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন মুস্‌লিম নরনারী। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন এই এতগুলি মুস্‌লিম নরনারীর ঘর, বাড়ী কাটিয়া খাট, বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, জমি জিরাত সিন্দবাদের ন্যায় স্কন্ধে লইয়া "শরাফত হাসেল" করিবার জন্য যেখানে বাঙ্গালা ভাষা নাই এরূপ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কি সম্ভবপর? অপর পক্ষে উর্দ্দু ভাষাকে বাঙ্গালাদেশের পল্লীগ্রামসমূহে কলমের জোরে চালাইবার যে নিষ্ফল প্রয়াস কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহা ও বোধ হয় আপনাদের অনেকের নিকট অবিদিত নহে।"

বাঙ্গালী মুস্‌লিমের সাহিত্যের অভাব সম্বন্ধে মাননীয় সভাপতি মহাশয় যে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, আমাদের মুস্‌লিম স্বদেশবাসীদিগের তাহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—"এক সম্প্রদায় বলেন, "আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যে ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাঙ্গালা নয়; উর্দ্দু, পারশী, আরবী-বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।" কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। আমির হাজমা বা হাতেম তাইয়ের পুঁথি, 'কাসাসুল-আম্বিয়া বা সোনাভানের পুঁথি যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোনকালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

সাহিত্য জিনিষটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাঙ্গালা দেশে আমরা হিন্দু-মুস্‌লিম দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন করিবার জন্য ও পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয় আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যখন বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতি সন্তানের দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ গঠিত, পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হইতেছিল তখন আমরা কেবল সমরখন্দ ও বোখারা, আরব ও ইস্পাহানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে যেমন অদুরদর্শী জননায়ক-গণের প্ররোচনায় পড়িয়া আমরা "কাফের" হইবার ভয়ে ইংরাজী ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, বাঙ্গালা ভাষার উদ্বোধনকালেও আমরা সেইরূপ দূরে দাঁড়াইয়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছি, আর পরের গালি খাইয়া নীরবে হজম করিয়াছি। আমি এখানে সেই হোসেনশাহী যুগের মুস্‌লিম কবিগণের কথা উত্থাপন করিতেছি না, কারণ যদিও তাঁহারা এখন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের খোরাক যোগাইতেছেন, তথাপি সমাজের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিবার জন্য আমাদের সাহিত্য-জীবনকে কতদূর কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ করিয়াছেন, তাহা আমাপেক্ষা আপনারাই নিশ্চয় ভাল বুঝিবেন। আসল কথা, প্রধানতঃ যে উপাদানে দিয়া সাহিত্য-জীবন গঠিত হয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে আমাদের বহু কালক্ষয় হইয়াছে; এখনও সম্যক্ উপলব্ধি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা হয় আপনাদের ন্যায় অনুষ্ঠানের যতই বৃদ্ধি হইবে, ততই পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমরাও জনসমাজের অপর দশজনের ন্যায় আদৃত, সম্মানিত হইতে থাকিব।"

তাহার পর শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—"সাহিত্যসৃষ্টির জন্য যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয় এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান, তাহাকে তর্কের জালে আছন্ন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন? মানুষের ভাবসমুদ্রে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয় তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমার মাতৃভাষাতেই প্রথম মূর্ত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্য ভাষাতে হইবে? হইতে পারে ইংরাজী আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দ্দু, আরবী, পারশী আমাদের ধর্ম্মের ভাষা; কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্য উহাদের একটিও ত উপযুক্ত নহে। ইংরাজী শিখিলে আমাদের সংসার-জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদ্‌ঘটন হইতে পারে; উর্দ্দু, আরবী, পারশী শিখিলে আমরা ইস্‌লামের তত্ত্ব ও তথ্যসমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য, কিন্তু যখন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে, আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ন্যায় আমারই এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে, তখন তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হয়, আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না, কারণ ইতিপূর্ব্বে ইহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই আপনাদের নিকট নিবেদন করিলাম।"

উপসংহারে সভাপতি [illegible]শিয় যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহার দিকে বাঙ্গালা দেশের হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন—"বঙ্গীয় মুস্‌লিম সমাজের এখন যে ঘোর দুর্দ্দিন, তাহাতে অসার কল্পনার দাস হইয়া আল্‌নশকরের আকাশ কুসুম গড়িয়া কালক্ষয় করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আল্লাহ্‌তালা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার ষোল-আনা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ধরুন শিশু-সাহিত্য; মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে আমাদের দেশের সেই পুরাতন কথকতা, গৃহে বৃদ্ধাদিগের সেই কেচ্ছা-কাহিনী সবই লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্র সরকার, সুকুমার রায় চৌধুরীর ন্যায় আমাদের মুস্‌লিম সমাজে কয়জনের আবির্ভাব হইয়াছে? যা দুই একজন দেখা দিতেছেন, তাঁহারাও যথেষ্ট সহানুভূতি পাইতেছেন কিনা সন্দেহ। বালকদিগের জন্য জলধর সেনের ন্যায় পাকা লেখকও কলম ধরিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই; কিন্তু আমরা সে দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছি বলিয়া মনে হয় না; অথচ শৈশব এবং কৈশোরই ভাল বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। চরিত লেখকই বা সে রকম আমাদের মধ্যে কই? বসওয়েল, হালি, যোগীন্দ্র বসুর ন্যায় চরিতাখ্যায়ক কি আমাদের বঙ্গীয় মুস্‌লিম সমাজে জন্মিতে নিষেধ আছে? ওমর খাইয়ামের অনুবাদ করেন কান্তিবাবু, নরেন্দ্র বাবু; কোরান ও হাদিসের অনুবাদ করেন গিরীশ বাবু। আমরা কবে আমাদের মহামূল্য রত্নরাজি অনুবাদের সাহায্যে পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব? বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্‌," একবালের "তারণা" আমাদের মধ্যে কবে শুনি? রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান কথা, দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্য কৌতুক, রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, দিলীপকুমারের সঙ্গীত চর্চ্চা, পুলিন দাসের লাঠি খেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই আমাদের সাধনার ফল পাইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, দার্শনিক হইতে না পারি, জগদীশ বোস বা প্রফুল্লচন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইতে না পারি, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক হইতে না পারি, কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ছোট হইবে কেন? খোদার আরশ টলাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া যদি আমাদের প্রকৃত অভাবমোচনে সকলে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে বদ্ধপরিকর হই, তাহা হইলে সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না।"

ভারতে লৌহের এবং ইস্পাতের কারবার ক্রমেই পুষ্টিলাভ করিতেছে। ১৯২৪ সনে ভারত গবর্মেণ্ট এই শিল্পের রক্ষার জন্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেই সরকারী সাহায্যই ভারতীয় লৌহ-শিল্পের এই পুষ্টি-সাধনের অন্যতম কারণ। যুদ্ধের সময় লোহার ও ইস্পাতের বাজার বড়ই চড়িয়াছিল। তাহার পর এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, অনেকে মনে করিয়াছিলেন, আর বুঝি চলে না। টাটার কারখানাই ভারতের একমাত্র বৃহৎ লোহার কারখানা। এত বড় বিরাট কারখানা এদেশে আর নাই। কিন্তু টানের মুখে এই কারখানাও টলমল। ভারত গবর্মেণ্ট সেই সময়েই বাউন্টি দিতে সম্মত হন। তাহা ছাড়া, রক্ষা-শুল্কও নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তাই আবার এই কারবার বেশ গুছাইয়া উঠে। এখন গবর্মেণ্ট লৌহ-কারবারে আর সাহায্য করিবেন কিনা এইরূপ কথা উঠিয়াছিল। তাই কারবারের অবস্থার সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান টারিফ-বোর্ড বা ভারতীয় শুল্ক-সভা তদন্তে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বোর্ডের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে।

তাহার মোট কথা এই যে,—লৌহ ও ইস্পাতের কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য গবর্মেণ্ট গত ১৯২৪ সন হইতে যে রক্ষা-শুল্ক প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা আরও সাত বৎসর কাল বাহাল রাখিতে হইবে; অর্থাৎ আগামী ১৯৩৪ সনের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই রক্ষা-শুল্ক বাহাল রাখা হউক,—ইহাই শুল্ক-বোর্ডের সুপারিশ। কিন্তু বোর্ড "বাউন্টি" অর্থাৎ সরকারী দান বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই সাত বৎসরের পরে, ভারতের লোহার কারখানার অবস্থা এতই ভাল হইবে যে, তখন আর সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন,—টাটার কারখানার ইস্পাতের জিনিষের কাটতি ক্রমেই বাড়িয়াছে। ১৯২৩-২৪ সনে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন ইস্পাতের জিনিষ জামসেদপুরে টাটার কারখানায় তৈয়ারী হইয়াছিল; ১৯২৬-২৭ সনে সম্ভবতঃ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন জিনিষ তৈয়ারী হইবে।

বোর্ডের মতে আগামী সাত বৎসরে এই কারখানার কাজ আরও বাড়িবে; ১৯৩৩-৩৪ সনে সম্ভবতঃ ৩ লক্ষ টন মাল তৈয়ারী হইতে পারিবে। ফলে, ভারতে ইস্পাতে তৈয়ারী জিনিষের দরও অনেক কমিয়া যাইবে। আপনা হইতেই কারবার চলিবে ভাল; সরকারী রক্ষা-শুল্ক পর্য্যন্ত প্রয়োজন হইবে না। বোর্ড বাউন্টি একেবারেই বন্ধ করিয়া দিতে বলিয়াছেন এবং রক্ষা-শুল্ক ৩৪ টাকার স্থানে ১৩ টাকা করিতে বলিয়াছেন। শুল্ক-বোর্ডের সুপারিশগুলি অবশ্য এখনও গবর্মেণ্ট মঞ্জুর করেন নাই। তবে, এ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এক বিল পেশ করা হইয়াছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'শ্রীকান্ত' তৃতীয়পর্ব্ব প্রকাশিত হইল ১॥০

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীচরণ সেন প্রণীত "বৈদ্য" মূল্য—।০

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "তরুণী" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত চরণদাস ঘোষ প্রণীত "হিঁদুর বৌ" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত নাটক "দ্রৌপদী" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত "মনের বল" মূল্য—১৲

শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত প্রণীত "ঋগ্বেদ ২য় ভাগ" মূল্য—২॥০

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত "সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনস্মৃতি ও বক্তৃতা" মূল্য—৪৲

নিবেদন

'ভারতবর্ষ' আগামী আষাঢ় মাসে পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৵০, ভিপিতে ৬॥৵০ ষাণ্মাসিক ৩৷৵০ আনা, ভিপিতে ৩৷৵০। এই জন্য ভিপিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভিপির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়, সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২৫শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভিপি করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **গ্রাহক নং** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়।

দ্রষ্টব্য—চতুর্দ্দশ বর্ষের 'ভারতবর্ষে'র একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকপাঠিকাগণের গোচর করিতেছি। এই বৎসর ২০০০ পৃষ্ঠাব্যাপী পঠিতব্য বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে; এতদ্ব্যতীত বহু ব্যঙ্গচিত্র, একাধিক বর্ণচিত্র ৬০ খানি ও একবর্ণ চিত্র ন্যূনাধিক ১২০০ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে এই চতুর্দ্দশ বর্ষে কি প্রবন্ধ-বৈচিত্র্যে, কি ত্রিবর্ণ চিত্র, কি একবর্ণ চিত্র—সর্ব্ব বিষয়েই উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিভিন্ন বিভাগের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখকগণ 'ভারতবর্ষে'র সেবা করিয়াছেন;—বাঙ্গালাদেশে কেন, ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশেরই কোন মাসিকপত্রই এত আয়োজন করিতে পারিয়াছে কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিয়া দেখিবেন।

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
Of Messers. Gurudas Chatterjea & Sons.
201, Cornwallis Street, Calcutta.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.

অভিমন্যু

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৪

দ্বিতীয় খণ্ড | চতুর্দ্দশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বেদ ও গীতা

শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ

বেদের সহিত গীতার সম্বন্ধ বিচার করিতে গেলে প্রথমেই দেখা যায়—গীতা যেন বেদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২ হইতে ৪৪ শ্লোক পর্য্যন্ত গীতা বেদবাদীগণের প্রতি তীব্র শ্লেষ করিয়াছে; এবং ৪৫ শ্লোকে স্পষ্টই বলিয়াছে—

ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।

—"ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির খেলাই বেদের আলোচ্য বিষয়; অর্জ্জুন, তুমি ত্রিগুণের অতীত হও।" আর এক স্থানে গীতা বলিয়াছে, জ্ঞানী ব্যক্তি বেদ ও উপনিষদকে অতিক্রম করেন,—শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে।

গীতার ন্যায় উদার, সার্ব্বজনীন, উচ্চ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র এইরূপে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূল, আর্য্য শিক্ষা-দীক্ষার মূল বেদকে নিন্দা করিতেছে, অবহেলা করিতেছে, ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি? বাস্তবিক আমরা যদি ভাল করিয়া দেখি, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিব যে, গীতা বেদকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছে; এবং কার্য্যতঃ গীতার যে শিক্ষা, তাহার মূল তত্ত্বগুলির অধিকাংশই উপনিষদ হইতে এবং উপনিষদের মূল বেদ হইতেই গৃহীত। গীতা নিজেই বেদের মহত্ত্ব পরে স্বীকার করিয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ১৫ অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—

বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্বেদবিদেবচাহম্।

"সকল বেদে আমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়,—আমিই বেদের কর্ত্তা, আমিই বেদের জ্ঞাতা।" গীতার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, কেবল গীতার সমগ্র শিক্ষার সহিত মিলাইয়া গীতার প্রত্যেক অংশের অর্থ করিতে হইবে। কোন একটি শ্লোক দেখিবামাত্র গীতার অর্থ সম্বন্ধে যদি আমরা কোন সিদ্ধান্ত করিতে যাই, তাহা হইলে আমরা পদে পদে ভুল করিব।

এক স্থানে গীতা বেদকে নিন্দা করিতেছে বলিয়া মনে হয়; এবং আর এক স্থানে গীতা বেদকে শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, জ্ঞানের শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত কথা এই যে, বেদের বিকৃত অর্থ করিয়া, বেদের ধর্ম্ম প্রকৃতভাবে না বুঝিয়া, যাহারা বেদের দোহাই দেয় এবং বেদের নামে লোকের বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করে—গীতা কেবল সেই বেদবাদরতাঃ ব্যক্তিগণকেই নিন্দা করিয়াছে। কিন্তু, গীতা, নিজে বেদের শিক্ষার নিগূঢ় মর্ম্মের সন্ধান দিতে অগ্রসর হইয়াছে—অতএব, গীতা বেদের বিরোধী নহে, বরং গীতাকে বেদের শ্রেষ্ঠ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাই আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন, "তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমাত বেদার্থ সার-সংগ্রহভূতং"—এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সার-সংগ্রহ-স্বরূপ। স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার বক্তৃতায় এক স্থানে এই কথাই বলিয়াছেন—"The only commentary, the authoritative commentary on the Vedas, has been made once and for all by Him who inspired the Vedas, by Krishna in the Gita"—"বেদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ভাষ্য হইতেছে গীতা। যিনি বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়ে বেদের আলোক জ্বালিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং গীতাতে বেদের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহাই বেদের শেষ ও চরম ব্যাখ্যা।"

বর্ত্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের ব্যাখ্যা করিতে যেরূপ গলদ্ঘর্ম্ম হইতেছেন, তাহাতে স্বামীজী বিবেকানন্দের কথাটা একটু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। বেদের এক একটা ঋক্, এক একটা মন্ত্র বা কথা লইয়া কত বাদানুবাদ করা যায়, কতরকমের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা করা যায়—সে সব চেষ্টা না করিয়া কেবল গীতা পড়িলেই বেদের মর্ম্ম বুঝা যাইবে, এ কেমন কথা? বাস্তবিক, বেদের আলোচনা করিয়া যাঁহারা পাণ্ডিত্যের প্রকাশ করিতে চান, তাহাদের জন্য স্বামীজী নিশ্চয়ই ঐ কথা বলেন নাই। আর যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন, আর যত পরিশ্রমই করুন না কেন—বৈদিক যুগে ঋষিগণ কখন কি অর্থে কি শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোথায় তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল, লক্ষ্য কি ছিল—সহস্র সহস্র বৎসর পরে এত দিনে সে সব সঠিক নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব—বেদ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিয়াই তাহা বেশ বুঝা যায়। বৈদিক যুগ হইতে আমরা এত দূরে সরিয়া আসিয়াছি, আমাদের মন, প্রাণ, বুদ্ধি, চিন্তা, ভাব, সেই যুগের মানুষ অপেক্ষা এত বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—যে বেদের আদিম অর্থ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করিবার আশা দুরাশা মাত্র। আমরা নিজেদের মনের মত করিয়া বেদের ব্যাখ্যা করিব, ফলে শিব গড়িতে বাঁদর গড়িব। বর্ত্তমানে বেদের যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা বাহির হইতেছে, তাহাদের সম্বন্ধে এই কথা বেশ প্রয়োগ করিতে পারা যায়। তাহা হইলে কি বেদ পড়িয়া কোন লাভ নাই? বেদ হইতে কি আমরা কোন সাহায্য পাইতে পারি না? সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের মূল স্বরূপ বুঝিতে, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিতে, ভবিষ্যতের পথ নির্ণয় করিতে, বেদ হইতে কি আমরা কোন আলোকই পাইতে পারি না? হাঁ, পারি—বেদ পড়িয়া লাভ আছে—কিন্তু, পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য বেদ পড়িয়া কেবল মস্তিষ্কের চালনা ভিন্ন অন্য কোন লাভই নাই। বৈদিক ঋষিদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গীটা কি ছিল, মানব-জীবনের নিগূঢ় রহস্য সম্বন্ধে কি সব গুহ্য কথা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন এবং মানব-জীবনকে ঊর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবার জন্য কি উপদেশ, কি সঙ্কেত তাঁহারা রাখিয়া গিয়াছেন—মোটামুটি এই সব জানিবার জন্য বেদ পড়িয়া লাভ আছে। কিন্তু, কেবল বুদ্ধি বিচারের দ্বারা এই নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝা সম্ভব নহে। যাঁহারা সাধনার বলে বৈদিক ঋষিগণের ন্যায়ই কতকটা অন্তর্দৃষ্টি পাইয়াছেন, তাহাদের পক্ষেই বেদের নিগূঢ় মর্ম্ম জানা সম্ভব। গীতাতে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। গীতা বেদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিবার কোন চেষ্টা করে নাই,—গীতাকার দিব্য আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বেদ-নিহিত সনাতন সত্যগুলি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে আধ্যাত্মিক জীবনের এক নূতন শাস্ত্র, নূতন বেদ প্রণয়ন করিয়াছেন। অতএব, গীতাকে বেদের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বলিলে কোন অত্যুক্তি হয় না।

বেদাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা লইয়া যে মতভেদ, তাহাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। পথের সন্ধান দেওয়াই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; কিন্তু যখন আমরা অতি মাত্রায় শাস্ত্রের অধীন হইয়া পড়ি, তখন আমাদের ভিতরে সকল শাস্ত্রের কর্ত্তা, সকল শাস্ত্রের বেত্তা স্বয়ং ভগবান যে রহিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া কেবল শাস্ত্র-বিচারে মগ্ন হইয়া পড়ি। সকল শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এই অন্তরস্থিত ভগবানকে জানা, তাঁহাকে জানিলে আর কিছু জানিতে বাকী থাকে না। শাস্ত্র যখন বিচার-

বিতর্কের জালে সেই ভগবানকেই ঢাকিয়া ফেলে, তখন তাহা বিষবৎ পরিত্যজ্য। এইজন্যই গীতা সকল শাস্ত্রের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছে—"সমস্ত দেশ জলপ্লাবনে ভাসিয়া গেলে, সামান্য কূপের জলের যতটুকু প্রয়োজন—অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই নাই।" বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি শ্রুতি শাস্ত্রের আলোচনায় বুদ্ধি যে বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠিতে পারে—গীতা "শ্রুতি বিপ্রতিপন্না" কথার দ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছে। অতএব, বেদাদি শাস্ত্র লইয়া মাথা না ঘামাইয়া, যাহাতে ভিতরে জ্ঞানের আলো লাভ করিতে পারা যায়—সেই চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। গীতা তাহারই সরল, সহজ পথ দেখাইয়া দিয়াছে। গীতা বিচার-বিতর্কের পথ না ধরিয়া, দিব্য-দৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক সত্য সকল গ্রহণ করিয়া, সাধন-জীবনের এমন পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যাহার অনুসরণ করিলে ক্রমশঃ সাধকের অন্তর ভিতর হইতেই আলোকিত হইয়া উঠিবে,—জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা; সে বেদ উপনিষদ অতিক্রম করিবে,—শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে। অতএব, বেদাদি শাস্ত্রকেই পরম বস্তু বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই।

গীতা বেদার্থের সার সংগ্রহ করিয়াছে বলিয়া এমন বুঝিতে হইবে না যে, বেদে যাহা আছে, গীতাতে তাহার অধিক আর কিছুই নাই। বাস্তবিক সত্য এক ও সনাতন হইলেও দেশে দেশে যুগে যুগে তাহার প্রকাশ বিভিন্ন,—রূপ বিভিন্ন। যুগ-যুগান্তরের ভিতর দিয়া সত্যের পূর্ণ প্রকাশের লীলা চলিয়াছে—সত্য অনন্ত, সত্যের প্রকাশও অনন্ত। অতএব, কোন যুগে, কোন দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে যে জগতের সমস্ত সত্য নিঃশেষে কথিত হইয়াছে, কিম্বা কোন যুগাবতার ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা ছাড়া বলিবার বা ভাবিবার কিছু নাই—এরূপ ধারণা নিতান্ত অপরিপক্ক ও সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির ফল। অবশ্য বেদের ন্যায় আধ্যাত্মিক সত্যের আকর ধর্ম্ম-শাস্ত্র জগতে আর কোথাও নাই। সনাতন সত্যসমূহ বীজ-রূপে বেদে নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু, বৈদিক যুগে তাহাদের যেরূপ প্রকাশ হইয়াছে, তাহাই যে চিরকালের জন্য, তাহা ছাড়া যে আর কিছুই নাই, ইহা বলিলে নিতান্ত ভুল হইবে। বেদকে ভিত্তি করিয়া উপনিষদ আধ্যাত্মিক সত্য প্রকাশে অনেক অগ্রসর হইয়াছে; আবার, বেদ ও উপনিষদকে ভিত্তি করিয়া গীতা আরও অগ্রসর হইয়াছে। গীতা শিক্ষার মূল বেদ ও উপনিষদে রহিয়াছে;—কিন্তু গীতা এমন তত্ত্বের সন্ধান দিয়াছে, যাহা বেদ উপনিষদে পাওয়া যায় না। গীতার পুরুষোত্তম-তত্ত্ব এই রূপ তত্ত্ব। বীজ-রূপে ইহা উপনিষদে নিহিত আছে বটে, কিন্তু, গীতাতেই ইহার পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে। আবার বেদে যজ্ঞের যে ব্যবস্থা, যে বর্ণনা আছে, কালক্রমে তাহাতে নানা গ্লানি প্রবেশ করে। উপনিষদের যুগে বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড লইয়া খুব বিরোধ হয়। গীতাও বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে তীব্র নিন্দা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মহাভারতের যুগে বৈদিক যাগযজ্ঞের খুবই অবনতি হইয়াছিল। শান্তিপর্ব্বে যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক স্থানে বলিয়াছিলেন যে, কালক্রমে বৈদিক অনুষ্ঠানসমূহ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এই বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন ভারতের বৈদিক যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপের পুনরাবির্ভাব করাইতে যান, তাঁহারা ইহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। যাহাই হউক, গীতা ক্রিয়াবিশেষ-বহুল বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির প্রকাশ্য নিন্দা করিয়াছে (২য় অধ্যায়—৪২-৪৪)। কিন্তু, তাই বলিয়া গীতা যজ্ঞকে একেবারে উড়াইয়া দেয় নাই—বরং এক স্থলে গীতা বলিয়াছে—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

"যজ্ঞার্থে যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা ব্যতীত সকল কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, অতএব, তদর্থে (অর্থাৎ যজ্ঞার্থে) কর্ম্ম কর—"। ২য় অধ্যায়ে যজ্ঞের নিন্দা করিয়া গীতা আবার ৩য় অধ্যায়েই যজ্ঞের প্রশংসা করিয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষ্যকারগণ এখানে যজ্ঞ শব্দের বিষ্ণু বা ভগবান অর্থ করিয়াছেন। যজ্ঞার্থে কর্ম্মকে ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম বলা যাইতে পারে বটে; কিন্তু, গীতা এখানে সোজাসুজি ঈশ্বরার্থ কথাটি ব্যবহার না করিয়া যজ্ঞার্থ শব্দ কেন ব্যবহার করিল তাহা বুঝিয়া দেখা কর্ত্তব্য। বাস্তবিক, ভাসাভাসি অগভীর ভাবে দেখিলে, অনেক স্থলেই মনে হয়, যেন গীতার শিক্ষা বিরোধ ও অসামঞ্জস্যে পরিপূর্ণ। গীতাকারও যে ইহা জানিতেন না তাহা নহে; কারণ, তিনি অর্জ্জুনের মুখে বার বার এই প্রশ্নই তুলিয়াছেন—ব্যামিশ্রেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়-সীব মে। গীতায় কখনও কর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছে, কখনও জ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছে, কখনও যজ্ঞের নিন্দা করিয়াছে,

কখনও যজ্ঞ ছাড়া আর সকল কর্ম্মেরই নিন্দা করিয়াছে,—এই ভাবে গীতা শিষ্যের বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে; এবং ক্রমশঃ এই সব বিরোধের যে সামঞ্জস্য করিয়াছে, তাহা অতি উচ্চ ও উদার। গীতা যেমন সাংখ্যযোগ ও কর্ম্ম-যোগের মধ্যে বিরোধের সমন্বয় করিয়াছে, তেমনিই বেদের মধ্যেই জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের যে বিরোধ, গীতা তাহারও সমাধান করিয়াছে; এবং এইরূপে জ্ঞান ও কর্ম্মের পূর্ণ সমন্বয় করিয়া অপূর্ব্ব কর্ম্মযোগের শিক্ষা দিয়াছে।

বেদ বলিতে সাধারণতঃ প্রাচীন যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া-কলাপের শাস্ত্রই বুঝায়; অন্ততঃ, বেদের বিখ্যাত ভাষ্যকর্ত্তা সায়ণাচার্য্য যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কেমন করিয়া যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া দেবতাগণকে তৃপ্ত করিতে হয়, এবং এইরূপে তৃপ্ত দেবগণের নিকট হইতে নানা কল্যাণ লাভ করিতে পারা যায়—বেদে তাহারই বর্ণনা আছে। বেদ সম্বন্ধে এইরূপ ধারণাকেই গীতা বেদবাদ নাম দিয়াছে। ইহার বিপরীত যে ধারণা তাহাই ব্রহ্মবাদ। বাস্তবিক, যখন গীতা রচিত হয়, তাহার পূর্ব্বে বহু দিন ধরিয়াই বেদের অর্থ লইয়া দ্বন্দ্ব ও মতভেদ চলিতেছিল; এবং সে দ্বন্দ্বের দুইটি প্রধান মীমাংসা হইয়াছিল—একটী মীমাংসা পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং অপরটি উত্তর-মীমাংসা। বেদের মধ্যেই উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই বেদের জ্ঞানকাণ্ড; এবং বেদের মধ্যে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের যে খুঁটিনাটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাই বেদের কর্ম্মকাণ্ড। বেদের এই দুই কাণ্ডের মধ্যে বিরোধ বহু দিন হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া যাঁহারা বলিলেন যে, যাগযজ্ঞাদিই প্রধান ব্যাপার, বিধিসঙ্গত ভাবে এই ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই ইহলোকে ধন, পুত্র, জয়, সর্ব্ব প্রকার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারা যায়, এবং পরলোকে স্বর্গ ও অমৃতত্বলাভ করিতে পারা যায়; এবং ইহাই বেদের মূল শিক্ষা—তাঁহাদের মীমাংসার নামই পূর্ব্ব-মীমাংসা। আর যাঁহারা বলিলেন যে, এই সব যাগযজ্ঞাদি অতি নীচের ব্যাপার,—কেবল প্রথমাবস্থায় ইহাদের কিছু প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা আছে—কিন্তু, মানুষকে পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করিতে হইবে, ব্রহ্মকে জানিতে হইবে; এবং এইরূপেই মানুষ প্রকৃত অমৃতত্ব ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবে—তাঁহাদের মীমাংসার নামই উত্তর-মীমাংসা। বলা বাহুল্য যে, বেদের মূল শিক্ষা সমগ্র ভাবে ধরিতে না পারিয়াই এইরূপ বিরোধের উদ্ভব হইয়াছিল—একদল লোক কর্ম্মের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন, আর এক দল জ্ঞানের দিকে ঝোঁক দিয়াছিলেন। কিন্তু, বেদের মধ্যে বস্তুতঃ এই বিরোধ নাই। গীতা বেদের মূল দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুসরণ করিয়া এই বিরোধের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে।

গীতা যজ্ঞের মর্ম্ম কিরূপ বুঝাইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলেই আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সমন্বয় কার্য্যে গীতা কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। গীতা নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্ট কামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ
তৈর্দ্দত্তান্ অপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

৩।১০—১৩

সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহিত প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছেন, "এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ কর;—এই যজ্ঞই তোমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করুক। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবগণকে সম্বর্দ্ধন কর; সেই দেবগণও তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন; এইরূপে পরস্পরের সম্বর্দ্ধন করিতে করিতে তোমরা পরম মঙ্গললাভ করিবে। যজ্ঞের দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন; এই দেবদত্ত ভোগ লাভ করিয়া যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোর। যাঁহারা যজ্ঞাবশেষ অন্ন ভোজন করেন, তাঁহারা সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কিন্তু যাহারা কেবল আপনার জন্যই অন্নপাক করে, সেই পাপিষ্ঠগণ পাপই ভোজন করে।"

বেদে যজ্ঞ কাহাকে বলে, গীতার এই বর্ণনা হইতে সংক্ষেপে তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়; এবং মনে হয় যে, গীতা এখানে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেই উপদেশ দিয়াছে।

কিন্তু, এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান ত কেবল প্রাচীন কালে ভারতেই প্রচলিত ছিল—তাহা হইলে গীতা কি সর্ব্ব-দেশের, সর্ব্ব-কালের মানুষের উপযোগী ধর্ম্মশিক্ষা দেয় নাই? গীতার ন্যায় সার্ব্বজনীন, উদার ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে আর কোথাও নাই। গীতা কোথাও এমন শিক্ষা দেয় নাই, যাহা সকল দেশের, সকল যুগের মানুষের পক্ষে প্রজুয্য নহে। দুই এক স্থানে গীতা যে প্রাচীন ভারতের রীতি, নীতি, আচার, অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছে, তাহা কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ; কিন্তু এই সব দৃষ্টান্তের অন্তর্নিহিত যে শিক্ষা তাহা সর্ব্বত্রই উপযোগী। গীতা এখানে কর্ম্মের নীতি বুঝাইতেছে। কর্ম্ম কি ভাবে করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হইবে না, মানুষকে ক্রমশঃ আত্মোন্নতির পথে লইয়া যাইবে—গীতা তাহারই নির্দ্দেশ করিতেছে। এখানে গীতার শিক্ষার মূল কথাটা এই যে, এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। এখানে কেহ একা থাকিতে পারে না, জীবন-যাত্রায় কেহ একা অগ্রসর হইতে পারে না। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হয়, পরস্পরকে পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ইহাই সৃষ্টির সনাতন নিয়ম। আদি কাল হইতে এই ভাবে আদান-প্রদানের ভিতর দিয়াই মানুষ ক্রমশঃ পরম কল্যাণের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। জগতের যখন ইহাই সনাতন নিয়ম,—যাহারা এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে, সংসার হইতে নিজের জন্য সাহায্য গ্রহণ করে, অথচ অপরের সাহায্যের জন্য কোনরূপ আত্মদান করে না—তাহারা পাপী, তাহারা চোর, তাহারা জগতের অনিষ্টের কারণ; অতএব, জগতের সনাতন নিয়মের বলে তাহাদের জীবন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হইবে। অতএব, সকল সময়ে নিজেকে জগতের কল্যাণের নিমিত্ত উৎসর্গ করিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই sacrifice, ইহাই উচ্চ জীবন লাভের মূল নীতি। শুধু ইন্দ্রিয়ভোগের জন্য, স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিও না,—জগতের কল্যাণের জন্য, সকলের কল্যাণের জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, সর্ব্বভূতহিতের জন্য কর্ম্ম কর, তাহাই যজ্ঞার্থে কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম করিতে করিতে তোমার যে সুখ, যে ভোগ লাভ হইবে, তাহা তোমার পক্ষে অমৃতের সমান হইবে। সেই ভোগ সুখের ভিতর দিয়া তুমি সমস্ত কলুষ, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ। উচ্চ জীবন লাভের এই সনাতন নীতিই যজ্ঞের রূপকের ভিতর দিয়া সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করা হইয়াছে। বেদে সর্ব্বত্রই এইরূপ পদ্ধতি। অন্তর্জীবনের কথাসমূহ, বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। বৈদিক সমস্ত যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপের এইরূপ দুইটা দিক আছে—একটা আধ্যাত্মিক, একটা বাহ্যিক। বাহ্যিক অনুষ্ঠান ঠিক ভাবে আচরণ করিতে পারিলে, ক্রমশঃ ভিতরের সত্যটা ফুটিয়া উঠে; এবং এই ভাবে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করিয়া মানুষ শ্রেয়ঃ পথে অগ্রসর হয়।

কিন্তু, যাহারা বলে যে, বাহ্যিক অনুষ্ঠানই সব, ইহা ছাড়া আর কিছু নাই,—নান্যদস্তিতিবাদিনঃ, তাহারা অবিপশ্চিতঃ—অজ্ঞানী। অনেক লোকে বেদের এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা করে। তাহাদের মতে অন্তর্জীবনের কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই, আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধির কোন প্রয়োজন নাই—কেবল নিয়মমত, বিধিমত কতকগুলা যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলেই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যাইবে। কিন্তু, বেদ এরূপ যাদুবিদ্যার শাস্ত্র নহে, ঝাড় ফুঁক মন্ত্রের শাস্ত্র নহে—বেদ গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের শাস্ত্র। যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের রূপকের মধ্য দিয়া বেদ সেই জ্ঞান সকল যুগের সকল মানুষের জন্য রাখিয়া গিয়াছে। গীতা বেদের অনুষ্ঠানাদির এই নিগূঢ় মর্ম্ম ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিয়াছে।—চতুর্থ অধ্যায়ে গীতা নানা প্রকারের যজ্ঞের বর্ণনা করিয়াছে। সেখানে স্পষ্টই বলিয়াছে যে, এই সব বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান আধ্যাত্মিক জ্ঞান, তপস্যার রূপক। অগ্নিই যজ্ঞের প্রধান জিনিস, কিন্তু এই অগ্নি কেবল জড় অগ্নি নহে। গীতা কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি ব্রহ্ম (৪।২৪), কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি সংযম, কোথাও বলিয়াছে এই অগ্নি ইন্দ্রিয়। গীতার এই ব্যাখ্যা স্বকপোল-কল্পিত নহে। বেদের মধ্যেই আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, যজ্ঞের অগ্নি কেবলমাত্র জড় অগ্নি নহে, অগ্নি তপঃ-শক্তি আবাহন-শক্তি, দৃষ্টিময় কর্ম্ম-শক্তি—অগ্নিই সত্য, অগ্নির দিব্যশ্রবণে বিচিত্র জ্ঞান পূর্ণপ্রকটিত—

অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্র শ্রবস্তমঃ।—ঋগ্বেদ।

বেদোক্ত যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবতাগণকে পরিতৃপ্ত করিলে যে নানা অভীষ্টসিদ্ধি লাভ হয়, স্বর্গলাভ হয়, গীতা তাহা অস্বীকার করে নাই। নবম অধ্যায়ে গীতা বলিয়াছে—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।

তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্র লোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

তবে, বাসনাপরায়ণ ব্যক্তিগণ যাগযজ্ঞাদির দ্বারা এই যে সকল ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সুখ লাভ করে, তাহা গীতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। গীতার সর্ব্ব-প্রথম শিক্ষা হইতেছে বাসনা ত্যাগ। গীতা যে দিব্য-জীবনের সন্ধান দিয়াছে, তাহার কাছে স্বর্গ-সুখ তুচ্ছ। তাহার ক্ষয় নাই, পুণ্যের শেষ হইলে সেখান হইতে পতিত হইবার কোন ভয় নাই।

বেদে যে নানা দেবতার পূজা উল্লিখিত আছে, গীতা তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নাই বা তাহাদের পূজা একেবারে নিরর্থক বলে নাই। তবে, গীতা দেখাইয়াছে যে, ঐ সকল বিভিন্ন দেবতা সেই এক শ্রেষ্ঠ দেবতা পুরুষোত্তমেরই বিভিন্ন রূপ। যাহারা ভোগসুখের জন্য বিভিন্ন দেবতার পূজা করে, তাহারা জানে না যে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক সেই একমাত্র ভগবান পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিতেছে—এবং তিনিই বিভিন্ন দেবতারূপে ঐ সকল ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া থাকেন (গীতা ৭।২১,২২)। কিন্তু, যাঁহারা সেই একমাত্র পুরুষোত্তমের আরাধনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করেন—

দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।

গীতা যে বলিয়াছে, বিভিন্ন দেবতাগণ একই ভগবানের বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন শক্তি—ইহা বেদেরই কথা। যাঁহারা বলেন, বেদ বহু দেবতার পূজা প্রচার করিয়াছে—বেদে এক ভগবানের সন্ধান নাই, তাঁহারা বেদের প্রকৃত অর্থের কোন সন্ধানই রাখেন না। বেদই স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছে—একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।

গীতা অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক আদর্শের সন্ধান দিয়াছে, দিব্য জীবন লাভের পথ দেখাইয়াছে; তাই নীচের স্তরের বাহ্যিক অনুষ্ঠানসমূহ তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছে। কিন্তু, নিম্ন অধিকারীদের পক্ষে এইরূপ বাহ্যিক অনুষ্ঠানের যথেষ্ট উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। যাহারা সর্ব্বদা নিজেদের ভোগসুখের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অপরের সর্ব্বনাশ করিয়াও নিজের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া যাইতেছে—তাহারা ঘোর পাপী—অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো। এই স্তরের উপরে উঠিতে হইলে যজ্ঞার্থ কর্ম্মের নীতি অবলম্বন করিতে হয়। দেবতাগণকে অর্পণ করিয়া যে কামোপভোগ করা যায় তাহা উচ্চস্তরের, তাহা একেবারে অবিমিশ্র কাম্যপরায়ণতা নহে। ইহারও উপরে উঠিতে হইলে কামনা ও আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হইবে এবং এইরূপ কর্ম্মের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করা যায়।—পরমাপ্নোতি পুরুষঃ। গীতা এই শেষোক্ত কর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছে। শেষ প্রকারের কর্ম্মকেও যজ্ঞ বলা যাইতে পারে এবং গীতার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।—সাধারণ যজ্ঞে আমরা বাসনা কামনা সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেবতার অর্চ্চনা করি। কিন্তু, ক্রমশঃ এইভাবে দেবোদ্দেশ্যে যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিতে করিতে আমাদের অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়, ইন্দ্রিয়গণ সংযত হয়, জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ আমরা উপলব্ধি করি যে, ব্যক্তিগত ভাবে আমাদের কোন কর্ত্তৃত্বই নাই, আমরা কিছুই করি না;—প্রকৃতিই সব করিতেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু কর্ম্ম হইতেছে সে সমস্তই প্রকৃতির দ্বারা সম্পাদিত মহাযজ্ঞ। সেই যজ্ঞের ফলভোক্তা আমরা নই, সে যজ্ঞের একমাত্র ভোক্তা ভগবান, —"অহং হি সর্ব্ব যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" আমরা আমাদের মূল সত্তায় সেই ভগবানের সহিত এক,—আমাদের প্রকৃতি, বিশ্বপ্রকৃতিরই একটা যন্ত্র বা একটা আধার। আমাদের ভিতর দিয়া প্রকৃতি নানা কর্ম্মরূপ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছে, ভগবান তাহার ফল ভোগ করিতেছেন—যখন আমাদের ইহা উপলব্ধি হয়, জ্ঞান হয়, তখনই আমাদের হয় শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞান যজ্ঞ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥

গীতা বৈদিক যজ্ঞকে এইরূপে গূঢ়, উদার, বিস্তৃত অর্থ দিয়াছে—বাহ্যিক যজ্ঞ হইতে আরম্ভ করিয়া, যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধ মুক্ত হইয়া ক্রমশঃ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা পরমা গতি লাভ করা যায়—

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িত কল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥

অতএব, গীতোক্ত শিক্ষায় অতি বাহ্যিক বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠানও বৰ্জ্জিত হয় নাই—গীতা কেবল তাহাদের স্থান ও

উপযোগিতা দেখাইয়া দিয়াছে।—মানুষ যখন নীচের স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বাহ্য বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে, ভিতরের দিকে ফিরিবার অভ্যাস নাই, ক্ষমতা নাই, আত্মার সন্ধান যখন সে পায় নাই, আধ্যাত্মিকতার মর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হয় নাই—তখন তাহার এই ইন্দ্রিয়-লালসাকে নিয়মিত ও সংযত করিতে হইবে বাহ্যিক যজ্ঞের দ্বারা। কেবল স্বার্থের জন্য সমস্ত কর্ম্ম না করিয়া দেবতাদের উদ্দেশে পূজাদিরূপে কিছু ত্যাগ করিয়া দেবতাদের দান স্বরূপ কামোপভোগ কর। এইরূপে ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া জ্ঞান লাভ করিবে। তখনই এই বাহ্যিক যজ্ঞের অন্তরালে যে নিগূঢ় সত্য নিহিত আছে, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া অমৃতের, অর্থাৎ দিব্য ভোগ, দিব্য আনন্দের অধিকারী হইবে।

গীতা যদি ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে সংযত করিবার উপায় স্বরূপ কেবল বৈদিক যাগযজ্ঞেরই নির্দ্দেশ করিত, তাহা হইলেও গীতার শিক্ষা সার্ব্বজনীন হইত না। কিন্তু, গীতা তাহা করে নাই। গীতা কেবল বলিয়াছে, নিয়তং কুরুকর্ম্মত্বম্—"নিয়ত" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় বিচ্ছৃঙ্খলভাবে কর্ম্ম না করিয়া, কোন উচ্চ আদর্শ, কোন বিধি বা ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া কর্ম্মসমূহকে নিয়মিত সংযত কর। বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান এইরূপ নিয়ত কর্ম্মের একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। যে ব্যক্তি বেদের কোন খবরই রাখে না, বৈদিক যাগযজ্ঞানুষ্ঠান কখনও করে নাই—সে যদি দেশের হিতের জন্য নিজের স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ করে, দরিদ্রের সেবা, আর্ত্তের সেবা, সর্ব্বভূতের সেবার জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, সংযম স্বীকার করে—এইরূপ যে কোন্ উচ্চ আদর্শ অনুসরণ করিয়া নিজের প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করে, নিয়মিত করে—তাহাকেই "নিয়ত কর্ম্ম" বলা যায়।—এইরূপ নিয়ত কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়। তখন কর্ম্মসকল আর কোন বিশেষ শাস্ত্র, কোন বিশেষ ধর্ম্ম বা আদর্শের দ্বারা নিয়মিত করিতে হয় না,—তখন সকল ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের উপরে উঠা যায়—তখন স্বয়ং ভগবান সাক্ষাৎভাবে আমাদের কর্ম্ম সকলকে নিয়মিত করেন। তখনই আমাদের সমস্ত কর্ম্মফল, সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণভাবে ভগবানে সমর্পিত হয়, তখনই আমাদের যজ্ঞ সম্পূর্ণ হয়।

উপনিষদের যুগে এক দিকে একদল লোক বাহ্য যাগ-যজ্ঞাদি, বাহ্যকর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। আর একদল লোক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানের আলোচনাকেই প্রধান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু, ইহার কোনটিই বেদের প্রকৃত আদর্শ নহে। বেদ শুধু বাহ্যিক যাগযজ্ঞাদির শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই, অথবা আধ্যাত্মিক জ্ঞানকেই চরম বস্তু বলিয়া গ্রহণ করে নাই। উচ্চ আধ্যাত্মিক জ্ঞানের আলোকে কেমন করিয়া আমাদের সমস্ত জীবনকে, কর্ম্মকে আলোকিত করিতে হয়—ভগবানের দিব্য গুণ, দিব্য শক্তি সকলের (ইহারাই দেবতা) আরাধনা করিয়া মানুষের মধ্যেই তাঁহাদের বিকাশ করিতে হয়, কেমন করিয়া দেবজীবন লাভ করিয়া ইহলোকেই অমৃতের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারা যায়—তাহার ব্যবহারিক প্রণালী শিক্ষা দেওয়াই ছিল বেদের নিগূঢ় লক্ষ্য। বেদের এই মহান্ আদর্শ অনুসরণ করিয়াই গীতা অপূর্ব্ব যোগ সাধনার রহস্য প্রচার করিয়াছে।

মা

শ্রীনলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

যে নামিত সন্ধ্যারাগে বাড়ায়ে চরণ
সে কি শুধু রূপকথা, ক্ষুদ্র দীপালোকে
টানিয়া জড়ায়ে দিত স্নিগ্ধ আবরণ,
চাহিতাম মুখপানে বিস্মিত পুলকে।
রূপের দেশের রাণী, রূপে ঢল ঢল,
মুখখানি চেনা চেনা, দেখিনু যে তারে
কোথায় রূপের দেশে সেথানে কেবল
মা ব'লে আঁকিতে হয় মানব-সুতারে।
তরুলতা তৃণশীর্ষে সহস্র মাণিক
আপনি জ্বলিয়া ওঠে মা ব'লে ডাকিলে,
কণ্ঠে দোলে মতি হার হীরকের চিক,
মা আমার কতবার কোলে তুলে নিলে।
চক্ষে নিরমল দীপ্তি বক্ষে শুধু স্নেহ,
কখন যে আসে যায় নাহি জানে কেহ।

পথের শেষে

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১৬)

বীথি এত কাছে থাকিয়াও কেমন ভাবে অনেক দূরে চলিয়া গেল, অনিল কিছুতেই আর তাহার নাগাল পাইল না। স্বামী-স্ত্রীর এই মনোভঙ্গের কথা জানিয়াছিল একা রমা, আর কেহই জানিতে পারে নাই।

বীথি যেমন অনিলের আচরণে মর্ম্মপীড়া পাইতেছিল, তাহার আচরণে অনিলও তাহাপেক্ষা কম মর্ম্মপীড়া পায় নাই। বীথিকে সে যেমনটী চাহিয়াছিল তেমনটী পায় নাই। বিবাহের আগে তাহারও বুঝিতে ভুল হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, বীথি মায়ের নিকট শিক্ষা পাইয়াছে, মায়ার আচার-ব্যবহার সে লইয়াছে; কিন্তু বিবাহ শেষে তাহার এ ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। সে দেখিল, বীথি পুঁথিগত শিক্ষা পাইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতিগত শিক্ষা সে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা তাহার সংস্কার পূর্ণ সংসারের মধ্য হইতে বিভিন্ন; দিদিমার সংস্কার তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

এ ছাড়া ভারি একরোখা স্বভাব তাহার। অনিল যাহা ভাল বলে, বীথি তাহা কিছুতেই ভাল বলিতে পারে না। অনিল যেমন ভাবে তাহাকে সাজাইয়া বাহির করিয়া আত্ম-তৃপ্তি লাভ করিতে চায়, তাহা বীথির কাছে অত্যন্ত খারাপ বলিয়াই ঠেকে। এরূপ স্ত্রী লইয়া কি সংসার-যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করা যায়? এ বিবাহের ফলে সুধা উঠে নাই, উঠিয়াছিল গরল। স্বামী স্ত্রী দুজনের কেহই সুখী হইতে পারে নাই, দুজনেই অনুতপ্ত হইতেছিল।

তবুও বীথি এখানে সেই স্বামীর সকল অন্যায়ই সহ্য করিয়াছিল। অন্তর যখন কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চাহিত—সে মনকে বুঝাইত—স্বামী দেবতা। দিদিমার প্রদত্ত এই মন্ত্র সে অহোরহ জপ করিয়া মনকে নরম করিয়া রাখিত, অনুর্ব্বর হইতে দিত না। এই উর্ব্বর হৃদয়-ক্ষেত্রে স্বামী-প্রেমের বীজ ছড়াইলে এক দিন তাহা মহা মহীরুহ হইতে পারিবে, তাহার এইরূপ আশা ছিল।

কিন্তু এবার আর বীথি সহ্য করিতে পারিল না। তাহার অন্তরে যে সত্য নারী ছিল সে গর্জ্জিয়া উঠিতেছিল। স্বামীর নিকট হইতে এরূপ ব্যবহার পাইবার আশা সে কখনই করিতে পারে নাই, কোন নারীই করিতে পারে না।

না, এ অপমান নারী হইয়া সে কখনই সহ্য করিবে না। জগতে যে নারীর স্বামী বই আপনার আর কেহ নাই, সেই স্বামীরই এ কি বিশ্বাসঘাতকতা! এই স্বামীকে আর বিশ্বাস করিতে পারা যায়? এই স্বামীর উপর আপনাকে নির্ভর করিয়া আর থাকিতে পারা যায়?

অনিলকে দেখিলেই তাহার মনের মধ্যে যেন রাবণের চিতা জ্বলিয়া উঠিতেছিল,—তাহার মনের কালো ছায়া মুখের উপর ঘনাইয়া উঠিতেছিল। স্ত্রীর মুখের উপর মনের ঘৃণা

পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে দেখিয়া অনিলও দূরে দূরে ছিল, কাছে আসিবার সাহস তাহার হয় নাই।

দিন তিন চার উভয়ের মধ্যে একটা কথাও চলে নাই। বীথি প্রাণপণে অনিলকে এড়াইয়া চলিতেছিল,—অনিলের মুখের দিকে সে ভাল করিয়া তাকাইতেও পারিতেছিল না।

সে দিন রাত্রে বাড়ীতে অনিলের কয়টী বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল। তাহার সহিত যাহাই হোক, বন্ধুদের সম্বর্দ্ধনা যে বীথি করিবে এবং আহারের তত্ত্বাবধান সে নিজেই করিবে, অনিল ইহাই আশা করিয়াছিল, কিন্তু বীথি মোটে এ দিকে ঘেঁসিল না।

গৃহের মধ্যে একটা সোফায় শুইয়া পড়িয়া বীথি একখানা বই দেখিতেছিল। রমা নিকটে মেঝেয় বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল। রাত্রি তখন অনেক হইয়া গিয়াছিল, নিমন্ত্রিতগণ চলিয়া গিয়াছেন।

ভেজানো দরজা ঠেলিয়া অনিল প্রবেশ করিবামাত্র রমা ধড়ফড় করিয়া উঠিল। বীথি বইখানা পাশে ফেলিয়া উঠিয়া বসিল। রমা বলিল, "আমি ও-ঘরে যাচ্ছি দিদিমণি।"

"না, তুমি বস রমা—"

কয়েকটা দিন আগেও স্বামীকে সে এতটুকু সঙ্কোচ করে নাই। আজ বীথি ভাবিতেছিল, অনিলের অনেক অনুনয়-বিনয় সত্বেও সে যে তাহার বন্ধুদের অভ্যর্থনা করিতে যায় নাই, ইহাতে নিশ্চয়ই অনিল রাগ করিয়াছে এবং তাই সে হয় তো গোটাকত অপ্রিয় কথা শুনাইবার জন্যই আসিয়াছে। এই সময়টা আপনাকে নিঃসহায়া কল্পনা করিয়া সে হতাশ হইয়া উঠিয়াছিল; তাই সে রমাকে ধরিয়া রাখিল।

অনিল টেবলের নিকট হইতে একখানা চেয়ার সরাইয়া একটু দূরে লইয়া গিয়া বসিল; স্থির দৃষ্টিতে সে শুধু বীথির পানে তাকাইয়া রহিল, একটা কথাও বলিল না।

বীথি মুখ নত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—সেও একটা কথাও বলিল না।

"বীথি—"

অকস্মাৎ এই আহ্বানটা কাণে আসিবামাত্র বীথি চমকাইয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া দেখিল, স্বামী তাহার পানে তেমনি পলকহীন নেত্রে চাহিয়া আছেন।

"শোনো, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

রমা অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আমি যাই।"

অনিল বলিল, "হ্যাঁ, তুমি যেত পার রমা, তোমার এখন এখানে থাকবার বিশেষ দরকার নেই।"

বীথি রমার গমনে বাধা দিয়া বলিল, "না, তুই থাক রমা। ওর সামনে সকল কথাই চলতে পারে। আমার এমন কোনও কথা নেই যা রমা জানে না।"

অনিল অতিরিক্ত গম্ভীর হইয়া বলিল, "তোমার না থাকতে পারে বীথি, আমার সে রকম গোপনীয় কথা থাকতে পারে। রমা, আমি বলছি, আমার কথা শোনো, খানিক-ক্ষণের জন্যে তুমি অন্য ঘরে যাও, তার পর এসো।"

রমা বাহির হইয়া গেল।

অনিল চেয়ারখানা সরাইয়া বীথির কাছে লইয়া আসিল। বীথি পরিত্যক্ত বইখানা কোলে তুলিয়া লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল।

"আচ্ছা বীথি, বার-বার আমায় এমন করে অপমানিত করা তোমার উচিত কাজ হচ্ছে কি, তাই আমি আজ তোমায় জিজ্ঞাসা করতে চাই।"

বীথি মুখ তুলিল, শান্ত সুরে বলিল, "কি অপমান করেছি?"

বড় দুঃখের মধ্যেও অনিল হাসিল, "কি রকমে যে করছ, তা এতখানি বুদ্ধি নিয়েও তুমি যে বুঝতে পারছ না, এ আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে বই কি বীথি! আমারই অদৃষ্ট-বশে বুদ্ধিমতী হয়েও তুমি বুদ্ধিহীনা হয়ে পড়েছ।"

বীথি জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকমে করেছি সেটা আগে বলে দাও! তোমার কথা এক-রকম ভাবের যা চট করে বুঝতে পারা যায় না।"

অনিল ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "সেদিন যে তুমি ক্লাব হতে একা পালিয়ে এসেছিলে, এ কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে; সবাই জিজ্ঞাসা করছেন,—এ কথা কি সত্যি যে, তুমি সেই অন্ধকার রাত্রে একা অতখানি পথ ছুটে বাড়ী এসেছ? কথাটা এমনি যে মানুষে হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারে না; অথচ যে যে তোমায় অত রাত্রে পথে ছুটতে দেখেছে, তারা প্রমাণও দিচ্ছে। বলব কি বীথি, আমার যেন মাথা কাটা যাচ্ছে,—আমি কারও কাছে মুখ তুলে কথা বলতে পারছি নে।"

উঙ্গভাবে বীথি বলিল, আমি যে পালিয়ে এসেছি, "সেটা লোকে জেনেছে; কিন্তু কেন যে পালিয়ে এসেছি, তা কেউ

জানে না,—আশ্চর্য্য কথা। যদি কারণটা তাঁরা জানতে পারতেন, তা হলে নিশ্চয়ই বলতেন—একলা ও-রকম ভাবে পালিয়ে এসে আমি বুদ্ধিমতীর কাজই করেছি। নারীর নারীত্ব যেখানে দানবের কামানলে আহুতি স্বরূপ নারীর রক্ষাকর্ত্তা স্বামী কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হয়ে থাকে, সেখানে নারীকে লজ্জা সরম ভয়ের দিকে তাকালে তো চলে না,—সকল বাধা দুর্ব্বল দুটি হাতে ঠেলে ফেলে তাকে এমনি করেই মুক্তির পথে ছুটতে হয়। আত্মরক্ষা—ধর্ম্মরক্ষা করতে মেয়েরা সবই করতে পারে, সেটা সবাই জানেন,—সতীর সতীত্ব সম্বন্ধে কেউই উদাসীন নন। তখন আত্মসম্ভ্রম-বোধ থাকে না, প্রাণের ভয় থাকে না, শুধু মনে হয়—কি করে ধর্ম্ম রক্ষা করা যাবে। এঁদের এ কথাটা জানিয়ে দেওয়া উচিত—একা নারী অমন করে অত রাত্রে কেন পথ ছুটেছিল।"

অকস্মাৎ রুষ্ট হইয়া উঠিয়া অনিল বলিল, "হ্যাঁ, কাল হতে সকলকেই এই কথাটা বলে বেড়াব। তার পর আজকের কথাটা, আজকের ব্যবহারটা তোমার কি রকম হয়েছে সেটা ভেবে দেখেছ?"

একটু নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিয়া, স্থির দুটি চোখের দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর ন্যস্ত করিয়া বীথি বলিল, "হ্যাঁ—সবই বুঝে দেখেছি, বুঝেছি বলেই আমি ওদিকে যাই নি। আমি তোমার স্ত্রী, তুমি আমার স্বামী; জানো তুমি—আমার মানসম্ভ্রম সবই তোমার হাতে; কিন্তু তুমি এমনই অবিবেচক—স্থান পাত্র বিবেচনা না করে যেখানে সেখানে আমায় টেনে নিয়ে যেতে চাও। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে ভাবটা সচরাচর সকলের মধ্যেই দেখা যায়, তোমার মধ্যে সেটা নেই,—নিজের স্ত্রীকে তুমি যেন খেলার পুতুল বলেই মনে ভাব। সেদিন তুমি যেমন তোমার স্ত্রীকে এক মাতাল ইংরাজ পশুর বাহুপাশে ফেলে দিয়ে অন্তর্ধান হয়েছিলে, তোমার কাছে কোন বিদেশীয় সেরকম ভাবে নিজের স্ত্রীকে ফেলে রেখে যেতে পারেন কি? তাঁরা সর্ব্বাংশে স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিয়েও স্ত্রীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে যতদূর সতর্ক, তুমি ততদূর সতর্ক কি? আমি তোমার বন্ধুদের সামনে অনেক বিবেচনা করেই যাই নি, ভবিষ্যতে আর কখনও যাব না বলেই মনে করেছি।"

আরক্ত মুখে অনিল বলিল, "কি ভাল কি মন্দ, সেটা তোমার চেয়ে, আমি যে ভালই বুঝি, সেটা বোধ হয় জানো বীথি?"

বীথি বলিল, "হ্যাঁ, তা আমি জেনেছি সেইদিনই, আজ নূতন করে তা জানতে চাই নে।"

অনিল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার নত মুখের উপর গভীর চিন্তার কয়েকটা রেখা স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ পরে অনিল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিল, "যথার্থ কথা বীথি, তোমারও ভুল হয়েছে, আমারও ভুল হয়েছে। আমরা কেউ কাউকেই চিনে নিতে পারি নি। এই ভুলের জন্যেই আমাদের বিবাহিত জীবন কিছুতেই সুখময় হতে পারবে না। তুমি যদি তোমার বাপ মায়ের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছা কর বীথি, আমি এখনি তাতে রাজি আছি। আমি দেখছি, আমার কাছে থেকে তুমি কিছুতেই সুখী হতে পারবে না; কারণ, আমাদের মাঝখানে একটা দেয়াল গাঁথা আছে। এ বিধাতার অভিশাপ—মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে আমাদের মাঝে। তোমাকে এ রকম ভাবে পীড়িত করতে—বেদনা দিতে বাস্তবিকই আমার এতটুকুও ইচ্ছে নেই। আমি যতকাল বাঁচব—তোমার বৃত্তির বন্দোবস্ত করে দেব, তুমি ঠিকমতই পাবে; এতে তুমি নিশ্চয়ই খুব সুখী হবে বীথি।"

"আর—তুমি?"

অনিলের মুখে বেদনাভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল, "আমি? —হ্যাঁ, আমিও সুখী হব বৈ কি। সুখী হব—সুখী করব বলেই তো তোমায় যেতে বলছি বীথি।"

বীথি চুপ করিয়া রহিল। এত সহজে মুক্তির কল্পনা সে করিতে পারে নাই। এ মুক্তি যে অনিশ্চিত,—অসহ। মুক্তি সে চাহিয়া লইবে ভাবিয়াছিল,—না চাহিতে মুক্তি যে আপনিই আসিয়া পড়িবে, তাহা সে ভাবে নাই। আজ হঠাৎ প্রার্থিত মুক্তিকে একেবারে হাতের মধ্যে অচিন্তিত ভাবে পাইয়া সে বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া পড়িল। আনন্দ—কই না, আনন্দ তো হইল না। সে যে আনন্দের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল, সে আনন্দ পাইল কই?

"তা হলে আমি আজই তোমার বাবাকে পত্র লিখে দেই বীথি, তুমিও তোমার মাকে একখানা পত্র দাও।"

সকল দুর্ব্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া বীথি বলিয়া উঠিল, "না, আমি মার কাছে যাব না।"

শান্ত কণ্ঠে অনিল বলিল, "তবে দাদুকে পত্র দেই, তাঁর কাছেই তো যাবে তুমি?"

বীথি মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, আমি সেখানেও যাব না, আমি যেখানে যাব পরে জানাব।"

দাদামহাশয়ের কাছে সে দাঁড়াইবে কি করিয়া? যখন তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, হঠাৎ কেন সে স্বামীর নিকট হইতে চলিয়া আসিল, তখন সে কি বলিবে?

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "বেশ কথা, তোমার যেখানে যেতে ইচ্ছা করে তা আমায় জানিয়ো,—আমি তোমায় সেইখানেই পাঠিয়ে দেব। বড় কষ্টের কথা বীথি—আমাদের যে বিয়ে হয়েছিল, এ দাগটা আর উঠাতে পারা যাবে না। যদি পারা যেত, তবে আমার বুকের রক্ত দিয়েও আমি এ দাগ মুছিয়ে দিতে পারতুম। বেশী দিনের কথা নয়—আমাদের বিয়ে হয়েছে;—এর মধ্যে আমাদের যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল, লোকে জানতে পারলে ভারি নিন্দে করবে—অনেক কথাই হবে। জানি—সবই আমার সইতে হবে। আমি সব দোষ আমার মাথায় নেব বীথি, তুমিও তাই দিয়ো। তোমায় যেন নিন্দার অংশভাগিনী না হতে হয়—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অনিল বাহির হইয়া গেল।

বীথি হাতের বই ছুড়িয়া ফেলিয়া সোফার উপর লুটাইয়া পড়িল। এতক্ষণ সে যে চোখের জলকে অনেক কষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা আর মানা মানিল না।

তাহাকে যাইতে হইবে, হাঁ, সত্যই তাহাকে যাইতে হইবে; কারণ, স্বামীর সহিত তাহার যথার্থ মিলন কখনও হইবে না। সে সকল স্থানে স্বামীকে পাশে পাইবে না। একটা সংস্কার ত্যাগ করিয়া স্বামীর পার্শ্বে যাইতে না যাইতেই, আবার দশটা সংস্কার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। স্বামী চলিয়াছেন এক পথে, সে চলিয়াছে ঠিক বিপরীত দিকে। এ জনমে কেহ কাহাকেও পাইবে না জানিয়াও, তবু সে এই স্বামীকে কি জানি কবে কেমন করিয়া ধীরে ধীরে ভালবাসিয়াছিল। এই ভালবাসার কথা এতকাল তাহার নিজের কাছে পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল, আজ ছাড়িয়া যাইবার কথা মনে হইতে হৃদয়খানা যখন অকস্মাৎ দারুণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, তখনি সে বুঝিতে পারিল সে মরিয়াছে,—তাহার এ মুক্তি বাহিরের—অন্তরের কখনই নহে।

কিন্তু এমন মন লইয়া স্বামীর কাছে বাস করাও তো যায় না। ইহাতে যে কলহ নিশ্চিত। আর বাহিরের লোকেও এ সব জানিয়া নিন্দাই করিবে মাত্র। না, তাহাকে যাইতেই হইবে, এখানে থাকা তাহার চলিবে না।

কোথায় যাইবে সে, যাইবার মত স্থান তাহার কই, যেখানে এ সব কথা কেহ জানিতেও চাহিবে না? ভাবিতে ভাবিতে এই সময় একটী অপরিচিত পল্লীর কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—ঠাকুরদা, স্নেহময় সরল-হৃদয় ঠাকুরদা পৌত্রীকে নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন।

মুহূর্ত্তে সে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইল।

প্রভাতে উঠিয়াই সে রমাকে বলিল, "তোকে আজই কলকাতায় যেতে হবে রমা। অনেক দিন এখানে রয়েছিস, এখন একবার যা দিদিমার কাছে, কি বলিস?"

রমা আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। বিস্ময় তাহার যথেষ্ট হইয়াছিল; তাই সে তাহার বড় বড় চোখ দুটি বীথির উপর রাখিয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাগ করিয়া বীথি বলিল, "যাস যদি সব গুছিয়ে নে, শঙ্কর তোকে সেখানে দিয়ে আসবে।"

রমাকে সে-দিন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য শঙ্করের সঙ্গে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া সে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিল।

এইবার তাহার নিজের বিদায়ের পালা। একটা মাঝারি ট্রাঙ্কের মধ্যে সে সামান্য সাদাসিধা কয়েকখানি কাপড়, সেমিজ ভরিয়া লইল। অনিল দাঁড়াইয়া তাহার বাক্স গুছানো দেখিতেছিল,—বেদনাভরা সুরে বলিল, "তোমার কি এই কাপড় সেমিজ ছাড়া আর কিছুই নেই বীথি? সবই রেখে চললে কার জন্যে?"

বীথি মলিন হাসিয়া বলিল, "ও সব কিছুতেই আমার দরকার নেই। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে একখানা মোটা কাপড়ই যথেষ্ট, ব্যয়-বাহুল্য সেখানে নেই। ও-সব তোমার যা খুসি করো, আমি স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে গেলুম।"

অনিল নিজে ষ্টেশনে আসিয়া বীথিকে ট্রেণে উঠাইয়া দিল। সঙ্গে তাহার একটী ভৃত্য যাইতেছিল,—সে বীথিকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবে। গোপনে অনিল তাহার হাতে পাঁচশত টাকা দিয়াছিল,—বীথি একপয়সাও লয় নাই,—এই টাকাটা রামলাল তাহাকে দিয়া চলিয়া আসিবে।

দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে অনিল বলিল, "তোমার কাছে নিত্য কত অপরাধ করেছি বীথি, আজ এই বিদায়

মুহূর্ত্তে সে সব ভুলে যেয়ো। আমাদের বিয়ের পরে দুইটী বছর কেটে গেছে, এর মধ্যে একটী দিনের জন্য তোমায় সুখী করতে পারি নি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—এবার হতে যেন তুমি সুখী হতে পার। ভবিষ্যতে আর কখনও আমাদের দেখা হবে কি না জানি নে, কিন্তু আমার কথা মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই তোমার মনে হবে; তখনও আমায় এমন করে শুধু ঘৃণাই করো না বীথি, জগতের মধ্যে বড় অভাগা বলে মার্জ্জনা করো।"

বীথি আড়ষ্টভাবে বসিয়া রহিল। তখনও সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না—ঝোঁকের বশে যে কাজটা সে করিতেছে, ইহা ভাল কি মন্দ।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। বীথি গবাক্ষপথে ঝুঁকিয়া পড়িয়া —যাহাকে নিত্য অবহেলাই দান করিয়া আসিয়াছে, সেই স্বামীর পানে অশ্রুসজল নেত্রে চাহিয়া রহিল। একটা বাঁক ঘুরিতেই সে মূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। যখন আর কিছুই দেখা গেল না, তখন সে নির্জ্জন কামরার মধ্যে রুদ্ধ রোদন মুক্ত করিয়া দিল।

বিলাসপুর ষ্টেশনে নবাগতা একটী রমণীর সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া গেল।

মিস রায় গিরিডি বালিকা বিদ্যালয়ের হেড মিষ্ট্রেস—ছুটিতে তিনি নাগপুরে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত খানিক আলাপ করিয়াই বীথি নিজের মত বদলাইয়া ফেলিল। হঠাৎ কাজের কথা মনে পড়িয়া গেল, এবং সম্মুখে একটা পথ দেখিতে পাইয়া সে মিস রায়ের সহিত গিরিডি যাইতে প্রস্তুত হইল।

হাওড়ায় আসিয়া সে রামলালকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিল। বিস্মিত রামলাল বলিল, "ডাঁকটর সাহেব আপনাকে বাড়ী পৌছে দেবার কথা বলেছেন,—পথে ছেড়ে দিয়ে গেলে তিনি আমায় বকবেন।"

বীথি বলিল, "না, কিছু বলবেন না। আমি ছেলে-মানুষ নই, আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে, তিনি আমায় চেনেন। সাহেবকে বলিস, আমি দাদুর বাড়ী গেলুম না, চাকরী করতে যাচ্ছি। আমি তাঁর কাছ হতে বৃত্তি চাইনে, আমার জীবিকার্জ্জন নিজেই করব। আচ্ছা, তুমি যদি না বলতে পার, আমি লিখে দিচ্ছি।"

সে ক্ষিপ্রহস্তে একখানা পত্র লিখিয়া রামলালের হাতে দিল।

অনিলের প্রদত্ত টাকার কথা তুলিবামাত্র, বীথি এমন প্রচণ্ড তাঁড়া দিয়া উঠিল যে, সে বেচারা ভয়ে টাকা বাহির করিতে পারিল না।

এবার নিশ্চিন্ত মনে অপরিচিত স্থানে অপরিচিতার ভাবে সে বাস করিতে চলিল।

(১৭)

কি কষ্টে যে দিন কাটিতেছে, তাহা কেহই জানিতে পারে নাই,—এমন কি, উপেন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত জানেন না। সংসারে যাহাকে গৃহিণীপণা করিতে হয়, তাহাকে ছোট বড় সকল ধাক্কাই সহিতে হয়, খুঁটিনাটি সকল বস্তুই দেখিতে হয়। সেইজন্য যতটা কষ্ট হয় তাহারই এতটা আর কাহারও হয় না। বিশেষ যাহার অবস্থা ভাল, তাহার অনটনের কথা জানাইতে না জানাইতে সেটা পূর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু যাহার অবস্থা সচ্ছল নয়, তাহার সেই অনটনকেই সামঞ্জস্য মানাইয়া চলিতে হয়,—দেবীর হইয়াছিল তাহাই।

দুইবেলা আহার জুটাইবে কেমন করিয়া— দেবীর তাহাই হইয়াছিল বিষম ভাবনা। এ বৎসর ধান জন্মিয়াছে কম, গোলা প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছে। যাহা চারিটী পড়িয়া আছে, তাহাতে দিনকতক দুইটী মানুষের কোনক্রমে চলিতে পারে। তাহার পর— ?

তাহার পর কি হইবে তাহা ভাবিতে দেবী নিথর হইয়া পড়ে, জ্ঞান থাকিতেও তাহার জ্ঞান থাকে না। তাহার চারিদিকে যে সীমাহীন অন্ধকারগুলা জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া, সেগুলা দ্রুত আসিয়া তাহার বুকখানাকে ছাইয়া ফেলে,—সম্মুখে আশার যে ক্ষীণ দীপটিকে কত করিয়া সে জ্বালাইয়া রাখে, সেটা নিবাইয়া ফেলে,—দেবীর নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে। অনেকক্ষণ অপলক নেত্রে সে সেই সীমাহীন অন্ধকারের পানে তাকাইয়া থাকে। তাহার পর হঠাৎ খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠে—তোমার মনে যা আছে ঠাকুর,—তাই হবে। জানি—ওগো, আমি ভাল করেই জানি, যে তোমার ওপর একান্ত ভাবে নির্ভর করে থাকে—তুমি কখনই তাকে ফেলতে পারো না। জানি,—তুমি তোমার চির-অনুগত দাসকে সত্যই শুকিয়ে মারতে পারবে না,—তার খাওয়ার যোগাড় যে তোমার নিজের হাতেই করতে হবে ঠাকুর।"

এই বিশ্বাসটা থাকার জন্যই তাহার বুকের মাঝের

ক্রমবর্দ্ধনশীল অন্ধকার আবার পাতলা হইয়া আসিত,—সে আবার দাঁড়াইতে পারিত, আবার কাজে হাত দিতে পারিত।

দীর্ঘ দুইটা বৎসর এমনই ভাবে কোথা দিয়া কেমন করিয়া যে কাটিয়া গিয়াছে, তাহা সে ভাবিয়া পায় না। দিনগুলা এত কষ্টের মধ্যেও দাঁড়াইয়া নাই। যেমন তাহার কাটিয়া যাওয়ার নিয়ম তেমনই কাটিয়া যাইতেছে। সংসারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া উপেন্দ্রনাথ তেমনই নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, আর সংসারে লিপ্ত হন নাই।

ভবানী আজ দুই বৎসর হইল চলিয়া গিয়াছে,—সেই বড় প্রিয়তমা কন্যার নামটী পর্য্যন্ত এই দুই বৎসরের মধ্যে তিনি মুখে আনেন নাই। ক্রমাগত আঘাত পাইলে, ক্রমাগত দিতে থাকিলে, আর কোন আঘাত, কিছু যাওয়ার ব্যথা বুকের মধ্যে আঁকা থাকিতে পারে না,—উপেন্দ্রনাথের এই বৈরাগ্য ভাব তাহারই স্পষ্ট পরিচয় দিতেছিল।

দেবী এক এক সময় অধীর হইয়া উঠিত। সত্যই সে ভবানীকে ভগিনীর মতই ভালবাসিত। তাই তাঁহার একটা সংবাদ পাইবার জন্য তাহার সারা হৃদয়খানা বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই সংবাদটী আনাইয়া দিবার প্রার্থনা সে জানায় কাহার কাছে?

সে-দিন পূজার যোগাড় করিতে বসিয়া সে অত্যন্ত অন্যমনা হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক দিন পরে ভবানীর একটী স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। একখানি চন্দন-কাষ্ঠে সে কবে নিজের নাম আঁকা-বাঁকা অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিল। আজ নিত্য-ব্যবহার্য্য চন্দনকাষ্ঠখানা কোথায় যাওয়ায়, দেবী তাড়াতাড়ি বহুদিনের অব্যবহার্য্য সেই চন্দন-কাষ্ঠখানি তুলিয়া লইল।

"পূজার যোগাড় এখনও হয় নি মা?"

চন্দনকাষ্ঠটির পানে চাহিয়া দেবী চুপ করিয়া বসিয়া ছিল,—দ্বারের উপর শ্বশুরের কথা শুনিবামাত্র তাড়াতাড়ি চন্দন ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "এই যে বাবা, হলো বলে।"

পূজার যোগাড় ক্ষিপ্রহস্তে করিয়া দিয়া সে রন্ধনের যোগাড় করিতে গেল।

"বাবু,—চিঠি—

উপেন্দ্রনাথ তখন পূজায় বসিয়াছেন, পত্র কে গ্রহণ করে? দেবী দরজার উপর দাঁড়াইতে পোষ্টম্যান দু'খানা এনভেলাপ-বদ্ধ পত্র প্রাঙ্গণে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

দেবী পত্র দু'খানা কুড়াইয়া লইল। একখানা এনভেলাপ কিছু বিচিত্র রকমের,—সে দিকে সে মোটেই দৃক্‌পাত করিল না। অন্যখানি তাহার নামে আসিয়াছে; তাই তাড়াতাড়ি সেখানা খুলিয়া বাহির করিল।

পত্র ভবানী লিখিয়াছে। দীর্ঘ দুই বৎসর পরে এই তাহার প্রথম পত্র। ঔৎসুক্যে দেবী পত্রখানা পড়িতে লাগিল।

ভবানী সামান্য দু' চার কথার মধ্যে নিজের কষ্টকর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে। তাহা পড়িতে গিয়া দেবীর দুই চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল।

বাংলার মেয়েদের মধ্যে অনেককেই স্বামীগৃহে এইরূপ ভাবে লাঞ্ছিতা হইতে হয়। ইহাদের কষ্ট দেখিতে বঙ্গসমাজ উদাসীন,—বধূনিগ্রহ বঙ্গসমাজে সহিয়া গিয়াছে।

ভবানীর স্বামী মাতাল, দুশ্চরিত্র; তাহার চরিত্রগত দোষগুলি এখনও সে এতটুকু বদলাইতে পারে নাই। খাশুড়ী তাহাকে দিনরাত তিরস্কার করেন, তাহার অপরাধ সে স্বামীকে সৎপথে ফিরাইতে পারে নাই। স্বামী তাহাকে কিছুতেই সুচোখে দেখিতে পারেন নাই। তাহার অপরাধ,—সে কেন পিত্রালয় হইতে অর্থ আনিতে পারে না, যাহাতে অন্ততঃ পক্ষে স্বামীর খরচটা চলিতে পারে। ভবানীর দুই ভাই যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন;—তাঁহারা বিশ্বাস করেন না যে, দুই পুত্রের কেহই পিতাকে সাহায্য করেন না,—ভবানীর পিতা দরিদ্র।

এখন স্বামীর জন্য পঞ্চাশ টাকা দরকার। এই টাকা না হইলে তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। ধার করিয়া এ পর্য্যন্ত সংসার চলিতেছে। ভবানীর গহনাপত্র বহু পূর্ব্বেই গিয়াছে। এখন মহাজন সুরেশকে ধরিয়াছে। সুরেশ এই টাকাটা আনিয়া দিবার জন্য ভবানীকে পীড়ন করিতেছে। যেমন করিয়াই হোক এই টাকা ভবানীকে পিত্রালয় হইতে আনিয়া দিতেই হইবে।

এইখানটায় চোখের জলে পত্রখানা আর্দ্র হইয়া গিয়াছে, তাহার চিহ্ন এখানে স্পষ্ট দীপ্যমান। ভবানী এতখানি পর্য্যন্ত লিখিয়া বোধ হয় খানিক কাঁদিয়াছিল, তাহার পর লিখিয়াছে—আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করছি বউদি, যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, আমি যেন সে জন্মে নারী হ'য়ে না জন্মাই। নারী হয়ে জন্মে জানতে পারছি, নারীকে কতটা উৎপীড়ন, কতটা লাঞ্ছনা সইতে হয়। ভগবান নারীকে কি উপাদানে তৈরী করেছেন বলতে পার কি? এত যে

আঘাত পাচ্ছি, তবু বেশ সব সইতে পারছি তো, বুকখানা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে না তো? এমন এক একটা কথা—মনে হয় কাগজের মত আমার অন্তরখানাকে শতখানা করে চিরে দেয়। দৈহিক উৎপীড়ন—হা ভগবান—এ কি বাংলা দেশের অভাগিনী মেয়ের চিরপ্রাপ্য একটা অভিশাপ? যদি কখনও সময় পাই বউদি,—তা হলে দেখাব কত পদাঘাত—কত বেত্রাঘাতের জলন্ত প্রমাণ এই দেহে। বউদি, বাবাকে একবার জিজ্ঞাসা করো—আরও কি আমায় সইতে হবে? তিনি আমায় সত্যের কাছে বলিদান দিলেন—আমার চেয়ে সত্য পালন তাঁর বড় হয়েছে! কিন্তু আমি যে আর সইতে পারছি নে, আমি যে এ দেহভার আর বইতে পারছি নে বউদি। আমার ইচ্ছা করছে—ছুটে তোমাদের কাছে যাই, বাবাকে দেখাই—সত্যের যূপকাষ্ঠে তাঁর প্রিয়তমা মেয়েকে ফেলে এই বলিদানের ব্যাপার। এর চেয়ে—বউদি, আমার মনে হয় —আমি একেবারেই মরি না কেন, বাবাও নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এরাও আমায় নিয়ে এ রকম টানাটানি করতে পারে না।

পূজান্তে, উপেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিলে দেবী পত্র দুখানা তাঁহার হাতে দিল।

এনভেলাপ দুখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া উপেন্দ্রনাথ সে দুখানা দেবীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "তুমিই পড় বউ মা। এখানা তোমার দেখছি, কে দিয়েছে?"

দেবী উত্তর দিল, "ঠাকুরঝি লিখেছে।"

"কে, ভবানী—?"

বলিয়াই বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত ভাবটাকে সামলাইয়া লইলেন। তখনি মনে পড়িয়া গেল,

কা তব কান্তা—কস্তে পুত্রাঃ

স্থির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছে? ভাল আছে তো?"

বিকৃত কণ্ঠে দেবী বলিল, "ভাল নেই বাবা।"

"কেন, অসুখ হয়েছে তা'র?"

দেবী বলিল, "পত্রখানা পড়লে বুঝতে পারবেন। সে কি অবস্থায় আছে—এই পত্রেই সব লিখেছে।"

পত্রখানা সে পড়িয়া গেল; পাঠান্তে সে মুখ তুলিয়া উপেন্দ্রনাথের পানে চাহিয়া দেখিল, তিনি নিস্তব্ধে আকাশের কোন্ এক অনির্দ্দিষ্ট স্থানের পানে দৃষ্টি রাখিয়া স্তব্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই বলিলেও চলে।

"বাবা—"

উপেন্দ্রনাথের দৃষ্টি নামিয়া ধরায় আসিল, "কি মা?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দেবী জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করবেন?"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "কিসের কি করব?"

দেবী বলিল, "টাকার?"

অতি গোপনে মর্ম্মের অন্তঃস্থলস্থিত দীর্ঘনিঃশ্বাসটাকে বাহির করিয়া ভারি বুককে হালকা করিয়া ফেলিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "দীন দরিদ্র আমি, আমার ঘরে একটী পয়সা নেই, টাকা আমি কোথায় পাব মা? আমার দুটি ছেলে, দু'জনেই কৃতি, বিদ্বান। লোকে ভাবে আমার অর্থের অপ্রতুল নেই। আমার ঘরের কথা জানাই কাকে মা, আমার মনের ব্যথা কে বুঝবে মা?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া উঠিল, তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না।

একটুখানি নীরব থাকিয়া দেবী বলিল, "কিন্তু এই টাকাটা দিতে না পারলে দিদিমণির অদৃষ্টে আরও কষ্ট ভোগ রয়েছে যে বাবা—।"

কণ্ঠ যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি কি করব মা, আমার এতে হাত কি আছে? নারায়ণ যা করাচ্ছেন তাই হচ্ছে, তুমি আমি কি করতে পারি? তিনি আমায় যা দিয়েছেন, আমায় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে,—ভবানীর এই দারুণ কষ্টের কথা শুনেও আমায় স্থির থাকতে হবে; কারণ, প্রতিবিধানের উপায় আমার হাতে নেই। নারায়ণের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক মা, আমি মনে প্রাণে তাই ডেকে বলছি—প্রভু, তোমার যে ইচ্ছা, তা যদি আমায় দিয়েই পূর্ণ করিয়ে নিতে চাও তবে তাই করাও, আমিও অহং-জ্ঞান ভুলে গিয়ে যেন তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করে যাই। আমি অর্থহীন, পথের ভিখারীর যা আছে আমার তা নেই। ভিখারীর চক্ষুলজ্জা থাকে না, আত্মজ্ঞান থাকে না, সে অনায়াসে ভিক্ষা চাইতে পারে। আমি তা পারিনে। আমার আত্মজ্ঞান বোধ আছে। তাই আমি তার চেয়েও হীন, তার চেয়েও ঘৃণ্য। মা, এ রকম ঘৃণ্য লোকের মেয়ের এ রকম ঢের কষ্ট সইতে হয়, ঢের কথা শুনতে হয়।"

অনেকক্ষণ তিনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাহার

পর ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতেছিলেন, দেবী ডাকিল, "বাবা, আর একখানা পত্র আছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও-খানার কথা আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছি। পড়তো মা, দেখি, কোথা হতে কে দিচ্ছে।"

দেবী এনভেলাপ ছিঁড়িয়া ফেলিল।

পত্রের পানে চাহিতেই তাহার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। সে চোখ ফিরাইতে পারিল না। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বদ্ধ দৃষ্টিতে শুধু চাহিয়াই রহিল।

এই যে পত্রখানা—এ তো মিথ্যা নয়। যে হতভাগ্য পুত্র পিতার আদেশ না লইয়া দূরে—বহুদূরে এক দেশে চলিয়া গিয়াছে, আজ বহুদিন পরে সে সেই পিতার কাছে ক্ষমা চাহিয়া পত্র দিয়াছে। এতকাল বুঝি তাহার পিতার কথা মনে পড়ে নাই,—পিতৃ-হৃদয়ের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা সে অনুভব করিতে পারে নাই। সুদীর্ঘকাল পরে—বুঝি পিতার অন্তরের নীরব বেদনা তাহার অন্তরের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়াছে। তাই সে নিজের অপরাধ মানিয়া লইয়া ক্ষমা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছে।

তাহাকে পত্র হস্তে তেমনই আড়ষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত উপেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "চুপ করে বসে রইলে যে মা, পত্রখানা পড়। কার পত্র, কোথা হতে আসছে?"

দেবী মুখ ফিরাইয়া চাপাস্বরে উত্তর দিল, "আপনার ছেলের পত্র বাবা, বিলেত হতে আসছে বোধ হয়, আপনি পড়ুন।"

পত্রখানা সে শ্বশুরের হাতে দিয়া স্খলিত চরণে তাড়াতাড়ি একদিকে চলিয়া গেল।

অপলক দৃষ্টিতে উপেন্দ্রনাথ পত্রখানার পানে তাকাইয়া রহিলেন; হৃদয়ের অভ্যন্তরে তখন রক্তস্রোত ছুটাছুটি করিতেছিল। সেই উদ্দাম রক্ত-তরঙ্গকে প্রশমিত করিতে খানিকটা সময় লাগিয়া গেল। উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি ডাকিলেন,—"বউ মা—"

দেবী রান্নাঘর হইতে উত্তর দিল, "যাচ্ছি বাবা, তরকারীটা চড়িয়ে দিয়ে যাই।"

উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তরকারী এখন থাক, ওর এখন কিছুমাত্র দরকার দেখছি নে। তুমি আগে একবার এদিকে একটু এসো,—পরে ওসব কাজ করো এখন।"

সে পত্রখানা পড়িতে বা শুনিতে দেবীর মোটেই ইচ্ছা ছিল না; কি হইবে আর শুনিয়া বা পড়িয়া? সত্য ভাল আছে শুনিয়াই সে সুখী। পত্রের নীচে—নামের আগে সে পলকের দৃষ্টিপাতে ওই খবরটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে,—বেশী আর কিছুই সে জানিতে চাহে না। দিনরাত গৃহদেবতা দামোদরের কাছে সে প্রার্থনা করিতেছে যেন সে চিত্তজয়ী হইতে পারে, যেন সে স্বামীকে এড়াইয়া যাইতে পারে। স্বামীকে সে প্রাণাপেক্ষা বেশী ভালবাসে। তাই বলিয়া স্বামীকে সে আর নিকটে পাইতে চায় না,—ভক্তি ভালবাসার পাত্রকে নিকটে আনিয়া সে আর ব্যথা পাইতে চায় না। দেবী জানে, তাহার প্রেমের মরণ নাই। তাহার ধ্বংস আছে; কিন্তু প্রেম তাহার অক্ষয় অব্যয় হইয়া থাকিবে। এ জন্মে তাহার প্রেমের পূজা অসার্থক থাকিয়া গেলেও, যে কোন জন্মে তাহা সার্থকতা লাভ করিবে। দেবী নিজেকে জোর করিয়া সব দেওয়ার পথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে,—ত্যাগের পূজা তাহার সার্থক হইবে না কি?

আসিবার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তাহাকে আসিতে হইল,—বৃদ্ধ শ্বশুরের কথা ঠেলিবার ক্ষমতা তাহার নাই। তাহার জীবনের মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিল বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা। নিজেকে সে এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না।

তেমনি উত্তেজিত কণ্ঠে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "সত্যই পত্র দিয়েছে বটে, পত্রখানা পড়েছ মা?"

নতমুখে দেবী উত্তর দিল, "না বাবা।"

বিস্ফারিত চোখে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন, "পড় নি? সে এখন ক্ষমা চাচ্ছে, বলছে—অবুঝ সন্তান সে, না বুঝে ভুলের পথ বেয়ে চলে এসেছে,—তাকে এখন ক্ষমা করতে হবে। সে বলছে যা হয়ে গেছে তার আর হাত নেই, এখন তাকে দয়া করা আমার উচিত; কারণ, সে বড় অভাগা। অপদার্থ সন্তান, জানে না, মনে ভেবে দেখেনি—গোড়া কেটে আগায় জল ঢাললে গাছ আর বাঁচে না।"

দেবী মুখ ফিরাইয়া লইল, কথা কহিল না। আবেগরুদ্ধ স্বরে উপেন্দ্রনাথ বলিলেন,—"আমি ভুলে যাব আমি কে আর সে কে? আমার বুকের ওপরকার এই চামড়াখানা তুলে ফেলে যদি দেখাবার হতো মা, তা হলে তোমায় দেখাতুম—ওদের ছুরি বসানোর ফলে আমার সমস্ত পঞ্জরাস্থি ভেঙ্গে

রয়েছে। মা আমার, বড় ব্যথাই আমি পেয়েছি,—আমার সারা বুকে ক্ষত জেগে রয়েছে। অন্ধ অকৃতজ্ঞ এখন সেই ক্ষততে প্রলেপ দিতে চাচ্ছে,—সেই ভাঙ্গা হাড় ক্ষমা চাওয়ার প্রলেপ দিয়ে জুড়তে চাচ্ছে। এ কি কখনও সম্ভব হতে পারে মা? সে একদিন আমার বড় আদরের ছেলে ছিল, একদিন তারই মুখপানে তাকিয়ে আমি সকল হারার দুঃখ ভুলে যেতুম। এখন কেমন করে তার সেই মুখের পানে তাকাব মা? তার সেই মুখের ওপর যে আমার অন্তরের সকল দৈন্য ফুটে উঠবে, আমার যে তখনিই জীবন্তে দগ্ধ হওয়ার ইচ্ছা জাগবে। সে মহাপাপী, তবু তাকে ক্ষমা করতুম—তবু তাকে বুকে টেনে নিতুম, যদি সে তার বাপের দেওয়া দান ছুঁড়ে ফেলে না দিত। আমি তার সকল অপরাধ ক্ষমা করতে পারতুম মা আমার, যদি সে তার বাপের দানের মর্য্যাদা রাখত, যদি সে আবার বিয়ে না করত। এ বুকে যে ক্ষুব্ধ আবেগ ফুলে ফুলে উঠছে মা আমার, যখন আমি তোমার এই সর্ব্বসহা মূর্ত্তিখানি দেখছি। ক্ষমা, দয়া, সব এই আবেগে ভেসে চলে গেছে,—আমার চোখে আমার ছেলে আর কেউ নেই। মা, তোমার সিঁথার সিঁন্দুর অক্ষয় হোক্, এ আশীর্ব্বাদ আমি করছি—কিন্তু সে অপদার্থ আমার কাছে মৃত আমি জানছি, আমার দুটি ছেলের মধ্যে কেউই আর বেঁচে নেই।”

দারুণ মনস্তাপে তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। বৃদ্ধ আত্মসম্বরণে অসমর্থ হইয়া করতলের মধ্যে বিকৃত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিলেন।

একটু পরেই সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া তিনি মুখ হইতে হাত সরাইলেন। কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া বলিলেন, “হ্যাঁ, সে আরও কি লিখেছে জানো? সে সাহস করে আমার কাছে টাকা পাঠাতে পারে নি। তার অন্তর বুঝি এইখানে দমে পড়েছিল যে, তার বাপ কখনও তাদের দুই ভাইয়ের এক পয়সা হাতে নেবে না। সে তাই প্রকাশের কাছে টাকা পাঠিয়েছে। তার অর্থ আমি নেব—তাই তুমি কি ভাব মা? বাপের মনে এ অভিমান, এ আত্মমর্য্যাদাটুকু জেগে আছে—যে সন্তান বাপের কথা রাখলে না, বাপকে অপমান করলে, তার কোন সাহায্য সে জীবন-সত্ত্বে নেবে না। আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলুম মা, আমায় চাকর দিয়ে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে—এই ব্যথার ক্ষত কি সহজে জুড়িয়ে যায় মা? আমার প্রত্যেক শিরায়-উপশিরায় সেই অপমানের উগ্র বিষ ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। যখন সব মনে হয়—আমার মনে হয়, আমি আত্মহত্যা করি, সন্তানের কাছ হতে যেচে নেওয়া অপমানের সব জ্বালা মরণ দিয়ে মুছে ফেলি।”

কণ্ঠস্বর উগ্র হইতে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছিল, দেবী সজল দুটি চোখের দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, “বাবা,—”

“হ্যাঁ—বড় উগ্র হয়ে উঠেছি, না মা? তুমিই বল মা, আমায় অপমান করে তার পর সে যে টাকা দিয়ে আমার ক্ষমা কিন্‌তে আস্‌ছে, এতে কি রাগ হওয়ার কথা নয়? ওরা বাস্তব জগৎটাকেই চিনেছে,—তাই ভাবছে, টাকা দিয়ে স্নেহ কেনা যায়। ওরে, তাই যদি হতো—তা হলে সংসার এতদিনে মরুভূমি হয়ে যেতো,—বাপ-মায়ের স্নেহ-ভালবাসা তা হলে আজও শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় জিনিস বলে গণ্য হতো না। এই টাকা দেওয়ার প্রস্তাব আমার বুকের আগুণে ঘি ঢেলে দিয়েছে—তা জানো মা। নারায়ণের কাছে কায়মনে প্রার্থনা করছি, তার—সেই হতভাগ্য আত্মসুখী সন্তানের এক পয়সা হাতে নেওয়ার আগে আমার যেন মৃত্যু হয়,—তার মুখ যেন আর আমায় না দেখতে হয়,—সে আসার আগে যেন আমি চিতায় শুতে পারি।”

দেবী গোপনে চোখ মুছিতে লাগিল। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন ভারতে দৃশ্যকাব্যোৎপত্তির ইতিহাস

শ্রীঅশোকনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাকাব্যের (epic) বিবরণ :—

এইবার আমরা প্রাচীন ভারতীয় শ্রব্য-কাব্যগুলি একবার বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিব—দৃশ্য-কাব্যের প্রাচীনত্ব তাহা হইতে প্রমাণিত হয় কি না। শ্রব্য ও দৃশ্য-কাব্যের পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ। আর রামায়ণ ও মহাভারতই প্রায় যাবতীয় হিন্দু রূপক বিশেষতঃ নাটকের উদ্ভবের আকর স্বরূপ। এখন আমাদের অনুসন্ধেয়,—উক্ত কাব্যদ্বয়ে অভিনয় সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় কি না।

Hopkins সাহেব তাঁহার The Great Epic of India নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন (পৃঃ ৫৫) যে, মহাভারতে এরূপ বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে সভাপর্ব্বের একাদশ অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশ শ্লোক মধ্যে যে "নাটক" শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়, তাহা পরের যুগে প্রক্ষিপ্ত। শান্তি-পর্ব্বের "নটস্য ভক্তিমিত্রস্য যচ্ছেৎ স্তবং সমাচরেৎ॥" ইত্যাদি শ্লোকে (১৪০ অঃ ২১ শ্লোক) Hillebrandt সাহেব অভিনেতৃ বিষয়ক স্পষ্ট উল্লেখ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। আবার অনুশাসনপর্ব্বে "চৌরাশ্চান্যোঽনৃতাশ্চান্যে তথান্যে নটনর্ত্তকাঃ (৩৩।১২) ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যা কালে নীলকণ্ঠ "নটনর্ত্তক" পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,"ভরতাদয়ঃ।" কিন্তু Keith সাহেব এ সকল শব্দকেই pantomime সম্পর্কীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১)

হরিবংশ হইতে আমরা নাটকাভিনয়ের অতি স্পষ্ট প্রমাণ পাই। "রামায়ণং মহাকাব্যমুদ্দেশ্যং নাটকীকৃতম্"··· হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯৩ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক হইতে জানা যায় যে, যাদবগণ বারাঙ্গনা সহযোগে দৈত্যপতি বজ্রনাভের সম্মুখে রামায়ণের সারাংশ অবলম্বনে রচিত নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন। "রম্ভাভিসার" নামক আরও একখানি নাটক তাঁহারা বজ্রনাভের পুরীমধ্যে অভিনয় করেন। ইহাতে যথাযথভাবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও প্রদর্শিত হইয়াছিল। "কৈলাসো রূপিতশ্চাপি মায়য়া যতুনন্দনৈঃ"··· (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ৯৩ অঃ ২৯ শ্লোক) সে অভিনয়ে (২) যাদবগণ দৈত্যগণকে সন্তুষ্ট করিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। মায়া দ্বারা কৈলাসপর্ব্বত প্রদর্শন দৃশ্যপটের কারসাজি ভিন্ন আর কি হওয়া সম্ভব? আর সে সময়ে দৃশ্যপটের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে পুরামাত্রায় অভিনয়ের বাকি রহিল কি? এ সম্বন্ধে আরও বিশেষ বিবরণ আছে; কে কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ফর্দ্দও আছে। "মনোবতী" নাম্নী বারাঙ্গনা রম্ভার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন···ইহার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। Keith সাহেব এ সকলই স্বীকার করিয়াছেন, তবে মূলেই গোল বাধিয়াছে। তিনি হরিবংশকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় অথবা বড় জোর দ্বিতীয় শতাব্দীর রচনা বলিতে চাহেন। অতএব হরিবংশের প্রমাণ প্রমাণ বলিয়াই গণ্য নহে। (৩)

রামায়ণেও নটনর্ত্তকের উল্লেখ আছে। "নারাজকে জনপদে প্রহৃষ্ট নটনর্ত্তকাঃ" (নটঃ সূত্রধার ইতি তিলকটীকা, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭ অঃ ১৫ শ্লোক)। "নাটক" শব্দটিরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়···"নাটকান্য পরে স্মাহুর্হাস্যানি বিবিধানি চ"···অযোধ্যা, ৬৯,৩। অযোধ্যাকাণ্ডে যে "ব্যামিশ্র" শব্দ (১, ২৭) পাওয়া যায় তিলকটীকায় তাহার অর্থ করা হইয়াছে···"প্রাকৃতাদিভাষামিশ্রিত নাটক।" কিন্তু অধ্যাপক

---

(১) ইহা ছাড়া "রঙ্গাবতরণ" (১২।২৯৪।৫) শব্দটি যে শান্তিপর্ব্বে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে Keith কি বলেন? ইহার বিশেষ আলোচনা "রূপদক্ষ না শিল্পী" নামক মদীয় প্রবন্ধে (নাচঘর, ৩য় বর্ষ, ১১শ, ১২শ, ১৩শ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য।

(২) "পাদোদ্ধারেণ নৃত্যেন অথৈবাভিনয়েন চ।
তুষ্টবুর্দানবা বীরা ভৈমানামতিতেজসাম্ ॥ ৩২ ॥
তে দদুর্বস্ত্রমুখ্যানি রত্নান্যাভরণানি চ।"···(৯৩ অধ্যায়)

(৩) ইহাই কি ঠিক? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ধারণা যে, খ্রীষ্টজন্মের পূর্ব্বে ভারতে কোন সভ্যতা প্রচলিত ছিল না। অবশ্য তাঁহাদের এরূপ ধারণা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যেন তেন প্রকারেণ ভারতীয় সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন খ্রীষ্টজন্মের পরে তাঁহারা টানিয়া নামাইতে চেষ্টা করেন ক্ষতি নাই···তবে ছিঁড়িয়া না যায়!

Keithএর মতে এ সকল পাঠ প্রক্ষিপ্ত; কি হেতু প্রক্ষিপ্ত, তাহার তিনি মোটেই উল্লেখ করেন নাই।

পক্ষান্তরে তাঁহার মতে এই মহাকাব্যদ্বয়ের পাঠ, শ্রবণ ও তাহার অঙ্গীভূত কথকতা হইতে দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টি। মহাকাব্য-আবৃত্তির প্রথা অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। কাম্বোডিয়া রাজবংশ সম্পর্কীয় সোম শর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণ কোন দেবমন্দিরে নিত্য পাঠের নিমিত্ত "ভারতে"র একখানি সমগ্র পুঁথি প্রদান করিয়াছিলেন (খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে)। ঐ সময়েরই কবি বাণভট্ট তাঁহার কাদম্বরী গ্রন্থে শিবমন্দিরে মহাকাব্য পাঠের রীতির উল্লেখ করিয়াছেন। স্বয়ং রাজ্ঞীও পাঠ শ্রবণ করিতেন, ইহার বর্ণনাও উহাতে দৃষ্ট হয়। চারি শত বৎসর পরে কাশ্মীরী কবি ক্ষেমেন্দ্র ঐ রীতির প্রশংসা করিয়াছেন। আর এখনও কেবল দেবমন্দিরে নহে, প্রত্যেক গ্রামে কোন বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দু ভদ্র গৃহস্থের বাটীতে, তিন চারি বা ততোধিক মাস ব্যাপিয়া কথক দ্বারা সমগ্র ভারত শ্রবণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আবৃত্তি-কারকগণ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—

(১) পাঠক—যাঁহারা শুধু মূল গ্রন্থ পাঠ করেন; (২) ধারক—যাঁহারা দেশী ভাষার সাহায্যে সাধারণকে পঠিত অংশটুকু বুঝাইয়া দেন। ইহা হইল সাধারণ পাঠের নিয়ম। কোন কোন স্থলে ধারক থাকেন না। পাঠকই স্বয়ং উভয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। কথকতা বা রামায়ণ গান প্রভৃতি একটু অন্য ধরণের। এগুলি সাধারণতঃ দেশী ভাষায় চলিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, এগুলির ভিতর একটু অভিনয়ের ভাবও বর্ত্তমান থাকে। যথা, রামের রাজ্যাভিষেকের সময় মণ্ডপটি রাজসভার মত সুসজ্জিত করা হয়; মূল কথক বা গায়ক সাধারণতঃ রামের ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইহাতে নৃত্য গীত বাদ্যাদিও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। পাঠ কার্য্যে এ সকলের অভাব। সুতরাং পাঠ-প্রণালীকে কথকতা অপেক্ষা প্রাচীন বলাই উচিত; এবং এই কথকতা অভিনয়ের আদি—ইহা Keithএর অভিমত।

সাঁচীতে যে Bas-relief পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এরূপ একদল কথকের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এ জিনিসটি খৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। ইহার মধ্যেও নৃত্য, গীত ও অঙ্গসঞ্চালনের আভাষ পাওয়া যায়। কেবল গন্ধচূর্ণকের যা' অভাব। সেইটুকু বর্ত্তমান থাকিলেই দৃশ্যকাব্যের সহিত কথকতার আর কোন প্রভেদ থাকে না। রামচন্দ্রের সভায় কুশ ও লব কর্ত্তৃক রামায়ণ গানের বৃত্তান্ত কথকতার যুগে—কথকতার অনুকরণেই গৃহীত ও রামায়ণ মধ্যে প্রক্ষিপ্তরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে—ইহাই Keithএর ধারণা।

নটের (Comedian অবশ্য) যে সকল পর্য্যায় পুরের যুগে পাওয়া যায়, "ভারত" (ভরতপুত্র) তাহার একটি। এই "ভারত" শব্দের অপভ্রংশ আধুনিক "ভাট"। কাব্য আবৃত্তি করা, বড় বড় রাজারাজড়ার কুলজীর পুঙ্খানুপুঙ্খ খোঁজখবর রাখা, বিবাহের সম্বন্ধাদি স্থির করা—ইঁহাদিগের কার্য্য। রাজপুতানার চারণগণও সমশ্রেণীর। সাধারণতঃ ইঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হ'ন—তবে শুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন—পতিত। কেন পতিত হইলেন তাহার অনেকরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে ভরতপুত্রগণের ঋষিশাপে পাতিত্যের কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

Keithএর সিদ্ধান্তানুসারে এই "ভারত"গণ 'ভারত' শাখার চারণ কবি মাত্র (rhapsodes)। ইহাদিগের পৃথক্ অগ্নি ও পৃথক্ হব্যের উল্লেখ ঋগ্বেদে পাওয়া যায় (৪)। তাঁহারাই ধীরে ধীরে মহাভারতের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব বর্ত্তমান মহাভারত কবিবিশেষের রচনা নহে—বহুব্যক্তির রচনার সমষ্টিমাত্র। মহাভারত রচনা যখন সম্পূর্ণ হইল, তখনই এই ভারতগণ অভিনয় কর্ম্মের সূত্রপাত করেন।

"কুশীলব" বলিয়া নটের আর একটি পর্য্যায় শব্দ আছে। এ শব্দটি রামচন্দ্রের যমজ পুত্রদ্বয় কুশ ও লবের নাম একী-করণে উৎপন্ন বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে ইহারা দুই ভাইই আদিম অভিনেতা; অতএব তাঁহাদিগের স্মৃতিরক্ষার নিমিত্ত কুশীলব শব্দের সৃষ্টি। এস্থলে দ্বন্দ্ব সমাসটি একটু অদ্ভুত রকমের। প্রথম পদটি দেখিলেই সহসা মনে হয়, উহা স্ত্রীলোকের নাম। পরবর্ত্তী যুগে যখন নটগণের স্বভাবচরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়া পড়িল, তখন সুরসিক পণ্ডিতগণ ইহার ব্যাখ্যা করিলেন—(কুশীলব = কু-শীল-ব) কুৎসিত-স্বভাবসম্পন্ন। কিন্তু এরূপ ব্যুৎপত্তিই বা কিরূপে সম্ভব হয়, তাহা আমাদিগের ধারণায় আইসে না।

---

(৪) Macdonell and Keith, Vedic Index, ii, 94 ff.

Weber (বৈদিক) "শৈলুষ" ও "শিলালিন্" শব্দের সহিত কুশীলবের সম্বন্ধ আবিষ্কারে প্রয়াস পাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা (৫)। পক্ষান্তরে, আমরা এরূপ সিদ্ধান্তও করিতে পারি যে, নটগণ চিরদিনই দূষিত চরিত্র; সুতরাং তাহাদিগকে 'কু-শীল-ব' বলা হইত। অথচ পাছে এই গালাগালিতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হ'ন, এই ভয়ে সহৃদয়গণ উক্ত শব্দটি কুশ ও লবের নাম একীকরণে উৎপন্ন বলিয়া প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করিতেন। এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ কোথাও নাই। যে কোন পক্ষকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ব্যাকরণের বিবরণ :—

এইবার ব্যাকরণ শাস্ত্রের পালা। পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ীর মধ্যে কয়েক স্থলে "নটসূত্র" শব্দ ও "নট" শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১) পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষুনটসূত্রয়োঃ (৪।৩।১১০),

(২) কর্ম্মন্দ কৃশাশ্বাদিনিঃ (৪।৩।১১১),

(৩) ছন্দো গৌক্থিকযাজ্ঞিক বহ্বচ নটাঞ্যঃ (৪।৩।১২৯), ইত্যাদি।

বেল্‌ভাল্‌কর মহোদয় বলেন যে, এই নটসূত্রদ্বয় নিশ্চয়ই ভরতনাট্য শাস্ত্রেরও পূর্ব্ববর্ত্তী (৬)। প্রসিদ্ধি আছে যে, এই নটসূত্রদ্বয় শিলালিন্ ও কৃশাশ্ব কর্ত্তৃক রচিত। অধ্যাপক Levi ইহার মধ্যে বেশ একটু শ্লেষ দেখিতে পাইয়াছেন; কৃশাশ্ব বলিতে বুঝায় "যাহার অশ্ব কৃশ" অর্থাৎ দুর্ব্বল, অথচ কৃশাশ্ব একজন প্রসিদ্ধ ইন্দোইরেণীয় বীর। শিলালিন্ অর্থে শিলাশায়ী; আবার শতপথব্রাহ্মণের ত্রয়োদশ কাণ্ডে শিলালীর নাম পাওয়া যায়; তাহা ছাড়া "শৈলালি-ব্রাহ্মণে"রও উল্লেখ আছে।

উক্ত সূত্রে "নাট্য" শব্দের অর্থ বৃত্তিকার করিয়াছেন, "নটানাম্ ধর্ম্ম আম্নায়ো বা"। কিন্তু Keith এ সকল স্থলেও "নট" শব্দের অর্থ করিতে চাহেন "pantomime"। তাঁহার পক্ষে যুক্তি এই যে, খ্রীষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে (৭) পাণিনির যুগে ভারতে অভিনয় হইত এরূপ কোন প্রমাণ নাই। Weber সাহেব আরও এক ধাপ উচাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, যেহেতু সূত্র তিনটি মহাভাষ্যমধ্যে ব্যাখ্যাত হয় নাই, অতএব উহারা প্রক্ষিপ্ত। এ সকল মতবাদকে হাসিয়া উড়ানই সুবুদ্ধির কার্য্য।

মোটের উপর আমরা অনুমান করিতে পারি যে, খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে অভিনয় ভারতে বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অভিনয় সম্বন্ধে গ্রন্থাদিও রচিত হইয়াছিল। শিলালী pantomime সম্বন্ধে সূত্র রচনা করিয়াছিলেন ইহা যদি বড় বড় পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিতে চাহেন, করুন; কিন্তু আমাদের উহা স্মরণ করিলেও হাসি পাইয়া থাকে।

ভগবান্ মহাভাষ্যকারের অনুরোধে Weber পাণিনির উক্ত সূত্রত্রয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই পতঞ্জলির স্বমুখ নিঃসৃত বাণী ত' আর অগ্রাহ্য করিলে চলিবে না। এই প্রসঙ্গে ব্যাকরণ লইয়া একটু আলোচনা করা আবশ্যক। প্রকৃত বিষয়ের সহিত ইহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই; তথাপি গোড়া হইতে সকল কথা খুলিয়া না বলিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে না। এই জন্যই এ নীরস প্রসঙ্গের অবতারণা।

পাণিনির একটি সূত্র আছে "অনদ্যতনে লঙ্" (৩।২।১১১)। ইহার সরল অর্থ "আজ ঘটে নাই এমন অতীত ঘটনা বুঝাইতে "লঙ্" প্রয়োগ হয়।" মহর্ষি কাত্যায়ন ইহার উপর বার্ত্তিক করিলেন "পরোক্ষে চ লোক-বিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শন বিষয়ে লঙ্ বক্তব্যঃ।" সাধারণতঃ পরোক্ষ অতীত বুঝাইতে "লিট্" প্রয়োগ হয়। কিন্তু লোক-বিজ্ঞাত পরোক্ষ অতীত, অথবা বর্ণনাকারীর নিজের চোখে দেখা জিনিসের বর্ণনা সময়ে লিট্ না হইয়া লঙ্ হইবে। এস্থলে মহাভাষ্যকার উদাহরণ দিয়াছেন, "অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্" (৮)। আবার সাধারণ-পরোক্ষে লিট্, "প্রযোক্তুর্দর্শন বিষয় ইতি কিমর্থম্? জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ।" —মহাভাষ্য—(৩।২।২)

(৫) Hist. of Ind. Lit. p. 197, Footnote.

(৬) Goldstuckerএর পাণিনির সময় খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দী। ইহা যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও পাণিনিকে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে ফেলিয়া থাকেন। কোন্ যুক্তি বলে Keith তাঁহার বয়স আরও কমাইলেন তাহার উল্লেখ নাই। যাহা হউক, Weberএর মত' তিনি যে পাণিনিকে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লইয়া যান নাই, ইহাই আমাদের সৌভাগ্য।

(৭) Vide History of Indian Literature, Weber, pp. 217—221.

(৮) ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যবন কর্ত্তৃক সাকেতাবরোধ মহাভাষ্য-কারের চোখে দেখা। ইহা হইতেই পতঞ্জলির সময় নির্ণীত হইয়াছে—খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দী।

কিন্তু ইহাতেও গোল মিটিল না। "হেতুমতি চ" (৩।১।২৬), এই সূত্র ব্যাখ্যা কালে তিনি দেখাইয়াছেন যে; সাধারণ পরোক্ষ অতীত বুঝাইবার জন্য বর্ত্তমান (লট্) ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে (৯)। কিরূপে ইহা সম্ভবে? কেবল সেই পরোক্ষ অতীত ঘটনার অভিনয় বর্ত্তমান সময়ে প্রদর্শিত হইতে থাকিলে এইরূপ বর্ত্তমান দ্বারা অতীত বর্ণনা সম্ভব। ভাষ্যকারের উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"ইহ তু কথং বর্ত্তমানকালতা, কংসং ঘাতয়তি বলিং বন্ধয়তীতি। চিরহতে চ কংসে চিরবদ্ধে চ বলৌ। অত্রাপি যুক্তা; কথম্? যে তাবদেতে শৌভিকা (শোভানিকা—ইতি পাঠান্তরম্) নামৈতে প্রত্যক্ষং কংসং ঘাতয়ন্তি, প্রত্যক্ষং চ বলিং বন্ধয়ন্তি। চিত্রেষপ্যুদ্গূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা দৃশ্যন্তে কংসস্য কৃষ্ণস্য চ (? কংসকর্ষণ্যশ্চ)। গ্রন্থিকেষু কথম্? যত্র শব্দগ্রন্থমাত্রং (শব্দগড়ুমাত্রং) লক্ষ্যতে? তেঽপি হি তেষামুৎপত্তিপ্রভৃত্যা বিনাশাদ্ বুদ্ধি-(ঋদ্ধি?) -র্ব্যাচক্ষাণাঃ সন্তো বুদ্ধি বিষয়ান্ প্রকাশয়ন্তি। আতশ্চ সতো ব্যামিশ্রা হি (ব্যামিশ্রিতাশ্চ) দৃশ্যন্তে। কেচিৎ কংসভক্তা ভবন্তি, কেচিদ্বাসুদেবভক্তাঃ। বর্ণান্যত্বং খল্বপি পুষ্যন্তি। কেচিৎ কালমুখা ভবন্তি, কেচিদ্রক্তমুখাঃ।..."

—মহাভাষ্য—(৩।১।২)

এই ভাষ্যাংশ Weber পাশ্চাত্যদেশবাসিগণকে প্রথম দেখাইবার পর প্রাচ্য বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কংসবধ বা বলিবন্ধন ত' অতি প্রাচীন কালের ঘটনা। সে স্থলে বর্ত্তমান প্রয়োগই বা হয় কিরূপে? Keith ভাষ্যকারের সমাধানের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

ঘটনা অতীত হইলেও যেখানে বর্ত্তমান প্রয়োগ হয়, বুঝিতে হইবে সেখানে প্রকৃত ঘটনার সহিত বক্তার কোন সম্পর্ক নাই; তিনি উহা বর্ত্তমানের উপযোগী করিয়া বর্ণনা করিতেছেন মাত্র। এইরূপ বর্ণনা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীর শিল্পী তিন বিভিন্ন প্রকারে করিতেন। (১) শৌভিক বা শোভনিক—ইঁহারা মূকভাবে আঙ্গিক অভিনয় মাত্র করিতেন। (২) চিত্রকর—ইঁহারা ছবি আঁকিয়া বর্ণনার কার্য্য করেন। (৩) গ্রন্থিক—ইঁহারা কেবল বাচিক বর্ণনা বা আবৃত্তি করেন; ইহা অনেকটা কথকতার মত। তাহা ছাড়া ইঁহারা প্রায়ই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পালা গাহিতেন—একদল কৃষ্ণভক্ত ও রক্তমুখ ও অপরদল কংসভক্ত ও কালমুখ। কোন কোন গ্রন্থে রঙ উল্টান আছে; কিন্তু তাহা ভুল। যথাক্রম গ্রহণই উচিত।

অধ্যাপক Luders শোভনিক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ছায়াচিত্রপ্রদর্শক।" ইহা যে অত্যন্ত ভুল তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ, প্রদীপকার কৈয়ট উহার অর্থ করিয়াছেন,—"শৌভিকা ইতি। কংসাদ্যনুকারিণাং নটানাং ব্যাখ্যানোপাধ্যায়াঃ। কংসানুকারী নটঃ সামাজিকৈঃ কংসবুদ্ধ্যা গৃহীতঃ কংসো ভাষ্যে বিবক্ষিতঃ।" Levi ইহার অর্থ না বুঝিয়া শৌভিককে 'নাট্যাচার্য্য' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ Luders সাহেব ইহার যাহা অর্থ করিয়াছেন, তাহাই ঠিক—"মূকাভিনয় যাহারা দর্শকগণের নিকট বুঝাইয়া দেয়, তাহারাই শৌভিক।" তথাপি ইহা হইতে ছায়াচিত্রের আভাষ কিরূপে পাওয়া যায় তাহা বলা কঠিন। বোম্বাই ও মথুরার ঝাক্কীদিগের মধ্যে এরূপ অভিনয় প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু Keith এ অর্থ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, কৈয়ট সম্ভবতঃ সাম্প্রদায়িক অর্থ জানিতেন না, তাই ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ শৌভিকগণ Pantomimist। তিনি বলেন যে, এইজন্যই শৌভিকগণ কাব্যমীমাংসায় রজ্জুনর্ত্তক ও কুস্তীগিরদিগের সহিত এক শ্রেণীর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আর Weberএর মতও তাঁহার সিদ্ধান্তের অনুকূল। এই প্রসঙ্গে তিনি Lüders ও Winternitz কে ভয়ানক আক্রমণ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, কি শৌভিক, কি চিত্রকর, কেহই মৌখিক বর্ণনা করিতেন না। শৌভিকগণের অঙ্গসঞ্চালন ও চিত্রকরগণের জীবনানুরূপ চিত্রই বর্ণনার কার্য্য করিত। নিজ বাক্য সমর্থনের জন্য তিনি হরদত্তের টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"যেঽপি চিত্রং ব্যাচক্ষতেঽয়ং মথুরাপ্রাসাদোঽয়ং কংসোঽয়ং ভগবান্ বাসুদেবঃ প্রবিষ্টএতাঃ কংসকর্ষিণ্যো রজ্জব এতা উদগূর্ণা নিপতিতাশ্চ প্রহারা অয়ং হতঃ কংসোঽয়মাকৃষ্ট ইতি; তেঽপি চিত্রগতং কংসং তাদৃশেনৈব বাসুদেবেন ঘাতয়ন্তি। চিত্রেঽপি হি তদ্বুদ্ধিরেব পশ্যতাম্। এতেন চিত্রলেখকা ব্যাখ্যাতাঃ।"

(৯) ইহা মহর্ষি কাত্যায়নের উপর ভাষ্যকারের আক্ষেপ মাত্র।

ইহা হইতে বোধ হয়, যেন চিত্রগুলি জীবন্ত হইয়া আপনাদিগের পরিচয় আপনারা প্রদান করিত। চিত্র-লেখকের পক্ষে চিত্র বুঝাইয়া দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত ব্যাপার না হইলেও, এস্থলে সেরূপ ব্যাপার মহাভাষ্যকারের অভিপ্রেত নহে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা হরদত্তের উক্তি ব্যর্থ।

ইহারই উপর নির্ভর করিয়া Keith শৌভিকগণকে মূক অভিনেতা বলিয়াছেন। তাহারা দর্শকগণের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ কংসবধের অভিনয় করিত বটে, কিন্তু সে অভিনয়ে যে কথোপকথন চলিত ইহার কোন উল্লেখ নাই। সেজন্য তিনি ইহাদিগকে পুরা অভিনেতা বলিতে রাজী নহেন। এখানেও Pantomime সিদ্ধান্ত তিনি চালাইতে চাহেন, তাহা বলাই বাহুল্য।

শৌভিকগণ রঙ্গমঞ্চে কথা কহিত কি না, বলিতে পারি না; তবে মহাভাষ্যকার যে নট ও নটস্ত্রীগণের কুৎসিত চরিত্রের বিষয় বিশেষভাবে অবগত ছিলেন, এ প্রমাণ আমরা দিতে পারি। এস্থলে শৌভিক শব্দের প্রয়োগ নাই সত্য, কিন্তু নট শব্দের প্রয়োগ আছে—

"তদ্ যথা নটানাং স্ত্রিয়ো রঙ্গং গতা যো যঃ পৃচ্ছতি কস্য যূয়ং কস্য যূয়মিতি তং তং তবেত্যাহুঃ। এবং ব্যঞ্জনান্যপি যস্য যস্যাচঃ কার্য্যমুচ্যতে তং তং ভজন্তে।"

ইহা বেশ অনুমান করা যায় যে, নট ও নটস্ত্রীগণ পরস্পর রঙ্গমঞ্চে কথাবার্ত্তা কহিত; এবং মহাভাষ্যকার অভিনয়ের কথা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। Keith শেষে এ কথা অনিচ্ছায় স্বীকারও করিয়াছেন; কোন দৃশ্যকাব্যের নাম পতঞ্জলি উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে তিনি দৃশ্যকাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন না, একথা Keith বলিতে সাহস করেন নাই।

এইবার গ্রন্থিকদিগের কথা। টীকাকারগণের পদাঙ্কানুসরণে গ্রন্থব্যাখ্যাকারক বলিয়া Luders গ্রন্থিক শব্দের অর্থ করিয়াছেন। Dr. Dahlmann ইহাদিগকে পরিব্রাজক চারণ (cyclic rhapsodes) বলিয়াছেন। ইহারা যে আবৃত্তি করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই করিত না, এ অর্থ করিলে দুই দলে বিভক্ত হওয়া ও রঙ মাখার কোন উপপত্তি হয় না। কোন কোন পণ্ডিত দর্শকগণের মধ্যে দুইদলে ভাগ কল্পনা করেন। কৃষ্ণভক্তের দল ভয়ে কৃষ্ণমুখ ও কংসের পক্ষপাতিগণ ক্রোধে রক্তমুখ হইতেন। অথবা কৃষ্ণভক্তগণ ঘৃণায় কৃষ্ণমুখ ও কংসভক্তগণ জিঘাংসায় রক্তমুখ হইতেন। এরূপ অর্থ নিতান্ত অসঙ্গত। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর দেশে, সে কৃষ্ণোপাসনার যুগে দর্শকগণ যে কংসভক্ত হইতেন, এরূপ মনে করাও হাস্যজনক। বিশেষতঃ ভাষ্যের সংস্কৃত হইতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, বিভাগ গ্রন্থিকগণের মধ্যে। তাহারাই মুখে রঙ মাখিয়া দুইদলে বিভক্ত হইত। সুতরাং কেবল আবৃত্তিই তাহাদের কার্য্য ছিল না। কৈয়ট ইহার পর্য্যায়-স্বরূপ 'কথক' শব্দ ধরিয়াছেন। ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইহাদিগকে কথক ও Greek Rhapsodist-গণের শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন।

কোন্ দল কোন্ বর্ণ হইতেন, তাহা লইয়া অনেক মতভেদ আছে। Hillebrandt সাহেব দলবিভাগ গ্রন্থিকগণের মধ্যেই স্বীকার করেন, তবে তাহারা রঙ মাখিত না, ইহাই তাঁহার অভিমত। যে দল যে রসের অভিনয় করিত, সে দলকে সেই বর্ণে রঞ্জিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে—ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। ইহা সম্ভব হইলেও হইতে পারে। কিন্তু Kielhorn সম্পাদিত মহাভাষ্যের পাঠ গ্রহণ করিয়া তিনি বলেন যে, কংসভক্তের দল ক্রোধে রক্তমুখ ও কৃষ্ণভক্তের দল ভয়ে কৃষ্ণমুখ হইতেন। ইহা অসম্ভব। চিরবিজয়ী কৃষ্ণভক্তের দল বরং ক্রোধে রক্তমুখ ও হন্যমান কংসভক্তের দল ভয়ে কৃষ্ণমুখ হইতেন—ইহাই সঙ্গত। আমরা তদনুরূপ পাঠই উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহাই হউক, এ স্থলে রসের বর্ণবিচারের আবশ্যকতা কিছুই নাই। ভগবান্ মহাভাষ্যকারের যুগে রঙ মাখিয়া অভিনয়ের ধারা প্রচলিত ছিল—ইহাই আমাদিগের সিদ্ধান্ত। বিশেষতঃ কেবলমাত্র আবৃত্তিকারক বলিয়া গ্রন্থিক শব্দের ব্যাখ্যা করিলে "প্রত্যক্ষং" শব্দটি ব্যর্থ হইয়া যায়। (১০)

ধর্ম্ম ও দৃশ্যকাব্যের উৎপত্তি

Keith মোটের উপর স্বীকার করিয়াছেন যে, পতঞ্জলির সময় রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব ছিল। দৃশ্যকাব্যের উপাদানও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান ছিল। নটগণ কেবল আবৃত্তি করা ছাড়া গানও গাহিত। "নটস্যভুক্তম্"—নটের ভোজন, নটের ক্ষুধা তখন খুব প্রসিদ্ধ। উত্তমমধ্যমও তাহার ভাগ্যে বেশ জুটিত। পুরুষ হইয়া যথাযোগ্য সাজসজ্জা করিয়া স্ত্রীলোকের ভূমিকা গ্রহণও তখন বেশ প্রচলিত ছিল। এই শ্রেণীর নটকে "ভ্রূকুংস" বলিয়া ভাষ্যকার উল্লেখ করিয়াছেন। (১১) তবে ইহা হইতে এরূপ ধারণা করা যাইতে পারে যে, তখনও স্ত্রীলোক লইয়া অভিনয় করা ততটা প্রসিদ্ধিলাভ করে নাই। ভারতীয় দৃশ্যকাব্য তখনও শিশু।

(১০) Sanskrit Drama, P. 36. Footnote.
(১১) ৬।৩।৪৩

সাগরপারের চিঠি

শ্রীপরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত

শান্তিদি,

আজ প্রায় মাস তিনেক হোল এখানে এসেচি। এদ্দিনের মধ্যেও তোমার কাছে একটা পৌঁছা সংবাদ পাঠাইনি—মনে মনে হয় ত খুব চটে গেছো! কিন্তু এখানে এসেই এমন হৈ চৈ আর হট্টগোলের মধ্যে পড়ে গেলুম যে, তোমার কাছে আর চিঠি লিখবার ফুরসুৎ করে উঠতে পারি নি! আশা করি আমার এই গাফিলতিটা মাপ করে নেবে।

তোমার কাছে দেরী করে চিঠি দেবার আর একটা কারণও আছে। আস্‌বার সময় বলেছিলে—'বিদেশে গিয়ে কী আর পাড়াগাঁয়ের এই বোনটাকে মনে থাকবে!' এতে আমার যা রাগ হয়েছিল—কী বল্‌ব! এদ্দিন হয় ত রাগ করেই চিঠি দিই নি ভেবেছিলুম, তোমার নিকট চিঠিই লিখব না। তুমি আমার কে! আমার জাঠতুতো বোনের জা। ভাগ্নী ত নিকট সম্পর্ক,—তার কাছে আবার চিঠি! কিন্তু কী গেরো!—দুদিন যেতে না যেতেই তোমার সেই দুষ্টুমী-ভরা চোখ দুটো কেবলি মনে পড়তে লাগলো।—কী বল্‌ব—এক দিন তোমায় স্বপ্নেও দেখে ফেল্লুম! বুঝলুম, আজ এই হাজার হাজার মাইল দূরে থেকেও সুদূর বাংলার বিজন পল্লীর এক নিভৃত কোণের একটী স্নেহময় হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ পাচ্ছি। তাই আজ বিশেষ কোরে সময় কোরে নিয়ে তোমার নিকট এই লম্বা চিঠি লিখতে বসলুম।

আস্‌বার সময় বলেছিলে, বিদেশে গিয়ে নিশ্চয়ই মেম বিয়ে করে আন্‌ব। ধ্যেৎ, মেম বিয়ে করতে যাবো কোন্ দুঃখে? এসব মদ্দা মদ্দা মেয়েগুলোকে দেখ্‌লে আমাদের মতো ছা'পোষা বাঙালী প্রাণ যেন জল হয়ে যেতে চায়—তার উপর আবার বিয়ে! আর এদের অনেককেই আমার মোটেই সুন্দর মনে হয় না। বাস্তবিক দিদি, তোমার পাশে যদি এদের দাঁড় করানো যায়, তবে মনে হয়, যেন এরা এক একটী শঙ্খিনী!

সুরুতেই বড্ড বাজে বকুনি আরম্ভ করলুম!—কী করব, জানোই ত,—চিরদিনই আমি একটু ছ্যাব্‌লা রকমের। একবার বক্‌বক্ করবার সুবিধে পেলে শ্রোতার নাড়ী ধরে টান দিয়ে তবে ছাড়ি! কিন্তু তুমি ত আর আমার তেমন দিদি নও, তাই তোমার কাছে যা-খুসি তা লিখতেও মোটেই ভয় হয় না। দেশে থাকতে আমি কী রকম গল্প করতুম, আর তুমি কেমন তন্ময় হয়ে শুনতে—মনে আছে ত! বিশেষতঃ এক দিনের কথা,—জীবনে তা' ভোল্‌বার নয়—অই যে রান্নাঘরে বসে গল্প করছিলুম, আর রাঁধতে রাঁধতে তোমার ডালই পুড়ে গেলো,—তোমার বোধই নেই—শেষে মাঐমার কী বকুনিটাই না খেতে হলো! মনে আছে ত!—আমি কিন্তু ভুলি নি, ভুল্‌বও না।

তুমি হয় ত ভাবচো, কী দুষ্টু ছেলে বাবা, এত কথাও মনে রাখে! আর আমিও বলি—তুমিও ত কম দুষ্টু নও দিদি,—কবে এক দিন খেজুরের রস চাখতে দিয়েছিলে, আর পিঁপড়েয় আমার জিব কামড়ে ধরেছিল,—সে কথা ত ক'দিন বলেছ। যা' হোক্, তোমার সঙ্গে এখন মিল,—এত দূর দেশে থেকে ঝগড়া ত আর করা যায় না।

এই ক'দিনেই দেশের জন্য মনটা কেমন করচে। প্রথম যেদিন এলাম, সেদিন সেই অবিশ্রান্ত কোলাহলে কাণটা যেন ঝালাপালা হয়ে গেলো; সারাদিন নিশ্বেস ফেলবারই ফুরসুৎ পেলাম না। তার পর যে বাসায় উঠলুম, তাদের অভ্যর্থনার চাপে দম বন্ধ হওয়ার যো আর কী! বাসার ছেলে-মেয়েরা যেন নেহাৎই একটা নতুন জিনিস দেখ্‌লে—কেবলই কৌতূহলের সঙ্গে আমার দিকে চাইতে লাগলো! তখন আমার এমন লজ্জাই করছিলো, কী বল্‌বো। তার পর মুখ ফুটে দু'একটা কথা বল্‌তে সুরু করলাম যখন, তখন দু'একজন আড়ালে থেকে মুচ্‌কি মুচ্‌কি যা হাসি! এখন অবিশ্যি আমি এক রকম পুরোনো হতে চলেচি।

এদের কতকগুলো জিনিস ভারী সুন্দর! এরা বেশ চট্‌পটে, তোমাদের মতো জবুথবু নয় মোটেই। গাড়ীতে চড়তে গেলে পা ফস্‌কে পড়ে না মোটেই, বা পোট্‌লা পুঁটুলি বাঁধতে গিয়ে ট্রেন ফেল করে বসে না। তা ছাড়া দুনিয়ার সব খবরই রাখে যেমন, ঘরের কাজেও তেম্নি সুনিপুণ।

প্রথম দিন গিন্নী আমাকে একটা ঘর দেখিয়ে যখন বল্লে—এই তোমার ঘর, আমি একটু অবাক্‌ই হয়েছিলুম,—এম্‌নি চমৎকার করে সব সাজানো-গুছানো; একেবারে যেন ছবির মত। শুনলুম, তার মেজ মেয়ে 'হেলেন' সাজিয়ে দিয়ে গেছে। আর খাবার টাবারও যা তৈরি করে, তাও বেশ চমৎকার।

আমার কিন্তু তোমার হাতের সরুচাকুলি, নারকেলপুলি খেতেই বেশী ভালো লাগে। আসবার সময় মা যে আমসত্ত দিয়ে দিয়েছিলেন, তারই খানিকটা ছিল। এদের দেওয়ায়,—চেখে দেখে, একেবারে লাফিয়ে বল্লে, 'স্কেন' 'স্কেন' অর্থাৎ কি না চমৎকার! একটা ছোট ছেলে—ফ্রিট্‌জ. ঘুরে ঘুরে আমার ঘরে এসে চুপি চুপি আমসত্ব চাইত, আর পেলে পরই গুট্‌লি পাকিয়ে টুপ করে মুখে পুরে দিব্যি সাধু মানুষটীর মতো এম্‌নি গম্ভীরভাবে চলে যেতো যে, মনে হলে হাসি পায়।

আর এই হেলেন্‌ ঠিক তোমারই মতো দেখ্‌তে—তবে একেবারে ফ্যাকাসে সাদা! আর তুমি,—সে ত তুমিই জানো! তবে হেলেন আমায় এমন যত্ন করে,—মনে হয় যেন শান্তিদির হাতের সেবাই পাচ্ছি। তোমার কথা তাকে বলেচি। সে ত শুনে মহা খুসী! তোমার সম্বন্ধে খুঁটে খুঁটে সে কত কথাই জান্‌তে চায়—তুমি কি পড়ো, পিয়ানো বাজাতে পারো কি না, ইত্যাদি—

হায় রে পোড়া কপাল! গোকুলপুরের শান্তিদি আবার পড়ে, আর পিয়ানো বাজায়! বড় জোর দু'একখানা চিঠি লিখা বা রামায়ণ মহাভারত পড়া; আর বিয়ের সময় মেয়েলী গান,—এই ত তোমাদের সব জারিজুরী। তবে আমি হেলেনকে বলেছি,—তোমার মতো সুন্দর খুব কমই আমি দেখেছি। তাইতে সে তোমার একখানা ফটো চেয়ে বসেছে। মেয়েটী ভারী নাছোড়বান্দা,—দিতেই হবে!...

এদের প্রত্যেকটা চালচলনের সঙ্গে কেবলি তোমাদের কথা মনে পড়ে! সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা যখন বায়োস্কোপ দেখতে যায়, আমার মন তখন কেবলি সাগরনালা ডিঙিয়ে সুদূর বাংলা দেশে তোমার পায়ের উপর গিয়ে পড়ে। মনে হয়,—তুমি ততক্ষণে হয় ত তুলসী-তলায় প্রদীপ দেখিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করচো; আর পট্‌লী হয় ত পাশে দাঁড়িয়ে বলচে—হরি বোল্‌, বোল্‌ হরি!...

এখানকার এই কর্ম্ম-সমুদ্রের ঢেউএর মধ্যে হাবুডুবু খেয়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ি, তখন বারবারই বাংলার একটী সেবাপরায়ণ হাতের কোমল স্পর্শের জন্য মনটা যেন কেমন কর্‌তে থাকে।

যাক্‌ দিদি, বহুত বাজে বক্‌লাম। আর বাজে না বকে কীই বা লিখ্‌ব! কাজের কথা আমাদের থাক্‌লে ত! কাজের কথার মধ্যে এই লিখ্‌চি,—খানিকটা আমসত্ব আর নারকেলের সন্দেশ পাঠিয়ে দেবে; আর শীতকালের অই পাটালি গুড়—তারই খানিকটা! ব্যস্‌ আর কিছু নয়! এই সামান্য জিনিস কটির সঙ্গে যে একটা অদৃশ্য জিনিস আস্‌বে, তা' ত আর সামান্য নয়,—এই দূর বিদেশে সে যে অমূল্য সম্পদ্‌!

ইচ্ছে আছে—ফিরে যাবার সময় তোমার জন্য একটা পিয়ানো নিয়ে আসবো—তোমাকে বাজাতে শেখাব। হেলেন্‌ যা বাজায়—একেবারে মাৎ করে দেয়। তাই তার কাছে আমি পিয়ানো শিখ্‌চি। তোমার জন্য কী পাঠাব বুঝতে পাচ্ছিনে। এরা যা ভালোবাসে, তা'ত আর তোমার পছন্দ হবে না। এরা গয়না পরতে চায় না; কিন্তু সারাদিন পোষাকের পূজা করে। তোমার ত আর এতে পোষাবে না,—হলুদের দাগ লাগিয়ে এক দিনে দিবে সব শেষ করে।

তবুও তোমার জন্য একটা পোষাক পাঠাচ্ছি। অন্ততঃ একটা দিন পরো। আমি অশ্বিনী বাবুকেও লিখ্‌চি,—তিনি নিজেই ত ফটোগ্রাফার,—এক দিন বাড়ী এসে এই পোষাক পরিয়ে তোমার একটা ফটো তুলে পাঠাবার জন্য। সেই ফটো হেলেনকে দিয়ে দেখাব—বাঙালীর মেয়ে কী সুন্দর!

খবরদার, ফটো না পাঠালে কিন্তু আমি রাগ করবো! দুমাসের মধ্যে যদি মেমের পোষাক-পরা শান্তিদির ফটো এসে না পৌছায়, তবে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেব। শেষে মরবার সময় টেলিগ্রাম করব—তাই বুঝে সুজে কাজ করো!

অনেক রাত হলো দিদি। এখন তোমরা হয় ত সব ঘুমুচ্ছ। আস্‌চে মেলেও তোমায় চিঠি দেবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু এ চিঠির উত্তর না পেলে আমি আর তোমার কাছে লিখছি নে। এখন তবে ঘুমোতে যাই। যদি তোমায় স্বপ্নে দেখি—সে কথা পরের চিঠিতে জানাবো। ইতি

তোমার ভুলুদা'

"শান্তিদি,

প্রায় বছর গড়াতে চল্লো,—আমি তোমায় লিখেছিলুম, আমার চিঠির উত্তর না পেলে আর কলম ধরব না। আমার সে কথা রেখেছি কি না দেখো। তোমার চিঠি অবিশ্যি পাইনি, তবু এ-চিঠি লিখ্‌চি, কিন্তু ডাকে দেব না।

আমার চিঠির উত্তর পাইনি, আর যে কোন দিন পাব না তাও জানি; তবু কাগজের উপর কলমের কয়েকটা আঁচড় না কেটে থাকতে পারি নে। আমায় মাপ করো দিদি।

আমি যে পোষাকটা পাঠিয়েছিলুম, তা' ফেরত এসেচে। মেজদির চিঠিও পেয়েচি। তিনি লিখচেন—"ভুলু তোমার চিঠি পেয়েচি। শান্তির কাছে এ রকম চিঠি লিখা তোমার ঠিক হয় নি। আর তোমার পাঠানো পোষাক নিয়ে ভারী একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে। সকলের মন ত সমান নয় ভাই,—নানা জনে নানা কথা বল্‌চে, আর শান্তিকে দুষচে। বল্‌চে, জা'এর খুড়তোত ভাই তো,—কী এমন একটা নিকট সম্পর্ক,—তার সঙ্গে এত মাখামাখি চিঠি-লেখালেখি কেন! তুমি ত বড় হয়েছ, সবই বুঝতে পারো—তাই বুঝে-সুঝে কাজ করবে। আর চিঠিপত্র আমার নামেই দিও।"

সবই বুঝতে পারচি দিদি! আসবার আগে যখন বাড়ী থেকে গোকুলপুর যেতে চাই, তখন মা ধমকে বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন—এত ঘন ঘন গোকুলপুরে কী কাজ! তাঁর ধমকের কারণ এদ্দিনে বুঝতে পারচি।······

আজ বেড়াতে যাই নি···মনটা কী রকম লাগচে বলে। আজ যেন আমি বাংলা দেশে ঝোপ-ঝাড়ের ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুন্‌চি,—ঠাকুর মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার ধ্বনি যেন কাণে এসে ঘা দিচ্ছে।···অই যে রাখাল ছেলেরা গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরচে, আর গরুগুলাও তাদের ধোঁয়া-দেওয়া গোয়ালে যাবার জন্য যেন ব্যগ্র হয়ে চল্‌চে।···বিলের ওপারের গ্রামগুলা সব যেন কুয়াসা আর ধোঁয়ায় ঢেকে গেছে।···একটা অস্পষ্ট রেখা ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না। বিলের কালো জলে ডুবন্ত সূর্য্যের রক্তরাঙা আলো পড়চে,—মনে হচ্ছে, যেন একটা লাল সমুদ্র শান্ত হয়ে রয়েছে।

এতক্ষণে সূর্য্য বোধ হয় ডুবলো। ছোট ছেলেরা পুকুরঘাটে হাত পা ধুয়ে মাদুর পেতে বোধ হয় রেড়ীর প্রদীপের সামনে পড়তে বসলো। আজ বাংলা দেশে কী তিথি গো? সপ্তমী না অষ্টমী? এতক্ষণে হয় ত চাঁদ উঠে গেছে!···

গ্রামের বধূরা এখন কী করচে! জল আনা ত অনেক আগেই সারা হয়ে গেছে! এখন বোধ হয় দরমার বেড়া-আঁটা রান্নাঘরে বসে রাঁধ্‌চে, আর কত কী-ই না ভাব্‌চে।···

ঠাকুরের বৈকালী দেওয়া হয়ে গেছে না কি গো? গিন্নীরা কী করচেন? দাওয়ার উপর পা ছড়িয়ে বসে মালা জপচেন, না নাতি-নাত্‌নীদের রাক্কস-খোক্কসের গল্প শোনাচ্ছেন!···

বেত-ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে, খানা-ডোবার পাশে পাশে হাজারো জোনাকী মিটমিট করচে বোধ হয়। ছেলেরা এতক্ষণে পড়া শেষ করে খেতে গেল না কি?···

আচ্ছা, আজ যদি খুব বৃষ্টির দিন হয়, তবে? বধূরা হয় ত গন্‌গনে চুলার সামনে বসে খিচুড়ি রাঁধ্‌চে! ছোট ছেলেরা হয় ত ঠাকুরমার গলা জড়িয়ে ধরে যত রাজ্যের গল্প শুন্‌চে। বাইরে শুধু বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্—তারি মাঝে মাঝে কোলা ব্যাং ডেকে উঠ্‌চে···'ঘ্যাকো ঘ্যাকো'।

না, এটা ত শীতকাল, বাংলায় এখন বৃষ্টি নেই। বউরা রাত্তিরে পুকুরঘাটে এঁটো বাসন মাজতে গিয়ে হয় ত শীতে কাঁপ্‌চে। আর সন্ধ্যা হতে না হতেই হয় ত শীতের পল্লী রাত দুপুরের মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে।···

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উৎরে গেছে। আমার বাসা থেকে 'স্প্রে' নদী দেখা যাচ্ছে, ওই যে কাইজারের প্রতিমূর্ত্তি! কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে—ওটা আউটরাম ঘাট, জেনারেল আউট্‌রামের প্রতিমূর্ত্তি! তবে কি আবার কলিকাতায় ফিরে এলাম! হ্যাঁ, এই যে গঙ্গার ঘোলা জল! ···জাহাজে জেঠীতে ধোঁয়ায় কুয়াসায় একাকার হয়ে গেছে। আমি কি শ্যামবাজারের বাসায় বসে লিখ্‌ছি? এখানকার রাস্তার আলো কি কল্‌কাতারই আলো?

গোকুলপুর যেতে কোন্ রাস্তায় যেতে হয়! রেলে চড়লে কত মাঠ ঘাট বন বাদাড় পেরিয়ে ছোট্ট একটী ষ্টেশন,—ওখানকার দীনু পয়েণ্টস্‌ম্যান হয় ত আলো দেখাচ্ছে! গাড়ী থেকে নেমে অই যে মেটে সড়ক···শান্তিদিদির বাড়ীর গা ঘেঁসে চলে গেছে। সড়কের দুই দিকে বাঁশ-বন আর শেয়ালকাঁটা। বাঁশবনের মশার সে কী ভন্‌ভনানি! একটা সোঁদা গন্ধ আসচে যেন কিসের?···

ও বাঁশিটা বাজাচ্ছে কে? রামু মণ্ডল না কি? বাঃ বেশ বাজায় ত; রামপ্রসাদী সুর কী মিষ্টি!···

মধুর পবন

শিল্পী—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সেনগুপ্ত

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Work

ওই পুকুরঘাটটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! ওঃ হরি! অই ত শান্তিদিদির পুকুরঘাট। এখানে বসে ত' রোজই শান্তিদি বাসন মাজে!

আচ্ছা, শান্তিদি এখন কী করচে · একবার উঁকি মেরে দেখলে হয় না! না না, কী কর, কী কর,—লোকে কী ভাববে! শান্তিদির নামে কলঙ্ক রটবে যে!··

এই ত সাতসমুদ্দুর তেরো নদীর পারে বসে সারা বাংলা দেশটা একবার ঘুরে এলাম। · আর ঘরের বাইরে এখানে সভ্য জগতের বিপুল কর্ম্মকোলাহল কী তুমুল নাদে জানিয়ে দিচ্ছে,—ইয়োরোপ আজ কী বেগে চলচে। আমি কি এ চলার বেগে তাল রেখে চলতে পারবো না? এ স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় গিয়ে ঠেকব জানি নে,—তবু এ পথেই আমার জীবন-তরী বেয়ে চলব। আমার পথে বাধা দেবে কে গো? হাজার মাইল দূরে এক পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তার ভালোবাসার জোরে আমায় আবার বাংলার সেই সহজ সরল শান্ত জীবন-যাত্রার পথে টেনে নিয়ে যাবে? ধ্যেৎ ··

হেলেন্ আমায় ভালোবাসে! তার এ ভালোবাসা আমি মাথায় তুলে নেবো। · আমি তাকে বিয়ে করবো। নাই বা রইল তার মধ্যে বাংলার মেয়ের সে শান্ত ভাব· সে যে মূর্ত্তিমতী কর্ম্ম-প্রতিমা! · ওগো বাংলার মেয়ে, তোমার ওই কালো আঁখির করুণ দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে আর চেয়ো না। তোমার শান্ত অনাবিল গভীর নির্ব্বাক্ প্রেম আমায় আর আকর্ষণ করতে পারবে না। তবে পারে, যদি উন্মাদের মতো আগুনের দীপ্তি নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারো। পারবে কি? ··চাইনে, চাইনে, ·চাইনে আমি সেই সব-সয়ে-যাওয়া· মুখ-না-ফোটা গভীর প্রেম। আমি চাই আমার সেই সুভদ্রা, যে নিজের সব দাবী জোর গলায় জাহির করতে একটু ভয় পায় না! ··

মা গো, তোমার অনেক দিনের সাধ—তোমার ছেলের একটী রাঙা টুকটুকে বউ আনবে। তোমার সে সাধ পূরাতে পারলুম না। তুমি কেন আমায় অমন করে গোকুলপুরে যেতে মানা করলে? শান্তিদিদির সে ভালোবাসাকে কেন সন্দেহের চোখে দেখলে?

শান্তিদি, তোমার কাছে আমসত্ব আর পাটালি গুড় চেয়ে পাঠিয়েছিলুম, আজ আর চাইনে! দিদি, আমাদের ভালোবাসাকে জোর করে ধরে রাখলে না কেন? আমাদের ভালোবাসা যে কত পবিত্র, তা' জোর গলায় কেন প্রকাশ করলে না? · কেন শুধু নীরবে· কেঁদে কেঁদে সব অপবাদ মাথায় তুলে নিলে?

না থাক্, আমি তোমার কে? · কোন্ এক গাঁয়ের মেয়ে! দেশে যদি ফিরি কোন দিন,—পূরাদস্তুর সাহেব হয়ে ফিরব। তখন কে তোমায় চিনবে? আর তুমিও কি হাত বাড়িয়ে আমায় আশীর্ব্বাদ করতে আসতে সাহস পাবে!···

না গো না, বাংলার দিদিকে কি ভোলা যায়? তোমার নিকট কোন দিন চিঠি লিখব না সত্য, কিন্তু চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে; তোমাকে ত মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না।

ওগো লক্ষ্মী! যেখানেই থাকি না কেন, বছর বছর ভাই-ফোঁটার সময় আমার কাপড় আর চন্দন পাঠিয়ে দিও। কর্ম্মস্রোতে নিজকে ভাসিয়ে দিয়ে যেমন করেই চলি না কেন, বছরের একটী দিন একটু থামব—তোমার কথা, বাংলার অনাড়ম্বর সহজ জীবন-যাত্রার কথা একবার মনের মধ্যে ভেবে নিতে। সেদিন একটু নিভৃতে তোমার পার্শেল খুলে ভাবব—আজ ভাইফোঁটা, শান্তিদির ফোঁটা আজ তার ভাইএর কপালে পড়ল।······

এ চিঠি ডাকে দেব না ভেবেছিলুম, কিন্তু দেব,—তবে তোমার নামে নয়। ভুল ঠিকানায় এ চিঠি পাঠাব, যাতে বাংলার অজানা বোন্দের দুয়ারে ঘুরে একটী ভাইএর ভালোবাসার ব্যর্থকাহিনী চিরদিনের জন্য শেষে ডেড্‌লেটার আফিসে আশ্রয় নেয়।······

তোমার ফেরত দেওয়া পোষাকটী আর কি করব! আমার বিয়ের সময় হেলেন্‌কে দিয়ে বলব—এ আমার দিদির হাতের দান।······

দিদি, আজও কি তুমি তেম্নি দুষ্টুমি-ভরা চোখে চাও? আজো কি মাঝে মাঝে আমার কথা মনে পড়ে? আজও কি পুকুরঘাটে বাসন মাজতে মাজতে অপরিচিত পথিক দেখলে চমকে উঠে ভাব—অই বুঝি ভুলুদা এল? আমের দিনে জন-গুণতি আমসত্ত্ব দেওয়ার সময় কি আজো ভাব,—যদি ভুলোদা থাকত।······

এখানকার এই ভোগ বিলাসের মাঝে থেকেও তোমার

হাতের এই ক্ষুদকুঁড়ার জন্য মনটা মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আজ কতদিন হয়ে গেলো দিদি, তোমার মুখের কথা শুনিনে বা তোমার হাতের লেখা পাইনে, তবু যেন মনে হয়, তোমার বুকভরা ভালোবাসা এই দূর দুরান্তরেও আমার সারা গায়ে বর্ষিত হচ্ছে !······

দিদি, নিত্য সন্ধ্যায় যখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে প্রণাম করবো, তখন আমার মঙ্গলের জন্য ঠাকুরের কাছে একটু প্রার্থনা কোরো। তোমার স্নেহাশীর্ব্বাদ এই জীবন সংগ্রামে আমাকে অভেদ্য বর্ম্মের মতো ঘিরে রাখবে ; আর তোমার অল্প কয়েক দিনের ভালোবাসার মধুস্মৃতি সারাজীবন আমাকে সুপথে শান্তিতে রাখবে। ইতি—

স্নেহাকাঙ্ক্ষী ভুলু

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ইন্দ্রজাল

শ্রীআশু দে

ইন্দ্রজাল, অথবা চলিত ভাষায় "ম্যাজিক" দেখেন নাই, এরূপ লোক বোধ হয় নাই। এরূপ মনোমুগ্ধকর, নির্দ্দোষ কৌতুক আর কোনো আমোদ-প্রমোদে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। ম্যাজিকওয়ালা ক্ষণে ক্ষণে অভিনব কৌশলে অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিতেছেন ; সকলে বার বার ধরিবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়া যাইতেছেন ; এদিকে হাস্যরোলে সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ কম্পিত, মুখরিত হইতেছে,—এ দৃশ্য বোধ হয় সকলেই কখনো না কখনো উপভোগ করিয়াছেন ! এবং দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই · বিশেষতঃ তরুণ সম্প্রদায় যে মনে মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা, যথা, "হায় রে, যদি অমনি ভাবে লোক ঠকাইতে পারিতাম" পোষণ করেন না, তাহাও বলা যায় না। আমার ধারণা,—ম্যাজিক দেখিয়া অল্পবিস্তর সকল বালকের মনেই এইরূপ বাসনা জাগরিত হয়,·· অধিকাংশের কিছুদিনের মধ্যেই সব লুপ্ত হইয়া যায়···অল্প সংখ্যক কয়েকটি "নাছোড়বান্দা" খাম-খেয়ালী বালকের বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত এই নেশা টিঁকিয়া থাকে। ১১ বৎসর বয়সে আমেরিকান ঐন্দ্রজালিক Thurston কে দেখিয়া প্রথম মনে উৎসাহ এবং উদ্যম অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তাহার পর ২১ বৎসর চলিয়া গিয়াছে,· জীবনস্রোতে অনেক তরঙ্গ, অনেক জোয়ার-ভাটা বহিয়া গিয়াছে · কিন্তু শৈশবের সেই সম্মোহন মন্ত্রের মায়া আজো কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। অনেক অনুযোগ, বিরাগ, এমন কি তাড়না পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াও অভ্যাস ছাড়ি নাই। তাহার পরিবর্ত্তে পারিশ্রমিক পাইয়াছি—আনন্দ। আত্ম-প্রসাদ যে একেবারে লাভ হয় নাই, তাহা বলিতে পারি না , কিন্তু সে বেশী দিন নহে। আনন্দ দান করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, তাহার তুলনায় আত্মপ্রসাদ তুচ্ছ। অনেক ক্ষেত্রে, অনেক সমাজে দেখাইয়া কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতাও লাভ হইয়াছে। সকলের পক্ষে বিপুল আয়োজন, দুঃসাধ্য অভ্যাস করা কষ্টকর। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এই যে অতি সহজে, অল্প চেষ্টায় কৌতূহলী, আমোদপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা যাহাতে বন্ধু-বান্ধবী-দিগের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, তাহার জন্য কয়েকটি সামান্য সহজসাধ্য কৌতুকের অবতারণা করিতেছি।

কিন্তু কৌশল যত সহজই হউক না কেন, সকলেরই মূলমন্ত্র হইতেছে অভ্যাস। এইটি সর্ব্বাগ্রে মনে রাখিতে হইবে। এ কথা অনেকেই জানেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, কদাচিৎ অল্প শিক্ষার্থীই এই মুখ্য নীতির অনুশীলন করিয়া থাকেন। যখন তখন অভ্যাস করা চাই। যতটুকু অবসর পাওয়া যাইবে, ততটুকুই কাজে লাগাইতে হইবে। তাহার জন্য সব চেয়ে ভালো স্থান আয়নার সম্মুখে। স্কচ কবি বার্ণস বলিয়াছিলেন, "দেবতারা আমাদের সেই গুণ দিন, যাহাতে আমরা অপরের চক্ষে নিজেদের দেখিতে পাই।" দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অভ্যাস করিলে এই সুবিধা পাওয়া যায়। অর্থাৎ দেখাইবার কৌশল, মুখের ভাব-ভঙ্গী, শরীরের সঞ্চালন, দর্শক যেরূপ দেখেন, ঐন্দ্রজালিক নিজের প্রতিবিম্বে ঠিক তাহারি প্রতিকৃতি দেখিতে পান, এবং সেই অনুযায়ী নিজের ভুলচুক সংশোধন করিতে পারেন।

অভ্যাসের পর প্রদর্শন। এই প্রদর্শন সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু বলিবার আছে। বিশ বৎসরে আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, খেলাটা কিছুই নয়, দেখানতেই আসল বাহাদুরী। মূল দ্রব্যের চেয়ে গিঠকাটীতেই যে বেশী আনন্দ। Trick যত অকিঞ্চিৎকরই হউক না কেন, তাহাতে কৌশল যত সহজই বোধ হউক না কেন,··· প্রকৃত গুণীর হাতে প্রদর্শনের নিপুণতায় এবং সরস বাক্য বিন্যাসের সহযোগে সেই সামান্য বস্তুটি দর্শকের মনে বিপুল আনন্দ ও কৌতূহলের উদ্রেক করে। কারণ, এটি মনে রাখা দরকার যে, ম্যাজিক দেখানোর উদ্দেশ্য,— বিশেষ করিয়া বৈঠকখানায় বন্ধুবর্গের মধ্যে বসিয়া মুখ্যতঃ আনন্দ দান, শুধু চোখ ধাঁধানো নয়। সেইজন্য অন্নের সহিত অনেক মুখরোচক ব্যঞ্জনের প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থী বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, যেন হাতের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ভাব ও ভঙ্গীও বেশ সহজ ও সরস হয়। সহজ ভাবটি প্রথম, তাহার পর তাহাতে সরসতার সংযোগ। এই দুই গুণ কাহারও স্বভাব-লব্ধ হয়। যাহাদের তাহা নাই, তাহাদের অভ্যাস চাই। সাহসের বিশেষ প্রয়োজন। "ধরা পড়িব" এ ভাব মনে একেবারেই স্থান

দিলে চলিবে না। "দর্শকেরা অজ্ঞান বালকের সদৃশ,—আমি যাহা বুঝাইব, তাহাই বুঝিবে"···এই ভাবটি মজ্জাগত হওয়া চাই। অবশ্য ম্যাজিক শেষ হইবার পরেও এই ভাবে চলিলে বিপদ হইতে পারে,—আমি শুধু দেখাইবার সময়ের কথা বলিতেছি। হাত, মুখ, কথা, হাসি, সমস্ত অঙ্গভঙ্গী যেন একেবারে জলের মত সহজ হইয়া যায়। কোথাও প্রয়াসের চিহ্নমাত্রও যেন না থাকে। আয়নার সম্মুখে সাধনা করিলে এই গুণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে আয়ত্ত হয়।

যে ফল হয়, তাহা ভাষায় অবর্ণনীয়। আর একটি কথা। আড়ম্বর করিলে Trickএর মাধুর্য্য খর্ব্ব হইয়া যায়। দেখাইবার অনেক আগে প্রস্তুত থাকিতে হয়। দেখাইবার সময়ে একেবারে হঠাৎ কথা কহিতে কহিতে আরম্ভ করিয়া দিতে হয়। কোনো বাঁধাধরা সরঞ্জাম, ষড়যন্ত্রের ভাব থাকিলে চলিবে না। ইংরাজীতে এই জাতীয় Trickকে Impromptu Trick বলে। আমি এই প্রবন্ধে যে সকল বস্তু লইয়া আলোচনা করিব, তাহা প্রায় সকল গৃহেই পাওয়া যায়। কিনিয়া লইলে অতি সামান্য খরচ পড়িবে। তৈয়ারী করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। কিন্তু তৈয়ারী বস্তুটি লইয়া যেন অনেকবার অভ্যাস করা থাকে।

পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আমার একমাত্র বক্তব্য এই যে, যাঁহার যে পোষাকে সুবিধা বোধ হয়, তিনি সেই বেশেই যেন অভ্যাস করেন। অনেক Trick আছে, যাহাতে পেণ্টলেন কোট পরিলে বিশেষ সুবিধা হয়। তাহাতে আপত্তি অথবা অসুবিধা না থাকিলে এই বেশই ম্যাজিকের পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু ধুতি পরিয়া যে ম্যাজিক করা যায় না ·· এরূপ কথার আমি কখনই সমর্থন করি না। এ সম্বন্ধে শিক্ষার্থী নিজের অভ্যাস অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। প্রকৃত গুণ আয়ত্ত হইলে শাড়ী পরিয়াও ম্যাজিক দেখানো যায়। পাশ্চাত্যদেশে অনেক মহিলা ঐন্দ্রজালিক আছেন, এবং তাঁহাদের প্রতিপত্তিও অল্প নয়।

এইবার আসল বস্তুর অবতারণা করিব। একটা রূপ মনে রাখিলে বড় ভালো হয়। সেটি এই যে, সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবেন, যাহাতে একটি Trickএর সঙ্গে তার পরেকার Trickএর কোনো প্রকার যোগাযোগ থাকে। অর্থাৎ যে বস্তু লইয়া এক নম্বর খেলা দেখাইলেন, দুই নম্বর খেলায় সেই বস্তু যদি কোনো কাজে লাগাইতে পারেন, তাহা হইলে বড়ই সুশোভন হয়। আমার প্রথম কয়েকটি তামাসাতে তাহার প্রমাণ দিব।

শ্রীআশু দে

বাক্যবিন্যাস ··ইংরাজীতে যাহাকে বলে patter—বৈঠকখানার ম্যাজিকে অমোঘ অস্ত্র। আমার নিজের মত এই যে, বাক্যবিন্যাস ব্যতিরেকে ছোট Trick দেখানো অসম্ভব। এই বাক্যবিন্যাসে কোনো আত্মম্ভরিতা বা গর্ব্বের যেন লেশ না থাকে। একেবারে সহজ কথাবার্ত্তা, মধ্যে মধ্যে একটু রঙ্গ, একটু তামাসা,—Trickটি যেন কথাবার্ত্তার মাত্রা ছাড়া আর কিছুই নয়···এইভাবে দেখাইলে একটি সামান্য Trickএরও

আরম্ভ করুন কয়েকটি রঙ্গীন কাগজের ফালি লইয়া। লম্বায় আন্দাজ ৩।৪ হাত, চওড়ায় এক ইঞ্চি, যেরূপ রঙীন কাগজের রিবণ লইয়া ছেলেরা শৃঙ্খল তৈয়ারী করে, সেই জাতীয় কাগজের ফালি ৪।৫টি চাই। কিঞ্চিৎ গঁদ অথবা ময়দার আঠা, এবং একটি লম্বা কাঁচি। আর কিছুই চাই না। নিম্নে কথাবার্ত্তা এবং ক্রিয়া এক সঙ্গে দিলাম।

"ম্যাজিক জিনিসটার পুরো সম্মান আজো হয়নি। এ'র ভেতরকার

গভীর সনাতন সত্যগুলি এখনো অনেকের বুঝতে বাকি আছে। আপনারা হাসবেন, কিন্তু আমি সত্য বলছি, যে কোনো গূঢ় প্রশ্নের মীমাংসা এই ক'খানি কাগজের ফালি নিয়ে করে ফেলা যায়। .... ধরুন, বিবাহ।.. ... হাসবেন্ না, হাসবেন্ না। ·এখানে সদ্যবিবাহিত কেউ আছেন? (এই স্থলে বিশেষ গাম্ভীর্য্যের প্রয়োজন। অভিনয়-নৈপুণ্য ম্যাজিকের প্রধান অঙ্গ।.....যদি বাস্তবিক নববিবাহিত কোনো তরুণ অথবা তরুণী উপস্থিত থাকেন। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া কথোপকথন চলিবে। নতুবা, সব চেয়ে পক্ককেশ বৃদ্ধ ব্যক্তির নিকট যাইবেন। অবশ্য তিনি ঐন্দ্রজালিকের গুরুজন সম্পর্কীয় হইলে চলিবে না। সাধারণ স্থানে এরূপ হাসি তামাসাতে কোনো হানি নাই।) কে? আপনি? .... বেশ, বেশ, মশাই, বড় খুসি হলাম। থাক্, এখন কেমন লাগচে, তা বলুন। "ভাবলুম বাহা বাহা বে" কেমন? আচ্ছা, বিবাহটাকে আপনার কি মনে হয়? একটা স্বপ্ন, একটা গান, একটা সুখের দীর্ঘনিঃশ্বাস, একটা আবেগভরা রঙীন প্রেমের ফাঁশ (এই কথা বলিতে বলিতে সমস্ত কাগজ ফেলিয়া মাত্র একটি কাগজের ফালি হাতে রাখিবেন। · আচ্ছা, এই নিন্ আপনার রঙীন ফাঁশ। (এই বলিয়া ফালিটির দুই মুখেই আঠা দিয়া জুড়িয়া দিন, অর্থাৎ যেন একটি বৃত্তের আকার হয়। কিন্তু জুড়িবার পূর্ব্বে একটি মুখ বাম হাতে ধরিয়া আর একটি মুখ ডানহাতে ধরিয়া এক পাক ঘুরাইয়া লইবেন। এক পাকের বেশী যেন না হয়। কথা কহিতে কহিতে কৌশলে করিতে হইবে। জুড়িবার পর, ঠিক যেন গঁদ শুকাইবার জন্য, বৃত্তটি লইয়া ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকিবেন, যাহাতে পাকটি দেখা না যায়) এই নিন আপনার গাঁঠছড়া (এই বলিয়া একবার রঙ্গচ্ছলে বৃত্তটি দর্শকের মাথা গলাইয়া মালার ন্যায় ফেলিয়া দিন; পুনরায় উঠাইয়া লইয়া) এই যে শৃঙ্খল, এই যে ব্যূহ, চক্র, প্রেমের ফাঁশ এ কখনো ছিন্ন করবার চেষ্টা করবেন না। (ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে) করবেন্ না, করবেন না। বিফল হবেন। শেষে দেখবেন মাথার রতন, লেপ্টে থাকবেন (জোড়ার মুখের দিকে দেখাইয়া) আঠার মতন। · বিশ্বাস করচেন না?... আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখুন। এই নিন্ কাঁচি। (কাঁচি হাতে দিন) এইবার এটাকে লম্বালম্বি দুটুকরো করে কেটে ফেলুন দিকি? যাতে আধ ইঞ্চি চওড়া ঠিক্ এমনি দুটি শিকলি পাই। (দেখাইবার জন্য শিকলটি হাতে লইয়া কোনো এক স্থানে কাঁচির একটি ফলা বিঁধাইয়া লম্বালম্বি খানিকটা কাটিয়া দেখান। তা'রপর তাঁহার হাতে সব দিন) এই রকম সমস্তটা কাটুন দিকি। দেখবেন, যেন ছিঁড়ে না যায়। (দর্শক তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।) হাঁ, বেশ হচ্ছে, বাঃ বাঃ .. (যখন শেষ হইয়া আসিবে)..... বেশ হচ্ছে, পিঞ্জর কাটতে সবাই এম্নি সাবধানে চলে... কিন্তু শেষটা? শেষটা? শেষটা কি? এই তো প্রশ্ন......(যেই সমস্ত বৃত্ত প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া দর্শক পুনরায় প্রথম কাটা যায়গায় ফিরিয়া আসিয়া দুই কাটা মুখ একত্র করিয়াছে)......আর এই তার সমাধান! .... কেমন দেখলেন তো?"

সাধারণতঃ এরূপস্থলে সকলেই আশা করেন যে আধ ইঞ্চি চওড়া এবং ৬।৪ হাত লম্বা দুইটি বৃত্ত পৃথক হইয়া পড়িয়া যাইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হইবে না। একটি পাক দেওয়ার ফলে দেখিবেন যে দুই বৃত্ত আপনা-আপনি এক হইয়া একটি প্রকাণ্ড বৃত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বের বৃত্তের দ্বিগুণ। স্বহস্তে করিয়া দেখুন।

পুনরায় আর একটি কাগজের ফালি লইয়া আরম্ভ করুন। ঐরূপ সরস বাক্যালাপ করিতে করিতে পুনরায় দুইমুখ আঠা দিয়া জুড়িয়া দিন। কিন্তু এবার একটি পাক না দিয়া দুইবার পাক দিয়া জুড়িবেন। সাবধান, যেন পাকের সংখ্যা কমবেশী না হয়, · অথবা কেহ লক্ষ্য না করে যে কাগজটিকে পাক দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য জুড়িবার পূর্ব্বে বাক্যবিন্যাস চাই, এবং জুড়িবার সময় অনবরত কাগজটিকে সঞ্চালন করা চাই। ··পুনরায় লম্বালম্বি কাটিতে দিন। এবার বৃত্ত পৃথকও হইবে না, দ্বিগুণ লম্বাও হইবে না। এইবার দুই বৃত্ত একটি অপরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শৃঙ্খলের আকার ধারণ করিবে। করিয়া দেখুন।

ঐ আধ ইঞ্চি চৌড়া কাগজের মধ্য হইতে এক ফুট আন্দাজ কাগজ ছিঁড়িয়া লউন। তামাসাটা এই। কাগজ ছিঁড়িয়া পুনরায় তাহাকে ইন্দ্রজাল প্রভাবে জোড়া দেওয়া। তজ্জন্য পূর্ব্বাহ্নে কিঞ্চিৎ প্রস্তুত থাকা দরকার। যে মাপের কাগজ ছিঁড়িবেন (এক্ষেত্রে ধরিয়া লউন ১ ফুট) ঠিক সেই মাপের এবং সেই রঙের একটি কাগজের ফালি নিম্নলিখিত ভাবে ভাঁজ করিয়া লইতে হইবে—

(ইংরাজীতে যাহাকে accordion pleating বলে সেই ভাবে)। অর্থাৎ অনেকগুলি ডব্লিউ একত্র করিলে যেরূপ আকার ধারণ করে, সেইভাবে কাগজটিকে পাট করিতে হইবে। তার পর কাগজটির দুই দিকে চাপিয়া খুব পাতলা করিয়া ধরিতে হইবে। এই চাপা কাগজটুকু তর্জ্জনী এবং মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলির অগ্রভাগের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া রাখিতে হইবে। তাহার অধিকাংশ হাতের তেলোর দিকে থাকিবে, বাহির হইতে কিছুই দেখা যাইবে না। অভ্যাস করিতে হইবে, নতুবা হইবে না। এই তামাসা আরম্ভ করিবার ঠিক আগেই পাট-করা কাগজের ফালিটি ঐ ভাবে দুই আঙ্গুলের মধ্যে রাখা চাই। তার পর অন্য কাগজের ফালি, অর্থাৎ যেটি ছেঁড়া হইবে, সেইটি লইয়া আরম্ভ করুন।

কাগজটি ধরিয়া প্রথমে লম্বায় আধাআধি ছিঁড়িয়া ফেলুন। দুই খানি আধফুট ফালি পাইলেন,...দুই হাতে দুই টুক্‌রা ধরা রহিল। এই দুই ফালি একত্র করিয়া পুনরায় আধাআধি ছিঁড়িয়া ফেলুন। তিন ইঞ্চির চারিটি টুক্‌রা পাইলেন। এইরূপে বারবার ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কাগজের ছেঁড়া টুক্‌রাগুলির সমষ্টি যখন লুকানো কাগজের আকার ধারণ করিল, · তখন ছেঁড়া কাগজ এবং লুকানো কাগজ দুইটাই একসঙ্গে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়া ঘুরাইতে থাকুন।.. এইরূপ করিতে করিতে কৌশলে উভয়ের স্থান পরিবর্ত্তন করুন। অর্থাৎ ছেঁড়া কাগজের গুটি (Roll) টি তর্জ্জনী এবং মধ্যমার মধ্যে চালাইয়া দিয়া, লুকানো আস্ত কাগজটি প্রকাশ্যে ধরিয়া থাকুন। লোকে যেন মনে করে যে বরাবর আগাগোড়া এক ফালি কাগজ লইয়াই সমস্ত ক্রিয়া

হইয়াছে। তাহার পর কিঞ্চিৎ বাগড়ম্বরের পর ধীরে ধীরে কাগজখানির দুই প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া খুলিয়া দেখান যে, ছেঁড়া কাগজ আবার জোড়া লাগিয়া গিয়াছে। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটি না একটি কাগজের টুকরা তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যে লুকানো থাকিবে। অথচ বাহির হইতে আঙ্গুলে কোনো আড়ষ্টভাব থাকিবে না।...এইজন্য এইভাবে কাগজ লুকাইয়া রাখার বিশেষ অভ্যাস চাই। ছেঁড়া কাগজ ও আস্ত কাগজ বদল করিতে খুব বেগ পাইতে হইবে না। দুইটি একসঙ্গে লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে জায়গা বদল করা বিশেষ শক্ত নয়।

Trick টি এক হিসাবে অতি অকিঞ্চিৎকর; কিন্তু গুণীর হাতে এই কাগজ ছেঁড়া তামাসাটি আজো অতি অপূর্ব্বভাবে দেখানো হইতেছে। তাহার কারণ পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। ছোট গেলাব প্রাণ আমার মতে কৌশল নয়, প্রদর্শনের সৌষ্ঠব। শেষ পর্য্যন্ত মনে রাখিবেন যে, আনন্দ দিতে হইবে, লোককে কৌতুক, ফূর্ত্তি দিতে হইবে, হাসাইতে হইবে। সে গুণ লিখিয়া, আঁকিয়া শেখানো যায় না। তবে অনেকদিন অভ্যাস করিলে একেবারে দুঃসাধ্য হইবে না।

অনন্তের কথা

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঘোষাল

"অনন্তকে বা তাঁহার শক্তিকে ভাবিতে গেলে যেমন স্থূলের মধ্য দিয়া ভাবিতে বা অনুভব করিতে পারা যায়, সেইরূপ অনন্তকে বা তাঁহার শক্তিকে সূক্ষ্মের মধ্য দিয়া অনুভব করা যায় কি না ইহাই জিজ্ঞাস্য?"

মনে কর, বিরাট অনন্তকে স্থূল হইতে সূক্ষ্মরূপ বিন্দুতে আনিলাম। তার পর বিন্দু হইতে অনন্ত ভাবনা করা বা বিন্দুর মধ্যে অনন্ত শক্তি অনুভব করা ত বড় সহজ নয়। বিন্দুর মধ্যে যে অনন্ততা ও শক্তি আছে, তাহাকে ধারণা বা অনুভব করিবার সহজ উপায় সাধনা। এবং সেই সাধনা, যিনি যে পথের পথিক তিনি সেই পথের মধ্য দিয়া যদি সাধনা করেন, তাহা হইলে বিন্দুর মধ্যে অনন্ততা ও তাঁহার শক্তি সাধনা করিতে পারেন।

প্রথমে অনন্তকে ও তাঁহার শক্তিকে সহজ উপায় দ্বারা স্থূলের মধ্য দিয়া ভাবিয়া দেখি। ঈশ্বর তাঁহার এই সৃষ্ট জগতে যে সকল বস্তু বা প্রাণী সৃজন করিয়াছেন, তাহার মধ্য দিয়া দেখি—মনুষ্যকে তিনি বুদ্ধি দিয়াছেন। মনুষ্য সেই বুদ্ধি-শক্তি দ্বারা এঞ্জিন, জাহাজ, মটরকার ও নানা প্রকার বস্তু প্রস্তুত করিতেছে; এবং যে সকল বস্তুর সাহায্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে সে সমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ। কেবল বুদ্ধির কৌশলে ঐ সকল বস্তু প্রস্তুত হইলেই যে তাহা কর্ম্মোপযোগী হইল তাহাও নহে। সেইগুলি চালিত করিতে হইলে যে সকল দ্রব্যের আবশ্যক, অর্থাৎ কয়লা, তেল, জল ইত্যাদি; তাহাও সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভ হইতে উৎপন্ন করিতেছেন। এই হইল তাঁহার স্থূলের মধ্য দিয়া শক্তি সম্বন্ধে অনন্ততা। তার পর দেখা যাউক, তিনি অপরিমেয় কি না? আমাদিগের নিজ ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা মনে করি, তিনি পরিমেয়। কিন্তু যদি নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে দেখিব, তিনি স্থূলের মধ্য দিয়াও অনন্ত, এবং সে অনন্তকে ধারণা করিতেই পারিব না। আমরা নিজ নিজ চক্ষু দ্বারা এই পৃথিবীর যতটুকু পর্য্যন্ত দেখিয়াছি বা দেখিতে পাই, তাহা অপেক্ষা পৃথিবী যে অনেক বৃহৎ তাহা ভূগোল, মানচিত্র দেখিয়া বুঝিতে পারি। এই হইল আমাদিগের একটী পৃথিবী সম্বন্ধে জ্ঞান। এইরূপ কোটী কোটী পৃথিবী আছে তাহার ত সন্দেহ নাই এখন স্থূলের মধ্য দিয়া অনন্তকে অনুভব করিলাম; কিন্তু ধারণা করিতে পারিলাম না। এইবার সূক্ষ্মের ভিতর দিয়া অনন্তকে বা তাঁহার শক্তিকে বুঝিতে পারি কি না দেখা যাউক। বিন্দুর মধ্য দিয়া অনন্তকে ভাবিতে গেলে মনে হয় যে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রমশক্তি বা ইংরাজীতে যাহাকে ডাইলিউটেড্ পোটেন্সী বলে, তাহা যদি বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, তাহা হইলে সূক্ষ্মের মধ্য দিয়া অনন্তকে বা তাঁহার শক্তিকে বুঝিতে পারিব। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতের প্রণালী এই—যে কোন ঔষধকে সূক্ষ্মাকারে পরিণত করিতে হইলে, এক ফোঁটা স্থূল আরকের অর্থাৎ মাদার টিনচারের সহিত ৯৯ ফোঁটা স্পিরিট মিশ্রিত করিলে উহা ১০০ ফোঁটা প্রথম ক্রম অর্থাৎ ডাইলিউশন্ প্রস্তুত হইল। ঐ প্রথম ক্রমের ১০০ ফোঁটার সহিত ৯৯০০ ফোঁটা স্পিরিট মিশ্রিত করিলে উহা ১০০০০ হাজার ফোঁটা দ্বিতীয় ক্রম বা ডাইলিউশন্ প্রস্তুত হইল। ক্রমশঃ ঐ ১০০০০ হাজার ফোঁটা দ্বিতীয় ক্রমের সহিত ৯,৯০,০০০ ফোঁটা স্পিরিট মিশ্রিত করিলে উহা ১০,০০,০০০ লক্ষ ফোঁটা তৃতীয় ক্রম বা ডাইলিউশন প্রস্তুত হইল। এইরূপ ক্রম পদ্ধতি দ্বারা ৩০, ২০০, ১০০০, ১০০০০০ ক্রমে বা ডাইলিউশনে পরিণত করিতে পারা যায়। এবং এই ক্রম পদ্ধতি মতে ঔষধের ক্রম বা ডাইলিউশন যত বাড়িবে উহার শক্তি বা পোটেন্সী তত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এখন বিন্দু অনন্ততে পরিণত হইল কি না? এইবার অনন্তকে বুঝিলাম, তিনি অনন্ত ও বিরাট। এইবার শক্তি সম্বন্ধে বুঝিয়া দেখি। ঐ স্থূল আরকের এক ফোঁটা যে শক্তি ধারণ করে তাহা স্থূলদেহী সকল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন, এবং তাহারা বলিবেন যে এই পর্য্যন্তই বিন্দুর শক্তি। কিন্তু যিনি সাধক তিনি বলিবেন যে ঐ এক বিন্দু স্থূল আরক যে শক্তি ধারণ করে, হোমিওপ্যাথিক ক্রম পদ্ধতি মতে সহস্র ক্রমের এক বিন্দু ঔষধ তদপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক শক্তি ধারণ করে। এবং ঐ ক্রম যত উচ্চ হইতে থাকিবে তাহার শক্তিও তত বৃদ্ধি পাইবে।

মনুষ্যের শরীর স্থূল। ধর, এই স্থূলদেহের পীড়া হইল। মনে কর, এক ব্যক্তির জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছে এবং জিহ্বায় কোন আস্বাদন পায় না। এখন ডাক্তারেরা বলিবেন যে জিহ্বার পক্ষাঘাত বা ইন্দ্রিয়-বৈকল্য ঘটিয়াছে। মোটামুটি দেখিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে জিহ্বা-যন্ত্রের পীড়া হইয়াছে। আরও সূক্ষ্মভাবে বুঝিলে বুঝিতে হইবে যে, জিহ্বা-যন্ত্রের সূক্ষ্ম স্নায়ুর বিকৃতি হইয়াছে। কিন্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্ম ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিলে বুঝিব যে জিহ্বার স্নায়ুর অন্তর্গত যে শক্তি আছে তাহারই বৈকল্য ঘটিয়াছে। আমাদের স্থূল চক্ষু দ্বারা চেষ্টা করিয়া বড় জোর জিহ্বার সূক্ষ্ম স্নায়ু অবধি দেখিতে পাইব; কিন্তু আর ত দৃষ্টি চলিবে না। এখন সূক্ষ্ম স্নায়ুর শক্তি ভাবিতে গেলে মাথায় বজ্রপাত হইবে। তখন ভাবিব যে কোন্ অতীন্দ্রিয়

বস্তুর শক্তিতে এই স্থূল জিহ্বা চালিত হইতেছিল, এবং সে শক্তিই বা কাহার শক্তি? স্থূল জিনিসের মধ্য দিয়া এ সূক্ষ্ম শক্তিকে কখনই, ধারণা, করিতে পারা যায় না, বা তাহার বৈকল্যও দূরীভূত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু হোমিওপ্যাথিক ক্রমপদ্ধতি মতে ও তাহার অন্তর্গত সূক্ষ্ম শক্তির দ্বারা ঐ স্নায়ুর অন্তর্গত সূক্ষ্ম শক্তির ক্রিয়া বিকলতা দূরীভূত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। আজকাল এলোপ্যাথিক মতে ইন্‌জেক্সন্—ইহাও সূক্ষ্ম ক্রম পদ্ধতির প্রণালী। এখন বিন্দু হইতে অনন্ত এবং বিন্দুর মধ্যেই অনন্ত শক্তি বেশ বুঝিলাম। তাহা হইলে স্থূলের মধ্য দিয়া তাঁহার অনন্ততা ও তাঁহার অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে যেমন কোন সংশয় থাকে না, সেইরূপ তিনি অণু হইতে পরমাণু হইলেও তাঁহার অনন্ততা বা শক্তির হ্রাস হয় না। এখন চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারি যে তিনি নিজ ইচ্ছায় প্রকৃতির সংযোগে অনন্ত হইতে পারেন, ইচ্ছা করিলে একপাদ দ্বারা অনন্ত আকাশকে আচ্ছাদিত করিতে পারেন, এক অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্র বালক হইয়া মা যশোদার কোলে শুইয়া স্তন পান করিতে পারেন, দুগ্ধপোষ্য বালক হইয়া মুখব্যাদান করিয়া মুখ-বিবরে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড দেখাইতে পারেন, এবং শালগ্রামশিলা হইয়া অনন্ত শক্তি ধারণ করিতে পারেন। আরও একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক—বুঝিতে পারা যায় কি না? একটা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বৃহৎ বট বৃক্ষের বীজ যদি চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে দেখিব যে, বৃক্ষের তুলনায় বীজ কিছুই নয়; কিন্তু নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারিব যে ঐ ক্ষুদ্র বীজ মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, এবং মৃত্তিকার সহিত সংযোগ হইলেই ঐ বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং ক্রমে বিশাল আকার ধারণ করে। তাহা হইলেই বেশ বুঝিতে পারিলাম যে ঐ বীজের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি আছে, তাহা যতদিন মৃত্তিকার সহিত সংযুক্ত না হয় ততদিন তাহার আভ্যন্তরিক শক্তি প্রকাশ পায় না। বীজের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহা যদিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তত্রাচ যেমন তাহার শক্তি অস্বীকার করা যায় না, সেইরূপ বীজ-মন্ত্রেরও অদ্ভুত শক্তি আছে। লৌহের উপর যেমন বৃক্ষের বীজ রোপণ করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না, সেইরূপ হৃদয় অপবিত্র হইলে বীজমন্ত্রও কার্য্যকর হয় না। যাঁহার হৃদয় পবিত্র, উত্তমরূপে কর্ষিত, তাঁহার হৃদি-ক্ষেত্রে বীজমন্ত্র পড়িবামাত্র অঙ্কুরিত হয় এবং যতই তাহাতে ভক্তিবারি সেচন করা হয়, ততই তাহার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অর্থাৎ গুরুদত্ত বীজমন্ত্র হৃদগত করিয়া, যদি মন রূপ স্পিরিট দ্বারা, শতবার, সহস্রবার, লক্ষ বার জপ করা যায়, তাহা হইলে তাহার শক্তি ঐ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং দিবারাত্রি ঐ মন্ত্র জপ করিতে করিতে অনন্ত ও তাঁহার শক্তিকে বুঝিতে পারা যায়। এখন যদি বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে দেখিব যে বীজমন্ত্র একটা শব্দ বই ত নয়। এবং সেই শব্দই ব্রহ্ম। ভগবান স্বয়ং অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন

"যচ্চাপি সর্ব্ব ভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন !
ন তদস্তি বিনা যৎস্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥"

"হে অর্জ্জুন! যাহা সর্ব্ব ভূতের বীজ তাহা ত আমিই, আমা ব্যতীত যাহা কিছু হইতে পারে, সেরূপ চরাচরভূত বিদ্যমান নাই।" বাস্তবিক এই চরাচর বীজরূপে ভগবানের সত্তা যে বস্তুতে নাই, তাহা থাকিতে পারে না। যাহাতে ভগবান নাই এমন কোন বস্তুই নাই। বিশাল সমুদ্র তটস্থ অসংখ্য বালুকাকণা হইতে চিরতুষারাবৃত অভ্রভেদী হিমালয় পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। এখন ব্রহ্মকে জানিতে হইলে বীজ-মন্ত্রের আশ্রয় লইতে হইবে, এবং ঐ বীজমন্ত্র দিবা-রাত্রি একনিষ্ঠ হইয়া সাধনা করিলে মনুষ্য শক্তিমান হইবে এবং অনন্ত ব্রহ্মকে জানিতে পারিবে। মানুষ যদি গুরু প্রদর্শিত প্রণালী মতে মন্ত্রের সাধনা করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ মন্ত্র-শক্তির প্রভাবে ত্রিকালজ্ঞ হইতে পারেন, অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান স্বচক্ষে দেখিতে পান। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ ঐ বীজমন্ত্র সাধনার দ্বারা ত্রিকালদর্শী ছিলেন। বীজনাম বা মন্ত্র-সংখ্যা বিধিপূর্ব্বক জপ করিলে তাহার যে কত শক্তি তাহা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে হরিদাসের জীবন-চরিত পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়। হরিদাস নিজ গৃহ ত্যাগ করিয়া বেনাপোলের নির্জ্জন বন মধ্যে কুটীরে বসিয়া রাত্রিদিন তিন লক্ষ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতেন। অমন বৈষ্ণববিদ্বেষী রাজা রামচন্দ্র খান তাঁহাকে অপমান করিতে নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এমন কি, বেশ্যাগণ আনিয়া ছিদ্রান্বেষণ করিয়া তাঁহার বৈরাগ্য ধর্ম্ম নাশ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। বেশ্যাগণের মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী তিন দিবস মধ্যে হরিদাসের মতি গতি নষ্ট করিবার জন্য অঙ্গীকার করিল। এক দিন রাত্রিকালে ঐ বেশ্যা সুন্দর বেশ ভূষা করিয়া হরিদাসের কুটীরে আসিয়া তুলসী নমস্কার করিয়া হরিদাসের গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া নানা প্রকার ভাবভঙ্গী দেখাইয়া নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিল। হরিদাস তাহাকে বলিলেন আমার সংখ্যানাম সমাপ্তি যাবৎ না হয়, তুমি বসিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ কর। নাম সমাপ্তি হইলে তোমার বাসনা পূর্ণ করিব। যখন হরিদাসের নাম সমাপ্তি হইল তখন প্রাতঃকাল হইয়াছে। প্রাতঃকাল দেখিয়া বেশ্যা চলিয়া গেল। পরদিন রাত্রিতে ঐ বেশ্যা পুনরায় আসিল। আবার হরিদাস এরূপ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। বেশ্যার চঞ্চলতা দেখিয়া হরিদাস তাহাকে বলিলেন, দেখ আমি কোটি নাম গ্রহণ যজ্ঞ করিয়াছি। আট সপ্তাহ হইবে মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা হইল না, কল্য সমাপ্ত হইবে। তার পর তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করিব। তৃতীয় দিবস এরূপ নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন নামের প্রভাবে বেশ্যার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ দণ্ডবৎ হইয়া হরিদাসের চরণে পতিত হইল। এবং সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল, তখন হরিদাস দয়া-পরবশ হইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার গৃহ-দ্রব্য ব্রাহ্মণে দান করিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম লও। এই কৃষ্ণনামরূপ মহামন্ত্রের সাধনা করিলে অচিরে কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত হইবে। সেই অবধি ঐ বেশ্যা রাত্রি দিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে তাহার ইন্দ্রিয় দমন হইল, এবং সে একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হইল। নামের এই অপূর্ব্ব শক্তি। অতএব সূক্ষ্ম বীজমন্ত্রের দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর, তাঁহাকে যে পাওয়া যায়, তাহাতে আর সংশয় নাই। এইবার পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা এবং তাঁহার বিভূতি অর্থাৎ জীবাত্মা ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে সূক্ষ্মের

মধ্য দিয়া একটু চিন্তা করিয়া দেখি, কতটা অগ্রসর হইতে পারি। পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা যে জীবাত্মা অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু কেবল বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম বা পরমাত্মা (অর্থাৎ জীব। ও জাগতিক পদার্থ ছাড়া) মহিমা-শক্তি শূন্য। কারণ—

জাগতিক পদার্থই ত ভগবানের বিভূতি, এবং উহাবাই ভগবানের মহিমাশক্তি প্রচার করছে। ধর, যেমন একজন রাজা। রাজার শক্তি প্রজার শক্তি অপেক্ষা অনেক বেশী বটে, কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিব যে, প্রজাই রাজার রাজশক্তি প্রচার করছে; কারণ, প্রজা না থাকিলে রাজার শক্তি কিছুই নয়। তাহা হইলেই বুঝিতে পারিলাম যে, ভগবানের প্রবৃত্তি সংযোগে বহু হইতে ইচ্ছা করিবার উদ্দেশ্যই বিভূতির মধ্য দিয়া তাঁহার শক্তির প্রচার করা। তিনি যদি বহু না হইতেন তাহা হইলে আমাদিগের কি আসিত যাইত? তাঁহার নিজের শক্তি নিজের মধ্যেই থাকিত। সূক্ষ্ম জীবাত্মার মধ্য দিয়া বহু হইয়া প্রচার হওয়াতেই, কেবল বিশুদ্ধ পরমাত্মা হইতে অধিকতর শক্তিশালী হইলেন। ভগবৎ সম্বন্ধে বুঝিবার চেষ্টা করিতে গেলে, এই জগতের মধ্য দিয়া না বুঝিলে ধারণা করিতেই পারা যায় না। সেজন্য আরও একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। ধর সূর্য্য। সূর্য্য একটা ঘনীভূত তাপাপিণ্ড বিশেষ; এবং কিরণ তাহার পাতলা রশ্মি, যাহা এই জগতে পতিত হইয়াছে। কিন্তু চেষ্টা করিলে বুঝিতে পারি যে পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত সূর্য্যের পাতলা কিরণ ঘনীভূত স্থুল পিণ্ডের শক্তির অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। কারণ ঘনীভূত সূর্য্যপিণ্ডের নিকটস্থ যে তাপ বা শক্তি তাহাতে জাগতিক সৃষ্ট পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়। যেমন একটী প্রদীপ। প্রদীপের আলোকে আমরা সাংসারিক সকল কার্য্যই করিতে পারি; কিন্তু যদি আমরা প্রদীপের শিখার নিকট অগ্রসর হইয়া শিখার উপর পতিত হই, তাহা হইলে আমাদের প্রাণ নষ্ট হইবে। অতএব বুঝিলাম, যদিও প্রদীপের শিখার শক্তি রশ্মি আলোকের শক্তি অপেক্ষা অধিক, কিন্তু রশ্মি আলোকের কার্য্যকারিণী শক্তি আসল শিখার শক্তি অপেক্ষা উপকারী ও শক্তিবিশিষ্ট। সেইরূপ পৃথিবীব্যাপী সূর্য্যের পাতলা কিরণ চরাচর সমস্ত জগতের জীব, জন্তু ও বৃক্ষাদির জীবন দান করিতেছে; কিন্তু সূর্য্যের ঘনীভূত স্থুল পিণ্ডের তাপ সমস্ত দগ্ধ করিতেছে। তাহা হইলেই বুঝিলাম, পাতলা ডাইলিউটেড, কিরণের রক্ষা শক্তি এবং স্থুল পিণ্ডের নাশশক্তি যেমন স্থূল, হাইড্রোসিয়ানিক এসিড এক ফোঁটার প্রাণনাশিনী শক্তি আর উহার ক্রম পদ্ধতি অনুযায়ী প্রস্তুত ঔষধের প্রাণরক্ষাকারিণী শক্তি; সেইরূপ কেবল বিশুদ্ধ ব্রহ্মকে স্থূলের মধ্য দিয়া অপেক্ষা তাঁহার সূক্ষ্ম বিভূতি বা সূক্ষ্ম বীজমন্ত্রের মধ্য দিয়া অধিকতর শীঘ্র এবং স্পষ্টভাবে অনুভব করিতে পারা যায়। আরও একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিব যে, সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে গেলে সূক্ষ্মের মধ্য দিয়াই বুঝিতে হইবে। যেমন সূক্ষ্ম জিনিসের মধ্যে স্থূল দ্রব্য ব্যবহার করা যায় না, বরং ব্যবহার করিলে সূক্ষ্ম জিনিস নষ্ট হইয়া যায়, ভগবৎ চিন্তাও সেইরূপ। মানব মাত্রে ভগবৎ চিন্তার স্থান হৃদয়। এই হৃদমন্দিরে ভগবৎ মূর্ত্তি, ভক্তিরূপ আসনে বসাইয়া দিবা রাত্রি তাঁহার জপ ও ধ্যান করিতে হইবে। বিষয় বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ বিষয়ের গন্ধ মাত্র মনে উদয় হইলে, ভগবান তখনি অন্তর্হিত হইবেন। এক সময়ে মন দুইটী জিনিস ধারণা করিতে পারে না। যখন ভগবৎ সম্বন্ধে ধ্যান করিতে হইবে তখন বিষয় থাকিবে না; এবং বিষয় থাকিলে ভগবান থাকিবেন না—ইহা অত্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিব। হোমিওপ্যাথিক ঔষধও এত সূক্ষ্ম যে উহাকে পবিত্র স্থানে রাখিতে এবং পবিত্র ভাবে সেবন করিতে হইবে, কারণ, কোনরূপ গন্ধ দ্রব্যের নিকট থাকিলে বা কোনরূপ গন্ধবিশিষ্ট দ্রব্য আহারের পর সেবন করিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ তখন সেই ঔষধ কার্য্যকরী হইবে না। বাস্তবিক ইহা ঠিক কথা। ক্রমপদ্ধতি-প্রণালীতে ডাইলিউসন্ করিয়া উহাকে এত সূক্ষ্মাকারে পরিণত করা হইয়াছে যে কোনরূপ গন্ধ দ্রব্যের সন্নিকটস্থ হইলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ভগবদ্ উপাসনাও ঠিক ঐরূপ। ভগবদ্ উপাসনা করিতে গেলে পবিত্র ও নির্ম্মল হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া সমস্ত বহিরোন্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তরাভিমুখ করিয়া মনস্থির করিয়া হৃদ্দেশে বিধি পূর্ব্বক জপ করিতে হইবে; কিন্তু সেই সময়ে যদি মনে বিষয়-বাসনা রূপ গন্ধের উদয় হয়, তাহা হইলে তখনই ঐ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ন্যায় সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইবে। অর্থাৎ বিক্ষেপ উপস্থিত হইবে। মনে বিষয়ের গন্ধ মাত্র উদয় হইলেই হৃদয়ে আর ভগবানের স্থান হইবে না, তিনি তখনই অন্তর্হিত হইবেন। এখন বিন্দুর মধ্যে অনন্ততা এবং সূক্ষ্ম বিন্দুর মধ্য দিয়া অনন্তকে ও তাঁহার শক্তিকে অনুভব করিতে পারিলাম কি না।

দ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ

শ্রীভবানীচরণ ভট্টাচার্য্য

কবির মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন সত্তা থাকে। তাহাদের একত্র সংমিশ্রণে ও পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বিধানেই কবির পরিপূর্ণ সার্থকতা। এই পৃথক্ সত্তাগুলির স্বরূপ অল্প কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হয় কবি স্রষ্টা ও দ্রষ্টা।

আর্টের সৃষ্টি যে কবির একটি বড় কাজ, এ বিষয়ে দ্বিমত হইতে পারে না। অন্যের ভাব আপন করিয়া লইয়াও কাব্য লেখা চলে; কিন্তু সে কাব্যে এমন একটা অভাব থাকিয়া যায়, যাহার জন্য রসজ্ঞদের কাছে তাহা অনাদরের বস্তু হইয়া উঠে। নূতন ভাব, ছন্দ ও বাক্যবিন্যাস, মানব-হৃদয়ের গূঢ়তম অনুভূতি - এই সব লইয়াই প্রকৃত কবি তাঁহার কাব্য লিখিয়া থাকেন। ইংরাজিতে যাহাকে creative genius বলা হইয়া থাকে, তাহার অভাবে শুধু পুরানো ছন্দ, রচনা-রীতি ও ভাবের একত্র-সংযোগে কবি কখনও স্রষ্টার আসন পাইতে পারেন না।

কবির দ্রষ্টা না হইলেও চলে। দেশের ও বিদেশের সাহিত্যে যাঁহারা কবি বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের অনেকেই দ্রষ্টা ছিলেন না। বার্ন্‌স্, মুর সিলার, হাইনি, কাব্যজগতে সুপরিচিত; কিন্তু তাঁহাদের কোন মতেই দ্রষ্টা বলা চলে কি না সন্দেহ।

চণ্ডীদাস, মাইকেল, হেমচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ…ইঁহাদের অভাবে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অর্দ্ধেক গৌরব চলিয়া যায়… কিন্তু ইঁহাদের কেহই দ্রষ্টা

নহেন। সহজ ভাব ও অনুভূতির সহিত প্রাণের আবেগ মিশাইয়া ইঁহারা লিখিয়া গিয়াছেন—ইঁহারা স্রষ্টা ; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাংলার আর কোনও কবিকে স্রষ্টা বলা চলে না।

"The poet is a seer"—কার্লাইলের এই উক্তিকে যথার্থ বলিয়া ধরিয়া লইলে অনেক কবিকেই কাব্যজগৎ হইতে বিদায় লইতে হয়। কিন্তু কবি হিসাবে তাঁহাদেরও একটা স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে। তাঁহারাও অনেক পাঠককে আনন্দ দিতে সমর্থ হইয়াছেন। ফুলের মাঝে গোলাপের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই—কিন্তু সামান্য শিউলিও অর্থহীন ভারমাত্র নয়। তবে বিশ্বকবি হইতে হইলে, যুগ যুগ ধরিয়া আর্টিষ্টের প্রাপ্য বন্দনা পাইতে হইলে, স্রষ্টা হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ রসসৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিসমাপ্তি নয়। 'সোনার তরী,' 'চিত্রা,' ও 'মানসী' রচিত হইবার পরে তাঁহার মধ্যে একটা বড় পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল—ক্রমে তিনি জীবনের অতল গভীরতায় নামিয়া গিয়াছেন, বাহির ছাড়িয়া অন্তরের সন্ধানে উন্মুখ হইয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি জগতের সৌন্দর্য্য ও মহিমায় মুগ্ধ হইয়া তাহার স্তুতির মাঝে আপনাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তী কাব্যজীবনে তাঁহার কবিতা আরও গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে—কবি বিশ্বের রহস্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। উপাসক রবীন্দ্রনাথ সাধকে পরিণত হইয়াছেন।

জীবন ও মরণ—এই দুইটি বড় রহস্য রবীন্দ্রনাথের নিকট নূতন রূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে। ইহাদের দুইয়ের মধ্যে তিনি কোথাও বিভীষিকার সন্ধান পান নাই। জীবনে যে অমৃতের আস্বাদ পাওয়া যায়—মরণেও তাহাই। জীবন ও মরণ, এ যেন একেরই নামান্তর মাত্র।

> নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
> তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ। (১)

মৃত্যুর মাধুরী অতি অল্প কবিরই চোখে পড়িয়াছে। সেক্‌স্‌পীয়ার মরণের যে রূপ দিয়াছেন তাহা বড় ভয়ানক—

> "...To die and we go we know not where
> To lie in cold obstruction, and to rot ;
> This sensible warm motion to become
> A kneaded clod, and the delighted spirit
> To bathe in fiery floods, or to reside
> In thrilling regions of thick-ribbed ice ;
> ....'tis too horrible. (২)

ইহার সহিত রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের একটি কবিতা পড়িলে বৈপরীত্য (contrast) সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে—

> মরণ রে, তুহুঁ মম শ্যাম সমান।
> মেঘবরণ তুঝ, মেঘজটাজুট,
> রক্ত কমলকর, রক্ত অধরপুট,
> তাপ বিমোচন করুণকোর তব
> মৃত্যু অমৃত করে দান (৩)

এই দুইটি বিভিন্ন-ভাবে কল্পিত রূপের প্রথমটির ভয়ানকত্ব মনে একটা বীভৎস রসের সঞ্চার করিয়া দেয়—অদূরে একটা ঘৃণিত, বিষাক্ত সরীসৃপ দেখিলে মনে যে ভাবের উদ্রেক হয়, ইহাতেও যেন তাহাই হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পিত মরণ শ্যামের মত—প্রিয়ের মত, মনোরম। তাহার আগমনীর ধ্বনি যেন নূপুরের মত বাজিয়া উঠিয়া একটা অব্যক্ত আনন্দ-লোকের সন্ধান দিয়া যায়। কবি ইহাকে 'বিশ্বচিত্তলোক' বলিয়াছেন।

> "—সেই বিশ্বচিত্তলোকে, যেথা সুগম্ভীর বাজে
> অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
> ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।" (৪)

সেক্‌স্‌পীয়ার এই 'অমর্ত্তলোকে'র সন্ধান দিতে পারেন নাই। তাঁহার কাছে ইহা শুধু "The unexplored region, from whose bourne, no traveller hath ever returned."

রবীন্দ্রনাথ এই 'নিরুদ্দেশের দেশে'র অপরূপ রূপ দেখাইয়াছেন। ইহজীবনের ওপারে মানবের জন্য যে এক মহা-ভবিষ্যৎ জাগিয়া আছে, ইহা রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় বিশ্বাস। এখানে উপনিষদের বাণী কবির উপর কতটা প্রভাব ফেলিয়াছে তাহা ভাবিবার বিষয়।

গীতাঞ্জলি-ভাব আসিয়া কবির মনের পূর্ব্ব-অনুভূতিগুলিকে গাঢ় ও গভীর করিয়া তুলিল। যে সকল চিন্তার ধারা এতদিন অস্ফুট বা অর্দ্ধস্ফুট-ভাবে সুপ্ত ছিল, তাহারা নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময়ের কবিতাগুলির ভিতরে একটা সুদৃঢ় স্পষ্টতা (directness) ও ঋষির বাণীর মত উদাত্ত সুরের সন্ধান পাওয়া যায়। গীতাঞ্জলি পর্য্যায়ের কবিতাসমূহের মধ্যে কয়েকটি মরণের কবিতা আছে। ইহারা বেদনাময় আকুলতা সত্ত্বেও দৃঢ় ওজস্বিতায় পূর্ণ। 'এ মৃত্যু ছেদিতে হবে এই ভয়জাল' (৫) কবিতাটিতে পার্থিব মৃত্যুর কথা বলা হয় নাই—নৈতিক বা মানসিক মরণের প্রতিই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত মৃত্যু—দৈহিক মৃত্যু যখন কবির নিকট আসিয়া দেখা দিল, তখন কবি গাহিয়াছেন—

> পাঠাইলে আজি মৃত্যুর দূত
> আমার ঘরের দ্বারে
> তব আহ্বান করি সে বহন
> পার হয়ে এল পারে।
> আজি এ রজনী তিমির আঁধার
> ভয়-ভারাতুর হৃদয় আমার,
> তবু দীপ-হাতে খুলি দিয়া দ্বার
> নমিয়া লইব তারে। (৬)

মৃত্যু রিক্তহস্তে ফিরিয়া যাইবে না—সে তাহার পূজার অর্ঘ্য লইয়া যাইবে। তাই আসন্ন প্রিয়-বিচ্ছেদ-ব্যথায় ঈশ ইচ্ছার নিকট মাথা নত করিয়া কবি গাহিতেছেন—

(১) গান—পৃঃ ৭১।
(২) Measure for Measure, (৩) ভানুসিংহের পদাবলী
(৪) পূরবী পৃঃ ২০
(৫) নৈবেদ্য পৃঃ ৭
(৬) নৈবেদ্য পৃঃ ৭

পূজিব তাহারে জোড়কর করি
ব্যাকুল নয়ন-জলে,
পূজিব তাহারে, পরাণের ধন
সঁপিয়া চরণ-তলে।

নৈবেদ্যের এই কবিতাটির মত আর একটি কবিতা গীতাঞ্জলিতে আছে…

মরণ যেদিন দিনের শেষে আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কি ধন দিবে উহারে?
ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি
শূন্য বিদায় করব না ত উহারে…
* * * * *
যা-কিছু মোর সঞ্চিত ধন
এত দিনের সব আয়োজন
চরম দিনে সাজিয়ে দিব উহারে। (৭)

মৃত্যুর এমন সুন্দর রূপ জগতের আর কোনও কবি দেখাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইহার দুইদিন পূর্ব্বে লিখিত অন্য একটি কবিতার শেষ চরণ… 'রাজার বেশে চল্‌রে হেসে মৃত্যুপারের সে উৎসবে।'

রবীন্দ্রনাথের আধুনিক কবিতাতেও তাঁহার কল্পিত মৃত্যুর রূপের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'পূরবীর' 'মৃত্যুর আহ্বান' ও 'কঙ্কাল' উল্লেখযোগ্য। এবার মানবজীবন তাহার অসীম বৈচিত্র্য লইয়া কবির নিকট কি ভাবে উদিত হইয়াছে, তাহা দেখা যাক। মরণ যাঁহার কাছে সৌন্দর্য্যময় তিনি যে জীবনের উচ্ছ্বাস ও উল্লাস পরম নিবিড়ভাবে অনুভব করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য।

জীবনের সমস্যা ও বিপুল রহস্য যুগে যুগে সকল দেশের কবিদের কাব্যের বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা শুধু

"জীবনটা কিছু না
একটা ইঃ একটা উঃ আর একটা আঃ…"

বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তবে আধুনিক কবিদের অনেকেই কেবলমাত্র জীবনের বাহিরের দিক্‌টা দেখাইতেছেন…মানুষের দৈনন্দিন কাজের ধারার মধ্যে যে সুখ দুঃখ জড়াইয়া আছে, তাহা লইয়াই ইঁহাদের কারবার। গোর্কি ও ডষ্টয়েভস্কি কথাসাহিত্যের সহায়তায় যাহা চিত্রিত করিয়াছেন, ইঁহারা কাব্যে সেই একই বিষয় ফুটাইয়া তুলিতে চান। আবার কেহ কেহ বা অন্তরের ঘাত-প্রতিঘাত ও দেখাইতেছেন…স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তিগুলি তাঁহাদের কাব্যের বিষয়। এইরূপ দুই শ্রেণীর কবিরই প্রয়োজন থাকিলেও জগৎকবি সভায়' হয় তো ইঁহাদের কোনও স্থান নাই। আধুনিক বিশ্ব-কবিদের মাঝে এমন কিছু আছে, যাহা এ জগতের অনেক উপরে…যাহা অতীন্দ্রিয়, অপ্রত্যক্ষের সহিত মানবজীবনের সূত্র গাঁথিয়া দেয়।' বাস্তবতা ইঁহাদের কাব্যের বিষয় নয়; আধ্যাত্মিকতা বা অনন্তের মধ্যে এক অন্তরাত্মা এবং সত্য-সুন্দরের সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি ও শিল্পচাতুর্য্যের সহিত তাহার প্রকাশ…ইহাই এই সকল কবির বিশেষত্ব। সাহিত্যের ভাষায় ইঁহাদের মরমী (mystic) বলা চলে। কেল্টিক্ কবি ইয়েট্‌স্ ও এ, ই, (জর্জ রাসেল) মরমী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ মরমী কবি। অরূপ-অসীমের মাঝে বারবার তিনি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার কবি-প্রতিভা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। 'এই সত্য-দর্শনের ফলে জীবনের প্রহেলিকা তাঁহার কাছে সহজ হইয়া ধরা দিয়াছে।

ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদের মত'…(৮)

ইহা সেই অরূপের উপলব্ধির ফল। 'নলিনীদলগত-জলমতি তরলম্ তদ্বৎজীবনমতিশয়চপলম্'…রবীন্দ্রনাথ এ কথার পরিপন্থী নহেন। জীবন তাঁহার কাছে একটা গূঢ় সত্য; ইহার একটা গভীর সার্থকতা আছে। তাই অমৃতস্য পুত্রোঽহম্'…উপনিষদের এই বাণী রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের মূলমন্ত্র। সৌন্দর্য্যবোধের ভিতর দিয়া এত বড় তত্ত্বজ্ঞান ফুটাইয়া তোলাতে রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব সমধিক প্রকটিত হইয়াছে।

কিন্তু জীবনের সার্থকতা কোথায়? ইহার পূর্ণ বিকাশে। বিকাশের উপায় কি?…সংগ্রাম। পুষ্পের শয্যায় মানুষ তাহার আদর্শের সন্ধান পায় না। সত্যের সন্ধানে তাহাকে কাঁটার পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, উন্মত্ত ঝঞ্ঝার সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাই কবি তাঁহার দেবতাকে বলিতেছেন, 'দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমাকে নাহি ডরিব হে'।

স্থূল দৃষ্টিতে যাহাকে দুঃখ বলিয়া বোধ হয়, আসলে তাহা সুখ ভিন্ন আর কিছুই নয়। 'আত্মানম্ বিদ্ধি' এই সার সত্য মানুষ দুঃখের দিনেই স্মরণ করিয়া নিজেকে বুঝিতে চেষ্টা করে। সুখের মুহূর্ত্তে তার চিন্তাশক্তি যেন প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকে, সময় ও আবেষ্টনীর তরঙ্গে নিশ্চেষ্টভাবে ও আরামে ভাসিয়া যাইতেই সে ভালবাসে। 'আনন্দম্' কথাটির মধ্যেও এই একই সত্য আছে। সুখের দিনে মানুষের হৃদয়ে আনন্দ আসে কি না সন্দেহ…যাহা আসে তাহা শুধু অগভীর হর্ষের উত্তেজনা ও ঈষৎ অনুভূতি। কিন্তু প্রকৃত আনন্দের মাঝে ব্যথাও আছে। সন্তানের জন্মের সময়ে মায়ের হৃদয়ে এই আনন্দের উদ্রেক হয়; ইহা তাঁহার অসহ বেদনাকে বাৎসল্যের রসে সরস করিয়া দেয়।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

এই করেছ ভাল, নিঠুর,
এই করেছ ভালো।
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়া'লে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো। (৮)

(৭) গীতাঞ্জলি, পৃঃ ১৩১।

(৮) গীতাঞ্জলি, পৃঃ ১০৪

ঠিক্ এই ভাব গীতাঞ্জলির একটি গানকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে···

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে
এ জীবন পুণ্য কর, দহন দানে।

রবীন্দ্রনাথ দেহ হইতে মনকে, পার্থিব হইতে অতীন্দ্রিয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। এই দুইই তাঁহার কাছে এক সত্যের রূপান্তর মাত্র। ইহাদের মাঝে যে যোগসূত্র রহিয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞান-লাভের সহিত ধীরে ধীরে মিলাইয়া যাইতে থাকে; ও একদিন দেহ ও মনের সম্বন্ধ নিকটতর হইয়া উঠে। তাই···

ইন্দ্রিয়ের দ্বার,
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।
যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে। (৯)

প্রাকৃত জগৎ শুধু মায়ার খেলা নয়। যে ঐশ শক্তি আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত রূপে, রসে, আলোয়, ছায়ায় ভরিয়া দিতেছে, তাহার কখনও বিচ্ছেদ নাই··সে চিরন্তন। "যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী, সে যে আসে আসে আসে।" প্রাকৃতের সহিত অপ্রাকৃতের··সীমার সহিত অসীমের যখন এত বড় প্রাণের যোগ রহিয়াছে, তখন একেকে বাদ দিয়া শুধু অপরকে লইয়া থাকা চলে না। ("The Infinite and the finite are one, as song and singing are one.") সীমা না থাকিলে অসীম আপনাকে অনুভব করিতে পারিত না। মানব-জগতের অভাবে ঈশ্বরের সত্তার কোনই মূল্য থাকে কি না সন্দেহ। তাই মূন্ময় মত দেহেরও একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে। এই ভাব চিত্রাঙ্গদার উত্তররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও কোনও সমালোচক চিত্রাঙ্গদার মধ্যে মানব-হৃদয়ের একটা অতি অগভীর বৃত্তি দেখিতে পাইয়া উহাকে ভাবোত্তেজনাময় (sensuous) বলিয়া থাকেন। কিন্তু উহাতে দেহ ও আত্মা এক লক্ষ্য লইয়া ছুটিয়া একটা পরম নিবিড় বাস্তব ও অতি-বাস্তব (ethereal) রসের সমন্বয় সাধন করিয়াছে বলিয়া আর্ট হিসাবে চিত্রাঙ্গদার স্থান এত উচ্চে। নারীত্বের একটা বড় সার্থকতা ইহাতে দেখানো হইয়াছে।

(৯) নৈবেদ্য, পৃঃ ৩১।

জীবন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার কয়েকটি ধারা দেখানো হইল। ফাল্গুনী, রক্তকরবী, মুক্তধারা, রাজা ও ডাকঘরে কবি জীবনের অসীম রহস্যের আরও কয়েকটা দিক্ খুলিয়া দেখাইয়াছেন ও তাহার সমাধান করিয়াছেন। তাহাদের আলোচনা করিলে এ প্রবন্ধের আয়তন অশোভন ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে বলিয়া আমরা তাহা হইতে বিরত হইলাম।

জীবন ও মরণ এই দুইটিই জগতের গূঢ় রহস্য। ইহাদের ভিতরের কথা এমনভাবে খুলিয়া বলা ও এমন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সহিত ইহাদের প্রকৃত রূপ অঙ্কিত করা একমাত্র দ্রষ্টারই কাজ। তাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শুধু রূপদক্ষ ও সৌন্দর্য্য স্রষ্টাই নহেন, তিনি ভাবদ্রষ্টা—সত্যদ্রষ্টা।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরের আলো জানালা দিয়া ঘরে আসিয়া পড়িতেই, মিঃ ঘোষ শ্রান্ত চক্ষু দু'টি খুলিয়া চাহিলেন। একবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—নির্ম্মল!

নির্ম্মলা কিছুদূরে টেবিলের কাছে দাঁড়াইয়া বেদানার রস তৈয়ার করিতেছিল,—ডাক শুনিয়া তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া বলিল—কেন বাবা? শরীরটা একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি? কেমন আছ এখন?

মিঃ ঘোষ একটু বিস্মিত ভাবে তাহার দিকে চাহিলেন। বলিলেন—আমার কি হয়েছে, বল্ তো মা? আমার ত কিছু মনে পড়ছে না? কিছু অসুখ করেছে কি?

নির্ম্মলা বিছানায় বসিয়া তাঁহার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইল। ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—তোমার যে আজ চার দিন ধরে বড্ড জ্বর হয়েছে বাবা! এক দিন একবারও তো তুমি চেয়ে দেখ নি,—একটি বারও তো আমায় ডাক নি বাবা! আজ এখন জ্বর কমে আসছে দেখছি; একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?

মিঃ ঘোষ আবার চোখ বুজিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—কি জানি—কিছু বুঝতে পারছি না! জ্বর হয়েছে বুঝি? ও, তাই শরীরটা এত দুর্ব্বল মনে হচ্ছে! চোখ চাইতে পারছি না!

নির্ম্মলা আকুল হইয়া বলিল···তোমার যে অনেকক্ষণ কিছু খাওয়া হয় নি, বাবা! তুমি একটা কুলকুচো করে এই বেদানার রসটুকু খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়! বেলা ত এখনও বেশি হয় নি! এর পরে বেলায় উঠে মুখ-টুখ ধুলেই হবে এখন।

মিঃ ঘোষ আর কিছু বলিলেন না। বলিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না। গভীর শ্রান্তি ও অবসাদের ভারে তাঁহার সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল। নির্ম্মলা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বেদানার রসটুকু খাওয়াইয়া দিলে তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নির্ম্মলা তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া একদৃষ্টে তাঁহার বিশুষ্ক পরিম্লান মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার ইহ-জগতে একমাত্র আশ্রয় যিনি ছিলেন, আজ সে তাঁহাকে জীবনের মত হারাইতে বসিয়াছে!

চারদিন আগে বৈকালের দিকে মিঃ ঘোষের প্রথমে অল্প জর হয়। রাত্রে সেই জর বাড়িতে বাড়িতে ক্রমশঃ তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন।

তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক অনিল বাবু সকালে তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন তাঁহার অসুখ গুরুতর ...জীবনের আশঙ্কা আছে। বিশেষ সাবধানে রাখিতে হইবে।

নির্ম্মলার চোখের সামনে সব অন্ধকার হইয়া আসিল। সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি দেওয়াল ধরিয়া সামলাইয়া লইল। তাহার পরই তাহার চোখে অশ্রুর বন্যা নামিল।

নির্ম্মলার অসহায় কাতর মুখের দিকে চাহিয়া প্রবীণ চিকিৎসক ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, দেখুন... আপনাদের বাড়ীতে যখন আর দ্বিতীয় লোক কেউ নেই, তখন আপনাকেই সমস্ত দিক ভেবে বুঝে চলতে হবে। কাজেই সব কথাগুলো আপনার জানা দরকার। মিঃ ঘোষের হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ...শরীরে তাঁর আর শক্তি বিশেষ কিছু নেই। গত কয়েক মাসের অতিরিক্ত মানসিক উত্তেজনায়, দুশ্চিন্তায় তাঁর জীবনী-শক্তি একেবারে ক্ষয় করে ফেলেছে। এখন এই যে অবসাদ ও ক্লান্তিতে তাঁকে এমন অবসন্ন ও চৈতন্যহীন করে রেখেছে, এ অবস্থা থেকে সুস্থ করে তোলা খুব কঠিন ও সময়-সাপেক্ষ। ওঁকে সর্ব্বক্ষণ খুব সাবধানে রাখবেন। ওঠা বসা একেবারেই বারণ,—বিছানার উপরেও এখন কিছু দিন উঠে বসতে দেবেন না। সর্ব্বদা শুয়ে থাকবেন। আর উনি যখন যা বলবেন, তার যেন কোন রকম অন্যথা না হয়। মন যেন সব সময় ভাল থাকে। এ সময়ে মনের কোন রকম সামান্য উত্তেজনাও ওঁর পক্ষে অনিষ্টকর। বিরক্তি রাগ বা উৎকণ্ঠা...বা এ রকম কোন উত্তেজনার কারণ ঘটলে হঠাৎ কোন ক্ষতি হওয়া অসম্ভব নয়।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাহার পর তিনি বলিলেন...আপনি যেন এ সব কথা শুনে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়বেন না। শুধু এই ভাবে রাখা দরকার বলেই আপনাকে এত কথা বলতে হলো। জরটা দু চার দিনেই কমে যেতে পারে। তারপরে এই রকম খুব সাবধানে কিছু দিন রেখে নিয়মিত চিকিৎসা ও সেবা হলেই আস্তে আস্তে সেরে উঠবেন এখন। কিছু ভয় পাবেন না আপনি! আমি দুবেলা এসে দেখে যাবো...তার মধ্যেও যদি দরকার হয়...তখনি ডেকে পাঠাবেন।

ডাক্তারের এ আশ্বাসবাণী নির্ম্মলার মুহ্যমান হৃদয়ে বিশেষ আশার সঞ্চার করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত দেহ মন অনিশ্চিত আশঙ্কায় ও উদ্বেগে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, ও থাকিয়া থাকিয়া কেবলি মনে হইতেছিল... তাহার পিতা এ রোগ-শয্যা ছাড়িয়া বুঝি আর উঠিবেন না।

চার পাঁচ দিন পরে মিঃ ঘোষের জর ছাড়িয়া গেল। শরীর দুর্ব্বল থাকিলেও সেদিন যেন তিনি একটু সুস্থ বোধ করিলেন।

দুপুরে নির্ম্মলা আহারাদি করিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলে, তিনি তাঁহার কম্পিত ক্ষীণ হাতখানি তুলিয়া নির্ম্মলার কোলের উপর রাখিলেন। অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষে বলিলেন... তুই যে দেখছি বড় রোগা হয়ে শুকিয়ে গিয়েছিস... মিলু! এ ক'দিন বুঝি রাতদিন আমার কাছে বসে কাটিয়েছিস...নয়? খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলি... অসুখটা দেখে... না মা?

নির্ম্মলা মুখ ফিরাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল...ও কিছু নয় বাবা! আমি ত ভালই আছি। তুমি নিজে কেমন আছ... বল দেখি? আজ একটু ভাল বোধ হচ্ছে কি?

হ্যাঁ মা! আজ আমার শরীরটা যেন খুব হালকা বলে মনে হচ্ছে! জরটা ছেড়ে গেছে কি না? দুর্ব্বলতা যেটুকু আছে...ওটা ক্রমশঃ খেতে দেতে কমে যাবে। কিন্তু মিলু! আজ শুধু শরীরটা নয়...মনটাও যদি ভিতর থেকে এমনি সুস্থ ও প্রফুল্ল হয়ে উঠতো! তুই ত জানিস নে মা! সে সব কথা! এত দিন ধরে মস্ত বড় একটা বোঝা বুকের উপর চেপে থেকে আমায় দম বন্ধ করে মারছে। আজ আমার বুক থেকে সে বোঝা নেমে গেলে মন আমার হালকা ও প্রফুল্ল

হয়ে উঠতো! মনে হচ্ছে···আমি যদি এত দিনেও ক্ষমা পেতুম মা! তা হলে কি যে একটা স্বস্তি ও শান্তিতে মন আমার ভরে উঠতো···সে আর তোকে, কি বোলবো···মিলু! আমি যেন বেঁচে যেতুম আজ!

মিঃ ঘোষ এত কথা এক সঙ্গে বলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। নির্ম্মলার একদিন এ সব কথা জানিবার জন্য আগ্রহ ও কৌতূহলের অন্ত ছিল না; কিন্তু আজ সে এ কথায় অত্যন্ত ভয় পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল···কোন্ কথায় কি আসিয়া পড়িয়া শেষে একটা কাণ্ড না ঘটে!

সে বলিল···ও সব কথা যেতে দেও, বাবা! তোমার শরীর দুর্ব্বল, এর উপর বেশি কথা বললে অসুখ করবে। ডাক্তার বাবু বারণ করে গেছেন··কথা· বলতে! তুমি চুপ করে ঘুমিয়ে পড়।

মিঃ ঘোষ অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন···ডাক্তার ত সবই জানে। গোটাকতক বাঁধা গৎ শিখে রেখেছে···তাই আউড়ে বেড়ায়। আমার মনের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা সে জানবে কোথা হতে! আমায় সব বলতে দে মিলু! যা আমি বলতে চাই···সে সব কথা বলা হলে আমি আরো সুস্থ হতে পারবো।

আর কিছু বলিলে তিনি হয় ত বিরক্ত হইবেন, সেই ভয়ে নির্ম্মলা আর প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিঃ ঘোষ বলিলেন—আচ্ছা নির্ম্মল···তোর বাবার উপর তোর বড় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে···নয়? তুই ত জেনে রেখেছিস···আমি একটা মস্ত দেবতুল্য লোক!

নির্ম্মলা নীচু হইয়া তাহার মুখখানি মিঃ ঘোষের বিশুষ্ক কপোলের উপর রাখিয়া আদরের সুরে বলিল···সে কি মিছে কথা···বাবা? আমার বাবার মত মহৎ লোক এ সহরে কটা আছে···বল তো শুনি?

মিঃ ঘোষ মাথা নাড়িয়া বলিলেন···ঐ তো···ঐখানেই যে মস্ত ভুল থেকে গেছে···মা! শুধু তুই কেন···এ ভুল বিশ্বাস অনেকেরই মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে! কিন্তু আমি যে একদিন কত বড় দোষ করেছিলুম, তা যদি তুই জানতিস···নির্ম্মল!

মিঃ ঘোষ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। নির্ম্মলা এ কথায় অত্যন্ত আহত হইয়া বলিল··· ও সব কথা কেন ভাবছো···বাবা? আমি নিজের চোখে দেখলেও কখনো বিশ্বাস করতে পারি না···যে তোমার দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয়েছে!

কিন্তু সত্যিই আমি বড় অনুচিত কাজ করেছি মা! জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত করেও তার কোন প্রতিকার করতে পারলুম না। মানুষকে অত বেশী বিশ্বাস করিস নে মিলু! দোষ গুণ মিলিয়ে মানুষ···মানুষই···সে দেবতা নয়···ভুল ভ্রান্তি তার পদে পদে!

তাহার পর আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিঃ ঘোষ বলিতে লাগিলেন···আমি নিজে কিন্তু কোন অন্যায় কাজ করি নি! আমার নামে···আমার মতে অন্য লোক সে সব কাজ করেছিল। কাজেই তার জন্য সকলের কাছে আমিই দায়ী! আমার বুদ্ধির দোষে একটা নির্দ্দোষ লোক গৃহহীন নিরাশ্রয় হয়ে পথে পথে বেড়িয়েছে! তার দুঃখ···তার মনের জ্বালা···কি এক দিনের জন্যও ভুলতে পেরেছি!

মিঃ ঘোষ চোখ বুজিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—যতদিন বয়স অল্প ছিল, ততদিন তবু এমন তীব্র ভাবে এ সব কথা মনে জেগে বসতো না—কিন্তু যে দিন থেকে তোর মাকে ঘরে আনলুম, যে দিন তোকে কোলে পেলুম, সেই দিন থেকে বেশ বুঝলুম, কি আগুন বুকে নিয়ে রামগোবিন্দ দেশান্তরী হয়ে গিয়েছে! দুধের ছেলে অসিতকে নিয়ে—

নির্ম্মলা এতক্ষণ আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, অসিতের নাম শুনিয়াই সে চমকিয়া উঠিল। তাহার সর্ব্ব শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল! এত দিন যে অস্পষ্ট সংশয়ের ছায়া কেবলই তাহার মনে অশান্তি জাগাইয়া তুলিত, আজ এক মুহূর্ত্তে সে সংশয় ঘুচিয়া সবই পরিষ্কার হইয়া গেল!

তাহার সেই প্রবল কম্পন অনুভব করিয়া মিঃ ঘোষ চোখ খুলিয়া চাহিলেন,—বলিলেন—তুই বুঝি অসিতের নাম শুনে চমকে উঠলি মিলু? সেই অসিত—সেই যে পাটনার জঙ্গলে—তোর হাত ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছিল? আঃ! কি করেই যে সব কথাগুলো তোকে বলি?

মিঃ ঘোষ আবার চক্ষু মুদিলেন, কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া নিজের মনে মৃদু মৃদু বলিতে লাগিলেন···না · বলা যায় না! সে সব কথা···মুখে এমন করে বলা যায় না। তাই ত সব লিখে রেখেছি! আমার টেবিলের বাঁ দিকের ড্রয়ারে··· বুঝেছিস··মা? এক তাড়া কাগজ আছে···দেখলেই সব বুঝতে পারবি!

তাঁহার মৃদু স্বর ক্রমে আরও মৃদুতর হইয়া আসিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বিজ বিজ করিয়া তিনি আরো কত বি বকিতেছিলেন। নির্ম্মলা…রামগোবিন্দ ও অসিত এই দুই নাম ছাড়া আর কিছু বুঝিতে পারিল না

সে স্তম্ভিত হৃদয়ে রুদ্ধবাক্ হইয়া পিতার শিয়রে বসিয়া ছিল। মিঃ ঘোষের লিখিত কাগজে তাহার জন্য না জানি কি ভীষণ তথ্য অপেক্ষা করিতেছে! এ অনিশ্চিত উদ্বেগ দিনের পর দিন ধরিয়া আর তো এমন ভাবে সহ্য করা যায় না! এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

ধীরে ধীরে আবার তাহার মনে অসিতের চিন্তা জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহার পিতা যে অসিতের কতখানি ক্ষতি করিয়াছেন, তাহা সে কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার জন্য এই যে তাঁহার জীবনব্যাপী তীব্র অনুতাপ…এই যে ঘোর মানসিক অশান্তি—ইহাতেও কি সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হইল না? অসিত ত তাঁহাকে তাহার পরম শত্রু বলিয়া জানিয়া, তাঁহার প্রতি তীব্র প্রতিহিংসা পোষণ করিতেছে। সে যদি একবার তাহার প্রতি তাঁহার মনের প্রকৃত ভাবটা জানিতে পারিত! আর একবার কি কোনরূপে তাহার দেখা পাওয়া যায় না?

পিসিমা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন…দিনটা ভোর এমনি করে ঠায় বসে আছ? দাদা ত ভাল আছেন আজ? একটু শুলে হতো? আজ পাঁচ দিন পাঁচ রাত একাক্রমে বসে কাটছে, একটু জিরেন না হলে মানষের শরীর থাকে? ওঠ দেখি…ও ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে ঘুমোও গে। আমি খানিক বসছি।

নির্ম্মলা ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল…এখন আর শোব না…পিসিমা, তিনটে বেজে গেছে। শীতের দিনে অবেলায় ঘুমোলে শরীর অসুখ করবে! তুমি বরং শোও একটু। সকাল থেকে এত খাটুনি খেটে এলে!

পিসীমা বলিলেন, আমার জন্য তোমায় ভাবতে হবে না বাছা। তুমি নিজের শরীরটার একটু যত্ন কর তো! না শোবে যদি, ত যাও…একটু বাগানের দিকে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়িয়ে এসো। দিন রাত না ঘুমিয়ে…আর বন্ধ ঘরে বসে ভেবে ভেবে চোখ মুখ শুকিয়ে বসে গেছে একেবারে! এর পরে তুমি পড়লে রুগী দেখবে কে এমন করে? ওঠো… আমি বসছি এখানে!

নির্ম্মলা এবার আর আপত্তি করিল না, তাহার মনের তখন যে অবস্থা…তাহার কেবল মনে হইতেছিল, নির্জ্জনে গিয়া একবার খানিক ভাবিয়া ও কাঁদিয়া আসে!

নিদ্রিত পিতার মুখের দিকে একবার চাহিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল…বাবার ঘুম ভাঙলেই আমায় ডেকে দিও পিসীমা!

সে আর তোমায় বলতে হবে না! বলিয়া পিসীমা নির্ম্মলার পরিত্যক্ত বিছানার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ ঘোষ অকাতরে ঘুমাইতেছিলেন। পাশের জানালা দিয়া এক ঝলক রৌদ্র তাঁহার মুখে আসিয়া পড়ায় পিসীমা উঠিয়া জানালা বন্ধ দিয়া আসিলেন। শালখানা টানিয়া মিঃ ঘোষের পায়ের উপর ভাল করিয়া চাপা দিতে দিতে বলিলেন…এদের যে কি স্বভাব…বল্লে ত কথা শুনবে না… রোগা মানুষকে কি এমন উত্তর-শিয়রি করে শোয়ায় কখনো! যত সব অনাচার…আর খ্রীষ্টানী কাণ্ড! এ সব অলুক্ষুণে কাজ দেখলে আমাদের মন খুঁত খুঁত করে!

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে থাকিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পিসীমার মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। তখনি তিনি সজাগ হইয়া চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন…পোড়া পেটে দু মুটো ভাত পড়লেই যেন রাজ্যের আলিস্যি এসে জড়িয়ে ধরে!

এবার তিনি বিশেষ সাবধান হইয়া দুই হাতে চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা…কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর তন্দ্রায় তাঁহার চোখের পাতা বুজিয়া আসিল…

নির্ম্মলা মিঃ ঘোষের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বাগানের ভিতর একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। শূন্যমনে সে কিছুক্ষণ উদাস নেত্রে চাহিয়া ভাবিল…সে এখন কোথায় আছে…কে জানে! হয় ত তাহারই খুব নিকটে কোথাও অবস্থান করিতেছে…এই একই আকাশের তলে…হয় তো একই সহরে…পাশাপাশি তাহারা দুজনে রহিয়াছে…কত নিকটে…তবু…কত দূরে! নিয়তি তাহাদের দুজনের মধ্যে যে ব্যবধান রচনা করিয়া রাখিয়াছে…তাহা দূর করিয়া তাহারা কোন দিন জীবনে পাশাপাশি দাঁড়াইতে পারিবে না…তাহা তো নিশ্চিত…তবু…একবার যদি সে আসে! এই একটিবার তাহার দেখা পাইবার আশা কিছুতে তাহার

মন হইতে যায় না। সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে··· প্রতি দণ্ডে প্রতি পলে এই একটী আশা তাহার মনে জাগ্রত থাকিয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া তোলে! যাহা হইবার নয়··· তাহার জন্য কেন আর এত ভাবিয়া মরা!

কিন্তু যদি সত্যই এমন হয়···যদি সত্যই কোন দিন সে আসে, সে তখন কি বলিবে? কি বলিবারই বা তাহার আছে? চোখ মুছিয়া নির্ম্মলা ভাবিল, এবার যদি কোন দিন সে তাহার দেখা পায়, তবে তাহার পিতার কথা সমস্ত বলিয়া সে নিজে তাহার জন্য তাহার কাছে ক্ষমা চাহিয়া লইবে। দুর্ব্বহ অশান্তির জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া তাহার পিতা আজ মৃত্যুশয্যায় শয়ান,···এখনো সে চিন্তা, সে ব্যথা তাঁহার অন্তর হইতে মুছিয়া যায় নাই। আজ এই শেষ মুহূর্ত্তে···যদি সত্যই তাঁহার জীবনের অবসান হইয়া আসিয়া থাকে, তবে আজো কি তিনি এই বেদনা···এই অনুতাপের জ্বালা বুকে জ্বলিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবেন? জীবনের শেষ দিনেও কি সে তাঁহার প্রাণে একটু স্বস্তি, একটু শান্তি দিতে পারিবে না? তাহার মান অপমান কিছু ভাবিবার সময় নাই, নিজের কোন কথা সে বলিতে চায় না, কোন দিন বলিবেও না। তাহার পিতার জন্য যেমন করিয়া হোক্ এ কাজ করিতেই হইবে! কিন্তু হায়! অসিত আজ কোথায়! সন্ সন্ শব্দে গাছের পাতা কাঁপাইয়া একটা জোর বাতাস বহিয়া গেল! তাহার পরেই শুষ্ক পাতার উপর মর্ মর্ করিয়া শব্দ হইতে, নির্ম্মলা মুখ ফিরাইয়া দেখিল···তাহার সম্মুখে···অসিত!

অকস্মাৎ নির্ম্মলার বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল! সে কি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে···না তাহার একাগ্র চিন্তার বস্তু রূপ ধরিয়া তাহার চিন্তাশক্তির আকর্ষণে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে? কি এ! সে কোন কথা বলিতে পারিল না! কেবল স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল!

অসিতও দু এক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ হইয়া রহিল! তাহার পর সে একটু হাসিয়া বলিল···আমায় হঠাৎ একেবারে এখানে দেখে আপনি অবাক্ হয়ে গেছেন···দেখছি! আমার কিন্তু দোষ নেই কিছু! আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আপনার চাকরটাকে খবর দিতে বলেছিলুম। সে আমায় ডেকে নিয়ে এসে এইখানে ছেড়ে দিয়ে গেল!

নির্ম্মলা তবু কোন কথা বলিতে পারিল না! তাহার গলা বুক শুকাইয়া কাঠ হইয়া গিয়াছিল!

অসিত একটু অপেক্ষা করিয়া আবার বলিল, আজ একটা বিশেষ দরকারের জন্য আপনার কাছে এসেছি! কিন্তু সে কথা বলবার আগে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি! এর পূর্ব্ব দিন আপনার সঙ্গে যে অভদ্র ও পশুর মত ব্যবহার করে গেছি, তার জন্য ক্ষমা চাইছি! আপনি সে জন্য আমায় মাপ না করলে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারবো না। নির্ম্মলা এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পলকহীন নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া ছিল, অসিতের মুখে এ কথা শুনিয়া তাহার দৃষ্টি আপনাআপনি নত হইয়া আসিল। রুদ্ধ বেদনা ও অভিমানে তাহার চক্ষু জ্বালা করিয়া জল আসিতেছিল,—সে নিজেকে সংযত করিবার জন্য মাথা হেঁট করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

অসিত কিন্তু তাহার এ ভাব বুঝিল না, সে ভাবিল—সেদিনের আচরণে নিজেকে অপমানিত মনে করিয়াই সে নীরব হইয়া আছে।

সে বলিল—সেদিন এখান হতে চলে যাবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত আমি একদিনও সুস্থির হতে পারিনি। কেন যে অমন বর্ব্বরতা করেছিলুম, সে কথা আপনাকে না বলাই ভালো। আপনি যখন কিছুই জানেন না, তখন কতকগুলো অবান্তর কথা বলে মিছে আপনাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? কিন্তু যে কারণেই হোক্ আপনার সঙ্গে ও-রকম ব্যবহার করা আমার বড় অন্যায় হয়েছে! তবে আপনাকে ব্যথা দিয়ে গিয়ে আমার দিন যে কি করে কেটেছে, সেটা যদি আপনি জানতেন!

অসিতের বিষাদপূর্ণ গভীর কণ্ঠস্বরে তাহার মনের দুর্নিবার বেদনা ফুটিয়া উঠিল! নির্ম্মলা অত্যন্ত আঘাত পাইয়া একবার অসিতের বিষণ্ণ গম্ভীর মুখের দিকে চাহিল! কি যে সে বলিবে, কিই বা সে করিবে, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না! কেন যে অসিত সেদিন তাহাকে ওভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া রাগিয়া চলিয়া গেল, কেনই বা আজ আবার নিজে আসিয়া এমন দীনভাবে ক্ষমা চাহিতেছে—সে ত কিছুই বোঝে না! সেদিন যে কারণ ছিল, আজও ত সে কারণ তেমনি অব্যাহত রহিয়াছে!

অসিত তখনো নির্ম্মলাকে নীরব দেখিয়া অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ

হইয়া বলিল, আপনি এখনও সে ব্যাপারটা ভুলতে পাচ্ছেন না, দেখছি! কই, কিছু বলছেন না ত? আমি দোষ করেছিলুম, আবার ফিরে এসে সে অন্যায় আবার স্বীকার করছি, তবু কি আমায় মাপ কর্ব্বেন না?

এবার নির্ম্মলা আর থাকিতে পারিল না। মাথা তুলিয়া বলিল, আপনাকে ক্ষমা করবার আমার কোন অধিকার নেই অসিতবাবু! বরং আমরাই আপনার কাছে দোষী—আমরাই আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। কথাটা যে আপনার কাছে কি করে তুলবো, তাই আমি এতক্ষণ ধীরে ধীরে ভাবছিলুম!

অসিত অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে নির্ম্মলার মুখের দিকে চাহিল!

নির্ম্মলা একবার এদিক ওদিক চাহিয়া, ঢোঁক গিলিয়া তাহার আঁচলটা টানিয়া সোজা করিতে করিতে নত মুখে বলিল, কিছুদিন আগে আমি জানতে পেরেছি, যে বাবা কোনও সময় আপনাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন অন্যায় ব্যবহার করেছেন। তিনি যে আপনাদের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছেন, আমি তার কিছুই জানি না, তাঁর হয়ে এ ভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলবার আমার কোন অধিকার আছে কি না, তাও আমার জানা নেই,—শুধু আজ কয় মাস ধরে তিনি যে অশান্তি ও যাতনা ভোগ করছেন, তাই দেখে দেখে আমার নিজের অসহ্য হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই তিনি কোন দোষ করে থাকেন—তার ত যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে,—আপনি তাঁকে ক্ষমা করতে পাবেন না কি?

বলিতে বলিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাহার অশ্রুভরা চক্ষু দুটি অসিতের প্রতি স্থির রাখিয়া বলিল, যে দিন পাটনার সেই জঙ্গলের মধ্যে আপনার সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয়, আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি, তার পর থেকেই তাঁর মানসিক রোগের সূত্রপাত হয়। প্রথম প্রথম আমি এ সব কিছুই বুঝতে পারতুম না। তাঁর সর্ব্বক্ষণ আশঙ্কা, মনের উদ্বেগ, চাঞ্চল্য দিন দিনই বাড়তে লাগলো। আজ তিনি সেই অশান্তির ফলে শয্যাগত হয়ে পড়েছেন, আর কখনো সুস্থ হতে পারবেন কি না, তার কিছুই স্থিরতা নেই। তবু এই অসুখের মধ্যেও তাঁর মনে এখনো সেই সব কথাই জাগছে। কি করে যে আমি তাঁকে এ অবস্থায়ও একটু শান্তি দেব, কিছুতে তা ভেবে পাচ্ছিলুম না। হয় ত এমনি করেই কোন্ দিন অতর্কিতে তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যাবে!

ঝর ঝর করিয়া নির্ম্মলার নয়নের অশ্রু অবাধে ঝরিতে লাগিল! অসিত তাহার অশ্রুসিক্ত কাতর মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

কিছুক্ষণ পরে চোখ মুছিয়া নির্ম্মলা আবার বলিল—তাঁর কথা থেকে আমার মনে হয়, হয় ত এর মধ্যে কিছু গোল আছে, হয় ত আপনারা তাঁকে যতটা দোষী ভাবেন, তাঁর তত দোষ নেই। আর যদি সত্যই তিনি সে দোষ করে থাকেন, তার জন্যও তিনি অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। আজ তিনি অনুতপ্ত, বৃদ্ধ, অসহায়, রোগশয্যাশায়ী, আজ তিনি আর আপনার প্রতিহিংসার পাত্র নন্ অসিতবাবু! আজ আপনি তাঁকে ক্ষমা করুন! আপনার ক্ষমা পেয়েছেন, জানলে তাঁর শেষ জীবন শান্তিময় হয়ে উঠবে!

নির্ম্মলার কথা শেষ হইলে অসিত কিছুক্ষণ স্থির চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, ক্ষমা করবার কি কিছু বাকি আছে নির্ম্মলা? তাঁকে যদি মন থেকে ক্ষমা করতে না পারতুম, তা হলে কি আজ এমন করে তোমার কাছে এসে দাঁড়াতে পারি?

অসিতের মুখে তাহার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র নির্ম্মলা চমকিয়া উঠিয়া একবার তাহার দিকে চাহিল! পরক্ষণেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া গভীর সুখে ও বেদনায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল! আজ যেন তাহার এতদিনের সকল সংশয়, সকল ব্যথা ও ভাবনার অবসান হইল! তাহার এতদিনের দগ্ধ ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে কে যেন অমৃতের প্রলেপ দিয়া তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া দিল! আজ সে অকূলে কূল পাইল!

উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের আবেগে নির্ম্মলার দেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অসিত সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, মিঃ ঘোষের অন্যায় যে কত বড় গুরুতর, সে তুমি কিছুই জান না, নির্ম্মলা! জেনে দরকারও নেই—কারণ আমি অনেক চেষ্টা করেও তাঁর প্রতি প্রতিহিংসার ভাব বজায় রাখতে পারি নি। তোমায় দেখবার পর থেকে আমার এতদিনের সব ধারণা, সব বিশ্বাস ওলোটপালোট হয়ে গেছে। তবু আমি কর্ত্তব্যবোধে চিরদিন তোমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবো বলেই মনস্থ করেছিলুম। তার জন্য নিজের

সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করেছি, অনেক চেষ্টা করেছি। এই কিছু দিন আগে পর্য্যন্ত মন স্থির করতে পারি নি, সে ত তুমি জানই। তবে শেষ পর্য্যন্ত আমারই পরাজয় হলো। উচিত বা অনুচিত যাই হোক্—আর আমি তোমাদের সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতে পারলুম না।

নির্ম্মলা তখনো তেমনি নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল। অসিতের ইচ্ছা হইতেছিল, তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটি সযত্নে মুছাইয়া দেয়, কিন্তু সে আগের মতই নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাঁদিয়া মনের ভার লঘু হইলে নির্ম্মলা চক্ষু মুছিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। এই ঘটনার পর তাহাদের পরস্পরের মনের ভাব উভয়ের নিকট আর কিছু অগোচর ছিল না।

নির্ম্মলা বলিল, তুমি একবার বাবার কাছে চল! তোমায় পেলে আর তোমার কথা শুনলে তিনি মন থেকে শান্তি পেয়ে শীগ্গির ভাল হয়ে উঠবেন।

অসিত বলিল, আজ আর সময় নেই। কথায় কথায় অত্যন্ত দেরি হয়ে গেছে। আমার হাতে এখন কত যে গুরুতর কাজের ভার রয়েছে—সে তুমি জান না। আমার নিজের সম্বন্ধে কোন কথাই তোমার জানা নেই। যদি কোন দিন সময় পাই, তবে আর এক দিন এসে সব বলে যাব। এখন যে জন্য এসেছি সেই কথাটা বলি। আজ থেকে দুদিন পরে এখানে একটা বিদ্রোহ আরম্ভ হবে। হয় তো সেই কাণ্ডটা সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী হতেও পারে! এ ঘটনা যে কি রকম হয়ে দাঁড়াবে, কত দিন ধরে চলবে, সে এখনো আমরা কিছু ঠিক করতে পারছি না। তাই সহরের নির্ব্বিরোধ লোক ও শিশু, বৃদ্ধ ও মেয়েদের জন্য আমরা একটা নিরাপদ স্থানও ব্যবস্থা করে রেখেছি। তাই তোমায় বলতে এসেছিলুম, যদি সে রকম গোল কিছু হয়, তা হলে যে লোক এসে তোমাকে ঠিক এই রকম আংটি দেখাবে, তাকে বিশ্বাস করে তোমরা তার সঙ্গে চলে যেও। সে আমাদের দলেরই বিশ্বস্ত লোক—সে তোমাদের ভাল জায়গায় নিয়ে গিয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবে;

অসিত তাহার হাত হইতে একটি আংটি খুলিয়া লইয়া নির্ম্মলার সামনে রাখিল।

নির্ম্মলা ক্ষণকাল সশঙ্কিত দৃষ্টিতে অঙ্গুরীর দিকে চাহিয়া রহিল! অসিতের এই সব কথা শুনিয়া ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল! সে বলিল—এ সব কি কথা যে বল্লে, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না! আবার কি মিউটিনি হবে? তুমি সে সময় কোথায় থাকবে তা হলে?

অসিত একটু হাসিয়া বলিল, সেটা এখন ঠিক বলতে পাচ্ছি না! কোথায় থাকবো, কি করবো, সবই এখন অনিশ্চিত। তবে এ ব্যাপারটা সব আমরাই গড়ে তুলেছি, আমাদেরই হাতে সমস্ত ভার—কাজেই আমাদেরই সব দিক দেখতে শুনতে হবে। আজ এখন আমি যাই—তা হলে। এ সব গোল মেটবার পরও যদি বেঁচে থাকি, তখন আবার দেখা হবে। এর মধ্যে তুমি মিঃ ঘোষকে আমার কথা বলে রেখো। আমার দ্বারা কোন দিন তাঁর কিছু ক্ষতি হবে না—এ বিশ্বাস তিনি রাখতে পারেন।

নির্ম্মলা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল! যদি বা এতদিন পরে সব বৈরিতা ভুলিয়া অসিত তাহার কাছে আসিল, তবে আবার এ সব কি হেঁয়ালি আরম্ভ হইতে চলিল? তাহার ভাগ্যে কি চিরদিনই এইরূপ একটা না একটা বিপর্য্যয় লাগিয়া থাকিবে?

অসিত আবার বলিল, মিঃ ঘোষকে বলবার কথা আমারও অনেক আছে নির্ম্মলা! তাঁর কাছে শোনবার কথাও আমার ঢের বেশি ছিল; কিন্তু এখন আর সে সময় নেই! দেশব্যাপী এত বড় একটা ঘটনার সময় ব্যক্তিগত জীবনের ছোটখাট কথা বা দাবী চলতে পারে না। সে সব ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক! তোমার সঙ্গে সেদিন রূঢ় ব্যবহার করে গিয়ে অবধি মনে শান্তি ছিল না, সেই জন্য, আর এই কথাটা বলে যাব বলে—ছুটে আসতে হলো। আমি এখন উঠি—বড় দেরি হয়ে গেল।

অসিত আর দাঁড়াইল না। নির্ম্মলাও তাহার সঙ্গে উঠিল। উভয়ে বাগান হইতে বাড়ী যাইবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, মিঃ ঘোষ সামনের বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া আছেন। প্রবল জ্বরে তাঁহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। জ্বরের ঘোরে কখন তিনি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়াছেন।

অসিত ও নির্ম্মলা হঠাৎ তাঁহাকে এ অবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। এ কি ব্যাপার!

অসিতের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সহসা মিঃ ঘোষের চোখে মুখে বিস্ময় ও আতঙ্কের রেখা ফুটিয়া উঠিল। ভগ্নস্বরে

বিকৃতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—ও কি? তুমি? তুমি এখানে? তাঁহার সর্ব্বশরীর কিসের উত্তেজনায় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তিনি পড়িয়া যান দেখিয়া অসিত তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেছিল।

মিঃ ঘোষ তাহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া ভয়-ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—নির্ম্মল! নির্ম্মল! ধর! আমায় ধর! বলিতে বলিতে তিনি বিবর্ণ মুখে ছিন্নমূল তরুর মত অসিতের পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িলেন। সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

হলাণ্ডে

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু

সুবিস্তৃত সমতল সবুজ ক্ষেত্র সুদূর দিগন্তে নীলাকাশের সঙ্গে মিশে গেছে; সবুজ মাঠের ওপর রূপার স্তার মত খালের জাল টানা—যেন চতুরঙ্গের ছক; খালের ধারে ধারে উইণ্ডমিল প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে; তার ওপর নীলাকাশ নত হয়ে পড়েছে—এই হচ্ছে হলাণ্ড। শীতের প্রভাতের ধূসর আলোর মধ্য দিয়ে আমাদের ট্রেন হুক্ অফ হলাণ্ড (Hook of Holland) থেকে আমষ্টারডামের (Amsterdam) দিকে চলেছে। গাড়ীর জানলা দিয়ে হলাণ্ডের এই রূপই দেখলুম। মাঠের পর মাঠ। তাদের মাঝ দিয়ে সোজা লম্বা খাল চলে গেছে,—দিগন্তে গিয়ে মিলেছে। খালের জল ভোরের আলোয় ঝিক্‌মিক্ করছে। দুধারে পাতাহীন গাছের সারি। মাঝে মাঝে এক একটা windmill স্তব্ধ প্রহরীর মত

আমষ্টারডাম—কালভারষ্ট্রাট্

দাঁড়িয়ে। সেই ধূসর অন্ধকারময় আকাশে উইণ্ডমিলগুলির মূর্ত্তি রহস্যময় বৃহৎ দেখায়—যেন চতুর্ভুজ দৈত্যের সারি গুম হয়ে বসে আছে। বাস্তবিক আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের মত এই উইণ্ডমিল ডাচ্ কৃষকদের ঘরে অনেক ধনরত্ন এনে

দিয়েছে। উইণ্ডমিলের বাংলা ঠিক কি করা যায় জানি না; কারণ, উইণ্ডমিল আমাদের দেশে নাই। বায়ু-যন্ত্র বা বায়ু-চালিত কল বলা যেতে পারে।

খাল দিয়ে মাখন, 'চিজ' বোঝাই করা নৌকা ধীরে চলেছে; খালের তীরে উইণ্ডমিল ঘুরছে; খালের জল মাঠের ছোট খালে ছড়িয়ে দিচ্ছে; মাঠের ওপর গরু চরছে; কৃষকের মেয়েরা রঙ্গীন সাজ পরে কাজে ব্যস্ত—হলাণ্ড বলতে এই ছবিটি আমার চোখে ভেসে ওঠে,—রেলগাড়ী থেকে হলাণ্ডের এই শান্ত কর্ম্মময় মূর্ত্তি দেখলুম।

গাড়ীতে হলাণ্ডের সম্বন্ধে একটা বই পড়তে পড়তে তার রাজ-

ভালবাসা চিরদিন তাহাদের অন্তরে জলজল করছে। বিশেষতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে হলাণ্ড যখন স্পেনের অধীন হল, স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস ও তার পর দ্বিতীয় ফিলিপের সময় পরাধীনতা ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত হয়ে উঠল, তখন উইলিয়াম প্রিন্স অফ অরেঞ্জের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্যে এই ছোট জাতি প্রবল পরাক্রান্ত স্পেনের রাজার বিরুদ্ধে প্রাণপণে কি প্রবল সংগ্রাম করেছিল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ডাচ্‌জাতি হচ্ছে প্রটেষ্টাণ্ট; তারা ক্যালভ্যানিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত। স্পেনের রাজা ছিলেন রোমান ক্যাথলিক। ধর্ম্মের নামে তাঁর সেনাপতি আল্‌ভা যে অত্যাচার করেছিল,

আমষ্টারডাম

ধানীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলুম। হলাণ্ড আয়তনে বিশেষ বড় নয়—১২,৬১৮ বর্গমাইল; তার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৭,২৯৮০৪৩ (১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে)। এই ছোট দেশ এই ছোট স্বাধীন জাতিকে পৃথিবীর সব জাতি সম্মান করে চলে। ডাচ্ জাতির ইতিহাস পড়বার জিনিষ। Motley's The Rise of the Dutch Republic যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য চিরন্তন সংগ্রামে পৃথিবীর ইতিহাসে ডাচ্ জাতির নাম অমর হয়ে আছে। হলাণ্ডের আদিম অধিবাসী জার্ম্মাণী হতে আসে। জার্ম্মান জাতির স্বাধীনতার প্রতি

তা পড়লে রক্ত গরম হয়ে ওঠে। এই অত্যাচারের ফলেই ডাচ্‌জাতি শীঘ্রই স্পেনের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা লাভ করলে।

সপ্তদশ শতাব্দী হচ্ছে হলাণ্ডের গৌরবময় ইতিহাসের কাল। এই সময় তার প্রসিদ্ধ শিল্পীরা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সময় তার বাণিজ্য সমস্ত পৃথিবীব্যাপী হয়ে উঠেছিল, তার শক্তি ও সমৃদ্ধি উপচে উঠেছিল। তার পর অন্য অন্য জাতির সঙ্গে ব্যবসায়ের পাল্লাতে তাকে অনেক হটে আসতে হয়েছে। ভারতবর্ষে, আমেরিকাতে তার প্রভুত্ব চলে গেল;

কিন্তু এখনও জাভা বোর্ণিও ও অন্যান্য উপনিবেশের বলে ডাচ্‌জাতি নগণ্য নয়।

খালের জাল দেখতে দেখতে হলাণ্ডের ইতিহাস পড়তে পড়তে আমষ্টারডামে এসে পৌছালুম। হলাণ্ডে খাল প্রায় রেললাইনের সমান দীর্ঘ। রেললাইন হচ্ছে ৩,৪৪৫ কিলোমিটার আর খাল হচ্ছে ৩,২৫০ কিলোমিটার। বাস্তবিক এই খালের গুণেই এ দেশের এত সমৃদ্ধি।

এ কথা ভাবলে অবাক লাগে যে, হলাণ্ডের অধিকাংশ ভূমি সমুদ্রের জলের উচ্চতার নিম্নে অবস্থিত। সমুদ্রের জলকে হটিয়ে, সমুদ্রের জলকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে ঠেকিয়ে, ডাচ্‌ জাতি তার নগর গ্রাম তৈরী করেছে। Dam of the Amstel বা আমষ্টেলের বাঁধ, এই নাম হতে আমষ্টারডাম নাম হয়েছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এখানে জেলেদের ছোট গ্রাম ছিল। তার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে সহর গড়ে ওঠে। সপ্তদশ শতাব্দীতেই এ নগরের শক্তি ও সম্পদ খুব বেড়ে যায়। Westphalia Treaty অনুসারে সেল্‌ড্‌ট Scheldt নদীর মুখ বন্ধ করা হয়। তাতে আণ্টওয়ার্পের বাণিজ্য পথ বন্ধ হয় ও আমষ্টারডামের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া ১৬০২ খ্রীঃ অব্দে যখন ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়, আমষ্টারডামের ধনী ব্যবসায়ীরাই তার নেতারূপে থাকেন। ইংলিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকৌশলের গুণে আজ ইংরাজ যেমন ভারত সাম্রাজ্য পাইয়াছে, তেমনি এই ডাচ্‌ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি ও দক্ষতায় ডাচ্‌ জাতি আজ জাভা ও অন্যান্য এসিয়ার উপনিবেশের মালিক। ১৬১৯ খ্রীঃ অব্দে জাভায় জাকাত্রার ধ্বংসাবশেষের ওপর বাটেভিয়াতে তার প্রধান নগর স্থাপন করে। এসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমষ্টারডামেরও ধনরত্ন লাভ হয়েছে, তাহার শক্তি ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি হয়েছে। আজ আমষ্টারডাম পৃথিবীর মধ্যে ব্যবসায়ের এক প্রধান কেন্দ্র; তার লোক-সংখ্যা সাত লক্ষের অধিক।

অ্যানাটমী-শিক্ষা—রেমব্রাণ্ট

আমষ্টারডাম সহরে নেমে মনে হল, যেন পথ ও খালের এক গোলকধাঁধাঁতে এসে পড়েছি। যেন একটা প্রকাণ্ড মাকড়সা খালের জালে সহরটি জড়িয়ে ধরেছে; সমস্ত সহর ঘিরে খালের জাল বুনেছে। ষ্টেসন থেকে বাহির হয়েই দেখি, সামনে সুন্দর খাল সোজা চলে গেছে। তার বাঁ দিক দিয়ে এক খাল বেরিয়ে গেছে, ডান দিক দিয়ে আর এক খাল

বেরিয়ে গেছে, কালো জল টলমল করছে। তার ওপর মোটর বোট, ছোট ষ্টীমার বাঁধা, ঘুমন্ত শিশুর মত স্থির। খালের ধারের পথ ধরে কিছু দূর চল্লুম সহরের দিকে। Dam নামে সহরের প্রধান জায়গায় এসে পড়লুম। গাইড বুকে লেখা আছে, এই জায়গা দিয়ে সব ট্রাম একবার ঘুরে যায়। সুতরাং সহরের কোথাও পথ হারিয়ে গেলে, ট্রামে করে Damএ এসে, তার পর নিজের হোটেলের দিশা খুঁজে নিতে পারা যায়। এইখানে রাজার প্রাসাদ ও একটি পুরাতন গির্জ্জা। সামনে প্রসিদ্ধ Kalver Straat। রাস্তাটি সরু, কিন্তু তার দুধারে দোকান ও কাফের সারি দেখে মনে

আমষ্টারডাম

হল, লণ্ডনের বণ্ড ষ্ট্রীট (Bond Street) দিয়ে বা পারিব বুলেভা দ্যো ইতালীয়ার ফুটপাথ দিয়ে চলেছি। রবিবারের সকাল, দোকান সব বন্ধ, পথে লোকজন খুব কম, শনিবারের নিশীথ-উৎসবের পর সবাই ঘুমোচ্ছে; শুধু দোকানের শো-কেসের সারি ঝলমল করছে।

আবার এক খালের ধারে এসে পড়লুম। গাইড বুক থেকে সহরের মানচিত্র দেখে মনে হ'ল, যেন মৌমাছির চাকের মত পথঘেরা বাড়ীর সারির টুকরো গোল করে সাজান; তাদের ঘিরে অর্দ্ধচন্দ্রের মত খালের রেখার পর রেখা। এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দর সহরে মুগ্ধ হয়ে খালের চক্রাবলীর মধ্যে দিশাহারা হয়ে গেলুম। সুন্দর সরু খালগুলি কখনও সোজা, কখনও এঁকে বেঁকে চলেছে,—তাতে মাল বোঝাই করা গাধাবোট বাঁধা। স্থির জল স্বচ্ছ আয়নার মত। তাতে পোলের ছায়া, গাছের সারির ছায়া, লাল হলদে বাড়ীর ছায়া পড়েছে। বিশেষতঃ যেখানে দুই রঙীন বাড়ীর সারির মধ্যে দিয়ে একটি সরু খাল চলে গেছে, সেখানে বড় সুন্দর। খালের পর খাল, পোলের পর পোল। দু'তিন মিনিট চলেই নতুন পোল। আমি যেন একটা মাকড়সার জালে পড়েছি—স্থলপথের সঙ্গে জলপথের, বাড়ীর ছাদের সঙ্গে নৌকার মাস্তুলের সারির জড়ামড়ি হয়ে গেছে। একটা ছোট গলিতে ঢুকে ভাবলুম, এবার কিছুক্ষণ শুধু মাটিতে চলা যাবে, কিন্তু একটু মোড় ফিরতেই জলের রেখা দেখা গেল, যেন সমস্ত সহর জুড়ে জল ও মাটির একটা লুকোচুরি খেলা চলেছে। সব চেয়ে সুন্দর লাগল এর পোলগুলি। এক একটি পোলের নব নব রূপ। কোনটি উটের পিঠের মত, কোনটি আধখানা চাঁদের মত, কোনটি বেড়াল যেমন করে পিঠ কুঁচকে তোলে, কোনটি বা যেন পদ্মের পাপড়ি, কোনটি একটি হাত যেন বেঁকে দুইটি তীরকে যুক্ত করেছে, কোনটি যেন আঙ্গুলের ইসারায় কোন রহস্যালোকে নিয়ে যাবে।—স্থির জলের ওপর পোলের এই বক্রতার ছায়াও

সুন্দর। হলাণ্ডের প্রধান নগর যেমন খালের জালে ঘেরা; সমস্ত হলাণ্ড তেম্‌নি খালেতে ভরা। এই খালের জাল দেশের কৃষি ও ব্যবসায়ের খুব সুবিধা করেছে বটে, তা ছাড়া আমার মনে হয় ডাচ্‌জতির মনের ওপরও খুব প্রভাব বিস্তার করেছে। খালের সঙ্গে নদীর তফাৎ এই যে, নদীর জল চঞ্চল, জোয়ার ও ভাটার টানাপোড়েনে উচ্ছ্বাস-গতিময়; কিন্তু খালের জল স্থির শান্ত। তা ছাড়া নদীর মধ্যে প্রয়োজন ছাড়া একটি অহৈতুকী আনন্দ আছে, কিন্তু খাল শুধু প্রয়োজনের জন্য কাটা। এই খালের জলের শান্তি স্থিরতা ডাচ্ জাতির মনেও আমরা দেখতে পাই। ফরাসী মন বা বাঙ্গালী মনের মত ডাচ্ মন অত ভাব-প্রবণ নয়, সহজেই উচ্ছ্বসিত বা বেদনায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে না। সে জন্য বাণিজ্যে ও আইন শাস্ত্রে ডাচ্-প্রতিভার বিশেষ বিকাশ দেখতে পাই। তা ছাড়া ডাচ্ রমণীদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্যে যে পৃথিবী-যোড়া খ্যাতি আছে, তাও এই সুপ্রচুর জল সরবরাহের গুণেই হয়েছে বলে মনে হয়।

রেমব্রান্টের বাড়ী

কিছুক্ষণ সহর ঘুরে হোটেলের ব্যবস্থার জন্য একটি ছোট হোটেলের সংলগ্ন কাফেতে ঢুকলুম। ঢুকেই প্রথম চোখে পড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা,—প্রতি টেবিল প রিষ্কার সাজান। চেয়ারগুলি ঠিক স্থানে রাখা, মাঝে বড় টেবিল, কাগজের সারি ভাঁজে ভাঁজে যোড়া, সাজান। পথের ধূলা নিয়ে সে ঘরে ঢুকতে সঙ্কোচ বোধ হল। হোটেলের অধিকারী তাঁর স্ত্রীর কাছে থেকে খবর নিয়ে জানালেন, হাঁ, ঘর পেতে পারি।

একটি ছোট সুন্দর ঘর; বিছানার চাদর, জানালার লেসের পর্দ্দা, সাদা দেওয়াল—সব ধপ ধপ, চক্‌চক্ করছে। লিখবার টেবিল, ড্রেসিং টেবিল, সব পরিষ্কার সাজান—কোথাও ধূলার একটু লেশ মাত্র নাই। মনে হল ডাচ গৃহকর্ত্রীরা পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বঙ্গ গৃহকর্ত্রীদের চেয়ে কিছু কম যান না।

হোটেল-কর্ত্রী গৃহে হাজির হলেন। মোটা, বেঁটে, মুখে হাসি-হাসি ভাব—বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। আমার সঙ্গে ঘরোয়া ভাবে আলাপ সুরু করে দিলেন। প্রথমে ঘরের দর ঠিক হল। তার পর বল্লুম, কি ব্রেক্‌ফাষ্ট দিতে পারেন? আমি কফি চাই। তিনি বল্‌লেন, যা খেতে দেব, তা খেয়ে আপনি খুসি হবেন।

কিছুক্ষণ পরে ব্রেকফাষ্ট এসে হাজির হল। এক প্রকাণ্ড ট্রেতে নানা জিনিস—সাদা ধপ ধপে লেসের জাল দিয়ে চাপা। এক ইংরাজ লেখক লিখেছেন যে, ডাচ ব্রেকফাষ্ট ইংরাজী বা ফরাসী ব্রেকফাষ্টের মতন নয়,—বোধ হয় দু'এর মাঝামাঝি। কিন্তু ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে আমি কখনও এমন সুন্দর ব্রেকফাষ্ট খাই নি। কফি, দুটি অর্দ্ধসিদ্ধ ডিম, দু'খণ্ড হ্যাম, মাখন, ৮।১০ স্লাইস টাটকা রুটি ও দু'টি বড় খণ্ড 'চিজ'। এমন সুস্বাদু টাটকা মাখন ও 'চিজ' আমি কোথাও খাই নি। ব্রেকফাষ্টের নমুনা দেখে বুঝলুম, কেন আমার হোটেল-কর্ত্রী

এখন স্থূলকায়া ও হাস্যময়ী, কেন ডাচ জাতির নরনারীদের এমন সুস্থ সবল ও একটু মোটা দেখতে। ইয়োরোপের সব দেশের মধ্যে হলাণ্ডের লোকের স্বাস্থ্য সব চেয়ে ভাল; ও তাদের মধ্যে রোগ খুব কম হয় বলে খ্যাতি। এখন ইয়োরোপের সব দেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা খুব হচ্ছে,—হলাণ্ডে এ রোগ সব চেয়ে কম। এমন টাটকা রুটি মাখন দুধ খেতে পেলে কোন রোগ হতে পারে না। হলাণ্ডের মাখন ও সুপ্রসিদ্ধ 'চিজের' ওপর ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্য দেশের লোক নির্ভর করে।

প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার মাখন, দুধ, চিজ ইত্যাদি বাহিরে রপ্তানি হয়। ১৯২৪ সালে ৬,২০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের 'চিজ' বাহিরে রপ্তানি হয়েছিল।

এলুমিনিয়াম ও পোরসিলেন বাসনগুলির দীপ্তিতে জলজল্ ঘরটি হোটেল-কর্ত্রীর হাস্যে ও গর্ব্বে উজ্জ্বল মুখখানির মত। আমি পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ প্রশংসা করে বল্লুম, আমাদের দেশের পরিষ্কার সম্বন্ধে শুচিবাইগ্রস্তা গৃহিণীদের ভাঁড়ার ঘর, রান্নাঘরকেও আপনি হারিয়েছেন। তিনি হেসে বল্লেন, দেখুন, এ হোটেল, এখানে ঘরদোর তেমন পরিষ্কার রাখা যায় না।

হলাণ্ডের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল—যখন আমি কলেজে পড়তুম। তার উইণ্ডমিল বা 'চিজ' দিয়ে নয়—তার বিখ্যাত চিত্রশিল্পীদের ছবি দিয়েই হলাণ্ড আমার তরুণ মন ভুলিয়েছিল। বিশেষতঃ রেমব্রাণ্টের (Rembrandt) আলো-অন্ধকারের রহস্যময় ছবিগুলি আমার অন্তর মুগ্ধ অভিভূত করে তুলত। সেই শিল্পীদের দেশ দেখবার জন্যেই হলাণ্ডে আসা।

Rijks Museum

ব্রেকফাষ্ট সেরে, বাহিরে যাবার পথে হোটেল-কর্ত্রীর রান্নাঘর পড়াতে, রান্নাঘর দেখতে ঢুকলুম। হোটেল-কর্ত্রী তাঁর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাজান রান্নাঘর দেখাতে বিশেষ গৌরব বোধ করলেন। দেওয়ালের সাদা টাইল ঝকঝক্ করছে, জলে ধোওয়া কাঠের মেজে কাঠের টেবিল তকতক্ করছে; বড় টেবিলের ওপর এলুমিনিয়ামের নানা বাসন কেটলি ইত্যাদি ঝকঝক্ করছে; দেওয়ালের গায়ে লাগান আলমারীতে চিনেমাটির পেয়ালা ডিস বাসনগুলি বকের সাদা পালকের মত পরিষ্কার; শুভ্র স্বপ্নের মত সাজান।

সতেরো শতাব্দীতে যখন ডাচ বণিকদের পোত ইয়োরোপ ছাড়িয়ে এসিয়া আমেরিকাতে বাণিজ্য বিস্তার করছে, ডাচ-জাতি নব নব উপনিবেশ স্থাপন করছে, সেই সময়েই হলাণ্ডে প্রসিদ্ধ ডাচ চিত্রকরেরা জন্মেছিলেন, চিত্র এঁকে গেছেন। রেমব্রাণ্টের তৈলচিত্রে যেমন দেখা যায়—অন্ধকার ছায়ালোক হতে হঠাৎ এক আলোর প্রদীপ জলে উঠেছে,

যেন কালো পাথরের বুক ভেদ করে ঝলমল ঝর্ণা-ধারা উৎসারিত হয়ে এসেছে, তেম্নি এই সতেরো শতাব্দীর হলাণ্ডে হঠাৎ কোথা থেকে আর্টের আগুন দপ্ দপ্ করে জলে উঠল। ফ্রান্স হল্‌স্‌, রেমব্রাণ্ট, জোয়াড্‌, ডু, পল পটর, ভারমেয়ার প্রমুখ প্রায় ত্রিশজন ছোটবড় চিত্রকর এই শতাব্দীতে জন্মেছিলেন। আর্টের ইতিহাসে তাঁদের নাম অমর হয়ে আছে। এঁদের আবির্ভাব যেমন আশ্চর্য্যকর, তেম্নি চমকপ্রদ। এদের আগে ডাচ্ চিত্রশিল্পের ইতিহাসে

হলাণ্ডে

কোন বড় চিত্রকরের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। উল্কাদলের মত এঁরা হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে সমস্ত ইয়োরোপীয় আর্টের আকাশ আলো করে দিয়ে গেছেন। সতেরো শতাব্দীর পর আবার হলাণ্ডে চিত্রকলার রঙ্গমঞ্চে কালো পর্দ্দা পড়ে গেল। আঠারো শতাব্দীতে কোন বড় চিত্রকরের আবির্ভাব হয় নি। উনিশ শতাব্দীতে ইজ্‌রেল (Israeles), মরিস্ (Maris) মোভে (Mauve) ও Expressionist Schoolএর ভান্ গফ (Van Gaugh) ইত্যাদি নানা চিত্রশিল্পী হলাণ্ডে জন্মেছেন বটে, কিন্তু রেমব্রাণ্ট বা ফ্রান্স হল্‌সের মত কেহ আর জন্মালেন না।

আমষ্টারডামে Rijks Museumএ এই সব ডাচ্ শিল্পীদের অনেক ভাল ভাল ছবি আছে। কিন্তু এই চিত্রশালার কথা বলার আগে রেমব্রাণ্টের একটু জীবন-কথা বলতে চাই।

১৬০৬ খৃঃ অব্দে লাইডেনে রাইন নদীর ধারে একটি বাড়ীতে রেমব্রাণ্টের জন্ম হয়। তাঁর বাবার উইণ্ড-মিল ও জমিজমা ছিল। তিনি হচ্ছেন পিতার চতুর্থ পুত্র। বাড়ীর
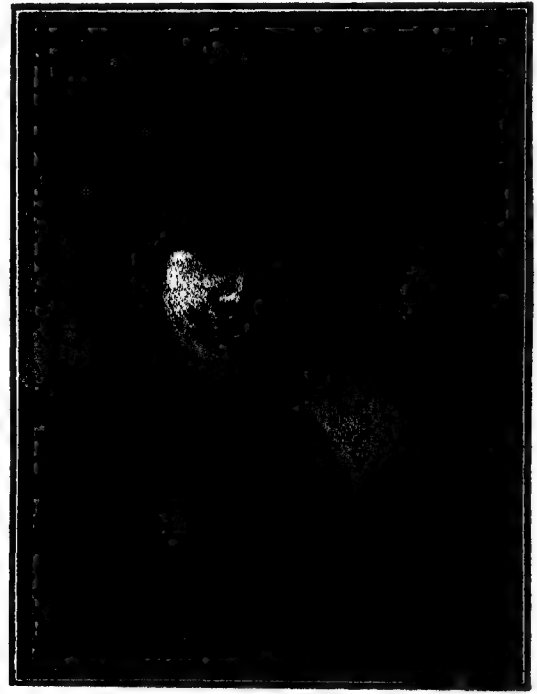
রেমব্রাণ্ট (১৬৩৪)
নিজের আঁকা তৈল-চিত্র

ছোট ছেলে বলে তাঁকে কোন লেখাপড়ার কাজে লাগান বাপ-মার ইচ্ছা ছিল। ছোটবেলা থেকেই তাঁর ছবি আঁকবার প্রতিভা বিকাশ পায়। সে সময়ের দু'জন প্রসিদ্ধ চিত্রকরের কাছে তিনি কিছু দিন আঁকতে শেখেন। তার পর নিজে বাড়ীতে বসে হাত দুরস্ত করতে লাগলেন। তখনকার সময়ের ইয়োরোপীয় আর্ট রেনেসাঁর ইতালীয় চিত্রকরদের প্রভাবে চালিত হচ্ছিল। কিন্তু হলাণ্ডের আর্টের ধারা ইতালীয়ান আর্ট থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ নিল। আর্ট চার্চ্চের অধীনে বা চার্চ্চের প্রভাবে যিশু মেরী ও সাধুদের ছবি এঁকে

বেড়ে উঠছিল। ডাচ্ শিল্পীরা কিন্তু এই চার্চ্চের প্রভাব বা অনুশাসন মানল না। প্রথমতঃ ডাচ্ জাতি Calvinist; তার পর রোমান ক্যাথলিকদের কাছ থেকে তারা এত অত্যাচার সয়েছে, যে রোমান চার্চ্চের ওপর তাদের মোটেই শ্রদ্ধা ছিল না। তারা সাধু দেবদেবীর ছবি না এঁকে মানুষের মধ্যে যে মহত্ত্ব আছে, প্রকৃতি, মানুষ, পশুর মধ্যে যে সৌন্দর্য্য, সহজ আনন্দের রূপ আছে, তাকে আর্টের মধ্যে রূপ দিলে, মানুষের সহজ সরল জীবনের লীলাকে আর্টের রাজ্যে বরণ করে নিলে। রেমব্রাণ্টের তরুণ বয়সের ছবি-গুলির মধ্যে আমরা তারি আভাস পাই। তিনি তাঁর

রেমব্রাণ্ট ও তাঁহার স্ত্রী (১৬৩৫)

বাবা, মা'র ছবি, নিজের ছবি, পথের ভিক্ষুক, গোঁড়ার ছবি, উইগুমিলের ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন।

তাঁর ছবি আঁকবার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল; আমষ্টারডামে এসে পৌঁছাল, ১৬৩১ খ্রীঃ অব্দে। তিনি তাঁর পিতৃগৃহ ছেড়ে আমষ্টারডামে এসে বাস করেন। তাঁর বাকী সমস্ত জীবন এই নগরেই কেটেছে।

তিনি এসেই সহরের মধ্যে একজন প্রধান চিত্রকর হয়ে উঠলেন। তাঁর Lesson in Anatomy বা দেহতত্ত্বের শিক্ষা (১৬৩২) ছবিখানিতে তাঁর নাম চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এ ছবিখানি এখন হেগ মিউজিয়ামে আছে। ছবির বিষয় হচ্ছে—অস্ত্রচিকিৎসক Tulp একটি শরীর কাটছেন ও তাঁকে ঘিরে আর সাতজন চিকিৎসক দেখছেন। ছবিটি খুব উঁচু দরের না হলেও পঁচিশ বৎসর বয়সের চিত্রকরের পক্ষে এরকম সুন্দর ছবি আঁকাতে যে খুব প্রতিভা আছে তা সবাই স্বীকার করলে।

এ ছবিখানি ডাক্তারদের খুব প্রিয় ছবি। অনেক ডাক্তারের বাড়ীতে বিশেষতঃ জার্ম্মান ডাক্তারদের ঘরে এ ছবির এক কপি দেখা যায়।

এর দু'বছর পরে রেমব্রাণ্ট সাসকিয়া (Saskia) নাম্নী এক সুন্দরী ফ্রিসিয়ান মেয়েকে বিবাহ করলেন। তাঁর স্ত্রী

রেমব্রাণ্ট (শেষ জীবনে)

যত দিন বেঁচে ছিলেন, তত দিন তিনিই তাঁর জীবন ও আর্টের কেন্দ্র রূপে ছিলেন। সাসকিয়াকে মডেল করে তিনি ছবির পর ছবি এঁকে গেছেন। কখনও রাণী রূপে, কখনও Bathshela রূপে, কখনও Samson এর স্ত্রী রূপে, কত বেশে কত রূপে এই সুন্দরী স্ত্রীকে এঁকে শিল্পী আনন্দ পেয়েছেন। ড্রেসডেনের চিত্রশালায় রেমব্রাণ্টের আঁকা একখানি ছবি দেখেছি—উৎসবে উচ্ছ্বসিত শিল্পী-দম্পতীর ছবি,—রেমব্রাণ্টের কোলে সাসকিয়া বসে, চিত্রকর হাস্যমুখে মদের পাত্র ধরে—যে ছবি দেখে বোঝা যায় তাঁদের বিবাহিত জীবন এম্নি উৎসবে আনন্দে কেটেছে।

বিবাহের কয়েক বছর পরে তাঁর ছোট বাড়ীতে থাকার সুবিধে হল না। তিনি একটি বড় বাড়ী কিনলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আর্টপ্রতিভার আশ্চর্য্য বিকাশ হতে লাগল। রেমব্রাণ্টের ছবির বিশেষত্ব হচ্ছে, তার আলো ও অন্ধকারের মায়া। এই আলো-ছায়ার খেলা এমন নিপুণভাবে লীলায়িত আর কোন চিত্রকরের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর প্রথম বয়সের ছবির মধ্যে আলো ও অন্ধকারের ছোপ বড় স্পষ্ট, বড় তীব্র বলে মনে হয়; কিন্তু মাঝারি বয়সের ছবিতে আলো ও ছায়ার সমাবেশ বড় সুন্দর, আশ্চর্য্যকর। পেছনের অন্ধকার ঘন কালো নয়, তা যেন আলোয় ছায়ায় ভরা, সে যেন ভোরের অন্ধকারের মত, আলোর স্পর্শে কাঁপছে—সেই অন্ধকার হতে আলোর ঝর্ণা উৎসারিত হয়ে ছবিকে সোনালী আলোয় জলজল করে তুলেছে; এ যেন প্রদীপের বুকের অন্ধকার আগুনের স্বপ্নভরা, তার মুখের জলন্ত শিখার পেছনে সে রহস্যময়ী অন্ধকার যেমন সুন্দর তেম্নি আশ্চর্য্যকর। এই আলোছায়ার লীলা—Clair obscur rembranesque হচ্ছে তাঁর ছবির বিশেষত্ব। তাঁর আগে কোন চিত্রকর এমনভাবে ছবি আঁকেনি—তাঁর পরেও কোন চিত্রকর এই আলো অন্ধকার রহস্যালোক সৃজন করে ছবিতে মানবাত্মার মূর্ত্তি আঁকতে পারল না।

আমষ্টারডামের চিত্রশালায় "Night Watch" নামে তাঁর যে জগৎবিখ্যাত তৈল ছবি আছে, তাতে তাঁর আঁকবার ধরণ বেশ বোঝা যায়। ছবিটি ১৬৪২ খ্রীঃ অব্দে অঙ্কিত।

নাইট ওয়াচ বা 'রাত্রের প্রহরী' ছবিটির ঠিক নাম নয়। কারণ ছবিটা মোটেই রাত্রের পাহারা বিষয়ে নয়। আর ছবির মধ্যে যে আলোর উজ্জ্বলতা আছে, তা দিনের আলোর দীপ্তির মত। ছবির বিষয়টা হচ্ছে, কাপ্তেন ফ্রান্স কক্ ও তাঁর বন্দুকধারী দল গিল্ড বা ক্লাবের ঘর থেকে বাহির হচ্ছে। এটা একটি গিল্ডের দলের ছবি। ছবিটি মিউজিয়ামের একটি বৃহৎ ঘরে আলাদা করে সাজান আছে। দেখলেই মনে হয়, যেন রংএর সঙ্গীত। ২৯টি সিভিক্ গার্ডকে এমনভাবে সাজান হয়েছে, তাদের মুখে তাদের সাজ-সজ্জায় এমন ভাবে বিচিত্র রংএর সমাবেশ ও ঐক্য দেওয়া হয়েছে, যে, তা দেখে অবাক হতে হয়। অনেকের মতে, এটি হচ্ছে রেমব্রাণ্টের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তৈলচিত্র। ছবির মাঝে লেফটেনাণ্টের তপ্তকাঞ্চন বর্ণের সাজ; অন্য দিকে সৈনিকের রক্তের মত রাঙা সাজসজ্জা, মাঝে কাপ্তানের কালো ভেলভেটের বেশ; অন্যান্য লোকদের স্নিগ্ধ সবুজ রং; তাদের মাঝে অন্ধকারে সহসা প্রদীপের শিখার মত একটি যুবতীর দীপ্তি—তার পর সকল রং ও কাঞ্চনবর্ণের দীপ্তি ধীরে ধীরে সন্ধ্যারাগের মত অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে—এই আলো-ছায়ার ছন্দে ছবিটি অপূর্ব্ব।

নাইট-ওয়াচ (রেমব্রাণ্ট)

কিন্তু রেমব্রাণ্ট যাদের জন্যে এ ছবিটি এঁকেছিলেন, তাঁরা ছবিটি দেখে মোটেই খুসি হন নি। বর্ত্তমান সময়ের আর্ট-সমালোচকেরা এ ছবিখানিকে পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ চিত্র বল্লেও, তাঁর সময়ের সমালোচকেরা ছবিখানির মোটেই প্রশংসা করেন নি। যে আলোছায়া-ঘন অঙ্কন-

রীতি তাঁর বিশেষ ভঙ্গী ও প্রতিভার পরিচায়ক, সেই রীতি তাঁরা মোটেই বুঝতে পারেন নি। এই ছবি আঁকার পর রেমব্রাণ্টের ছবি আঁকার রীতি যত বিশুদ্ধ ও অপূর্ব্ব হতে লাগল, তাঁর নাম ততই খারাপ হতে লাগল,—তাঁর ছবির ক্রেতা আর তেমন জুটত না।

যে বৎসর তিনি Night Watch আঁকেন সেই বৎসর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়। এর পর থেকে রেমব্রাণ্টের দুঃখের সময় আরম্ভ হল। আজ ইয়োরোপের প্রধান নগরীসমূহের চিত্রশালায় তাঁর যে সব ছবি শোভা পাচ্ছে, তার অনেক ছবি ক্রেতার অভাবে তাঁর ঘরে জমতে লাগল। তিনি ধার করতে লাগলেন, বাড়ী বাঁধা দিলেন, ঋণ-জালে জড়িত হয়ে পড়লেন। তার পর Hendrickje stoffles নাম্নী তাঁর বাড়ীর যুবতী দাসীর সঙ্গে তাঁর অবৈধ প্রণয় আরম্ভ হল। পারির লুভারে এই যুবতীর একটি অপূর্ব্ব তৈলচিত্র—রেমব্রাণ্টের আঁকা—আছে। দেখলে মনে হয়, যেন অন্ধকার সাগর মন্থর করে পূর্ণচন্দ্র উঠছে।

অবশেষে পঞ্চাশ বৎসর বয়সে তিতি দেউলিয়া হলেন। তাঁর সমস্ত জীবন-সঞ্চিত নানা শিল্পদ্রব্য, তাঁর আঁকা ছোট বড় ৬৮ খানি ছবি, সব আসবাব, জিনিসপত্র এমন কি, টেবিলের চাদর পর্য্যন্ত সব দেউলিয়ার আদালতে নীলামে বিক্রি হয়ে গেল। তাতে তাঁর ঋণের কিছু শোধ হল, আর তাঁকে বাড়ী ছেড়ে পথের ভিখারী হয়ে বেরিয়ে আসতে হল। এত ছবি জিনিস বেচে পাঁচহাজার গুইলডারও (guilders) উঠল না। আর আজ তাঁর যে-কোন ভাল ছবি লক্ষ গুইলডারে বিক্রি হতে পারে। সেদিন কাগজে পড়লুম আমেরিকাতে তাঁর একটি সাধারণ ছবি ২৭০,০০০ ডলারে বিক্রি হয়েছে।

কিন্তু এই দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা যেন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যে বৎসর তাঁর সব জিনিস নিলাম হয়, সেই বৎসরে তিনি তাঁর দু'খানি শ্রেষ্ঠ ছবি এঁকে গেছেন। তার পর তাঁর শেষ জীবনে তিনি অপমানিত, বন্ধুহীন, দীন অবস্থার মধ্যেই বহু শ্রেষ্ঠ চিত্র এঁকেছেন। তখন ক্রেতার ফরমাস অনুসারে বা সমালোচকের মন জুগিয়ে তাঁকে আঁকতে হয় নি,—তাঁর প্রতিভা মুক্তিলাভ করে পূর্ণবিকশিত হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে রেমব্রাণ্ট তাঁর নিজেরও কয়েকটি ছবি এঁকে গেছেন,—তরুণ হাস্যদীপ্ত রেমব্রাণ্ট নয়। লণ্ডনে তাঁর শেষ জীবনের একটি ছবি দেখেছি। দেখলে মনে হয়, যেন রেমব্রাণ্ট তাঁর আপন সৃষ্ট আর্টের জগতে প্রৌঢ় নৃপতির মত সোনালী বেশ পরে শান্ত, আপন আর্টের ধ্যানে সমাহিত; পৃথিবীর দুঃখ-দারিদ্র্য নিন্দা অপমান তাঁকে স্পর্শ করছে না, তাঁর জীবনের বেদনা ও ক্ষতির রাজ্যের ওপরে আর্টের চিরন্তন শান্তিলোকে তিনি মহীয়ান ভাবে বসে আছেন। এ ছবি তাঁর আত্মার ছবি।

৬৩ বৎসর বয়সে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর দেশবাসীরা তাঁকে ভুলে গেছে। অখ্যাত অজ্ঞাত ভাবে সাধারণ লোকের মত তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু আজ তিনি আর্টের অমরাবতীতে গৌরবের স্থান পেয়েছেন। পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ চিত্রকর বলে তাঁর খ্যাতি। যাঁকে এক দিন দেউলিয়ে হয়ে নিজের বাড়ী ছেড়ে পথে বাহির হতে হয়েছিল, পরে তাঁর ছবি কি রকম দামে বিক্রি হয়েছে, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে তাঁর একটি এচিং (etching) দুহাজার পাউণ্ডে বিক্রি হয়। লুভারে একটি ছোট ছবি আছে, তা প্রথমে (১৭০১) ১৮০০ পাউণ্ডে বিক্রি হয়। তার পর (১৭৬৮)
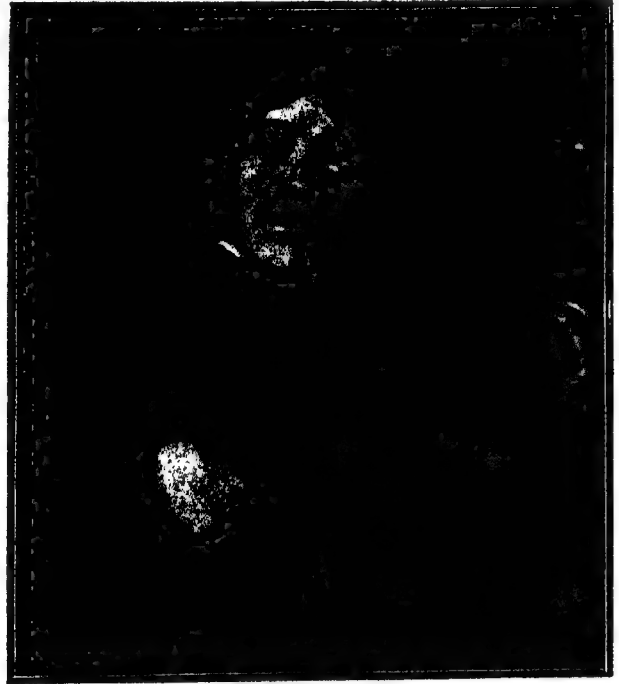
ফ্রান্স হাল্‌স

৫৪৫০ পাউণ্ডে বিক্রি হয়। তার পর (১৭৯৩) ১৭,১২০ পাউণ্ডে বিক্রি হয়। ১৮০২ সালে তাঁর একটি ছবি ১৫,০০০ ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়েছিল। সেই ছবি ১৮৮৮ সালে ৪০০,০০০ ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়। ১৯১১ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ উইণ্ডমিল্লের ছবি আমেরিকাতে ২৫০০,০০০ ফরাসী ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়। Jan Six বলে তাঁর এক ছবি ১৭৫৪তে ৬৬০ ফরাসী ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়েছিল; ১৯১২তে সেখানি ৭৭,০০০ ফরাসী ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়।

প্রার্থনা (মেস)

Rijks Museumএ ফ্রান্স হাল্‌সের কয়েকখানি ছবি আছে। তার মধ্যে The Buffoon বা ভাঁড় ছবিটি প্রসিদ্ধ। লণ্ডনে Wallace Collectionএ তাঁর The Laughing Cavalier বলে একখানি সুন্দর ছবির কথা মনে পড়ল। হালস্ ছিলেন নিখুঁত কারিগর। রেমব্রাণ্টের সঙ্গে তাঁর আঁকার ভঙ্গীর তফাৎ এই যে, রেমব্রাণ্ট যার ছবি একেছেন তার আত্মাকে আঁকতে চেয়েছেন, তাই রংএর আলোয় হয়ত শুধু মুখখানি জলজল করে, তার বেশভূষা তার অঙ্গ শরীরের অংশ অন্ধকারে মিলিয়ে দিয়েছেন। এক ইংরাজ আর্ট সমালোচক রেমব্রাণ্ট সম্বন্ধে লিখেছেন—For Rembrandt the one means of expression was light, light as it gleams in a place of darkness flashing here on some significant face or momentary glimpse of white linen, glittering on a jewel or a sword hilt, and reflected even mere dimly from a wall or the folds of a dress, till it becomes indistinguishable from shadow and merges in the all pervading gloom. It enables the painter to focus, as no other formula of oil-painting has succeeded in doing the spectator's attention on the significant features of the design and to suppress the forms and details that are unessential.

কিন্তু হাল্‌সের কাছে কিছুই অদরকারী নয়। শুধু মুখ নয়, হাতের ভঙ্গী, দেহের সাজের নিখুঁত লেসের কাজ, যে লোকটির ছবি আঁকছেন তার সব নিপুণ ভাবে তাঁর আঁকা চাই। রেমব্রাণ্টের মত তাঁর অন্তর্দৃষ্টি না থাকলেও মানুষের মুখ ও সাজসজ্জা আঁকতে বিশেষতঃ ভবঘুরে দলের লোক আঁকতে তিনি ওস্তাদ।

ফ্রান্স হাল্‌সের জীবনও বড় সুখের ছিল না। রেমব্রাণ্টের মত তিনিও ঋণজালে জড়িত হয়ে দেউলিয়ে হয়েছিলেন—তাঁরও ছবি সব নীলামে বিক্রি হয়েছিল। শেষ জীবনে তিনি এত গরীব হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর ঘরভাড়া মিউনিসিপ্যালিটি হতে দিত। শেষে তাঁর নগরবাসী তাঁর এক মাসহারার ব্যবস্থা করে দেন।

মিউজিয়ামের সব ছবি ও চিত্রকরের কথা লেখা সম্ভব নয়। আর একখানি ছবির কথা বলব। সেখানি হচ্ছে নিকোলাস মেসের (Nicolas Maes) 'Prayer' প্রার্থনা। তিনি প্রথমে রেমব্রাণ্টের ষ্টুডিওতে কাজ করেছিলেন ও

রেমব্রাণ্টের ধরণে ছবি আঁকতে চেষ্টা করতেন। তাঁর ছবির বিষয় প্রায়ই ঘরোয়া। প্রার্থনা ছবিখানি আমাদের সহজেই মুগ্ধ করে। কোন কৃষক-গৃহিণী খাবারের আগে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করছেন, দেওয়ালে চাবি ঝুলছে, টেবিলে সুপ, রুটি, ছুরি ইত্যাদি রয়েছে, গৃহিণীর মুখ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় ভরা।

মিউজিয়ামের পর আমষ্টারডামে দেখবার জিনিস হচ্ছে—ইহুদি-পাড়া। জু-পাড়া সহরের খুব পুরাতন অংশ। এখানে পুরাতন সময়ের আঁকাবাঁকা রাস্তা দেখা যায়। ষোল ও সতেরো শতাব্দীতে ইয়োরোপের নানা স্থান থেকে অনেক জু নির্য্যাতিত হয়ে এই নগরে আশ্রয় নিয়েছিল, আর জু'রা আমষ্টারডামের বাণিজ্যের সমৃদ্ধির এক প্রধান কারণ।

এই জু-পাড়াতে বিখ্যাত দার্শনিক স্পিনোজা (Spinoza) জন্মেছিলেন। এই পাড়ার মধ্যে জোডেন ব্রে ষ্টাটেতে রেমব্রাণ্টের বাড়ী আছে। একদিন দেউলিয়ে হয়ে তাঁকে যে বাড়ী ছেড়ে বাহির হয়ে আসতে হয়েছিল, আজ সেই বাড়ী তাঁর দেশবাসী তাঁর স্মৃতিচিহ্ন রূপে তাঁর ছবির মিউজিয়াম করে রেখেছে। বাড়ীর সামনেটা বেশ সুন্দর দেখতে—লাল ইট ও সাদাপাথরের মধ্যে জানলাগুলি বসান। বাড়ীর তেতোলার ঘরে ঢুকে মন দুলে উঠল। তেতোলায় রেমব্রাণ্টের ছবি আঁকার ঘর ছিল। এই খানে তিনি কত প্রসিদ্ধ ছবি এঁকেছেন। মেস প্রমুখ তাঁর শিষ্যরা এইখানে ছবি আঁকতেন। জু-পাড়ার মধ্যে ঘুরলে রেমব্রাণ্টের ছবির মত মুখ খুঁজে পাওয়া যায়। বৃদ্ধ জু, জু-কনে ইত্যাদি তাঁর অনেক ছবির জীবন্ত মূর্ত্তি এই আঁকাবাঁকা পুরাতন পাড়ার মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যায় মনে হল।

সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরে এলুম। আমার ঘরের জানলা থেকে সহরের বড় সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। হোটেলের সামনে একটি খাল চাঁদের মত বেঁকে গেছে। খালের ওধারে লাল বাড়ীর সারি উঠেছে—সন্ধ্যার অন্ধকারে ছবির মত দেখাচ্ছে। খালের বেঁকের মাঝ দিয়ে আর একটি খাল জু-পাড়ার দিকে সোজা চলে গেছে। দূরে জুদের সিনাগগের চূড়া দেখা যাচ্ছে। স্বচ্ছ অন্ধকারে খালের ধারের নৌকা ষ্টিমার গাধাবোটের সারি বড় রহস্যময় দেখাল। সামনের সূচাল-মুখ নৌকাটা দেখাচ্ছে যেন একটা হাঙ্গর চুপ করে শুয়ে আছে, তার পাশের ষ্টিমারটা মনে হচ্ছে যেন এক প্রকাণ্ড পরী তার কালো ডানা মুড়ে অন্ধকারে ঘুমোচ্ছে; ঠোঁটের মত তার চিমনীটা জেগে আছে। তার পাশের গাধাবোটের ওপর পিপের সারি—মনে হচ্ছে যেন আলিবাবার দস্যু-দল-ভরা পিপের সারি। এই বস্তা বাক্স পিপে ভরা গাধাবোটের সারি দেখে বুঝলুম পৃথিবীর মধ্যে হলাণ্ডের শক্তি ও সম্মান তার চিত্রকরদের জন্য নয়, তার বণিকদের জন্য। এই পিপেগুলি কোন্ বিদেশে গিয়ে কত ধনরত্ন লুট করে নিয়ে আসবে তা কে জানে। রেমব্রাণ্টের ছবি দেখে যতই মুগ্ধ হই না কেন, কিন্তু শ্রান্ত অবসন্ন ঘুমন্ত ভারবাহী গর্দ্দভদের মত ওই যে মাল-ভরা গাধাবোটগুলি রয়েছে, এই বাণিজ্য-প্রধান ধনিক সভ্যতার যুগে ওই গাধাবোটগুলির মধ্যেই জাতির শক্তি ও সম্পদ রয়েছে। হলাণ্ডের এক বছরের বাণিজ্যের হিসাব দেখলেই তা বোঝা যায়।

কিন্তু সে সন্ধ্যায় মায়াময় অন্ধকারে এ সব কথা ভাবতে ভাল লাগল না। নৌকা ষ্টিমারগুলিকে মনে হতে লাগল যেন রূপকথায় বেঙ্গমাবেঙ্গমীরা ঘুমোচ্ছে, তারা কত কাল ঘুরবে, কত নদী কত দেশ দেখবে, তা কে জানে।

সত্যের আলো

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যার কণ্ঠে ঢালি' বিষ
বলেছিনু ;—কর বন্ধু মকরন্দ পান।
মরণের আলিঙ্গন মাঝে
ফোটা হাসি তার গেছে দিয়ে প্রতিদান!

সে হাসির মাঝে ছিল যেন
অশনির অগ্নি দিয়ে অতি স্পষ্ট লেখা,-
সখে, তারে ধরেছি গো আজ,
শত আরাধনে কভু দেয়নি যে দেখা!

খোকার টাটি

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কিরণ-বাবু মৃত্যুর সময় রামযাদুর হাতে দু হাজার টাকা ও একটি বাক্‌সর চাবি দিয়ে তাকে বলেছিলেন—ঐ কাঠের বাক্‌সর ভিতর আমার জীবনের পঁচিশ বৎসরের পরিশ্রম সঞ্চিত আছে। তিনখানা বই আমি লিখছিলাম, প্রায় শেষ করা হয়েছে; ঐ তিনখানা তুমি ছাপিয়ে প্রকাশ কোরো। ছাপ্‌বার খরচ দু হাজার টাকা তোমার হাতে দিলাম; অত খরচ হয়তো লাগবে না—যা বাঁচবে তা তোমার; আর বই বিক্রীর যা আয় হবে তাও তোমার। আমার এই শেষ অনুরোধটি তুমি রক্ষা কোরো, আমি পরলোক থেকে দেখে সুখী হবো।

রামযাদু সেই দু হাজার টাকা হাতে পেয়ে কতকগুলো বাজে লেখা ছাপিয়ে অপব্যয় করা আবশ্যক মনে করে নি। কিরণ-বাবুর লেখা বই তিনখানির রাশীকৃত খাতা কাঠের বাক্‌সের মধ্যেই বন্ধ হয়ে প'ড়ে ছিলো, এবং কিরণ-বাবুর দেওয়া দু হাজার টাকা রামযাদুর ও তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার নামের সেভিংস-ব্যাঙ্কের খাতায় চারিয়ে জমা হয়ে গিয়েছিলো। এই পুঁজির ভরসাতেই সে কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হয়ে চাকরীর সন্ধান করছিলো।

কিরণ-বাবুর বই তিনখানার কথা রামযাদু এক রকম ভুলেই গিয়েছিলো। আজ পরাণ-বাবুর মুখে সাধারণ চাকরীর উমেদারদের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ও বিদ্যানুসন্ধিৎসুদের সাহায্য করতে স্বীকারোক্তি শুন্‌বা মাত্রই রামযাদুর স্বার্থবুদ্ধি তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে সেই অবহেলিত কাঠের সিন্দুকটার কথা; এতোদিন সে যে খাতার রাশিকে অকেজো আবর্জ্জনা মনে করে' এসেছে, আজ তার সেগুলিকে টাকা-ধরা বড়শীর টোপ বলে' মনে হলো, আলাদীনের প্রদীপের মতন সেগুলির অসাধ্যসাধনের শক্তি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। সে তৎক্ষণাৎ স্থির করে' ফেললে পরাণ-বাবুকে তাঁর নিজের কথার জালে বদ্ধ করে' কিরণ-বাবুর লেখা খাতাগুলিকে অস্ত্র করে' তাঁকে বধ করতে হবে। একবার তার মনে একটু ভয় হয়েছিলো যে কিরণ-বাবুর লেখার মধ্যে বাস্তবিক কোনো গুণপণা আছে কি না; সে তো শুধু বই তিনখানার নাম ও সূচীপত্র মাত্র প'ড়েছিলো; কোন্ বই কেমন লেখা হয়েছে যাচাই করে' দেখ্‌বার আগ্রহ তার তো একদিনও হয়নি—কারণ যেখানে অর্থলাভের সম্ভাবনা নেই সে জিনিস যে তার কাছে নিতান্তই বাজে। এই সব খাতার স্তূপ যদি বাস্তবিকই বাজে বকুনিতে ভরা থাকে তবে সেগুলি পরাণ-বাবুকে দেখিয়ে সে কি শেষকালে অপ্রস্তুত হয়ে যাবে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হতে লাগলো যে কিরণ-বাবুর মতন একজন শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক যে বিষয়ে পঁচিশ বৎসর পরিশ্রম করেছে তা কি একেবারেই খেলো হবে?

এইরূপ সাত-পাঁচ ভাব্‌তে ভাব্‌তে রামযাদু তার বন্ধুর মেসে ফিরে গেলো। তার পর প্রফুল্ল মনে খাওয়া-দাওয়া করে' বললে মার অসুখের কথা শুনে মনটা চঞ্চল হয়ে আছে; যদিও দেশের লোকটি বল্‌লে যে মা ভালো আছেন, তবু মন স্থির হচ্ছে না; যাই একবার মাকে দেখেই আসি।

মেসের লোকে তার মাতৃবৎসলতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো। রামযাদু দেশে যাত্রা কর্‌লে।

রামযাদু প্রথম প্রাপ্তব্য ট্রেণে যশোরে পৌঁছেই কিরণ-বাবুর বইএর সিন্দুকটা খুলে বস্‌লো। সেই সব খাতার মধ্যে মৌলিক গবেষণা আছে কি না খোঁজার চেয়ে, কোথাও কিরণ-বাবুর নাম গন্ধ পরিচয় আছে কি না তাই তন্ন তন্ন করে' খুঁজ্‌তে লেগে গেলো। অতি সাবধানে কিরণ-বাবুর নাম বা পরিচয় খুঁজে খুঁজে সেই জায়গাটার কাগজ ছিঁড়ে ফেল্‌বার উপায় থাক্‌লে ছিঁড়ে ফেল্‌তে লাগলো, নয়তো কালী দিয়ে তার উপরে এমন ঘন প্রলেপ দিতে লাগ্‌লো যে তার ভিতর থেকে কিরণ-বাবুর নাম যেনো উঁকি মার্‌তেও না পারে।

সমস্ত রাত জেগে এই চুরির আয়োজন সম্পূর্ণ করে' পরদিন সে সিন্দুকটি নিয়ে কলিকাতা রওনা হলো; পরাণ-বাবুর জন্যে এক ভাঁড় ভালো গাওয়া-ঘি ও একটা প্রকাণ্ড মানকচু সংগ্রহ করে' নিতেও তার ভুল হলো না।

কল্‌কাতায় এসে সে একেবারে' বরাবর পরাণ-বাবুর বাড়ীতে এসে উপস্থিত। গাড়ীর ছাদ থেকে নাম্‌লো বইভরা সিন্দুক ও মানকচু এবং গাড়ীর জঠর থেকে বেরুলো ঘিয়ের ভাঁড় ও জীর্ণ ছাতা হাতে শীর্ণ রামযাদু।

রামযাদু ব-মাল পরাণ-বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হতেই পরাণ-বাবুর ছোটো ছোটো চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌লো ও ঝাঁপালো গোঁপটা আনন্দে ভয়-পাওয়া বিড়ালের মতন ফুলে উঠ্‌লো। পরাণ-বাবু বল্‌লেন—প্রণাম হই মুখুজ্জে মশায়! অনেক রকম সুস্বাদু সামগ্রী এনেছেন যে! ওরে রামা, গাড়ীর ভাড়া দিয়ে দিস্‌।

রামযাদু পকেট থেকে মনিব্যাগ বাহির করে বল্‌লে—গাড়ীর ভাড়া আমি দিচ্ছি।

পরাণ-বাবু হেসে বল্‌লেন—আমার বাড়ীতে এসে আপনি গাড়ীভাড়া দেবেন কি? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসুন তো।

রামযাদুকে পয়সা খরচ না করা সম্বন্ধে দুবার অনুরোধ কর্‌তে হয় না। সে মনিব্যাগটি যথাস্থানে পুনঃ স্থাপিত করে' চেয়ারে গিয়ে বস্‌লো এবং সে শুন্‌তে পেলে গাড়ীখানা দরজার কাছ থেকে চলে' গেলো—তা হলে গাড়োয়ান ভাড়া ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে।

রামযাদু ব'স্‌লে পর পরাণ-বাবু বল্‌লেন—ঐ সিন্দুকে আপনার বই আছে বুঝি?

রামযাদু ঘাড় নেড়ে সায় দিলে দেখে পরাণ-বাবু আবার প্রশ্ন কর্‌লেন—ঐ ভাঁড়ে কি?

রামযাদু একটু সম্ভ্রমকুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লে—আপনার জন্যে একটু খাঁটি গাওয়া-ঘি এনেছি।

পরাণ-বাবু উৎফুল্ল হয়ে বলে' উঠ্‌লেন—চমৎকার! আমি মশায় একবার নড়ালে গিয়েছিলাম; সে যে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধ আর স্বাদ এখনো যেনো আমার নাকে আর জিভে লেগে আছে! কল্‌কাতায় এমন জিনিস পাবার জো নেই—মাখনে পর্য্যন্ত ভেজাল দেয় মশায়! মাখন-গালানো ঘি খেয়ে অম্বলে গলা জ্বলে' সারা হতে হয়।... ওরে পচা!

পরাণ-বাবুর বজ্রনিনাদের উত্তরে নীচের তলা থেকে জবাব এলো—এজ্ঞে যাই!

শব্দ এসে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গেই পচা অভিধের ভৃত্য ছুটে এসে হাজির হলো এবং ছুটে আসার জন্য দ্রুত নিশ্বাস চেপে স্বাভাবিক নিশ্বাস নেবার চেষ্টা কর্‌তে লাগলো।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—এই ঘি আর কচু বাড়ীর ভিতর নিয়ে যা—ঘিটা ভালো করে' রাখতে বল্‌বি—খাঁটি গাওয়া-ঘি!—যশোরের!—বুঝ্‌লি?

পচা নত হয়ে ভাঁড় ও কচু তুল্‌তে তুল্‌তে বল্‌লে—এজ্ঞে।

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আর বোঁচাকে বল্‌ ঐ সিন্দুকটা পাশের ঘরে তুলে রেখে দেবে।—বুঝ্‌লি?

পচা ভাঁড় ও কচু নিয়ে চলে' যেতে যেতে বলে' গেলো—এজ্ঞে।

এবার পরাণ-বাবু রামযাদুর দিকে ফিরে বল্‌লেন—বল্‌তে তো পারিনে মুখুজ্জে মশায়, বেলা হয়েছে, যদি এখানেই স্নান কর্‌তেন.....

রামযাদু অমনি তৎক্ষণাৎ অম্লান মুখে মিথ্যা কথা বল্‌লে—বই লেখবার তথ্য সংগ্রহ কর্‌বার জন্যে বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে যে ম্যালেরিয়া ধরেছে, তাতে চান্‌ কর্‌লেই আমার জ্বর হয়! তাই আজ বারো বচ্ছর আমি চান্‌ করিনি।

পরাণ-বাবু বিস্ময় ও প্রশংসা-ভরা স্বরে বল্‌লেন—বারো বচ্ছর চান করেন নি! আপনার অসাধারণ অধ্যবসায় ও বিদ্যানুরাগ! এমন একনিষ্ঠ বাণীসেবক আমি কখনো দেখিনি!... তা হলে মুখুজ্জে মশায়, নতুন কাপড় ও গামছা আছে, দয়া করে' পা হাত ধুতে কি কোনো আপত্তি...

রামযাদু বল্‌লে—আপত্তি আর কি? ইতিহাসের সন্ধানে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এমন এক এক গাঁয়ে গিয়ে পড়েছি যে সেখানে নমঃশূদ্র কি মুসলমান ছাড়া আর কোনো জাত নেই। তাদের গোয়ালঘরে রান্না করে' খেতে হয়েছে, কি করি বলুন!

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—তা হলে গা তুলুন। ওরে পচা, মুখুজ্জে মশায়কে চানের ঘরে নিয়ে যা।

* * *

রামযাদু পরাণ-বাবুর নিত্য-অতিথি ও প্রতিপাল্য হয়ে উঠেছে। পরাণ-বাবুর খরচে কিরণ-বাবুর লেখা বইগুলি রামযাদুর নামে প্রকাশ হওয়াতে দেশময় রাম-যাদুর খ্যাতি ও নাম ছড়িয়ে পড়েছে। দেশের সাহিত্যিক মহলে রাম-যাদুর অসাধারণ খাতির ও প্রতিপত্তি; রামযাদুকে বহু সভা-সমিতি থেকে সম্বর্দ্ধনা কর্‌বার ও অভিনন্দন দেবার

ধুম পড়ে' গেছে। রামযাদু যে সাহিত্য-সাধনার তপস্যায় আপনার স্বাস্থ্যকে বলি দিয়েছে এই সংবাদটি যখন সে নিজে ও পরাণ-বাবুকে দিয়ে দেশময় বেশ করে' প্রচার ও রাষ্ট্র করে' দিলে, তখন দেশময় সহানুভূতিপূর্ণ প্রশংসার বান ডাকতে লাগলো; খবরের কাগজে রামযাদুর বইএর সমালোচনা উপলক্ষ্য করে' নিছক প্রশংসা ও জয়জয়কার বিঘোষিত হতে লাগলো; রামযাদু যে লক্ষ্মণের মতন চৌদ্দ বৎসর অনাহারে অনিদ্রায় বনে বনে বেড়িয়ে দেবী সরস্বতীর সাধনা করেছে এই সংবাদেই লোকের মন এমন অভিভূত হয়ে উঠেছিলো যে কেউ আর তার নামে প্রচারিত রচনাগুলির প্রকৃত সমালোচনা কর্বার অবসরই পাচ্ছিলো না। কলিকাতার বিশিষ্ট সমাজে রামযাদুর প্রতিষ্ঠা এমন হঠাৎ কায়েমী হয়ে গেলো যে রামযাদু নিজের বুদ্ধির প্রখরতা সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সেই বুদ্ধিরও এই রকম অপ্রত্যাশিত সাফল্য দেখে আশ্চর্য্য হয়ে উঠলো। কলিকাতার বড়ো বড়ো ডাক্তার কবিরাজ বিনা পয়সায় রামযাদুকে চিকিৎসা করে' সুস্থ কর্বার আগ্রহ প্রকাশ কর্তে লাগলেন; বড়ো বড়ো কবিরাজেরা দামী দামী ঔষধ বিনামূল্যে রামযাদুর বাড়ীতে নিজেরা বয়ে নিয়ে এসে দিয়ে যান; রামযাদুর মেসের ঘর কবিরাজী ঔষধালয় হয়ে ওঠ্বার উপক্রম কর্তে লাগলো। এতো ঔষধ রামযাদু অকারণে খেতে মাথ্তেও পারে না; ঘরে জমিয়ে রাখ্তেও পারে না; কবিরাজেরা প্রায়ই অনাহূত এসে উপস্থিত হন এবং তাঁরা যদি দেখেন যে রামযাদু কোনো ঔষধই সেবন করে নি তবে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হবেন এবং তার বুজরুকিও ফাঁস হয়ে যাবে; পয়সার জিনিস প্রাণ ধরে' সে ফেলে দিতেও পারে না, সে বরং বিনা অসুখে ঔষধ সেবন করে' অসুখে ভুগ্তে—এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্তে প্রস্তুত আছে, তবু সে প্রাণ ধরে' পয়সার জিনিস ফেলে দিতে পার্বে না! হঠাৎ রামযাদুর মনে হলো এই সব ঔষধ বেচেও তো দু পয়সা উপার্জ্জন করে' নিতে পারা যায়! মনে সঙ্কল্প উদয় হবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া রামযাদুর স্বভাব। সে ঔষধ বেচবার সন্ধানে নির্গত হলো। ভিন্ন পাড়ায় এক ছোট্ট ঘরের সাম্নে এক কবিরাজের কদর্য্য সাইনবোর্ড টাঙানো দেখে রামযাদু বুঝলে এই কবিরাজটি হাতুড়ে যদিও বা না হয় তো বড়ো গরীব, ছোটো এঁদোপড়া ঘরে তার আস্তানা, আর তার এমন সঙ্গতি নেই যে একখানা সুশ্রী সাইনবোর্ড লাগায়; তাকে দিয়েই নিজের কার্য্যসিদ্ধি হবে মনে করে' রামযাদু সেই কবিরাজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কবিরাজ আগন্তুককে দেখেই গম্ভীর হয়ে খাড়া হয়ে বস্লো, বেচারা হয়তো মনে কর্লে যে সেদিন তার সুপ্রভাত! তার ভাগ্যে একজন রোগী পাওয়া গেছে তা হলে! রামযাদুর চেহারা একেই শীর্ণ ম্লান, তাতে আবার সে নিজেকে রুগ্ন প্রতিপন্ন কর্বার জন্য স্নান করা ছেড়ে দিয়েছে; এই অবস্থায় তাকে রোগী মনে করাতে কবিরাজের দুরাশাকে কিছুমাত্র দোষী করা যায় না। কবিরাজের ঘরে একজন লোক বসে' ছিলো; কবিরাজ তাকে সম্বোধন করে' বলে' উঠ্লো—"আপনি তিন দিন ওষুধ খেয়েই যখন ভালো বোধ কর্ছেন, তখন ঐ ওষুধেই আপনার ব্যাধি আরোগ্য হবে; পুরাতন ব্যাধি কিনা, দীর্ঘকাল ওষুধ সেবন না কর্লে তো নির্ম্মূল হয়ে যাবে না।" তার পর রামযাদুর দিকে ফিরে বল্লে—"আসুন, বসুন। আমি এঁকে দেখে নিয়ে, আপনাকে দেখ্ছি।" তার পর আবার ঘরের অপর লোকটির দিকে ফিরে কবিরাজ বল্লে—"বৈকালের ঔষধটার অনুপানটা একটু বদ্লে দেবো। আচ্ছা আপনি বসুন··" বলে' রামযাদুকে দেখিয়ে বল্লে—"বাবুকে বড় কাতর কাহিল দেখ্ছি; আগে ওনাকে দেখে লই··" এবং অমনি রামযাদুর দিকে ফিরে বল্লে—"বাবুর ব্যাধিটি কি? একবার হাতটা দেখি·"

রামযাদু কবিরাজের রকম দেখে মনে মনে হেসে কবিরাজের প্রসারিত হাতে নিজের হাত সমর্পণ না করে' বল্লে—"এঁকে দেখে নিন। তার পর আমার কথা বল্বো—আমার একটু গোপনে···"

কবিরাজ উৎসাহিত হয়ে বলে' উঠ্ল—ও! আপনার গোপনীয় ব্যাধি হয়েছে! তার জন্যে কিছু চিন্তা কর্বেন না, ঐ ব্যাধির ধন্বন্তরি ঔষধ আমার কাছে আছে···আমার পিতামহের স্বপ্নলব্ধ···

রামযাদু মনে মনে কৌতুক ও বিরক্তি উভয়ই অনুভব করে' মনে মনে বল্লে—"দূর বেটা গোবদ্যি!" তার পর প্রকাশ্যে বল্লে—না মশায়, আমার কোনো ব্যাধি নেই। আমি অন্য একটি গোপন কথা আপনাকে বল্তে এসেছি···

রামযাদুর এই কথা শুনে কবিরাজের দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠ্লো; অপরিচিত লোক কবিরাজের

কাছে চিকিৎসার কথা ছাড়া আর কি গোপনীয় কথা বল্‌তে পারে তা ঠিক কর্‌তে না পেরে কবিরাজ ঘরের অপর লোকটিকে বল্‌লে—আচ্ছা হরিচরণ, তুমি এখন যাও, তোমাকে অন্য সময় ব্যবস্থা ক'রে দেবো ··

হরিচরণকে কবিরাজ আগে আপনি বলে' সম্বোধন কর্‌ছিলো, এখন তাকে সে তুমি বল্‌লে, ধূর্ত্ত রামযাদুর লক্ষ্য থেকে এই বিসদৃশ ব্যবহার এড়ালো না; রামযাদু মনে মনে হেসে বল্‌লে—বেটা ধড়িবাজ! বাড়ীর লোককে রোগী বানিয়ে পসার জমাবার জোচ্চুরি! আমার কাছে বেটার ধাপ্পাবাজী!

রামযাদু আড়চোখে চেয়ে দেখ্‌লে হরিচরণ কবিরাজের দিকে চেয়ে অর্থপূর্ণ ভাবে ঈষৎ হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

হরিচরণ চলে' যেতেই কবিরাজ কৌতূহলী স্বরে বলে' উঠলো—আপনার কি কথা?

রামযাদু কণ্ঠস্বর নামিয়ে বল্‌লে—কিছু ওষুধ কিন্‌বেন?

কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলে—চোরাই মাল নাকি?

রামযাদু মনে মনে কবিরাজকে শক্ত রকম একটা গালাগালি দিয়ে প্রকাশ্যে বল্‌লে—না। একজন রোগীর জন্যে আনা হয়েছিলো, এখন আর দরকার নেই।

কবিরাজ জিজ্ঞাসা করলে—রোগীর মৃত্যু হয়েছে বুঝি?

রামযাদু মনে মনে বল্‌লে—"তোর মৃত্যু হোক দগ্ধানন!" প্রকাশ্যে বল্‌লে—না, মৃত্যু হয় নি; এখন আর সে-সব ওষুধের দরকার নেই। আপনি কিন্‌বেন কি না তাই বলুন।

কবিরাজ বল্‌লে—আরে মশায়, চটেন কেনো? কার ওষুধ, কি ওষুধ, কোন্ কবিরাজের প্রস্তুত, না জান্‌লে কিনি কেমন করে'?

রামযাদু বল্‌লে—ওষুধ আমার, সহরের সেরা কবিরাজের তৈরী, এই ওষুধের ফর্দ্দ—

রামযাদু ঔষধের তালিকা পকেট থেকে বাহির করে' কবিরাজের সাম্‌নে ফেলে দিলে—কবিরাজ পড়তে লাগল—বসন্তকুসুমাকর দুই সপ্তাহ, চ্যবনপ্রাস চার সপ্তাহ, মকরধ্বজ চার সপ্তাহ·· এগুলি কি?···ব্যবস্থাপত্র!···সহরের ধন্বন্তরিকল্প কবিরাজদের!···চোরাইমাল নয় তা হলে!·· আমি কিন্‌তে পারি ··কতো দিতে হবে?

রামযাদু বল্‌লে—অর্দ্ধমূল্য।

কবিরাজ ফর্দ্দ ফেরত দিয়ে বল্‌লে—পার্‌বো না, মাপ কর্‌বেন। কম-সম করে' দিলে কিন্‌তে পারি।

রামযাদু মনে মনে একটু ভেবে বল্‌লে—শাস্ত্রে বলেছে সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ! অর্দ্ধের বেশী ত্যাগ করা তো শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর কমাতে আমি পার্‌ব না। বসুন তবে··· ··

দাঁও ফেঁসে যায় দেখে কবিরাজ ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্‌ল—আরে মশায়, যান কেনো, একটু বসুন না। ক্রয়-বিক্রয় কি এক কথায় হয়, কথায় বলে—

শও কথায় সওদা,
আর শতেক ঠাসায় ময়দা;
শতেক চাষে মূলো ···

রামযাদু ব্যস্ত হয়ে বলে' উঠ্‌লো—আপনার শ্লোক আবৃত্তি রেখে ওষুধ নিতে হয় তো নিয়ে ফেলুন, আমার ঢের কাজ আছে।

কবিরাজ মনে মনে বল্‌লে—"আচ্ছা ব্যস্তবাগীশ তো! দুনিয়ায় সবাই ব্যস্ত, কেবল আমিই দেখি বেকার!" তার পর প্রকাশ্যে বল্‌লে—আচ্ছা আপনার কথাও থাক, আমার কথাও থাক—সিকিমূল্য হলেই ঠিক হতো, তা আপনি যখন বেশী কমাতে নারাজ তখন তেহাই দামে দিয়ে দিন ·

রামযাদু যথালাভ মনে করে' বল্‌লে—আচ্ছা, এই আমাদের প্রথম কারবারের বউনি বলে' আপনাকে কম মূল্যে দিচ্ছি; কিন্তু এর পরে অর্দ্ধমূল্য দিতে হবে।

ভবিষ্যতেও এই রকম উৎকৃষ্ট ঔষধ অল্পমূল্যে পাবার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে কবিরাজ বল্‌লে—আপনি অনুগ্রহ করে' এলে সে বিষয় বিবেচনা করে' দেখা যাবে। আপনারা?

রামযাদু বল্‌লে—ব্রাহ্মণ।

কবিরাজ হাতজোড় করে' মাথা নুইয়ে প্রণাম করে' বল্‌লে—মধ্যে মধ্যে পায়ের ধূলো দিয়ে কৃতার্থ করবেন। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বড় সুখী হলাম।

রামযাদু কুকুরের মতন দাঁত বার করে' হেসে বল্‌লে—সে উভয়তঃই।

রামযাদুর এ একটা নূতন উপার্জ্জনের পথ হলো; সে

এখন আরো বেশী ক'রে শহরের বড়ো বড়ো কবিরাজের কাছেই নিজের স্বাস্থ্যহানির কাঁদুনি গেয়ে ঔষধ আদায় করে আর সেই কবিরাজকে বেচে আসে।

এক দিন কবিরাজের কাছে ঔষধ বেচে ফিরে আসতে আসতে রামযাদুর মনে হলো—মানুষের শরীর এই আছে এই নেই। পরাণ-বাবু যে-রকম মোটা, আর তাঁর বয়সও তো কম হয় নি, তাতে তাঁর জীবনের ভরসা আর কতো দিন। বেটা কেওট বেঁচে থাকতে থাকতে আমার একটা কায়েমী ছিল্লে বাগিয়ে নিতে হবে।

রামযাদুর চিন্তাকে কর্ম্মে পরিণত করতে কখনো কাল-বিলম্ব হয় না। সে কবিরাজের বাড়ী থেকে নিজের বাসায় ফিরে না গিয়ে বরাবর পরাণ-বাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলো।

তাকে আসতে দেখেই পরাণ-বাবু বলে' উঠলেন—এই যে মুখুজ্জে মশায়, প্রণাম হই। টাইম্‌স্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্টে আপনার বইএর কী রকম প্রশংসা বেরিয়েছে দেখেছেন ?

রামযাদু উৎফুল্ল মুখে বল্‌লে—না ··

"এই দেখুন" বলে' পরাণ-বাবু কাগজখানা রামযাদুর সামনে এগিয়ে দিলেন।

রামযাদু কাগজখানা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে বল্‌লে—আমি এণ্ড্রুসন, বেভারিজ, পার্জিটার, গ্রিয়ার্‌সন আর য়াকোবির চিঠি পেয়েছি—তাঁরা সবাই তো দয়া করে' ভালোই বলেছেন। য়াকোবি বার্লিন টাগেব্লাট্ আর ট্সাইটুং থেকে দুটো সমালোচনার কাটিং পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি তো জার্ম্মান জানি না······

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনি আমাকে সে দুটো দেবেন, আমি আমাদের আপিসের সাহেবদের দিয়ে······

রামযাদু পরাণ-বাবুর কথার মাঝখানেই বলে' উঠলো—ভালো কথা মনে করে' দিয়েছেন—আমি কদিন থেকেই বলি-বলি করছি, কথায় কথায় চাপা পড়ে' যায়, আর বলা হয় না······

পরাণ-বাবু উৎসুক হয়ে বল্‌লেন—আজ্ঞে করুন······

রামযাদু বলতে লাগলো—আপনার আপিসের কথাতেই মনে হলো—আপনার আপিসে আমার যদি একটি কাজ···

পরাণ-বাবু ব্যস্ত হয়ে বল্‌লেন—আপনার আর কাজ করবার কি দরকার ? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে সাহিত্যানুসন্ধান করুন ; আমি তো বলেছি, আপনার সপরিবারের অভাব আমারই অভাব এবং তা মোচন করবার চিন্তাও আমারই······

রামযাদু দন্তবিকাশ করে' বল্‌লে—আপনার অসীম দয়া, পরম মহত্ত্ব, অগাধ উদারতা ! কিন্তু······

পরাণ-বাবু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এতে আর কিন্তু কি মুখুজ্জে মশায় ?

রামযাদু পরম বিনয়ের অভিনয় করে' মাথা নীচু করে' বল্‌লে—আজ্ঞে স্বাবলম্বী হয়ে সাহিত্যালোচনা করতে পারলেই·· ···

পরাণ-বাবু আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে বল্‌লেন—এ আপনারই উপযুক্ত কথা হয়েছে মুখুজ্জে মশায় ! স্বাবলম্বন ! এই কথাটি যে কত বড়ো কথা তা আমাদের দেশের লোকেরা তো বড়ো কেউ একটা বোঝে না ! আপনার যে গুণপনা আছে তাতে আপনার অভাব-মোচনের ভার গভর্মেণ্টের ও দেশের লোকেরই নেওয়া উচিত এবং তারা নিতেও প্রস্তুত আছে ; তৎসত্ত্বেও আপনি যে স্বোপার্জ্জিত আয়ের উপরই নির্ভর করতে চান এতে আপনার পৌরুষ আর মহত্ত্বেরই পরিচয় পাওয়া যায় !

রামযাদু আপনার কৌশলের সফলতায় হর্ষ গদ্গদ হয়ে বল্‌লে—আপনি আমাকে অনুগ্রহ করেন বলে' এতটা গৌরব আমাকে দিচ্ছেন······

পরাণ-বাবু বল্‌লেন—আপনার গৌরব আপনি নিজে অর্জ্জন করেন মুখুজ্জে মশায় ! আপনার অর্থোপার্জ্জনের পথও আপনা হতেই মুক্ত হয়ে যাবে।

রামযাদু বল্‌লে—সে যদি হয় তবে হবে আপনারই অনুগ্রহে ! প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আপনার কাছ থেকে উপকার পায় নি এমন লোক বাংলা দেশে বিরল ! আমার বইগুলো তো সিন্দুকে বন্ধ হয়ে ধূলো হচ্ছিলো ; তাদের আপনিই প্রকাশ করে' আমাকে কৃতার্থ করেছেন, আমাদের বঙ্গসরস্বতীকে জয়যুক্ত করেছেন ! আমি সরস্বতীর অধম সেবক······

পরাণ-বাবু রামযাদুর গৌরবে গৌরবান্বিত অনুভব করে' গর্ব্বিত ভাবে বল্‌লেন—আপনি সরস্বতীর বরপুত্র !

রামযাদু প্রতারণালব্ধ এই স্তুতিবাক্যে সত্য-সত্যই

লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলে। পরাণ-বাবু দেখে ভাবলেন—আহা! কী বিনয়!

পরাণ-বাবু বললেন—আপনি তা হলে প্রস্তুত হয়ে থাকবেন, কাল থেকেই আমাদের আপিসে আপনি বেরোবেন—আজ একবার বড় সাহেবকে বলে'......

রামযাদু বললে—যে আজ্ঞে। সাহেব-টাহেব ও-সব তো মিথ্যে, আপনি সর্ব্বশক্তিমান্...ইচ্ছাময়...পতিতপাবন......

পরাণ-বাবু তোষামোদে তুষ্ট হয়ে বড়ো বড়ো গোঁপের ঝোপের ভিতর থেকে হেসে বললেন—না না, আপনারা আমার বন্ধুরা আমাকে যা মনে করেন তা আমি নই। আচ্ছা মুখুজ্জে মশায়......

পরাণ-বাবুর এই আচ্ছা বলে' স্বর টেনে থেমে যাওয়া মানে যে সম্বোধিত ব্যক্তিকে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করতে বলা তা রামযাদু জেনে নিয়েছিলো। সে উঠে বললে—আচ্ছা, তবে এখন আসি......

রামযাদু বাইরে চলে' যেতে যেতে মনে মনে বলতে লাগলো—বেটা কেওট! বোকা নিরেট! আচ্ছা ভোগা দিয়ে মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া যাচ্ছে! বাবা তারকনাথ, আচ্ছা ফন্দি বাৎলে দিয়েছো বাবা! বিশ্বাসের পোকে আর কিছুদিন বাঁচিয়ে যদি রাখো তো আমি বেশ দু পয়সার সঙ্গতি করে' নিতে পারব!

(ক্রমশঃ)

তিব্বত পর্য্যটকের ডায়েরী

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায় বি-এ, বি-টি

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গ্রামের অধিবাসিগণ আমাদিগকে সেদিন তুষারাবৃত গিরিবর্ত্ম অতিক্রম না করিয়া রিঙ্‌বি নামক স্থানে অবস্থান করিবার জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিল; কারণ সে স্থান হইতে খাদ্যসংগ্রহ অনায়াসসাধ্য ছিল। কিন্তু তাহাদের কথানুযায়ী সেখানে থাকিলে আমাদের বিরুদ্ধে নানা কথা রটনা হইত; এবং ফলে তিব্বত সীমান্তের গার্ড আমাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। পরন্তু গিরিপথের তুষাররাশি কখন কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া লোক-চলাচলের উপযোগী হইবে, তিন দিনের পথ হইতে উহা নির্দ্ধারণ করাও আমাদের পক্ষে শক্ত হইত। আমরা তুষার-বিমুক্ত যমপুং গিরিপথ ধরিয়া চলিব স্থির করিলাম। আমাদের কুলীরা গ্রামের লোকদের নিকট প্রচার করিল; আমরা শিকারী (বস্তুতঃ ফুমচুঙের বেশভূষা দেখিয়া ঠিক তাহাই মনে হইত), গিরিবর্ত্মে আমাদের তেমন প্রয়োজন নাই, তবে কাংপাচাঁ নামক স্থানে আমাদিগকে পৌঁছিতে হইবে, কারণ সেখানে শিকার যথেষ্ট মিলে। যদি আমরা নাম্‌গাসালে পৌঁছিতে অসমর্থ হই, তবে আমরা খুব সম্ভবতঃ জংগ্রির পথে দার্জ্জিলিং প্রত্যাবৃত্ত হইব।

আমরা গ্রামের পশ্চাৎ দিক দিয়া চলিতে চলিতে কতকগুলি দীর্ঘ সাইপ্রেস গাছ ও একটি মাত্র জুপিটর বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। শেষোক্ত বৃক্ষকে এ অঞ্চলে ভ্রমক্রমে চন্দনতরু বলা হয়। কিছুদূর পথ চলিয়া আমরা ডেচোপ্‌ফুগ নামক বিশাল পাহাড়ের দিকে যে পথ চলিয়াছে তাহা পার হইয়া চলিলাম। সেই পর্ব্বতের গর্ত্ত ভূত-প্রেত-আশ্রিত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

আমরা কখন কখন দেখিতে লাগিলাম, লিম্বুগণ বাঁশ দিয়া মাদুর নির্ম্মাণ করিতেছে, কোথাও ঘরের ছাউনি দিবার জন্য 'ওজিয়ার' গাছ সংগ্রহ করিতেছে। নদীর ধার দিয়া আমাদের রাস্তাটি সোজা চলিয়াছে। এক স্থানে উহার উপর এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী আসিয়া পড়িয়াছে। তদুপরি সেতু নির্ম্মিত। পাহাড়ের উপর স্থানে স্থানে সিঁড়ি কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দিবা এক ঘটিকার সময় আমরা পাংটং নামক স্থানে উপনীত হইলাম। সেখানে যে পান্থশালায় আমাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিলাম তাহা বড় জঘন্য। তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতেছিল, সুতরাং সেই বিশ্রী গৃহেই আমাদিগকে রন্ধন

করিতে হইল। সঙ্কীর্ণ গৃহে আমাদের সোজা হইয়া দাঁড়াইবার উপায় পর্য্যন্ত ছিল না। পিপীলিকা ও শতপদ কীট দ্রব্যসামগ্রীর উপর অবাধে বিচরণ করিতে লাগিল। আর রন্ধনকালে আগুন ধরাইবার জন্য ব্যবহৃত হাপর হইতে উত্থিত ধূমধূলি আমাদের শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিবার উপক্রম করিল। যদিও আমাদের স্বতন্ত্র তাঁবু ছিল, তথাপি ভৃত্যদের একগুঁয়েমিতে তাহা আর খাটান হইল না। ঐ সঙ্কীর্ণ গৃহই তাহাদের পক্ষে আরামপ্রদ ছিল। তন্মধ্যে আমিও আরাম পাইব, ইহাই তাহাদের ধারণা ছিল।

ফুরচুঙ্‌ তাহারই আত্মীয় গ্রাম্য মোড়লের নিকট হইতে কিছু দুগ্ধ, পনির ও ভাল মাছ সংগ্রহ করিল। আমরা 'বীয়ার' বারুণী পানে ক্লান্তি দূর করিয়া আমাদের সঙ্গী জর্ডন ও টোনজাঙের সঙ্গীত শ্রবণে মনোযোগী হইলাম। ইহারা সুরাপানের সঙ্গে সঙ্গে স্বর-লহরীর অপূর্ব্ব লীলা প্রদর্শন করিতে লাগিল; আর ক্ষুদ্র শব্দাড়ম্বর-বহুল বক্তৃতা দিতে লাগিল। আমাদের বোঝা বহন করিলেও স্বদেশে ইহারা সম্ভ্রান্ত বলিয়াই খ্যাত ছিল। আমার সন্তোষ বিধানার্থ ইহারা ভৃত্যের কার্য্য করিতেও আপত্তি করিল না।

এ কার্য্যে আমার বাহিরের লোক নিযুক্ত করিবারও উপায় ছিল না। কারণ আমার গুপ্ত গতিবিধি যে-সে লোককে জানান আমার অভিপ্রেত ছিল না। জর্ডনের সঙ্গীত ও বক্তৃতা আমাকে বিমুগ্ধ করিল। আমি বিস্মিত হইলাম কি করিয়া সুরাদেবীর কৃপায় এবং অসভ্য পার্ব্বত্য লোকের ভিতরও এরূপ বাগ্মিতা শক্তি জন্মিতে পারে! ভাবাতিশয্যে সে "অমূল্য পুষ্পমাল্য" * (Rinchen Tenwa) নামক পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত করিল। নিম্নে তাহারই ভাবানুবাদ দেওয়া হইল—

আজি সমাগত হেথা যত বন্ধুজন
মন দিয়ে কৃপা করে' করুন শ্রবণ;
ঈগল বিহঙ্গরাজ যখনই সে উড়ে
পক্ষিগণ তার সঙ্গে অমনি যে ঘুরে।
মৃগরাজ সিংহ যবে করে উল্লম্ফন,
পশুযূথ সঙ্গে সঙ্গে করিবে নর্ত্তন।
বারুণীর সেবা যেই করিবে যখন
বাগ্মীশ্রেষ্ঠ বলি তায় করিবে গণন;
মুখ দিয়া বাক্য যেই করে সে নির্গত,
সকলে শুনিবে তাহা হয়ে অবহিত।

এখানে শেষবাক্যে সাদৃশ্য ঠিক রহিল না। যখন বারুণী-সেবী বাক্য উচ্চারণ করিবে, তখন অন্যেরাও কথা বলিতে থাকিবে, জর্ডনের এরূপ বলিলে ঠিক হইত। সে কবিতাটি যথাযথরূপ উদ্ধৃত করিতেছিল, সুতরাং কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিবার স্বাধীনতা তাহার ছিল না।

নবেম্বর ১৬

জর্ডন ও টোনজাঙের সঙ্গে কয়েকটি চিঠি ও আমার দেশীয় পরিচ্ছদগুলি দিয়া তাহাদিগকে দার্জ্জিলিং পাঠাইলাম, আর আমরাও পুনরায় যাত্রা করিলাম। রিঙ্‌বি নদীর ধার দিয়া অর্দ্ধক্রোশ চলিয়া আমরা লাঙ্‌মো গিরিবর্ত্মে পৌঁছিলাম। উহা খর্ব্বাকৃতি বংশবন ও শৈবালময় [illegible] ওক বৃক্ষ সমাবৃত ছিল।

দিবা দুই ঘটিকার সময় আমরা চানজোমে পৌঁছিলাম। এই জায়গাটি রিঙ্‌বি নদীর দুই শাখা নদীর সঙ্গমস্থল। এ স্থানে শক্ত পাথরের পোস্তা বিশিষ্ট সুনির্ম্মিত একটি সেতু আছে। নদীর খাত হরিদ্বর্ণ ঘন শৈবালে আবৃত। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া আমরা কেতা নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। চতুর্দ্দিক ব্যাঘ্র ভল্লুক বরাহের লীলাভূমি নিবিড় অরণ্যানী। তখন আমার তাঁবুটিও সঙ্গে ছিল না। যাহা হউক বিছানার চাদর খাটাইয়া তাঁবুর মত করিয়া কোন রূপে শীতবাত হইতে আত্মরক্ষার উপায় বিধান করিলাম। সন্নিহিত এক বৃক্ষশাখায় আমাদের সঙ্গীয় মৎস্য মাংস ঝুলাইয়া রাখিলাম। এজন্য সারারাত্রিই মূষিক ও পেচকের সমাগম হইতে লাগিল।

নবেম্বর ১৭

সেদিন আমরা যখন নিবিড় অরণ্য ও ঘন গুল্মবনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তখন আমাদের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কারণ সিঙ্‌লি পর্ব্বতবর্ত্মে একটি নরভুক ব্যাঘ্র দুইজন নেপালীর জীবনলীলার অবসান করিয়া দিয়াছিল, এ সংবাদ আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল।

---

* শাক্য পণ্ডিত বিরচিত ৪৫৪টি শ্লোকবিশিষ্ট উক্ত পুস্তকের সংস্কৃত নাম 'সুভাষিত রত্ননিধি'। উহা বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় অনুদিত হইয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজে আদৃত হইয়াছে। শাক্য পণ্ডিতের ভারতীয় নাম আনন্দধ্বজ। তিনি খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে তিব্বতের তশিলহুনপো নামক স্থানে বাস করিতেন।

আর গত বৎসরের পূর্ব্ব বর্ষে একটি বাঘ জংগ্রি পর্য্যন্ত পৌছিয়া দশ বারটি বলীবর্দ্দের প্রাণ সংহার করিয়া দিয়াছিল। আমাদের ভয় হইয়াছিল, এ স্থলের বলীবর্দ্দের লোভে হয় ত শার্দ্দুল দল এখানে আসিয়াও সংহার-লীলা আরম্ভ করিবে। এখন যে রাস্তায় চলিলাম, তাহা সরলোন্নত ও প্রস্তরময়। তখন হাঁড়ভাঙ্গা শীত পড়িয়াছে।

দ্বিপ্রহরে আমরা যে স্থলে পৌছিলাম, সেখানে বৃহৎ বৃহৎ মনোরম স্থলপদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর ভিতর দিয়া অগ্রসর হওয়ার সময় আমরা বিচিত্রদেহ বিবিধ বিহঙ্গের আতঙ্ক উপস্থিত করিয়া দিয়াছিলাম। তার পর আমরা এক তুষার-মণ্ডিত শৈল সমীপে উপনীত হইলাম। এখন ক্রমেই কঠিন চড়াই পথ। আমরা অবগত হইলাম, এ স্থলে সিকিমের লেপ্চা সৈন্যদল তীর নিক্ষেপ পূর্ব্বক এবং শত্রুদের উপর বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া গুর্খা আক্রমণকারীদিগকে পরাভূত করিয়াছিল। এই দুর্গম পথ অতিক্রমের পর চড়াই রাস্তা অপেক্ষাকৃত কম ক্লেশাবহ। পথে আমরা পর্ব্বতগাত্র হইতে প্রলম্বিত কতকগুলি মধুচক্র দেখিতে পাইলাম। সমতল ক্ষেত্রে সচরাচর যেরূপ মৌচাক দেখিতে পাওয়া যায়, এগুলি তেমন নয়—দেখিতে ঠিক বেঙের ছাতার ন্যায়।

দুই ঘটিকার সময় আমরা যমপুঙ্ গুহায় উপস্থিত হইলাম। পাহাড়ের এ স্থানের দিকে বায়ু প্রবাহিত হইত। দূরে বৃহৎ বৃহৎ পতাকা উড্ডীয়মান দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, গোশালা ও লোকালয় নিকটেই রহিয়াছে। গ্রামের সম্মুখে সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত তুষারমালা গ্রামটীকে সুরম্য করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু গ্রামপ্রান্তে উপনীত হওয়ামাত্র সে সু-দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া গেল। জনমানবহীন গ্রামটি আমাদের নয়ন মুকুরে প্রতিফলিত হইল। জনপ্রাণী দূরে থাক, আরণ্য গো বা একটি কুকুরও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল না। শুধু কতকগুলি বায়স ছাদের উপর ও পতাকা দণ্ডের উপর বসিয়া ছিল। মাত্র ১০।১২টি বাড়ী লইয়া সেই গ্রাম। গৃহগুলি শিথিল প্রস্তর নির্ম্মিত, গঠন-নৈপুণ্য মোটেই নাই! ছাদটি দেবদারু কাষ্ঠের, মাঝে মাঝে প্রস্তর দ্বারা সংবদ্ধ। বড় বড় ঘরগুলি তালাবদ্ধ ছিল। যে গুলিতে তালা ছিল না তাহা রজ্জু দ্বারা দৃঢ়সংবদ্ধ। প্রতি গৃহে প্রচুর রক্তরঞ্জন লতা বিদ্যমান ছিল। অধিবাসিগণ এই লতার পরিবর্ত্তে লবণ সংগ্রহ করে। গ্রীষ্মকালে ও নবেম্বর মাসে তুষারপাত আরম্ভ হইলেই পূর্ব্ব-নেপাল হইতে লবণের আমদানী হয়। পশ্চিম সিকিমের লিম্বু ও লেপচাগণ প্রতি বৎসর মারোয়া, ভুট্টা, রঞ্জনলতা এবং দার্জ্জিলিং বাজারের অন্যান্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য এখানে আসে। তৎপরিবর্ত্তে ইহারা লবণ, পশম, চা, তিব্বতীয় বাসনপত্র প্রদান করিয়া থাকে।

নবেম্বর ১৮

যমপুং গিরিবর্ত্ম বেশী উচ্চ না হইলেও বড় দুরারোহ ছিল। জংগ্রি গিরিসঙ্কটের ন্যায় উহা সমশীর্ষ উদ্ভিদ-বহুল ছিল না। এই শৈলের উত্তর প্রান্তভাগ সুবিখ্যাত কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। পার্ব্বত্য লোকেরা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে কুম্ভকর্ণ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পূর্ব্বদিক ব্যতীত যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়—শুধু শুভ্র তুষার। যখন 'দু' গিরিবর্ত্মের বা দৈত্যগিরির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবতরণ করিলাম, নিম্নে নিম্নগামী এক সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তাহারই মধ্য দিয়া স্রোতস্বিনী রিংবি নিয়ত কুলুকুলু-নাদে প্রবাহিত হইতেছে। যমপুং হইতে তুষার-স্রোত প্রবাহিত হইয়া অর্দ্ধমাইল পরিধিবিশিষ্ট এক হ্রদে পতিত হইয়াছে। উহা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বলিয়া তামাচু নামে অভিহিত। নেপালীরা ইহাকে লামপুক্রি কহে। দু-গিরিপথ হইতেই কঠিন চড়াই পথ চলিয়াছে। তখন ইউজিয়েমের মাথাব্যথা ও শ্বাসকৃচ্ছ্র তার উপক্রম হইয়াছে বলিয়া জানাইল এবং তাহার 'পর্ব্বতপীড়া' হইয়াছে বলিয়া সে নির্দ্দেশ করিল। তদুপরি আমাদের দুর্ভাগ্যহেতু এরূপ বাত্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল যে, আমি কয়েকবার ধরাশায়ী হইলাম। একজন কুলী এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ভূপতিত হইল যে তাহার পা হিমানীতে অবসন্ন হইয়া গেল। আমি আমার পাদুকা ও কাবুলী মোজা তাহাকে দিয়া স্বয়ং তিব্বতীয় বুট পরিধান করিলাম। গুমোর পথ তুষারাবৃত থাকায় গিরিবর্ত্মের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া আমাদিগকে চক্রাকারে ঘুরিয়া যাইতে হইল। বরফ গলিয়া যাওয়ায় পথচলা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হইল। হস্তপদ উভয়ের সাহায্যে আমি যতদূর সাবধানে পারি চলিতে লাগিলাম। আমরা যে গিরি-সঙ্কট দিয়া চলিতেছিলাম তাহা এত নিম্নগামী ছিল যে, আঁকা বাঁকা পথে চলিতে চলিতে চক্ষুর্দ্বয় যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এই গিরি-সঙ্কটের তুষারই ইয়ংসো নদের উৎপত্তি স্থল। এই নদ জংগ্রি গিরি-

সঙ্কট অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। চড়াইয়ের চেয়ে উতরাই পথই আমাদের বেশী সঙ্কটময় বলিয়া মনে হইল। এরূপ রাস্তায় চলাচলে অভ্যস্ত আমার কুলী আমাকে অনেক পশ্চাতে রাখিয়া চলিয়া গেল। 'দু' গিরিসঙ্কটের তুষাররাশি অতিক্রম করিয়া আমরা দেবদারু পরিপূর্ণ একটি গভীর সঙ্কীর্ণ গিরিপথ দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে স্থানে স্থানে গোচারণ-ভূমিও রহিয়াছে। উপরে বিরাট সরলোন্নত শৈল। আমরা একটি সমান্তরাল শৈল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। তার পরই গুমো পল্লী। ২০০০ ফিট নিম্নে গিরিপথের মধ্যে অবস্থিত এই স্থানই আমাদের পরবর্ত্তী বিশ্রাম-স্থল হইল। আমরা একটি তুষারক্ষেত্র অনুসরণ করিয়া চলিলাম এবং সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রম্য বনানী-পূর্ণ গুমোর গিরিপথে উপনীত হইলাম। উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্রবীভূত তুষারজাত যে জল-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা গিরিসঙ্কটটি ভাসাইয়া দিয়াছিল। গুমো গিরিবর্ত্মের উপর যে খাড়া পাহাড় অবস্থিত তাহার একপার্শ্বে লছমীপাত্র বা ভাগ্যহ্রদ। লোকে বলে, তন্মধ্যে প্রচুর সুবর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তর আছে। ইহার পরিধি অর্দ্ধক্রোশ, জল ঘন কৃষ্ণবর্ণ। গভীর জলে জলহস্তীর বাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

নবেম্বর ১৯

এক হাঁটু জলের মধ্য দিয়া আমরা একটি স্রোতস্বিনী পার হইলাম। তাহা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া রটং নদীর মধ্যে আত্ম-গোপন করিয়া উহাকে জল-ধারা দানে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। আমরা বোগতো গিরিসঙ্কটে আরূঢ় হইলাম। আমাদের পথের উপর দিকের পাহাড়ে দেবদারু, জুপিটর প্রভৃতি বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। এই বিটপী-শ্রেণী এক বিশুদ্ধ তুষারক্ষেত্রজাত জলপ্রণালীর প্রান্তদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত। উহা হইতে এক ক্ষুদ্র নদী উৎপন্ন হইয়া নিম্নগামী হইয়াছে। উভয় পার্শ্বে ভগ্ন প্রস্তর। এ স্থান হইতে দুইটি পদাঙ্ক-চিহ্ন পথ বহির্গত হইয়া বোগতো শৈলের ঢালু পার্শ্ব-দেশে পৌঁছিয়াছে। একটি পথ নদীর ধার দিয়া গিয়াছে। যমপুংয়ের পশুপালকগণ ও যঙমার লবণ-ব্যবসায়ীরা সাধারণতঃ এই পথে গমনাগমন করিয়া থাকে। আমরা যে পথটি ধরিলাম, তাহাতে অনেক বিষবৃক্ষ জন্মিয়া আছে। এই-গুলি ভক্ষণে গোমহিষের শরীরেও বিষক্রিয়া হইয়া থাকে। 'ফেজেণ্ট' পাখীরা তথায় একপ্রকার বৃহৎ স্থলপদ্ম আহার করিতেছিল। অনেক বন্য মেষযূথ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শৈলশৃঙ্গ আরোহণের পূর্ব্বেই স্থলপদ্ম ও জুপিটর বৃক্ষ আমাদের নয়নের অন্তরাল হইল। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে শুধু জলৌকা ও শৈবাল জাতীয় গুল্ম আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

সেদিনটা সামান্য অন্নাহার ও চাপান করিয়া থাকায় আমাদের শরীর এত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, এত উচ্চ পার্ব্বত্যপথে আরোহণ আমাদের নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইল। আধমাইল পথ পর্য্যন্ত দেহটাকে জো টানিয়া লইয়া চলিলাম। আমার মাথা ভীষণভাবে ঘুরিতে লাগিল, আর সঙ্গে সঙ্গে বমির উদ্রেক হইল। অবশেষে দেহটি নিতান্ত ক্লান্ত হওয়ায় মাটির উপর শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া রহিলাম। কুলীদের ক্লান্তি আমাদের চেয়েও বেশী হইয়াছিল। আমি শুধু আমার ভারি পোষাক লইয়া চলিতেছিলাম, কিন্তু কুলীরা চলিয়া-ছিল এই দুর্গম পথে গুরুভার বহন করিয়া। তখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল। আকাশে দ্রুত-সঞ্চরণশীল নীরদ-মালা। একজন কুলী চা তৈয়ার করিলে আমি কিঞ্চিৎ পান করিলাম। ফুরচুঙ আমাকে একটি ভাজা ফল খাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু আমি আর কিছুই আহার করিলাম না। কম্বল জড়াইয়া সটান শুইয়া পড়িলাম। পাছে গড়াইয়া গভীর গহ্বরে পড়িয়া যাই, এজন্য বোঝার উপর পাদুটি ঠেকাইয়া রাখিলাম। রাত্রে মোটেই সুনিদ্রা হইল না; কিন্তু আমার পাশেই আমার সঙ্গীরা নাক ডাকাইয়া গভীর নিদ্রা যাইতেছিল।

নবেম্বর ২০

আকাশ মেঘাবৃত, সুমন্দ মলয় প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের পথ-প্রদর্শক তুষার-ঝটিকার লক্ষণ বুঝিয়া কতিপয় মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অনিচ্ছার সহিত বোঝা মাথায় লইল। নোগা নামে কথিত এই ভীষণ ঢালু পর্ব্বত-পার্শ্ব অতিক্রম করিয়া আমরা চড়াই পথে চলিলাম।

শতেক গজ চড়াই পথে চলিয়া Tsonag tso নামক ক্ষুদ্র হ্রদের নিকট পৌঁছিলাম। ইহার তলদেশ জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে ৪০০ গজ, প্রস্থে ২০০ গজ। অতঃপর আমরা বরফাচ্ছাদিত শৈলের পর শৈল অতিক্রম করিয়া চলিলাম। কি প্রাণোন্মাদকারী বিরাট দৃশ্য! কি ভীতি সঞ্চারিণী নিস্তব্ধতা। জলের শব্দ মাত্র নাই, এমন

কি কোথাও তুষার-পিণ্ড স্খলনের শব্দটি পর্য্যন্ত কর্ণগোচর হইল না। আমাদের মধ্যে কাহারো মুখে কথাটি নাই। পিচ্ছিল পথে গমন হেতু সকলেই পথের দিকে মনোনিবিষ্ট হইয়া চলিয়াছি।

অর্দ্ধক্রোশ চড়াই পথে চলিয়া আমরা আরও একটি দ্রব-সলিল হ্রদের নিকট উপনীত হইলাম। আমাদের পথ-প্রদর্শক দৌড়িয়া কিছুদুর অগ্রসর হইয়া কিছু বরফ ও তুষারখণ্ড সংগ্রহপূর্ব্বক হ্রদের উপর ছড়াইয়া দিল। উদ্দেশ্য, আমরা যেন তাহাতে পরিষ্কাররূপে পথ দেখিতে পাই,—কোথায়ও যেন পিছলাইয়া না পড়ি। এই ক্ষুদ্রাকার হ্রদটি সিকিমবাসীদের ধর্ম্মগ্রন্থে অতি পবিত্র বলিয়া কথিত আছে; ইহাকে 'Tso dom-dongma' বা ময়ূর চিহ্নাঙ্কিত হ্রদ বলা হয়। মুগ্ধ ভক্ত দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন, হ্রদের তুষারাস্তরণের উপরিস্থিত জলবিম্বে যেন ময়ূর পক্ষের মত নানাবর্ণের চিহ্ন রহিয়াছে। আমাদের সম্মুখ ভাগে বিরাট চুম্বোক গিরিসঙ্কট সগর্ব্বে দণ্ডায়মান। চঞ্চল মেঘমালা সূর্য্যের উপর দিয়া গমনাগমন করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের মস্তকের উপরিস্থিত আকাশটি যেন একেবারে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইল। এ পর্য্যন্ত নির্ভীক রূপে পরিচিত আমাদের পথ-প্রদর্শকের সাহস হঠাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "আরও অগ্রসর হইতেছেন, কেন মহাশয়? এই জন-মানবহীন স্থানে মৃত্যু যে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া আছে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সব শেষ হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ফুরচুঙ্, বল্‌ছ কি? মৃত্যু কোথায় দেখছ?"

সে উত্তর করিল, "মহাশয়, আকাশের দিকে তাকান। এই মেঘগুলি শীঘ্রই ঘনীভূত তুষারে পরিণত হইয়া আমাদের মস্তকে পতিত হইবে। তাহা হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বিধান কোন মানুষই করিতে পারিবে না। আমরা রাস্তার এই ধারে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ রক্ষা পাইলেও অপর পার্শ্বে গেলে আর রক্ষা নাই।" ফুরচুঙ্ ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিল, ভয়ে তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মহাশয়, আমরা যদি এখনই 'বোগতো' গিরিবর্ত্মে ফিরিয়া না যাই, তবে প্রভু-ভৃত্য উভয়েই প্রাণ হারাইব। আকাশের এই অশুভ লক্ষণই আমাদিগকে বোগতোর দিকে প্রত্যাগমন করিবার জন্য প্রণোদিত করিতেছে।" এবার বালকের ন্যায় রোদন করিতে করিতে সে অনুরোধ করিল, কিন্তু সবই বৃথা হইল। আমি ফুরচুঙ্ ও কুলীদিগকে বলিলাম, "আমি এক পাও পিছাইয়া যাইব না, এই আমার সঙ্কল্প—সব অনুনয় বিনয়ই আমার নিকট বৃথা।" এক ঘণ্টায় বোগতোতে ফিরিয়া যাওয়াও বড় সম্ভবপর ছিল না। আবার রাস্তায় বরফ পড়িতে আরম্ভ হইলেও নিরুপায়। পরন্তু এই ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই আমাদের বিপদের অবসান হইবে না। বিপদ দেখিয়া আমরা যে পথ ছাড়িয়া যাইব, সেই পথ দিয়াই আমাদিগকে পুনরায় চলিতে হইবে। তখন যে আবার তুষারপাত হইবে না কে বলিতে পারে?

আমার সঙ্গে যুক্তি-তর্কে পরাভূত হইয়া ফুরচুঙ্ এবার অগ্রসর হইতে লাগিল। আমি এখন সকলের অগ্রগামী হইলাম। নববলে বলীয়ান হইয়া গিরি আরোহণ করিতে করিতে এক ঘণ্টার মধ্যে গিরি-সঙ্কটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আকাশ তখন মেঘমুক্ত; নীল গগন যেন আমাদের দিকে সস্মিত দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। জ্যোতির্ম্ময় বিবস্বানের পুনরাবির্ভাবে আমাদের সকল ভয় অপগত হইল। আমাদের বামে 'সান্দাব ফুগ', দক্ষিণে কাঙলাজংমার উত্তুঙ্গ শৈল-শিখর দৃষ্টিগোচর হইল। এদিকে নেপালের সারখাম্বু জেলাস্থিত অত্যুচ্চ গোলাকৃতি ল্যাপ্‌চাই শৈল তুষারের ভিতর দিয়া মাথা উঁচু করিয়া দণ্ডায়মান হইল। চুম্বোকের উপত্যকাকে 'জলের চামচ' বলা হয়; কারণ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ হইতে চামচাকৃতি পাত্রে যেন উহা জল সংগ্রহ করে।

শৈলশিখরে নির্ব্বিঘ্নে উপনীত হইয়া হর্ষ প্রকাশ করিবার সময় মাত্র আমার ছিল না। আমাদের পথপ্রদর্শক হাসিতে হাসিতে তখন বোঝার চর্ম্মবেষ্টনীতে হস্তার্পণ করিল এবং যথাভ্যস্ত প্রার্থনা করিয়া পথ চলিতে লাগিল। অবতরণের পথ এবার বড়ই বিপদ-সঙ্কুল। কারণ বরফে পথের চিহ্ন মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল না। পথ-প্রদর্শক বরফের গভীরতা মাপিয়া কোন্‌দিকে পথ, তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিল; এবং পথের সন্ধান না পাইয়া আঁকা বাঁকা পথে চলিল; কিন্তু সেরূপ ভাবে চলা তাহার মত অভিজ্ঞনেত্র না হইলে সহজ নহে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পথ চলিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমরা সামান্য দূরই

অগ্রসর হইয়াছি। একটা দীর্ঘ-লাঙ্গুল চিতাবাঘের অনুসৃত পথে তখন আমরা চলিয়াছি। আমরা অবাক হইলাম, কি করিয়া উহা নরম বরফের মধ্যে একেবারে ডুবিয়া না গিয়া এভাবে হাঁটিয়া চলিয়া ছিল। আমাদের অনুচরেরা বলিল, ইহাদের একটা অলৌকিক ক্ষমতা রহিয়াছে। এটি চিতাবাঘ নহে, চিতা বাঘের প্রেতদেহ। বরফের ভিতর দিয়া ঘণ্টা-খানেক চলিবার পর আমার সমস্ত শক্তি যেন ক্ষয় হইয়া গেল; আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। পথপ্রদর্শক বোঝা খুলিয়া আবার বাঁধিয়া লইল। ভঙ্গপ্রবণ জিনিসগুলি দিয়া এক বোঝা তৈয়ার করিল, কাপড় ও রসদাদি দ্বারা আর একটি বোঝা করিয়া লইল। শেষোক্ত বোঝাটি ঢালু পর্ব্বত-গাত্রে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। বরফের সহিত উহার ঘর্ষণে যে পথ প্রস্তুত হইল, সেই পথ অবলম্বনে আমরা চলিতে লাগিলাম, যে পর্য্যন্ত না বোঝাটি একটি প্রস্তরখণ্ডে ঠেকিয়া গিয়াছিল। তার পর আমি অর্দ্ধ-কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত বরফের উপর দিয়া কনুইয়ের সাহায্যে গড়াইয়া চলিতে লাগিলাম। পাছে ভাসমান তুষারখণ্ডের খাটলে পড়িয়া যাই এই ভয়ে এই ভাবে চলিতে হইল।

দিবা সার্দ্ধ ত্রিঘটিকার সময় আমরা 'চুলোন কিয়োক' গিরিপথের যে-স্থলে অবতরণ করিলাম, তথায় স্থানে স্থানে বরফের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত স্থান দৃষ্টিগোচর হইল। এক স্থানে পাটলবর্ণ বৃহৎ পত্র বিশিষ্ট উৎপল-বন দেখিতে পাইলাম। প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি বাতাসে আন্দোলিত হইতেছিল। কুলীরা এখন আমায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। তৃণগুল্ম, স্থলপদ্ম, জুপিটার বৃক্ষের বন পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, আমি যেন নূতন শক্তিলাভ করিয়া চলিতে লাগিলাম। কিন্তু শ্বাসগ্রহণের জন্য আমাকে স্থানে স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল। বিবিধ বৃক্ষবল্লরী ও সুগন্ধ গুল্মাদি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আমরা গিরিসঙ্কটের উতরাই পথে চলিতে চলিতে দিবাবসান সময়ে একটি বৃহৎ বিচ্ছিন্ন শৈলের নিকট উপস্থিত হইলাম। উহার নীচেই আমরা তাঁবু খাটাইলাম। সম্মুখ ভাগে ৪ ফুট পরিসর একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিনী। এই স্রোতস্বিনী হইতেই নেপালের সুবিখ্যাত কাবিলি নদী বহির্গত হইয়াছে। চুপোক ও স্কোরুম পর্ব্বতের জলধারাই ইহাকে পুষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শিল্পী—শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

ঝড়ে

হাত-দেখা

জ্যোতির্বাচস্পতি

হাতের গড়ন

একজনের হাত দেখে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ঘটনা বল্‌তে হলে, প্রথমে তাঁর প্রকৃতি জানা দরকার। তা না হ'লে তাঁর হাত দেখে সমস্ত ঘটনা যথাযথ নির্দ্দেশ করা সম্ভব হ'বে না। একজন কোমল-হৃদয় লোকের হাতে যে ঘটনার চিহ্ন গভীর রেখা অঙ্কিত করবে, একজন কঠিন-হৃদয় লোকের হাতে তা অতি ক্ষীণভাবে দেখা যাবে। কাজেই প্রথমে জাতকের চরিত্র না জান্‌লে, তার হাত দেখে বলা যাবে না ঘটনাটির গুরুত্ব কতখানি।

হাত দেখে চরিত্র নির্ণয় কর্‌তে হ'লে, প্রথম দেখা দরকার —হাতের গড়ন। মানুষের হাতের দুটি ভাগ আছে (১) হাতের তেলো আর (২) হাতের আঙুল। হাতের আঙুলের মধ্যে আবার চারটি আঙুল এক দিকে আছে এবং বুড়ো আঙুলটি অপর দিকে আছে। আঙুল চারটি যেন হাতের তেলোরই পরিণতি। বুড়ো আঙুল অন্য আঙুলগুলি হতে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে। প্রকৃতি নির্ণয়ে বুড়ো আঙুলের স্বাতন্ত্র্যের গুরুত্ব এবং কারকতা আছে। আগে আমি হাতের তেলো এবং চারটি আঙুলের গড়ন সম্বন্ধে বল্‌ব।

দশ-বিশটা হাত কেউ যদি লক্ষ্য করে দেখেন, তাহ'লে তিনি দেখ্‌তে পাবেন যে, কারো কারো হাতের তেলোর চার পাশ বেশ চৌরস, যেন চার দিকে কয়েকটা সরল রেখা দিয়ে তেলোটা তৈরী। আবার কারো কারো হাতের তেলোর চার-পাশ উঁচু নীচু। কারো তেলোর নীচের দিকে কব্জির কাছে দুপাশ হয়তো ফুলো ফুলো ভাব; কারো হয়তো তেলোর উপর দিকে দুপাশে খানিকটা করে ফুলে রয়েছে—এই হিসেবে হাতের তেলোকে সম আর বিষম এই দু ভাগে ভাগ করা যায়। হাতের তেলোর মত হাতের চারটি আঙুলের প্রত্যেকটার চার পাশও চৌরস কি উঁচুনীচু হতে পারে; এবং সেই হিসেবে আঙুলগুলিকেও সম আর বিষম এই দুই ভাগ করা যায় (চিত্র দেখুন)।

সম এবং বিষম হাত থেকে প্রকৃতিটা মোটামুটি বা সাধারণ ভাবে বোঝা যেতে পারে।

বিষম হাতের প্রকৃতি

বিষম হাত পুরুষ বা প্রত্যক্ষ (positive) প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে। কাজেই যে ব্যক্তির বিষম হাত, তাঁর ইচ্ছাশক্তি প্রবল ও দুর্দ্দমনীয়। তিনি নিজে সহজে অবস্থা দ্বারা অভিভূত হ'ন না—অবস্থাকে নিজের মত করে গড়ে তোলবার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে আছে। তাঁর মতের বিরুদ্ধ কোন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো শক্ত এবং তিনি সহজে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হন না। ভিন্ন মত বা ভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তিনি সহজে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না; এবং তিনি সহজে কারো বশ্যতা স্বীকার কর্‌তে নারাজ। তিনি ত্বরিত-কর্ম্মাও
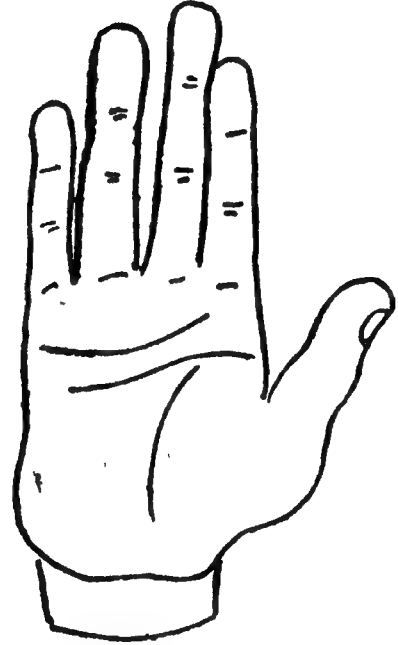
হতে পারেন; দীর্ঘ-সূত্রীও হতে পারেন; উদার স্পষ্টবক্তাও হতে পারেন; সঙ্কীর্ণচেতা সংযত-বাক্‌ও হতে পারেন; কিন্তু তিনি যাই হোন, নিজের ইচ্ছা বা মতের প্রতিকূল ঘটনা, মত বা বাক্য সহ্য করা তাঁর পক্ষে কঠিন। তাঁর মধ্যে যে মৌলিকতা থাক্‌বেই এমন কোন কথা নেই; অন্য লোকের উপদেশ বা কার্য্যকলাপের দ্বারা তাঁর মতবাদ বা চরিত্র গঠিত

হতে পারে ; কিন্তু একবার তিনি যে মতকে নিজের বলে গ্রহণ করেছেন, ভালই হোক বা মন্দই হোক, তা সহজে ছাড়তে প্রস্তুত হবেন না। তিনি ভাঙ্গবেন তবু মচ্‌কাবেন না। এই হ'ল বিষম হাতের সাধারণ প্রকৃতি। গড়ন হিসেবে বিষম হাতকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১ম—যে হাতের তেলোর দুপাশ নীচের দিকে ফোলা ফোলা ভাব এবং আঙুলের ডগাগুলি মোটা। এ শ্রেণীর হাতকে কর্ম্মী হাত বা প্রাণময় হাত বলা যেতে পারে (চিত্র দেখুন)।

বিষম হাত
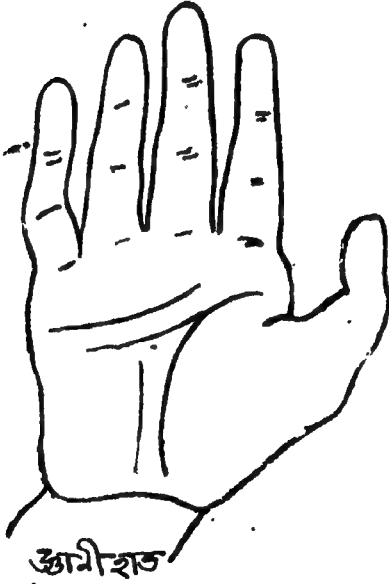
জ্ঞানী হাত

২য়—যে হাতের তেলোর দু পাশ উপর দিকে ফোলা ফোলা ভাব এবং আঙুলের গোড়াগুলি মোটা। এ শ্রেণীর হাতকে জ্ঞানী হাত বা বিজ্ঞানময় হাত বলা যেতে পারে (চিত্র দেখুন)।

এদের প্রকৃতি সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে বলা হবে।

সম হাতের প্রকৃতি

বিষম হাত যেমন পুরুষ বা প্রত্যক্ষ প্রকৃতি নির্দ্দেশ করে, সম হাত তেমনি নারী বা পরোক্ষ প্রকৃতির সূচক। সাধারণতঃ সম হাতের লোকের প্রকৃতি নমনীয় ও সামাজিকতাপূর্ণ। বিভিন্ন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে চলবার ক্ষমতা এবং অপরের যুক্তি ও মত সহজে গ্রহণ করবার শক্তি তাঁর আছে। তিনি নিজের মত বা অভিরুচির বিরুদ্ধ অনেক কাজ করে থাকেন, কেবল লোক-মতের দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে বা সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতির বশবর্ত্তী হয়ে। যাঁর সম হাত তাঁর প্রকৃতির একটা প্রধান লক্ষণ হচ্চে ভাবগ্রাহিতা। এতে এক পক্ষে যেমন তাঁকে উদার ও মুক্ত-চিত্ত, উর্ব্বর-মস্তিষ্ক, কল্পনার প্রাচুর্য্য, নূতন ভাব ও অভিনব চিন্তাপ্রণালী গ্রহণ করবার ক্ষমতা দিতে পারে, অন্য দিকে তেমনি তাঁকে স্বাধীন-চিন্তাহীন, গতানুগতিক, মৌলিকতাবর্জ্জিত ও চর্ব্বিত-চর্ব্বণ-কারী করে ফেল্‌তে পারে। তখন তোতা পাখীর মত পরের কথার প্রতিধ্বনি করাই তাঁর বড় কাজ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবিক সম হাতে এই দু'রকমের প্রকৃতিই দেখা যায়। হৃদয়ের ব্যাপারেও সম হাতের দুরকম প্রকৃতি পাওয়া যায়। সম-হাতের একদল লোক সহানুভূতিসম্পন্ন, পরদুঃখকাতর, সামাজিকতাপূর্ণ ও পরোপকাররত ; আর একদল শুধু ভাব-প্রবণ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ, পরদুঃখে উদাসীন অথবা শুধু মৌখিক দুঃখ-প্রকাশকারী। কর্ম্মজগতে সমহাতের লোক
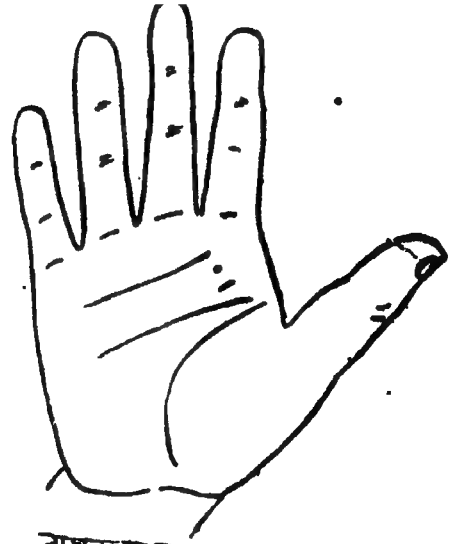
সম হাত

বাস্তব হাত

পরের সাহচর্য্যে অথবা পরের অধীনে যত ভাল কাজ করতে পারেন, একা তত নয়। সম হাতের লোকের মধ্যে প্রভু বা নেতার চেয়ে অধীন বা অনুগত লোক বেশী। অবশ্য এ থেকে এমন বোঝায় না যে, সমহাতের লোক মাত্রেরই আত্ম-সম্মান-জ্ঞান অথবা স্বাধীন প্রকৃতির অভাব আছে। আসল

কথা—নিয়ম শৃঙ্খলা এবং প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলা তাঁর একটা মজ্জাগত স্বভাব; কিন্তু যেখানে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা বা আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সেখানে নিজের তেজস্বিতার পরিচয় দিতে পরাঙ্মুখ হ'ন না। বিষম হাতের মত সম হাতেরও দুটী শ্রেণী আছে।

১ম—যে হাতের তেলোর দুপাশ সোজা এবং সমানভাবে আঙুল পর্য্যন্ত উঠে গিয়েছে, যাতে সমস্ত তেলোটা একটা চতুষ্কোণ বলে মনে হয়। এ শ্রেণীর হাতকে বাস্তব হাত বা অন্নময় হাত বলা যেতে পারে (চিত্র দেখুন)।

২য়—যে হাতের তেলোর দুপাশ নীচে থেকে উপর দিকে ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, যাতে করে হাতের তেলোটা ছুঁচলো বলে মনে হয়। এ শ্রেণীর হাতকে ভাবুক হাত বা মনোময় হাত বলা যেতে পারে (চিত্র দেখুন)।

সমহস্ত

ভাবুকহাত

তা হলে হাতের চারিটী শ্রেণী পাচ্চি—(১) বাস্তব (২) কর্ম্মী (৩) ভাবুক (৪) জ্ঞানী। এই চারটী শ্রেণী চৈতন্যে চারটী স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমাদের চৈতন্যের চারটী স্তর আছে। সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রে তাদের কোষ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই চারটী কোষ বা স্তরের নাম যথাক্রমে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়। চৈতন্য যখন স্থূল বস্তুকে (matter) আশ্রয় করে থাকে, আমরা তখন বলি তা অন্নময় কোষে অভিব্যক্ত। তেমনি চৈতন্য যখন কর্ম্ম বা শক্তিকে (energy) আশ্রয় করে, আমরা তাকে প্রাণময় কোষের অভিব্যক্তি বলে ধরি। যখন কোন আবেগ বা অনুভূতিকে (feeling) আশ্রয় করে, তাকে মনোময় কোষের অভিব্যক্তি; এবং যখন চিন্তাকে বা বুদ্ধিকে (thought or intellect) আশ্রয় করে, তখন তাকে বিজ্ঞানময় কোষের অভিব্যক্তি বলে থাকি। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে চৈতন্য এই চারিটী কোষেই কম-বেশী কাজ করে—কিন্তু এক এক জন ব্যক্তির মধ্যে এক এক কোষে চৈতন্যের অভিব্যক্তি বেশী। কারো চৈতন্য হয় ত অন্নময় কোষে বেশী জাগ্রত, কারো হয় তো প্রাণময়ে, কারো বা মনোময়ে এবং কারো বা বিজ্ঞানময়ে। যার চৈতন্যের লীলা যে কোষ আশ্রয় করে বেশী ফোটে, তার প্রকৃতি সেই ভাবের হয়; এবং তার প্রকৃতির সঙ্গে তার হাতের গড়নের অবিকল মিল থাকে। বাস্তব হাতের লোকের চৈতন্যের খেলা অন্নময় কোষে বেশী—কর্ম্মী হাতের লোকের চৈতন্য প্রাণময়ে বেশী জাগ্রত—ভাবুক হাতের লোকের চৈতন্য মনোময়ে বেশী অভিব্যক্ত—এবং জ্ঞানী হাতের লোকের চৈতন্য বিজ্ঞানময়ে অধিকতর প্রস্ফুটিত।

হাতের গড়ন হিসাবে প্রকৃতি বর্ণনা করবার আগে হাতের সম্বন্ধে আরও দু একটি কথা বলা দরকার। গোটাকত হাত নিয়ে তাদের তেলোগুলি কেউ যদি টিপে দেখেন, তাহলে দেখতে পাবেন, সবগুলি সমান নয়। কোন হাতের তেলো খুব শক্ত, কোন হাতের তেলো খুব নরম এবং কোন হাতের তেলো খুব নরমও নয় খুব শক্তও নয়—মাঝামাঝি। স্পর্শ হিসাবে হাতের তেলোকে এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় (১) নরম (২) শক্ত এবং (৩) মাঝারি। এর দ্বারা বোঝা যায়, প্রকৃতির গতি কোন্ দিকে হবে। সাধারণতঃ নরম হাত নির্দ্দেশ করে চাঞ্চল্য বা গতি, শক্ত হাত দৃঢ়তা বা স্থৈর্য্য এবং মাঝামাঝি হাত সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য। নরম, শক্ত ও মাঝামাঝি হাতের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করতে গেলে চার শ্রেণীর হাতের সংশ্রবে তাদের অর্থ বোঝা প্রয়োজন।

বাস্তব হাত

একে গড়ন হিসাবে চৌকা হাত এবং দার্শনিক পরিভাষায় অন্নময় হাত বলা হয়েছে। একে প্রয়োজনবাদীর হাত বা কাজের লোকের হাত বলা যেতে পারে। এই হাতের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে সব জিনিসকে প্রয়োজন বা

পার্থিব উপযোগিতার দিক থেকে লক্ষ্য করা। এই হাতের লোকেরা প্রত্যেক বিষয়ের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ দিকটাই সহজে বুঝতে পারেন। এঁরা প্রায়ই রক্ষণশীল।—চিরাগত প্রথা মেনে চলতে এবং রুটিন মাফিক কাজ করে যেতে এঁরা খুব পটু; কিন্তু তার কারণ এ নয় যে, তাঁরা সেই প্রথার উপকারিতা বুঝেছেন—তাঁদের আসল প্রকৃতি হচ্চে সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে কাজ করা। এঁরা কাজকর্ম্মে সহজে সমাজের বিরুদ্ধে যেতে চান না,—দশজনে যা করে তাঁরাও তাই করেন। তাঁরা যে মোটে বদলান না তা নয়—কিন্তু তাঁরা অগ্রণী হয়ে সহজে কোন কাজ করতে রাজী নন। সমাজের নিয়ম যদি আজ উল্টে যায়, তাহলে তাঁরা পুরানো নিয়ম ছেড়ে নতুন নিয়ম বিনাবাক্যব্যয়ে মেনে চলবেন—তা সে যতই অসঙ্গত হোক। এঁরাই সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। যে কাজ শ্রেণীর ভাগ লোকে করে এঁরাও তাই করে যান; তার ভালমন্দ বিচারের ভার তাঁরা নেন না। অথবা যদিই বা বিচার করেন এবং বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ন, তাহলেও নিজের মত অনুসারে কাজ করতে সাহসী হন না। বাস্তব-হাতের লোকের মৌলিকতা এবং কল্পনাশক্তি কম; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট পথে একভাবে পরিশ্রম করবার ক্ষমতা এবং অধ্যবসায় খুব বেশী। এতে করে অনেক সময় তাঁরা তাঁদের অধিকতর প্রতিভা-সম্পন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীকেও পরাস্ত করতে পারেন। যে বিজ্ঞান যে বিদ্যা কাজে লাগে তাই তাঁদের বেশী প্রিয়। ব্যবসা বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতির দিকে তাঁদের খুব ঝোঁক। তাঁরা প্রায়ই সত্যপ্রিয় ও খাড়া প্রকৃতির লোক হ'ন। তাঁদের প্রধান দোষ—তাঁরা সব জিনিস নিজের বুদ্ধির গজ-কাঠির মাপে মেপে নিতে চান। এই শ্রেণীর মধ্যে তিন রকমের লোক পাওয়া যায়—(১) যাঁদের হাতের তেলো শক্ত এবং ঊর্দ্ধ রেখাটি মোটেই নেই বা অতি সামান্যভাবে বা বিশ্রীভাবে আছে; (২) যাঁদের হাতের তেলো নরম এবং ঊর্দ্ধরেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে আছে; (৩) যাঁদের হাতের তেলো মাঝা মাঝি এবং ঊর্দ্ধরেখা পরিষ্কার না হোক অন্ততঃ স্পষ্ট। হাতের তেলোর মাঝখান দিয়ে যে রেখা কব্জির দিক থেকে আঙুলের দিকে সোজা উঠে যায়, তাকেই ঊর্দ্ধরেখা কিংবা বাস্তব রেখা বলে (চিত্র দেখুন)। *

যে সব বাস্তব হাতে ঊর্দ্ধ রেখা মোটে নেই, আঙুলগুলি চৌকা এবং বেঁটে বেঁটে আর হাতের তেলো শক্ত, তা একেবারে জড় প্রকৃতির নির্দ্দেশক। এ রকম হাতের লোকেদের বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের উপরে যেতে পারে না। এরা সাধারণতঃ অবস্থার দাস—যে ভাবে যে অবস্থায় থাকে তার পরিবর্ত্তন করতে চায়ও না, পারেও না। অসভ্য বুনো এবং কুলী মজুরদের মধ্যে এই হাত অনেক দেখতে পাওয়া যায়। এদের মন সাধারণতঃ পশু মনের এক ধাপ উপরে। কিন্তু খাবার পরবার জন্যে যা নিত্যকর্ম্ম তা ছাড়া অন্য কাজ এরা বোঝেও না, করেও না। জলজলে চকচকে রং এবং মিষ্ট সুর তাদের আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু শিল্প বা কলার কোন ধারণা তাদের নেই। তারা শুধু নিজের ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির দ্বারাই পরিচালিত হয়,—বুদ্ধি বা বিবেচনার স্থান তাদের মধ্যে নেই। সৌভাগ্যের বিষয় এ রকম হাতের সংখ্যা বাংলাদেশে খুব কম, এমন কি কুলী মজুরের মধ্যেও। এদের জীবন উদ্ভিদ-জীবন,—এরা জন্মায়, খায় দায়, ঘুমোয় এবং মরে। জ্ঞানময় জগতে এদের অস্তিত্বের ছাপ মোটেই পড়ে না। এই রকম হাতে যদি ঊর্দ্ধ রেখার একটু চিহ্ন থাকে, কিম্বা হাতের আঙুলগুলি নেহাৎ বেঁটে না হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বুদ্ধির আভাস কতকটা দেখা যায় বটে; কিন্তু তা হলেও তারা স্বার্থপর, আত্মসর্ব্বস্ব এবং বৃথাগর্ব্বী হয়ে থাকে। নিজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে তাদের খুব উচ্চ ধারণা থাকে—তাহাতেই তারা যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করে! এ রকম লোক হয় ত টাকাকড়ি হিসাবে ভাগ্যবান্ হতে পারে; কিন্তু তবুও তাদের উদ্ভিদ-জীবন,—চৈতন্যের উঁচু স্তরগুলি তাদের কাছে লুকানোই থেকে যায়। তারাও বোঝে কেবল টাকা রোজগার আর জীবন ধারণ। টাকা কড়ির হিসাবে উন্নতি করলেও তারা অবস্থার দাস এবং উন্নতি ততটা তাদের কৃতিত্বের ফল নয় যতটা ভাগ্যের।

• বাস্তব হাতের তেলো যদি নরম হয় এবং ঊর্দ্ধরেখা যদি স্পষ্ট আর পরিষ্কারভাবে আঁকা থাকে, তাহলে বাস্তব হাতের

* পাশ্চাত্যমতে এই রেখাকে ভাগ্যরেখা (Line of fate) বলা, হয়ে থাকে। কিন্তু তা কতদূর ঠিক তা বলা যায় না। পরবর্ত্তী পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদ্‌গণ একে Line of Career বা কর্ম্মজীবনের রেখা বলেছেন। আসলে এ রেখা জাতকের বাস্তব বা স্থূল পারিপার্শ্বিক নির্দ্দেশ করে। এই রেখা যাঁর হাতে স্পষ্ট—তাঁর পারিপার্শ্বিক তাঁর চৈতন্যের মধ্যে স্পষ্ট তরঙ্গের সৃষ্টি করবেই—তা সে সুখকর হোক আর দুঃখজনকই হোক।

ভাল গুণগুলি চমৎকার ভাবে প্রকাশ পায়। এ রকম হাতের আঙুল লম্বা না হলেও মানান-সই হয়ে থাকে। এই হাতের লোক স্থূল জগতে বাস্তব কাজ করতে চান বটে, কিন্তু তাঁদের প্রত্যেক কাজের পিছনে সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির একটা সুন্দর আদর্শ থাকে; অর্থাৎ যে কাজে দেশের বা দশের বাস্তবিক বা প্রত্যক্ষ উপকার নেই, সে কাজে তাঁরা বড় একটা অগ্রসর হন না; কিন্তু তাঁরা যে কাজে লাগেন, তাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করতে চান। এই হাতের লোকের উচ্চাভিলাষ প্রবল; কিন্তু সে উচ্চাভিলাষ কখনও সীমা অতিক্রম করে না। তাঁদের ব্যবহারিক ও পার্থিব ব্যাপারের জ্ঞান খুব প্রবল।

যে কাজে সংগঠন শক্তি এবং সহজ জ্ঞানের দরকার, তাতে এঁদের বিশেষ পারদর্শিতা দেখা যায়। এঁদের মধ্যে কর্ম্মতৎপরতা ও অধ্যবসায় একসঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। এঁরা সামাজিক, অথচ এঁদের একটা গণ্ডী আছে যা সহজে এঁরা অতিক্রম করেন না। স্নেহ প্রীতির অনুভূতি এঁদের আছে; কিন্তু স্বভাবতঃ সংযমী বলে এঁদের মনের আবেগ বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। এঁরা সংস্কারের পক্ষপাতী; কিন্তু সে সংস্কারের ধারণাও এঁদের ব্যবহারিক সহজ জ্ঞানকে অনুসরণ করে। এঁরা স্বাধীনতা-প্রিয় এবং স্বাধীনচেতা লোক এবং নিজের দিকে ও নিজের স্বার্থের দিকে এঁদের সতর্ক দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু এঁরা একেবারে আত্ম-সর্ব্বস্ব ন'ন—এঁরা যেমন নিজের প্রাপ্য পেতে চান, তেমনি পরের দেনাও কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে ইচ্ছুক। ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় এঁদের স্বাভাবিক দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়; এবং যদিও এঁরা বাস্তব জগতেই কাজ করতে-ভালবাসেন, তবুও বাস্তব জগতের প্রকৃত মূল্য এঁরা বোঝেন—খাঁটি ভাববাদীর মত তাকে একেবারে তুচ্ছ করেন না কিম্বা পুরো জড়বাদীর মত তাকেই সব বলে ভাবেন না। এই হাতে ঊর্দ্ধরেখা স্পষ্ট না থাকলে জড়বাদ এবং স্বার্থপরতার আধিক্য হয়। সে ক্ষেত্রে ঐ রকম হাতের লোক নিজের কাজ এবং নিজের পারিপার্শ্বিককেই সব চেয়ে বড় বলে মনে করে থাকেন।

বাস্তব বা চৌকা হাতের তেলো যদি খুব শক্তও না হয়, খুব নরমও না হয়, অর্থাৎ মাঝামাঝি হয়, এবং ঊর্দ্ধ রেখার আঁক পরিষ্কার বা বড় না হলেও স্পষ্ট থাকে, তাহ'লে তা সাধারণতঃ সতর্কতা ও সাবধানতার সূচনা করে। এই রকম হাতের লোক প্রায় হিসাবী ও সাবধানী হয়ে থাকেন; এবং সহজে কোন অজানা ব্যাপারে হাত দিতে চান না। বেশ হিসাব করে এবং চারদিক দেখে শুনে কাজ করতে চান। এঁরা কোন দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে সহজে রাজী হন না; অন্যের অধীনে অথবা অন্যের সাহচর্য্যে কাজ করতে পেলেই এঁরা থাকেন ভাল। এঁদের জীবন প্রায়ই একঘেয়ে ভাবে কাটে। এঁরা সাধারণতঃ সেই সব কাজ করে থাকেন যা বরাবর সব লোকে করে আসচে। সাধারণ চাকরী এবং আবহমান কালের প্রচলিত প্রোফেসন বা ব্যবসা এঁদের প্রিয়।

এঁরাও সাধারণতঃ নিজের স্ত্রীপুত্র-পরিবার নিয়ে নিজের নিয়মিত কাজ করে নির্ঝঞ্ঝাটে জীবন কাটাতে ভালবাসেন, পরের জন্য ভাবনা চিন্তায় মাথা গরম করতে এঁরা নারাজ। নতুনকে এঁরা বড় ভয় করেন—সেইজন্য এঁরা সব রকম সংস্কারের বিরোধী—এঁরা তাড়াতাড়ি বা ঝোঁকের মাথায় কোন কাজ করেন না। চারদিক গুছিয়ে, ধীরে সুস্থে ধাপে ধাপে এঁরা কাজে অগ্রসর হ'ন। এঁদের মধ্যে যে প্রতিভাশালী বা শক্তিমান্ ব্যক্তি নেই, তা নয়; কিন্তু এঁদের অতি-সাবধানতা এবং অজানার উপর ভয়ের জন্য এঁরা অনেক সময় সুযোগ পেয়েও তাকে কাজে লাগাতে পারেন না। এই রকম হাত ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এবং সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে অনেক দেখা যায়। আমাদের দেশে সাধারণ জমীদার, গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী প্রভৃতির মধ্যেও এ রকম হাত পাওয়া যায়। এঁদের কাছেও সাধারণতঃ জীবনের সৌন্দর্য্যের দিকটা গুপ্তই থেকে যায়। এই রকম হাতে যাঁদের ঊর্দ্ধরেখা বেশ স্পষ্ট ও পরিষ্কার—তাঁরা দায়িত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণও করেন এবং তা বিচক্ষণতা ও ধীরতার সঙ্গে সমাধাও করেন। এঁরা শান্তিপ্রিয় এবং শান্তিরক্ষার জন্য ও নিজের কাজ সুসম্পন্ন করবার জন্য অনেক সময় কৌশল ও কূটনীতি অবলম্বন করে থাকেন। এঁরা দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদের যোগ্য এবং অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির মধ্যে এই হাত দেখতে পাওয়া যায়।

কর্ম্মী হাত

গড়ন হিসাবে একে মাথা-মোটা হাত এবং দার্শনিক পরিভাষায় প্রাণময় হাত বলা হয়েছে। এই হাতের প্রধান লক্ষণ হচ্চে কর্ম্মশীলতা এবং প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য।

এই হাতের লোক এক ভাবে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। যদি হাতের কাছে কাজ না থাকে তাহ'লে এঁরা কাজ তৈরী করে নেবেন। কাজই এঁদের প্রধান

লক্ষ্য—সে কাজে কি ফল হ'বে, সে কাজ ভাল কি মন্দ, তার বিবেচনা এঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম।

এই হাতের লোকের মধ্যে সেইজন্য হঠকারিতা ও পরিবর্ত্তন-প্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এঁরা এক জায়গায় বসে একঘেয়ে কাজ করতে ভালবাসেন না; এবং সব বিষয়ে সংস্কারের পক্ষপাতী। এঁরা সাধারণতঃ সাহসী হয়ে থাকেন—সব রকমের সাহসিক কাজে এঁদের অগ্রণী হতে দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা কাজ না পেলে আল্পস পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করেন, বিমানপোতে চড়ে পৃথিবী ঘোরেন—গৌরীশঙ্করের মাথায় উঠবার অভিযান করেন। এঁদের সামনে রাতদিন কাজ যোগান চাই। এঁরা যদি কাজ না পান, তাহ'লে তৈরী জিনিস ভেঙে আবার গড়বেন। এই কাজের নেশার জন্য, এই শ্রেণীর লোকের মধ্যে খুব ভাল ও খুব মন্দ দুরকম লোকই দেখা যায়। উত্তেজনাপূর্ণ কাজের দিকে ঝোঁক বলে অনেক সময় এঁদের প্রকৃতি নিকৃষ্ট আমোদ আহ্লাদ এবং নষ্টামি গুণ্ডামিকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত হয়। আবার কর্ম্মী, দেশহিতৈষী, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্মপ্রচারক, আবিষ্কারক, প্রভৃতির মধ্যেও এই হাত দেখা যায়। যে সব বালকের এই রকম হাত, তাদের অভিভাবকদের উচিত—খুব সতর্কভাবে তাদের পরিচালনা করা। লেখা পড়াই হোক, খেলাধুলাই হোক, সব জিনিসের মধ্য দিয়ে তাদের চাই উত্তেজনা ও নূতনত্ব। কাজেই একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর মুখস্থ করা কিম্বা রুটিন মাফিক কাজ তাদের দিয়ে করাতে গেলে তাদের প্রকৃতি বিগড়ে যেতে পারে। বাস্তব হাতের মত কর্ম্মী হাতেরও তিন প্রকার ভেদ পাওয়া যায়।

১ম—যে হাত খুব নরম এবং শক্তি-রেখা * অস্পষ্ট কিম্বা বিশ্রীভাবে আঁকা। হাতের পাশে বুড়ো আঙুল আর তর্জ্জনীর মাঝামাঝি জায়গা থেকে উঠে যে রেখা হাতের তেলোর মাঝে এড়োভাবে এসে উপস্থিত হয়, তাকে শক্তি-রেখা—প্রাণ রেখা বা নাড়ী রেখা বলা হয় (চিত্র দেখুন)। এই লোক অত্যন্ত হঠকারী হয়ে থাকেন। উত্তেজনার নেশা ও আমোদপ্রিয়তা এঁদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। সেই জন্য অসৎসঙ্গে পড়লে এঁদের প্রকৃতির নিকৃষ্ট দিকটাই বেশী অভিব্যক্ত হয়ে পড়ে। তখন নেশা, জুয়াখেলা, ব্যভিচার প্রভৃতির উত্তেজনাই এঁদের চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই হাতের লোক প্রায়ই অব্যবস্থিত-চিত্ত হয়ে থাকেন এবং এঁরা সহজে কারো বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী হন না। ধরা-বাঁধা নিয়ম মেনে ভালমানুষটির মত জীবন কাটিয়ে যাওয়া এঁদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। এঁদের মধ্যে বহু কাজের যোগ্যতা আছে; কিন্তু এঁরা এক কাজে প্রায়ই বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারেন না। অজানার দিকে একটা টান এঁদের সাংসারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে সহজে উন্নতি করতে দেয় না। এঁরা কি চান, তাহা সব সময় নিজেই ঠিক বোঝেন না; সেই জন্য এদের অতর্কিতভাবে মত পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়। এঁদের প্রায়ই মৌলিকত্ব থাকে—যে কোন কাজই হোক্—এঁরা তা সম্পূর্ণ নিজের মতে এবং নিজের মতলবে করতে চান—তাতে ভালই হোক আর মন্দই হোক। পাঁচজনের গোড়ে গোড় দিয়ে চলা কিম্বা পাঁচজনের মুখ পানে চেয়ে কাজ করা এঁদের পোষায় না। কবি যাঁদের "লক্ষ্মীছাড়ার দল" বলেছেন, এঁরা সেই বেপরোয়া মনুষ্য-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের হয় ত অনেক খেয়াল আছে, এঁরা হয় ত অনেক সময় সমাজের হিতকর নিয়মগুলিও মানতে চান না। এঁদের মধ্যে অনেকে হয় ত বিদ্রোহী, হয় ত চরিত্রহীন, হয় ত মদ্যপ, হয় ত জুয়ারী, কিন্তু এঁদের প্রধান লক্ষ্য অচলায়তন ভেঙে চুরমার করা। এঁদের মধ্যে কারো যদি শক্তিরেখা এবং ঊর্দ্ধরেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত হয়, তাহ'লে তার দ্বারা পৃথিবীর সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পক্ষে অনেক সাহায্য হয়ে থাকে।

২য়—কর্ম্মীহাতের মধ্যে যে হাতের তেলো শক্ত এবং শক্তিরেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে আঁকা। কর্ম্মীহাতের মধ্যে এই রকম হাতই সব চেয়ে ভাল। এই হাতের লোক যেমন কর্ম্মতৎপর ও উদ্যমশীল, তেমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে থাকেন। বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্পের দিকে এঁদের প্রায়ই ঝোঁক থাকে। এঁরা যে কাজেই যান, সব যায়গায় নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলেন। এঁরা স্বাধীনতাপ্রিয় হয়ে থাকেন, এবং সব কাজ নিজের মতে নিজের ভাবে করতে ভালবাসেন। এঁদের আত্ম-প্রত্যয় খুব প্রবল। নিজের কাজ এবং নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে প্রায়ই একটা

* পাশ্চাত্য হস্তরেখাবিদ্‌রা একে Line of head বলে উল্লেখ করেন। হিন্দু সামুদ্রিক বেত্তাদের মতে এই রেখা—প্রাণরেখা। এ দেশের সাধারণ সামুদ্রিকবেত্তারা কেউ একে পিতৃরেখা বলেন—কেউ বলেন মাতৃরেখা।

গর্ব্ব দেখা যায়। অবশ্য যোগ্যতার জন্য সে গর্ব্ব মার্জ্জনা করা যেতে পারে। যে-কোন ব্যাপারে হোক, এঁরা কিছু না কিছু মৌলিকতার পরিচয় দেবেনই। সাধারণতঃ কলকব্জা, ডিজাইন প্রভৃতির কাজে এঁদের সাধারণ যোগ্যতা দেখা যায়। এঁদের ব্যবহারিক বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি বেশ চমৎকার হয়ে থাকে এবং এঁদের মধ্যে প্রেরণা এবং অন্তর্দৃষ্টিও যথেষ্ট প্রবল। কোন্ জায়গায় কি ভাবে কাজ করলে তা সবচেয়ে ফলপ্রদ হবে, সে বিষয় এঁদের জ্ঞান অপরিসীম। এঁদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের ভাব সবচেয়ে প্রবল এবং সব যায়গায় সব বিষয়ে এঁরা বৈজ্ঞানিক নিয়মের অভিব্যক্তি দেখতে চান। সব রকমের নূতনত্বপূর্ণ ও নবাবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে এঁরা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন। ইলেক্‌ট্রিক্, রেলওয়ে, এরোপ্লেন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত অনেকের মধ্যে এ রকম হাত দেখা যায়। অনেক আবিষ্কারক, উদ্ভাবক, যন্ত্রশিল্পী ইঞ্জিনিয়ারেরও এই রকম হাত *। এই রকম হাতে যদি শক্তি-রেখা স্পষ্ট বা পরিষ্কার না থাকে তাহলে তা একগুঁয়েমি এবং বিবাদ-প্রবণতা নির্দ্দেশ করে। এই রকম হাতের লোক স্থানে অস্থানে নিজের গৌরব প্রচার এবং প্রভুত্ব স্থাপন করতে চান এবং অনেক সময় বিবাদে প্রবৃত্ত হ'ন কেবল প্রতিপক্ষের উপর জয়লাভের আকাঙ্ক্ষায়। পরের দোষ বা খুঁত এঁদের সহজেই নজরে পড়ে এবং পরের দুর্ব্বলতা দেখে সেখানে মর্ম্মান্তিক আঘাত করতে মোটেই বাধে না। এঁরা লোক-প্রিয় হতে না পারলেও লোকে এঁদের ভয় ও সমীহ করে চলে ব'লে এঁরা সহজেই অন্যের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারেন।

অন্য—কর্ম্মীহাতের মধ্যে যে হাতের তেলো খুব শক্তও নয় কিম্বা খুব নরমও নয়, আর যে হাতে শক্তিরেখা খুব স্পষ্ট ও পরিষ্কার না হলেও নিতান্ত অস্পষ্ট কিম্বা বিশ্রী নয়। এই হাতের লোক সাধারণতঃ একটু খেয়ালী প্রকৃতির হয়ে থাকেন। এঁরাও উত্তেজনা ভালবাসেন এবং খেলাধূলা প্রভৃতির দিকে এঁদের ঝোঁক খুব বেশী। এঁরা একটু খিটখিটে বা খুঁতখুঁতে প্রকৃতির লোক। এঁদের মধ্যে প্রতিভা এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা যেতে পারে বটে, কিন্তু সে প্রতিভার পূর্ণ স্ফূর্ত্তি এঁদের প্রায়ই হয় না। এঁদের মধ্যেও চাঞ্চল্য খুব বেশী দেখা যায়—সেই জন্যই এঁরা যথেষ্ট যোগ্যতা সত্ত্বেও কোন কাজ শেষ করে উঠতে পারেন না। এঁদের মধ্যেও বৈচিত্র্যের দিকে একটা আকর্ষণ লক্ষিত হয়। এঁদের মধ্যে দ্বন্দ্বভাব খুব প্রবল এবং এই দ্বন্দ্বভাবের জন্যই এঁদের এক সময় অসম সাহসী আবার অন্য সময় ভীরু বলে মনে হয়। এঁদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব আছে বটে, কিন্তু হঠাৎ কোন কাজ করতে হলে, কিম্বা হঠাৎ কোন কথা বলতে হলে, একটু থতমত ভাব প্রকাশ পেতে পারে। এঁরা একটা কাজ আরম্ভ করবার সময় অদম্য উৎসাহের সঙ্গে লেগে পড়েন; কিন্তু কাজ যত অগ্রসর হয়, ততই তাঁদের উৎসাহ কমে আসে এবং শেষে সে কাজ অসমাপ্ত রেখে আবার নূতন কাজের দিকে ছোটেন। এঁদের এই স্বভাবের জন্য অন্য লোকের অধীনে বা অন্য লোকের সহযোগে কাজ করলেই এঁদের কৃতিত্ব প্রকাশ পায় বেশী। এঁদের মধ্যে বহুতর কাজের যোগ্যতা আছে এবং সব রকম হাতের কাজের দিকে এঁদের ঝোঁক বেশী। ভাল শিক্ষা পেলে এঁরা সাহিত্যিক এবং শিল্পী হতে পারেন—কিন্তু সে ক্ষেত্রেও ছোট ছোট রচনা কিম্বা শিল্পে এঁদের প্রতিভা ফোটে বেশী—যাতে একটানা পরিশ্রম দরকার এমন কোন কাজ এঁদের পোষায় না। অশিক্ষিত হ'লেও এঁদের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ হয় এবং মিস্ত্রী বা কারিগরের কাজে এঁদের স্বাভাবিক পটুত্ব দেখা যায়। এঁদের মধ্যে যাঁর হাতে শক্তি-রেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কার থাকে তিনি কর্ম্মজগতে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করতে পারেন; কিন্তু যাঁর হাতে শক্তিরেখা অস্পষ্ট বা অপরিষ্কার, অব্যবস্থিত-চিত্ততার জন্য তিনি "হতে পার্ত্তেম"এর দলেই থেকে যান।

* এই হাতের লোক সব সময়ই বেশ সপ্রতিভ এবং আত্মস্থ হয়ে থাকেন। যে অবস্থায় যে ভাবেই থাকুন—এঁদের ব্যক্তিত্ব সহজে নষ্ট হয় না। যে পুরুষের এই রকম হাত স্ত্রীলোকেরা অতি সহজেই তাঁর দিকে আকৃষ্ট হ'ন এবং তাঁর সহস্র অপরাধ অনায়াসে মার্জ্জনা করে থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের পছন্দ ও না-পছন্দ খুব পরিষ্কার ভাবে নির্দিষ্ট, এবং এঁদের মধ্যে দোমনাভাব কিছু নাই। এঁরা এঁদের বক্তব্য বেশ জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করেন। এঁদের বাক্যের মধ্যে যুক্তির চেয়ে শক্তি বেশী; কথার মধ্যে এমন একটা দৃঢ়তা আছে যা সহজেই লোককে অভিভূত করে ফেলে।

ভাবুক হাত

গড়ন হিসেবে একে ছুঁচলো হাত এবং দার্শনিক পরিভাষায় মনোময় হাত বলা হয়েছে। সহানুভূতি এই হাতের প্রধান লক্ষণ।

এই হাতের লোক অতিমাত্রায় ভাবপ্রবণ হয়ে থাকেন। এঁদের সব কাজ হৃদয় বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে অভিব্যক্ত হয়। যে কাজ এঁদের মনে লাগে এঁরা তাই করেন—যুক্তি বা বিচারের স্থান সেখানে নাই। এঁরা ভাবের দ্বারা এমনি অভিভূত হয়ে থাকেন যে, সংযমের কথা এঁদের মনেও আসে না। অনুভূতির প্রাবল্যের জন্য এঁদের মুহুর্মুহু ভাব পরিবর্ত্তন হয়। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ দ্বারা সহজেই বিচলিত হ'ন এবং সব রকম সৌন্দর্য্য তীব্রভাবে উপভোগ করেন। সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণের জন্য এঁরা যে কোন শিল্প বা কলার দিকে অতি সহজে ঝুঁকে পড়েন; কিন্তু ধীরতার অভাব এবং শ্রমে বিরাগের জন্য তা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারেন না। কাজেই এঁদের বহুতর বিষয়ের জ্ঞান থাকলেও কোন বিষয়ে পরিপূর্ণ দক্ষতা প্রায়ই দেখা যায় না। এঁদের কারো কারো শিল্পে বা কলায় মাঝে মাঝে প্রতিভার চমক লক্ষিত হতে পারে; কিন্তু তা ততটা শিক্ষা বা সাধনার ফল নয়, যতটা সহজাত সংস্কারের—শিল্প বা কলার একটা সহজ জ্ঞান থাকলেও তার বিজ্ঞানের দিকটা তাঁদের কাছে প্রায় অন্ধকারই থেকে যায়। যে কবির এই রকম হাত তিনি ছন্দ বা অলঙ্কারে বিজ্ঞানের বড় একটা ধার ধারেন না—তিনি বোঝেন কাণে ভাল লাগলেই হ'ল। এই হাতের চিত্রকর ছায়ালোক বা বর্ণবিন্যাসের বিজ্ঞান না বুঝেও নিজের দৃষ্টির উপর নির্ভর করে ছবি আঁকেন। সঙ্গীতজ্ঞ রাগ রাগিণী মিড় গমক মূর্চ্ছনা গিটকিরির সম্যক জ্ঞান না থাকলেও নিজের সহজ জ্ঞান দিয়ে রসোদ্ভাবন করে থাকেন। এই হাতের অভিনেতা অভিনয়ের কলাকৌশল না বুঝেও গৃহীত ভূমিকার ভাবে ভাবিত হয়ে সুন্দর অভিনয় করতে পারেন। বক্তা বক্তৃতায় যুক্তি না থাকলেও আবেগের প্রাবল্য দিয়ে তাকে প্রাণস্পর্শী করে তোলেন। মোট কথা তাঁদের কাছে সব জিনিস অভিব্যক্ত হয় অনুভূতির মধ্য দিয়ে।

অন্যান্য হাতের মত ভাবুক হাতেরও তিনটি শ্রেণী আছে।

১ম—যে হাত খুব নরম এবং যে অনুভূতিরেখা অস্পষ্ট অথবা বিশ্রীভাবে আঁকা। তর্জ্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের মাঝের যায়গাটুকু থেকে উঠে যে রেখা বুড়ো আঙ্গুলের নীচের উঁচু যায়গাটিকে বেষ্টন করে কব্জির কাছে অথবা কব্জিতে শেষ হয়েছে তাকে অনুভূতি রেখা * বলে (চিত্র দেখুন)।

এই হাতের লোকের সহানুভূতি অত্যন্ত প্রবল। যখন যে রকম সমাজে গিয়ে পড়েন, তখন তার ভাবে ভাবিত হয়ে ওঠেন। কাজেই সমাজে মেশবার যথেষ্ট যোগ্যতা এঁদের মধ্যে থাকলেও এঁদের মতির স্থিরতা খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। এঁদের আবেগ অতি প্রচণ্ড—কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। ঝোঁকের মাথায় কাজ করা এঁদের স্বভাব,—তার পরে হয় ত তাঁরা কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করেন। রোমান্সের দিকে এঁদের ঝোঁক খুব বেশী এবং শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের যে কোন সৌন্দর্য্য এঁদের খুব শীঘ্র খুব সহজে এবং খুব তীব্র ভাবে আকর্ষণ করে। অত্যন্ত আবেগশীল বলে সব জিনিস অতিরঞ্জিত করে এবং রস দিয়ে বর্ণনা করতে তাঁরা প্রায় পটু হ'ন। কিন্তু একনিষ্ঠা বলে কোন জিনিষ এঁদের মধ্যে নেই। এঁরা কোন কাজেই বেশী দিন টিঁকে থাকতে পারেন না—তবে যদি কোন কাজের প্রকৃতি এ রকম হয় যে তাতে ঘন ঘন পরিবর্ত্তন আছে, তাহ'লে সে কাজে তাঁরা স্থায়ী হতেও পারেন। এই হাতের লোকের প্রকৃতি সমুদ্রের মতই পরিবর্ত্তনশীল। এঁরা অতি তুচ্ছ কারণেই রেগে যান—আশার ক্ষীণ ইঙ্গিতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন—আশঙ্কার আভাস মাত্রেই বিহ্বল হয়ে পড়েন—সামান্য বাধাতেই হতাশ্বাস ও নিরুদ্যম হয়ে পড়েন, পরের সামান্য দুঃখ কষ্টের কথা শুনলেই এঁদের হৃদয় বিগলিত হয়;—মোট কথা, এঁদের হৃদয় যেন বিচলিত হবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এঁদের হৃদয়ের অভিজ্ঞতার সংখ্যা করা যায় না; কিন্তু হায়, এঁরা নটের মত অভিনয়ই করে যান—কোন অভিজ্ঞতা এঁদের হৃদয়ে স্থায়ী রেখা আঁকতে পারে না।

এঁরা সহানুভূতিসম্পন্ন বটে এবং পরের দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করতে পারেন বটে, কিন্তু কারো জন্য নিজের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিতে রাজী ন'ন। এঁরা পরের উপকার করতে পারেন সেইখানে যেখানে নিজের সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অভাব না হয়। অবশ্য এঁরা ঠিক কৃপণ নন—টাকাকড়ির উপর এঁদের বিশেষ মমতা দেখা যায় না—কিন্তু এঁদের অনুভূতি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বলে, ব্যক্তিগত

* প্রাচ্য যোগীরা একে মনোময় বলেন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ একে বলেন Line of life বা আয়ুরেখা—কিন্তু তা যুক্তিসঙ্গত নয়। একে বলা উচিত Line of Sensation। ভারতীয় সাধারণ সামুদ্রিক-বেত্তারা কেউ বা একে বলেন মাতৃরেখা, কেউ পিতৃরেখা।

দুঃখ কষ্টকে এঁরা বাঘের মত ভয় করেন—কষ্ট এঁরা মোটে সহ্য করতে পারেন না—ব্যক্তিগত সামান্য দুঃখেই অভিভূত হয়ে পড়েন। নিজের ব্যক্তিগত অভাব পূর্ণ হয়ে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে এঁরা অকাতরে দান করেন—কিন্তু এঁদের দান প্রায়ই অপাত্রে পড়ে। কেন না এঁদের হৃদয় যে মুহূর্ত্তে বিচলিত হয় সেই মুহূর্ত্তেই দান করেন—বিবেচনার অবসর এঁদের থাকে না। কাজেই দান করেও এঁরা অনেক সময় হাস্যাস্পদ হ'ন।

মোটের ওপর এই হাতের লোক প্রায়ই কাজের লোক হতে পারেন না এবং তাঁদের জীবন প্রায়ই নিষ্ফল হয়ে যায়।

এঁরা অত্যন্ত ভাবপ্রবণ বলে এঁদের মধ্যে গতানুশোচনা অত্যন্ত প্রবল হয় এবং অনেক সময় কি কর্ত্তে পার্ত্তুম এই চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকাতে এঁদের সামনে দিয়ে বড় বড় সুযোগ অলক্ষিতভাবে সরে যায়।

এই হাতের লোকের মধ্যে যাঁদের অনুভূতি-রেখা স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয় এবং শক্তি-রেখা সোজা ও মানানসই হয়, তাঁরা তাঁদের কাব্য ও শিল্পের সহজজ্ঞান বাস্তব কর্ম্মে প্রয়োগ করে জীবন সফল করে তুলতে পারেন।

২য়—ভাবুক হাতের মধ্যে যে হাতের তেলো বেশ শক্ত এবং সহানুভূতি-রেখা সুস্পষ্ট ভাবে আঁকা। এই হাতের লোকের পছন্দ এবং না-পছন্দ অতি পরিষ্কার ভাবে নির্দ্দিষ্ট। এঁরা খুব ভাবপ্রবণ বটে, কিন্তু এঁদের হৃদয়ের বেগ সহজে বাইরে প্রকাশ পায় না। এঁদের মনের ভাবের মধ্যে মাঝামাঝি কিছু নেই। একজন লোককে দেখলেই এঁরা হয় তাকে ভালবাসবেন—না হয় ঘৃণা করবেন। আবার যাকে এঁরা ভালবাসেন—তাকে প্রাণ দিয়েই ভালবাসবেন—যাকে ঘৃণা করবেন তাকে অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করবেন। এঁদের মনোবৃত্তি অন্তঃসলিলা নদীর মত দৃষ্টির অগোচর থাকলেও তার বেগ প্রায়ই অতি তীব্র হ'য়ে থাকে। সেইজন্য এঁদের বিশেষ সংযম অভ্যাস দরকার—কেন না প্রচণ্ড মনোবেগের বশীভূত হয়ে এঁরা এমন কাজ করে বস্‌তে পারেন, যার ফলে এঁদের সারাজীবনটা ব্যর্থতায় পূর্ণ হয়ে যেতে পারে। এঁদের বাইরে থেকে দেখ্‌তে নিরীহ বোধ হ'লেও এরা অতি-মাত্রায় উত্তেজনাপ্রিয় ও ঈর্ষাপ্রবণ। এঁরা সব জিনিস নিজের একচেটে করে রাখতে চান। প্রেমের ব্যাপারে এঁদের এই ঈর্ষাপ্রবণতা খুব বেশী পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে—প্রীতির পাত্রকে তাঁরা পরিপূর্ণরূপে নিজস্ব করে নিতে চান—সেখানে সামান্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাও তাঁদের অসহ্য। তাঁদের জীবনে যে সব প্রলোভনের ব্যাপার এসে উপস্থিত হয়, তা থেকে আত্মরক্ষা করতে হ'লে অসামান্য নৈতিক বলের প্রয়োজন। এই হাতের অধিকাংশ ব্যক্তিই নিজের ভাবের প্রাবল্যে কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে পড়েন। এঁদের বাসনাগুলি প্রবল হলেও এঁরা তার মধ্যে একটু রোমান্স—একটু রহস্য জড়াতে চান্—আর সেইজন্যই এঁরা গুপ্ত সভাসমিতির দিকে প্রায়ই আকৃষ্ট হ'ন। যদি এঁদের হাতের অন্যান্য রেখাগুলি দ্বারা আধ্যাত্মিকতা সূচিত হয়, তা হলে ধর্ম্মের গুপ্ত সাধনায় এঁরা যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেন। সাধারণতঃ এই হাতের লোকের জীবনের সব কাজ কোন না কোন প্রবল বাসনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তা সে বাসনা ভালই হোক্ আর মন্দই হোক্—সামান্যই হোক্ আর অসামান্যই হোক্। অনেক সময় এই হাতের লোকের মধ্যে আলস্য আরামপ্রিয়তা অত্যন্ত প্রবলভাবে দেখা দেয় এবং তার ফলে এঁদের জীবনে অনেক অনর্থক দুঃখ এসে উপস্থিত হয়।

৩য়—যে হাতের তেলো শক্তও নয় নরমও নয়—এবং অনুভূতি রেখা সুন্দর না হোক স্পষ্টভাবে আঁকা।

এই শ্রেণীর হাত দেখ্‌তে সব রকম হাতের চেয়ে সুন্দর এবং সর্ব্বদেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে এই হাত

বেশী দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর হাত যাঁদের, তাঁদের বাস্তব জীবনের জ্ঞান খুব কম। তাঁরা নিজেদের মনে একটা যে-কোন কাল্পনিক আদর্শ খাড়া ক'রে প্রায় তার পেছনেই ছোটেন—বাস্তব কাজ সম্বন্ধে এঁরা কিছু জানেন না এবং এঁরা বুঝতে পারেন না কি করে লোকে যুক্তি দিয়ে বা হিসাব করে অথবা সাবধান হয়ে কাজ করে। যদি বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে এঁদের কখনও নামতে হয় তা হ'লে এঁরা অকূলপাথারে পড়েন—এবং কর্ম্মজগতে এঁদের মত দুর্ভাগ্য ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। এঁরা বাতাসে কেবলি স্বপন বপন করে থাকেন; কাজেই শেষে বাস্তব জীবনে হতাশ হয়ে আকাশ-কুসুম চয়ন করতে বাধ্য হ'ন। এই শ্রেণীর হাতের লোককে যদি কখনও বাধ্য হয়ে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়, তাহ'লে পদে পদে ব্যর্থতার আঘাত পেয়ে তাঁদের জীবন একটা অসীম নৈরাশ্য ও আশঙ্কায় ভরে ওঠে। এঁরা স্বপ্নের শিশু, কল্পলোকের জীব—বাস্তব জগতে এঁরা পান শুধু ব্যর্থতার ব্যথা ও নিষ্ফলতার নৈরাশ্য। যদি হাতের অন্য সব চিহ্ন দ্বারা এঁদের আধ্যাত্মিকতার যোগ পাওয়া যায় তাহ'লে এঁরা আধ্যাত্মিকতার যথেষ্ট উন্নতি করতে পারেন। কিন্তু তা না থাক্‌লে অনেক সময় ঘটনার স্রোতে গা ভাসান দিয়ে এঁরা নৈতিক অবনতির নিম্নতম স্তরে নেমে যেতে পারেন। পারিপার্শ্বিককে নিজের শক্তির দ্বারা জয় করবার কল্পনাও এঁরা করতে পারেন না। এঁদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য হয় তখনই যখন এঁরা বাস্তবিকতার পারিপার্শ্বিকে এসে পড়েন। চার পাশের কাজের লোকেরা যখন এই স্বপ্ন-শিশুকে মোচড় দিয়ে তার মধ্য হতে কাজের রস নিংড়ে বের করে নিতে চান—তখন সেই বেচারীর অসহায় অবস্থা সহজেই অনুমান করা যায়। চারদিক থেকে ক্রমাগত সে শোনে—সে অকেজো, সে অপদার্থ—আর সেই ধিক্কারের গ্লানিতে তার জীবন নৈরাশ্যের প্রলেপে কালো হ'য়ে ওঠে। হায়! পৃথিবীর কাজের লোকেরা বোঝে না যে—শুধু দরকার দিয়েই জীবন ভরানো যায় না, জীবন সুন্দরের অনুভূতিও আকাঙ্ক্ষা করে; কেবলমাত্র দরকারী খাদ্য পেলেই সে তৃপ্ত হয় না—সে চায় রস, সে চায় বৈচিত্র্য, সে চায় শিল্প, সে চায় সঙ্গীত, চিত্র, কাব্য। পৃথিবীতে রসের অনুভূতি, সৌন্দর্য্যের জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। এই শ্রেণীর হাতের লোকেরা পৃথিবীর সেই অভাবটুকু পূর্ণ করেন। এঁদের তীব্র অনুভূতি দিয়ে সুন্দরকে সুন্দরতর করে এঁরা চোখের সামনে ধরতে পারেন। এঁদের যাঁরা কাজের লোক করে গড়ে তুলতে চান, তাঁরা শুধু এঁদের ওপরই অবিচার করেন না—মানব-সমাজের উপর অত্যাচার করেন। গোলাপফুল জগতের কাজে লাগে না বলে গোলাপফুলের বাগানকে বেগুনের ক্ষেতে পরিণত করা উচিত—তা কে বলবে। জগতে আলু পটলেরও স্থান আছে—গোলাপ ফুলেরও আছে এবং তাই থাকা উচিত। পৃথিবীর কেজো লোকেরা যা-ই বলুন, সমাজের উচিত এই শ্রেণীর হাতের লোকদের খোরাক যোগান।

রাজস্থান

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

বাইশ বছর আগে প্রথম যখন রাজপুতানায় যাই, তখন আমি বালক মাত্র। তখন যা দেখেছিলুম তাই অদ্ভুত বলে মনে হয়েছিল। অদ্ভুত বাড়ী-ঘর, অদ্ভুত পোষাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্ত্তা সবই অদ্ভুত। মনের মধ্যে রাশি রাশি কথা জমিয়ে রেখেছিলুম, যদি কখনো সুযোগ পাই তখন বলব এই আশায়। কিন্তু আজ মনের কোণগুলি আতি-পাতি কোরে খুঁজেও তখনকার দুটি একটি কথা ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছি না। মানুষের স্মৃতি জিনিসটা প্রকৃতির কারখানার একটি অপূর্ব্ব বস্তু। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, যার যতখানি প্রয়োজন, তার মধ্যে ঠিক ততখানিই সঞ্চিত থাকে। কাজেই আমার মন থেকে যা মুছে গিয়েছে তার জন্য বিলাপ না কোরে, যা বলতে চাই সেই কথা সুরু করা যাক্।

প্রথম যখন রাজপুতানায় গিয়েছিলুম—টড সাহেবের রাজস্থান কেতাবখানা পড়বার সুযোগ তখন পাই নি। ঘরে ফিরে যখন রাজস্থান পড়লুম তখন মনে হোলো—ঠকেছি, ভয়ানক ঠকেছি। এমন দেশটা ভাল কোরে দেখবার

সুযোগ পেয়েও দেখা হোলো না।" এবারে যাবার আগে শুধু যে রাজস্থানখানা মুখস্থ করেছিলুম তা নয়, যদি ভুলে যাই সেই ভয়ে কেতাব দুখানা সঙ্গে নিয়েছিলুম। কিন্তু এবারেও মনে হোলো—ঠকেছি, ভয়ানক ঠকেছি। কারণ রাজস্থান পড়ে আর রাজপুতানায় যাওয়া চলে না।

ছেলে বয়সে যখন রাজপুতানায় গিয়েছিলুম, তখনকার একটা ছবি মনের মধ্যে এখনো জলজল করছে। ঘটনাটা ঘটেছিল জয়পুরে! শহরের বাইরে ষ্টেশনের কাছেই একখানা ঘর ভাড়া করে ছিলুম। ভাড়া দৈনিক এক পয়সা। ঘরখানা আমার একলা থাকার পক্ষে খুব প্রশস্ত হোলেও তাতে বাস করতে পারতুম না। কারণ ছোট্ট একটি দরজা ছাড়া সেখানে আলো কিংবা বাতাস প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। আমি আমার পথের সম্বল ছোট্ট পুটলীটিকে সেই ঘরের মধ্যে রেখে তার আলো ও বাতাস প্রবেশের একমাত্র পথও রুদ্ধ কোরে একেবারে খোলা রাস্তায় দাঁড়ালুম। দিনের বেলা রাস্তাতেই বাস করি, আর রাত্রে সেই ঘরের সামনে একটু ফাঁকা যায়গায় শুয়ে থাকি, দরজার দিকে মুখ কোরে—এইভাবে দিন কাটছিল।

এক দিন, বেলা তখন দুটো কি আড়াইটা হবে। রাস্তার ধারে এক খাবারের দোকান থেকে পুরী আর জিলেপী কিনে বেশ বাগিয়ে বসে খাবারের উদ্যোগ করছি, এমন সময় একটি ছেলে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে অতি কাতর মুখভঙ্গী কোরে খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে। জীর্ণ তার শরীর, আর তার মাথা থেকে পা অবধি ধূলো আর কাদায় ভরা। তার সেই অবস্থা দেখে করুণায় আমার বালক প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। আমি ঠোঙ্গা থেকে পুরী ও জিলেপী তুলে তার হাতে দিলুম। যাঁহাতক তার হাতে খাবার পড়া, আর দেখতে দেখতে প্রায় পঞ্চাশজন ছেলে—সকলকেই পূর্ব্বোক্ত ছেলেটীর যমজ ভাই বলা চলে,—আমাকে ঘিরে চীৎকার সুরু করলে—এ সেট—এ সেট সাহেব।

খাবারগুলি তাদের মধ্যে বিতরণ কোরে শূন্য ঠোঙ্গা একদিকে ফেলে দিলুম। শূন্য ঠোঙ্গার গায়ে যেটুকু তরকারী লেগে ছিল, তারই জন্য সে কী যুদ্ধ! দেখে মনে হয়েছিল—হ্যাঁ লড়ুয়ে জাত বটে।

আর একটি ঘটনার কথা মনে আছে। সকাল বেলা গুটি গুটি খাবারের দোকানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় একটি বৃদ্ধা আমার কাছে পয়সা চাইলে। বৃদ্ধাকে দেখে মনে হোলো যে তার বয়স একশোর কাছাকাছি হবে। জীর্ণ শীর্ণ শরীর, নড়তে পারছে না, হাত পা বেঁকে গেছে, অত্যন্ত বৃদ্ধা। আমি তাকে বল্লুম—ফিরে এসে তোমায় পয়সা দেব। সে কথা কানে না তুলে সে কাঁপতে কাঁপতে আমার সঙ্গে চল্‌ল। খাবারের দোকানে আর যাওয়া হোলো না। সেখান থেকে ঘুরে যেখানেই যাই, সেই বৃদ্ধা পশ্চাতে। শেষে রেগে তাকে বল্লুম—কিছুতেই তোকে পয়সা দেব না। কিন্তু সে কথা কে শোনে! আমি জোরে পা চালালুম; কিন্তু যাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে নড়তে পারে না,—সেই বৃদ্ধা আমার সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে লাগল। অবশেষে তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আমি একখানা এক্কা ভাড়া কোরে তাতে উঠে পড়লুম। সেও এক্কার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এক্কার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আমার প্রাণ অতিষ্ঠ কোরে সে পয়সা আদায় করে তবে ছাড়লে। এক্কা ভাড়াটি আক্কেল সেলামী রূপে গেল। রাজস্থানের এই ভিখারীর ব্যবহার দেখে অত্যন্ত চটে সেইদিনই জয়পুর ত্যাগ করেছিলুম।

এবার প্রথমে গিয়েছিলুম মেবারের রাজধানী উদয়পুরে। যাঁরা উদয়পুরে যাবেন, তাঁদের সুবিধার জন্য পথের একটু বিবরণ দেওয়া গেল। বেলা একটার সময় হাওড়া থেকে সাত নম্বর আপ দিল্লী এক্সপ্রেস ধরে পরদিন বেলা বারোটার সময় আমরা টুণ্ডালায় পৌঁছলুম। এই এক্সপ্রেসখানার চেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন বোধ হয় এখানে আর নেই। টুণ্ডালায় আগ্রা যাবার ট্রেন তৈরী থাকে। বেলা একটার সময় সেখানা আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছয়। বেলা ৫।৹টার সময় আগ্রা ফোর্ট থেকে একখানা ট্রেন ছাড়ে—সেখানা সোজা আজমীরে গিয়ে পৌঁছয় বেলা সাড়ে দশটায়। রাত্রি এগারোটার সময় চিতোরগড়-উদয়পুর রেলওয়ের গাড়ীতে চড়তে হয়। এই গাড়ী খুব ভোরবেলা চিতোরগড় গিয়ে পৌঁছয়।

বাংলা দেশের ছেলে বুড়ো কারুর কাছেই চিতোরগড়ের পরিচয় দিতে হবে না। এ স্থান চোখে না দেখলেও, শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত এমন কোনো বাঙালী নেই, যিনি চিতোরের নাম জানেন না। চিতোরের কথা পরে বল্‌ব।

চিতোরগড়ে গিয়ে যখন আমাদের গাড়ীখানা পৌঁছল,

প্রকৃতির চোখ থেকে ঘুমের আবেশ তখনো ভাল কোরে কাটেনি। ষ্টেশনের সামনেই অত্যন্ত অস্পষ্ট একটা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল,—আস্তে আস্তে প্রকৃতির মুখ থেকে কুয়াসার ওড়না সরে গিয়ে চোখের সম্মুখে চিতোরগড় ফুটে উঠল। দূর থেকে কেবল মীরা বাইয়ের মন্দির ও চিতোরের কালী মন্দির ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। যাবার সময় আর চিতোরে নামা হয় নি, ফেরবার সময় সেখানে দুদিন কাটিয়েছিলুম, সে বিবরণ পরে বলব।

চিতোর থেকে উদয়পুরে যাবার জন্য আবার অন্য ট্রেন ধরতে হয়। আজমীর থেকে রাত্রের ট্রেনে একখানা composite গাড়ী জুড়ে দেওয়া হয়, তাতে চড়লে এখানে আর গাড়ী বদল করতে হয় না। এই গাড়ীখানা নতুন ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। আমরা এই গাড়ীখানায় চড়েছিলুম বলে গাড়ী বদলাবার হাঙ্গামা আর পোহাতে হয় নি। চিতোর থেকে বেলা প্রায় সাতটার সময় গাড়ী ছাড়ল। এখান থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত State Railway।

উদয়পুর যেতে রেল পথের দুদিকে—কোথাও কেবল বালুময় মরুভূমি, কোথাও বা প্রকাণ্ড জলাশয়, কোথাও বা চাষের ক্ষেত দেখা যায়। কিন্তু বেশী চোখে পড়ে পাহাড়। গাড়ী যতই উদয়পুরের কাছে যেতে থাকে, পাহাড়ের শ্রেণী তত ঘন হোয়ে ওঠে। পাহাড়গুলো প্রায়ই বৃক্ষলতাদি-শূন্য। বেলা প্রায় এগারোটার সময় গাড়ী দোবারী ষ্টেশনে পৌছল। দোবারী ষ্টেশন চারিদিকে পাহাড়ের মধ্যে ছোট্ট একটু উপত্যকার ওপর তৈরি। দুদিক থেকে দুটো বড় পাহাড় এইখানে মিলে বিরাট একটা প্রাকৃতিক দেওয়ালে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ের এই সঙ্গমস্থলে প্রকাণ্ড দরজা বসান। এই দরজার ভেতর দিয়ে রেল লাইন চলে গিয়েছে। শোনা গেল যে, রাত্রি এগারোটার সময় এই দরজা বন্ধ কোরে দেওয়া হয়। দোবারী হোলো উদয়পুর শহরের সীমানা। এই গিরি-সঙ্কট ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। রাণা রাজসিংহ একবার মোগল সেনাদলকে এই গিরি-সঙ্কটের মধ্যে ফেলে কি নাকাল করেছিলেন, ইতিহাস-পাঠক মাত্রই সে কথা অবগত আছেন। এখান থেকে উদয়পুর মাত্র পাঁচ ছয় মাইল। আগে উদয়পুর যেতে হোলে এইখানে নামতে হোতো। দোবারী থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রেল সম্প্রতি খোলা হয়েছে।
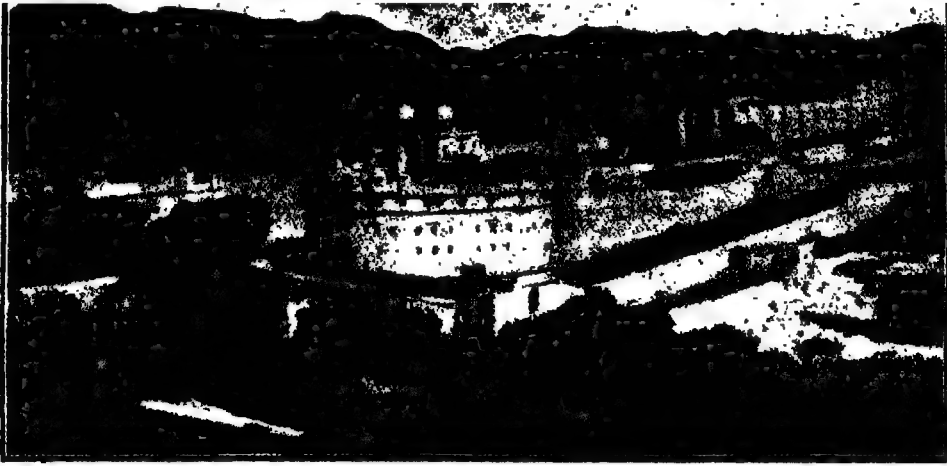
সামোর উদ্যান, শিরনিবাস-প্রাসাদ—উদয়পুর

বেলা প্রায় বারোটার সময় আমাদের ট্রেন উদয়পুরে পৌছল। ষ্টেশনে নামা মাত্র সরকারী কর্ম্মচারী এসে ধরলে—বাক্স খোলো। মাশুল আদায় হোতে পারে এমন কোনো মালপত্র আছে কি না। আমাদের সঙ্গে একই গাড়ীতে একদল মার্কিন পুরুষ ও রমণী উদয়পুরে নামলেন। তাঁদের সঙ্গে যে সব বাক্স পেটরা ছিল, সেগুলির আয়তন ও আকৃতি উভয়ই সন্দেহের উদ্রেক করে। কিন্তু কর্ম্মচারীরা সেদিকে ফিরেও চাইলেন না। পরীক্ষার পালা শেষ হওয়ার পর মুক্তি পেয়ে ষ্টেশনের বাইরে আসা গেল। ষ্টেশনের বাইরেই এক্কা ও টাঙ্গা পাওয়া যায়। উদয়পুরে ভাড়াটে মোটর মাত্র খান দুয়েক আছে। তাদের ভাড়া অত্যন্ত বেশী,—আর আগে থেকে ব্যবস্থা না করলে তা পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ শীতের সময়। কারণ এই সময় মার্কিণী দর্শক এত বেশী আসে যে, মোটর-ওয়ালারা দেশী গ্রাহককে বড় একটা গ্রাহ্যই করে না।

উদয়পুরে যাঁরা যাবেন, তাঁরা আগে থাকতে থাকবার যায়গা ঠিক কোরে রওনা হবেন, নচেৎ মহা মুস্কিলে পড়তে হবে। সেখানে বিলিতী ধরণের একটা হোটেল আছে, সেখানে দৈনিক সাত টাকা আদায় করা হয়। পাঁচ টাকা আসল হোটেল খরচ; আর প্রতি যাত্রীর জন্য মহারাণা প্রত্যহ দুটি কোরে টাকা মাশুল আদায় করেন। আমরা এই হোটেলে গিয়ে দেখি, সেখানকার কামরাগুলি ভর্ত্তি। শুধু তাই নয়, লোক এত বেশী হয়েছে যে, হোটেলের বাইরে ফাঁকা যায়গায় আট দশটা তাঁবু ফেলে দেওয়া হয়েছে। আর প্রত্যেক তাঁবুতে দু-তিন জন কোরে লোকের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই যাত্রীরা সকলেই ইয়োরোপ ও আমেরিকার নানা স্থান থেকে ভারতবর্ষ দেখতে এসেছেন। আমাদের থাকবার বাড়ী ঠিক করবার জন্য আগে লোক পাঠানো হয়েছিল; কিন্তু তারা হোটেল বা ধর্ম্মশালায় যায়গা না পেয়ে, বাড়ী ভাড়া করবার জন্য সাত দিন চেষ্টা করেও কিছু করতে পারে নি। অবশেষে অত্যন্ত আশ্চর্য্য উপায়ে থাকবার একটা ব্যবস্থা হোয়ে গেল। শহরের মধ্যে ভাড়াটে বাড়ী নেই। ফলচাঁদ—আসল নাম ফুলচাঁদ কিন্তু উদয়পুরী হিন্দিতে ফুল ফলে দাঁড়িয়েছে—নামে এক ব্যক্তি তার বাড়ীতে ঘর ভাড়া দেয়। কিন্তু সে ভাড়া অত্যন্ত বেশী, আর ঘরগুলিও বাসের উপযোগী নয়। শহরের বাইরে কোনো কোনো সর্দ্দারের বাগান-বাড়ী আছে; কিন্তু সে সব বাড়ী ভাড়া চাইলে তাঁদের অপমান হয়। তাঁরা খুশী হোয়ে যদি বিনামূল্যে থাকতে দেন, তবেই সেখানে বাস করা সম্ভব। সর্দ্দারেরা যে কিসে খুশী হন, তা জানা না থাকায়, আমাদের প্রথমে ভারী মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। আমরা শহরের বাইরে হনুমানজীর মন্দিরের পাশে একখানা খালি বাগানবাড়ীর আশপাশে ঘুরছি, এমন সময় এক-জন লোক এসে বল্লে—মহারাজা হিম্মৎ সিং তোমাদের ডাকছেন।

লোকটীর সঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে হনুমানজীর মন্দিরের কাছে গেলুম। মহারাজা তখন মন্দির প্রদক্ষিণ করছিলেন। কয়েক মিনিট পরে তিনি আমাদের কাছে এসে একজন অনুচরকে জিজ্ঞাসা করলেন—এ ব্যক্তিরা কি চায়?

কর্ম্মচারীটা দোভাষীর মতন আমাদের জিজ্ঞাসা করলে—কি চাই আপনাদের?

আমরা বল্লুম—বিদেশী আমরা, এখানে থাকবার বাসা খুঁজছি, কিন্তু পাচ্ছি না।

কর্ম্মচারীটী আবার আমাদের কথাগুলি মহারাজকে বল্লে। মহারাজ সে কথা শুনে তাকে বলে দিলেন—আমার বগীখানার ওপর তলা খুলে এদের থাকতে দাও।

অত্যন্ত আশ্চর্য্যভাবে ভগবান আমাদের বাসা মিলিয়ে দিলেন। এই বাড়ীখানা মহারাজা সম্প্রতি তাঁর গাড়ী রাখবার জন্য তৈরি করিয়েছেন। নীচের তলায় গাড়ী থাকে; আর ওপরের তলায় কোনো অতিথি এলে তাদের থাকতে দেওয়া হয়।

মহারাজা হিম্মৎ সিং মেবারের রাণার নিকট-আত্মীয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে মহারাণার যে কি সম্পর্ক—দেড় মাস চেষ্টা কোরেও আমরা তা সঠিক জানতে পারি নি। তাঁর খাস চাকরদের প্রশ্ন কোরেও এ বিষয়ে কোনো সন্তোষজনক উত্তর পাই নি। কেউ বলেছে ভাই, কেউ বলে ভাগ্নে, ভাইপো, খুড়ো, মামা ইত্যাদি। সম্ভব অসম্ভব যত রকমের সম্বন্ধ হোতে পারে সবই শুনেছি। আসল সম্পর্কটা যে কি, তা নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না—মহারাণার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, এই জেনেই তারা খুসী।

মহারাজা হিম্মৎসিংয়ের খেয়াল সম্বন্ধে মেবারে অনেক মজার কথা প্রচলিত আছে। আমরা উদয়পুরে যাবার কিছু আগে একটি বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কথায় কথায় প্রকাশ হোয়ে পড়ল যে, মহারাজার যে মাসে জন্ম, সেই ভদ্রলোকটীরও সেই মাসেই জন্ম। মহারাজের জন্মমাসে জন্মগ্রহণ করার সৌভাগ্য হওয়ায় তখুনি তাঁর প্রতি কুড়ি টাকা ইনামের ব্যবস্থা হোয়ে গেল। আমরা প্রায় দেড়মাস উদয়পুরে ছিলুম। এই দেড়মাস কাল মহারাজা সর্ব্বদা সযত্নে আমাদের খোঁজ খবর করেছেন; এবং বাড়ী সম্বন্ধে যখন যা অসুবিধা হয়েছে, তা নিবারণ করেছেন।

উদয়পুর শহরটী ছোট্ট। তার চারদিক উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দেওয়ালের পরেই চওড়া একটা অগভীর পরিখা। পরিখার মধ্যে দিয়ে সরু একটু জলস্রোতে বয়ে চলেছে। শহরের চারিদিকে ছোট বড় পাহাড়ের অন্ত নেই। একটা বড় পাহাড়ের খানিকটা নিয়েই শহর তৈরি। এই দিকটাতেই রাজপ্রাসাদ। শহরে প্রবেশের জন্য কয়েকটা

দরজা আছে। রাত্রি এগারোটার সময় সমস্ত দরজা বন্ধ হোয়ে যায়, তখন শহরে ঢোকা বা বেরুনো বন্ধ। অত্যন্ত দরকার পড়লে নাম ধাম ও প্রয়োজনের বিবরণ লিখে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

মেবারের রাজপ্রাসাদ যেমন বিশাল তেমনি সুন্দর। ভারতবর্ষের অন্যান্য অনেক দেশীয় রাজ্যের প্রাসাদ দেখবার সুযোগ আমার হয়েছে; কিন্তু উদয়পুরের প্রাসাদ দেখলে স্বতঃই যেমন মনে হয়—হ্যাঁ, রাজবাড়ী বটে! এমনটি আর কোনো প্রাসাদ দেখে অন্ততঃ আমার মনে হয় নি। এর মধ্যে কতখানি ভারতীয় শিল্পের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়েছে, আর অন্যান্য প্রাসাদে কতখানি হয় নি, সে বিচার করা আমার অসাধ্য। এই প্রাসাদের প্রথম গোড়াপত্তন কোরে যান মহারাণা প্রতাপসিংয়ের পুত্র মহারাণা অমরসিং। তাঁর পর থেকে প্রায় প্রত্যেক রাণাই কিছু কিছু কোরে প্রাসাদের মহল বাড়িয়ে এসেছেন। বর্ত্তমান মহারাণা ফতে সিংও পুরাতন প্রাসাদের সংলগ্ন আর একটি সুন্দর প্রাসাদ করিয়েছেন। এই নতুন প্রাসাদের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। প্রাসাদের একদিকে প্রকাণ্ড পিছোলা হ্রদ। হ্রদের ওপারে পাহাড়। পিছোলা হ্রদের মধ্যে দুটি শ্বেত পাথরের প্রাসাদ। একটির নাম জগ-নিবাস ও অন্যটির নাম জগমন্দির। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্রাট শাহজাদা খুরম পিতৃদ্রোহী ও পলাতক অবস্থায় যখন মেবারের রাণার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন আশ্রিত-বৎসল মেবারাধিপতি তাঁর বাসের জন্য হ্রদের মধ্যে এই প্রাসাদ তৈরি করেন। শাহজাদা খুরম অনেক দিন এই প্রাসাদে বন্ধুভাবে বাস করেন। বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ মেবারের রাণার সঙ্গে তিনি পাগড়ী বিনিময় করেছিলেন। সেই পাগড়ী আজও মেবারে রক্ষিত আছে। এই পিছোলা হ্রদের মধ্যে আরও দু-একটি ছোট বড় শ্বেত পাথরের চাতাল আছে। রাজবাড়ীর লোকেরা মধ্যে-মধ্যে নৌকায় চড়ে সেখানে গিয়ে আমোদ প্রমোদ করেন। সৌন্দর্য্যে ও শিল্পসৌকর্য্যে এই প্রাসাদগুলি অনুপম। জ্যোৎস্নারাত্রে উর্ম্মিবিহীন স্তব্ধ স্বচ্ছ জলের ওপর যখন এই শ্বেত প্রাসাদের ছায়া পড়ে, তখন মনে হয়, স্বপ্নলোকের সুন্দরীরা ধরণীতে নেমে এসে, দর্পণে নিজেদের রূপ দেখে নিজেরাই মুগ্ধ হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রাসাদগুলি দেখতে হোলে মহারাণা বা যুবরাজের অনুমতি চাই। আমরা একাধিকবার এই প্রাসাদ দেখবার অনুমতি পেয়েছিলুম; এবং সরকার থেকেই আমাদের জন্য নৌকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এগুলির বিশদ বিবরণ দিতে গেলে একখানা বড় বই হোয়ে যাবে।

যোগনিবাস—জল-বেষ্টিত-প্রাসাদ—উদয়পুর

রাজপ্রাসাদের বাইরেই জগন্নাথের মন্দির। পাথরের মন্দির অনেকটা উড়িষ্যার মন্দিরগুলির আকারে তৈরি মন্দিরের সমস্তটাই খোদাই করা কাজ। শহরের মধ্যে এই মন্দিরটাই সব থেকে বড়। শহরের মধ্যে ও বাইরে ছোট-খাট পাথরের আরও অনেক মন্দির আছে। শহরে ঢোকবার জন্য যতগুলি দরজা আছে, তার মধ্যে হাতীপোল দরজাই সব থেকে বড়। এই দরজা দিয়ে ঢুকে যে রাস্তা, সেই রাস্তাই একেবারে প্রাসাদের প্রধান দরজা বড়ীপোলে গিয়ে শেষ

হয়েছে। এই দরজা দিয়ে না কি একমাত্র মহারাণা ছাড়া আর কেউ হাতী চড়ে যেতে পারেন না। দরজার এত সম্মান,—কিন্তু সেখানে এত দুর্গন্ধ যে, সরকারী থাটা-পায়খানাও তার কাছে হার মানে। দরজা পেরুলেই খানিকটা খোলা যায়গা। এইখানে হাতীশালা ও ঘোড়াশালা। এই স্থানের দুর্গন্ধ বড়ীপোল দরজাকেও হার মানায়। এরই একধারে চারদিকে ঘেরা হাতী লড়াইয়ের প্রাঙ্গণ। প্রাসাদের দেওয়াল খুব উঁচু, সাদা পথ্থের কাজ করা। উদয়পুরে চুণের কাজ অতি সুন্দর হয়। তার পালিশ এমন সুন্দর ও এত সাদা যে, রোদের সময় সেদিকে বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অনেক যায়গায় চুণের কাজ পাথরকে হার মানিয়েছে।

প্রাসাদের মধ্যে খুব সুন্দর কাজকরা ঘর ও রাজপুত চিত্রের অনেক ভাল ভাল নিদর্শন আছে শুনে,এক দিন প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলুম। বড়ীপোল ফটকের নীচেই একজন কর্ম্মচারী আমার পথ আটকালেন—তুমি কে বট?

—মানুষ।

—মানুষ তো দেখতেই পাচ্ছি; কিন্তু মাথায় কোনো আবরণ নেই কেন? আর এখানেই বা তোমার কি প্রয়োজন!

আমি বল্লুম—মাথায় আবরণ না দেওয়াই আমাদের রীতি। এখানে এসেছি প্রাসাদ দর্শনের অভিলাষে।

—তুমি কোন্ দেশের লোক?

—আমি বাঙালী।

লোকটী তার পাশের অন্য এক কর্ম্মচারীর সঙ্গে প্রায় পাঁচ মিনিটকাল গবেষণা কোরে আমাকে যাবার হুকুম দিলে। আমার সঙ্গে যখন উক্ত কর্ম্মচারীটির কথাবার্ত্তা চলছিল, তখন একদল শ্বেত পুরুষ ও রমণী আমাদের পাশ দিয়ে প্রাসাদের ভেতরে চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, বড়ীপোলের কর্ম্মচারীরা সেদিকে চেয়েও দেখলেন না। প্রাসাদ দেখাবার জন্য একটি লোক চাওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীটি দু-একজনকে অনুরোধ করলেন; কিন্তু কেউ রাজী হোলো না। অবশেষে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে শুনে, একটি লোক আমার সঙ্গে এল। এই ব্যক্তি প্রথমে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—পুরোনো মহল আগে দেখবে না নতুন মহল?

সাহালিয়া বাড়ীর ফোয়ারা—উদয়পুর

ছবিগুলি পুরোনো মহলে আছে শুনে সেই মহলই প্রথমে দেখবার অভিলাষ জানালুম। পুরোনো মহলের প্রবেশের পথে এক যায়গায় তলোয়ারধারী প্রহরী আমার পথ আটকালে।

—কি ব্যাপার?

প্রহরী তার রক্তবর্ণ চক্ষু কটমট কোরে বল্লে—এখুনি মাথা ঢাক।

—মাথা কি দিয়ে ঢাকি! টুপি তো নেই, হাত দিয়ে ঢাকলে চলবে?

লোকটার চোখ মুখের অবস্থা দেখে মনে হোলো বুঝি কেটেই ফেলে। ইতিমধ্যে আমার পাণ্ডার সঙ্গে তার বচসা সুরু হোয়ে গেল। অনেকক্ষণ তর্কাতর্কির পর অত্যন্ত অনিচ্ছায় প্রহরী আমাদের পথ ছেড়ে দিলে। কিছুদূর যেতে না যেতে আর এক ঘাঁটিতে আবার পথ আটকানো হোলো। এখানেও ঐ রকম প্রহরী আছে। প্রহরীর পাশে একটুখানি দপ্তরের মতন স্থানে একজন ভদ্রবেশী কর্ম্মচারী বসে আছেন। তিনি বল্লেন—মাথা ঢাকতে হবে, জুতো মোজা খুলতে হবে।

মুখ তুলে দেখলুম—আমার আগে যে সব শ্বেত রমণী ও পুরুষরা প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁরাও সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন ও কৌতূহলী হোয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছেন। তাঁদের গাইড ভাঙা ইংরাজীতে ব্যাপারটার তাৎপর্য্য তাঁদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। লজ্জায় একবার মনে হোলো তখুনি সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু তা পারলুম না। আমি কর্ম্মচারীটিকে বল্লুম—এদের যদি জুতো ও মোজা খোলাতে পার তবে আমিও খুলব। সে বল্লে—বিলিতী লোকদের সম্বন্ধে কোনো নিয়ম নেই। এ নিয়ম শুধু দেশী লোকের জন্য।

আমি রেগে বল্লুম—নিজের দেশের লোকের খুব ইজ্জৎ তোমরা রাখ তো।

কর্ম্মচারীটি বল্লে—কি করব, এই এখানকার নিয়ম।

আর বাক্যব্যয় বৃথা মনে কোরে সেখান থেকে ফিরলুম। প্রহরী থেকে আরম্ভ কোরে সকলে বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন এতখানি ধৃষ্টতা এর আগে তারা আর দেখেনি।

বাসায় ফিরতে ফিরতে মনে হোতে লাগল, যেন আজ অত্যন্ত আত্মীয়ের গৃহদ্বার থেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হোয়ে ফিরতে হোলো। মনে পড়্‌ল—ছেলেবেলায় গুরুজনদের মুখে বীর বালক বাদলের বীরত্ব কাহিনী শুনে, তার লীলাভূমি দেখবার জন্য মনের মধ্যে কি ঔৎসুক্য জেগেছিল। মনে পড়্‌ল—ছাতের ওপরে বন্ধুদের সামনে—স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে—আবৃত্তি। বাঙালী মেবারকে কি চোখে দেখে মেবারের লোক তা জানে না। বাঙালী তার কাব্যে, গাথায়, গানে, নাটকে মেবারের ইতিহাসকে অমর কোরে রেখেছে। তাদের বীরত্বের কাহিনী শুনে বাঙালীর বুক ফুলে উঠে; তাদের দুঃখের কাহিনী পড়তে পড়তে বাঙালীর চক্ষু সজল হয়। অভিমান-ক্ষুব্ধ হৃদয়ে সেদিন সত্যই মনে হয়েছিল, যদি জন্মান্তর থাকে, তা হোলে মৃত্যুর পরে যেন সাগরের পারে জন্মলাভ করি। দূর সেই জন্মভূমি থেকে যখন এই প্রাসাদ দেখতে আসব, তখন এই অহেতুকী সেলামবৃষ্টির প্রতি অবহেলায় দৃষ্টি নিক্ষেপ কোরে সসম্মানে সোজা মাথায় ভেতরে চলে যাব।

রাজপ্রাসাদের পশ্চাদ্ভাগের দৃশ্য—উদয়পুর

জুতো খোলার আর একটি ঘটনা এইখানে বলি।: এক দিন মেবারের ভবিষ্যৎ রাণা যুবরাজ স্যর ভূপাল সিং অত্যন্ত অনুগ্রহ কোরে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শহরের বাইরে ছোট্ট একটি পাহাড়ের ওপর যুবরাজের বিলাসকুঞ্জ। পাহাড়ের নীচেই ফতেসাগর নামে প্রকাণ্ড হ্রদ। হ্রদের ওপারে খুব উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর একটি মন্দির। সন্ধ্যার সময় যুবরাজের এই প্রাসাদ থেকে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোরম। এই প্রাসাদে আগে রেসিডেণ্ট বাস করতেন। আজকাল নতুন রেসিডেন্সি তৈরি হওয়ায় যুবরাজ অধিকাংশ সময় এইখানেই যাপন করেন। আমরা সেখানে উপস্থিত হওয়ার পর একজন কর্ম্মচারী এসে

জানালেন যে বাপাজীর (সেখানে যুবরাজকে সকলে বাপাজী, বাপুজী, বাবাজী ও বাবুজী বলে। ঠিক কি বলে তা চেষ্টা কোরে ও জিজ্ঞাসা কোরে বুঝতে পারি নি।) সামনে তোমরা চেয়ারে বসতে পাবে না। মাটিতে কার্পেট পাতা আছে—সেখানে বসতে হবে। জুতো কিংবা মোজা পায়ে দিয়েও সেখানে ঢুকতে পাবে না। এখানকার প্রজাদের এই নিয়ম পালন করতে হয়।

আমরা সেই ব্যক্তিকে জানালুম যে, আমরা তোমার বাপাজীর প্রজা নয় এবং এখানে নিমন্ত্রিত হোয়ে এসেছি। এ রকম সর্ত্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা আমাদের সাধ্য নয়।

এই বলে আমরা তখুনি সেখান থেকে চলে এলুম। মেবারী প্রজা হোলে বোধ হয় তখুনি আমাদের ফাঁসীর হুকুম হোয়ে যেত।

মহারাণা যে তিন মাস শিকারে কাটান, যুবরাজ সেই সময়টা এইখানে থাকেন। দু-বেলা প্রাসাদ থেকে তাঁর জন্য খাবার যায়। দশ বারো জন স্ত্রীলোক ঝুড়ি মাথায় তাঁর খাবার বয়ে নিয়ে যায়। আগে ও পিছনে দুজন তলোয়ারধারী সওয়ার চেঁচিয়ে লোক সরাতে থাকে। খাবারের ডালা প্রায়ই খোলা থাকে। অধিকাংশ সময়ই মামুলী পুরী, জিলেপী ও লাড্ডুতে ঝুড়ি ভর্ত্তি দেখেছি।

যুবরাজের সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা হয় 'মহেলি কি বাড়ীতে'। ফতে সাগরের সম্মুখে একটি বাগানের মধ্যে এই প্রমোদভবন। বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই পুকুরের মত বড় একটি বাঁধান চৌবাচ্ছা। চৌবাচ্ছার চতুর্দ্দিকে সরু সরু অসংখ্য ছিদ্র, মাঝখানে একটি শ্বেত পাথরের ছত্রী। এই ছিদ্রগুলি এক একটি ফোয়ারা। ফোয়ারাগুলি খুলে দিলে মনে হয় যেন ছেলেবেলার কোন এক পরীরাজ্যের মহলে এসে পড়েছি। এইখানে নাকি মেবারের রাজপুরের মহিলারা সখীদের নিয়ে জলকেলি করতেন। চৌবাচ্ছার সামনে একটি দোতলা বাড়ী। নীচে দরবার-গৃহের মত মাঝারী একটি ঘর ও তার চারপাশে ছোট ঘর আছে। ওপরে তিন চারটী ঘর। একটী ঘরের দেওয়াল ছাদ সমস্ত যায়গায় পদ্মপাতা আঁকা। বাড়ীর বাইরে একটি বড় বাঁধান চৌবাচ্ছায় পদ্মবন। স্থানটী যেমন নির্জ্জন তেমনি রমণীয়। এই বাড়ীতে সেই চৌবাচ্ছার ধারে বাপ্পারাওয়ের বংশধর মেবারের ভবিষ্যৎ রাণা শ্বর ভূপাল সিং ইত্যাদি ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। অবশ্য সাক্ষাতের ব্যবস্থা আগেই ঠিক করা হয়েছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মিনিট পাঁচেক আগে একজন খবরদার এসে সংবাদ দিলে—বাপুজী আসছেন। কিছুক্ষণ পরে যুবরাজ এলেন দুজন লোকের ওপর ভর দিয়ে। যুবরাজের অর্দ্ধাঙ্গ পঙ্গু, তিনি চলতে কিংবা দাঁড়াতে পারেন না। দুজন লোক দুদিক তাঁর দুহাত ধরে কোনো রকমে হিঁচড়ে নিয়ে চলে'। রাণা প্রতাপ সিংয়ের বংশধরের এই অবস্থা দেখে দুঃখ হয়,—মনে হয়, ঈশ্বরের কি অদ্ভুত বিচার। যুবরাজ

জল বেষ্টিত-প্রাসাদ—উদয়পুর (এই প্রাসাদে সম্রাট সাজাহান আশ্রয়-লাভ করিয়াছিলেন)

আমাদের কাছে আসতেই একখানা চেয়ার এল। তিনি বসতেই আমরা নমস্কার করলুম। তিনি প্রতি-নমস্কার না করায় আমরা মনে করলুম, বোধ হয় আমাদের নমস্কারটা দেখতে পান নি। আবার সেলাম ঠুকলুম; কিন্তু কোনো উত্তর নাই। পরে শুনেছি যে, মেবারের রাণা কিংবা ভবিষ্যৎ রাণারা মরলোকের কোনো জীবের কাছে মাথা নোয়ান না। কিন্তু পঙ্গু হোলেও শিকার প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়ায় তাঁর খুব উৎসাহ, এবং তিনি নিজে একজন ভাল শিকারী।

সকলেই জানেন যে, রাজপুত জাতির শিকার খেলায় খুবই উৎসাহ। মেবারে এক সময় খুব সমারোহের সঙ্গে আহেরিয়া প্রভৃতি উৎসব সম্পন্ন হোতো। বর্ত্তমানেও মহারাণা প্রায় তিন মাস উদয়পুর ত্যাগ কোরে সেখান থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে জয়সমন্দ নামক প্রাসাদে গিয়ে বাস কল্লেন শিকারের উদ্দেশ্যে। আমরা যেদিন উদয়পুরে পৌঁছলুম, তার পর দিন বেলা দশটা কি এগারোটার সময় মহারাণা শিকারে বেরুলেন। সঙ্গে প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা—হাতী, ঘোড়া লোক লস্কর। সেদিনটা নাকি শাস্ত্রমতে শিকারের পক্ষে খুব প্রশস্ত ছিল। সেদিনের শিকারের নাম 'মুহূর্ত্তকা শিকার'। তিনি জয়সমন্দ থেকে ফেরবার পূর্ব্বেই আমরা উদয়পুর ত্যাগ করেছিলুম।

উদয়পুর শহরের বাইরে পাহাড়ে ও উপত্যাকায় মাঝে মাঝে এক একটা উঁচু গোল বাড়ী (Towerএর মতন) দেখতে পাওয়া যায়। এই বাড়ীগুলির নাম উদি। রাণা বা রাজপুত্ররা এইখানে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে থাকেন, লোকেরা আশপাশ থেকে জানোয়ার তাড়িয়ে এইখানে নিয়ে আসে, আর তাঁরা গুলি কোরে শিকার করেন।

শিকারের মধ্যে বন্য বরাহই বেশী। পিছোলা হ্রদের ধারে একটা ছোট পাহাড়ের উপর মাঝারি গোছের একটা বাড়ী আছে। এই বাড়ীর নাম 'মাসউদি'। এইখানে প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের কিছুপূর্ব্বে বন্যবরাহদের ভোজন করান হয়। বরাহদের এই ভোজনপর্ব্ব একটা দেখবার জিনিষ। খাওয়ার আগে লোকেরা জঙ্গলে নেমে হাঁক দিতে থাকে; তাদের ডাক শুনে বরাহরা সপুত্র সকন্যা সংবংশে এসে মারামারি কোরে খাবার খায়। এদের খাবার জন্য প্রত্যহ আট মণ ভুট্টার বরাদ্দ আছে। এই মাসউদিতে রাজসরকারের পালিত দুটি বরাহ আছে। সে দুটি দেখবার জিনিষ। তাদের ছোটখাট দাঁতাল হাতী বলা চলে। এইখানে বাঘ ও বরাহে লড়াইয়ের স্থান আছে। শোনা গেল অধিকাংশ সময়ে শার্দ্দূল-নন্দনই বরাহের কাছে পরাজিত হয়। বরাহকে অবতার বলে যাঁরা মানতে চান না, তাঁদের উদয়পুরে যাওয়া কর্ত্তব্য।

যুবরাজ একদিন তাঁর শিকারে আমাদের ডেকেছিলেন। পঙ্গু হোলেও অব্যর্থ তাঁর সন্ধান। তাঁকে একজন প্রথম শ্রেণীর শিকারী বলা যেতে পারে। শিকারে তাঁর পিতা মহারাণা ফতেসিংয়েরও খুব নাম আছে। উদয়পুরে কেউ কেউ বল্লেন যে মহারাণা ধড়াধ্বড় সিংহ শিকার করেন। এতবড় একটা গুলি ঠিক ভাবে গিলতে না পারায় আমরা এ কথায় একটু আপত্তি করেছিলুম। কিন্তু তারা বল্লে যে বিশ্বাস না করলে আর কি করা যাবে। আমরা কি রকম শিকার করি, জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলুম যে, প্রত্যেক বাঙালীর ছেলে প্রত্যহ তিনটী কোরে বাঘ না মেরে জলগ্রহণ করে না। কথাটা তারা বিশ্বাস করলে কি না বোঝা গেল না। তবে মহারাজা হিম্মৎ সিংহের ছেলে রাজকুমার প্রভাত সিং একদিন আমাদের শিকারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ সেদিন সন্ধ্যা অবধি জঙ্গলে ঢাক পিটিয়ে সামনে একটা কাঠ বিড়ালও পড়ল না।

উদয়পুরের রাজপ্রাসাদ যেমন বিরাট, সাধারণ লোকদের বাড়ীগুলি তেমনি ছোট। অতটুকু খোপের মতন বাড়ীতে কি কোরে যে তারা বাস করে, ভাবলে আশ্চর্য্য হোতে হয়। শহরের মধ্যে বড় বাড়ী খুব কমই আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর দরজায় হাতী আঁকা আছে। অধিকাংশ বাড়ীর দেওয়ালে তাদের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্র ও সূর্য্যের ছবি আঁকা। শহরে মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম। অনেক দিন আগে কোন এক মহারাণা বোম্বাই অঞ্চল থেকে একশো ঘর বরি মুসলমানকে জায়গা জমি দিয়ে উদয়পুরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। সেই একশো ঘর এখন অনেক ঘরে পরিণত হয়েছে। এরা প্রায় সকলেই ব্যবসা করে। হিন্দু মুসলমানে বেশ সদ্ভাব দেখা গেল। অসদ্ভাবের বীজ মসজিদের সেখানে বড়ই অসদ্ভাব। মুসলমানদেরও শোভাযাত্রা কোরে বাজনা বাজিয়ে যেতে সেখানে একাধিকবার দেখেছি। শহরের মধ্যে কোথাও মসজিদ নাই। মুসলমান অধিবাসীরা শহরের বাইরে বাড়ীভাড়া কোরে সেখানে নেমাজ পড়ে। ঠিক

বলতে পারি না, তবে দেখে শুনে মনে হয় যে, উদয়পুর রাজ্যে মসজিদ তৈরি করার হুকুম নেই।

রাজস্থানের অন্যান্য স্থানের মতন উদয়পুরেও জৈন ধর্ম্মের প্রভাব খুব বেশী। পথে ঘাটে প্রায়ই সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা ঠোঁটের ওপরে একটা কোরে স্তোর ঝালর পরেন ও সঙ্গে মোটা ঝাঁটার মতন একটা সুতোর ঝাড়ন নিয়ে বেড়ান। মুখের ঝালরটা প্রায় থুৎনী অবধি ঝোলেন। পাছে বাতাসের সঙ্গে কোনো পোকা মাকড় মুখের মধ্যে গিয়ে জীবহত্যা হয়, সেইজন্য এই সাবধানতা। শহরের বাইরে একটি জৈন ধর্ম্মশালা ও একটি জৈন-মন্দির আছে।

শহরে তরকারী ইত্যাদি বেশ পাওয়া যায়। রাস্তার দুদিকে সকাল বিকাল মেয়েরা ঝুড়ি সাজিয়ে বসে তরকারী বিক্রি করে। তারা প্রত্যেক তরকারীতেই ধনে শাক ব্যবহার করে। আমরা প্রথমে যখন সেখানে গেলুম, তখন কোনো কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আমাদের জানিয়েছিলেন যে, সেখানে মাছ মাংস খাওয়া নিষেধ। তাঁরা আরও বলে দিয়েছিলেন যে, গরু খেলে একশো একটাকা জরিমানা ও ছ'-বছরের জেল। পাঁঠার মাংস খেলে পঁচাত্তর টাকা জরিমানা ও তিন বছর। মাছ খেলে রাজসরকার থেকে লোক এসে প্রথমে প্রহার দেবে একেবারে অজ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত—তার পরে একান্ন টাকা জরিমানা আর তিন মাস। মুরগী খেলে একচল্লিশ টাকা ও তিনমাস। আহারের এই বিধি ব্যবস্থার কথা শুনে সেই দিন ফেরবার গাড়ী কখন ছাড়ে তার খোঁজ নিতে লাগলুম, এমন সময় একজন আশ্বাস দিয়ে বল্লেন যে, যা শুনেছি তা সব মিথ্যা। পাঁঠার মাংস সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। মুরগী খেলে কোনো সাজা হয় না। তবে গরু ও মাছ সম্বন্ধে ঐ ব্যবস্থাই বটে। তবে শূয়রের মাংস যথেষ্ট পাওয়া যায়। লুকিয়ে মাছও জোগাড় হোতে পারে, তবে গরুটা—।

আমরা তাকে ভরসা দিলুম যে গরু ও শূয়রটা আমাদের চলে না। পাঁঠার মাংস হোলেই আমাদের আপাততঃ চলবে। লুকিয়ে মাছ খেতেও আমরা রাজি নই; কারণ, মাছ খেয়ে জেলে যেতে পর্য্যন্ত রাজী আছি; কিন্তু এ বয়সে ঐ রকম প্রহারটা আর ধাতে সইবে না।

পাঁঠার মাংস সেখানে খুব সস্তা, পাঁচ আনায় এক সের। তবে সোমবারে মহারাণা মাংস খান না বলে সে দিনে শহরে পাঁঠা কাটা হয় না, তবে রেসিডেন্সিতে সব দিনেই মাংস পাওয়া যায়। উদয়পুরী সের একশো আট তোলায়। বেশ ভালো ঘি পাঁচ সিকে সের। গরুর দুধ একেবারেই পাওয়া যায় না বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। বেশীর ভাগ ছাগলের দুধই চলে; তার পরে মহিষের দুধ। ছাগলের দুধ সেখানে টাকায় ছসের পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই দুটি তিনটি কোরে ছাগল আছে। ছাগলগুলি বাংলা দেশের গরুর চেয়ে বড় দেখতে।

তৈরি খাবার সেখানে পাওয়া যায় না। সেখানকার উঁচুদরের খাবার হোলো জিলিপী। নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে দুই এক জায়গায় ভাল বরফী খেয়েছি, অর্ডার না দিলে তা পাওয়া যায় না।

উদয়পুরে একটি ইংরেজী স্কুল ও একটি কলেজ আছে। কলেজে আই-এ অবধি পড়ান হয়। গোলাপ-বাগ নামে প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে আস্তাবলের মতন একটি বাড়ীতে কলেজ বসে। রবিবারেও স্কুল কলেজ হয়, সোমবারে ছুটির দিন। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল বাঙালী, তাঁর বাড়ী শ্রীহট্ট অঞ্চলে। ছাত্ররা সপ্তাহে দু-দিন খেলতে পায়। কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, এর চেয়ে বেশী খেললে না কি পড়া শুনায় মন থাকে না। এই বাগানেই একই বাড়ীতে লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম আছে। মিউজিয়ামে যুবরাজের খানকয়েক ছবি, মেবারী গয়না ও অস্ত্রশস্ত্রের অনেকগুলি নিদর্শন আছে। প্রাসাদ থেকে শাহজাদা খুরমের পাগড়ীটা এখানে এনে রাখা হয়েছে। একটা আলমারীতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশের লোকের চেহারা ও পোষাকের নমুনা আছে। এগুলি ছোট ছোট মাটির মূর্ত্তি। একটি মূর্ত্তি—তার অঙ্গে হিন্দুস্থানী জামা, মাথায় মাড়োয়ারী পাগড়ী—নীচে লেখা আছে বাঙালী ব্রাহ্মণ। শুনেছিলুম লাইব্রেরীতে অনেক বই ও অনেক পুরাতন পাণ্ডুলিপি আছে। আমরা কতকগুলি পুরাতন হিন্দি ও ইংরেজী সংবাদপত্র ছাড়া সেখানে আর কিছু দেখতে পাই নি। পাণ্ডুলিপি থাকা অসম্ভব নয়; কিন্তু সে সব বোধ হয় প্রাসাদে রক্ষিত আছে। এই বাগানেরই এক কোণে চিড়িয়াখানা আছে। সেখানে কতকগুলি প্যান্থার জাতীয় বাঘ, গোটা দুয়েক ভাল্লুক আর একটি বড় বরাহ আছে। এক যায়গায় কতকগুলি মার্জ্জার-নন্দনকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ কোরে রাখা

হোয়েছে। তারা তারস্বরে চীৎকার কোরে তাদের প্রতি এই দারুণ অবিচারের প্রতিবাদ করছে।

পিছোলা হ্রদ ছাড়া উদয়পুরে আরও ছুটি বড় বড় হ্রদ আছে। একটির নাম স্বরূপ সাগর ও অন্যটীর নাম ফতে সাগর। ফতে সাগর হ্রদ বর্ত্তমান মহারাণা, ফতে সিংয়ের আমলে তৈরি হয়েছে। একজন ফরাসী ইঞ্জিনীয়ার এই হ্রদ তৈরি করেন। এই ফরাসী লোকটী সারাজীবন মেবারেই কাটিয়েছিলেন। আহার বিহার, পোষাক পরিচ্ছদ কথা-বার্ত্তায় তিনি সর্ব্ব রকমেই মেবারী হোয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প উদয়পুরে প্রচলিত। সহর থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-বেষ্টিত আর একটি বড় হ্রদ আছে; তার নাম রাজসমন্দ। এই হ্রদ তৈরি করিয়েছিলেন রাণা রাজসিংহ। হ্রদের চতুর্দ্দিকের বেড় প্রায় বারো মাইল। চারদিক শ্বেত পাথর দিয়ে বাঁধান। শহরের অন্য দিকে ছাব্বিশ সাতাশ মাইল দূরে জয়সমন্দ হ্রদ। এর চেয়ে বড় হ্রদ বোধ হয় ভারতবর্ষে আর নেই। এর বেড় ত্রিশ মাইলের কম নয়। রাণা জয়সিং এই হ্রদ তৈরি করিয়েছিলেন। এই হ্রদের ধারেই তিনি তাঁর প্রিয়তমা রাণী কমলাদেবীর জন্য একটি প্রাসাদও তৈরি করিয়েছিলেন। সে প্রাসাদ এখনো আছে। এই সব বড় বড় জলাশয় থাকার জন্য মেবারে চাষবাসের খুব সুবিধা হয়েছে। মেবারের জমিও বেশ উর্ব্বরা। আমরা অনেক বাগানে আম কলা কমলা লেবুর গাছ ফলে ভরা দেখেছি। সেখানকার কমলালেবু অত্যন্ত টক। শহরের মধ্যে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। পথে ঘাটে এমন কি মাঠের মধ্যেও বিস্তর কুয়ো আছে। কিন্তু সে জল মুখে দিলে বমি ঠেলে আসে। খুব কম কুয়োর জলই পানীয়রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। সকলের বাড়ীতে কুয়ো নাই। সাধারণ গৃহস্থের মেয়েরা নিজেরাই পানীয় ও অন্য জল দূরের কুয়ো থেকে নিয়ে আসে। দরিদ্র গৃহস্থের মেয়েরা অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে জল সরবরাহ কোরে বেড়ায়। দলে দলে মেয়ে মাথায় জল ভরা গাগরী নিয়ে চলেছে—এই দৃশ্য সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি সব সময়েই দেখা যায়। ছোট মেয়ের ছোট গাগরী, বড় মেয়ের বড় গাগরী। হিন্দু মুসলমান একই কুয়ো থেকে অবাধে জল নেয়।

উদয়পুরের মেয়েরা মোটা কাপড়ের ঘাগরা বা পেশোয়াজ পরে। পেশোয়াজ রঙীন এবং তার ওপরে নানা রকমের ছাপ। অঙ্গে চোলি এবং পেশোয়াজের অর্দ্ধেক দেহ ও মুখ ঢেকে ওড়না দেয়। সমস্তই রঙীন, শাদার চিহ্নমাত্রও কোথাও নেই। এই ওড়নাকে উদয়পুরী ভাষায় শাড়ী বলা হয়। মেয়েরা সাধারণতঃ সুন্দরী নয়। তাদের কার রং কি রকম তা বলা যায় না, কারণ দেহের ওপরে এত ময়লা যে আসল চামড়ার রং আবিষ্কার করতে হোলে প্রত্নতাত্ত্বিকের প্রয়োজন হয়। অত্যন্ত নোংরা, স্নান খুব কমই করে। দশ হাত দূর দিয়ে গেলেও নাকে কাপড় দিতে হয়। এই সম্পর্কে একটা মজার গল্প মনে পড়্‌ল। মেসোপোটেমিয়ায় যখন যুদ্ধ চলছিল, তখন দু-জন সৈনিকে তর্ক বাধে। একজন বলে রাম ছাগলের গায়ে ভয়ানক গন্ধ; কিন্তু অন্য ব্যক্তি বলে যে সেখানকার তুর্কীদের গায়ের গন্ধ রামছাগলকেও হার মানায়। তর্কে কিছুই স্থির করতে না পেরে মীমাংসার জন্য তারা কাপ্তেনকে গিয়ে ধরলে। কাপ্তেন তাদের তর্কের কারণ শুনে বল্লেন—এ আর বেশী কথা কি! একটা রাম ছাগল ও একজন তুর্কীকে ধরে নিয়ে এস—এখুনি এ বিষয়ের একটা মীমাংসা হোয়ে যাক্।

দুজনে দুদিকে ছুটল। একটু পরেই এক ব্যক্তি রাম ছাগল নিয়ে এসে হাজির। কাপ্তেন সাহেবের সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে রামছাগলের পরিচয় ছিল না। যাহাতক রামছাগলের গন্ধ তাঁর নাকে যাওয়া, অমনি তিনি দাঁত খিঁচিয়ে অজ্ঞান হোয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে অন্য ব্যক্তি তুর্কী নিয়ে এসে হাজির করলে। তুর্কীর গায়ের গন্ধে রামছাগলের চৈতন্য লুপ্ত হোলো। আমার বিশ্বাস উদয়পুর থেকে বেছে যদি একটি মেয়েকে সেই সভায় নিয়ে যাওয়া হোতো, তা হোলে তুর্কীও অচৈতন্য হোয়ে পড়্‌ত।

মুসলমান মেয়েরা ঘাঘরার নীচে চুস্ত পায়জামা পরে; আর চোলির ওপরে পাঞ্জাবী আস্তিনওয়ালা পিরাণ পরে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, মুসলমানের মেয়েরা প্রায় মুখ খুলে বেড়ায়। কিন্তু হিন্দুরা কচিৎ মুখ খোলে। বড় হিন্দু ঘরের মেয়েদের জন্য কড়া পর্দ্দার ব্যবস্থা।

পুরুষদের পোষাক হোলো চুস্ত পায়জামা, পায়ের গোড়ালী অবধি ঝোলা আংরাখা। বিঘৎখানেক চওড়া আর খুব লম্বা পাতলা কাপড়ের পাগড়ী। পাগড়ীর খুব সুন্দর সুন্দর রং দেখতে পাওয়া যায়। গজ খানেক চওড়া আর

হাত দশেক লম্বা একটা পাতলা কাপড় তারা কোমরে জড়ায়। এই হোলো তাদের দরবারী পোষাক। প্রথম দৃষ্টিতে এই না-পুরুষ না-স্ত্রী পোষাক অত্যন্ত খারাপ লাগে। কিন্তু কিছুদিন দেখতে দেখতে চোখ সয়ে গেলে মন্দ লাগে না। এখানে অনেককে ধুতির ওপরে আংরাখা, তার ওপরে একটা কোট পরতে দেখেছি। মেবারে পাগড়ী বাঁধার কায়দা অনেকটা কলকাতার মাড়োয়ারীদের ধরণে। সেখানে প্রত্যেকেই তলোয়ার নিয়ে বেড়ায়। সম্ভ্রান্ত লোকেরা বাঁ হাতে উল্টে তলোয়ার ধরে চলেন। এ জিনিষটা এখন সেখানে শোভার্থেই ব্যবহার হয়। দু-জন তলোয়ারধারীতে ঝগড়া হচ্ছে দেখেছি; কিন্তু তলোয়ার-যুদ্ধ কোথাও দেখি নি। মেবারের ভূতপূর্ব্ব রাণারা তাঁদের দেশবাসীর হাতে তলোয়ার দিয়ে তাদের ঘাতসহ কোরে তুলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বর্ত্তমান রাজাদের চাপে তারা ক্রমেই বেশ ভারসহ হোয়ে উঠেছে দেশ গেল। কারণ এক এক খানা তলোয়ারের ভার বড় কম নয়। এখানে দাড়ির ভারী সম্মান। মহারাণা ফতেসিংয়ের এই আশী বছর বয়সেও দিব্য জাঁদরেল দাড়ি। দাড়ি না থাকলে দরবারে প্রবেশ নিষেধ। রাণা প্রতাপ সিংয়ের আমলকার সেই মান্য করা দাড়ি এখন এমন ভোল ফিরিয়েছে যে, তাকে আজ চেনা মুস্কিল। যে দাড়ি এক দিন তাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় জ্ঞাপন করত, আজ সেই দাড়ি তাদের সৌভাগ্যের প্রথম সোপান অবধি পৌঁছে দিচ্ছে।

মহারাণা যেমন দাড়ির ভক্ত, যুবরাজ তেমনি দাড়ির বিরোধী। তিনি নিজে দাড়ি কামান এবং তাঁর চার পাশে যে সব পারিষদ ঘোরে, তাদের সকলেরই দাড়ি মুণ্ডিত।

উদয়পুর শহরে কিছুদিন হোলো বিজলী বাতী হয়েছে। রাস্তার ধারে খুব উঁচু লোহার থামে বাতি ঝোলে। আলো অত্যন্ত কম, অন্ধকার রাত্রে সমস্ত রাস্তা আলোকিত হয় না। কিন্তু কম আলোয় প্রজাদের কিছু অসুবিধা হয় বলে বোধ হোলো না। ইলেকট্রিক্ হয়েছে এইতেই তারা সুখী; আর অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত শহর একেবারে ঘুম-পাড়ানীর দেশে পরিণত হয়। রাত্রি সাতটার পর রাস্তায় কচিৎ দু এক জন লোক দেখা যায়। অন্ধকার রাস্তা দিয়ে লণ্ঠনবিহীন টাঙ্গা ও বাইসাইকেল নির্ব্বিবাদে বোঁ বোঁ কোরে ছোটে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পথিকের হাতে রাত্রে লণ্ঠন না থাকলে পুলিশে ধরে।

শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা উঁচু পাহাড়ের ওপরে একটি সুন্দর প্রাসাদ আছে। এই প্রাসাদের নাম সজ্জনগড়। মহারাজা সুজনসিং—উদয়পুরী ভাষায় সজন-সিং—এই প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। প্রাসাদে যাবার জন্য পাহাড় কেটে ঘোরানো রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ের মূল থেকে প্রাসাদের দরজা অবধি রাস্তা দু মাইলের কিছু বেশী হবে। রাস্তা অত্যন্ত খাড়া এবং উঠতে কষ্ট হয়। এ রাস্তায় গাড়ী চলে না। নারীদের পক্ষে সেখানে পদব্রজে যাওয়া এক রকম অসম্ভব। শ্বেত বা দেশীয় মহিলারা পাল্কী বা হাতীতে চড়ে যাবার ব্যবস্থা করেন। আমাদের সেখানে পৌঁছতে এক ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লেগেছিল। ওপরে গিয়ে যখন পৌঁছলুম তখন ডিসেম্বর মাসের শীতেও ঘামে জামা কাপড় ভিজে গিয়েছিল। গেলাস দুই জল খেয়ে তবে ধাতস্থ হই। দৈবাৎ সেদিন আমাদের অঙ্গ বিলিতী খোলসে শোভিত থাকায়, প্রাসাদ দেখতে কোনোই কষ্ট হয় নি। সেখানকার লোকেরা সেলামের ওপর সেলাম বাজিয়ে প্রাসাদের সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন কোরে আমাদের দেখালে। সজনগড় প্রাসাদের গঠন-কৌশল যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি সুন্দর। এইখানে একটা বড় ঘরের মাঝখানের খিলানের নীচে দুটি শ্বেত পাথরের থাম আছে। ঐ থামের গায়ে যে ফুল পাতা খোদাই করা আছে, তা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। দিল্লী আগ্রা বা জয়পুরে এ ধরণের কাজ দেখি নি। অথচ এ প্রাসাদ খুবই আধুনিক। সজনগড়ের সম্মুখে ফতে সাগর আকাশের নীল ছায়া বুকে ধরে স্থির হোয়ে পড়ে আছে; আর তার পশ্চাতে যত দূর চোখ যায়—সমুদ্রের বড় বড় ঢেউয়ের মতন পাহাড়ের পর পাহাড়—নির্ব্বাক নিশ্চল—ইতিহাসের মৌন সাক্ষীরূপে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের কাছে ভাল দূরবীণ ছিল। এইখান থেকে সেই দূরবীণ দিয়ে অনেক দূরে হ্রদ ও রাজপ্রাসাদ পরিষ্কার দেখা যেতে লাগল।

আমরা একদিন একলিঙ্গের মন্দির দেখতে গিয়েছিলুম। একলিঙ্গই হলেন মেবার রাজ্যের আসল মালিক। বাপ্পারাও থেকে বর্ত্তমান মহারাণা ফতে সিং পর্য্যন্ত সকলেই তাঁরই সেবক ও প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করেছেন এবং করছেন। উদয়পুর শহর থেকে তেরো মাইল দূরে পাহাড়ের

কোলে একটি বড় বাঁধের মধ্যে একলিঙ্গজীর মন্দির স্থাপিত। গ্রামের নাম একলিঙ্গপুর। মহাদেবের বাসস্থান বলে কেউ কেউ স্থানটাকে আদর কোরে কৈলাসপুর বলে থাকেন। সেখানে যাবার জন্য টাঙ্গা ও মোটর ভাড়া পাওয়া যায়। আমরা টাঙ্গায় গিয়েছিলুম। আগে পাহাড়ের পাদমূল ও উপত্যকার ভেতর দিয়ে মন্দিরে যাবার রাস্তা ছিল; কিন্তু সে রাস্তা অত্যন্ত লম্বা ও মন্দিরে পৌঁছতে দেরী হোতো বলে' পঞ্চাশ ষাট বছর হোলো পাহাড়ের ওপর দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরি হয়েছে।

একলিঙ্গজীর মন্দির শাদা পাথরে তৈরি। বেশী উঁচু নয়। ভুবনেশ্বর, কোনার্ক বা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলি যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এ মন্দির চোখেই ধরবে না। মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে মীরাবাইয়ের নামে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। এই মন্দিরটার বিগ্রহের অবস্থা দেখলে মনে হয় না যে এখানে পূজো হয়। রত্নবেদী পর্য্যন্ত পায়রার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ। মীরা বাইয়ের মন্দিরের গায়ে অনেক মূর্ত্তি খোদিত আছে। দুই একটি যুগলার্দ্ধ মূর্ত্তিও চোখে পড়ল। অনেকগুলি মূর্ত্তি ভাঙা। মুসলমানদের হাতে এ মন্দিরও লাঞ্ছিত হয়েছে।

খাস একলিঙ্গজীর মন্দিরের সম্মুখে একটি বড় পিতলের বৃষ বসান আছে। বৃষটি ফাঁপা, কিন্তু গঠন অতি সুন্দর। একলিঙ্গ বিগ্রহ কাল পাথরের মুখলিঙ্গ,—তাতে সোনার সাপ জড়ান; আরও অনেক সোনার গহনা এদিক-ওদিকে লাগান আছে। মন্দিরের ভিতরে গর্ভ-গৃহের ঠিক সম্মুখেই একটা যায়গায় পাঁচ দশ মিনিট অন্তরই গান হচ্ছে। গানের সঙ্গত সেতার ও ঢোল। দূরে এক যায়গায় দরদম সানাই পোঁ পোঁ করছে। মন্দিরের ভেতরে ব্রাহ্মণ ও রাজপুত ছাড়া অন্য কারুকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। গর্ভ-গৃহের এক পাশে একটা দরজা ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্য জাতের লোকেরা ঠাকুরকে প্রণাম করে। শুনলুম যে শাদা নরনারীগণও এইখানে দাঁড়িয়ে ঠাকুর দর্শন করে। মন্দিরের পাশেই একটা উঁচু পাহাড়ের চুড়োয় একটি মঠ আছে। মহারাণা যখন মন্দিরে আসেন, তখন তিনি নিজেই পূজো করেন।

একলিঙ্গের মন্দিরের চেয়ে সেখানে যাতায়াতের পথটাই আমার বেশী ভাল লেগেছিল। জঙ্গলময় পাহাড়ের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে রাস্তা। একপাশে উঁচু পাহাড় আর এক পাশে পাহাড়ে ঢাল। এই দিকে জঙ্গল। ওপর থেকে নীচের পুরোনো রাস্তাটা মাঝে মাঝে দেখা যায়। এক এক যায়গায় দুদিক থেকে দুটো বড় বড় পাহাড় এসে মিশেছে। পাহাড়ের এই সঙ্গমস্থলে বড় বড় দরজা বসান। মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড জলাশয় ও গমের ক্ষেত দেখা যায়। কোনো কোনো পাহাড়ের চূড়ায় একটি মাত্র ভাঙ্গা মন্দির অতীতের একটু স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে ভীলদের গ্রাম। কালো পাথরে কোঁদা ভীল ছেলে মেয়েদের সরল সহাস্য মুখ এখনো মনকে আঁকড়ে আছে।

কিছু দিন আগে আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত লোক পত্রান্তরে উদয়পুর সম্বন্ধে একটি বিবরণ লিখেছিলেন। তাঁর লেখা পড়ে ধারণা হয়েছিল যে, তিনি সেখানে কোনো নামজাদা গাইয়ের গান শুনতে গিয়েছিলেন। আমরা সেখানে গাইয়ে ও বাজিয়ের অনেক সন্ধান করেও, দুর্ভাগ্য বশতঃ ভাল গান বাজনা শুনতে পাই নি। রাজ-সরকারের দু-একজন গাইয়ে বাজিয়ে আছেন বটে, কিন্তু সঙ্গীত অত্যন্ত মামুলী ধরণের। তা শোনবার জন্য উদয়পুরে যাবার প্রয়োজন হয় না। সেখানে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক বাড়ী বাড়ী গান শুনিয়ে বেড়ায়। এরা প্রায়ই দলবদ্ধ হোয়ে ঘোরে এবং তিনজনের কম এক দলে থাকে না। হারমোনিয়াম ও ঢোল কাপড়ে বেঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। মেবারী ভাষায় এদের ঢুলনী বলে। এরা অত্যন্ত লজ্জাশীলা; অর্থাৎ সাধারণ হিন্দু মেয়েদের চেয়ে এদের ঘোমটার বহর বেশী। ঘোমটার ভেতর থেকেই দর-দস্তুর করে। দর ঠিক হোয়ে গেলে বসে' হারমোনিয়াম ও ঢোলের ঘোমটা খুলে ফেলে গান-বাজনা সুরু করে। নিজেদের মুখের ঘোমটা যেমন তেমনই থাকে। মধ্যে মধ্যে যখন লম্বা তাল ছাড়বার দরকার হয়, তখন চট্ কোরে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে ঘোম্‌টা একটু ফাঁক কোরে তাল ছাড়ে। শেষ হোয়ে গেলেই ঘোমটা ফেলে আবার হারমোনিয়ামের দিকে মুখ ফেরায়। সে এক মজার দৃশ্য! এদের মধ্যে দু একজনের মুখ হঠাৎ দেখে ফেলেছি; কিন্তু দেখেই মনে হয়েছে যে, ঘোমটাতেই তাদের মানায় ভাল। ঢুলনীদের মধ্যে কারুর কারুর কণ্ঠস্বর অতি মধুর। উপযুক্ত শিক্ষা ও সাধনা থাকলে তারা উচ্চশ্রেণীর গাইয়ে হোতে পারত। আসল মেবারী গান এদের কাছে শুনতে পাওয়া যায়।

মেবারের নিজস্ব কোনো নাচ নেই। থাকলেও তা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। এক দিন যুবরাজ আমাদের জন্ম জগমন্দির প্রাসাদে নাচের আয়োজন করেছিলেন। নিজ প্রাসাদের সম্মুখে জলের ওপরে একটা বড় শ্বেত পাথরের ঘরে নাচের মজলিস্ বস্‌ল। রাজকীয় ব্যাপার, রাজকীয় সমারোহে পূর্ণ। কিন্তু আসল নাচিয়েদের চেহারা দেখে আমাদের চক্ষুস্থির! সুন্দর অঙ্গ-সৌষ্ঠব—নৃত্যের যা প্রধান জিনিস—তা তো দূরের কথা, সে অঙ্গের কোনো সৌষ্ঠবই নেই। কোনোটী মোটা, পা দুটি ঠিক তালগাছের মতন, কোনোটীর পা আবার ঝাঁটার কাঠির মতন—এই সব দেহে বহুমূল্য পায়জামা, ঘাঘরা, ওড়না ইত্যাদি পরে যখন তারা নৃত্য সুরু করলে, তখন সুন্দর ও বীভৎসে মিলে একটা অদ্ভুত রসের সৃষ্টি হোলো। এই সব নাচিয়ে মেবার রাজ-সরকার নাকি অনেক সন্ধান কোরে যোগাড় করেছেন। এরা সরকার থেকে রীতিমত মাইনে পায়।

মেবারের বর্ত্তমান রাজপুতদের দেখলে মনে হয় না যে, এরাই রাণা সঙ্গ, ভীম সিং, প্রতাপ সিং, জয়মল্ল বা বাদলের জাত। কিন্তু সেখানকার ঘোড়া দেখলে চৈতকের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকে না। বর্ত্তমান মেবারে একমাত্র চৈতকের বংশধরেরাই তাদের পূর্ব্বপুরুষের খানদানি বজায় রেখেছে। সেখানে ঘোড়ার রেওয়াজ খুব বেশী; আর সে ঘোড়া দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিলিতী জিন সেখানে চলে না, তিন চারটি গদি দেওয়া দেশী জিনই সচরাচর চলে। ঘোড়ারা পুল্‌কী চালে চলতে জানে না—একেবারে চার পা তুলে ছোটে। পাঁচ বছরের ছেলে থেকে আরম্ভ করে অতি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে। রাণার অশ্বশালায় অনেকগুলি আসল আরবী ঘোড়া আছে। ঘোড়ায় চড়বার সময়ও মেবারীরা তলোয়ার ছাড়ে না—সেটা সেই গদির নীচে গোঁজা থাকে। মেবারের পুরাতন কাহিনীতে নারীদের ঘোড়ায় চড়ার কথা আছে; কিন্তু সদরে কি মফস্বলে ভদ্র কি অভদ্র কোনো নারীকেই ঘোড়ায় চড়তে দেখি নি।

মেবারীরা নিজের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন। দু-চারজন ভাট এখনো তাদের পুরাতন গৌরবের কাহিনীগুলিকে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে; কিন্তু অচিরেই যে সব বিস্মৃতির অতল তলে ডুবে যাবে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মীরা বাইয়ের দোঁহা ও তাঁর গান সংগ্রহ করবার অনেক চেষ্টা কোরেও উদয়পুরে তা পাই নি। হলদীঘাট রণক্ষেত্র দেখা তো দূরের কথা, ঐ নামে মেবার রাজ্যে যে কোনো স্থান আছে, সে কথা শতকরা আধজন সহরবাসীও জানে না। আমরা প্রায় পনেরো দিন চেষ্টা কোরে তবে হলদীঘাট যাবার পথের সন্ধান পেয়েছিলুম। শুনলুম যে সে স্থান এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে দু-একজন বাঙালী এসে ঐ নামের একটা স্থানের সন্ধান করে। অর্থব্যয় ও পথের ক্লেশকে অগ্রাহ্য কোরে তারা হলদীঘাট দেখতে যায়। আমরা যাবার কিছু দিন আগেই একজন বাঙ্গালী পরিব্রাজক হলদীঘাটে গিয়েছিলেন বলে শুনলুম।

ক্রমশঃ

কবির কপাল

এস, ওয়াজেদ আলি বি-এ, এল্‌এল্‌-বি (কান্টাব)

(১)

আবেদ যখন জানতে পারলে তার কনিষ্ঠ মালেক উট চরাতে গিয়ে পাল ছেড়ে বনি ইহইয়া কবিলার ছোকরাদের কাছে কবিতা পড়ছিল, আর সেই সুযোগে তাদের চিরশত্রু বনি কায়েসের লোকেরা সমস্ত উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, সে তার মনের আগুন আর চেপে রাখতে পারলে না। এর জন্য অবশ্য তার দোষও দেওয়া যায় না। রোজ কিছু মালেককে উট চরাতে হতো না। এক দিন অন্তর আবেদকেও চরাতে হতো। আর সে যখন চরাতো তখন একটী উটও কারও চুরি করবার সাধ্য ছিল না। সমস্ত দিন সে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে পালের চারি দিকে পাহারা দিয়ে বেড়াতো। পাল ছেড়ে ভুলেও কোথাও যেতো না। হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও শত্রুরা তার হাত থেকে উট চুরির কোন সুযোগই পেতো না।

পালের দেখা-শুনার ভার, যে দিন মালেকের হাতে

পড়তো, সে দিন কিছু একটা-না-একটা দুর্ঘটনা ঘটতোই। আর তা ঘটতো মালেকেরই দোষে। পালের কথা সে একেবারেই ভাবতো না। উটগুলোকে তাদের অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে সে, প্রতিবেশী কবিলার যত অকালপক্ক নিষ্কর্ম্মা ছেলে ছিল, তাদের কাছে কবিতা লিখে, গান গেয়ে বেড়াতো; আর তাদের সঙ্গে মিলে শরাব খেয়ে হট্টগোল করতো। সুযোগ পেলে কুরঙ্গ-নয়না মরু-সুন্দরীর সঙ্গে প্রেমের অভিসার করতেও সে কোন রকম দ্বিধা করতো না। ফলে তার হাত থেকে রোজই উট চুরি যেতো। আবেদ একটু চাপা স্বভাবের লোক ছিল। মনে মনে খুব চটলেও মুখে সে বড় বেশী কিছু বলতো না। এবার যখন এক সঙ্গে এক পাল উট চুরি গেল, তখন আর আবেদ তার রাগ চেপে রাখতে পারলে না।

বেশ চড়া গলায় সে মালেককে কাছে ডাকলে। লজ্জিত কুণ্ঠিত মালেক তার সামনে এসে দাঁড়ালো। ক্রোধ কম্পিত দৃষ্টিতে মালেকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আবেদ বললে, "পালের আজ খবর কি?"

মালেক বললে, "বনি কায়েসের সেই শয়তানেরা আজ পালের উটগুলোকে চুরি করে নিয়ে গেছে।"

আবেদ বললে, "এখন কি করা হবে?"

মালেক একটু তাচ্ছল্যের ভাব দেখিয়ে বল্‌লে, "তার আর ভাবনা কি? বনি কায়েসের সঙ্গে লড়াই করা যাবে।" তার পর সদর্পে খাপ থেকে তলওয়ার বার করে বল্‌লে, "আমার এই তলোয়ারের সাম্‌নে দাঁড়াতে পারে, এমন সাধ্য কি ঐ চোরেদের আছে? ওদের মাথাগুলো ওদের ঘাড় থেকে মাটিতে নামিয়ে তবে আমি ছাড়বো। আমাদের উট তো ফিরিয়ে আনবোই, তাছাড়া ঐ শয়তানদের উঠগুলোও ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে আসবো। দেখবো, কে আমায় বাধা দেয়।"

মালেকের এই অযৌক্তিক আস্ফালন দেখে আবেদ আগুন-লাগা বারুদের স্তূপের মত জ্বলে উঠলো। মালেকের প্রতি তার চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সে বললে,— "এত দিন তোমায় মানুষ বলে মনে করে আমি মস্ত একটা ভুল করেছিলুম মালেক,—তুমি মানুষ নও, তুমি হচ্ছ একটা জানওয়ার।...না, না, তুমি জানওয়ার নও! তা হলে তো তোমার কাছ থেকে অনেক কায পাওয়া যেতো। তুমি মানুষও নও, জানওয়ারও নও। তুমি হচ্ছ মস্ত বড় একটা নির্লজ্জ, নিষ্কর্ম্মা পাগল। তা ছাড়া তুমি আর কিছুই নও। আরে হতভাগা, বনি কায়েসের সঙ্গে লড়াই করবার কি এই সময়?...এই সে দিন ওদের মিত্র কবিলা বনি তোফেলের লোকেরা এসে আমেরার চারণ-ক্ষেত্রে ডেরা করেছে। এখন লড়াই হলে তারাও কায়েসদের সঙ্গে যোগ দেবে। তোমার মত পাগলের কথা শুনলে আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আরব দেশ থেকে লোপ পাবে।"

মালেক বললে, "ভাই সাহেব, আপনার বুকে সাহসের মাত্রাটা একটু কম, তাই আপনি অত শঙ্কিত হচ্ছেন। আমি অমন দুটো ছেড়ে দশটা কবিলারও কোন পরোয়া করি না। এক পাল ভেড়ার সঙ্গে আর এক পাল ভেড়া যোগ দিলে কি তাতে সিংহের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়? আপনাকে কোন বিপদের মধ্যে যেতে হবে না, আপনি চুপ করে ঘরে বসে থাকুন। আমি একাই আমার এই বিশ্বাসী তলওয়ারের সাহায্যে বনি কায়েস আর বনি তোফেলের দফা রফা করে দেবো। বীর কেমন করে লড়াই করে, আরব একবার অবাক হয়ে তা দেখবে।"

উত্তেজিত আবেদ কনিষ্ঠের এই প্রলাপে ধৈর্য্য হারিয়ে চীৎকার করে উঠলো,—"মালেক, তুমি এখান থেকে দূর হও। তোমার মত বেহায়া পাগলের আমাদের কোন দরকার নাই। এক পাল উট হারিয়ে কোথায় তোমার অনুতাপ হবে, তা না, সেটা নিয়ে তুমি আস্ফালন করতেও লজ্জা কর না। কেবল তো আস্ফালন নয়! আমি হচ্ছি বড় ভাই, তোমার বোজর্গ। কবিলার সর্দ্দার আমি, আমার সামনে সকলে মাথা হেঁট করে চলে। আর তুমি আজ আমার মুখের উপর অপমান করতে কোন সঙ্কোচ বোধ করলে না! কাসেম, তোমার মত লোক কবিলায় থাকলে এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত দূষিত হয়ে উঠবে। যাও—আজই তুমি এখান থেকে বিদায় হও। তোমাকে আমাদের আর কোন প্রয়োজন নাই।"

তর্কের উত্তেজনায় মালেকেরও মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। দ্বিধা মাত্র না করে সে উত্তর দিলে,—"কিছু পরওয়া নেই ভাই সাহেব, এই আমি চল্লুম। আমি হচ্ছি একজন মানুষ। আমার মনে দয়া মমতা, স্নেহ ভালবাসা আছে। তা ছাড়া আমি হচ্ছি তোমার ভাই। আমার আর তোমার শিরায়

একই রক্ত প্রবাহিত। একই মায়ের গর্ভ থেকে আমরা পৃথিবীতে এসেছি, একই বাপের ঔরসে আমাদের জন্ম। তা সত্ত্বেও তুমি কিনা কতকগুলো পশুকে আমার চেয়ে বেশী মূল্যবান মনে করলে! এতই নীচ তোমার মন! তোমার মত হীন প্রকৃতির লোকের সঙ্গে থাকাও লজ্জাকর! নীরস, শুষ্ক-হৃদয় কৃপণ তুমি! আমার প্রতিভার মূল্য তুমি কি বুঝবে? আমার প্রতিভার মূল্য বুঝবে আরবের সেই রসজ্ঞ কবিরা, আমার গান যাদের মোহিত করেছে। আমার মহত্বের কথা তুমি কি জানবে? আমার মহত্বের কথা জানে মরুভূমির সেই আর্ত্ত লোকেরা, আমার এই তীক্ষ্ণ অসি দস্যু-তস্করের হাত থেকে যাদের উদ্ধার করেছে! আমার মনুষ্যত্বের গৌরব তুমি কি অনুভব করবে? সে গৌরব অনুভব করে সেই গেজাল-নয়না তরুণীরা—আমার প্রেমের অমৃত পান করে যারা ধন্য হয়েছে; যারা গুণী, যারা দরদী, যারা রসিক, যারা প্রেমিক, যারা সৌন্দর্য্য-পিপাসী, তারাই আমার মূল্য বোঝে। আমার মূল্য বোঝা তোমার কাজ নয়। তোমার মুখ দিয়ে ভুলেও কখনও কবিতার একটা পদও বের হয় নি! আমার ভাবুকতার কথা তুমি জানবে না। জীবনে কখনও আর্ত্তের ক্রন্দনে তোমার তলওয়ার খাপ থেকে লাফিয়ে ওঠে নি! আমার এই দরদী হৃদয়ের কথা তুমি বুঝবে না। নারীর সৌন্দর্য্য কখনও তোমার মনে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে নি! আমার অন্তরের জ্বালা তুমি বুঝবে না। ওসব হচ্ছে তোমার অতীত, আর তুমিও তাদের অতীত! তুমি উট চরাও, উটের দুধ বিক্রি কর, আর তা থেকে যা পয়সা পাও, তাই দিয়ে নূতন উট খরিদ কর। এই হচ্ছে তোমার পেশা, এই হচ্ছে তোমার স্বপ্ন আর সাধনা, আর এতেই হচ্ছে তোমার জীবনের সিদ্ধি। আল্লা তোমায় এই কাযের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, অন্য কাযের জন্য করেন নি! তুমি মাটির মানুষ, মাটিতেই থাক। আমার কথা তুমি কি বুঝবে, বল! আমি জন্মেছি অন্য কাযের জন্য!···আমি জন্মেছি আমার এই তীক্ষ্ণ তলওয়ার নিয়ে মরুপ্রান্তরে বিচরণ করবার জন্য, পশুরাজ সিংহ যেমন তার তীক্ষ্ণ নখর নিয়ে সেখানে বিচরণ করে··· নির্ভীক মনে, নিশ্চিন্ত প্রাণে! যেখানে বিপদ সেখানেই আমি হাজির। বিদ্যুৎ যেমন আকাশের মেঘমালাকে বিদীর্ণ করে, আমার এই তীক্ষ্ণ অসিও তেমনি বিপদের ঘনঘটাকে অবাধে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দেয়। আর্ত্তের আমি সহায়, বিপন্নের আমি বন্ধু। আমি জন্মেছি কবিত্বের জন্য, বীরত্বের গৌরব কীর্ত্তন করবার জন্য, সুন্দরীর রূপের মাধুর্য্য ভাষার ঝঙ্কারে মানুষের অন্তরে তরঙ্গায়িত করবার জন্য! যে-সে কাযের জন্য আমার জন্ম হয় নি! আরবের মহিমার ইতিহাস মানুষের মনে কে জাগিয়ে রেখেছে? আমার দ্বারাই সে কায হয়েছে, তোমার দ্বারা হয় নি! হামজা এবং আলি, খালেদ এবং অমরুর স্মৃতিকে আমিই চিরস্মরণীয় করেছি, তুমি কর নি! হাতেমের বদান্যতা আজ আমার প্রতিভার বলেই আরবের শিবিরে শিবিরে কীর্ত্তিত হচ্ছে, তোমার প্রতিভার বলে তা হয় নি! মজনুর স্বর্গীয় প্রেম, লাইলীর লাবণ্যের অতুলনীয় গৌরব কে আজ মনে রাখতো, যদি আমি আমার লেখনীর অমৃতে তাদের অমর করে না রাখতুম। সে কায আবেদ, তুমি করতে পারতে না। আল্লা আমাকে ধনী করেন নি, সে তাঁর ইচ্ছা। ইচ্ছা করলে তিনি আমায় কারুণের চেয়েও ধনী করতে পারতেন, সোলেমানের চেয়েও ঐশ্বর্য্যশালী করতে পারতেন, সেকেন্দারের চেয়েও ক্ষমতাবান্ করতে পারতেন! তিনি তা ইচ্ছা করেন নি! তাই আমি গরিব, সম্পদহীন, দুর্ব্বল। আল্লা অজ্ঞ নন। যা তিনি করেছেন, তা ভালই করেছেন। তাঁর বিধানের সঙ্গে ঝগড়া করার অভ্যাস তোমার থাকতে পারে, আমার নাই! তোমার মাথা নামাজের সেজদায়—সর্ব্বক্ষণ নত হয়েই আছে। ফরজ, সুন্নত, নকল কোন রোজাই (উপবাসব্রত) কখনও তোমায় বাদ দিতে দেখলুম না। সারাদিন ওসবিহ (মালা) হাতে করে তুমি খোদার নাম জপ করছ। লোক তোমায় দেখে মনে করে তুমি একটি ওলি কিম্বা আওলিয়া। বাইরের চমক তোমার যথেষ্ট। তোমার অন্তর কিন্তু ঢোলের মতই শূন্য। একটা উট হারালে মাতৃহারা মেষ-শিশুর মত করুণ সুরে কাঁদতে তুমি ছাড় না। সামান্য কিছু বিপদপাত হলে তুমি তোমার ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব ভুলে তোমার নিকটতম আত্মীয়কে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লজ্জা বোধ কর না। ওহে ধার্ম্মিকপ্রবর! তোমার আল্লায় উপর বিশ্বাস তখন কোথায় চলে যায়! আমি নামাজও পড়ি না, আর রোজাও রাখি না। আর ইয়াকুতের মত উজ্জ্বল, ভাবে ভরপুর আঙ্গুরের উচ্ছ্বসিত রসকেও আমি তাচ্ছিল্যও করি না। সুন্দরী রমণী

মধুভাণ্ড

শিল্পী—শ্রীযুক্ত গুরাম মলইয়া

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দেখলে তুমি 'তওবা' 'তওবা' করে নিজের অন্ধকার গর্তের ভিতর আশ্রয় নাও ; আর আমি তাদের সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয় ছটা দেখে আনন্দে বিভোর হই ! তাদের কাছ থেকে পালাবার খেয়াল আমার স্বপ্নেও আসে না। আমার ব্যবহার দেখে তুমি মনে কর, আমি নিশ্চয়ই একজন মহাপাপী ; নরক ছাড়া অন্য কোথাও আমার স্থান হবে না। ধার্ম্মিক আমি না হতে পারি, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আল্লা যখন পরীক্ষা ছলে কোন বিপদ আমার জন্য পাঠিয়ে দেন, আমি তো তখন তোমার মত ব্যাকুল আর অধীর হই না ! আল্লা যখন তাঁর বিশ্বের মঙ্গলের জন্য,—মঙ্গল ছাড়া তিনি তো কিছু চান্ না,—আমার কোন ক্ষতি করিয়ে দেন, আমি তো তখন তাঁর বিধানের বিরুদ্ধে তোমার মত ক্রন্দনের করুণ প্রতিবাদ তুলি না ! কবিলার ছেলে-মেয়েরা যখন একটু আনন্দ-উৎসব করতে চায়, তখন তাদের সুখ দেবার জন্য পালের পুষ্টতম উটটিকে জবেহ করতে (বলি দিতে) আমি তো তোমার মত কুণ্ঠা দেখাই না ! তোমার মধ্যে যদি অনুভূতি থাকতো তা'হলে, প্রকৃত ধার্ম্মিক কে, আর কে নয়, তুমি তা অনায়াসে বুঝতে ! সে অনুভূতি কিন্তু আল্লা তোমায় দেন নি ! তোমাকে বোঝাবার চেষ্টা, পাথরকে বোঝাবার চেষ্টার মতই নিষ্ফল। সে চেষ্টা আমি করবো না। তোমার উটগুলোকে তুমি আমার চেয়ে বেশী মূল্যবান বলে মনে করলে ! সোবহান আল্লা ! সোবহান আল্লা ! আমি এখন চল্লম ! আর আমার দেখা পাবে না। তবে একটা কথা, তোমায় বলে যাচ্ছি, মনে রেখো। যে মহিমময় আল্লা আমায় আমার প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তিনি সেই প্রতিভাকে কখনও নষ্ট হতে দেবেন না। আমার সংস্থান তিনি কোন না কোন উপায়ে করবেনই করবেন। তোমার উটের ক্ষতির বিষয় তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তুমি যত উট হারিয়েছ, তার দ্বিগুণ উট শীঘ্রই আমি তোমায় পাঠিয়ে দেবো।"

আবেদ চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়িয়ে মালেকের কথা শুনছিল। কথা শেষে কোন উত্তরের অপেক্ষা না করেই মালেক তাম্বু থেকে বেরিয়ে পড়লো। আবেদের তখন সংজ্ঞা ফিরে এলো। সে ভাবলে, মালেক গেল কোথায় ? চিন্তান্বিত মনে শিবিরের বাইরে এসে সে দেখলে, মালেক তার প্রিয় ঘোড়াটী চড়ে দ্রুতগতিতে মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে চলেছে ! ক্রোধ, ক্ষোভ আর অভিমান আবেদের মনকেও অভিভূত করে ফেললে। একটা নিশ্বাস ফেলে অস্ফুটস্বরে সে বল্লে,—"যাক্, জাহান্নামে যাক্।"

(২)

শিবির থেকে যথেষ্ট দূরে এসে মালেক অশ্বের বেগ একটু সংযত করে নিলে। ধীরে ধীরে সেই মরুপ্রান্তর দিয়ে চলতে চলতে সে নিজের জীবনের কথা ভাবতে লাগলো। ভাবার কারণও যথেষ্ট ছিল, আর বিষয়ও যথেষ্ট ছিল।

বড় ভাই আবেদের সঙ্গে ঝগড়া করে তাকে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা শোনানো এক কথা, আর জীবনের সমস্ত বেষ্টনীর সংস্রব ত্যাগ করে একটা সম্পূর্ণ অভিনব জীবন আরম্ভ করা আর এক কথা ! মালেকের অনেক প্রতিপত্তিশালী বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজন ছিলেন,—তাঁদের কাছে গেলে তাঁরা আদরেই তাকে গ্রহণ করতেন। মালেকের উদ্ধত প্রকৃতি কিন্তু সে পথ অবলম্বন করতে কোন মতেই রাজী হল না। কোন নূতন জগতে, নূতন বেষ্টনীর মধ্যে জীবনটাকে অভিনব ভাবে প্রকাশ করবার জন্য তার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

মালেক ভাবতে লাগলো,—অরসিক আবেদের মুখ আর দেখবো না। যত শীঘ্র পারি, তার হারানো উটের ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজেকে তার হাত থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত করবো। আর তার পর আমার এই মুক্ত জীবনটাকে প্রকৃত একজন মানুষের মত একবার উপভোগ করবো। লোক আমায় দেখে বলবে, হাঁ, মালেক একজন মানুষ বটে ! জীবনটা কেমন করে ভোগ করতে হয়, তা সে জানে ! মানুষ কিছু অমর নয়। মরণ যখন আসবে, তখন আবেদকেও যেতে হবে, আর আমাকেও যেতে হবে। আমার শরীর যে মাটীতে মিশবে, ওর শরীরও ঠিক সেই মাটিতেই মিশবে। মরবার আগে কিন্তু আমি এই জীবনটা একবার উপভোগ করে যাব ; ঐ বখিলের মত দূর থেকে ভয়ে ভয়ে তার অপরূপ ঐশ্বর্য্য কেবল চোখ দিয়ে দেখেই বিদায় নেবো না। জীবনকে প্রাণের সঙ্গে ভোগ করবার জন্যই আমরা জন্মেছি। তা যদি না করতে পারি, তা'হলে কবরেও আমি শান্তি পাবো না ! সেই আলোকহীন আবাসেও অনুশোচনার বৃশ্চিক আমার হৃৎপিণ্ড দংশন করে আমায় বলতে থাকবে,—হতভাগা, অমন একটা সুযোগ পেলি, আর হেলায় সেটাকে খোয়ালি ! তোর যে নরকেও স্থান হবে না ! না, না, তা হতে পারে না ! কিছুতেই আমি তা হতে দেবো না ! আর

কিছু করি আর না করি, জীবনের লাল আঙুরের ফেণিল শরাবটা প্রাণ ভরে একবার পান করবোই করবো। এই ইয়াকুতি আবেহায়াত থেকে নিজেকে বঞ্চিত হতে দেবো না।

কিন্তু, এখন যাই কোথায়! কোথা থেকে জীবনের খেলা আবার নূতন করে আরম্ভ করি! মাতামহ শেখ হোসেনের কাছে গেলে অবশ্য তিনি সাদরে আমায় গ্রহণ করবেন। বন্ধু হারেসও আমায় পেলে আনন্দে মেতে উঠবে। আমার সুখের জন্য সে সব করবে। কিন্তু না, আমি কারও কাছে যাবো না! আমি কারও আশ্রয় চাইবো না! আমার আশ্রয় হচ্চে আমার এই তীক্ষ্ণ তলওয়ার, আর আশ্রয় হচ্চে আমার অতুলনীয় প্রতিভা। এই দুই অমোঘ অস্ত্রই আমার জন্য পথ সাফ করবে। এরাই আমাকে অতুল বিভবের অধিকারী করবে। এরাই আমাকে আরবের আমীর করবে। এদের সাহায্যেই আমি পৃথিবীর রাজা হবো। লোক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তখন আমার দিকে চেয়ে থাকবে। কৃপণ আবেদ তখন "আমার ছোট ভাই" "আমার ছোট ভাই" বলে আমার অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে। হা, হা, সে এক দিন হবে বটে!

ভবিষ্যৎ গৌরবের কল্পনায় উত্তেজিত হয়ে মালেক ঘোড়ার পেটের নীচে গোড়ালি দিয়ে সজোরে আঘাত করলে। তেজী ঘোড়া বায়ুবেগে মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে চললো। কল্পকুশল মালেক তখন কল্পনায় নিজেকে এক প্রবল পরাক্রান্ত দস্যুদলের সর্দাররূপে দেখতে পেলে। কোষ থেকে অসি নিষ্কাষিত করে তার কাল্পনিক শত্রুদের বিরুদ্ধে সেটা বেগে সঞ্চালন করতে করতে সে বলতে লাগলো, "ঠিক কথা! আমি হব দস্যুদের সর্দার! আরবের যত নামজাদা ডাকাত আছে, সকলকে আমার দলে আনবো। জাহান্নামী বনি কায়েসদের সমস্ত উট জবরদস্তি কেড়ে নেবো। খালি বনি কায়েস কেন—" হঠাৎ সামনের দিকে মালেকের দৃষ্টি পড়লো। সে দেখলে, তার অন্তরঙ্গ বন্ধু হারেস তার দিকে ঘোড়া চালিয়ে আসছে। ঘোড়ার জিন থেকে কতকগুলো ছোটবড় পাখী ঝুলছে, আর হারেসের পৃষ্ঠদেশে তার ধনুর্ব্বাণ বিলম্বিত রয়েছে।

দূর থেকেই হারেস "আহলান্" "আহলান্" বলে চীৎকার করে উঠলো। কাসেম একটু কুণ্ঠিত হয়ে ঘোড়া থামিয়ে সেখানে দাঁড়ালো। হাসতে হাসতে নিকটে এসে হারেস জিজ্ঞাসা করলে, "কার বিরুদ্ধে অমন নির্দ্দয়ভাবে তল্‌ওয়ার চালাচ্ছিলে দোস্ত? কোনো দুশমন তো দেখতে পাচ্ছি না!"

লজ্জায় কাসেমের মুখ লাল হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি তল্‌ওয়ারটা খাপের ভিতর পূরে জোর করে মুখে একটু হাসি এনে সে বললে,—"তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে দোস্ত, চল আস্তে আস্তে, বলছি।"

"বটে, আচ্ছা চল" বলে হারেস অগ্রসর হলো। কাসেমও তার পাশাপাশি চলতে লাগলো। নিজের চিন্তাকে একটু গুছিয়ে নিয়ে কাসেম বল্লে,—"আবেদের সঙ্গে আমার খুব একটা ঝগড়া হয়ে গেছে। আমি কবিলা ত্যাগ করে চলেছি।"

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে হারেস বললে,—"সে কি কথা, দোস্ত? এমন কি গুরুতর ঘটনা ঘটেছে, যার জন্য পিতৃপিতামহদের কবিলা তোমায় ছাড়তে হচ্ছে?"

"শোন, সব বলছি।" বলে কাসেম তার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় হারেসের কাছে ঝগড়ার কথা সব বলতে লাগলো। হারেসও উৎকর্ণ হয়ে সে সব শুনতে লাগলো। শেষে যখন কাসেম খুব গম্ভীরভাবে বললে যে সে একজন ডাকাতের সর্দ্দার হবে সঙ্কল্প করেছে, তখন হারেস না হেসে আর থাকতে পারলে না। হাসির বেগ একটু প্রশমিত হবার পর সে বললে,—"লোকে কবিদের পাগল বলে থাকে। আমার সে কথায় বিশ্বাস হতো না! আজ কিন্তু তোমার কথা শুনে আর তোমার কাণ্ড দেখে লোকের কথা যে ঠিক তা বুঝতে পারলুম।"

কাসেম বিরক্ত হয়ে বললে,—"আমি যখন কায করে দেখিয়ে দেবো, তখন আর তুমি হাসবে না!"

দুই বন্ধু তখন হারেসের শিবিরের নিকটেই এসে পড়েছিল। ঘোড়া থামিয়ে স্মিতহাস্যে হারেস বললে—"আচ্ছা দোস্ত, আপাততঃ আমারই আতিথ্য স্বীকার কর। দস্যুগিরি দু'চার দিন মুলতুবি রাখলে রাহি মোসাফেরদের তেমন বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না।" কাসেম গম্ভীর স্বরে বললে,—"আমি কারও আশ্রয় নেবো না বলে সঙ্কল্প করেছি। কিসমৎ আমায় যে পথে নিয়ে যায়, সেই পথেই যাব।"

হারেস বললে,—"কিসমৎ তোমায় আজ আমার এই কুটীরে নিয়ে এসেছে বলেই মনে কর! তা ছাড়া, আগামী পরশু দিন আমির ইহইয়ার জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর মহলে কবিদের এক দরবার হবে। আরবের যত নামজাদা কবি

সব সেখানে আসবে। তোমার কাছেও নিশ্চয় আমিরের দূত যাবে। সেই দরবারে তোমায় হাজির হতেই হবে। প্রতিযোগিতায় যদি কবিদের হারাতে পার তাহলে আর তোমায় দস্যুগিরি করতে হবে না।"

কবিত্বের প্রতিযোগিতার কথা শুনে কাসেম উত্তেজিত হয়ে উঠলো। লাফিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে বললে, "ঠিক হয়েছে! আমার মঙ্গলের জন্যই আল্লা আজ তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন। আমি এই কবির মজলিসে অবশ্যই যাব! সেখানে একবার দেখিয়ে দেবো যে, আমার মত কবি এই আরব দেশে নাই।"

হারেস সস্নেহ দৃষ্টিতে তার ভাবপ্রবণ বন্ধুটীর দিকে চেয়ে বললে, "তোমারি দস্যুগিরির কথা সব যে ভুলে গেলে।"

লজ্জায় কাসেমের মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো। দুই বন্ধু তখন যথাস্থানে তাদের ঘোড়া দুটাকে রেখে শিবিরে প্রবেশ করলে।

(৩)

নির্দ্দিষ্ট সময়ে দুই বন্ধু আমির ইহইয়ার দরবারে হাজির হলো। আমির ছিলেন হেজাজের একটা ক্ষুদ্র জনপদের মালিক। তাঁর ইষ্টক-নির্ম্মিত সুন্দর বাড়ীটী মরুবাসী আরবের নিকট প্রাসাদ বলেই প্রতীয়মান হতো। তাঁর পালের উট এবং ভেড়ার সংখ্যা করা দুষ্কর হতো। লোকে তাঁকে হেজাজের অদ্বিতীয় ধনী বলেই জানতো। তিনি যে কেবল অতুল সম্পদের অধিকারী ছিলেন তা নয়। তাঁর মনটীও ছিল অতি উচ্চ ধরণের। তা ছাড়া, কবিত্বের জন্যও তাঁর বেশ একটু সুখ্যাতি ছিল। কবিদের তিনি বড় ভালবাসতেন; আর যথাসম্ভব তাদের সাহায্য করতে কোন ত্রুটি করতেন না। প্রত্যেক বৎসর তাঁর জন্মতিথিতে তাঁর মহল-প্রাঙ্গণে কবিদের একটা বড় দরবার বসতো। সেই দরবারে আরবের বিখ্যাত কবিরা এসে প্রতিযোগিতা করতেন। যে কবির রচনা সর্ব্বসাধারণের মনঃপূত হতো, আমির তাঁকে একশত উট পুরস্কার দিতেন।

প্রথামত এবারেও আমিরের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে দরবার বসলো। আমির একটা ক্ষুদ্র অথচ সৌজন্যপূর্ণ বক্তৃতায় উপস্থিত সকলের সম্বর্দ্ধনা করলেন। তার পর কবিতা-পাঠ আরম্ভ হলো। কোন কবি তাঁর মাশুকের সৌন্দর্য্য বর্ণনায় শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করলেন। কেউ তাঁর উটের প্রশংসা-গীতিতে সভা-মণ্ডপকে মুখরিত করে তুললেন। কোন অভিজাত কবি উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর কুল-মহিমা কীর্ত্তন করতে লাগলেন। শ্রোতারা—"মরহক" রবে তাদের প্রিয় কবিদের উৎসাহিত করতে লাগলো। আনন্দে, উৎসাহে এবং উত্তেজনায় সভা সরগরম হয়ে উঠলো।

আরবের খ্যাতনামা কবিরা একে একে তাঁদের রচনা পাঠ শেষ করলেন। ক্ষণেকের জন্য সভা নিস্তব্ধ হল। আমির তখন দর্শকদের লক্ষ্য করে বললেন, "আপনাদের মধ্যে আর কেউ কবিতা পড়তে ইচ্ছা করেন?" কাসেমের পাশ থেকে উঠে হারেস বললে, "আইয়াহুল আমির! (হে আমির!) আমার তরুণ বন্ধু কাসেম আজ এই দরবারে উপস্থিত আছেন। তাঁর নাম এখনো পর্য্যন্ত সকলের পরিচিত হয় নি বটে, কিন্তু তিনি প্রকৃতই একজন স্বভাব-কবি। অনুমতি পেলে তিনি একটী কবিতা পড়তে পারেন।"

স্মিতহাস্যে আমির বললেন, "সে তো অতি উত্তম কথা! তরুণ কবির প্রশংসা শুনে তার কবিতার রস গ্রহণের জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ হচ্ছে। আপনার বন্ধুকে কবিতা পড়তে বলুন।"

সলজ্জ আরক্তিম মুখে যখন কাসেম কবিতা পাঠের জন্য সভায় দাঁড়ালো, সকলে অবাক্ হয়ে তখন তাকে দেখতে লাগলো। এই অজাতশ্মশ্রু যুবককে আরবের শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দুঃসাহস প্রকাশ করতে দেখে লোকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাসেমের সমস্ত মুখমণ্ডলে কিন্তু এক অপূর্ব্ব দ্যুতি ছিল। আর তার অবয়ব থেকে একটা আত্ম-নির্ভরশীলতার ভাব অতি স্পষ্ট প্রকটিত হচ্ছিল। কেউ তাকে অবজ্ঞা করতে সাহস করলে না। উদগ্রীব হয়ে তার কবিতা শোনবার জন্য সকলে তার দিকে চেয়ে রইল।

কাসেম উদ্ধত দৃষ্টিতে একবার সভার চারি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। তার পর আরবের চিরাচরিত রীতি মত সে তার মাশুকের প্রশংসা-সূচক দুই চারিটী পদ ধীরে ধীরে পড়তে লাগলো। প্রবীণ কবিরা স্মিতহাস্যে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। মাশুকের প্রশংসায় তারা তো সিদ্ধহস্ত। তরুণ এই বালক তাঁদের সঙ্গে কি প্রতিযোগিতা করিবে। কাসেম তাদের অব্যক্ত বিদ্রূপ লক্ষ্য করে, একটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাদের দিকে চাইলে। সমস্ত দ্বিধা সমস্ত কুণ্ঠা তখন তার শরীর এবং মন থেকে স্খলিত হয়ে পড়লো। তার সেই রচনাটী হারেসের কাছে সে ছুঁড়ে

ফেলে দিলে। তার পর সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সে দৃপ্ত কণ্ঠে, ওজস্বিনী ভাষায়, অভিনব ছন্দে, অপ্রতিহত গতিতে তার নিজের গৌরবের কথা, নিজের আশার কথা, নিজের আকাঙ্ক্ষার কথা বলতে লাগলো। সে বললে, বংশ-গৌরবে সে কারও চেয়ে হীন নয়, কিন্তু বংশাবলী নিয়ে গর্ব্ব করাকে সে কাপুরুষের কায বলেই মনে করে। আরবের একাধিক কুরঙ্গনয়না সুন্দরীকে সে তার মাশুক বলে গণ্য করে, কিন্তু তাদের সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় কালক্ষেপ করাকে সে লাম্পট্য ছাড়া আর কিছু বলে মনে করে না। তার গর্ব্ব হচ্ছে নিজেকে নিয়ে, তার গৌরব হচ্ছে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে, আর তার কবিত্বের সার্থকতা হচ্ছে নিজের মহিমা কীর্ত্তনে। তার গর্ব্ব হচ্ছে যে সে একজন মানুষ, আল্লার প্রতিনিধি, বিশ্বের অভিজাত! তার গর্ব্ব হচ্ছে যে সে তল্‌ওয়ার চালাতে জানে হামজার মত, যে ভালবাসতে জানে মজনুর মত, সে কবিতা লিখতে জানে ইমরোল কায়েসের মত। মনুষ্যত্ব ছাড়া মানুষের গৌরব করবার কিছু নাই। আর সেই মনুষ্যত্বের গৌরবই তার পক্ষে যথেষ্ট!

কাসেমের কণ্ঠস্বর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠতে লাগলো। তার মুখের দীপ্তি অন্তরের উত্তেজনায় প্রখর থেকে প্রখরতর হতে লাগলো। তার গর্ব্বিত অঙ্গ-সঞ্চালনের ভঙ্গীতে এক দিগ্বিজয়ী বীরের আত্মপ্রত্যয় এবং আত্মগৌরব প্রকটিত হতে লাগলো। তার সেই প্রতিভা-উদ্ভাসিত, তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তিটী তখন মনুষ্যত্বের একটী মূর্ত্তিমান বিগ্রহের মত দেখাতে লাগলো।

কাসেমের উদ্ধত ভাব দেখে লোকে প্রথম তার উপর একটু বিরক্ত হয়েছিল। ধীরে ধীরে সেই বিরক্তি কিন্তু সহানুভূতিতে রূপান্তরিত হলো। প্রতিভার এই অভিনব, অপরূপ প্রকাশ দেখে লোকে মুগ্ধ হয়ে গেল। "মরহবা" "মরহবা" ধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হয়ে উঠলো। কাসেমের সেই গর্ব্বোদ্ধত, আত্মপ্রত্যয়সম্পন্ন, আত্ম-প্রকাশমান মূর্ত্তির মধ্যে প্রত্যেক দর্শক তার নিজের নিগূঢ়তম আত্মার সন্ধান পেতে লাগলো। তার সেই দৃপ্ত অঙ্গুলি-সঞ্চালনের অনুসরণ করে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হবার জন্য তাদের প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠলো।

কাসেম বলতে লাগলো, "এই বিশ্ব-চরাচরকে সৃষ্টি করে আল্লা চারিদিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন, পর্ব্বত তার বিপুল শরীর নিয়ে সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবলেন, "পর্ব্বতই আকারে সকলের চেয়ে বড়, এ-ই জগতে আমার প্রতিনিধি করবো।"

পর্ব্বতকে সম্বোধন করে আল্লা বললেন, "হে পর্ব্বত, আমার সৃষ্টির মধ্যে তুমিই আকারে সর্ব্বোচ্চ; আমার প্রতিনিধিত্বের ভার তোমাকেই দিতে ইচ্ছা করি। সে ভার তুমি নিতে প্রস্তুত আছ?" ভীতি-কম্পিত কণ্ঠে পাহাড় বল্‌লে, "প্রভু, অত বড় দায়িত্ব বহন করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমায় ক্ষমা করুন।"

আল্লা তখন সমুদ্রকে সম্বোধন করে বললেন, "হে জলধি, আমার অসীমত্বের সঙ্গে মানুষ তোমারই তুলনা দিয়ে থাকে। তোমাকেই আমি আমার প্রতিনিধিত্বের যোগ্য বলে মনে করি। তুমি সে ভার নিতে প্রস্তুত আছ?"

কাতর মিনতির স্বরে সমুদ্র বললে, "প্রভু, আমি দুর্ব্বল মেরুদণ্ডহীন জলের সমষ্টি মাত্র! আপনার প্রতিনিধিত্বের ভার বহন করবার ক্ষমতা আমার নাই। আমায় ক্ষমা করুন।"

আল্লা বিষণ্ণ মনে তখন আসমানের ফেরেস্তাদের দিকে চেয়ে বললেন, "হে আমার ফেরেস্তাগণ, রূপে, গুণে এবং ক্ষমতায় তোমরাই হচ্ছ আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমার প্রতিনিধিত্বের ভার নেবার যোগ্যতা তোমাদের বিশেষ করেই আছে। তোমরা কি সে ভার নিতে প্রস্তুত আছ?" আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে ফেরেস্তারা বললেন, "হে নিখিলের প্রভু! তুমি অসীম আর আমরা সসীম,—তুমি সর্ব্বব্যাপী আর আমরা সীমাবদ্ধ। তুমি নিত্য, আর আমাদের অস্তিত্ব তোমার ইচ্ছার অধীন। তোমার প্রতিনিধিত্বের গুরু ভার বহন করবার ক্ষমতা আমাদের নেই। তুমি আমাদের ক্ষমা কর।"

নিরাশ অন্তরে তখন আল্লা মানুষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন, বল্‌লেন, "হে মানব, তুমি দুর্ব্বল এবং স্বল্পায়ু। তোমায় অনুরোধ করতেও আমার কুণ্ঠা হয়। আমার সৃষ্টির মধ্যে যারা ক্ষমতায় তোমার চেয়ে অনেক বড়, তারা আমার প্রতিনিধিত্বের ভার বহন করতে অস্বীকার করেছে। তাই তোমার মত জানতে এখন আমার আগ্রহ হচ্ছে—তুমি আমার প্রতিনিধিত্ব করতে কি রাজি আছ?"

সেই দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র প্রাণী তখন তার বুকের উপর হাত রেখে বল্‌লে, "হে রব্বেল আ'লামিন্ (বিশ্বের অধীশ্বর)! পর্ব্বতের তুলনায় আমি অতি ক্ষুদ্র; সমুদ্রের তুলনায় আমি অতি অকিঞ্চিৎকর, ফেরেস্তাদের তুলনায় আমি অতি দুর্ব্বল;

যে ভার বহন করবার সাহস তাদের হয় নি, সে ভার আমি গ্রহণ করলে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার পানে চেয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসবে। কিন্তু হে নিত্য প্রভু, সে হাসির ভয় আমি করি না। তোমার সন্তোষের জন্য আমি সব করতে প্রস্তুত আছি। তুমি যখন তোমার প্রতিনিধিত্বের গুরু ভার আমার উপর চাপাতে ইচ্ছা করেছ, আমি তখন তাতে না বলবো না। যতক্ষণ আমার এই ক্ষুদ্র দেহে প্রাণ আছে, ততক্ষণ সে ভার আমি আনন্দে বহন করবো। তুমি জানো আমি দুর্ব্বল। আমার হাতে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হবে। অনেক সময় কর্ত্তব্য সাধনে আমি শৈথিল্য দেখাব। প্রভু, তুমি কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরে থেকো। তোমার এই দাস শেষে তোমার আজ্ঞা পালন করবেই করবে।"

ক্ষুদ্র, ক্ষীণজীবী মানবের এই মহাবাক্যে আল্লার আরশ (সিংহাসন) থেকে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে "মারহবা" "মারহবা" (কল্যাণ হোক, কল্যাণ হোক) ধ্বনি বেজে উঠলো। সেই আশীর্ব্বাণী বিশ্বে, ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্র ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। আল্লার সমস্ত সৃষ্টি বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিতে মানবের দিকে চেয়ে রইলো। বিশ্বপ্রভু ফেরেস্তা-মণ্ডলীকে সম্বোধন করে বললেন, "হে আলোক সন্তানগণ, আদমই আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আদমই আমার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। আর আদমই আমার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তোমরা সকলে আদমের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কর।"

অতুলনীয় মহিমা-মণ্ডিত সেই ফেরেস্তাগণ তখন আদমকে প্রণিপাত করলেন। সেই দিন থেকে মানব এই বিশ্বে আল্লার প্রতিনিধি হলো।

কাসেম তার গলার সুর সপ্তমে চড়িয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে লাগলো, "আজ আমি আল্লার প্রতিনিধি, বিশ্বের অভিজাত, সেই মানবের গরিমা কীর্ত্তন করছি। আমি ক্ষুদ্র বালক কাসেম নই, আমি হচ্ছি সেই মানব, বিশ্ব-সম্রাটের সুযোগ্য প্রতিনিধি। আমার কাছে অজেয় কিছুই নাই। আল্লার বরে আমি অজেয়, অমর, অসীম শক্তিশালী। আল্লার প্রতিনিধি হয়ে আমি জন্মেছি, আল্লার প্রতিনিধি হয়েই এই বিশ্বে আমি বিরাজ করবো। সেই বিশ্বসম্রাটের মহিমাকে নিজের মধ্যে প্রতিফলিত করে আমি ধন্য হব।"

কবিতা শেষ করে কাসেম আসন গ্রহণ করলে। উল্লাসের জয়ধ্বনিতে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠলো। সকলে একবাক্যে বলতে লাগলো, এমন কবিতা তারা পূর্ব্বে কখনও শোনে নি। আমির ইহইয়া স্বয়ং একজন রসগ্রাহী কবি ছিলেন। এই তরুণ যুবকের অপূর্ব্ব কবি-প্রতিভা দেখে তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলেন। সর্ব্ব সমক্ষে সেই সভাতেই কাসেমের সঙ্গে তাঁর একমাত্র কন্যা আমিনার বিবাহের প্রস্তাব তিনি করলেন। কাসেম এ সৌভাগ্য স্বপ্নেও কল্পনা করে নি। আমিরের অনুগ্রহের জন্য সে তাঁর কাছে অশ্রু-সজল নয়নে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো।

আমিরের নিমন্ত্রণ পেয়ে আবেদ যথাসময়ে এসে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিলে, আর সহাস্যমুখে পাত্র-পক্ষের তরফ থেকে কর্ত্তৃত্ব করতে লাগলো! মনে মনে সে ভাবলে, কাসেমকে সে যতটা নির্ব্বোধ মনে করেছিল, প্রকৃত পক্ষে সে ততটা নির্ব্বোধ নয়! কোথায় গেলে কিছু হাত করতে পারা যায়, সে বিষয় তার যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান আছে। অনুজের প্রতি তার ভ্রাতৃস্নেহ আবার উথলে উঠলো।

বিবাহের পর আবেদকে একা পেয়ে কাসেম বললে, "আমি তো বলেছিলুম আবেদ, আল্লা আমার রাস্তা করে দেবেনই। আমার প্রতিভা একেবারে মাঠে মারা যাবে না।"

খুঁতখুঁতে-স্বভাব আবেদ বললে, "সে তো বুঝলুম কাসেম। তোমার প্রতিভা না হয় মাঠে নাই মারা গেল। আমার গরিব উটগুলো তো মাঠে মারা গেল!"

কার্য্য-ব্যপদেশে আমির ইহইয়া সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি কাসেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আবেদ কোন্ উটের কথা নিয়ে অমন আক্ষেপ করছে?"

কাসেম তখন উট চুরির সমস্ত বৃত্তান্ত আমিরকে বললে। আবেদকে সম্বোধন করে আমির হাসতে হাসতে বললেন, "আমার জামাই তোমায় দু'শো উট দেবার অঙ্গীকার করেছিল; আমি চারশো উট দিচ্ছি। কেমন, তার ঋণ পরিশোধ হলো তো?" মনের উল্লাস দমন করে আবেদ বললে, "উটগুলোর চেহারা দেখলে তবে বলতে পারি।"

আমির কন্যাকে বিবাহ করে কাসেম অসামান্য বৈভবের অধিকারী হলো বটে, কিন্তু সুখ সে পেলে না। আমিনা ছিল বড় বদমেজাজী আর অহঙ্কারী মেয়ে। কাসেমকে সে তার পিতার একজন মামুলি আশ্রিতের মতই দেখতে লাগলো, স্বামীর মত তাকে দেখতে পারলে না। আত্মাভিমানী কাসেম তার ব্যবহারে অন্তরে দগ্ধ হতে লাগলো।

যত দিন যেতে লাগলো—তার অবস্থা ততই শোচনীয় হয়ে উঠছিল! স্বাধীন মুক্ত জীবনের জন্য তার ভাবপ্রবণ গর্ব্বিত প্রাণ আবার ছটফট করতে লাগলো!

আমিরের মহলে একটী সুন্দরী খৃষ্টান বান্দী ছিল। তার নাম ছিল সারা। সে সবে মাত্র এই যৌবনের স্বর্ণ-দ্বারে পদার্পণ করেছিল। লাবণ্য তার সুঠাম শরীরের প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যেক প্রত্যঙ্গে ঢেউ খেলিয়ে বেড়াচ্ছিল। কাসেমের মুহ্যমান কবি-প্রাণ তাকে দেখে যেন ফেরদৌসের (স্বর্গের) একটা ইয়াকুতের চাবি হাতে পেলে। তার প্রাণের সমস্ত উচ্ছ্বাস সে বিরলে বসে সারার মানস-প্রতিমার চরণ-প্রান্তে নিবেদন করতো। নিভৃতে বসে সারার উদ্দেশে কবিতা রচনা করা ক্রমে তার একটা বাতিক হয়ে দাঁড়ালো।

কাসেম যদি সারার উদ্দেশে কবিতা লিখেই ক্ষান্ত থাকতো, তা'হলে হয় তো কোন বিপদ ঘটতো না! তার উচ্ছল ভাবপ্রবণ প্রাণ কিন্তু তা নিয়েই খুশী রইলো না।

সেদিন পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছিল। মরু-প্রান্তর কোন্ মায়া রাজ্যের রজত-সমুদ্রের মত চক্‌চক্ করছিল। দূর পাহাড়ের রাখাল বালকের বাঁশীর করুণ সুরের ব্যথিত মূর্চ্ছনা সেই প্রান্তরকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। মনে হচ্ছিল যেন কোন ইন্দ্রজালাবদ্ধ রাজকুমারী তাঁর প্রাসাদ-কারাগারের গবাক্ষে বসে তাঁর সুদূরবাসী রাজপুত্রের কাছে প্রেমের আকুল আহ্বান সমুদ্রের লহরগুলির উপরে কম্পিত শঙ্কিত হৃদয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছেন! কেঁদে কেঁদে সে যেন বলছিল, "প্রাণ আমার, হৃদয় আমার, এসো তুমি। এই সুদূর মায়া-দ্বীপের এই দুর্ভেদ্য কারাগার থেকে তুমি আমায় উদ্ধার করে নিয়ে চলো। তুমি উদ্ধার না করলে আমি আর বাঁচবো না।" তার কোমল হৃদয় এক একবার যেন আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠছিল, আবার পরক্ষণেই নৈরাশ্যের ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে অশ্রুর সহস্র ধারায় ফেটে পড়ছিল। কাসেম একটী খেজুর গাছের ঝোপের তলায় বসে সেই জ্যোৎস্না-পুলকিত রাত্রের শোভা দেখছিল। বাঁশীর এই আকুল সুর তাকে ব্যাকুল করে তুললে। বাস্তব জীবনের কথা সে একেবারে ভুলে গেল। তার মানস-চক্ষে সারার কমনীয় মূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে ফুটে উঠলো। তার মনে হলো, সারাই যেন তাকে আদর করে, সোহাগ করে, মিনতি করে ডাকছে। সে-ই যেন আমির ইহইয়ের মহল থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য তারই কাছে করুণ কণ্ঠে মিনতি জানাচ্ছে। সে মিনতি কাসেম উপেক্ষা করতে পারলে না। ধীরে ধীরে সেই খেজুর-কুঞ্জ ছেড়ে সে মহলের দিকে অগ্রসর হলো।

সারার কক্ষের পাশ দিয়ে আমিনা কোন্ আত্মীয়ার কক্ষে যাচ্ছিল। কাসেমের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর হঠাৎ তার কাণে এলো। থমকে দাঁড়িয়ে যে সারার কক্ষের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। সেখানে যা দেখলে, তাতে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো।

সারা লজ্জাবনত মুখে একটী ছোট ফরাসের উপর সেলাইয়ের কায নিয়ে বসে আছে, আর অনতি-দূরে দাঁড়িয়ে কাসেম উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার রূপের গুণানুকীর্ত্তন করছে। আর সে যে তার প্রেমের মুগ্ধ ভিখারী, সে কথা তার কাছে করুণ কণ্ঠে নিবেদন করছে।

আমিনা ঝড়ের মত সেই কক্ষে প্রবেশ করে সজোরে সারাকে পদাঘাতে হঠিয়ে চীৎকার করে উঠলো, "জাহান্নামের কীট! তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, তুই আমার স্বামীর সঙ্গে প্রেমালাপ করিস!" তার পর কাসেমের দিকে তার তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে সে বললে, "তুচ্ছ পথের ভিখারী, তোমার অপরাধের যোগ্য শাস্তি দেবো। এখনি গিয়ে প্রহরীদের দিয়ে তোমায় বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করছি।" তার পর উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমিনা যেমন ঝড়ের মত এসেছিল, তেমনি ঝড়ের মতই সারার কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল!

সারা করুণ নেত্রে কাসেমের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি কেন আমার কক্ষে এলে! কে তোমায় এমন দুর্ম্মতি দিয়েছিল?"

কাসেম কুণ্ঠা-বিজড়িত কাতর কণ্ঠে বললে,—"আমায় ক্ষমা কর, সারা" বলে সে কক্ষ থেকে বাহির হয়ে বারেন্দায় এসে দাঁড়ালো। মহলে ইতিমধ্যে একটা মস্ত সোরগোল সুরু হয়েছিল। কাসেম মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করে সোজা আস্তাবলের মধ্যে চলে গেল। সেখানে তার নিজের সেই বিশ্বস্ত ঘোড়াটীতে জিন খাটিয়ে তাকে আস্তাবলের বাহিরে নিয়ে এলো। তার পর লজ্জিত, বিক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে সে একবার আমিরের মহলের দিকে চাইলে। এবং পরক্ষণে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসে গোড়ালি দিয়ে সজোরে ঘোড়ার পার্শ্বদেশে আঘাত করে লাগাম নাড়া দিলে। প্রভুভক্ত ঘোড়া প্রভুর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে বায়ুর গতিতে সেই সীমাহীন মরু-প্রান্তর অতিক্রম করে চললো।…… ……

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী সাহানা দেবী

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

প্রভু ব্যথা দিয়ে ধরো মোরে যখনি দিই ফাঁকি !
আমি যখনি দিই ফাঁকি !
তোমার আকাশ ধরায় রং যে দিঠি বুলায়—দেখি তা কি !
তুমি ধরো আমার ফাঁকি !
ভাবি তোমায় ভুলে রইব দূরে, গাইব আমার আপন সুরে,
আপন মনে, সঙ্গোপনে চলি পথের বাকি—
আমার তখন ধরো ফাঁকি !

কান্না আমার পথ-ভুলে লুটায় হৃদয় উপকূলে
মূর্চ্ছাহত, বেদন শত যাচে কারে ডাকি—
আমার তখন দেখাও ফাঁকি !
দেখি গান যে আমার তোমায় ছাড়া
স্পন্দনহীন ! দেয় না সাড়া !
নিঠুর তোমার কঠিন তালে জানাও আমার ফাঁকি—
তখন চাও যা থাকে বাকি !

II মা গা -া | মা ধা -া | ণা র্সা ণর্সা | ধা র্সণা ধণা | ধা ণধা ণপা |
প্র ভু - ব্য থা - দি য়ে - ধ রো - মো রে -

পধা পাঃ ণঃ | ধপা মা গা | মা ধা -া | ণা র্সা ণর্সা |
য- খ- - - নি - ফাঁ কি - আ মি -

র্সপা পর্সা ণধা | ধপা মা -া | মা পা -া |
য- খ- - নি দি - ফাঁ কি -

া না না | না না -া | না সনা ধনা | পধা নর্সা -া | না -া র্সা |
তো মার আ কা শ ধ রা- - - - -য় - র ং যে

না র্সা - | না র্র্সনর্সা ণা | ধা পা -া | পধা মপা ধণা | ধা পা -া |
দি ঠি - বু লা- - য় দে খি - তা- কি- - - তু মি -

০ + ০ +

ধা পা ধপা | ণা -া ধপা | মা গা মগা | গর্মা পা -া | II

ধ রো - - - - - - আ মা র্ ফাঁ কি -

০ + ০ + ০ +

{ -া মা গা | মা ধা ধা | ধা ধণা র্সণা | ধণা পধা -া | না -া র্সা | না সা -া |

ভা বি তো মা র্ ভু লে- - - - - - - র ই ব দূ রে -

দে খি গা ন্ যে আ মা- - - - - - - র্ তো মা র্ ছা ড়া -

০ + [নর্সর্রা গর্মর্পা] +

নর্সা ণধা ণপা | ধর্সা নর্সা -া | র্সর্সর্রর্গা র্মা র্মা | র্গা র্রর্সনা -া |

- - - - - - - - - - - গা - - ই ব আ মা - - র্

- - - - - - - - - - - স্প - - ন্দ ন হী - - - ন্

০

[র্সর্গর্রর্গা]

০ +

নর্সর্গর্রর্গা র্রর্সনর্সা ণা | ণা ধা -া | } ধা ধণর্রা র্সরা | র্সা ণা ধপা |

আ - - প - - ন্ সু রে আ প - - - ন্ ম নে - -

দে - য় না - - - সা ড়া নি ঠু র তো মা - র

০ + + ০

পা ধপা ণা | ণধপা মা গা | মা পা -া | ণা র্সা র্রা | র্সধা র্সণা ধণা |

স - - ং গো - - প নে চ লি - প থে র বা - কি - - -

ক ঠি - - - - ন্ তা নে জা না ও আ মা র ফাঁ কি - -

+ ০ + ০ +

ধা পা -া | পধা পাঃ ণঃ | ণধপা মা গা | মা পা -া | -া -া -া | II II

আ মা র ত - থ - - - ন্ ধ রো ফাঁ কি - - - - -

ত খ ন চা - - ও যা - থা কে বা কি - - - - -

০ + ০ + ০

সাঃ রঃ গা | গঃ গা মা | রগা সরগপা মা | মা মঃ -া | মা ধা -া |

কা - - ন্না আ মা র্ প - থ - - - - - ভু লে - লু টা য়

+ ০ + ০

ধা র্সণা ধণা | পধা পধণর্সা ণর্সা | ণা ধা -া | না -া না |

হৃ দ - - য় উ - প - - - কূ লে - মূ - র্চ্ছা

+ ০ + ০ +

না না -া | না র্সর্গা র্রর্গা | র্রর্সনা র্সা -া | মা ধা -া | ধা ণধা ণপা |

হ ত - বে দ - - ন্ শ - - ত - যা চে - কা রে - -

০ + ০ +

পধা পধর্সা ণা | ণা ধা -া | পধা পমগা -া | সা গা মা |

ডা - কি - - আ মা র্ ত - থ - - ন্ দে খা ও

০ +

গরা মগা -া | -া -া -া |

ফাঁ কি - - - - -

তারার বাণী

শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজি দূরের আলোয় মূর্ত্তি তোমার উঠছে কেবল দুলে
এ কি সমাপ্তিহীন হাতছানিতে হৃদয় উপকূলে!
প্রিয়, কাছে তোমার অরূপ ছটা কভু এমন তর
কই পীযূষে প্রাণ কাড়ে নি' ত'—গন্ধে ভর ভর!
বল কি যাদুতে তোমার প্রতি চাউনি গীতি হাস
আজ নিখিল ভুবন রন্ধ্রে ভরি' দেয় তব সুবাস!

ভাবি হয়ত' তোমায় সমীপে তার চেনার সীমায় ঢেকে
সদা রাখ্‌ত তৃষা অজান্তে মোর; তাই না-পাওয়ায় এঁকে
বুঝি গেল রেখে দিয়ে তোমার গোপন তুলিখানি
মোর চিত্ততলে অচিন পট এ! তোমার পরশ বাণী;
বল তাই কি এ অজানা জোয়ারের বানেতে আজি
যায় ছাপি' আমার প্রাণের দুকূল অসীম প্রভায় সাজি'!

আজি ধূ ধূ করে চারিধারে অপার জলমরু
নাই মাটির সে চির চেনা ভাষ—শ্যামল তৃণ তরু;
কেবল ফেন-নিশ্বাসে জলবালা পুঞ্জ ঢেউয়ের বাঁধে
যেন কোন্ সে আলিঙ্গনের লাগি আছ্‌ড়ে লুটি' কাঁদে:—
"যদি বেসেছি জীবনে ভাল—পাই না কেন তারে?
"শুধু নিবিড় তৃষা মেটাতে কি অশ্রুপ্লাবন ধারে?"

হঠাৎ দিগন্তে ঐ ধীরে ধীরে একটি তারার আঁখি
আকুল বিরহিণীর নীল নয়নে তাহার দিঠি রাখি'
যেন চায় গাহিতে কোন্ পূরবী বাজিয়ে দ্যুলোক—তার
রুচি কাঁপনে তার গগন বুকে মুক্তা মাণিক হার!
কেন লক্ষ যোজন দূরের গীতি শুন্‌তে হৃদি চায়—
যদি মর্ত্ত্যলোকে অমর্ত্ত্য গান পথ খুঁজে না পায়!

না না— দরদীর সে পরিচিত সুরে তারার আলো
শোনো ঐ না বাঁশি বাজিয়ে গাহে?—"আমিও গো ভালো
"ধরায় বেসেছিলাম উর্ম্মিবালা! তাই ত' এত দূরে
"থেকে পেরেছি মোর সুর মেলাতে বসুন্ধরার সুরে।
"তাই বলি ধনি! কেন ফুলে রুদ্ধ অভিমানে
"কর প্রেমের পূজায় ব্যর্থ তোমার ক্ষুব্ধতারি গানে?"

"হায় উপায় কি ?" কয় জলকুমারী ;—"নিতুই-নব ঢঙে
"প্রতি অশ্রু-হাসির সুষমাতে, নৃত্যবাঁশির রঙে
"গেয়ে জীবন-গীতি তোমার পাথার যাও না কেন দলি—
"উধাও গন্ধ ঢেলে অবহেলে নিঃশেষে সম্বলি' ?"
শুনি তারার বাণী উর্ম্মিরাণী বিছিয়ে অশ্রুরাশি
'চ্ছসে :— "কার তরে হায় গাই, সে যে নাই !" কয় তারা সম্ভাষি' :—

"ওগো তোমার আরতিতে সাড়া দিতেই হবে তাকে
"যার অদর্শনে প্রাণ তব আজ নিষ্ফলতায় ঢাকে ;
"জেনো শুধু তোমার গানের সাথে গাইতে সুদূর থেকে
"সে যে ছিল, আছে, থাক্‌বে বেঁচে তোমার 'পরে রেখে
"তার কম্প্র আঁখির বেদনভরা উছল প্রেমের ডাক
"আজ যতই দূরে হোক্ না তারি জীবন পথের বাঁক।

"তাকে চল্‌তে হবেই তোমার পানে চেয়ে সেথান থেকে
"করি তোমার অর্ঘ্য পাথেয় তার, যবে তুমি এঁকে
"সৃজি' যাবে চ'লে নিত্য নূতন বর্ণতুলিপাতে
"প্রতি রেখায় নিথর রূপটি তোমার উষায় সাঁঝে রাতে।
"কাছে হ'তে ধরায় আমিও যে পাই নি' ধরাতলে
"কেন ?— দূরের কোলেই পরম-পাওয়া গুপ্ত ঝলে ব'লে।

পেরিম, এডেন, লাহেজ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ব্যাব-এল-ম্যাণ্ডেব প্রণালীর মধ্যে পেরিম একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরময় দ্বীপ। লাল সাগরে প্রবেশ করিবার পথে এই দ্বীপ। এই দ্বীপ হইতে ইচ্ছা করিলে লাল-সাগরে জাহাজ ইত্যাদির প্রবেশ-বহির্গমন নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আরব এবং এই দ্বীপের মধ্যে ছোট একটি প্রণালী আছে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা ইহা প্রথম দখল করে; উদ্দেশ্য—মিশরস্থিত ফরাসীদের ভারত মহাসমুদ্রে কর্তৃত্ব স্থাপনে বাধা দেওয়া। বর্ত্তমানে এই দ্বীপে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী এবং একদল আরব সৈন্য আছে। এডেন হইতেই ইহার শাসন-কার্য্য চলিয়া থাকে। পেরিম অনুর্ব্বর দেশ; এবং তথায় সকল সময় বাত্যা-প্রবাহিত। ইংরাজ ব্যবসায়ীদের কয়েকটি আড্ডা ছাড়া এখানে আর বিশেষ কিছুই নাই। কয়লার কুলী ছাড়া অন্যান্য অধিবাসীরা মৎস্যজীবী। এডেন পেরিম হইতে ৯৬ মাইল পশ্চিমে।

এডেনের বাঁ দিকে কয়েকটি পাহাড় আছে—ইহারা ছোট-এডেন নামে পরিচিত। এই স্থানের লোকেরাও মৎস্যজীবী। অধিকাংশ ভ্রমণকারীর ধারণা যে, এডেন কয়লার ডিপো মাত্র। এডেনে বহুযুগ পূর্ব্বে পারসিকদের দ্বারা নির্ম্মিত ট্যাঙ্ক ইত্যাদি দেখিবার জিনিস আছে। পাহাড়ের উপরে ইহার অবস্থিতি। এডেনের সুমসুখ পাহাড়ের উচ্চতা ১৭২৫ ফিট। ছোট-এডেনের পিছন দিয়া যখন সূর্য্যাস্ত হয়, তখন সে দৃশ্য অতি মনোরম হয়।

জামবিয়ার যথাযথ ব্যবহার

এডেনে যে সকল শুষ্ক পাহাড় আছে তাহাতে বাঁদরের রাজত্ব। বহু প্রকার বন্য মোরগও এই স্থানে আছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, যেখানে সামান্য সামান্য মাটি জমিয়া আছে, সেই সকল স্থান হইতে ১৩২ রকমের নতুন ধরণের গাছ গাছড়া পাওয়া গিয়াছে। এডেনে তেলের খনি আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা আছে।

এডেনে বহু জাতির বাস। আরবদেরও বহু জাতি এই সহরে বাস করে। রাস্তার ধারের কফিখানাগুলি দেখিলে মিশরের পথঘাটের কথা মনে পড়ে। এই সকল কফিখানাতে নানা প্রকার স্থানীয় রাজনীতির

সোমালি পত্রবাহক

পবিত্র কার্পেটের শোভাযাত্রা

লাহেজের বংশীবাদক

সমস্ত বৎসরে এডেনে মাত্র চারি ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। এডেনের তাপ ১০০ ফারেনহাইট খুব কম সময়েই হয়। মে এবং জুন মাস অসহ্য গরম। বৃষ্টিপাত অত্যন্ত কম বলিয়াই বোধ হয় এডেনে রোগাদির প্রাবল্য কম। সূর্য্যাস্ত ছাড়া এডেন বন্দর হইতে আরো দুইটি মনোরম দৃশ্য দেখা যায়। চন্দ্রালোকে পাহাড়ের দৃশ্য এবং সূর্য্য উদয় হইবার সময় মাআলা পোতাশ্রয়ের দৃশ্য।

এডেন হইতে লাহেজ যাইবার পথ মরুভূমির মাঝখান দিয়া। ৩০।৪০টি উটের যাত্রীদল একসঙ্গে এই পথ দিয়া চলে। এই দৃশ্য বড় মনোরম। উটের পিঠে আরোহীরা সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া দুলিতে দুলিতে মরুপথ অতিক্রম করিতে থাকে। মাঝে মাঝে সঙ্গীতের শব্দ পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে উটকে গতিশীল করিবার জন্য আল্লার দোহাই দিয়া গালি দিবার শব্দও শোনা যায়। মরুভূমির দৃশ্যের মনোহারিত্বের বর্ণনা করা অসম্ভব। মরুভূমিতে মানুষ তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার সান্নিধ্য অনুভব করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। উটের গলার ঘণ্টার টুং টুং শব্দ শুনিতে শুনিতে জগৎ সংসারের সব কথা মানুষ যেন ভুলিয়া যায়।

লাহেজ কারাগারের বন্দিগণ

আলোচনা হয়। নিশবদেশের সংবাদপত্রাদিও বহু পরিমাণে পঠিত হইয়া থাকে।

এডেনের সমস্ত কুরূপ, কয়লার গাদি ইত্যাদির তলায় যেন কি একটা মায়া আছে। বহু শত বৎসর পূর্ব্বের কত

রাজবংশের স্মৃতি যে এইখানে আছে, তাহার স্থিরতা নাই। ওয়াল্ট হুইটম্যান বলিয়াছেন "এডেনের আকাশ বাতাসে বহু যুগ পূর্ব্বের মানুষদের স্পর্শ পাওয়া যায়। আমার নিকটে যে কেহ রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সকল সময়েই যেন কাহারা আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে বলিয়া মনে হয়।"

সোমালী গৃহিণীর ধূমপান

প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌স্ জাহাজ-ঘাটে জাহাজ হইতে নামিয়াই গত মহাযুদ্ধের একটি স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যায়। এই স্মৃতিস্তম্ভটিকে তাহার চারিদিকের দৃশ্যের মধ্যে অত্যন্ত বেখাপ্পা বলিয়া মনে হয়। ইহার ডান দিকে একটি উদ্যান আছে। বিকাল বেলায় আরব, য়িহুদী, এবং ভারতীয় ছোট ছোট বালক বালিকারা তথায় খেলা করে। এই উদ্যান পার হইয়া ইউনিয়ান ক্লাব পার হইয়া পাহাড়ের উপর প্রথম সহকারী রেসিডেন্টের আবাস দেখা যায়। হগ্ ক্লক টাওয়ারও এই স্থান হইতে দেখা যায়। এই ক্লক টাওয়ার একজন ভূতপূর্ব্ব রেসিডেন্টের স্মৃতিজড়িত। তার পর সহরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কয়েকটি অতিক্রম করিয়া খেলার মাঠের দৃশ্য চোখে পড়ে।

পাহাড়ের বাঁদিকে পল্টনাবাস। ডানদিকে সৈন্যদের স্নানাগার। এডেন সহরে ভ্রমণ করিবার জন্য ট্যাক্সি ইত্যাদি পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকেরা পথ প্রদর্শকের কাজ করিয়া মাঝে মাঝে কিছু রোজগার করে। শ্বেতাঙ্গদের থাকিবার জন্য হোটেল ইত্যাদির ভাল ব্যবস্থা আছে। কালা আদমিদের জন্য তেমন সুবন্দোবস্ত কিছু নাই।

হিন্দুক্ষৌরকার

এডেন-লাহেজ রেলওয়ের আড্ডা পার হইয়া সোমালিপুরা গ্রাম। এই গ্রাম পার হইয়া কাঠের ব্যবসায়ীদের গৃহাদি দেখা যায়। এইখানে সমুদ্রের উপকূলে একটি আরব দেবতা আছে। এই দেবতার কাছে আফ্রিকার এক জাতি না কি প্রতি বৎসর একটি আরব-শিশু চুরি করিয়া বলি দিয়া থাকে।

সহরের এক প্রান্তে মাআলা নামক স্থান অত্যন্ত নির্জ্জন। সাধারণ লোকে বিশেষ কাজ না পড়িলে এই দিক মাড়ায় না। আরবেরা অনেক সময় গালি দিয়া বলে "জিনের দল তোকে মাআলাতে লইয়া যাউক"—এই বাক্য হইতেই মাআলা কেমন চমৎকার স্থান তাহা বুঝা যায়।

লাহেজ বাজারে মিষ্টান্ন বিক্রেতা য়িহুদী

এডেন হইতে প্রায় দশ মাইল দূরে সেখ ওথমান নামক সীমান্ত ষ্টেশন। এই স্থান হইতে আর একটি রাস্তা দিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে এডেন-রক্ষার জন্য নির্ম্মিত দেওয়ালগুলির কাছে যাওয়া যায়। এইখানে একটি গিরিসঙ্কট আছে। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে একটি অগম্য স্থান দেখা যায়। এইখানে নাকি "কেনে"র কবর আছে।

এডেন সহরে দুইটি হিন্দু মন্দির বর্ত্তমান। এডেন ইংরেজ অধিকারে আসিবার পর এই দুইটি মন্দির নির্ম্মিত হয়। এডেন সহরের বাজার দেখিতে বড় চমৎকার। কত রকম লোক কত রকম পোষাক পরিয়া বাজারে আসে
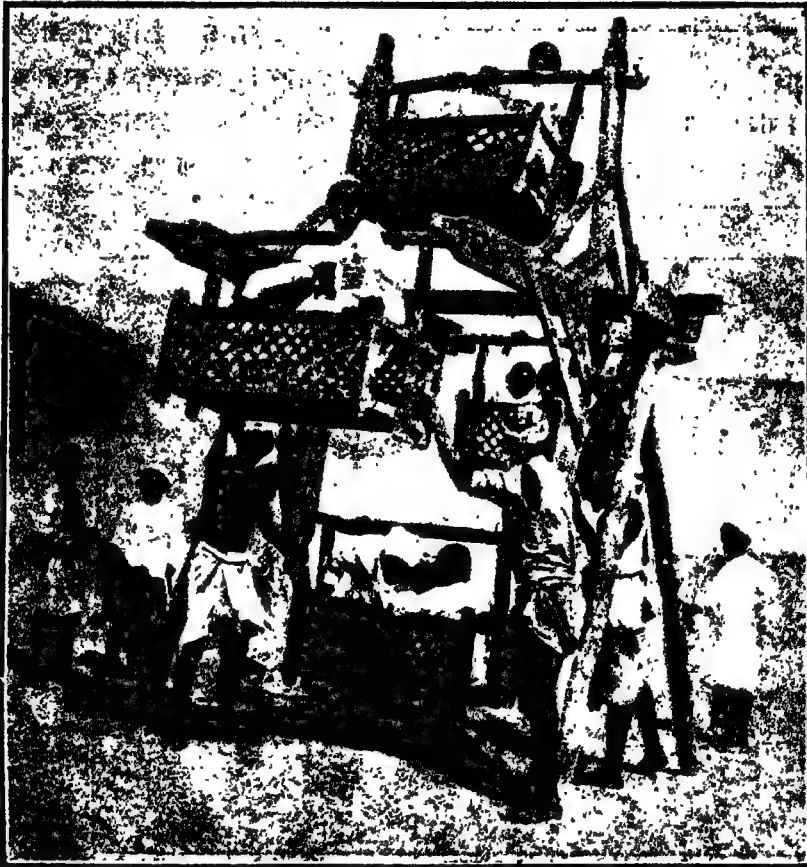
আরব-বালক-বালিকাগণের মেলাক্ষেত্রে আমোদ

তাহার ঠিক নাই। সমস্ত বাজারে জীবনের লক্ষণ পূরা মাত্রায় পাওয়া যায়।

সিরা নামক ছোট দ্বীপটি এডেনের সহিত একটি বাঁধ দ্বারা সংযুক্ত হইয়াছে। এডেন সহর পুর্ব্বে একটি আগ্নেয়গিরি ছিল। এখন নিভিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়—কিন্তু স্থির নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আরবেরা বলে যে সিরা দ্বীপের পেটের মধ্যে প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড আছে। আল্লা এক দিন এই আগুন পৃথিবীর উপরে ছড়াইয়া দিবেন।

এডেনের রাজপথে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য

লাহেজের সুলতানের—শরীর রক্ষীবৃন্দ

এডেনের দক্ষিণ দিকে হোকাট ফ্লাটস্ পার হইলে এডেনের ইংরেজদের আদি কবরস্থান চোখে পড়ে। এই পথ দিয়া আরো খানিক আগাইয়া গেলেই রাস্তার শেষ এবং মার্শাগ লাইটহাউস দেখা যায়। এডেনের পাহাড়ের আগ্নেয় গহ্বরের উপর আল এদ্‌রাসের প্রধান মসজিদ। এই মসজিদের চারিদিকে এডেনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কবরস্থান। এই কবরস্থানে অতি অল্প কয়জন লোকই মৃত্যুর পর স্থান পাইবার আশা করিতে পারে। যাহারা এই কবরে স্থানলাভ করে—লোকে তাহাদের অতি ভাগ্যবান এবং আল্লার প্রিয়পুত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

এডেনের সেথ ওথমান রাজপথ দিয়া গেলে "বোর মাকসার"। এই স্থানে বর্ত্তমানে পল্টন্ থাকে। এখানে পোলো গ্রাউণ্ড এবং মাকসার গল্‌ফ্ ক্লাব দেখা যায়।

এডেনের একটি প্রধান ব্যবসায় "সল্টপ্যান্"গুলিও এই রাস্তার পাশে পড়ে। প্রায় ২০ মিনিট এই রাস্তা দিয়া

আরবে 'জোয়ারি' মাড়াই

বড়দিনে মুসলমানদিগের মেলা

গাড়ীতে গেলে পর সেখ ওথমান গ্রামে পৌঁছান যায়। এই স্থান ১৯১৫ সালে তুর্কীরা দখল করে। কিছু কাল পরেই আবার তুর্কী হস্ত হইতে এই স্থান পুনরধিকার করা হয়। এই স্থানে একজন সহকারী রেসিডেন্টের বাস। নানা প্রকার ব্যবসায়ের কেন্দ্র এই স্থানে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। ১৮৮১ সালে এডেনের চোর-বদমায়েসদের এই সেথ গ্রামে আটক করিয়া রাখা হইত। সেথ ওথমানে "কিথ ক্যাল-কোনার মিশনে"র কেন্দ্র। এই মিশনের উদ্যোক্তার কবর তোকাট বে কবর-স্থানে আছে।

এডেনের প্রধান ব্যবসা হইতেছে—আরবদেশের অভ্যন্তর হইতে যে সকল মালপত্র আসিয়া এখানে জমা হয়, তাহা জাহাজে উঠাইয়া দেওয়া। সোমালিল্যাণ্ড হইতে কাঁচা এবং পাকা চামড়া আমদানী হয়। এডেন হইতে তাহা বিদেশে রপ্তানি হয়। হজারিয়া প্রদেশ হইতে
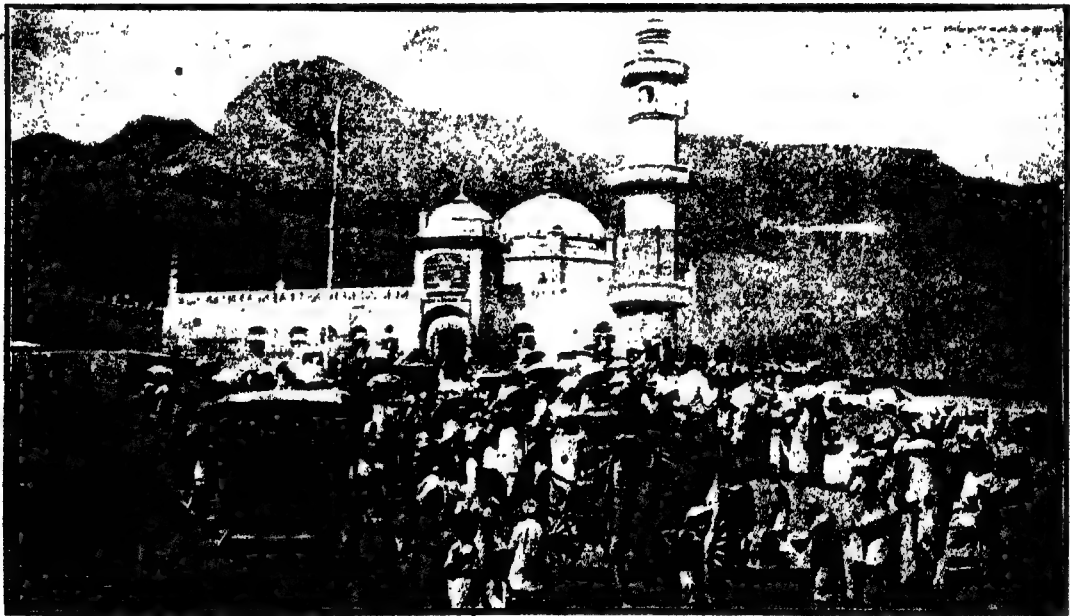
বিখ্যাত মোচা কফি আসে। এই প্রদেশ পূর্ব্বে তুর্কীর দখলে ছিল। মেনাখা পাহাড় এবং যাকা প্রদেশ হইতেও বহু পরিমাণে কফির আমদানী হয়। অ্যাবিসিনিয়া হইতে হাতীর দাঁতের আমদানী হয়।

আরব শ্রমিকেরা বেশীর ভাগ আরব দেশের অনেক দূর প্রদেশ হইতে আসিয়া থাকে। এডেনের বন্দরগুলিতে তাহারা মাল বহন ইত্যাদির কাজ করে। কফি এবং চামড়ার কারখানাতেও ইহারা কাজ করে। এডেনের সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ব্যবসায়ীরা হাড্রামাউত নামক স্থানের লোক। আরব দেশের এবং আফ্রিকার মধ্যস্থিত লাল সাগরে বহু সংখ্যক ঐ দেশীয় বড় নৌকা এপার-ওপার করিতেছে। এই সকল নৌকা বেশীর ভাগ মাল বহনের কার্য্যই করিয়া থাকে। ঘোর মাকসারে "সণ্টপ্যান"গুলিতে বহু শত শ্রমিক নিযুক্ত আছে। তাওহাই প্রদেশের সিগারেটের কারখানাতে বহুসংখ্যক গ্রীক এবং য়িহুদী নিযুক্ত আছে। য়িহুদীরা ইহা ছাড়া উট পাখীর ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছে।

মেলায় আমোদ-আনন্দ

এডেনে গাছপালার একান্ত অভাব চোখকে পীড়া দেয়। চারিদিকে পাথর পাহাড় ইত্যাদি একঘেয়ে ভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। এডেনে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থার কমতি কিছু নাই। পোলো, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি খেলার ব্যবস্থা আছে। ক্লাবও বহু সংখ্যক আছে। তাহা হইলেও গরমের দিনে এই স্থানে সমস্ত আমোদ প্রমোদের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রাণ হাঁপাইয়া ওঠে।

পানের জন্য যে জল ব্যবহার করা হয়, তাহা সমুদ্রের জল ফুটাইয়া বাষ্প করিয়া সেই জল পুনরায় জমাইয়া লওয়া হয়। ইহাতে সুফল আছে—জল দ্বারা যে সকল রোগের বিস্তার হয়, তাহা হইতে পারে না। ইলেকট্রিক লাইট এবং ফ্যানের প্রচার হইবার সঙ্গে সঙ্গে এডেনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এডেনে নাম করার মত সাধারণ পাঠাগার বা গ্রন্থাগার নাই। পথঘাটের অবস্থা দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। ট্যাক্সির সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পথ ঘাটের অবস্থা সমান রহিয়াছে। উত্তর-পূর্ব্বমুখী মরসুমী বাতাস বহিবার সময় সহরের ঘর বাড়ী সব কয়লার ধূলাতে কালো হইয়া যায়। শত শত জাহাজের ধোঁয়াও সহরকে বড় কম ব্যতিব্যস্ত করে না।

এডেনের ১৬ মাইল উত্তরে লাহেজ সহর। এই প্রকার অযত্নরক্ষিত এবং বিশৃঙ্খল সহর খুব কম দেখা যায়।

এই স্থানের সুলতানদের নিকট হইতেই ইংরাজেরা ১৮৩৯ সালে এডেন দখল করে। আরব দেশের অন্যান্য প্রদেশের লোকদের অপেক্ষা এই দেশের লোকেরা অধিক সভ্য। এডেনের নিকটে থাকিবার ফলেই হয় ত ইহা হইয়াছে। লাহেজকে "এডেনের গেট" বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

লাহেজে জলের অভাব নাই। টাইবান নদী হইতে খাল কাটিয়া সহরে জলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জলের প্রাচুর্য্যের জন্য লাহেজ সহরে উদ্যান, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, নানাপ্রকার ফলমূল তরীতরকারী প্রচুর পরিমাণে আছে। সহরের চারিদিকের মাটির ঘরবাড়ীর মধ্যে নবাবের বাড়ীটি বেথাপ্পা রকমের সুন্দর এবং প্রকাণ্ড। সহরে মশামাছির কমতি নাই। লোকেরা অন্যান্য আরবদের তুলনায় শান্ত এবং শিষ্ট। খুব সম্ভবতঃ ইহা ইংরেজ প্রভাবের ফল। ইহারা নানা প্রকার ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকে। এই সহরের লোকেদের আরবেরা ঠাট্টা করিয়া "শুকন মাছ খেকো" বলিয়া থাকে। কারণ,
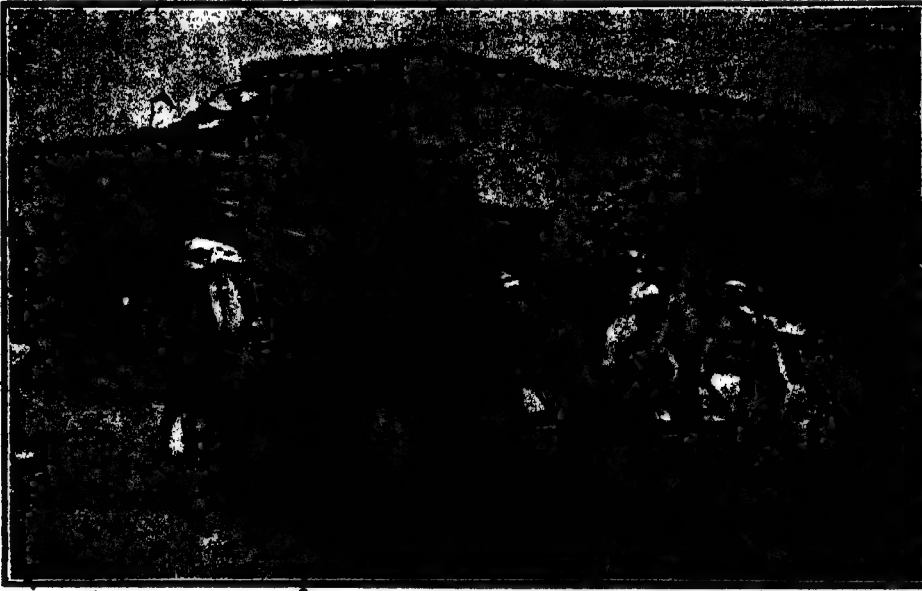
কাষ্ঠবাহী উষ্ট্র

ইহারা এডেন হইতে আনীত শুষ্ক মাছ বহু পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া থাকে। লেহাজ প্রদেশ এমনি শান্তিপূর্ণ থাকে; কিন্তু মাঝে মাঝে সুবেহি-জাতির আক্রমণে ব্যতি-ব্যস্ত হয়। ইহারা কাহারো অধীন নয়—লুটপাট করিয়া দিন গুজরান করে। ইহারা যাত্রীদল লুটপাটও করিয়া থাকে।

এডেন হইতে ৫০০ মাইল দূরে সোকোট্রা দ্বীপ। ইংরাজদের সহিত এই দ্বীপের সম্বন্ধ ১৮৩৪ সাল হইতে। এডেন-রেসিডেন্ট এই দ্বীপের ইংরেজ-স্বার্থ দেখিয়া থাকেন। ইহা তাঁহার এলাকার মধ্যে। এই দ্বীপের রাজধানী টামারিডা—এই নাম বোধ হয় পর্টুগিজ নাবিকদের দেওয়া। সোকোট্রানরা ইহাকে হাডিবু বলে। টামারিডার দুই মাইল পূর্ব্বে—পুরাতন রাজধানী সিক্। তাহার পূর্ব্ব গৌরব লুপ্ত—বর্ত্তমানে কেবল ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এই দ্বীপের হাজির পর্ব্বতশ্রেণী দেখিবার জিনিস। পুরাতন ব্যবসা এখানে যাহা ছিল, তাহা বর্ত্তমানে প্রায় লোপ পাইবার অবস্থায়। সমুদ্র উপকূলবাসীরা মৎস্যজীবী। দ্বীপের মধ্যে পর্ব্বতবাসীরা পশু-পালন করিয়া জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে। মৎস্যজীবী এবং পশুপালক—দুইটি বিভিন্ন জাতি। দ্বীপের ভাষা অনেকটা পুরাতন মাহরি ভাষার মতন—উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। প্রবাদ আছে যে আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এই দ্বীপে একটি গ্রীক উপনিবেশ স্থাপন করেন। দ্বীপের পূর্ব্ব উপকূলে পাহাড়ে ঝড়ের সময় ঠোক্কর লাগিয়া বহু জাহাজ নষ্ট হইয়াছে।

দ্বীপের পশ্চিম দিকে কালানিসা গ্রাম। এখানে অনেকগুলি মসজিদ আছে। সোকোট্রাতে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের চিহ্ন স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই দ্বীপে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। জিনিসের অদল বদলে ব্যবসা চলিত। হাডিবু সহর পরিষ্কার। বহু তালকুঞ্জ সহরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। দ্বীপবাসীরা লাজুক, ইহাদের রং ফর্সা এবং দেহ সুন্দর। সোকোট্রাতে এক প্রকার ভাল খচ্চর এবং দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যায়।

এডেন হইতে ৭৫০ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে কুরিয়া মুরিয়া দ্বীপ অবস্থিত। এই দ্বীপ ইংরেজরা মাস্কাটের সুলতানের নিকট হইতে পায়। লাল সাগরে কেবল্ বসাইবার সময় সুলতান ইহা দান করেন। এই দ্বীপ এডেনের শাসনাধীন।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

৬০

"এ কি! আজ এঁর মধ্যেই ফিরলেন যে?"

কর্ত্তা কোন কথা না কহিয়া, ছাতাটি রাখিয়া ধুপ্ করিয়া বসিলেন।

বলিলাম,—"সকালে বেড়ানো আপনার অভ্যাস,—এখানকার সকালটা খোয়াতে মন খুঁৎ-খুঁৎ করে,—ক্ষতি বলে মনে হয়। কাজ আছে বুঝি?"

বিমর্ষভাবে বলিলেন,—"বেড়াতে আর দিলেন কই। ধর্ম্মশালায় গিয়ে তো সব শুনেই এলুম,—সবারই তো ফেরবার তাড়া পড়ে গেছে! অকারণ এতো ব্যস্ত হওয়া যে কেনো তাও বুঝি না!—

"কি কষ্ট হচ্ছে, তাও খুলে বলবেন না। কেউ কি বলেছি যে বাবা বৈদ্যনাথকে দর্শন করতেই হবে! এমন অন্যায় কথা বলবো কেনো! তাঁর চরণামৃত খেতে বলেছি কি!—বলুন? আমি কি জানিনা—আপনারা ভালো লেখাপড়া শিখেছেন,—ওটা যে ব্যাসিলির বাসা, সে-জ্ঞান খাসা আছেই। তবে আমার অপরাধটা কি,—বলুন!"

শুনিয়া আমি তো অবাক। কি যে বলিব ভাবিয়া পাইনা। বলিলাম,—"আপনি ও-সব কি বলছেন?"

"না,—বেশ কাটছিল;—এঁরাও কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকেন,—বদ্-ফরমাজ কি দুর্ভাবনা inject করবার (ঢোকাবার) ফুরসৎ পেতেন না। পাঁচ রকম পড়ায় অম্বলটাও দেবে থাকছিল। আমারো বেড়াবার বহর আর বাহার দুই-ই বেড়েছিল,—বেশ ছিলুম। এইবার সুদে আসোলে গুণতে হবে দেখছি।"

বলিলাম,—"আপনার কথায় একবারও 'না' বলতে পারিনি,—হ'লও অনেক দিন। কাশী থেকে"—

বলিলেন—"হাঁ—তা বটে, তা এটিও তীর্থক্ষেত্র। তবে, কাশী 'নির্ব্বাণ' দেন,—এখানে—ধিকি-ধিকি! ইনি রাবণের ঠাকুর কিনা,—নিবতে দেন না,—চিতা বেশ চড়্‌কো। তাই, মালদারেরাই আসেন,—রোশনাই চাই তো।"—

আরো কত কি বলিয়া যাইতেন,—সুরটা পুরবীতে ঝুঁকিয়াছে, সহজে থামিবেনা।

বলিলাম—"এমন আনন্দে আর এত' যত্নের মধ্যে জীবনের অল্প দিনই কেটেছে। আপনার সাহায্যে এখানকার প্রায় সবই তো দেখা হয়ে গেছে—"

'কই—আপনি তো আজো মফস্বল মাড়ান নি।"

বলিলাম—"ওটা না-দেখে, ওর জন্যে—কাগজে আর কথায়—আক্ষেপ করাটাই রীতি, আর ওর গুণগান করাটাও বটে। এ বয়সে আর রীতিবিরুদ্ধ কাজ করা কেন'! জুতোও নারাজ,—তার দোষ নেই।"

"জুতো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ,—এখানকার পথে পা দেওয়া, আর তাদের 'ঘিস্‌কাপের' মুখে দেওয়া—একই কথা নয় কি? কাঁকর আর বালির মুখে, তলাটা সাত দিনেই সাফ্! এখানে এলে বেড়াবার বাতিক বাড়ে এবং তা ভালও লাগে;—provided শ্বশুরের যদি জুতোর দোকান থাকে।"

এতক্ষণে কর্ত্তার মুখে হাসি ফুটিল, বলিলেন—"তা বটে,—এই দেখুননা"—

কথা অসমাপ্তই রহিয়া গেল। জয়হরি দমকা হাওয়ার মত' ঘরে ঢুকিয়াই কর্ত্তাকে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ মশাই, এবার পোষ-মাসটা মলমাস ছিল বুঝি? না—ঝম্প-বর্ষ (leap year) পড়ায় টোপ্‌কে চলে গেল,—চেহারা দেখতে পেলুম-না! এসেছিলো?"

তাহার পণ্ডিতি-প্রশ্নে আমি অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—"তার তরে তিন মাস পরে হঠাৎ আজ তোমার এতটা মাথাব্যথা কেন?"

সে আমাকে দেখিতে পায় নাই, চাহিয়াই—"এই যে আপনি আছেন" বলিয়াই যেন দমিয়া গেল।

কর্ত্তা জয়হরিকে পাইলে ও তাহার কথা শুনিলে খুসি হইতেন,—স্ফূর্ত্তি দেখা দিত। তাঁহার ম্যাজমেজে ভাবটা মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল।

এক-গাল হাসি ঠেলিয়া বলিলেন,—"জয়হরি বাবুর মত' মানুষ আছেন বলেই,—মাজাভাঙা সংসারগুলো খাড়া আছে,—মাথা উঁচু করে খোলা-হাওয়া টানতে পায়।—

—"আমাদেরই যেন দাঁত পড়ে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধরেছে,—পোষমাসটা মল-মাস দাঁড়িয়ে গেছে,—কমলালেবু আর কেকেতেই ধর্ম্মরক্ষা চলে! জয়হরি বাবু চিন্তাশীল লোক, আক্কেলে—সে-কেলে;—ঠিক্ ধরেছেন। ধর্ম্মচ্যুত হয়েছিলুম আর কি!—সাধু সঙ্গের সুখই এই, চট্ বাঁচিয়ে দিলেন। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে—কিছু ঝুঁকিয়ে মাপলেই খোলসা,—কি বলেন জয়হরি বাবু?"

সে মুসড়িয়া গিয়াছিল, আমার দিকে চাহিয়া বলিল,—"উনি ওঁদের সব খেতে বলে এলেন কিনা—তাই। সেই Red P—রাঙা-আলুগুলো থাকে তো—কাজ"—

কর্ত্তা উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"ঠিকই তো,—আছে বই কি, ঘুঁটের ঘরে—সারের সঙ্গ পেয়ে অঙ্কুর ছাড়চে। উঃ, আপনার লোক না হলে—কে এতটা ভাবে বলুন!"

আবার সেই মাসখানেক পূর্ব্বের Red P মাথায় পৌঁছিয়া, আমাকে অপ্রকৃতিস্থ করিয়া দিল। বলিলাম,—

"ও দেখছি মরতে এসেছে,—কেউ বাঁচাতে পারবেনা! যেরূপ গুলিভুক্ত করে' আনছে, ও তো যাবেই,—আপনাকে আমাকেও রেখে যাবেনা; অন্ততঃ জেলে জমা দিয়ে যাবে! ওর ওই Red Pর পাক্ চড়াবার আগে—ও আগে এক-খানা "ডেমি"তে আট আনার টিকিট মেরে লিখে সই করে' দিক—"আমি স্বইচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে খাইতেছি,—ইহার পরিণামের জন্য হরিনাম করা ছাড়া, কেহ দায়ী হইবেন না।—

"সরকার আটগণ্ডা সেলামী পেলেই ঠাণ্ডা হতে পারেন,—আমাদেরও রক্ষার রাস্তা থাকবে। ও কি জ্ঞানের তোয়াক্কা রেখে খাবে ভাবছেন!"

সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল,—"ডাক্তার বাবুরও নেমন্তন্ন আছে, তিনি যা বলবেন,—তাঁর পাশেই বসবো। নষ্ট হবে বলেই"—

হাসিও পায়,—রাগও হয়! আমি আর কথা কহিলাম না।

কর্ত্তা বলিলেন—"হ্যাঁ, তাও তো বটে,—তবে আর কি,—ভাবচেন কেন'—ডাক্তার রয়েছেন! আবার ইনস্পেক্টার মোস্তাফা মিঞাও তেমনি ভদ্দর লোক! বলেন,—তাঁর কাছে বাপও যা—বাইরের লোকও তা,—এক ভাব। প্রবল উন্নতি-কামী কিনা,—'বসুধৈব'—এক-পা। আপনি ভাববেন না।—

—"আচ্ছা—আসুন তো জয়হরি বাবু,—অনেক কাজ, আপনি না হলে হবেনা। কিন্তু—ঐ ছ'সের রাঙা-আলুতে হবে কি?"

এই বলিতে বলিতে জয়হরিকে লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

মরুক্ গে।

৬১

বাসায় আজ সকলেই ব্যস্ত,—ঘটার আয়োজন!

কর্ত্তা সারাদিনই বাজার করিতেছেন।—একবার ফেরেন, তখনি—ইস্ সা-জিরেটা ভুল হয়ে গেছে—বলিয়া আবার ছোটেন।

বাণেশ্বর উঠানের মাঝখানে বসিয়া মাছ কুটিতেছে;—তাহাকে কিছুতেই দেখিতে পাননা।

—"বেটা সট্‌কেছে' দেখেছ,—হারামজাদার টিকি দেখবার জো নেই,—বেইমান বেটা!"

বলিলাম—"ওর টিকি আছে নাকি?"

"কই—তা তো দেখিনি! বেটা দেখায়ও না তো। জাত জন্ম খেলে দেখছি! পেলে বেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখবেন তো,—দেখতে হয়েছে। ওরে বাপরে—ধর্ম্ম নিয়ে কথা।—

"আমি চট্‌করে দালচিনিটে বদলে আনি,—একদম পেয়রা গাছের ছাল! বেটা দেখবে?"

বলিলাম—"আপনিই তো এনেছেন।"

"সঙ্গে থাকলে তো দেখতো,—তা থাকবে?"

দ্রুত চলিয়া গেলেন।

এই ভাব সারাদিন চলিয়াছে।

জয়হরির আজ মেল্‌ডে (Mail-day); সে মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। গায়ে গেঞ্জী, মাথায় গামছা,—এই যা তফাৎ।—বজায় লুচি-ভাজা বামন! কাপড়ে তেল হলুদ,—পা মেলিয়া রাঙা-আলু সিদ্ধ চট্‌কাইতেছে। মেয়েরা যা চাকিতে দিতেছেন—তাহাই মুখে ফেলিতেছে বা তাঁহারাই তাহার মুখে ফেলিয়া দিতেছেন, চাখার বিরাম নাই! পান-জরদাও মুহুর্মুহু চলিয়াছে। সে যেন ঠাকুর-ঝি!

বৈঠকের পাশের ঘরেই বাণেশ্বরের আস্থানা। মধ্যে মধ্যে সেখানেও তাহার সাড়া পাইতেছি,—সাড়াটা অবশ্য হুঁকার মার্ফৎ। সে টান্ রাঢ়ে ভিন্ন বাঙ্গলার অন্য কোন' ঝাড়ে জন্মায় না। তাহাতে—কমা, সেমিকোলন্ নাই, দীর্ঘ ব্যবধানে—ড্যাস্ আছে মাত্র, আর শ্রোতাদের কাছে—ষ্ট্যাড্‌মিরেসন্!

একবার শুনিতে পাইলাম বাণেশ্বর বলিতেছে—"কি করলেন বাবু,—ওটা যে আমার ডাবা!"

"অ্যাঁ—তাই তো,—তোমার যে বড় ক্ষেতি করলুম!"

"আজ্ঞে—আমার আর ক্ষেতি কি! আপনি—ব্রাহ্মণ"—

"ও—সেই কথা! তোমাদের বাড়ী না মেদিনীপুরে,—দেড়হাত তফাতেই তো শ্রীক্ষেত্র! কোনো দোষ নেই। "এই—সুবর্ণরেখা পার হলুম" বলিয়া, সজোরে একটি টান্ মারিল,—দপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

কর্ত্তা আসেন আর বাহির হইয়া যান, একবারও বসিতে দেখিলামনা। পথে আর বাজারে থাকিতে পারিলেই যেন আরাম পান,—ব্যস্ত থাকিলেই বাঁচেন। খুব নার্ভাস্ হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

বসিতে বলায় বলিলেন—"না,—জয়হরি বাবু আছেন—কিছু দেখতে হবে না। এমন লোক খোয়ানো—"

চলিয়া গেলেন,—"দই আনা হয় নাই!"

*　　*　　*

সন্ধ্যার পর গণেনবাবু ও ধর্ম্মশালার যুবকদ্বয় আসিলেন; —অমর পূর্ব্বেই আসিয়াছে।

কর্ত্তা পূর্ব্ববৎ ব্যস্ত, কেবলি বাণেশ্বরকে ডাক্ পড়িতেছে—

"বেটা আমাকে ডোবাবে। এই—থানেশ্বর,—থানেশ্বর!—

"উঃ, কি দুঃসময়ই পড়েছে,—আর একটা মামুদও আসে না,—বেটাকে সুরকীশ্বর না হয় চেপ্‌টে টালিশ্বর বানিয়ে দেয়! এই—থানেশ্বর,—এই বেটা বধিরেশ্বর!"

অমর কম্ শোনে,—আমার দিকে চাহিয়া বলিল—"কি চাচ্ছেন,—লোহার দর?"

বলিলাম,—পরে বলিব।

কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

কর্ত্তা হঠাৎ ব্যস্তভাবে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিয়া গেলেন—"বড় দেরি হয়ে গেল ডাক্তার বাবু, কি করব'—এই সময় চাকর ব্যাটাও কোথায় সট্‌কেছে! আপনাদের টাইমে খাওয়া—এতো খাওয়া নয়—কষ্ট পাওয়া! এই চাট্‌নিটে নাবলেই—জয়হরি বাবু চাকেন।"

চলিয়া গেলেন।

ডাক্তার বাবু অবশ্য তখনো আসেন নাই।

তিনি রাত আটটার পর আসিলেন। কর্ত্তার সামনে পড়ায়—"এই যে,—আবার ডাক্ পড়েছিল বুঝি,—উঃ কি গোঁয়ারতুমি কাজ! মানুষ মারা,—নিজে মরা,—বাপ্! একটু স্থির হয়ে বসবার জো নেই। থাক্, আপনি ত' তবু ফেরেন্!"

আমি তাঁহার সম্ভাষণ শুনিয়া সঙ্কুচিত হইতেছিলাম,—করেন কি!

ডাক্তার বাবু চিনিতেন, মৃদুহাস্যে বলিলেন,—"হ্যাঁ—কেবল খাবার সময়।"

তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"জয়হরির চাট্‌নি চাখা হ'ল কি?"

"উঃ—ভারি মনে করে দিয়েছেন। বসুন ডাক্তার বাবু, আর যেন কোথাও যাবেন না। ছিষ্টিছাড়া হিষ্টিরিয়া আজকাল ঘর ঘর,—এখুনি রামও ছুটে আসতে পারেন, শ্যামও ছুটে আসতে পারেন! আমাদের সময়ে তো মশাই শুধু "হিষ্টিরিই ছিল,—তা সেটাও কম্ রোগ ছিল না। রাত জেগে—মিছে কথা মুখস্থ করা,—সন্ধ্যে নয়, গায়ত্রী নয়—বাবরশার বাপের নাম! আচ্ছা—এসে বলচি।"

চলিয়া গেলেন। সকলের মুখেই হাসি।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"বেশ আছেন!"

বলিলাম,—"চাকরটি না থাকলেই—অনাথ!"

গণেন বাবুর সহিত নানা কথা চলিতে লাগিল।

অমর আমাকে বলিল,—"এখন আছ ত'—মিছে বসে বেড়িয়ে কি হবে, আমার সঙ্গে ঘোরো। রোজ পাঁচটা টাকা—গালাগাল; দুদিনে দশ, তিন দিনে পনেরো, সপ্তায় পঁয়ত্রিশ, মাসে দেড়-শো,—কে দেয় হে,—বুঝলে! দাঁও পেলে পাঁচ-সাত শো-ও হয়। মিছে বেড়িয়ে আর হবে কি! দিক্ না কেউ এক পয়সা!—

"আর তোমাদের ওই ভুলগুলো ছাড়ো,—সত্যি মিথ্যে, ধর্ম্ম অধর্ম্ম,—রোজগারের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কি? ও সব ভাবতে গেলেই—কলাপোড়া খাবে—তা বলছি।—

"ধর্ম্ম নয়ই বা কেন',—সেই টাকায় ধর্ম্ম কর না—যত পারো। এই আমি'ত তিন চার খানা বাড়ী তুললুম, পাঁচ সাত হাজার টাকার গয়না গড়ালুম,—ধর্ম্মকর্ম্ম আর কা'কে বলে!—মিস্ত্রী মজুর, স্যেকরা ছুতোর, ইটওলা কাটওলা চূণ-ওলাকে কত টাকা দিলুম—মুটো মুটো হে! ধর্ম্ম নয়?—

"বাগান করেছি,—মরসুমে দেড় হাজার টাকার ল্যাংড়া বেচি,—কমসে কম নিজেও তিরিশটে খাই,—দাগি আর খেঁদোগুলো যা মিষ্টি! আত্মার তৃপ্তি—ধর্ম্ম নয়? যাদের বেচি, তাদের আত্মাকেও তৃপ্তি দেওয়া হয়,—ধর্ম্ম নয়! আমি,—ও ঢের ভেবে দেখেছি। আগে রোজগার, তারপর ধর্ম্ম আপসে চলে,—বুঝলে! ধর্ম্মের জোগাড় করে নেও।"

কাহারো কথা শুনিতে দেয় না, কেবলি গা ঠ্যালে আর ফি-হাত বলে—"কি বলো?"

বুঝিলাম,—একটা কিছু মতলব আঁটিয়াছে—এখানে তাহার একজন বিশ্বাসী অনুচর চাই।

ভগবান রক্ষা করিলেন। কর্ত্তা আসিয়া বলিলেন—"কষ্ট করে উঠতে হবে।"

আমি সর্ব্বাগ্রেই উঠিয়া পড়িলাম।

গিয়া দেখি,—একেবারে সব সাজাইয়া ডাকা হইয়াছে। দালান,—সম্ভারে, সুগন্ধে ভরপুর!

কর্ত্তা বলিলেন—"আজ সব একসঙ্গে বসতে হবে। ডাক্তার বাবুর দু'পাশে গণেনবাবু আর জয়হরি বাবুর স্থান। জয়হরি বাবু পোলাওটা নিজের হাতে গরম গরম দেবেন বলেই অপেক্ষা করছেন,—তারপর ঠাকুর আছেন।"

অমর আমার পাশেই বসিল। একগ্রাস মুখে দেয় আর বলে,—"বুঝলে!" কখনো,—"কেমন?" কভু—"তখন দেখবে কি মজা! রোজ বল বাড়বে।"

' আবার বলে—"পৃথিবীটার তিনভাগ লোহা হ'ত—কেয়া মজাই হ'ত! কেন যে হলনা! পুরিতে গিয়ে দেখি—কূল-কিনারা নেই, কেবল জল আর জল! কোন্ কাজে যে আসে! আকাশের দিকে চাইলেও—ঐ অ-কেজো ফাঁকটা দেখে এমন আপশোষ হয়! হয় না?"

আমার খাওয়া ঘুরিয়া গেল,—কি যে মুখে তুলিতেছি—বুঝিতে পারি না,—আস্বাদও পাইনা। সকলের হাস্যালাপ চলিতেছে,—কিছুই কাণে আসে না। কেবল প্রলাপ শুনিতেছি!

বলে—"তুমি ঠিক্ করে বল দেখি—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে প্রভাব কার? ছুঁচটি থেকে জাহাজ, এয়ারোপ্লেন—লোহার। সাকার দেবতা—নয় কি? কাল থেকেই—লেগে যাও,—বুঝলে?"

একটা হাসি উঠিল। কর্ত্তা বলিতেছেন—"ইনি এখন শেফিল্ডে,—লোহাবাবের পাল্লায় পড়েছেন!"

ডাক্তার বাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"জয়হরি বাবুর ঘুম নাকি খুব সজাগ,—চোখ বুজলেই গড়ের-বাদ্যি বাজান!"

বুঝিলাম—জয়হরির প্রসঙ্গ পড়িয়াছে। একটু হাসিলাম।

আমাকে কিছু বলিতে হইল না, জয়হরিই বলিল—"ওঁরাই বলেন, আমি তো মশাই কিছুই জানি না। ঠাকুদ্দা মশার ছিল বটে,—বংশের কিই বা পেয়েছি! ঠাকুমা শীতকালে জলের ঝাপটা মেরে তাঁকে পাশ ফেরাতেন,—গ্রীষ্মকালে শাঁড়াসি দিয়ে নাক্ টিপে ধরতে হ'ত। নবাব সরকারে কাজ করতেন, রাত্রে ঘুমুতে ঘুমুতে বাড়ী আসতেন,—প্রায়ই পুকুরে পরে ঘুম ভাংতো। তাঁর কোনো গুণই পাইনি।"

অমর আমার গা ঠেলিয়া বলিল—"তা হ'লে কাল্ থেকেই,—কেমন?"

গণেনবাবু জয়হরির কথা অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন, বলিলেন—"না-না, একি সম্ভব!"

জয়হরি উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"আমি নিজেই দেখেছি,—তখন আমার জ্ঞান হয়েছে যে। তিনি বাড়ীতেই থাকতেন, মাসে দু'একদিন নবাবকে সেলাম দিতে যেতেন। নবাব বড় ভালোবাসতেন। তাঁর সব দাঁতগুলি পড়ে যাওয়ায় দিল্লী থেকে লোক আনিয়ে—দাঁত বাঁধিয়ে দেন। অনেক খরচ

পড়ে,—সোণার স্প্রিং, সোণার ক্লিপ., সোণার প্লেট্! তখনকার দিনে দাঁত বাঁধানো আর গঙ্গার ঘাট বাঁধানো—সমানই ছিল। এখন তো দাঁত আর গ্রন্থাবলী একই মশাই—বাঁধতে সমানই খরচ।"

ডাক্তার বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কর্ত্তা পাত হইতে হাত তুলিয়া উদাসভাবে বলিলেন,—"এঁদের ছেড়ে,—না:—আর নয়"—

অমর আমাকে ধাক্কা দিয়া বলিল—"ঠিক্ রইল',—কেমন? তোমারি জন্যে"—

আমি তাহার কথায় কাণ না দিয়া বলিলাম—"রাজা অশোক থাকলে ঐ দন্ত জোড়াটি স্মরণীয় করে রক্ষার্থে আর এক নম্বর স্তম্ভ বাড়তো। তিনিই কদর বুঝতেন। ও Family relicsটি (বংশ পরিচয়টি) যত্ন করে রেখো।

আমি কথা কওয়ায়, জয়হরি উৎসাহের সহিত বলিল—"সে আর রইল' কই মশাই; ঠাকুর্দ্দা নিজেই সে দায় থেকে আমাদের রেহাই দিয়ে গেছেন।—

"শনিবার শনিবার নবাববাড়ী থেকে দুটি করে প্রৌঢ় পাঁটা পাওয়া যেত। তিনি তার ভাঙা একটি ভোগ লাগাতেন—অন্যটি আমাদের পেটে যেত। ইদানীং মুড়িটা খেতে তাঁর কষ্ট হত। সবাই বলে,—তার বদলে তাই আমাদের দু'ভায়ের মাথা খেয়ে গেছেন।—

"এক শনিবার আহারান্তে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছিলেন। সেটাকে সাদর আহ্বান ঠাউরে, চোরে সিঁদ কেটে ঘরে ঢুকে,—তাঁর মুখ ফাঁক করে দাঁত জোড়াটি খুলে নিয়ে যায়,—কিছুই টের পাননি।"

কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"অ্যাঁ,—আহা-হা.—ব্রহ্মদন্ত! বেটাকে পাঁটা হয়ে ওঁর পেটেই যেতে হবে!"

"আর যেতে হবে! সকালে উঠে দেখেন—দাঁত নেই! দুর্ভাবনায় বসে পড়লেন! শেষ সিঁদটা দেখতে পেয়ে, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—'আঃ-বাঁচলুম, ভাগ্যিস বেটা সিঁদ কেটেছিল,—তা না তো—পেট কাটতে হ'ত। মা কালী রক্ষা করলেন! না—আর থাকা নয়! ব্রাহ্মণী গেছেন,—পাঁটা খাওয়াও গেল,—আর কোন্ সুখে থাকা! মালসা-ভোগ মারতে আর বাঁচা কেনো! আমরা লম্বোদর বাড়ুয্যের সন্তান, জনার্দ্দনের জীব, দামোদরের সেবক,—কারুরই মর্য্যাদা রাখতে পারব না, না; আর পাপ বাড়ানো নয়!'—

"তিন মাসেই দেহ ছাড়লেন!"

হাসিটা সমানেই চলিতেছিল,—সহসা থামিয়া গেল।

কর্ত্তা বলিলেন—"উঃ, কি ট্রাজিডি!"

অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"তা বটে, rather tragi-comedy (অম্ল-মধুর)। আমরা জয়হরিবাবুর মুখ থেকে যা পেলুম—"মলিয়ারে"র মাথা থেকেও তা পাই নি। একদম্ বিশুদ্ধ।"

জয়হরি হতাশভাবে বলিল—"বংশের কোনো গুণই পেলুমনা!"

অমর বলিল—"কাল্ দিনটাও খুব ভালো"—

চাটুন্নি আসিয়া সকলের চমক্ ভাঙাইয়া দিল। এতক্ষণ কেবল খাইয়া যাওয়াই হইতেছিল, কি খাইতেছি তাহার উপর নজর ছিলনা। এইবার,—সত্যমিথ্যা ভগবানই জানেন, বোধহয় ভদ্রতার খাতিরে,—রন্ধনের সুখ্যাতি সুরু হইল।

জয়হরি মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল—"ঠাকুর,—এইবার সেই—আসল্!"

বুঝিলাম—জয়হরির সেই Red pa পিণ্ড—(রাঙা আলুর পিটে)।

সকলের সামনে এক এক রেকাব আসিয়া পড়িল। মুখে দিয়া, সকলেই প্রশংসা আরম্ভ করিলেন,—যেমন মোলায়েম তেমনি মধুর এবং সুস্বাদু—বাঃ!

জয়হরি গর্ব্বোৎফুল্ল নেত্রে সকলের মুখে একবার চাহিয়া, শেষ যেন ফণা তুলিয়া বক্রগ্রীব ভাবে আমাকে, বলিল—

"নির্ভয়ে লাগান,—কাঁটা খোঁচা নেই, দাঁতেরও দরকার নেই,—একদম্ তালব্য! জিব দিয়ে তালুতে তুললেই তলিয়ে যাবে!"

রাসকেল!

ডাক্তার বাবুকে বলিলাম—"ওকে একটু দেখবেন।"

কর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"সে আমি দেখ্ছি—ও তো আমার কাজ, ওঁকে কষ্ট করতে হবে কেন"।—

—"এই ঠাকুর—ঠাকুর!"

উঠানের দিকে গলা বাড়াইয়া ডাকের উপর ডাক! ঠাকুর তখন অমরকে দিতেছিল।

—"কোনো বেটা বাড়ী থাকবেনা! আমিই উঠ্ছি!"

কর্ত্তাকে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া ঠাকুর কথা কহিল,—"এই যে বাবু, ওঁকেই ত দিতে যাচ্ছি।"

"ওঁকে—কাকে রে বেটা!—তিনি তো রান্নাঘরে।"

জানালার পরপার হইতে চাপা আওয়াজ শোনা গেল—"বুড়ো বয়সে মিন্‌সের মতিচ্ছন্ন বটেছে!"

"আজ্ঞে—এই দেখুননা" বলিয়া ঠাকুর জয়হরির রেকাবি আবার পূর্ণ করিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"ওতে আর কটা ধরবে,—পাত-তো পরিষ্কার—পাতেও দাও।"

ঠাকুর পাতও পূর্ণ করিয়া দিল।

ডাক্তার বাবুকে বলিলাম—"চখের সামনে, ব্রহ্মহত্যা দেখবেন!"

জয়হরি ফি-হাত পাঁচটা করিয়া বদনে দিতেছিল।

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"না—আপনি ভাববেন না—অভুক্ত উঠতে দেব' কেনো।—বেশ করে খান জয়হরি বাবু,—লজ্জা করবেন না,—ওঁরা আমাকে দুষবেন।"

বলিলাম—"ও বিবাহ করেছে, বউটি ছেলেমানুষ,—সন্তানাদি"—

ডাক্তারবাবু বলিলেন—"তাই ত', কাচ্চাবাচ্চা হলে আপনিই কমে যাবে—তা আমি জানি। সেটা আর বলতে হবে কেন,—এখন না খেলে আর খাবেন কবে,—নিয়েসো ঠাকুর।"

কর্ত্তা বলিলেন—"তাকে আর পাবেন কোথায়! আমার দু'বেটাই সমান জুটেছে—এক ভস্ম আর ছার। সে বেটা বাণলিঙ্গ—ইনি ঠাকুর! কেবল—পঞ্চগব্য চড়াও।"

ঠাকুর জয়হরির পাতে গামলিটা উপুড় করিয়া দিল।

জয়হরি বলিল—"কি করলে, সতেরটা হলেই হ'ত,—১০৩ যে হয়ে গেছে।"

ডাক্তার বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"মিষ্টান্নটা আমাদের বংশে জপের সংখ্যায় চলে কিনা,—১০৮ হলেই,—না বলেতে হয়।"

"বাঃ কি সুন্দর নিয়ম! মিষ্টান্নের মধ্যেই মুক্তির পথ। সবাই এই নিয়ম রক্ষা করা চললে—দেশের দুখ্‌খু দূর হতে আর ক'দিন লাগে!—

১৭ হলেই তো ১০৮ হয়? বেশ—আপনি খেয়ে যান,—আমি সংখ্যা রাখছি।"

বলিলাম—"ওকি ডাক্তার বাবু—১০৩ তো আগেই হয়ে গেছে! দেশে বিধবা বিবাহ নেই,—বউটি বড় ছেলেমানুষ"—

কর্ত্তা কথাটা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন—"আহা—তা থাকলে আর দুখ্‌খু কি মশাই,—নেই বলেই তো বেঁচে থাকতে হয়। নইলে—ঠাকুর চাকরের সুখ দেখছেন তো! হুঁঃ—ওঁরা সেটা বুঝবেন; বুঝলে কি আর সধবা থাকেন!"

কি সর্ব্বনাশ!

অমর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া আছে,—ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে চাহি নাই। চাহিয়া দেখি গাঢ় সন্নিবেশ, সেও কম্ ব্যস্ত নয়!

বলিল—"খাওনা,—বেশ করেছে হে—তোফা!" পরেই,—"বুঝলে, এর গোড়াতেও ওই লোহা,—জমি খোঁড়ে কে!"

লক্ষ্য করিতেছিলাম—গণেনবাবু খাইবার অভিনয়ই করিয়া যাইতেছিলেন। কেহ বলিলে বা কাহারও সহিত চোখাচোখি হইলে—কিছু মুখে দিতেছিলেন মাত্র।

ডাক্তার বাবু জয়হরিকে বলিলেন—"আর ছ'টা হলেই হয়।"

পাতে ছয়টাই ছিল, এবং তাহা হইলেই ১০৮ হয়,—প্রকৃত কিন্তু ১৪৮ হয়!

বলিলাম—"ও ঠিক্ মরবে,—আপনি ওকে সঙ্গে করে ডাক্তারখানায় নিয়ে যান।"

জয়হরি অবশিষ্ট ছয়টা মুখে ফেলিল।

ডাক্তার বাবু বলিলেন—"এই ১০৮ হ'ল। আর?"

"না,—পঙ্‌ক্তিতে নিয়ম ভঙ্গ করবনা,—সকালে খেলেই হবে।"

* * * *

আহারান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি,—অমর আর দাঁড়ায় নাই—চলিয়া গিয়াছে।

পান সে খায়না; তবে বলিতে শুনিয়াছিলাম—"অমনি পেলে বিষও খাই!"

গণেনবাবুকে ধর্ম্মশালায় পৌছাইয়া দিয়া জয়হরি ফিরিল।

দু'এক কথার পর বীরেন বলিল—"আমরাও গণেনবাবুর সঙ্গে কাল যাচ্ছি। ওঁকে পৌছে দিয়ে বাড়ী যাব। ডাক্তার বাবুর খাতিরেই এতদিন ধর্ম্মশালায় আশ্রয় পেয়েছিলুম,—গণেনবাবুকে ফেলেও যেতে মন চাচ্ছিল না।

অলক সাজতো কুন্দফুলে, শিরীষ প'রতো কর্ণমূলে,

মেখলাতে দুলিয়ে দিতো নব-নীপের মালা। —রবীন্দ্রনাথ।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

Bharatvarsha Halftone & Ptg. Works

আপনাদের সূত্র আর আকর্ষণও আমাদের টেনে রেখেছিল। জয়হরি বাবুর মত পরোপকারী লোক দেখিনি,—অনেক লাভ হ'য়। আপনারাও যাবেন শুনচি।"

অপ্রত্যাশিত ভাবে গণেনবাবুর এমন সঙ্গী মেলায় ভারি একটা স্বস্তি বোধ করিলাম।

বলিলাম—"তোমরা কি বেড়াতে বেরিয়ে ছিলে,—তীর্থ করতে তো নয়ই ?"

"হ্যাঁ—বেড়ানই বলতে হয়, তা বই আর কি। দেশের কোনো কাজ করতে গেলেই—সহজে পুলিসের পরিচিত হয়ে পড়তে হয়, বলেন—

"গরিবের ছেলেদের কেন' পড়াও, চাষীদের সঙ্গে কেন' মেশো, তাদের ভালোকথা কি কৃষি সম্বন্ধে দরকারী কথা শোনাবার ভার তোমাদের কে দিলে, গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়ার পাঁচন বিলিয়ে বেড়াবার মাথাব্যথা তোমাদের কেনো,—যার গরজ সে চ্যারিটেবল্ ডিস্পেন্সরি খুঁজে নিতে পারেনা কি। সরকার বাহাদুর সবই তো করে রেখেছেন।

"পরের পুকুরের পানা পরিষ্কার করে বেড়ানো কি ভদ্র-সন্তানের কাজ ? এর তো একটাতেও এক পয়সা আমদানী নেই,—বিনা রোজগারে লোকের ক'দিন কাটে! তার চেয়ে দেশে তো কন্যাদায়গ্রস্তের অভাব নেই, তাদের উপকার করলেই তো হয়।—ইত্যাদি উপাদেয় কথা আর উপদেশ শুনতে হয়।—

"এঁরা চাননা যে দেশের লোক দেশের লোকের বা মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে চেষ্টাও পায়। কারণ সে কাজের জন্যে নাকি তাঁরা রয়েছেন,—ডেমি কাগজে ষ্ট্যাম্প মেরে দুঃখ জানালেই শোনানি হবে! দেশে কি পুলিস্ নেই না আদালত নেই; ইত্যাদি।

"তাই মাঝে মাঝে অতিষ্ঠ হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। তবে,—পরিচয় হয়ে গেলে খোঁজ খবর রাখবেন। সুতরাং—যেখানেই থাকি—অসহায় নই !"

আমি অবাক হইয়া শুনিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম—সত্যই কি এতবড় সভ্যতাভিমানী জাতটা এতটা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে! না—এটা আমাদেরি দেশায় মহাপুরুষদের মহিমা!

ধীরেন বলিল—"এখানে দিন কতক থেকে অন্যত্র চলে যাব বলেই এসেছিলুম, কিন্তু গণেনবাবুর অবস্থা দেখে আটকে গেলুম। তাতে আমাদেরই লাভ বেশি হয়েছে। আমাদের করাকর্ম্মার ভেতর—হিসেব থাকে, চতুরতা থাকে, বুদ্ধি খেলানও থাকে,—কিন্তু তা না রেখেও যে কেবল অভিন্ন ভেবে ঐকান্তিক সদিচ্ছায়, ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও—সহজে বেশি কাজ করা যায়, তা দেখে গেলুম। পারব কিনা জানিনা! যাবার সময় পায়ের ধূলোটা যেন পাই।"

আমার কণ্ঠ ভার হইয়া আসিয়াছিল, বলিলাম—"ভগবান তোমাদের সদিচ্ছার সহায় হউন,—তোমরা আনন্দে থাক'।"

উভয়ে নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বাহিরের রোয়াকে ডাক্তার বাবুর সাড়া পাইয়া তাঁহাকে সংবাদটা দিবার জন্য গেলাম! দেখি জয়হরি অতি কাতর ভাবে হাতজোড় করিয়া বলিতেছে—

"আমাকে সত্যি করে বলুন ডাক্তার বাবু—আর কোনো ভয় নেই তো! ঐ ভাঙা শরীরে পালটে পড়লে আর রক্ষা থাকবেনা। তার চেয়ে দিন কতক থেকে যাওয়া বরং ভাল।"

"ওঁর জন্যে আর ভাববেন না জয়হরি বাবু। আমি বলছি—উনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়েছেন; এখন কর্ম্মহীন বসে থাকাটাই ওঁর পক্ষে খারাপ। ওঁকে আর একদিনও আটকাবেন না।"

"না—তা হলে"—

আমি উপস্থিত হইয়া সংবাদটা দিলাম। ডাক্তার বাবু খুব খুসি হইলেন।

জয়হরি বলিয়া উঠিল—"জয় বাবা বৈদ্যনাথ!"

মাধুরী আসিয়া জয়হরিকে ডাকিল! বলিল,—"দিদিমা শুয়ে আছেন, উঠ্ছেন না,—খাবেন না। তুমি একবার এসো।"

জয়হরি ছুটিয়া চলিয়া গেল! (ক্রমশঃ)

স্বামী বিবেকানন্দ *

অধ্যাপক রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম্‌-এ

আপনারা নববর্ষের অভিষেক করলেন সঙ্গীত ও সাহিত্যের রসে। আপনাদের পারিজাত-সমাজের পক্ষে নববর্ষ সর্ব্বতোভাবে রসপূর্ণ হউক। সঙ্গীত ও সাহিত্য রসের দুইটি ধারা; কিন্তু একই নির্ঝর হইতে উৎসারিত হ'য়েছে এরা। সেটি হচ্ছে মিলন। গীত ও সঙ্গীতের মধ্যে যদি কিছু পার্থক্য

স্বামী বিবেকানন্দ

থাকে, ত আমার মনে হয় সে হচ্ছে এই মিলন। 'সঙ্গত' না হলে সঙ্গীত হয় না। মিলন না হলে আবার সঙ্গত হয় না। একজনের দ্বারা কি সঙ্গত হতে পারে? সুতরাং সঙ্গীতের মধ্যে মিলনের ভাবটি প্রস্ফুট রয়েছে। সাহিত্যের অর্থও মিলন। সহিত শব্দ থেকে সাহিত্য এসেছে। পাঁচ জনের উপভোগ্য বলেই সাহিত্যের নাম সাহিত্য। কাব্য সাহিত্য, রস-সাহিত্য, সবই মিলনের মাঙ্গলিকে মধুর। আপনাদের এই সঙ্গীত-সাহিত্য-ভূয়িষ্ঠ মিলন মধুময় হউক, ইহাই আমার নববর্ষের শুভকামনা বলে আপনারা গ্রহণ করুন। আর আপনারা আমাকে যে আজকার মিলন-মহোৎসব-পূত সন্ধ্যায় এই আনন্দের ভোজ দিলেন, এর জন্যে আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আমার আরও আনন্দের বিষয় এই যে, আজ আপনারা এমন একজন মহাজনের পুণ্যস্মৃতির আলোচনা করছেন, যাঁর কথা শুনলে পুণ্য হয়, যাঁর স্মরণে দেহ মন পবিত্র হয়, এবং যাঁর অভয় বাণী দেশ যদি অনুসরণ করে, ত দেশ ধন্য হ'য়ে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়ে আর্য্য ঋষিদের যুগ-যুগান্ত সঞ্চিত জ্ঞানরাশি বেরিয়েছিল। ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি তাঁহাতে সঞ্চারিত হয়ে যে কি অপূর্ব্ব চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ভাবলেও শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠে। তাঁর মুখ দিয়ে যখন গোমুখীর জলধারার ন্যায় বেদান্ত, উপনিষৎ এবং নিখিল বিশ্বের ধর্ম্মশাস্ত্রের [illegible] নির্গত হতো, তখন সত্য তাহাকে আশ্রয় করে' থাকতো। ধর্ম্মে নিষ্ঠা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকৃপা মিলিত হয়ে তাঁকে তেজোগর্ভ বজ্রের মত করে তুলেছিল। আমি এ পর্য্যন্ত যত লোকের বক্তৃতা বা লেখা পড়েছি, তার কোনওটির মধ্যে এত তেজ দেখি নাই। তিনি আমেরিকায় যখন ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন maxim বন্দুকের আবিষ্কর্ত্তা সেই অমিততেজা সন্ন্যাসীকে দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। When Vivekananda arose, they saw that they had a Napoleon to deal with

* দক্ষিণ-ব্যাঁটরা পারিজাত সমাজের নববর্ষ-মিলনোপলক্ষে সভাপতির বক্তৃতার সার-মর্ম্ম।

...He became the lion of the day. He played with the parsons as a cat plays with a mouse.

সত্যসন্ধ স্বামীজির বাণী অনেক সময়ে ভবিষ্যৎবাণীর মত মনে হয়। বর্ত্তমান যুগে তাঁর কথাগুলি বিশেষ প্রণিধান করে' ভেবে দেখবার প্রয়োজন আছে। বিবেকানন্দ একজন যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, ভারতবর্ষের বিশেষ সৌভাগ্যবলে তিনি আমাদের এই পতিত জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর বজ্রগর্ভ ভক্তির দ্বারা এই সারা দেশটাকে তিনি জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশকে যে তিনি কত ভালবেসেছিলেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না। স্বদেশ-প্রীতি, স্বদেশ-প্রীতি করে চীৎকার করলেই স্বদেশপ্রীতি হয় না। স্বদেশকে ভালবাস্‌তে হলে কি করতে হয়, তা, স্বামী বিবেকানন্দের পদতলে বসে যুগযুগান্ত ধরে' শিক্ষা করা যায়। তিনি এ দেশের প্রতি ধূলিকণাকে ভালবাসতেন। এ দেশের যা কিছু মন্দ, তা তিনি উৎসাদিত করে, এদেশকে তিনি এক মহামহিমময় আসন প্রদান করবার জন্য লালায়িত ছিলেন। এ দেশের দোষগুণ তিনি যেমন করে' ভাব্‌তে চেষ্টা করেছিলেন, এমন আর কেহ কখনও করেছে কি না সন্দেহ। তাঁর ভালবাসা অন্ধ ছিল না। তিনি স্বদেশকে জগতের সভায় শ্রেষ্ঠ, বরেণ্য, গরীয়ান্ করে' তুল্‌তে চেয়েছিলেন। তা করতে হলে কেবল জোর গলায় দেশের জয়ভেরী বাজালেই চলে না। আমরা আমাদিগকে বড় বল্‌লেই, আমরা বড় এ কথা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয়ে যায় না। তিনি বিদেশীয়দের নিকট আমাদের আধ্যাত্মিক আদর্শ যত নির্ভীকতার সঙ্গে বল্‌তেন, আমাদের নিকট আমাদের দোষের সম্বন্ধে তার চেয়েও বেশী জোরে বলতেন। সত্য কখনও সংকুচিত হয় না। যাঁরা সত্যকে আশ্রয় করেছেন, তাঁরা 'বিগতভী:'— তাঁহাদের কোনও ভয়ই নেই। লোভ ও ভয় এ দুটিকে তিনি জয় করেছিলেন। হাততালির লোভে তিনি কখনও অপ্রিয় সত্য বলতেও কুণ্ঠিত হতেন না। বরঞ্চ যেখানে দোষ, ত্রুটী, অভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার দরকার হ'ত, সেখানে তিনি কশাঘাত করতে কিছুমাত্র মমতা করতেন না। হাজার বছরের জড়তা ও আলস্যে এ জাতির হৃদয় অসাড় হয়ে উঠেছিল। স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন যে, এই অসাড়তা ভাঙতে হলে' আঘাত করতে হবে নির্ম্মমভাবে। তবে চৈতন্য উদ্বুদ্ধ হলেও হতে পারে। কিন্তু আমাদের জড়ত্ব এত চাবুকেও ঘুচ্‌ল না। সে আমাদের দুর্ভাগ্য। স্বামীজির তাতে কিছু দোষ নেই। তিনি যা মন্দ বলে বুঝেছিলেন, যা কুসংস্কার বলে' ঠিক করেছিলেন, তা'র মূলোৎপাটন করতে তিনি একটুও পশ্চাৎপদ হন নাই। জগতের সভায় দাঁড়িয়ে তিনি ভারতের প্রতিনিধি স্বরূপে, অতীত সভ্যতার গৌরব বক্ষে নিয়ে, আর্য্য ঋষিদের আদর্শ ফুটিয়ে তুলে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন 'ভারতে ধর্ম্মপ্রাণতা আছে, আধ্যাত্মিকতা আছে, ভক্তির প্রস্রবণ আছে, জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার আছে, হিমালয়ের মত স্থির অটল বিশ্বাস আছে—এমন আর কোথায় আছে। বিশ্বের লোক মৌন বিস্ময়ে শুনিল। কিন্তু দেশের লোককে তিনি বল্‌লেন কিসের ধর্ম্ম তাদের,—যাদের দেশে. গরীবেরা—দরিদ্র-নারায়ণেরা না খেয়ে মরে? কিসের ধর্ম্ম তাদের, যারা—আট বছরের মেয়ের বিয়ে দিয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়? কিসের ধর্ম্ম, কিসের ঈশ্বর—যদি এক জাতি অপর জাতির মুখে অবজ্ঞায় ক্ষুধার অন্ন তুলে না দিতে পাবে? দেখ, পাশ্চাত্য জগতের দিকে একবার তাকাও, তারা দারিদ্র্য দৈন্য মোচন করতে সর্ব্বদা সচেষ্ট, তারা নারীদিগকে চরণে দলে না—তাই তারা ত্রিভুবনজয়ী।

স্বামীজি যে সকল কথা বলেছেন, তার মধ্যে তিনটি কথা আমার মনে সব সময়ে জাগে। একটি হচ্ছে দারিদ্র্য মোচন; আর একটি জাতির শারীরিক উৎকর্ষ। আর একটি জাতিভেদের কঠোর বাঁধন। এ তিনটি কথাই আজকার দিনে ভেবে দেখবার খুব প্রয়োজন রয়েছে। মানুষ হ'তে হ'লে, আস্ত জীবন্ত মানুষ হতে হলে চাই অন্নের সংস্থান, আর চাই শারীরিক সামর্থ্য। বিলাসিতায় লক্ষ কোটী টাকা আমরা ঢেলে দি, আমাদের দেবমন্দিরে অফুরন্ত অর্থ সঞ্চিত, বোম্বাইয়ের লোকে ছারপোকার হাসপাতাল বানিয়ে টাকার শ্রাদ্ধ করে, আর আমার প্রতিবেশীরা না খেয়ে মারা যাচ্ছে, তা কেউ দেখবে না? স্বামীজি আমাদের দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্য দূর করবার জন্যে যে কি প্রাণান্তিক চেষ্টা করেছিলেন, তা অনেকেই জানেন। আমাদের কিসের স্বদেশ-প্রেম, যদি আমরা আমাদের ভাইদের দিকে ফিরেও না তাকাই? স্বামীজির উপদেশ শুনে যদি এ দিকে সকলের দৃষ্টি পতিত হ'ত, তাহলে ভারতবর্ষের অবস্থা অনেক পরিমাণে ভাল হ'তে পারত। আমরা দুর্ব্বল, আমরা কষ্ট সহ্য করতে,

অক্ষম, আমরা আত্মরক্ষায় অসমর্থ, আমরা আমাদের মানসম্ভ্রম রক্ষায় অপারগ; কি এক সর্ব্বনাশী দুর্ব্বলতা এই হিন্দু জাতটাকে গ্রাস করেছে! স্বামীজি বল্‌তেন, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। বলবান হও, বীর হও। স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে' চীৎকার করলে, স্বাধীনতা কখনও আপনি এসে করতলগত হবে না। স্বাধীনতা পাবার মত এবং পেয়ে রক্ষা করবার মত বল যে মুহূর্ত্তে হবে, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের গলায় স্বাধীনতা বরমাল্য দান করবে। কারও শক্তি নেই যে আমাদের আর পদানত করে রাখে। ঋষিদের কথায় তাই তিনি বল্‌তেন, নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য। জাগো ভাই, জাগো—একবার আপনার বলে উঠে দাঁড়াও, মনোমত বর লাভ কর। আমরা স্বামীজির কথায় কর্ম্মপাত করতে পারি নি। যুগ-যুগান্তের জড়তা আমাদিগকে বধির করে রেখেছে; স্বামীজির অমোঘ বাণী কাণে পঁহুছিল না। মুখে আমরা সাম্যবাদ বলে চীৎকার করি। আমরা একই ব্রহ্মের বিকাশ, আমাদের মধ্যে ভেদ নাই, ভেদ নাই। কিন্তু আমাদের জঠরে অন্নাভাব, বাহুতে বলাভাব,—সাম্যবাদ মুখেই উঠে ঠোঁটেই লয় পায়। আর দেখ মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে, সাম্যবাদ কি অপূর্ব্ব একতায় তাদের বেঁধেছে। এক জনের বিপদ হলে' শত শত মুসলমান তখনই কোমর বেঁধে তার সাহায্যে অগ্রসর হয়। জীবনের মমতা করে না, স্ত্রীপুত্রের ভাবনা ভাবে না; শুধু ভাবে জাত ভাইয়ের বিপদে আমার চুপ করে' থাকবার যো নেই। আমার বাহুতে বল নেই, নেই বা রইল, আমি যুদ্ধে নিপুণ নই, নাই বা হ'লাম—আমাকে এগিয়ে যেতেই হবে, যেতেই হবে। আর আমরা—? স্বামীজি চোখ রাঙিয়ে বলেছেন, ফেলে দেও তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম,—আগে বলীয়ান্ হও, আত্মরক্ষায় সমর্থ হও। এই মহাপ্রাণ রাজনীতি-পণ্ডিত যুগ-প্রবর্ত্তক মহাত্মার কথা আমরা শুনেও শুনি নি। আজ তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হতে হচ্ছে। মুখে আমরা যতই সাম্যবাদ প্রচার করি না কেন, জাতিভেদ আমাদিগকে ভেদের চরম অবস্থায় উপনীত করেছে। আমরা মুখে শিবোঽহংই বলি আর সোঽহংই বলি, কাযের বেলায় আমাদের শিব অনেকগুলি হয়ে দাঁড়ায়; ব্রাহ্মণ শিব, কায়স্থ শিব, মুচি শিব ইত্যাদি। আপনারা হয় ত জানেন না যে, এই জাতিভেদ পল্লীগ্রামে কত বিকট হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন অনেক স্থান আমি জানি, যেখানে শূদ্রের কালীবাড়ীতে ব্রাহ্মণ মাথা নোয়ানো প্রয়োজন করে না। পূজো ত সেখানে দিতেই নেই! আমাদের জাতিভেদ দেবতাদের মধ্যে পর্য্যন্ত গড়িয়েছে—অন্য ব্যাপারে কা কথা। এই যাদের অবস্থা, তাদের উন্নতির আশা কোথায়? ধ্যান করুন—স্বামীজির সেই তেজঃপুঞ্জ কলেবর, ধ্যান করুন—এই পতিত জাতির মধ্যে দ্বেষাদ্বেষি রেশা-রেশি দেখে তাঁর চোখ দিয়ে বহ্নি-জ্বালার মত কিরূপ অশ্রু বেরিয়েছিল। তাতেও তাঁর কথা আমরা গ্রাহ্য করি নি।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রীতির তুলনা কোথায়? আমরা সে অনুরাগ, সে সত্যসংকল্প নিষ্ঠা, সে সেবার গরিমা আর দেখি নাই। এখনকার স্বদেশ-প্রীতি ত সে ছাঁচে দেখতে পাই না। আমাদের মধ্যে যাঁরা দেশানুরাগী, তাঁদের অনেকের খানা বিলাতী Sauce নইলে রোচে না, বিলাতী পানীয় নইলে সন্ধ্যা কাটে না; বিলাতী ভাব, বিলাতী পোষাক, নইলে এক দিনও চলে না। তাঁরাই স্বদেশের প্রধান পুরোহিতের পদ অধিকার করে আছেন। আমার মুখে এ সব কথা আপনাদের ভাল লাগবে না। আমি সরকারী চাকর এবং খেতাবী চাকর। করযোড়ে বলি, মনে রাখ্‌বেন যে, চাকরের পক্ষে খেতাব নেওয়া না নেওয়া ইচ্ছাধীন না হতেও পারে। আপনারা সে সব ভুলে গিয়ে শুধু স্বামীজির আদর্শটা ভেবে দেখবেন। আজকাল রাজনীতিক ক্ষেত্রে স্বামীজির আদর্শ একবার দুবার নয়, বার বার মনে করিয়ে দেবার দরকার হয়েছে। যদি সে আদর্শ আমরা এখনও ধরতে না পারি, তা হলে আমাদের আশা নেই। আমরা যদি দেশের দারিদ্র্য দুঃখ ক্লেশ নিবারণ করতে তাঁরই বাণীর অনুসরণ না করি, তাহলে বিবেকানন্দের এ দেশে জন্মানো ব্যর্থ হয়েছে। আমরা যদি রমণীর অবস্থা উন্নত না করি, শিক্ষার ক্ষেত্র বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর করতে চেষ্টা না করি, আমরা যদি কুসংস্কার-জালে জড়িয়ে আমাদের নিম্ন জাতিদিগকে অস্পৃশ্য করে রেখে দি, তা হলে স্বামীজীর শিক্ষাদীক্ষা সব বিড়ম্বনা হয়ে যাবে।

চণ্ডীদাস *

শ্রীচন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ

আমি ষ্টার থিয়েটারে চণ্ডীদাস নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছি। তবে, গ্রন্থকারকেও আধুনিক "অস্পৃশ্যতা পরিহার" রোগের প্রভাব কিয়ৎ পরিমাণে অধিকার করিতে পারিয়াছে দেখিয়া একটু ক্ষুব্ধও হইয়াছি।

আজকাল নাটক লেখা কাজটা বড়ই শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অধিকাংশ লেখক লোকের রুচির অনুবর্ত্তী হইয়া নিজের প্রতিভার প্রতি অত্যাচার করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, লোকের মন যোগান কবির কার্য্য নহে। কবি উৎপথবর্ত্তী সমাজকে সুপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিবেন; সমাজ, ধর্ম্ম, সদাচার, অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে কবি জনসমাজকে সৎপথে চালিত করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ কবি। দেশহিতৈষিতা, সমাজহিতৈষিতা, এবং স্বধর্ম্মরক্ষায় তৎপরতা কবির প্রধান গুণ। যে কবি সমাজে কুপ্রবৃত্তি প্রচারে সহায়তা করেন, তিনি প্রতিভাবান হইলেও কবি নামের কলঙ্ক। রচনার কৌশলে লোকের কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া সমাজকে কুপথের পথিক করা প্রতিভার অপব্যবহার। আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি, অপরেশবাবু ধর্ম্ম ও সমাজের মর্য্যাদা যাহাতে প্রতিহত না হয় তৎপতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া নাটক রচনা করেন। প্রতিকূল স্রোতে নিজের গতি ঠিক রাখা বড়ই কঠিন। তাই বলিতেছিলাম, অপরেশ বাবু বড় শক্ত কাজে হাত দিয়াছেন। নাটকের বিষয় নির্ব্বাচন দেখিলে মনে হয়, অসুবিধা তিনি নিজেই ডাকিয়া আনিয়াছেন। দুইটা মানুষের জীবনের খানিকটা অংশ লইয়া তাঁহার নাটক। সেই অংশেও নাটকীয় বস্তু বেশী নাই। সুতরাং কল্পনার সাহায্যে তাঁহাকে সকল অভাব পূরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। সেই কল্পনা সকলের সমভাবে তৃপ্তিকর হইবে কি না কে বলিবে,—"ভিন্নরুচিহি লোকঃ।" আমার ভাল লাগিয়াছে।

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণের ছেলে। নান্নুরের বাশুলী দেবীর পূজারী। রজকিনী রামী সেই গ্রামের অধিবাসিনী। উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। এই প্রণয়টা যার যেরূপ ইচ্ছা বর্ণনা করেন; কেহ বলেন, ইহা লৌকিক, কেহ বলেন আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক হইলেই প্রণয়ের নাম হয়—প্রেম। সেই প্রেমের লক্ষণ হইল—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

এখন রামী-চণ্ডীদাসের প্রণয় যদি প্রেম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তবেই কবি কৃতকার্য্য হন,—অন্যথা একটা কুৎসিত বিষয়ের বর্ণনার অপরাধ কবির ঘাড়ে চাপিয়া বসে এবং তিনি কুরুচি প্রচারের আসামী হইয়া দাঁড়ান।

তাঁহার নাটক পড়িয়া এবং অভিনয় দেখিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব কবি কৃতকার্য্য হইয়াছেন, চণ্ডীদাস রজকিনীর প্রণয়ে কবি লৌকিকতার লেশও রাখেন নাই, সমস্তই আধ্যাত্মিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। চণ্ডীদাসের এবং রামীর প্রেমের আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রামের জমীদার দুর্লভ রায়ের চরিত্রের কল্পনা। দুর্লভ রায় কামপ্রবৃত্তিমূলক লৌকিক প্রণয়ের উৎকট লালসায় রামীর প্রতি বহু প্রকার সম্ভব পৈশাচিক অত্যাচার করিয়াছেন—রামী টলে নাই। চণ্ডীদাস, কোনরূপ অত্যাচার করা ত দূরের কথা, কোনরূপ অসাধু ভাবও রামীর নিকট প্রকাশ করেন নাই, পরস্পরের রূপ দেখিয়া পরস্পর আসক্ত—পরস্পরের কথা শুনিয়া পরস্পর মুগ্ধ উপদিষ্ট; উভয়েই ভাবে প্রেমসাধনার গুরু পাইয়াছি। চণ্ডীদাস বলিলেন,—

'শুন রজকিনী রামী।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া,
শরণ লইনু আমি।"

রামীর উত্তর,—

"তোমার চরণে, আমার পরাণে,
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী।"

দুর্লভ রায়ের চরিত্রের সঙ্গে চণ্ডীদাসের চরিত্রের বা রামীর চরিত্রের যে যে স্থলে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলেই একের কুৎসিত লৌকিকতা ও অপরের মধুর আধ্যাত্মিকতা বিশেষ ভাবে ফুটিয়াছে।

কবি চণ্ডীদাস রজকিনীকে লইয়া আর এক বিষম সমস্যায় পড়িলেন। সে সমস্যা, সামাজিক। সমাজের কথা ভাবিলে চণ্ডীদাসকে সদাচার, সুনীতিপরায়ণ এবং নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলা যায় না। বিধবা, রূপবতী যুবতী রজকিনীর সহিত তাঁহার মেলামেশা লোকে কু-ভাবে লইবেই। পর-পুরুষের সহিত পর-রমণীর এরূপ মেলামেশা যে সমাজ-গর্হিত, এ বিষয়ে কবি অজ্ঞ নহেন। চণ্ডীদাসের রজকিনী-সঙ্গম সমাজের চক্ষে, বিশেষতঃ হিন্দু-সমাজের চক্ষে নির্দ্দোষ হইতে পারে না। চণ্ডীদাস-রজকিনীর সম্বন্ধ বিশুদ্ধ এবং আধ্যাত্মিকতা পূর্ণ—ইহা সমাজকে তাঁহাদের সমাজ-জীবনে কেহ বুঝাইতে পারে নাই, পারা সম্ভব নহে। কবি অতি সাবধানে সে চেষ্টা পরিহার করিয়াছেন। সুতরাং কবি চণ্ডীদাসকে সমাজের শাসনাধীন রাখিয়া এক দিকে যেমন সমাজের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন, অপর দিকে চণ্ডীদাসকে সমাজের বাহির করিয়া বিশুদ্ধ প্রেমের, আধ্যাত্মিক প্রণয়ের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

প্রেম অন্ধ। প্রেম জাতি-কুল-মান মানে না। তাহার গতিও

---

* চণ্ডীদাস নাটক, শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত; মূল্য এক টাকা।

অবাধ—কোন গণ্ডীর ভিতর বিশুদ্ধ প্রেমকে কেহ কখনও বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। প্রেম সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া উদ্দামভাবে চলিবেই। যে প্রেমিক বলিতে পারে,—

"পীরিতি-নগরে বসতি করিব,
পীরিতে বাঁধিব ঘর।
* * * *
হৃদয়-পিঞ্জরে পীরিতি থুইব
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভনে॥"

তাহার "পীরিতি" রোধিবে কে? সুতরাং জাতি-কুল-মানের মহিমা চণ্ডীদাসের পীরিতির প্রখর-স্রোতে ভাসিয়া গেল, তখনই—"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম" হইয়া দাঁড়াইল।

এরূপে নাটক যতটা অগ্রসর হইয়াছে, চণ্ডীদাস-রজকিনীর প্রেমও ততটা পরিণতি লাভ করিয়াছে। ক্রমে চণ্ডীদাসের চক্ষে রজকিনী কিশোরী এবং রজকিনীর চক্ষে চণ্ডীদাস নটবর বংশীধারী হইয়া উভয়কে এক অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক সূত্রে বদ্ধ করিয়াছে। তখন উভয়ে প্রেমের পূজায় জাতি-কুল-মানে জলাঞ্জলি দিয়া সমাজের গণ্ডী অতিক্রম করিল। কবি দেখিলেন, প্রেমের অসীম রাজ্যে বিচরণশীল এই বিহঙ্গ-যুগলকে সমাজের গণ্ডীর মধ্যে রাখিলে সনাতন সমাজ ভারগ্রস্ত হয়,—তাহাদের প্রেমের অবাধ গতিও ব্যাহত হয়; সুতরাং তিনি সমাজের গণ্ডী কাটাইয়া প্রেম, প্রেমিক এবং কবিত্বের সরল-গতি অব্যাহত রাখিয়াছেন।

আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমি নিরস্ত হইব। নবকৃন্দাবনের কথা উল্লেখ না করিলে চণ্ডীদাস সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকে। সেই জন্য সংক্ষেপে নববৃন্দাবনের কথাটা একটু বলিব।

নববৃন্দাবন কবির অদ্ভুত সৃষ্টি! নিত্যা নিজেকে যশোদা মনে করেন। তাঁহার জাগ্রত স্বপ্ন বড়ই মধুর। খেয়ালের বশে তিনি মনে করেন, তিনি যশোদা, তাঁহার গোপাল খেলা করে, গোঠে যায়, বাঁশী বাজায়—সবই করে। 'গোপাল রোদে রোদে ঘুরিয়া বেড়ায়' এই ছায়া-যশোদা তাহা সহ্য করিতে পারেন না। সাধারণ লেখকের হাতে পড়িলে নিত্যা উন্মাদিনী বলিয়া প্রতিভাত হইতেন; কিন্তু কবি অনুপম প্রতিভাবলে নিত্যার উন্মাদকে ধর্ম্মের আবরণে এমন ভাবে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, নব বৃন্দাবন,—গোপালমূর্ত্তি, এবং নিত্যার কথাবার্ত্তা আত্ম-বিস্মৃতা নিত্যাকে বাস্তবিক যশোদায় পরিণত করিয়াছে। নববৃন্দাবন দর্শকের হৃদয়ে বৃন্দাবন সৃষ্টি করে, নিত্যার মধুর সঙ্গীতে শ্রোতার হৃদয়ে অমৃতধারা বহিতে থাকে। কবির বৃন্দাবন মধুর—বড়ই মধুর,—দর্শক এই বৃন্দাবনের মাধুরীতে ডুবিয়া থাকে। আমার বৃন্দাবনের সব দৃশ্য দেখা হয় নাই,—গোপালমূর্ত্তি দেখার পর হইতে আনন্দাশ্রু আমার চোখ দু'টী আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

"চণ্ডীদাস"—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কর-কমলে উৎসর্গ করা হইয়াছে—উপযুক্ত পাত্রে উপহার; কে কাহার গৌরববর্দ্ধক—চিন্তা করিয়া স্থির করিব।

শিল্পী—শ্রীসুধীরঞ্জন খাস্তগীর

বাউল

হট্টগোলের মাঝখানে

শ্রীকপিলপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

হিন্দুস্থানীদের দেশ

হট্টগোলে ভরা এক হাট। খাম্‌চা-খাম্‌চা খড়ে-ছাওয়া, ঝড়ে-বাতাসে এখানে-ওখানে হেলে-পড়া, লম্বা টানা অসরল তিন সারী ঘর, সরু-সরু অনুচ্চ বাঁশের খোঁটায় কোন রকমে দাঁড়িয়ে থেকে হাটের জনবহুল পশারীর জনকয়েকের স্থান সঙ্কুলান কর্‌ছে। সেই কম্‌জোর বাঁশের খোঁটাতেই কোণাও-কোথাও করগেট্ টিনে ছেয়ে মেরামতের উন্নতির চেষ্টা দেখা যাচ্ছে! ছেঁড়া খড়ের পাশাপাশি নতুন টিন বাজারের হট্টগোলের মতই এলোমেলো ঠেক্‌ছে।

এই তৃতীয় প্রহরের রগ্‌চটা রদ্দুরেও হাটে লোক গিস্‌গিস্ কর্‌ছে। আশেপাশের মধ্যে সারা হপ্তায় এই একটীই সওদা কর্‌বার দিন, কাজেই ধামা-চাঙ্গারি-মাথায় গ্রাম-গ্রামান্তরের মেয়ে-পুরুষ জুটেছে। ঘরগুলো ছাড়া সবেমাত্র দু' তিনটী গাছ কোন রকমে সামান্য ছায়া দিয়ে লোকের ভিড় তাদের তলায় ঘন করে' টেনেছে। আলু-মূলো-বেগুন, লঙ্কা-হলুদ-মশলা, মুড়ি-কড়াইভাজা, জিলিপী-চিনির লাড্ডু, লাঙ্গলের ফাল-পেরেক-লোহা-লক্কড়, পান-সিগ্রেট-শামুকের চুণ থেকে আরম্ভ করে দু'চার রকম ডালের চালের বস্তা নিয়ে যে যেখানে পেরেছে, ছায়া দেখে দোকানদারেরা এলোমেলো বসে পড়েছে।

ক্রেতা-বিক্রেতার কচ্‌কচিতে তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি হয়ে এই এলোমেলো আয়োজনটার সঙ্গে রীতিমত পাল্লা দিচ্ছিল। বিক্রয়-প্রতীক্ষায় বিক্রেতাদের মনের চিন্তাগুলোও ঠিক এমনি খাপছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বেগুন-ওয়ালী তার এক-ঝাঁকা বেগুন রদ্দুরের মধ্যে রেখে, নিজেকে কোনরকমে একটা খড়ো-ঘরের তলায় ঢুকিয়ে নিয়ে, দাঁড়ি-পাল্লা হাতে বসে বসে ভাব্‌ছিল,—বেগুন ক্ষেতের উত্তর ধারটায় বেড়া দেওয়া হয়নি,—বারো বছরের ছেলেটাকে গুলি-ডাণ্ডা খেলা থেকে ধরে' এনে পাহারায় বসিয়ে রেখে এসেছে,—সে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, আর সেই দাম্বালে কালো গরুটা—! আবার ভাব্‌ছিল, রূপোর হাঁসুলিটায় টাল খেয়ে গিয়েছে, স্যাক্‌রাকে একবার দিলে হয়...।

বুড়ী মুড়ি-ওয়ালী, একটা বড় ধামায় এক ধামা মুড়ি, আর ছোট ছোট চেঙ্গারিতে পাঁচ-রকম ভাজাভুজি সাজিয়ে রেখে, ফোক্‌লা কষের আড়ালে এক ড্যালা গুল্ নাড়্‌তে নাড়্‌তে তার মাটীর নীচে পোঁতা টাকাগুলো আর ক'টা হলে তিনকুড়ি পূর্ত্তি হয়, তারই হিসেব কর্‌ছিল,—আর মাঝে মাঝে অদূরের বেহায়া যুবতী পানওয়ালীর হেসে ঢলে' ক্রেতা জমাবার ঢঙ্ দেখে নিজের যৌবনকালের সঙ্গে তুলনা করে' ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর্‌ছিল।

জোয়ানমর্দ্দ ডালওয়ালা একটা বুড়ী ঘোটকীর পিঠে দুটো বস্তা দুধারে ঝুলিয়ে, আর মাঝখানে নিজে বসে' হাটে এল। বস্তা নামিয়ে ঘোটকীর মুখ থেকে লাগাম-রূপী শনের দড়িটা খুলে নিয়ে সাম্‌নের পা-দুটো যোড়া করে' বেঁধে দিলে। ঘোটকী ঘণ্টা কয়েকের অবসর বুঝ্‌তে পেরে একবার আনন্দরব তুলে যোড়-পায়ে লাফাতে লাফাতে ইঁদারার আশেপাশের কচি ঘাসের দিকে লুব্ধ-নয়নে প্রস্থান কর্‌লে। আস্‌তে একটু বিলম্ব হ'য়ে গিয়েছিল, দোকান সাজাতে সাজাতে ডালওয়ালা—অন্য দোকানদারেরা আজ তার চেয়ে কত বেশীই না বেচে ফেলেছে—ভেবে' মনে মনে আপ্‌শোষ কর্‌তে লাগ্‌ল।

ওপাশে লক্ষটাকার স্বপ্নে লালচক্ষু মাড়োয়ারী কাপড়-ওয়ালা ধুতি, শাড়ী, জামার ছিটের বস্তার পাশে বসে ভেবে ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিল না—মাপের এই গজটা একটু ছোট করে' ফেল্‌লে, সরকার বাহাদুরের তথা পুলিশ দারোগার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হয়!

বহুদূর থেকে ক্রেতারা রদ্দুরে পুড়ে এসে ছায়ার আশায় ভিড় কর্‌ছিল, আর জিনিষপত্রের অগ্নিমূল্যতার সমালোচনা করে' বিক্রেতাদের অন্যায়টা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর্‌ছিল।

নিছক ক্রেতা ছাড়া অন্য শ্রেণীর আগন্তুকের অভাবও ছিল না; ভবঘুরে, টো-টো-প্রত্যাশী, 'যদি কিছু লাভ করা যায়, একটু হাটে যাওয়া যাক' ভেবেও অনেকে এসে হাটের জনতা-বৃদ্ধি করেছে।

মাছের বাজারটা একটা গাছের তলায় বসেছে। এলো-মেলো গণ্ডগোলের অভাব এখানেও নেই। একজন বুড়ো, গোটাকতক রুই, সের পাঁচেক কই, আর একটা প্রকাণ্ড চিতল একটা বড় ঝাকায় নিয়ে, মাটীর ওপরে এক যায়গায় বসেছে। ময়লা-কালো হাঁড়ি-কলসীর ভিতর কই, শিঙ্গি, আর মাগুর মাছ নিয়ে একধারে জনকয়েক রুক্ষচুল বুড়ী ঘেন্না-ধরানো মলিন বস্ত্রে চক্রাকারে বসেছে। আর একপাশে বসেছে একটী বছর বাইশের জেলেনী একটা ঝাঁকায় পাঁচ-মিশুলি বাটা, খয়রা, পুঁটী আর টেংরা-মাছ নিয়ে।

বাটা-খয়রা-পুঁটী মাছ কেনবার খরিদ্দারই দেখা যায় কিছু অধিক। যুবতী জেলেনীর প্রায় গা-ঘেঁসে ক্রেতারা মাছ বাছতে বসে' গিয়েছে। আন্মনা, টানা-টানা-চোখ দিয়ে একবার চারপাশ দেখে নিয়ে স্বাস্থ্যপূর্ণ বক্ষে আঁচলখানি সে মাঝে মাঝে টেনে দিচ্ছে।

এর কথা কিন্তু এগাঁয়ে ওগাঁয়ে অনেকে বলাবলি করে' থাকে,—কারণও তার আছে। বুড়ী মুড়ি-ওয়ালী আর বেগুন-ওয়ালীর হাটের পথে আজ দেখা হ'লে, একথা-সেকথার পর এই ঢলানী মেয়েটার বিষয়ই আলোচ্য হ'য়ে রদ্দুরের, ভারীবোঝার, আর ঠোকর-দেওয়া আ'লের উপরে দূর রাস্তার ক্লান্তি অপনোদন করেছিল। নীলকুঠির সাহেব-পুত্রের কীর্ত্তি-চিহ্ন—মেয়েটার সঙ্গে তার স্বামীর অত্যধিক হঠাৎ-দেখা-হ'য়ে-যাওয়া, কেমন যেন হঠাৎ ক'দিন তার চোখে পড়ে' যায়; তাই সে ছোঁড়াকে হাট-ফেরত খালি ঝাঁকাটা দিয়ে ঘা-কতক বসিয়ে দিয়েছিল। ছোঁড়া রাগ করে' একলা কোথায় বিদেশে চলে গিয়েছে। এদিকে মা-বাপমরা ছোট ভাইটী মাসাবধি জ্বরে পড়ে—পয়সা নেই, তবে, সরকারী ডাক্তারখানার নবাগত বৃদ্ধ ডাক্তার বাবুটীর নাকি দয়ার শরীর, বিনা আহ্বানেই তিনি বোধ করি তার সকল দুঃখ বুঝে ফেলে, ঘন ঘন এসে ইন্‌জেক্‌সন্ দিয়ে যান। এগাঁয়ে, ওগাঁয়ে কোন কথাটাই বাদ যায় না।

মাছের ঝাঁকা কোলে যুবতী ভাবছিল, তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীটার কথা। আবার ভাবছিল, বাড়ীতে ভাইটা জ্বরে ধুঁকছে, এই রদ্দুরের তাতে জল-পিপাসায় যদি তার ছাতি ফাটবার উপক্রমও করে' থাকে—দিদি তার হাটে! একটা আধা-বয়সী বেয়াক্কেলে বুড়ো তার গায়ের উপর এসে পড়েছিল, —কনুই দিয়ে তাকে ধাক্কা মেরে যুবতী জিজ্ঞেসা কর্‌লে, "কত মাছ নেবে।"

দারিদ্র্য, সংসারের নিরাশ্রয়তা আজ যেন তাকে হঠাৎ বড্ড অবসন্ন করে' তুলেছে। কুঁড়েখানার খাজনা দিতে হবে, জলকর খাজনাও বাকি—পয়সা নেই। পয়সা নেই—ভাইকে বদ্যি দেখায়। বুড়ো ডাক্তারের অযাচিত ক্লেশস্বীকার কি জানি কেন তার কেমন যেন বিরক্তিকর ঠেকত'। বিশেষতঃ লোকটার বিরল-দাঁতের হাসি আশ্বাস দেবার জন্যে প্রযুক্ত হ'লেও তার অসহ্য বোধ হ'ত—অথচ ভাইএর মুখ চেয়ে সব হজম করে' আস্‌তে হচ্ছে। যৌবনের তেজে সে লোকের মাঝে মাথা সোজা করে' থাকে, কিন্তু নিরালা হ'লে বুকের চাপে চোখে জল বেরিয়ে আসে। স্বামী ছোঁড়াকে ঝাঁকা প্রহার তো একটা সামান্য ব্যাপার,—ঝগড়া-ঝাঁটি মিটিয়ে নিয়ে তার কি উচিত ছিল না, এতদিনে ফিরে আসা? এমনভাবে নিরাশ্রয় তাকে ফেলে রেখে কেমন করে' কোন্ বিদেশে সে রয়েছে! সবচেয়ে রাগ হচ্ছিল তার নিজের উপর, পুরুষ-মানুষের অভিমান তো হবেই,—কি এমন দোষ করেছিল সে ছোঁড়া, যে, তাকে হঠাৎ সে মেরে বস্‌ল! ত্বরিত হস্তে মাছ দিতে দিতে যুবতী এলো-মেলো ভেবেই চলেছে। এতগুলো বেদনার মধ্যে একটা জিনিস সে বুঝতে পার্‌ছিল না,—কেন তার প্রাণটা খালি কেঁদে কেঁদে ডাক ছাড়্‌ছে—সে আসুক, তার স্বামী ফিরে আসুক! সারাহাটের কোলাহল একটা অবিচ্ছিন্ন 'জম্‌জম্' শব্দের সৃষ্টি করেছে,—যুবতীর প্রাণ একসুরে আন্মনা কেঁদে চলেছে,—সে আসুক, সে আসুক।

হঠাৎ রুই-চিতল মাছওয়ালা বুড়ো চীৎকার করে' কাকুতি কর্‌তে লাগল, "না, বাবু,—ওটা নয় বাবু!"—যুবতীর আন্মনা মন বাজারের গণ্ডগোলে ফিরে এল। বুড়োর দিকে মেছোহাট সুদ্ধ লোকের দৃষ্টি পড়্‌ল।

প্রবীণ ডাক্তারবাবু সরকারী ডাক্তারখানার দরোয়ান সঙ্গে হাটে তাঁর পাওনা আদায় করতে এসেছেন। বুড়োর বড় চিতলটাই তিনি হাতে করে' তুলেছেন! বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে খপ করে' তাঁর হাত ধরে' ফেল্‌লে, "মরে যাব বাবু।

ওটা নয়!" ডাক্তারবাবুর টাকধরা মাথার তলায় রগের শিরগুলো রাগে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, "এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া!" দরোয়ান চট্‌ করে' পটু-হস্তে বুড়োর গালে চড় কসে' দিলে—ঠাস্‌ ঠাস্‌। বেচারা বসে' পড়ে কাঁদ্‌তে লাগল। বাবু মাছ নিয়ে বিজয়-গর্ব্বে ফির্‌লেন। যুবতী জেলেনীকে দেখে তাঁর দন্তবিরল কষের পাশে আবার হাসি দেখা দিল। তিনি তার দিকে অগ্রসর হ'লেন, "কি গো, ভাই একটু ভালো আছে তো? ঝাঁকায় কি মাছ?"

দরিদ্র বৃদ্ধকে সপ্তাহ-ভরের অন্ন-সংস্থান হারিয়ে হৃদয়-বিহীন ভাবে মার খেতে দেখে, যুবতী থ' মেরে হাত পা গুটিয়ে বসে ছিল। মুহূর্ত্তের জন্যে মেছোহাটার গোলমালটাও বোধ করি নিস্তব্ধ হ'য়ে থেমে গিয়েছিল। বাবু জেলেনীর ঝাঁকার কাছে এগিয়ে গিয়ে একবার, দু'বার, তিনবার, বহু বার দু'হাতে মাছ তুলে নিয়ে দরোয়ানের কাছে দিতে লাগলেন—হেসে, হেসে। যুবতী নিষেধও করে না, সে পাথরের মত নিথর হ'য়ে গিয়েছে। বাবু একবার একটু থমকে দাঁড়িয়ে আবার হেসে আরও চারটী মাছ তুললেন। অকস্মাৎ যুবতী বাঘিনীর মত লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল,—সমস্ত মাছের ঝাঁকাটা তুলে প্রবীণ ডাক্তারবাবুর টাকের উপর নিক্ষেপ কর্‌লে।

মেছো-হাটায় তুমুল কোলাহল উঠে গেল! "আরে, আরে, করলে কি?" বাবুর পরিচ্ছদের দুরবস্থায় দু' একজন হাস্য-সংবরণ কর্‌তেও পার্‌লে না। দরোয়ান ক্রোধে এগিয়ে এল—যুবতীকে প্রহার কর্‌বে! ডাক্তারবাবু কিন্তু নিবারণ করে' ফেল্‌লেন,—আবার তাঁর বিরলদন্ত হাস্যে বল্‌লেন, "আরে, ছেড়েদে, ছেড়েদে। বুঝ্‌লি না, আমার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছে!" 'হা, হা' উচ্চহাস্যে নির্লজ্জ চলে গেল। যুবতী গোঁজ হয়ে ছড়ানো মাছগুলো ঝাঁকায় তুলে বসে' রইল—আশে-পাশের লোকগুলো কৌতুক আর চেপে রাখ্‌তে পার্‌ছিল না।

ডালওয়ালা, মশলাওয়ালা থেকে ক্রমে কাপড়ওয়ালা মাড়োয়াড়ীর কাছ পর্য্যন্ত এই কৌতুককর ঘটনাটা একটানা আলোচ্য হয়ে সারাহাটের এলোমেলো ভাব কাটিয়ে রসের প্রবাহ বহিয়ে দিলে। বেগুন ওয়ালী, মুড়ি-ওয়ালীদের কাছে গাঁ থেকে আর একটা কি খবর এসেছিল, সবিস্ময়ে তারই আলোচনা পাশাপাশি মুখে মুখে ঘুর্‌ছিল, ক্রমে এ খবরটাও সে মহলে পৌঁছল।

মুড়ি-ওয়ালী বুড়ীর বোধ হয় বিক্রী শেষ হয়ে গিয়েছিল—হঠাৎ তার মাছ নেবার তাড়া পড়ে' গেল। যুবতীর সাম্‌নে এসে আর সে নিজেকে সাম্‌লাতে পার্‌লে না, রাগে হাত মুখ নেড়ে বলে' উঠ্‌ল, "বেহায়া ছুঁড়ী, হাটে ঢলাঢলি কর্‌ছিস্‌—ভাইটা মরে' পড়ে রয়েছে! ধর্ম্মের ভয় কি একটুও নেই! কুকুরেই টেনে নিয়ে যেত, যদি না—!"

হট্টগোলে, গণ্ডগোলে কেনা বেচা চল্‌তে লাগল।

চেরাপুঞ্জি

শ্রীপাপিয়া দেবী বি-এ

বড়দিনের ছুটীতে আমি শিলঙ্‌ বেড়াইতে গিয়াছিলাম। বাবা সেখানে সরকারী চাকুরী করিতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতাম, একবার ইচ্ছা হইল,—মেঘমালার দেশের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া আসিব। বিশেষ চেরাপুঞ্জী ভ্রমণের সখটা অনেক দিন থেকেই ছিল। ঐ দুর্গম পথে যাতায়াত করা বেশ কষ্টসাধ্য জেনেও কি জানি কেন, এক দিন শিলঙের উজ্জ্বল প্রভাতে শৈত্যবাতাবিক্ষুব্ধ বরফ-মণ্ডিত অর্দ্ধদগ্ধ শ্যামল ভূমি ত্যাগ করিয়া আমরা বেলা নয়টার সময় একখানি ট্যাক্সি মোটর গাড়ীতে চাপিয়া রওনা হইল্যাম। ষ্টেসনে এসেছিলেন, বাবা, খোকা, "গানী", আর পাঁচ বছরের কচি ভাইটি "টুনু"। আশৈশব আমি একটু বিভিন্ন রকমের ছিলাম। বাংলা বধূর মত সলজ্জ ভাব, শিশুর সারল্য (যাকে আজকাল লোকে Simplicity—Foolishness বলে থাকেন) বুকরাঙা ব্যথা যেন রাধিকার বিরহের মত, আর কোন একটা ব্যাপারে

হঠাৎ দমে যাওয়া অভ্যাস জন্মাবধি চিরন্তন ছিল। বিদায়-বেলা কবিদের মত মুখর ছন্দে বিদায়-বিহ্বলার কাঁকনের রিণিঝিনি, "হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,…কাজল আঁখি পড়িল মনে" অথবা সেই ঘোমটার ফাঁকে মুচ্‌কি হাসির আলোছায়া,…এ সবের জন্য ত আমার প্রাণ কেঁদে উঠত না…আর নেই যে, তাই বা কেমন করিয়া বলি…ভবিষ্যতে কি হইবে?…

আমার ব্যথাভরা প্রাণ জড়িয়ে ধরতে চাইত ঐ বকুল বাগানের মুকুলভরা গাছগুলি, সজিনার মস্ত হাওয়া, বাংলার মাঝির মেটোসুরে গান, ধূ ধূ তেপান্তরের মাঠে রাখালের বাউল সুরের মধুর তান, প্রাণ দোলানো, ঢেউ-খেলানো সোণার ধানের ক্ষেতের শ্যামলশোভা;—আর ঐ অচিন দেশের, সুদূরের ধূ ধূ গাঁয়ের নীলাঞ্চলখানি জড়িয়ে ধরতে।… চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে যখন দেশের পর দেশ, কাননের পর কানন, পাহাড় পর্ব্বত, নদনদী,—সব ছেড়ে যেতেম,—কি যে বিষাদের একটা করুণ রাগিণী আমার বুকের মাঝে বেজে উঠত! কিছুতেই ওগুলিকে ভোলা যেত না,—সেদিনও আমার ঐ রকম হয়েছিল।

যখন মোটরগাড়ীখানি শিলঙের আঁকা-বাঁকা পথখানির উপর দিয়ে ঘড় ঘড় করে উঠল, রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট ভাইটি ফুল্ল জ্যোৎস্নার মত হাসির ফিনিক ছড়িয়ে দিয়ে তার নিস্‌পিস্ টোল-খাওয়া গাল দুটী থেকে কুন্দপাতির বিকাশ করিয়ে দিল। বল্‌ব কি,—আমার যেন ফিরে শিলঙে নেমে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল।

গাড়ীখানি ছুটিতে লাগিল। যে গাড়ীখানিতে আমরা চেপেছিলাম, তাতে আরও দুইটি বিদেশিনী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা বাঙালী নয়,—শিলঙের "মামী"। খাসিয়া রমণীদিগকে এদেশের প্রথানুসারে "মামী" সম্বোধন করিতে হয়। কেউ যেন অন্য রকম মনে না করেন। তাদের দুধে-আলতা রঙ, ঝক্‌ঝকে পোষাক, ঢল্‌ঢলে মুখভরা হাসি, আমার বিচ্ছেদ-পিপাসার একটু শান্তি দিচ্ছিল কিন্তু,—তাদের করুণ অভোল-ভোলা হাসির ভিতর কি-যেন একটা সান্ত্বনার আভা ফুটে বের হয়েছিল, তাদের সাথে একটু প্রাণখোলা কথাবার্ত্তা সুরু করতেই আমার সব ব্যথা জল হয়ে গেল।

চেরাপুঞ্জি

তারা যখন আধা-ভাঙা হিন্দিতে কথা কইছিল, আমিও প্রত্যুত্তর দিচ্ছিলাম। হিমিনদা ড্রাইভারের পাশে বসে হেসেই খুন। আবার যখন তারা নিজেরা তাহাদের দেশের ভাষায় কথা সুরু করিল, আমি হাঁ করে পথের পানে চেয়ে রইলাম। কি করিব, কিছুই বোধগম্য হইল না। গাড়ী হু হু শব্দে

পাহাড়ের বুক চিরিয়া কাঁকর রাঙা পথের মাঝে, কখনও বা নিবিড় বনরাজির ভিতর দিয়ে পাগলা ঝোরার রিমঝিম স্বপ্নালসে বোনা নীরব রাগিণীর রেশ সঙ্গে নিয়ে ছুটিয়া চলিল। প্রায় ৪।৫ মাইল পর্য্যন্ত শিলং সহরের আভাষ যবনিকার অন্তরাল থেকে আমাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। তার পর এমন একটা জায়গায় আসিয়া পৌছিলাম, যেখানে দুই ধারে দৈত্যের মত দুইটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেন হাঁ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গাড়ী খানিকে গিলিবার জন্য বসিয়া আছে। তাহাদের গায়ে গায়ে অসংখ্য গুল্মলতা, বৃক্ষ—সবাই যেন আঁধারের আবছায়ায় উঁকিঝুঁকি দিতেছিল। একঝাঁক পাখী বসন্তের সুদূর আগমনের নিশানা লইয়া উড়িয়া গেল। পথের ধারে একটি মামী তাহার শিশু কন্যাকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া হঠাৎ টুনুর কথা মনে পড়িল।

প্রায় নয় মাইল যাওয়ার পর গাড়ী থামাইয়া "হাতিপাণি" (Elephant Falls) দেখিয়া আসিলাম। দেখিতে বড়ই সুন্দর! পথের পাশে আর একখানি মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, কোন আরোহী দেখিলাম না; ড্রাইভারের মুখে শুনিলাম, সেই গাড়ীর আরোহীরাও চেরাপুঞ্জি যাইবেন, আপাততঃ শিলঙের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ (Shillong peak) দেখিতে গিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা ষোল মাইল অতিক্রম করিয়া "ডামেন" পৌঁছিলাম। এখানে কতকগুলি খাসিয়া বস্তি, দুইচারিটি দোকান-ঘর, সরাই ও একটি ডাক-বাংলা আছে। আর দেখিবার মত কিছুই নাই।

"ডামেন" ছাড়িয়া মাইল দুই যাইতে না যাইতেই গাড়ী আসিয়া একেবারে দুইটা প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়ের মাঝখানে পড়িল। পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে যে দিকে চাই—কেবল পাহাড় আর কণ্টকময় গুল্মরাজি। মাঝে মাঝে খাসিয়া বস্তি, ছোট ছোট কাঁটা গাছ, আর মাঝে মাঝে সবুজবর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলে রঞ্জিত কাঁকর-ধূলি-ধূসরিত বালিয়াড়ি। দক্ষিণ কোণের ছোট ছোট পাহাড়গুলি মাথা তুলিয়া যেন সম্মুখের সবুজ সমতলক্ষেত্রের বিপুলতা ও নীরবতা বিস্ময়ভরে দেখিতে দেখিতে স্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মাথা ডিঙাইয়া পাহাড়ের গায়ে উচ্চ বৃক্ষগুলিকে কাঁপাইয়া সেই বনস্থলীকে শীতল করিবার জন্যই যেন বাতাস শন শন করিয়া বহিতেছে! শিলঙের শীতের কথা হিমিনদার মুখে শুনিয়াছিলাম, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।

গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। তখন পর্য্যন্ত আমরা পাতালস্পর্শী চেরাপুঞ্জির সন্নিকটবর্ত্তী গড়ের রাস্তার পাশে আসিয়া পৌঁছি নাই। সে গড়ের দিকে তাকাইলেই প্রাণ শিহরিয়া ওঠে।
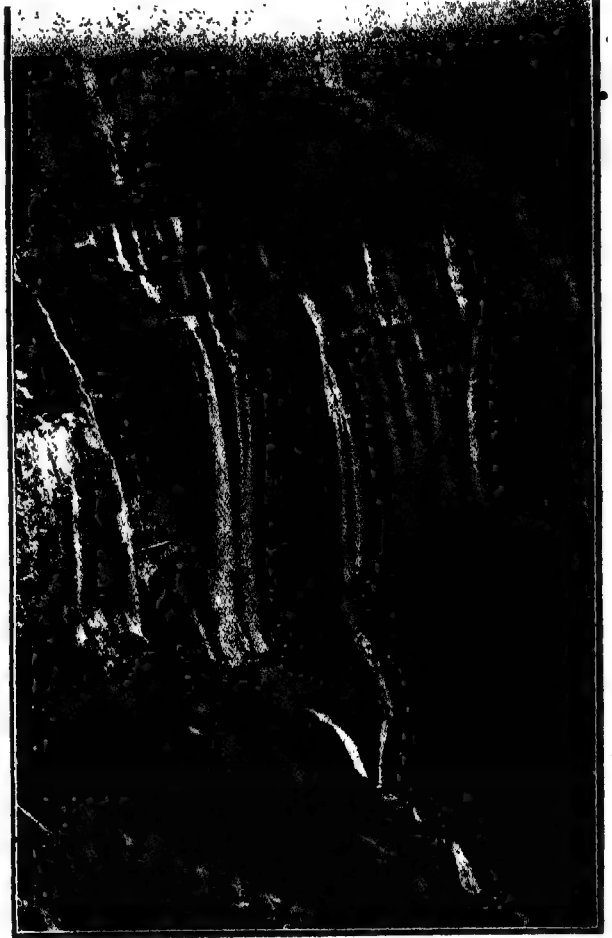
মবসাময়ী প্রপাত ১৮০০ ফিট্—চেরাপুঞ্জি

একবার আড় নয়নে দেখিয়াছিলাম, আর ফিরিয়া দেখিতে সাহস হয় নাই।

রাস্তার পাশে তিন চারিটি খাসিয়া রমণী কুঁজো ভরিয়া জল লইয়া যাইতেছিল। বিদেশিনীর নিকট জানিতে পারিলাম —এই ঝরণার জলই এখানকার অধিবাসীদের পেয়। এক মাইল বা দুই মাইল দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে আসিয়া, নিজেদের

পৃষ্ঠে কলস বোঝাই করিয়া ঐ প্রকার ঝরণা হইতে গ্রামবাসিগণ জল লইয়া যায়। বাসনমাজা কার্য্য প্রায়ই বালিদ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। শিলংএর জল কিন্তু বড়ই সুস্বাদু এবং পাচক। পেট ভরিয়া গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করার পর এক গ্লাস জল খাইলে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যেই আবার ক্ষুধার উদ্রেক প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। হিমিনদা তাহা প্রত্যক্ষ বুঝাইয়া দিলেন। শিলঙ থেকে রওনা হবার সময় তিনি প্রাতরাশটি বেশ উত্তম রূপেই শেষ করিয়াছিলেন; কিন্তু পথে তাঁহাকে দুইবার আকণ্ঠ জলপান করিতে হইয়াছিল। বিদেশিনী রমণীরা ত হাসিয়াই অস্থির। কারণ, তাঁহারা ছয়মাসের ভিতর বারি স্পর্শ করেন না—স্নান ত দূরের কথা। চা পান গাছের উচ্চ বেড়ার মধ্যে একখানি বা দুইখানি ঘর; একটি মাত্র ক্ষুদ্র দ্বার। বায়ু প্রবেশের জন্য নামমাত্র গবাক্ষ বা ছিদ্র দু'একটী আছে। মাটীর ভিতর প্রচুর বালি থাকায় ফসলের কার্য্য কোন প্রকারে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। তরী-তরকারীর মধ্যে দেখিলাম আলু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে হয়। কোন কোন ক্ষেতে বেগুণও হইয়া থাকে। ফলের মধ্যে পিচ, নাস্‌পাতি, কমলা, এসবই দেখিলাম। শীতের সময় কি না, কমলার মনোহর বাগান দুই একটি দেখিলাম।

পথে যাইতে যাইতে দেখিলাম, অনেক স্থলের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। কোথাও কোথাও পর্য্যায় ক্রমে উন্নত ও অনুন্নত ভূমি-ভাগ তরঙ্গায়িত হইয়া দূরে চক্রবালে আত্ম-

ডাম্পে

করিয়া তৃষ্ণা মিটাইয়া থাকেন। আমাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট ঘৃত, আটা, সূক্ষ্ম আতপ তণ্ডুল, নানাপ্রকার ফল, কিস্‌মিস্ বাদাম, পেস্তা, চিনি, ও উৎকৃষ্ট ক্ষীরের বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন সংগৃহীত ছিল। হিমিনদা মাঝে মাঝে সে গুলির সদ্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কলিকাতার সৌখীন বাবুদের মধ্যে আজকাল ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার প্রাচুর্য্য দেখিয়া,—ডাক্তার না হইলেও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহারা শিলঙ—চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে আসিয়া এই জল পান করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন।

এই বিশাল অরণ্যানীর ভিতরও দুই তিন মাইল অন্তর এক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যাইতে লাগিল; কাঁটা হারা হইয়া গিয়াছে। শৈল-শৃঙ্খলের আবেষ্টনের মধ্য দিয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আর সাত মাইল অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা চেরাপুঞ্জি আসিয়া পৌছি। দূরকে নিকট এবং নিকটকে দূর করিয়া আমরা ক্রমে কতকগুলি প্রসিদ্ধ খাসিয়া বস্তি পার হইয়া গেলাম। এই স্থানগুলিতে পাথুরে কয়লার খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পথের দুই ধারে তাহাদের যথেষ্ট স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইলাম। এখানে আসিয়া গাড়ী থামান হইল,—কারণ হিমিনদা'র ভিতরের রসদ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে অপর ট্যাক্সিখানি আসিয়া অত্যন্ত বেরসিক বেতালের মত ঘড়াঙ ঘঙ শব্দে থামিল। তন্মধ্য হইতে নামিলেন—দুইজন সুদৃশ্য

পরিচ্ছদধারী বাঙালী যুবক। উভয়েই শিলঙে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। একজন, পরিচয়ে জানিলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে-বি-এ পড়েন। আর একজন প্রেসিডেন্সিতে এম্‌-এ পড়েন। ঢাকা প্রবাসী মিঃ এইচ, চাটার্জ্জি আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে আসিলেন, শুনিলাম এই তুহিন প্রদেশে বিগত বিশ বৎসর হইল তাঁহারা বাঙলা ছাড়িয়া আছেন। তবে এখনও একেবারে ছাড়েন নাই, পূজাপার্ব্বণ উপলক্ষে ও কলেজের ছাত্র হিসাবে আজও সোণার বাংলার সংশ্রবে আছেন। বেশ উপভোগ্য ঠাণ্ডা-গরম মিশ্রিত আবহাওয়ার আমেজ পড়িয়াছে। সরস হাস্য গল্পে হেমবাবু সময়টা

জর্জের পথে—চেরাপুঞ্জি

বেশ কাটাইয়া দিলেন, যতক্ষণ না তাঁহার অন্যতম বন্ধু এমন ক্ষিপ্রতার সহিত সুপরিপক্ক ঘৃত প্রচুর মুগের ডাল এবং সুসিদ্ধ অন্ন প্রস্তুত করিতেছিলেন। অমিয় বাবু অমিয়ই পরিবেশন করিলেন। হিমিনদা, হেমবাবু কি এক শ্রদ্ধার সহিত গুরুসেবা করিতে লাগিলেন, তাহার বর্ণনার ভাষা নাই, প্রাণের ভেতর একটা দাগ আজও রয়ে গেছে। অমিয় বাবুর পরিবেশনের সময় যে কি কষ্ট হয়েছিল, সেইটি বিশেষ ভাবে বুঝতে পেরেছিলাম শুধু আমি। আমাকে কেন যে "দ্রৌপদীর" কর্ত্তব্য হতে নিরস্ত করেছিলেন, সেজন্য আমি বেশ অভিমান করে অমিয় বাবুর স্বহস্তের অন্নব্যঞ্জন খেতে ঘোর আপত্তি করেছিলেম; কিন্তু হেমবাবুর নিতান্ত অনুরোধে ও ভদ্রতার খাতিরে আমাকে কিছু গলাধঃকরণ করিতে হইয়াছিল। বিশেষতঃ হেমবাবু ও অমিয় বাবুর মত দুইটি বন্ধু গন্তব্য স্থান পর্য্যন্ত একসঙ্গে থাকিবেন, সে আমার আশার অতীত। হেমবাবু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেন, আমি ইডেন কলেজে আই-এ পড়িতাম। তাঁর সঙ্গে জানাশোনা ছিল না; কিন্তু পরিচয়ে এমন হইয়া পড়িল যে, তিনি ও অমিয়বাবু আমাদের আত্মীয়-স্থানীয় হইয়া পড়িলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীর বিবৃতি জীবনে কোন দিন করিবার ইচ্ছা ছিল না, শুধু সেই সুখ-স্মৃতির রক্ষা কল্পে এইটি বিবৃত করিলাম। খবরের কাগজে পড়িয়াছি অমিয়বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া শিমলায় বেশ মোটা বেতনের চাকুরী করেন। কিন্তু সেই সদানন্দ সুরসিক ও সুন্দরতম হেম বাবুর খোঁজখবর আজ পর্য্যন্তও পাই নাই। * * * *

আহারাদির পরে আবার মোটরে চাপিয়া বসিলাম। হেমবাবুর গাড়ীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এখান হইতে পথ একটু নূতন ধরণের। আমরা পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে ঢালুর উপর দিয়া চলিতেছি। কেহ যদি পর্ব্বতের শীর্ষদেশে উঠিয়া শায়িত অবস্থায় নিজেকে ছাড়িয়া দেয়, তবে সে গড়াইতে গড়াইতে আমাদিগকে লইয়া কোন্ অতল প্রদেশে পতিত

পাহাড়িয়া পথে।—অদূরে স্রোতস্বিনা

কিছুদূর অগ্রসর হইতেই চেরাপুঞ্জি সহর অদূর পাহাড়ের কোলে নন্দদুলালের মত গাছের ফাঁকে লুকোচুরি খেলিতে লাগিল। সমুদ্র বক্ষ হইতে আমরা প্রায় ৬০০০ ফিট উচ্চে উঠিয়াছি। অদূরে মুস্মাই জলপ্রপাতের জল-গর্জ্জন আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। গাড়ী সেখানেই থামাইয়া রাখা হইল। পথের ধারে চেরাপুঞ্জির সিমের (Siem—রাজা) স্মৃতিস্তম্ভ দেখিলাম। নামিয়া দেখি 'Mr. H' মোটরে দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেছেন! হঠাৎ জাগরিত হইয়া সহাস্য মুখে নামিয়া পড়িলেন। সম্মুখেই সেই সুন্দর ঝরণা। কিংবদন্তী আছে যে, পৃথিবীর মধ্যে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের পরই ইহা দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে বৃহত্তম বলিয়া বিবেচিত হয়। জানি না ইহা কতদূর সত্য। আমরা উইলো বনের মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিতে লাগিলাম। হুঙ্কার শব্দে জলরাশি উপলখণ্ডের উপর লাফাইতে লাফাইতে কোন্ এক অজানার উদ্দেশে ছুটিয়া যাইতেছে। অমিয়বাবু বেড়াইতে বেড়াইতে শিলঙের নানাবিধ সৌন্দর্য্যের গল্প শুনাইতে লাগিলেন। জঠরাগ্নি কিন্তু তখন

হইবে। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় চিত্তাকর্ষক। বাম দিকে নদীর অপর পারে মহাগিরি পর্ব্বতের তুষার-শৃঙ্গ দণ্ডায়মান। ডান্ দিকে 'হেংহি' পর্ব্বতমালা, মধ্যে জনশূন্য অপ্রশস্ত উপত্যকার মধ্য দিয়া এক পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া মৃদু নাদে কোন্ অসীমের দিকে চলিয়াছে। এই উপত্যকায় ভালুক, চিতাবাঘ, বিশেষতঃ এক প্রকার বন্য হরিণ ও তিতির পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে" —রবীন্দ্রনাথ

খাদ্যের অভাবে অন্ন দগ্ধ করিতেছিল। শীতকালে "মুসমাই" জলপ্রপাতের জলধারা প্রায়শ কমিয়া যায়। কিন্তু যে জলধারা প্রায় হাজার ফিট নিম্নে পড়িতেছিল, তাহাতেই স্ফটিক-চূর্ণের সৃষ্টি হইতেছিল। তাহা হইতে উৎক্ষিপ্ত সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম জলকণিকা বাষ্পাকারে উড়িয়া বাতাসে মিশিয়া যাইতেছিল। এই জন্যই সম্ভবতঃ এখানকার অধিবাসীরা সুস্থ সবল। তাহারা এই জল-প্রপাতের 'ধুঁয়াধারা' সেবন করিয়া সহজেই অনেক গুরুপাক দ্রব্য হজম করিতে পারে। দৃশ্য মন্দ নহে, কিন্তু তখন আমরা শিলঙের বিখ্যাত "বিডন ও বিশপ" জল-প্রপাতের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। তিন চারি শত ফিট উচ্চ হইতে পতিত জলধারার সহিত কি ইহার তুলনা হয়!

অমিয়বাবু অদূরে একটা প্রকাণ্ড উপলখণ্ডের উপর গা ঢালিয়া দিয়া গাহিতেছিলেন—

"—দূর দেশী ঐ রাখাল বালক আমার বটের ছায়ায়
সারা বেলা গেল গেয়ে—"

তাঁহার সেই সুমধুর সঙ্গীতে সবাই মুগ্ধ হইয়া গেল। ভাবের আবেশে হিমিনদা' ভোজনপর্ব্ব একেবারে ভুলিয়া গেলেন। অমিয়বাবুর গান থামিতেই আমাকে আর একটা গানের জন্য চাপিয়া ধরিলেন। আমার ভয়ানক লজ্জা করছিল; কিন্তু তবু আমায় গাহিতে হইল, আমি গাহিলাম—

"তুমি কেমন করে গান কর যে গুণী
আমি অবাক্ হয়ে শুনি।—"

ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। আমরা চেরাপুঞ্জির গহ্বর দেখিবার জন্য চলিলাম। কিংবদন্তী আছে, কামরূপের কামাখ্যার মন্দিরের সহিত এই সুড়ঙ্গপথে পাতালের নীচে দিয়া সংযোগ আছে। আমরা আধ পোয়া মাইল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলাম। সঙ্গে তিনটি রূপবতী খাসিয়া রমণী পথ-প্রদর্শকরূপে ছিল। তাহাদের প্রত্যেককে এক টাকা করিয়া দিতে হইল। যখন তাহারা বিস্ময়ভরা ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাহাদের ভাষায় কথা বলিতেছিল, হেমবাবু তাহাদিগের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—এ যেন কবি-বর্ণিত সেই "কালো মেঘের হরিণ কালো চোখ"। চোখ দুটি বড় সুন্দর, দৃষ্টিটা প্রাণস্পর্শী—অনেকক্ষণ স্মরণ থাকে।

গাড়ী যতই চেরাপুঞ্জি ছাড়িয়া আসিল, অদূরে বনের শেষে মাঠ, এবং মাঠের শেষে বন দেখিতে লাগিলাম। প্রান্তরের শেষ সীমায় বনের শ্যামল কান্তি চারিদিকেই ভাবী বসন্তের সৌন্দর্য্যচ্ছটা প্রকাশ করিতেছিল। নিকটেই একটি মন্দির। মন্দিরের ভিতরে যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষু জুড়াইয়া গেল; হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠিল। ফুল বিল্বদলে ও পুষ্পমাল্যে শিবলিঙ্গকে অতি রমণীয় বেশে সজ্জিত করা হইয়াছিল। চারিদিকেই ভিখারীর উৎপাত—একঘেয়ে সুরে একই কথা গাহিতেছে—"রাজাবাবু পয়সা, মাইজি পয়সা"। অতি কষ্টে তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়া গেল। বাবার অঙ্গনে বসিয়া একটি অন্ধ বালক সুললিত কণ্ঠে শিবাষ্টক আবৃত্তি করিতেছিল—

পথের ধারে—শিলঙের "মামী" ও তাঁহার শিশুকন্যা

"প্রভুমীশ মনীশমশেষ গুণং
গুণহীন মহীশ গরলাভরণং
রণ নির্জ্জিত দুর্জ্জয় দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরুম্।

সময়োচিত স্তবটি সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। এখান হইতে মোটর গাড়ী বিদায় দেওয়া হইল। এখন পদব্রজে প্রায় সাত মাইল পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে হইবে। এমন পথে যাইতে হইবে, যাহা শুধু নীচের দিকে,—প্রায়

কোম্পানীগঞ্জ

চারি হাজার ফিট নীচে নামিতে হইবে। পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একবার ফস্‌কাইলে আর উপায় নাই। গাড়ী ঘোড়া কিছুই চলে না এবং ঐ পথে চলিতেও পারে না।

একমাত্র ভরসা মানুষের পৃষ্ঠদেশে চড়িয়া যাওয়া। খাসিয়া দেশে এই সব আরামকেদারাকে "থাপা" বলে। ইহাকে পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে দৃঢ় করিয়া একটি দড়ির মত বেতের বোনা "নান্‌লা" দিয়া কপোলের সঙ্গে ঝুলাইয়া লইয়া যায়। এই দুস্তর গিরিকন্দর পারাপার হইতে তাহাদের সাহায্য ব্যতীত আর উপায় নাই। আমরা দুইজনে তাহাদের শরণাপন্ন হইলাম। হেমবাবু ও অমিয়বাবু পদব্রজে আমাদের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা পার্ব্বত্য পথে এই ভাবে চলাফেরায় বিশেষ অভ্যস্ত।

এক মাইল যাইতেই দেখি দূরে বাম দিকে মহাদেব-গিরির উপরে তুষার-সম্পাত হইয়াছে।

পথের দুই পারে, চারিদিকে কমলালেবু, তেজপাতার বাগান। সেই পথ-দিয়া আমাদের প্রায় এক মাইল পথ যাইতে হইবে। হিমিনদা পথের পার্শ্ব হইতে একটী কমলা বৃন্তচ্যুত করিলেন। আমরা ঢাকা কলিকাতায় যে সকল কমলা পাই, তাহার প্রায় অর্দ্ধেকই শুষ্ক, বিস্বাদ এবং রসশূন্য; আর এই কমলা কোয়াগুলি যেন রসে ভরপুর। বেশ সস্তা ও পয়সায় তিন চারিটি পাওয়া যায়। কমলা বাগানের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মন প্রাণ বিমোহিত হইল। সেই বিমলকান্তি বৃক্ষের সারি ও রসভরা কমলা লেবুর দোদুল্যমান নৃত্য দেখিয়া মুখে-চোখে জল ছুটিল। চোখের জল আনন্দে ও জিভের জল · ! নিত্যকার হাসি অশ্রুর মধ্যে এ একটি স্মরণীয় দিন কিন্তু। অনেক দূর হাঁটিয়া আমরা একটি ছায়াময় বন্য গাছের তলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। ঝুরঝুর করিয়া কয়েকটি শুষ্ক পত্র আমাদের মাথার উপর ঝরিয়া গেল। বৃক্ষের নব পল্লবের মধ্য হইতে একটী পাখী শিষ্‌ দিতেছিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা মহাদেব-গিরিতে পৌছিলাম, অতিথি হইলাম এক খাসিয়া পরিবারের গৃহে। তাহারা বেশ আদর-যত্ন করিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের আহার্য্য আমাদের নিকট অভক্ষ্য। শূকর মাংস, মৎস্য এবং ব্যাঙ্‌ ইত্যাদি তাহাদের খাদ্য। তাহারা আমাদিগকে কমলালেবু, চাঁপাকলা, পেঁপে প্রভৃতি আনিয়া দিল, কিন্তু তাহাদের গৃহে

চেরাপুঞ্জি "সিমের" স্মৃতিস্তম্ভ

বসিয়া সে-সব গলাধঃকরণ করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না, বাহিরে দাঁড়াইয়া যে যার ইচ্ছা মত কিছু খাইলাম, এমন কি চা পান পর্য্যন্ত বনস্থলীতে হইয়াছিল। তবে তাহারা সভ্য, বিশ্বাসী, এবং নিরীহ প্রকৃতির। বেশ প্রাণ খুলিয়া ইংরেজীতে কথা বলিল,—সে শুধু ইংরেজ-মিশনারীদের অপার অনুগ্রহে। প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি, উঠানের ঘাসগুলি বেশ সাদা বোধ হইতেছে। মনে হইল, তুলা ভিজিয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—তুহিন (Frost)। ঘাসের উপর অতি সূক্ষ্ম তুলার আকারে হিম জমিয়া রহিয়াছে। ইহা বরফপাতের পূর্ব্ব-সূচনা। সকাল বেলা চা পান করা হইল অমিয়বাবুর অনুগ্রহে; তিনি যে বৃক্ষতলে বসিয়া চায়ের জল গরম করিয়াছিলেন, হিমিনদা তাঁহার Kodakএর সাহায্যে সেখানকার একখানি আলোকচিত্র সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন। কাছে একটা গাছ কেহ কাটিয়াছিল, তাহারই সন্নিকটে অনেক শুক্না কুচি কাঠ পড়িয়া ছিল। সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া, পাথরের তথাকথিত চুল্লীতে স্বদেশী কেৎলী লোটাতে জল গরম হইয়াছিল। ষ্টোভ ও চায়ের সরঞ্জাম সঙ্গেই ছিল। স্পিরিটের বোতলটি কোথায় যে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা মনে নাই, সুতরাং স্বদেশী উপায় ভিন্ন আর অন্য গতি ছিল না।

আজ খুব উতরাই পথে নামিতে লাগিলাম। প্রায় দুই মাইল নামিয়া একটি বস্তীতে পৌছিলাম। সেখান হইতে অদূরে হিমালয়ের রজতধারার দেশ দেখিলাম। কি সুন্দর,—দেখিয়াই ভক্তি-গদগদ চিত্তে দেশ-জননীর উদ্দেশে হেমবাবু "রবি বাবুর" সেই কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করিলেন—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে
জ্ঞানধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।"

প্রায় এক মাইল সঙ্কীর্ণ পথ-বিশিষ্ট উতরাই নামিয়া পার্ব্বত্য একটি নদীর উপর একটা কাঠের পুল পার হইলাম। এবার বড় সমস্যায় পড়িতে হইল। সম্মুখে একটু চড়াই যাইতে হইবে। খাড়া চড়াই রাস্তাটিও ভয়ানক খারাপ। খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইলাম, কারণ দম ফুরাইয়া গিয়াছিল।

গ্রামের ভিতর দিয়া রাস্তা গিয়াছে। আবার উতরাই নামিতে লাগিলাম। সম্মুখে যে ছোট পাহাড়টি দেখা যাইতেছে, বোধ হইল উহার উপর চড়িলেই, "থারিয়াঘাট", ভোলাগঞ্জ দেখা যাইবে। কিন্তু সম্মুখের আঁকা বাঁকা পথের আর শেষ নাই। তখন কি করিব,—সকলে মিলিয়া বিশ্রাম-সুখ-লালসায় নিম্নস্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া পড়িলাম।

ক্ষুৎপিপাসা যথেষ্ট লাগিয়াছে। সঙ্গে রন্ধনের দ্রব্যাদি সবই আছে, কিন্তু কেহ আর ইচ্ছা প্রকাশ না করায়, বিশেষতঃ, এই পরিশ্রমের পর, শিলঙ হইতে আনীত রুটি-মাখনেই কার্য্য শেষ করা গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় এক মাইলের অধিক যখন নামিয়া আসিয়াছি, তখন দৃশ্যপটের যেন একেবারেই পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। অদূরে অবারিত মাঠ, 'গগন ললাট চুমে তব পদধূলি' দেখা দিল। এই বার ভোলাগঞ্জ পৌছিব। কিন্তু ছোটবড় পাথর পরিপূর্ণ একটি প্রান্তর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। ঠকাঠক্ জুতায় আঘাত লাগিয়া যে মধুর শব্দ হইতেছিল, তাহাই উপভোগ করিতে করিতে ভোলাগঞ্জ পৌছিলাম।

স্থলপথের ভ্রমণ এখানেই শেষ হইল। এখন জলপথে যাইতে হইবে। ভোলাগঞ্জ হইতে ছাতক যাইতে হইলে নৌকায় যাইতে হয়। সে যে-সে নৌকা হইলে চলিবে না, এক হাত পরিমাণ জল,—নীচে পাথরের কুচিকুচি ছোট বড় টুকরা, আর স্রোতের বেগ অতীব ভয়ানক। একবার নৌকা উল্টাইয়া গেলে আর উপায় নাই। এখন নৌকা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে "কোন্দা" নৌকা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা কতকটা অনুমান করিতে-পারিবেন। প্রকাণ্ড লম্বা নৌকা, নৌকার মধ্যে ছাঁচ-ঢালার মত ফাঁপা,—ইহার ভিতর আরোহীদিগের স্থান। এক হাত কি দেড় হাত উঁচু, কোন মতে মাথা গুঁজিয়া বসিতে হইবে। তবে ছইয়ের ভিতরে না বসিলে কোন কষ্ট হয় না,—বাহিরে দিব্য আরামে থাকা যায়, অবশ্য দিনের বেলা। রাত্রিতে হাত পা ছড়াইয়া শোওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর নাই। আমাদেরও তাহাই করিতে হইয়াছিল।

হিমিনদা' নৌকা ভাড়া করিলেন। পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিতে হইবে; পরদিন ভোরের বেলা ছাতক পৌছিব। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে হাঁটিয়া বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন সমস্তই স্থির হইয়া গিয়াছে। মনে করিলাম, একবার নদীতে স্নান করিয়া লই, শরীর একটু শীতল হইবে। কিন্তু স্নান করা হইল না, নদীর জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা। হেমবাবু ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে অবগাহন করিলেন।

বর্ষাকালে যদিও নদী খুব বড় ও ভীষণ-মূর্ত্তি হইয়া থাকে, এ সময়ে খুব ছোট—কুলুকুলু রবে বহিয়া চলিয়াছে। নদীর গর্ভেও সর্ব্বত্রই বড় বড় পাথর। গর্ভের ভিতর প্রায় আধ মাইল হাঁটিতে হইল। জলের মধ্যেও বড় বড় পাথর। জলে নামিয়াই বুঝিতে পারা গেল, এখনও জলের স্রোত এত বেশী যে, সাঁতার দিলেই বেগে ভাসিয়া যাইতে হইবে। হেমবাবু বেশী দূর না যাইয়াই স্নান শেষ করিলেন। তিনি সাঁতার দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। নদীর জল অতি শীতল ও পরিষ্কার। আকণ্ঠ পূরিয়া সকলেই সেই জল পান করিলাম।

প্রায় সন্ধ্যার সময় নৌকা ছাড়া হইল। দুইটি মাঝি, উভয়েই শ্রীহট্ট দেশীয় হিন্দু,—বোধ হয় নমঃশূদ্র জাতীয়। তাহারা যে অপূর্ব্ব রসালাপে, সাংসারিক সুখ-দুঃখের কথা কহিতে কহিতে চলিয়াছিল, তাহার একটু নমুনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

১ম ব্যক্তি—(দ্বিতীয়কে)—হেদিন যে আপনারার বাড়ী শ্রাদ্ধ ঐছিল, হিটা কি আপনার না আপনার ভায়ের ?

দ্বিতীয়—আমার ভাযুর। (অর্থাৎ আমার ভাইর)

১ম—কিতা অইছিল ? তাইন কিতা অইয়ি মারা গেছইন।

দ্বিতীয়—সর্পদংশনে তাইন (তিনি) মারা গেছইন।

১ম—সর্পদংশন ? এত বড় ভয়ঙ্কর কথা! কুনখানে দংশন কর্‌ছিল ?

দ্বিতীয়—চক্ষের উপরিভাগে।

১ম—যাক্, তিনি ত বড় বাঁচ্‌ছইন। চক্ষুরত্ন পরমধন। তাইন গেছইন গেছইন, কিতা অইছে, তাইনের চক্ষু জবর বাঁচা বাঁচ্‌ছে······

হিমিনদা, অমিয়বাবু মিলিয়া সকলেই বেশ উপভোগ করিতেছিলেন। একবার সকলেই পিছনে ফিরিয়া চাহিলাম। সূর্য্যদেবের লাল ছটা—যেন পর্ব্বতের কোলে একটি রাঙা ছবি দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। প্রায় অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। নদীর দুই তীরে সর্ব্বত্রই ঘন জঙ্গল, কোথাও মনুষ্যের বসবাস দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। মাঝিরা বলিল, এই সমস্ত জঙ্গলে নানা রকম বন্য পশু ও ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু থাকে।

সন্ধ্যার পরই কোম্পানীগঞ্জ পৌঁছিলাম। তাহার অনতিদূরে কিলবরণ কোম্পানীর পাথর বোঝাই করিবার জন্য একখানি গাধাবোট নদীবক্ষে ভাসিতেছিল। বনফুলের মিষ্ট গন্ধে বাতাস উতলা হইয়া উঠিল। নদীর তীরবর্ত্তী জঙ্গল হইতে শৃগালেরা সন্ধ্যাবন্দনা করিল। "জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী" দেখিয়াই অমিয়বাবু গুন্‌গুন্ করিয়া গান ধরিলেন—

"ওগো মাঝি তরী হেথা বাঁধব নাকো আজকের সাঁজে।
ভিড়িও না চলুক তরী এই নদীর মাঝে।
এই নদীর এই ঘাটেতে এমনি সময় আমার প্রিয়া
যেত ছোট কলসীটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া"—ইত্যাদি

সঙ্গীতের পর সঙ্গীতের ধারা ছুটিতে লাগিল। নীল আকাশে তারার রাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। হেমবাবু তখন মাথা নীচু করিয়া বসিয়া ছিলেন। দেখিলাম মন তাঁর বেদনায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দুই চোখ যেন ছলছলিয়া উঠিয়াছে। তিনি যেমন মিশুক, তেমনি সদালাপী। তাঁহাকে নিস্তব্ধ অবস্থায় বসিতে দেখিয়া হিমিনদা ছইয়ের ভিতর হইতে বাহিরে আসিলেন। আর কাহারও সাহস ছিল না যে ঐ মৌনী ভাব ভঙ্গ করে। হিমিনদা একবার মুক্ত আকাশের পানে চাহিলেন। বাহিরের বিশ্ব তখন জ্যোৎস্নার হাসি মাখিয়া একেবারে যেন মশগুল। অমিয় বাবুর সঙ্গীত-সুধায় হেমবাবুর মুখে চোখে এমন অপরূপ দীপ্তি, অপূর্ব্ব ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তার কাছে হিমিনদার কথা বলাও অসম্ভব। সেও যেন ঐ বিমুখতার সৌন্দর্য্যের নেশায় বিভোর হইয়া উঠিল—যেন চিরজন্ম ধরিয়া এ সৌন্দর্য্য-বিমুখতার পায়ে আপনাকে লুটাইয়া রাখিতে সকলেই চায়! হেমবাবুর দুই চোখে হতাশার বেদনা অশ্রুবাষ্পের আকারে পুঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। মুখে কাতরতার কি চিহ্নই যে ফুটিয়া উঠিল,—আমরা তখন তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলাম,—কহিলাম—এমনি নির্ম্মমতায় কেন তাঁহার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে। কোন উত্তর পাইলাম না। তাঁর বুকের মধ্যে প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ঝড়ের বেগে ফুঁশিয়া উঠিল। নেহাত পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও মাত্র এই কথা বলিলেন—যা অতীত, তা অতীত, স্মৃতি মাত্র! সে কথার আলোচনায় লাভও কিছু মাত্র নেই।······

ভোরে ছাতক পৌঁছিলাম। সেখান হ'তে ষ্টীমারে ঢাকাভিমুখে রওনা হইলাম।*

* এই ভ্রমণ-কাহিনীর আলোকচিত্রগুলি শিলঙের বিখ্যাত ফটোগ্রাফার ঘোষাল ব্রাদার্সের (Ghoshal Bros) স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের অনুগ্রহে পাওয়া গেল—লেখিকা।

আশাহতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

আমি এসেচি।

তুমি এসেচ ?

দুদিন আসিনি বলে কি তুমি রাগ করেচ ?

না, মনে করেছিলুম তুমি আর আসবে না।

কেন ?

কেন ! তা কি তুমি জান না ?

ওঃ, তোমার কাছে বুঝি সে খবর এসে গেচে।

আসবে না !

এতে আমার কোন হাত নেই মীরা।

তোমার হাত নেই ?

সত্যিই আমার হাত নেই।

তবে কেন এতদিন আশার আলো ধরে এসেচ ?

আমি যে তোমায় সত্যিই বড় ভালবাসি মীরা।

আজ যে সে ভালবাসার আর কোন মূল্য নেই।

ভালবাসার মূল্য কি কখনও কমে মীরা ?

মূল্য না কমলেও, ভালবাসা যে কমে যায়।

আমি কি রকম ভালবাসি তা ত তুমি জান।

জানি।

তবে ?

তোমায় যে আর একজনকে ভালবাসতে হবে।

হবে। তবে তা পারব কি না তা ত জানি না।

পারবে, খুব পারবে।

কি করে জানলে ?

আমি যে তোমার অন্তরের কথা জানি।

মীরা !

কি ?

তুমিও ত আমায় খুব ভালবাস।

এতদিন বেসে এসেচি।

এখন ?

এখন !—

তুমি কাঁদ্‌চ মীরা ?

কই, না—

আবার কাঁদ্‌চ।

মীরা ?

এত কাঁদ্‌লে মীরা।

আঘাত যে বড় বেশী পেয়েচি—

আমি কি ইচ্ছে করে আঘাত দিয়েচি ?

না—

তবে ?

আমি যে বড় বেশী করে আশা করেছিলুম।

বড় বেশী !

বেশী নয় ? তোমার যে রাজৈশ্বর্য্য, আর আমি যে দীনের মেয়ে।

এখন কি করি বল ?

আমায় আর দেখা দিও না।

দেখা দেব না ?

তা ছাড়া যে আর অন্য উপায় নেই।

মীরা !

কি ?

দুজনকে কি ভালবাসা যায় না ?

তুমি পুরুষ, হয় ত পার।

আর তুমি ?

আমি নারী, আমি ত তা পারবো না।

আমায় একবারে ভুলে যাবে ?

যেতে হবে।

পারবে ?

পার—বো—

আবার চোখে জল এল !

কই, না !

মীরা !

কি ?

আমি তো তোমায় ভুলতে পারবো না।

নিশ্চয় পারবে।

যদি না পারি ?

তাহলে যে একজনের ওপর বড় অবিচার হবে।

অবিচার—

* * * *

মীরা—

কি ?

তবে যাই ?

যাবে ? যাও—

মীরা মুখ নত করিল। সুব্রত উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

মুখ তুলিতেই মীরা দেখিল, অল্প দূরে দাঁড়াইয়া সুব্রত তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। চারিচক্ষের মিলন হইতেই মীরা কাঁদিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীহেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

ডাকটিকিটের তৈরী ছবি—

নিউইয়র্কের এক চিত্র-প্রদর্শনীতে একটি অদ্ভুত ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবিখানি একজন বিখ্যাত লোকের। সুইডিস আমেরিকান ডাকটিকিটের দ্বারাই এই ছবিখানি প্রস্তুত হয়। কোনো প্রকার রং বা তুলির ব্যবহার করা হয় নাই। ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডও ডাকটিকিট আঁটিয়া তৈরী করা হয়।

ডাকটিকিটের তৈরী ছবি

বাণিজ্যশুল্ক বুঝিবার নক্সা—

ইয়োরোপের কোন দেশের আমদানী দ্রব্যের উপর কি

বাণিজ্য শুল্ক বুঝিবার নক্সা

পরিমাণ শুল্ক আদায় হয়, তাহা বুঝিবার জন্য একটি রিলিফ ম্যাপ তৈরী করা হইয়াছে। প্রত্যেকটি দেশ দেওয়াল দিয়া ঘেরা, দেওয়ালের উচ্চতার উপর শুল্কের কম-বেশী নির্ভর করিতেছে।

পুলিসের দেহরক্ষী বর্ম্ম—

জার্ম্মাণ পুলিসদের দেহ আততায়ীর গুলি হইতে রক্ষা করিবার জন্য একপ্রকার বর্ম্ম ব্যবহৃত হইতেছে। এই বর্ম্ম

পুলিশের দেহরক্ষী বর্ম্ম

অতি তাড়াতাড়ি খোলা এবং পরা যায়। দেহের যে সকল স্থানে গুলি লাগিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা খুব বেশী, সেই সকল স্থান বিশেষ করিয়া রক্ষা করার ব্যবস্থা আছে।

জাল নোট, দলিলাদি ধরিবার কল—

বাজারে জাল নোট চলে। দলিলাদির জালও প্রায় হইয়া থাকে। মানুষের সাধারণ চোখে এই জাল ধরা অসম্ভব। কালির রংএর সামান্য তারতম্য খালি চোখে দেখা যায় না। একপ্রকার কল আবিষ্কার হইয়াছে, এই

জাল নোট, দলিলাদির ধরিবার কল

কলের নীচে অতি তীক্ষ্ণ আলোকের নীচে একখানি আসল এবং একখানি জাল নোট রাখিলে, কোন্‌টি কি তাহা বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

মোটরকারে ভাঁজকরা ট্রাঙ্ক—

এই ট্রাঙ্কের যখন দরকার হয়, তখন ভাঁজ খুলিয়া মালপত্র ভরিয়া ফুটবোর্ডে বা পিছনে বাঁধিয়া লওয়া যাইতে
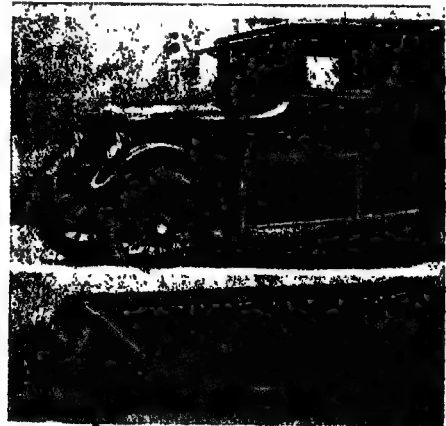
মোটরকারে ভাঁজকরা ট্রাঙ্ক

পারে। ট্রাঙ্কের যখন দরকার নাই, তখন ইহা ভাঁজ করিয়া পাট করিয়া সামনের সিটের নীচে রাখা যাইতে পারে।

বাক্সটি ওয়াটার-প্রুফ দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত। মোটরকারে যাহারা বেশী ভ্রমণ করে, তাহাদের পক্ষে এই বাক্স খুব উপকারী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঝাড়ুদারদের পীঠে গাড়ী থামাইবার সঙ্কেত-কাচ—

রাস্তা পরিষ্কার করিবার সময় পাছে গাড়ী আসিয়া ঝাড়ুদারদের ঘাড়ে পড়ে, এইজন্য পোর্টল্যাণ্ডের (যুক্তরাষ্ট্র) ঝাড়ুদারদের পেটিতে আলোক প্রতিফলিত করিতে পারে—এই প্রকার গোলাকার কাচ সামনে এবং পিছনে লাগান আছে। অন্ধকারেও এই লাল কাচ বেশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তার দুই পাশের আলো এই লাল কাচে প্রতিফলিত হয়।

ঝাড়ুদারদের পীঠে গাড়ী থামাইবার সঙ্কেত-কাচ

মানুষভুকদের শিল্পকলা—

মানুষভুক ইত্যাদি অসভ্য জাতির লোকেরা সব বিষয়েই অসভ্য—ইহাই আমাদের সাধারণ ধারণা। কিন্তু দক্ষিণ সমুদ্রের এক দ্বীপের অসভ্য মানুষভুক জাতির লোক এক প্রকার গাছের ত্বক হইতে অতি চমৎকার একপ্রকার চিত্র-বিচিত্র করা কাগজ তৈয়ার করে। এই কাগজের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া তাহারা পরিধান করে। চিত্রে এক কাগজ-বস্ত্রের নমুনা পাইবেন।

মানুষভুকদের শিল্পকলা

অভিনব বেহালা—

বেহালার সঙ্গে একটি হর্ণ লাগাইয়া লওয়ার ফলে যন্ত্রের স্বরবৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতে স্বরের মিষ্টত্বহানি হয় নাই।

অভিনব বেহালা

হর্ণ এমনভাবে লাগান আছে যে, ছড়ি চালাইতে কোনো প্রকার অসুবিধা হয় না।

মানুষ-তোলা ঘুড়ি

অতি বৃহৎ ঘুড়ির সাহায্যে মানুষকে আকাশে তোলা যাইতে পারে—ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কিছুকাল পূর্ব্বে এই প্রকারে বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত ঘুড়ির সাহায্যে একজন লোককে ক্যামেরা লইয়া ১৫০ ফিট উপরে উঠান হয়। এইখান হইতে সে নীচের চলন্ত দৃশ্যের ছবি তোলে।

মানুষ তোলা ঘুড়ি

সিকাগো সহরের রাত্রি দৃশ্য

সিকাগো সহরের রাত্রি-দৃশ্য—

দুই পাশের বহুতলা বাড়ীর উপর হইতে সিকাগো সহরের রাস্তা রাত্রিকালে কেমন দেখায় দেখুন রাস্তার এত নিকটে নিকটে এত ভয়ানক জোরালো আলোর সারি থাকে যে, সমস্ত রাস্তা দিনের মত হইয়া যায়। এই প্রকার আলোর প্রবর্ত্তন অতি অল্প কাল মাত্র হইয়াছে। পৃথিবীর অপর কোনো সহরের রাস্তায় এই প্রকার বাতির ব্যবস্থা নাই।

এরোপ্লেন-ধ্বংসকারী

চৌ-কামান—

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বিভাগ শত্রুপক্ষীয় এরোপ্লেন ধ্বংস করিবার জন্য একপ্রকার চৌ-কামান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি কামান ছুঁড়িতে যেমন লোকের দরকার, ইহাতেও তাহাই লাগিবে—কেবল চারিটি নল হইতে গোলাবর্ষণ হইবে বলিয়া, গোলার পরিমাণ চারগুণ দরকার হইবে। সময়ও একটি কামান ছোড়ার মতই লাগিবে।
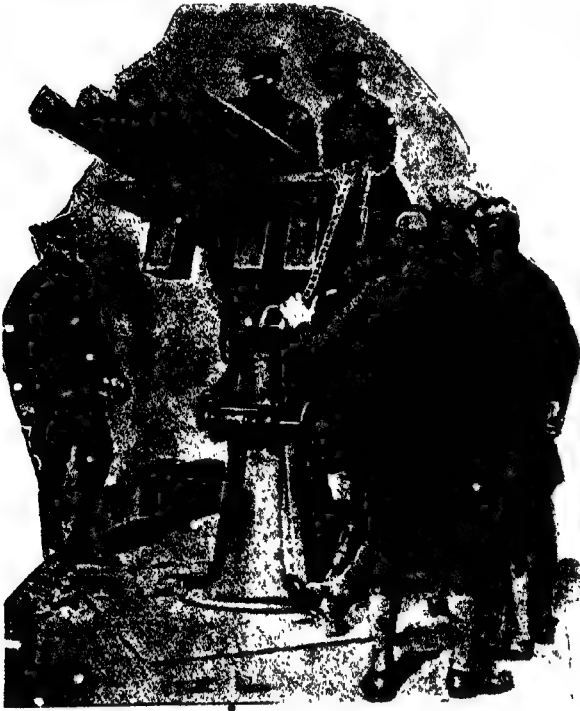
এরোপ্লেন—ধ্বংসকারী চৌ-কামান

বহুকাল ধরিয়া ডিম তাজা রাখা

বহুকাল ধরিয়া ডিম তাজা রাখা—

ডিমকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখাই তাড়াতাড়ি ডিম নষ্ট হইবার একটি প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। এক জার্ম্মাণ মিস্ত্রি ডিম লম্বালম্বি করিয়া রাখিবার জন্য একটি ডিমাধার নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই ডিমাধারে বহু ডিম রক্ষা করা যায়। ডিমাধারটিকে রোজ এক পাক করিয়া ঘুরাইয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। একটি হাতলের সাহায্যে এই ডিমাধার ঘুরান যায়। কবে কল ঘুরান হইল, তাহা দেখিবার জন্য একটি তারিখ দেখিবার যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রে আপনা আপনি তারিখ বদলাইয়া যায়। পরীক্ষাতে প্রমাণ হইয়াছে যে, এই কলে অন্য কোনো প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার না করিয়াও এক বছরেরও বেশী সময় ডিম রক্ষা করা যায়।
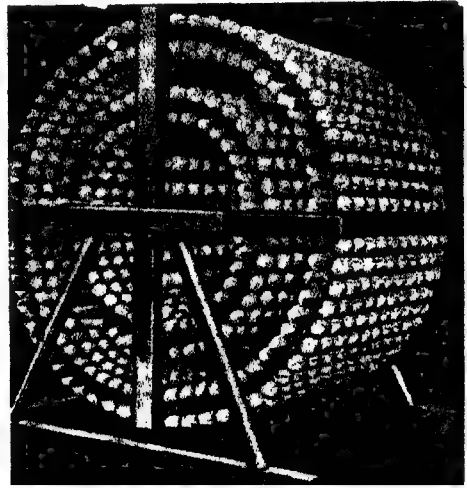
বিচিত্র বেড়াইবার রাস্তা—

জার্ম্মাণির হামবার্গ সহরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ীর প্রতি তলার চারিদিকে সেই তলার লোকজনদের বেড়াইবার জন্য কার্ণিস বাড়াইয়া বিচিত্র রাস্তা তৈয়ার করা হইয়াছে। খোলা আলো বাতাস সেবন করিবার জন্য এখন আর লোকজনদের নীচে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নামিতে হয় না। এই প্রকার প্রতি তলার চারিদিকে বেড়াইবার ব্যবস্থা করাতে বাড়ীর ঘরের মধ্যে আলো বাতাসও প্রচুর পরিমাণে যায়।
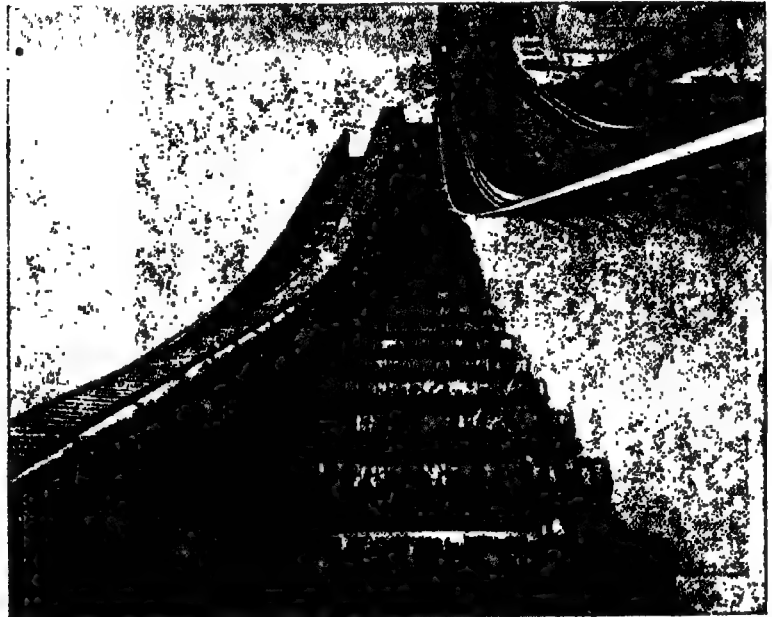
বিচিত্র বেড়াইবার রাস্তা

দিক্‌শূল

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

(২৩)

বৈকালে রমাপদর সহিত নরেশ রঘুনন্দন হলে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল। সুকুমারী তাহার শয়ন-কক্ষে শয্যার উপর বসিয়া পথ-পার্শ্বের জানালা ঈষৎ উন্মোচিত করিয়া অনুৎসুক চিত্তে পথের লোক-চলাচল দেখিতেছিল; সরমা তথায় উপস্থিত হইয়া ঘিণ্টুকে তাহার ক্রোড়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "দিদি, আমরাই না হয় দোষ করেছি, ঘিণ্টু ত' কোনো দোষ করে নি, তাকে তুমি ছেড়ে রয়েছ কেন?"

নিমেষের জন্য বক্রদৃষ্টিতে ঘিণ্টুর প্রতি একবার চাহিয়া দেখিয়া সুকুমারী দুই বাহু দিয়া তাহাকে তুলিয়া লইয়া বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিল; তাহার পর ক্ষণকাল নিঃশব্দে অবস্থান করিয়া আনত মুখে দুঃখার্ত্ত স্বরে বলিতে লাগিল, "দোষ কারো নয় সরো, দোষ আমার অদৃষ্টেরি! তা নইলে নিজের ছেলেই বা যাবে কেন, আর গেলই যদি ত' পরের ছেলের উপর এ টান পড়বে কেন?"

দুঃখিত স্বরে সরমা বলিল, "ঘিণ্টু কি তোমার পর দিদি?"

বহুক্ষণ পরে মাসীকে নিকটে পাইয়া ঘিণ্টু মাসীর আরক্ত উন্নত নাসিকা দক্ষিণ হস্তে চাপিয়া ধরিয়া তাহার দুর্জ্ঞেয় নিরক্ষর ভাষায় নানাপ্রকার অভিযোগ অনুযোগ প্রকাশ করিতেছিল। এই সকল অধিকার-স্থাপন অপ্রতিবাদে সহ্য করিতে করিতে সুকুমারী বলিল, "পর। যার উপর কোনো রকম জোর খাটানো চলে না সে পর নয় ত' কি? তবে এ বিষয়ে আমি তোদের দোষ দিই নে সরো, কথাটা তোলা বাস্তবিকই আমার অন্যায় হয়েছিল। যাকে পাবার জন্যে আমি এত ব্যস্ত হয়েছি তা'কে ছাড়তে তোদের যদি আপত্তি হয় তাতে কোনো কথা বলবার নেই। আমি হলে ত' কখনো ছাড়তাম না!" বলিয়া সুকুমারী বক্ষের মধ্যে ঘিণ্টুকে আর একটু চাপিয়া ধরিয়া তাহার মুখচুম্বন করিল।

সুকুমারীর কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে সরমার মনে হইল যে-কথা সুকুমারী বলিতেছে তাহা অভিমানের শ্লেষোক্তি নহে, বিচার এবং বিবেচনার সহায়তায় সে পরে যাহা বুঝিয়াছে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। বস্তুতঃ নৈরাশ্যের উন্মাদনা অপসৃত হওয়ার পর প্রথম যখন সুকুমারী বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে পরের ছেলে লওয়া যত সহজ কথা, নিজের ছেলে দেওয়া তদপেক্ষা অনেক কঠিন, তখন হইতে তাহার মনে রোষের পরিবর্ত্তে ক্ষোভ স্থানাধিকার করিতেছিল। নিজের ক্ষুধা নিবৃত্তির অভিপ্রায়ে পরের গ্রাস কাড়িতে গিয়া বিফল হইয়া অনুশোচনায় সে সমস্ত দিন মনে মনে বারম্বার এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যে-প্রবৃত্তির হস্তে তাহাকে আজ এই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইল তাহাকে সে জয় করিবে। চিড়িয়াখানার বাঘিনীরাও হয় ত' দুই দিন মাংস না পাইয়া এরূপ প্রতিজ্ঞা করে—কিন্তু তৃতীয় দিনে যখন তাহাদের সম্মুখে মাংস আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন দেখা যায়, প্রতিজ্ঞার অন্তরালে প্রবৃত্তি সংযত হয় নাই, প্রবলতর হইবারই সুযোগ পাইয়াছে। দেহ এবং মনের আচরণে এ বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। তাই সরমা যখন সুকুমারীর নিকট ঘিণ্টুকে স্থাপন করিল তখন সমস্ত দিন ধরিয়া সুকুমারী যে সঙ্কল্পকে বুদ্ধি, বিবেচনা এবং অভিমানের সাহায্যে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহা নিমেষের মধ্যে কোথা দিয়া অপসৃত হইল তাহা সে বুঝিতেও পারিল না, বুঝিবার চেষ্টাও করিল না। অপমানে এবং অভিমানে তাহার যে-বক্ষ অবিশ্রান্ত ক্ষুব্ধ হইতেছিল সেই বক্ষেরই উপর সে ঘিণ্টুকে চাপিয়া ধরিল!

"সরো!"

"কি দিদি?"

"মা ত' আমি নই; কিন্তু মাসীর অধিকারও আমার নেই কি?"

ব্যগ্রস্বরে সরমা বলিল, "এ কথা কেন বলছ দিদি? মা আর মাসী কি ভিন্ন?"

"তাই যদি হয় তা হলে এবার দিনকতকের জন্য ঘিণ্টুকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে কাশী চল্। ছেলেটা দিন দিন কি হয়ে যাচ্ছে তা চোখ চেয়ে একবারো দেখেছিস কি? শুধু মাস দুই তিনের জন্য চেয়ে নিয়ে যাওয়া—কলকাতা ফেরবার পথে ভাগলপুরে তোদের নামিয়ে দিয়ে যাব। মাসীর এইটুকু অধিকার,—এতেও কি রমাপদ আপত্তি করবে?"

যে বৃহৎ প্রার্থনা সুকুমারীর নামঞ্জুর হইয়াছে তাহার তুলনায় এ প্রার্থনা এতই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল যে সরমা অকুতোভয়ে জানাইল রমাপদ কখনো ইহাতে আপত্তি করিবে না। এত বড় বিবাদ এরূপ সহজ সন্ধির দ্বারা মিটিয়াছে দেখিয়া রমাপদও তাহারই মত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিবে এই বিশ্বাসে সে রমাপদর মতামতের জন্য অপেক্ষা করা অনাবশ্যক মনে করিয়া উভয়ের হইয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দিল। বলিল, "যে কারণে তিনি ও-কথায় রাজী হন নি, সেই কারণেই এ-কথায় রাজী হবেন। ঘিণ্টুকে তিনি আমার চেয়েও বেশী ভালবাসেন; ঘিণ্টুর যাতে ভাল হবে তা'তে তিনি কখনো অমত করবেন না।"

সুকুমারীর মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। একবার মনে করিল বলে 'তা'ত দেখতেই পেলাম! এত ভালবাসেন যে এত বড় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে ছেলেটাকে চিরকালের জন্য দারিদ্র্যের মধ্যে বেঁধে রেখে দিলেন!' কিন্তু এ বিষয়ে আর অনাবশ্যক আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি না হওয়ায় চুপ করিয়া রহিল।

রাত্রে সরমা রমাপদকে কথাটা জানাইল। কিন্তু সে যাহা প্রত্যাশা করিয়াছিল তাহার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না—হর্ষের কোনো অভিব্যক্তি রমাপদর দিক হইতে প্রকাশ পাইল না। এমনই সে স্তব্ধ হইয়া রহিল যে স্বস্তিতে 'নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেছে', কি অস্বস্তিতে 'নিঃশ্বাস ফেলিয়া মরিতেছে' তাহা একই মাত্রায় দুর্বোধ্য হইয়া রহিল।

উৎকণ্ঠিত হইয়া সরমা জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছ?"

"কিছুই বলছি নে।"

"কেন, এতেও তোমার মত নেই না কি?"

"না, এতেও আমার মত নেই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি আমার মত নিয়ে লড়াই করব না, তোমার ইচ্ছা হয় তোমরা যেতে পার।"

বিস্ময়-বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে সরমা বলিল, "এতেও মত নেই? কেন, এতে মত না থাকবার কারণ কি?"

কিছু পূর্ব্বে যাহারা জমীদারী বেদখল করিতে আসিয়াছিল তাহাদিগকে জমীদারী ইজারা দিতে প্রবৃত্তি হয় না এমনই একটা কোনো কথা বলিতে রমাপদর ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু সে কথা না বলিয়া সে বলিল, "এসব মনের ভিতরের কথা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া করতে নেই। এ বিষয়ে আমার মত নেই এইটুকু জেনেই আমাকে অব্যাহতি দিলে কথাটা সংক্ষেপে শেষ হয়।"

কিন্তু সরমা কথা সংক্ষেপ হইতে দিল না; অগত্যা রমাপদকে অনেক কথাই বলিতে হইল। প্রবৃত্তি, আত্মমর্য্যাদা, অবস্থা অতিক্রম করিয়া জীবন যাপনের অসমীচীনতা—সব দিক দিয়াই সে নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হইল না। বহুক্ষণ ধরিয়া বাদ-প্রতিবাদের পর সরমা বলিল, "তুমি এত দিক দেখ্‌ছ, কিন্তু খোকার দিক আর দিদির দিক দিয়ে কথাটা একেবারেই দেখছ না।"

রমাপদ বলিল, "বেশ ত', সে দুটো দিক যদি তোমার নজরে পড়ে থাকে তুমি সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই কাজ কর। কিন্তু দেখো, দিদিকে পুত্র-সাধ ভিক্ষা দিতে গিয়ে শেষকালে না অশোক বনে বাস করতে হয়!"

রমাপদর পরিহাস-বচনের কোনো উত্তর না দিয়া সরমা বলিল, "দেখ, যে অবস্থায় দিদিকে আমি মত দিয়েছি তাতে এখন আর কথা ওল্টানো যায় না। ছোট-বড় তাঁর সব রকম উপরোধেই যদি আমরা অমত করি তা হলে আমাদের অমতের কোনো মানে থাকে না।"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রমাপদ বলিল, "তা হলে আমার অমত তোমার দিদিকে জানিয়ো না। সব বিষয়েই যে আমার মত নিতে হবে আর আমার মতানুযায়ী কাজ করতে হবে তা'রো ত' কোনো মানে নেই?"

"কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোমার অমতে কোনো কাজ আমি করেছি কি? বিয়ের দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত—একদিনো?"

রমাপদ ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "যতদূর মনে পড়ছে একদিনো না।"

"তবে ?"

সরমার মুখের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রমাপদ বলিল, "তবে কি ?"

সরমার দুই চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল; বলিল, "তবে তুমি আজ আমাকে তোমার মতের বিরুদ্ধে কাজ করতে বাধ্য করছ কেন ?"

সবিস্ময়ে রমাপদ বলিল, "আমি বাধ্য করছি ? কেন, তুমি আমাকে তা হলে এ ব্যাপারে কি করতে বল ?"

কিরূপে বাধ্য করিতেছে সে কথার কোনো প্রকার বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত না হইয়া সরমা একেবারে রমপদর শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুবিধাজনক বিবেচনা করিল। হাস্য-অশ্রুর দুই ফলা অস্ত্র মুখের উপর ধারণ করিয়া সে বলিল, "তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো। খোকা একটু সামলে উঠলে যেদিন তুমি আমাদের নিয়ে আসতে চাইবে সেই দিনই চলে আসব।" সমিনতি সোৎসুক নেত্রে সরমা রমাপদর প্রতি চাহিয়া রহিল।

রমাপদ কিন্তু এ কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "সরমা, এ পর্য্যন্ত বরাবর ধারণা ছিল যে সুবুদ্ধি ভগবান আমার চেয়ে তোমাকেই বেশী দিয়েছেন; কিন্তু সে ধারণা তুমি আজকে বদলে দিতে চাও না কি ? আমার মতের বিরুদ্ধে তোমাকে কাজ করতে বাধ্য করা যদি আমার পক্ষে অনুচিত হয়, তা'হলে আমার মতের বিরুদ্ধে আমাকে কাজ করতে বাধ্য করা তোমার পক্ষেই উচিত হবে কি ? তা ছাড়া মতটা এমন কোনো জিনিস নয় যে টাকাকড়ির মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেওয়া যেতে পারে। অনিচ্ছার মত সোনার পাথর-বাটির মতো একটা অবাস্তব জিনিস।"

সরমা কিন্তু এ ভৎ সনায় নিরস্ত না হইয়া সেই অবাস্তব জিনিসেরই জন্য কিছুক্ষণ ধরিয়া পীড়াপীড়ি করিল; অবশেষে শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হইয়া সহসা তাহার মনে পড়িয়া গেল কিছুদিন পূর্ব্বে কথকের মুখে শুনা জাম্ববতীর উপাখ্যান এবং গৃহে ফিরিবার পথে তাহার সঙ্গিনীর তদ্বিষয়ে মন্তব্যের কথা। তখন ক্রমশঃ তাহার মনের মধ্যে এই ধারণা নিঃসংশয় হইয়া উঠিল যে কাশী যাওয়ার এই প্রস্তাব, যাহার ভিতর তাহার পুত্রের মঙ্গল-সম্ভাবনা নিহিত আছে, অত্যন্ত সমীচীন; এবং তদ্বিরুদ্ধে রমাপদর যে আপত্তি তাহা অন্যায়। সে তখন আপনাকে জাম্ববতীর স্থলাভিষিক্ত কল্পনা করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "খোকাকে বাঁচাবার জন্যে তোমার অনুমতি না পেয়েও আমাকে যে কাশী যেতে হচ্ছে—সে অপরাধের জন্য আমি কিন্তু দায়ী নই।"

সরমার কথা শুনিয়া রমাপদ হাসিতে লাগিল; বলিল, "কে বলছে তুমি দায়ী ? এর জন্যে কেউ যদি দায়ী হয় ত' তোমার মধ্যে মার প্রকৃতি যিনি তৈরী ক'রেছেন তিনি দায়ী। যে-সব ইতর প্রাণী সন্তান জন্মালে সন্তান খেয়ে ফেলে তাদের হাত থেকে সন্তান রক্ষা করবার জন্যে স্ত্রী-প্রাণী পুরুষ-প্রাণীকে মেরে পর্য্যন্ত ফেলে এ তুমি শোন নি সরমা ? মাকড়সা মৌমাছি এদের কথা জানো না ?"

এ কথার আধখানা একদিন রমাপদর মুখেই সরমা শুনিয়াছিল। আজ তাহাদের নিজ প্রসঙ্গে এমন বিকটভাবে কথাটা শুনিয়া একটা অনির্দেয় আতঙ্কে সে মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। রমাপদর কথার কোনো উত্তর না দিয়া সে চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া রমাপদ বলিল, "আর কোনো কথা আছে কি ?"

মৃদুস্বরে সরমা বলিল, "না, আর কোনো কথা নেই, তুমি ঘুমোও।"

রমাপদকে ঘুমাইতে বলিয়া সরমা কিন্তু বিনিদ্র-চক্ষে ঘিণ্টুর পার্শ্বে নিঃশব্দে শুইয়া রহিল। ঘিণ্টুর অপর পার্শ্বে শয়ন করিয়া রমাপদ ক্রমশঃ ঘুমাইয়া পড়িল কি জাগিয়া রহিল তাহা সে বুঝিতে পারিল না। সে স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিল পূর্ব্বকার কথা—যখন দারিদ্র্যের পেষণে তাহারা নিষ্পেষিত হইত অথচ ঘিণ্টু জন্মায় নাই। দুঃখ তখনকার দিনে কত সরল ছিল—কত সহজে অকাতর ভোগের দ্বারা তাহার শেষ হইত। যত জটিলতার সূত্রপাত হইল ঘিণ্টুর জন্ম হইতে—যখন একান্ত-গত হৃদয়ের মধ্যে বিভাগ-রেখা প্রথম দেখা দিল। কিন্তু সে কি সত্যই বিভাগ-রেখা ? তার কি কোনো নির্দ্দিষ্ট অপরিবর্ত্তনীয় স্থান আছে—সে কি কোনো দিক দিয়া কোনো প্রকারে সীমাবদ্ধ ? তদ্গত-চিত্তে ভাবিয়া দেখিয়া সরমা মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'কোথাও না! কোথাও না!' অথচ উভয় দিক হইতে এমন একটা জঘন্য বিবাদের কোলাহল উঠিয়াছে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রাচীর পড়িবার উপক্রম হইলে দুই দিক হইতে যেমন উঠে!

মিশন স্কুলের ঘড়ীতে বারোটা বাজিয়া গেল—একটা বাজিয়া গেল—ক্রমশঃ তুইটা বাজিয়া গেল। সরমা মনে-মনে বলিতে লাগিল, 'কিছুই বুঝলে না আমাকে। আমি ত' মিণ্টুকে দিদির হাতে সঁপে দিয়ে সব অনর্থের শেষ করতে এক রকম রাজী হয়েছিলাম। তুমিই পারলে না—অথচ কথায়-কথায় পোকা-মাকড় ইতর-প্রাণীর সঙ্গে আমার তুলনা করচ! উঃ! এর চেয়ে যদি মিণ্টুটা না জন্মাত ত' ভাল ছিল! দিদিও ধন্য! এই যন্ত্রণার জন্যে প্রাণ বার করছে!" পাশ ফিরিয়া সরমা তাঁহার নিদ্রিত পুত্রকে বাহু দ্বারা বেষ্টিত করিয়া ধরিল।

"সরমা!"

সরমা চমকিয়া পুত্রের দেহ হইতে হাত তুলিয়া লইয়া বলিল, "তুমি এখনো জেগে আছ?"

"তুমিও ত' জেগে রয়েছ। কেন—ঘুম হচ্ছে না?"

"না। তোমারো হচ্ছে না?"

"ভাল হচ্ছে না।"

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া থাকিবার পর সরমা বলিল, "শুনছ?"

"কি?"

"তুমি যে মাকড়সা আর মৌমাছির সঙ্গে আমার তুলনা করছিলে, আমি কিন্তু তা নই!"

মিণ্টুকে অতিক্রম করিয়া রমাপদর একখানা হাত সরমার মাথার উপর আসিয়া পড়িল। "না, তুমি তা নও সে-কথা আমি জানি। রাত অনেক হয়েছে, এখন ঘুমোও।"

নিজের দুই হস্তের মধ্যে রমাপদর হাত-খানা চাপিয়া ধরিয়া সরমা বলিল, "কাল একবার শরতবাবুকে ডেকে খোকাকে দেখাও না? তিনি যদি ভরসা দেন যে জ্বরটা এখানেই ক্রমশঃ ভাল হয়ে যাবে তা হলে আমরা আর কাশী যাইনে।"

"কিন্তু তোমার দিদি?"

নীরবে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সরমা কহিল, "দিদি ত' খোকারই জন্যে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, সে তখন আমি তাঁকে বুঝিয়ে দোব।"

পরদিন সকাল হইতে কিন্তু কথাটা শরতবাবুর মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ক্রমশঃ কাশী যাওয়ার দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন কি তৎপরদিন সন্ধ্যার গাড়ীতে যাওয়া হইবে তাহা পর্য্যন্ত স্থির হইয়া আসিল।

ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া সরমা বলিল, "এত শীঘ্র কেন দিদি?"

সুকুমারী বলিল, "মিছিমিছি দেরী করেই বা কি হবে?" মনে-মনে বলিল, 'শুভস্য শীঘ্রং।'

ভাগলপুরে থাকিতে শরতবাবু পরামর্শ দিলে কাশী যাওয়ার এ কথা একেবারে বন্ধ করিবার সুযোগ হইবে, এই ভরসায় সরমা সুকুমারীর কথায় উপস্থিত আর বিশেষ কিছু আপত্তি করিল না। কোন্ দিকে তরী বাহিলে তাহার পক্ষে শুভ তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া সে ঘটনার স্রোতে নিজেকে ফেলিয়া ফলাফলের প্রতীক্ষায় থাকিতে মনস্থ করিল।

সরমার মনের দুঃখ এবং দ্বন্দ্ব বুঝিতে পারিয়া সুকুমারী বলিল, "রমাপদকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে আর একবার ভাল করে চেষ্টা কর না সরো?—করবি?"

মাথা নাড়িয়া সরমা বলিল, "আমি বললে কোনো ফল হবে না দিদি; তোমরা দুজনে বরং একবার বলে দেখো।"

কিন্তু তাহাতেও কোনো ফল হইল না,—সুকুমারীর সমস্ত অনুরোধ উপরোধ রমাপদ সহজ সহাস্যমুখে কাটাইয়া দিল।

বিমর্ষ-মুখে সুকুমারী বলিল, "তুমি সঙ্গে গেলে ওদের দিনকতক থাকা হত! এতে শীঘ্রই চলে আসতে হবে।"

রমাপদ হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, "ঠিক উল্টো! আমি সঙ্গে থাকলে নিয়ে আসবার একজন লোক থাকবে। আমি না গেলে পাঠানো না পাঠানো আপনাদের ইচ্ছাধীন থাকবে। অথচ নিয়ে আসবার জন্যে আমার দিক থেকে কোনো তাগিদ থাকবে না—এ নিশ্চয় জানবেন।"

নরেশ বলিল, "ভায়া, তুমি আর এক দিকের কথাটা যে একেবারে ভুলে থাকছ। ধনু থেকে তীরকে যত বেশী পিছনে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, তার সামনে ফিরে আসবার ঝোঁক তত বেশী বেড়ে ওঠে, সে হিসেব ত তুমি করছ না। দু-দিন পরে ভাগলপুরে ফেরবার জন্যে সরমা যখন জেদ ধরবে, তখন নিয়ে আসবার জন্যে তুমি সঙ্গে নেই, এ আপত্তি কোনো কাজে লাগবে না।"

মনে-মনে রমাপদ বলিল, 'সে ভয় বড় নেই—তীর এখন ছিলে-ছাড়া হয়ে আছে।' প্রকাশ্যে বলিল, "তখন যদি আমার সাহায্যের দরকার হয় আমাকে জানাবেন, আমি সে সঙ্কটও কাটিয়ে দোবো।"

(ক্রমশঃ)

পুস্তক-পরিচয়

সপ্তগোস্বামী।—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র-সঙ্কলিত, মূল্য দুই টাকা। এখানি গ্রন্থকারের 'ভক্ত-প্রসঙ্গ' গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীলোকনাথ গোস্বামী এবং শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ, এই সপ্ত-গোস্বামীর পবিত্র জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব-সাহিত্য আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা এই সপ্ত-গোস্বামীর অবদান বিশেষ ভাবেই অবগত আছেন। সেকালের বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এই মহাত্মাদিগের পরিচয়ও আছে। কিন্তু, সেগুলি সাধারণ লোকে সংগ্রহ করিয়া পড়িবার সুযোগ ও সুবিধা পায় না। এই কথা ভাবিয়াই ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র তাঁহার অতুলনীয় ভাষায় এই জীবন-বৃত্ত বিবৃত করিয়াছেন। তিনি নিজে স্বীকার না করিলেও আমরা জানি তিনি এই কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ঐতিহাসিক সতীশ-চন্দ্রের অন্তরের অন্তঃপুরে যে ভাব-লহরী, যে রস-মাধুর্য্য দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতেছিল, ইহা তাহারই বহিঃপ্রকাশ। গ্রন্থখানি সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি অমূল্যরত্ন। ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় গ্রন্থকারের প্রেম ও ভক্তি প্রবাহিত হইয়াছে। আমরা এই সুন্দর, সুলিখিত গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

সেবিকা।—শ্রীরজনীকান্ত মজুমদার প্রণীত, মূল্য দুই টাকা। এখানিকে গ্রন্থকার গার্হস্থ্য শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস নামে অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহাকে চিকিৎসা-বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়াই পরিচিত করিতে চাই। রজনীবাবু যে একজন সুচিকিৎসক এবং স্ত্রীলোকের চিকিৎসা সম্বন্ধে যে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, তাহা এই 'সেবিকা' পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। গ্রন্থকার সুকৌশলে গল্পচ্ছলে সেবিকার প্রত্যেক কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। এরূপ সুন্দর, এমন প্রয়োজনীয় পুস্তকখানি বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে ঘরে থাকা উচিত।

জীবন।—শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ প্রণীত, মূল্য এক টাকা। এখানি ছোট কাব্য। কবি, এই ছোট কাব্যখানিকে চারিটী পর্ব্বে বিভক্ত করিয়াছেন—প্রভাত, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, ও সন্ধ্যা। এই চারিটী পর্ব্বে তিনি যে কবি-প্রতিভা, যে ধ্যানশীলতা, যে আধ্যাত্মিক ভাব-প্রবণতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই আমাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, পড়িতে পড়িতে অনেক স্থানে মনে হয় যেন ওমার খৈয়াম পড়িতেছি। গ্রন্থকার কবিরাজ; তাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের ভূমিকা লিখিতে বসিয়া মনস্বী হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—"এই 'জীবন' কাব্য পাঠ করে মনে হয়, উদূখল মুষলের মধ্যে থেকেও কবিরাজ মহাশয়ের কবিতা-রস গুলঞ্চ গুবাক্ ভেদ করে উৎসারিত হয়েছে।"

গীতা।—শ্রীব্যোমব্রহ্ম গীতাধ্যায়ী-ব্যাখ্যাত; মূল্য এক টাকা চারি আনা। এই গীতাখানি শ্রীধর স্বামী ও তুরীয়স্বামীর টীকার সারাংশ গ্রহণে অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বিস্তৃত ভূমিকায় অনেক সার সত্যের আলোচনা আছে। বাজারে এখন গীতার ছড়াছড়ি। তাহা হইলেও এইখানি যে তাহাদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করিবে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কামন্দকীয়-নীতিসার। শ্রীগণপতি সরকার কৃত অনুবাদ; মূল্য একটাকা মাত্র। সংস্কৃত-ভাষায় এক্ষণে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতিসার ও কামন্দকীয় নীতিসার এই তিনখানি শ্রেষ্ঠ নীতিগ্রন্থ দেখিতে পাই। তাহার মধ্যে কামন্দকীয় নীতিসার অল্পের মধ্যে বেশ উপযোগী। যাঁহারা এই কৌটিল্যের নীতিশাস্ত্র বুঝিতে চাহেন, তাঁহাদের এই নীতি সারখানি অগ্রে পাঠ করা দরকার। শ্রীযুক্ত সরকার মহাশয় সুপণ্ডিত ও সুলেখক। তাঁহার এই অনুবাদ প্রাঞ্জল হইয়াছে। এই বইখানি পাঠ করিলে শুক্রনীতি ও চাণক্যনীতি সহজেই আয়ত্ত হইবে। যাঁহারা ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকেন, এই পুস্তকখানি তাঁহাদের অবশ্য পাঠ্য।

সত্যের সন্ধান।—শ্রীযোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রণীত; মূল্য এক টাকা। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারই কয়েকটী একত্রবদ্ধ করিয়া এই 'সত্যের সন্ধান' বইখানি ছাপাইয়াছেন। লেখক যে সত্যানুসন্ধিৎসু, তাহা তাঁহার যে-কোন একটী প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বিনা আড়ম্বরে, অতি সরলভাবে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন; সেই জন্য তাঁহার এই প্রবন্ধ কয়টী আমাদের ভাল লাগিয়াছে এবং যিনি একটু মন দিয়া এই প্রবন্ধগুলি পড়িবেন, তাঁহারই ভাল লাগিবে।

মণিমুক্তা।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় এম-এ প্রণীত; মূল্য আট আনা। এখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত, সচিত্র বই। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুর ছেলেমেয়েদের লইয়াই কারবার, তিনি শিক্ষক। তাই তাঁহার এই বইখানি ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা যা চায়, তাহাই এই বই খানিতে আছে—প্রচুর আনন্দ, এবং লেখকের রচনা-গুণে সে আনন্দ পরম উপভোগ্য হইয়াছে।

কেদার-বদরীর পথে।—শ্রীবীরেশচন্দ্র দাস বি-এল্ প্রণীত; মূল্য দেড় টাকা। গ্রন্থকার কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম তীর্থে গমন করিয়াছিলেন; তাহারই বর্ণনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পথের কথা বেশ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কেদার ও বদরীর ইতিহাসও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ, মানচিত্রখানি দেওয়াতে পথের সন্ধান ভাল পাওয়া যাইবে। এই শ্রেণীর ভ্রমণ-কাহিনী যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। এই বইখানির বর্ণনা-ভঙ্গী বেশ মনোরম।

কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা।—শ্রীবিধুভূষণ সরকার প্রণীত; মূল্য দশ আনা। মহাভারতে দ্রোণ ও দ্রুপদের যে কলহকাহিনী

আছে, সেই উপাদানই এই নাটকখানির আখ্যায়িকা। সেই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত বিধুবাবু যে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাহা সুখ-পাঠ্য হইয়াছে এবং শুনিয়াছি বেলেঘাটা লাইব্রেরীর কোন এক বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে এই নাটকখানির অভিনয় দর্শনে অনেকেই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। নাটকখানি যে ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে নাট্য-কারের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দুলালী।—শ্রীরামেন্দু দত্ত প্রণীত, দাম এক টাকা। এখনি ছোট গল্পের সংগ্রহ ; প্রথম গল্পের নামানুসারে বইখানির নামকরণ হইয়াছে। লেখক মহাশয় বিভিন্ন সাময়িক পত্রে যে সকল ছোট গল্প লিখিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটী এবং দুই একটী নূতন গল্প দিয়া এই পুস্তক খানি ছাপাইয়াছেন। গল্পগুলি ছোট, অনাবশ্যক বাগাড়ম্বর করিয়া গল্পের কলেবর স্ফীত করিবার চেষ্টা লেখক করেন নাই। তাহারই জন্য গল্পগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখার ধরণও সুন্দর।

সরল যোগসাধন।—শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত ; মূল্য দুই টাকা চারি আনা। ব্রহ্মচারী মহাশয় যোগ সাধন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রবন্ধ 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় লিখিয়াছিলেন। সেইগুলির সহিত আরও অনেক বিষয় যোগ করিয়া এই পুস্তকখানি ছাপাইয়াছেন। ইহাতে যোগ সাধন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহারা যোগসাধন করিতে চান বা যোগসাধন সম্বন্ধে কিছু অবগত হইতে চান, তাঁহারা এই পুস্তকখানি হইতে বিশেষ সহায়তা লাভ করিবেন।

অভিশপ্ত-সাধনা।—শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত ; মূল্য তিন টাকা। এই সুবৃহৎ উপন্যাসখানি যখন ধারাবাহিক ভাবে 'বাশরী' পত্রে প্রকাশিত হইতেছিল, তখনই আমরা ইহা পাঠ করিয়াছি। এই উপন্যাস-খানির প্রধান চরিত্র রাবেয়া ; তিনি বাঙ্গালী নন, হিন্দুস্থানের বাহিরের মুসলমান মহিলা। তাঁহারই অভিশপ্ত সাধনার বিস্তৃত বিবরণ এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে দুইটী বাঙ্গালী চরিত্রও আছে ; একটী অধ্যাপক সিংহ, অপরটী মিঃ চৌধুরী। কোষ্ঠীগণনা ও ফলিত জ্যোতিষ বিষয়ে গ্রন্থকর্ত্রীর যে প্রগাঢ় জ্ঞান আছে, তাহা এই উপন্যাসের সর্ব্বত্র বিদ্যমান। বলিতে গেলে তাহার বিশ্লেষণই এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। খ্যাতনামা লেখিকা এই উপন্যাসে যে যে চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার কোনটাই অস্পষ্ট হয় নাই।

বাণিজ্যে ব্যাঙ্কের প্রভাব

শ্রীবিনয়ভূষণ মজুমদার, এম-এ

বাহিরের দিক হইতে দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতে বোঝাই যায় না ব্যাঙ্ক লাভ করে কি করিয়া। ব্যাঙ্ক টাকা গচ্ছিত রাখে, আর চাহিবামাত্রই তাহা পরিশোধ করিয়া দেয়, ইহাতে লাভ হইবার সম্ভাবনা কোথায় খুঁজিয়া পাওয়া একটু জটিল। স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit) লইয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত-ভাবে সুদে খাটান যাইতে পারে, কিন্তু Current account বা চলতি হিসাবের উপরও ব্যাঙ্ককে সুদ দিতে হয় ;—এই টাকার কি প্রকার ব্যবহার দ্বারা সুদ দিয়াও লাভ হইতে পারে তাহা এই প্রবন্ধে দেখান যাইবে। মোটামুটি প্রণালীটী এই যে, চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকারে টাকা লইয়া চাহিবামাত্র পাইবার সর্ত্তেই লাগান যাইতে পারে। ফেলিয়া রাখিলে অনর্থক সুদ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা ; আবার সমস্ত টাকা লাগাইলে যদি সময়-মত না পাওয়া যায়, ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব লইয়াই টানাটানি ;—কাজেই এই দুইয়ের মাঝামাঝি রাস্তা খুঁজিয়া লইয়া সব দিক বজায় রাখিতে হইবে।

সকল কাজেরই প্রসার কিংবা উন্নতিই স্বাভাবিক। কাজের প্রসার হইলে ব্যাঙ্ককে ক্রমেই বেশী টাকা নিয়োগ করিতে হয়। ক্রমাগতই মূলধন বাড়াইবার জন্য অংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা যায় না, কাজেই অন্য উপায়ে ব্যাঙ্কের টাকা যোগাড় করিতে হয়। সোজা কথায়, এই টাকা জোগাড়ের নাম 'ধার করা'—কিন্তু ব্যাঙ্কের বেলায় তাহার নাম হয় 'ডিপোজিট' বা জমা। ধার লইবার জন্য লোকে আসে ব্যাঙ্কে, আর ধার 'দিবার' জন্য ব্যাঙ্ক ধার লয় তাঁহাদেরই নিকটে। বাহিরের টাকা লইয়াই ব্যাঙ্ক কারবার করিয়া থাকে। অন্য ব্যবসায়ীর পক্ষে ইহা কঠিন, কিন্তু ব্যাঙ্কের নিকট ইহাই সনাতন প্রথা ও স্বাভাবিক।

অস্থায়ী জমা বা চল্‌তি হিসাব

পরিশোধ করিবার সর্ত্তভেদে জমা তিন প্রকার। ব্যবসায়ীগণের টাকা কোন্ সময়ে যে প্রয়োজন হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা নাই ; কাজেই চাহিবামাত্র পাইবার সর্ত্ত ছাড়া

অন্য কোনও সর্ত্তে তাঁহারা টাকা জমা রাখিতে পারেন না। টাকা উদ্বৃত্ত হইয়া পড়িলে অন্য কথা; কিন্তু কারবারে চল্‌তি টাকা তাঁহারা চল্‌তি হিসাবেই রাখিতে বাধ্য। এই চলতি হিসাবের নামই Current account। ব্যাঙ্ক গচ্ছিত টাকার যে কোনও অংশ বা সমস্ত চাহিবামাত্র দিতে বাধ্য থাকে। প্রয়োজন-মত আমানতকারী চেক্ (Cheque) দ্বারা এই টাকা উঠাইয়া থাকেন। জমা দিবার বা উঠাইবার কোনও বাধা নাই। দিনে যতবার ইচ্ছা জমা দিতে পারা যায়, আবার যতগুলি ইচ্ছা চেক্ কাটিয়া তাহা উঠাইতেও পারা যায়। কোনও কোনও ব্যাঙ্কের টাকার অবস্থা এত সচ্ছল, বা প্রতিপত্তি এত বেশী, যে, এই প্রকার জমার উপর সুদই দেয় না; বরং জমা বা চেকের সংখ্যা বেশী বাড়িয়া গেলে ব্যাঙ্কই কিছু লইয়া থাকে;—ইহা সব ক্ষেত্রে অন্যায়ও বলা যায় না। মনে করুন, কোনও ব্যক্তির হিসাবে দেখিতে পাওয়া গেল যে দিনের মধ্যে গড়পড়তায় ১০০০৲ টাকা জমা আসে; কিন্তু দিনের ভিতরেই সেই পরিমাণ টাকার চেক্ কাটা হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের ইহাতে কোনই লাভ নাই, কেবলমাত্র পরিশ্রম। এমন টাকা জমা পড়িয়া থাকে না, যাহা তাহারা খাটাইতে পারে অথচ জমা আর খরচের হিসাব করিতে করিতে একটী লোকের অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক অবস্থা ও হিসাব অনুসারে কিছু কিছু 'কমিশন' লইয়া থাকে; কিংবা জমা লইবার সময় এরূপ সর্ত্ত করিয়া লয় যে, হিসাবে অন্যূন ১০০।২০০৲ টাকা সর্ব্বদা রাখিতেই হইবে, নচেৎ খরচ বাবদ ব্যাঙ্ককে নির্দ্দিষ্ট হার অনুসারে কিছু দিতে হইবে। Imperial Bank ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ব্যাঙ্কই Current accountএ সুদ দিয়া থাকে। সুদের হার ডিপোজিটের উপর শতকরা বার্ষিক ২৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা। এই সুদের হিসাব হয় দুই প্রকারে। কোনও কোনও ব্যাঙ্কের নিয়ম মাসের প্রথম তারিখ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেদিন সর্ব্বাপেক্ষা কম টাকা থাকিবে তাহার উপর সেই মাসের সুদ দেওয়া;—ইহার নাম Monthly balance বা মাসিক জমার উপর সুদ। আবার কোনও কোনও ব্যাঙ্ক যেদিন যত টাকাই থাকুক একটা নির্দ্দিষ্ট টাকার বেশী থাকিলেই ডিপোজিটরকে প্রতিদিনের উদ্বৃত্ত টাকার উপর সুদ দিয়া থাকে। ইহার নাম Daily balance বা দৈনিক জমার উপর সুদ। আমানতকারীগণের দিক হইতে শেষোক্ত নিয়মই সুবিধাজনক। কাহারও হাতে হয়ত ১০০০০৲ মাত্র ৪ দিনের জন্য উদ্বৃত্ত আছে। প্রথমোক্ত নিয়মানুসারে এই টাকা রাখিলে এই ৪ দিনের জন্য কোনও সুদ পাওয়া যাইবে না;—কিন্তু Daily balanceএর হিসাবে এই ৪ দিনের জন্য ২।০ আনা সুদ পাওয়া যাইতে পারে। চেক্ দ্বারা টাকা উঠাইতে হইলে এতদিন পর্য্যন্ত প্রতি চেকের উপর গভর্ণমেণ্টকে ⁄০ আনা হিসাবে দিতে হইত, আগামী জুলাই মাস হইতে এই duty রহিত করা হইয়াছে। অতঃপর চেক্ কাটিতে হইলে আমানতকারীর কোনও খরচই নাই। আমেরিকায়ও চেকের উপর কোনও duty লওয়া হয় না;—ইহাতে অল্প সঙ্গতিসম্পন্ন আমানতকারীগণের বিশেষ সুবিধা;—আর সামান্য সামান্য ব্যাপারেও চেকের দ্বারা পরিশোধ করিতে গায়ে লাগে না বলিয়া সকলে আশা করেন ইহাতে চেকের প্রচলন বৃদ্ধি হইবে।

সেভিংস্ ব্যাঙ্ক

যাহাদের টাকার ঘন ঘন প্রয়োজন হয় না, অন্ততঃ যাহারা কিছুদিন পর পাইলেও কাজ চালাইয়া লইতে পারে, তাহাদের জন্য প্রায় প্রত্যেক ব্যাঙ্কেই "সেভিংস্ ব্যাঙ্ক" ডিপোজিট লইবার ব্যবস্থা আছে। ডাকঘরের হিসাবের মত এই হিসাবে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পর্য্যন্ত এক নামে রাখা যাইতে পারে; এবং সপ্তাহে একবার কিংবা দুইবার টাকা উঠান যাইতে পারে। Current account অপেক্ষা এই accountএর টাকা বেশী দিনের জন্য লাগান যাইতে পারে বলিয়া এই হিসাবে সুদ বেশী পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহার উপর শতকরা বার্ষিক ৩।০ হইতে ৪৲ পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। ব্যাঙ্ককে রীতিমত রসিদ দিয়া টাকা উঠাইতে হয়; কোনও কোনও ব্যাঙ্কে এই হিসাবেও 'চেকের' ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষে সেভিংস্ হিসাব খুব সুবিধাজনক; আর দেশের দিক দিয়া এই প্রকার জমা যত বৃদ্ধি পায় ততই মঙ্গলজনক। দুই বা ততোধিক ব্যক্তির নামে হিসাব খুলিয়াও এই প্রকার জমা দেওয়া যাইতে পারে এই সর্ত্তে, যে, তাঁহাদের ভিতর যে কেহ একা কিংবা কাহারও সহিত একযোগে এই টাকা উঠাইতে পারিবেন। একজনের মৃত্যু কিংবা কোনও দুর্ঘটনা হইলে অপরের পক্ষে টাকা উঠাইতে কোনও বাধা থাকে না বলিয়া অনেকে এই বন্দোবস্ত পছন্দ করিয়া থাকেন।

স্থায়ী জমা Fixed Deposit.

এই দুই প্রকার জমা ছাড়া যাঁহাদের নিকট উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে, তাঁহারা কোনও নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জমা রাখিয়া থাকেন। এই প্রকার জমার উপর নির্ভর করিয়াই ব্যাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশী সময়ের জন্য ব্যবসায়ীগণকে ধার দিয়া থাকে;—কাজেই ইহার উপর সুদও বেশী দেয়। আজকালকার বাজারে ১ বৎসরের জমার উপর শতকরা বার্ষিক ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত সুদ পাওয়া যায়। ১ মাসের অধিক ও ১ বৎসরের অনধিক যে কোনও কালের জন্য টাকা জমা দেওয়া যাইতে পারে। সেভিংস্ হিসাবের ন্যায় এই হিসাবেও দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তির নামে হিসাব ও একজন বা দুইজনকে দিবার সর্ত্ত করা যায়। অনেকের ধারণা Fixed Depositএ টাকা রাখিলে টাকা আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ধারণা অমূলক। ইচ্ছামত এই টাকা উঠাইবার দাবী থাকে না সত্য, কিন্তু স্থায়ী জমা থাকিলে কোনও ব্যাঙ্কই ঐ জমা জামিনস্বরূপ বিবেচনা করিয়া আমানতকারীর প্রয়োজন-মত টাকা দিতে কুণ্ঠিত হয় না। যে সময়ের জন্য যত টাকা এইরূপে পাওয়া যায়, সেই সময়ের জন্য তত টাকার উপর ব্যাঙ্ক বাজার বিবেচনা করিয়া সুদ লইয়া থাকে। জমার উপর সুদ চলিতেই থাকে, কাজেই ইহা বিশেষ ব্যয়সাধ্যও নহে। ব্যবসায়ীগণের Reserve Fund এই প্রকার স্থায়ী জমা কিংবা কোম্পানীর কাগজে রাখাই লাভজনক।

ব্যাঙ্কের কাজ

এই প্রকার বিভিন্ন উপায়ে টাকার সংস্থান করিয়া ব্যাঙ্ক তাহার কি ব্যবহার করে, তাহার উপরই ব্যাঙ্কের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে। সমস্ত টাকা যদি Mortgage বা জমি-জমা কিংবা বাড়ী বন্ধকের উপর লাগান হয়, তাহা হইলে সুদ বেশী আসিতে পারে সন্দেহ নাই। কিন্তু চলতি হিসাবের টাকা চাহিবামাত্র দেওয়া সুকঠিন হয়, আর স্থায়ী জমার টাকা দেয় হইলে শোধ করা অসুবিধাজনক হয়, বলিয়া মূল হারাইবার সম্ভাবনাও হইয়া থাকে। আবার যদি এই সমস্ত টাকা অপর কোনও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখা যায়, কিংবা কোম্পানির কাগজ কিনিয়া সুদে খাটান যায়, তাহা হইলে লাভ ত দূরের কথা জমা টাকার উপর সুদ দেওয়াও কঠিন হইয়া পড়ে। টাকা খাটাইতেই হইবে। কি পরিমাণ টাকা কোন্ প্রকার Investmentএ রাখা যাইতে পারে, তাহার বিচার করা ও সেই প্রকার বিলি বন্দোবস্ত করা ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণের প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ত্তৃপক্ষগণের উপদেশ মত টাকা অপরকে দিতেই হইবে, আবার সময় মত তাহা আদায় করিয়া পাওনাদারগণের কড়া গণ্ডা শোধ করিতে হইবে; এই দোটানার মধ্যে স্থির হইয়া সামঞ্জস্য রাখিয়া চলার নামই Banking। মহাজনগণ টাকা লাগাইয়া থাকে; কিন্তু বাহির হইতে জমা লয় না, আর রাখিলেও সেটা অনুগ্রহের মধ্যে; কাজেই নিজেদের টাকা যে প্রকারেই খাটান হয় না কেন, তাহাতে অন্যের কিছু আসে যায় না; কিন্তু ব্যাঙ্ককে হিসাব করিতে হয় তাহার লাভ ছাড়া পাওনাদারগণের সুবিধা ও অসুবিধা। অসাবধানে দেশেরও অমঙ্গল।

প্রত্যেক বাণিজ্য-কেন্দ্রেই টাকার অভাবের একটা নির্দ্দিষ্ট গতি আছে। এক স্থানে বৎসরের কয়েক মাস টাকার বেশী টান, অন্য সময়ে অল্প প্রয়োজন; আবার কোনও স্থানে সপ্তাহের ২।১ দিন টাকার বিশেষ প্রয়োজন পড়ে, অন্যান্য দিন হয় ত জমাই বেশী হইতে থাকে। এই প্রকার টাকার টানের গতি বা জোয়ার-ভাঁটা বুঝিয়া চলা ব্যাঙ্কের কর্ম্মকর্ত্তা বা Manager-এর প্রধান কর্ত্তব্য। কোন্ দিন কত টাকার প্রয়োজন হইবে, কখন টাকার টান হইবে, কি প্রকার ব্যবসায়ে টাকা নিয়োগ করা স্থানবিশেষে সুবিধাজনক, তাহা বুঝিয়া চলার উপরই ব্যাঙ্কের উন্নতি। এইরূপ বিচার করিয়া কোনও স্থানে Current ও Savings হিসাবের ১৮ হইতে ২৫ শতাংশ পর্য্যন্ত টাকা ব্যাঙ্ক সর্ব্বদা হাতে রাখে, অবশিষ্ট শতকরা ৮৫ হইতে ৭৫৲ টাকা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের জন্য শীঘ্র পাইবার বন্দোবস্তে দিয়া থাকে।

তিন প্রকার উপায়ে ব্যাঙ্ক টাকা লাগাইয়া সুদ উপার্জ্জন করে। প্রকার-ভেদে ইংরাজীতে এই উপার্জ্জনের নামকরণ হইয়াছে Interest, Exchange ও Discount। Exchange ও Discount সুদেরই নামান্তর মাত্র।

ব্যাঙ্কের আয়—সুদ

টাকা ধার দিলে সুদের সর্ত্ত থাকে। মাসে, ছয় মাসে, কিংবা বৎসরের শেষে দেনদারকে সুদ দিতে হয়। অপরের টাকা ব্যবহার করিলে উহা ব্যবহার করিবার মূল্যস্বরূপ যে অর্থ দেওয়া যায়, উহাকেই সুদ বলা যায়। ব্যাঙ্কের টাকা

প্রয়োজন মত ব্যবহার করিয়া ব্যবসায়ীগণ লাভ করিয়া থাকে। সেই লাভের কিয়দংশ ব্যাঙ্ক পাইয়া থাকে। কেবলমাত্র দেনদারগণের নিকট হইতেই ব্যাঙ্ক সুদ পাইয়া থাকে এরূপ নহে; প্রত্যেক ব্যাঙ্কই ক্ষমতা অনুসারে কিছু টাকার কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া রাখে। ইহাতে দুইটী উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রথমতঃ টাকা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়া থাকে না—৬ মাস অন্তর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যায়; আর দ্বিতীয়তঃ, প্রয়োজন হইলে ঐ কাগজ জামিন রাখিয়া অল্প-হারে অন্য ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পাওয়া যায়। ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য টাকা পাওয়া সহজসাধ্য করিয়া রাখা (liquidify); কাজেই কোম্পানির কাগজ তাহার নিকট অতি মূল্যবান সম্পত্তি। প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য জমা টাকার অন্ততঃ শতকরা ২৫ কোম্পানীর কাগজ রাখা।

সুদের হার

ব্যবসায়ীগণকে বাণিজ্য-পরিচালনের জন্য যে অর্থ দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার সুদের হার স্থান ও ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে এক হইতে পারে না। যেখানে চল্‌তি হার কম, সেখানে বেশী হার আশা করিলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যবসায়ী ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত কারবার স্থাপনের আশা করা যাইতে পারে না। এই বাঙ্গলাদেশেই আবার এমন স্থান আছে, যেখানে মূল্যবান সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়াও শতকরা বার্ষিক ১৮৲ টাকা হইতে ২৪৲ টাকার কম হারে টাকা পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে ব্যাঙ্ক ১২৲ টাকা হারে টাকা দিলে তাহা সস্তাই বলা যাইতে পারে। ব্যক্তি, ব্যবসা ও বাজারের অবস্থা দ্বারা সুদের হার নির্দ্ধারিত হয়।

(১) বাজারে উদ্বৃত্ত অর্থ ও তাহার অভাবের উপর সুদের হার প্রধানতঃ স্থির হয়। যখন ব্যবসার গতি মন্দ হয়, টিকিয়া থাকিবার অভিপ্রায়ে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য টাকার অভাব বৃদ্ধি পায়; আবার ব্যবসার গতিক মন্দ দেখিয়া বিত্তশালী ব্যক্তিগণ তাহাদের অর্থ অন্য স্থানে খাটাইবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। টাকা কম পড়িয়া যাওয়াতে সে স্থানের লোকদিগকে বেশী হারে টাকা ধার করিতে হয়। বাজার গরম হইলেও অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ীর আগমন ও প্রয়োজন বশতঃ এইরূপ অবস্থা হইতে পারে।

(২) লোকের কার্য্যক্ষমতায় সাধারণ বিশ্বাসের উপরও সুদের হার নির্ভর করে। যখন সাধারণ ব্যবসায়ে অবস্থা ভাল, সকলেই আশা করে সামান্য পরিশ্রম ও য[ত্ন] দ্বারাই লোক লাভবান হইবে, তখন মহাজনগণও ধা[র] দিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেই অবস্থায় বাজারে টাকা ধা[র] লইতে হইলে বেশী সুদ দিবারও প্রয়োজন হয় না।

(৩) স্থানীয় ব্যবসার জোর থাকুক বা না থাকুক, যদি কোনও কারণে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ কিংবা উদ্বৃত্ত অর্থ কম পড়িয়া যায়, তাহা হইলে সুদের হার বেশী হইতে পারে। ভারত-সরকার যখন কোনও কারণে বিলাতে বেশী টাকা পাঠাইয়া দেন, তখন নূতন টাকা কিংবা নোট তাহার পরিবর্ত্তে প্রস্তুত না হইলে টাকার স্বল্পতাবশতঃ সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে।

(৪) কোনও বিশেষ ব্যবসায়ে লাভ বেশী হইলে ব্যাঙ্ক স্বভাবতঃ সেই ব্যবসায়ের জন্য টাকা দিয়া একটু বেশী আদায় করিতে চায়; তবে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাকে সাবধান হইতে হয়।

(৫) জামিন বা Securityর তারতম্য ও দেনদার-গণের ব্যক্তিগত পসার কিংবা যশঃ অপযশের উপরেও সুদের তারতম্য হয়। যে ক্ষেত্রে সব টাকা মারা যাইবার সম্ভাবনা নাই, অথচ শতকরা ১০—২০ টাকা হারাইবার ভয় থাকে, সেখানে এই ক্ষতি পূরণ করিবার মত টাকা লাভ করিবার জন্য হার বৃদ্ধি করিতেই হইবে।

ছয় মাসের বেশী সময়ের জন্য টাকা ধার দিতে Commercial Bank মাত্রই কুণ্ঠিত হয়; তবে Mortgage কিংবা নূতন ব্যবসায়ে টাকা নিয়োগ করিলে ৬ মাসের ভিতর টাকা পাইবার সম্ভাবনা খুব কম; কাজেই অধিকাংশ টাকা এই প্রকার সুদে না খাটাইয়া ব্যাঙ্ক অন্য প্রকারে নিয়োগ করিয়া থাকে।

Exchange—বাট্টা

এই প্রকার অল্প সময়ের জন্য টাকা নিয়োগ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় অন্য স্থানের উপর চেক্, হুণ্ডি ও বিল ভাঙ্গান। এই সমস্ত কাগজে টাকা চাহিবামাত্র দিবার অঙ্গীকার কিংবা বরাত (order) থাকে। আর সাধারণতঃ সুনাম-বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণের হুণ্ডি প্রভৃতি ৭ দিনের মধ্যেই আদায় হইয়া যায়। শতকরা ।০ আনা হিসাবে বাট্টা লইলেই

ইহাতে শতকরা ১৪ হারে সুদে টাকা লাগাইবার কাজ হয়। কলিকাতায় কোনও ব্যবসায়ী মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাইয়ের কোনও ব্যবসায়ীকে মাল বিক্রয় করিল। ক্রেতার প্রতিনিধির পক্ষে টাকার থলি সঙ্গে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান সম্ভবপর নহে, সুতরাং মাল বুঝিয়া পাইয়া, টাকার পরিবর্ত্তে সে তাহার মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাইয়ের গদির উপর মূল্য দিবার বরাত বা হুকুম লিখিয়া দিল। বিক্রেতার টাকার দরকার, সৎ বলিয়া তাহার সুনামও আছে। সে তখন ঐ কাগজখানি লইয়া তাহার Bankএ গেল। ব্যাঙ্ক তাহার অবস্থা, পসার প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া বাট্টা কাটিয়া রাখিয়া এই টাকা দিল। ক্রেতার লাভ, তাহাকে নগদ টাকা দিতে হইল না, বিক্রেতাকেও টাকার জন্য বসিয়া থাকিতে হইল না; ব্যাঙ্ক ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে আসিয়া উভয়েরই অভাব মিটাইয়া দিল। তার পর সেই হুণ্ডিখানি মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাইয়ে পাঠাইয়া ব্যাঙ্ক টাকা আদায় করিয়া লইবে। কিন্তু পাঠাইয়া আদায় করিতে অন্ততঃ ৪ দিন লাগিবে, আবার কোনও বন্দোবস্ত করিয়া সেই টাকা কলিকাতায় আনিতেও ৩ দিন সময় যাইবে;—এই ৭ দিন টাকাগুলি বিক্রেতার সাহায্যার্থ আবদ্ধ রাখিতে হইবে—ইহার মূল্যের নামই বাট্টা।

অপ্রত্যক্ষভাবে ব্যাঙ্ক মণি-অর্ডার ইনসিওরেন্স ও ভিঃ পির কাজ বা বিল আদায়ও করিয়া থাকে; কিন্তু ডাকঘর অপেক্ষা অনেক কম খরচে। টাকা পাঠাইতে হইলে যতদিন না পৌঁছায় ততদিন ডাকঘরে আটক থাকে; বিশেষ প্রয়োজনেও তাহার পুনর্ব্যবহার চলে না; কিন্তু ব্যাঙ্ক হইতে পাঠাইলে যে Draft বা বরাত পাওয়া যায়, ইচ্ছামত তাহার বিক্রয় ও হস্তান্তর করা চলে। আর বেশী টাকা পাঠাইতে ডাকঘরের সাহায্য লইলে লোকসানই হয়। মনে করুন ১০,০০০৲ টাকা লাহোর পাঠাইতে হইবে। মণি-অর্ডার করিতে গেলে অন্যূন ১৭ অংশে করিতে হইবে;—খরচ পড়িবে ১০০৲ টাকা; ইনসিওর করিলে ৫ খানি করিতে হইবে; খরচ হইবে ১৪৲; আর ডাকঘরের গালামোহর প্রভৃতি পরীক্ষা করাইতে লাগিবে এক ঘণ্টা। ব্যাঙ্কে জমা দিলে Draft কিংবা টেলিগ্রাম দ্বারা এই টাকা লাহোরে পাঠান যাইবে ৬।০ টাকায়। আবার মনে করুন, কানপুর হইতে ২০,০০০৲ টাকার ময়দা আসিল কলিকাতায়। বিক্রেতা গাড়ী পাঠাইয়াই রসিদ পাঠাইবে ক্রেতার নিকট, গাড়ী ছাড় করাইবার জন্য; কিন্তু তাহার ইচ্ছা ক্রেতা টাকা দিয়া মাল লইবে, কিংবা ২।১ দিন লইতে দেরী করিলে উপযুক্ত সুদ দিবে। এই টাকা এই সর্ত্তে হিসাব করিয়া সুদ লইয়া পাঠাইবে কে? ডাকঘরে ইহা অচল, আর সুদ আদায় করিবার কথা ত কেহ কানেও শুনিবে না। বিক্রেতা তাহার রসিদপত্র, হুকুমনামা প্রভৃতি ব্যাঙ্কের হাতে দিলেই এই সমস্ত কাজ ৫।৬ দিনের মধ্যে অনায়াসেই সম্পন্ন হইয়া যায়;—আর প্রয়োজন ও পসার থাকিলে আদায় হইবার পূর্ব্বেও টাকা পাইতে পারে। এই সমস্ত কাজের জন্য ব্যাঙ্ক যে কমিশন লইয়া থাকে তাহাকে Exchange বলে। Exchange বলিলে দেশান্তরে টাকা প্রেরণ ও তথা হইতে আনয়নের মূল্য-নিরূপক হারও বুঝায়।

Discount

পূর্ব্ব হইতেই সুদ কাটিয়া টাকা দিবার নাম ডিস্কাউণ্ট। কানপুরের বিক্রেতার সহিত ক্রেতার এরূপ বন্দোবস্ত থাকিতে পারে যে, তাহার মাল সমস্ত কিংবা আংশিক বিক্রয় করিয়া এক কি দেড় মাসের মধ্যে সে টাকা পরিশোধ করিবে। এরূপ স্থলে বিক্রেতা কলিকাতার ক্রেতার উপর এক কি দেড় মাসের "মুদ্দতি" হুণ্ডি কাটিয়া থাকে। যথাবিধি ষ্ট্যাম্পকরা কাগজের উপর বিক্রেতা ক্রেতার উপর হুকুম লিখিয়া দেয় যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে কোনও ব্যক্তি বা ব্যাঙ্ককে তাহার বরাতমত টাকা দিবে। ব্যাঙ্ক এই কাগজ বা হুণ্ডি ক্রেতাকে দেখাইলে সে ইহা সহি করিয়া স্বীকার করিয়া লয় ও মালের রসিদ গ্রহণ করে। ইহাকে D. A. Bill বা 'স্বীকার' করিয়া রসিদ পাইবার বিল বলা যায়। প্রয়োজন হইলে বিক্রেতা তাহার পরিচিত ব্যাঙ্ক হইতে আদায় হইতে যতদিন বাকী, ততদিনের সুদ বাদ দিয়া টাকা পাইতে পারে। এই প্রকার সুদ কাটিয়া টাকা দিবার নাম Discount। সুদ অগ্রিম লওয়াতে প্রকৃত পক্ষে বেশী হার পড়ে—হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, শতকরা ১০ হিসাবে দিলে প্রকৃত পক্ষে শতকরা সাড়ে দশ পড়ে। এই Discountএর কাজ ব্যাঙ্কের নিকট বেশ পছন্দসই; কারণ (১) টাকা পাইবার নির্দ্দিষ্ট দিন জানা থাকে (২) সুদ পূর্ব্ব হইতেই পাওয়া যায় (৩) স্বীকার করার পর অন্ততঃ দুই জন ব্যক্তির জামিন থাকে

(৪) বাছাই করিয়া লইয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সংস্থান করা যায় (৫) এবং অন্য স্থানে এইগুলিকে জামিন স্বরূপ রাখিয়া টাকা পাওয়া যায়।

দেশে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইলে এই প্রকার বিলের কাজ বৃদ্ধি পায়—এই ডিস্কাউন্টের হারই দেশের বাণিজ্যের মাপকাটী বা অবস্থাজ্ঞাপক। সকল ব্যাঙ্কের অধিকাংশ টাকাই যদি এই প্রকার বিলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সময়-মত ব্যাঙ্কের পাওনাদারগণের টাকা দেওয়ার অসুবিধা হইয়া পড়ে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য Rediscounting Bank বা ব্যাঙ্কের অথবা মহাজনের বিল "ভাঙ্গাইবার" ব্যাঙ্ক থাকে। তাহারা কেবল এই একই কাজ করিয়া থাকে। সমস্ত দেশেই এই প্রকার ব্যাঙ্ক আছে, কেবল ভারতবর্ষ ছাড়া। অধুনা ভারত-সরকার এই প্রকার একটী ব্যাঙ্ক গঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার নাম হইবে Reserve Bank of India.

অন্যান্য কাজ।

অর্থসংক্রান্ত অন্যান্য অনেক কাজও ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন, কোম্পানির কাগজের সুদ আদায় করা কি কঠিন ব্যাপার। এই ঝঞ্চাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় ব্যাঙ্কে কাগজগুলি ফেলিয়া দেওয়া। যথাসময়ে সুদ আদায় হইয়া হিসাবে জমা হইয়া যাইবে। কোম্পানির ডিভিডেণ্ড বা লভ্যাংশ আদায়ও ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া জীবন-বীমা কোম্পানিকে সুদ, প্রিমিয়ম প্রভৃতি দেওয়া, আদেশমত কোনও স্থানে টাকা পাঠান, গবর্ণমেণ্টের কাগজ ও সেয়ারের ক্রয়-বিক্রয় ইহাদের হাত দিয়া করান যাইতে পারে। টাকা থাকিলে আদেশমত খরচ ও না থাকিলে ব্যবসাসংক্রান্ত কাগজ পত্রে আদায় করা ও ঋণ দেওয়াই ব্যাঙ্কের কাজ। আমেরিকার Trust Company'র অনুকরণে কোনও কোনও ব্যাঙ্ক উইলের সর্ত্ত অনুসারে Executor of Trustee নিযুক্ত হইয়া টাকার বিলি-বন্দোবস্ত করে। জমিদারগণের পক্ষ হইতে খাজনা কিংবা ভাড়া আদায়ও, বন্দোবস্ত করিলে ইহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এই সমস্ত কাজ ছাড়া দলিলপত্র সেয়ার "ইন্সিওরেন্স পলিসি" (Insurance Policy) হীরা জহরত রক্ষণাবেক্ষণও ব্যাঙ্ক করিতে পারে। অবশ্য সমস্ত কাজের জন্যই কিছু কমিশন দিতে হয়। বিনামূল্যেও একটী কাজ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওয়া যায়। ব্যবসাক্ষেত্রে ধার দেওয়া অনিবার্য্য; কিন্তু কাহাকে ধার দেওয়া যায়, বা না যায়, তাহার যথাবিধি অনুসন্ধান সব সময় হইয়া উঠে না। আবার নূতন গ্রাহক হইলে "দিই কি না দিই" একটা সমস্যার কথাও হইয়া পড়ে। এই সমস্যার সময়ও ইউরোপ, আমেরিকায় সন্ধান ও পরামর্শ লইবার স্থান ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কে একটী বিভাগই থাকে, তাহার কাজ অনুসন্ধান লওয়া। কোন ব্যবসায়ীর কি অবস্থা, কি সম্পত্তি, কি কাজ, কি প্রকার বাজারে দেনা-পাওনা, কাহার পসার কত, আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলেও ব্যবসানীতি কি প্রকার, এই সমস্ত বিষয়ে অনুসন্ধান লইয়া ও কারবারকারীগণকে প্রদান করিয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। বিনামূল্যে এই অমূল্য পরামর্শ পাওয়া সকলেরই অধিকার।

শোক-সংবাদ

পরলোকগত কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর

কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক ১৮৭৬ খ্রীঃ অঃ ১৬ই জুন রবিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লোকান্তরগত কুমার সুরেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের পুত্র এবং চিরস্মরণীয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের পৌত্র। ৺কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক বাল্যজীবনে হিন্দুস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। দান ও দয়ার অবতার লোকপূজ্য রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মার্ব্বল প্যালেসে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপুরুষের সৌরভময় যশঃকীর্ত্তি উপযুক্ত ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কোমল-স্বভাব-সম্পন্ন কুমার জ্ঞানেন্দ্র সৌন্দর্য্যগ্রাহী, জ্ঞানপ্রিয়, কলানুরাগী ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের সংগুণসমূহ তিনি

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি চিত্রবিদ্যায়ও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন; তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের অটুট পরিণতি আজিকার মার্ব্বেল প্যালেসের অমূল্য চিত্রকলার ভাণ্ডার। কুমার জ্ঞানেন্দ্রের অলৌকিক ঔদার্য্য ও দানশীলতার স্মরণার্থ ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ দিল্লীতে রাজ্যাভিষেক কালে ১৯১২ খ্রীঃ অঃ ১২ই ডিসেম্বর তাঁহাকে করোনেশন মেডেল প্রদান করিয়া গুণীর যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র তাঁহার সমাজের মণির স্বরূপ ছিলেন। দরিদ্রের পিতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়-দাতা বলিয়া পথের ভিখারী, অনাথ সকলেই তাঁহার পানে আর্ত্ত নয়নে চাহিত। কর্ম্মবীর কুমার জ্ঞানেন্দ্র কর্ম্মসাধনের জন্য উপযুক্ত সুস্থ সবল দেহ পাইয়াছিলেন। অতি অল্প লোকই তাঁহার মত নীরোগ হইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারে। শুনা যায়, তিনি আজীবন কোনওরূপ সাংঘাতিক পীড়া ভোগ করেন নাই। অন্তিমকালে তিনি যে রোগাক্রান্ত হইয়া একমাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন, তাহাই তাঁহার প্রথম ও শেষ রোগশয্যায় শয়ন। একমাত্র পুত্র শ্রীমান গোপেন্দ্র মল্লিক ও তিনটি কন্যা রাখিয়া, ৫১ বৎসর বয়সে ১৭ই এপ্রিল ১৯২৭ সালে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়গণের এই গভীর শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।
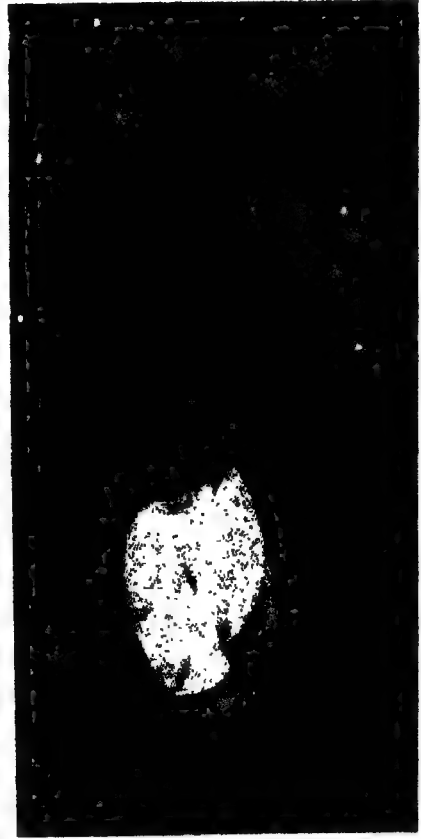
৺কুমার জ্ঞানেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর

সাময়িকী

কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতিকৃতি এই মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট সুশোভিত করিল। কবি বিহারীলাল কলিকাতা নিমতলা পল্লীতে ১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। পৌরোহিত্যই দীননাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের জীবিকা ছিল। তিনি পুত্র বিহারীলালকে ব্রাহ্মণোচিত সুশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। বিহারীলাল যথাসময়ে কলেজ হইতে বাহির হইয়া বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। কলেজে অধ্যয়ন সময়েই সতীর্থগণ বিহারীলালের 'কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পান। এই শক্তি ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে বঙ্গ-কবি-সমাজে বরণীয় আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল। 'সারদামঙ্গল' 'বঙ্গসুন্দরী' 'প্রেম-প্রবাহিণী' প্রভৃতি পুস্তক তাঁহার অসামান্য কবিত্বের নিদর্শন। তিনি বাঙ্গালা কবিতার এক নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি খ্যাতনামা বাঙ্গালী কবি বিহারীলালকে গুরুস্থানীয় মনে করেন। বিহারীলাল তাঁহার 'বঙ্গসুন্দরী'তে যে গীতধ্বনি করেন, তাহারই প্রতিধ্বনি পরবর্ত্তী কবিদিগের লেখনীমুখে বহির্গত হইয়াছিল। ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বিহারীলাল পরলোকগত হন। আমরা বিহারীলালের প্রতিকৃতি প্রকাশিত করিয়া কবিবরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।

বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইয়ুরোপে যাওয়ার পথে বোম্বাই নগরে উপস্থিত হইলে তথাকার সংবাদপত্র-প্রতিনিধিগণ অনেকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আজকাল ভারতবাসীর সম্মুখে যে সকল গুরুতর প্রশ্ন সমুপস্থিত তদ্বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে ইচ্ছুক হন। কথোপকথন প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হইয়াছিল। যতটা জানা গিয়াছে, তিনি রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক বিষয়ে বিরুদ্ধবাদ-সহিষ্ণুতা অনুমোদন করেন, এবং অস্পৃশ্যতাদি প্রথা সম্বন্ধে তীব্র বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন, প্রত্যেককেই স্বকীয় ভাবে দেশের জন্য কাজ করিতে হইবে; কিন্তু স্বার্থচিন্তা পরিহার করিয়া সেবার প্রাচীন আদর্শ উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। তাঁহার গবেষণার বাস্তব মূল্য কিছু আছে কিনা সে বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন, উত্তরে তিনি বলিয়াছেন ফ্যারাডের ন্যায় বড় বড় বিজ্ঞানবিদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কালেও ঐরূপ সন্দেহ পোষণ করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান কালে ভারতবর্ষে যে গবেষণা পরিচালিত হইতেছে তাঁহার এক প্রধান দোষ এই যে উহা কেবল স্বাধীনতাবর্জ্জিত পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুকরণের চেষ্টা মাত্র। ভারতের এবং পাশ্চাত্য দেশের অবস্থায় এত পার্থক্য যে, ভারতকে কি বিজ্ঞানক্ষেত্রে কি অপর ক্ষেত্রে নিজের প্রশ্নসমাধানপন্থা নিজেরই বাহির করিয়া লইতে হইবে, তাঁহার স্বকীয় বিজ্ঞানাগারে যন্ত্রপাতি সবই তাঁহাকে নূতন করিয়া করিতে হইয়াছে। আর একটি ত্রুটি হইতেছে সম্যক আত্মনিয়োগের অভাব, ইহা ছাড়া কোন বড় কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। স্যার জগদীশ বলিয়াছেন, তাঁহার দৃঢ় ধারণা এই যে জগতের সভ্যতার আদিস্থান ভারতবর্ষ, জগতের জ্ঞানবিকাশ সাধনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য রহিয়াছে; পাশ্চাত্য দেশ ক্রমেই ইহা স্বীকার করিতেছে।

বাঙ্গলার শিক্ষাবিভাগের ১৯২৫-২৬ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, এই বিভাগের আর্থিক অবস্থা গত কয়েক বৎসরের তুলনায় আলোচ্য বর্ষে সন্তোষজনক। কয়েকটী বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক মঞ্জুরীর টাকা অর্দ্ধলক্ষ বৃদ্ধিত করা হইয়াছে, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলোচ্যবর্ষে বিশেষ কিছু করা হয় নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংস্কার এবং সেকেণ্ডারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চালনার উন্নতি বিধান করার কথা ছিল। অর্থাভাবে তাহা হইয়া উঠে নাই। এই বৎসরে কোন শিক্ষামন্ত্রী ছিল না। কাজেই সমগ্র বৎসর এই বিভাগ গবর্ণরের শাসন-পরিষদের একজন সদস্যের কর্ত্তৃত্বাধীন ছিল। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক করার উদ্দেশ্যে একটি "এডুকেশন সেস" বসাইবার কথা উঠে। পাঁচটি কেন্দ্রে সমবেত হইয়া সরকারী প্রতিনিধি এবং বিশেষজ্ঞগণ এই বিষয় আলোচনা করেন। প্রস্তাবিত "সেস" সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচনা হইলেও সকলে তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। এই বিষয়ে ব্যাপক উপায় অবলম্বনের কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। আলোচ্যবর্ষে প্রদেশের সর্ব্বত্র পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত পাঠ্য পদ্ধতি মক্তবসমূহে প্রবর্ত্তন করা হয়। সরকারী সাহায্যকৃত হাইস্কুল সমূহের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি এবং অন্যান্য উন্নতির জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে সাধারণ মঞ্জুরীর অতিরিক্ত তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। বে-সরকারী আর্ট কলেজগুলিকে সাহায্য দেওয়ার জন্য প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ২০০০০ টাকা প্রদান করা হইয়াছে। অর্থাভাবের জন্য গত কয়েক বৎসর কাল পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষা বৃত্তি বন্ধ ছিল। এই বৎসর কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত মাত্রায় তাহা প্রদান করা হইয়াছে। ফলে অনেক শিক্ষক শিক্ষাগ্রহণের জন্য গমন করিয়াছেন। বে-সরকারী স্কুল ও কলেজসমূহে এ বৎসর একটু বর্দ্ধিত হারে ছাত্রবেতন আদায় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সরকার হইতে একটু বেশী মাত্রায় সাহায্য দান করা হইয়াছে। এই সমস্ত কারণে বর্ণিত বে-সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক অবস্থা এই বৎসর একটু ভাল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক ব্যয়ের জন্য সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এইভাবেই দেওয়া হইবে। ফলে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্থিক অনটন আর থাকিবে না। শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চার উপকারিতা ক্রমেই স্কুল কলেজের ছাত্রগণ উপলব্ধি করিতেছেন। ফলে ব্যায়াম এবং ব্রতীবালক আন্দোলনের উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ ওটেন মহোদয় শিক্ষা-বিভাগের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম প্রদত্ত হইল; কিন্তু এই রিপোর্টে তিনি আর একটী কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শিক্ষাবিভাগের কার্য্যের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি একটী পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক অধিক। ইহাদের কতকগুলিকে মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" বাঙ্গালার লোকসংখ্যা ৪৬,৬৯৫,৫৩৬, এবং তাহাদের শিক্ষার জন্য ১০৩৬টী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় অর্থাৎ গড়ে প্রায় ৪৬ হাজার লোকের জন্য একটী স্কুল আছে। এই স্কুলের অধিকাংশই বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মিঃ ওটেনের চক্ষে এই স্কুলের সংখ্যা অত্যধিক হইল। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে জনসাধারণের শ্রদ্ধা নাই। স্কুল কলেজ প্রভৃতি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেরাণী তৈয়ারীর কারখানা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মিঃ ওটেন যদি এই শিক্ষার আমূল সংস্কার করিবার ব্যবস্থা করিতেন, তাহাতে কাহারও দুঃখ প্রকাশ করিবার কিছুই থাকিত না; কারণ তাহাতে একটা নূতন কিছু হইবার অবকাশ পাইত। কিন্তু উচ্চ স্কুলকে মধ্যস্কুলে পরিবর্ত্তনরূপ সংস্কারের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারা যায় না।

অনেকেই শুনিয়া নিরাশ হইবেন যে, বোম্বাইয়ের প্যারাস্‌নিস্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত বিখ্যাত ঐতিহাসিক চিত্রাবলী বিক্রয়ার্থ বাজারে উপস্থিত করা হইয়াছে এবং আমেরিকানরা উহা কিনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ভারতীয় চিত্রাবলীর এই অমূল্য সম্পদ যাহাতে বিদেশে না যাইতে পারে, তজ্জন্য কেহ কেহ কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সফল হইল না। সাতারাতে প্যারাস্‌নিস্ পরিবারের যে মিউজিয়ম আছে, তথায় সংগৃহীত পুস্তকাদি ও দলিলপত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং বোম্বাই সরকার প্যারাস্‌নিস্ পরিবারকে মাসিক ২০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া উক্ত মিউজিয়ম বিনা সর্ত্তে এবং বিনামূল্যে গ্রহণ করিয়াছেন। প্যারাস্‌নিস্ পরিবারের সংগৃহীত চিত্রসমূহের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী মিঃ এ, ডি, প্যারাস্‌নিসের সহিত জনৈক সংবাদপত্র-প্রতিনিধি তাঁহার সাতারার গৃহে দেখা করেন। মিঃ এ, ডি, প্যারাসনিস তাঁহাকে বলেন,—সংগৃহীত চিত্রাদি ও পুস্তকাদির দুইটী বিভাগ আছে। সরকার ২০০ টাকার একটি মাসিক বৃত্তি দিয়া পুস্তকাদি তাঁহাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু চিত্রগুলির উপর সরকারের কোনই অধিকার নাই। কারণ উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্তু বর্ত্তমানে আর্থিক দায় হইতে উক্ত মূল্যবান ছবিগুলিকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যে কোন দেশ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে ছবিগুলি কিনিবার ডাক আসিবে। সে দেশকেই ঐ ছবিগুলি বিক্রয় করিতে হইবে। শিবাজী স্মৃতি সমিতি উক্ত চিত্রসমূহ রক্ষা করিবেন বলিয়া একবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু কার্য্যকালে তাহার কিছুই হইল না। বড়ই দুঃখের বিষয় যে, ভারতের কোনও ধনীব্যক্তি অগ্রসর হইয়া এই সমস্ত ভারতীয় বহুমূল্য চিত্রাদি রক্ষার জন্য কোনই ব্যবস্থা করিলেন না। ভারতের অতীত কীর্ত্তির প্রতি স্বদেশীয়গণের এই প্রকার ঔদাসীন্য বড়ই মর্ম্মান্তিক। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মার্কিণের হস্তেই এই ঐতিহাসিক সম্পদ অর্পিত হইবে।

গভর্ণমেণ্ট দুই পয়সা পোষ্টকার্ডের মূল্য এক পয়সায় কমাইয়া দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। পোষ্টকার্ডের মূল্য এক পয়সা হইলে গভর্ণমেণ্টের ৮৪ লক্ষ টাকা আয় কম হইত। গভর্ণমেণ্ট মোটরকারের শুল্ক শতকরা দশ টাকা কমাইয়া দেওয়ায় কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান সহ্য করিতে রাজী হইলেন, কিন্তু পোষ্টকার্ডের মূল্য কমাইতে পারিলেন না। মোটরকার মাত্র কয়েকজন ধনীতে ব্যবহার করে। তাহাদিগের মোটর গাড়ী ক্রয় করিতে দুই বা এক সহস্র অধিক খরচ হইলে কিছু আসে যায় না; কিন্তু পোষ্টকার্ডের মূল্য না কমিলে কোটি কোটি দরিদ্র ভারতবাসীর অসুবিধা হইবে। যাহারা ধনী তাহাদের সুবিধা করিয়া দিয়া গভর্ণমেণ্ট দরিদ্রদিগের অসন্তোষ বাড়াইয়া দিতেছেন

সেদিন নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরে নিখিল-বঙ্গীয় শিক্ষক-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। কলিকাতা সিটি কলেজের অধ্যক্ষ প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই উপলক্ষে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

এই বক্তৃতায় বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় কথার আলোচনা করা হইয়াছিল। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালার শিক্ষকদিগের ন্যায় দরিদ্র সম্প্রদায় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সরকার বাঙ্গালার শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির এবং তাঁহাদের ভবিষ্যৎ অবস্থার উন্নতি সাধনের কি উপায় করা যাইতে পারে, তাহার অবধারণ করিবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অধ্যাপক মৈত্র সেই কমিটীর অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন ঐ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি শিক্ষকদিগের, বিশেষতঃ পাঠশালার গুরুমহাশয়দিগের দুঃস্থ অবস্থার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে সাক্ষীদিগের মুখে শুনিয়াছিলেন যে, সরকারী পাঠশালার গুরুমহাশয়রা মাসিক ৪ টাকা হইতে ৫ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইয়া থাকেন। নর্ম্মাল স্কুলের ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক জন পণ্ডিত বহু দিন ধরিয়া মাসিক ২০ টাকা মাত্র বেতনে চাকরী করিয়া আসিতেছিলেন, ইহা তিনি দেখিয়াছেন। অধ্যাপক মৈত্র বলিয়াছেন যে, তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের বেতন কিছু বর্দ্ধিত করাইয়া দিয়াছেন; কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের বেতন এখন যাহা হইয়াছে, তাহাও পর্য্যাপ্ত নহে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন যে, বে-সরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদিগের অবস্থা প্রায় পূর্ব্ববৎই শোচনীয় রহিয়াছে। পল্লীগ্রামের অনেক পাঠশালার গুরুমহাশয়রা মাসিক ৫—৭ টাকার অধিক পায়েন না; তাহার ফল এই হয় যে, ঐ সকল কার্য্য করিবার জন্য ঠিক যোগ্য লোকই পাওয়া যায় না। আজকাল একটি সাধারণ ভৃত্য রাখিতে যাইলে তাহার খোরাক-পোষাক এবং বেতনাদি বাবদ প্রায় মাসিক ২৫ টাকা পড়ে। সাধারণ মজুররা দৈনিক ৮—১০ আনার কম মজুরী করে না। এরূপ অবস্থায় যদি পাঠশালার গুরুমহাশয়রা মাসিক ৫—৭ বেতন পায়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইঁহারা কখনই একনিষ্ঠ হইয়া শিক্ষকতা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন না, ইঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্য উপায়ে আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ নিতান্ত কঠোর দারিদ্র্যের সহিত অহরহঃ সংগ্রাম করিতে হয় বলিয়া ইঁহাদের মানসিক বৃত্তগুলি সম্যক্‌ভাবে স্ফূর্ত্তি পায় না। এইরূপ দুরবস্থায় পতিত ব্যক্তিদিগের হস্তে সুকোমলমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার ভার অর্পণ করাও ঠিক নহে। সেই জন্য শিক্ষকদিগের অবস্থা যাহাতে স্বচ্ছল হয়, অচিরাৎ তাহার সুব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় আর একটী কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, আজকাল দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষা-বিভাগের অভিভাবকেরা বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণ বাবদ বহু অর্থ ব্যয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তাদিগের এ প্রকার বিবেচনা ভাল মনে করেন না; আমরাও এ কথা পূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি। আমরা বলি, বিদ্যালয়ের গৃহ অস্বাস্থ্যকর না হইলেই হইল এবং সেই গৃহে যাহাতে ছাত্রগণের স্থান সংকুলান হয়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিলেই হইল। অধ্যাপক মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য-খণ্ডে এখন বহু লোকের ইহাই মত যে, বিদ্যালয়-গৃহের জন্য অধিক অর্থব্যয় সঙ্গত নহে। উয়োরোপে উন্মুক্ত স্থানে বসিয়া শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনেকে আন্দোলন করিতেছেন। সেখানকার অনেক বড় বড় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গৃহ প্রাসাদতুল্য নহে, ইহা অধ্যাপক মহাশয় স্বয়ং দেখিয়া আসিয়াছেন। সে দেশেই যদি বিদ্যালয়-গৃহাদি বহুব্যয়ে নির্ম্মিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের দেশে বিদ্যালয়ের জন্য বড় বড় ইমারত নির্ম্মাণের জন্য কর্ত্তাদিগের এত আগ্রহ কেন? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে, খাদ্যদ্রব্য যদি উপাদেয় হয়, তাহা সোণার থালে পরিবেশন না করিয়া কলার পাতায় পরিবেশন করিলে তাহার স্বাদও কমে না, উপাদেয়তাও কমে না। শিক্ষা যদি ভাল ভাবে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষাপ্রদানের স্থান প্রাসাদে না হইয়া বৃক্ষতলে হইলে তাহার মর্য্যাদা বা গুণের হানি হয় না। বোলপুর শান্তি-নিকেতনে যে প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা নাই, সেখানে যে বৃক্ষতলে বা সামান্য তৃণকুটীরে শিক্ষাপ্রদান করা হয়, তাহাতে কি শিক্ষার কোন অঙ্গহানি হইতেছে? বিশেষতঃ আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা

অধিকাংশই কুটীরবাসী দরিদ্র সন্তান। তাহাদের শিক্ষার জন্য বালাখানা তৈয়ারী না করিয়া যাহাতে সেই অর্থে উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়, ভাল পুস্তকাগার স্থাপন করা হয়, তাহা কি অধিক কার্য্যকরী নহে? শান্তিপুরের সম্মেলনে বহুদর্শী প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশবাবু যে এ বিষয়ে 'শিক্ষাবিভাগের' দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ভরসা হয়, অধ্যাপক মহাশয়ের এ কথা কর্ত্তৃপক্ষ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "আমরা কি ও কে" মূল্য—২৲

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ব্যথার পূজা" মূল্য—১॥৹

শ্রীসরসীবালা বসু প্রণীত "প্রবাল" মূল্য—২৲

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত "নারী" মূল্য—১॥৹

৺প্যারীশঙ্কর দাশগুপ্ত প্রণীত "অর্জ্জুন" মূল্য—॥৵৹

৺উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব প্রণীত "সমাজ" মূল্য—॥৵৹

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত "আচার্য্য শঙ্কর ও রামানুজ" (পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য—৫

শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বন্ধুর দান" মূল্য—২৲

শ্রীনিতাইপদ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্ন প্রণীত "সপ্তমাবতার" মূল্য—১॥৹

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত ও শ্রীযুক্ত জে, এম, সেন প্রণীত "মনস্বিতার মাপ"—॥৹

শ্রীবিধুভূষণ দত্ত প্রণীত "বদরীনারায়ণের পথে" মূল্য—৸৹

Publisher—**Sudhanshusekhar Chatterjea.**
of Messers Gurudas Chatterjea & Sons.
201. Cornwallis Street. CALCUTTA.

Printer—**Narendranath Kunar,**
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street, CALCUTTA.